CUK-HA878-62-P359

॥ পেপার ব্যাক ক্লাসিকস্-এর একটি বিশেষ ঘোষণা ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গণদেবতা ৭॥

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১২॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই ১২॥

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম ১২॥

আগামী ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে চারখানি বিখ্যাত ক্লাসিক উপন্যাস - এর পেপার-ব্যাক সংস্করণ।

• প্রতিটি বই-ই ল্যাকারিং করা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ এবং সুন্দর কাগজে ছাপা।

• স্থায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের গ্রাহক নম্বর জানিয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। গ্রাহকরা ২০% কমিশন পাবেন।

• স্থায়ী গ্রাহক ছাড়া অন্য যে কোন ক্রেতাদের ক্ষেত্রে চারখানি বইয়ের একত্র মূল্য মাত্র চল্লিশ টাকা (৪০৲)।

পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম অবদান

কৈলাস ও মানস সরোবর

সুন্দর কাগজে ছাপা ও প্রচুর আর্ট প্লেট সমন্বিত শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী
পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য - ১৮৲

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থরাজি
নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ৭৲

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনী

পঞ্চবটী ৮৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

হংসেশ্বরী ১০৲

* *

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
সুমথনাথ ঘোষের অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ উপন্যাস

সুদূরের পিয়াসী ৮৲

একালের বিখ্যাত জ্যোতিষী
কালপুরুষ-এর

বহু বিচিত্র মানবভাগ্য অভিজ্ঞতার সঞ্চয়
বাস্তব মানবজীবনের চাঞ্চল্যকর
ঘটনাবলীর দলিল

কালপুরুষের ডায়েরী ১৫

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে
লিখিত

পাঞ্চজন্য ১৬৲

২য় সংস্করণ বেরুলো

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ /৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯/৩৪-৮৭৯১

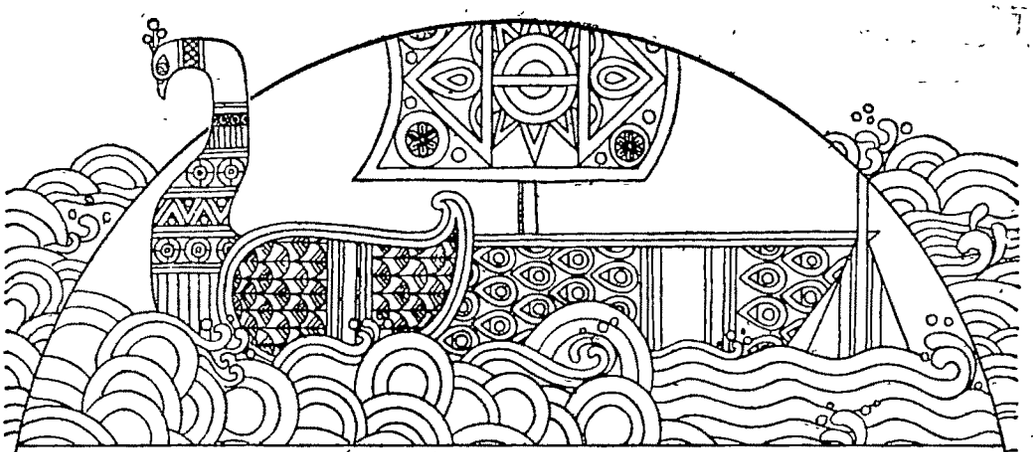

পূজায় চাই নতুন জুতো

অ্যাডমিরাল ৫৭

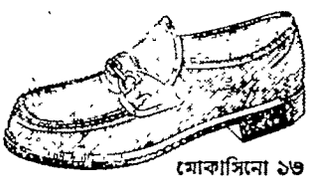
মোকাসিনো ১৩

এক্সিকিউটিভ ১৭

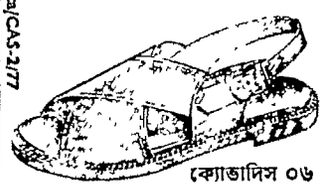
ক্যোতাদিস ০৬

জীন্‌স্ ৩৭

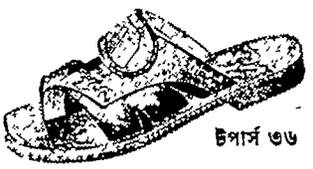
টপার্স ৩৬

নোভা ১৪

নোভা ১৩

সিনড্যারেলা ৭৮

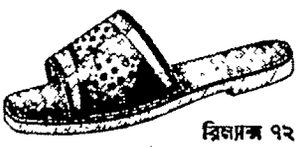
রিলাক্স ৭২

লিলিপুট ১৪

লিলিপুট ৪৪

জুনিয়ার ০৪

ব্লু মক ৫৪

Bata

Bata understands shoes

Bata/CAS-2/77

P 35,761

অমৃত
১৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা
৬ আশ্বিন ১৩৮৪
23 SEPT, 1977

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ৪ বৈকুণ্ঠ পাঠক
সমালোচনা ৪
একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের খসড়া ৬
উৎপলকুমার বসু
নগদ বিদায় ৮ কবিতা সিংহ
অপ্রকাশিত জীবনানন্দের সন্ধানে ১০
শারদ সাহিত্যের পাশাপাশি
শাড়ি ১৩ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ কাহিনী
কাঁসিরাঙায় গণ্ডার ধরতে গিয়ে ১৪
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কেউটে রপ্তানি ২৬ প্রবীর ঘোষ
নির্বাচন (গল্প) ২৮ পরিতোষ সেন
স্বৈরথ (গল্প) ৩৩ সুজিত দাশগুপ্ত
দুর্গা তৈরির কারখানায় ৪০
দেবব্রত রায়
পেলে দ্য সকার কিং ৪৪
রূপক সাহা
মিসা-৭৩। ৫০ শ্যামল রায়
বনবিবি উপাখ্যান ৫৩
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
পাকদণ্ডী ৫৫ লীলা মজুমদার
বাঙলার বাইরে বাঙালী ৫৭
খেলা ৫৮
সিনেমা ৬০
বিচিত্রা ৬৩

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
সুন্দরবন বদলাচ্ছে
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
গল্প লিখেছেন গৌতম রায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা
রাজশেখর বসুর চলন্তিকা
লিখেছেন উৎপলকুমার বসু

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
ভেতরের অলংকরণ করেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত।

সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বিনিশ্চয়

বাঙালি সংস্কৃতি-প্রিয় জাত, একথা সকলেই স্বীকার করেন, আর এ নিয়ে আমরা গর্বও বোধ করে থাকি। সেজন্যে সংস্কৃতি নিয়ে কোনো আলোচনা শুরু হলে অনেকেই রীতিমত উৎসাহী হয়ে উঠি।

ইদানীং কলকাতা শহরে খারাপ নাটক ও ক্যাবারে ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি শোনা যাচ্ছে। অপসংস্কৃতি কথাটা এখন অবিশ্যি অতিব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু অপসংস্কৃতি ব্যাপারটা আকাশ থেকে পড়ে না, দেশের জল মাটি আবহাওয়া থেকেই জন্মায়। একথা আমরা ক'জন ভেবে দেখি। ইংরেজ কবি ও সমালোচক এলিয়ট একবার বলেছিলেন, প্রত্যেকটি যুগ ঠিক সেই ধরনের সাহিত্যই পায়, যা পাবার যোগ্য সে। বলাই বাহুল্য এই সত্যটি শুধু সাহিত্যের বেলাতেই নয়, সংস্কৃতির অন্য সব শাখা-প্রশাখা, যেমন নাটক সিনেমা, গান ইত্যাদি সব কিছুর সম্বন্ধেই খাটে। সেজন্যে অপসংস্কৃতি, বিশেষ করে 'খারাপ' নাটক নিয়ে যদি আপত্তি তোলা হয় তাহলে বুঝতে হবে তার আসল শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে সমাজের মধ্যেই। কাজেই সমস্যাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি জিনিসটি অবিভাজ্য এবং তার একটি পূর্বাপরতা আছে। কোনো সমাজে যদি 'খারাপ' নাটক দেখা দেয় তাহলে অনুমান করা ভুল হবে না, সংস্কৃতির অন্য নানা বিভাগেও তার সমর্থন রয়েছে। এবং সে ব্যাপারটা হঠাৎ দেখা দেয় নি, অনেক দিন ধরে ধাপে ধাপে তার পরিণতি ঘটেছে।

এক্ষেত্রে, অর্থাৎ বাংলা নাটকের কোনো কোনো জায়গায় যদি অপসংস্কৃতির লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে, অনুরূপ ধরনের নাটক বহু দিন ধরেই চলছিল; এবং নাটক ছাড়াও, সিনেমা ও সাহিত্যের মধ্যেও তার জাত ভাইরা আগে থেকেই আসর জাঁকিয়ে বসে ছিল। কাজেই কলকাতায় যদি 'খারাপ' নাটক দেখা দিয়ে থাকে তবে চোখ ফেরাতে হবে, সিনেমা ও সাহিত্যের দিকেও। বিশেষ করে সিনেমার দিকেই, কেননা সিনেমা জনরুচি সৃষ্টি কিম্বা তাকে কলুষিত করার ব্যাপারে নাটকের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী।

কিন্তু সব কিছুর আগে স্থির হওয়া দরকার, 'খারাপ' নাটক বলতে কোন্ ধরনের নাটক বোঝানো হচ্ছে?, এবং তার চেয়েও যা জরুরী, 'খারাপে'র সংজ্ঞা কী?

কেননা সকলেই জানেন, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্নটি খুবই জটিল। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক দেশেই দেখা গেছে, এক যুগের নীতিবোধের নিরিখে যা অপসংস্কৃতি কিম্বা অশ্লীল মনে করা হয়েছে, অন্য কালে সেটা ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।

বিষয়টি নিয়ে তাই স্থির মস্তিষ্কের বিবেচনা করা দরকার। আবেগের হাত ধরে এগোলে বিপরীত আবেগ আবার পেণ্ডুলামের মতো উল্টো দিকেও ঠেলে নিয়ে যেতে পারে।

সাহিত্য

এখন তাদের শেষ। লেখকদের শারদীয় শ্রমের শেষ। পুজো সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন পড়ছে কাগজে। পাঠকরা তাকিয়ে আছেন—কবে কোন্ কাগজ বেরুবে।

সারা দেশে ধান বোনা শেষ। আমন ধানের চারা ভালভাবে বসে গেছে। আশ্বিন কার্তিকে ধানচারা বড় হয়ে বিষেনকাঠি ছাড়বে। অবশ্য জ্যাঠো বোনা গেতু ধান অনেক আগে পাকবে। লক্ষ্মীপুজোর কদিন পরেই কাটা পড়বে। কিন্তু বেশিরভাগ জমিতে ধান হলুদ হবে অঘ্রান-পৌষে।

ততদিনে শারদ সংখ্যার নিউজপ্রিন্টও হলুদ হবে। হাতে হাতে ঘুরে মলাট-গুলো খসে যাবে। তখনই শারদ সাহিত্যের সাগর থেকে দু-একটি নাম—দু একটি লেখা ভেসে উঠবে। অমুক গল্প। তমুক কবিতা। সেই উপন্যাসটি। এমনি করেই বর্ষার মুখে মুখে লেখা লেখাগুলো শীতে এসে ঝাড়াই-বাছাই হয়ে খানিকটা হবে—ধান। আর বেশিরভাগই চিটে। পাঠকের রুচির বাতাস তা উড়িয়ে দিয়ে পুষ্ট ধানটি বেছে নেবে।

সাহিত্যের খামারে এখন অনেকটাই খড়। চিটে ধান। চাষীর ভাষায় পুষকল বা পুষ্ট ধান যেকোন জমিতে খড়-চিটের তুলনায় চিরকালই কম। শারদসংখ্যার জন্যে দর্ঘণ্ট হলকর্ষণ। কিন্তু পরিণামে—পুষকল ধান কতটুকু?

বর্ষার মুখে মুখে সারা দেশ জুড়ে হাল পড়ে। আর পড়ে লেখকদের কলম। কাগজে। চরিত্র, আইডিয়া, কল্পনা—তার সঙ্গে থাকে লেখকের জীবনযাপন—বিরক্তি, আবিষ্কার, সুখ ও স্বপ্ন। এসবের মিশেলেই শারদ সংখ্যায় গল্প উপন্যাস ফলে। কবিতা ফুটে ওঠে।

সাহিত্যের এই আমন চাষের বয়স বেশি নয়। এটি পত্রপত্রিকার আবিষ্কার। নতুন হলেও বাঙালী গ্রহণ করেছে। লেখক লিখছেন। পাঠক পড়ছেন। পড়ে ভুলে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা যেন আর সাহিত্য নয়। সাহিত্য আমরা মনে রাখি। ভুলি না। ভুলে যাই খাদ্য। সাহিত্য খাদ্য হয়ে যাচ্ছে কেন? যাই দি ডিমান্ড অব পপুলার প্রেস—কিছু লেখককে লিখে যেতেই হবে। অবিরাম। অনবরত। জনপ্রিয়তার ফড়ার হিসেবে কয়েকজনকে ব্যবহৃত হতে হবে। এই পদ্ধতিতে লেখকের জন্যে (১) প্রচার, (২) পাঠক, (৩) দক্ষিণা আছে। নেই যে জিনিসটি—তার নাম শিল্প। তবু পপুলার প্রেসের চাহিদায়—এত ডামাডোলেও যেখানে লেখা শিল্প হয়ে ওঠে—সেখানে পাঠক নিজেকে ধন্য মনে করবেন। কিন্তু এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে।

এদেশে বছরে সত্তর ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। আমরা বাঙালীরা সারা বছরে কাঁদিও সত্তর ইঞ্চি। কলকাতার মাটি ভসভসে। পাঁচশো ফুট নিচেই শুধু জল। তাই ভাবাবেগ আমাদের অস্থি। নিস্পৃহতাকে আমরা অবহেলা বলে ভুল করি। মোটামুটি কান্না-কাটির ময়দানে ডোবানো গদ্যগাঁথাকে আমরা সদাই মহৎ ভেবে গ্রহণে অভ্যস্ত। এখন তো এদেশে বছরে তিনবার ধান হচ্ছে!

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সমালোচনা

বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক

বিদেশীয় ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাঁরা আমাদের নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। সুদীর্ঘ মুসলমান আমলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা নানা কারণে টোল ও চতুষ্পাঠীর চৌহদ্দির মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিস্মৃত অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করলেন বিদেশীয় ভারততত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতরা। তাঁদের গবেষণার ফল থেকেই জানতে পেরেছি আমাদের পূর্ব ইতিহাস, এবং এই জানা থেকেই এসেছে আত্মগৌরবের অনুভূতি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম মূল প্রেরণা এসেছে এই স্বাজাত্যাভিমান থেকেই। তাছাড়া এই গৌরববোধ ভারতবাসীর মনে এনেছে আত্মবিশ্বাস, তারা উপলব্ধি করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ন্যূন নয়, বরং অনেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এই গৌরববোধ পরোক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছে।

দুঃখের বিষয় এই সব বিদেশী মনীষীদের দান আমরা কদাচিৎ স্মরণ করি। যাঁরা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিদ্যাযতনে চর্চা করেন তাঁরা বিদেশীয় ভারততত্ত্ববিদদের নাম এবং কর্মের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসী এঁদের সাধনার কথা সামান্যই জানেন।

বিদেশীয় পণ্ডিতরা বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার তাগিদেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাসক হিসাবে ইংরেজদের না হয় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার তাগিদ ছিল, কিন্তু অন্য দেশীয় পণ্ডিতদের মনে স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না।

গৌরহরিগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আঁকেতিল দ্য পেরোঁ সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম ভারতবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেন। সে কাল বিদেশের নানা কেন্দ্রে এখনও চলছে। উনবিংশ শতক থেকে ভারতীয় পণ্ডিতরা বিদেশীয় পথিকৃৎদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আলোচনার ধারাটিকে আরও বেগবান করে তুলেছেন।

বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিকদের সাধনার পরিচয় লাভ না করলে নিজের দেশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় লিখিত। এই সব রচনা বাংলায় অনুবাদ হবে এমন আশা সুদূর-পরাহত। গৌরহরিবাবু আলোচ্য গ্রন্থে বাঙালী পাঠকের সাধারণ প্রয়োজন অনেকটা মিটিয়েছেন। বিদেশী পণ্ডিতদের সাধনার ক্ষেত্র, কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে পরিচয় এবং ভারত সম্পর্কিত তাঁদের রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠকদের জন্য সন্নিবেশিত করেছেন। আঁকেতিল দ্য পেরোঁ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিকের কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মোট সংখ্যা ২১৪। পঁচিশ-জন খ্যাতনামা পণ্ডিত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি[illegible]। লেখক একান্ত নিষ্ঠা ও [illegible] [illegible] সূত্র সুসংগ্রথিত করেছেন।

বিদেশী নামের যথাযথ প্রতিবর্ণীকরণ সযত্নে করা হয়েছে; সঙ্গে রোমান হরফে নামটি ছেপে দেওয়াটা সুবিবেচনার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে ভারতবিদ্যা সম্পর্কে এটি একটি মূল্যবান রেফারেন্স বই হিসাবে গণ্য হবে। বইটির দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষিত পাঠকমহলে এর সমাদর হয়েছে। এ জাতীয় বই ভারতের আর কোনো ভাষায় আছে বলে আমাদের জানা নেই। এমন একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করে গৌরাঙ্গবাবু বাংলা ভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক— শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ। মূল্য পাঁচিশ টাকা।

এক অনন্য স্মারকগ্রন্থ

ডেভিড হেয়ার আধুনিক বাঙলা গঠনের অন্যতম পুরোহিত। ঊনবিংশ শতকের বাঙলা-রেনাশাঁ ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করেছে; যদিও য়ুরোপীয় পুনর্জাগরণের সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে বাঙলার রেনাশাঁ আংশিকভাবে সফল হয়েছিলো, সমগ্র দেশ জুড়ে এর প্রভাব যেমন অনুভব করা যায় নি, তেমনি ফললাভের ক্ষেত্রে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ বঞ্চিতই রয়েছে দীর্ঘকাল, চিত্তমুক্তি বলতে যা বোঝায় তা এদেশে এখনো ঘটেনি। এর কারণ যা-ই হোক, স্বীকার করতেই হবে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয় এই সময় থেকেই, ক্রমশই তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ডেভিড হেয়ার, একজন বিদেশী, ভাগ্যপরিবর্তনের স্রোতে ভেসে অনেকেরই মতন এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভের চাইতে এদেশকে নিজের বলে মনে করে সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আধুনিকীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশ এই মহাত্মাকে বাদ দিয়ে কেউই ভাবতে পারে না। মানুষটির মধ্যে চারিত্রিক মহত্ত্ব ও কর্মশক্তির সমন্বয় হয়েছিল যা সেকালে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মধ্যেই এরকম পূর্ণতা লাভ করেছিলো।

আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষ গঠনে এই মানুষটির ভূমিকা কতোখানি তা নতুন করে আর একবার ভাবা উচিত, যদিও তাঁর দান আমাদের অজানা নয়। রাখাল ভট্টাচার্য সম্প্রতি ডেভিড হেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংকলন সম্পাদনা করেছেন যা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

সংকলনটিতে ইংরেজী ও বাংলা রচনা সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে স্বনামধন্য লেখকও যেমনি আছেন তেমনি অল্পপরিচিত লেখকও রয়েছেন। যদিও আগে ভাগেই বলে রাখা ভালো, মুদ্রণ পারিপাট্য, মূল্যবান ছবি, কাগজ ইত্যাদিতে যে মনোযোগ সম্পাদক দিয়েছেন, লেখক ও লেখা সংগ্রহ ও নির্বাচনে ততোটা মনোযোগী হননি। তথাপি এই ঐতিহাসিক সংকলনটিতে যেসব মূল্যবান লেখা রয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়। হেয়ার, তথা ঊনিশ শতক সম্বন্ধে আগ্রহী মাত্রই সংকলনটি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন।

১৪৫ বছর আগে ডেভিড হেয়ারের সম্বর্ধনা, ৫৬জন এদেশীয় যুবকবৃন্দ দিয়েছিলেন, তার উত্তরে হেয়ার কি বলেছিলেন তা উদ্ধার করে কুমারেশ ঘোষ একটি প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। সমসাময়িকের চোখে ডেভিড হেয়ার—নবহরি কবিরাজ; মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার ও বাংলার নবজাগরণ—অমর দত্ত; শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদি পরিকল্পক হেয়ার—পান্নালাল দাশগুপ্ত; ডেভিড হেয়ারের ধর্ম—রাখাল ভট্টাচার্য; ডেভিড হেয়ার ও তৎকালীন কলিকাতা সমাজ—তরুণকুমার সেন, এই সবকটি প্রবন্ধই তথ্যনির্ভর, সুলিখিত, পরবর্তী হেয়ার-অনুসন্ধিৎসুদের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

ইংরেজী বিভাগ দামসাধ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আশা করে যার্থ হতে হয়। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি ভালো। শিবপ্রসাদ সমাদ্দার বরং নতুন তথ্য দিয়েছেন—পাঠকের চিন্তা ও আগ্রহের খোরাক আছে তাঁর লেখায়। সর্বশেষ বলা যায়, এই গ্রন্থে হেয়ারের বিচিত্র কর্মজীবনকে নানা কোণ থেকে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। তার অভাব চোখে পড়ে। তবে সম্পাদক যে একটি প্রয়োজনীয় কাজে যথেষ্ট যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছেন তা স্বীকার করতেই হবে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ডেভিড হেয়ার দ্বিশতবার্ষিকী সংকলন ১৯৭৫-৭৬। দাম ৩ টাকা।

চাণক্য সেনের এপিক উপন্যাস

পুত্র, পিতাকে

কি সব অঘটন ঘটল ষাট দশকের দুনিয়ায় যাতে পুত্রেরা সব পিতাদের নির্মিত সমাজ সভ্যতার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে রুখে দাঁড়াল? আমেরিকার পুত্রেরা পিতাদের হাতে প্রজ্বলিত যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরতে রাজী হ'ল না; ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা টলমল হ'ল পুত্রদের বিদ্রোহী প্রতিবাদে; চেকোস্লোভাকিয়ার পুত্ররা হঠাৎ 'মানব না' ধ্বনি তুলে বেঁকে বসল; ভারতবর্ষে, বিশেষকরে বঙ্গদেশে হাজার হাজার পুত্ররা পিতৃ-আয়োজনকে পূজা দিতে অসম্মত হ'ল। বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরিত হ'ল একালের অন্যতম প্রধান ঘটনা: পুত্র ও পিতার পারস্পরিক ব্যবধান, যার ইংরাজী নাম জেনারেশন গ্যাপ। এই বিরাট উপন্যাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

দাম : ১৮.০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

ডঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন ১৯-৮০

অধ্যাপক মুকুল বসু, ডলি বসু ও সমীর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল ১৮-৯০

For Degree Course

Prof. S. N. Basu's

Income Tax Simplified
(With Amendments for 1977-78) Latest Ed. 20.00

Standard Problems on Accountancy
(witn Theories) 12.00

Standard Problems on Advanced Accountancy
(with Solution) 8.50

Model Problems on Accountancy 7.00

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সেনের

হিসাব পরীক্ষা শাস্ত্র (Auditing) ১৫.০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩।

একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের খসড়া

উৎপলকুমার বসু

সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী যখন উত্তর কলকাতার শহরতলিতে প্রথম প্রদর্শিত হয় তখন বরানগরে আমার এক বন্ধুকে তার পাড়ার ভবিষ্যদ্বক্তা সাইকেল বিক্রেতা-ওয়ালা বলেছিল—ছবিটা ভালো, তবে পাবলিকে নেবে না।

এর থেকে গূঢ় সমালোচনা আর কি হতে পারে!

বস্তুত, পাবলিকে নেবে কি—এই ভূতগ্রস্ত চিন্তা প্রত্যেক লেখক বা চিত্র-পরিচালকের সুখনিদ্রা হরণ করে। পাবলিক বলতে যা বোঝায় তা নিয়েও তর্ক চলে প্রকাশকের বৈঠকে বা প্রোডিউসারের দপ্তরে।

বোম্বে ফিল্মের এক বিখ্যাত চরিত্রের সঙ্গে আমার একদা সখ্যতা হয়েছিল। না, এ-কে আপনারা রুপালি পর্দায় দেখেন নি। ধরা যাক এর নাম মানিকচাঁদ। মানিকচাঁদের কাজ হচ্ছে ফিল্মে 'একস্ট্রা' সরবরাহ করা। তার অফিস ছিল—ছিল কর্মচারীদল। আধ ঘন্টার নোটিশে সে আপনার দরজায় হাজির করে দিতে পারে দুঃস্থ মাতা, ঘটোৎকচবর্ণশালী বালিকা বা পূর্ণাবয়ব এলশেসিয়া কুকুর যে সকলের কথা শোনে এবং ঘরবাড়ি নোংরা করে না তার চেয়েও বড়ো কথা—মানিকচাঁদ বোম্বাই-এর চিত্র পরিচালকদের উপদেশ দেয়। সে উপদেশ অত্যন্ত ভারি ও মূল্যবান। এর কথা শুনে চলেছিলেন বলেই আজ অমুকে লাখোপতি, তমুকে জাপানি গাড়ি চড়ে—এ-টা মানিকচাঁদ আমাকে প্রায়শই বলতো। সে আরো বলতো হিন্দি সিনেমা শহর থেকে যত পয়সা তোলে—তার দশগুণ উপার্জন করে গ্রাম থেকে। অর্থনীতির অধ্যাপকের মতো সে মোটা চশমা মুছতে মুছতে আমাকে জানিয়েছিল: ভারতবর্ষের শতকরা আশিজন লোক গ্রামে থাকে। গ্রামের লোক কি দেখতে চায়? তার একটা তালিকা তৈরী করা যাক। আপনি ভাবছেন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের সীতাসমান সতীত্ব যা ঠাকুরদেবতার অলৌকিক লীলাখেলা। না। আপনি তো মানিকচাঁদের মতো দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞ নন। তার তালিকার সর্বপ্রথম উপকরণ—সাপ। যে কোনো ছলছুতোয় দু-একটা সাপের কীর্তিকলাপ ফিল্মে দেখাতেই হবে। দ্বিতীয়ত, বাছুরসমেত গাভী। ধরা যাক নায়ক টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন এবং ঘোড়ার খুরের রাঙা ধুলো সরে যেতেই দেখা গেল পথের পাশে একটি লোক গরু দুইছে। পাশে দাঁড়িয়ে বাছুরটি। এক মিনিটের দৃশ্য কিন্তু আবেদন সহস্র বছরের। তারপর, গঙ্গামাইয়া এবং তৎসম্পর্কিত ভক্তিস্নানের দৃশ্য যদি দেখাতে পারেন, তবে আপনার রাজহংসটি যে বহুকাল স্বর্ণডিম্ব প্রসব করবে—এটা নিশ্চিত।

আমি মানিকচাঁদকে সন্দেহের চোখে দেখতাম। যতটা না তার মেকি দেশপ্রেমের জন্য—তার চেয়েও বেশি তার অর্থকরী দূরদৃষ্টির জন্য। সত্যি তার ছবি দেশব্যাপী দরিদ্র ক্ষুধার্ত লোকেদের গাঁট খুলে স্বল্প সম্বলটুকু বের করে আনতো। মানিকচাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সাংস্কৃতিক পকেটমারা বললে হয়ত আপনাদের আপত্তি হবে না। কিন্তু সে কি কোনো বেআইনী কাজ করছে? অবশ্যই নয়। হয়ত বা অনৈতিক তার দৃষ্টি—দূরনিবদ্ধ অথচ ট্যারা।

এই ধরনের মানিকচাঁদেরা আজ ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের জগত ছেয়ে ফেলেছে। দুপা চললেই এদের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

দেখা যাক, আজ আমি আপনার জন্য অমনই এক মানিকচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি কিনা। আসুন, আজ আমরা এমন এক 'জনপ্রিয়' উপন্যাসের খসড়া তৈরী করি যা ঐ বিখ্যাত (কি যেন নাম) শারদীয়ার সম্পাদক দুহাতে লুফে নেবেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই আপনার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবে পরিচালকের কালো অ্যাম্বাসাডর। উপন্যাসের কাহিনী কি রকম হবে? প্রেম-নির্ভর? সামাজিক? না কি বিয়ের রাতে ধরনের কুসুমাস্তীর্ণ রগড়। আমার অনুরোধ ঐ লোকারণ্য পথে যাবেন না। বরঞ্চ ডিটেকটিভ গল্পের কথা ভাবা যাক। বাংলা সাহিত্য বা চলচ্চিত্রের এই ভূখণ্ডে আজ একটু নিশ্বাস ফেলার মতো স্থান আছে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার পাঠককে কখনোই নির্বোধ বা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না। অর্থাৎ যদিও জানি আপনি আর দশজনের চেয়ে চালাক ও কুশলী—না হলে এসব লেখা পড়বেন কেন—তবু নিজের রচনায় যেন সেই ভাবটি না ফুটে ওঠে। মনে রাখবেন, রবিবার দুপুরে, আত্মতৃপ্ত মধ্যাহ্নভোজনের পর, যখন চারদিকে একটু ঝিম ধরেছে এবং পাড়ার কুকুরগুলো অব্দি হাঁকাহাঁকি থামিয়ে দিয়েছে, তখন, সেই অবকাশে আপনার ভক্ত পাঠক বা পাঠিকা হাতে তুলে নিয়েছেন আপনারই লেখা দয়াময় সান্যালের শেষ আর্তনাদ বা ঐ জাতীয় কোনো জমজমাট সাহিত্যপ্রচেষ্টা।

মোটামুটি, গল্পের লাইন যেন বিশেষ জটিল না হয়। সদ্যমৃত দয়াময় সান্যালের চরিত্রও যেন প্রচলিত গোয়েন্দাকাহিনী অনুযায়ী ধনী কিন্তু অবিবাহিত, সতর্ক অথচ অন্যমনস্ক, কিছুটা রহস্যময়, কিছুটা উদার—বিশেষ নিকটের চাকর, ড্রাইভার ইত্যাদিদের প্রতি—এইভাবেই যেন পরিবেশিত হয়। শুরুর দু-এক পাতার মধ্যে যদি পাঠককে বেঁধে ফেলতে না পারেন তাহলে চলবে না। শুরু কিভাবে করবেন? তারও একটা প্রচলিত রূপ আছে। যেমন ধরুন:

> ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে হাওড়া স্টেশন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে গেল নাইন আপ দুন এক্সপ্রেস। মধ্যবর্তী একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরার গদিতে অধিকতর আরামে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, হেলান দিয়ে বসলেন কানপুরের বিখ্যাত চামড়ার ব্যবসায়ী দয়াময় সান্যাল.....

দূরপাল্লার ট্রেনে এপর্যন্ত কত না নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখা গেছে। অথচ নেহাত গবেট না হলে কোনো আত-ওরকম দুঃসাহসিক ক্রমে হাত

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জরি • সিল্ক
• অঁত • মিল
• গেঞ্জি
• শার্ট • স্যুট
• ছিট কাপড়

শারদীয় অমৃত ১৩৮৪

জীবন / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
চীনে সুনীতিকুমারের সঙ্গে / গোপাল হালদার
রাজার সঙ্গে দেখা / বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাকবি ও মহাপ্রভু / অমিতাভ চৌধুরী
আমেরিকায় রবিশঙ্করের মুখোমুখি / জহুরী সওদাগর
নিভে যাওয়া নক্ষত্র / মধুসূদন মজুমদার
সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি
সংসারী সুভাষচন্দ্র / শিববত্রত ঘোষ

বড়গল্প

এই রকম / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ন'বাবু, সেজোবাবু / পরিতোষ সেন
দৃশ্যপটে আমিই নায়ক / মহাশ্বেতা দেবী
একদিন অমলা আসবে / কবিতা সিংহ

উপন্যাস

মানুষের ঘর বাড়ি / অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের শেষে / নিমাই ভট্টাচার্য
তুমি, মালিনী চৌধুরী / চাণক্য সেন
উমাপতির সাধআহ্লাদ / প্রফুল্ল রায়
অজ্ঞাতবাস / শৈবাল মিত্র
কক্ষপথ / তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, সামসুল হক, তরুণ চৌধুরী, পরমানন্দ সরস্বতী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রানা চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ ঘোষ।

কৃষ্ণ ধর, কালীকৃষ্ণ গুহ, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, শম্ভু রক্ষিত, দেবারতি মিত্র, রত্নেশ্বর হাজরা, অজয় সেন, রুদ্রেন্দু সরকার, প্রভাত চৌধুরী, প্রতিমা রায়, তুষার চৌধুরী।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

গল্প

ফণু / প্রেমেন্দ্র মিত্র
পার্বতী / গজেন্দ্রকুমার মিত্র
হিসেবের বাইরে / আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ফসল তোলার দিনে / আশাপূর্ণা দেবী
কলকাতা থেকে ফেরা / শচীন দাশ
ছোট মাপের মানুষ / সুধাংশু ঘোষ
চিকে / শিশির লাহিড়ী
অ্যানাটমি / নবকুমার বসু
চাই/হীরক রায়
শেষ বিকেল / বুদ্ধদেব গুহ
মহিষ ও জ্যোৎস্না / শিশির দাশ

অলংকরণ : সুবোধ দাশগুপ্ত, ধ্রুব রায়, গৌতম রায় এবং নিতাই ঘোষ

দাম দশ টাকা ॥ সডাক বারো টাকা

নগদ বিদায়

কবিতা সিংহ

ধন-দেবতার জন্য ভারতের প্রথম 'জ্ঞান-পীঠ' পুরস্কার বাংলার জন্য নিয়ে এলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন কিন্তু সাধারণ বাঙালী জনগণ খুশী হলেও, বাঙালী ইন্টালিজেনসিয়ার একটি সিনিক্ সিংহভাগ অবিমিশ্র আনন্দিত হতে পারেননি। অনেক তথাকথিত পত্র-পত্রিকা এমনও বলেছিলেন যে—তারাশঙ্কর, বন্দ্যোপাধ্যায় মাড়োয়ারীর টাকা গ্রহণ করেছেন।

অথচ আমাদের এমনই দুমুখো মূল্যবোধ, যে, পরবর্তীকালে যখন অন্য একজন বাঙালী কবি ঐ একই পুরস্কারটি লাভ করলেন তখন ওই একই তথাকথিত পত্র-পত্রিকায় প্রচুর সাধুবাদ অভিনন্দন ও পুরস্কারের যথোপযুক্ততার কথা সাড়ম্বরে ঘোষিত হল এবং লক্ষ টাকার তোড়া থেকে অবলীলা ক্রমে 'মাড়োয়ারী' ছাপটি মুছে গেল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বীরভূমের এক গেঁয়ো মানুষ। ঐতিহ্যবাহী এই সহজ পুরুষটি ছিলেন কথাবার্তায় সাধাসিধা স্টাইল বা শক দেওয়া উক্তি তাঁর চরিত্রে ছিল না। মনে পড়ে, তিনি যখন পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন এক ঘরোয়া কথোপকথনে বলেছিলেন—এত বৃদ্ধ বয়সে আর পুরস্কার কেন? এ পুরস্কার তরুনতর কেউ পেলে তবু কিছু করতে পারতেন। কিন্তু এসব গতানুগতিক কথায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের আসন টলে না। টলার কথাও নয়। তাঁদের আসন টলে শকিত ভান-স্বীকারোক্তিতে। যেমন ধরুন পুরস্কার পাবার পর যদি কোনো কবি বলেন—'অনেকগুলো টাকা তো!' এবং অন্য এক কবি ধুয়ো ধরেন—'বরং একটা গাড়ি কিনে ফেলুন না, কেন?' তাহলে কেমন লাগে? অবশ্য এঁরাতো এমনি সব কথা বলবেনই। এ সব কথা এঁদের মুখেই সাজে। যাঁরা মাটির ছাঁচে তোলা দেবীমুখকে বাখেন কিউরিও করে এবং 'কোশাকুশি'-ও 'পিলসুজ'কে ব্যবহার করেন 'ছাইদানী' করে, এবং যাঁরা সাহিত্যিক মিলন সেতু গড়ার মিশন নিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার আকাশ-পথেই থাকেন সতত সঞ্চরমান, বাংলাসাহিত্য তাঁদেরই ইচ্ছামত কাঁচকাটা হয়ে বিশ্বের দরবারে বিকলাঙ্গ পৌঁছোয়। 'অনেকগুলো টাকা'—টাকা, টাকা, টাকা এভাবে একটি পুরস্কারের অবমূল্যায়ন হতে দেখে সেদিন কিন্তু বর্তমান লেখকের মত একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী সাহিত্য কর্মীর সমস্ত অন্তঃকরণ বিতৃষ্ণায় গুটিয়ে গিয়েছিল। পুরস্কারকে যদি আমি শুধু কতকগুলো নিছক টাকা মনে করি, তাহলে সে টাকা না নেওয়াই তো ছিল ভালো। টাকার প্রয়োজন থাকলে তো সাত হাত মাটিই কাটা যায়, কিংবা মোট বওয়া যায়। সাহিত্য পুরস্কার-ছলে তা গ্রহণ করা কেন?

কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। বাংলা সাহিত্যের আকাশের শীর্ষ দেশে যেন ঝকঝক করে জ্বলছে সোনা রুপোর চাকতি, ডলার, রুবল ও ইন্ডিয়ান কারেনসী। বাংলা সাহিত্যের আজকের দিনের সঙ্গে এই নগদ-বিদায়ের পালা দিয়েই, বিগত দিনের মূল্যবোধের আকাশপাতাল তফাৎ ঘটে গেছে। একদিন মৃত্যুশয্যাশায়ী কন্যাকে সামনে রেখে তারাশঙ্করকে লিখতে হয়েছিল ওষুধ-পথ্যের পয়সা জোগাড়ের জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরীর ছত্রে ছত্রে অর্থের জন্য যন্ত্রণার কথা রয়েছে। নজরুলকে অনটনের জন্য গ্রন্থসত্ব বিক্রি করে দিতে হয়েছিল সেদিন। সারা জীবন তাচ্ছিল্যের আড়ালে থেকে মৃত্যুর পরে বাজারে কদর পেয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। অথচ আজকের বেশির ভাগ প্রধান লেখকই প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী এবং কেউ কেউ ক্ষমতাসীনও।

কেবল টাকার জন্য অন্তত এঁদের কারোরই কলম ধরার দরকার নেই। (অবশ্য একটি দুটি ব্যতিক্রম এখনও আছেন। একটি নাম তো প্রায়ই স্মরণে আসছে। তিনি হলেন সমরেশ বসু।) অথচ টাকার জন্য এঁদের আজকের আকুলতা প্রায় কুসীদ-জীবির মত কুশ্রী। পাবলিশারের ঘরে ঘরে ঘোরাঘুরি, কেউ লেখা চাইতে এলে—'আগে দাদা টাকা ফেলে কথা বলুন', ইত্যাদি টালবাহানা, উপন্যাসের অর্ধেক দিয়ে দেয় কি? গল্পের খাতিরে বলে একধরনের বাকস্বাধীনতা লেখকদের দেওয়া হয়, জেনে রাখুন। যদি তা-ও আপনার মন খুঁত-খুঁত করে—তবে বিখ্যাত চামড়ার ব্যবসায়ী কলকাতায় নতুন-ওঠা দশতলার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিন। সেখানে আরও বহু সন্দেহ উদ্রেককারী চরিত্রকে আপনি ঝটপট এনে মেশাতে যাবেন। যেমন, দারোয়ান বা লিফটম্যান বা দেশ থেকে সদ্য ঘুরে আসা মেদিনীপুরি চাকর। এরকম একটা সূত্রপাত মন্দ কি:

শেষ নিমন্ত্রিত অতিথিকে বিদায় জানিয়ে দয়াময় সান্যাল ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। হাত দিয়ে সোজা করে দিলেন। দেয়ালে ঝোলানো আধুনিক পেইন্টিংটাকে। একটু যেন বেঁকে গিয়েছিল। শেষ সিগারেটটা ধরালেন আলস্যভরে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন ঘরের অগোছালো রূপ। টেবিলের উপর প্লেটে অর্ধভুক্ত বাদাম, আলু-ভাজার ছড়াছড়ি। মদের খালি বোতল ও গেলাসগুলি সরিয়ে নেবার লোক এখন নেই কেননা হরিপদকে তিনি সন্ধ্যেবেলাতেই ছুটি দিয়েছেন। দূরে একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল। দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো দু-টো।

ভিজে তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মুছে জামাকাপড় বদলিয়ে ক্লান্ত ধনকুবের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বাথরুমে অ্যাশট্রের উপর সিগারেটটা তিনি ফেলে এসেছেন। মাথার কাছের জানালা না হয় খোলাই থাক—ভাবলেন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দয়াময়ের মৃদু নাসিকাধ্বনি শোনা গেল। পরিশ্রমী লোক বলে—তাঁর অনিদ্রা রোগের বালাই নেই।

একতলায়, রাত্রে যেখানে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের গাড়িগুলি তুলে রাখা হয় তারই এক কোণে দারোয়ান রামনেহাল খাটিয়ায় শুয়ে আছে। কিন্তু তার ঘুম আসছে না। সে ভাবছে কাল পোস্ট-অফিসে গিয়ে এ মাসের মাইনেটা মানি-অর্ডার করে দেওয়া যাবে কি? এমন সময় দূরে, হয়ত বা উপরের কোনো এক ফ্ল্যাট থেকে, শোনা গেল দীর্ঘ এক আর্তনাদ। রামনেহাল চকিতে উঠে এল বাইরে। মাথা তুলে দেখলো ফ্ল্যাটবাড়ির বিশাল শাদা দেয়াল, আলো জ্বলছে না কোনো জানালার না কি না তলার বকসীবাবুদের ঘরে একটা কিছু জ্বলছে এবং নিভে গেল পরমুহূর্তেই। দু চার মিনিট সে অপেক্ষা করলো গেটের কাছে। আবার যদি কিছু ঘটে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না কেবল চোমাথায় একদল

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রজকিশোর দত্তের

অ থেকে বিসর্গ

এই লেখকের পরের বই

সরমা ও আমি—উপন্যাস

টিকলু—হাসির গল্প

এ নহে গল্প—গল্পগুচ্ছ

ইন্ডিয়ান বুক মার্ট

১২।১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

নাথ ব্রাদার্স ও হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

কলিকাতা-১২

বাকিটা ধরে রেখে দর কষাকষি, ছোটগল্পকে উপন্যাস বলে চালানো একবার জবাই করা মুর্গীকে নাম বদলে আর একবার চালানো। ছোট ব্যাপারকে ব্যাগে ভরে লোভের হাত-ছানি দোলানো। শিরোনাম বাদ দিয়ে কতকগুলো ফিচারকে অধ্যায় বলে চালিয়ে, উপন্যাসোপম বইকরা—এসব তো চলেছেই। এবং আশ্চর্য এই কীর্তিকলাপের সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু ব্যক্তি এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়ে যাচ্ছেন যে, যেখান থেকে আমেরিকা রাশিয়া চীন জাপান সমদূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো ক্যাম্প পুরস্কার দিলেই এঁরা অঞ্জলি পাতেন। কারণ এঁদের এই উচ্চস্তরে পৌঁছোলে টাকার আর কোন জাত থাকে না। সাহিত্য বিক্রয়ের নগর বিদারে তা হয়ে যায় 'নিরুপাধি'। অথচ এই টাকাই আর একটু নিম্নস্তরের এবং ঐ উচ্চ উচ্চ ব্যক্তিবর্গের কোটারির বাইরে গিয়ে পড়লেই নতুন উপাধি নিয়ে বনে যায় 'মাড়োয়ারীর টাকা', 'আমেরিকার টাকা' 'রাশিয়ার টাকা', 'জার্মানীর টাকা' 'চীনের টাকা'।

আজ যখন ভারতীয় ও বহির্বিশ্ব সাহিত্যের পুরোনো সময়কে পর্দা সরিয়ে দেখি,—দেখি অনেক মহান কবি ও লেখককে। যাঁরা সমস্ত জীবন কেবল লেখার জন্যই লিখে গেছেন। দুঃখ দারিদ্র বঞ্চনা ও অপমানে অত্যাচারিত হয়ে কেবল সরস্বতীর আরাধনাই করে গেছেন। এবং জীবিতকালে ত নয়ই, মৃত্যুরও অনেক পরে এঁরা আবিষ্কৃত হয়েছেন। হয়েছেন নবনোত্তর সম্মানিত।

ভাবি তাঁরা কি সব অন্য গ্রহের মানুষ ছিলেন। কোন্ দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা লিখতেন? অকৃতার্থ তাঁরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট সেই কবির মত, রাজার গলার মালাটি পর্যন্ত পাননি স্বীকৃতিস্বরূপ। তাঁদের চিতার ছাই মিলিয়ে গেছে পঞ্চভূতে, কবরের মাটিতে জন্মেছে তাচ্ছিল্যের ঘাস, কিন্তু ক্রমশ উজ্জ্বল আর দগদগে হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখা যত বেশি করে কালের পালিশ পড়ছে।

একবার একজন প্রখ্যাত লেখিকা আমাকে ভদ্রতাবশতঃ প্রশ্ন করেছিলেন—এখন কি লিখছো টিখছো?

বলেছিলাম—একটি উপন্যাস লিখছি।

—কোন্ কাগজের জন্যে?

—কোনো কাগজের জন্য না।

—এম্নি?

—এম্নি।

—ওমা, কি করে লেখো। আমি তো তাগাদা ছাড়া একটি শব্দও লিখতে পারি না।

বৈকুণ্ঠ পাঠক কি এই তাগাদাকেই সেই তলপেটের ইঞ্জেকশন বলে অভিহিত করেছিলেন? কে জানে?—যাই হোক, আমি কেবল অন্তরে অন্তরে অনুভব করি, লেখার জন্য তাগিদ আর লেখকের ভিতরে নেই। তাগিদটা একেবারেই বাইরে চলে এসেছে। এবং লেখকের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করছে—এই 'নগদ বিদায়', 'মোটা দক্ষিণা' এবং নানাবিধ সরু মোটা অংকের পুরস্কার।

বাংলা সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাই সভয়ে একটি প্রস্তাব রাখি। তা হলো সাহিত্য থেকে 'দেন-মোহন' তুলে দেওয়ার প্রস্তাব। সাহিত্যের বিনিময় মূল্যকে—'অ-মূল্য' করে দেওয়া হোক।

টাকা দিয়ে সাহিত্যের বেচাকেনা, অর্থ মূল্যের পুরস্কার—এসব স্বীকৃতিদান বন্ধ হোক। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যদিও বা এখনই তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা সম্ভব না হয়—কবিতার ক্ষেত্রে হোক। কবিতাকে যেন টাকা দিয়ে বেচাকেনা না করা যায়।

বলাই বাহুল্য, এমন ব্যবস্থা চালু হবার আগেই হাঁ হাঁ করে উঠবেন লেখকেরা। —সে কি, সে কি,—পত্রিকারা টাকা পাবে, মুদ্রক টাকা পাবে—বই বিক্রেতা টাকা পাবে আর আমরা লেখকেরা পাব না?

না পাবেন না। ওরা তো লেখক নয়, ওরা টাকা করতে চায়। ওরা টাকা পাক্। আপনি লেখক। আপনি পাবেন না। আপনি কেবল অমূল্য লেখা লিখবেন। এবং দেখবেন লেখা অ-মূল্য হয়ে গেলে আপনাকে আর সম্পাদকের সামনে নাড়ুগোপালটি হয়ে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। স্বয়ং সম্পাদকই যাবেন আপনার কাছে। এবং কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রকাশকদের জুতোর সুখতলা ছিঁড়বে আপনারই দরজায় ঘোরাঘুরি করে। আপনাকে আর আজকের মত হাফসোল লাগাতে হবে না পাবলিশারের ঘরে ঘরে গিয়ে। এবং সর্বোপরি যা ঘটবে তা হলো লেখা অ-মূল্য হয়ে গেলে, বাংলা সাহিত্যের বড় বাজার—এক পলকেই জনশূন্য খাঁ খাঁ শ্মশানে পরিণত হবে।

শবযাত্রীদের কোলাহল শোনা গেল মাত্র। রামদেহাল এসে শুয়ে পড়লো তার খাটে এবং তখনই শোনা গেল আবার সেই রক্তজমাট করা তীব্র আর্তনাদ। এবার অতি স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহে এ-টা মানুষেরই গলার শেষ প্রকম্পিত ডাক.....

কেমন বুঝছেন? দাঁড়াবে তো?

আর দশপ্রকার উপন্যাসের মতো গোয়েন্দাকাহিনীও বিশেষ নিয়মশৃংখলা মেনে গড়ে ওঠে। যেমন, আগেই বলেছি, হত ব্যক্তি কখনোই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হবেন না। অর্থাৎ, আপনাতে আমাতে, দুঃখের বিষয় রহস্য নেই। কেননা আমরা অতিসাধারণ। আমার উপার্জন কতো বা আমি হপ্তায় ক'বেলা মাছ খাই—এটা পাড়ার সমস্ত লোক জানে। হঠাৎ ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরলে পাড়ায় কানাকানি শুরু হয়।

গরীবদের কথা বাদ দিন। তাদের নিয়ে সময়নষ্ট করা লেখকদের সাজে না।

আরেকটা কথা। আপনি ঘরে বসে যা লিখবেন—তা-ই সাহিত্য। এর জন্য আপনাকে আইন আদালতের পাতা দেখতে হবে না, বা ছুটতে হবে না লাইব্রেরিতে। লক্ষ্য সরেছি, সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত গোয়েন্দাকাহিনীর কদর নেই।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। কি স্টাইলে লিখবেন আপনি? আপনার নিজস্ব একটা রচনাভঙ্গি থাকলে, আপনি ভাগ্যবান। যদি তা না থাকে, আমাদের কজনেরই বা সে-টা আছে, তবে আপনাকে খানিকটা হাত মকসো তো করতেই হবে। ধরা যাক, আপনাদের পাড়ার একটি বাড়িতে সম্প্রতি চুরি হয়েছে। আপনি তারই বর্ণনা লিখুন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্টাইলে লিখতে পারেন। না হয় রবীন্দ্রিক ভঙ্গিতে। না হয় আধুনিক কালের মুক্তবা আলগা স্টাইলে। আত্মবিশ্বাস যদি আপনাকে নিজস্ব স্টাইলে লেখায়—তাহলেও আপত্তি নেই। শ' দুয়েক শব্দে লেখা আপনার সাহিত্যপ্রচেষ্টা আমাকে এই পত্রিকার অফিসে ডাকে পাঠিয়ে দিন। প্রতিটি চিঠির উত্তর পাবেন। নির্বাচিত রচনাগুলি প্রকাশিত বা আলোচিত হবে। কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটতে পারে।

অর্থাৎ, জলে তো নেমে পড়ুন। তারপর দেখা যাবে আপনি কেমন সাঁতারু।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

অনুদিত অন্ধ্রের বিপ্লবী সাহিত্য কর্মীদের লেখা গল্পের সংকলন

এখন যে হাওয়া বইছে ৫্

নিউ বুক সেন্টার

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

অপ্রকাশিত জীবনানন্দের সন্ধানে

লোডশেডিং দিনদুপুরে হলেও রাতের পরিবেশ তৈরি হয়—যদি ঘরের দরজা-জানালা বেশির ভাগই বন্ধ থাকে। সেদিনও বাগবাজারে বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল। ঘরে গুমোট। আবছা অন্ধকার। নারীকণ্ঠ ভেসে এল ফোনে। দক্ষিণ কলকাতার পঞ্চাননতলা রোড থেকে আশাদি কথা বলছেন। আমি ফোনের এ প্রান্তে, উত্তর কলকাতায়।

'সুসংবাদ আছে।' আশাদি বললেন, 'জীবনানন্দের একটা অপ্রকাশিত প্রবন্ধের হদিশ পেয়েছি। ছাপবেন শারদীয় যুগান্তরে? প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞেস করুন।'

প্রফুল্ল রায় সাময়িকী-সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস 'একজন প্রেমিকের গল্প'-র পাণ্ডুলিপির ভেতরে ডুবেছিলেন তখন মোমবাতির আলোয়। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ভোলা দত্তর চোখে মুখে গিরগিটির মতো নানা রঙের খেলা। বালিশের পাশে রাখা আয়নায় নিজের মুখ নয়, মৃতা স্ত্রীর মুখ দেখে ভোলা দত্ত। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে। নিশ্চয়ই এসব লক্ষ্য করছিলেন প্রফুল্লবাবু। দুদিন আগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বাসক-শয়ন'-এর পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তেও এরকম তন্ময় হয়ে যেতে দেখেছি তাঁকে। আশুদা এবার যুগান্তরে ছাড়া অন্য কোথাও উপন্যাস লিখছেন না।

প্রফুল্লবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে আমি আশাদির কথারই প্রতিধ্বনি করলুম, 'ছাপবেন?'

কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে মানুষের যেরকম অবস্থা হয়, প্রফুল্লবাবুর অবস্থা অনেকটা সেরকম। যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না আমার কথা। বললেন, 'জীবনানন্দের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ? কোথায় পেলেন? নিয়ে আসুন এক্ষুণি। ছাপব।'

এমন বিস্ময় আমি তাঁর চোখে দেখেছিলুম আরেকবার—যেদিন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মারা যান, তার পরের দিন। ছানি-পড়া চোখ নিয়ে সুনীতিবাবু 'জীবন-কথা' লিখে গেছেন। এ খবর জানতেন না কেউই—একমাত্র গবেষণা-সহায়ক অনিল কাঞ্জিলাল ছাড়া। খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন প্রফুল্লবাবু, 'এ লেখা আমার চাই-ই।' ফিরে এসে হাসি হাসি মুখ করে বলেছিলেন, 'জীবন-কথা' পেয়েছি। আর পেয়েছি আচার্যের আঁকা একটি ছবি। আপনারা কি জানতেন সুনীতিকুমার আর্টিস্ট ছিলেন?'

আমি জানতুম তাঁর ড্রইং সেন্স ছিল চমৎকার। তাঁর ঘরে আমি একটা মূর্তি দেখেছি—দি লেডি আই ফল ইন লাভ উইথ। লন্ডন থেকে এই মূর্তিটাকে আনিয়েছিলেন তিনি ব্রোঞ্জে ঢালাই করে।

প্রফুল্লবাবু বললেন, শারদীয় যুগান্তরের বিজ্ঞাপনে লিখুন : শতাব্দীর সমবয়সী এক মহীরুহের আত্মকাহিনী ছাপা হচ্ছে যুগান্তরে। বর্তমান শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের শ্রেষ্ঠতম রচনা। ও হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায় আর অমিতাভ চৌধুরীর নাম দুটো উল্লেখ করবেন। কে যেন বলেছিলেন, ভারতীয় আই-সি-এস-দের কীর্তিকাহিনী লেখা হলে সিভিলওয়ার লেগে যাবে ভাবতে?। অন্নদাশঙ্কর লিখছেন সেই লেখা। কবি রবীন্দ্রনাথ আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে নিয়ে অমিতাভ চৌধুরী লিখছেন 'কবি ও সন্ন্যাসী'—এবারের সবচেয়ে আলোড়নকারী রচনা। অনেকেই জানেন না যে, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক ছিল গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সেসব গান রামকৃষ্ণকে গেয়ে শোনাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম শোকসভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ফোনের ও প্রান্তে আশাদির উৎসুক উপস্থিতি। আমি বললুম, 'লেখাটি আজই চাই, আশাদি। অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

'আজ নয়।' আশাদি বললেন, 'কাল আসুন। আজ আমার কলেজ আছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলুম। প্রফুল্লবাবু অধৈর্য, 'কি হল? আজ পাওয়া যাবে না?'

—না। কাল দেবেন।

—ঠিক আছে কালই যাবেন আপনি।

আমি তাঁকে লেখাটির আদি-ইতিহাস জানালুম। জীবনানন্দের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দুজনেই বরিশালের লোক। হাতের লেখা কাগজের জন্যে একটা কবিতা চেয়েছিলেন জীবনানন্দের কাছে। জীবনানন্দ কবিতা দিতে পারেননি। পরিবর্তে একটা প্রবন্ধ লেখেন সমকালীন সাহিত্যের মেজাজমর্জি নিয়ে। এই সেই প্রবন্ধ।

আশাদি বলেছিলেন, 'প্রবন্ধটি আমি পেতুম না—যদি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের রচনাবলী সম্পাদনা ও সংগ্রহের কাজে হাত না দিতুম। যুগান্তরে আমার আবেদন বেরুবার পর, এক বয়স্ক ভদ্রলোক (প্রাণকমল গুহঠাকুরতা) আমার সঙ্গে দেখা করেন নারায়ণবাবুর কয়েকটি লেখা নিয়ে। তাঁর কাছেই ছিল জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপি।

পরের দিন আবার টেলিফোন করেন আশাদি, 'চলে আসুন। আমি রেডি।' জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশ ও তাঁর স্ত্রী নলিনীদিকে ফোন করেছিলুম। তাঁরা বললেন, লেখা আবিষ্কার করেছো তুমি। লিখিয়েছেন তোমার স্বামী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কাজেই যেখানে খুশি ছাপতে দিতে পারো। আমাদের আপত্তি নেই। দাবিও নেই।'

পঞ্চাননতলা যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দরজায় দাঁড়িয়ে। গাড়িতে উঠে বললেন, 'আমিও ওদিকেই যাব। চলুন। লিফট দিচ্ছি।' সঙ্গে গল্পকার শচীন দাস। এবার বিভিন্ন পুজো-সংখ্যায় লিখেছেন অনেকগুলি গল্প।

শ্যামলবাবুকে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ মনে হল। গা এলিয়ে দিয়ে বসেছেন পেছনের সিটে। আমি তাঁর পাশাপাশি। মিনিটখানেক বাদে মুখ খুললেন, 'গোলোকধাম' পড়েছেন?

'গোলোকধাম' এবারের শারদীয় যুগান্তরে লেখা তাঁর উপন্যাসের নাম। একজন সাংবাদিকের জীবন নিয়ে লেখা। বুঝি আত্মজীবনীমূলক? গো-ডাউন ক্লার্ক থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের নিউজএডিটর হয়েছেন এক ভদ্রলোক। কি যেন নাম? ভুলে গেছি। প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের বান্ধবীর কুকুর গেছে ডগ-শোতো কেনেল ক্লাবে। সঙ্গে সাংবাদিক ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী অমৃতসর থেকে ভি-পি-তে গামলা আনায়। মেয়ে মলি তার প্রিয় কুকুরকে নিয়ে গেটে আটকে পড়ে। কেনেল ক্লাবে ঢুকতে পারে না। গেটের বাইরে মলি ড্রাইভার। সে পড়েছে ক্লাশ টু অব্দি। কিন্তু প্রেম করে গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে 'গোলোক-ধামের'র কাহিনী।

তেমনি বিষণ্ণ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। পুজোসংখ্যা অমৃতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ক্লান্ত। বললেন, 'আমি বানিয়ে গল্প লিখতে পারি না। জীবনের কোনো একটা প্রান্ত থেকে শুরু করি। এগোই। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে লেখা শেষ হয়ে যায়। আমি 'গোলোকধাম' এভাবেই লিখেছি।'

মিনিটখানেকের জন্য থামলেন শ্যামলবাবু। গাড়ি এগিয়ে চলেছে লিন্ডসে স্ট্রীট ধরে। কাউকে যেন খোঁজ করছেন, মনে হল। না, পাওয়া গেল না। আবার মুখ খুললেন শ্যামলবাবু, এবারের শারদীয় অমৃত কেমন হচ্ছে বলুন তো?

'কী করে বলি!'

আমি বললুম, প্রেমেন্দ্র মিত্র অমৃতের বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

এত লেখা জোগাড় করল কীভাবে শ্যামল। এবে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে।

৬টি উপন্যাস ছাপা হচ্ছে শারদীয়-অমৃতে। সঙ্গে মুজতবা আলির বিতর্কিত ডাইরি। অজস্র ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা। কবিতাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এলোমেলো করে। বয়সের, লেখার গুরুত্ব বিচার না করে। শ্যামলবাবু চান, পাঠক-পাঠিকারা বিচার করে নিক—কে ভালো লিখছেন, কে মন্দ। এলোমেলো করে দিলে পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে সুবিধে। বাছাই করতে সুবিধে। তবু জিজ্ঞেস করলুম, এরকম না করলে হত না?

—আমি এলোমেলো করতে ভালবাসি। এলোমেলো করে দিলে পাঠক চিন্তাশীল হয়ে ওঠে। বয়স্ক হয়। নিজের বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের সম্পর্কে নীরব থাকতে চান। মনে হল, সংশয়াচ্ছন্ন। কাতর। জ্যোৎস্নায়, শিশিরে, কুয়াশায় ঘুরতে ভালোবাসেন। হঠাৎ-ই মুখ তুলে বললেন, আমি লেখক হতে চেয়েছিলুম, সম্পাদক হতে চাইনি। অন্যের লেখার ওপরে খবর-দারি করা আমার পোষায় না। ভালোও লাগে না। অমিতদাকে আমি একথা বলেছি।

অমিতদা, মানে অমিতাভ চৌধুরী—যুগান্তরের নিউজ এডিটর।

প্রসঙ্গ পাল্টে শ্যামলবাবু বললেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবার উপন্যাস লিখেছে অমৃতে। জমিয়ে দিয়েছে। মেয়েছেলে নিয়ে ফস্টিনস্টি করেনি।

—মানে!

—মানে সেক্স নয়, মানুষের জীবন তাঁর উপন্যাসের বিষয়। সামান্য জিনিসও যে কত অসামান্য হতে পারে, তা অতীন দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নাম—'মানুষের ঘরবাড়ি।'

—'শৈবাল মিত্র লিখেছেন কেমন?'

—'শৈবাল পাওয়ারফুল। খুব নামী নয়, জানি। এবারই কমার্সিয়াল হাউসের একটি কাগজে উপন্যাস লিখছে প্রথম—অমৃতে। তবু আমার বিশ্বাস, খুব হৈ-চৈ হবে তাঁকে নিয়ে।'

—'শুনছি, মুজতবা আলীর ডায়েরী নাকি খুব বিতর্কিত।'

—'ভয়ে আছি।' শ্যামলবাবু বললেন, 'যে-কথা মুখে বলে যেতে পারেননি, আলী সাহেব, তাই লিখে রেখে গেছে ডায়েরীতে।

গাড়ি তখন আমির আলি এভিনিউ ধরে গড়িয়াহাটমুখী। সোজা দক্ষিণে। আড়মোড়া ভাঙলেন শ্যামলবাবু। নিস্তেজ হয়ে আসা আলোয় রাস্তাঘাট মলিন হয়ে আসছে। বিস্টওয়াচে ছটা বাজে। এখন সন্ধে। পঞ্চাননতলার মোড়ে আমি নেমে গেলুম। ডাইনে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট। বাঁয়ে পঞ্চাননতলা রোড।

আশাদির দরজায় কলিংবেল আছে। টিপলুম। কিন্তু বাজল না। খেয়াল হল, আরে, এখানেও তো লোডশেডিং। কড়া নাড়তেই মোমবাতি হাতে বেরিয়ে এলেন আশাদি। 'আসুন, আসুন' বলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ডানদিকে বসার ঘর। বললেন, বসুন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঘরে বসে গল্প করেছি আমি কয়েক বছর আগেও। নারায়ণবাবু নেই। তার অ্যাসটেস্টা ঘরে গেছে। তার ওপরে মোমবাতিটা বসিয়ে দিয়ে আশাদি বললেন, মিনিট খানেকের মধ্যেই আসছি।

আশাদি বেরিয়ে গেলেন। মনেহল, চায়ের অর্ডার দিতে। সিগারেট ধরাব কিনা, ভাবছিলুম। নারায়ণবাবু আমাকে সিগারেট অফার করতেন, ৫৫৫। কখনো বলতেন, 'আমার ইনসমনিয়া আছে। ঘুমোতে পারি না। ঘুমের ট্যাবলেট খাই নিয়মিত। নীহাররঞ্জন গুপ্ত বলে গেছেন, ঘুমের ট্যাবলেট খেলে হার্টের টেবল দেখা দিতে পারে। কী যে করি! তার ওপরে ব্লাড-সুগারের আশঙ্কা।'

—তাহলে খান কেন?'

—ঘুম হয় না যে।

—কষ্ট হয় খুব?

—তা তো হয়ই। তবে অভিজ্ঞতা বাড়ছে। ইনসমনিয়া না থাকলে আমি রাতের কলকাতাকে ভালো করে চিনতে পারতুম না। মধ্যরাতে যখন কলে জল থাকে না, তখনও এক রকমের আওয়াজ হয় জলের পাইপে। আরসোলা, টিকটিকিরা ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। আমি শুনি, রেল শান্টিংয়ের শব্দ, ছুটন্ত লরির গুমগুম আওয়াজ, রিকসার টুংটাং। নিশ্চয়ই কোনো মাতাল যায় এত রাতে। স্টীমারের ভোঁ বাজে গঙ্গায়।

যদ্দুর মনে পড়ছে, 'তৃতীয় নয়ন' কিংবা অনুরূপ কোনো নামের উপন্যাসে নারায়ণবাবু তাঁর এই নৈশ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। 'মেঘের ওপর প্রাসাদ' উপন্যাসের একটা কপি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' রচনার আদি কাহিনী বলেছিলেন। শোভাবাজারের একটি মেসবাড়িতে থাকতেন তিনি তখন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র আর ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে।'

ঘরে ঢুকেই আশাদি আমার হাতে গোটা দুই তিন হাতেলেখা পত্রিকার বাঁধানো সংখ্যা দিয়ে বললেন, দেখুন তো একবার খুলে—আজকের দিনের বিখ্যাতদের এর মধ্যে পাওয়া যায় কিনা। সবাই বরিশালিয়া।

একটা পত্রিকার নাম 'অঞ্জলি'। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির পাতা ওল্টালুম। নামপত্রে লেখা রয়েছে : 'অঞ্জলি' (মৈত্রিক পত্রিকা)। যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমল ঠাকুরতা। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৪১ সাল। কার্যালয় :

প্রকাশিত হলো

ডেসমণ্ড ব্যাগলির ইতিহাসাশ্রিত দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী—ছোটবড় সকলের।

স্বর্ণতলি

ভাষান্তর / বাবু মুখোপাধ্যায় ১৬-০০

মুসোলিনির বিপুল সম্পত্তি চলেছে এক জার্মান কনভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে। কিন্তু লিগুরিয়ান উপকূলের কাছে কনভয়টি হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। কয়েকজন শুধু কনভয়টির শেষ পরিণতির ঘটনা জানতো। বিশেষভাবে তৈরি পালতোলা নৌকো করে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে ইতালি অভিমুখে পাড়ি দিল সেই ধন ভাণ্ডার উদ্ধার করে আনতে। কিন্তু গুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করে ইতালির বাইরে আনতে গিয়ে হলো বিপদ। শুধু ইতালি সরকার নয়, ওদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল একদল প্রাক্তন বিপ্লবী আর জনৈক ব্রিটিশ জলদস্যু। শুরু হলো ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর স্বর্ণতলিযুক্ত নৌকোর নাবিকদের সঙ্গে জলদস্যুদের এক লোমহর্ষক ধরা ছোঁয়ার খেলা। .....

পত্রপুট / পরিবেশক-কথা ও কাহিনী

১৩, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ।। কলিকাতা-৭৩

ক্যারেডস ক্লাব, কলেজ বো, বগুড়া, বরিশাল।' সূচীপত্রের শিরোনাম : 'উপাচার।'

'অঞ্জলি'র এ সংখ্যা—নববর্ষ সংখ্যা। প্রথম পৃষ্ঠায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'নববর্ষ'। চার পংক্তির দুটো স্তবক। হুবহু করছি।

নববর্ষ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

যে আসে দিগন্ত হতে
কিংশুকের রক্ত সমারোহে,
আতপ্ত চৈত্রের রৌদ্রে বিকশিত
চম্পা-গন্ধ মোহে,
নীলাভ্রের বিস্তৃতে
ভবিষ্যের শিল্পলিপি রাখি,
বৈশাখীর শুভ্র-শংখে
চিরন্তন যাত্রিকেরে ডাকি।

আজি মোর রক্তে রক্তে
শুনি যেন তার পদধ্বনি,
শুনি তার পাঞ্চজন্য
মোর মর্মে উঠিছে নিঃস্বনি,
বন্ধাঞ্জলি রক্তাশোকে
রচিলাম পূজা-উপহার,
তারি বেদীপীঠে লব অগ্নিদীক্ষা
যাত্রিকে আমার।

মোমের আলোয় আমি প্রায় সব কটি লেখাই পড়ে ফেললুম। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি। সপ্তম প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ এম-এ। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আমি পঞ্চাননতলা রোডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নেই। সময় পেছিয়ে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে চলে গেছি। অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ এম-এ নয়, কবি জীবনানন্দ দাশ দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। বলছেন, 'বাঙালীর সাহিত্যোদ্যম তার পলিটিকসের উদ্দীপনার চেয়ে খুব বেশি পিছিয়ে নেই।'

হ্যাঁ, জীবনানন্দেরই কণ্ঠস্বর।

জীবনানন্দ বলছেন, 'যে জাতির ভিতরে ইতিহাস চেতনা ও সমাজ-চৈতন্য নেই, সে জাতির দুর্ভাগ্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।'

প্রবন্ধটি পকেটে পুরে আমি উঠে দাঁড়ালুম। মোমবাতি হাতে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন আশা দি। বাতি নিভু নিভু। বললেন, 'আবার আসবেন একদিন—দিনের বেলা। আজ লোডশেডিংয়ে ভালোভাবে কথাই হলো না।'

রাস্তা পেরুতে না পেরুতেই বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে উঠল পঞ্চাননতলা রোড। আমি তখন রাস্তার ওপারে—রামকৃষ্ণ মিশনের কাছাকাছি।

আরও জীবনানন্দ

পরের দিন সকালে যখন বাসা থেকে বেরোই, ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। হাতে ছাতা। রাসবিহারীর ত্রিকোণ পার্কে পৌঁছুলুম ঠিক দশটায়। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ তখন নীল। জীবনানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ বললেন আশা দেবীর ফোন আমি পেয়েছি। লেখাটি আপনারা ছাপতে পারেন।'

প্রবন্ধটি দেখালুম তাঁকে। অশোকানন্দবাবু দেখলেন। হ্যাঁ, 'কল্পনা-প্রতিভা', 'মাধবলা' ইত্যাদি জীবনানন্দেরই নিজস্ব শব্দ। হলে, নামের আগে 'অধ্যাপক' এবং পরে 'এম এ' ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

'অপ্রকাশিত আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করলুম আমি, 'দু একটা কবিতা পেলে ভালো হয়।'

—'থাকতেও পারে।' অশোকানন্দবাবু বললেন, 'সোমবারে আসুন। খুঁজে দেখি।'

সোমবারে যেতে পারিনি। গেলুম মঙ্গলবার সকালে। দু দুটো অপ্রকাশিত কবিতা আমার হাতে দিয়ে অশোকানন্দবাবু বললেন, 'জীবনানন্দের সমগ্র রচনাবলী বেরুচ্ছে না বলে অনেকে অভিযোগ করছেন। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি অগ্রন্থিত রচনাগুলিকে একত্র করে—সেরকম একটা কিছু করতে। কাজে হাত দিয়ে বুঝেছি, কাজটা সহজ নয়। গ্রন্থভুক্ত হয়নি, এমন অনেক রচনা এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পত্র-পত্রিকার পাতায়। জীবনানন্দের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

জীবনানন্দ পছন্দ করতেন নীল-মলাটের বই। আকাশী রঙ। আমার পকেটে এখন নীল কালিতে লেখা জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতা। অশোকানন্দবাবু বললেন, নীল-মলাটের একটি পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থ এখনো আছে আমার হেফাজতে। অন্তর্গত কবিতাগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। আরও কিছু কবিতার সঙ্গে সেটি বেরুবে বই আকারে—ছাপা হবে।'

জীবনানন্দের একটি কবিতার শিরোনাম নেই। বোধহয় পরে সুযোগই একটি শিরোনাম দেবেন ভেবেছিলেন। সময় পাননি। সেভাবেই অচিহ্নিত হয়ে আছে কবিতাটি পাণ্ডুলিপির পাতায়। তার প্রথম স্তবকটি এরকম—

'কারা কবে কথা বলেছিল,
ভালোবেসে এসেছিল কাছে,
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে হবু
কয়েকটি পুরনো গাছ আছে;
নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে।'

উপসংহার

সময়ে অসময়ে শারদীয় অমৃতের প্রুফ দেখতে বাগবাজারে ছুটে আসেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, অমর মিত্র, তরুণ চৌধুরী ও শ্যামল রায়। মাঝে মাঝে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, তেজেশ অধিকারীও আসেন। শ্যামলকে নিয়ে সবাই আতঙ্কিত। সুবোধ দাশগুপ্তের স্পন্ডিলাইটিস। তাঁর ঘাড়ে-গর্দানের অসাড় অংশে সূচ ফুটিয়ে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করেন শ্যামল রায় চীনাপদ্ধতিতে। প্রায়ই দুজনে কি যেন শলা-পরামর্শ করেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কথা 'জীবন' এর প্রুফ দেখতে দেখতে মন্তব্য করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়—'দারুণ কাজ করেছেন শ্যামলদা। বিভূতিবাবুকে দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস লিখিয়ে নিয়েছেন।'

তাঁর ধারণা, গোপাল হালদারের স্মৃতিকথা চীনে সুনীতিকুমারের সঙ্গে সাড়া জাগাবে। স্মৃতিকথা হলেও এটি ভ্রমণ-কাহিনী। মহত্তম জীবনের স্পর্শে উজ্জ্বল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা চঞ্চল করবে আমাদের—বিচিত্র সব পরিস্থিতির ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে।

কেমন লাগছে 'সংসারী সুভাষচন্দ্র?'

—'নেতাজী বিয়ে করেছেন শুনে চমকে উঠেছিলুম একবার।'—প্রুফ রিডার বললেন, 'দ্বিতীয়বার চমকে চমকে উঠছি 'সংসারী সুভাষচন্দ্র' পড়ে।'

পুজোসংখ্যার গ্রীনরুমের অবস্থা এখন চঞ্চল। রাজা-মহারাজারা যে-যার পোষাক পরে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত। 'মানুষের ঘরবাড়ি' লিখে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃপ্ত মনে হচ্ছে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় 'পিন্ডারী দেখে এলাম' লিখেছেন। উপন্যাস না ভ্রমণকাহিনী? পার্বত্য-এলাকার উঁচু-নিচু নানা শৃঙ্গের মতো তার অনেক চরিত্র। ল্যান্ডস্কেপের পর ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। চলমান নিসর্গ-চিত্র।

সুধাংশু ঘোষ যে ভেতরে ভেতরে অন্য মতলব আঁটছিলেন, বুঝতে পারিনি। বাগবাজার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'কলকাতা ত্যাগ করেছি।'

—মানে?

—এতদিন মধ্যবিত্ত মানুষের ভেতরটাকে দেখার চেষ্টা করেছি গল্পে-উপন্যাসে। 'পটভূমি পান্থশালা'র পটভূমি পুরুলিয়ার একটি সরাইখানা। রুক্ষখানা অঞ্চলের মানুষজন এতে উপস্থিত।

—এর নায়ক নাকি একজন খুনী?

—হ্যাঁ, প্রথম জীবনে একটা খুন করে পলাতক হয়েছিল সে। আঠারো-উনিশ বছর পর সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিল। পারেনি। পালিয়েছে আরেকটি খুনের চেষ্টা করে।

যুগান্তরে তিনটে বড় গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ ... আর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অতীনের গল্পের নাম 'রেলগাড়ি ঝিকঝিক'। এ গল্পের নায়িকা কল্পনায় বহু পুরুষের সঙ্গে ঘুরেছে দীর্ঘ-কাল। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'বহু বৃক্ষের সঙ্গে'। একদিন একজন পুরুষ এল তাকে ছিনিয়ে নিতে। রাজেন্দ্রাণীর সাজে সাজল সে সেদিন। সারা শরীরে শুনল বিসর্জনের বাজনা।

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস 'উমাপতির সাধ-আহ্লাদ' পড়তে পড়তে হেসে কুটি-কুটি হচ্ছেন প্রভাত চৌধুরী। বলেন, 'কে বলে সোস্যাল স্যাটায়ার আর লেখা হয় না?'

প্রফুল্ল রায় উদ্বিগ্ন। 'উমাপতির সাধ-আহ্লাদ' এখন নির্ভুল ছাপা হলে হয়। কম্পোজ করতে করতে লাইনো অপা-রেটর হাসছেন যে।

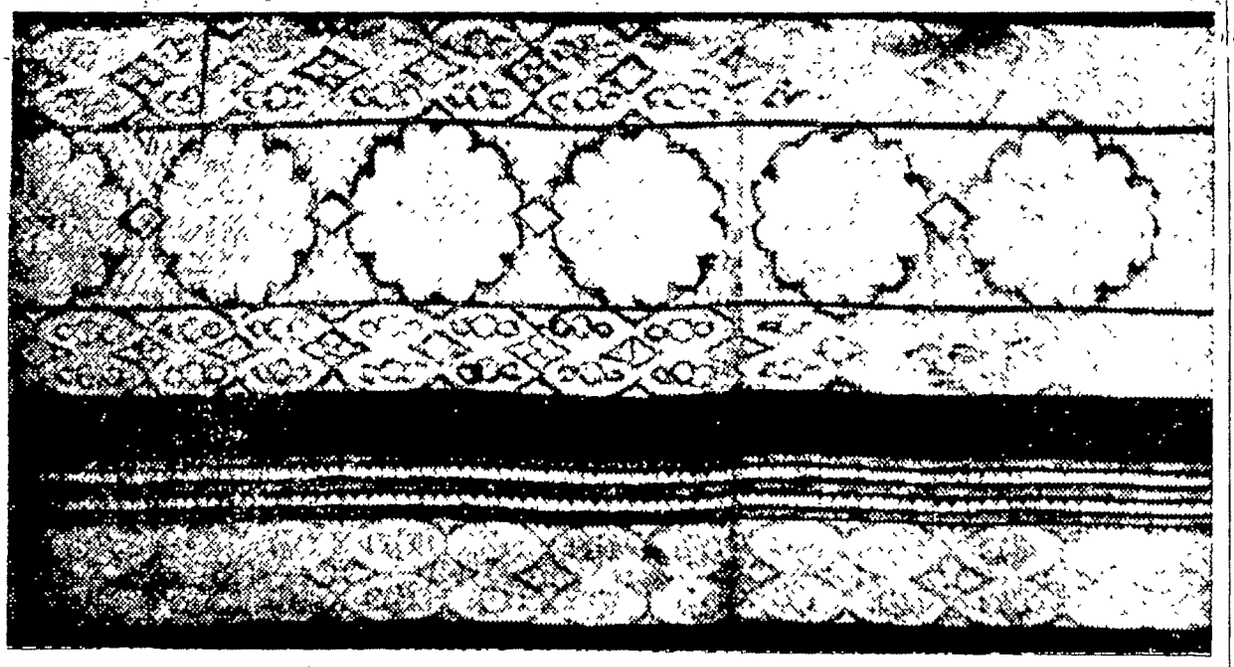

শারদ সাহিত্যের পাশাপাশি শাড়ি

নদে জেলার ফুলিয়া এখন সকাল ছ'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত রণপায়ের গতিতে তাঁত বুনে চলেছে। সারাদিন খটাখট। সারা তাঁতিপাড়ায় খটাখট। হাজার দুয়েক তাঁতিবাড়ি জুড়ে রঙের মেলা। নকশার বাহার। বাড়ির দাওয়ায় রঙিন সুতো। শাদা, কালো, তুঁতে, টকটকে লাল, গাঢ় বেগুনি, কচি কলা-পাতা, গাছপালার সবুজ, সোনার হরিণ বরণ। কলকাতাকে পুজোর শাড়ি পরাতে ফুলিয়ার তাঁতিপাড়া নিজেই হয়ে উঠেছে এক রঙিন পৃথিবী। ফুলিয়াই এখন পশ্চিমবঙ্গে ওপার বাংলার বিখ্যাত টাঙ্গাইল শাড়ির সবচেয়ে বড়ো আখড়া। এখানকার তাঁতিরা সবাই আদিতে টাঙ্গাইলের তাঁতি। দেশভাগের সময় এখানে এসে বাসা বাঁধেন। বাংলাদেশের যুদ্ধেও অনেক টাঙ্গাইল তাঁতশিল্পী আদি বাস ছেড়ে ফুলিয়ায় তাঁত বসান। এখানকার বসাকপাড়া হয়ে ওঠে বাঙালী মেয়েদের প্রাণের জায়গা, প্রিয় তীর্থ। তাঁতশিল্পের সোনার খনি। বড়ো বাজারের সোনার হাঁস।

ঘরে-ঘরে, ঘুরে-ঘুরে দেখি আর অবাক হই। রঙে-রঙে, নকশায়-নকশায় আমার চোখ ভরে যায়। আমি বরাবর কল্পনা করতুম, বাংলার ফুল-পাখি, লতা-পাতা, বর্ণাঢ্য ঋতু, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত থেকে রং নিংড়ে নিয়ে বাঙালীর শাড়ি বাঙানো হবে। ফুলিয়ার বয়নশিল্পে সেই কল্পনারই রং দেখলাম।

কাঁঠালগাছের ছায়ায়, এবাড়ি-ওবাড়ির দাওয়ায় বসে মেয়ে-বউরা দেখলুম আর্ট সিল্ক নক্সা করার কাজ করছেন। টাঙ্গাইলের আদি ভাষায় যাকে বলে মোড়কে ভরা। এক বাড়িতে চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকেও ভারি মনোযোগ দিয়ে নক্সা করতে দেখলুম। দাওয়ার এক ধারে নানা রঙের সুতোর নাটা রোদে দেয়া হয়েছে। সুতোয় চটকানো পান্তাভাত মাখিয়ে শুকিয়ে নেয়া হচ্ছে।

কেউ-কেউ দেখলুম এখনো গ্রাফ-পেপারে ডিজাইন ছকছেন। নতুন নতুন ডিজাইন তাঁতীর কল্পনাতেই ধরা দেয়, পরে গ্রাফ-পেপারে তুলে নেয়া হয়। এঁরা কিন্তু সবাই প্রায় নিরক্ষর। অবশ্য বাইরে থেকেও ডিজাইন করিয়ে আনা হয়। সারা বছর ধরেই নিত্য-নতুন ডিজাইন ভাবেন শিল্পীরা। পুজোর মরশুমেও ভাবেন। তাই বলে পুজোর ডিজাইন বলে ঠিক আলাদা কিছু নেই। একেক বার কোনো কোনো ডিজাইন পুজোর বাজার আলো করে।

এবারের পুজোবাজার মাত করেছে ডুরে শাড়ি। ডিজাইনটা নতুন নয়, কিন্তু এটাই এখনকার সবচেয়ে মন-মাতানো টাঙ্গাইল নকশা। শাদা আর্ট সিল্কের নকশা পাড়। জমি শাদার সঙ্গে রঙিন ডোরা। এরকম একটি শাড়ি বুনছিলেন অমূল্য দাস। ইনি বংশপরম্পরায় তাঁতী নন, বসাকপাড়ায় এসে তাঁতের কাজ শিখে নিয়েছেন চমৎকার। মগন হয়ে তাঁত বুনছেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নলি পাকাতে ব্যস্ত। দু-দিনে এরকম একেকটা ডুরে শাড়ি নেমে যায়। টানা-পোড়েন দু-দিকেই ১০০ কাউন্টের সেরা সুতো, কোঠারি মিলের। আগে এই সুতো পশ্চিমবাংলার কল্যাণী স্পিনিং মিল্স থেকে পাওয়া যেতো। সেটাই তখন ভারতের ১০০ কাউন্টের সেরা সুতো। দামেও কোয়েম্বাটুরের চেয়ে কিছু কম। তন্তু-জীবী উন্নয়ন সমিতির অমূল্য বসাক জানালেন, কল্যাণীর ওই সুতো আবার পাওয়া গেলে, বা সারা ভারতে সুতোর এক দাম হলে, শাড়ির দাম কম করেও শতকরা দশ ভাগ কমতো। এখন এই ডুরে শাড়ির দাম কলকাতার দোকানে ৭৮ টাকা।

একই একটা রকমফের দেখলাম সমিতির অফিসে। জমি একই, শুধু ডোরাগুলো একটু মোটা, আর, একটু দূরে-দূরে। বাড়তি জৌলুস পাড়ে। এক দিকের পাড় ৬ ইঞ্চি, আরেক দিকে ১০ ইঞ্চি। জমকালো নকশা। দাম ১০০ টাকার মতন। পাইকারি ৭৫ টাকা। সব-চেয়ে সস্তা টাঙ্গাইল শাড়ি ৩৫ টাকা, আর সবচেয়ে দামী শাড়ির দাম ২৫০ টাকা। এটা দু-হাত ঘুরে কলকাতার দোকানের খরচারো দাম। এবার পুজোয় ৫০০ টাকা দামের নতুন নকশা বাজারে ছাড়া হচ্ছে বলে যে খবর বেরিয়েছে, সেটা গুজব। পুজোর নতুন নকশা চোখ-জুড়ানো শেড-ডুরি শাড়ির দাম ১০৫ টাকার মতন। তার বরং, অলংকরণ, পাড়, জমি পরের বারে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

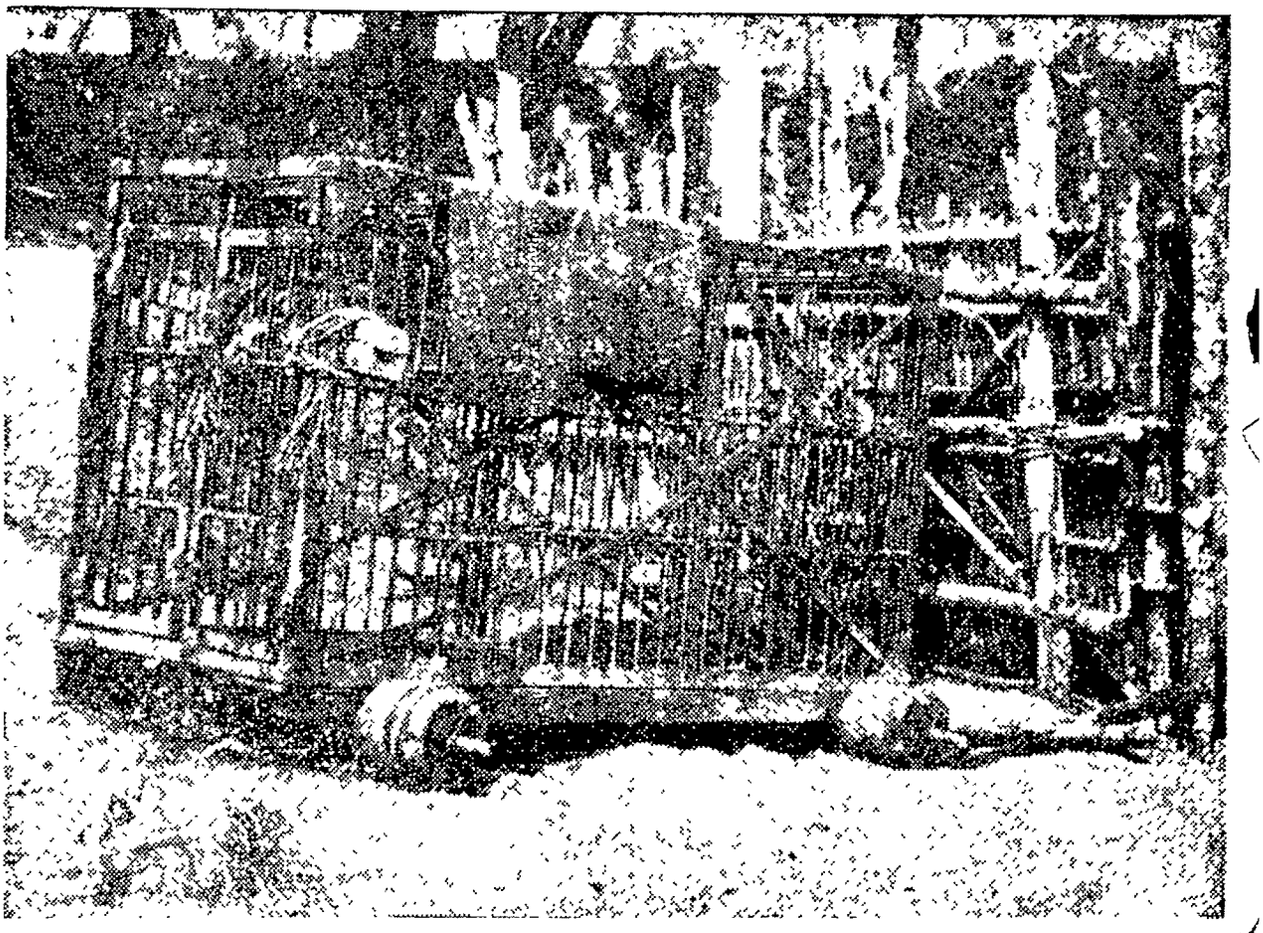

কাজিরাঙায় গণ্ডার ধরতে গিয়ে

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাগুরীর বীট-অফিসার শ্রীধানেশ্বর দাসের কাছে পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢোকার প্রস্তাব পেশ করতেই তিনি চুপ করে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, অমন কাজও করবেন না।

বহু জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই আমি জিজ্ঞাসু চোখে চাইলাম।

—এখানকার এই কাজিরাঙার গণ্ডারদের হালচাল আপনার একদম জানা নেই, তাই—

আস্তে বললেন শ্রীদাস।

বাগুরি বীট-অফিসের লাগোয়া ছবির মতো বাংলোটার লনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। আমাদের মুখ রয়েছে জঙ্গলের দিকে। বাংলোর পিছনে দু পা হেঁটে গেলেই শুরু কাজিরাঙার বিখ্যাত জঙ্গল—গেম স্যাংচুয়ারি। মন বার বার সেদিকে দৌড় মারছে। শেষ বসন্তের পাতা-ঝরা জঙ্গল তার অজস্র আঙুল বাড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে।

—কিন্তু ভারতের এই এক খড়গওয়ালা গণ্ডাররা শুনতে পাই আফ্রিকার কালো দু খড়গওয়ালা গণ্ডারদের মতো অত ভয়ংকর নয়।—আমি বললাম একটু বিজ্ঞ হবার ভান করে।

—কাজিরাঙার গণ্ডাররা দারুণ মেজাজী। তারা কখন যে কি মেজাজে থাকে তা চট করে বোঝা যায় না।—জবাব দিলেন শ্রীদাস আমার কথার পিঠেই।

—আমি এই জঙ্গলের কাজে লেগে আছি বহু কম দিন নয়। প্রথম যখন গণ্ডারদের সেন্সাস নেওয়া হয়, তখন ট্রেনী হিসাবে এই জঙ্গলেই আমার হাতেখড়ি। আমি আজও গণ্ডারদের মেজাজ ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি না। জঙ্গলে ঢুকলে আশ-পাশে আপনি দূরে-কাছে আকছার গণ্ডার দেখতে পাবেন। হয়ত তারা আপনাকে দেখেও দেখবে না। যেমন চরছে তেমনিই চরতে থাকবে। কিংবা কাদা-ভরা ডোবায় শুয়ে আরামে গড়াগড়ি দেবে। কিন্তু তাদের ভেতর থেকে যদি হঠাৎ দু-একটার মেজাজ বিগড়ে যায়, আর ফোঁস ফোঁস করে আপনাকে তাড়া করে, তাহলে ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও সাধ্যি নেই আপনাকে রক্ষে করে। জঙ্গলে যদি ঢুকতে চান হাতীর পিঠে যান।

একটু থেকে শ্রীদাস আবার বললেন, আমরা অবশ্য টুরিস্ট দলের সঙ্গে সব সময়ে একজন করে আর্মড গার্ড দিই। এটা আমাদের নিয়ম। কোন রকম ঝুঁকি আমরা নিই না। আর বাচ্চার সঙ্গে মা গণ্ডার তো সব সময়েই সাংঘাতিক বিপজ্জনক। জঙ্গলের ভিতর-বাইরে প্রতি বছর বেশ কয়েকজন মরে গণ্ডারদের খপ্পরে পড়ে, শোনেন নি সে খবর?

গী সাহেবের অভিজ্ঞতা :

শ্রীদাসের কথায় আমার মনে পড়ল গী সাহেবের অভিজ্ঞতা। ই, পি, গী—ভারতীয় বন্য প্রাণীর নাড়ী-নক্ষত্র যাঁর নখদর্পণে। গী সাহেব একবার হাতীর পিঠের থেকে নেমে [illegible] সঙ্গে ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতি নিয়ে চলল অনুচর। একটা ফাঁকা জায়গায় তিনি ক্যামেরা ফিট করলেন তিন ঠ্যাং-এর ওপর। গণ্ডারটা ক্যামেরার আওতার আসতেই শুরু হল তাঁর ছবি

নেওয়া। চোখ তাঁর সেঁটে রইল ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে। এদিকে গণ্ডারটা ঘাস খাওয়া ছেড়ে এগুতে লাগল তার দিকে। সাহেব ছবি নিতেই ব্যস্ত, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলেন ভিউ-ফাইন্ডার জুড়ে গণ্ডারের ছবি। গণ্ডারটা এসে পড়েছে খুব কাছে। কিন্তু ছবিও আসছে দুর্দান্ত। ক্যামেরা ছাড়া যায় না। অনুচরকে হাতীতে উঠতে বলে তিনি ক্যামেরা চালাতেই রইলেন। শেষে জন্তুটা যখন প্রায় ঘাড়ের ওপর, তখন ক্যামেরা-ট্যামেরা ফেলে সাহেব দে ছুট।

গণ্ডারটা ক্যামেরার কাছে এসে ধীরে-সুস্থে যন্ত্রটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল চার দিকে ঘুরে ঘুরে। আর লেজ ধরে চটপট হাতীর পিঠে উঠতে উঠতে গী সাহেব ভাবলেন, গণ্ডারটা যদি ক্যামেরাটা চালাতে জানত, তাহলে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়া একটা মানুষের কী চমৎকার ছবিই না সে তুলে নিতে পারত।

ধন্য মিস্টার গীর রসিক মন। যমের মুখে দাঁড়িয়েও সে রসিকতা ছাড়ে না।

আর একবার হাতী ছেড়ে দিয়ে সাহেব দুজন অনুচরের সঙ্গে ঢুকেছেন জঙ্গলে। ১৫ ফুট উঁচু শরবনের (একেই ইংরাজীতে বলে এলিফ্যান্ট গ্র্যাস—হাতীর পালও এই ঘন ঘাসের জঙ্গলে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই এই নাম) ভেতর দিয়ে চলেছেন এক ঢিলতে সরু পথ বেয়ে। এই রকম শুঁড়ি পথগুলো তৈরী হয় জানোয়ার যাতায়াতের ফলে ঘাস দু দিকে সরে গিয়ে। হঠাৎ সঙ্গের লোক দুটো দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, সাহেব গণ্ড আসছে (আসামী ভাষায় গণ্ডারকে গণ্ড বলে)। বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। সাহেব জানেন, দৌড়ে অলিম্পিক জেতা লোকও গণ্ডারের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তবুও সাহেব দৌড়তে লাগলেন, পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। পথটাও আবার ভিজে ভিজে, পিছল। তার ওপর গণ্ডারের তিন-খুরের চাপে আর হাতীর পায়ের দাবানিতে ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো। তার ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়াও সহজ নয়। পা হড়কে মুখ থুবড়ে পড়লেন সাহেব কাদার ওপর। আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল ভারতের গণ্ডাররা মাটিতে পড়ে যাওয়া লোককে আক্রমণ করে না, যেমন করে থাকে হিংস্র বুনো হাতীরা। তিনি সেই অবস্থাতেই গুট করে কাত হয়ে গড়িয়ে পথ থেকে একটু পাশে সরে গেলেন। পর মুহূর্তেই গণ্ডারটা বাজের মত মাটি কাঁপিয়ে কানের পাশ দিয়ে ছুটে বার হয়ে গেল।

মিনিট কয়েক পর দুজন সঙ্গীর একজন এসে হাজির। —সাহেব ঠিক আছেন তো? তখন তাঁরা দুজনে তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সে ঘাসের জঙ্গলের ভেতর থেকে বার হয়ে আসছে। লোকটার সারা শরীর তখনও ঠক-ঠক করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছে না নিদারুণ ভয়ে। খানিকটা সময় লাগল তার সামলে উঠতে। তখন সে জানাল, সে-ও ঘাসের ভেতর মড়ার মত শুয়ে পড়েছিল। আর গণ্ডারটা তার ওপর দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে গরম নিশ্বাস ছাড়ছিল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে ওটা তাকে ছেড়ে দিয়েই চলে গেল।

গণ্ডার শিকার ঃ

দুপুরের খাওয়া সেরে বাংলোর বারান্দায় বসে অর্কিডের শোভা দেখছিলাম। এরা লাগিয়েছে নানা রকমের অর্কিড, বাংলোর বড় বড় গাছগুলোতে। সবগুলোই জংলী। যেমন ফুলের বাহার, তেমনি এক একটার মিষ্টি গন্ধ।

শ্রীদাস বেশ একটু উত্তেজনা নিয়েই বারান্দায় উঠে এলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, একটা গণ্ডার ধরা পড়েছে, দেখতে যাবেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।—উত্তেজনায় আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

—কখন ধরা পড়ল? কোথায়?

—আজ সকাল আটটায় ধরা পড়েছে মিহিমুখের জঙ্গলে। ডি এফ ও কি রেঞ্জার সাহেব কেউই এখন এখানে নেই। আমাকেই গিয়ে ওটাকে তুলে আনার বন্দোবস্ত করতে হবে। —বললেন, শ্রীদাস।

—যাবেন কিভাবে?

—কেন, আমার মোটর বাইকে। আপনি যাবেন আমার পিছনে।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা বাগুড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কেঁহড়া (এখানেই কাজিরাঙার আসল ট্যুরিস্ট সেন্টার) হয়ে ধরেছি উত্তর-মুখো জঙ্গলের পথ। যাচ্ছি দু পাশে কিছুটা ফাঁকা মাঠ ফেলে। একটু এগিয়েই পড়ল বড় গাছের জঙ্গল, রাস্তার ডান দিকটায়। প্রচুর ল্যাগারোস্টোমিয়ার (অর্জুন জাতের গাছ) সঙ্গে শিমুল আর হিজলের ছড়াছড়ি। চিকন সবুজ পাতায় গাছগুলো ভরে গেছে। শুধু কঁইর আর সিজ গাছগুলো এখনও হাড়সার—তাদের পাতা আসতে একটু দেরি।

মেঠো পথে মোটর বাইক, ঢেউ-এর মুখে মেছো নৌকো। তবু খুব বেশী মালুম হচ্ছে না। চোখের সঙ্গে মন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের এখন বিরাট ভোজ। মাইল দুই

মিটার এসেই ধু-ধু ঘাসের জঙ্গল ডাইনে-বাঁয়ে বড় গাছের জঙ্গল সবে গেছে একটু দূরে দূরে।

একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গোটা দশেক হাতী। শ্রীদাস বললেন, এরা সব ডিপার্টমেন্টের পোষা হাতী। টুরিস্ট নিয়ে যাবে জঙ্গলে।

মাহুতরা হাতীদের সঙ্গে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন বেলা ৩টে। ৪টে নাগাদ টুরিস্টরা এসে যাবে। সারা পৃথিবী থেকে তাদের আগমন। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউ-রোপের বিভিন্ন জায়গা, ভারতের লোক তো আছেই। তাদের জন্যেই হাতীরা প্রস্তুত। রাস্তার পাশে হাতীতে চড়বার কাঠের সিঁড়ি। আমরা এদের পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি, জঙ্গলের গভীরে।

এক জায়গায় একটা সবুজ রঙ-করা কাঠের ঘেরাটোপ দেওয়া মাচান। অনেকটা জাহাজের মর্কি বিজের মত। ২৫।৩০ ফুট উঁচু। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠবার ব্যবস্থা। চার দিকে তার চওড়া বারান্দা।

—ওয়াচ টাওয়ার—বললেন শ্রীদাস। তার নীচে মোটর বাইকটাকে থামালেন। আমরা নামলাম। বাইকটাকে খাড়া করতে বললেন, অনেক সময় মানুষের জায়গায় ওপরের বারান্দায় ভিড় জমায় বোঁমা-ওয়ালা ভালুকের দল।

—তখন বোধ হয় গোটা-কতক মানুষকে আশ-পাশের জঙ্গলে খাড়া করে দিলে তাদের কিছু দ্রষ্টব্য হয়, কি বলেন?—হাসতে হাসতে বললাম। শ্রীদাসও একটু হেসে এগিয়ে চললেন জঙ্গলের মধ্যে।

এখন শ্রীচরণই ভরসা। দাস বললেন, আমাদের এবার একটু সাবধানে এগুতে হবে। দু পাশে একটু চোখ রাখবেন।

শুনে মনে মনে একটু বেশ থ্রিল অনুভব করলাম।

নিস্তব্ধ, নির্জন ঘাসের জঙ্গল। জায়গায় জায়গায় ঘাস খুব বড় নয়। মাস দুই আগে শীতের সময় থেকে পুরোন ঘাস জ্বালান শুরু হয়েছে। এক একটা জায়গায় পুরোন শুকনো ঘাস পুড়ে গিয়ে গজিয়েছে নতুন ঘাস। আড়াই-তিন ফুট উঁচু, নধর সবুজ সতেজ ঘাসের গোছা। পোড়া শরবনের ছাপও দেখছি এদিকে-ওদিকে প্রচুর। তাদের আধপোড়া, ঝলসে যাওয়া ডাঁটা-গুলোতে অজস্র কাল কাল ছোপ।

বেশ কিছুটা জঙ্গল ঠেলে এসে ধরলাম শুঁড়িপথ একটা। নির্ঘাৎ গণ্ডার যাতায়াতের পথ এটা। দু দিকে ঘাসের বন সরে গেছে। সেটা ধরে খানিকটা দূরে এগিয়ে যেতেই লোকজনের আওয়াজ কানে এল।

আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। মাঝখানে ঘাসের জঙ্গল কেটে বেশ খানিকটা জায়গা সাফ করা হয়েছে। সেখানে কাজ করে যাচ্ছে জনা পঁচিশেক লোক। আমাদের এগিয়ে যেতে দেখেই তাদের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। লম্বা একহারা চেহারা, চওড়া হাড়, শক্ত গড়ন। পীতাভ গায়ের রঙ, পরণে খাঁকী। বয়স বছর চল্লিশ। এক মুখ হাসি। পানের রসে তার চকচকে দাঁতের হাসি রসাল হয়ে ফুটে উঠল।

—পানিরাম বোকোটিয়াল—পরিচয় দিলেন শ্রীদাস।—গণ্ডার ধরতে সমস্ত প্ল্যানটা ওরই। ও আরও দুটো গণ্ডার ধরেছে কয়েক মাস আগে। ওস্তাদ লোক।

পানিরাম বিনয়ে গলে গেল।

—আপনাদের কাজিরাঙা তো অভয়ারণ্য। এখানে নিশ্চয়ই জন্তু ধরা নিষিদ্ধ। আপনারা গণ্ডার ধরছেন, ব্যাপার কি?—আমি জানতে চাইলাম।

—গণ্ডার আমাদের এখানে এখন যথেষ্ট বেড়েছে। তাই বাইরের 'জু' থেকে অর্ডার এলে আমরা দু-একটা ধরে পাঠাই। এটা খুব সম্ভবত যাবে ইউনাইটেড স্টেটস-এ। চলুন যাই জানোয়ারটাকে দেখি।

একটা ছোট গর্ত ঘিরে কটা লোক হৈ-হৈ করছে। তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। ফোঁস ফোঁসানীটা দূর থেকেই কানে আসছিল। অনেকটা বেগে যাওয়া ষাঁড় কি মোষের ফোঁসানীর মত। কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার, লম্বায় প্রায় ৯ ফুটের কাছাকাছি, একটা সদ্য খোঁড়া গর্তের মধ্যে পড়ে দুর্দান্ত রাগে ফুঁসছে। গর্তটা লম্বায় দশ ফুট, ছ ফুটের মত গভীর, আর চওড়া হচ্ছে সাড়ে ৪ ফুট। মানে কোন রকমে প্রকাণ্ড দেহটা তাতে টায়টোয় ধরেছে মাত্র। নড়াচড়ার মত এতটুকু ফাঁকও তাতে নেই। তার ওপর তাকে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা হয়েছে অনেকগুলো শক্ত নারকেল কাতার কাছি দিয়ে। সেই কাছি-

মহেঞ্জোদাড়োয় গণ্ডারের সীল

গুলো গর্ত থেকে কিছু দূরে গাছের গুঁড়ির রলা পুঁতে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাঁধা।

গণ্ডারটা প্রচণ্ড ক্ষোভে গর্তের আশ-পাশের নরম মাটিতে তার খড়্গ দিয়ে আঘাত করছে। বার বার গাড়ার ভিতর পা ঠুকছে। সেই অতটুকু জায়গার মধ্যে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও সে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে। যেন পাশের মাটির স্তূপ সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলতে চায়।

শ্রীদাস জানোয়ারটাকে বেশ ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। আমিও দেখলাম।

—একটা চমৎকার স্পেসিমেন, কি বলুন। সুন্দর খড়্গটা। শ্রীদাসের মুখ খুশীতে ঝলমল করে উঠল। সত্যি বলতে কি এত কাছে থেকে গণ্ডার দেখা আমার জীবনে এই প্রথম।

বর্মের মত পুরু চামড়ায় ঢাকা সমস্ত শরীরটা। পিছনে পাছার ওপরে নীচে বড় বড় উঁচু কড়া পড়ার মত কতকগুলো গুল। যেন দুর্গের সিং দরজার ওপর বিরেট-করা লোহার গুল। কাঁধের নীচ দিয়ে পুরু চামড়ার কোঁচকানি, কোমরের কাছেও তাই। হাঁটুর ওপরে চামড়ার ভাঁজ। পাঁজরার ওপরেও গভীর কোঁচকানি। লম্বা অদ্ভুত মুখ, চোখ দুটো মুখের তুলনায় ছোট, কুতকুতে। মাথার দু পাশে ছোট ছোট দুটো কান, রাগে ভয়ে দুদিকে খাড়া। মাঝে মাঝে শব্দ করার জন্য চটপট খাচ্ছে ঘুরে, রাডারের মত। মুখের সামনে ওপরের ঠোঁটটা কেমন বেড়ে ছুঁচলো হয়ে ঝুলে এসেছে। আর নাকের ডগায় একটি নধর খড়্গ। নীচের দিকটা চওড়া, ওপরের দিকে সরু কিন্তু ছুঁচোল নয়। পিছনের বেঁড়ে লেজটা উত্তেজনায় সে ঘন ঘন আছড়াচ্ছে শরীরের ওপর।

ঐ বন্ধন দশাতেই সে যতটা পারছে দাপাদাপি করছে।

একটা টাটকা তাজা, একেবারে জলন্ত পাঁপর। আমি দেখছি তার প্রকাণ্ড শরীরটা, তাতে জমাট বাঁধা প্রচণ্ড শকতি আর তেজ। আমার মনে হচ্ছে ওটা যেন সদ্য ধরে আনা হয়েছে কোটি বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী থেকে।

গর্তের সামনের দিকের জমিটাতে বহু লোক এক সঙ্গে কাজ করছে। মাটি কেটে বানাচ্ছে একটা র‍্যামপার্টের মত। সেটা তারা টেনে নিয়ে আসবে বরাবর গর্তের মুখ অবধি। সেখানে তার গভীরতা হবে গর্তটার সম সম—মানে ছ ফুট। তারপর ঐ র‍্যামপার্ট বেয়ে নামান হবে একটা চাকাওয়ালা বিরাট লোহার খাঁচা। খাঁচার শিকগুলো যেমন শক্ত তেমনি মোটা। লোহার খাঁচার দরজার মুখটা গণ্ডারের ঠিক মুখোমুখি বসান হবে। তখন গণ্ডার আর খাঁচার খোলা দরজার মাঝখানে থাকবে শুধু এক চিলতে মাটির আড়াল। পরে ঝপাঝপ কোদালের ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে ঐ মাটির আড়ালটুকু। তখন গণ্ডারটাকে পিছন দিক দিয়ে লাঠি পেটা করলেই সে ঢুকে পড়বে ঐ খোলা খাঁচার দরজা দিয়ে একেবারে ভেতরে। তখন দরজাটা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হবে নাট-বল্টু দিয়ে। গণ্ডারটার ওজন আন্দাজ আড়াই টনের মত। তাকে খাঁচা শুদ্ধ টেনে রাস্তায় তুলতে কাজে লাগান হবে এই ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে বড় হাতীটাকে। রাস্তার ওপর থাকবে একটা মোটর ট্রেলার। তা দিয়ে খাঁচা টেনে নিয়ে যাওয়া হবে কোহড়াতে।

সেখানে একটা বেশ বড় জায়গা ঘিরে গাছের গুঁড়ির বলা পুঁতে খেদার মতো করা আছে। ভেতরে আছে জল-কাদার হোড। ঐ খাঁচার দরজা খেদার দরজার মুখোমুখি রেখে খাঁচার দরজা দেওয়া হবে খুলে। গণ্ডার ততক্ষণে খাঁচার মধ্যে একেবারে বেপরোয়া। ছাড়া পাওয়ার জন্যে সে তার সমস্ত শরীর দিয়ে খাঁচার লোহার রডে ঘা মেরে মেরে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

এমন সময় খাঁচার দরজা খোলা পেলে সে তখনই বাব হয়ে খেদার দরজা দিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে খেদার মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে খেদার ভারী কাঠের দরজাটা ওপর থেকে নীচে নেমে আসবে। গণ্ডার খেদার মধ্যে থাকবে বন্দী।

এত সব ব্যাপার শেষ হতে আজ সারারাত কাবার হয়ে গড়াবে কাল দুপুর পর্যন্ত। ততক্ষণ এই লোকগুলির এতটুকু বিশ্রাম নেই। শ্রীদাসও বোধহয় রাতে বিশ্রাম পাবেন না।

অবশ্য তারপরের ব্যাপারটা মোটেই কঠিন নয়। গণ্ডারটাকে হাতে করে কচি-কচি ঘাসপাতা খাওয়ান হবে খেদার কাঠের ফাঁক দিয়ে। ক্রমশঃ সে মানুষের সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত হবে। তখন এক-আধবার ভেতরে গিয়ে কেউ কেউ তাকে গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদরও করতে পারে। এইভাবে কয়েকমাস খেদায় রেখে সে রীতিমতো পোষ মেনে গেলে, তাকে উড়োজাহাজে চাপিয়ে পাঠান হবে বিদেশে। সেখানে তার আদর যে-কোন একজন রাজকুমারের মতো।

এতে আসাম সরকার ফরেন একসচেঞ্জ ঘরে তুলবে দু' লক্ষ টাকার মতো। আর যদি গণ্ডারটি যায় ভারতের ভেতরকার কোন দেশে, তাহলে তার দাম হবে এক লাখ।

আমরা খড়্গ দেখে এই গণ্ডারটার বয়স অনুমান করলাম। এটি একেবারে নওজোয়ান বয়স বারো-তেরো। পানি-রামকে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে এটাকে স্পট করলে?

—গত সপ্তা দুই ধরে এর ওপর নজর রেখেছিলাম। এটাই এর যাতায়াতের পথ। ঐ দেখুন গণ্ডারের পায়খানা।

দেখলাম, ঘাসের জঙ্গলটা যেখানে দু' ফাঁক হয়ে সরু শুঁড়ি রাস্তা বার হয়েছে, তার ওপরেই গোবরগাদার মতো এক-

বাচ্চাসহ গণ্ডার মাতা

রাশ গণ্ডারের মলমূত্র পড়ে আছে। সেগুলো জমে ছোটখাট একটা ঢিবি হয়ে গেছে যেন।

গণ্ডারদের স্বভাব হল, তারা যেখানেই চরে বেড়াক, পায়খানা করে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই। কাজেই তাকে এখানে আসতেই হয়েছে।

—এই গর্তটা কেটেছে একেবারে ওর চলার পথের ওপরেই। এই গর্তের ওপর লম্বালম্বি সাজিয়েছি শর-কাঠি। তার ওপর চাপিয়েছি ঘাসের চাবড়া। যাতে ওর এতটুকু সন্দেহ না হয়।

বুঝলাম, ক্যামোফ্লেজের সবরকম ব্যবস্থাই নিয়েছিল পানিরাম। এবং সেই ফাঁদেই গণ্ডারটা আজ সকালে পা দিয়েছে বড় কুলক্ষণেই। তারপর ঐ আড়াই-টনী ওজন শর-কাঠির ওপরে কতক্ষণই বা। সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়েছে এই গর্তে।

এটাই আমাদের ভারতীয় গণ্ডার ধরবার সনাতন পদ্ধতি। কিন্তু আফ্রিকার গণ্ডার ধরার কায়দাটা অন্য রকম। যাঁরা 'হাটারি' ছবি পর্দাতে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সে-দৃশ্য মনে করতে পারবেন। একটা ফাঁকা জায়গায় গণ্ডারটাকে খেদিয়ে এনে তার সঙ্গে জীপে চড়ে পাল্লা দেওয়া ছুটে কাটা। গণ্ডারটার কাছাকাছি হলেই শক্ত লম্বা ল্যাসোর মতো একটা দড়ি দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা। কিন্তু তাতে বিপদও খুব বেশি। যদিও খেলার মতো একটা স্পোর্ট হিসাবেই শিকারীরা ব্যাপারটাকে নিয়ে থাকেন। গণ্ডার যদি দৌড়ে এসে কোনরকমে জীপে ধাক্কা মারে তো সর্বনাশ। ঐ বিদ্যুতের মতো ছুটে আসা চলন্ত তিন-চার টনী ট্যাংকের ধাক্কায় জীপ উল্টে শিকারীদের প্রাণ সংশয় হতে পারে। তবু স্পোর্টস্ ইজ স্পোর্টস্।

গণ্ডারের আদিপর্ব :

গণ্ডার ভারতের সনাতন আদিবাসী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে যদি মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৫০০০) বোঝায়, তবে সে-যুগেও গণ্ডার তার বনেদী ছাপ রেখেছে বহু সীলে। সে সীলগুলির হরফ পড়তে দুনিয়ার পণ্ডিতরা হিমসিম খাচ্ছেন, কিন্তু গণ্ডারকে চিনে নিতে একটা বালকেরও কোন কষ্ট নেই।

গণ্ডারের সত্যিকারের ইতিহাস খুঁজতে গেলে হাতড়াতে হবে মহাকালের দপ্তরে। সাত কোটি বছর পেরিয়ে মাটির তলায়। তখন সম্ভবত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া মিলে ছিল এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। তখনই হয়েছিল গণ্ডারের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব। তিন-শ' টন্নী-নোথেররা আকারে তখন একটা বড়সড় ভেড়ার চেয়ে উঁচু ছিল না। তাদের চারণভূমি ছিল উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া। পরের দু' কোটি বছরে উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের যোগসেতু অলিন্দে গেল সমুদ্রের তলায়। তখন এশিয়ার সঙ্গে

গণ্ডারের খুরা থেকে তৈরি কাপ

বেড়াত সতেরো ফিট উঁচু বেলুচিথেরিয়ামরা (বেলুচিস্তানে এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাই এই নাম)। তাদের নাকের ডগায় কিন্তু খড়্গ ছিল না। তারা লম্বা গলা বাড়িয়ে চব্বিশ-পঁচিশ ফিট উঁচু গাছের পাতা অনায়াসে খেতে পারত।

খড়্গওয়ালা গণ্ডারেরা পাঁচ কোটি থেকে দশ লক্ষ বছর আগেও তামাম দুনিয়া—এমনকি উত্তর-দক্ষিণ মেরুও চষে বেড়িয়েছে। এখন এরা এসে ঠেকেছে শুধু আফ্রিকা আর এশিয়ায়। কাজেই ধরা যায় একমাত্র এই এশিয়াতেই শৃঙ্গী গণ্ডার-দের ইতিহাস, পাঁচ কোটি বছরের ইতিহাস।

এই পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে এদের একুশটা প্রজাতি পৃথিবী থেকে ঝাড়ে-বংশে লোপাট হয়ে গেছে। বাকি পাঁচটি প্রজাতি তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষের অনেক অত্যাচার সহ্য করে কোনরকমে টিঁকে আছে এশিয়ায় আর আফ্রিকায়।

গণ্ডার পুরাতত্ত্ব :

মহেঞ্জোদাড়োর সীল ছাড়াও প্রাচীন গ্রীস-রোমের ইতিহাসে-পুরাণে গণ্ডারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলের অনেক জায়গায় মিশর দেশের গণ্ডারের কথা লেখা আছে। গ্রীক দার্শনিক টিসিয়াস এক রকম বুনো গাধার বর্ণনা দিয়েছেন, যা গণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন, এদের নাকের ডগায় খড়্গ আছে। ঐ খড়্গে যে পান-পাত্র তৈরি হয়, তাতে সুরাপান করলে বাত ও মৃগী রোগ আরোগ্য হয়।

এই গাধাদের গোড়ালির হাড়ের গঠন অতি চমৎকার। ষাঁড়ের মতো দৃঢ়। এদের খুর চেরা। বুনো বা ঘরে পোষা গাধা কি অন্য কোন একখুরওয়ালা জন্তুর গোড়ালি এদের মতো নয়।

আরিস্ততল তাঁর প্রকৃতি বিজ্ঞানের গ্রন্থে টিসিয়াসকে সমর্থন করে লেখেন, এক খড়্গ ও সেই সঙ্গে এক খুরওয়ালা কোন জন্তু তিনি জীবনে দেখেননি। তিনি কেবল দেখেছেন গোড়ালির চওড়া হাড়ওয়ালা ও খড়্গওয়ালা ভারতীয় গাধা।

খৃঃ পূঃ ১৮০-তে এগায়ার কাইডিস একটা একশৃঙ্গ গণ্ডারকে একটা হাতির পেট ফাঁসিয়ে দেবার বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন। তাঁর মতে হাতির পেট ফাঁসানর জন্যেই এর নাম রাইনোসেরস। ভাষাতাত্ত্বিকরা গবেষণা করে দেখতে পারেন, এ-কথা ঠিক কিনা।

ঠিক হোক বা না হোক, প্রাচীন রোম রাজ্যের অনেক মুদ্রায় যে গণ্ডারের প্রতিকৃতি ছাপা আছে, তা রোম মিউজিয়ামে গেলেই চোখে পড়বে।

এশিয়ায় তৈমুরলং তাঁর বিধ্বংসী বিজয়-অভিযানের ফাঁকে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের জঙ্গলে গণ্ডার শিকার করে-ছিলেন—ইতিহাস এমন বলে। মোঘল সাম্রাজ্যের শুরু যে বাবর-বাদশার হাতে সেই হাত ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু নদীর তীরে ঝোপেঝাড়ে কিভাবে গণ্ডার শিকার করেছিল, তার বিবরণ তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৫১৩-তে কাম্বের রাজা পর্তুগাল-রাজ ইমান্যুয়েলকে এক গণ্ডার উপহার হিসেবে পাঠান। এই প্রথম ভারতীয় গণ্ডার জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করে গোয়ার বন্দর থেকে।

প্রাচীন রোমের কথায় আবার ফিরে যাই। আগস্টস্ সীজার কিং প্যান্টাকে জয় করে স্বর্গ জেতার গর্ব অনুভব করেছিলেন। সেই জয় জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করবার সময় তিনি মল্ল-ভূমিতে বুনো গণ্ডার আর জলহস্তির লড়াই দেখিয়েছিলেন। সম্রাট এন্টোনিয়াস হেলিওগবেলাস ও গার্ডিয়ান দুজনেই এইরকম গণ্ডারের খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দিতেন মাঝে মাঝে।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ, প্যারিসে হৈ-হৈ। কি, না এসেছে একটা গণ্ডারের বাচ্চা। ছুটলেন বিজ্ঞানীর দল। লাভোয়াসিয়ের, লা মার্ক, ক্যুভিয়ের, বোঁকোঁ। প্রাণীবিজ্ঞানী ক্যুভিয়ের আর অভিব্যক্তিবাদী বোঁকোঁ খুঁটিনাটি বর্ণনা লিখে রাখলেন সেই গণ্ডারের বাচ্চার।

১৭৯০-এ যে গণ্ডারটাকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়, তার সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা লিখেছেন বিংলে সাহেব। দর্শকরা তার গা চাপড়ালেও সে কিছু ছুঁটি বলে না। দিনে তার খাবার হল সের-দশেক ঘাস, সের-দশেক বিস্কুট, প্রচুর কাঁচা শাক-সব্জি। দিনে দু-তিনবার পাঁচ বালতি করে জল দেওয়া হয় তাকে। সে চোঁচোঁ করে এক নিশ্বাসে তা শুষে নেয়। গণ্ডারটা মিষ্টি মদ খেতে খুব ভালবাসে। ঘণ্টায় সে বোতল-চারেক অনায়াসে টানতে পারে।

ভারতীয় স্মৃতিতে গণ্ডারের স্থান :

ভারতীয় স্মৃতিতে গণ্ডারের স্থান সুনির্দিষ্ট। আদি ভারতীয় সমাজবিধির স্রষ্টা মনু গণ্ডারকে পঞ্চনখ প্রাণীদের শ্রেণীভুক্ত করে, তাকে তাবৎ হিন্দু, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য করে গেছেন।

মহাভারতে কুরু পিতামহ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিধিনির্দেশ দিয়েছিলেন শর-শয্যায় শুয়ে। সেখানে কোন কোন আমিষ পদার্থে পিতৃলোকের কতদিন তৃপ্তি, তারই একটা লেখা চওড়া ফর্দ দেওয়া আছে। মাছে দু' মাস, ভেড়ার মাংসে তিন মাস। খরগোসের মাংসে চার মাস, ছাগলের মাংসে পাঁচ মাস। শূকর বা বরাহ মাংসে ছ' মাস, শোল মাছে সাত মাস। হরিণের মাংসে আট মাস, সম্বরের মাংসে ন' মাস। অন্য গবাদি পশুর মাংসে দশ মাস। কিন্তু বৃষ-মাংসে বারো বছর। আর গণ্ডারের মাংসে অনন্তকাল।

তাই কট্টর হিন্দু নেপালের রাজাদের শ্রাদ্ধে এখনও গণ্ডারের মাংস দেবার বিধি আছে। এবং নেপালের রাজকীয় অরণ্যে গণ্ডার জিইয়ে রাখার আসল উদ্দেশ্যটাই ছিল এই।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গণ্ডার-মাংসের গুণ বর্ণনা করা আছে। সুশ্রুত তাঁর সংহিতায় বলেছেন, গণ্ডারের মাংস বলকর, বৃংহন (বৃদ্ধিকর) ও গরু। কফ ও বায়ু নাশক। কষায়। পিতৃলোকের তৃপ্তিকর ও পবিত্র। আয়ুর হিতকর। মূত্রবন্ধকারক ও রুক্ষ।

প্রাচীন ভারতে গণ্ডারের একটা বিশেষ স্থান ছিল বলেই, নানা শাস্ত্রে—মহাকাব্যে—পুরাণে গণ্ডারকে নানা অভিধা দেওয়া হয়েছে। খড়্গ থাকার জন্য সে খড়্গী তো বটেই। বনচর তৃণভোজী বলে খড়্গমৃগ। কেরাড় (এই নামটা সংস্কৃতে কিভাবে এসেছে সঠিক বোঝা গেল না)। মুখটা লম্বা আর ভারী বলেও বটে, খড়্গ থাকার জন্যও বটে—তুঙ্গমুখ। বাজের মতো

বর্তমান শতাব্দীর
এক মহীরুহের আত্মজীবনী
বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা

জীবন-কথা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বড়তুলির

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আই, সি, এস'
অমিতাভ চৌধুরীর 'কবি ও সন্ন্যাসী'

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৪

গল্পের মত মজার

লীলা মজুমদারের 'মধ্যমণি' ॥ জহুরী সওদাগরের 'আলি আকবর, স্বদেশে এবং বিদেশে' ॥ অমিতাভ দাশগুপ্তের 'নও শুধু ছবি' ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে।

বিখ্যাতের দুটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ/কবিতা

পিণ্ডারী দেখে এলাম
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ফিল্মে নিয়ে অজয় বসুর 'বাঙালী হৃদয়ে সোনালী স্মৃতি'

অভিনেত্রীকে নিয়ে
মধুসূদন মজুমদারের 'ভরাথাক স্মৃতি সুবাস'

২টি বড় গল্প॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

হাসির বড় গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে
দাম/১০ টাকা
সডাক/১২ টাকা

যুগান্তর শারদীয়া

গল্পে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী
সতোন্দ্রকুমার মিত্র/কণা বসু মিশ্র
সমরেশ মজুমদার/শৈবাল মিত্র
শচীন দাশ এবং অনেকে

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র/অরুণ মিত্র
দিনেশ দাশ/মনীশ ঘটক
অশোক বিজয় রাহা
হরপ্রসাদ মিত্র/মনীন্দ্র রায়
কৃষ্ণ ধর/রাম বসু/পরমানন্দ
সরস্বতী/বিমলচন্দ্র ঘোষ
সুনীলকুমার নন্দী/গৌরাঙ্গ
ভৌমিক/আলোক সরকার/
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত/পূর্ণেন্দু পত্রী/
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/মানস
রায়চৌধুরী/তারাপদ রায়
কাবিকুল ইসলাম/সামসুল
হক/আনন্দ বাগচী
দেবারতি মিত্র/পবিত্র
মুখোপাধ্যায়/অমিতাভ
চক্রবর্তী এবং কয়েকজন

স্কেচ

সুনীলমাধব সেন
প্রকাশ কর্মকার/গণেশ পাত্র
রবীন মণ্ডল/বিকাশ
ভট্টাচার্য/ধীরাজ চৌধুরী
দিলীপ কুণ্ডু/মানু
রাঠোড়/শুভপ্রসন্ন/দিলীপ
মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙীন আর্টপ্লেট

শক্ত চামড়ায় দেহ ঢাকা, তাই বজ্রবর্ম। কাঁধের কাছে আর কোমরের কাছে দুটো গভীর খাঁজ, তাই ঘূর্ণবলী। গণ্ডার একা একা জঙ্গলে চরে বেড়ায়, তাই সে একচর। এসব ছাড়াও বর্ধীনস, স্বনোৎসাহ এসব নামও দেওয়া হয়েছে গণ্ডারকে। তবে তার সবচেয়ে চলতি নাম হল গণ্ড ও গণ্ডক।

গণ্ড শব্দের সংস্কৃতে একটা বিশেষ অর্থ আছে। দেহের কড়া-পড়া অংশকে বলা হয় গণ্ড। সমস্ত শরীরটাই কড়া-পড়া বলে এই জন্তুর সংস্কৃত নাম গণ্ড বা গণ্ডক। আসামী ভাষায় গঁড়। হিন্দীতে গেঁড়া। প্রাচীন বাংলায় গণ্ডাল। তার থেকে গাণ্ডার ও গণ্ডার।

এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আদিকাল থেকে ভারতবর্ষের সর্বত্র কি রাজা-মহারাজা, কি সাধারণ মানুষ গণ্ডার মেরে খেতে রীতিমতো অভ্যস্ত ছিল।

গণ্ডারের স্টক টেকিং :

গণ্ডারদের পাঁচ প্রজাতির মধ্যে আফ্রিকায় রয়েছে দুটি। একটি সাদা, অপরটি কালো। ওদের দুয়েরই খড়্গ দুটি করে। সাদারা দুনিয়ার সব গণ্ডারের সেরা। পা থেকে কাঁধ অবধি ঝাড়া ছ' ফিট উঁচু। ওজনে চার টনের কাছাকাছি। কালোরা আরও একটু ছোট। তবে সংখ্যায় অনেক বেশি। ১৩৬৪-তে আফ্রিকার কালো গণ্ডারদের সংখ্যা ছিল এগারো হাজার থেকে সাড়ে তেরো হাজার। সাদারা ছিল মাত্র আড়াই থেকে তিন হাজার। আশা করা যায় এই বারো বছরে তাদের সংখ্যা আরও বেড়েছে।

এদের তুলনায় এশিয়ার গণ্ডারদের সংখ্যা অনেক কম।

এশিয়ার তিনটি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হল ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডার। আকারে ও ওজনে আফ্রিকার সাদাদের ঠিক পরেই এর জায়গা। ভরা বয়সের একটা একশৃঙ্গ গণ্ডার লম্বায় চোদ্দ ফিট। পা থেকে কাঁধ অবধি উঁচু ছ' ফিটের কাছাকাছি। আর ওজনেও প্রায় তিন টন।

এশিয়ার আর দুই প্রজাতির গণ্ডাররা হল জাভা ও সুমাত্রার গণ্ডার। জাভার গণ্ডার একশৃঙ্গ, দেখতে ভারতীয় গণ্ডারদের মতোই। তবে আকারে একটু ছোট। সুমাত্রার বেঁটে গণ্ডাররা আবার তাদের চেয়েও ছোট, কিন্তু দুই শৃঙ্গ। ১৯৩৫ অবধি সুমাত্রার বেঁটে গণ্ডার আসামের মিজোরামেও দেখা যেত। এখন তাদের দেখা যায় বর্মা, মালয় আর সুমাত্রাতে।

জাভার গণ্ডাররা সংখ্যায় এখন খুবই কম। তাদের দেখা যায় পশ্চিম জাভার উজুং কুলন্-এর সংরক্ষিত অরণ্যে। যদিও গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ চীন হয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিতর দিয়ে জাভা ও সুমাত্রা—এই বিস্তীর্ণ এলাকাটা জুড়ে।

সুন্দরবন ও মেদিনীপুরে গণ্ডার চরত :

বিশ শতকের গোড়াতেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জাভার একশৃঙ্গ ছোট গণ্ডাররা এন্তার চরে বেড়াত। বিশেষ করে বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে, মেদিনীপুরের হিজলী ও ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে, গঙ্গার ধারে রাজমহলের উঁচু পাহাড়-জঙ্গলে, উড়িষ্যার মহানদীর মোহনার ব-দ্বীপে ও বালেশ্বরের জঙ্গলে।

আমার বাবার জ্যাঠামশাই সাতনব্বই বছর বয়সে দেহ রাখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক মাস আগে। তার মুখে সুন্দরবনের গণ্ডারদের চাক্ষুষ বর্ণনা ও মাংস খাবার গল্প শুনে প্রথমে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে আমার অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু ১৩০১ সালে ছাপা বিশ্বকোষে সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে গণ্ডারের অস্তিত্ব লোপ সাম্প্রতিক ঘটনা বলে উল্লেখ করা দেখে আমার বিশ্বাস ফিরে আসে। এখন অবশ্য এসব অঞ্চলে গণ্ডারের কোন চিহ্নই নেই, এখন তো সে-সব কথা উপকথার সামিল। কিন্তু তবুও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যপ্রমাণ প্রচুর।

ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় বড় একশৃঙ্গ গণ্ডারদের শুধুমাত্র দেখা যায় নেপালের ন্যাশনাল পার্কে। সেখানে এদের সংখ্যা শ' দুই-আড়াই মাত্র।

গণ্ডার বংশ—এক ডজন থেকে হাজার :

বৃহত্তর ভারতে বহুকাল ধরে একশৃঙ্গ গণ্ডার বাইরের দেশগুলোতে প্রায় কিংবদন্তী পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তাদের আকার যেমন বিরাট তেমনি তাদের প্রাচুর্য। হঠাৎ বিশ শতকের সুরুতে দেখা গেল কিংবদন্তী শুধু কিংবদন্তী। ভারতীয় এক শৃঙ্গ বড় গণ্ডারের গোষ্ঠী ভারত থেকে, সেই সঙ্গে সারা দুনিয়া থেকে লোপ পেতে চলেছে। বিশ্বের প্রাণীপ্রেমিকরা হৈ হৈ করে উঠলেন। বিলিতী প্রাণিবিজ্ঞানীরা হুঁসিয়ারী ছাড়লেন। দায়িত্ব অর্শাল শাসক বৃটিশ সরকারের ঘাড়ে, সরকারের টনক নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কাজও হল।

১৯০৪-এ সরকার কতকগুলো অরণ্য অঞ্চল সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে দিল। জরুরী ব্যবস্থা নিল এক শৃঙ্গ বড় গণ্ডারদের বাঁচাবার জন্যে। আসামের মিকির পাহাড় দক্ষিণে রেখে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সীমানা করে চওড়ায় ৮ মাইল আর পূব পশ্চিমে লম্বায় ২৫ মাইল নিয়ে একটি সংরক্ষিত অরণ্য তৈরী হল কাজিরঙাতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। না করে উপায় ছিল না। যে কাজিরঙায় এক সময় শয়ে শয়ে গণ্ডার ঘুরে বেড়াত, সেখানে তখন দেখা গেল কুল্লে ডজনখানেক বেঁচে আছে।

একশৃঙ্গ ভারতীয় গণ্ডারদের বাঁচাবার সবরকম দায়িত্ব তখন সরকার নিয়েছে। বন্দোবস্ত সবদিক দিয়েই পাকা। তাই ১৯৩০-এ কাজিরঙায় একশৃঙ্গ গণ্ডারদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দেড়শতে।

তারপরই সুরু হল গুপ্তঘাতকদের এলোপাথাড়ি গণ্ডার খুন—যাকে ইংরেজীতে বলে পোচিং। এইসব খুনে-জল্লাদ পোচাররা রাতের আঁধারে কি দিনের বেলায় জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে লুকিয়ে একের পর এক নির্বিরোধী অসহায় গণ্ডারগুলোকে মেরে শেষ করতে লাগল। ১৯৩৫ সরকার আইন কড়া করতে বাধ্য হল। ব্যবস্থা হল, জঙ্গলে সর্বত্র পাহারার। গণ্ডার মারা কমল কিছুটা। দেখা গেল গণ্ডারদের সংখ্যা আবার ধীরে ধীরে উঠতির দিকে।

কিন্তু চার দশকের সুরুতেই হল এক সর্বনেশে মহামারী। জঙ্গলে তখন বহু বাইরের লোক পালে পালে পোষা গরু-মোষ চরাত। তাদের থেকে সংক্রমণ এল গণ্ডারদের এক ভয়ংকর ব্যাধির। ঠিক বোঝা যায় নি রোগটা কি। কিন্তু জঙ্গলের যেখানে সেখানে গণ্ডার মরে পড়ে থাকতে দেখা যেত। এইভাবে খতম হল বাইশটা গণ্ডার।

১৯৪৭-এ এলো এনথ্রাক্স রোগের সংক্রমণ। তাতেও মরল চোদ্দটা। এগুলো হল গোনাগুনতির মধ্যে। জঙ্গলের দুর্ভেদ্য অগম্য জায়গায় কতোগুলো যে মরে, পড়ে রইল তাদের হিসাবই আর পাওয়া গেল না।

পোষা গরু-মোষদের সংক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে নানা-রকম ব্যবস্থা নেওয়া হল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিস্টার পি. ডি. স্ট্রাশে ছিলেন আসামের বন বিভাগের চীফ কনজারভেটর। অমন বনাপ্রাণী দরদী ব্যক্তি সারা দুনিয়ায় যে কজন আছেন আঙুলে গুনে নাম করা যায়। তিনি গণ্ডার বংশকে বাঁচাবার জন্যে যা যা করার সম্ভব তা করেছেন।

১৯৫১তে ডিসেম্বর মাসে তিনি গৌহাটি ভেটেরেনারী কলেজের অধ্যাপক আর ছাত্রদের মিলিয়ে একান জনের একটি গবেষক দল আনিয়েছেন। তারা সারা কাজিরঙার জঙ্গল তন্নতন্ন

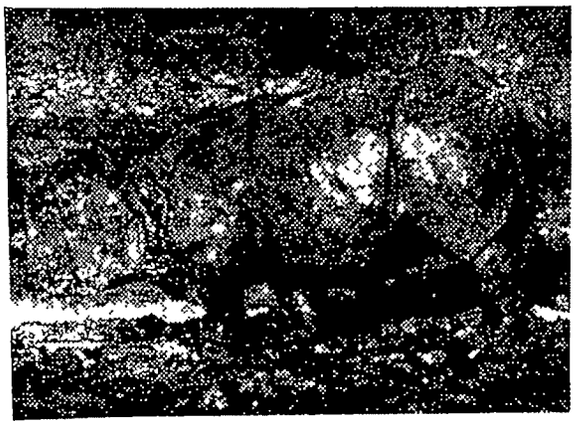

করে চষে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জঙ্গলে চরা পঞ্চাশ হাজার পোষা গরু-মোষকে টিকে দিয়েছেন রিন্ডারপেস্টের। এই ভয়ংকর ব্যাধি রিন্ডারপেস্ট গন্ডারদের ধরে খুব চটপট। এর পরই রোগের আক্রমণ কমে গেল। গন্ডার মৃত্যুর হারও গেল কমে। পোচিং বন্ধ করার জন্য স্ট্রাশে কাজিরঙার জঙ্গলের বাইরে সমস্তটা জঙ্গল বেড় দিয়ে খানিকটা ফাঁকা চৌহদ্দি রাখলেন 'ব্যাফার জোন' হিসাবে। ঐ সমস্ত জায়গা জুড়ে তিনি বসালেন কঠোর পাহারা। বন্ধ করে দিলেন জঙ্গলে সব রকম শিকার। কিন্তু এতো করেও পোচিং বন্ধ করা গেল না। যাবে কি করে? চীফ কনজারভেটর তো আর সব সময়ে কাজিরঙাতে বসে থাকেন না। কাজিরঙা হল সরাসরি একজন রেঞ্জারের দায়িত্বে। সেই রেঞ্জারের সঙ্গে গী-সাহেবের ১৯৪৯এ যে কথাবার্তা হয়েছিল তা বড় মজার। একটু তুলে দিচ্ছি গী-সাহেবের নিজের লেখা থেকে।

'আজকাল কি কাজিরঙায় কোন পোচিং হচ্ছে'—বেধড়ক গন্ডার পোচিং-এর খবর পেয়ে গী-সাহেব এসে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন রেঞ্জারকে।

'পোচিং? পোচিং কি করে হবে-? এটা একটা স্যাংচুয়ারী। আমার লোক চারদিকে পাহারা দিচ্ছে।'—বেশ জাঁকের সঙ্গে জবাব দিলেন রেঞ্জার।

গী বলছেন, যখনই আমি এই রকম জবাব শুনি তখনই আমি বুঝতে পারি আসল ব্যাপারটা কি।

খবর মিস্টার গীর কাছে ঠিকই পৌঁছত, কারণ তিনি থাকতেন কাজিরঙার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা চা-বাগানে। সেখানকার ম্যানেজার ছিলেন তিনি। কাজিরঙার জঙ্গলে ১৯৩৮ থেকে দর্শক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়। মাথা পিছু হাতি ভাড়া একক্ষেপে ছিল পনেরো টাকা। সে শুধু দিনের বেলাতেই। রাতে সেই হাতি যখন পোচার নিয়ে জঙ্গলে ঢুকত তখন তার ভাড়া হত পঞ্চাশ। এ রোজগারের সমস্তটাই যেত কর্মচারীদের পকেটে। সর্ষের মধ্যে ভূত।

গন্ডার বংশ বাঁচানর জন্য গীর অবদান কিছুমাত্র কম নয়। তিনি মিস্টার স্ট্রাশেকে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই রেঞ্জারকে সরিয়ে জনৈক স্কুলমাস্টার আর. সি. দাসকে কাজিরঙার রেঞ্জার করে পাঠালেন স্ট্রাশে। দাস এসেই পোচারদের সঙ্গে হাত মেলান কর্মচারীদের তাড়ালেন। ঢেলে সাজালেন অনুশাসন। ডিভিশন্যাল অফিসার যিনি এলেন, তিনিও একজন উৎসাহী, দক্ষ যুবক। কাজিরঙার এখন যে রূপ তার কাঠামো শ্রীদাসেরই হাতে।

এখন কাজিরঙাতে পোচিং প্রায় বন্ধ বলা চলে। কালে-ভদ্রে দু'একটা হয় না যে তা নয়, তবে সেগুলো হয় বন বিভাগের কর্মচারীদের জবরদস্ত কড়া নজর এড়িয়ে। আসলে পোচিং হল কালোবাজারী, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি-ডাকাতির মতো একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। এর মূল শুধু উপড়ে ফেলতে হলে দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে অন্যভাবে গড়তে হতে পারে।

তবে এই সীমিত কাঠামোর মধ্যে কাজিরঙার বনবিভাগ যতটা করবার করেছেন। গত ৭৪ সাল থেকে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে বাইরের লোকেদের পোষা গরু-মোষ চরান একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া একটি লোকও জঙ্গলে ঢুকতে পায় না। এতে পোচিং-এর একটা মস্তবড় ফাঁক বন্ধ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে।

এই সব কড়া ব্যবস্থা ও কড়া পাহারার ফলে কাজিরঙার গন্ডার গোষ্ঠি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিনশোর কাছে। ১৯৬৬র গননায় তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল চারশো। ১৯৭২-এর গননায় পাওয়া গিয়েছে ছশো সত্তর। এবার মার্চের শেষে কাজিরঙায় গিয়ে এক শৃঙ্গ গন্ডারগোষ্ঠির বাড়বাড়ন্ত দেখে মনে ভরসা এল।

জঙ্গলে ঢুকে এক ফার্লং গেলেই দুটো একটা (সবচেয়ে কম) গন্ডার নজরে পড়বেই। বীট-অফিসার শ্রীদাস বেথে ঢেকে তাঁর অনুমান দিলেন আটশোর মতো। আমার মনে হল হাজারের কম কিছুতেই নয়।

বাঘ মারা পড়ে তার সুন্দর চামড়ার জন্যে। গজদন্তের জন্যে মারা পড়ে হাতি। লোমের জন্য চমরী হত হয়। আর খড়্গের জন্যে গন্ডার।

যদিও গন্ডারে শরীরের প্রতি অংশই মূল্যবান তবু খড়্গের দামের তুলনায় অন্যগুলি কিছুই নয়। গন্ডারের মাংসের দাম বেশ চড়া। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর তা প্রিয় খাদ্য। তার চেয়েও চড়া দামে বিকোয় তার চামড়া। তাতে যুদ্ধের ঢাল থেকে শুরু করে বহু রকমের সৌখীন জিনিস তৈরী হয়। হাড় তো বিক্রী হয়ই, অস্ত্রশস্ত্রের বাঁট আর হরেক রকম ঘর সাজানোর জিনিস তৈরীর জন্যে। তাছাড়াও গন্ডারের হাড়—মারণ-উচাটন-বশীকরণের মোক্ষম যাদুদন্ড। গন্ডারের কিছুই ফেলা যায় না। এমন কি তার প্রস্রাবে পর্যন্ত এন্টিসেপ্টিক গুণ আছে। ১৯৫৫তে ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অব নেচার-এর পক্ষে আমেরিকান ন্যাচরালিস্ট লী-মার্টিন-ট্যালবট এক রিপোর্ট দাখিল করেছেন। তাতে উল্লেখ করেছেন, কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার বাইরে ছোট ছোট কাচের টিউবে গন্ডারের প্রস্রাব বিক্রী হতে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

গন্ডারের খড়্গের দাম সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। ট্যালবট লিখছেন, সুমাত্রায় ভারতীয় গন্ডারের একখানা বিরাট খড়্গ চাই নিজ সিন্ডিকেট হাজার পাউন্ড (প্রায় ষোল সতেরো হাজার টাকা) দিয়েও কিনতে রাজী ছিল।

P 35961

এই বিশ শতকের শেষের দিকেও মিশর থেকে শুরু করে হংকং পর্যন্ত ঢালাও প্রাচ্য দেশে গন্ডারের খড়্গের চড়া বাজার। সে বাজারে একটা খড়্গের দাম দেড়-দু হাজার টাকা অনায়াসে। তিনের দশকে একটা খড়্গের দাম ছিল তার ওজনের অর্ধেক পরিমাণ সোনা। এখন তার দাম তার চেয়ে অনেক চড়া। ৬২-৬৩ সালে গৌহাটিতে এক লট গন্ডারের খড়্গ নিলাম হয়। তাতে বোম্বাই থেকে একদল ব্যবসায়ী স্পেশাল চার্টার করে গৌহাটিতে আসে। তারা প্রতি পাউন্ড ২৫২৫ টাকায় সমস্ত লটটা কিনে নেয়। কাজেই এই খড়্গের জন্য গন্ডারদের জীবনের ওপর আজও যে পোচারদের হামলা চলবে তাতে আশ্চর্য কি?

অথচ যে জন্য খড়্গের এই চড়া বাজার। তার পুরোটাই একটা প্রবাদভিত্তিক অন্ধবিশ্বাস।

আদিকাল থেকে তামাম প্রাচ্যের লোকের মনে বিশ্বাস, গন্ডারের খড়্গচূর্ণ হল পুরুষত্ব-হীনতার অব্যর্থ দাওয়াই।

বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধিতে এর কিয়া নাকি মদনানন্দ মোদকের দশ-গুণ। ব্যস্! এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই বাজারে গণ্ডার খড়্গের এই দারুণ চাহিদা। অথচ সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেলে কতক-গুলি রাসায়নিক ল্যাবরেটরীতে খড়্গচূর্ণের ওপর গবেষণা করে তার মধ্যে হিটেফোটা হরমোন জাতীয় অথবা জৈব রাসায়নিক কামদ কোন বস্তুর সন্ধান মেলে নি।

কিন্তু তবু অন্ধ বিশ্বাস অটল। এইসব অন্ধ বিশ্বাসীদের মতে গণ্ডার-খড়্গের গুণ একমুখে বলে শেষ করা যায় না। গর্ভবতী আসন্নপ্রসবা নারীর বিছানার নীচে খড়্গ রেখে দাও, তার নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হবে। প্রাচ্যের কোন কোন দেশে গণ্ডার-খড়্গের মালিকের খড়্গ ভাড়া দেওয়া একটা দারুণ ব্যবসা। প্রতিক্ষেপে খড়্গ পিছু ভাড়া ৫০০ টাকার মতো।

এছাড়াও গণ্ডারের খড়্গ ভেজান জল খাও, দেখবে যম তোমার কাছে ঘেঁসবে না। সারা রাত এক বালতি জলে খড়্গ ভিজিয়ে রাখলে তা মৃতসঞ্জীবনী সুধার সামিল। পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সকালে উঠে এক এক চামচ এই জল প্রথমেই পান করে নেয়, বজ্রদেহী হবার অলীক কল্পনায়।

কম্যুনিস্ট চীনে অবশ্য গণ্ডারের খড়্গ এফ্রোডিসিয়াক বা কামোত্তেজক ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বেশ কবছর আগে থেকেই।

গণ্ডারের খড়্গ এক গোছা লোম ছাড়া আর কিছুই নয়

অথচ গণ্ডারের শিং বা খড়্গ এক গোছা লোমের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। গরু-মোষের শিং যেমন এক গোছা লোম এক সঙ্গে জমে গিয়ে তৈরী হয়—ঠিক তেমনি। গরু-মোষের হয় মাথার দু পাশে, আর গণ্ডারের হয় নাকের ওপর।

স্তন্যপায়ীদের লোম বা চুল এক জাতীয় প্রোটিন পদার্থে তৈরী, তার নাম কেরাটিন। এই কেরাটিনের তন্তুগুচ্ছ জমে খড়্গের উৎপত্তি। তাই বিজ্ঞানে এর নাম কেরাটিন তন্তু শৃঙ্গ।

ভারতীয় গণ্ডারের নাকের ওপর এই খড়্গ লম্বায় সাধারণতঃ আট ইঞ্চি থেকে এক ফুট। জন্তুবিশেষে এটা বেড়ে ষোল থেকে বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। তবে বৃটীশ মিউজিয়ামে যে প্রকাণ্ড খড়্গটি রাখা আছে সেটা চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা—একটা অসাধারণ ব্যাপার।

এই খড়্গের মূল থাকে চামড়ার নীচেই, হাড় পর্যন্ত গভীরে যায় না। তাই এটি মাঝে মাঝে খসে পড়ে যায়। সে জায়গায় আবার গজায় নতুন খড়্গ। জঙ্গলে এই রকম খসে পড়ে থাকা পুরোন খড়্গ প্রায়ই কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার গণ্ডারদের খড়্গ হল এক সাংঘাতিক অস্ত্র। এ দিয়ে সে অন্য প্রাণী তো দূরের কথা হাতিকে পর্যন্ত জখম করে ছাড়ে। লোকজন দেখলেই সে ফোঁস ফোঁস করে রুখে মারতে আসে। ভারতীয় গণ্ডার মানুষজন দেখলেই কিন্তু তেড়ে মারতে আসে না। যদি সে কোন কারণে গোঁ নিয়ে তেড়ে আসে, তখন তার অস্ত্র খড়্গ নয়। তার আসল অস্ত্র হল ওপর-নীচের দাঁতের পাটির কাটি ছেদন দন্ত। বিশেষ করে তার নীচের পাটির দাঁতগুলো। শত্রুকে ওর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে গণ্ডার তার ভারী মাথা এক ঝাঁকুনিতে ওপরের দিকে উঠিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যাকে কামড়ায় তার শরীরে তৈরী হয় এক ভয়াবহ ক্ষত। তাতেই মনে হয় সে বুঝি খড়্গ দিয়ে গুঁতিয়ে দিল। আসলে তা নয়।

কাফিরডার জঙ্গলে আমি বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি ঘুরে-ঘুরে। বিভিন্ন দিনে আমি বহু গণ্ডার দেখেছি। কিন্তু কখনও কোন গণ্ডারকে গাছের গায়ে খড়্গ ঘষতে দেখিনি। অথচ আফ্রিকার গণ্ডাররা তাদের খড়্গ গাছের গায়ে ঘষে রীতিমতো শান দেয়।

গণ্ডারের লম্বা মুখে নাকের ডগায় উদ্যত খড়্গ—তা সে আক্রমণ করুক চাই না করুক, সে এক ভীতিপ্রদ দৃশ্য। বিশেষ করে সে যখন তার দুর্দান্ত গোঁ নিয়ে খড়্গ উঁচিয়ে তেড়ে আসে, তখন বাঘ কিম্বা হাতিও তার কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না।

গণ্ডার-হাতিতে

একটা বড় গণ্ডারকে বাঘ রীতিমতো ভয় করে। হাতিও তার যাতায়াতের পথে পড়লে পাশ কাটিয়ে চলে। অথবা রকম সকম একটু এদিক ওদিক দেখলে সটান উল্টো পথ ধরে। বন বিভাগের শিক্ষিত হাতিরা গণ্ডারের মেজাজ বুঝে তাদের খুব কাছেই যায়। মাঝে মাঝে তাড়াও করে। কিন্তু যদি সে বোঝে গণ্ডারটার সত্যি গোঁ চেপেছে, তবে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে।

আমি কয়েকবারই হাতি নিয়ে গণ্ডারের দশ গজের মধ্যে মুখোমুখি হয়েছি, ছবি নেবার জন্যে। দু-একটা গণ্ডার তেড়েও এসেছে। কিন্তু হাতির হুঁসিয়ারী গর্জন শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। খুব কাছে এসেও আর এগোয়নি।

একবার একটা প্রকাণ্ড গণ্ডারকে আমাদের হাতি দেওকলি ঘাসের জঙ্গল থেকে তেড়ে বার করে। সেটা চাইছিল লুকোতে। দেওকলি কিছুতেই তাকে লুকোতে দেবে না। সে তাকে ক্রমাগত তাড়া করে। শেষে গণ্ডারটা বিরক্ত হয়ে ঘুরে রুখে দাঁড়ায়। ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসতে থাকে দেওকলির দিকে জঙ্গল তোলপাড় করে। দেওকলির হুঁসিয়ারী সে গ্রাহ্যও করে না। অসম্ভব গোঁ নিয়ে সে এগোতে থাকে। দেওকলির তখন প্রায় রণে ভঙ্গ দেবার উপক্রম। এমন সময় বন বিভাগের আর এক হাতি সাধনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাঁড়ায় দেওকলির পাশে। তখন দুজনে মিলে এক প্রচণ্ড হুংকার। গণ্ডারটার এবার হুঁস হয়। সে মাত্র পনেরো হাত দূরে এসে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিনিট দুয়েক সে একেবারে স্ট্যাচু—নট নড়ন-চড়ন। পরক্ষণেই চোখের পলকে তার অত বড় শরীরটা কুইক এবাউট টার্ণ করে একেবারে ভোঁ দৌড়। জমিতে তার খুরের আওয়াজ বাজতে থাকে খটাং খটাং। আর নাক দিয়ে বার হতে থাকে গাঁক গাঁক করে একটা অদ্ভুত শব্দ।

দেওকলির মাহুত হাজারিকাকে বলি, ও রকম খোঁচাখুঁচি করে বিপদের ঝুঁকি নেবার দরকার কি?

হাজারিকা একটু হেসে জবাব দেয়, হুজুর ও কিছু নয়। হাতি গণ্ডারের সঙ্গে একটু মস্করা করছে।

বুনো মস্করা নিঃসন্দেহে।

আর একদিন ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। শ্রীযুক্ত দাস আছেন সঙ্গে। কদিন থেকেই আমরা চেষ্টা করছি মুনা বিলের ধারে সম্বরের ঝাঁকটা দেখব বলে। (সম্বর এই জঙ্গলে সংখ্যায় খুব বেশী নেই)। যে পথটা মুনা বিলের পাড়ে গিয়ে উঠেছে, তার দু পাশে ঘন শরবনের জঙ্গল, প্রায় পনেরো ফিট উঁচু পাঁচিলের মতো। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই শুরু মুনা বিলের খাত। সেখানে গজিয়েছে ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাস। ঘাস থেকো জানোয়ারদের চরবার একটা চমৎকার জায়গা। গাড়িটা শরবনের পাঁচিল পার হতেই দেখি—আরে সর্বনাশ! পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে এক বিশালকায় গণ্ডার! আমাদের দেখেই সে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। এগিয়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে।

গণ্ডারটার বিশেষ দোষ নেই। আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল তার নাড়ের গাদার ওপরে। গণ্ডারের ধর্মই হল একটা জায়গায় পায়খানা করা। খুব সম্ভবতঃ বিলের খাতে সবুজ ঘাসে পেট ভরিয়ে, জল খাওয়া সেরে সে আসছিল তার সন্ধ্যার কাজ সারতে। আমাদের গাড়িটা তার পায়খানার জায়গাতে দাঁড়াতে তার সে কাজে বাধা পড়েছে। তাই সে গেছে চটে। হাত দশেকের মধ্যে যখন সে এসে পড়েছে, আমরা মনে মনে বিপদ গণলাম। শ্রীযুক্ত দাস তাঁর রাইফেলটা রেডী করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার হাতের

শুভ উদ্বোধন

আগামী ১০ই আশ্বিন '৮৪ (২৭শে সেপ্টেম্বর '৭৭) মঙ্গলবার 'মৌসুমী প্রকাশনী'-র নতুন কার্যালয় ও বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন হচ্ছে-১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯ —এই ঠিকানায়। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের সকল পৃষ্ঠপোষক, পুস্তক-বিক্রেতা, সাধারণ ক্রেতা ও শুভাকাঙ্খী সুধীবৃন্দের ব্যক্তিগত উপস্থিতি, সাহচর্য ও সহযোগিতা কামনা করি। এই বিশেষ

বিশেষ কমিশনের সুযোগ

শুভদিনে আমরা সাধারণ ক্রেতাদের আমাদের প্রকাশিত যে-কোনো বই ২০% কমিশনে দেব। পুস্তক বিক্রেতারা ওই দিন অতিরিক্ত ৫% কমিশন পাবেন। বাইরে থেকে যাঁরা অগ্রিম টাকা পাঠাবেন তাঁরাও এই বিশেষ কমিশন গ্রহণের সুযোগ পাবেন ৮ই অক্টোবর' ৭৭ পর্যন্ত।

॥ এই শুভদিনে প্রকাশিত হচ্ছে ॥

কালকূট রচনা সমগ্র (৪র্থ খণ্ড) ॥ সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত ॥ ২৫·০০ শ্রীমতীকাফে ॥ সমরেশ বসু ॥ ১৬·০০ জ্যোৎস্নার খেলা ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ৮·০০ পরীর সঙ্গে প্রেম ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৮·০০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম ॥ হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১০·০০ প্রেমিকার মুখ ॥ দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

মৌসুমী প্রকাশনী নতুন ঠিকানা ঃ
১এ, কলেজ রো ॥ কলকাতা-৯ ॥ ফোন ঃ ৩২-১৪৫৩

চেটো দিয়ে গাড়ির গায়ে বারকতক পিটিয়ে দিলেন দমদম করে। মুখে ছাগল-গরু তাড়ানোর মতো আওয়াজ করলেন—হ্যাঃ হ্যাঃ।

হঠাৎ গণ্ডারটা থমকে পড়ল। এবং বেশ কিছুক্ষণ ঐ রকম থমকে দাঁড়িয়েই রইল। তার চোখের চাউনিটা আর মুখের ভাবটা গড়িয়ে পড়া আলোতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অনেকটা ঠিক হতভম্ব ভ্যাবলার মতো। তারপর বোঁ করে ঘুরে, উল্টো পথে দু-দ্দাড় দৌড়। গায়ে খুরের আওয়াজ উঠল খটাং খটাং। নাকে ঝাঁক গাঁক।

বোধ হয় এই অনুধাবন শক্তির অভাবের জন্যেই গণ্ডার ক্রমে সহজে ঘাতকের হাতে মারা পড়ে। যে সব চাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বাঘ কি হাতি শত্রুর গন্ধ পেলেই আত্মরক্ষার জন্যে লুকিয়ে পড়ে জঙ্গলের গভীরে, গণ্ডারের তা নেই। তাছাড়া চটে গেলে সে সোজা তার সমস্ত শরীরটা বার করে আক্রমণ করে বসবে। তার একরোখা গোঁ এমনিই যে তার কাছে লুকোছাপার বা হটে যাবার কোন প্রশ্নই নেই।

গণ্ডারে-বাঘে

বাঘ একলা কখনও বড় গণ্ডারের দিকে ঘেঁসে না। কিন্তু এই কাজিরঙায় বাঘের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। সেটা হল গণ্ডারের বাচ্চা মারার। মারা শিকারের মাংস মাঘ খেতে পারে না। তবু মারাতেই তার অনন্দ। এমনিতে মা-গণ্ডার তার বাচ্চাকে সামনে রেখে ঘোরে সব সময়ে। দেখে আমার মনে হয়েছে মা তার বাচ্চাকে বুক দিয়ে আগলে বেড়ায়। তার কাছে ঘেঁষে বাঘের এমন সাধ্য নেই। তখন দুটো বাঘ একসঙ্গে জুটে মা-বাচ্চার পিছনে লাগে। একটা তেড়ে যায় মার দিকে। মা তখন তার পিছনে তাড়া করে বাচ্চাকে ফেলে রেখেই। অন্য বাঘটা সেই সুযোগে বাচ্চাটাকে মারে।

বন বিভাগের কর্মী শ্রীযুক্ত আহমেদ বললেন, এভাবে বাঘ বছরে বেশ কয়েকটা গণ্ডারের বাচ্চা মেরে শেষ করে। না হলে গণ্ডারের সংখ্যা কাজিরঙাতে আরও বাড়তে পারত।

গণ্ডারের দাম্পত্য

বাইরের থেকে দেখলে স্ত্রী-পুরুষ গণ্ডারে কোন তফাতই নজরে পড়বে না। সবারই খড়গ প্রায় একই ধরনের। গায়ের রং গাঢ় চকোলেট। তবে সর্বদাই সে কাদায় হোড়ে গড়াগড়ি দিয়ে সারা শরীরে পলস্তারা লাগিয়ে রাখে বলে শুকনো কাদার খড়ি ওড়ে। আসল রং দেখার সুযোগ আমার হয়েছে এক সকালে, যখন এক মা গণ্ডার গণ্ডারমারী বিলের জলে সদ্য স্নান করে উঠে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছে। সকালের রোদে তার গায়ের চামড়া পুরু পালিশ করা তামার প্লেটের মতো ঝকঝক করছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

গণ্ডাররা এমনিতে বনে একাই চরে বেড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় একটা গণ্ডার আর একটার পিছনে তাড়া করেছে। মনে হয় একটা পুরুষ ছুটছে লড়াইয়ের জন্যে আর একটা পুরুষের পিছনে। আসলে কিন্তু তা নয়। একটী ঋতুমতী আসঙ্গলিপ্সু স্ত্রী গণ্ডার কাছে অনিচ্ছুক পুরুষকে রাজী করাতে।

মেয়ে গণ্ডার ঋতুমতী হয় ছেচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ দিন অন্তর অন্তর। পুরুষ গণ্ডারদেরও উত্তেজনার বিশেষ সময় আসে। তখন তারা স্ত্রী-সঙ্গের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রী আর পুরুষের উত্তেজনা যখন একই সময়ে জাগে তখনই আসে তাদের আসল সঙ্গমের সময়। মার্চের শেষের দিকে আসে এই সময়টা। তার মানা যায়, বছরের সব ঋতুতেই কিছু না কিছু স্ত্রী-পুরুষকে জড়সড় দেখা যায়।

এই তথ্যের নির্ভরযোগ্য লেখা রিপোর্ট আমি কোথাও পাইনি। তবে হল বিভাগের [illegible] ঘটনার উল্লেখ শুনেছি। একটা কথা মানতেই হবে, গণ্ডারের যৌন-জীবন সম্বন্ধে পুরোপুরি তথ্য আমাদের হাতে আসেনি।

গর্ভধারণ

স্ত্রী গণ্ডারের গর্ভধারণের সময় হল ষোল মাস এক সপ্তা থেকে দু সপ্তা। মাহুত হাজারিকার ধারণা হিসেবে ষোল মাস ষোল দিন। (মানুষের যেমন চলতি হিসেব দশ মাস দশ দিন, তেমনি আর কি!) বাচ্চার জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে ওজন থাকে ৬০ কিলোর মতো।

গণ্ডার পুরোপুরি ঘাসখেকো জানোয়ার। পুরনো শরবন জ্বলে যাবার পর যে কচি কচি শরগাছ জন্মায়, তা গণ্ডারের রাজ-ভোগ। কখন সখন সে বিলের কচুরিপানার কচি পাতাতে মুখ বদলায়।

গণ্ডারের আয়ু হাতির মতোই ষাট থেকে সত্তর বছর।

গণ্ডার মারা কাপুরুষের কাজ

ভারতের জনসাধারণ আদিকাল থেকে গণ্ডার মেরেছে তার খড়্গ আর মাংসের জন্যে। রাজা বাদশারা মেরেছে শিকার খেলার আনন্দে। কিন্তু তাতেই যে গণ্ডার বংশ নির্মূল হত এমন কথা বলা যায় না। কারণ সেগুলো মূলে গণহত্যা ছিল না।

গণ্ডার গোষ্ঠীর বিপর্যয়ের শুরু হয়েছে গত দু শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়ে বৃটিশরাজের দাপটে ভারতের রাজা-মহারাজা-সুলতান-বাদশারা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হল। তখন তাদের একমাত্র বীরত্বের কাজ হল বুনো জানোয়ার শিকার করা। নিজেদের যথেষ্ট নিরাপত্তার ভেতরে রেখে রাইফেল দিয়ে তারা অসহায় বুনো জানোয়ারগুলোকে নির্বিচারে খুন করে ভারতবর্ষের আরণ্য ঐশ্বর্যের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে। বাঘ, সিংহ, বিশেষ কয়েক জাতের হরিণ, বুনো বরাহ ও নানান জাতের পশুপাখী প্রায় নিঃশেষ হবার মুখে এসেছে। এইসব হীনবীর্য কাপুরুষের দল বন্য জন্তুদের এই পশু-হত্যাকে সে সময়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলে সমাজে চালাতে চেয়েছে। সে যুগে যে যতো জন্তু মারতে পারত, সে তত বড় বীর। এই বীরত্বের মেগ্যালোম্যানিয়া ফিউডাল মনোবৃত্তির একটা বিশেষ লক্ষণ। আর এই হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে সহজ শিকার গণ্ডার। গণ্ডার বংশ ধ্বংসের এটা একটা বড় কারণ।

এর ওপর বিপর্যয় এনেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের আকাশ-ছোঁয়া লোভ। অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে তারা খড়্গের ব্যবসা চালু রেখেছে একনাগাড়ে ভারতীয় গণ্ডার মেরে। এই সেদিন অবধি [illegible] গেছে, জঙ্গলে একের পর এক গণ্ডার মরে পড়ে আছে। তাদের পচা শব ছিঁড়ে খাচ্ছে শিয়াল-হায়না-শকুনরা। সবই ঠিক আছে শুধু নাকের ডগার খড়্গটা কাটা।

গণ্ডারদের চলাচলের রাস্তা, পায়খানার জায়গা [illegible] থাকার জন্যে পোচারদের গণ্ডার মারতে এতটুকু অসুবিধা নেই। নাড়ের গাদার আড়ালে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল। তার পর আছে ভারতীয় সনাতন পদ্ধতি, যাতায়াতের পথে গর্ত কেটে ক্যামোফ্লেজ করে গণ্ডার ধরা। কিন্তু পোচারদের নৃশংস হত্যা শয়তানকেও লজ্জা দেবে। তারা গর্তের নীচে বাঁশের খাদি ডগা সরু কলমের মতো কেটে সোজা বল্লমের ফলার মতো বসিয়ে দেয়। গণ্ডার সেই গর্তে পড়লেই সেগুলো তার পেটের দিকের নরম অংশে গিঁথে গিয়ে তাকে সাংঘাতিক জখম করে। সে আর নড়াচড়া করতে পারে না। সেই অবসরে পোচাররা নাকের ওপর থেকে খড়্গটা কেটে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। বেচারা অসহায় জীবটা তখন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একটু একটু করে মরতে থাকে।

আসার কথা কাজিরঙ্গার এই পোচিং প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া, হলং অঞ্চল থেকে কয়েক বছর আগেও ক্রমাগত গণ্ডার পোচিং-এর খবর এসেছে। এখনিতেই পশ্চিমবঙ্গে গণ্ডারের সংখ্যা অনেক কম, পোচিং-এর কোপ পড়ে অবস্থা আরও কাহিল।

গণ্ডার ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ বসতি বিভ্রাট

এসব সত্ত্বেও গণ্ডারগোষ্ঠী বংশ বৃদ্ধি করে কোন রকমে হয়তো টিঁকে থাকতে পারত। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় এনেছে বসতি বিভ্রাট।

প্রত্যেক জীবের পৃথিবীতে খেয়ে বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধি করার জন্য চাই উপযুক্ত বসতি—ইংরাজীতে যাকে বলে হ্যাবিট্যাট। গণ্ডারদের বসতি হল বিস্তীর্ণ ঘাসে ভরা চারণভূমি। শব ঘাসের জঙ্গল। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার পূর্বে এই ধরনের জঙ্গল ছড়িয়েছিল একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়ে। আর দূরে দূরে উঁচু পাহাড় অঞ্চলে ছিল বড় গাছের জঙ্গল। নাবাল পাঁলপড়া অঞ্চলে বড় গাছের জঙ্গল যে আদপেই ছিল না এমন নয়। ঘাসের জঙ্গলের কিনারে কি মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো বড় গাছের জঙ্গল সব সময়েই ছিল। কিন্তু নাবাল অঞ্চলের বেশীর ভাগ জুড়েই ছিল ঘাসের জঙ্গল।

আসামে জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব অরণ্য অঞ্চলে—নাবাল এবং উঁচু জমিতেও লোকবসতি শুরু হয়ে যায়। লোকেরা জীবিকার জন্যে নীচু উর্বরা ঘাসের জঙ্গল সাফ করে চাষ-বাস শুরু করে দেয়। সেই সঙ্গে গণ্ডারের প্রকৃতিদত্ত অধিকারে পড়ে মানুষের হাত। গণ্ডাররা তখন সেইসব অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে আসে উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের জঙ্গলে।

সেখানে এসেও তাদের রেহাই নেই। মানুষের উৎপাত বাড়তেই থাকে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে শুরু হয়েছে চায়ের চাষ। তার সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে চলতে থাকে ধান চাষও—যাকে চলতি কথায় বলা হয় টেরাস কাল্টিভেশন। চা-বাগানে কাজ করার জন্যে বাইরের থেকে আমদানী করা হয় হাজার হাজার শ্রমিক। তাদের বসবাসের জন্যে তৈরী হয় বস্তির পর বস্তি। জঙ্গল হাঁসিল হতে থাকে মাইলের পর মাইল। এ ব্যাপারে মারা পড়ে বহু বুনোজন্তু। তার চেয়েও বেশী সংখ্যায় তারা হয় উদ্বাস্তু।

এই শতকের গোড়াতে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিরাট জঙ্গল এলাকার এই শোচনীয় দুর্গতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডারের গোষ্ঠীও ক্রমাগত মার খেয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পৃথিবী থেকে লোপ পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এখন কাজিরঙ্গার স্যাংচুয়ারি একটি আদর্শ অভয়ারণ্য। জীব-সংরক্ষণ বা কনজারভেশন প্রতিটি সভ্য জাতের একটি গুরুদায়িত্ব। সেই দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন কাজিরঙ্গার বনবিভাগের কর্মচারীরা।

রেঞ্জার শ্রীসুনোয়ালকে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জঙ্গলের প্রত্যেকটা বিলে তো দেখি মাছঠাসা। ওদের কি ব্যবস্থা—?

—ওগুলো ডোঁদড়, মেছো ঈগল আর মাছখেকো পাখিদের জন্যে—

জবাব দিয়েছিলেন শ্রীসুনোয়াল। তারপর হেসে বলেছিলেন, এই জঙ্গলের ঘাস-গাছপালা-জীবজন্তু যা কিছু দেখছেন, তাদের একটিও সরকারি আয়ের জন্য নয়। জঙ্গল থেকে আয় করা আমরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। জঙ্গলে যা কিছু আছে তা শুধু জঙ্গলের পশু-পাখিদের চরে খেয়ে বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধি করার জন্যে। বাইরের থেকে যাতে তাদের ওপর উৎপাত না হয় তার জন্যে জিম্মাদার হয়ে আছি আমরা।

আপাততঃ এইটাই একটা মস্ত বড় লাভ।

স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ে
সবচেয়ে বেশী লাভের উপায়!

ইউবিআই রি-ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান

১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট আপনি কিনতে পারেন। টাকাটা অবশ্য ১০০-এর গুণিতকে হওয়া চাই। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, ৬২ ও ৭৩ মাসের মেয়াদে পাওয়া যায়। এই সার্টিফিকেট থেকে আপনি স্বল্পমেয়াদে সবচেয়ে বেশী লাভ পাবেন ৭৩ মাসের মেয়াদ শেষে ১০০০ টাকার একটা সার্টিফিকেট থেকে আপনি পাবেন ১৮৩৩·০০ টাকা—অর্থাৎ, লাভ হচ্ছে ৮৩৩·০০ টাকা।

- ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থা, সমিতি, ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কেনা যায়। নাবালকের নামেও কেনা যায়।
- আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজন হলে, সুদের আয় বাদে বার্ষিক সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।
- সার্টিফিকেটের দামের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়।

সুবিধেমতো টাকার অঙ্ক ও সঞ্চয়ের মেয়াদ বেছে নিয়ে ইউবিআই-এর রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট কিনুন।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

কেউটে রপ্তানি

সাপ-রপ্তানির দিকপাল মেসার্স ওরিয়েন্টাল রেপটাইল সাপ্লাই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নাজির আলি সাপের বিষয়ে সত্যিই গুণীজন। থাকেন গোলপুকুর। সাউথ শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মিনিট পঁয়ত্রিশ লাগে বারুইপুর পৌঁছতে। বারুইপুর স্টেশন থেকে গোলপুকুর হেঁটে অথবা রিকসায় যাওয়া যায়। বাঁশের খুঁটি আর দরমার বেড়ার ছাওয়া মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু দৈর্ঘে-প্রস্থে ছোটখাটো একটা হলঘর বিশেষ। সাদামাটা পরিবেশে প্রচার থেকে বঞ্চিত সাপের সাচ্চা সমঝদার নাজির আলি ৭৩ বছর বয়সেও এখনও টানটান। চোখে সৌখিন চশমা, দাড়ি-গোঁফহীন মুখে সরল ব্যক্তিত্বের আভাস।

কথা হচ্ছিল নাজির আলির সঙ্গে। প্রসঙ্গটা আমিই তুললাম, নাজির সাহেব, আপনার চলছে কেমন?

—আ—র চলছে। সরকার সাপ-রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে পথে বসিয়েছেন আমাদের। ১৯৭০ সালে সরকার সাপ-রপ্তানি বন্ধ করলেন। আমাদের দেশের চাহিদা নাকি আগে মেটাতে হবে, কিন্তু আমাদের দেশে চাহিদা কোথায় বলুন? কেনে তো সাধারণ সাপুড়ে, বেদে আর মাল সম্প্রদায়ের লোকেরা। এছাড়া কলকাতা আর মফঃস্বলের কিছু কলেজ মাঝে-মধ্যে নেয়। গড়ে মাসে ১৫-২০টার বেশি বিক্রি নেই। অথচ ১৯৬৯-৭০ সালে এক বছরে কম করে তিন-চার হাজার সাপ বিদেশে পাঠিয়েছি। রপ্তানি চালু থাকাকালীন সাপ যেমন প্রচুর বিক্রি করেছি, তেমনি দামও পেয়েছি চড়া। পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি বহু প্রদেশের সাপুড়ে সম্প্রদায় ও সাপ ধরে এমন লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনমাফিক মাল যোগাড় করতাম, তারাও দুটো পয়সার মুখ দেখতো। কিন্তু সে-কালও গেছে, আমরাও দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

—প্রধানত কি জাতের সাপ রপ্তানী হতো?

—কেউটে। যদিও বিষাক্ত আর নির্বিষ মিলিয়ে ১০-১২ জাতের সাপ রপ্তানি করেছি, তবু একা কেউটেই গেছে মোট রপ্তানি-করা সাপের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। বিদেশে কেউটের খুব চাহিদা। কেউটে বিক্রি করে অন্য যে-কোন সাপের তুলনায় লাভও হয় অনেক বেশি, কারণ আমাদের পশ্চিমবাংলায় বিষাক্ত সাপের মধ্যে কেউটেই মেলে সবচেয়ে বেশি। তাই কেউটে সংগ্রহ করি খুব সস্তা দরে। কি আমাদের দেশের বাজারে, কি বিদেশের বাজারে কেউটের বড় আদর। শুধু বিষের জন্য নয়, খেলা দেখানোর পক্ষেও আদর্শ সাপ কেউটে। ফণা তুলে নাচবে আর মাঝে মাঝে ফোঁস করে ছোবল মারবে, তবে না খেলা জমবে। সাপ বলতেই সাধারণ লোকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে সাপের ফণা। অথচ ভারতবর্ষে যে প্রায় ২০০ রকমের সাপ

আছে, তার মধ্যে শুধু কেউটে, গোখরো ও শংখচূড়—এই তিন সমগোত্রীয় সাপের ফণা আছে।

কেউটের পরেই বিদেশের বাজারে চাহিদা চন্দ্রবোড়ার। সেও পাঠিয়েছি মোটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। টিকটিকি, তক্ষক, গিরগিটি, ব্যাঙাচি, কি না পাঠিয়েছি। শুধু টিকটিকিই পাঠিয়েছি অন্তত ছয় হাজার। এখন তো সবই বন্ধ। সরীসৃপ, তা সে জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন, অথবা সরীসৃপের চামড়া বা দেহাংশ দ্বারা তৈরি জিনিস রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এখনও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সাপ পাঠানর জন্য অনুরোধ আসে। এই দেখুন, এক বিদেশী কোম্পানীর এই চিঠিটা কয়েকদিন আগে পেয়েছি। অর্ডার বোধ করেছে সাপ পাঠাতে।

চোখ বোলান শেষ হতেই নাজির আলি প্রশ্ন করলেন, ওরা নির্বিষ সাপ চেয়েছে। দেশে বিষের ব্যাপক চাহিদা হবে—এই আশায় বিষাক্ত সাপের চালান ব্যাণ্ড করা হয়েছে বললে না হয় মেনে নিতে পারি, কিন্তু নির্বিষ সাপ দেশের কি উপকারে লাগে বলতে পারেন?—নাজিরের কথায় যথেষ্ট ঝাঁঝ।

নাজির আলি যখন বিদেশে সাপ পাঠাতেন, সে-সময় থাকতেন বারুইপুরেরই দত্তপাড়ায়। সাপ বাক্স-বন্দী হওয়ার সময় আমিও দু-একবার উপস্থিত ছিলাম। যে সাপগুলোকে পাঠান হতো, তাদের প্যাক করার আগে খাওয়ানো হতো। নিয়ে আসা হতো মার্কিন কাপড়ে তৈরি থলে। থলেগুলো আকৃতিতে সিমেন্টের বস্তার মতো হলেও, আকারে তার চেয়ে একটু ছোটই হতো। এক-এক জাতের সাপকে এক-একটা থলেতে ভরে ফেলা হতো, অর্থাৎ কেউটের থলেতে শুধু কেউটেই, চন্দ্রবোড়ার থলেতে চন্দ্রবোড়া, এইরকম

আর কি। এক-একটি থলেতে ৪-৫টা সাপ পুরে মুখগুলো সেলাই করা হতো অথবা বেঁধে ফেলা হতো। তারপর থলেগুলোকে প্লাইউডের বাক্সে টান-টান করে পেতে থলের দুপাশে পেরেক মারা হতো, যাতে বাক্স নাড়াচাড়া করা হলেও সাপগুলো এক জায়গাতেই থাকতে পারে।

বাক্সগুলো তৈরি করা হতো নানা আকারে। কোনটা ২৪"×২০"×৮", আবার কোনটা ২৪"×১৬"×১২" আকারের। বাক্সে ½" আকারের ৮-১০টা ফুটো করা হতো। থলে সাজিয়ে বাক্সগুলো বন্ধ করার পর বিশেষ নিরাপত্তার খাতিরে তারের জাল দিয়ে মোড়া হতো বাক্সগুলোকে।

বাক্স আর থলের খরচ সাপের কারবারীর কিন্তু বিদেশে পাঠানর বিমান খরচা সব সময় ক্রেতাই বহন করেছে। বিমান ছাড়া জাহাজে কখনো সাপ রপ্তানি হয়নি।

১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ এই ধরনের বাক্স করতে খরচা পড়তো ১২-১৩ টাকা। থলের দাম পড়তো টাকা দেড়েক।

নাজির আলি সে-সময় যে-দামে সাপ কিনতেন ও বিক্রি করে যে দাম পেতেন তার একটা পর্যায়ক্রমিক তালিকা দেওয়া হল :

বিষাক্ত সাপ : কেউটে ১০—১৫ টাকা এবং ৩০—৫০ টাকা, গোখরো ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, চন্দ্রবোড়া ১০—১৫ টাকা এবং ৩০—৫০ টাকা, কালাজ ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, শাঁখামুটে ১৫—২০ টাকা এবং ৩৫—৫৫ টাকা, শংখচূড় ২০০—২২৫ এবং ৫০০—৭৫০ টাকা।

নির্বিষ সাপ : পাইথন ১৭৫—২৫০ টাকা এবং ৫০০—১০০০ টাকা, কালনাগিনী ১৫—২০ টাকা এবং ৩০—৫৫ টাকা, বেত আছড়া, হেলে ধরগিন্নী, লাউ ডগা, ধামিন, ভাংমেটে ১—২ টাকা এবং ৩—৬ টাকা।

বহু দেশে সাপ পাঠিয়েছেন নাজির আলি। জাপান, পশ্চিম জার্মানী আর হল্যান্ডই ছিল তাঁর প্রধান ক্রেতা, এছাড়াও সাপ যেত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার, নিউইয়র্কে, লন্ডনে, ইতালী, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে।

দীপক মিত্রের সাপ-রপ্তানীর খবরটা পেয়েছিলাম এক্সপোর্ট - ইমপোর্ট অফিসের ঊর্ধ্বতম মহল থেকেই। প্রথমেই যাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলাম, আমার পূর্বপরিচিত সেই কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্ট - ইমপোর্ট বললেন, দীপক মিত্র প্রথম সাপ রপ্তানির লাইসেন্স পায় ১৯৭৫-এর জুন নাগাদ। ১৯৭৭-এর শুরুতেই ওই লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় শ্রীমিত্র আবার একটি লাইসেন্সের আবেদন করেন। এবং সেই সূত্রে বর্তমানেও আরো একটি লাইসেন্স পেয়েছেন। এটির কার্যকাল ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮-এর মার্চ পর্যন্ত।

সাপ রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই লাইসেন্স দেওয়া হলো কি কারণে, জিজ্ঞেস করায় কন্ট্রোলার জানালেন, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্য সাপ কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সূত্রে দীপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকমেনডেশনসহ কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও বাণিজ্য দপ্তরে এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে সাপ রপ্তানীর জন্য আবেদন করে। ওই তিন দপ্তরের স্পেশাল রেকমেনডেশনের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির কেন্দ্রীয় রপ্তানী-আমদানি দপ্তর সাপ-রপ্তানীর অনুমতি দেয়। যতদূর মনে পড়ে ৬০-৬৫টি সাপ পাঠাবার অনুমতি ছিল। কিন্তু দীপক মাত্র ১৫-১৬টি সাপ পাঠাতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় দফা লাইসেন্স পাওয়ার পর শ্রীমিত্র কোনও সাপ বিদেশে পাঠাননি।

পঞ্চানন মিত্র ও দীপক মিত্র—পিতাপুত্রে সাপের চাষ করেন বাদুড়ে। শ্যামবাজার থেকে ৯৩ নম্বর বাসে কাঠোর পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগে। কাঠোরে নেমে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই সর্পোদ্যান। ওখানে বসেই কথা হচ্ছিল পঞ্চানন মিত্রের সঙ্গে। বয়স, বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন। ফর্সা, পাতলা গড়ন, মাঝারি লম্বা। কথাবার্তায় দারুণ চটপটে। জীবন শুরু করেছিলেন সেলসম্যান হিসেবে। একটা কসমেটিকের ছোটখাট ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। একবার হঠাৎ কঠিন রোগে হলেন শয্যাশায়ী। অংশীদারকে বিশ্বাস করার খেসারৎ দিয়ে নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। সাপই হয়ে উঠল ধ্যান-জ্ঞান। দুই ছেলে—দীপক ও আশিস এগিয়ে এলো বাবাকে সাহায্য করতে। পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, পেয়েছেন যথেষ্ট প্রচারের সুযোগ, পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা।

—প্রায় বছর দুয়েক পরে এলেন প্রবীরবাবু। খুব ভাল লাগলো আপনি আসায়। মাটি-কোপান খুপরিটা রেখে হাত ধুতে ধুতে পঞ্চাননবাবু বললেন।

—আপনার ছেলে কই? একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম।

—দীপক? ও তো সাধারণত থাকে না এখানে, জানেনই তো আমিই এখানে রাত্রিবাস করি। সপ্তায় এক-আধদিন হিন্দুস্থান পার্কের বাসায় যাওয়ার সুযোগ পাই।

—শুনলাম আপনারা সাপ রপ্তানী করছেন?

—হ্যাঁ। এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে।

—কতদিন ধরে রপ্তানী করছেন?

—১৯৭৫ এর জুন থেকে।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চাননবাবু জানালেন, এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অনুরোধে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের রেকমেনডেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তরকে আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অফিস থেকে সরাসরি লাইসেন্স পেয়েছেন।

কি পরিমাণ সাপ পাঠাবার অনুমতি ছিল ও কি পরিমাণ পাঠিয়েছেন জিজ্ঞেস করায় জানালেন, ও তো মনে নেই, ভুলে গেছি। কাগজপত্র যে কোথায় আছে—। কাগজপত্র না দেখে সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না।

—তাও আনুমানিক কতো হবে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার এই প্রশ্নটা রাখলাম। বার বার একই উত্তর পেলাম—সঠিক পরিমাণ মনে নেই। আন্দাজে তো কিছু আপনাকে বলতে পারি না।

—কি কি জাতের সাপ পাঠিয়েছেন?

গোখরো, কেউটে, শাঁখামুটে, চন্দ্রবোড়া, কালাজ, লাউডগা, বেত আছড়া, কালনাগিনী প্রভৃতি।

পশ্চিম বাংলার সাপের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাদের ব্যাজার এখন সবচেয়ে রমরমা সেই বারুইপুর বোস্টমপাড়া রেল গেটের বাসিন্দা মামা ভাগ্নে ছেরামত আলি ও জিয়াদ আলির সঙ্গেও কথা বলেছি সাপ রপ্তানী নিয়ে।

মামা ছেরামৎ। বয়স বছর পঞ্চাশ। গায়ের রং ফর্সাই বলা চলে। মাঝারি উচ্চতার ছেরামৎ কথা বলে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে। ভাগ্নে জিয়াদের বয়স বছর চল্লিশ হবে। গায়ের রঙ শ্যামলা, উচ্চতা মাঝারি। ওরা সাত-আট পুরুষের সাপুড়ে। এখনো পরিবারের মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো সকলেই সাপ ধরে, সাপ বেচে, সাপ খেলিয়ে নানারকম টোটকা ওষুধ বেচে রোজগারের ধান্দা করে। কলকাতার সায়েন্স কলেজ, বঙ্গবাসী, প্রেসিডেন্সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্ব বিভাগে নগদ দামে বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপ বিক্রি করে। বাড়িতেই বাক্স বন্দী করে সাপ পোষে। বিভিন্ন জাতের সাপের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বাকস।

ছেরামৎ কথা প্রসঙ্গে জানাল সাপ ওরা সরাসরি কোনদিন রপ্তানী করেনি, নাজির আলি যখন রপ্তানী করত তখন তাকে প্রয়োজন মাফিক সাপ জোগান দিয়েছে। সাপ রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় বহু সাপুড়ে পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রবীর ঘোষ

নির্বাচন

পরিতোষ সেন
লিখিত ও চিত্রিত

উনিশশো আটচল্লিশের জুন মাস। মার শরীর কিছুদিন থেকেই অসুস্থ যাচ্ছে। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছি, এমন সময় তিনি আমাকে তাঁর শয্যার পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমার ডান হাতটি ধরে নরম সুরে বললেন, 'আজকাল কেবলই আমার মনে হয় যে, আমি তোমাদের মধ্যে আর বেশী দিন নেই। তাই তোমাকে বিবাহিত দেখে যেতে পারলে আমার শেষ ইচ্ছেটি পূর্ণ হয়।'

মায়ের এ কামনাটি আমার মনে একটি তোলপাড় সৃষ্টি করল।

বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বয়েস, সুদর্শন এবং সুযোগ্য পাত্র হিসেবে বিবেচিত হলেও, বিবাহ চিন্তা তখনো আমার মনে বাসা বাঁধে নি। স্বভাবে আমি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং আবেগপূর্ণ। তাই, মার প্রস্তাবটির গুরুত্ব বিশেষ বিবেচনা না করেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হলাম।

আমার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হতে আর মাত্র ন-দশ দিন বাকি। যদি ভাগ্যদেবী সহায় হন, তাহলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহ করে সস্ত্রীক আমার কর্মস্থল ইন্দোরে ফিরে যাবো, এ বাসনা নিয়ে আমি বাড়ি থেকে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের, জরুরী পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অবিলম্বে সুযোগ্য পাত্রীর খোঁজ দিতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিলাম যে, আমার জাত-বিচার কিংবা দাবী-দাওয়ার বালাই নেই। এবং পাত্রী পছন্দ হলে একদিনের নোটিশেই বিবাহের আয়োজন করে ফেলতে হবে। 'আমি 'বে-পাগলা' হয়ে গেছি এ-কথাটি গ্রীষ্মের খড়কুটোর চালে আগুনের মতোই কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। তাই পাত্রীর খোঁজ আসতে কোনোই বিলম্ব হল না। মেয়ে দেখে বেড়ানোর এবং সাজানো বিয়েতে আমি বরাবরই ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আর কোনো উপায় নেই দেখে অগত্যা তাতেই সায় দিতে বাধ্য হলাম।

প্রথমেই একটি আত্মীয়ের মারফৎ, উত্তর কলকাতার এক কবিরাজ মহাশয়ের 'সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, গৌরবর্ণা, গৃহকর্মে-নিপুণা এবং গ্র্যাজুয়েট' কন্যার খবর পেলাম। আমিও কবিরাজ পুত্র। শুরুতেই মিল। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। 'হোয়াট্ বিগিনস্ ওয়েল, এন্ডস্ ওয়েল' এই মনে করে সেদিনই বিকেলে, শিল্পীবন্ধু প্রদোষ দাশগুপ্ত, বর্ধন মৈত্র এবং প্রাণকৃষ্ণ পাল সহ পাত্রীর বাড়িতে হাজির হলাম। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাত্রীর পিতা সরাসরি আমাদের তেতালার ঘরে নিয়ে গেলেন। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ঘরের সামনে একটি বড় ছাদ। এক পাশে আরো দুটি ঘর এবং বারান্দা। ছাদে, দড়ির ওপর একটি গামছা, দু-তিনটি শাড়ি এবং দুটি ব্লাউজ শুকিয়ে গিয়ে তোলবার অপেক্ষায় আছে।

শিল্পী মাত্রেই তো কিঞ্চিৎ কল্পনা-বিলাসী হয়। এ ব্যাপারে বিধাতা আমার বেলায় কোনোই কার্পণ্য করেন নি। ব্লাউজ দুটির ওপর নজর যেতেই আমার কল্পনা গেরোবাজ পায়রার মতো মহাকাশের দিকে ছুট্ দিল। ময়ূরকণ্ঠী-নীল রঙের ব্লাউজটির আয়তন এবং ছাঁট্ দেখে একটি কৃশকায়া পরিধানকারিণীর ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এটির তুলনায় নস্যি-রঙের অন্য ব্লাউজটির পরিধানকারিণী যে বেশ স্বাস্থ্যবতী তা বুঝে নিতে বিশেষ মাথা ঘামাতে হল না। কাপড়ের সারির ওপর দিয়ে এক ফালি দক্ষিণের আকাশ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ছাদের কোণে একটি তুলসীমঞ্চ। ঘরের ভেতর আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। পশ্চিমের দেয়ালে কালো মার্বেল কাগজের ওপর তুলোয়-সাঁটা একটি বাঁধানো হাঁসের ছবি। পুবের দেয়ালে, জলরঙে আঁকা, সূর্যাস্তের পটভূমিকায়, কয়েকটি পাল-তোলা জেলে ডিঙির আরেকটি ছবি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি ছবিরই কোণে যে সইটি আছে, তাঁরও নাম ছবি। বাবা কবি আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ হলেও রাজারের চলতি ঘষা পয়সার মতো, কবির

বহু প্রচলিত গানের কলিটি, 'তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা'. একটি অবাধ্য পতঙ্গের মতো আমার মনে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরপাক খেতে থাকলো।

ছাদে শুকনো কাপড়গুলোর তলায় হঠাৎ গৌরবর্ণা, আলতা-রাঙা, অতি সুশ্রী দুটি পা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার আঙুলগুলো এমনই লম্বা এবং নিটোল যেন অবিকল শাপলা ফুলের কুঁড়ি। মাটিতে পায়ের পাতা দুটি ফেলার ভঙ্গীতে লজ্জার ইঙ্গিত। অনেকটা নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'বীণাবাদিনী'র পায়ের মতো। দড়ির ওপর তাঁরই একটি হাত, শুধু ব্লাউজ দুটিকে টপাটপ তুলে নিয়ে কাপড়ের আড়ালে চলে গেল। তাঁর বাকি অঙ্গের রূপ ও সুষমা কল্পনা করছি, এমন সময় চাবুকের মতো ছিমছাম একটি তন্বী, মুহূর্তের জন্যে, একটি সাতরঙা প্রজাপতির চালে এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল। আচমকা এক ঝলক আলো যেন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রত্যাশা এবং খুশীর একটি বিরাট ঢেউ ফুলে ফুলে উঠে আমার প্রাণের একূল-ওকূল ভাসিয়ে দিল। বন্ধুবর প্রদোষদা চোখ টিপে বললেন, 'বাঃ, খাসা, খাসা! আর ভাবনা কিসের।' আমিও তৎক্ষণাৎ মনোস্থির করে ফেললাম। আর দ্বিতীয় পাত্রী দেখা নয়। আজকেই, এই মুহূর্তেই পাকা কথা দিয়ে যাবো, সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে সুখবর জানাবো, সন্ধ্যাবেলায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করব, কয়েক দিনের মধ্যেই অপরূপ স্ত্রীকে নিয়ে সগর্বে কর্মস্থলে ফিরে যাবো—এ-সব নানা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনছি, এমন সময় বৃদ্ধ কবিরাজ মশাই, হাত ধরে একটি মেয়েকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। 'এটি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছবি', এই বলে ভদ্রলোক তাঁকে আমাদের সামনে বসিয়ে দিলেন। ছাদে নীল রঙের ব্লাউজটি যে কার ছিল, চোখের নিমেষে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। দিন যেন হঠাৎ রাত হয়ে গেল। আড় চোখে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি। সবারই চক্ষু জানাবড়া। ব্লাউজটি দেখে আমার কল্পলোকে যে ছবিটির উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে বাস্তব 'ছবির' হুবহু মিল দেখে আমি এমনই আঁতকে উঠলাম যে আমি মূর্ছা যাই আর কি। চেহারায় তিনি যেমনই হোন না কেন, পাত্রীর সামনে এ-রকম বেসামাল হওয়া শিষ্টাচারের খেলাপ।

আমার ভাবী স্ত্রী, শাস্ত্রীয় বিধানে রূপায়িত এবং স্ত্রীরূপের নির্যাস, অজন্তার দেয়ালে আঁকা 'রাজকন্যা'র মতো দেখতে হবে. এমন দুরাশাকে স্বপ্নেও কোনোদিন মনে ঠাঁই দিই নি। অবিলম্বে বিবাহ করা আমার পক্ষে যতোই জরুরী হোক না কেন, তাই বলে, আপাদমস্তক শুধু সরল রেখার একটি সমষ্টি উত্থান পরে পতনহীন রৈমাত্রিকতার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা আমার জীবনসঙ্গিনী হবেন, তারও কোনো যুক্তি দেখি না। অবিশ্যি প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়ে অনেকেই অযৌক্তিক সব কাণ্ড-কারখানা করেন। এই তো আমার বাল্যবন্ধু জয়ন্ত। কার্তিকের মতো সুদর্শন এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। বাপ-মার ঘোরতর আপত্তি থাকার দরুণ অতি সাধারণ শ্যামবর্ণা, ছবির মতোই 'স্বাস্থ্যবতী' এবং ডিভোর্সি রমাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এক রাতের জন্যে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে বিয়ে করে ফেললো। এমন গভীর হার্দ্য সম্পর্ক হলে তো আমিও ছবিকে, আমার মাথার মুকুট করে, ইন্দোরে ফিরে যেতাম। আমার মনে এ-সব তর্কবিতর্কের তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কার থেকে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার মনের অবচেতন স্তর থেকে অকস্মাৎ একটি ছবি মূর্ত হয়ে উঠলো। তা দেখে আমি আরো শঙ্কিত হলাম। মানুষের আকৃতি নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা আমার শিক্ষা এবং রুচি-বিরুদ্ধ। কিন্তু পাত্রীর দিকে যখনই আমার নজর যাচ্ছে, তখনই তাঁর শরীরটি, মিলিয়ে গিয়ে এ নতুন আকারটিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক যেন চার্লি চ্যাপ্‌লিনের গোল্ডরাশ ছবির বিখ্যাত দৃশ্যটি—যে দৃশ্যটিতে হৃষ্টপুষ্ট পুরুষটির আকার আস্তে আস্তে মুছে গিয়ে একটি বিরাট মোরগের রূপ নিচ্ছে। চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে যে রূপান্তর দেখছি, চোখ বুজেও তাই। এ তো মহা জ্বালা! মন থেকে বস্তার ছবিটা যতোই তাড়াবার চেষ্টা করি না কেন, ততোই অবিকল সিনেমার মতো, 'মিক্‌স' করে, সেটি ফিরে ফিরে আসে। এখন কি করি! এমন সময় সেই ছিমছাম সুদর্শনা তন্বীটি, একটি ট্রেতে, চা, সন্দেশ পানতুয়া এবং সিঙাড়া নিয়ে হাজির হল। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দের একটি তরঙ্গ তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সমস্ত বিভ্রান্তি এবং গণ্ডোগোলের মূলে তো ইনিই।

কি মুস্কিল! এতোক্ষণ শুধু বস্তার ছবিটিই আমাকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু এ তন্বীটির অকস্মাৎ আগমন জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুললো। হঠাৎ ছবির ওপর চোখ পড়তেই দেখি এই তন্বীটি তাঁর স্থানে বসে আছে। এতোক্ষণ ছিল ছবি আর বস্তার 'মিক্‌স'। এখন শুরু হল ছবি আর তাঁর বোনের—। সবলরেখা এবং স্থূলতা লোপ পেয়ে তার স্থান নিল, আনন্দোচ্ছল, সর্পাকার বক্ররেখা এবং বিভিন্ন অঙ্গের সুষমায় মণ্ডিত একটি অপরূপ মেয়ে। আমি তাঁর উক্ততা অনুভব করছি। তাঁর দেহসৌরভ আমার নাকে ভেসে আসছে। আমার তখন মনে হলো যেন আমি বহু পুষ্পিত, মধুর নিনাদিত, এক উদ্যানে, উজ্জ্বল লাল বর্ণের একটি দোলনায় বসে আছি। সে যেন আমাকে দোলাচ্ছে। তার সঙ্গে দুটি কথা বলার বাসনায় আমি কিঞ্চিৎ এগিয়ে বসি। ঠিক এমন সময় তন্বীর ছবিটি মিলিয়ে গিয়ে আগের ছবিটি ফিরে আসে। এক মুহূর্তে সুদর্শনা এই মেয়েটি, পর মুহূর্তেই আবার অন্যটি—এ দুয়ের টানা-পোড়েনে আমার অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়। কল্পনা-বিলাসী হবার এই তো বড়ো বিপদ। চোখের সামনে কঠোর বাস্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে মরীচিকার পেছনে ছোটা—শিল্পী-

জানসের এই তো মস্ত দোষ। এই সমস্যার কী করে সমাধান করা যায় এ-সব ভাবছি, এমন সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের চা-মিষ্টি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ছবিকে কিছু জিজ্ঞেস করুন।' হায়। যে আমার মনে হাজার প্রশ্নের ঝড় তুলে দিল, সে যে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত আমার অন্তরটিকে আকাশ জোড়া একটি কালো মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে চলে গেল। আচমকা এক ঝড়ের ঝাপটায় আমার বাগানের সদ্য প্রস্ফুটিত বড়-বেরঙের ফুল-গুলো বৃন্তচ্যুত করে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে গেল। এসব নানা কথা, নানা ভাব আমার মন থেকে বেরুবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় সেই মেয়েটি জলের গ্লাস নিয়ে আবার দেখা দিল। আমার সঙ্গে তাঁর আকস্মিক চোখাচোখি হলো। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলি, 'ওগো! তুমি একি করলে! যে-আগুন তুমি জ্বালিয়ে দিলে, আমার চোখের জলে সে কি নিভে যাবে! তুমি কি চাও সে জলে আমি যাই ডুবে। আমার অন্তরের গান কি শুরুতেই থেমে যাবে।' আমার মনে তখন ভাবাবেগের খই ফুটছে। সে আওয়াজ তার কানে পৌঁছলো কিনা কে জানে। মেয়েটি জলের গ্লাস রেখে দিয়ে চলে গেল।

পাত্রীর বাবা আবার বললেন, 'আমার ছবি লেখাপড়া ছাড়াও রান্নাবান্না, শেলাই-ফোঁড়াই—বস্তুতঃ সব রকম হাতের কাজেই খুব পারদর্শী।' দেয়ালে টাঙানো, শিল্প কর্মের নমুনা দুটির ভিত্তিতে প্রশ্নটি নেহাৎ অবাস্তব হলেও, ভদ্রতার খাতিরে প্রদোষদা অগত্যা জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, 'আচ্ছা ছবি, তুমি কার কাছে ছবি আঁকা শিখেছ?' সলজ্জ, বিনীত, মুখটির থেকে হিশ্‌হিশ করে উত্তর এলো, 'আমি নিজে নিজেই শিখেছি।' তাঁর কথা শেষ না হতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার বেশ টেনে বললেন, 'বাবা পরিতোষের মতো নাম করা শিল্পীর হাতে পড়লে ছবির আর চিন্তা কিসের। এ বিদ্যায় ছবির সমস্ত অভাব-অভিযোগই তো পরিতোষ মিটিয়ে দিতে পারবে। কি বল পরিতোষ।' এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। তেতাল্লার ঘরের মেঝেটি যেন আমার নিতম্বের তলা থেকে খসে পড়ছে। আমি এক অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে থাকলাম। এরই মধ্যে বৃদ্ধ আমাকে তাঁর জামাতা বানিয়ে ফেলেছেন। সর্বনাশ। এই হারে, আর খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলে তো পুরুত ডেকে সন্ধ্যের আগেই ছবির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছাড়বেন। আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরটা চিংড়ি মাছের মতো লাফিয়ে উঠলো। আর কথা না বাড়াবার উদ্দেশ্যে প্রদোষদাকে চিমটি কাটলাম। তিনি আমার সঙ্কেত চটপট বুঝে নিলেন। বিপদের পর্যায়টি সংক্ষেপ করার চেষ্টায় পাত্রীর বাবাকে বললেন, 'আচ্ছা ছবিকে এবার ভেতরে যেতে বলুন। ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে আর লাভ কি।' ভদ্রলোক অতিবাগ্র হয়ে আবার বললেন, 'আপনারা ওকে তো তেমন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?' প্রদোষদাও তেমনি পেশাদারী পাত্রী দেখিয়ের মতো জবাব দিয়ে বললেন, 'ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা, তা হাঁড়ির একটা ভাত টিপ্‌লেই তো বোঝা যায়। ওঁর ছবি আঁকার হাত দেখেই তো বুঝে নিয়েছি যে এসব ব্যাপারেও ওর দক্ষতা কতোখানি। আচ্ছা আজ উঠি। এই বলে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ছবি মাথা নীচু করে আমাদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবো, এমন সময় আমার চোখ পাশের বারান্দাটির দিকে গেল। বড় বিভ্রান্তি এবং গন্ডোগোলের সৃষ্টিকর্ত্রী সেই তন্বীটি দাঁড়িয়ে আছে। এক পা সিঁড়িতে বাড়িয়ে আমি থেমে গেলাম। অপলক নয়নে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, মেয়েটি, অসোয়াস্তি বোধ করে, ঘরের ভেতর চলে গেল।

সময় কম। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আরো দুটি পাত্রী দেখার তাড়া ছিল। তাই চটপট ট্যাকসি ধরে টালিগঞ্জে এক বাড়িতে পৌঁছলাম। পাত্রী গায়িকা। চাক্ষুষ না দেখলেও রেডিওতে জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং হাল্কা রাগপ্রধান গায়িকা হিসেবে তাঁর পরিচয় জানা ছিল। তাঁর সঙ্গীতগুরু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এটি এ গুরুরই বাড়ি। আমার সম্বন্ধে পাত্রীকে কিছুই জানানো হবে না বলে আগে থেকেই স্থির ছিল। ধরা যাক্ শিক্ষকের নাম শিশিরবিন্দু এবং ছাত্রীর নাম সীতা। শিশিরবিন্দুই আগ্রহ করে এই সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের মুখে সীতার গুনের উচ্ছ্বাস শুনে তাঁকে দেখতে আমি স্বভাবতই খুব উৎসুক ছিলাম।

রেললাইনের ধারে পুরোনো একতলা বাড়ি। সেদিন, কোনো কারণে, বিজলির আলো জ্বলছিল না। টেবিলের ওপর একটি হ্যারিকেনের বাতি। শিশিরবিন্দু হার-মোনিয়ামে বসেছেন। গানের বই হাতে সীতা গাইছেন, 'আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো,..... ....' শব্দের সঙ্গে ভাবাবেগের প্রাচুর্য দেখে মনে হল, গায়িকার হৃদয় কুম্ভটি যেন একটি ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো টগবগিয়ে উঠেছে। 'তুমি তাইগো, তুমি তাইগো' কথা কটি উচ্চারিত হবার সময় গায়িকার কণ্ঠে, একদিকে অস্থিরতা এবং নিঃসহায়তার, অন্যদিকে আত্মসমর্পণের আকুল আকুতি প্রকাশ পেল। কাল্পনিক কিংবা বাস্তবই হোক, যাকে কেন্দ্র করে এ ভাবাবেগের ফোয়ারা ছুটছে, তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ অহেতুক হিংসে আমার অন্তরকে ছ্যাঁকা দিল।

সীতার মুখটি অবিকল হিমসাগর আমের মতো গোল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কোমলাঙ্গী। গলার স্বরও বেশ মধুর। সহজ সরল ব্যবহার। মোটামুটি, বেশ একটি আকর্ষণীয় পাত্রী বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মুখে এবং শরীরের এক পাশে হ্যারিকেনের মোলায়েম আলোর স্পর্শ লেগেছে। গায়ে হাল্কা আসমানি রঙের সাধারণ শাড়ি। অন্ধকার পটভূমিকায়, সব মিলে পরিমিত রঙের আঁকা পাশ্চাত্য ধরণের, আলো ছায়ার, ছোট্ট একটি অয়েল পেন্টিং-এর মতো দেখাচ্ছে।

গান শেষ হতেই শিশিরবিন্দু আমাদের সঙ্গে সীতার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের নমস্কার জানাবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর একটি খুঁত আমার নজরে পড়লো। আকৃতিতে সম্পূর্ণ নিখুঁত এমন পুরুষ কিংবা স্ত্রী, দশলাখে হয়ত একটিই দেখা যায়। তাহলেও, আমার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিচারে খুঁতটি একদিক থেকে বেশ গুরুতরই বলা যায়। উচ্চতায় আমি ছয় ফুট। সীতা খুব বেশী হলেও সাড়ে চার ফুট। অর্থাৎ আমার কোমর এবং বক্ষের মাঝামাঝি। এক কথায় সাবস পক্ষীর পাশে ঘুঘু শাবক। আমার পাশে তাঁকে নিতান্তই বেমানান দেখানো ছাড়াও, দাম্পত্য জীবনে নানা রকম যথার্থ অসুবিধে দেখা দিতে পারে—এসব অহেতুক দুশ্চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকলো। যাইহোক সমাধানের পক্ষে এমন কিছু অসাধ্য সমস্যা নয়! ভালো লেগেছে, এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা। এসব খুঁটিনাটি পরে বিবেচনা করা যাবেখন। এদিকে আরেকটি পাত্রী দেখতে যাবার সময় হয়েছে। তাই সীতার গানের তারিফ করে আমরা উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার একটি পার্কের কোণে এক লেখক, এক হালে চলচ্চিত্রের নির্দেশকের বাড়ী হাজির হলাম। তাঁর স্ত্রীও পর পর তিন-চারটি জনপ্রিয় বাংলা ছবির প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে বেশ নাম করেছেন। পাত্রী লেখকের ভাগ্নী। লেখকের সঙ্গে আমার অল্প পরিচয় থাকলেও, আমার সহপাঠীর মাধ্যমে তেল

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনূদিত

প্রতিবেশী সহোদর

সমকালীন অসমীয়া কবিতা

১০.০০

প্রাইমা পাবলিকেশন্স

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড়, কলিঃ-৭

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করার পর তাঁর স্ত্রী একটি ২৪-২৫ বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন। দুজনেরই হাতে চা এবং মিষ্টির ট্রে। মেয়েটির নাম সুনীতা। শুধু গৌরবর্ণা বললে তার ওপর অবিচার করা হবে। জরীর কাজে অলংকৃত কাল রঙের শাড়ী এবং ব্লাউজের দরুন তাঁর গায়ের রঙটি, হাতের সোনার বালা এবং কানের দুলকেও যেন হার মানিয়ে দেয়। তাঁর হাত দুটি কচি কদলীকাণ্ডের মতই নিটোল। বক্ষস্থল যেন ব্লাউজের সেলাই ছিঁড়ে এক্ষুনি, বর্ষার বাঁধ দেয়া নদীর মতই ফেটে পড়বে। সৃষ্টিকর্তা যেমন মুক্ত হস্তে তাঁর দেহকে যাবতীয় স্ত্রীসুলভ সমৃদ্ধি দান করেছেন। তাঁর এই দেহের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌন আবেদনের ছবটা চারদিকে এমনই বিকিরিত হচ্ছে যে, জ্যৈষ্ঠের শেষের গুমট সন্ধ্যেটিকে যেন আরও গুমট করে তুলেছে। এত সমৃদ্ধির অধিকারিণী হয়েও বিধাতা একটি ব্যাপারে তাঁকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর গণ্ড এবং চোয়ালের হাড়গুলো এতই চওড়া এতই লক্ষ্যণীয় যে, তাঁর মুখশ্রী একটি অনমনীয়তার প্রলেপে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। লাবণ্যের অভাবকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে, তাঁর সম্পূর্ণ কামান ভ্রূ দুটি। সেখানে কাল পেন্সিলে আঁকা চুলের মত সরু দুটি রেখা, অযথা একটি কর্কশতার ছাপ ফেলেছে। আমি তাকে কি করে বোঝাই যে, স্বাভাবিক, পুরু, ভোমরার মত কাল, কুঁচকুচে ভ্রূযুগল তার মুখের বিশেষ আদলের সঙ্গে খুবই মানানসই হত। বলাবাহুল্য, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে ভ্রূ-কামান, আজকালকার মত স্ত্রী- ফ্যাসানের একটি প্রচলিত অঙ্গ ছিল না। এক শ্রেণীর থিয়েটার, সিনেমা কিংবা যাত্রার অভিনেত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এ ব্যাপারটি আমার কাছে, তাঁর অমার্জিত রুচির পরিচায়ক বলে মনে হল। আমার এ ধারণাটি নেহাৎই ভিত্তিহীন নয়, তার সমর্থন পেতে বেশী দেরি হল না।

দক্ষিণ কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে তখন প্রমথেশ বরুয়ার, পর পর, বেশ কয়েকটি পুরোন ছবি দেখান হচ্ছে। বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীবরুয়ার অবদান কি, এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। আমি কথায় ফাঁকে ফাঁকে, আড় চোখে, পাত্রীর শরীরের জৌলুস তারিফ করছি। সুনীতা চুপ করে বসে আছে দেখে প্রদোষদা তাকে প্রশ্ন করলেন, 'সুনীতা, বরুয়ার কোন্ ছবিটি তোমার বেশী ভাল লাগল?' সোনার বরণ মেয়েটির উত্তর শুনে আমি চেয়ার থেকে ঠাশ করে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি।

তিনি বললেন, 'প্রমথেশ বরুয়ার ৪৪৪ ছবির মধ্যে আমার ৪৪৪ থেকে ভাল লেগেছে 'দেবদাস আর চোড়শী'। অভিনেত্রীর মার্জিত কথাবার্তার তুলনায় এই মেয়েটির প্রত্যেকটি কথা আমার কানে যেন একেকটি স্ক্রু-ড্রাইভারের মত প্রবেশ করল। আমি মনে মনে বলি, 'অচল! অচল!' প্রদোষদা আমার পাশেই বসেছিলেন। কনুই দিয়ে আমাকে আস্তে করে গুঁতো দিতেই আমি তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝে নিলাম। আরও কি সব ৪৪ ৪৪ করে বলতে যাচ্ছিল দেখে প্রদোষদা তাড়াতাড়ি তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেন? গৃহদাহও খুব ভাল।' যাই হোক, চা-মিষ্টি এবং লেখকের নানা খোশ গল্পের মধ্য দিয়ে পক্ষান্তরে সন্ধ্যেটি ভালই কাটল। লেখক এবং অভিনেত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরবর্তী চার-পাঁচ দিনে আরও বেশ কয়েকটি পাত্রী দেখা হল। সবিতা, মুদুলা, বেলা, কেতকী, কবিতা, কেয়া, ছায়া, ছন্দা, দোলা, প্রিয়া, ভারতী, তাপসী, ললিতা, অনিতা ইত্যাদি। উল্লেখ করবার পক্ষে নামগুলোর মতই আকৃতিতেও তাঁরা বৈশিষ্ট্যহীন। এবেলা-ওবেলা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সিঙাড়া ইত্যাদি খেয়ে আমার মত আজন্ম মেঠাই-পাগল লোকের জিভেও অরুচি ধরে গেল। এদিকে পাত্রী যতই দেখছি, ততই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। এদের মধ্যে দু-একজনকে বড়জোর চলনসই বলা যায়, যেমন ছন্দা আর তাপসী। কিন্তু ছন্দার গীটার বাদ্যযন্ত্রপ্রীতি দেখে, বিনা বিলম্বে তাঁকে বাতিল করতে বাধ্য হলাম। এই যন্ত্রটি আমার কানের বিষ। আর তাপসীর তেল-চিটকে বিনুনি অতি সাদাসিধে, বর্ণহীন, এক কথায় বিধবার মত, পোশাক-আশাক আর গম্ভীর প্রকৃতি দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি নিজে গপ্পো-গুজবে লোক, হাসি-ঠাট্টায় আমার দিন কাটে। তাই, যে মেয়ে নীরবতার উপাসক এবং সাজ-সজ্জায় বিরূপ, সে মেয়েকে নিয়ে ঘর করা, অনেকটা খাল কেটে কুমির আনারই সামিল নয় কি! এসব বিষয়ে আমি বেশ আধুনিক ভাবাপন্ন, এবং রুচিসম্পন্ন হাল-ফ্যাশানে বিশ্বাসী। এসব নানা রকম তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিবেচনা আমার মস্তিষ্কে বেশ জট পাকাচ্ছে। ছুটি ফুরোতে আর মাত্র তিন দিন বাকী। মার শেষ ইচ্ছেটা কি তাহলে আমি পূর্ণ করতে পারব না। দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম নেই। সেই ছাদে দেখা মেয়েটিই তো যত গোলমাল বাধাল। তাঁর মাপ-কাঠিতে কম-বেশী সবাইকে, কি রকম ফিকে লাগছে। এমন সময় এক সাংবাদিক বন্ধুর মারফৎ আরেকটি সুযোগ্য পাত্রীর খবর এল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার পক্ষে হাসি আদর্শ পাত্রী। হাসি তাঁর স্ত্রীর বড় বোনের ননদ। এম-এ পাশ, সুশ্রী ইত্যাদি ইত্যাদি। স্থির হল যে, দাদা-বৌদির ইচ্ছেয়, হাসি তাঁদের বাড়িতে সারা দিন কাটাতে আসবেন। তাঁকে যে আমরা দেখতে যাব, এ কথাটি তার কাছ থেকে গোপন রাখা হবে। আমি এবং আমার সাংবাদিক বন্ধু সন্ধ্যে ছটা নাগাদ তাঁদের বাড়ি উপস্থিত হব।

সেদিন রবিবার। জ্যৈষ্ঠের কাঠাল পাকা গরমে, দিনটা সকাল থেকে ভীষণ গুমট হয়ে আছে। বিকেল হতেই উত্তরের আকাশে ঘন কাল মেঘ দেখা দিল। কথা ছিল, আমি এবং সাংবাদিক বন্ধুটি আলাদা-নির্ধারিত সময়ে হাসির দাদার বাড়ি পৌঁছব। গরদের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে নিলাম। হাতে ছাতা। একটি রিকশায় চড়ে 'সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ, শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ'—এসব বলতে বলতে গন্তব্যস্থল

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
বহু প্রশংসিত কবিতার বই
"কাব্যসুষমা"
ইন্দু দাঁ
দাম : দশ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : কবিনিবাস—মমতা
৫৯, পারমার রোড
পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী

প্রেমিক কবি ইন্দু দাঁ বিরচিত
দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ
"মনশ্রী"
দাম : আট টাকা
এই লেখকের কবিতার সুরে লেখা
দুটি অনন্য উপন্যাস
শীতল হাওয়া উষ্ণ হৃদয়
বৌদি পুলিশ দেবর দাগী
রন্দ্রহ

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে রওনা হলাম।

গড়িয়াহাট পৌঁছতে না পৌঁছতেই প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষল ধারে বৃষ্টিও শুরু হল। রিকশা থামিয়ে রাস্তার ধারে কোথাও আশ্রয় নেবারও সময় নেই। ওদিকে নির্ধারিত সময় এগিয়ে আসছে। রিকশা গড়িয়াহাট রোড ধরে টুং-টুং আওয়াজে, উত্তরের দিকে এগুচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁটও সেদিক থেকে সমান্তরালভাবে তীরের বেগে আসছে। ছাতা এবং রিকশার ঢাকনা কোন কাজেই এল না। অল্পক্ষণ মিনিটের মধ্যেই আমার এমন হাল হল, যেন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠেছি। বাড়ি ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে নেব এমন সময়ও হাতে নেই। তাছাড়া ইচ্ছেও নেই। শুনেছি 'ম্যারেজেস আর মেড্ ইন্ হেভেন' শ্রীশ্রীপ্রজাপতি যদি সত্যি সত্যিই তাঁর সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে হাসির চোখে, আমার এ ভিজে দাঁড়ির মত চেহারাটিও কার্তিকের মত সুদর্শন লাগবে। হয়ত তিনি ফিস ফিস করে, মুচকি হেসে বলবেন, 'হাউ রোম্যান্টিক!' এসব ভাবতে-ভাবতে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছলাম।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। পোর্চের তলায় রিকশা থামতেই দেখি আমার বন্ধু এবং চল্লিশোত্তর এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। 'আমি হাসির বৌদি' বলে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। আমাদের ড্রইং রুমে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে কিঞ্চিৎ চিন্তিত মনে হল। ভবিষ্যৎ জামাই যে স্নান করে ভিজে কাপড়ে লেপ্টে এসে হাজির হবেন, এমন একটি অভাবনীয় দৃশ্য হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর স্বামীর গেঞ্জি, ধুতি এবং পাঞ্জাবি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পাশের বাথরুমে গিয়ে প্লিজ চেঞ্জ করে নিন।' উত্তরে আমি বললাম, 'থাক। দরকার কি। এই তো, পাখার তলায় বসেছি, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে।' সর্দি লাগবে, জ্বর হবে। এসব ভয় দেখিয়েও তিনি আমাকে রাজী করাতে পারলেন না দেখে, অগত্যা হাল ছেড়ে দিলেন। আমার কর্মস্থল ইন্দোর কেমন জায়গা, কলকাতা থেকে কত দূর, সেখানে বাঙালী সমাজ আছে কিনা, বৌদির এসব নানা প্রশ্নের মোকাবিলা করছি, এমন সময় হাই-হীলড জুতোর খট-খট আওয়াজে, নাটকীয়ভাবে, একটি মেয়ে প্রবেশ করল। বৌদি পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই আমি অনুমান করে নিলাম ইনি কে। যাই হোক, পরিচয়ের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় শেষ না হতেই হাসি বৌদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একি বৌদি! টি হ্যাজন্ট্ বিন সার্ভড্ ইয়েট?' বেয়ারা! বলে জোরে হাঁক দিলেন। উর্দি-পরা বেয়ারা দরজায় দেখা দিতেই হাসি তাকে চা আনবার আদেশ দিলেন। আমি মনে মনে বলি, 'বাঃ! বেশ স্মার্ট তো! সাজ-পোশাকেও তেমনি কায়দাদুরস্ত। এ ব্যাপারে তাপসী-ললিতার দল যে রীতিমত গাঁইয়া সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। গত কদিনের তুলনায় বর্তমান অভিজ্ঞতাটি আমার খুব মনমত লাগছে। একটু আড়ষ্ট বোধ করলেও আমি বেশ উপভোগ করছি।

অপরূপ সুন্দরী না হলেও হাসির মুখটি, যে কোন মানদণ্ডের বিচারেই বেশ আকর্ষণীয় বলা যায়। তদুপরি আছে প্ল্যামারের সুমিশ্রন। আকারে তার মুখটি অবিকল অশ্বত্থ পাতার মত। উচ্চতায়ও সীতার তুলনায় বেশ দীর্ঘাঙ্গী। কাঁধ অব্দি ঢেউ খেলান, সদ্যশ্যাম্পু-করা রেশমী চুল। পাখার হাওয়ায়, থেকে থেকেই তার কয়েক গাছা চুল চোখের ওপর উড়ে আসছে। সেগুলোকে সাবলীল ছন্দে, মৃদু মাথার দোলায়, সরিয়ে দেবার চেষ্টায় তার সুন্দর, লম্বা নিটোল গলাটি এবং অনাবৃত ও মসৃণ কাঁধটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর চোখের পাতায় সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। ছোট্ট, পুরু, ঠোঁট জোড়া রক্তবর্ণ লিপ-স্টিকে রঞ্জিত। ত্বকে ফাউন্ডেশন ক্রিমের ওপর পাউডারের ছোঁয়া এতই হাল্কা যে বিশেষ নজর না দিলে তা বোঝা দায়। কানে পাথর বসান অতিসূক্ষ্ম দুটি সোনার ফুল। গলায় মারাঠী মঙ্গলসূত্র। হাতে এবং

পায়ের নখে মানানসই রঙের নেলপালিশ। এ সব কিছুরই ব্যবহার পরিমিত এবং মার্জিত রুচির ছাপে সুস্পষ্ট। পরনে পেঁয়াজি রঙের দক্ষিণ ভারতীয় দামী সিল্কের শাড়ি। এই পোশাকটি তাঁর পাকা ধান রঙের ত্বকটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এ দুয়ের সঙ্গে সংযত সবুজ রঙের হাত-কাটা ব্লাউজটিও খুব মানানসই হয়েছে। কটিদেশ হুবহু মৌমাছির মত না হলেও সরুই বলা যায়। বাকী স্ত্রীসুলভ অঙ্গের মাপজোক সুনীতার মত না হলেই বা কি! যে সম্পদ আছে, আমার মত পুরুষের মন মজাতে তাই যথেষ্ট। এত স্তুতি গাইবার পরও যদি পাঠকেরা মনে করেন যে, আমি এখনও লাট্টু হয়ে যাইনি, তাহলে নিতান্তই ভুল করবেন।

আমার জামা-কাপড় এখনও বেশ ভেজা। একটু শীতও করছে। হাসি চা ঢালতে শুরু করলেন। তাঁর সব ব্যাপারেই একটা আত্মসচেতনতার অনুপস্থিতি আমাকে আকৃষ্ট করল। বৌদির হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে, আমার জন্যও ঢাললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন 'হাউ মাচ সুগার প্লিজ?' নিছক নিজের সতন্ত্রতা জাহির করবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'নান্ প্লিজ, দুধও নয়। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'সে কি! আপনি একেবারেই চিনি খান না?' পাছে আমাকে ডায়াবেটিসের রোগী ঠাউরে নেন, তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, খুব খাই, শুধু চা-কফির সঙ্গে খাই না।' এতক্ষণে হাসি আমার দিকে তেমন নজর চিছিল না। তাই সরাসরি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে নিজেকে বাহবা দিলাম। বৌদি ফ্রুরিজের কেক এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, উনি এক জরুরী তলবে অল্পক্ষণের জন্যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতে বাধ্য হয়েছেন। এক ঘন্টার মধ্যেই ফেরবার কথা। আশা করি আপনাদের তাড়া নেই। তাড়া কিসের। উনি যত দেরি করে ফেরেন ততই তো ভাল। হাসির সঙ্গে আরও বাড়তি কিছুক্ষণ সময় কাটান যাবে।

ফুটবল খেলা থেকে শুরু করে,—রবীন্দ্র গীতিনাট্য, আধুনিক ইংরিজি ফিকশান, দেশের রাজনীতি,—এসব পাঁচ-মিশালি আলোচনায় হাসির সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে বোঝা গেল যে এসব বিষয়ে তিনি বেশ অবহিত। কথায় কথায় এও জানা গেল যে, তিনি ইংরিজী সাহিত্যের ছাত্রী। আমি মুগ্ধ হয়ে তার চালচলন, কথাবার্তা দেখছি আর শুনছি। তাঁকে আমার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করছি, আমাদের দুজনের কি রকম আদর্শ জুড়ি হবে, সবাই আমাদের দেখে কি রকম হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে, আমার ইংরেজ প্রিন্সিপাল, হাসির ইংরিজি শুনে, তার স্মার্টনেস দেখে, আমাকে কি সুনজরে দেখবে এবং তার ফলে আমার পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী—এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম টেরও পাই নি। হঠাৎ চায়ের কাপটা আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে ঠাশ করে মার্বেলের মেঝেতে পড়ল। হাসি আমারই

উল্টোদিকে বসেছিল। খানিকটা চা ছিটকে গিয়ে তার দামী শাড়ির পাড়ের একটা অংশ ভিজিয়ে দিল। আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে বলি, আই অ্যাম সরি'। 'দ্যাটস অল রাইট' বলে ব্যাপারটা তিনি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। আমি যতই বলি, 'আপনি প্লিজ চেঞ্জ করে আসুন। শাড়িটাকে এক্ষুনি জলে ভিজিয়ে দিন, তা না হলে চায়ের দাগ আর কোনদিন উঠবে না।' তিনি ততই এম্ব্যারাস্ড বোধ করেন। জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে বলেন, 'দ্যাটস অল রাইট, দ্যাটস অল রাইট'। আমি আরেকবার, 'আই অ্যাম রিয়েলী ভেরী সরি' বলতে যাচ্ছি, এমন সময় অচানক, আমার নাক থেকে এমন জোরে একটা হাঁচি এল যে সমস্ত ঘরটা কেঁপে উঠল। হাসির চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার সন্দেহ হল যে, ব্যাপারটা খুব শোভন হল না। একবার ভাবতে ভাবতেই পর পর আরও পাঁচ-ছটা হাঁচি এল। কিছুতেই থামাতে পারছি না। আমার একটুকুতেই সর্দি-কাশি লেগে যায়। আপশোস হয় যে, কেন বাহাদুরী দেখাতে গেলাম। ভেজা জামা-কাপটা তখন বদলে নিলেই হত। বৌদি উঠে গিয়ে আরেকটা কাপ চা আর অ্যাসপ্রো নিয়ে এলেন। গরম চা ঢেলে দিয়ে আমাকে চটপট বড়ি দুটো খেয়ে নিতে বললেন। বেয়ারা এসে মেঝেটা মুছে দিল। ভেতরে যেতে যেতে আড় চোখে আমার দিকে তাকাল। পকেট হাতড়ে দেখি রুমাল নেই। অথচ ওটার প্রয়োজন ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ল। কি করি! 'একসকিউজ মি' বলে বাথরুমে চলে গেলাম। সেখানে আয়নায় চোখ পড়তেই হকচকিয়ে গেলাম। নিজেকে নিজেই চিনতে পারছি না। লম্বা চুলগুলো তেলে-ভেজা প্রদীপের সলতের মত নেতিয়ে তখনও

আমার মাথার চারদিকে ঝুলে আছে। সঙ্গে চিরুনী নেই। বাথরুমেও নেই। মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। গরদের পাঞ্জাবিটা কুঁকড়ে গিয়ে ময়লা চটের মত দেখাচ্ছে। তাতে কি! আমি চলে গেলে হাসি যখন জানবে যে আমি আর্টিস্ট, তখন নিশ্চয়ই আমার সাত খুন মাপ করে দেবে। যাই হোক বাথরুমে আর বেশীক্ষণ থাকলে বৌদি হয়তে এবার পেটের ওষুধ আনতে ছুটবেন এসব কথা ভেবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। সোফায় বসতে যাব, এমন সময়, টিপয়ের কোণায় আমার ধুতির কাছাটা আটকে গেল। সেটি খুলে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। 'ভেরি সরি' বলে কোন রকমে সেটিকে সামলে নিলাম। না, না। এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ হবে না। থাকলেই আবার কিছু অঘটন ঘটবে। তাই সুযোগ বুঝে বন্ধুকে ইশারা করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হাসি এবং তার বৌদিকে, খুব মনোজ্ঞ সন্ধ্যেটির জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বৌদি আমাদের সঙ্গে পোর্চ অবদি এলেন। আমাকে বললেন, 'মিঃ সেন, আপনার যদি হাসিকে ভাল লেগে থাকে, তাহলে একদিন সময় নিন। বিচার-বিবেচনা করে দেখুন। তার-পরই আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব।'

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল আর কি যে, আমি তো অনেকক্ষণ আগেই সব ভেবে বসে আছি। আরেক দিন সময় নষ্ট করার দরকার কি! সুযোগ্য পাত্র হিসেবে আমার একটা গর্ব আছে। হ্যাংলামী করা মোটেই উচিত হবে না, কেস্ খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই, 'আচ্ছা! ঠিক আছে' বলে আমরা বৌদিকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

বেরিয়ে এসেই সাংবাদিক বন্ধু বললেন, 'ব্যাস! আর কি! এবার লাগিয়ে দিন।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি তো পারলে এক্ষুনি হাসিকে তুলে নিয়ে', বলেই দুজনে হো-হো-হো করে হেসে উঠলাম। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, 'আপনার জন্যেই তো হল! আমি তো একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা লাগোয়া ফাঁড়ি পৌঁছতেই 'শুভস্য শীঘ্রম' বলে তিনি তাঁর বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। মাকে সুখবর জানাতেই তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। যা কিছু ব্যবস্থা করার কালকের মধ্যেই সব করে ফেল।' আমি বলি, 'ব্যবস্থা করার আর তেমন কি আছে। বিয়ে করেই তো তোমাকে প্রণাম করে, হাওড় স্টেশনে ট্রেন ধরতে হবে। ছুটির ত আর মাত্র দু দিন বাকী আছে!' সে রাত্রি আমার এক তিলও ঘুম এল না।

পরদিন আমি প্রহর গুনছি। আজকের দিন ফুরিয়ে কাল কখন আসবে।

আয়নার চোখ পড়তেই হকচকিয়ে গেলাম

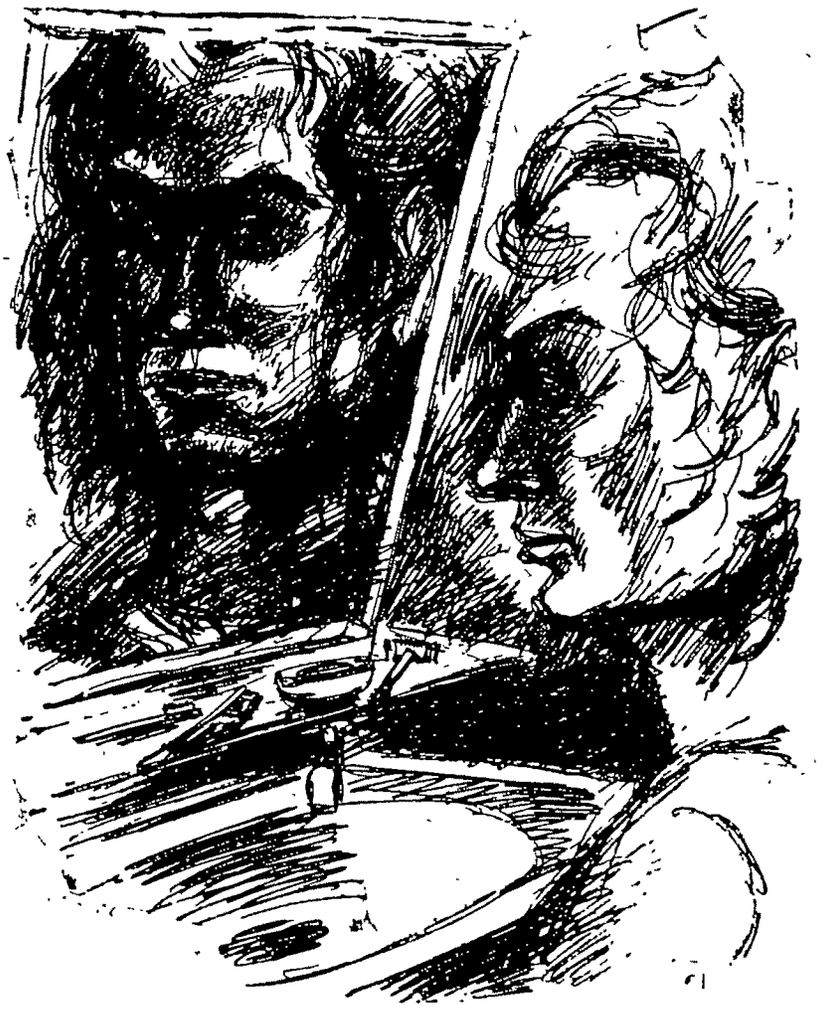

হাসির বৌদি একদিনের জন্যে ব্যাপারটাকে শুধু শুধুই ঝুলিয়ে রাখলেন। তাঁকে ফোন করার মুহূর্তটি কখন আসবে। বেলা যেমন বাড়ছে সেই হারে বাড়ছে আমার অধৈর্যও। মন ভীষণ ছটফট করছে। হাসি যে তখন আমার প্রাণমন জুড়ে বসেছে। একদিকে খুশীর জোয়ার, আরেকদিকে আমার ত্রিশ বছর বয়সের স্বাধীন, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ভাবনাহীন, নির্ঝঞ্ঝাট কুমার জীবনের অবসান। সময় যেন থেমে আছে। যাই হোক দুপুরে সিনেমা দেখে, সন্ধ্যের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, দিনটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল আটটা বাজতেই হাসির বৌদিকে ফোন করলাম। 'নমস্কার মিসেস রায়, ভালো আছেন তো?' হাসি ভালো আছে তো বলতে গিয়ে চেপে গেলাম। 'হ্যাঁ ভালো আছি' বলে তিনি থেমে গেলেন। আমি বলি, সেদিন সন্ধ্যেটি কিন্তু খুব ভালোই কাটলো।' 'হ্যাঁ বেশ কাটলো।', বলে তিনি আবার থেমে গেলেন। আসল কথাটি পাড়তে আমার হঠাৎ এতো লজ্জা পেলো যে মুখ দিয়ে আর সেটি কিছুতেই বেরুচ্ছে না। দুপক্ষই নীরব দেখে আমি বললাম, 'দেখুন আমি কিন্তু...' এটুকু বলেই আমার জিভটা থেমে গেল। অবশ্য একটা সাসপেন্স তৈরী হচ্ছে দেখে আমি অগত্যা বলেই ফেললাম যে, হাসিকে আমার বেশ ভালো লেগেছে এবং আগামীকালের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেললে খুব ভালো হয়। তিনি নির্বাক আছেন দেখে আমি অধৈর্য হয়ে বলি, 'হ্যালো, হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন?' ওপার থেকে জবাব এলো, 'এদিকে.... ব্যাপারটা যে,.... একটু অন্যরকম টার্ন নিয়েছে। সেদিন আপনি....চলে যাবার পর....আপনার....পার্সোনাল অফ ডিভিনিট বলে....হাসিকে জিজ্ঞেস করলাম,....ভদ্র-লোককে কেমন লাগলো?' আমি অতি ব্যগ্র হয়ে বলি, 'হাসি কি বললো?' 'হাসি বললো....হি ইজ ভেরি অল্ড। আমি তৎক্ষণাৎ ফোনটা রেখে দিলাম।

এ কদিন পাত্রীর খুঁত ধরা শুধু আমারই অধিকার ছিল। এতদিন আমার পুরুষালি অহঙ্কার একটি গ্যাস ভর্তি বেলুনের মতো ফুলেফেঁপে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। আজ সেই অধিকার হাসি কেড়ে নিল। আজ হাসি স্বাধীন বিচারের ছুঁচ ফুটিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে ধরাশায়ী করল। ফ্যাঁস্যাশ!! হাসি দেবী, হাচ্ছ্যাস!!

আমি ওকে

ফ্যারেক্স®

খাওয়াতে শুরু করে ভালই করেছিলাম।

আমার ডাক্তার বলেছিলেন: "বাচ্চা ৩ মাসে পড়তে, দুধই যথেষ্ট নয়। ওর দরকার ফ্যারেক্স।"

ডাক্তাররা ফ্যারেক্স খাওয়াতে বলেন কেন?
দুটো কারণে: এটি এক নিখুঁত সুষম আহার যা আপনার বাচ্চার প্রথম শক্ত আহারের চাহিদা পূরণ করে; আর কচি বাচ্চার কোমল হজমশক্তির পক্ষেও এটি খুব ভাল।

বাচ্চার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ফ্যারেক্স চমৎকারভাবে সুষম কেন?
আপনার বাচ্চার মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্য প্রোটিন দরকার: ফ্যারেক্স সঠিক আর সহজে হজম-করার প্রোটিন যোগায়। আপনার বাচ্চার শক্তি দরকার: এই শক্তির জন্যে ফ্যারেক্স যোগায় কার্বোহাইড্রেট। আর আপনার বাচ্চার বয়স ৩ মাস হয়ে উঠতেই ও জন্মের সময় আপনার কাছ থেকে যে আয়রণ পেয়েছিল—ওর সেই আয়রণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনার বাচ্চার চাহিদা পূরণের জন্য আর ওর রক্ত সুস্থ রাখার জন্য ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত আয়রণ। এছাড়া ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২ যার দৌলতে আপনার বাচ্চার গ'ড়ে ওঠে মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁত।

৩ মাসে পড়তেই কেন?
ওর চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গ'ড়ে তোলার জন্য, আর তা'তে শক্ত আহার ও চিবিয়ে না খেয়ে গিলে ফেলবে না। আপনি যদি ওকে এখন থেকেই ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু করেন তাহ'লে ও পরের দিকে "বড়দের" খাবার সহজে আয়ত্ত ক'রে নিতে পারবে আর তা ভালভাবে চিবিয়ে খেতে এবং হজমও করতে পারবে।

সেদ্ধ আলু চটকে দিলে চলবে না?
আপনার বাচ্চাকে কোনো শক্ত আহার দেবার আগে ওর হজম-শক্তির ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। ৩ মাসে ওর হজমশক্তি এখনও কোমল। তাই ওর এমন এক শক্ত-আহার দরকার যা ও সহজে হজম করতে পারবে। তাছাড়া গতানুগতিক খাবার সবসময় সুষম হয় না যা থেকে আপনার বাচ্চা ওর শরীরের জরুরী চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে: আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২। তাই ডাক্তাররা যে বলেন ৩ মাসে পড়তেই বাচ্চাকে অবশ্যই ফ্যারেক্স খাওয়ানো উচিত—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কখন থেকে ওকে "বড়দের" খাবার খাওয়াতে শুরু করব?
যখন থেকে ও প্রথম হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করবে। ওকে ফল, শাকসব্জি, ডাল, ডিম দিন, তবে ফ্যারেক্স খাওয়ানো বন্ধ করবেন না। আপনার বাচ্চার বয়স ৩ বছর না হওয়া পর্য্যন্ত একটু কল্পনার সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত খাবারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স মেশান।

শিশুদের প্রথম শক্ত আহার—সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

সিনটাক্স-CF 37-2115-BG

বৈরথ

সুজিত দাশগুপ্ত

কবে যে একদিন অগভীর ঘুমে এক আশ্চর্য সুরেলা শব্দ বিভিন্ন পর্দায় ওঠা নামা করতে শুনেছিলাম, আজও মাঝে মাঝে তা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যেন বহু ওপর থেকে ঠুং-ঠাং শব্দ তুলে স্লাহার খাঁচার এধার-ওধার ছুঁতে ছুঁতে মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে ভাবী কোনো বস্তু। শবদটা যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ কোনো পর্দায় তাকে ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের অর্কেস্ট্রায় ওই শব্দ যেন ছোঁয়া যায় না। গভীর কোনো পতনের শবদ। গৌরকে বলেছিলাম, ওর ইলেকট্রিক গিটারে ঠিক আসে না। গৌর পারে না। আমি আমার স্প্যানিশ গিটারে পারি না। ব্রতীন পিয়ানো একর্ডিয়ান বাজায়। ব্রতীন পারে নি। ভোলা মাউথ অর্গান বাজায়। ভোলা খুব ভাল বাজায়। ও আমাদের হীরো। অথচ এ পারবে না জানি। চতুর্দিকের এক ভীষণ নৈঃশব্দের মধ্যে ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুলে দূরের অতল গভীরে ছুটে যাচ্ছে কোন বস্তু—আমাদের কারুর পক্ষেই এইরকম একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

ইয়ং অর্কেস্ট্রা—এই নাম আমাদের ছজনের একটা মিলিত সম্পদ। অন্য দু-জনের একজন ফেলা। গৌরের ভাই। জ্যাজ বাজায়। অনিন্দ্য বাজায় বলা। পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে যায়। অনেক সমস্যা আসে। সমাধানও হয় নিশ্চয় কিছু কিছু। কিন্তু ইয়ং অর্কেস্ট্রার ছজন মানুষ তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। আমরা খবর রাখি না তা নয়। আমরা ধ্বংসের খবর রাখি। ভূকম্পনের খবর রাখি। কিন্তু তারা কখনই আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচিত হয় না। বরং ধর্মতলার কোন দোকান ইদানীং স্প্যানিশ গিটার, বঙ্গ বিক্রী করে সুনাম কুড়িয়েছে তার আলোচনা করি। এবং প্রায়ই নতুন হিট গান আমাদের নিজস্ব যন্ত্রে তুলে নেওয়ার ঘোরতর আয়োজন চলতে থাকে।

এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে গৌড়ের দোতলা বাড়ির একেবারে কোণের ঘরে সবাই জড় হওয়া। তারপর একই সুরে বারবার বাজিয়ে ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া। আর কোনো শীতের এবং শীত শেষের সন্ধ্যায় বহুলোকের সামনে বসে সেই সুর বাজিয়ে আসা।

আমাদের সুনাম আমাদের অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে লাগল। ফলে আমাদের উৎসাহের আগুন ক্রমশ উত্তেজনায় এসে দাঁড়াল। কারণ ফাংশনে গিয়ে দাঁড়ালেই অযাচিত সম্মান। শ্রোতাদের একের পর এক অনুরোধ। প্রিয় গান শুনতে শুনতে ওদের মধ্যে থেকে কেউ সিটি দেয়। কেউ কেউ চেয়ারে উঠে কোমরে হাত রেখে নাচতে থাকে। ক্রমশ উত্তেজনা আমাদের মধ্যেও পেট্রোলে আগুন লাগার মত ছড়িয়ে যায়। অথচ আমরা এসে বললে প্রথমে পরিবেশ বেশ শান্ত থাকে।

শুরুতে বাজান হয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। হয়, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি....অথবা তোমায় কিছু দেব বলে....নয়ত, জাগরণে যায় বিভাবরী....এইরকম কয়েকটা গান তোলা আছে। তারই একটা বাজিয়ে দিই। তারপরই শুরু হয় গাইডের সেই গান ও কোন হায় তেরা মুসাফির যাওগি কাঁহা। এবপরই একলাফে.. বাজার হিটকরা গানগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। দর্শকদের চেয়ারগুলো ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে যায় কয়েকজন বয়স্ক নারী-পুরুষ। মেয়েদের মধ্যে থেকেও অনেকেই চলে যায়। যারা ম্যাকসি পরে আসে জিনের আঁটসাঁট জামা অথবা বেলবটস সেইসব মেয়েরা নড়েচড়ে বসে পায়ে তাল দেয় এবং জেন্টস নামাঙ্কিত হলের অন্যদিকে আড়চোখে তাকায়।

সেইদিন থেকে আমাদের রেট প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল যেইদিন আমাদের দলে এল তৃণা। প্রথম দু-একটা ফাংশনে তৃণা গাইবার পর দিনে গড়ে প্রায় তিন-চারটা জায়গা থেকে বায়না করতে আসে। কোন

কোন দিন আরও বেশী। ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই। তৃণাকে আবিষ্কার করেছিল ভোলা। ওর চোখমুখ ধারালো। ফর্সা। আঙ্গুলের সরু ডগায় পরিষ্কার কাটা নখের ওপর লাল নেলপলিস। এখন গায়েগতি লেগে আরো রং খুলেছে ওর। আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ও যখন আমাদের দলে এল তখন ওর পরিবারে দু-বেলার অনটন। অনেকগুলো ভাই-বোন। ওর বড় এক দাদা আছে। কিছুই করে না। এখন আমাদের যেদিন যেখানে ফাংশন থাকে সেখানে যায়। সামনেব রোতে বসে। আমাদের বাজনার শেষে উইংসের আড়াল থেকে তৃণা এসে দাঁড়ায়। ওর ঘুরে বেড়ানোর জন্য স্টেজে জায়গা ছাড়া থাকে। হাতে মাউথপিস নিয়ে তৃণা ঘুরে ঘুরে গান গায়। প্রথমে ভোলা এসে মাউথপিসটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে ভারী গলায় বলে, আপকা নাম?

—মেরা নাম?

একটু থামে তৃণা। হাসে। বুকের লকেটটা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে লজ্জার হাসি মিশিয়ে বলে, মেরা নাম সুনীতা।

ঠিক তেমনিভাবে যেমন ছিল 'ইয়াদো কি বরাত' ছবিতে। তারপর শুরু হয় সেই গান, দম মার দম....।

তৃণার গানের মাদকতা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। ওরা কেউ নাচে। কেউ সিটি দেয়। তৃণার দাদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে স্টেজের দিকে। পা নাচায়। সাদা আলোয় তৃণার মাখন রঙ্গা পেট, নাভি শাড়ীর আড়াল থেকে উদ্ভাসিত হয়। তৃণার পরিষ্কার বাহু-মূল, আর ওই অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঘরভর্তি দর্শকের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও স্পষ্ট শুনতে পাই ভারী কিছু পতনের শব্দ। লোহার বিমে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ক্রমশ অতলে ডুবে যাচ্ছে। তৃণার বাবা একটা সাধারণ অফিসের সাধারণ করণিক। লোকটার ঘিয়ে রংয়ের জামা জুড়ে অজস্র ঘামের দাগ। এই গরমের দিনে সবসময় দাগ ধরা জামা লোকটার গায়ে। কেমন ঝুঁকে পড়ে ক্লান্ত পায়ে ছেঁড়া ব্যাগ হাতে অফিসের দিকে হেঁটে যায় লোকটা।

আমরা ছাড়া এ অঞ্চলে আর একজন আছেন। অমরেশ আচার্য। ভাল বেহালা বাজান। আগে বহু ফাংশনে বাজাতেন। লোকে ধৈর্য ধরে শুনতে শুনতে একসময় আত্মমগ্ন হয়ে উঠত। আলাপ ছেড়ে ক্রমশ দ্রুতের দিকে এগিয়ে যেত অমরদার ছড়ি। পাশে তবলচি যন্ত্রের মত হাত নেড়ে যাচ্ছে বাঁয়া তবলার ওপর। অমরদা স্টেজের ঠিক মধ্যিখানে। দর্শকরা সেইদিকে তাকিয়ে চুপ-চাপ বসে আছে। কেউ কেউ নিজের অজ্ঞাতে মাথা নাড়ছে সুরের ওঠানামার সঙ্গে। মনে হত হলের মধ্যে একটা সূচ ফেললে তার আওয়াজ শুনতে পাব—আত্মমগ্ন-সুখী এই-রকম এক অবিচল স্থৈর্যে ভরা থাকত হলের এধার-ওধার। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবৎ অমরদা আর কোনো শ্রোতা পান না। এখন উনি কেমন যেন বহুদিন আগের মানুষ হয়ে গেছেন। বিয়ে করেন নি। বেহালার ওপর নির্ভর করে জীবন চলে যাচ্ছিল। একসময় ছাত্র ছিল অনেক। এখন আর ছাত্র জোটে না। সবাই গিটার শেখে। বংগ বাজায়। অমরদার পৃথিবীতে বেহালা শেখার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা তৃণাকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়া করা গাড়ির ওপরে মাদুরসেট, বস ইত্যাদি চাপিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে যাই। অমরদা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেই আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকান। আমাদের গাড়ির চাকার তলায় পড়ে ছিটকে যাওয়া কাদা তাঁর কাপড়ে কখনো পড়লেও পড়তে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়। অমরদা যিনি ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি আর কককে চেহারার লোক ছিলেন তিনি আজকাল অন্ধকার মাখানো চায়ের দোকানে বসে মাছি তাড়িয়ে পাউরুটি ডোবান চায়ের গ্লাসে। কখনো সখনো ঘরোয়া ফাংশনে বেহালা বাজানোর ডাক আসে। কিন্তু অর্থ আসে না। তবু অমরদা যান। আগে সঙ্গে শিষ্যরা থাকত। এখন তিনি একাই বেহালা হাতে এগিয়ে যান লাহা অথবা সান্যালদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তায় দেখা হলেই ঠোঁটে হাসি আনার চেষ্টা করেন, কি ভাল তো?

—হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ি।

—আপনি?—

—এই চলে যাচ্ছে ভাই।—

এই সময় অমরদার গলার স্বর উদাস হয়ে আসে। আর আমি হঠাৎ শুনতে পাই ভারী কিছু পতনের শব্দ। লোহার বিমে ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুলে ক্রমশ অতলে হারিয়ে যাচ্ছে।

একা এক নির্জন ঘরে অমরদার সন্ধ্যা কাটে। জীবনের সমস্ত দিনই হয়ত কেটে যায়। কখনো কোনো দিন ওঁর ঘরে গেলে দেখতে পাই এক আশ্চর্য শূন্যতা মেশানো হাসি। মুখের উচ্চাবচ ভূমি জাগিয়ে হাসেন অমরদা, আয় আয়।—

তখন হয়ত তিনি রান্না করছেন। উনুনের সামনে বসে পরনের ছেঁড়া লুঙ্গিটাকে লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে রাখার অস্বস্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন। সেদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিই। বলি,—কেমন আছেন?

—আর ভাই...

হয়ত বলার কথা ফুরোয় না। কিন্তু হঠাৎ থেমে যান। ঘরের একধারের দড়িতে ঝোলে দুটো গেরুয়া রংয়েব পাঞ্জাবি। একটা পায়জামা। দাগকবা তেলচিটে বিছানার একধারে সযত্নে রাখা থাকে বেহালার বাকস। দক্ষিণের জানালাটা আমিই খুলে দিই। মরচে ধরে ফুটো হয়ে যাওয়া টিনের দেওয়াল ভেদ করে এসে পড়ে রোদের রেখা। বাইরে তখন নীল আকাশে স্বজন-বিলাসী সুর তোলে কোনো শঙ্খচিল। বাইরের দিক থেকে চোখ গুটিয়ে হঠাৎ আমার দিকে তাকান অমরদা। বলেন, চলে না রে।... এইভাবে কখনো কোনো মানুষের চলতে পারে? ....দেনা তোদের টিমে একটা চান্স। আমি খুব ভালো বেহালা পারি। খুব ভাল বাজাতে পারি। ....দিবি....

অমরদার চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ি। জানি, ইয়ং অর্কেস্ট্রা কোনো দিন ওঁকে বেহালা বাজাতে ডাকবে

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর
তুলতে অদ্বিতীয় অভিনব
এক বই!

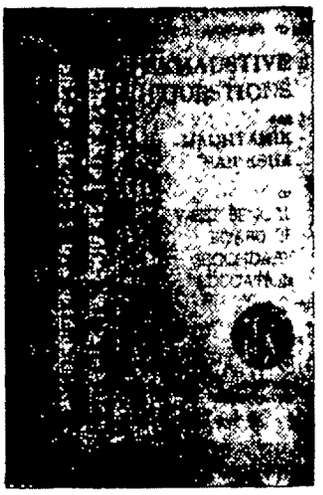

AN ANALYTICAL
APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS FOR
MADHYAMIK PARIKSHA
1978 & 1979

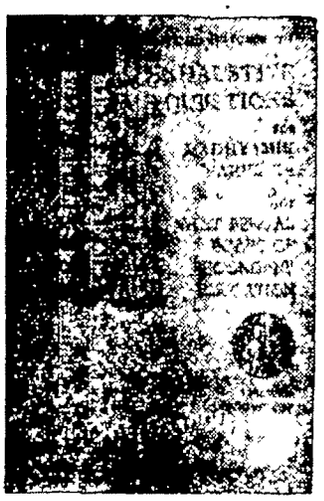

এ বই কিনলে
TEST PAPERS
কেনার আর দরকার হয় না
Price : Rs. 15/- only

B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE,
CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

না। এইভাবে ভাতেভাত খেয়ে কতদিন চলবে ওর! কতদিন চলতে পারে।

ভোলা খুব টিপটপ থাকতে ভালবাসে। গৌর বাজায় ইলেকট্রিক গিটার। গৌরও। ভোলা জামা-কাপড়ের দিকে খুব নজর দেয়। গৌর জামাকাপড় আর স্বাস্থ্য উভয়ের দিকেই। অথচ তৃণা কিন্তু সবায়ের সঙ্গেই সহজভাবে মেশার চেষ্টা করে বলে মনে হয়। আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত। গৌর এবং ভোলার সঙ্গেও হয়ত তাই। রেওয়াজের জন্য গৌরের বাড়িতে আমাদের যেতই হয়। গৌরের মা নাকি তৃণাকে পছন্দ করে গৌরের কথা ভেবে। যেহেতু তৃণা ভোলার আবিষ্কার, অতএব ভোলা তৃণাকে ছাড়তে চায় না তৃণার যাতে কোনোরকমের অসুবিধা অথবা কষ্ট না হয় সেদিকে ভোলার গভীরতর নজর। ভোলা আর গৌরের বন্ধুত্ব অটুট বলেই মনে হয় এতকাল। এবার হয়ত গৌর অন্যদল তৈরী করবে। এবার হয়ত ও সরে দাঁড়াবে ইয়ং-অর্কেস্ট্রা থেকে। হঠাৎ কোনো পরিবর্তনের অপেক্ষায় থেকেও ওদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আমি কিছুই বুঝি না। কিছু না কিছুই জানি না। তবু কেন যে সেই আওয়াজ শুনলাম। ভারী কিছু পতনের শব্দ। লোহার বিমে ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুলে ক্রমশ অতলে তুবে যাচ্ছে।

একটা সময় আসে যখন কোনো গোপন বিষয় সকলেই জানে অথচ কেউ মুখ খোলে না। তেমনি এক আশ্চর্য গোপনীয়তায় দিন কেটে যাচ্ছিল আমাদের। আমরা দেখতাম গৌর আর ভোলার মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবু আমরা চুপ। আমাদের ট্যাকসি সোজা উত্তরমুখো এগিয়ে চলেছে। আগের গাড়িতে চলে গেছে তৃণা, অনিন্দ্য, ফেলা আর গৌর। গৌরের সঙ্গে ওর ভাইকে ভোলাই তুলে দিয়েছে। কারণ ওই গাড়িতে তৃণা আছে। পেছনের গাড়িতে আমি ভোলা আর ব্রতীন। ব্রতীন চুপচাপ সিগারেট টানছিল। আমাদের পাড়ার কাছাকাছি বেলওয়ে ব্রীজের ওপর আসতেই গাড়ি দাঁড় করাল ভোলা। বলল, নিত্যা শোন তোর সঙ্গে কথা আছে।

আমার স্প্যানিশ গিটার নিয়ে নেমে দাঁড়ালাম। ভোলা গাড়ির জানালার মুখ নামিয়ে বলল, তুই চল ব্রতীন। আমরা হেঁটে ফিরছি।—ব্রতীন চলে গেল। ভোলা একটা সিগারেট ধরাল। আমিও।

—তুই কিছু শুনেছিস?—

ভোলার মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, না,—

—তৃণাকে বিয়ে করছি। সবই ঠিক থাকছে, শুধু গৌর আর ওর ভাই থাকবে না।—

তৃণা মানে, ইয়ে ও কি.....—

ভোলা আমার মুখের দিকে তাকাল। অন্ধকারে তারার আলোয় দেখলাম ভোলার মুখে অবজ্ঞার হাসি। বলল, তৃণা আমাকেই ভালবাসে। কথা বলতে বলতে ব্রীজের একটা ধারে এসে দাঁড়ালাম। ভোলা রেলিং-এ ভর রেখে নিচের দিকে মাথা ঝোঁকাল। থুথু ফেলল। বলল, তুই থাকছিস তো?

দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলাম। ভোলা আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল, ঠিক আছে কাল তো দেখা হবে, কাল জানাস।

সাইডিং থেকে ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে। এই ব্রীজের ওপর, এবং সমস্ত আকাশে। বহু নক্ষত্র চিকমিক চিকমিক জ্বলছে। আর দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে একচক্ষু লাল সিগন্যাল আলো। মাথার নামাঙ্কিত আলো নিয়ে রেলের জমির সীমানার পরেই বাস-রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিনেমা হল। বহুক্ষণ যাবৎ একটা বেহালার সুর ভেসে আসছে। ভোলা বলল, ফিরি।—

—তুই যা। আমি পরে যাব।—

—কেন?

—দেখি অমরদা বোধহয়।

ভোলা চলে গেল। আমি সেই বেহালার সুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটু এগিয়ে ব্রীজের মাঝ বরাবর রেলিং-এর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বেহালার সুরে তুলেছেন অমরদা। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতে ধরা স্প্যানিশ গিটার। একমনে বাঁদিকে একটু মাথা নুয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন অমরদা। কোনো সাড় নেই। ব্রীজ ছাড়িয়ে ওই সুর দূর থেকে ক্রমশ দূরে ভেসে চলে যাচ্ছে। হাল্কা হাওয়ার সঙ্গে জানালা ছাড়িয়ে মশারি ভেদ করে এই সুর ঢুকে পড়ছে ওই বাড়ীগুলোতে। ওই রেলের কোয়ার্টারে। ওরা কেমন নিশ্চিন্তে সমস্ত দুঃখের কথা ভুলে শুনছে এই সুর। এই রাগ আমি চিনি। দরবারি। আমি যদি এমনি করে বাজাতে পারতাম আমার এই যন্ত্রে আমি যদি মানুষের তাৎক্ষণিক দুঃখ ভোলাতে পারতাম। এই রকম অচপল কোনো সুরে। এইরকম করুণ কোনো সুরে। অমরদা বাজাচ্ছেন আর আমি ওই সুরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে অমরদার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। কেমন নিপুণ আঙুলে পর্দা রাখছে লোকটা। কেমন ছোটখাট শিল্পকর্ম গড়ে তুলেছে সুরের ফাঁকে ফাঁকে। ক্রমশ আলাপ ছেড়ে দ্রুতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ছড়ের আঁচড়ে। অমরদা কি আশ্চর্য যাদুকর। আমি সবকিছু ভুলে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। এক আকাশ নক্ষত্রের তলায়। ক্রমশ সুরের পূর্ণ অবস্থায় এসে থর থর করে কাঁপছে যেন সবকিছু। অমরদা ওই অবস্থাতেই হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর হঠাৎ হাত আলগা করে ছড়ি তুলে নিলেন বেহালার ওপর থেকে। বললেন, কে?..... নিত্যা?—

—হ্যাঁ—

—তুই কি, এ্যাঁ.....ওই যন্ত্র নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস?.....পারবি ওতে এমনি রাগ বাজাতে?.....ফেলে দে ছুঁড়ে। ফেলে দে বলছি।—আমি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। অমরদার যা খুশি তাই যেন করিয়ে নিতে পারে তখন আমাকে দিয়ে। কিছু না ভেবেই আচমকা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গিটারটা। প্রথমে কাছেই একটা লোহার বিমে লাগল। তারপর এধার-ওধার আঘাত খেয়ে ঠুং-ঠাং শব্দ তুলতে তুলতে ক্রমশ কোথায় হারিয়ে গেল সেটা। অমরদা আমার দিকে চকচকে চোখে তাকালেন। বললেন, বেহালা শেখ। বেহালা শেখ। তুই পারবি নিত্যা। তোকে দিয়ে হবে।—

আমি কি করে ফেলেছি ঠিক বুঝতে পারছি না। অমরদার দিকে আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছি। লোকটার সমস্ত অবয়ব জুড়ে দারিদ্র্য হো-হো, হো-হো হাসছে অথচ এমন আশ্চর্য ক্ষ্যাপা লোক। বলল, মালকোষ শুনবি? শোন। খুব ভাল লাগবে।—

সেই রাতে অমরদার হাত ধরে নেমে এসেছিল ঈশ্বরের দূত। সমস্ত চরাচর জুড়ে এক অপার্থিব নির্জনতার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা দুজন। মাথার ওপর অসীম শূন্যতার অগণিত তারার আলো। সেইরাত ওইভাবেই কেটেছিল। অমরদার মালকোষে একক আলাপ শুনতে শুনতে।

বহুদিন ক্লাবে যাই না। কি এক ইচ্ছে হল ছেড়ে দিলাম বাজান। চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে সংসারও তার দাবী নিয়ে হাজির হল। একদিন হঠাৎ ভোলার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। বলল, আজ ক্লাবের ফাংশন আছে। যাস দেখতে।—

একদিন নেশায় মত্ত ছিল। পুরোপুরি ভো ভুলতে পারিনি তাই গুটিগুটি পায়ে গেলাম। ইয়ং-স্টারের ফাংশন। আগের দল নেই ভাঙাচুর হয়েছে। গৌর নেই। তবু দর্শকের মধ্যে কি ভীষণ উত্তেজনা। আজ অনেক প্রিয় গান শোনা যাবে। প্রিয় গানের সুর হলের ভেতর অন্ধকার বিছিয়ে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে পর্দা সরে যেতেই চমকে গেলাম। আমার জায়গায়, আমার সেই শূন্যস্থানে ফোলের ওপর স্প্যানিশ গিটার রেখে মাটির ওপর চোখ নামিয়ে বসে আছেন অমরদা। সেই অমরদা, যে নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একদিন অগাধীর ঘুমে শুনতে পাওয়া ভারী কিছু পতনের শব্দকে দাশতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল।

দিনভর স্নিগ্ধতার আলিঙ্গনে...

প্রত্যেকটি দিনকে করে
তুলুন সুরভি-ধারায় স্নাত
এক অভিনব দিন...ব্যবহার করুন
বিনাকা স্টারডাস্ট ট্যাল্ক!
এর আকর্ষণীয় অনুভূতি সারাদিন
জড়িয়ে থাকে আপনার অঙ্গে অঙ্গে...
এর স্নিগ্ধতার আবেশ সারাদিন
টেনে রাখে মধুর রেশ...
আপনার আপনজনদেরও
মাখতে বলুন!

বিনাকা স্টারডাস্ট ট্যাল্ক

U-BT/11/7 bec

দুর্গা তৈরির কারখানায়

দেবব্রত রায়

কি আশ্চর্য রাস্তা কলকাতার এই চিৎপুর। বিশাল হাড় বারকরা জীর্ণ অট্টালিকাগুলি একদিকে যেমন ১৯ শতকের বাবু-কালচারকে ঠাট্টা করছে তেমনি এর অসংখ্য সরু সরু রাস্তা, গলি ক্রমবর্ধমান মানুষ ও বাণিজ্যের চাপ, যা প্রায় গত দুশো বছর ধরে বাড়তে বাড়তে এখন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কেমন ছিল ১৮০৬-এর চিৎপুর ?

> "17 different catagories of owners were found here : European, Government, Muslim, Muslim Prostitude, non-Bengali, unclassified Hindu Prostitute, Brahmin, Gandhavanik Goldsmith, Kalu, Kayastha, Moira, Pod Sunri, Subarnavanik & Tili"
>
> ("CALCUTTA Myths & History, S. K. Mukherjee 1977)

এসপ্লানেড থেকে একটি চিৎপুরের ট্রামে উঠলে চলচ্চিত্রের টলি শট (লাইন পেতে তার ওপর চাকাওয়ালা তক্তা বসিয়ে ক্যামেরা ঠেলে নিয়ে যাওয়া)-এর মত দুধারে যে সব অসংখ্য বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, গাড়ি-ঘোড়া, মানুষের মুখ, মুখের ম্লান অভিব্যক্তি, ক্লান্তি, ভয় ও ক্ষুধা চোখে পড়ে তাতে তিরিশ মিনিটের এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ও প্রায় গায়ে কাঁটা দেওয়া ডকুমেন্টারি ছবি দেখার অভিজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হতে হয়। লালবাজার থেকেই যদি আরম্ভ করা যায়। কিম্বা আর একটু পিছিয়ে এসে বেন্টিং স্ট্রীট। কর্মঠ চীনা স্ত্রী-পুরুষের জুতোর দোকান সারি সারি। এরপর লালবাজার পেরোলেই রাস্তা আরো সরু হয়ে যত উত্তরে এগোচ্ছে তত তা মানুষ ও দোকানের ভিড়ে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কত অসংখ্য রকমের দোকান আর মানুষের কত অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিস। নাখোদা মসজিদকে ঘিরে যেমন রয়েছে মুসলমানদের আতর-তামাক বা ওষুধ-সুর্মার দোকান তেমনি আর একটু এগোলেই দেখা যায় বিহারীদের কচুরী, সরবত লোহালককড়, পান-জর্দা, ঘি ভুজি ও চায়ের দোকান। কত বিচিত্র সাইন বোর্ড, কত মজার দোকানদারদের চেহারা আর কি ব্যস্ত সব খদ্দেররা। কোথাও ঠেলার ওপর ঘুমিয়ে আছে ক্লান্ত শ্রমিক, কোথাও ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে বসে নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে স্বাস্থ্যবতী গাভী। এরই মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ে ছাপা শাড়িতে মাড়োয়ারী যুবতীর মন্থর আয়েসী চাল। এরপরও আছে চিৎপুরের বাজার রাজত্ব আর মোহময় বেশ্যাদের কটাক্ষ আরো কত কি। এবং এই পেরিয়ে এসে তবে কুমারটুলির মৃৎশিল্পের জগৎ।

ট্রাম থেকে নেমেই বাঁদিকের রাস্তা। গলির মোড় থেকেই মাটির গন্ধ আর দৃশ্য। প্রতিমা রং, বাঁশ খড়, সোলার সাজসজ্জা আর কর্মরত অসংখ্য শিল্পী কর্মী। গলির মোড়ে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল এক ১২।১৩ বছর বয়সের কৃশকায় বালক খালি গায়ে বসে ছোট ছোট পুতুল বিক্রী করছে। কালো চাকচিক্যহীন গায়ের রং লম্বাটে ধরণের মুখ। একটা খাঁকি জীর্ণ হাফ প্যান্ট পরা আর চোখে মাপের চেয়ে বড় একটা পুরু লেন্সের চশমা। লেন্সের দাপটে চোখ দুটি ঝাপসা ও বিকৃত লাগছে। চশমার ফ্রেমটি কোনকালে লাল রং-এর বলে মনে হল। একদিকে চিৎপুর, অন্যদিকে গঙ্গা। মাঝে কুমারটুলি। কলকাতার উত্তরের এই অঞ্চলটি এই শহরের মতই প্রাচীন। যে তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতার পত্তন হয় তার মধ্যে সুতানুটি হচ্ছে সর্ব উত্তরে মধ্যে কলিকাতা ও দক্ষিণ গোবিন্দপুর। এই সুতানুটি অঞ্চলেই হল বর্তমান কুমারটুলি। কুমারটুলির নামেই প্রকাশ যে এখানে কুমোরদের বাস। প্রায় দুশো বছর আগে কলকাতার ক্রমবর্ধমান ধনীদের প্রতিমা গড়ার চাহিদা মেটাতে বছরের একটা সময় কৃষ্ণনগর থেকে কিছু কিছু মৃৎশিল্পী কলকাতায় আসতেন। পরে একদিকে বছরের প্রায় সব সময়ই মূর্তি গড়ার প্রয়োজন হওয়ায় এবং অন্যদিকে বাকী সময়টায় ধনী গৃহে নকশা বা পোড়ামাটির কাজ করার বায়না জোটায় মৃৎশিল্পীদের কিছু কিছু

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জল এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। শহরের ধন-সম্পদ উত্তরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং গঙ্গার ধারে মাটি সহজ লভ্য হওয়ায় তাঁরা কুমারটুলি অঞ্চলটিই বেছে নেন। অবশ্য উত্তর কলকাতায় গঙ্গার ধারে তো আরো জায়গা রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে কুমারটুলি কেন এ প্রশ্নের সঠিক ঐতিহাসিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো প্রথম দলটি এসে এখানেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় দলটিও। ফলে পরবর্তী দলগুলিও এখানে বসতি স্থাপন করলেন। কলকাতার উত্তর অংশে যেমন এঁরা ধনীদের আকর্ষণে কেন্দ্রীভূত হলেন দক্ষিণ অংশে তেমনি ভিড় করলেন কালী মন্দিরের ভক্ত-সাধারণের আকর্ষণে। কালীঘাট মন্দিরের পুণ্যার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাটির পুতুলের সংগে সংগে গড়ে উঠেছিল পট-শিল্পের একটি সজীব ধারা পরে যা কালীঘাটের পট নামে বিশ্ব বিখ্যাত হয়।

কুমারটুলি ঘাটের পেছনে গঙ্গার ধারের বাড়িগুলির প্রাচীনতা দেখলেই কুমারটুলি অঞ্চলটির প্রাচীনতা অনুমান করা যায়। ঘাট থেকে উঠে রেল লাইন পার হয়ে একটু ভেতরে গেলেই কবিরাজ বাড়ি। দরজার পাশে শ্বেত পাথরের ফলকে (এখন অবশ্য আর শ্বেত নেই) খোদাই করা রয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি দানের বার্তা। তারো এগোলে শিরা উপশিরার মত গলি, সরু গলি, আরো সরু—একজনেরও যেতে কষ্ট হয়। কি চাপা আর দমবন্ধ করা। বর্ষায় মাটি গলে এসে পড়েছে রাস্তায়। তারই মধ্যে গলির মোড়ে মোড়ে তেলে-ভাজার দোকান। বিষণ্ণ সন্ধ্যার মুখে এই সব সংকীর্ণ গলির মধ্যে আটকে পড়ছে ধোঁয়া। কি সাঁতসেতে আর অস্বাস্থ্যকর। কোথাও পড়ে রয়েছে সারি সারি কাটা কাঠকুটো, কোথাও শুকোচ্ছে গলা কাটা সার সার মুণ্ডু। মেয়েরাও চুপ করে নেই। পুতুলে প্রাথমিক সাদা রং লাগাবার কাজে তো তেমন দক্ষতার দরকার নেই, তাদেরও কাজে লাগান হয়েছে। এরই মধ্যে বাস করেন দুশো ঘর মৃৎশিল্পী। কুমারটুলিতে এখন প্রাণের জোয়ার, কর্ম চাঞ্চল্য। ধান কাটার মুখে চাষীদের মত। এক-একটি ছোট ছোট চালায় ঠাসা রয়েছে অর্ধ সমাপ্ত সব মূর্তি। তারই মধ্যে কোথাও হারিকেন জ্বলছে, কোথাও মোমবাতি প্রতিমার বুকের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে ন্যাতা বোলাচ্ছেন বা নিটোল করছেন প্রতিমার গলা, বুক বা কোমরের স্ফীত অংশটি। কেউ আবো তন্ময় হয়ে বাঁশের ধারাল কঞ্চি দিয়ে স্পষ্ট করছেন নারী দেহের সেই সব ভাঁজ যা বারোয়ারি পুজোর পৃষ্ঠপোষকদের উদ্বুদ্ধ করে এই সব মূর্তি কিনতে।

যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন তাঁদের আর বাড়ি বলে কোন বস্তু নেই। কিন্তু যাঁরা শান্তিপুর, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর থেকে আসেন তাদের কর্মস্থলই কেবল এখানে। পরিবার ও জমিজমা রয়েছে দেশে যেখানে ওঁরা মাঝে মাঝে যান এই দম বন্ধ করা 'আর্টিস্টিক' পরিবেশ থেকে বেরিয়ে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসেন খোলা আলো-হাওয়ার মধ্যে, চাষবাস স্ত্রী-পুত্রের দেখা-শোনা করে।

'এখানে কাজ করা যায় না। কি ছোট জায়গা। তার ওপর সর্বদাই জল পড়ছে। ওদিকটা কেমন ভেঙ্গে পড়েছে দেখুন। ডডমাগুলো যে কতদিনের পুরনো তা কি বলব। টালিগুলোও ফুটো হয়ে গেছে। তারপর তো লোড শেডিং আছেই। আর সেই যে বিকেলের আগে আলো গেছে এখন রাত আটটা হতে চলল আসার নাম নেই। এ রকমভাবে কদিন আর চালাব বলুন। আপনাকে যে বসতে দিই কোথায়।' —একটানা কথাগুলো বলে চুপ করলেন কৃষ্ণনগরের সুধীর পাল। বেশ পরিষ্কার ধুতি গেঞ্জি গায়ে আর চোখে স্কুল মাস্টার ধরণের চশমায় সুধীর পালকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

আপনার পরিবার কি কৃষ্ণনগরেই থাকেন?

—'তা ছাড়া উপায় কি বলুন। এই নোংরা পরিবেশে তো মনও নোংরা হয়ে যাবে। এখানে কি কেউ থাকে। আমার, জানেন, কুমারটুলির প্রধান সমস্যা মনে হয় এর বসতির সমস্যা। বিশ্বব্যাংক থেকে সাহেবরা এসেছিলেন আমাদের অবস্থা দেখতে। আমি বললাম আমাদের একটু জায়গা দিন আর ছাদটা একটু পাকা করে দিন। আর কিছু চাই না।'

সুধীর পাল প্রতিমা তৈরীর মধ্যেও ভাষা বিস্ময় হরিনাথ দের একটি মূর্তি তৈরী করছেন তাঁর জন্ম-শতবর্ষ কমিটির জন্যে।

সমস্যা অবশ্য শুধু বসতির নয়। কুমারটুলিতে সমস্যা অনেক। সমস্যা টাকার বিদ্যুতের জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যের। এ সবই এদের নিজস্ব সমস্যা। কিন্তু শিল্পের একটি বড় সমস্যা আছে যা একান্তই শিল্পগত সমস্যা। দ্রুত ফ্যাসানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কুমারটুলির শিল্পীরা এখন হিমসিম খাচ্ছেন। নতুন জেনারেশন-এর কাছে এটা ততটা নয় যতটা প্রাচীনদের কাছে। অবশ্য কুমারটুলিতে এখন যৌবনের বাণ। নতুন একটি জেনারেশন কাজ করছেন এখন। ঘাটের ঊর্ধ্বে শিল্পী খুব বেশী চোখে পড়ে না।

প্রায় শিশু বয়েস থেকেই এঁদের কাজ আরম্ভ করতে হয় বাবা-কাকার সঙ্গে। খড় বাঁধা মাটি লাগান, ন্যাতা দেওয়া—আরও কত খুঁটিনাটি কাজ শিখতে হয় প্রথমে। ২০।২১-এ এসে অল্প-স্বল্প কাজ করার স্বাধীনতা পান। যদিও প্রচ্ছন্নভাবে সেখানেও থাকে বাবার কড়া শাসন। ২৫ থেকে ৪০ বছর হল কাজ করার সবচেয়ে ভাল সময়। যৌবনের কল্পনার ও তেজে নিজেকে তখন অসুরের মত মনে হয়। মৎ শিল্পীদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে। তার জন্যে দরকার উপযুক্ত আহার, বিশ্রাম ও ব্যায়াম। চল্লিশের পরের আরও দশ বছর কাজ করেন অপেক্ষাকৃত অল্প দাপটের সঙ্গে। পঞ্চাশের পর থেকে শরীর শিথিল হতে থাকে। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ।

'আমার বাবার মত আমরা কেউই খাটতে পারি না। এই সব ২০।২২ হাতের বড় বড় মূর্তি একাই করতে পারতেন। এখন বয়েস পঁচাশি বছর। থাকেন নবদ্বীপে। আমি বাবার কাছেই কাজ শিখি। আজকাল তো সে সব কাজের কোন কদর নেই। বছর কয়েক হল ওরিয়েন্টাল স্টাইলেরই চাহিদা বেশী।' —বললেন কেনা পাল। সংস্থার নাম মডার্ণ আর্ট স্টুডিও। কেনা পালকে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মনে হল কুমারটুলিতে মূর্তি শিল্পের শ্রেণী বিভাগটি বেশ মজার।

১। বাংলা ঠাকুর, ২। আর্টের ঠাকুর, ৩। ওরিয়েন্টাল ঠাকুর।

বাংলার ঠাকুর হল ঐতিহ্যপূর্ণ এক চালার শিল্পীত প্রতিমা যার আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশের গ্রামের জমিদার বাড়িতে

বাঙলারীতির দুর্গাপ্রতিমা

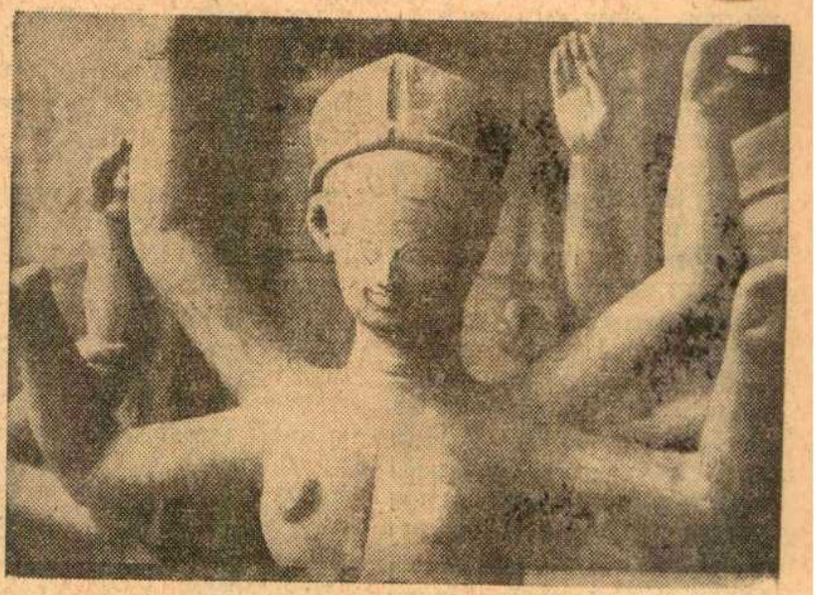

ও শহুরে ধনীদের বাড়িতে পূজো হয়ে আসছে। এই সব প্রতিমা তৈরী হয় শাস্ত্রীয় মাপ-জোপ ওনিয়ম-কানুন অনুসারে। এখনও কখনও কোথাও দেখা ডাকের সাজের ঠাকুর এই শ্রেণীভুক্ত। হলুদ পানের মত মুখ, টানা চোখ, রত্নখচিত বিশাল মুকুট ও পোষাকে স্পষ্টতই একটি একটি দেবীর ভাব আসে। তার ওপরে মূর্তিকে যথাসম্ভব ত্রিমাত্রিক গঠন থেকে ফ্ল্যাট দ্বিমাত্রিক গঠনে নিয়ে যাওয়া এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২। আর্টের ঠাকুরের সংজ্ঞা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। এই শ্রেণীর মূর্তি বলতে বোঝায় যা কিছু আজগুবি, আধুনিক ও উদ্ভট। এখানে চূড়ান্তভাবে বাস্তবতা মেনে চলা হয়, যা ঠিক বাংলা ঠাকুরের বিপরীত। কম্পোজিশন-এর দিক থেকে এর একবৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন শিল্পী জি পাল প্রায় ৪০ বছর আগে। মূর্তিগুলিকে তিনি এক চালার মধ্যে না রেখে তাদের ছড়িয়ে দেন বিভিন্ন দিকে। ফলে এক চালার সেই জমাট ঘনবদ্ধতা ভেঙে গিয়ে প্রতিটি মূর্তি আলাদাভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী জি পালের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী অনুকারকদের হাতে তা গত ৪০ বছর ধরে কলকাতার বারোয়ারী পূজোর পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা ও মৃৎশিল্পীদের যথেচ্ছাচারিতার মিশ্রণে এই ধারা পল্লবিত হতে হতে এখন এক ভয়াবহ বিকৃতিতে এসে পৌঁচেছে।

গোপেশ্বর পাল (জি পাল নামেই প্রসিদ্ধ) ছিলেন কুমারটুলিতে এক অসামান্য ব্যতিক্রম। মাটিকে নিজের আজ্ঞাবহ করার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হন অত্যন্ত শৈশবেই। মাটির এই প্ল্যাস্টিক রূপ বিষয়ে তিনিই প্রথম সচেতন হন কুমারটুলির মৃৎশিল্পী সমাজে। এবং বাস্তবতার যে ধারাটি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে এ যাবৎ কাল সজীব ছিল তার পূর্ণতর প্রকাশ দেখা গেল জি পালের করা ঠাকুর দেবতার মূর্তিতে, জীবজন্তু, ফল, পাখি ও মানুষের মুখের নানা অভিব্যক্তির মধ্যে। তাই ১৯২৪ সালের ইংরেজ সরকার লণ্ডনের Wembley Park এর প্রদর্শনীতে যখন গোপেশ্বর পালকে মনোনীত করে পাঠান তখন DAILY TELEGRAPH এই রকমভাবে খবরটি ছাপিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে :

'Mr. Gopeswar Pal at work
in Bengal Court, Indian
Pavillion.
Lightning Sculptor
Genius from Bengal Exhibits his
Skill at Wembley'.

ফলে জি পালের কাজে বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেলেও তাঁর ঐতিহ্যময় রুচি কখনো কোন বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেয় নি। মাঝে মাঝে তাঁর এই বাস্তবনিষ্ঠা পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত যখন বিক্ষত মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ির গঠন ও রঙ যথাযথ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে মেডিকেল কলেজের সার্জেনের শরণাপন্ন হতেন অথবা ময়ূরের পালকের অবিকল রঙ আনার জন্যে সারা দিন চিড়িয়াখানায় কাটাতেন। বরং তাঁর কাজেই প্রথম বোঝা গেল যে প্রতিমার গঠন বাস্তবনিষ্ঠ হয়েও তা দেবীত্বে কিভাবে উন্নীত হতে পারে। কারণ এরও একশো বছর আগে কলকাতার বারোয়ারি পূজোর যে বর্ণনা হুতোম প্যাঁচার নকশায় বর্ণনা করা হয়েছে তা পড়লেই জি পালের কৃতিত্ব বিষয় আমরা নিশ্চিত হই।

বর্ণনাটি এই রকম—

'বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু — ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া, সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্তি,—সিংগির গা রূপালী গিলটি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকরুণের বিধিবয়ানা মুখ—রঙ ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা, বক্ষ, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচচেন। প্রতিমার উপর ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু ব্যাজচুচে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিফরম ও কেস্ট।'

কেনা পালের এবং তার সঙ্গে আরো অনেকের কাজ দেখে ওপরের হুতোমী বর্ণনাটি আবার অত্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে। গত কয়েক বছর কলকাতার পূজোর প্রতিমা না দেখার এবারে মূর্তি দেখে আমাকে একটু ধাক্কা খেতে হল। বেশ কিছু দিন ধরেই প্যাণ্ডেল এবং আলোর জৌলুসে মূর্তিকে যেভাবে অবহেলা করা হচ্ছিল তার একটি অন্য রূপ এবারের পূজোর মূর্তিগুলিতে দেখা যাবে। অবশ্য খবর নিয়ে জানলাম যে কয়েক বছর ধরেই চলছে এই রীতির জনপ্রিয়তা। এবারেও মূর্তিকে ভীষণভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে কিন্তু পরিবর্তে নিপুণ যত্নে তৈরী হচ্ছে অসুর ও সিংহ।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গত এক দশকে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে হিংসার স্থানটি কত স্থায়ী হয়েছে। নকশাল-নবকংগ্রেস ও তৃতীয় বিশ্বের চুল-দাড়ি ট্রাউজার্স শোভিত কেতা-দুরস্ত বিপ্লব বিলাসীদের মিশ্রিত বাঙ্গালী রূপটি। অবিকলভাবে মূর্ত হয়েছে অসুরের নানা ভঙ্গীতে। অসুরের চেহারায় হিংসার উপস্থিতিটিই তো স্বাভাবিক। এবং তা এত দিন একটি ক্ল্যাসিকাল রূপও পেয়েছিল। কিন্তু এবারে অসুরের প্লাবিত চুল ও দীর্ঘ পারিপাটি জুলপি আমাদের কেবল এক জোড়া বেল-ট্রাউজার্সের অভাবের কথাই মনে করিয়ে দেবে। মনে হচ্ছে যেন অসুর ড্রেসিং টেবিল থেকে প্রসাধন সেরে ওয়ারড্রবের দিকে যাবার মুখে আক্রান্ত হয়েছে। এবং সেই আক্রমণ মোকাবিলা করছে চুলের পারিপাট্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। হয়ত হেয়ার স্প্রে ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে এই ধরনের অবাস্তব কাণ্ডটি। কেনা পালের অসুর ফোরগ্রাউণ্ডে থেকে বড় হয়ে আমাদের প্রধান মনোযোগের বস্তু হয়ে উঠেছে। দুর্গা অনেক জায়গাতেই বেশ অসহায়া। একটি জটিল কম্পোজিশন আছে কেনা পালের চালতেই। দু পায়ে ভর দিয়ে সিংহ সোজা দাঁড়িয়ে আক্রমণ করছে অসুরকে এবং ততোধিক বিক্রমে চুল ও জুলপিকে অক্ষত রেখে অসুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। দুর্গাকে এখানে মনে হচ্ছে আধুনিক মুষ্টিযুদ্ধের আসরে কোন নারী দর্শক। শুধু কেনা পাল নয় কুমারটুলিতে অনেকের কাজেই দেখা গেল দুর্গার অবস্থা বেশ শোচনীয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও যে একটি ব্যাপারে বিস্মিত না হয়ে কোন উপায় থাকে না তা হল এই অল্প পরিসরে এই সব বিরাট মূর্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনা। এটা যেন মিকেলাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলে শুয়ে কাজ করার মত। লক্ষ টাকায় নির্মিত আলোকজ্বল প্যাণ্ডেলের মধ্যে মূর্তি কিভাবে থাকবে এবং দর্শকের থেকে তার দূরত্ব ও উচ্চতার এই অন্ধকার, ভিজে গলির মধ্যে বসে তা সঠিক অনুমান করা যে শক্ত তা আশা করি বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না।

কুমারটুলির তৃতীয় ভঙ্গীটির নাম ওরিয়েন্টাল ঠাকুর। ওরিয়েন্টাল ঠাকুর অনেকটা বাংলা ঠাকুর ও আর্টের ঠাকুরের মাঝামাঝি রূপ। যেন দুই রীতির মধ্যে যোগসূত্র। এই রীতি হল অজন্তার চিত্রিত নারীদের অনুকরণে রচিত মূর্তি। বিষ্ণুদের ভাষায় বলা যায় 'স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।' এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অজন্তার ঢং-এ মূর্তিটি করার পর সারা গায়ে, হাতে, মুখে এমন কি জামা-কাপড়েও বেনে বাড়ির বৌদের মত চাপ চাপ মাটির অলংকার বসিয়ে দেওয়া। এবং অলংকারগুলি সূক্ষ্ম না হওয়ায় তার ভারে মূর্তিটি প্রাণ হারিয়ে ভোঁতা হয়ে যায়। ওরিয়েন্টাল বিষয়ে জনসাধারণের ধারণার এটি একটি নিদর্শন। এবং এই রীতির চাহিদাই কয়েক বছর হল খুব বেশী।

'এই স্টাইল ব্যাপারটি কি জনসাধারণের ওপর আপনারা চাপান না কি জনসাধারণ আপনাদের ওপর চাপায়?

এই প্রশ্ন একাধিক শিল্পীকে করে আমার মোটামুটি এই ধারণা হয়েছে যে, হয়ত কোনবার বিশেষ কোন বারোয়ারি প্রতিমা দর্শকসাধরণের মনে ধরল অর্থাৎ সেই প্যাণ্ডেলে ভিড় হল, কাগজে ছবি ছাপা হল বা শ্রেষ্ঠ মূর্তি হিসেবে সরকারী পুরস্কার মিলল। ব্যস, পরের বছর সমস্ত পূজা কমিটি আব্দার ধরল, 'ঐ রকম মূর্তি করে দিতে হবে আমাদের।' প্রথম বছরটা হয়ত শিল্পীরা অতটা প্রস্তুত হতে পারলেন না তার পরের বছর ভরিয়ে দিলেন সারা শহর সেই মূর্তিতে। সাহিত্য শিল্প থেকে আরম্ভ করে পোষাক-প্রসাধন পর্যন্ত জনরুচির চরিত্রটি একই রকম।

গত গত বছর একটি মূর্তি থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকাও পাওয়া গেছে। অবশ্য রমেশ পালের মূর্তির দাম আরও বেশী—পনের হাজার পর্যন্ত।'

'কার করা মূর্তি থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পাওয়া গেছে?'

'এই আমাদেরই'—ঈষৎ লাজুক হাসি হেসে জবাব দিলেন তরুণ শিল্পী বলরাম পাল। 'আমরা পূর্ববাংলা থেকে আসি বড় দাঙ্গার পর।'

বলরামের পিতা গোরাচাঁদ পালের বয়স এখন ৬৫ বছর। পূর্ববাংলায় জাত ব্যবসা ছিল হাঁড়ি-কলসী গড়া। কিন্তু যৌবনে মামা সনাতন পালের কাছে মূর্তি গড়া শেখেন। তারপর থেকে মূর্তিই গড়েন। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় এলে সরকারী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন ক্যাম্পে থাকার ভয়ে। কুমারটুলিতে এসে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন কঠোর সংগ্রামের মধ্যে। গোরাচাঁদবাবুর সাত ছেলের চারজন আছেন মূর্তি গড়ার কাজে। বলরামের কাজ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং কোথাও বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা নেই। যদিও আর্টের ঠাকুরের যা যা যুগলক্ষণ তা সবই রয়েছে তাঁর কাজে। অন্য তিনজনের একজন ব্যাংকের কর্মচারী ও আর একজন একটি বীমা কোম্পানীর দালাল এবং একেবারে ছোটজন সরকারী আর্ট কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করছেন।

'আপনারা কেউ আর্ট কলেজ যান নি?'

বলরাম পাল দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে — 'আমাদের কখনো আর্ট কলেজে যাবার দরকার হয় নি। বাবার কাছেই সব শিখেছি। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে কাজ করছি। ছোট ভাইকে কলেজে পাঠাতে হল এই জন্যে যে আর্ট কলেজের সার্টিফিকেট না থাকলে সরকারি অর্ডার পেতে অসুবিধে হয়। তাই প্রায় সব ঘর থেকেই একজন করে আর্ট কলেজে পড়তে যায়।

এ ছাড়া আর কি অসুবিধে?

'অসুবিধে তো অনেক। জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে তাতে মূর্তির সংখ্যা বাড়লেও লাভ কমে গেছে। গত বছর যেমন এক ঠেলাগাড়ি মাটির দাম ছিল ১২ থেকে ১৪ টাকা এবারে তার দাম হয়েছে ২০ টাকা। বাঁশ ছিল ৪ টাকা এবারে হয়েছে ৮ টাকা। কাঠ, খড়, রঙ, সুতলী—সবেরই তো দাম বাড়ছে। মাটি তৈরীর খরচও বেড়েছে। যে মাটি আমরা এবার কুড়ি টাকায় কিনলাম তা তৈরী করতে খরচ লাগবে আরও ২০ টাকা, মজুরী আর ধানের ভুষি নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেড়েছে গরান কাঠের দাম। গরান আসে সুন্দরবন থেকে। এবারে সরকারী হুকুমে কাঠ কাটা বন্ধ হওয়ায় দাম খুব চড়া। অথচ শক্ত গরান কাঠ না হলে মূর্তি দাঁড়াবে কি করে। তার পর তো এবারে নতুন ঝামেলা বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে মূর্তি শুকোতে চাইছে না। তাই আগুন জেলে শুকোতে হচ্ছে। রাত্রে কাজ করা তো বন্ধই হয়ে গেছে বিদ্যুতের অভাবে। তবু যাই হোক কয়েক বছর ধরে ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে বলে কোন রকমে টিঁকে আছি। তাও কত বার ব্যাংকের টাকা শোধ দিতে পারি নি নব্বই বৎসরের মৃৎশিল্পী বিপীন পাল

সেই ১৯৭০-৭১ থেকে। তাদের তো আর ব্যাংক টাকা দেবে না। নকশাল হাঙ্গামার সময় সেই দুটো বছর যে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে তার ফল এখনও বহু ঘর ভোগ করছে। ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বছরে ২৫টি দুর্গা, ৩০।৩৫টি কালী, ১৫০টি সরস্বতী ও গোটা পঞ্চাশেক অন্যান্য প্রতিমা করে চলে যায় আমাদের। বাবা তো এখন আর কাজ করতে পারেন না।'

গোরাচাঁদ পালের মত আরও অনেক মৃৎশিল্পী দেশ বিভাগের পর কুমারটুলিতে এসে বাসা বাঁধেন ঠিক যেমন দুশো বছর আগে কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পীরা এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য প্রথম দিকে এখানে এসে স্থানীয় শিল্পীদের জীবিকার ভাগ বসান খুব সহজ হয় নি। তাই পুরনো কুমারটুলি মৃৎশিল্প সমিতির সঙ্গে যোগ না দিয়ে পূর্ববঙ্গের শিল্পীরা নিজেদের একটি সমিতি গঠন করেন এঁদের বিশেষ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যে। অনেক দিন পরে এই পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ভাগটি দেখে বেশ মজা লাগল। সাধারণভাবে এক কলকাতার ফুটবল ছাড়া ইদানীং এই ভাগটি সচরাচর চোখে পড়ে না।

'আপনার বয়স কত?'

'তা প্রায় নব্বই। প্রায় কেন ঠিক নব্বই।'

চমৎকার পরিষ্কার শান্তিপুরী বাংলায় উত্তর দিলেন শিল্পী বিপিন পাল। শীর্ণ, বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন কিন্তু খুব জোরে হাঁটতে পারেন এখনও। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ উচ্চারণ তার সঙ্গে অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল স্মৃতি। তাঁর কাছে বসে গত একশ বছরের কুমারটুলির ইতিহাস শোনা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। দশ বছর বয়সে বিপিনবাবু কলকাতায় আসেন পিতা গোপালচন্দ্র পালের সঙ্গে।

'আমার ঠাকুর্দা উমেশ পালও কুমারটুলিতে কাজ করতেন। দশ বছর বয়সে নৌকো করে বাবার সঙ্গে কুমারটুলি ঘাটে এসে নামি। বাড়ির জন্যে মন কেমন করত বলে বড় রাস্তায় গিয়ে বসে বসে ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখতাম।'

নব্বই বছরের বিপিন পালের স্ত্রী মারা গেছেন মাস দুয়েক আগে বিরাশি বছর বয়সে। তাই একটু উদাসীন থাকেন আজকাল। সারা জীবন বহু শোক ও দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে বলে কোন ক্ষোভ নেই।

'আমি তো রেডি হয়ে আছি। মা যেদিন ডাকবেন চলে যাব। কিছুই গ্রাহ্য করব না।'

'বেশ শান্তিতে কাটিয়েছি আমি। মাঝে মাঝে ভয়ানক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে কিন্তু মা সব কিছু উদ্ধার করে দিয়েছেন। জামাই মারা যাবার পর বাচ্চাদের নিয়ে মেয়ে উঠল আমার কাছে। তখন বাড়িতে ১২।১৪ জন লোকের খাওয়া। কিন্তু কোন অসুবিধে হয় নি।'

'বারয়ারি মা এই তো কিছুদিন আগেও স্বপ্নে দেখা দিলেন। পরিবারের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হত কিন্তু মা স্বপ্নে এসে সব মিটিয়ে দিতেন।'

'একবার স্বপ্নে বললেন, 'বিপিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার কোন ছেলে নেই। শান্তি আমার মেয়ের ছেলে। খুব ভাল কাজ করছে। কিন্তু আমি বাংলা ঠাকুর ছাড়া গড়ি না। ইংরিজী ঠাকুর গড়তে পারি না। কোনদিন ও কাজ করব না। আমি এই রকম ঠাকুরই গড়ি। এখন সব দেখি মানুষের মত ঠাকুর গড়ছে। কত জায়গায় গেছি ঠাকুর গড়তে। একবার বোম্বাই নিয়ে গেল ঠাকুর গড়তে—বাংলার ঠাকুর। আমি চোখ আঁকার খুব ভাল ছিলাম। মা চাইতেন আমি চোখ আঁকি।'

ছবি আঁকতে পারেন?

'ছবি তো আমাদের আঁকতেই হয়। বাংলার ঠাকুরের মাথার ওপর চালচিত্র আঁকতে হয়। তবে এখন পারব না। চোখে দেখি না রাত্রে। একদিন সকালে আসবেন কাগজ নিয়ে, ছবি এঁকে দেব।'

কি খান সারা দিন?

'সকালে আটার রুটি গুড় দিয়ে। দুপুরে ডাল আর ভাত। মাছ মাংস রান্না হয় না তবে কেউ দিলে খাই। খুব নরম করে দিতে হয়, দাঁত নেই তো। আবার সন্ধ্যায় পর দুধ রুটি।'

সূর্তি করেন এখনো?

'করি গোটা পাঁচেক প্রতি বছর। মা চান বলেই করি। এবারে এখনো আরম্ভ করি নি। এই ভাদ্র মাসটা গেলেই আরম্ভ করব। চোখটাই সবচেয়ে ঝামেলা করে। আর কদিনই বা কাজ করব। মা ডাকলেই চলে যাব।'

এবং বিপিন পাল যেদিন চলে যাবেন কুমারটুলিতে সেদিন থেকে বাংলা ঠাকুরের যুগও শেষ হবে।

'সাড়ে ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শারদোৎসব; শরত [illegible] উৎসব'

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পেলে দ্য সকার কিং

রূপক সাহা

'পেলের সম্পর্কে আর কিছু বলার বাকী আছে কি? বিশ্বের সবচেয়ে কমপ্লিট ফুটবলার উনি যার মধ্যে বিন্দুমাত্র খুঁতও নেই। পেলে আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—এবং সম্ভবত সর্বকালের। ওর সহজ গোলের খতিয়ানই—ওর অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রমাণ'—বলেছেন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ববি মুর।

'মাই সকার স্টোরি' বইটিতে ববি তার আত্মকথনে স্বীকার করেছেন—'পেলের অত্যাশ্চর্য দক্ষতার নজিরগুলো স্মরণ করে এবং নিজের উপলব্ধি থেকেই একথা বলছি। বেশ মনে আছে, একবার মাত্র কাঁধ ঝাঁকুনিতে ধোকা দিয়ে আমাকে উল্টোদিকে ছিটকে ফেলে কত সহজে বল নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি—অথচ সেই মুহূর্তে ওকে সাইড লাইনের কাছে কোণঠাসা করে আমি ট্যাকল করার ফিকির খুঁজছিলাম।'

'পেলে অসাধারণ, অতিপ্রাকৃত। ব্রাজিল টিম থেকে ওকে সরিয়ে নিন—দেখবেন, আমরাও ব্রাজিলের চেয়ে কোন অংশে কমতি নই।'

চৌষট্টি সালে রিও-র মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের কাছে ৫—১ গোলে বিধ্বস্ত হবার কারণ জানাতে গিয়ে এই-ভাবেই ববি মুর একবার সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন। ওর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড তখন ছেষট্টির বিশ্ব কাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। মারকানা স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচটির দু বছর পর অবশ্য ববি তার দেশবাসীকে উপহার দিতে পেরেছিলেন জুলে রিমে কাপ।

শুধু ববি মুরই নন, বিশ্বের প্রথম সারির বহু ফুটবল নায়কও পেলে সম্পর্কে তাদের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। ববি চার্লটনের কথায়—'আমার দেখা সবচেয়ে উত্তেজক খেলোয়াড় পেলে। ওর নামের চারপাশে যা কিছু গ্ল্যামার তার তিনি যোগ্য। ওর খেলাই তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—কোন রীতিতে উনি ফুটবল খেলেন। ফুটবল ওর কাছে কবিতার মতো ছন্দোময়।'

ববি বলেছেন—'পেলের খেলার সব-চেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো বোধহয়, ওর সেই সব গোল করার ক্ষমতা যখন তার মুহূর্ত মাত্র আগেও গোলের ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ফুটবলের জন্মই হয়েছিল হয়ত এই যাদুকর খেলোয়াড়ের জন্য।'

ফুটবল দুনিয়ার আরেক তারকা জিওফ হার্স্ট অভিভূত হয়ে বলেছেন—'পেলে সম্পর্কে আমি শুধু পাগলের মতো বকবক করে যেতে পারি। ওর মতো কেউ—একটা জীবনে একবার আসে কিনা সন্দেহ। তোমার দলে নিয়ে ওকে শুধু বল বাড়িয়ে দেবার ধান্ধা করো এবং তারপর প্রার্থনা করো ওর বাকী কাজটা করার।'

'ইউরোপের কালো মুকতো' ইও-সোবিওর ভাষায়—'পেলের খেলা—আমি কেবল স্বপ্নেই খেলে থাকি। আমাকে যারা ওর চেয়েও বড় বলছেন, তাদের জানাই—কোনদিনও আমি ওর সমান হতে পারব না। আমাকে বড় বানাতে গিয়ে দয়া করে ওকে ছোট করবেন না। পেলে ফুটবলের রাজা, বাদশা—আমি গোলাম মাত্র।'

অ্যালান বলের কথায়—'পেলেকে

দেখার আগে বিশ্বাস করতাম না একজনকে নিয়ে একটা ফুটবল টিম' তৈরী হতে পারে। পেলে সমেত ব্রাজিল সবসময়ই বিপজ্জনক, উনি ছাড়া এমন একটি দল—যাকে হারানো যায়। এডসন অ্যারেন্টাস ডো নাসিমেন্টো নামটা বর্ণবহুল কিন্তু কোন-মতেই নামের মালিকের চেয়ে নয়। কেউ যখন পেলে শব্দটি উচ্চারণ করে তখন সবাই বুঝে যায়, কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এটা তার যশের প্রতিই শ্রদ্ধাপ্রকাশ।'

একজন ঝানু ব্রিটিশ ফুটবল সমালোচক লিখেছেন—স্ট্যানলি ম্যাথুজ, গ্রীভস, হিডেকুটি, পুসকাস এবং স্টিফেনহো—প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিন্তু একমাত্র পেলেই এদের দক্ষতার নির্যাসে তৈরী।

আরেক ফরাসী সাংবাদিক পেলে সম্পর্কে তার অনুভূতি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—'ওর প্রথম দেখার পর থেকে একমাস শুধু ভেবেছিলাম কি লিখবো: ওর কোন উপমা খুঁজে পাইনি—উনি অতুলনীয়।'

পেলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না আটান্নর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের কোচ ভিসেন্ট ফিওলাও। ফুটবলের ওই সেরা লড়াইয়ের আসরে ওকে নামিয়েছিলেন ফিওলাই অনেকের আপত্তির তোয়াক্কা না করে। ফিওলা বলেছেন—'পেলের মতো বল নিয়ে যা খুশি তাই করার ব্যাপারটা আর কারো আসে না। চার্লটন, মুর ও ইওসোবিও সকলেই উঁচু জাতের ফুটবলার কিন্তু পেলের মতো নন।'

সুইডেনের, সেই আসর থেকে জুলে রিমে কাপ প্রথম নিয়ে এসেছিলেন ফিওলা ব্রাজিলে। ওখানেই অভিষেক হয়েছিল সতের বছরের তরুণ এক ফুটবল যুবরাজের। বিশ্বের বাঘা বাঘা ফুটবল সাংবাদিকরা সেদিন পেলের শিল্প সমন্বিত খেলার বর্ণনা দিয়েছিলেন সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিয়ে—'পেলে ভোজবাজি জানা একজন ফরোয়ার্ড, মেধাবী ডিবলার। উনি অনতিক্রম্য গতিতে ধোকা দেন, এবং বল ঘোরান। বল যখন শুনো তখন কেউটের ছোবলের মতো আঘাত করার ক্ষমতা আছে ওর হেডে।'

পেলের ক্লাব সান্টোস ইওরোপে যখন তাদের সদর্প অভিযান চালাচ্ছিল তখন একটি টিমের ট্রেনার বলেছিলেন—'ওদের অনুকরণ করার কথা অর্থহীন। আমাদের ছেলেরা ওদের ছাঁচে তৈরী নয়। আমার ছেলেরা যদি পেলের মতো চটপটটে ও প্রতারণাময় ডজিং, টুইস্টিং, ফেইন্টিং করতে যায় তাহলে প্রতিটি পেশীতে টান ধরবে। পেলে একজন রাবারের মানুষ যার ভেতরটা লোহার তৈরী। ওকে মাঠে এতো আঘাত করা হয় তবুও উনি ফিরে ফিরে আসেন... কোন মানুষের সাধ্যি নেই ওকে আটকায়।'

পেলের সম্বন্ধে প্রশস্তি গেয়ে বহু কোটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে এ যাবৎ কিন্তু সেই ব্রিটিশ সাংবাদিকের ঝলসে ওঠা

কলমটির বোধহয় তুলনা নেই যিনি লিখেছিলেন—'ফুটবল রাজ্যে—যার সীমায় সীমায় বিশ্বের সব দেশগুলোই বর্তমান—একমাত্র রাজা পেলে। ওর ওপরে আছেন সেই আধ্যাত্মিক শক্তি যিনি স্বর্গেরও শাসনকর্তা।'

পেলের মতো ফুটবলার পৃথিবীতে জন্মায়নি—হয়তো জন্মাবেও না। উনিই সেই খেলোয়াড় যার সম্বন্ধে তুলনা বোঝাবার অন্য কিছু পাওয়া যায় না। ওর খেলা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। যাবতীয় বিদ্বেষ, হানাহানি, মলিনতা আর রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওর ইমেজ। বিশ্বের প্রতিটি কোণে ওর জন্য সাদর অভ্যর্থনা অপেক্ষা করে। আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার মাঝে বসে উনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন?

একবার উনি বলেছিলেন—'নিজের সম্বন্ধে আর ভাবি না। আমি এখন শুধু ঈশ্বর আর আমার চারপাশের লোকের কথাই ভাবি। আমি কি তাই-যা লোকে বলে? মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হয়তো সেই লোকটি নই। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে আমি একা নই। আজ যা হয়েছি তার জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী: তারা আমাকে নানাভাবে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।'

'আমি আজ যা হতে পেরেছি তার কারণ আমি সাহায্য উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি। আমাকে শেখানো হয়েছিল, উত্তেজিত এবং সমালোচনা করা হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি না যে, জন্মগত ফুটবলার বলে কিছু আছে। হয়ত কেউ সহজাত কিছু স্কিল এবং প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে পারেন কিন্তু খোলা মনে বলছি, সত্যিই এটা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় যে—ফুটবলার হয়েই কেউ জন্মায়। সাফল্যটা কোন দুর্ঘটনা নয়। ওটা আসে কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শেখার ইচ্ছে এবং সর্বোপরি শেখার জন্য ভালবাসা এবং অগ্রহ থেকে।'

ফুটবল সম্পর্কে এই 'দুর্শনই'

পেলেকে কিংবদন্তী করে তুলেছে। সফলতা ওর জীবনেও এসেছে ধাপে ধাপে, একের পর এক বাধার গণ্ডি টপকে, যদিও বাধাগুলি ছিল ওর প্রতিভার সম্পর্কে ধারণার অক্ষমতা। পেলে নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছেন ওর সহজাত গুণাবলীর স্ফুরণেই। তের বছরের কিশোর পেলেকে চিনে নিয়েছিলেন একদা বাউরু ক্লাবের উইলডেমার ডি বিটো—ক্লাবের কোচ, চোদ্দশ সালের বিশ্বকাপে যিনি ছিলেন ব্রাজিলের নির্ভরযোগ্য ইনসাইড রাইট। 'সারা বিশ্ব আজ তাদের শ্রেষ্ঠতম একজন ফুটবলারকে পেতে যাচ্ছে'—পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে বিটো ঘোষণা করেছিলেন পেলেকে নির্দেশ করেই—'এই ছেলেটির অসম্ভব বল কন্ট্রোল। এর অনেক আছে, ফুটবলের সব কিছুই এর আছে।'

পৃথিবীর সব কোচই তাদের তৈরী হতে থাকা খেলোয়াড়দের সম্পর্কে এই কথা বলেন। বিটোর নির্ঘোষে তাই কেউ গুরুত্ব দেননি। বাউরুর বিস্ময় বালককে দেখানোর জন্যই একসময় বিটো চিঠি লিখলেন ব্রাজিলের নামকরা সান্টোস ক্লাবে। ওরা এলেন, অভিভূত হলেন এবং শোনা যায়—কর্মকর্তাদের একজন নাকি খেলা চলার সময়ই দৌড়ে মাঠে যান, খেলা বন্ধ করে দেন যতক্ষণ না পেলে তাদের হয়ে সই করেন।

সান্টোস ক্লাবের হয়ে পেলে প্রথম তিন বছরে গড়ে চুরানব্বইটি করে গোল করেন। এরই মাঝে নিজের ক্লাবকে সাও পাওলো লীগ চ্যাম্পিয়ন করা ছাড়াও আটান্ন সালে প্রথম ভেঙ্গেছেন লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতা ফেইটিকোর তিরিশ বছরের একটি রেকর্ড—তিপ্পান্নটি গোল করে। তখন তার বয়েস মাত্র আঠারো। ওর এই অতুলনীয় গোল-স্পৃহা দেখে এক সময় এমন সন্দেহও করা হতে লাগল যে, উনি বোধহয় বেশীদিন এ সাফল্য ধরে রাখতে পারবেন না। সান্টোস ক্লাবের এক সমর্থক 'ফুটবল মানথলি' নামক একটি বিটিশ ম্যাগাজিনে লিখলেন—'অবাক হবেন না যদি দেখেন পাঁচ বছরের মধ্যে পেলের নাম মুছে গেছে। ওকে নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে। পেলের মতো কেউ এতো খেলতে পারবেন না যেমন অপারগ হবেন তার ফর্ম বছরের পর বছর এমন রাখতে।' সমর্থকটি তার লেখার শেষে একটি তালিকা জুড়ে দিয়েছিলেন যাতে মাত্র দশদিনে চারটে শহরে মোট সাতটা লীগ ও কাপ ম্যাচে পেলেকে খেলানোর একটি হিসেব ছিল। পর পর দুটি ম্যাচ কোন একটি শহরে হয়নি তাই যাতায়াতের ধকলেরও একটা ব্যাপার ছিল। যদিও দশদিনে সাতটা ম্যাচ খেলানো একটু আলাদা ব্যাপার কিন্তু সপ্তাহে দুটি কি তিনটি ম্যাচ তো হরবখতই ওকে খেলানো হচ্ছে। পেলে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে বাধ্য'—সমর্থকটি এই মন্তব্য করে তার খেলাটি শেষ করেছিলেন।

আটান্নতে সুইডেন বিশ্বকাপে পেলে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। কোচ ভিসেন্ট ফিওলা তৃতীয় ম্যাচে ফরোয়ার্ড লাইনের উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে কট্টর সমালোচনা শুরু হয়। সমালোচকদের লক্ষ্য ছিলেন পেলে এবং সদ্য অ্যাপেন্ডিকস অপারেশনের পর উঠে আসা গ্যারিনচা। সতের বছরের পেলে খেলতে নেমেই ব্রাজিল টিমের আক্রমণ মারমুখী করে তুললেন এবং সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন তার জীবনের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ম্যাচে ওয়েলসের বিরুদ্ধে একটি অসাধারণ গোল করে। ফুটবলের যুবরাজকে সারা বিশ্ব বরণ করে নিল সেই প্রথম।

আটান্ন থেকে সত্তর—মাঝের বারোটি বছর টপকে পেলে পৌঁছেছেন খ্যাতির মাঝ গগনে। সত্তরের মেকসিকো বিশ্বকাপের কিছু আগে ওকে নিয়ে একটি ঘটনায় সারা ব্রাজিল তোলপাড় হয়ে যায়। জাতীয় দলকে কোচিং-যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেবার জোয়াও সালদানার ওপর। সালদানা পেশায় বেতার ভাষ্যকার ও সাংবাদিক বলেই ছিলেন হয়ত স্পষ্টবক্তা। কিন্তু গোলমাল বাধালেন যখন সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রাজিল টিম থেকে পেলেকে বাদ দেওয়ার। দু-একটি ম্যাচে সালদানা তার প্রিয় খেলোয়াড় ডাবওকে খেলালেনও। ক্ষেপে গেলেন সারা ব্রাজিলের ফুটবল সমঝদাররা। 'সালদানাকে কোতল করো'— চীৎকার করে উঠলেন ওরা। ব্যাপারটা এমন স্তরে পৌঁছল যে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকেও নাক গলাতে হলো, কেন এমন হলো ?

সালদানা কিন্তু স্পষ্টই জানালেন—'পেলেকে দরকার নেই, ও শেষ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের কোন একতিয়ার নেই আমার টিম গড়ার ব্যাপারে কোন পরামর্শ দেওয়ার।

উনি কি ক্যাবিনেট ভাঙ্গা-গড়ার সময়ে আমার পরামর্শ নেন?'

সালদানাকে খারিজ করা হলো ওর এই স্পর্ধা প্রকাশের পর। এলেন মারিও জাগালো, ব্রাজিলের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান খেলোয়াড় ও কোচ। জাগালো পেলেকে জাগিয়ে তুললেন—প্রধানত সালদানার অভিযোগগুলোকেই মূলধন করেই। 'ট্রেনিংয়ের সময়, এমন কি এই বিশ্বকাপের ম্যাচের আগেও আমি পেলেকে মনে করিয়ে দিতাম—বেতার ভাষ্যকার এবং সাংবাদিক হিসেবে সালদানা প্রেস বকসে থাকবেন, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমার সম্বন্ধে উনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো ভুল' জাগালো সত্তরের জুলে রিমে কাপ জয়ের পর সাংবাদিকদের বলেছিলেন। উদ্ধত এবং গর্বিত সালদানাকে বোঝানো গিয়েছিল তিনি পেলের চেয়ে বড় নন।

পেলে অনন্য, কিন্তু কেন? একবার উনি বলেছিলেন—'আমি ফুটবল খেলি না, ফুটবলই আমাকে খেলিয়ে নেয়।' বস্তুত, মাঠে ওর অলৌকিক বিচরণই সেকথা প্রমাণ করে দেয়। উনি যা খেলেন—পৃথিবীর তাবৎ ফুটবলাররা তা স্বপ্নেই খেলে থাকে। কবি মুরের মতে, 'পেলে দৌড়োন না, উনি যেন মাঠে ভেসে বেড়ান।' বল নিয়ে পেলে যা খুশি তাই করতে পারেন। বলশুদ্ধ যখন ছোটেন তখন ছোট পদক্ষেপে যদিও অসম্ভব দ্রুত গতিতে। গতির পরিবর্তন করতে পারেন ইচ্ছেমত। দৌড়োতে দৌড়োতে পায়ের ঝাঁকানিতে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া, শুধুমাত্র কাঁধের দুলুনিতে কোন কোন সময় বল না স্পর্শ করেই চার-পাঁচজনকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, প্রায় সাইড লাইন ঘেঁষে পায়ের আউটসাইড দিয়ে বল আয়ত্তে রেখে ছোটা, বল রিসিভ করার আগেই ধাবমান বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ঘুরে গিয়ে নাস্তানাবুদ করা বা তার গোড়ালিতে বল মেরে রিবাউণ্ড নেওয়া, ব্যাক স্পিন করিয়ে সতীর্থের কাছে বল পৌঁছে দেওয়া—ইত্যাদি কলাকৌশলগুলো পেলে হেলাফেলায় করেন। উনি একবার যেভাবে একজনকে ধোঁকা দেন দ্বিতীয়বার আর সেভাবে দেন না। ওর ব্যানানা কিক' নিখুঁত বেঁকে রক্ষণভাগের পাঁচিল ধসিয়ে দিতে পারে। একটি মুভ করার আগেই তার পরবর্তী তিনটি মুভ ভেবে নেন উনি। একটি বল ঢোকার মতো ফাঁক পেলে দুরূহ কোণ থেকেও গোল করতে পারেন। গোল পাওয়ার দক্ষতা এবং খেলার মধ্যে ক্লাসিক সৌন্দর্যই পেলেকে রাজার আসনে বসিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে জনপ্রিয়তার এভারেস্টে।

বকসিংয়ে বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি একবার বলেছিলেন—'খেলার জগতে আমার সঙ্গে তুলনা করার মতো একজনই আছেন—তিনি হলেন পেলে।' আলি তার বাকপটুতার জন্য নজর কাড়েন—ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ওর চলন-বলন, উনি কাউকে তোয়াক্কা করেন না। ওরও জনপ্রিয়তার শেষ নেই। বস্তুত,

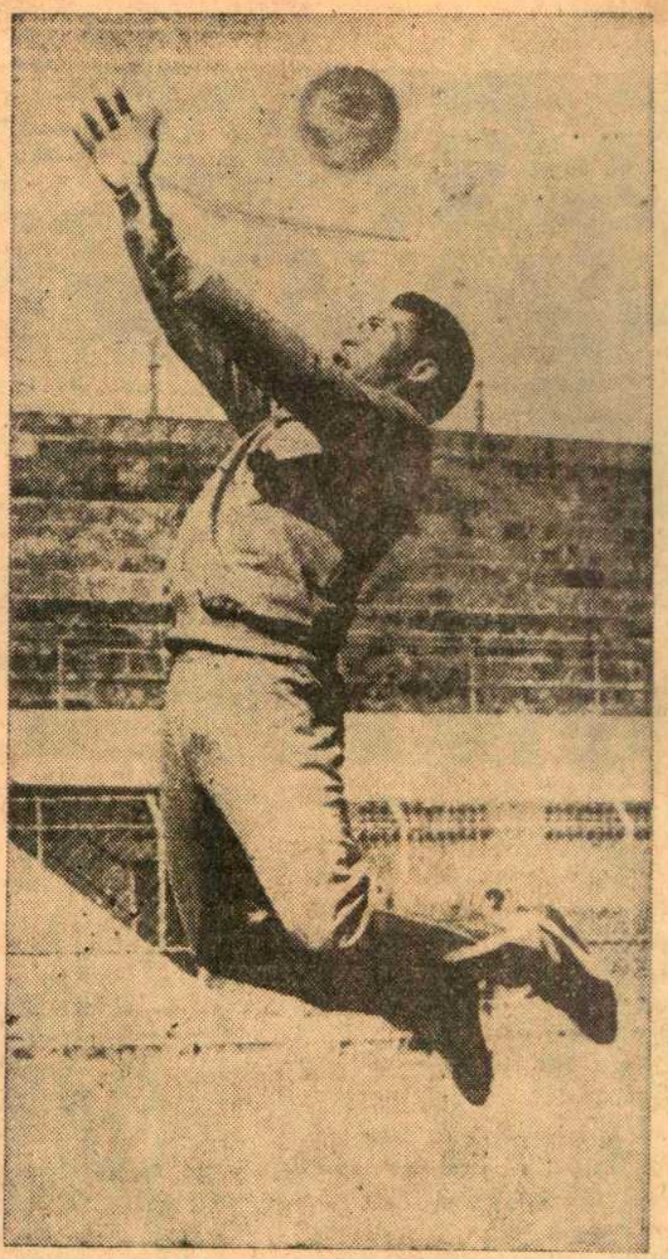

আলি এবং পেলের মধ্যে কে বেশী জনপ্রিয় তা তর্কসাপেক্ষ। একজন একক খেলায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ, অপরজন দলগত খেলায়, দুজনেই কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের। আলি যেখানে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দুনিয়ার সাদা মানুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা করে—পেলে সেখানে নিশ্চুপ। অবশ্য এর কারণও আছে। আলি এমন একটি দেশের নাগরিক যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত। শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা করার কারণটা আলির তিকত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই। পেলের দেশ ব্রাজিলে এই বৈষম্যটা ততটা প্রকট নয়। এ প্রসঙ্গে কোন এক সময় পেলে বলেছিলেন—'আমরা সবাই সমান এবং ভাইয়ের মতো।'

সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে পেলে রাজসিক সম্মান, প্রতিপত্তি, কুবেরের অর্থ এবং যশ সবই পেয়েছেন। এতো সব কিছু পাওয়ার পরও পেলে মানুষটি কেমন? ছোটবেলাটা ওর কেটেছে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এবং বাবা ডোণ্ডিনহো ও মা সেলেস্টির দুই বিপরীত ইচ্ছের টানা-পোড়েনে। মা চাইতেন ছেলে লেখাপড়া করুক। ওর বাবার মতো যেন ফুটবল মাঠ থেকে ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে কোনদিন না ফেরে। পেলে ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একবার বলেছিলেন—'ফুটবলের জন্য আমি লেখাপড়া ছেড়েছিলাম হয়ত আপনারা শুনে থাকবেন। হ্যাঁ, এটা সত্যি। জীবনের সেই সময়টায় আমার কোন ধারণাই ছিল না লেখাপড়া করাটা কত জরুরী—ভাবতাম ফুটবলই বোধহয় সব। এখন আমি বুঝতে পারি কেন মা বলতেন ফুটবল কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে হোমওয়ার্কটা করতে। আপনারা জানেন যে, মায়ের উপদেশ উপেক্ষা করে আমি কেবল সময় এবং জীবন দিয়েছি ফুটবলের পেছনেই। অনেক বছর পর আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম তারপর ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম শারীর শিক্ষার।'

লেখাপড়া এবং খেলা দুটোরই দরকার, যেমন দরকার দুটোতেই সফল হওয়ার।'

মায়ের প্রভাব ওর জীবনে না পড়লেও পেলে বাবার আকাঙ্খাকে কিন্তু রূপ দিয়েছিলেন। একজন সাংবাদিক ওকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি যদি ফুটবলের রাজা পেলে না হতেন, তাহলে কোন মহাপুরুষ হতে চাইতেন?'

পেলে উত্তর দিয়েছিলেন—'ডোন্ডিনহো আমার বাবা।'

ওর বাবা চোট পেয়ে খেলা ছেড়েছিলেন—বড় খেলোয়াড় হবার বাসনাটা উপড়ে ফেলে। পেলে তার বাবার নীরব যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। 'বাবাই আমার প্রথম কোচ'—একশো গোল করার পর পেলে একবার টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন-'বাবা নিজে ছিলেন একজন চমৎকার খেলোয়াড়। উনিই আমাকে ফুটবলের প্রথম পাঠ দিয়েছেনআর আমি তাঁকেই আদর্শ করেছি।'

ডোন্ডিনহোই একসময় পেলেকে তুলে দিয়েছিলেন ভিসেন্ট রিটোর হাতে। ধীরে ধীরে উনি হয়েছেন পেলের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা। বিপুল অর্থের মালিক পেলে যখনই দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছেন তখনই ডোন্ডিনহো তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—সুপারিশ করেছেন কাকে অর্থদান করা দরকার।

ধাপে ধাপে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছেন পেলে আর—ফুটবলপ্রেমীদের ভালোবাসার অত্যাচার তত বেড়েছে। ওর জীবন নিয়ে একটি ফিল্ম কোম্পানী ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলে পেলে বলেছিলেন—'আমি জানি না, আমি কোথায়। এখন বাইরে বেরুতেই ভয় হয়। লোকে যখনই আমাকে চিনে ফেলে তখনই পিছু নেয়। এমনকি আমার গাড়ি পর্যন্ত ওরা চিনে রেখেছে। ভিড়ের জট খুলে গাড়িতে ওঠাও মুস্কিল হয়ে পড়ে। যখন ঘুরতে যাই তখন কোন কোন সময় ঘরেই আটকা থাকি। মাঝে মাঝে আবার লুকিয়ে হোটেলও বদলাতে হয়। রবিবার চার্চে যেতে ভালো লাগে। সেখানেও লোকে যখন প্রশস্তি গায় তখন ভালো লাগে না। যে কোন জায়গাই এটা অস্বস্তিকর, কিন্তু চার্চের ভেতর এটা অত্যাচার! লোকে আমাকে দেবতা বানিয়ে আমার কাছে চিঠি পাঠায়—অর্থ সাহায্য চায়, কখনও কখনও চিঠির বান্ডিলে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও জানিয়ে বসে। ইচ্ছে করে এমন জায়গায় কিছুদিন ছুটির আমেজে থাকতে যেখানে ফুটবল খেলা হয় না।

রাজপ্রাসাদের মতো পেলের বাড়িটা ব্রাসিলবাসীর চোখে তীর্থস্থান। এক বিদেশী ওর বাড়িটি দেখে একজন কুলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'এই প্রাসাদটি কার?' খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বিদেশীটির দিকে তাকিয়ে রাস্তার কুলীটি উত্তর দিয়েছিল—'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ ভালো, এ প্রশ্নটা অন্য কাউকে কোরো না। বিপদে পড়বে।' ব্রাজিলবাসী পেলেকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। তবুও পেলে সহজ সাধারণ মানুষই থেকে গিয়েছেন। যেদিন প্রথম সান্টোস ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন সেদিনকার পেলের মতোই—সদা বিনয়ী এবং হাস্যময়। কেউ যদি ও'র সাক্ষাৎপ্রার্থী হয় পেলে তাকে ফিরিয়ে দেন না। যত ব্যস্তই থাকুন

না কেন ওর অটোগ্রাফ চাইলে পেলে নারাজ হন না। লোকে ওকে যতো বড়ো খেলোয়াড়ই বলুক না কেন—ট্রেনিংয়ের সময় পেলে সতীর্থরা মাঠ ছেড়ে চলে না গেলে ড্রেসিং-রুমে ঢোকেন না। ছেঁকে ধরা সাংবাদিকরা যত প্রশ্নই করুক না কেন—পেলে প্রতিটির উত্তর না দিয়ে উঠে যান না। সবচেয়ে বড় কথা, উনি ঘৃণা করেন ওকে যখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বলে ডাকা হয়।

ফুটবল বোদ্ধারা বলেন—'যেখানে সেরা ফুটবলারদের শেষ, সেখানেই পেলের শুরু।' ওকে আটকাতে না পেরে আঘাত করে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা বহুবার হয়েছে। ওর ডান হাঁটু—যা দিনের পর দিন মার-কুটে খেলোয়াড়দের শিকার হয়েছে—দেখে এক স্পেশালিস্ট বলেছিলেন পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিদের হাঁটু এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। খ্যাতির মূল্য পেলে এইভাবে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। পেলে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন? প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন? তাহলে এই তিনটি ঘটনা আপনাদের জানানো দরকার। চৌষট্টিতে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে পেলে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে করতে একসময়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। দর্শকদের অবাক করে একসময় ঘুষি মেরে বিপক্ষের একজন খেলোয়াড়—মেসিয়ানোর নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। কেন এমন করলেন? খেলার শেষে ভাঙ্গা গলায় স্বীকার করেছিলেন উনি—'আমাকে মেরে বসিয়ে দেবার চক্রান্ত হয়েছিল যাতে এই ম্যাচের পর সান্টোসের হয়ে লীগের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি না খেলতে পারি। যখন দেখলাম শোনা কথাটা সত্যিই—আমাকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না, শুধু ফাউল করা হচ্ছে তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি—পাল্টা জবাব দিয়ে বসেছি। আর বোধহয় আমার ফুটবল খেলা উচিত নয়।'

পরের বছর জানুয়ারী মাসে সান্টোস-বোটাফোগোর খেলায় পেলেকে অসহিষ্ণু হতে দেখা গিয়েছিল। প্রথম থেকে ওকে ফাউল করা হচ্ছিল এবং যখনই উনি বিপক্ষের ফাউল খুঁজে পাচ্ছিলেন তখনই পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পেলে ধৈর্য রাখতে পারেন নি—রেফারীর চোখের সামনেই পাল্টা মার দিয়েছিলেন। তাকে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়েছিল। পেলের খুঁড়িয়ে হাঁটা মূর্তিটি যখন ড্রেসিংরুমে যাচ্ছিল তখন দর্শকরা রেফারীকে অভিসম্পাত করছিলেন। এর পরের ইতিহাসটা অন্যরকম। ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থা রেফারীর সিদ্ধান্তে পেলের অসন্তুষ্টিতে একটি সভা ডাকেন এবং সেখানে প্রমাণ হয়, পেলে নির্দোষ। রেফারী আলবিনো জানফেরাই তিরিশ দিনের জন্য সাসপেন্ডেড হন।

তৃতীয়বার এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে পেলের সহস্রতম গোলের ঠিক পরের ম্যাচটিতেই। সান্টোস খেলছিল এ্যাটো-লেটিকোর সঙ্গে। শুরুর আগে পেলেকে 'ফুটবল রাজা' হিসেবে অভিষিক্ত করা হয় সোনার পাতার মুকুট পরিয়ে। সেদিন ম্যাচের সময় পেলে বল ধরলেই দর্শকরা পাগলের মতো চীৎকার করছিলেন। তারপর একত্রিশ মিনিটের মাথায় সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে। বিপক্ষের গোলকীপারকে ধাক্কা মারায় পেলেকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হয়। উনি মাথা পেতে সিদ্ধান্তটি স্বীকার করে নেন। ঐদিন মাঠ থেকে পেলেকে বার করে দিয়ে রেফারী এক দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। সেদিন টগ-বগে জনতা হয়ত একটি খণ্ডযুদ্ধ বাধাতো কিন্তু ফুটবল রাজা নিজেই রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তার অনুগত প্রজাদের শান্ত করেছিলেন।

ফুটবল মাঠে অতিপ্রাকৃত পেলে—সাধারণ জীবনে আর পাঁচটা মানুষের মতোই অনুভূতিপ্রবণ। গোল করার পর ওর লাফ দিয়ে ফিরে আসার ভঙ্গীটি অনন্য-সাধারণ। আনন্দ ওকে আবেগপ্রবণ করে: যেমন স্পর্শ করে দুঃখ, বেদনা। জীবনের সহস্রতম গোলটা করার পরেই উনি যে উক্তিটি করেছিলেন তা ভোলা যায় না—'আমি সেই প্রত্যাশিত গোলটি করেছি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জগতের সেইসব দরিদ্র ছেলেদের কথা যাদের কিছুই নেই এবং অন্ধ বোবা ছেলেদের কথা যাদের আমি কিসমাসে সাহায্য করতে চাই।'

আরেকবার—ট্রেনিং শেষে ক্লান্ত পেলে ড্রেসিংরুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটি বাচ্চা ছেলে অটোগ্রাফ নেবার জন্য নাইরে অপেক্ষা করছিল। পেলে বেশ কয়েকবার ফিরিয়ে দেবার পর কি ভেবে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ছেলেটিকে। ওর সঙ্গে কথা বলে ছেলে-মানুষের মতো কেঁদে ফেলেছিলেন, আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকে। একটা বাদামের ওপর দিয়েছিলেন ওর অমূল্য অটোগ্রাফ।

ছেলেটি কোনদিন পেলের খেলা দেখেনি। কারণ সে ছিল জন্মান্ধ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে শুক্লা দেবী প্রণীত

নরোত্তম লোকনাথ ও

মহীয়সী মনীষা দেবী

বারদীর গোঁসাই-পুরুষোত্তম লোকনাথ এবং মহাবোধ-এর অমর লেখিকা ব্রহ্মময়ী মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যভিত্তিক প্রামাণ্য জীবনী ॥ ঋষি-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বিবেচনায়, "মনীষা দেবী সত্যই মহীয়সী ছিলেন—তিনি পরম ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুরুষোত্তম লোকনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে আমিও তাহাই বলি—"ভুবনে করিতে শুদ্ধ সমুন্নত দুঃখহীন সুতৃপ্ত নিঃসাধ।"

আত্মজ্ঞান কবিতা তাঁহার আত্মপরিচয়:

"পরমাপ্রকৃতি আমি মহামায়া
সৃষ্টিস্থিতিলয়,
আমিই বিভিন্নরূপে বিরাজিতা
বিশ্বব্রহ্মময়।"

মূল্য: ছয় টাকা। মনীষাতীর্থ
জে-২৪৮ পাহাড়পুর, কলি-২৪

বি/২৯৯১

চাকরি চাই?

আপনার একটা চাকরির দরকার—এদেশে বা বিদেশে বা যেখানেই হোক না কেন? কিন্তু আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনিও আর পাঁচজন বেকারের মত খবরের কাগজের কর্মখালির পৃষ্ঠা Consumer Service ইত্যাদি তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে পড়েন। কিন্তু যে সব চাকরির বিজ্ঞাপন সেখানে থাকে তার জন্য দরকার পাঁচ সাত বা দশ বছরের অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার দরকার এমন একটি ট্রেণিং-এর সুযোগ অথবা চাকরির সন্ধান, যার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনও প্রয়োজন নেই।

আপনার এই বিশেষ সমস্যার কথা মনে রেখেই প্রকাশিত হয়েছে কর্মখালি ও ট্রেণিং সংক্রান্ত সাপ্তাহিক অল ইণ্ডিয়া এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট গেজেট। যাঁদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাঁদের জন্য চাকরি ও বিভিন্ন ট্রেণিং স্কীমের খবর থাকে এই সাপ্তাহিকে। মূল্য ২০ পয়সা। যাঁরা ডাকযোগে পত্রিকা নেবেন, তাঁদের জন্য চাঁদার হার: ত্রৈমাসিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭ টাকা, বার্ষিক ১২ টাকা। নগদে বা M O যোগে চাঁদা পাঠান যায়।

ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিশিয়ানদের কর্মখালি ও ট্রেণিং সংক্রান্ত সাপ্তাহিক 'ইঞ্জিনীয়ার্স এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট গেজেট'। মূল্য ৬০ পয়সা। ডাকযোগে পত্রিকা নেবার জন্য চাঁদার হার: ত্রৈমাসিক ৯ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৬ টাকা, বার্ষিক ৩০ টাকা।

অল ইণ্ডিয়া এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট গেজেট
ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট গেজেট
১০ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিঃ-১

বি/৩০৩৬

শ্যামল রায়

(১০)

আমি উঠে বসলাম। অধ্যাপক ছেলেটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। লোকটি বলল, 'ওকে তুলে দিন।' আমি অধ্যাপক ছেলেটির গায়ে হাত দি। ও চমকে, উঠে বসে। 'আবার কি হল?'

'কিছু নয়, বড়বাবু ডাকছেন।' বলে, লোকটি দরজার দিকটা দেখিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে একটা আলো জ্বলছিল। স্তিমিত আলো। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, আমাদের জামা কাপড়ে, শরীরে ধুলো বালি ময়লা লেগে রয়েছে। আমি আর অধ্যাপক ছেলেটি সে সব দু-হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। লোকটি বলল, 'চলুন।'

'এই নিয়ে এলেন, এই নিয়ে যাচ্ছেন....।'

'ও সব কথা ওখানে গিয়ে বলবেন।' লোকটি বলল। অধ্যাপক ছেলেটি মনে মনে, মুখে কি সব বলতে থাকে। ওর চিঠি পড়া আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

'হাত ছাড়ুন।' ছেলেটি বলল। লোক দুটি আমাদের দুজনের হাত আরো জোড়ে মুচড়ে দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। সেই সিঁড়ি, দু-পাশে ঘর, মাঝখানে সরু বারান্দা, কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার পেড়িয়ে পেড়িয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম।

'ঘুমিয়ে ছিলেন নাকি? একজন বলল।

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে ঘুম হয়?'

'হবে না কেন?'

লোক দুটো হাসতে লাগল। ওদের শরীরের কাঁকুনি আমি হাতের মধ্যে অনুভব করতে পারছিলাম।

'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টা মন্দিরে— ঘুম হবে না কেন?' বলে, লোক দুটো খুব জোরে হেসে উঠল। অধ্যাপক ছেলেটি আমার পা মাড়িয়ে দেয়। সংকোচে মুখ তুলে তাকায়। আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' বড়-বাবুর ঘর। দরজা বন্ধ। একটি লোক এগিয়ে গিয়ে, হাত দিয়ে দরজার ওপর শব্দ করলো।

'কে?'

'আমরা স্যার।'

'দাঁড়াও একটু।'

আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের ভিতর কি হচ্ছে বোঝা গেল না। আসেপাশে লোকজন খুব একটা নেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন লোক বসে আছে, ঘুরছে। আমার খুব গরম লাগছিল। হাতের তালু, মুখে, নাকে ঘাম হচ্ছিল। দরজা খুলে গেল। কয়েকজন লোক ঘরের ভিতর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল বিশাল চেহারা, কালো, খালি গা পরনে কারো লুঙ্গী, অথবা অন্য কিছু। আমি ওদের দিকে তাকালাম হি.....হি.....হি.....হাসির শব্দ। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে সেই শব্দ কোথায় দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত দিকে আলোর রূপ ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের ভিতরে খুব কষ্ট। কে যেন আমাকে ছুঁয়ে ফেলছে— ধরে ফেলছে।

'হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?'

একটা লোক আমার ঘাড়ে থাবা দিয়ে বসিয়ে দিল।

'স্কাউণ্ড্রেল, হোয়াট আর ইউ.....?'

ঘাড়ের ওপর একটা যন্ত্রণা নিয়ে আমি বসে পড়লাম। একটু দূরে কৃষ্ণ আর শিপ্রা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের ভিতরটা টনটন করছে।

আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। লোকটি আমার ঘাড়ে থাবা মেরে বসিয়ে দেয়। কৃষ্ণ এগিয়ে আসে, বলতে চেষ্টা করে, আমরা.....। লোকটি কৃষ্ণর দিকে তেড়ে যায়। 'চোপ, তুম উধার ঠারো....'

কৃষ্ণ একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। শিপ্রাকে দেখি, ভয়ে আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। আমি ওপরের দিকে তাকাই, দশ-বারোজন লোক, কালো কুচকুচে বিশাল শরীর। সাদা, নীল, হলুদ, সবুজ জাঙ্গিয়া পরে, অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার শরীর ভিজে, টলটল করে জল পড়ছে। কেউ হাসছে, কেই গম্ভীর হয়ে এগিয়ে আসছে। আমার শরীর হিম হয়ে আসতে থাকে।

আমরা যখন বাস থেকে কাণ্টাই রোডে নেমে এখানে আসছি, তখন ওদের আমরা দেখেছিলাম। দূরে একটা পুকুরে সবাই মিলে স্নান করছিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিল,

বাংলায় প্যালেস্টাইনের কবিতা

আশিস সান্যালের

নতুন বই

জলপাই অরণ্যে প্রতিদিন

দাম : ছয় টাকা

তৃতীয় বিশ্বের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে আশিস সান্যালের পরিচয় সুদীর্ঘ দিনের। তাঁর এই বিষয়ে রচিত বহু প্রবন্ধ স্বদেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়ে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি সূর্যের প্রতিবেশীর পর এই নতুন সংকলনটি উপহার দিলেন বাংলা সাহিত্যে। বিস্তৃত ভূমিকা কবি-পরিচিতি সহ এই বইটি সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই তরুণ কবি।

প্রাইমা । ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭

পটে আঁকা ছবি

নীল, সবুজ, গ্রে, কালো, ব্রাউন ও বেইজ—
অপ্রসুন্দর নানান রঙের সম্ভার, আর কেউ
দিতে পারে না উপহার।
পপলিন, কেম্ব্রিক, সাটিন, ড্রিল,
কটনের গ্যাবার্ডিন। এছাড়াও,
পলিক্রেস্টার ব্লেণ্ড করা
স্যুটিং ও শার্টিং

মদুরার কাপড়

প্রস্তুতকারী:

মদুরা কোটস্

বিক্রেতা: সুন্দরদাস খ্যাকার্সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৪, লুকাস লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০১ জয় ভারত ক্যাভ্রিকস্, ১৭, সুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শিউভগবান গঙ্গাধর, ১১৩ বি, মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শ্যাম টেক্সটাইলস্, মহাবীরস্থান, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৪ (পশ্চিম বঙ্গ)।

MDU-9M 6EN

'ওরা কারা'? শিপ্রা বলেছিল, 'অ্যাংলো, খড়গপুরে রেল ইয়ার্ডের ড্রাইভার খালাসি হবে।'

কন্টাই রোড থেকে বিস্তৃত মাঠ আর সবুজ প্রান্তর দেখে আমরা ছুটতে থাকি। সবুজে মোরা মসৃণ কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে আসি অনেকটা দূর। ঘন সবুজ বিস্তৃত মাঠ। একটু দূরে ঢালু জমি নেমে গেছে নীচের দিকে আমরা সেদিকে ছুটে যাচ্ছিলাম। আরো নীচে, আরো নীচে, সবুজ মাঠ। আমাদের কুহকের মত ডাকছিল। আমরা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকি। কৃষ্ণ বলল, 'এখানে কোনদিন হয়তো, বিশাল কোন পুকুর ছিল। এখন জল শুকিয়ে প্রকৃতি তার বুক সবুজ কার্পেটে বাঁধিয়ে দিয়েছে। কি দারুন না....?' আমরা নীচের দিকে নামতে থাকি। দু-পাশের ঢালু জমি নীচু হয়ে মাঝামাঝি কেন্দ্রে এসে মিলেছে। কেন্দ্রের মাঝখানে একটা ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ। জীর্ণ ধূসর কালের রঙে কালো হয়ে আছে। একটু দূরে একটা বেদী-বাঁধানো। চারপাশে কিছু পোড়া কাঠ, ভাঙ্গা কলসী, ছেঁড়া বালিশ, শুকনো হাড় ছড়িয়েছিল। কৃষ্ণ একটা হাড় তুলে নিয়ে বলল, 'কার ছিল.....সে কোথায়—

আমরা স্মৃতিস্তম্ভের দিকে এগিয়ে যাই। 'এর গায়ে আমি নাম লিখব?' বলে, কৃষ্ণ হাড়ের টুকরো দিয়ে নিজের নাম লিখলো। তার পর শিপ্রাকে বলল, 'তুমিও লেখ ..' শিপ্রা হেসে হাত গুটিয়ে নিল। আমি বললাম, 'লেখ না কি হয়েছে? ..সবার নাম লেখা থাক'। শিপ্রা কৃষ্ণর হাত থেকে হাড়ের টুকরো নিয়ে নিজের নাম লিখলো। আমি লিখলাম। ঠিক সেই সময় আমার ঘাড়ে একটা কঠিন হাত থাবা দিল।

'স্কাউন্ড্রেল....'

'হু অর ইউ...কে....?' আমি চীৎকার করে উঠি। লোকটি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। 'কি করছেন এখানে?' ভাঙ্গা বাংলার কঠিন স্বর।

'কিছু নয়....নাম লিখছিলাম।'

'কেন এসেছেন এখানে?'

'বেড়াতে...এসেছি।'

লোকটি এবার তীক্ষ্ণ চোখে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি কে?'

'আমার বান্ধবী'

'আর উনি?'

'আমার বন্ধু।'

'কোথায় থাকেন'

'কোলকাতায়।'

'আর এই মেয়েটি?'

'খড়গপুর।'

'কি জন্য এসেছেন?' বলে একটা চীৎকার দিয়ে লোকটি আমাকে ঘুষি মারল। আমি ছিটকে গিয়ে বেদীর ওপর পড়ে যাই। লোকটি এগিয়ে যায় শিপ্রার দিকে। কৃষ্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কি নাম?'

শিপ্রা নাম বলল।

'খড়গপুরে কোথায় থাকেন?'

শিপ্রা জায়গার নাম বলল।

'আমাকে চেনেন?'

শিপ্রা বলল, 'না।'

'চেনেন না? খড়গপুরে থাকেন আর আমাকে চেনেন না?'

শিপ্রা বলল, '....না....।'

লোকটা চীৎকার করে উঠলো 'আমাকে চেনেন না....?' বলে, বাঁ হাতে বুক চাপড়াতে লাগল। ওর বুকে কালো কারে চৌকা একটা সোনার মাদুলী বাঁধা ছিল। বুকের শব্দে মাদুলীটা কয়েকবার লাফিয়ে উঠে থেমে গেল। কৃষ্ণ এবার এগিয়ে এসে বলল 'চিনবে না কেন? চেনে....তুমি ওকে চেন না?'

শিপ্রা কাঁপছিল। বলল, হাঁ....চিনি ...আপনি.... লোকটি বলল, 'হাঁ....আমার নাম ডেনিস।'

'হাঁ..! এবার চিনতে পেরেছি। আপনাকে আমি গোলু বাজারে অনেকবার দেখেছি।'

লোকটি এবার শান্ত হয়। কৃষ্ণ এগিয়ে এসে ওঁর কাঁধে হাত রাখে। কাছে টেনে নিয়ে হাঁটতে থাকে। চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল ওরা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ওরা এগিয়ে গেল শিপ্রার দিকে। আমি উঠে দাঁড়াই। হাত তুলে শিপ্রাকে স্থির হয়ে থাকতে বলি। শিপ্রা ডুকরে কেঁদে উঠলো। 'আমাদের ছেড়ে দিন...আপনাদের সব দিয়ে দিচ্ছি' বলে, হাতের চুড়ি, কানের দুল, গলার হার খুলতে থাকে। আমি চীৎকার করে ছুটে যাই। 'কি হচ্ছে কি? এরা কি চোর না ডাকাত?.... তুমি সব খুলে দিচ্ছ।'

লোকগুলো একটু পিছিয়ে যায়। আমি ওদের দিকে শান্ত ভাবে তাকাই।

ওদের দলের থেকে একজন বলে ওঠে 'নেহি হাম লোক চোর ডাকু নেহি হ্যাঁয়.... সালে, তুম লোগ ইহা খতরা কাম করনে কে লিয়ে আয়া.. শালে লোগ বদমাস।'

আমি বললাম, 'দেখুন, বিশ্বাস করুন আমরা কোন খারাপ কাজ করতে আসিনি। আমরা কোলকাতায় থাকি এখনে বেড়াতে....।' শিপ্রা এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর দিকে দুটো লোক এগিয়ে যেতেই ও চীৎকার করে উঠল। 'বিশ্বাস করুন আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। গোলবাজারে আমাদের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমরা এখানে....।' লোক দুটো দাঁড়িয়ে যায়। আমার দিকে ফিরে আসে।

'আপনি কি কাজ করেন?'

'ছবি আঁকি। এপ্রিল মাসে কলকাতা একাডেমি অব ফাইন আর্টসে আমার একস-জিবিশন হয়েছে আমি একজন শিল্পী..... কলকাতায় সবাই আমাকে চেনে।' আমি এক নিশ্বাসে বলে যাই।

'নাম কি?'

'নাম বললাম।'

মিথ্যা বলছ না?

'না, দেখুন।' বলে আমি ঝোলা থেকে আমার একসজিবিশনের ক্যাটালগ বার করি। ওর সামনে এগিয়ে দেই। পেপার কাটিং দেখাই।

'তোমার নাম যে এই ..প্রমাণ কি?'

'আসুন আমার সাথে। বলে, আমি ওদের স্মৃতিস্তম্ভের দিকে নিয়ে যাই।

'এখানে আমরা প্রথম এসে নাম লিখেছিলাম। মিলিয়ে দেখুন..মেলে কিনা?

একটি লোক এগিয়ে এসে উঁচু হয়ে দেখতে থাকে। তারপর চোখ নামিয়ে ফিরে আসে। ওদের মধ্যে একজন অন্য একজনকে ইশারা করল। চোখে একটা লোলুপ দৃষ্টি। আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা আমাদের মেরে শিপ্রাকে নিয়ে চলে যাবে। চারপাশে কেউ নেই। কন্টাই রোড অনেক দূরে। চীৎকার করলে কেউ শুনবে না। শিপ্রা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কৃষ্ণ দূরে ওই লোকটার কাধে হাত দিয়ে ঘুরছে। কি সব বলছে, কি সব দেখাচ্ছে, কি সব দিচ্ছে।

আমার সামনে যারা ছিল তাদের মধ্যে আমি বৃদ্ধ মতন একজনকে দেখতে পেলাম। কালো, অধিকাংশ চুল পাকা। লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন বুকে একটা সোনার কুশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওর দিকে শান্ত ভাবে এগিয়ে গেলাম। গলার কুশে হাত দিয়ে বললাম, 'বা বেশ সুন্দর...সোনার?'

(চলবে)

বনবাস উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

—ওটাই তো চালাকি। ধর না, কাল যে তোকে লুৎফাবিবি দেখালাম, আমি যদি বলি ওর মধ্যেও আমি কালী দেখেছি।

—তা তো দেখতেই পারিস। যা ভুশো কালীর মতো চেহারা।

—চেহারা কালো হতে পারে। কিন্তু কিরকম রসকস করছিল বল। আমি তো অনেককাল পর এলাম, অথচ লক্ষ্য করেছিস, আমাকে একদম ভোলে নি।

—ওরা কাউকে ভোলে না। ভুললে ওদের রোজগার থাকে না।

চৈতন্য বলল, আমাকে না ভোলার কারণ আছে, আমি ওকে একবার একটা চকচকে লাল রঙের জামা কিনে দিয়েছিলাম। চল না ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি?

নিশি গম্ভীর হয়ে গেল, না, তুই যা।

—কেন? তই যাবি না? ভাল লাগেনি তোর? ভাল না লাগলে চল অন্য জায়গায় যাই।

—বলেছি তো তুই যা। তোর সখ, তুই মিটিয়ে আয়।

—বাহ্ বাবা, তুইও দেখছি হাফ সন্ন্যাসী হয়ে উঠলি রে।

নিশি বলল, বাজে কথা ছাড়। ছোট কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে মনে আছে। আগে রাজবাড়ি চল। তারপর তোর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যা।

চৈতন্য বোঝাল, রাগ করিস না নিশি। কলকাতায় আবার কবে আসব তার ঠিক আছে। এর মধ্যে বাঘে কুমিরেও আমাদের খেয়ে ফেলতে পারে।

নিশি চুপ করে থাকল।

চৈতন্য বলল, আজ বরং দুজনে দুটো বেলফুলের মালা নিয়ে যাব। কালই আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

নিশি তবু নীরব আছে দেখে চৈতন্য বলল, ঠিক আছে, তুই যাস আর না যাস, আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত হাফ সন্ন্যাসী হয়ে কাটাব, তারপর সন্ধ্যে হলে একা একাই হাফ-গেরস্ত লুৎফাবিবির কাছে চলে যাব। আমার কালী ভাই দক্ষিণেশ্বরে নেই, ঐ লুৎফার কাছেই পড়ে আছে।

দুজনে মুখ গোঁজ করে হাঁটতে লাগল।

।।ছাব্বিশ।।

শীতের প্রকোপ প্রচণ্ড বাড়ল। রোদে দাঁড়িয়েও হি' হি' কাঁপতে হয়। গাছের গায়ে কুড়ুল মারতে গেলে এখন ঝনঝন করে উঠবে সারা শরীর। গত কয়েক বছরের মধ্যেও এমন ধারাল শীত আর পড়েছে কিনা সন্দেহ!

শুকদেব আর জগন্নাথ সারা রাত মাচায় কাটিয়ে ভোর ভোর ফিরে এসেছে। এসেই জগন্নাথ বিছানা নিয়েছে, শুকদেব মৌজ করে গাঁজার ছিলিম সাজিয়েছে। গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে থালি-গা হল, তারপর উঠোনে নেমে এসে ধিঙ্গি নাচ নাচতে শুরু করল। ব্যোম ব্যোম মহাদেব!

গাঁজায় সর্ব শরীর এখন চাঙ্গা, চোখ দুটো লাল কয়লার মতো টকটকে। সারা রাত মাচার বসে রাত জেগে কোমর ধরে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সব ক্লান্তি ওর বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

ওদিকে মকবুলকে দেখা গেল। মকবুল এখন অল্প অল্প হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে মকবুল ঠুকঠুক করে উঠোনে নেমে এল। দেখল, নাটুয়া দলের অধিকারীর মতো ভঙ্গি করে গান জুড়েছে শুকদেব,

গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে
গর্দানে বাড়ে জোর

মকবুল থমকে দাঁড়ায়, বটে বটে আর কি হয়?

শুকদেব উৎসাহ পেয়ে নেচে ওঠে,

(দাদা) গর্দানে বাড়ে জোর
বাবা-দাদার নাম ডুবিয়ে
হলাম গাঁজাখোর।

বটে রে গাঁজাখোর? আজ যে বড় ফুর্তি? কী হয়েছে?

শুকদেব হি' হি' করে হাসল, কেমন গাইলাম বলো?

মকবুল বলল, ঠিক কলের গানের মতো। কিন্তু সারা রাত জাগার পর সকালে এমন কি ঘটল যে এত ফুর্তি?

শুকদেব বলল, গাঁজা একবার টেনে দেখ না, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন ফুর্তি! খাবে?

এমন সময় দুজনেই কিছুটা থমকে দাঁড়াল, আরে সেই নতুন লোক না! হ্যাঁ সেই লক্ষ্মণই। মুখটা কেমন চামসে মেরে গেছে। দু' দিনেই লোকটার চেহারা কেমন পালটে গেছে।

শুকদেব ডাকল, এই যে খেস্টান সাহেব! ভালো আছো? চলবে নাকি এক হাত?

লক্ষ্মণ এগিয়ে এল, কি?

—মহাদেবের পেসাদ গো। খেয়ে গায়ে গর্দানে জোর বাড়িয়ে নাও। বাদা বনে এসেছ,

কবে বড়োমিএগর সঙ্গে লড়তে হবে বলা তো যায় না। এসো।

লক্ষ্মণ বললো, তোমরা খাচ্ছ, খাও। আমার ওসব চলে না। তাছাড়া আমার কাজ আছে।

—যা আবা, তোমার আবার কাজ কি গো? শিঙে হারিয়ে এখন কাঁকুড়ে ফুঁ দেবে নাকি গো? হেঁ হেঁ—

—মানে! লক্ষ্মণ থমকে দাঁড়াল, কথাটা ভীষণ অপমানকর। টনটন করে উঠল ওর বুকের ভেতর।

মকবুল অবস্থাটা সামাল দেবার চেষ্টা করল। সকালবেলা ঝামেলা না করাই ভালো। বলল, তুই শালা সককালবেলা গাঁজা খেয়ে মাতলামী করবি, কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও শিখলি না? কাজে যাবি না?

—সারা রাত তো কাজ করেই এলাম গো মিঞাসাব। সারা দিন আজ আমার ছুটি।

—তালে ঘরে শুয়ে ঘুমুগে যা। দেখ গে জগাটা ঘুমুচ্ছে। লক্ষ্মণের দিকে তাকাল মকবুল, তুমি কিছু মনে করো না গো, পাগলটার মুখ বড় খারাপ।

শুকদেব আবার গান ধরে, আমি হলাম গাঁজা খোওওর—আমি গো খেস্টান সাহেব। আমি, আমি—

লক্ষ্মণ আর ওদের দিকে তাকায় না। এই জংলীগুলোর কাছে মানুষের মান-সম্মানের কোন দাম নেই। যেন গরুচোরের মতোই অবস্থা। কী কুক্ষণেই যে গৌরীকে নিয়ে এখানে এসে হাজির হল ও। এখন ওকে নিয়ে না যাওয়া যাবে পাদরি পাড়ায়, না বিদ্যাপুরীতে। রাতে যেভাবে ও কাটারি নিয়ে মারতে এসেছিল, সে দৃশ্য কিছুতেই মেলান যাচ্ছে না। কেন, কেন গৌরী অমন মার-মুখি হয়ে গেল ওর ওপর। কি এমন অন্যায় করেছে ও।

সারাটা রাত নৌকাতে ছটফট করে কাটিয়েছে লক্ষ্মণ। ঘুমুতে পারে নি। একে শীত, তার উপর হাজার রকম দুশ্চিন্তা। চিন্তার কোন শেষ নেই। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে, মহাশূন্যে ও ভাসছে। কেউ নেই, ওকে হাত ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ভোরের দিকে প্রচণ্ড অবসন্নতার মধ্যে ও টের পেল, কারা যেন হৈ-চৈ করতে করতে ভেড়ি অবধি এল। তারপর নৌকো নিয়ে ভেড়ির ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে শুরু করল। লক্ষ্মণ চিনতে পারল ঈশানকে, রজনীকে। চারপাশের ভেড়ির অবস্থা দেখবার জন্য ওরা বেরিয়ে পড়েছে। আর মনে হল এই তো ওর সময়। গৌরীকে একা পেতে হলে এই তো সময়। কাঠুরেরা দড়িদড়া দা কুড়াল নিয়ে এখনই জঙ্গলে ঢুকবে। এমন সুবর্ণ সুযোগ যেন আর ও হাতে পাবে না কোন দিন। একটা শেষ বোঝাপড়া ওকে করতেই হবে এবার।

নৌকো থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মণ। বাইরের কনকনে শীত ওর সারা দেহে যেন তীরের ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছারিবাড়ির উঠোনে এসেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ও। কাঠুরেরা অনেকেই এখনো কাজে বেরয় নি। গৌরী কোথায়? গৌরী কি এখনো ঘরেই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

লক্ষ্মণ দেখলো, উঠোনের একপাশে হরিণটা বাঁধা। পা গুটিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছে হরিণটা। চোখ দুটো বড় করুণ।

কিন্তু গৌরী কোথায়! তবে কি গৌরীকেও সঙ্গে নিয়ে বেরুল ওরা। কিন্তু না, তা কি করে সম্ভব। স্পষ্ট ও ঈশান আর রজনীকে নৌকোয় উঠতে দেখেছে। দেখেছে আরো দু-তিনটে লোককে, তার মধ্যে গৌরী ছিল না। তবে কোথায়, কোথায় গৌরী।

শুকদেব একপাশে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। লক্ষ্মণ ওকে এড়িয়ে যাবার জন্য সরে এল। কাঠুরে ডেরার পেছন দিকে এগিয়ে এসে মিষ্টি জলের পুকুরটার কাছে দাঁড়াল। জলের ওপর এখনো কুয়াশা দুলছে। ঘাট ফাঁকা, কেউ নেই।

সরে এল ভেড়ির দিকে। ভেড়ির ওপর আগুনের কুণ্ডলির পোড়া কাঠ আর ছাই পড়ে আছে। কাছাকাছি এগিয়ে একটু হাত-পা সেঁকে নিল। কানের লতি দুটো বরফের মতো জমে আছে। হাত সেঁকে সেঁকে কান ঘাড় গলা গরম করে নিল লক্ষ্মণ। তারপর আবার অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

নদীতে রোদ ঝিকোচ্ছে। নদী থেকে ছড়িয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক আলোর আভা চার পাশে। ওদিকে নদীর ওপারে জঙ্গলের মাথায় পাখির ঝাঁক। অথচ কোন দৃশ্যই ওর ভাল লাগছিল না। রাগে ক্ষোভে সমস্ত কিছুই ভেঙেচুরে একশা করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল ওর। ক্ষমতা থাকলে ও কাঠুরে ডেরা আর কাছারিবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিত। লোকগুলির মাথায় কুড়াল চালিয়ে চালিয়ে মনের ঝাল মেটাত। কেমন করে যে লোকগুলির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিছুই মাথায় আসছিল না ওর। অভিমানে বুকের ভেতরে কেবল গুড়গুড় করে কাঁপতে থাকল লক্ষ্মণ।

ক্ষণিকের জন্য চোখে ঘোলা দেখতে শুরু করল ও। পর মুহূর্তেই আবার চোখের হলুদ ভাবটা কেটে গেল। ঘাটের কাঠ টানার নৌকোটার দিকে চোখ পড়ল। দু'চার জন দৈত্যের মতো মানুষ সেই নৌকোয় কাঠ সাজাচ্ছে। ওদিকে এগোতে ইচ্ছে হল না। লোকগুলো লক্ষ্মণকে দেখলেই মুখ টিপে টিপে কথা বলবে। অসহ্য।

নৌকাটা ছাড়িয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে ভাঙা ভেড়ির নতুন বাঁধটাকে দেখা যেত। ভেড়িটা ওদিকে দু-তিনটে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই ভেড়ির গা ধরে ধরেই নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে ঈশানরা।

নদীর ঢালের দিকে তাকাল লক্ষ্মণ। ভাঁটা চলছে বোধ হয়। ঢালে কাদার মধ্যে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক। মাটি খুঁড়ছে। কাদার ডুব দিয়ে দিয়ে গা লুকোচ্ছে। আবার ভেসে উঠে কাদার উপর চিত্র আঁকছে। নোনা মাছ সাপের মতো। কাদার ভেতরও ডুব সাঁতার দিতে পারে যেন। অদ্ভুতভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাদার দিকে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মণ। ভীষণ একা একা লাগছে। ভীষণ অসহায় লাগছে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

(চলবে)

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
P.O. KATRISARAI (GAYA)

রজনীগ

• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক-তাঁত
• মিল বস্ত্র
• গেঞ্জি
• শার্টিং-সুটিং
• ছিট কাপড়

৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

সে বার ঠাকুরমার আশী বছর বয়স হল। তাঁর যে পেটে ক্যান্সার ছিল একথা কেউ আমাদের বলেনি। একদিন খুব অসুস্থ হয়ে ঠাকুমা দেশ থেকে এসে বড় জ্যাঠা-মশায়ের বাড়িতে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। চারদিকে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি ঘিরে রইল, মাঝখান থেকে ঠাকুরমা স্বর্গে গেলেন। গল্প শুনেছিলাম ৩৩ বছর বয়সে ঠাকুমার শ্বশুরের ইচ্ছা-মৃত্যু হয়েছিল। বুড়ো মা-বাবা, ছেলেমানুষ স্ত্রী আর ছোট্ট এক ছেলে রেখে মারা যাবার সময় তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন 'দুঃখ কর না তোমার ঐ এক ছেলে থেকে একশো হবে।' সেই ছেলে আমার ঠাকুরদা। ঠাকুরমার আট ছেলে-মেয়ে ও ৫৪টি নাতি-নাতনি হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েদের ধরলে ১০০ না হলেও কাছাকাছি হবে। মুশকিল হল ঠাকুমার নাতি-নাতনিদের কারো একটি কারো দুটি সন্তান কারো কেউ নেই, আবার কেউ কেউ বিয়েই করেনি।

(১৯)

অনেকে জানতে চায়—পাকদণ্ডী নাম কেন। পাকদণ্ডী হল তো পাহাড়ের খাড়াই ওঠার সাপের মতো আঁকা-বাঁকা পথ। সেই পথ-ই। ছোটবেলায় দেখতাম, মধ্যিখানে আমাদের শহরখানি, তার প্রায় চারদিক ঘিরে পাহাড়। কাছের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতাম, একেবারে তলা থেকে চূড়ো অবধি পথ চলে গেছে। সে-পথ সোজা নয়। সোজা পথ-ও একটা থাকত, পাকদণ্ডীর বাঁক থেকে বাঁকে সে-পথ খাড়া উঠে যেত। ভারি কষ্টকর, হাঁপ-ধরা পথ সেটা, পাকদণ্ডীর সিকি ভাগ লম্বা, কাজের মানুষদের পথ। খাসিয়া মেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে সেই পথ দিয়েই উঠত। আরাম করা কাকে বলে তারা জানত না।

কিন্তু পাকদণ্ডী আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, ছায়ায় ছায়ায় উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি বনের মধ্যে ঢুকল। দুদিকের গাছ ঝুঁকে পড়ে পথটাকে কোলে নিত। একদিকে তার পাহাড়ের গা, একদিকে ঢাল নেমে গেছে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরের খাঁজে খাঁজে সিল্‌ভার-ফার্ণ, মেডেন-হেয়ার ফার্ণ, তাদের কি বাহার। সিল্‌ভার-ফার্ণের তলায় কে যেন খড়ি মাখিয়েছে, হাতে চেপে ধরলে, ফার্ণের ছাপ হাতে উঠে আসে। আর ফুলের কথা কত বলব। বুনো ভায়োলেট, বুনো স্ট্রবেরি, পাতার সঙ্গে মিশিয়ে-থাকা লজ্জাশীলা হানি-সাকল্‌, তার মধু-গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। দেখতে দেখতে ফুল-পাতা তুলতে তুলতে, পাহাড়-চড়া। সে-পাহাড় চড়াতে কোনো কষ্ট থাকে না। একমাত্র মুশকিল হল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। কার কখন সূর্য ডোবে কে জানে। গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই জন্য পাকদণ্ডী নাম। এর বেশি কি বলব? ভালো জিনিস দেখে দেখে চলা, মন বোঝাই করে সুন্দর জিনিস জমা করা।

এদিকে ১৯২২ শেষ হল, ১৯২৩ শুরু হল। আমার পনেরো বছর বয়স হল। নাবালকত্বর আর কিছু বাকি রইল না। এর আগেই মা দিদিকে, আমাকে ডেকে নিয়ে একদিন, অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষের ছেলেমেয়ে কেন হয় জানিস?' আমরা তো অবাক। আমতা আমতা করে বললাম, 'ভগবান দেন।' মা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতে করে কিছু দেন না, মানুষরা নিজেরা পাকায়।' এই বলে সোজা বাংলায় আমাদের মুখের দিকে চেয়ে মানুষের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করে দিলেন। আমি তখন হয়তো ১৩ পূর্ণ হয়ে ১৪-য় পড়েছি। আমাদের ভিক্টোরীয় মায়ের মুখে এমন অকথ্য সংবাদ শুনে বলা বাহুল্য আমরা শক্‌ড্‌। একেবারে 'শকু'। জাপানী ভাষায় উপ-যুক্ত শব্দ না থাকায়, ওরা শক্‌ড্‌কে বলে 'শকু'।

'শকু' হলেও একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়নি। অনেকগুলি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সেই সুযোগে জেনে নিলাম। ছেলেপুলে হওয়ার যখন এমন সহজ উপায় আছে, তখন রাজারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করত কেন? মা তারো সহজ উত্তর দিলেন। অতিরিক্ত বিলাসী আর উচ্ছৃংখল জীবন কাটানোর ফলে ছেলে হত না। ওষুধপত্র, তাবিজ, শেকড়, কিছুতেই কিছু হত না।

'তাহলে তো বিয়ে না হলেও ছেলে হতে পারে।'

মা বললেন, 'পারেই তো।' তার অসুবিধাগুলোও বুঝিয়ে দিলেন। মা সেই একদিনেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের একটা চলনসই যৌনবিজ্ঞানের পাঠ দিলেন। আর কোনো দিনও বিষয়টা উত্থাপন করেননি। তবে কতকগুলো ভালো ইংরিজি বই কিনে দিয়েছিলেন। আমার ভিক্টোরীয় আদর্শে মানুষ মায়ের পক্ষে এই পাঠ দেওয়া যে কত শক্ত কাজ ছিল এবং তিনি যে কি স্পষ্ট ও নির্মলভাবে সে-পাঠ দিয়েছিলেন, ভেবে আশ্চর্য হই।

ব্যস্‌, আর কি চাই? আমাদের বড় হওয়ার আর কি বাকি রইল? তবু ছিল ছিল বাকি। সেই বছর দুটি ভালোবাসার মানুষকে হারালাম। দুটি কেন, বলতে হয়

তিনটি। একজন হলেন আমাদের বড় জ্যাঠামশাই। আরেকজনের মৃত্যুর কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত মনটা হু-হু করে। তিনি আমাদের বড়দাদা।

মনে হত বড়-জ্যাঠা খুব বুড়ো। পাকা দাড়ি, গম্ভীর ভাব। কিন্তু কিছু-দিন আগে পর্যন্তও রোজ আমহার্স্ট রো থেকে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসতেন। তাঁকে ধরল জ্বরে। সে-জ্বরের কারণ ছিল বুকের দোষ। দেখতে দেখতে তাঁর ঐ বলিষ্ঠ শরীর ভেঙে পড়ল। জ্যাঠামশাই দেওঘর গেলেন হাওয়া বদল করতে। আর ফিরলেন না। তখন তাঁর হয়তো ৬৮-৬৯ বছর বয়স। মনে আছে, এত দূরে দূরে থাকতেন যে, ব্যক্তিগত অভাব বিশেষ কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু বাবার বড় কষ্ট হয়েছিল। কতদিন বাবার মুখ দেখলে আমাদের কষ্ট হত। তাছাড়া ঠাকুমা নেই, বড়-জ্যাঠাও গেলেন, কেমন একলা লাগত।

কাজে ভরা ছিল জ্যাঠামশায়ের জীবনটা। যৌবনে বাপকে হারিয়ে, তাঁর সব দায়িত্ব নিজে বহন করেছিলেন। ছোট বোনের বিয়ে দেওয়া, ছোট ভাইদের মানুষ করা, সবই তাঁর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। ঐ গম্ভীর চেহারার পিছনে আশ্চর্য উদার প্রাণরসে ভরপুর একটা চিত্ত ছিল। বাংলার যুবকদের জীবনযাত্রার মোড় তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ-রাজ্যের তরুণরা একটা বলিষ্ঠ ক্রীড়ানুরাগী আদর্শ উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিল। একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, দুরূহ গণিতশাস্ত্রের বই রচনা করেছেন, অন্যদিকে ঘরকুনো বাঙালী ছেলেদের খেলার মাঠে তিনিই প্রথম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত এ-দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের একটা অলিখিত ধারণা ছিল যে, গড়ের মাঠে গিয়ে সবার সামনে বল পেটালে সে-ছেলে মানুষ হয় না। এই বজ্রগম্ভীর মানুষটির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চিরকালের মতো বাঙালী ছেলেরা বেঁচে গেল।

প্রথম উল্লেখযোগ্য, ক্রিকেট খেলার দেশী ক্লাব হল টাউন ক্লাব। ১৯০০ সালেরও আগে, বিশেষ করে বড়-জ্যাঠা-মশায়ের আগ্রহে ও অপরিসীম চেষ্টায় কয়েকজন দূরদর্শী ও চিন্তাশীল বাঙালী মিলে এই ক্লাবের পত্তন করেছিলেন।

চাটিখানিক কাজ নয়, একটা গোটা জাতিকে বোঝানো মাঠে গিয়ে ছোট ছেলের মতে একটা কাঠের চ্যাপটা ডান্ডা দিয়ে শক্ত একটা গোলাকে পেটা-পিটি করলে কিভাবে কলেজের ছেলেদের উপকার হতে পারে। পৃষ্ঠপোষক অবিশ্যি আরো ছিলেন : নাটোরের মহারাজা, ভূ-কৈলাসের রাজা, মালখানগরের বসু পরিবারের কয়েকজন মাতব্বর আর অনেকগুলো আগ্রহে অধীর যুবক। এই উৎসাহী যুবকদের দলে আমার বাবা প্রমদারঞ্জন, আর দুই জ্যাঠা মুক্তিদা আর কুশলদাও ছিলেন। পরে মুক্তিদা-রঞ্জনের ছেলেরা, সোনা-পিসিমার ছেলেরা, আমার অতুল পিসেমশায়ের ছেলেরা বেচু দত্তরায়, প্রেমা দত্তরায় এবং আরো অনেকে জ্যাঠামশায়ের দেখানো পথ ধরেছিলেন।

টাউন ক্লাব হল। এখন যেটাকে সকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ বলে সকলে জানে, গোড়ায় সেটাই ছিল টাউন ক্লাবের মাঠ। পরে কোনো কারণে ক্লাবটি উঠে পাশের মাঠে চলে যায় এবং এখনো সেখানে আছে। বলা যেতে পারে বাঙালী ক্রিকেট ক্লাব বলতে, টাউন ক্লাবই প্রথম। পরে অবশ্য খ্যাতিতে, ঔজ্জ্বল্যে স্পোর্টিং ইউ-নিয়ন ক্লাব তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টাউন ক্লাবই বাঙালী ক্রিকেট ক্লাবের পিতামহ।

ক্লাব তৈরি হয়েছিল, ভালো ভালো খেলোয়াড় তৈরি হয়েছিল, আমাদের গোটা পরিবারের ক্রিকেটের ওপর একটা জন্মগত আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জন-সাধারণকে ক্রিকেটমুখী করতে আরো প্রায় ৫৫ বছর লেগেছিল। ক্রিকেটের মাঠে মেয়ে দর্শক কেউ ভাবতেও পারত না। টিকিট, গ্যালারি, একে-ওকে ধরাধরির কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না।

ছোট জ্যাঠামশাই বোধহয় সবটাতে বাড়াবাড়ি করতেন। একদিন ১৯২২ সালে, ভাগ্নী-ভাইঝিদের একটা দল নিয়ে ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হলেন। ক্যালকাটা ক্লাবের সায়েবদের সঙ্গে টাউন ক্লাবের খেলা। বড়-জ্যাঠামশাই উপস্থিত থাকবেন। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে আদৌ বলা হয়নি। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যতই উদার হন, নিজের মেয়েদের বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে দেননি। ১৫-১৬ বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের খেলার মাঠে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন থাকা অসম্ভব। না জানানোই ভালো।

এখানে বাবার মনোভাব অবধানযোগ্য। কথাটা পাড়তেই তিনি ছোট-জ্যাঠামশাইকে বললেন, 'দেখ ছোড়দা, তুমি যা খুশি করতে পার, খালি আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। একপাল মেয়ে নিয়ে তুমি মাঠে যেও, আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি আলাদা যাব।'

তাই করা হল। ছোট-জ্যাঠাকে গড়পার থেকে নিজের দুই মেয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে পিসিমার দুই মেয়ে আর রসা রোড থেকে আমাদের দুই বোনকে, নিজস্ব গাড়ি অভাবে সংগ্রহ করতে কতখানি বেগ পেতে হয়েছিল, সহজেই কল্পনা করা যায়। ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, উত্তর কলকাতার চার মেয়েকে সম্ভবতঃ সুন্দর-জ্যাঠার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। আবছায়া মনে পড়ছে তাঁদের বাড়িরও গোটা দুই বোন গেছিল। আমাদের দুই বোনকে ছোট-জ্যাঠামশাই ট্যাক্সি করে ইডেন গার্ডেনে নামালেন।

সে ইডেন গার্ডেনের কথা আজকাল-কার লোকে ভাবতেই পারে না। মাঝখানে খেলা হত, তার চারদিক ঘিরে সেরফ নন্দন-কানন ছড়িয়ে থাকত। যত্ন করে ছাঁটা ঘাসজমি, তার মাঝখানে নিখুঁত পিচ, দেখেও চোখ জুড়োত। কেমন একটা অন্য জগৎ। হৈ-হল্লা নেই, ঠোলাঠেলি, গালা-গালি নেই। মাথার ওপর নীল আকাশ, গায়ে লাগে গঙ্গার বাতাস, চারধারে ফুলের বাহার, সবুজ মাঠে সাদা পোষাক-পরা বাইশটা খেলোয়াড় আর তদের সাহায্য-কারীরা।

(চলবে)

মাত্র ৪৫৲ টাকায়
ট্রানজিসটার রেডিও

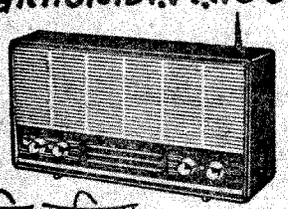

কি করিয়া
তৈয়ারী করিতে হয়
২ মাসের ভিতর শিখুন
শিক্ষান্তে
মাসিক ২০০৲/৩০০৲
উপার্জন করুন
রয়েল কলেজ
১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো
শিয়ালদহ
শাখা :
৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে)
৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে)
১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড
খিদিরপুর

সাড়ীর মেলা
ফোন ৩৪-৮৮৮০
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (ধ্রুব) কলিকাতা ৭

বাংলার বাইরে বাঙালী

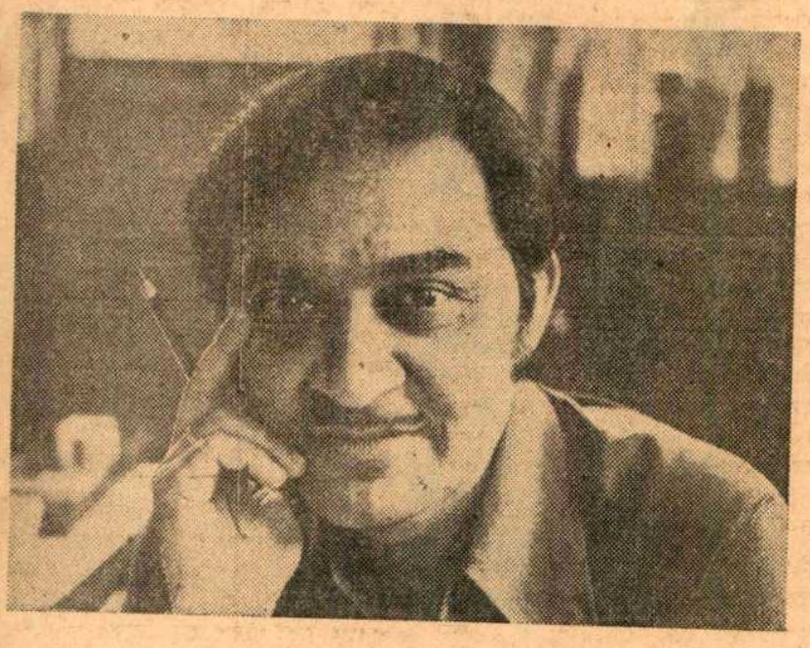

অলোক ধর

বোম্বাই

ফাল্গুন মাসের শিরীষ শাখার মত ক্লান্তিবিহীনভাবে বোম্বাই শহরে বসে এক বাঙ্গালী চিত্রকর শিল্পের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন। মাত্র সাত বছর বয়সে প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় গানটি তাঁকে অভিভূত করেছিল, তখন থেকেই তিনি যেন কার আগমন প্রতীক্ষা করেছেন—সে কি আসে? সৌভাগ্যের কথা, নিমেষগণন তাঁর ব্যর্থ যায়নি, শিল্প ভারতী এসেছেন তাঁর জীবনে, সার্থক করেছেন তাঁকে। এই শিল্পীটি—অলোক ধর।

জন্ম পাহাড় ঘেরা ছবির মত কুচবিহার শহরে। অঙ্কন শিল্প তিনি যে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন একথা বলা চলে না হয়তো, তবে তাঁর পিতা স্বর্গীয় অধীর ধর পেশায় আইনজীবী হলেও ছবি আঁকার শখ ছিল তাঁর। উত্তরাধিকার সূত্রে যেটা পেয়েছেন সেটি নাট্যপ্রেম। নাটক লিখতে, নাট্যরূপ দিতে এমন কি অভিনয় করতেও তিনি ক্লান্তিবিহীন। গত ডিসেম্বর মাসে এখানে অনুষ্ঠিত শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে শ্রীধর নতুন আঙ্গিকে নাট্যরূপ দিলেন শরৎচন্দ্রের কাহিনী কোরেলের। প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ হয়েছে এই নাটক দেখে।

নাটক লেখার শুরু বাল্যকালেই। অভিনয়ও তাই। তবে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি কলকাতার আর্ট কলেজের ছাত্র। তখন একটি নাটকের দলও ছিল যার নাম লোক ভারতী ক্লাব। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক তাঁর মধ্যে বিশেষ এক অনুভূতির সৃষ্টি করে, ঐ নাটকের জয়সিংহ চরিত্রে ক্রমান্বয়ে অভিনয় করতে করতে তিনি এক এক সময় নিজের অস্তিত্ব ভুলে নিজেকে জয়সিংহই ভাবতে শুরু করতেন। ১৯৫৯ সালে বোম্বাই আসার পরও তিনি বিসর্জন নাটক করেছেন এবং জয়সিংহের ভূমিকাতেই।

অঙ্কনশিল্পীরূপে আজ থেকে এক যুগ আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদে নতুন আঙ্গিকে ছবি এঁকে বাঙ্গালী চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। তখন থেকে কাহিনীর অঙ্গসজ্জা বা ইলাসট্রেশনের জয়রথ দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে।

এখানকার একটি বিখ্যাত এ্যাড-ভার্টাইজিং কোম্পানীর সঙ্গে তিনি যুক্ত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইলাসট্রেশন করতে ভাল লাগে, না পেন্টিং? তিনি বললেন, ইলাসট্রেশন ভাল লাগে ঠিকই তবে, ইজেল তুলি নিয়ে নিজের মনে আঁকতে যতটা আনন্দ পাই, এতে ততটা হয় না।

সিনেমার সম্বন্ধে এখনও কিছু ভাবেন নি। ভবিষ্যতে পেন্টিং-এর কাজই বেশী করার ইচ্ছা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভুবনেশ্বর

নতুন ভুবনেশ্বর ওড়িশার রাজধানী—চাকচিকাময়, সাজান-গোছান, নাতিদীর্ঘ উচ্চ অট্টালিকায় মোড়া। ওড়িশার প্রাণকেন্দ্র। যার গোড়াপত্তন হয়েছিল স্বাধীনতার পরে পরেই। গড়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ওড়িশা সরকারের প্রধান প্রধান সরকারী কার্যালয়, বিধানসভা ভবন, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি সবই এই নতুন শহরে অবস্থিত। তাছাড়া স্টেশনের দু পাশে ওড়িশার মিনি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এখানে টি-ভি সেটও তৈরি হচ্ছে এবং করমুক্ত হওয়ায় দামেও শস্তা। আর পুরনো ভুবনেশ্বর হল মন্দিরে মন্দিরে মোড়া। এর বুকে পবিত্র দেব-বিগ্রহের স্পর্শ। বড়, মেজ ও ছোট মিলিয়ে বেশ কিছু মন্দির এই পুরনো ভুবনেশ্বরে এবং তার আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ভুবনেশ্বর একদিকে যেমন ভারতের তীর্থক্ষেত্র আবার অপর দিকে স্বাস্থ্যনিবাসও। পেটের রোগ বাঙালীর জাতীয় রোগ বললেই চলে। পুরনো ভুবনেশ্বরের কেদারেশ্বর মন্দির সংলগ্ন প্রস্রবণের সুমিষ্ট জল পান করেন নি এমন বাঙালীর সংখ্যা কোটিতে গোটিক। অনেক বঙ্গ সন্তানকে দেখেছি এই জল কুঁজোয় বয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতে। ওড়িশা সরকার যদি বোতলে পুরে এই জল বকেশ্বরের জলের মত বিক্রি করেন তবে বেশ দু পয়সা সরকারী তহবিলে আমদানী হতে পারে। তাই পুরনো ভুবনেশ্বরই হল টুরিস্ট এবং তীর্থযাত্রীদের প্রধান আকর্ষণ। কতটুকুই বা পথ। মাত্র এক রাত্রির মামলা। রাতের মিল খেয়ে হাওড়া থেকে আটটায় পুরী একসপ্রেসে চাপুন। ভোর ছটায় ভুবনেশ্বর নেমে ব্রেকফাস্ট খান। নেই নেই করেও ভুবনেশ্বরে হাজার পাঁচেক বঙ্গ সন্তানের বসবাস। অধিকাংশই রয়েছেন চাকুরীর খাতিরে আর কিছু সংখ্যক আছেন বিজিনেস ক্লাস। স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। কথায় আছে যেখানে বাঙালী সেখানেই কালীবাড়ি। তা ভুবনেশ্বরেই বা বাদ পড়বে কেন? এখানেও কটি ছোটখাট কালীবাড়ি সমিতি রয়েছে। আর এঁদের দৌলতেই রাজধানী ভুবনেশ্বরে বাঙালীর জাতীয় উৎসব 'দুর্গা পূজার প্রথম প্রচলন হয়। এখনও তা অব্যাহত।

ওড়িশাবাসীরা বাঙালীর মতই সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। ওড়িসি নৃত্য তো ভুবন বিখ্যাত। কটকে অন্নপূর্ণা নাট্যমঞ্চ ৫০ বছরের পুরনো। পেশাদার অপেশাদার উভয় সংস্থার পক্ষ থেকেই এই মঞ্চে নিয়মিত নাট্যাভিনয় হয়ে থাকে। এই নাটকে ঢেউ-এর স্পর্শ ভুবনেশ্বরেও লেগেছে। এখানকার সুদৃশ্য রবীন্দ্র মন্ডপে প্রায় প্রতি দিনই নাটক অভিনীত হচ্ছে। পেশাদার-অপেশাদার, সরকারী-বেসরকারী সকল নাট্য সংস্থাই নিজ নিজ নাটক মঞ্চস্থ করছেন এই রবীন্দ্র মন্ডপে। বাঙালী সংস্থা ভারতী সংঘের তরফ থেকে বাংলা নাটকও মাঝে মাঝে অভিনীত হয়ে থাকে। মাস দুই আগে কলকাতার তরুণ অপেরার তিন রাত্রি-ব্যাপী যাত্রা এখানে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল। বলতে গেলে অপেরার কর্ণধার শান্তি-গোপালের অভিনয় দেখে উৎকল বঙ্গবাসী সবাই বিমুগ্ধ। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ ধরনের যাত্রা দেখতে সবাই উৎসুক। হলফ করে বলতে পারি কলকাতার নামী যাত্রা পার্টি এখানে শো দেখিয়ে বেশ দু পয়সা কামাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এখানে আনানোটাই এক বিরাট সমস্যা। তেমন বাঙালী সংস্থা ভুবনেশ্বরে কই?

প্রমথেশ ভট্টাচার্য

খেলা

বিশ্ব অ্যাথলেটিকস্

পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মহাদেশ হিসাবে ইউরোপ এবং দেশ হিসাবে পূর্ব জার্মানী বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছে ইউরোপ এবং পূর্ব জার্মানী। পুরুষ বিভাগে পূর্ব জার্মানী ১২৭ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান লাভ করে। মাত্র পাঁচ পয়েন্ট কম পেয়ে আমেরিকা ২য় স্থান এবং পশ্চিম জার্মানী ১১২ পয়েন্টে ৩য় স্থান পায়। পুরুষ বিভাগে এশিয়ার পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪৪। মেয়েদের বিভাগে ইউরোপ ১০৭ পয়েন্ট, পূর্ব জার্মাণী ১০৯ পয়েন্ট এবং রশিয়া ৮৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। এশিয়া ৪৯ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে তালিকায় ওসেনিয়া এবং আফ্রিকার মাথার উপরে স্থান করে নিয়েছিল।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসের আসরে পূর্ব জার্মানীর বিরাট অগ্রগতি দেখে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক আথলেটিকসের আসরে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছিল আমেরিকা (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৭) এবং মেয়েদের বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছিল পূর্ব জার্মানী (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। পুরুষ ও মেয়েদের বিভাগের পদক একসঙ্গে ধরে তালিকা তৈরী করলে সেই তালিকার প্রথম তিনটি স্থান এইরকম দাঁড়ায়ঃ ১ম স্থান পূর্ব জার্মানী—মোট পদক ২৬ (পুরুষ বিভাগে ৮ ও মেয়েদের বিভাগে ১৮), ২য় স্থান আমেরিকা—মোট পদক ২২ (পুরুষ বিভাগে ১৯ ও মেয়েদের বিভাগে ৩) এবং ৩য় স্থান রাশিয়া—মোট পদক ১৯ (পুরুষ বিভাগে ১০ ও মেয়েদের বিভাগে ৯)।

সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের আসরে মেয়েদের বর্শা নিক্ষেপ দিয়ে খেলার সূচনা হয়েছিল। তবে প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছিলেন আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট এডুইন মোসেস। তিনি পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলস ৪৭-৫৮ সেকেন্ডে শেষ করে স্বর্ণপদক পান। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে তিনি ৪০০ মিটার হার্ডলসের স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং বিশ্ব রেকর্ডধারী।

পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০-১০ সেকেন্ডে শেষ করে স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট স্টেভ উইলিয়ামস। তবে তিনি তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (৯-৯ সেঃ) ভাঙ্গতে পারেননি। মেয়েদের জ্যাভেলিনে স্বর্ণপদক পান ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালের

জ্যাভেলিনে স্বর্ণপদক বিজয়িনী রুথ ফুকস (পূর্ব জার্মানী)

পুরুষদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক বিজয়ী এডুইন মোসেস (আমেরিকা)

অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়িনী রুথ ফুকস (পূর্ব জার্মানী)। তিনি ৬২-৩৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন।

অনুষ্ঠানে দুটি করে স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন মেয়েদের ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে ইরিনা জেউইনস্কা (পোল্যান্ড), পুরুষদের ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে আলবার্টো জুয়ানতোরিনা (কিউবা) এবং পুরুষদের ৫,০০০ এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে মিরুটস ইফতার (ইথিওপিয়া)। পোল্যান্ডের ইরিনা জেউইনস্কা ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৪৯-২৯ সেকেন্ড) স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর কাছে বয়সের ভার এবং সাংসারিক দায়দায়িত্ব অলিম্পিক গেমসের আসরে স্বর্ণপদক জয়ের পক্ষে অন্তরায় নয়। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ এবং তিনি ছিলেন এক সন্তানের জননী। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকের আসরে পুরুষদের ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন কিউবার আলবার্টো জুয়ানতোরিনা। তাঁর আগে একই বছরের অলিম্পিক আসরে এই দুই ইভেন্টে একজনের পক্ষে স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি।

প্রথম বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের আসরে অনেক অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং বিশ্বরেকর্ডধারী অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুরুষদের ৪×১০০ মিটার রিলেতে আমেরিকা ৩৮-৩ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে পাঁচ বছর আগে মিউনিখ অলিম্পিকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে দেয়।

তিনদিনের এই বিশ্ব অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের থেকে এশিয়া মহাদেশ বিরাট ব্যবধানে পড়ে আছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় প্রথা প্রকরণ এবং দৈহিক সক্ষমতার দিক থেকে এশিয়ার ঘাটতি অনেক বেশী। এশিয়ার এ্যাথলীটরা শিক্ষানবীশের মত প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। জোড়াতালি দিয়ে দল গঠন করা হয়েছিল। এই দলে একতা ছিল না, ছাড়াছাড়া ভাব।

ভারত থেকে পাঁচজন অ্যাথলীট এশিয়ান দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভারতের মহিলা অ্যাথলীট অনসূয়া বাঈ শেষপর্যন্ত এশিয়ান দলে স্থান পাননি। কারণ যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারেন নি। ভারতের চারজন পুরুষ অ্যাথলীট চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ডিসকাসে প্রভীন কুমার ৬ষ্ঠ, সটপুটে বাহাদুর সিং ৭ম, ৮০০ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সিং ৮ম এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে উদয় প্রভু ৮ম স্থান পেয়েছিলেন।

দর্শক

দস্যু রত্নাকর ছবিতে রেহানা সুলতান

সিনেমা

চলচ্চিত্রে সেন্সার ও চুম্বন ইত্যাদি

ভারতবর্ষের পরাধীন যুগে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের স্বার্থে পত্র-পত্রিকার মতো চলচ্চিত্রেও সেন্সার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। বেশ কিছু বিষয় তা সত্যনিষ্ঠ হলেও চলচ্চিত্রে নিষিদ্ধ ছিল। যেহেতু ফিল্ম একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম তাই তৎকালীন সরকার তাঁদের দুর্বলতা আদি সাধারণ্যে প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন; অন্যদিকে ঐ সময়ের রক্ষণশীল সরকারের শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ এক ধারণা কাজ করত। ফলে তাঁদের কাছে যা রুচি-বিরুদ্ধ হত, তা শিল্প হত না। ক্রমে এই পদ্ধতি একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। আজ স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যেও ঐ আইন পরিবর্তনের ইচ্ছে বা সময় আমাদের জাতীয় সরকারের হয়নি। যেভাবে চলে আসছে, হয়তো তাঁরা সেটাকেই সঠিক বলে ভাবছেন, নয়তো এ বিষয়ে অত্যন্ত অবহেলা তাঁদের ভাবাতে সাহায্য করছে না।

এখন সেন্সার চলে তার নিজের খেয়ালে, নিজের ইচ্ছেয়, কোন যুক্তি-তর্কে ধার ধারে না। ভারতবর্ষের সব জায়গায় ফিল্ম সেন্টারের নিয়মপদ্ধতি এক। কিন্তু কোথাও কি একইভাবে প্রয়োগ হয়, বোম্বাইতে যেখানে একটি যৌন রগরগে ও খুনখারাপি ছবি 'ইউ' সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে, পশ্চিম বাংলায় সেখানে অতি সাধারণ ছবিও 'এ' মার্কা হয়ে যায়। এর অনেক উদাহরণ রাখা যেতে পারে, যা আপনারা জানেন,—তাই নাম দিয়ে অযথা ভিড় বাড়ালাম না। আসল কথা, ছবির এই 'এ' বা 'ইউ' নির্ভর করে ফিল্ম সেন্সার কমিটির মনোভাবের ওপর। আমাদের দেশের প্রতিটি আইনকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ফিল্ম সেন্সারও তার বাইরে নয়। তাই এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করে যান। তাঁদের খুশীমতো কোন দৃশ্য থাকে, কোন দৃশ্য থাকে না। ১৯৭৪, '৭৫-এর অধিকাংশ বাংলা ছবি 'এ' সার্টিফিকেট পেয়েছিল, এবং এই প্রাপ্তিতে ছবির প্রযোজক-পরিবেশকের উদ্যোগ কতটা সে বিতর্কে না গিয়ে শুধু এটুকুই বলা যায়, ব্যাপারটা তাঁদের খুশীই করেছিল। তখন দর্শকেরা 'প্রাপ্ত-বয়স্ক' দেখলেই ছুটতেন। নিশ্চয়ই কিছু নিষিদ্ধ দৃশ্য আছে এই ভেবে। সাধারণতঃ দেখা যায় সে ছবিতে অ্যাডালটস ওনলি লেবেল লাগানো সেই ছবিতেই বেশী করে অপ্রাপ্তবয়স্কের ভিড়—আর তাদের বাধা দেওয়ার মতোও কোনো ব্যবস্থা নেই। অবশ্য ৭৬-৭৭-এ তেমন করে আর 'এ' দেখা যাচ্ছে না—যেহেতু দর্শক এখন এ ব্যাপারে অনেকটা শীতল হয়ে গেছেন।

ছবিতে এই 'এ', 'ইউ' আসে সাধারণতঃ একেসস অব ভায়োলেন্স এন্ড সেকস থেকে। ছবির ব্যাপারে ভারতীয় সেকস-এর ব্যাখ্যা সুদূরপ্রসারী ও ব্যঞ্জনাময়। সেখানে চুম্বন অন্যায়, কিন্তু বিছানায় ধুতাধুস্তি অন্যায় নয়। উলঙ্গ হওয়া অন্যায়, কিন্তু কোমর অব্দি কাপড় তুলে ব্লাউজের

স্ট্যাপ খুলে বীভৎস অঙ্গভঙ্গি অন্যায় নয়। অন্যায় নয় নানা যৌন ইঙ্গিতের মাধ্যমে দর্শকদের উত্তেজিত করা। এই আমাদের ছবির ন্যায় অন্যায় বোধ ও বিচার। এবং সেখানে যে ভাষা ও রীতির প্রয়োগ হয়, তার চেয়ে চুম্বন ইত্যাদি অনেক বেশী শ্লীল অনেক বেশী সাংস্কৃতিক।

এতো গেল দেশীয় ছবির একটা দিক। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যেসব ছবি আসে, ভারতীয় ঐতিহ্য রাখতে তার ওপর এমন-ভাবে কাঁচি চালানো হয় যে ছবি আর ছবি থাকে না। আবার এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের আলাদা ট্রিটমেন্ট। বোম্বাইতে একটা ছবি সেন্সার হওয়ার পরে কলকাতায় সেই ছবি আবেকবার সেন্সার হয়েছে এমনি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী, একেবারেই সাধুসন্ত প্রকৃতির। কোন মুহূর্ত, সে ছবিতে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, তা যদি সেন্সারের আওতায় পড়ে, তাহলে তা দেখা ভারতীয়ের কাছে পাপ। তাই বিদেশের কুশলী চিত্রসম্পাদকদের ছবিনেও এমনভাবে কাঁচি চালানো হয় যে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের ছবি চিনতে ভুল করেন।

এখন প্রশ্ন, বর্তমানে চলচ্চিত্রে যে সেন্সার পদ্ধতি প্রয়োগ হয়, তা কতটা যুক্তিসম্মত? এই প্রচলিত সেন্সার আইনে পুলিশেরা সব ন্যায়ের প্রতীক। তারা ঘুষ নিলেও দেখানো যাবে না। সরকার অন্যায় কাজ করলেও ছবিতে সে সম্পর্কে নীরব থাকতে হবে। মন্ত্রী, পদস্থ অফিসার বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের দোষত্রুটি সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। ওঁদের একমাত্র মহিমা কেতন ছাড়া এ ব্যাপারে ছবির অন্যকিছু করণীয় নেই। অবশ্য সরকার-বিরোধী দল সম্পর্কে বললে তাঁদের আপত্তির কিছু নেই।

সেন্সারের যে কিছু ভাল দিক নেই, তাও নয়। কিন্তু মুশকিল হল, ঐ ক্ষুদ্র ভাল অংশের হাত ফসকে যে গরিষ্ঠ বস্তু বেরিয়ে আসে, তাতে সেন্সারের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভায়োলেন্স বা মার্ডার ইত্যাদির ব্যাপারে সেন্সারে দুটো শব্দ চালু আছে কেন ও কিভাবে একটা খুনের ঘটনায় কোন ব্যক্তি কেন খুন হল, আর কিভাবে হল এর কোনটা দেখানো কতটা জরুরী? এক্ষেত্রে শিল্পের বিবেচনায় যার দাবী অগ্রগণ্য তাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রায়ই অপ্রয়োজনীয়ভাবে 'কেন'র চেয়ে 'কিভাবে'র ওপরে এমন জোর দেয় যে অনেক ক্ষেত্রেই তা অতি-নাটকীয়তার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। গল্প বা ঘটনার দাবীতে শিল্পসম্মতভাবে যদি তীব্র সিংসতাও আসে, তাকে স্বীকার করা উচিত, কিন্তু অনাবশ্যকভাবে সামান্য ফিচলেমিকেও মেনে নেওয়া যায় না।

অথচ ছবিতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ও এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এইসব মালমশলা এমন বুদ্ধি করে চালানো হয় যে সেন্সারের সতর্ক কাঁচিও তাকে রুখতে পারে না। অবশ্য সেন্সারও এসব খুজখেমের ব্যাপারে অনেকখানি উদার। এই মন্তব্যের তাগিদে কিছুদিন পূর্বে প্রদর্শিত একটি বাংলা ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার শেষে শ্বেত কপোত ও মাঝখানে একাধিকবার যীশুর মূর্তি এনে ছবিটিকে শান্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। অথচ তার মধ্যেই বেশকিছু পাশবিক খুনের দৃশ্য উপস্থাপিত যা ভীষনভাবে উদ্দেশ্য-মূলক ও প্রয়োজনহীন। এপ্রসঙ্গে এক প্রখ্যাত নাট্য ব্যবসায়ীর কথা মনে পড়ে। তিনি একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিলেন, তাঁর নাটকে ক্যাবারে ইত্যাদি থাকে এইজন্য যে তিনি অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। তিনি ক্যাবারে দেখিয়েই ক্যাবারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন। এটাই নাকি তাঁর মতে এসব বন্ধ করা ও এর বিরুদ্ধাচরণ করার উত্তম পথ। কি সাংঘাতিক প্রগতিশীল চিন্তা!

আমার মতে ছবিতে খুন বা হিংসা ইত্যাদি দূষণীয় নয়, যদি তা ছবির গতি অনুযায়ী এসে যায়। এখন তাহলে প্রশ্ন কোন্ ব্যাপারটাকে ক্রাইমের পর্যায়ে ফেলা যায়। মাংসের প্রয়োজনে ছাগল হত্যা নিশ্চয়ই ক্রাইম নয়। কিন্তু কোনো ছবিতে যদি দেখা যায় যে সেখানে ছাগলের গলায় ছুরি চালানো হচ্ছে, ছাগলটা বীভৎস চিৎকার করে ছটফট করছে, আর তা দেখে একটা ছোট্ট ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছে--তাহলে সেখানে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ক্রাইমের অঙ্গীভূত হয়।

যৌনতা বা পুরুষনারীর নগ্ন দৃশ্য বা শারীরিক মিলন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। 'হ্যাগস এ্যান্ড কিসেস' নামে সুইডেনের একটি ছবিতে এজাতীয় কিছু ঘটনা ছিল। একটি ছেলে ভাল কবিতা লেখে, ছবি আঁকে একদিন তার প্রেমিকার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে শহর ছেড়ে যাবে স্থির করল, বিদায় নিতে গেল এক বন্ধুর কাছে, কিন্তু বন্ধুটি তাকে ছাড়ল না, সে চাইল ছেলেটি তার বাড়ীতে থাকুক, আবার ছবিটবি আঁকুক, বন্ধুটি তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল, যেভাবেই হোক তাকে এখানে রাখতে হবে, প্রয়োজন হলে ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিতে তার স্ত্রী যেন ছেলেটির সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ও করে। স্ত্রী রাজী হয়ে গেল। কিন্তু একসময় ভাল-বাসার অভিনয় করতে করতে সে ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলল। এই পর্যায়ে ছেলেটি ও তার বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার সহবাস ও নানা ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এসেছে। এবং তা খুবই খোলাখুলি কিন্তু কোনোটাই অপ্রয়োজনীয় বা উত্তেজনার উদ্দেশ্যে নয়। অথচ ছবির শেষে ছেলেটি ও তার বন্ধু যেখানে কথা বলছে ও যেখানে দুজনকেই বেশ খুশী মনে হচ্ছে সেখানে তার স্ত্রীর ব্যবহার অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। বন্ধুটি সেসময় সুখী, কেননা সে ছেলেটিকে তার বাড়ীতে রাখতে পেরেছে ও সে আবার ছবি ইত্যাদির কাজে ব্যস্ত।

অন্যদিকে ছেলেটি সুখী এজন্য যে সে এক ভালবাসা হারিয়ে আরেক ভালবাসা পেয়েছে। এই দুই বন্ধু যখন একটা ঘরে কথা বলছিল, তখন প্রাণের ঘরে বন্ধুর স্ত্রী

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নির্বিঘ্ন রাখবে

বৈশিষ্ট্য :
- অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত।
- ব্যবহার-পদ্ধতি খুবই সহজ।
- বেল্ট, হুক বা পিন লাগেনা।
- অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকেনা।
- প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
- অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।

টিউবে এবং বিনা টিউবে যে কোন ঔষধের দোকানে অথবা বড় বিপণিতে পাওয়া যায়

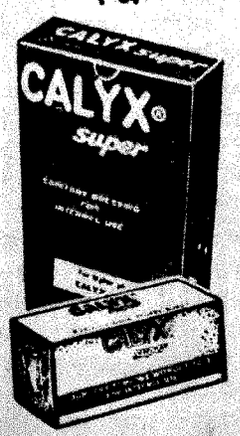

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩১ শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১১ • ফোন : ৩৫-৪১৪৫

ধীরে ধীরে শরীর থেকে সব কাপড় ইত্যাদি খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। সারা ছবিতে এই দৃশ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার ওখানকার দর্শকেরাই এই দৃশ্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন।

সুইডেন, ইটালী বা ফ্রান্সে সেন্সার প্রথার প্রচলন নেই। আমেরিকাতেও তা সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই এসব দেশের ছবিতে ব্যাপকহারে সেকস ক্রাইম ইত্যাদি থাকার সুযোগ আছে। কিন্তু সে সুযোগ বর্তমানে প্রায় কোন পরিচালকই গ্রহণ করেন না। তার কারণ দর্শক। একসময় অবশ্য ঐ জাতীয় ছবিতে প্রচুর দর্শক হতো। কিন্তু এর বারবার পুনরাবৃত্তিতে দর্শকদের কাছে পুরো ব্যাপারটা ক্রমশঃ একঘেয়ে ও বিরক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে ছবি সেন্সারমুক্ত হলে বা সেন্সার এসবের সুযোগ দিলে কিছু সুযোগসন্ধানী যে তার ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসবেন এ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কিন্তু তা কতদিন, একসময় ঐ উত্তেজনা স্তিমিত হতে বাধ্য। কিছুদিন আগে যেমন ক্যাবারে মার্কা নাটক হলেই হাউসফুল হতো, কিন্তু এখন কি সেই পরিমাণে হয়। তাই আগামী দিনের জন্য সেন্সারকে আরো উদার ও প্রশস্ত হতে হবে, যাতে ছবি তার নিজস্ব ইচ্ছে বা গতি অনুযায়ী চলতে পারে। আমরা, ছবির পরিচালক ও দর্শক কতোটা এর সুযোগ নিই, তা দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া নগ্ননাভি ও শুধুমাত্র ঘুরে ঢাকা শরীর বা সাবাবের বুদবুদের মধ্যে অর্ধনগ্না নায়িকার ঢেয়ে চুম্বন বা উন্মুক্ত শরীর অনেক বেশী ভদ্র ও রুচি-সম্মত।

বিকাশ রায়

মহলায় শয়তানের দরবার

বেহালা সোদপুরের একটা লম্বা হলঘরে শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানীর মহলা চলছে। জানালা দিয়ে পুকুর দেখা যায়। পুকুর পাড়ে নারকেল গাছ। তাল গাছও দু-একটা।

শিল্পীরা যাঁরা মহলাঘরেই আছেন, তাঁরা অনেকেই খালি গায়ে তখনো। মহলা শুরু হবে দুটোয়। কিছুটা আগেই গিয়ে পড়েছি। মালিক শ্রীরেন নট্ট স্বয়ং অভ্যর্থনা করলেন। খোরাকি জলপানির টাকা দিচ্ছিলেন শিল্পীদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুতুল চক্রবর্তী এলেন। শাড়ি ভিজে গেছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এ বছরেই যাত্রায় এসেছেন। ওঁর নাটক করা হয়েছে।

নিউ এম্পায়ারে মুক্তি পাচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক ছবিতে সতীন্দ্র, শোভা সেন, কালী ব্যানার্জী, মাঃ পিন্টু

পুতুল চক্রবর্তীর বোন হাসপাতালে। 'অবস্থা গুরুতর'। বললেন, 'এটা নতুন কি? বাবাকে শ্মশানে পুড়িয়ে গঙ্গায় স্নান করে পাশেই মুক্ত অঙ্গনে নাটক করেছি।'

আমি স্তম্ভিত। শুধুমাত্র পেশার খাতিরে কি এটা সম্ভব?

অভিনয়কে ভালোবাসেন পুতুল। অভিনয় তাঁর জীবন। বিকাশের ক্ষেত্র।

মনে মনে উচ্চারণ করলাম, 'মঙ্গল হোক্ আপনার।'

রোদ উঠলো। রোদে ভেজা শাড়ি শুকিয়ে নিলেন পুতুল, পুতুল চক্রবর্তী, যিনি ঠিক দুটোর সময় হয়ে যাবেন কমলা দেবী।

'শয়তানের দরবার' পালারা আলা-উদ্দিন খিলজি বাঁকে লুণ্ঠন করে শাদী করেন। খিলজির পুত্র মোবারক যাঁকে আম্মা বলে ডাকে। যিনি রাজমাতা। মনের গভীরে ছিল প্রতিশোধ স্পৃহা, আজ বিস্মৃত। মোবারক তাঁর সন্তান তুল্য।

পালাটির রচয়িতা পালা সম্রাট ব্রজেন দে।

নির্দেশক মৃণাল ঘোষ ঠিক দুটোয় মহলা শুরু করে দিলেন। সুরকার অমিয় ভট্টাচার্যও উপস্থিত। সিকোয়েন্স বুঝে নিতে।

তিন ব্রাহ্মণের পরামর্শের সময় কুলীন বাসুদেব শিরোমণির দেড়শতম পুত্রবধূ ইন্দ্রানী 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আসচে এলেন। পেছনে স্বয়ং শিরোমণি মশায়। ইন্দ্রানীকে সতীস্বর্গে যেতে হবে। 'আমাকে বাঁচতে দিন, সতীস্বর্গে

সদ্য প্রকাশিত রসোত্তীর্ণ উপন্যাস

মোহন ঘোষের

চাঁদ নেই জ্যোৎস্না

ললিতা বৌদির মুখ থেকে গল্প শুনে কুমার ভালবাসল শিবানীকে। ডায়রীর পাতায় পাতায় কুমার লিখেছে সে কথা। সেই কুমার-ই আবার তার ডায়রীর এক জায়গায় লিখেছে: "....ললিতা বৌদির স্নেহ আমার অনুভূতিতে প্রিয়া-প্রেমিকার ভালবাসায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ঈশ্বর সাক্ষী, এর জন্যে আমি অনুতপ্ত। আমি ললিতা বৌদিকে শ্রদ্ধা করতে চাই, সম্মান করতে চাই।...." একাধিক অনবদ্য চরিত্রের ভীড়ে এক জটিল-মধুর প্রণয় কাহিনী।

দাম: ছয় টাকা

ত্রিধারা প্রকাশনী:

১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯

প্রাপ্তিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী, দে বুক ষ্টোর, কথা ও কাহিনী, ভৈরব পুস্তকালয়

বি/২৯৯২

লোকনাট্যের মুক্তিদীক্ষা পালায় শিবদাস মুখার্জি ও অনাদি চক্রবর্তী

যেতে আমি চাই না। পুণ্য অর্জন করতেও আমি চাই না' ইন্দ্রানীর করুণ মিনতি। চমৎকার করলেন তমসা ব্যানার্জি। মিষ্টি দেখতে এই ছোট্ট শরীরের অভিনেত্রী অভিনয়ের গুণে পালার প্রথম দৃশ্যকেই করুণ করে দিলেন। খুবই আন্তরিক অভিনয় তমসার। নামে তমসা থাকলেও উনি আলোয় যাবেন নিশ্চিত।

মানু ভট্টাচার্য অর্থাৎ রাজার আমীর সামসুল এসে ইন্দ্রানীকে উদ্ধার করলো সতীদাহ থেকে। মানু বেশ লম্বা। গলাটাও ভরাট। খুবই উৎসাহী ও উদ্যোগী যুবক।

বিপদ আরো ঘন হল তখন পুতুল অর্থাৎ কমলা দেবী গলাকে অনেক খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'আমি তো এখনো ভুলতে পারি না খসরুর। আমার সেই কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনি, সেই শান্তিরা তপোবন.... (

খসরু মোবারকের বন্ধু। আবার কমলা দেবীর নিজের পুত্র যা তাঁরও অজানা। খসরু করছেন শম্ভু ব্যানার্জি। সুদর্শন এবং সুকণ্ঠের অধিকারী শম্ভুবাবু মহলার ফাঁকে বললেন, 'আজ চারটে ক্লাস করে এলাম। লাস্ট পিরিয়ডে অরগানিক কেমিষ্ট্রির ইথেল পড়িয়েছি।' সাহাপুর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান শিক্ষক শম্ভুবাবু মঞ্চের নিয়মিত অভিনেতা। এ বছরই প্রথম যাত্রা করবেন।

খিলজি বংশে কেউ অমর হতে আসেনি'—মোবারকের কণ্ঠেও বেদনা। মনোজকুমার করছেন মোবারক। দক্ষ এবং অভিজ্ঞ এই অভিনেতা যথেষ্ট উজ্জ্বল। এ পালায় তিনি সম্পদ।

সাহানা বিবির ভূমিকায় রেখা ভট্টাচার্য, বাসুদেব শিরোমণি রূপে অজিত মুখার্জি এবং খালেদ-এ অনিল রায়ও নিজস্ব কৃতিত্ব দেখালেন মহলায়।

প্রিন্টেড পাঞ্জাবি আর পাজামা পড়ে বসেছিলেন অমিতাভ রায়, দুটো এলো খোঁপা বেঁধে কেয়া রায়। এদের মহলা দেখতে পেলাম না। প্রথম দিকের মহলা। কেউ কেউ পার্ট ভুল বলছিলেন। নির্দেশক মৃণাল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'মনে করবেন না, আমি সব ভুলে গেছি। উনি বসে আছেন বলে কিছু বলছি না।' উনি অর্থাৎ আমি। কাজেই আমাকে উঠে পড়তে হল।

মহলা তো শিক্ষণপর্ব। ত্রুটি সংশোধনের জন্যই মহলা। মহলায় নিষ্ঠার ফলাফল আসরে প্রতিফলিত হবে।

মৃণালবাবু বললেন—"এর সেট দেখবেন। একেবারে অন্যরকম। যাত্রাতে এরকম সেট কখনো হয়নি।

'দেখবো তো 'নিশ্চয়ই'। আমার মহলা ঘরের না বলা উত্তরটা লিখতেই হল।

সপ্তর্ষি

২১ আগস্ট মধ্য হাওড়ার 'সপ্তর্ষি' এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করল। কৃষ্ণা ঘোষের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বটি ছিল 'নৃত্যশ্রী' গোষ্ঠীর লোক-নৃত্য ও কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'। লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানটি খুব একটা উপ-ভোগ্য না হলেও, 'তাসের দেশ' প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে তাসের দেশে তাসেদের বৃত্তাকারে নাচের দৃশ্যটির উপ-স্থাপনা বা তাসেদের সঙ্গে রাজপুত্র ও সদাগর-পুত্রের সংলাপ বিনিময় এবং শেষ দৃশ্যে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ রীতিমত ভালো হয়েছে। প্রতিটি অভিনয়ে নিষ্ঠার ছাপ ছিল। সব-কটি চরিত্রই সু-অভিনীত। তার মধ্যেও বেশি মন কাড়ে রাজপুত্র ও সদাগর-পুত্রের অভিনয়। এই দুটি চরিত্রে ছিলেন যথা-ক্রমে মৌসুমী মুখার্জি ও মধুমিতা সিনহা। হরতনের চরিত্রে সুমিতা ঘোষালের অভিনয়েও মুন্সিয়ানার ছাপ মেলে। বিশেষ করে, তার মূকাভিনয় ও হাতের মুদ্রায় হরতনের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার কাজে। পত্রলেখা চরিত্রে শম্পা ব্যানার্জি, রুইতন—লীনা করাতি, রাজা—সুমিত্রা চ্যাটার্জি ও রানীর ভূমিকায় রুমা বসু নিজ নিজ চরিত্রে যথাযথ। সংগীত-নির্দেশনা ও রাজপুত্রের কণ্ঠসংগীতে ছিলেন সমীর মিত্র। এছাড়াও স্বপ্ন চ্যাটার্জি, কেকা মুখার্জি, রীণা ব্যানার্জি ও হেনা ব্যানার্জির কণ্ঠদান প্রশংসার দাবি রাখে। ভাষ্যে ছিলেন নূপুর ভদ্র ও কানাই ঢ্যাঙ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লক্ষ্মী মুখার্জি।

ব্রজেন্দ্রসুন্দর দত্ত

প্রদর্শনী

গোপাল সান্যালের ছবি

ম্যাক্সমুলার ভবনের দরজার কাছে পৌঁছেই অদূরবর্তী দেয়ালে পাখী-বিক্রেতাকে দেখে দর্শকদের অনেকে থমকে দাঁড়াতে পারেন কৌতূহলবশতঃ এবং এই কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হতে থাকলে দর্শক আরও এগিয়ে যাবেন। তখন তাঁর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি বহুবর্ণরঞ্জিত ক্যানভাস বিচ্ছিন্ন-ভাবে ইতস্ততঃ। এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে ডানে-বামে—কোথায়ও পুরোনো মন্দির বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় দাঁড়িয়ে। কোথায়ও প্রেমিক উন্মুখ আয়তনয়নে, কোথায়ও নতশিরে ভ্রাম্যমান শঙ্কর। কোথায়ও বা যেন বাতাসে ভাসমান অশ্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে—কোনখানে বাঁশী-বাদকের পরিবার মুগ্ধতায় মিয়েমান। আলো-আঁধারী অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙীন ভাসমান মাছ কখনও বা ইতস্ততঃ।

সমগ্র পরিবেশটায় কোন চমক নেই, নেই কোন উজ্জ্বলতা। বরং বলা যায় একটা স্নিগ্ধ নিশ্চুপ অস্তিত্ব রং রূপ রেখার মধ্যে বিধৃত বেদনায় কিছুটা বিহ্বল। গোপালের জগৎ নাড়া দেয় সেই চৈতন্যকে যেখানে রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য—সব এক হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়।

ম্যাক্সমুলারকে ধন্যবাদ যে গোপালের শিল্পসম্ভারকে তাঁরা সযত্নে কোলকাতার কলারসিকদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

বেশ কয়েক বছর বাদে গোপাল সান্যাল তাঁর রচনাসম্ভার নিয়ে কোল-কাতার শিল্পজগতে আবির্ভূত হয়েছেন। দীর্ঘকাল তাঁর এই নীরবতায় কোলকাতার শিল্পপ্রিয় দর্শকরা বঞ্চিত থাকলেও, শিল্পী গোপাল সান্যাল থেমে থাকেননি। যেখানে তাঁর মন রং খুঁজে পেতে চেয়েছে কিন্তু পায়নি, সেখানে অনাসক্তভাবে সাদা-কালোর মধ্যে নিজেকে পেতে চেষ্টা করেছে। সর্বদা কাজ করে যাওয়ার মধ্যে গোপালের একটা আত্মসমীক্ষার ইঙ্গিত থাকে। জগতকে বুদ্ধি দিয়ে জানার চাইতে মানবিক প্রবৃত্তিতে তাড়িত হতে গোপাল স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন—করাই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। তাঁর কথাতেই বলা যায় 'আমি সাধারণ জীবনের ছবি আঁকতে চাই যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখি—যেখানে মানুষ সব সময় তার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামরত। অস্তিত্ব বাঁচাতেই জীবনের সংগ্রাম। অধিকতর সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন পেতে মানুষ

তার সবকিছু প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামরত। এবং আন্তরিক ও সহজভাবেই বুদ্ধিগ্রাহ্য দৈনন্দিন ঘটনাকে আমি চিত্রায়িত করে থাকি।'

খুবই স্বাভাবিক যে, গোপাল জটিল জীবন-রহস্যে বিশ্বাসী নন চিত্রগত বিষয়ে। যে কারণে সব সময় তাঁর অন্তর্মুখী চেতনাকে খুব সাধারণ মানবিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। পাখী, মানব-মানবী, জন্তু-জানোয়ার অবাধে তাঁর চিত্ররাজ্যে বিচরণ করে। তুচ্ছ অরোপিত বস্তুকেও মনোগ্রাহী করে তুলতে জমির বিভাজন। বর্ণপ্রলেপ, রেখার গতিময়তা—সবকিছুই তাঁর দক্ষ কারুময়তা ইঙ্গিত-বহ। এমনকি বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে যখন তিনি তাঁর মানব অভিলাষ ব্যক্ত করতে প্রয়াসী, সে-ক্ষেত্রেও সামান্য অলংকরণের মনোজ্ঞ সংস্থাপন তাঁর চিত্রভাসকে অনেক বেশি সংবেদনশীল করে তোলে। তাঁর সাদা-কালো রেখাচিত্রের পাশে তাঁর তেলের ছবিগুলি অনেক বেশি বর্ণাঢ্য—যদিও বিন্যাসে কোন অসংযমের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় না। মূলতঃ গোপাল রোমান্টিক মানসিকতার লোক। পারিপার্শ্বিক পরি-বেশের মধ্যে যে মালিন্য অবশ্যই তা তাঁর রচনাকে কিছুটা বিষণ্ণতার ছাপ দিয়েছে। এখানে তাঁর সবকিছু অঙ্কিত বস্তুতে তাঁর আন্তরচেতনার যে-ছাপ পাওয়া যায়, তাকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলা যায় না কোন-ভাবে। কিন্তু একটা সতেজ বিষণ্ণতায় মেদুর। বোধহয় এই কারণে গোপাল বিশিষ্ট এবং তাঁর সমকালীন শিল্পলোকে তিনি যে বিচ্ছিন্নভাবে বিশিষ্ট তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবির ক্ষেত্রে আধুনিকতা বলতে দর্শক সাধারণের যে অনীহা গোপালের শিল্পভাবনায় তার স্বাক্ষর নেই। আবেগ-তাড়িত বলেই গোপাল তাঁর শিল্পকলাকে সহজেই হৃদয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন।

গোপালের লেখায় সর্পিলগতি অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে যখন তাঁর আবেগপ্রবণ মন জিজ্ঞাসু না হয়ে হৃদয়ানু-সন্ধানরত থাকে। গভীর ঘন কালো রেখা কখনও সরু কখনও মোটা হয়ে অঙ্কিত-বস্তুকে সজীব উন্মাদনায় গভীর করে তোলে। পরিসর বিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি কখনও ভারসাম্য হারান নি।

বিষয়বস্তু হিসাবে ঘোড়া বরাবর শিল্পীদের খুব প্রিয়। গোপালের কাছে তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোপালের ঘোড়া

কিন্তু অন্যান্য শিল্পীর কাজ থেকে বিশিষ্ট। রেখার ছন্দময়তায় তার ঘোড়ার গতিকে তিনি যথার্থভাবে ধরতে পারেন ইচ্ছামত। উদ্দাম রেখাকে কখনও স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট করে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন। যার ফলে দর্শকদের মধ্যে একটা ছোট্ট ভাবনার অবকাশ থাকে। কালোর ওপর হলুদ রেখার বস্তুকে সমতল থেকে উদ্ধার করে ছন্দময়তা আরোপে তিনি সার্থকতা দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ রেখা-চিত্রে একটা আর্তি প্রকাশ পেয়েছে যা দর্শক-মনকে সহজে অভিভূত করে। বর্ণের ক্ষেত্রে গোপাল সংযমী, আত্মস্থ এবং যথাযথ। তাঁর 'শেষযাত্রা' চিত্রটিতে জমির বিভাজন বর্ণাঢ্য রেখার টানটোনে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। শ্লথগতিতে চলমান অশ্বের পিঠে কাক বা পাখী জাতীয় একটা ছোট প্রাণী—যা বিপর্যস্ত অশ্বের অসহায়তাকে তিরস্কার করছে। এখানে বর্ণবিন্যাসে রোমান্টিক মানসিকতার ইঙ্গিত থাকলেও ছবির মূল-বিন্দুতে বিষণ্ণতার ছাপ প্রকট। কিন্তু এখানে তাঁর সামগ্রিক উপস্থাপনায় যে নৈপুণ্যের ছাপ পাওয়া যায় তা সহজেই কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ।

রেখাচিত্র এবং চিত্র—এ দুই-এর ক্ষেত্রে গোপাল সান্যাল তাঁর নিজস্ব গঠন-ভঙ্গীকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর সব রচনাতে একটা পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়—কারণ গোপাল তাঁর স্বরূপে একান্ত আন্তরিক। এবং এই আন্তরিকতা খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে যখন তা গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যায়।

রবীন মণ্ডল

নীলাম

রবিবার। ২৮ আগস্ট। ঘড়িতে এখন প্রায় সাড়ে বারটা। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি। ২৫-বি, পার্ক স্ট্রীটে, কারনানি ম্যানসনের পিছনদিকের একতলায়—নীলামদার স্টেইনার এ্যান্ড কোং-এ। ডাক উঠেছে একশো আশি টাকা। ভালো কাঠের একখানা ডাইনিং-রুম ক্যাবিনেট। কিনতে চাইছেন বেশ কয়েকজন। একজন ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা দেখছেন। কাঁচের ওপর তাঁর মুখের ছায়া পড়েছে। ক্যাবিনেটের মাথায় একবার আঙুলের টোকা দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'দুশো'। ওদিকের দরজার কাছে মাঝবয়সী একজন তিনি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। এবার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দুশো দশ'। নীলামদার অনেকক্ষণ ধরে হাঁকলেন, 'দুশো দশ, দুশো দশ। আর কেউ? একেবারে নতুন, জলের দামে।' কেউ উঠলেন না আর। হাতুড়ির শব্দ শোনা গেল। দুশো দশ টাকায় ঐ ডাইনিং-রুম ক্যাবিনেটটা পেয়ে মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরালেন।

চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে। মাঝে মাঝে হুশ্ করে গাড়ি এসে থামছে। আবার কাদা-পায়েও ঢুকে পড়ছে বহু লোক। সবারই ইচ্ছা, তাদের পছন্দমতো জিনিসটি যেন তারা পায়। ভবানীপুরের দুই তরুণের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা আজই প্রথম এসেছেন নীলামের বাজারে। উদ্দেশ্য, পছন্দ হলে একটা বুককেস কিনবেন। ঠিকমতো কিনতে পারলে বাজারের থেকে এখানে সস্তায় পাওয়া যায় বলেই তাঁরা এখানে এসেছেন। সস্তায় যে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ আমি একটু আগেই পেয়েছি ডালহৌসী একসচেঞ্জে। রাসেল স্ট্রীটের ঐ দোকানে এক ভদ্রলোক মাত্র বাইশ টাকায় কিনলেন চারখানা হাওয়াই শার্ট।

কী পাওয়া যায় না এখানে? লোহার কড়াই থেকে শুরু করে দামী পাথরের বুদ্ধমূর্তি, পালংক, সেফটি রেজার ডাইনিং টেবিল-চেয়ার, কাঁচি, তালা-চাবি—সবকিছুই কেতার জন্য নীলাম-টেবিলে উঠেছে।

স্টেইনারে তখন নীলামদার হাঁকছেন, 'বার্মা টিকের রাইটিং টেবল। একেবারে আনকোরা। ষাট টাকা। ষাট। বলুন কেউ।'

এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা বললেন, 'পঁয়ষট্টি।' অনেক বিবেচনা করে তিনি ঐ দাম বলেছেন বলেই মনে হয়। মুখ-চোখ একেবারে তীক্ষ্ণ। উত্তেজনায় দাঁতে নখ কাটতে শুরু করেছেন। আমি সারা দোকানটায় একবার ঘুরে নিলাম। ওদিকে, দূরে, এককোণে এক দম্পতি একটা ডবল বেডের পালংক দেখছেন ঘুরে ঘুরে, আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস্ করে কথা বলছেন। স্বামী ভদ্রলোক সিগারেট ধরাচ্ছেন। ততক্ষণে বার্মা টিকের রাইটিং টেবিলটা সত্তর টাকায় একজন হেঁকে গিয়েছেন। বেশ ঝকঝকে চেহারা এক তরুণ।

এবার নীলাম হচ্ছে একটা সোফা-সেট। ডাক উঠেছে তিনশো কুড়ি টাকা। পঁচিশ। তিরিশ। শেষকালে তিনশো চৌত্রিশ টাকায় এক দম্পতি আরামদায়ক সোফা-সেটটি পেয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সোফায় একবার বসে দেখেও নিলেন। তাঁদের দুজনকেই বেশ খুশি খুশি ভাব।

ভদ্রমহিলা ঘড়ি দেখলেন একবার। বোঝা গেল, দেরি হয়ে গেছে অনেক।

কোম্পানির একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, দোকান খোলে এগারোটায় এবং নীলাম শেষ হবার পর বন্ধ হয়। কিছু সময় হাতে নিয়ে এখানে আসই উচিত। বেশ ঘুরেফিরে কেনরা একটা আনন্দ আছে। তবে, সঙ্গে একজন থাকলে সুবিধে হয়। একা-একা পেরে ওঠা যায় না। এক-গুঁয়েমি করে ডাক উঠিয়ে যাতে না যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘড়িতে প্রায় পৌনে দুটো। এখন আরো ভিড় বেড়েছে। নীলামদার তখনো হেঁকে চলেছেন, 'একটা এইচ এম ভি এমি রেডিও। একেবারে নতুন' একটা লোক নবটা ঘোরাতেই মেয়েলী গলার হিন্দুস্থানী গান ভেসে এল। ওদিক থেকে এক-জন কত দাম বললেন বোঝা গেল না।

একরাম আলি

আবৃত্তির আসর

আবৃত্তিলোক আয়োজিত সুজাত সদনে গত ২৯ আগস্ট একটি আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রসঙ্গ : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র, অমিয় রায়চৌধুরী, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ, সৌমিত্র মিত্র, কাজল চৌধুরী, কুমকুম দে, কেয়া মুখোপাধ্যায় ও মাধুশ্রী কাহালী, কুমার রায় এবং আরো অনেকে।

প্রথম পর্বে সুকান্তর স্মরণে সুকান্তর কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান শংকর ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, কেয়া মুখো-পাধ্যায়, কুমকুম দে, দেবদুলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় ও কাজল চৌধুরী দ্বৈত কণ্ঠে।

তৃপ্তি মিত্রের 'বোধন' কবিতার আবৃত্তি হৃদয় স্পর্শ করে যায়। 'বোধন' কবিতায় উচ্চারণ গলার নিচু পর্দা থেকে উঁচু পর্দায় অবারিত চলাফেরা অনেকক্ষণ কবিতার সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। মনে দাগ কাটে শংকর ঘোষের কবিতা পাঠ। সৌমিত্র মিত্রের বিষ্ণু দে-র কবিতা 'আত আই চম্পা'র আবৃত্তিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় পর্বে 'স্বাধীনতা তুমি' এই শিরোনামে মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্র-নাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, দীনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংখ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এবং বাংলাদেশের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ শামসুর রহমানের কবিতা, পাঠ ও আবৃত্তি শোনা গেল এই অনুষ্ঠানে।

তরুণ চৌধু

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ।। অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ।। ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইন্‌ক্রিমিন* দিয়ে

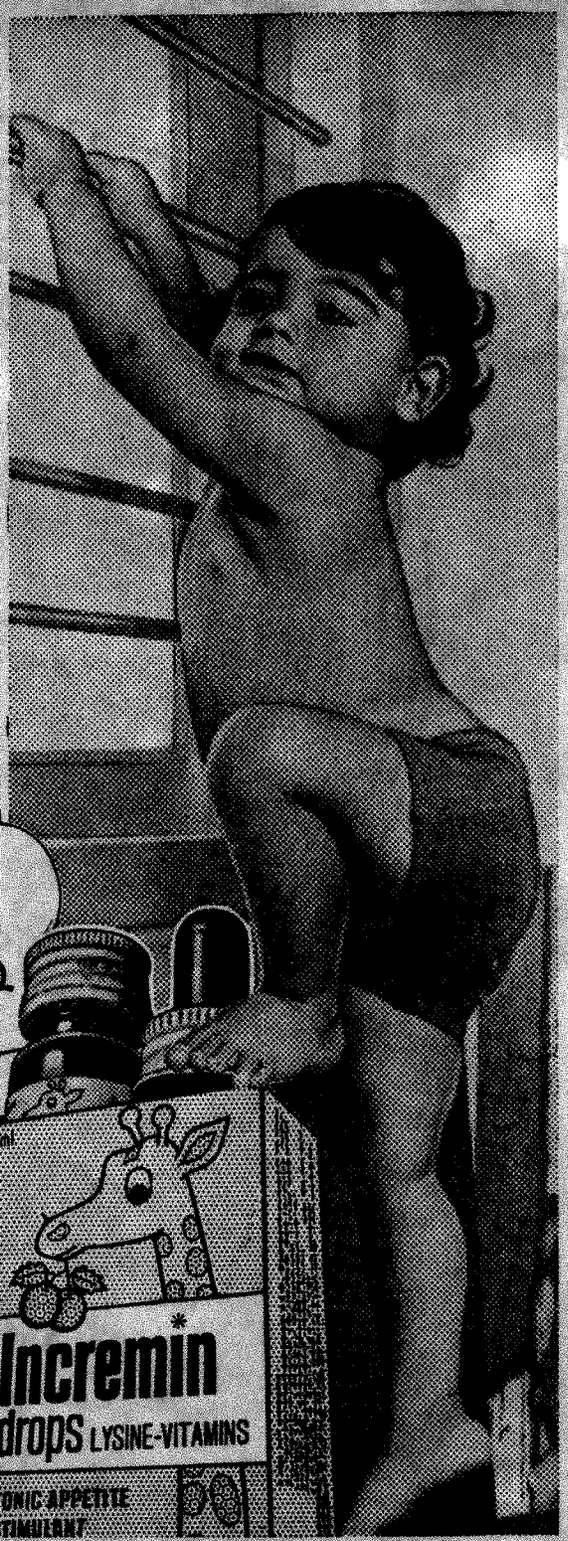

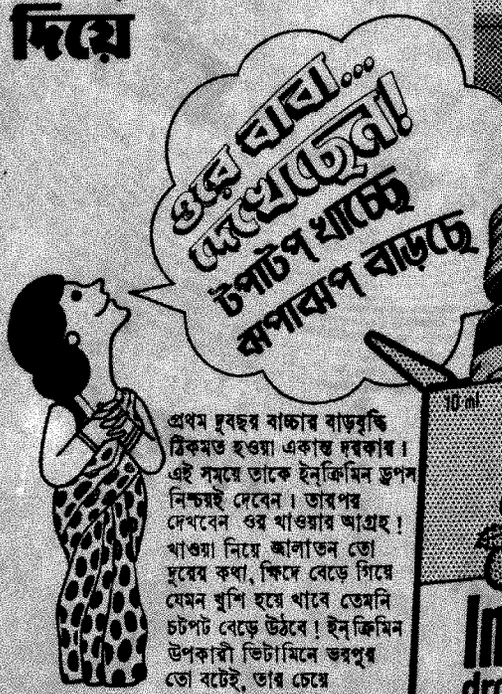

প্রথম দুবছর বাচ্চার বাড়বৃদ্ধি ঠিকমত হওয়া একান্ত দরকার। এই সময়ে তাকে ইন্‌ক্রিমিন ড্রপস নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইন্‌ক্রিমিন উপকারী ভিটামিনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড়কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুরি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইন্‌ক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্য্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম—Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ
আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Sista's-INC-3641-R/78 Ben

Gram : AMRITA Calcutta-700003 AMRITA Phone 55-5231 (14 lines)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সুগৃহিণীদের জন্য!

কুকমী গুঁড়া মশলার

১ কে.জি.'র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

SEP 1977

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

১৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

ABP 353

স্বত্বাধিকারী : এন. কে. গোয়েন্কা এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৭৫ পয়সা

অমৃত

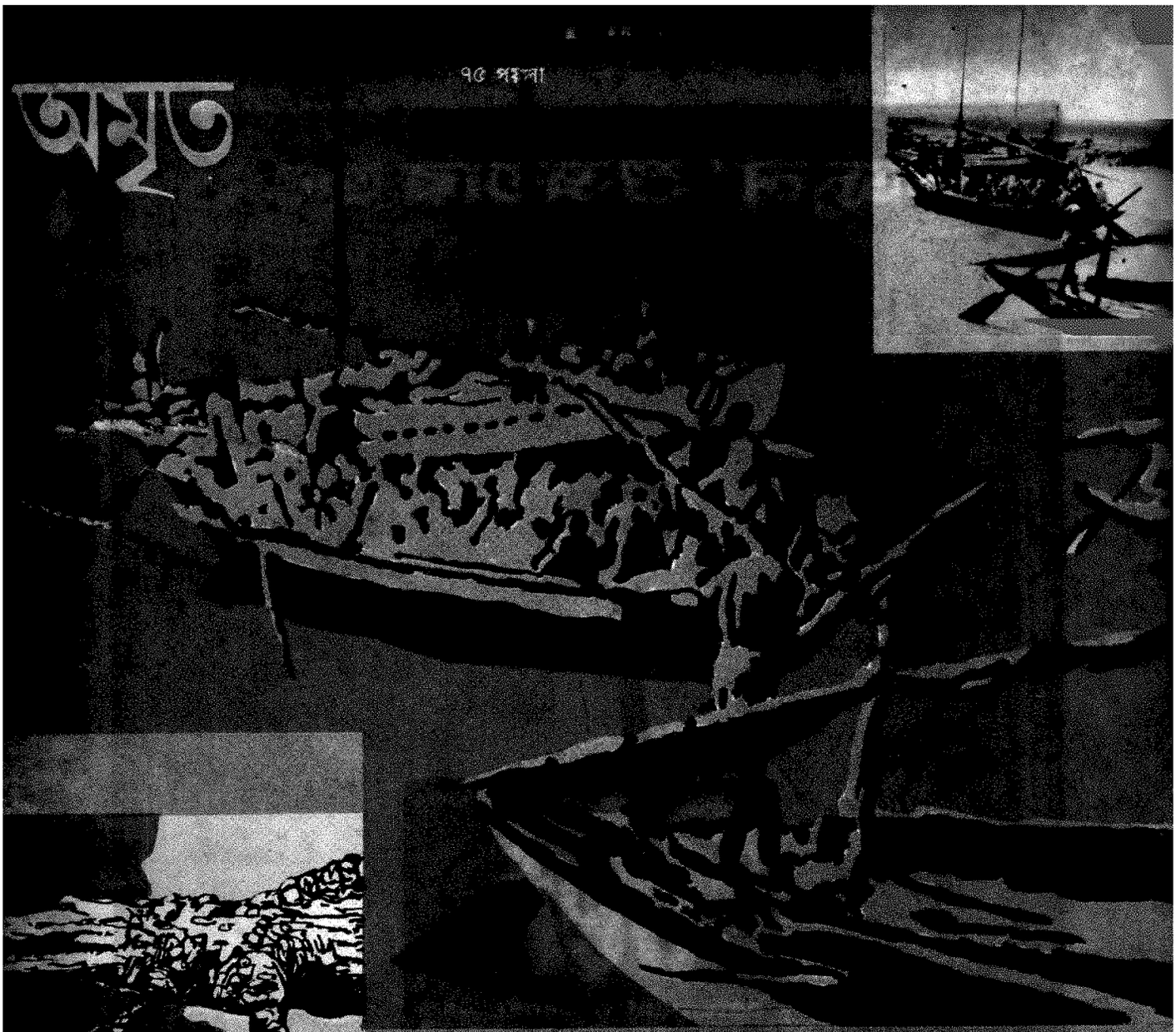

সুন্দরবন বদলাচ্ছে
যেখানে উদ্বাস্তু যায়নি

গৌতম রায়ের গল্প

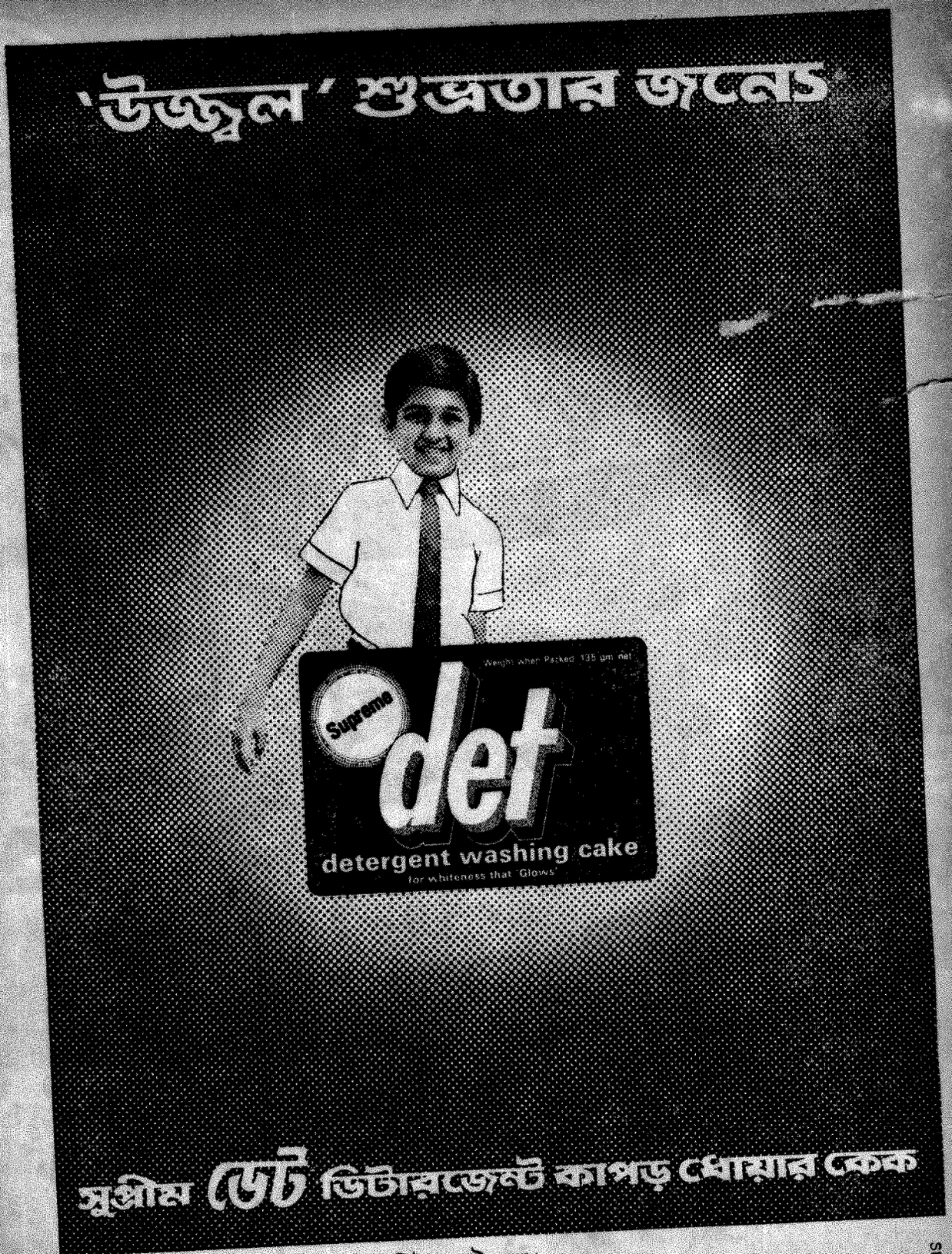

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়, কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

Shilpi-DM TA/76 Ben

শৈলেশ দে'র সাম্প্রতিকতম রচনা

গান্ধীজী ও নেতাজী

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অহিংস ও সহিংস নায়কদ্বয়ের মিল-অমিল, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আপোষ-বিরোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ। জাতির পিতা ও জাতির নেতা দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে, একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে চিন্তাও করা যায় না। যুগে যুগে পরিবর্তনশীল ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দুই মহান্ নায়ককে শত চেষ্টা করলেও বিস্মৃত হতে পারবে না। দাম—২০৲ টাকা

অনুশীলন সমিতির সার্থক নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর সার্থকতম রচনা

বিপ্লবীর জীবনদর্শন ২০৲

স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নির্ভরযোগ্য সৈনিক ও নেতার প্রত্যক্ষ বিপ্লবান্দোলনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। তাঁর বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি-চারণে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু অপ্রকাশিত ও অকথিত ঘটনা-বিন্যাস যা বাংলা গ্রন্থ-সমাজে একান্তই বিরল।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫৲

ভারতের বিপ্লবান্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস-সমৃদ্ধ সুবিশাল গ্রন্থ।

চিরঞ্জীবের কয়েকখানি সেরা বই

শুধু পেলে বা বেকেনবাউয়ার নয়—বিশ্বকাপ ফুটবলে যাঁরা খেলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেই সেরা খেলোয়াড়দের জানবার একমাত্র বই। ৬০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। ২৪ পৃষ্ঠা দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেট। ১৯৩০ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ঘটনাবলী।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫৲

কলকাতা কিভাবে বিশ্ব টেবল টেনিসের দায়িত্ব পেয়েছিল। তারপর নেতাজী স্টেডিয়ামের শুরু এবং নামী-অনামী কত মানুষের আনাগোনা। কে কেমন খেলল—ইত্যাদি নিয়ে গল্পের মত করে লেখা। অসংখ্য ছবি।

বিশ্ব টেবল টেনিস ২০৲

১৯৩২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ভারত যত টেস্টে জিতেছে, তার সবগুলির ধারা বিবরণী। স্কোর বোর্ড, ২০ পৃষ্ঠা ছবি। পরবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে

সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন:

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

ব্রিটাস-BBC.GLX.36-203 BG

অমৃত

১৭ বর্ষ ২১ সংখ্যা
১৩ আশ্বিন ১৩৮৪
30 SEPT. 1977.

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ৪
সমালোচনা ৫
অবসিনিটি ৬ কবিতা সিংহ
চিঠিপত্র ৭
বাজশেখব বসুব চলন্তিকা ১০
উৎপলকুমাব বসু
শারদ সাহিত্যেব পাশাপাশি শাড়ি ১২
অমবেন্দ্র চক্রবর্তী
তুষাব বায়ের কবিতা ১৩
প্রচ্ছদ কাহিনী
সুন্দরবন বদলাচ্ছে ১৪
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
যেখানে উদ্বাস্তু যায়নি ১৬
গৌতম ভট্টাচার্য
লাউডগাব জীবন ও বিভূতিভূষণ ২০
গৌবীশংকব ভট্টাচার্য
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা ২৩
ক্যালিফোর্ণিয়া মলয় ২৪
নবনীতা দেবসেন
বনবিবি উপাখ্যান ৩০
ববেন গঙ্গোপাধ্যায
মিসা-১৯৭৩/৩৪ শ্যামল বায়
পাক দণ্ডী ৩৭ লীলা মজুমদার
বড গানের সমঝদার চিরকালই
কলকাতা ৩৯ সন্ধ্যা সেন
মানুষ তৈবিব কল ৪৩
শৈবাল মিত্র
নিহতেব নাম (গল্প) ৪৫
গৌতম রায
গাঁওবুড়ো (গল্প) ৪৯ অমর মিত্র
খেলা ৫৪
বাঙলাব বাইরে বাঙালী ৫৮
সিনেমা ৫৯
বিচিত্রা ৬৪

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না
লিখেছেন যোগনাথ মুখোপাধ্যায
বিশ্বনাথ বসুর গল্প
উৎপল বসুর কলমে
একালের দাস ব্যবসা
তারাপদ রায়ের
বিদ্যাপতির পদাবলী

এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
ভিতরের ছবি ও অলংকরণ
সমীর সরকার এবং ধ্রুব রায়

ফারাক্কা কলকাতা বাংলাদেশ

অনেক দিনের অধ্যবসায় এবং বহুবার আলাপ-আলোচনার পরেও ফারাক্কার প্রশ্নটি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। বাংলাদেশকে যাঁরা জানেন তাঁদের অজ্ঞাত নয় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ঐ দেশটিকে উষর অঞ্চল বলা চলে না। বরং নদীমাতৃক দেশ বললে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, বাংলাদেশের আসল পরিচয় সেইটেই। গঙ্গা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ছাড়াও অজস্র ছোটোখাটো নদীনালা এবং সংখ্যাতীত খালবিলে সমৃদ্ধ ঐ দেশে জলের আধিক্য ও বন্যাই ছিল বরাবরের সমস্যা; হঠাৎ কেন ফারাক্কা বাঁধ শুরু হওয়া থেকেই সেখানে জলের অভাব নিয়ে এমন আতংক দেখা দিল সে এক প্রশ্ন বটে।

অন্যদিকে, ফারাক্কা থেকে জল না পেয়ে যে কলকাতা বন্দরের নাভিশ্বাস উঠেছে, সেটা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। এবং একথা সকলেই জানেন কলকাতা বন্দর যদি অচল হয়ে যায়, তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের কম করে দশটি রাজ্য এবং নেপাল ও ভুটানের অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড রকম বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে।

ভারত কোনো সময়েই অন্য কোনো রাষ্ট্রের ক্ষতি চায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক তর্কাতীত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। কাজেই বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ভারতেরও আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গেই এটাও নিশ্চয় আশা করা অন্যায় হবে না যে বাংলাদেশও ভারতের স্বার্থের কথা চিন্তা করবে। সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাবের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলমিশ করে থাকা ছাড়া এই দুটি সীমান্ত-সংলগ্ন দেশের পক্ষে আর কী উপায় আছে। বিশেষ করে দুটি দেশই যখন সমস্যা-কণ্টকিত, দুটি দেশেই যখন উন্নয়নের কাজের জন্যে শান্তিরক্ষা চূড়ান্ত রকম জরুরী।

সুখের বিষয়, দুটি দেশই মনে হয় সমস্যার গুরুত্বের বিষয়ে একমত হতে পেরেছে এবং বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলির মারফৎ সে-দেশে কী পরিমাণ জলের জোগান পাওয়া যায় সে বিষয়ে যুক্তভাবে জরীপ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

কাজেই বাংলাদেশের পক্ষে এখন অপেক্ষা করাই হবে সঠিক পদ্ধতি। ইতিমধ্যে ৪০,০০০ হাজার কিউসেক জল যে ফারাক্কার বাঁধ থেকে কলকাতা বন্দরের পক্ষে কী অনিবার্য রকম জরুরী সে বিষয়েও তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন।

সাহিত্য

শেষ নৌকা

অনেকদিন আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা কলেজ স্ট্রীটে ওয়াই এম সি এ-র দোতলার হলে তুষার রায়কে প্রথম দেখি। কবিতা পড়ছিলেন। কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, কবিতার লাইন—সবই নতুন। আকর্ষণ করবার মত আলাদা যেন কি ছিল তাতে।

এরপর অনেকবার তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছে। সব সময় ওঁর শরীর ভালো থাকতো না। একবার খারাপ শরীরে ও কোথায় চলে গেল। ফিরে এলো—তামা, ফর্সা হয়ে। সুন্দর চামড়া। চকচক করছে চোখ। গলায় ফুর্তির হাসি। কথার ভাঁজে ভাঁজে রসিকতা। দেখা হলে ঝুঁকে পড়ে স্বাগতম জানাতো। যেন কলকাতার রাস্তা বা রেস্তোরাঁ—সবই ওঁর নিজের বৈঠকখানা।

তখনই বুঝতে পারি—আবার ওর শরীর খারাপের সময় আসছে। ও নিজেই নিজের শরীরটা হাতের কাছে পাচ্ছে বলে খারাপ করতে খুব সুবিধে। এই সুবিধে থেকেই সম্ভবত ওঁর লেখার জিনিসপত্র সংগ্রহ করে।

সে সময় বুঝতে পারতাম—সামান্য একটা আধুলি কুড়িয়ে পেয়ে আমরা তা ঘষে মেজে তাতে গিয়ে পাঁচ ব্যাটারির আলো ফেলছি—যাতে ঝকঝকে দেখায়। আর তুষারের গেঁজেতে অনেকগুলো রানীর টাকা। ধুলো মাখানো। মাজেও না। আলোও ফেলে না। জীবন নিয়ে মউজে আছে।

রোদে পোড়া দুপুরের কলকাতায় ও দিব্যি নিজের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে বেড়াতো। তখন ও একজন বীর। নানা ভাষার নানা শব্দ বাংলার সঙ্গে যারনী মিশাল দিয়ে দিব্যি বলে যেতো। তখন ও রূপকথায় থাকতো। সেই থাকাটা ছিল ওঁর নিজের কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য। সেই সময়টাও ও নিজে চলচ্চিত্রের বেপরোয়া নায়ক। কিংবা নোয়ার নৌকোর কর্ণধারী গান, ছবি, সংলাপ, শব্দ—সবই ওর ভবে আর বর্ণনায় সিমফনির চেহারা নিত।

একবার প্রায় একটা পুরো দিন ওর সঙ্গে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। সেদিনটা বিশেষ করে মনে আছে। কারণ, তুষারের বাচনভঙ্গী, শব্দচয়ন ভোলা কঠিন। কথা বলার ভেতর কত কল্পনা। যেমন, মস্তান কিভাবে একটি এলাকাকে প্যানিক করে তোলে—তা বোঝাবার জন্যে ও বলেছিল—মহল্লা গরম। এসব কথা বলার সময় তুষারের চোখ, উচ্চারণ—সবই অন্য রকম হয়ে যেতো। বিষণ্ণকে হাসিয়ে বৈকুণ্ঠ প্রসন্ন করে থাকে। সেদিন তুষার বৈকুণ্ঠকে হাসিয়ে তার মনের ভার হালকা করে দিয়েছিল।

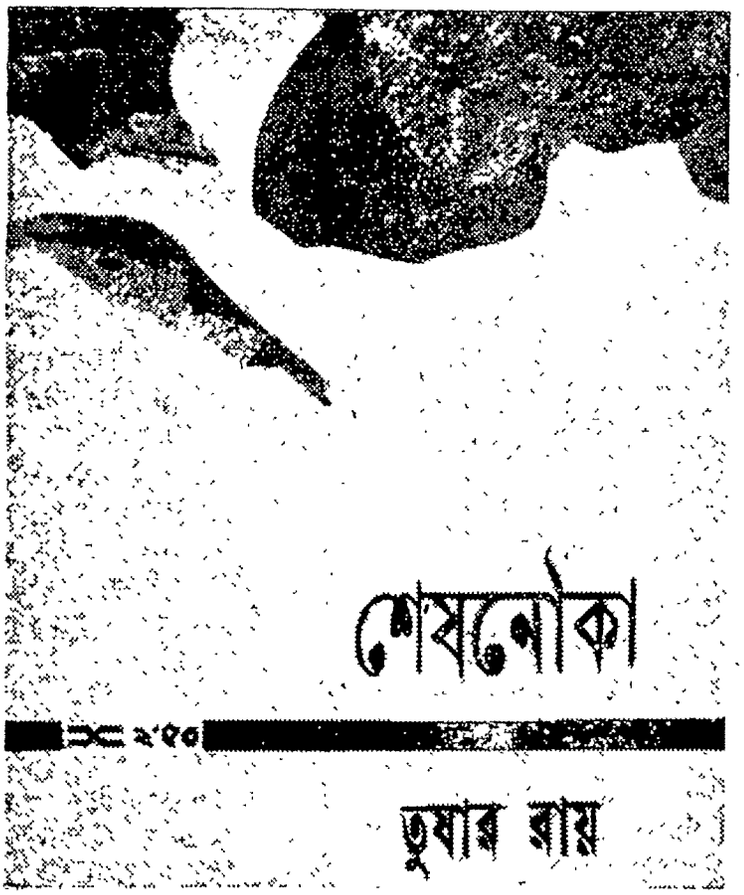

খবর পাওয়া যেতো—তুষার ইনকবি-জিবল্। রঙীন ছায়াছবি করবে। ওঁর কবিতা পেলে পড়ে দেখি। তারে সবসময় কিছু পাই। তুষারের সঙ্গে কোন অভিযানে গেলে ওকে আরও ভালো করে বোঝা যেত। অনেক সময় দিয়ে মিশলে তবে ওর সঙ্গে ওর জগতে যাওয়া যেত।

এরকম একটি অভিযান বিষয়ে ওঁর গদ্যগ্রন্থের নাম—শেষ নৌকা। তুষার লিখেছিল প্রায় দশ বছর আগে। এ লেখা বৈকুণ্ঠ অনেকবার পড়েছে। বোঝাই যায় কাল্পনিক অভিযান। তবু যেন 'অস্তিত্বের' থেকে সত্যতর।' গ্রন্থের পুস্তানীতে লেখা রয়েছে—

'ভাষা নিয়ে ম্যাজিক, শব্দ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—এই সবের বাইরেও আর একটা ম্যাজিক আছে—সে ম্যাজিক নিজেকে হত্যা করার ম্যাজিক—লোকের সামনে দ্যাখানো, যে দেখুন আমি আগুন খাচ্ছি—সেই এক ধরনের ভোজবাজি আছে না—অথচ সে আগুন খাওয়ায় জিভ বুক পুড়ে যায়—সেই রকম ম্যাজিক আধুনিক গদ্য বা পদ্যে দেখাই আমরা, যার ভিতর নিজেকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়—জ্বালিয়ে দিতে হয়।'

কয়েকজন কবি আর লেখক জেলেদের কাছ থেকে 'ক্যানো' ভাড়া নিয়েছে। বেরিয়ে পড়বে শেষ অভিযানে। সমুদ্রতীরে তাদের এক সম্মেলন। তাঁবুতে বসবাস। কাছাকাছি পাহাড়ি গাঁয়ে মেলা বসেছে। প্রচুর পান-ভোজন। সুন্দরী স্ত্রীলোক। জীবতের ছন্দী।

এসব দিয়ে শেষ নৌকার একটি কাহিনী সাজিয়েছিল তুষার। এটা আপাত কাহিনী। ভেতরে পরম প্রত্যক্ষ হয়ে বসে আছে তুষার। তার প্রিয় খাদ্য। প্রিয় বাচনভঙ্গী। প্রিয় পোশাক ও পরিবেশ—সাক্ষ লেখায়। তুষারের পছন্দমত চেহারার মেয়ে এই কাহিনীতে চলাফেরা করেছে। কাহিনীর আকাশে তারই পছন্দমত মেঘ।

সেই যে একদিন তুষারের সঙ্গে একটি দিন কাটিয়েছিলাম—তারই স্মৃতির সঙ্গে এই গ্রন্থের ভাষা, ভঙ্গী—সবকিছু মিশে যাচ্ছে।

আজ সকাল থেকে—প্রায় বারো ঘণ্টা হোল—দুপুরে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি—এই বইখানি পড়ছি—আর দ্রুতই একটা ধারণা লিখবার চেষ্টা করছি। কিছুতেই পারছি না। ফিরিয়ে ফিরিয়ে পড়ছি। অনেক জায়গা ভীষণ ভালো লাগছে। অনেক জায়গা ভীষণ ছেলেমানুষী। তাও সুন্দর। চিনতে পারছি—এইসব ভাবনার সঙ্গী একদা তো আমিও ছিলাম। এখন আর নই। সে স্বর্গে থাকতে পারিনি। তুষার পেরেছিল। অবিশ্বাস ও ফুর্তির জন্যে আমরা অনেকেই পারিনি। তাই কি তুষারকে গোপনে আমরা অনেকেই ভালোবাসতাম। এখনো বাসি। কিছু বুঝে: কিছু না বুঝে। যেখানে স্নেহ কাজ করে। মোটা হয়ে গেলে—বয়স বেড়ে গেলে বোধ হয় এরকম হয়। তাই ব্যান্ডমান্টার—

তুষার তাঁর নৌকা নিয়ে চলে গেলো।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সমালোচনা

কলকাতার তানসেন, সদারঙ্গ, সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন কিংবা গোয়ালিয়র, বোম্বাই, মথুরার এলাহি গানের মজলিসে বিশাল সামিয়ানা অথবা রাজকীয় প্রাসাদ মঞ্চে চোখ ঝলসানো আলোর রোশনাই, আতর-গুলাব খুশবু আর চিকন কাজের লক্ষ্ণৌ পাঞ্জাবি গায়ে ভারতের নামী দামী ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েরা আসর মাত করেন। রাত ভোর রাত জাগা চোখে সুরের ফুল ফুটে যায় দরদী শ্রোতার। তারপর একদিন সম্মেলন শেষ হয়। বিষণ্ণতার সুর ভাসে যেন বিসর্জনের বেদনায়। শূন্য মণ্ডপের বুকে দাঁড়ালে কি তখন অন্য কিছু শোনা যায়? রাগরাগিণীর আলাপ, জোড়, ঝালা ছাপিয়ে অন্য কোন সুর? অন্য কোন গান? হয়তো শোনা যায়। নির্জন মণ্ডপের নিঃসঙ্গ হাওয়ায় তখন বুঝিবা ভেসে বেড়ায় অন্য এক সুর। এক শীতল যন্ত্রণার অনুভূতিতে যেন সেই সম্রাট গাইয়ে বাজিয়েদের বুক ঠেলে উঠে আসে সেই সুর। আর তখনই সেই সব অপার্থিব চরিত্রগুলির অন্তরস জীবনের রাগরাগিণী তাদের মানবিক চেহারাটিকে স্পষ্ট করে। তখন মন্ডপ জুড়ে খুশীর খুশবু নেই। ওস্তাদি গানবাজনার কেয়াবাৎ সামলাতে ঘন ঘন মাথা নাড়া নেই। ক্লান্ত শ্রোতার চোখ ছুঁয়ে এক বিষণ্ণ জলছবি—মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত বিখ্যাত সরোদিয়া কুমার নাথ। গায়ে টুটা ফাটা জামা। কপালে কালশিটা। সুরের সম্রাট সুরার নেশায় মাতাল। স্খলিত চরণে কোনমতে দাঁড়িয়ে। চোখে ভাসছে সেই চিঠি, 'কুমার আমায় ক্ষমা কোরো। ...আমি চাইনি তুমি আস। তবু তুমি এলে...! প্রিয়া।' পাশে দাঁড়িয়ে আরও একজন—তবলিয়া চন্দ্রজিৎ। জিপবন্দনী খুলে তবলা বাঁয়া বের করে যন্ত্রণার শব্দে ধিনি বলেন, 'গম তো ভালা ছুপা লিয়া, আঁসু ক্যায়সে ছুপাউ ম্যায়।'

শূন্য মঞ্চে আরও অনেকেই আসেন। চোখ বন্ধ করে আঁখি দেবী ধরেন ভীম্ পলশ্রী। সেই আঁখি দেবী—দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি পায়ে পায়ে মাড়িয়ে গঙ্গার ঠান্ডা জলে শরীরটা ছেড়ে দেওয়ার মুহূর্তে ঐখান ঘাট থেকে শুনেছিলেন এক অলৌকিক কণ্ঠ—'ন্যায়সা কাম না করো মায়ী। ঘর যা মায়ী, ঘর যা।' এমনি কত ছবিই শূন্য মণ্ডপের বিষণ্ণ নির্জনতার যন্ত্রণা হয়ে ভেসে বেড়ায়।

অরুণ বাগচীর উপন্যাস 'আশাবরী'তে সুর সাম্রাজ্যের সেই সম্রাট সম্রাজ্ঞীদের জীবনের কিছু ঘনিষ্ঠ মানবিক ছবি দেখেছি। সম্মেলন মহাসম্মেলনের প্রমত্ত কলরব থেকে যা আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এক নিঃশব্দ মণ্ডপে। যেখানে সম্রাটের চোখে জল। সম্রাজ্ঞীর বুকে বেদনায় জলছবি।

নিঃশব্দ বেদনার গান

আর অরুণ বাগচী সেই সঙ্গে সম্মেলন মহাসম্মেলন, কনফারেন্স মহা-কনফারেন্সের নেপথ্য চলচ্চিত্রটিও অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন। সেখানকার প্রতিটি চরিত্রই অভিজ্ঞতায় বাস্তবে জীবন্ত।

'আশাবরী'তে অরুণবাবু এক কর্মময় সমারোহের রাজত্বের অলৌকিক নায়ক-নায়িকার জীবনঘনিষ্ঠ সুর, তাল, লয়কে শুনিয়েছেন পাখা ওস্তাদী কেরামতিতে।

অরুণ বাগচী

বাস্তব চরিত্রগুলির সঙ্গে কাল্পনিক চরিত্র-গুলিও তার মুন্সিয়ানার দৌলতে সীমারেখা মুছে ফেলেছে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশাবরী। অরুণ বাগচী। আনন্দ পাবলিশার্স। দাম ছ' টাকা।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস

'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বায়োস্কোপ। আসুন। দেখুন। যাহা কেহ কখনো কল্পনা করেন নাই, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ, জীবজন্তু, জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।'

এটা সে যুগের বিজ্ঞাপন। সে যুগ মানে সবে যখন হীরালাল সেন, স্টিভেন্সনের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী দেখে উৎসাহী হয়েছেন। ভাই মতিলালকে নিয়ে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানী গড়েছেন।

এদেশে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭তে হীরালাল উৎসাহিত হলেন এবং সেই বছরেই এই বাংলাদেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। পরের বছর ১৮৯৮ সালে বাংলার বাইরে ছবি দেখানর ব্যবস্থাও তিনিই করলেন। ইনি প্রায় কুড়িটা ছোটবড় ছবি তোলেন। প্রায় সবকটাই দর্শকদের আনন্দ দেয়।

বাংলাদেশে যখন হীরালাল সেন, মতিলাল সেন, অমর দত্তরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে উৎসাহে টগবগ, তখন বোম্বেতে ভাট ওয়াদেকর, টোরনি, চিত্রা, ফালকে সাহেবকেও ঠিক একই উৎসাহে টগবগ হতে দেখি। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে ডি জি ফালকে একটি স্মরণীয় নাম। কিভাবে চলচ্চিত্রকে ব্যবসা করা যায়—সে ব্যাপারে তিনিই পথপ্রদর্শক। ১৯১৩ সালে 'রাজা হরিশচন্দ্র' নামে একটি ছবি ডি জি ফালকে পরিচালনা করেন।

১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ষোল বছরে ২৫৪টা পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি মুক্তিলাভ করে। ১৯১৩ সালে প্রথম বাংলা-ভাষায় নির্বাক ছবি 'বিল্বমঙ্গল' মুক্তিলাভ করে। আর ১৯৩১ সালে প্রথম মাতৃম কোম্পানী বাংলা সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' প্রযোজনা ও মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেন।

এইসব খবরাখবর জোগাড় করেন একজন বাঙালী খামখেয়ালী। নাম: প্রণব-কুমার বিশ্বাস। প্রথম প্রথম শখের জন্যে চলচ্চিত্রের প্রচার পুস্তিকা সংগ্রহ করতেন। তারপর একদিন সেটা নেশায় পেয়ে বসল প্রণববাবুকে। প্রণববাবু তখন নেশার মধ্যে ২৫৪টা ছবির সংক্ষিপ্ত গল্প, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সেই সময়কার বিজ্ঞাপন, নেপথ্যের গায়ক-গায়িকা, কোন্ কোন্ হলে সেইসব ছবি দেখান হত, সেইসব ছবির প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, শিল্প-নির্দেশক কারা ছিলেন, সেসব সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রথম খণ্ডে সেইসব খবরের ইতিহাসও লিখলেন। শুধু খেয়াল বশে একজনের মধ্যে এতোবড়ো একটা শিল্পের ইতিহাস, পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে চলেছে।

এই বই পড়তে পড়তে আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে—যেসব খবর এখানে নেই। যেমন তখন কোথায় কোথায় স্টুডিও ছিল। সেইসব স্টুডিওই বা কেমন ছিল—যন্ত্রপাতি তখন কতখানি সহজলভ্য হতো, কলাকুশলীরা কিভাবে তাঁদের সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করে কাজ করেছিলেন—সেসব খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে; আশাকরি পরবর্তী চারখণ্ডের কোন এক খণ্ডে সেই তথ্যবহুল ইতিহাস আমরা পড়বার সুযোগ পাব।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেন, ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যতগুলো ছবি তৈরী হয়েছে তার মধ্যে বারোটা ছবি নিঃসন্দেহে উল্লেখ-যোগ্য। চণ্ডীদাস, আলিবাবা, গোরা, দেবদাস, উদয়ের পথে, বিদ্যাপতি, প্রফুল্ল,

অবসিনিটি

কবিতা সিংহ

কয়েকটি কারণে 'অবসিনিটি' শব্দটির বাংলা করার চেষ্টা করলাম না। কেন করলাম না, তা ক্রমশ প্রকাশ্য। এই শব্দটির অনুমেয় অর্থের কাছাকাছি হয়তো বাংলা 'অশ্লীলতা' কথাটি কিছুটা পৌঁছোয়। সম্প্রতি আর একটা কথাও চালু হয়েছে।—অপসংস্কৃতি। 'অপসংস্কৃতি' শব্দটি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য হয় বলেই আমি মনে করি।

ইতরজনের অশ্লীলতাকেই ভদ্র পোশাক পরালে তাকে ধরা শক্ত হয়। তাই 'অপসংস্কৃতি' কথাটি দিয়েই তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই 'অপসংস্কৃতি'র প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা ভদ্রলোকবর্গ এবং দেশি-বিলাতি ডিগ্রির ছত্রছায়ায় শাসিত বলে 'অবসিনিটি'র অভিযোগে তাঁদের কোমরে দড়ি পরানো সহজ নয়।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে যারা নিছক পর্ণোগ্রাফী বিক্রি করতো, তাদের হাতে হাতকড়া লাগাতে এক মিনিটও লাগে না, কিন্তু যারা ওই পর্ণোগ্রাফীকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গান, কবিতা, উপন্যাস বলে চালান, তাঁদের হাতে একবার হাতকড়া পরিয়ে দেখুন না। তখনই তারা ডি এইচ লরেন্সের সামান্য উত্তরসূরী বলে গিয়ে জেহাদ ঘোষণা করবে। অশ্লীলতার অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে কিন্তু জেলে গিয়ে প্রতিবাদ জানানোর মত কোমরের জোর না থাকায় জরিমানা দিয়ে ছাড় আদায় করে নেবে। ঠিক তেমনি, যেসব মেয়ে 'ঝুমুর' 'খেউড়' 'লেটোর' দলে কোমর দোলায় তারা হল কুরুচিপূর্ণ নাচওয়ালী অথচ নামী হোটেলে টুপিস্ সুইম স্যুট পরে তার চেয়েও বেশি কোমর দোলালে তারাই বনে যায় 'ক্যাবারে ড্যান্সার'। এবং এসব আইনের ফাঁক হল ভদ্র পাংলুন-ধারীদের জন্য, যারা কথায় কথায় বিদেশী স্বাধিকারের দোহাই পাড়ে।

অবসিনিটি নামক বিষয়টি কি? এবং কেমন? —ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৪-এ তার হদিশ মিলবে। মোটামুটি, 'অবসিন' বই, পুস্তিকা, ছবি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রচার, বিক্রি, আমদানি রপ্তানি দণ্ডযোগ্য। 'অবসিন' জিনিসপত্র কাঁচা বয়েসের ছেলেমেয়েদের কাছে বিক্রি করা অবৈধ, 'অবসিন' গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ও ক্রিয়াকর্ম জনসমক্ষে করাও অবৈধ। চলচ্চিত্র, ওষুধ, ম্যাজিক প্রতিষেধকও 'অবসিন' হলে তার বিক্রি, ভাড়া দেওয়া, প্রদর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি অবৈধ।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, ভদ্রলোকেরা আইনের ফাঁক দিয়ে বহন করে আনেন তাঁদের অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও অবসিনিটি। কি করে? —যেমন ধরুন, 'অবসিনিটি'র অপরাধে যেসব বিদেশী গ্রন্থ অপরাধী হয়ে আছে, সে-সব গ্রন্থের যা বিষয়বস্তু, তার চেয়ে আরো অনেক উলঙ্গ বিষয়বস্তু এখনকার অনেক বাঙালী ঔপন্যাসিকরা হেলাফেলা করে লিখে থাকেন। হেলাফেলা অর্থে তা ভারতীয় সমাজ-সংসারে আদৌ প্রযোজ্য কিনা না ভেবে। এবং সে-সব লেখার ওপর কিছুমাত্র সেন্সর হতে দেখা যায় না। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার ভারতে নিষিদ্ধ। কিন্তু এইসব ভারতীয় লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারগুলির জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

কাকে প্রকৃতই 'অবসিন' বলা যাবে, কিংবা কোন 'অবসিনিটি' বিতর্কিত? —তাই বা বলে দেবে কে? জেনেভাতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে 'সাপ্রেশন অফ সারকুলেশন অফ অ্যান্ড ট্রাফিক ইন অবসিন পাবলিকেশন' সম্বন্ধে আইন প্রণীত হয়েছিল, তারই ছাঁচে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারাটি কৃত। কিন্তু তখনো লর্ড ক্যাম্বেলের আইনে 'অবসিন' কথাটির একটা ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তাতে লর্ড ক্যাম্বেল বলেছিলেন—যেসব লেখা মানুষের নীতিবোধকে, বিশেষতঃ গুরুজনের নীতিবোধকে নষ্ট করার একমাত্র ও অনন্য উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়, যে-সব বইতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রচলিত শালীনতাবোধকে প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়, সে-সব বই-ই মাত্র 'অবসিন'।

শহর থেকে দূরে, নন্দিনী ভাবীকাল, নর্তকী, সাপুড়ে প্রভৃতি ছবি আজকের তুলনায় প্রযুক্তিগত কলাকৌশল নিম্নমানের হতে পারে, কিন্তু মানবিক আবেদন তো বটেই অভিনব বিষয়-বৈচিত্র্য ও তা রূপায়িত করবার নব নব রীতি প্রবর্তনার দিক দিয়েও সেসব ছবি নতুন করে বিচার করার প্রয়োজন আছে। ভবতোষ চৌধুরী

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। প্রণবকুমার বিশ্বাস, সমকাল প্রকাশনী, ৮।২, গোয়ালটুলি লেন। কলকাতা-১৩। দাম পঁচিশ টাকা।

আঞ্চলিক ইতিহাসের এক অমূল্য গ্রন্থ—

ঘাটালের কথা

পঞ্চানন রায় ও অধ্যাপক প্রণব রায় রচিত

আর্টপেপারে ছাপা বহু ছবি ও দুষ্প্রাপ্য মানচিত্রসহ। ২০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বাণীসংসদ

১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে

গ্রন্থ রচনায় লেখক যতটা পরিশ্রম করেছেন ততটা সফল হয়েছেন, এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে না। কেননা গ্রন্থটির অধ্যায়গুলির বক্তব্য পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে, এসব কথা তো জানাই আছে, এসব তো এর আগে কেউ না কেউ আলোচনা করে গেছেন। এর মূল কারণ হল গ্রন্থের বিষয়বস্তু এমনই যে এ সম্বন্ধে পুরোপুরিভাবে নতুন কিছু বলতে না পারলে আলোচনায় পূর্ববর্তী লেখকদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যাবেই। জানি না, হয়তো বা গ্রন্থের আয়তন আরো সংক্ষিপ্ত করা হলে এই অসুবিধা ঘটত না। তবে গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। তাছাড়া আর একটা প্রশ্ন মনে জাগে—গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রচুর উদ্ধৃতির সার্থকতা আছে, নাকি নেই। কেন জানি না, আমার মনে হয় যে গবেষক যখন নতুন কোন বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্য কারো উদ্ধৃতির উল্লেখ তার পক্ষে যথাসম্ভব না করাই ভালো। তা করলে গবেষকের নবতর বক্তব্যের নবত্বের হানি হয় না কি? যেমন ধরা যাক, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মনে করেন 'বিষবৃক্ষ' প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মত যে যৌক্তিক তা প্রমাণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। তার মানে এই দাঁড়ায় নাকি যে লেখক রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থন করছেন অর্থাৎ—নিজের কোন নতুন বক্তব্য রাখছেন না? উদ্ধৃতির মাধ্যমে অন্যের বক্তব্যের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপন এবং স্বীকৃত সত্যের স্তূপীকরণ—এই যদি গবেষণার অর্থ হয় তাহলে তো গবেষককে অন্যের গোবর খুঁজেই নাকাল হতে হয়। আমার এই বক্তব্য অবশ্য নিছক এই গ্রন্থটিকে লক্ষ্য করে নয়, যে কোন গবেষণা গ্রন্থেই তো দেখা যায় অসংখ্য উদ্ধৃতি।

যাই হোক, এই গ্রন্থটি কিন্তু সুলিখিত। লেখকের বিশ্লেষণী ক্ষমতার ছাপ এতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ যাঁরা পাঠ করবেন, তাঁরা এই গ্রন্থটি পড়ে বাংলা গদ্যের সূচনা, তার ক্রমবিকাশ এবং উপন্যাসের উদ্ভব ও তার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন যুগের বাংলার নবজাগ্রত মানসিকতার প্রকাশ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ধারণা করতে পারবেন।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে : অশোককুমার দে। জিজ্ঞাসা। কলকাতা ৯। দাম বারো টাকা।

কিন্তু আসুন দেখা যাক, এই অবসিনিটির বিষয়ে বহু বিতর্কিত লরেন্স সাহেব নিজেই কি কি বলছেন। তিনি বলেছেন, 'অবসিন' শব্দটা এসেছে 'অবসিনা' শব্দ থেকে। যার মানে মঞ্চের ওপর যা দেখানো যায় না। তিনি তুলেছেন সেই পুরোনো কথা। হ্যামলেট এককালে ক্রমওয়েলীয় জনতাকে ক্রুদ্ধ করেছিল, এ্যারিস্টোফেনিস এখনো মানুষকে আঘাত দেয়—তাহলে কি তারা অবসিন?

এরপর তিনি জনতার কথা বলেছেন। বলেছেন মানুষের ভিড় হল চিরকালই স্থূল চরিত্রের। ভিড়ের মনোভাব মানুষের নিজস্ব মনোভাব নয়। মূল মনোভাব নয়। মানুষের ভিড়ের মনোভাব তাদের একস্প্লয়টাররা তাদের মধ্যে হঠকারিতার সঙ্গে চালান করে দেয়। অন্তরের আন্তরিকতা থেকে সে মনোভাব উঠে আসে না। তাই ভিড় চিরকালই 'অবসিন', ভিড় চিরকালই 'সেকেন্ড হ্যান্ড' ভাবনার খদ্দের।

সব কথা বেশ ঠিকঠাকই যাচ্ছিল, লরেন্স যখন হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন যে, বোকাচ্চিও-র 'ডেকামেরন নাইট'-এর গল্পগুলি বেশ স্বাস্থ্যকর, কিন্তু শার্লট ব্রন্টির 'জেন আয়ার', ভাগনারের 'টিস্টান অ্যান্ড আইসোল্ডে', এমনকি কিছু কিছু জনপ্রিয় খ্রীস্টান প্রার্থনা-গীতিও তার কাছে প্রায় পর্ণোগ্রাফী, এমনকি জয়েসের 'ইউলিসিস'ও তার কাছে 'অবসিন', তখনই কেমন যেন তাঁর বিচার-বুদ্ধির সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হতে লাগল। এ-কথা সত্যি যে, সময় কাল ও দেশের ব্যবধানে অবসিনিটির মান বদলায়। সমাজ কতটা গ্রহণ করতে পারে বা নিতে পারে, তার ওপর অবসিনিটির বিচার চলে। আমাদের সাহিত্যে সমাজের সকল সমস্যাকে পিছনে রেখে পর্ণোগ্রাফী লেখার এত মাতামাতি এই জন্যেই যে, পর্ণোগ্রাফী খুব সহজেই লেখককে পরিচিত করে তোলে। সেই জন্য আজও খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের জনপ্রিয় সাহিত্য হল এস্কেপিস্ট সাহিত্য। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, সমাজ ব্যবস্থার আমূল বিবর্তন, সমাজের ভেদাভেদ সমস্যার কথা সাহিত্যের মধ্যে এসেছে উপ-চরিত্র হয়ে। মূল বিষয় হয়ে নয়। উপ-চরিত্র হিসেবে এসব উপাদানের বুড়ি ছুঁইয়ে রাখলে কারো তেমন কিছু বলার থাকে না, লেখকও খুব মডার্ন বলে কীর্তিত হন। তবে একথা বলছি না যে আন্তরিক লেখা বাংলাসাহিত্যে একটিও নেই। অবশ্যই আছে। কিন্তু সাময়িক আগাছার সেই সব চিতন্তন শিলালিপি কে আর উল্টে পাল্টে দেখে?

অশ্লীলতা বা অবসিনিটি আজকে তাই আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। বরং বলা যায় অতীত সমস্যা। আমরা কলকাতার মানুষেরা ধোঁয়াশার নিঃশ্বাস নিয়ে, ডিজেল গলাধঃকরণ করে, কর্পোরেশনের পানি খেয়ে যেমন 'ইমিয়ুন' হয়ে গেছি তেমনি পদে পদে অশ্লীলতা, চতুর্দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে আমাদের অবরোধের দুর্গগুলো অকেজো করে দিতে গিয়ে নিজেরাই অকেজো হয়ে পড়ছে। 'কন্ট্রাসেপ্টিভ' ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন বলে, একদাম যেশে শ্রীমতী এ্যানিবেশান্ত সাজা পেয়েছিলেন আজ সে-দেশে ফ্রক-পরা বালিকারা হাসপাতালে আইনানুগ গর্ভপাত করতে যাচ্ছে লাইন বেঁধে। এরপরেই কি অশ্লীলতা বা অবসিনিটির পক্ষে ধুতু ফেলে ডুবে মরার কথা আসে না?

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে সমাজ আরো অনেক বেশি বিষ গ্রহণ করে নিতে শিখেছে। কিন্তু মানুষের যা চরম ক্ষতি, তা ঘটছে অন্য ভাবে। মানুষ আজ পতনের দিকে আরো একপা এগিয়ে গিয়ে নিজের যৌন উত্তেজনার হরেজোড়িকেও অস্বীকার করছে। সে যেন নিচ্ছে সঙ্গমের পরের ক্লান্তিকে সঙ্গমের আগেই। মদের নেশা, ধোঁয়ার ঝিমুনি কিংবা বড়ির ঘুম।

এই ভয়ংকর ভয়াল অমানুষিক অবসিনিটির দিকে আজ যে ক্ষতিকর সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক ও অন্যান্য উপাদান আমাদের ক্রমশ এগিয়ে দিচ্ছে, আসুন আমরা শেষরাতের মত ঘুম কাটিয়ে উঠে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলি—আমরা সুস্থ স্বাস্থ্যকর মানবিক সৃষ্টিময়, মহাকাব্যের—ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যের মহান যৌবনবোধ ফিরে চাই।

চিঠিপত্র

নিয়মিত 'অমৃতে'র পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখে আসছি বিগত ৩০ সংখ্যা থেকে এযাবৎ ৩৯ সংখ্যাটি বিশেষ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমার। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ এক নতুন পদক্ষেপ বলা যায়। এবং এ-কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পাঠক-মনে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছে, বিশেষ করে বৈকুণ্ঠ পাঠককে দেখে মনে হচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস বা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি না হয়ে যান। উত্তরোত্তর পত্রিকার চেহারা ও রুচিসম্মত লেখা পত্রিকার মান বৃদ্ধি করেছে।

পরেশ দাস,
হাবড়া, ২৪ পরগণা

সজনীকান্ত না হয়ে যান

ভাল লেখা পাচ্ছেন না?

বৈকুণ্ঠ পাঠক, আপনার লেখার মধ্যে যে আর কিসসু খুঁজে পাচ্ছিনে। সাহিত্য দ্বারা পরিচালিত হলে ভাল হয় নাকি? একজনের চিন্তাধারা যত মুক্তই হোক না কেন, যে-কোন বিষয়ে কিছুটা সংকীর্ণতা প্রকাশ পাবেই। এবং বিষয়-বস্তুর বিভিন্নতাও ভেবে দেখবার মতো। অতএব এ-যাত্রায় সাহিত্য নামক ফলটি আপনি ভক্তিভরে বিশ্বেশ্বরকে দান করুন, এই কামনা।

আর, ভাল লেখা পাচ্ছেন না, তাই না? নতুন লেখকদের লেখা একবারও পড়ে দেখেন? মন দিয়ে একটু পড়ে দেখলে বুঝবেন, নতুনেরা অনেক মার্জিত, যত্নবান। অন্ততঃ অমৃতের প্রখ্যাত লেখকদের মতো ঘন ঘন দুর্গন্ধময় বমি করেন না।

কমল আচার্য,
কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি,
৭৩৬২০২।

হরিবিলাস আর কাঞ্চনদের কাগজ

১ জুলাইর কাগজে বৈকুণ্ঠ পাঠকের কলমে পাঠক কোন এক পাঠকের মতামত উদ্ধৃত করেছেন যে, 'অমৃত'টা নাকি—ছ্যা ছ্যা, ওখানে কে লিখবে। যিনি এ-কথা বলেছেন, তিনি অবশ্যই হরিবিলাস আর কাঞ্চনদের দলে নন। এবং তাঁর লেখা হরিবিলাস এবং কাঞ্চনদের ছাড়া আর কোন কাগজে বেরোচ্ছে কিনা জানি না। তবে আমি হরিবিলাস আর কাঞ্চনদের একজন হয়েই বলি, সারা বাংলাদেশে যাঁরা অমৃত পড়েন এবং অমৃত-র মত প্রথম শ্রেণীর একটি পত্রিকায় আশ্রয় পেয়ে যাঁরা সাহিত্য করতে চান, তাঁদের কাছে অমৃত হরিবিলাসের পত্রিকা হয়েই থাকুক। শিল্প ও সাহিত্য কারো একচেটিয়া নয় একথা বৈকুণ্ঠ পাঠক আপনার, আমার সকলেরই। তাই কোনো কাগজে তার সাহিত্য ও শৈল্পিক উৎকর্ষ কতখানি বাড়ল বা কমল সেটিই মুখ্য বিচার্য—বিচার্য নয়, তাতে নামী কোন্ লেখক লিখলেন, না অনামী কোনো হরিবিলাস, কাঞ্চন লিখলেন।

পিনাকবিজয় চক্রবর্তী,

কাউকে তোয়াজ করবেন না

'অমৃত' পত্রিকায় নিয়মিত বৈকুণ্ঠ পাঠকের ঝাল-মিষ্টি-টক (বিদগ্ধ পাঠকের ভাষায় বটতলা-মার্কা রচনা) সাহিত্য-ফিচার পড়ছি। ঠিক চাটনির মতো লাগলেও, মাঝে মাঝে বাঘা তেঁতুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠবাবুর লেখা অনেক ক্ষেত্রে তোয়াজ করা, নয়তো অন্য কারুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো। মশাই, লেখার মত লিখুন, নচেৎ অমৃতের পাতায় বেফালতু কেরামতি ফলিয়ে লাভ কী। কাউকে তোয়াজ করে তার নামের জাহেরি করবেন আর কাউকে বা ভাষার চাবুকে জর্জরিত করবেন, এ কোন্ ধরনের প্রবণতা? জেগেও ঘুমানোর ভান করা যে জাতির স্বভাব, শত বাক্য-বর্ষণেও সে-জাতির সাংস্কৃতিক চেতনার পূর্ণ জাগৃতি ঘটবে বলে আশা করা যায় কী?

ইনসান আলী সেখ,
'বাংলা আমার মাটি আমার'
দঃ হাসিমনগর

অপূর্ব লিখছেন

বেশ কিছুদিন ধরে 'অমৃতে' বৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখা পড়েছি। আজও তার 'ভুলিতে চাই' পড়লাম। অপূর্ব লিখেছেন তিনি। সাচ্চা কথা বলেছেন। প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য। বং আর পোশাকের আড়ালে আধুনিক সাহিত্যের বিকৃত কমার্সিয়াল রূপটিকে পাঠকের সামনে সহজ সরল বোধগম্য করে তুলে ধরেছেন। তার এই স্বচ্ছ ও খাঁটি দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক-সমাজের সমর্থন পাবে। প্রতিটি মানুষ আধুনিক সাহিত্যের উপর দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। আধুনিক সাহিত্যের হতাশা সাধারণ মানুষের সরস মনোবৃত্তিকে মরু-ভূমির মতো শুষ্ক ও নীরস করে তুলছে। অথচ তাদের বলার ভাষা নেই। বৈকুণ্ঠ পাঠক তাদের সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন।

আশা করি তার লেখা আরও যুক্তি-নির্ভর ও সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক সাহিত্যকে বিপদমুক্ত হতে সাহায্য করবে।

নিয়াজুল হক
দক্ষিণকুল, বর্ধমান।

আপনি এখন কত দশকের?

প্রিয় বৈকুণ্ঠ। আপনি এখন কত দশকের? কিছুদিন আগেও আপনি 'আবার একজন রবীন্দ্রনাথের' জন্য বুক ফাটিয়েছেন, আবার ১৫ই জুলাইয়ের অমৃতে 'ভুলিতে চাই' বলে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তাতে আমার যেন কেমন লাগে। বৈকুণ্ঠ 'বি টি রোডের ধারে পড়েছেন, কিন্তু পড়েননি কাল-কূটের 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' কিংবা চাণক্য সেনের 'সবে শুরু' 'এখনও অমৃত' বা সুনীলের 'একা এবং কয়েকজন' বা 'আমিই সে'—এসব লেখা অন্তত আমাদের মতো যুবাপ্রায়দের মধ্যে আলোড়ন এনেছে। এমন অনেক নাম করা যায়। আবার বলতে হয়, 'হাঁসুলী বাঁক' একবারই সৃষ্টি হয়। তার স্বাদ একরকম। এদের স্বাদ অন্য-রকম। 'হাঁসুলী বাঁক' এখনও বহুবার বহুজনে পড়ে। পাশাপাশি এঁরাও পঠিত হন। এজন্য বৈকুণ্ঠবাবু! আপনি আক্ষেপ না করে 'এমনটা হয় কেন?' না বলে, আরো কিছু সময় ধৈর্য ধরুন, দেখুন না, 'হাঁসুলীর' সুরে না হলেও, একটু নতুন ধরনের সুরে বাঁধা কিছু সৃষ্টি হয় কিনা। কিছু পেয়েও যেতে পারেন।

প্রবীর ভট্টাচার্য,
কুলটি।

আন্তরিক ধন্যবাদ

সম্প্রতি 'অমৃতে'র সংখ্যাগুলিতে বৈকুণ্ঠ পাঠকের সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তা-পূর্ণ প্রবন্ধগুলি পড়ে কতকটা আশান্বিত হয়েছি। গত ১৫-২০ বছরের বাংলা পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা প্রবন্ধের প্রকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ইদানীং কালের পাঠক-পাঠিকারা সাহিত্য সমালোচনা কি, ধারণাই করতে পারেন না। মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচক সাহিত্যিকগণের অন্তর্ধানে সাহিত্যের এই ধারাটি অবলুপ্ত হতে বসেছিল। প্রগাঢ় সাহস নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু এ-সম্বন্ধে অগ্রণী হওয়ায়, সাহিত্যের এই মূল্যবান ধারাটির পুনঃ প্রবর্তন হবে, আমরা আন্তরিক বিশ্বাস করি। বৈকুণ্ঠবাবুর এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় কোনও বই প্রকাশিত হলেই (তা গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা প্রবন্ধই হোক) পত্র-পত্রিকায় তার যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রশংসামূলক। তাতে বাংলা সাহিত্যে ফসল বাড়ল, না আবর্জনা বাড়ল, তার কোনও ইঙ্গিত থাকে না। সত্যকার নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাবে কয়েক আধুনিক সাহিত্যিক 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী', 'দিগ্বিজয়ী', 'দিক্‌পাল' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত হচ্ছেন। সত্যি তাঁদের এ-ধরনের খ্যাতি লাভের যোগ্যতা আছে কিনা, দেখবার বা বলবার কেউ নেই। পাঠক-পাঠিকারা নিরুপায় হয়ে অনেক অখাদ্য খেতে বাধ্য হন। সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি থাকা দরকার এবং সেটা নির্ভীক সমালোচকের কাজ। 'অমৃত' যদি এই দায়িত্ব-পূর্ণ ধারার প্রবর্তন করেন, তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন সার্থক উৎপাদনের আশা করা যায়।

নতুন পর্যায়ের অমৃতে এখন পর্যন্ত কয়েকটি সফল গল্প, কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ পেয়েছি। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ কবিতা এখনও পাইনি। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ আরও হ্রাস করার অবকাশ রয়েছে। কবিতা ও চলচ্চিত্রের স্থান কমিয়ে, গত ৩০ বছরে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য সম্বন্ধে 'সাহিত্য আদালত' বিভাগ খোলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের মূল্যবান অভিমত দিতে পারবেন। এতে করে একদিন, সুদক্ষ সমালোচক-সাহিত্যিকেরও সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুতঃ পাঠক-পাঠিকাদের সাহিত্য আদালত থাকা দরকার, যাতে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির নতুন প্রেরণা আসে। তাছাড়া, বাংলা সাহিত্যে যে ব্যবসায় বুদ্ধি প্রাধান্য পেয়েছে, তাও ব্যাহত হবে।

আধুনিক গ্রামীণ সমাজ এবং আধু-নিক নাগরিক জীবন সম্বন্ধে যদি বাস্তব,

শনিবারের চিঠি

বাংলা সাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি' একটি নামী দামী তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৩৩১ সালে ১০ শ্রাবণ শনিবার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে তার সাহিত্য জগতে আবির্ভাব ঘটে। ৩২ পৃষ্ঠার একটি চটি বই মাত্র এক আনা মূল্যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা শ্রীযোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় ৯১নং আপার সারকুলার রোডে প্রবাসী প্রেসে ছাপা শুরু হয়। এই পত্রিকায় যেসব লেখক লিখতেন তাঁরা অধিকাংশই বেনামে লেখা ছাপাতেন। যাঁরা স্বনামে ও বেনামে লেখা ছাপাতেন তাঁরা হলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ইনি তার রাশনামে লেখা ছাপাতেন। তার রাশনাম ছিল, ডমরুধর ভট্টাচার্য, ইনি ডঃ ভঃ এই ছদ্মনামে লিখতেন) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইনি ১৩৩১ সালের ১৭ই শ্রাবণ 'মন্ত্রী ও যন্ত্রী' এই ছদ্মনামে 'চরখা ও বেহালা' নামে একটি লেখা ছাপিয়েছিলেন।) শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস, শান্তা দেবী, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মোহিত-লাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (ইনি 'শ্রীদিবাকর' এই ছদ্মনাম নিয়ে ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সালে 'তালতলা সাহিত্য' নামে তার প্রথম লেখা ছাপান।) অশোক চট্টো-পাধ্যায় (সাপ্তাহিক ১ম সংখ্যা ১০ শ্রাবণ 'মুখবন্ধ' নামে স্বনামে একটি লেখা ছাপান।) যোগানন্দ দাস (১০ শ্রাবণ ১৩৩১ সালে 'জীবনদর্শন' নামে একটি সংক্ষিপ্ত লেখা ছাপেন।) হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সজনী-কান্ত দাস প্রমুখ লেখকবৃন্দ।

মানবিক আবেদন-সমন্বিত গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তবে পাঠক-পাঠিকারা একটা নতুন স্বাদ পাবেন। পাঠক-পাঠিকারা গল্প-উপন্যাসে শুধু হতাশা, ব্যর্থতা ও যৌন-লালসার কথায় আর সন্তুষ্ট নন, তাঁরা এগুলির সমাধানও চান, সেজন্য সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতে হবে। রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনীতে পাঠক-পাঠিকার মন ভরে না। পচা, দুর্গন্ধ খাদ্য পরিবেশন দ্রুত বন্ধ করতে পারলে পাঠক-পাঠিকাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আশা করি, বৈকুণ্ঠবাবু এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখবেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাস,
১৫৪।২, বিদ্যানগর
জি সি এফ এস্টেট
জব্বলপুর (এম পি)

আপনি কি ঠিক?

আপনার স্বল্প পরিসরে অল্প কথায় সাবলীল ভঙ্গিতে অনেক বিতর্কিত বিষয়ের উপর স্বচ্ছ আলোকপাত দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তবু কতগুলো প্রশ্ন থেকে যায়। আপনি লিখেছেন, অমৃত ছাপা হবে সাদা কাগজে কালো কালিতে। ছাপার অক্ষর থাকবে আগের মতো। কোন পরিবর্তন করা হবে না। কিন্তু মশাই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র প্রভৃতি কী তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে? কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পরিবর্তন করতেই হবে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে। তা না হলে অমৃতের পরিণতি হবে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, সবুজপত্রের মতো বেদনাময়।

সম্প্রতি দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে নকশালবাদীর উপর। একটি প্রকাশ পেয়েছে গেলবারের কোন এক সাপ্তাহিক পূজা সংখ্যায়, অপরটি এই দু' মাস আগে একটি পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায়। আমার মনে হয় আপনি সেই লেখা দু'টি সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 'নকশালবাদী চরিত্র নিয়ে কিছু লেখা চোখে পড়েছে। দেখেছি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন সংঘর্ষ নেই। আছে একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব। কৃতকর্মের জন্যে হা-হুতাশ মেশানো পদ্য-পদ্য গদ্য।' আপনি এই দর্শন ও সংঘর্ষশূন্য সাহিত্যের সঙ্গে রূপকথার খুব মিল খুঁজে পেয়েছেন। আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সব সাহিত্য যে শেষ হবে কোন বিশ্বাস বা দর্শন স্থাপন করে তার কোন মানে নেই। কোন বেদনা, হতাশা, অনুশোচনা, আত্মসমর্পণের বিষাদভরা কাহিনীর প্রকাশ তো হতে পারে সাহিত্যে। যা আমাদের দেশে সত্যি ঘটেছে। কোন দর্শন বা সংঘর্ষ পেলেন না তাই বা কী করে হয়!

অনির্বাণ সেন
৪৯৬, দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।

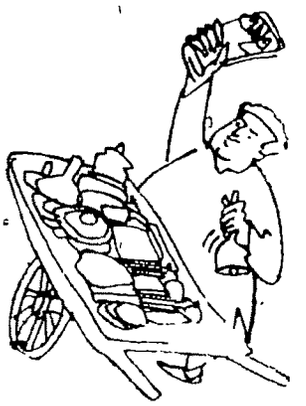

এত সস্তা হয়ে যাচ্ছেন কেন?

আপনি এত সস্তা হয়ে যাচ্ছেন কেন? ফুটপাতের মাল 'সাড়েচ্ছনা'-র মতো। আপনি তো এমন ছিলেন না। ছদ্মনামের আড়ালে থাকলেও, অনেকের মতো আমিও আপনাকে চিনি। আপনার স্বনামে লেখা কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প আমি পড়েছি। সেই আলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কেন? সম্পাদকের টেবিলে বসার পর থেকে 'অমৃত' বাজারে বিকোচ্ছে বেশি নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্য একটি সাপ্তাহিককে কি টেক্কা দিতে পারছে? পারছে না। না বিক্রিতে, না সাহিত্যে। ব্যবসায়িক সাফল্য দেখুন, সাহিত্যও দেখুন। গোটা অমৃত খুললে দেখা যাবে ফাঁকা আওয়াজ। গল্পে ইদানীং পুলিশী অত্যাচার বেশি। 'বিবেকানন্দ' সম্পর্কীয় লেখা শেষ হবে কবে? সিনেমার সমালোচনা সস্তা। খেলার কথা না বলাই ভাল। অন্যান্য ফিচার একই ধরনের। তবে কেন পড়ছি অমৃত? অভ্যেস। কিন্তু অভ্যেস পাল্টে গেলে কি হবে বলা যায় না। চাণক্য সেনের কলম নিয়মিত থাকেই না। দামী গল্প দামীই হয়ে গেছে। আর আপনার লেখা? আশা এনেছিল মনে। কিন্তু 'সস্তা' আখ্যা নেবার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আচ্ছা, আপনি স্বনামে 'অমৃত'-তে মাঝেমধ্যে গল্প লিখলে তো পারেন। আর একটা কথা। আগামী প্রতিভাদের লেখা প্রকাশ হওয়া ভাল। কিন্তু তারাদাসবাবুর মতো নিম্নমানের লেখা যেন নিয়মিত ছাপা না হয়। 'অমৃত'-কে ভাল করুন। আমরা পড়ব। আমরা সবাই পড়ব।

দীপককুমার চৌধুরী
১।১৪, সি আই টি বিল্ডিংস,
বেলেঘাটা, কলকাতা-১০

কিন্তু সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' আর বেশীদিন চলে না। ১৩৩১ সালের ৯ ফাল্গুন তার মৃত্যু ঘটে।

তারপর দু' বছর অতিক্রম হওয়ার পর ১৩৩৪ সালে ভাদ্র মাসে এই পত্রিকা মাসিকরূপে পুনরায় প্রকাশিত হয়। তবে সাপ্তাহিক ও মাসিকের অন্তর্বর্তী সময়ে তিনটি অসাময়িক সংখ্যা বের হয় (১) জুবিলী সংখ্যা—১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, (২) বিরহ সংখ্যা—আষাঢ়, ১৩৩৩, (৩) ডোটসংখ্যা—কার্তিক, ১৩৩৩ 'শনিবারের চিঠির' জুবিলী সংখ্যা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় প্রকাশ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাঝখানে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৩৮ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত এই দু' বছর এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে শনিবারের চিঠি' যে তিনটি সংখ্যা অসাময়িক সংখ্যা হিসেবে বের হয় সেই তিনটি সংখ্যা এবং 'শনিবারের চিঠি' মাসিকরূপে বের হওয়ার প্রথম বেশ কটি সংখ্যা যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় বের হয়। পরে নীরদ চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী ও সজনীকান্ত দাস এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন।

মাসিকরূপে প্রথম বছরে যেসব লেখক লেখেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজশেখর বসু (পরশুরাম), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), গোপাল হালদার প্রভৃতি লেখক। পরে বাংলাদেশের প্রায় সব লেখকই এই পত্রিকায় লেখার জন্য যোগ দেন। —জয়ন্ত পাণ্ডা; গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ বাসন্তিয়া, জেলা মেদিনীপুর।

[তারাশংকর, দুই বিভূতিভূষণ নিয়মিতভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে লিখেছেন—বৈকুণ্ঠ পাঠক]

বৈকুণ্ঠের অনুবীক্ষণ

৬ই মে সংখ্যায় বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'আবার একজন রবীন্দ্রনাথ চাই' পড়ে বিস্মিত হলাম। আমার মনে হয়েছে, তাঁর আধুনিক কবিতা, গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই—কেননা, আধুনিক গল্প কাহিনী কবিতা উপন্যাসকে ট্যাস গব্ব আখ্যায় ভূষিত করেছেন। বৈকুণ্ঠ পাঠকের বোধহয় ধারণা নেই যে, আধুনিক কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী বা পুষ্কর দাশগুপ্তের বিভিন্ন বিদেশী ভাষার ওপর অসামান্য দখল আছে। আমার মনে হয়, বৈকুণ্ঠবাবু হার্মেটিক গোষ্ঠী, সুরিয়ালিস্ট গোষ্ঠী বা হাংরি জেনারেসনস্ অথবা সত্তর দশকের আধুনিক শক্তিমান কোন গল্পকারের নামও শোনেননি।

অশোক পোদ্দার
৩৫, কাশীপুর রোড, কলকাতা-২

রাজশেখর বসুর চলন্তিকা

উৎপলকুমার বসু

আজ যদি অকস্মাৎ আপনাকে এক জনমানবহীন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং আপনি অন্তত শিক্ষিত বিবেচনায় আপনাকে যদি গোটা পাঁচেক বই সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে আপনি কি কি বই সঙ্গে নেবেন? মহাভারত বা রামায়ণ হয়ত আপনার তালিকায় থাকবে। গীতা, কোরান বা বাইবেল আপনি সঙ্গে নিলে আমি ধরে নেব আপনি ধার্মিক প্রকৃতির লোক। ভেষজ চিকিৎসা বা আত্মরক্ষার উপায় জাতীয় কোনো গ্রন্থ যদি সঙ্গে নেন তবে আমি আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করব। কিংবা আপনি বুঝি দশটা পাঁচটা আফিস করে রণক্লান্ত এক নাগরিক এবং এই নির্বাসন আপনার মনের গোপন পলায়নী প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করছে। হঠকারী আপনি স্থির করলেন—না, সেখানে আমি শুধু গলা ছেড়ে গান গাইব বা চিৎকার করে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কবিতা পড়ব—আপনি তাহলে সঙ্গে নিন সঙ্গীতিকা, সঙ্গিতা বা গীতবিতান। আপনি যদি বি. এ; এম. এ. পাশ হয়ে থাকেন তবে অখণ্ড সেকস্‌পীয়ার আপনাকে সাহচর্য দিক।

আমার ব্যক্তিগত তালিকার প্রথম নাম—রাজশেখর বসুর চলন্তিকা। আমি বহু বছর দেশে বিদেশে ঘুরেছি এবং এই গ্রন্থটি আমার সর্বদা সাথী ছিল। না, ভুল বললাম। একদা আমাদের বিদেশের গৃহ-স্থালীতে এক নৈশ পানভোজনের আয়োজন হয়েছিল এবং মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে আমার একমাত্র চলন্তিকাটিকে আমি এক আমেরিকাযাত্রী প্রবাসকাতর বাঙালী যুবকের হাতে তুলে দিই। পরের দিন সকালে আমাকে ছুটে যেতে হয় এয়ারপোর্টে এবং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বইটিকে ফিরিয়ে আনি। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কুয়াশা পড়েছিল খুব এবং বন্ধুটির প্লেন দেরিতে ছাড়ে। যদি তা না হত, তাহলে—আমি বিজ্ঞ ইতিহাসের ছাত্রর মতো জোর দিয়ে বলতে পারি, তাহলে আমার সাহিত্য প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত অন্যভাবে লেখা হত।

ভূমিকায় রাজশেখর লিখছেন :

> বাংলাভাষায় একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে—যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে।

কী বিনয় এই পণ্ডিতের! আমার কাছে তো এ-টি একটি দশকর্মভাণ্ডার। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে উল্টেপাল্টে দেখি। শীত গ্রীষ্মে যত এর বয়স বাড়ে তত বাড়ে এর আকর্ষণীয়তা। উৎসর্গপত্রে যে সব সাহায্যকারী বিদ্বজ্জনের নামের উল্লেখ আছে তাঁদের কাউকেই আমি চিনি না—কিন্তু রাজশেখর যদি তাঁদের বিশ্বাস করিয়ে থাকেন যে এরূপ একটি 'ছোট অভিধানের দরকার আছে' তবে আমার মন্তব্য তো বাহুল্যমাত্র।

আমার নানা ভাষার অভিধান চর্চা করার অভ্যেস আছে। কিন্তু গোপনে বলি, আমার উৎসাহ বালকোচিত। আমি প্রথমেই দেখি কী কী খারাপ কথা অভিধানকর্তা সংগ্রহ করেছেন। আপনি কি জানেন 'পায়খানা' শব্দটি ফারসী পাইখানহ্ থেকে এসেছে। আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাসে আপনি হয়ত 'মাই' 'মোতা' 'পাছা' ইত্যাদি শব্দের বহু ব্যবহার দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন এবং ভাবছেন এসব কী রোতো মাল যে বাজারে ছাড়া হচ্ছে! আপনি রাজশেখরের শরণাপন্ন হোন। দেখবেন মাই, মোতা, পাছা ইত্যাদি শব্দগুলি 'মৌখিক, গ্রাম্য বা অশিষ্ট-শব্দ' নয়। রোতো শব্দটি কিন্তু ছোটোলোকি শব্দ। মাল শব্দটি মদ হিসেবে ব্যবহার হ'লে অশিষ্ট—এ-টা রাজশেখর বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। 'শিশ্ন' শব্দটি চলন্তিকায় আছে। না, তার যে চলতি বাংলা প্রতিশব্দগুলির কথা আপনি ভাবছেন—সেগুলি নেই। অর্থাৎ রাজশেখর খানিকটা উন্নাসিক।

সরল কথা এই যে অভিধান প্রণয়ন কোনো নিরপেক্ষ কাজ নয়। সাধারণ লোকের রুচি, তার শালীনতাবোধ যাতে আহত না হয় এ জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। আরেকটু ভেবে দেখুন—যে অভিধানগুলিতে সংজ্ঞানির্ণয় করা হয় সেখানে অভিধানকারীর চরিত্র আরো স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়ে না কি? আমি দুটি অভিধানে কম্যুনিজম কী—এই প্রসঙ্গে দেখেছি লেখা আছে—

(১) এ-টি একটি দুষ্ট মতবাদ। সমাজে বিশৃঙ্খলা আনাই এই মতবাদের লক্ষ্য। এর সমর্থকরা বন্দুক, বোমা ইত্যাদি হিংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার ক'রে শান্তিপ্রিয় দেশবাসীদের উত্যক্ত করে।

(২) শত শত বছর ধ'রে নিপীড়িত যে সাধারণ মানুষ— তার শৃঙ্খলমোচনের প্রথম দার্শনিক প্রস্তাব। এই মতবাদের লক্ষ্য হ'ল দেশবাসীর অর্থনৈতিক অসাম্যের বিলোপসাধন এবং সেই অসাম্যের উপর নির্ভরশীল যে সমাজ ব্যবস্থা—তার আমূল পরিবর্তন।

কোন্ টীকা আপনি গ্রহণ করবেন—সে-টা আপনার দায়িত্ব।

অভিধান বলতে আমরা দুই জাতীয় সংগ্রহ বুঝি। প্রথমতঃ, শব্দের অর্থ ও তার

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
PO KATRISARAI (GAYA)

ব্যবহার বিষয়ক আবহণ, দ্বিতীয়ত বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া ধরনের গ্রন্থ। হাজার হাজার বছর আগে, খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, ভারতে ও চীনে, দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকরা প্রথম বিশ্বকোষ প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ— হিন্দু পুরাণের নাম করা যেতে পারে। পুরাণ বস্তুত সমসাময়িক ধর্মবিশ্বাস, সমাজ বিন্যাস, গল্প কাহিনী ও দেবদেবীদের উপাখ্যান ইত্যাদির সংমিশ্রণ। তথ্যনির্ভর নয়—তত্ত্বপূর্ণ। এগুলির পাঠ আজ আমাদের আনন্দ দিতে পারে—কিন্তু বর্তমান কালে পুরাণের ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নাম আমরা অনেকে শুনেছি এবং হয়ত বা লাইব্রেরীতে দেখেছি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমকালীন জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদের সই-করা প্রবন্ধ সংগ্রহ এ-টি। একদা লেনিন নিজ নামে সমাজতন্ত্রের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন এখানে। তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে অতিরিক্ত পাঠ হিসেবে একটি প্রয়োজনীয় রচনা তালিকা যুক্ত থাকার রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ এই জাতীয় সংগ্রহ শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুত নয়—মানুষের সর্বগ্রাসী কৌতূহলকে অধিকতর বিস্তৃত করাই এর উদ্দেশ্য। দু'শ বছর আগে, ফরাসী দেশে, খ্যাতনামা দার্শনিক দিদেরো বিশ্বকোষ সংগ্রহে হাত দিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর মনোনীত রচনাগুলিতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভূত সমালোচনা ছিল। ফলে, সংগ্রহের অংশ বিশেষকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং ক্ষমতাশালী যাজক ও রাজপুরুষেরা দিদেরোর বিশ্বকোষের প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। ভীত প্রকাশক, রচনাবলীর একটি বিরাট অংশের প্রুফ রাশিয়ায় জারের পুস্তকাগারে লুকিয়ে রাখেন। কিছুদিন আগে লেনিনগ্রাডে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অভিধান ও বিশ্বকোষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্য আধুনিক কালে বজায় নেই। অভিধানে দেখছি সংজ্ঞানির্ধারণের প্রচেষ্টা এবং বিশ্বকোষে দেখেছি শব্দ-অনুশীলন। রাজশেখরের চলন্তিকায় আমরা পাচ্ছি অতিরিক্ত দুটি সংযোজন : বানানের নিয়ম ও সেই সূত্রে বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে

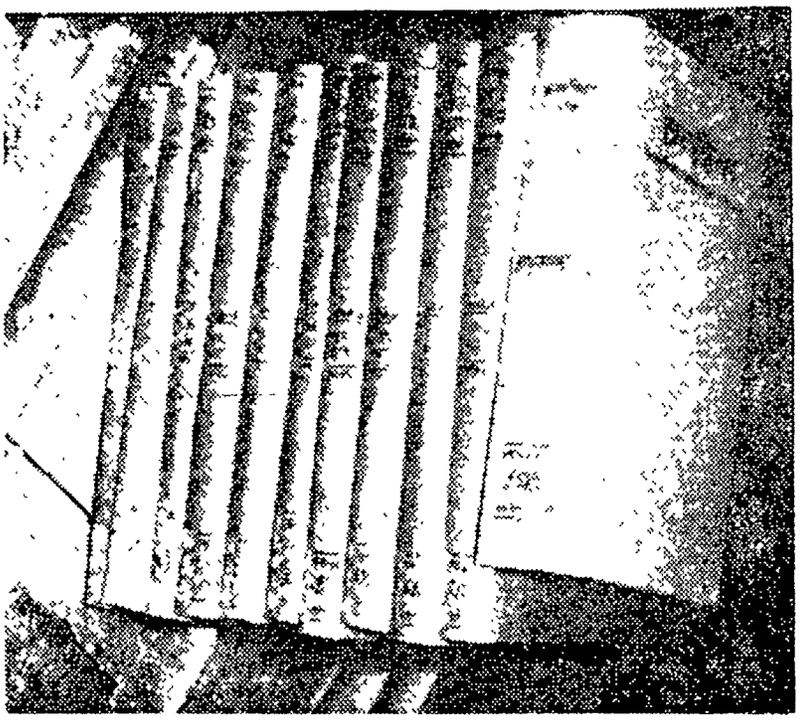

প্রয়োজনীয় আলাপ পরিচয় এবং সব শেষে পারিভাষিক শব্দ তালিকা। তাছাড়া 'বানানে ও শব্দের গঠনে ভুল' শীর্ষক অংশটির পাঠ আমাকে প্রায় নিরক্ষর প্রমাণ করে। আমি তো জেনে এসেছি 'অর্ধাঙ্গিনী' শব্দটি ভুল নয় —রাজশেখর বলছেন, না, ওর সঠিক রূপ হচ্ছে অর্ধাঙ্গী। 'ইতিমধ্যে' ভুল—হবে ইতোমধ্যে। আমাদের অনেকেরই বাপ-ঠাকুর্দা 'কর্মব্যপদেশে দাক্ষিণাত্যে' গিয়েছিলেন। ঠিক কি? কর্মব্যপদেশে কথাটির মানে হ'ল কাজের ছুতায় এবং দাক্ষিণাত্য বিশেষণমাত্র, অর্থ দক্ষিণ দেশীয়। কবি রবীন্দ্রনাথ 'মৌনতা' ব্যবহার করে পার পেয়েছেন— কিন্তু শব্দবিজ্ঞানী রাজশেখরের মতে সঠিক প্রয়োগ হল মৌন।

আরো কতো নতুন শব্দ, অপরিচিত চিত্র, অব্যবহৃত বর্ণ ও অনাঘ্রাত গন্ধ বহন করে এনেছে এই স্বল্পায়তন অভিধান। 'কন্ঠুটো' মানে গাংদাড়া মাছ ও 'কুরর' মানে উৎক্রোশ পক্ষী। উভয়ের সঙ্গেই আমি পরিচিত নই। কোনো জনপ্রিয় গল্পকারকে কি আপনার সম্প্রতিকালে 'কুম্ভীলক' বলে মনে হয়েছে। শব্দটির অর্থ হল চোর বা যে অপরের লেখা হইতে চুরি করে। 'কিল্ডুলুক' শব্দটির মানে কেঁচো। তাই বা কে জানতো। 'তামরস' শব্দটি হয়ত আপনার রসনাকে সিক্ত করছে— শব্দটির অর্থ কিন্তু পদ্মফুল। 'কবয়ী' কোনো সাহিত্য পত্রিকার নাম নয়— হায়, এর অর্থ কি মাছ। ভোজনের পর আপনার কি পান খাওয়ার অভ্যেস আছে? দেখবেন, চুণ ও 'খদির' যেন সমমাত্রায় থাকে। আপনি যদি কৃষিকর্মে উৎসাহী হন তবে 'আচোট' শব্দের অর্থ জেনে রাখুন অচষা বা পূর্বে অব্যবহৃত জমি।

এখন তাহলে বলি যে শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। 'হাসুলি' শব্দের অর্থ রাজশেখরের মতে অর্ধচন্দ্রাকার হার। আমার ধারণা শব্দটির মূল অর্থ ঘাস বা ঝোপঝাড় কাটার কাজে ব্যবহৃত বাঁকা তরবারি বিশেষ। ইংরেজি 'এসটিমেট' শব্দের অর্থ না কি প্রাক্কলন ? আমার মনে হয় আনুমাণিক শব্দটিই এর স্বচ্ছ অনুবাদ।

বাল্যে আমার অঙ্ক শিক্ষক আমাকে প্রায়ই 'হাঁদা' বলে সম্বোধন করতেন। সে বিশেষণ প্রয়োগ যতই যুক্তিসম্মত হোক না কেন—আজ দেখছি রাজশেখর বলছেন শব্দটি অশিষ্ট। একটি গণিত বিদ্বেষী, অপটু বালকের ক্রোধের কারণ এতদিনে তাঁর দৌলতে খুঁজে পাওয়া গেল।

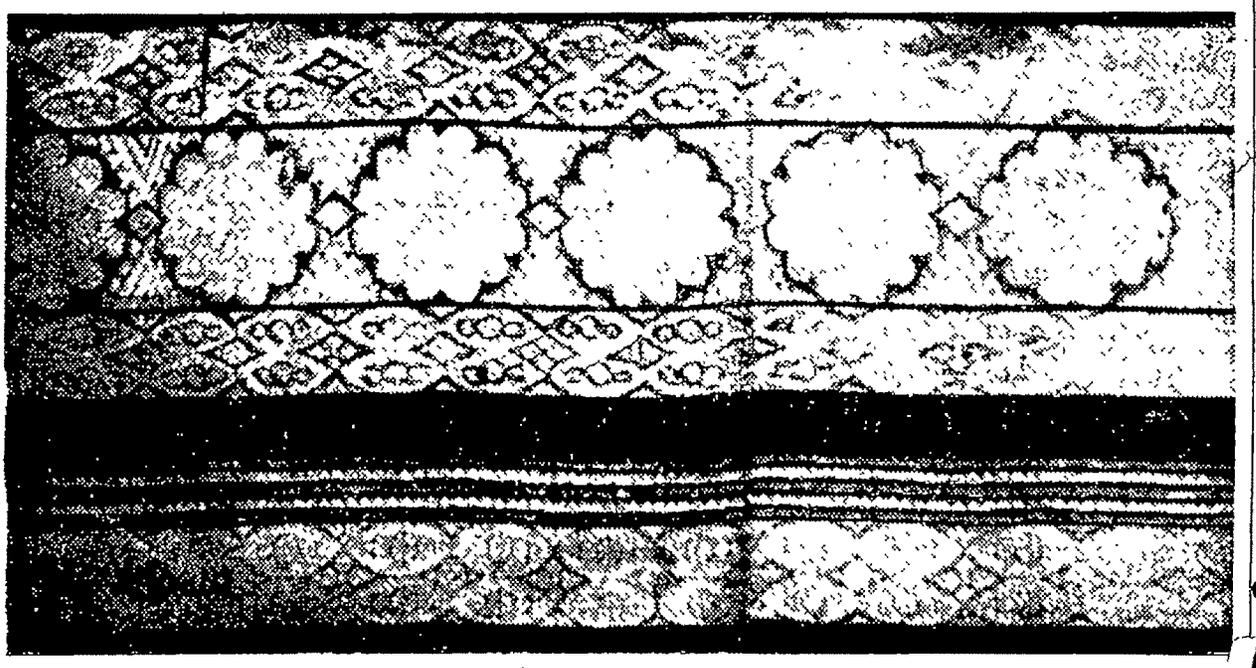

শারদ সাহিত্যের পাশাপাশি শাড়ি

(২)

শাদা আর্ট সিল্কের নকশাপাড়, শাদার সঙ্গে রঙিন ডোরা মিশোনো জমির কথা বলেছি। ফুলিয়া বসাকপাড়ার অনেক তাঁতীই জানালেন, এটাই এবার পুজোয় মেয়েদের বেশি ভালোবাসা পাচ্ছে। এই নকশা কিন্তু নতুন নয়। বছর-ভরই চলেছে, এখন হঠাৎ বিশেষ মনোযোগ পেয়ে পুজোবাজার জাঁকিয়ে বসেছে।

এবার পুজোয় টাঙ্গাইল শাড়ির সত্যিকার নতুন নকশা শেড-ডুরি। কারো মনে ছিলো, এই প্রথম তাঁতে বোনা হচ্ছে। পাড় পুরোটাই আর্ট সিল্কে। শুরুতেই তিন সারি ফুল, লতা। লাল রেখা দিয়ে প্যানেল ভাগ করা। বোতাম ফুলের সারিতে পশ্চাৎপটের শাদা রং সুরুপনা। এক ফুট চওড়া পাড়ে ওই একবার, আর পাড়ের একেবারে নিচের দিকে এই তিন সারি ফুল-লতার পুনরাবৃত্তিতে আরেক বার—মোট দু জায়গায় শাদার ব্যবহার। মাঝখানে রংচিকচিক ইঞ্চি-ছয়েক দাবার ছক। একেকটি ঘর দুটি করে ত্রিভুজ দিয়ে কোণাকুণি ভাগ-করা। পুরো ছকটা লাল কমলা সবুজ বেগনি রঙের সমাবেশ। চেক জমি। সুরোয় বা মুগোতে। সুতো টানা-পোড়েন দুদিকেই ১০০ কাউন্টের। সুতি জমি হলে পাইকারি দাম ৮০ টাকা, দোকানের খুচরো দাম ১০৪—১০৫ টাকা।

তাঁতিপাড়ায় ঘুরে ঘুরে রংচিকচিক বুনোট, চিত্রবৈচিত্র্যময় টানা-পোড়েন দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হলো। আমাদের মেয়েদের শিল্পিত লজ্জানিবারণে, সংস্কৃত সাজ-সজ্জায় বাংলার তাঁতের শাড়ি যতো যোগ্য, যতো সুদৃশ্য, ততো সুলভ নয় কেন? এই ধরনের আর সব পণ্যের মতন শাড়িও তৈরি হয় বিত্তবানদের কথা মনে রেখে। একশো, দেড়শো, দুশো, আড়াইশো টাকা দিয়ে এ-দেশের কজন শাড়ি কিনতে পারেন? বেশির ভাগ মানুষেরই তো বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোয় না গোছের অবস্থা হয়ে ছাড়া হয়েছে। যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবনভর শাড়ি বুনে চলেছেন, তাঁদের ঘরেও তো শতছিন্ন কাপড়ের মতন দারিদ্র্য। অমূল্য দাস দুদিন ধরে সস্ত্রীক একটা ডুরে শাড়ি বুনে হাতে পান সাকুল্যে চোদ্দ টাকা। অমূল্য না হয় জন্ম-তাঁতী নন এখানকার তাঁতীর কাছে কাজ শিখে মজুরি খাটেন। তন্তুবায় উন্নয়ন সমিতির সদস্য বংশপরম্পরায় শুধু তাঁতই বুনছেন, এমন একজনকে দেখলাম তন্ময় হয়ে মুগা ডুরি শাড়ি বুনছেন। শেষ হলে স্বামী-স্ত্রী মিলে মজুরি পাবেন চল্লিশ টাকা। একটা শাড়ি শেষ হতে লাগে আড়াই দিন। কলকাতার দোকানে খুচরো বিক্রির দাম ১৬৫—৭০ টাকা। বড়বাজারের পাইকাররা ফুলিয়ায় এসে ১৩২—৩৩ টাকায় নিয়ে যান। কাঁচামাল, সমিতির খরচ, তাঁতীর মজুরি সব দিয়ে একটা মুগা-ডুরির খরচ পড়ে ১২৮ টাকা। এর একটা শাড়িতে তাঁতীদের সমিতির লাভ চার-পাঁচ টাকা। লাভের অংশ ওই তাঁতীরও প্রাপ্য। কিন্তু সে নামেই। লাভের গুড় আসলে পিঁপড়ে খেয়ে যায়। ব্যাংকের সুদ হয়ে উবে যায়। সুতোর হার খুব যে চড়া, তা নয়। হয় কী, বড়বাজার ধারে কেনে, একদিনেই দেখলাম ৬০০০ শাড়ি কিনে নিলো। সেই শাড়ির দাম আদায় করতে ফুলিয়ার তাঁতীকে কম করেও দু মাস ফুলিয়া-কলকাতা হাঁটাহাটি করতে হয়। ফলে সময়ের হিসেবে সুদের পরিমাণ বাড়ে। আসল লাভ যায় পাইকার, দোকান-দারদের ঘরে। যাঁরা শাড়ি তৈরি করেন, আর যাঁরা শাড়ি পরেন, মার খান এই দুই শ্রেণীর মানুষ। ফুলিয়ার মোট উৎপাদনের কিছু অংশ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনে নেন। সব শাড়িই কি সরকার ন্যায্য দামে কিনে নিতে পারেন না? শুধু বিক্রি— বিতরণের খরচটুকু যোগ করে? তাতে তাঁতী বাঁচবে, বাংলার গৌরব তাঁতের শাড়ি বাঁচবে।

পেঁচাপাড় শাড়ির কাজ দেখতে দেখতে ভাবি, আমাদের তাঁতশিল্পও কি যাবার পথে? পাড়ের সৌন্দর্যে আমার চোখ আটকে যায়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কবিতা বোঝার আগে

তুষার রায়

এক উজ্জ্বল সকালে আজ দাড়ি কামাতে অন্যমনস্ক,—
রেডিও-য় তখন কি জানি কার বেহালা বাজছিল
হাতের ক্ষুরকে কোনো সময় বেহালার ছড় ভাবলে
রক্তের কাঁপন লোনা স্বাদে তারপর খেয়াল নেই
চৈতন্যবিহীন আমি কোন সময় পৌঁছে গেছি
ওষুধ, গন্ধ, নার্সের ফিটফাট নড়াচড়া, এই
হসপিটালে—।

এক শিশি ঘুমের বড়ির দিকে তাকাতে আমার
গঁদের আঠার মতো গাঢ় ঘুম, মশারীর ফোকর দিয়ে
রাত গলে না এমন অনেক নীচের থেকে দু-চারটে
শ্বাসে অকসিজেন টানার কথা সতেরোটা বড়ির
পরেও মনে পড়ে যায় এই প্রাণ, এই প্রাণধন....
সাত সতেরো এসব কি আর পড়বেন মশাররা এই
মর্বিড লাইনগুলো, আপাতত চুপচাপ
কিছু না বলে বসে বসে থাকার মানে কবিতা বোঝার আগে

একবার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখুন....ঠিক পড়ছে কিনা।

আমাদের তুষার

তুষারের বাবাকে আমরা জানতাম 'কচিবাবু' নামে। তা বাবু ছিলেন বটে। কুঠিঘাটের নড়াইল হাউস থেকে সন্ধ্যে নাগাদ তাঁর ল্যাণ্ডো গোপাললাল ঠাকুর রোডে খোয়া পাথর উড়িয়ে ছুটত। তেজি ঘোড়ার লোহার নাল-আঁটা খুর থেকে লাল-নীল আগুনের ফুলকি উড়ত। আমরা ফুটপাত-বিহীন পথের কোণ চেপে দাঁড়াতাম।

ঘুরে-ফিরে তুষারের সঙ্গে দেখা হল অনেক দিন পর। অসম্ভব অ্যাট্রাকটিভ চেহারা তখন তার — দুঁদে স্টোরিটেলার, এক লহমায় দুর্ধর্ষ ছড়া বানায় মুখে মুখে, সারা দুনিয়ার যাবতীয় টিট-বিটস তার হাতের আমলকি। রিচার্ড বার্টনের মত হাত দুটো ফাঁক করে একটু ঝুঁকে হাঁটে, কর্ড মেরে মেরে প্রতিটি কথা উচ্চারণ করে, অগ্রজ কবি-লেখক দেখলেই বাঃ করে পরম সৌজন্যে—চোস্ত পোশাক, চোস্ত বুলি—এই সব নিয়ে তখন আমাদের তুষার।

আরো পরে, পদ্যের বিষ যখন তার শরীরে পুরোপুরি কায়েম হতে লাগল, আমাদের চোখের ওপর নিজেকে ভাঙতে শুরু করল সে। তার ছড়ার গিমিক আর ট্র্যাউজার খসে পড়তে লাগল, পদ্য থেকে টুপটাপ ঝরে যেতে লাগল স্মার্ট ইংরিজি শব্দগুলি, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে তুষার ক্রমশ পদ্যকার থেকে হয়ে উঠতে লাগল কবি। ওর সমস্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, কররেখা অপ্রতিরোধ্যভাবে ছুটে যেতে লাগল কবিতায় —শুধু কবিতারই দিকে। তুষার ছাড়া আর কাউকেই আমি কবিতার নেশায় নিজের জীবনকে এভাবে কাঁচের বাসনের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখি নি।

ময়দান কাঁপিয়ে চাবুকের মত শরীরে রিল তুলে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর সামনে যে তুষার আবৃত্তি করে যেত একটির পর একটি পদ্য, এক মুহূর্তে কেড়ে লুটে নিত অসংখ্য তাজা প্রাণ, যার 'ব্যান্ডমাস্টার' কম-ঝমিয়ে বেজে উঠত সবার বুকের খাঁজে খাঁজে, সেই জমজমাট আসর থেকে অদৃশ্য টুপি নাড়িয়ে প্রকৃত কবিতার খোঁজেই একদিন বিদায় নিল তুষার।

তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হতো রাস্তার ধারের সস্তা নেশার আড্ডায়, শ্মশানের উদাস আলোয়, এবং অনিবার্য-ভাবে মাঝ রাতে শ্যামবাজারের পঞ্চমুখী মোহানায়। শেয়ারের ট্যাকসি চড়ে সে-সব রাতে সিঁথির মোড়ে যেতাম আমরা, সেখান থেকে প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে ডানলপ, কোনদিন বাঁয়ে বেঁকে দক্ষিণেশ্বর অবধি। জামসেদপুরে সুবর্ণ রেখার তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদ, গুড়-মহুয়া আর পদ্যের জোরাল মদ সারা রাত পান করতে করতে সাঁওতাল মহল্লার অর্জুন গাছের নীচে আমরা কি ঘুমিয়ে পড়ি নি ভোর-হয় হয় অন্ধকারে?

দু-দুবার টি-বি হাসপাতাল থেকে ফিরে এল তুষার—তবু হিসেবের কোন ধার ধারল না। নিজের মাথা ছিঁড়ে নিজের তাজা রক্ত ছিটিয়ে দিল সে, তার চাপ চাপ চিহ্ন লেগে রয়েছে তার শেষ কবিতার বই 'মরুভূমির আকাশে তারা'-য়। কবিদের ভালোবেসে, কবিতাকে ভালোবেসে শুধু কবিতারই জন্য আক্ষরিক অর্থে মরে গেল তুষার। চোখ বুজলেই দেখতে পাই ঐ অশ্বারোহীদের—লীড করছে শংকর, পিছনে যোগব্রত, তার পিছনে বিমল, এবং এখন, চতুর্থ অশ্বারোহী তুষার। ওরাই উইন, প্লেস, সব কিছু নিয়ে নিল, অলসো ব্যান-মার্কা আমার বেতো, খঞ্জ ঘোড়াটি কবে আসবে—কবে?

অভিতাভ দাশগুপ্ত

সুন্দরবন বদলাচ্ছে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটবেলায় ভূগোলের ম্যাপ আঁকবার সময়, ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাংলাদেশের ঠিক নিচে হিজিবিজি করে আঁকাবাঁকা রেখা এঁকে নিতে হোত। সেই আঁকাবাঁকা রেখাগুলি যে কক্সবাজারের খাঁড়ি আর বদ্বীপের সমাহার তা তেমনভাবে বুঝিনি তখনো। সেই বদ্বীপ আর খাঁড়িগুলিতে এককালে ছিলো গভীর জঙ্গল, এখন তার কিছু অংশ বেখে বাকি সবখানেই গড়ে উঠেছে বসত। কবে ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের ডেকে এইসব বন ইজারা দিয়ে-দিলেন, সে এখন এক গল্পবিশেষ। এক এক লপ্তে পাঁচ হাজার বিঘের লট তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো নামমাত্র মূল্যে। তারপর জমিদারেরা জঙ্গলের ভিতর কাছারি তৈরী করে কাটিয়েছেন রোমহর্ষক সব রাত, বাইরে থেকে এনেছিলেন অনেক আদিবাসী, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি, এসেছিলো আরও অনেক মানুষ, যারা জীবন তুচ্ছ করে, বাঘ, সাপ ও কুমীরের সঙ্গে ঘর করে এই জঙ্গল হাসিল করে গড়ে তুলেছিলেন বসত, সেও এক উত্তেজক কাহিনী। জঙ্গল হাসিল হবার পর প্রায় একশ বছর কেটে গেছে। একদল মানুষ যাঁরা বিভিন্ন কারণে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন সুন্দরবন এলাকায়, এখন তাঁদের জীবনযাপনের ধরণ কেমন, তা জানবার জন্য কৌতূহল হয় বৈকি।

জঙ্গল হাসিল করে বসতি গড়ার পর সুন্দরবনের জীবনে এখন টানাপোড়েন।

কেউ এসেছিলেন মেদিনীপুরের কাঁথি বা তমলুক থেকে, কেউবা চব্বিশ পরগণার অন্য প্রান্তের মানুষ, কেউবা খুলনা-যশোর থেকে গাঙ-জঙ্গল পেরিয়ে হাসিল করেছিলেন সুন্দরবনের জঙ্গল, এক এক লটে পাঁচ থেকে দশ হাজার বিঘের প্লট, যেসব জমিদার বনভূমির বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন সরকারের কাছ থেকে, তাঁরাই ফের ইজারা দিয়ে দিলেন এইসব মানুষদের কাছে, জঙ্গল সাফাই করে বসতি পত্তন করবার অধিকার দিয়ে। যে-ব মানুষ সেই ভয়ংকর জঙ্গলের গেঁয়ো, গরান, সুন্দরী, পশুর, বাইন প্রভৃতি গাছের উচ্ছেদ-সাধনে রত হয়েছিলেন, তাঁদের ইতিহাস খুঁজলে প্রকাশ পায় এক-একটি কাহিনী। কথিত আছে, কেউবা ছিলেন নারী-অপহরণকারী, কেউ দুশ্চরিত্র, কেউ কেউ সমাজের চোখে অপরাধী। ভয়ে, নিগৃহীত বা বিতাড়িত হয়ে কেউ জঙ্গলের মগডালে টোঙ বেঁধে স্ত্রীলোকসমেত কাটিয়েছেন রাতের পর রাত।

পত্তন করে গড়ে উঠেছে তার সঠিক কোনো হিসেব নেই। কেউ বলেন আশী, কেউবা একশ বছর পর্যন্ত এর বয়স অনুমান করেন। বয়স যে খুব বেশী নয়, তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় নদীর ধারে ধারে হেঁতাল, গেঁয়ো, বাইন গাছের সার। এখনও পাড়ার চামড়া-ঝুলে-পড়েছে এমন বৃদ্ধ মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলে ভ্রূ কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করেন জঙ্গল হাসিল করার শৈশবের দিনগুলির কথা, অনেক লোমহর্ষক গল্পও ঘোরে এরকম বহু পুরোন মানুষের মুখে মুখে।

কোথাও বা কল্পনাবিলাসী ইংরাজ সাহেব গড়ে তুলেছিলেন ছিমছাম টাউনশিপ, এস্টেট বা কাছারি জাতীয় অমনি কিছু, চারপাশের জঙ্গল কেটে বানিয়েছিলেন ঘরবাড়ি, বাগবাগিচা, এবং কিছু নিজস্ব প্রজাও সৃষ্টি করেছিলেন। গোসাবার 'হ্যামিলটন এস্টেট' বানিয়েছিলেন হ্যামিলটন সাহেব, পুরো একটা জমজমাট শহর বসিয়ে ফেলেছিলেন কাঠের ঘরবাড়ি, জমিজিরেত-সমেত, ছিলো ফুরফুরে ইলেকট্রিক-বাতি, মার এস্টেটের নিজস্ব কারেন্সিও। তেমন বঙ্গোপসাগরের কূলে ফেজার সাহেব গড়ে

তুলেছিলেন ফেব্রাবগঞ্জ, তার কাছারির চারপাশ ঘিরে হাজার হাজার নারকেল গাছ—সে দৃশ্য ছিলো চমৎকার, ট্যুরিস্ট সেণ্টারের উপযোগী।

সুন্দরবনের এই বসতি ক্রমে শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে বিশাল আকার ধারণ করেছে, এখন প্রায় পঁচিশ লাখ মানুষ এই নদীনালার দেশে জমিজিরেত আর চাষবাস করে দিন গুজরান করছে। নদীনাগার জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তাদের চলাফেরা আর নাওয়া-খাওয়ার সময়ও একতারে বাঁধা। প্রায় একশ বছর বয়স হতে চললো সুন্দরবনের বসতের, অথচ সভ্যতার এতো কাছাকাছি থেকে সভ্যতা থেকে এতো দূরে বোধহয় এখন কোনো সুসভ্য জাতিই নেই পৃথিবীর, এই মানুষদের এক বিশাল অংশ এখনো দেখেনি পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, বাস-ট্যাক্সি বা আধুনিকতম সভ্যতার নিদর্শন। সার সার ডিঙি রঙীন পাল উড়িয়ে সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে নিয়ে যায় কাছাকাছি কোন শহর থেকে আনা আনাজপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বা মানুষজন। মানুষ বকচরের একহাঁটু কাদা পেরিয়ে দশ পনেরো মাইল আলের পথ বা ইরিগেশনের বাঁধ ধরে হেঁটে যায় তার গাঁয়ের দিকে। বর্ষায় সে পথ হিমালয়ের বরফ-ঢাকা পার্বত্য পথের চেয়েও হয়ে ওঠে দুর্গম, এঁটেল মাটি বৃষ্টির জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল হয়ে পড়ে।

পিতৃপুরুষেরা পত্তন গড়েছিলেন বেঁচে থাকার তাড়নায়, কিন্তু উত্তরপুরুষকে শিখিয়ে যাননি কিভাবে এই অন্ধকার থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। সুন্দরবনের এখনকার বাসিন্দা জন্মেই শিখে নিয়েছে বেঁচে থাকার এইটেই স্বাভাবিক রীতি, যখন দুখানি সবল পা, বিশাল কলজের জোর আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়েছেন ঈশ্বর, তখন এই নদীনালা আর জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তাই জমিজিরেতের ওপর অসীম মায়া তাদের, বুক-বুক করে ধরে রাখতে চায় বাপ-ঠাকুর্দার ইজারাপ্রাপ্ত সম্পত্তির শেষ লেজিটুকু, চাষবাস করে আর জমিটুকু ধরে রাখবার প্রাণান্ত-প্রয়াসে মামলা-মোকর্দমায় কেটে যায় তাদের দিনগুলো।

এদিকে জমিও একফসলী, যেটুকু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমন ধান ঘরে ওঠে তাছাড়া কোনো বিশেষ চাষ সম্ভব নয় এ-মাটিতে। নোনাজল চারদিকে, আধুনিক উপায়ে কোনো নল-কূপও কার্যকরী করা যাচ্ছে না যেহেতু এগার-বারোশ ফুট নিচের জলও নোনার প্রভাবপুষ্ট। মিষ্টিজলের পুকুর কাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে মাঝে মধ্যে, তাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বছরে যদি ষাঁড়াষাঁড়ির কোটালে ইরিগেশনের বাঁধ উপচে বা ভেঙে ক্ষেতে মাঠে ঢুকে পড়ে নোনাজল তাহলে আর চাষীকে ফসল ঘরে তুলতে হবে না, নোনার আগুনে ফসল ও জমির বুক পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। যে বছর অজন্মা, চাষীকে হাভাতে হয়ে কোন দুষ্ট মহাজনের হেপাজতে দাদনের ভারে গলা অব্দি ডুবে থাকতে হয় যেন মেরুদণ্ডহীন।

এরকম টানাপোড়েনে সুন্দরবনের মানুষ প্রায় বিপর্যস্ত, নিপেষ্ট-ক্রীতদাসের সঙ্গে [illegible] ফারাক। প্রকৃতির ক্রীতদাস হয়ে জোয়ার-ভাঁটার দেশে [illegible] গুনে হিসেব করতে হয় তিথি, বাড়ি থেকে বেরুবার [illegible] বা ভাঁটার তালে নিসর্গিত হয় গতিবিধি, কখ[illegible] রাত খোলা আকাশের নিচে ডিঙির পাটাতনে কেটে যায়।

সুন্দরবনের এখন দুই শরীক : জোতদার ও ভাগচাষী

মাঝে মধ্যে এক-আধটা ছোট ছোট বসতি, তারপর মাইল-মাইল মাঠক্ষেত বিশাল প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সুন্দরবনে। সে মাঠে খরিফ শস্যের সময় সবুজে সবুজ, ধান কাটা সারা হলে বুকফাটা মাঠ খাঁ খাঁ করে জানান দেয় বিশাল শূন্যতার। এই একফসলের দেশে জমি খতিয়ান থেকে খণ্ড-খতিয়ান হতে হতে ক্রমশ বোঝা বাড়িয়েছে আলের, আর সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল ভাগচাষী গোষ্ঠীর, যারা এই সুন্দরবনের জনসমষ্টির সংখ্যাগুরু অংশ। জোতদার তার সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণ ও চাষআবাদের কারণে সৃষ্টি করেছিল ভাগচাষীর, ভাগচাষ-আইনে এখন ভাগচাষী ফসলের ভাগ পায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, আর মালিক লাঙল বীজ ও সার সরবরাহ করলে ভাগাভাগি হয় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এক লপ্তে হাজার হাজার বিঘে জমি থাকলে, সে জমির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রায় অসম্ভব কাজ, জোতদার ভাগচাষীতে ঠিকমতো সদ্ভাবও থাকে না। পরস্পর অসাক্ষাতের আর ভুল বোঝাবুঝির সূত্রে ক্রমে এক অলিখিত দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় এই দুই শরিকের মধ্যে, যে দ্বন্দ্ব পর্যবসিত হয় মামলা-মোকদ্দমায়। এখন ভাগচাষী ও জোতদার পরস্পর পরস্পরের জাতিশত্রু হিসেবে পরিগণিত। আর 'দখনের লোক মামলাবাজ' একথার সত্যতা প্রমাণ দেবার জন্যই বুঝি ধানকাটার মরশুম শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোর্ট-কাছারিতে আনাগোনা শুরু হয়। তার থেকে বাগ্‌বিতণ্ডা, শেষ পর্যন্ত লাঠিয়ালও জড়ো হয় জমির আলের উপর। সরকারী আইনের যতো কড়াকড়ি হচ্ছে, আইন রচিত হচ্ছে ভাগচাষীর অনুকূলে, ততো ভাগ-চাষীর শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে দেশের সর্বত্র। নদীনালার দেশে একফসলী জমিই যেখানে একমাত্র সম্বল, সেখানে জোতদার ও ভাগচাষী মরীয়ার মতো আঁকড়ে পড়ে থাকে সুন্দরবনের জমি।

গত দশ বৎসরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভাগচাষ-আন্দোলনের ফলে এখন অনেক ভাগচাষীই তাঁর মালিককে ফাঁকি দিয়ে জমির ফসল নিজের গোলায় তুলছেন, বিশেষ করে যে-সব মহাজন কলকাতা, হাওড়া বা মেদিনীপুরের বাসিন্দা, স্থানীয় ভাষায় যাঁদের বলা হয় 'পাইকস্ত মহাজন' বা 'ফাঁকের মহাজন', তারা আর ভাগচাষীর কাছ থেকে ফসলের ন্যায্য ভাগ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে পারছেন না। অবশ্য কাকদ্বীপের জুমুর মোল্লা-তুমুর মোল্লাদের মতো অনেক মহাজন এ-নামে বে-নামে শ'য়ে শ'য়ে জমির মালিক হয়েও দাঁতের উপর রেখে দিয়েছে ভাগচাষীদের।

গোলাভরা ধান .... সেদিন একদিন ছিলো ....

ঠাকুরমার মুখে শোনা রূপকথার গল্পে হাঁ হয়ে যেতাম রাতের বেলা, ঘুম আসতেই চাইতো না। রূপকথার রাক্ষসের সঙ্গে আরেকটা কথা গেঁথে গিয়েছিলো মনের মধ্যে : হাতীশালে হাতী, পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান। জঙ্গল সাফাই-এর পর একদিন উর্বরা ছিলো সুন্দরবনের জমি, দুর্গম পথঘাটের জন্য দামও ছিলো কম। এখন যেমন কমে এসেছে বিঘা পতি ফসল, তেমন উদ্বৃত্ত ধান ঘরে রাখার রেওয়াজ নেই আজকাল। লেভী-আইনে খোরাকি ছাড়া বাকি সব ধান সরকারের ডি পি এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হয় সরকার নির্ধারিত মূল্যে। সুন্দরবনের বহু মানুষকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, এ-ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ রয়েছে প্রচণ্ড। বর্ধমান বা বীরভূমের উদ্বৃত্ত তিনফসলী জমির উৎপাদনের সঙ্গে সুন্দরবনের দুর্গম-এলাকার একফসলী জমির

উৎপাদন দেখা হয় প্রায় একই হারে; একথা তো সত্যি, এই এক-ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকেই তাদের শিক্ষা-খরচ, ঔষধ-খরচ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য খরচ চালাতে হয়। সেখানে বাজারে যখন ধানের দর দেড়শ' টাকা, তখন সরকারী-নির্ধারিত সাতাত্তর টাকা কুইন্ট্যালে ধান বিক্রীর হুকুমটা তাদের কাছে জুলুম বলে মনে হয় বৈকি। আবার ভাগ-ধান পান না এমন অনেক জমির মালিকের নামে লেভির নোটিশ গেলে তাদের বাধ্য হয়ে শরণাপন্ন হতে হয় কোর্টের।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, বছরের পর বছর এতো হয়রানির পরও জমির মালিক আজও ত্যাগ করতে পারেন না জমির মায়া। অনেককেই বলি, বিক্রি-বাটোয়ারা করে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যান না কেন, তাহলে তো প্রতি বছরের এই হাঙ্গামা, কোর্ট-কাছারি আর মিশার ভয় থেকে তো রেহাই পাওয়া যায়? কিন্তু হয়তো উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া এই জমিজিরেত তাঁদের নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সরকারের আইন যেমন আছে তেমনই তাকে বিপর্যস্ত করতে রয়েছে জানচালের চোরাকারবারীরা। কিছুদিন আগে ক্যানিং থেকে গোসাবা যেতে লঞ্চে আলাপ হলো গড়খালির জামসেদ আলীর সঙ্গে। অল্পজমির মালিক তার বাবা, ফসল ওঠার পর সে নেমেছে চোরাকারবারীতে। বাসন্তী এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে ডিঙি-বোঝাই ধান নিয়ে পাচার করে ক্যানিং-এর চুনাখালিতে। জিজ্ঞাসা-বাদে উত্তর দেয়, দিনের বেলা মামাদের সঙ্গে ঘর থাকে, বস্তা প্রতি এক থেকে দেড় টাকা। আইনের ধরো কড়াকড়ি হয়, এই রেট ততো বাড়ে। তারপর রাতের বেলা ডিঙি-বোঝাই ধান নিয়ে পাড়ি দেয় চুনাখালি, ওখান থেকে অন্য কেউ ক্যানিং হয়ে কলকাতা নিয়ে যাবে। ধানের মালিকও এখন গোলায় ধান না রেখে উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করে দেন দালাল বা ফড়িয়াদের হাতে, যেখানে সরকার বা রাইসমিলের বাঁধা দর থেকে কিছু বেশী মুনাফা হতে পারে। ধান পাচার করার জন্য যেমন নদীতে ব্যবহার হয় ডিঙির, তেমনই দুর্গম সুন্দরবনের মাত্রক্ষেতে গরুর গাড়ির চলন না থাকায় ঘোড়ার পিঠে চালান হয় ধান, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'বোলদেও'।

একশ' বছর আগে এখানেই ছিলো অসাড় জঙ্গল, অথচ এখন কাকদ্বীপ জমজমাট শহর হয়ে উঠেছে।

গলিঘুঁজিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কোন জীর্ণপ্রায় দোকান বা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে শোনা যাবে, 'এ বাড়িটা তো সেই জঙ্গল কাটাই থেকে এভাবেই রয়ে গেছে।' অথচ তার চারপাশ ঘিরে একশোটা বছর গজিয়ে ফেলেছে অনেক উদ্ভিদ, বিস্তার করেছে অনেক শাখা-প্রশাখা। একদিন কাকদ্বীপ থেকে ডায়মণ্ডহারবার কোর্ট যেতে হলে একমাত্র যান ছিলো ডিঙি, তখন ছিলো না রাস্তাঘাট, এমন কি পায়ে হাঁটার পথও। এখন জমজমাট শহর কাকদ্বীপের পাকারাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জনৈক ফিশারী অফিসার স্মৃতিচারণ করেন উনিশো পঞ্চাশ-একান্ন সালের। যখন নোনা-জলের মাছচাষের জন্য তাঁরা ডায়মণ্ডহারবার থেকে লঞ্চযোগে কাক-দ্বীপের জলজঙ্গলের উপকূলে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন জলাবিলওলা কাকদ্বীপে। তখন আশেপাশে উঠছে চালাঘর, জঙ্গল-কাটাই হওয়া এক রুক্ষ চেহারা, মাঠক্ষেত চারদিকে, এখনকার আর পাঁচটা লাটের গাঁয়ের মতোই। তারপর তিপ্পান্ন-চুয়ান্নতে পাকা রাস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার আলো এর গাড়িতে চড়ে, পাকা-বাড়ির পরে পাকাবাড়ি হতে এখন অফিস-স্কুল-কলেজ-কোর্ট-হাসপাতালে কাকদ্বীপের আদত পাল্টে ফেলেছে প্রায়। গড়ে উঠেছে ইরিগেশনের নতুন কলোনী, তার লাল বাড়িগুলোতে হিসেব রাখা হয় মাটি-কাটার, নদীর দুই কূলের বাঁধ মেরামতের চিরাচরিত নিয়মানুসারে। ব্লক ও জে-এল-আর-ও অফিস দিন দিন জনাকীর্ণ হয়ে উঠছে দিনের বেলায়। হাসপাতালে বেড়ে গেছে রুগীর পরিমাণ, ঘোরাফেরা করছেন ওয়ার্ডে তরুণ ডাক্তারেরা, এমনকি পশুচিকিৎসালয়েও রোজই ভিড় বাড়াচ্ছে অবলা পেশেন্টের দল। প্রায় তিরিশটির মতো সরকারী অফিস তার পাঁচশো কর্মচারীসমেত ঝকমকে করে রেখেছে কাকদ্বীপকে। এই সরকারী তৎপরতার বাইরে নজর দিলে অনুভূত হবে যেজন্যে এই ভীড় সেই স্থানীয় বাসিন্দারা, মানে যারা শহর কাকদ্বীপকে মূলধন করে মূলধন

যেখানে উদ্বাস্তু যায়নি

যে কোন অঞ্চলেরই স্থানীয় মানুষ বুজির ধান্দাটা তার নিজের এলাকাতেও করতে পারে। কিন্তু কোন রাজ্যে বহিরাগতরা যেহেতু স্থানীয় মানুষ হওয়ার চেনা-জানা, শেকড় থাকার জোর—ইত্যাদির সুযোগ সহযোগিতা পায় না, তাই বুজির ধান্দাটা করে যেখানে বুজি-রোজগারের স্কোপটা অনেক, অনেক বেশী সেইসব জায়গাতেই অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজধানী ও শিল্পনগরীগুলোতেই। আর বুজির ব্যাপারটাই যেহেতু বেঁচে ও টিকে থাকার প্রধানতম ব্যাপার, সেহেতু মাথা গোঁজার ঠাঁইটাও স্বাভাবিক-ভাবেই বুজির জায়গা বা তার আশপাশের অঞ্চলেই হয়। উদ্বাস্তুরা বহিরাগত এ রাজ্যে। স্বাভাবিকভাবেই তারা জমাট বেঁধে আছে কলকাতা এবং শিল্পনগরী-গুলোতে ও আশপাশে। কলকাতা একটু ছাড়িয়ে গেলেই, বা কিছুটা, উদ্বাস্তু-দের দেখা প্রায় মেলেই না।

—কলকাতার দোরগোড়াতেই, বেলের টিকিটে হাওড়া থেকে যার দূরত্ব ছাপা থাকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার—এমন একটা গ্রামাঞ্চল হল হুগলী জেলার বলরাম-বাটী। ঐ অঞ্চলে বেশ কয়েকটা গ্রাম আছে। কিন্তু এতবড় একটা তল্লাটে একটাও উদ্বাস্তু মিলবে না—কি নতুন, কি পুরোন।

একটা কথা মনে রাখতে হবে উদ্বাস্তুরা জমিজমা ঘরবাড়ীই নয়, আরও অনেক কিছুই হারিয়ে চলে আসে। শেকড় ছেঁড়া হয়ে। তারাতো বাউল-বিরাগী নয়। সাধারণ মানুষ। আর শেকড় না থাকলে তো সাধারণ মানুষ টিকতেই পারে না। তাই নতুন জায়গাতে এসে উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাড়াতাড়ি সে-জায়গায় শেকড়-গাড়ার এটা সেটা বিভিন্ন চেষ্টা-টেষ্টা দেখা যাচ্ছে। যেমন — খ্যাঁচড়া আধ-খ্যাঁচড়াভাবে গড়ে ওঠা কাঁচা রাস্তা ছোটখাটো কয়েকটা দোকান, সুগিরির চেয়ে এককাঠি দুকাঠি উন্নতস্তরের ঘর-বাড়ী....। এগুলোর কোনটাই নেই বলরামবাটীতে। ওখানকার রাস্তাটা কাঁচা হলেও বহু পুরোন, দুটো জেনারেশন পার করা তো হবেই। তাড়াহুড়ো করে যে তৈরী করা নয় এটা দেখলেই বোঝা যায়। আর নেতাজী কি বাঘা যতীন পাঠমন্দির ইত্যাদি নামের এলোমেলো গোছের দরিদ্র বিদ্যালয়, যা উদ্বাস্তু এলাকাগুলোতেই শুধু দেখা যায়, তা এখানে নেই। এখানে একটা প্রাইমারী

বাড়িয়ে নিচ্ছে নিজেদের, বানাচ্ছে বড়ো বড়ো প্রাসাদ। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভূষিমালের ব্যবসাদার, বা কাপড়-ব্যবসায়ী অথবা কন্ট্রাকটর। বুদ্ধি খাটিয়ে মূলধন বিনিয়োগ করে টাকায় টাকা বা ততোধিক রোজগার তাদের। তাছাড়া আছে এই শহরের ভৌগোলিক গুরুত্ব, কাকদ্বীপ-নামখানা-সাগর-পাথরপ্রতিমা চার-চারটি ব্লকের একমাত্র দরজা এই কাকদ্বীপ, উপরন্তু মুড়িগঙ্গার ওপারে মেদিনীপুরের কাঁথি-খেজুরি-তালপাটি অঞ্চলের এক বিশাল জনসমষ্টি তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য নির্ভরশীল কাকদ্বীপ শহরের ওপর। হাটের দিনে শ'য়ে শ'য়ে ডিঙি এসে নোঙর করে কাকদ্বীপের রূপচাঁদ ঘাট, লঞ্চঘাট, শ্মশানকালী বা অনিল মাইতির ঘাটে, গভীররাত পর্যন্ত কেনাবেচা শেষ করে বোঝাই-ডিঙি নিয়ে জোয়ার-ভাটার ঘড়ি অনুযায়ী ফিরে যায় লাট-অঞ্চলে। এই ভাসমান জনপ্রবাহের নিত্যব্যবহার্যের জন্য কাকদ্বীপে জমে উঠেছে হোটেল-ব্যবসা। এরা যেমন এইসব ছোট কারবারীদের প্রয়োজন মেটায়, তেমনি আহার যোগায় বকখালি বা সুন্দরবন ভ্রমণেচ্ছু ট্যুরিস্টদের। ক্রমে কাকদ্বীপ হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের ফটক, এক জমজমাট সবে গড়তে-থাকা শহর, যতো না এর স্থানীয় মানুষদের অগ্রগতির জন্য তার চেয়েও এখানে ভাসমান দূর-দূরান্তের মানুষজনের যাতায়াতের ফলে, আর শহরের এক বিরাট অংশ সরকারী অফিসের কর্মিবৃন্দের অবস্থানের জন্য তো বটেই।

সুন্দরবনের বাঘ চোরাকারবারীদের অনেকটা ঠেকিয়েছে।

জামাজলেত বাদ দিলে সুন্দরবনের আর যে সম্পত্তি মানুষের চোখে লোভনীয় তা হলো সুন্দরবনের গভীরতর অংশে বনসম্পদ, যার লোভে বছরের পর বছর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মানুষ ডিঙি সম্বল করে সেঁধিয়ে যায় গভীর জঙ্গলের খাঁড়ির ভিতর। ডিঙি থামিয়ে বেয়ে গরাণ গেঁয়ো পশুর বা গোল-এর জঙ্গল কেটে বোঝাই করে ডিঙি, বনঝাউএর ডাল থেকে টইটম্বুর মধুর চাক ভেঙে ভর্তি করে কলস। এক-একটা মৌচাক থেকে মাঝে মাঝে ষোল থেকে আঠেরো কেজি মধুও পাওয়া যায়। সজনেখালি যেতে যেতে প্রশ্ন করি দোলো মাঝিকে, 'ভয় করে না তোমাদের, এতো ঘন জঙ্গল, আর যেরকম বাঘের উৎপাত?' দোলো হাসে, তার মুখের মানচিত্রে আলোছায়ার খেলা, 'বাবু, মধের নেশা কি জিনিস, আপনেরা বুঝবেন না। এক-একবার জঙ্গল করে ফিরলে পুরো দু-দুটো পাতি হাতে আসে।' মানে দুশো টাকা।

প্রায়ই বাঘের উপস্থিতি শোনা যাচ্ছে সজনেখালি থেকে কেঁদো পর্যন্ত গোসাবার দক্ষিণে বিশাল জঙ্গলের ভিতরে বাইরে। গোসাবা থেকে মাত্র দশ-বারো মাইল দক্ষিণে সজনেখালির জঙ্গল। গোমর নদী ধরে ডিঙিতে গেলে একপাশে জঙ্গলের ফরেস্ট-অফিস, অন্যপারে লোকালয়। মাঝে মাঝেই বাঘ নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। কদিন আগেই এক বাঘিনী তার সদ্যোজাত সন্তানকে বাঁচাবার জন্য নদী পেরিয়ে চলে গিয়েছিলো ওপারে; মানুষের তাড়া খেয়ে আবার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেছে।

বড়ো-সাইজের কাঁকড়া জাল থেকে বার করে ভাঁড়ে পুরছে এমন এক রোগা শীর্ণ আলগা-গায়ে শীতের ভোরে কাঁপতে-থাকা মাঝি জানালো, কদিন আগেই তার নৌকোয় রাতের গভীরে বাঘ এসে হানা দিয়ে গেছে।

তাই তো দোলো মাঝি ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, বাবু বাঘের উৎপাত যদি না থাকতো তাহলে সুন্দরবনের জঙ্গল করে সাফ হয়ে যেতো, চোরাকারবারীরা সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বনের মধু আর কাঠ সাবাড় করে দিতো চোখের নিমেষে।

জম্মুদ্বীপে শুঁটকিমাছের ইন্ডাস্ট্রি

কলকাতা থেকে এখন সরাসরি নামখানা পর্যন্ত স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস যায় দিনে দুখানা করে, নামখানায় হাতানিয়া দুয়ানিয়া নদী পার হয়ে ওপারে এক ঘন্টার ঢিমেতালা বাসে পৌঁছে যাওয়া যায় ফেজারগঞ্জে, যার মাইল দেড়েক দূরে হাঁটাপথে বকখালি। ফেজারগঞ্জ থেকে সমুদ্রের বাঁচে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের বুকে জম্মুদ্বীপ ভাসছে বড়োসড়ো একখানা জাহাজের মতো। দু-আড়াই স্কোয়ার মাইলের এই ছোট্ট দ্বীপে এখন কেবল বড়ো বড়ো ঘাস ও কিছু গেঁয়ো হেঁতাল গাছের দেখা মেলে। আর আছে চমৎকার বালির লম্বা বাঁচ। ফেজারগঞ্জ বা বকখালি থেকে

স্কুল আছে আর মেয়েদের ক্লাস এইট আর ছেলেদের সেকেন্ডারী। তিনটে স্কুলেরই নাম অন্যরকম। দুটোর প্রতিষ্ঠাতাদের নামে নাম, যাঁরা এখানকার তিন পুরুষের স্থায়ী বাসিন্দা। মাস্টার মশাইরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেবার সুযোগ পেয়েছেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তাদের কাউকেই ফ্রি সার্ভিস দিয়ে যেতে হয় না। মুদীর দোকান সব দোকানই দশ-বিশ বছরের শেকড় গেড়ে বসে আছে, দরমা টিনের বাতাবাতি গজিয়ে ওঠা দোকানপাট নয়। মাটিরই হোক পাকাই হোক সব, সব বাড়িগুলোই থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় নিদেন দুটো জেনারেশন তো কাবার করেছে,— উদ্বাস্তু-এলাকার বাড়িঘর গুলোর মত পলকা-টলকা কি সাতলা-হীন দেওয়াল-ওলা নয়। উদ্বাস্তু এলাকাগুলো দেখেছি, কেমন যেন সব দূরে দূরে 'নোঙর করার' মত ভাব—কে কার কতি ধারে হে' এমনটা। ওইসব এলাকার মানুষদের মধ্যে দস্তুরমত ভাগ হয়ে যায়। আদি বাসিন্দা আর উদ্বাস্তু— দু পক্ষই পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকে। ঐসব জায়গার বাসিন্দাদের দেখলে আমার মনে হয় পরিবারগত একদল মানুষ কিছু-দিনের জন্য এসেছে। অনুপ্রবেশকারী-টারীর মত মনে হয়। স্থানীয় আদি বাসিন্দারা এলাকাটা থেকে তাদের শেকড় ছিঁড়ে গেছে অ্যামনটা ভাবতে থাকে। ফলে তারা নিজেদের এলাকাটা সম্পর্কেই ভালোবাসা-টালোবাসা হারিয়ে ফেলে। কলরামবাটীতে স্বাভাবিকভাবেই এসব কিছুই নেই। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। দু-পক্ষের ভাগ নেই। সুতোকেই এই অঞ্চলটার সঙ্গে নাড়ির যোগ অনুভব করে, ফলতঃ প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ একটা থিরথিরে ভাব। ক্ষমতা প্রার্থনীয়— উদ্বাস্তু অঞ্চলগুলোয় পুরুষ-নারী ও অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেমন যেন একটা 'বে-আব্রু, 'হা হা হি হি' 'কি ডোন্ট কেয়ারি' ভাব আছে, কোন কিছুতেই রাখঢাকের বালাই নেই। সেই ভাবটা এখানে নেই। এখানে যা কিছু হয় রেখে ঢেকে হয়। স্বার্থ-পরতা, পরচর্চার অকর্মণ্য বসে থাকার ব্যাপারটা দারুণভাবে হয়, যা উদ্বাস্তু এলাকাগুলোতে হয় না। মাইকে শুধু হিন্দী কি হাল্কা ফিল্মী গান বাজে না, সিরিয়াস গানটানও প্রায়ই বাজে: এখানে রেলস্টেশনে অফিস-টাইমে সন্দেহজনক অফিসযাত্রিনী কি কলেজ-পড়ুয়া তরুণীদের দেখা যায় না। উগ্র চোখ মুখের ছেলেদেরও দেখা যায় না চায়ের দোকান স্টোকান বা এখানে ওখানে।

গৌতম ভট্টাচার্য

লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবস্থা করলে এই দ্বীপকে এক চমৎকার ট্যুরিস্ট-সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। দ্বীপের চারপাশে তৈরী করা যেতে পারে হাউসবোটের মতো থাকার ব্যবস্থা। জঙ্গল পরিষ্কার করে চারপাশে বাঁধ দিয়ে ছোটখাটো টাউনশিপ গড়ে উঠবে হোটেল-রেস্তরাঁ সহ। অবশ্য এই ব্যবস্থাপনা-শুধুমাত্র শীতের তিন মাসের জন্য চললেই ভালো হবে। দু-চার দিন হাউসবোটে উইক-এন্ড কাটিয়ে আবার কল্লোলিনী কলকাতায় ফিরে যাবে তাজা ফুরফুরে মানুষ।

অথচ এমন একটি সুন্দর দ্বীপে এখন বছরের চার-পাঁচ মাস জুড়ে বাস করে চার-পাঁচশো ঘর জেলে। ডিঙি করে গভীর সমুদ্র থেকে তারা শোল, পাঙাশ, আড়, পারশে বা রূপবতী মাছ ধরে নিয়ে আসে, দিনের রোদ্দুরে শুকিয়ে নেয় সেই মাছ বালির ওপরে ফেলে, তারপর সেই শুঁটকি মাছ ফের ডিঙি-বোঝাই করে চালান হয় কাকদ্বীপ-নামখানা হয়ে কলকাতা বা অন্য কোথাও।

সুন্দরবনের কুমীর প্রকল্প

সরকারের বনদপ্তরের কল্যাণে সুন্দরবনে আর এক সম্পদ গড়ে উঠতে চলেছে, তা হলো কুমীর-প্রকল্প। কুমীরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে তাকে বড়ো করে মোটারকম বিদেশী-মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করেছেন বন-দপ্তর এই প্রকল্পের মাধ্যমে। নামখানা থেকে হাতানিয়া দুয়ানিয়া নদী ধরে সপ্তমুখী পার হয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবৎপুরে গত পাঁচ-ছ মাস ধরে এই প্রকল্প চলছে, তাই দেখবার জন্য সেদিন নামখানার রেঞ্জ-অফিসার সুকুমার খাস্তগীরের সঙ্গে যখন ভগবৎপুরে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। নদী থেকে গরাণের জেটি উঠেছে মাটির বাঁধে, চারপাশে নারকেল-চারা লাগানো হয়েছে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে, কিছু ঝাউ চারাও জায়গাটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে অনেকখানি।

মিঃ খাস্তগীর বলছিলেন, এই প্রকল্প শুরু করার জন্য আগ্রহ আসছিলো অনেকদিন ধরেই, সারা সুন্দরবনের জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলেছেন কুমীরের ডিমের খোঁজে। শেষে গত ২৪ জুলাই (১৯৭৬) হেড়োভাঙায় হেঁতাল-জঙ্গলে খোঁজ মিললো কুমীরের ডিমের। জঙ্গলের ভিতর ঠিক যে-পর্যন্ত জোয়ারের জল গিয়ে পৌঁছয় তার একটু উপরে ফাঁকা শুকনো এবং উঁচু মাটিতে ডিম পাড়ে কুমীর।

ডিম পাড়ার পর তা দেওয়ার পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন-ধরনের। হেঁতালপাতা আর মাটি জলে ভিজিয়ে লেই করে তার উপরে ডিম পাড়ে কুমীর, তারপর তার উপরে আবার মাটির লেই দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে ডিমগুলো। তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য লেজ দিয়ে বারবার সেখানে জল ছিটোয়, কখনো শরীরের উত্তাপ দিয়ে সেটা গরমও করে তোলে কুমীর। ৮০।৯০ দিন এভাবে বাসা আগলে রাখার পর হঠাৎ ডিম ফাটার শব্দ পেলেই বাসাটা ভেঙে ফেলে সে, তারপরই কুমীরের বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

ঠিক এমনি এক বাসার সন্ধান পেলেন কুমীর প্রকল্পের ভৌমিকবাবু এবং রেঞ্জ-অফিসার মিঃ খাস্তগীর। আগলে-থাকা মা-কুমীরকে লাঠিসোটা দিয়ে খেদিয়ে বাসা ভেঙে ওঁরা নোট করে নেন কোন ডিম কোন পজিসনে এবং কার উপর কোনটা আছে, কাঠের বাক্সে ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে মাটি দিয়ে লেপে ওঁরা চলে এলেন ভগবৎপুরে। বাসা-ভাঙার বাসার তাপমাত্রা ছিলো ৩২°-৩° সেঃ। ঠিক এখানেও তাপমাত্রা যাতে না বাড়ে-কমে তার জন্য কখনো জল ছিটিয়ে কখনো পলিথিন-সীটে ঢেকে এবং প্রতি দুঘণ্টা অন্তর তাপমাত্রা টুকে রাখতে লাগলেন ওঁরা। ঠিক ৩০ আগস্ট একচল্লিশটি পাওয়া ডিমের মধ্যে তেত্রিশটি বাচ্চা ফুটে বার হলো। বাক্সের মধ্যে ডিম-ফাটার আওয়াজ হতেই বাসা ভেঙে ডিমগুলো বার করে বাচ্চা হবার সুযোগ করে দিলেন ওঁরা।

তখন দশ-বারোটি চৌবাচ্চায় ওদের ছেড়ে দেওয়া হল, কখনো জলে কখনো জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে রোদ্দুরের আমেজ নিচ্ছিল বাচ্চাগুলি, এক-একটি দশবারো ইঞ্চি লম্বায়, কিন্তু তাতেই তাদের কি তেজ, মানুষজন দেখলে হাঁ করে তেড়ে আসে। তারের জাল দিয়ে চৌবাচ্চার উপর চমৎকার ঘর করা হয়েছে, ইঁট দিয়ে পাঁচিল গাঁথা হয়েছে চারদিকে।

বাচ্চা-কুমীরের আস্তানার পাশে একটি ছোট ল্যাবরেটরীও আছে, ওখানে ডিমের খোলা, যার সাইজ হাঁসের ডিমের চাইতে একটু বড়ো, তাছাড়া বাচ্চা ফুটতে গিয়ে মারা গেছে এমন একটি বাচ্চাকে রাখা হয়েছে ফরমালিন সলিউসনের ভিতর। সবই এখন প্রস্তুতির পথে। তার ওপাশে পাঁচিলের ভিতর একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো কুমীরও রাখা আছে। এখন বাচ্চাগুলিকে চিংড়িমাছ দেওয়া হয় খাদ্য হিসেবে, আর ওরাও বেড়ে উঠছে তরতর করে।

মিঃ খাস্তগীর জানালেন কথায় কথায়, উড়িষ্যায় প্রথম কুমীর-প্রকল্প শুরু হয়, এখন আমাদের পারফরমেন্স ওদের অবাক করে দিয়েছে। একদল শিক্ষার্থী শীগগীর পাঠাচ্ছেন উড়িষ্যা সরকার আমাদের কাছে ট্রেনিং নেবার জন্য।

একটা পূর্ণবয়স্ক কুমীরের বাজারদর এখন দশ হাজার টাকার মতো, সবই বিদেশী মুদ্রা আনতে সক্ষম হবে। কুমীরের চামড়া থেকে তৈরী হবে সৌখীন জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি, যা বিদেশে ভালো বাজার পায়। বন-দপ্তর এখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করছেন এই প্রকল্পের, তাঁরা আশা করছেন এই প্রকল্প খুব শীগগীর সবার নজর কেড়ে নিতে পারবে।

এভাবেই ধীরে ধীরে সুন্দরবনের মানুষের বেঁচে থাকার একটা আলাদা ধরণ গড়ে উঠেছে, যা আর পাঁচটা জেলার জীবনের সঙ্গে মেলে না, খাপ খায় না। সুন্দরবন চিরকালই রহস্যময় ছিলো, আজও একশ বছর পত্তন গড়ে ওঠার পরও সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের বসতি রহস্যময় রয়ে গেছে।

দিনভর স্নিগ্ধতার আলিঙ্গনে...

এক অভিনব
আকর্ষণীয় সুগন্ধে

প্রত্যেকটি দিনকে করে
তুলুন সুরভি-ধারায় স্নাত
এক অভিনব দিন···ব্যবহার করুন
বিনাকা স্টারডাস্ট ট্যাল্ক!
এর আকর্ষণীয় অনুভূতি সারাদিন
জড়িয়ে থাকে আপনার অঙ্গে অঙ্গে···।
এর স্নিগ্ধতার আবেশ সারাদিন
টেনে রাখে মধুর রেশ···
আপনার আপনজনদেরও
মাখতে বলুন।

বিনাকা স্টারডাস্ট ট্যাল্ক

U-6 T/11/7 ben

লাউডগার জীবন ও বিভূতিভূষণ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মেঘ মেঘ এই সকালে রাস্তার ওপারের কিন্তু চোখের ওপরের বস্তির দিকে এমনিই তাকিয়েছিলাম। আর অমনি শহুরে এই মনটায় সোঁদা সোঁদা গন্ধের শ্যামল সবুজ স্নিগ্ধ সুন্দর এক ঝলক গেঁয়ো জীবনের আবহাওয়া এমনভাবেই আমাকে দখল করে বসল, যেন আমি এরই আশায় বসেছিলাম এতকাল। আমার দৃষ্টির আশ্রয় সামনের একখানা টালির ছাদ, না, ছাদের ও-প্রান্ত থেকে উঠে এপিঠের ওপরে লতানো একটা লকলকে লাউ ডগা। লাল টালির ঢালু বুকে ঘোলাটে মেঘলা সকালের জলায় সবুজ কোমল তনুটি এলিয়ে লতাটা শুয়ে রয়েছে, পাগলা হাওয়ার সুড়সুড়িতে থেকে থেকে ওর কচি শরীরটা শিরশিরিয়ে দুলে দুলে খুশিতে লুটোপুটি করছে। ওই লাউ ডগাটা একটু একটু করে বাড়ছে—ক'দিনই দেখছি—ওই আমার শৈশব কৈশোরের পল্লী জীবনের স্মৃতিকে বহু যুগের ওপার থেকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে। ভোর-বেলায় আমার এই এক কাজ হয়েছে—ডগাটা কতটা বেড়েছে দেখা। গেরস্থর বাড়ির ভেতরের জমিতে ওর শেকড় রয়েছে। গাছটার মালিক সে। হোক্ না অন্য লোকে মালিক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমি ত উঠতি ঐ ডগার প্রতিদিনের সৌন্দর্য দেখার মালিক। এখানে আমার কোনো শরীক নেই, অংশীদারী নিয়ে মামলা - মোকদ্দমার ঝামেলাও নেই। ওই ত রয়েছে প্রকৃতির মহাগ্রন্থের একটি উজ্জ্বল, নির্মল, পবিত্র। আমারই পাঠ গ্রহণের প্রতীক্ষায়। আমার যখন ইচ্ছে, অবসর মত সময়ে ওকে দেখব, যেন সেই জন্যই অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে রয়েছে প্রকৃতি তার বিচিত্র সম্পদ সম্ভার সাজিয়ে।

কথাগুলো নতুন নয়, আমার নিজের বলে আহাম্মকীও যেন গোপনে গভীরে কোনোদিন না হয় আমার। কত বছর আগে তার সঠিক হিসেব দেওয়া মুস্কিল, যে-হিসেবটা পেশ করা যায় সেটা নেহাত ক্যালেন্ডারের কাল নির্দেশ ছাড়া বেশি কিছু নয়। আসল হিসেব আমি তাকে বলি না। অনুভূতির রাজ্যে সে মর্মবাণীটি নিজের প্রতিদিনের গতানুগতিকতার মালিন্যের আড়ালে আপন প্রাণ শক্তিতে লালিত হয়, বেড়ে উঠে অকস্মাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করে, আমার সত্তাকে অনুচ্চ উচ্চারণে জানায় 'আমি আছি, এই দ্যাখো' সেদিনটাকে এক হিসেবে অনুভূতির প্রাপ্ত বয়স্কতা বলতে হবে—বলতে হবেই।

অতো ভনিতার দরকার কি, আজকের ওই লাউ ডগাটা দেখে যে আনন্দ পেলাম বড়দার 'মাকালফলের কাহিনী'র প্রুফ সংশোধনের সময়ে তার প্রথম বীজটি আমার অন্তরে বপন করা হয়েছিল। হয়ত আমার বলা উচিত ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশা-এর 'অসাধারণ' গল্প গ্রন্থে ...ইত্যাদি। সেটাই সামাজিক শিষ্টাচার সঙ্গত হত। কিন্তু শুধু অসাধারণ সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়, এটুকু জাহির না করার কোনো কারণ ত দেখি না।

এমনিতেই সব দিনই ত সাধারণ দিন। আজকের এই দিনটিও তেমনি হয়ে ফুরিয়ে হারিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু ওই লাউ-ডগাকে দেখে মনের মধ্যে যে অনির্বচনীয়, অনাবিল আনন্দ উপভোগ করলাম, সেই আনন্দ আর কোনো দিন এ জীবনে আসবে কিনা না—জেনেও বলতে পারি এর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জমা থাকবে আর ঠিক সময়ে এর সৌরভ বড়সে বাস্তব-বিধ্বস্ত অন্তরটি আমোদিত হবে। আর এর জন্য যদি বড়দাকে না জানাই 'তুমি ধন্য—তাই আমিও ধন্য' তবে অকৃতজ্ঞতার অপরাধের গ্লানি আমাকেই কলঙ্কিত করবে। তাঁর মত করে বলতে পারব না। তার দরকারও নেই, আমার মত করেই বলি—এই লাউ-ডগার আয়ু কুঁড়ি, ফুল, ফল নিয়ে বড়-জোর মাসখানেক। তারপর ফল সমেত একে কেটে ফেলবে গেরস্থ। এ রকম কত লাউ-ডগাই ত পৃথিবীতে প্রতিদিন জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, কাটার পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কেউ তা দ্যাখে, কেউ বা দেখেও দ্যাখে না, কেউ দেখে আনন্দ পায়—প্রকৃতির এই দান সৌন্দর্যের পসারীকে যে আনন্দ দিল তার জন্য এক পয়সাও খরচ নেই অথবা লাখ টাকা খরচ করেও এমন আনন্দের সন্ধান নাও মিলতে পারে। বস্তীর এ-পারে জানালা দিয়েই ওই দিকে তাকিয়ে আমি যে আনন্দ পেলাম তা কি গাছটির মালিক পেয়েছে? সে হয়ত সাংসারিক বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, নিতান্ত একটা আনাজ-তরকারী হিসেবেই লাউ-বীজ বপন করেছে। তা করুক তাকে আমি মোটেই ছোট করতে চাই না। বাস্তব প্রয়োজনটা ত উপেক্ষণীয় নয়।

কথার কথায় মনে পড়ছে, বড়দা বলতেন, 'আমার মনে করলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায়।' প্রসঙ্গটা ছিল, তাঁর কলকাতায় বাড়ি করার বিষয়ে। মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসতেন, বন্ধুরাও চাইতেন তিনি কলকাতায় বাড়ি নিয়ে আর সবার মত বাস করুন। কিন্তু এক-আধ বেলা থেকেই চলে যেতেন। হাসতে হাসতে বলতেন—'শহর-বাজারে বাড়ি করার কোনো মানে হয় না। যে কোনো বাড়িই ত আমার বাড়ি হে! বলো, কোন্‌টা তোমার পছন্দ, আমি তোমায় দানপত্র করে লিখে দিচ্চি। আসলে গাছ পালা, খাল বিল না দেখলে মনটা ইঁট কাঠ সিমেন্ট আর গাড়ি ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ে মরে যাবে দমবন্ধ হয়ে।'

মন যখন চলতে শুরু করে তখন তার গতিবেগ বিচিত্র হয়, বর্তমানকে ডিঙিয়ে পারম্পর্যের বেড়া ভেঙে অনায়াসে যে কোনোকালে পৌঁছোয়। বছর তিরিশেকের কাছাকাছি অতীতের কথা। শহর কলকাতার

পঞ্চপাণ্ডবের পদচিহ্ন ডানদিক থেকে— গৌরীশংকর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ দত্ত

বিরাট এক ধনীর সঙ্গে আমার সে সময়ে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এ শহরে তাঁদের কমপক্ষে খান চল্লিশ-পঞ্চাশ বাড়ি ছিল। কাগজের বাজারে একচ্ছত্র কারবার তখন ভোলানাথ দত্ত অ্যান্ড সন্সের। সেই পরিবারের ছোটবাবু বিভূতিভূষণ দত্ত। এমনিতে তিনি এতই মিতব্যয়ী যে, 'কৃপণ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। আসলে মানুষটি খুব সরল এবং সাধাসিধে জীবনযাপনেই অভ্যস্ত। তাঁকে কলকাতার বাইরে নড়ানো কঠিন কান্ড। সেই কঠিন কান্ডটি আমি ঘটিয়ে ফেললাম। বললাম—'কেবল টাকার আন্ডিল বেঁধেই মরছেন। একটু বাইরে বেরিয়ে দেখুন না জগতটা কত সুন্দর।'

আমি গরীবের ঘরের ছেলে হয়েও ছোটবাবুকে কিছুতেই ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে চড়াতে পারি নি, তাঁর মতে ওটা বাজে খরচ। তবে অপরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিঃশব্দে দু-দশ হাজারের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করতেন না—এও প্রত্যক্ষভাবে জানা আছে আমার।

শীতের এক বিকেলে ছোটবাবুকে নিয়ে বসে মেলে উঠলাম ঘাটশিলার উদ্দেশে। সেখানে বড়দা আছেন, আছেন ভোলাদা আর ভোলাদার বাড়িতে হাওয়া বদলের জন্য বাসিন্দা ইন্দুদার শ্যালাও আমন্ত্রণ আছে। দাহিগোড়ায় ভোলাদার (বরণীমোহন মিত্র) বাড়ির উল্টো দিকেই বড়দার ঘাটশিলার কুটীর—কুটীর বলছি এই জন্য যে খোলার ছাদওয়ালা এই বাড়িটিকে ঠিক সাধারণ বাড়ি বলা যায় না, কেতাদুরস্ত বাংলোও তা নয়। আমার উদ্দেশ্য শহরের বিষয়ী বিভূতিভূষণ আর অবৈষয়িক বিভূতিভূষণে একটা যোগাযোগ স্থাপন।—রাতখানা গল্পগুজবে পার হল। পরদিন ভোরবেলায় পথে পা দিয়ে দেখি, ওই জনবসতিবিরল মোরাবের রাস্তায় আরও একজন, তিনি বড়দা। আমাকে দেখে বললেন, 'চলো একটু ঘুরে আসি।' আমতলার মোড়ে পৌঁছবার আগেই কন্ট্রাক্টর কালীবাবুকে ট্রাকের দেখভাল করতে দেখে বড়দা খুব উৎসাহ ভরে জিগ্যেস করলেন—কি কালীবাবু আজ কোথায় যাবেন ?

—মুরাকাঞ্জিয়া।

বড়দা বেশ বড় গলায় কালীবাবুকে শুনিয়ে আমাকে বললেন—গৌরীশংকর তোমার কপাল ভালো। মুরোকাঞ্জিয়ার জঙ্গল ভারি সুন্দর জায়গা। কালীবাবুর কল্যাণে ওদিকে আমার যাওয়া আছে। এ বেশ ভালই হল। লরী ছাড়তেও দেরি নেই।

তারপর আমায় কোনো কথা বলতে দিলেন না। ছোটবাবু, ভোলাদা, ইন্দুদা, বড়দার বাড়িতে নুটুদা, গৌরী বৌদি সবাই ভাববেন বাড়িতে খবর না দিয়ে এইভাবে বেপাত্তা হয়ে গেলে—এ-সব যুক্তির একটাও টিকল না। উনি বললেন, অত কান্ড করতে গেলে যাওয়া হয় না।

ওঁর এক কথা—ওরা সব বদ্ধ জীব। তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না। এই ত যাবো আর আসবো। জানাজানি হলে সেথো জুটে যাবে, অত জায়গা কোথায়।

সত্যি কথা। ড্রাইভারের পাশে একজনের সীট, তাতেই আমরা দুজনে কোনো রকমে বসবো।

বস্তুতঃ মুরাকাঞ্জিয়ার নাম ভূগোলের পাতায় লেখা নেই। নেই বলেই ত আর জায়গাটার সৌন্দর্য কিছু কম নয়। এই ভ্রমণের কথা আমি 'অপর পাঁচালী'তে লিখেছি। কিন্তু সেই বৃত্তান্তের বাইরে সেবারের যাত্রার আর একটি পদবন্ধে যোবার বিবরণ বাদ পড়ে গিয়েছিল—সেই কথাই আজ লিপিবদ্ধ করছি।

সে সময় হয়ত পঞ্চপাণ্ডবের সুবর্ণরেখার তীরে পদার্পণের কাহিনীটা আমি বিশ্বাস করতাম না বলেই মনে কিছু রেখাপাত করে নি, যেমন করে নি হাতী-জোবরাতে বুনো হাতীদের স্নানের গল্প।

মুরাকাঞ্জিয়ায় চলে গেলাম সকালে আর ফিরতে বোধহয় বেলা দেড়টা কি দুটো বেজে গিয়েছিল। বকুনী খেতে হল। ছোটবাবু ত রীতিমত তিরস্কারই করলেন—'মানেচ্চে কী যে করো, মানেচ্চে আমি

নাটকের অভিনব সংকলন
প্রকাশিত হোল

দু'টি পূর্ণাঙ্গ নাটক—ছ'টি একাঙ্ক নাটক এবং নাট্য-আলোচনাসহ একই মলাটে
আশ্চর্য সংকলন
শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত—

নাট্য লিপিকা

লিখেছেন—

ধনঞ্জয় বৈরাগী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্য, রতনকুমার ঘোষ, জ্যোৎস্নাময় বসু, সঞ্জীব সেন, প্রভাস ভদ্র, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, তপনকুমার ঘোষাল, মিহির সেন, অগ্নিদূত।

প্রায় পঁচিশ টাকার বই একই মলাটে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র
আট টাকায়

সীমিত সংখ্যক কপি ছাপা হয়েছে

লিপিকা / ৩০।১-এ কলেজ রো,
কলকাতা - ৯

তোমাদের এই খামখেয়ালের কোনো মানে খুঁজে পাই না।' তা তিনি বলতেই পারেন। কলকাতার নিয়মবদ্ধ মানুষ, তাঁকে সঙ্গে এনে এইভাবে ফেলে চলে যাওয়া মোটেই উচিত কাজ হয় নি। বড়দার অবিশ্যি অন্য যুক্তি, তিনি বলেছিলেন, এইসব বনজঙ্গল ওদের ভালো লাগবে না। সৌন্দর্য সবাই দেখবার চোখ নিয়ে আসে না।

বিকেলবেলায় বড়দার নেতৃত্বে আমরা বেরুলাম। বড়দার বেড়ানোর কোনো ছক নেই। এক-একদিন এক-একদিকে পা চালিয়ে দিলেই হল। অদ্ভুত অদ্ভুত নামও দিয়ে বসেন এক-একটা জায়গার, যে নামটা তাঁর একান্ত নিজস্ব। এবং দেখেছি কিছুকাল পরে সবাই সেই জায়গাটিকে তাঁর দেওয়া নামে বেশ চেনে। বিউটি স্পট আবিষ্কারের এই নেশা তাঁর এক বৈশিষ্ট্য। ছোটবাবু ঘাটশিলায় এসেছেন, তাঁকে নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে বই-কি। ভোলাদাও সঙ্গী। এবেলা আর দূরে পারে যাওয়া নয়, কাছাকাছি।

সুবর্ণরেখার ধারে যতো খুশি বেড়াও না। পাথুরে নদীর ধার, বালি আর বুনো ঘাস, কোথাও বা কিছু গাছ-গাছালি। বাংলাদেশের নদী তীরের শ্যামলতা খুঁজে না পেলেও উদাসী সন্ন্যাসীর বুদ্ধ বৃক্ষ দার্শনিক রূপের আকর্ষণ কি কম। এই আপাত কঠিন প্রকৃতির অন্তরে যদি সরসতা না থাকত তাহলে সুবর্ণরেখার বালির বুকে ওই স্রোত ধারা এল কেমন করে! শীতের তপঃশীর্ণ প্রবাহ কোথাও বা হারিয়ে গেছে, কোথাও গভীর পাথরের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। বর্ষার সুবর্ণরেখার সঙ্গে শীতের এই শুকনো নদীরেখার কোনো মিল নেই।

পাথরের চাঁইতে চারিদিক ঢাকা একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বড়দা বললেন—এই হল পঞ্চপাণ্ডব। এই যে দেখুন বিভূতিবাবু, পাঁচ-জোড়া পায়ের ছাপ। ভীমের পায়ের চাপে ওই জায়গাটা বেশি দেবে গিয়েছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—হ্যাঁ, পঞ্চপাণ্ডবের আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না, এখানে তাঁরা বেড়াতে এলেন—যত্তোসব—

বড়দা বিড়ি ধরিয়ে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে হয়ত বলে থাকবেন—তুমি থামবে কি ছোকরা। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের জন্যে নিশ্চয় কামাকাটকা কি লণ্ডনে চলে যান নি। সে যাক্, এখানে দু-দণ্ড স্থির হয়ে বস। দেখবে কি রকম ভালো লাগবে। বসো-ত!

—তা নয় বসছি। জায়গাটা নির্জন। এখানে একা একা বসে থাকলে নিভৃতে গভীর চিন্তা করাও সম্ভব। কিন্তু আপনি যাই বলুন বড়দা, পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন তার অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই।

ছোটবাবুর মুখে কোনো কথা নেই। তিনি একবার আমার মুখের দিকে আবার বড়দার দিকে চাইছেন। ভালো লাগার/মন্দ লাগার স্পষ্ট ছাপ মুখের কোথাও নেই।

বড়দা বললেন—হুঁ, ফ্যাক্ট প্রমাণ নেই। তা নয় না-ই থাকল। তুমি স্বীকার করছো যে জায়গাটা সুন্দর, বার্স তাহলেই হল। আমিও অবিশ্যি বলছি না যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এঁরা এখানে চড়ুইভাতি করেছিলেন। তবে এখানকার আদিবাসীদের বিশ্বাস এখানেই পঞ্চপাণ্ডবেরা ছিলেন।

এক ফাঁকে ভোলাদা আমাদের ফটো তুললেন। সেটা আজও রয়েছে আমার কাছে।

—আপনি একজন পণ্ডিত মানুষ, তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—তুমি ক্ষেপেচ। বেচারাদের কি সম্বল আছে বলো, যে সবল বিশ্বাস আর কল্পনা নিয়ে তারা বেঁচে আছে সেটুকুও নষ্ট করে দেবার আমি কে? শুধু এই ঘাটশিলা ধলভূমগড় কি গালুডিই নয় সারা ভারত জুড়ে কত জায়গায় কত কিম্বদন্তীই আছে তার হিসেব কে রাখে! আমাদের দেশই কেবল কিম্বদন্তীর দেশ নয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই এ রকম নানা ধরনের লোক-শ্রুতি তুমি দেখতে পাবে। দু-পাতা ইতিহাসের বিদ্যে নিয়ে তুমি যাকে ভ্রান্ত ধারণা বলছো, আসলে সেটা অত সহজে উড়িয়ে দেবার বস্তু নয়। মনের খোরাক সবারই দরকার। কেউ বা বই পড়ে সেই খোরাক মেটায় আর কেউ পৃথিবী আর চারদিকের প্রকৃতির পরিবেশ থেকে তা আহরণ করে। একজন একটা কিছু শুনল, সেটা গল্প করল কাছাকাছির পাঁচজনের কাছে। ধরো শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে বুড়ো গাঁও বুড়ো পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনী বলেছিল, তারপর তারই কোনো পড়শী দেখল পঞ্চপাণ্ডবের পায়ের ছাপ এইখানে। বেশ ত, কল্পনার এই যে অভিব্যক্তি মুখে মুখে চলে আসছে এই বা মন্দ কি। সত্যি-মিথ্যে, বাস্তব অবাস্তব, এ সবের বাইরে হল অনুভূতির রাজ্য। ভাবের রাজ্যে ভুল ঘটনা আমল পায় না হে সব সময়।

জবাব দেবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন সেই সুবর্ণরেখার চরে। সত্যিই ত, একই বস্তুকে কত দিক থেকে দেখা যায়, তা কি আমরা তলিয়ে চিন্তা করি। চিন্তার পথ দেখাবার মত মানুষ (আমি পুঁথিগত পথের কথা বলছি না) আজকের দিনে ক্রমেই কমে আসছে তাই বোধহয় এত উন্মার্গগামীতে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। থাক ওসব বড় বড় কথা। আমি কিছু কিছু এই ধরনের মানুষের সঙ্গ পেয়েছি, ইচ্ছে করে তাদের কথা শোনাই—মূল্যবান কিছু দিতে পারবোই এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব না হলেও হয়ত কিছু ঋষিঋণ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে পারা সম্ভব। ঋষিঋণ কখনো শোধ হয় না, তা প্রসবের মাধ্যমে উত্তর পুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত করাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা—কেন না সেগুলিই ত একটি দেশের, একটি জাতির ঐতিহ্য যা তাকে বিশ্ব মাঝে বৈশিষ্ট্য দেবে, একাল থেকে আগামীকালে উত্তরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার যোগসূত্রও বটে।

স্নেহাংশু দাস সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক **বনানী**
অক্টোবর '৭৭ সংখ্যা প্রকাশিত হল। মূল্য - ২ টাকা। উঁচু মানের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় পত্রিকা। যাঁরা এখনো 'বনানী' দেখেন নি, তাঁরা মণি অর্ডারে ২ টাকা পাঠান বা স্টলে দেখুন।
কার্যালয় : দক্ষিণ থানা মাকুয়া, পোঃ বি-গার্ডেন, হাওড়া-৭১১ ১০৩
বি/৩১০০

বেনারসী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়-সিল্ক
• তাঁত-মিল
• পোষাক
• সার্টিং-সুটিং
ও ছিট কাপড়

যাবো

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাইকেল রিক্‌শার হর্ন বেজে উঠলে যাবো।
শিফ্‌ট শুরু হবার আগেই
অথবা ঈষৎ-শেষে, ঘুমের আবেশে
সাইরেনের শব্দ নীল ভ্রমর গুঞ্জন মনে ক'রে
মঞ্জিষ্ঠা-অধরে চুমা দিতে গিয়ে ফের
দরবেশ পোশাক প'রে সুফীদের দেশে

যাবো

মেরি টাইলার অমলেন্দুর কাছে ফিরলে, মেরি টাইলারের
জেলখানার সেইসিস্‌ গাছে
পীতাভ
পাতায়-পাতায় কিছু পাখির জিঞ্জির ছিঁড়ে গেলে
বিছাবো
মেদুর মাদুর, তার জমিনে থাকবে অগ্নিলতা

সাইকেল রিক্‌শার হর্ন যে বাজাবে তার মেজো ছেলে
কোন্‌-একটা কলেজে পড়ে, বাপের হোটেলে
রুচি নেই, চিঠি দেয়নি বহুদিন হলো;
মেরি-টাইলারের অভিজ্ঞতা
তিক্ত করে দিয়ে কিছু কর্মচারী পাশপোর্ট বিকোলো
প'ড়ে-যাওয়া-নিক্‌সনের দরে

আমার যাওয়া না-যাওয়া দু'দিকে সমান ঝুঁকে পড়ে।

ক্যালিফোর্নিয়া-মলয়

একটি বিভ্রমণ কাহিনী

নবনীতা দেব সেন

কাচের ঘরে ওঠার হুকুম নেই। ছাদের উপর গাছ-পাথর পড়তে পারে। তবুও আমরা কতক যাত্রী উপরে উঠে দেখতে গেলুম অবস্থা। একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া দরকার, ব্যাপারটা কী ঘটছে। ইতি-মধ্যে গাড়ি আবার নড়েছে। একটু পিছিয়ে খানিক থামছে, আবার আস্তে আস্তে পিছনে চলছে। আবার থামছে।

কেন এত থামবো?—কেনই বা এত ধীর আমাদের গতি?—ওপর থেকে যা দেখতে পাওয়া গেল, তা বুঝতে পারা, বা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন। অতিকায় সরী-সৃপের মতো দীর্ঘ ট্রেনটির পশ্চাদ্দেশের দূর প্রান্তে চারটি রহস্যময় ক্ষুদ্র ছায়া-মূর্তি বরফ ভেঙে হাঁটছেন, শাবল বা কোদাল দিয়ে লাইনের ওপর খোঁচাখুঁচি করে বরফ সরানোর ভঙ্গি করছেন, তাতে বরফ সরুক বা না-সরুক (দৃশ্যত বরফ কিছুই সরছে না) পুনরায় হাঁটছেন। বেশ কিছুদূর যাবার পরে তাঁরা ইশারায় ট্রেনকে ডাকছেন। অমনি ট্রেন গুটগুটি পিছু হেটে তাঁদের কোলটি ঘেঁষে শান্ত ছেলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ছে। আবার তাঁরা পথ-কাটার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন। এই মূকনাট্য কিছুক্ষণ দেখবার পরে নেমে এলুম ভারাক্রান্ত মনে। এই বেটে চলে কি কি আমরা কোনওদিন কোথাও পৌঁছতে পারবো? এই ঐন্দ্রজালিক অঙ্গভঙ্গির মানে কি? ওঁরা কি বনের অপদেবতার ওঝা?—এসব প্রশ্নের উত্তর মিলেছিলো ট্রেন ছেড়ে আসার বহু পরে।

জিনিস হারানোয় ওস্তাদ অমর্ত্যর ট্র্যাভলার্স চেকের বইখানি ট্রেনের হট্ট-গোলে তাঁর নিয়মমাফিক হারিয়ে গেল। বার্কলিতে পৌঁছে যাবার দু'দিন বাদে ঐ ট্রেনের এক দয়ালু নিগ্রো কর্মী রবার্ট এল্‌উডস্‌, আমাদের বাড়ি বয়ে এসে চেক-বইটি ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ উপ-লক্ষে তিনি সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গে বহুক্ষণ সরস আড্ডা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই মুখে—ট্রেনলাইনের ঐ রহস্য মূর্তি-চতুষ্টয়ের দৃশ্যের ব্যাখ্যা শুনি। সত্যিই ঐ চারমূর্তি চারজন শ্রমিকের। তাঁরা ট্রেনের নিরাপত্তা বাঁচিয়ে পথনির্দেশ করছিলেন। কিন্তু বরফ নয়, ওঁরা সরাচ্ছিলেন পাথর। সারারাত্রি ধরে ছোটো ছোটো ধস নেমেছে। একদিক থেকে পাথর এসে জমছে রেললাইনে, অন্যদিকে খুচরো বরফ জমে উঠছে সেই পাথরগুলিকে আচ্ছন্ন করে। ঐ তুষারকে ট্রেন পারোয়া করে না মোটেই। ঐটুকু তুষার মাড়িয়ে সে অবলীলায় ছুটতে পারে। কিন্তু তুষারের তলায় যদি নেপথ্যশায়ী বড়ো পাথর থাকে, তাহলেই যে গাড়ি রেল থেকে ছিটকে পড়বে খাদের তলায়। এই শ্রমিকেরা পরীক্ষা করছিলেন, তুষারের ঢিবির নিচে শক্ত পাথর আছে কিনা। পাথর থাকলে সাফ করছিলেন, না-থাকলে হাত নেড়ে ইশারা করছিলেন।

বাতভর যে ট্রেন শুধু আগুপিছু খেলা করেছে, তারও কারণ জানা গেল। যাতে লাইনের উপরে পাথরের ঢিবি জমে উঠতে না পারে। এগিয়ে পিছিয়ে ট্রেন কেবল, ধ্বসে-পড়া পাথরগুলিকে সমান করছিলো। সারারাত থেমে থেকে সকালে হঠাৎ চলতে শুরু করলে ট্রেনটি লাইন থেকে ফস্কে যেতে পারে জমেওঠা পাথরের ঢিবিতে হোঁচট লেগে। তিন হপ্তা আগে সিয়েররাতে সাদার্ন প্যাসিফিক কোম্পানীর যে ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটেছিলো, সে তো এই কারণেই।

শুনেই রক্ত জল হয়ে গেলো আমার। অথচ তখন তো আমরা নিজেদের বৈঠক-খানার গরম দেওয়ালের আওতায়। 'ক্যালি-ফোর্নিয়া-মলয়' তখনই স্মৃতির এলাকায় পৌঁছে অবাস্তব ছবি হয়ে গিয়েছে।

চোখ মুখে আজ কিন্তু ঘুমের চিহ্নমাত্র ছিলো না। যদিও হাফ্‌ কাপও কফি মেলে নি আজ। —'বিছানা ছাড়ার প্রশ্নই তো নেই।' বলল বজার। 'বিছানা কোথায়?' —'কেডী এলেই সকলকে কফি দেওয়া হবে'—মলয়কন্যা দ্রুত আশ্বাস দিলেন।

সৈনিকটি সিধে হয়ে বসে আছেন। প্রেমিকার মাথা তাঁর খাকী কাপড়ে

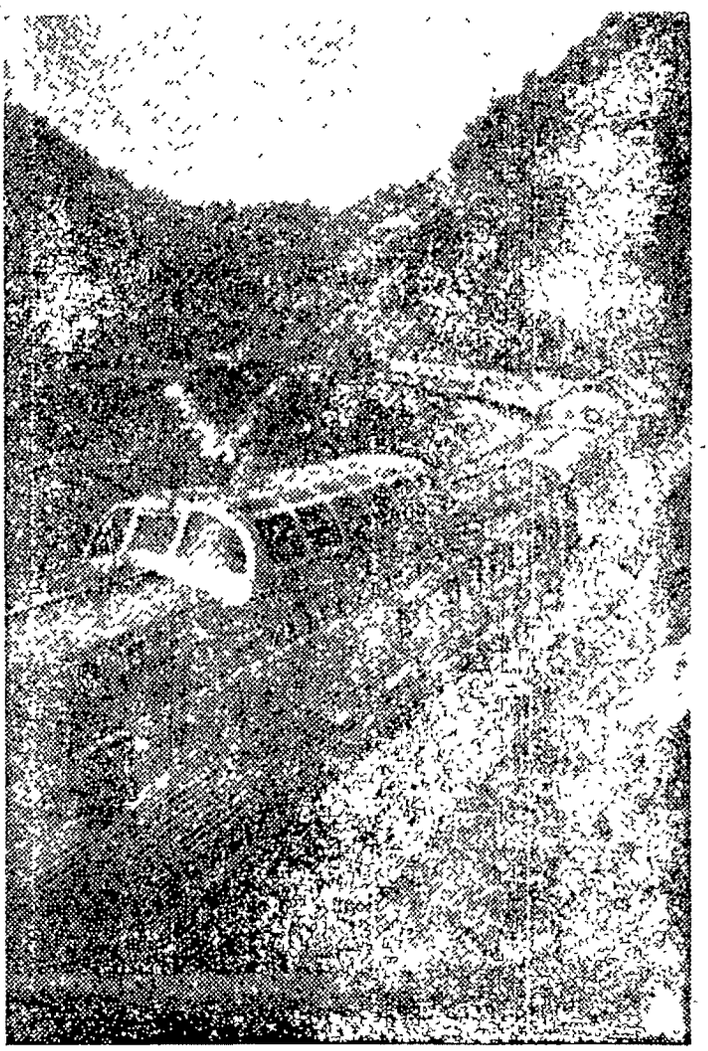

হেলানো। তিনি বললেন—'আমার আজই ফ্রেসনো থেকে ভিয়েতনাম রওনা হবার কথা ছিলো।'

বারবার সকলেই স্তব্ধ রইলুম। প্রেমিকার নিচু স্বর শোনা গেল,—'তবু তো একটা দিন বেশী. . !' সেই মুহূর্তে বোধ-হয় আমাদের প্রত্যেকের মন ঠিক এই বাক্যটিই উচ্চারণ করছিলো। —একটা দিনও তো। ওয়ান মোর ডে! শুধু এইটুকুই এই ট্রেনের দেরির একমাত্র লাভ। ট্রেন মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গে ঢুকছে,—মধ্যে মধ্যে সেতু পার হচ্ছে—শ্লথ-গতিতে হলেও, সমানেই পিছু হঠে চলেছে। আকাশ দেখে সময় আন্দাজ করা যায় না। বাইরে ধূসর অন্ধকারে বরফ ঝরছে। এত ঘন ঘন সুড়ঙ্গে ঢুকছি, এবং এতক্ষণ ধরে সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকছি, (সুড়ঙ্গ মুখের পাথর তখন সাফ্ করা হচ্ছে) যে ক্রমশঃ সুড়ঙ্গের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পেতে লাগলুম সকলেই। সবুজ দেওয়ালে জলের ঘন ঘন রেখা, ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ার শব্দ। রহস্যময়, স্যাঁত-সেঁতে, স্বপ্নিল। যেন পাতাল পুরী। একবার সুড়ঙ্গ থেকে বের হতেই, আমাদের পিছনের লাবন্যময়ী বৃদ্ধাটি বলে উঠলেন—'দেখেছো, গাছগুলো সব ফুরিয়ে গেলো। এখানে শুধুই বরফ।' তাঁর স্বামী বললেন—'গাছ কোথায় দেখলে মেরী? অনেকক্ষণ তো গাছ দেখিনি।'

—'কেন, এই যে এতক্ষণ আমরা বনের মধ্যে ছিলাম?'

—'বন কোথায়, মেরী' শান্ত বৃদ্ধটি সসংকোচে শুধরে দিলেন,—'তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমরা তো টানেলে বসেছিলাম।' —'কিন্তু, আমি যে উঁচু উঁচু কতো গাছ দেখলাম? অন্ধকার অরণ্য?' —'ও তোমার চোখের ভুল, মেরী, ও তো সব পাথরের গায়ে জলের দাগ। সুড়ঙ্গের অন্ধকার। অরণ্যের নয়।'

একবার এক সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েই আমরা দেখতে পেলুম একটি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র লোকালয়। তুষার লাঙ্গল দিয়ে রাস্তা চষছিলেন একজন। আমরা সবাই চিৎকার করে অভিবাদন জানালুম তাঁকে। যেন এক জন্ম, এক জীবন সমুদ্রের তলায় কাটিয়ে, আবার আমরা মর্ত্যের মাটিতে ফিরে এসেছি! তিনিও মহোল্লাসে সম্বর্ধনা জানালেন আমাদের। যেন কতোকালের আত্মীয়। তবে কি এই-ই কেডী? —হ্যাঁ, এই তো কেডী গ্রাম। যাত্রীদের মধ্যে জয়ধ্বনি উঠলো। হারানো ঈশ্বর-বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার মতো পরম আহ্লাদের মুহূর্ত।

তারপরই দুধ, চা, কফি। কিন্তু, খাদ্য নেই। ছোটোরা শুধু দুধে তুষ্ট নয়। বেলা বারোটা অবধি তারা অনাহারে আছে। তবু, কয়েক কলি গান উপহার পড়লো সুন্দরী নিগ্রো কিশোরী দুটির গলায়।

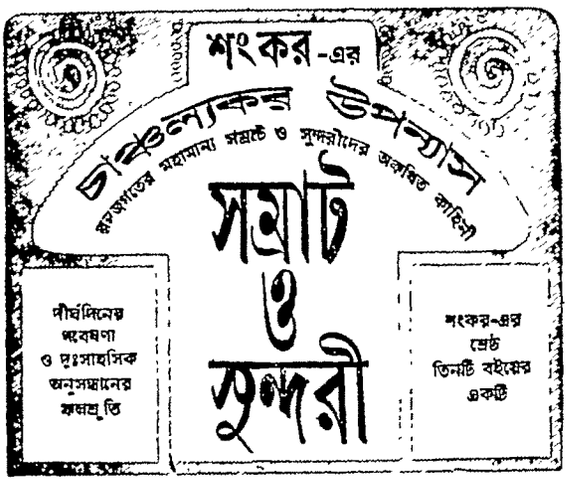

রাজকীয় প্রচ্ছদে, অবিশ্বাস্য দামে, এখন পাওয়া যাচ্ছে
১০৲ ভিপি ১২৲ (দু'কপি ২২৲)

মঞ্চ থেকে নক্সুই পর্যন্ত ছোট বড় সবার জন্যে আশ্চর্য বই
এক ব্যাগ শংকর
প্রাউস উপন্যাস, ছোট উপন্যাস ও গল্পের ওমনিবাস
৬৲ ভিপি ৮৲

তিনটি ভারত বিখ্যাত বই একত্রে
১২ টাকার মধ্যে
শংকর-এর প্রথম ট্রিলজি-ট্রায়াল
স্বর্গ মর্ত পাতাল
জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা
ভিপি ১৫৲

৫৲ বাঁচান ঃ তিনটি বই একত্রে ভিপি ৩০৲

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

বোম্বাইতে বই মেলা

দুর্গাপূজার কয়েকদিন বান্দ্রা নতুন পল্লী পূজা প্যাণ্ডেলে বিরাট বাংলা বই মেলার আয়োজন করেছি। সবাই আসুন। বিশেষ কোনো বইয়ের দরকার থাকলে এখনই লিখুন।

অবশেষে প্রকাশিত হলো একটি অসাধারণ গ্রন্থ

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত

শত্রু-মিত্র বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ভক্ত অভক্ত সকলের জন্যে বাংলা সাহিত্যের এই অমূল্য সংযোজন নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।

এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে মাত্র একখানিই প্রকাশিত হয়েছে। তার নাম শ্রীমকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনায় আনন্দময়ী মায়ের এই কথামৃত সংগ্রহ করেছেন শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী।

দাম ১০ টাকা ভিপি ১২ টাকা

দে'জ পাবলিশিং C/O দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ • ফোন ৩৪৫০৩৫

লাস্ট চান্স-জো। পশ্চিমী ফূর্তি ও আতিথ্যের (৩৬ ফুট উঁচু) প্রতিমূর্তি

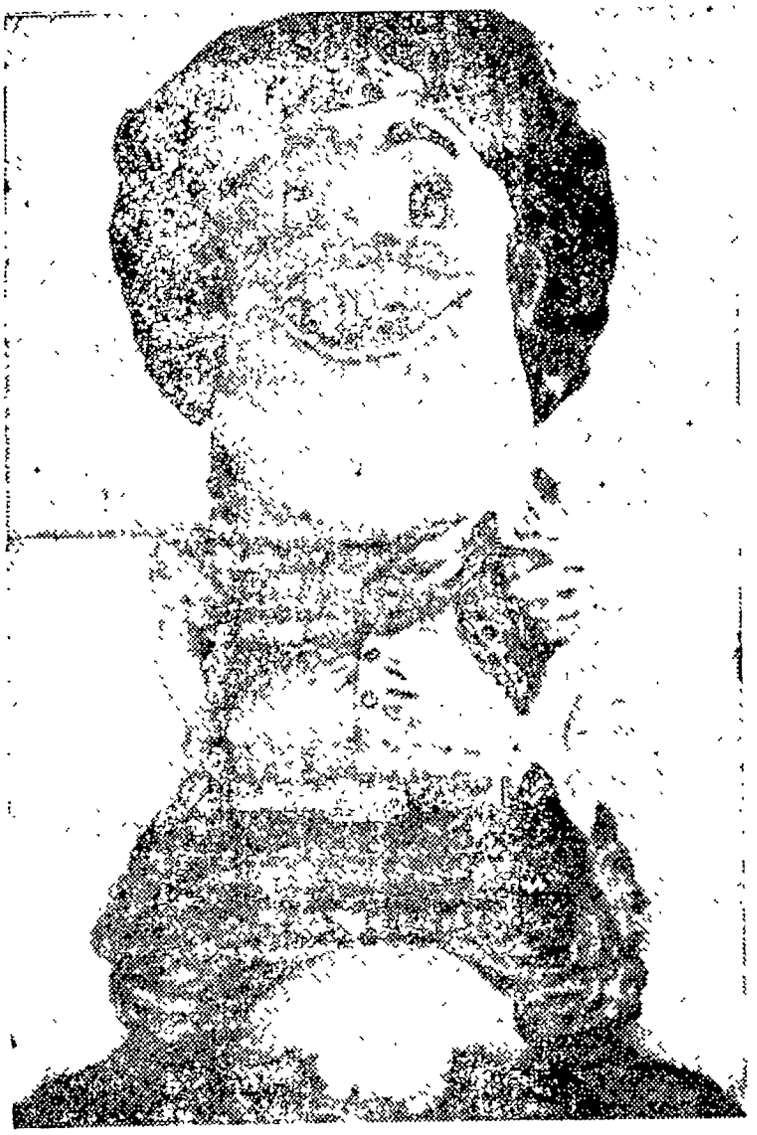

তাস পিটতে বসে গেলেন কেউ কেউ সানন্দ উৎসাহে। স্কটি দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। স্কটির কাঁচ মাও। বজার এসে আড্ডা জমালো অমর্ত্যর সঙ্গে। কাছিম-খোলার মোটা চশমা আঁটা বজার কাঠ-খোদাইয়ের তরুণ কারিগর। আরো এক জোড়া বন্ধু জুটিয়েছি আমরা। ক্যাথি আর ব্যারী গর্ডন। বার্কলিতে মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছে ব্যারী। সোনালী দাঁড়ি নেড়ে নেড়ে বাঁট্ ব্যক্তিত্বের ব্যারী, নানা রহস্য পরিহাস জুড়ে দিলো। স্বল্পবাক্ ক্যাথি একটি বই খুললো কোলের উপর। ক্যাথির চোখ দুটির রং ঠিক গঙ্গা জলের মতো।

আমরা এই তিন জোড়া অল্প বয়সী যাত্রী, ক'দিন পথে, বিপথে, আহ্লাদে, উৎকণ্ঠায় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাটিয়েছিলুম। পিছনের উত্তরাশী প্রাচীন দম্পতিটির সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব জমে গিয়েছে এর মধ্যে। তাঁরা তাঁদের একমাত্র মেয়ের কাছে কিস্ মাস কাটাতে গিয়েছিলেন ইলিনয়ে। এখন বাস করেন স্যাক্রামেন্টোতে। রিটায়ার করলেই মার্কিন দম্পতিরা ক্যালিফর্ণিয়াতে চলে আসেন। বার্ণপ্রস্থের ঠিক উপযোগী আবহাওয়া এখানে। সারা বছরই নাতি শীতোষ্ণ।

খুব সম্ভবত আবহাওয়ার কারণেই ক্যালিফোর্ণিয়া হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের এতো মনের মতো। এখানে অগুন্তি মঠ, আশ্রম আছে। আর আছে, এককালে শ্রমজীবী, বর্তমানে জমিদার, এমন শিখদের একাধিক কলোনী,—গুরুদ্বারা সব শুদ্ধু।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ছাড়াও, ধর্ম-প্রচারের পক্ষে ক্যালিফর্ণিয়াকে বেছে নেবার একটি কারণ হয়তো এখানকার বয়স্ক বাসিন্দাদের সংখ্যাধিক্য।

এদেশে বাস করার পরে একটি ইচ্ছে ক্রমশঃ আমার মনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : যেন ভারতবর্ষে বুড়ো হবার সৌভাগ্য পাই। বার্ধক্যকে তার প্রাপ্য মর্যাদা এখনো দিতে জানে গরীব ভারতবর্ষ। নাতি-নাতনীর চাঁদের হাটের কোমল জ্যোছনায় যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারি আমার নিজের দেশে।

এদেশে বার্ধক্যে সৌন্দর্য নেই, সম্মান নেই, আছে একটা ভয়ংকর হেরে যাওয়া আর অসহনীয় প্রতীক্ষা। একাকিত্বের দুর্বিসহতা ঘোচাতে এদের বিচিত্র প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নিরাশ্রয় বৃদ্ধদের আশ্রমাশ্রমের কথা বলছি না—সাশ্রয় বৃদ্ধদের কথাই ধরা যাক্। আছে একশো রকম ক্লাবের চোখ ধাঁধানো বাড়াবাড়ি—আর আছে চার্চ-কেন্দ্রিক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। উপরি হোলো এই প্রাচ্য ঘেঁষা মিস্টিক্-ধর্মচর্চা-যেমন জৈনবাদী বৌদ্ধধর্ম, বিবিধ হিন্দু মঠ, যোগী আশ্রম।

মা-লক্ষ্মীর তো বাছবিচার নেই। শুধু জরাই নয়, মৃত্যুকে ঘিরেও যে বাণিজ্য চলে এদেশে—সেখানেও তাঁর সমান কৃপা। জেসিকা মিট্‌ফোর্ডের বইতে (দি আমেরিকান ওয়ে অফ ডেথ) জেনেছি, ক্যালিফর্ণিয়াতেই মরচুয়ারি-ব্যবসা সবচেয়ে জবরদস্ত। যে-কোনো ক্যালিফর্ণিয়াবাসীর বাড়ি থেকে মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে একটি-না-একটি মরচুয়ারি নাকি মিলবেই। (শহরে হলে দশ পনেরো মিনিটের বেশি নয়।) অথচ, হাকিম-বদ্যি বা হাসপাতাল যোগাড় করা তার চেয়ে ঢের ঢের কঠিন কর্ম। এই মরচুয়ারি বা শবব্যবস্থাগার কিন্তু আমাদের সৎকার-সমিতির সমগোত্রীয় নয়। এই সমাজসেবার উদ্দেশ্যও অন্য, মাশুলও উঁচু। এরা সৎকারের সব কিছু—অর্থাৎ, শ্মশানের ব্যবস্থা, উইলের বন্দোবস্ত, নিমন্ত্রিতের তালিকা থেকে শুরু করে, শবকে সাজানো (ফুল-চন্দনে নয়, এরা রঙের কারচুপিতে, পোশাকের ভেল্কিতে নাকি নব্বুইকে উনিশ সাজাতে ওস্তাদ)—পর্যন্ত যাবতীয় অপ্রিয় দায়িত্ব যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে পালন করে,—কবর দেওয়া তো বটেই।

যে মৃতব্যক্তি যতো ধনী, তাঁর শেষ কাজে ততো সুব্যবস্থা হয়। হলিউডের রোমাঞ্চকর গোরোদ্যান 'ফরেস্ট লনে'র অলৌকিক কাহিনী ইভ্লিন ওয়হ্-এর উপন্যাসে (দি লাভ্ড ওয়ান) পড়ে শিহরিত হয়েছি! জেসিকা মিট্‌ফোর্ডও এই মরণ-উপবনটির কথা বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। অর্থাধিক্য ঘটলে যে কী উন্মাদ অধঃপাতেই যেতে পারে আমাদের কল্পনাশক্তি, তার অনির্বচনীয় ছবি দেখা যায় এই 'ফরেস্ট লন'-এর বহু বিচিত্র কবর-লীলায়।

জরা ও মৃত্যু এদেশে মহান্ হয়ে ওঠেনি, পূর্ণতার মহৎস্পর্শে শ্রদ্ধেয় হতে পারেনি, হয়েছে, হয় করুণ নয় কিম্ভূত। "পিটি" এবং "অ্যাবসার্ডিটি" হোলো মার্কিনী-বার্ধক্যের প্রধান দুটি সুর।

আমাদের এই দুজন সহযাত্রী, যদিও বার্ধক্যের নিয়ম মেনে কাশীবাসী হবার মতো ক্যালিফর্ণিয়াবাসী হয়েছেন, এঁদের মধ্যে

কিন্তু কোথাও মায়ার স্পর্শ লাগেনি এখনও। দুজনেই বোধহয় আশী পার হয়েছেন, কিন্তু স্যাক্রামেন্টোতে মুদির দোকান চালান নিয়মিত। আপাতত একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে আসায় দুজনেই বিবর্ণবিধুর হয়ে পড়েছেন। আমারও যে 'একমাত্র' সন্তানটি বহু যোজন দূরে রয়েছে, আবার, আমিও যে একজনদের 'একমাত্র',—যাঁরা সাগরপারে অপেক্ষা করে আছেন,—এখবর জেনে তাঁরা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলেন মনে হোলো।

এদেশে এত বছর কাটিয়ে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি সন্তান ও পিতামাতার বিচ্ছেদ, এমনকি বিরোধ দেখতে,—যে মেয়ের মুখে মায়ের নিন্দে আর মায়ের মুখে মেয়ের নামে অভিযোগ শোনাটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়। অশীতি-উত্তীর্ণ এঁদের সন্তানস্নেহে হঠাৎ যেন নতুন অথচ চেনা স্বাদ পেলুম। এঁরা এত গোলমালের মধ্যে কিন্তু একবারও বিচলিত হননি। সর্বদাই হাসিখুশি, সস্নেহ, সহিষ্ণু।

আমরা 'কেডী' থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে—ক্রমে 'পোর্টোলা'য় এসে পৌঁছুলুম। সেখানে খাদ্য সংগ্রহ করে রেল কোম্পানী দফায় দফায় প্রাতরাশ পরিবেশন করতে লাগলেন। আমরা খেতে বসলুম দুটোয়। যদিও আমরা দুজনেই বেলাদুপুরে ঘুম থেকে উঠি,—তাই বলে দুপুর দুটোয় প্রাতরাশের সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। পুরোদস্তুর অনশনভঙ্গের পর আমরা 'দুগ্‌গা বলে বরফ-ঝড়ের মধ্যে নেমে পড়লুম। তুষারপাত এবারে তুষার-বাত্যায় পরিণত হয়েছে। হুকুম পাওয়া গেছে, ট্রেন ত্যাগ করে গ্রেহাউন্ড বাসে আরোহণ করতে হবে। ট্রেন এখান থেকেই আবার শিকাগোয় ফিরে যাবে।

বিপদে মানুষের কীরকম পিঁপড়ের মতো নিয়ম তামিল করে চলবার ধাত আপনাআপনিই তৈরি হয়ে যায়! যেন, আমরা কোনো সেনাবাহিনীর অনুশীলিত পদাতিকবাহিনী, এমনি এক হুকুমবরদারী মনোভাব আপনিই গড়ে উঠেছিল যাত্রীদলের মধ্যে। যে-যার ঘটি, কম্বল নিয়ে, বিনা প্রশ্নে বিনা প্রতিবাদে বরফঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহিদের মতো ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে স্টেশনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বাসের সারির দিকে দল বেঁধে ধেয়ে চললুম।

প্রতিটি বাসের কপালে ফেট্টি বাঁধা আছে : স্যাক্রামেন্টো, অরোভিল, ওকল্যান্ড-বার্কলি, সানফ্রান্সিস্কো, স্টকটন, স্যান-হোসে। যে যার গন্তব্য ফেট্টি দেখে উঠে পড়ো। বাসের পেট চেরাই আছে, হাঁ-য়ের মধ্যে ঠেলে দাও তল্পি-তল্পা।

বাসে উঠে হি হি করে শীতে কাঁপতে লাগলুম আমি। সর্বাঙ্গ বরফে আর প্রবল বাতাসে হিম হয়ে গেছে। বীরপুরুষের মতো অমর্ত্য সেই কনকনে বরফঝড়ের মধ্যে আবার নেমে পড়ে ছুটলেন টেলিগ্রাম করতে। ক্লাস দুটি বাতিল করে দিতে হবে, নৈলে ছাত্ররা বসে থাকবে। বড়দিনের ছুটির পর আজই প্রথম ক্লাস শুরু।

আমার মাথা ধরেছে প্রচণ্ড। অ্যানা-সিনের শরণ নিয়ে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলুম—"কোন্ পথে যাবো আমরা-?"

তিনি জবাব দিলেন—"এখন যাবো নেভাদায়, রিণোশহরে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর ৫০নং রুটে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। অন্য সমস্ত রাস্তা বরফে বন্ধ হয়ে গেছে। আর ৫০নং রাস্তা গত সপ্তাহে এতবার ট্র্যাফিকের জন্য খুলেছে এবং এতবারই বরফের চাপে বন্ধ হয়ে গেছে যে, এখন ওটা রাস্তা না খড়খড়ি, সেটা পর্যন্ত আর বোঝার উপায় নেই।" অতএব, অদৃষ্টই জানেন, কোন্ পথে যাচ্ছি আমরা!

অমর্ত্য ফিরে এলেন। এই বাসেই এলো স্কটি-বজার-এলিজাবেথ, ক্যাথি-ব্যারী, আর মলয়কুমারী। সব বাসই প্রথমে স্যাক্রামেন্টো যাবে, —ক্যালিফর্ণিয়ার রাজধানীতে।—তারপরে অন্য অন্যদিকে ছড়িয়ে পড়বে বাসগুলি।

দেশে থাকতে যেমন হঠাৎ কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়,—'আমেরিকার রাজধানী কী?' ৮০ শতাংশ মানুষ না ভেবে চট্ করে

উত্তর দেন—"নিউইয়র্ক"। "ভেমনি, ক্যালিফর্ণিয়ার বাইরের মানুষদের ক্যালিফর্ণিয়া রাজ্যের রাজধানী কী? প্রশ্ন করলে; বেশির ভাগই উত্তর আসে, "সানফ্রানসিস্কো" "লস এ্যাঞ্জেলেস্।" স্যাক্রামেন্টোর খ্যাতি কেবল সরকারী মহলেই সীমিত।

রিণোর পথে ধবফঝড় বেড়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। তবু আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই রিণো পৌঁছলুম।

বিশাল বিলাসখানা Casino Nugget Sparks- এ আমাদের নিমন্ত্রণ আছে; রেল কোম্পানীর অতিথি আমরা। এক অতিকায় নৈশভোজে পরম আপ্যায়িত হবার পরে; একশো সাতাশজন পথভ্রষ্ট পথিক ক্যাসিনোটির বিরাট জুয়ার আড্ডাঘরে এসে দাঁড়ালুম। অতিথিদের যথাযোগ্য মেজাজ সৃষ্টি করবার জন্যে ক্যাসিনো-কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে শরাব-পানের একটি করে নেমন্তন্ন চিঠি দিয়েছেন। অতিথিরাও হৈ হৈ করে বারের টুলে বসে পড়লেন। আর, আমার মতন যারা সোমরসে বঞ্চিত অভাগা, ঘুরে ঘুরে জুয়া খেলার যন্ত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম।

এ এক আশ্চর্য জঙ্গল। ল্যাকপট জুয়ার স্পট্ মেশিন সারি বেঁধে ভীড় করে আছে যেন এক গভীর অরণ্যের মতো। আর, তাদের সামনে একলক্ষ উদ্ভ্রান্ত-চোখের শত শত মানুষ কেবল মেশিনের হাতল ঠেলছেন। গর্তে পয়সা ফেলছেন, আর হাতল ঠেলছেন—পয়সা ফেলছেন, আর হাতল ঠেলছেন। মেশিন যেবার হারছে সেবারে পয়সা কুড়িয়ে তুলছেন, আবার মেশিনে ফেলছেন, আবার হাতল ঘুরছে। এর শেষ নেই শুরু নেই। অন্যদিকে রুলেটের ভাগ্যচক্র। আর একপাশে বসেছে সারি সারি টেবিল। সুসজ্জিত নারী পুরুষেরা পাশাখেলা পরিচালনা করছেন তাতে। চলেছে ক্র্যাপস খেলা চলেছে ব্ল্যাকজ্যাক জুয়া। গুলন করে একাগ্র মানুষ খেলে যাচ্ছেন একে অন্যের বিপক্ষে। গুনে গুনে টাকা তুলছেন পরিচালিকা, দান হাঁকছেন পাশা পড়ছে। চলছে তাস। ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আমার মতো কয়েকজন কৌতূহলী দর্শক। খেলুড়েদের ঠোঁট শক্ত, চোখ পাষাণ।

আমার ভালো লাগলো না। আরেক পাশে গিয়ে দেখি আরো হলঘর আছে Keno খেলবার, Bingo খেলবার। আর আছে স্টেজ, তার বাইরে উল্লম্ফ যুবতীদের সদ্যোজাত শরীরের ছবি। এই কাসিনোতে মোট সাতটি রেস্তরাঁ আছে, এমনকি শিশুদের একটি থিয়েটার পর্যন্ত আছে দোতলায়। বাবা-মা যখন জুয়ো খেলেন, শিশুরা বোধহয় তখন থিয়েটার দেখে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলুম, খুব বরফ ঝরছে। কিন্তু তাতে আলোর অক্ষরে লেখা

'ENTERTAINMENT.....
CASINO NUGGET SPARKS'

নাম একটুও নিভে যাচ্ছে না। বরফে ভিজছে ছত্রিশ ফুট উঁচু শাদা দাড়িওয়ালা বেঁটে বুড়োর রংচঙে মূর্তি—

'Last chance Joe-Symbol of Western Fun and hospitality!'

বুড়োর মাথায় ছোঁড়া টুপী। ফোক্‌লামুখে হাসি যেন ধরছে না।

আমেরিকার মন্টিকার্লো হোলো এই রিণো, টাহো, আর লাগ্‌ভেগাস্। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজ হাত-বদল হচ্ছে এখানে। শত শত ভাগ্য গড়ছে ভাঙছে। কিন্তু ভূমধ্য-সাগরের সোনালী সৈকতে, পামগাছের ছায়ায়, মর্মরের প্রাসাদে যে জুয়ার বিলাস দেখেছি, তার সঙ্গে এই মার্কিনী জুয়ার আড্ডার তুলনা চলে না। মন্টিকার্লোর আদবকায়দাই অন্য,—তার খেলুড়েদের রকমটাই আলাদা। পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের চেহারা সেই রাজপ্রাসাদ-ওয়ালা কাসিনোতে যেন জ্বলছে। হৃদয়মন ঝলসে দেয়।

এখানকার জুয়াড়ীদের জাত আলাদা। ঐশ্বর্যের ঝলমলানি সত্ত্বেও, এই আড্ডা স্পষ্টতই 'ডিপ্লোমেটের।' সাদিও মনাকো রাজ্যের মতোই নেভাদা রাজ্যেরও প্রধান আয় হয় এইসব জুয়ার আড্ডা থেকেই। তা সত্ত্বেও মনাকোর সঙ্গে কি নেভাদার কোনো-রকম মিল দেখানো যায়?

ক্ষুদে শহর রিণোর মুখাগুণ কিন্তু আরেকটি। জগৎ জুড়ে এর খ্যাতি এই জন্যে যে, ডিভোর্স এখানে অতিসুলভ। এ দেশের কর্তাগিন্নিরা তাই তাড়ায় থাকলে রিণোতে এসে ঝট্ করে ডিভোর্সটা যোগাড় করে নিয়েই নতুন বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসেন। চিত্রতারকাদের স্বর্গ, আর গৃহস্থদের বিভীষিকা—এই রিণো।

ক্যালিফর্ণিয়া-দখিনহাওয়ার যাত্রীদের মধ্যে কারুরই বিবাহ বিচ্ছেদে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না, অথবা জুয়া খেলায়। যে-যার পানীয় ফুরুতেই বাসে এসে বসলেন। কেবল পুল্‌ম্যানের যাত্রী এক দম্পতি নেমে গেলেন রিণোতেই। বাস যাত্রার ধকল তাঁদের সহ্য হবে না হয়তো, কিংবা, রিণোর কুহকে হয়তো ভুলেছেন।

সারথি বদল করে এক সারি বাস্, ঠিক যেন একসার ঘোড়ার মতো রাত্রির মধ্যে ছুটে বেরিয়ে পড়লো।

তুষারবাত্যা কিন্তু ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো। দলা দলা তুষারের উন্মত্ত ঘূর্ণিগুলো পাক খেয়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো জানলার কাচে। মস্ত মস্ত ওয়াইপার দুটি সমানে দ্রুত-দৌড়া-দৌড়ি করেও, কাচ পরিষ্কার রাখতে পারছিলো না। প্রবল আক্রোশের সঙ্গে তুষারঝড় আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলো।

চালক গম্ভীর গলায় বললেন—"আমার মনে হয় না, আজ রাত্রে সিয়েরা পার হওয়া যাবে!"

স্কুনার পাস্ বন্ধ। ডনার পাস্ও আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা আছে একমাত্র 'একো-সামিট্'। কিন্তু তাও-এক-মুখো-রাস্তা হয়ে কাজ করছে। সেইদিকেই চলেছে বাস্। খুবই আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছে। পথে-ঘাটে বরফ, আকাশে-বাতাসে বরফ। সামনের অন্ধকার ফুটো করে বাসের হেডলাইটের বর্শা দুটি আগে আগে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ আটকে গেল একটি গাড়ীতে। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী, মাথায় জ্বলছে হলদে বাতি দপ্‌দপিয়ে। গায়ে নোটিস—"এই রাস্তায় শিকলি বা স্নো-টায়ার অত্যাবশ্যক!" সারথি বাস ছেড়ে নামলেন। মোটা মোটা শিকলি নামালেন। বাসের চাকায় গা ঘিরে অনেকক্ষণ ধরে লাগানো হোলো, অন্ততঃ পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের, আর প্রায় অনন্ত দৈর্ঘ্যের সেই শিকলি।

শৃঙ্খল-সজ্জিত আমরা যখন স-টঙ্কারে পথে ছুটলুম, তখন রাস্তার তুষার প্রায় হাঁটু সমান,—আর, পথের দুধারে (কে জানে কতো দিন ধরে) দেড়তলা উঁচু বরফের ঢিবি গড়ে রেখেছে স্নো প্লাও-গুলো। আমাদের সামনেই, একটি তুষার-জঙ্গল চলছিলো পথ সাফ করতে করতে। প্রায় হলুম আমরা নেভাদার রাজধানী কার্সন

লাক্সারি ট্যুরিষ্ট কোচে বেড়াতে চলুন

দীঘা যাতায়াত ৩০ হলদিয়া যাতায়াত ১৫.

বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটী-কামারপুকুর যাতায়াত ৩০.

মেট্রো সিনেমার সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে
লাক্সারি ট্যুরিস্ট কোচ রোজ সকালে ছাড়ছে

ট্যুরিষ্ট সার্ভিসেস ইণ্ডিয়া

বুকিং অফিস—ট্যাক্সি বুথ, মেট্রো সিনেমার সামনে, এসপ্ল্যানেড

Booking Hours : 6 a.m. to 7.30 p.m on all days

শহর। যদিও এটি রিনো বা লাস্‌ভেগাসের মতো প্রসিদ্ধ নয়, তবু, শহরটি পেরুতে গিয়ে কেবল কতগুলি "সারারাত্রি খোলা" ঝলমলে জুয়াখানা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। তারপরে হোটেল-কণ্টকিত লেক টাহো জনপদটি পার হয়ে আমরা ক্যালিফর্ণিয়ার সীমান্তে এসে পৌঁছুলাম। ঘন অন্ধকারে টাহো হ্রদ উহ্যই রইলো।

সীমান্তে বাস্‌ থামলো। বরফঝড় শিরোধার্য করে আপাদমস্তক ঘনবস্ত্রে আবৃত একজন বশংবদ মনুষ্য কম্পিতকলেবরে বাসের মধ্যে উঁকি দিলেন। —"লেবু, আপেল, ন্যাশপাতি—কারুর কাছে কোনোরকম ফল থাকলে এখানে রেখে যেতে হবে। ক্যালি-ফর্ণিয়া রাজ্যের আইনে ফল নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।" —এক বাস্‌ মানুষ তুমুল গর্জনে হুংকার তুললো। প্রাণটুকু সঙ্গে নিয়ে ক্যালিফর্ণিয়ায় ঢুকবো না রেখে যাবো সেটাই যাদের স্থির নেই এখন,—তাদের কাছে কিনা আপেল ন্যাশপাতির কথা!! —সীমান্তপ্রহরী নিঃশব্দে তুরিৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাস্‌-এঞ্জিনের গর্জনে শিকলের শিঞ্জিনী মিলিয়ে আবার চললো।

কিন্তু, বেশীদূর নয়। সামনে জোড়ায় জোড়ায় লালবাতির একটি শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে আছে। একসারি গাড়ী। এ পথও বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্‌ আর যাবে না। আবার প্রতীক্ষা পর্ব আরম্ভ। কখন পথ সাফ্‌ হবে। তখন আবার চলবো। ঘূর্ণিপাক খেয়ে তুষারঝড় বইতে লাগলো। প্রচণ্ড রেগে ঝটাপটি করছে অন্ধকার বনের দীর্ঘ গাছগুলি। ঝোড়ো বাতাস উদ্দামতর হয়ে উঠছে। গাছগুলোর দাপট দেখে একটুও সে ভয় করছিলো না এমন বলতে পারিনে। বাসের উপরে একটি মাত্র মহীরুহ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেই তো কেল্লা ফতে!

ড্রাইভার নেমে গেলেন, অন্যান্য গাড়ীর চালকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। যাত্রীরা সিগারেট ধরালেন। অমর্ত্যর বীডিংলাইট বহারাতি বাসেও জ্বলে উঠলো মাথার কাছে। আজকের বক্তৃতাগুলো হয়নি বটে, কিন্তু কাল তো একটা গ্র্যাজুয়েট-সেমিনার আছে, আর আছে একটি পাবলিক লেকচার। ইউনিভার্সিটি-ক্যালেণ্ডারে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সেটি কিছুদিন যাবৎ।

আমি বসে বসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তুষারের তাণ্ডব দেখছিলুম কিছুক্ষণ যাদেই সে-মুগ্ধতা আপনি কেটে গেলো। কারণ, বাসের বন্ধ বাতাস তখন অবিরল ধূমপানের কল্যাণে প্রায় শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে। গাড়ী রগায়ে নোটিস্‌ আছে—'পিছনের চারটি আসন ছাড়া বাসের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ।' এবং আছে কয়েকটি রাজ্যের ও শহরের নাম, যেখানে বাসের সর্বত্রই ধূমপান বে-আইনী। আমি বসেছি বাসের পায় এক-দম সামনে। তবু নিশ্বাস নেওয়া শক্ত হয়ে উঠলো। আইন ভেঙ্গে ধূমপায়ীরা আমার চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করেছেন। আমি চেঁচিয়ে এলিজাবেথকে বললুম—'ধোঁয়ায় তোমার কষ্ট হচ্ছে না?' সে জবাব দিলে—'খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, কেউ কি সেটা খেয়াল করবেন?' তখন আমরা দুজনে স্পষ্ট গলায় কিছুক্ষণ, বন্ধ বাতাসে ধোঁয়ার মাত্রাধিক্য ঘটলে মনুষ্যদেহে তার কী কী অপকার হতে পারে, এই প্রসঙ্গের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে দেখলুম। পিছনের ভদ্রলোক তখন একটি সিগারেট থেকে আরেকটি সিগারেট ধরালেন। সামনের ভদ্র-লোক পাইপে নতুন করে তামাক সাজলেন। অথচ, দুদিন আগে হলে এঁরাই প্রথমে পরম বিনয়ের সঙ্গে ধূমপানের আগে অনু-মতি চাইতেন, এবং এ জাতীয় করুণ কথোপ-কথন শুনতে পাবার পরে কখনোই দ্বিতীয় কল্কেটি সাজাতেন না। উল্টে বরং গলা বাড়িয়ে পূর্বকৃত 'পাপের' জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। পশ্চিমী সভ্যতার সেই সেজনোর মখমল-বিছানো রাস্তাটি ছেড়ে আমরা কখন যেন একটা অন্যপথে রওনা হয়ে পড়েছি!

বাসের মধ্যে টিঁকতে না পেরে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। দরজা খুলে পা নিচে নামাবা-মাত্র নরম বরফে ডুবে গেলুম। বরফ হাঁটু ছাড়িয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। হিম-হাওয়ায় কানের লতি, নাকের ডগা এক নিমেষে উধাও! তারপরে ফুস্‌ফুস বোঝাই করলুম তাজা ঠাণ্ডা ঈশ্বরের হাওয়ায়। তুষার মুঠোয় তুলে নিয়ে ছোঁয়ালুম গালে, কপালে। ক্যাথি আর ব্যারীও নেমে পড়লো। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে তখন।—'কী করি বলো তো?' ক্যাথি বললো—'বরফ খাও।' ব্যারী বললো—'তুষারে কিন্তু আসলে তেষ্টা মরে না। তুষার গলিয়ে জল বানিয়ে নাও। জল এখানে পাবে না।'—জল বানাবো কিসে? হঠাৎ মনে পড়লো এ্যানাসিন খাওয়ার জন্যে, হাতব্যাগে একটি কাগজের গ্লাস আছে। বাসে উঠলুম, সেই গ্লাস আনতে। অমর্ত্য একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছিলেন, যাতে আমি ভিতরের সীটে ঢুকতে পারি। পালখের টুপি-পরিহিতা জরাজীর্ণ এক মহিলা ঠিক এই সময়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দরজার দিকে। অমর্ত্যর পা তাঁর পায়ে একটু ঠেকে গেছে-কি-না গেছে—অমনি শুরু হলো আমার কর্তার দরবারী আদবকায়দা।—'দুঃখিত; পরম দুঃখিত, অনুগ্রহ করে এই অধীনকে ক্ষমা করুন।' অমর্ত্যর করোষ্ণ-সৌজন্য তরুণীদের বেলায় যতোটা কার্যকরী হোতো, এক্ষেত্রে হোলো তার বিপরীত। গলিত চোখ পাকিয়ে, ধাঁধানো দাঁত খিঁচিয়ে তিনি বললেন—'তুমি ছোকরা কিনা ইচ্ছে করে আমাকে লাথি মারলে-? নিজেকে নিয়ে লজ্জাও করে না তোমার?'

বৃদ্ধার কথা শুনে অমর্ত্য তো একেবারে পাথর হয়ে গেলেন।—'যতো সব অভদ্র ফরেনার!' বলে মহিলা বাথরুমে ঢুকে গেলেন বীরদর্পে। আমার মুখ থেকে একটা ছোটোখাটো অস্পষ্ট আর্তনাদ নির্গত হয়ে গেলো। রত্নার গলা খাঁকারি দিয়ে জোরে-জোরে মোটা গলায় বলে উঠলো—'যেতে দাও ভাই যেতে দাও। ওসব লোকের কথা গ্রাহ্য করতে নেই। অবজ্ঞাই একমাত্র রাস্তা। কুকুরদের ঘেউ ঘেউ করতে দাও।'

(চলবে)

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
বহু প্রশংসিত কবিতার বই
"কাব্যসুষমা"
ইন্দু দাঁ
দাম : দশ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : কবিনিবাস—মন্ত্রতা
৫৯, পারমার রোড
পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী

প্রেমিক কবি ইন্দু দাঁ বিরচিত
দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ
"মনশ্রী"
দাম : আট টাকা
এই লেখকের কবিতার সুরে লেখা
দুটি অনন্য উপন্যাস
শীতল হাওয়া উষ্ণ হৃদয়
বৌদি পুলিশ দেবর দাসী
বস্তুস্থ

বন্যার উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

যাহ্, দাঁড়িয়ে থাকা মানেই মাথাটাকে জরুরজং করে তোলা। লক্ষ্মণ ভেড়ির ওপর দিয়েই উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। তিন-চারশ' হাত তফাতে ওদিকেও জঙ্গল। নদী আর জঙ্গলের সীমারেখায় আট দশ ফুট উঁচু ভেড়িটা কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে! এই ভেড়ি ধরে হাঁটতে হাঁটতেই পুরো দ্বীপটাকে একবার পাক খেয়ে ঘুরে আসা যায়। একটু পা চালিয়ে হাঁটা শুরু করে ও। আচ্ছা, ঈশানটাকে ঐ জঙ্গলের ধারে গিয়ে ধরি ও একা পেয়ে যায়। পেছন থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে ওর মাথায় একটা লাঠি বসিয়ে দেবে ও। ঈশান উল্টে পড়ে গেলেই ওকে টেনে হিঁচড়ে ঐ নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। একবার ঐ জলে ওকে ভাসিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। তখন আবার ভাল মানুষটি হয়ে ফিরে আসা যাবে কাঠুরে-ডেরায়।

যদি টের পেয়ে যায় কাঠুরেরা। যদি সন্দেহ করে লক্ষ্মণই এমন কাজ করেছে, লক্ষ্মণ পালাবে। কে থাকতে চেয়েছে এই জঙ্গলে। লক্ষ্মণ একা হোক, গৌরীকে নিয়ে হোক পালাবে নৌকো করে।

কোথায় পালাবে! ওকি পাদরিপাড়ায় গিয়ে হাজির হবে! আর তখন ফাদার ওকে বিশ্বাস করলেও দুর্লভদা করবে না। হাজারটা প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হবে ওকে। গৌরীকে নিয়ে যে লক্ষ্মণই পাদরিপাড়া থেকে গোপনে সরে পড়েছিল, একথা এখন আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। ও বোঝাতে পারবে না গৌরী কি সাংঘাতিক। এখানে ও যে কটা দিন কাটিয়ে গেছে, সবার চোখে কী ভীষণ ফাঁকি দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে গেছে। এই পাদরিপাড়ায় ও রকম ললনা মেয়ে থাকলে পাদরিপাড়ারই সর্বনাশ।

কিন্তু কেউ বুঝবে না লক্ষ্মণের কথা। বরং লক্ষ্মণকেই অবিশ্বাস করে পাদরিপাড়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আচ্ছা, কেউ যদি ওকে আশ্রয় না দেয়, কোথায় যাবে ও! কিভাবে দিন চালাবে ও!

আবার ঝিমঝিমুনি শুরু হবে যার মাথার মধ্যে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ও লক্ষ্য করে জঙ্গলের গা ঘেঁষেই চলেছে ও। নদীর এদিকটা যেন আরো বেশি নিবিড়, থমথমে। জঙ্গলের ভিতর ঢুকলে গা ছড়ে যেতে পারে ওর।

নদীর দিকে তাকাল। ঘোলা জলের স্রোতে কয়েক খণ্ড বড় বড় কাঠের টুকরো ভেসে যাচ্ছে। এদিককার কাঁকড়াগুলো আকারে বেশ বড় বড় মনে হল ওর। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রেখেছে ওরা। এই সব গর্ত থেকেই ফাটল হয় ভেড়িতে। গর্তের ভিতরে লাঠি ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে মাটির ঢেলা অনেক খানি সরিয়ে দেওয়া যায়।

হাত নিশপিশ করে ওঠে ওর। ভেড়িটাকে এখানে নরম করে রাখলে কেমন হয়। জোয়ারে জলের দাপট একটু বাড়লে গরগর করে জল ঢুকে পড়তে পারে। তাই থেকে বাঁধে ভাঙন ধরতে পারে। ভাঙন প্রথমে ছোট, তাই থেকে বড়, তারপর আরো বড় হয়ে উঠতে পারে। বাঁধ ভাঙার কথা প্রথমে যদি কেউ টের না পায়, বন্যা ঘটে যেতে পারে এই দ্বীপে। সব-কিছু তখন তছনছ হয়ে যেতে পারে।

মাথায় শয়তানের চাকা ঘুরতে শুরু করে লক্ষ্মণের। অনেকক্ষণ ধরে গর্ত-গুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ও। তারপর আবার ও হাঁটতে থাকে। জঙ্গলের আড়ালে কাছারিবাড়িটাকে আর দেখা যায় না। আরো বেশ খানিকটা এগোলে কাঠুরেদের কাঠ কাটা হৈ-চৈয়ের শব্দও আর শোনা যায় না। বেশ একটুক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করল, না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ও ছাড়া আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে লক্ষ্মণই যেন একা এখন জীবিত মানুষ।

আরো খানিকটা এগিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরেই গাছটা ওর নজরে পড়েছিল। গাছের পাতা কি করে অমন কালো রঙের হতে পারে! মিশমিশে কালো পাতার ঝাপড়ান একটা গাছ। ও কি ভুল দেখছে! জগৎ-সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটতে পারে কে অত জানবে তার! গাছটার দিক থেকে ও নজর ফেরাতে পারল না, আর একটু এগিয়ে গেল। আর এমন সময় ওর ভ্রম কাটল। কালো কালো ওগুলো যে পাতা নয় ও চিনতে পারল। হাজার হাজার জল-কাক বসেছিল গাছটায়। কাকের রঙেই গাছটা অমন কালো দেখাচ্ছিল।

একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে গাছটার দিকে ছুঁড়ে মারল লক্ষ্মণ। আর কাক-গুলি হঠাৎ একসঙ্গে গাছ থেকে লাফিয়ে উঠে গাছের সবুজ চেহারাটা ফিরিয়ে দিল।

কাকগুলি অমন করে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণও ভয়ে গুটিয়ে এসে-ছিল। বুকের হৃদপিণ্ডটা যেন ধরাস্ করে লাফিয়ে উঠেছিল। থমকে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। কাকগুলি উড়তে শুরু করল। উড়তে উড়তে নদীর জলে ছায়া ফেলে দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে কাকগুলির দিকে তাকিয়ে থাকল লক্ষ্মণ। পরে চোখ ফিরিয়ে এনে আবার গাছটার দিকে তাকাল। কী উজ্জ্বল সবুজ আভা আবার বেরুচ্ছে গাছ থেকে। যেন এই কিছুক্ষণ আগে নতুন করে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে গাছটা।

লেখন প্রকাশনীর বই

অন্যায় ও অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন বিক্ষুব্ধ যুবকের আত্ম-কথনের একখানি অনবদ্য সদ্য প্রকাশিত মিষ্টি-করুণ উপন্যাস—

*মুখোমুখি একা : দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬·০০

দেশ, যুগান্তর, বেতার জগৎ প্রভৃতি প্রশংসিত শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যের ওপর গবেষণাধর্মী একখানি অপূর্ব ও অভিনব গ্রন্থ—

*শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র : ও প্রসঙ্গত রমেশ সরকার ১০·০০

কথা ও সুরে হৃদয়স্পর্শী অর্থাৎ কবি ও শিল্পীর প্রতিভার মিলন নিয়ে ভাতখণ্ডে সংকলিত বন্দিশ অনুসারী একখানি অতুলনীয় সংগীত গ্রন্থ—

*বাংলা খেয়াল : কমলেশ বসু ৯·০০

তথা অবিমিশ্র রাগপ্রধান

পরিবেশক : দে বুক / নাথ ব্রাদার্স / এস্ চন্দ্র অ্যাণ্ড কোং

ভারতে এর বিক্রী সবচেয়ে বেশী

অন্য যে কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের তুলনায়

সুপার৭৭৭

লক্ষ লক্ষ লোকের পছন্দ আর তাঁদের মত:
সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার বার
বেশী দিন চলে, অনেক বেশী সাদা করে,
সাবানের তুলনায় খরচও কম।

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

Shilpi-dm-6a/77 Ben

লক্ষ্মণ দ্রুত পা চালিয়ে গাছটার কাছাকাছি চলে এল। ভেড়ির দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে গাছটা কাছ থেকে গাছটার দিকে তাকালে মনে হয়, প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করেছে ও। কি গাছ ওটা! মসৃণ বড় বড় পাতা। না, চিনতে পারল না লক্ষ্মণ।

হঠাৎই ওর নজর পড়ল গাছটার দিকে। গোড়ায় বিরাট একটা গর্ত। গর্তটা ভেড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। ভেড়ির মাটি বেশ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। এতবড় একটা গর্তকে এভাবে কিছুতেই জিইয়ে রাখা উচিত নয়। যে-কোন দিন ভেড়ি প্রথম হয়ে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। রজনীদের চোখে পড়লে ওরা এখনি এটাকে বন্ধ করার জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ছুটে আসবে।

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রজকিশোর দত্তের

অ থেকে বিসর্গ

এই লেখকের পরের বই

সরমা ও আমি—উপন্যাস

টিকলু—হাসির গল্প

এ নহে গল্প—গল্পগুচ্ছ

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট

১২।১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

নাথ ব্রাদার্স ও হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

কলিকাতা-১২

লক্ষ্মণ বেশ খানিকক্ষণ গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকল। বুকের ভিতর ঢিব-ঢিব করে উঠল ওর। মনে হল, এতক্ষণ তো ও এরকম গর্তই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তবে কি ভগবানই ওকে প্রতিশোধ নেবার জন্য গর্তটা পাইয়ে দিলেন। সামান্য একটা কোদাল থাকলে এখনি ভেড়িটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে রাখতে পারত ও। জোয়ার এলেই আর দেখতে হবে না। সমস্ত দ্বীপটা ভাসিয়ে দিতে আর কতক্ষণ।

মাথায় শয়তানের চাকা ঘুরতে শুরু করল আবার। হাত-পা নিশপিশ করে উঠল লক্ষ্মণের। গর্তটা শুরু হয়েছে জঙ্গলের দিক থেকে। ওপাশে নেমে কাজটা হাসিল করে গোছের ডাল চাপা দিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। রজনীরা নদীর দিক দিয়ে নৌকো বেয়ে ভেড়ি দেখছে এদিকে কি ঘটছে বুঝবে কি করে।

আর অপেক্ষা নয়। দু' লাফে নিচে জঙ্গলের দিকে নেমে এল লক্ষ্মণ। গাছের শেকড়গুলো আলগা হয়ে বাইরের দিকে ফুলে ফুলে আছে। জোরে জোরে বার-দুয়েক চাপ করালেই গাছটা উলটে পড়বে ভেড়ির দিকে। গাছটার গায়ে একটু ঝাঁকি দিয়ে দেখে নিল লক্ষ্মণ।

কিন্তু আগেই গাছটাকে নিয়ে ও যুদ্ধ করতে চায় না। গর্তের কাছে এগিয়ে এসে বারকয়েক পা ছুঁড়ে লাথি মারল লক্ষ্মণ। মাটি বেশ কেঁপে উঠল। মাটির ওপর ও হামলে পড়ে। তারপর দু' হাত দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। মাটির বড় বড় চাপ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। নরম মাটি, ফলে, তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু শাবলের মতো কিছু একটা হাতে থাকলে কাজটা যেন সহজ হত। নিদেনপক্ষে একটা লাঠি।

লাঠির কথা মনে আসতেই ও উঠে দাঁড়াল। একটা গাছের ডাল ভেঙে নেবার চেষ্টা করল। আশেপাশে অসংখ্য শুলো শেকড়। ধনুকের ফলার মতো ছুঁচলো হয়ে আছে। ওরকম একটা শক্ত শুলো পেলে খুব সুবিধে হত। কিন্তু খালি হাতে শুলো তুলে নেওয়া অসম্ভব। গাছের ডালই একটা মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে নিল। বাঃ, এটাতেই কাজ দেবে।

লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ বুঝতে পারে, বেশ অনেকখানি ফাঁপা হয়ে আছে ভেড়ির নিচে। উত্তেজনা বাড়ে লক্ষ্মণের। শালা, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারলে আর পায় কে।

গর্তের ভেতর দেহটাকে অনেকখানি ঢুকিয়ে দেয় লক্ষ্মণ। লাঠি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরো অনেকখানি ও আলগা করে ফেলে। জলে ভেজা নরম মাটি, তবু এত সহজেই যে কাজ হতে থাকবে ও আশা করেনি। আরো দ্রুত ও হাত চালায়। মনের যত রাগ আর জ্বালা এইভাবেই যেন ও ছড়িয়ে যাবে এই মাটিতে।

বেশ খানিকক্ষণ ও ঐভাবে মাটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আবার এক সময় ও উঠে আসে। দুটো-চারটে জোয়ারের জলের ধাক্কা লাগলেই আর দেখতে হবে না। কেমন এক উত্তেজনা আর তৃপ্তিতে ওর চোখ-মুখ ঝলসে ওঠে।

গাছটাকে এবার ধাক্কাতে শুরু করে লক্ষ্মণ। গাছটাকে দিয়েই গর্তটাকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। গাছটা গর্তের উপর পড়ে থাকলে কেউ টেরই পাবে না গর্তটাকে।

ধাক্কায় ধাক্কায় গাছটা শেকড় শুদ্ধ নড়তে থাকে। আরো একটু চাপ কষে ও গাছটাকে মাটির উপর আছড়ে ফেলে। ভেড়ির অনেকখানি অংশ ঢাকা পড়ে যায় এবার গাছে।

তারপর হাত ঝাড়া দিয়ে ভেড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় লক্ষ্মণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবার লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ে। রজনীদের নৌকো নাকি ওটা। হ্যাঁ, রজনীদেরই নৌকো। চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি ওর। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা পুরো দ্বীপটাকে পাক খেয়ে এল কি করে। ওকে কি ওরা দেখে ফেলল।

শ্বাসবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল লক্ষ্মণ।

ডিঙি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছে, কে? কে ওখানে?

লক্ষ্মণের গা দিয়ে এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম করতে শুরু করল। উত্তর দেয় না লক্ষ্মণ। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি উচিত

শরৎ অনুরাগীবৃন্দ বিগত সাত বছর যে বইটির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, তার দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য

তারাপদ সাঁতরা প্রচ্ছদঃ দুর্গেন্দু পত্রী ৭.০০

সমালোচকদের মতে সামতাবেড় সম্পর্কিত শরৎচর্চার একমাত্র তথ্যপূর্ণ আলোচনার বই

বিবেকানন্দ-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনোজ্ঞ ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হয়েছে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল

বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রথম খণ্ড ৭.০০

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী ও ডঃ মায়াঞ্জনা গোস্বামী

প্রচ্ছদঃ নবীন কুঠারী

ঋক প্রকাশনী

প্রযত্নেঃ পুস্তক বিপণি ২৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

উচিত হচ্ছে। এ যে ঈশানেরই গলা, চিনতে অসুবিধা হয় না। ঈশানরা কি চিনে ফেলেছে ওকে। যদি চিনে থাকে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। ওকে এখনই পালাতে হবে। কোনভাবে একবার নিজের ডিঙিতে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। আর এখানে নয়। প্রাণে বাঁচতে হলে আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতর কোন্ দিকে পালাবে ও। ঈশানরা কি এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা এখানে এসে ভেড়ির ওপর উঠে দাঁড়ালেই তো ওপড়ানো গাছটাকে দেখতে পাবে। তখন বিরাট গর্তটাও ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

আরো একটুক্ষণ অবস্থাটা বুঝবার জন্য লক্ষ্মণ ঝোপের আড়ালে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নাহ্, একটু একটু করে সরে যাওয়াই ভালো। পা টিপে টিপে ও এগোতে শুরু করল। আর এ-সময় প্রচণ্ডভাবে ও চমকে উঠল। গুলির শব্দ। ওকে লক্ষ্য করেই কি গুলি ছুঁড়ল, বুঝতে পারল না লক্ষ্মণ। এমনও তো হতে পারে, নিজেদের ভয় কাটাবার জন্য ওরা গুলি ছুঁড়ল। তবে কি ওরা সাংঘাতিক কোন জন্তু-জানোয়ার দেখে গুলি ছুঁড়ছে নাকি ওকেই দেখল। ওরা কি নৌকো থেকে এতক্ষণে ডাঙায় নেমে পড়ল। কি জানি, কিছুই বুঝতে পারল না ও।

নাহ্, এক্ষুনি ওর পালান উচিত। আরো জঙ্গলের গভীরে ও ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু অসম্ভব কাদা। কাদা আর শুলো কাঁটা। এগোন যায় না। এখনি ও কাদায় আছড়ে পড়তে পারে, আর তাহলে শুলোয় গেঁথে যাবে লক্ষ্মণ। এবার মাথা নিচু করে ভেড়ির পাশ ধরেই ওর ঘাটের দিকে পালান উচিত। একবার ঘাটের দিকে পৌঁছতে পারলে নৌকাখানা পেয়ে যাবে ও।

ঝুঁকে ঝুঁকে ও এগোতে শুরু করল।

কিন্তু ততক্ষণে ভেড়ির ওপর উঠে পড়েছে ওরা। বজনীর গলা পাওয়া গেল, ঐ, ঐ, ঐ। ঐ পালাচ্ছে।

লক্ষ্মণ কি ধরা পড়ে গেল। তবে কি ওরা বুঝতে পেরেছে, লক্ষ্মণ এখানে বসে ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল। ওরা কি বুঝতে পেরেছে, ওদের সর্বনাশ করার জন্য এখানে এই জঙ্গলের দিকে এগিয়ে এসেছিল লক্ষ্মণ।

যা থাকে কপালে, লক্ষ্মণ ভেড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে দৌড়তে শুরু করল।

—খবরদার, গুলি করব। পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ঈশান।

গ্রাহ্য করল না লক্ষ্মণ। প্রাণপণে ছুটতে থাকল। আর খানিকটা দূরে এগিয়ে ও বুঝতে পারল, কাজটা ও ভাল করল না। অমনভাবে ছুটতে শুরু করায় ওকে আরো সন্দেহ করছে ওরা। কি দরকার ছিল দৌড়বার। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভাল-মানুষটি সেজে গেলেই তো হত।

কিন্তু আর দাঁড়ান যায় না। লক্ষ্য করল ওর পেছন পেছন ওরাও ছুটতে শুরু করেছে। চেঁচাচ্ছে, পালাল, মার মার মার—

পেছন থেকে যেন কুকুর তাড়া করেছে ওরা। একবার পিছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করল। ওরে বাপ্, ওগুলো কি। ঢেলা ছুঁড়ছে ওরা।

আর দাঁড়াবার উপায় নেই। হাতে একটা দা-কুড়াল থাকলে তেড়ে যাওয়া যেত, কিন্তু সে উপায় নেই।

ঈশান আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, ধর শালাকে, পালাল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ঈশান।

লক্ষ্মণ ঘুরে দাঁড়াল, কি করেছি আমি যে ঢিল মারছ?

—শালা তোকে কবর দেব। ভেড়িতে যে গর্ত করেছিস, সেখানে তোকে কবর দেব। আবার ঢিল ছুঁড়ে মারল ঈশান।

নাহ্, টের পেয়ে গেছে সবাই। আর দাঁড়ান চলে না। যে-কোন মুহূর্তে ঢিল এসে ওর মাথায় লাগবে। আবার ছুটতে শুরু করলে লক্ষ্মণ। ততক্ষণে সারা তল্লাটে যেন জানাজানি হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিক থেকে কাঠ কাটা ফেলে দা-কুড়াল নিয়ে ছুটে আসছে সবাই। এত-গুলো লোকের মুখ থেকে কি করে এখন প্রাণে বাঁচবে লক্ষ্মণ। চোখে আবার কেমন হলুদ দেখতে শুরু করে ও।

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি এসেও ভেড়ির দিক থেকে নামতে সাহস হয় না লক্ষ্মণের। লক্ষ্য করল কাঠুরেদের হাত নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে ঈশান। কি বোঝাচ্ছে?

লক্ষ্মণ কি যে করবে ভেবে পেল না। কাঠুরেদের পাল্টা চিৎকার করে বোঝাবার চেষ্টা করল লক্ষ্মণ, আমি না, আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস কর, আমি না।

কিন্তু কাঠুরেরা ততক্ষণে হা-হা করে আসরে নেমে পড়েছে। হাজার হাজার ঢিল উড়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে।

হাত তুলে ঢিল থেকে বাঁচবার চেষ্টা করল লক্ষ্মণ। মাথায় এসে মস্ত একটা মাটির ঢেলা আছড়ে পড়ল। ঘুরে পড়ল লক্ষ্মণ। এটা মাটির ঢেলা, না দা। একটা ধারাল দা কে যেন ছুঁড়ে দিয়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

হাজার হাজার ঢিল উড়ে আসছে। উহ্, চোখের ডিমের ওপর কি যেন একটা ফেটে পড়ল। সবকিছু অন্ধকার হয়ে যেতে থাকল। হাতজোড় করে আকুতি শুরু করল লক্ষ্মণ। বাঁচাও, বাঁচাও।

অথচ ওর ঐ ক্ষীণ গলার শব্দ হারিয়ে গেল। দা-কাটারি ঢিল যে-যা পারছে ছুঁড়ে মারছে। হ্যাঁ মারছেই।

কোনক্রমে উঠে আবার টলতে টলতে ছুটতে শুরু করল লক্ষ্মণ। ভেড়ি থেকে গড়িয়ে নদীর ঢালের দিকে পড়ে গেল। লোকগুলো খুব কাছাকাছি হয়ে পড়েছে। একদিকে নদী, বাকি তিন দিকে ঘিরে ধরেছে ওরা।

নদীর ঢালে হাঁটু ডোবান কাদায় আছড়ে পড়ল লক্ষ্মণ। পিঠের ওপর কি যেন একটা গেঁথে যাচ্ছে। হাঁটু ছুঁয়ে আগুনের মতো কি যেন ওটা বেরিয়ে গেল।

শেষবারের মতো আবার ঊর্ধ্বে হাত তুলে আকুতি জানাল ও।

কিন্তু বৃষ্টির মতো ঢিল। বজ্রের চিৎকার। মুখের চোয়ালে কি যেন একটা আছড়ে পড়ে চোয়ালটাকে থেঁতলে দিল।

(চলবে)

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্যামল রায়

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নাড়ালো। আমি ওকে খুব আস্তে ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম—তুমি আমাদের বাঁচাও .. একমাত্র তুমিই আছো আমাদের বাঁচাতে পারে.... তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো.... আমাদের বাঁচাও . ঘোরের মত শুনতে লাগল বৃদ্ধ লোকটি। ডান হাত তুলে আমার কাঁধে হাত রাখলো। মুখে কিছু বলল না। ইশারা করল শিপ্রাকে. .. ওপরে উঠে যাও। ওপরে উঠে যাও. শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কি সব জটলা করছে। শিপ্রাকে ইশারা করলাম, ওপরে উঠে যাও। শিপ্রা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ সেই জটলার দিকে চলে গেল। কৃষ্ণ সেই লোকটির কাঁধে হাত রেখে ঘুরছে। শিপ্রা আমার হাত ধরল,

'কেন যে এখানে এলে—এখন কি হবে ?'

'দেখা যাক কি হয়। কিছু একটা হবে তুমি পালাও ওপরে উঠে যাও.... কেউ দেখুক তোমাকে।'

'না। যা হবার হোক । দেখ তোমাকে ডাকছে।' আমি ফিরে তাকাই। বৃদ্ধ লোকটি আমাকে ডাকছে। আমি কৃষ্ণকে ডাকি। কৃষ্ণ এক হাত তুলে আমাকে থামতে বলে। আমি বৃদ্ধ লোকটির দিকে এগিয়ে যাই।

ওরা সব বসে ছিল। বসে বসে জটলা করছিল। বৃদ্ধ লোকটি হাত দিয়ে মাটিতে বসতে বলল। আমি ওদের পাশে গিয়ে বসি।

'কেন এখানে এসেছেন বলুন ?'

'বললাম তো বেড়াতে এসেছি।'

'মিথ্যা কথা।'

'না, বিশ্বাস করুন, ওকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ও কে ?'

—আমার বন্ধু।'

'কি করে ?'

'একজন কবি।'

'কলকাতায় তোমাদের সবাই চেনে ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছো তোমরা চলে যাও, এদিকে আর আসবে না।' ওদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ায়।

'নেহি ...মত ছোড. . শালে লোগ।'

বৃদ্ধ লোকটি ওকে ধমকে বসতে বলে।

লোকটি একটু থতিয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা এখানেই নামলেন কেন ? বেড়াবার তো অনেক জায়গা আছে—কাঁথি ...দীঘা।'

'আমরা অনেকটা খেয়ালে নেমেছি। দীঘা যাবার সময় ছিল না। আমরা ঠিক করেছিলাম, খড়গপুর থেকে প্রত্যেকে এক টাকার টিকিট কাটবো—যতদূরে যাওয়া যাবে, যাবো। যেখানে নামিয়ে দেয়, নামবো। তারপর একটু ঘুরেফিরে বাসে করে আবার খড়গপুর ফিরে যাবো। অনেকটা খেয়ালে নেমেছি....এ রকম আমরা প্রায়ই করি.... কিন্তু

'এ কাজ আপনারা ভালো করেন নি।' বলে. কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ লোকটি আবার বলল,

'আপনারা কলকাতায় থাকেন ?'

'হ্যাঁ।'

'প্রমাণ দেখাতে পারেন।'

'যে কোন প্রমাণ ?'

আমার কাছে 'নির্জন সৈকতে' সিনেমার টিকিট ছিল। বললাম, 'এই দেখুন, কাল এই বই রিলিজ হবে। আমরা কলকাতায় থাকি... কাল কলকাতায় ফিরে যাবো।'

বৃদ্ধ লোকটি টিকিটগুলো হাতে নিয়ে দেখলো।

'ঠিক আছে....আপনারা চলে যান।' বলে, উঠে দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম, কৃষ্ণ আর সেই লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি শিপ্রার কাছে গিয়ে বলল, 'বহিন, ভয় নেই...চিনেন তো আমাকে ? গোল-বাজারে ফির দেখা হবে।' শিপ্রা এই প্রথম হাসল। ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালো কৃষ্ণ বলল, 'দেখা তো নিশ্চয়ই হবে, দেখা হলে ওকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যেয়ো। ও আমার বন্ধুর ছোট ভাই।' আমাকে বলল, 'তুইতো চিনিস আমার যে বন্ধু মহামেডান স্পোর্টিংএ খেলে'। আমি বললাম, চিনবে না কেন—বেশ চিনি।' এই লোকটি এবার হাসলো। আমি বললাম, 'আসুন কলকাতায় একদিন, আমাদের বাড়িতে থাকবেন, অসুবিধা নেই।' লোকটি বলল, যাবো.... আমার দাদাকে আপনারা চেনেন....ওনার বন্ধু....যাবো।'

কৃষ্ণ বলল, 'কাল আমরা ফিরে যাচ্ছি—আমাদের সঙ্গে চলুন।' বৃদ্ধ লোকটি আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা উপরের দিকে উঠতে থাকুন।' খুব নীচু স্বর, ক্ষীণ, পরাস্ত।

আমি শিপ্রাকে ইশারা করলাম ওপরের দিকে উঠতে। আমরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। লোকগুলো আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগল। সেই লোকটি আমাকে বলল, 'মাফ করবেন আমাকে। আপনার গায়ে আমি হাত দিয়েছি।' আমি বললাম—'ঠিক আছে ওরকম ভুল না জেনে বুঝে হয়েই থাকে।' লোকটি আমার পাশেপাশে হাঁটতে লাগল।

'কলকাতায় কাউকে বলবেন না।'

'না না, আপনি তা ভাবছেন কেন ?'

বর্তমান শতাব্দীর
এক মহীরুহের আত্মজীবনী
বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা

জীবন-কথা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বড়গুলিতে

অন্নদাশঙ্কর রায়ের **'আই, সি, এস'**
অমিতাভ চৌধুরীর **'কবি ও সন্ন্যাসী'**

শারদীয়া যুগান্তর ১৩৮৪

গল্পের মত গল্পের মত

লীলা মজুমদারের **'মধ্যমণি'** ॥ জহুরী সওদাগরের **'আলি আকবর, স্বদেশে এবং বিদেশে'** ॥ অমিতাভ দাশগুপ্তের **'নও শুধু ছবি'** ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে।

বিখ্যাত চারটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ/কবিতা

পিণ্ডারী দেখে এলাম
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট নিয়ে অজয় বসুর 'বাঙালী হৃদয়ে সোনালী স্মৃতি'

অভিনেত্রীকে নিয়ে
মধুসূদন মজুমদারের 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'

২টি বড় গল্প ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

হাসির বড় গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে
দাম ১০ টাকা
সডাক/১২ টাকা

গল্পে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী
সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র/কণা বসু মিশ্র
সমরেশ মজুমদার/শৈবাল মিত্র
সচীন দাশ এবং অনেকে

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র/অরুণ মিত্র
দিনেশ দাশ/মণীশ ঘটক
অশোক বিজয় রাহা
হরপ্রসাদ মিত্র/মনীন্দ্র রায়
কৃষ্ণ ধর/রাম বসু/পরমানন্দ
সরস্বতী/বিমল চন্দ্র ঘোষ
সুনীলকুমার নন্দী/গৌরাঙ্গ
ভৌমিক/আলোক সরকার/
পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত/পূর্ণেন্দু পত্রী
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/মানস
রায়চৌধুরী/তারাপদ রায়
কবিকুল ইসলাম/সামসুল
হক/আনন্দ বাগচী
দেবারতি মিত্র/পবিত্র
মুখোপাধ্যায়/অমিতাভ
চক্রবর্তী এবং কয়েকজন

স্কেচ

সুনীলমাধব সেন
প্রকাশ কর্মকার/গণেশ পাত্র
রবীন মণ্ডল/বিকাশ
ভট্টাচার্য/ধীরাজ চৌধুরী
দিলীপ কুণ্ডু/মানু
রায়েড়/শুভপ্রসন্ন/দিলীপ
মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙীন আর্টপ্লেট

'আমার দাদার একটা ইজ্জত আছে।'

কৃষ্ণ বলল, 'তুমি কি পাগল! —এসব কথা কি কেউ বলে।' আমরা অনেকটা উঠে এসেছি। বৃদ্ধ লোকটি আর শিপ্রা একটু আগে এগিয়ে গেছে। মাঝখানে আমি কৃষ্ণ আর সেই লোকটি। আমাদের পিছু পিছু লোকগুলো আসছিল।

কৃষ্ণ বলল, 'আমার গলা শুকিয়ে গেছে, একটা সিগারেট দেবে।' সেই লোকটি হাত বাড়িয়ে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। কোমরে হাত দিয়ে, একটা মনিব্যাগ আর একটা পেন কৃষ্ণর হাতে তুলে দিল। কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'এখন কোন বাস পাওয়া যাবে।' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ যাবে। দীঘা-খড়গপুর বাস পাওয়া যাবে।' আমরা এবার ওপরে উঠে এসেছি। বিস্তৃত মাঠ পেরিয়ে দূরে কাঁচাই রোড দেখা যাচ্ছে। গ্রামের কৃষক মাথায় ঝাঁকা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ দূরে একটা লেভেল ক্রসিং। একটা গুমটি ঘর। সার সার পোস্টে বিজলী তার চলে গেছে অনেকদূরে। বৃদ্ধ লোকটি আর শিপ্রা দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা কাছে যেতেই বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'আপনারা চলে যান। এখানে থাকবেন না।' কৃষ্ণ বলল 'না না আমরা থাকবো না বাস পেলেই চলে যাবো।'

কৃষ্ণর বন্ধুর ভাই আর বৃদ্ধ লোকটির কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। একটু দূরে অন্য সবাই জটলা করছে। বৃদ্ধ লোকটি বলল যান দেরি করবেন না—চলে যান।' আমি বললাম, 'বড় রাস্তায় উঠলে কেউ তো আমাদের আবার ধরবে না?'

'না না, কেউ কিছু করবে না—কেউ কিছু বললে আমাদের কথা বলবেন। আমরা এখানে আছি।'

'আমি বললাম, আচ্ছা! তা হলে চলি।' ওরা হাত তুলল। পিছনে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দেখতে লাগল—আমরা চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, 'যাই ভাই সব।' ওরা সব হাত নাড়াতে লাগল। আমরা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের শরীরে যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে এল। কৃষ্ণ বলল, 'খুব জোর বেঁচে গেছি আজ যে কি হতে পারত ভাবা যায় না।'

কি হতে পারত সেই ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। হয়তো সবার এক, কোন ব্যতিক্রম নেই।

আমি বললাম, 'সত্যি .. ভাবা যায় না।' শিপ্রা কোন কথা বলছিল না। একমনে মুখ নীচু করে হাঁটছিল। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, কল্টাই রোডের ওপরে বেশ লোক জমে গেছে। সবাই গ্রামের কৃষক স্থানীয় গরীব লোক যে যার মত দাঁড়িয়ে আমাদের অবাক হয়ে দেখছে।

শিপ্রা বলল, 'ওরা কারা?'

'স্থানীয় লোকজন হবে।'

'এভাবে দাঁড়িয়ে কেন?'

'আমাদের দেখছে।'

'দেখার কি আছে।'

কৃষ্ণ বলল, 'আছে! এখানে এই নির্জন জায়গায় দুটো ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখলে সবাই সন্দেহের চোখে দেখবে.... আমাদের খেয়ালের একটা সীমা থাকা উচিত ছিল।'

শিপ্রা বলল, 'হ্যাঁ। সীমা থাকা উচিত ছিল এখানে—এভাবে আসা ....।'

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। রোডের ওপরের লোকজনেরা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। বিকেল পড়ে গেছে। হু হু করে উত্তরের বাতাস আমাদের সবকিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। দূরে দূরে গ্রাম, ধানক্ষেত, ছোট বড় সরল গাছ, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

'তুই ওই লোকটিকে কি বলছিলি ... কাঁধে হাত দিয়ে।'

'সে অনেক কিছু। এখন বলার মত মনের অবস্থা নেই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওরা আমাদের দূর থেকে দেখেছিল, মনে করেছিল আমরা কোন খারাপ কাজ করতে যাচ্ছি। কবি শিল্পীর খেয়ালের কথা ভাবেনি। যে যে অবস্থায় ছিল উঠে চলে এসেছে।'

ওরা আমাদের ভেবেছে বিখ্যাত লোক, কলকাতায় আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক কিছু আছে—কিছু একটা করলে ওদের ক্ষতি হতে পারে ভেবে কিছু করেনি। তাছাড়া যার কাঁধে হাত রেখে আমি ঘুরছিলাম, ও যখন বলল, ওকেও কলকাতার সবাই চেনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ভাবে চেনে? ও তখন ওর দাদার কথা বলল, ওর দাদা মহামেডান স্পোর্টিংএ খেলে। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার নাম কি? ও নাম বলাতে সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, ওকে তো আমি চিনি। আমার বন্ধু। শুনে ও দাঁড়িয়ে যায়। বলে, তোমার বন্ধু? আমি বললাম, হ্যাঁ। ওর চেহারা, আকৃতি, প্রকৃতি কোন পোস্টে খেলে, কয়টা গোল দিয়েছে, কোথায় থাকে, সব বলাতে ও অনেকটা বিশ্বাস করল। বলল, 'ওসব অনেকেই জানে, কেউ জানে না এমন কথা বললে বিশ্বাস করবো।'

আমি বললাম, ও চা কফিতে চিনি খায় না। শুনে লোকটি একটু ঘাবড়ে যায়। বলল, তুমি জানলে কি করে? আমি বললাম, সব সময় আড্ডা দিচ্ছি, চা কফি খাচ্ছি, আর আমি জানবো না? ও আমার দিকে তাকিয়ে ওর কাঁধ থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়। আমি বললাম তুমি আমার বন্ধুর ভাই, আমার ভাই। আজ যদি কিছু হয় আমি তোমার দাদাকে কি বলবো? কলকাতায় যারা জানবে কি বলবে? ও বলল, কিছু হবে না, আমি ব্যবস্থা করছি বলে আমাকে তোদের কাছে নিয়ে আসে।

শিপ্রা বলল, 'আপনি কি করে জানলেন ও চা কফিতে চিনি খায় না?'

'জানি, কফি হাউসে এক দিন আলাপ হয়েছিল। সেদিন কফিতে চিনি ছিল বলে ও খায়নি। পরে চিনি ছাড়া কফি আনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোথায় কখন কি ব্যাপার কাজে লাগে—ভাবা যায় না।'

আমরা কল্টাই রোডের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের দিকে হাত তুলে নাড়িয়ে দিলাম। ওরাও হাত নাড়তে লাগল।

শিপ্রা বলল, 'দেখ লোকগুলো কেমন দেখছে?'

'দেখুক, ভয় কি?'

'না ভয় কি! যা করেছিলে। আজ যে কি সর্বনাশ হতো।'

'কি আর হতো?'

'সেই, কি আর হতো!'

আমি চুপ করে থাকি। ওর কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। বললাম, 'ক্ষমা কর।'

'ক্ষমার কি আছে, কে কাকে ক্ষমা করে কিছু হলে কি করতে? ..কি করতে?'

'চুপ কর।' কৃষ্ণ বলল। 'কিছু হলে কিছুই করার ছিল না। আমরা হয়তো তোমার জন্য মরে যেতে পারতাম, কিন্তু মরলেও কিছু হতো না ...যা হবার হত।'

শিপ্রা বলল, 'সেই, যা হবার হত.... কে কি যে মরত জানা হয়ে গেছে।'

আমি চুপ করে হাঁটছিলাম। আমার কিছু বলার নেই। কৃষ্ণ বিরক্ত হল। বলল, 'চুপ কর .....এখন এ-প্রসঙ্গ থাক ..... ভাল লাগছে না।'

আমরা কল্টাই রোডের ওপর উঠে এলাম। কিছু লোক যারা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা একে একে চলে যেতে লাগল। যেন আমাদের দেখার জন্যই দাঁড়িয়েছিল। দেখা হয়ে গেছে বলে, চলে যায়।

আমি বললাম, 'তোর কাছ থেকে ওই লোকটা সবকিছু নিয়ে নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। টাকা পয়সা, পেন এমনকি সিগারেটের প্যাকেট পর্যন্ত। আর কিছু থাকলে তাও নিত।'

'যা হোক ফেরত পেয়েছিস।'

'হ্যাঁ। ফেরত পেয়েছি প্রাণটাও।'

(চলবে)

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

মাঠে খেলা হচ্ছে, চারধারে মুষ্টিমেয় ক্রিকেট-পাগল রোদে পা ছড়িয়ে ঘাসে বসে খেলা দেখছে। সুন্দর ছোট প্যাভিলিয়ন, তার কাছে এক সারি বেতের চেয়ার পাতা ছিল। ক্যালকাটা ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে হয়তো বলা ছিল। বার্কমায়ার সাহেব মোটা শরীর নিয়ে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ক্রিকেটিং ক্যাপ পরা, সাদা পোষাক পরা, সাহেব-সাহেব চেহারার যে দাড়িমুখ মানুষটি ছিলেন, তিনিই যে আমাদের বড়-জ্যাঠামশাই সেটা বুঝতে সময় লাগল।

বার্কমায়ারের সঙ্গে দেখলাম তাঁর খুব ভাব। বড়-জ্যাঠাকে এমন চমৎকার ইংরিজি বলতে শুনে আমরা থ। বার্কমায়ার বললেন, 'কি পানীয় দেব লেডিজদের?' কেউ কিছু বলবার আগে বড়-জ্যাঠা বললেন, 'নাথিং স্ট্রং।'—বলে মুচকি হাসতে হাসতে চলে গেলেন আর সেমুখো হলেন না। ঐ বড়-জ্যাঠাকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে লর্ডস্-এ ব্যাট হাতে দাঁড় করিয়ে দিলেও নিশ্চয় ঘাবড়াতেন না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা আইসক্রীম-সোডা খেলাম।

ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের মাঝখানে বসে ক্রিকেট খেলার নিয়ম কানুন বলে দিতে লাগলেন। মাঠের কোন্ জায়গাটা লং ফিল্ড, কোথায় কভার পয়েন্ট, কাকে স্লিপ বলে, গুগলি কি, পায়ের বদলে হাত থাকলেও লেগ-বিফোর-উইকেট হয়, এসব আমাদের তাঁর কাছে শেখা। দুঃখের কথা আর-কি বলব, এখন সব নাম পাল্টেছে। কিন্তু আমরা ৮—৯টি বোনই যে প্রথম বাঙালী মেয়ে ক্রিকেট ফ্যান এবং প্রথম দর্শক, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সেদিনের স্মৃতিটি আমার মনের পটে সোনার জলে লেখা হয়ে রইল। আজ পর্যন্ত তার মাধুর্য এতটুকু টশকায়নি। লাঞ্চের সময় আমাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল।

যতদূর মনে পড়ে, এটা হবে ১৯২২ সালের কথা। এক বছর আগেও হতে পারে, সময় গুলিয়ে যায়। বলেছি তো ১৯১৯ সালটি ভালো যায়নি। বছরের গোড়ায় যামিনীদা দেশে গিয়ে আর ফেরার নাম করে না। দু'বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। যামিনীদা ব্যস্ত হয়ে দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে, তারপর আরেকটা বিয়ে করে ফিরে এসেছিল। বাবা চটে কাঁই। বললেন, 'বাল-বিধবাদের আবার বিয়ে হক, কিন্তু তা তো দেবে না। বুড়ো-হাবড়া নিজে আরেকটা বিয়ে করে এল।'

বাল-বিধবার কথা কি করে উঠল ভেবে পেলাম না। কারণ, যামিনীদার তো মেয়েই ছিল না, ছেলেরও বিয়ে হয়নি যে, মরে গিয়ে বাল-বিধবা বানাবে। সে যাই হক, যামিনীদা সে-বছর আবার দেশে গেল। ছ'মাস আট মাস কেটে গেল, আর ফেরে না। সকলে বিরক্ত। এমন সময় হঠাৎ ন্যাড়া মাথায় যামিনীদার ছেলে তারিণী এসে বলল, 'বাবা জ্বর হয়ে মারা গেছে, তার কি টাকাকড়ি পাওনা আছে নিতে এসেছি।'

দারুণ আঘাত লেগেছিল। যামিনীদা আমাদের রান্না করে খাওয়ায় না, এমন কোনো সময়ের কথা মনে পড়ে না। হয়তে আমার ২ বছর বয়স থেকেই ছিল। ধমক-ধামাক, ঠেলে রান্নাঘর থেকে বের করে দেওয়া, চ্যালা-কাঠ নিয়ে তেড়ে আসা, সব কথা মা-বাবার কাছে গিয়ে লাগানো ইত্যাদি কারণে, যদিও তার সঙ্গে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ থামত না, এখন ছবির অন্য দিকটাই কেবলই মনে পড়তে লাগল।

আমরা যে-যা খেতে ভালোবাসতাম, তাকে ঠিক সেইটি দিতে যামিনীদার ভুল হত না। সর জমিয়ে বাড়িতে গাওয়া ঘি করত, তার চাঁচির ওপর গুঁড়ো চিনি ছড়িয়ে ডাক দিত, 'কোথায় গেলে, চাঁচি খাবা না?' অমনি আমরা আমাদের সেই মস্ত বাগানের যে-যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে ছুটে এসে ময়লা হাত পাততাম। যামিনীদা ন্যাশপাতি গাছের নিচে জলের কল দেখিয়ে দিত, 'যাও, হাত ধুইয়া আস।'

মাকে যামিনীদা দেবতার মতো ভক্তি করত। মার কখনো অসুখ-বিসুখ হলে, বাবা যদি টুরে থাকতেন, যামিনীদাই একাধারে আমাদের মা-বাবা হয়ে যেত। রোগা টিং-টিঙে শরীর খোঁচা গোঁফ, খিটখিটে যামিনীদার জন্য আজ পর্যন্ত আমার মন কেমন করে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মাইনে পেত, কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র পেত, মাঝে মাঝে ধার-ধোর করত। ওর মৃত্যুর খবর যখন এল, তখন অন্য লোকে আমাদের রান্না করত। তার নাম ছিল বৈষম। পুরীর কাছে বাড়ি। আমরা ডাকতাম বিষ্ণু বলে। সে কিচ্ছু রান্না জানত না। গরম তেলে মাছ ছাড়তে হলে, 'মা' বলে এক ডাক দিয়ে, পাঁচ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াত। মা তাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছিলেন। পরে তেলের স্টোভের ওপর তন্দুর বসিয়ে সায়েববাড়ির মতো কেক বানাত। প্রথমে আমার মায়ের সংসারে তারপর বোনদের সংসারে, সব নিয়ে ৫০ বছর আমাদের বাড়িতে কাজ করেছিল। শেষে দেখতে পায় না, পা কাঁপে, তবু কাজ ছাড়বে না। ওর ছেলে ভালো কাজ করত, সে নিয়ে যেতে চাইত। কিছুতেই যাবে না। দিদিকে বলত, তুমি বেঁচে থাকতে আমি ছেলের ভাত খাব?' দিদি তাকে পেন্সন দিত, বলত, 'নিজের ভাত-ই খাও।' অবসর নিয়ে বেশিদিন সে বাঁচেনি।

এসব লোক আজকাল হয় না। যখন এসেছিল, আমার ছোট বোনের বয়স ছিল তিন। যামিনীদা রান্না করত, বিষ্ণু কাপড় কাচত, বিছানা তুলত, ফাই-ফরমায়েস খাটত। লতিকাকে ডাকত 'খুকী', কারণ মা ডাকতেন 'খুকী' আর বিষ্ণুর সবকিছু মায়ের মতো করা চাই। লতিকার বয়স যখন ত্রিশ, কার্সিয়াং-এর 'ভাও হিল' স্কুলের অধ্যক্ষা, বিষ্ণু তখনো তাকে ডাকে 'খুকী'। একবার বাংলার রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী গেছেন স্কুল দেখতে। পরিদর্শনের কাজ হয়ে গেলে, লতিকার বাংলোর বসবার ঘরে বসে গরম কফি, ঘরে-করা কেক্-বিস্কুট খাওয়া হচ্ছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম, দু-একবার চোখে পড়ল, গলা-বন্ধ সোয়েটার পরে ভারি অপ্রসন্ন মুখে বিষ্ণু বসবার ঘরের দরজার কাছে ঘোরা-ঘুরি করছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই, আমি ভুরু কোঁচকালাম, বিষ্ণু সরে গেল।

আবার দেখি পাশের দরজা দিয়ে উঁকি মারছে আর বিড়বিড় করছে। অবশেষে বিশিষ্ট অতিথিরা উঠলেন, আমরা গাড়ি-বারান্দা অবধি গিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে দিলাম। রাজ্যপালের স্ত্রী মায়ের কলেজের বন্ধু, তাঁর সঙ্গে শেষ কটা কথা বলে নিচ্ছেন, এমন সময় স্পষ্ট শুনলাম, বিষ্ণু আর ধৈর্য রাখতে না পেরে, লতিকার কাছে গিয়ে বলল, 'এই খুকী। এসব কি হচ্ছে, দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে না?' ওকে বকতে গিয়ে লতিকা হেসে ফেলল, আর যারা শুনতে পেল, তারা সবাই হেসে ফেলল। এতক্ষণ পর লজ্জা পেয়ে বিষ্ণু পিটটান দিল। এ-ঘটনা হল ১৯৫২ সালের ব্যাপার। আমার ছোটবেলা সম্বন্ধে যে-বই লিখেছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম 'আর কোনোখানে'। এ-ও সেই আর কোনোখানের কথা, এ-জগতে এমন হয় না।

১৯২৩ সালের সব চাইতে বড় আঘাত বড়দার মৃত্যু। বছরটা শুরুই হয়েছিল হতাশার মধ্যে দিয়ে। দিদি আমার অক্ষর চেনা একসঙ্গে, সেই ইস্তক একসঙ্গে পড়া-শুনো, খেলাধুলো, একরকম কাপড়-চোপড়, ওর চাইতে পড়ায় আমি একটু ভালো. তবে ও-ও ক্লাসের খুব ভালোদের একজন ছিল—কিন্তু ও বেজায় লক্ষ্মীমন্ত, আমি দুরন্ত, মুখফোঁড়, অসহিষ্ণু। স্কুলে দুজনার ছাড়াছাড়ি হবে কখনো ভাবিনি। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর অবধি ভাবছি, কয়েকমাস পরেই দুজনে একসঙ্গে ম্যাট্রিক দেব। তখন ১৬ পূর্ণ হলে ম্যাট্রিক দেবার কথা। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বললেন —'মেয়েদের বেলা অত নিয়ম কেউ মানে না। তোমার ফেব্রুয়ারিতে ১৫ পুরবে, তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে।' দুঃখের বিষয়, সে অনুমতি পাওয়া গেল না। দিদি এবং পুরনো বন্ধুর দল পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগল, আমি নিচের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে বসলাম। আমার বিশেষ বন্ধু মীরা দত্তগুপ্তাও পরীক্ষা দিল, তার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি।

তবে নতুন সহপাঠিনীরাও মন্দ ছিল না। অল্পদিনে তাদের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেল। কথাটা একবার মেনে নেবার পর আর তত কষ্ট হত না। মজা হচ্ছে, তার পরের বছর থেকে পরীক্ষার বয়স ১৬ থেকে কমিয়ে ১৫ করে দেওয়া হল। মাঝখান থেকে আমার একটা বছর নষ্ট হল। তবে নষ্ট বোধহয় হয়নি, অজস্র ইংরিজি-বাংলা বই পড়েছিলাম। ছবি আঁকা শিখেছিলাম। বিশেষ সেলাই ক্লাসে যোগ দিয়ে নানারকম এম্ব্রয়ডারির কাজ শিখেছিলাম। দিদিরা পাস করে কলেজে ভর্তি হল। আমি স্কুলেই রইলাম।

এর মধ্যে একদিন সকালের দিকে একজন শিক্ষিকা এসে আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। নাকি মা আমাদের নিতে এসেছেন। নিচে নেমে মায়ের মুখ দেখে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। দেখলাম, মার হাতটাও থরথর করে কাঁপছে।

(২০)

ট্যাকসি থেকে নেমে দেখলাম এ গড়পার সে গড়পার নয়। এখানে হাসি নেই, কথা নেই, কাজ নেই, আনন্দ নেই। প্রেস্ বন্ধ, প্রেসের ঝম্-ঝম্ শব্দ বন্ধ। কে যেন মনের কানে বলে দিল এখানে আর কোনো দিন ও সব হবে না। সব নাটক, সব গান, সব হাসি-ঠাট্টা চির কালের মতো থেমে গেছে। কেউ কোনো কথা বলল না। একতলার কোনো মানুষ আছে মনে হল না। সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক দাঁড়িয়ে ছিল। চেনা লোক প্রায় সবাই, কিন্তু সকলকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। বসবার ঘরের শ্বেত পাথরের মেঝের ওপর আমার ঠাকুমার ছেলেমেয়ে বৌ নাতি-নাতনি নাত-বৌ নাত-জামাইরা কাঠ হয়ে বসেছিল।

বসবার ঘরের পাশ দিয়ে বড়দার ঘরে গেলাম। বড়দা চোখ বুজে বুকের ওপর হাত দু'খানি জড়ো করে, একটা নিচু খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। সাদা কাপড়, সাদা চাদর, সাদা ফুল। বড়দার পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে আমার হতভাগিনী জ্যাঠাইমা পড়ে ছিলেন। বড়দার পাশে একটা মোড়ার ওপর আমার অনন্য সাধারণ বৌঠান চোখ বুজে, দু-হাত জোড় করে বসেছিলেন আর তাঁর দু' গাল বেয়ে স্রোতের মতো জল পড়ছিল। মানিককে কোথাও দেখি নি, হয়তো তাকে কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছিল। মানিকের তখন দু' বছর বয়স, তার মায়ের ২৯ বছর, তার বাবার ৩৬ বছর।

দেখে দেখে দেখে দেখে চিরকালের মতো সে দৃশ্য আমার মনের ওপর আঁকা হয়ে গেল। বড়দার কোঁকড়া চুল, শীর্ণ গাল, তার ওপর কোথায় একটা বড় আঁচিল। হৃদয়ের মধ্যে কাউকে যদি গুরুর আসন দিয়ে থাকি, এই সেই মানুষ।

মনে আছে কেউ চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করে নি। জ্যাঠাইমা-ও না। ব্রাহ্মবাড়ির এই একটি দিককে আমি বড় শ্রদ্ধা করি। শোকের সময় কখনো কাউকে সংযম হারাতে দেখি নি। মনে আছে কে যেন গান গেয়েছিল। বৌঠানের আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই বড় ভালো গাইয়ে। কনক দাশ, রেণুকা দেবী, সাহানা দেবী, আরো অনেকে। তবে সেদিন কারা গান করেছিলেন মনে নেই। বড়দার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তটিও মনে করতে পারি না। শুধু এটুকু মনে আছে খালি খালি মনে হচ্ছিল সব হারিয়ে ফেললাম, কিছু বাকি রইল না।

একদিন বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসে 'আবোলতাবোলের' একটা ছবিতে তুলি লাগাতে লাগাতে বড়দা বলেছিলেন, 'তুই-ও এ-সব করবি, কেমন?' আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে শুধু মাথা দুলিয়েছিলাম। আসলে পারি নি বিশেষ কিছু করতে। ছবি সামান্যই এঁকেছি। ওঁদের মতো জোরালো হাত কই? কবিতা আমার আসে না। গল্প লিখেছি অজস্র। বড়দার গল্পের মধ্যে এক ধরনের সততা আছে, যার সামনে যা কিছু মেকি, নকল, ভণ্ডামী সব মাথা হেঁট করে। আমার সাধ্য মতো সেই সততাটুকুকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। সেই সততার তলায় তলায় সরসতার স্রোত বইয়ে দিতেন বড়দা। কোথাও এতটুকু তিক্ততা, কিংবা গ্লানি থাকতে দিতেন না। আমিও সারা জীবন সেই চেষ্টাই করেছি। মেকি জিনিস পরিহার করতে চেয়েছি। মনের মধ্যে গল্পগুলি যেমন ফুটেছে, তেমনি সাজিয়ে দিয়েছি। নকল কিছুর জায়গা রাখি নি, মাস্টারি করার চেষ্টা করিনি।

এ-সব হল পরের কথা। সেদিন আমার পনেরো বছর বয়স, তখনো স্কুলে পড়ি। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম বড়দা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই আমার পথ। আমাকে দিয়ে অন্য কোনো কাজ হবে না। পণ্ডিতিয়ানা তো নয়ই। বড়দার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারের জীবনধারায় অন্য রকম সুর বাজতে আরম্ভ করল। যেন আত্মপ্রত্যয় কমে গেল। এখানে বড়দার বইয়ের বিষয়ও কিছু বলতে হয়। সব চাইতে আশ্চর্য কথা হল যে বড়দা একটা ছাপাখানার মালিক, একটা নাম-করা প্রকাশনালয়ের মাথা, অথচ ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের একখানিও বই ছেপে বের করেন নি। ঐ যে আবোল-তাবোল,—যার কবিতার মতো কবিতা রবীন্দ্রনাথ-ও লেখেন নি, যার ছবির মতো ছবি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল চিন্তাও করেননি, যার মলাটের পরিকল্পনা দুনিয়াতে কেউ আজ অবধি করেনি— ঐ একখানি বইয়েরও পরিপূর্ণ রূপটি বড়দা দেখে যাননি। শুধুমাত্র তাঁর জীবনের শেষ সময়ে, বইয়ের ডামি কপিটি একবার হাতে নিয়েছিলেন। ৩৬ বছর বয়সে কি কারো মরা উচিত? তারি মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিল তাঁর কত রচনা, কত ছবি। আমার ৩৬ বছর বয়সে আমি তাঁর সিকির সিকি কাজও করে উঠিনি। বড়দার সব বই বহুকাল পরে মানিকের আর সিগনেট্ প্রেসের যুগ্ম চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(চলবে)

বড় গানের সমঝদার চিরকালই কলকাতা

অনিল মিত্র

সন্ধ্যা সেন

মিত্তির বাড়ী

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরে শ্রোতা, শিল্পী উদ্যোক্তা সবারই কাছের মানুষ অনিল মিত্র —ইউনিভার্সাল 'অনিলদা'। হাসিখুশী উজ্জ্বল অবিবাহিত। গায়ে কখনো গিলে-করা, কখনো বা লক্ষ্ণৌর কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি; কোঁচানো দিশি ধুতি, শাদা পাম্পশু। মুখ ঝকঝকে ধারাল। ওল্টানো চুল। বয়সে সত্তর। জিজ্ঞেস করলে বলেন, দেখে কি মনে হয়? অথচ বুঝলে আমি মন্মথবাবু, হীরুবাবু সবার চেয়েই বড়। আমার এই সঙ্গীত জগতে আমার চেয়ে বয়সে বড় যে কয়েকজন আছেন তাঁরা রায় বাহাদুর কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৪), পরেশ ভট্টাচার্য (৮৬) এবং ডাঃ প্রকাশ সেন। এ ছাড়া আমিই বড়। দেখে কি মনে হয়?

ওঁর কথাই তাকালাম ওঁর দিকে। সব সময় ফুর্তিতে টগবগ করছেন। ১৯২২ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি ঘরে-বাইরে থেকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষা-গৃহের এমন কোন সঙ্গীত আসর বা শিল্পী নেই যার গান বাজনা তিনি শোনেননি।

উত্তর কলকাতার মিত্তির বাড়ির অনিল মিত্র ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী।

কবে কোন শৈশবে গানকে ভাল-বেসেছিলেন সেই মুগ্ধতার ঘোর আজও কাটেনি। সেই নেশাই ওঁকে খানিকটা জীবনবিরাগী করে তুলেছে। সঙ্গীতই ওঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ও ভালবাসা।

জিজ্ঞেস করছিলাম, আচ্ছা অনিলদা, তখনকার কনফারেন্সের কথা কিছু বলুন?

—কনফারেন্স, কনসার্ট এসব ত আজকের ব্যাপার।

ভাবছিলাম, ১৯৩৪ সালও ওঁর কাছে আজ! বললাম, তবু বলুন?

অনিলদা বললেন, পাথুরেঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ১৯৩৪ সালে কনফারেন্স শুরু করেছিলেন।

তার আগে ছিলো লালচাঁদ বড়াল উৎসব, মুরারী সম্মেলন, শঙ্কর উৎসব, দীনু হাজরার সম্মেলন, নিকুন্ন দত্তর জলসা, আরও ছোটোখাটো গানের আসর শৌখিন ধনীগৃহে।

আমি কিন্তু চিরকালই বিনাটিকিটের যাত্রী। তখন অবশ্য এখনকার মত টিকিট বা কার্ড সিস্টেম ছিলো না। সমঝদার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভালো গানবাজনা শোনার উদ্দেশ্যেই উদ্যোক্তারা এসব আসরের আয়োজন করতেন।

তবু একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার ত ছিল? কিন্তু আমি ওসবের তোয়াক্কা করতাম না। লজ্জা, মান, ভয় কিছুই ছিল না। বড় বড় ওস্তাদের গান শুনতে হলে অতসব মান-অপমানের কথা ভাবলে চলে? যখনই খবর পেতাম অমুকের বাড়ী গানের আসর হবে অমনই মালকোঁচা মেরে র‍্যাপারখানা গায়ে জড়িয়ে ছুটতাম। প্রথমে সেসব বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরতাম। আস্তে আস্তে জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিতাম, তারপর বকে বসতাম। এইরকম করতে করতে হঠাৎ কখনও দেখলাম কোনো শিল্পী একদল সঙ্গী নিয়ে ভেতরে ঢুকছেন, টুক করে তাঁদের সঙ্গে ঢুকে পড়তাম। বারবার এইভাবে যাতায়াত করতে করতে ঐসব মহলে খানিকটা মুখচেনা হয়ে গেলাম। তখন আর বিশেষ অসুবিধা হোতো না। তাই একটু আধটু বকাঝকাকে গায়ে মাখতাম না।

তারপর ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে বহাল হবার পর অনেকটা সুবিধা হয়ে গেলো। বাইচাঁদবাবুদের বাড়ীতে স্টেটের খরচে প্রতি বছর লালচাঁদ বড়াল উৎসব হত। সেখানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন। এখন যেমন নিয়ম করে পর্যায়ক্রমে গানবাজনা, নাচ চলে তখন কিন্তু ঠিক সেভাবে অনুষ্ঠান চলতো না। জমিদার বাড়ীর এলাহি ব্যাপার। ওস্তাদরা ত বাড়ীতে রয়েছেন। তাঁদের একটা অনুষ্ঠান শেষ করে দেশান্তরে অন্য আসরে যোগ দেবার জন্য পরের প্লেন ধরতে ত ছুটতে হবে না। অতএব সারাদিনরাত ধরে চলতো গানবাজনা। মাঝে মাঝে পান জরদা, সরবত খেয়ে জিরিয়ে নেওয়ার পালা। তারপরই আবার শুরু হত বিরতিহীন গানবাজনা ও নাচের মরশুম। সেসব দিনের উন্মাদনা কি ভোলার।

কিন্তু সেসব আসরে ঢুকতেন কি করে? জিজ্ঞেস করলাম।

অনিলদা বললেন, কমেডিয়ান শ্যাম লাহাকে চেনেন ত? তিনি আসলে ছিলেন শ্যাম শীল। পরে লাহাবাড়ী তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার পর তিনি হয়েছিলেন শ্যাম লাহা। যাই হোক আমাদের অফিসে ভোলা শীল কাজ করতেন। তিনি আমায় খুবই স্নেহ করতেন আর আমার এভাবে গানবাজনা শোনার উদ্যমের ওপর ছিলো তাঁর অপরিসীম দরদের দৃষ্টি। শ্যামবাবু ছিলেন তাঁরই ছোটো ভাই। রায়বাবুর বাড়ীর সকল উৎসবেই শ্যামবাবুর নিমন্ত্রণ বাঁধা ছিলো। তাঁকেই ভোলাদা বলে দিয়েছিলেন 'তুমি যখন রায়বাবুদের বাড়ী যাবে অনিলকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।'

এই ভোলাদার অনুগ্রহেই রায়বাবুর বাড়ীর অনেক বড় বড় শিল্পীর গানবাজনা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

এই আসরেই শুনেছিলাম মুস্তারী বাঈএর গান। সে যে কি অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ বলে বোঝাতে পারব না। তখন অল্প বয়স। অত বেশী বিচারশক্তি গড়ে ওঠেনি। এইটুকুই স্মরণে আসে যেমন ছিলো তাঁর পাণ্ডিত্য তেমনই গায়কীর জেল্লা। অতি বড় মূর্খও সে গান শুনে বিস্ময়ে, মুগ্ধ হয়ে যেতো।

ঐখানেই অলকানন্দা (তখনকার তরুণী অলকানন্দা) থালার ওপর নাচ দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়ে-

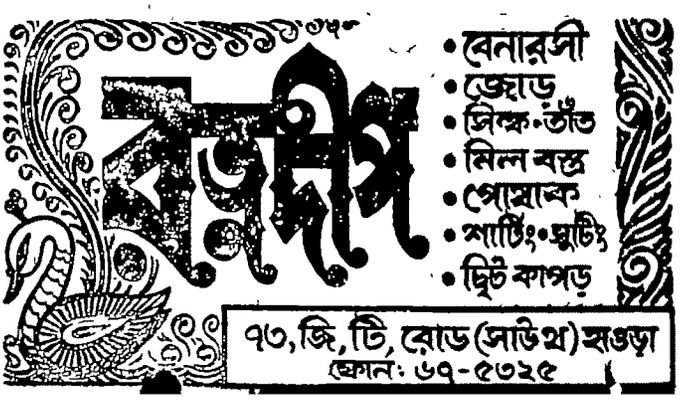

সুরেশ সঙ্গীত সংসদের সম্বর্ধনা সভায়

ছিলেন। এই আসরেই মজিদ খাঁ, গিরিজা-বাবু, কস্তুরী বাঈ, কেশরী বাঈ, থেরাকোয়া সাহেব এঁদের সব দেখবার ও শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সরোদী হাফেজ আলিকেও সবচেয়ে বেশী শুনেছি এই বাড়ীর আসরেই। ওঁর বাজনায় সুরের এমন একটা সম্মোহনী আবেশ সৃষ্টি করতো কি বলব?

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সরোদও শুনেছি এই যুগেই। কোথায়, সেটা ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে তাঁর লয় ও তালের দুর্ধর্ষ পাণ্ডিত্য যন্ত্রসঙ্গীতের জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

এ যাবৎ অনেক নায়ক-নায়িকা, প্রযোজক, পরিচালক, যাত্রা মালিক মামলা ঠুকে চুমকী তুলে দেবার ভয় দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছেন, কারণ আঁতে ঘা লাগলেও তাঁরা মনে-প্রাণে স্বীকার করেন

চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রা বিষয়ক
নির্ভীকপাক্ষিক

চুমকী

কখনও মিথ্যা খবর ছাপে না—
কখনও সত্য খবর চাপে না—

পূজা সংখ্যা পুস্তকাকারে বেরোচ্ছে মহালয়ার দিন। দাম মাত্র ২৲ টাকা।

সৎ সাংবাদিকতায় উৎসাহী তরুণ-তরুণীরা, সম্পাদকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করিতে পারেন।

চুমকী/১০৮বি, রায় বাহাদুর রোড,
কলিকাতা—৩৪

এই প্রসঙ্গেই বহু পরের একটি ঘটনা মনে পড়ে। ইন্দিরা সিনেমা হলে মঞ্চস্থ তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বাজাতে বসেছেন। ওঁর দুপাশে দুই দিকপাল তবলচি। উনি চান পালাক্রমে দুই তবলচি সঙ্গত করবে। কিন্তু তাঁরাও নামী লোক। নিজেদের কেরামতী দেখাবার সুযোগ ছাড়বেন কেন? ঘোরদৌড়ের মত দুজনে যেন পাল্লা দিয়ে ছুটেছেন কে কাকে একহাত নিতে পারে। ওঁদের কাণ্ড দেখে খাঁ সাহেব একটু মুচকী হেসে টুক করে দাদ্‌রা ছন্দের এমন এক গৎ ধরলেন যে দুজনেরই হাত যেন অনড় হয়ে গেলো। তাঁরা হাঁ করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। কেউ ধরতে পারছেন না কি তাল। উনি ছিলেন এই ধরনের মজার মানুষ। ছন্দ ও মাত্রার কারিকুরী বুদ্ধির বিস্ময়কর কৌশলে খাঁ সাহেবের জোড়া মেলা ভার। তবে তাঁর ছেলে ও জামায়ের বাজনায় তাঁর চিন্তার নকশা মেলে। তালের ছন্দের এই বৈচিত্র্য সঙ্গীতজগতে অবশ্যই এঁদের তুলনাবিহীন অবদান।

রায়বাবুর বাড়ীর এইসব জলসা ছাড়াও মুরারী সম্মেলন হত শিবনারায়ণ দাস লেনে দুরীবাবুর বাড়ীর ঠিক সামনে। তখনকার সঙ্গীতজগতে পাখোয়াজী মুরারী গুপ্ত ছিলো এক বিরাট নাম। তিনিই খ্যাতনামা পাখোয়াজী দুরীবাবুর গুরু। এ সম্মেলনে কলকাতার সকল ধ্রুপদীর সে জমকালো সমাবেশ আমার স্মৃতিলোকে একটা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কে আসেনি? গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বুটে গোপাল), জ্ঞান গোস্বামী, ললিত মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথবাবু (ইনি জেমসফিল্ডে কাজ করতেন), ধীরেন ভট্টাচার্য (কাজ করতেন টানার মরিশনে), যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান গোস্বামী ও ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জোড় দরবারী কানাড়ার আলাপ। আহা এতদিন বাদেও যেন কানে বাজছে। ওঁদের জোড়ে-গাওয়া দরবারী কানাড়ার আলাপ তখনকার সঙ্গীতজগতে এখনকার আলি আকবর-রবিশংকরের যুগল-বন্দীর মতই জনপ্রিয় ছিলো।

এঁরা ছাড়াও গাইতেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী এঁদের কথা আর কি বলব? কিন্তু এঁদের মত সু-কণ্ঠ রস-স্রষ্টা সবাই নিশ্চয় ছিলেন না। তবু তখনকার শ্রোতারা সবরকম গায়কের গানই মন দিয়ে শুনতেন, সকল শিল্পীকেই মান্য করতেন। যেমন ধরুন না এক খেয়ালিয়া ছিলেন রামকিষণ মিশ্র। ইনি শিবাপন্থ গাইয়ে-যুগলের মধ্যে শিবার ছেলে। তাঁর কণ্ঠ তেমন সুরেলা ছিলো না। তিনি ধীরস্থির বিস্তারেরও ধার ধারতেন না। কিন্তু লয়ের কাজ ছিলো দুর্দান্ত। তিল-বাড়া, পঞ্চম সোয়ারী, আড়া ঠেকা—সেসবও সবাই আনন্দিত চিত্তে নিয়েছেন। হীরুবাবুর ভাষায় পর্বতপ্রমাণ পাণ্ডিত্যের সংগতিয়া ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ বাজাতে পারতো না।

তখনকার শিল্পীদের প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধানম্র ভাব সৃষ্টি করার পিছনে কর্মকর্তাদের অবদানও বড় কম ছিলো না। একটু আগেই রায়বাবুর বাড়ীর আসরে সারাদিনরাতব্যাপী গানবাজনার কথা বলছিলাম না? সেখানেই একবার গান-বাজনার সান্ধ্য আসর রাত দুটো অবধি গড়াবার পর যখন হাফেজ আলি খাঁ সাহেব বাজাতে বসলেন রায়বাবু নিজে হাতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'বাজনা শেষ হবার আগে কেউ বেরোতে পারবে না।' এত রাতে শিল্পী যখন মেহেরবাণী করে বাজাচ্ছেন তাঁর মেজাজ নষ্ট করবার মত অধর্ম আর কিছু হতে পারে না।

তাই ত বলছিলাম তখনকার মানুষ আর্টিস্টদের ইজ্জৎ দিতে জানতেন। এখন? প্রোগ্রাম শেষ হতে-না হতেই আর্টিস্টদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে উদ্যোক্তারা সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে এগোন। ভাবখানা এই 'এবার তোমার পথ তুমি দেখ আমার পথ আমি দেখি।' অনেক সময় শিল্পীদের একটা ট্যাক্সীও ডেকে দেওয়া হয় না। তাঁদের সঙ্গে সারকেদ বা অন্য সাঙ্গপাঙ্গো না থাকলে রাত্রে বা বর্ষাকালে রীতিমত বিপন্নই হতে হয়।

ঐ যাঃ! দেখলেন? কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। ওটা আমাদের আগেকার দিনের আড্ডাবাজদের দোষ। কি বলছিলাম? হ্যাঁ, আর এক জলসা হত রাধানাথ মল্লিক লেনে। এ জলসার কর্ণধার ছিলেন পাখোয়াজী নগেন মুখোপাধ্যায়। নগেনবাবু আর গোপালবাবু (বিখ্যাত ধ্রুপদী) যখন একসঙ্গে পাখোয়াজ আর তানপুরা নিয়ে বসতেন সে এক দেখবার মত দৃশ্য হত। নগেনবাবুর মত তেহাইএর মজা আন[illegible] আর কোনো পাখোয়াজীকে দেখিনি। স[illegible] পৌঁছুবার আগে ওঁর সেই সংকেত দেখানো বেলের ফুলঝুরিতে গোপালবাবুও সাড়া দিয়ে উঠতেন আর পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছবার একটা থ্রিল যেন দুজনে অনুভব করতেন। সেই শিহরণের ঢেউ লাগতো দর্শকদের

চিত্তেও। সে আনন্দ এখনকার শ্রোতারা কল্পনাও করতে পারবেন না। সমের শেষ মাত্রায় পৌঁছলেই সারা আসরের লোক একসঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে 'হাঃ' করে উঠতেন আর সমের এই শেষ মাত্রাতেই শিল্পীযুগল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতেন।

হাওড়াতে প্রতি বছরই রসতো নিকুঞ্জ দত্তর জলসা, যার জনপ্রিয় নাম ছিলো নিকুন দত্তর জলসা। সেখানের একটা বাঁধা অনুষ্ঠান ছিলো পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র, তাঁর মেজভাই ডোমা মিশ্র ও ছোটোভাই বিষ্ণুসেবক মিশ্রর ত্রয়ী খেয়াল। গানে কোনো মাধুর্য ছিলো না। শুধু লয়ের কাজ। মুহূর্তে মুহূর্তে ছন্দ পরিবর্তনের চমক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে গান শ্রোতারা শুনতেন? তখন ত এত কনফারেন্স টনফারেন্স হত না? শ্রোতারাও এমন সবজান্তাপানা ভাব ছিলো না। বললাম না তখনকার মানুষ আর্টিস্টদের ইজ্জৎ দিতে জানতো? সকলের সব অনুষ্ঠানই মন দিয়ে শুনতো আর সব কিছু থেকেই রসগ্রহণের চেষ্টা করতো। ওঁদের তিনজনের লয় পাণ্ডিত্যে তারা মজাই পেতেন।

বৌবাজারের দীনবন্ধু সম্মেলনেও ধ্রুপদেরই প্রাধান্য ছিলো। ঐ বৌবাজারেই নির্মলচন্দ্র চন্দ্রর বাড়ী ললিতবাবুর বাবা মহিম মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি সম্মেলনে হেন ধ্রুপদী নেই যিনি অংশগ্রহণ করেননি। তখনকার শ্রোতারাও ছিলেন ধ্রুপদের ভক্ত। কারণ হরদম বড় বড় ধ্রুপদীদের গান শুনে শুনে তাঁদের কান তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

আর এক স্মরণীয় জলসা করতেন হীরুবাবু,—তাঁর বাবা মন্মথ গাঙ্গুলীর স্মৃতিসভা উপলক্ষ্যে। স্মরণীয় বলছি এই কারণে হীরুবাবুর প্রচণ্ড দরদ ছিলো কলকাতার সঙ্গীতরসিক মধ্যবিত্ত অবস্থার শ্রোতাদের জন্য। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে আসর বসতো। হীরুবাবু প্রচার কার্ড বিলি করতেন। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন উনি তাঁদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সমাদর করে বসাতেন। উনি চাইতেন শ্রোতারা তৈরী হোক, তাদের মধ্যে রসবোধ উদ্বেল হয়ে উঠুক। হয়েও ছিলো তাই। তখনকার শ্রোতারা কি আন্দাজ গানপাগলা ছিলো জানেন? মাথা নাড়লাম। না তেমন একটা জানি না। অনিলদা বললেন, বহু রাতে যথানির্দিষ্ট আসর ভাঙ্গলো। সবাই উঠে যাচ্ছেন। হঠাৎ খবর এলো কে ভীষ্ম-বাবুকে ধরে আনছে। অমনই সবাই আবার বসে পড়লেন, যারা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ফিরে এসে আবার বসলেন। বাড়ী ফিরবেন কখন অথবা কেমন করে, সে হুঁশ কারো ছিলো না। গানও হয়েছিলো সেইরকম। সারারাত ধরে ভীষ্ম-বাবুর গানের রেশ ধরে শ্রোতারা সেদিন যে কোথায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সে খবর তাঁদের নিজেরই জানা ছিলো না। ভাবের সে নিবিড়তায় যেন সঙ্গীতের গহন, গভীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শোনা গিয়েছিল। এরকম মুহূর্ত শ্রোতাদের জীবনে বারবার আসে না। সেইজন্যই সে রাত যেন আরব্য উপন্যাসের রঙিন স্বপ্নরাত হয়ে আজও আমার স্মৃতিলোকে জ্বলজ্বল করছে। এখানেই শুনেছিলাম খলিফা আরেদ হোসেনের তবলার সঙ্গে এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাজনা।

তবু বলব এ সব কিছু পরের যুগের ঘটনা, গানবাজনা যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তারও আগের যুগ এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষ্মবাবু আজ আচার্যতুল্য—আমি কিন্তু ঐ ভীষ্মদেব চাটুজ্যেকে দেখেছি প্রথম যখন তিনি কম্পিটিটর হিসেবে ওরিয়েন্টাল মিউজিক কমপিটিশান-এর সেভেন্থ অ্যানুয়াল সিটিঙ-এ যোগ দেন ১৯৩০-৩১ এর সেসনে। ১৫ মিনিটের খেয়াল। গলা দারুণ তৈরী। ঝড়ের মত তান করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। খেয়াল ঠুংরী, টপ্পা সব কিছুতেই অদ্বিতীয় হয়ে বেস্ট ম্যানস প্রাইজ পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তখন ত এমন স্যুভেনীরের ঘটা ছিলো না? হ্যান্ডবিল প্রথা ছিলো।

পকেট থেকে অবেল্ল কালারের একটা কাগজ বার করে দেখালেন। ১৯৩০ সালের এক টুকরো রঙিন কাগজ। তার ওপর দিয়ে এতগুলি বছর অতিক্রমের চাপে রং কিছু বিবর্ণ। কিন্তু বহু যত্নে রাখার দরুণ আজও নি-ভাঁজ। সেই হ্যান্ডবিলেই দেখা গেল, ঠুংরীতে প্রথম হয়েছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রযুল্ল সেনগুপ্ত এবং ঐ একই কম্পিটিশনে সেতারে ফার্স্ট হয়েছিলেন বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, মডার্ন বেঙ্গলী সঙের পর্যায়ে বাউলে ফার্স্ট হয়েছিলেন অনুপম ঘটক।

শুধু কি তাই? এ-যুগের দিকপাল তবলিয়াদের অন্যতম ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান—যিনি আজ প্রৌঢ়ত্বেরও শেষ প্রান্তে পৌঁচেছেন তাঁরই কৈশোরে অনিলদা তাঁকে লালচাঁদ বড়াল উৎসবে মাস্টার কেরামৎরূপে বাজাতে দেখেছেন। সে হ্যান্ডবিলও দেখালেন।

আর একটা একান্তভাবেই ঘরোয়া গানবাজনা হত মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে বিষ্ণু সেনগুপ্তের বাড়ী (ইনি কাস্টমস হাউসের এ্যাপ্রেজার ছিলেন)। প্রতি রবিবার তাঁর বাড়ী সাতকড়ি মালাকার, জ্ঞান গোস্বামী গাইতে আসতেন। জ্ঞান গোস্বামী তখনও জ্ঞান গোসাই হয়ে ওঠেননি। তিনি ছিলেন শিল্পীপরিচিতি যাকে বলে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। প্রত্যেক রবিবার সকাল ৯টায় ও বাড়ীর জানলার সামনে দাঁড়াতাম আর বেলা ১২টা অবধি গান শুনতাম। রোদ, ক্ষিদে, দাঁড়াবার কষ্ট—এসব বোধকে বাড়ীতে ফেলে রেখে আসতাম। বাড়ীতে ফিরলে সবাই যখন বলত 'মুখখানা যে আগুনপারা হয়ে উঠেছে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?' তখন খেয়াল হত এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়েছিলাম।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
এ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীর একত্র সংকলন

কিরীটী অমনিবাস

দশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।
১ম খণ্ড-২০৲ ২য় খণ্ড-২০৲
৩য় খণ্ড-২০৲ ৪র্থ খণ্ড-২০৲
৫ম খণ্ড-১৫৲ ৬ষ্ঠ খণ্ড-১৫৲
৭ম খণ্ড-১৫৲ ৮ম খণ্ড-১৫৲
৯ম খণ্ড-১৫৲ এবং দশম খণ্ড-১৫৲ একাদশ খণ্ড যন্ত্রস্থ

।। নতুন বই ।।
আশাপূর্ণা দেবীর
চার দেওয়ালের বাইরে ৮৲
বিমল মিত্র অনূদিত
ও হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প ১৪৲
সমরেশ বসুর
কীর্তিনাশিনী ৭৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
উর্বশী সন্ধ্যা ৯৲
সুমথনাথ ঘোষের
ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
তিনে একে চার ২০৲

।। প্রকাশিত হয়েছে ।।
শঙ্কু মহারাজের
মানালীর মালঞ্চে ১২৲
মনোমোহন মানালী, নাগর কুলু, মণিকরণ ও যোগীন্দর নগরের ওপর রচিত উপন্যাস-রসসিক্ত অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনী।

অমর সাহিত্য প্রকাশন,
৭, টেমার লেন কলিকাতা-৯

সরকার লেনে অটলবাবুর (অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট অটল সেন) বাড়িতে শুনেছিলাম পন্ডিত ঝুলে, ছোটে খাঁ ও ঢেঁকুনের গান। এই প্রসঙ্গেই বলি লালাবাবু যখন বাজবল্লভ পাড়ায় ভূপেন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল করে-ছিলেন (স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের স্মৃতির প্রতি সম্মাননার্থে) সেখানে ঢেঁকুনেকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে সংগীত শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

এনায়েৎ খাঁ সাহেবের বাজনা প্রথম শুনি কোথায়? হরি ঘোষ স্ট্রীটে বতীন পালের বাড়ি (চলতি নাম খাঁল্লা পাল)। তাঁর ভাইপোর বিয়েতে এবোপ্লেনে তত্ত্ব গিয়েছিলো বলে সারা কলকাতায় হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিলো।

সিমলা স্ট্রীটে নেপাল কবরেজের বাড়ি ছন্দু মিশ্র (যাঁর কার্তিকের মত চেহারার খ্যাতি ছিলো) অনুষ্ঠান শুনেছিলাম। শুনেছিলাম বেনারস ঘরাণার ভুঁরি মিশ্রর তবলা। তাঁরই ছেলে দাসু ও দুর্গা মিশ্র।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠেই একবার আমির খাঁর তবলা সংগতে অশোক আলির গান শুনেছিলাম। তান বিস্তারের ভেতরই ঘোরানো-ফেরানো স্বর সংগমের সে অভিনব নকসা না শুনলে ধারণা করা যায় না।

ঐ আসরেই চোখে পড়েছিলো কৃষ্ণচন্দ্র দে ও ওস্তাদ জমীর খাঁর সেঁহার্দ। কেষ্টবাবু জমীরকে ঠেলা মেরে বলছেন 'তুমি গাও'—আর জমীর খাঁ সাহেব বলছেন 'না তুমি'—কিন্তু কেষ্ট-বাবুর জিদে জমীর খাঁ সাহেবকেই আগে গাইতে হল 'মুরলীওয়ালে শ্যাম'। সে ধরণের মধুঢালা ঠুংরি জীবনে খুব কমই শুনেছি।

তখন কার্ড সিস্টেম ছিলো না। এসব আসরে সবারই ছিলো অবারিত দ্বার। মনের

সন্ধ্যা মুখার্জির গানের আসরে

আনন্দে গান শুনে বেড়াতাম। কোনো প্রবেশমই ছিলো না। প্রবেশমই বলুন আর মজাই বলুন সেটা দেখা দিলো কার্ড সিস্টেম চালু হবার পর। তখনই ভেতরে ঢোকবার জন্য নানান মতলব বার করতে হত। একবার গভর্নমেন্ট হাউসে একটা ফাংশন হচ্ছে। আধুনিক, ক্লাসিক্যাল সব-রকম গানের সমাবেশ। স্টেটের বাইরে দু-চারবার পায়চারী করে 'দুর্গা' নামে কপাল ঠুকে ভেতরে যেই না ঢুকতে গেছি অমনই তেড়ে এলো এক সার্জেন্ট 'হোয়ার ইজ ইওর কার্ড?' আমি বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললাম 'নো কার্ড।'—আমি তখন চোখকান বুজে বলে ফেললাম 'মাই পিপল আর দেয়ার'। আর একজন সার্জেন্টও এগিয়ে এসে সঙ্গীকে প্রশ্ন করল 'এনিথিং রং?'

'বাবু হ্যাজ গট নো কার্ড বাট স্টীল ইনসিস্টস অন গোয়িং ইনসাইড।'

আমি আবার বললাম, 'মাই পিপল আর দেয়ার?'

ওরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তারপর বলে 'লেট আস চেক' বলেই আমার দু পাশে দুজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে অ্যারেস্ট করার মত করে আমায় ভেতরে নিয়ে চলল।'

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বীরদর্পে চলছি। বরাত ভালই। কিছুদূরে এগোনোর পরই হঠাৎ আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিনি সম্ভ্রান্ত মানুষ এবং সপরিবারে গিয়েছিলেন। দেখা হতেই মহা-উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন 'কি অনিলবাবু? এত লেট যে?'

'ইট্ নো হিম?'—সার্জেন্টরা জিজ্ঞেস করে।

'ইয়েস! ইয়েস! হি ইজ এ গেস্ট শ্রোতা।'

ব্যস! অমনই তারা আমায় ছেড়ে গটগট করে চলে গেল।

আর একটা মজার গল্প বলে নিচ্ছি এই প্রসঙ্গে। তখন অবশ্য কনফারেন্স সুরু হয়েছে। রাণাঘাটের এক কনফারেন্সে যাচ্ছিলাম একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন সেরে। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম লাস্ট ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। একলাফে ট্রেনে উঠে পড়লাম। টিকেট কাটা হল না। রাণাঘাট স্টেশনে নেমে মুস্কিলে পড়লাম। কি করা যায়? অমনই বুদ্ধিটা খুলে গেলো। আমায় কেউ কোনো প্রশ্ন করার আগেই তেড়েমেড়ে কোঁচা হাতে চেকারদের কাছে গিয়ে ব্যস্ত সমস্তভাবে বললাম, 'দেখুন দাদা, আমি টিকিট কেটে আসতে পারিনি। মাঠ থেকে ঐ যে লাউড স্পীকারের শব্দ শুনছেন আমি ঐখানে যাব। আমার করণীয় কি আছে বলুন।'

ওরা দুজন সেই সার্জেনের মত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো—আমায় ঐ কন-ফারেন্সের কোনো আর্টিস্ট-টার্টিস্ট ভেবে বসলো বোধহয়। তারপর বলল 'আচ্ছা একটা টাকা দিন'—।

মাত্র ১৲ টাকা দক্ষিণায় সেই কন-ফারেন্সের চলে গেলাম।

হার্মোনিয়ম যন্ত্রের বিখ্যাত কোম্পানী আর বি দাসের নাম ত জানেন? লাল-বাজারে তিনিই একবার একটা বিরাট জলসার আয়োজন করেছিলেন। সেখানেই অন্যসব ধ্রুপদীদের সঙ্গে রাধিকা গোস্বামীর ধ্রুপদ শুনি। এমন মধুর কণ্ঠ ও ভাবের ধ্রুপদ আর কখনও শুনিনি।

(চলবে)

সাহিত্য সুধা

বাংলাসাহিত্যে যে ধরণের পত্রিকার সব-চেয়ে বেশী প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

শারদ সংখ্যা

ওরা অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে।

যাঁরা লিখছেন: সমরেশ বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কুমারসন্ধ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নির্মলেন্দু গৌতম, কমল লাহিড়ী এবং ক্যাসিয়াস কেন্ড্র ও পেলে সম্পর্কে চিরঞ্জীব ও জয়ন্ত দত্ত। সেই সঙ্গে একাডেমী পুরস্কারবিজয়ী মৈত্রেয়ী দেবী এবং একজন রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত বহু বিতর্কিত সাহিত্যিক একমাত্র সাহিত্যসুধাতেই লিখছেন। নতুন ক'রে রিভিউ হচ্ছে 'নাট্যরাব'।

মূল্য ৩.০০ / সডাক ৪.৫০ / এজেন্টরা যোগাযোগ করুন। বার্ষিক গ্রাহক হ'লে বিনামূল্যে শারদীয়া / নিয়মাবলীর জন্য লিখুন:

সম্পাদক: সাহিত্যসুধা, ৩৩/৩ই চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা ॥ ২৭

বি/৮০৭৭

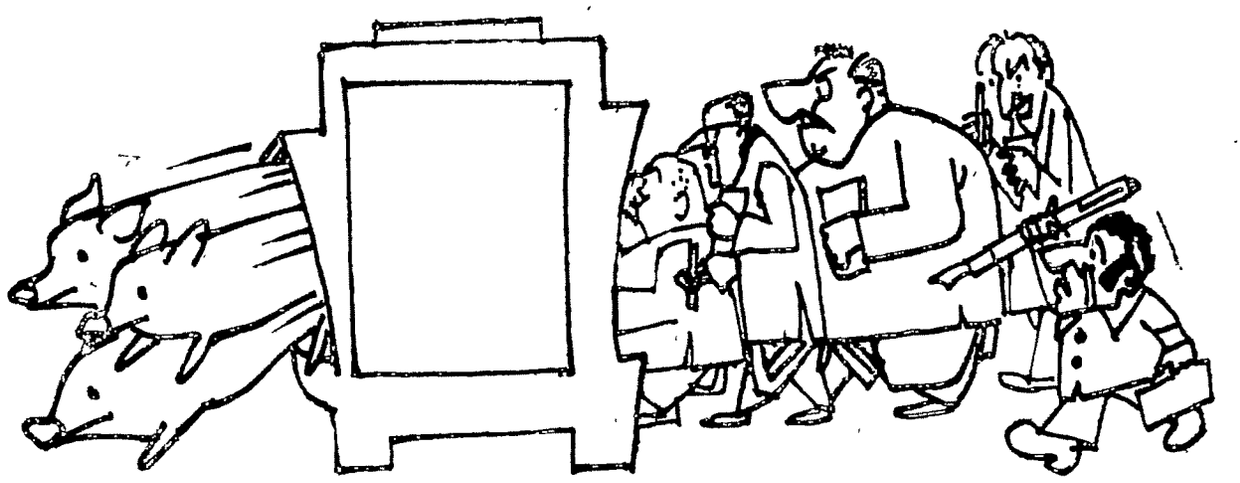

মানুষ তৈরির কল

শৈবাল মিত্র

ছেলেবেলায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজটা আমার খুব প্রিয় ছিল। বাড়ীতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ছিল। তারা আমার দাদা। স্কুলে সেভেন এইটের ছাত্র। তাদের কান্ডকারখানা দেখে অবাক হতুম। একটুকরো কাচে সূর্যের আলো ধরে কাগজে আগুন লাগাতো তারা। কাচের জার উপুড় করে জ্বলন্ত মোমবাতি ঢেকে দিত। ভেতরে একটা নেংটি ইঁদুর। বাতিটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিভে যেতে। নেংটি ইঁদুরটা ছটফট করতো। দম বন্ধ হয়ে মরতো।

আমি তখনও স্কুল দেখিনি। কিন্তু স্কুলে শেখা বিদ্যের নেশা লাগলো। আমার ছোটোকাকা ছিল রসিক লোক। এম এস সি পাশ। ভালো চাকরী করে। সদ্য বিয়ে হয়েছে। টইটম্বুর রস, উপচে পড়ছে। মরা ইঁদুর দেখে সে বললো— ছুঁচোকে ফোলালে শুয়োর হয়। জানিস কি?

স্কুলে পড়া দাদারা হাসলো। কিন্তু কথাটা আমার মাথায় গেঁথে গেল। ছুঁচো আর শুয়োর, দুটোই আমার দেখা। অনেক মিল আছে। চোখ, মুখের আদলটাও প্রায় এক। দুজনেই মাটিতে মুখ গুঁজে চলে। বাদা, পাঁক, অন্ধকার ভালোবাসে।

আমি ছুঁচো ধরার কাজে নামলুম। নিজের হাতে শুয়োর বানিয়ে বাড়ীতে তাক লাগিয়ে দেবো। আবিষ্কারের নেশা আমাকে পেয়েছে। বুঁদ হয়ে আছি।

কিন্তু ছুঁচো আর পাওয়া যায় না। রাতে বেরোয়। ভয়ানক চালাক। চারটে খুরে পায়ে ঝড়ের গতি। এক সন্ধ্যেতে প্রায় ধরে ফেলেছিলুম। কিন্তু গায়ের বদ গন্ধে ছুঁতে পারলুম না। একটা ছুঁচো তেড়ে এলো কামড়াতে। হতাশ হচ্ছিলুম। মনিকে একদিন চুপিচুপি বললুম সব।

মনিময় কাজ করতো আমাদের বাড়ীতে। আমার দাদাদের চেয়ে একটু বড়ো। প্রায় রাতে যাত্রা দেখতে যেতো। দিনের বেলা দুটো চোখ লাল। ঢুলতে ঢুলতে কাজ করতো। মেজাজ ভালো থাকলে গুনগুন করতো। যাত্রাগানের কলি- ওহে কালো-সোনা, নারীর বসন নিতে লাজ লাগে না। মনি নিজেও দু' একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছিল। আমি জানতুম। তাই ওর বিদ্যেবুদ্ধিতে ভরসা ছিল। মনি তাড়ি খেত। বাজারে তাড়ি না পেলে বাড়ীতে তৈরি করতো। এক ঘটি টক দৈ-এর ঘোলে কুড়ি ফোঁটা কেরোসিন মিশিয়ে কয়েক ঘন্টা রাখলেই, সেটা তাড়ি হয়ে যায়। মনি বানাতো। বাড়ীর কেউ জানতো না। মনি আমাকে ভালোবেসে বলেছিল। ভাঁড়ার থেকে দৈটা আমাকে চুরি করতে হতো।

সব শুনে মনি বললো ছুঁচো ধরা মুশকিল। ব্যাটারা মহা ধড়িবাজ। মুখে বিষ থাকে। কামড়ালে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। আমার মুখ শুকিয়ে যায়। এরকম একটা বৃগান্তকারী প্রচেষ্টা মার খাওয়ায় আমি প্রায় ভেঙে পড়ি। মনি আমাকে দেখে। বলে,যাও একটু দৈ গেঁড়িয়ে আনো। আমি ততোক্ষণ ভাবি।

আমি দৈ আনতে যাই। আধঘন্টা বাদে ঘোলের ঘটিতে মনি গুনে গুনে কেরোসিনের ফোঁটা ফেলে। ওর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, নতুন কিছু একটা ভেবেছে।

ঠিক তাই। মনি বললো- ছুঁচোর বদলে নেংটি ইঁদুর বা ধেড়ে ইঁদুর দিয়ে কাজ চালাও।

'তা হয় নাকি- আমি বেগে যাই।

'কেন হবে না- মনির জবাব তৈরি- ইঁদুর আর ছুঁচো মাসতুতো ভাই। যেমন তুমি আর তপু। নেমন্তন্ন বাড়ীতে তোমার আর তপুর এক কদর। তোমার বদলে তপু যেতে পারে। তপুর বদলে তুমি।

যুক্তিটা মোক্ষম। আমি মেনে নিলুম।

মনি কয়েকটা নেংটি ইঁদুর ধরলো। বাড়ীতে ফুটবলে হাওয়া দেওয়ার একটা পাম্প ছিল। দাদারা বল নিয়ে চলে গেলে সেটা হাতে চুপিসারে ছাতে যেতুম। পাম্পটার সরু মুখে নেংটি ইঁদুরের ল্যাজ ঢুকিয়ে হাওয়া ঢোকানো মুশকিল। ইঁদুরটা ছটফট করে। আঁচড়ায়, কামড়াতে আসে। ল্যাজ ছিঁড়ে বকতারকতি। শেষ পর্যন্ত বেচারী মরে যায়। দু-তিনটে ইঁদুর মরে গেলে, আমি হাল ছেড়ে দিই। বাড়ীতেও ঝামেলা শুরু হয়েছিল। ছাতে দালানে মরা ইঁদুর পড়ে থাকে। ছোটো কাকা বললো, রোগ হবে। নতুন কাকী ভয় পেয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার বায়না ধরলো।

প্রথম উদ্যোগটা এভাবে ভেস্তে গেল। আমি কিন্তু দমলুম না। ভাবলুম, ইঁদুর ছুঁচোর ল্যাজের ডগায় একটা ফুটো থাকলে ভালো হতো। হাওয়া ঢোকানোর একটা রাস্তা দরকার তো। ছুঁচো থেকে শুয়োর বানাতে না পেরে অন্য একটা মতলব মাথায় এলো। আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানালে কেমন হয়। দু-একটা আঙুলের দরকার। বাড়িতে জনাকয়েক শিশু ছিল। তারা আমার ভাইবোন। দুপুরে ফাঁকা ঘরে তারা ঘুমোতো। দাদারা স্কুলে। মা-কাকী-পিসিরা পাশের ঘরে তাস আর আড্ডায় মশগুল। ঘুমন্ত বাচ্চাগুলোর আঙুলের দিকে তাকিয়ে আমি উসখুস করতুম। হাতের বুড়ো আঙুলটা আমার পছন্দ। টুকাই ছোট বোন। আমার বড়ো আদরের। ওর আঙুলটা কাটা ঠিক হবে না। কিন্তু

আমার ন্যাঠতুতো ভাই। আমাকে খুব ভালোবাসে। ওকেও রেহাই দিতে হয়। মন ঠিক করতে পারি না। আবার মনির কাছে ধর্ণা দিই।

ফাঁকা ছাত। চিলে কোঠার ছায়ায়, দেয়ালে ঠেস দিয়ে মনি ঝিমোচ্ছে। সামনে খালি ঘটি। আমার কথা শুনে ও চোখ পাকায়। বলে—ওসব আঙুল, ফাঙুল কাটায় আমি নেই।

আমি হাল ছাড়ি না। বসে থাকি। মনির চোখ বোজা। আমাকে কাছে ডাকে। ফিসফিস করে—তুমি মানুষ বানাও।

'কি করে?'

'একটা বেটাছেলের ডিমের সঙ্গে একটা মেয়েছেলের ডিম জুড়ে দাও—আধবোজা চোখে সে জানায়।'

আমার সেই বয়েসে এর চেয়ে চমক দেওয়া কথা আর শুনিনি। এতোকাল জানতুম, ভগবান এক রাতে টুপ করে আমাকে বিছানায় রেখে গেছেন। ষষ্ঠী ঠাকরুণ অর্থাৎ বাড়ির সাদা বেড়ালটার পিঠে চেপে টুকাই একদিন মার পেটে ঢুকে পড়েছিল। তারপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই সব গল্প ফুটিফাটা হয়ে গেল। মনি খোঁচায় হাঁ করে দেখছ কি? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আমি অবাক হয়েছিলুম।

মুখ বুজে আমি ঘাড় দোলাই বিশ্বাস হচ্ছে।'

মনি আরো বিশদ হয়—ছাগল ধরানো দেখেছো?

'হাঁ।"

'তবে?'

গতকালই বাড়ির একটা ছাগলকে বাজারে ধরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের গ্রাম থেকে বাজার মাইলখানেকের রাস্তা। সামনে ছাগল নিয়ে মনি। পেছনে আমরা একদল দুধের শিশু। বাজারে গোষ্ঠ পালের একটা বোকা পাঁঠা আছে। পেল্লাই চেহারা। মুখে লম্বা দাড়ি।

গায়ের বোঁটকা গন্ধে ভূত পালায়। আশপাশের গ্রাম থেকে সকলে আসে ছাগল নিয়ে ছাগল পিছু চার আনা খরচ। দু-তিনবার আমি সেই কাণ্ড দেখেছি। কিছু বুঝিনি। একটা খেলা যেন।

মনি বললো—ছাগল ধরানো হলো মেয়ে ছাগলের ডিমের সঙ্গে পুরুষ ছাগলের ডিম জুড়ে দেওয়া। মেয়ে ছাগলের পেটে সেই ডিম বড়ো হয়। তারপর চারপেয়ে মানোষায় হয়ে বেরিয়ে আসে।

মনি কতো জানে। ওর জ্ঞানের বহর দেখে আতংকিত হই।

'কিন্তু মানুষের ডিম কোথায় পাবো—জিজ্ঞেস করি।'

'তার জন্যে ভাবনা নেই—মনি অভয় দেয়—তুমি মেয়েছেলের ডিমটা জোগাড় করো। বেটাছেলের ডিমটা আমি দেবো।'

ও আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু গলায় বলে—নতুন কাকিকে বলো। মেয়ে মানুষের ডিম পেয়ে যাবে।'

ওর কথা বলার ভঙ্গীতে ভয় লাগে। বুঝি, ব্যাপারটা সোজা নয়।

কিন্তু হাল ছাড়ি না। একটা জ্যান্ত মানুষ তৈরি করার মতলব ভাঁজি। সকলের মাথা ঘুরিয়ে দেবো।

দিন কয়েক নতুন কাকির খুব ন্যাওটা হয়ে যাই। সারাদিন আশেপাশে ঘুরঘুর করি। সকলের বলে—কাকি ভক্ত হয়েছে।

জিভের ডগায় কথাটা নিয়ে ছটফট করি। বলতে পারি না। শিশু মনেরও একটা বিচারবুদ্ধি আছে। মনির বলার ভঙ্গীতেই বুঝেছিলুম, কথাটা খুব গোপনীয়, নিষিদ্ধ।

ছোটকাকা আমার ওপর চটে। বিরক্ত হয়। নতুন বিয়ে হয়েছে। কাকির শরীরের মিষ্টি গন্ধে ওদের শোবার ঘরটা ম'ম করে। আমার জন্যে ছোটকাকার অনেক আদর মাঠে মারা যায়। একদিন বলে ফেলল—কাকির সঙ্গে তুই এরকম জিনে জোঁকের মতো আটকে আছিস কেন?' কাকি হাসলো। লজ্জা পাওয়ার বোধ হয়েছিল। কান মুখ লাল হয়ে গেল। রেগে গেলুম খুব। ছোট কাকাকে ঘায়েল করার ফন্দী আঁটলুম।

এক দুপুরে চারপাশ যখন চুপচাপ, কেউ দেখছে না, আমি ছোটকাকার ঘরে ঢুকি। টেবিলের ওপর থেকে বিয়েতে পাওয়া নতুন ওমেগা ঘড়িটা তুলে নিই। একতলায় নামি। ভাঁড়ার ঘরের দরজা ভেজানো। দরজা খুলি। একটা বিশাল জাম-বাটিতে প্রায় সের দুয়েক দুধ ঢাকা থাকে। বাটির ঢাকা খুলে ঘড়িটা দুধে ফেলে দিই। বাটিটা আঢাকা পড়ে থাকে। ভাঁড়ার ঘরের দরজা হাট। আমি জানি, বাড়ির একটা হুলো আর গোটা দুয়েক মেনি বেড়াল এখুনি হাজির হবে। ঘড়ি শুদ্ধ দুধ তারা সাবাড় করবে। আমিও তাই চাই। ছোটকাকার সখের ঘড়ি বেড়ালের পেটে যাক।

ওপরে ফিরে ভাইবোনদের মাঝখানে শুয়ে পড়ি। একটু বাদেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হবে। জেগে থাকলে জড়িয়ে পড়ার ভয়। চোখ বুজে থাকি।

হৈ হট্টগোলে ঘুম ভাঙে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিছু পরেই পরিষ্কার হয় ব্যাপারটা। ছোটকাকার ঘড়ি নিখোঁজ।

মনিকে ছোটকাকা বেদম পেটাচ্ছে। সে 'বাবাগো মাগো' চীৎকারে আকাশ ফাটাচ্ছে। ঝি চমোকে জেরা করছে আমার মা। হঠাৎ নীচ থেকে ছোট পিসি ককিয়ে ওঠে দুধের ঢাকা খুললো কে? হতচ্ছাড়া বেড়ালে সব দুধ খেয়ে গেছে।

পর পর দুর্ঘটনা। গোটা বাড়ি কাঁপছে। পিসিই আবার হাঁক পাড়ে—এই তো ছোড়দার ঘড়ি। দুধের বাটিতে।

চোর খোঁজা বন্ধ রেখে সকলে ভাঁড়ারের দিকে ছোটে। আমি হতাশ হই। বেড়ালগুলো একেবারে বাচ্চেতাই। একটা ঘড়ি পর্যন্ত খেতে পারে না।

মনি বেঁচে যায়। বেচারা বেশ ঘা কতক খেয়েছে। আমার সঙ্গে একবার চোখা-চোখি হয়। মনির চোখে আগুন ঠিকরোয়।

ঘটনাটা নিয়ে জোর গবেষণা হয়। দুধের বাটিতে ঘড়ি পাওয়ার ধাঁধাটা কেউ ধরতে পারে না। সেজঠাকুমা বলে অপ-দেবতার হাত। ছোট কাকির বিয়ের বেনারসী দিয়ে ছোটকাকা মাঝ রাত পর্যন্ত ঘড়িটা মোছে।

এসব প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ছোটকাকির শরীরের মিষ্টি গন্ধ বহুকাল মরে গেছে। ছোটকাকা এখন গাল ভুবড়োনো, খিটখিটে বুড়ো। অগস্ত্যযাত্রা পালা দেখতে গিয়ে মনি আর ফেরেনি। বাবা, মা দেওয়ালে এখন শুধু ছবি। আমি শহর কোলকাতায় থাকি। আমার বাড়ির সামনে আদি গঙ্গার খাল। ময়লা কালো জল। হাওয়া ছাড়লে দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। একপাল শুয়োর খালের পাঁকে দাপাদাপি করে। কাদায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে আরামে তাদের চোখ বুজে আসে। মাঝে মাঝে মধ্য রাতে আদি গঙ্গার সেই পচা জলস্রোত আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় উঠে আসে। অলি-গলি ভেসে যায়। নরকের হাওয়া বয়। ক্ষুদা পাঁকে লক্ষ লক্ষ শুয়োর তাণ্ডব নাচে। কদর্য গন্ধে গা ঘোলায়। শুয়োরগুলোর বুড়ো আঙুল নেই। সে জায়গায় কলাগাছের ঝাড়। বহুত কলা ফলেছে। মর্তমান কাঁটালি, সিঙ্গাপুরি, চাঁপা। আমি দেখি। ছেলেবেলার ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর কথা মনে পড়ে। ভাবি নতুন করে আর একবার শুরু করলে কেমন হয়। শুয়োর থেকে মানুষ বানানোর কোনো কল? কিন্তু ভয় হয়। আরো খারাপ কোনো জন্তু যদি জন্ম নেয়। যদি একদল ভাড়াটে লেখক, সাংবাদিক বা সম্পাদক তৈরি হয়, তাহলে কি হবে। কলমবাজ ঠ্যাঙাড়ের সংখ্যা আমি আর বাড়াতে চাই না।

নিহতের নাম

গৌতম রায়

স্বপ্নটা ইদানীং আমি প্রায়ই দেখছি। একই স্বপ্ন মানুষ দুবার দেখে কিনা জানি না। কিন্তু কদিন হল স্বপ্নটা আমাকে ঘিরে থাকছে সর্বক্ষণ, শুরুটা ভাবি অদ্ভুত। নিদ্রিত চেতনার গভীর অন্ধকারে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে উঁচু মাথাওয়ালা বিরাট অথচ প্রায় জীর্ণ স্তম্ভসারি। বেশ বোঝা যায় এ যেন এক বিধ্বস্ত-প্রাচীন অট্টালিকার শেষ পরিণতি। হতবাক বিমূঢ়তার মধ্যে কখন যেন জেগে ওঠে একটি লৌহ ফটক। অনেকটা সেই রাজা-মহারাজার আমলের মত। ফটকের সামনে দাঁড়াতেই ফটকটা খুলে যায়। চোখে-মুখে অসংখ্য জিজ্ঞাসা নিয়ে ভেতরে চলে আসি। এখন আর সেই উঁচু মাথাওয়ালা ভাঙাচুরো স্তম্ভগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং সেখানে দৃশ্যমান কক্ষসারি। কক্ষের পর কক্ষ। দরজা ঠেলে প্রতি কক্ষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার মনে হয়, প্রতিবারেই, আমি কেন কাউকে খুঁজছি। কিন্তু যাকে খুঁজে পেতে চাইছি তাকে আর কোথাও পাচ্ছি না। প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার তন্ন তন্ন অন্বেষণ শেষে সেই গভীর বক্তাক্ত দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ে। কবর-বিষণ্ণ অন্ধকারে কে একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার আশে-পাশে সমস্ত জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তার

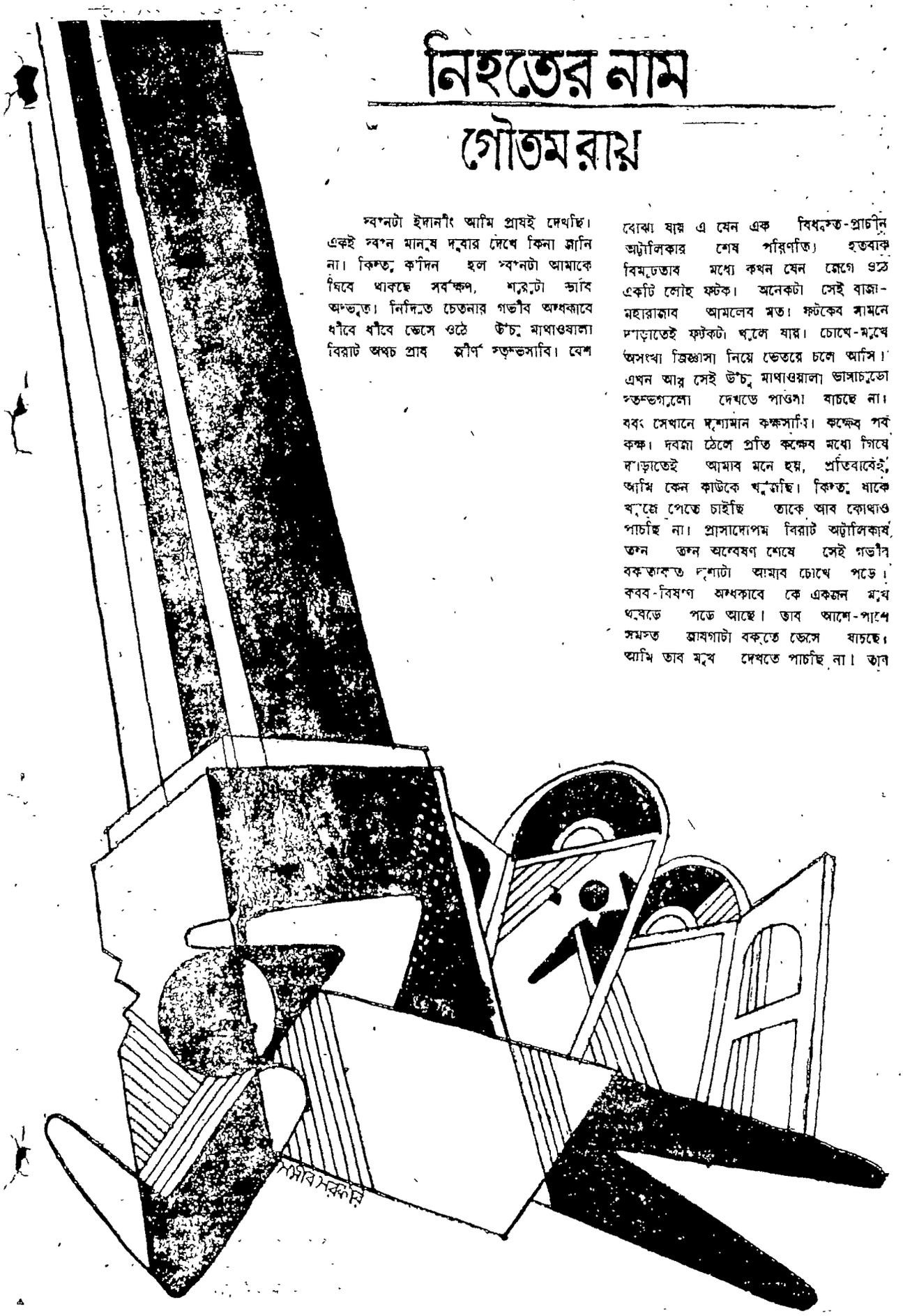

শরীরটা এমনি বিকৃত যে তাকে সনাক্ত-পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। তবু তাকে বড় পরিচিত মনে হয়, যেন তাকে কোথাও দেখেছি। হঠাৎ সেই ভ্রমর-কালো অন্ধকারে কড়ায় চাপানো গরম দুধের মত চাপ চাপ উষ্ণ রক্তের ঢেউ যেন উথলে পড়তে চাইল। বন্যার মত তীব্র বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। আমি নিমেষে সেই বিভৎসতার হাত হতে ছুটে পালাতে চাইলাম। আমার বেশ মনে পড়ে মানে স্বপ্নটা ত আমার মুখস্ত হয়ে গেছে, আমি ছুটতে ছুটতে বাস স্টপে চলে আসি। দূর থেকে দেখতে পাই রাতের শেষ বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কাছাকাছি হবার আগেই বাসটা স্টপ ছেড়ে এগিয়ে যায়। ছুটে গিয়েও কিন্তু বাসটাকে কিছুতেই ধরতে পারি না। গাঢ় অন্ধকারে পিছনের লাল আলোর ক্রমঅপসৃয়মান বিন্দুটি ছাড়া আর আমি কিছুই দেখতে পাই না। রাতের শেষ বাসটা আর আমার কিছুতেই ধরা হয় না।

এই আমার স্বপ্নের পরিণতি। বন্যার মত তীব্র রক্তের উচ্ছ্বাস। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা চেনা অথচ অচেনা নিহত কেউ কাউকে খুঁজে পেতে চাওয়া অথচ খুঁজে না পাওয়া। অবশেষে নিশীথ অন্ধকারে তীব্র রক্তলাল বিন্দু। একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্বপ্নের শুরু, নির্দিষ্ট পরিণতিতে তার সমাপ্তি। স্বপ্নের প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমার মনের পর্দায় ছায়াছবির মত স্পষ্ট আর চলন্ত।

অনেকবার অনেকভাবে দৃষ্টিকোণ পাল্টে পাল্টে স্বপ্নটার ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনভাবেই সদুত্তর পাই না। বরং ক্রমশ সব কিছু আরো দুর্বোধ্য আরো জটিল হয়ে উঠে। এক গভীর অসুখ বুকে রেখে ক্রমাগত বিষণ্ণ হই প্রতিদিন প্রভাতে। সারাদিন রুটপাকান লম্বা কাজের পরিশ্রমে স্বপ্নটাকে ভোলার চেষ্টা করি। কারণ আমি কোনদিনও কোনভাবে রক্তপাত দেখতে পারি না। পারতপক্ষে আমি কখনোই পাঁঠা কাটা কষাইয়ের সঙ্গে আলাপ করি না। হলফ করে বলতে পারি নিজের চোখে কখনো রক্তাক্ত মুরগীর ছটফটানি দেখিনি। ছেলেবেলায় বেশ মনে পড়ে, দত্তবাড়ির উঠোনে মাদুর্গার বলির পাঁঠা ধরে রাখার জন্যে বন্ধুদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। আমি কিন্তু বরারই বলির আগে সরে আসতুম। বন্ধুরা বলত শালা ভীতুর ডিম। তখন ওদের কথায় রাগ হলেও এখন বুঝতে পারি ওদের কোন দোষ ছিল না। আসলে আমরা মানুষেরা প্রায় সকলেই হরর-লাভার। রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা দলে দলে ছুটে যাই সেখানে। বাস পুড়লে দাঁড়িয়ে মজা দেখি। ট্রামের ধাক্কায় একটি লোক কাৎরাচ্ছে। মানুষ অবলীলায় সে রক্তপাত সহ্য করে এবং পরে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। গভীর নিশুতি রাতে ধু-ধু মাঠের মধ্যে হঠাৎ ট্রেন থেমে গেলে ভয় আশংকায় বিব্রত হলেও হৈ চৈ করে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ি। ঘটনা যদি বিভৎসতার দিকে থাকে ত দর্শক সংখ্যা যায় বেড়ে। এত কিছু জেনেও আমি কিন্তু কিছুতেই রক্তপাত দেখতে পারি না। কেন না আমি নিরীহ শান্তিপ্রিয় এবং নির্বিবাদী। তবু কেন যে আমি রক্তপাতের দৃশ্য স্বপ্নে দেখলাম কিছুতেই বুঝতে পারি না। শুনেছি স্বপ্ন নাকি অবচেতনের প্রতিছবি। তবে কি অবচেতনে কারো খুন হবার কথা ভেবেছি? তাই বা হবে কেমন করে? ক্ষুণাক্ষরেও আমি কোনদিন কারো ক্ষতির কথা ভাবিনি। আমার দ্বারা কোনদিন কারো বিপদ হবে এমন কথাও চিন্তা করিনি। সেই সব ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত স্তম্ভগুলোই বা কেন? বৃহৎ অট্টালিকায় আমি কাকে খুঁজেছিলাম? তবে কি সেই নিহত ব্যক্তিকেই? যাকে আমি চিনেও চিনতে পারিনি। যাকে আমি পেয়েও ছুটে পালিয়ে গেছি। পালিয়ে গিয়েও শেষ বাস ধরতে পারিনি। অবশেষে হতাশায় ক্লান্তিতে ডুবেছি।

দুশ্চিন্তার চাবুকে প্রতিদিন যখন বিক্ষত, প্রতি রাত যখন স্বপ্নের বিভৎসতায় ভীত, পাশে নিদ্রিতা প্রায় নগ্না তটিনীও যখন আমার কামনার দরজায় বিবর্ণা, ঠিক তখনই হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল নিরঞ্জনের সঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সাদা কাগজে জলছবির ম্যাজিক শুরু হয়ে গেল। জটিল আবর্তে মনের তলদেশ যখন বিচারের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না, নিমেষেই রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে পেলুম হাতের মুঠোয়।

নিরঞ্জনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা [illegible] আগে এবং অসুস্থ স্বপ্নের রহস্য [illegible] হবার মাঝামাঝি সময়ে মোটামুটি [illegible] সিদ্ধান্তে এসেছিলুম। কখন যেন একটা নিশ্চিত বিশ্বাসে ভাবতে শুরু করেছিলুম কোথাও একটা খুন হয়েছে। আমার চার-পাশের ঠাস বুনোনীর মত নিটোল শান্ত পরিবেশ থেকে কোন একজনকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আসলে সে যে কে তা আমি বুঝতে পারছিলুম না। কারণ সেই নিহতের মুখ আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু তার উপুড় হয়ে পড়ে থাকার ধরনটা আমার চেতনার পর্দায় কেমন যেন পরি-চিতের ছাপ ফেলেছিল। একটা বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল কেউ একজন আমার চেনা-জগতের ত্রিসীমানা থেকে সরে গেছে। কিছুদিন যাবৎ আমি তার পরিচিত বিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি না। অনেকদিন অনেক রাতে স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তার মুখ কল্পনায় পড়তে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ডিম সাদা দেওয়ালে কোন একটি আঁচড়ও চোখে পড়েনি। ট্রামে যেতে যেতে অন্যমনস্ক জগতে চেনা-অচেনা মুখের ভীড়ে তার আদল পাবার চেষ্টা করেছি। অনেক চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে কখনো ভেবেছি এ বোধহয় আমার মনের নিছক একটা সাজানো কল্পনা। কখনো ভেবেছি স্বপ্ন স্বপ্নই। তার কোন ব্যাখ্যা নেই। তবু দিনের শেষে কনে দেখা আলোয় চমকে গেছি বারবার রক্তের হিজিবিজি দাগে। শেষমেষ যখন আমি বিবর্ণ ও বিব্রত, ক্লান্ত ও বিষণ্ণ স্বপ্নের উপর্যুপরি আঘাতে ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল নিরঞ্জনের সঙ্গে। অথচ নিরঞ্জনকে আমি একাদন ভীষণ করে খুঁজেছিলুম। কিন্তু ও সেই অবিশ্বাস্য নিরুদ্দেশ থেকে ও আর ফিরে আসেনি। ওকে আর খুঁজে পাইনি।

বিশ্বাসের উষ্ণনরম লেপটাকে সর্বাংগে মুড়ি দিয়ে এতদিন আমি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলাম যে আমি কোনদিন কোন অন্যায় করিনি। কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করিনি। আমি চিরদিন নিজের বিবেকের কাছে সৎ, শান্ত ও নিরীহ। দৈনন্দিন জীবনে আমার কোন খেদ নেই। তটিনী ছাড়া আমি কোনদিন অন্য কোন নারীতে আসক্ত হইনি। একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেমে তটিনী রীতিমত সুখী স্ত্রী। অযথা পুত্র-ভাবে তাকে আমি ভারাক্রান্ত করিনি। এক পুত্র এক কন্যার সুখী দম্পতি আমরা। আবার আমার সংসারকে পূর্ণ করতে অন্য ধাতুরে বিপন্ন করিনি। সংসারে যার যা পাওনা আমি মিটিয়েছি যথাযোগ্য সম্মানে। গত দশ বছর বিধবা বোনের ভার নিয়েছি হাসিমুখে। দায়িত্ব পালনে কেউ আমাকে বিমুখ উপাধি দেবে না। অফিসে আমি একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী। ঘুষ নেবার প্রচুর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ নিইনি।

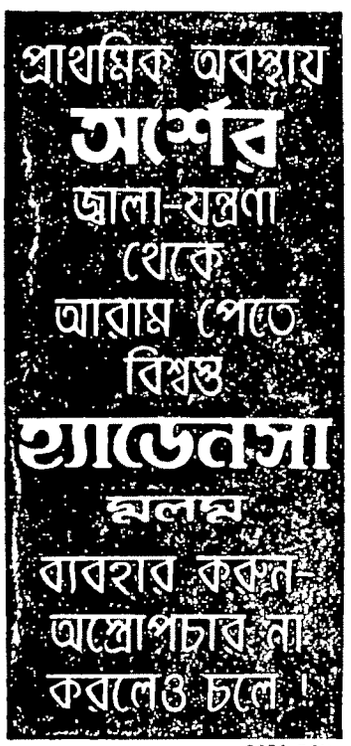

3651 BEN

বাজারে মাছওয়ালার কাছে বারবার ঠকেছি তবু মুখ ফুটে কোনদিন তাকে কটু বলতে পারিনি কারণ আমি নির্বিবাদী। আমার পরিচিত বিশ্বাস মাছওয়ালা একদিন তার স্বভাবে লজ্জিত হয়ে আমাকে ঠকানোর কথা ভাববে না। বাজারে আমার কোন ধার নেই। ধার নিয়ে ফেরৎ না দিলেও তার সঙ্গে আমার ব্যবহারের তারতম্য ঘটেনি। এককথায় আমি সেই সুখী ভদ্রলোক জগতে যার কোন শত্রু নেই। চেনা-জানা গন্ডীমধ্যে কোথাও কোন বেমানান ঘটনা নেই। আসলে আমি সেই সুখী ভদ্রলোক যে মনে-প্রাণে বিশ্বাসের 'দরজায় কুলুপ এঁটে ডেবে এসেছে তার ভাঁড়ারে কোন অন্যায় আর অসৎ মূলধন' নেই। চারিদিকে অসংখ্য কোলাহলের মধ্যে আমি এক নির্বিকল্প ভদ্রলোক। অন্তত নিরঞ্জনকে পুনর্বার আবিষ্কার করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বপ্নের বিভৎস মানসিক ক্লান্তিকর বিপন্নতা নিয়েও সে বিশ্বাসে এতটুকু ছেদ পড়েনি।

নিরঞ্জন যখন আমার বাড়িতে এসেছিল তখন কতই বা ওর বয়েস। দশ কি এগার। ছোট্ট ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। চেহারাটা কালো কালো। নিটোল স্বাস্থ্যের দৌলতে উজ্জ্বল। একমাথা কুচকুচে কোঁকড়ানো চুল। সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল ঐ ভীরু গ্রাম্য ছেলেটার চোখ দুটো। অদ্ভুত এক শান্ত মাদকতা ছিল ওর চোখে। নিষ্পাপ ম্লানিন্যহীন স্বপ্ন স্বপ্ন চাহনী। এক নজরে যা মন টানে, মন কাড়ে। তটিনীও বুঝি ঐ শান্ত চোখের মায়ায় পড়েছিল। বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে একেবারে সঙ্গে করে গ্রাম্য সরলতা কোঁচড়ে বেঁধে এনেছিল। তার কোন ইচ্ছায় কোনদিন বাধা দেব না তটিনী তা জানত। তাই একেবারে সঙ্গে এনে বাড়ির কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে নিরঞ্জনকে দেখে একটু অবাক হয়েছিলুম। ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিলুম—সাক্ষাৎ কেষ্ট ঠাকুরটিকে ধরে আনলে কোথা থেকে?

মিষ্টি হেসে তটিনী বলেছিল—একটা ছোট ছেলের খুব দরকার। টুকটাক ফাইফরমাসগুলোর জন্যে আমাকে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই

ওকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বলেছিলুম—তা বেশ ত। থাকুক না। তাছাড়া তোমার ছেলেকেও দেখবার একজন লোক চাই।

সেই থেকে কেষ্ট ঠাকুর রয়ে গেছে। ওকে আমি মাঝে মাঝে কেষ্ট বলে ডাকতুম। তাতে ওর কোন আপত্তি ছিল না। বরং আমার ওই ডাকে ও একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত হাসিমুখে সব ফাইফরমাস সুখীচিত্তে করে দিত।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছি। নিরঞ্জনকে আমি ঠিক চাকরের মত দেখিনি কোনদিনও। ওকে আমি স্কুলে দিয়েছিলুম। আমার ছেলেমেয়ের গৃহশিক্ষকের কাছে ওর পড়ার ব্যবস্থাও করেছিলুম। চমৎকার মাথা ছিল ওর। তরতরিয়ে ক্লাশগুলো টপকে যাচ্ছিল বেশ। ভৃত্য থেকে কখন যেন বাড়ির ছেলে হয়ে গিয়েছিল। ও আমার ওপর জোর খাটাত। দাবী জানাত। আবদার করত। তটিনীও নিজের ছেলের মতই ওকে দেখত। এমনকি ওর বাবাও ওকে নিতে এলে মন খারাপ করত। শেষে ওর বাবা আর আসত না। কারণ ওর বাবা জেনে গিয়েছিল এখানে ও সুখে আর শান্তিতে আছে। আর এই ভরা সংসারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আমার আরো বেশী সুখী সুখী মনে হত।

অথচ সেই নিরঞ্জন একদিন চলে গেল। আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে ও হারিয়ে গেল। এবং আমি সারা শহর বিস্তারা সকল উপায়ে ওকে অবিরাম খুঁজেও আর খুঁজে পাইনি। তারপর অনেকগুলো বছর সময়ের ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। স্মৃতির পেলটে আরো অসংখ্য ঘটনার আঁচড়ে নিরঞ্জনের মুখ ঝাপসা হয়েছে। এক সময় হারিয়ে গেছে কখন।

প্রাচীন বিধ্বস্ত উঁচু স্তম্ভগুলোর দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি অনেকক্ষণ। আসলে আমি কি কিছু দেখছি? কিছু কি দেখতে চাইছি? আমি কি অতীতকে দেখতে চেষ্টা করছি? তবে কি এতদিন হারিয়ে যাওয়া নিরঞ্জনের সন্ধান পেতে চাইছিলুম মনে মনে? সম্বিত ফিরে পেলুম তটিনীর ডাকে—কি গো, চিনতে পারছ না নিরঞ্জনকে? দেখ দেখ কত বড় হয়ে গেছে ও।

দাঁড়িয়ে বসেছে নিরঞ্জন আমার সামনে। সেই নিরঞ্জন যে একদিন আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না। সেই নিরঞ্জন, যে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল আমাদের কিছু না বলে। আজ এখানে কলকাতা থেকে অনেক দূরে বেড়াতে এসে আবিষ্কার করলুম ট্যুরিস্ট বাসের কনডাকটর নিরঞ্জনকে। আর ঠিক সেই তখনিই রূপকাঠির যাদুস্পর্শে সাদা কাগজের ওপর জলছবির খেলা দেখলুম। ঝটিতি সরে গেল অতীতের যবনিকা। নিমেষে পরিষ্কার হল সব কিছু। কুয়াশা মিলিয়ে গেল বোদস্পর্শে। আমি চিনলাম সেই নিহত অচেনাকে রক্তের হিজিবিজি থেকে।

মনে পড়ল এক অতি সামান্য ঘটনা। নেহাতই মামুলী। এত ক্ষীণ আর তুচ্ছ সে ঘটনা যা কারো মনে থাকার। কথা না। সেই কিঞ্চিৎকর কাহিনীর নায়ক অতীতের গর্ভ থেকে তুলে আনল তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় অতি মূল্যবান অথচ নগণ্য এক সূত্র।

ছবি দেখায় ছিল তটিনীর মারাত্মক নেশা। ছায়াছবির যে কোন ছবিই ওর কাছে আকর্ষণীয়। বলা যায় ওটাই ওর একমাত্র দুর্বলতা। আসলে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মামুলী কিছু কাহিনী, কিছু বাজনা, হৈ হট্টগোল—ব্যস তাইতেই তটিনী সন্তুষ্ট। ছবি যতই খারাপ হোক তাতে তার কিছুই যেত আসত না। আর তার ছবি দেখতে যেতে চাওয়া মানেই আমার শিরচ্ছেদ। একা ও যাবে না আমাকে ছাড়া। আমার ভালো না লাগলেও ওকে আমার সঙ্গ দিতে হবে। আর যেহেতু আমি শান্তিপ্রিয় বিবেকসম্পন্ন আদর্শ স্বামী তাই আমাকে নির্বিকার চিত্তে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকতেই হবে মুখে মিষ্টি হাসি বজায় রেখে।

একদিন সকালে তটিনী এসে সিনেমা যাবার বায়না ধরল। সকালবেলা। তাড়া।

প্রকাশিত হল
নতুন কবিতার বই
গিলোটিনে
আলপনা ৫-০০
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
প্রাপ্তিস্থান ঃ সিগনেট / নাথ ব্রাদার্স / দে বুক স্টোর / শৈব্যা পুস্তকালয়

মাত্র ৪৫ টাকায়
ট্রানজিসটার রেডিও
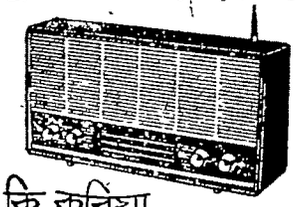
কি করিয়া
তৈয়ারী করিতে হয়
২ মাসের ভিতর শিখুন
শিক্ষান্তে
মাসিক ২০০/৩০০
উপার্জন করুন
রয়েল কলেজ
১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো
শিয়ালদহ
শাখা ঃ
৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণা রূপাশে)
৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে)
১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড
খিদিরপুর

তাড়ির সময়। নিজে গিয়ে টিকিট কাটার সময়ও নেই। তাই বেবুনোর মুখে নিরঞ্জনের হাতে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে টিকিট কেটে রাখতে বলে গেলাম।

বিকেল বিকেল ফিরে এসে দেখি তটিনী আষাঢ়-আকাশের মত থমথমে মুখে ধুন্তি নাড়ছে। একটু অবাক হলুম। অন্তত সিনেমা যাবার দিনে ও সুখী পায়রার মত গলা ফুলিয়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়। আরাম করে দুপুরে ঘুমোয়। ঘটা করে সাজে। অথচ সেদিন ও রান্নাঘরে। থমথমে মুখে। ব্যাপারটা একটু পরেই জানা গেল। নিরঞ্জন সকালে টাকা নিয়ে টিকিট কাটতে বেরিয়েছিল যথারীতি। কিন্তু এখনও সে ফেরেনি। আশ্চর্য। কোথায় গেল ছেলেটা? হারিয়ে যাবার কথা ত নয়। তবে কি পয়সাকড়ি হারিয়ে ফেলে লজ্জায় আর ফিরছে না? তাই বা হবে কেন? টাকাপয়সা হারালেও ওকে কেউ কিছু বলবে না। ওকে আমরা বিশ্বাস করি। ও কখনো আমাদের মিথ্যে বলে না। তাহলে গেল কোথায়? দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা নটা ছেড়ে দশটার দিকে ছুটে চলল। ছবি দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভ কিন্তু ততক্ষণে তটিনী ভুলেছে। এমন ত' কখনো হয় না। রাত যত বাড়ে ও ততই নিরঞ্জনের জন্য ঘরবার করতে থাকে। আমিও আর দেরি করা সমীচিন নয় ভেবে বাইরে যাবার উদ্যোগ করলুম। ইতি-মধ্যে পাড়ারই একটা ছেলে এসে খবর দিল নিরঞ্জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ছেলেটির মুখে আরো খবর পাওয়া গেল। অত্যন্ত ভীড়ে কাউন্টারে কোনরকম টিকিট না পেয়ে ব্ল্যাকে টিকিট কিনতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তখনই ছুটতে হল থানায়। পাড়ায় অত্যন্ত সজ্জন ও সাধু ব্যক্তি হিসেবে আমার খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। তার ওপর থানার বড়সাহেব ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিত। বেশ সমীহ করতেন তিনি আমাকে। যেতেই অভ্যর্থনা জানালেন। একটু বিস্মিতও হলেন হঠাৎ থানায় আমার উপস্থিতিতে।

বড় সাহেবের প্রশ্নে সঙ্কোচে মুখ তুলে দ্বিধাভরে জানিয়েছিলুম আমার উপস্থিতির কারণ। তিনি খোঁজ নিয়ে জানালেন নিরঞ্জন যথারীতি থানাতেই আছে। ডেকে পাঠালেন তখনি। এখন এই মুহূর্তে আমার স্পষ্ট সব মনে পড়ছে। আজকের এই মুহূর্তে নিরঞ্জনের দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা মনে করিয়ে দিচ্ছে সেদিনের নিরঞ্জনকে। ঠিক এমনিই ভয়হীন নিঃসঙ্কোচে অগাধ বিশ্বাসে এসে দাঁড়িয়েছিল নিরঞ্জন আমার সামনে।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অন্য। হাতে নাতে ধরা পড়ায় ওর বিরুদ্ধে টিকিট ব্ল্যাকের অভিযোগই করা হয়েছে। কথার মাঝখানেই সে এসে পড়েছিল। সেই ভাব, এবং ধীর, নম্র এবং বিশ্বাসী পদক্ষেপ। ওকে দেখে আমার প্রাণে শান্তি এসেছিল। কিন্তু বড়সাহেব প্রায় এক ধাপ্পড়ই কষিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—আপনার মত লোকের বাড়িতে এইসব টিকিট ব্ল্যাকারদের ঢুকতে দিয়েছেন? এরা সব হাড়বিচ্ছু শয়তানের দল। দেখছেন না কেমন মিটমিট করে চাইছে। দেখবেন হয়ত কোনদিন আপনারই বাড়িঘর সাফ করে চলে গেছে।

বড়সাহেবের কথায় আমি আপত্তি তুলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু এখন আমার সব মনে পড়ছে, আমি কিছুই বলতে পারিনি। কেননা আমি নিরীহ। গোলমাল পছন্দ করি না। কেননা আমি নির্বিবাদী। বিবাদ অথবা তর্ক ভালবাসি না। কেননা আমি শান্তিপ্রিয়—অশান্তি আমার সয় না। নীরবে বড়-সাহেবের উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা শুনে গিয়ে-ছিলুম। যদিও আমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল যেহেতু আমি জানতুম বড়সাহেবের সব কথাই অর্থহীন। আমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল কেননা আমি বিশ্বাস করতুম নিরঞ্জন সম্পূর্ণ নির্দোষ। একথা আমার থেকে আর কেউ বেশী জানত না। বড়-সাহেবের অভিযোগ মিথ্যা জেনেও নিরঞ্জনের সততা সম্বন্ধে কোন ওকালতিই করতে পারিনি। আমি কিছুতেই বলতে পারিনি বৃথা তর্কের ভয়ে যে নিরঞ্জন আমারই কথামত টিকিট কিনতে গিয়েছিল ব্ল্যাক করতে নয়।

অনেক ধমক আর অযথা উপদেশের পর বড়সাহেব নিরঞ্জনকে আমার ব্যক্তিগত সততার জামিনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, এ ধরনের চাকরবাকরকে যেন বেশীদিন বাড়িতে না রাখি? ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে উঠতে গিয়ে সেই শেষ-বারের মত নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল? কোথায় তখন তার সেই কোমল-মাধুর্য? সেই শান্ত মাদকতা? এ তো রীতিমত ঘৃণা আর বিস্ময়। ক্রোধ আর অভিমান। নিরঞ্জনের এ দৃষ্টি আমার দেখা ছিল না। চমকে উঠেছিলুম। থানা থেকে ছাড়া পেয়েও আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। আমার জন্যে অপেক্ষাও করেনি। একটি কথাও বলেনি। নীরবে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছিল আমার জন্য অপেক্ষা না করেই কেননা বড়সাহেব আমাকে তারপরেও আরো কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিলেন পারি-বারিক কুশলাদির জিজ্ঞাসাবাদে।

ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। সেই পৌষশীতে নিরঞ্জন আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল একবস্ত্রে। সম্ভাব্য সকল স্থানেই ওকে আমি খুঁজেছি। বিশ্বাস্য সকল উপায়ে ওকে ফিরে পাবার চেষ্টা করেছি। তার স্মৃতির শেলেট নিত্য ঘটনার অসংখ্য আঁচড় কখন যেন নিরঞ্জনকে আমার মনের ধোয়াশায় নির্বাসিত করেছে।

এখন এই মুহূর্তে ট্যুরিস্ট বাসের কনডাক্টর নিরঞ্জনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্বাসের লেপটাকে কেমন ভিজে আর শীতশীত মনে হল। মনে হল অনেকদিনের পুরনো বিধ্বস্ত কঙ্কালসার বিবর্ণ মূল্যবোধ নিয়ে অথর্বের মত বেঁচে আছি যেন। আসলে আমার মৃত্যু ঘটেছে অনেকদিন। আসলে সৎ এবং সাচ্চা থাকাটাকে এই মুহূর্তে অহং-এর মিথ্যা নির্মোক বলে মনে হল। আসলে নিরীহ নির্বিবাদী এবং শান্তিপ্রিয় প্রবৃত্তিগুলোর অন্তরালে এক অতি অহংকারী এবং সুবিধাবাদীকে পোষণ করে এসেছি ঐতিহ্যকাল। আমি কোনদিন কোন অন্যায় করিনি, কারো কোন ক্ষতি করিনি এইসব মামুলী আত্মসন্তোষগুলোকে বস্তাপচা অন্তসারহীন ছিবড়ে বলে মনে হল। কনে-দেখা আলোর বকতের হিজি-বিজি আঁচড়ের মধ্যে চিনতে পারলাম কবর-বিষণ্ণ অন্ধকারে কে সেই নিহতপ্রাণ। স্বপ্নে আমি তার মুখ দেখতে পাইনি। আমি তাকে চিনতে পারিনি। এখন এই বিধ্বস্ত প্রাচীন হাসির প্রাচীর ভগ্নাবশেষের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে চিনতে পারলুম স্বপ্নের সেই নিহতকে।

হা ঈশ্বর। কতদিন যে নিজেকে দেখিনি দর্পণে।

বাজীরাও সেন-এর
অনবদ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস
দুচোখে ভ্রমর
৬-০০
লেখাপড়া
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলি—১২
বি/৩০৭৪

বোম্মানা বিশ্বনাথম্
অনূদিত অন্ধ্রের বিপ্লবী সাহিত্য কর্মীদের লেখা গল্পের সংকলন
এখন যে হাওয়া বইছে ৫
নিউ বুক সেন্টার
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

গাঁওবুড়ো

অমর মিত্র

কুসুমপুরের বুড়ো কফিরচাঁদ যাবে বড়বাবুর কাছে। পিঠের লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়েছে ছোট্ট পুঁটলি। সামান্য কুঁজো হাঁটে বুড়ো। আলোফোটার সময় এমন পৃথিবী কোমল শীতল, এই চৈত্রের ভোরবেলায়। বাতাস আর মাটি আশ্চর্য সুখের। এক মানুষ ফকিরচাঁদ যাবে বড়বাবুর কাছে। মোরগগুলোর গাঁক গাঁক চিৎকার এখনো থামেনি। পিলপিলে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে। একপা একপা এগিয়ে বুড়ো দুহাত জোড় করে নতুন সূর্যকে প্রণাম জানায়। নাহ্, চোখটা এখন বেশ লাগছে, শরীরও। হাল্কা হাওয়ায় বুড়োর ঝাপসা চোখে কোমল হাতের স্পর্শ।

তার বয়স তিন কুড়ি পেরুল নিশ্চিত। কি যে হল, এই বয়সেই চোখে ঝাপসা দেখে পৃথিবীটাকে। হাত পা থরথর করে কাঁপে। গায়ের চামড়া শিথিল কুঞ্চিত চোখমুখে অসংখ্য ভাঁজ। এহেন বুড়োর হঠাৎ এই বয়সে ইচ্ছে হয় বিশ মাইল দূরে দুর্গাহিল্লি জঙ্গল পেরিয়ে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার তীরে কন্যাডিহার বড়বাবুর কাছে গিয়ে সমস্ত দুঃখ দূর করে আসে তো কে বাধা দেয়। মন বড় অস্থির হয়েছে। অদেখা সেই বড়মানুষের কাছে সে যাবেই। তার দুঃখ কষ্ট কি একটা—যেমন এই চোখ। সেই মানুষ নিশ্চিন্ত

সন্ধান দিয়ে দেবেন এমন এক বদ্যির যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তার চোখটা ভাল হয়ে যাবে। ছানি কাটলে আবার ছানি পড়ে, পৃথিবীটাকে কদিন সে বুক ভরে দেখেনি। আর সেই বড়-মানুষের কাছেই কতরকম ওষুধ না আছে, বনজ শিকড়বাকড়।

যেমন তার একমাত্র পুত্র। গাঁয়ের একটা মেয়ে নিয়ে সে পালিয়েছে চাকুলিয়া। সেখানে কি যেন চাকরি জুটিয়েছে। অথচ এই বয়সে পুত্র সন্তানটি কাছে না থাকলে হয় না। বৃদ্ধ বয়সের সুখের জন্যই না পুত্রের জন্ম-দান! এই পুত্রটিকে ঘরে ফিরিয়ে আনার এখন অব্যর্থ পরিকল্পনার সন্ধান তিনি দিয়ে দেবেন যে ভালবাসার মেয়েটিকে ছেড়ে সে সুড়সুড় করে ঘরে এসে ঢুকবে।

যেমন তার জমিজমা। একা মানুষ ফকিরচাঁদ, বউটিও মরেছে। এখন জমি-জমা রক্ষা এই নষ্ট দেহে দায় হয়। ইচ্ছেমত শত্তুরে ধান কেটে নিয়ে যায়। সেই ফসল বাঁচাবার জন্য বড়বাবুর উপ-দেশই যথেষ্ট হবে। আর—

আর বউ মরার পরও এই ষাট বছরে দেহের রক্ত শীতল হয়নি। যদি একটা গরীবের মেয়ের সন্ধান তিনি দিয়ে দেন! বুড়োর চোখ চকচক করে ওঠে, মুখের কোণে লালা এসে যায়। সোমত্ত মেয়ে দেখলে এখনো শরীরটা কেমন করে ওঠে না!

সুতরাং, [illegible] যাবে বড়বাবুর কাছে। তিনি [illegible] কন্যাডিহাতে। সবকথা তাঁকে খুলে বলবে সে। কাল রাতে ফকিরচাঁদ নিজের মরণের স্বপ্ন দেখেছে। গাঁয়ের মানুষ সব তৈরি হয়ে আছে তার মরার জন্য। মরলেই হেওয়ারিশ জমিজমা সব লুটেপুটে খাবে। না, তা হবার নয়।

অনেকদিন, বহু বছর ধরে সে শুনেছে বড়বাবুর কথা। একটা সময়ে তাঁর কত কথাই না কানে আসত। এ তল্লাটের মাথা নাকি তিনি। তাঁর কথাতেই সব বদলে যেত। ফকিরচাঁদ এই গাঁয়ে এসেছে বছর পনেরো। তার আগে ঘর ছিল সেই পরিহাটি পেরিয়ে। এখানে এসেই তার ঘর হল, অল্পস্বল্প জমিজমা। তখন শুনত বড়বাবুর কথা। যায়নি কোনদিন, এবার যাবে। আগে বিশ্বাস হত না, এখন মন উচন পাটন করে।

এই বয়সে মনের ভিতর যে কি হয়। বউটা মরে স্বর্গে গেল। ছেলেটি নিজের মাগ জুটিয়ে পালাল। সে একা এই পুরি পাহারা দিতে থেকে যায়। একটু আধটু জমিজমা ঘরদুয়ার নিয়ে বুড়ো ফকিরচাঁদ যক্ষির মত বসে থাকে। গাঁয়ের দশটা মানুষ তার মরণ চায়। নাহ্ মরণ অত সহজ নয়, বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে ভাবে। চোখটা যদি ভাল হয়ে যায় তবে আর একবার উফরক্তের অনু-ভূতিতে পৃথিবীটাকে দেখে নেবে।

কুসুমপুরের ঝোপঝাড় জলশূন্য ডোবাডাহি পেরিয়ে সে দমকা একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। এই মাঠ, কুসুমপুরের বিশাল ডাহি, সামান্য চড়াই উৎরাই পাথুরে গেরুয়া ভূমি। মাথার উপর বিস্তীর্ণ আকাশ দিগন্তে বিলীন মাঠ, এই বিশাল পৃথিবীতে আলো গাঢ় হয়ে আসছে। গাঢ় আলোর ভিতর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ একা হাঁটছে, এখন এইরকম দৃশ্য। যেতে হবে বহু-দূর। মাঠ পার হয়ে গাঁ পেরিয়ে জঙ্গল, সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার মাঠ জঙ্গল গ্রাম ডাহি এই রকমই তো পথ। কত বছর আগে গাঁয়ে এসেছিল বুড়ো তা আর স্মরণে থাকে না। সেই যেবার যুদ্ধের উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছিল নিশ্চিন্তার ওপারে তারও অনেক আগে। যুদ্ধের উড়োজাহাজ। হ্যাঁ। ঘড় ঘড় শব্দ সে আকাশে চোখ মেলে। মাথায় পাখা ঘুরিয়ে হেলিকাপ্টার যাচ্ছে কলাই-কুন্ডার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে বোদ্দুর হয়ে গেল পিতলবাঙা। লাল টকটকে সূর্যটা কখন রঙ বদলেছে। সে মাঠ পার হয় ঠান্ডায় ঠান্ডায়। আকাশটা আরো দূরে সরে যায়। এবার হাল্কা ঝাটি জঙ্গলের ভিতর সরু পায়ে চলার রাস্তা। এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলটা ফর্সা হয়ে গেলে সে থমকে দেখে সামনে এক খাল। এখনো জল এক কোমর হবেই। অন্য সময় দেড় মানুষ তো বটেই। এই চৈত্রে জল কমছে, বৈশাখে তলানি পড়ে থাকবে। এর উপরে একটা সাঁকো থাকত না। সেটা উধাও। বুড়ো হালুক-চালুক চাঁদিক দেখে। কোথাও, কোথাও নেই। তবে কি তার ভুল হল। উঁহু, ভুল হবার কথা নয়। হুই তো সেই বটবিরিক্ষ। বুড়ো তার ঝাপসা চোখ মেলে দেখে। বাবুবনি খালের এই পারাপারের জায়গায় তো সেই বট। সেই কালপুরুষের বট। সেটা আছে, সাঁকোটা নেই। চিহ্নমাত্র নেই এখানে। বুড়ো নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে স্রোত আছে বেশ। এই মরাডাহির এলাকায় একমাত্র জলের উৎস। ঐ ওপারে উদ্ধতের মত দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়াবট অথচ সাঁকোটা উধাও। সে বিপন্ন বোধ করে।

খালের নিচে কাদা আছে। জল আছে আর স্রোতও। এক বর্ষায় বুড়ো নাকফুড়ি মাছ ধরতে গিয়ে ভেসে মরে আটকে ছিল মাইল পাঁচেক দূরে কদম-ডিহাতে। বুড়ো বিব্রত বোধ করে। পার না হলে চলবে কি করে। ডানে বাঁয়ে তাকায়। এই টলমলে দেহ নিয়ে এইরকম ঝাপসা চোখ নিয়ে সে জলে নামতে পারবে না। নাকফুড়ির কথা মনে পড়ছে। বিপদের ভিতরে পড়ে বুড়ো ফকিরচাঁদ থমমেরে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশে রোদ খেলতে থাকে। আকাশ হামলে সূর্য উঠেছে অনেকটা। চারপাশ জনশূন্য।

ঠিক এমন সময় দূরে কোথায় বাঁশির শব্দ গাঢ় হয়ে ভাসে। সে ধড়-ফড়িয়ে ওঠে। ধোঁয়াশাবৃত চোখে এদিক সেদিক দেখে। কোথায়! বাঁশি বাজিয়ে একটা কালো মানুষ ধূমকেতুর মত সামনে এসে দাঁড়ায়। ফকিরচাঁদ মানুষ পায়।

—যাবু কাই, ও গাঁওবুড়া? সে বাঁশি থামিয়েছে।

—বড়বাবুর নিকট যাবা। ফকির-চাঁদ এগিয়ে এসেছে।

—বড়বাবু! সি আবার কুন মানুষ হাঁ! কালো মানুষ বিস্মিত হয়েছে। বড়বাবুর কথা শোনেনি। বুড়ো খিক খিক করে হেসে ফেলে। কি বলবে সে বড়বাবুর সম্বন্ধে, এই পৃথিবী সম্বন্ধে কি সব কথা বলা যায়। কত রহস্য। তাই বুড়ো হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে—

পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ ছড়ায়
মেঘে ভর করি কে বরষে জল?
পুষ্প ফুটিলে সে গন্ধ ছড়ায়
মেঘে ভর করি সে বরষে জল।

কালো মানুষের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। বুড়ো বড়বাবুর কথা অনেক বলে যায়। অনেক!

—তু সাচ বুলছিস বুড়া?

—হাঁ। ঝুট বুলি না মুই। মোর [illegible] জানিসনি তু, জুয়ান বেটা ঘর

শারদীয়া কলাবউ

মহালয়ার আগে প্রকাশিত হচ্ছে।

কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, সামসুল হক, চিত্তরঞ্জন মাইতি, শ্যামলকান্তি দাশ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অজয় সেন, চান্দামামা ও অনেকে। **গল্প**—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস রায়, সুবীরকুমার দাস, শ্রীনাড়ু ও অনেকে। **সাক্ষাৎকার** বনফুলের সঙ্গে শ্রীনাড়ুর কিছুক্ষণ॥ এছাড়া আরো লেখা থাকছে। দাম—দু' টাকা।

কলাবউ সম্পাদক—শ্রীঅরুণাভ মিত্র, ৫।৩, হেরম্ব দাস লেন, কলি-৯

ভাঙি পলাইছে, বউটি মরি যাইছে। ঘরে মর মানুষ লাই, আঁখিতে দেখি না মুই, সব বড়বাবু ভাল করি দিবে।

—বাব্বা দেওতার মত। নবীন মেঘের মত শরীরে বিস্ময় উথলে পড়ে।

—হাঁ।

—তা তু যা। কালো মানুষ ফিরে যেতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো তার হাত ধরে ফেলে, পার হবা কি করি?

—মু জানি কি? সে হাত ছাড়াতে চায়।

—তু পার করি দে। বুড়ো টলমলে কণ্ঠে বলে।

—তা তু দিবি কি?

হ্যাঁ বুড়ো তাকে সব দেবে। বড়-বাবুর কাছে গিয়ে বলবে তার কথা, তুর দুঃখ লাই?

—হাঁ।

—সোউ দুঃখ দূর করি দিব বড়বাবুকে বুলে।

—সাচ।

—হাঁরে হাঁ, বড়বাবুর নামে ঝুটা বুলি না।

ঝপ করে বুড়োর হাল্কা দেহটা কাঁধে তুলে সেই মানুষ খালে নামে। জল ঠেলতে ঠেলতে দুঃখের কথা বলে, বুড়া তকে পার করি দিলাম, বড়বাবুকে বুলবি কিন্তু।

এই ছোটসোনা মাঙ্গির বুকের ভিতরটা যেন চৈত্রদিনের মাঠ। ভালবাসে ব্রুক্কিম হাঁসদার মেয়েটিকে। সে মেয়েও ভালবাসে এই মানুষকে, কিন্তু তাতে হবেটা কি। মেয়ের বাপ বিয়ে দেবে না ওর সঙ্গে, কিছুতেই না।

বিয়ের কথা শুনেই বুড়োর শরীরটা ছমছমিয়ে ওঠে, আহা বেহাতে যে কি সুখ।

—তা বেহা দিবেনি কিনো।

—মুর ঘর নাই জমিন নাই।

অহ শালা হা ঘরে। বুড়ো বুকের ভিতর খুব হাসে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওপারে।

—তু শুন গাঁবুড়া, মু উহারে ভালবাসি ঠিক, তু বড়বাবুরে বুলবি....।

গাঁওবুড়ো তুই বলবি এই নবীন মেঘের মত যুবক ভালবাসে যে নারীকে তার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। গাঁয়ের নাম আসানবনি। বড়বাবু যদি ওদের মিলিয়ে দেন। সে এখন যেতে পারবে মু মুরে কুলাইকুন্ডার দিকে। জন-মজুরির কাজ আছে সেখানে। কাল বিকেলে এখানেই অপেক্ষা করবে সে। বুড়োকে পার করে দেবে আর তার সুখের খবর শুনবে নিশ্চিত।

উজ্জ্বল রোদে ভেসে সে বাঁশি বাজিয়ে দেয়। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোথায় চলে যায় সেই বাঁশির শব্দ। বুড়োকে পার করে দিয়ে খাল পেরিয়ে সে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফকির-চাঁদ উদাসীন পথ চলে। রোদ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসছে, আহা বড় দুঃখু তোর, ভালবাসার মেয়্যামানুষের সঙ্গে বেহা না হলে বেদনা হয়, বড়-বাবুকে সব বুলবো মুই।

গাঁওবুড়ো পথ হাঁটে। রুক্ষ মাটির গেরুয়া পথ। একপাশে জঙ্গল অন্য পাশে ঢালু মাঠ। গহীন গাছ-গাছালিতে ঢাকা টিলা। চৈত্র শেষের দিন। টলমলে বাতাসে ভেসে আসে আলুথালু ফুলের গন্ধ। শাল ফুল মহুয়া ফুল।

সেই বিশ বছর আগে শরীর ছিল মোষের মত। সব শেষ হয়ে গিয়ে ও জেরটা রয়ে গেছে। না হলে তপ্তদিন এতটা পথ হাঁটা এই শিথিল দেহে সম্ভব হয় কি করে। টালমাটাল দেহ ঝাপসা চোখ নিয়ে সে দুলে-দুলে হাঁটতে থাকে।

এখন রোদ্দুর রুপা বর্ণের হয়। ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে দেহের উপর। বাতাসে অগ্নিময়তা। এমন টিটিবা রোদে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ফকির চাঁদের গলা শুকিয়ে যায়। কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত মুখ। জিহ্বায় কেমন তিকত স্বাদ। দেহটা মরুভূমি হয়ে গেছে। বুড়ো ঝাপসা চোখে সব আলুথালু দেখে। এপাশে জঙ্গল ওপাশে রুক্ষ চড়াই-উৎরাই ডাহি। সে বিপন্ন বোধ করে। বড়বাবুর কাছে যাবে, তা সে তো অনেকদূর। তার চলন শ্লথ হয়ে আসে। জিভ বার ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে সে চলতে থাকে। তারপর এক সময় কোথেকে গান ভেসে আসে। ভরা রোদে গান গায় কারা? মানুষ কোনদিকে? গাঁওবুড়ো শব্দ লক্ষ্য ক'রে হাঁটতে থাকে। ক্রমে গানের শব্দ তীক্ষ্ণ হয়ে আসে। ঘুরে হাল্কা জঙ্গল ছাড়িয়ে টুকরো মাঠ। সেখানে মেয়ে-পুরুষ জুটেছে অনেক। তারস্বরে গান শুরু করেছে সবাই। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ। বুড়ো গুটিসুটি সেখানে গিয়ে হাজির হয়। মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।

—কি হয়টে ইখানে? ফকিরচাঁদ হাঁসফাঁস করে।

নেশাতুর এখানে সবাই। বুড়োকে দেখে তারা মজা পেয়ে যায়। বাহারে—

কুন গাঁ থেকে বিরোল ইটা

দিব নাকি চাউলের পিঠা!

হা-হা-হা। বোদ্দুরে যে চাঁদি ফেটে যায় বুড়োর। সে বসে পড়েছে ছোট্ট নিমগাছেটার ছায়ায়।

—শালুই পুজো হয়টে কত্তা।

—জল দাও গো, মরি যাই।

জল দে, জল দে বলে চিৎকার করে ওঠে দু-একজন। ঝকঝকে পাত্রে জল আসে। আহ্, বুড়ো মাথার চাঁদিতে জল দেয়। গলায় জল ঢেলে সে ধাতস্থ হয়। দৃষ্টি ফিরে আসছে আবার। নিমের ছায়ায় সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়।

—তা তুদের পুজো ইখেনে কিনো?

—কিনো? জাহেরা থান, শালুই পুজো, জঙ্গলে যাব। মানুষটার কণ্ঠ জড়িয়ে অসংলগ্ন। ও-পাশে আবার গান শুরু করে দিয়েছে মেয়েরা। সে ঝাপসা চোখ টান-টান করে। কে একজন ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় ওদের, ভিনদিশা মানুষ কথা কয়, ইখন গান লয়'।

মুরুব্বি সাঁওতাল টলে টলে জিজ্ঞাসা করে, হাঁ গাঁ বুড়া যাবু কাই?'

—কনিয়াডিহি।

—ঘর কাই হইল।

—কুসুমপুর।

—কুসুমপুর হোয় বাব্বা! যাবু কনিয়াডিহি, কন্দুরে বটে? তা যাবু কিনো?

বুড়ো এখন স্থির হয়েছে। সবার মুখের দিকে তাকায়। চোখ লাল করে সব টলছে।

—মু যাবা বড়বাবুর নিকট।

—সি আবার কুন মানুষ! ফরিস্টার।

ধ্যুস! বড়বাবুর কথা জানোনি....! বুড়ো অবাক হয়।

পুষ্প ফুটিলে....! বুড়ো বড়-বাবুর কথা বলে। বড়বাবুর মহিমার কথা।

—মুদের বড়বাবু লাগবেনি, মুরা ভাল আছি।

—হোয় চুপ যা, কে একজন ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, 'বুড়ো মুদের দুঃখু আছে অনেক, হুই আকাশের সমান দুঃখু।

ফকিরচাঁদ চোখ পিটপিট করে যুবতীদের দেখতে থাকে লুকিয়ে চুরিয়ে আর অন্যমনস্কের মত বলে ফেলে, 'বুলে ফেল তুদের দুঃখু, সব দূর হই যাবু।

—তা বুলবো, তুই হাঁড়িয়া খাবু? খপ করে একজন বুড়োর হাত ধরে ফেলে।

—না হে, বড়বাবুর নিকট যাবো যে।

—আহু, তাহলে মুদের দুঃখুর কথা শুন।

আমাদের বড় দুঃখ বুড়ো। শালুই পুজোয় ধুমধাম করতে পারিনে। শাল গাছই জোটে না, ফরেস্টার চালান দেবে খড়গপুরে, আমাদের এই দুঃখ। আমাদের কষ্ট হয় যে পুজোয় বরাহ বলি দিতে পারিনে, কত দুঃখু! আমার মেয়েটা তিনদিশী হা-ঘরের সঙ্গে পালিয়ে যাবে বোধহয়....। বড় দুঃখ শাল গাছ পাইনে, কাঠ কাটতে পাইনে, শিকার জোটে না। সব চালান দেবে খড়গপুরে। বরাহ জোটে না। মারাং বুরু সন্তুষ্ট হয় না বুড়ো.....নেশা করলে পুলিশে এসে ধরে। সব চালান দিবে খাড়গগ্রামে।

লোকটা দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুজে কাঁদতে থাকে। পাশের মানুষগুলোও কাঁদতে থাকে।

—বুড়ো তু হলি গিয়া দিবতা, মুদের দুঃখু শুনত্যা এসিছিস। তুই হাঁড়িয়া না খা তো ভাত খা। ভাত না খা তো জল খা।

বুড়োকে জোর করে ভাত খাইয়ে দেয় ওরা। মুখে রোচে না গা গুলোয়। তবুও পেট বাঁচে। এক সময় উঠতে হয়। সাঁওতাল দেহুরি পিছনে পিছনে আসে. 'বুড়া তু বুলিস সি বড়-মানুষকে, বুলিস যাতে বেদনাটা দূর হয়, তবে কত ভালবাসলাম হাঁ।

ফকিরচাঁদ নরম হয়ে যায়. 'কাল এখেনে থাকিস ফিরার পথে তোদের সব বুলে যাবু।

গাঁওবুড়ো পথ হাঁটে। কয়েক পা চলেই ফিক করে হেসে ফেলে তার-পর উদাসীন হয়ে যায়। কত কষ্ট মানুষের। বড়বাবুকে সব বলতে হবে। এমনি হাঁটতে হাঁটতে সূর্য্যি মাথায় উঠে হেলে যায়। আকাশে গুম গুম শব্দ হয়। মেঘের! না মেঘ নয়, কলাই-কুণ্ডায় বোমের শব্দ। মহড়া চলছে।

দুর্গাহীর জঙ্গল পড়ে যায়। বেলা নেমে আসছে। এটা পার হয়ে দুখানা গাঁ, মাঠ তা পেরিয়ে সুবর্ণরেখা নদী। সে নদীর তীরেই কন্যাডিহা। সেই নদীর কাছাকাছি বড়বাবু থাকেন। দীর্ঘ উন্নত দেহ। টকটকে রঙ। মাথার চুল এতদিনে পাকা হয়ে গেছে নিশ্চিত। বড়বাবুকে দেখেনি ফকিরচাঁদ, শুনেছে তাঁর কথা। চোখে দেখেনি শুধু কানে শুনেছে।

বড়বাবুকে ছোট সোনামাণ্ডির কথা বলতে হবে, বলতে হবে ঐ গাঁয়ের সাঁওতালদের কথা। নিজের কথাও বলতে হবে। নাহ্ যক্ষির মত পাহারা দিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। হয় একটা বউ চাই নতুবা ছেলেটা ঘরে ফিরে আসুক। গাঁওবুড়ো থিরথিরিয়ে পথ হাঁটে। আর এই রকম হাঁটতে হাঁটতে কখন মাথার গনগনে আকাশটা হারিয়ে গেছে গাছগাছালির আড়ালে তা বুড়ো জানে না। এখন জঙ্গলের গভীর সে। রোদ কোথাও কোথাও ঠিকরে পড়েছে দু এক টুকরো নতুবা সব ছায়াঘন। জঙ্গল আগে ছিল ভয়ের, এখন ভয় কম। তবুও কত বিস্ময় না জমা হয়ে আছে। জানোয়ারের পিঠে চেপে এই জঙ্গলেই না ঘুরে বেড়ান বড়ামঠাকুর। ঐ শালগাছের গোড়ায় স্তূপাকার মাটির হাতি ঘোড়ায় তাঁর থান হয়ত। কোথায় যেন আছে রাক্ষসী রকিশী দেবীর থান। বুড়ো নিঃঝুম পথ হাঁটতে থাকে। তারপর হঠাৎ এক সময় বিপন্ন হয়ে পড়ে। তিনদিকে তিনটি রাস্তা গেছে। কোন দিকে যাবে সে। ঝাপসা চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে তারপর হঠাৎ দেখে দূরে শালগাছের গোড়ায় কি নড়ে চড়ে। মানুষ নাকি!

সে হাঁক মারে, 'কোন মানুষ গো ইদিক আস।

সে মানুষে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বুড়োর ঝাপসা চোখে স্পষ্ট দেখে। বুকের ভিতরটা ধুক-ধুক করে ওঠে। জঙ্গলে কত না ভয়! অপদেবতা নাকি! নড়ে চড়ে মানুষের মত। যাই হোক না কেন এখন দিকহারা বুড়োকে ওখানেই যেতে হবে। সে এগিয়ে যায়।

ঝাপসা চোখে সব স্পষ্ট দেখে। গা শিউরে ওঠে তার। একি! মানুষই বটে। ফিসফিসিয়ে কথা বলে। কুষ্ঠে দেহটা বীভৎস। টসটসে লাল মুখটা। সে নেতিয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে।

—কোন গাঁর গো তুই। বুড়ো পয়সা ছুঁড়ে দেয় গাঁট থেকে।

মানুষটা ছুঁয়েও দেখে না, সমাজে নাই পয়সা দিয়া কি হইব?

ফকিরচাঁদ স্তব্ধ হয়ে যায়। বলে মানুষটা!

—মরন ধরিছে মুরে. হাঁ-গ বু! যাবু কাই, কুন গাঁয়?

—কনিয়াডিহি, বড়বাবুর কাছে।

লোকটা নির্বিকার বসে রইল।

—বড় রোগ কন্দিনের তোর?

—পাঁচ সাল হইবে ই জন্টিতে।

বুড়ো সামনে দাঁড়াতেও ভয় পায়। ওই মুখ দেখা যায় না।

—কনিয়াডিহি কুন পথে? বুড়ো জবাব পায় না

—তু বড়বাবুর নিকট যাইলে দাওয়াই বাতলে দিত। বুড়ো আবার বলে।

—সি আবার কে? গম্‌গম করে ওঠে কুষ্ঠরোগীর কণ্ঠস্বর এই জঙ্গলে।

বুড়োর দেহে শীত ঘনায়। সে কাঁপা গলায় কন্যাডিহার বড়মানুষের কথা বলে। কুষ্ঠ রোগীর চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে, সে হাত বাড়িয়ে বুড়োকে ধরতে যায় আর কি। বুড়ো সরে যায়।

—মু পথ বাতলে দিচ্ছি, তু তোর বড়বাবুকে মুর কথা বলবু, যদি রোগটা সারে, লোকালয়ে ঘুরতি চাইরে বুড়া। লোকটার স্বর ভারি হয়ে ওঠে।

শেষে মানুষটা পথ দেখিয়ে দেয়। বুড়ো কথা দেয় ওষুধ নিয়ে ফিরবে। বড়মানুষ যদি একবার ছুঁয়ে দেন তো রোগ সেরে যাবে, বুড়ো লোকটাকে বসতে থাকে।

এখন ফকিরচাঁদ জোরে হাঁটে। বুকটা ভার হয়ে আছে। এমন দেহ, বড় রোগে সব গেল। এমন নবীন বয়স। বলবে সে, বড়বাবুকে সবার কথা বলবে। এই সব মানুষ না থাকলে সে বড়বাবুর কাছে পৌঁছত কি করে। সকলের কথাই বলবে। সে মানুষের ইচ্ছায় সকলের দুঃখের শেষ হবে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে নদীর দিকে। সে উদাসীন পথ হাঁটে। ঐ তো বোধ হয় কন্যাডিহা, ঐ দেখা যায় সুবর্ণরেখা। ধবধবে সাদা বালিয়াড়ি। ওখানেই সেই বড়মানুষের ঘর। বুড়ো জোরে হাঁটে। মানুষের কত দুঃখ। কত বেদনা। সকলের কষ্ট যদি চলে যেত তবেই না! ভাবতে ভাবতে বুড়ো চিকন্ হাসে। কষ্ট না হলে সুখটা বুঝবে কি

করে মানুষ। সেই আশায় তো এতটা পথ ছুটে আসা।

বিকেলের পৃথিবীটা বিষণ্ণ হয়ে এল। তার বুকটা হাঁসফাঁস করছে উত্তেজনায়। শীর্ণ দেহ শিথিল কুঞ্চিত চর্ম ঝাপসা চোখ লগবগে শরীর নিয়ে তার ধকল গেছে বেশ। জিভ বেরিয়ে আসার জোগাড়। শরীরটা নুয়ে যাচ্ছে বার বার। এখন যদি কোথাও নরম বিশ্রাম পেত সে। আর সেই ঘরে যদি তার মরা বউটি বেঁচে থাকত, ছেলেটি ঘর ছেড়ে না পালাত, তাহলে এতটা কষ্ট হত না। শিথিল আরামে শরীর এলিয়ে সে ঝাপসা চোখে পৃথিবীটাকে দেখত। ছানি কাটিয়ে আনত, আবার ছানি পড়ত। তারপর একদিন ছেলের হাত ধরে চলে আসত এখানে। ছেলে তাকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে আসত, ডুলি করে নিয়ে আসত।- কন্যাডিহার - বড়-মানুষ তার চোখ ভাল করে দিত। ফর্সা করে দিত পৃথিবীটাকে। তা হবার নয়, তাই তো জীবন হাতে করে এই চৈত্রের দিন ভেসে অদেখা বিশাল পুরুষের কাছে জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছান।

ধকপকান বুক নিয়ে সে হাঁটতে থাকে। ছায়া হয়ে উঠেছে দীর্ঘ। সূর্য নেমে যায় যায়। ফকিরচাঁদ বিষণ্ণ বোধ করে। দিন শেষের সময়েই চাঁদের হাট কসোরের কথা মনে পড়ে। গাঁওবুড়ো এসে পৌঁছাল সুবর্ণরেখার পাড়ে। এরই নাম কি কন্যাডিহা। চারপাশে বিষণ্ণ বাতাস বয়ে যায় হা হা করে। এই গাঁয়েই বড়বাবু থাকেন।

নদী খেয়ে ফেলেছে গাঁয়ের সব-টাই। এখানে সেখানে ইতস্তত বাস্তু-ভিটের চিহ্ন ছড়িয়ে। পানফুলি বাবলা আর কত রকম গাছগাছালির ঝোপে অন্ধকার। আর আশ্চর্য একটা মানুষও নেই। বুড়োর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। অস্বচ্ছ চোখেই সে মানুষ খোঁজে। মানুষ তো একটা না একটা থাকবে। বড়বাবুর গাঁ তো এটাই হবে এর পরে নদী নিয়েছে বিপজ্জনক বাঁক আর গ্রাম কোথায়।

শরীর নিঃঝুম হয়ে আসছে। এটা হয়ত কন্যাডিহা নয়। পথ ভুল হ'ল।

আশ পাশে কোথাও আছে। অন্য কোথাও। অন্য কোনখানে।

ক্রমে অন্ধকার বিস্তৃত হয়। বুড়োর কাছে নদী পেরিয়ে বাতাস আসে। অন্ধকার গাঢ় হয়। বিপন্ন গাঁও-বুড়ো এদিক সেদিক মানুষ খোঁজে। তারপর হঠাৎ এক সময় পায়ের কাছে ধূমায়িত আলো ঝুলিয়ে একমানুষ ফকিরচাঁদকে পার হতে যায়, গাঁওবুড়ো হাঁসফাঁসিয়ে চিৎকার করে, কে যায়-গা মানুষ, রসো'। সে মানুষ থেমে যায়।

—বড়বাবুর ঘর কোন গাঁয়।

বড়বাবু। বিস্ময়ে অন্ধকারে সে চেয়ে থাকে বুড়োর দিকে।

গাঁওবুড়ো কাঁপা গলায় বড়বাবুর মহিমার কথা বলে। তিনি পরিশ্রান্ত মানুষকে বিশ্রাম দেন, অফুরন্ত জীবনের কথা বলেন। অবলীলায় কত দুরূহ সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। তিনি বড়মানুষ। বিশাল এক পুরুষ। রোগ শোক তাপে তাঁর কাছেই আশ্রয়।

এই মানুষ খনখনে গলায় হেসে ওঠে, 'হা হা তুমি স্বপন দিখ গাঁও-বুড়ো, এমন মানুষ কই। কোথাও নেই। এমন মানুষ আজকাল আর থাকে না, থাকে না।' লোকটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পা বাড়ায়, ফলত ফকিরচাঁদ নিঃসঙ্গ।

তখন অন্ধকারের পৃথিবীতে চাঁদ ভেসেছে গেরুয়া বর্ণের ডিম্বাকার। তার সামনে অন্তহীন চরাচরে কেউ নেই। সেই বিশাল পুরুষও নয়। এক-মাত্র দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বালিয়াড়ি নিয়ে এই নদী। সব কেমন রহস্যময়। বুড়োর মাথার ঠিক থাকছে না, সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু তুমি থাকলে না। মানুষে বলে এমন মানুষ আর এখন থাকে না। তুমি থাকলে না তাহলে আমার কষ্ট বেদনা, ছোটসোনার দুঃখ, কুষ্ঠ রোগীর জীবন আর সেই সাঁও তাল গাঁয়ের কষ্ট কিভাবে হারিয়ে যাবে।

সে নেমে গেছে বালিয়াড়িতে। অল্পালোকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে বালু-কণা। বিস্তীর্ণ বালিতে নেমে উদার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সে তার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, 'শকুনের মত পাহারা দিব কি করে বড়বাবু, অন্ধ চোখে বেঁচে থাকব কি করে বড়মানুষ।'

এই নদীটা রয়ে গেছে অথচ সে মানুষ থাকল না। নিঃশব্দে কখন চলে গেছে অথচ দুঃখ কষ্ট বেদনা আর বিশ্বাসটুকু রেখে গেছে গাঁওবুড়োর মনে।

—চলি যাইলে তো সব দুঃখু-গুলান নি গেলোন কিনো? বুড়ো ফিসফিসিয়ে নদীর সঙ্গে কথা বলে। দূরে কোথায় ছপ ছপ শব্দ হয়। বড়-মানুষে হেঁটে যায়।

গাঁওবুড়ো দ্রুত দৌড়তে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে বালিয়াড়িতে। এক আকাশ পৃথিবীর উপর মরে থাকে। সব নৈঃশব্দ্য ডোবে। তারপর এক সময় লাল সবুজ আলো জ্বালিয়ে এক উড়াজাহাজ নৈঃশব্দ্য ভেসে চলে যায়।

ফেরার পথে সেই জঙ্গলে সেই মাঠে সেই খালের সামনে অপেক্ষা করে থাকে যে যেমন। গাঁওবুড়ো কাল ফেরেনি, আজ ফিরলো না তবু ফিরবে নিশ্চয়ই।

খেলা

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের ঠিক মাঝখানে ফ্লোরের ওপর সাদা রেখার বর্গক্ষেত্র। আয়তন, ফ্রি-স্টাইল বা বক্সিং রিং-এর প্রায় সমান। তিন বাহুর সমান্তরাল করে তিনটি সাদা সরল রেখা বর্গক্ষেত্রটির ভেতর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

রিতা কাম হিয়ার. কেজি ইউ নো.. ...আরে ভাই ছোড় বাত. হোয়াট নন্-সেন্স ...

...রমেশ ভাবী ...পার্থ এদিকে এদিকে..

হই হই, চীৎকার, হাসি, হুল্লোড় আর উল্লাসে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়াম ভেঙে পড়ছিল। উজ্জ্বল বর্ণ, সিল্ক আর ঝকঝকে পোশাক পরা যুবক-যুবতীদের মাঝখানে আমি এক মাত্র মলিন মানুষ।

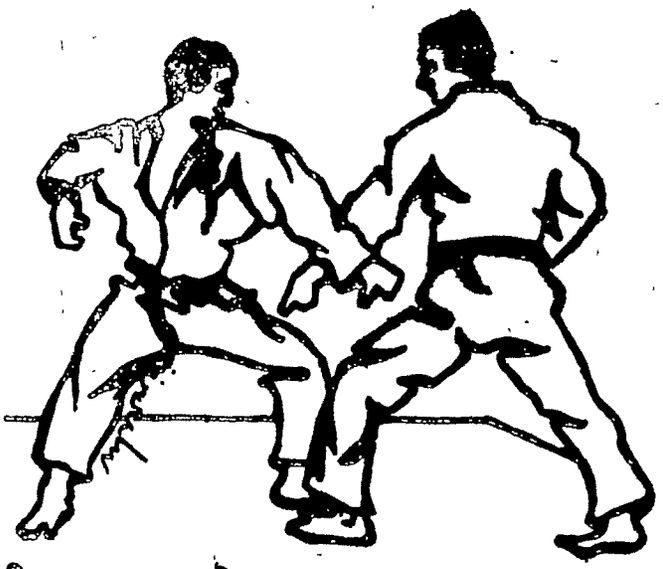

জাতীয় ক্যারাটে

১০ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটা। আসার সময় দেখে এসেছি স্টেডিয়ামের বাইরে, প্রত্যেক গেট ও বাকের মুখে মুখে লম্বা কিউ—লোকে লোকারণ্য। এখন বন্যার তোড়ের মত সবাই স্টেডিয়ামে ঢুকছে। মুখে মুখে একটা নাম কয়েকবার শোনা গেল। বুসলী .বুসলী . .।

আমার দশ টাকার টিকিট। গেট নং বি, ব্লক নং নয়, রো-ইউ, সিট নম্বর উনিশ। জীবনে কখনো এত দামের টিকিট কেটে কিছু দেখিনি। মনে মনে অভিজাত্য পোষণ করলেও: খাটো প্যান্ট, খাটো শার্ট নিয়ে উনিশ নম্বর সিটে বসে থাকি। চার পাশে যে যার মত বসে আছে। মাইকে ঘোষক কি যেন বললেন, কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। হর্ন বেজে উঠল। কিছুক্ষণ পরে দেখি লাইন বেঁধে ডবল ফাইল ফর্মেশানে কয়েক-জন মার্চ করে আসছে। বুঝলাম, মার্চ পাস্ট.

সামনে একটি খাটো মেয়ে তার পেছনে পরপর কয়েকজন। মেয়েটির হাতে নিজ দলের পরিচিতি ধরা আছে—এ, আই, কে, এফ অফিসিয়ালস্। তারপর পর পর বিহার, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ, মাদ্রাজ মহারাষ্ট্র এবং বাংলা। বাংলার দলটিই সবচেয়ে বড়, সংখ্যায় আটত্রিশ। প্রথম দলটিতে প্রায় সবারই পরনে প্যান্ট শার্ট ছিল। কিন্তু পরে যারা এলেন তাদের পরনে ছিল ক্যারাটে পোশাক। সাদা ঢিলে খাটো পায়জামা, হাতাওয়ালা ফতুয়ার মত সাদা পোশাক। কারো পোশাকই পরিস্কার নয়, বেশ ময়লা, মযলা বা আধ ময়লা। এই পোশাক পরে প্রথম জাতীয় ক্যারাটে চাম্পিয়ান (শিপে লড়াই করতে এসেছে কেন? আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। এমন নিস্তেজ, করুণ মার্চপাস্ট আমি আগে কখনো দেখিনি।

মার্চ পাস্ট প্রথা অনুযায়ী ফিরে যায়। ব্যবস্থাপকেরা চারদিক থেকে ছুটে এসে বর্গ ক্ষেত্রের চার কোণে চারটি ফোল্ডিং চেয়ার রেখে, আর একটি চেয়ার ক্ষেত্রের বাইরে রেখে চলে গেলেন। আবার ছুটে এসে দুটো করে ঝান্ডা কোণের চেয়ার গুলিতে রেখে চলে গেলেন। একটা সাদা, একটা লাল। মাইকে ঘোষক কথা বলছেন—এমন সময় স্টেডিয়ামের ভেতর হুড়মুড় হুড়মুড় শব্দ। ভাল করে তাকিয়ে দেখি। তিন টাকা ছাড়া দশ টাকা সিটের দর্শকেরা সামনে গিয়ে বসার জন্য নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কাছের সিট। পঁচিশ, অথবা পঞ্চাশ টাকার হবে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও আছেন। হঠাৎ আমার আশপাশ থেকে লোক ছুটতে শুরু করল। একটি মেয়ের ম্যাক্সি আটকে গেল হুকে। ভলেন্টিয়ারেরা ছুটে এলেন চারপাশ থেকে। কাকুতি, মিনতি, বাতজোড়, কিন্তু দর্শকদের বিক্রমের কাছে ওদের খুব অসহায় মনে হল। এদিকে স্টেডিয়ামের ভেতর বর্গ-ক্ষেত্রের ওপরে লড়াকুরা এসে গেছেন। এবার খেলা দেখাবেন। আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ভলেন্টিয়ারেরা ফিরে যাচ্ছে-ফিরে যাচ্ছে।

ঘোষক কি বলছেন বোঝা যাচ্ছে না। খেলা শুরু হয়ে যায়। একজন প্রতিপাদক ক্যারেটের আইন-কানুন দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তিনি একটি পা স্বাভাবিক ভাবে তুলে অপর জনের চোখের পাশে একটু ওপরে তুলে দেখালেন। কোনটা আইনী কোনটা বেআইনী মার তাও দেখালেন। তারপর দুজনেই ফিরে গেলেন। আর একজন ছুটে এসে ক্ষেত্রের রেখার বাইরে কয়েকজোড়া সাদা ও কালো বেল্ট এবং গ্লাবস রেখে গেলেন। দুটি দল এক বর্গক্ষেত্রের দু-পাশে বসলেন। ছয়জন পরিচালক এলেন। চারজন চারকোণের চেয়ারে বসলেন। একজন বসলেন দূরের চেয়ারে আর একজন থাকলেন বর্গ-ক্ষেত্রের ভেতরে। দু-দলের দু-জন দু-পাশ থেকে উঠে এল। চারকোণের চারজন পরি-চালক দুই হাতে লাল ও সাদা ঝান্ডা তুলে নিলেন। শুরু হল মার। ঢাকি যেমন বোল তোলে পা তুলে পা ফেলে, ডাইনে ঘুরে বায়ে ঘুরে। অনেকটা সেই রকমের পদক্ষেপ ওঁদের পায়ে ছিল। খালি পা, হাতে মাথা। কাটা কালো গ্লাবস্ কনুই ভাজ করে আঙ্গুল মুড়ে ওরা পরস্পরকে মারছিল। বক্সিং বা রেসলিং-এর মার যেমন বোঝা যায় ক্যারাটে মার সে রকম নয় বিদ্যুৎ বেগে একটু হাত তুললো, নামালো ব্যস্—রক্তপাত। একটু দূরে দুজন লোক জলে ভেজানো লাল তোয়ালে নিয়ে বসে আছেন। তিন থেকে চার মিনিটের খেলা শেষ হলেই ওরা তোয়ালে নিয়ে ছুটে এসে ফ্লোরের রক্ত মুছে দিচ্ছে। কারো কপাল কাটছে, কারো চোয়াল ভাঙছে, কারো দাঁত পড়ে যাচ্ছে আর রক্ত বড়ছে। লাল তোয়ালে এসে মুছে যাচ্ছে রক্ত।

আবার নতুন দল আসছে। এক এক খেলোয়াড় এক এক অঙ্গভঙ্গিতে খেলে যাচ্ছেন। এর আগে ক্যারাটে দেখিনি, নাম শুনেছি। নিয়ম-কানুন জানি না। আমার ক্লান্তি লাগছিল। ঘুরে ফিরে তাকাই, কয়েকজন যুবকের সাথে সুন্দরী কয়েকটি মেয়ে বসে আছে। ওদের হাত বোঝাই খাবার কাগজের ঠোঙায় আইসক্রিম, আলু ভাজা, আরো কত কি—নাম জানি না। আমি খেলা ছেড়ে ওদের দেখতে থাকি। হঠাৎ স্টেডিয়াম ফেটে পড়ল। তাকিয়ে দেখি একজন খেলো-য়াড়তল পেট ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে অপরজন বসে আছে দূরে। পরিচালকেরা হাত পা টেনে দিচ্ছে। সারা স্টেডিয়ামে সে কি উল্লাস, অমার মনে হল, আমি মধ্যযুগের বুল-ফাইট দেখছি। আমি ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ রাখি। কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে সব কিছু বিরক্তিকর মনে হয়। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয় পরিচালকেরা। খেলোয়াড়দের

মারের ক্ষেত্রে আইন কানুন মানা হচ্ছে কিনা তা দেখানোর জন্য চারকোণের চারজন পরিচালক বসে আছেন। সাদা অথবা লাল ঝান্ডা তোলেন কখনো দুই ঝান্ডা জোড় লাগিয়ে দেখান। একের সঙ্গে অপরের না মিললেই সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে এক জায়গায় জড়ো হন। নিজেদের মত ঠিক করেন। আবার ফিরে গিয়ে বসেন। এটা একবার দুবার সহ্য হয় কিন্তু প্রতি মারের পরেই কি এইভাবে উঠে এসে পরামর্শ করতে হয়? আমার মনে হল, খেলা কেউ দেখছে না। যে যার নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আর একজন লোককে নিয়ে দর্শকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেই লোকটি স্টেডিয়ামের ভিতর ঘোরাফেরা করছিল। সম্ভবত কোন প্রদেশের ম্যানেজার। রোগা, লম্বা, কালো, একটু কুজো, বড় গোঁফ শুকনো পাছা, বেলবটস, ঢোলা শার্ট। অনেকটা জোকারের মত দেখতে। ওঁর কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সে যখনই স্টেডিয়ামের ফ্লোরে আসছিল সবাই ওকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠছিল কাগজের বল ছুঁড়ে দেওয়া, পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া, থুতু দেওয়া সবকিছু করছিল ওঁকে দেখে। কাজের প্রয়োজনে তাকে ফ্লোরে ঘুরতেই হচ্ছিল। উনি হাসিমুখে কাগজের বল, পয়সা কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। সবাই হই হই করে উঠছিল, তিনি গ্লানি আর আহত মর্যাদা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলা চলছে। বল ঝড়ছে। ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে। পরিচালকেরা পরামর্শ করছেন। এর মধ্যে আমি সেই লোকটিকে দেখতে থাকি আহত হই। আমরা মনে হল আমার কিছু করা উচিত। দশ হাজার দর্শকের কাছে আমি কিছুই করতে পারি না কিন্তু একজনের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারি। ধৈর্যের বাঁধ ছিঁড়ে যায়। আমি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। নীচে নেমে যাই। সেই লোকটির সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। বাংলাদেশের হয়ে ক্ষমা চাইবো। স্টেডিয়ামের বাইরে এসে পথ পাই না। একে ওকে জিজ্ঞেস করে, অনেক খুঁজে একটা গেটের মুখে চলে এলাম। ঢুকতে দিল না। বলল, কাকে চাই?

একজনের সঙ্গে দেখা করবো।

নাম কি?

নাম জানি না।

কি দরকার?

ক্ষমা চাইবো।

কেন?

অপরাধ হয়েছে।

কার?

আমাদের।

আমেরিকান টেনিস

ফরেস্ট হিলসে আয়োজিত আমেরিকার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ৪নং বাছাই গিলারমো ভিলাস (আর্জেন্টিনা) অপ্রত্যাশিতভাবে ২নং বাছাই এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) হারিয়ে টেনিস খেলার পণ্ডিতদের পূর্বাভাস নস্যাৎ করে দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার ৪নং বাছাই ২৫ বছরের ন্যাটা খেলোয়াড় ভিলাস যে এভাবে ফেভারিট কোনর্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হবেন এ কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। এই ফরেস্ট হিলসের আসরে এর আগে এই দুজনের দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং দুবারই কোনর্স জিতেছিলেন। ভিলাস এবছরের ফাইনালে সোয়া তিন ঘন্টা লড়াই করে কোনর্সকে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের শোধ নিলেন। এখানে ভিলাস সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। তিনি এবছর ক্লেকোর্টের টেনিস আসরে একনাগাড়ে ৪৫টি খেলায় জিতে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। গত ৮ মাসে টেনিস খেলার সূত্রে তাঁর উপার্জনের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে দুলক্ষ পাউন্ডের বেশী। ফাইনাল খেলার শেষে ভিলাসের অনুরাগীরা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে অভিনন্দন জানান। আনন্দের জোয়ারে ভিলাস তাঁর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। মিষ্টভাষী তরুণ খেলোয়াড় ভিলাসের, কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ফরেস্ট হিলসে আমেরিকার টেনিস আসরে ভিলাসের আগে দক্ষিণ আমেরিকার অপর কোন খেলোয়াড় খেতাব জয়ী হননি।

প্রতিযোগিতার ১নং বাছাই এবং ১৯৭৭ উইম্বলডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান বর্ন বর্গ (সুইডেন) তৃতীয় রাউন্ডে ১০নং বাছাই ডিক স্টকটনের বিপক্ষে খেলার সময় ডান কাঁধের পেশীর টানে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েন্ডি টার্নবুলের হাতে ২নং বাছাই আমেরিকার মার্টিনা নভ্রাতিলোভার পরাজয় এ বছরের অপ্রত্যাশিত ঘটনা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতার ১নং বাছাই কিংস ইভার্ট (আমেরিকা) মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৭৫-৭৭) সিঙ্গলস খেতাব লাভের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে গিয়ে কোনর্স তাঁর প্রাপ্য ট্রফি এবং ১৬,৫০০ ডলারের চেক না নিয়েই ঝড়ের গতিতে মাঠ ছেড়ে চলে যান। পুরস্কার না নিয়ে এইভাবে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। বর্গের এই অখেলোয়াড়ী আচরণে সকলেই বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। আনন্দ অমৃতরাজ এবং শশী মেনন ২য় রাউন্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন। যশজিৎ সিং ১ম রাউন্ডেই হেরে যান। রমেশ কৃষ্ণানকে জুনিয়র টেনিসের আসরে ১ম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: ৪নং বাছাই গিলারমো ভিলাস (আর্জেন্টিনা) ২-৬, ৬-৩ ৭-৬ ও ৬-০ গেমে ২নং বাছাই এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই এবং গত দু বছরের চ্যাম্পিয়ান কিংস ইভার্ট (আমেরিকা) ৭-৬ ও ৬-২ গেমে ওয়েন্ডি টার্নবুলকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: বব হিউইট এবং ফ্রিউ ম্যাকমিলান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬ ৪ ও ৬-০ গেমে রাউল র‍্যামিরেজ (মেকসিকো) এবং ব্রায়ান গটফ্রিডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস: বেট্টি স্টোভ (নেদারল্যান্ডস) এবং ফ্রিউ ম্যাকমিলান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬-২, ৩-৬ ও ৬-৩ গেমে বিলি জিন কিং এবং ভিটাস গেরুলাইটিসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

বড়দলে ফুটবল ট্রফি

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত লোকপ্রিয় বড়দলে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছিল কলকাতার দুই জনপ্রিয় দল—মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং। মোহনবাগান ৪-০ গোলে জয়ী হয়ে উপর্যুপরি চারবার বড়দলে ট্রফি জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য মোহনবাগান ছাড়া অপর কোন দল উপর্যুপরি তিনবারও এই ট্রফি জয়ী হয়নি। ফাইনালে মোহনবাগানের পক্ষে এইভাবে গোল দিয়েছিলেন ৪র্থ মিনিটে আকবর, ১০ম ও ৩০ মিনিটে মানস এবং ৪২ মিনিটে শ্যাম। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ২-১ গোলে গোরাব ডেপো ক্লাবকে এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে চন্দ্র মেমোরিয়াল দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালদহে অনুষ্ঠিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত থেকে যায়। ফলে ২৪ পরগণা এবং চন্দননগর দল যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। অপরদিকে আন্তঃ জেলা সাব জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হাওড়ার বিপক্ষে নদীয়া ১-০ গোলে জয়ী হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল এবং বি এন আর। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে এরিয়ান্সের বিপক্ষে খেলবে মোহনবাগান।

মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে বি এন আর ৪-৩ গোলে (টাই-ব্রেকারে) মহমেডান স্পোর্টিং এরিয়ান্স ১-০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ইস্ট-বেঙ্গল ১-০ গোলে পোর্ট ট্রাস্ট দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ফুটবল কাপ

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত ৭ম প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি ফুটবল প্রতি-যোগিতার ফাইনালে ব্রাজিলের সাও পালো ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া 'এ' দলকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট কাপ জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর এই দুটি দল যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল।

এ বছরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ৯টি দল দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। দুই গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় ৯টি দল এইভাবে দুভাগ হয়ে খেলছিল: এ গ্রুপে ৫টি দল—দক্ষিণ কোরিয়া এ দল, থাইল্যান্ড, ভারত, ইংল্যান্ডের মিডলসেকস ওয়ান্ডারার্স এবং লেবানন। অপরদিকে বি গ্রুপে এই চারটি দল—সাও পালো (ব্রাজিল), মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া বি দল এবং বাহরিণ।

গ্রুপ এ: চ্যাম্পিয়ান—দক্ষিণ কোরিয়া এ (জয় ৪) এবং রানার্স-আপ—থাই-ল্যান্ড (জয় ৩ ও হার ১)

গ্রুপ বি: চ্যাম্পিয়ান—সাও পালো (জয় ২ ও ড্র ১) এবং রানার্স-আপ মালয়েশিয়া (জয় ১, হার ১ ও ড্র ১)

সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়া এ পরাজিত করে মালয়েশিয়াকে এবং সাও পালো ৪-০ গোলে থাইল্যান্ডকে হারায়।

ভারতের খেলা

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় ভারত ০-৩ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া এ, ০-৪ গোলে থাইল্যান্ড এবং ০-১ গোলে মিডলসেকস দলের কাছে হেরে যায়। ভারতের একমাত্র জয় লেবাননের বিপক্ষে ৪-২ গোলে। সিউলের প্রেসিডেন্ট কাপে যোগদানকারী ভারতীয় দলে বাংলা থেকে ৫ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলের অধিনায়ক ছিলেন বাংলার প্রদীপ চৌধুরী।

দর্শক

ইস্টবেঙ্গলের তিন খেলোয়াড় শ্যামল ঘোষ ভাস্কর গাঙ্গুলি এবং চিন্ময় চ্যাটার্জির সঙ্গে অশ্রু চ্যাটার্জি (ছবির বাঁদিকে) এবং মণি দে (বাঁদিক থেকে চতুর্থ)।

যবনিকার অন্তরালে

এক বছর বিরতির পর এবার আবার কলকাতার ফুটবল লীগ জয় করল ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব। উনিশশো সাতাত্তরের লীগে তারা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান। ১৯৭০-৭৭ এই আট বছরে লীগের শিরোপা সাতবারই লাল-হলুদের দল ইস্টবেঙ্গলের মাথায় উঠেছে। সত্তরের ফুটবল দর্শক কাঁপাচ্ছে, মাতাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের তরুণ যোদ্ধারা। এখন এই মুহূর্তে কলকাতার ফুটবলে যেন চলেছে ইস্টবেঙ্গলের এজ।

মাঠে দেহের শেষ রক্তবিন্দু ব্যয় করে খেলোয়াড়রা কিনে নিচ্ছেন হাজার হাজার সমর্থকের বহু ঈপ্সিত—জয়। অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিন্তার তরঙ্গ বইয়ে প্রশিক্ষক ঠিক করছেন সাফল্যের স্ট্র্যাটেজি। ক্লাবের অফিস রুমে টেবিলের সামনে বসে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে কর্মকর্তারা ছকে নিচ্ছেন পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্ট। সকলের মিলিত প্রয়াসে আসছে সাফল্য। আসছে সম্মান। হাউই-এর তেজে জয়ধ্বনি উঠছে আকাশে। আনন্দে হাট চারিদিকে।

কিন্তু এই সাফল্যের কিছু কুশীলব থেকে যান যবনিকার অন্তরালে। হয়ত জয়ের ভিত্তি গড়তে তাঁদের অবদান সামান্য। তবু কে ভুলতে পারে সেতুবন্ধনে কাঠ-বিড়ালীর কাছ থেকে রামচন্দ্রের সাহায্য নেবার কথা? নেপথ্যে থেকে যারা 'সাক-সেসের' কাঠামো গড়েন তাঁরা অন্ধকারেই থেকে যান। মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়ত জানতে পারেন তাঁদের কথা। তাদের অব-দানের কথা। কিন্তু গরিষ্ঠাংশের কাছেই তারা অপরিচিত থেকে যান। পর্দার অন্তরালের মানুষ হয়েই জীবন কাটান তাঁরা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই স্মরণীয় সাফল্যে যারা নেপথ্যে থেকে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন, আসুন, আজ তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

মাঠে ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে, জল-ঝড়-প্লাবন-ভূমিকম্প যাই হোক না কেন একজন মাঠে আসবেনই। খেলার সময় সাইড লাইনের ধারে সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন উনি। হঠাৎ চোট পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের কোন প্লেয়ার মাঠের মধ্যে বসে কিংবা শুয়ে পড়লেই হল....একশো মিটার স্প্রিন্ট টানার ভঙ্গীতে কৃশতনু মানুষটি ইথাইল ক্লোরাইড কিংবা স্পিরিটের বোতল নিয়ে ছুটবেন মাঠের মধ্যে। সবার আগে আহত খেলোয়াড়ের কাছে পৌঁছান চাই-ই ওঁর। পরিচর্যা করে খেলোয়াড়টিকে সচল করতে না পারলে যে ওঁর জীবনই বৃথা।....

জানেন, যখন দেখি আমার ম্যাসাজের পরও প্লেয়ার উঠতে পারছে না, মাঠে স্ট্রেচার ঢুকছে। তখন বড় দুঃখ হয়। মনে হয় এই চোটটা ওর না লেগে তো আমারও লাগতে পারত।

সোদপুরের পূর্বপল্লীর বাসিন্দা মণি দে ইস্টবেঙ্গলের অবৈতনিক ম্যাসিওর। এখন বয়স বেয়াল্লিশ। ছোটবেলা থেকেই ইস্টবেঙ্গলের ভক্ত। ম্যাসাজ করার কলা-কৌশল শিখেছেন বউবাজার ব্যায়াম সমিতিতে। গুরু ওঙ্কার ব্যানার্জি। ১৯৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রদীপ ঘোষ মণি-বাবুকে নিয়ে আসেন হকি খেলোয়াড়দের ম্যাসাজ করার জন্য। তখন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ক্যাপ্টেন প্রশান্ত সিংহ। হকি প্লেয়ারদের ম্যাসাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মণিবাবু প্রশান্ত সিংহ আর তাঁর দল-বলকে দেখে ভাবতেন — আমি কি ফুট-বলারদের ম্যাসাজ করার সুযোগ পাব না?

মণিবাবুর স্বপ্ন সফল হল ১৯৬৮ সালে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তখনকার ফুটবল সম্পাদক সুবীর ঘোষ ওঁকে নিযুক্ত করলেন ফুটবল দলের ম্যাসিওর হিসেবে। সেই শুরু। তারপর থেকে আজও অক্লান্ত-ভাবে মণিবাবু কাজ করে চলেছেন। আমার

প্রশ্নের উত্তরে বললেন,—এটা তো আমার পেশা নয়, নেশা। আমার ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। খেলোয়াড়দের বডি ফিট রাখতে যেটুকু কাজ আমি করতে পারি, সেটাই আমার একমাত্র আনন্দ। খেলোয়াড়রাও আমাকে ভালবাসে। আমাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করে। কোচদের নির্দেশে আমি খেলোয়াড়দের খোটখাট চোট সারাতে সাহায্য করি। ওদের ভালবাসা পাওয়াটাও বড় কথা নয় কি?

মণিবাবু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে ডুরাণ্ড-বোডার্স, ডি সি এম এমন কি দূর-দূরান্তে প্রদর্শনী ম্যাচের আসরেও হাজির থেকেছেন। ১৯৭৫ সালে ডি সি এম টুর্নামেন্টের একটি গল্প শোনালেন উনি। সেদিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলা কোরিয়ার একটি দলের। প্রদীপ ব্যানার্জি তখন কোচ। শ্যাম থাপার পায়ে চোট। শ্যাম সকাল থেকেই বলছে যে এই চোট নিয়ে খেলা সম্ভব নয়। প্রদীপ ব্যানার্জি মণিবাবুকে বললেন শ্যামকে বিকেলের মধ্যেই ফিট করতে হবে। ব্যাস, লেগে পড়লেন মণিবাবু। চলল গরম জল ঠাণ্ডা জল দিয়ে হট-কোল্ড ম্যাসাজ। বিকেলে শ্যাম হাণ্ডেড পার্সেন্ট ফিট। খেলতে নামল অবশ্য যন্ত্রণা নিবারক ইঞ্জেকশান নিয়ে।

এখন ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিসের দিন খুব সকালে মাঠে চলে আসেন মণিবাবু। প্র্যাকটিসের শেষে চলে ম্যাসাজ। ম্যাসাজ করার পর ক্লাবেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসে। আর খেলার দিন বিকেলে মাঠে। এ হল মণিবাবুর রুটিন, যিনি নীরবে-নিভৃতে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের সচল রাখার কাজ করে চলেছেন।

আর এক নীরব কর্মী ইস্টবেঙ্গলের গোঁড়া সমর্থক শোভাবাজারের ছাব্বিশ বছরের যুবক অশ্রু চ্যাটার্জি। অশ্রু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্লেয়ারদের কেয়ারটেকার। সকালে কে কে প্র্যাকটিসে আসছে, কেইবা আসছে না তার হিসাব খাতায় তুলে রাখা, প্লেয়ারদের খাওয়া-দাওয়া তত্ত্বাবধান করা, মেন্যু কি হবে তা ঠিক করে দেওয়া, অসুখ করলে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া, আউট স্টেশান প্লেয়ারদের কি চাই না চাই তার ফর্দ তৈরী করা খেলার খবর খেলোয়াড়দের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া—এই সব দায়িত্ব অশ্রু স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ সবের জন্য কি পান? আমার প্রশ্ন শুনে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন অশ্রু, —কি পাই মানে? ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমার প্রাণ। সেই ক্লাবের জন্য কিছু করতে পারাটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া খেলোয়াড়েরা কর্মকর্তারা আমাকে দারুণ ভালবাসেন, এটাই তো একটা বিরাট পাওয়া।

সেই চিত্ত নন্দ বলবার যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন অশ্রু তখন থেকে খেলা দেখছেন। আট আনার গ্যালারির নিয়মিত দর্শক ছিলেন উনি। প্রতিদিন খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল টেন্টে চলে আসতেন অশ্রু। মালিদের হাতে-পায়ে ধরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে অবাক চোখে খেলোয়াড়দের দেখতেন। ১৯৭৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের সম্পাদক অমল ভট্টাচার্য অশ্রুর একনিষ্ঠতা দেখে ওকে প্লেয়ারদের দেখাশোনা করার কাজ দেন। বেকার অশ্রু এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন মেম্বারও বটে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আর এক তরুণ কর্মী নিউ আলিপুরের বাসিন্দা মনোতোষ মণ্ডল। নিজে ভগবান বিশ্বাস করুন চাই না করুন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিটি খেলার দিন কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসা চাই ওর। পুজো অবশ্যই যায় ক্লাবের তরফ থেকে। প্রসাদী সিঁদুর আর ফুল-বেলপাতা নিয়ে ক্লাবে ফেরেন মনোতোষ। খেলোয়াড়দের আশীর্বাদী ফুলে মাথা ছুঁইয়ে মাঠে নামেন। মনোতোষও বেকার। ঝড়-জল-বৃষ্টিতে কালীঘাটে যাওয়ার ব্যাপারে কামাই নেই মনোতোষের। কাউকে কিছু বলতে হয় না খেলার দিন ফুল বেলপাতা নিয়ে মনোতোষ ঠিক হাজির হবেনই হবেন।

এবার যবনিকার অন্তরালের কুশীলব পরিচিতিতে ইতি টানার আগে আর এক-জনকে পাঠকদের দরবারে হাজির করছি। ইনি অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বেতনভুক কর্মী। প্রধান মালি শংকর পিল্লাই। প্রতিটি খেলোয়াড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর উত্তর পঞ্চাশ প্রৌঢ় শংকরের। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শংকরের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়েই বিরাজ করছে। কোন খেলোয়াড় ক্লাব ছাড়লে শংকর হাউ হাউ করে কাঁদে। ভাল প্লেয়ার ক্লাবে এলে শংকর গান গেয়ে নাচে। খেলোয়াড়দের সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্য শংকর প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। কোন খেলোয়াড় অসুস্থ হলে তার শয্যা-পার্শ্বে শংকর সবার আগে ছুটে যায়।

এঁরা সবাই নেপথ্য কর্মী। যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে যে-যার কাজ করে যাচ্ছেন। এই সব কুশীলবদের কাছ থেকে টুকরো টুকরো আলো নিয়েই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আজ ভাস্বর, পাদপ্রদীপের আলোকে প্রতিভাত।

গৌড়-মল্লার

।। শিক্ষকমণ্ডলী ।।

কণ্ঠসঙ্গীত : ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, রূপমালা ঘোষ, চিত্তপ্রিয় মুখোঃ, তপন চক্রবর্তী, শ্যামলী নাগ।

যন্ত্রসঙ্গীত : গোকুল নাগ, শীতল অধিকারী, প্রফেসর অনিল ভট্টাচার্য, দীপক মুখার্জি। নৃত্য : সুনীত বসু

অংকন : কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী (উপদেষ্টা) সমীর মণ্ডল

আবৃত্তি :

নন্দিতা নাগ ও দেবদুলাল বন্দ্যোঃ

রামধনু আসর

শিশুদের নাচ, গান, তবলা, আবৃত্তি ও ছবি আঁকা। একই বেতনে যে কোনো তিনটি।

২০।এ, অক্রুর দত্ত লেন 'হিন্দ' সিনেমার নিকট। ফোন : ২৪-১৫৭৫। অনুসন্ধান —রবিবার সকাল ৮টা—১২টা, অন্যান্য দিন বিকেল ৫টা—৮টা।

বি/৩০৯৬

প্রকাশিত হোল সেই চিরন্তন পত্রিকা
একুশ বছরের পুরনো তবু চিরনতুন
বাংলা ভাষার অভিজাত এবং মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—

সপ্তর্ষি

শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন—

উপন্যাস —শক্তিপদ রাজগুরু ॥ পিনাকীরঞ্জন গুহ

বিশেষ রচনা—ডঃ অমিয় চক্রবর্তী ॥ শ্রীপান্থ ॥ কমল দাস

কবিতা —নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

বড় গল্প —সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য।

গল্প —হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শেখর বসু, সমীর রক্ষিত, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সুবৃহৎ সংখ্যাটির দাম মাত্র পাঁচ টাকা।
শহরের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

সম্পাদকের দপ্তর : বাটানগর, ২৪ পরগণা
শহরে যোগাযোগের দপ্তর : লিপিকা, ৩০।১-এ, কলেজ রো, কলকাতা—৯

বাংলার বাইরে বাঙালী

দিল্লী

আনন্দ পর্বত। পূব থেকে ঢাল বেয়ে দেশবন্ধু গুপ্তা রোড় সোজা এসেছে সত্যিকারের এক ছোটখাট পর্বতের পাদদেশে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এই পর্বত উত্তর-দক্ষিণে ঈষৎ ছড়িয়ে। তারই গা বেয়ে পথ। ইঁটের তৈরি বাড়ি। সংকীর্ণ পথ, গলি-ঘুঁজি। সাইকেল ঠেলে ঠেলে উঠতে হয়। নামবার সময় কষে ব্রেক ধরতে হয়। ঘিঞ্জি এলাকা। সামনের সমতল গাড়ি ঘোড়া আর মানুষে শিলিগুড়ির ব্যস্ত হিল কার্ট রোডের মতো কর্মব্যস্ত।

দিল্লির প্রায় কেন্দ্রস্থলে এই আনন্দ-পর্বত। পোস্টাল জোন, নয়াদিল্লি : পাঁচ। এরই অদূরে ডানপাশে দেবনগর, বাম পাশে রোহতক রোড়। দিল্লির অন্যতম জনবহুল এলাকা। অবশ্য পাঁচিল ঘেরা পুরানো দিল্লির মতো নয়। এখানে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস। সরকারী-বেসরকারী চাকুরে, ছোটখাট দোকানদার আর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। পূবে, আরও একটু এগিয়ে, আজমল খান রোড। বিখ্যাত করোল বাগ বাজার। দক্ষিণ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক ছেড়ে দিলে অন্যত্র যে কটি মুষ্টিমেয় এলাকায় বাঙালী নজরে পড়ে এই এলাকাটা তার অন্যতম।

করোল বাগে বঙ্গীয় সংসদ আছে, বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী আছে। আছে সংসদের অনিয়মিত পত্রিকা — 'অজন্তা।' এবং আছে বেশ কিছু সংখ্যক সভ্য। বাঙালী। তবে এরা দেবনগরের সরকারী-বেসরকারী আবাসিক এলাকা ছাপিয়ে আনন্দ-পর্বতের পাদদেশ অবধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও পর্বতের গায়ে কেউ বাসা নেন নি, এটাই সকলের জানা এবং শোনা।

টেলিভিশন মানেই

"টেলিকিং"

ও "ক্রাউন"

অর্থাৎ টি ভির রাজা।

আজই আসুন, দেখুন শুনুন ও কিনে খুসী হোন।

এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সজিস্টার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ষ্টীরওফ্রাম ইত্যাদি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩

ফোন : ২৪-৪৭৯৩

এক রবিবারের সকালে এই রোম্যান্টিক 'গ্রামটা' ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

দূরে, পূবে, করোল বাগ বাস টার্মিনাসের ঢাল বেয়ে নেমে আলতো বাঁক নিলেই দিগন্ত জুড়ে আনন্দ-পর্বতের আকাশ ক্যানভাসে বোন্দুরে ঝলমল করা ফুলের মতো যেন বাড়িগুলোকে দেখা যায়, আসলে তা কোন রোম্যান্টিক পরিবেশের বিষয় নয়। কলকাতার কোন ঘিঞ্জি বস্তী-এলাকা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় যে মানুষ, যে গন্ধ, যে বর্ণ চোখে পড়ে—এখানেও তেমনি। তবে দৃশ্যত তা একটু আলাদা এই যা। প্রবাসে এসে এখানে কেউ বাসা নেবে তা মনে হয় না। প্রথমটা তাই হতাশ হতেই হল।

কিন্তু অর্থনীতির একটা বিচিত্র রূপ আছে। ভাষা, জাতি, বর্ণ সবকিছুকে সে এক করে দিতে পারে তার এক-একটি বরান্দের লাইন টেনে। তাই খাটিয়ায় শুয়ে থাকা এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ অবাঙালীর পাশে বসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে এক অর্ধ-নগ্ন শীর্ণতম, জীর্ণতম 'বাঙাল'-কে কথা বলতে দেখা গেল কয়েক পা এগোতেই। পাশে দুটি ছেলে ছেঁড়া ইজের পরে মাটি আর কাঠ নিয়ে কী সব আবোল-তাবোল খেলছিল। ওদের মধ্যে কথা হচ্ছি না, তাই মুশকিলে পড়লাম। 'বাঙালে'র বেটা কোন?

যতীন্দ্র পাল। মাঝ বয়েসী। ওর ছেলেপুলে নেই। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, তাই কাজে বেরোয় নি। জাত ব্যবসা নয়—তবু নিরুপায় হয়ে চিরুণী-কাঁচি নিয়ে নাপিতের কাজ করে। বউ আছে। বাড়ি বাড়ি কাজ করে, তাই দেখা হল না। গায়ে পড়েই যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ওর অনিচ্ছাতেও ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলাম। ছোট্ট উঠানের চারপাশে উঁচু-নিচু ঘর। চার-পাঁচটি পরিবার। ওরা স্বামী-স্ত্রী একটি ঘরে থাকেন। ত্রিশ টাকা ভাড়া। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ি। তাই বোন্দুরে আসার ফাঁকটুকু চট করে আবিষ্কার করতে পারলাম না। এই জীবন চেনা। ঘরে না ঢুকে বেরিয়ে এসেছি। যতীন্দ্রবাবুর সন্দেহ কাটে না কিছুতেই। বারে বারে বললাম, 'যেতে যেতে দেখলাম আপনি বাঙালী, কথা বলার লোভ হল। পাহাড়ী জায়গা তাই দেখতে বেরিয়েছিলাম।'

যতীন্দ্রবাবুর দৃষ্টিটা আগাগোড়াই আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছিল। আমি ওঁর পিঠটা জড়াবার ভঙ্গীতে স্পর্শ করে একবার বললাম, চলুন নিচে নামি। কিছু বললেন না, আমার সঙ্গে নামতে শুরু করলেন। এক সময় বলেই ফেললাম, আমাকে অবাঙালী ভাবছেন আপনার?

নিটোল কামান ভাঁজ ভাঁজ গালটাতে আরও ভাঁজ ফেলে হাসলেন, যেন মনে মনে জিভ কাটলেন, কী যে বলেন বাবু। আসলে আপনে তো বলেন নাই ক্যানো আসলেন, তাই ভাবতেছিলাম....

খানিক পরে যতীন্দ্রবাবু হাল্কা হলেন। আমরা সমতলে, বাস স্টপের কাছে এক রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছিলাম। ধুতিটাকে গায়ে জড়িয়ে তখন তিনি জামা করেছেন। আমার দেওয়া সিগেট্রটা টানছেন। বললেন, ঘরে জোয়ান বউ থাকলে একটা ভয় থাকেই। এমনিতে এই পাড়াটা চোর-বদমাশের। রাত করে পরিবার তাই কখনো বাড়ি ফেরে না। তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

'আমাকে বাঙালী দেখেও আপনার ভয় করছিল?'

যতীন্দ্র পাল মাথা নিচু করে হাসলেন, ই-চায়ের গ্লাস ধতা হাতটাকে হাঁটুর ভরসায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, সত্যি বলতে কি, ওই কারণেই ভয়টা হয়েছিল আরও বেশি।

যতীন্দ্রের স্ত্রী লতা। বছর চব্বিশ-পঁচিশ। স্বাস্থ্য ভালো। রং ফর্সা। পূর্ণ যৌবনবতী। বাঙালীর বাড়ি বাড়ি কাজ করে। প্রথম প্রথম এখান থেকে মাইল চার-পাঁচ হেঁটে গোল মারকেটে কাজ করতে যেত। পরে কাছাকাছি এলাকায় কাজ পেয়ে দূরে আর যায়না। গতা নাকি প্রায়ই এসে কান্নাকাটি করে, গালাগাল দেয় বাঙালী ছেলেগুলোকে। রাস্তায়, পাড়ায় প্রায়ই নাকি নানাজনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাতে রাত কাটাবার ইঙ্গিত থাকে। পয়সার ইঙ্গিত।

যতীন্দ্রের কাছেই আরও শুনলাম, অবাঙালী ছোকড়ারা নাকি আরও কদর্য মন্তব্য করে বসে। তাতে আমাদের দুঃখ নাই। ওদের দেশে আসছি, আমাদের সামলায় চলতে হবে। কিন্তু বাঙালী ও রকম করলে রাক হবে না?'

আমি যতীন্দ্রবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বাঙালী-অবাঙালীর প্রশ্নটা এখানে অবাস্তব। ছেলে-ছোকড়ারা এমন করবেই। সরখানেই করে। কলকাতাতেও কম না। যতীন্দ্রের যুক্তিটা অন্য। ছেলেমানুষী এবং সেই আদ্যিকালের বস্তাপচা দাবি। তার বক্তব্য : বিদেশে বাঙালীকে বাঙালী দেখবে না তো কে দেখবে?

আমি নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম এমন নয়। তবে এটা ঠিক, একটি সংগ্রামী প্রবাসী বাঙালীকে খুঁজতে গিয়ে সে কাজ পড়েই রইল। যতীন্দ্রের ছেলেমানুষী দাবিটা সব নড়বড়ে করে দিল।

গোলাপ বৌ ছবিতে শর্মিত : সন্ধ্যা

সিনেমা

বাংলা চলচ্চিত্র ও তার নায়ক নায়িকা

কলকাতার হলগুলোতে এখন পুরনো বাংলা ছবি বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নতুন ছবির তুলনায় ঐসব ছবি সেলও দিচ্ছে ভাল। এর মূলে আছে তার গল্প, অভিনয় ও আনুষঙ্গিক কিছু দৃশ্য। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা সিনেমার প্রধান উপজীব্য ছিল প্রেম। বাঙালী দর্শকেরা প্রধানতঃ রোমান্টিক মেজাজের। ভাব, ভালবাসার ছবি তাঁরা বেশী পছন্দ করেন। তাই ঐ ছবিগুলোতে এত ভিড়। অবশ্য আজকাল যেসব ছবি হচ্ছে, তাও মূলতঃ এইজাতীয় হলেও তা দর্শকদের আনুকূল্য পাচ্ছে না।

সময়ের বিবর্তনে আমাদের জীবন-ধারনের পদ্ধতি পাল্টে যায়। দশ পনের বছর আগে একটি ছেলে কোন মেয়েকে যেভাবে ভালবাসা জানাতো, আজ তার পুনরাবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ চলচ্চিত্রকারেরা এ কথটা মনে রাখেন না। কিন্তু এর চেয়েও যে বড় সমস্যা তা হল রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করার মতো শিল্পী এখন বাংলা চলচ্চিত্রে নেই। কথাটা অত্যন্ত তেতো হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে বর্তমানের বাংলা ছবিতে শুধু নায়ক নায়িকা কেন, চরিত্রাভিনেতারও বড় বেশী অভাব। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র বা ছায়াদেবীদের পর ঐ শ্রেণীর কোনো শিল্পী বাংলা সিনেমায় আসেন নি। ছবি বিশ্বাসের পরে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রৌঢ় চরিত্র বাংলা সিনেমায় আর দেখাই যায় না।

পরবর্তীকালে বিকাশ রায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, সন্ধ্যারানীদের অনেকখানি দেওয়ার থাকলেও পরিচালকদের অজ্ঞতার জন্য তাঁরা ঠিকভাবে ব্যবহৃত হননি। ফলে তাঁদের শিল্পীজীবনের অনেকখানি বীভৎস টাইপ চরিত্র করতে করতেই কেটে যাচ্ছে। অন্যদিকে যেসব নায়ক নায়িকাদের সঙ্গে ওঁরা কাজ করেন, তাঁদের বেশীরভাগের অভিনয়ের মান এত দুর্বল যে পরিচালক তাঁদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে এইসব শিল্পীদের আড়াল করে রাখতে বাধ্য হন। অবশ্য বাংলা চলচ্চিত্রে এখন যথার্থ নায়ক বা নায়িকা নেই বললেই চলে।

বাংলা সিনেমার প্রথম যুগে প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, কানন দেবী, রবীন মজুমদারেরা চলচ্চিত্র জগৎটাকে ভরিয়ে রেখেছিলেন। ওঁদের পরবর্তীকালে অসিতবরণ উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী অনিল চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জিরা এসে গেলেন। অভিনয়ে এঁরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। ফলে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণই থেকে গেল। চলচ্চিত্র কোথাও থমকে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল না। তারপর এঁদের পরে পরেই এলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, মাধবী মুখো-

পাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অপর্ণা দাশগুপ্তেরা। কিন্তু তারপর?

অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে তারপর অনেকেই এসেছেন। শুভেন্দু, সাঁমত, স্বরূপ, রঞ্জিত, দীপঙ্কর, সন্তু, আরতি, সুমিত্রা, মিঠু, রাজশ্রী, জয়শ্রী এমনি আরো অনেকে। কিন্তু নায়ক - নায়িকা, বিশেষ করে রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা হিসেবে কেউই স্বীকৃতি পাননি। অভিনয়ের ঘাটতি ও শারীরিক সৌন্দর্যের অভাব এইসব শিল্পীদের বিশেষ করে নায়কদের প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোম্বাই চলচ্চিত্রের বর্ষীয়ান শিল্পীদের লক্ষ্য করুন, দেবানন্দ, ধর্মেন্দর, মায় দিলীপকুমার পর্যন্ত—এঁদের শরীরে বাড়তি মেদ একটুও নেই। অথচ কবছর আগের সাঁমত, রঞ্জিত, দীপঙ্করদের সঙ্গে বর্তমানের এঁদের তুলনা করলে দেখা যাবে, অভিনয়ের মান বৃদ্ধির চেয়ে ওঁরা শরীরের ওজন বাড়াতে বেশী মন দিয়েছেন নতুন যেসব অভিনেতা চলচ্চিত্রে এসেছেন, তাঁরা অনেকেই অভিনয়ের চেয়ে শরীর দর্শনেই বেশী উৎসুক। অমৃত সিনেমা বিকাশ জানা তিন এর মূলে তাঁদের অভিনয়ের অজ্ঞতা ও পরিচালকের পরিচালনার অভাব। ফলে আজকের চলচ্চিত্রে এই তরুণ নায়ক নায়িকাদের চেয়ে পুরোনো চান্সপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকারাই বেশী সুযোগ পাচ্ছেন। এবং তা ২৫ বছরের যুবকের চরিত্রে। কেননা অভিনয় ব্যাপারটা ওঁরা বেশী বোঝেন। কিন্তু দর্শকেরা ঐ একই মুখ ও একজাতীয় অভিনয় বারবার দেখে দেখে ক্রমশঃ হতাশ ও বিরক্ত হচ্ছেন।

প্রকৃত বলতে গেলে সৌমিত্র, মাধবীর পরে বাংলা সিনেমায় আর কোন পরিপূর্ণ নায়ক নায়িকা আসেন নি। এই বাংলায় যেখানে প্রায় ছ' কোটি লোকের বাস, সেখানে কি অভিনয়-জ্ঞান ছেলেমেয়ের এতই অভাব।

মনে হয় তা নয়। আসলে আমাদের স্টুডিওপাড়া বিজ্ঞ; উল্লেখযোগ্য কীর্তির জন্য যে খ্যাতি লাভ করেছে, তার ফলে সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীরা আসতে ভরসা পান না। অভিনয় করতে এসে পাছে সর্বস্বান্ত হয়ে যান, এরকম কিছু ভাবনা তাঁদের আসতে দেয় না। যদিও এজাতীয় ঘটনা খুবই কম, তবু লোকমুখে এর প্রচার এত বেশী হয়েছে যে তা যতদিন না ভেঙ্গে যায়, যতদিন না এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ততদিন এই ভয় থাকবেই।

অন্যদিকে এর মধ্যেও যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁরা প্রকৃত পরিচালকের অভাবে এমনভাবে ব্যবহৃত হন যে অভিনয় ব্যাপারটাই তাঁদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়।

বাংলা চলচ্চিত্রের ঘন অকাল-বার্ধক্য। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের আড্ডা। নতুন কোন পরিচালক, কলাকুশলী অভিনেতা - অভিনেত্রী এখানে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারেন না। অথচ এই চলচ্চিত্রকে আবার যৌবনে ফেরাতে হলে প্রথম প্রজন্মের দুরন্ত গতিসম্পন্ন বেশ কিছু তাজা মুখ যাঁদের সমস্ত কাজের মধ্যে থাকবে এক সৃষ্টিশীল উদ্দামতা। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কি তাঁদের আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে না?

বিকাশ জানা

শ্রীমুকুল দত্তের কাছে একবারও যাঁরা শিখেছেন; তাঁরা বলেন উনি নির্ভরযোগ্য এবং দায়িত্বশীল।

কাননদেবী যদি ছবি করতেন...

না, অভিনয় নয়, পর্দায় আর নিজের মুখ দেখানোর কোনো বাসনা নেই তাঁর। এক সময়ে তাঁর নামে বুকে কাঁপন লাগত গোঁফের সরু রেখায় উদ্ভাসিত যুবক কুলের, তাঁর সুরেলা গলার গান বাঁশী হয়ে বাজত অনেক পুরুষের বুকে। এখনও যে কোন কোন বয়োবৃদ্ধদের তেমন অনুভূতি হয় না তা নয়। বেতার কেন্দ্র থেকে শেষ উত্তর— মুক্তির গান বাজলে কেউ কেউ নস্টালজিয়া রোগাক্রান্ত হন, টি-ভির পর্দায় পুরোনো সেই কোকিল কন্ঠীর মুখটি ফুটে ওঠলে এখনও আথালি-পাথালি করা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে হয়ত অনেকেরই।

তিনিই আবার টালিগঞ্জের স্টুডিওতে ফিরে আসার বাসনা বুকে নিয়ে বসেছিলেন। ক্যামেরা সামনে মুখে মেক-আপ নিয়ে তিনি যেতেন না, তিনি আসতেন প্রোডিউসার হিসাবে, ছবি তৈরীর মূল কারিগর হয়ে।

কিন্তু না, সে বাসনা পূর্ণ হলো না কানন দেবীর। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার বিজয়িনী এখন অসুস্থ শরীর আর অভিমান ভরা মন নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। প্রাণের প্রিয় স্টুডিও চত্বরে ফিরে যাবার বাসনা তাঁর এমন মরা নদী। কিছুদিন আগে মনস্থ করেছিলেন আবার ছবি তৈরী করবে কেমন হয়? শ্রীমতী পিকচার্সের নাম এখনও অমলিন। সরকারকে প্রদায় প্রশ্রয়

৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী; কলিকাতা—৬

—ঃ ১৩৮৪'র বিস্ময় ঃ—

এই প্রথম দ্বিমাত্রিক মঞ্চে অভিনয়

আপনারা আমার ॥ প্রতিটি মানুষের ভুখা পেটের

রচনা, নির্দেশনা, গীতিকার ও সুর ঃ স্বপন সেনগুপ্ত

'আন্তিগোনে' প্রসঙ্গে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[১৯৭৫-এর অগাস্ট মাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নান্দীকার প্রযোজিত 'আন্তিগোনে' নাটকটি দেখতে এসেছিলেন অ্যাকাডেমি হলে। তার কয়েক দিন পরে 'আন্তিগোনে'র নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষকে সুনীতিকুমার এই চিঠি-টি লেখেন।]

প্রীতিভাজনেষু, ২৬-৮-৭৫

বড়ো চিঠি লিখতে পারছি না—সংক্ষেপে আপনাদের "আন্তিগোনে" অভিনয়ের প্রশংসা করে দু-কথা লিখছি। নাটকটির নাম দেখে মনে হয়েছিল বুঝি বা বইখানি সোফোক্লেস্-এরই গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবাদ। কিন্তু অভিনয়ের গোড়াতেই বোঝা গেল যে, এখানি একটি সম্পূর্ণ বই—মূলে ফরাসিতে লেখা, আধুনিক ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার ঝাঁ আনুইয়-এর রচনা। কোরস্-এর ভূমিকায় ভারতীয় পোষাকে যে ভদ্রলোক অভিনয় করছিলেন, প্রথমটায় ধরতে একটু দেরি হয়েছিল। পরে দেখলুম, বইখানি গ্রীক ট্র্যাজেডির থেকে অন্য জাতের হলেও, বেশ শক্তিশালী রচনা। যদিও একটু বেশি রকম রাজনৈতিক বা আবহগতের প্রচারের বা বিচারের চেষ্টা কতকটা রসহানি করছিল—আমার জ্ঞানগোচর মতো। তিনজন প্রহরীর মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা সুবিধার লাগে নি।

কিন্তু শ্রীমতী কেয়া চক্রবর্তী আর শ্রীযুক্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়—অদ্ভুত, অনবদ্য। এই দুই জনের বইখানিকে যে একটা মর্যাদা দিয়েছে, তার আর তুলনা হয় না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মতো তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা বেশ গুছিয়েই বলেছেন—আধুনিক মানুষের মনকে নাড়া দেয়। বুড়িতে ফিরে এসে আবার বহু বৎসর পরে সোফোক্লেস্-এর "আন্তিগোনে" (ইংরেজি তরজমায় আর শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বাঙলা অনুবাদে—মূল গ্রীক বইখানি হাতের কাছে রেখে) পড়া গেল, এবং এতে এক নোতুন ধরনের আনন্দ, নোতুন আলো পাওয়া গেল। গ্রীক ট্র্যাজেডি পুরানো হয় না, এবং তার শাশ্বত আবেদন মলিন হয় না।

পরে Team Annouith এর ফরাসি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়ে ফেললুম। এ বইখানিও মোটের উপর ভালোই লাগল। আর এই পড়ার ফলে আপনাদের অভিনয়ের সার্থকতা আরও ভালো করে উপলব্ধি করতে পারলুম।

অন্তিগোনের আর ক্রেওন্-এর অভিনয়-গৌরব ভোলবার নয়—অভিনেত্রী আর অভিনেতা দুজনকেই আমার হার্দিক অভিনন্দন আর প্রীতি জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পোষাকের জন্যেও তারিফ করছি। ক্রেওন্-কে সত্যিই হিরোইক এজ এর একজন গ্রীক বীরপুরুষের মতোই দেখাচ্ছিল। আন্তিগোনে মাধুর্যের আর ভীষণতার, আশার আর নৈরাশ্যের এক অপূর্ব সমাবেশ রূপে সকলেরই মন হরণ করেছিলেন—ক্রেওনকে যে নৈতিক দিক থেকে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল, সে-কথা সকলেই অনুধাবন করেছিলেন।

নান্দীকার-এর এই প্রযোজনা বিশেষভাবেই প্রশংসার্হ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করে তোলার অন্যতম কারিগর তো তিনিই।

একের পর এক তিনি তৈরী করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বড়দিদি, শুভদা, দেবদাস, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত অন্নদাদি।

শ্রীমতী পিকচার্স একটা সময় "ভালো" ছবির কারখানা ছিল বলা যায়। সেই কানন দেবী আবার আসতে চাইছিলেন ক্যামেরার পেছনে, সামনে নয়। কিন্তু হলো না। কেন জানেন?

এক কথায় বলতে গেলে আজকের ফিল্ম পাড়ার হাওয়া তাঁর ভালো লাগছে না তাই। সত্যিই, ঘটনা অন্য কিছু নয়। কানন দেবীই বললেন—'আমরা যে পরিবেশ, যে শৃঙ্খলা, যে নিষ্ঠা, যে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করেছি আজ তা নেই। একবারে মন্দের মত পেশাদারী মন নিয়ে কাজ করতে আমি পারব না।'

দু-একবার কয়েক পা এগিয়েও ছিলেন, শিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু ভাতের হাঁড়ির একটা দানেটা চাল টিপেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ফিল্মের হাওয়া কোন্ দিকে। ক্ষোভের সুরে কানন দেবী বললেন—'সেট সেজে রেডি হয়ে বসে আছি, হঠাৎ নায়ক ফোন করে হয়ত জানাবেন আজ তাঁর মুড্ নেই শুটিং হবে না। এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারব না। আমরা তো এমন পরিবেশে কাজ করিনি। গায়ে ধুম জ্বর নিয়েও আমরা শুটিং করেছি।' তিনি আরও বললেন—'আন্তরিক নিষ্ঠাও তো দেখি না আজকাল। শুধু টাকার সঙ্গেই যেন সম্পর্ক। কাজের কথা পরে।'

বললাম—আপনি ছবি শুরু করলে নিশ্চয়ই কেউ এমন ব্যবহার করবে না। আপনাকে শ্রদ্ধা সম্মান করে সবাই।' কানন দেবী হাসলেন কথাটা শুনে। বললেন—'আমো তো তাই, শ্রদ্ধা-সম্মান আলাদা জিনিষ, আর প্রফেশনাল ব্যবহার আলাদা, দুটোকে এক করতে পারে কজন?

এক পাহাড় অভিযোগ আর অভিমানের বোঝা নিয়ে কানন দেবী তাই এখন নীরব। ছবি করার কথা আর ভাবছেন না। ঠাকুর গোপালের সেবায় নিবেদন করেছেন নিজেকে। সময় কাটছে গোপালকে নিয়েই। এই গোপালের পুজো করতে বসেই তিনি দিল্লীর চিঠিখানি পেয়েছিলেন। তাই এই জাতীয় সম্মান তাঁর কাছে গোপালের দেওয়া পুরস্কার যেন।

তিনি নির্লিপ্ত চিত্তেই এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। পুরস্কার নিতে দিল্লীও যাবার ইচ্ছে আছে। শত হোক পুরস্কার-সম্মান পাওয়ার ঘটনাগুলো সব সময়েই আনন্দের, কানন দেবী তাই বললেন—'জীবনে যত শ্রদ্ধা - সম্মান - ভালবাসা পেয়েছি তার শেষ নেই, এই পুরস্কার সেই বোঝাকে আর একটু বাড়িয়ে দিল, পুরস্কারের বোঝা বইতে কার না আনন্দ হয় বলো!'

পূজায়
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সপ্তপদী
ফ্যাসেনী
শাড়ী
বিপণী
৬২, জি. টি. রোড,
(সাউথ) হাওড়া

পাওয়ার পূর্ণতায় তিনি আজ কানায় কানায়। বস্তু জগতের পাওয়া কিম্বা ভাবজগতের পাওয়া দুটি কলসই তাঁর পূর্ণ। জীবনের শেষ আশা আবার ছবি করার বাসনাটি বোধহয় আর পূর্ণ হবে না। এইকুই ক্ষোভ।

নিঃ ধঃ

ফুলশয্যা না শবশয্যা

'সারথি' নামের আড়ালে যিনি বা যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি বাংলা চলচ্চিত্রকে রথ ভেবে নিজেদের তার সারথি মনে করেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়, তিনি ছন্দক। এই ভদ্রলোক সিদ্ধার্থকে বেছে এমন সব দৃশ্যের মুখোমুখি করিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সংসার ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

নাটক নাটক

মঞ্চসফল ও জনপ্রিয়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

চারমূর্তি ৩.০০

শৈলেশ গুহনিয়োগীর

উঁদার পণ্ড বুধোর ঘাড়ে ৪.০০

ভূতের মুখে রাম নাম ২.৫০

ভগবান গ্রেপ্তার ২.৫০

ডাইভোর্স ২.৫০

পলিটিক্স ২.০০

গঙ্গাপদ বসুর

সত্য মারা গেছে ৪.৫০

কিরণ মৈত্রের

বারো ঘণ্টা ৪.০০

এদের রাখবো কোথায় ৩.০০

বিশ পঞ্চাশ ৩.০০

বীরু মুখোপাধ্যায়ের

অদল বদল ৪.০০

দাদা জন্মালেন ৩.০০

এখানে থিয়েটার হবে ৩.৫০

সিটি বুক এজেন্সী

৪৪।১সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ-৯

সারকারিনা মঞ্চে অগ্নিবন্যা নাটকে সুভাষ সরকার : সুলতা চৌধুরী

আমাদের দর্শকদেরও আজ ঐ একই অবস্থা।

পরিচালক সারথি 'ফুলশয্যা'কে একটি বাণিজ্যিক ছবি করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক মানেই কি স্থূল ঘটনার সমাবেশ? নিম্ন মানের হাসিঠাট্টা? চরিত্রদের যখন যা ইচ্ছে করে যাওয়া?

বাঙ্গালী সনাতন দর্শক নাটক ভালবাসেন। এখনেও একাধিক নাটক গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ও আবেগসর্বস্ব। কোনো চরিত্রই এখানে এস্টাব্লিশড্ নয়, তাঁদের পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই সময়ের মানুষের মতো হলেও, তারা যেসব ঘটনার অংশীদার তা গড়ে উঠেছে এক অচেনা কালে, অচেনা জায়গায়। অবশ্য উদ্ভট মস্তিষ্কপ্রসূত ঐসব ঘটনায় এমন প্যাচপেচে সেন্টিমেন্টের টাচ্ আছে যা হয়তো এক শ্রেণীর দর্শকের ভাল লাগতে সাহায্য করবে।

চল্লিশোত্তীর্ণ শিল্পীরা। এখানে ২৫-৩০ বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যদিও মেকাপ ও ক্যামেরা তাঁদের বয়সে পুরোপুরি লুকিয়ে রাখতে পারেনি, তবু এ-ছবির প্রধান সম্পদ ঐ একটাই—তাঁদের অভিনয়, বিশেষ করে অনিল চ্যাটার্জি ও অনুপকুমার। নিজেদের জায়গায় এই দুই শিল্পী আজো অতুলনীয়, তাঁদের বহুব্যবহৃত অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও।

আঙ্গিকে ছবিটিতে প্রচুর দুর্বলতা আছে। ক্যামেরার নড়াচড়ার ভীষণ অনীহা। সম্পাদনায় অনাবশ্যক চমক দেওয়ার চেষ্টা। আবহসংগীতও তাই। গানগুলো আলাদা করে শুনতে খারাপ না লাগলেও, ছবিতে মোটেই সুপ্রযুক্ত নয়, বিশেষ করে সুচন্দ্রার গানটি। সিনেমার নায়িকা, যদি সে প্রেম করে, তাহলে তাকে গান গাইতেই হবে, এই যুক্তিতে কি ঐ গানের প্রয়োগ?

ছবিটির শর্ট ডিভিশানে কিছু গোঁজামিল থাকলেও নানা সাসপেন্স সৃষ্টি করে এখানে গতি আনার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য এর গল্প বা ঘটনার গতি-প্রকৃতি থেকে শেষপর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সিনেমার অনেকটা জায়গা এখনো শরৎচন্দ্রের অধিকারে।

বিকাশ জানা

স্টুডিওর ছবিতে আরতি : সমিত

একটি উপভোগ্য নাটক

শুধু অবসর বিনোদন নয়, আবার হাল্কা হাসির বন্যা বইয়ে দেবার জন্যেও নয় আনন্দ আর সেই সংগে বর্তমান সমাজের একটি বিশেষ চিত্রের পূর্ণ-রূপ তুলে ধরেছিলেন ইনষ্টিট্যুট শিল্পী গোষ্ঠী (কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন-ষ্টিট্যুট) ১ সেপ্টেম্বর ৭৭ প্রেসিডেন্সী কলেজ অডিটোরিয়ামে (বেকার হল) সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক 'অবার্থ' মঞ্চস্থ করে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন নীহার কুণ্ডু। প্রয়োগকৌশলের অভিনবত্বে নির্দেশক তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে অতীতের নাটকগুলির মতই অর্থ নাটককে এক অসাধারণ শিল্প-কর্মে পরিণত করেছিলেন। এখানে নির্দেশকের কল্পনা নিজের প্রতিভার সংগে সুবন্ধ সংমিশ্রনে নির্দিষ্ট বৃত্তের পরিধিতে প্রতিটি শিল্পীর ত্রুটিহীন অভিনয়কে আবদ্ধ রেখেছিল। এতটুকু বাড়াবাড়ি ছিল না, সমগ্র নাটকটি ছিল একটি বলিষ্ঠ চিন্তার সার্থক রূপায়ণ। নির্দেশকের এটি একটি স্মরণীয় অবদান, ইনষ্টিট্যুট শিল্পী গোষ্ঠীর একটি গৌরবোজ্জ্বল নিবেদন।

অভিনয়ের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় প্রবীর-এর ভূমিকায় অমিত দের। এঁর সংগে সমানতালে অভিনয় করেন নন্দার ভূমিকায় আরতি ঘোষ। ননীগোপালের ভূমিকায় সিদ্ধেশ্বর সেন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফণীভূষণের চরিত্রে অশোক ঘোষাল কোমলে-কঠিনে গড়া একটি মানুষের চরিত্র সুন্দরভাবে রূপায়িত করে-ছিলেন। অতনুর ভূমিকায় ধীরেন দত্ত তাঁর সহজ সরল অভিনয়ে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। রত্নার ভূমিকায় লেখা চট্টোপাধ্যায়-এর অভিনয় একটি প্রাণ চঞ্চল মেয়ের চরিত্র দর্শকদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। পদ্মার ভূমিকায় ইরা বসু চৌধুরীর অভিনয় মনে রাখার মত। প্রভাস মুখোপাধ্যায়ের পুরন্দর একটি টাইপ চরিত্রের সার্থক শিল্পীরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। রাজেন ও গজেন-এর ভূমিকায় সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও প্রাণগোপাল সাহা কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। শিবনাথ-এর ভূমিকায় শংকর দাস একটি অপরূপ টাইপ চরিত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য ভূমিকায় মনিলাল মল্লিক, তপন চক্রবর্তী, প্রবীর ঘোষাল ও দিলীপ দত্ত সুঅভিনয় করেন। আবহ-সংগীতে মডার্ন অর্কেস্ট্রা ও আলোক সম্পাতে বিজয় চট্টোপাধ্যায় নাটকটির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলিকে উপভোগ্য ও উচ্চমানের করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নাটকে এঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

৩০ জুলাই '৭৭। রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ম। সঙ্গীতাঞ্জলি শিল্পী সংসদ তাঁদের 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে যথারীতি বিচিত্রার আসর বসিয়ে আবৃত্তি একক সঙ্গীত এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন। প্রত্যেক শিল্পীই নৃত্য-সঙ্গীতে দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষভাবে উত্তীয় বজ্রসেন কোটাল ও শ্যামার ভূমিকায় যথাক্রমে পঙ্কজ, কৃষ্ণকলি, শ্যামল ও সবিতা উল্লেখযোগ্য। সবিতা দাস ও কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য নৃত্যে এবং শ্রীমতী দীপালী গুহ সঙ্গীত পরিচালনে কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। অধ্যাপক শিশির গুহ ও হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অঞ্জু গুহ। শিল্পী সংসদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কেননা সৃজন ও শিক্ষাকে এঁরা একসূত্রে বেঁধেছেন অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে।

সৃজায় মনেরমত শাড়ী * পোষাক
হাওড়া ফ্রেণ্ডস সোসাইটী
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৪৪৯৭

রান্না

ডিম চিংড়ি ককটেল

দিন কয়েক আগে মণিপুরী বৌদি এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আড়াই মণের মত ওজন, কিন্তু রাঁধেন ভালো। বললাম, তুমি যখন আছো, আজ কিছু একটা রাঁধো। তিনি নড়েচড়ে বসলেন, কি খাবি? বললাম, মাসের শেষ, বাজার থেকে কিনতে পারি, সাধ্যির মধ্যে হয়, এমন কিছু বল। তিনি গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলে বললেন, তোদের এখানে কুচো চিংড়ি পাওয়া যায়? যায়। কত করে? সাড়ে চার থেকে পাঁচ। ডিম, ফাটা হলেও চলবে। এই ধরো আস্তো হলে পঞ্চান্ন, ষাট ফাটা হলে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ। সরষের তেল? সে অনেক দাম। কত? তেরো টাকা। রেপসিডে চলবে? একটু কম আছে—সাড়ে সাত টাকা। আদা? তিন টাকা কেজি। পেয়াজ? এক টাকা পঁচিশ থেকে আড়াই টাকা। আলু? এক টাকা ত্রিশ থেকে চল্লিশ। হলুদ, লঙ্কা? জান বাজার থেকে কিনলে একটু সস্তা হবে। হলুদ লঙ্কা দুটোই দশ টাকা। ময়দা? দু টাকা। মণিপুরী বৌদি বললেন, ঠিক আছে; বাড়িতে লোক কত জন? বললাম, চারজন। তবে একটা কাজ কর, বাজার থেকে আড়াইশো কুচো চিংড়ি নিয়ে আয়। ডিম আন একটা ফাটা হলেও চলবে। সরষের তেল নিয়ে আয় দেড়শো গ্রাম। আলু আড়াইশো। একটু চিনি হলে ভালো হয়? বললাম, ওতো বাড়িতেই আছে। নুন? ওতো দিতেই হবে। নুন কেউ না খেলে বলিস তাহলে অন্য ব্যবস্থা আছে। সবাই খায়। তবে তো ভালোই। পরিমাণ মত একটু পেঁয়াজ, আদা, হলুদ লঙ্কা নিয়ে আয়। চারজনের খাবার কতটা আর লাগবে? বললাম, না কতটা আর। তবে যা নিয়ে আয়। আমার নড়তে চড়তে কষ্ট, না হলে আমি নিজেই যেতাম। বললাম, ঠিক আছে। তোমায় নড়তে চড়তে হবে না বলতো কি করে রাঁধবে? কেন? দরকার আছে এক জায়গায় ঢুকে দেব।

তিনি একটু মুচকি হাসলেন। বললেন, আমার নাম দিবি তো। সে হবে খন, বলেই না। মণিপুরী বৌদি বললেন, তবে লিখে নে। চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে বেটে নিন। পরিমাণমত আদা, পেঁয়াজ সামান্য একটু চিনি, লঙ্কা, লবণ দিয়ে মেখে নিন। ডিম ভেঙে চিংড়ি বাটার সঙ্গে মাখুন। এর মধ্যে সামান্য ময়দা দিয়ে এ্যালুমিনিয়াম বাটির ভিতর ঘি অথবা তেল মেখে তাকে গরম জলের ওপর বসিয়ে জমাট করি নিন। জমাট হয়ে গেলে একটি থালার মধ্যে ঢেলে তাকে বরফি অথবা পছন্দ মতন খণ্ড খণ্ড করে ভেজে নিন। যে রূপে মাংস রাঁধে সেইভাবে রান্না করতে পারেন অথবা গরম গরম ভাজা পরিবেশন করতে পারেন। আমি চটপট লিখে নিয়ে বললাম, আর একটা বলো। মণিপুরী বৌদি বললেন, সে হবে'খন, আছি তো কদিন। আজ এই থাক।

আত্রেয়ী সেনগুপ্তা

চাষ পাগল ডাক্তার

উবিদপুর। হুগলী জেলার খানাকুল থানার এক 'রিমোট ভিলেজ'। গাঁটিকে ঘিরে কানা নদী বার-বার বাঁক নিয়েছে। লোকবসতি নেহাৎ কম নয়। এই গাঁয়েই মণি ডাক্তারের বাড়ী। ডাঃ মণিমোহন রায়। আর এক রায়, মানে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও প্রথমে ছিলেন এল-এম-এস, আর মণি ডাক্তার এল-এম-এফ ক্যাল। একটা ট্রিপিক্যাল ক্যারেকটার। গাঁয়ের অনেক আদমিরই আদরের ডাক চাষী ডাক্তার। আসলে সকলেই দেবতা জ্ঞানেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। মাটির মোটা দেওয়ালে টিনের চাল দেওয়া দোতলা বাড়ী মণিবাবুর। বাড়ীর বাইরে সদর হিসেবে যেটা, সেটাই হল ডিসপেনসারি। নামেই ডিসপেনসারি। ঘরের মেঝেতে কোথাও কোথাও ইঁদুরে মাটি তুলেছে, আবার কোথাও বা মাকড়সার জাল বোনা। এরই মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লাল-নীল সব ওষুধের বোতল। আর থাকার মধ্যে একটা ঢকঢকে আদ্যিকালের টেবিল, নড়বড়ে চেয়ার, আর রুগীদের শুয়ে বিশ্রাম নেবার জন্যে অনেকদিনের পুরনো একটা তক্তোপোষ। টেবিলের ওপর বহু পুরনো মলাট ছেঁড়া কয়েকটা খাতা আর উঁই-এ কাটা নিজের নামের লেটারহেড প্যাড ছাড়া কিছু ইনজেকসনের শিশি। এই রকমটাই ছিল ডাক্তারখানাটা। মণি ডাক্তারের বয়স সাত দশকের কোঠায়। এক মাথা সাদা ধবধবে চুল, গায়ের মাংস কিন্তু এই বয়সেও ফিট। একটুও কুঁচকোয়নি। অনেকদিনের না কামানো দাড়িও থাকে মাঝে মধ্যে। মাঝারি মাপের গড়ন। ঝোঁক কিন্তু ডাক্তারির চেয়ে চাষেই বেশী। জমি-জায়গাও আছে ভালোই। আর ওই জমি চষে ফসল বোনা থেকে, সল কেটে ঘরে তোলা পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই ডাক্তারবাবু জমিতেই পড়ে থাকেন। জন-মুনিষদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে সব কাজই করেন মণিবাবু। সারা দিনের মধ্যে ওঁকে ডিসপেনসারিতে পাওয়া যায় একদম ভোরবেলা, আর সেই রাত্রিতে। মাঝে মধ্যে দুপুরবেলাতেও ডাক্তারখানা খোলা দেখা যায় আর ওই সময়গুলোতে যেন রুগীদের হাট বসে যায়। একান্ত সিরিয়াস কেস না হলে দিনের বেলা ডাকে বেরোন না। জেনারেলি ডাকে বেরোন রাত্রিতে। বাইরে ডাকে যাওয়ার কোন সাজপোশাক নেই। গায়ে মোটা হাফহাতা শার্ট আর সঙ্গে মিলিয়ে মোটা আধময়লা ধুতি। পায়ে বহুদিনের পুরনো পেরেক ওঠা চটি। হাতে কোন ব্যাগের বালাই নেই। জামার ওই পকেটগুলোই যথেষ্ট। ব্যাগ পিঠ দেখার যন্ত্রটার একদিক বেঁকে তুবড়ে গেছে কিছুটা। সেটাও পকেটেই থাকে। দু'হাত দিয়ে ধরে কোনরকমে রুগীর বুক পিঠ দেখেন ওটা দিয়ে। ইঞ্জেকসনের বাকসটাও ওই পকেটের মধ্যেই থাকে ডাক্তারবাবুর। জমিতে থাকার সময় ভুলেও কেউ ডাক্তার ভাবতে পারে না। নেহাৎই একটা সাধারণ চাষী। একটা ছোট গামছা কোনরকমে এঁটেউঁটে পরা, আর একটা গামছা কাঁধে। গরু-লাঙল সবই নিজের, এমনকি চাষবাসের নতুন সব সরঞ্জামও কিনেছেন উনি। সারাদিন জমিতে কাটালেও সব খবরই রাখেন ডাক্তারবাবু। রেডিও'য় সন্ধ্যের কৃষি কথার আসর অবশ্যই শোনেন ও দৈনিক কাগজ পড়ে নানারকম চাষের আলোচনা করেন, চাষী ভূমিদের সঙ্গে। রাজনীতি ভালো বোঝেন। ভালো লোক পেলে রাজনীতির আলোচনাও করেন রীতিমত। ডাক্তারখানায় ঢুকেই কেউ যদি রোগের কথা বলে, উনি খুব একটা খুশী হন না। চাষবাস বা জমি-জায়গার কথা বললে খুব আনন্দ পান। সঠিক ওষুধের দাম না দিতে পারলেও ঠিক সময় গেলে ওষুধ পায় অনেকেই। তাইতো প্রায় সবাই বলে, ডাক্তারবাবু আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা। উনি চলে গেলে আমাদের কি হবে? শিশি ধুয়ে জল দিলেও যে ধন্বন্তরি।

নারায়ণরতন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

পটে আঁকা ছবি

নীল, সবুজ, গ্রে, কালো, ব্রাউন্ ও বেইজ্ —
স্বপ্নসুন্দর নানান রঙের সম্ভার
আর কেউ দিতে পারে না উপহার।
পপলিন, কেম্ব্রিক, সাটিন, ড্রিল, কটনের গ্যাবার্ডিন।
এছাড়াও, পলিয়েস্টার ব্লেণ্ড করা স্যুটিং ও শার্টিং।

মদুরার কাপড়

প্রস্তুতকারী:

মদুরা কোট্স

বিক্রেতা: সুন্দরদাস খ্যাকার্সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৪, লুকাস লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০১ জয় ভারত ফ্যাব্রিকস্, ১৭, সুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শিউভগবান গজাধর, ১১৩বি, মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শ্যাম টেক্সটাইলস্, মহাবীরস্থান, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৪ (পশ্চিম বঙ্গ)

MCL-233 BEN

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 30th September,
Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

কুকমী গুঁড়া মশলার
১ কে.জি.'র বুভুজ, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

ছবি-সহযোগে : এন. সে. বোসের এণ্ড কো. প্রাইভেট লিমিটেড

৭ অক্টোবর ১৯৭৭ ৭৫ পয়সা

অমৃত

সম্পাদক—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

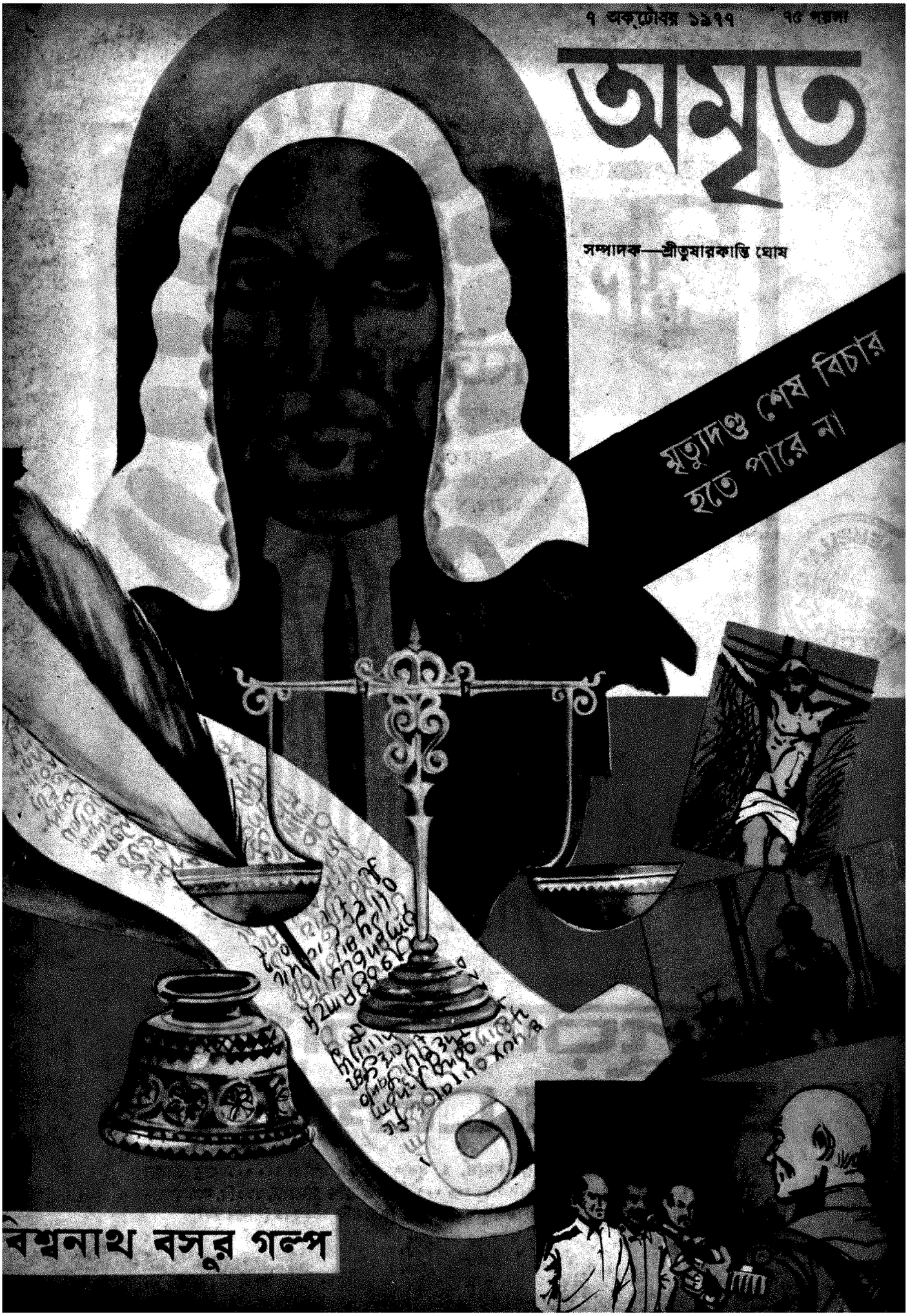

মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না

বিশ্বনাথ বসুর গল্প

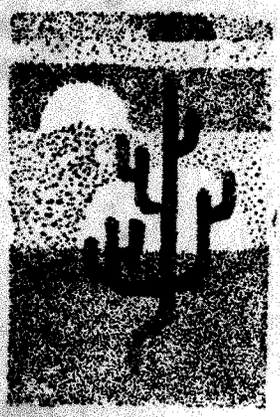

পটে আঁকা ছবি

নীল, সবুজ, গ্রে, কালো, ব্রাউন্ ও বেইজ্—
স্বপ্নসুন্দর নানান রঙের সম্ভার
আর কেউ দিতে পারে না উপহার।
পপলিন, কেম্ব্রিক, সার্টিন, ড্রিল, কটনের গ্যাবার্ডিন।
এছাড়াও, পলিয়েস্টার ব্লেণ্ড করা স্যুটিং ও শার্টিং

মদুরার কাপড়

প্রস্তুতকারী:

মদুরা কোট্স

বিক্রেতা: সুন্দরদাস খ্যাকার্সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৪, লুকাস লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০১ জয় ভারত ফ্যাব্রিকস্, ১৭, সুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শিউভগবান গজাধর, ১১৩ বি, মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শ্যাম টেক্সটাইলস্, মহাবীরস্থান, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৪ (পশ্চিম বঙ্গ)

MCL-223 BEN

সগৌরবে প্রকাশিত হলো ভ্রমণ সাহিত্যের একখানি অসাধারণ বই

পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাস ও মানস সরোবর ২০৲

অসংখ্য আর্ট প্লেট ও তথ্য সমন্বিত

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই :-

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ৬৲

কালপুরুষ-এর

কালপুরুষের ডায়রী ১৫৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

হংসেশ্বরী ১০৲

সুমথনাথ ঘোষের ভ্রমণ উপন্যাস

সুদূরের পিয়াসী ৮৲

সীতা দেবীর ছোটদের বই

নিরেট গুরুর কাহিনী ও অনান্য গল্প ৬৲

শ্রেষ্ঠ চারখানি পেপার ব্যাক-ক্লাসিক্স্

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম ১২॥

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১২॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই ১২॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গণদেবতা ৭॥

মাত্র তিন টাকা (৩৲) জমা দিয়ে স্থায়ী গ্রাহক হলে ২০% কমিশন পাবেন। অথবা ৪খানি এক সঙ্গে নিলে ৪০৲। গ্রাহক করা চলছে।

॥ নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো ॥

বাংলা সাহিত্যের দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস :-

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পাঞ্চজন্য ১৬৲

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ৩০৲

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড—কুড়ি টাকা

শংকর-এর

ইদানীং কালের

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

স্থানীয় সংবাদ

১০ম মুদ্রণ—দশ টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি ৭৩ ৩৪-৩৪৯২

৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯/৩৪-৮৭৯১

এশিয়ার বই

১০্ দিয়ে ডিস্কাউন্ট কুপন কিনে আজই গ্রাহক হন

৫ বছর পর্যন্ত ২৫ শতাংশ কামশনে কিনুন নতুন নতুন বই

অমনিবাস সিরিজ

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন নিয়ে আসছে এশিয়ার অমনিবাস
দামী কাগজ * বড় বড় টাইপ * ঝরঝরে ছাপা * পাতায় পাতায় ছবি
মজবুত বাঁধাই * বহুরঙা জ্যাকেট * প্রকাশন শিল্পের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বেরুচ্ছে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চয় এক খণ্ডে

সম্ভাব্য সূচী ঃ শকুন্তলা । ক্ষীরের পুতুল । নালক । বুড়ো আংলা । ভূত পতরীর দেশ । রাজকাহিনী । খাতাঞ্চীর খাতা । আরও থাকছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একরঙা ও বহুরঙা ছবির সঙ্গে শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামীর আঁকা অজস্র ছবি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

অমনিবাস

প্রথম খণ্ডের সম্ভাব্যসূচী ঃ হুকাকাশী সমগ্র। পদ্মরাগ । চায়ের ধোঁয়া। ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি। হাস্য রহস্য । নূতন পুরাণ । ছবি ঃ তাপস দত্ত

হর্ষবর্ধন অমনিবাস

হাসির সম্রাট শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধন সিরিজের নির্বাচিত উপন্যাস ও গল্প।

ছবি ঃ শৈল চক্রবর্তী

আর বেরুচ্ছে ছোটদের লুফে নেবার বই ঃ

গৌরী ধর্মপালের ঃ পলকা। সুনীল জানার ঃ বাঘের দুধ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের ঃ উপেনটি বায়োস্কোপ। ২৫ জন ক্ষুদে শিল্পীর আঁকা ছবির সঙ্গে গীতা দত্তের ছড়ার বই 'ছবির মেলা ছড়ার খেলা'

আজই পেতে পারেন যে রচনাবলীগুলি

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী ১ম খণ্ড ২৫্, ২য় খণ্ড ২৫্, ৩য় খণ্ড ২০্, ৪র্থ খণ্ড ছাপা চলছে

লীলা মজুমদার ১ম খণ্ড ২৫্, ২য় ২৫্

সুকুমার রায় ১ম ২৫্, ২য় ৩৫্ হান্স অ্যাণ্ডারসন ১ম ২৫্, ২য় ২০্
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১ম ৩০্, ২য় ৩০্ লুইস ক্যারল ১ম ২৫্, ২য় ২৫্
এডওয়ার্ড লিয়ার ১২ গ্রিমভাইদের রচনাবলী ১ম ২৫্, ২য় ২০্, ৩য় ২০্

গ্রিমভাইদের গ্রাহক কার্ডের ২য় খণ্ড ও অন্যান্য প্রতিটি বই ১৫।১০।৭৭-র মধ্যে সংগ্রহ করুন

বিভিন্ন স্বাদের কয়েকটি সঙ্কলন ঃ সোনালী রূপকথা ৭্, ভৌতিক গল্প ৭্, দেশ বিদেশের রূপকথা ৫·৫০ রূপকথা ৫ ছবি ছড়ার দেশে ৫্ গোয়েন্দা ৫্ আজগুবি গল্প ৭্।

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বই ঃ

ডঃ নীলরতন সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্র-বীক্ষা ২৫্
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
কবি তরু দত্ত ৫্
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
বিচিত্র বাঘ শিকার ৫্
অজিতকৃষ্ণ বসু
ম্যানিকের গল্প ৫্

লুইস ক্যারল
আজব দেশে অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার ৬.৫০
আয়না বাড়ি ৬.৫০
অনুবাদ ঃ জয়ন্ত চৌধুরী
বাইডার হ্যাগার্ড
রাজা সলোমনের খনি ৮্
অনুবাদ ঃ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

লীলা মজুমদার
বহুরূপী ৫্
অজেয় রায়
কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন ৫্
রথীন সরকার
যখন গোয়েন্দা ৫্
শিবরাম চক্রবর্তী
প্রাণ নিয়ে টানাটানি ৬্

দূরকে করিল নিকট ৭্ (রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও টেলিভিশন আবিষ্কারের গল্প) জন, জে, ফ্লোহার্টি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ সরকার। [পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।]

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কার্যালয় ঃ ৭২-১ শিশির ভাদুড়ী সরণী - কলিকাতা-৬
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ এ-১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট - কলিকাতা-৭

অমৃত

১৭ বর্ষ ২২ সংখ্যা
২০ আশ্বিন ১৩৮৪
7 Oct. 1977.

সম্পাদকীয় ৩
জীবনটাই তো উপন্যাস ৪
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ক্রেয়ন এবং কালীদা এখন আলাদা ৫
বৈকুণ্ঠ পাঠক

নান্দীকারে ভাঙন ৮ চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদকাহিনী

মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না ১০
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

রক্তের বদলে রক্ত ? ১৪
মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

চোরচরিতামৃত (গল্প) ১৭
বিশ্বনাথ বসু

শকুন (গল্প) ২২
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বড় গানের সমঝদার চিরকালই
কলকাতা ২৬ সন্ধ্যা সেন

বনবিবি উপাখ্যান ৩০
রবেন গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যালিফোর্নিয়া মলয় ৩৫
নবনীতা দেবসেন

পাকদণ্ডী ৪০ লীলা মজুমদার
শাড়ি ৪৩ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পাবলো নেরুদার জবানবন্দী ৪৪
উৎপলকুমার বসু

কবিতা ৪৬ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়,
গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
অমিতাভ গুপ্ত, আনন্দ ঘোষ হাজরা

মিসা-৭৩/৪৮ শ্যামল রায়
বসালাপ ৫৪ কবিতা সিংহ

খেলা ৫৫

সিনেমা ৫৭

বিচিত্রা ৬২

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
আমাদের পোশাক
লিখেছেন নিশীথরঞ্জন রায়

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প

উৎপলকুমার বসুর
একালের দাস ব্যবসা

কবিতা সিংহের
স্লান ফটোগ্রাফ

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন সন্তোষ গুপ্ত, ভিতরের ছবি ও অলংকরণ সুবোধ দাশগুপ্ত এবং অসিত কুণ্ডু

আমার বাংলা ভাষা

বাংলাভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটি অবশ্য অনেক কাল আগেরই, কিন্তু তখন এ-বিষয়ে খুব যে একটা কাজ এগিয়েছিল এমন শোনা যায়নি। বরং আপত্তির কথাই শোনা গেছে নানাদিক থেকে। কখনো বলা হয়েছে যথেষ্ট রকম পরিভাষার অভাব আছে বাংলাভাষায়। কখনো আবার বাহানা শোনা গেছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যার টাইপরাইটার নেই। ফলে উৎসাহের গ্যাস প্রস্তাবের বয়ান রচনাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর পূর্ণ বিকশিত ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলার স্থান একেবারে প্রথমের দিকে। বাংলা সাহিত্য গোটা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালানো যাবে না, এ-যুক্তি হাস্যকর বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। বাংলায় পরিভাষা নেই, কিন্তু বাংলা মানে কি সংস্কৃত ? এই বঙ্গদেশেই বহাল তবিয়তে বহুকাল পাঠান-মোগলেরা রাজকার্য চালিয়েছে, এবং অবশ্যই তা ইংরেজিতে চালানো হয়নি। পরিভাষার অভাবে তাদের রাজপাট যে বসাতলে গেছে তাও শোনা যায়নি। আসলে সরকারি দপ্তরখানার পণ্ডিতেরা ইংরেজি ছাড়া আর কিছুই জানেন না বলেই এত টালবাহানা। নয়তো সরকারি কাজের পরিভাষা বঙ্গদেশে যথেষ্টই আছে। হয়তো সেগুলো লৌকিক শব্দ বা ফারসি। কিন্তু সাধারণ বাঙালিরা তা বোঝে, এখনো বোঝে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সাহেবরা যদি সেই শব্দগুলো শিখে নিতেন, সরকারি কাজ অতি সহজেই চালানো যেত।

তাছাড়া আরো দুটি শিখে নেবার জায়গা আছে—ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ। সকলেই জানেন, ত্রিপুরা যখন দেশীয় রাজ্য ছিল, তখন তার সরকারি কাজ বরাবরই চলত বাংলাভাষায়। কাজেই সেখানে তৈরি পরিভাষা অজস্র সংখ্যাতেই পাওয়া সম্ভব। আর বাংলাদেশ তো স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র, তার কাজকর্ম যে বাংলাভাষাতেই চলে এ তো সর্বজনবিদিত।

তবে একটা কথা। পরিভাষা তৈরি করতে বসলে সবার আগে দেখা দরকার, চালু ইংরেজি কথাটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে গেছে কিনা। যদি তা গিয়ে থাকে, এবং শব্দটি যদি বাংলাভাষার সঙ্গে ইতিমধ্যেই খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে আর নতুন করে শব্দ খোঁজার মানে হবে না। বরং তাতে সোজা কাজকে জটিল করে তোলা হবে। আগে যখন পরিভাষা কমিটি বসানো হয়েছিল তাতে এ-রকম বিপত্তির সূত্রপাত ঘটেছিল বলেই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার।

যাই হোক, ভালো কাজ একেবারে অবহেলিত থাকার চেয়ে দেরিতে শুরু হলেও ভালো। এতদিনে হয়তো বাংলাভাষার সত্যিকারের বন্ধনদশা ঘুচবে, এবং তার গতিও হবে আরো বেশি সচ্ছন্দ ও সর্বত্রগামী।

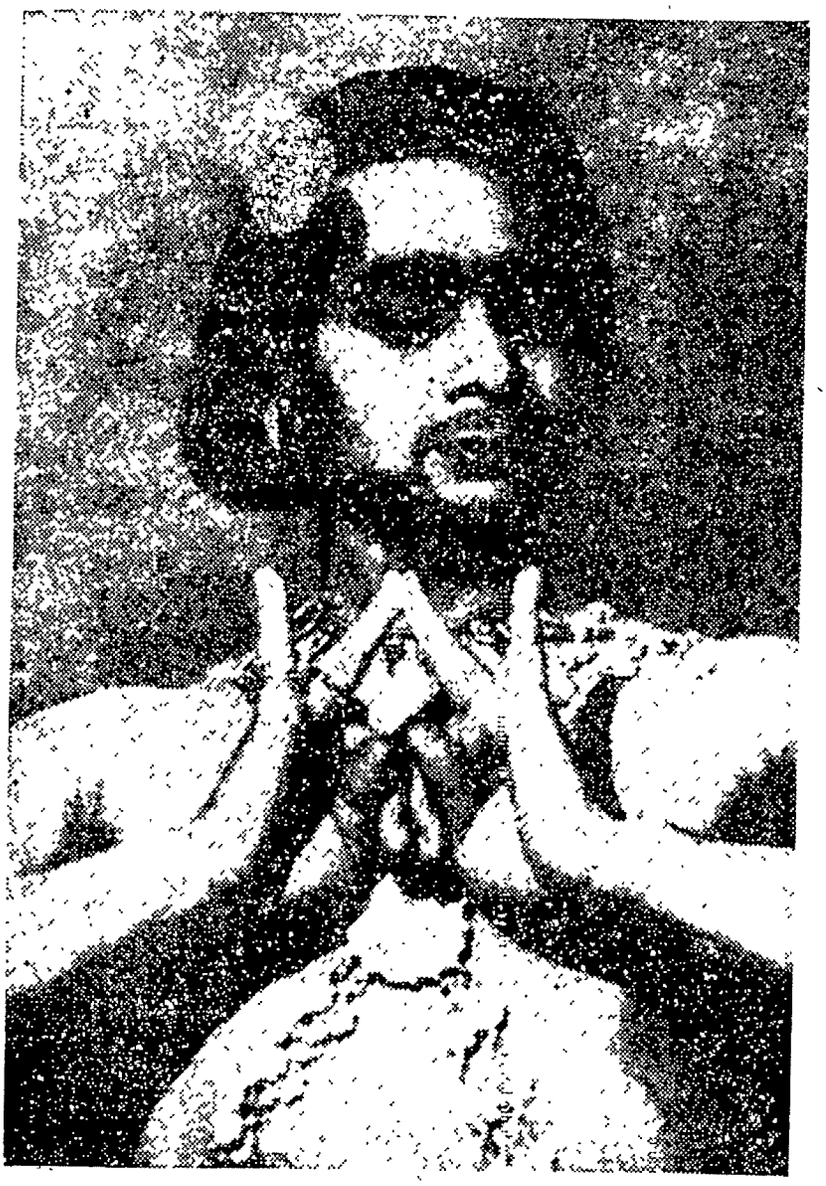

জীবনটাই তো উপন্যাস

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

গত পাঁচ-সাত বছর কি তারও বেশি, হৃদয়ের গোলযোগে ভুগছিলেন উদয়শঙ্কর। শরীরের ওপর দখল হারাচ্ছিলেন ক্রমাগত। মনের ওপরেও বোধহয় তেমন কর্তৃত্ব ছিল না। বিকেল বেলায় বোদ্দুরের মতো এক গাঢ় বিষণ্ণতা তাঁকে ক্রমাগত এক অসারতা ও অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছি নানা উপলক্ষে। 'সাত আটবার। আমি দেখেছি, নৈশ-জাগরণের ক্লান্তি তাঁর শরীরে। যেন ক্লান্তি নয়, উৎসব-শেষের বিষণ্ণতা। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে যাচ্ছে অস্তগামী সূর্য। তার আভা ছিল মুখেমুখে। ছিল স্মৃতিচারণার অবকাশ। তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে উদয়শঙ্কর কথা বলতেন আমার সঙ্গে। জলের গভীর থেকে মানুষ যে-ভাবে রুপোলি, নীল মাছ ধরে নিয়ে আসে, ঠিক সেভাবে উদয়শঙ্কর আমাকে তাঁর অতীত-জীবনের ভগ্নাংশগুলি উপহার দিতেন। ধারাবাহিক নয়, টুকরো টুকরো ছবি। বিচ্ছিন্ন: হীরকের দীপ্তি ছিল তাতে। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'আকাশ-প্রদীপ' লিখেছিলেন। তাঁর স্মৃতিচিত্রগুলিও আমার কাছে 'আকাশ-প্রদীপ' রচনারই সামিল মনে হত।

।।১।।

উদয়শঙ্করের 'উদয়'-এর সঙ্গে সূর্যোদয়ের সম্পর্ক নেই, যেমন আছে রবি-শঙ্করের রবির সঙ্গে। আমার নামের সঙ্গে একটি স্থানের অনুষঙ্গ জড়িত—'উদয়পুর'। আমার বাবা ছিলেন রাজ-পরিবারের গৃহ-শিক্ষক। পরে মন্ত্রী হন।'

উদয়শঙ্কর এ তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁর গলফ ক্লাব রোডের বাড়িতে বসে। বলেছিলেন, 'আমার কথা ছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার, নৃত্যশিল্পী নয়। বিস্তর ছবি এঁকেছি আমি কৈশোরে, যৌবনে।'

'আপনার জীবন তো বড় ঘটনাময়।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'এখনো সেসব মনে আছে?'

সকাল বেলার রৌদ্র খেলা করছিল পুবের বারান্দায়। অমলাশঙ্কর এঘর ওঘর করছিলেন মাঝে মাঝে। আমাদের আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন। বন্ধু শ্যামল নন্দী পূব-দক্ষিণের একটি বাড়িতে বসে কবিতার ওপরে ছবি আঁকছিলেন। একটু আগেই তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলে এসেছি। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় থাকেন তাঁরই বাড়িতে। বোধহয় উদয়শঙ্করের জীবন নিয়ে একটা বই লেখার কথা ভাবছিলেন।

এমন কিছু ঘটনা থাকে, এমন কিছু ছবি—যা জীবনে সর্বস্বান্ত হওয়ার পরেও থেকে যায়, আমার শৈশব ঠিক সেভাবে আমার স্মৃতিতে থেকে গেছে।' উদয়শঙ্কর বললেন, 'রাজ-পরিবারের সঙ্গে জড়িত থেকে আমি দুটো ছবি উপহার পেয়েছিলুম শৈশবে। প্রথমটি রাত্রির, দ্বিতীয় দিনের বেলার।'

আমি চুপ করে বসেছিলুম। প্রশ্ন করিনি। তাঁর চোখে শৈশবে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নাচ্ছন্নতা নেমে এসেছিল। কী একটা জরুরী কাজে অমলাশঙ্কর ঘরের ভেতরে চলে গেলেন।

মুখ খুললেন উদয়শঙ্কর, 'মধ্যরাতে আমি নূপুরের শব্দ শুনতে পেতুম ঘুম ভেঙে। রাজবাড়ির জলসাঘরে যাওয়ার উপায় ছিল না। নিষেধ ছিল। কিন্তু ভাঙা ভাঙা গানের কলি, ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসত রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে। আমার কাছে রহস্যময় মনে হত সেই শব্দ। কারা গাইছে? কারা নাচছে? আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। আমি মনে মনে অসম্ভব সব কল্পনা করতুম। হয়তো চলে যেতুম রূপ-কথার দেশে।'

'কল্পনার ওপরে তো কারো নিষেধ খাটে না।' স্বগতোক্তি করলেন উদয়শঙ্কর, 'এভাবেই আমি কল্পনা-প্রবণ হয়ে উঠেছিলুম। দ্বিতীয় ছবিটি এখনো চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে। সে ছবি দিনের বেলার, হোলি উৎসবের। গোটা উত্তর ভারত, বিশেষ করে রাজস্থান মেতে উঠত হোলি-উৎসবে। সারা পথে ফাগের ছড়াছড়ি। নাচগান। ছেলেবুড়ো কেউ বাদ যেত না, নিষেধ শুনত না। আমি সেসব নাচ-গানে মেতে উঠতে চাইতুম। এমনিতেই ওখানকার মেয়েরা পরে নানারকমের রঙিন পোষাক—লাল, হলুদ।'

মাঝখানে বাধা দিয়েছিলুম আমি, বলেছিলুম, 'রাজস্থানের প্রকৃতি কঠোর। ততটা জীবন্ত নয়। প্রকৃতির কৃপণতাকে ঢেকে দিয়েছেন রাজস্থানের মানুষ নানা-রঙের কাপড়চোপড় পরে।

আমাকে আমল দেন নি উদয়শঙ্কর।

বলার ঝোঁকে ছিলেন। বললেন, 'বছরে একবার বেরুতো রাজকীয় মিছিল। সে যে কী বর্ণবহুল, কী আশ্চর্য দৃশ্য ভাষায় বোঝানো কঠিন। হাতির পিঠে নানারকমের কারুকাজ করা হাওদা। তার ওপরে নানা-রঙের পোষাক-পরা নরনারী। বাঈজীরা নাচত হাতির পিঠে। গায়কের দল গান গাইত। এই বিশাল মিছিলের অংশীদার ছিলেন সবাই—রাজারা, প্রজারা। আমার কাছে সব মিলিয়ে মনে হত একটা ছবি। সেই চলমান ছবির দিকে আমি তাকিয়ে থাকতুম।'

।।২।।

কথা শুরু হলে আর শেষ হয় না। উদয়শঙ্কর আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ছিলুম বাবার বড়ছেলে। কিন্তু মায়ের ছিল মেয়ের শখ। সে শখ মেটাতেন তিনি আমাকে দিয়ে। আমাকে প্রায়ই ফ্রক পরিয়ে রাখতেন। ভাবতেন, আমি তাঁর ছেলে নই, মেয়ে।'

—আশ্চর্য। ফ্রক পরে থাকতে আপনার ভালো লাগত?

—পোষাকের আবার ভালো-মন্দ কি। বলেছিলেন উদয়শঙ্কর, মায়ের ভালো লাগত। তাঁর চোখমুখ দেখে আমি বুঝতে পারতুম। তাতেই খুশিতে ডগমগ করতুম আমি। মা গ্রামোফোনে রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে বলতেন, নাচ খোকা। আমি অঙ্গভঙ্গি করে নাচতুম। কি নাচতুম? হোলির সময়ে গয়লারা যেসব নাচ নাচত, সেইসব নাচ। আর বাড়ির লোকজন, ঝি-চাকর, পাড়া-প্রতিবেশীরা যেভাবে চলাফেরা করত, তাদের অঙ্গভঙ্গি হুবহু নকল করে দেখাতুম। মা খুশি হতেন।'

স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর। স্মৃতির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ জেগে উঠলেন মনে হল মুহূর্তের জন্য, তাই বলে নাচিয়ে হওয়ার স্বপ্ন তখন আমি দেখতুম না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিলুম। ফ্রক ছেড়ে প্যান্ট ধরেছিলুম। তখন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ছিল সাইনবোর্ড আঁকার একটি দোকান। দোকানই তো? বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নামধাম ছাড়া সিনসিনারিও আঁকা হত সেখানে। আমি অবসর পেলেই সেখানে গিয়ে বসে থাকতুম। আমার দাদু ছিলেন জমিদার। খুব কড়া লোক। আবার আমাকে ভালোও বাসতেন খুব। তিনি আমার এ অভ্যাসটিকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, ছবি আঁকে ছোট লোকেরা। ওসব জমিদারের নাতির কাজ নয়।'

—ওদের কাজে সাহায্য করতেন বুঝি আপনি?

—করতুম। মাঝে মাঝে ছবিও আঁকতুম ওদের দেখাদেখি। জমিদারের নাতি বলে রঙ তুলি ওলটপালট কিছু এঁকে ফেললে ওরা রাগ করতেন না। পরে নিজের চেষ্টায় আমি বাড়িতে বসে কয়েকটা কুকুর, বেড়াল, পাখির ছবি এঁকেছিলুম। দাদু দেখলে রাগ করতেন নিশ্চয়ই। মা রাগ করেন নি। বরং খুশিই হয়েছিলেন। বাবা ছিলেন আধুনিক মানুষ। আমার ছবি-আঁকার চেষ্টাটাকে তাঁর কাছে ছোটলোকের কাজ মনে হত না। তবে সকলেই আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন একথা ভেবে যে, খেয়াল খুশিমতো চলতে দিলে আমার পড়াশোনা হবে না।

—ছবি আঁকা বন্ধ করেছিলেন আপনি?

—ছবি আঁকা বন্ধ করিনি। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইনবোর্ডের দোকান থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হলুম। প্রথমে বইয়ের ছবি আঁকতুম শাদা কাগজের ওপর। পরে চার পাশের গাছগাছালি, পশু-পাখি আঁকতুম। সঙ্গে পড়াশোনা চলছিল। ম্যাট্রিক পাশের পর কেউ আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেননি। আমি বোম্বের জে জে স্কুল আর্টে ভর্তি হলুম ১৯১৯ সালে। স্কলারশিপও পেয়েছিলুম। কিন্তু বোম্বের শিক্ষা বেশিদিন নয়। বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলুম লন্ডনে। ভর্তি হলুম রয়েল কলেজ অফ আর্টসে। পাঁচ বছরের কোর্স তিন বছরে শেষ করে এ-আর-সি-এ ডিগ্রী পেলুম। তখন একটা আত্ম-প্রতিকৃতি এঁকেছিলুম আমি, আর অনেকগুলি কম্পোজিশান। সেসবের জন্যেও পুরস্কার জুটেছিল।

—নাচের জগতে এলেন কি করে?

—সে এক ঘটনা।

উদয়শঙ্করের চোখেমুখে শৈশব-যৌবনের রঙ ফুটে উঠেছিল সেদিন। আমার দৃষ্টিরও ভুল হতে পারে। মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ঘুমের জগতে ফিরে যাবার জন্যে বুঝি প্রস্তুত হচ্ছিলেন উদয়শঙ্কর। বললেন, 'পাভলোভা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না হলে আমি নৃত্যশিল্পী হতুম না, চিত্রশিল্পীই থাকতুম।'

চোখে মুখে তাঁর ক্লান্তির ছাপ। বেলা সাড়ে দশটা প্রায়। ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে যাবেন উদয়শঙ্কর। হৃদযন্ত্রের গোলমাল সমানে চলেছে। বললেন, আজ আর নয়, আরেকদিন আসুন—সব বলব।'

বললুম, আর দু মিনিট সময় দিন। আমার কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

—পাভলোভা বিখ্যাত রুশ নর্তকী, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যায় আমার লন্ডনে। বেশি দিনের নয়, দু-চারদিনের যোগাযোগ। স্বভাবত ছবির চেয়ে নাচের প্রসঙ্গেই কথা হত বেশি। পাভলোভা একদিন জানতে চান, ভারতীয় নাচের বৈশিষ্ট্য কি? ধরণধারণ কেমন? বিদ্যার্থীর মতো আমার শৈশবের

স্মৃতি আমাকে নাড়া দিয়ে গেল হঠাৎ। আমি উত্তর ভারতের গয়লাদের কাছ থেকে শেখা একটা নাচ নেচে দেখালুম। পাভলোভা কী দেখলেন আমার মধ্যে কে জানে। আমাকে বললেন, বাঃ চমৎকার। এই তো আমি চাইছিলুম। ফলে, দু-দুটো নৃত্য-নাট্যের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হল আমাকে পাভলোভার দলের জন্য। একটি 'হিন্দু-বিবাহ। অপরটি 'রাধা-কৃষ্ণ' যুগলনৃত্য—আমার আর পাভলোভার।

—প্রতিক্রিয়া হয়নি কিছু?

—খুব।

উদয়শংকর বললেন, হতাশ হয়েছিলেন আমার শুভানুধ্যায়ীরা। গিয়েছি আর্টিস্ট হতে। আমার জন্যে জোগাড় হয়ে আছে প্রি-ভি বোম স্কলারশিপ। সেই আমি কিনা হতছাড়া বাউন্ডুলের মতো এক নর্তকীর সঙ্গে জুটে গিয়েছি। ভাবতে গিয়ে অনেকের দুচোখের নিদ্রা চলে গেল। অনেকে ছিঃ ছিঃ করলেন। তার আগেই আমি লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে অসি-নৃত্য করে বিখ্যাত হয়ে গেলুম। খবরের কাগজে আমার বিস্তর প্রশংসা বেরুল।

একটু থামলেন উদয়শংকর। বললেন, বাবাকে বোঝানো কঠিন ছিল। শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন। হ্যাঁ নৃত্যও একটা আর্ট। তাতে যদি আমার আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, তাতে তাঁর আপত্তি থাকতে পারে না। বোঝালেন পাভলোভাও। রয়েল অপেরা হাউস, কনভেন্ট গার্ডেনের মতো অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে আমার ও পাভলোভার নাচের প্রদর্শনী হল। পাভলোভা বিখ্যাত ছিলেন। আমিও বিখ্যাত হলুম। পাভলোভা বললেন, ভারতের সভ্যতা যে কত উন্নত, কত বিস্ময়ের, তা এই নাচ দেখেই বুঝতে পারছি।'

থামলেন উদয়শংকর। চোখে তন্দ্রার আবেশ। 'নমস্কার' বলে পিছু হটলেন দুপা, যেমন করে পর্দার আড়ালে মানুষ চলে যায় ঠিক সেভাবে তিনি পিছু হটে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। প্রতি নমস্কার করার আমি সময় পেলুম না।

।।৩।।

সেদিন উদয়শংকরের সঙ্গে অমলাশংকর ছিলেন প্রায় সারাক্ষণ। দরকার ছিল দুজনের সঙ্গেই। জাতীয় নাট্যশালা। নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল যুগান্তরে। তাদের মতামত সংগ্রহের দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর।

একটু থেমে থেমে, বিরতিবহুল শ্বাসাঘাত-প্রধান বাক্যক্ষেপে উদয়শংকর কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে। যদ্দূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রভারতীর নৃত্যশিক্ষক কে পি এস মেননও ছিলেন আমাদের পাশাপাশি একটি চেয়ারে। অমলাশংকরের সঙ্গে বোধহয় তাঁর কোনো কথা ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অনেকে বলছেন রবীন্দ্র-সদনকে জাতীয় নাট্যশালা করতে। আপনি কি সে দাবির অংশীদার হতে চান?

—না।

উদয়শংকর স্পষ্টত আমাকে বললেন, ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-[illegible] নয়। জাতীয় নাট্যশালার গঠনে সেই ধ্রুপদী চেতনা ও পরিবেশ দরকার।

—ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলটাকে যদি জাতীয় নাট্যশালা করা হয়, তাহলে....

আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উদয়শংকর বললেন, খুব ভালো হয়। জায়গাও আছে। ঐরকম চকমেলানো বাড়ি কলকাতায় আর দ্বিতীয়টি নেই। উত্তরের এসপ্ল্যানেড থেকে দাঁড়ালেই নজরে পড়ে। তবে, আরো কয়েকটি বাড়ি তৈরি করতে হবে তার চত্বরে। আধুনিক, পৌরাণিক সব রকমের নৃত্য, নাটক অভিনয়ের উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ বানাতে হবে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের থাকার উপযোগী বাসস্থান দরকার। তারা ওখানেই বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে, অভিনয়ের সঙ্গে একাত্ম হবে ধীরে ধীরে। না হলে কাজ হবে না।

অমলাশংকরের চোখেমুখে সেই মুহূর্তে আনন্দ ও বিস্ময় খেলা করছিল। বললেন, দারুণ ব্যাপার হবে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলকে জাতীয় নাট্যশালা করা হলে। ওর গম্বুজ থেকে নৃত্যশিল্পীরা নেমে আসবে নাচতে নাচতে নিচের দিকে।

মনে হচ্ছিল আমার, নাচের দৃশ্যটা অমলাশংকরের কল্পনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দেশ-বিদেশের নজির টেনে উদয়শংকর আমাকে বলেছিলেন, সব দেশেরই একটা জাতীয় অহংকার আছে। আমাদের নেই, তা বলছি না। কিন্তু যা আছে, তাকে রক্ষা করার উপযুক্ত চেতনা আমাদের নেই। সেটা তৈরি হলে সব হবে, নাহলে সবই যাবে। এই শতকের গোড়ার দিকে আমরা জেগে ছিলুম। উনিশ শতকের বাংলাদেশও ছিল জাগ্রত। এখন আমাদের মধ্যে সেই স্পিরিট আর নেই। আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি ক্রমশ। ঘুমের দিকে ঢলে পড়ছি।

টুকরো টুকরো কথা। সব মনে নেই। তাঁর বক্তব্যের অনুলিখন ছাপা হয়েছিল যুগান্তরে। আমি লিখে দিয়েছিলুম। তাঁকে দেখলেই আমার মনে হত, ঘুমের জগতে চলে যাচ্ছেন তিনি। কেন মনে হত, জানি না। মনে হত, এটাই সারকথা। অসম্ভব এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি কথা বলতেন।

।।৪।।

শংকর-স্কোপ দেখেছেন? আচমকা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উদয়শংকর। দেখা হয়নি এখনো। লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়লুম, না।

—কাল শো আছে। আসুন মহাজাতি সদনে।

উদয়শংকরের আমন্ত্রণ আমার কাছে এক দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কালই যাব।

গিয়ে দেখি হাউস ফুল। শো আরম্ভ হতে দেরি নেই। টিকিট কাউন্টারে কয়েকজন বসেছিলেন। কী বলি। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, মিঃ শংকর কি এসেছেন?

—কোন শংকর?

—উদয়শংকর। তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন পরস্পর। বিপন্ন বোধ করছিলেন। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শংকর, অথচ ওদের কিছু বলেন নি, ব্যাপারটা আমাকেও অদ্ভুত এক পরিস্থিতির ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। পরিস্থিতি সামলাতে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

—না, না, এমন কিছু দরকার নয়। আমি বললুম, পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। বলবেন, গৌরাংগ ভৌমিক এসেছিলেন।

বলেই আমি বিব্রত মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিলুম। হঠাৎ দৌড়ে এলেন এক ভদ্রলোক আমারই দিকে। আমাকে ডাকলেন। পেছন ফিরে দেখি, উদয়শংকর দাঁড়িয়ে আছেন বুকিং কাউন্টারের কোণের দিকে। আশ্চর্য! মুহূর্তের জন্যে আমি মাটির সঙ্গে মিশে গেলুম।

ক্ষমা চাইছি।

উদয়শংকরের দু-হাত জোড়া, আমি ভুলে গিয়েছিলুম আমার সেক্রেটারিকে বলতে। আসুন। এক্ষুণি শো আরম্ভ হবে।

বিস্ময়ে আমার দু-চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল সেদিন। এত বড় মানুষের সান্নিধ্যে আমি কমই এসেছি। শিষ্টাচারে, ভদ্রতায়, ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি আমাকে সেদিন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। পাশাপাশি আসনে বসে শংকর-স্কোপের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন কিছুক্ষণ। নৃত্য, অভিনয়, ক্যামেরা ও ভোজবাজির ব্যবহার সম্পর্কে আমাকে সচেতন করেছিলেন।

তারপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মাত্র একদিন, বালিগঞ্জ প্লেসের বহুতল একটি বাড়ির ফ্ল্যাটে। অমলাশংকর ছিলেন না। একজন চাকর এসে বলল, বাবু এখন ওষুধ খাবেন। খটাখট শব্দ আসছিল পাশের ঘর থেকে। কাঠের না ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা কাজ করছিল হাতুড়ি বাটালি নিয়ে—তারই শব্দ।

বেলা সাড়ে নটা তখন। উদয়শংকর এলেন গেঞ্জি গায়ে। আমাকে দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন মনে হল। বললেন, আত্মজীবনী লিখছি। অনেকটা এগিয়েছি। আমার জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল। একটা সাপ্তাহিকে। আমি বারণ করেছি ছাপতে।

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, কাজ হবে না। ওষুধ খাওয়া ফেলে রেখে তিনি একবার দেখা করতে এসেছেন মাত্র। তবু এলোমেলো কথা হল কিছুক্ষণ। সবই আত্মজীবনী প্রসঙ্গে। এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু কথা।

জীবনটাকে কি বেখে ঢেকে প্রকাশ করতে চান? জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি—কিছু গোপন করতে চান?

—না। ঠিক ঠিক যেমনটি আমি ছিলুম এবং আছি, সেরকমটিই লিখতে চাই। গল্প বানাতে চাই না। জীবনটাই তো উপন্যাস।

[illegible]

অজিতেশ কেয়া রুদ্রপ্রসাদ

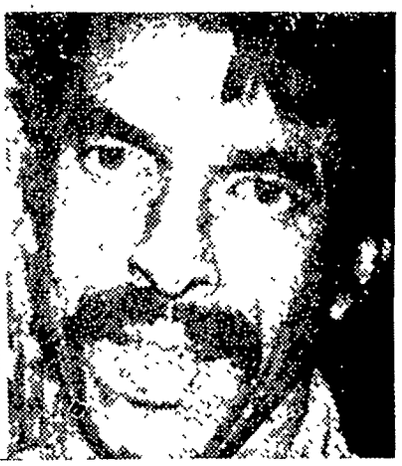

কেয়ন এবং কালিদা এখন আলাদা

নান্দীকার এবং নান্দীমুখ—এই দুই নামে দুটি নাটকের দলের বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে।

নান্দীকার একটি পরিচিত নাম। এই নামের সঙ্গে এতদিন ধরে তিনজন জড়িত—অজিতেশ, কেয়া, রুদ্রপ্রসাদ।

কেয়া নেই।

এখন দেখছি : নান্দীকারে একটি নাম নেই। সে নাম : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিখ্যাত নামটি জড়িত হয়েছে একটি নতুন দলের নির্দেশনায়। সে দল হোল—নান্দীমুখ।

আমরা ওই তিনজনকে একসঙ্গে ভাবতে অভ্যস্ত। কেয়ার মত অমন একজন মানুষের মৃত্যুর ধাক্কা বাংলা থিয়েটার এবং দর্শক এখনো সামলে উঠতে পারে নি। ওঠাও কঠিন।

তারপর ধাক্কা খেলাম সকালের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। দুই দল। দুদিকে দুজনের নাম। কেয়ন এবং কালিদা এখন আলাদা। হাজার হলেও অজিতেশ এবং রুদ্রপ্রসাদ—দুজনেই বাঙালী। ওঁরা আমাদের চরিত্র অনুযায়ী কাজ করেছেন। একটা জিনিস গড়ে তুলে ওঁরা দুজনে দু' টুকরো করলেন। যিনি বেঁধে রেখেছিলেন তিনি নেই।

সওদাগরের নৌকো দেখতে গিয়ে আকাদেমিতে কেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুই বোয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, আজ অজিতদার নাটক—আমি ভলান্টিয়ার।

বিনোদিনীতে রুদ্র ছিলেন—অ বাবু। অজিতেশ গিরীশ ঘোষ। কেয়া বিনোদিনী। অজিতেশ ডাকছেন—বিনোদ। মঞ্চের পেছনটায় ঝমঝম করে আগেকার বৃন্দবাদন।

ভালো মানুষে শান্তা রূপিণী কেয়ার সামনে সেলুন মালিক অজিতেশ। বিয়ের আসরে বর রুদ্র গান গাইছেন।

আন্তিগোনের মঞ্চসজ্জা নিয়ে বেশি রাতে রুদ্রের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। ১৪ রকমের রঙীন কাপড় দিয়ে মঞ্চকে ভাগ করা হয়েছিল। তার ভেতর দাঁড়িয়ে অজিতেশ কেয়াকে নিরাপদ বাস্তায় আনতে চাইছিলেন। নির্দেশনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

ফুটবলের প্রথম অভিনয়ের কদিন আগে কেয়ার ফোন। আমাদের বিশেষ অভিনয়—দেখবেন না? বললাম, জানতাম না। অজিতদাকে বলুন। আপনি গেলে খুশী হবেন। আমার কথা বলবেন না যেন।

ঠা ঠা রোদ্দুরে বেলেঘাটা লেকের কাছে সিঁড়ি ভেঙে সেই চাতালায়। সন্ত্রীক খেতে বসেছিলেন। উঠে এলেন অজিতেশ। বললেন, এটা রুদ্রর প্রোডাকসন। কেয়া সেজেছে মাসী। মা হলে ভালো হোত। বেশ খরচের প্রোডাকসন। আমি একজন জামাইবাবুর রোল করছি। আমি কম খরচের প্রোডাকসন করি। টলস্টয়ের একটা লেখা নিয়ে নাটক করবো।

ট্যাক্স। হল নেই। চড়া দরে ভাড়া ও বিজ্ঞাপন। উপরন্তু নাটক নেই। কয়েক বছর ধরে দর্শককে অভ্যস্ত করে করে এতদিনে 'দর্শকধন্য' অ্যাডজেক্টিভটি পাওয়ার মুখে মুখে দুটুকরো হয়ে গেলেন আপনারা। এখনো তো কেয়ার কাল-অশৌচের বছর কাটেনি। কেউ কি আপনারা ডিরেকটর থেকে ডিকটেটর হয়ে উঠেছিলেন? কাউন্টার সেলের ক্যাশ অনেক সময় গ্রুপ থিয়েটার ভেঙে দেয়। কিন্তু যতদূর শুনেছি—ফুটবলের আয়ব্যয় প্রায় সমান সমান।

মহলা এবং অভিনয়—সবই ফুটবলে নাকি লাভস্ লেবার? তাহলে?

তবে কি পার্সোনালিটি ক্ল্যাস? অহং? নামের বিজ্ঞাপনে ছোট বড় টাইপ? বড় রোল? ছোট রোল? সেসব নিশ্চয় নয়। এসব তো পাড়ার ক্লাবে হয়।

আপনারা গ্রুপ থিয়েটার করে আসছেন এতদিন। থিয়েটার আপনাদের কাছে আন্দোলন। সবার ওপরে ডিসিপ্লিন। দু' আড়াই বছর আগে কেয়া থাকতে আপনারা তিনজন এসব কথাই একজায়গায় বসে বলেছিলেন। আপনাদের বয়স এখন তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের ভেতর। গরম দেশ। ব্লাড সুগার, টেনশন ইত্যাদি শো বিজনেসের সহযোগী। বিদেশী নাটক তর্জমা, তার মহলা এবং তাকে মঞ্চসফল করার একটা পরিশ্রম আছে। ক্লান্তি, কণ্ঠস্বর ও সতর্ক সিলু বজায় রাখাও কঠিন। আমাদের আয়ু হাজার বছর নয়। কর্মক্ষম, পরিণত, ফলপ্রসূ বয়সটার মেয়াদ সব সময় খুব কম। আপনাদের আমরা 'পরিণত' বলতে শুরু করেছি। আর ঠিক এই সময়ে এই কাণ্ড!

হয়তো মানুষ বলেই এরকম করেছেন।

আপনাদের ভেতরের শ্রেষ্ঠকে আমরা সব সময় অভিনন্দন জানাবো।

একটা জিনিস রুদ্রপ্রসাদ। আপনার ফুটবলের সঙ্গে ওসবের যোগ কোথায়? এক ঝাঁক আবৃত্তি। গণসংগীত। বিষ্ণু দে'র স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যৎ। কাগজের বিজ্ঞাপনে এসব কথা রয়েছে। মানে নান্দীকারের সহযোগিতায় ওসব হবে। কেন? মানে বুঝতে পারছি না।

প্রিয় শের আফগান। আপনি ওসব জল পাতেননি দেখে ভালো লাগলো।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

নান্দীকারে ভাঙন

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

পয়লা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। আকাডেমিতে নান্দীকারের 'ফুটবল' হওয়ার কথা। অগ্রিম বিক্রি ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা। সেই দিন টিকিট কিনতেও এসেছিল অনেকে। কিন্তু শো হলো না। নান্দীকার টাকা ফেরত দিল, দর্শকদের হয়রানি করার জন্যে ক্ষমা চাইলো। দর্শকদের প্রশ্ন : কেন শো হবে না? নান্দীকারের উত্তর : অনিবার্য কারণে।

কী হতে পারে সেই অনিবার্যতা, তাই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আলোচনা চলে। বহু লোক জড় হয়েছে অ্যাকাডেমি হলের সামনে। অনুমানের চেষ্টা, আলোচনা, বিতর্ক, বিবাদ, উত্তেজনা। নান্দীকারের জীবনে এ ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটেনি। এই প্রথম। তাহলে কি নান্দীকার ভাঙছে? অসুবিধেটা কোথায়? সে-অসুবিধে দূর করা যায় না? এইসব দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা ও কৌতূহলের মধ্যে সব দর্শক বারবার একটা কথা বলেছে, কেয়া থাকলে এমন হোতো না। হতে পারত না। শো বন্ধ হোতো না।

পরের দিন খবরটা অ্যাকাডেমি হল ছাড়িয়ে থিয়েটার অনুরাগী অনেক মানুষের কাছে পৌঁছলো। তাদেরও একটা কথা : কেয়া থাকলে নিশ্চয়ই ঠেকাতে পারতো।

নান্দীকারের সদস্য ও কর্মীদের প্রায় সবার মুখে ঐ একই কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি : কেয়া নেই, তাই ঠেকানো গেল না। কেয়াদি থাকলে এমন হোতো না—হতে পারতো না।

সকলেরই অসীম বিশ্বাস— প্রায় যেন অলৌকিক স্তরে।

কেন এই বিশ্বাস? কী করেছিল কেয়া? কী করতো কেয়া? দলের একজন সদস্য ছিল, অভিনয় করত। অভিনয়ের জন্যে চাকরি ছেড়েছিল। সংগঠনের জন্যে প্রচুর কাজ করত—বোধহয় নান্দীকারের ব্যস্ততম কর্মী ছিল সে। প্রচার, হিসেব ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল তার। শেষদিকে প্রায় সব বইয়েরই নায়িকা ছিল সে। নান্দীকারের ছোট লাইব্রেরী প্রধানত তার উদ্যোগেই গড়ে ওঠে। গ্রামের জনসাধারণের কাছে নাটক কী ভাবে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যে ছিল উদগ্রীব ও সচেষ্ট। কোনো ধরনের কাজেই পেছপাও নয়। যত পরিশ্রমই হোক, শরীর ভাঙুক, কাজ বাদ দিত না। দলের যে কোনো সংকটে এগিয়ে সামনে দাঁড়াতো। অর্থ সংকটের দিনে ব্যক্তিগত দায়িত্বে হাজার হাজার টাকা ধার করত, নিজের গয়না বিক্রি করত, বন্ধক দিত। ভাঙনের চিহ্ন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকাতো। সৎ, আন্তরিক, উদ্যোগী কেয়ার কথা কেউ ফেলতে পারত না। তার ভালবাসা বেশি ছিল বলে জোরও বেশি ছিল। সে যেন ছিল নান্দীকারের বিবেক—এ কথা শুনতে অতিরঞ্জিত হলেও সত্য। শুধু নান্দীকারে নয়, তার বন্ধুমহলে, সহকর্মী মহলে ধীরে ধীরে ঐ রকম একটা স্থান তার হয়ে গিয়েছিল, হয়ে যেত। সবাইকে সে প্রখরভাবে সত্যের মুখোমুখি করিয়ে দিত—আত্মপ্রতারণা বা অন্য কোনো ভঙ্গী দিয়ে আড়াল করতে দিত না। এ বিবেক একটি শুদ্ধ বোধ মাত্র নয়, সক্রিয় একটি সত্তা। বন্ধুর দোষ দেখাতো সে নির্মমভাবে। অবন্ধুর গুণ দেখলে তাকে লালন করার সব দায়িত্ব অযাচিতভাবেই গ্রহণ করে নিত। নিজের এক কণা স্বার্থপরতা ছিল না বলে অন্যের স্বার্থপরতার সঙ্গে আপোস করত না। খুব সংক্ষেপে এই ছিল কেয়া।

নান্দীকারে মতান্তর মনান্তর এই নতুন হচ্ছে না। অনেকবার হয়েছে। যেমন সব দলেই হয়ে থাকে। হয়েছে, আবার মিটেছেও। অনেকের শুভেচ্ছায় ও চেষ্টায়, বেশির ভাগ সময়ে কেয়ার চেষ্টায়।

একবারের কথা মনে পড়ছে। তখন নান্দীকার রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় করে। একটি ঘটনায় নান্দীকার পুরো ভাঙনের মুখে এসে পড়ে। রঙ্গনা থেকে চলে আসে অজিত। বাড়িতে কিছু দুঃখ ক্ষোভ প্রকাশ করে, রাতের খাওয়া সেরে, অজিত শুয়ে পড়ে। রাত বারোটায় দরজায় ঠক-ঠক শব্দ। দরজা খুলে দেখা গেল—কেয়া, রুদ্র, সুব্রত। কেয়া এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে তর্ক করেছে, আলোচনা করেছে। নান্দীকার ভেঙে যাবে এই দুঃখে নিভৃতে কেঁদেছে। কথাবার্তার শেষ ধাপ—অজিতের বাড়িতে। যখন মীমাংসা হোলো তখন রাত সাড়ে তিনটে। বাকি রাতটা সবাইকে ওখানে থাকতে বললো অজিত। কিন্তু ভাঙন রোধ করে কেয়ার প্রাণে তখন ফুর্তি এসে গেছে। তা ছাড়া, রাতের কলকাতা দেখতে কেয়া ভালবাসতো। সুতরাং বেরিয়ে পড়া যাক। বেলেঘাটায় নতুন লেক হয়েছে। সেটা ভালো করে দেখা হয় নি। রাতে সেটা দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। চল। কেউ না যায়, কেয়া একাই যাবে। কেয়া বেরোলো। নতুন বেলেঘাটার চওড়া রাস্তা। একদম ফাঁকা। একটু এগোলে অন্য রাস্তা। রাস্তায় লোক শুয়ে আছে যথারীতি। এই যারা ফুটপাতে শুয়ে জীবন কাটাচ্ছে তাদের জীবনের সঙ্গে নান্দীকারের নাটকের কোনো সম্পর্ক আছে? নেই। তাহলে কীসের এই ঝগড়া-বিবাদ? ঝগড়ায় তো লজ্জা হওয়া উচিত। কাজের কাজ কিছু করতে পারা গেল না। ঝগড়া আর ঝগড়া-মেটানোয় এনার্জি না দিয়ে আসল কাজে দেওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার। নইলে নাটক করে কী লাভ? নান্দীকার রেখে, তার ভাঙন রুখেই বা লাভ কী? এইটুকু লাভ যে পরে চেষ্টা করা যাবে। নান্দীকার না থাকলে তো চেষ্টাও করা যাবে না।

শেষ রাতের নিঃশব্দ নির্জনতায়, আলোয়, আঁধারে বেলেঘাটার রাস্তায় হাঁটে কেয়া। আশ্চর্য আলাদা দেখাচ্ছে এখন কলকাতাকে। বিরোধ মিটেছে বলে একটু নিশ্চিন্ত লাগে কেয়ার। ভোরভোর সময়ে বাড়ি ফিরে শিশুর মতো ঘুমোয় কেয়া।

এবার কী হোলো? পয়লা সেপ্টেম্বর শো হোলো না। রাতে মিটিং হোলো—প্রায় সারা রাত। তাতে মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাবার সিদ্ধান্ত হয়। কারো কারো ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের চেষ্টায় ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক তাদের

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি.টি রোড (সাউথ) হাওড়া

[illegible] মধ্যে একটি [illegible] ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্কটিশচার্চ [illegible] ছেলে-মেয়েরা কেয়ার স্মৃতি[illegible] অর্থ সংগ্রহ করছিল— তাদের জন্যে নান্দীকার ফুটবল-এর একটি শো করে দেয় স্টারে ৫ সেপ্টেম্বর সকালে। এই শো বানচাল হবার মুখে গিয়েছিল। স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় শো-টি বেঁচে যায়। সব দিক দিয়েই সফল হয় সেই শো। কেয়া শেষবারের মতো নান্দীকারকে ঐক্যবদ্ধ করলো—পরোক্ষে।

৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। স্থিতাবস্থার সময় শেষ। সেদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কথাবার্তা চলে। কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো যায় নি। সুতরাং কেয়ার মৃত্যুর ছয় মাস না পেরোতে নান্দীকার ভেঙে গেল। আর তিনদিন বাকি ছিল ছয় মাস হতে।

অজিতের বাড়ি থেকে বেরোলাম। তখন রাত হয়ে গেছে। কেয়াও একদিন মীমাংসার কথাবার্তার পরে এই রাস্তাতেই হেঁটেছিল। সেদিন ছিল শেষ-রাত আজ এখন রাতের শুরু। সেদিন কেয়া ছিল সফল। আজ শুধুই ব্যর্থতা। সেদিন সে হালকা পাখায় পাব হয়েছিল এই রাস্তা। আমার গতি মন্থর, ভারাক্রান্ত।

বেলেঘাটা থেকে কেয়া ফিরেছিল গাড়িতে। আমিও গেলাম কেয়ার বাড়িতে। কেয়ার মা খবরটা জানার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছেন।

তিন-তলার ছোট ঘর। কেয়ার বসার ঘর। এই ঘরেই কেয়া লোকজনের সঙ্গে দেখা করত। আজ কেয়া নেই। ভালোমানুষের পোস্টার থেকে বাঁধানো কেয়ার বড় একটা ছবি দেয়ালে টাঙানো আছে। সেই ছবির ঠিক সামনে বসি আমি। ফ্রেমে-বাঁধা কেয়া খুশী-খুশী দীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শুধু ছবি।

কেয়ার মা এসে বসেন মেজেতে— কেয়ার ছবির একটা পাশে। তাঁকে খবরটা দিই। রোধ করা যায়নি— নান্দীকার ভেঙে গেছে। তিনি কিছুই বলেন না। শুধু তাঁর চোখ দুটি বিষণ্ণ হয়। কেয়া দীপ্ত চোখে আমায় বিঁধতে থাকে।

প্রায় ছ' মাস আগে একদিন কেয়ার মা এই ঘরেই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সবাই এসে তাঁকে কেয়ার দুর্ঘটনার সেই মর্মান্তিক খবরটি দিয়েছিলাম—এই ঘরেই। সেদিন সবাই এসেছিলাম। আজ আমি একা এসেছি।

কেয়া নেই। কেয়ার নান্দীকারও আর রইল না। অজিতের নান্দীকার আছে, রুদ্রের নান্দীকার আছে, কেয়ার নান্দীকার নেই।

ঐক্যবদ্ধ নান্দীকার নেই— সেটাই ছিল কেয়ার নান্দীকার। বাইরের দিক থেকে তাই একথা সত্য—কেয়ার নান্দীকার নেই। কিন্তু ভিতর দিক থেকে? সব [illegible] বলছে, আমাদের বলে [illegible] কেয়ার কথা, কেয়ার আদর্শ। থিয়েটারে আমাদের করণীয় আছে, সমাজের কাছে আমাদের দায় আছে, সে-দায়, সে-কর্তব্য আমরা পালন করব। আমরা কমিটেড— থিয়েটারের কাছে, সমাজের কাছে, কেয়ার কাছে।

যদি কোনো পক্ষ, বা সব পক্ষই, এই দায় ঠিক ঠিক পালন করে, যদি তারা কথা রাখতে পারে, তাহলে কেয়ার নান্দীকার বেঁচে আছে একথা জনসাধারণ স্বীকার করে নেবে, তার আগে নয়। তারা তখন বলবে—কেয়া নেই, কিন্তু কেয়ার নান্দীকার আছে: নও শুধু ছবি। আর সেই দিন না আসা পর্যন্ত নান্দীকারের সব সভ্যদের আমাদের মতো নান্দীকারের অসংখ্য অনুরাগীদের, মাথা নিচু করে বিষণ্ণভাবে পথ চলতে হবে।

ক্যালিক্স্® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নির্বিঘ্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :

★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর। টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

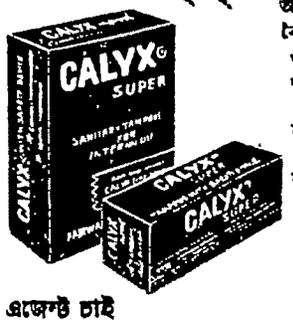

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১১
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

এজেন্ট চাই

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৬ষ্ঠ সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-কান্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন— (Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
(For B.U.) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২.০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—
দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত
কুলীন কুলসর্বস্ব ১০-০০

শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed. and Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান-৩য় সং ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
সংশোধিত ৩য় সংস্করণ ১৫-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, ঘোষ ও হালদার
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা ১৮-০০

BP
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯ ফোন : ৩৪-৭২৩৪

মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

জিঘাংসা মানুষের পাশব অতীতের উত্তরাধিকার। পশু-জগতে হত্যাই জীবনের অলংঘ্য শর্ত। নিজের বাঁচার জন্য চাই অন্যের জীবন, নিজের নিরাপত্তার জন্য চাই অন্যের বিনাশ। ক্ষুদ্র বৃহতের শিকার, বৃহৎ বৃহত্তরের। প্রকৃতির রাজ্যে জীবন তাই বাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের মতো সর্বদাই সচকিত এবং বিপন্ন।

হত্যা বিড়ম্বিত পশু জীবন থেকে মানুষের মনুষ্যত্বের উত্তরণ লক্ষ বছরের কাহিনী হলেও পশু জীবনের অনিবার্য প্রবৃত্তি-গুলি আজও মানুষের মনের মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি, মানবিক বোধ ও সংযম ঐসব পাশব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হলেও ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত পশুত্বকে লাগাম ছাড়া হতে দেয় না। কিন্তু মুহূর্তের অসতর্কতায় কিংবা প্রশ্রয়ে চাপা থাকা পশুত্ব যখন শিকল ছেঁড়া হিংস্র জন্তুর মত নৃশংস উত্তেজনায় দিশাহারা হয়, তখন পলকে মানুষ তার আরণ্যক অতীতে ফিরে যায়, জিঘাংসা হয় তার স্বাভাবিক বৃত্তি। মানুষ মানুষকে পশুর মত আঘাত করে হত্যা করে। সুতরাং হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে পরাজিত মনুষ্যত্বের অসহায় বলি। সে জয়ী নয়, সে পরাস্ত। তাকে বাঁধার প্রয়োজন আছে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু তাকে পশুর মত হত্যা করা অনিবার্য প্রয়োজন কিনা—এ প্রশ্ন খুব বেশি দিনের না হলেও আজ বিশ্ব-জনীন।

দেশে দেশে সমাজবিজ্ঞানী, মানবতাবাদী ও রাষ্ট্রনায়কদের আজ জিজ্ঞাসা—মৃত্যুদণ্ড ত হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত মানুষকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে সমাজজীবন বিপদমুক্ত হয়েছে কি? আরব দুনিয়ায়, আফ্রিকায় এখনও একটি জীবনের জন্য দশটি জীবন নেওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের সামনে হত্যাকারী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহীকে গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, তরোয়াল দিয়ে মাথা কেটে, এমন কি পিটিয়ে মারা হয়। তবু ঐসব দেশে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র কিংবা নরহত্যা বন্ধ হয়েছে কি? হত্যা দিয়ে যে হত্যার প্রতিকার হয় না, একি আজ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির লেখা দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও সভ্য দুনিয়ায় মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে চলে এসেছে নরহত্যা। —হত্যা জীবিকার জন্য, হত্যা খেলার জন্য, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে।

কিন্তু মৃত্যুদণ্ড শুধু হত্যাপরাধেই দেওয়া হয়েছে, একথা বললে ভুল বলা হবে। হাজার হাজার বছর ধরে, এমন কি ঊন-বিংশ শতাব্দীতেও এমন সব কারণে অসংখ্য হতভাগ্যকে জীবন দিতে হয়েছে যেগুলি সামান্যতম অপরাধ বলেও আজকের মানুষের কাছে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, হিব্রু, পারস্য, গ্রীস, রোম—সব প্রাচীন সভ্যতায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড-যোগ্য অপরাধ তালিকায় এমন সব অপরাধের উল্লেখ ছিল, যেগুলির জন্য একালে ছ মাস কারাদণ্ডও কঠিন শাস্তি বিবেচিত হয়। যেমন হামুরাবির দণ্ডবিধিতে মদ বেচায় দুর্নীতি ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ; ইহুদি (হিব্রু) আইনে মূর্তিপূজার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ভুল করেও কেউ যদি রাজার সিংহাসনে বসে পড়ত তাহলে প্রাচীন পারশিক আইনে সে বেচারার গলা বাঁচানোর কোন উপায় ছিল না। পেরিক্লিসের সময়ে গ্রীসে পুজ্যব্যক্তির অসম্মানের (স্যাক্রিলেজ) মূল্য দিতে হত প্রাণ দিয়ে। প্রাচীন রোম প্রজাতন্ত্রে একজনের মদের আলমারির চাবি চুরি করারও সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ব্যাভিচার, মূর্তিপূজা, সতীত্ব হারানো, ডাইনীবৃত্তি ইত্যাদির অভিযোগে

হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য দুনিয়ায় অগণিত হতভাগ্যকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে।

ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে আটটি গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সে অপরাধগুলি হল—রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র (প্রস্তুতি ও প্রয়াসসহ), ক্ষুদে ষড়যন্ত্র (যেমন কারও স্বামীকে হত্যার চেষ্টা), খুন, চুরি, ডাকাতি, সিঁধ কেটে চুরি, ধর্ষণ ও অগ্নি সংযোগ। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ তালিকা সমানেই দীর্ঘ হতে থাকে এবং টিউডর ও স্টুয়ার্ট যুগে প্রায় সব অপরাধই, যেমন ঘোড়া চুরি, ভেড়া চুরি, পার্ক থেকে গাছ কাটা, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭৮০ সালে, প্রথম তিন হ্যানোভার বংশীয় রাজার রাজত্বের শেষে বৃটেনে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮০।

আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে যে সব ব্যবস্থা একদা প্রচলিত ছিল তা একালে কল্পনা করাও কঠিন। ফাঁসি, পুড়িয়ে মারা, গরম তেলের কড়ায় ফেলে দেওয়া, হিংস্র পশুর মুখে ছেড়ে দেওয়া, জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া, জলে ডুবিয়ে মারা, পেষণযন্ত্রে গুঁড়িয়ে ফেলা, কুশবিদ্ধ করা, ঢিলিয়ে মারা, শূলে চড়ানো, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা, শিরশ্ছেদ করা, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা, ঊর্ধ্ববাহু করে বেঁধে নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল। তবে নৃশংসতার সব দৃষ্টান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছিল প্রাচীন পারস্যের 'নৌকা পদ্ধতি.' তাতে দণ্ডিতকে একটি নৌকায় শুইয়ে তার ওপর আর একটি নৌকা উপুড় করে চাপিয়ে দেওয়া হত, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকত শুধু দণ্ডিত ব্যক্তির মাথা ও হাত পা। তারপর মুখে ও হাত পায়ে মধু মাখিয়ে তার ওপর পিঁপড়ে মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি ছেড়ে দেওয়া হত। মুখটা থাকত সূর্যের দিকে উন্মুক্ত করা। যাতে চট করে অপরাধীর মৃত্যু না হয় তার জন্য মাঝে মাঝে জোর করে তাকে কিছু খাওয়ানো হত। ঐভাবে কয়েক দিন থাকার পর, কীট দংশনে সমগ্র দেহ বিষাক্ত হয়ে সেই হতভাগ্যর মৃত্যু ঘটত। আমাদের দেশের রাজা-উজির জমিদাররাও একদা অর্ধ-প্রোথিত মানুষকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানোর মত নানা নিষ্ঠুর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন বলে গল্প শোনা যায়। বর্তমানে আরব দুনিয়ায় ও আফ্রিকায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে প্রকাশ্যে জনতার সামনে গুলি করে, তরবারি দিয়ে মাথা কেটে অথবা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু পৃথিবীর যে সব দেশে এখনও মৃত্যুদণ্ড প্রচলিত আছে তার বেশির ভাগই ঐ দণ্ড অতিদ্রুত, সবচেয়ে কম কষ্টদায়ক পদ্ধতিতে ও গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে সারা করার পক্ষপাতী। বৃটেনে ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে ফাঁসি সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। ফ্রান্সে গিলোটিনে দণ্ডিতের শিরশ্ছেদ করা হয়। স্পেনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় গারোট নামক যন্ত্রে। তাতে অপরাধীর গলায় একটি তামার বেড়ি পরিয়ে তার স্ক্রু এঁটে এঁটে সেটিকে ছোট করা হয় আর সেই সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ অপরাধীর গলায় সেই সব স্ক্রুর আগার দিকটা সিঁধিয়ে যায়। অর্থাৎ শুধু শ্বাসরোধই নয়, সেই সঙ্গে বিঁধে যাওয়া স্ক্রুর অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে হতভাগ্য অপরাধী এক সময় প্রাণ হারায়। প্রাচীন গ্রীসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার বিকল্প বেছে নিতে বলা হত এবং সক্রেটিস তাই করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব রাজ্যে এখনও মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে সেখানে অপরাধীকে গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে হত্যা করা হয়। কোন কোন রাজ্যে অপরাধীর ইচ্ছামত ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে অথবা উল্লিখিত দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি প্রয়োগ করে জীবনের

পরিসমাপ্তি ঘটান হয়। ভারতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় জেলের ভিতরে, রাত্রির অন্ধকারে। সে সময় সেখানে কিছু প্রহরী ও কয়েকজন সরকারি কর্মচারী উপস্থিত থাকেন। ফাঁসির মঞ্চে তোলার আগে দণ্ডিতের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহৃদয় ব্যবহার করা হয়। তাকে শেষ প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী একজন যাজক উপস্থিত থেকে তার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেন।

মানব সভ্যতার সূচনাকালে যে কোন অপরাধকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির অপরাধ বলে মনে করা হত এবং সংশ্লিষ্টদেরই তার প্রতিকার করতে হত। কেউ হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির আপনজনেরা একজোট হয়ে সাধ্যমত তার বদলা নিত। কিন্তু মানব সমাজ সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ সম্পর্কে ধারণা পাল্টাতে থাকে, এবং চার হাজার বছর আগে হামুরাবির দণ্ডবিধিতেই দেখা যায় অপরাধকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে না বলে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপরাধীর দণ্ডবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর দেওয়া হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হিব্রু রাজ্যেও যে কোন অপরাধকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রনায়কদের। সুতরাং সাবধানের মার নেই ভেবে তাঁরা যে কোন অপরাধকেই কঠোর দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেন। সমাজ গড়ে উঠেছে পরিবার নিয়ে, সুতরাং সমাজের শান্তির স্বার্থে কোন পরিবারে অশান্তি ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই ব্যভিচার, অসতীত্ব, স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, এমন কি বাপ-মার প্রতি কটূক্তি আইনত নিষিদ্ধ হল, অতি সাবধানীরা মৃত্যুদণ্ডের পর্যন্ত বিধান দিলেন ঐসব অপরাধের জন্য। এক সময় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ঘোড়ার কার্য-

কারিতা ছিল খুবই, শীতপ্রধান দেশে পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া ছিল অমূল্য। অতএব ঘোড়া চুরি, ভেড়া চুরির মত কাজও মৃত্যু-দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হল ইংলণ্ডে। সমাজে অপরাধ-প্রবণতা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়, সে কারণে দোকান থেকে পাঁচ শিলিং-এর বেশি দামের জিনিস চুরি, রাস্তার ধারের বা পার্কের গাছ কাটা, এমন কি খরগোশ শিকার পর্যন্ত একদা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল ইংলণ্ডে ও ইউরোপের বহু দেশে। এইভাবেই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিনশ'র কাছাকাছি দাঁড়ায়।

কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষের সেই দিন হাঁস হল যেদিন দেখল সামান্যতম অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকা সত্ত্বেও অপরাধ না কমে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে কারণ খুঁজে পাওয়াও কঠিন হল না। তাঁরা বললেন, অপরাধের বিচারকরা মানুষ, যন্ত্র নন। ভেড়া চুরির জন্য ছ মাস জেল তাঁরা অপরাধীকে অনায়াসেই দিতে পারবেন, কিন্তু তার জন্য ফাঁসির নির্দেশ দেওয়ার মত নির্দয় কেউই হতে পারেন না। বিচারপতিদের এই অনুকম্পাই লঘু অপরাধে গুরু দণ্ডের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং শাস্তির বিধান দিতে হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে।

স্যার রবার্ট পীল যখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, তখনই এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দণ্ডবিধি সংশোধিত হয়। অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট হয় অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে। শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ বা বদলা নেওয়া নয়, শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন—এই নীতিও সে সময় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। বৃটেনে ১৮৩৪ সালে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১৫ এবং ১৮৬১ সালে মাত্র ৪টি অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বলবৎ থাকে। সে অপরাধগুলি হল—নরহত্যা, পুলিশ হেফাজত থেকে পালানো ও মারণাস্ত্রের সাহায্যে গ্রেপ্তারে বাধাদানের চেষ্টা, ডক ও অস্ত্রাগার ধ্বংস অথবা ধ্বংসের চেষ্টা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আবার এর শতাব্দীকাল পরে, ১৯৬৫ সালে বৃটেনে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ লোপ পায়।

বৃটিশ শাসনকালে আমেরিকায় মোট ১২টি অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধি এখনকার মত তখনও ছিল রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়, সমগ্র উপনিবেশে কোন কেন্দ্রীয় দণ্ডবিধি বলবৎ ছিল না। ফলে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে রাজ্যগুলির মনোভাব ও নীতিতে ছিল ব্যাপক পার্থক্য। যেমন ম্যাসাচুসেট রাজ্যে পৌত্তলিকতা, ডাইনিবিদ্যা, ঈশ্বর নিন্দা (ব্ল্যাসফেমি), নরহত্যা, মারাত্মক আঘাত হানা, পাষুকাম (সডমি), ব্যাভিচার (অ্যাডালটারি), নারীধর্ষণ, মানুষ চুরি, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। আবার পেনসিলভানিয়া রাজ্যে মাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নরহত্যা—এই দুটি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বিবেচিত হত।

উনিশ শতকের গোড়াতেই আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৮৪৫ সালে গঠিত হয় 'আমেরিকান সোসাইটি ফর দি অ্যাবোলিশান অফ্ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট'। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত মৃত্যুদণ্ডের অবসান হয়েছে, কিন্তু সে আলোচনায় পরে আসছি। এখন মৃত্যুদণ্ড রদের বিরুদ্ধে গোড়ার আন্দোলনের কথা বলি।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন গড়ে ওঠে ইউরোপে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগায় ইতালির বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অপরাধ-বিজ্ঞানী সি বি বেচারিয়ার প্রবন্ধ 'দেই দেলিত্তি ই দেলি পেনে' (অপরাধ ও শাস্তি), যা ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয় ও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ফ্রান্সের বিশিষ্ট মানবতাবাদী চিন্তানায়ক ভলতেয়ার ঐ প্রবন্ধের যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তিনিও মৃত্যুদণ্ড লোপের ধ্বনি তোলেন। ভলতেয়ার বলেন, শুধুমাত্র ঐ একটি রচনার জন্যই বেচারিয়া অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইংলণ্ডে মৃত্যুদণ্ড রদের দাবিতে সমর্থন জানালেন ডেভিড হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, টমাস পেইন, জেরেমি বেনথাম প্রমুখ মানবতাবাদী মনীষী। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বেচারিয়ার যুক্তি ও আবেদনে প্রভাবিত হয়ে রাশিয়ায় মৃত্যুদণ্ড রদের নির্দেশ দেন।

বেচারিয়ার বক্তব্যের সার কথা—অভিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রই অপরাধী নয়। সুতরাং অভিযুক্তের উপর পীড়ন না করে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। বিচার হতে হবে প্রকাশ্য আদালতে এবং উভয় পক্ষের যুক্তি বিচারকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে শুনতে হবে। আর অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে। তিনি মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ লোপের প্রস্তাব দেন এবং নরহত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই যথেষ্ট শাস্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কারা-সংস্কারেরও প্রস্তাব দেন। তিনিই প্রথম বলেন, অপরাধীকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নেওয়া নয়, তাকে সংযত ও সংশোধিত করা। এই জন্য তিনি লঘু ও গুরু অপরাধের অপরাধীদের কারাগারে এক জায়গায় না রাখার প্রস্তাব দেন।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বেচারিয়ার দণ্ডনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব ও সুপারিশ আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রে নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। বেচারিয়ার প্রস্তাবের আগে ইউরোপের খুব কম দেশেই কারাগার ছিল। অপরাধীদের চাবুক মারা, গরম ছেঁকা দিয়ে গা দাগিয়ে দেওয়া, হাত-পা কেটে দেওয়া প্রভৃতি ছিল ছোট অপরাধের শাস্তি। বড় অপরাধের শাস্তিগুলির কথা ত আগেই বলা হয়েছে। দৈহিক পীড়ন ছাড়া যে শাস্তি হতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ সে কথা ভাবতে পারে নি। আবার কারাগারও প্রথম দিকে ছিল অন্ধকূপের মত ভয়ংকর। সেখানে প্রবেশের পর খুব কম লোকই জীবিত

বেরিয়ে আসতে পারত, যারা আসত, রুগ্ন দেহ নিয়ে বাকী জীবন সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকত। কারাগার যে সংশোধনাগার এবং বিভ্রান্ত বিপথগামী মানুষকে আবার সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই যে তার কাজ, রাষ্ট্রবিধায়কদের এ উপলব্ধি সম্পূর্ণ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইউরোপের অণুরাষ্ট্র লিখটেনস্টিনে ১৭৯৮ সালের পর কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় নি। তার পরেই এ ব্যাপারে অগ্রণী দেশ ইউরোপের অপর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লাকসেমবুর্গ, সে দেশে শেষ ফাঁসি হয় ১৮২১ সালে। এর পর উদ্যোগী হতে দেখা যায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে। ভেনেজুয়েলার মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৮৬৩ সালে, কোস্টারিকায় ১৮৮০, ব্রেজিলে ১৮৯১, ইকুয়েডরে ১৮৯৭, পানামায় ১৯০৩, উরুগুয়েতে ১৯০৭, কলম্বিয়ায় ১৯১০, আর্জেন্টিনায় ১৯২২, ডোমিনিকান রিপাবলিকে ১৯২৪ ও মেকসিকোয় ১৯২৮ সালে। পর্তুগালে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৮৬৭ সালে এবং স্পেনে ১৯১০ সালের পর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের আইবেরিয়া উপদ্বীপের ঐ দুটি দেশের সিদ্ধান্তই লাতিন আমেরিকায় তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে এই ব্যাপারে প্রভাবিত করে। ফিনল্যান্ডে ১৮২২ সালের পর অসামরিক অপরাধে কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় নি। এবং ১৯৪৯ সালে ঐ দেশে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ রদ হয়। সুইডেনে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯২১ সালে এবং ডেনমার্কে ১৯৩০ সালে। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, আইসল্যান্ড ও ইতালিতে চল্লিশের দশকে মৃত্যুদণ্ড লোপ পায়।

কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে প্রথম মৃত্যুদণ্ড ও সেই সঙ্গে বেত্রদণ্ড লোপ পায় নিউজিল্যান্ডে। অস্ট্রেলিয়ার ছটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে চারটিতে মৃত্যুদণ্ড নেই। শ্রীলংকায় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকের শাসনকালে মৃত্যুদণ্ড লোপ পায়। কিন্তু বন্দরনায়েক স্বয়ং আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সেদেশে আবার মৃত্যুদণ্ড বহাল হয়। কানাডায় মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯৬৭ সালে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মৃত্যুদণ্ড নেই নেপালে ও ইজরাইলে। নেপালে ১৯৩১ সালে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়। ইজরাইলে ১৯৫৪ সাল থেকে নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড বন্ধ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নাজি জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতা সেদেশে এখনও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

বৃহৎ রাষ্ট্র নামে পরিচিত ৫টি দেশের মধ্যে একমাত্র বৃটেনে মৃত্যুদণ্ড রদ হয় ১৯৬৫ সালে। ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও বিভিন্ন অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, যদিও তার সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। রক্ষণশীলতা ও সতর্ক অগ্রগতি বৃটেনের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোন আন্তর্জাতিক আন্দোলনই ঐ দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেদেশে মৃত্যুদণ্ড রদের প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও শ্রমিক দল বা রক্ষণশীল দলের সদস্যদের ওপর ভোট দেওয়ার ব্যাপারে কোন দলীয় নির্দেশ বা হুইপ থাকে না। উভয় দলের সদস্যই নিজের বিচার-বিবেচনা মত প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন। তারপরও সমগ্র পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং মাঝে মাঝেই এ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হয়ে থাকে। এ সতর্কতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বৃটেনের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করছে অন্য বৃহৎ শক্তিগুলির মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

পুজোর আগেই বেরিয়ে গেল

আপনাদের মনের মতন একটি বই— আপনাদের মনে রাখবার মতন একটি বই দুষ্প্রাপ্য ছবির এ্যালবামে এ যেন মূল্যবান সব লেখার মেলা এই বিশেষ সংখ্যার চিন্তাশীল লেখক ও তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ নিবন্ধগুলি প্রকাশিত।

৩০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

স্বাদেশ ও সংকল্প

সংবিধান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত—
অনুপ চক্রবর্তী

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ
ভবানী মুখোপাধ্যায়

সার্বভৌম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি
ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রাতৃত্ববোধ ও নারীর মর্যাদা
ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
সঞ্জীবকুমার বসু

দাম ৮-০০ রেজিষ্ট্রী ডাকে ১১-০০

প্রাপ্তিস্থান
পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২
ডাকে পেতে হলে নিম্ন ঠিকানায় এম ও করে টাকা পাঠাতে হবে

অভী প্রকাশন

১০, কিরণশংকর রায় রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবজন্তু সংরক্ষণ
অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

কঠোর পরিশ্রম ও সমষ্টিগত কর্মতৎপরতা
ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও বৈচিত্র্য
ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও সংস্কার মন্যতা
ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

এই সব মূল্যবান আলোচনাগুলির সঙ্গে আছে ১২০টি আর্ট প্লেট যা বাংলা পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দিনগুলি ও তদানিন্তন জাতীয় নেতৃবৃন্দের অসংখ্য ছবি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এক সঙ্গে এতগুলি ছবি পাওয়া উৎসাহী পাঠকদের কাছে সংগ্রহ করে রাখার মত। ম্যাপলিথো কাগজে ও লাইনো টাইপে ছাপা।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শুধু নরহত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে বিশেষ করে স্তালিনের দীর্ঘ শাসনকালে রাজনৈতিক কারণে যে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব কারও জানা নেই। সেদেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শেষ উল্লেখযোগ্য বলি লেভ্রান্তি বেরিয়া। কুশ্চেভের শাসনকাল থেকে রাশিয়ায় রাজনৈতিক হত্যা বন্ধ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-৭২ সালের মধ্যে মোট ৩,৮৫৯ জনকে অসামরিক অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তবে ঐ সময়ের শেষ ক' বছরে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা খুবই কম ছিল। যেখানে ১৯৩৫ সালে ফাঁসি হয় ১৯৯ জনের, সেখানে ১৯৬৬ সালে ফাঁসির সংখ্যা এক ও পরবর্তী বছরে দুই। ১৯৬৮-৭২ সালের মধ্যে একজনেরও ফাঁসি হয়নি। ১৯৩০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে যতজনের ফাঁসি হয়েছে তার মধ্যে ৩,৩৩৫ জনের হয়েছে খুনের জন্য ও ৪৫৫ জনের হয়েছে ধর্ষণের জন্য। দণ্ডিতের মধ্যে ২,০৬৬ জন (৫৩.৫ শতাংশ) কৃষ্ণাঙ্গ, ১৭৫১ জন (৪৫.৪ শতাংশ), শ্বেতাঙ্গ ও ৪২ জন অন্য জাতি গোষ্ঠীর। দণ্ডিতদের মধ্যে ৩২ জন নারী যাদের মধ্যে ২০ জন শ্বেতাঙ্গিনী ও ১২ জন কৃষ্ণাঙ্গী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে সব মৃত্যুদণ্ডের আদেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তার মধ্যে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ১৯৫৩ সালে তাঁরা দণ্ডিত হন। আমেরিকায় ও কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় তাঁদের রক্ষার দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। সে আন্দোলন সফল না হলেও মার্কিন নাগরিকদের চিন্তাধারা তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ১৯৬০ সালে আবার সিরিল চেসম্যানকে রক্ষার জন্য সারা আমেরিকা উত্তাল হয়। সে প্রয়াসও সফল হয় নি, কিন্তু আমেরিকার মানুষ মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ঐ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের ২৯ জুন আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে মৃত্যুদণ্ডকে 'নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক' এবং সে কারণে মার্কিন সংবিধানে ঘোষিত মৌল অধিকারের সঙ্গে 'সঙ্গতিহীন' বলে ঘোষণা করা হয়। রায়টির ভাষা অবশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না এবং মাত্র ৫-৪ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ঐ রায়ের পক্ষে ছিল। বিচারকদের মধ্যে কেবলমাত্র দুজন সুস্পষ্ট ভাষায় মৃত্যুদণ্ডকে মার্কিন সংবিধান-বিরোধী বলে অভিমত দেন। রায়টি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ১৬টিতে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্য অঙ্গ রাজ্যগুলিতেও কদাচিৎ কোন গুরুতর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। যাই হোক, সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মাত্র একজনের সেদেশে ফাঁসি হয়েছে। রবার্ট কেনেডি বা মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকারী কারও ফাঁসি হয় নি।

মৃত্যুদণ্ডের অসার্থকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন, হত্যা ও মৃত্যুদণ্ড পরস্পর বিরোধী নয় যে একের জন্য অন্যটি বিলুপ্ত হবে, তারা একই এবং এক থেকে অন্যের উদ্ভব। একথা যে কতটা সত্য তা এখন যে সব দেশে

রক্তের বদলে রক্ত ?

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

রক্তের কালচে লাল দাগ শুখিয়ে গেছে অনেক দিন। কালের যাদুকরী প্রলেপ স্মৃতির দগদগে ক্ষতচিহ্নটাকেও সারিয়ে দিয়েছে। শুধু আজও যা জেগে আছে তা হাড় হিম করে দেওয়া একটা দুর্দান্ত ভয়, একটা দারুণ ত্রাস। এখন এক শরতের মধ্যাহ্নে সেই দুর্দান্ত ত্রাসে শিউরে ওঠা একটা পরিবারের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে আছি মধ্য কলকাতার একটি দেড় কামরার বাসায়।

ভয়ে মূক যে পরিবারের ভগ্নাংশটি এখন আমার সামনে হাজির রয়েছে তাঁরা যে মুহূর্তে আমার সাংবাদিক পরিচয় পেলেন সেই মুহূর্তে চুপ করে গেলেন। তক্তাপোশে ময়লা বিছানা, দড়ির আলনায় কিছু আধ ময়লা শাড়ি, পাজামা, ফতুয়া। এক কোণে কয়েকটা খেলো বাসনকোসন। তক্তাপোশের পাশে রঙ চটা টিনের তোরঙ্গ। তার গায়েই দু-এক জোড়া সস্তা চপ্পল।

মধ্য কলকাতার যে সব ঘিঞ্জী এলাকায় দিনেও সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ সেই রকম এক এলাকার মধ্যে এখন নিহত পুলিশ কনস্টেবল পরিবারটির আস্তানা। না, নিহত সেই পুলিশের নাম কিছুতেই বলা যাবে না। এই কথা স্বীকার করে নেবার পরই আমি ওই বোবা মুখগুলিকে একটু মুখর করতে পেরেছিলাম।

তাঁদের কাছে আমাকে আরও কবুল করতে হয়েছে যে, পরিবারের যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের কারও নাম, ধাম কিছুই আমি লিখতে পারব না। এমন কি ট্রাফিক ডিউটি করার সময় কলকাতা শহরের ঠিক কোন এলাকাটাতে প্রায় ৪০ বছরের বয়সের পুলিশটি জখম হয়ে কাটা পাঁঠার মত ধড়ফড় করছিল সে কথাও আমি লিখতে পারব না— এই শপথও আমায় করতে হয়েছে তিরিশ পার হওয়া রোগা শোক-বিধ্বস্ত বিধবাটির কাছে।

নিরুপায়ে আমি ওঁর সব কথাতে সায় দিই। মনে মনে কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম তবে কি শাদা খাতা নিয়েই ফিরতে হবে আমাকে। মনে এই ভাবনা জাগতেই আমি ভদ্রমহিলাকে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি কোন কিছুই আপনাদের সম্পর্কে লেখা যাবে না।

তিনি বললেন, তা কেন? আমাদের পরিচয় প্রকাশ না করে বাকি সব কথাই লিখুন। কিন্তু কিই বা লিখবেন আমাদের নিয়ে।

মহিলার শ্বশুর বললেন, বৌমা ঠিকই বলেছে। আমরা তো আর কোন শহীদের পরিবার নই। কে আমাদের খোঁজ রাখে বলুন? আমার জোয়ান ছেলেটা আর কোন কাজ না পেয়ে পুলিশে নাম লিখিয়েছিল। কোন দিনই মারধোর করার দিকে তার ঝোঁক ছিল না। তবু কলকাতায় যখন গলা কাটাকাটি শুরু হল তখন সে ভয় পেত। বলত, যদি কোন দিন আমাকেও কাটতে আসে।

আমি ওকে সাহস দিতাম। বলতাম, তোর ভয় কি? তুই তো শুধু ট্রাফিক ডিউটি করিস। বৌমাও তাই বলত। তবে মাঝে মাঝে কালিঘাটে পুজো দিতে যেত। মায়ের প্রসাদী ফুল দিয়ে দিত তার জামার পকেটে।

আমরা সবাই ওকে সাহস দিতাম। কিন্তু আমাদের বুকেও ভয় ছিল। কাগজ খুললেই দেখতাম রক্ত আর আগুন। নাকে আসত বারুদের গন্ধ। ছেলেটা যতক্ষণ ঘরে না ফিরত স্বস্তি পেতাম না।

এমনি করে যে দিনটা কাটত, সে দিনটা পর্যন্ত ছেলেটার পরমায়ু ছিল বলে মনে করত নিহত পুলিশ সেপাইয়ের বাবা।

সেটা সেই যুগ যখন দেওয়ালে নানা লিখনের সঙ্গে, চলছে-চলবে'র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হত, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশ বারো।

বৃদ্ধ বললেন, ছেলে যখন কাজে ঢুকেছিল তখন সেপাইদের মাইনে ছিল মোটে আশী টাকা। বছরে বাড়ত দু' টাকা করে। এমনি করে একশ বারো টাকা মাইনে হলে আর বাড়ত না। ও যখন মারা গেল তখন মাইনে পেত

মৃত্যুদণ্ড আছে এবং যে সব দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন তুলনা করলেই বুঝতে পারি। ইউরোপের দেশে দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই, কিন্তু সে সব দেশ খুনোখুনিতে ভরে যায় নি। অপর দিক আরব দুনিয়ায় ও আফ্রিকায় দলে দলে মানুষকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে অথবা গুলি করে মারা হলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। মরক্কোর রাজাকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে এক দফায় ৬৫ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু সে রক্তের দাগ না শুকোতেই আবার একটি বড় ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং আবার কয়েকটি প্রাণ বলি হয়। ইথিওপিয়ায় অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্যে কয়েক মাস আগে এক দিনে ৪৮ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, কিন্তু সেদেশে আজও শান্তি আসে নি। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের ভয় মানুষের হত্যা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে এর সমর্থনে জোরাল যুক্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ যখন হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয় তখন নিজের জীবনের কথা সে মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করে না। আর যে প্রাণভয়ে ভীত তার পক্ষে খুন করা ত দূরের কথা, কাউকে একটা চড় মারার সাহসও কখনো হয় না।

মৃত্যুদণ্ডের সমর্থকরা বলেন, যারা নরঘাতী, নিষ্ঠুর, স্বভাব দুর্বৃত্ত তাদের জেলে আটক রাখা হলে জেলের শান্তি বিঘ্নিত হয়, জেলের অন্যান্য কয়েদী এবং প্রহরীদেরও ঐ সব ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তার পর নির্দিষ্ট মেয়াদ জেল খেটে বেরিয়ে এলে আবার সে সমাজ-জীবন সন্ত্রস্ত করে। আর মানুষ খুন করে সে এমন কোন সুকাজ করে নি যার জন্য তাকে শান্তিপ্রিয় বরদাতাদের পয়সায় সারা জীবন বসিয়ে খাওয়াতে হবে। এসব যুক্তির জবাবে মৃত্যুদণ্ড রদের সমর্থকদের বক্তব্য, অপরাধতত্ত্ববিদরা দেখেছেন, জেলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরাই সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও শান্ত। বরঞ্চ ঝামেলা হয় ছিঁচকে অপরাধীদের নিয়ে। হত্যাকারী মুহূর্তের উত্তেজনায় চরম অন্যায় করে থাকলেও সে স্বভাব দুর্বৃত্ত নয়। তাই একবার মুক্তি পেলে সে আর কখনও ফিরে আসে না। কিন্তু চোর, পকেটমার, জালিয়াৎরা জেলঘুঘু। জেলই তাদের সারা জীবনের আস্তানা। তারা ছাড়া পাওয়ার কদিন পরেই আবার একটা অপরাধ করে ফিরে আসে। সুতরাং জেলের অবহাওয়া তারাই বেশী দূষিত করে এবং শান্তিপ্রিয় করদাতাদের পয়সা তাদের জন্যই খরচ হয় বেশী। এমন পকেটমার সব জেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে যার সাজা হয়েছে অন্তত বিশ-পঁচিশ বার এবং জেলে কেটেছে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর।

তারপর মৃত্যুদণ্ড দিতে সব বিচারক ও জুরি এত বেশী সতর্ক যে প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ডের বিধান না থাকলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীর শাস্তি হতে পারত। অকারণে অথবা সন্দেহযুক্ত কারণে একজনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে সকলেরই ভয়। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী জেনেও সামান্যতম অজুহাতে জুরি অনেক সময় অপরাধীকে 'নট গিল্টি' বলে ছেড়ে দেন।

বিচার-বিভ্রাট যে কী মর্মান্তিক হতে পারে তা ইংলণ্ডের একটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যাবে। ১৯৫০ সালে টিমথি ইভান্স নামে এক ব্যক্তিকে স্ত্রী ও কন্যা হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

একশ'র ওপর আর কয়েকটা টাকা। বোধহয় চার হবে। হ্যাঁ ডি-এ কিছু ছিল বোক। সব মিলিয়ে দুশোও নয়।

দুশোটা টাকাও এই মাগগী গণ্ডার বাজারে যে ছেলে রোজগার করতে পারত না তাদের সংসার যেমন চলার কথা তেমনি চলত। তবুও সেই ছেলের শোকে গোটা পরিবারটা যেন কদিন পাথর হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, ওকে মেরেছিল ছুরি আর ভোজালী দিয়ে।

তখন কলকাতায়, রাণাঘাটে, বারাসাতে, হাওড়ায় নকসালপন্থী সন্দেহে ছেলেদের পুলিশ মারত পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে। কাউকে মারা হত কুকুরের মত পিটিয়ে। তথাকথিত নকসালপন্থী শহুরে গেরিলাদের হাতিয়ার ছিল ছুরি, ভোজালী, পাইপ গান আর বোমা।

বৃদ্ধ জানেন না, আমি জানি যে ১৯৭০ সালে এই রকম সব হাঙ্গামায় বাংলা পৌনে চারশো মানুষ খতম হয়েছিলেন।

ঐ বছর মোট ৫২৬ জন পুলিশের ওপর আক্রমণ হয়েছিল। তার মধ্যে মারা গিয়েছিলেন ৪১ জন। মারো অথবা মরো—এই ছিল সেই যুগটার নীতিবাক্য।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিকের ওই সেপাই মারার কাজ করত না, তাই বোধহয় তাকে মরতে হল। তার শরীরের নয় জায়গায় সেদিন আঘাত করা হয়েছিল। তখন মানুষটিকে আরও তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচান যেত কি না তা বৃদ্ধ বা তাঁর বউমা বলতে পারলেন না।

বৃদ্ধ বললেন, ও সব কথা ভেবেই বা লাভ কি? কাল ফুরিয়ে ছিল, চলে গেছে, এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিই।

বাড়িতে যখন খবর এল তখন সব শেষ। শেষ সময়েও আমাদের কাউকে কাছে পায় নি। জানি না শেষ সময় ও কি বলে গিয়েছিল।

নেহাতই নির্লজ্জের মত ওঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যখন শুনলেন উনি খুন হয়েছেন তখন আপনাদের কি মনে হল?

আবার বৃদ্ধই জবাব দিলেন। বললেন, আপনি হয়ত মনে করছেন, আমি তখন ভাবছিলাম এর পর সংসারটা কি করে চলবে? কে মানুষ করবে আমার নাতি-নাতনীদের? তাই না?

আমি বলি, না, না। ঠিক তা নয়। এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বৃদ্ধ বললেন, তবে শুনুন, আমি তখন ভাবছিলাম, কেন এমন হোল? কার রক্তের বদলা নেওয়া হল আমার ছেলের রক্তে?

সেদিন বৃদ্ধ তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্নটির জবাব পান নি। আজও পেলেন না।

ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়ে এ-সব কথা আলোচনা করার সময় বৃদ্ধ রাগেন নি, কাঁদেন নি—এমন কি বিরক্তও হন নি। তাই ভরসা পেয়ে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজে বোধহয় দেখেছেন, রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে?

—হ্যাঁ, তা দেখেছি।

—কাজটা ভাল হচ্ছে, না মন্দ হচ্ছে?

এবার তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জবাব দিলেন, দেখুন সবার কথা আমি বলতে পারব না। যদি শুনতে চান, তবে আমার কথাটা বলতে পারি।

আমি ওঁকে অনুরোধ করি, তাই বলুন।

উনি জবাব দেন, আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি রক্তের দাগ রক্ত দিয়ে মোছা যায় না। আমার, ওই বউটার, ওই নাবালক ছেলে-মেয়েগুলোর তো যা হবার তা হয়েছে। ঐ অপরাধ যারা করেছে তাদের ফাঁসি দিলে তো আর ছেলে ফিরবে না।

ওতো রক্তের বদলে রক্তের মত কথা হয়ে গেল। না, না মশাই তা আমি চাই না।

এইবার বৃদ্ধ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছলেন।

ইভান্স বলে যে সে খুনী নয়, খুনী জন কিস্টি যে প্রত্যক্ষদর্শী সেজে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। ঐ ঘটনার তিন বছর পরে ছয়জন নারী হত্যার অভিযোগে কিস্টি ধরা পড়ে এবং ফাঁসির একমাস আগে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয় যে, ইভান্সের স্ত্রী ও কন্যাকে সেই হত্যা করেছিল। ঐ ঘটনার পর বৃটেনে মৃত্যু-দণ্ড রদের আন্দোলন আরও জোরালো হয়।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, অন্তত পরীক্ষা-মূলকভাবেও ভারতে কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড রদের সমর্থক ছিলেন। তিনিও ক্যালকাটা হাইকোর্ট ল রিপোর্টস থেকে একটি কেস উদ্ধৃত করে দেখান, মানুষের বিচারের ভুলে কিভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিও প্রাণ হারাতে পারে। এক তরুণী হত্যার দায়ে একটি বৃদ্ধের মৃত্যুদণ্ড হয়। এক্ষেত্রেও বৃদ্ধটি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানায় যে সে ঐ মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে কোনভাবে জড়িত নয় এবং মেয়েটির আদ্দেই মৃত্যু হয়েছে কিনা তাও তার জানা নেই। আর ঐ বৃদ্ধের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার দু বছর বাদে সেই মৃত মেয়েটি গাঁয়ে ফিরে এসে জানায় যে সে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল।

অনুরূপ আরও একটি ঘটনার কথা প্রকাশিত হয় একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায়, ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। মধ্য-প্রদেশে গোন্ডা জেলার তরাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাঁদসুখা গ্রামের অধিবাসী গজানন্দ ২৫ আগস্ট থেকে বেপাত্তা হলে রটে যায় যে, তাকে খুন করা হয়েছে। তারপর একটি বিকৃত শবের সন্ধানও মিললো যাকে অনেকে গজানন্দের দেহ বলে সনাক্ত করলো, ময়না তদন্তে ঐ দেহে আঘাতের চিহ্নও মিললো। এর পরেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেওয়া হলো। আসামীদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার মামলা যখন প্রায় প্রমাণ হয়ে এসেছে, সেই সময় হঠাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে স্বয়ং নিহত গজানন্দ গোন্ডার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত তিন আসামীর সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মাবতারকে জানালো, সে সম্পূর্ণ জীবিত। কাজের খোঁজে সে পাশের জেলায় কিছুদিনের জন্য গিয়েছিল।

মানুষের বিচারের ভুলে যুগে যুগে কত নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে তা বোঝার পক্ষে তিনটি ঘটনাই কি যথেষ্ট নয়? যার হাতে ক্ষমতা তার বিচারই ন্যায় বিচার—এ দম্ভ মানুষের কবে যাবে? যারা ক্ষমতাবান তাদের জন্য আইনের ফাঁক, সন্দেহের অবকাশ সব সময় মেলে। মামলা প্রমাণ হলেও তাদের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বেশি কিছুতেই হয় না, যার প্রকৃত অর্থ বছর দশ-বারো বন্দীজীবন। তার ওপর ডিভিসন পেয়ে গেলে ত কথাই নেই, সাজার বোঝা আরও অর্ধেক সাঘব হয়ে গেল। দুঃসহ সুবিচারের বোঝা বইতে হয় শুধু দরিদ্র ও দুর্বলদের। মৃত্যুদণ্ড রদের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট জনসনের অ্যাটর্নি-জেনারেল ব্যামসে ক্লার্ক তাই বলেছিলেন—ইট ইজ দি পুয়োর, দি সিক, দি ইগনোরেন্ট, দি পাওয়ারলেস অ্যান্ড দি ডিফেন্ডেন্ট হু আর একজিস্টিউটেড।

একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ডঃ কাটজু হিসাব করে দেখান যে, প্রতি বছর ভারতে প্রায় দশ হাজার লোকের বিরুদ্ধে নর-হত্যার অভিযোগ আনা হয়। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫জন যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অথবা সন্দেহের অবকাশে দায়রা জজের আদালতেই ছাড়া পেয়ে যায়। বাকি যারা থাকে তাদের ১৫ শতাংশ মুক্তি পায় হাইকোর্টে আপিল করে। এর পরেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের একটা বড় অংশ ফাঁসি থেকে রক্ষা পায় রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা লাভ করে। এইভাবে বাদ পড়তে পড়তে দশ হাজার অভিযুক্তের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এক শ থেকে দেড়শ জনকে ফাঁসিমঞ্চে ঝুলতে হয়। অথচ মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারটা না থাকলে হয়ত অনেক মামলার কিনারা হতো ও অনেক বেশি অপরাধীর সাজা হতো।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের জন্য অন্তত মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা উচিত এমন একটা অভিমত মৃত্যুদণ্ড রদের সমর্থকদের মধ্যেও শোনা যায়। মনে হতে পারে কথাটা ঠিক, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে ত কোন ঝুঁকি নেওয়া যায় না। কিন্তু এখানেও যে কথাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার তা হল, কোন অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রী সরকারের উৎখাতের জন্য তৎপরতাকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র বলা যায় না। বৃটেনে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের কোন অবকাশই নেই, কারণ সে-দেশে অতি সহজ পথে সরকারের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু পর্তুগালে সাল-জারের ঐতিহ্যবাহী স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোন উপায়ে হওয়া সম্ভব ছিল? সেখানে ত অভ্যুত্থানের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র হবেই। পর্তুগালের স্বৈরতন্ত্রী শাসকরা আগেভাগে জানতে পারলে হয়ত অভ্যুত্থানের নায়কদের অনেককে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতেন, কিন্তু সভ্য গণতন্ত্রী দুনিয়ার মানুষ কি সে-বিচারকে সমর্থন জানাতো? রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়, তাহলে সেখানে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কোন অবকাশই থাকে না। যুদ্ধের সময় অবশ্য বৃটেনের মতো দেশেও লর্ড হর্থর মতো দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কিন্তু সেরকম বিশ্বব্যাপী সার্বিক যুদ্ধ আর কোনদিনই হবে না।

অবশ্য সভ্যতা সম্বন্ধে শেষ কথা যেমন কোনদিনই বলা যাবে না, তেমনই তার অগ্রগতির পথে উদ্ভূত সমস্যাগুলিরও কোন বাঁধাধরা সমাধান বাৎলে দেওয়া যায় না। মিউনিখ অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গন যে কয়েকটি নরপিশাচের উন্মত্ততায় রক্তে লাল হলো, তার বিচার কিভাবে হবে? বিমান ছিনতাই করে নিরাপরাধ যাত্রীদের জীবন বারবার বিপন্ন করছে যারা, তাদের দমন করতে কেন চরম ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? যেসব অর্থনৈতিক অপরাধীদের কাজের ফলে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে পড়ে এবং সব রাষ্ট্রীয় আইনকে যারা বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও বুড়ো আঙুল দেখায়, তাদের কেন চরম শাস্তি দেওয়া হবে না? ইরানে যে আফিং চোরাচালানদারদের ফাঁসি দেওয়া হয়, সে কি সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য কাজ?—এসব প্রশ্নের কোন উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। কিন্তু এসব সমস্যাই প্রকৃত-পক্ষে আন্তর্জাতিক এবং রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেই এ-সবের সমাধান খুঁজতে হবে। নানা কারণে সারা বিশ্বের মানুষ আজ আগের তুলনায় অনেক বেশি বেপরোয়া ও মৃত্যুভয়হীন, সুতরাং মৃত্যুভয় দেখিয়ে ঐসব বেপরোয়া মানুষ-দের সংযত করা যাবে, এমন সহজ সমাধানের সমস্যা ঐগুলি নয়। পূর্ণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া ঐসব সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বিমান ছিনতাইকারীদের কোন দেশ তার বিমানবন্দরে নামতে দেবে না—শুধু এই একটি সিদ্ধান্তে সব দেশ একমত হতে পারলেই হাইজ্যাকিং এক দিনে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইরকম আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের মতো সমস্যাও আয়ত্তে আনা যায়।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর চল্লিশটি রাষ্ট্রে এপর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ রদ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে এখন মৃত্যুদণ্ড নেই। অনেক সভ্য রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল না হলেও, তার বাস্তব প্রয়োগ বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। যেদিন সারা পৃথিবীতে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ রদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সেদিনই বলা যাবে, বর্বরতার অন্ধকার থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা আর একটি মাইলস্টোন অতিক্রম করেছি।

চোরচরিতামৃত

বিশ্বনাথ বসু

কালো পা কাদা জলের কামড়ে পড়া যে চাষার, লোহার লাইন দিয়ে ছুটে আসা রেল ইঞ্জিনের গর্জনে তার মাঠুয়া বুকে ধকপকায়। নীলকুঠি গ্রাম থেকে যেন রগ ছেঁড়া হয়ে সে এলো জিলা শহরে। মরা মহারাজার অধুনালুপ্ত রাজধানী। ওল্ড টাউন স্টেশনে, ইতস্ততঃ পড়ে থাকা মাল বগী খালাস বগী, গুদাম, পোড়া ঝামা, প্ল্যাটফর্ম, লোহার বাকলের বেড়া, লাটনের চিত্রিবিত্রি আর সানটিং করা গাড়ির সিটি ও ধোঁয়ায় স্থানটা কেমন যেন লোহালক্কড়ের কারখানা কারখানা। সত্যিকার কারখানা নেই। স্টেশনের উত্তরে কেবল কয়েকটা ধেনো কল। নিরিবিলি প্ল্যাটফর্ম-এরা একেবারে বাজে কোনায় সে শেষ অবধি এক কানচি জায়গা পায়। রোজ রাত দশটার মধ্যেই প্ল্যাটফর্ম দখল হয়ে যায় যাত্রী, ভিখিরী, জুয়াড়ুর আর হকারে। প্রসূতাগারের পাশে সে যেন টিকিটহীন অপরাধীর মতো আত্মগোপন করে থাকে। ঘুম আর হয় না। যেন চাষার কামঘাটা দেহের বা পৌষ ভাতের ঘুম ঘুচিয়ে মেরেই তাকে করে তুলেছিল রাতচরা।

কাজকামের ধান্ধায় তাকে হন্যে হতে হয়েছে। তারপর সম্বল হলো হাত পাতা বা মালই রাজী। অঙ্গ পঙ্গু যদি না থাকে, আজকাল, আমল পাওয়া যায় না। ভিক্ষাও এক রকম পেশাই। তাকে এখন অন্য ফিকির ধরতে হয়। সন্ধ্যাকালে হসপিটালের বড় গেটের ধারে সে ওৎ পেতে বসে। আর বাজারের রাস্তায় গ্রাম পালানো মাতা রাস্তায় লুটিয়ে বিশ্রীভাবে কাঁদে, কোলের বাচ্চাটা পাহারা দেয় কালাই চটা শূন্য থালা। কোন অনভিজ্ঞ ভদ্রলোক বা মহিলা দয়াপরবশত যদি জিজ্ঞাসা করে—এই কাঁদছো কেন? —কুনেক ভাত দ্যাও মা। মুখ ধুলোয় গুঁজেই বলায় যেন মনে হয় মাটির নীচ থেকে মিনতি আসে। কাছাকাছি সন্ধ্যার আঁধার থমথমায়। —ভাত তুমি কোথায় পাবে এই ভর সন্ধ্যায়? —দাও বে বাপ, দুইটা পাইসা তালে মোক দাও। পেটৎ মোর বড় ভোকের ব্যাথা। আনাড়ি কুষানির ইনানো বিনানো গলার ভানটা তখন ভেঙে যায়।

এক চ্যাংড়া এতোই কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল যে ধরা পড়ে যেতো। নিতাই তার এক রকম কায়দা, দুই বস্তা দাঁস বাংকুয়ায় লটকিয়ে নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে যেতো। আর, ঘাঁস লাগি মাজি। ঘাঁস লাগি দুটো হাঁক দিয়ে কি না দিয়েই কাঁপতে কাঁপতে আঙিনায় ঢলে পড়ে যেতো। কেউ বলতো মৃগী রোগ কেউ ভিরমী, আবার কেউ বলতো সাহস করতো না, ভাবতো—মরেই যাচ্ছে। জলের

আপটা, পাখার বাতাস পেয়ে সে চ্যাংড়া ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতো। তখন কি হয়েছিল রে তোর? ভালো লাগছে?' শুধালেই, জড়ানো স্বরে বা ভাবে-সাবে সে বুঝিয়ে দিতোই—কছু খালো নাই মাজি। —আহারে, ভিখেরি তো নয়। কতটুকু বা বয়েস? মাইজি দিদিমণিদের মধ্যে এই রকম কথা হওয়ার পর রুটী না হয় মুড়ি না হয় ভাত মিলতোই। এই কারণেই একদিন সে এক কাপ গরম হরলিক্স খেয়েছিল। আন্ধারুয়া ওষ পেতে বসে থাকে আর কাউকে ভালো মানসি বলে মনে লাগে তো এই বলে পাকড়ায়—বাবু মোর একটা কথা শুনিবেন? তারপর যা মনে আসে লোকটার পেছনে চলতে চলতে বলতে থাকে—জমিন মোর আর নাইরো। মোর বাউ বউটা অসুখত মরি গেইসে। চিকিৎসাটাও করিবার না পারলোং বাবু। এলায় মোক পাইসে যম অসুখটায়। ডাগডরবাবু কসে, কালি সকালে হসপিটালত ভর্তি দিবে। কিন্তুক আজি এই রাতে কি খাও বাবু? ডোকেই বুঝি মোর দেহা খতম হয়। এইভাবে লোকের মত লেগে থেকে বকর বকর করেও, জলে রোদে পোড়া ও উপবাস অভ্যাসিয়া পাকা-গিঠা চামা দেহের দরুণ সে দশটা পয়সাও পায় না।

খায় সম্বল, ছাতহীন পোড়ো বাড়ির বা রেল প্ল্যাটফর্মের বাসীন্দারা যারা রোজ চাউল গম খায় তারা দু রকমের হয়, দেহ খুঁতা বা ছিঁচকে। আন্ধারুয়া কোনটাই নয়। হসপিটালের রাস্তায় ফাঁদ পাতার মোহ আর দীর্ঘদিন থাকে না। সে এখন সন্ধ্যা লাগতেই মদনমোহন মন্দিরের বাইরে কাছা আঁটা ফালপড় পরে ঘোরাঘুরি করে। নগরের এক প্রান্তে রাজপ্রাসাদ আর নগরের মাঝখানে মদনবাড়ি, ভক্তদের কাছে জাগ্রত মদন দেবের থান। পোড়া মরিলের গন্ধহীন ও চাকার শব্দ শূন্য দিঘীর জল ঘোরা পরিচ্ছন্ন রাস্তা, কালো জলের চৌকা দিঘী, পাড়ের অবৈধ ঝুপড়ি উঠিয়ে দিয়ে বসবার জন্য শানের সোফা, চার ঘাটের অনেক সিঁড়ি আর মন্দির রাস্তার ধারে হাতির ফাঁদের মতো বিরাট ঝকঝকে মসৃণ পামের শৃঙ্খলা। মদনবাড়ির সদর দরজার উপর নহবৎ ঘর। উল্টো দিকে পুজোর উপকরণ ও প্রসাদের ব্যবসা, কাচের খাটো শো-কেস, বড় বড় থালায় সন্দেশের গাঁথনি, নকুলদানার চিপি, ফুল বাতাসা যেন পয়সা কড়ি। পামের তলায় কালো পাথর, গর্ত, কাগজ বাতা টায়ার পোড়া ছাই, ভাঙা হাড়ি, চটে মোড়ানো শিশু আর ঢাল। আমের চোকলা, কলার খোসা, কাঁঠালের ভুতি নিয়ে কাঙাল বাচ্চাগুলির মধ্যে কুকুর কাজিয়া। এইখানেই কানাকানি দোতরা খঞ্জনি বাজিয়ে চিতান-দীঘল রসের ভাওয়াইয়া জমায়। ঝালাই করা লণ্ঠনটা তাদের চুরি হয়ে গেলে আর কানাকানি গায় না, কোথায় বা চলে যায়। প্রাচীর ঘেরা কঠিন আড়ালের ভেতরে আলোকিত, ধূপ-ধুনায় কুয়াশা করা, কাঁসর ঘন্টা ধ্বনিত নিত্য উৎসবী মন্দির। যেন এক পরাবাস্তবতা।

আধারুয়া রাউনতুলা হয়ে প্রসাদের দোকানের কাছে। হাত ফসকানো নকুল-দানা সে রাস্তা থেকে জুম পা ফাঁক করে, মাথা নীচুতে নামিয়ে কুড়িয়ে মুখে পোরে। রাত ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কয়েকটি বেকার যুবক ফুলের মালা, চন্দন পাটা, প্রসাদ নিয়ে ঘুরতি ঘর তুলে বসে আছে। তাদের আসল কাজ যেন ভালিগোছে মে বউ দেখা। আন্ধারুয়াও বোঝে আর এই ভেবে রস পায় যে চ্যাংড়াদের কপালোং একই দশা। ওদিকে ব্যাপারীরা খালি পায়ে খালি গায়ে, বিড়ায় বিড়ায় হয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে রিকশে থামায়, আর খরিদ্দার পাকড়ায় অষ্টপ্রহরের দমে—এই যে আসেন মা। আসেন বাবা,' বলে। আন্ধারুয়া মনে মনে বলে,—'এই গিন্না আবার যেন ভিখারীরও অধম।' ইতিমধ্যেই আন্ধারুয়া শিক্ষিত বেকারদের প্রসাদ বিক্রয় কেন্দ্রে হাত পেতে পেতে এক চোখা চ্যাংড়ার কাছ থেকে পেয়েছে আধ-খাওয়া চারমিনার আর আদি দোকানের ঠাকুরের কাছে অদ্ভুত খিস্তি। তার হাসি লাগে। অতঃপর সে পোলাপানের মত মন্দিরে ভক্তি ভোগ দিয়ে ফেরাদের পেছু লাগে, দু হাত আঁজলা করা—এট্টু প্রসাদ দাও-মোক মা। অবশ্য গরদ গয়নায় চেকনাইদের ধরতে সাহস হয় না। তাদেরই পেছনে সবাই যায় সারা আটপৌড়া। একবার সে ভুল বশতঃ মদন দেবকে মানত দেবার আগেই লক্ষ্মী প্রতিমার মত বউয়ের কাছে প্রসাদ চেয়ে দুখে আলতা পা দেখলো। তবে সে এক কচি বিধবার কাছ থেকে, বিষাদ প্রতিমার হাত থেকে, এক খন্ড কলার চাক কামাই করে।

ঢাক বাজা, আগুন দাপানো, বাজ। কীর্তি প্রাচীন মন্দিরের স্থূল স্থাপত্য। সদর দ্বারের শীর্ষে, নহবৎখানায় রোজ ভোর ছটা থেকে সাড়ে সাতটা অবধি শুদ্ধ সুরে সানাই বাজে। দ্বারের দেয়ালে অনাচার পাপাচার নিষিদ্ধ করে, নিয়ম কানুন তত্ত্বাবধায়ক দাতা ইত্যাদি উল্লেখ করে বোর্ডের বিজ্ঞাপন। সিমেন্ট বাঁধানো পথের দু-পাশে বিয়েতে মৌসম ভাত পরি-বেশনের বালতির মতো টবে ছোট ঝাউ। প্রধান মন্দিরের চূড়োয় গম্বুজের গামলা আর স্বর্ণকলস, রাসের মেলায় অগুনন বালবের আলোয় ষোলকলার চাঁদ হয়। প্রাচীর বরাবর পাতাবাহার মলয়ায় ঢাকা, জাল দেয়া, টিনের খুদে খুদে চালায় রাসের রাধাকৃষ্ণ, রাম, বলরাম, লবকুশ, মনসা, শনি, দুর্বাসা প্রভৃতির মন্ডপ অবিকল যেন চিড়িয়াখানায় সজারু, পাখী, কাঠবিড়ালির খাঁচা। শ্বেতপাথরের বারান্দায় সোনার মদন আর রুপোর ভবানী পাহারায় দিন-রাত রাইফেল হাতে পুলিশ পাহারা। তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় জাগ্রত মদনেরও ভবানীর উজ্জ্বলতার কাছে কত অসহায়, ম্লান বিড়ম্বিত। গোল সাদা থামের কাছে ঝাড়বাতির মত ঘণ্টাগুচ্ছ, নাড়ালে তীব্র ভ্যাট, মৃদু কোমল অনেক রকম শব্দ হয়। চত্বরে হাড়িকাঠ কাণ্ডকাটা বৃক্ষ, রাসের সময় রাঙা কাদা হয়। মন্দিরের পেছনটায় গলির ভেতর ভোগের ঘর। তারপর বড় নালা ও এপাড়ার বাড়িঘর। যখন রাজ্যপাট ছিল আতপ ভোগের গন্ধ নাকি এই অঞ্চলকে গন্ধময় করে রাখতো, উঠোন, বারান্দা, বিছানায়, তারপর হসপিটাল, বাজার, এমনকি কারাগারে সে বাসেনাই ছড়াতো। রোজ বেধহয় রান্না হতো দশমন মিহি চালা আর এখন সেই অবেলায় এক চিলতে কলাপাতায় নীলাঘাসের দিশী মলমের মতো পাতলা আলোনা খিচুড়ি। মন্দিরের কপালে বড় লাইট, রকমারি ফুলের ছাঁদে মিষ্টি, যেমন ডালিয়া আমন্ত্রি, পরাত বেকারীতে চালকলা আর কাটা ফলের সম্ভার, কাঁসর ঘণ্টা ধূপাতি আরতির উল্লাস আর তাঁমপাত্রে চরণামৃত।

কবিতা ও শিল্পভাবনার একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্র

উত্তর সূরি

২৪ বর্ষের শেষতম সংখ্যা বিশেষ শারদীয় সারা বাংলা-দেশের প্রায় ১০০টি লিটল ম্যাগাজিন থেকে বাছাই করা তরুণতম কবিদের কবিতাগুচ্ছ অমিয় চক্রবর্তী থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের মূল্যবান সংকলন দুটি অসাধারণ আর্ট প্লেট। কথাসাহিত্যিকদের মূল্যায়ন "কবিতার ভাবনা" ৫ম অধ্যায়ে ব্লেক প্রসঙ্গে লিখেছেন অরুণ ভট্টাচার্য তাঁর সমর্পিত শৈশবেরই কাহিনী আচার্য সুনীতি-কুমারের দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ। এজরা পাউন্ড এবং রজনীকান্ত সেন বিষয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা কলকাতার বড় বড় স্টলে পাবেন।

টাঃ ৪-০০

২৫ বর্ষের গ্রাহক চাঁদা এম, ও করে পাঠান টাঃ ৮-০০

৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড। কলিকাতা-৫০

এর আগে আন্ধারু মন্দিরে প্রবেশ করেছে ভক্তি দিতেই, সঙ্গে তার বউ বাচ্চারা ছিল। মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্রে রেখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ দীর্ঘতম মেলা জমে, রাসের মেলা, এক মাইল মতন বড় সে মেলাটা। স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠ, জেলখানা-ভিক্টোরিয়া কলেজএর রাস্তা, মোড়, বড়বাস্তা, অলিগলিতে সংখ্যাতীত দোকানপাট, হবেকমাল মাথাচুলকার বস্তা, গোঁসাইনিমাইর পালাগান তলংকার সার্কাস কলকাতার ম্যাজিক, মান্দ্রাজের অগ্নিসাপ, উজ্জ্বল আলোয় বানে নাগরদোলা অভয়াবনা সাপচুম্বন, পুতুল খেলায় চাসনালা এবং আমেরিকার সরবৎ পান করা, কথা বলা ডল। চতুর্দিক একেবারে জমজমাট। জিলাপী চাঁদলুচি, চুড়িনালক, পাথর-বাটি হতের ভাষা কামলাস্ত্র, পাঁচালি, চিনির ছাঁচে হাতি সিংহ সেপাই শ্লোকি কত কি, আর লক্ষলক্ষ উৎফুল্ল মানুষ। অধিকাংশই গ্রামা চাষা। মেলাময় কিচ খেলনার ঠেলাগাড়ির চলা বাজনা, ঝমঝমি বেলুনগুলো, বাঁশ বাঁশীর তাড়া যেন ভীড়ের কালো চুলের জলে ভেসে যায় শতদল। রাসের দিনে রাজারানী আমেরিকান কারে মদনবাড়িতে আসতেন আর তামাম মেলাটা ভেঙে তখন করত রাজা দর্শন। আন্ধারুয়াও রাজা দেখেছিল গোটা জীবনে একবার, সাক্ষাৎ মদন। রাজার দেহের বংটা সদ্য বিয়ানো গাইয়ের মোটা দুধের মতন। তেত্রিশ কোটি দেবতা অঙ্কিত ভাগ্যচক্র বড় দেউনিয়ার পোহাল পাখির মতো আকাশ উঁচু আর দেশী অস্ত্রের মতো মোটা থেকে আগা চোখা, ধারালো। এই ভাগ্যচক্র না ঘোরালে নাকি রাসে আসাই বৃথা। রাজা রানীও ঘোরায়। আন্ধারুয়াও ঘুরিয়েছিল। এই সময় একটা কাণ্ড হয়, রানীর এক দাসীর ছোঁয়া তার হাতের কনুইতে লাগে। সে ছোঁয়া কোন কালেই ছাড়ানো গেলোই না এতো আরামিয়া। যাহোক, পায়ের পাতর উপর ভর দিয়ে তার বউ কেবল শূন্যে হাত নাড়ে, কাঁধে নিলে বাচ্চারা নাগালে পায়। কিন্তু ভয়ে কাঁদে। —'এই সরি যাও। সরি যাও দেওনিয়ার ঘর।' ভীড়ের ভোড় তাদের ঠেলে সরিয়ে দেয়। ঠেলা খেয়েও সে রাগে না। সবাইকে তো একবার ভাগ্যচক্র নাড়িয়ে ভাগ্য যাচাই বা ভাগ্যসুখ বাসনা করতেই হবে। বরং সে একটা চকচকা আধুলি ছুঁড়ে দেয় অবতার দেবতাদের সিংহাসনের তলে জোরে, যেন পাণ্ডাদের নজরে পয়সাটা না পড়ে। বড়পাণ্ডা, লাল চন্দন বস্তা গায়ের পাণ্ডা যাকে তাকে পাত্তা দেয় না। দশ বিশ একশ টাকার নোট নিক্ষেপ শূন্যভাবে কোমরের কাপড়ে গোঁজে, ফোলা মোলায়েম পেটের নাভির গর্তে টাকা সেঁটে থাকে। অন্য এক পাণ্ডা, বউ ধরন কোলাধাঙ্গএর মতো প্রণামে মগ্ন, সিঁড়িতে বউয়ের হাত মিছামিছি ধরি দেয়। বোকার অবস্থার আন্ধারু মজাই পায়। তারপরই তার চোখে জল আসে, বাচ্চাশিশুদের ভুক্তি দেখে, ওরা দুটিতে নরম নরম হাত কপালে তুলে নমো নমো করে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সামিয়ানার তলায়, মঞ্চে, নামগান, বাউল সংগীত, কৃষ্ণকীর্তন যাত্রা, মহাভারত, বেদ পাঠ হয়। ভীড়। ঐদিন গৌরাঙ্গদাসের নামগান হচ্ছিল। সারা অঞ্চলে তার গান গলার খ্যাতি। আন্ধারুর বউ বাচ্চাদের নিয়ে সামিয়ানার ছাওয়ায়, ত্রিপলের মধ্যে কোনরকম করে জায়গা নেয়। গান শোনা তারপর রাত কাটানো। গীতাল গৌরাঙ্গ খোলের লহরায় আর গানের রসের ভাবে বসা থেকে উঠে নেচে গাইছিল : 'নামে গানে প্রেমে জগৎ নাচাবে বলে গৌরাঙ্গ নিজেই তো নাচিছে।' হরিবোলা।' হরিবোলা।' হঠাৎ এই উক্তির সময়, দুহাত ঊর্ধ্বে তোলা গীতালের কাঁচা কাপড় খুলে গেলো। কেউ হাসলো না। তার বাচ্চা চ্যাংড়া দুটি অসভ্যের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেই আন্ধারুয়াও হাসতে লাগলো। বউও সেই রকম। কি হাসি। এক রোগা বুড়া পাকা ভ্রূ পাকিয়ে, শেষে রাগে বলল যখন—'লজ্জা নাইরো?' তাড়াতাড়ি সে মুখে হাত চাপা দিয়ে আর চিমটি কেটে বউ-বাচ্চাদের হাসি থামায়।

আজ আন্ধারুয়া একাএকা। চারদিকে ডাকাডাকি করে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণায় দরজা দিয়ে সুযোগমত ঢুকে যায়। মন্দিরের মধ্যে। লোকে কেবল মদনের মাহাত্ম্যতেই তদগত থাকে না বা নেহাৎ ভক্তিই দেয় না, আলাদা ধান্ধায়ও থাকতে পারে। যেমন, দর্শনের এক পণ্ডিত নাকি ছিলেন যিনি সারা বছর বিদ্যালয় ও গৃহ ছাড়া বড় কোথাও যেতেন না। জ্ঞান ব্যবহারের যশে তিনি স্বনামখ্যাত, অজাতশত্রু, সৌম্য সুন্দর। বৎসরে একবার মাত্র বেরুতেন। তখন, রামকৃষ্ণ আশ্রমের মেলায়, শ্বেত-পাথরের মন্দিরে উপাসনা করে ফেরবার কালে ঠিক ভুল করে পুরানো চটিজোড়া ফেলে নতুন কোনো চটি পায়ে গলিয়ে চলে আসতেন। ব্যাপারটা নাকি সকলেই জানতো। অথচ কেউ তাকে খেয়াল করাতো না। বরং শোনা যায় যার চটি পদযুগলে গলালেন সে তার ফেলে যাওয়া পুরাতন চটিজোড়া পেয়ে ধন্য বোধ করেছেন। এরকম আত্মভোলাদের নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু কত রকম সত্যিকার শেয়ানা শয়তান যে থাকে। তাই মন্দিরের সব দরজায় লোহার কোলাপসিবল।

আন্ধারুয়া তো বুঝেই নেয় সোনার মদনের মন্দিরে যাওয়াটা সুবিধের হবে না। কোনকালেই হবে না। অবশ্য প্রসাদের পরিমাণ অনেক আর সরেস। সামান্য আসলটা এখনও প্রায় নাকি জগন্নাথের ভোগের তুল্য। সে উচ্চাভিলাষ না করে, পাতাবাহার কাপড়ে আড়ালকরা নিরালা দশ অবতারের পানের দিকে ছায়ায় ছায়ায় দ্রুত হেঁটে যায়। কাছাকাছি মানুষজন নেই। জটলা মদনের বারান্দায় জড়ো। যেন নিশ্চিন্ত বনের মধ্যে বনদেবতার স্থান, দেউলের দরজা খোলা, ভেতরে বড় বড় পরাতে সন্দেশ বাতাসা। একটু ইতস্ততঃ করে আন্ধারুয়া কোমর ভেঙে হাঁটু গেড়ে, থামের পাশে রাখা তামার পাত্রভরা চরণামৃত কুশিতে তুলে হাতের গন্ডুষে ঢেলে চেটে চেটে খায়। পুনরায় সে কুশি ডুবায়। যেন অমৃত। তার মধ্যে অসুর অবতারের আবডাঙা লেগে গেছে, জিহ্বা মানসাই চরের মতো তৃষ্ণা-জর্জর। তবু সে তামপাত্রটা তুলে চুমুক দিতে পারে না, প্রকৃতই পাপের ভয়। ইতা-হসরে পায়ে জোলো গোদ, নাভিতে ফড়া পৈতা, কপালে মোটা দাগের সিন্দুর টানা, বলশালী, অবতার মন্দিরের পান্ডা এসে কোন মেজাজ না দেখিয়ে আলগোছে তাকে ঘাড়ে পাকড়ে, ঠেলে গেটের বাইরে ভাগিয়ে দেয়। তার কেমন যেন অপমান লাগে। তখন আহারের রাত, মন্দির কমিটির সুপারিশমত মন্দিরের লৌহদ্বার বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। সে জীব লাগিয়ে মিঠা ঠোঁট চাটে।

মদনবাড়ির মোড়ের কালভার্ট আন্ধা-রুয়া একাই দখলে পায়। এত রাতে স্টেশনের প্লাটফর্মও বেদখল হয়ে গেছে। তাছাড়া

ফিরে যাবার সামর্থ্য আর ইচ্ছাও তার আর আর ছিল না। আসলে তার একটা মতলব আছে। আলকাতরায় কালভার্টের গায়ে বেদ-ভিত্তিক সাম্য ও নৈতিক বিপ্লবের দেয়াল লেখা,, শানের ঠাণ্ডায় একলা পেটা পেট চেপে ঘুমের ভানে আন্ধারু পড়ে ছিল। পামের তলে ইঁটপাথরের আখায় আমজাম-পাতার নৈশ আগুনের লাফনাচ, অঘ্রানের রাতে আঙিনায় নয়া ধানের পোহাল যেমন জ্বলে নেভে জ্বলে, দেহা গরম হয়, কালো নোনিয়ার গন্ধালি ভাত হয়, ডাল ডিমা ভাজি সাগাই অতিথির জন্য। চিৎ হলে স্তিমিত জ্যোৎস্নায় খণ্ড খণ্ড বাদামী, ছাইরঙা মেঘে মনে পড়ায় যে সে রাতে চাষা। ঝড়ঝড়ি ঢাকা পেখমের মতো বেউড় মোমশালী বাঁশঝাড়ের চূড়োয় জ্বলো, পাটের নিধুয়া মাঠ পাথার, ছাগল শিশুর লোমের মত রেশমী বলানের চারা, চটকে, মরীচ মাখা পান্তাভাতের মতো কাঠায় কাঠায় রোয়া গাবার ক্ষেত—আহা, আন্ধারুয়ার যদি বাইচষা দশটা বিঘা, কয় কাঠা জমিন থাকতো। যতটুকু ছিল আধি-য়ারির এখন হাতছাড়া। গিরি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ধানপাটের চাষ তুলে দিয়ে আনারসের খামার বানায়। নাঙলচষা জমিনে ছোড়াকরা ট্রাকটর চষে, চাকা সুদর্শনের, কংসবধের চক্রর মতো আর যেন এনামেলের থালার দাঁত। কিন্তু তার চাষা হাতেই যাদু ছিল, যাদুমন্ত্রমাখা পাকা হাত। পালের হাতের বশে মাটি যেমন হয় ০ অচলা লক্ষ্মী, ভগবতীর প্রতিমা, সেইরকম। আসলে যেন ট্রাকটরের চাকা মদনেরই ভাগ্য-চক্র। চক্রের পয়মন্তে গিরিদের ভাগ্য হয়, শাপেপাপে কেউ ভাগ্য হারায়। তার ক্ষেত ভোড়ার হয় পয়মাল। গিরি মহাজন বাচ্চা-কাচ্চাকে 'হাসি হাসি কয়—কতো, ফলের উপর পাত?—আনারস। বাচচারা হৈচৈ করে বলে।—হ। ধান নোয়ায়, পাট নোয়ায়, কাঁঠালও নোয়ায়, আনারস। এই চাষটাকে মুই কাঁস আনা কাটি রস, বস বিপ্লব। আর টাকটরটা হইল ময়দানব। দেখ না তুহে, ব্রাসের (ফরেস্ট) জমিনও বেনং উর্বরা হয়। ঐ নাঙল কাস্তে বিপ্লব রঙ মোর আর না লাগে। এলায় এই বসবিপ্লব। বুঝিচিস রে আন্ধারুয়া? আন্ধারুয়া শানে শুয়ে ভাবে গতর খাটবার একটা মাতলামি মজা আছে। শ্রাবণ বৈশালী মাসে কামের জোয়াল তবু কত তাজা লাগে। কাবণ, তারপর, হেমন্তির ধানবনে বাতাসের ঝরঝর খসখস, বহটইয়ের বাঙা ঝাঁক উড়াল, কালাই পুদিনার বাসে-নাই, এসে যায় আবার ধান উঁইবার দিন। কালভার্টে, দেয়াল লেখায় চিৎ আন্ধারুয়া ভরপেটে ঢেকুর তোলার মত তৃপ্তিতে আকাশে তাকালে দেখে খণ্ডখণ্ড মেঘের যোগে তরবরী লোমশ গোরাঘা, শূন্যে মখর থাবা তুলে, একাদশীর টসটসা চাঁদ গেলে।

মাঝরাতের বিরংসা যেমন অপ্রতিরোধ্য, অন্নভাণ্ডারে তেমন যন্ত্রণা আন্ধারুয়াকে কালভার্ট থেকে নামিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেয়। রাস্তা মেরামতের ভাঙা পাথরস্তূপের আয়তক্ষেত্রে তার শরীরের কালো পিছল ছায়া পড়ে। সে আর রাতচরা আর তার নামটাও আন্ধারু, আন্ধারুয়া। তিনতলা, হরেক রং-এ চকচকা, কড়িগাঁথা, মঙ্গলচিহ্ন আঁকা, গোদরেজ আলমারীর মতো চেপ্টা নীরেট দালান। আন্ধারু কোন দিক, কোন কিছু গ্রাহ্য না করে, পা বাড়িয়ে, নালা পেরিয়ে, ছানচা দিয়ে, ভিং বারান্দা ধরে চলে যায় মেঘর চলাচলের কণ্ঠাখুলিতে। পচাজলের কাদায় আদার, বাসক ভাতের জংলা, দালানের দেয়াল উঠে গেছে খাড়াই, জানালার গরাদ, আলাদা দেয়াল, মসলা টানবার দরজা আর মাঝখানে নোংরা জল ফিনাইয়েলের দুটো মোটা পাইপ। খালি পেটেই আন্ধারুয়ার পায়খানা পায়। ঊর্ধশ্বাস মটোরের সশব্দ জোরালো আলো মোড়টায় পিছলে গেলো। কপালে পাইপ ঠেকিয়ে পাইপ বেয়ে উঠে যেতে থাকে, যেন গুয়া সুপুরি গাছেতেই চড়ে আজন্ম দক্ষ অন্ধকুয়া। প্রাচীরের আগায় গাঁথা কাচের ফলকে জানালা গলে নামা নীল ঘুম আলো পড়ে, বেদের মাটিঘষা নাঙলের ফালের মতো জ্বলতে থাকায় সে সাবধানে চাষার কর্কশ গোড়ালি দেয়ালের কিনারে রাখলো। বাঁ হাতের চেটোয় জোর ভর দিয়ে বাঁ পা সে টেনে আনে। তারপরই পা বাঁধা সুলেমানী ঘোড়ার মতো দুপা তুলে কাঁচের উপর দিয়ে সে বড় লাফ দেয়। একটা আস্তে শব্দ হয়, মাটির শব্দ বড় চাপা। সে বোঝে গোড়ালির খানিকটা মাংস কেটে নেমে গেছে। হাত দিলে হাত ভিজে যায়, আঙুল চ্যাট চ্যাট করে, রক্ত তার পাতলা জলা হয় নাই। আলি-কাটা কোদালের চোট ছিটকে লাগলে যেমন হয়। খুমচিয়ে মুঠিভরা মাটি তুলে আন্ধারুয়া, অন্ধকারে জখম গোড়ালিতে সেই মাটি ঘষে দেয়। মাটি। কাটার পোড়ায় মাটি ঠাণ্ডা।]

অন্ধকারে বসেই সে আন্দাজ করে কোনটা বড়কর্তার ঘর, টাকাপয়সা দলিল থাকে, কোনটা গিন্নীর, গয়নাগাঁটি, ভাঁড়ার চাবি আর কোনগুলো বউছেলেদের, রেডিও, ঘড়ি, জামাকাপড়, আয়না এবং কোণারটা ঢাল তাল দি ভালডার ভাঁড়ার ঘর। তার শরীর বেয়ে যেন শীতল শিহরণ চলে যায়, সে নিজেকে বলে—মনমোহনের দিব্যি মুই চোর না। মুই আন্ধারুয়া। অন্নাঘরটা উঠানেই। সে হামা দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় যায় আর নাঙলধরা কড়াপড়া হাত দিতেই বুঝলো এই দরজা ভাঙা ভগবান ভাকাত কেন ভগবানেরও অসাধ্য। সে তাড়াতাড়ি উঠানে নেমে রান্নাঘরের পেছনটায় যায়। নালার গর্ত পেলো পুরো হাত ডানাসহ ঢুকে যায়। হাত ঢুকিয়ে সে নাড়লো চারলো যেমন করে পুকুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাগুর কাঁকড়া ধরতে হয়। এখন যদি শাবোল থাকতো কিংবা মরচাপড়া নাঙলটাই। সে দাঁতে দাঁত দিয়ে এখন নিজেকে সামলায়। খেয়াল হতে কমলার গাদা থেকে কমলাভাঙা লোহাটা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে নিয়ে এলো। অতঃপর লোহার সন্তর্পণ আঘাতে সে নালার মুখের সিমেন্ট চটিয়ে ফেলে, ভক্তির মতো ধৈর্যের সাথে এমন-ভাবে লোহা চালায় যে শব্দ হয় না, বুড়ির দাঁতের মতো ইঁট জমিনের জল বাঁধার জন্য কোদাল কোপানো ঘাসের চাপড়ার মতো আলগা হয়, টনতেই খসে যায়। একটা ইঁট, দুইটা ইঁট খোলে। নালার গর্ত কমে বড় হয়। গর্তের ভেতর দিয়ে সে হাত দুটো চালিয়ে দেখে, মাথা, নাকে অচিরাৎ লাগে ভাত মাছ-পচা দুর্গন্ধ যেন আকালের কালে গৃহস্থঘরে মানুষ পচার মতো বিকট। কাঁধ সেঁধিয়ে যায় কোনরকমে, পেট অনায়াসে আর কোমরপাছা ঠেকে যায়। তবু তাকে আপ্রাণ গুঁতোতে হয়, যন্ত্রণায় দমবন্ধ হয়ে আসে, বিশ্রাম নিতে হয় যেন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে যাবে। রাস্তা থেকে হঠাৎ একটা নেড়ি চাঁদের দিকে চেয়ে লেজ দু-ঠ্যাংএ গুঁজে মাঝদরিয়ায় তিতকালো ঘুর্ণিতে আক্রান্ত একা মাঝিয়ালের মতো তীক্ষ্ণ ডাক দেয়। আন্ধারু তার দেহটা ভেতরে ছুঁড়ে দেয় এবং চালচমাড়া ছিলে ব্রিওলের মতো বেরিয়ে যায়। হায়রে, বাবুদের আংশালও এমন ঢালাল হয়। আংশালের ভেতরে যেন আতর গন্ধময় অন্ধকার। দাঁড়াতে কষ্ট হয়, তাই আন্ধারু শুয়ে শুয়েই মেঝে হাতড়ায়, শিল-নোড়া, আঁশবটি, নেভা উনান। অবশ্য সে দেয়াল ধরে দাঁড়াতে পারে। দেয়ালে জাগানো তাক সে হাতের নাগালে পায়, মদনের চক্র হাতে পাওয়া বউয়ের অবস্থাই। এই তার হাতেখড়ি, হাতে ঠেকে কড়াই, কড়াইয়ে মাছ আঁছানো, ইলিশ, বাসেনাইতে বোঝা ঘরি, গমলা আর বড় ভাতের হাড়ি। ভয়াল উত্তেজনা হাড় কাঁপানো জ্বালার মধ্যে তার কান্না এসে যায়। সে আংশালের দেবতার উদ্দেশে রুদ্ধ আবেগে ভয়ে বলে নেয়, আনচিরি ঠাকুর দোহাই মোর পাপ না ধরেন। মুইতো উৎখাতি চাষা। তারপর সে ভাতের হাঁড়িটা ধরে নামাতে গেলে কড়াই থেকে লাগা তেলে-তেলতেলা হাত থেকে হাঁড়িটা পিছলে যায়। ভাত তাকে যেন স্নান করিয়ে দেয়, চুলময় ভাত, পায়ের তলে শেওলার মতো ভাতের ছড়াছড়ি, গলার, কণ্ঠার কাছে আটকে যাওয়া চিকন চালের ভাত।

আলো জ্বলে উঠলে, জানালা খুলার

চাকুরীর পরীক্ষায় :	এ কে ব্যানার্জীর	
1 W. B. CLERKSHIP EXAMINATION	Rs.	8.00
2. MISCELLANEOUS EXAMINATION	Rs.	8.00
3. FIFTH FIVE YEAR PLAN	Rs.	3.00
4. GENERAL KNOWLEDGE & CURRENT AFFAIRS	Rs.	3.00

বেনসনস : ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

খিল খুলে গেলো. লোকজন চাকর বাকর সব বেরিয়ে এলো বোঝা যায় বাড়িটা কত জমজমাট, কত বড়। কর্তা এখানে আসবার সময় দেশের জোত জমিন বেচে মোটা ক্যাশ আনতে পেরেছিলেন শোনা যায়। সেই ক্যাশ তিনি গ্রামেগঞ্জে সুদে দাদনে লাগিয়ে তরল করলেন। বড় ছেলে গোড়াতেই বিড়ির ব্যবসায় নামলো, এ-জেলা পাট তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে বিড়ি ফ্যাকটরিতে দু শত কারিগর অর্থাৎ কারিগর-এর মাথাপিছু দুই টাকা হলে চারশত টাকা রোজ লাভ। এ-টাকার ভাড়া খাটানো দুটো লেলাল্যান্ড। মেজটি উকিল, বেশ নামডাক, সেজোজন ডাক তার ও মনসামাতা ডিসপেনসারির মালিক, কাছেই হসপিটাল আর সবার আদরের ছোট-ছেলে ক্লাশ ঠিকাদার। কর্তা এখন নেহাৎ মাকে বলে সিলিপিং পার্টনার, খেনো কলের, পাটগোলার। নিত্যসকাল সন্ধ্যায় গীতা পাঠ করেন। খদ্দরের নিমা গায়ে কর্তা এই বয়সে দোতলা থেকে একটা খারাপ খিস্তি দিয়ে রাগে পায়ের বইলা খড়ম ছুঁড়ে মারতেই তুলসী বেদীতে লাগলো। আর চোরকে প্রহার শুরু হলো। বড় ভাইয়ের শরীরে চর্বির আধিক্য, সেই পেটে লাথি মেরে রোগা চোরকে চিৎ করে ফেলে দেয়। তারপর ঠিকাদারের হাতপা মগজ চললো, মারের কায়দাও জানে সে, সেদিনও পাড়ার মাল্লা ছিল। বুড়ো বাপের গালিগালাজ, কলাবাগান বাস্তুতে তার আলাদা পাকা ঘরই আছে, বয়সে সয় না আর তাই যায় না এবং প্রহারের চোটে চাপা পড়ে গেছে চোরের চিৎকার। চোরটা পাকামাল না। বাড়ির সুন্দরী প্রতিমার মতো বউরা ঘোমটার তলা দিয়ে নাটা চোরকে দেখছিল আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কি যেন বলাবলি করে মেয়েলী তরলতায় হাসছিল। দুষ্টু দুষ্টু টুকটুকে বাচ্চারা আধো গলায় 'আরো মালো. আরো মালো' বলে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ছুটে নামছে উঠছে। এই এক মজার খেলা পেয়েছে এতো রাতে। উকিল ছেলে গম্ভীর গলায় রেলিং-এ ভর দিয়ে বললে,—দেখিস বেজায়গায় যেন মারিস না ভুলা। এই কথায় ভুলা ক্ষেপে গিয়ে উপরের দিকে চেয়ে বলে—মানচোৎ। তোর বড় দরদ, না? শালা চোর-চামাড়ের কেস লড়ে চাঁড়ালের মতো পয়সা কামাস, তো। তাই লেকচার।—এই মারে বকিস না। মারবি তো মার ছালা পেচিয়ে মার, শরীরে যেন দাগ না পড়ে। চোরকে মারার কোন আইন নেই। এরপর বড় ভাই গিয়ে ছোট ভাইকে নিরস্ত করলো। কারণ, মা-বউরা নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। যাহোক মেছেলে, এরা খুব নরম আর মায়াদরদী হয়। চোরটা আঙিনায় কাতরাচ্ছিল। ছালার ঝামেলা না করে সাত মাসের বাচ্চার লিভার পউডার দুধ গোলাবার জন্য ঈগল ফ্লাকসে ধাঁধা গরম জল, চৈত্র-দুপুরে পিপাসায় নিঃশেষিত অবেশ্য স্কোয়াশের বোতলে ভরে তা দিয়ে কৌশলে মেরে চোরের লাস্সটা গলিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তার ছুটে এসে হাত চেপে ধরেছিল ঠিকাদার ভাইয়ের—রাস্কেল! মেরে ফেলবি নাকি? চোরের নাড়ি টিপে সে শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—না, মরে যায়নি। তারপর ভিড়ের দিকে চেয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কেউ ফোন করে থানায়। ইডিয়েট। ছোট ভাইটি ডাক্তারদাদাকে সমীহ করে চলার দরুন মাথা হেঁট করে আড়ালে চলে যায়। বউ তাকে ঘাম মোছার জন্য দোবড়া তোয়ালে দেয়।

এসব কেসে জিজ্ঞাসাবাদ তেমন বিশেষ হয় না। চোর বামালসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ভোরে, শেয়াল-কুকুরে খাওয়া লাশের মতো ছেঁড়াখোড়া চোরটা পড়েছিল উঠানেই। পুলিশ অফিসার বললেন—দাগী কোথায় মশায়? আপনারাই তো দেখি থার্ড ডিগ্রী মেথড এপ্লাই করেছেন। উচিত হয়নি। কোথা দিয়ে চোর ঢুকেছিল? রান্নাঘরের ভাঙা নালাটা তিনি দেখলেন। ডায়রীতে বিবরণ টুকলেন। শেষে দারোগা রূঢ়ভাবেই বললেন—ছেলেদেরকে থানায় যেতে হবে। আমরা যাচ্ছি। উইদাউট ডিলে চলে আসুন। মেয়ে-বউরা এখন কাঁদতে লাগলো, যেন বা আপন মানুষ মরার শোকেই কান্না। দুজন কনস্টেবল হাত-পা ধরে চোরটাকে ভ্যানে তুললো। সে অমানুষিক কষ্টে গোঙায়। ভ্যানটা ছেড়ে দেয়. গন্তব্যস্থল হাসপাতাল নয়, আপাতত হসপিটাল। সত্যি কথা কি, অপরাধও তো একরকম রোগ।

কাৎ হয়ে পড়ে থাকা বিক্ষত উলঙ্গ দেহটার কোন কোন অংশ নড়ছিল কাটা কাঁকিমের কলিজার মতো। পুরানো ভ্যানটা ভাঙা রাস্তার ঝাঁকিতে ঝর-ঝর করে, এরিয়াল পুরুৎ-এর টিকির মতো ল্যাক্-পেকায়। মোড় ঘুরে সাগরদীঘির পাড়-বরাবর আদালতের রাস্তায় ভ্যানটা স্পীড নিতেই চোরটা অতিকষ্টে চিৎ হয়ে জল চাইলো। একজন কনস্টেবল চলন্ত গাড়িতে টলতে টলতে এগিয়ে জালের ভেতর দিয়ে অফিসারকে বলল—জল চাইছে স্যার। —চাক। —সাগরদীঘি থেকে এক আঁজলা জল এনে দেবো? মরে যাবে বোধহয়। —এ-জল কি দেয়া যায়?? —কেন —কেবল গরম জল দেয়া যায়। অফিসার জবাব দেয়। —মানে-? —অত তোমার বেরুন নেই। এই জল যে খারাপ নয় তার প্রমাণ কি? দারোগা কনস্টেবলের মুখের দিকে চেয়ে—মুশকিল। ধরো দয়া দেখিয়ে জল দিলে আর গিলতেই মারা গেলো। তখন উকিল লাগিয়ে বলতে পারে যে, জলে বিষ ছিল। কেস ফাঁসাবার জন্য পুলিশই মেরে ফেলেছে। ভীষণ বিস্ক, রাজার আমল তো নয় যে, সাগরদীঘির পাড়ে সর্বক্ষণ কোতয়াল থাকে। এখন বারোয়ারী মাল, যার খুশি হাগছে-মুতছে। এ-জল নোংরা। —এ-জল কত লোকে খায় স্যার?—মরেও। এও কি কম ক্রাইম? অফিসার সিগারেট ধরালেন, উদাস হয়ে গেলেন। —এ-জলে কিন্তু খুব ভালো ডাল সিদ্ধ হয়। —ঐ তো হলো গরম। গরম-জলের দোষ নেই। অফিসার একটু বিরক্তই হলেন, তার ভালো লাগছিল না কেমন। কনস্টেবল রামকৃষ্ণ ভগত চোরটার দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল—মোরার আগে এক আদমি মাঙ্গলো, দিলাম না, পাপ না লাগে? —রামকৃষ্ণ এরপর থেকে ডিউটিতে বেরুবার সময় হৃদয়টা উঠোনে পুঁতে রেখো এসো। মরণাপন্ন মানুষকে আচমকা জল দিলে হার্টফেল করে। হসপিটাল তো এসেই গেলো। দারোগা ভোরের আলোয় দ্রুতবেগে পেরিয়ে-যাওয়া পার্টিকল জর্জ কোর্ট কাছারির দিকে তাকিয়ে রাত-জাগা চোখের জ্বালার মতো বলে ফেলল। একটাকেও রেহাই দেবো না। ফাটক খাটাবো। দেখিস রামকৃষ্ণ, তোরাও আর ভাত খেতে পারবি না। দেখিস অভিশাপ লাগবে, অভিশাপ। নামেই সাগর।

কালো ভ্যানটা হসপিটালে ঢুকতেই ওষুধগন্ধী বাতাস জীব দিয়ে চেটে নিতে গিয়ে আন্ধারুরা নরকস্থ হয়। চিকিৎসার আধবোতল কি একফোঁটা স্যালাইনও লাগলো না।

২৯শে ভাদ্র প্রকাশিত হল পঞ্চতন্ত্র-র দু'খানি গ্রন্থ
প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক
বীরেন্দ্র দত্তের
সহজ কঠিন ৫.০০
প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক
উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের
রবীন্দ্রসঙ্গ ৭.০০
পরিবেশক : দেবশ্রী সাহিত্য সদন, ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

নরমেধ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ওপর-নিচ মিলিয়ে চারখানা ঘর। নিচে টিউবওয়েল। পাঁচিল-ঘেরা, মাথায় টিনের চালা। রান্নাঘরটাও খুব ছোটো নয়। দেয়ালে তাক কাটা। তক্তা বসিয়ে দিলে রান্নার জিনিস রাখা যাবে।

ওপরের ঘর দেখে মাকে বেশ তৃপ্ত মনে হলো।

'এক মাপেরই ঘর, তবু ওপরতলায় একটু বড়ো দেখায়, দেখেছিস?'

'তোমার পছন্দ?'

'এতোটা ভাবিনি। দক্ষিণ কোন্‌টা রে?' বলে তিনি উঠোনের দিকের

দরজা খুলে নববধূ হয়ে যান, প্রথম শ্বশুরঘর করতে আসার স্মৃতি কি তাঁর মনে পড়লো ?

'কী সুন্দর বারান্দা। আমি এখানে তুলসীগাছ করবো। নিচে লাউ-পুঁই। যাক, এতোদিনে একটা মনের মতন বাড়ি পেলি।'

নিচতলায় জিনিসপত্র স্তূপাকার হয়ে আছে। সূর্য ডুবলে গোছগাছ করার অসুবিধে। এখনো সব ঘরে বাল্‌ব লাগানো হয়নি। ঢাকুরিয়া থেকে খুলে-আনা বাল্‌বগুলো কোথায়, কিসের মধ্যে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। দুয়েকটা বোধহয় কিনতেও হবে। এখানে ইলেকট্রিকের দোকান কোথায় জানি না। বাড়ি ছেড়ে যাওয়াও এখন সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে, আজকের মতো অর্ধেক আলোতেই চালিয়ে নিতে হবে। সন্ধে হলেই বাড়ির অর্ধেক অন্ধকার।

মাকে বললাম, 'বেলা থাকতে থাকতে বিছানা-টিছানা কোন্‌টা কোথায় হবে তুমি দেখিয়ে দাও। রান্নার জিনিসপত্র, চাল-ডাল কোন্‌টা যে কিসের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে আছে কে জানে।'

'তুই যা, আমি যাচ্ছি। চল, ছাদটা একবার দেখে যাই।'

'না, মা। খালি পায়ে আমার গা শিরশির করছে। হাওয়াই চপ্পলগুলো কোথায় জানো ?'

একটা বালতির মধ্যে কাগজে মুড়ে তো রেখেছিলাম। চল, নিচেই যাই। তালাগুলো কোথায় রেখেছি বল তো ? রান্নঘরে তো তালা দিতে হবে।'

সিঁড়িতে এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার। মা দেয়াল ধরে নামতে থাকেন। আমি পায়ের আন্দাজে, মায়ের পিছু-পিছু।

নিচে এসে দেখি বিছানা-বাক্‌সের স্তূপের ওপর হাতে মাথা রেখে মিলি মেঝেয় বসে আছে। মোমের মূর্তি।

'ওমা! তুই বসে! খুচরো জিনিস-গুলো একটু হাত লাগিয়ে গোছগাছ করে রাখতে পারতিস।'

'তোমাদের জিনিস, তোমরা গোছাও। কখন থেকে একবার বাথরুম যাবো ভাবছি—বাথরুম নেই, কিছু নেই, আমি বড়দার ওখানে গিয়ে থাকবো।'

মিলি ওইরকমই। কথায়-কথায় রাগ, একটুতেই অভিমান। সবে স্কার্ট-ব্লাউজ ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ম্যাক্‌সিও পরে। কলকাতা ছেড়ে এসে ও যে খুব দমে যাবে সে আমি জানতাম।

মুখ গোঁজ করে বসেছিলো। ওকে দেখে এই প্রথম আমার বাড়ি নির্বাচন নিয়ে দ্বিধা হয়। সবাই বলে আমি নাকি বড়দার চেয়েও সুন্দর। মিলির পাশে আমরা কেউ কিছু না। জন্ম থেকে ঢাকুরের আড়াই ঘরের ফ্ল্যাটে মানুষ, শহুরেপনায় বদ্ধমূল, তবু ওকে আমার হঠাৎ-হঠাৎ রূপকথার কিশোরী মনে হয়। লাগোয়া বাথরুমের অভ্যেস, উঠোন পেরিয়ে টিনের চালা ও কী করে মানিয়ে নেবে ?

মা বললেন, 'কেন, পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় অতো লজ্জা কিসের ? কল-কাতায় ওরকম কতো কলঘর আছে। লোকেরা চান-টান সবই করে।'

'পাঁচিল ঘেরা না ছাই। হাড়-পাঁজরা-বেরুনো দেয়াল, এখানে ফাটল, ওখানে ফোঁকড়, বদমাশগুলো যেন উঁকি মারছে।' মিলি কেঁদে ফেলে।

'আমি কাল মিস্তিরি ডেকে সারিয়ে দেবো। কাঁদিসনি। বাল্‌বগুলো কোথায় জানিস ?'

মিলি ভিজে চোখের ইঙ্গিতে জুতোর একটা বাক্‌স দেখিয়ে দেয়। গতবারের পুজোর। ওটাও মা এতোটা পথ টেনে এনেছেন। আমি সাবধানে খুলি। ভাঙা কাচের টুকরোয় বাক্‌সের ভেতরটা চিকচিক করে ওঠে।

মিলি উঠে কলঘরে যায়। শব্দ করে টিনের দরজা টানে। হয়তো ঠিকমতো বন্ধ হয়নি, প্রায় আধ মিনিট ধরে তার দরজা বন্ধের কসরৎ শোনা যায়।

কলকাতায়ও একবার বাথরুমের একটা পাল্লার কব্‌জা জলে-জলে ক্ষয়ে গিয়েছিল, দরজা দিলেও অল্প একটু ফাঁকা ফাঁক থাকতো, মিলি তিনদিন চান করেনি। নতুন-তোলা দোতলার বাড়িওলা তখন এক ব্যবসায়ী ভাড়াটে বসিয়েছে। লিলুয়া, না কোথায় তার পাঁপড়ের ব্যবসা। তিনটি ধাড়ি মেয়ে, একগা গয়না-পরা বৌ। মিলির চান করে বেরুনোর সময়টা লোকটা বার-বার ওপরের বারান্দায় ভিজে গেঞ্জি শুকোলো কি-না দেখতে আসবে। হাত তারে, চোখ নিচে। বদমাইশের ধাড়ি।

মিলিকে বড়দার বাড়িতেই মানা-তো। বেচারি! ভালো পরিবেশের একে-বারে কাঙাল। একবার গেলে আর আসতে চায় না। একটা মাত্র বোন, তাকে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন :

নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

ফরহ্যান্স ব্যবহারকারীরা স্বেচ্ছায় জানিয়েছেন

"আমার মাড়ি দৃঢ় ও সুস্থ হয়ে গেছে"

"আপনাদের 'ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট' ব্যবহার করে আমার মাড়ি দৃঢ় ও সুস্থ হয়ে গেছে। এর আগে মাড়ির যন্ত্রণায় ভুগতাম। এখন শুধু আপনাদের টুথপেষ্ট ব্যবহার করেই সে যন্ত্রণা থেকে বেঁচেছি।"

(স্বাঃ) ডি. এন. দাস, শিকারপুর

"আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো"

"রাজামুন্দ্রির এক ডেন্টিস্ট...আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।"

(স্বাঃ) পি. জে. ল্যাজার, চিরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্ট্যাট) জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

দাঁতের সঠিক যত্ন নিতে হলে, রাত্রে আর সকালে আপনার দাঁত পরিষ্কার আর মাড়ি মালিশ করার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন। ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করবেন, কারণ দাঁত ব্রাশ করার ও মাড়ি মালিশ করার জন্যে এ বিশেষভাবে তৈরী।

ফরহ্যান্স

দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

বিনামূল্যে! দাঁত ও মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ডাকখরচ বাবদ ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসারী ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট—T 128-168 পোষ্ট ব্যাগ নং ১১৪৬৯, বম্বে ৪০০ ০০১-এ লিখুন

(ইংরাজী ভাষায় চাইলে জানাবেন।)

168 F-152 Bn.

রাখতে বড়দার কী অতো অসুবিধে আমি বুঝি না।

বড়দার বিয়ের ফোটোটা আর বাবার ফোটো মা পাশাপাশি টাঙালেন। বাবাকে বড়দার প্রায় সমবয়েসী লাগে। যেন দুই ভাই। বড়দার অন্নপ্রাশনের ফোটো মা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখ তো, হাত যায় কিনা। ভাগ্যিস ছবি-গুলো আস্ত আছে।'

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। আমি পাশের ঘরে টেবিল-চেয়ারগুলো ঠেলে দিলাম, উপরের দু ঘরের মশারি টাঙাতে পাঁচটা পেরেক পুঁততে হলো। বুড়ো আঙুলে কয়লা-ভাঙা হাতুড়ির ঘা পড়ে রক্ত জমে যায়।

বাবার ওপর নতুন করে আমার রাগ হয়। যে-সংসার ছেড়েই যাবে, সেই সংসার গড়তে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। সন্ন্যাসীদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

মা রাতের চাল বাছতে বসেছেন। মিলি আপন মনে ঘর গুছোয়। হাতুড়ির ঘা কেউ দেখেনি। আমি ব্যথা লুকিয়ে আমার শৈশবের তিন-চাকার সাইকেলটা খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিই।

মিলি জামা-কাপড় বার করে আলনায় রাখতে রাখতে বললো, 'চা খাবে?'

'তুই এদিকটা গুছিয়ে ফেল, আমি চা করছি।'

মা স্টোভ নিয়ে রান্নাঘরে যান।

আমার আঙুল টাটাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'স্টোভ একটু পরে ধরিয়ো। আমি বেরোচ্ছি। দেখি যদি কোনো ইলেকট্রিকের দোকান পাই।'

'কাল যাস। ওপরে-নিচে দুটো তো ঠিকই আছে।'

'নতুন জায়গা। অন্ধকারে তোমারই কষ্ট হবে। মিলিটা যা ভিতু।'

এটা তো শুক্লপক্ষ। আজ দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী। জানলা খুলে রাখলে জ্যোছনা পাওয়া যাবে। দোতলায় ভয় কিসের?'

মা বরাবরই একটু সাহসী। মিলির জন্মের পর বাবার আধ্যাত্মিক নেশা চাগিয়ে উঠলে তিনিই শক্ত মুঠোয় সংসারের হাল ধরেন। বড়দার ইঞ্জি-নিয়ারিং-এর সেটা শেষ বছর। বাবা নিরুদ্দেশ, মা হার-বালা বেচে খড়গপুরে মাসে-মাসে বড়দার বরাদ্দ পাঠিয়েছেন।

'সংসার হইতে বিটায়ার করিলাম' লিখে বাবা এক রাতে বাড়ি ছেড়ে যান। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে সেই চিরকুট পড়ে আমরা দু-ভাই গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি। বড়দা তখন পুজোর ছুটিতে বাড়িতে। সেদিন মায়ের চোখে এক-ফোঁটা জল দেখিনি। পরেও না। মা এক ধরনের জেদ নিয়েই রইলেন। বছর ঘুরতে শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। বাড়ির দরজায় কোন সন্ন্যাসী এলে, মা অদ্ভুত চোখে জটাজুটধারী লোকটার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। সেই দৃষ্টির মধ্যেও জেদের মতন কঠিন কিছু থাকতো। হয়তো দুঃখ একেকজনের জীবনে একেক বেশে বাসা বাঁধে। মায়ের দুঃখ হয়তো তার জেদের চেহারা নিয়েছে। এমনিতে বাবার ফোটো দেয়ালে ঝোলে, এখানেও নিজের হাতে টাঙালেন। কিন্তু ভুল করেও কখনো বাবার কথা বলেননি। কোনোদিন বলেন না। আমার একটা ভয় ছিলো, নতুন বাড়িতে মা হয়তো বাবার কথা মনে করে কষ্ট পাবেন। ট্রেনে সারটা পথ মা চুপ করে বসে ছিলেন। কিছু ভাবছিলেন। হয়তো পিছনের স্মৃতি। হয়তো আমার বাবার কথা। মাকে ওইরকম ডুবে থাকতে দেখলে বাবার ওপর আমার রাগ আরো বেড়ে যায়।

মা চা নিয়ে এলেন। নিজে খান না। কাপটা নিয়ে আমি একটা ট্রাংকের ওপর বসে দেয়ালে পিঠ রাখি। একটু ক্লান্ত লাগে।

'তোকে কি কালই আপিস যেতে হবে?'

'এখন দেখছি, দু-দিন ছুটি নিলেই হতো। রোজ সকালে ট্রেন ধরতে কেমন লাগবে কে জানে।'

'কতো লোকই তো ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। তোর মান্থলি টিকিট করতে হবে। দূরে এসে পথ খরচা কিন্তু কমলো।'

মিলি পাশের ঘরে উঃ করে ওঠে। এই তো কাপড় গুছোচ্ছিল। আমি দৌড়ে যাই। উবু হয়ে বসে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে ধরে আছে।

'কী হলো? কই, দেখি।'

মিলি জবাব দেয় না। মেঝেয় রক্ত। ঠিক ওর পায়ের নিচে। নিশ্চয়ই হোঁচট খেয়েছে। নয়তো ভারি কিছু আঙুলে পড়েছে। নিচু হয়ে দেখলাম, নখের কোণ চুইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। মিলির এই এক স্বভাব, কেটে-টেটে গেলে টিপে-টিপে আরো রক্ত বার করবে।

'ডেটল কি বার্ণল লাগিয়ে দে। আমার শেভিং সেটটার সঙ্গে ডেটল ছিলো না?'

চারপাশে চোখ বুলোই। স্তূপা-কার জিনিসপত্রের মধ্যে কোথায় ডেটল, কোথায় বার্ণল। মিলি একবারও মাথা তোলে না। দু-হাতের অঙুলের চাপে রক্ত ঝরায়। ভুরু কোঁচকালো। সেলাই-মেশিনের পাশে তার চায়ের কাপ থেকে চুইয়ে চুইয়ে ধোঁয়া ওঠে।

বাবার সম্পর্কে মিলির মনোভাব আমি ধরতে পারি না। আমার মতন ওরও কি রাগ হয়? না-কি বাবার কথা ভেবে ও কষ্ট পায়, গোপন অভি-মান পোষে? ওর জন্মসন বাবার গৃহ-ত্যাগে পুরোনো মন্বন্তরের মতন এক দুর্বিষহ স্মৃতি হয়ে আছে। মিলি কখনো কখনো দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে আমি দেখেছি। রূপকথার মতন যার রূপ, তার কেন এতো দীর্ঘশ্বাস? আমি মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর জন্মটা একটা অভিশাপ। ও যেন একটা হাঁস, যে দীঘি চেয়ে শুধু ঘোলা জলের ডোবা সাঁতরে ফেরে।

আপনা থেকেই আমার গলায় মমতা এসে যায়, 'মিলি, উঠে আয়, আমি ডেটল লাগিয়ে দেবো।'

মিলি আঙুল টিপে ধরে বসে থাকে। নখের কোণ-উপচে রক্ত গড়ায়।

রক্ত ওভাবে নষ্ট করতে নেই রে। তাছাড়া বাড়িময় ধুলো, কোন রোগের বীজ কখন রক্তে মিশবে। রাগ করে থাকিসনি, আয়।

কলকাতা শহরে কি আর বাড়ি ছিল না, ছোড়দা?

বাড়ি ছিলো। রোজই তো কতো নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। সেসব আমাদের জন্যে নয়।

যেখানে ছিলাম সেখানেই না-হয় থেকে যেতাম। এই ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দ-পুরের চেয়ে তো ভালো।

সব কথা তুই বুঝবি না মিলি। কলকাতায় আমাদের আর চলছিল না, খরচ চালাতে পারছিলাম না। তাছাড়া দোতলার নীলমণিবাবুকে তো দেখেছিস। ওদের হাত থেকে তোকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। ওদের হাতে টাকা, ওরাই এখন রাস্তা দাপিয়ে হাঁটে।

ডেটলের শিশি খুঁজে বার করতে আমার কপালে ঘাম ফোটে। মিলি আমার হাত থেকে শিশিটা নিয়ে পায়ের আঙুলে ডেটল লাগায়।

আমি মিলিকে সান্ত্বনা দিই, একটু দূর হলো তা-ও কী আর এমন কলকাতা থেকে কুড়ি কিলোমিটার, ইলেকট্রিক ট্রেনে আধ ঘন্টার পথ, বাড়িটা কিন্তু অনেক বেশি বাসযোগ্য। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে থাকা যাবে। বাড়িওয়ালা নেই, নীলমণিবাবুরা নেই, একেবারে স্বাধীন। আর এই জানলা খুললেই গাছপালা, এতোটা আকাশ—তুই তো কিছুই দেখলি না।

এখন থেকে তো এই সবই দেখতে হবে। ছোড়দা, আমি ভাবছি, বেজাল্ট বেরুনো পর্যন্ত বসে না থেকে শর্টহ্যান্ড ক্লাশে ভরতি হয়ে যাই।

প্রায়ই দেখি লেডি স্টেনো, সেক্রেটারির বিজ্ঞাপন থাকে। মাইনে বেশ ভালোই। তুমি কী বলো? ছমাস এক বছরের কোর্স। শুধু শুধু কলেজে এক কাড়ি টাকা নষ্ট করে লাভ কী?

উঃ, জ্বলে যাচ্ছে।

ব লাগিয়েছিস বুঝি? জল মিশিয়ে নিতে হয়।

মাকে কিছু বলিনি। তুমি কী বলো?

শোন, সন্ধে হয়ে আসছে, এখন এসব কথা থাক। চ, ছাদটা দেখে আসি। মা কোথায় দেখ তো।

মা কিন্তু বাড়ি দেখে খুশি। অনেক দিন পর মার হাসিমুখ দেখলাম।

মিলির সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বললাম, তোর এমন মুখ আমার ভালো লাগছে না। তুই একেবারে কলকাতাই হয়ে গেছিস। শোন মিলি কাল ভোরে তোকে নিয়ে আমি বেরুবো। দেখিস, এখানকার পরিবেশ তোর ভালো লাগবে। কলকাতায় আবার মানুষ থাকে নাকি। রাস্তায় দেখিসনি সব কী রকম চোখে তাকায়।

মিলি কথা বলে না, পা দিয়ে সিঁড়ি খুঁজে খুঁজে উঠতে থাকে।

তাছাড়া মেজদাকে সামনের মাসে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। অতো বছর ভুগলো, এখন ওর আলো-হাওয়ার খুব দরকার।

মিলি নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙে। দীর্ঘশ্বাস শুনে আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। ওর কি বাবার কথা মনে পড়লো? অন্ধকারে ওর মুখ ঝাপসা দেখায়। সিঁড়িটা অল্পেই অন্ধকার হয়ে যায়। বিকেল থেকেই এখানে একটা আলো জ্বেলে রাখা দরকার। বাল্ব-গুলো কালই কিনতে হবে।

মিলি দাঁড়িয়ে পড়ে। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে মেজদা কোনো দিন চাকরি করতে পারবে না ভেবে এমন কষ্ট হয়। ছোড়দা, আমি প্রাইভেট সেক্রেটারির কোর্সটাই নেবো।

দূর। এতোটুকু মেয়ে আবার এসব ভাবে নাকি।

মিলি ওপরে উঠতে-উঠতে বলে, আমি আর পড়বো না।

আস্তে। আবার হোঁচট খাবি। তোর জ্বালা কমেছে? আগে এম এটা পাশ কর, তারপর একটা মেয়ে কলেজে পড়াতে পড়াতে প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার কথাটা ভেবে দেখা যাবে।

দোতলায় চমৎকার গোধূলি। মা এর মধ্যেই ঘর-দুটো গুছিয়ে ফেলেছেন। এতোক্ষণে আলাদা একটা শ্রী ফুটেছে। মনে হচ্ছে, এ যেন আমাদেরই বাড়ি, একেবারে নিজস্ব।

মাকে দেখে আমার মন ভরে যায়। কী খুশি। কী উৎসাহ। আমাদের দেখে বললেন, বিজয় থাকবে ওই ঘরটায়। পুব দক্ষিণে পাঁচটা জানলা, খুব আলো-হাওয়া। তুই এ-ঘরে। পাঁচটার কথা অভ্যেস, বারান্দায় চক্কর দিতে পারবি। আমি মিলিকে নিয়ে নিচতলায় থাকবো।

একলা, একতলায় তোমাদের ভয় করবে না?

মা একটা ট্রাঙ্ক খুলেছিলেন, চাবি দিতে দিতে বললেন, ভয় কিসের রে। চ, ছাদটা দেখে আসি।

প্রথমে আমি, আমার পেছনে পাশাপাশি মা ও মিলি। সন্ধে আরো ঘন। অন্ধকারে মায়ের গলা শুনি, এবার বাড়িতে একটা বউ চাই। কদিন পর মিলি কলেজে যাবে, আমি সারাদিন একা থাকবো নাকি?

এই প্রথম মিলির গলায় খুশির ছোঁয়া লাগে, ছোড়দা?

সাবধানে আয়। হোঁচট খাবি।

ছাদে পৌঁছে তিন জন তিন দিকে ছড়িয়ে যাই। চারদিক বড়ো অপরূপ। সন্ধের আকাশও যে এমন নীল হতে পারে, আমি জানতাম না।

আমরা তিনজনেই ঘুরে ঘুরে দেখি। বুক ভরে নিশ্বাস নিই। আমাদের পায়ের তলায় কর্কশ ছাদটাও বড়ো স্বাদু লাগে। পায়ের চাপে চাপে সুখ, স্বস্তি, অধিকারের স্পর্শ নিতে থাকি আমরা।

হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মা প্রায় দৌড়ে আমার কাছে এসে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, চ খোকা, নিচে যাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী হয়েছে মা?

শিগ্গির চ। শিগ্গির। মিলি। বলে তিনি দুহাতে আমাদের দুজনকে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চললেন।

কী হয়েছে, কী ব্যাপার? মা, তুমি অমন করছো কেন?

আঃ খোকা। বলছি চল। শিগ্গির।

রাস্তায় কাউকে দেখলে? হঠাৎ ভয় পেলে কেন? মা।

মিলি বললো মা তোমার কী হয়েছে? রাস্তায় কোনো সন্ন্যাসী দেখে ভয় পেয়েছো?

মা অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন। আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছাদের উত্তর-পশ্চিম কোনের কার্ণিশে ঝুঁকে রাস্তা দেখলাম, একটা ছাগলছানা ঘাস খেতে-খেতে আপনমনে এগোচ্ছে।

সিঁড়ির মুখ থেকে মা চেঁচিয়ে ওঠেন, খোকা। ওখানে দাঁড়াসনি। শকুন।

মুখ তুলে দেখি রাস্তার ঠিক পাশেই তালগাছে একটা শকুন জুবুথুবু মেরে বসে আছে। আমাদের কার্ণিশ থেকে মাত্রই দশ-বারো হাত দূরে। কিন্তু সন্ধের অন্ধকারে এমন ভাবে মিশে আছে, এতো কাছ থেকেও চট করে চোখে পড়ে না।

আমি একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে শকুনটাকে তাড়াতে যাচ্ছি, মা পেছন থেকে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন কী করছিস। আর এক মুহূর্তও নয়। শিগ্গির চল।

নিচে নেমে মা উত্তর-পশ্চিমের জানলা বন্ধ করে দিলেন।

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর
তথা আদ্যন্ত আভিনব
এক বই

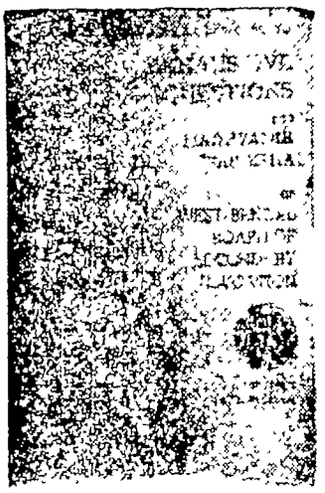

AN ANALYTICAL
APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS FOR
MADHYAMIK PARIKSHA
1978 & 1979

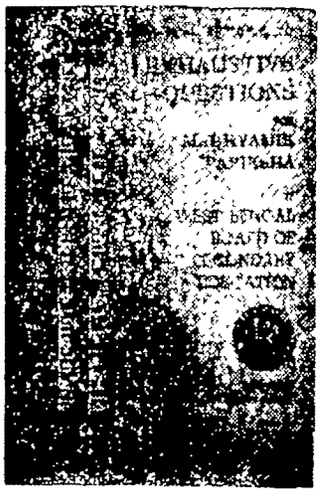

এ বই কিনলে
TEST PAPERS
কেনার আর দরকার হয় না
Price : Rs. 15/- only

B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE,
CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

বড় গানের সমঝদার

সন্ধ্যা সেন

চিরকালই কলকাতা

রাজবল্লভপাড়ার বিশ্বনাথ সান্যালের বাড়ি শুনেছিলাম চন্দন চোবের ধ্রুপদ। রাধিকাবাবুর মত অমন মিঠে গলা তাঁর ছিলো না। কিন্তু পাণ্ডিত্য, গায়কী সব মিলিয়ে বেশ একটা গমগমে সম্ভাব সৃষ্টি হত তাঁর গানে।

অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে হেদুয়ার কাছে কালিচরণ মিত্রের বাড়ি প্রতি বছর একটা করে সংগীতাসর সংগঠন করতেন। সেখানে অশ্বিনীকুমার দত্ত (দানীবাবু) ধ্রুপদও গাইতেন আবার পাখোয়াজও বাজাতেন। প্রথমেই অন্য যেসব ধ্রুপদীদের নাম করেছি—ভূতনাথবাবু, ললিতবাবু, ধীরেন ভট্টাচার্য, যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরা এসব আসরে প্রচুর গাইতেন। এ আসরেও শুনেছিলাম জ্ঞান গোঁসাই ললিতবাবুর সেই জোড়ে গাওয়া দরবারী কানাড়া আর কুটে গোপাল ও নগেন মুখুজ্যের ধ্রুপদ ও পাখোয়াজ। এখানেও দেখেছি সোমের মাথার হুমড়ি খেয়ে পড়ে এই দুই শিল্পীর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরার সেই আবেগ উচ্ছল দৃশ্য।

ধ্রুপদ, খেয়াল তথা উচ্চাংগ সংগীতের প্রতিই তখনকার মানুষের বেশী ঝোঁক ছিল বলেই তখন শুধু ঐ ধরনেরই আসর হত। একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে অথবা দীলিপ রায় ছাড়া অন্য কারো কণ্ঠে বাংলা গান শোনা যেতো না। তবে সেসব বাংলা গানও রাগ-ঘেঁষা।

কিন্তু মজা দেখুন কলকাতার ধনীসমাজ এমন সংগীত ভক্ত হলেও শিক্ষিত পরিবার গানকে তখনও শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। হীরুবাবুর বাবা মন্মথনাথ গাঙ্গুলী ছেলেকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তবলা শেখবার বন্দোবস্ত করেছিলেন বলে তাঁকেও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে হত। আমি নিজের কানে কত লোককে বলতে শুনেছি 'মন্মথবাবু অতবড় শিক্ষিত মানুষ হয়ে ছেলেটাকে ঢুলী করে তুলছেন।'

এই মন্মথবাবু দারুণ সুর পাগল মানুষ ছিলেন। একবার তাঁর বাড়িতে রাজমিস্ত্রী লেগেছিল। একজন মিস্ত্রীকে ছাদ পিটতে পিটতে গান গাইতে শুনে তিনি তাকে ডেকে রোজ তার গান শুনতেন।

হেদুয়ার কাছেই থাকতেন ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য—এক সাবেকী বৃদ্ধ। তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে গানের আসর বসতো। সেখানেও আমরা অনেক আনন্দ করেছি। তখনকার দিনে হরেন শীলের নাম ছিলো সেতার ও সরোদ বাদক হিসেবে। কিন্তু তিনি যে ভাল গানও গাইতেন এ খবর অনেকেই জানতেন না। ষষ্ঠীবাবুর বাড়িতে সব শিল্পীদের অনুরোধে ইনি গানও শুনিয়েছিলেন। অনাথ বসুর একাধারে নারী ও পুরুষ কণ্ঠের গান আমি এ আসরেই শুনেছি।

তখনকার গানের জলসায় মেয়েদের যাওয়ার চল ছিলো না। হীরুবাবুর বাবার স্মৃতিবাসরেই প্রথম ভদ্রবাড়ির মেয়েদের গান শুনতে যাবার রেওয়াজ শুরু হল।

আর বাঙ্গালী মেয়েদের প্রথম গানের তালিম দেওয়া শুরু করেন গিরিজাবাবু। তাঁর প্রথম শিষ্যা গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের দুই নাতনী সাধনা সেন ও নীলিমা সেন (উত্তরকালের সুবিখ্যাতা নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু ও নয়না দেবী) ইভা দত্ত, গীতা দাস, মোকন (শিবপুরের কৃপানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা)। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে এই প্রথম উচ্চাঙ্গ সংগীত এলো।

গিরিজাবাবুর তিনজন নামকরা শিষ্য ছিলেন যামিনী গাঙ্গুলী, রথীন চ্যাটার্জি ও শৈলেন ব্যানার্জি। তখন সংগীত সমাজে যামিনী-রথীন-শৈলেন একটা ফেইজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

১৯৩৪ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে কনফরেন্সের অধ্যায় শুরু হল। এ কনফারেন্সের পরিকল্পনা অবশ্যই পাথুরিয়াঘাটের ভূপেনবাবুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি ভুললে চলবে না কনফারেন্সের আইডিয়া রায়চাঁদবাবুরই। উনি তখন রেডিও, গ্রামোফোন, ছায়াছবি তথা সংগীতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একেবারে শীর্ষে। তাছাড়া নিজেও বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। বাইবাবু, কেরামৎ খাঁ সাহেব ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—এঁরা তিনজন হলেন কেরামতের বাবা মজিদ খাঁ সাহেবের নামকরা শিষ্য, যদিও এঁদের মধ্যে বয়সের তফাৎ যথেষ্ট।

যাই হোক—যা বলছিলাম। একে জমিদার, তার ওপর গান-বাজনা জানা নামকরা লোক। সারা ভারতের সংগীত মহলে রায়চাঁদের দারুণ খাতির। ওস্তাদরা ওকে মান্যও করতেন। আমি বারবার বলছি না প্রথম যুগে কলকাতার সবটাই সংগীতের আসর ছিলো ধ্রুপদ-প্রধান? রায়বাবুরাই প্রথম কলকাতার বাইরে ক্রোম্বাই, দিল্লী, গোয়ালিয়র থেকে গাইয়ে বাজিয়ে আনিয়ে ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল, নাচ এইরকম পরিবেশনায় পরিবর্তন করে সংগীতাসরে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের আগে না পরে ঠিক মনে পড়ছে না—রায়বাবু ন্যাশনাল মিউজিক কনফারেন্স করেছিলেন পূর্বাশী সিনেমা হলে। সেখানেই শুনেছিলাম ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শেষ গান পুরিয়ার আলাপ। জীবনের শেষদিন অবধি সে গান মনে থাকবে।

কনফারেন্সের প্রসংগে আসবার আগে এইরকম স্মরণযোগ্য আরও দু-একটা অনুষ্ঠানের কথা বলুন না?—আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

সে কি একটা? হাজার হাজার আছে। জানেন ত হেমন্তবাবু একবার আমায় তাঁর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠির ঠিকানায় লিখেছিলেন:

অনিল মিত্র

(৩৫ বছরের শ্রোতা)।

৩৫ বছরের প্রায় প্রতিটি দিনের সঙ্গীতাসর সে ত বড় চাট্টিখানি কথা নয়? আগে যদি জানতাম এমন করে কেউ সেসব দিনের কথা শুনতে চাইবে তাহলে না হয় ডায়েরী করে রাখতাম।

ডায়েরী করে রাখলে ত তার দাম কমে যেতো। সেইসব মুখর দিনের ভাষা মন্থন করবার এই থিঙ্গল আয়ার কপালে জুটতো না।—আমি বললাম।

এ্যা-ই। যা বলেছেন? অনিলদা আবার উচ্চকিত হাসিতে থিগলিত হন।

এই মুহূর্তে ফৈয়াজ খাঁর সেই পুরিয়ার আলাপ ছাড়াও মনে আসছে নাসিরুদ্দিনের আলাপ ও ধ্রুপদ।

শুনেছিলাম ঐ রায়বাবুদেরই জলসায়। আর একবার গিরিজাবাবু ঠুংরি গেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলো মির্জা সাহেবের হার্মোনিয়ম, ছোটে খাঁর সারেংগী আর হীরুবাবুর তবলা। 'পিকি বোলো না বোলো'— এই রকম গোছের বোল। সে যে এক লহমায় কি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো বলা যায় না। আসর ভর্তি শ্রোতাদের মনে যেন দড়ির ফাঁস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হাওড়ায় কৃপানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শুনেছিলাম শ্রীজন বাঈ-এর ছেলে খাদেম হোসেনের পাখোয়াজ। সে আওয়াজ, বোলের ছন্দ লয় ফৈয়াজের চমক যৌবনের সৃজনী শক্তির অপরূপ বিকাশকেই যেন অনুভব করেছিলাম। এ অনুভূতি জীবনে হামেশাই আসে না।

প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মেলনে বহুকাল আগে বৃদ্ধ ধ্রুপদী

অমরনাথ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে পাখোয়াজ সংগতে শুনেছিলাম একটি রবীন্দ্রসংগীত 'অল্প লইয়া থাকি আমি তাই'। তাঁর মুখের সেই একসপ্রেশন গলার খেলা আমার জীবনে রীতিমত একটা অভিজ্ঞতা। সেইদিন এক ঝলক বিদ্যুতের মতই একটা উপলব্ধি যেন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিলো মনের অতল গহনে—ধ্রুপদের ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধতায় মনটা থিতিয়ে না গেলে এসব গান এমন করে গাওয়া যায় না। গৈরিক বসন ত্যাগীকেই সাজে। ভোগীকে নয়—

'বাঃ। চমৎকার বলেছেন—ছোটবেলা থেকে ধ্রুপদ শুনতে শুনতে ত আপনারও বেশ একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে—

এ্যা-ই। আমার তারিফে আবার উচ্চকিত হাসিতে বিগলিত অনিলদা।

কি বলছিলাম? ....বেশ আনন্দ করে গান-বাজনা শুনে দিন- কেটে যাচ্ছিলো। গোল বাধলো কনফারেন্স শুরু হবার পর। পাথুরিয়াঘাটার 'ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এই সংগীত সম্মেলনীর প্রেরণা পেয়েছিলেন এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যর কাছে। এই সম্মেলনেই হীরুবাবুকে নিয়ে ভূপেন-বাবু গিয়েছিলেন। সেখানের সাতদিনব্যাপী সংগীত উৎসব দেখে ভূপেনবাবুর মনে ইচ্ছে জাগলো কলকাতাতেও এই ধরণের সম্মেলন প্রচলন করবার।

ওঁরা দেওয়ান ছিলেন। ভূপেনবাবু খিলাত ঘোষের ভাইপো। তিনি লালা-বাবুকেও সঙ্গে নিলেন—এগিয়ে এলেন কলকাতা ও তার চারপাশের রাজা-মহারাজা, ধনী জমিদার। কাজ এগোতে দেরি হল না। কিন্তু তখন থেকে গানের সভার চেহারা আস্তে আস্তে পালটাতে শুরু করলো।

কেমন করে?

এই প্রথম সাধারণ দর্শক ওপেন-টু-অল ফাংশনে আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলি প্রমুখ শিল্পীদের দেখবার ও গান শোনবার সুযোগ পেলেন। এর আগে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো এ রস আস্বাদনের পথ ছিলো না। রায়বাবুর বাড়ি যখন- মালকা জান, কেশরীবাঈ আরো সব-বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হত তখন সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। আমার মত মাছোড়বান্দা লোকও সেসব গান শুনতে পায়নি। কারণ সেসব ছিলো স্টেটের পয়সায় বাড়ির উৎসব। নিমন্ত্রিত অভিজাতমহলই সেসব গান বাজনা শোনবার অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে এসব আসরের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

এই নিরিখে বিচার করে দেখলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের পরিধি অনেকখানিই বিস্তৃত হল। প্রথমে খানিকটা কৌতূহলের বশে, খানিকটা অন্যের কাছে বাহাদুরী নেবার উদ্দেশ্যে অনেকেই মানে একটু সঙ্গতিপন্ন অবস্থার মানুষ এইসব কন-ফারেন্সে যেতে শুরু করলেন। তারপর যেতে যেতে কেমন একটা নেশা লেগে গেলো। সারা রাত জেগে যারা আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, ওংকারনাথ আলাউদ্দিন খাঁর গানবাজনা শোনেন তাঁদের অন্যরা মানে, যাদের সে সুযোগ নেই রীতিমত সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করলেন। এ সবের একটা মোহ ত ছিলই।

এই মোহ বা নেশাই ক্রমে ভাল লাগায় রূপান্তরিত হল। তারপর এমন হল যে এই সব রাতের আসরে না গেলে প্রাণ হায় হায় করে। এই রকম ভাবে একটা বিরাট বিদগ্ধ শ্রোতৃগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। তাদের কান-প্রাণ সবই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য উতলা হয়ে উঠলো।

সংগীত জগতের উল্লেখযোগ্য পট-পরিবর্তন ঘটালো এই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। বড় বড় ওস্তাদ ও বাইদের গান শুনতে শুনতে ক্রমশঃ শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখবার উৎসাহ জাগলো। তখনই স্কুল-কলেজে সংগীত শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করবার প্রেরণা দেখা গেলো। ভাতখণ্ডের বই-এর খোঁজ পড়লো। আরও অনেকে এসব বিষয়ে বই লেখবার প্রেরণা পেলেন। এই-ভাবে রাগ রাগিণীর পর্দা চলন এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একটা ধারণা গড়ে উঠতে লাগলো। এর আগে এখানে ওখানে হঠাৎ গানের কিছু অংশ শুনে গলায় তুলে নিতো। তার একটা মজা ছিলো বটে কিন্তু সে সুর হারিয়ে যাবার ভয়ও ছিলো। সে আলোচনায় পরে আসছি। তার আগে নিজের কথাটা বলে নিই।

কনফারেন্স, টিকিট সেল এইসব সিস্টেম চালু হবার পর আমার খুব অসুবিধে হয়ে গেলো। অত টাকা দিয়ে টিকিট কেনবার সামর্থ্য নেই। ভেতরে ঢুকব কেমন করে? প্রথম সমস্যার ধাক্কাটা কাটতেই আস্তে আস্তে রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেলো। আমাদের অফিসেই কাজ করতেন খ্যাতনামা পাখোয়াজী খগেনবাবু। তিনি পাখোয়াজে দুলভবাবুর এবং তবলায় হীরুবাবুর বাবা মন্মথবাবুর শিষ্য। তাঁরই দৌলতে উদ্যোগে সংগীত জগতের দু-চারজন মানুষের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেলো। তাঁদেরই কেউ হয়ত বললেন 'অমুক সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকো কখনও বা সেরকম কোনো সুবিধা হোক তোমায় ঠিক ঢুকিয়ে দেব।' কখনও দিতেন না। তখন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসতাম।

খগেনবাবু যখন দেরি করে যেতেন ওঁর কার্ড নিয়ে আমি হয়ত আগে বেরে খানিকটা শুনলাম, ওঁর সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে আবার বেরিয়ে এলাম, উনি কার্ড

মাইক শেইনের

ছায়াছায়া মৃত্যু ১২

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত একটি অসাধারণ রহস্যোপন্যাস। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের থ্রিলার।

শার্লক হোমস্

তাঁর

নতুন রহস্যের চমক নিয়ে

হিজ লাস্ট বাউ ১২

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

সৃজনী পাবলিশার্স

প্রাপ্তিস্থান : কথা ও কাহিনী। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।....তখন অবশ্য বাইরে লাউড স্পীকার দেওয়া হত। কিন্তু শীতের রাতে কাঁহাতক আর বাইরে দাঁড়িয়ে শোনা যায়? কেউ হয়ত মাঝরাতে বাড়ি চলে যাচ্ছেন আমি কাকুতি-মিনতি করে বলতাম 'দাদা টিকিটটা দিয়ে যান না শুনি?' যাঁদের সিজন টিকিট থাকতো তাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত না। ডেলি টিকিটের শ্রোতারা মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করতেন। এই প্রসংগেই আর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটকে অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের 'জয় সীতাপতি' আর 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল করে' শোনবার জন্য কম কষ্ট করেছি?

রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেউ হয়ে ঢোকবার আগে রিফিউজড হব জেনেও অনুনয় করতাম 'দাদা একবারটি টিকিটটা দিন কেষ্টবাবুর জয় সীতাপতি গানটা শুনেই আমি ফিরে এসে টিকিট দিয়ে দেব আপনাকে। একেবারে ফার্স্ট সিনেই গানটা আছে। এইভাবে প্রায় প্রতিদিনই একবার করে শোনবার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে সফল হতাম। মাঝে মাঝে হতাম না। একবার এক বৃদ্ধের কাছে ঐভাবে টিকিট চাইতেই হেসে বললেন, গানটা শুনে টিকিটটা ঠিক এসে ফেরত দেবে ত?

এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি—বলেই গা ছুঁতে যেতেই তিনি হাত ধরে বললেন, 'থাক থাক পায়ে হাত দিতে হবে না। যাও, গান শুনে এসো।'

এইরকম সদাশয় মানুষ সব যুগেই কিছু কিছু আছেন। আমাদের মত মানুষের ভরসা ওঁরাই।

একটু আগেই পাখোয়াজী খগেনবাবুর কথা বলছিলাম না? ওঁর মত এমন আত্ম-ভোলা, সঙ্গীতপ্রাণ মানুষ খুব অল্পই দেখেছি। ওঁর কন্যার মৃত্যুর পর শ্মশান থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর যেখানে অস্থিত শ্মশানে ছিলো সেইখানে বসে চার ঘণ্টা ধরে তেড়ে রেওয়াজ করে এসে বললেন 'এতক্ষণে মনটা শান্ত হল।' পাড়ার সবাই তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্বিকার প্রসন্ন মুখ দেখে মনে হয়নি এসব কটুবাদ তাঁর ধ্যানস্থ অন্তরকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেছে।—

অনিলদার কথা শুনে একটু আনমনা হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেলো একটি শ্লোক 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত সুখেষু বিগতস্পৃহা।'

যা হওয়া উচিত তা কি সবসময় মানুষ হতে পারে? কিন্তু সাধারণ মানুষ যা পারে না সাধক মানুষ তাই পারেন কত অনায়াসে? একটা জায়গায় নিঃসর্ত আত্ম সমর্পণ করতে পারলে বোধহয় সকল শোক-দুঃখ যন্ত্রণা পাথার এত সহজে পেরিয়ে আসা যায়।

আর সামনে যিনি বসে আছেন মানে বসে থেকেও যিনি হারিয়ে গেছেন স্মৃতির অতলে তিনিই বা লজ্জা অপমান, শারীরিক ক্লেশ সব কিছুকে উপেক্ষা করে সারাজীবন ছুটে বেরিয়েছেন কিসের তাড়নায়? সেও কি এমনই কোনো সমর্পণের তাগিদে নয়?

হঠাৎ চমকে আবার আপন সম্বিতে ফিরে আসি। অনিলদা তখন বলে চলেছেন, এক বিদেশী শ্রোতা আমায় বলেছিলেন উই-আর সেলিং অন দ্য সেম বোট। তুমিও পাগলের মত গানবাজনা শুনে বেড়াও আমিও গান শোনবার তৃষ্ণা নিয়ে সুদূর ভারতবর্ষে ছুটে এসেছি। আই ডু এগ্রি। তবু তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ অনেক। তোমায় শুধু কলকাতা শহরের জলসাতেই দেখি,— তার বাইরে নয়। আমার গতিবিধি কলকাতা, শহরতলী, মফঃস্বল সর্বত্রই। তাছাড়া তোমার গাড়ি আছে টাকা আছে। আমার মত কষ্ট করে তোমায় ছুটোছুটি করতে হয় না। তা বটে গম্ভীর হয়ে সে বলেছিলো।

জানেন সন্ধ্যাদি, আমি প্রায়তপক্ষে কোনোদিন কলকাতা বা তার আশেপাশের কোন জলসা কোনদিন বাদ দিইনি এবং তার জন্য কোনো কষ্টকে গায়ে মাখিনি। একবার ব্যারাকপুরে ছিলো সারা রাতের আসর। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মহারোধি কোঙ্গাইটিতে ছিলো আরপ্রা চক্রবর্তীর গান। কি করা যায়? ঠিক করলাম তারাপদবাবুর গান শুনে লাস্ট ট্রেনে (রাত সাড়ে এগারোটায়) ব্যারাকপুর যাব। সারারাতের ব্যাপার। কোনো ঝামেলা নেই।

এইভাবে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছে একটা রিকসা করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। কিন্তু এক মাইল আগে থেকে কোথায় লাউড স্পীকারে আসরের কথা, গান, রোশনচৌকির শব্দ? কোথায় উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে নিশানা? পৌঁছে দেখি জনশূন্য অন্ধকার। নিস্তব্ধ পল্লী। দোকান রাস্তাও বন্ধ। উপায়? অনেক ভেবেচিন্তে কাছাকাছি পরিচিত এক ভদ্র-লোকের বাড়ি যেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ডাকা নাড়ার পর তিনি ঘুম ভেঙে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সব শুনে বললেন, সে কি? ফাংশন বাতিল হয়ে গেছে খবর পাননি? বাস, ট্রেন সবই ত বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরবেন কি করে? এক কাজ করুন। নীচের ঘরে একটা তক্তপোশ আছে। ঘর খুলে দিচ্ছি। ঐ ঘরেই কোনো রকমে রাতটা কাটিয়ে দিন।

তাছাড়া আর উপায় কি ছিলো? সেই তক্তপোশে শুয়ে সারারাত ধরে ছারপোকা আর মশার কামড় খেয়ে ভোর হতে না-হতেই উঠে ফার্স্ট বাসে চলে এলাম।

আর একবার কালীঘাটের একটা জলসায় ঢোকবার সুযোগ। থাইসিস রোগে কাতরাতে ওয়ার্কশপে একটা হেলথমন্ত্রী বাসের ভেতর ঢুকে বসে সারা শীতের রাত বেশ মজা করে গানবাজনা শুনেছিলাম। আর ধনী বিদেশী শ্রোতা আমার সঙ্গে তার তুলনা করে!

অত্যন্ত অন্যায়। গানের শ্রোতা হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতার অভিনবত্বের সংগে পাল্লা দিতে পারেন মত শ্রোতা এদেশে ওদেশে কোনো দেশেই মেলা দায়। মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠছে একটা কথা জানতে। সারারাত মশার কামড় খেতে খেতে অথবা একা একটা বিরাট বাসে বসে কখনও মনে জাগেনি আগেকার আতবগোলাপ গন্ধিত ধনীর আসরের সংগীত সন্ধ্যা আর এখনকার অর্থগতির যুগের এই সব কম ফারেন্সের গতি-প্রকৃতির তুলনা?—আমি আর এক প্রশ্ন প্রশ্ন করি।

জাগেনি আবার? প্রথম যুগে সৌখীন মানুষের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের তাগিদে সংগীত সভার জন্ম। তারপর সাধারণ মানুষের মনে সেই সঙ্গীতবোধ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে কনফারেন্সের অবতারণা করলেন ভূপেনবাবু, লালাবাবু এঁরা। কিন্তু সংগীত রসাস্বাদনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করলেও হুজুগ, গ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইত্যাদির প্রয়োজনে উদ্যোক্তাদের চিন্তার মোড় ঘুরলো কিছুটা বণিজের দিকে। নিছক শিল্পচর্চার ব্যাপার আর রইলো না।

তবু বলব প্রথমের দিকে দিলদরিয়া রাজা মহারাজা বড় বড় জমিদারবর্গ পৃষ্ঠ-

মাত্র ৪৫ টাকায়
ট্রানজিসটার রেডিও

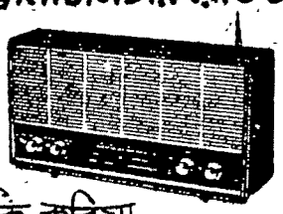

কি করিয়া
তৈয়ারী করিতে হয়
২ মাসের ভিতর শিখুন
শিক্ষান্তে
মাসিক ২০০/৩০০
উপার্জন করুন
রয়েল কলেজ
১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো
শিয়ালদহ
৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে)
৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে)
১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড
খিদিরপুর

পোষক থাকার দরুন অর্থচিন্তার চাপটা তেমন বেশী ছিলো না। যখন একাধিক কনফারেন্স হল তখন সংগঠকদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। একজন বলেন আমরা অমুক অমুক আর্টিস্টকে এনেছি তাঁকে অন্য কেউ আনতে পারেননি। অপরজন বলেন 'আমরা এনেছি তমুক তমুক শিল্পীদের তাঁরা আমাদের কনফারেন্সেরই শীলমোহর করা। সংগঠকদের পরস্পরের মধ্যে এইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলার দরুন আখেরে শ্রোতাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয়নি। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের শিল্পীদেরই তাঁরা প্রায় তবে শুনতে পেতেন।

সর্বপ্রথম কনফারেন্স হল অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। ১৯৩৪ সাল থেকে। তারপর ১৯৪৫ সাল থেকে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স। শিল্পী মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বলব এসব কনফারেন্সে অন্ধদুলু কবিম খাঁ সাহেব, ওংকারনাথ ঠাকুর, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, কেশরবাঈ যে সম্মান পেতেন সে সম্মান পেতেন না গোলাম আলি খাঁ সাহেব। আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁর দেহাবসানের পর গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে নিয়ে হইহই পড়ে গেলো।

যাই হোক কনফারেন্সের আগে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গীতরসিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসাস্বাদনের অধিকারী ছিলেন। কনফারেন্স চালু হবার পর কিছু অর্থ ব্যয় করলে সকলেই এসব গান শুনতে পাবেন এ বোধ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ সাধারণ মানুষ সচেতন হল যে এ গান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, সকলেরই আছে এ গান শোনবার ও উপভোগ করবার অধিকার। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলো আবদুল করিম খাঁ, ওংকারনাথ, ফৈয়াজ খাঁ, হীরাবাঈ, কেশরবাঈ-এর গান—আলাউদ্দিন খাঁ, হাফেজ আলি এনায়েৎ খাঁর বাজনা। তাঁরা ছিলেন কলকাতার বাইরের গুণীদের—পালসকর, কুমার গন্ধর্ব তখন তরুণ শিল্পী। কি যুগ ছিলো! ভাবুন একবার।

একবার আবদুল করিম খাঁ সাহেবকে খুব কাছ থেকে দেখতে ও শুনতে ইচ্ছে হোলো। বরাবর বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি। একবার চেহারাটা দেখব না? কেন জানি না আমার মন বলছিলো উনি আর বেশীদিন থাকবেন না। আমি খগেনবাবুকে বলেও ছিলাম সে কথা। উনি বললেন, তোমার মনটা এত চঞ্চল হচ্ছে? আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

ওঁকে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স থেকে খাতির করে একটা ব্যাচ দিয়েছিল। সেই ব্যাচ উনি আমায় দিয়েছিলেন ভেতরে ঢোকবার জন্য। ব্যাচের দৌলতে ভেতরে গিয়েই আমি ব্যাচটি খুলে এক ফাঁকে চুপিচুপি খগেনবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়েই বীরদর্পে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর এর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছি, ওর পানের ডিবে থেকে পান তুলে খাচ্ছি যেন আমিই সেখানের মরুব্বীদের একজন। সে আসরে শুনেছিলাম আবদুল করিমের গান, একেবারে তাঁর কাছাকাছি বসে। আর তাঁর পূর্ণ মেজাজে। ভগবান সেদিন আমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। কি গান যে সেদিন গেয়েছিলেন! গান শেষ হবার পর অত লোক যখন বেরিয়ে আসে একটা হৈ-হৈ হয় না? কিন্তু সেদিন কোনো কোলাহল নেই, শব্দ নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেমন একটা থমথমে ভাব সারা হলে। সবাই নীরবে বেরিয়ে আসছে। যেন কি একটা হয়ে গেছে। সে কণ্ঠের মায়াময় সুরে ভাবে সবাই যেন একেবারে মেসমেরাইজড।

এ গান শোনার পর বাড়িতে এসেও কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি সারাদিন। যতবার সেই অপরূপ কণ্ঠের সুর কানের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠছিলো নিজেকে অত্যন্ত সার্থক মনে হচ্ছিলো। আর বারবার মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছিলাম শ্রদ্ধেয় খগেনবাবুকে। তাঁর অনুগ্রহেই ত এমন গান শুনতে পেলাম এতবড় শিল্পীর একেবারে কাছটিতে বসে? আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের কপালও তাঁর কত দয়া?

আবদুল করিমের গানে অতিবড় গোঁড়াকেও 'আহা' করে উঠতে হত। অথচ তাঁর চেহারা দেখে অতবড় প্রতিভার কোনো আন্দাজ পাওয়া যেতো না। অতি শীর্ণকায়। মেহনতী মানুষের মত দেখতে। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে তবেই স্বল্পবাক মানুষটির মধ্যে একটা আত্মভোলা ভাবুক ছায়া চোখে পড়তো।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের খুব রাজসিক চেহারা ছিলো। সাদা চাপকান, জমকালো পাগড়ী, রুপো বাঁধানো লাঠি নিয়ে আসরে ঢুকলেই আসরে সাড়া পড়ে যেতো। উনি যখন লাঠিতে রাখা হাতের ওপর চিবুক রেখে গোঁফ মুচড়ে মহারাজার মত বসতেন—ওর ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করতো না।

ওংকারনাথের ছিলো রাজর্ষির মত চেহারা। উনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন। সবার সঙ্গে হাসতেন, কথা বলতেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা দূরত্বও বজায় রাখতেন।

মজলিশী মানুষ ছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁন। গড়ীনবুমে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। আমায় দেখলেই বলতেন 'তোমাকেই ত এতক্ষণ খুঁজছিলাম। কোথায় ছিলে? তুমি না এলে কি আসর জমে?

(চলবে)

০ এবারের পূজায় কিশোরদের অভিনব গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
অতলের আতঙ্ক ৩-৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবীর
হায়নার হাসি ৩-৫০

স্বপনবুড়োর
ভয়ঙ্করের স্বপ্ন ৩-৫০

নিঝুম রাতের অট্টহাসি ৩-৫০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
নীল জলের মুক্তো ডুবুরী ৩-০০

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
সুন্দরবনের রাক্ষস ৩-৫০

আফ্রিকার বনে জঙ্গলে ৩-০০

আশাপূর্ণা দেবীর
ডাকাতের কবলে আমি ৩-০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
শুঁড়-ওলা বাবা ৩-০০
দাদু নাতির দৌড় ৩-৫০

ইন্দিরা দেবীর
ইন্দিরাদির মিষ্টি গল্প ৩-০০

রবিদাস সাহাবারের
চম্বলের ডাকাত ৩-৫০
জলদস্যুর কবলে ৩-০০

শক্তিপদ রাজগুরুর
সোনা পাহাড়ের দৈত্য ৩-৫০
পটলার বাঘ শিকার ৩-০০

সিট বুক এজেন্সী : ৪৪।১সি, রেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৭০০০০৯

বন্যার জলজীবন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

লক্ষ্মণ আর দাঁড়াতে পারল না। সারা গা এখন রক্তে পেছল। কাদার মধ্যে গড়াতে গড়াতে আরো নিচের দিকে নেমে এল ও। দু'চোখের দৃষ্টিতে এখন জোনাকির মতো অসংখ্য আলোকণা। ওগুলো আলো, না রক্তকণা। আশ্চর্য, এত রক্ত ওর দেহে! এত পেছল এই রক্ত। ও হাত নাড়তে গিয়ে বুঝল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ও। রক্ত, না জল। তবে কি ও জলের মধ্যেই নেমে পড়েছে। এত নোনতা কেন! রক্তও কি নোনতা!

ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিছুই ছিল না তখন। ঢিলের ঘায়ে এপাশ থেকে ওপাশে টলে পড়ছিল ও। জলের ওপর অল্প অল্প দোল খেতে শুরু করল লক্ষ্মণ। তারপর ধীরে ধীরে ওর চোখের ওপর থেকে জোনাকির আলোগুলো মুছে যেতে শুরু করল। প্রশান্ত একটা অন্ধকার যেন ওকে গ্রাস করে নিতে লাগল। তারপর ওর পেট বুক নড়িকুন্ড কোমর, অবশেষে ওর চোখ মুখ নাক সব, সবকিছু তলিয়ে যেতে শুরু করল ঐ অন্ধকারে।

নদীতে এখন ভাঁটা। লক্ষ্মণ বুঝতে পারল না, নদীর ভাঁটা এখন ওকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সাগরের দিকে নিয়ে যাবার যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

লক্ষ্মণ মারমুখী লোকগুলির সামনে ধীরে ধীরে জলের তলায় তলিয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

ভেড়ির ওপর সবাই তখন হায়লে পড়েছে। কেউ কেউ ভেড়ি থেকে নেমে একেবারে জলের কাছাকাছি এক কোমর কাদায়। হাতে হাতে তখনো দা কুড়োল লাঠি। কিন্তু অস্ত্রগুলি ধীরে ধীরে শিথিল হত থেকে খসে পড়তে শুরু করেছে। মুখে কথা না থাকলেও চোখে-চোখে তখনো সবার একই ভাষা. না আমি না, আমি নই। আমি তোমাকে আঘাত করিনি যুবক।

সমস্ত পরিবেশটাই কেমন এক অবসাদে ঢলে পড়ল। পৃথিবীর সেই আদিমতম নারকীয় ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি দেখে সবাই কেমন হতবাক। প্রস্তর মূর্তি ঘটিয়ে একটা মানুষকে যদি মেরে ফেলা যায় বিশ্ব সংসারের কীই বা ক্ষতি, কীই বা লাভ? মুখগুলি থমথম করতে থাকে। এত সহজেই যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে, অংশীদার হয়েও কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এখন। অথচ যা ঘটল তা স্বপ্নও নয়। লোকটা রক্তাক্ত দেহে আঘাত এড়াতে এড়াতে নদীর জলে আশ্রয় নেবার জন্য ঢলে পড়ল। নদী তাকে তলিয়ে নিয়ে গেল পাতালে।

নদীরও বলিহারি যাই। নিরবধিকাল চন্দনের মতো ঘোলা জল নিয়ে ছুটতে ছুটতে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে নদী। উদাসীন ভঙ্গি। পাপ পুণ্য বোধ নেই, নির্বিকার।

ঈশান জলের দিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটা ভেসে উঠছে না কেন? চারপাশে তাকাল। আশ্চর্য তখনো ভেড়ি ধরে ছুটে আসছে লোক। হ্যাঁ ঐ তো, রজনীও। থমকে রইল ঈশান।

রজনীর গলা পেল ওরা, কি হয়েছে? কোথায়? কোথায় গেল লোকটা?

কে একজন নদীর জলে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, ঐ জলে।

—কী ঐ জলে? রজনীও বিশ্বাস করতে পারছিল না, নদীর ঐ জলে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বিশ্বাসই করা যায় না, ঝাঁকে ঝাঁকে যেখানে কুমিরের বাস, সেখানে জেনে শুনে কেউ পা ছোঁয়াতে পারে। কুমিরের চোখ এড়িয়ে গেলেও কামটের বিপদ কে না জানে। নিঃশব্দে জলের তলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে কামটে।

রজনী আরো এগিয়ে এল, এই শুয়োরের বাচ্চা, গেল কোথায় লোকটা?

ঈশান তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। বলল, আহাম্মকরা ঐভাবেই মরে। ভেড়িতে গর্ত খুঁড়তে গিয়েছিল, বনবিবি ওকে ডুবিয়ে মেরেছে।

—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ধরতে পারলি না?

—তুমি ধরলেই পারতে। ঈশান দাঁত মুখ বিকৃত করে কাদা থেকে দুপা উঠে এল।

আর এমন সময় সারা আকাশ কাঁপিয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠল। হ্যাঁ, গৌরীরই গলা।

গৌরীর গা থেকে কাপড় খসে পড়েছিল। বিভ্রান্ত দৃষ্টি। ভেড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল গৌরী। লক্ষ্মণদা? আমার লক্ষ্মণদা? লক্ষ্মণদা কোথায়?

ঈশান ধীরে ধীরে এগিয়ে এল গৌরীর কাছে। গৌরী—

—লক্ষ্মণদা কোথায়? পালটা চিৎকার করে উঠল গৌরী।

—গৌরী শোন, তোমার লক্ষ্মণদা কী সর্বনাশ করতে গিয়েছিল আমাদের।

—কী করেছে ও? কান্নায় ফুলে উঠল গৌরী।

—ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল লক্ষ্মণ। আমরা এতগুলো লোক এখানে জলের তলায় ডুবে মরতাম।

—তাই বলে তোমরা ওকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেবে?

—আমরা খুন করি নি গৌরী। আমরা ওকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটেছিলাম। আমরা ওকে জলে ভাসাই নি।

—আমার কী হবে এখন। গৌরী ভেড়ি থেকে কয়েক পা কাদার দিকে নেমে আসে। তারপর চিৎকার করে ওঠে লক্ষ্মণদা গো—

ঈশান আরো এগিয়ে আসে গৌরীর দিকে। কোথাকার কোন ভূত সঙ্গে করে বেরিয়েছিলে শুনি। জেনে শুনে কেউ জলে ঝাঁপায়!

—আমার কী হবে? আমি কোথায় যাবো? কাদার ওপর আছড়ে পড়ে গৌরী। ফুলে ফুলে ওঠে দেহটা।

রজনীও এগিয়ে এল, সাঁতার জানে না লোকটা?

গৌরী উত্তর দিল না।

বাদার লোক সাঁতার জানে না বিশ্বাস করা যায় না। রজনী সন্দেহ প্রকাশ করল, সাঁতার না জানলে জলে ঝাঁপাবে বিশ্বাস হয় না!

খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে মকবুলও এসে ভেড়িতে দাঁড়িয়েছে, দেখতে পেল সবাই। মকবুলই প্রথম স্মরণ করিয়ে দিল, জলেই যদি পড়ে থাকে খোঁজাখুঁজি করে দেখা উচিত। সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে লগিলগা নিয়ে নেমে পড়লে হয় না?

—হবে না কেন? কিন্তু জলে কে নামবে?

জলে কেউ নামবে না। নামাও উচিত না। রজনী বলল, ঠিক আছে ডিঙিতে চড়েই খুঁজে দেখা।

ঈশান চেঁচিয়ে উঠল, মাছ ধরার গুন নিয়ে আয় জগন্নাথ। বড় নৌকোয় বাঁশ আছে, নিয়ে আয়।

মাছ ধরার গুন আনতে জগন্নাথ ছুটে গেল।

গৌরী আবার চেঁচিয়ে উঠল, আমার কী হবে গো—

রজনী বলল, আর দেরি করিস না ঈশান। যা নৌকোয় ওঠ। আমি আছি ওর পাশে। তুই যা।

এখন মধ্য দুপুর। শীতের দুপুর বলেই রোদের তেজটা গায়ে লাগছে না।

রজনী মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছে। কান্না অনেকটা সংক্রামক রোগের মতো। রজনীর খুবই খারাপ লাগতে থাকে। লক্ষ্মণটাকে এভাবে তেড়ে না গেলেই হত। অন্যায় যা ও করেছে তার জন্য আলাদা সাজা ওকে দেওয়া যেত। মেয়েটার জন্যই কেমন যেন মন ভিজে উঠছিল রজনীর। আর রাগটা আছড়ে পড়ছিল ঈশানের ওপর। একটা না একটা গোলমাল ও বাধিয়েই চলেছে। মেয়েটাকে নিয়ে এখন আরো কি বিপাকে পড়তে হয়, কে জানে।

ওদিকে বড় বড় কয়েকটা বাঁশ জোগাড় হয়ে গেছে। মাছ ধরার গুনও চলে এল। পাড়ে দাঁড়িয়েই কয়েকজন গুন ছোড়াছুড়ি শুরু করে দিল। গুনের কাঁটা জলের তলদেশে গড়াতে গড়াতে আবার উঠে আসছে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই। বেমালুম যেন জলের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়ে মিশে গেছে লক্ষ্মণ।

গুন টেনে যে লক্ষ্মণকে পাওয়া যাবে না তা আগেই জানা ছিল। তবু গুন না টানলে মনের অস্বস্তিও থেকে যেত। ওদিকে ডিঙি নৌকোয় চার-পাঁচজন উঠে পড়েছে। জলের তোড়ে নৌকা সামলান দায়। রসিকলাল বৈঠা ধরল। বাঁশ হাতে ঈশান আর জগন্নাথ। জলে বাঁশ ডুবিয়ে ধরে রাখা দায়। এই মনে হয় কিছু বুঝি একটা ঠেকছে, কিন্তু না, কিছুই না।

একটা ঘেরা জাল পেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখা যেত। কিন্তু জাল বয়ে আনার কথা কারোরই মাথায় ছিল না। এই অরণ্যের দেশে জাল সঙ্গে রাখার কথা কেউই ভাবে নি আগে।

জগন্নাথ বলল, লোকটা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যেতে পারে বল দেখি?

ঈশান বলল, শালার আয়ু ফুরিয়েছিল। শিবের সাধ্য নেই ওকে বাঁচায়।

আবার বাঁশ খোঁচাতে শুরু করে ওরা। জলের টানে বাঁশের গোড়া ভেসে ভেসে ওঠে। অসম্ভব শক্তি দিয়ে মাটির মধ্যে গুঁজে গুঁজে দেখতে হয় ওদের।

রজনী লক্ষ্য করল, মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ জন শিথিল হয়ে গেছে। ঘোলাটে চোখ। মুখের ওপর আঁচল চেপে

কচি বয়েসে দন্তক্ষয়ের দরুন দাঁত পড়ে গেলে সেখানে যে শক্ত দাঁত বেরোয় তা টেরা-বাঁকা হয়ে গজিয়ে উঠতে পারে। তাতে মিষ্টি হাসির শ্রী চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একটিই উপায়—বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত সুরক্ষিত রাখা।

পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের দীর্ঘস্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফসফেট।

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

M-BF 7/7 bn

ধরা। জলের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে ও। রজনীর মনে হল, এই মেয়েটাই আসলে খুনী। লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে চিরকালের মতো ওর সর্বনাশ করে দেওয়ার মূলে এই মেয়েটাই। আরো কত কিছু যে ও ঘটাবে কে জানে।

ঈশান অক্লান্ত লগি খুঁচিয়ে যাচ্ছে। রসিক নৌকার গলুই আবার ঘুরিয়ে ধরল। ঈশান হুইয়ের গায়ে পিঠ লাগিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

—ফালতু লগি খোচাচ্ছিস জগন্নাথ। ও নেই।

—নেই ?

—জলের টানে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে।

অসম্ভব নয়। জগন্নাথ চুপ করে থাকে। ওর সারা গা নুনে জলে ভেজা। চকচক করছে। এতক্ষণ ধরে কেউ ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। মরেও যদি যায় তাহলে ভেসে উঠবে।

—জলে ডুবে গেলে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে ওঠে না। কখনো কখনো দুচার দিন সময় লেগে যায়।

—কামটেই টেনে নিয়ে গেছে তাহলে।

—নিতেও পারে। ঈশান আবার লগি নামাল।

জগন্নাথ বলল, লগিতে ধরা পড়বে না। যদি ধরা পড়ে ওদের গুন টানাতেই ধরা পড়বে।

ঝপাঝপ গুন ছুঁড়ছিল ওরা। কিন্তু বৃথাই টানা। পরিষ্কার গুনের কাঁটা উঠে আসছিল ডাঙার।

জগন্নাথ এসময় সরাসরি অভিযোগ করল, তুই অমন করে কাটারিটা ওর দিকে না ছুঁড়লেও পারতিস।

ঈশান চমকে উঠল, আমি! না আমি না।

—আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না ঈশান। তোর কাটারিটা ওর মুখে লেগেছে।

ঈশান রুখে দাঁড়াল, বাজে কথা। আমি ছুঁড়ি নি। কিন্তু হাত থেকে লগিটা ওর খসে গেল।

জগন্নাথও দমবার পাত্র নয়, অনেকেই অনেক কিছু ছুঁড়েছে কিন্তু তোর কাটারিই ওকে ঘায়েল করেছে। ও সামলাতে পারে নি।

ঈশান তেড়ে এল জগন্নাথের দিকে, ফের আমার নামে দোষ চাপাবি তো শেষ পর্যন্ত তোকেও হিসেব দিতে হবে জগন্নাথ।

রসিক মাঝখানে পড়ে সরিয়ে দিল দুজনকে।

জগন্নাথ ভেবির দিকে তাকাল। যেন শালা, লক্ষ্মণের জন্য দরদ দেখাচ্ছিস ? ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল কে ?

জগন্নাথ ভেরি দিকে তাকাল। যেন রজনীকেই ও এসময় পাশে খুঁজছিল। রজনী মেয়েটাকে আগলে গায় গায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—শালা, ফন্দি এঁটেছিল, আমাদের নদীর জলে ডুবিয়ে মারবে। সেদিন যে বাঁধ ভাঙল, সেটাও ওরই কীর্তি জানিস ?

জগন্নাথ তাকিয়ে থাকল। উত্তর দিলেই ঝগড়া হবে। চুপ করে থাকাই ভাল।

রসিক নৌকাটাকে এবার তীরের দিকে ঘুরিয়ে আনল।

ঈশান বিড়বিড় করে বলল, শালা নিজের পাপে নিজে মরেছে। আমরা কেউ ওকে মারি নি।

ভেড়ির ওপর থোকা থোকা মানুষ। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে, গুনের টানে কিছু একটা ভেসে উঠলেও উঠতে পারে।

জগন্নাথ ডিঙি থেকে নেমে পড়ল। এক হাঁটু কাদা। কাদা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ও ভেড়ির ওপরে মকবুলের দিকে চলে গেল। নেমে পড়ল ঈশানও। এগিয়ে এল গৌরীর দিকে।

রজনী ফ্যাল ফ্যাল করে জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। ঈশানকে পাশে পেয়ে শুধাল, পেলি না ?

ঈশান বলল, কপালে থাকলে এখনো পাওয়া যেতে পারে, ওরা গুন টানছে।

—আমার কী হবে ঈশানদা ? আবার ডুকরে উঠল গৌরী। লোকটা যে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে বেরিয়েছিল।

—খোঁজাখুঁজি তো হচ্ছে। ঈশানের আর কিছু বলতে সাহস হল না।

—লক্ষ্মণ দা তো পাদরিপাড়া থেকে বেরুতে চায় নি। আমিই ওকে জোর করে রাব করে এনেছিলাম গো—

—একটা শয়তানকে তুমি জোগাড় করেছিলে। ওরকম মানুষ ঘরের চালেও আগুন লাগাতে পারত।

—তোমরা ওকে মারলে কেন? আমাদের তাড়িয়ে দিলেই তো পারতে।

—আমরা মারি নি। নিজেই গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

গৌরীর শরীরটা ফুলে উঠল, তোমরা ওকে তাড়া করে এনে এই নদীর জলে ফেলে দাও নি বলতে চাও?

ঈশান কিছুটা থমকে যায়। সব সময় মাথা ঠিক রাখা যায় না। যদি ওর শয়তানী চোখে না দেখতাম, তাহলে এক কথা ছিল।

প্রকাশিত হল

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

হিমালয়ে দুর্ঘটনা ৭৲

প্রখ্যাত হিমালয় অভিযাত্রী ও ভ্রমণকাহিনীকারের তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। দুঃসাহসিক হিমালয়-অভিযানে দুর্ঘটনার বিবরণ।

সরিৎশেখর মজুমদার

তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে ৭৲

বাংলার একদা ভাগ্যনিয়ন্তা তেলিয়াগড়ী দুর্গ ও গিরিপথের বিষয়ে দেড় হাজার বছরের ফ্যান্টাসী উপন্যাস। অথচ অবিকৃত ইতিহাস। ভালো কাগজ। বহু রেখাচিত্র ও তেলিয়াগড়ীর ফটো।

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

ওগো দুখ জাগানিয়া ৪৲

ছাপ্পান্নটি স্বরচিত গানের সংকলন। "আওয়ার সুইটেস্ট সংগস্" বলা যায়।

পরিবেশক ঃ নাথ ব্রাদার্স ঃ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

রজনী বলল, আমি তোদের আগেই বলেছিলাম ঈশান, ওদের তাড়িয়ে দে। কি দরকার বাপু ঝামেলায় যাওয়া।

ঈশানের আর তর্ক করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

—আর তোমাকেও বলিহারি মেয়ে। বারবার ঘুরে ফিরে আমাদেরই এখানে। আমরা আছি আমাদের জ্বালায়। তার মধ্যে যত সব নাই ঝামেলা ঘাড়ে চাপান।

গৌরী আবার আঁচল গুঁজে ধবল মুখে। একা একটা অসহায় লোক পেয়ে তোমরা ওকে মেরে ফেলবে? তোমরা খুনী।

মকবুলের গলা পাওয়া গেল এ সময়, তোমরা এবার উঠে এসে রজনী ভাই। ওখানে বসে থেকে তো লাভ নেই।

গৌরী জলের দিকে চোখ পেতে বসে থাকল, না, আমি যাব না।

—লক্ষ্মণকে যদি পাওয়া যায়, এমনিতেই যাবে। ওখানে বসে কান্নাকাটি করে কিছু লাভ আছে?

ঈশান ধীরে ধীরে সরে গেল। এক-জনের হাত থেকে গুনের দড়ি ছিনিয়ে নিল, আমাকে দে।

রজনী বলল, ওঠ মেয়ে। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরান যাবে না, ওঠ।

—না, আমি যাব না। গা থেকে রজনীর হাত ছাড়িয়ে নিল গৌরী।

—মিছি মিছি কেবল বসে থাকা। ওঠ।

—আমাকে তোমরা ঘোষবনেই দিয়ে এস। আমি ফাদারের কাছে সব বলব।

রজনী কেমন গুটিয়ে গেল, লক্ষ্মণকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কথাটা এই জঙ্গলের বাইরে গেলেই বিপদ। তখন রজনীকে নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল ওর।

—আমি আর এক মুহূর্ত থাকব না এখানে। তোমরা মানুষ খুন করেছ। লক্ষ্মণদা গো—

আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল গৌরী।

রজনী অবস্থাটা এবার সামাল দেবার জন্য ধমকে উঠল, খবরদার, যা বলছি তাই কর। উঠে পড়।

রজনীর দিকে তাকাল গৌরী। তোমরা আমাকে ঘোষবনে না দিয়ে এলে, আমি একাই বেরুব। আমি একাই চলে যাব।

গৌরী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

রজনী বলল, আমরা তোমাকে বেঁধে রাখব না। ঘোষবনেই দিয়ে আসব। এখন চলো।

—কোথায়?

—এখানে বসে তো আর লাভ নেই। কাছারি ঘরে চল। কি করা যায় পরে ভাবা যাবে।

—না, আমি যাব না। গৌরী ছুটে ডিঙি নৌকার দিকে আসতেই রজনী খপ করে ওর হাতটাকে ধরে ফেলল। কি পাগলামী শুরু হচ্ছে।

—আমি চলে যাবো, আমাকে ছাড়, ছেড়ে দাও।

রজনী গায়ের জোরে ওকে টেনে নিয়ে এল ডেঙির ওপর। বলেছি তো —পৌঁছে দেব। লক্ষ্মণকে পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে না?

গৌরী রজনীর দিকে তাকাল। কেমন যেন বিশ্বস্ত মনে হল ওকে। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শুধাল, কালই আমাকে পৌঁছে দেবে তো তোমরা?

রজনী বলল, আগে কাছারিতে চল, কে দোষ করেছে তার বিচার হবে, তারপর না! গৌরী চুপ করে শুনল।

—অন্যায় যে করেছে, তাকে শাস্তি আমরা দেবই। চলো। গৌরীর হাত ধরে টানল রজনী।

কী আশ্চর্য গৌরী এগোতে শুরু করল রজনীর সঙ্গে। দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখার মতো। এই রজনীই না দু' দিন আগে মেয়েটার নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। তা হলে কি মেয়েটা আজ রজনীকেও বশ করল।

ঈশানও গুন টানা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। ওরা ডেঙি থেকে

পোড়ার জায়গা থেকে পুঁজ হতে দেবেন না

সঙ্গে সঙ্গে বার্ণল লাগান

বার্ণল সবসময়ে হাতের কাছে মজুত রাখুন

বার্ণল পোড়া জায়গায় কোনও ফোস্কা পড়তে বা কোনও পোড়া দাগ হতে দেয় না, জ্বালা-যন্ত্রনা জলদি দূর করে।

পুড়ে গেলে কার্যকরী চিকিৎসার জন্যে সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ঘরেতে সবসময় হাতের কাছে বার্ণল মজুত রাখুন।

বার্ণল এক অদ্বিতীয় ফর্মুলার তৈরী হওয়ার ফলে এর কার্যকরী ক্ষমতা পোড়া জায়গার 'ভেতর ও বাইরে' দুই-এতেই ক্রিয়াশীল। বার্ণলের জীবাণু-প্রতিষেধক উপাদান মলমের ওপর ওপরই থাকে, অন্যান্য মলমের মত ভেতরে 'আটকে লেগে' থাকে না। আর সেই কারণেই বার্ণলে কাজ হয় খুব তাড়াতাড়ি... জ্বালা-যন্ত্রনার জায়গায় ঠাণ্ডা হয়ে আরাম বোধ হয়; ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে আর ক্ষতে জীবাণু প্রবেশ হতে দেয় না।

এই ভাবে পোড়া জায়গা থেকে পুঁজ হয়ে কোন ক্ষত না হওয়ার ফলে সেরে যায়- খুব তাড়াতাড়ি। এইসঙ্গে মনে রাখবেন, কাটা, ছড়ে যাওয়া ও ছেঁচে যাওয়া জায়গাতেও বার্ণল লাগালে সেরে যায় তাড়াতাড়ি।

BC-2182

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রশোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, অষ্টম মুদ্রণ—১৪৲।

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী-মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূত হন।

ডিঃ ক্রাউন সাইজে ৪০০ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রে শোভিত, বোর্ড বাঁধাই।
কণ্ঠ মুদ্রণ—৮৲।

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনী সন্ন্যাসিনী শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে এমন মহীয়সী নারী এ যুগে বিরল। 'দুর্গামা' জীবনচরিতখানি এক-বার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা বহু চিত্রশোভিত সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲।

সাধনা

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে উক্তি, বহু সুল-লিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সাধনার কুঞ্জে মনোহারীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ডিঃ ক্রাউন সাইজে ৩৬৮ পৃষ্ঠা, প্ল্যাস্টিক কভারে। কণ্ঠ মুদ্রণ—৬৲।

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা।
তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, গৌরীমাতা সরণী কলিকাতা-৪

নেমে ধীরে ধীরে কাছারি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। গৌরীর উত্তেজনা না কমলে ওর কাছে আর এগোন যাবে না। গৌরী কি দেখে ফেলেছে ঈশানের কাটারিটাই ওর মাথায় গিয়ে আঘাত করেছে? আর তার ভয়ের সামলাতে না পেরেই লক্ষ্মণ জলের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে?

ঠিক এরকম যে ঘটনা ঈশান স্বপ্নেও ভাবে নি। ও ভাবতেই পারে নি লোকটা নিমেষের মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাবে। এ অবস্থায় আবার গৌরীর মুখোমুখি হবে কি করে ও। ধুশ শালা, কি কুক্ষণেই যে বাদায় এসে পা দিয়েছিলাম। ক্ষোভে গজরাতে শুরু করল ঈশান।

চার-পাঁচ জন লোক তখনো ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে গুন টেনে চলেছে নদীতে। জলের তলায় ধারে কাছে যদি লোকটা থাকত, ঠিক পাওয়া যেত। তবে কি কুমিরে বা কুমেটেই ওকে টেনে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল? অথচ আজ সকালেও লোকটাকে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখা গেছে। মানুষের জীবনেরই কোন দাম নেই।

আর ঠিক এতক্ষণ পরে নাটকের প্রায় শেষ অঙ্কে গেঁজেল শুকদেবটাকে দেখা গেল। রক্তাক্ত চোখ। এতক্ষণ কোথায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল, কে জানে। এখানে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে বিন্দুমাত্র বোধ হয় টের পায় নি ও। কেমন ঘোলাটে চোখে তাকাল।

—কি হয়েছে গো ঈশান?

ঈশান একপলক তাকাল শুকদেবের দিকে। উত্তর করল না।

—কি হয়েছে বলবে তো? এই দ্যাখো, কেউ না বললে আমি বুঝব কি করে।

—তোর বুঝতে হবে না। ঈশান পালটা চেঁচিয়ে উঠল, কোদাল গাঁইতা নিয়ে কয়েকজন আমার সঙ্গে চলে আয়। ভেড়িতে যে ঘোঁগ বানিয়ে গেছে লোকটা, সেটা আগে বুঝিয়ে আসি চল।

মকবুল তখনো দাঁড়িয়ে ছিল ভেড়ির ওপর। যারা গুন টানছিল তাদের উপদেশ দিল, তিন সুবোর মুখ অবধি গুন টানতে টানতে এগিয়ে যা তোরা। তবু না পাওয়া গেলে আর কি করা যাবে।

ঈশান নিজই একটা কোদাল তুলে নিল। চল, কে কে যাবি আমার সঙ্গে।

শুকদেব আবার চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে বলবে তো? আমি কি মানুষ নই?

মকবুল বলল, তুই আমার কাছে আয় শুকদেব, আমি বলছি।

শুকদেব এগিয়ে এল। বলো, তুমিই বলো।

মকবুল বলল, নতুন লোকটাকে কামটে টেনে নিয়ে গেছে জলের তলায়।

—কেন?

—কেন কি? যা, আরো গাঁজা টান গে যা। দেখছিস, সবার মাথা গরম, তবু তোর লজ্জা নেই।

শুকদেব বলল, ডাঙার মানুষকে কামটে ধরে কি করে, সেটাই তো আমার প্রশ্ন গো।

ডাঙার মানুষ জলে পা দিলে কামটে ধরবেই। যা, রাত জেগেছিস, এবার ঘুমিয়ে নে গে যা।

শুকদেব আবার কি একটা রসিকতা করল। কিন্তু যা ঘটেছে তা যে আদৌ রসিকতার নয় ওকে বোঝান যাবে না। মকবুল আবার জলের ভাঁজে চোখ ফিরিয়ে আনল। ভাঁটার নদী। জল নামতে নামতে বেশ কিছুটা কাদার লেই জমিয়েছে তীরে। এই ভাঁটায় নদী আরো শুকিয়ে গেলেও লোকটাকে যদি পাওয়া না যায় তা হলে আর আশা নেই।

মকবুল ভেড়ির ওপরই বসে পড়ে। ঈশান আট দশ জন লোক নিয়ে ঘোঁগ সারাইয়ের জন্য এগোতে থাকে। কাদায় এত-ক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝছিল তারাও এক এক করে ভেড়ির ওপর উঠে এসে বসে পড়ে।

আর ওদিকে গৌরীকে নিয়ে রজনী ততক্ষণে কাছারি ঘরে ঢুকে পড়েছে।

—এই মেয়ে!

গৌরী তাকাল।

—চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে নাও। মিছিমিছি কেঁদে লাভ নেই। এখানে বসে বিশ্রাম কর। তারপর দেখি কি করা যায়।

গৌরী কাছারি ঘরের মেঝেতেই বসে পড়ে। বুকের ভেতর পুঞ্জ পুঞ্জ কান্না। কোন্ অপরাধে এত বড় শাস্তি হল ওর। লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি সেদিন বাঁধ ভেঙে রেখেছিল। লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি আজও ভেড়ি ভাঙবার জন্য ঐ জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল। অসম্ভব, বিশ্বাস করতে পারে না গৌরী। লক্ষ্মণদাকে যতটুকু ও চেনে এ কাজ ও করতেই পারে না। তবে কি ঈশানই মিছিমিছি ওর নামে এত সব দোষ চাপিয়ে এখন সাধু সাজতে চাইছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গৌরী। সেদিন রাতে অমন করে ওকে কাটারি তুলে ভয় না দেখালেও হত। লক্ষ্মণদা কি সেই রাগেই লোকগুলির ওপর প্রতিশোধ তুলতে গিয়েছিল।

—লক্ষ্মণদা গো—আবার ডুকরে উঠল গৌরী।

রজনী খাটে বসে ঠায় তাকিয়ে ছিল গৌরীর দিকে। আবার একটা হুমকি ছাড়ল, কি হলা যা বললাম কানে গেল না। চোখে মুখে জল দিয়ে এলে না?

(চলবে)

ক্যালিফোর্নিয়া-মলয়

একটি বিভ্রমণ কাহিনী

নবনীতা দেব সেন

আর এলিজাবেথ করুণ গলায় বললো —'মাথামুণ্ডু কোনো কিছু কি আর খেয়াল থাকছে কারুর? কী বলতে যে-কী বলছে লোকে, কারুরই মাথার ঠিক নেই এখন। তুমি যেন কিছু মনে করো না অমর্ত্য!'

আমি গ্লাস ভরে তুষার নিয়ে এসে দেখি, আমার তুষারের খরিদ্দার অনেক। এলিজাবেথ, রজার, মলয়কুমারী—সবাই এক এক খাবলা বরফ চাখলেন। আমি বসে রইলুম—কখন তুষার গলবে!.... যদিও বাসের তাপযন্ত্র চলছিলো, তুষারের তরল হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। শেষে ঐ অবস্থাতেই তাকে গলাধঃকরণ করতে হলো, তেষ্টায় তখন তালু অবধি খাঁ খাঁ করছে। বাসের ভেতরটায় শুকনো গরম, জমাট ধোঁয়া, ভাপসা ঘাম, কোণের ছোট্ট কলঘর থেকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ আসছে। একটি শিশু নিম্নস্বরে গুনগুনিয়ে কাঁদছে। মায়েরা মাঝে মাঝে বাচ্চাদের ধমকে উঠছেন কড়া-গলায়।

আরো কতক্ষণ বাসে বসে থাকতে হবে?—

পথ কি সাফ হবে না?—

—গাড়ি ঘোরাও, চলো বিনোয় ফিরে যাই।'

—ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও। ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও না কেন?

নানা কণ্ঠ শোনা যেতে লাগলো। ড্রাইভার বললেন—'আমরা কি সখ করে পথের মধ্যে বসে আছি? একটি বাসের রিভার্স-গীয়ার নষ্ট হয়ে গেছে। সে-গাড়ি ঘুরবে না। ওদের ফেলে কি ফিরে যেতে পারি?'

একটি একটি করে উঠে দাঁড়ালো সব ক'জন যুবক যাত্রী। দস্তানা পরলো, টুপি আঁটলো। তারপরে কোনো কথা না, বলে প্রত্যেকে নেমে গেলো বাস থেকে। আমার কর্তাটি শুদ্ধু। অতঃপর শুরু হোলো এদের গাড়ি ঠেলার পর্ব। হাঁটু অবধি বরফে গুঁড়ে এরা অথর্ব বাসটির গায়ে ঠেলা মারে —বাস দশ ইঞ্চি এগিয়ে দেড় ফুট পিছিয়ে আসে পিছলে। অম্নি দুড়দাড় করে দুদিকে ছুটে পালায় ছেলেগুলো। আবার জড়ো হয়। আবার ঠেলা লাগায়।....ক্রমশঃ, প্রত্যেকের মাথায় ইঞ্চি-দুই পুরু হয়ে বরফ জমে উঠলো। পোশাক শাদা হয়ে গেলো। অমর্ত্য ফিরে এসে বললেন—'অসম্ভব। ও নড়ানো যাবে না। হাত জমে বরফ হয়ে গেছে আমাদের!'—অমর্ত্যকে প্রাণ থাকতে টুপি

হার্ভে'র ওয়াগন হুইল হোটেল
লেক টাহো—নেভেদা

পরানো সম্ভব নয়। ফলে, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া শাদা বরফ। চশমার ফ্রেমেও পুরু বরফ জমে উঠেছে। ঝুলি থেকে কাগজের তোয়ালে বার করে দিলুম, মাথা মুছতে, চশমা মুছতে। মোটা চামড়ার দস্তানা থেকে আঙুলগুলো যখন বেরুলো, তাদের সেই কুঞ্চিত শাদা মূর্তি চেনা শক্ত। একে একে সব ছেলেরাই ফিরলো। সবাই ক্লান্ত। আরো সিগারেট। আরো হতাশা। আরো ধোঁয়া। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মন আর মেজাজের রং পাল্টে চলেছে ঘণ্টাগুলোর সঙ্গে। ট্রেনে প্রথম যখন এই পথ হারানোর পালা শুরু হোলো, তখন প্রত্যেকের মনের যে-চেহারাটি প্রথম জেগে উঠেছিলো, তার সঙ্গে এখনকার চেহারাটির কোনো মিল নেই। যখন লাইন বেঁধে সবাই খাবার ঘরে গেছি,—স্বেচ্ছায় অল্পবয়সীরা বৃদ্ধদের এগিয়ে দিয়েছেন, বৃদ্ধরা দিয়েছেন শিশুদের এগিয়ে। যখন তরুণরা খেতে বসেছেন, তখন সবচেয়ে উঁচু খাদ্যটুকু অবশিষ্ট থেকেছে, তবু কারুরই ভুরু কুঁচকে ওঠেনি।

'অনুষ্ঠানে'র বেড়া ডিঙিয়ে কোনো এক সময়ে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছিলুম। যে মাতাল পুরুষটি প্রথম রাত্রেই পানশালার মেঝেয় আছড়ে পড়ে' এক ট্রেন মানুষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন,—তিনিই যখন 'কেডী' এলে পর এক পেয়ালা কফি এনে দিতে অনুরোধ করলেন, তখন তাঁরই জন্যে সহযাত্রীরা পরমরতে আটটি কামরা পেরিয়ে তিন পেয়ালা গরম কফি বয়ে এনে দিয়েছিলেন। যে নিগ্রো ভদ্রলোক দুটি ধামাল শিশু সামলাতে সামলাতে একলা চলেছেন, তাঁকে খাওয়ার ঘরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে, মধ্য পশ্চিমের গোঁড়া চাষীগিন্নী নিজেই এগিয়ে গিয়ে দুরন্ত বাচ্চা দুটিকে রাখতে চেয়েছেন। ভোরবেলায়, ঠাণ্ডায়, অন্ধকারে যখন অন্নজল ছিলো না, যাত্রীরা সকলেই তখন নিজেদের একটি দুটি চকোলেট বা আপেল সাগ্রহে ভাগ করে নিয়েছেন পাশের প্রতিবেশীর সঙ্গে। এখন কোথায় গেলো সেই দরদশীল মুখগুলো?—আমরা সেই পরম সামাজিক প্রাণীগুলিই তো এই বাসের গরমে বসে বসে ভয়ানক সব আত্মকেন্দ্রিকতার কৌশল দেখাচ্ছি!

একটি মহিলা এসে মলয়কন্যাকে বললেন: 'বাসের পিছনদিকে ভীষণ গ্যাস হয়েছে, আমার বাচ্চা দুটোর শরীর খারাপ করছে, একটা জানলা খুলতে পারি কি?'

মলয়কন্যার জবাব এলো: 'আমাকে বারবার বিরক্ত করবেন না। আমি এখন অফ-ডিউটি, মনে রাখবেন।'

এক বৃদ্ধ এসে প্রশ্ন করলেন: 'আর কতোক্ষণ আন্দাজ আমাদের এইখানে বসে থাকতে হবে? অন্যরকম কোনো ব্যবস্থা কী—'

ঝামটা দিয়ে মলয়কুমারী জানালেন: 'দয়া করে নিজেই একটু বুদ্ধি খরচ করে দেখলে পারেন না? আমার কাছে কোনো অলৌকিক সমাধান নেই।'

অথচ, এই মেয়েটিই তো ট্রেনে হাসিমুখে ছুটোছুটি করে একাগ্রচিত্তে একশো সাতাশটা মনের সাতশো রকম আবদারের প্রশ্রয় দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? —সোনালী চুল ঝামরে পড়ছিলো কপালে, বিরক্তির রেখামাত্র ছিলো না সেই ব্যস্ত, ব্যাকুল মুখে প্রায় অমানুষিক অতিথিবাৎসল্য দেখিয়েছেন ইনিই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় যেন ধৈর্যের সেই ক্ষীণ পাড়টুকু হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। সহসা অতল শূন্যতায় সাঁতরে বেড়াতে শুরু করেছি আমরা প্রত্যেকে, একদম একলা।

বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে উত্তেজনায় সিটিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। বড়োদের মধ্যে যে স্নায়ুর যুদ্ধ বেঁধে গেছে, তার চাপটা বোধহয় ওদেরই সইতে হচ্ছে সব-থেকে বেশী। কেউ আর কাঁদছে না। এখন ওরা যেন ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণের জন্য লোম খাড়া করে পল গুনছে।

এখন আর কেউ বাইরে নেই। বাইরে ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। আমরা যে-বাস আসনে বন্দী। যেন সবাই কোনো কয়লাখাদে চাপা পড়ে যুগযুগান্ত বসে আছি। কোনোদিন রক্ষাকারীদল আসবে মুক্তির পরওয়ানা নিয়ে, উপরে উঠে এসে দেখবো ভুবন আবার পাল্টে গেছে।

টোয়েন্টি ওয়ান বা ব্ল্যাক জ্যাক জুয়া

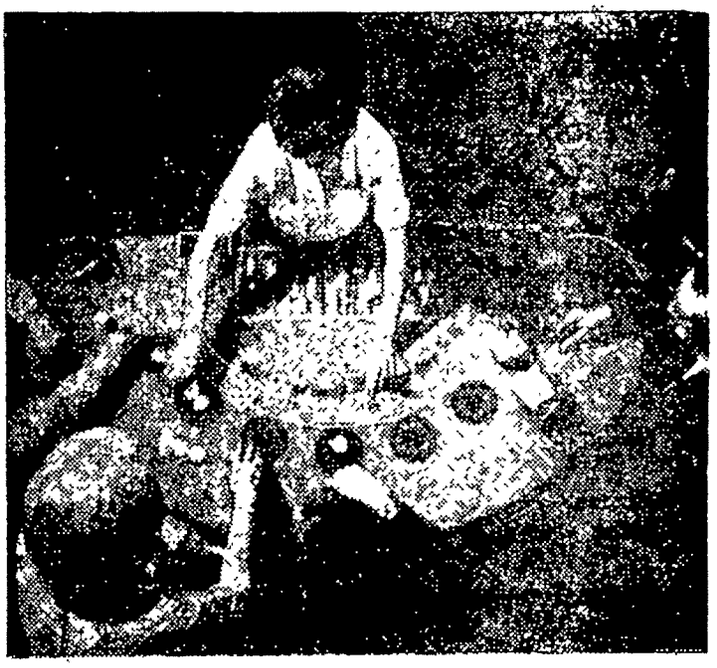

তরুণ ড্রাইভার হুইলে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে আছেন। কাঁচা মুখখানা ভাব-লেশহীন। বন্ধ কাচের বাইরে ঝড়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন অনেকদূরে ফিসফিস উঠছে। ভিতরের নৈঃশব্দ্য ভীরু রুগীর থার্মোমিটারের পারার মতো তীব্রবেগে বেড়ে উঠছে।

এইবারে তিনজন মাঝবয়সী, বলিষ্ঠ পুরুষ বাঘের মতো শব্দহীন পা ফেলে ড্রাইভারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একজন চাপাতের কণ্ঠে বললেন: কি পেয়েছো তুমি?—যাবে, —না, যাবে না?' অন্য দুজন শুধু চুপ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ড্রাইভারের মুখেচোখে একটা অবাক আতঙ্ক এক নিমেষেই ফুটে উঠলো। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন—'না, ও-গাড়ির যাত্রীদের ফেলে রেখে আমরা যেতে পারবো না। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

—ব্যবস্থাটা এই মুহূর্তেই করতে হবে,—নইলে—

ড্রাইভারও রুখে উঠলেন—'আপনারা কি নিজেদের আরাম ছেড়ে দিতে রাজী আছেন ও-বাসের মেয়েদের জন্যে? তাহলে ওদের এই গাড়িতেই তুলে নিয়ে ফিরতে পারি। আপনারা দাঁড়িয়ে যেতে রাজী আছেন?'

তীব্র নৈঃশব্দ্য জাগিয়ে ভয়াবহ রকম স্তব্ধ রইলেন তিন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে কদিন ধরেই প্রত্যেকের স্নায়ুর উপরে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, এবারে তা চরম-সীমায় উপনীত হয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো,—উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে আমি চোখ বুজে ফেললুম। এমন সময়ে সেই গাড়ি-ঠেলা ছেলেগুলোর একজন ভরাগলায় বলে উঠলো—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবো আমরা পুরুষরা সকলে।' সঙ্গে সঙ্গে সেই তিন মূর্তির একজন কড়া-সুরে ধমকে উঠলেন—'যা করবার চটপট করো বলছি,—নইলে—'

কিন্তু এবারে তাঁর হুমকি শুনে আমার ভয় করলো না। সেই চরম মুহূর্তটি পেরিয়ে গেছে। পারের তলায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে গেছি আমরা আবার। গুন-গুনিয়ে কথা শুরু হোলো যাত্রীদের মধ্যে। ড্রাইভার নেমে চলে গেলেন।

তার পরেই কলরোল সহকারে দলে দলে মহিলা পুরুষ ও শিশু আমাদের বাস আক্রমণ করলেন। পুরুষেরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন, মেয়েরা ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়তে লাগলেন। দু একটি বৃদ্ধ ছাড়া সব ছেলেরাই দাঁড়িয়েছেন,—তবু কিন্তু সব নবাগতাদের বসার জায়গা হয় নি। বয়স্কাদের বসতে দিয়ে তরুণীরা তখনো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চেয়ে দেখি, সেই ভিয়েনাযাত্রিণী সৈনিকটি ও তাঁর বান্ধবী দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলা সবদিক দিয়েই জয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সজ্জায়, তাঁর আচরণে তরুণীর অধিক তারুণ্য। এ পরীক্ষাতেও তিনি হার মানেন নি। আমার পাশের মাঝবয়সী মহিলাটি বসে পড়লেন, অথচ তাঁর চেয়ে স্পষ্টতঃ বয়স্কাসী হয়েও, দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন সিতকুন্তলা নায়িকাটি। মনে হোলো যেন গালের, ঠোঁটের জৌলুস একটু নষ্ট হয়েছে ধকলে, নকল পল্লবের নীচে আসল ক্লান্তি। সবুজ ছায়া আরো উৎকট হয়ে উঠেছে নয়ন-সীমায়। কিন্তু সৈনিকটির অনাথ বাহু তখনো তাঁর কটির আশ্রয় ছাড়ে নি।

এমন সময়ে পিছন থেকে সেই বাঙ্ময়ী বৃদ্ধা (যিনি অমর্ত্যকে আগেই অভিভাষিত করেছেন) তীব্র আহ্বান জানালেন:—'ওই যে সামনের বাড়িটি, ওই যে সামনের শাদা চুল বুড়ি,—আপনি এখানে এসে বসুন,—আমার পাশে জায়গা রয়েছে।'

রজত শিখরিনী চমকে উঠলেন। কিন্তু নড়লেন না। আমরা সহসা চঞ্চল হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলুম, সকলেই বিব্রতভাবে দিগ্বিদিকে দৃষ্টি নিবেশ করতে চেষ্টা করলুম, যাতে কেউই ওঁর দিকে না তাকিয়ে ফেলি।

বৃদ্ধা নাছোড়।—'ওই যে, ঐ সৈনিকটির ঠিক সামনেই যে বৃদ্ধা মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন,—আপনাকেই তো বলছি—এই যে এখানে জায়গা রয়েছে।' তারপরেই দণ্ডায়মান পুরুষদের প্রতি হুংকার—'সরুন, সরুন বলছি আপনারা। জায়গা ছেড়ে দিন, তবে তো উনি আসতে পারবেন। এই যে,—চলে আসুন এইবার।' এইবারে কোনোদিকে না তাকিয়ে ক্লান্ত পা ফেলে সেই শূন্য আসনে গিয়ে বসলেন তিনি, সৈনিকের বাহুর উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে। হাস্য ফিরে চললো রিনোষ দিকে।

আমার মনে মনে ওই মহিলাটির প্রতি সহানুভূতি কখনোই ছিলো বলে ভাবি নি। কিন্তু বিদ্রোহিনীর এই স্পষ্ট পরাজয় স্বীকার আমার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেলো। —না, এই মায়া বড় বেশী করে ধরিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। শেষ পর্যন্ত জানা গেল বিনোর পথও তুষারে বন্ধ হয়ে গেছে। আর সেখানে ফেরা যাবে না। একমাত্র ভরসা এখন লেক টাহো।

কোনো রকমে সেখানে পৌঁছলুম ভোর তিনটেয়। ভাগ্যিস আমাদের একটি ঝকঝকে এগারোতলা হোটেলে নামিয়ে দিলেন ও হোটেল-কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একশো সাতাশীজন উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে রাজী করালেন।

যাত্রীদের মধ্যে আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটি আধো-আতঙ্ক উপস্থিত হোলো—হোটেল খরচা রেল কোম্পানীই দেবেন তো? যাত্রীদের মধ্যে শতকরা আশীজনেরই ক্ষমতার বাইরে এই বিলাসী Harvey's wagon Wheel Hotel এ রাত্রিবাস। না, খরচ আমাদের নয়। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যে-যার ঘরে যাই। ঘর। স্নানঘর। বিছানা। এ সবই এখন মহার্ঘ, দুষ্প্রাপ্য। ভোর চারটে নাগাদ উষ্ণ ধারায় স্নান সেরে, কলের ফুটন্ত জলে টি-ব্যাগ ভিজিয়ে দুধ চিনি বিহীন চা বানিয়ে খেয়ে,—আমরা নরম শাদা বিছানায় লুটিয়ে পড়লুম—চার দিন বাদে প্রথম। সকালে উঠে চিরকালীন নাটকীয় প্রধান অচেতন মানুষ চেতনা পেয়ে যা বলে, সেই—'আমি কোথায়?' বলতে ইচ্ছে করলো। এলাহি ব্যাপার। দেখি, ঘরে গোলাপী টেলিফোন, সোনালী টেলিভিশন সেট, বোতাম টিপলেই দেওয়াল থেকে কিন্নরীদের গান বেরোয়, ঘরের লাগোয়া গোলাপী পাথরের গোল বারান্দা, আর তার লাগোয়া চিত্রার্পিত লেক টাহো। এত বিলাস-বাসনও কপালে ছিল!

ঘরে বিস্তৃত ঘন নীল হ্রদ,—ঠিক বাল্যপাঠের সেই সমুদ্র বা সামাদ্র পদবী-ধারী হ্রদগুলির মতো বিপুল, মনোহর, শুভ্রাভরণ। তাকে বেষ্টন করে আছে ঢেউ খেলানো পাহাড়—আপাদমস্তক তাদের অভ্রভেদ শাদা। খাস বাঙ্গালীর মনে একবারে কৃষ্ণ বলরামের তুলনাটা উঁকি না দিয়ে পারে না। ঝকঝকে পেতল-রঙের রোদ উঠেছে আজ—চতুর্দিকে তুষার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। আজ সাতই জানুয়ারি ১৯৬৫। দিনক্ষণের হিসেব আবার ফিরে আসছে মাথার মধ্যে।

পাঁচই দুপুরে যাদের কিনা বাড়ি ফিরে অ্যাপিস-উপকূলে করার কথা—তাঁরা সবাই সাতই বেলা দশটায় উঠে টাহো-হ্রদের স্বপ্নময় তীরে বসে বাড়ন্তীর খানাপিনা করতে লাগলেন। একেই বলে রূপান্তর। এরপরিচ্ছন্ন [illegible] দেখতে আসেন এই টাহো হ্রদে। হ্রদে চলে Water-skiing, পাহাড়ে চলে তুষার-স্কী-ইরিং আর হোটেলে চলে জুয়া খেলা।

আজ সকালে সবাই শান্ত, সুস্থ, আত্মস্থ। তুষার ঝড় থেমে গিয়েছে। যদিও রাস্তায় সারি বাঁধা গাড়িগুলি ছোটো ছোটো শৈলশ্রেণীর মতো তুষারে সম্পূর্ণ ঢেকে আছে। রং-চঙে মোটেলগুলির (মোটর + হোটেল=মোটেল) ছাদে প্রায় ৩।৪ ফুট উঁচু তুষার। তুষার ঝড় তো একদিন দুদিন নয়,—দুটি সপ্তাহ ধরে চলেছে এখানে। একটানা।

এবারে যাত্রীরা একে একে জুয়ার যন্ত্র টিপতে শুরু করে দিলেন। আমি আর অমর্ত্য একটু খেলে দেখলুম যে আমার কপাল এই লাইনে অতিশয় ভালো। পাঁচ সেন্ট ফেলে ফেলে পঞ্চাশ সেন্ট করে পেতে লাগলুম। কিন্তু শেষ অবধি কলের টাকা কলকেই সঁপে দিয়ে, ভয়ংকর ছেলে গিয়ে লেজ গুটিয়ে দুড়দাড় করে পালিয়ে এলুম দুজনে।

সেবার দক্ষিণ ফ্রান্সে মন্টি-কার্লোতে গিয়ে রাজসিক সব কাণ্ড-কারখানা দেখে ঘাবড়ে গেলেও, আমি যে-তীর্থের যা-কৃত্য, তা পালন করতে ছাড়ি নি। রীতিমতো একটি গোটা ফরাসী ফ্রাঙ্ক (এক টাকা) পুরো দিয়ে রুলেতের বাজি ধরে, সে বাজি হেরে এসেছি। এখন আমি ম্যাটিক-ফেল ছাত্রীর মত, মন্টি-কার্লোয় হেরে-যাওয়া একজন জুয়াড়ী। তীর্থে গেলে বিগ্রহ দর্শন করা চাই। সেখানকার যা। জুয়ার আড্ডায় যাবো, অথচ জুয়া খেলবো না? তাও কি হয়।

এক সময়ে লেক দেখা ফুরোয়। জুয়া খেলা ফুরোয়। যাত্রীদের তুলে নিয়ে বাস রওনা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের নিবেদনের মাস্টারমশাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে লেকচারে পৌঁছুতে পারবেন না। বেচারীর মন খুব খারাপ, ছাত্রদের পরীক্ষা সামনেই। ওদিকে অমর্ত্য পাবলিক লেকচারটি যে ভেস্তে গেল, সে জন্যে অমর্ত্যর তেমন দুঃখু দেখলুম না। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক স্কিটভস্কি, এই তরুণ অধ্যাপকের মতিগতি বিষয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন বলে মনে হোলো। ফোনের পরে ফোন আসছে একেকটি জুয়ার আড্ডা থেকে। প্রথম বারে রিনো থেকে। দ্বিতীয় বার লেক টাহো। এবার স্কিটভস্কি অমর্ত্যকে বললেন—'তোমার নেক্সট কলটা আমা করছি লাস্ ভেগাস থেকে পাবো। ভালো-ভাবেই স্ট্যান্ডেড করে ছাড়বে তোমাদের রেল কোম্পানী।' রিনো টাহো এবং লাস ভেগাস নেভাদার জুয়ার ব্যবসার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। বরফঝড়ে আটকে যাবি তো যা, একের পরে এক জুয়ার আড্ডায় আশ্রয় নিতে হবে? এও কি বিশ্বাস্য? অমর্ত্য এই বিপাকে পড়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিত এবং যার-পরনাই চঞ্চলহৃদয় (ছাত্রদের জন্য এত ভালোবাসা কোন্ বউয়ের ভালো লাগে?) ক্লাস করতে না পেরে। আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিলো। কী রোমাঞ্চ, কী উত্তেজনা। এমন এ্যাডভেঞ্চার কি চট করে মানুষের জীবনে ঘটে? কলকাতার ছাপোষা গেরস্থ মেয়ে, এমনি বরফ ঝড়ে আচমকা আটকা পড়বো জীবনে কবার? আমার তো চাকরি পোস্ট-ওক্টরাল রিসার্চের, দু চার দিন দেরিতে ফিরলে কোনোই ক্ষতি নেই। সত্যি বলতে কি এই দৈব দুর্বিপাকে পড়ে আমি

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

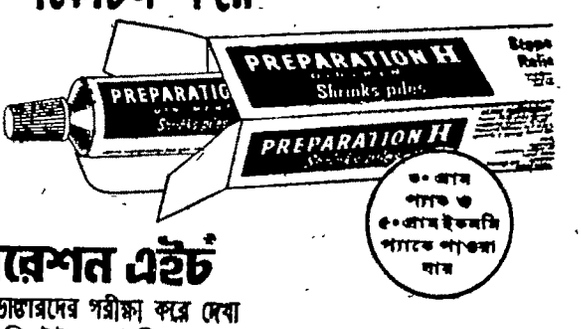

প্রেপারেশন এইচ

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-88 পোঃ অঃ বক্স ১০১৩৩, বম্বে ৪০০০০১

*Regd. User of TM. Geoffrey Manners & Co Ltd.

177-PH-82 BEN

রীতিমতো আহ্লাদিত— প্রাণের ভয় তো নেই! বিশেষ করে এখন জগৎ ভর্তি পেতল-রঙা রোদ্দুরে। পথ তো পাওয়া গেছে। দেরি হয়, হোক না?

বাস থেমে পড়লো লেক টাহো পেরিয়েই। যেখানে 'ল্যাকার্ড' লাগানো আছে : 'ভূস্বর্গ টাহো হ্রদ' (Lake Tahoe-Paradise) একে একে সকলেই বরফের মধ্যে নেমে পড়লুম। গাড়ির সুদীর্ঘ সারি জড়ো হয়েছে পথে।

Echo Summit এখনও বরফবন্দী, একমুখো। এখন শুধু ওদিকের গাড়িগুলি ছাড়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে এদিকের গাড়িদের যেতে দেওয়া হবে। দেখতে দেখতে জমে উঠলো বরফের গোলা লোফালুফির খেলা। ছেলে বুড়ো প্রত্যেকেই মেতে উঠলেন। আর, আজন্ম অ-সাবধানী আমি যথারীতি বরফে পা পিছলে একটি 'মহতী' আছাড় খেলুম—তাও আবার এক মার্কিনী ভদ্রলোকের চলমান মুভি-ক্যামেরার ঠিক সামনে। এই নাটকীয় দৃশ্য তুলতে পারার আশাতীত সৌভাগ্যে ভদ্র-লোক রীতিমত সুখী হলেন মনে হোলো, যদিও মুখে প্রচুর সমবেদনা জানানোর চেষ্টা করলেন। শাদা বরফে লাল শাড়ি পরা বাদামী মেয়ের পদস্খলনের বর্ণবহুল দৃশ্য তো রোজ ঘটছে না তাঁর ক্যামেরার সামনে?

গাড়ি আবার চললো। একো সামিট্ পেরিয়ে আমরা এইবার নামতে শুরু করলুম। ক্রমশ বরফের বোঝা হাল্কা হতে হতে লাল পাথরের গা দেখা যেতে শুরু করলো। 'ফেশ্ পন্ড' নামে এক জায়গায় থেমে আমরা স্যান্ডুইচ লাঞ্চ খেয়ে নিলুম। ক্রমশ গাছের পাতা দেখা গেলো, তারপরে আস্তে আস্তে রাঙা মাটির রাস্তা আর ঘাস জমি এসে পড়লো। তারপর শস্য ক্ষেত। পাহাড় কখন পিছনে রয়ে গেছে। কী উজ্জ্বলই লাগলো সবুজ রংটিকে—কী যে অতুলনীয় মনে হোলো মাটির লাল। কদিন ধরে কেবল শাদা দেখে দেখে, মনেই ছিলো না যেন, প্রকৃতিতে অন্য রংও আছে।

সন্ধ্যাবেলায়, স্যাকরামেন্টোতে এসে সারথি আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় চাইলেন। নতুন চালক আসবেন এবারে। তিনি নেমে যাবার পরেই, সেই জাঁদরেল বৃদ্ধা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'আমরা প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে ওই ছোকরাকে কিছু

জিজ্ঞাসা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

দশ টাকা

গ্রন্থমেলা / এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

জ্যাকপট জুয়ার যন্ত্র

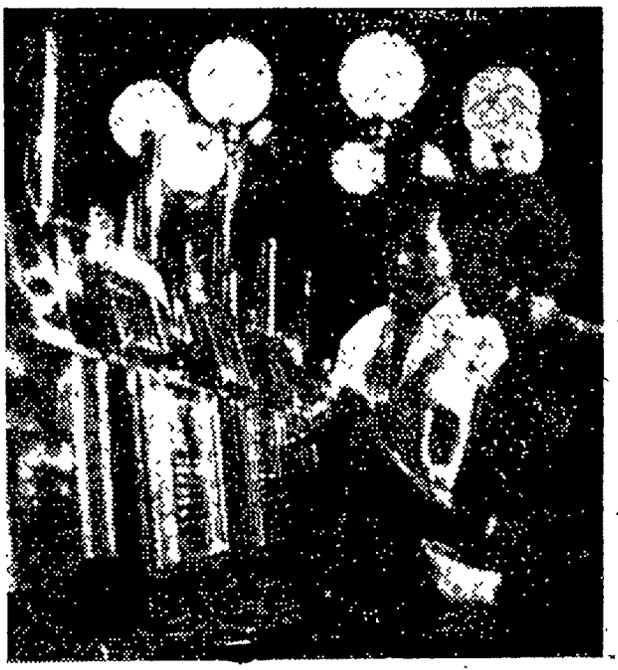

বখশিশ দিতে চাই। ছোকরা বড়ো ভালো গাড়ি চালিয়েছে অতো বরফঝড়ের মধ্যে।' সঙ্গে সঙ্গেই মত দিলেন সবাই একবাক্যে। ব্যারী চাঁদা তুললো,—তারপরে ড্রাইভারকে দক্ষিণা দিতে গেলো।

ড্রাইভার ফিরে এলেন। অভিভূত স্বরে বারংবার শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন আমাদের।

স্যাকরামেন্টোর পথ ঝক্‌ঝক্ করছে বৈদ্যুতিক আলোর। —এখানে দিব্যি রোদ্দুর চলেছে তিন দিন ধরে—জানালেন আমাদের নতুন চালকটি। এবারে এখান থেকে যেতে হবে বার্কলি শহরে।

রাত্রিবেলায় ওকল্যান্ডের বাস স্টেশনে এসে নামলুম। স্কটি—লক্ষ্মী সোনা,—বিদায়, আবার দেখা হবে এলিজাবেথ,—নিশ্চয়ই ফোন কোরো, ক্যাথি।

—'কোনোদিন ভুলবো না—দেখা হবে বৈকি!'

—'নিশ্চয় দেখা হবে। শুভ রাত্রি।'

মস্ত বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছিলো। নেমেই দেখি আমাদের প্রতি-বেশী বন্ধু রন্ ও কারেন্ বিয়ারস্টেড্ (Rou, Karen Biersted) গাড়ি নিয়ে হাজির। সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় এই যতটুকু অপূর্ব আরামপ্রদ লাগল। —'আরে! তোমরা কী করে জানলে? অদিনে, অসময়ে, এমন যে-জায়গায় এসে আমরা নামলুম!'

ওরা হুড়মুড়িয়ে হৈ চৈ করে বলতে লাগলো, তিন দিন ধরে ওরা মহাচিন্তিত, কেবলই রেল কোম্পানীকে ফোন করেছে,—কী হোলো? আজ খবরের কাগজে অমতোর পাবলিক লেকচারের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, অথচ সে 'মানুষটা' উবে গেলো কোথায়? শেষ পর্যন্ত—রেলওয়ে থেকে খবর জোগাড় করে আমাদের নিতে এসেছে। —আমরা নাকি আজ তিন দিন ধরেই জোর খবর পর্যায়ে রেডিওতে ও সংবাদপত্রে খ্যাতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে বসে আছি। সব কাটিং রেখে দিয়েছে ওরা। সত্যি মিথ্যে দুইয়ে মিলিয়ে ক্যালি-ফোর্নিয়ার গতিবিধির নাড়ী-নক্ষত্র কাগজে দিয়েছে রোজ। বাড়িতে এসে ডিম ভাজা আর খিচুড়ি রান্না করলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম আমরা সেই সব কাটিংস, আর চিঠিপত্রের গোছা নিয়ে। কতো চিঠিই যে এসে বসে আছে! এদিকে ফোন আসতে লাগলো একের পরে এক। বন্ধুরা সকলেই ক্যালিফর্নিয়া ফোর্নিয়ার দুর্বিপাকের খবরে উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ যেমন বিনা নোটিসেই ঢুকে পড়েছিলো—তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেছে জীবন থেকে পালখ নদীর প্রলয়ঙ্কর শোভা, মত্ত সিয়েরার তুষার-তান্ডব, আর টাহোর চিকন কালো জল। আমাদের সেই অস্নাত অতন্দ্র বিধ্বস্ত মূর্তি পাল্টে দিব্যি সংসারী চেহারা হয়েছে এখন। আয়নাতে তাকালে আর ধরতে পারবো না ধূলি লাগানো সেই উড়নচণ্ডে দিন-রাত্রির ছায়া।

কেবল ছবির এ্যালবামে এখনও একটা বিরাট রসিকতা হয়ে তোলা রয়েছে ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিকের উপহার দেওয়া মস্ত রঙিন মানচিত্র—ক্যালিফর্নিয়া-ফোর্নিয়ের দীর্ঘ যাত্রাপথটি তাতে লাল রঙে দাগানো। মানচিত্রের ওপরে মোটা মোটা কালো হরফে লেখা বিজ্ঞাপন :

Take time to live a little...
Travel by train.
See the wonders of America... at eye-level. Avoid highway hazards by dependable "All-weather" train travel in relaxed comfort!

বর্তমান শতাব্দীর
এক মহীরুহের আত্মজীবনী
বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা

জীবন-কথা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঝড়তুলনে

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আই, সি, এস'
অমিতাভ চৌধুরীর 'কবি ও সন্ন্যাসী'

শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৪

গল্পের মত গল্পের

লীলা মজুমদারের 'মধ্যমণি' ॥ জহুরী সওদাগরের 'আলি আকবর, স্বদেশে এবং বিদেশে' ॥ অমিতাভ দাশগুপ্তের 'নও শুধু ছবি' ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে।

বিষয়কর চারটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ/কবিতা

পিণ্ডারী দেখে এলাম
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট নিয়ে অজয় বসুর 'বাঙালী হৃদয়ে সোনালী স্মৃতি'

অভিনেত্রীকে নিয়ে
মধুসূদন মজুমদারের 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'

দুটি বড় গল্প ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

ক্রমির বড় গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে যুগান্তর পূজাসংখ্যা

দাম/১০ টাকা
সডাক/১২ টাকা

গল্পে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র/কল্পনা বসু মিশ্র
সমরেশ মজুমদার/শৈবাল মিত্র
শচীন দাশ এবং অনেকে

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র/অরুণ মিত্র
দিলীপ দাশ/মনীশ ঘটক
অশোক বিজয় রাহা
হরপ্রসাদ মিত্র/মনীন্দ্র রায়
কৃষ্ণ ধর/রাম বসু/পরমানন্দ
সরস্বতী/বিমল চন্দ্র ঘোষ
সুনীলকুমার নন্দী/গৌরাঙ্গ
ভৌমিক/আলোক সরকার/
শ্রীবেন্দু দাশগুপ্ত/পূর্ণেন্দু পত্রী
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/মানস
রায়চৌধুরী/তারাপদ রায়
কাবিকল ইসলাম/সামসুল
হক/আনন্দ বাগচী
দেবারতি মিত্র/পবিত্র
মুখোপাধ্যায়/অমিতাভ
চক্রবর্তী এবং কয়েকজন

স্কেচ

সুনীলমাধব সেন
প্রকাশ কর্মকার/গণেশ পাইন
রবীন মণ্ডল/বিকাশ
ভট্টাচার্য/ধীরাজ চৌধুরী
দিলীপ কুণ্ডু/মানু
রাঠোড়/শুভপ্রসন্ন/দিলীপ
মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙীন আর্টপ্লেট

লীলা মজুমদার পাকদণ্ডী

এই তিনটি মানুষ, প্রথমে উপেন্দ্রকিশোর, তারপর সুকুমার, তারপর সত্যজিৎ, বাংলার শিশু-সাহিত্যের সাবালক-প্রাপ্তির জন্য যা করেছেন, সেটা অবধান-যোগ্য। ছোটদের জন্য বই লিখলেই শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু তথ্যমূলক পাঠ্য-পুস্তক লিখে গেলে তো নয়ই। ছোটদের বিষয় গল্প লিখলেও সব সময় শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো গভীরে নামে। এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। তিনি জ্যাঠামশায়ের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, দুজনার একই ধরনের আদর্শ ছিল। বড়দাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মনে আছে বড়দার শেষ অসুখের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?' বড়দা গান শুনতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি সেখানে ছিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা কিছু লিখেছেন, চমৎকার হলেও আমি তার মধ্যে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা দেখতে পাই। যেখানে বড়দের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হচ্ছে, সেখানেও বিদ্রোহটা মায়ের কাছে প্রকাশ করা বাদেই তার বেপরোয়া ভাবটা নিছক ছেলেমানুষীতে দাঁড়ায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ খোকামি সইতে পারতেন না। ছোটদের জন্য তাঁর সব লেখাতেই দুটি জিনিস লক্ষ্য করি। তিনি চাইতেন ছোটরা বিশ্ব-প্রকৃতির সব রস উপভোগ করুক এবং বলিষ্ঠভাবে বড় হতে শিখুক। এর মধ্যেই গুরুগিরির হাওয়া আছে। শিশু-সাহিত্যে গুরুগিরির স্থান নেই, এমন কি গুরুরও স্থান নেই। অথচ বিশ্ব-প্রকৃতির সব রস উপভোগ করে বড় হতে পারার কথা আছে। যেমন করে সকলের অগোচরে ছোট ছেলের শরীরটিও বাড়ে।

উপেন্দ্রকিশোরের লেখার মধ্যে এই সহজ কথাটা বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন যে চমৎকার সৃষ্টি, একে ছোটদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এমন যে উপভোগ্য জীবন, এর মজা বুঝতে পারলে আপনা থেকেই একে শ্রদ্ধা করা যাবে। উপেন্দ্রকিশোরের আগে পর্যন্ত বাংলায় সামান্য যে শিশু-সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে শিক্ষা দেবার দিকটাতেই গুরুত্ব দেওয়া হত। আর তার প্রায় সবই ইংরিজি বই থেকে নেওয়া হত। তাও অনেক সময় নাম-ধাম বদলে, মূল বইটার রস সব নষ্ট করে দিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর রসকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন। কিন্তু তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে খুব অল্পই মৌলিক গল্প। সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর গল্প-সল্প ছাড়া। সেগুলি একেবারে মৌলিক এবং প্রাণ-রসে ভরপুর। ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতি-কথা, তথ্যমূলক রচনা সবই নিজে তৈরি করে লিখতেন। গল্পের বেলা কেন লিখতেন না জানি না। যে কোন দেশের বলিষ্ঠ সাহিত্য মৌলিক হয়। ছোটদের জন্য রচনাও।

সেই মৌলিকত্ব সুকুমারের মধ্যে অপূর্ব খেয়াল-রসে ভরতি হয়ে উপচে পড়ত। বড়দা প্রায় সব গল্প নিজে বানিয়ে লিখতেন। কদাচিৎ দু-তিনটি প্রচলিত রসের গল্প লিখেছেন। ঐ সরসতা আর স্বকীয়তা দিয়ে বড়দা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেই বাংলার শিশু-সাহিত্যকে সাবালকত্ব দিয়ে গেছেন। যতদিন লেখকরা অন্যদের বই থেকে ভূরি-ভূরি সামগ্রী ধার করে আনতে থাকেন, ততদিন বুঝতে হবে তাঁদের নিজেদের দেবার মতো কিছু নেই। অর্থাৎ তাঁদের দেশের সাহিত্য তখনো দানা বাঁধেনি। দানা না বাঁধা মানেই রস তখনো কাঁচা, পাংলা পানসে। সুকুমার সেই পাংলা রসে দানা বাঁধিয়ে দিলেন।

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। হাজার উচ্চাশা থাকলেও, ক্ষমতা ছিল কাঁচা। তবে এটুকু বুঝতাম বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্য কিছু করতে হলে, শুধু পুরনো রচনার নির্ঘণ্ট দিলে হবে না, কিছু সৃষ্টির কাজ করতে হবে। তারপর ৫৪ বছর কেটে গেছে, আমাদেরো সন্ধ্যা নেমেছে, তবু দেখছি সৃষ্টির কাজের শেষ নেই। কে একজন চিন্তাশীল মনীষী বলে ছিলেন, 'দুনিয়াতে নতুন চিন্তা বলে কিছু নেই। সব কথাই কোনো না কোনো সময়ে, কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ, একবার না একবার বলে গেছেন।' সেইগুলিই হয়তো আমাদের মূলধন। কিছু অনুবাদ করেছি, কিছু জীবন-কথা ভ্রমণ-কথা সংক্ষেপে ছোটদের জন্য লিখে দিয়েছি। তার কিছুই আমার নিজের বলে প্রকাশ করিনি। মূল্যবান জিনিস যদি পাঠকদের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই তুলে ধরেছি। বড়দের বই যে অনুবাদ করেছি, সেও ঐ একই কারণে, নয়তো নিছক বাস্তব উদ্দেশ্যে। তাও বই পছন্দ না হলে নয়।

সত্যজিৎ আমার চাইতে তেরো বছরের ছোট। কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও বাগ্‌দেবীর তাড়ায় না লিখে পারে না। সব মৌলিক, অভিনব, চমকময়। অতিশয় উত্তেজনাময় কাহিনীর তলায় তলায় সরসতার নদী বয়ে যায়। এমন গল্প এর আগে বাংলায় লেখা হয়নি, যদিও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প ভালো ভালো আছে। এ-সব হল দুঃসাহসিক চিন্তার গল্প। এ-সব গল্পের বৈশিষ্ট্য হল যে, পাঠক-বর্গের যে একটা বৃহৎ অংশের যোগ্য বই বাংলায় বিশেষ লেখা হয় না—অর্থাৎ মোটামুটি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্কদের কথা বলা হচ্ছে—মানিক তাদের অভাব ঘুচিয়ে দিচ্ছে। এবং যোগ্য-ভাবেই দিচ্ছে। যেমনি গল্পের রোমাঞ্চ, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, রুচিও কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। গুরুজন-দের আপত্তিতে কোনো অবকাশ থাকে না। যে-দেশেরই সাহিত্য পরিণতি লাভ করেছে সেখানেই এই ধরনের বই দেখা দিয়েছে। গত কয় বছরের মধ্যে বাংলায় বেশ কটি তথ্যমূলক, কিংবা একেবারে কাল্পনিক দুঃসাহসিক অভিযান ও অভিজ্ঞতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল ছোটদের সাহিত্যের শেষ অধ্যায়। সুখের বিষয় মানিকের ভক্ত লেখকদের একটা বড় দল

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সার্টিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

ক্রমে তৈরি হয়ে উঠছে। তারা যদি সত্যজিতের গল্পের উচ্চ মান রক্ষা করতে পারে, বাংলা কিশোর-সাহিত্যের সুদিন তাহলে এসে গেল।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এইটুকু প্রকাশ করা যে বড়দা উত্তরাধিকার স্বরূপ বাপের কাছ থেকে যে প্রতিভা লাভ করেছিলেন, ৩৬ বছরের জীবনে তাতে এমনি প্রাণ-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন যে আজ পর্যন্ত তার কাজ অদম্য-গতিতে চলেছে। এ বিষয়ে সত্যজিতের অবদান নেহাৎ কম নয়।

তবে মাঝখানে মস্ত একটা মরুভূমি। তখন সেটা তত লক্ষ্য করিনি। নিজে সাবালিকা হবার কাজে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম। ১৯২৩-২৪ সালের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। দেশে তখন স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমে বল পাচ্ছিল। তার মানে নয় শুধু বোমা বারুদ বিস্ফোরণ পিকেটিং ও কারা-বরণ। সে সব তো ছিলই। তা ছাড়াও ভিতরে ভিতরে দেশটাকে যে একটা বড় কিছুর জন্য তৈরি হতে হবে এবং হচ্ছেও, একথা আমি বিশ্বাস করতাম।

কতকগুলো মুসকিলও ছিল। বাবা সরকারী চাকরে। পরীক্ষা দিয়ে নিজ গুণে সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ঢুকে, ক্রমে ক্রমে প্রভিন্‌শিয়াল সার্ভিস থেকে ইম্‌পিরিয়েল সার্ভিসে উন্নত হয়েছিলেন। সেটা তত লজ্জার বিষয় ছিল না—অক্ষমতাতে বাহাদুরি কোথায়? —যতটা ছিল বাবার

ধবধবে ঝকমকে
নিরাপদে ধোলাই
ঘরেই করতে হ'লে
সিফোম চাই!

আরো সাদা আরো উজ্জ্বল ক'রে বাড়ীতে কাচার জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী সিফোম। সবরকম তাপ-উৎপাদনকারী ক্ষতিকর রাসায়নিক মুক্ত সিফোম জামা-কাপড়ের পক্ষে যেমন মোলায়েম তেমন খরচেও লাগে অনেক কম।

সিফোম

কাপড় বাঁচায়—পয়সাও বাঁচায়

র‍্যাপসল ল্যাবরেটরী
১৪৬/৫, লেক গার্ডেন্‌স
কলিকাতা-৭০০ ০৪৫

প্রথমে রায়-সাহেব, পরে রায়-বাহাদুর উপাধি লাভে। আমরা সবাই জানতাম বাবা কোনো দিন কারো খোশামুদি করেননি,- কারো বাড়ি গিয়ে বসে থাকেননি, বরং কখনো যদি বাধ্য হয়ে কোনো সভা বা পার্টিতে যেতে হয়েছে বেজায় বিরক্ত হয়ে, হাঁড়ি মুখ করে গেছেন। উপাধি পেয়েছেন সেরফ্ ভালো কাজ করার জন্য। অবিশ্বাসীরা যাই বলুক, তখনো মাঝে মাঝে যোগ্য ব্যক্তিরা শিরোপা পেত। এখনো পায়। তবে সবাই পায় না। এবং তখনো যেমন, এখনো তেমন অযোগ্যরাও অনেকে পায়। কোনটা যে বেশি খারাপ তা জানি না।

চিরকালের বেস্ট-সেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ক্ল্যাসিক হরার্-এর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষান্তর

ব্রাম স্টোকার

ড্রাকুলা

প্রতি বৃহস্পতিবার বিবিধ ভারতীতে রাত ন'টায় 'ড্রাকুলা' নাটক শুনুন।

চিরায়ত

১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-৭৩

যাইহক উপাধিগুলোর ওপর বাবা হাড়ে চটা ছিলেন। নিজে কখনো ব্যবহার করতেন না, আর কেউ করলে বিরক্ত হতেন। আসলে আমাদের দেশভক্ত বন্ধু-বান্ধবরা ঐ উপাধির কথা জানতে পারেনি। তাইতে আমরা বেঁচে গেছিলাম। কিন্তু বাবা কেন সরকারী চাকরি ছাড়ছেন না, তাই নিয়ে গঞ্জনা দিতে ছাড়ত না। মার কাছে একবার কথাটা পাড়লে, মা সোজা-সুজি বললেন, এ-তো কোনো বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ নয়। তাছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের দেশ-প্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার চালাবি? এমন অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর হয় না বলে রণে ভঙ্গ দিতে হল।

তখন কেউ বিদেশী কাপড় পরত না। শহরের নানা জায়গায় যে যার দামী দামী বিদেশী কাপড়-চোপড় এনে স্তূপাকার করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। মা একবার বলেছিলেন, 'শীতে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরীব মানুষ। পুড়িয়ে না ফেলে ঐ গরম জামাগুলো ওদের দিয়ে দিলে হত না?' আমরা তখন জোর গলায় বলেছিলাম, 'না, মা, হত না। দেশ-প্রেমের জন্য সবাইকে কষ্ট করতে হবে।' এখন ভাবি মা মন্দ কথা বলেন নি।

এদিকে বাবা নিউ মার্কেট থেকে আমাদের জন্য চমৎকার সব ভয়েলের কাপড় কিনে আনতেন। নিজেরা জামা করতাম। তখন খুব ভালো দিশী সুতির কাপড় পাওয়া যেত না, যদিও গরম কাপড় আর রেশমী কাপড় তৈরি হত। আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা মোটা শাড়ি পরে স্কুলে যেতাম। ৪৬ ইঞ্চি বহর, ১০ হাত। আমার খুব আরাম হত, কিন্তু দিদি আর মা আমার চাইতে ৪-৫ ইঃ লম্বা, ওদের খাটো হত। সুখের বিষয় টাকা পাঁচেক দিয়ে চমৎকার ৪৮ ইঃ বহরের ১১ হাত তাঁতের কাপড় পাওয়া যেত। সত্যি কথা বলতে কি শাড়ি নিয়ে কোনো কষ্ট ছিল না। কিন্তু দিশী মিল সবে চালু হয়েছে, জামার কাপড় বানায় খড়খড়ে, মোটা। আমরা খদ্দরের জামা পরা ধরলাম। খাদি প্রতি-ষ্ঠান থেকে কিনে আনতাম। আর কখনো বিলিতী কাপড়-জামা পরিনি। পরে সুন্দর ভয়েলও এ-দেশে তৈরি হত। এখনো 'ফরেন' কাপড় গায়ে তুলতে পারি না।

আমার বন্ধু মীরা দত্তগুপ্তা আমাকে একটা তকলি আর এক পুঁটলি তৈরি করা তুলো দিয়ে বলল, 'গান্ধীজি বলেছেন এই দিয়ে সুতো কেটে, পরে ঘরে ঘরে তাঁতে বুনে নিলে, দেশে কারো কাপড়ের কষ্ট থাকবে না।' কতকটা মীরার অকাট্য যুক্তি শুনে আর কতকটা ওকে বেজায় ভালোবাস-তাম বলে, তকলিটা নিয়ে সুতো কাটা অভ্যাস করতে লাগলাম। বাবাকে লুকিয়ে। এ বিষয়ে তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল না। বলতেন, 'শখের কথা আলাদা। কিন্তু মিল না চললে দেশের আর্থিক উন্নতি হবে না।' সে যাই হক, বেশ সুন্দর দেখতে হত আমার সুতোগুলো। শেষটা অনেক সুতো জমে গেল।

তখন মীরাকে বললাম, 'এখন কি করা হবে? তাঁত বসাবার জায়গা আমাদের বাড়িতে নেই। তাঁত কিনবার টাকাও নেই আমার। তাঁত চালাতে জানিও না।' মীরা বলল, 'ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।' নাকি খাদি প্রতিষ্ঠান না কোথায় ওঁরা কাপড় বুনে দিতেন। ওকে সুতোগুলো দিয়ে আশায় আশায় রইলাম। কবে আমার নিজের হাতে কাটা সুতির জামা গায়ে দেব। এমন সময় একদিন হাঁড়িমুখ করে মীরা এসে বলল, 'এই নে তোর সুতো। আমাদের কারো সুতো ওঁরা নিলেন না। নাকি যথেষ্ট পাক দিই না, তাঁতে চড়ালেই ছিঁড়ে যাবে।' শুনে আমি অবাক হলাম। ওর বেশি পাক দেব কি। আর পাক দিলে যে সবটাই গুটলি পাকিয়ে যায়। রইল আমার তকলি কাটা। ঐ তকলিটা বছর পাঁচেক আগেও আমার কাছে যত্ন করে রাখা ছিল। তারপর যে কোথায় গেল বলতে পারছি না।

মীরা আমাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী করে তোলার জন্য কম চেষ্টা করেনি। কবে ঠিক মনে নেই, হয় ঐ সময়, নয় ২-১ বছর পরেও হতে পারে, ভবানীপুরে ওদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে মহিলাদের লাঠি খেলা ও অসি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কাঠি-ফেন্সিং-এর মতো চেহারা ছিল দুজনার। যেমনি বেঁটে, তেমনি মোটা। ও আমার চেয়েও বেশি। তাতে কি হয়েছে? আমরা আরো উৎসাহী সদস্যা জুটিয়ে মহা আগ্রহের সঙ্গে বিকেলে গিয়ে 'শিব-মুড়া, দাড়ি-মুড়া ইত্যাদি করতাম। ভারি ভদ্র ও আদর্শবাদী মাস্টারও জোগাড় করেছিল মীরা। বলা বাহুল্য এসবের জন্য কেউ একটা পয়সা নিত না। গরীব হলেও না। আদর্শবাদের যুগ সেটা। দুষ্টুলোক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু বাবা আমাদের এমনি কড়া পাহারায় রাখতেন যে তাদের অস্তিত্ব তেমন টের পেতাম না। খালি আমাদের কলেজ বিভাগের একজন মেয়ের দাদা সাইকেল করে রোজ দিদির আর আমার পেছন পেছন স্কুল থেকে বাড়ি অবধি আসত। কিছু বলত-টলত না। ওর মা-বোনরা আমাদের চেনা ছিলেন। একবার ভালো করে শিব-মুড়া দাড়ি-মুড়াটা বন্ধ হলেই একদিন দেখে নেব? সে সুযোগ আর আসেনি, লাঠি লাগানোর মধ্যে ভালো-মানুষ মাস্টারটির ঠ্যাঙে একদিন এমনি বাড়ি মেরে দিলাম, যে দুদিন ধরে বেচারি খোঁড়াল। তবে এখনো মনে হয় ঠ্যাংটা তার সময়মতো সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নইলে ও আবার কেমনধারা মাস্টার।

(চলবে)

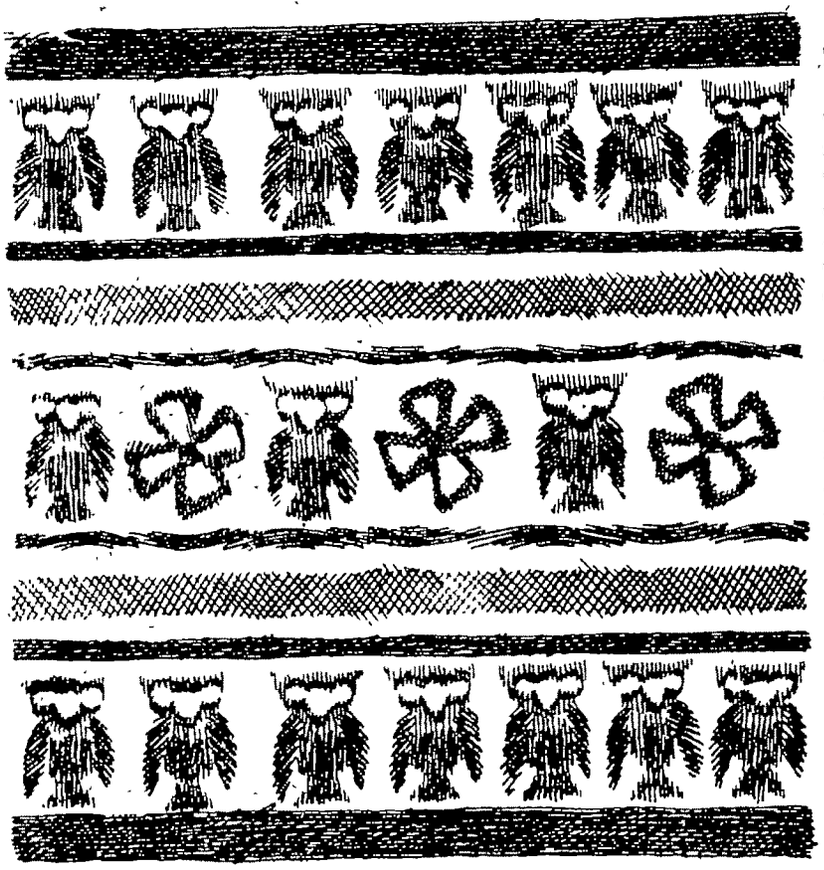

শারদ সাহিত্যের পাশাপাশি

শাড়ি

পেঁচাপাড় একছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৃতীয় পুরস্কার পাওয়া শাড়ি। আধ ইঞ্চি কালো বর্ডার, তারপর লাল আর্ট সিল্কের সারিবদ্ধ পেঁচা, আবার আর্ট সিল্কের কালো রেখা, নিচেই আসামের মুগার এক ইঞ্চি চওড়া রেখা, তার নিচে লাল আর্ট সিল্কের রেখা, তারপর আবার কালো পেঁচার সারি—এবার একটা পেঁচা, একটা ফুল, এইভাবে। আবার লাল, মুগা, কালো বর্ডার পেরিয়ে লাল রঙের পেঁচার সারি। সব-নিচে কালো বর্ডার। জমি ধবধবে সাদা। সুতো সেই ১০০ কাউন্টের। টানা পোড়েন দু-দিকেই।

গাছের ছায়ায় তাঁতঘরে বসে এ-রকম একটা পেঁচাপাড় শাড়ির ফিনিশিং-এর কাজ করছিলেন চন্দ্রনাথ বসাক। সরকারের পুরস্কৃত শাড়িটিও এঁরই হাতের রচনা। সেটার জমিতে অবশ্য রঙিন বুটি ছিলো। কারুকাজ ছাড়া হচ্ছে বুটিহীন শাড়ি। কেননা বুটিতে বড্ড বেশি পরিশ্রম, খরচও বেশি। যে-কেউ এখানে এসে এই শাড়ি ৭৫ টাকায় কিনতে পাবেন। শিয়ালদা থেকে ফুলিয়া ট্রেনে ঘন্টা-দুয়েকের পথ। ইস্টিশন থেকে বসাকপাড়ার বিক্সা ভাড়া করে যাওয়া-আসার খরচ ১০ টাকা বাদ দিলেও ১৫ টাকার মাশুল। কলকাতার দোকানে পেঁচা পাড় শাড়ির দাম ১০০ টাকা। বড়োবাজারের পাইকারিরা ফুলিয়ায় কেনেন ৭০ টাকা করে। ফুলিয়ার পরের ইস্টিশন শান্তিপুর। সেখানকার তাঁতি-পাড়াও ওই সঙ্গে ঘুরে আসতে পারেন।

রঙের শেষ নেই, নকশার সীমা নেই। মানুষের কল্পনাকে কে আর কবে সীমার গণ্ডি টেনে এক ঠাঁই বসিয়ে রাখতে পারে! তাঁতের শাড়ি দেখতে দেখতে মনে হয়, রুচি ও সৌন্দর্যের খনি। মাঝারি, এমন-কি সাধারণ কাজও চোখে পড়লো। খরচ না-বাড়িয়ে শুধু শিল্পগুণে কল্পনানৈপুণ্যে এগুলো আরো মনোরম করা যায় না? টলটলে নীল আকাশের গায়ে ধবধবে শাদা মেঘের স্তূপ চুপ করে ভেসে আছে কিংবা আকাশে লাল আলপনা আঁকছে বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, কি যামিনী রায়ের হরিণ, কি জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, এইসব রং-রেখা, কবিতা সুতোয় ধরা যায় না? হয়তো যায়। হয়তো একদিন যাবে। যদি বাংলার তাঁত বাঁচে। তাঁতী বাঁচে। নাইলন ডেকরনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে। নিজেদের বিক্রয় সংগঠন নেই। ধারে শাড়ি বেচে পাওনার আশায় হা-ক'রে বসে-থাকা আছে। কাঁচা মালের সমস্যা আছে। এতো সব ফাঁড়া কাটিয়ে বাংলার তাঁত আরো কতো দিন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে, পাড়া জাগিয়ে খটাখট করে যাবে, জোর করে বলা যায় না। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, খাগড়ার কাঁসার শিল্প—বাংলার নিজস্ব এরকম কতো শিল্পই আজ ধুঁকছে।

ফুলিয়া গিয়েছিলাম ঠিক এক মাস আগে। টাঙ্গাইল তাঁতের রং-চং, শিল্প রুচি, রূপলাবণ্য মনে করতে গিয়ে দেখি, এর মধ্যেই সব ঝাপসা ঠেকছে। শাড়ির কাঁচা রং, কি নকশার শিথিল বুনোন তার কারণ নয়। সত্যি বলতে কী, একমাত্র তুঁতে ছাড়া ফুলিয়ার সব রঙই পাকা, প্রায় শাশ্বত। আর বুনোন? সুতোর অতো সূক্ষ্ম, অতো স্থায়ী কাজ বিস্ময়কর। সেই চোখ জুড়োনো রং, সেই মনোমুগ্ধকর নকশাও আজ ধূসর লাগে, তাঁত-ঝলমল বসাকপাড়ার কথা ভেবেও আমার মন নেচে উঠছে না, তার কারণ বসাকপাড়ার দারিদ্র্য। ঘরে-ঘরে অনটন। পাড়া ঘুরে পাড়াময় আমি দুঃখের স্থায়ী নকশা দেখেছি।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওখানকার উন্নয়ন আর সমবায় সমিতিগুলো গড়ে ওঠার আগে অনেক তাঁতীকেই মাটি কাটার কাজ করতে হতো। সমিতি হয়ে সেই দুর্বিষহ দশা কিঞ্চিৎ কেটেছে ঠিক, কিন্তু, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাঁরা অতো শ্রম করেন, তাঁরা কেন বছর-ভর দুধে-ভাতে থাকবেন না, আমি কিছুতেই ভেবে পাই না। শুধু ফুলিয়াই নয়, শান্তিপুর, ধনেখালি সর্বত্রই তাঁতীদের জীবন যাপনের ছবি একই। এদেশে যাঁরাই সত্যিকার শ্রম করেন, তাঁরাই দেখি সত্যিকার দরিদ্র। **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**

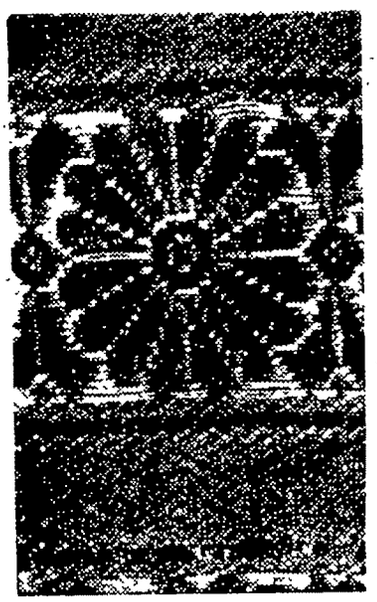

পাবলো নেরুদার জবানবন্দী

উৎপলকুমার বসু

উনিশশো পঞ্চাশ সালে পাবলো নেরুদা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমবারের কথা পরে বলব। প্যারিস থেকে 'শান্তির স্বপক্ষে' নামক এক যুদ্ধবিরোধী সংঘের দূত হিসেবে বৈজ্ঞানিক জোলিও ক্যুরি তাঁকে এদেশে পাঠান। নেরুদার সঙ্গে ছিল দুটি চিঠি। একটি ভারতীয় পদার্থবিদ্ রমনের নামে—অপরটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্য। বোম্বাই বিমানবন্দরে নেরুদার জিনিসপত্র উল্টোপাল্টে সার্চ করা হয়। সঙ্গে ছিল একটি সুটকেশে কিছু ব্যবহৃত জামা-কাপড় এবং একটি থলিতে সাবান তোয়ালে ইত্যাদি। দু ঘন্টা ধরে একদল কাস্টমস অফিসার এই সামান্য কয়েকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচিয়ে দ্যাখে। এমনকি যে খবরের কাগজে তাঁর জুতো জোড়াটি বাঁধা ছিল সেটাও গবেষণার বস্তু হিসেবে ঐ তদন্তকারীদের কাছে অপ্রত্যাশিত মূল্য পায়। শেষ পর্যন্ত নেরুদাকে কাগজপত্র ছাড়াই হোটেলে চলে যেতে বলা হয়। পরে ওগুলি সরকারী কর্মচারীদের হাতে ফেরত আসে। এই অভিজ্ঞতা প্রীতিকর নয়।

রমন তাঁকে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে খানার টেবিলে পরিচয় করিয়ে দেন। বিজয়লক্ষ্মীর রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও পোশাক-আশাক পাবলো নেরুদাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তিনি যথার্থই বিস্মিত হন যখন দ্যাখেন ঐ মহিয়সী, তাঁর মনিমাণিক্যবিজড়িত অভিজাত আঙুল ডুবিয়ে ভাত-মাংস মেখে খাচ্ছেন। আমরা বাংলায় যাকে বলি কচ্ছি ডুবিয়ে খাওয়া আর কি।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত নেরুদার স্মৃতিতে বহু বিখ্যাত চরিত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য আছে যা অসম্মানজনক বলে মনে হতে পারে। বস্তুত, এই বইটি নানা দিকে বিভিন্ন কারণে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নেরুদার নিজের দেশ—চিলিতে—শুধু যে এই বইটি নিষিদ্ধ তা নয়, লেখকের দেশে ফেরাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিলেন বর্তমান সরকার। এই সব বাদবিসম্বাদের ঊর্ধ্বে তিনি আজ। কয়েক বছর আগে নেরুদার মৃত্যু হল।

জওহরলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আছে, উল্লেখযোগ্য। নেহরুর হাতে চিঠিটা তুলে দেওয়া মাত্র, এই জগতবিখ্যাত দেশনেতাকে নেরুদার এক বন্ধু মানুষ বলে মনে হয়। জোলিও ক্যুরিকে তাহলে আমি ফিরে গিয়ে কী বলব—নেরুদা প্রশ্ন করেন।

নেহরু শুকনো জবাব দেন—আমিই চিঠির উত্তর পাঠাবো খন।

তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। নেরুদা ভদ্রতাবোধে তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নেহরু সমানই উদাসীন ও শীতল। তিনি মন্তব্য করেন—উভয় পক্ষই তো দেখছি আজকাল শান্তি শান্তি বলে কলহ করছে।

বিদায় নেবার সময় প্রধানমন্ত্রী যেন একটু আন্তরিক হয়ে ওঠেন। নেরুদার ভারত থাকাকালীন কোনো সাহায্য দরকার হবে কি না তিনি জানতে চান। নেরুদা তাজমহল দেখার অনুমতি চেয়ে বসলেন।

হোটেলে ফেরা মাত্র ম্যানেজার তাঁকে বলে যে—আপনার তাজমহল দেখার নির্দেশ পাওয়া গেছে। যখন ইচ্ছে যেতে পারেন।

নেরুদা উত্তর করলেন—হ্যাঁ আমি এখনই যেতে চাই। তবে আগ্রায় নয়, পালামে। অবিলম্বে ইওরোপগামী একটি যাত্রীবাহী বিমান এই বিখ্যাত বিপ্লবী ও লেখককে নিয়ে পাড়ি দিল প্যারিসের উদ্দেশ্যে।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে সরু একফালি দেশ—চিলি। এখানকার লোকেরা অতি দরিদ্র। পাবলো নেরুদার বাবা ছিলেন রেলের কর্মচারী। লাইনে পাথর ফেলা ছিল তাঁর কাজ। অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বালক কবিকে বড়ো হতে হয়েছে। জঙ্গলে উন্মেষ হল তাঁর কবিচেতনার। ছোটবেলায়, একদা চারের জমিতে, বেড়ার পাশে বসে খেলছিল এই শিশু। হঠাৎ আরেকটি বালকের হাত ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে। ঐ হাত কবির জন্য ফেলে দিয়ে গেল একটি ছোটো ভাঙা পুতুল— মলিন লোমে ঢাকা এক ভেড়া। চাকা লাগানো তার পায়ের কাছে। অমন আশ্চর্য খেলনা পরে হারিয়ে যায় বা আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধ বয়সেও কবি বৃথা নানা দেশে ঐ রূপ একটি পুতুল খুঁজেছেন। হাতটিই বা কার—কে জানে।

চিলির জঙ্গলের চমকপ্রদ বর্ণনা লিখেছেন নেরুদা। ভারতীয় বনভূমির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। কারণ ঐ ছোটো দেশে আবহাওয়া বড়ই অশিষ্ট। ঝড় বৃষ্টি লেগেই আছে। আর অকল্পনীয় শীত। রাশিয়ানরা অব্দি চিলির শীতকে সমীহ করে—নেরুদা লিখছেন। সদা দুর্যোগপূর্ণ পারিপার্শ্বিকে যে মানুষেরা বসবাস করে তাদের মানসিক দৃঢ়তা ও কর্মশক্তি প্রশংসনীয়। ধনীরা থাকে শহরে। সান্তিয়াগো সেই শহরের নাম।

চিলির অর্থনৈতিক চরিত্র ঔপনিবেশিক। দেশী ধনকুবেরদের সঙ্গে ইওরোপ আমেরিকার ব্যবসায়ীমহলের মিত্রতা প্রথা অনুযায়ী অতি গভীর ও জনকল্যাণবিরোধী। দেশের সাংস্কৃতির মানসিকতাও ভিন্ন নয়। অর্থাৎ চিলির বুদ্ধিজীবীরা উৎকর্ণ হয়ে আছেন কবে প্যারিস বা লণ্ডন বা মাদ্রিদ তাঁদের ডাক দেবে। যুবক কবি নেরুদা কিন্তু রাজদূতের চাকরি নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন দরিদ্রতর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। একই সঙ্গে কবিতা লেখা ও সামাজিক শিক্ষা গ্রহণে প্রয়াসী হলেন তিনি। তাঁর কবিতায় ক্রমশ ফুটে উঠল এক বিপ্লবী কবিপুরুষের প্রতিচ্ছবি।

সে সময় তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। তাঁর প্রথম ভারতদর্শন। এই শহরে তখন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। সেখানে তরুণ নেরুদার সঙ্গে গান্ধি, মোতিলাল ও সুভাষচন্দ্রের আলাপ হয়। গান্ধীর ঐশ্বরিক জনপ্রিয়তা ও সুবিধাবাদী রাজনীতি তাঁকে স্তম্ভিত করে। অভিজাত মোতিলালকে তিনি সংগঠনী নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বিস্ময়কর রাজনীতিবিদ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ছিল ওজস্বিনী — নেরুদা লিখেছেন। ভারতীয় দর্শন এবং ভারতের ধর্মনির্ভরতা তাঁকে লজ্জিত করে। যে পরাধীন দেশে লোকেরা অনাহারে মারা যায় সেদেশে নিজ নাইকুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে যোগচর্চা করার মতো উৎকট সাধনার অপকারিতা তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। ভারত প্রেমিক পশ্চিমী সাহেব-বিবিদের

প্রবোচনায় যে এই নিকৃষ্ট, অসামাজিক ধাপ্পাবাজ প্রচার ঘটছে—তাও তাঁর চোখে এড়ায়নি।

প্রত্যেক লেখক বা শিল্পীর বুঝি একাধিক জন্মস্থান থাকে। নেরুদার প্রথম দেশ—চিলি। দ্বিতীয়—প্যারিস। প্যারিস তাঁর কর্মস্থল ও প্রিয়তম শহর। এখানে দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন তিনি। একদা নিঃসম্বল ভবঘুরে কবি হিসেবে। পরবর্তীকালে নিজ দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে। বহু রাজনৈতিক ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্রমশ দৃঢ়তর হয়। যুদ্ধের সময় এখানেই তিনি ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংস্থা গড়ে তোলেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লেখক ছিলেন তার সদস্য।

সোভিয়েট নিমন্ত্রণে নেরুদা প্রথম সে দেশে যান উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে। পুশকিন জন্মবার্ষিকীর সভায় তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা। সদা ভ্রাম্যমাণ জ্ঞানী এই কবির বিবৃতি যে বাশিয়ানদের মুগ্ধ করেছিল—সন্দেহ নেই। বাশিয়ার লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর যৌবনের বন্ধু। একত্রে প্যারিসে বসবাস করেছেন। পুলিশের দৌলতে তাঁদের পরিচয় হয়। ঘটনাটি এই—নেরুদা ফরাসী পুলিশের গোপন ফাইলে দ্যাখেন যে তাঁকে এক অবাঞ্ছিত এবং বিপজ্জনক গেরিলা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার সহচর হিসেবে লিখিত আছে এরেনবুর্গের নাম। সুতরাং এরেনবুর্গকে এক কাফেতে আবিষ্কার করে তিনি নিজ পরিচয় দেন এবং বলেন যে—আমাদের আর আলাপের কি দরকার। পুলিশ বলেছে যে আমরা নাকি অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতএব, আসুন করমর্দন করা যাক। রাশিয়ান কথা সাহিত্যিকের সঙ্গে চিলির কবির সেই আন্তর্জাতিক সখ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভোজন ও পানরসিক এরেনবুর্গ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী মদ ও ইওরোপীয় সুখাদ্যের সঙ্গে নেরুদার পরিচয় ঘটান।

অতঃপর কিউবার বিপ্লবীদের সঙ্গেও নেরুদার অন্তরঙ্গতা হয়। ফিদেল কাসত্রো তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান প্রথম স্বাধীনতা দিবসের সমারোহে। এখানে কাসত্রোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কাহিনী লক্ষণীয়। হাভানার এক গৃহ উৎসবে অতিথি নেরুদাকে কেউ গোপনে জানিয়ে যায় যে জেনারেল কাসত্রো রাগানের সীমান্তে এক গ্যারাজ ঘরে অপেক্ষা করছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। নেরুদা একা সেই চোরা-কুঠরিতে বসে থাকেন। সহসা দরজায় নেতার আবির্ভাব হয় এবং হ্যালো নেরুদা বলে তিনি ভদ্রলোককে আলিঙ্গনে কবিকে জড়িয়ে ধরেন। পর মুহূর্তে সরে গিয়ে বর্ষণপটু কাসত্রো বিদ্যুৎ চমকে ঘরের কোণা থেকে এক সাংবাদিককে চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলেন। বেচারী গোপনে এই ঐতিহাসিক দৃশ্যের ছবি তুলতে এসেছিল বোধহয়। গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে কাসত্রো তাকে বের করে দেন। ক্যামেরাটা মেঝেতে গড়াগড়ি যায়। তারপর স্থির হয়ে বসে; কাসত্রো দক্ষিণ আমেরিকার প্রয়োজনের উপযুক্ত এক সংবাদ বিতরণ কেন্দ্রের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা সুরু করেন। প্রেসনা লাতিনা নামক সমাচার সংস্থার ঐভাবে উৎপত্তি। বেজিস দ্যুবে বলেছেন যে বলিভিয়ার জঙ্গলে বিদ্রোহী চে গুয়েভেরা সর্বদা দুটি বই তাঁর কাঁধের ব্যাগে বহন করতেন একটি গণিতের অপরটি নেরুদার এক কাব্য সংগ্রহ।

চিলির রাজনৈতিক সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে দেখা দিতে থাকে। দেশ প্রায় ভেঙে পড়ে। সম্ভব বছর বয়সে বৃদ্ধ কবিকে আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হল। এবার চিলির জাতীয় নির্বাচনে তাঁকে সংযুক্ত বামপন্থী দলের পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়। কিন্তু পুরনো সুহৃদ সেনের আইয়ান্দের জন্য তিনি সরে দাঁড়ান। বিপুল জনসমর্থনে আইয়ান্দে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এই পরিবর্তন বিদেশী শক্তিগুলি, বিশেষত নিকসন সরকার ভালো চোখে দ্যাখেনি। তাদের প্রবোচনায় ও দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় নতুন স্বেচ্ছাচারী মিলিটারী দল শাসনভার হাতে তুলে নিলেন। এক রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের ফলে আইয়ান্দের মৃত্যু ঘটল। তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ গোপনে রাষ্ট্রপতি ভবনের একপাশে দ্রুত সমাধিস্থ করা হল। একমাত্র সাক্ষী থাকলেন আইয়ান্দের সদ্য বিধবা পত্নী। বিমান থেকে তখনও প্রাসাদের উপর বোমাবর্ষণ চলেছে।

এই ঘটনার ঠিক বারো দিন পর কবি নেরুদারও মৃত্যু হল। ডায়েরির শেষ পাতায় তিনি লিখছেন—আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় আমি আজ নিজের চোখে দেখে গেলাম এবং দেখে গেলাম চিলির সেনাপতিরা আবার কিভাবে তাদের নিজ মাতৃভূমিকে প্রতারিত করলেন।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ডি লিট

শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার /২৮.০০

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল / শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ - বিবরণী ১৩-০০

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী সংগ্রহ, আত্মকথা, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় আলোচনা, প্রতিটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার সহ জীবনকথা নির্ভুল সন তারিখ সহ লেখক বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল / শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা ৪-৫০

বইটি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনেক কৌতূহল নিবৃত্ত করবে।

দীনবন্ধু ঘোষ/শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে দেবানন্দপুর ৪

শিশিরকুমার মাইতি/শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৫-৫০

Prof. Humayun Kabir/**Sarat Chandra Chatterjee/Rs. 4.00**

গৃহদাহ (The Fire) ও দত্তা'র (The Betrothed) অনুবাদ পাওয়া যায়

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী/উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য/১.০০

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য/ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা/৮.০০

নন্দিনী শতপথীর ওড়িয়া গল্পের বঙ্গানুবাদ/গল্পসংকলন/৪.০০

উৎপল দত্ত'র নাটক/দিল্লী চলো ৪-৫০

Sefali Nundy **/Bengali For Foreigners/Rs. 6.00**

Anna Louise Strong **/The Stalin Era/Rs. 4.00**

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়/ এক সময় দুই কবি /৫.৫০

বর্তকাল কালের দুই প্রধান কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের কবি ব্যক্তিত্ব ও কবিমানসের রহস্য উন্মোচিত হলো।

অশোক গুহ/আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম/৫.৫০

ছাত্রছাত্রীদের উপহার দেবার মতন একটি অসাধারণ গ্রন্থ

Scalpell the Sword স্পেন ও চীনের কমুনিস্ট বিপ্লবের মহান সংগ্রাম-সাথী ডাঃ নর্মান বেথুনের অমর জীবনকথা। এই গ্রন্থের ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। জোড়া Post card লিখে গ্রাহক হলে ২০% ছাড় পাবেন।

পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫/১বি, বিধান সরণি/কলিকাতা-৬

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

হাত

আমার হাত পাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের বাইরে
বেড়ার ওপাশ থেকে আমি ওদের গুটিয়ে নিয়ে আসি
ঘুমের সময় স্বপ্নে দেখি জানলার বাইরে
বেড়ে বেড়ে যায় আমার হাত—
যেখান থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে সেই মাটির ফুটো
হাঁড়িটা ওরা নামিয়ে আনতে চায়,
কিন্তু আমি ওদের গুটিয়ে আনি অভ্যস্ত চেহারার মধ্যে
বলি, দর্জিদের কাজ বাড়িয়ে দিয়ো না ক্রমশ
বশীকরণের মন্ত্র শেখাই ওদের, শেখাই কী করে
কবিতা লিখতে হয় রক্ত দিয়ে, আর না পারলে কী করে
শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়তে হয় বিছানায় আমার শরীরের পাশে....

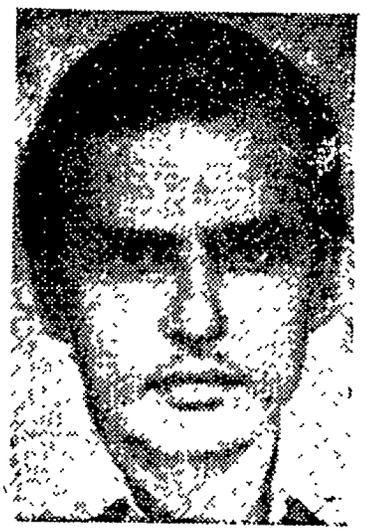

ছাঁকনি

ছাঁকনির ভিতর দিয়ে গলে পড়ার নামই কৃতিত্ব
কেউ পারে না, কেউ পারে।
কোনো রকমে একটি কাপের হৃদয়ে আশ্রয় নিতে হয়
তারপর সরাসরি জয় করতে হয় তাবৎ পেটের সাম্রাজ্য।

ধূমায়িত এক কাপ কফির আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি
জয়ী হয়ে সে খ্যাতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায় না
রণনীতি তার পছন্দ নয়, ফিরে যেতে চায়
যেখানে থেকে এসেছিল সেখানে
কিন্তু ছাঁকনির ভিতর দিয়ে যারা আসে এপারে একবার
গা গতরে হয়ে যায় মোটা, ফিরতে পারে না,—
ছাঁকনিও ফিরতে পারে না তার ছিদ্রহীন
জমাট আসল অস্তিত্বে।

পা

লাথি মারলে সোজা ফুটবলের মতো উঠে যাই আকাশে
ফুল হয়ে ফুটি, অথবা ছড়িয়ে পড়ি বিশাল বটগাছের মতো
আমার এই ছড়িয়ে পড়ার জন্যে তাহলে প্রয়োজন ছিল
কয়েকটি লাথির? লাথির জন্যে পা? নাকি সে
ঘুরে ঘুরে চোখকে দেখতে সাহায্য করে
সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু ছড়িয়ে আছে
ছোট ছোট পাথর আর ঢেলা।...
জ্যোৎস্না সুখী নয় সেখানে, তবু ফোটে।
বিবাহিত সেই মেয়েটির মতো যে ছেড়ে যেতে পারে না
তার স্বামীকে, কিন্তু অসুখী। বেঁচে সুখের জন্যে
পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় দুবেলা
সে তার নিজের পা চিবিয়ে খায় দুবেলা
বুকের মাংস খুলে সাজিয়ে রাখে থালায়
প্রচণ্ড রোদে সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু গোল গোল
শুকনো নিরেট থালা সাজানো আছে ...
পা হেঁটে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে
আর মাঝে মধ্যেই লাথি মেরে দেখছে
একটা থালা আরেকটা থালার গায়ে আছড়ে পড়ে কিনা।

ভাষা নেই

[অনুরাব রায়ের জন্যে অ-শোক কয়েকপংক্তি]

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আছে আরো বহু কিছু আছে,
প্রকৃত দুঃখেরই কোনো প্রতিশব্দ নেই।
হয়তো-বা ঐশ্বরিক, সে অনন্য, নিরক্ষর—
বোবার ভাষার মতো ঠোঁটের ওপরে শুধু কাঁপে।

কী যে তার পরিতাপ।
কে আর ওজনে তাকে মাপে ?

আছে আরো বহু কিছু আছে,
প্রকৃত শোকেরই শুধু প্রতিশব্দ নেই।
মন্দির-চূড়োয় সূর্য ডুবে গেলে
যদি কেউ অতর্কিতে কাঁদে,
কে পারে তেমন কান্না জীবনে থামাতে ?,
নেই তার বিকল্প ও সমব্যথী নেই—

হৃদয়ধর্মিতা বুঝি নেই ?
ঈশ্বরের প্রতিবেশী নক্ষত্রেরও তত বেশি
নেই দুঃখ, নেই শোক, সমান মাপের ভালোবাসা :
নেই কোনো বেদনার বিকল্পের ভাষা।
ক্ষয়ের ভেতরে থাকে স্মৃতি।

অসহায় আমরা বুঝি, বড়ো অসহায় !

রাত্রি বাতাসকে

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভাসো ভাসো রেল লাইনের কাছে গিয়ে গভীর ব্যাপক বাতাস,
রাত্রে আমায় জড়াও করো তোমার সমধর্মী।
ওড়ো এবং ওড়াও গাছের জীর্ণ পাতার রাশ,
ভাঙো আমায় নষ্ট করো পাগল সহকর্মী।।
তোমার যেমন বিরতি নেই, নেই বুকে আর খুচরো কোন পয়সা।
দু হাতে সব ছড়িয়ে তোমার আনন্দ শব-বহন—
তোমার যেমন প্রতিদিনই আধুনিকের নেশা,
ভাসাও আমায় ভাঙো আমার নষ্ট মেয়ের স্মরণ।

বিবাহ ॥

অমিতাভ গুপ্ত

এই সন্ধ্যার অধৈর্যপরায়ণ বাতাসে আমার খবর আমি
পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের কাছে
তোমাদের খবর কী, জানতে ইচ্ছে করে
তোমাদের ঘর ও গেরস্তালি, আঁকাবাঁকা ফসলের মাঠ,
মাঠের প্রান্তে একটি টিলা
টিলার ওপর এখন আঁকা হয়ে আছে সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য
মাঠ ছেড়ে চলেছে রাখাল, তীর ছেড়ে চলেছে নৌকো
একটি প্রগলভ নদী ঘিরে আছে তোমাদের

তোমরা কেমন আছ ? আমার কথা কখনো মনে পড়ে কিনা
এতদূরে বসে আমার বোঝা অসম্ভব,
শুধু এই সন্ধ্যার বাতাস
হয়ে উঠেছে মুখর ও চঞ্চল
একটি ফেলে আসা নদীর কথা মনে পড়ে যায় আমার
একটি ফেলে আসা সূর্যাস্তের দৃশ্য সমস্ত মাঠ পেরিয়ে
হিমার্ত এবং উষ্ণ ঋতুগুলি পেরিয়ে
জ্বলে ওঠে আমার চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা বনভূমির
সীমান্তরেখায়

যেন ওই বনভূমিকে এবার পেয়েছি আমি বিবাহবন্ধনে।।

কোলকাতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

রাত্রি গভীর হলে কোলকাতা ফুটপাতে একা একা বসে
ভুটিয়া পসারী তুলে নিয়ে যায় শীতের পোষাক
বৌবাজারের মোড়ে নিভে যায় উজ্জ্বল ঝরোকা
ছেঁড়া কাঁথাকানি তুলে সবে পড়ে দিনের জ্যোতিষী
গাড়ির গাড়োলগুলো ডুবে গেলে মদে ও নারীতে
কোলকাতা ভুলে খাওয়া আত্মীয়ের অনুষঙ্গ চায়।

তখনি সমুদ্র নামে বুক জুড়ে কোলকাতা আবরণহীন
সুখে নিমজ্জিত হয় দুখে ডোবে কী ভীষণ অবসাদে ভোগে
রাত্রি নয় যেন দিন বেবুশ্যে রমণী খোঁজে তৃপ্ত বিছানায়
গভীর ঘুমের স্মৃতি ভিজে চোখে অসম্ভব লুকোচুরি খেলে।

কোলকাতা চিঠি চায় ছেড়ে যাওয়া প্রেমিকের যা তাকে ভোলাবে।।

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন

শ্যামল রায়

'থাক। আর প্রাণের কথা বলতে হবে না.....প্রাণের কথা থাক।' আমি শিপ্রার দিকে মুখ তুলে তাকাই। ও মুখ নীচু করে হাঁটতে থাকে।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই গুমটি ঘরের দিকে। রাস্তার কিছু লোক আমাদের পিছু পিছু আসছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দূরে গুমটি ঘরের সামনে খাটিয়ার ওপরে বসে একজন সুর করে রামায়ণ পড়ছিল। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কে একজন এসে লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ করে দিয়ে গেল। কৃষ্ণ বলল, 'গাড়ি আসছে। চল। আমরা ওই গাছের নীচে গিয়ে বসি।' একজন লোক আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাস পাওয়া যাবে?' লোকটি বলল, 'কোন দিকের।' আমি হাত তুলে খড়গপুরের দিক দেখিয়ে দিই। লোকটি বলল, 'যাবে'। আমরা গুমটি ঘরের পাশে গাছের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে।

ভীষণ জোরে মাটি কাঁপিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলে যায়। শব্দময় নীরবতা ধীরে ধীরে আমাদের ঘিরে ধরে। একটা লোক এসে লেভেল ক্রসিং এর গেটটা খুলে দিয়ে যায়।

(এগার)

ভোর হয়ে আসছে। আমি চোখ তুলে চেয়ে থাকি। চার দেয়ালের অন্ধকার গলে যাচ্ছে—মসৃণ। অন্ধকার গলে গলে আলো ফুটে উঠছে। কে যেন ডাকছে দূর থেকে। কে যেন আসছে আশেপাশে, আবার দূরে চলে যাচ্ছে। একটা শব্দ হল—গুলি।

'কখন দেখা হয়েছিল?'

'পরশু।'

'সঙ্গে কে কে ছিল?'

'আমি একা।'

'সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'না।'

একটা শব্দ হল—গুলি। আমি চোখ নামিয়ে নেই নীচে। অন্ধকারে ডুবে যাই। চোখের ভিতর আলোর বিন্দু খেলা করতে থাকে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ। নড়ছে, দুলছে, ছুটছে, একে অপরের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে।

'এখন কেমন লাগছে?'

আমি চোখ তুলে বললাম, 'ভাল।'

'কাল কি হয়েছিল?'

'জানি না।'

'কি বলছিলেন?'

'কই?'

'এই যে বললেন, পরশু আমি একা না।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি উঠে বসুন। কাল সারা রাত বকেছেন. ফিরে আসার সময় রাস্তায় বকছিলেন। ওরা আপনার মুখের কাছে কান নিয়েছিল।'

'সত্যি!! কি বলেছি আপনি শুনেছেন?'

'কিছু কিছু শুনেছি।'

'কি বলেছি,....কি?'

'বলেছেন অনেক কিছু সব কিছু মনে নেই। অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর প্রলাপ।'

'যেমন?'

'লেখ না .....সবার নাম.....থাক. .. বেড়াতে এসেছি. .. কলকাতায়....খড়গপুর.... কি হচ্ছে.... চোর . .তুমি.... খুলে দিচ্ছ.... ছবি আঁকি ..সত্যি....ভাবা যায় না....। এইসব আর কি।'

আমি বললাম—'ও—হতে পারে।'

'হতে পারে, না। আপনি বলেছেন—ওরা সব শুনেছে। কাল যখন আমাদের দু-জনকে বড়বাবু ডাকছে বলে পাশের ঘরে নিয়ে গেল, দরজা খুলতেই আপনি হাত পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ওরা ধরাধরি করে আপনাকে ভিতরে নিয়ে গেল টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। আপনি কোন সাড়া শব্দ নেই দেখে খানিকটা জল খাইয়ে দিল। আপনি বকতে থাকলেন ওরা আপনার মুখের কাছে কান নিয়ে গেল কিছুক্ষণ শুনেটুনে গাড়ি করে আমাদের থানা লক-আপে পাঠিয়ে দিল। আপনি কিছুই টের পান নি?'

'না।'

অধ্যাপক ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ কেমন ফাঁকা দেখেছেন? একটি লোক নেই। কাল আমরা আসার আগে হয়তো খালি করে দিয়েছে। পাকা ব্যবস্থা।'

'কেন?'

'আপনি যদি লক-আপে মারা যান; কেউ সাক্ষি থাকবে না।'

'কেন, আপনি তো ছিলেন?'

'আমি তো—আপনিই। আমাদেরকে ওরা আলাদাভাবে দেখে না।'

আমি হাসলাম। অথচ আমরা কত আলাদা—কত ভিন্ন—বিভক্ত।

'চা দেয় না এখানে?'

'দেয়।'

'কখন?'

'দেবে একটু পরেই—বসুন এখানে।' বলে, আমি অধ্যাপক ছেলেটিকে কাছে ডেকে নেই। ও এগিয়ে আসে। আমার পাশে বসে পরে। 'কি বলুন?'

'আমি কাল জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের মারছে না কেন? আপনি বললেন, পরে বুঝবেন জেলে গিয়ে—ব্যাপার কি?'

ব্যাপার কিছুই নয়। মারধোরের ব্যাপারে পুলিশ দু-রকম কৌশল নেয়, প্রথমত পুলিশের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে মানে, সবার নাম-ধাম বলে দেয়। ডেন. সেল্টার দেখিয়ে দেয়, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একে ওকে ধরিয়ে দেয়। তখন

তার আর করার কিছুই থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, এ-সব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচার অথবা মৃত্যু ভয়ের জন্যও করে। একবার বলতে থাকলে পুলিশ এদের খুব তোয়াজ করে। অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়। এইভাবে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে। একবার এসে গেলে পুলিশ তখন এদের দিয়ে নানা কাজ করায়; তার মধ্যে জেলে পাঠিয়ে খোচরের কাজ করানোটাই প্রধান। পুলিশ ওদের বলে দেয় জেলে গিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে থাকবি। চুটিয়ে রাজনীতি করবি। প্রয়োজন হলে লড়াই করবি। সব সময় এক নম্বর কমরেড হতে চেষ্টা করবি। সেটা হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবি। আমাদের লোক জেলে থাকে। তাদের সঙ্গে তোর একটা ব্যবস্থা করে দেব। তোফা থাকবি। ভয় কি? কিন্তু কথা মত কাজ না করলে ভয় অবশ্য একটু আছে। তোকে আমরা থানা থেকে বিপ্লবী করে জেলে পাঠিয়ে দেব—ভয় কি?

'কিভাবে বিপ্লবী করে জেলে পাঠাবে?'

'কেন? মেরে! আমি একজনকে জানি। সে পুলিশকে সব বলে দিয়েছিল। প্রথম থেকেই পুলিশ তার গায়ে হাত দেয় নি। কিন্তু যেদিন থানা থেকে জেলে পাঠাবে। তার আগের দিন রাত্রে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে হাতের, পায়ের হাড়গোড় ভেঙে মাথা ফাটিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে থানা লক-আপে নিয়ে এল। আমরা ছেলেটিকে আগলে রাখলাম লক-আপের ভিতর যারা ছিল, তারা সবাই ওকে সমীহ করতে লাগল। পরে ও জেলে গিয়ে খুব লড়াকু হয়েছিল। জেলের ভিতরকার সংগঠনের সব খবর ও পুলিশকে দিত। পরে ধরা পড়ে যায়। তারপর থেকে সেই জেলে ওকে আর দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত পুলিশ কাউকে ধরার পর যখন দেখে, সে মোটামুটি ভদ্র, লেখাপড়া জানে, রাজনীতি জানে, বোঝে, সংগঠন করার ক্ষমতা আছে, ভাল বলতে কইতে পারে, তখন তার সম্পর্কে অন্য কৌশল নিয়ে থাকে। তাকে বিশ্বাস-ঘাতক বানিয়ে জেলে পাঠানো। যাতে সে জেলে গিয়ে রাজনীতি করতে না পারে। সংগঠন করতে না পারে। রাজনীতি থেকে বসে যাওয়া ছেলেদের তুলতে না পারে। কৌশলটা খুবই সোজা। তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা। পুলিশের বিরুদ্ধে সে যাই বলুক, করুক, গায়ে হাত না দেওয়া। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোয়াজে রাখা। কখনো একা একা, কখনো সবার সঙ্গে লক-আপে রাখা, যাতে সবাই সন্দেহ করে—এ-সব বলে দিয়েছে, তাই মার খায় নি, ভাল আছে ভাল থাকছে।'

আমি বললাম 'বেশ ব্যবস্থা।'

'বেশ তো বটেই। তবে এটা মনে করা ঠিক নয় যে যারা মার খেয়ে জেলে যায় তারা সবাই খোচর। অথবা যারা মার না খেয়ে জেলে যায়, তারা সবাই বিপ্লবী। এর বহু ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম না থাকলে এই কৌশলের কোন গুরুত্ব থাকতো না।

আমি বললাম, 'সে তো বটেই। আপনি জেলে ছিলেন কবে?'

'ছিলাম সত্তর একাত্তরে—কেন?'

'না, অভিজ্ঞ লোক মনে হচ্ছে, তাই।'

'আমার আর কি অভিজ্ঞতা—জেলে যান নিজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন।' বলে অধ্যাপক ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল লক-আপের দিকে। আমি বসে রইলাম। মানুষজন জেগে উঠেছে। জেগে ওঠার জাগতিক শব্দ আস পাস থেকে উঠে আসছে। লক-আপের সামনের দিকে একজন ছুটে গেল, দড়ির এক প্রান্ত তার কোমরে বাঁধা, অন্য প্রান্ত ধরে পিছনে পিছনে কনেস্টবল ছুটছে—হাসছে। লোকটি সকালের কাজ সারতে গেল। অধ্যাপক ছেলেটি লক আপের মুখ থেকে ফিরে এল। বলল, 'আমাদের নেবে না?'

'নেবে, একজন তো গেল—ফিরে আসুক!'

'চা এখনো এলো না?'

'আসবে, বসুন—এত ছটফট করছেন কেন?' অধ্যাপক ছেলেটি লক-আপের ভিতরে পায়চারি করতে থাকে। আমি বসে বসে দেখি।

বললাম, 'আপনাকে কোর্টে নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'জামিনের চেষ্টা করলেন।'

'না।'

'উকিল দিয়েছেন?'

'না।'

'কেন?'

'জামিন - টামিন, উকিল - ফুকিলে বিশ্বাস করি না।'

'এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে?'

'আছে। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষনা করেছি—তার কাছে আবার জামিন কি?—উকিল কি?' আমি ওঁকে কাছে

ইতিহাসের আখ্যায়িকা

ছোটরা গল্প পড়তে ভালবাসে, ইতিহাসের গল্প পড়লে তাদের আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই হয়। ছোটদের জন্য ইতিহাসের আখ্যায়িকা লেখেন রজনীকান্ত গুপ্ত। তারপর লেখেন অবনীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রকুমার। আজ তাঁরা বেঁচে নেই। তাদের রচনা-ধারার একমাত্র অনুগামী বর্তমানে শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। ছোটদের জন্য ইতিহাস আশ্রিত গল্প-উপন্যাস তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর কয়েক খানি বইয়ের নাম বলছি: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী 'মহাকালের পূজারী' দাম সাড়ে চার টাকা। গ্রীকরাজ মিনাণ্ডারের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী 'হে বীর প্রণাম করি' ও বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'নীল নায়ের মাঝি' বই দুখানি একত্রে কিশোর গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, দাম চার টাকা। ভারত উপকূলে পর্তুগীজ জল দস্যুদের অনাচার কাহিনী 'বেনগাঞ্জির আখড়া', দাম দুই টাকা। নবাব মীরজাফরের আমলের কাহিনী 'লালচাঁদের টাকা আর, নিমাইচাঁদের লাঠি দাম দেড় টাকা। সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা 'অরণ্য দেউল', দাম দুই টাকা। বৌদ্ধ যুগের তিনটি বড় গল্প নিয়ে 'আনন্দ ওমনিবাস' দ্বিতীয় খণ্ড, দাম পাঁচ টাকা। বইগুলির উপযোগিতা যাচাই করার জন্য ছোটদের দেবার আগে বড়রাও একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন।

ভ্রমণ-সাহিত্য

দেশভ্রমণে আনন্দ আছে। দ্রষ্টব্য স্থানের সব তথ্য জানা থাকলে সে আনন্দ বৃদ্ধি পায়। শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের ভ্রমণকাহিনী সেই দিক থেকে অপরিহার্য। বইগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রেফারেন্সে সমৃদ্ধ এবং গাইডের কাজ করে। তাঁর লেখা মন্দিরে মন্দিরে—মাদ্রাজ থেকে মহীশূর রাজ্য, রামেশ্বর ও কুমারিকা অবধি সচিত্র ভ্রমণ-কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, দাম আট টাকা। পশ্চিম দিগন্তে—বারাণসী থেকে ওয়া বন্দর অবধি খাজুরাহো জব্বলপুর ঝাঁসী, সাঁচী, ইলোরা, অজন্তা এলিফ্যান্টা, কানহেরী, দিলওয়ারা, সোমনাথ ভেট-দ্বারকা প্রভৃতি ভ্রমণ কথা; সচিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, দাম দশ টাকা। নালন্দা থেকে লুম্বিনী—সারনাথ থেকে কুশীনগর, নালন্দা, রাজগীর কপিলাবাস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থ পরিক্রমা। সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ দাম সাত টাকা। কাশ্মীর—স্বপ্নের কাশ্মীর ভ্রমণ-কথা। সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ দাম চার টাকা। নীলাচলের পথে—কটক থেকে বহরমপুর ওড়িষ্যা রাজ ভ্রমণ-কথা। সচিত্র। দাম চার টাকা। আমার দেশ আমার গর্ব—এ দেশের অবাক-করা দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ। দাম—আড়াই টাকা।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স কিশোর ভারতী

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯ এ।১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

ডাকি। ও পায়চারি করতে থাকে। হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দেই—পাশেই লক-আপ, পুলিশের লোক আছে, শুনবে। ও একবার লক-আপের দিকে মুখ তুলে আমার কাছে সরে আসে। 'কি-ব্যাপার?'

'বলছিলাম, কাছে আসুন কথা বলি।'

ছেলেটি আমার পাশে এসে বসল। বলল, এত কথা বলার কি আছে?... ডাকছেন কেন?'

'পাশেই পুলিশের লোক,—শুনে ফেলবে।'

'শুনুক গিয়ে, করবেটা কি?'

'কি আর করবে—তবু সবার জন্য সব কথা তো নয়।'

'কি বলছিলেন, বলুন?'

'আপনি বলেছিলেন ৩০২, ১২০এ, ১২০বি, কেস আপনার বিরুদ্ধে আছে। উকিল না দিলে লড়বেন কি করে।'

'কোর্ট কাচারি আইন আদালতে বিশ্বাস কী না উকিল দেব কেন?'

'আপনি উকিল না দিলে, ওরা দেবে। একতরফা বিচার হবে——সাজা হবে।'

'হোক। সাজা ওরা দেবেই, জোর করে দেবে—দিচ্ছে না?'

'দিচ্ছে! তবু আইনের তো ফাঁক-'

'সে ফাঁক-ফোকর আপনি দেখুন—আমার প্রয়োজন নেই—এত সব সংশোধনবাদী চিন্তা।' লকআপের মুখে ধাতব শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি চায়ের ছেলেটি এসেছে। আমি উঠে যাই। দু-ভাড চা নিয়ে ফিরে আসি। অধ্যাপক ছেলেটির হাতে একটি ভাড তুলে দেই। 'নিন্—ঠাণ্ডা।' ছেলেটি চুপ করে আমার হাত থেকে ভাড়টি তুলে নেয়।

আমি বললাম, 'রাগ করেছেন?' ছেলেটি চুপ করে থাকে। আমি ওঁর পাশে বসি। ছেলেটি বলল, 'আপনি জামিনের চেষ্টা করেছেন? উকিল ঠিক করেছেন?'

—'না।'

—'কেন?'

—আমি এখনো জানি না আমার কেস কি, কি ব্যাপার—কিছুই জানি না।'

—'জানলে করবেন?'

—'চেষ্টা করবো।'

—'কেন?'

—'করবো না? ওরা ইচ্ছে মত সাজা দেবে আমি মেনে নেব?'

'আপনার মানা, না-মানায় ওদের কি আসে যায়।'

—'কিছুই না।'

—'তবে চেষ্টা কেন?'

—'বেরুতে তো হবে, সারা জীবন জেলে থাকবো নাকি?'

—'সারা জীবন জেলে থাকবেন কেন? বেরুবেন।'

—'কি করে।'

—'জেল ভেঙে।'

—'এর আগে আপনি কি করে বেরিয়েছিলেন—জেল ভেঙে?'

—'না।'

—'তবে'

—'আগের বার মিসায় ছিলাম। ওরা আমাদের মাদ্রাজের কুড্ডালোরে নিয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকে ছেড়ে দিয়েছে।'

—'কেন?'

'কেন, তা জানবো কি করে? সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে, আমাকেও দিয়েছে।'

'না দিলে—কি করতেন?'

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হত।'

আমি বললাম, 'সে তো নিশ্চই, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়।' অধ্যাপক ছেলেটি হাতে চায়ের ভাড নিয়ে বসে ছিল। আমি বললাম, 'ওটা ফেলে দিন।' ছেলেটি 'ও' বলে ফেলে দিল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কখন এসেছে জানা যায় নি। এখন বেশ বুঝতে পারছি বৃষ্টি পড়ছে। ঘুলঘুলিতে বৃষ্টির ধোঁয়া কুয়াশার মত হাল্কা শরীর নিয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে। লক-আপের ভিতর একটা স্যাৎসেতে ভাব—শীত শীত ভাব। আমি জামাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসি।

'আর আপনার কোর্ট আছে?'

'আছে হবতো—কেন?'

'না এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনার আছে?'

'না,—কেন?'

'এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।'

আমি অধ্যাপক ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও মুখ নীচু করে থাকে। আমি বললাম, 'আচ্ছা, ভারতের প্রতিটি কোণই কি অগ্নিগর্ভ?'

অধ্যাপক ছেলেটি মুখ তুলে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'তা যদি হয়, তবে তো ধরে নিতে পারি ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির উপাদান এবং রূপ সব জায়গায় সমান।'

'নিশ্চই।'

'কি করে?'

'চেয়ারম্যান বলেছেন, আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে—পারে কিনা?"

'দাবানল সৃষ্টি করে স্ফুলিঙ্গেরাই. কিন্তু প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ কি দাবানল সৃষ্টি করতে পারে?'

—'না'।

—'না, কেন?'

—'পারে না, দাবানলকে ছড়িয়ে দেবার বিষয়ীগত প্রস্তুতি না থাকার জন্য পারে না।'

—'শুধু কি বিষয়ীগত প্রস্তুতি? নাকি, বিষয়গত অবস্থানেরও প্রয়োজন আছে।'

—'আছে।'

—'তা যদি থেকে থাকে, তবে আগে দেখা দরকার, ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি সংস্কৃতির কি সমবিকাশ হয়েছে না কি অসমবিকাশ।'

—'সমবিকাশ হয়েছে।'

—'কি করে?'

—'চারু মজুমদার বলেছেন, ভারতের প্রতিটি কোণ অগ্নিগর্ভ।'

—'ভারতের প্রতিটি কোণই যদি অগ্নিগর্ভ হয়—তবে আমাদের সমবিকাশের তত্ত্বের ওপর, সে দাঁড়াতে হয়।'

—'হবেই তো।'

—'না!'

—'কেন—না?'

—'ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির সমবিকাশ হয়নি।'

রসিকরঞ্জন ছদ্মনামী

প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক বসুমতীর ভূতপূর্ব প্রধান সম্পাদক

শ্রীকেদার ঘোষ রচিত

অথ রসিকরঞ্জন কথা

প্রথম খণ্ড ৮.০০

দ্বিতীয় খণ্ড ৮.০০

বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে, মনঃসমীক্ষণের গম্ভীরতায় এবং বর্ণনাভঙ্গীর স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র 'বেডসাইড বিডিং'

শ্লেষ-মধুর রম্যরচনা

লিপিকা

৩০/১এ, কলেজ রো ॥ কলি-৯

সাদা মলম

বি-টেক্স

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স এজেন্সী (প্রাঃ লিঃ)

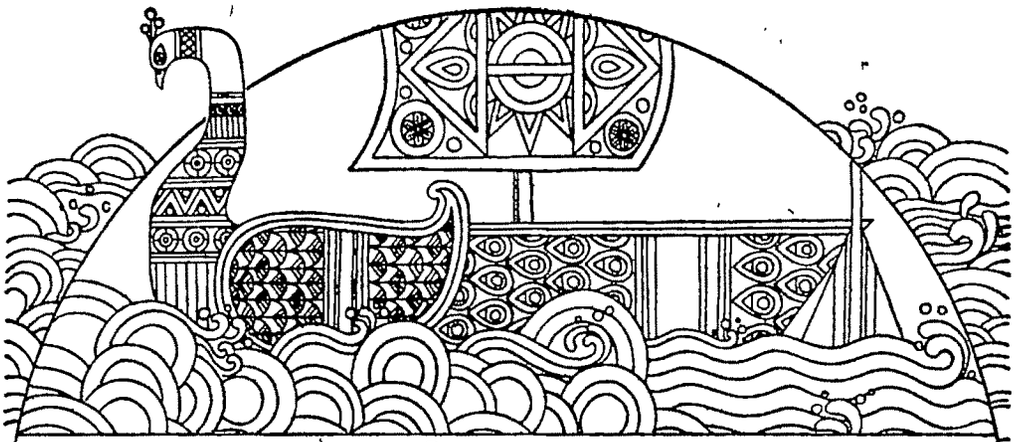

পূজায় চাই নতুন জুতো

অ্যাডমিরাল ৫৭

মোকাসিনো ১৩

এক্সিকিউটিভ ১৭

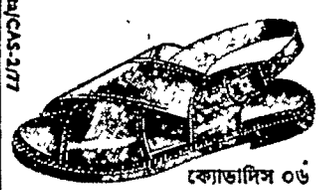

ক্যোডাদিস ০৬

জীন্‌স্ ৩৭

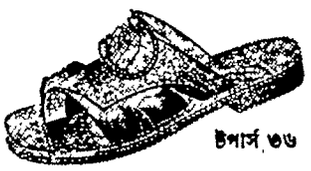

টপার্স ৩৬

নোভা ১৪

নোভা ১৩

সিনড্যারেলা ৭৮

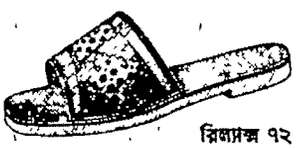

রিল্যাক্স ৭২

লিলিপুট ১৪

লিলিপুট ৪৪

জুনিয়ার ০৪

বম্ব মক ৫৪

Bata

Bata understands shoes

Bata/CAS-2/77

—এই তত্ত্ব সংশোধনবাদীদের তত্ত্ব।'

—'সে আপনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন, মানতে পারেন, না মানতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না।'

—'তবে এত প্রশ্ন কিসের—কথা কিসের?'

—'প্রশ্ন থেকে যায়—সারা জীবন থেকে যাবে এইসব প্রশ্ন—এখানে কারো-কিছু করার নেই।'

—'তবে চুপ করে থাকুন।'

'চুপ করে কি করে। একবার বলছেন ভারতবর্ষ আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক। আবার বলছেন সমবিকাশ। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের কখনো সমবিকাশ হয়।'

—'হয়।'

—'না, হয় না। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ মানেই অসম-বিকাশের দেশ। সে দেশের প্রতিটি কোণ অগ্নিগর্ভ হয় না।'

'তাহলে চারু মজুমদার ভুল বলেছেন?'

'অবশ্যই ভুল বলেছেন।'

'চারু মজুমদারের ভুল হয় না। উনি ভুল করতে পারেন না।'

'তাহলে তো কোন কথাই নেই।'

'নেই তো। আপনিই তো ধকধক করছেন।' বলে অধ্যাপক ছেলেটি উঠে যায়। লক-আপের ভিতর পায়চারি করতে থাকে। আমাকে দেখতে থাকে।

অক্ষর

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে প্রকাশিত

প্রখ্যাত কবি

৺যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

রথী ও সারথি ৩.

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

"কবিতায় গীতার মর্মানুবাদ। মূল বক্তব্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই; অথচ ছন্দোময় রচনার মধ্যে সাহিত্যের রস জমিয়াছে।"

—যুগান্তর

"প্রকৃত কর্ম - পথ - সন্ধানী কিশোর চিত্তের কথা ভাবিয়াই আমি এ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম"—ভূমিকায় কবির উক্তি

পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট: কলিঃ ৭৩

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘুলঘুলি দিয়ে আলো ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। কোন মালিন্য নেই আলোর ভিতর। আমি সেই আলোর দিকে চেয়ে থাকি। বুকের ভিতর হৃৎপিন্ড দুলতে থাকে। সন্দীপদা বলতেন, দেখ, কোনদিন এমন কোন মানুষ ছিল না, থাকবে না যার মধ্যে সবই ভুল অথবা তাঁর সবকিছুই সঠিক। ভুল আর নির্ভুল একে অপরকে আশ্রয় করে বাস করে। একে অপরের আধার। কারো মধ্যে ভুলের পরিমাণ বেশী থাকে, কারো মধ্যে কম। যার মধ্যে কম তার ওপরেই নির্ভর করবি বেশী কিন্তু নির্ভরশীল হবি না—তাহলে ঠকে যাবি, হেরে যাবি। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল ঠকে গেছি সন্দীপদা হেরে গেছি।' অধ্যাপক ছেলেটি পায়চারি করছে। আমি ওকে কাছে ডাকি। ও পায়চারি করতে থাকে। আমি লক-আপের দেয়ালে চোখ রেখে বসে থাকি। জরাজীর্ণ দেয়াল। ভিতরে ইঁট আছে, থাকে থাকে সাজানো। ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে চুন বালি সিমেন্ট। ইঁটের ওপরে বাইরে চুন বালি সিমেন্ট দিয়ে গাথা এই লক-আপের ঘর। এই ঘর অন্য কিছু হতে পারতো। কোন আর্টিস্টের স্টুডিও, ছেলে-মেয়ের পড়ার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর অথবা কোন দম্পতির শোবার ঘর। এইসব কিছু না হয়ে, হয়েছে থানার লক-আপ। এখন অধ্যাপক ছেলেটি পায়চারি করছে। আমি নড়বড়ে হৃৎপিন্ড নিয়ে বসে আছি। লক-আপের দেয়ালে দেখার কিছু নেই। সব কিছু পরিচিত, সাদামাটা মনে হয়। মনে হয় ঘরের কোণে এই টিনটাকে চিনি। একটু দূরে শালপাতা আর ভাঙা ভাঁড়ের আবর্জনাকে আমি চিনি। দুর্গন্ধকে আমি চিনি। এই আলো অন্ধকারকে আমি চিনি। ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে আবার বৃষ্টি নামল। এই বৃষ্টিকে আমি চিনি।

সেইদিনও ঠিক এইভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি আর অমল ট্রেনে যাচ্ছি। দূরপাল্লার ট্রেন। দুরাত দুদিন পার হয়ে আজ তৃতীয় দিনের রাত দশটা। একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ছোট স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম নেই। আলো নেই। দূরে একটা গুমটি ঘরের মত দেখতে পেলাম। কিছু একটা জ্বলছে। অমল বলল, এখানে আমাদের নামতে হবে।' আমি বললাম, 'এ কোন স্টেশন?'

—'হবে কিছু একটা—নেমে পড়ুন।'

—'চেন তো?'

—'চিনি। খুব চেনা।'

আমার হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। অমলের কাঁধে ঝোলা। অমল ঝোলার ভিতর থেকে কয়েকটা বই বার করে আমার নীচে, পেটের ভিতর গুঁজে নিল। আমাকে বলল, 'নামুন।'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমি বৃষ্টির ভেতর নেমে যাই। অমল আমার পিছু পিছু নামতে থাকে। চারদিক অন্ধকার। বৃষ্টির কণা দেখা যায় না। শব্দ শুনি, অনুভব করি—এ কোন অন্ধকার বৃষ্টি? একটা লোক, কালো কিছু গায়ে দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল অন্ধকার বৃষ্টির ভিতর।

আমি অমলকে বললাম, 'দৌড়োও'।

আমি আর অমল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দৌড়োতে থাকি। আমি বললাম, 'কোন দিকে?'

অমল হাত তুলে গুমটি ঘর দেখিয়ে দিল। ওটা গুমটি ঘর নয় স্টেশন অফিস। গুমটি ঘরে আলো জ্বলে না—জ্বালায় না।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। পায়ের নীচে উঁচু নীচু জমি, ভাঙা খোয়া, ছোট বড় পাথর অনুভব করছি। জলে কাদায় ভিজে একে অপরের গায়ে লেগে গেছে—মখামখি। অমল বলল, 'ছুটে লাভ নেই, ভিজে গেছি, পারছি না।' আমরা ছোটা বন্ধ করে হাঁটতে থাকি। বৃষ্টি পড়তে থাকে। অন্ধকার ঘন হয়। ঘন হতে থাকে।

'নাম জান?'

'কার?'

'যার ওখানে যাবো।'

'না।'

'তবে?'

'পদবী জানি।'

'কি?'

'শর্মা।'

'কি করে?'

'পরেন্টসম্যান।'

আমরা স্টেশন অফিসে চলে আসি। দু-এক ধাপ সিঁড়ি। তারপর লম্বা বারান্দা। পাশাপাশি ঘর। টিকিট কাউন্টার। দুটো কাঠের বেঞ্চ। ওয়েটিং রুম। এখানে বৃষ্টি নেই। বাইরে ঘন কালো বৃষ্টি পড়ছে। পর পর দুটো ঘর বন্ধ ছিল। দক্ষিণের একটা ঘর খোলা। ঘর থেকে মৃদু আলোর আভা ঠিকরে পড়েছে বারান্দায়। ভিজে বারান্দা চিক চিক করছিল।

'দেখ কেউ আছে কিনা।'

অমল অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। দরজার সামনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। একটি বৃদ্ধ মতন লোক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ফর্সা, দীর্ঘদেহী একটা কালো চাদর দিয়ে আপাদমস্তক মোড়া।

'কাকে চাই?'

'আমরা রাত্রে এখানে একটু থাকবো।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'এসেছি একটু দূর থেকে।'

'কোথায় যাবেন?'

'যাবো মালঞ্চে।'

'চলে যান—থাকবেন কেন?'

'সঙ্গে আলো নেই—পথ ঠিক চিনি না।'

'পথ চেনার কি আছে? দক্ষিণে গিয়ে সোজা বাঁয়ে বেঁকে যাবেন। মাইল খানেক তো যেতে হবে।'

'অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে, নতুন এসেছি।'

'থাকতে চান, থাকুন। আমার কোন আপত্তি নেই।' বলে, বৃদ্ধ লোকটি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। অমল ফিরে আসে।

'কার সঙ্গে কথা বললে?'

'স্টেশনের কেউ হবে।'

কি দরকার ছিল কথা বলার!'

'বলে রাখা ভাল। না হলে অনেক সময় ঝামেলা হয়।'

'কি আর ঝামেলা হবে। একটু পরে যখন দেখবে আমরা স্টেশনে নেই—তখন সন্দেহ করবে—কি ভাববে।'

'কি আর ভাববে—ভাববে, আমরা চলে গেছি।'

আমাদের জামা কাপড় ভিজে গিয়েছিল। গা গড়িয়ে জল পড়ছে। অমলের ঝোলা বই সব ভিজে গেছে। পেটের নীচ থেকে বইগুলো বার করে আমার হাতে দিল। বলল, 'আপনার ব্যাগে ট্রুকিয়ে নিন—আগে দিলে ভাল হত।' আমি ওর হাত থেকে বইগুলো তুলে নি। 'রেড-বুক', 'তিনটি লেখা', 'জনগণের সেবা কর।'

'এখন কি করবে?'

'কি আর করবো? একটু বসি, বৃষ্টি থামুক, তারপর বেরিয়ে পড়বো।'

'তার আগে, জামা-কাপড়গুলো নিংড়ে নাও।'

'ঠিক বলেছেন।' বলে, অমল জামা-কাপড় খুলতে থাকে। আমিও খুলতে থাকি। এ-ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে সব কিছু খুলে ফেলে নিংড়ে নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকে। অমল হাসছিল। আমি বললাম, 'খুব ক্ষিদে পেয়েছে অমল, ধারে কাছে কোথাও কিছু নেই?'

'না। এখানে ধারে কাছে বলে কিছু নেই। এক আছে শর্মার বাড়ি, ওখানে গেলে কিছু হতে পারে।

'তা হলে চল। বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই।'

'আপনার হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন তবে, দেখা যাক কি হয়।'

আমরা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৃষ্টির ভিতরে চলে যাই। এখন বৃষ্টি অনেকটা হাল্কা—মসৃণ। বেশ লাগছিল হাঁটতে। অমল বলল, 'কাকে জিজ্ঞেস করি বলুন তো?'

'কি?'

'শর্মার বাড়ি কোথায়।'

'তুমি চেন না।'

'চিনি, অনেকদিন আগে এসেছিলাম—ঠিক মনে পড়ছে না।'

'চেষ্টা কর—জিজ্ঞেস করতে হবে না।'

অমল বলল, 'ঠিক আছে—আসুন তো।'

যেখানে আমরা এসে নেমেছিলাম। সেখানে অমল একটু দাঁড়াল। লাইনের এদিক ওদিক তাকিয়ে কিসব দেখলো। আমি বললাম, 'এদিকে কি?'

'শর্মার বাড়ি।'

'চিনতে পারছো?'

'চিনবো ঠিক। আসুন না।'

অমল রেল লাইন পেড়িয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। এ-দিকটা জল আর কাদায় পথ ডুবে আছে। বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। এই অন্ধকারেও একটা আলোর আভা জলের ওপর খেলছিল। কালো সিসের বুকে যেমন সাদা থাকে, জলের রঙে সেই সাদা ভাসছিল। অমল বলল, 'সাদা জায়গায় পা দেবেন না—ওটা জল। কালো জায়গায় পা দিন।' আমি হেসে বলি, 'আমাকে কি আনাড়ি পেয়েছ?' কাদা খোচার মত জল টপ্‌কে টপ্‌কে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু দূরে জমি একটু ওপরে উঠে গেছে। তারপর একটা ফাকা জমি। জমির ডানদিকে বাঁদিকে কয়েকটা ঘর অন্ধকারের পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে বাঁশের ঝোপ—আম জাম আর বনজ গাছ পেরিয়ে কলা গাছের সারি। ঝিঁঝির একটানা শব্দ নিঝুম করে দিয়েছে চারদিক। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে উঠলো। আমি বললাম,

'কি—চিনতে পারছো?'

'মনে হয় পারছি—আসুন না।'

কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হয় না। এখানে কেউ ছিল বলেও মনে হয় না। অথচ অমল হাঁটতে থাকে, এগিয়ে যায়।

'এখন কেউ কি জেগে আছে?'

'না। সন্ধ্যা হলেই এখানে সব শুতে যায়। আজ বৃষ্টির রাত, কে জেগে থাকে?'

'তাহলে কি করবে?'

'ডেকে তুলবো।'

আমি ঠাট্টা করে বলি, 'জনগনের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গবে?'

অমল হেসে ওঠে। 'কাঁচা ঘুম কোথায়? হাজার বছর ধরে ঘুমাচ্ছে।'

আমরা আর একটু এগিয়ে যাই। ঘরগুলোর কাছাকাছি চলে আসি। একটা ঘরের চালের নীচ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল। আমি অমলকে বললাম, 'দেখ, ওই ঘর থেকে ধোঁয়া আসছে। হয়তো কেউ জেগে আছে—চল।' অমল বলল, 'আসুন।'

একটু পরে অমল চেঁচিয়ে ওঠে, 'পেয়ে গেছি—এটাই শর্মার বাড়ি।'

আমি বললাম, 'দেখ ভালো করে।'

'দেখতে হবে না—এটাই—আসুন।'

পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। ঘরের গা ঘেঁষে কয়েকটা সুপারী গাছ সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। ডাইনে বাঁয়ে বাঁশের বেড়া। বেড়া টপকে আমরা উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। পরিষ্কার উঠোন। জলে ভিজে চিকচিক করছে। একটি বউ উঠোন পেরিয়ে এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে প্রায় দৌড়ে সামনের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। অমল ডাকলো, 'কে-আছেন?' কোন সাড়াশব্দ নেই। ভেজা জামা কাপড় নিয়ে আমরা ভিজে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। অমল আবার ডাকল। এ-বার সাড়া এল ভিতর থেকে।—'কে?'

একজন মাঝবয়সী লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। খালি গা। পরনে খাটো ধুতি। মাথায় ঝাকড়া চুল। কালো। আমাদের দেখে তিনি দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলেন। 'কাকে চাই?'

'শর্মা আছে?'

'কোন শর্মা?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না মেজদা—আমি অমল।'

'ও—তা, বিবু তো বাড়িতে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'দেশে।'

'কবে ফিরবে?'

'ঠিক নেই,—কেন?'

'একটু দরকার ছিল।'

'কোন দরকার নেই—ও অর পার্টি-ফার্টি করবে না— আপনারা যেতে পারেন।'

'বলছিলাম কি.....'

'আপনারা যেতে পারেন।'

অমল আমার মুখের দিকে চোখ তুলল। ধীরে স্বর নামিয়ে বলল, 'কি করি বলুন তো?" ওদিকে দরজা বন্ধ করে মেজদা ঘরের ভিতরে চলে যান।

আমি বললাম, 'এই বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। এত রাতে সবাই জেগে—ব্যাপার কি?

অমল একটু উদ্যোগী হয়ে বলল, 'দেখবো।'

(চলবে)

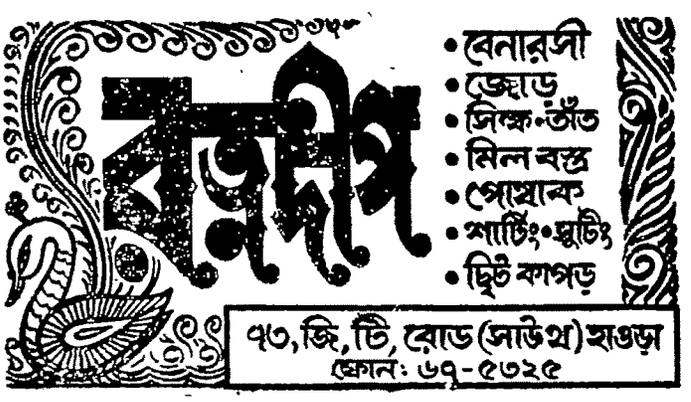

প্রবন্ধ সিংহ

আপনাকে নিয়ে কেউ রসালাপ করলে সইতে পারেন ?

কিংবা নিজেকে নিয়েই কি রসালাপ করতে পারেন আজকাল ?

নিজেকে নিয়ে, নিজের বন্ধুবান্ধব পরিজন নিয়ে, শ্রেণী বা জাতিকে নিয়ে ? —না, পারেন না। সে-সব দিন আজ গত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই রসালাপের স্বর্ণযুগ পেরিয়ে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি বিংশ শতাব্দীর রামগরুড়ের যুগে। এখন অস্মদ্দেশে শিল্প ও সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে অতি দ্রুত রসগ্রহণের ক্ষমতা কমে আসছে। জীবনের সবটাকেই আমরা একটা গুরুগম্ভীর শোকযাত্রার অন্তর্গত করে নিয়ে, খুব কায়দামাফিক চৌকোন-ছন্দে 'ঘাস-বিচালি' করে চলেছি। ঘাস-বিচালি অর্থে লেফট-রাইট। একবার রসালাপ করেই দেখুন না। বলবে হয়, আমার জাত তুলেছে, নাহলে বয়স, নাহলে রূপ, শিক্ষা, উপাধি, পাঁজসন, বাপ-মা এবং কি নয় ? রসিকতা এখন 'বার্ষিক পরিকল্পনা', 'দফা' এবং 'কর্মসূচী'র যাঁতাকলে পিষে চ্যাপটা হয়ে গিয়েছে চোপসানো আর উড্ডীন বেলুনের মধ্যেকার মর্মান্তিক তফাতে সে আজ বিপর্যস্ত। আজকাল তাই রসালাপে বিপদ হচ্ছে। এবং সে-বিপদ পদে পদে। অথচ এক কালে 'বিদ্যাসাগরী' চটিজুতা নিয়ে বঙ্কিমের কটাক্ষপাতে, করুণাসাগর তো ক্রুদ্ধ হননি, বরং তিনি সানন্দে উত্তর করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরী চটিজুতা পুরানো হলেই 'বঙ্কিম' হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, এ-যুগের দুজন মহারথী কি পরস্পরকে এ-ধরনের রসিকতা করতে সাহস করবেন, না রসিকতার রস গ্রহণ করবেন সাহিত্যিক বলবেন—ব্যাটা শুকনো পণ্ডিত, রসালাপের ছলে, আমায় বোধহয় এবার সাহিত্য পুরস্কারটা না দেবার জন্য প্যাঁচ কষছে। আর পণ্ডিত ভাবতেন—ব্যাটা মূর্খ সাহিত্যিক, রসালাপের ছলে আমাকে লেট-ডাউন করবার জন্য চক্রান্ত করছে।

চাঁ কী, রসালাপকে অনৃত-ভাষণের মার্কা দেবে, পত্রিকায় প্রতিবাদ, এমনকি উকিলের সাহায্যও নিতে পারেন। তাই বলছিলাম, বিংশ শতাব্দীতে রসালাপ ব্যাপারটিই যেন বিষয়-বহির্ভূত। কিন্তু কেবল রসালাপের মুহ্যমানতাই সত্য কী ? রসালাপের 'অসাড়তা'ও তো মিথ্যে নয়।

তবু মাঝে মাঝে গাছ-কাটা গুঁড়ি থেকে যেমন নতুন পাতা বেরোয়, তেমনি এখানে-ওখানে কিছু কিছু রসগ্রাহীতার চিহ্ন মেলে। যেমন একটি ছবি এক্ষুনি মনে পড়ছে, যা অল্প কিছুদিন আগেই আমরা পাড়ায় পাড়ায় দেখেছি। অফিস-ফিরতি পাড়ার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অজান্তেই হেসে ফেলেছিলাম, যখন পাড়ার গলিতে দু-দল রকের ছেলেদের হাসি-গল্পের মাঝখানে ঝুলতে দেখলাম ভাঙা কলসী আর পুঁইশাকের লতিকে। দুটি বিবাদমান ফুটবল দলের পতাকা যেন পত-পত করে উড়ে হাসছে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

যদি রসগ্রাহী মন না থাকতো, এই ফুটো-কলসী আর পুঁইশাকের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই তুমুল ধুন্ধুমার লেগে যেতে পারত। কিন্তু এই সুন্দর খেলোয়াড়ী মনগুলিকে শেষপর্যন্ত বাঁচিয়ে নিয়ে যাবে কে ? আমাদের সংস্কৃতির প্রধান হাতিয়ার-গুলো তো এখন স্থূল ভাঁড়ামির হাতে। বাংলা সাহিত্যেও রসিকতার মান নামতে নামতে এখন 'প্যান্টের বোতাম' তক্ এসে পৌঁছে গেছে।

আফটার শিবরাম হু ?

না, কেউ না। উই আর ড্রাইং ব্ল্যাংক্। আজকাল হাসির গল্পের ছিরি দেখলে কান্না পায়। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। পাতিলেবু ফুলিয়ে বানানো যায় না বাতাবী। দরকার পড়লেই যখন-তখন হাসির গল্প-লেখক বানানো যায় না।

যে-কথা বলছিলাম, এই বিংশ শতাব্দীতে রসিকতায় বিপদ আছে। একবার পরিমল গোস্বামী এমনিতর বিপদে পড়েছিলেন। তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের পাতাটি সম্পাদনা করতেন তখন। সে-সময় জনৈক ডাক্তারবাবু যুগান্তরে সম্ভবতঃ সাহিত্য বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন। সেই লেখার তলায় পরিমল গোস্বামী মজা করে লিখেছিলেন যে, আর একজন ডাক্তারও কবিতাটবিতা লিখতেন। তাঁর নাম ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর যায় কোথায়!—চিঠির পর চিঠি। এবং ক্রমাগত চিঠি। ছি-ছি-ছি যুগান্তরের রবিবারের পাতার সম্পাদক এত অশিক্ষিত। তিনি এপর্যন্ত জানেন না যে ডাক্তার হওয়াটাই রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় নয়। তিনি 'নোবল প্রাইজ' পেয়েছেন। তিনি বিশ্বকবি। রসালাপ করে যেমন আতান্তরে পড়তে হয়, তেমনি আতান্তরে পড়লেও রসালাপের দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায়। এর অন্যতম দুটি উদাহরণ পর পর রাখছি।

প্রেমাংকুর আতর্থী বা বুড়োদা বা মহাস্থবির জাতক তখন কলকাতার একটি পত্রিকার সম্পাদক। খুব পপুলার লোক। বহু 'হেঁ হেঁ পার্টি' তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তৈল দেয়, এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে এটা জনসমক্ষে প্রমাণ করতে পারলে কৃতার্থ হয়।

এহেন বুড়োদা একদিন ট্রামে যাচ্ছেন। বসেছেন বেশ সামনের দিকের সিটে। হঠাৎ পিছন থেকে—এই যে বুড়োদা, কেমন আছেন ?

তারপর বুড়োদার ঘর-সংসার, চাকরি, নতুন লেখা ইত্যাদি কতরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা যায় সব বর্ষিত হতে লাগলো পিছন থেকে। বুড়োদা যত হা-হুঁ করে গলা নামিয়ে উত্তর দেন—ওদিকের গলা তত জোর হয়, ব্যক্তিগত হয় আর ট্রামশুদ্ধ লোকের চমকপ্রদ কাজের খোরাক হয়। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলেন না বুড়োদা। হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন,—আমার তো সব খবর শুনলেন কিন্তু আপনার সেই পুরোনো রোগটি কেমন আছে ? তাতে জানা হল না। বলেই একটি পরিচিত যৌন-ব্যাধির নাম করে বসলেন বাধ্য হয়ে। বলাই বাহুল্য, অতঃপর পশ্চাতে কবরের নিস্তব্ধতা।

আর এক পরিচিত লেখক, বয়সে তরুণ, —ট্রেনে যাচ্ছিলেন। অমনি একজন খেজুরে পল্লবগ্রাহী ছোঁকে ধরলেন তাঁকে। —আরে! আপনিই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ? আপনার কত বই পড়েছি। আমি তো আপনার 'ফ্যান'। আচ্ছা 'গোলাপ কেন গোলাপী' বইটা তো আপনারই লেখা তাই না ?

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ঠোঁটের তাক্ থেকে পছন্দমত বক্ত হিম-করা সেই হাসিটি নামিয়ে এনে বললেন—শুধু গোলাপ কেন গোলাপীই বা বলছেন কেন দাদা ? আমার 'গুদামে গুমখুন' বইটা পড়েননি ? 'ফুয়েরারের ফোয়ারা' ? কিংবা 'অট্টহাসের অট্টহাসি' ?

ও বাব্বা, এতসব বই লিখেছেন আপনি ? এই বাচ্চা বয়সে ?

বুদ্ধমূর্তির মত ভারিক্কী মুখ করে শ্যামল বললেন, — আসলে আমাদের ফ্যামিলিটাই একটু লিটারারি মাইন্ডেড কিনা ? যেমন দেখুন না আমার আরো দুটি ভাই—তাঁরাও লেখেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। আর আমার বাবাকে তো জানেনই আপনার। প্রখ্যাত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার দাদু তো স্বনামধন্য 'উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আর দাদুর বাবা 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা তো আমাদেরই ফ্যামিলির জিনিস।

এরপর আমরা জানি না শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ফ্যান পরবর্তী স্টেশন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন, না দরজা থেকেই লাফিয়ে পড়েছিলেন ?

দামাল দামু নেই

কলকাতা ময়দানের দামাল ছেলে দামু চলে গেলেন। বড় অপ্রত্যাশিত, বড় বেদনা-দায়ক এই মৃত্যু। যিনি কোনদিন কোন কিছুকেই পরোয়া করেন নি সেই অনিল দে'কে দিনকয়েক আগে হার স্বীকার করতে হলো অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্তের কাছে। তাদের আক্রমণে মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন অনিল দে। সেই আঘাতই মৃত্যুর রূপ ধরে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল শুক্রবার (২৩-৯-৭৭) বেলা এগারোটা নাগাদ।

নামের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ছিল তাঁর। দামু দামালই। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে তাঁর মতো নামী খেলোয়াড় অল্প কজনই বা ছিলেন। খেলতেন ঝড়ের বেগে। নিজেকে কোনদিন বেঁধে রাখেন নি কোন একটি বিশেষ জায়গায়। প্রথমে খেলতেন ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসেবে। তারপর নেমে এসে রাইট হাফ ব্যাকে।

সে যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন অনিল দে। ১৯১১ সালে প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয়ের পর থেকে মোহনবাগান বরাবরই ডাকসাইটে দল। সেই মোহন-বাগানের নেতৃত্বের ভার তাঁর ওপর পড়েছে একাধিকবার।

কিন্তু তাঁর ঐ বেপরোয়া মনোভাব আর দামাল চরিত্র তাঁকে বার বার অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু মনটি ছিল তাজা ঘোড়ার মতো টগবগে।

তাই চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে —সারা দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের দামামা বেজে চলেছে তখন দামাল দামুও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বড় বিচিত্রভাবে। ইডেনে তখন বসেছে বড় ক্রিকেটের আসর। খেলতে এসেছেন বিশ্ব বিখ্যাত খেলোয়াড়রা। খেলছেন কিথ মিলার, ডেনিস কম্পটন। তখনই 'বিদেশী খেলা বন্ধ কর'—এই আওয়াজ তুলে রসিদ আলি দিবসে অনিল দে তাঁর দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একদিনের জন্যে চঞ্চল করে তুলেছিলেন ইডেন উদ্যানকে।

কিন্তু নিজেকে কোনদিনই স্থির রাখতে পারেন নি অনিল দে। তাঁর দামাল চরিত্র সব কিছু যেন লণ্ডভণ্ড করে দিত। অহেতুক বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তেন, জড়িয়ে পড়তেন এমন সব কাজে যা তাঁকে মানায় না। কিছুতেই মানায় না। কিন্তু ওঁর ঐ দামু নামটি যেন ওঁকে দামাল করে দিত।

বেশ কয়েক বছর আগে অতীতের খ্যাতনামা নায়িকা অনুভা গুপ্তার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর তিনি যেন আরো

অনিল দে

বেশী দামাল হয়ে উঠেছিলেন। কোন বাধা মানতেন না। কোনকিছু পরোয়া করতেন না।

ময়দানকে বড় ভালোবাসতেন অনিল দে। গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস তাঁকে টানতো। ফুটবল ছিল তাঁর প্রাণ। তাই সুযোগ পেলেই ভেটারেন্স ক্লাবের জার্সি গায় চড়িয়ে দামাল দামু নেমে পড়তেন মাঠে। ভেটারেন্স ক্লাবের সঙ্গে খেলতে যখন বাইরে যেতেন তখন তিনি একাই মাতিয়ে রাখতেন দলটাকে। হাসি, হুল্লোড় আর গল্পে কেটে যেতো সময়।

দেখতে দেখতে তাঁর জীবনের সাতাশটি বসন্ত যে কেটে গেছে একথা কোনদিন কাউকে বুঝতে দেন নি। অবশ্য আজ-কালকার দিনে সাতাশ কোন বয়সই নয়।

কিন্তু তাঁর ঐ দামাল চরিত্রটিই হয়তো তাঁর অপ্রত্যাশিত শেষের দিনটিকে তড়িঘড়ি করে টেনে আনলো। তাঁর মাথার পেছনে লোহার রডের প্রচণ্ড আঘাত এবং প্রচুর রক্তপাত গোবরার চিত্তরঞ্জন হাস-পাতালে অন্তিম লগ্নটি বয়ে এনে ইতির দাঁড়ি টেনে দিল ময়দানের একটি দামাল চরিত্রের ওপর। বড় নিষ্ঠুর এই আঘাত, বড় করুণ এই মৃত্যু।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রজকিশোর দত্তের

অ থেকে বিসর্গ

এই লেখকের পরের বই

সরমা ও আমি—উপন্যাস

টিকলু—হাসির গল্প

এ নহে গল্প—গল্পগুচ্ছ

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট

১২।১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

নাথ ব্রদার্স ও হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

কলিকাতা-১২

সম্প্রতি প্রকাশিত রচনাবলী

বনফুল রচনাবলী (১১শ খণ্ড)

প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ তাদের খণ্ডটি তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করুন।

মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বুদ্ধদেব বসু রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড)

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (৫ম খণ্ড)

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২য় খণ্ড)

নরেন্দ্রনাথ রচনাবলী (১ম খণ্ড)

প্রতিটি রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের মূল্য ২০৲। মূল্যবান তথ্যপঞ্জী সমৃদ্ধ। প্রতি খণ্ড কম-বেশি ৬০০ পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য বাঁধাই, আকর্ষণীয় মুদ্রণে।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩

খেলা

প্রদর্শনী ফুটবল

ইডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে বহু প্রত্যাশিত কসমস বনাম মোহনবাগানের প্রদর্শনী ফুটবল খেলাটি ২—২ গোলে অমীমাংসিত থেকে গেছে। তারকাখচিত এই কসমস ফুটবল দল নর্থ আমেরিকান ফুটবল লীগের খেলায় এবছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান। মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণে তারা কলকাতায় এই প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলতে এসেছিল। এই দলের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ফুটবলের সর্বকালের সম্রাট পেলে।

প্রতিভাবান খেলোয়াড়পুষ্ট কসমস দলের খেলা দেখে দর্শকরা কিন্তু খুবই হতাশ হয়েছেন। অপরদিকে মোহনবাগান অসাধারণ ভাল খেলে দর্শকদের মন জয় করেছিল। মোহনবাগানের অতি গোঁড়া সমর্থকরাও ভাবতে পারেননি মোহনবাগান এত ভাল খেলবে। দর্শকদের দারুণ হতাশ করেছেন ফুটবলের সম্রাট পেলে। খেলার মাধ্যমে পেলে এইদিন দর্শকদের সামনে সম্রাটের ভাবমূর্তি ধরে তুলতে পারেননি। ১০ মিনিটের খেলায় তাঁর মাত্র কয়েকটা পাসের কাজ, শট এবং সপ্রতিভ ক্রীড়া-তৎপরতা প্রমাণ করে তিনি একজন জাত খেলোয়াড়। কিন্তু এতে কি দর্শকদের মন ভরে?

কয়েকদিন ধরে সারা কলকাতা শহর যেমন কসমস ক্লাব এবং ফুটবলের সম্রাট পেলের খেলা দেখা নিয়ে মেতে উঠেছিল, এখন তেমনি তাদের খেলা নিয়ে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে ফুটবলের অনুরাগী মহল। সর্বত্র আলোচনা চলছে পেলের এবং কসমস ক্লাবের নৈরাশ্যজনক খেলা নিয়ে। এই খেলা দেখানোর জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ? এটা নিঃসন্দেহে বিরাট অর্থ এবং সময়ের অপব্যয়। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, এই খেলা থেকে আমাদের দেশের ভাবীকালের ফুটবল খেলোয়াড়রা নাকি ফুটবল খেলার অনেক কিছু কলা-কৌশল তুলে নিতে পারবে এবং তারকাখচিত ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলা দেখে দেশের ছেলে-মেয়েরা ফুটবল ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত হবে। মরেরা ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত হবে। খেলার শেষে দেখা গেছে অগণিত দর্শক প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ক্ষোভে খেলার টিকিট টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছেন। সময় এবং অর্থদণ্ডের জন্যে আপশোস করছেন। তাঁদের কাছে একমাত্র বড় সান্ত্বনা যে, মোহনবাগান ক্লাব ভারতীয় ফুটবল খেলার মুখ রেখেছে। এবং অল্পের জন্যে তাদের এইদিনের খেলায় জয়লাভ হাতছাড়া হয়েছে।

প্রথমার্ধের ১৯ মিনিটের মাথায় পেলের কাছ থেকে বল পেয়ে কসমস দলের কার্লস আলবার্টো এইদিনের খেলায় প্রথম গোলটি দেন। এই গোলের আগে হাবিব কসমস দলের গোলের মুখে একমাত্র গোল-কিপারকে কয়েক গজ দূরে পেয়েও গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। গোল খাওয়ার দুমিনিট পরেই মোহনবাগানের শ্যাম থাপা গোল শোধ করে দেন। প্রথমার্ধের খেলার ৩৩ মিনিটের মাথায় হাবিব দলের দ্বিতীয় গোল করেন। বিরতির সময় মোহনবাগান ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। মোহনবাগান এদিনের দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পাঁচজন খেলোয়াড় বদলী করে। অপরদিকে কসমস ক্লাব করে দুজন। খেলার ৭৩ মিনিটের মাথায় এক বিতর্কিত পেনাল্টি কিক থেকে কিনালিয়া গোল দিয়ে খেলার ফলাফল সমান করেন। কসমস দলের কোচ মোহনবাগানের বিপক্ষে এই পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্তে রেফারীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। খবরে প্রকাশ, মোহনবাগানের এইদিনের খেলা দেখে পেলে বিস্ময় প্রকাশ করে তাদের খেলার প্রশংসা করেন।

দুই দলের খেলোয়াড়

মোহনবাগান : শিবাজী ব্যানার্জি (বিশ্বজিত দাস); সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী ও দিলীপ পালিত (কম্পটন দত্ত)' গৌতম সরকার (দিলীপ সরকার) ও প্রসূন ব্যানার্জি; হাবিব, আকবর (সুভাষ ভৌমিক), শ্যাম থাপা (মানস ভট্টাচার্য) এবং বিদেশ বসু।

কসমস : ইরল ইয়াসিন; কার্লস আলবার্টো; ওয়ার্নার বথ, নেলসি মোরাইস (ফোরমোজ) ও বিলডো মেনেজ; টেরি গারবেট (কানটিলো) এবং ভিটোমির ডিমিত্রিভিচ; টনি ফিল্ড, স্টুর্ট স্কুলিয়ন, পেলে এবং কিনালিয়া।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠেছে দুই চির পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৪—০ গোলে এরিয়ান্সের বিপক্ষে জয়ী হয়। মোহনবাগানের পক্ষে গোল করেন মানস ভট্টাচার্য (২), শ্যাম থাপা এবং বিদেশ বসু। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে বি এন আর-কে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দুটি গোলই দেন রঞ্জিৎ মুখার্জি।

এই নিয়ে মোহনবাগান ২৫ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ২৪বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল ২৩বার ফাইনালে উঠে জিতেছে ১৫বার, রানার্স-আপ হয়েছে ৫বার এবং তাদের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৩বার (প্রতিবারই মোহনবাগানের বিপক্ষে)। অপরদিকে মোহনবাগান ২৪ বার ফাইনালে উঠে জয়ী হয়েছে ১০বার, রানার্স-আপ ১০বার এবং তাদের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৪বার (রাজস্থানের বিপক্ষে একবার এবং ইস্ট-বেঙ্গলের বিপক্ষে তিনবার)।

মোহনবাগান প্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয় ১৯১১ সালে ইস্ট ইয়র্কের বিপক্ষে ২—১ গোলে। এটা ছিল মোহন-বাগানের প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ১৯৪২ সালে তাদের প্রথম আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় ১—২ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং দলের কাছে হেরে যায়। ইস্টবেঙ্গল প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয় করে ১৯৪৩ সালে পুলিশকে ৩—০ গোলে হারিয়ে।

ইতিপূর্বে আই এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ১৫বার। এই খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইস্টবেঙ্গলের জয় ৯বার (এর মধ্যে দুবার যুগ্মবিজয়ী), মোহন-বাগানের জয় ৫বার (এর মধ্যে দুবার যুগ্মবিজয়ী), খেলা পরিত্যক্ত ২বার এবং ১৯৫৯ সালে এই দুই দলের ফাইনাল খেলার আসর একেবারেই বসেনি।

দর্শক

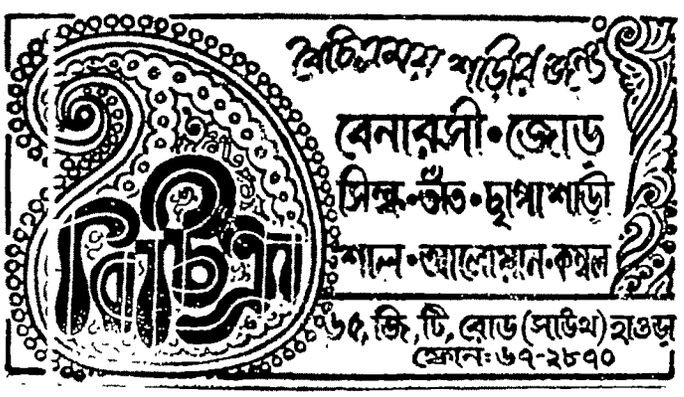

সিনেমা

চলচ্চিত্র ও সততা

ছবি করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মানবিক বোধ এবং বাস্তবজগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান। ঋত্বিক ঘটকের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরাও সহমত পোষণ করি এজন্য যে সিনেমা যাঁরা করেন আর যাঁরা দেখেন তাঁরা কেউই সমাজের বাইরে নয়। কোনো চলচ্চিত্রে শিল্পের ধর্ম পালিত হোক বা না হোক তা জীবনের বাইরে যেতে পারে না। এবং সেই জীবনকে চলতে হয় মাটির পরে পা রেখে। এই সত্তর দশকে দাঁড়িয়ে তিরিশ বা চল্লিশ দশকের কাহিনী যে কেউ বলতে পারেন, কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গী যেন স্বচ্ছ হয়। আমরা দর্শকেরা তাঁর কাছ থেকে চাইব ঐ দশকের প্রকৃত রূপ। বিকৃত বা মিথ্যে দৃশ্য নয়। আসলে চলচ্চিত্রের প্রথম যে শর্ত, তাহল বক্তব্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হওয়া। তিনি নিরপেক্ষ না হতে পারেন, তাঁর বিশেষ মন্তব্য বা মতবাদ চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা করতে যে কোন ঘটনা আনতে পারেন, কিন্তু তা যেন সময়ের শর্ত পুরোপুরি পালন করে।

চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিচালকদের জন্য নির্মিত নয়, নির্মিত হয় দর্শকদের জন্য। তাই তাঁদের দিকেই সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাহলে কি দর্শকরা যা চান, তাই-ই চলচ্চিত্রে আনতে হবে। এ প্রশ্নের আগেই আর একটা জিজ্ঞাসা এসে যায়: দর্শকরা কি চান? এই চাওয়া ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আপেক্ষিক। হলে ঢোকার আগে দর্শকেরা নিজেরাই হয়তো জানেন না কি তাঁদের চাওয়া বা কি ভাল লাগে। চলচ্চিত্রকারদের এখানেই সুযোগ। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব চাওয়া ও ভাললাগাগুলো দর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেন। দর্শকেরাও তা গ্রহণ করেন, ছবি দেখতে দেখতে ভাবেন 'আরে এটাই তো আমি ভেবেছিলেন।' এবং এখানেই গড়ে ওঠে চিত্রস্রষ্টা ও দর্শকদের এক অদৃশ্য সম্পর্ক।

পরিচালকের প্রথমেই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং রুচিশীল বোধ, মানে সাহিত্যবোধ, শিল্পবোধ, সমাজবোধ এইসব আর কি। এই গুণগুলো তার আয়ত্তাধীন থাকলে তিনি দর্শকদের কমান্ড করতে পারেন। তখন তাঁর অঙ্গুলিচালনায় দর্শকের গতি স্থির হয়। কিন্তু কেউ যদি ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ দর্শকের ওপর ছেড়ে দেন (যা আজকাল ভারতীয় সিনেমায় হচ্ছে) তাহলে তা যেমন একদিকে শিল্প হয় না, অন্যদিকে দর্শকও সেদিকে পা বাড়ান না। হাল আমলের ছবিগুলো পরিণতি দেখলেই এটা

সঙ্গীতা ছবিতে রূপা ও দীপন্তে

একেবারেই মনগড়া, এর সমস্যা এবং সমাধানও তেমনি, যা যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির বাইরে। এ বিষয়ে অনেকের মন্তব্য, দর্শকেরা যা চান, তাই তাঁরা দিচ্ছেন। তর্কের খাতিরে যদি একথা স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন আসে, সবসময় এইসব তথাকথিত দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি চলে। দর্শকের রুচি পাল্টাতে স্রষ্টাদেরই আগে এগিয়ে আসা উচিত। পেইন্টিংস, সাহিত্য ইত্যাদিতে আজ যে বিবর্তন, তা এভাবেই এসেছে। তা নাহলে শুধুমাত্র দর্শকের দিকে তাকিয়ে থাকলে গল্প-কবিতা টেকচাঁদ ঠাকুর বা ভারতচন্দ্রের যুগেই থাকত।

সত্যি বলতে কি, বেশকিছু মূর্খ এবং আধামূর্খ, যাঁরা বেশীকিছু নয়, তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কেও অভিজ্ঞ তারাই চলচ্চিত্র মাধ্যমকে পুরোপুরি কব্জা করার কথা ভাবতেন, তাঁরা হয় চলচ্চিত্র থেকে সরে গেছেন বা যাচ্ছেন, নয়তো কোয়ালিশান করেছেন। আজকের চলচ্চিত্রশিল্পের চারদিকে মিথ্যে, ভণ্ডামী, শঠতা। এখানে সততা, সাহস ইত্যাদি বোকামি বলে ব্যাখ্যায়িত হয়। যে যত বেশী মিথ্যেবাদী, ভীরু, বেদমায়েস, সেই এখানে তত বেশী সম্মানিত। তাই এর মধ্যে থেকে সৎ কিছু করতে চাইলে আগে তাঁদেরই সৎ হতে হবে, যাঁরা এই শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

নিছক ছবি করার জন্য ছবি আর নয়, তাঁদের ছবি করতে হবে মানুষের জন্য, মানুষকে নিয়ে। তাঁরা এই সমাজ ও সময় থেকে অনেক কিছুই নিচ্ছেন, তাই কিছু দেওয়াই দরকার। আমাদের ক্রোধ, দুঃখ, অসহায়তা ইত্যাদি হবে তাঁদের ছবির উপজীব্য, যেখানে আমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পাবে অমলিন হয়ে, এই সমাজ,

শিল্পের মোহকে, সেখানে কোনো ভন্ডামী থাকবে না, মিথ্যে থাকবে না, বাহবা নেওয়া আবেগ থাকবে না, থাকবে জীবন সম্পর্কে সত্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টি।

আমরা ঐ স্বর্ণময় যুগের অপেক্ষায় আছি। **বিকাশ ভট্টা**

ছোট্ট নায়ক

চারপাশ থেকে মন্তব্য 'পয়সাটা জলে গেল', 'সময়টাই মাটি' বা 'আরে গল্প কোথায়?' এই ধরনের। তবু 'ছোট্ট নায়ক'কে আমার ভাল লেগেছে। কারণ এর সৎ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। কারণ পরিচালক শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেন যে সিনেমার ভাষা আলাদা। সরাসরি যা বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসে না। বক্তব্য রেখেছেন বেশীর ভাগই ক্যামেরার মাধ্যমে। তবে ছবি একেবারে দোষ ত্রুটির বাইরে নয়। ক্লিটলের দিকে বেশ নজর দেবার দরকার ছিল। এডিটিং-এর বেলাতেও তাই। আর ছবিতে ঘটনা দেখাতে দেখাতে সময়ের ব্যাপারটাও যেন হারিয়ে গেছে।

ছোট্ট নায়ক তোতনের ব্যাপারটা বেশ ইনটারেসটিং সে তার বন্ধু মান্তুদিকে খুঁজতে গিয়ে অতবড় কলকাতা মধ্যে হারিয়ে যায়। একে একে সে নানান চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে থাকে। আর এমন এমন সময়ে—যখন বিশ্বজিৎ-মহুয়া, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণ-কুমার প্রমুখের জীবনের বিশেষ মুহূর্ত। ভাল লাগে না। কারণ অস্বাভাবিকতা এবং মেলোড্রামা ভাল লাগে, যখন তোতনের সঙ্গে দেখা হয় গৌতম রায়, ভানু ব্যানার্জি, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, চিন্ময় রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জি ও বিশেষ করে পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে। এইসব জায়গায় সবই সুন্দর এবং স্বাভাবিক। অন্ধ ভিখারীর সাহায্যে তোতন এগিয়ে গেলে মনে হয় এ ছবি বুঝি ছোটদের। সে ধরণ ভাঙ্গে, ক্যামেরা বিদ্যা বাওয়ের বিশেষ বিশেষ স্থানে উঁকি দিতে। যদিও ঘটনাটা স্বাভাবিক।

ছবিতে অনেক সুন্দর মুহূর্ত আছে। দেবানো সাঁতিতে কুকুরের ওঠানামা। কন্যাশব্যাকে বল কুড়োনো। পাগলের লেকচার—সেখানে শ্রোতা একমাত্র তোতন। হাত নেড়ে তোতনের কবিতা শোনান। প্রতীক হিসেবে বকসিং। ইত্যাদি। তবে সব কিছুর ওপরে এ ছবির ক্যামেরা। কিন্তু এ ধরনের ছবিতে গান কেন? এখানেও বকস অফিস? আর লিপ মুভমেন্ট?

যাক্ গে। ছবির শেষে তোতনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললাম—তোমার অভিনয় ত ভালই লাগল। সোনার কেল্লাতেও ভাল লেগেছিল। এদিকে সবাই এ ছবিকে খারাপ বলছে কেন বল ত?

কেন? আমার ত ভালই লাগল। বলল মাঃ কুশল

স্টারে সিপাই মিউটিনি

তরুণ অপেরা বাংলা যাত্রা-জগতের সেই অন্যতম ব্যতিক্রম যাঁরা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক পালা বর্জন করে যাত্রা যে গণশিক্ষার প্রধান মাধ্যম—এই সত্যকে তাঁদের এতাবৎ সমস্ত প্রযোজনার মধ্যে প্রমাণ করেছেন। হিটলার, লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও-ৎসে-তুঙ, বিদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রভৃতি প্রযোজনার পর এঁরা এবার উপস্থিত করলেন নতুন পালা—সিপাই মিউটিনি। এরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত সোমবার—১৯শে সেপ্টেম্বর, স্টারে।

১৮৫৭-র সেই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ—যোধকর্ণি, সর্বভারতব্যাপী প্রথম বেনিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ব্যারাকপুর, মীরাট, দিল্লি—ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে তৈরী হয়েছে এই পালা। পালাকার মধু গোস্বামী। সংলাপের যে আবেগ ও তীব্রতা, ঘটনার ঘনঘটা, সবর

সাত ভাই চম্পা ছবিতে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

শান্তিগোপাল

দেশপ্রেম—যা যা একটা পালাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে, সবই আছে। কিন্তু উদ্বোধনী রজনীর অভিনয় দেখা একধরনের অসম্পূর্ণতা ফলতই তরুণ অপেরার যা বৈশিষ্ট্য—দলগত নৈপুণ্য এবং অভিনয়-ক্ষমতা পরিমার্জনের অভাবে তা সেদিন বেশ অগোছালো। এমনকি কিংবদন্তীর নায়ক শান্তিগোপালও তবে যেহেতু ঘটনার প্রেক্ষাপট ১৮৫৭, ফলতই পোষাক, মেক-আপ, সংলাপ এবং সংগীতের সুর ১৯৭৭-র মতো হলে মনে হয় দায়িত্ব পালন হলো না। যেমন মনে হলো, শুধুমাত্র পালা জমানোর জন্য ইতিহাস থেকে বহুদূর সরে যাওয়া এক ধরনের অজ্ঞতা। এমনিতেই বহু অসংলগ্নতায় এ পালা দুর্বল। সংগীতও। তবে পরবর্তী সম্পাদনায় নিশ্চয় এ ভুল উতরানো যাবে। বোধকরি, তরুণ অপেরার এটি প্রথম প্রযোজনা যেখানে অভিনয়ে শান্তিগোপালই একমাত্র নন, সার্বিক দলগত অভিনয় অপরিহার্য। চোখে পড়েও তাই।

পরিশেষে, বিরতিহীন সাড়ে তিনঘন্টা অভিনয় দেখার পর যখন কোমর টনটন, তখনি মনে হলো—মাথার উপরে খোলা আকাশ, কম্বলের ওম, ঠ্যাং ছড়িয়ে বসা এবং ধূমপানের স্বাধীনতা ছাড়া অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে যাত্রা দেখা অসম্ভব। মানায়ও না। এবং সেজন্যেও কোন উত্তর দিতে পারলাম না যখন তিনি বললেন—চা-বাগান এবং কোলিয়ারি এলাকা দখল করতে গেলে ঐসব ঐতিহাসিক বিকৃতিতে কিছু যায় আসে না, আর, পাঁচ টাকা খরচ করে কোন গাঁয়ের কৃষক বা শ্রমিক কম করে চার ঘন্টার পালা না পেলে প্যান্ডেল পুড়িয়ে দেবে। এসব কথা শহুরে বুদ্ধিজীবিরা একটু ভেবে দেখবেন?

কবিতায় জং

ভরত সমশের জং বাহাদুর রাণা এক নতুন অভিজ্ঞতা দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন টাকায় সবকিছুই হয়। এতদিন জানতাম আর যাই হোক অন্ততঃ শিল্প-সংস্কৃতি হয় না। বিক্রমাদিত্যের সময়কার ইতিহাস বলে, তিনি অপরাজেয় সম্রাট হয়েও কবি বা গায়ক ইত্যাদি হতে সাহস করেননি। পরিবর্তে নবরত্ন সভার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ঐ সব যুগে বিক্রমাদিত্যেরা যা পারেন নি, আজ রাণা বাহাদুরেরা তা করতে সক্ষম হয়েছেন। টাকার জোরে তাঁরা অভিনেতা। নেত্রীদের যা খুশী বানান, ইচ্ছে মতো হাত পা নাড়ান, মাথামুণ্ডহীন ঘটনা গড়ে তার ছবি তোলেন এবং তা সিনেমা নামে সাধারণ্যে দেখানোর সাহস রাখেন। কবিতা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়

তথ্যকেন্দ্র

১০, গভর্ণমেন্ট প্লেস ইস্ট (রাজভবনের সামনে) কলি ১

সম্পাদিকা
মন্ত্রশ্রী তালুকদার এম. এ.
উপদেষ্টা
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
এম. এস-সি, পি. এইচ-ডি

তথ্য-কেন্দ্রের মাধ্যমে বিবাহিত পাত্রপাত্রীর সংখ্যা

মে ১৯৭৫	৭৮৬
মে ১৯৭৬	৮৭০
মে ১৯৭৭	১৮৪

নিয়মাবলী

১। তথ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২। তালিকাভুক্তির জন্য তিন টাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে পাঁচ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে ফাইনালাইজেশন ফি দশ টাকা অর্থাৎ প্রথম মাসে মোট আট টাকা, পরের মাস থেকে পাঁচ টাকা ও বিবাহ স্থির হলে দশ টাকা দিতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ স্থির না হলে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যয়ে তথ্যকেন্দ্রের সার্ভিস পাবেন।

* বিশেষ ক্ষেত্রে -এর ব্যবস্থা করা হয়।

** পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের কাজ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ত্বরান্বিত করার জন্য Computer Service -এর ব্যবস্থা আছে।

মতামত

"Thousands were married through the help of the agency... " Tathya Kendra has a role which satisfies the demands of the traditional and the contemporary, an outcome of society's own evolution" **THE STATESMAN, March 6, 1977.**

"সদস্যের সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার....। যন্ত্রজ্যোতিষী (Computer) এক মিনিটেরও কম সময়ে মনে মনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে জানিয়ে দেবেন কোন পাত্রের উপযুক্ত কোন পাত্রী আর কোন পাত্রীর উচিত কোন পাত্রকে বরমাল্যে অভিষিক্ত করা।" —আনন্দবাজার ২৯শে নভেম্বর ১৯৭৬

".. the number of wedding under the agency's auspices since June 1972 encourage optimism From 102 that month, the figure has short up to 408 last January. Bless the bride — and the agency". **THE STATESMAN, April 8, 1974.**

...."এই আধুনিক প্রজাপতি অফিসে ভিড় এমন কিছু কম নয়। বিয়েও হয়েছে কয়েক হাজার।" —বসুমতী, ১৫ই এপ্রিল; ১৯৭৩

..."লোকের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, বাইরেও...হাজার হাজার লোক নাম লিখিয়েছেন।"

—যুগান্তর; ১২ই শ্রাবণ; ১৩৮০

শ্রীরাণা সম্ভবতঃ বাংলা সিনেমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছেন। তা না হলে স্বয়ং পরিচালনায় এগিয়ে আসবেন কেন। কিন্তু তাঁর এই অতিরিক্ত ভালবাসায় মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্রের যেন সম্পূর্ণ সৎকার না হয়ে যায়। এখনো যাঁরা বাংলা সিনেমা দেখেন, আশা রাখেন, তাঁদের পক্ষে রাণা মহাশয়দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, অনেকদিন থেকে এই চলচ্চিত্রের ক্ষয়রোগ হয়েছে, আপনারা দয়া করে তাকে আর এসব অখাদ্য খাওয়াবেন না। নিজেকে নিয়ে যা খুশী করার স্বাধীনতা আপনাদের আছে। কিন্তু আমাদের সময় ও অর্থ ব্যয়ের অধিকার আপনাদের নেই।

রাজধানী যাত্রা ইউনিটের সূর্যহারা পালায় অরুণ মুখার্জি ও বেবী মুখার্জি

চলচ্চিত্রে আসেন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ। একদল চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাহায্যে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে চান, আরেকদল চান এই মাধ্যমটিকে কাজে লাগিয়ে সস্তায় নাম কিনতে। জানতে ইচ্ছে করে শ্রীরাণা কিসের তাগিদে পরিচালনায় এলেন। নাকি তিনি পরিচালক হিসেবে নিজের নামটা অমর করতে চেয়েছিলেন। এখানে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন, পরিচালক বা চিত্রনাট্যকারের ন্যূনতম যে যোগ্যতা থাকা উচিৎ, তা কি তাঁর আয়ত্তাধীন? তাহলে যে কবিতা অন্য কথা বলত।

যদি তিনি প্রকৃতই চলচ্চিত্রকে ভালবাসেন, তাহলে একটি আবেদন, আরো কিছুদিন পরিচালনা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। ততদিন বরং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের শীর্ষেন্দু শ্যামল-মতিদের গল্প পড়ুন, একা ক্যামেরায় ছবি তুলুন, খোলা চোখে দিন রাত্রির তফাৎ বুঝুন, চিত্রনাট্য অভিনয় ইত্যাদি শিখুন, গ্যদার, ফেলিনি, সত্যজিৎ, মৃণালেরা আয়ত্তের বাইরে থাকলে অন্ততঃ তরুণ মজুমদার, শকতি সামন্ত, রাজকাপুরদের ছবিগুলো বার বার দেখুন, তারচেয়েও বেশী মানুষের সঙ্গে মিশুন, উপলব্ধি করুন তাদের জীবন-পরিবেশ। তারপর না হয় পরিচালনার কথা ভাববেন।

'কবিতা'র ডিটেইলস্ আলোচনায় গেলাম না। তা করার মতো কোন গুণ ছবিটিতে নেই। তাছাড়া সময় আর কাগজের মূল্যও আজকাল প্রচুর বেড়ে গেছে।

এই ছবির প্রশংসা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত নই। তবু দুঃখ এজন্য যে প্রতি আলোচনাতেই প্রায় একই রেকর্ড বাজাতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন এই সমালোচক ভাল বলতে চায়, দুর্দান্ত প্রশংসা করতে চায়। আপনারা পরিচালকেরা অনুগ্রহ করে তার সামান্যতম সুযোগ দিন।

বিকাশ জানা

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রী চিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

শ্রী অখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১।২, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন ঃ ৪৫-০৯৩৯

পূজায় শীতভাপ নিয়ন্ত্রিত রূপসী

ফ্যাশনী শাড়ী বিপনী

৬২, জি, টি, রোড, (সাউথ) হাওড়া

পূজায় মনোরম শাড়ী ❋ গেঞ্জি

নতুন ফ্রেণ্ডস সোসাইটি

৭৪৫, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

কেয়া চক্রবর্তী স্মরণে

পরলোকগত কেয়া চক্রবর্তীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্কটিশ চার্চ কলেজের স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন একটি আন্তঃ কলেজ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া তাঁর স্মৃতির প্রতি স্থায়ী সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠান মারফৎ নান্দীকারের ফুটবল নাটকটি পরিবেশন করে কলেজ পাওয়ার 'টুডেন্টস লাইব্রেরী' ফান্ডের জন্য অর্থও সংগ্রহ করা হয়।

ফেড ইন ফেড আউট

।। সে এক মানুষ—অনন্যপ্রতিভা ।।

একবার এক চিত্র পরিচালক জানতে পারলেন, তাঁর ছবি বিদেশে আমন্ত্রিত হয়েছে। সাবটাইটেল চাই। অথচ হাতের কাছে ঐ ছবির কোনো স্ক্রীপ্ট বা চিত্রনাট্য ছিল না। কিন্তু পরিচালক দমলেন না, তিনি অনেকটাই মুখস্তের মতো বলে গেলেন ছবিটির সাবটাইটেল কি হবে। তাঁর এক ছাত্র ঐ সাবটাইটেল কপি করছিলেন খুবই ভীতগ্রস্থ ভাবে। স্ক্রীপ্ট নেই, হাতের কাছে চিত্রনাট্য নেই, অথচ মদ্যপান অবস্থায় পরিচালক যা বলছেন তা সঠিক তো। আশ্চর্যের কথা এই দেখা গেল মূল ছবির সঙ্গে সাবটাইটেলটি কমা, পূর্ণচ্ছেদ অব্দি মিলে গেছে। এই মহাস্মৃতিধর পরিচালকের নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।

*

।। রুপালী-পর্দায় যদি এমন ।।

যদি কোন সিনেমা দেখতে বসে দেখেন যে আপনার প্রিয় হিরো হিরোইন কখনো ছিপছিপে গড়ন, আবার আরেক মুহূর্তে পৃথুল, মোটা, স্থূলকায়া, কখনো চলায় লঘু ছন্দ, কিন্তু তারপরেই গোদা পায়ের মন্থর গতি, আপনি কি খুবই অবাক হবেন না। বিশ্বাস করুন বা না করুন এমনটি ঘটেছিল তামিল ছবি 'যেন থামারাই' লালপদ্ম ছবিতে। ক্যামেরার কারসাজি ভাবছেন। মোটেই কিন্তু নয়, আসলে ছবিটির স্যুটিংএর সময়ের হেরফেরে এই কাণ্ড। নায়ক তরুন শিবাজী গনেশন, নায়িকা তন্বী পদ্মিনী। ওদের চেহারা ছবিটি তৈরী হওয়ার প্রথম দিকে ছিল পেলব, তারপর পার হয়েছে দশ দশটি বছর। দেহের মেদ বেড়েছে যথেষ্ট। ফলে যা হবার ঘটেছে।

সুচিত্রা-কমিশন

প্রযোজকের সঙ্গে ছবির চুক্তি করে শেষমেষ সেই চুক্তি খারিজ করার জন্যে বাংলা চলচ্চিত্রের নামী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের বিরুদ্ধে কোন এক প্রযোজক কোর্ট ঠুকেছেন। এদিকে শ্রীমতী সেন তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য কমিশন নিযুক্ত করেছেন। বাংলা সিনেমায় নাকি এমন কমিশন এই প্রথম

আবার কিসসা কুরসি কা?

মরণাপন্ন অবস্থায় শ্রীঅমৃত নাহাতা পরিচালিত যে ছবিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে সেটি প্রযোজক শ্রীনাহাতা পুনরায় চলচ্চিত্রায়িত করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। শোনা যাচ্ছে এই সংস্কারের তিনি ছবির স্যুটিং শুরু করার আগেই সেন্সরে প্রাবলিসিটি পেল, তাতে ছবিটি যে বেশ কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা করবে তা জ্যোতিষ না জেনেও বলা যায়।

কেচ্ছা-প্রীতি

সেদিন এক অভিনেত্রী সাংবাদিকদের ওপর রেগে খাপ্পা। সাংবাদিকেরা নাকি তাকে তত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অথচ ঐ দিনের কাগজেই তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। পরে জানা গেল তিনি ক্রুদ্ধ, যেহেতু তাঁর বিষয়ে নরম-গরম কেচ্ছা কেলেঙ্কারী আজকাল কাগজে থাকছে না। এখনকার দর্শকেরা ছবির অভিনয়ের চেয়ে কার কত কেচ্ছা তাই জানতে আগ্রহী। কেচ্ছা ছাড়া বড় এ্যাকটেস? নৈব নৈব চ।

বাংলা সিনেমার পুরনো একটি বিজ্ঞাপন

নবকেতনের 'অফসর' চিত্রের বিজ্ঞাপন ঃ 'মিলনের মধুরতায় চুম্বনের মাদকতায় - আলিঙ্গনের তীব্রতায়—যে প্রেম সার্থক হয়ে আছে বাস্তবের অনুভূতির মাঝে, আজ রুপালী পর্দার বুকে তাদেরই মিলন ও হুবহু প্রতিচ্ছবি—নবতর মাধুর্যে অভিব্যক্ত।

বাংলা-সেন্সরের কাঁচির স্পর্শমুক্ত প্রথম আদিরসাশ্রিত চিত্র-নাটক অফুরন্ত নৃত্যগীতাদি সম্ভারে পরিবেশিত অসাধারণ কৌতুক চিত্র।'

এই বিজ্ঞাপনটি যুগান্তর পত্রিকায় ২৭ বছর আগে ১৩৫৭ সালের ২২শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছিল।

দীপ দত্ত

মাও পরবর্তী যুগে সমগ্র চীনই আজ বাবুদের স্তূপ। একদিকে সর্বোচ্চ নেতা হুয়া কুয়ো ফেং অন্যদিকে মাওপত্নী মাদাম চিয়াং চিং। অবিরাম লড়াই। লড়াই মতাদর্শের; লড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের।
রহস্য কাহিনীর চেয়েও রুদ্ধশ্বাস, দুঃসাহসিক ও নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলিল

রেদুইনের
গ্যাং অফ ফোর ১৪-০০

অন্বেষা। ৮৯এ, এন, কে, ঘোষাল রোড, কলিঃ-৪২। কলেজ স্ট্রীটে খোঁজ করুন।

যুসাস

অক্টোবর, '৭৭

নমস্কার। আশাকরি শিল্প সম্পর্কিত 'যুসাস'টি আপনাদের হাতে পৌঁছে গেছে। কেননা ভাললাগা মন্দলাগা নিয়ে চিঠি পাচ্ছি। আরও পেতে চাই। সেগুলো ছাপবো আসছে সংখ্যায়। না, পুজোসংখ্যা নয়। যদিও সংখ্যাটি পুজোর আগেই হাতে পৌঁছে দিচ্ছি। কী থাকছে এতে? কেবল ছোটগল্প আর সাম্প্রতিক ছোটগল্পের উপর ক্ষুরধার আলোচনা। এইসব উদীয়মান স্রষ্টারা আগামীদিনের ছোটগল্পকার ও সমালোচক।

জানেন, দুঃখ কী? নিগূঢ় ও শাণিত ছোটগল্পের বড় অভাব এখন। আপনি কি এই দুঃখমোচনে তৎপর হবেন না?

তা'হলে আপনার শ্রেষ্ঠ গল্প বা নিবন্ধটি এক্ষুনি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

যোগাযোগ : সম্পাদক—যুসাস ৫৪।বি হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলি-১২।

রাজগীনা

৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬

১৩৮৪-র যাত্রা জগতে নতুন ঢঙে [illegible] পালা, নতুন সংযোজনায়

আহ্বান

সম্পাদনা ও নির্দেশনা ।। গোবিন্দ দে

রচনা— রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সুর— জগন্নাথ ধর

গীতিকার— অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্রা

কফিহাউস

কফিহাউসে ঢুকতে গিয়েও, আনন্দ বেরিয়ে আসে। আনন্দ যে কেন এরকম ব্যবহার করছে, বোঝা যাচ্ছে না। প্রায় চারটে থেকে ওর সঙ্গে আমি আছি—এখন ছ'টা; আজ শনিবারের বিকেলে অ্যালবার্ট হল জমজমাট, আনন্দকে অন্তত চারটে লেখাও দিতে হবে চারটে লিটল ম্যাগাজিনে—তা-ও, আনন্দ বেরিয়ে এলো। আমার খুব খারাপ লাগছে; কারণ, এই দু'ঘণ্টায় মোট তিনটি কথা ও বলেছে। অথচ, ওর মেজাজ খারাপ বুঝে ওকে একা রেখে, হলে উঠে যাওয়াটাও প্রাণে লাগছে।

কলেজ স্কোয়ারে এসে, ঘাসের 'পর বসে, আনন্দ খানিকটা ঠাণ্ডা হলো। আমি এবার বললাম, কিরে, এতো গম্ভীর হয়ে আছিস যে? কিছু কমিট করবি নাকি? আনন্দ চাপা নিশ্বাস ছেড়ে বললো, বুঝতে পারছি তোকে বোর করছি, যাক, কিছু না। আসলে, লেখার সময়টাতেই যতো গণ্ডগোল বাধে। আমি চুপ করে থাকলাম। আনন্দ আবার বললো, সকালে রেশন থেকে এসে বাড়ির ঘাঁটঘাঁট বুঝে নিয়ে কপি করতে বসলাম, বুঝলি? তুই বলেছিলি না, শেষ তিনটে লাইন ফ্ল্যাট লাগছে? আমি ভাবছিলাম কিভাবে পালটানো যায়। প্রথমে মনে হলো, না, পালটাতে পারবো না। কপি করতে করতে তখন হঠাৎ দুটো লাইন এলো, লাইন দুটো কিন্তু একটার পর একটা নয়। মাঝখানের লাইনটা নেই। অথচ সেই দুটো লাইনে—মনে হলো, হ্যাঁ, একটা ট্রুইস্ট আছে। জাস্ট মিসিং লাইনটা হাতড়াচ্ছি—কি অবস্থা বোঝ—তখন মা এসে বললো বাজারে যেতে হবে। কেন? বাবা মাছ দেখে আনেনি—সেটা পালটাতে হবে। বাবার নাকি চেনা দোকানী, অসুবিধে হবে না। তুই বোঝ, ভেটকি মাছ আমি আদপেই চিনি না। বললাম, একটু পরে গেলে হয় না। মা বুঝলি কাগজ পেন দেখে কিরকম ভায়োলেন্ট হয়ে গেলো, তক্ষুনি বেশ কড়া করে ছেড়ে দিলো যে, বাবা না হয় ভাত-সেদ্ধ-ভাত খেয়ে যাবে—তার আর সংসারের কাছে প্রত্যাশা কি—কিন্তু ভাইকে তার পরীক্ষার দিনে তিনি শুধু সেদ্ধ-ডাল-ভাত বেড়ে দিতে পারবেন না। কাজেই তো সেই চার স্টপেজ দূরে। গিয়ে দেখি যে, ভেটকির চুপড়ি শেষ। টাটকা মাছ যদি নিতে হয় তবে চোদ্দ টাকা কেজি কি একটা বুই-টাইপের মাছ আছে—নীট একটি টাকা গাঁটগচ্চা দিয়ে তাই নিলাম পচা ভেটকি পালটে। বুঝলি, তারপর তা দেখেও মা-র গজর-গজর আর থামতে চায় না। একে তো মিসিং লাইনটা পাইনি, তারপর ঝট করে রাগ হতেই বাকি দুটোও ভ্যানিশ। আরো রাগ চড়ে গেলো। বলে বসলাম, থামবে? আরে ব্বাস, ফ্যামিলি একেকাট্টা হয়ে লেগে গেলো। দি ওল্ড ম্যান মুখ হাঁড়ি করে ফেললো, বুপু-ঝুপু মাকে এনথু দিতে থাকলো। মিডিওকার আপবিদিং নিয়ে কবিতা লেখাটা একটা ফার্স মাইরি—

আমি নীরস মুখে বললাম, বাড়ি থেকে এনকারেজ করলে, ছেলে আমার কবি বলে টাটে বসিয়ে রাখলে তোর ভালো লাগতো?

আনন্দ বললো, না। আমি পুজো-টুজো চাই না, কিন্তু এটাও বুঝি না যে, লিখি বলে এতোটা টিজ করারই বা কি আছে?

আমি চুপ করে গেলাম। আমাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে অবস্থাটা যে একরকম তা নয়। যে তাপসের কড়া গলা মাঝেমধ্যেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, লেখা থেকে সমস্ত সেন্টিমেন্টালিজমকে ইরেজ করতে হবে, সেই তাপসের বড়দির সঙ্গে তাপসসুদ্ধ আমাদের তিনজনের পরশুদিন এসপ্লানেডে দেখা হয়েছিলো। একথা-সেকথার পর বড়দি বললেন, তপুর তো আর নাগালই পাওয়া যায় না—সব-সময়ই যে কি ভাবের ঘরে থাকে তা ও-ই জানে। 'ভাবের ঘরে' বলবার সময় বড়দি ঠোঁট মুচড়ে হাসলেন। তাপসের বড়দি বয়েসে, অনেক বড়ো, এখনো তাপসদের বাড়ির একজন অর্থকরী নির্ভর তিনি—তাপস ছোটো-মেজো-বড়ো অনেকরকম ঢোক গিলে ফেললো শুধু। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে দীপংকর—সে একদিন হাসতে হাসতে বললো, ভাই সাড়ে দশটার পর আলো জ্বালাতে দেবে না। কাজেই, সকালে আমি লিখবার একটা ভান করি।

খুব সকালেই। জানি, দু' লাইন লিখলেই বাবা ডাকবে। কিন্তু বাবাকে তো অফিসে যেতে হবে ডিয়ার—দুপুরটা?

—অতোক্ষণ সাস্পেন্স করতে পারিস?

দীপংকর ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বললো, করতে হবেই। এখনকার কবিদের মুড়ি হলে চলে না। এই তো বাড়িতে এতোগুলো ম্যাগাজিন আমি নিয়ে যাই, কেউ খুলেও দেখে না। অথচ সেদিন দেশে পদ্যটা বেরোলো বলে, একটু স্পেশাল খাতির হলো আমার—দিন দুই সবাই এমন ব্যাইট মুখে ঘুরতে লাগলো যেন বংশের মুখোজ্জ্বল করে ফেলেছি। আমি তো মনে মনে হাসছি। জানিস, ওই লেখাটাও বাড়িতে কেউ পড়েনি? দুদিন বাদে আবার সব যেমন তেমন—

তরুণতম কবি দেবাঞ্জন এই সেদিন বললো, ক্লাশ নাইন থেকে ইলেভেন অবধি বাবা বেগুলার ঠেঙিয়ে গেছেন লেখা ছাড়ানোর জন্যে। অথচ দেখুন, বাবা কিন্তু রীতিমতো সাহিত্যপাঠক। এখন বুঝতে পেরেছেন, কিছু হবে না, টায়ার্ড হয়ে মেনে নিয়েছেন।

সমস্ত তরুণ কবি-লেখকরাই যাঁদের বয়স ষোলো থেকে বত্রিশ, অনেক বেশি একা। যে পরিবারের তাঁরা আছেন, সেই পরিবারে কারোর সঙ্গেই তাঁদের সত্যি-কারের আত্মীয়তা হয় না। তাঁদের উদ্বেগ, পরিশ্রম, ভাবনার অংশীজন তাঁদেরই বাবা মা-ভাই-বোন—লেখা ধরার আগে, যাঁরা সত্যিই তাঁদের প্রথম আপনার জন ছিলেন। লেখা এঁদের তফাতে নিয়ে যায়। একজন লেখক মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে দেখতে পান, মা-পিসিমা হয়তো টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছেন—একমুহূর্ত ভালো লাগে, তারপরই তাঁর মনে পড়ে যায়, এটা নিছক বাৎসল্য—ঐ মা বা পিসিমা লেখাগুলি কখনো পড়বেন না। মাঝে মাঝে তিনি দেখতে পান, বোন কৌতূহলে একটা সদ্যলেখা গল্প পড়ে যাচ্ছে—তারা বোঝেন যে, ভগিনী আসলে ভাইয়ের স্বপ্ননায়িকার হদিশ পাবার মনো গোয়েন্দাগিরি করছেন। মাঝে মাঝেই আত্মীয়েরা, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়িয়ে আরো মন দিয়ে রেজাল্টটা ভালো করা উচিত—একটা চাকরি, বিপুলে বেকার-সমস্যা সত্ত্বেও পাওয়া উচিত—ছোটো জামাইবাবার শাকুমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। লিখে কি হয়? কোন স্বর্গে বাতি দেওয়া হয়? তা-ও আবার মন-ভারি-করা, ধোঁয়াটে লেখা সব। মাস দুয়েক আমি কিন্তু লিখতে পারছিলাম না। আর সবাইকার মতো লেখাও সুখের পাখরা—প্রকৃত দুঃসময়ে উড়ে যায়। মাস দুই এক লাইনও না লিখে আমার ধারণা হলো, যাঃ। তাহলে তো সব খতম। আমাকে কি আর কোনোমতেই লেখক বলা উচিত? দু' সেকেন্ড আমি বদ্ধমূল বিশ্বাসে এসে পড়লাম যে ইহজীবনে আমি আর কখনোই লিখতে পারবো না। তখন, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, লেখকদের লেখার সময়ে গিয়ে পড়ে এবার দেখবো—কেন অন্যেরা তাদের জ্বালাতন করে। আমি এখন অলেখক, নির্ঘাৎ বুঝতে পারবো মনস্তত্ত্বটা কি।

তাপসের বাড়ি গেলাম। একতলাতেই তাপস থাকে। জানালা দিয়ে দেখে নিলাম, সে লিখছে। তাপসকে আমরা বরাবরই বানী বলে জানি—তার মুখ দেখে অল্প

একটু চমকে উঠলাম। সম্পূর্ণ শোকার্ত মুখে তাপস লিখে চলেছে, মাঝেমধ্যে চোখ তুলে কোনোদিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু, কিছু দেখছে না। চিনি না। একজন লেখকবন্ধু হয়েও তাপসকে আমি চিনতাম না। আর,....তাছাড়া, তাছাড়া কতোক্ষণ লিখবে ও? এমনভাবে লিখে চলেছে যেন কারো সঙ্গে ও রয়েছে, ঘাড় ঘুরিয়ে আর দেখার দরকার নেই যে, হাতপাঁচেক দূরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। পৃথিবীও এভাবেই চলে—নিজের খেয়ালে—সাড়ে তিন হাত দূরে আমরা চলাফেরা করি, আনন্দ করি, কষ্ট পাই, জন্মাই, মরে যাই—পৃথিবী খেয়াল করে না, পৃথিবী খেয়ালই করে না। কিন্তু পৃথিবী তো জড়জগৎ, পৃথিবী তো অনেক বড়ো, আমার থেকে এক ইঞ্চি লম্বায় ছোটো, দু' ইঞ্চি বহরে বড়ো আমারই বয়সী তাপস কেন ঐ স্পর্ধা পাবে? আমি গলা পরিষ্কার করার সুরে ডেকে উঠলাম, তাপস.....

তাপস তাকালো। চট করে একবার লেখার দিকে তাকিয়ে, ঘনঘন চোখের পলক ফেললো। বোঝা গেলো, সে তার কলকাতার ঠিকানায়, তার পরিচিতদের কাছে, ভেবে-চিন্তে, ফিরে আসছে। আমি লজ্জিত গলায় বললাম, ডিসটার্ব করলাম, না? মরতে পারলে যে জুড়োতো সে যেমন বেঁচে উঠে শুধু হাসার জন্যে অল্প একটু হাসে, তেমনভাবে হেসে তাপস বললো, কিছু না। বোস একটু, আসছি।

একটু আগেই এই ঘর অন্য রকম ছিলো। আমার মনে হলো, আমি তো ঠিকই করেছি। তাপসের বড়দি আনন্দের মা দীপংকরের বাবা—প্রত্যেকেই ঠিক। যা ছোঁয়া যায় না, তাকেই তো মানুষ ভাঙে, যা পবিত্র, তা-ই তো সবথেকে বেশি ধর্ষণযোগ্য। যার জন্যে, কবিতাকে একস্‌প্লেন করার এতো ধুমধাম এখনো হয়ে চলেছে। আনন্দ দীপংকরকে লেখবার সময় আমি বাধা দেবো—তারা মানুষ, তারা লেখা ফেলে তাকাবে। লেখা, সেই অসহ্য অবস্থা, যা আমার অস্তিত্বের উপেক্ষা—তা চুরমার হয়ে যাবে এক মুহূর্তে। কিন্তু, তারপর যদি আনন্দ আর দীপংকর কলম তুলে না নেয়, তাহলে আরো শ্বাসকষ্ট, আরো দুঃখ, আরো লজ্জা! দরজার দিকে তাকিয়ে অনুপস্থিত তাপসকে আবার মনে-মনে লেখার টেবিলে বসাতে বসাতে আমি ভাবলাম, তাপস তো এখন লিখতে পারছে, সে আমাকে বুঝুক!

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে মধ্যযুরোপে দেখা যেত ৬৫ থেকে ১০০ ফুট উঁচু ডাইনোসরস। সেই ডাইনোসরস পরিবারভুক্ত টাইরানোসরস রেক্স-এর এই সুবৃহৎ মূলানুগ মূর্তিটি দেখতে পাওয়া যাবে হেরবজবার্গের কাছে স্টেইগারলান্ড প্রমোদ কেন্দ্রে।

তারাশঙ্করের কবি

৪ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে তারাশংকরের অমর প্রেমোপাখ্যান 'কবি'র নৃত্যনাট্যরূপ পরিবেশন করলেন রাগিণী। নাট্যরূপ রাজেশ্বর মিত্রের। সুষম, সুন্দর। পরিচালক অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যরচনা, এই ধরনের নৃত্যনাট্যে যেমন হয়, যতো-না নৃত্য, তার চেয়ে বেশি অভিনয়। প্রায় মূকাভিনয়ধর্মী। অথচ আমাদের ধ্রুপদী নৃত্যে, কুচিপুড়ি কি ওড়িশিতে, অভিনয়-অংশও যতো নৃত্যসমৃদ্ধ। শীচট্টোপাধ্যায় স্বয়ং কবিয়ালের সারল্য ও আবেগকে বেশ সুন্দর রূপ দিয়েছেন। কবিয়ালের জীবনের প্রথম প্রেম, বিচ্ছেদ এবং সেই প্রেমকে চিরকালের জন্য হারানোর ব্যথা তাঁর নৃত্যে এবং জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গানে ঠিক রূপটি খুঁজে পেয়েছিল। শেষাংশে তাঁর নাচে পুনরাবৃত্তি একটু বেশি। বসন-চরিত্রে পলি গুহ ও ঠাকুরঝি-রূপে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কমল ঘোষ-দস্তিদার ও সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়ের নাচ মনে রাখার মতো। সাধন গুহ তাঁর খ্যাতি খাটো করেন নি।

নৃত্যনাট্যটি আরো একটু ঘনসংবদ্ধ হলে দর্শকদের মন আরো ভরতো। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা—সবকিছু অঙ্গভঙ্গিমা, কারুকার্যহীন পদ সঞ্চালন এবং প্রায় মুদ্রাহীন নৃত্যে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—শুধু ওঝা এবং সন্টিধরের অঙ্গভঙ্গি এবং অভিনয় কখনো নৃত্য আশ্রয় করে। পলি গুহর প্রথম দিকের নাচ খেমটা-ঝুমুর জাতীয়। সেটাই চরিত্রানুগ।

কবিয়াল এবং বাজনের ছেলের নৃত্যাংশটিতে, নৃত্যপরিচালক চমৎকার

কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পাগলিনী ঠাকুরঝিকে ওঝা দিয়ে সুস্থ করা এবং কবিয়াল ও ঠাকুরঝির প্রথম প্রণয়ের দৃশ্যগুলিতেও তাই। কিন্তু বসন ও কবিয়ালের ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্যগুলিতে নাটকই বেশি, নৃত্য কম। শেষ দৃশ্যে বসনের মৃত্যুর পর কবিয়াল যখন ঠাকুরঝির কাছে ফিরে এসে দাঁড়ালো, তাকেও সে চিরকালের মতো হারিয়েছে, তখন তার আর্তনাদ-ভরা নৃত্য, ঠাকুরঝির অশরীরী আত্মার নূপুরধ্বনি এবং আলোর আলো-আঁধারিতে ঠাকুরঝির এক-একবার মোহময়ী ভঙ্গিমায় দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মনে দাগ কাটে। এখানেই শেষ হলে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী হতো। কিন্তু এর মধ্যে আবার একদিকে বসনের আত্মা, একদিকে ঠাকুরঝির আত্মা, মাঝখানে কবিয়াল—অতিরিক্ত নাটকীয়।

নৃত্যাংশে অন্যান্য শিল্পীরা নিজের নিজের চরিত্র বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আবৃত্তি মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সেনগুপ্ত চৈতী রায় প্রমুখের গানগুলিও খুবই দরদের সঙ্গে গাওয়া হয়েছে। বাদ্যের সঙ্গীত পরিচালনার তারিফ করতে হয়। অনুষ্ঠানটি বিকলাঙ্গদের সাহায্যকল্পে জেনে ভালো লাগে। উদ্যোক্তা বিহ্যাবিলিটেশন ইন্ডিয়া।

নৃত্যশ্রী দর্শক

নীলাম

আটাশ সেপ্টেম্বরের সকাল সাড়ে দশটা। রবিবার। বাইরে বেশ রোদ। চব্বিশের বি, পার্ক স্ট্রিটের চৌরঙ্গী সেলস্ ব্যুরোতে অন্যান্য রবিবারের মতোই বেশ ভীড় হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো এই দোকানে পুরোনো ও নতুন—দুই শ্রেণীর জিনিসই নীলাম হয়। এখানে জিনিস কিনতে যেমন ক্রেতা আসেন তেমনি ব্যবসাদারও আসেন।

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অল্পদিনেই জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
P O KA[illegible]ISARAI (GAYA)

কথায় কথায় জানা গেল, এঁদের ভালো বা খারাপ মরশুম বলতে তেমন-কিছু নেই। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় লোকজন একটু কম আসে—এছাড়া বছরের বাদবাকী সময়ে এঁরা ভালোই ব্যবসা করেন।

এই সমস্ত কথাবার্তা যখন হচ্ছে, তার ফাঁকে একজন নীলামদার ওদিকের প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দোকানের এক কর্মচারী তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা কোকাকোলা। ঢকঢক করে অনেকটা খেয়ে তিনি নীলাম শুরু করলেন।

আজ সবচেয়ে বেশী ডাক উঠেছিল একটা স্টিরিও রেকর্ডপ্লেয়ার কাম টেপ-রেকর্ডার-এর। জিনিসটা জাপানী। তার মসৃণতার জোরে সেটি মোট তিন হাজার একশো টাকায় বিকি হয়ে যায়। ক্রেতা—একজন বাঙালী ভদ্রলোক। এর আগে, একটি ইমপোর্টেড চামড়ার এ্যাটাচি কেস নীলামে ওঠায় এক ভদ্রলোক বললেন, ইমপোর্টেড। আরে, হিন্দুস্থান কি লেদার দুনিয়া সে উঁচা। চারদিকে একটা হালকা গুঞ্জন উঠল। এবং তারপরই নীলামের জন্য এল তিনটি অফিস ফাইল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই এগুলো কি ইমপোর্টেড বোর্ডের তৈরী?' এবার হো-হো করে হাসি। সমবেত হাসাহাসির মাঝে এক চল্লিশ টাকায় ফাইল বিনটি কিনে নিলেন এক ভদ্রলোক।

এতোক্ষণ যে ঝাড় লণ্ঠনটি দোকানের মাঝখানে শোভা বিকিরণ করছিল, এবার সেটি নীলামে উঠল। দুজন অ-বাঙালী ভদ্রলোক তুমুল ডাকাডাকি করে দামটা নিয়ে গেলেন দেড় হাজারে। এবং তারপরই সব চুপচাপ। আর, কেউ ওঠেন না। নীলামদার হেঁকে চলেছেন, 'এনি মোর? এনি মোর?' প্রায় ফিসফিস করে একজন বললেন, 'পনেরো শো পঞ্চাশ।' বলে মুখ লুকিয়ে নিলেন। যে দুজন এতোক্ষণ ডাকাডাকি করছিলেন তাঁরা একেবারে চুপ। মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেশী বলে 'ওস্তাদ কা খেল' দেখিয়ে তিনিই পেয়ে গেলেন ঝাড়লণ্ঠনটা!

এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। বেলেঘাটায় থাকেন। সেই দশটায় এসে ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিস কিনেছেন। কাঁচের জিনিসপত্র রেকর্ড প্লেয়ার টেপ-রেকর্ডার, জাপানী রেড-কভার, ইলেকট্রিক আয়রন—এসমস্ত কিনে তিনি অবশেষে গৃহদেবতার জন্য একটি কাঠের সিংহাসনও নিলেন একশো পঞ্চাশ টাকায়। তিনি বললেন 'ছাঁ মশায়, ঘর সাজাবার জন্যই কিনছি। এই দেখুন না, এতোসব কিনলাম আর সিংহাসনটা হাতের কাছে পেয়েও যদি না-কিনি তাহলে গৃহদেবতার প্রতি কি অবিচার হয় না?

একরাম আলি

রান্না

মাংসের পরটা

এখন ভাদ্র মাস। বর্ষা আসে নিয়মিত। লতা-পাতা ঘন সবুজ হয়, এই মাসে সুন্দর সজীব। আজ সকালে মণিপুরী বৌদিকে বললাম, আজ রবিবার, বেশ মেঘলা মেঘলা, বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব, একটা কিছু করা যাক না। তিনি বললেন কি করবো? বাজার দেখলাম ঢের শাক-সব্জী উঠেছে। নিয়ে আসবো? বৃষ্টিতে কেউ শাক-সব্জী খায়—তোর কোন আক্কেল নেই। আমি বললাম, তাহলে তোমার আক্কেলে বল। তিনি বললেন, বাজার থেকে একশ গ্রাম মাংস কিমা নিয়ে আয়—কত হবে, একশ গ্রাম কত আর দেড় টাকা। তবে ময়দা আন এক গ্রাম। আদা পঁচিশ গ্রাম। পেঁয়াজ পঞ্চাশ গ্রাম চিনি পাঁচ গ্রাম। ঘি বা ডালডা পঞ্চাশ গ্রাম। সরষের তেল পঁচিশ গ্রাম ভিনিগার এক চামচ। আর কি? তিন চার কাঁচা লংকা, হলুদ শুকনো লংকা না পরিমাণ মত—ব্যাস। আমি মনে মনে হিসেব করি—মাংসের কিমা দেড় টাকা, ময়দা কুড়ি পয়সা, আদা দশ পয়সা, পেঁয়াজ দশ পয়সা চিনি পাঁচ পয়সা, নুন এক পয়সা লংকা পাঁচ পয়সা ঘি হলে দেড় টাকা ডালডা হলে ষাট পয়সা। তেল লাগবে কুড়ি পয়সা ভিনিগারের বোতল বাইশ আউন্স দু টাকা এক চামচে আর কত পড়বে। তবু হিসেব করে দেখলাম প্রায় দু টাকা নব্বুই। বললাম কড়া হাত। তিনি বললেন যত গুড়ে তত মিষ্টি—যেমন দিবি তেমন হবে। বললাম ঠিক আছে। বল কি ভাবে করতে হবে টুকে নি।

মণিপুরী বৌদি বলতে লাগলেন মাংসের কিমা আদার রস, পেঁয়াজের আর ভিনিগার দিয়ে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবি। তারপর কিমাটা ভাল করে বেটে নিয়ে পরিমাণ মত হলুদ লংকা দিয়ে তেলে একটু কষিয়ে নিবি। তার মধ্যে ময়দাতে নুন দিয়ে কষিয়ে নেওয়া কিমার সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিবি। তার মধ্যে পরিমাণ মত চিনি আর কাঁচা লংকা কুচো করে কেটে ওর মধ্যে দিবি। ভাল করে মেখে নিয়ে ছোট বড় ইচ্ছে মত গুলি করে ঘিয়ে বা ডালডায় পরিমাণ মত ভেজে নিলেই হল। গরম খা, ঠাণ্ডা ভালো লাগবে।

আত্রেয়ী সেনগুপ্ত

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

[illegible] ৫৫ পয়সা। বিদেশে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে সাফ করে চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

এখন

পাচ্ছেন ক্লিনিক ল্যানোলিনঃ শুষ্ক চুলের গোড়ার জন্যে

ক্লিনিকঃ স্বাভাবিক চুলের গোড়ার জন্যে

ক্লিনিক কি ভাবে কাজ করে—

বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় তৈরী করা ক্লিনিক ও ক্লিনিক ল্যানোলিন, চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) ধুয়ে একদম সাফ করে দেয়।

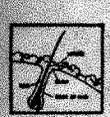

রাশি রাশি ঘন ফেনা চুলের গোড়া অবধি ঢুকে সমস্ত খুস্‌কি ধুয়ে নির্মূল করে দেয় কিন্তু চুলের নিজস্ব স্বাভাবিক তেলাভাবের কোন ক্ষতি করে না। চুল করে তোলে ঝলমলে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

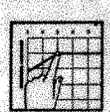

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলেঃ চুলে ভাল করে ফেনা মাখিয়ে আলতো করে ধুয়ে ফেলুন। দ্বিতীয়বার ফেনা লাগিয়ে মিনিট খানেক ঘষতে থাকুন। এতে ক্লিনিক ফলপ্রদভাবে কাজ করে ও চুলের গোড়ার নতুন জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

নিয়মিতভাবে ক্লিনিক বা ক্লিনিক ল্যানোলিন ব্যবহার করুনঃ অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একবার। ক্লিনিক আপনার চুল থেকে ড্যানড্রাফ (খুস্‌কি) একদম নির্মূল করে দেবে।

ক্লিনিক ল্যানোলিন একমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

এখন আপনি পছন্দ করে নিন।

HLCL-1509

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড-এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 7th October, 1977
Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

কুকমী গুঁড়া মশলার ১ কে.জি.'র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

জামায় জ্যান্ত জোনাকি

আমাদের পোশাক

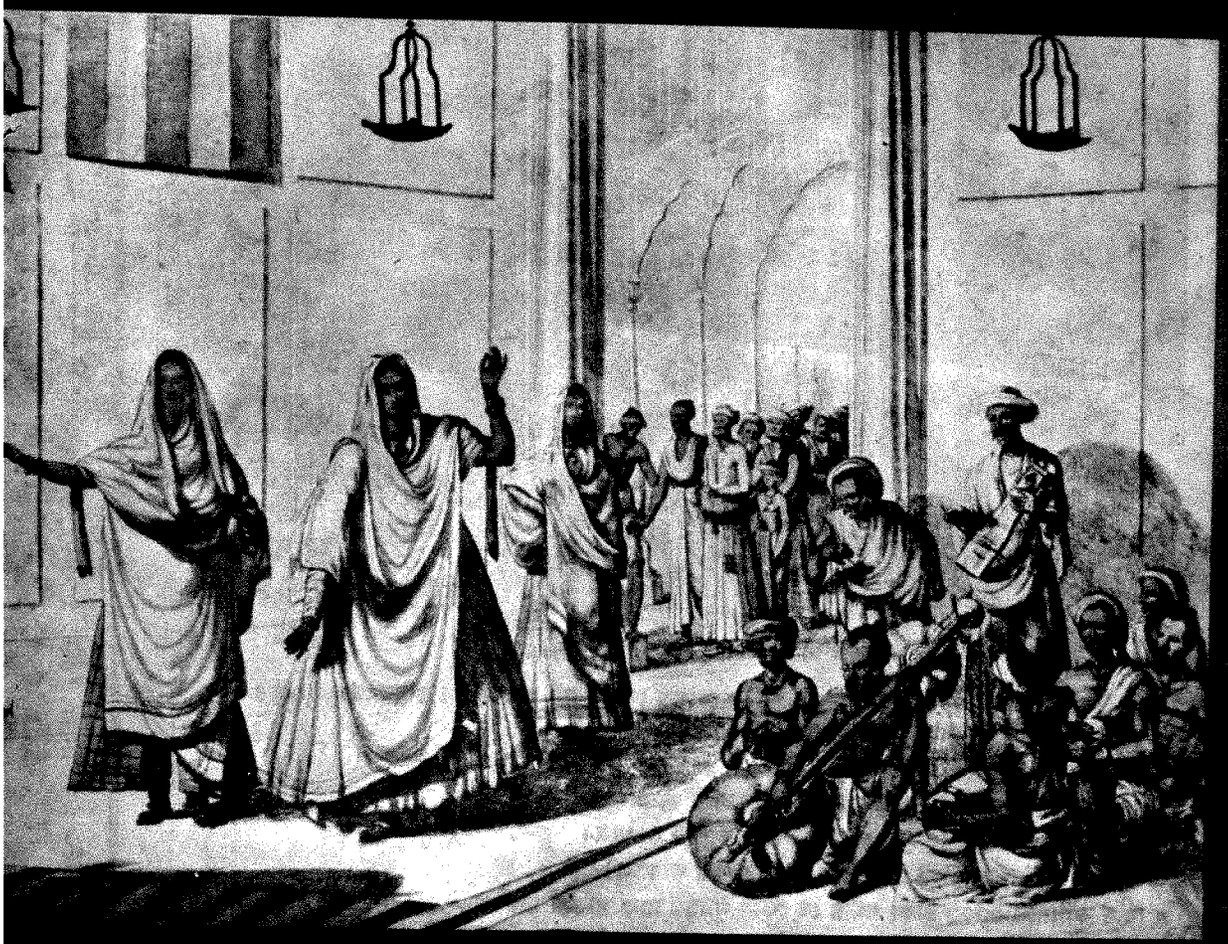

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প

একটি আকর্ষণীয় উপহার

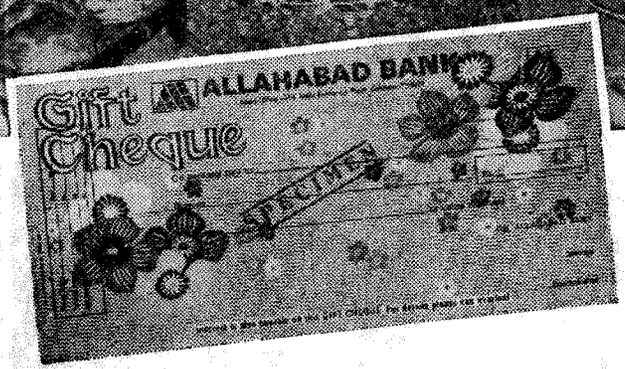

একমাত্র এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের
গিফ্‌ট চেকেই
সুদ পাওয়া যায়।
ছোটদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দেবার
সেরা উপহার।

এমন উপহার দিন যা দিনে-দিনে আসল দামের চেয়েও বেশী দামী হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গিফ্‌ট চেক এক আদর্শ উপহার।

* প্রদেয় সুদের হার :
  ৪% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ৯১ দিন পরে ভাঙালে।
  ৪.৫% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ৬ মাস পরে ভাঙালে।
  ৬% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ১ বছর পরে ভাঙালে।
* বিনা কমিশনে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত যে কোন মূল্যের চেক পাওয়া যায়।
* ভারতে এই ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় কিনতে পাবেন ও ভাঙাতে পারবেন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

U-AB-2 BEN

নাটক ।

রতনকুমার ঘোষের

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা
সেন্সার-বন্দী নাটক (নারী-বর্জিত) ৫.

সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫.

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে (১ নারী) ৫.

সীতাহরণ (২ নারী) ৫.

এই নাট্যকারের অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটক

সকালের জন্য (১ নারী ।। ৫ম সং) ৫.

ভোরের মিছিল (১ নারী) ৫.

এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫.

দোহাই হাসবেন না (২ নারী) ৫.

সম্রাট (২ নারী) ৫. **ফেরা** ৩॥.

অমৃতস্য পুত্রাঃ ৩ নারী) ৫.

ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩.

নাটক ।।

মনোজ মিত্রের

পরবাস (১ নারী) ৫.

নরক গুলজার (১ নারী) ৫.

অশ্বিনদত্তের

বৃত্ত বিশ্ব ভালবাসা (১ নারী) ৫.

মণীন্দ্র রায়ের

লখিন্দর (২ নারী) ৫.

মনোরঞ্জন দাসের

অরণ্য ফসল (২ নারী) ৫.

সুশীলকুমার গুপ্তের

সমান্তরাল (২ নারী) ৫.

অগ্নিমিত্রের

পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫.

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

কেষ্টধনের কেরামতি (২ নারী) ৫.

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্লেক জানি (১ নারী) ৫.

মন্মথ রায়ের

শরৎ বিপ্লব (৪ নারী) ৫.

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জনপদবধূ (৫ নারী) ৫.

তমাল দাসের

স্বপ্ন সম্ভবা (২ নারী) ৩.

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের

ক্যাপ্টেন হুররা
(২য় সং ।। ১ নারী) ৫.

গঙ্গাপদ বসুর

নহুমাতা (১ নারী) ৩॥

একটি স্বপ্নের জন্যে (২ নারী) ৩॥

রাধারমণ ঘোষের

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৫.

রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫.

কিরণ মৈত্রের

রাতের কান্না (২ নারী) ৫.

শেষ কোথায় (২ নারী) ৪.

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু ৩॥

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর

জৈব জননী (৩ নারী) ৩॥

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

তোমার জননী (২ নারী) ৫.

সেই মন সেই মন (২ নারী) ৩॥

পাঞ্চজন্য (২ নারী) ৩.

দেবনারায়ণ গুপ্তের

নাটকার (২ নারী) ৫.

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪.

শক্তিপদ রাজগুরুর

কুমারী মন (৩ নারী) ৩.

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩॥

সইস্তাহার (১ নারী) ৪.

নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩.

অগ্নিমিত্রের

নিকটে ফাঁদ (২ নারী) ৫.

জটায়ু (৩ নারী) ৪.

নিজস্ব সংবাদদাতা (৩ নারী) ৩॥

পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন—

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

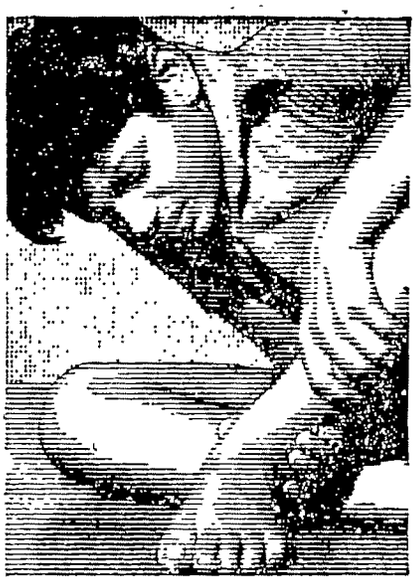

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা কমানোর জোরালো মলম

অমৃতাঞ্জন জোরালো ওষুধ। এতে দশটি চমৎকার ভেষজ আছে যা মাথাধরা, পিঠব্যথা, পেশীর যন্ত্রণা, মচকানি ও সর্দিতে চটপট আরাম এনে দেয়।

অ্যানোলিয়াম

সর্দি সারানোর আরামদায়ক মলম

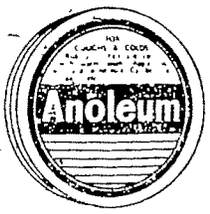

অ্যানোলিয়ামে আছে সর্দিকাশি সারানোর অব্যর্থ ভেষজ। এবং কোমল ত্বকের কথা ভেবেই এটি বিশেষভাবে তৈরী।

এই দুটি মলমই ঘরে হাতের কাছে রাখুন। কে জানে কখন দরকার হয়।

অমৃতাঞ্জন ও অ্যানোলিয়াম—নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ।

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড
৮০ বছরের বেশি সময় ধরে নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ প্রস্তুতকারক,

AM 1578

অমৃত
১৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা
২৭ আশ্বিন ১৩৮৪
14 Octo. 1977

সম্পাদকীয় ৩

ঢাকায় উদয়শঙ্কর ৪ মনীশ ঘটক
প্লান ফটোগ্রাফ ৬ কবিতা সিংহ
চিঠিপত্র ৬
সাহিত্য ১১ বৈকুণ্ঠ পাঠক

প্রচ্ছদকাহিনী

আমাদের পোশাক ১২ নিশীথরঞ্জন রায়
জামায় জ্যান্ত জোনাকি ১৭

অশোক চক্রবর্তী
গল্প
শ্রীলতার দ্বীপ ২০
অমিয়ভূষণ মজুমদার
বিদ্যাপতির পদাবলী ৩৬ তারাপদ রায়
একালের দাসপ্রথা ৩৮

উৎপলকুমার বসু
বড় গানের সমঝদার চিরকালই
কলকাতা ৪০ সন্ধ্যা সেন
পাকদণ্ডী ৪২ লীলা মজুমদার
সমালোচনা ৪৪
বনবিবি উপাখ্যান ৪৬

রবেন গঙ্গোপাধ্যায়
মিসা ১৯৭৩/৪৯ শ্যামল রায়
বাঙলার বাইরে বাঙালী ৫২
বহরমপুরে শরৎচন্দ্র ৫৪

গোপালচন্দ্র রায়
খেলা ৫৬
সিনেমা ৫৭
বিচিত্রা ৬২

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
বারোয়ারির ভগবান যৌবন
গল্প লিখেছেন
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপলকুমার বসুর

ভোজনবিলাস
কালিদাস দত্তর
পৌন্ড্রবর্ধন ও বর্ধমানভুক্তি
এবং
সুন্দরবনে পর্তুগীজ

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন
নিতাই ঘোষ
ভিতরের ছবি ও অলংকরণ
নিতাই ঘোষ এবং সুবোধ দাশগুপ্ত

উদয়শঙ্কর

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যে কয়জন প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের সাধনার ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সারা পৃথিবীর সামনে তাকে তুলে ধরেছেন, নৃত্যগুরু উদয়শঙ্কর ছিলেন সেই বিরলসংখ্যক মহৎ ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম।

চিত্রকলার তালিম নেবার জন্যে বিলাতে গিয়ে তরুণ উদয়শঙ্কর বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে শিল্পী আনা পাভলভার দলে যোগ দেন, এবং পাভলভার সঙ্গী নৃত্যশিল্পী হিসাবে খ্যাতিও অর্জন করেন। তাঁর চিত্রগুরু রটেনস্টাইনের কিন্তু ধারণা ছিল, উদয়শঙ্করের আসল প্রতিভা চিত্রশিল্পে। পাভলভা তা সত্ত্বেও জানান নৃত্যই শঙ্কর-প্রতিভার যোগ্য মাধ্যম। এবং উদয়শঙ্করও পাভলভার মতেই সায় দেন।

এইভাবে নিজের ভাগ্য নিজে স্থির করে নিয়ে পাভলভার পরামর্শে তিনি ভারতীয় নৃত্যের দিকে চোখ ফেরান। এবং অবিস্মরণীয় পুরুষাকারের সঙ্গে অনেকদিন ধরে বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে ভারতের মন্দিরে ও গুহায় উৎকীর্ণ নৃত্যভঙ্গিগুলির ফোটোগ্রাফ দেখে দেখে গবেষণা করতে থাকেন। তারপর তাঁর ভারতে ফিরে আসা। তত্ত্বগত জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে আরম্ভ করেন বাস্তব প্রয়োগের কলাকৌশলগুলি। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন তিনি চিরায়ত নৃত্য বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে শুরু করে সংখ্যাহীন লোকনৃত্যের আবেগ-বৈচিত্র্যগুলি পর্যালোচনা করে। এবং সবকিছুকে নিয়ে এক আশ্চর্য সমীকরণে সৃষ্টি করলেন এক নিজস্ব নৃত্যরীতি, যা আগাগোড়া ভারতীয় হয়েও নতুন; যা অনুকরণ নয়, পুনর্জন্ম। উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যকলার এই রেনেশাঁসের প্রাণস্বরূপ।

তাই বলে এ নয় যে তিনি শুধু পুরনো ঐতিহ্য নিয়েই থেকেছেন, কিম্বা প্রাচীন বক্তব্যকেই নতুন আঙ্গিকে হাজির করেছেন। মোটেই তা নয়। অতীতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্তমানের দিকেও চোখ ফিরিয়েছেন, যন্ত্র যুগের বেদনাকেও রূপায়িত করেছেন দলগত নৃত্যছন্দের অপরূপ প্রয়োগনৈপুণ্যের ভিতর দিয়ে। সেদিক থেকে ঐতিহ্যকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও সৃষ্টি করে গেছেন আগামীদিনের জন্যে নতুন ঐতিহ্য। আধুনিক যুগের নৃত্যশিল্পীরা যদি উদয়শঙ্করের এই উদ্ভাবনী প্রতিভা থেকে প্রেরণা লাভ করেন এবং নতুন কালের নতুন বক্তব্যকে নৃত্যরূপায়িত করতে পারেন তবে সেটাই হবে নৃত্যগুরুর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কেননা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে।' এবং সেই সঙ্গে এটাও সত্য—যে সমাজে প্রকৃত প্রাণশক্তি থাকে, তার নৃত্যও হয় প্রাণবান। সে কেবল অতীতের পুনরাবৃত্তিতেই মুগ্ধ থাকতে পারে না। তাকে প্রতিদিনই নতুন করে জন্ম নিতে হয়।

ঢাকায় উদয়শংকর

মনীশ ঘটক

সোমবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ এ কলকাতায় দেশিকোত্তম উদয়শংকরের মহাপ্রয়াণ হোলো। পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার একটি মধুর স্মৃতি মনে এল, কিন্তু নিজের সাম্প্রতিক শারীরিক অসামর্থ্য এই স্মৃতিচারণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। তবু যতটা পারি চেষ্টা করি। তখনকার অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা ছাড়া একটি মাত্র, অর্থাৎ ঢাকা শহরেই একমাত্র তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, এই স্মৃতিচারণ তার নথী হিসেবে গণ্য হবে আশা করব।

১৯৩১ সালের বড়দিনে আমি ঢাকা থেকে কলকাতা এসেছি। ঢাকা কর্মস্থল ছিল তখন। বদলির চাকরির চতুর্থ বছর সেটা। সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোড তখন ছিল কর্পোরেশন স্ট্রীট। রীগ্যাল সিনেমার উল্টোদিকে সেন্ট্রাল অটোমবাইল স্টোর এর মালিক শ্রীহরেন ঘোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁর অফিস ঘরটাই ছিল পুরোনো কলেজী বন্ধুদের মিলন ক্ষেত্র। কাজের ধান্দায় দিনমান কাটিয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা সেখানে যে যখন কলকাতা থাকতাম, মিলিত হতাম। হরেনদা আমার সহপাঠী ছিলেন না, পাঁচ-ছ বছর সেকেন্ড ইয়ারে। আই এ পরীক্ষায় না বসে থেকে থেকে আমাদের সাথে ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়ে ছিলেন।

হরেনদা কথা প্রসঙ্গে বললেন,

মনীশ তুমি কি উদয়শংকরের নাচ দেখেছো?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না। তবে কাগজে পড়লাম এম্পায়ার থিয়েটারে নাচের উৎসব হয়ে গেল, দেশে জয়জয়কার পড়ে গেছে। কলকাতায় কি আর শো হবে না?

হরেনদা বললেন, না, আপাতত নয়। বড়দিনের মরশুমে এম্পায়ার থিয়েটার দীর্ঘদিন এর জন্য অন্যান্য চুক্তির মেয়াদে আটকা পড়ে গেছে। তা ঢাকাও ত বড় শহর, বাংলার দ্বিতীয় শহর, সেখানে দিন দুয়েকের মতো শো আয়োজন করা যায় না?

আমি বললাম, নিশ্চয় যায়—তবে জানুয়ারীতে ফিরে খোঁজখবর করতে হবে। ওখানে চার পাঁচটা সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির হল আছে। তা ছাড়া য়ুনিভার্সিটির কার্জন হল আছে, কিন্তু সেখানে বোধহয় ব্যবসাদারী শো করতে দেবে না—মানে টিকিট বিক্রী করে।

হরেনদা বললেন, বেশ ত, দু-চারদিনের মধ্যেই ত ফিরবে, গিয়ে খোঁজ খবর কোরো, আর সঙ্গে সঙ্গে জানিও। আচ্ছা, কাল ত ফ্রি আছো, বিস্টলে লাঞ্চে এসো

হরেনদা তখনো সৌখীনদার ইমপ্রেসারিও হয়ে যান নি। ও কাজে সবে হাত লাগিয়েছেন। ওঁর মূল ব্যবসা ফোর্ড মোটরের সার্ভিসেজ, তাতেই বেশ চলে যায়। তা ছাড়া নতুন নতুন ব্যবসায়ে প্রাথমিক তোড়জোড় করা—শেয়ার বিক্রী জাতীয়—ইত্যাদিতেও হাত লাগান। বাসন্তী কটন মিল, নিউ থিয়েটার্স এই রকম গোটা কয়েক নাম এখন মনে পড়ে। নিজেও একটা ছবি তুলেছিলেন 'বুকের বোঝা' নাম দিয়ে, তাতে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিরো ছিলেন।

লাঞ্চের ব্যাপারে আমি রাজী হয়ে পরদিন বিস্টল হোটেলে বেলা ১২॥টায় গেলাম। এখন যেখানে মেট্রোর আগে কল্পতরু মিষ্টির দোকান একতলায়—সেই বাড়ীটার সব কটা তলা নিয়ে তখন বিস্টল হোটেল।

বেলা একটায় উদয়শংকরকে নিয়ে হরেন দা এলেন। আমরা দোতলায় গিয়ে বসলাম। উদয়শংকরকে প্রথমে দেখেই মোহিত হয়ে গেলাম। তখন তাঁর বয়স ৩১।৩২, কি সুঠাম দেহ, কি সুন্দর চোখ, অল্প একটু বাবরী গোছের লতানো চুল—সব জড়িয়ে একটা ভাস্কর্যের প্রতীকী চেহারা।

কথা বার্তা। কিন্তু কাজের কথাতেই পরিসমাপ্ত হল। ওঁরা গেলে কত নেবেন, কতজন যাবেন, এই সব। আলাপ আলোচনা ওঁরাই করলেন, হরেন দা আমাকে বললেন, ডিটেলস্ পরে বলব।

লাঞ্চের পর উদয়শংকর কন্টিনেন্টাল হোটেলে ফিরে গেলেন। সেইখানেই ওঁরা উঠেছিলেন।

বিকেলে হরেনদার সাথে দেখা হল। তিনি বললেন,

—ওরা দু'দিনে তিনটে শো দেবে—১২০০্ নেবে। তা ছাড়া কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে ট্রেণে সেকেন্ড ক্লাস ও স্টীমারে ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া নেবেন।

জানতাম সেই পদ্ধতিই সে আমলে চালু ছিল। তখনকার ট্রেণের সেকেন্ডক্লাস এখনকার ফার্স্টক্লাসের কাছাকাছি ছিল। আর গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা মেল স্টীমারের সেকেন্ডক্লাস ছিল বন্দি, আরামে নেয়ে খেয়ে যেতে হলে ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিন ও ডেক অপরিহার্য ছিল। দোতলায় স্টীমারের সামনের দিকের ডেকে জাহাজের গতিমুখো ইজি চেয়ারে বসে কাটাতে ভারী আরাম ছিল। বললাম

—সেই ব্যবস্থাই হবে, যদি সুবিধে মতো হল পাই। খোঁজখবর নিয়ে জানাব।

১লা জানুয়ারী ১৯৩২ সাল আমি [illegible]

শহরে পৌঁছে কয়েকদিন অফিস কাছারি করে কাটিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাথে হাউস পাওয়ার ব্যাপারে লেগে গেলাম। সদর ঘাটের সিনেমা হাউস। নবাবপুর রোডের মুকুল থিয়েটার। আসক জমাদারের গলির লায়ন থিয়েটার। কোনটার মালিকদেরই রাজী করাতে পারা গেল না। তাঁরা বোধহয় ভাবলেন মনীশবাবু লোক সুবিধের নয়, শেষ পর্যন্ত ভাড়ার টাকাই দেবে না। কাজেই অযথা প্রচণ্ড ভাড়া হেঁকে আমাকে বিফল-মনোরথ করলেন। এইভাবে মাস খানেক কাটল।

শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মাস দেড়েক পর, রাজী হয়ে গেলেন আবদুল্লাটোলা পিকচার হাউসের মন্মথবাবু। যেদিন দুটো শো হবে সেদিনের জন্য ২০০্ ও শেষ দিন একটা শোয়ে ১০০্ তে রাজী হয়ে গেলেন। তারিখ পরে জানাব বলে রাখলাম।

এইবার হোল আসল বিপদ—অর্থাৎ ২০।২৫ জন লোকের যাওয়া আসার ভাড়া, তাদের থাকাকালীন খাই খরচ ও চুক্তির টাকা, সব মিলে প্রায় হাজার তিন সাড়ে তিনের ধাক্কা। এ টাকা উঠবে কিনা ভয় হতে লাগল। কিন্তু ভয়কে ভয় পাবার বয়স সেটা নয়, তাই ভয় কাটিয়ে ভাবতে বসলাম। প্রথমেই মনে হল, এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের পথনির্দেশক হয়েছিল যে উদয়শংকরকে শুধু নৃত্যকলাকুশলী বলে প্রচারিত করলে তাঁর মনীষার অবমাননা করা হবে। তিনি শিল্পী ও বাহির্বিশ্বে ভারতীয় শিল্পসুষমার রাজদূত, ফ্রান্স জার্মাণী ও অন্যান্য স্থানে তিনি যে সম্মান পেয়েছেন সেটা মূলতঃ ভারতশিল্পের মর্মবাণীর প্রতি নন্দনতত্ত্ববিৎ ও সাধারণ সরল মানুষের আন্তরিক স্বীকৃতি। এই মর্মে প্রচার করতে হবে। শুধু প্রচারের জন্য নয়, এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস বলেই এত জোর পেয়েছিলাম।

এই ধারণা মাথায় নিয়ে আমি ঢাকা য়ুনিভার্সিটির তৎকালীন অন্যতম প্রধান আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমার সমস্ত কথা শুনলেন এবং ভাবতে আজও রোমাঞ্চ হয় যে, তিনি আমার বক্তব্য শুধু কাণেই শুনলেন না, কার্যকরী রূপ দিতে নিজেই এগিয়ে এলেন। তাঁর সাথে পরামর্শ করে ঠিক হল যে যেদিন উদয়শংকর তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকা পৌঁছলেন সেদিন পৌরসম্বর্ধনা দেয়া হবে কার্জন হলে এবং মানপত্র ও অন্যান্য উপঢৌকন বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসংস্থা এবং শহরবাসীর তরফ থেকে দেওয়া হবে। উদয়শংকরকে আখ্যাত করা হবে কালচারাল অ্যাম্বাসাডর অফ্ ইন্ডিয়া অভিধায়। এই পথেই আমরা এগিয়ে গেলাম এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা করতে কোমর বেঁধে লেগে গেলাম।

তারপর রেসই দিনটি এল। নারায়ণগঞ্জের স্টীমার ঘাটে কমপক্ষে দশ হাজার লোক—তার বেশীর ভাগই ছাত্র ও যুবা,—সমবেত হলেন দুপুরে ঢাকা মেলস্টীমার নোঙর করবার ঘাটে। সে এক অপরূপ দৃশ্য—বহুলোক বলেছেন যে অত লোকের ভীড়

(দাঁড়িয়ে)—ডাইনে থেকে—বিষ্ণুদাস শিবালী মাথায় গান্ধী ক্যাপ, অন্যান্য, বাঁদিক থেকে একজন আগে কাঁধে বোঁতামি পাঞ্জাবী পরা তিমিরবরণ, একদম বাঁয়ে রাজেন্দ্রশংকর। (গান্ধী ক্যাপ)
(চেয়ারে বসে)—কাকা কেদারশংকর, সিমকি, মিস্ সেন, উদয়শংকর ও কনকলতা।
(মাটিতে বসে)—ডাইনে থেকে দ্বিতীয় শিল্পী অনিল ভট্টাচার্য, রবিশংকরকে কোলে নিয়ে লেখক, একেবারে বাঁয়ে দেবেন্দ্রশংকর।

আর কোনও দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির আগমনেও হয়নি। ষ্টীমার থেকে নামবার সিঁড়ির কাঠের একটা দিক ভেঙে জন দুয়েক লোক জলে পড়ে গেল। উদয়শংকর অভিভূত হয়ে এগিয়ে গেলেন সাহায্য করতে—দরকার হল না, বাবা জলে তারা নিজেরাই উঠে এলেন।

ওঁদের নিয়ে ঢাকায় এনে কারসেট্রিজ ডাক বাংলোয় তুললাম। বাংলোর দোতলাটা সম্পূর্ণ ভাড়া নেয়া হয়েছিল ওঁদের জন্য। সন্ধ্যায় সিভিক রিসেপ্সান—কার্জন হলে। সেদিন কোন শো নেই—পরদিন থেকে প্রোগ্রাম। আমি ছুটলাম আচার্য হরেশচন্দ্রের কাছে—ডাক বাংলোয় আমার সহকারীরা রইলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন আচার্য স্বয়ং, পৃষ্ঠপোষক ঢাকার নবাব হবিবুল্লা সাহেব ও প্রসিদ্ধ কলা-রসিক কয়েশচন্দ্র দাস। সম্পাদক আমি, সহ-সম্পাদক চারজন—সুবোধ সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মৃণাল দাসগুপ্তা ও মীনা দে চৌধুরী। সহসম্পাদকেরা মানবীয় শিল্পী সম্প্রদায়ের তদারকির সুব্যবস্থা করে উদয়শংকরের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ঢাকা ছাড়বার আগে তিনি ঢাকার আয়োজন ও সুপরিচালনার জন্য অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে গিয়েছিলেন।

কার্জন হলে সন্ধ্যায় রিসেপ্শন—অতবড় হল সম্পূর্ণ জনসমাকীর্ণ। আচার্য হরেশচন্দ্র অভিভাষণ টি পড়লেন এবং চাকাই মসলিনে মুদ্রিত অভিভাষণটি রূপোর ফিলিগ্রি করা ষ্ট্যান্ডে বসানো একটি বৃহৎ শংখের মধ্যে পুরে অর্পণ করা হলো।

স্থানীয় শিল্পীদের আবাহন সঙ্গীত ও বিদায় সঙ্গীত দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘটল। আরো অনেক বিদগ্ধ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। সভাশেষে উদয়শংকর সম্প্রদায়কে ডাক বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আমি ছুটলাম আরমানীটোলা পিকচার হাউসে—টিকিট বিক্রীর যাবতীয় ভার হাউসের মালিক মন্মথবাবুর ওপর ন্যস্ত ছিল। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, সেও অকল্পনীয়। প্রথম দিনের দুটি শোয়ের টিকিট বেশীর ভাগই বিক্রী হয়ে গেছে দ্বিতীয় দিনের একটি শোয়েরও আংশিক। অবশ্য শেষের কথা আরো বলতে গেলে বলতে হয় যে শেষ পর্যন্ত শুধু সিটের টিকেটই বিক্রী সীমাবদ্ধ থাকে নি—ষ্ট্যান্ডিং অ্যাকোমোডেশনেও বেচতে হয়েছিল চড়া দামে। আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল আশাতীতভাবে।

আমি উদয়শংকর কিম্বা তাঁর দলীয় প্রখ্যাত শিল্পী সমাবেশের গুণাগুণ বিচারের ভার নিই নি, কাজেই শুধু নিজেদের কথাই এক কাহন বলে যাচ্ছি। দলে ছিলেন, উদয়শংকর নিজে, খুড়তুতো বোন কনকলতা, প্রবাসী মহিলা সিমকি, দেবেন্দ্রশংকর, রাজেন্দ্রশংকর, রবিশংকর—এঁরা সবাই নৃত্য-শিল্পী। রবিশংকর তখন ষষ্ঠ বর্ষে বয়েসের হবেন, তিনি তখনো যন্ত্রশিল্পীরূপে আত্ম-প্রকাশ করবার প্রস্তুতি নেন নি,—নাচের দলে ছিলেন। সঙ্গীত বিশারদদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ তিমিরবরণ ও বিষ্ণুদাস শিবালী ছিলেন এবং আরো অনেকে ছিলেন যাঁরা পরে খ্যাতনামা হয়েছিলেন—কিন্তু আজ আমার আর নামগুলো মনে পড়ছে না।

এঁদের তিনটে শোতো ঢাকায় তথা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন ঘটে গেল। আবাল বৃদ্ধ বণিতা শুধু জয়, জয়, আর ধন্য, ধন্য রবে দিক মুখর করে তুললেন।

যাবার আগের দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের শোয়ের পর রাত্রে ডাক বাংলোয় বিরাট ডোজসভার আয়োজন হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে উদয়শংকর বললেন ঘোড়া-গাড়ীর ছাদে বসে শহর পরিক্রমা করে দেখবেন। এত শিশুসুলভ সরলতা ও কৌতুকের সাথে অনুরোধটি জানালেন যে তখনি খান সাত আট ফার্স্টক্লাস মানে রবার টায়ার লাগানো। ভাড়াটে গাড়ী সংগ্রহ করা হল এবং প্রতি ছাদে চারজন করে বসে শহর দেখতে বেরুলেন। আমি ও আমার চার সহকারী সম্পাদকও ছিলাম সাথে।

উদয়শংকর মন খুলে কখনো গানের কলি গাইছেন, কখনো নৈশসৌন্দর্য সৌন্দর্য বিষয়ে মন্তব্য করছেন—এমনি এক উপভোগ্য পরিবেশ ভ্রমণ শেষ হল।

পরদিন ওঁদের সীমান্তগঞ্জে গিয়ে কলকাতাগামী মেলষ্টীমারে তুলে দিয়ে এলাম। সবাই অভিভূত, আমাদের চোখে জল। বিরহভাবাক্রান্ত মনে আমরা ফিরে এলাম, নটরাজ সদলবলে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ফ্লাশব্যাক

কবিতা সিংহ

এইমাত্র একটা খবর এল।

কোনো অধুনালুপ্ত মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা নাকি অসুস্থ। কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে, তিনি নাকি বিদেশে গেছেন চিকিৎসার জন্য।

ঈশ্বর করুন খবরটি সত্যিই উড়ো হোক।

ঈশ্বর করুন বিদেশের উন্নততর চিকিৎসায় তিনি সত্যিকার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আসুন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আজ একজনের কথা আমার মনে পড়ছেই।

মনে পড়া ছাড়া যেন আর কোনো গতিই নেই।

অনেক অনেক দিন পরে ধুলো ঝেড়ে একটি মোটা কাগজের খাকিরঙা খাম থেকে—যেটিতে আমার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের ফটোগ্রাফ জমা করে রাখি—তার একটি মাত্র ছোট্ট ফটোগ্রাফ খুঁজে বের করলাম।

চোখের সামনে ছবিটি ধরতেই যেন স্মৃতির পাতলা আবরণটি কাঁচা হয়ে উঠলো। ফেটে উপচে পড়ল তাজা লাল স্মৃতি।

সে কিন্তু কোনো ধনীর দুলালী ছিল না। ধনীর ঘরণীও হয়নি সে। তার বাড়ি ছিল উত্তর বাংলায়। বাবা মা আর ভাই-বোনের সংসারে থাকতে থাকতেই, মাথার ভিতর কবিতার পোকা নিয়ে সে ক্রমে ক্রমে ক্রুদ্ধ আর আলাদা হয়ে উঠছিল। তখন থেকেই তার চেষ্টা, সাহিত্যের ডায়নামো সেখানে ভয়ংকর ধর ধর, সেই কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর। সে চেয়েছিল সাহিত্য পরিবারের মধ্যবর্তী কুণ্ডাগ্নিতে আর সকলের কাছাকাছি পাশাপাশি বসে হাত সেঁকতে।

কিন্তু কলকাতায় সে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

সে রূপসী ছিল না। সে গুছিয়ে কথা বলতে পারত না। সাধারণ স্কুল শিক্ষিকার মতই পোশাক-আসাক পরত। চোখে পরত পুরোনো ধরণের চশমা।

কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে সে ছিল সংস্কারমুক্ত। অদ্ভুত বৈপ্লবিক আর দুঃসাহসী সব কাজ করে বসত—দুমদাম করে। কিন্তু 'ভিতর' 'অন্তর'—এই সব আর দেখে কে?

পৃথিবীতে তাহলে কভার ডিসাইনার থাকত না। মলাট ছাপা হত না সাড়ম্বর অফ-সেটে।

একদিন ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সে নিজেই আমার কাছে এসে হাজির। তাই আলাপ হল। তার আগেই কবি গোষ্ঠী ও কফি হাউস কেন্দ্রিক সাহিত্য চক্রের সঙ্গে তার রীতিমত জানাশুনো হয়ে গেছে। একটি ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিও তৈরী হয়ে উঠেছে। খুশিই হলাম। দুজন কবির মিলন সুখেরই হবে। অন্তত ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের পরিবেশ থেকে সে খানিক রেহাই পাবে। কিছুদিন যাবার পর লক্ষ্য করলাম সে আর তেমন সাহিত্য পাড়ায় যায় না। একা একা কলকাতার ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুরে কাটায়। আমায় একদিন বলল—তোমার কাছে আগে আসিনি কেন জানো? অমুক আমায় বলেছিল তুমি নাকি লেখা ছাপাবার জন্যে সবসময় সম্পাদকের টেবিলের সামনে বসে থাকো।

আমি হেসে বলেছিলাম—থাকি তো? না হলে লেখা ছাপা হয় কি করে?

শেষ পর্যন্ত তার কবি প্রেমিকের অন্যত্র বিবাহে আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রণও খেয়ে এলাম।

যাইহোক, সে আসত। সংগে অর্জুন কবিতা নিয়ে আসত। এবং সে যখন আসত না, ডাকে পাঠানো তার কবিতা আসছিল। সংগে চিঠি। দীর্ঘ সব চিঠি। কেন যে সেসব যত্ন করে রাখিনি। তাকেই কখনো তেমন যত্ন করেছি বলে মনে পড়ে না।

সত্যি কথা বলতে কি আমার দেড়-খানা ঘরের সংসারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বায়নাক্কা, চাকরি-বাকরি সামলে, মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে, সে এলে, এবং ক্রমাগত বসে থাকলে আমি যে সবসময়েই শরৎচন্দ্রের নাসিকাদের মত অতিথি বৎসল হতে পারতাম তেমনও নয়। তবু বুঝতাম, তার না এসে উপায় নেই: তাই সে আসে।

চিঠিপত্র

বরং খোলাখুলি অসৎ হওয়া ভালো

উৎপলবাবুর সাক্ষাৎকার পড়ে মনে হোল তিনি কাটাছাঁটা ভাষায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছেন যাতে পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ না থাকে। দুঃখের বিষয় আমার মত মোটাবুদ্ধির মানুষও পাঠক সমাজে আছে, যে বা যারা সাক্ষাৎকারটি পড়ে অথৈ জলে পড়ে গেছে। সংশয়ের কারণ-গুলো একে একে তুলে ধরছি।

উৎপলবাবু বলেছেন, "এ দেশে জাতীয় নাট্যশালা মানে হচ্ছে সরকারের আইনে করা অধীনস্থ কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত একটি নাট্যশালা' অর্থাৎ সেখানে শিল্পীদের বাক্-স্বাধীনতা থাকে না। পাশাপাশি তিনি বহুবার অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে সোভিয়েট দেশের নাট্যশালার কথা তুলে ধরেছেন। সে দেশে যে নাট্যশালা সরকার নিয়ন্ত্রিত নয় এবং সেখানে অবাধ বাক্-স্বাধীনতা আছে একথা আগে জানতুম না। শুনেছি শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে মঞ্চশিল্পীদের যে সাক্ষাৎকার হয় তাতে শ্রীমতী শোভা সেন অনুরূপভাবে সোভিয়েট দেশের তুলনা দেওয়াতে শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন যে সেদেশে সরকার শিল্পীদের সাহায্য করে বটে কিন্তু শিল্পীদের সেখানে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। দেখা যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধীও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সোভিয়েট দেশে মঞ্চ যে সরকার নিয়ন্ত্রিত নয় এবং সেখানে শিল্পীদের যে সার্বিক স্বাধীনতা আছে এই অজানা তথ্য পরোক্ষভাবে জানিয়ে উৎপলবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

তারপর ধরুন উৎপলবাবু নাট্যমঞ্চ সমিতির শরীক হতে রাজী নন, কারণ যে গ্রুপগুলি এতে জড়িত তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতে মেলে না। ভালো কথা। কিন্তু তাঁর মত আদর্শবাদী মানুষ তাহলে বোম্বাই 'ফিল্ম ব্যবসার অংশীদার হন কি করে? যে ব্যবসা তাঁরই ভাষায় "ধনিকসম্পন্ন জঘন্য অশ্লীল এক ধরনের শিল্প'। এই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত কোনো মিল নেই (আশা করি), তবে কি শুধু পয়সা উপার্জনের জন্যে তিনি এই ব্যবসার শরীক হন? তাই যদি হন তবে তাঁর ফর্মুলাটা যে ভালো তা মানতেই হবে, এবং এটা মেনে নিলে বহু বুদ্ধিহীন লোক বিবেকের তাড়না থেকে মুক্তি পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারবে? এটা অনুযায়ী তাহলে মানুষ দুটি আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টে নিজেকে ভাগ করে নেবে। একটিতে আদর্শ টাদর্শর বালাই থাকবে না, সেখানে পয়সা উপার্জনটাই মোক্ষ হবে। অন্যটিতে অবকাশ মত সে আদর্শের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবে। কিন্তু এই ফর্মুলাটা মেনে নিলে উৎপলবাবু তো স্বচ্ছন্দে ব্যভিচার বা বারবধূর মত নাটকেও নামতে পারেন। কিংবা ধরুন প্রেমানাবার্য হোলীনৃত্য বা শর্মিলা ঠাকুরের সম্বলিত 'অমানুষ' ছবিটির ধরি রূপায়ণ সম্ভব হয় (তাতে আবার জমিদার বংশের ছেলেকে হীরো বানানো হয়েছে—কী বিপদের কথা!) তবে তাতেও তিনি নিশ্চয়ই অভিনয় করতে পারবেন। এমনকি যেহেতু এই ধরণের নাটক অনেক বেশী সংখ্যায় দর্শক টানবে তাই এর মাধ্যমে তাঁর

কাহিনী আর দীর্ঘ করব না। ক্রমশ একটি স্কুলে চাকরি পেল। এবং পেল সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার। স্কুলটি কো-এডুকেশন। এবং সম্ভবত সে বয়োঃকনিষ্ঠ কাউকে ভালোবাসল। শুনেছিলাম এই দুরন্ত সম্পর্ক তার চাকরি যাওয়ার একটি কারণ হয়। চাকরিহীন, অর্থহীন দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত অবস্থাতেও ওর খুব ইচ্ছেছিল, যেন ওর একটি কবিতার বই হয়। এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই আমি এক কবি প্রকাশকের সংগে ওকে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। সেই দুর্যোগেও, সে টাকা দিয়েছিল সেই কবি প্রকাশককে। তার দারিদ্র্যের নগ্ন চেহারাটা সে আমাকে দেখাতে লজ্জা পেত। ভাবত ভরা সংসারে বসে আমি বুঝতে পারব না সে কত যন্ত্রণা পাচ্ছে।

তার শেষ চাকরি ওই মহিলা পত্রিকায়। পত্রিকাটিতে প্রধানত ধনী কন্যা ও বধূদের পাতাজোড়া ছবি প্রকাশিত হত, শাড়ির ফ্যাশান, ব্লাউজের কাট, মুখরোচক রান্নার সংগে থাকত সৌখীন সাহিত্যের ফোড়ন। সে মাঝে মাঝে আসত। বলত, চাকরি তার প্রথমে ছিল মূলত লেখার। এখন তা দাঁড়িয়েছে পিওনগিরিতে সারা দুপুর রোদে রোদে ঘোরা। লেখা জোগাড়করা, বিজ্ঞাপন জোগার করা ইত্যাদি। যাকে বলে অড জবস—প্রায় সবকিছুই তাকে দিয়ে করিয়ে নিতেন সম্পাদিকা। একদিন হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলেছিল জানো আজকাল আর হয় না। অসহ্য কষ্ট। মাঝে মাঝে এসে দুপুরে ঘুমোত আমার কাছে।

পারছি না। শরীরটা সবসময় জ্বলে। হজম হাতে এখনো ধরে আছি তার ফটোগ্রাফটা ফটোটা মহাবোধি সোসাইটি হলে হতালা। পাশাপাশি বসে আছি আমরা। সে একটু ঝুঁকে চশমাটা নাক থেকে একটু নামা। চোখ তুলে তাকিয়ে আছে সে। শূন্য ক্লান্ত ফাঁকা দৃষ্টি।

আমি এসেছি শুনে সে আমার পাশে এসে বসেছিল।

আমাকেই প্রথমে কবিতা পড়তে ডাকা হল। ফিরে এলাম। ওর সংগে গল্প করছি। কবিতা পাঠও শুনছি। অনেক কবি পড়লেন। কিন্তু ওকে কেউ ডাকছে না। উদ্যোক্তাদের ডেকে ওর কথা বললাম। তারা হ্যাঁ না করে চলে গেলেন। ও দেখলাম সব লক্ষ্য করছে। শেষ পর্যন্ত উঠেই গেলাম। ওর কথা বলে যখন ফিরে এলাম দেখলাম ওর আসনটি শূন্য। ওকে খুঁজতে বেরোলাম। আর ফিরে আসিনি। তার সংগে সেই আমার শেষ দেখা। তারপর শুনলাম ঘোর লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সে হসপিটালে। যন্ত্রণায় নিজেকে ছিঁড়ছে নিজের পরিবেশকে ছিঁড়ছে।

তার কলকাতার যে আত্মীয়েরা তার দেখা শোনা করছিলেন তাঁদেরই একজন তার প্রাপ্য বেতনের জন্য যখন কাগজের সম্পাদিকাকে ফোন করলেন তখন সম্পাদিকা তার রোগ ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর শুনেও ফোনের কাছে উঠে এলেন না। পরিচারক, মারফৎ জানালেন যে তিনি লাউঞ্জে চা-পানে ব্যাপৃত। তাঁর কোন বিসিভ করার সময় নেই।

তার সেই কবিতার বইটিও, তার জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি। বোধহয়, যিনি তার কাছ থেকে অর্থ নিয়েছিলেন তিনি বছরের পর বছর দেরী করেছিলেন এই ভেবে যে তার অকালমৃত্যু হবে না।

কিন্তু পৃথিবীতে সবসময়ই যা ঘটে তা সব হিসেবের বাইরে। যারা যায় তারা আর ভুল শোধরাবার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ দিয়ে যায় না। আর তাদের জন্যে মহাবোধি হলে দ্বিতীয় কবি সম্মেলন বসানো যায় না। আর তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হাতে তুলে দেওয়া যায় না তাদের ছাপানো বাক্যগ্রন্থ।

এক বিখ্যাত মানুষের কথা পড়েছিলাম। দুপুর রোদে চৌমাথার মোড়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে থাকতেন কারণ অল্প বয়সে বৃদ্ধ বাবাকে রোদের মধ্যে কাজে পাঠিয়ে তিনি বাড়িতে ঘুমোতেন।

আমাদের উদ্ধারের উপায়ও তাই। অনুতাপের রোদে পোড়া শোক আর দুঃখের অশ্রুতে ভেজা।

কিন্তু সেই সংগে একটি বিশ্বাসও ভিতরে পালন করি আমি তা হলো পুনরুত্থান। পুনরুত্থান না বলে পুনর্জন্মও কি বলা যায় না।

তখনো কি ফিরে দেখা হবে না?

ফিরে ক্ষমা চাওয়া?

যে সাফল্য আমাদের সবচেয়ে বড় বিফলতা,

ঈশ্বর করুন সেই ঘোর কর্কট থেকে আমাদের সকলের মুক্তি হোক।

শস্ত্র বিপ্লবের প্রচার কার্যটাও ভালোভাবে হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে মনে হয় যে সেক্ষেত্রে তিনি হঠাৎ ভীষণ হিংসামার্গী হয়ে উঠবেন। আর তখন তাঁর রিঅ্যাকশনটা কি কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠবে না?

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? দেশের মুখোজ্জ্বলকারী ইন্দো-অ্যামেরিকান প্রয়াস 'গুরুর মত ছবিতে বা যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর আদর্শহীন বোম্বাই ছবিতে অভিনয় করে উৎপলবাবু অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করেন, এবং তার ফাঁকে ফাঁকে আদর্শবাদী গণনাট্যও মঞ্চস্থ করেন। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। পরশুরামের গণ্ডেবি-রাম বাটপাড়িয়া তো কবেই বলেছিল, "যদি ধন কুছ দোষ লাগে—জানে রণছোড়জী—মেরা পুণ্যি থোড়াবহুত জমা আছে।"

তা এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর উপার্জিত অর্থ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গণআন্দোলনের কাজেই ব্যয় করা হয়। তাঁর নিজস্ব বিরাট লাইব্রেরী আছে, তা না হলে তিনি জ্ঞান আহরণ করবেন কি করে? কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্য অর্থাভাবে বই কিনতে না পারলেও পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন কিন্তু তাঁদের কথা বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ তাঁদের ফর্মুলার সঙ্গে উৎপলবাবুর ফর্মুলা মেলে না। আপনাদের প্রতিনিধি বর্ণনা অনুযায়ী উৎপলবাবুর বিরাট বাড়িতে বাস করা অথবা 'এ্যাই' বলে সম্বোধন করার জন্যে ভৃত্যকুল পোষণ করাও পরোক্ষভাবে বিপ্লবেরই কাজ। নিজে এবং নিজের পরিবারবর্গ আরামে না থাকলে শ্রমিক-ভাইদের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে মাথা ঘামানো যায় কি? নাকি টেলিভিশনে বোরিং খেলা দেখতে ব্যস্ত থাকার বাগবাজার থেকে টালীগঞ্জ আগত ক্লান্ত সাংবাদিককে পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট সত্ত্বেও ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যায়?

এইসব পরস্পরবিরোধী বুকনি ও তথ্যের সমাবেশে 'বিপ্লব' 'আদর্শ' 'নীতি' ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ বড়োই গোলমেলে বোধ হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে খোলাখুলি-ভাবে অসৎ হওয়া বরং ভালো কিন্তু সততার মুখোস পরে যেসব অসৎ মানুষ ঘুরে বেড়ায় তারা সমাজের পক্ষে ঢের বেশী ক্ষতিকর।

বারবধূ নাটকের ওপর তো অনেকেই খড়গ-হস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অভিযোগ হোল দর্শকের এক ধরনের মনোবৃত্তি একসপ্লয়েট করে তাঁরা ব্যবসা করছেন। কিন্তু উৎপল-বাবুর নাটকের সুশ্রাব্য ভাষা, ধর্ষণ ও নারী-দেহের আকর্ষণীয় বর্ণনা, এবং অতিমার্জিত রসিকতা ও গালিগালাজ সম্বন্ধে তাঁদের কি বক্তব্য? (এ বস্তু আবার গ্রামেগঞ্জে, মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে দিতে উৎপলবাবু কৃত-সংকল্প)। বারবধূর প্রযোজক বলেন তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ, উৎপলবাবুর উদ্দেশ্যও যে মহৎ তাতে সন্দেহ কি? উপরোক্ত উপাদান-গুলিই হয়তো বিপ্লব-সংস্কৃতির বাহক ও পরিপূরক। সোভিয়েট মঞ্চে এর তুলনা আছে কি?

থাকতেও পারে। আমরা আর কতটুকুই বা জানি। উৎপলবাবুর কথা এবং কাজ থেকে আমরা কতকিছুই না শিখলুম। তবু সংশয় যেতে চায় না। যেমন উৎপলবাবু আমাদের দেশের সাংবাদিকতাকে বৃহন্নলাবৃত্তি বলেছেন। তাঁর কর্মপ্রণালীকেও ঠিক অর্জুনবৃত্তি বলে মেনে নিতে বাধছে। পোড়ার মুখে হাসিও আসছে।

সুজাতা বসু
বান্দ্রা, বোম্বাই।

'বারবধূ' একটি মদের নেশা

আপনার 'সাহিত্য' অধ্যায় খুলে দেখলাম 'নাটক এবং মন্ত্রী'। অপূর্ব ফায়দায় লেখা এবং সমালোচনা দুটোই আমার চোখে পড়ল। আপনি যে ভালো লিখতে পারেন সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। অন্তত আমার নেই। বিশ্বাস করুন।

এখন আমার প্রশ্ন একজন সুসাহিত্যিক বা খ্যাতনামা সাংবাদিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হতে পারে আপনি নিশ্চয় সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সমাজের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের উপর সমাজের ভালো মন্দ অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং সেই বুদ্ধিজীবি মহলের একজন হিসাবে আপনি যেভাবে একটি অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ নোংরা বহির্দৃশ্যে পূর্ণ, অবাস্তব নাটক 'বারবধূ'কে সমর্থন করলেন তাতে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য দরদী মানুষেরা থমকে দাঁড়িয়েছেন। এখন বোধহয় নতুন করে নাট্যকারদের ভেবে দেখার সময় এসেছে যে আগামী দিনে 'বারবধূ'ই নাট্যকারদের ভবিষ্যত হবে না 'বারবধূ'র বিপরীত চিন্তাধারাই ভবিষ্যত হবে?

আপনি নিশ্চয় জানেন যে সুন্দর, সুস্থ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগামী দিনে যুবক-যুবতীদের একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে। এদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, কবি ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদেরই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিটি দেশেই তাই হয়েছে আমাদের ভারতেও তার ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়ই।

'বারবধূ' একটি মদের নেশা, মিস শেফালীর উলঙ্গ কায়দায় নৃত্য একটি মদের নেশা, হোটেলের নাচ, নাইট ক্লাব সবই মদের নেশার মত অর্থাৎ একবার যদি তরুণ সমাজকে ধরতে পারে তবে চুম্বকের মত লেগে থাকে। এই সমস্ত যা কিছু সমাজের ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

মাননীয় দেশপাণ্ডে মহাশয় বলেছেন, 'সংস্কৃতি কেমন হবে তা জনসাধারণ গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমেই স্থির করবেন।' খুব ভাল কথা। বিচারের মানদণ্ডটা কি হবে। অশ্লীল নাটক? বর্তমানে এই ধরনের নাটক, সিনেমা, নাইট ক্লাব প্রভৃতি মানুষ বেশী বেশী করে গ্রহণ করছে তবে কি ধরে নিতে হবে এটা সুস্থ নাটক? নিশ্চয় নয়। আর একটি প্রশ্ন হোলো ষোলোশো রজনী সফল হওয়া বা হাউসফুল মানে কি পশ্চিমবাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষ গ্রহণ করলো?

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'বারবধূ'কে 'অপসংস্কৃতি' বলায় কারো দুঃখ করার কিছুই নেই। তিনি বারবধূ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন বন্ধ করার জন্য। আমার প্রশ্ন বন্ধ করে দিয়ে ভালো নাটক মঞ্চস্থ করতে তাদের আপত্তি কি? সমাজের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরবার জন্য যারা নাটক করে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন 'বারবধূ' তাদের লিস্টের মধ্যে পড়ছে না। একটা অশ্লীল নাটক তা যতই বাস্তব হোক সে সম্পর্কে যদি একটি স্বাধীন দেশের সরকারের ঐ বিভাগীয় মন্ত্রী অনুরোধ করে থাকেন তাহলে তার সম্মান রক্ষা না করে তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি এই সমালোচনা কেন? আইন হাতে থাকলে নিশ্চয় ব্যবস্থা হোতো। আইন নেই বলেই অপনাদের মত কয়েকজনের সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে। আসলে বারবধূ কর্তৃপক্ষ সরকারের মন্ত্রীকেও মানছেন না এবং জনসাধারণের রায়ও মানছেন না। 'বারবধূ' কর্তৃপক্ষ এই নাটকটিকে এখন পুরোদমে চালাচ্ছেন, কারণ কোনো বিপদ সৃষ্টি হয়নি শুধুমাত্র অনুরোধ এসেছে। তাই বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয় বলেছেন 'আছে যখন থাক না!' তাহলে তো এবার নাট্য আন্দোলন শুরু হবে কোন নাটক চলা উচিত বা কোন নাটক চলা উচিত নয় তাই নিয়ে। সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে।

বৈকুণ্ঠ পাঠক, মন্ত্রী মশায়ের সঙ্গে একমত না হতে পারেন কিন্তু তরুণ সমাজের নৈতিক চরিত্র যাতে এইসব গোষ্ঠী নষ্ট করতে না পারে সেদিকে একটু নজর দিন না। 'বারবধূ' কর্তৃপক্ষ বনাম সরকারের তথ্যমন্ত্রী হচ্ছে হোক না। আপনি আমি কেন ইন্টারফেয়ার করি। আসুন মুখ বন্ধ করে বসে থাকি। ভালো কাজ যখন হবে তখন মুখ খুলব। কেমন? রাজীব ঘোষচৌধুরী; সি আই টি বিল্ডিংস, ব্লক, ৮, ফ্ল্যাট ১১, কলিকাতা ৫৪।

এত হৈ চৈ কেন?

অমৃতের ৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আপনার লেখা পড়ে শ্রীপুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডের বহুমুখী প্রতিভার খবর জানা গেল—এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু 'নাটক' এবং মন্ত্রী' নিয়ে এ লেখার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল? বারবধূর ষোলোশো রজনী অভিনয় উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য তথ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অসীমবাবু আমন্ত্রণ জানান। তথ্যমন্ত্রী ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে লেখেন—'বারবধূ অপসংস্কৃতির বাহক; আপনারা অবিলম্বে তাই নাটক বন্ধ করুন। কিন্তু এরপর তথ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষাই বলেছেন যে তার এই আবেদন (নাটক বন্ধের) কখনই সরকারী হুকুম নয়। বারবধূ বন্ধ করার সপক্ষে যদি সত্যিকারের জনমত গড়ে ওঠে তবেই শুধু বারবধূ বন্ধ করার সরকারী চেষ্টা হবে, না হলে বারবধূ যেমন চলছে তেমনি চলবে। বারবধূ বন্ধ করার স্বপক্ষে সত্যিকারের জনমত গড়ে ওঠার যখন কোন কারণই নেই তখন তথ্যমন্ত্রীর 'একটি কথা' নিয়ে এত হৈ চৈ কেন! বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বারবধূর বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অসীমবাবু তথ্যমন্ত্রীর কথাটিকে মূলধন করে বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্য এনেছেন (এখানে এ কথাটি বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জনৈক অমৃত পাঠকের কলমের ধাক্কায় বারবধূ বিজ্ঞাপনের রূপান্তর হয়েছিল—যে বারবধূর প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছিল তা সকলের ভালো লাগার নাটকে দাঁড়িয়েছিল)। আপনার লেখাটি পড়ে মনে

হচ্ছে এও এক ধরনের প্রচার-চমক—এর বেশী কিছুই নয়।

তথ্যমন্ত্রী বারবধূকে অপসংস্কৃতির বাহক বলে অন্যায় করেছেন। তিনি যদি বারবধূর অভিনয় বন্ধ করতেন নিশ্চয়ই ঘোরতর অন্যায় হতো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা লাভও হতো—জনৈকের মৃত্যুর অসীম চক্রবর্তীকে আমরা আবার ফিরে পেতাম। বারবধূ যেমন অপসংস্কৃতির বাহক নয়, তেমনি মহৎ সৃষ্টিও নয়। বারবধূর ব্যবসায়িক সাফল্য অসীমকে অন্ধ (অন্তর্দৃষ্টি অর্থে) করে দিয়েছে—না হলে তিনি বুঝতে পারতেন বারবধূর এক একটি রজনী তাঁর সৃজন-ক্ষমতাকে তিল তিল করে ক্ষয় করে যাচ্ছে। এখনও অসীম শেষ হয়ে যাননি—তাই আজ যদি বারবধূ বন্ধ হয়ে যেতো, অসীমের কাছে সত্যিকারের মহৎ কিছুই হয়তো আমরা পেতাম। কিন্তু যেদিন বারবধূ বন্ধ হবে সেদিন অসীমের সত্যিই কি কিছু দেওয়ার থাকবে! যাক্ দুঃখ করে লাভ নেই, 'অসীমকে আর ফুটপাথে অভিনয় করতে হবে না' এই ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করবো।

সুপ্রিয় দত্ত চৌধুরী। শিলং-৭৯৩০০৪।

ঈর্ষার আর একনাম অপসংস্কৃতি

৯ সেপ্টেম্বর অমৃতে বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয়ের "নাটক এবং মন্ত্রী" লেখাটি পড়ে আমার কয়েকটি কথা মনে হল। সে কথাগুলি জানাচ্ছি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয় ঐ লেখার মাধ্যমে "বারবধূ" নাটকটি অপসংস্কৃতি নয় এই কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি নাটকটি সম্পর্কে ২২শে এপ্রিলের সংখ্যাতেও প্রসস্তি গেয়ে ভাল সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমার মতে এটি একটি অপসংস্কৃতির নাটক। বর্তমানে এটি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনারা অন্য নাটক করুন, যদি ক্ষতি হয় তবে সরকারী তরফ থেকে সাহায্য করা হবে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে এটিকে এতদিন 'বেপ্রাহট নাটক', 'প্রতিটি দৃশ্য প্রাপ্তবয়স্কের জন্য' বলে চালিয়েছেন। অসীমবাবু বর্তমানে বিজ্ঞাপনে বোল তুলেছেন "না দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান এ নাটকটি বন্ধ থাক আর দেখে গত দু'বছরে চল্লিশ লক্ষ লোক চেয়েছেন এ নাটক চলুক। আমাদের কি করা উচিত।" ঈর্ষার আরেক নাম অপসংস্কৃতি"। আমার প্রশ্ন চল্লিশ লক্ষ দর্শকের মধ্যে কতজন নাট্যরস গ্রহণের জন্য দেখেছেন আর কতজন বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে নাটকের নায়িকার দেহ দেখার জন্যে উপস্থিত ছিলেন তা কি ভেবে দেখা হয়েছে? সেক্স সম্বলিত হিন্দি সিনেমাগুলিতে প্রচণ্ড ভিড় হয় তবে এগুলিকে কোন শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলব?

প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক ডঃ কারাগোন ভের একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন—"একজন তরুণ দার্শনিক একটি চিন্তাভিত্তিক ছবির চেয়ে যৌন আবেদন ভরা একটি ছবি বেশী পছন্দ করে। তাই তারা দাবি করে—ওকে বেছে নিতে দাও"। যারা যৌন লিপ্সার বিকৃত সৃষ্টি করে তারা শিল্পী নয়, তারা শিল্পীর দারিদ্র্যকে নিজেদের যৌন লিপ্সার সঙ্গী করে শিল্পকে হত্যা করে।

বিমলচন্দ্র দাস। গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

বারবধূ আরও কদর্য

বারবধূ সংস্কৃতিও নয় আবার অপসংস্কৃতিও নয়। তাহলে কি? সমাজের নীচু স্তরের নোংরামি, কারণ সংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতি দুটি বিষয়ে পরস্পরের সম্পর্ক বাংলা সাহিত্যে বিপরীত চিন্তাধারায় গড়ে উঠেছে। সমাজের দুই শ্রেণীর সংঘাতের মধ্যেই ঐ দুটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

শ্যামলবাবু, আমি আপনাকে চিনি না তবে একবার সাক্ষাৎ পেলে বাধিত হতাম। আপনার উপন্যাস দু-একটি আমি পড়েছি। লেখার উপর অধিকার আছে। উপন্যাস লেখার ধৈর্য আছে। যতটুকু নাম করেছেন, তার চাইতে আরও নাম করতে পারবেন যদি 'বারবধূ'-কর্তৃপক্ষ আপনার উপর সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার না করে বা আপনি ওদের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করে সরাসরি আক্রমণ করেন। আপনাদের উপর সমাজের তরুণ-তরুণীদের চরিত্র গঠনের অনেকটাই নির্ভর করে। সাহিত্য মানে সু-সংস্কৃতি। বুদ্ধিজীবীদের পরম বন্ধু কলম। সেই কলম যার পক্ষে যাবে তাদেরই বিজয় ঘোষিত হবে।

বলুন তো পিন্টুর চরিত্র আপনার ভালো লাগলো? বেশ্যাপল্লী অনেক ভদ্র কিন্তু প্রতাপ হলে 'বারবধূ' তার চাইতেও

প্রকাশিত হলো

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর

যক্ষিণী ১২

বুদ্ধদেব গুহর

লবঙ্গীর জঙ্গলে ৮

শচীন ভৌমিক-এর

হাউস ফুল ১২

পরিতোষ মজুমদার-এর

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ১২

শ্রীপারাবত-এর

চিতোরগড় ৮

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩ ফোন : ৩৪-৫০৩৫

কদর্য নয় কি? ভালবাসাগুলো কি করে বুঝলাম না। মাননীয় মন্ত্রীর অনুরোধকে উপেক্ষা করে—এভাবে 'বারবধূ' পক্ষে ওকালতি করে নিজের নাম কলঙ্কিত করেছেন কেন? বিশ্বনাথ দাস। কিরণবাবুর বাগান, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

বাচ্চা ছেলের মত যুক্তি

বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'নাটক এবং মন্ত্রী শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে বিস্মিত ও মর্মাহত হলাম। 'বারবধূ' নাটকটির অভিনয় বন্ধ না করার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তিনি 'অমৃত' পাঠকের সামনে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছেন বলে ত আমার মনে হয় না। তার মতে 'বারবধূ' চলতে পারে কারণ (১) 'তিনি তাঁর দুই কন্যা ও স্ত্রী এই নাটক দেখে 'খারাপ' হয়ে যাননি।' (২) হোটেলের নাচগান, হিন্দি ছবি, রঙীন ম্যাগাজিন ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মশাইএর ক্ষমতা যখন নেই তখন কি তিনি ওই 'বারবধূ' নাটক বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন। (৩) 'আছে যখন থাক না, লোকে খারাপ হলে নেবে না।' মাননীয় বৈকুণ্ঠ পাঠক, আপনি নিজেই একটু সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করুন ত আপনার ওই তিন দফা যুক্তি দিয়ে কি 'বারবধূ'কে ডিফেন্ড করা যায়? বিশ্বাস করুন, আপনার মত বিদগ্ধ সমালোচকের কাছ থেকে এরকম ছেলেমানুষী লেখা বেরিয়ে আসবে এ আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

এ সম্পর্কে আলোচনায় পুরুষোত্তম দেশপাণ্ডের মন্তব্যও আমাকে খুব হতাশ করেছে। তাঁর মতে, 'সংস্কৃতি কেমন হবে তা জনসাধারণ গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমেই স্থির করেছেন।' এই 'বারবধূ' শহর কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জ মাতিয়ে বর্তমানে এশিয়া রেকর্ডের পথে। জনসাধারণ একে ভীষণ আন্তরিক(?)ভাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই নাটক সুসংস্কৃতির ধারক ও বাহক না হয়ে যায় না। বাঃ! দারুণ যুক্তি! আচ্ছা বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয় এখন দেশপাণ্ডেজির 'গ্রহণ ও বর্জন' ফরমুলা ধরে আসুন না 'সংস্কৃতি - অপসংস্কৃতি' নামের সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করি। উদাহরণ ১—পাশাপাশি দুটো হলে একটায় দেখান হচ্ছে ধরুন দারুণ একটা হিন্দি ছবি আর একটায় বাঙলা ছবির একজন নামী পরিচালকের একটা পরীক্ষামূলক ছবি। হিন্দী ছবির টিকিটের দাম বেসরকারী বাজারে পঞ্চাশ টাকা ছাড়িয়ে গেছে আর ওদিকে পরীক্ষামূলক বাঙলা ছবির বেচারা টিকিটবাবু জানলাটা আধখোলা রেখে ঝিমুতে ঝিমুতে একটু ঘুমুনো যায় কিনা তার চিন্তা করছে। এখানে দ্বিতীয় ছবিটি জনগণ দ্বারা বর্জিত অতএব দেশপাণ্ডেজীর সূত্র অনুসারে ছবিটিতে অপসংস্কৃতির কাদা লেগে আছে।

উদাহরণ ২—কলকাতায় 'বারবধূ', 'বান্ধবী', 'প্রজাপতি' যখন তেজী ঘোড়ার মত ঘাড় ফুলিয়ে টগবগ শব্দে ছুটছে তখন 'ফুটবল', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'রামযাত্রা'র মত নাটকগুলো কোনও রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে 'একটা কিছু' করার চেষ্টা করছে। এখন এই 'বারবধূ' ইত্যাদি নাটকগুলোকে জনগণ গ্রহণ করেছে সুতরাং 'গ্রহণ বর্জন' সূত্র অনুসারে এরা 'প্রগতিশীল' সুসংস্কৃতির সুগন্ধ ছড়িয়ে আমাদের ধন্য করছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, চতুর্মুখে এদের প্রশংসা শুনতে শুনতে ক্রমশঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু শুধু 'অমৃতে'র কিছু দুষ্প্রাপ্য নিউজপ্রিন্টের অপচয় হবে। মাননীয় বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয় এবং অমৃতের সুধী পাঠকবৃন্দ, এইবার আপনারা দেশপাণ্ডেজীর 'গ্রহণ-বর্জন' ফরমুলা আর ওপরের উদাহরণ দুটো অনুগ্রহ করে একটু বিশ্লেষণ করে দেখুন ত দেশপাণ্ডেজীর মন্তব্য কতখানি সমর্থনযোগ্য। মনে হয় এক মিলিমিটারও না। আসলে 'গ্রহণ-বর্জন' ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যবসায়িক, এ দিয়ে কোন শিল্প-সংস্কৃতির ভাল মন্দ বিচার করা যায় না, যেতে পারে না। আর আমাদের দেশে সস্তা জিনিসের কদর বেশী এ ত একটা স্কুলের ছেলেও জানে। আর একটা কথা বলে লেখাটা শেষ করতে চাই। একটা নাটক আমি দেখে এসে 'খারাপ' হয়ে গেলাম না, সুতরাং নাটকটি ভাল এরকম বাচ্চা ছেলের মত যুক্তি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

সুদেব চট্টোপাধ্যায়। কুলটি (বর্ধমান)।

বৈকুণ্ঠ, প্রসঙ্গান্তরে আসুন

'বারবধূ' নাটক আমি বহরমপুর শহরে দেখেছি, দেখে অভিভূত হয়েছি—নাটকের প্লট, সমবেত অভিনয়, নাটকের নির্দেশনার ক্ষেত্রে অপূর্ব মুনশীয়ানার ফলশ্রুতিতে যে রসসৃষ্টি তা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, নাটকে কতগুলি দৃশ্য ছিল যেগুলিকে নাকি মফঃস্বলে সংযতভাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে, দর্শকদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, শুনছি এখন যে নাটক চলছে তাতেও নাকি কিঞ্চিৎ কাঁচি ব্যবহার করা হয়েছে। সে যাই হোক, অগণিত দর্শক নাটক (সুস্থ শরীরে যদিও সবাই নয়, হাসাহাসি হয়েছিল—মানে ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি) দেখে, তারিফ করেছিলেন আর কেতকী দত্তের সেই অভিনয় অবিস্মরণীয়।

কিন্তু, এই নাটকের বিপক্ষে ঝড় উঠেছে—আবার পক্ষেও সৈন্য মোতায়েন। আমরা নাটকের বিরুদ্ধে সরকারী কোন সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নই—'বারবধূ' উঠলে 'অপসংস্কৃতির' লয় হবে, আর থাকলেই প্রলয় ঘটবে, বিষয়টা তা নয়।

'বারবধূ'র পক্ষে বলেছি। এখন বলি, দিনের পর দিন 'বধূ' সর্বস্ব নারীমূর্তি—গরম গরম ছবি আর গরম গরম বুলি—'ভালবাসার বেন্না হট নাটক', আর এক বিচিত্র সহাবস্থান, ডাঃ চৌধুরী বলিতেছেন নাট্যকার-কবি বলিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি, এখন আবার ভিয়েৎনাম আর 'বারবধূ' এই বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে।—। একই নাটক চলছে—দ্বিতীয় কই—এতে সৃষ্টির নিশানা কোথায়? এও তো একপ্রকার বণিকবৃত্তি—এখানে সংগ্রাম-টংগ্রাম কোথায়। বৈকুণ্ঠ পাঠক মহাশয় 'বারবধূ'কে যেমন চলছে চলতে দিন, বাংলা নাটকের পক্ষে প্রসঙ্গান্তরে আসুন। আপনি কি জানেন, মফঃস্বলে বালুরঘাটে 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থাকে—দেখেছেন তাঁদের নাটক? আমি দেখেছি 'দেবীগর্জন'—এঁদের পক্ষে কলম ধরুন—সারা দেশের নাট্যচর্চার পক্ষে অমৃত সহায়ক শক্তি হয়ে উঠুক। জ্যোতি রায়। বহরমপুর।

সাহিত্য

চিতায় মঠ

মরলে চিতায় মঠ দিতে চাই আমরা। বেঁচে থাকতে দিয়ে থাকি—অবহেলা। ইহলোকে অবিশ্বাসী আমরা পরলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। বেঁচে থাকতে কারও শক্তিকে স্বীকার করে নিতে আমাদের আটকায়। মৃত্যু হলে তবেই মরণোত্তর স্বীকৃতি দিতে ছুটে যাই। আর সে মৃত্যু অকালে হলে তো কথাই নেই। আমাদের কলম দিয়ে খবরের কাগজের কলমে লাল ঝোল ঝরে।

ঝরাই আমরা—যারা সবে অকালমৃত্যুর বয়সটা টপকে চলে এসেছি। আমরা কারা? যারা কিনা একটু আধটু বিপদ ও অভিমানের স্বাদ গায় মেখে টুপ করে নিজেদের নিরাপদ ফ্ল্যাটে ফিরে আসি। জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে অভিজ্ঞতা আয় করি—তাতে খানিক পালিশ, খানিক অভ্যাসের মিশেল দিয়ে কোনক্রমে নিয়ারার টু দ্য বিয়ালিটি খাড়া করে ফেলি।

যে সামান্য ক'জন এই জোচ্চুরিতে গা না ভাসিয়ে শিল্প করতে চান—তাঁরা শরীরের দামে কবিতা কেনেন। এ ঘটনা বারবার দেখে আসছি। মনে মনে নমস্কার জানাচ্ছি। প্রকাশ্যে মুঠো কঠিন করে প্রশংসা করছি সামান্য। পিঠ চাপছি অধিক।

কল্পনা, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সব সময় হাত মিলিয়ে চলে না। ব্যবহারিক জগতে একটা সিস্টেম ইন ম্যানেজমেন্ট কিংবা গৃহিণীপনা না থাকলে শিল্প সাজিয়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে।

রমানাথ শেখর সুব্রত আশিস তারাদাস বিকুমার শৈবাল সিদ্ধার্থ সঞ্জীব অমর মিত্র হীরক চন্ডী লাহিড়ী বিজন শচীন দাশ এরা গল্প লিখছেন। কবিতা লিখছেন পবিত্র রত্নেশ্বর বুদ্ধদেব ভাস্কর দেবারতি পার্থ প্রতিম অলোকনাথ দাউদ অমরেন্দ্র। এদের জন্যে, এদের জীবৎকালে শিল্প প্রকাশের ভদ্র সম্মত কি আয়োজন আমরা করতে পেরেছি? তুষার, যোগব্রত, আমাদের প্রিয় শংকর চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে সম্মানজনক ও উৎসাহব্যঞ্জক কী পরিবেশ আমরা দিতে পেরেছি?

পবিত্র মুখোপাধ্যায় আঠারো বছর ধরে 'কবিপত্র' নামে একটি কাগজ করে আসছেন। বালক বয়স থেকে যাকে ক্ষুধার অন্ন ও মাথা গোঁজার ঠাঁই যোগাড় করতেই অনবরত হন্যে হয়ে প্রাইভেট টিউশনি করে কাটাতে হয়েছে—তাঁর কি দরকার ছিল কবিতা করার?

কবিরা তবু দুর্ফর্মার কাগজ করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন। গল্প লেখকদের কথা ভাবুন। রমানাথ সুব্রতরা বছরের পর বছর গল্পের কাগজ বের করে ছেন। এই সময়টাতে ওরা এল আই সির দালালি করতে পারতেন। তা করেন নি। চল্লিশের কাছাকাছি গিয়েও এখনো কি একজন বাঙ্গালী গল্প লেখককে বৃহৎ প্রকাশনার সম্পাদকের মানসিক অবস্থা বুঝে কথা শুরু করতে হয় না?—তাঁর অপরাধ, তিনি গল্প লিখেছেন। অনেক সময় তাঁকে দিনের একটা বাঁধা সময়ে গল্প নির্বাচকের সঙ্গে ধীর পায়ে পায়চারী করে তাঁর সঙ্গী হতে হয়—তাঁর মন পেতে হয়—তারপর তাঁর গল্পটি কম্পোজে যায়।

বৈকুণ্ঠ স্বয়ং একদা এই পায়চারী পার্টির সদস্য ছিল। নির্বাচক মানুষটি ভালো। তিনিও পরিস্থিতির দাস।

এই দুর্গন্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোথায়? মর্যাদার জন্য কেউ বেঁকে দাঁড়ায় না কেন? —এই গরমের দেশে লেখকেরা শরীর ও মন বয়সের ভাগে ভাগ করা। চল্লিশ অতিক্রম করেও অনেকেই আমরা উদীয়মান ও তরুণ। এই সমাজে চুঙ্গিকর, টোল ট্যাকস, পোল পারাপারের তোলা, নীলাম বাজারের রোজকার বসবার জন্যে পয়সা দিতে হয়। কলকাতায় ঢুকতে অনেকগুলি পোল আছে। হাওড়ায়, শিয়ালদায় প্ল্যাটফর্ম টিকিট আছে। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অনেক খেয়া এবং লঞ্চ। ডালহৌসির বড় বড় শিল্প ভবনের ব্যবসার ইমেদারীতে একস পেন্স্ একাউন্টে বহু শিশি উপচে ফোয়ারা ওঠে। সি, এম, ডি, এর তৈরী রাস্তা খুঁড়ে পাতাল রেল সুড়ঙ্গ কাটে।

এর ভেতর থেকে বছরে একদিনের জন্যে টাকায় একটি পয়সা শিল্পের জন্যে তুলে রাখা যায় না? তাহলে কাউকে পায়চারী পার্টির সদস্য হতে হয় না। অকাল মৃত্যুর আগেই তুষার রায় যে প্রতিভা ছিলেন, তার প্রকাশ করা যেত। পবিত্র মুখোপাধ্যায় স্বস্তিতে 'কবিপত্র' করতে পারতেন। বিজনকুমার ঘোষ অনেক আগেই বেশি সময় দিয়ে তাঁর পবিত্র পাগলামি গল্পে ভরে দিতে পারতেন।

যিনি আঁকবেন যিনি লিখবেন—কারও জন্যে এই এক কোটি লোকের শহরে বসে গল্প করারও জায়গা নেই। প্রকাশের সম্মানজনক মাধ্যম নেই। যারা এখন চেয়ারে—তাদের সম্পর্কে সত্যি কথা বলার উপায় নেই। এর উপর এই বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে কিছু ছদ্ম প্রগতিশীল মোহান্ত বসে আছেন। এঁরাই বিভ্রান্ত করে দেয়ার শাসন। মাঝে মাঝে এঁরা ফতোয়া দিয়ে থাকেন। শিল্পের চেয়ে নেপথ্যে এরা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অধিক চিন্তিত। শোনা যায় বিপ্লবী।

'অমৃত' চায় প্রবল সমালোচনা। ভালো হলে প্রচণ্ড স্বীকৃতি। সাধাসীমিত। তবু সদা-ই অর্গল মুক্ত। এখানে কারুর মুখ চেয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। সম্পাদকও সমালোচনার বাইরে নন। কাউকে কারো সঙ্গে মন রেখে পায়চারী করার দরকার নেই। ভালো লেখা দিয়ে 'অমৃতের' পৃষ্ঠা কটি আপনি দখল করুন। অকালে আপনার মৃত্যুর আগেই আপনাকে 'অমৃত' স্বীকার করতে চায়। সসম্মানে। মরণোত্তর প্রতিভায় আমরা কম বিশ্বাসী। **বৈকুণ্ঠ পাঠক**

রসিকরঞ্জন ছদ্মনামী

প্রখ্যাত সাংবাদিক দৈনিক
বসুমতীর ভূতপূর্ব প্রধান
সম্পাদক

শ্রীকেদার ঘোষ রচিত

অথ রসিকরঞ্জন কথা

প্রথম খণ্ড ৮.০০
দ্বিতীয় খণ্ড ৮.০০

বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে, মনঃসমীক্ষণের গভীরতায় এবং বর্ণনাভঙ্গীর স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র 'বেডসাইড রিডিং'
শ্লেষ-মধুর রম্যরচনা

লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো ॥ কলি-৯

পূজায় চাই নূতন শাড়ী-তাঁত
জানাই আমন্ত্রণ
সাড়ীর মেলা
লিট বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূর্ব) কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৪-৮৮৮৩

আমাদের পোশাক

নিশীথরঞ্জন রায়

ইংরেজ আমলের এক অভিজ্ঞতার কাহিনী। খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। কলকাতার এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের স্বনামধন্য সম্পাদক লাটভবনে আমন্ত্রিত হয়েছেন। মে-জুন মাস—প্রচণ্ড গরম। সম্পাদক লাটসাহেবের ঘরে ঢুকে দেখলেন, বিজলী পাখা সত্ত্বেও (তখনও এয়ার-কন্ডিশন চালু হয়নি) ঘর্মাক্ত-কলেবর লাট-সাহেবের কাছে পোশাকের আতিশয্যের ভার রীতিমত দুর্বহ হয়ে উঠেছে। সাহেবের দুরবস্থা দেখে সম্পাদক মশাই বললেন ধুতি, পাঞ্জাবী, পাজামা যাহোক কিছু পরলে কৃষ্টির হাত থেকে আপনি পরিত্রাণ পেতেন—পরেন না কেন? কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাহেব বললেন—'বিকজ উই আর এ স্টুপিড পিপল।'

উঠেছে। সাহেবের দুরবস্থা দেখে সম্পাদকমশাই বললেন—

কাহিনীটির পিছনে এ-সত্যই প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কোনও একটি দেশের অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সে-দেশের জল-বায়ু, আবহাওয়া মেনে নিয়ে তার উপযোগী করে পরিকল্পিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ হিন্দুস্থানের জলবায়ু এক ও অভিন্ন নয়। অঞ্চল ভেদে জলবায়ু ভিন্নধর্মী, এর ফলে হিন্দুস্থানের অধি-বাসীদের পরিধানও বিচিত্র। খুব প্রাচীন যুগের ভারতবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যাকে আমরা ঐতিহাসিক যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকি, সেই যুগের ভারতীয়রা কি ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত পোশাকের বৈশিষ্ট্য কি ছিল সে-সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারি—সে-যুগের সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব এবং চিত্রশিল্পের সাহায্যে। এই সব উপকরণ থেকে একদিকে পোশাক-পরিচ্ছদের ধারা-বাহিকতা, অপরদিকে ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

আজ থেকে দেড়শো-দুশো বছর আগেকার কথা ধরা যাক। অষ্টাদশ শতককে আমরা এখন পর্যন্ত খুব কাছাকাছি পাবার চেষ্টা করিনি। এ-যুগকে আমরা অন্ধকারের যুগ বলেই চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। রাজনীতির যুগ থেকে এটি অবশ্যই ভাঙাগড়ার যুগ—সুতরাং স্থিতিশীলতার অভাব ঘটবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনীতিই তো কোন জাতির সামগ্রিক পরিচয় হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে—কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।'

আসল কথা, বহুদিন পর্যন্ত ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে আমরা রাজনীতি এবং রাজবৃত্তকে অবিসম্বাদী প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। সমাজ-জীবন সম্পর্কে আমরা ছিলাম নিস্পৃহ, উদাসীন। সাম্প্রতিককালে এই ঔদাসীন্য দূর করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ইতিহাসের পুঁথিতে এখন পর্যন্ত সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি অনেকখানি অসম্পূর্ণ। অথচ এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এখানে সমাজ-দর্শনের অনুকূল উপকরণের পরিমাণ আগের যুগের তুলনায় অনেক বেশি। সাহিত্যের পরিধি ততদিনে অনেকখানি ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে, দীর্ঘকাল ধরে সমাজে যারা অবহেলিত, অনাদৃত ছিল, তারা সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে। সমাজ ও অর্থনীতি-বিন্যাসের ফলে যেসব নতুন শ্রেণী ও বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছে, তারাও স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে সাহিত্যের পাতায়, শিল্পীর কীর্তিতে। ভাস্কর্য-অলংকরণের ক্ষেত্রেও শ্রেণী-সংরক্ষণের বিধান আগের যুগের তুলনায় অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছে। দেব-দেবীদের একাধি-পত্য হ্রাস পেয়ে সেখানে ভিড় করে আসতে শুরু করেছেন মর্ত্যলোকের সাধারণ নরনারীদের দল। চিত্রশিল্পের বৈচিত্র্যও ততদিনে সমাজ-জীবনের অনুদ্ঘাটিত-পূর্ব বহু চরিত্রের অব-গুণ্ঠন মুক্তি ঘটানোতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সমাজ-জীবনের ইতিহাস-চর্চায় যারা লিপ্ত, তারা ততোখানি নির্ভর করছে সাহিত্যিক উপাদান এবং সরকারী-বেসরকারী দলিল-দস্তাবেজের উপর ততোখানি গুরুত্ব তারা

আজও আরোপ করেছি সমসাময়িক যুগের চিত্রকলা থেকে সংগৃহীতব্য উপাদানের উপর।

অষ্টাদশ শতকের পোশাক-পরিচ্ছদের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে রয়েছে ভারতীয়দের বসনভূষণ, পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, যেমন, অধোবাস, উত্তরীয়, অন্তর্বাস, ওড়না, চোলি, স্তনপট্ট ইত্যাদির বিবরণ। কৌটিল্য থেকে শুরু করে মা-হুয়ান পর্যন্ত সকলেই বাংলাদেশের সূক্ষ্মবস্ত্রের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কোন কোন পট্টবস্ত্র ছিল অলংকরণশোভিত, যেমন মেঘ-উড়ুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষ্মীবিলাস, স্বারবাসিনী এবং শিল্পহটী। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্রের খ্যাতি ছিল অব্যাহত। সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণে অষ্টাদশ শতকে পোশাক-পরিচ্ছদ বসনভূষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর মূলে রয়েছে প্রধানত ইসলামী ও পাশ্চাত্য রীতি-নীতির প্রভাব। বৃহত্তর পল্লীবাসী নরনারীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রভাব তেমন অনুভূত না হলেও, নগরবাসী, বিশেষত রাজকর্মোপজীবীদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ বহন করে নতুন আঙ্গিক এবং দেহাবরণের পরিচয়। নতুন ধরনের পরিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাপকান, চোগা, শেরওয়ানী, চুড়িদার পাজামা। বাংলাদেশের পোশাকের ক্ষেত্রে উত্তর-ভারতের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা পরতেন সেলাইবিহীন একবস্ত্র। পরবর্তীকালে উত্তর-ভারত থেকে আমদানি করা হলো সেলাই-বস্ত্র—জামা বা গাত্রাবরণ ব্যবহারের রীতি। অষ্টাদশ শতকেই আবার ঘটেছিল নতুন বৃত্তির উদ্ভব। পাশ্চাত্য বণিকদের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। এই সময় কৃষিনির্ভর সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল ব্যাপকতর ভিত্তিতে বাণিজ্য-প্রধান অর্থনীতির নতুন দিগন্ত। এর ফলে আবির্ভূত হলো নতুন বৃত্তি। নতুন সম্প্রদায়। ইংরেজদের বাসস্থান এবং কর্মস্থল আশ্রয় করে গড়ে উঠলো নতুন ভৃত্যতান্ত্রিক সংগঠন। একদিকে নতুন পোশাকধারী বেহিস্তান, সরকার, সদরয়ালা, অপরদিকে দেখা গেল হুকুমবরদার, দুরিয়া, মহিস, চোবদার, হরকরা ইত্যাদি। সাবেকী আমলের পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নবাগতদের পোশাক-পরিচ্ছদ কি ধরনের ছিল, তা জানার আগ্রহ নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। পুঁথিপত্র থেকে বসনভূষণ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও এ-সম্পর্কে বিশদ এবং নির্ভুল তথ্য সংগৃহীত হতে পারে একমাত্র সমসাময়িক চিত্রশিল্পের সাহায্যে।

সাবেকী আমলের পরিধান যা তখনও পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল অথবা সমাজে নবাগতদের পোশাক-পরিচ্ছদ কি ধরনের ছিল, তা জানার আগ্রহ নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। সে-যুগের পুঁথিপত্র থেকে বসনভূষণ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব, কিন্তু এ-সম্পর্কে খুঁটিনাটি এবং নির্ভুল তথ্য সংগৃহীত হতে পারে একমাত্র সমসাময়িক চিত্র-শিল্পের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে বিদেশী চিত্রশিল্পীদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বিদেশী চিত্রশিল্পীদের কথা বলার কারণ এই যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের কর্মপ্রচেষ্টা তখন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। মোগল-যুগে চিত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতির কথা সকলেরই জানা আছে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে চিত্রশিল্পের সাধনায় সে-যুগে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর আকীর্ণ রয়েছে বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্র পটভূমি জুড়ে। মানুষ, পশুপক্ষী, রাজদরবার, অস্ত্রশস্ত্র, বাদশাহদের ক্রীড়া, মৃগয়া, সামরিক ছাউনি, দুর্গ, সৈন্যসামন্ত, মনসবদার, আমীর ওমরাহ, সমরাভিযান, সামাজিক, ধর্মীয় উৎসব, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাজপ্রাসাদ, সরকারী দপ্তরখানা, রাগরাগিণী, বেহিস্ত—সবকিছুই তাদের রঙ ও তুলির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। সে-যুগের বিভিন্ন বৃত্তিধারী নরনারীর পরিচয়ও তাদের চিত্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল-যুগে বাদশাহরাই শুধু চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি তাঁদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও প্রাদেশিক চিত্রচর্চার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে গড়ে উঠেছিল পশ্চিম ভারতীয়, পূর্বভারতীয়, রাজস্থানী, পাহাড়ী, পাহাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই মোগল চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দেখা দিল অবনতির চিহ্ন। ঔরঙ্গজীব বাদশাহের 'পিউরিটান' নীতি এর জন্য অনেকখানি দায়ি ছিল।

তাঁর মৃত্যুর পর থেকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় সর্বাত্মক অবক্ষয়। তুর্কী-আফগান অভ্যুত্থানের আগে ভারতের সংস্কৃতি ও মনন আলোচনা প্রসঙ্গে উর্দুভাষী কবি হালি লিখেছিলেন—

'ইধর হিন্দ্ মে' হরতরফ অন্ধেরা।'

মোগল-যুগের অবসান এবং ইংরেজ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী কালের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কেও হালির এই উক্তি সমান প্রযোজ্য। দুই যুগের সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে এমনি ধরনের নিস্তরঙ্গতা হয়তো কিছু পরিমাণে অপ্রতিরোধ্য। শক্তিশালী, সুসংহত কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাব ঘটলে সংস্কৃতির ক্ষেত্র দেখা দেয় নিষ্ক্রিয়তা, সৃজনধর্মী প্রয়াসের অপমৃত্যু। তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। দেখা দেয় গোষ্ঠী-স্বার্থের অশোভন সংঘাত এবং ব্যাপক বিশৃংখলা—এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। এমনি অবক্ষয়ের যুগের শেষে প্রতিষ্ঠিত হলো বিদেশী শাসন। এই বিদেশী প্রভুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী শিল্পীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন ভারত-সন্ধানে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় জনসমাজের চিত্র-উদ্ঘাটনের মূলে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছরের মধ্যেই পূর্ব-ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক হয়ে দাঁড়ালো। এতোদিন শুধু কোম্পানীর চাকুরে হিসেবেই বেশি সংখ্যক ইংলণ্ড-সন্তান ভারতে আসতেন। ইংরেজ শাসন নিশ্চিত হবার পর একদিকে যেমন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারত সম্পর্কে আগ্রহী হতে শুরু করলেন, অপরদিকে তেমনই শিল্পীদল বেছে নিলেন ভারতবর্ষকে তাঁদের নতুন কর্মক্ষেত্ররূপে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দুই দশকে দল বেঁধে তাঁরা পাড়ি দিলেন সুদূর ভারতবর্ষের দিকে। অনেকেই শুনেছিলেন ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্যের খ্যাতি। এদেশে প্রচুর রুজি-রোজগারের সম্ভাবনা রয়েছে—এই বিশ্বাস তাঁদের অনেককে উৎসাহিত করেছিল দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ভারতের কূলে পাড়ি জমাতে। গভর্নর থেকে কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী (এঁদের বলা হয়েছে ইংরেজ নবাব) এবং দেশীয় নবাব-বাদশাহজাদাদের পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করতেন। এর ফলে অর্থের দিক থেকে তাঁরা প্রচুর পরিমাণে লাভবানও হয়েছিলেন। আবার এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকারের ভারত-প্রেমী ছিলেন। তখনকার দিনে রাজনৈতিক অস্থিরতা পুরোপুরি দূর হয়নি। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত ছিল রীতিমতো কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক ব্যাপার। তবু বিপদ-আপদ সত্ত্বেও তাঁরা ঘুরেফিরে দেখেছেন গোটা ভারতবর্ষ—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা (কাশ্মীর আর আসাম ছাড়া)। এ-প্রসঙ্গে টমাস আর উইলিয়ম ড্যানিয়েল-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যখন যেখানে তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই তাঁরা তাঁদের তুলিতে, রঙে, পেন্সিলে, জল-রঙে তুলে নিয়েছেন সমসাময়িক যুগের প্রতিচ্ছবি—ঐতিহাসিক সৌধমালা, স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইত্যাদি। এঁদের শিল্পকীর্তির পরিচয় না পেলে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের ভারতবর্ষের রূপ আমাদের কাছে অনেকখানি অজানা থেকে যেতো। যাঁরা নবাব-রাজবাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রতিমূর্তি এঁকেছেন সে-যুগের বিশিষ্ট নরনারীর। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ইংরেজ রাজপুরুষ, অথবা কোম্পানীর আশ্রিত রাজন্যবর্গ কিংবা তাঁদের উপদেষ্টামণ্ডলী। সমসাময়িক ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের পরিচয় রেখে যাবার কোন চেষ্টা তাঁরা করেননি। টিলি বেইলি জোফানী, হজেস্, হাম্ফ্রে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে যাঁদের উপস্থাপিত করেছেন, সাধারণ মানুষের স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ফ্রান্সিস্ বালথাসার সলভিনস্।

বেলজিয়ম-এর অধিবাসী সলভিনস্-এর জন্ম আন্টওয়ার্প শহরে ১৮৬০ সালের ৬ জুলাই। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর শিক্ষানবীশী শুরু হয় এই শহরেই। সেখানে তাঁর প্রেরণা ছিল জাহাজের গায়ে ছবি আঁকা। বেশি দিন এ-ধরনের কাজ তাঁর ভাল লাগেনি। স্বাধীনভাবে শিল্পসাধনাই ছিল তাঁর কাম্য। তাই ২৯ বছর বয়সে সলভিনস্ পাড়ি দিলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। কবে তিনি এদেশে এসে পৌঁছেছিলেন তা সঠিক জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজ শিল্পী বেইলির এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, সলভিনস্ ১৭৯১ সালে হাজির ছিলেন কলকাতায়। প্রথম দিকে তাঁর রুজি-রোজগার ছিল মন্দা। জাহাজের পরিবর্তে পাল্কির গায়ে নক্সা এঁকেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। পরের বছর হঠাৎ তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন তাঁর শিল্পকৃতির প্রমাণ দেবার। ১৭৯২ সালে ইংরেজদের হাতে টিপু সুলতানের সামরিক পরাজয় ঘটে। এই সাফল্য ছিল বিজেতাদের কাছে রীতি-মতো গৌরব ও গর্বের বিষয়। তাই তার আলোকমালা এবং অলংকরণ দিয়ে লাটভবন (তখনও আজকের রাজভবন ভূমিষ্ঠ হয়নি) সুসজ্জিত করে বিজয়োৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শিল্পী হিসেবে আমন্ত্রিত হলেন সলভিনস্। এই বছরের ২৬ এপ্রিল তারিখের ক্যালকাটা গেজেট-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, লাট-প্রাসাদের সামনে স্থাপিত হয়েছিল সলভিনস্-এর আঁকা এক মনোরম চিত্র। এই ছবিটি আঁকতে শিল্পীর লেগেছিল মাত্র ছ'দিন। পরবর্তীকালে এই ছবিটি স্থান পায় সাউথ কেনসিংটনের সংগ্রহশালায়। এর পর থেকে তাঁর খ্যাতি ও অর্থাগমের পথ অনেকখানি সুগম হয়ে উঠলো। কলকাতার স্টুয়ার্ট কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল পাল্কির অলংকরণে। শুধু সাধারণ পাল্কি নয়—বড়লাট কর্ণ-ওয়ালিশের নির্দেশে টিপুর বংশধরদের ব্যবহারের জন্য ৬-৭০০০ টাকা খরচ করে যে-দুটি পাল্কি তৈরী হয়েছিল, তার অলংকরণের ভার ন্যস্ত হয়েছিল সলভিনস্-এর উপর।

সলভিনস্ সমসাময়িক যুগের অন্যান্য পাশ্চাত্য শিল্পীদের পথ অনুসরণ করেননি। নবাব-বাদশাহ কিংবা রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা, এমনকি, সান্নিধ্যের জন্যও তিনি লালায়িত ছিলেন না। অর্থোপার্জনও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল না। তিনি ভাল-বেসেছিলেন এদেশের সাধারণ মানুষকে। তাদের সমাজ ও জীবন-যাপন প্রণালী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। শ্রেণী ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে এ-দেশের নরনারী মাত্রই ছিল তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার বিষয়বস্তু। যখন জোফানীর মতো কুশলী শিল্পী রাজপুরুষ এবং নবাবদের প্রতিকৃতি আঁকতে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, যখন উইলিয়ম হজেস এবং আরও কিছু পরে টমাস এবং উইলিয়ম ড্যানিয়েল সারা ভারত প্রদক্ষিণ করে লিপ্ত হয়েছিলেন এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদী, পাহাড়, উপত্যকা, মন্দির, মসজিদ, সমাধি-সৌধ, দুর্গ ইত্যাদিকে সার্থক ও সুনিপুণ চিত্রশিল্পের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলার সাধনায়, সেই যুগে বেলজিয়ম থেকে আসা এই শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন সমসাময়িক যুগের ভারতীয়দের আচরিত বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার, ধর্মাচারণ, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব, যানবাহন ইত্যাদির রূপায়ণ, খোদিত রঙীন চিত্রের সাহায্যে এসব রূপায়িত করাই ছিল সলভিনস্-এর উদ্দেশ্যে।

সলভিনস্-এর নিরলস এবং অপরিমেয় অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি—এ ক্যাটালগ অফ কালারড্ এচিংস ডেসক্রিপটিভ অফ দ্য ম্যানারস, ক্যারেকটর, কাস্টমস, ড্রেসেস্ অফ দ্য হিন্দুজ।' ১৭৯৪ সালে এই বিরাট পরিকল্পনার বিষয়টি ঘোষিত হয় ক্যালকাটা গেজেট-এর মাধ্যমে। প্রতিটি খণ্ডে ২৪টি চিত্র নিয়ে ১২টি স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই চিত্র-সংগ্রহের প্রতিটির মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ১ টাকা। দু' বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনা রূপায়িত হবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও ৫ বছরের আগে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৭৯৯ সালে কলকাতার মিরর প্রেস থেকে এই সচিত্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল। পৌনে দুশো বছরেরও আগে কলকাতার এক প্রেস থেকে এ ধরনের খোদিত রঙীন চিত্রের অ্যালবাম

প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'রায়োগ্রাফিক ইউনিভার্সেলে'র মতে যে-কাগজের উপর ছবি ছাপা হয়েছিল তা তৈরী করেছিলেন শিল্পী নিজেই।

একটানা বার বছর এদেশে কাটিয়ে ১৮০৩ সালের শেষাশেষি সলভিন্‌স্‌ ফিরে গেলেন স্বদেশে। ১৮০৪ সালের পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেজিস্টারে তাঁর নাম অনুল্লেখিত। এই বছরেই লণ্ডন থেকে শিল্পী এডোয়ার্ড ওরমে-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'দি কসটিউম অফ হিন্দুস্থান বাই বি সলভিনস অফ ক্যালকাটা—সিক্‌সটি কারারড এনগ্রেভিং উইথ ডেসক্রিপসন ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ'। সম্পূর্ণ অননুমোদিত এই বিষয়ের বিরুদ্ধে সলভিন্‌স্‌ আদালতে বিচারপ্রার্থী হলে ওরমে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এরপর সলভিনস তাঁর কর্মস্থল বেছে নিলেন প্যারিস শহর। ১৭৯৯ সালে যার সূচনা কলকাতায় তা আরও বিশদ চিত্রসম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হলো প্যারিস থেকে ১৮০৮-১২ সালে। নূতন নামকরণ হলো কসটিউম লা হিন্দুজ, চার খণ্ডে প্রকাশিত এই অ্যালবাম-এর চিত্র-সংখ্যা ২৮৮। শিল্পী শুধু ছবিই আঁকেননি। প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি পাঠকদের (অবশ্যই বিদেশী পাঠক) জন্য লিখেছেন তথ্যবহুল পরিচিতি-পত্র—ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায়। একজন বিদেশীর পক্ষে আমাদের সমাজ-জীবনের রীতিনীতি, চালচলন সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর নিখুঁতভাবে জানা এবং বোঝা সম্ভব ছিল না; কিন্তু সলভিন্‌স্‌-এর প্রস্তাবনা থেকে বোঝা যায় এদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি মোটামুটি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করবেন :

..."In the present race of Hindoos, the observant of nature will see, perhaps with lttle variation the came features, customs, character and religious mysteries which history has recorded of their ancestors, at a time when the inhabitants of other parts of the glob were not in a state of civilisation .....while it is unquestionable that their primiture manners have been preserved amongst them by an immutable attachment to their ancient religions"

সলভিন্‌স্‌ চেয়েছিলেন সমসাময়িক যুগের ভারতীয় জনজীবনের সামগ্রিক রূপটিকে রঙে রেখায় প্রাণবন্ত করে তুলতে। শিল্প হিসেবে তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা সম্পর্কে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কোন কোন চিত্র-সমালোচক বলেছেন এদের কতকগুলো চিত্র 'রুড'। সমালোচকদের এ-মন্তব্য মেনে নিলেও সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে এদের মূল্য সন্দেহাতীত। সলভিন্‌স্‌-এর চিত্রসগ্রহে প্রতিফলিত রয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের ভারতীয় জনজীবনের ব্যাপক এবং নিবিড় পরিচয়। সে যুগের সকল শ্রেণীর মানুষ, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বিচিত্রধর্মী বৃত্তি, সামাজিক উৎসব, ধর্মাচরণ, আচার অনুষ্ঠান—এককথায় তাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ বিধৃত রয়েছে সলভিন্‌স্‌-অঙ্কিত চিত্রাবলীতে। আজ থেকে পৌনে দুশো বছর আগেকার এই চিত্রভিত্তিক রূপ আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে শিল্পীর কি পরিমাণ তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে। সাধারণ এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ব্রাহ্মণের ছবি এঁকেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; বিভিন্ন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-প্রতিকৃতিকে তিনি তুলে ধরেছেন রঙে রেখার বন্ধনে—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঊর্ধ্ববাহু, অবধূত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, নাগা, দরবেশ, ফকির—কেউই বাদ পড়েন নি। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের শোভাযাত্রা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর তুলির স্পর্শে—সরকার, বেনিয়ান, গোমস্তা, দৈবজ্ঞ, সাঁখারি, কাঁসারি, চুণারি, মুদি, পটুয়া, গোয়ালা চাষা কৈবর্তা, ধোপা, আয়া, চৌকিদার, মশালচি, হরকরা সকলেই রয়েছেন তাঁর অ্যালবাম-এর পাতায়। স্ত্রীজাতির জীবনযাপন প্রণালীর বিভিন্ন দিকও উন্মোচিত হয়েছে শিল্পীর চিত্র-সংগ্রহে। রাজা, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, জমিদার প্রমুখ ধনী অভিজাত শ্রেণীও

সমবায় প্রকাশনীর বই

কিশোর জ্ঞান কোষ

[১ম খণ্ড ভকাশ হল দু খণ্ডে মূল্য ৫০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ৩৮ টাকা]

উপদেষ্টামণ্ডলী : ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মৈত্রেয়ী দেবী বিনয় ঘোষ

বাংলা ভাষায় এমন কোন অভিধান বা কোষ নেই যা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মানসিক গঠনের রসদ এবং ক্যারিয়ার গঠনের পথনির্দেশ করতে পারে। কিশোর জ্ঞানকোষ এই অভাব পূরণ করবে। প্রথম খণ্ডে থাকছে পৃথিবী। প্রাণ। মানব জাতির উদ্ভব এবং তারপর। ইতিহাস।

তুমি বড় হয়ে কী হবে : এই অধ্যায়ে থাকছে পশ্চিমবঙ্গে এবং সারা ভারতে বিভিন্ন কারিগরী, চিকিৎসা এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ সম্বন্ধের বিশদ তথ্য। এই ভীষণ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

বিজ্ঞান। ভাষা ও লিপি। সমবায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। ভারতবর্ষ। খেলাধুলো। বিবিধ। এবং

ভ্রমণ : এই অধ্যায়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যেমন যাতায়াতের ব্যবস্থা, দেখার জায়গা, থাকার ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে ইউথ হোস্টেলের খবর।

এক কথায় কিশোর জ্ঞানকোষ ছাত্রছাত্রীদের জীবন গঠনের আধুনিক বেদ।

মূল সম্পাদক : অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক সমীর রক্ষিত দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ বিষ্ণু বসু অর্ধেন্দু চক্রবর্তী অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবব্রত মল্লিক

গ্রাহকরা বই সংগ্রহ করুন। আরো কিছু গ্রাহক করা হচ্ছে।

রূপকথার বিশ্ব দশ টাকা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রূপকথার গল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ। রেক্সিনে বাঁধাই। সোনার জলে লেখা। ভেতরে অজস্র রঙ বেরঙের ছবি।

আজকের প্রেমের গল্প পনের টাকা

৩২ জন গল্পকারের প্রেমের গল্পের সংকলন।

পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী কুড়ি টাকা। গ্রাহক মূল্য পনের টাকা। এতে থাকবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরানের গল্প। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হন।

পরিবেশনা : মডেল পাবলিশিং হাউস ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা

পেয়েছেন তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসন। শুধু তাই নয়, দোল, দুর্গোৎসব, নীলপুজো, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, রামায়ণ মহাভারত পাঠ, সহমরণ ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চিত্রের মাধ্যমে। এমন কি, যা অবলম্বন করে সে যুগের মানুষ একদিকে জীবিকা নির্বাহ, অপরদিকে রসাস্বাদন করার সুযোগ পেতো—বাদ্যযন্ত্র, খেলাধুলার উপকরণ, হাটবাজার, বিদ্যালয়, মন্দির, মঠ, রাস্তাঘাট, যানবাহন (পাল্কী ও তার বাহকদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র) —এরাও শিল্পীর কাছে পেয়েছে যথাযোগ্য স্বীকৃতি।

অষ্টাদশ শতকের জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করতে হলে, সে যুগের পরিচয়কে দৃশ্যমান করে তুলতে হলে যে সব উপকরণ অপরিহার্য তাদের বেশীর ভাগই আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—নবাব বাদশাহ, রাজা মহারাজদের স্মৃতিবহনকারী মালমশলা কখনও কিছু পরিমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পরিধেয়। তার নিত্যব্যবহার্য কোদাল, কুড়ুল, খুন্তী, ঘটিবাটি, লাঙল, ঢেঁকি, ঘরবাড়ী আজ অনিবার্যরূপেই নিশ্চিহ্ন। তবু সলভিন্‌স্‌-এর পাতায় সেই বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলির স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুস্থানের জনতার সামগ্রিক জীবনের পরিচয় ছাড়াও সলভিন্‌স্‌ যে বিপুল উপকরণ-সম্ভার দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন তার সংগ্রহ-ভাণ্ডার তা থেকে বিশেষভাবে আমরা দেড়শো থেকে দুশো বছর আগের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের বিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারি। পোশাক-পরিচ্ছদের চিত্ররূপের সাহায্যে সলভিন্‌স্‌ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন অষ্টাদশ শতকের সমাজ-জীবনের সুস্পষ্ট রূপ-রেখা। সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস-গবেষকদের তিনি আবদ্ধ করে গিয়েছেন অচ্ছেদ্য ঋণ-বন্ধনে।

সলভিন্‌স্‌-এর ভারতে প্রবাস-যাপনের অধিকাংশ কালই অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতায়। তবু তাঁর অ্যালবামে যাঁদের প্রতিকৃতি স্থানলাভ করেছে তারা শুধু কলকাতা অথবা বাংলাদেশের মানুষ নয়। তামাম হিন্দুস্থানের নরনারী এবং তাদের সৃষ্টি এবং বৃত্তি-উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদের বিশদ পরিচয় তার খোদিত চিত্রে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে যুগ থেকেই কলকাতা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর সমাবেশে জনবহুল নগরে পরিণতিলাভ করেছিল। তাই কলকাতা থেকেই তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তাঁর চিত্রাঙ্কনের অধিকাংশ বিষয়বস্তু। এ কারণেই আমরা পাই তৎকালীন ভারতের প্রতিটি প্রদেশের নরনারীর পরিচয়; প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বৃত্তিধারী নরনারীর শোভাযাত্রা—স্বল্পবাস পরিহিত মল্লবীর, কৌপীনধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আলখাল্লা পরিহিত ফকির-দরবেশ, উত্তরীয় কাঁধে কোঁচানো ধুতিসম্বল দৈবজ্ঞ, পাগড়ি-চাপকান-চাপরাশ শোভিত হুকাবর্দার, পাগড়ি, চাদর, ধুতি। জামা গায়ে চটি পায়ে সরকার, অনাবৃত ঊর্ধ্বদেহ পুজারী, রুক্ষাননা একবস্ত্রপরিহিতা মৎস্যজীবিনী, শাড়ী জামার বাহুল্যভার-বাহিনী সম্ভ্রান্ত মহিলা। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোটধুতি পরিহিত মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি—আগুল্ফলম্বিত ধুতির ব্যবহার তখন ছিল সীমাবদ্ধ—সাধারণভাবে ধুতির প্রস্থ ছিল হাঁটুর উপর পর্যন্ত। নাভির নীচেই দুলামান থাকিত কটিবন্ধের গাঁট। ধুতির তুলনায় শাড়ীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল অনেক বেশী। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মহিলারা পরতেন আগুল্ফলম্বিত কারুকার্যশোভিত বস্ত্র। নর্তকীরা পরতেন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাট ধরনের পা'জামা, তাঁদের দেহের ঊর্ধ্বাংশ আবৃত থাকত জামা ওড়নায়। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য এবং অলঙ্করণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদা জ্ঞাপনই ছিল এদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা ও ব্যবহারের মূলে। প্রাচীন যুগে পূর্ব-ভারত অঞ্চলে মস্তকাবরণ ব্যবহারের প্রচলন না থাকলেও সলভিন্‌স্‌-এর যুগে সরকার, বেনিয়ান, গোমস্তা, ওকীল, উকীল ভেদে বিভিন্ন ধরনের পাগড়ি ব্যবহৃত হতো মস্তকাবরণ হিসেবে।

সলভিন্‌স্‌-এর যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে পৌনে দুশো বছরেরও বেশী আগে। এই যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করলে অষ্টাদশ এবং পরবর্তী শতকের ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি এবং পোশাক-পরিচ্ছদের তুলনামূলক ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিঃসন্দেহে রচনা করা সম্ভব।

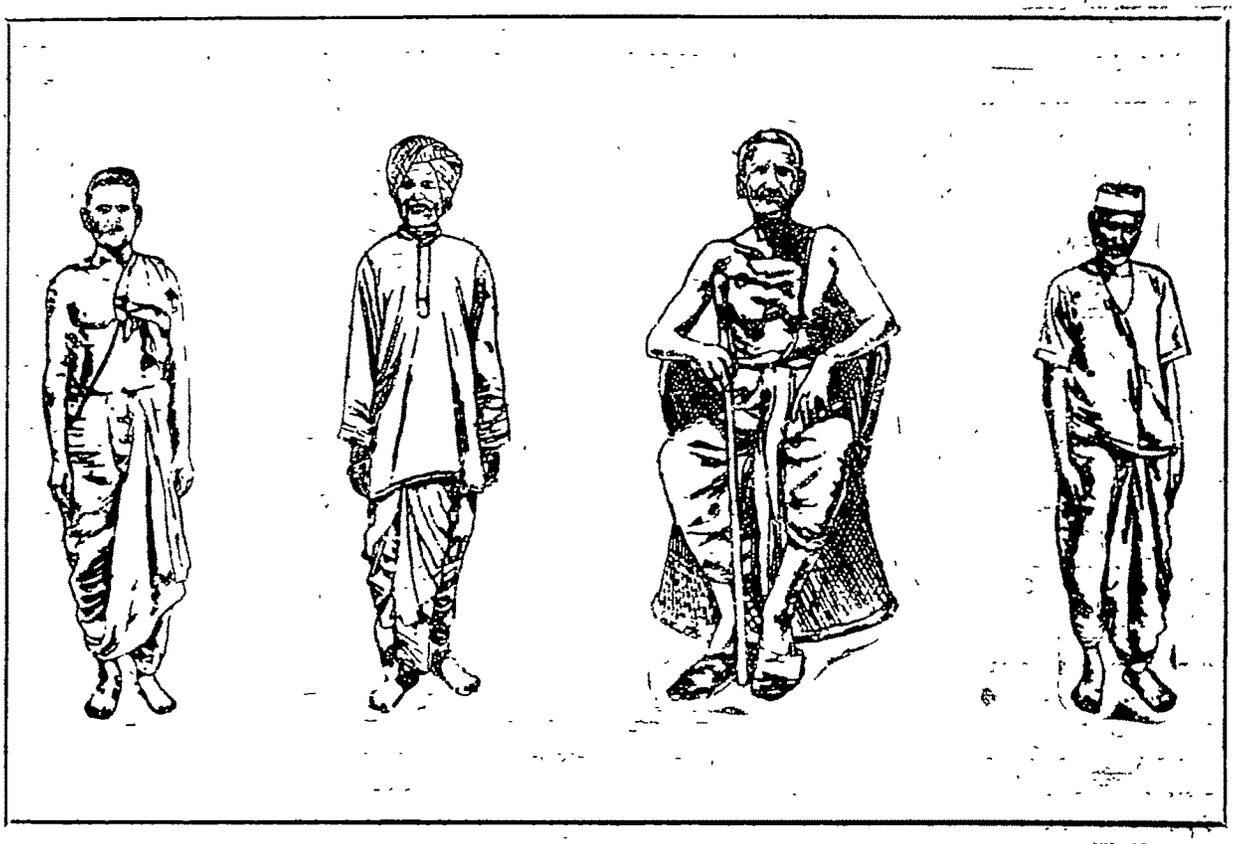

জামায় জ্যান্ত জোনাকি

অশোক চক্রবর্তী

এবার কি পুজো বন্ধ থাকছে? মেটিয়াবুরুজে ঘুরে ঘুরে প্রথমে তা-ই মনে হয়। কলকাতার এই পশ্চিম প্রান্তটুকু জুড়েই তো গোটা বাংলার দর্জিমহল। অথচ পুজোর একমাসও বাকি নেই, এখনো মেশিনে লোক নেই, দোকানের ব্যস্ততা নেই, জামাকাপড়ের পাহাড় চোখে পড়ে না। পাড়াময় ঘরে-ঘরে জানলা-দরজায় বকে-বারান্দায় মেশিন চোখে পড়লেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে দেখি সবারই গল্প করার অঢেল অবকাশ।

এখানে আসার আগে ভেবেছিলুম উল্টো ছবি দেখবো। দেখবো ভীষণ ব্যস্ত সব। প্রতি বছর পুজোর চাহিদা মেটাতে এই সময়টা মেটিয়াবুরুজে ঘুমুবার সময় পায় না। শুধু ঘরের মধ্যেই না, বাইরেও দু-চারটে করে মেশিন বসে যায়। কয়েক সপ্তাহ জন্য অনেক বাড়তি দর্জি আসেন বাংলার নানা অঞ্চল থেকে। তেমন বড়ো ওস্তাদরা একশো-দেড়শো কারিগরকেও কাজে লাগিয়ে দেন একসঙ্গে। দোকানে-দোকানে ছিটকাপড়ের ডাঁই। কর্মচারী-দের নিয়ে বৈকালিক টিফিন করতে করতে একজন বললেন, সারাদিনে তখন একগ্লাস জল হাত বাড়িয়ে খেতে পারি না। গায়ে মশা বসে বসে রক্ত খায়, দেখি, মারতে পারি না।

হাটে হাটে তখন পাইকারি ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় লেগে যায়। বাংলার সমস্ত অঞ্চল থেকে, দিল্লি-বম্বে থেকেও খদ্দের আসে। মঙ্গলবারের হাওড়ার হাটে, বুধ-রবির শ্যামবাজারের হাটে আর শনি-বুধের চেতলার হাটে মেটিয়াবুরুজের পাইকারি কেনাবেচা। তিন পিস পাঁচ পিস দুশো পিস লট-কে-লট। তখন এখানকার দর্জিদের হাতে থোক থোক কাঁচা টাকা। সারা বছরের নামে এই তো যা মোটা টাকা। তারপর তো মাসের পর মাস ঝিমোনো।

এবার এমন হলো কেন? হাটের খদ্দের ঠিকমতো আসছে না এখনো। অর্ডারি পাইকাররা এখনো হাঁ করে আছেন বড়ো বড়ো ওস্তাগর আর কোম্পানির অর্ডারের অপেক্ষায়। মেশিনে সুতো পরাতে পরাতে একজন বললেন, 'ওনারা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।' দর্জিপাড়ার আশা, আর সপ্তা-দুয়েক বাদে ঈদ পেরোলেই হুড়োহুড়ি পড়বে। অথচ একটু আগে থেকে অর্ডার পেলে শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়ো এড়ানো যায়। হাতে মাত্র পনেরোদিন সময় নিয়ে পুজোর চাপ সামলানো যায় না। কেউ কেউ বললেন, সরকার যদি এখানকার অর্ডারগুলো এঁদের জন্য বেঁধে দিতেন তো অবস্থা এতো খারাপ হতো না। অনেক অর্ডার বাইরে চলে যাচ্ছে।

এঁরা কিন্তু কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বেশ তৈরি। পথে একটা মেশিন-মেরামতির দোকানে মেশিনের কলকব্জা খুলছে বাচ্চা ছেলে অরুণ অধিকারী। বয়স ১৪-১৫। ও জানালো কাজের চাপ এখন বেড়েছে। সবাই মেশিনপত্র সারিয়ে নিচ্ছে। সেলাইয়ের রঙিন সুতোর দোকানেও পসরা সাজানো। রাস্তার পাশে একটা দোকানে নতুন সাজসজ্জা হচ্ছে। চুনকাম, দরজা-জানলায় নতুন রং, দেয়াল আলমারি। জামার কাপড়ও সবাই অল্পবিস্তর হাতের কাছে মজুত রেখেছেন। এবার উল্লেখযোগ্য মেয়েদের জামার কাপড়। সবকিছুই যখন আকাশছোঁয়া দর, অনেক সস্তায় মেয়েদের জন্য এসেছে নাইলন নেট। সাড়ে সাত থেকে ন-টাকার মতো মিটার পড়ে। সব দর্জিই দেখলাম এই কাপড়ে ঝুঁকেছেন। বললেন, দামী কাপড়ের কাজ করবেন নামী-দামী ওস্তাগররা।

এবারের ফ্যাশান-ডিজাইন কীরকম?

—ছেলেদের তেমন নয়, মেয়েদের তো রোজই বদলাচ্ছে।

—নতুন ডিজাইন তো বের করেন বড়ো বড়ো অর্ডারি কোম্পানিরা?

—ওনারা ক্যাটালগ দেন, সব সময় ঠিক ওনাদের মতো হয় না। আমরাও করি।

—কীরকম?

—ও কাঁচির মুখে যখন যেমন বেরোয়।

—আপনারা নতুন ডিজাইন ছাড়লে নতুন ব্র্যান্ড দেন?

—ও সব আমরা দিই না। ওস্তাগররা-দোকানদাররাই মারে ওসব ছাপ।

অর্ডারিরা পাইকারি মজুরিতেই সন্তুষ্ট। হাটের পাইকাররা মাল বিকোলেই নিশ্চিন্ত। বাংলার বেডিমেড পোশাকের এই বিরাট কারখানার অজ্ঞাত কারিগররা অধিকাংশই পুরুষানুক্রমে এখানকার বাসিন্দা। অনেকে আসেন বাংলার কাছে-দূরের গ্রাম গঞ্জ থেকে। বছরে দু'তিন মাসের জন্য বাড়ি যান।

ডেলিপ্যাসেঞ্জারি চলে না। এখানকার শিশুরাও অবলীলায় মেশিন চালায়। বড়োদের কাছে দুয়েক মাস অ্যাপ্রেন্টিসের মতো শিখে নেয়, তারপর একা একা টুকটাক কাজে হাত মকশো করা। স্বাধীনভাবে মেশিনের সব কাজ করতে পারে এগারো-বারো বছর বয়সের মধ্যেই। শেখার সময় শুধু খাওয়াপরা পায়, কাজ শিখলে টাকা। শিখে অনেকে পরে অন্যত্র চলে যায়। বাকিরা থেকে যায় এখানেই। মহা আগ্রহে যারা কাজ শিখছে বা শিখে মেশিন চালাচ্ছে তাদের অনেকেই বংশে প্রথম দর্জি। মুর্শিদাবাদের রাইহান শেখ তার বাবা মারা যাবার পর চাষবাসের বংশপেশা ছেড়ে চলে এসেছে। এখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই মেশিনের সব কাজ পারে।

জিজ্ঞেস করলুম, চাষবাস ছেড়ে এলে কেন?

—এখন চাষবাসের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের সত্তর-আশি ভাগ ছেলে এখন বাইরের কাজে বেরিয়ে পড়েছে।

—বাড়িতে আর ভাইবোন আছে?

—হ্যাঁ।

—তারা কেউ দর্জিগিরি করে?

—না।

—এ কাজ কেমন লাগছে?

—অনেক ভালো।

কিসমৎ আলি আরো ছোটো। বয়স নয়-দশ। কাপড়ের পাড় মুড়ছিলো। বাবা বাগনানে রাজমিস্ত্রি। বাবাই কিসমৎকে নতুন পেশায় পাঠিয়েছেন। খাওয়া-পরায় শিখছে। সাত-আট বছর থেকে সব বয়সের ছেলেকেই দেখলাম এখানে এসেছে কর্মসূত্রে। তাদের বংশপেশা আর কোথাও অন্য কিছু।

এখানে একেক কারখানায় একজন-দুজন থেকে দশবারোজন কাজ করেন। দর্জিপাড়ার আলাদা আলাদা 'ডিপার্ট'-এ তৈরি হয় ছেলেদের আর মেয়েদের পোশাক। মেয়েদেরও আবার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের পর্যন্ত জামাকাপড় তৈরি হয় এক এলাকায়, মহিলাদের জন্য হয় অন্য এলাকায়। তিন ছেলেকে নিয়ে কারখানা সাজিয়েছেন বাহান্ন-তিপ্পন্নর একজন। তিনি বললেন, একসঙ্গে মেয়েদের-ছেলেদের দুরকম চালানো যায় না।

সব ডিপার্টে এখন বছরের সাধারণ সময়ের মতো কাজ। সর্বত্র হাঁ করে পুজোর কাজের অপেক্ষা। চল্লিশোর্ধ্ব পিয়ারালি মোল্লাকে জিজ্ঞেস করলাম:

এইরকম যখন বছরে কাজের চাপ থাকে না তখন আপনাদের চলে কী করে? অন্য কাজ করেন কি?

—না, অন্য কাজ আমাদের কখনো করতে হয় না। অর্ডারি দর্জিরা বাড়ি বাড়ি অর্ডার নেন, পাইকারি বেচার জন্য হাট তো বছরভর আছেই। এ কাজ একবার শিখলে তাকে কখনো কাজের অভাবে শুকোতে হয় না।

খবরের কাগজের টেলারিংএর বিজ্ঞাপন মনে পড়লো—'মাসে ২৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা উপার্জন করুন।' দেশের বেকার সমস্যার কথা ভেবে জিজ্ঞেস করলুম:

এই জীবিকায় নামতে কী কী দরকার?

—কিচ্ছু না। কোনো বিদ্যেবুদ্ধি না-থাকলেও তার এই জীবিকায় কাজ জোটে। এটা-ওটা টুকটাক কেটে-মুড়ে দেওয়া, ছোটোখাটো সেলাই-ফোঁড়াই, ইস্তিরি—কাজের অভাব নেই।

—পুঁজি কি কাজের শুরুতেই কিছু লাগে না? কাজ শেখার সময়?

—আমাদের কিছু লাগে না। না বিদ্যে বা বুদ্ধি না বয়স। কানাখোঁড়াও এখানে কেজো।

এতো সুবিধে এতো সুখ বোধহয় বাঙালির আর কোনো স্বাধীন কাজে নেই। বাড়ির সবাই কাজে লাগতে পারে। পুরুষানুক্রমিক জীবিকা ছেড়ে অনেকেই তাই টেলারিং শিখছেন আজকাল। মুসলমানদের পাশে হিন্দুরা, পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও। তবে মুসলমান ঘরের মেয়েরা নয়। টেলারিংএর ডিগ্রি-ডিপ্লোমা খাস কলকাতাতেই দিনের দিন বেড়ে চলেছে। পিয়ারালি একটা খবর দিলেন। বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধের সময় কিছু ছেলে এসেছিলো এখানে। এঁদের কাছে দর্জিগিরি শিখে এখন তারা দেশে ফিরে স্বচ্ছন্দে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, এখন বাংলাদেশে ওঁদের একাজে মনোভাব কীরকম?

—এখন ওরা বলে খুব উপকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের লোক আগে টেলারিংকে নিচু কাজ মনে করতো। এখন করে না।

—আচ্ছা, সারাজীবন তো আপনারা অক্লান্ত খেটে যাচ্ছেন—আপনাদের তৈরি পোশাক-আশাকেই বাঙালির বাবুয়ানা। আপনার কখনো কাজের জন্য মনখারাপ করে না?

—কাজের জন্য কখনো মনখারাপ করে না। মনখারাপ করে এদেশের লোকগুলোর কথা ভাবলে। রুচি কোথায় নামছে! জামাকাপড় কাটতেই সব দেখি তো। তাছাড়া, দেখুন আগে বৃটিশদের সেবা করে আনন্দ পেতুম। কাজে একটা রোমাঞ্চ ছিলো। মজুরি বখশিশটাই বড়ো নয়। আসলে ওনাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিলো। এখন সেদিন আর নেই। এখন কে আমার তৈরি জামা পরবে তা-ই জানতে পারি না। কীরকম যন্ত্রের মতো লাগে মাঝে মাঝে। টাকা পয়সাই কি সব?

—এরকম যদি মনে হয় তো ছেলেদের টেলারিং-এর কাজ শেখাচ্ছেন কেন? লেখাপড়া বা অন্যকিছু শেখালে ভালো করতেন না?

—আসলে এতো ভেবে কি কেউ কিছু করছি? আপনিই সব হয়ে যাচ্ছে। এদেশে কি লেখাপড়ার কোনো দাম আছে? অনেকে শিখতে যায়, কিছু হয় না, আবার ফিরে আসে।

—একটু-আধটু লেখাপড়া না-জানলে আপনাদের কাজে কিছু অসুবিধে হয় না?

—আগে হতো না। বৃটিশরা খাঁটি মানুষ ছিলো। কাজের দাম বুঝতো। তাদের কাছে ইয়েস-নো দিয়েই চলে যেতো। এখন লেখাপড়া জানি না বলে একটু-আধটু অসুবিধে হয়। মাড়োয়ারি কোম্পানিকে অর্ডার সাপ্লাই দিলাম—ওরা বিল করার সময় কতোটা কী দাম রাখলো, কী বাদ দিলো, হিসেবে ভুল রইলো কিনা বুঝতে পারি না। এইরকম সব-কর্মসূত্রে যা হয়।

আমি বললাম, বৃটিশদের কথা বলছিলেন না? আপনাদের সেই সেকালের কথা শুনতে ইচ্ছে হয়।

—একটা ঘটনার কথা বলি শুনুন। আমি তখন ছোটো। পার্কস্ট্রিটে মেমের ডান্সের আসর হবে। আমাদের টেলারের ওপর হুকুম হলো, এমন জামা মেমের জন্য বানিয়ে দিতে হবে যা হবে সবচেয়ে মডার্ন। আর কারো মতো হলে চলবে না। দাম যা লাগে লাগবে। বেশ। জোনাকি পোকা দেখেছেন? ওই যে অন্ধকারে জ্বলে। আমাদের টেলার সেই জোনাকি পোকা একটা একটা করে জামার শাদা ফাইন কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে এমনভাবে গেঁথে দিলো যে সরে যেতে না পারে। নাচের আসরে মেম সেই জামা পরে গেছে। নাচের সময় হুকুম হলো হলঘরের সব আলো নিবিয়ে দাও। আলো নিবলো। কিন্তু অন্ধকার হলঘরে যে মেমের গা দিয়ে আলো বেরোচ্ছে! কি ব্যাপার! কি ব্যাপার! জামার মধ্যে থেকে আলো বেরোয়! কে বানিয়েছে এ জামা? এখুনি ডাকো টেলারকে। আমরা টেলারকে নিয়ে গেলাম দুরু দুরু বুকে। সাহেব তক্ষুনি তাকে পাঁচ হাজার টাকা বখশিশ দিলো।

—মজুরি?

—মজুরি তো আগেই মিটিয়ে দিয়েছে।

—মজুরি কীরকম দিতো?

—শুনুন। মেমের জামা একটা জায়গা একটু বিপু করতে হবে। টেলারকে বললো দ্যাখো তো টেলার কী করা যায়। বলেই দুশো টাকা ফেলে দিলো। টেলার তো হাঁ। দু-চার টাকার কাজ হবে—দুশো টাকার ভাঙানি দেবে কোথায় থেকে। এ দিকে মেম দেখছে টেলার টাকায় হাত দেয় না। ভাবলো ও বুঝি খুশী নয়। আরো দুশো টাকা ফেলে দিলো। টেলার এবার আরো ঘাবড়ে গেলো। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন সায়েব ঘরে ঢুকেছে। সায়েবকে দেখে মেম বললো, কী ব্যাপার বলো তো? টেলারকে জামা সেলাইয়ের জন্য চারশো টাকা দিলাম, ও নেয় না কেন? সায়েব সব দেখে বললো, এতোটা কাজের জন্য চারশো টাকা দিলে নেবে কেন? বলে সায়েব আরো দুশো টাকা দিয়ে বললো, নাও টেলার, এবার খুশি তো? টাকা তুলে নাও।

পটে আঁকা ছবি

নীল, সবুজ, গ্রে, কালো, ব্রাউন ও বেইজ—
স্বপ্নসুন্দর নানান রঙের সম্ভার, আর কেউ
দিতে পাবে না উপহার।
পপলিন, কেম্ব্রিক, সাটিন, ড্রিল,
কটনের গ্যাবার্ডিন। এছাড়াও,
পলিয়েস্টার ব্লেণ্ড করা
স্যুটিং ও শার্টিং

মদুরার কাপড়

প্রস্তুতকারী:

মদুরা কোটস্

বিক্রেতা: সুন্দরদাস থ্যাকার্সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৪, লুকাস লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০১ জয় ভারত ফ্যাব্রিকস্, ১৭, সুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শিউভগবান গজাধর, ১১৩ বি, মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শ্যাম টেক্সটাইলস্, মহাবীরস্থান, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৪ (পশ্চিম বঙ্গ)।

MCL-234 BEN.

শ্রীলতা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এয়ারফিল্ডের কাছে চারতাবা হোটেলের তিন কামরার স্যুইটে রাত আটটা হয়। ট্যুরিস্টের জন্যই এ মাঝারি ভালো হোটেল। সব চাইতে ভালো হোটেলগুলোকে পছন্দ করে নেয়ার আগে এখানে দু'এক রাত হয়তো থাকে তারা। তখন এখানে তারা মিলিত হ'লে ক্ষণস্থায়ী নাটক তৈরী হ'তে পারে যার কথা পরে মনে থাকে না। কোন কোন ট্যুরিস্ট এখানেই থেকে যায় আর সারাজীবনই ক্ষণস্থায়ী নাটকে অংশ নিতে থাকে।

রাত আটটা হয়। এ ঘরটা ডাইনিংরুম, ড্রয়িংরুম মিলিয়ে সাজানো। চার জনের ডাইনিং টেবল্। যার উপরে সাদা ঢাকনা। দুটো গ্লাসে ন্যাপকিনের ফুল। কিন্তু পাশাপাশি আর টেবলের ঠিক মাঝখানে রাখা। মনে হবে ডিনারের সময়ে চেয়ারের কাছাকাছি টেনে নিলেই হবে। এখন টেবলের উপরে দুখানা ছবির পত্রিকা, চেয়ারগুলোও দেয়াল ঘেষে সাজানো, টেবলের থেকে আলাদা ক'রে। ড্রয়িংরুমের মতো। এদিকে একটা বড় কনভার্টিবল্ শোফা যাকে শয্যা করা যায়। শোফার পাশে একটা গদিদার বৃত্তকার হাতলের চেয়ার। যার মুখোমুখী দেয়ালে একটা আয়না যাতে মুখ উঁচু করলে শ্রীলতার মুখের ছবি ফুটছে। ঘরে এখন যে আলো তাতে হাল্কা বাদামির ভাব আছে। প্রায়ই দেখা যায় রঙীন কোন জিনিস থেকে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে কাছাকাছি অন্য অনেক জিনিসকে রাঙিয়ে দিতে পারে। শ্রীলতার পরনের ফিরোজা সিল্ক থেকে আলোটা সারা ঘরে ছড়াচ্ছে এমন হ'তে পারে।

উল বুনছে শ্রীলতা। কাঁটায় কাঁটা লেগে মৃদু কুটকাট শব্দ হচ্ছে। উলের বুপোলি কাঁটা এক ডিজাইন উলে ফোটাচ্ছে নড়ে নড়ে, উল ফুঁড়ে বেরিয়ে বেরিয়ে। কখনও তার কানের সাদা পাথরের দুল, কখনও বাউটি আংটির পাথর ঝিক্‌মিক্ করছে।

মুখ তুললো শ্রীলতা। নিজের মুখের ছায়াই আয়নাতে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে গেলো। গরীবা গরবিনীর মতো হ'লো তারপর।

সে ডাকসাইটে সুন্দরী নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মুখই সুন্দর।

টুটুল লিটুলকে হোটেল হলে ডিনার খাইয়ে নিয়ে সুইটে ফিরে কিছুক্ষণ গল্পগাছা ক'রে কি ভেবে উঠে সে কানের দুল পালটেছিলো, হাতের বাউটি, শাড়ি পালটেছিলো, চুলের গোড়ায় ঘাড়ে পাউডার দিয়ে এলো খোঁপা বেঁধেছিলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সেটা শোবার ঘরের আয়না আর তাতে কপালের উপরের চুলের থেকে, চোখের ম্যাসকারা থেকে হাঁটুর কাছে সিল্কের কুঁচি পর্যন্ত চোখে পড়ে।

আয়নায়, এখানে, কপাল থেকে কাঁধ অবধি। আয়নার উপরের অংশটা সাদা চক্‌চকে সাদা নয়। ছবির ক্যানভাসে সাদা দেয়ার পর যেমন। দেয়ালের ছায়াই হবে।

টুটুল অবাক হয়েছিলো। বলেছিলো, মা তুমি এখন বাইরে যাবে নাকি? সিনেমায় যাবে নাকি গো?

একেবারে ওর বাবার মতো কথা বলে, গলার সুর পর্যন্ত।

আর মিটুন খুব খুশী হায়ে পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ে সিল্কের উরুতে মুখ গুঁজে, রোগা রোগা সাদা হাতে কোমর জড়িয়ে ধরেছিলো। —লক্ষ্মী, মা।

শ্রীলতা হাসলো। তার দু'তিনটে দাঁত সেই লালজাতীয় আলোয় দাড়িমদানার মতো দেখালো। মনে হয় চক্‌চকে পাথরে তৈরী, কিন্তু ভিতরের টস্‌টসে রসের কথাও মনে থাকে।

উলের কাঁটা পাশে সোফায় রেখে, ডান হাত তুলে ডান কানের উপরে চুলগুলোকে আস্তে আস্তে চেপে দিলো সে।

আবার উল কাঁটা নিলো হাতে। এটা এমন যে তুমি ভেবে যেতো পারো, তাতে কাঁটা থামে না। কখনও থমকে যেতে পারে, তারপর কুটকাট ক'রে চলতে থাকে। কখনও চুড়িতে বাউটিতে মৃদু শব্দ হয়।

আয়নায় ওটা মাছ নয়। মুখ নিচু ক'রে ভাবলে শ্রীলতা। দুমুখ চোখা চকচকে বৃত্তাভাসের মধ্যে লেখা হোটেলের নামই, যেমন বেলগাড়িতে থাকে। সাদা আয়নার ফলকের উপরের দিকে ডান কোণে যেন এরোপ্লেনের মতো ভাসানো, যদি আয়নাটা আকাশ হয়। নিচের হাল্কা বাদামি রঙের উপরে সাদা আকাশ। মেঘে ধূসর হ'য়ে ওঠার আগে শেষ বসন্তের আকাশ।

সেখানে লাউঞ্জেও তখন বসন্ত কিন্তু। ডালিয়া, গ্ল্যাডিয়োলা, হলি হোক্। সোনা-হলুদ, ফিরোজা, লাল, সিঁদুর—নানা রং আর কতরকমের পাঁপড়ি। একটা স্বচ্ছ ধরনের রোদে ফুলগুলো, তাদের গাঢ় সবুজ পাতা-গুলো যেন বিলাসিনী যাদের সংসারে কোন কাজ নেই। লাউঞ্জের সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে নেমে গিয়ে টারম্যাকে পৌঁছানোর আগে।

ফুলগুলোর এপারে রঙীন বেতের চেয়ারগুলোতে যারা তাদের পোশাকের, চুলের, ঠোঁটের, চোখের ম্যাসকারার, সানগ্লাসের রঙেও, যেমন ডানদিকেই সেই সিকিমি মহিলার সিঁদুর রং ঠোঁট আর নখ, সিপিয়া বেড্রাকেডের গাউন যার বোতামগুলো চাপকানের মতো পাশে, যেমন শ্রীলতার সাদা-ফুলদার হাল্কা নীল টিশার্ট আর দুধসাদায় হাল্কা লালের বেখা স্ল্যাকসে, হাল্কা লাল ঠোঁট আর নখে, সিপিয়ায় ম্যাসকারা করা চোখের কোলের কালিমায়, এমনকি পুরুষদেরও, যেমন মিস্টার মিটারের ইস্পাতনীল স্যুটে সেই বসন্তই যেন। তেমন এক করোফতা। আর মৌমাছিও উপস্থিত ছিলো।

টবগুলোর পরে, বেডগুলোর পরে টারম্যাক, স্টিলের খুঁটিখোঁটা, এলু-মিনিয়াম রঙের হ্যাঙ্গার সব শেষে খানিকটা সবজে-নীল দিগন্তের উপরে মন্দারোদের আকাশে দুই কুণ্ডলী সাদা মেঘের সঙ্গে এক কুণ্ডলী ইস্পাতনীল মেঘ, যেন সাদা সিনথেটিক কোন কাপড়ে আঁকা—যে কাপড় ঝিলমিল করছে কিন্তু আসলে যা ফেব্রুয়ারীর শেষের-দিকের বেলা দুটোর রোদে ভরা আকাশ। যে আকাশে ফক্কার ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি এইমাত্র দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তখনই কি শব্দ পাচ্ছ? একটা

কিন্তু তখনই কি শব্দ পাচ্ছ? মৌমাছি বরং লাউঞ্জের মানুষগুলোর দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু পরিমাণে ধুলো উড়ানো সেই করোণ্ড বাতাসও। কিন্তু বেশ সতর্ক, কারো ঠোঁটে বসছে না, কারো কানের টাপকে সহজে বিশ্বাস করছে না, বেলফুলের মতো বটে কিন্তু নাও হতে পারে। কারণ এখন তো সে বসন্ত প্রায় শেষ ক'রে এনেছে।

আয়নাটাকে দেখলে শ্রীলতা। একটু বেশী উঁচু করেছিলো মুখ। গলা, গলার নিচে হারের পাথর, কাঁধের শাড়ি। ওটা কিন্তু মাছের মতোই।

ফুলগুলো যেন একটু বেশী ফুটে যাওয়া। পাপড়ির ধারগুলো যেন কিছু রোদে ঝলসানো, একটু কুঁকড়ে যাওয়া। হয়তো আরও উত্তরে যেখানে জলীয় বাষ্প আরও বেশী থাকে সকালের কুয়াশায় এখনও, ফুলগুলো হয়তো এখনও তাজা। আজ কলকাতায় কুয়াশা ছিলো বটে, কিন্তু তখন তো, দেখছো, ঝকঝকে রোদের দুপুর। শেষ বসন্তই। শ্রীলতা তার স্ল্যাকশ ঢাকা পা দুটোকে সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন তার আঠাশ বছর হয়েছে।

কেমন একটা আলসেমি রাতের নেশা লাগে না?

একটা নীল মাছিও ভোঁ ক'রে এখান থেকে ওখানে বসার চেষ্টা করলো।

এরোপ্লেনটারও শব্দ শোনা গেলো।

মিস্টার মিটার বললে, ফক্কার ফ্রেন্ডশিপই এটা।

এটাই হবে, বললে কমরেড ঘোষ।

মায়ের কোলে ঝুঁকে ছ'বছরের মিটুন বললে, ফক্কা ফেনছিব বুঝি?

এই প্লেনটাই আমাদের? বললে টুটুল। তার আট বছর হ'লো।

সে বসন্তকে কৃত্রিমও বলা যায়। টবে বসানো। তাছাড়া প্রকৃতিতে ফুল-গুলো অতবড় হয় না। দস্তুরমতো গ্র্যাফ্টিং ইত্যাদি ক'রে এগুলো এমন, অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। উলের উপরে একটু ঝুঁকেই পড়লো শ্রীলতা। অর্থাৎ একটু গোলমেলে ব্যাপারই।

প্লেনটা যেন রুপোলি চকচকে মাছ বার পেটের নিচে শেষ পাখনার কাছে ইতিমধ্যে ভাব। মিস্টার মিটারের মুখটা একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। অনেক মানসিক প্রস্তুতির পরেও অপারেশন থিয়েটারে যেতে যেমন হ'তে পারে হয়তো।

শ্রীলতা ভাবলে, মাছটা অবাক হ'য়ে যায়। ভয় পেয়ে যায়। বড়শি নয় অথচ কিছু যেন বিঁধে গিয়েছে। সকলের থেকে দূরে গিয়ে জলের নিচে শ্যাওলাধরা বুড়ো পাথরের গায়ে নিজেকে ঘষে, যেন ভিতরে যা ঢুকেছে তাকে খসিয়ে দিতে কতরকম ক'রে নিজের শরীরকে বাঁকায়, ভাঙচুর করে, মরার মতো নিজেকে ভাসিয়ে দেয় জলের তলার সোঁতাতে। তারপর দেখে সে মরে নি। ভয় কমতে থাকে খুব ধীরে ধীরে। সমাজের অভিজ্ঞতা যেন লণ্ঠন হাতে তাকে খুঁজতে বেরিয়ে ডাকাডাকি করে।

কৃত্রিম বসন্ত তো বটেই। যেমন মিস্টার মিটারের ম্যানিকিওর করা নখ। যেমন তার সদ্য হেয়ারড্রেসিং করা মাথা যার জন্য পনর টাকা লেগেছে কাল। যেমন তার কান দুটো যা থেকে এক গোছা ক'রে লোম বেরিয়ে থাকতো। হেয়ার-ড্রেসারের কাছে গিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু মিটার তা পারে নি শেষ পর্যন্ত। যেন নিজের গোপনীয়তায় ডাকা হবে তাতে সেই অ্যাংলো চুলকাটনেওয়ালীকে। শেষে বাড়িতে ফিরে শ্রীলতাকে বলেছিলো মিটার সলজ্জভাবে, আর শ্রীলতা বেশ সাহস ক'রে ছোট কাঁচি দিয়ে সেগুলোকে সরিয়েছে।

তা তার সাহস পাওয়ার কথাই, লোমনাশক লোশন দিয়ে গলার নিচে কতগুলো বেয়াড়া বাড়তি লোমকে নির্মূল করতে সেই সাহায্য করেছিলো এর আগে। কেমন, লজ্জার মতো লাগে না? কৃত্রিম তো বটেই। যেমন শ্রীলতার চোখের কোলের কালিমার কালো ম্যাসকারা। সে তো সত্যি নষ্ট মেয়ে নয়?

কলকাতার মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে মিস্টার মিটারের কারখানা-ফার্ম। এখন তার নাম গমলিং মিটার। আগে গমলিং-ইণ্ডিয়া ছিলো। গমলিং মিটারের প্রেসি-ডেন্ট ডুবাই যাচ্ছে। তিন থেকে পাঁচ

শারদীয় 'শিসের' জমিনে সাহিত্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন

প্রবন্ধে :—বিনয় ঘোষ, কার্তিক লাহিড়ী, যোগেশ্বর রায়, ফণিভূষণ আচার্য, গুরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু বিশ্বাস, শিশির গুহ, সুব্রত চক্রবর্তী, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

গল্পে :—যতীন বালা, অচিন্ত্য বরাট, প্রদীপ আচার্য, কালী চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ মিত্র, শুভাশিস নাথ, নারায়ণ মণ্ডল, সত্য দেবনাথ, সমর মুখোপাধ্যায়, এবং চন্দন ঘোষ।

কবিতা :—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ দাসগুপ্ত, শান্তনু দাশ, কবিরুল ইসলাম, জলধি হালদার, কার্তিক মোদক, শক্তি সেনগুপ্ত, বিপ্লব চন্দ, রতনতনু ঘাঁটি, সৌমেন বন্দ্যোঃ, জয়তী রায়, স্বপন চক্রবর্তী, মুকুতি বসু, এবং যোগব্রত চক্রবর্তী'র শেষ লেখা। ও
চীনা কবিতার অনুবাদ, সেক্সপীয়রের 'সনেট'

মহালয়ার আগেই ক'লকাতার বিভিন্ন স্টলে এসে যাবে।
দাম—তিন টাকা। সডাক—পাঁচ টাকা। কার্যালয়—সিমুলতলা, বনগাঁ, ২৪-পরগণা। কলকাতা চারে; ৩৪এইচ, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড।

লাখ টাকার ফ্যান, এবার সার্কুলেটর ইত্যাদির রপ্তানি বন্দোবস্ত হওয়ার কথা আছে, তাকে পাকাপাকি করাই। কাল বিকেলে কলকাতায় পৌঁছে এয়ার-ফিল্ডের কাছে এই ট্যুরিস্ট-হোটেলে তিন কামরার সুইট নিয়েছিলো তারা।

বন্দোবস্তটাকে কিছু কৃত্রিম মনে হচ্ছে কি? তারা তো আজই ফার্মের বাংলো থেকে সোজা এয়ারফিল্ডে আসতে পারতো যে গাড়িতে এসেছিলো সেটাতেই। হোটেল কেন, হোটেলে রাত্রি-বাস কেন? এটাও তৈরী করাব, গড়ে তোলার ব্যাপার। শ্রীযুত মিত্র এঞ্জিনীয়ার, পরে গমলিং ইণ্ডিয়ার একজিকিউটিব, ক্রমশঃ মিস্টার মিটার, পরে গমলিং মিটারের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পরে (এ সবই হয়েছে শ্রীলতার বিশ থেকে এই আটাশে পৌঁছানোর মধ্যে) এই প্রথম মিস্টার মিটার ফরেইনে যাচ্ছে, যদিও হতে পারে, ডুবাই মাত্র কিছুদূরে, ইউরোপের মতো ফরেইন নয়, এই প্রথম তার ফার্ম এক্স পোর্ট কনট্র্যাক্ট পেতে চলেছে এত টাকার যার ফলে তার ফ্যাক্টরীর প্রোডাকশন্ দ্বিগুণ আড়াইগুণ বাড়বে। কিছু একটা করা দরকার নয়? এই বিশেষ ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করার জন্যই এই হোটেলে থাকা, রাত কাটানো।

বাহ্, হাসলো শ্রীলতা ভাবনার মধ্যে, মানুষ তো শুধু হওয়াই নয়, করাও। যেমন শ্রীযুত মিত্র ক্রমশ নিজেকে মিস্টার মিটার ক'রে তোলে। যেমন তখনকার টিশার্ট-স্ল্যাকসে শ্রীলতা, যেমন মিস্টার মিটারের ম্যানিকিওর করা নখের সুদৃশ্যতা। যেমন ছেলেদের ডিনার হয়ে যাওয়ার পরে তত রাতে কোথাও বেরোনোর কথা না থাকলেও, এই চুল জড়ানো ফাঁপা এলো খোঁপায়, এই শাড়ি পালটানো। কানের পাথরটা ঝিক্‌মিক করছে, গালেও তার লম্বা স্বচ্ছ ছায়া পড়ছে।

শ্রীলতার নাভির নিচে একটা গরম অনুভূতি। টেবলের উপরে কাটগ্লাস-গ্লাসে ন্যাপকিন জড়িয়ে ফুল, দুটো গ্লাস। মুখ নিচু করলে শ্রীলতা চকিতে। ভাবনার মধ্যে ঠাট্টা করলে অনুভূতিটাকে —অহাহা, ওটা ক্ষিধেই বাপু। তাছাড়া কিছু নয়।.. .....

মায়ের ছড়িয়ে রাখা স্ল্যাকস ঢাকা দু পায়ের মধ্যে ঢুকে কনুই দুটো আর বুকের কাছে মুখ রেখে ছ বছরের মিটুন বললে—একটা কোকা খাবো। তার সোনালি-হলুদ মুখটাকে এদিক ওদিক করলে যেন মায়ের বুকে ঘষবে। আর তখন শ্যামল রঙের টুটুল তার আট বছরের গাম্ভীর্যে না-শোনার ভাণ করলে। তার বড় বড় চোখের প্রান্ত দুটো অবিকল মিস্টার মিটারের মতো কিন্তু।

মিস্টার মিটার বললে, এটাই হবে।

সে হাসলো। কিন্তু তার ঠোঁট আর দাঁত হাসিটা মরলেও সেই ভঙ্গিতেই স্থির হয়ে রইলো।

ফকার-ফ্রেণ্ডশিপই, বললে কমরেড ঘোষ পিছন সাবি থেকে, আর তার হলুদ চিমসে হাত দুটোকে নার্ভাস-ভাবে ঘষলো।

তখন তো প্লেনটার পেটের কাছে বাদামী বাদামী রেখা আর ফুটকি ফুটে উঠেছে। মুখ তুললো শ্রীলতা।

ওটা কিন্তু মাছের মতোই। চক চক করছে, আর আয়না আকাশে ডান দিকে উপরে। তখন মনে হলো এখনই ঝুপ করে নেমে পড়ে রাণওয়ে ছুঁয়ে মোটরকারের মতো ছুটে চলবে প্লেনটা।

টুটুল গম্ভীর হয়ে বললে, এই প্লেনে বাবা যাবে ডুবাই।

তা যেন স্কুলের বন্ধুদের কাছে।

মিটুন তার ছোট ছোট হলুদ হাত দুটোকে নেড়ে নেড়ে তালি দিলো, ডুবাই, ডুবাই।

কিন্তু....

ভাবলে শ্রীলতা, দ্বিতীয়বারে কি যে তাড়াতাড়ি ঘটে যায়।

ঝুপ করে নেমে পড়লো প্লেনটা। আর পুরুষরা কি যে ভয় পেয়ে যায়। দ্বিতীয়বারে বোধ হয় মাছটা আগের বারের অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে তেমনই ছটফট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ছটফটানি কিছু কৃত্রিম হয় না?

ওদিকের সিকিমী মহিলা তার সঙ্গীদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কি যে তাড়াতাড়ি....

প্রথমে মিস্টার মিটার। তারপরে এক লাইনে টুটুল-শ্রীলতা-মিটুন। পিছনের লাইনে কমরেড ঘোষ ধার পালে, কিন্তু কিছু দূরে, শ্রীলতার আয়া। মাইকে কথা শুরু হয়েছে। প্লেনটা ট্যাকসির মতো চলতে চলতে বাঁক নিয়ে ঘুরে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো। আর তার পরে সাদা সিফন পরা সেই মেয়েটি। প্লেন থেকে নেমে প্লেনের কাছে সে যেন প্রদক্ষিণ করলো। যেন নিষ্পাপ কিছু।

আসলে কিন্তু দ্বিতীয়বারের সেই অনুভূতিতে ছটফটানি যা থাকে তা হয়তো প্রথমবারের ছটফটানির স্মৃতি। পুরুষরা বরং, আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে যেন মুখ তুললো শ্রীলতা, যেন ফ্লাউয়ার ভাস ভেঙে ফেলে ভয় পায়। উলের কাঁটা সোফার শুয়ে ডান হাত তুলে কানের উপরের চুলগুলোকে একটু চেপে দিলো শ্রীলতা।

মুখ নামালো সে। তার খোঁপার চূড়াটা আয়নার নিচের কোণে দেখা গেলো। হয়তো সে এয়ার হোস্টেসই। অনেকক্ষণ যে সেই বেলফুলের মতো সাদা শিফনের মেয়েটিকে দেখেছিলো। যাত্রীরা প্লেনে উঠলো। সব শেষে এয়ার হোস্টেস। তারপর প্লেন চলতে শুরু করলো, আর অযাত্রীরা রুমাল নাড়তে। টুটুল, মিটুন, শ্রীলতা, কমরেড ঘোষ। কেমন যেন দুঃখের মতো, কিছু হারানোর মতো, ছিঁড়ে যাওয়ার মতো মনে হয়। প্লেনের বাতাসে ওড়া ধুলো চোখে ঢুকে যায়, জল এসে যায় চোখে। তারপর টুটুল বললে, এ মা, তুমি কোন দিকে রুমাল নাড়ছো? বাবা তো প্রথমদিকে। ওদিকে তো এয়ার হোস্টেস্ ঢুকেছিলো, প্লেনের পিছন দিকে।

নাটকের অভিনব সংকলন প্রকাশিত হোল

দু'টি পূর্ণাঙ্গ নাটক—ছ'টি একাঙ্ক নাটক এবং নাট্য-আলোচনাসহ একই মলাটে

আশ্চর্য সংকলন

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত—

নাট্য লিপিকা

লিখেছেন—

ত্রিশূল-ধনঞ্জয় বৈরাগী, মা-জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্য, রতনকুমার ঘোষ, জ্যোৎস্নাময় বসু, সঞ্জীব সেন, প্রভাস ভদ্র, তপনকুমার ঘোষাল, মিহির সেন, প্রকাশ নন্দী।

প্রায় পঁচিশ টাকার বই একই মলাটে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র **আট টাকায়**

সীমিত সংখ্যক কপি ছাপা হয়েছে

ভিঃ পিঃ তে দশ টাকা।

লিপিকা / ৩০।১-এ কলেজ রো, কলকাতা - ৯

বহির্বঙ্গের ঠিকানা - কিতাবঘর, নিউ দিল্লী - ১

আশ্চর্য, কিন্তু, উল সমেত কাঁটা দুটো থেমে গেলো, হঠাৎ মনে হচ্ছিলো তখন শ্রীলতার নিষ্পাপ কিছু চলে যাচ্ছে। যেন তাকে বিদায় দিতে চোখে জল আসবে।

তারপরেই এক হাত টুটুলকে ধরতে দিয়ে অন্যহাতে মিটুনের হাত ধরে মৃদু দৌড়ের ভঙ্গিতে শ্রীলতা তাদের গাড়ির দিকে গিয়েছিলো যেন ঘাসগুলো স্প্রিং মা পায়ের তলে উঠছে নামছে। আর হাসছিলো তারা সেই দৌড় দৌড় খেলায়।

—আমাদের গাড়িতেই এসো কমরেড ঘোষ।

—আমাকে বলছেন?

—এসো। অনেক জায়গা আছে।

ভাবলে শ্রীলতা ভাবনার মধ্যে অবাক হয়ে হয়ে—আশ্চর্য, কিন্তু মনে হচ্ছিলো তখন নিষ্পাপ কিছু চলে যাচ্ছে যার জন্যে সে মনে করতে পারছে না মিস্টার মিটার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কিংবা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ফিরে দেখেছিলো কিনা, কিংবা রুমাল নেড়েছিলো কিনা, কিংবা কি করেছিলো সে, অর্থাৎ যাকে বিদায় দিতে আসা সে কিভাবে বিদায় নিলো তা দেখা হয়নি।

সেই না-দেখা যেন ছোট একটা কালো গর্ত সময়ের। না ওতে পড়লে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, ওতে যেন বাতাস কম।

দেখো কাণ্ড! ভাবলে শ্রীলতা। আর তারপর আবার হোটেলের লাউঞ্জে। সেখানে একটা গোল টেবিল ঘিরে, বরং গাড়িবারান্দার মতো, পিলারগুলোর উপরে ছাদ, দেয়ালগুলো দূরে দূরে, পিলারগুলোর কাছে কাছে পিতলের টবে পাম আর ডালিয়া, ছাদের কাঁচ থেকে টেবচা টেবচা রোদের ত্রিভুজ মতো ফালি, গোল টেবিল ঘিরে একটা পরিবারের মতো বসেছিলো কমরেড ঘোষ, টুটুল, মিটুন, শ্রীলতা, এমনকি আয়াও।

কেশর-হলুদ ফ্লানেলের চাইনিজ শার্ট, গেঞ্জ ওরস্টেডের ট্রাউজার পরা কমরেড ঘোষ। বুকপকেট থেকে নীল চেক রুমালের কোণ। তার উল্টোদিকে শ্রীলতা নিজে। সেই সাদা ফুলদার নীল টিশার্ট, আর দুধসাদায় হাল্কা লালের বেখা স্ল্যাকস্। আয়াই বরং সিল্কের শাড়িতে।

শ্রীলতা হেসে বললে, তুমিও বসো।

তারপর কমরেড ঘোষের দিকে চেয়ে বলেছিলো, ওরা কোকা খাবে। আর আমরা চা খেতে পারি।

তখন পিলারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট আলোই ছিলো। কমরেড ঘোষের গায়ের কাছে একটা টবের ফার্ণে রোদ চক্‌চক্ করছিলো। কমরেড ঘোষ বললে, আমরা চা খেতে পারি।

কমরেড ঘোষকে সেই কেশর-হলুদে একটু বেশী হলুদ লাগছিলো। প্রকৃত-পক্ষে শ্রীলতার চাইতে ফর্সা নয়, টুটুলের চাইতে ফর্সা হতে পারে, বরং মিটুনের মতো। মিটুন অবশ্য অনেক তুলতুলে, অনেক টাটকা তার গায়ের রং।

ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দাঁতে গর্ত! দাঁতের রোগ! এর হাত থেকে বাঁচতে হলে আপনার দাঁতকে দন্তক্ষয়ের কবল থেকে বাঁচান। বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত পরিষ্কার আর সুরক্ষিত রাখুন।

পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের দীর্ঘস্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফস্‌ফেট।

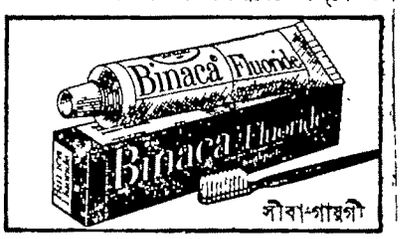

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

U-BF 8/7 bnp

ছেলেরা কোকাকোলা খেয়েছিলো। শ্রীলতা আর কমরেড ঘোষ চা।

কমরেড ঘোষকে তুমি ডাকসাইটে সুন্দর বলতে পারো না। দেখো, নাকটা যেন মুখের তুলনায় উঁচু। হিসাব করলে চিবুকটা বরং সরু। অবশ্য, সব মানুষের মুখই সুন্দর।

চা শেষ ক'রে শ্রীলতা বললে, গাড়ি কেনার কথা হয়ে আছে। আমরা এখন রংটা পছন্দ করতে যাবো।

কম্পানির গাড়িতে তা অবশ্যই প্রেসিডেন্টের নিজস্ব ব্যাপারও, শ্রীলতা তার ছেলেদের নিয়ে গাড়ির রং পছন্দ করতে চলে গিয়েছিলো।

দেয়ালের গায়ের ছোট্ট গোল সোনালি আর কালো দিয়ে ঘড়িটার দিকে চোখ তুললে শ্রীলতা। সাড়ে আট বাজে। এখন চা খাওয়া যায় না।

তা ছাড়া

যেন কান খাড়া ক'রে শুনলো শ্রীলতা। হাসি হাসি হলো তার মুখ। কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। টুটুল মিটুন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আঞ্চলিক ইতিহাসের এক অমূল্য গ্রন্থ—

ঘাটালের কথা

পঞ্চানন রায় ও অধ্যাপক প্রণব রায় রচিত

আর্টপেপারে ছাপা বহু ছবি ও দুষ্প্রাপ্য মানচিত্রসহ। ২০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বাণী সংসদ

১৪এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

ডিনারের একঘণ্টার মধ্যেই ঘুমায়। সেটাই ওদের অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে শ্রীলতা। একা একা তাদের ঘুমানোর এই ট্রেনিং দেয়ার ফলে ভালো ঘুম হয় তাদের। বাহ্, সে মা, আর শেখাবে না?

তাছাড়া

এ ঘরটার আলো কিন্তু খানিকটা হাল্কা বাদামী। যেন কি বলবে? যেন বসন্তের সন্ধ্যা। খানিকটা যেন অন্য কোথাও থেকে আনা। যেমন ধরো শ্রীলতার চুল যাকে কাক-কালো মনে হয় না বরং যেন খয়েরী। ডান হাতটাকে সোফার উপরে পেতে সেই সিল্কের উপরে চালিয়ে চালিয়ে নিলো শ্রীলতা।

তাছাড়া, সে তো ছিলো এয়ার হোস্টেস। সব সময়ে নিষ্পাপ হয় না তারা বোধহয়। তাই নয়?

মুখ তুলে হাসলো শ্রীলতা।

স্যার

দ্বিতীয়বারে কখনও তোমার তেমন মনে হয় না যে একটা দীর্ঘায় আসা সন্ধ্যার ভেসে ভেসে আসা পিরামিডে তারার আকাশের নিচে চোখে জল ভ'রে একা শুয়ে আছ যখন দূরে দূরে আলোর বিন্দুগুলো তোমাকে যেন তোমার মৃতদেহকে খুঁজছে।

গাড়ি পছন্দ ক'রে শ্রীলতা ফিরে এসেছিলো।

তখন চারটে হবে বেলা। গাড়ি-বারান্দার মতো সেই একদিক খোলা লাউঞ্জেই। খোলা দিকটা দক্ষিণে বাড়ানো। সেজন্য তখনই সেখানে পড়ন্ত-বেলার মায়াবি উত্তরলতার খেলা। টুটুল মিটুন তখন নাচছে যেন কেননা টুটুলের কাঁধে একটা ব্যাট বাঁহাতে লাল বল। তার ক্রিকেট-ক্যাপ মিটুনের ঈর্ষা কমাতে মিটুনের মাথায় মিটুনের বুকে জড়িয়ে ধরা মস্ত একটা টেডিবিয়ার। আর শ্রীলতার চোখ দুটিও তখন চক্‌চক্ করে থাকবে, কেননা সে মনের মতো গাড়িটাকে পেয়েছে। যেন খেলনা এমন এক টুসিটার যা যেন টুটুলই পারবে চালাতে, আর টকটকে সিঁদুরে।

তুমি বলতে পারো না, মুখ তুললো শ্রীলতা, আগে থেকে কি তোমার পছন্দ। তারপর তুমি হঠাৎ দেখো পেলে আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এটাই তোমার পছন্দ সেই কবে থেকে। যেন মনে একেই খুঁজছিলে ব'লে শান্তি ছিলো না। আর শান্তি হ'লো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্বিতীয় পিলারটার পাশেই বেতের চেয়ারে গা ডুবিয়ে হাতের তেলোয় সিগারেটের বাকস কমরেড ঘোষকে দেখতে পেলো শ্রীলতা।

আর প্রথম পিলারের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

যেমন সে নিজের বাংলোর লনে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ কখনও ঘরের ভান করে আতপ্ত ঘাসে লুটিয়ে পড়ে যার ফলে টুটুল মিটুনের ডাকাত পুলিশ খেলা শেষ হয়। আর শ্রীলতা তখন সত্যি বিশ্রাম করেও নেয়। টুটুল মিটুনদের তাদের বাথরুমে নিয়ে যায় আয়া তারপর।

শ্রীলতা বললে, ওদের নিয়ে যাও আঈ, অনেক ধুলো লেগেছে গায়ে।

তেমন ক্লান্তির ভঙ্গিতেই কমরেড ঘোষের কাছাকাছি আর একখানা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে হেসেছিলো সে।

—আমি কিন্তু সত্যি আশা করিনি, তুমি কি জানতে আমি মিসেস মিটার।

আর তখন বাদামিতে দুধে মিশানো ঘন আলো চারিদিকে।

—তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—বোধহয় রোদ লাগলো।

—তোমাকে চা দিতে বলবো কি? বললে কমরেড ঘোষ।

ওয়েটারদের কেউ কেউ এসময়ে এই লাউঞ্জে ডিংকসের অর্ডার নিতে ঘোরে। উঠে গিয়ে তাদের একজনকে ধরে আনলে কমরেড ঘোষ।

অনেক সময়ে কিন্তু কথা আসতে চায় না। কমরেড ঘোষ সিগারেট বার করলো। ধরালো না।

আজ গরম কিন্তু। বললে শ্রীলতা।

এমনকি ওয়েটার এলো। চেয়ার দুটোর সামনে টিপয় রাখলে। চায়ের প্লেট কাপ সাজালো কমরেড ঘোষ নিজেই।

কমরেড ঘোষ বললে মৃদু হেসে আর তাতেই যেন তার পরিশ্রমে লাল হ'লো মুখ অথচ এখন বসন্ত নয়?

চা তৈরি করলো শ্রীলতা।

কমরেড ঘোষ চা নিতে যেন দ্বিধা করলো। বললে, আমি জানতুম না তুমিই মিসেস মিটার।

আচ্ছা, সুব্রতবাবু, হাসলো শ্রীলতা।

—কিছু বললে?

—না।

প্রকাশিত হোল সেই চিরন্তন পত্রিকা
একুশ বছরের পুরনো তবু চিরনতুন
বাংলা ভাষার অভিজাত এবং মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—

সপ্তর্ষি

শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন—
উপন্যাস —শক্তিপদ রাজগুরু ॥ পিনাকীরঞ্জন গুহ
বিশেষ রচনা—ডঃ অমিয় চক্রবর্তী ॥ শ্রীপান্থ ॥ কমল দাস
কবিতা —নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সাধনা মুখোপাধ্যায় অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।
বড় গল্প —সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার ভট্টাচার্য।
গল্প —হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শেখর বসু, সমীর রক্ষিত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপন চট্টোপাধ্যায়।
চলচ্চিত্র —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই সুবৃহৎ সংখ্যাটির দাম মাত্র পাঁচ টাকা।
শহরের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

সম্পাদকের দপ্তর : বাটানগর, ২৪ পরগণা
শহরে যোগাযোগের দপ্তর : লিপিকা ৩০।১-এ, কলেজ রো, কলকাতা—৯

মাথা ধরেছে?
এক গ্লাস
জলে
খান

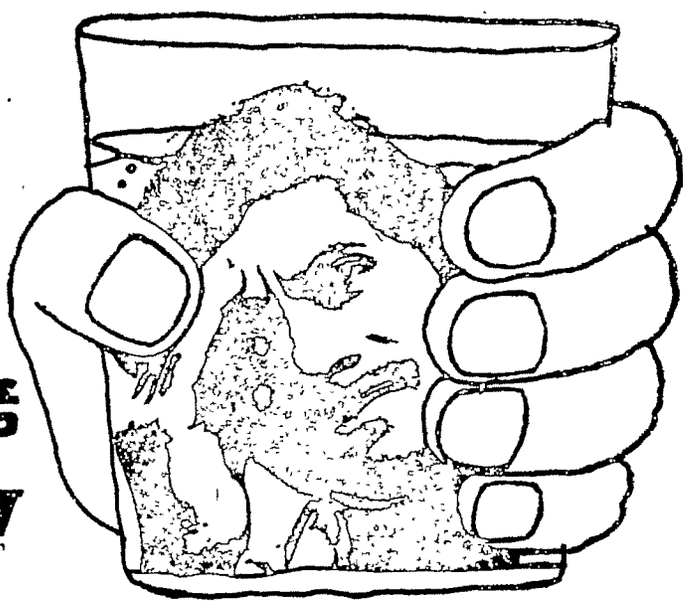

Saridon

আর কেবল একটি

সারিডন

ট্রেডমার্ক 'রোম'

চা নিলে সুব্রত ঘোষ। বললে, এটা একটা যোগাযোগ। যদিও জানতুম তোমার উপাধি মিত্র। কিন্তু তুমি মিসেস মিটার জানতুম না।

কেমন দিন চলে যায়! এই ভয়ানক পুরনো কথাটা বলে সলজ্জ হয়ে হাসলো শ্রীলতা।

এতক্ষণে সিগারেট ধরাতে পারলো সুব্রত।

চাটা পেয়ে ভালোই হলো। বললে শ্রীলতা।

—তুমি কিন্তু বদলাও নি। বললে সুব্রত।

—দেখেই চিনেছিলাম। হাসলো নির্শব্দে শ্রীলতা। কেউ তো আর সত্যি ছদ্মবেশ পরো নি।

মধুমালা কেমন আছে? মধুমালা দিদি কোথায়?

—ভালোই আছে, বেশ ভালোই। চন্দননগরেই।.....

ভাবনার মধ্যে হাসিতে ভাঙচুর হ'লো শ্রীলতার ঠোঁট।

সেটা কিন্তু একটা গোল দ্বীপ। কিন্তু তা যেন কোথাও থেকে আসা। টেবলে পেপারওয়েট ক'রে রাখা একটা গ্লাসবলের মতো। উপরে চকচকে কাঁচ, কিন্তু তার ভিতরে একটা রঙীন ডিজাইন। উপরে গোল হয়ে নেমে যেন মাটিকে ছুঁয়ে নীল নীল আকাশ, আর তার নিচে লাল লাল ফুল ফোটা সবুজ মাটি, একটা গ্লাসবলের মধ্যে যেমন হ'তে পারে।

এদিকের এ দ্বীপটা কিন্তু বড়। প্রকৃতপক্ষে তো দ্বীপ নয়। কূলেরই অংশ। কিছু পুরনো পুরনো গাছ, একটা বাংলো বাড়ি সমেত যা সেবারের বর্ষায় কূল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো।

আর দূরে সেই ছোট নীল দ্বীপটা যা শীতের দুপুরে নদীর চকচকে কাঁচের টুকরো ছড়ানো বুকে। এ দ্বীপের এক-জন অকবি ছবিটাকে প্রায় নষ্ট করে বলে উঠেছিলো-দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বি ...

সেটা ছিলো মধুমালার বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। বিয়ের উৎসবে যেতে পারেনি শ্রীলতা। সিস্টার মিটারের মামাতো বোন অধ্যাপক ডকটর মধুমালা বসুর সঙ্গে অধ্যাপক ডকটর সুব্রত ঘোষের বিয়ে। ভালোই হয়েছিলো বিয়ে। মিস্টার মিটার যেতে পারে নি, গমলিং ইণ্ডি-য়ায় ধর্মঘট, শ্রীলতা যেতে পারে নি টুটুল তখন সদ্যজাত।

বিয়ের বার্ষিকীর খবর পেয়ে শ্রীলতা সুতরাং আঈর কোলে টুটুলকে নিয়ে গিয়েছিলো। মিস্টার মিটারের পক্ষে সেবারও যাওয়া সম্ভব হয় নি। কেন না তখন গমলিং ইণ্ডিয়া গুটিয়ে নেবার কথা চলেছে যে চঞ্চল বিশৃংখলার মধ্যে থেকে গমলিং মিটার ক্রমশ জেগে উঠবে।

কথা এসেছিলো এবারের বর্ষায় নদীর ধারের বাংলোটা কূল থেকে আলাদা হয়ে এক দ্বীপ হয়েছে, বাংলো আর তার চারিদিকের লন আর বাগান। সেখানে এখন কেউ বাস করছে না মালি ছাড়া। পি ডবল্যু ডির লোকেরা বর্ষার সেই চওড়া ফাটলটাতে পাথর আর মাটি ঢালছে, ফাটলটার উপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো আছে।

কথা এসেছিলো কলকাতার জুতে যাওয়ার পথে এক ঝাঁক বুনো হাস নেমেছে দ্বীপটার কাছে।

বাংলোর মালিকের মত নিতে এক-বার বললেই হয়।

উৎসব রাতে। কৌতুকরসে পাগল পেবানীই বোধ হয় কথাটা। পাঁচ-ছজন জুটে গেলো। একটা শট গান। নদীর ধারে পিকনিকের মতো ব্রেকফাস্ট। তারপর নিশ্চয় স্নান হতে পারবে, সুতরাং দু-চারজন বেদিং সুট এনেছে। মধুমালা ইতিমধ্যে সন্তান বহন করছে। সুতরাং সে জলে নামবে না। সুতরাং তার একটা ঝকঝকে কালোয় হলুদ অদ্ভুত সাহসী বিকিনি যা সে নিশ্চয় ব্যবহার করেনি শ্রীলতার জন্য সে সুট-কেসে ভরে নিয়েছিলো। তারই তো পরিকল্পনা। হেসে বলেছিলো সে, দেখি বউদি কত সাহস তোমার। আর বাঁশের সাঁকোটা দিয়ে মধুমালার পার হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করে প্রায় শূন্য থেকে একটা জেলে ডিঙ্গি যোগাড় করে ফেলেছিলো সুব্রতবাবু নদীর তীরের খোঁটা থেকে। নৌকা তো নয় নৌকার স্বপ্ন বলতে পারো। বোধ হয় দুজনের বেশী তিনজনের ভার বয় না। একটা বোঠে, মাঝখানে একটা বাঁশ পোঁতা যাতে উঁচু করে বাঁধা গেরি-মাটিতে রং করা বিছানার চাদর যেন একখানা যা নাকি পালের কাজ করবে।

ব্রেকফাস্ট শেষে যখন গাছগুলোর আড়ালে তারা হেসে গল্প করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন সেই বাংলোর মালির কি মনে হচ্ছিলো এরা কেউ মানুষ

২৯শে ভাদ্র প্রকাশিত হয়েছে

প্রতিষ্ঠিত কথাকার
বীরেন্দ্র দত্তের
সহজ কঠিন
পাঁচ টাকা

প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক
উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের
রবীন্দ্রসঙ্গ
সাত টাকা

পরিবেশক : দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রকাশিত হ'ল
এবার পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

সাহিত্য-সেতুর **প্রেম সংখ্যা**

বিভিন্ন দেশে সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে বৈধ-অবৈধ, শ্লীল-অশ্লীল প্রেম, প্রেম-ফ্রয়েড-যৌন জীবন, পশু, পাখী ও আদিবাসী সমাজে প্রেম, মনীষীদের গোপন প্রেম, ভগবৎ প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেমের স্বরূপ নিয়ে তথ্য ও তত্ত্বমূলক, সচিত্র রসঘন আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাবৃন্দ।

প্রেম নিয়ে এত বৈচিত্র্যময় সংকলন ইতিপূর্বে হয়নি। প্রায় তিনশো পাতা, পাতায় পাতায় ছবি, পরিচ্ছন্ন ছাপা, মনো-রম প্রচ্ছদ। দাম মাত্র পাঁচ টাকা। রেজিস্টার্ড ডাকে আট টাকা।

পাতিরাম সহ সমস্ত সম্ভ্রান্ত পত্রিকা স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ : সম্পাদক/সাহিত্য-সেতু
কলকাতা দপ্তর : ১এ, রামময় রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৫

তার পর তারা স্নান আর সাঁতারের জন্য বাগানের শেষে রোদে ঢাকা ঢালু লনে গিয়ে জমা হয়েছিলো, কারণ তা ছাড়া অন্য খেলাটা সম্ভব ছিলো না। কেন না এ দিকের দ্বীপটায় একটা ঘাসও নেই, আর মালি বলেছিলো যদি থাকে তবে তা ওই নদী দেখাচ্ছে সেই দ্বীপটার কাছে।

মালিকে বলা হয়েছিলো তাদের বাংলোর কূলের দিকে সে পাহারায় থাকবে। কেউ এসে বলবে মেয়েরা স্নান করছেন।

তখন বেলা নটা হবে। আর সেই ছোট্ট ডিঙিটা দড়ি দিয়ে লনের ধারের একটা গাছে বাঁধা। এয়ার-গানের মতো চেহারা হাল্কা সরু নলের শট্‌গানটা সেই নৌকার যা সে-রকম করে রাখা হয়েছিলো।

সে তো আর ডাইভিং বোর্ডওয়ালা স্নানের ঘাট নয়। নৌকাটার বরং উঠে দু-একজন জলে লাফিয়ে পড়ছে। কেউ বা তা করার আগে দড়িতে যত-দূর যায় তেমন চালিয়ে নিচ্ছে নৌকাটাকে।

বাংলোর বারান্দার ঘরে বেদিং কসটিউম পরলে শ্রীলতা। আর মধুবালা বললে হাসতে হাসতে, তুমি জ্বালিয়ে দেবে, বৌদি।

শ্রীলতা বললে, বেতের চেয়ার টেনে এনে বসতে দিন মধুমালা দিদিকে। আজ ওর বিয়েরই উৎসব, সুব্রতবাবু। ওই সব চাইতে দামী।

এই কথাতেই সকলে হেসে উঠে-ছিলো, হাসার জন্য এমনই প্রস্তুত ছিলো তারা।

দুবার পালা মত নৌকা থেকে জলে ডাইভ করেছিলো শ্রীলতা। একবার কি বুদ্ধি হলো তার মাথায়, গাছের গোড়া থেকে ডিঙির দড়িটা খুলেও দিলো সে নৌকোয় উঠবার আগে। নৌকায় উঠে, অন্যেরা কেউ কেউ যেমন তার আগে, ডাইভ দেয়ার আগে সে সেই গিরিমাটি রাঙানো বিছানার চাদরের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়িতে টান দিতেই পালে বাতাস লেগে গেলো, তর তর করে এগিয়ে গেলো নৌকাটা।

ডান হাতের উলের ঘরগুলো বাঁ কাটায় তুললে শ্রীলতা। হাসি হাসি মুখে সে ভাবলে, যেন বাঘটবে ভাসানো একটা কাজের নৌকা হঠাৎ বড় হলো আর তাতে উঠে বসেছে কেউ।

আনন্দে উৎসাহে কয়েকজন সাঁতারু সেই নৌকাকে অনুসরণ করলো। লনের উপরে যারা তারা সেই নতুন খেলা উদ্ভাবিত হতে দেখে হাততালি দিলো, হাসলো হো-হো করে।

কিন্তু নদীকে দেখে বোঝা যায় না, তার প্রায় স্নিগ্ধ সুকোমল বুকের কোথায়

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমানিত হয়ে গেছে।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কিভাবে কাজ করে:

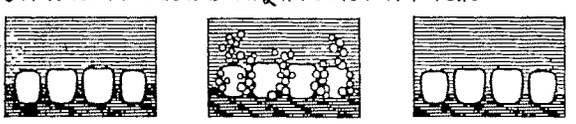

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জন্মায় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, দন্তক্ষয় রোগের প্রতিরোধ।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট

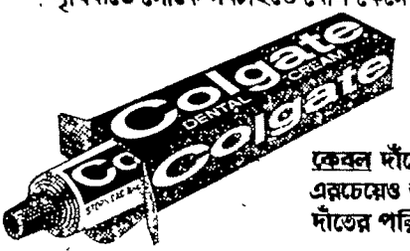

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

DC.G.62 BN

বিদ্যুতের মতো চপলতা থাকতে পারে। কিংবা কথাটা তা নয়, তার মসৃণ শান্ত বুকের আড়াআড়ি একটা তীব্র প্রবাহ থাকে যার কথা জানা যায় না।

দু-এক মিনিটে নৌকার বেড়ে যাওয়া গতির সঙ্গে, গতি তো বেড়েছিলোই, জলের শব্দ হচ্ছিলো নৌকার কাঠে, জল উচু হয়ে উঠছিলো আগ্-গলুইএর কাছে। শ্রীলতা তখন ভেবেছিলো পালের যে দড়িটা সে ধরে আছে তা কি ছেড়ে দেবে? ভয় ঠিক নয়, কেন না তখনও তো লনের উপরে যারা তাদেরহাসি, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে;

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
P.O. KATRISARAI (GAYA)

মাত্র ৪৫ টাকায়
ট্রানজিসটার রেডিও

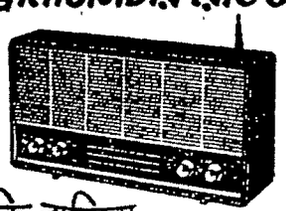

কি করিয়া
তৈয়ারী করিতে হয়
২ মাসের ভিতর শিখুন
শিক্ষান্তে
মাসিক ২০০/৩০০
উপার্জন করুন
নাও কি নাতারস্ত

রয়েল কলেজ
১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো
শিয়ালদহ
শাখা :
৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে)
৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে)
১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড
খিদিরপুর

মনে হয়েছিলো এবার নৌকাকে ঘুরিয়ে নিলে হয়। সাঁতারুরা, যারা পিছনে আসছিলো, কেউ ফিরে যাচ্ছে, কেউ এক জায়গাতেই সাঁতার দিচ্ছে, শুধু একজন খুব জোরে জোরে সাঁতার দিয়ে নৌকাটাকে ধরে ফেললে।

সুব্রতবাবু নৌকায় উঠে বসলো। ভিজে মুখের উপরে ভিজে চুল। হাসলো সে হো হো করে, যেন খেলার নতুন পর্যায়। শ্রীলতার পাশে বসলো সে, বোঠেটাকে হাতে করলো। লনের উপরে যারা ছিলো তারা কিছু বললে চিৎকার করে, কি বললে বোঝা গেলো না।

নৌকা তখন জোরেই চলছে, নিচে স্রোতে আর উপরে পালের বাতাস। সুব্রতবাবু বন্দুকটা উঁচু করে ধরে লনের লোকগুলোকে দেখালো, যেন বললে দেখি ছোট নীল দ্বীপটায় হাঁস আছ কি না। সত্যি কি তা ভেবেছিলো সে?

কিন্তু পালে বাতাস টা, তখন নৌকা যেন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে, আরও বেশী চাপ দিচ্ছে। তখন হঠাৎ আবিষ্কার হলো যেন নদীটা বাথটব নয়, গোলদিঘীও নয়।

শ্রীলতা, আনাড়ি যেমন করতে পারে, পালের দড়িতে ঢিল দিতেই নৌকাটা বেসামাল হয়ে উঠলো। সুব্রতবাবুও এমন কিছু জলের পোকা নয়। চিন্তিত মুখে বললে, ছেড়ো না ছেড়ো না, ভেবে দেখি। ওভাবে নৌকা ঘুরবে না বোধ হয়।

শ্রীলতা ভাবলে, (সাড়ে আট পার হয়েছে রাত্রি) এমন মনে থাকে এক-একটা কথা।....

ছাড়া তো নয়ই। ছেড়ে দিলে নৌকা ফিরতো না। বরং একবার তো দড়ি টেনে টান টান রাখতে শ্রীলতাকে শুয়েই পড়তে হলো। ভাগ্যে পায়ের তেলো আটকাতে পেরেছিলো নৌকার একটা আড়াআড়ি কাঠে। তখন সুব্রতবাবুকেও দড়ি ধরতে হয়েছিলো। কি জোর বাতাস।

সত্যি কি ওই নীল দ্বীপটায়....

সুব্রতবাবু বাঁ হাতে দড়ি ধরে ছিলো। শ্রীলতাকে ঘিরে তবে ডান হাতেও দড়ি ধরতে পারলে।

খালি গা সুব্রতবাবুর, তখনও জল গড়াচ্ছে। আন্ডার-প্যান্টের উপরে টাওয়েল জড়ানো। তখন শ্রীলতার মনে পড়েছিলো নিজেকে। পিঠটা একেবারে খালি কোমরের নিচে পর্যন্ত। দু টুকরো সেই দুঃসাহসী স্নানের পোশাক। নাভির নিচে থেকে উরুর কয়েক ইঞ্চি যেমন ঢাকা থাকে এই আধুনিকতায়।

সুব্রতবাবু এমন কিছু মাঝি নয়। লনের নিচে যেখানে তারা জলে নেমেছিলো সেটা বাঁধানো ঘাট না হত পারে, প্রায়-স্থির শান্ত শীতের জল ছিলো। কিন্তু সেটা সরোবর নয়, জীবিত নদী।

সুব্রতবাবু বললে, মনে হচ্ছে স্রোতটা আমাদের দ্বীপটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝ নদীথেকে ফিরতে হলে হাল লাগবে। সে হাসলো। আর ওখানে সত্যি হাঁস থাকতে পারে হয়তো।

ভয় করছিলো তখন শ্রীলতার। কিন্তু হাসিও তো রাখতে হয় মুখে। তখন লনের উপরে যারা তারা অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

সুব্রতবাবু বললে, স্রোতের বোধ হয় একটা পয়েন্ট অব নো রিটার্ন থাকে। সেখানে পৌঁছালে স্রোতের হিসাবই মানতে হয়। নিজে থেকে ফেরা যায় না। দেখি ভেবে। সুব্রতবাবু হাসলো। হয়তো দ্বীপে পৌঁছে ঠিক করতে হবে কি করে নৌকা ফেরা।

না, ডুবে মরার ভয় নয়। নদীটা এখানে বেশ চওড়া আর সাদা। এমন কি সাদা সাটিনে কাঁচের টুকরো আর নয় রোদ পড়ে। এখানেযেন ঢেউ আর গতিটাই তার আসল কথা। তা হলেও সাঁতার দিয়ে কোথাও নিশ্চয় পৌঁছানো যাবে। কিন্তু.....

একটু নার্ভাসভাবে হেসেছিলো শ্রীলতা।

নদীতে সত্যি পয়েন্ট অব নো রিটার্ন থাকে না। কিন্তু তুমি বলতে পারো না, কখন ঝড় উঠবে, অন্তত ঝড়ের মতো বাতাস। তুমি বলতে পারো না, নদীর স্রোতের সেই ঢেউগুলোই বাতাসকে তেমন কাছে টেনে আনে কিনা, যেন নিজের বুকে, কিংবা বাতাসটা তেমন বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে তেমন পাগলামি করতে থাকে বলেই নদীতে তেমন ঢেউ উঠে পড়ে।

নীল দ্বীপটাকে ছাড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা উল্টে গিয়েছিলো। আগ-গলুইটা যেন বিপদ ঘটালে আটকে গিয়ে কিছুতে। তখন কিন্তু ভয় করার মতো অবসর থাকে না। জ্যাবরানো জড়ানো অনুভূতিগুলো বরং মনে থেকে যায়। জলের শব্দ, দ্রুত চোখের সামনে আলোর রং বদলে যাওয়া, কানে শব্দের চাপ। তলিয়ে যাওয়ার অনুভূতি। পাশে আর একটা ঝপাং শব্দ।

তারপর মাথা তুলেছিলো শ্রীলতা। একটু ব্যথা লেখে থাকবে। কিন্তু কাশতে কাশতে জল ঝেড়ে ফেলতে মাথা ঝাঁকিয়ে সে হেসে ফেললে। জল সেখানে বড়জোর উরু পর্যন্ত ছোঁয়।

সুব্রতবাবু কথা বলতে গিয়ে কাশলো নৌকাটাই বরং তলিয়ে দূরে দূরে করে কোথায় চলে গেলো।

খানিকটা দূরে গিয়ে তারা পায়ের তলায় শুকনো বালি পেয়েছিলো।

তাকে অবশ্য ঝড় বলে না। জোর বাতাস। আকাশ কালো হয়নি। বরং সেই বেলা নটায় দ্বীপের উপরে আকাশ উজ্জ্বল নীল। কিছু ভাঙে নি। কিছু কি হারিয়েছে?

সুব্রতবাবু হেসে বললে, বন্দুকটা আর নৌকাটা গেলো।

বাতাসটাতখন জোরে থাকবে, যখন মধুমালা দিদির জন্য কেনা কিন্তু ব্যবহার না করা স্নানের জামা যখন পরেছিলো শ্রীলতা।

সুব্রতবাবু হেসে বললে, এখানে রোদ থাকলেও বাতাসটা জলো, কারণ বালি ভিজে। চলো শুকনো জায়গায় যাই।

পিঠে হাত রেখে আবার হেসেছিলো সুব্রতবাবু।

হয়তো দ্বীপের বালি উড়ে তেমন হচ্ছিলো। একটা সাদা যেন সাত-আট ফুট উঁচু, পর্দাই যেন, জলের বুকের উপর দিয়ে, যেন তা কুয়াশা, যার ওপারে বাংলোর লন, বাগান সব আড়াল হয়ে গিয়েছে।

গোল নীল একটা দ্বীপ যার উপরে চকচকে নীল আকাশ, আর পায়ের তলায় ক্রমশ শুকিয়ে আসা বালি। যেন টেবিলে রাখা গ্লাস বল। যেখানে যে বলের মধ্যে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

শীত শীত করছিলো। তা স্বাভাবিকই। সেটা শীতকাল তো। জলে পড়ার আগেও তো সাঁতরে সাঁতারের পোশাক ভিজেছিলো।

সুব্রতবাবু বললে, আমার এই তোয়ালেটা নাও। গা মুছে ফেলো।

শুকনো বালির উপরে পাশাপাশি বসেছিলো তারা। চারিদিকে বালি উড়ে উড়ে যেন কুয়াশার পর্দা।

সুব্রতবাবু বললে, তোয়ালেটা পরে ওগুলোকে বরং শুকিয়ে নাও। সুব্রত বাবুর শুকিয়ে ওঠা পিতল-হলুদ শরীর, যা হাল্কা, যাতে কিছু পেশীর উঁচুনিচু ছিলো, চোখে পড়ছিলো শ্রীলতার।

শীত শীত লাগছিলো তা মিথ্যে নয়। শ্রীলতা বলেছিলেন, শীত শীত লাগছে।.....শিউরে শিউরে উঠছিলো শরীর।

আর তারপর তারা একটা পরিচ্ছন্ন ছোট বালিআড়ির শুকনো কবোষ্ণ ঢালে শুয়ে থেকেছিলো। কবোষ্ণ শীতের রোদ। পাশে রাখা স্নানের পোশাক শুকিয়ে উঠছিলো।

না, দ্বিতীয়বারে কিন্তু তেমন মনে হয় না, যে এক ঘনিয়ে আসা ম্লান অন্ধকারে এক পিরামিডের উপরে তুমি পড়ে আছ। কারণ পাশে দু কনুই নিজের শরীরের ভার রেখে পিঠে রোদ নিয়ে সুব্রতবাবু।

আয়নার দিকে মুখ ফিরালো শ্রীলতা। সে কি কিছু ভাববে?

ঝড় নয় ঠিক। বরং বাতাসে বালি উড়িয়ে একটা কুয়াশার কবোষ্ণ ঘের। যা উজ্জ্বল, সাদা, কিন্তু ভিতরে তোমারা একা, ওপারের কোন দ্বীপের কিছু দেখা যায় না।.....

কিন্তু এটা তো হোটেল। আর সেটা তখন ছিলো হোটেলের পোর্টিকো মার্কা লাউঞ্জ, শ্রীলতার বাংলো নয় যার লনে ছেলেরা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে আয়ার সঙ্গে হাত-পা ধুতে গেলে ক্লান্ত শ্রীলতা হয় গরম ঘাসে কিংবা বাগানের বেড়ের চেয়ারে বসবে।

তা ছাড়া টুটুল নতুন ব্যাট পেয়েছে দোতালায় উঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে দুভাই-ই ফিরে এলো আঙ্কেকে নিয়ে।

কোথায় খেলবি?

টুটুল দোতালার জানলা থেকে হোটেলের পশ্চিম দিকে একটা ছোট লন দেখতে পেয়েছে। আয়াকে বললে শ্রীলতা, তুমি একটু সঙ্গে থেকো। দেখো জানলার কাঁচ-টাচ না ভাঙে।....

পুরুষরা কিন্তু ভয় পায়, যেন কাঁচের পুতুলের হাত-পা কিছু ভেঙে ফেলেছে। অনেক পরে, তখন সুব্রতবাবু ভাবতে শুরু করেছে কি করে ফেরা হবে, তখন তখন প্রায় বিকেল হতে চলেছে, অনেক মানুষের গলার শব্দ, মোটর বোটের শব্দ শোনা গিয়েছিলো সেই কুয়াশা ভেদ করে।

সব চাইতে আগে নেমেছিলো মধুমালা দিদি।

একজন বললে বন্দুকের শব্দ করলে না কেন? নৌকো ডুবলো যখন?

অন্য একজন বললে, হাঁস মারতে মারতে গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিলো।

সুব্রতবাবু বললে, তোমার কিছু অসুবিধা হয়নি তো, মধুমালা?

এখন দেখছি হবে, মধুমালা হাসলো, রাত্রির ভোজের মাংসওয়ালাকে বলে দিয়েছি এত হাঁস আসছে যে, মুরগী-টুরগী দরকার হবে না। নৌকো ডুবলো কি করে?

যেতে যেতে আঙ্কে শ্রীলতার পাশে থেকে দাঁড়ালো। বললে, লতাদিদিমণি, ইনি আমদের চন্দননগরের জামাইবাবু নয়?

ওমা? সে কি? ইনি তো কমরেড ঘোষ। আজই তো প্রথম দেখছিস এঁকে।

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশীনম্বর তুলতে অদ্বিতীয় অভিনব এক বই।

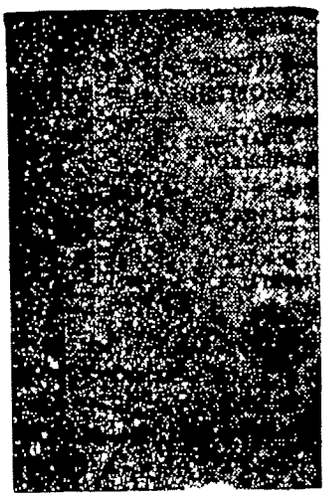

AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE QUESTIONS FOR
MADHYAMIK PARIKSHA
1978 & 1979

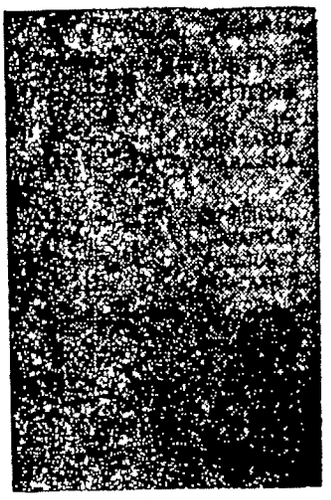

এ বই কিনলে
TEST PAPERS
কেনার আর দরকার হয় না
Price : Rs. 15/- only

B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE,
CALCUTTA-9
Phone 34-7328

আঙ্গি বিব্রত হয়ে টুটুলমিটুনের সঙ্গে চলে গেলো।

আর শ্রীলতা বললে, সুব্রতবাবু, মধুমালাদিদির সেবার কি ছেলে হয়েছিলো, না মেয়ে? অনেকদিন সংবাদ রাখা হয় না।

—মেয়ে।

—নিশ্চয় দিদির মতো হয়েছে। কি নাম রেখেছেন?

—শ্রীলতা।

—ওমা! সে কি!

বিব্রত হয়ে যেন চোখ নামালো সুব্রতবাবু।

দুহাত থেকে উল কাঁটা নামিয়ে দু হাতের আঙুলগুলোকে একত্র করে ফোটালো শ্রীলতা। মাথার কিছু উপরে হাত তুলে আলসেমি দূর করলে। আয়নায় নিজেকে দেখে যেন বিস্মিত হলো।

পরের দিনও উৎসব ছিলো। রাতের খাওয়া শেষ হলে কাছের অতিথিরা চলে গেলে, আর দূরের যারা, তারা যখন নিজেদের ঘরের দিকে একে একে যেতে শুরু করেছে, হাঁই তুলে তুলে, শ্রীলতা বলছিলো, আমিও একটু ঘুরে আসি না কেন বাড়ি থেকে?

—তুই যে ক'দিন থাকবি বলেছিলি। বললে মধুমালা।

—কাল সকালের দিকে ফিরবো।

—এত রাতে যাবি কি করে?

ওদের হাসাহাসির মধ্যে শ্রীলতা একা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিলো। নিজেদের বাংলোর হাতায় ঢুকে খুব জোরে জোরে ইলেকট্রিক হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি যখন পার্ক করলো, রাত দুটো বাজে।

দরোয়ান দরজা খুলে অবাক। দোতলার ল্যাণ্ডিং-এ শ্রীযুত মিত্র অবাক।

....শ্রীলতা হাসলো আবার উল হাতে নিয়ে।....

শ্রীলতা বলেছিলো, রসো, স্নান করে আসি।

মিত্র বললে, ওরা কোথায়, টুটুল, আসা...

—এমন করে এলে যে একা?

—আহাআ!

অনেক গরম জল আর সাবান দিয়ে যেন পথের ধুলো থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীলতা ঘরে গিয়েছিলো।

মিত্র গম্ভীর মুখে বলেছিলো, অন্যের বিয়ের উৎসবে মেয়েদের কিন্তু নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

—ভারি জানো।

ক্ষতিপূরণ.....

স্বামীর বুকের সঙ্গে আদরে গলে যেতে যেতে শ্রীলতা বলেছিলো, আমাকে কিন্তু একটা জিনিস দিতে হবে।

—কি এমন?

—আহাআ! শোন কাল সকালে আমাকে দু হাজার ক্যাশ দিওতো। একটা নৌকো হারিয়েছি, একটা শট্‌গান।

শ্রীলতা হেসে হেসে নৌকো ডুবি আর বন্দুক হারানোর গল্পটা করেছিলো। জেলেটির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আর বন্দুক মধুমালাদিদির পাশের বাড়ির ওদের।

মিত্র বলেছিলো, তাও ভালো। আমি ভাবি টুটুলের বয়স তো সবে এক বছর, এখনই....

সেদিন শ্রীলতার পরনে ছিলো সোনালি হলুদ শিফন। আজ, বিকেলে কেন সকাল থেকেই সুব্রতবাবুর পরনে কেরম-হলুদ ফ্ল্যানেলের জামা ছিলো। আর, একজন কিন্তু সত্যি ভাবেনি, কমরেড ঘোষ সুব্রতবাবুই যখন প্রথম শুনেছিলো একজন কমরেড আসছে।

শ্রীলতা বললে, আপনি অধ্যাপক ছিলেন তখন সুব্রতবাবু।

—এখনও।

—এরা বলছে কমরেড।

—টেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করতে ভালো লাগে।

চা শেষ হয়েছিলো তখন।

শ্রীলতা বললে, হঠাৎ তার হাসি পেয়েছিলো যেন তারপর যেন তার বুদ্ধির বাইরে গেলো ট্রেড ইউনিয়ান আর একটা ফার্মের প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি অবস্থানের ব্যাপারটা।

—কিন্তু আপনি কি মালিকদের একজনকে শুভযাত্রা জানাতে আসেনি?

সুব্রতবাবু হেসে বলেছিলো, কোম্পানির লাভে ট্রেড ইউনিয়ানেরও লাভ। মিস্টার মিটারের সঙ্গে আলাপও করা বটে। আমাদের এর আগে দেখা হয়নি তো।

—ওরা যদি বলে কমরেড ঘোষ মালিককে খোসামোদ করছিলো? শ্রীলতা হেসেছিলো।

—মিথ্যা বলবে না। ওঁর কোম্পানিতে যে রিঅ্যাকশনারী পার্টির ইউনিয়ান পাকাপাকি হয়ে বসেছে তাকে সরাতে গেলে আমাদের মালিকের সঙ্গে খাতির রাখতে হবে। মালিকের সঙ্গে সহযোগিতা করবো বলেই আমি এসেছি।

দুজনেই হেসে উঠেছিলো।

কি যে তাড়াতাড়ি ঘটে।....

তুমি কি সুব্রতবাবুর রাজনৈতিক [illegible] ছেলে-

অসপৃশ্য পায়খানা!

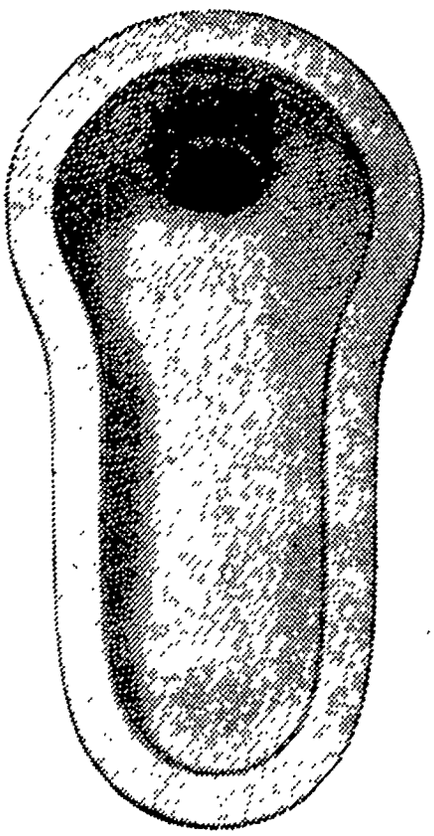

ভারতে কথাটা বলতেও ঘেন্না! কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক তাঁদের পায়খানা সত্যিই দারুণ অপরিষ্কার রাখেন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবচেয়ে কম নজর শুধু ওই পায়খানার বেলায়। ভাবটা—না দেখলেই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মাথা ঘামবে কারণগুলো দেখলে:

ময়লা পায়খানা শুধু দেখতে বিশ্রী আর দুর্গন্ধময় তাই নয়—তা যেমন অস্বাস্থ্যকর আর স্বাস্থ্যবিধির প্রতিকূল তেমনি দারুণ বিপজ্জনক।

এটাই হল সরল সত্য কথা। একটুও কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। তাহলে আপনার নিজের মনকেই জিগ্‌গেস করুন তো…

আপনার পায়খানা আপনি যেমন পরিষ্কার চান সেই রকম কি?

উত্তরটা ভাল ক'রে জেনে রাখা দরকার একজনাব—আপনার।

রোজ সকালে পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখলেও সে কি ঠিক মত কাজ করছে, না নম-নম ক'রে কাজ সেরে পালাচ্ছে? উত্তরটা আপনার যদি খারাপ লাগে একটা জিনিসের বিষয় জেনে রাখলে আপনি সুখী হবেন…স্যানিফ্রেশ।

স্যানিফ্রেশ জিনিসটা কি?

স্যানিফ্রেশ হল পায়খানা পরিষ্কার করার পদার্থ যা সব ময়লা সাফ ক'রে পায়খানা ঝকঝকে রাখে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার পাত্রের মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা তাকে কাজ করতে দিন। আরও ভাল হয় যদি একরাত অবধি রেখে দেন। তারপর আবার জল ঢেলে দিন। তাতে যদি ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না দেখেন, তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। বস্! আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখার সব ঝামেলা দূর।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে

১. স্যানিফ্রেশ পুরোপুরি পরিষ্কার করে।

এতে রয়েছে অত্যন্ত কার্যকর পরিষ্কার করার পদার্থ যা দারুণ শক্ত দাগও উঠিয়ে দেয়। যাক যেখানে পৌঁছয় না সেখানেও স্যানিফ্রেশ কাজ করে।

২. স্যানিফ্রেশ বিপজ্জনক রোগজীবাণু বিনাশ করে।

পায়খানায় রোগজীবাণু জন্মাতে পারে। তাতে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা খুব বেশী। যে কাজ সাধারণ 'ফিনাইল' করতে পারে না সে কাজ স্যানিফ্রেশ করে—আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই আপনার পায়খানা যে একেবারে নিরাপদ সেবিষয়ে আপনি একদম নিশ্চিন্ত।

৩. স্যানিফ্রেশ বিরক্তিকর দুর্গন্ধ দূর করে

কখন কখন পায়খানার দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ। পায়খানার হাওয়াবাতাস খেলার পথ না থাকলে দুর্গন্ধ আটক থাকে আর তখন যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া! স্যানিফ্রেশে এমন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ আছে যা সব বদগন্ধ দূর ক'রে বাতাস নির্মল ক'রে তোলে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার? পায়খানা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রত্যেক দিন।

নকল হইতে সাবধান!
প্যাকের ওপর
স্যানিফ্রেশ
নাম দেখে নিন:
এ হলো— বালসারার
সেরা কোয়ালিটির গ্যারান্টী

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ
৩৩ ক্যাথিড্রাল মাঙ্কার রোড বোম্বাই ৪০০ ০২৩।

CHAITRA-BLS-82-BEN REV

মানুষি নয়? কি জানি এতে হয়েতো কাজ হয়। হয়তো মালিকপক্ষও একে প্রশ্রয় দেয়। পুরুষদের রাজ্যের সংবাদ নাকি এটা, পুরুষালি ব্যাপার?

কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ছেলেদের নিয়ে আই ফিরলো। আর সোফারও। কথা ছিলো বেলা চারটেতে ফেরা হবে। তখন থেকে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে সোফার। এখন তো প্রায় পাঁচটা হয়। সন্ধ্যা ঘোর হওয়ার আগেই পৌঁছে যাওয়া যায় এখনও রওনা হলে।

চারটেতে ফেরার কথা এখন সে সময়টা পার করে দিয়েছে শ্রীলতা। যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো শ্রীলতা। সোফার, আই, টুটুল-মিটুন, সুব্রতবাবু সবাই সবাই যেন সিদ্ধান্তের জন্য চেয়ে আছে শ্রীলতার দিকে। এই সময়েই ফেরার কথা। সিদ্ধান্ত তো আগেই নেয়া আছে।

অবশেষে শ্রীলতা বলেছিলো, আই যাবে ফিরে টুটুল-মিটুনকে নিয়ে। টুটুল বলেছিলো, তুমি থাকবে, মা, এখানে একা?

আর সেজন্যেই যেন সিদ্ধান্ত পাল্টে নিয়ে সোফারের সঙ্গে আয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীলতা।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপের উপরে দাঁড়িয়ে টুটুল-মিটুন আয়ার যাওয়া দেখলে।

সুব্রতবাবু বললে, বেশ ছেলেরা তোমার। টুটুল তো একেবারে মিস্টার মিটার যেন।

—মিটুনও আমার কম নয়। জ্বর হচ্ছে এবার।

—হ্যাঁ, মিটুনও ভালো।

বয়সের কথা যদি বলো, টুটুলের আট হলো। মিস্টার মিটারের ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। শ্রীলতার আটাশ। সেদিক দিয়ে সুব্রতবাবুই সবচাইতে অভিজ্ঞ। হয়তো পঁয়তাল্লিশ। কানের কাছে চুলে যেন মরচে রং কিছু। চোখের কোণ কিছু কোঁচকানো। কিন্তু চক্‌চকে চোখ। কেয়ম-হলুদ জামা, আর রোদে-পোড়া পিতল রং-এর মুখ। মনে হয় না—বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আর রঙের কথা যদি বলো, টুটুল বরং শ্যামল। আর মিটুন সোনালি।

তখন শ্রীলতা উঠে দাঁড়িয়েছিলো। দোতলায় তার স্যুইটের দিকে যেতে যেতে লাউঞ্জ পার হতে হতে হেড-ওয়েটারকে পেয়ে বলেছিলো, সাত নম্বরে আজ চারটে ডিনার। দুটো সাতটাতেই। হলে। আর দুটো ঘরে আটটার পরে, কিংবা খবর দেবো যখন।

মায়ের ভুল ধরে হেসে টুটুল বলেছিলো, আমরা তো আজ লোক তিনজন। চারটে বললে কেন? বাবা ডুবাইতে এতক্ষণে।

হেসে সুব্রতবাবু বললে, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তোমার শ্রীলতা।

হেসেছিলো শ্রীলতা। বলেছিলো, ডিনার আটটায়।

এখন নটা হতে যায়।

ডান হাতের পিঠে ঠোঁট আড়াল করে হাই তুললো শ্রীলতা।

টুটুল-মিটুন এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ স্বাস্থ্য ভালোই ওদের। ভালো রাখতে পেরেছে শ্রীলতা। গড়ন আলাদা হয়, মিটুন হয়তো বড় হলেও ছিপ্‌ছিপে হবে। কিন্তু স্বাস্থ্য নিশ্চয় ভালো রাখতে পারবে।

সাতটাতে ঠিক সাতটাতে, চিরদিন যেমন, হলে বসে ছেলেদের ডিনার খাইয়েছে শ্রীলতা। তার বাড়িতেই তাই নিয়ম। একসঙ্গে খেলে ছেলেদের দিক চোখ রাখা যায় না। পেট ভরে না, কিংবা বাজে জিনিসে ভরায়।

আর তারপরে ওরা যখন খাচ্ছে, শ্রীলতা আজ উঠে পড়েছিলো। বলেছিলো, তোরা খেয়ে আয়। একা একা সিঁড়ি চিনে উঠবি। সে বেশ মজা হবে।

আর শ্রীলতা ঘরে এসে স্নান করে নিয়েছিলো, শাড়ি পালটেছিলো। অলংকারে রদবদল করতে শুরু করেছিলো।

তারপর দুই ছেলের খাটের মাঝখানে চেয়ারে বসে গল্প বলতে শুরু করেছিলো। তার বাড়িতেও তাই নিয়ম। তাতে ছেলেদের ঘুম ভালো হয়।

তখন টুটুল জিজ্ঞাসা করেছিলো, শ্রীলতা সিনেমায় যাবে কিনা।

শ্রীলতা গল্প বলেছিলো। সে-সব গল্পই হয় রামায়ন-মহাভারতের, কখনও একটু ঘুরিয়ে রূপকথার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিয়ে।

শ্রীলতা বলেছিলো: এক রানী একদিন দেখলে তার বড় ছেলেটা বড্ড একা একা। সে তখন ভগবানকে কত বললে, ঠাকুর আমার সোনার টুটুলের একটা ভাই এনে দাও, বন্ধু এনে দাও।

টুটুল বললে, এ তোমার রাম-লক্ষ্মণের গল্প।

—ওমা তাই।

মিটুন বললে, আমি লক্ষ্মণ।

টুটুল বললে, তার চাইতে রানী যদি মন্তর জানতো আর যদি অর্জুনের মতো একটা ছেলে হতো ভালো হতো। জানো মা, এঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলে আমাকে বলে আমি কোনদিনই ভালো তীরন্দাজ হবো না। যদি আমাকে অর্জুনের মতো ভাই দিতে, সে যদি উড়ন্ত হাঁস মারতে পারতো, রবিন হুডের মতো, তাহলে মন্টু খুব জব্দ হয়।

—ওমা, তাই? একদিন তো রানী এক সন্নেসীকে পেলো। অনেক ক'রে বললে তাকে আমার বড়ছেলেকে একটা বন্ধু দাও, ভাই দাও। সন্নেসী কোমর থেকে একটা শিকড় দিয়ে বললে স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে খেয়ে নিস।

টুটুল বললে, আমি কিন্তু বড় হলে লড়গট্ হবো।

—সে কি?

—সেনাপতি।

—না, তুই হবি একজন মস্তবড় এঞ্জিনীয়ার।

—বাবার মতো?

—হ্যাঁ। তুই সাবমেরিণ তৈরি করবি, জাহাজ তৈরি করবি। মিটুন জামা খুলেছিস কেন?

মিটুন বললে, আমি কি হবো মা?

হাসলো শ্রীলতা। তুই একটা নাগা সন্নেসী হবি।

তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

আর কি উল বুনবে শ্রীলতা? রাত বেড়েছে। এখন বরং শীত শীতই লাগছে। এদিক-ওদিক চাইলো সে। হাসলো না একে কি তুমি কোনভাবেই নীল বলতে পারো? যেন অভিজ্ঞতার রং সাদা বাদামীতে মেশানো।

সেই নৌকাটার সেই বিছানার চাদরের মতো ছোট পালটা কিন্তু ছিলো যেন গেরিমাটিতে রঙনো। যাকে গৈরিক বলে।

শ্রীলতা ঘড়ির দিকে চাইলো। নটা বাজে। একেবারে অবাক হ'য়ে গেলো যেন সে। পর্দা ফেলা থাকলেও দরজা তো খোলাই আছে। সে কি একবার উঠে দেখবে?

তুমি এখন হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হ'য়ে যাবে? এসব কি কাণ্ড? এই রাত জেগে বসে থাকা?

এখন সকাল হয়েছে। সকাল ক'রেই উঠেছে শ্রীলতা। এখন অনেক কাজ তার। একদিনের জন্য আসা তবু দুটো সুটকেশ এনেছে। তা থেকে যা বেরিয়েছে তা আবার ভরে নিতে হবে। গাড়িটার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলে দুটোকে সাজিয়ে নিতে হবে। ব্রেকফাস্ট করেই রওনা হবে তারা। কাল বিকেলেই তো ফেরার কথা ছিলো।

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রজকিশোর দত্তের

অ থেকে বিসর্গ

এই লেখকের পরের বই

সরমা ও আমি—উপন্যাস

টিকলু—হাসির গল্প

এ নহে গল্প—গল্পগুচ্ছ

ইণ্ডিয়ান বুক আর্ট

১২।১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

নাথ ব্রাদার্স ও হিন্দুস্থান লাইব্রেরী

কলিকাতা-১২

টুটুলের ব্রাশে পেস্ট দিয়ে, মিটুনের ব্রাশ নিজে নিয়ে মিটুনের দাঁত মাজতে বসেছে সে বাথরুমের দরজার কাছে। মিটুন মিষ্টিমিষ্টি পেস্ট খেয়ে ফেলে, নয় মোটেই মুখে দেয় না ব্রাশ। টুটুল ব্রাশ নিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে পায়চারি করে আর দাঁত মাজে। কি ক'রে যে ছেলেরা যার যার বাবাকে নকল করে। আশ্চর্য নয়?

কাল রাতে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে প্রথমে বারান্দায়, পরে ল্যান্ডিং-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো শ্রীলতা। তখনও হোটেলে অনেক আলো ছিলো। কিন্তু আলোটাকে হলদে আর বাসী মনে হয়েছিলো। রাত ন'টা, তবু যেন ক্লান্ত রাতজাগা আলো।

সে বরং শুতে গিয়েছিলো।

টুটুল বেশ ভালো ঘুমাচ্ছে। যেভাবে ঘুমায়। ডানপাশ ফিরে ডানহাত তুলে বাঁ কাঁধের উপরে রেখে। ঠিক যেন, হেসেছিলো শ্রীলতা, গমলিং মিটারের প্রেসিডেন্ট, শুধু ঠোঁট দুটো এখনও লাল।

কিন্তু—

ভয় পেয়ে গিয়েছিলো মৃদুভাবে শ্রীলতা। মিটুনের বিছানায় সে তো নেই। খুঁজতে বেশী হয়নি। অন্য শোবার ঘরটিতে ঢুকে শ্রীলতা দেখেছিলো মিটুন মায়ের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, একেবারে নাগা সন্নেসী। আচ্ছা—সত্যি কি ও কখনও একা একা বোধ করে? তা কি সম্ভব? ঝগড়া করে না কিন্তু যেন পৃথক হয়ে থাকতে চায় আর সকলের থেকে। কিন্তু তা কি সম্ভব? হঠাৎ নিজের শোবার ঘরেই টুটুলের পাশে তার থেকে পৃথক মনে হয়েছে নিজেকে? নাকি ভয় পেয়েছিলো? তাই মায়ের বিছানায়?

ইস্। কি ঠান্ডা। এই শীতে যেন বরফে স্নান করে উঠেছে। দেরি করতে পারলো না শ্রীলতা। তাড়াতাড়ি মিটুনের পাশে শুয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে, যেন নিজের গায়ের উত্তাপ দিয়ে তার গা গরম করে তুলবে।

টুটুল দাঁত ব্রাশ করতে করতে পায়চারি করছিলো। সে তাড়াতাড়ি এসে বললে দেখো কান্ডা ফ্ল্যাটের দরজা খোলা? কে খুললো? সারারাত খোলা ছিলো নাকি?

—ওমা! তাই?

তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়ে দিলো মিটুনের শ্রীলতা। টুটুলকে বললে তাড়াতাড়ি স্নান করে নে। ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছা।

মিটুনের মুখ মুছে দিলো শ্রীলতা। তার লাল গোলাপের মতো ঠোঁট ভাঙচুর হ'লো। তার তা দেখে সেখানে চুমু খেলো শ্রীলতা।

টুটুল বললে, মা, আমি কিন্তু কোনদিন একটা পাইনে ওখানে।

শ্রীলতা হেসে বললে, আয়, আজ স্নান করি। ব্রেকফাস্টের আগেই গাড়ির দোকানকে টেলিফোন করতে হবে।

তিনজনে স্নান করতে সুরু করলে তারা। তত গরম নয় জল। ঠান্ডাই। শীত শীত ক'রে। শ্রীলতা বললে, সাহস করো। সেও সাহস ক'রে প্রচুর সাবান দিয়ে অনেক ঠান্ডা জল ঢেলে স্নান করতে শুরু করলো। টুটুল মিটুনও কম যায় না। মিটুন তো টবে কাঁপিয়ে পড়লো।

মিটুন ভিজে শাড়ীর আড়ে মায়ের বুক দেখতে পেয়েছিলো। ছুটে এসে কোলে বসে মুখ লাগালো।

শ্রীলতা বললে, ছাড়, ছাড়, দস্যি, নাগা কোথাকার।

টুটুল বললে, তুই আর বড় হবি না, মিটু।

তিনজনে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলো তারা।

আয়, আর, জামা পর। কোনটা পরবি রে? টুটুল তুই এই ইস্প্রাতনীল

স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ে
সবচেয়ে বেশী লাভের উপায়!
ইউবিআই রি-ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান

১০০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট আপনি কিনতে পারেন। টাকাটা অবশ্য ১০০-এর গুণিতকে হওয়া চাই। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, ৬২ ও ৭৩ মাসের মেয়াদে পাওয়া যায়। এই সার্টিফিকেট থেকে আপনি স্বল্পমেয়াদে সবচেয়ে বেশী লাভ পাবেন। ৭৩ মাসের মেয়াদ শেষে ১০০০ টাকার একটা সার্টিফিকেট থেকে আপনি পাবেন ১৮৩৩'০০ টাকা—অর্থাৎ, লাভ হচ্ছে ৮৩৩'০০ টাকা।

- ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থা, সমিতি, ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কেনা যায়। নাবালকের নামেও কেনা যায়।
- আয়কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজন হলে, সুদের আয় বাবদ বার্ষিক সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।
- সার্টিফিকেটের দামের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়।

সুবিধেমতো টাকার অঙ্ক ও সঞ্চয়ের মেয়াদ বেছে নিয়ে ইউবিআই-এর রি-ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট কিনুন।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBIPUB 377 B R

স্যুটটা নে। মিটুন বললে, সোনাবটা পরবো।

—আচ্ছা বোকা, ওটা কি সোনা? উলের? হাত দিয়ে দেখ। আর রং কেমন ইয়লো। জরদা, তাই নয় মা? টুটুল বললে।

পর, পর, আমার শীত গেলে গেলো। শ্রীলতা বললে আবার হেসে। ছেলেদের জামা পরিয়ে (ইস্পাতনীলে টুটুল, মিটুন কেমনইয়লো জ্যাকেট), টেলিফোন করলে গাড়ির দোকানে শ্রীলতা।

না, তাদের কোন আপত্তি নেই। ন'টায় গাড়ি পৌঁছে দেবে হোটেলে।

সাড়ে আটটেই ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে। ন'টাতে গাড়ি এলো। হোটেলের জন্য একটা আর গাড়ির জন্য একটা দুটো চেক্ সই করলো শ্রীলতা। এটা তাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। তা, এটার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক চেক্ অবশ্যই সই করতে হয় গমলিং মিটারের প্রেসিডেন্ট মিস্টার মিটারকে। এটা যে বিশেষ কি অ্যাকাউন্ট তা বর্ণনায় ধরা পড়ে না। সব খরচই তো দুজনের। তা হলেও এটা পৃথক। বলবে কি খেলার? অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য দেখো। এটায় মিস্টার মিটারের সই পরিষ্কার বাংলা হবে, শুভব্রত মিত্র। প্রত্যেকটা অক্ষর যেন, স্নিগ্ধ, স্পষ্ট, যেন খেলার হাসিতে ভরা। সেই সই-এর তলে তলে নিজের নাম সই করলে শ্রীলতা। যেন যৌথ জীবনের প্রমাণ। আর কত স্নিগ্ধ।

লাল টক্‌টকে সিঁদুর রঙের ছোট্ট গাড়ি। যেন লনে টুটুল মিটুনও অনায়াসে চালাতে পারবে বলেই কেনা। খেলনা বললে হেসো না।

পিছনের সিটে দু'ভাই, পাশাপাশি শ্রীলতা চালাচ্ছে।

তা, এ ভাবেই তো দু'ভাইয়ে সারা-জীবন পাশাপাশি থাকতে হবে। হ্যাঁ, তাদের সম্বন্ধে পরিকল্পনা আছে শ্রীলতার।

শ্রীলতা খুব উচ্চাভিলাষী তার ছেলেদের সম্বন্ধে। দোষ কি তাতে। তার মনের নিভৃতে, যেন তা এক নীল নীল দ্বীপই, যেখানে সে তাদের লালন ক'রে কেউই তার খবর পেতে পারে না। সুতরাং কেউ তাকে ঠাট্টাও করতে পারবে না।

ইস্পাতনীল স্যুটে সুন্দর দেখাচ্ছে টুটুলকে। সে এঞ্জিনীয়ারই হবে। তার বাবার চাইতেও বড়। এমন এক এঞ্জি-নীয়ার, যে দেশের জন্য নতুন সাবমেরিণ, নতুন ফাইটার তৈরি করে দেবে।

কাউকে কাউকে কিন্তু হলুদ হলুদ, কেমন-ইওলোই বলো, জামায় বেশ দেখায়। তা লাগে কেন? সন্ন্যাসীরা কি সে ধরনের রঙের জামা পরে ব'লে?

নৌকোর সেই পালটার রং ছিলো কিন্তু গেরুয়া, গৈরিকই বলতে পারো। আবার দেখতে পেলো মিটুনকে সে গাড়ি চালানোর আয়নায়। কেমন-ইওলো (নাকি পীত?) জ্যাকেটে, যেন সূর্যমুখী ফুলের মতো।

মিটুন সম্বন্ধে সে এখনও কিছু ঠিক করেনি। সে কি ইন্ডাস্ট্রির প্রেসি-ডেন্ট হবে কিংবা অধ্যাপক, কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা? কেমন অবাক হয়ে দেখছে না? সে ভাবছে হয়তো এমন ভারি ভারি ট্রাক, লরি, বাস এ সবেরমধ্যে দিয়ে খেলনার মতো সিঁদুরে রঙের ছোট্ট পলকা গাড়িটাকে মা কেমন মসৃণ সহজ-ভাবে চালিয়ে নিতে পারে যখন চারিদিকে বিপদের মতো ধেয়ে আসে বড় বড় গাড়ি।

শ্রীলতা ভাবলো, তুমি বলতে পারো না। কেমন যেন একটু গোলমেলে, একটু অসাধারণই বলতে হবে। তেমন হলে সে পরে কি সন্ন্যাসী হতে? সন্ন্যাসীরা হলুদ পোশাকও পরে কখনও কখনও।

হয়তো সন্ন্যাসী হ'লেই তাকে মানায় সেই অসাধারণত্বের জন্যে। অসাধারণত্বই নাকি? হঠাৎ যেন জল এসে যেতে পারে শ্রীলতার চোখে। হয়তো তাই মানায়, সন্ন্যাসী হওয়াই মানায়। কোনদিনই অন্য কোন পুরুষের সাহায্য নিতে হয় না—আর তাই যেন ভালো। কিন্তু....তারা পৃথিবীর বুকের উপরে দিয়ে হেঁটে যায়, খুব নরম পায়ে সে চলা। আঘাত দিতে তো চায় না। কিন্তু তাতে কি লজ্জা সত্ত্বেও পৃথিবী বলে না তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না। ঠিক মায়ের মত? তবু সে চলে যেতে থাকে যেন এক সুনীল আকাশের খোঁজে। আর যেন তার চলে যাওয়া পৃথিবীকে বলতে থাকে তুমি পাপী। সকলকে জানিয়ে বলে না, ব্যথা দেবার জন্য বলে না, মনে করিয়ে দেয় শুধু, শুধু চলে গিয়ে! ....তাই যেন মানায় এসব বেলায়।

আর কত নীল, কত গভীর নীল হয় সেই সন্ন্যাসীর আকাশ। শ্রীলতা ভাবলে, না পৃথিবী, না মেয়েমানুষ, আমরা এই সন্ন্যাসীদের মনকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। কত নীল আর কোথায় সেই নীল আকাশ।

শ্রীলতা হাতের পিঠে চোখ ছুঁইয়ে নিয়ে ভাবলে এখনও কত ছোট মিটুন, কতটুকু দেখছো না? হলুদ জ্যাকেটের বড় বড় কলারের মধ্যে ওর মুখটা সূর্য-মুখীর মতোই দেখাচ্ছে। সে হাসলো।

ঠোঁটের কোলে প্রায় নিশব্দ শিষে একটা গানের কলি ফোটাতে ফোটাতে পটুহাতের স্টিয়ারিং-এ বিপদের মতো ধেয়ে আসা কালো, ধূসর ট্রাক, লরি।

বাসের মধ্যে দিয়ে সহজ মসৃণ গতিতে লাল খেলনার মতো নতুন গাড়িটাকে চালাতে লাগলো শ্রীলতা হাসি হাসি মুখে পথের নিরাপদ গলিঘুঁজোকে চক্‌চকে চোখে খুঁজে খুঁজে।

একটি ত্রিপদী সাহিত্য পত্র

॥গোধূলি-মন॥ শারদ সংখ্যা ০ ১৩৮৪

০ চারটি মননশীল প্রবন্ধ ॥ প্রাগৈতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিককালের বঙ্গীয় সভ্যতা। বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ০ চন্দননগর করপোরেশনের জন্মলগ্ন ॥ সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ০ দাদাইজম থেকে স্যুররেয়ালিজম ॥ আবু সঈদ ০ আধুনিক ওড়িয়া নাটক প্রসঙ্গে ॥ দিলীপ মিত্র

০ আধ ডজন ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প ॥ বোম্মানা বিশ্বনাথম্। দুলাল চট্টোপাধ্যায়। নব বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌর বৈরাগী। কৃষ্ণা বসু। অশোক চট্টোপাধ্যায়

০ সচিত্র ফিচার ॥ কুমোরপাড়ার ঘরসংসার ঃ মাটির ভাঁড়ের পেছনে। সমীরণ মুখোপাধ্যায়

০ একাংক নাটক ॥ সিসিফাস্। গোপাল দে

০ বেশ কিছু বাছাই কবিতা লিখেছেন ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণ ধর। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। গোপাল ভৌমিক। মতি মুখোপাধ্যায়। দেবী রায়। রবীন সুর। অরুন্ধতী সেনগুপ্ত। নয়ন রায়। বঙ্কিম চক্রবর্তী। অমল দাস। সমীর মণ্ডল। নিভা দে। সমীর মুখোপাধ্যায়। ভাস্কর দাশ গুপ্ত। উৎপল ত্রিবেদী। স্বিজেন আচার্য। সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি রায়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রণব বসুরায়। শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রণব মাইতি। অমরনাথ বসু। প্রফুল্ল অধিকারী। মবিনুল হক্। মলয়কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। শ্যামা দে, শংকর মিত্র, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল চক্রবর্তী। হিমানীশ গোস্বামী। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শম্ভু রক্ষিত। অমল দেব। সনৎ মান্না। বীরেন্দ্রকুমার দেব। ০ রঙিন উজ্জ্বল আর্টপেপারের প্রচ্ছদ ॥ তিনরঙা দুর্গার ছবি

হাওড়া স্টেশন/কলেজ স্ট্রীট ও অন্যান্য স্টলে ০ তিন টাকা (সডাক পাঁচ টাকা)

সম্পাদক ॥ অশোক চট্টোপাধ্যায় ০ নতুনপাড়া ॥ চন্দননগর ॥ হুগলী

বি/৩০৯০

প্রকাশিত হয়েছে

বর্তমান শতাব্দীর
এক মহীরুহের আত্মজীবনী
বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা

জীবন-কথা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বড়গল্প

অন্নদাশঙ্কর রায়ের **'আই, সি, এস'**
অমিতাভ চৌধুরীর **'কবি ও সন্ন্যাসী'**

শারদীয়া বসুমতী ১৩৮৪

গল্পের মত মনোরম

লীলা মজুমদারের **'মধ্যমণি'** ॥ জহুরী সওদাগরের **'আলি আকবর, স্বদেশে এবং বিদেশে'** ॥ অমিতাভ দাশগুপ্তের **'নও শুধু ছবি'** ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে।

বিষয়কর চারটি উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশু ঘোষ

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ/কবিতা

পিণ্ডারী দেখে এলাম
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ফিকে নিয়ে অজয় বসুর 'বাঙালী হৃদয়ে সোনালী স্মৃতি'

অভিনেত্রীকে নিয়ে
মধুসূদন মজুমদারের 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'

২টি বড় গল্প ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা সিংহ

হাসির বড় গল্প লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সুবর্ণ বসুমতী ১৩৮৪

দাম/১০ টাকা
সডাক/১২ টাকা

গল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী/মহাশ্বেতা দেবী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র/কণা বসু মিশ্র
সমরেশ মজুমদার/শৈবাল মিত্র
শচীন দাশ এবং অনেকে

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র/অরুণ মিত্র
দিনেশ দাশ/মনীশ ঘটক
অশোক বিজয় রাহা
হরপ্রসাদ মিত্র/মনীন্দ্র রায়
কৃষ্ণ ধর/রাম বসু/পরমানন্দ
সরস্বতী/কমলচন্দ্র ঘোষ
সুনীলকুমার নন্দী/গৌরাঙ্গ
ভৌমিক/আলোক সরকার/
শ্রীবন্দ্যু দাশগুপ্ত/পূর্ণেন্দু পত্রী
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত/মানস
রায়চৌধুরী/তারাপদ রায়
কাবিকল ইসলাম/সামসুল
হক/আনন্দ বাগচী
দেবারতি মিত্র/পবিত্র
মুখোপাধ্যায়/অমিতাভ
চক্রবর্তী এবং কয়েকজন

স্কেচ

সুনীলমাধব সেন
প্রকাশ কর্মকার/গণেশ পাত্র
রবীন মণ্ডল/বিকাশ
ভট্টাচার্য/ধীরাজ চৌধুরী
দিলীপ কুণ্ডু/মানু
রাঠোড়/শুভ্রপ্রসন্ন/দিলীপ
মুখোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা ও শ্রীগৌরাঙ্গের
রঙীন আর্টপ্লেট

বিদ্যাপতির পদাবলী

তারাপদ রায়

[মাধব করিঅ সুখুখি সমাধানে
তুএ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনী করএ কে আনে ।।
বিদ্যাপতি

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে
এত আর কে করিয়াছে ।
রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ]

।। ১ ।।

কাননে কাননে কুন্দ ফুল ।
পলটি পলটি তাহি ভমর ভুল ।।
পুনমতি তরুণী পিয়া সঙ্গ পাব ।
বরিসে বরিসে ঋতুরাজ আব ।।
রঅনি ছোটি হো দিবস বাঢ় ।
জনি কামদেব করবাল কাঁঢ় ।।
মলয়ানিল পিব জুবতি মান ।
বিরহিন-বেদন কেও ন জান ।।

বাগানে বাগানে ফুটেছে কুন্দফুল
ফিরে ফিরে তাই ভ্রমরের হয় ভুল ।
বছরে বছরে বসন্ত ফিরে আসে
ফেরে প্রিয়তম তার তরুণীর পাশে ।
রাত ছোট হয় দিনের সীমানা বাড়ে
মদন দেবতা ধার দেয় তলোয়ারে ।
বিরহ-বেদনা যুবতীর অভিমান
বসন্ত বায়ু নিঃশেষে করে পান ।।

।। ২ ।।

মুখ তোর পুনিমক চন্দা ।
অধর মধুরি ফুল গেল মকরন্দা ।।
অগে ধনি সুন্দরি রামা ।
রভসক অবসরক ভেলি হে বামা ।।
কোপে ন দেহে মধুপানে ।
জীবন জৌবন সপন সমানে ।।

তোমার মুখ পূর্ণিমার চাঁদ,
তোমার ঠোঁটে বাঁধুলি ফুলের মধু,
মিলনমেলায় যখনি অবসাদ
তখনই তুমি হে সুন্দরী বধূ,
ফেরালে মুখ ফেরালে মধু কিসের অভিমানে,
স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে গেলো জীবন এবং যৌবনের মানে ।।

॥ ৩ ॥

চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জ্ঞান ॥
হেরই সুধানিধি সুর।
নিসি বৈঠলি সুবদনী ঝুর ॥
হরি হরি দারুণ তোমারি সিনেহ।
তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ ॥
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাটিয়া হেরই তোহারি ॥
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত শরীর ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
দূতীক বচন লজা এল কান ॥

চন্দন যেন বিষ,
বাতাস যেন আগুনের শিষ।
যেন সূর্যের মত উষ্ণ চাঁদ
চোখের জলে সারারাত।
হরি হে দারুণ তোমার স্নেহ
জীবন থাকে কিনা সন্দেহ।
অভিভাবকদের কড়া নজর
তারই ফাঁকে অশ্রুর বহর।
বয়ে যায় নয়ন নীর
কত বেদনা সয় সেই শরীর।
দূতীর মুখে এই সব কথায়
কানাই কিছুটা লজ্জা পায়।
সেই কথা লিখেছেন নিজের ভাষায়
বিদ্যাপতি এবং পরে তারাপদ রায়।

॥ ৪ ॥

মন পরল ভেল পরদেশ নাহ।
দেখি নিসাকর তন উঠ দাহ ॥
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেশ কন্ত ॥
সুমরি সনেহ নহি ভাব।
দারুণ দাদুর কোকিল রাব ॥
সুমরি সুমরি খসু নীবিবন্ধ আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ ॥

প্রেমিক এখন অন্যকে ভালোবেসে
অন্যের বশে বিদেশে
তাই চাঁদ ওঠে দেহ জ্বলে যায়
দেহ ও হৃদয় জ্বলে পুড়ে যায়
মদনের বেদনায়।
কান্ত বিদেশে এ বেদনা তারই তরে,
শূন্য কুটিরে তারই কথা মনে পড়ে
কোকিলের গান নিদারুণ বাজে মনে
খুলে যায় নীবি পুরানো প্রেমের স্মরণে।

॥ ৫ ॥

গগন গরজি ঘন ঘোর।
হে সখি, কখন আওত পহু মোর ॥
উগলহি পাঁচোবান।
হে সখি, অব ন বচত মোর প্রাণ ॥
করব কওন পরকার।
হে সখি, জৌবন ভেল জিব কাল ॥
ভরহি বিদ্যাপতি ভান।
হে সখি, পুরুষ করহি পরমান ॥

গগনে মেঘের ঘন গর্জন
হে সখী, কখন আসবে আমার স্বামী
পঞ্চশরের এই যে দহন
হে সখী, এখন কিভাবে বাঁচবো আমি
কি করবো বলো এই যৌবন
হে সখী, এখন হয়েছে আমার বাধা
তারাপদ বলে, সুন্দরী শোনো বিদ্যাপতির বচন
পুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখো রাধা।

একালের দাসব্যবসা

উপলকুমার বসু

একদা দিল্লীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দুই বৃদ্ধ বাঙালী যাত্রীর মুখে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনি—

—কী সেন সাহেব? এবার চললেন কোথায়?

—আর বলেন কেন, ডাক এসেছে ছোটোমেয়ের কাছ থেকে। বেবি-সিটিং করতে ক্যালিফোর্নিয়া চলেছি। তা, আপনি এ পথে?

—আমারও ছেলেটি লন্ডনে ডাক্তারি করে—আগেরবার বলেছিলুম বোধহয়। ভাবছি বুড়ো বয়সে তার ওখানেই কিছুদিন কাটিয়ে আসি। বারবার লিখছে....এখানেই বা আমায় দেখাশোনার লোক কোথায়....

উক্ত আলোচনায় বাধা পড়ে কেননা এয়ার-ইন্ডিয়ার যাত্রীদের কাস্টমস চৌকি-এ যেতে অনুরোধ করা হয়। কালো কোট পরা, মাফলার জড়ানো ঐ দুটি শীর্ণ ও নির্ভেজাল বাঙালীকে আমি ধীরে ধীরে কাচের দেয়ালের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি। এঁদের কথাবার্তা এবং বেশভূষা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁরা অতি সাধারণ গৃহস্থ। হোমড়া-চোমড়া কেউকেটা নন। প্রসঙ্গে এঁরা হয়ত সাথী হবেন। কিন্তু মনের সন্দেহ কাটে না।

পঞ্চাশের দশক থেকে প্রচুর বাঙালী বিদেশে চলে যেতে থাকেন। যদিও এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান আমার জানা নেই তবু বলতে পারি আজ এমন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার দুর্লভ যাদের নিকটাত্মীয় কেউ না কেউ বিদেশে বসবাস করছেন না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারী বিদ্যার আকস্মিক প্রসার ঘটে বিধান রায়ের আমলে। হয়ত উক্ত দুই বৃদ্ধের ছেলেমেয়েরা সেই কালের প্রবাসী। তখন শিক্ষিত বেকারদের উপযুক্ত কর্ম-সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হয় না। বিদেশের মোহে এবং যোগ্য চাকরির আকর্ষণে, বছরের পর বছর, বহু যুবক, তাঁদের ঘরবাড়ি, প্রিয়-পরিজন পিছনে ফেলে, দেশত্যাগ করেন। একদা ছিল জলযাত্রা। আধুনিক কালে দ্রুতগামী জেটবিমান এঁদের যাতায়াত পৌঁছে দিয়েছে অদেখা, অপরিচিত বিদেশি শহরের শীতার্ত হৃদয়স্থলে। একটা বড়ো অংশ গেছেন বিলেতে এবং অপর একটি অংশ জার্মানিতে। কিছু লোক গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আমেরিকার উপকূলে—কিছু বা ক্যানাডায়। এইসব দেশগুলি যে মানবিক উদারতা দেখানোর জন্য এত বিদেশির কর্মসংস্থান করে দিয়েছে—তা নয়। বাঙালী যুবকের যেমন প্রয়োজন ছিল গ্রাসাচ্ছাদনের—এদেরও প্রয়োজন ছিল শিক্ষিত ও কুশলী কর্মীদের। জার্মানীর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে, বিলেতের হাসপাতালে, আমেরিকার স্কুলে, ক্যানাডার জনমানবহীন খনি অঞ্চলে কর্মঠ পুরুষের অভাব ছিল বলেই—দরিদ্র নবাগতদের ঐসব দেশগুলিতে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়। ইউরোপ আমেরিকার উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক উপার্জন তখন প্রভূত—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'বুম পিরিয়ড' চলছে।

কি ধরনের কাজ নির্দিষ্ট হয় বিদেশিদের জন্য? বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, যে ধরনের কাজ স্থানীয় লোকেরা করতে নারাজ। হয় নোংরা কাজ, নয় অধিক পরিশ্রমের কাজ বা অল্প মাইনের কাজ। যে বি-এস-সি পাশ ছেলেটি পাড়ার রকে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অবসর বিনোদন করত—সে, বিদেশে, দিনে বারো, চৌদ্দ ঘন্টা নিরলস খেটে চলেছে, এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। সে যথার্থই দেশত্যাগী এবং নিজের তত্ত্বাবধান নিজেই করছে। সুতরাং তাকে হতে হয়েছে স্বাবলম্বী ও প্র্যাকটিক্যাল। তাকে হতে হয়েছে সঞ্চয়ী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে অভিবাসন বা 'ইমিগ্রেশন' বিংশ শতাব্দীর দাসব্যবসা। যদিও মার্জিত ও আধুনিক তার রূপ কিন্তু মানুষ বা মানুষের শ্রম কেনা-বেচার প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি মূলত এক। কেউ কেউ বলছেন পশ্চিমের জগত যেন আলো-ঝলমলে মোহিনী শহর এবং সেই শহর ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর দরিদ্র গ্রামস্বরূপ দেশগুলি থেকে তাদের কর্মঠ পুরুষদের। পশ্চিম জার্মানিতে বহিরাগত কর্মীদের বলা হয় 'গেস্ট ওয়ার্কার' বা আমন্ত্রিত শ্রমিক। কথাটা গালভরা—কিন্তু এঁদের চাকরির পারমিট দু বছরের জন্য। তারপর, প্রয়োজনমতো, বাড়ানো হয় বা নাকচ করে দেওয়া হয়। যদি অতিরিক্ত সময় বসবাসের অনুমতি না মেলে—তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয় নিমন্ত্রিতদের। ভদ্রতার এরূপ নমুনা বিরল। নাগরিক অধিকার বলে কিছু নেই বিদেশি কর্মীদের। তাঁরা ঘরবাড়ি করতে পারেন না, ভোট দিতে পারেন না, এমনকি ব্যাঙ্ক বা অর্থপ্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনে ধারকর্জ করতেও পারেন না। স্বোপার্জিত অর্থ দেশের বাইরে পাঠাতে অবশ্য কোনো বাধা নেই। অর্থাৎ 'ফ্যালো কড়ি—মাখো তেল' ধরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু থেকে স্থাপিত হয়। এমন খল সৌহার্দ্য শুধু অনৈতিক নয়—অসামাজিকও বটে। বহিরাগত শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন আজকের জার্মানির অপরিমেয় রাসায়নিক উৎপাদন, কলকারখানার অভূতপূর্ব প্রসার ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি। একসময় জার্মান মেয়ে বিয়ে করলে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়া যেত। আজকাল শুনছি সে প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। আমেরিকা এবং ক্যানাডাতেও কঠোর আইনকানুন প্রয়োগ করা হয় বিদেশীদের প্রতি।

বৃটিশ অভিবাসনের প্রকৃতি আলাদা। কর্মপ্রার্থী ভারতীয়দের তিন শ্রেণীতে ভাগ করতেন ইংরেজ সরকার। প্রথমত উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার, অধ্যাপক বা বিজ্ঞানী। দ্বিতীয়ত, দক্ষ বা প্রায়-দক্ষ এঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান। তৃতীয়ত, সাধারণ শ্রমী বা চাষী

শারদোৎসবে ছোটদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার :

পূজা-বার্ষিকী **কিশোর বাংলা** দাম ৪ টাকা

লিখেছেন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্বপনবুড়ো, ধীরেন্দ্রলাল ধর, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বোম্মানা বিশ্বনাথম্, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাকর মাচ্বে, রবিদাস সাহারায়, রাণা বসু, নির্মলেন্দু গৌতম, কার্তিক ঘোষ, সরল দে, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত দত্ত এবং আরো অনেকে।

ছবি এঁকেছেন : শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ ঘোষ, কাজী, রমেন আচার্য, গৌতম কর্মকার প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থমেলা এ-১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭

মজুর। প্রয়োজনানুসারে, বৃটিশ হাই-কমিশন যে শ্রেণীকে ইচ্ছে, ইংলন্ডে বসবাসের 'ভাউচার' দিতেন। একদা, সাধারণ ও কর্মঠ লোকেদের প্রয়োজন হয়েছিল বলে পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু বৃটেন অভিমুখে যাত্রা করেন। এঁরা এখনো কলকারখানায় শ্রমিক বা বাসে ট্রেনে ড্রাইভার-কনডাকটর। প্রয়োজন মিটে যাওয়া মাত্র এই অভিবাসন নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে, দরকার হয় ডাক্তার নার্স বা শিক্ষকের। তখন তাঁদের যাওয়ার অনুমতি মেলে। অর্থাৎ নিজের কোলে ঝোল টেনে নেওয়ায় এই সাম্রাজ্যবাদী দেশ আবার পুরনো দিনের মতই দক্ষতা দেখিয়েছে।

নবাগতের অভিজ্ঞতা কি রকম? ধরা যাক, অজিতবাবু একজন সদ্যপাশ করা ডাক্তার। তিন পাউন্ড বা সর্বসাকুল্যে গোটা পঞ্চাশ টাকা (ভারত সরকারের বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণের বিষময় উদাহরণ এটি) হাতে ধরে তিনি লন্ডনে উপস্থিত হলেন। প্রবাসী বাঙালী বন্ধুরা তাঁকে সাময়িক আশ্রয় দিল। তাদের গৃহস্থালিতে পর্যাপ্ত মাছভাত খেয়ে চিকিৎসকের ধারণা হল বিলেতের পথ তাহলে কুসুমাস্তীর্ণ বটে। এবার কর্ম-সন্ধান। বড়ো বড়ো শহরে চাকরির অভাব। সুতরাং তাঁকে যেতে হবে দূর গ্রামে—অধিকাংশ সময় 'লোকাম' ডাক্তার হিসেবে। এই শব্দটির বাংলা ভাষায় প্রচলন নেই। এর সরল অর্থ হল ঠিকে কাজ। অর্থাৎ কেউ ছুটিতে আছেন—বা অন্য কারণে অনুপস্থিত। তাঁর জায়গায় অজিতবাবু অল্প-কালের জন্য কাজ করলেন। ক্রমশ, তাঁর চৈতন্যোদয় হতে থাকে। তিনি যে শ্বেতাঙ্গ নন—এটা জানার জন্য তাঁকে আর নিজের দিকে তাকাতে হয় না। অন্যদের চোখেই তিনি সেটা স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁকে অন্যায্য ও অপ্রিয় কাজগুলি করতে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘন্টা 'অন কল' থাকেন ক্যাজুয়ালটি বিভাগে। শল্যবিশারদ চাকরি করছেন উন্মাদ হাসপাতালে বা শিশুবিশেষজ্ঞ দীর্ঘকাল চিকিৎসা করছেন বৃদ্ধদের—এমন উদাহরণও অগণ্য। অজিতবাবু যদি স্থিতধী হন—যদি মানব-চরিত্র বোঝায় তাঁর দক্ষতা, রোগ নির্ণয়ের দক্ষতার চেয়ে কম না হয় তবে তিনি একদিন উন্নতি করবেন। কিন্তু সে বহু-দূরের পথ এবং বিপদসঙ্কুলও বটে।

বৃটিশ সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই নবাগতদের সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার উপহার দেন। কাগজে কলমে, বসবাসের অনুমতি পাওয়া মাত্র বহিরাগত ব্যক্তি ও বৃটিশ নাগরিকে কোনো ভেদ থাকার কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অস্তিত্ব

দশক আগে এই সমস্যা গুরুতর রূপ নিল। পূর্ব আফ্রিকার ছোটো ছোটো দেশগুলি দ্রুত স্বাধীন হয় এবং সেখানকার ভারতীয়রা বৃটিশ পাসপোর্ট হাতে, উপস্থিত হলেন ইংলন্ডের দরজায়। এঁদের ফেলাও যায় না—রাখাও যায় না। তখন একটি স্থূল বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন পাশ হল। বৃটিশ নাগরিকদের ভাগ করা হল দুভাগে। প্রথম শ্রেণীর নাগরিকরা হলেন দেশোয়ালী অর্থাৎ বকতের সম্পর্কে বৃটিশ। আরো সরল করে বলা যায়—শ্বেতাঙ্গ। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা হলেন বৃটিশ, তবে কলোনীর লোক—অর্থাৎ কৃষ্ণকায়। বৃটিশ সরকারের উদারতার মুখোশটি খুলে পড়ল অকস্মাৎ।

বৃটেনের শ্বেত-সমাজ বহিরাগত কালো লোকেদের ভালো চোখে দেখেননি বললে অনেক কম বলা হয়। বহু অঞ্চলে প্রকট সাম্প্রদায়িক বিবাদ শুরু হয়েছে। বক্তৃতা ঝেড়ে সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যদিও নৈতিক বিচারে কালো ও শাদা কর্মী-দের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না—কিন্তু কর্মক্ষেত্রে, জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহস অনেকেরই নেই।

এত জ্ঞান সত্ত্বেও আজো কেন সহস্র সহস্র ভারতীয় চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দক্ষ পুরুষ-নারী পশ্চিম দেশে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর? অধিক উপার্জন ও বিদেশি অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা হয়ত এর মূল কারণ। বুঝি বা তা নয়। যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তাঁর সামাজিক নিরাপত্তায় কেউ হাত না দেয় এবং তাঁর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে—তবে সেই সুদিনে ভারতীয় নাগরিককে আর দেশেদেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হবে না অন্নসংস্থানের আশায় বা মিথ্যা সম্মানের লোভে। সেদিন এই অবমাননাকর

বড় গানের সমঝদার

সন্ধ্যা সেন

চিরকালই কলকাতা

একবার খবর পেয়েছিলেন আমার হাত জখম হয়েছে। দেখা হতেই খবর নিয়েছিলেন 'কেমন করে এ দুর্ঘটনা ঘটলো? এমন রসিক শ্রোতা যদি হাত ভেঙ্গে পড়ে থাকে তাহলে ত আমাদের গাইবে বাজিয়েদের পক্ষে খুব শোকের ব্যাপার। যাই হোক, আমার ডিবের একটা গান খাও তাহলে দেখবে এক্ষুনি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

এই রকম মজার মানুষ ছিলেন খাঁ সাহেব। সবার সঙ্গে ওঁর আলাপ যেন অন্তরঙ্গতার মাধুর্যে ভেজা।

অল বেঙ্গল, অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের পরের যুগের সংগীত সম্মেলনী হল তানসেন সংগীত সম্মেলন সদারং সঙ্গীত সম্মেলন। এসব সম্মেলন আবদুল করিম খাঁ কিংবা বড়ে গোলাম আলি খাঁকে পায়নি। তবে ওঙ্কারনাথ বড়ে গোলাম আলি খাঁকে তানসেন সদারং এর শ্রোতারা প্রাণভরে শুনেছে।

যন্ত্রসংগীতের শ্রোতারা তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের কাছে চিরঋণী থাকবে। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মত সাধক যন্ত্রীর গায়কী ও তন্ত্রকারী অঙ্গের যুগ-বিপ্লবী সমন্বয়ের অবদান সম্বন্ধে এঁরাই আমাদের সচেতন করেছেন। এখানেই শুনেছি আলাউদ্দিন, আলি আকবর, রবিশংকরের ত্রয়ী অনুষ্ঠান। শুনেছি আলি আকবর রবিশংকরের যুগলবন্দী। তখনই সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করলো যে যন্ত্রসংগীতের জগতে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব রেনেশাঁ সৃষ্টি করেছেন। এতরকম বোল তাল ছন্দ যন্ত্রসংগীতে আগে ছিলো না। নানা তালে বাজনার প্রবর্তন করেছেন এই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ও তাঁর শিষ্যরা। এখনও যন্ত্রসংগীতের বেশীর ভাগ শিল্পীই আলাউদ্দিন ঘরাণার ঢঙে বাজান।

সদারং সঙ্গীত সম্মেলনের অবদান নিঃসন্দেহে সুনন্দা পট্টনায়ক। আজও মনে পড়ে ১৯৫৭ সালের সেই দৃশ্য। মহাজাতি সদনে মেঝেতে তখনও সিমেন্টের আস্তরণ পড়েনি। একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাইতে উঠলো স্টেজে। কানাই দত্ত আর সগীরুদ্দিন বসেছে তবলা আর সারেংগীতে। দুপাশে দুই বিনুনী। সবাই ভাবছে চান্স পাওয়া তরুণ শিল্পীদের কেউ হবে বা। কিন্তু গান শুরু করতে না করতেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো। মহিলা শিল্পী ত দূরের কথা অমন তাবাণা সারা ভারতবর্ষে কটা পুরুষই বা গাইতে পারে? সুনন্দার প্রথম অনুষ্ঠান শুনে সবাই একবাক্যে সেকথা স্বীকার করেছিলো।

কিন্তু তবু বলব আজকের যুগে যন্ত্রসংগীতের তুলনায় কণ্ঠসংগীতে ভাল শিল্পীর সংখ্যা বড়ই কম। ভীমসেন যোশী সুনন্দা ছাড়া বকম অফিসের শিল্পী নেই-ই বলতে গেলে। আবার ভীমসেন যোশীর সঙ্গে সুনন্দার বয়সের তফাৎ অনেক।

প্রথম অধ্যায়ে, মানে ধনী গৃহের জলসা, অল বেঙ্গল কনফারেন্স, অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে এবং পরে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনেও শুনেছিলাম আলাবন্দে খাঁ ও তাঁর তিন ছেলে নাসিরুদ্দিন খাঁ বহিমুদ্দিন খাঁ ও তানসেন পাণ্ডের ধ্রুপদ আলাপ। সেসব এখনকার কনফারেন্সে ক? এই আলোচনা প্রসঙ্গেই বলি ভীষ্মদেবের মত নামী গাইয়েকেও জাতখেয়ালী আমি বলব না সুরলা আবার মেজাজ, কণ্ঠের মোহিনী মায়া তাঁকে এত বড় শিল্পী করে তুলেছে।

তখন ও এখন

কনফারেন্স জলসা, গান-বাজনার ৪৮'র আগের চেয়ে এখন অনেক ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। তবু বলব তখনকার যুগে শিল্পীরা যে সম্মান পেয়েছেন এখনকার শিল্পীরা তা পাননি।

তখনকার যুগের ওস্তাদ অথবা বাইদের কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করতো না। তাঁরাও কনজারভেটিভ ছিলেন। চট করে কাউকে আমল দিতেন না। সমঝদার মানুষও তাঁদের সঙ্গে গানবাজনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করতেন 'আপনি কতদূর গান-বাজনা শিখেছেন? কোনো বন্দোবস্তের একটু ওদিক হলেই গাইয়েরা স্টেজের ওপর বসে উদ্যোক্তাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেন। এখন ত শিল্পীদের ব্যবহারে ত্রুটি পেলে দর্শকরা তাঁকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে থাকেন। এক বিখ্যাত শিল্পীর ভাগ্যে দু-তিনবার এ দুর্ভোগ ঘটেছে।

তখনকার বাইরা ছিলেন যেমন উদ্ধত তেমনই অহংকারী। কারো কোনো প্রশ্নের জবাবই দিতেন না। সেই তুলনায় এখন সুনন্দা পট্টনায়ককে দেখুন না? কত ভদ্র, নম্র অমায়িক। সাধারণ মানুষের সঙ্গেও হেসে কথা বলেন, সবাইকে কত সম্মান দেন। নিসার হোসেন বিনায়করাও পটবর্ধন ছাড়া ও রকম তারাণাই বা কজন গেয়েছেন? অমন ভজনও কারো কণ্ঠে শুনিনি। ওর ভজন তথা-কথিত ঠুংরি ঘেঁষা ভজন নয়, ধ্রুপদী ভাবের ভরাট গাম্ভীর্যে গমগম করে। আর কি পাণ্ডিত্য। সাতটা ভাষা ওঁর আয়ত্তে। পূজারিণীর মত জীবন চরিত্র পবিত্র সাত্ত্বিক ভাব। আগেকার দিন হলে এমন শিল্পীকে পুজো করতো। এখন তাঁর বিরুদ্ধেই কত চক্রান্ত তাঁকে হেয় করবার হীন চেষ্টা দেখে মনে বড় লাগে। ওঁর কণ্ঠে 'যোগী মত যা', 'জগন্নাথ স্বামী' এসব গান আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গানের মতই সারা সভা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। ঐ একমাত্র শিল্পী যিনি কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য ছাড়া শুধু মাত্র কণ্ঠ ও প্রতিভার জোরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন

পরিবেশের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলেও বলব তখনকার আসরের একটা আলাদা গ্ল্যামারিটি ছিলো। এখন কনফারেন্সে যেয়ে দেখুন গান শুনতে যাবার নাম করে গিয়ে সব রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমিয়েছে। তরুণ-তরুণীদের দেখা শোনা ও হাসি-তামাসার একটা প্রশস্ত জায়গা হয়ে উঠেছে এখনকার গান-বাজনার আসর। হলেও গান-বাজনার সময় ঠাট্টা-তামাসা গল্পগুজব চলছে।

তখন এসব হবার যোটি ছিলো? গান-বাজনার আসরে আসতেন কেমন সব মানুষ? নাটোরের রাজপরিবার কাশিম-বাজার, শোভাবাজার পাথুরেঘাটার রাজ-পরিবারের সবাই, ছাতুবাবু, লাটুবাবুর

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
আরাম পেতে
বিশ্বস্ত
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে!
3651 BEN

বাড়ির সব। সেসব কোঁচানো ঢাকাই ধুতি, গরদ আদির পাঞ্জাবি, ধবধবে গায়ের রং বাহারে পানের ডিবে হাতে অভিজাত ব্যক্তিরা আসরে ঢুকলেন যেন তার মর্যাদা বাড়াতে। তাঁদের দেখে দরোয়ানরা সেলাম ঠুকছে, আসরে বসা শিল্পীরা মাথা ঝাঁকিয়ে কুর্নিশ করছেন। এখন? হলে ঢোকার আগে সিগেটের শেষ টানটা ফেলে দিয়ে হাল্কা মেজাজে হলে ঢুকছে কাল আমলের যুবকরা যেন সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। সেটে গুনে গুনে টিকিট চেক করে। (না করে উপায় কি? মানুষ যে অসৎ হয়ে পড়ছে)? আগে গান-বাজনার মাঝখানে আসর থেকে উঠে আসার কথা কেউ ভাবতে পারতো না তবু রবিশংকরকে ধন্যবাদ যে সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ ও দরজা বন্ধ করে দেবার রেওয়াজ করে তাঁর আসরে অন্তত এসব অভব্য আচরণ অনেকটা দমন করেছেন।

আর এখন একজন আর্টিস্টের প্রোগ্রাম শেষ হবার সংগে সংগেই তিনি গাড়ি ডাকিয়ে তবলা তানপুরা নিয়ে চলে যান। তখন? আসরে গেলে দেখতে পেতেন তরুণ বিলায়েত খাঁ হয়ত বাজাচ্ছেন, সামনে বসে ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কারনাথ, হাফেজ আলি, আবদুল করিম—সে আসরের রূপই আলাদা। সেসব দৃশ্য দেখলেই মনটা সম্ভ্রমে ভরে যেতো। এখন সে অ্যাটমোসফিয়ার কই? তাছাড়া তখনকার আসরে সংগীতজ্ঞানহীন ছেলে-ছোকরা থাকতো না। এটা ছিলো গান-বাজনা জমে ওঠার একটা মস্ত সহায়। এখন খেলার মাঠে যান দেখবেন হয়ত কোনো মহিলা বুনতে বুনতে পাশের সঙ্গিনীকে বলছেন কাল রাত্রে রেডিওতে মোস্তাক আলির সেতার শুনলাম আর কি দারুণ হচ্ছে দ্যাখ?

এখন গান-বাজনার স্কুল কলেজ, ইত্যাদির কারণে কিছু রাগ-ঠাট শেখা ডিগ্রী পাওয়া এসব অনেক সোজা হয়ে গেছে। তার ফলে পাঁচ দশটা রাগের তালিম পেতে না পেতেই শিক্ষার্থীরা ট্যুইশানী খোঁজে, নিজের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই শুরু হয় শিক্ষকতার অভিযান। তারপরই প্রোগ্রাম পাবার আপ্রাণ সংগ্রাম। রাগের আরোহী অবরোহী ঠাট এসব থিওরী সম্বন্ধে এঁরা ওয়াকিবহাল—কিন্তু রাগের মর্মে প্রবেশ করবার মত অভিনিবেশ নেই। আগে কোনো আসরে একটা রাগ শুনে সংগীতানুরাগী এক কলি মনে রাখা সুর গুনগুন করে গাইতে গাইতে গাইবার প্রেরণাতেই রাগী বিস্তার রচনা করে নিতেন। তাতে ভাবনার বিকাশ, সৃজনশীল উচ্ছ্বাস সবেরই ব্যাপ্তি ঘটতো। এখনকার শিল্পীদের গানে সে কোয়ালিটি নেই এই রকম ধ্যানের অভাবেই।

এভাবে গানের আসরে ঘুরে ঘুরে এখন আপনার হতাশা আসে না? জিজ্ঞেস করি।

আমি কোনো সময়েই হতাশ নই। সব সময়ই সুখী। সারা জীবন ধরে এমন সব গান-বাজনা শুনলাম কোনো মূল্য না দিয়েই। সব শিল্পীদের স্নেহ ভালবাসাও পেলাম। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপল সেন থেকে সুরু করে সব শিল্পীরাই আমায় দেখলে কত খুসী হন। রবিশংকর কলকাতা, বালি, উত্তরপাড়া, ব্যারাকপুর, আসানসোলের সব আসরে আমায় দেখে কতবার বলেছেন কোনদিন লন্ডনে আমার কনসার্টে দেখবো আপনি সামনে বসে আছেন।

এসব শুনে আনন্দ হয় না? তারপর আপনিও আমায় এতখানি সমাদর করলেন। এসব কজনের ভাগ্যে জোটে? বহুদিন আগে পাইকপাড়ায় একটা মিউজিক কনফারেন্সের স্যুভেনীরে আমার লেখা চেয়েছিলো। চেয়েছিলো অনেককালের শ্রোতার অভিজ্ঞতার এজাহার।

খবরের কাগজের পাতায় আমায় অবশ্য প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন আপনি। তানসেনে সন্ধ্যা মুখার্জীর সঙ্গে ছবি তুলে যুগান্তরে এই কলকাতায়-এর কলমে ছাপিয়ে। মণীন্দ্র রায় লিখেছিলেন আমার সম্বন্ধে। তারপরে সুরেশ সংগীত সংসদ আমায় সংবর্ধনা দিলেন খুব ঘটা করে। সেখানে স্বয়ং মন্মথবাবু আমার হাতে উপহার ও মানপত্র তুলে দিয়েছিলেন। এমন কোনো পত্র-পত্রিকা নেই যাতে সে খবর প্রকাশিত হয়নি। অনেক গুণী শিল্পীর ভাগ্যেও এতবড় প্রাপ্তি ঘটেনি যা আমি গানের আসরে সেজে টো-টো কোম্পানী করে পেলাম। সংগীত শ্রোতার জীবনে এরচেয়ে বড় সার্থকতা কি থাকতে পারে?

আমার কথাটি ফুরোলো। এবার শিল্পীদের একটি উপদেশ গ্র্যাটিস দিচ্ছি শুধুমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠের দাবীতে। আশাকরি আমায় কেউ ভুল বুঝবেন না? বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার ডাক্তারদের নিজেদের প্রফেশনের ক্ষেত্রে বিদেশী ডিগ্রীর একটা দাম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কোনোক্রমে একবার বাইরে ঘুরে এলেই আর্টিস্টদের মধ্যে আজকাল এমন একটা ভাব দেখা যায় যেন তাঁরা একটা কেউ-কেটা হয়ে গেছেন। এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ বিদেশীরা ভারতীয় সংগীতের কি বোঝেন? নিজের দেশের স্বীকৃতিটাই জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হওয়া উচিত।

শেষ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

গোয়েন্দা গ্রন্থাবলী

কিরীটী অমনিবাস

১ম খণ্ড : কিরীটীর আবির্ভাব-রহস্যভেদীচক্রী-বৌরাণীর বিল-হাড়ের পাশা ২০৲

২য় খণ্ড : হলুদ শয়তান-ডাইনীর কাশী-ড্রাগন-মোমের আলো-বসন্তরজনী-কালোপাখী ২০৲

৩য় খণ্ড : বিষকুম্ভ-মৃত্যুবাণ-আলোকলতা-রাত্রি যখন গভীর হয় ২০৲

৪র্থ খণ্ড : তাতকসৈকতে-বনমরালী-সুভদ্রাহরণ-বিদ্যুৎ-বহ্নি ২০৲

৫ম খণ্ড : মন পবন-অদৃশ্যশত্রু-আদিমরিপু-প্রজাপতির রং-চারের অঙ্ক ১৫৲

৬ষ্ঠ খণ্ড : মৃগতৃষ্ণা-পুষ্পধনু-মিথুন লগ্ন-মণিকুন্তলা ১৫৲

৭ম খণ্ড : কৃষ্ণাকাবেরী-নভিবিলাপ-মদনভস্ম ১৫৲

৮ম খণ্ড : বিপু সংহার-নাগপাশ-ছোবা-সেতারের সুর-ওরা তিনজন ১৫৲

৯ম খণ্ড : কালোহাত-ছায়াকুহেলী-মৃত্যুবিষ-পদ্মিনী ১৫৲

১০ম খণ্ড : ঘুম নেই-কলঙ্ক কথা-হীরা চুনি পান্না ১৫৲

একাদশ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

মূল্য ১৫৲ টাকা

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

(২১)

ঐ বছর পুজোর সময় আমরা দেওঘরে গেছিলাম। মায়ের শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছিল না। প্রফুল্ল কাকাবাবুর কোন আত্মীয়ের বাড়ি, রেলের গুমটির ওপরেই। সারা বছর খালি পড়ে থাকত, একটা দেখাশোনা করার লোকও ছিল না। পাশের বাড়ির পুলিশ অফিসারের কাছে চাবি থাকত। বড় ভাল লোক। আমাদের খুব দেখা-শুনো করতেন আর থেকে থেকেই জিজ্ঞাসা করতেন রাতে কেউ জ্বালাতন করেছে কিনা। বৈদ্যনাথের এক পান্ডাও আমাদের তার পাখনার তলায় নিয়ে নিল। তার পুষ্ঠপোষকতায় আমরা মন্দির, তপোবন ইত্যাদি নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলাম। তাছাড়া বৈদ্যনাথের শ্রেষ্ঠ পান্ডার দোকান সে-ই আমাদের চিনিয়ে দিল। ফর্সা, শুটকো, মিচকে চেহারা। কিন্তু উপকার করত সন্দেহ নেই।

দলটি আমাদের খুব ছোট ছিল না, জসিডি অবধি একটা গোটা থার্ড ক্লাস হাফ কামরা রিজার্ভ করে গেছিলাম। তাতেও কিছু সীট বাকি থাকছে শুনে আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কেউ ঝুলে পড়ল। সুন্দর জ্যাঠার বড় মেয়ে প্রীতিলতা। তার বেশ লিখবার হাত ছিল। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে সিলেটে চলে যাওয়াতে, সে প্রতিভা ফুটবার সুযোগ পায় নি। খুতিদির দুই ভাই হৈমদা, নীরজাদা, এরা খেলার মাঠে বিখ্যাত ছিল। দুজনেই ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত। একজন শিবপুরে, একজন বেনারসে। বড় জ্যাঠার বড় ছেলের বড় ছেলে, নরেশ। আমার চাইতে বছর তিন-চারের ছোট, ভারী মিষ্টি স্বভাব এবং তার চেয়েও মিষ্টি গানের গলা। তবে পরে শুনেছিলাম, কোন মেয়ে গাইছে মনে করে নাকি স্থানীয় যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট জ্যাঠার দুই মেয়ে ভুতুদি, বুলুদিও ছিল। নরেশ ছাড়া আর সকলেই আমাদের চাইতে ৫-৭-১০ বছরের বড়। তবু খুব জমত। আরও কয়েক বছর আগে এই নীরজাদাই আমাদের কাছে অবিরাম ধারায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূতের ও রোমাঞ্চের গল্প নিজের অভিজ্ঞতা বলে, চালাত। এবার অবিশ্যি সে সম্ভাবনা ছিল না, আমরা বড় বেশি চালাক হয়ে গেছিলাম।

বাড়িতে এত লোক, যে প্রায় সব ঘরেই শোবার ব্যবস্থা করতে হত। বাড়ির সব চাইতে ভাল ঘরটির তিন দিক খোলা, হু-হু করে হাওয়া দিত। কোন ঘরেই বড় বড় তক্তাপোশ ছাড়া কোন আসবাব ছিল না। আর ছিল প্রচুর দেয়াল-আলমারি। এই ঘরটিতে মেয়েদের শুতে দেওয়া হয়েছিল। তার মানে ভুতুদি, বুলুদি, দিদি, আমি। সারা রাত আর ঘুমুতে পারি না। কেমন একটা অস্বস্তি। থেকে থেকেই ঘুম ভেঙে যায়। চারজনেরই। দু-রাত এ-রকম হবার পর মা বললেন, 'থাক গে, ওটাকে খাবার ঘর করে, এদিকের ছোট ঘরে তোরা শো।' তাই করা হল। উত্তরের ঘর, অনেক ছোট, তবু সারা দিন খোলা বাতাসে দুরে দুরে বেড়িয়ে, খুব ঘুমোতাম।

এই সময় হৈমদা, নীরজাদা এসে পড়াতে আবার জায়গার অভাব ঘটল। ওরা বলল, 'আমরা ঐ খাবার ঘরটাতেই শোব। বারে বারে ঘুম ভেঙে যায় আবার কি? আমাদের ভাঙবে না।' এই বলে ওরা ঐ ঘরে গেল। বলা বাহুল্য সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। দু দিন চেষ্টার পর, ভিতরের বন্ধ দালানে ছেলেদের জন্য চালা বিছানা পাতা হত। সবাই আরামে ঘুমোত।

এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী কলকাতার বিখ্যাত হার্ট স্পেশ্যালিস্ট ডাঃ এস এন রায়ের স্ত্রী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা কি ঐ বাড়িতে খুব শান্তিতে আছ?' মা বললেন, 'কেন বল তো?' 'ও-বাড়িতে তো কেউ থাকতে পারে না। ওটা নাকি ভুতের বাড়ি। পুব-দক্ষিণের বড় ঘরে একজন দুঃখিনী মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।' আমরা বললাম, 'ও-ঘরে কেউ শোয় না। আমরা তো বেশ ভালই আছি।' এটাই আমার জীবনের একমাত্র প্রত্যক্ষ ভূতের কাহিনী। তবে ঐ সময় থেকেই ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার মনটা কেমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে। কত যে ভূতের গল্প লিখেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু দেখি নি কিছু, ভয়ও পাই নি কেউ। ১৯২৩ সালে দিদি ম্যাট্রিক পাস করে ডায়োসেসান কলেজেই পড়ছিল। খুব ভাল কলেজ ছিল, চমৎকার একটা লাইব্রেরি ছিল। সে যাই হোক, কলেজের নিয়ম ছিল সবাইকে খোঁপা বেঁধে যেতে হবে। দিদির চক্ষুস্থির। খোঁপা বাঁধতে কে শেখাবে? মা মাসি তো চুল টেনে বেণী বেঁধে, বেণী পাকিয়ে খুদে এক খোঁপা তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। সে-সবের চল উঠে গেছিল। কাজেই ভুতুদি বুলুদির শরণ নিতে হল। ওরা এবং ওদের পর বন্ধুরা প্রায় মাথার সমান বড় বড় খোঁপা বাঁধত। খোঁপাগুলো ফোঁপরা হত, কারণ অনেকেরই মাথায় খুব বেশি চুল ছিল না। কিন্তু তাতেই নাকি ভাল খোঁপা বাঁধার সুবিধা। আমরা তো ওদের কাছে খোঁপা বাঁধা শিখতে বসলাম। সে কথাই বলি।

প্রথমে সব চুলগুলো আঁচড়ে পেছনে নিয়ে একটা কালো ফিতে দিয়ে শক্ত করে গোড়া বাঁধা হত। তারপর সামনেটা চিরুনি দিয়ে ঠিক করা হত। এ কাজটি ভাল করে করতে হত, পরে চিরুনি লাগাতে গেলে সবশুদ্ধ ধ্বসে পড়বার ভয় ছিল। পেছনের চুল এবার তিন ভাগ করে, মধ্যের ভাগটাকে জড়িয়ে তুলে বেশ কয়েকটা কালো লোহার কাঁটা দিয়ে শক্ত করে আটকাতে হত। তারপর তার চার দিকে দু দিকের দুটি ভাগকে জড়িয়ে হেয়ার পিন দিয়ে যথাস্থানে এঁটে দিতে হত। বুলুদির নাকি ২১-২২টার কম কাঁটাতে চলত না। কিন্তু দেখতে হত চমৎকার। আমরাও খুব চেষ্টা করতাম। কাজটা খুব সহজ ছিল না। অনেক সময় সব করে-টরে, সেজে-গুজে কোথায় বেরুব, ঠিক সেই মুহূর্তে নাকের ডগায় একটা মাছি বসল। সেটাকে তাড়াবার জন্য যেই না একটু মুন্ডু নেড়েছি, ব্যস সবসুদ্ধ ধ্বসে গেল। চারদিকে হেয়ার-পিনের বৃষ্টি। কোন ভাল জিনিস কি আর সহজে হয়। আমি ৬ বছর ঐ রকম খোঁপা বাঁধার পর, শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলাম আমার স্কুলের বন্ধু অরুণা দিব্যি সুন্দর গোড় না বেঁধে, হাতে জড়িয়ে খোঁপা করে, তার মধ্যিখানের ফাঁশটি টেনে বের করে আনে। অমনি দেড় মিনিটে চমৎকার এক অজন্তা প্যাটার্নের খোঁপা হয়ে যায়। তাতে দুটি বড় সেলুলয়েডের কাঁটা কিংবা একটি রূপোর বড় কাঁটা গুঁজে রাখলে সারা দিনে আর খুলে পড়ে না। এই খোঁপাই আমি আজ পর্যন্ত বাঁধি। কেউ শিখতে চাইলে শিখিয়েও দিতে পারি। কাঁটা না দিলেও চলে।

পুজোর শেষে ফিরে এলাম কলকাতায়। কোথাও যেতে যেমনই ভাল লাগত, ফিরে আসতেও তার সমান ভাল লাগত। গড়পারের বাড়ির আবহাওয়া চোখের সামনে বদলে যেতে লাগল। নতুন বাড়ি, সে-বাড়িতে কেউ বাস করে নি, শূন্য হলেও একেবারেই ফাঁকা হয় না, কারণ সে-বাড়ি হয় সম্ভাবনায় ভরা। কিন্তু সে-বাড়ি থেকে সব চাইতে প্রিয় মানুষটি চলে গেছে, সেই বাড়ি হয় ফাঁকা। তার প্রাণ চলে যায়। যদি না আর কেউ প্রাণ দিতে পারে। গড়পারের বাড়ি তৈরি হবার পর মাত্র আট-নয় বছর কেটেছিল। এরই মধ্যে মনে ঘরে 'ছাড়ি-ছাড়ি' হাওয়া।

ও-বাড়ি ছাড়তেই হল। ব্যবসা রাখা গেল না। কত আশা করে বিলেত থেকে কলপাতি আনিয়ে জ্যাঠামশাই ছাপাখানা করেছিলেন। তার কি সুনাম। সারা ভারত থেকে ইউ রায় এন্ড সন্সে হাফ-টোন ব্লক ছবি ছেপে দেবার ফরমায়েস আসত। আর কি সব ছবি। তার ফেলে দেওয়া রঙীন প্রুফ আমরা তুলে এনে যত্ন করে রাখতাম। কিন্তু ব্যবসা পোকত হবার সময় রইল না। জ্যাঠামশাই ৫২ বছরে, বড়দা ৩৬ বছরে চলে গেলেন। মণিদার ঘাড়ে সব পড়ল। তখন বয়স হবে ৩২। ছোট ভাই সুবিমল এ-সব কাজের দিক-ও কখনো মাড়ায় নি। কি করে যে কি হয়ে গেল এখনও বুঝতে পারি না। শুনেছি ধার ছিল মাত্র এক-দেড় লাখ, আর নানা জায়গা থেকে পাওনা ছিল দু লাখ। তবু কেন ব্যবসা উঠে গেল ভেবে পাই না। কোন একটা ব্যাংক কি অন্য প্রতিষ্ঠান কি সর্বনাশ ঠেকাতে পারত না? মোট কথা পাওনাদাররা ছিল পেশাদার মহাজন, তারা এক জোট হয়ে নালিশ করেছিল। ব্যবসা, গুডউইল, বাড়ি-ঘর সব নিলাম হয়ে গেছিল। কপর্দকশূন্য অবস্থায়, আমার দেবতুল্য জ্যাঠামশাইয়ের, যাঁর বাড়িতে কত অনাথ অভাজন আশ্রয় পেয়েছিল, সেই জ্যাঠামশায়ের দুঃখিনী বিধবা আর দিক-ভ্রান্ত সন্তানরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল। তবে এ-সব ঘটতে সময় লেগেছিল দুই বছরের বেশি।

তার মধ্যে স্নেহের নীড় ভেঙে ফেলার বিষম ক্লেশ। কোর্ট থেকে বলেছিল বৌদের স্ত্রীধন ছাড়া আর সব জিনিসের নির্ভুল তালিকা তৈরি করে কোর্টের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে। সে এক বেদনাময় অধ্যায়। তার হাস্যকর দিকটাও ছিল। যারা চিরকাল রস বিলিয়ে এসেছে, তারা তালিকা করতেও রস পরিবেশন না করে পারে নি। মজার মজার বর্ণনা ছিল ঐ তালিকায়। কেউ পড়েছিল কিনা জানি না। নিলেমে বাড কিনেছিল পাশের বাড়ির ছেলেদের স্কুল। কিনেছিলেন একজন ইউ রায় এন্ড সন্সের সঙ্গে সংযুক্ত দুই ভাই, শ্রীকরুণা-বিন্দু বিশ্বাস ও শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস। আরও খদ্দের থাকতে পারে, আমি সবিশেষ জানি না।

আমার কোন জ্যাঠামশাই কুলদাপ্রসন্ন, তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ঐ বাড়িতেই বাস করছিলেন। তাঁর নিজস্ব আসবাবপত্রে নাম লেখা ছিল না বা অধিকার প্রমাণ করা কোন দলিল ছিল না বলে, সেগুলিও তাঁদের ভুক্ত হয়ে নিলেম হয়ে গেছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পাণ্ডুলিপি, 'সন্দেশ' পত্রিকার স্বত্বাধিকার, প্রেস, প্রকাশনী, সব গেছিল। কেবল সুকুমারের উত্তরাধিকারী সত্যজিতের তখন দু বছর বয়স। তার অংশটি নাবালকের সম্পত্তি বলে তখন কাগজপত্রে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে নি।

সব কথা মনে করতে পারি না। ঐ দুটি দুঃসময় বছরের কথা সব মানিও না। তবে পুরনো চাকররা এ বাড়িতে কাজ করে করে বুড়ো হয়ে গেছিল, তারা কেউ যেতে চাইছিল না। মনে আছে বলছিল কোথায় যাবে আজীবনের আশ্রয় ছেড়ে।

বড়দার মৃত্যু আর বাড়ি নিলেম হবার মাঝখানে ছিল ১৯২৪ সাল। তখনও সকলে গড়পারেই ছিল। শেষ একটি আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ বাড়িতে। হয়তো খুব আনন্দের ব্যাপার হয় নি, কিন্তু বিয়ে-বাড়ির নিজস্ব এক রকম মহিমা আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। যত দূর মনে হচ্ছে বৈশাখ মাসে ছোট জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ের আগে বিয়ে হল।

আমি সেবার ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম। ডায়োসেসান স্কুলেই সীট পড়ত আমাদের। তখন পরীক্ষার হলে টোকাটুকির কথা শোনাই যেত না। এক-আধজন বেপরোয়া অপরাধী দেখা গেলে, তাকে তখুনি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হত। পরীক্ষার আগের তিন মাস পরীক্ষার্থিনীদের সে যে কি যত্নে তৈরি করা হত, এখনো মনে করে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। সে অন্য রকম তৈরি করা। এখন দেখি ভাল ছাত্ররা যাতে বিদ্যালয়ের খ্যাতি বাড়ায়, তাই তাদের বেশি করে যত্ন নেওয়া হয় আর দুর্বল ছাত্রদের এক বছর আগে থেকে ট্রান্সফার সার্টি-ফিকেট দেওয়া হয়। আমাদের সময় এর ঠিক উল্টোটি হত। ভালদের সাহায্য করতে শিক্ষিকারা তো সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন, কিন্তু শেষের ঐ তিনটি মাস ধরে যে-ছাত্রী যে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ দুর্বল, তাকে সেই বিষয়ে তাঁরা আপ্রাণ তালিম দিয়ে যেতেন। শুধু যারা তিনটে-চারটে বিষয়ে এত কাঁচা যে পাশ করবার কোন সম্ভাবনাই থাকত না, তাদের সে-বছর পাঠান হত না। কাজেই সকলেই ঐ তিনটি মাস খুব খাটত।

আমি নিজে আগের মত বাংলায় কাঁচা না থাকলেও, ঐখানেই আমার সব চাইতে দুর্বলতা। সুখের বিষয় খাঁটি ব্যাকরণের প্রশ্নে খুব কম নম্বর থাকত। বাক্য-রচনা, ভ্রম-সংশোধন, ব্যাখ্যা কর, ইত্যাদি বুদ্ধি করে চালিয়ে দিতে পারতাম। অনুবাদ আর রচনায় আমাকে পায় কে। কিন্তু যতই নিজেকে প্রবোধ দিই না কেন, বাংলায় আমি একটু কাঁচাই ছিলাম। যেখানে যত বাংলা বই পেতাম, সব পড়তাম। কি ভাল ভাল মাসিক পত্রিকা বেরুত: প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি। সব পড়তাম। রবীন্দ্র-নাথের কিছু কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরুত। 'শেষের কবিতা' বোধ হচ্ছে 'বিচিত্রা'য় বেরিয়েছিল; কোন সালে ঠিক মনে নেই। প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলাম। তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে বিচার-বুদ্ধি লোপ পেত।

কিন্তু ঐ স্কুলের শেষ বছরটাতে মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করত। মনে হত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে কি একটা বাদ পড়ে যায়। তখন তারাশংকরের নাম কেউ শোনে নি, কিন্তু শরৎবাবুর অনেক ভক্ত। আমাদের বাড়িতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বড়রা খুব উৎসাহী না হলেও, তাঁর সব উপন্যাস আমাদের কিনে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার মা-বাবা ভারি উদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন নাম করা সাহিত্যিককে তখনো চোখে দেখেছি বলে মনে হয় না। এখনো ভাবি চোখে দেখার কি খুব গুরুত্ব আছে? দু-চার দিন মিশবার সুযোগ পেলে হয়তো ব্যক্তিগত তথ্য কিছু জানা যেতে পারে। কিন্তু তার বা কতখানি মূল্য? কত সময় যার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, তাকে কাছে থেকে দেখে হতাশ হয়েছি। ঐ যে-কথাটা বারে বারে বলি, বারে বারে তার সমর্থন পেয়েছি। সৃজনের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মের দিক আর ব্যক্তিগত জীবনের দিক একে-বারে আলাদা। কোথা থেকে, হৃদয়ের গভীরের কোন নিভৃত গোপন স্বর্গ থেকে সৃষ্টির মন্ত্রটি পান তাঁরা; তার সঙ্গে মলিন জগতের কোন সম্পর্ক নেই, যতই বাধা, যতই প্রেম থাক না কেন। বড়দার মৃত্যুর পর সন্দেশ আর বেশি দিন চলে নি।

(চলবে)

ঋত্বিক তর্পণ

সব শিল্পীকেই অবাক হবার ক্ষমতা মনে চিরসবুজ চিরজাগরূক রাখতে হয়। অবাক না হলে কোন বৃহৎ কর্ম সমাধা হয় না। কিছু না কিছুর প্রতি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা, অভিভূত হয়ে যাওয়া তাৎক্ষনিকতার মধ্যে, রসে টাইটম্বুর হয়ে জারিয়ে যাওয়া, হয়তো অনেক পরে কোন স্নিগ্ধ মুহূর্তে নিজের সেই অনুভূতিকে মনের ভাঁড়ার থেকে টেনে বের করে সাজিগুজি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা,—এই হচ্ছে সৃষ্টিশীল কর্মের গূঢ় রহস্য।'—যেকোনো নিষ্ঠ কবি ও গদ্য শিল্পীর পরিণত বয়সের সিদ্ধান্ত যে চলচ্চিত্র শিল্পীরও সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা ঋত্বিক ঘটকের 'দুইদিক' লেখা থেকে তা জানা গেল। এটা প্রমাণিত-সত্য, ঋত্বিক ঘটক, পরিচালক নন শুধু, উঁচুদরের স্রষ্টা তাই তাঁর ছবিতে তিনি তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত থাকেন, যেমন একটা মহৎ উপন্যাসে ও দীর্ঘ কবিতায় থাকেন উপন্যাসিক ও কবি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'চিত্রপট'—এর দশম সংখ্যার ঋত্বিক ঘটকের শিল্প ভাবনা, রীতি, সংকট, উত্তরণ ভূমি ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের নানাপর্ব ও স্তরকে কখনো বিশ্লেষণে কখনো স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আর একবার গ্রন্থন করা হয়েছে। লিখেছেন ঋত্বিককুমার ঘটক, মৃণাল সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, পরিতোষ সেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,

বিষ্ণু দে, বিভাস চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু আরও অনেকে।

এর আগে, চলচ্চিত্র জগতের বহুবিতর্কিত, সম্মানিত ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, চিত্রপটও তাদের মতন উল্লেখযোগ্য লেখায় ভরা; বিশেষভাবে মূল্য বাড়িয়েছে ঋত্বিকের নিজের ন' দশটা লেখা, যা একসঙ্গে অন্য পত্রিকায় দেখিনি। এ ছাড়া লেখকদের মধ্যে অনেকেই আত্মীয়তা সূত্রে, কিংবা ব্যবসায়িক বা সামাজিক কারণে ঋত্বিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের লেখা বেশ কয়েকটি রয়েছে। আমরা, বাঙালীরা যে বিস্মৃতিপরায়ণ বলে নিন্দিত হই, তা অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হলেও ঋত্বিকের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ঋত্বিকের প্রতিভা সম্বন্ধে উৎসাহ বাড়ছে, তাকে নিয়ে লেখা বই, পত্রপত্রিকার ঘাটতি আছে। বাঙালীর সবচেয়ে বেদনার জায়গা, দেশ বিভাগ—তা এই মহান পরিচালক কখনো ভুলতে পারেন নি, তিনি নানাভাবে তা জানিয়েছেন—কখনো চলচ্চিত্রে, কখনো লেখার মধ্য দিয়ে। এমন কোনো গভীর তল তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন যা বাঙালী মাত্রই একান্ত ব্যক্তিগত বেদনার বলে মনে করে। এই প্রতিভাবান স্রষ্টার প্রতি উৎসাহ যতো বাড়ে ততই ভালো; চিত্রপট-এর বর্তমান সংখ্যা ঋত্বিক ঘটকের প্রতিভার সামগ্রিক চেহারাটা অল্প পরিসরে তুলে ধরতে পেরেছে। এজন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

চিত্রপট। দশম সংখ্যা। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। বি-৫, ভারত ভবন, ৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭২।

সমালোচনা

বাঙলা ছন্দ সাঙ্গীতিক

বাংলা গানের ইতিবৃত্ত ইতিহাস বৃত্তান্ত প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই অনুসরণ। কারণ চর্যাপদ থেকে রামনিধি গুপ্ত দাশুরায় পর্যন্ত বাংলা কবিতা গীতিমূলক। গীতিকাব্য শুধু পাঠ করা হত না, আবৃত্তি নয় গান গেয়ে প্রচার করা হত লোকসমাজে। গীতশ্রী সাবিত্রী ঘোষ তাঁর 'বাংলা গানের ইতিবৃত্ত' বইতে অতিপরিচিত বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাস ছুঁয়ে একটা তালিকাক্রম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচনা করেছেন। নারায়ণ চৌধুরীর ভূমিকাটি তাঁর গ্রন্থের সারাৎসার। কীর্তন শাক্তগীতি ইত্যাদির রসের সঙ্গে ও লোকগীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ মাত্র করলে সঙ্গীতশিক্ষার্থীর কাছে তার সুর গায়নশৈলী ধরা পড়ে না। শ্রীমতী ঘোষ কিছু প্রাচীন বিভিন্ন ধারার বাংলা গানের স্বরলিপি তাঁর প্রাজ্ঞ সঙ্গীতাচার্যদের কাছ থেকে শেখা ঐসব গানের স্টাইল যদি বৈজ্ঞানিকভাবে সাধ্যমত স্বরচিত্রলিপি করে দিতেন ত সঙ্গীতশিক্ষার্থীর বড় উপকার হত। বৈষ্ণব কাব্যগীতি শাক্তগীতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ভূরিভূরি বই আছে। সঙ্গীতের তথ্য আর সুরপরিচায়িকা এক জিনিস নয়। সাবিত্রী দেবী গায়িকা বলেই বলছি। এক প্রকাশক আমায় বললেন, পুরানো বাংলা গান নিয়ে এখনও এমন বই বেশ কম যা দেখে শিক্ষার্থী গান গাইতে পারে। মুশকিল এই। 'কা আ তরু—বর' রাগ পটমঞ্জরীতে গাইলেই কি হাজার বছর আগেকার চর্যাগীতি হবে। কীর্তনের স্টাইল না হয় এখনও চলছে। তাও মনোহরশাহী গরাণহাটী ইত্যাদি কৃষ্ণচন্দ্র দে রামকমল নবদ্বীপ বৃন্দাবনী খগেন মিত্তির ও'রা থাকলে যেমন দেখাতে পারতেন এমন এখন কজন? কে মল্লিক কালীপদ পাঠকের শিষ্যরা আছেন কে কে? কটা রেকর্ড বা তাঁদের বাজে? প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি না গানের বই লেখার তাৎপর্য টান দিচ্ছি।

'শাক্ত কবিতার মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য নেই, অলংকারের সমৃদ্ধি নেই এবং বাণীর পারিপাট্য নেই। ..শাক্ত পদাবলীতে কাব্যসৌন্দর্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না—' (৩৯—৪০ পাতা) শ্রীমতী ঘোষের এ সিদ্ধান্ত মানতে পারছি না। ছন্দের বৈচিত্র্য বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন?

'সজল আমার। মন ভ্রমরা। কালীপদ। নীল। কমলে।,
'যাও যাও গিরি। আনিতে গেরী'
'মন তুমি কৃষি। কাজ জানো না—

শাক্ত গীতির এসব লাইন কি স্ক্যান করে পড়লে একই ছন্দোরীতির মনে হবে? বাংলা ছন্দ সাঙ্গীতিক। তবে পড়বার সময় পাঁচ মাত্রার ছন্দ আবার গাওয়া যায় তাকে ছয় বা সাতে বা আটে। বৈষ্ণব কবি বা শাক্ত কবি (যাঁরা সবাই গাইতে জানতেন) গানের সুরের, তালের মাত্রার চলন ধরে গান বেঁধেছেন, হয়ত এমনি আবৃত্তি করতে গেলে মনে হয় ছন্দ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু বস্তুত তা নয় সব ক্ষেত্রে। অলংকারের সমৃদ্ধি কি কেবল শব্দালংকারে বা শব্দধ্বনির পারিপাট্যে। 'মন-ভ্রমরা' 'কালীপদ নীল কমলে' 'মানব ভ্রমীন' ইত্যাদি অলংকার সহস্র-শব্দের বলেই কি ভাবে গরীব? বাণীর পারিপাট্য কি বৈষ্ণবপদাবলীর শৃঙ্গারাদি মধুর রসেই? বাৎসল্য দাস্যতে থাকে না? শাক্তগীতিতে যে দুটি রস মূলাধার। পরিপাটি মানে যা সুবিন্যস্ত। সেটা দেহের না হয়ে স্বভাব ও আত্মার হলেই কবিতা গান ওঠে উঁচু ধাপে। বৈষ্ণব কাব্যেও ভক্তির উঁচু সিঁড়ি সাজঘরের ধারে নয় অনাবৃত কৈলাসের। 'বাংলা গানের ইতিবৃত্ত' পরি-

চ্ছন্ন গ্রন্থ। সঙ্গীত উপাধি পরীক্ষার্থীর সহায়ক গ্রন্থ। সাবিত্রী ঘোষ শেষ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট দশকে আমার কানে বাংলা গানের সুকণ্ঠী রেকর্ডশিল্পী হিসাবে হামেশা বাজতেন। সঙ্গীতলেখিকা হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা তাঁর শিল্পীজীবনের পূর্ণতা সৃষ্টি করে দিলে।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

বাংলাগানের ইতিবৃত্ত : গীতশ্রী সাবিত্রী ঘোষ
মূল্য আট টাকা।

অনাবিল হাসির খোরাক

বাংলা পত্র-পত্রিকায় অনাবিল হাসির গল্প আজকাল আর প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু কিছু ব্যঙ্গরচনা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে-সব লেখার চরম উদ্দেশ্য হলো উদ্দিষ্টকে কঠিন আঘাত করা। তাতে উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা জানি না, কিন্তু অনাবিল হাসি শুকিয়ে যায়। হিমানীশ গোস্বামীর 'ঘটক' চরিত্র পাঠকের কাছে নতুন নয়—বিভিন্ন সাময়িকীতে ঘটকের কাণ্ড-কারখানার কথা পড়া যায়। এইভাবেই একটু একটু করে একটি কাল্পনিক চরিত্রের মিল গড়ে ওঠে। 'লণ্ডন শহরের সাধু ঘটক' ঘটকের কিছু নতুন কাহিনীর সংকলন। এতে সমাজের প্রতি, মানবচরিত্রের ছোটখাট ত্রুটির প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে বটে—কিন্তু সে নরম বিদ্রূপ কাউকে অসহনীয় আঘাত করবে না, ভুলগুলি ধরিয়ে দেয় মাত্র।

এটি উপন্যাস নয়, গল্পের সমষ্টিও নয়। ইংরেজি ভাষার সাহায্য নিয়ে একে কয়েকটি অ্যানেকডোট-এর সমাহার বলা যেতে পারে। লেখার স্টাইল বারবার অনাবিল হাসির রাজা জেরোম কে জেরোমের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কানিটকারের স্যুটের ব্যাপার আর বডদিনের উপহার নিয়ে প্রভাস এবং রবার্টের প্রতিযোগিতার কথা বহুদিন মনে থাকবে। হিমানীশ গোস্বামীর একটা উদাসীনভাবে গল্প বলে যাবার কায়দা আছে: সূক্ষ্ম রসিকতায় পাঠক যখন বেদম হাসবেন, লেখক তখন একটুও ইনভলবড নন্। এটা বেশ ক্ষমতার পরিচয়।

বইটির ছাপা ভারি সুন্দর, একটুও চোখে লাগে না। মুদ্রণ প্রমাদ নেই বললেই চলে। প্রচ্ছদ মনোজ্ঞ।

ভাবাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

লণ্ডন শহরের সাধু ঘটক ।। হিমানীশ গোস্বামী ।। আশা প্রকাশনী, ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড কোলকাতা-৭০০০০৯। বারো টাকা।

অনিকেত প্রেম ও প্রকৃতি

উপন্যাস লেখার যাবতীয় উপকরণ হাতের কাছে জড় করতে পেরেছেন সুনীল দাশ তার সাম্প্রতিকতম 'কাল মধুমাস'-এ।

দুই সুদর্শন যুবক যুবতী সরিৎ ও স্বাতী স্বামী স্ত্রী নন সামাজিক অর্থে, কিন্তু হৃদয়ের কাছাকাছি তাদের মতো আর কেউ নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে কেয়া ও অনিন্দ্য অনেক ভাসমান ও আপাতসুখের অশ্লীলতার দ্বারা আবৃত। অবশ্য সে অনেক পরের কথা।

স্বাতী ব্যারিস্টার মৈত্রের বিবাহিতা স্ত্রী এবং সন্তানহীনা। সে সরিৎকে ভালো-বেসেছে নিজের শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য। আর সরিৎ সেই স্বাতীরই পরোক্ষ কারণে খুন করেছে একজন পুলিশ সার্জেনকে।

ফলে দুজনকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ঠিকানাবিহীন এক মানস-দম্পতি পালিয়ে চলে এসেছে কালিম্পং. সেখান থেকে গ্যাংটক. পরে গ্যাংটক থেকে কেয়াদের সঙ্গী হয়ে দার্জিলিং-জেলার এখানে সেখানে শুধু ছুট ছুট, ধরা পড়ার ভয়ে। আর মাঝে মাঝে চলচ্চিত্রের পশ্চাৎপটে ফিরে যাওয়া—সেখানে ব্যারিস্টার মৈত্র, মৃত সেই পুলিশ সার্জেনের মুখ, স্বাতীর দামাল ভাই কাঞ্চন এবং তার আশ্চর্য কবিস্বভাবের পিতা।

আশ্চর্য মুনশীয়ানার সঙ্গে সুনীল দাশ এই ভীত-সন্ত্রস্ত মানব সন্তানদের প্রেমের অপূর্ব বিচিত্র লীলা ময়ূরের পেখমের মতো মেলে ধরেছেন। তার মাঝে মাঝে আছে চকিতে সেই ফেলে আসা ঘটনার মোকাবিলা।

উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। স্বাতী আর সরিৎ নিজেদের শরীরের হিসাব নিকাশ খেলায় মত্ত: স্বাতী বলছে, আচ্ছা, বলো—তোমার .. মোট কতগুলো তিল আছে?—তিল? হ্যাঁ, তিল। স্বাতী মজা করে বলে, ব্ল্যাক স্পট।

ব্ল্যাক স্পট শব্দটা যেন ধাক্কা দেয় সরিৎকে। মুহূর্তে সরিতের মুখের রেখা বদলে যায়।

সরিতের শেষ পরিণতি স্বাতীরও শেষ পরিণতি ঠিকই কিন্তু তার মৃত্যুটাই তো কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের কাঠামো গড়ে দিয়েছে।

এ-উপন্যাসের নাম 'কাল-মধুমাস' কিন্তু সমগ্র উপন্যাস পড়ার পর এ-নামকে মনে হয় বাচালতা। যিনি এমন উপন্যাস লিখতে জানেন তাঁর নামকরণের ব্যাপারে এই এলানো ভঙ্গি দৃষ্টিকটু লাগবেই। সারা উপন্যাস জুড়ে যে সন্ত্রস্তভাব নামকরণ সেই ভাবকে অনেকটাই ফিউডাল করে দিয়েছে।

মীনু চৌধুরী

কাল মধুমাস। সুনীল দাস। বামারণী প্রকাশ ভবন। দাম বারো টাকা।

পেন পিকচার

অনুপম মূল চরিত্র। আদর্শবাদী যুবক। অথচ যার মেরুদণ্ড পুরো সিধে নয়। আবার অপার ক্ষমায় যীশুখ্রীস্ট-টীস্টও হয়ে উঠতে পারে না। তাকে শিক্ষকতার লাইনে এনে তার চোখ দিয়ে সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রটাকেই দেখানো হয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাত্র সমাজ। দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকসমাজ। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির যাচ্ছেতাই কিয়াকলাপ।..কান্তিবাবু বদন-বাবু, পবিত্রবাবু ...এইসব চরিত্রগুলো, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অতি পরিচিত চরিত্র-গুলোরই প্রতিনিধি হিসেবে যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি বাংলা উপন্যাস, কিন্তু পাতায় পাতায় অত ইংরাজীর ছড়াছড়ি কেন? বইটি সাহিত্য-কর্ম হিসেবে কি দাঁড়িয়েছে সে প্রসঙ্গে না গিয়েই বলা যায় যে বইটি নৈরাজ্য ও দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রের স্পষ্ট একটা 'পেন-পিকচার' হয়েছে এটা নিশ্চিত।

গৌতম ভট্টাচার্য

মাস্টার মশায়—ডঃ দীপক দে। পরিবেশক —দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড। কলকাতা। সাড়ে পাঁচ টাকা।

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯, শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়• সিল্ক
• তাঁত• মিল
• পোষাক
• সার্টিং• সুটিং
ও ছিট কাপড়

বনবিবি উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গৌরী আবার চুপ করে থাকল। লক্ষ্মণদার সঙ্গে ও নৌকোয় কাটিয়েছে। লক্ষ্মণদা ছটফট করেছে, কিন্তু ভগবান স্বাক্ষী লক্ষ্মণদা তো কখনো গায়ের জোর খাটায় নি। লক্ষ্মণদা যে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসত গৌরীকে। গৌরী কেবল সময় চেয়েছিল, সময়। বিদ্যাপুরী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিল গৌরী। ওদের বিয়ে হবে, কেউ জানবে না, এমন কিছু আর ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে চায় নি ও। হে ভগবান, আমার কি হবে গো।

—কি হল? বসে বসে কেবল কাঁদলেই চলবে? রজনী খাট থেকে নেমে এল।

—তোমরা ওকে খুন করলে কেন রজনী ভাই? আমাদের তোমরা জোর করে নৌকায় তুলে ভাসিয়ে দিলে না কেন?

—কপালের লেখা কেউ এড়াতে পারে না। রজনী দার্শনিকের মতো সান্ত্বনা দিল। গৌরী গোঁজ হয়ে বসে থাকল।

—তোমরা খ্রীস্টানরা কি বিশ্বাস কর জানি না, তবে হিন্দুদের কর্মফল আছে। যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়।

গৌরীর দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে এল। রজনীর কথা ওর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না।

—লোকটা যে ভাল নয়, তা প্রথম দিন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝেছিলাম। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এখানে আসার কি দরকার ছিল বলো?

গৌরী ক্রমশ যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। রজনী ওর পাশটিতে এসে দাঁড়াল। তারপর ওর পিঠে আলতো করে হাত বিছিয়ে দিল রজনী।

—কি হল? উঠবে না?

ঝাঁকি খেয়ে গৌরী যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, কর্মফল কি?

রজনী ওকে কাছে টেনে নিল। কর্মফল কি তা কি জানি, তবে কি এই জঙ্গলে এসে পড়ে থাকি, দেখতে পাচ্ছ না?

গৌরী আবার সশঙ্কিত প্রশ্ন করল, আমি কি কর্ম করেছি যে এমন ফল পাচ্ছি।

গৌরীকে [illegible] তুলল রজনী। কর্মফল মাথা পেতে নিতে হয়। ওঠ।

গৌরী একটা যেন আশ্রয় খুঁজছিল। কান্নায় ভেঙে মাথা গুঁজে দিল রজনীর বুকে।

—আহ্, কী করে, কী করে। রজনী যৌবনভার নারীর দেহটা নিয়ে বৃষ্টির মতো যেন গলে যেতে থাকে। আর এমন সময় হঠাৎ ওর কি খেয়াল হওয়ার পিছন ফিরে তাকিয়ে কেমন চমকে ধাক্কা দিয়ে ও সরিয়ে দেয় গৌরীকে।

রজনী দেখল, দরজায় দু হাত তুলে যমরাজের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে আছে শুকদেব।

শুকদেব হি হি করে হেসে উঠল, 'বনের মধ্যে বনবিবির কত রে ভাই খেলা—

।।আটাশ।।

আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। ম্লান হয়ে এসেছিল দিনের উত্তেজনা। নদীর জলে টাটকা মুঠো মুঠো রক্ত যেন বিছিয়ে দিয়েছিল সূর্য। ওপারে জঙ্গলের মাথায় দিনের শেষ দৃশ্যের মতো সূর্যটা এখনো ঝুলে আছে। অজস্র পাখি শূন্যে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ই বোঝা যায়, সুন্দরবনের পাখিদেরই দেশ। সমস্ত আলো আর উত্তেজনা ফুরিয়ে যাওয়ার পর পাখিগুলো কোথায় যে আশ্রয় নেবে কে জানে।

ভেড়িতে এখন একটাই মাত্র মানুষ, ঈশান। পা ছড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল ঈশান। খালি গা। শুকনো নুনের চাক বেঁধে আছে সারা গায়ে। চকচক করছে ঘাড়-গর্দানের মাংস। উশকো খুশকো চুল। চোখ দুটো হলদেটে হয়ে আছে। ঠিক একরকমটাই হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবে নি ও। অথচ কিছুতেই ও এড়াতে পারল না ঘটনাটা। মানুষ খুন করার দায়ে ওকেই কি সবাই দুষে বেড়াচ্ছে! অথচ লক্ষ্মণের দিকে ও একা তেড়ে যায় নি। ওর একার ক্ষমতা ছিল না, লক্ষ্মণকে ডুবিয়ে মারার। তেমন ইচ্ছেও ওর ছিল না। দশজনের ক্রোধ একসঙ্গে উগড়ে পড়েছিল লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণের মৃত্যুর জন্য কেউ যদি দায়ী থাকে তবে সে একা নয়, সবাই।

পরমুহূর্তেই ও অন্যভাবে চিন্তা করল, লক্ষ্মণের মৃত্যুর জন্য লক্ষ্মণই দায়ী, নিজের পাপে নিজেই মরেছে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের সমস্ত কীর্তি ভগবান দেখেছেন, ভগবানই ওকে ডুবিয়ে মেরেছেন। লক্ষ্মণ যে গৌরীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তা আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক ঈশান বুঝেছিল। লোকটার চোখের দৃষ্টিই ছিল অন্য রকম। ঈশানের চোখে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায় নি ও।

অথচ গৌরীকে এসব বোঝান যাবে না। গৌরী বুঝবে না। ভেড়ির গর্তে মাটি ঢেলে ঢেলে বন্ধ করে এসে ঈশান গৌরীর খোঁজে এসেছিল। গৌরীকে বোঝাবার জন্য ও এগিয়ে এসেছিল কাছারিঘরের দিকে। দেখল, গৌরী কাছারি ঘরে মেঝেতে শুয়ে আছে। ঘর ফাঁকা। রজনী হয়তো কুলি ডেরার কোথাও জমে বসেছে।

ঈশান দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, গৌরী।

কোন উত্তর নেই।

মেঝেতেই ছোট্ট এই টুকুন হয়ে শুয়ে ছিল গৌরী। ঈশান আবার ডাকল গৌরী।

গৌরী ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখে মুখে কেমন এক আতংক।

—তোমাকে আমি বিদ্যাপুরী পৌঁছে দিয়ে আসব গৌরী। সত্যি বলছি, আমি তোমাকে ঠিক তোমার দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেব।

গৌরী কিছু শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হল না ওর। শূন্য দৃষ্টি। গৌরী কি ঈশানকে চিনতে পারছে না।

ঈশান ঘরের ভিতর ঢুকল। গৌরীর পাশটিতে এগিয়ে এল।

গৌরীর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন কালেই যেন ও ঈশানকে দেখে নি এমন ভঙ্গি।

ঈশান আবেগ মিশিয়ে ডাকল, গৌরী। কথা বলছ না কেন? এই—গৌরীর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। চিক চিক করে উঠল জলকণা।

—আমাকে বিশ্বাস কর গৌরী, আমি মারি নি।

গৌরী এবারও কোন উচ্চ বাচ্য করল না।

ঈশান আরো একটু ঘনিষ্ঠ হল, আমি ওকে মারতে চাই নি গৌরী। ও যখন ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ে আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, আমি কেবল বাধা দিতে চেয়েছিলাম।

গৌরী ডুকরে উঠল। ওর সর্ব শরীর কান্নায় গুমরে উঠল।

ঈশান বলল ভগবানের নামে সত্যি কাটছি, আমি মারি নি। তুমি বিশ্বাস কর গৌরী আমি মারি নি।

গৌরীর সমস্ত মুখমণ্ডল থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। এ দৃশ্য বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। ঈশান চুপ করে বসে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল গৌরীর দিকে। গৌরী একটু কথা বললে হয়তো ও স্বস্তি পেত। কিন্তু নির্বাক কান্নার মত ছাড়া আর কোনভাবেই গৌরীকে পেল না ও।

এমন সময় রজনীর গলা পেল ঈশান। রজনী ডাকল, এই ঈশান এদিকে আয়।

ঈশান দরজার দিকে তাকাল, রজনী একা নয়, সঙ্গে মকবুল।

মকবুলও ডাকল, এদিকে আয়, শুনে যা।

ঈশান উঠে এল। কি?

ঈশানকে ওরা টেনে নিয়ে এল বাইরে, মেয়েটাকে একা থাকতে দে। ভীষণ আঘাত পেয়েছে ও। একা থাকলে সামলে উঠবে।

ঈশান তাকিয়ে রইল।

মকবুল বলল ভাল করে একবার কেঁদে নিতে পারলে কষ্টটা ওর কমে যেত। ওকে এখন একলা থাকতে দেওয়াই ভাল। আয় এদিকে আয়।

ঈশান একবার ঘুরে তাকাল কাছারি ঘরের দিকে। ঘরের ভিতর গৌরী। লক্ষ্মণের জন্য ওর যে এত শোক জমা হয়ে ছিল, কল্পনাতেও আনতে পারে নি ঈশান। এমন হল কেন। লক্ষ্মণকে যদি ও এত ভালবেসে থাকে, কেন তবে নৌকো নিয়ে এ-ঘাটে এল ওরা। কেন তবে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য এত আগ্রহ ছিল গৌরীর। কোন কিছুই হিসাব মিলাতে পারছিল না ও। প্রচণ্ড হতাশা এসে আঁকড়ে ধরল ঈশানকে।

রজনী বলল, সব সময় মাথা গরম করে কাজ করবি, এখন ফলভোগ করতে হবে সবাইকে। ভাগ্যিস এসব জায়গায় থানা পুলিশের ভয় নেই, নইলে সব ব্যাটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত।

ঈশানের আর তর্ক করতে ইচ্ছে করছিল না। রজনী কোনদিনই ওকে ভাল চোখে দেখে নি। আজ তো আরো দেখবে না। কিন্তু ভগবান সাক্ষী বিন্দুমাত্র দোষী নয় ঈশান। অন্যায় দেখেছে বলেই রুখে উঠেছিল ও।

ঈশান ভেড়ির দিকে অলসভাবে হেঁটে এগিয়ে এল। কিছুই ভাল লাগছে না। গৌরীর সজল চোখ দুটো কেন দেখবার জন্য কাছারি ঘরে গিয়েছিল ও। কেন? নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল ওর। দুপদাপ মাটিতে পা ছুঁড়ে অবশেষে ভেড়ির ওপর উঠে এল ঈশান। হাত পা ছড়িয়ে ভেড়ির ওপর বসে পড়ল। দিনের আলো স্তিমিত। ঠাণ্ডা বাতাসে গা পিঠ কনকন করে উঠছিল। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না ওর। রোদ, বৃষ্টি, শীত কতটুকুই বা কাবু করবে ওকে।

নদীতে ঘোলা জলের স্রোতে ভারি কাঠ ভেসে যাচ্ছে। ভাটা শেষ হয়ে এখন আবার শুরু হয়েছে জোয়ার। সূর্যটা ক্রমশই যেন ডুবে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। নেহাৎ সুন্দরবন বলেই এখানে এ সময় কাঁসরঘণ্টা শঙ্খ বাজার রেওয়াজ নেই। অথচ এ সময় কলকাতায় গলিতে গলিতে মন্দিরের সামনে ভক্তদের ভিড় বাড়ে। পথে পথে ট্রাম বাস, টাঙ্গা, রিকসা, গাড়ির পর গাড়ি। মানুষের পর মানুষ। কত নিশ্চিন্তে আছে মানুষগুলি। আর এই জঙ্গলের মধ্যে যেন নির্বাসিত হয়েছে ঈশানরা।

নদীর দিকে তাকিয়ে কী আশ্চর্য, কলকাতার কথাই মনে পড়ল ঈশানের। মনে পড়ল, ছোটকর্তা নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। মনে পড়ল কামিনীর কথা। কত ভাগ্য করে ওরা জন্মেছিলেন। আর ঈশানের ভাগ্যেই লেখা ছিল এই সব।

গৌরীর জন্য জীবনও দিতে রাজি ছিল ঈশান, কিন্তু সব কিছু কেমন যেন বুদবুদের মতো উবে গেল। গৌরী হয়তো আর কোনদিন ঈশানের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাও বলতে চাইবে না। লক্ষ্মণকে যদি এ মুহূর্তে আবার ফিরিয়ে আনা যেত, ঈশান ফিরিয়ে আনত, কিন্তু মৃত্যু যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে কিভাবে আর ফেরাবে ঈশান।

মনে হল, কেউ যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঈশান ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল। শুকদেব। আবার চোখ ফিরিয়ে নিল ও।

শুকদেব বলল, বুড়ো বাসুকির রূপ দেখছিস বুঝি ঈশান। দেখ দেখ, প্রাণ ভরে দেখ।

ঈশান কথা বলল না। নদী বুড়ো বাসুকির ওপর থেকে সূর্যের সমস্ত লাল রঙটুকু মুছে যাচ্ছে। পাতলা আঁধার যেন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

শুকদেব এসে পাশটিতে বসে পড়ল, ঈশানের দিকে তাকাল। তারপর একটা মাটির ঢেলা নদীর দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলল, নদী শালা সব খায়। জ্যান্ত খায়, মৃত খায়। সর্বগ্রাসী।

জাহাজে করে দিন কয়েক বেড়ানোর নতুন সুযোগ। ছুটি হয়ে উঠবে নিরুদ্বেগ আর অবিস্মরণীয়—ব্যবস্থা করেছে আমাদের তাপনিয়ন্ত্রিত যাত্রীবাহী জাহাজ এম. ভি. চিদাম্বরম।

সঙ্গে পাবেন মোটা ডিসকাউণ্ট

■ ছাত্রদের কনসেশন ৪০% পর্যন্ত ■ একক ভ্রমণে ২০% পর্যন্ত ■ ৪ জনের এক-একটি দলে ৩০% পর্যন্ত ■ ১৫ জন ছাত্রের দলে শিক্ষকের ভাড়া লাগবে না ■ যাওয়া আসার ক্ষেত্রে, সিঙ্গাপুরে জাহাজেই থাকা যাবে সামান্য খরচে ■ ডমিটরি ও বাঙ্ক যাত্রীদের জন্য 'পি' ফরমের প্রয়োজন নেই ■ ফরেন ট্র্যাভেল স্কীম অধীনে ১০০ মার্কিন ডলারের এক্সচেঞ্জ ■ এয়ার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে অবাধে টিকিট বদল করা যাবে।

মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর অভিমুখে মাদ্রাজ থেকে প্রতি ২০ দিনে একবার যাত্রা।

দুই সপ্তাহের সফর, সঙ্গে অবসর বিনোদন, কৌতুক ও আনন্দ। সুইমিং পুলে সাঁতার, ডেকে খেলা, বারে মদ্যপান এবং স্বাদু আহার—সবই পাবেন।

জাহাজের মধ্যেই দোকান —কেনাকাটায় শুল্ক লাগে না। আর দেখা যাবে অমিন্দা পেনাঙ, কুয়ালালামপুর (পেনাঙ কেলাঙ) ও সিঙ্গাপুর—ক্রেতাদের স্বর্গ।

আরও বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

দি শিপিং করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

'শিপিং হাউস', মাদাম কামা রোড, কলে-২১, ফোন: ২৫৯৯০০/২৫৭৯৬১, টেলেক্স: ০২১-২৩৭৯/২৬২৪ 'শিপিং হাউস', ৮৩ স্ট্রাণ্ড রোড, পি. বি. নং ২৬৩৬, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: ২৩২৩৫৪ টেলেক্স: ০২১-৭৩১১ 'সুরলোক', দ্বিতীয় তল, ৩৬ জনপথ, নয়া দিল্লী-১১০০০১, ফোন: ৪৬৯০৭, টেলেক্স: ০৩১-২২০৬

এজেন্ট: কে. পি. ডি সেথ মকন্দমল রাউথার অ্যাণ্ড সেন্স প্রাঃ লিঃ ৪১ ডিভি চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ-৬০০০০১, ফোন: ২৫৭৫৬, টেলেক্স: ০৪১-৫৫২০০ সেকেণ্ড ফ্লাইম বীচ, মাদাপাইজাম ফোন: ২৭২

ঈশান বলল, থামবি, ভাল লাগছে না।

—এই বাপু তোমাদের একটা দোষ। যা সত্যি তা শুনতে চাও না।

—যা সত্যি তা চোখেই দেখতে পায় সবাই, তোকে আর বলতে হবে না।

শুকদেব হাসল, নদী সেদিন সাপটাকে খেয়ে ছিল, আজ খেল লক্ষ্মণকে। একদিন তোকেও খাবে ঈশান। একদিন আমাকেও। আমরা শালা কেউ পার পাব না।

ঈশান আবার একবার শুকদেবের দিকে তাকাল, কেন মিছিমিছি আমাকে বিরক্ত করছিস ?

—বেশ তো, করব না। কিন্তু আমার একটা কথা শুনতে হবে।

—কি কথা ?

—আকাশে এখন তিন তারা ফুটে গেছে। আর এখানে বসে থাকা ঠিক নয়।

—কেন ? কি হবে ?

—কি হবে জানিস না ? ঐ দূরে জঙ্গলের দিকে তাকা ?

ইচ্ছে না থাকলেও তাকাল ঈশান। কি ওখানে ?

—চিনতে পারছিস ?

—কি ?

—জঙ্গল কেমন গাঁক গাঁক করে হাসছে। জানিস না, রাত্রি হলে জঙ্গল হেঁটে চলে বেড়াতে পারে ?

ঈশান দেখল জঙ্গলের দিকে চাপ চাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের অসংখ্য আলোর কণা। বুঝল, জোনাকির আলো চিনবার মতো অন্ধকার জমেছে ও দিকে।

—কাল আমরা জঙ্গলের মাচায় বসে কাটিয়েছি। জঙ্গলের কায়দা কানুন সব দেখে এসেছি।

—কি দেখেছিস ?

—দেখেছি, জঙ্গল খেয়াল খুশী মতো ছুটোছুটি করে। জঙ্গল তার কালো কালো হাত মেলে ধরে সারারাত আমাদের মাচাটা ঝাঁকিয়েছে।

—খুব গাঁজা খেয়েছিলি নিশ্চয়ই ?

শুকদেব বলল, বিশ্বাস না করলে কিছুই বলার নেই। ঠিক আছে, জঙ্গলের কথা নয় উড়িয়েই দিলি, কিন্তু সামনের এই নদী।

—কি করেছে নদী ?

শুকদেব হা হা করে হাসল, নদীর দিকে তাকিয়ে দেখ তো ঠিক চিনতে পারিস কি না।

ঈশান দেখল, সমস্ত চরাচর জুড়ে ঘন অন্ধকার ঘিরে আসছে। আর তারই মাঝে সাদা মশারির মতো কুয়াশার চাদর নেমে এসে নদীটাকে যেন ঘিরে ধরছে।

কী আশ্চর্য। নদীর ওপার দেখা যাচ্ছে না। ওপাশের জঙ্গলও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। দিগন্ত ছড়ান কেবল জল আর জল। সাংঘাতিক একটা চেহারা হয়েছে নদীর। তারই মাঝে কুচি কুচি ফসফরাসের আগুনগুলিকে এখন চেনা যাচ্ছে।

—কি দেখছিস ?

ঈশান বলল, চল ফিরি এবার।

আবার হাসল শুকদেব। তবু ভালো বড়ে মিঞা আমাদের দিকে নজর দেয় নি এখনো। চল।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। দেখল, কাঠের স্তূপে সন্ধ্যার আগুন জ্বালাবার কাজে কয়েকজন লেগে পড়েছে। ওদিকে কাছারি বাড়িটা আজ স্তব্ধ। কুলি ডেরায় মানুষজন আছে কি নেই বুঝবার উপায় নেই যেন। এত স্তব্ধতা সব কি আজ লক্ষ্মণের জন্য। লক্ষ্মণই কি জিতে গেল শেষ পর্যন্ত।

ভেড়ি থেকে নেমে ওরা কাছারি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

শুকদেব বলল, ঈশান একটা কথা বলব ?

—বল না। কত কথাই তো বলছিস।

—কাউকে ভালবাসতে নেই রে ঈশান, কষ্ট বাড়ে।

—কাউকেই আমি ভালবাসি নি।

শুকদেব ঈশানের পিঠে হাত রাখল, নিজেকেও ভালবাসতে নেই।

কেমন দুর্বোধ্য লাগে শুকদেবকে। ঈশান থমকে দাঁড়াল।

শুকদেব বলল, ভালবাসলেই মায়া জন্মায়। মায়া মানুষের কষ্ট বাড়ায়।

—কি বলতে চাস পরিষ্কার করে বল ? আমি হেয়ালি বুঝি না।

শুকদেব বলল, গাঁজা খাবি ?

ঈশান বলল, না। আমি খাই না।

—খেলে কষ্ট যেত।

—তোর যাচ্ছে, তাতেই আমি খুশি। আমার কথা তোকে না ভাবলেও চলবে।

কাছারি বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হল ওরা। ওদিকে ঘোট পাকিয়ে পাঁচাই খেতে বসেছে কয়েকজন। মকবুল, রজনী আর জগন্নাথ কাছারি ঘরের বারান্দায় বসে গল্প জুড়েছে। গৌরী কি এখনো ঘরের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। চিৎকার করে কাঁদছে না কেন গৌরী, অন্তত ওর গলার স্বর শুনতে পেত ঈশান।

—খাবি না ? আবার প্রশ্ন করল শুকদেব।

ঈশান বলল, আমায় আর বিরক্ত করিস না শুকদেব। এমনিতেই আমার মেজাজ ঠিক নেই, তারপর খারাপ কিছুও ঘটে যেতে পারে।

ঈশান সরে এল। আর এ সময় ওর হরিণটার কথা মনে পড়ল। ডেরার পেছন দিকে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল ওটাকে। সারাদিন হয়তো বাঁধাই রয়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ও ছুটে এল পেছন দিকে।

সামনেই মিষ্টি জলের গড়। গড়ের এপাশে ওপাশে অনেকদূর অবধি জঙ্গল সাফ করে ফেলা হয়েছে। গাছের গুঁড়িগুলো কোথাও কোথাও উঁচু হয়ে আছে। অন্ধকারে পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঈশান হরিণের কাছে এল। দেখল জবুথবু হয়ে বসে আছে হরিণটা। ঈশানের পায়ের শব্দ পেতেই চমকে তাকাল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখ থুবড়ে আবার পড়ে গেল।

ঈশান আবেগ মিশিয়ে ধীরে ধীরে ডাকল, সোনা। সোনামানি। সারাদিন তোকে খুব কষ্ট দিয়েছি না রে ?

হরিণের গায়ে হাত রাখতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল ঈশানের।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোর ? এই সোনা, বল না ?

হরিণের সর্বশরীরে অদ্ভুত এক কম্পন গড়াতে শুরু করল। এ কম্পন কি যন্ত্রণার না আনন্দের ধরতে পারল না ঈশান। দিন দিন হরিণটা দুর্বলই হয়ে পড়ছে। পায়ের চোট খাওয়া অংশটা ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠেছে। বেশিক্ষণ আর উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ও। মুখে কুটোটিও কাটতে চায় না। অথচ রাশি রাশি কেওড়াপাতার ডাল ভেঙে এনে জড় করে রাখে ঈশান। আজও ভোরের দিকে নতুন পাতা এনে চারপাশে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু কী আশ্চর্য, সামান্য একটুও ও দাঁতে কেটেছে কিনা কে জানে।

—এই সোনা। কি হয়েছে, বল না ? তোকে বেঁধে রেখেছি বলে মন খারাপ ?

হরিণটাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করল ঈশান। ভেলভেটের মতো নরম গা। উষ্ণ। কিন্তু ঝলকে ঝলকে শিহরণ বইছে গা দিয়ে। ভাঙা গুলি বেঁধা পায়ের কাছে হাত রাখতেই প্রচণ্ড তাপ অনুভব করল ও। হরিণটা গা ঝাঁকি দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

—ব্যথা বেড়েছে ? এই বল না ?

অন্ধকারে হরিণের চোখের দৃষ্টি বোঝা গেল না। দূর থেকে দেখলে হয়তো বা চোখ দুটোকে আগুনের গোলার মতো মনে হত ওর। এখন বুনো ভাবটা যেন কেটে গেছে।

—আয়। ঘরে আয়। ঈশান ওকে পাঁজা কোলে করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফিরতে শুরু করল ডেরার দিকে।

একটু থমকে দাঁড়াল ও। বড় আপন জন বলে মনে হচ্ছে হরিণটাকে। হরিণের মতো আজ ঈশানও তো পঙ্গু, অসহায়। কেউ বুঝবে না ওদের দুঃখ, কেউ বুঝবে না। কেউ জানতে চাইবে না, কেন ঈশান অমন করে তেড়ে গেল লক্ষ্মণের দিকে। কেন, কিসের জন্য আজ এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল এই জঙ্গলে।

—সোনা। হরিণটার গায়ে মুখ ঘষল ঈশান। চোখ দুটো ওর আপনি আপনি ভিজে উঠল। তোকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে খুব কষ্ট দিলাম না রে ?

হরিণশিশু নির্বিকার।

—ঠিক আছে তোকে জঙ্গলেই নিয়ে গিয়ে আবার তোর দলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসব। যাবি ?

হরিণটা স্তব্ধ হয়ে বুকের সঙ্গে সেঁটে রইল। ঈশান ওর মুখটাকে ঘুরিয়ে ধরল, এই, বল না রে। যাবি ? আমি তোকে আর আটকে রাখব না সোনা। তোর গলার শেকলটা এবার থেকে খুলে রাখব। কি রাজি তো ?

(চলবে)

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন

শ্যামল রায়

'দেখবে কি? তাড়িয়ে দিচ্ছে...'

'তাড়ালেই হল—আপনি দাঁড়ান তো' বলে অমল এগিয়ে গেল দরজার দিকে। হাতের আঙুল দিয়ে শব্দ করে ডাকতে লাগল... মেজদা... মেজদা ..... কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। মেজদাকে আমরা অবাক দেখতে পেলাম।

'কি ব্যাপার?'

'শুনুন না একটু, কথা আছে?'

'কোন কথা নেই, আপনারা যেতে পারেন।'

'আহা, শুনুন।'

আমি বললাম, 'অমল চলে এসো।' অমল পিছন ফিরে হাত তুলে আমাকে দাঁড়াতে বলে তর্ক জুড়ে দেয়। মেজদা খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। আমি এগিয়ে যাই। আমাকে দেখে মেজদা একটু শান্ত হল। দরজার ওপর থেকে উঠোনে নেমে আমার কাছে এসে বললেন, 'দেখুন, আমার আমার খুব বিশ্বাস...এরা হলে অতিথিকে কেউ আশ্রয় দেয় না...এমন কথা...' আমি বললাম, 'কি হয়েছে? খুলে বলুন?'

'আমার বাবা খুব অসুস্থ। বিশ্বাস করে বিছানায় আর ওঠে বাড়াবাড়ি...'

'কি অসুখ?'

'জানি না....অনেকে অনেক রকম বলছে... আমার মনে হয় কাল।'

'মাথার কষ্ট পাচ্ছেন?'

'খুব কষ্ট, আজ খুব বেড়েছে।'

'আমরা একটু দেখতে পারি?'

আসুন না আসুন বলে মেজদা দু-হাত এগিয়ে বাড়িয়ে, প্রথমে ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট্টঘর। দরমার বেড়া। কড়িবর্গার ওপরে টিনের চাল। জানালা নেই। একটাই দরজা। সমস্ত ঘরে ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে। চোখ জ্বালানো আসটে গন্ধ। মেঝের ওপর বাঁশের চটাইয়ে ছেঁড়া কাঁথা কাথা জড়িয়ে একজন বৃদ্ধলোক শুয়ে আছেন। পায়ের কাছে একটি বউ বসে কি সব করছে। ঘোমটা অনেকখানি নেমে এসেছে, মুখ দেখা যায় না। পাশে একটা ভাঙা কড়াই। কড়াইয়ের ভিতর ঘুটে আর কাট কয়লার মিশ্রিতে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পদ্মপাতার মত কয়েকটা বড় পাতা আগুনের উপর সেঁকা হচ্ছে। একজন বৃদ্ধা আগুনের সামনে বসে বৃদ্ধলোকটির কোমরে সেঁক দিচ্ছে। বৃদ্ধলোকটির মুখ থেকে মৃদু শব্দ উঠে আসছে। হয়তো কিছু বলছে—কিছু বলছে না। আমাদের দেখে বউটি উঠে চলে গেল। কি হয়েছে দেখুন তো—কি করতে পারে? এমন মুখ করে আমাদের সামনে মেজদা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'দেখুন, আমি একটা চিকিৎসা জানি, সূঁচ ফুটিয়ে করতে হয়। চেষ্টা করলে এই ব্যথা কমিয়ে দিতে পারি। আপনি কি বলেন?'

মেজদা বললেন, 'সেই চীনা চিকিৎসা তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আকুপাংচার।'

'আমি সিবুর মুখে সব শুনেছি। আপনি করতে পারেন। আমার কোন আপত্তি নেই....সেরে যাবে তো?'

'একদিনে কি সারে? সাময়িকভাবে ব্যথা কমবে। আরাম পাবেন।'

'তাই করুন আমারা সব আশা ছেড়ে দিয়েছি—আপনি যা হয় করুন।'

আমি বৃদ্ধার পাশে বসি। বৃদ্ধা উঠে যান। আমি ব্যাগ খুলি। মেজদাকে বললাম, একটু জল আনতে—গরম জল। মেজদা, ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অমলকে বললাম, 'এই আগুনটা সরাও।' অমল আগুন সরিয়ে রাখতে গিয়ে বলল, 'ভয় নেই তো?—দেখবেন!'

আমি বললাম—'না।'

বার

নির্জন নিস্তব্ধ ঘর। বৃদ্ধ লোকটি শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে। আমি ব্যাগ থেকে ছোট একটা বাক্স বার করি। বাক্সের ভেতর থেকে সূঁচ তুলে, তুলো তুলে, রেক্টিফায়েড স্পিরিট দিয়ে, সূঁচগুলো পরিষ্কার করতে থাকি। এমন সময় বৃষ্টির মত ঝম-ঝমিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। বড় বড় চোখ। কালো। আগুন রঙের ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা। মুখের ওপর এই মাত্র পড়ে যাবে, হারিয়ে যাবে, এমন একটা হাসি নিয়ে সে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় বেঁকে যাচ্ছে—বাঁ-হাত দিয়ে দরজার একটি কোণ ধরে সে ঘাড় নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার মনে হল—রাণু! ঠিক রাণু! মনে মনে বলি, তুই কোথায়—কেমন আছিস? তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে দি। ও হাসতে থাকে।

'তোমরা কে যাপ?' অস্পষ্ট কয়েকটি শব্দের গড়-ঘড়ানি বেরিয়ে এল বৃদ্ধ লোকটির বুক থেকে।

'আমরা আপনার ছেলের বন্ধু।' অমল বলল।

'অ।' বলে, বৃদ্ধ লোকটি নির্বিকার হয়ে শুয়ে থাকলেন। মেজদা ঘরে এলেন। হাতে একটা এলামেলের বাটি। ধোঁয়া উঠছে। আমার পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, 'একটু দেরী হয়ে গেল। ঘরে আগুন...' আমি বললাম, 'ঠিক আছে—তাতে কি?'

'আপনারা আজ রাতটা এখানে থেকে যান। রান্নার ব্যবস্থা করেছি—গরীবের ঘর। সামান্য একটু...' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' তারপর মুখ তুলে হাসলাম। মেজদা হাসলেন। ছোট মেয়েটি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমল হেসে কি করছিল। এবার একটু নড়ে চড়ে বসল। আমি বললাম, 'দেখুন, এই চিকিৎসার ফলাফলটি নিশ্চয় আছে। খাওয়া দাওয়া, খাদ্যপথ্য, আচার-বিচারের কোন আইন কানুন এই চিকিৎসায় নেই। নিশ্চয় হচ্ছে, আমার কথাগুলো আপনার বাবাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার কথাগুলো তিনি বুঝতে পারলে, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলে, তবেই এই চিকিৎসা আমি করতে পারবো। এই চিকিৎসার কোন ওষুধ নেই যে খাইয়ে দিলাম আর রোগ মত চলে গেল, অসুখ ভালো হয়ে গেল। তাই বলছি—একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

মেজদা বললেন, 'বলুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

'এই যে সূঁচগুলো দেখছেন, এগুলো স্টেইনলেস স্টিলের তৈরী। পিছনের হাতল তামার তার দিয়ে জড়ানো। হাতলের মুখ থেকে সূঁচের মুখ এক ইঞ্চি থেকে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা। এর মধ্য দিয়ে আমি কয়েকটা সূঁচ ওনার শরীরের বিভিন্ন অংশে ফুটিয়ে দেব। সূঁচের মুখ ঠিক জায়গা মত পড়লে এক ধরনের অনুভূতি ওনার শরীরের ভিতরে হবে শরীরের যেখানে সূঁচ ফোটানো হবে সেখান থেকে মনে হবে, কিছু একটা নীচের দিকে অথবা আশেপাশে সরে যাচ্ছে। কখনো মনে হবে, সেটা গরম কিছু, কখনো মনে হবে সেটা ঠাণ্ডা কিছু, কখনো মনে হবে, খুব সামান্য ইলেকট্রিক শকের মত একটা কিছু, অথবা মনে হবে জায়গাটা ফুলে উঠছে, ভারি হয়ে উঠছে। এই মনে হওয়া এক এক জায়গায় এক এক রকম। আমি বলে দেব অনুভূতি কোথায় কি রকম হবে। ওনাকে সেটা বলতে হবে। আমার কথা মত তিনি তা অনুভব করছেন কিনা, যদি না করেন, তা হলে বুঝতে হবে, সূঁচের মুখ ঠিক জায়গায় পড়েনি। আর তা যদি না পড়ে তা হলে কোন কাজ হবে না। আমাদের পরিশ্রম হবে, আপনার বাবা কষ্ট পাবেন। কোন কাজ হবে না।'

মেজদা বললেন, 'আচ্ছা। আমি বুঝিয়ে বলছি।' বলে, ডাকলেন 'বাবা?' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!' মেজদা বললেন, 'তোমাকে ওনারা চিকিৎসা করবেন—শুনছো?' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!'

'তোমাকে সূঁচ ফোটাবে!'

'বড় ব্যথা!'

'ব্যথা কমে যাবে!'

'অ্যাঁ!'

'যেখানে ফোটাবে, সেখানে কিছু নড়বে চড়বে, ঠাণ্ডা গরম এদিক সেদিক যাবে, ফুলবে, ভারি হবে—না হলে কাজ হবে না।'

বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!'

'তেমন তেমন হয় কিনা বলো কিন্তু!'

বাবা বললেন, 'অ্যাঁ।'

মেজদা বললেন, 'কি করবেন করুণ—আমি বুঝে নেব।'

'আপনি বুঝলে হবে না, আমাকে বুঝতে হবে!'

'ঠিক আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'উনি যেভাবে শুয়ে আছেন, তাতে আমার অসুবিধা হবে। ওনাকে ঠিক করে, উপুড় করে শুইয়ে দিন।'

মেজদা, উপুড় হয়ে বসে, বাবাকে সেইভাবে শুইয়ে দিলেন। বাবা উঃ আঃ করতে লাগলেন, লম্বা শক্ত একটা বাঁশের মত শরীর উপুড় হয়ে গেল।

অমল বলল, 'আপনি এ-কাজ করেন জানা ছিল না।'

আমি হাসলাম।

'সত্যি, কেউ বলেনি আমাকে!'

'তুমি শোননি অ্যাকুপাংচারের কথা?'

'শুনেছি, দেখিনি কখনো, আপনি করেন...'

আমি বললাম, 'এবার দেখ—জান। ভাল জিনিস।'

মেজদা হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। অমলের চোখ পড়ছিল। কি করে? কি হয়? এই রকম একটা ভাব। আমি মেজদাকে বললাম, 'কোথায় কোথায় সব চাইতে বেশী ব্যথা বলুন!'

'কোমরে।'

'আর?'

'পিঠে, হাঁটুতে, হাতের কাঁধে, কনুইয়ে প্রায় সব জায়গায়!'

'সব জায়গার ব্যথা তো আর এক দিনে কমবে না, সব চেয়ে বেশী কোথায় বলুন।'

'কোমরে।'

আমি তুলোর ওপর রেক্টিফাইড স্পিরিট মাখিয়ে নিয়ে বাবার লাম্বার ভার্টিব্রার আশপাশ ভাল করে ঘসে ময়লা তুললাম। তুলোটা একদম কালো হয়ে যায়। সেটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে পরিষ্কার করি। সেটাও কালো হয়ে যায়। আবার নতুন করে করতে যাবো, মেজদা বললেন,

'খুব ময়লা, স্নান হয় না কতদিন!'

আমি বললাম, 'তাতে কি—ও রকম হয়ে থাকে।'

অমল আমার কাছে সরে এসে বসল। বলল, 'ধরতে হবে?'

'ধরলে তো ভালো হয়!'

'কি ভাবে ধরবো?'

'যেভাবে তোমার সুবিধে!' আমি হাসলাম।

মেজদা বললেন, 'আমি ধরছি, আপনি সরুন।'

আমি স্পিরিট দিয়ে সূঁচগুলো ভাল ভাবে পরিষ্কার করছিলাম। নরম সূঁচ একেবেঁকে ছিল কয়েকটা, সেগুলো সোজা করতে সময় নিল একটু। মেজদা আর অমল দু-দিক থেকে দুজন বাবাকে চেপে ধরেছে। বাবার শরীর শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, 'ছাড়ুন, ধরতে হবে না। শরীরটাকে নরম, আলগা করে দিতে বলুন। এইভাবে, শক্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকলে কষ্ট পাবেন।'

মেজদা বললেন, 'বাবা গা ছাড়!'

বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!'

আমি বাবার লাম্বার ভার্টিব্রার স্পাইনের ফাঁক ও পিছনের মধ্য রেখার সংযোগস্থল থেকে দেড় সুন বাইরে এসে সূঁচ ফুটিয়ে দি। বাবা একটু নড়ে ওঠেন। মধ্যরেখার ডান দিকে আর বাঁদিকে দুটো সূঁচকে লম্বভাবে দাঁড় করিয়ে দি। মেজদা আর অমল সেই দিকে চেয়ে থাকে।

বাবার স্যাক্রাল হাড়টাস থেকে তিন সুন বাইরে গ্লুটিয়াস মাংসপেশীর ওপর সূঁচ ফুটিয়ে দিতেই আমার মনে হল, সাইরে বুঝি পড়ছে। আমি মেজদাকে বললাম, 'অনুভূতি ঠিক মত যায় কিনা জিজ্ঞেস করুন।' আমি লেন-সু-র ওপর দাঁড় করান সূঁচের হাতলে হাত রাখি। দুই ইঞ্চি সূঁচ ওপরে, নীচে ঘুরিয়ে ঘিরিয়ে লম্বভাবে দেড় ইঞ্চি ঢুকিয়ে দি। মেজদাকে বললাম, 'এখন কোমর কামড়ে ধরবে, ডানদিকের পাছার পেশী পর্যন্ত যাবে—যাবে?' মেজদা বললেন, 'যাচ্ছে বাবা?'

বাবা চুপ করে থাকেন। নিথর, স্থির। আমি আবার ওপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'যাচ্ছে?'

বাবা চুপ। মেজদা বললেন, 'কি হল?'

'কিছু নয়। যাবে ঠিক।' বলে, সূঁচের মুখ একটু ঘুরিয়ে দি। মেজদা বললেন, 'কি হল—যাচ্ছে?'

বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!'

মেজদার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমি সেই উজ্জ্বলতাকে প্রশ্রয় দি। স্যাক্রাল হাড়টাসের পাশে দাঁড় করান তিন ইঞ্চি সূঁচের হাতলে হাত দিয়ে সূঁচের মুখ লম্বভাবে আড়াই ইঞ্চি ঢুকিয়ে দি। ওপরে, নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে-ফিরে সে চলে যায়। মেজদাকে বললাম, এবার উরু আর পায়ের পিছন দিয়ে শকের মত কোন অনুভূতি সোজাসুজি গোড়ালির তলা পর্যন্ত যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।

মেজদা বললেন, 'যাচ্ছে বাবা?'

বাবা বললেন, 'অ্যাঁ!'

এইভাবে দু-পাশে ছি-বিয়ানে দাঁড়-করান সূঁচের অনুভূতিও ঠিক ঠিক গেল। বললাম, 'এইভাবে থাক কিছুক্ষণ!'

'কতক্ষণ?'

'এই পনের, কুড়ি মিনিট!'

অমল বলল, 'হয়ে গেল?'

'না, দেব।' বলে, বাবার হাঁটুর পিছনের দিকের কাপড় তুললাম। হাঁটুর পিছনের ভাঁজের ঠিক মাঝখানে যেখানে বাইরের আর ভেতরের দিকের পেশীর মধ্যে ফাঁক রয়েছে, সেখানে স্পিরিট দিয়ে ময়লা তুলে ওয়েই-চুং দেবার জন্য সূঁচ পরিষ্কার করি। দেড় ইঞ্চি সূঁচ পেশীর ফাঁকে লম্বভাবে ঘুরে-ফিরে এক ইঞ্চি ঢুকে যায়। মেজদাকে বললাম, 'পায়ের পিছন দিক দিয়ে শকের মত অনুভূতি গোড়ালির নীচ পর্যন্ত বা কড়ে আঙুলের দিকে যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।'

মেজদা বললেন, 'বাবা যাচ্ছে?'

'বাবা বললেন, 'অ্যাঁ।'

অমল বলল, 'হয়ে গেল—আর দেবেন না?'

'দেব, চিৎ করে শুইয়ে। এখন এই থাক।'

'টিপেটুপে যে মাপজোক করলেন ব্যাপারটা কি?'

'ওটা শরীরের ওপর নির্দিষ্ট বিন্দু খুঁজে পাওয়ার মাপ। চীনারা এই মাপকে 'সুন' বলে। রোগীর বুড়ো আঙুলের ওপরের গাঁটের মাপ।

অমল বলল, 'সুন ভারী সুন্দর নাম —না? আচ্ছা, সূঁচ ফোটাতে ব্যথা লাগে না?'

'লাগে, সামান্য। সূঁচ ফোটার যে সাধারণ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, সে রকম কিছু নয়।'

অমল বলল, 'সুন,—হি-হি!'

আমি মেজদাকে বললাম, 'খাওয়ার কিছু আছে?'

'কি?'

'এই বিড়ি-টিড়ি!'

'বিড়ি খাবেন?'

'আছে কিনা বলুন?'

মেজদা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি দরজার দিকে মুখ তুলতেই দেখি, মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেঁকে কোমরে হাত। বাঁ-হাতটা আলতো করে আঙুল তুলে ঠোঁট ছুঁয়ে আছে। ময়লা, জট-ধরা বিন্যস্ত চুল আগুন রঙের ফিতে দিয়ে বাঁধা। আমার দিকে তাকিয়ে আছে—স্থির। ভেজা চোখ, শাণিত দৃষ্টি, একবিন্দু জল শিশিরের মত গালের ওপর দুলছে। আমি ওকে কাছে ডাকি। ও ঘাড় নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অমল বলল, 'আসবে না, ভয় পেয়েছে।'

'ভয় নয়। অন্য কিছু—থাক!'

মেজদা ঘরে ঢুকলেন। হাতে কিছু আছে বলে মনে হল। তিনি এগিয়ে এলেন, আমাদের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে বসলেন। দুটো বিড়ি দু আঙুলে তুলে বললেন, 'নিন—আর নেই।' তাঁর বাঁ হাতের আঙুল ডান হাতের কনুই ছুঁয়ে আছে। সংকোচে হাত কাঁপছে।

'এতেই হবে।' বলে, আমি বিড়ি দুটো তুলে নি। একটা অমলকে দিয়ে বলি, 'আগুন দিন।' মেজদা উঠে গিয়ে সেই আগুনের কড়াইটা নিয়ে আসেন। আমি আগুনের ভেতর বিড়ির মুখ ছুঁইয়ে নিয়ে, বিড়ির মুখে আগুন দি। অমল আমার হাত থেকে আগুন নিয়ে বিড়িতে টান দেয়—'আঁ!'

ভিজে ধোঁয়া মুখের ভেতরটা অসাড় করে দেয়। একটা তিতকুটে ভাব জিভে জড়িয়ে যেতে থাকে। মুখে থুতু আসে। গিলে ফেলি। গা গুলিয়ে ওঠে। কবেকার বিড়ি খাচ্ছি—কে জানে? সময় যায়। আমি মাঝে মাঝে সূঁচের মুখ ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে দি। বাবা নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন, না জেগে আছেন বোঝা যায় না।

'কয়টা বাজে?'

অমল ঝোলা থেকে ঘড়ি বার করে বলল, 'সাড়ে বারো!'

'বেশ রাত হয়েছে?'

'হুঁ!'

আমি ফোটানো সূঁচ তুলবো বলে, তুলোর ওপর স্পিরিট লাগাই। তারপর এক একটি করে সূঁচ তুলতে থাকি। তোলার পর ফোটানো জায়গাগুলো স্পিরিট-তুলো দিয়ে ভালোভাবে মুছে দি। সূঁচগুলো গরম জলের পাত্রের ভিতর ছেড়ে দিয়ে বাবার কোমর, হাঁটুর পিছন দিকটাতে ম্যাসেজ করতে করতে অমলকে বলি, 'সূঁচের গা ঠিকভাবে ধরা আর রোগীর শরীরে ফোটানোর ব্যাপারে চীনারা কি বলে জান?

'কি?'

'বাঘের মত ধর আর ফুলের মত ফোটাও!'

'কথাটা ভারী সুন্দর না!'

'হ্যাঁ। সব কঠিন কাজই শুনতে সুন্দর ....আমাকে দেখ না?'

'কি?'

'কথাটা আমি জানি, বলিও সুন্দর-ভাবে কিন্তু করি—কি?'

'কি করেন?'

'ফুলের মত ধরি আর বাঘের মত ফোটাই।'

অমল হাসতে থাকে। ওর হাসির ভেতর আমার কথা সমর্থনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। যেন বলছে, 'আপনি ভাই করেন!'

'কথাটা সুন্দর তো বললে, ছার কথা জিজ্ঞেস করলে না?'

'কার?'

'এতক্ষণে?'

'বলুন না।'

'আমি ঠিক জানি না। তবে, শুনেছি, কথাটি মাও সে-তুং বলেছিলেন।'

অমল চুপ করে থাকে। যেন, তিনি ছাড়া আর কে? এমন একটা ভাব। ওর এই ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগে না। বললাম, 'অমল!'

'কি?'

'মানুষ মানে কি?'

'অনেক লোক।'

'একজন তো নয়?'

'না।'

'কথাটা মনে রেখো।'

'এ আর নতুন কথা কি?'

'নতুন পুরানো নয়, মনে রাখার কথা।'

অমল আর কোন কথা বলে না। চুপ করে বসে থাকে। ও যেন কোথায় আহত হয়েছে। বসে বসে সেই ক্ষত খুঁজতে থাকে। কষ্ট হল। আমি ওর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম।

মেজদাকে বললাম, 'এবার ওনাকে তুলে বসিয়ে দিন।'

মেজদা হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। এবার জোড়া পায়ে নড়েচড়ে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ডান হাত বাবার বুকের নীচে চালিয়ে দিয়ে, বাঁ হাতের চেটো পিঠের ওপর রাখলেন। অমল এগিয়ে এসে কোমরের কাছটা ধরতে চেষ্টা করলো। বাবা একটু ঘুরে গিয়ে উঠে বসলেন। বসা অবস্থায় হাঁটু ভাঁজ করে, পা দুটো সামনের দিকে তুলে মেজদাকে বললাম, 'একটু ধরে থাকুন। পা যেন না নড়ে যায়।' মেজদা এক হাত দিয়ে হাঁটু জোড়া ধরে বসে রইলেন। অমল চুপ। একমনে সব কিছু দেখছিল অথবা কিছুই দেখছিল না। আমি গরম জলের পাত্র থেকে সূঁচ তুলে স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকি। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। এই নির্জনতার ভেতর দিয়ে সময় চুপ চাপ চলে যেতে থাকে। সময় চলে যায়।

বাবাকে বললাম, 'ব্যথা কি রকম মনে হচ্ছে?' বাবা ম্লান হাসলেন। বললাম, 'কি রকম?'

'কম বাবা, অনেক কম!'

'সূঁচ ফোটাতে ব্যথা লাগছে?'

বাবা মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, না, কিছু বোঝা গেল না। আমি বাবার মাথার পেছনে ঘাড়ের পাশে, পিঠের ওপর ঘাড়ের নীচে, দুই পাশে। হাতের, পায়ের বিভিন্ন অংশে স্পিরিট দিয়ে মুছে দি। তারপর দুই আঙুলের ফাঁকে সূঁচ তুলে নি। মনে মনে বলি, বাঘের মত ধর আর ফুলের মত ফোটাও। বাবার পিঠ সামনে রেখে, মাথা সামনের দিকে নুইয়ে ঘাড়ের পাশের দিকে, অক্সিপিটাল হাড়ের ঠিক নীচে স্টারনো-ম্যাসটয়েড ও ট্রাপেজিয়াম মাংসপেশীর ফাঁকে সবচেয়ে গভীর জায়গায় লম্বভাবে দেড় ইঞ্চি সূঁচের মুখ বিপরীত চোখের দিকে করে এক ইঞ্চি ঢুকিয়ে দি। ডাইনে বাঁয়ে নড়ে-চড়ে সূঁচ জায়গা মত চলে যায়। ঠিকঠাক গেল কিনা জানার জন্য বাবাকে বললাম, 'কানের ওপর আর মাথার পাশ দিয়ে কপালের দিকে কিছু যাচ্ছে?'

বাবা মাথা নাড়লেন—'হ্যাঁ!' আমি বললাম, 'মাথা নাড়াবেন না, মুখে বলুন। মুখে বলবেন।' একইভাবে দু-পাশে ফাঁচি দেবার পর সাত নম্বর সার্ভাইকাল স্পাইন আর এক নম্বর থোরাসিক স্পাইনের মধ্যে তাঁচে, তাঁচে থেকে আধ সুন বাইরে; ডাইনে, বাঁয়ে, থিংহোরান, ইনফ্রাস্কাপুলার ফসার মধ্যবিন্দুতে থিয়ান চুং, প্যাটেলার ঠিক নীচে প্যাটেলার লিগামেন্টের দুই দিকে, বাইরের গর্তের মধ্যে তুলি বা ল্যাটারাল লি-সান, প্যাটেলার মাঝখান থেকে চার সুন নীচে, টিবিয়ার সামনের ধার থেকে এক আঙুল বাইরে চু সান লি, ডেলটয়েড সাংসপেশীর সামনের ও মধ্য অংশের ফাঁকে স্ক্যাপুলার একোমিয়ান প্রসেসের শেষ দিক থেকে আধ সুন নীচে চিয়েন-ইউ, তর্জনী আর বুড়ো আঙুল কিছুটা ফাঁক করে দুই নম্বর মেটাকারপাল হ্যাডের মধ্যবিন্দুর আধ সুন বাইরের দিকে হোকু দিয়ে, আমি বাবার কাছ থেকে সরে আসি। মনে হল, কথা যত অনুভূতি গেছে। মেজদাকে বলি, আজ এই থাক—কি বলেন, মেজদা সঙ্কোচে হাসেন। 'কোন দরকার নেই.. ও আর পার্টিফার্টি করবে না.... আপনারা যেতে পারেন। এই কথাগুলো সেই হাসির মধ্যে ছিল না। আমি খুঁজতে থাকি। পাই না। একটু পরে মেজদা উঠে চলে যান। অমল যেন কেমন হয়ে বসে আছে। আমি আন্তরিকভাবে অমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'একটা ভুল হয়ে গেছে অমল।

(চলবে)

বাংলার বাইরে বাঙালী

শিল্পী প্রতিমা

নৃত্য এবং সঙ্গীত দুই ঈশ্বরের মহৎ দান। নৃত্যের রূপ সুন্দর হলো বিদ্রোহী পদ্মাবতী—এ শুধু কবির কল্পনায় কিংবা শুধুমাত্র নাট্যরাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এটা বোধগম্য যে কোন সঙ্গীত অথবা নৃত্যে সমর্পিত সার্থক শিল্পীর পক্ষেই প্রযোজ্য। তাই কত সময় আমরা সার্থক শিল্পীর অনুষ্ঠান শুনে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ কিছু সময়ের জন্যে ভুলে যাই।

এমনি একজন শিল্পী—প্রতিমা। যে তার সমস্ত সত্তাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে তার শিল্পের মধ্যে। তাই দর্শকও তার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলে ছন্দলয়ের জগতেই বিচরণ করে। এই শিল্পীর পুরো নাম কুমারী প্রতিমা চৌধুরী। ত্রিপুরার আগরতলায় তার জন্ম। গানের বাড়ীতে ব্যতিক্রম—তার ভাল লাগে নাচ। শুধু ভাল লাগে নয়, তার রক্তে অনুভব করে মৃদঙ্গের ধ্বনি। তার মনে হয়—'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তা তা থৈ থৈ।' প্রতিটি শিরায় যে শিল্পের পদধ্বনি তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারুর ছিল না। তবু রক্ষণশীল বাঙ্গালী বাড়ীতে নাচকেই পেশা বা নেশা হিসাবে নিতে বেশ বাধা পেতে হয়েছে প্রতিমাকে।

ছ' বছর বয়সেরও আগে থেকে নাচ শিখেছে প্রতিমা। প্রায় দশ বছর গুরু রাজ-[illegible] চক্রবর্তীর কাছে শিখেছে মণি-পুরী নাচ। ওখান থেকেই একটা বিষয় হিসাবে নাচ নিয়ে সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হয় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, নাচে অনার্স নিয়ে।

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে ১৯৬৭ সালে বোম্বাইতে আসে ভারত নাট্যমে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। প্রাচীন ভারতের ক্লাসিক নাচের অন্যতম প্রধান শাখা ভারত নাট্যম, যা বর্তমানে তাঞ্জোরের কয়েকটি নৃত্যে উৎসর্গীকৃত পরিবারের মধ্যেই সীমিত। বোম্বাই-এর শ্রীরাজ রাজেশ্বরী ভারত নাট্যম কলা মন্দিরের গুরুও এমনি পরিবারের লোক।

এই বিদ্যালয়ে শ্রীকল্যাণ সুন্দরমের তত্ত্বাবধানে ভারত নাট্যমে শিক্ষা নিয়ে প্রতিমা খ্যাতিসম্পন্ন ভারত নাট্যম শিল্পীদের মধ্যে অন্যতমা হয়েছে। মণিপুরী, ভারত নাট্যম ছাড়াও কথাকলি এবং রবীন্দ্র নৃত্যে তার পারদর্শিতা রয়েছে। কলকাতা এবং বোম্বাই-এ একক নৃত্য-প্রদর্শন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিমার নৃত্যের বিশেষ আকর্ষণ তার ছন্দজ্ঞান এবং বিরহ, মিলন, আনন্দ, বেদনা, ইত্যাদি অনুভূতির গভীর ব্যঞ্জনা। স্বাধীনতার সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা, গৌহাটি ইত্যাদি স্থানে তার নৃত্য প্রদর্শন করে স্থানীয় লোকের মনে স্থায়ী আসন বিছিয়ে এসেছে।

সে বর্তমানে শ্রীরাজ রাজেশ্বরী ভারত নাট্যম কলা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। তার গুরুজীকে সাহায্য করাই তার উদ্দেশ্য, এছাড়া বোম্বাই-এর নিউ এরা স্কুলে ছোট ছোট মেয়েদের নাচও শেখায়। প্রতিমার ইচ্ছা উচ্চাঙ্গের ভারতীয় নৃত্যকে বহমান এবং শক্তিশালী করে রাখার সাহায্য করা। তার আর একটি বাসনা বিশ্বের দরবারে এই ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা। এই উদ্দেশ্যে শ্রীরাজ রাজেশ্বরী কলা মন্দির থেকে বিদেশে নৃত্য প্রদর্শনের চেষ্টা চলছে। যার মুখ্য শিল্পী হবে প্রতিমা।

সার্থকনামা প্রতিমার চেহারা এবং ব্যবহার, দুই-ই মনহরণকারী। বাংলার বাইরে বাঙ্গালী মেয়েটি বিশেষ সম্মান পাচ্ছে দেখে আমরা আনন্দিত। সেই খুশীই কানায় কানায় ভরে উঠবে যখন সে শুধু বাংলার বাইরে নয়, ভারতের বাইরেও এমনি গৌরব আহরণ করে আনবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

কানপুর

এখানে বৃষ্টির জল তেমনভাবে গড়িয়ে পড়ে না। একখণ্ড মেঘ দেখার জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় সারাটা আকাশের দিকে। স্বচ্ছ নিজের পাড়ে গিয়েও নাকে রুমাল চেপে গরম বাতাস টেনে নিতে হয়। তারপর শীতের তীব্রতা এতোই বেশী যে চোখ দুটো বাকী রেখে সর্বাঙ্গে গরম আচ্ছাদনে আবৃত রাখতে হয়। বিশেষ করে এই দুটি ঋতুকে নিয়েই কানপুর শহর।

হাওড়া থেকে কালকা মেল-এ চাপলে মাত্র ষোল ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে কানপুর। আর এই কানপুরেই বিশেষ বিশেষ জায়গায় একচেটিয়া বাঙালীরা স্থায়ী অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বাঙালীর সবরকম শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ে হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে দিনযাপন করছেন এখানকার বাঙালীরা। কালীপি রোড ধরে আরমাপুর এস্টেটের দিকে গেলে বাংলার মতো কিছু দৃশ্য এখানে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে। তিরিশ ফুট চওড়া কালীপি রোডের একপাশে অর্ডন্যান্স ফ্যাকটরী, ঠিক বিপরীত দিকে আরমাপুর। এখানে প্রায় তিরিশ শতাংশের মতো বাঙালীরা স্থায়ীভাবে বাস করছেন। বার মাসে তের পার্বন নিয়ে এরা মেতে রয়েছেন সবসময়।

কানপুর শহর জুড়ে একটি মাত্র বাংলা স্কুল, পুরোপুরি বাংলাভাষায় এখানে পড়ানো হয়। আরমাপুরের বাঙালীরা সান্ধ্য সম্মেলনের আসর বসিয়ে নানাবিধ সমস্যার তথা চিন্তা করেন। এর ফলে সান্ধ্য সম্মিলনী বিদ্যালয়ের জন্ম হয় ২রা জানুয়ারী ১৯৪৭-এ। প্রথমদিকে এখানে সেখানে স্কুলটি চললেও ১৯৬২ সালে স্থায়ীভাবে এই বিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। ফি বছর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে পরীক্ষা নিয়ে যান। একদা [illegible] ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করত—১৯৭৭-এ তা এসে দাঁড়িয়েছে [illegible]।

কথাটা শুনে বড় কষ্ট লাগে। অত্যধিক কষ্ট লাগে কোন কোন বাঙালী ছেলে মেয়ের ভাষা সাজপোশাক ও বাংলাভাবার প্রতি উদাসিনতা দেখে। অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা যায় ইংরেজী কিংবা হিন্দি মিডিয়ামে না পড়লে নাকি চাকরী পাওয়া কষ্টকর।

এখানে খেলা ও খেয়াল নামক দু-দুটো পত্রিকাকে নিয়ে বেশ সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, আবৃত্তিকারেরা এসে আই-আই-টি হলে এক গরমাট গরম বাধায় শীতল আবহাওয়া তৈরি করেছেন তাদের স্বলপকথা, গান, আবৃত্তি ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে। আই-আই-টির অমিতাভ ভট্টাচার্য একদিকে যেমন বাঙালীদের কর্ণধার অন্যদিকে তেমনি বঙ্গীয় সমিতি (আই আই টি) সদা প্রস্তুত বাঙালীদের প্রয়োজিত অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করায়।

ভাবলে অবাক হতে হয়, কানপুর শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে সাকোরিতে রয়েছে দু দুটো বাংলা লাইব্রেরী। তরুণের আসর নামক লাইব্রেরীর গোড়া পত্তন হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। বইয়ের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের মতো আর প্রবাসী পাঠাগারে এক হাজারের মতো। আরমাপুরে সান্ধ্য সম্মেলনী পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় দু' হাজারের মতো। মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শুরু করে সত্তর দশকের কবিদের কবিতার বই নিয়ে এই পাঠাগার-গুলো নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে।

নাটকের দিক থেকে কানপুরে খুবই জাঁকজমক। এক সাধারণের মিলিত হয়ে 'প্রতীকী' নামক নাট্যসংস্থার জন্ম হয় ১৯৭৩ সালে। বাংলা নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতীক বলেই তার নামকরণ হয় প্রতীকী। প্রতীকী নামক এই গোষ্ঠী প্রতিবছর একাধিক নাটক পরিচালনা করে অজস্র ধন্যবাদ সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে এসে সংগীতপিপাসু বাঙালীদের পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়েছে। আর কানপুরের স্থানীয় গায়কদের মধ্যে রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কে-না জানে। এছাড়া রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কালীবাড়ী, যেখানে বাঙালীরা গিয়ে কিছুটা সময় ধর্মের নামে মনোযোগ দিতে পারে।

কানপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় বিশ-বাইশটি দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার কয়েকদিন নাটক ছাড়াও দু-এক জায়গায় যাত্রার আসর বসে। যাত্রানুরাগীরা নিশ্চয়ই তা মন দিয়ে উপভোগ করেন।

ভক্তিব্রত দেব

ভূপাল

ভূপাল। একে তাল, তলাইয়ার শহর বলা যায়। মানে, বড় দুই দীঘি ও জলাশয়ের সমষ্টি দিয়ে ঘেরা। দু শরিকের ভাগ বাঁটোয়ারার মত পুরাতন ও নূতন শহর নিয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের রাজধানী।

পুরাতন ভূপাল মসজিদ আর অতীতের মরাবের মহলের সুউচ্চ মিনারের চাকচিক্য নিয়ে বড় ও ছোট তালের (তলার নামে প্রচলিত) পাশে অবস্থিত। অনেক ছোট ছোট নদীর জলধারা এসে ভূপালের শহরে গাম্বরের গায়ে আটকা পড়ে বিশাল কৃত্রিম লেকের আকার ধারণ করেছে। এ জলাধার প্রায় ২০ স্কোয়ার মাইল জায়গা জুড়ে কূল কিনারাহীন হ্রদের আকার ধারণ করেছে। শহরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গপথে এই জলধারাকে নিষ্কাশিত করার পথে যে খাল পড়ে তা খুল পোকতা নামে খ্যাত।

ছোট ছোট পথ। গলি। লাগোয়া বাড়ী। সীমানা চিহ্নিত করাই মুস্কিল। তবে ১৯৫৬ সালে নূতন রাজধানী হবার পর থেকে পুরোনো ভূপালের পথ সংস্কার, জল বিতরণের ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক নর্দমা এসে বড় লেকের জল দূষিত করেছে। শ্রীমহেশ নীলকণ্ঠ বুচ, রাজধানীর প্রশাসক হয়ে এসে পুরাতন এবং এমনকি নূতন শহরের অনেক ভোল পাল্টে দিয়েছেন। কেউ তা না দেখলে এ মনোমুগ্ধকর পরিবর্তন অনুভব করতে পারবে না। হাউসিং বোর্ডও সমান তালে গৃহের পর গৃহের সমষ্টি সাজিয়ে যাচ্ছে সর্বস্তরের জনগণের জন্য। হাউসিং বোর্ডও মিঃ বুচের অধীনে। উনি চেয়ারম্যান।

দুই জেলারিশিষ্ট অতীতের ভূপাল রাজ্যের চীফ কমিশনারের যে বাসভবন ছিল, যা বর্তমান গভর্নর হাউসের যেখানে শেষ সেই রোশনপুরা নাকা, সেখান থেকে নূতন ভূপালের শুরু। এখানে পুরো জঙ্গল ছিল। দিনে দলবদ্ধ হয়ে লোক যাতায়াত করত। এরই এক জায়গাকে চোর ইমলী (তেঁতুল) বলে এখনও লোকে। এই দু সারী পাহাড়ের গায়ে যে নূতন শহর গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রথমে চীফ সেক্রেটারী হতে শুরু করে কেরানী, পিওনের বাস।

নূতন শহরতলী। টি টি নগর। সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক তাঁতিয়া টোপের নামে উৎসর্গিত। সুন্দর ঘরবাড়ী। ঝকঝকে রাস্তা। বর্ষাতেও কোথাও গাড়ী অথবা জলে রসে কাঁদুনী লাগে না। বৃষ্টির জলধারা উপলব্ধি হয়। রাস্তা কর্দমাক্ত হয় না। বর্ষার জল পাহাড়ী শহরের মাটির বুকে দৃশ্য, অদৃশ্য নালা, গর্তের মধ্যে হুস করে মিলিয়ে যায়। সুদৃশ্য পার্ক আছে অনেক। নানা নাম। যেমন ময়ূর, কলেজাক। চমৎকার সুইমিং পুল। সর্বজন ব্যবহার করতে পারে, সামান্য দক্ষিণা দিয়ে। কোলাহলীন্য বর্জিত।

টি টি নগর কয়েক ভাগে বিভক্ত। নর্থ সাউথ। এই শেষ নয়। কোথাও ১২৫০, ১৪৬৪, ৪৫ বাংলো, ৭৫ বাংলো—এই নাম-গুলি এখানকার লোকের উচ্চারণ করতে অথবা কোন পথচারী বা আগন্তুকের প্রশ্নই উক্ত স্থানের পরিচয় বলে দেবে। কোন কারণের কত উচ্চ বেতনের সরকারী কর্মচারী বাস করে, মহল্লার নাম শুনে মনে বিস্ময় জাগে।

বাঁ দিকের মোষের পীঠের মতো দেখতে পাহাড়ের নিচের দিকে এম-এম-এ রেস্ট হাউস, উপরে মধ্যস্থলে ভগবানের আলয় (লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, কথিত বিড়লা মন্দির নামে খ্যাত), অন্য নামকে শাসকদের রঙ্গমূর্তির আসন (সেক্রেটারিয়েট)—যা আগরার কেল্লার অনুকরণে লাল পাথরের সংমিশ্রণে তৈরি। এর সামনে আরও দুটি বৃহৎ নির্মীয়মান।

১৪৬৪ মহল্লার যেখানে শেষ—তারপর গড়ে উঠেছে বেসরকারী কলোনী। এরেরা কলোনী। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থেকে শুরু করে আপামর জনগণ সবাই জমি ক্রয় করে বাড়ী তৈরি করেছে। ছোট্ট আশা নিয়ে ক্ষুদ্র গৃহ যেমন আছে, উচ্চাভিলাষীদের সুদৃশ্য অট্টালিকাও স্থান পেয়েছে।

এখানে পুরোনো বাঙ্গালী বাসিন্দা কেউ নেই, মানে পুরুষানুক্রমে বাস। নানা স্থান থেকে কার্যপলক্ষে এসে আস্তানা পেতেছে। কেউ কেউ নিজ বাসস্থান তৈরী করেছে। প্রবাসে থেকেও ভূপালের সাধারণ মেয়ে জয়া ভাদুড়ী, চিত্রপটে অনেক বড় মায়াজাল তুলে ধরেছে।

বঙ্গসন্তানরা প্রতিবর্ষের ন্যায় প্রাক্কে পূজার মিটিং করতে প্রস্তুতি পর্বে মেতে উঠেছে। চাঁদা, প্রসাদ বিতরণ, থিয়েটার নিয়ে তর্কের রোল উঠবে কালীমূর্তি বিহীন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। এদৃশ্য সাপের মত আঁকাবাঁকা রেললাইন দ্বারা বিভক্ত, অপর পারে হেভী ইলেকট্রিক্যালস-এর কালীবাড়ী প্রাঙ্গণও দেখা যাবে। সেখানে অবশ্য মৃন্ময়ী মূর্তির স্থাপনা হয়েছে। মা, দুর্গাদেবী আসছেন। অতএব ভক্তরা উত্তরাঙ্গ তুলছে।

অনিল রায়

বহরমপুরে শরৎচন্দ্র

গোপালচন্দ্র রায়

মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভার বাংলা শাখার সভাপতি ছিলাম আমি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ত্রিদিব চৌধুরী এম-পি। নাগপুরের এই সভায় ত্রিদিববাবু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। সভা শেষে এই নিয়েই আমি সেদিন তাঁকে কয়েকটি প্রশ্নও করেছিলাম। ত্রিদিববাবু সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যা যা বলেছিলেন, তা এই—আমি তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ি। সেটা ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের কথা। খুব সম্ভব তখন আগস্ট মাস। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার বহরমপুর যান। তখনকার দিনে কলকাতা থেকে রাত্রি দশটা এগারোটা নাগাদ একটা 'জালগোলা প্যাসেঞ্জার' ছাড়ত। ঐ ট্রেনটা পরের দিন ঠিক সকালেই বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছত।

শরৎচন্দ্র ঐ রাত্রের ট্রেনে চেপে সেদিন সকালে বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি বহরমপুর শহরে গিয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে সৈদাবাদে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'সৈদাবাদ হাউসে' উঠেছিলেন। ঐ বাড়িতে এখন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী হয়েছে।

এই সৈদাবাদেই মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর মাসীমা মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নামে তখন ছিল 'স্বর্ণময়ী ক্লাব'। শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন ঐ স্বর্ণময়ী ক্লাবের এক বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে 'স্বর্ণময়ী ক্লাবে' আসবেন শুনে আমরাও আমাদের 'যুব সমিতি'র এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। সকালে ছিল স্বর্ণময়ী ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, ঐ সভার পর বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় তিনি আমাদের যুব সমিতির সভায় আসবেন বলে কথা দেন।

আমাদের যুব সমিতি ছিল বহরমপুরের গ্রান্ট হলে। গ্রান্ট হল শহরের মাঝখানে। এর নিকটেই ছেলেদের ও মেয়েদের কলেজ এবং ছাত্রাবাস ইত্যাদি।

সকালে স্বর্ণময়ী ক্লাবের সভার পর স্নানাহার সেরে শরৎচন্দ্র নৌকায় করে সৈদাবাদ থেকে মাইল চার দূরে মুর্শিদাবাদ শহরে গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তে এলাহিগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখতে যান। তারপর সেখান থেকে নৌকায় বহরমপুর ঘাটে আসেন। যুব সমিতির সভ্যরা ঘাট থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গ্রান্ট হলে তাঁকে নিয়ে আসেন।

আমরা শরৎচন্দ্রকে সেদিন যে অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলাম সেটি লিখেছিলেন, যুব সমিতির সভাপতি [illegible] বসু সর্বাধিকারী। এই অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা নিয়ে লেখা হয়েছিল—তুমি শিখায়েছ স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।

শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে এই কথার সূত্র ধরেই বলেছিলেন—মানুষের জন্মগত অধিকার নয়, মনুষ্যত্বের অধিকার। মানুষ হয়ে জন্মালেই স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।

আমাদের সভার পর আমি শরৎচন্দ্রকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। সে প্রশ্নটা এই—আপনি কোন্ বিপ্লবীকে দেখে আপনার পথের দাবীর সব্যসাচী চিত্রিত করেছেন?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—আমি কোন বিশিষ্ট একজনকে আদর্শ করে সব্যসাচী লিখিনি। এই রকম একটা লোক সামনে আসুক, যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লড়াই করে যেতে পারবে। এইটাই আমি চেয়েছি। সেই আদর্শটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি বইটা লিখেছি। সব্যসাচী তোমাদের জন্যে।

আমরা শরৎচন্দ্রকে যে মানপত্রটা দিয়েছিলাম, সেটা কারও কাছে আছে কিনা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে। অনেকে তো মারাই গেছেন।

ত্রিদিববাবুকে আমি সেদিন শেষ প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি কি নলিনীকান্ত সরকারের 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বইটা পড়েছেন? তাতে নলিনীবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র একবার তাঁর কি একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহরমপুরে গেলে, তাঁর অনুমতি নিয়েই স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেন। সভার সময় স্থির হয় বিকাল ৫টায়। শরৎচন্দ্র আহারের পর মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর এস্টেটের ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে যান। দেখা হলে গঙ্গার ধারে বসে যতীনবাবুর সঙ্গে গল্প করেন। সভার সময় চলে যাচ্ছে—যতীনবাবু বার বার একথা বলা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র নানা অছিলায় আরও অনেক দেরি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় আর গেলেনই না। নলিনীবাবু লিখেছেন, একথা তিনি যতীন সেনগুপ্তর মুখে শুনেছেন।

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীরও উদ্যোগে শরৎচন্দ্রকে যে একবার 'বোট পার্টি'তে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন হয়েছিল, একথা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য শিষ্যা বহরমপুরের নিরুপমা দেবীও তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সম্বর্ধনা সভায় এসেছিলেন কি আসেননি, এ সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী ঠিক বলতে পারেননি। তবে সভার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অথবা শরৎচন্দ্র আসছেন না, এ নিয়ে সে সভায় গুঞ্জন হয়েছিল, একথা তিনি লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র যেদিন আপনাদের যুব সমিতির সভায় এসেছিলেন, সেদিনই কি বিকালে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল? আপনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন?

উত্তরে ত্রিদিববাবু বললেন—শরৎচন্দ্রকে সেদিন সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা আমার মনে নেই। তবে এটা আমার বেশ মনে আছে, শরৎচন্দ্র আমাদের সভায় এসেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময়। তিনি আসবেন কি আসবেন না—এই ভেবে ভেবে সভায় অনেকেই তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। লোকে ঐ রাত্রি পর্যন্তই তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলেন। তিনি এলে সকলেই খুশী হলেন।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে গিয়ে কবি যতীন সেনগুপ্তকে নিয়ে যে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের আবার একটা লেখা (শরৎ-স্মরণীয়) এখন চোখে পড়ায় দেখছি, তাতে তিনি লিখেছেন—শরৎচন্দ্র এবং যতীনবাবুর সঙ্গে সেদিন সাবিত্রীবাবুও গিয়েছিলেন।

সাবিত্রীবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র সেবার বহরমপুরে গিয়েছিলেন, সেখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ নিয়ে। আর সেই সভাতেই শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চারটে নাগাদ তো তোমাদের সভা—বলে শরৎচন্দ্র দুপুরের পর মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন সিরাজের কবর দেখতে। কবর দেখে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসে সৈদাবাদ রাজবাড়ির ফটকে যখন ফেরেন তখন সাড়ে ছটা বেজেছে। দেরি হওয়ায়—না খুব অন্যায় হয়ে গেল—বলে শরৎচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না।

এতে সাবিত্রীবাবু ও যতীনবাবু বিবর্ণ মনে সভায় খবরটা দেবার জন্য যখন আসছেন, এমন সময় পথে শুনলেন, সভায় হাজারখানেক লোক হয়েছিল, মহিলারাও এসেছিলেন। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী হাত জোড় করে সভাস্থ সকলকে বলেন, বুঝতে পারছি না, শরৎবাবু কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? লোক পাঠিয়েছি, সে এখনো ফিরে আসেনি। আপনারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন।—এরপর নমঃ নমঃ করে সভা শেষ হয়েছে।

সাবিত্রীবাবু লিখেছেন—পরের দিন সকালে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম তিনি রাত্রির গাড়িতেই কলকাতা ফিরে গেছেন।

এখানে শরৎচন্দ্রের বহরমপুরে সভা করতে যাওয়া নিয়ে, ত্রিদিববাবু, নলিনীবাবু

ও সাবিত্রীবাবু—এঁদের তিনজনের কাহিনীতে কিছু ভিন্ন রূপ থাকলেও, সকলেই কিন্তু বলছেন—শরৎচন্দ্র বহরমপুরে গিয়ে মুর্শিদাবাদে সিরাজের কবর দেখতে গিয়েছিলেন। তাই মনে হয় শরৎচন্দ্র বহরমপুরে সভা করতে একবারই গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে গেলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে গিয়েছিলেন, না স্বর্ণময়ী ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে গিয়েছিলেন, না ব্যক্তিগত প্রয়োজনে? আর শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনার ব্যবস্থাটা কৃষ্ণনাথ কলেজে হয়েছিল না গঙ্গাবক্ষে বোটে?

আর শরৎচন্দ্র মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেখানে দেরি করে সম্বর্ধনা সভায় আসেননি, এটাও ঠিক বলে মনে করি, কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে সৈদাবাদ রাজপ্রাসাদে গিয়েছিলেন না যুব সমিতির সভায় এসেছিলেন?

এঁদের পরস্পরের কথায় অসঙ্গতি থাকলেও, সাবিত্রীবাবু কথিত কৃষ্ণনাথ কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের উদ্যোক্তারা মাত্র সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সভা আরম্ভ করেন এবং নমঃ নমঃ করে সভা শেষ করেন। আর শরৎচন্দ্র রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় ফেরেন—এই কথাগুলোয় কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়। সন্দেহের কারণ, এইজন্য যে, শরৎচন্দ্র যখন একবারই বহরমপুরে সভা করতে গিয়েছিলেন, তখন এ সম্পর্কে সকলের বর্ণনা এক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা না হয়ে ভিন্নরূপ হচ্ছে বলেই।

এ সম্পর্কে বহরমপুরের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ সেনের পৌত্র শোভেন্দ্রমোহন সেনকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শোভেন্দ্রবাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি বলেন—শরৎচন্দ্র ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সৈদাবাদ রাজবাড়ির নিকটেই এক পৃথক বাড়িতে অবস্থিত মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল নিঃস্ব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা এবং আর্ত ও রোগীর সেবা করা। সমিতির নিজস্ব ভবনে 'ইনডোর গেমে'রও ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতি বছর মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর সদর ঘাট থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাট পর্যন্ত—এই ৭২ কিলোমিটারের যে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতা চলছে, সেই প্রতিযোগিতার প্রবর্তক ঐ মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতিই। অবশ্য প্রথমে ঐ প্রতিযোগিতা হত বহরমপুর শহরের উত্তর সীমান্তের কুঞ্জঘাটার জলকল ঘাট থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাট পর্যন্ত, ১২ কিলোমিটার।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র সেবার বহরমপুরে গিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরে সিরাজদ্দৌলার কবর দেখতে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য। যদিও আমি তখন বালক ছিলাম, তাহলেও সেদিনের কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। তাছাড়া পরবর্তী জীবনেও অনেকের মুখে শরৎচন্দ্রের ঐ সমিতির বার্ষিক উৎসবে আসা এবং সিরাজদ্দৌলার কবর দেখতে যাওয়ার কথা শুনেছি। তবে শরৎচন্দ্র কবর দেখার পর কোন সভায় গিয়েছিলেন, কি যাননি, তা বলতে পারব না। সে কথা আজ আর মনে নেই। আর এটাও ঠিক যে শরৎচন্দ্র বহরমপুরে এসে একবারই ঐ কবর দেখতে গিয়েছিলেন।

সম্প্রতি শরৎচন্দ্রকে দেওয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির সভ্যদের একটি মানপত্র আমার হাতে এসেছে। তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজ বা কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে যাননি, গিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক উৎসবেই। আর বোট পার্টিতে অথবা কলেজে যেখানেই তার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়ে থাক, তিনি সিরাজদ্দৌলার কবর দেখে দেরি করে শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় যাননি। তবে এলাহিগঞ্জ থেকে সিধা ত্রিদিববাবুদের যুব সংঘের সভায় গিয়েছিলেন।

স্বর্ণময়ী সমিতির দেওয়া মানপত্রটি এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাই সেই মানপত্রটি এখানে দিলাম—

দিগন্তবিস্তৃতকীর্তি স্বনামখ্যাত বহুদর্শনজ্ঞানসম্পন্ন বঙ্গগৌরব শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

মহানুভব শ্রীকরকমলে—

মহাত্মন্!

মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুণ্যময় নাম ও স্মৃতিবিজড়িত এই ক্ষুদ্র সমিতির স্বল্পসম্পদবিহীন সভ্যবৃন্দ আজ আপনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এই ক্ষুদ্রায়তন সমিতি ভবনে উপস্থিত। কিন্তু আপনার দয়াপ্রণোদিত শুভাগমনের অপার আনন্দের আমাদিগের কণ্ঠ রুদ্ধ এবং অভিবাদনের উপযুক্ত ভাষার দীনতা প্রযুক্ত আমরাও লজ্জাহীন। আপনার বিহিত পূজার কোন উপায়ই আমাদিগের নাই। আছে কেবল হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আপনি নিজগুণে আমাদিগের শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন এই দীন অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

হে নরনারী হৃদয়ভারতরঙ্গ লীলার সুমহান দ্রষ্টা! আপনি বাঙ্গালা দেশের অতীত গৌরব বিজড়িত মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এই ক্ষুদ্র সমিতির সামান্য কয়েকজন যুবকের সনির্বন্ধ প্রার্থনা পূরণ করিয়া শুধু আমাদিগকে নহে—সমগ্র মুর্শিদাবাদবাসী বিশেষত এই নগরবাসীগণকে দর্শন দিয়া ধন্য করিলেন।

হে বাণী-বরনন্দন! আপনি এই মহাভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া বাগ্দেবীর পবিত্র কোমল অঙ্গ যে দিব্য জ্যোতির্ময় অলঙ্কার দ্বারা পরিশোভিত করিয়া তাঁহাকে অলৌকিক শ্রীসম্পন্না করিয়াছেন, বাগ্দেবীর সে মূর্তি আপনার দেশবাসীর হৃদয়পটে অবিরত বিরাজমান। আপনার নাম বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের বালক, বালিকা, কিশোর, কিশোরী, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেরই মুখে নিরন্তর উচ্চারিত। আমরা আজ এই অভিনন্দন প্রদানের সঙ্গে ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনি নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন এবং আপনার প্রদত্ত সাহিত্য-ভাণ্ডারে অজস্র রত্নরাজি বিতরণ করুন 'গৌড়জনে যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

গুণমুগ্ধ বিনীত
স্বর্ণময়ী সমিতির সভ্যবৃন্দ

স্বর্ণময়ী সমিতি ভবন
সৈদাবাদ
খাগড়া পোঃ মুর্শিদাবাদ
১০ই ভাদ্র, ১৩৩৫

এই মানপত্রের বক্তব্যটি কমলা রংয়ের একখণ্ড দামী সিল্কের কাপড়ের উপরে মুদ্রিত।

পূজায় মনোরম শাড়ী ও গোঞ্জ
রেঙ্গল হোসিয়ারী
৫৪৫, জি.টি. রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

খেলা

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এ বছরের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের কাছে তাদের পূর্ব অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। গত বছর মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছিল। এ বছর তা হল না। ইস্টবেঙ্গল হয়েছে লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং মোহনবাগান একাই আই এফ এ শীল্ড জয়ী।

মোহনবাগান এ পর্যন্ত ২৫ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে শীল্ড জয়ী হয়েছে ১১ বার, হেরেছে ১০ বার এবং তাদের ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৪ বার (রাজস্থানের বিপক্ষে একবার এবং ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ৩ বার)। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল ২৪ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলে শীল্ড দখল তুলেছে ১৫ বার, রানার্স-আপ হয়েছে ৬ বার, এবং তাদের ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৩ বার (বিপক্ষে মোহনবাগান)।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে এই নিয়ে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সঙ্গে খেলেছে ১৬ বার। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইস্টবেঙ্গলের জয় ১০ বার (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী দুবার), মোহনবাগানের জয় ৫ বার (এর মধ্যে যুগ্মবিজয়ী দুবার) এবং খেলা পরিত্যক্ত ৩ বার।

গত ৮ বছরে (১৯৭০-৭৭) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলার আসরে ইস্টবেঙ্গল অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছে। এই ৮ বছরে (১৯৭০-৭৭) ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৭ বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৬ বার—রেকর্ড)। এই সময়ে মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১ বার (১৯৭৬ সালে)। গত ৮ বছরে আই এফ এ শীল্ডের খেলায় ইস্টবেঙ্গল শীল্ড জয়ী হয়েছে ৬ বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৫ বার—এককভাবে ৫ বার এবং যুগ্মভাবে ১ বার—রেকর্ড)। অপরদিকে মোহনবাগান গত ৮ বছরে শীল্ড পেয়েছে ২ বার—১৯৭৬ সালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে এবং ১৯৭৭ সালে এককভাবে।

এখন ১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলার প্রসঙ্গে আসা যাক। দুই দলই স্নায়ুর চাপে জর্জরিত হয়ে খেলা শুরু করেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে মোহনবাগানের কিন্তু বেশী সময় লাগেনি। তারা শেষ সময় পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছিল। ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেক বেশী উদ্যম, মানসিক দৃঢ়তা এবং ক্রীড়াগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল মোহনবাগান। মোহনবাগান যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে। তারা যে-রকম দাপটে খেলেছিল তাতে তাদের বেশী গোলের ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল সংঘবদ্ধ হয়ে খেলতে পারেনি। লড়িয়ে দল হিসাবে তাদের যে খ্যাতি, এই দিনের খেলায় তারা তার কোন পরিচয় দিতে পারেনি। তারা আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়েছিল।

রেফারী কড়া হাতে খেলাটি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ফাউল সম্পর্কে যে অ্যাডভান্টেজ রুল আছে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেননি। ফলে দু-দলেরই ক্ষতি হয়।

প্রথমার্ধের খেলাটা হয়েছিল এলোমেলো। দু-দলেরই খেলোয়াড়রা বেআইনীভাবে গায়ের জোরে খেলেছিলেন। ফলে খেলা উপভোগ্য হয়নি। প্রথমার্ধের খেলায় মোহনবাগানের প্রাধান্য থাকলেও সমগ্র খেলাটি কোন সময়েই উঁচু মানে উঠতে পারেনি। প্রথমার্ধের খেলায় উল্লেখ করার মত দুটি সট ছিল। প্রথমটি গৌতমের এবং দ্বিতীয়টি সুরজিতের। খেলার ১৪ মিনিটে গৌতম এক জোরালো ফ্রিকিক করেন। বলটি ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ভাস্করকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে অল্পের জন্যে গোলে না-ঢুকে বারে লেগে মাঠের বাইরে চলে যায়। অপরদিকে সুরজিতের কর্ণার কিক থেকে বলটা বিপদজনকভাবে বাঁক নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যায়। মোহনবাগানের গোলরক্ষক শিবাজী খুব তৎপরতা এবং দক্ষতার সঙ্গে বলটা ধরেছিলেন। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান দাপটে খেলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মোহনবাগানের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণাত্মক ক্রীড়া দক্ষতার খেলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। মোহনবাগানের আক্রমণের চাপে পড়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের হিমসিম খেতে হয়েছিল। গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীর অসাধারণ খেলার জন্যেই ইস্টবেঙ্গল এ যাত্রা মাত্র এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। তাছাড়া খেলার শেষ দিকে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা ইস্টবেঙ্গলের গোল সীমানায় বল পেয়ে গোলে বল মারতে অযথা দেরী করায় এবং বল নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় গোল করার একাধিক সুযোগ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৬৩ মিনিটের মাথায় মানস ভট্টাচার্যের জায়গায় আকবর খেলতে নেমে খেলার মোড় মোহনবাগানের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন। এর মিনিট চারেক পর হাবিব এবং আকবরের যৌথ চেষ্টায় বলটা শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের পেনাল্টি সীমানার মধ্যে শ্যামের পায়ে আসে। এবং শ্যাম সুন্দরভাবে বল মেরে দলের জয়সূচক গোলটি করেন ৬৭-মিনিটের মাথায়। মোহনবাগান খেলোয়াড় বদলী করে যেমন লাভবান হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল তেমন হয়নি। এ বছরের লীগের খেলায় সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন রঞ্জিৎ মুখার্জি। তাঁকে বসিয়ে প্রদীপ দত্তকে নামিয়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলার কোন উন্নতি হয়নি। মোহনবাগান খেলার শেষ দিকে ইস্টবেঙ্গলকে আত্মরক্ষায় একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিল। ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য খুব ভাল যে, তাদের বেশী গোল খেতে হয়নি।

মোহনবাগানের পক্ষে ভাল খেলেছিলেন অধিনায়ক সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম, প্রসূন, বিদেশ, শ্যাম এবং আকবর। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে অধিনায়ক শ্যামল ঘোষ, ভাস্কর এবং মনোরঞ্জন। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী একাধিকবার অবধারিত পতন থেকে দলকে রক্ষা করেন। খেলার শেষ দিকে মনোরঞ্জন তিনবার বিপদের আশু সম্ভাবনা থেকে দলকে উদ্ধার করেন।

দুই দলের খেলোয়াড়

মোহনবাগান : শিবাজী ব্যানার্জি; সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী এবং দিলীপ পালিত; গৌতম সরকার এবং প্রসূন ব্যানার্জি; মানস ভট্টাচার্য (আকবর), শ্যাম থাপা, হাবিব এবং বিদেশ বসু।

ইস্টবেঙ্গল : ভাস্কর গাঙ্গুলী; চিন্ময় চ্যাটার্জি, শ্যামল ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শ্যামল ব্যানার্জি; সমরেশ চৌধুরী এবং প্রশান্ত ব্যানার্জি; উলগানাথন, রঞ্জিত মুখার্জি (প্রদীপ দত্ত); মিহির বসু এবং সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

দর্শক

নাটক

দুঃস্বপ্নের নগরীতে উৎপল দত্ত

কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবার পথে। দেশ এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রগতিপ্রেমী ছোটো-বড়ো-মাঝারি কর্ণধারদের বিচিত্র জনসেবা। দেশপ্রেম। কলকাতার চোখধাঁধানো আকাশচুম্বী বাড়ি। রাস্তাচুম্বী নতুন অ্যামবাসাডর কি বিদেশী গাড়ির মিছিল। এ কালের এই সব দৃশ্য-ধ্বনির ভিতর-কার ধাপ্পা, আড়ালের ধুরন্ধর ধান্দাবাজি কেউ যদি নিপুণ শিল্পপ্রতিভায় তুলে ধরেন, মিথ্যে ওইসব স্লোগান আর জৌলুশের ফানুস ফাটিয়ে মুমূর্ষু মানুষের দুঃখ-জ্বালা কোনো নাট্যদল যদি নাটকে বাঁধেন, তাহলে সেটা একটা মস্ত কাজ হয়। যুগ যুগ ধরে জিয়ানো শোষণের ইতিকথা মনে রাখলে, শেয়াল-শকুনে খোবলানো আমাদের এই সময় চোখে রাখলে এই ধরনের নাটক বাঁধা, মঞ্চ-সাধাকে একটি মহান কৃত্য বলতেও আমার বাধে না। কে না জানে, শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে নাটকই সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।

বাংলা মঞ্চের মহান প্রতিভা উৎপল দত্ত দীর্ঘকাল নাটককে এভাবেই ভেবে আসছেন, প্রয়োগ করছেন, রচনা ও পরিচালনা করে চলেছেন। তাঁর হাতে নাটক হয়ে ওঠে অস্ত্র। তাঁর গোড়ার দিককার নাট্যচর্চায়, যেমন 'অঙ্গার'-এ নাটককেই তিনি অস্ত্র করে তোলেন, অস্ত্রশস্ত্রে-স্লোগানে নাটক সাজান না। ক্রমেই সেদিকে তিনি এগিয়েছেন। এখানেই তিনি, এভাবেই তিনি নীলদর্পণ কি রক্তকরবীর অমরতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ওই সব নাটকও তো অস্ত্রই। লড়াইয়ের হাতিয়ার। অঙ্গার-এ তাপস সেন, কি ফেরারী ফৌজ-এর ত্রিমাত্রিক মঞ্চ বাদ দিলে, ওই পর্বে নাট্যকার উৎপল দত্তের পূর্বপুরুষ হিসেবে নীলদর্পণ-এর নাট্যকারকে অংশত চিনে নেয়া যায় না? প্রযোজনার প্রকরণের ধরণধারণ তো বদলাবেই, যে-কোনো শিল্পেই প্রকরণের ইতিহাস তো আসলে তা বদলেরই ইতিহাস।

নীলচাষীদের জ্বালাযন্ত্রণা, রক্তকরবী-মুক্তধারা দেখেও কিন্তু আমরা জ্বলে উঠি। দর্শকের সেই জ্বলে-ওঠাই কি বড়ো অস্ত্র নয়? উৎপল দত্ত বেশ কিছু কাল ধরে ওই অঘটন-পটিয়সী প্রতিভায়, অপূর্ব নির্মাণক্ষমতায় আস্থা

অমর আকবর অ্যান্টনি ছবিতে অমিতাভ বচ্চন

খুইয়েছেন। তাঁর রচনা ও পরিচালনায় তিনি যে শিল্প গড়ন, নাট্যগুণ-টুন একেবারে ঝেড়ে ফেলতে উঠে-পড়ে লেগেছেন, শুধু তাই নিয়ে কোনো নালিশ সাজে না—ভাস্কর্য ভাস্কর্যহীনতার দিকে, কবিতা অকবিতার দিকে, গল্প নাটক কবিতা অকবিতার দিকে, গল্প গল্পহীনতার দিকে, নাটক নাটকশূন্যতার দিকে যেতেই পারে, হামেশাই যায়। কিন্তু কোনো নতুন গড়ন, নবীন মাত্রা না পেলে সেই নতুন চর্চার আর মানে কী?

আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ ক'দিন আগে পি-এল-টির দুঃস্বপ্নের নগরী দেখে এই সব কথা মনে এলো। রচনা ও পরিচালনা উৎপল দত্তের। তার মানে আমাদের পরম বিস্ময়কর নাট্য-প্রতিভার। তাঁর কাজ দেখে আমি নতুন করে মুগ্ধ হয়েছি, নতুন করে নিরাশ হয়েছি।

কলকাতার গত কয়েক বছরের রাজনীতিকে নিপুণ হাতে প্রথম থেকেই মঞ্চে তিনি বেঁধে ফেলেছেন। ওই সময়ের রোজকার বাস্তবতা, রোজকার রাজনীতি। এমন-কী সিগারেট, জুতো, এয়ার লাইন্স ইত্যাদি মুনাফালিপ্সু ব্যবসায়িক নিয়ন-লাইট, বিজ্ঞাপনলিপির সঙ্গে 'বন্দুকের

নলই শকতির উৎস', 'যাও সে তুঙ' এই সব লিখন, সুচিত্রা-কণিকা-দেবব্রত-হেমন্ত-বাণী ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীতের আসরের পোস্টার—ইত্যাদির ব্যবহার স্থান-কালকে মঞ্চে আমূল তুলে এনেছে। ওই আবহে রাইফেল-বন্দুক হাতে জ্যান্ত পুলিশ, মাথার ওপর হাত তুলে থাকা কলকাতার জীবন্মৃত মানুষ, মাননীয় মজুতদার দেশচালক, মান্যবর ঘুষ কংগ্রেস নেতা, মঞ্চের আরেক আয়তনে একদিকে টেলিফোন অপারেটর, আরেক দিক এদের

যাত্রার ইতিহাসে এই প্রথম

একই সঙ্গে চারটি পালার

নাম ভূমিকায়

রুবীদত্ত

বঙ্কিম চন্দ্রের

দেবী চৌধুরানী

নন্দ চৌধুরীর

রানী দুর্গাবতী

গৌরাঙ্গ ঘোষের

রানী রাসমণি

তারাশঙ্করের

মঞ্জরী

সঙ্গে আছেন: কালীদাস গাঙ্গুলী
অজেয় মুখার্জী, প্রণব ব্যানার্জী
এবং শচীন ভট্টাচার্য ও
অনুপ কুমার
সুপর্ণা দেবী
সীমা সরকার, মঞ্জু ব্যানার্জী
অঞ্জলি ভট্টাচার্য ও আরও
অনেকে

সমকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কল্যানী অপেরা

১০৪/১এ বিডন স্ট্রীট (চিৎপুর মোড়)
কলিকাতা-৬

যামনা চলছে

অগ্রহায়ন ও পৌস মাসের
জন্য নর্থ বেঙ্গল ও আসামের
যামনা চলছে

ময়না ছবিতে সুমিত্রা মুখার্জি ও রঞ্জিত মল্লিক।

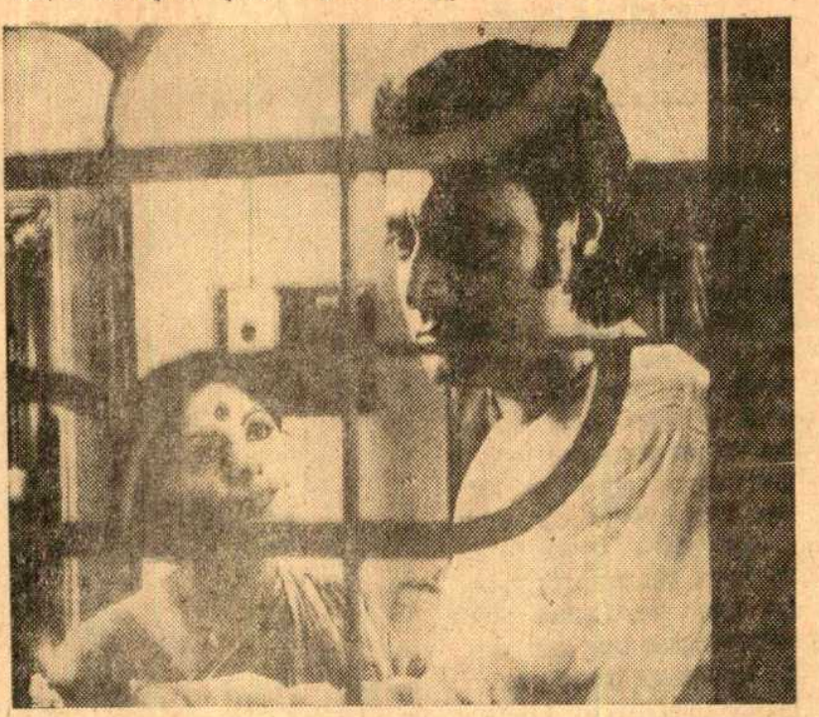

হাতের পুতুল, বিবেক দংশনে কাতর খুনে যুবক—এই কটকটে বাস্তবতা নাটকের গোড়াতেই আমাদের এক হ্যাঁচকায় নাটকের মূল প্রবাহে টেনে নেয়। পর্দা উঠতেই, রকত ও প্রগতির বাণী মাখা সেই সময়ের মধ্যে আমি তো প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম। সে-ই আমার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়া, পি-এল-টির প্রতি, উৎপল দত্তের উদ্দেশে।

তারপর মঞ্চ জুড়ে শুরু হয়ে গেলো প্রবন্ধ। রাজনৈতিক তত্ত্বকথা। দলীয় ভাষা ও বিশ্লেষণ। রোজকার খবরের কাগজ। এসব নিয়েও নাটক হয়, শুধু একদিনের খবরের কাগজ থেকেও সার্থক নাটক হতে পারে, হয়তো শুধু উৎপল দত্তের হাতেই হতে পারতো। কিন্তু আগেই বলেছি ,ওই প্রতিভায় তিনি আর বিশ্বাস করেন না। ফলে যা হবার তা-ই হলো। চমৎকার রঙ্গরসিকতা, মনোরম বিদ্রূপ, বিদগ্ধ বিশ্লেষণ। ছিলো অজস্র উপকরণ অব্যবহৃত অপরিসীম সম্ভাবনা। মাঝে-মধ্যে দু-একটা প্রবল মুহূর্তও পাইনি তা নয়। স্টাইলাইজেশনের সহযোগিতাও ছিলো, সংলাপে ভারসিফিকেশন, সংবাদপত্রের সাধুভাষা—প্রকরণগত কারুকর্মের ঘাটতি ছিলো না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওই টুকরো টুকরো কারুকর্মই। সব মিলিয়ে কোনো সমগ্রতায় দানা বাধে না। ফলে কোনো এক রাষ্ট্রনায়কের দেয়া খেতাব 'দুঃস্বপ্নের নগরী' শুধু কতোগুলি আলগা নাটকীয়তায়, সাংবাদিক বাস্তবতায়, কি নাটকের শুরু ও শেষের দুটি আবেগকাঁপা গানে সুখস্বপ্নের নগরী হয় বটে, লাল সূর্য-টূর্যও ওঠে, কিন্তু সে-সবই মনে হয় সিনে আঁকা, দর্শকের হৃদয়ে তার কোনো আঁচড় লাগে না।

শিল্প-সাহিত্য স্বেচ্ছাচারিতা সয় ঠিকই, কিন্তু শুধু সক্ষমের স্বেচ্ছাচারিতাই সয়। আর নাটককে শিল্প থেকে ছিঁড়ে আনবেন—এতো জোর কোনো নাট্যকার কি নাট্যপরিচালকের হাতে নেই।

—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মন্থন

বোধহয় বছর খানেক আগে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাটক দেখেছিলাম রবীন্দ্রসদনে। তার মূল কথা ছিল ছাত্রদের চরিত্র ও দেহ গঠন। একজন আদর্শবাদী মাষ্টার (?) ছিলেন তাদের দীক্ষাগুরু। সেই নাটকে আদর্শের কথা-টথা ছাড়াও ছাত্রদের দিয়ে মঞ্চেই শরীরচর্চা (প্যারালাল বার, রিং, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি) দেখানো হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত শ্লথগতি নাটক বলে সম্পূর্ণ রস উপভোগ করা সেদিন সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি দেখা রূপান্তরীর 'মন্থন' নাটকও সেই ছাত্রদের নিয়েই এবং এখানেও একজন আদর্শবাদী মাষ্টার মশাই আছেন। তবে এ নাটকের মূল বক্তব্য ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি (প্রিন্সিপালের সামনে মস্তানদের মত ছাত্রদের উপস্থিতি, অনায়াস ভঙ্গীতে সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি যার বহিঃপ্রকাশ), শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার মতবাদ এবং বিপ্লবই যে এই ঘুণধরা সমাজটাকে পাল্টে দেবার একমাত্র অস্ত্র, এমনি ধরনের কিছু ব্যাপার।

এ নাটকে শোষক ও শোষিতের চেহারা অন্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারিতা, তার মাধ্যমে দেশের ব্যাপক ছাত্রসমাজকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা, এসব ব্যাপার যেমন সত্য তেমনি ভয়াবহ সন্দেহ নেই। শিক্ষার ধারা এইভাবে এবং এই পথে চললে আজকের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও ভাববার।

কিন্তু সেটা বোধহয় এই ধরনের আলগা-বাঁধুনি নাটকের মারফৎ সম্ভব নয়। অথচ নাটকের বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল।

এ নাটকের অভিনয়ও তেমন জোরালো নয়। একমাত্র হরিসাধন, ললিত ও প্রিন্সিপাল ছাড়া। বিপ্লবী নায়ক তো রীতিমত নিষ্প্রাণ।

এ নাটকের একমাত্র সম্পদ দেবাশিস দাশগুপ্তের সঙ্গীত। প্রারম্ভিক আবহ সঙ্গীতটুকু তো রীতিমত বর্ণাঢ্য। কিন্তু সেই অনুপাতে নাটক কৈ। সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ও ভাল নাটক সেইভাবেই মঞ্চস্থ হোক এটাই আশা করি।

সত্যব্রত দাশগুপ্ত ও রথীন সরকারের মঞ্চসজ্জায় মুনশীয়ানা আছে। ধ্বনির কাজও স্থানবিশেষে সুন্দর, কিন্তু আলোকসজ্জা ত নৈরাশ্যজনক। অথচ নাটকে আলো একটা ভাইটাল ব্যাপার।

নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কালীঘাট পার্কের স্থায়ী মঞ্চ মাইম একাডেমিতে, যেখানে কাঠের চেয়ার, পয়সার অভাবে দেয়ালে পলেস্তারা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ম্যাসাকার ইন রোম

১৯৪৪ সালে জার্মান সৈন্যরা ইটালীর নিরীহ মানুষের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার করেছিল, ১৯৭২ সালেও ইটালী যে তা ভোলেনি, তার প্রমাণ রবার্ট কাট্জ-এর গবেষণামূলক বই 'ডেথ ইন রোম' অবলম্বনে প্রখ্যাত প্রযোজক কার্লো পল্টির ছবি 'ম্যাসাকার ইন রোম'। যার পরিচালক গ্রীসের বিখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা জর্জ প্যান কসমাটোস।

১৯৪৪ সালের ২২ ও ২৩শে মার্চ এবং পরের কুড়ি ঘন্টার ঘটনা এ ছবিতে স্থান পেয়েছে।

সেই সময়কার দুটি দিনকে নির্দিষ্ট করে পরিচালক বেছে নিয়েছেন তার ছবির জন্যে। তার পরের কুড়ি ঘন্টায় দেখানো হয়েছে শেষ দিনের ঘটনার জের।

২২ মার্চ কোন ঘটনা নেই। শুধু হিটলারের জার্মানের রোম অবরোধ করার পেছনের মানসিকতাটা দেখানো হয়েছে।

পরদিনের ঘটনা রোমের প্রতিবাদের চেষ্টা। যার চরম মূল্য দিতে হয় তারও পরের দিন হিটলারের নির্দেশে। কয়েক শো নিরীহ মানুষকে যার জন্যে প্রাণ দিতে হয় বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে।

রোমের সেই ফুঁসে ওঠার ইতিহাস, অন্যদিকে জার্মান অত্যাচারের ইতিহাস নিয়েই 'ম্যাসাকার ইন রোম'।

আমাদের যাত্রা হলো শুরু

যুগযাত্রা

রবীন্দ্র সরণী

৮৪-র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

ঐতিহাসিক নাটক

মীনাবাজার

রচনা - ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় সুর - তরুণ মুখোপাধ্যায়

দুঃসাহসীক নাটক

আগ্নেয়গিরি

রচনা - প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সুর - বৈদ্যনাথ সরকার

নাটক নির্দেশনায়—মোহিত বিশ্বাস

— ভূমিকায় —

মোহিত বিশ্বাস, সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য, গোষ্ট দাস (কণ্ঠে) সোনা দেবনাথ, মঞ্জুশ্রী বোস, অরুণা গোস্বামী, বেলা ব্যানার্জী মঞ্জুশ্রী সেন।

আরও যাঁরা আছেন—যুগল সরকার, অবনী চন্দ্র, অমর রায়চৌধুরী, গোপাল দে, রঞ্জিত ব্যানার্জি, সত্যেন দে, যশোদা চক্রবর্তী, রণজিৎ মুখার্জি, ধীরেন ঘোষ, শ্যামল মুখার্জি, সুনীল নন্দী, মুকুতি সাউ, তাপসী চ্যাটার্জি, শুক্লা সাহা।

প্রোপ্রাইটার—সুনীল প্রামানিক ম্যানেজার—কালী ব্যানার্জী

সহঃ ম্যানেজার—বিশ্বনাথ মুখার্জি, লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী

অফিস ইন চার্জ—সঞ্জয় সামন্ত

পরিচালক

যামিনী গুপ্ত

বনবাসর ছবিতে সন্তু ও মহুয়া

এখানে বিপ্লবীদের দ্বারা একটি মাত্র বোমা বিস্ফোরণ ছাড়া যুদ্ধের কোন ঘনঘটা নেই। শহরে জার্মান সৈন্যদের টহলদারী এবং কর্নেল ক্যাপলার ও ফাদার আন্তোনেলের মধ্যে কথোপকথনই ছবির বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে। দুটি ঋজু চরিত্রের শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ রীতিমত চমকপ্রদ।

জার্মান কর্নেলকে এ ছবিতে অনেকটাই সুস্থ দেখানো হয়েছে। যিনি হিটলারের নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়েও (সেখানে তিনি কর্তব্যে অটল) স্বতন্ত্র একটি মনকে নিজের মধ্যে লালন করেন। সেখানে তিনি ফাদারের প্রতিভায় মুগ্ধ হন, সুকৃতির বিচারে তার কথা মেনে নেন।

কর্নেল ও ফাদারের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন যথাক্রমে রিচার্ড বার্টন ও মার্সেলো মাস্ত্রোইনি। ছবির শেষ দৃশ্যটি, যেখানে নিজের রিভলবার দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একজন ইটালিয়ানকে হত্যা করতে গিয়ে সহসা ফাদারের (যাকে সে না জেনেই বধ করতে উদ্যত) সঙ্গে কর্নেলের চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই দৃশ্যটি যেমন চমকের সৃষ্টি করে, অভিনয়ের দিক থেকেও তেমনি অসাধারণ। গোটা ছবির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য সন্দেহ নেই।

এই অবশ্য দর্শনীয় ছবিটি এফ সি সির পরিবেশনায় যমুনা চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে। শা, ব, চ

রঙ্গসভার 'গিলোটিন'

সমাজের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ যখন বিভ্রান্তিকর, তখন সে সমাজের পতন অনিবার্য বাঙালীজাতির এই ভয়াবহ ইঙ্গিতের ভিত্তিতে রচিত 'গিলোটিন' নাটকটি (রচনা অচিন্ত্য মজুমদার) গত ৬ সেপ্টেম্বর মুক্ত-অঙ্গনে মঞ্চস্থ করলেন প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থা রঙ্গসভা। সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান আজ কোন পথে তারই স্পষ্ট বক্তব্য নাটকে প্রতিফলিত। প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীপীযূষ বসুর নির্দেশনায় নাটকটি সার্থকভাবে অভিনীত। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ছিল না সেকথা বলা চলে না, তবে অনুশীলনে আরও সচেতন হলে নাটকটি সমাদৃত হবে। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চায়ের দোকানের মতি (প্রভাত দত্ত), মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শবাদী পুরুষ প্রদীপ (তুষার ভৌমিক), বিভ্রান্ত মস্তানরূপী

যুবক (নিম্মলেন্দু চক্রবর্তী) ও প্রদীপের স্ত্রী রমলা (গৌরী আড়ভি)। এছাড়া প্রদীপের পিতা মনমোহন (রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) ও পুলিশ ইন্সপেক্টর (কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়) মোটামুটি ভালই অভিনয় করেছেন। আবহসঙ্গীত ও আলোর কাজ পরিবেশানুগ।

যাত্রায় ময়মনসিংহ গীতিকা

স্বর্গতা মলিনা দেবীর আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর এবছর নবরঞ্জন অপেরার প্রথম অভিনয় শুরু হল। পালার নাম মহুয়া।

যাত্রা আরম্ভ হওয়ার একটু পরই বুঝতে পারি, আসলে এটি মৈমনসিংহ-গীতিকার সেই বিখ্যাত পালাটি, যেখানে নায়িকার প্রতি বাঙালী নায়কের 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি'-র মতো সর্বনাশা প্রেম টল্‌টল্‌ করে ওঠে। গত বছর 'লায়লা মজনু' করার পর এরকম একটি পালার খুবই দরকার ছিল দলের। এবং সেটি দিয়েছেন সমরেশ বসু। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকার সেই সারল্য, প্রায়-রূপকথার রহস্য এখানে কোথায়? কখনো-কখনো যে দেখা যায়নি, তা নয়। মহুয়া ও বেদের দলের মেয়েরা কলসী কাঁখে যখন নদীতে জল আনতে যায়, তখন ক্ষণিকের জন্য হলেও, সেই গন্ধ পাওয়া গেছে। আর, গান; এই নাটকের প্রধান সম্পদই হল গান। চমৎকার সুর দিয়েছেন ভূপেন হাজারিকা। সারা নাটকে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে আছে। তবে, মৈমনসিংহ-গীতিকা থেকে গানগুলি নিলে কি ভালো হত না? ওরকম গান থাকতে কেন আবার নতুন করে গান লেখানো হয়েছে, বোঝা গেল না।

সমস্ত পালাটা এক তারে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দলের, যাকে বলে, টিম ওয়ার্ক, তা খুবই ভালো। রুস্তম খাঁর মতো ছোট্ট রোল থেকে শুরু করে নদেরচাঁদের ইন্দ্র লাহিড়ী—সবাই চমৎকার অভিনয় করেছেন। মহুয়ার ভূমিকায় রয়েছেন গত বছরের 'লায়লা'—ছন্দা চ্যাটার্জি। তাঁকে অনেক নাচতে ও গাইতে হয়েছে। এবং তিনি যতদূর পেরেছেন, তা করেছেন। হুমরা বেদের ভূমিকায় মনোরঞ্জন চক্রবর্তীও সুন্দর মানিয়ে নিয়েছেন। ঐ চরিত্রের বাৎসল্য ও প্রতিশোধ-স্পৃহা—এই দুটি দিকই তিনি সমানভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নগর-কোতোয়াল ও তাঁর স্ত্রী—এই দুজনের ওপর ভার পড়েছিল লোক হাসাবার। তাঁরা হাসিয়েছেনও ঠিক ঠিক। দেওয়ান-কাকার গাম্ভীর্যময় অভিনয় দর্শকদের মনে থাকবেই।

ভারতী অপেরার কংস পালায় নাম ভূমিকায় রাখাল সিংহ

শেষে যা বলার তা হলো, নাটকটি যদিও মৈমনসিংহ-গীতিকা থেকে নেওয়া, তবু, এখনকার দর্শকদের জন্য নাটকটিতে সবই রাখা হয়েছে। 'শোলে' ছবির মতো ডাকাতের সামনে নায়িকাকে নাচতে হয়েছে। এবং বিখ্যাত 'আলিবাবা-চল্লিশ চোরের' মতো ডাকাতও একইভাবে জখম হয়েছে। ছোটখাট মারপিট, নায়কের মুখে গান, জমকালো ভিলেন, কমেডিয়ান—সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে এই নাটকে। এ-সবের চাপে পূর্ববঙ্গের সেই স্পর্শকাতর লোকগাথাটি প্রায় মরো-মরো।

পূজায়
শীতভাপ নিয়ন্ত্রিত
মদিনা
ফ্যাঙ্গী
শাড়ী
বিপণী
৬২, ডি. টি. রোড,
(সাউথ) হাওড়া

বিচিত্রা

নীলাম

মাত্র এগারো টাকায় একটি পাঁচ সেল টর্চ ও একটি স্কোয়ার টর্চ বিক্রী হয়ে গেল এইমাত্র। দুটো জিনিসই চমৎকার। যিনি এলেন, তিনি বেশ উৎফুল্ল। বিশাল টেবিল ঘিরে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে। নীলাম শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। ১২-সি, রাসেল স্ট্রীটের রাসেল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে নীলামদার। রাস্তার উল্টোদিকে বেঙ্গল ক্লাব। প্রচুর লোক ওখানে কসমস প্লেয়ার-দের জন্য অপেক্ষা করলে। রবিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর।

নীলামদার হেঁকে উঠলেন, 'সাতাশখানা বই, নতুন, বলুন।' গিয়ে দেখি, মোপাঁসা থেকে শুরু করে নিউইয়র্ক টাইমস্-এ বেস্ট সেলার লিস্টে উল্লিখিত 'গ্রীণ ডার্কনেস পর্যন্ত রয়েছে। দু টাকা দিয়ে শুরু করে এক তরুণী সতেরো টাকায় সাতাশটি বই কিনলেন। উনি আর কী কিনবেন, তা জানার কৌতূহল আমার ভীষণ হচ্ছিল। একটু পরই দেখা গেল, চোদ্দটি কাঁটাচামচের একটা প্যাকেটে নীলামে উঠেছে। তরুণীটি এতোক্ষণ ঝুঁকে পড়ে বইগুলি দেখছিলেন, এবার উঠে নীলামে যোগ দিলেন। সাত। দশ। বারো। এভাবে পনেরো টাকায় তিনি এ-গুলো পেয়ে গেলেন। একেবারে ঝকঝকে। নীলামদার বলেছিলেন, ইমপোর্টেড।

একটা কারী ডিস, একটা পুডিং ডিস ও দুটো ছোট পেয়ালা যখন নীলামে উঠেছে, তখন বেলা সাড়ে বারটা। মাত্র সাত টাকায় ঐগুলো পেয়ে গেলেন এক ভদ্রলোক। নীলামদার নাম জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, নাম গোপাল। আর-ও কয়েকবার একই প্রশ্ন ও একই উত্তর শোনা গেল। শেষে, নীলামদার বললেন, আপকা নাম বহুৎ আচ্ছা রাখখা হ্যায় জী।

এরপরই অত্যন্ত চমৎকার একটা ডিনার সেট নীলামে উঠল। তিরিশ পিসের এই ডিনার সেটটি টেবিল আলো করে এতোক্ষণ ছিল। দেখলাম, অনেকেই ওটিকে লক্ষ্য করছিলেন। চড়চড় করে দাম উঠে পরিষ্কার দুশো আশি টাকায় এক দম্পতির অধিকারে ওটা চলে গেল। এরপর তাঁরা কিনলেন, ছ'টি কাচের বিয়ার মগ। পঁচানব্বই টাকায়। সাত পিস্ কাট গ্লাসের ফ্রুট সেট-ও তাঁরাই নিলেন। সুন্দর এই সেটটি দুশো পঞ্চাশ টাকায় গেল। এরপর স্বামী ভদ্রলোক বাড়ি যাবার জন্য ছটফট করছিলেন। স্ত্রী বললেন, দাঁড়াও না, আর একটা দেখে যাই।

এক ভদ্রলোক ক্যাটালগ হাতে এতো-ক্ষণ বসে ছিলেন। এই পরিবেশে তিনি যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছেন। মনে হয়, তাঁর চশমার কাঁচে দেশী-বিদেশী বই-এর অক্ষর-গুলো কিলবিল করছে। হঠাৎ দেখি, নীলামদার হাঁকছেন, 'এক প্যাকেট পুরোনো কয়েন। এ হিস্টোরিক্যাল আইটেম। বলুন কেউ।' আমি গিয়ে দেখি, বেশ বড় প্যাকেট ভর্তি মুদ্রা। বেশীর ভাগই অচেনা। ঐ ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত একশো এগারো টাকায় ঐগুলি নিলেন। তারপর নলীমদার হাঁক-লেন 'ব্যাটারী কাম্ এ সি স্পুল টেপ-উইথ মাইক। বলুন, একেবারে নতুন।' দাম উঠতে লাগল। দুশো পঞ্চাশ, আশি নব্বুই। চশমাওয়ালা ভদ্রলোকটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। তিনশো টাকায় টেপ-রেকর্ডারটা বিক্রী হয়ে গেল।

একরাম আলি

রান্না

ডালিয়ার ভাত আর খিচুড়ী

সেদিন মণিপুরী বৌদি বলছিলেন, আমাদের ওখানে একবার চালের কেজি পাঁচ টাকা হয়ে গেল। যারা আগে ভাগে চাল কিনে রেখেছিল তাদের তো পোয়াবারো। আমাদের তো জানিস—দিন আনি, দিন খাই। তোর দাদাকে বললাম, চালের চেয়ে তো গম সস্তা, কয়েক কেজি গম আধভাঙ্গা করে নিয়ে এসো। উনি বললেন, কেন, ও দিয়ে কী হবে? বললাম, অনেক কিছু হবে, ডালিয়ার ভাত হবে, খিচুড়ী হবে মিষ্টিভাত হবে, আমিষ, নিরামিষ পোলাও হবে, মোহনভোগ হবে, পরমান্ন, পুডিং, কেক, বিষ্ণুভোগ হবে—কী না হবে। তোর দাদা তারপর আর চালই কিনতে চায় না, ডালিয়ার হেনতেন খেয়েই চলল কয়েক মাস।

আমি বললাম, বলো না কিছু, কাগজে লিখে দিই। মণিবৌদি কোন্‌টা লিখবি? আমি বললাম ভাত থেকে শুরু কর। মণিপুরী বৌদি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, এ-আর লেখার কী আছে? ভাত যদি করতে চাস, তবে ডালিয়াকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখবি। তারপর জলে সিদ্ধ করবি। জল শুকিয়ে [illegible] নামিয়ে নিবি। ঠাণ্ডা জলে পরিমাণ [illegible] ঘি দিয়ে ঐ ডালিয়া সিদ্ধ কর। জল [illegible] গেলে ভাত হয়ে গেল। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে এই ভাত খুব উপকারী। আরও এক-ভাবে এই ভাত করা যায়। ডালিয়া সিদ্ধ করে নরম হলে জল শুকিয়ে নিবি। তারপর আবার অর্ধেক জল আর অর্ধেক দুধে একটু ঘি, আন্দাজ মত নুন দিয়ে সিদ্ধ করে শুকিয়ে নিলেই ফাস্‌ক্লাস ভাত। আর যদি খিচুড়ি করতে চাস তবে ডালিয়াকে জলে সিদ্ধ করে নরম করে নামিয়ে রাখবি। এক চামচ ডালিয়ায়, দুই চাম কাঁচা মুগের ডাল, একটু মাখন, নুন, কাঁচা লংকা, কয়েকটা রসুনের কোয়া আর তেজপাতা দিয়ে সিদ্ধ করবি। সিদ্ধ করবার সময় দু-একটা দার-চিনির টুকরো একটা এলাচ দিলেও পারিস, না দিলেও পারিস। ডালিয়া আর ডাল মিসে গেলে একটু আদাবাটা দিয়ে নামিয়ে রাখবি। মুখরোচক করতে হলে নামাবার সময় সামান্য জিরেবাটা দিতে পারিস। মনে রাখবি, ভাজা মুগের ডাল দিয়ে ডালিয়ার খিচুরী রাঁধলে কিন্তু হজম হতে কষ্ট হবে। আর বেশী মশলা দিয়ে রান্না করলে খেতে ভালো লাগবে না।

আত্রেয়ী সেনগুপ্ত

রেস্তোরা

ক্ষিধে পেলে মানুষ, যা হাতের কাছে পায়, তাই দিয়ে ক্ষিধে মেটায়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের দাসত্ব করে আসছে মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে। তবু সেই ক্ষুধার্ত মানুষের মনের ইচ্ছেটা বাইরে এনে সেলুলয়েডের ফিতেতে যদি ধরা যায় —দেখা যাবে সেই ইচ্ছেতে মিষ্টান্ন নেই। দেখা যাবে ঝাল, নোননতা কিংবা টক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য সেলুলয়েডের থেকে পর্দায় দৃশ্য-মান হয়ে উঠছে।

পকেটে সামান্য পয়সা নিয়ে কলকাতায় অনেক যুবককে ঘুরতে দেখা যায়। যা পয়সা তাতে বড়ো কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকতে হয় না। সে জানে ঐসব বড়ো বড়ো রেস্তোরাঁয় কি কি খাবার পাওয়া যায়। কেননা মাঝে মধ্যে বেড়ালের মতো তার ভাগ্যেও সিঁকে ছেঁড়ে।

পেটে ক্ষিধে, পকেটে সামান্য পয়সা, জিভে স্বাদ আছে—এইসব নিয়ে ঢুকে পড়া যেতে পারে কুণ্ডু কেবিনের মতো কোনো ছোট কেবিনে।

কুণ্ডু কেবিন রমেশ মিত্র রোডের উপর। দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ সিনেমার উল্টো দিকে এই রমেশ মিত্র রোড। চওড়া ভারী, পিচ মোড়া রাস্তা চলে গেছে একে-বারে ল্যান্সডাউন রোডের দিকে। ঐদিকে মোটর ভিহিকেলস। এই রাস্তায় মোটরের যন্ত্রপাতির দোকান, গাড়ি সারাবার কারখানা দেখা যায়। কুণ্ডু কেবিনের খদ্দের সাধা-রণতঃ এইসব কারখানার শ্রমিক, পাড়ার ছেলেরা আর পথচলতি লোক।

১০'×৫' এই কেবিন চল্লিশ বছরের পুরোনো। আগে গৌরবাবুর বাবা চালাতেন। তখন মাসে এক টাকা ভাড়া ছিল। এখন সেই ভাড়া কুড়ি টাকায় এসে উঠেছে। এখন গৌর বাবু চালান। পাড়ার ছেলেরা গোবাদা বলে ডাকে। বছর পঁয়ত্রিশ সুন্দর স্বাস্থ্য, সামান্য ভুঁড়ি, ব্যাক ব্রাশ চুল গোবাবাবুকে

জিগ্যেস করলাম, কেমন চলে আপনার কেবিন ?

গম্ভীর অসুখী ভরাট মুখে আমার দিকে তাকিয়ে পাকা অভিনেতার মতো বললেন, 'কপালে লিখিতং ঝ্যাঁটা। খ্যাঁভাবে কোন্ গুখেগোর ব্যাটা ?' বলে একটু থেমে আবার বললেন, কি করে চলে আপনিই বলুন না। দুটো লোকের পঞ্চান্ন টাকা মাইনে, দু বেলা খাওয়া-দাওয়া জলখাবার পর্যন্ত। একটা সেফটিপিন দরকার হলে ওদের, সেটাও আমাকেই দিতে হয়। তেলের যা দাম বাড়ছে তাতে আর ৪৫ পয়সায় মাটন চপ, ভেজিটেবল চপ কিংবা একটাকা করে কাটলেট দিতে পারি না। হুট করে দামও বাড়ানো যায় না। তাই কয়েক দিন বন্ধ রেখেছি। বিকেলের দিকে আবার তৈরি করব। তিরিশ পয়সায় ঘুগনি, আলুরদম, ভালো কোম্পানীর রুটি, ওমলেট আর চা, বিস্কুট, কেক দিয়েই এখন দোকান চলছে। এই দোকান থেকেই দশ জনের পেট চালাতে হয়। দৈনিক কমপক্ষে ১৫ কেজি কয়লা লাগে। ৫০ থেকে ৬০ টাকার বেশি বিক্রী করা যায় না। বলতে বলতে গোরাবাবু আমার সামনে থেকে ঘুগনির প্লেট তুলে নিয়ে গেলেন। চা দিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনার লোকেরা সব গেল কোথায়। দুপুরের দিকে ওদের একটু বিশ্রাম দিই। স্নান-খাওয়া সেরে ওরা বিশ্রাম নেয়। আমি এসময়ে একলাই চালাই।

আমার পরিচয় জানতে পেরে আমার প্লেটে ঘুগনির উপর আর একবার পেঁয়াজ-কুচি ছড়িয়ে দিলেন। গরীব কৌটো ঝাঁকিয়ে ভালো করে মশলা ছড়িয়ে দিলেন গরম গরম ঘুগনির ওপরে। চমৎকার স্বাদ। গোরাবাবু নিজেই তৈরি করেন বড়ো বড়ো দুটো অ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে ঘুগনি আর আলুরদম। স্কুলের মতো হাই বেঞ্চ আর লোয়ার বেঞ্চে বসে সুস্বাদু ঘুগনি আলুর-দম, ওমলেট কিংবা মটন চপ, ভেজিটেবল চপ, কাটলেট আর চা খেয়ে পরম তৃপ্তিতে ফিরতে দেশলাই খোঁচাতে খোঁচাতে ক্ষুধার্ত —যিনি এখন অর্থাৎ কেবিন থেকে বেরোনোর পর পরম তৃপ্ত—খুসীও।

তরুণ চৌধুরী

স্মরণে, প্রদর্শনে

বাংলা প্রকাশন শিল্পে একাই একটি ঘরানা, প্রচার কল্পনায় সুরুচি সঞ্চারক, তরুণ কবি-শিল্পীদের উৎসাহদাতা দিলীপ-কুমার গুপ্ত নিজে ছিলেন স্বভাব-নেপথ্য-চর। এখন আরো দূর নেপথ্যে সরে গেছেন। তাঁকে আমাদের চোখের সামনে, মনের সামনে মেলে রাখা, স্মরণে ধরা আমাদের সংস্কৃতির স্বার্থেই জরুরি। কবি অরুণ-কুমার সরকার, দিলীপকুমারের দীর্ঘ দিনের সহকর্মী নৃপেন্দ্র সান্যাল ও কবি-অধ্যাপক নরেশ গুহ সেই জরুরি কাজের ডাক দিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দিলীপকুমার গুপ্তর স্মরণসভা আসলে একটি উজ্জ্বল গুণীজন সমাবেশের রূপ ধরেছিল। মঙ্গলাচরণ, সঙ্গীত, স্মৃতি-চর্চা, প্রশস্তিজ্ঞাপন, সভাপতির ভাষণ—অনুষ্ঠানের নানা অঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফাদার রবার্ট অ'তোয়ান, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, অম্লান দত্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, গীতা মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। আর যাঁর স্মরণে এই সভা তাঁর অনুপস্থিতি হয়ে উঠেছিল এক মহিমান্বিত উপস্থিতি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অরূপের কত রূপ দরশন

'এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা গানের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নই এবং সেজন্যই সেই-সব গানগুলির অনুশীলন ও সংরক্ষণ বিষয়েও আমরা যথেষ্ট আগ্রহী নই। বাংলা গানের ইতিহাসে ব্রহ্মসঙ্গীত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গানগুলির নতুন করে মূল্যায়নের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে'—এই অনিবার্য প্রয়োজনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থেকেই 'ইন্দিরা' সঙ্গীত সংস্থা ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সন্তুষ্ট রাম-মোহন থেকে শুরু করে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পর্যন্ত আঠারো জন সঙ্গীত রচয়িতার গান অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়। এঁদের মধ্যে অনেকের গানই সচরাচর কোন শিল্পীর গলায় শোনার সৌভাগ্য হয় না। সেই দুর্লভ সুযোগটি দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গোষ্ঠী সত্যিকারের সঙ্গীত রসিকের প্রশংসা পাবেন—সন্দেহ নেই।

অনুষ্ঠান শুরু হয় রামমোহনের লেখা বেহাগ রাগাশ্রয়ী ত্রিতালে আবদ্ধ 'নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ' সমবেত সঙ্গীতটি দিয়ে। এতে কণ্ঠ দেন ইন্দিরার শিল্পী গোষ্ঠী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কেন ভোল, ভোল চির সুহৃদে' গানটি (কুকুভা/আড়া ঠেকা) পরিবেশন করেন সত্যেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী সুপর্ণা চৌধুরী (ঠাকুর)। গানটির ভাবরূপ তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভি, ভি, ওয়াঝল্-ওয়ার অনবদ্য গেয়েছেন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের লেখা 'পরিপূর্ণমানন্দম' (দেশ/মুক্ত-ছন্দ) গানটি। এছাড়া বিস্মিত করেছেন সুচিত্রা মিত্র। কালীনারায়ণ গুপ্তের লেখা বাউলাঙ্গ সুরের 'এ গো দরদি, আমার মন কেন উদাসী' গানটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গেয়ে অনুষ্ঠান মণ্ডপে মুহূর্তে এক অন্য অনুভূতি এনে দিয়েছিলেন—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যান্য আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে ঋতু গুহ, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গান ভালো লেগেছে। অর্ঘ সেনের গান এবং গলা দুই-ই ভালো। তবে গানে আরোপিত নাটকীয়তা ভালো লাগেনি। ইন্দিরা গোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে শ্রীনন্দা মল্লিকের গান সত্যিই ভালো লেগেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'আজি আনন্দে প্রেমচন্দ্রে' গানটি তিনি যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই গেয়েছেন। শেষের দিকে ইন্দিরা গোষ্ঠীর সমবেত গানগুলি বিশেষ করে রবীন্দ্র-নাথের 'জানি জানি কোন আদিকাল হতে' নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে।

আগেও বলেছি আবারও বলছি এমন একটি অভিনব অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ। তবে গানের আগে রচয়িতাদের সামান্য পরিচয় দিতে পারলে ভালো হত।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপর্ণা চৌধুরী

গৌড়মল্লার

।। শিক্ষকগণ্ডলী ।।

কণ্ঠসঙ্গীত ঃ ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খাঁ, জপমালা ঘোষ, চিত্তপ্রিয় মুখোঃ, তপন চক্রবর্তী, শ্যামলী নাগ।

যন্ত্রসঙ্গীত ঃ গোকুল নাগ, শীতল অধিকারী, প্রফেসর অমিল ভট্টাচার্য, দীপক মুখার্জি। নৃত্য ঃ সুনীত বসু

অঙ্কন ঃ কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী (উপদেষ্টা) সমীর মণ্ডল

আবৃত্তি ঃ

নন্দিতা নাগ ও দেবদুলাল বন্দ্যোঃ

রামধনু আসর

শিশুদের নাচ, গান, তবলা, আবৃত্তি ও ছবি আঁকা। একই রেতনে যে কোনো তিনটি।

২৩।এ, অক্রুর দত্ত লেন 'হিন্দ' সিনেমার নিকট। ফোন ঃ ২৪-১৫৭৫। অনুসন্ধান —রবিবার সকাল ৮টা—১২টা, অন্যদিন বিকেল ৫টা—৮টা

বি/৩০৯৬

আমি কঙ্কাবতী বলছি

প্রকৃত সৌন্দর্য কাকে বলে, কি তার সঠিক ব্যাখ্যা, এ বিষয়ে বিতর্কের শেষ নেই, তাই সাজসজ্জা-প্রসাধন, নিত্যনতুন মতবাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে.....

প্রায়শ বলা হয়ে থাকে, যে পুরুষের গৌরব তার শারীরিক ও বুদ্ধিগত যোগ্যতা; বিপরীতে নারীর সম্পদ হলো সৌন্দর্য। যদিও আজকালকার মহিলারা মানতে চাইবেন না এ কথা, রূপচর্চা বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত ও অসচেতন মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না। কাম্যও নয় সেটা। তবে, রূপচর্চা ও প্রসাধন-শিল্প রুচির সঙ্গে, সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এক ধাঁচের সৌন্দর্যে সাড়া দেন না সবাই। ভারতবর্ষে যে মুখশ্রী, যে গায়ের রঙ, যে শরীর সুন্দর বিবেচিত হবে, পাশ্চাত্য রুচিতে তা অতি সাধারণ ঠেকতে পারে। প্রকৃত সৌন্দর্য কাকে বলে, কি তার সঠিক ব্যাখ্যা, এ বিষয়ে বিতর্কের শেষ নেই: তাই সাজ-সজ্জা-প্রসাধন, নিত্য নতুন মতবাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

এ কথা খাঁটি সত্য, যে একটি সুঠাম, মেদহীন দেহ, স্বাস্থ্যে-সূর্যে আলোকিত ঝকঝকে বাদামী ত্বক, ও দুটি প্রাণবন্ত চোখ সুন্দরতম। এগুলি হলো সেইরকম সৌন্দর্য যেমন প্রকাশিত বুশ নর্তকী আনা পাভলোভা কিংবা ভারতীয় উদয়শঙ্করের দেহের হিল্লোলে, যা কাঁচ কলাপাতা বা টিয়া পাখির গায়ের ঘন সবুজের মতো স্বতস্ফূর্ত। নিজের শরীরকে চকচকে রাখতে স্নো বা পাউডার ব্যবহার করে না চিতা বাঘ, ইলিশ মাছ ধায় না বিউটি পার্লারে। উদয়শঙ্কর উন্মুক্ত বক্ষে মঞ্চে এসে দাঁড়ালে, তাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্য কোনো আলোক সম্পাতের ফল নয়, নয় কোনো মেক-আপম্যানের কৃতিত্ব। এই সৌন্দর্যের স্রষ্টা হতে পারেন একমাত্র স্বাস্থ্য দেবী স্বয়ং।

প্রিয় পোশাক যেমন নিত্য কাচতে ও ইস্ত্রি করতে হয়, বাগানে ফুলের টবে দিতে হয় জল, ও গাছকে যথাযথ সার, তেমনি আমাদের দেহের প্রতিও কিছু আবশ্যিক কর্তব্য আছে আমাদের। যেমন ধরুন, নিয়মিত স্নান, সামান্য ব্যায়াম, ঘণ্টা ছয়েক ঘুম ও সময়মতো আহার। এগুলি অবশ্য শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, কারুরই অজানা নয়, এবং সমভাবে প্রযোজ্য সবারই প্রতি। তবুও এই সব দৈনন্দিন ক্রিয়ার উল্লেখ করলাম কারণ এগুলিই হলো সৌন্দর্য চর্চার প্রথম ধাপ।

সৌন্দর্য চর্চায় দ্বিতীয় স্থান ত্বক পরিচর্যার, কারণ (১) বিজ্ঞান বলে, যে গায়ের চামড়া হলো মানুষের শরীরের সবচেয়ে বিস্তৃত অংশ (২) বয়েস, ক্লান্তি, কাঠিন্য ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি ছাপ রেখে যায় ত্বকে। চামড়া যদি হয় শুকনো রুক্ষ, প্রাণহীন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মেক-আপও মুখশ্রী আনো করতে পারবে না। কাজেই সুন্দরীদের কর্তব্য আগে ত্বকের দিকে নজর দেওয়া।

হয় অতিরিকত তেলতেলে, নয়তো রুক্ষ—মেয়েদের মধ্যে এই দুই রকম ত্বকই চোখে পড়ে বেশি। কোনটি কম অপ্রীতিকর বলা মুস্কিল, তবে প্রথমে আলোচনা করা যাক তেলতেলে ত্বক বিষয়ে।

বিখ্যাত খাদ্যবিদ শ্রীমতী অ্যাডেল ডেভিস মনে করেন যে অতিরিকত তেলতেলে চুল ও চামড়ার কারণ শরীরে ভিটামিন 'বি'২ এর অভাব। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' রয়েছে মেটে, খামির বাদাম, কোনো কোনো সবজি, আটার রুটি, দই প্রভৃতিতে। শ্রীমতী ডেভিসের মতে সপ্তাহ তিনেকের জন্য দৈনিক পাঁচ থেকে পনেরো মিলিগ্রাম ভিটামিন বি২ খেলে চামড়া অবিলম্বেই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এছাড়াও বিভিন্ন বাহ্যিক উপায় এই ধরনের ত্বকে প্রয়োগ করা চলে। তেলতেলে ত্বক দৈনিক দুবার অর্থাৎ সকালবেলা ও রাত্রে শোবার আগে ঈষদুষ্ণ জল আর কোনো মৃদু সাবান দিয়ে ভালো করে ধোওয়া আবশ্যক। আর উচিত দু দিনে একবার ভাপ দিয়ে মুখ ধোওয়া। এর জন্য দরকার হবে একটি বালতি পরিষ্কার তোওয়ালে ও এক কেটল ফুটন্ত জল।

বালতিতে গরম জল ঢেলেই তোয়ালে দিয়ে বালতির উপরটা ঢেকে ফেলুন যাতে একটুও গরম ধোঁওয়া পালাতে না পারে। এবারে উবু হয়ে বসে বালতির মধ্যে মাথা গলিয়ে দিন। বালতিতে ঢোকানো মাথার উপর তোওয়ালেটা টান টান করে মেলে দিন যাতে বালতির বাইরে কোনো ধোঁওয়া না যেতে পারে। এ ভাবে ঘেড় থেকে দুই মিনিট থাকুন; তারপর মুখ যখন আস্তে আস্তে লালচে হয়ে গিয়েছে, আর বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো বাষ্প ভরে গেছে, তখন অনেক ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

মুখের চামড়া মসৃণ রাখতে বাসন ব্যবহার করতে পারেন। সামান্য বাসন অল্প দুধ আর জল মিশিয়ে মসৃণ করে গুলে ফেলুন। খুব পাৎলা যেন না হয়। সারা মুখে, ঘাড়ে, গলায় ভালো করে মাখুন। মিনিট পাঁচেক এইভাবে রেখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

শীতকালে সিন্থেটিক ক্রীম ইত্যাদির বদলে এক চামচ কাজু বাদাম বাটা, এক চামচ শশার রস ও দু তিন ফোঁটা মধু মুখে মাখুন; ত্বক হয়ে উঠবে তরতাজা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

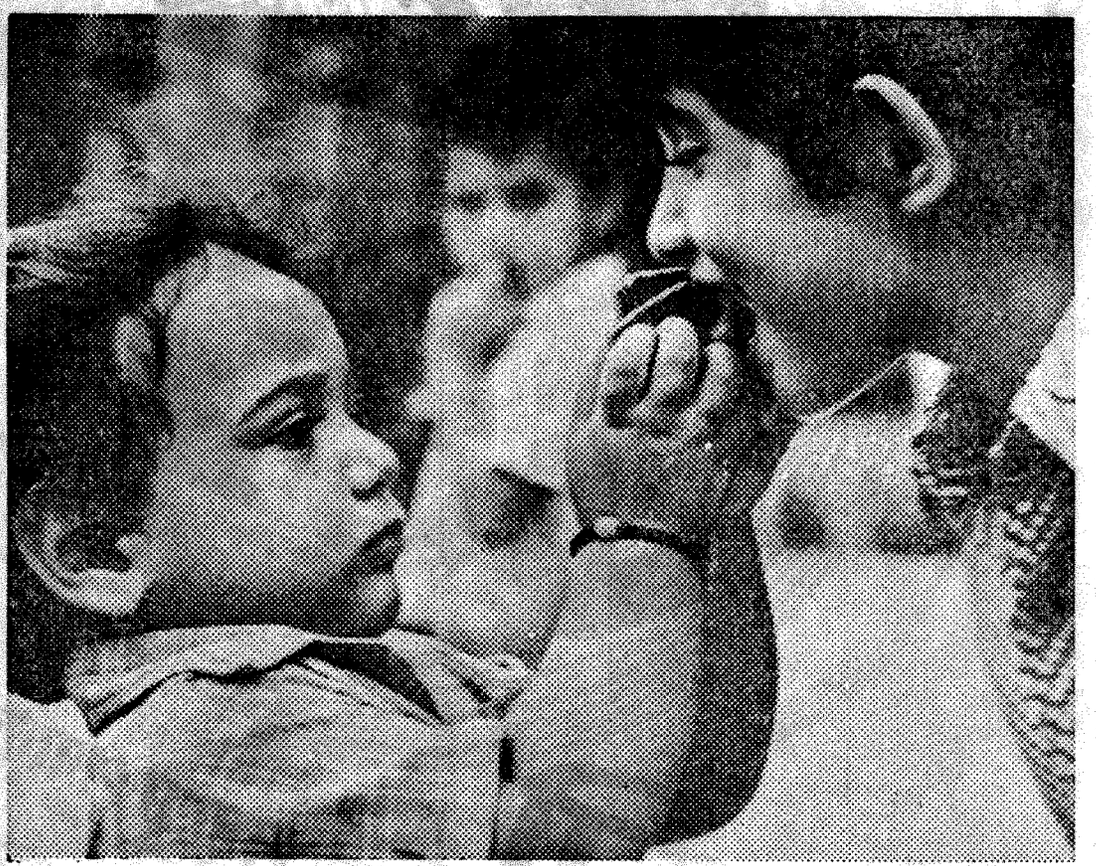

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিনটাস-BBC.GLX.36-203 BG

সুগৃহিণীদের জন্য!

গুঁড়া মশলার

কুকমী

১ কে.জি.'র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা • মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় • গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : **কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ**

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ • ফোন : ৩৩০৯৯৫ • পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ • ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 353

কভার-অফসেট : এন. কে. গোয়েন এণ্ড কো: প্রাইভেট লিমিটেড

1 5 1977

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১১ নভেম্বর ১৯৭৭
৭৫ পয়সা

লোকায়ত লোক শিল্প

সাঁটার গাট্টা

একটি আকর্ষণীয় উপহার

একমাত্র এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের
গিফ্‌ট চেকেই
সুদ পাওয়া যায়।
ছোটদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দেবার
সেরা উপহার।

এমন উপহার দিন যা দিনে-দিনে আসল দামের চেয়েও বেশী দামী হয়ে উঠে। ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের গিফ্‌ট চেক এক আদর্শ উপহার।

* **প্রদেয় সুদের হার ঃ**
  ৪% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ৯১ দিন পরে ভাঙালে।
  ৪.৫% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ৬ মাস পরে ভাঙালে।
  ৬% যে তারিখের গিফ্‌ট চেক তার ১ বছর পরে ভাঙালে।
* বিনা কমিশনে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত যে কোন মূল্যের চেক পাওয়া যায়।
* ভারতে এই ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় কিনতে পাবেন ও ভাঙাতে পারবেন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

U-AB-2 BEN

নাটক ।

রতনকুমার ঘোষের

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা
সেন্সার-বন্দী নাটক (নারী-বর্জিত) ৫.
সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫.
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে (১ নারী) ৫.
সীতাহরণ (২ নারী) ৫.
সকালের জন্য (১ নারী ।। ৫ম সং) ৫.
ভোরের মিছিল (১ নারী) ৫.
এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫.
দোহাই হাসবেন না (২ নারী) ৫.
সম্রাট (২ নারী) ৫. **ফেরা** ৩॥.
অমৃতস্য পুত্রাঃ ৩ নারী) ৫.
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩.

নাটক ।।

মনোজ মিত্রের

পরবাস (১ নারী) ৫.
নরক গুলজার (১ নারী) ৫.

অগ্নিদূতের

বৃত্ত বিশ্ব ভালবাসা (১ নারী) ৫.

দিব্যেন্দু গুহর

ল্যাঙ্গুয়েজ (৩ নারী) ৫.

মনোরঞ্জন দাসের

অরণ্য ফসল (২ নারী) ৫.

সুশীলকুমার গুপ্তের

সমান্তরাল (২ নারী) ৫.

অগ্নিমিত্রের

পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫.

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

কেষ্টধনের কেরামতি (২ নারী) ৫.

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্লেক জানি (১ নারী) ৫.

মন্মথ রায়ের

শরৎ বিপ্লব (৪ নারী) ৫.

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জনপদ বধূ (৫ নারী) ৫.

তমাল দাসের

স্বপ্ন সম্ভবা (২ নারী) ৩.

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের

ক্যাপ্টেন হুররা
(২য় সং ।। ১ নারী) ৫.

গঙ্গাপদ বসুর

নহমাতা (১ নারী) ৩॥
একটি স্বপ্নের জন্যে (২ নারী) ৩॥

রামারমণ ঘোষের

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৫.
রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫.

কিরণ মৈত্রের

রাতের কান্না (২ নারী) ৫.
শেষ কোথায় (২ নারী) ৪.

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু ৩॥

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর

জনক জননী (৩ নারী) ৩॥

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

আমার জননী (২ নারী) ৫.
এই মন সেই মন (২ নারী) ৩॥
পাঞ্চজন্য (২ নারী) ৩.

দেবনারায়ণ গুপ্তের

নাট্যকার (২ নারী) ৫.

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪.

শক্তিপদ রাজগুরুর

কুমারী মন (৩ নারী) ৩.

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩॥
ইস্তাহার (১ নারী) ৪
নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩.

অগ্নিমিত্রের

নিকটে ফাঁদ (২ নারী)
জটায়ু (৩ নারী) ৪.
নিজস্ব সংবাদদাতা (৩ নারী) ৩॥

পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ ফোন : ৩৪-৮৫৫৫

গা-ব্যথা করছে? এক গ্লাস জলে খান

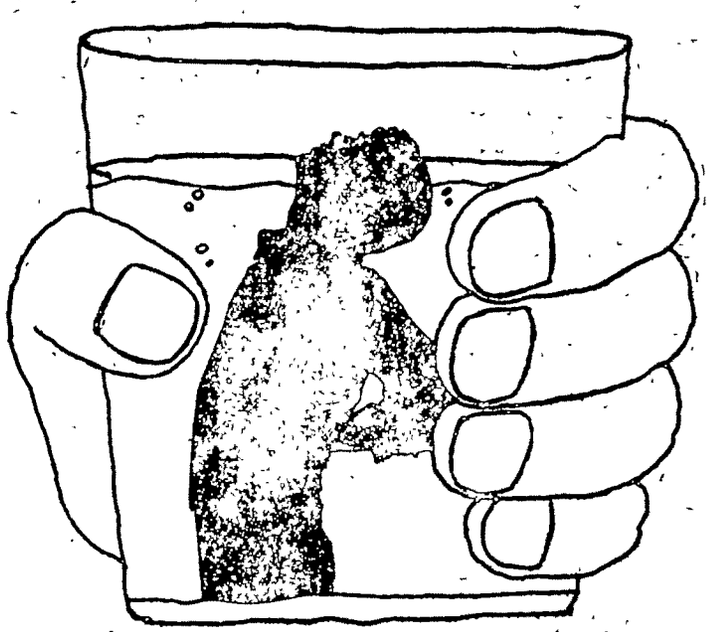

Saridon

আর কেবল একটি

সারিডন

ফেলুদার 'রোল'

(RP.2159A)

অমৃত
১৭ বর্ষ
২৬ সংখ্যা
২৫ কার্তিক
১৩৮৪
11th Nov. 1977

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ৪ বৈকুণ্ঠ পাঠক
চিঠিপত্র ৪
আমার জ্যাঠামশাই সুধীরঞ্জন ৭
প্রসাদরঞ্জন দাস
নভসা জীবনধারা ১০
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
মানুষ কেনাবেচার ইতিহাস ১৪
বজ্রমাধব ভট্টাচার্য
সমালোচনা ২০
গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪
মনোরঞ্জন বসু
মিসা/৭৩/২৮ শ্যামল রায়
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ৩২
মণীন্দ্র রায়/সুবোধ বসু
প্রচ্ছদ কাহিনী
সেকালের রেস একালে ৩৬
নারায়ণ দত্ত/দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোজিৎ মিত্রের গল্প ৪৪
সমরকান্তি বিশ্বাসের গল্প ৪৯
বিজয়া ৫১ কবিতা সিংহ
কবিতা ৫২
ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবি ৫৩
আনন্দময়ীর আগমনে ৫৪
উৎপলকুমার বসু
খেলা ৫৬ সিনেমা ৫৮ বিচিত্রা ৬২
ভিতরের ছবি ও অলংকরণ
সুবোধ দাশগুপ্ত, নিতাই ঘোষ এবং
মানব বড়ুয়া

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
যাত্রার জাত গেল
লিখেছেন প্রভাতকুমার দাশ

গল্প লিখেছেন
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য/সন্দীপ সরকার

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'

দেশভ্রমণ নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু সেটা প্রত্যাশিত পরিমাণে কিনা বলা শক্ত। সম্প্রতি পর্যটন মেলা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পর্যটনকে জনপ্রিয় করা। কিন্তু সময় নির্বাচন করার আগে বোধহয় আরো একটু বিবেচনা করলে ভালো হত।

দেশ বেড়াতে মানুষ বরাবরই ভালোবাসে। আদিম যুগের যাযাবর স্বভাবই হয়তো এর একটা বড় কারণ। তাছাড়া একালের এই ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনযাত্রায় স্নায়বিক পীড়ন এত বেশি যে মাঝে মাঝে জীবনযাত্রার পরিবেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও থাকে না। এটা যে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যেই দরকার তা নয়, মনের শুশ্রূষার জন্যেও বিশেষ রকম জরুরী। এবং ইদানীং দেখা যাচ্ছে চিকিৎসকেরা এমনকি অনেক শরীরের অসুখের জন্যেও মনকেই করছেন দায়ী।

হয়তো এই কারণেই ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বচ্ছল দেশের মানুষেরা দলে দলে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশেই টহল দিয়ে বেড়ান। মনের বিপর্যস্ত ভারকেন্দ্রকে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্যেই হয়তো তা করেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না, তাঁরা শুধু বিদেশেই যান না, নিজের দেশেও যথেষ্টই ঘুরে বেড়ান। অর্থাৎ ভ্রমণ তাঁদের কাছে নেহাৎই একটা শখের ব্যাপার নয়, এটা তাঁদের কাছে অপরিহার্য প্রয়োজন। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে প্রতি সপ্তাহের শেষেই তাঁরা ছুটির দিনগুলিতে বাইরে যান।

এই যে জাতিগত অভ্যাস, এটা এখনো আমাদের দেশে দূর অস্ত। সরকারি প্রচার যদি ভ্রমণকে এইভাবে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য রকম জরুরি বলে চেনাতে পারে, এবং সেভাবে অভ্যস্ত করাতে পারে, কিছুটা অন্তত কাজের কাজ হয়।

শ্যামল দত্ত রায়

প্রচ্ছদের নেপথ্যে ঃ ১৯৩৪ সালে বিহারে শ্যামল দত্ত রায়ের জন্ম। ১৯৫৫-তে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌স থেকে স্নাতক হন। একই সঙ্গে তেলরং, জলরং এবং ছাপের ছবিতে দক্ষতা দেখানো রীতিমত ক্ষমতার ব্যাপার। শ্যামলবাবু সেই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী।

১৯৫৩ থেকেই যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন শ্যামল দত্ত রায়। দিল্লীর ললিতকলা একাডেমী, বোম্বাইয়ের 'বোম্বাই আর্টস সোসাইটি', কলকাতার 'বিড়লা একাডেমী', 'অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস' ছাড়াও বিভিন্ন সহরে তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে। এ ছাড়া আমেরিকা পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ, আলজিরিয়া এবং বাঙলা দেশেও শ্যামলবাবুর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে শ্যামল দত্তরায় কলকাতায় অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস, স্টেট অ্যাকাডেমী ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিড়লা অ্যাকাডেমী প্রভৃতি বিশিষ্ট সংস্থা থেকে সম্মানিত হয়েছেন। সুবর্ণ পদকও পেয়েছেন এই স্বীকৃতির জন্য। সোসাইটি অফ কনটেমপরারী আর্টিস্টস-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সাহিত্য

ভাল জিনিস। ৭২ লক্ষ

ছবিতে কথায় ইতিহাস, পুরাণ, মহান ভারতীয় যুগপুরুষের কাহিনী—প্রকাশ করে চলেছেন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া বুক হাউস এডুকেশন ট্রাস্ট—১৯৭১ থেকে। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করতেই এই চেষ্টা। মুনাফা ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা বিস্তারে।

এমন কথাবার্তা সাধারণ শোনা যায়। তারপর একদিন তা লোকসানের অতলে তলিয়ে যায়। ভালো চেষ্টা বলে আমরা অকাল মৃত্যুর জন্যে মনে মনে দুঃখিত হই। এই বলে আফশোষ করে থাকি—ভালো জিনিস লোকে নেয় না। সবাই আচলে কাচ বাঁধছে।

আমাদের ধারণা, আমাদের দেশে হাল্কা ও মুচমুচে জিনিসই বুঝি বেশী চলে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা মনে করে থাকি—ভাল জিনিসের কোন চাহিদা নেই।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছি অন্য-ব্যাপার। ইণ্ডিয়া বুক হাউস এডুকেশন ট্রাস্ট ১৩০ খানি অমর চিত্রকথা বের করেছেন। প্রতিটি বত্রিশ পৃষ্ঠার এই সচিত্র গল্পকথা ভারতের অমর মানুষ বিষয় নিয়ে রচিত। ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস, লোককথা নিয়ে এই সব বই। আঞ্চলিক ভাষার ধ্রুপদী গ্রন্থও ওরা এমন ছবি ও কথায় ছেপেছেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু ভারত নয়—ইউরোপ, ফিজি, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স তানজানিয়া, হল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশুরাও এই সব ছবির গল্পকথা কেনে এবং পড়ে। গত সেপ্টেম্বর

অব্দি এ ধরনের ৭২ লক্ষ বই ওরা বিক্রী করেছেন।

ইংরেজী হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটিতে এসব বই ছাপা হচ্ছে। তাছাড়া ছাপা হয়েছে তামিল, তেলেগু, মালায়ালম উড়িয়া ও কন্নড় ভাষায়। কিছু ছাপা হয়েছে ফরাসী, সোহাইলী, ইন্দোনেশীয়, ফিজি, স্প্যানিশ ও ডাচ ভাষায়।

সম্প্রতি বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ওপর প্রকাশিত অমর চিত্রকথা বই দুখানি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ৬ হাজার কপি করে বিক্রী হয়ে গেছে।

এদের তালিকায় দেখতে পাচ্ছি, প্রহ্লাদ, পৃথ্বীরাজ চৌহান, রামচন্দ্র রাণপ্রতাপ বর্ণজিত সিং, শকুন্তলা, শেখ শাহ সুভাষচন্দ্র—সবাই আছেন।

কে বলে ভাল জিনিস চলে না?

বৈকুণ্ঠ পাঠক

চিঠিপত্র

কাঁঠালের আমসত্ত্ব

আপনার পত্রিকার ২৬ আগস্ট ১৯৭৭ সংখ্যায় দুই কবি অমল মুখোপাধ্যায় ও সামসুল হক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক অমল মুখোপাধ্যায় একেবারে ন্যাজে-গোবরে করে ফেলেছেন। অমৃত যখন একটি বহু আলোচিত পত্রিকা হয়ে উঠেছে, তখন একজন কবিতা-সম্পর্কে-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে কবিতার বই-এর আলোচনা করানোয় শুধু যে সমস্ত ব্যাপারটাই 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' হয়ে উঠেছে তা নয়, অমৃতের সুনামও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আলোচককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, উনি কি পত্রিকা-মারফৎ ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন?

১। চাঁদকে মতি মুখোপাধ্যায় স্ত্রী-লিঙ্গ দান করার ক্ষুব্ধ হয়েছেন আলোচক। ধান গাছের কোন লিঙ্গ পরিচয় নেই—জীবনানন্দও দ্যাখেন নি, তবুও তিনি লিখেছেন, তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল। আলোচকের অভিমত চাই।

২ সবলবর্গীয় বুকে বলতে উনি নাকি এতদিন তুণ জানতেন। এ মন্তব্যে ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হয়ে উঠেছে। কোন্ বই থেকে এ-খবর পেলেন, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা কতো, জানতে চাই।

৩ সামসুল হকের কবিতার কথাটা কি সেক্স-বর্ণন ক্ষেত্র ছিলো? বোধ হয় লাইনটা ছিলো, 'শেষ ঘা ফালের বেদ স্ব-নক্ষেত্রে'। এতে অন্য অসঙ্গ গতি কোথায়।

৪ 'বেদের হৃদ' কি খুবই কষ্ট-কল্পিত? তাহলে পূর্ণিমার চাঁদকে ঝল-সানো রুটি', অথবা হিমালয়কে 'পৃথিবীর স্তন' ভাবা—এসবই তো কষ্টকল্পনার আওতায় পড়ে?

আর একটা কথা, দ্বিতীয় বইটি আলোচনা করতে গিয়ে আলোচক মাত্র তিনটি কবিতা পড়ে সমগ্র বইটির আলোচনা করেছেন, এজন্য আলোচককে ধন্যবাদ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১।৭ নিউ টালীগঞ্জ, কলকাতা-৩৩।

সমালোচক হলেই কবিতা লেখার অধিকারী নন

২৬শে অগস্ট 'অমৃত'তে অমল মুখোপাধ্যায় দুটি কবিতার বই-এর আলোচনা করেছেন।

তার আলোচনা পড়ে এই কথাই মনে

হলো যে, সমালোচক হলেই তিনি কবিতা বোঝার অধিকারী নন। ওরস উপলব্ধি করার মতো স্বতন্ত্র কিছু মেধার প্রয়োজন। আর এটাও ঠিক যে, ভাষাতত্ত্ববিদ বা বৈয়াকরণ হলেই তিনি কাব্য বোঝার মতো স্বতন্ত্র রসবেত্তা হতে পারেন না।

মতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই-এর নাম সরল বর্গীয় ঋজু উদ্ভিদ। বর্গ কথাটার অর্থ স-জাতীয় সমূহ। আর বর্গীয় কথাটার অর্থ বর্গ সম্বন্ধীয়। ঋজুর আরো অর্থ আছে : সুবোধ্য ও সুন্দর উদ্ভিদের অর্থ : যা মাটি ভেদ করে ওঠে। তাহলে অর্থ দাঁড়াল : সোজা সজাতীয় সুন্দর উদ্ভিদ। সোজা এবং স-জাতীয় হলে যে তা কেবলই তৃণ হবে তার মানে আছে কি?

যখন আলঙ্কারিকরা বহু যুগ আগে থেকেই সুন্দরী মেয়ের মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করে থাকেন তখন যে তারা স্ত্রীলিঙ্গের ওপর পুংলিঙ্গ আরোপের অবৈধতা সম্বন্ধে খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়েই এই কাজটি করেছিলেন তা তো মনে হয় না। আসলে কবি ব্যাকরণ শাস্ত্র মেনে কবিতা রচনা করবেন এমন আশা যেন অমল মুখোপাধ্যায় কখনো না করেন। তাহলে মৌলিকতার সঙ্গে সমালোচনা মিশেই সমালোচনা সাহিত্য গড়ে তোলে। লোপামুদ্রা কর, ১৭৭ডি, এস পি মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬

শিশুর মতো বিস্ময়

২৬ অক্টোবর অমৃতে সমালোচনা বিভাগে সামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ 'নিভন্ত মোমবাতির তলায় শাদা ঘোড়ার' আলোচনা পড়ে যথেষ্ট পরিমাণে হতবাক হওয়ার সুযোগ ঘটল।

স্পষ্ট কথা বলার প্রলোভনে তিনি যে এরকম স্থূল ভ্রান্তির ফাঁদে জড়িয়ে পড়বেন তা বোধহয় সমালোচক নিজেও জানতে পারেন নি। সমালোচক আশ্চর্য হয়েছেন এই কথা ভেবে যে সভ্যতার বিকাশের পেছনে শ্রম ও মেধারই অবদান থেকে থাকে স্বপ্ন ও স্মৃতি আবার আসে কোথা? প্রায় শিশুর মতো বিস্ময়। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়েছি এই কথা ভেবে যে,এই অত্যন্ত সহজ সত্যটি কী করে সমলোচকের কাছে ধরা পড়ল না যে, মেধা ও শ্রম এবং স্বপ্ন ও স্মৃতির মধ্যে কোনো বৈবিত্যমূলক বৈপরীত্য নেই। সভ্যতার বিকাশের পেছনে যে পরিশ্রম ও পরিশ্রমার্জনিত মেধা রয়ে গেছে, তা যে বাস্তবিক সিকভাবে মানুষের মস্তিষ্কের কোষে সঞ্চিত স্মৃতির সহযোগিতা থেকেই উৎপন্ন—এ-কথা বুঝতে নিশ্চয়ই ডায়লেক্-টিকসের তত্ত্ব জানতে হয় না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

সামসুল হকের ব্যাকরণ জ্ঞান সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা রীতিমতো প্রতিবাদ-যোগ্য। সামসুল হকের কবিতাতে ব্যাকরণের শুদ্ধতা বোধ হয় একটু বেশি মাত্রাতেই থাকে। তাছাড়া 'সেদ সন্নক্ষেত' বলে কি সত্যই কোনো শব্দ গঠন করেছেন তিনি? তিনি বলেছেন—ব'য়ে যা ফুলের সেদ সন্নক্ষেতে। একেবারে নির্ভুল ব্যাকরণ। সমালোচক কী সমালোচনা করার ঝোঁকে এই বাক্যের অর্থই বুঝতে চান নি? আর সমাজ-রপন করার মধ্যে তো আমরা অন্তত অভিনব কিছুই দেখতে পাই নি। এইটাও ব্যাকরণের ভুল নাকি? আসলে সমালোচক শুধুমাত্র সমালোচনার জন্যই সমালোচনা করার প্রলোভনে এতদূর চলে গেছেন যে, মতি মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন যে, তৃণ নাকি সরলবর্গীয় বৃক্ষ। না শুধু এরণ্ড নয়, তৃণও তাহলে আজকাল বৃক্ষ হচ্ছে। হচ্ছে যে তা' তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত; নবপল্লী বারাসাত।

মেজাজ খারাপ হয়ে যায়

অমৃতের ২৬ আগস্ট সংখ্যার সমালোচনার পাতায় অমল মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ খারাপ হয়ে যায়' পড়ে কিছু কৌতুক বোধ করলাম। আমি চাঁদের লিঙ্গ কী, জানি না। কিন্তু কি সত্যিই আছে? জীবনানন্দ 'বুড়ি চাঁদ' লিখেছিলেন অসাধারণ সার্থকতায়। তবে কি মতি মুখোপাধ্যায়ের নটিনী শব্দটিতে সমালোচকের আপত্তি? তাহলে তিনি কথাটা বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেললেন কেন?

সামসুল হকের 'নিভন্ত মোমবাতির তলায় শাদা ঘোড়া' সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই যার মধ্যে শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র পরীক্ষা আছে, জটিল অথচ সার্থক চেতনা-পদ্ধতি আছে, মেধার সতর্ক ব্যবহার আছে, এবং প্রথম কবিতাটি একটি দুর্ধর্ষ কবিতা। কিন্তু সমালোচক শুধু বিজ্ঞজনের মতো লাঠিই ঘোরালেন। এই বই-এর একটু-ও কাছে যেতে পারলেন না। কালীকৃষ্ণ গুহ; কলকাতা-৩৮

পিঠ চুলকান সমালোচনা নয়

২৬-৮-৭৭ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের লেখা মেজাজ খারাপ হয়ে গেল' সমালোচনাটি খুব ভালো লাগল। তিনি যে পিঠ চুলকানো সমালোচকদের দলে নন, স্পেডকে স্পেড বলার সৎ সাহস যে তাঁর আছে তার প্রমাণ 'অমৃতে' প্রকাশিত সমালোচনাটি।

পেরেকের ঠিক মাথায় ঘা দিয়ে অমল বাবু বলেছেন, 'অনেক দিন ধরে ব্যাপারটা চলে আসছে। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে। যেটা অনুভব করি, সেটা অকপটে বলার অক্ষমতা। কেবলই নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে আপস করে চলার মধ্যে যে কাপুরুষতা আছে, তা আমাদের চরিত্র ও শক্তিকে দিন দিন হীন করে ফেলছে।. সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে কথাটা নিদারুণভাবে প্রযোজ্য। এমন একটা স্বার্থচক্র, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতের মত সাহিত্যেও গড়ে উঠেছে যে সাহিত্যিকরা পরস্পরের পিঠ চুলকে চলেছেন। মনে মনে যাই ভাবুন না কেন, প্রকাশ্যে কেউ সত্য কথা বলেন না। হয়ত ভাবেন, সত্য বলে অকারণ বাজার নষ্ট করে লাভ কি? তার চেয়ে আমিও ভাল, তুমিও ভাল, সমালোচনার এই নীতি অনেক বেশী ব্যবসায়িক ফলদ। ফলতঃ সমালোচনার ক্ষেত্রে সত্য কথার বিপরীতটাই চলে আসছে। তাই আজকের কবি ও কথাশিল্পীরা পাঠকদের তোষাক্কা না রেখে বছরের পর বছর যা খুশি তাই লিখে যেতে পারছেন। এদিকে সৎ পাঠকেরা তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। শত অভিযোগ তাদের মনে জমা হয়ে আছে বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এখন ত আরও মজা আছে। যাঁরা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, মোটামুটি তাঁরাই সেরা সমালোচকের আসনে জাঁকিয়ে বসে আছেন, গাঁয়ে মানুক বা না মানুক।'

সত্যি কথাই বলেছেন সমালোচক। সৎ পাঠকের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অনিল সোম, গ্রামসেদগঞ্জ।

কিছু বলার নেই

২৬ আগস্টের অমৃত-এ সামসুল হক-এর 'নিভন্ত মোমবাতির তলায় শাদা ঘোড়া' এবং অন্য এক কবির আরেকটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা (?) প্রসঙ্গে শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ফলতঃ সমালোচনার ক্ষেত্রে সত্য কথার বিপরীতটাই চলে আসছে। স্পষ্টভাষী এবং সাহসী অমল-বাবুর লেখা পড়ে আবার আমাদের মনে পড়লো, সত্যিই সমালোচনার ব্যাপারটা আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। জীবনানন্দর 'সমারূঢ়'র অধ্যাপকের সম্ভবত কিছু কিছু বদপাদ জানা ছিলো, অমলবাবুর ক্ষেত্রে সেটুকুও না থাকায় সমালোচনাটি একটি হাস্যকর অসংলগ্ন বাচালতায় পরিণত হয়েছে। যার যে রকম বোঝার ধরন, কবিতা তিনি সেরকমই বুঝবেন,—আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু জনক-জননীর মতো সহজ কবিতাটাও যে তিনি গুলিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন, তা ভাবতে একটু কষ্ট হয় নিশ্চয়ই। শ্রম ও মেধা এবং স্বপ্ন ও স্মৃতি মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং এই চারের সমাহারেই সভ্যতার জন্ম, শুধু প্রথম দুটি নিয়ে নয়। অমল-বাবু লিখেছেন—পাল্টে গেল মতটা, অমনবা যদি বলি—উল্টো বুঝলি রাম। যাক এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না, কেননা, অমলবাবুও কবিতার আলোচনা প্রায় কিছুই করেননি। অমলবাবু যে বিষয়ে উৎসাহী, সেই বিষয়েই আমরা এবার কিছু বলতে চাই। ব্যাকরণ। ভাগ্যিস অমলবাবু বলেননি—সামসুল হক বা। জানেন না। তিনি বলেছেন—কবি ব্যাকর। নিয়ম মানামানির লাইনেই যাননি। অম বাবুকে ধন্যবাদ, কেননা, সামসুলের এক। দুর্নাম ছিলো—তিনি নাকি ব্যাকরণ নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামান, কবিতাটাকেই

ব্যাকরণ করে তুলতে চান, অমলবাবু সেই দুর্নামটা ঘোচালেন। সামসুল হক এবার নিশ্চয়ই খুশী। কিন্তু, অমলবাবুর লেখা বাক্যগুলো এমন হয়েছে যে, সামসুল হকের ব্যাকরণ দিয়ে তিনি কী বলতে চান, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। তাছাড়া, মূল বইটা খুলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামসুল বাক্যকে যেভাবে গঠন করেননি, শব্দকে যেভাবে স্থাপন করেননি, অমলবাবু সেই দায় সামসুলের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। বইটা কি অমলবাবুর হাতের কাছে ছিলো না? ব্যাপারটা কী? সামসুল ব্যাকরণকে শুধু যে মেনেছেন তাই নয়, প্রয়োজনের অনেক বেশি মেনেছেন। এবং এটাই তাঁর কবিতার প্রধান দোষ। এই বিতর্কের মীমাংসা করার জন্যে আমরা সম্পাদকের সামনে একটা প্রস্তাব রাখছি। তিনি অমল-বাবুর সঙ্গে সামসুল হকের একটা সাক্ষাৎ-কারের ব্যবস্থা করুন। সেখানে কেবলমাত্র ব্যাকরণের আলোচনা হবে। অমলবাবু নিশ্চয়ই এতে উৎসাহ বোধ করবেন। আর সামসুল হককে অনুরোধ করবো, আপনি আপনার দুর্নামকে আর একবার বরণ করে নিন। শুধু দুটো শর্ত থাকবে: ১। আলোচনাটি স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ২। সত্যিকারের কোনো ব্যাকরণবিদ সেখানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সেই বিতর্কের পূর্ণ বিবরণ আমরা আপনার পত্রিকায় দেখতে চাই। পাঠক হিসেবে এটা আমাদের দাবি। নতুবা আমাদের মেজাজ সত্যিই খারাপ হয়ে যাবে। পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ, কাকদ্বীপ ২৪ পরগণা।

কলকাতা—দুর্গোৎসব ও লিট্‌ল ম্যাগাজিন

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজোয় এবার আমাকে টেবিলক্লথের ফ্যেয়াস দিতেই হবে.: আদি ঢাকেশ্বরী থেকে ছোট পিসির মত একটা নীল পার কাঞ্জিভরম সিল্ক না দিলে পুজোয় আমি বেরোবোই না..; মুগার কাজ করা একখানা ধনেখালি আর জড়ির পাড়ের একটা টাঙ্গাইল যদি না দাও তাহলে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে ছাড়বো বলে রাখছি..; মেজ ছেলে (ইনি তৃতীয়বার বি. কম, পার্ট ওয়ানের জন্য তৈরি হচ্ছেন) ছোট মেয়ে (ইনি 'পি' ডিভিশানে মাধ্যমিক পাশ করে বর্তমানে এগারো ক্লাশের ছাত্রী) এবং স্বয়ং গিন্নির এহেন সোচ্চার দাবী শুনে মধ্যবিত্ত গৃহকর্তার প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, সে সময় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের তরুণ সম্পাদক তার আগামী শারদ শাখার সংখ্যার জন্য কুটীর শিল্পসংস্থা—এম. টি. পি. ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস এবং পাড়ার টেলারিং সপ থেকে বিড়ি উৎপাদক পর্যন্ত একটি বিজ্ঞাপনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের যথোচিত আনুকূল্য ব্যতীত লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশের সড়ক খুঁজে পায় না। দুটো 'ফুল পেজ' বিজ্ঞাপন মানেই পত্রিকার একটা ফর্মা বৃদ্ধি পাওয়া।

ছোট বড় সব সম্পাদকই তার পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি আরো ভালো সুন্দর করে তুলতে চান। এবং এই 'আরো' ব্যাপারগুলোর যথাযথ সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে অনিবার্যভাবে সম্পাদকের সোয়া পাঁচ কেজি ওজন কমে যায়।

দুনম্বরী টাকায় গোদরেজ স্টীল আলমারির 'হিডন চেম্বার' ভরিয়ে রাখা তথাকথিত উঁচুমহলের উঁচু অফিসারগণ স্কচ হুইস্কির গেলাস ও লাস্যময়ী স্টেনোর বুক থেকে মুখ তুলে একটি-বারও ভেবে দেখেন না এবার পুজোপলক্ষে তার স্ত্রীর কেনা দুটো শাড়ীর মোট মূল্যের সমপরিমাণ টাকার জন্য একটি পত্রিকার বহু আকাঙ্ক্ষিত শারদ সংখ্যাটি প্রকাশ করা গেল না।

আলো ঝলমলে বাতানুকূল বিপনিতে দুটো বেনারসী ক্যাশ কাউন্টারে, পাঠিয়ে আমেরিকান জর্জেটের দিকে হাত বাড়ানো মেদবহুল থলথলে ফুটবলের মত দেখতে মহিলাটি একবারের জন্যও আঁচ করতে পারলেন না যে সেই বিপনির সামনের ফুটপাথ ধরে উসকো-খুসকো চুলে ঝোলা কাঁধে একটি তরুণ ছুটে যাচ্ছে কোন এক প্রেসের উদ্দেশ্যে। তরুণটির ঝোলায় দুটো 'হাফ পেজ' বিজ্ঞাপনের ম্যাটার এবং তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পত্রিকার কভারটা দু'কালারে করা যাচ্ছে।

এই মাত্র যে তরুণীটি 'অষ্টমীর দিন তোমার থাকা চাইই চাই. . নইলে. .' ইত্যাদি শব্দে ভরা তার প্রেমিকাকে দুপাতা চিঠিটি ডাকবাকসে ফেললে, ঠিক তক্ষুনি কলেজ স্ট্রীটের কোন এক গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরে বাঁহাতে জ্বলন্ত চারমিনার নিয়ে নিবিষ্ট মনে প্রথম ফর্মার প্রুফ দেখছে এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ।

মহালয়ার ভোরে আকাশবাণীর মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানে পাড়া কেঁপে ওঠার পরই হঠাৎ একদিন ঝপ করে ষষ্ঠী এসে দুয়ারে হানা দ্যায়।

মা দুর্গা তাঁর উড়নচণ্ডী ভবঘুরে স্বামীকে ছেড়ে চার রাত্রির জন্য বাপের বাড়ি আসেন। এ বাড়ির টেঁপি আর পাশের বাড়ির ন্যাপলা ছাদের ওপর ঢিলে বাঁধা চিঠি ছোড়াছুড়ি করে ঠিক করে নেয় সপ্তমীর দিন কে কখন কোথায় থাকবে। নোতুন জামাই শালিকাবৃন্দের কাছে সম্মান রক্ষার্থে অফিসের গাড়িটা অনেক কষ্টে একদিনের জন্য ম্যানেজ করে ফালে। ক্ষণিক সুখের পিয়াসী নয়নারীদের নিয়ে 'পুজো স্পেশ্যাল' গুলি বওনা দ্যায় তথাকথিত কোন 'মনোরম' জায়গার উদ্দেশ্যে। তরুণ বিকসাচালক সপ্তমী অষ্টমীতে সারাদিন সারারাতের টিপে উপার্জন করা টাকায় (অন্ততঃ নবমীর দিন তো দিতেই হবে) বউকে একটা ডুরে শাড়ি কিনে দেবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। প্রবাসী স্বামী এবার পুজোয় আসতে পারছে না জানতে পেরে যুবতী বউ তার একমাত্র দ্যাওরকে 'প্রক্সি' দেবার জন্য বেছে নেয়। সুন্দরী কলকাতা (কল্লোলিনী!) আলোর মালায় সেজে এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে মুচকি হাসে।

দেখতে দেখতে পার হয়ে যায় সপ্তমীর রাত, এভাবে অষ্টমী—নবমী. .।

হাজারো মানুষের মাথায় ভরে ওঠে বারুঘাট। একে একে বিভিন্ন আলোক-সজ্জায় সেজে 'ব্যান্ড পার্টি'র কান ঝালাপালা করা আর্তনাদের মাঝে (সিটি সহযোগে কোমর বাঁকানো টুইস্টনাচ তো আছেই) মা দুর্গা আবার শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

যুবক তার তরুণী বান্ধবীর হাত মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে হৃদয়ের গহন গভীর থেকে প্রার্থনা জানায়, সামনের বার আরো বেশী আনন্দ আরো বেশী সুখপ্রদ মুহূর্তের পসরা নিয়ে এসো মা। কর্মাশিষল বকবাজ পার্টির ওয়ার্কিং মেম্বাররা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে. হায় যাওয়া এবি মধ্যে পুজো শেষ হয়ে গেল। আমিনিয়া নিজামের মালিকেরা পাঁচ ও দশ টাকার নোটগুলো আলাদা আলাদা বান্ডিল করতে করতে ভাবে—কলকাতায় ব্যবসাটা বেশ ভালই জমে উঠেছে।

একরকম সময়, চারদিকে যখন নানা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ব্যালেন্স সীট কষা চলেছে একটু কান পাতলেই সেই উসকো-খুসকো চুলের ঝোলা কাঁধে তরুণটিকে শংকর বা পাতিরামের বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম স্বরে একান্ত গোপন কথার মত ফিসফিস করে বলতে শোনা যাবে, কি গো, ক' কপি বিক্রী হলো?

[প্রিয় শিল্প ।। প্রথম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত]

আমার জ্যাঠামশাই সুধীরঞ্জন

প্রসাদরঞ্জন দাস

ঠাকুমার আদরের খোকা, আমার শ্রদ্ধেয় জ্যাঠামশাই এবং আপনাদের সকলের প্রিয় সুধীবাবু অথবা সুধীদা চলে গেলেন। এখানে এমন অনেক বয়স্থ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা তাঁকে আমার থেকে অনেক বেশিদিন ধরে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তাই আমাকে যখন তাঁর একটি জীবনালেখ্য রচনা করার কথা বলা হল, তখন আমার মনে হল —এটি এক সামান্য গজকাঠি দিয়ে একটি মহাসমুদ্র পরিমাপ করার অথবা একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে বলার মত অসম্ভব প্রস্তাবের সামিল। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রের কথা বলে, তিনিও তেমনি তাঁর কথা বলে গিয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে, আত্মজীবনীতে ও স্মৃতি-চয়নে। তাই তাঁর বিশাল জীবনী রচনায় না গিয়ে আমি শুধু কয়েকটি ঘটনা বা দৃশ্যের অবতারণা করছি যা খুব কাছের মানুষ হিসাবে একান্তই আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করব কালিম্পং পাহাড়ে একটি প্রত্যুষের কথা। মাসটা ছিল সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সাল। আমার বড়মা অর্থাৎ আপনাদের বরুদি গত হয়েছেন তার কয়েক মাস আগেই অর্থাৎ এপ্রিলে। দাদা এবং ছোড়দাও নেই। জ্যাঠামশাই কালিম্পংএ তাঁর প্রিয় 'স্বপনপুরীতে' একাকীত্বের জীবন যাপন করছেন। আমি দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায় একটি প্রজেক্টের কাজে কর্মরত এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখতে যাই।

একদিন খুব ভোরে জ্যাঠামশাই-এর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল, 'বাবুই উঠে পড়, বাইরে আয়' ডাকছেন তিনি। উঠে বাইরে আসতেই যেন এক স্বর্গোদ্যান উন্মোচিত হল আমার চোখের সামনে। কুয়াশার যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে সূর্য উঠছে পর্বতের শিখরে তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রতিফলিত হচ্ছে তার কিরণ এবং সেই দিকে তাকিয়ে আমার ঋজুদেহী ঋষিসদৃশ জ্যাঠামশাই উচ্চারণ করছেন সূর্যমন্ত্র—

'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্ন প্রণতোস্মি
দিবাকরং'

সে এক আশ্চর্য উপলব্ধিতে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। আমার আধুনিক কারিগরী শিক্ষার বনিয়াদ আচম্বিতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি প্রাচীন ভারতবর্ষের যেন একটি ঝলক দেখতে পেলাম। একজন বিশাল মানুষ তাঁর বিশালতর ঐতিহ্য নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটি পথ খুলে দিলেন, যে পথে আমার পূর্বসূরীরা গমন করেছেন, যে পথে আমার ভারতবর্ষ, যা থেকে আমরা এখন নির্বাসিত।

সেইবার কালিম্পং-এ জ্যাঠামশাই আমাকে আরও অনেক বহুমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার মনে তখন উঠত নানা প্রশ্নের ঝড়। জ্যাঠামশাই বুঝতেন তা। শুধু আমি নয়, আমার বয়সী আরও অনেক ছেলেমেয়েদের মনের দরজা ঠেলে এক লহমায় ভেতরে চলে যেতে পারতেন তিনি সেই বয়সেও। শাশ্বত মনের মানুষ যাঁরা তাঁদের কাছে 'জেনারেশন গ্যাপ' কোন বাধাই নয়। তাঁর কালিম্পং-এর বাড়িটি ছিল যেন এক তীর্থক্ষেত্র। বহু ছোট-বড় আবাল-বৃদ্ধবণিতা আসতেন তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা মনে চেপে রেখে সবাইকে পথ-নির্দেশ করতেন জ্যাঠা-মশাই। আমার মনে হত মহাভারতের সেই বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেবের কথা—শরশয্যায় শায়িত হয়েও যিনি উত্তরসূরীদের শান্তিপথ দেখিয়ে ছিলেন।

বংশসূত্রে আমাদের দেশ ঢাকা বিক্রম-পুরের তেলিরবাগ গ্রামে। ঐ তেলিরবাগেই কেটেছিল জ্যাঠামশাইয়ের শৈশব। সেই সময়ের একটি গল্প তিনি সহাস্যে আমাদের বলতেন। শিশু সুধীরঞ্জনের হাতেখড়ি হয়ে-ছিল তেলিরবাগের পুরোহিত গদাধর চক্র-বর্তী মশায়ের কাছে। তবে সেই পুরোহিত 'ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য যে কতটা তাতে নাকি গুরুজনদের কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। তাই হাতে খড়ির পর দুএকজন হিতৈষী ঠাকুমাকে বলেই ফেললেন, 'সোনাবেমা, খোকার হাতে খড়ি শ্যাষে গদাধর ঠাকুরের হাতেই কয়লা, পোলাটায় মূর্খ না হয়।' ঠাকুমা কি বলে-ছিলেন জানি না, কিন্তু সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাগে অগ্নিশর্মা। দৃপ্ত ঘোষণায় বলেছিলেন—'এই আমি গদাধর শর্মা আজ কয়া দিলাম, এই পোলায় একদিন অনেক উচুতে উঠব।' সেদিনের সেই পাঁচ বছরের খোকা একদিন সত্যিই খ্যাতি, যশ, সম্মান, বিত্ত ও প্রতিপত্তির শিখরে আরোহন করে-ছিলেন। সেই গদাধর চক্রবর্তী তখন যদিও আর ইহজগতে ছিলেন না, তবু নিশ্চয়ই মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আর একটি পুরনো গল্প বলতেন জ্যাঠামশাই। ঠাকুমার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে, ঠাকুর্দার বয়স তখন ষোল। তারপর দিন যায়, ঠাকুমার কোন সন্তানের দেখা নেই। শেষে যখন বার বছর অতিক্রান্ত হয়ে ঠাকুমা বাইশে পা দিলেন তখন শ্বশুরবাড়ির অর্থাৎ ঠাকুর্দার বাড়ির লোকেরা ঠিক করলেন ঠাকুর্দার আর একবার বিয়ে দেবেন। ঠাকুমার তো মহা প্রমাদ। সতীন ঘরে আসে আসে এই সময় কোলে এলেন খোকা। ঠাকুর্দার দ্বিতীয় বিয়েটা আর হল না। ঠাকুরমাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ-লেন। এর পরে ধীরে ধীরে ঠাকুমার আরও সন্তান অবশ্য হল, কিন্তু ঠাকুমাকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, খোকা আমার সাধনার ধন, ওরে আমি কামনা করিয়া পাইছি।

জ্যাঠামশাই-এর চরিত্রের এক অতুল-নীয় বৈশিষ্ট্য, যা সকলকে বিস্মিত করত, তা হল ক্ষমতার শীর্ষস্থানে গিয়েও তিনি মনে-প্রাণে তেলিরবাগের খোকাই থেকে গিয়েছিলেন। বিপুল অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, যশ,কোনটিই তাঁর মনে অহমিকার ছায়ামাত্র ফেলতে পারেনি।ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র তাঁর কাছে সমানভাবে আসত, যেত

চিরদিন নিঃসংকোচে এবং নির্ভয়ে। 'সাহেব ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না' এই কথাটি তাঁর অভিধানেই ছিল না। সাধারণ মানুষ, সে যতই সাধারণ হোক না কেন, তাদের ঘরে গিয়ে বসতেন ঘরের লোকের মত। আবার এই লোকই প্রয়োজনে সিংহ সদৃশ আচরণ করেছেন সেই দুর্ধর্ষ মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রণের দুর্নীতি দমনে। মানুষ বিচারের একটিই বলিষ্ঠ মাপ ছিল তাঁর—লোকটি 'সৎ না অসৎ, সাধু না অসাধু। এছাড়া আর কোন বৈষয়িক ভেদাভেদ তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। এর একটি সহজ উত্তর আছে। কেউ যখন বিমানযানে সুউচ্চ আকাশ পথে উড়ে চলেন তখন ভূপৃষ্ঠে একতলা ও দশতলা বাড়ির উচ্চতার কোন ব্যতিক্রম তার কাছে প্রতীয়মান হয় না। জ্যাঠামশাই-এর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি হয়েছিল। মনুষ্যত্বের এত উচ্চতায় তিনি আরোহন করেছিলেন যে কে একটু ক্ষুদ্র, কে একটু বৃহৎ, তা ভেদাভেদ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমার ঠাকুর্দার একটি গল্প খুব বলতেন জ্যাঠামশাই। আমার ঠাকুর্দা কলকাতা পৌর দপ্তরের একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। কায়ক্লেশেই সংসার চলত। তথাপি তিনি বন্ধুমহলে ছিলেন একজন অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি। তা তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও সততার জন্য। একবার ঠাকুর্দার আর্থিক অনটনের সময় একজন দুর্বৃত্ত লোক তাকে মোটা উৎকোচের লোভ দেখালে তিনি তাকে প্রহার দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন। তার পর থেকে পৌর দপ্তরের বন্ধুরা তাঁর নাম দেন 'সাধু'। এই গল্পটি বলার সময় জ্যাঠামশাইর মুখ গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। বলতেন, 'আমরা বিক্রমপুরের তেলিববাগের দাসবংশের লোক। কষ্ট স্বীকার করতে হয় করবি কিন্তু অন্যায়র কাছে মাথা নোয়াস না কোন দিন।' এই রকম গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত জ্যাঠামশাইর মুখ যখন তিনি তাঁর দাদাবাবু চিত্তরঞ্জনের কথা বলতেন। জ্যাঠামশাই জন্মানোর পর চিত্তরঞ্জন ঠাকুমাকে বলেছিলেন, 'সোনা খুড়িমা, তোমার এই পোলার ভার আমি নিলাম।' তারপর থেকে জ্যাঠামশাইর জীবনে চিত্তরঞ্জনের প্রভাব যে কত গভীর তা আপনারা তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় পেয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কেবল তাঁর দাদাবাবুই ছিলেন না, এক কথায় ছিলেন তাঁর হিরো। আমি একবার বলেছিলাম, 'তোমাকে আমি প্রচণ্ড ঈর্ষা করি, জ্যাঠামশাই। তোমার একদিকে ছিলেন চিত্তরঞ্জন, অপর দিকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।'

আইন জগতের দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে জ্যাঠামশাই শিক্ষাব্রতীরূপে বিশ্বভারতীর অবৈতনিক উপাচার্য পদে যখন আসেন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছেন। যে গুরুদেবের আশ্রম থেকে জীবন যাত্রার পাথেয় তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেই আশ্রমেই আবার ফিরে এলেন জীবনের পড়ন্ত বেলায়। বিশ্বভারতীর তখন অবস্থা ভাল নয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সেই আশ্রমের পুরাতন আদর্শগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার কাজে হাত দিলেন। পাশে পেলেন আমার মেজ জ্যাঠামশাই অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার নিশীথরঞ্জনকে। তিনিও বিনা পারিশ্রমিকে আশ্রমের অবাধ উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন।

বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহেরুকে বলে জ্যাঠামশাই সরাসরি ব্যবস্থা করলেন তার। এই মিলিত প্রচেষ্টায় যোগ দিতে আরও হিতৈষীজন এগিয়ে এলেন। প্রভূত উন্নতি হল আশ্রমের। প্রভাতী প্রার্থনা অনুষ্ঠান বৈতালিক প্রায় বন্ধ হয়ে যায় দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। মুখে একটিও কথা না বলে উদাহরণ সৃষ্টি করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রতিদিন দেখা যেতে লাগল, অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে এই বৃদ্ধ উপাচার্য চলেছেন বৈতালিকের পথে। মন্ত্রের মত কাজ হল। আশ্রমিক বালকবালিকার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিতে প্রার্থনা সভা তপোবনের আকৃতি ধারণ করল।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একবার পণ্ডিত নেহেরু এসেছেন শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখাচ্ছেন জ্যাঠামশাই। পিছনে পিছনে আনন্দ পাঠশালা ও পাঠভবনের অজস্র বালখিল্য। শিশুরা পণ্ডিতজীর বড় প্রিয়। তিনি ভাবলেন তাঁকে ঘিরেই ভীড় বুঝি। কিন্তু এরা সুধীদাদুকেই ঘিরে ধরেছে। আশ্চর্য হলেন পণ্ডিতজী। তখন জ্যাঠামশাই সহাস্যে জানালেন যে এরা তাঁর দেশ-বিদেশের স্ট্যাম্পের গ্রাহক। সুধীদার কাজ নিয়মিত এদের স্ট্যাম্প যোগান। পণ্ডিতজী সানন্দে সামিল হয়ে গেলেন ওদের দলে। এরপর যতদিন পণ্ডিত নেহেরু জীবিত ছিলেন ততদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে হাজারো দেশের স্ট্যাম্প তিনি পাঠিয়ে দিতেন সুধীদাদুর ক্ষুদে গ্রাহকদের জন্য। কখনো ভুল হয়নি। সেই শিশুরা এতদিনে বড় হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ বা আজকে এখানেই রয়েছেন সেই মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে।

জ্যাঠামশাইর জীবনের শেষ কটি বছর যে কি মর্মান্তিক তা আপনারা সকলেই জানেন। সেই ভয়াবহ ঘটনাবলির সুরু হয় ছোড়দা সুহৃদরঞ্জন ও তাঁর বড় মেয়ের জীপ দুর্ঘটনার মৃত্যুতে। তারপর একে একে গেলেন খোকনদা, অর্থাৎ বীর বৈমানিক সুরঞ্জন, প্রাণাধিক ভাই কর্মবীর নিশীথরঞ্জন এবং অবশেষে সুদীর্ঘ সাহচর্যের দাবী চুকিয়ে সহধর্মিণী বুবু। তথাপি সেই বৃদ্ধ মহাবট শোকেতাপে অটল থেকে ছায়া দিয়ে চললেন। শৈশবে দাদাবাবু চিত্তরঞ্জন এবং কৈশোরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যে অংকুরকে মিলিত স্নেহধারায় এক বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন অবশেষে তার শাখায় ঘনিয়ে এল অপরাহ্নের ছায়া। গত বছর স্বপনপুরীতে বসে এক ধূসর সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাই হঠাৎ আমাকে বললেন, আর কদিন ধরে রাখবি আমায়, এখন তো কোথাও আমার হরিয়ে যবার নেই মানা।' কালিম্পং-এর অন্ধকার আকাশে সেদিন অজস্র নক্ষত্রের দীপাবলী। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোর দাদাবা, তোর বড়মা, মেজ জ্যাঠা নস্যু কেউ হারায়নি। এদের মাঝেই কোথায়ও না কোথাও আছে।' কি সুদূর বিশ্বাস। কি গভীর প্রত্যয়, কিছুই হারায় না।

অবশেষে ঘনিয়ে এল ১৬ই সেপ্টেম্বর। এক বিরাট মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের পথ পরিক্রমা করে শিয়রে শুভ্রফুল এবং সহস্র জনের প্রণাম নিয়ে ভেলা ভাসালেন অসীম শান্তি পারাবারে।

মৃত্যু মানে রূপান্তর—এই এক গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর। তাই যেন সত্য হয়। তাঁর সেই চিরন্তন উপলব্ধি বুকে নিয়ে আমরাও যেন আজ বলতে পারি, তিনি হারিয়ে যাননি, যাবেন না কোনদিন। বিক্রমপুরের পদ্মাপারে তিনি থাকবেন, থাকবেন রাজধানী দিল্লির পথে, কলকাতা হাইকোর্টের গথিক স্থাপত্যে তিনি থাকবেন। আর থাকবেন শান্তিনিকেতনের খোয়াই, শালবন আর পূর্বপল্লীর মাঠে। আবার কোপাই নদীর তীরে গুরুদেবের শেখানো গান গেয়ে আমাদের বলবেন, 'সেদিন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।'

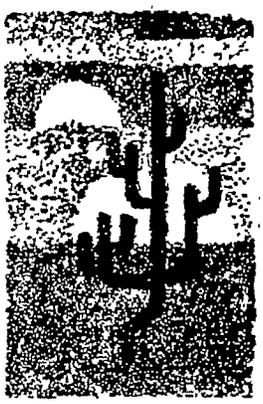

পটে আঁকা ছবি

নীল, সবুজ, গ্রে, কালো, ব্রাউন্ ও বেইজ্—
স্বপ্নসুন্দর নানান রঙের সম্ভার
আর কেউ দিতে পারে না উপহার।
পপলিন, কেম্ব্রিক, সার্টিন, ড্রিল, কটনের গ্যাবার্ডিন।
এছাড়াও, পলিয়েস্টার ব্লেণ্ড করা স্যুটিং ও শার্টিং

মদুরার কাপড়

প্রস্তুতকারী:

মদুরা কোট্স

বিক্রেতা: সুন্দরদাস খ্যাকার্সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৪, লুকাস লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০১ জয় ভারত ফ্যাব্রিকস্, ১৭, হুরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শিউভগবান গজাধর, ১১৩ বি, মনোহরদাস কাটরা, কলিকাতা ৭০০ ০০৭. শ্যাম টেক্সটাইলস্, মহাবীরস্থান, শিলিগুড়ি ৭৩৪ ৪০৪ (পশ্চিম বঙ্গ)

MCL-235 BEN

নভসা জীবনধারা

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

নৈশভোজ : এয়ারফোর্স স্টাইল

আবার একটি খাকি রঙের বাস। এটি নিয়ে গেল আজ সকালের দ্বিতীয় প্রাতরাশের টেবিলে। শাদা ডেকোলাম-টপ লম্বাটে টেবিলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সারি সারি প্লেট, কেন্দ্রস্থানে মধ্যখানে মহারাজের মতন ২ কেজি মাখন প্রথমেই চোখে পড়ে। বড় বড় ডিনার-প্লেটে টিন-উপুড়-করে ঢালা বিস্কিটই চার-রকম। কেক-পাস্ট্রি-ডিম-টোস্টের ছড়াছড়ি। আমার অগ্নিমান্দ্য নেই। সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে বলেই, কী ধরনের খাওয়া-দাওয়া করতে হবে ভেবে দমে গেলুম। বড় ভয় করল।

আমার অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বিশেষত ঝোড়হাট অফিসার্স ক্লাবের বিদায়ী ডিনারে। নিয়োদের বেকারিতে তৈরি বান-রুটি, ফ্রায়েড রাইস, দুরকম স্যুপ, স্মোকড ফিশ, চিকেন রোস্ট ফ্রুট সালাড ইত্যাদি। সুপরিকল্পিত সব ডিনারেই একটি বিশেষ আকর্ষণ থাকে। এখানে সেটা হয় রাশিয়ান সালাড নয়তো ক্যাশমিরী লঙ্কার তৈরি বেসিপিটিই হার। ঐ দুটির স্বাদ যথাক্রমে জিভ ও আলজিভে এখনো লেগে আছে।

ডিনার শেষ করে রণবীর ঠোঁট দুটো মুছে ফেললেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে শশীশেখর, ননীচোরা বালগোপালের মতই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। কাঁধের পর কাঁধে চড়ে স্বাশত দধিভাণ্ডটি ছুঁতে সে ছাড়া পারে আর কে? দশ কোর্সের ডিনারে সেকেন্ড হেল্প নেবার প্রয়োজন হয় শুধু তারই। রণবীরকে দেখিয়ে পারস্পেকটিভ পত্রিকার পুরুষ যখন আমাকে নিচু গলায় বলছে, 'দেখুন, ওর দাড়িতে এক ফোঁটা ঝোল লাগেনি'—তখন তৃতীয় ঠ্যাঙ নাড়িয়ে উত্তেজিত শশীশেখর বলে চলেছে, 'উই থট দি এয়ারফোর্স পিপল আর হোস্টাইল। বাট নাউ উই ফাইন্ড দে ক্যান বী হসপিটেবল অলসো হাঃ। হাঃ। হাঃ।' কী মারাত্মক সংক্রামক তার ঐ ঠেট হিন্দি কারবেকট-ইংরেজি এবং মাংসের ঝোল মাখা হিউমার! অনবধি মানুষ একসঙ্গে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠি।

বোস্ট তৈরি হয়েছিল এয়ারফোর্স পোলট্রির মুর্গি দিয়ে। শুয়োরের বাচ্চার মত এক-একটা। ১০০ জনের জন্যে বুফে-ডিনারে একসঙ্গে ২০০ মুর্গির ঠ্যাঙ আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। উল্লেখ থাকে যে, আমি বানীক্ষেত থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ফোর্ট উইলিয়মের পিছনে সূর্যাস্ত প্রভৃতি দেখেছি।

ব্রীফিং রুমে

ব্রেকফাস্টের পর ব্রীফিং-রুম। এয়ার-কণ্ডিশানড গ্যালারি রুমে উঁচু লেকচার স্ট্যান্ড থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন গ্রুপ-ক্যাপ্টেন ডি এস যোগ। এয়ার ভাইস মার্শাল জে আর ভাসিন আমাদের সঙ্গে নিচে বসে। দ্বিতীয়ভাগের ডেকগণের দিকে বালকগণের লোস্টের মত গাল্পে-মাথায় এসে পড়তে লাগল অশ্রুতপূর্ব সব শব্দবাক্য : ফাইটার পাইলট, সুপারসনিক, মিগ, অ্যালুয়েট, রাডার, রকেট, এম-আই-এইট, হান্টার, পায়, ন্যাট, অজিত, মিরাজ, ও মিশাইলস .. শেষমেষ, 'ওহে বালকগণ, তোমাদের কাছে যাহা ক্রীড়া, তাহাই আমাদের মৃত্যুর কারণ' ব'লে ভেসে-ওঠার অবস্থা।

পাইলটদের ট্রেনিং সম্পর্কে এখানে যা শোনা গেল, তা চমৎকৃত হবার মত। ১৫ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে কয়েকবার দাড়ি কামাবার আগেই, ছেলেদের একটি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। তারপর সিলেকশান বোর্ড। তারপর ডেরাডুনে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাদেমি : এখানে ৩ বছর। তারপর এয়ার-ফোর্স অ্যাকাদেমি : ১বছর। এবার সে 'ডানা' পায় বা কমিশনড হয়।

এরপর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ৪ বছর তাকে ফাইটার প্লেন চালাতে হয়। প্রথমে মিরাজ, ন্যাট, অজিত। সবশেষে মিগ২১। এই শেষ ২ বছর তাকে দাঁত পর্যন্ত-সশস্ত্র করে তোলে। অনেকে যেমন আর মানুষ থাকে না, হয়ে পড়ে ডাক্তার, মোক্তার, কবি, গয়লা, সমালোচক, সাঁকরা, এম-এল-এ বা মন্ত্রী—তিল রুমাল, বেড়াল হয়ে পড়ে-রুপালি জিগ্যাসায় আকাশ থেকে আকাশে লাফিয়ে পড়ে ঐ ৮ বছরে এরা হয়ে পড়ে ব্রাউডেড লোপার্ড এক-একটি. এই মেঘময় চিতারই অন্য নাম ফাইটার পাইলট। যত ছেলেকে ডেরাডুন পাঠায়, তার শতকরা ৩ ভাগও ব্যাঘ্রমনস্ক হয়ে উঠতে পারে না। তারা হেলিকপ্টার ও যাত্রীবিমান চালায়।

আমার সামনের বেঞ্চি থেকে এয়ার ভাইস মার্শাল জে আর ভাসিন উঠে দাঁড়ালেন। দেখলুম, তিনি পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ইঞ্চিপাঁচেক বেশি লম্বাই দেখাল যখন তিনি বললেন, 'আমাদের ফাইটার পাইলটদের ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া—সর্বত্র নানারকম কোর্সে যোগ দিতে আমরা পাঠাই। সর্বত্র থেকে তারা সেরা পুরস্কারগুলি কেড়ে আনে। সংখ্যার দিক থেকে এয়ারফোর্স হিসেবে আমরা পৃথিবীতে সপ্তম। কিন্তু, পারফরমেন্স-ওয়াইজ, অন্তত আমাদের ধারে কাছে এমন কেউ নেই, যারা ভারতীয় এয়ার-ফোর্সের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমার ছেলেরা যে-কোনো শত্রু-বিমান চূর্ণ করতে পারে।' ১৯৭১ সালে তারা যা দেখিয়েছে, আমাদের এখনকার শক্তির তুলনায় তা কিছুই নয়। হ্যাঁ,' এয়ার ভাইস মার্শাল বললেন, 'আমরা ইসরায়েলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।'

ভাইস-মার্শাল পুরোপুরি ভারতে তৈরি অজিত-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন, যা বিদেশী ন্যাট-এর জায়গা নিচ্ছে। মিগ ২১-এর গতি আমরা বাড়িয়ে নিয়েছি এবং অন্যান্য পারফরমেন্স। 'মিগ এখন ৯৮ শতাংশ ভারতেই তৈরি হয়' উনি বললেন এবং বারবার ডাকোটার প্রশংসা করতে লাগলেন। '২৭ বছর ধরে ঘর করছি, ওর তুলনা হয় না,' ডাকোটার কথা বলতে গিয়ে ঝোড়হাটের সান্ধ্য ককটেল পার্টিতে শ্রদ্ধায় প্রগাঢ় আর অনুরাগে আর্দ্র হয়ে এসেছিল গ্রুপ-ক্যাপ্টেন মানিন গলাও। মনে হয়েছিল, যেন পতিব্রতা আপন সহধর্মিণীর কথা বলছেন। দুর্ধর্ষ মিগ পাইলট অ্যালেন অ্যালে (বীরচক্র) তেজপুরের পার্টিতে গ্লাস বারবার পানীয়ে ভরে নিতে নিতে বলেছিলেন, 'মিগ! মিগ! মিগে আছেটা কী!' 'হাজার-হাজার গ্যাজেট শুধু। কিন্তু ডাকোটায়, শুধু ডাকোটাতেই আজো স্টীয়ারিং ধরা যায়।' পাইলট বোঝে, যন্ত্র নয়, সে, নিজে, প্লেনটা চালাচ্ছে!' ডাকোটা সম্পর্কে ছেলেবুড়ো সকলেই কেন উচ্ছ্বসিত? কলোম্বিয়াং যাবার আগে সেটা বুঝিনি।

অজানা বিমানবন্দরে

পূর্বাঞ্চলের কোনো একটি এয়ারপোর্টে আমাদের আনা হয়েছে (নাম বলা নিষেধ)। 'শুধু লিখতে পারেন, এখানে আকাশ নীল আর পৃথিবী সবুজ। আর ঐ দেখুন,' রণবীর তর্জনী তুলে দেখালেন, এখানে কত কাঞ্চনজঙ্ঘা।' সাময়িক সেন্সরশিপ অগ্রাহ্য করেও আমি কিন্তু আর একটু লিখব : অসলে ভোরের পাখিটিও এখানে যুদ্ধ কোথা, যুদ্ধ কোথা' বলে ডেকে ঘুম ভাঙায়।

এয়ার-কন্ড ব্রীফিং

আমাদের এয়ার-কন্ড ব্রীফিং বুমে আনা হয়েছে। পেপে, ব্রাহামস, সুজি এবং দামু এই চারজন নিতান্ত তরুণ বয়স্ক পাইলটকে শেষমুহূর্তের নির্দেশ দিচ্ছেন স্কোয়াড্রন-লীডার পুরী। স্ট্যান্ড-বাই হল রায়। পুরীর হাতে একটা লম্বা লাঠি। বড় বড় ব্ল্যাকবোর্ডের পর্দা টেনে, ম্যাপ দেখিয়ে, উনি আসন্ন বিমান-যুদ্ধের সম্ভাব্য জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছেন। বিমান-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি পাইলটদের আবার-করে মনে করিয়ে দেওয়া হল, যেমন ২৮৫০ লিটার পেট্রল আছে প্রতি প্লেনে, ইত্যাদি।

স্পেস-স্যুট পরে তারা প্রস্তুত হয়ে গেল। ওরা এখুনি ৪৫০০০ ফিট (৯ কিমির মত) উঁচু দিয়ে আকাশের ওপারে আকাশ ছুড়ে যাবে। সেখানে রক্ত টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, চামড়া ফেটে যায়, নাক ও মুখ দিয়ে দলগল করে রক্ত বেরুতে থাকে। তাই স্পেস স্যুট। এটা নিজে পরা বা খোলা যায় না। ব্লাড-প্রেসার যন্ত্রের ফিতের চেয়ে জোরে এটি সর্বাঙ্গ চেপে থাকে। পরে দেখেছি, যখন এই মহাকাশ পোশাক খুলে দেওয়া হয় তখন ফোয়ারার মত হিটকে ঘাম বেরুতে থাকে। তাকে তখুনি বৈমানিক চিকিৎসা-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পোষাক পরে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। শুধু অ্যাকসানের সময়, কিছুক্ষণের জন্য, পরতে হয়।

স্পেস-স্যুটের মাথায় স্বচ্ছ হুডটি এখন খোলা। হুডের মধ্যে ছোট্ট মাইক্রো-ফোন। পাঁচজন ক্লাউডেড লেপার্ড আপাতত কফি খাচ্ছে। পেপে একটি তুখোড় জোক করেছে। ব্রাহামস হা-হা করে হাসছে। একটু দেরিতে বুঝে, স্ট্যান্ড-বাই রায় হাসিতে যোগ দেয়।

হঠাৎ হ্যান্ড-সিগনালে টেক-অফ করার নির্দেশ দেওয়া হল। ঠিক দৌড়ে নয়, চার-চারটি চিতা মেঘময় লাফে লাফে এগিয়ে গেল চারটি মিগ-বিমানের দিকে। রায় কফি খেতে লাগল।

আমাদের আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল টেক-অফ আদেশের ঠিক ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে বিমানগুলি মাটি ছেড়ে দেবে। বিমান-যুদ্ধের সময় মাপে মুহূর্ত-কাঁটা। সেদিক থেকে এই ৫০০ গজ দৌড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অলিম্পিক-রেকর্ডের চেয়ে কিছু বেশিই।

এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। মুহূর্ত-কাঁটা এগিয়ে চলেছে। চারটি মিগের ল্যাজ নড়ছে। সমস্ত কামান, মিশাইল ও রকেট এখন অন্ করা। ককপিটের ঢাকনা নেমে আসছে।

ঠিক ১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের মাথায় ১০ সেকেন্ড ব্যবধানে ৪টি মিগ হাউই-এর মত হুশ করে উঠে গিয়ে এক আকাশে বিন্দু হয়ে হয়ে মুহূর্তে অপর আকাশে কোথায় মিলালো।। তার বান নিলো কি নিলো না, বোঝা গেল না।

বোমারু পাইলট স্কোয়াড্রন লীডার পুরী, বীরচক্র অ্যালেন অ্যালে

এয়ারোবেটিকস না ভোজবাজি?

এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে আমরা যে এয়ারোবেটিকস বা বিমান-ক্রীড়া দেখেছিলাম, তা দেখে, অন্তত আমার অবস্থার সঙ্গে, শুধু শেয়ালদা স্টেশনে প্রথম-অপরু তুলনা করতে পারি। দিক-বিদিক, ঊর্ধ্ব, এমন-কি অধঃ থেকে এসে পড়ছে গাণ্ডীব-মুক্ত দিব্য-তূনীর সব.... অ্যালেন যখন তার মিগটিকে অন্তরীক্ষ থেকে স্ট্রেট ভাইভেভার্টিক্যালী মাটি পর্যন্ত নামিয়ে আনেন এবং তারপর যেন মাটি ছুঁয়ে চোখের পলকে, একই রেখা ধরে সোজা উঠে গেল আকাশে—তখন অর্জুনের অঞ্জলিক বাণের কথাই মনে পড়েছিল। এই সেই ভৌমাস্ত্র, যা মাটিতে মেরে অর্জুন পাতাল থেকে জল তুলে আনে। শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্মের তৃষ্ণা শুধু তাতেই মিটেছিল।

কখনো ২২০০ মাইল বেগে মাটি থেকে মাত্র ১০০০ গজ উঁচু দিয়ে ঐ দিব্যগতি তীরটিকে উড়ে যেতে দেখি। গ্রাউন্ড রাডারকে মিগ এ-ভাবেই 'কদলী দেখিয়ে থাকে। অত নিচুতে হঠাৎ একটি চলকিন মত বন বন বন করে খানিক ঘুরে, তীরটি শূন্যে মিলিয়ে যায়। ইও-ইও'র মত এগিয়ে গিয়ে সাঁৎ করে পিছিয়ে আসে। আর একটি অবিস্মরণীয়, সেটা কী করে ভাষায় বর্ণনা করব বুঝতে পারছি না। ছবির সাহায্য নিতে হয়। একজন সাঁতারু যদি একবার চিৎ ও একবার উপুড়-সাঁতার দিতে দিতে তীরবেগে এগিয়ে যায়, এই বিমানক্রীড়াটি ছিল সেই রকম।

অ্যালেন অ্যালের মিগটি হঠাৎ ঝুপ করে রাণওয়েতে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজের কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ল স্পীড-ব্রেকার—প্যারাসুটের মত দেখতে। নামা ও থামার মধ্যে ব্যবধান মিনিট দুই।

ককপিটের ঢাকনা উঠে যেতেই, হাসতে হাসতে ভানহাতের বুড়োআঙুল তুলে অভিবাদন জানালো অ্যালে। টাওয়ার থেকে আমরাও হাতে নাড়ি।

সেদিন সন্ধ্যার পার্টিতে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসেছিলাম। আমাকে বুড়বাক বানিয়ে সে বলল, তার দুই যুবতী মেয়ে এবং একটি নাতিতরুণ ছেলে। বিটায়ার করতেও আর বেশি দেরি নেই। গুডনেশ! আমি এতক্ষণ তুমি-তুমি করেই তার সঙ্গে কথা বলছিলুম। ভাগ্যিস ইংরেজিতে তুমি-আপনি নেই!

'রিটায়ারমেন্টের পর কী?' প্রশ্ন করায় তাকে যে-কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণীর মতই একটু দুশ্চিন্তিত দেখাল।

অমাবস্যার আকাশে চাঁদ

কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে আমাদের র‍্যাডার-গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর দেখানো হয় একটি অস্ত্রাগার—সেখানে রয়েছে অতি-আধুনিক বিমানযুদ্ধের উপ-যোগী অটোমেটিক কামান, রকেট, মিশাইলস ইত্যাদি। কিন্তু সে সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। ওসব ভুলে যান রুদ্রবীর সিং বলে দিয়েছেন।

কাজেই, সিমুলেটর রুমে একটি মিগ ককপিটের চারিধারে আমরা এখন। ঠিক মিগ ককপিটে নয়, তার অবিকল নকল একটি। ৭ম বছরের একজন ছাত্র-পাইলট ককপিটে বসে। তার গায়ে স্পেস-স্যুট, মাথায় স্বচ্ছ হুড, হুডের মধ্যে মাইক্রো-ফোন। স্যুটের সঙ্গে লাগোয়া অকসিজেন সিলিন্ডার।

সিমুলেটর রুমে পার্থিব আবহাওয়া নেই। মই দিয়ে উঠে দেখলুম, বিধাতার অপূর্ব কারুকার্যময় ককপিটের অভ্যন্তরে সংখ্যাতীত গ্যাজেটের মধ্যে পাইলট একা বসে। একা? হ্যাঁ একা। অনেকে হয়ত [illegible] না ফাইটার প্লেনে আরোহী বলতে

থাকে মাত্র একজন। যে চালক, সে-ই যোদ্ধা।

ব্লোড়হাটের পার্টিতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মানি বিচ্ছেদবিহীন মোনোলগে টানা দশ মিনিট ধরে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বলেছিলেন।

'বড় বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে... হোয়েন ইউ আর অ্যাওয়েআর অফ দ্য ডেঞ্জার ফ্লাড বাইন্ডিং উইদিন ইউ দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ডাই এনটায়ার মোমেন্ট।' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওর কণ্ঠস্বর, তিলিবিবামের মতন শোনাচ্ছিল, 'আমিও সঙ্গে এয়ারফোর্সের তফাৎটা কোথায় জানেন? আমিতে মরে ইওয়ানরা আর তারা একসঙ্গে মরে। আর তারা লড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে মরে অফিসাররা। আর তারা মরে আকাশে। আর তারা একা।' উনি আর একটি বাক্যও সম্পূর্ণ করতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে সিমুলেটর রুমের মধ্যে অমাবস্যার রাত নেমে এল। প্লানেটোরিয়ামের মতন আর কী; আকাশে কালপুরুষ! ককপিটের ঢাকা নেমে এল। নিশ্চল গর্জন-কারী ককপিটে বসে পাইলট এখন অবাস্তব অন্তরীক্ষে উড়ে চলেছে। ঝড়, শব্দ ও হাওয়া আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

সেখানে টি ভি স্ক্রীনে প্রশিক্ষকেরা ছেলেটির মুখচ্ছবিতে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। কাল্পনিক বিমানযুদ্ধে রত পাইলটকে তাঁরা নানান নির্দেশ দিতে লাগলেন। যেমন, তার মিশাইলটি মিস-ফায়ার হয়েছে। শত্রু-বিমানটি এখন ওখানে। ঐ দিকে যাও। ক্লোজ-ইন করো। অটোমেটিক কামান ছোড়। তার প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পর্দায় ফুটে উঠছে। এরকম চূড়ান্ত মুহূর্তে অনেকেই সম্মোহিত হয়ে পড়ে। তারা পরে শত্রুবিমান চালায়।

সে এবার গ্রাউন্ড রাডারের বাইরে চলে গেল। 'এখন সে একা। একা? হ্যাঁ, একা। ঈশ্বরের মত সে এখন একা।

এখন আত্মীয় বলতে শুধু গোল দেওয়াল ঘড়ির মত ইনবিল্ট রাডারটি। এক মাইলের মধ্যে শত্রুবিমান এসে পড়লে ওখানে তার ছায়া পড়বে। মজা হচ্ছে, শত্রুবিমানেও রয়েছে অমনি একটি রাডার। দুটি বিমানই শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি গতিসম্পন্ন। এমন দিব্যগতি থেকে লক্ষ্যভেদ করে যে সব অস্ত্র, বলা বাহুল্য, তাদের গতি বহুগুণে বেশি। কুরুক্ষেত্রের অলৌকিক দিব্যাস্ত্র-গুলিই যেন স্বশরীরে।

অতপর, রাডারে ছায়া পড়ামাত্র, যা করবার, মুহূর্তের অনু-অংশের মধ্যে তা করতে হবে। এয়ারফোর্সের ভাষায় একেই বলা হয়েছে 'লাইটনিং রিফ্লেক্স'।

কাল্পনিক নভঅঙ্গনে আমাদের মনিব-মস্তিষ্কসম্পন্ন যৌবময় চিতাটি কী করছে তা এখন কেউ জানে না। রাডারে সে কি শত্রুবিমানের দেখা পেয়েছে, না পায়নি?

টি ভি স্ক্রীন জুড়ে অমাবস্যার আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠছে।

দুজন নেকড়ে (ও একজন মেষশাবক)

অফিসার্স ক্লাবে লাঞ্চের সময় একজন এয়ারফোর্স পাইলটের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চটুল ইংরেজিতে 'হায়' বলে এগিয়ে এসে সে নিজে করমর্দন করেছিল। তার ঘরে বাসিবাস করার অনুমতি আমি পেয়ে গেলুম।

আমার কি সৌভাগ্য, দুপুরবেলা যে ছিল ফ্লাইং অফিসার তি এম সিনহা, সন্ধে-বেলা দেখা গেল সে-ই দেবনাথ সিংহ।

দেবনাথের বাড়ি হায়দ্রাবাদে। তারা প্রবাসী বাঙালি। বাবা ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট। রিটায়ার করে ওখানেই সেটেল করেছেন। দু ভাই। দু বোন। মা নেই।

সন্ধেবেলা পানীয়ের টানে অফিসার্স ক্লাবে যাবার আর কোনো কারণই রইল না। ফ্রীজ থেকে দেবনাথ বীয়ার বের করল। এয়ারফোর্সের ছেলেদের সম্পর্কে একটি খাঁটি কথা যা বলা চলে তা হল এরা প্রত্যেকে অমিতাভর (বচ্চন) চেয়ে সুদর্শন। স্কুল-কলেজের বিদ্যে বেশিদূর না এগোলেও, বোধ হয়তো মিগ-এর মত সফিসটিকেটেড প্লেন চালায় বলেই, এদের ব্যবহার ও কথা-বার্তা সাতিশয় মার্জিত। এক গ্লাসেই আমি বেশ ইয়ার হয়ে পড়লুম। দেবনাথ বিয়ার ছুঁল না। একটু পরেই নাইট-ফ্লাইট।

দেবনাথ সিমেনসের খুব ভক্ত। সে যখন বাংলায় বলছিল, 'ও'র মজা কী জানেন তো, ও'র গোয়েন্দাটি সব পারে, শুধু মার্ডারারকে ধরতে পারে না—হাহাহাহাহা....' সে সময় মোটরসাইকেল চালিয়ে মিশ্র এল। এয়ার-পোর্টের একপ্রান্তে এই অফিসার্স মেসে ফ্লাইং অফিসারদের সকলের দরজার সামনেই একটি করে জরুরিদস্ত এনাফিল্ড।

সকালবেলা দুঃসহ স্পেশ-স্যুট পরে এই মিশ্রই ডেমনস্ট্রেশান দিয়েছিল। তার ফ্লাইট নেই। সে বীয়ার নিল। বন্দী বাঘের মত দেখাচ্ছিল তোমাকে, আমি শুরু করলুম, 'আমাদের মত জেসার বীরিদের ছেলো তোমার এই হেনস্তা....'

'তা কেন!' ভারি সপ্রতিভভাবে সে, বলল, 'কাউকে না কাউকে তো পরতেই হত। এতে আমরা কিছু মনে করি না। তাছাড়া ঐ স্যুট তো আমরা পরিই। দাট ইজ পার্ট অফ দ্য লাইফ উই লিড হিয়ার।'

শুনে বিনা-বীয়ারে দেবনাথ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সে বলল, 'দেখুন, আমাদের যা কোয়ালিফিকেশান, কোথায় আমরা এত টাকা মাইনে পাব।' ঘরের আপাদমাথার সে চোখ বোলাল, 'এই যে এত সুখ রেখেছে, সে কেন? না, একদিন যুদ্ধ হবে। আমাদের জীবন হল সেই মুহূর্তটির মতো প্রতীক্ষা, যখন আমি প্রথম এনিমি-প্লেনের দেখা পাব। তারপর যা হবার—তা হবে।' আমি এবার ভালো করে দেখলুম তার মুখশ্রী থেকে নবারুণরাগ এখনো মুছে যায়নি। মুখে এত বক্তাভা লাগে শুধু কিশোরবেলায়।

জয় চল

এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ওঠা-নামার অনবরত শব্দ ভেসে আসছে। দেবনাথ নাইট-ফ্লাইটে বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে গেছে মিশ্র। দেবনাথের ফ্লাইট রাত দশটা থেকে তিন ঘণ্টা। তার আগে ঘণ্টাখানেক ধরে চলবে

বাগিং আর মাত্র ৭০০।৮০০ ঘন্টা ফ্লাইং আওয়ার্স সম্পূর্ণ করতে পারলেই সে একজন ফাইটার-পাইলট হয়ে যাবে। ও, হায়, আর মানুষ থাকবে না।

অফিসার্স ক্লাব থেকে সোলের 'ইয়ে দোস্তি' গানের সুর ভেসে আসছে। একটু আগে খেয়ে এসেছি।

ঘুম আসতে দেরি আছে। ইত্যবসরে আমি দেবনাথের ঘরটি খুঁটিয়ে দেখে নিই। একটি প্রমাণ সাইজের ফ্রীজ। ওভাল আয়না-সহ চমৎকার ড্রেসিং টেবল। আয়নার নিচে দু রকম আফটার-সেভিং (একটি বিলাতি : আইস-ব্লু), হেয়ারটনিক দুরকম, পণ্ডস্-এর ভ্যানিশিং ক্রীম-ফ্লাওয়ার ট্যালক ইত্যাদি। সিলভিকিম। নিভিয়া। ভেসলীন লিপ আইস (প্রোটেক্স ইওর লিপস ফ্রম উইণ্ড, কোল্ড অ্যাণ্ড সান) ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়াড-রোবের মাথায় একটি ডিম্বাকার প্রস্তরখণ্ডে লেখা : জিনিয়াস অ্যাট ওয়ার্ক। ডোণ্ট ডিসটার্ব।

শূন্য : ৫ জোড়া। ফ্ল্যাট-হিল : ১ জোড়া। কেডসজাতীয় : ২ জোড়া। নর্থ স্টার : ১। স্লিপার : ৩। ওয়াডরোবের বাইরে ইউনিফর্ম বাদে জামা টাঙানো আছে মোট ১০টা। ট্রাউজার্স : ৫। চারকোল গ্রে টেরিউল স্যুট : ১। সিন্থেটিক গেঞ্জি : ২। একটির গায়ে লেখা : 'ডিক্টেটোরি'।

স্টিরিওফোনিক সাউণ্ড সিস্টেম। 'স্যাফট ইন আফ্রিকা' নামে অশ্রুতপূর্ব চলচ্চিত্রের 'আর ইউ ম্যান এনাফ' জাতীয় রেকর্ড। কঙ-ফু ফাইটার কার্ল ডগলাসের গান কেউ শুনেছেন কী? 'ডার্ক সাইড অফ দা মুন'? অথচ রেকর্ডের ওপর 'দারাং সাইকেল স্টোর্স, তেজপুর'-এর বাবার স্ট্যাম্প।

এবার ঈষৎ বে-আইনীভাবে দেখব বলে আমি ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিই। আশা করি দেবনাথ মাপ করবে বা মজাই পাবে জেনে যে, তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে রাশি রাশি মেয়ের ছবি দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। এরা কেউ তথাকথিত নীতু সিং, শাবানা আজমি কি জয়া ভাদুড়ি নয়—একসঙ্গে এত অচেনা সব ছবি আমি আগে দেখিনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঐ ঘরে আমি তার বাবা ও ভাইবোন তথা স্বর্গীয়া মায়ের কোনো ছবি দেখতে পাইনি বা চিঠিপত্র।

যাইহোক, তাহলে বাথরুমে আউট-বেজিনাস আরো কিছু থাকতে পারে ভেবে আমি এবার সেখানে যাই। সেখানে সত্যিই একটি আশ্চর্য আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দেওয়ালে-আঁটা লাইফ-সাইজ কিশোরী ভেনাস এক। তাকে নগ্ন বললে ঠিক বলা হবে না। বেশ ভুল বলা হবে যাবে। কেননা সে যে শাদা গোলাপটি বুকের কাছে ধরে রেখেছে, তার সুদীর্ঘ ডাঁটি থেকে বেরিয়ে দুটি খাঁজকাটা সবুজ পাতা অন্তত তার স্তনবৃন্ত দুটি ঢেকে রেখেছে।

রাত বারোটা। পুরো দুটি ঘন্টা কেটে গেছে। ঐ মহানডঅঙ্গনে শব্দের চেয়ে তিনগুণ বেশি গতিদ্রুতায় উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেবনাথ। একা? হ্যাঁ, একা। সে এখন কী করছে তা কেউ জানে না। আততায়ীর দেখা সে পেয়েছে কী?

আমার মাথার মধ্যে সহসা একটি লাইটনিং বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ঘুম আর জাগরণের টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে আমি কেমন করে যেন টের পেলুম এই মুহূর্ত তার বাড়ারের দিগন্ত থেকে লাফিয়ে উঠল ঘাতক-বিমানের ছায়া!

সমস্ত কল্পনার একটি বাস্তবতাকেন্দ্র থাকে। ঘূর্ণি ঘুমের ধাক্কা খেতে খেতে সেই সর্বনাশকেন্দ্র দাঁড়িয়ে আমার সহসা মনে পড়ে গেল :

"সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা...."

(শেষ)

পোড়ার জায়গা থেকে পূঁজ হতে দেবেন না
সঙ্গে সঙ্গে বার্ণল লাগান

বার্ণল সবসময়ে হাতের কাছে মজুত রাখুন

বার্ণল পোড়া জায়গায় কোনও ফোস্কা পড়তে বা কোনও পোড়া দাগ হতে দেয় না, জ্বালা-যন্ত্রনা জলদি দূর করে।

পুড়ে গেলে কার্যকরী চিকিৎসার জন্যে সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পুড়েছে সবসময় হাতের কাছে বার্ণল মজুত রাখুন।

বার্ণল এক অদ্বিতীয় ফর্মুলায় তৈরী হওয়ার ফলে এর কার্যকরী ক্ষমতা পোড়া জায়গার 'ভেতর ও বাইরে' দুই—এতেই ক্রিয়াশীল। বার্ণলের জীবাণু—প্রতিষেধক উপাদান মলমের ওপর ওপরই থাকে, অন্যান্য মলমের মত ভেতরে 'আটকে লেগে' থাকে না। আর সেই কারণেই বার্ণলে কাজ হয় খুব তাড়াতাড়ি... জ্বালা-যন্ত্রনার জায়গায় ঠাণ্ডা হয়ে আরাম বোধ হয়; ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে আর ক্ষতে জীবাণু প্রবেশ হতে দেয় না।

এই ভাবে পোড়া জায়গা থেকে পূঁজ হয়ে কোন ক্ষত না হওয়ার ফলে সেরে যায়—খুব তাড়াতাড়ি। এইসঙ্গে মনে রাখবেন, কাটা, ছড়ে যাওয়া ও ছেঁচে যাওয়া জায়গাতেও বার্ণল লাগালে সেরে যায় তাড়াতাড়ি।

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

গত ত্রিশ বছরের বেশী কাল এই কুকীদের মধ্যে ডাক্তার হয়ে বসবাস ছি। এই (দীর্ঘ) কালের অভিজ্ঞতার, প্রতি এই যে আমাদের দেশবাসীদের নায় এরা বহু গুণ খোলামেলা হাসি- ন; এদের চিত্ত অনেক স্পষ্ট। এদের নুভূতি ও সমবেদনা বোঝা যায়। হয়তো র মানসপটে অন্য ধাঁচে ছকা, হয়ে পারে। হতে পারে য়োরোপের মনের ছাঁদ থেকে তা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভেবে ভেবে অবাক হয়েছি কেমন একই ঘটনার ছাপ কখনও আমাদের উভয়ের মনেই অনুরূপ হয়ে ফুটেছে; আবার কখনও তা ফুটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। কাজেই দাসপ্রথা সম্পর্কে কিছু লেখা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়নি। এ সম্পর্কে যতই অভিজ্ঞতা জন্মেছে ততই লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি যে দাসত্ব এবং বিমুক্তি এই দুটি তত্ত্ব নিয়ে আমরা এক ধারায় ভাবি, ওরা ভাবে অন্য ধারায়। আমাদের ভাবনা আমাদের যেমন নাড়া দেয়, ওদের মনে, প্রাণে সেই ভাবনাই সাড়া তোলে একেবারে অন্য সুরে।

তবুও (বিষয়টি আমার মনে যতই সাড়া তুলুক না কেন)—এ কথা ঠিক যে এ বিষয় নিয়ে এই লিপিকর্মটি করতে আমার আদৌ ভালো লাগে নি। এই যে অত- লান্তিকের ওপার এপার ব্যাপী মানুষ কেনা- বেচার অঘটন,—এটি মানুষ জাতটার চরম নৃশংসতা এবং বর্বরতা ছাড়া ঘটতেই পারতো না; আর মানুষের এই দারুণ পশুতার এলাহার ভেবে চিন্তে গুছিয়ে লেখার দায়টি আদৌ সুখের ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে চিন্তা করতে আমার বেদনা যতই তীব্র হোক না কেন এই নিদারুণ পরিণতির নেপথ্য ভূমির বর্বর অত্যাচারের কথা না বলে, চুপ করে থাকাও হোতো অসম্ভব। অনেকে লিখেছেন; এবং সেই লেখা পড়ে অনেকে অনেক বাণীও দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, কাহিনী অতি- রঞ্জিত, কেউ বলেছেন, এসব বিষণ্ণ চিন্তার উদ্গার। আমি বরং বলবো, অদ্যাবধি যত কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সত্ত্বেও এ অত্যাচারের বহু কথাই রয়ে গেছে অনুদ্ঘাটিত, অনু- ল্লিখিত, অনুচ্চারিত।

ডাক্তার অলিভার রান্সফোর্ড আফ্রিকা সম্পর্কে একাধিক বই লিখেছেন। বুলাওয়ায়ো-র থেকে নিয়েছেন স্বেচ্ছা- নির্বাসনা তাঁর কথাগুলো আমি বারবার পড়ি আর ভাবি, —এ ধরনের অত্যাচার বন্ধ সত্যিই হয়েছে কী? বারফুর, আবিসিনিয়া, মোজাম্বিক, গিনি-বিসাও, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম;....কত বলবো? না, না। মানুষের মুক্তি আসেনি, আসবে না। তখন যারা জাহাজ ভরে মানুষ নিয়ে বেচা-কেনা করছে তাদের তাগিদ, খোঁজা, তাড়না ছিলো দুর্দম লোভ। সে-লোভ কি আজ একটুও কমেছে? বরং দেখছি তা আরও প্রখর, আরও মজবুত, আরও নিবিড়, গভীর, সূক্ষ্ম এবং মোক্ষম। গ্রীণল্যান্ডে এস্কিমোরা, আমেরিকার আদিবাসী আপা- চেরা, মেকসিকোর আজটেকরা, পেরুর ইংকারা, সারা দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত অখ্যাত লক্ষ লক্ষ আদিবাসীরা, এমন কি অস্ট্রেলিয়ার মাওরী আদিবাসীরা আজ যদি কলম ধরতো, বলতো পৃথিবীর মধ্যে একটি মহৎ জাতি আছে: তারা লোভের তাড়নায় সেই স্যাবাইন মেয়েদের ওপর বলাৎকারের সময় থেকে অদ্যাবধি জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে। তাদের লোভের আগুনে দয়া, ধর্ম, মনুষ্যত্ব, সত্য সব কিছু পুড়িয়েছে, পোড়াচ্ছে। এ দরবার শয়তানের দরবার। এ থেকে যারা পরিত্রাণ দেবে তাদের হতে হবে নির্লোভ, তৃপ্ত। অতৃপ্তিই মানুষের প্রথম ও শেষ শত্রু। অতৃপ্তিই শয়তান।

এ লেখার বিষয়-বস্তু শাদা-কালোর দ্বন্দ্ব। এবং এই দ্বন্দ্ব জ্বর সংঘাত নিয়ে বহু গবেষণা এবং বহু লেখা সাম্প্রতিক কালে প্রেসের কালি মেখে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শাদা-কালো তত্ত্বটা একটু নিকষে ঘষে যাচাই করে নিতে হবে। কারণ আমরাও বারবার 'শাদা' ও 'কালো' কথা দুটো ব্যবহার করবো।

নৃ-তত্ত্ববিদরা অন্য পরিভাষা ব্যবহার করলেও এই 'শাদা' ও 'কালো' শব্দ দুটি থেকে অব্যাহতি পান নি। ওঁরা মানুষের করোটী, কেশ, কেরামতি, কৃতিত্ব নিয়ে অনেক ভাগ বিভাগও যেমন করেছেন, তেমনি শাদা-কালো নিয়েও মাতামাতি করা ছাড়েন নি। আমরাও এই শব্দ জোরের সঙ্গেই ব্যবহার করবো। কারণ, বাঁচানো যাবে না। আমাদের ভাষার মর্মেই এই দৃষ্টিভঙ্গী সেঁদিয়ে গেছে। 'ছেলে ফর্সা নয়', 'মেয়ে বড্ড কালো, কুচবরণ কন্যে,' 'চাঁদপারা মুখ', 'চান্দবরণী কন্যা'-দের সম্বন্ধে আমাদের কবিদের দৃষ্টির ভাষার ব্যবহারের নিগূঢ় সম্পর্ক। আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্বে আমরা আর্যেরই স্বপক্ষে। আমরা যে আর্যই এই নিষ্পত্তিতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নেই, রাখিও নি। এবং আমাদের বেদ থেকে কালিদাস, জয়দেব পর্যন্ত 'হিমকর-কিরণাবদাত-বর্ণা', 'তুহিনমপি হিমাশৌর্লক্ষ্য লক্ষ্মী'-দের প্রচুর সমাদর। ফর্সা-য় আমাদের প্রীতি, অফর্সায় অপ্রীতি, এ সবই আমরা আর্যদের কাছ থেকে পেয়েছি। অনার্যদের প্রতি চিরকালীন খানদানী অপ্রীতি আমাদের। এই বিদ্বেষের সূত্র ধরেই আমরা নিজেদের আর্য বলে চিহ্নিত করতে পারলে ধন্য যাই। এটা তো 'জাতি'র কথা নয়। 'জাতি'র বিচার নৃতত্ত্ববিদদের বিচার।—এটা 'সংস্কৃতি'র কথা। 'দেশ' ধরে 'জাতি' বিচার, রক্ত-সংক্রমণ ধরে 'জাতি' বিচার এবং 'সংস্কৃতি' ধরে জাতি বিচার—তিন ধরনের বিচারই চালু আছে।

দেশ বা রক্ত ধরে 'জাতি' বিচারটা মানুষকে বারবার বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে গেছে। 'সংস্কৃতি' ধরে বিচারটা যদিও একটু শিক্ষা-দীক্ষা সাপেক্ষ, তবুও সেটাই যেন বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়।

ভেবে চিন্তে দেখলে অস্বীকার করা যায় না যে সংস্কৃতিই দেশ, সংস্কৃতিই জাতি। তামিলের কৃষ্ণনাথন, কেরালার রামাইয়া, ডিবরুগড়ের শংকর দেব, ডায়মণ্ড-হারবারের গৌরবিনোদ পাঁজা, অমৃতসরের গোবিন সিং আমার কে? কিসে আমি তার সাথে বাঁধা? সেকি রং, না চেহারা? না তো। ও বাবদে আমরা পরস্পর নানা বিরোধে হাবুডুবু খাচ্ছি। নাকে, চোখে, চুলে, রংয়ে, ভাষায়, পোষাকে, রান্নায়—না, না; আমাদের মিল নেই। এমন কি অমরা পরস্পরকে বিশ্বাসও করি না। রান্না খেলে জাত হারাই; মেয়ে দিলে জাত হারাই; মেয়ে আনলে প্রেত পিণ্ডের ঠিকানা হারাবার ঢের আগে জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে পিণ্ড লোপ হয়ে যায়। এটো, সর্কড়ী, হেগো—সংস্কৃতির সঙ্গে মানান খুঁজে পাই না। পেঁয়াজ দিয়ে ভোগ দেওয়া (দক্ষিণে); ফুলের সঙ্গে, বা ফুলের রঙ্গলী ভাত ছুঁড়ে পুজো করা (হিমালয়ে, নেপালে, তিব্বতে, লামা-মন্দিরে), ছত্তিশ বছরের কেলো হাঁড়ির রান্নায় ভোগ চড়ানো (রাজস্থানে), মুরগীর ঝোল দিয়ে দেবীর পুজো (সিমলায় তারা-দেবী মন্দির), চাঁড়াল নিয়ে কালীর পুজো; বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকায় দেবীর মহাস্নান। ডোমনী নিয়ে লয় কর্ম।

তবে মিল কোথায়? মিল ঐ গায়ত্রী মন্ত্রে; শত্রুদের মন্ত্র—অপহৃতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবৎ ভবেদ্ধ-তাশ্চ সর্বেঽসুরদানবাঃ ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাশ্চ পিশাচ সংঘাঃ হতাময়া যাতুধানশ্চ সর্বে। ঐ মিলের জন্যই মন্ত্রও রচেছি—(১) গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। (২) কুরুক্ষেত্রং-গয়া - গঙ্গা-প্রভাস- পুষ্কর-বাণিচ। (৩) আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যন্তু। এমনি সব মিলন দ্যোতক ব্যঞ্জিত মন্ত্র বহু বহু। এটাই হিন্দু। এটাই হিন্দু সংস্কৃতি। এর প্রত্যুত্তর যাঁরা করে তাঁরা ধর্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, সংস্কৃতিদ্রোহী। ও ধরনের বুদ্ধি রথের রশি পিছনে টানে। ঠুঁটো জগন্নাথের মেলায় যা সম্ভব, জীবন্ত ভরন্ত চলন্ত ধাবমান জগন্নাথের রথের মেলায় তা সম্ভব নয়।

তাই মনোযোগ সহকারে বিচার করলে দেখা যায় যে 'দেশ' বা 'রক্ত' ধরে 'জাতি' (আমরা যাকে জাত বলি : নৈলে মনুষ্য জাতি, পক্ষী জাতি, বানর জাতি, জন্ ধাতুর 'জেন' নিয়ে, প্রোটোপ্লাজম্ নিয়ে জনন-বিজ্ঞানের পরিভাষায় যা জাতি বলি সেটা ঠিকই বলি) বিচারটা না টেঁকে যুক্তিতে, না বিজ্ঞানে; না ন্যায়ে, না অভিধানে। ওটা স্মৃতির চাপান; এবং এই সব আনুষঙ্গিক কারণেই স্মৃতি যুগে যুগে বদলেছে। এখন যা স্মৃতি বলে চালু তা রাজাহীন রাজ্য, মাথাহীন চিন্তা; দেহহীন রসবোধ। গোঁয়ার্তুমী। সংস্কারও নয়, সমাজও নয়। অন্ধ একটা জিদ্।

আসলে নদীর ধারার মতো, কালের গতির মতো,—সংস্কৃতি সতত সঞ্চরমান। এই সংস্কৃতিই দেশ; এই সংস্কৃতিই জাতি। আর্য জাতি বলতে নাক-চুল-রং ধরে বিচারের চেয়ে ভাষা, গান, রান্না, বেশভূষা, পার্বণ-পুজো এগুলো ধরে বিচারই অনেক অর্থে যথার্থ। এ ধরনের বিচারটাই মিলনের বিচার; ঐতিহাসিক অর্থে 'হিন্দু' বিচার। হিন্দুর 'হিন্দুত্ব' মানেই এই মিলনগর্ভ একাত্মীয়তা। অনার্যকে আর্য করা সহজ ছিলো না। 'কৃণ্বন্তু বিশ্ব মার্যম্' যে বহু জাতি সমন্বয়ের বার্তা, তা বলে বোধ হয় না। বহু সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে করতে, তো সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে করতেই তো সংস্কৃতির অগ্রগতি। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে কালিবোংগা পর্যন্ত তার নজীর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

আজ যাকে হিন্দু বলি সেটা হিন্দু সংস্কৃতি; হিন্দু 'জাতি' নয়। এবং এই অর্থে এই হিন্দু শব্দটি ধর্মেরও বড়ো কিছু। ধর্ম তো বৈদিক; বর্ণাশ্রমী। তবে আবার নিজেদের বর্ণাশ্রমী না বলে 'হিন্দু' বলা কেন? তার কারণ স্পষ্টতঃই খোকার অন্নপ্রাশন আর পৈতে 'দেওয়া' ছাড়া আর 'আশ্রম' বলতে কিছুই নেই। আশ্রমের চার-পাই কাটা পড়েছে। গতিহীন হয়ে গত্যন্তর না দেখে শুধু বর্ণটির ঘাড় চেপে ধরেছি। এবং বর্ণ বর্ণ করেই হন্যে হয়েছি। নৈলে বর্ণাশ্রম পার করে এসে হিন্দু জগতে প্রবেশের অধিকারই তো আমরা পেলাম এই মিলন-ব্রতকে অস্বাদী করে, অস্বীকার করে। নৈলে যুগে যুগে আরব সাগর পারস্য সাগর পার করে যে সব বর্ণাশ্রমীরা, অথর্ব-বেদীরা, সূর্যোপাসক, অগ্নি উপাসক, শিব উপাসকেরা এখানে এলেন তাঁরাই বা গেলেন কোথায়? শাক, গ্রীক, হূনেরাই বা গেলো কোথায়? গজনীর সুলতানের বিরাট বে

সেনাবাহিনীকে আমরা আটকে রাখলাম তাঁরাই বা গেলো কোথায়? কোন পথে আমরা স্কন্দ পেলাম, গণপতি পেলাম, শ্রী-যন্ত্র পেলাম, মাহিষ্মতীর সেই নিদারুণ কুমারীপ্রিয় অগ্নিদেবকে পেলাম?—পেলাম বরাহ-মিহির, বৃহদ্দেবতা, হোরা, সামুদ্রিক? শুধু তাই নয়। শুধু পেলাম তাই নয়;—দিলামও। কোন্ পথে দিলাম এই ধর্মের প্রবাহ বইয়ে সুদূরে হিন্দু চীন, মলয়, কাম্বোজ, শংখদ্বীপ, বহিদ্বীপ, যবদ্বীপ-কোরিয়া পর্যন্ত?

সেই অঙ্গীকরণের সিদ্ধ মন্ত্র পুরাণে পুরাণে বিধৃত। সেই ধৃতিশক্তির দক্ষতার অসামান্য ক্ষমতার বলেই ধর্ম হিসেবে হিন্দুত্ব মিলনেরই একটি বলিষ্ঠ সংজ্ঞা ছিলো। একথা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করা যায় না যে ইতর ধর্ম থেকে হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রবেশের পথ চিরকালই রুদ্ধ ছিলো। যদি তা থাকতো তা হলে আচার্য ব্রাহ্মণ, সারস্বত ব্রাহ্মণ, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, অথর্ব বেদী ব্রাহ্মণ, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ, আয়ুর্বেদী ব্রাহ্মণ, বরাহমিহির গোত্রীয়রা এ সমাজের অঙ্গাঙ্গী হতে পেতো না। হেলিওডোরাস্ প্রমুখ গ্রীকরা বিষ্ণুমন্দির স্থাপনা করে পরম বৈষ্ণব হয়ে যেতে পারতেন না।

কাজেই 'জাতি'—না কৃষ্ণ, না শ্বেত। জাতি মনুষ্য। এবং মনুষ্যের বর্ণ ফুল ও ফলের বর্ণের মতো স্বভাবজ। ইংরেজ ভাষ্যকার যাই বলুক না কেন, বর্ণাশ্রমের 'বর্ণ' রং নয়। হলে অক্ষরের বর্ণমালাকে নানা রংয়ে সাজাতে হয়; বর্ণবোধকে রং-বোধ বলতে হয়। 'বর্ণাশ্রমেতরানাং নো বদ্ধি ধর্মান্'—বলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বর্ণাশ্রমের বাইরের মুনিরা 'ধর্ম কী?' জিজ্ঞাসা করতেন না। বর্ণ মানে সে রং, সে অর্থ কেবল য়োরোপের সংস্কৃতজ্ঞ সুবিধাবাদী ভাষ্যকারেরাই বলেন, মানেন। আমরা জানি বর্ণ বিভাগ অর্থে গুণ এবং কর্মানুসারে পদার্থ এবং বস্তু মাত্রের পর্যায় নির্ণয়,—ক্লাসিফিকেশন। 'কচু' বলতে নানা গুণের ও বর্ণের কচু আছে। কোনো কচু শুকরে চেনে, এবং ঘেচুর সঙ্গে কচুকে সে এক করে না। কোনো কচু মানুষে চেনে, এবং মানের সঙ্গে ওলের বর্ণভেদ তার খুব জানা আছে। প্রমাণ, সুশ্রুত, চরক, অমরকোষের অমর সিংহ, সর্বাগ্রে প্রমাণ প্রাণিনি।

তবু আমরা 'শাদা', 'কালো' বলি। এই গন্ধেও আমরা শাদা-কালো সংজ্ঞা দুটো ব্যবহার করেছি। মূলতঃ সূর্যহীন এবং বর্ণহীন দেশের আকাশে জ্যাংলা-পড়া প্যাঁক্ প্যাঁকে য়োরোপিয়ান মানুষগুলোকেই আমরা বলি 'শাদা'। কেউই ওরা কুন্দেন্দুতুষার হার ধবলা শাদা নয়; এমন কি শ্বেতী লাগা শাদাও নয়। ওরা বর্ণহীন। যেমন শাদা-ঝোল, শাদা-খানা, শাদা-কথা, শাদা-মন, শাদা-মাটা মানুষ। এ শাদা যেন আমরা নিউট্রাল বলে জানি। কিন্তু জোরটা গিয়ে জবর পড়ে ঐ য়োরোপিয়ান সংস্কৃতিটার ওপর। ওদের নিজেদের দেশের মধ্যে আজ এ কারণে, কাল ও কারণে খাওয়া-খাওয়ির তো অন্তই ছিলো না; আজও নেই। কখনও ধর্ম ধর্ম করে, কখনও ব্যবসা-বাণিজ্য বলে, কখনও শ্রেফ ডাকাতির বুদ্ধিতেই রাহাজানির যুদ্ধ লেগেই আছে। কখনও বাহানা মেয়ে, কখনও বাহানা ধর্ম, কখনও বাহানা গরিমা, কখনও বাহানা ইজ্জৎ, আবার কখনও বাহানা স্বাদেশিকতা; সাম্রাজ্যবাদের ভাষ্যে লড়াই মানেই গুটীকয় ব্যক্তির 'লাভ'। হোক ইহকালের, হোক অল্পকালের,—কিন্তু লাভ লাভই। সৈন্যদল ভাগ পেতো লুঠের, মেয়ের, মদের, ব্যভিচারের। লাভের সেই রাস্তা দাপট জমা দিন ফুরুলেই পায়ের জুতো পায়ে, মাথার মুকুট মাথায়। সৈন্যেরা গড়াগড়ি খেতো দারিদ্র্যের গলিঘুঁজীতে। তাদের পরিবারেরা কাজাবাচ্ছা নিয়ে মাঠে মাঠে মজুরি খাটতো। বাবু মোশায়রা বড় বড় ইমারত গড়তেন। শহর গড়ে নাম জুড়ে দিতেন কনস্টান্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল্, পম্পে, সিজারিয়া, ইসলামাবাদ, জোহানেসবার্গ, আলেকজান্দ্রিয়া।

'শাদা' বলতে এই লড়াকু, ওপর চড়াও, হামলাবাজ হাঁকাই-ঝাকাই দলের সর্দারদের আমরা জানি যারা এগিয়ে আসে ভদ্র-সেজে; বসত করে বণিক সেজে; সভাসদ্ হয় ধর্মের নামে; চুগলখোরী করে ন্যায়-দর্শনোর অজুহাতে, গুতাগুতি বাধিয়ে দেয় হক্-এর দাবি জোরদার করার নামে। এবং তারপরে হুড়প করে ফেলে সর্বস্ব। এই হোলো এক ধরনের পরিচয়। বার বার এসেছে একটা দিক থেকেই। এদের বর্বর বলা চলবে না কারণ এরা তো আর ঘোড়ায় চড়ে ডাকাত হয়ে লাফিয়ে পড়ে আগুন ধরিয়ে লুঠ করে চলে যায়নি। এরা মসনদ গেড়ে, জমি দখল করে, ন্যায়, আইন, আতিথেয়তা, সরলতার গলাটিপে ব্যবস্থা পাকা করেছে দেশের, ক্ষেতের, মানুষের, সমাজের সমস্ত অধিকারকে তিলে তিলে শুষে থোথ্লা করেছে; কেবল চেয়েছে কী করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা রেখে সাধারণ জনতাকে অন্তহীন বুভুক্ষায় সিদ্ধ করে নীচ, স্বার্থপর, ভীত, সন্ত্রস্ত, মেরুদণ্ডহীন করে রাখা যায়।

এরা না শ্বেত না কৃষ্ণ। এরা এরাই। এরা একটা প্রবৃত্তি। একটা ধারা। এরা শোষে আর শোষে। মানুষ হয়ে মানুষকে শোষে। নীতি, আইন, ধর্ম, বিদ্যা, শাসন, নিয়ম সব এই একটি সাধনের স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রিত। সে সাধন,—বহুর গ্রাসের অন্ন, অল্প কয়েকটির মধ্যে বাধার সাধন। যে দেশে ধনের ও ধনীর যত প্রাচুর্য সেই দেশে গরীব ও গরীবির নানারূপে নানা নিগ্রহ। নিগ্রহ কেবল নিগ্রোর নয়, নিগ্রহ কেবল কালোর নয়। নিগ্রহ আমেরিকা ভারতকে বা ভিয়েৎনামকে করছে না; নিগ্রহ য়োরোপ কেবল এশিয়াকে বা আফ্রিকাকে করছে না; নিগ্রহ যুক্তরাষ্ট্র য়োরো-এশিয়াকে করছে না। নিগ্রহ করছে একটি অধিকার লোলুপ তস্কর প্রবৃত্তি সমগ্র মনুষ্য সমাজকে। এবং পাছে এই তত্ত্বকথার জানাজানি হয়ে যায় তাই—এটাকে জাহিরী ভাষায় চিহ্নিত করে বলি শাদারা-কালোরা—কালুরা-পার্টি-ধলুয়া পার্টি, হোয়াইট-ব্ল্যাক। আসলে এটা আরও ঘনা-ব্যাপার। শ্রেফ দস্যুতা। জলে কবলে পাইরেট। স্থলে কবলে দাবায়ুস, আলেকজান্দার, নেপোলিয়ন, পিজারো, কোর্তেজ,—এমন কি ওয়াশিংগটন, আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্, ক্লাইভ্, ওয়েলেস্লী, সিসিল রোডস, জেনারেল বোথা, ইয়ান স্মিথ্। আরও গভীরে ভাবলে এ ডাকাতি এ রাহাজানি গুটিবন্দী হয়েও করা যায়। তখন নাম হয় ব্যাঙ্ক্, লিমিটেড কোম্পানী, শেয়ার বাজার, মাল্টী ন্যাশন্যাল কোম্পানী, য়োরো-ডলার, চেন্ড্ বিজনেস্, টাটা হাউস, বিড়লা হাউস,—ওপেক, টেক্সমাকো, সোকোনী, ফিলিপ্স, এ্যাল্কোআ। এদের শাদা বলা বৃথা। এরা একটা দল। এদের ফেরে পড়ে যারা কলে-পিষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারা যে কেবল কালা তা নয়। তারা শাদাও। যারা এ দলে তাদের মধ্যে যদি কালা না থাকে তবে জাঁদরেল নামের ডাকসাইটে সব কোম্পানী, যথা, টয়োটা, ক্যানন্, সিম্কো, টাটা, গোয়েঙ্কা, ওপেক,—এরা কারা? কিন্তু পারছে না এরা। ঐ যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ছাড়াও লাতিন আমেরিকার স্পানিশ ও পর্তুগীজ সামন্ত জমিদারেরা—ওদেরই সঙ্গে আজ জোটবন্দী হয়েছে য়োরো-আমেরিকান সওদাগরেরাও। ব্যাপার এই। শাদা-কালোর লড়াইটাকে শুধু দেশ, জাতি রং, ধর্ম দিয়ে বিচার করলেই ভুল হয়ে যাবে। দাঙ্গা লড়াই যখন হয় তখন হিন্দু-মুসলমানে, ইহুদী-খ্রীষ্টানে, ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্টে মুসলমান-ইহুদীতে হয় না। হয় শোষক এবং শোষিতের মধ্যে; সুবিধাবাজ এবং অসুবিধাভাগীদের মধ্যে। বাইরে থেকে যা দেখি তা নাটক; যা শুনি, যা

গাড়ি, হোক পত্রিকা, বই বা টি-ভি বোর্ড, সব প্রচার। মস্ত বড়ো ভুল এগুলোকে ধর্মদাঙ্গা বলা। এটা গোড়ার ভুল। এবং ভুল বলেই, ভেস্তেও যাবে। গোড়ার ভুল তো! এটা 'ভুল' বলে জাহির হয়ে ফল-ফুল হয়ে সাক্ষী হতে হতে একটা যুগই হয়তো কেটে যাবে।

তদিনে দাস-দেব বংশে নতুন ঝাড় কণ্টীবৃপে দেখা দেবে। কালক্রমে বর্ণাত অনুযায়ী তারা পাকতে পাকতে এদের পাকা মজবুত খানদানী কেরামাতের পথ অনেক এগিয়ে যাবে। দাসরা দাসতর হবে। বুভুক্ষিত আরও বুভুক্ষিত হবে। রুগ্ন আরও বেশী রোগী হবে। হাসপাতাল বাড়বে। স্কুলও বাড়বে। বই বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও বাড়বে। ঐ স্ফীতি দেখেই সবাই বলবে 'বাহবা নন্দ বাহবা নন্দ বাহবা নন্দলাল!' নন্দলালকী জয়!! ঐ সামান্য বন্টন-সন্ধির কৃপায় এই ধুরন্ধরদের চেপে ধরা পোঁটলা আরও জাঁদরেল হবে। "দাস"দের ছানা-পোনারা "শিক্ষিত" হয়ে আর্জানো পোষা পশুর পালের মত তাদের দেওয়া কৃপায় ভোজের বদলী "প্রভুর" ধন-দৌলৎ পাহারা দেবে।

এই নিয়ম। এরাই 'আর্জে'-রাখা অর্জিত দাস। এরাই চাটে সেই হাত যে হাত খাওয়ার, টানে তার গাড়ি যদ্দ গোশালায় বাস করে; জয়ধ্বনি করে তার যে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিলো না, রথে চড়তে দিলো না। হাঁড়ি থেকে মুখ তোলার ফুরসৎই যে পেলো না, লড়াই সে করবে কোন্ তাকতে? তবু সংগ্রাম চলে, চলেছে, চলছে।

এই নিদারুণ সংগ্রামকেই শ্রেণী সংগ্রাম বলা হয়। শ্রেণী সংগ্রামকে পিছিয়ে রাখার কায়দাটাকেই বিশেষভাবে বলা হয়েছে "শাদা"। এবং এই শ্রেণী সংগ্রামের স্বপক্ষে যারা মরছে তারা ছিলো লাল; আজকাল বলা হয় কালো। এই কায়দার প্যাঁচে পড়ে বেঘোরে যারা মারা গেছে, যাচ্ছে, এবং যাবে বলেই আজও জোয়াল কাঁধে বইছে তারাই অবিদ্যায় উপাসতে, এবং অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। তারাই ঘোর অন্ধকারে—মাথা কালো।

এরা শোষিত শ্রেণী। এদের বলা হয় কালো। এটা মাত্র চামড়ার চেকনাই নিয়ে লড়াই নয়। এরাই আজ ক্ষেপে লাল। অধিকার অধিকার না করে এদের আর থাকে নেই।

দাস ব্যবসায়ও আফ্রিকা সেই নিদারুণ কালো ইতিহাসের একটা অধ্যায়। কালো তারা নৈসর্গিক কারণে। হঠাৎ দাস-ব্যবসায়ে তারা পণ্য হয়ে পড়লো তার কারণ হঠাৎ তাদের সরল সমুদ্রতটের শান্ত নিরিবিলিতে ইয়োরোপীয় দস্যুদের জাহাজ ঠেকে গেলো। হঠাৎ কতকগুলো কারণে সমুদ্রপারের কতকগুলো সাদা মানুষ অসাদাদের ঠেঙিয়ে দূর করেও সুবিধা করতে না পেরে চাইলো শ্রমিক, এবং সেই শ্রমের কড়িও না দেবার সিদ্ধান্ত আরম্ভ করলো সেই অত্যাচার যার বর্ণনা যুগে যুগে যাঁরাই করেছেন তারাই

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমানিত হয়ে গেছে।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কিভাবে কাজ করে:

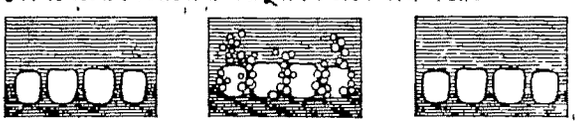

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জন্মায় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, দন্তক্ষয় রোগের প্রতিরোধ।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

DC.G.62 BN

করুণ এক কাহিনীর বিন্যাস করেছেন। শাদাদের নিন্দা করেছেন, মানবীয় দয়া মায়া রুচির অবনতি নিয়ে মাথুর আর নিমাই সন্ন্যাস গেয়ে কেঁদে ভাসিয়েছেন। কিন্তু আঘাত করেন নি এই দাসত্বের ইতিহাসের বুনিয়াদে। সেটা শাদা-কালোর কথা নয়। সেটা অনতান্ত্রিক শক্তিবাদের সঙ্গে অনতান্ত্রিক সাম্যবাদের দুর্ধর্ষ সংগ্রামের কথা। এই কথার সত্যতা যাচাই করতেই আজ 'কালো-শমি' খড়গ তুলেছে। অতলান্তিকের এপার ওপার আগুন জ্বলে উঠেছে। এ আগুন সহজে নিববে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কাজেই 'কালো' ও 'শাদা' বলতে কোনো জাতি বা দেশকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। চিহ্নিত করে দিতে হবে এই সংগ্রামের দুটো চরিত্রের কথা। য়োরোপ থেকে দাস-ব্যবসায় একভাবে ছড়িয়েছে; য়োরোপ থেকেই এটা সরিয়ে দেবার তাগাদাও এসেছে। য়োরোপ যদি শাদা-আত্মার শয়তান হয়, য়োরোপই তার শাপমোচনও হবে বাধ্য। শাদার পাপ শাদাকেই ধুয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু পাপ সত্য শাদায় বা কালোয় নেই। পাপ ছিলো লোভে, তস্করতায়, স্বার্থে, অমানবিক অধর্মে, অসত্যে, নৈরাজ্যে। এবং তা আজও আছে, এবং পূর্ণতর বিক্রমে, দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞায়, সমর্থতর ব্যবস্থায়, নিদারুণতর অবজ্ঞায়, অনীহায় অনড় হয়ে আছে। এই শাদা অত্যাচারও শাদা। এই শাদা অনিয়মও শাদা। আমরা যারা সেই শাদাদের মহৎ ধাপ্পাবাজি ও ধার্মিক দাগাবাজির বোঝা ভাবে নিগৃহিত—আমরাই কালো। ধর্মে বর্ণে আমরা ফাবাক দেখতাম না যদি না দেখাটা শিখিয়ে দেওয়া হতো।

নৈলে কালোকে অ-ভালো বলবে কে?

কালো যদি অ-ভালো, অমনোনীয়, ত্যাজ্য হয়, কোথায় রাখি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কপিল, ভৃগু, ব্রহ্মদধীচি, পরশুরাম, রাম, ব্যাসদেব, বাসুদেব কৃষ্ণ, রাবণ, বিভীষণ—বহু বহু আরও সব প্রখ্যাত সাধু, সাধ্বী, ঋষি, মনীষি,—যাঁরা দেবতার পূজা পেয়ে গেছেন। বাঙ্গসেনী কৃষ্ণা, সুদেষ্ণা, কৃষ্ণ কুমারীদের নিয়ে কাব্য রচনা করা হয়েছে। শ্যামা-কালী আমাদের মা। শ্যামরূপ রং নিয়ে আদর অনাদর করার ফলে মানব-সমাজ যতো পাপকর্ম করেছে তারই একটা উৎপাত এই নিগ্রোসমস্যা। শাদা-কালো নিয়ে যে সমস্যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে,— এ সমস্যাও তারই একটা খণ্ডাংশ, একটা বার্ত্তিক। এ সমস্যা গভীরভাবে বর্তমান যুগের ইতিহাসকে নাড়া দিচ্ছে। নিগ্রো সমস্যাই এ গ্রন্থের সমস্যা। দাস সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। সে সমস্যা আজ ইতিহাস। গভীরতর অর্থে আজ আমরা দাসানুদাস। নিঃস্বে আছি।

তার কারণ দাস প্রথাও বহুপ্রতিষ্ঠিত, বহুপ্রাচীন, বিধবাদাহপ্রথা, বৈধব্য প্রথা, পিতৃগোষ্ঠিতন্ত্র, মাতৃগোষ্ঠিতন্ত্র, পণপ্রথার মতো একটা প্রথা মাত্র। সমাজে ছিলো; আজও আছে। বসন্ত, বিসূচিকাও রোগ; যক্ষ্মা, কর্কট রোগও রোগ; আবার রক্তচাপ, উপদংশ, ফেরঙ্গ রোগও রোগ। ধাঁধা খোঁজা যাঁরা জানেন 'এর মধ্যে কিছু রোগ সংক্রামিত হয় সমাজে; কিন্তু রোধ করা যায়। কিছু রোগ সহজে হয় না; যখন হয় হঠাৎ হয়, তখন কারণও বার করা যায়। চিকিৎসাও সাধ্য। কিছু রোগ আবার সম্পূর্ণটাই স্ব-ভাব ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে অত্যাচার অনাচারেই জাগে। আবার ঐ ধরনের রোগের চিকিৎসাতেই ভিষকদের বনিয়াদী আয়।

সমাজেও এমনি রোগ ঢোকে; ঢুকে সমাজকে ধ্বংস করে। দাসপ্রথা সমাজের স্বাভাবিক বিকাশে অবশ্যম্ভাবীও নয়, স্বাভাবিকও নয়। এটা মানুষের গড়ে তোলা সমস্যা। ইতিহাস বলছে 'দাস' সমাজের অঙ্গ হয়ে প্রাচীনকাল থেকেই ছিলো। দাসীপুত্র বিদুর; দাসকন্যা রামের বন্ধু; দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত; 'কুতুবুদ্দীন দাস। কিন্তু প্রাচীনকালের দাস প্রথার ধারা, কারণ, প্রয়োগ ও অনুশাসন ছিলো স্বতন্ত্র। এ-কালের দাস-প্রথার কারণ একেবারেই অন্য। এবং কারণটির চিকিৎসা না হওয়ার ফলে এবং না হওয়া পর্যন্ত প্রথাটি থেকেই যাবে। তার রূপ, রং, নাম, ঠিকানা, ব্যবহার বাইরে থেকে বদলালেও প্রয়োগ এই কারণে বদলাবে না যে প্রয়োগের কারণটি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।—কারণের কারণ ভিন্ন হওয়ার দরুণ এই ধরনের দাস-প্রথার ধারা, প্রয়োগ ও অনুশাসন প্রভৃতির ক্ষতি করলো বেশী। তারা রাক্ষস হয়ে গেলো। আজও রাক্ষস আছে।

এই কারণটা কী এটা যদি জানতে পারা যায় তা হলেই মানব সমাজ উঠে পড়ে লেগে যাবে কারণটাকে উৎখাত করতে। যারা লাগবে তাদের সংখ্যা যারা লাগতে দেবে না তাদের অনুপাতে (মানুষ আর ম্যালেরিয়ার কারণের মতো) অদ্ভুত এক সাম্য-বিপর্যয়। ম্যালেরিয়ার কারণ এনাফেলিস্ মশাকে মারার দাওয়াই আছে; প্রয়োগ করা যায়; প্রয়োগ হয়ও (আবার মানুষের মতবন্তেই তার প্রয়োগে বাধাও উপস্থিত হয়)। আশ্চর্য, ম্যালেরিয়া তবু ছিলোও, আছেও; থাকবে না এমন আশা নেই। কিন্তু ঐ যে 'দাস' বানাবার 'কারণ', 'প্রয়োজনীয়তা—ওটির দাম কিছু লোকের কাছে এতো বেশি যে, যাবৎ সেই 'কিছু' লোক এবং তাঁদের 'প্রয়োজনীয়তা' থাকবে, তাবৎ দাস-কেও থাকতে হবে। তাই দাস-প্রথা এখনও আছে। অবশ্য তাদের আর দাস বলা হয় না। তার নাম বদলেছে। কিন্তু কানাকে পদ্মলোচন বললেই সে কিছু চক্ষুষ্মান হবে না!

সুতরাং, এ-কথা সত্য যে, 'দাস' হওয়া, করা, রাখা—এমনকি কেনাও সেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় থেকেই হয়ে আসছে। হয়ে আসছে তাও আগের থেকেও বেদেও দাস সংক্রান্ত উক্তি পাই। সেকালে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনের মধ্যে দাস-দাসী লাভও একটা লোভ ছিলো। স্পার্টা-ট্রয়ের যুদ্ধের পরে দোষে ছিলেন ট্রয়ের নারী সমাজেও পণ্য হয়েছিলো। নারীদের বন্টন নিয়ে তর্কবাদ হয়েছিলো। দ্রৌপদীকে পণ্য হতে হয়েছিলো। বাইবেলে মুসার প্রিয়তম পুত্র দাসী গর্ভজাত। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্তও নাকি দাসী গর্ভজাত। বিদুর দাসীপুত্র ছিলেন। রামচন্দ্র যখন দশরথের প্রাসাদে বসবাস শুরু করেন, তখন প্রসিদ্ধ তিনটি রানী ছাড়াও দশরথের আরও তিনশত দাসী-স্ত্রীর খবর পাই।

* * *

এসব 'দাস' বা 'দাসীর সংখ্যাও যেন আলাদা, এদের সঙ্গে ব্যবহারও ছিলো তেমনি সংযত ও সীমিত। তাদের সঙ্গে ব্যবহারও ভেবেচিন্তেই করতে হোতো। দাস বা দাসী বলেই মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে যা খুশি তাই করা। অধিকার সমাজের ছিলো না। মনু থেকে নিয়ে প্লাতো, সেনেকা, সিসেরো প্রভৃতি মনীষী দাসদের অধিকার সম্পর্কে বাঁধাধরা নিয়ম তো ভেবেছিলেনই, প্রয়োজনমতো তাদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থাও করা হোতো। কোরাণে দাসের সঙ্গে ব্যবহার করা নিয়ে পয়গম্বরের বিশেষ অনুশাসন আছে। ফলে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিকার করাও দাসের পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। মুসলমান ইতিহাসে দাসেদের মধ্যে রাজছত্রও চড়েছিলো। আরব সংস্কৃতিতে বহু দাস-মনীষীর বহু অবদান আছে। 'দাস' কথাটা প্রাচীন। সমাজে 'দাস'-ও প্রাচীন। কিন্তু য়োরোপের লোভ পশুর মতো মানুষ ধরে খাঁচায় ভরে মানুষকে পণ্য করে ফেললো। এ এক অন্য ব্যাপার।

দাস সম্বন্ধে রোমান আইন ছিলো কড়া। রোম্যানদের জীবনাদর্শের অনেকটাই দাসেদের সম্পর্কে সংযত। রোমান আইনে যে-ধরনের সুচিন্তিত বিধি বিধান দেখতে পাওয়া যায় এমনটা সহজে অন্য কৃষ্টিতে দুর্লভ। মনুর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মনু ছাড়াও দাসপ্রথা হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবেরা, গরীব এবং তমা মাতা বিনতা। ভারতে দাসকৃষ্টি লোকের চেয়ে খুব খারাপ ছিলো না। বংশানুক্রমে দাসেরা বেশ সম্মানিত। এই সমদর্শিতার আদর্শ রোম্যানরা দাসদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও কোন রেখেছিলো। সমাজে তাদের প্রাচুর্য থাকায় এবং দাসদের [illegible] মেশা, গতিবিধির অধিকার [illegible] সমাজের সম্ভবে [illegible] নানা সমস্যাও [illegible] দিয়েছিলো।

(ক্রমশঃ)

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দুষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৪৫ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা কমানোর জোরালো মলম

অমৃতাঞ্জন জোরালো ওষুধ। এতে দশটি চমৎকার ভেষজ আছে যা মাথাধরা, পিঠব্যথা, পেশীর যন্ত্রণা, মচকানি ও সর্দিতে চটপট আরাম এনে দেয়।

অ্যানোলিয়াম

সর্দি সারানোর আরামদায়ক মলম

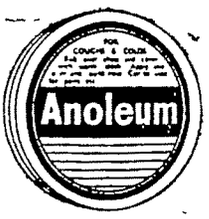

অ্যানোলিয়ামে আছে সর্দিকাশি সারানোর অব্যর্থ ভেষজ। এবং কোমল ত্বকের কথা ভেবেই এটি বিশেষভাবে তৈরী।

এই দুটি মলমই ঘরে হাতের কাছে রাখুন। কে জানে কখন দরকার হয়।

অমৃতাঞ্জন ও অ্যানোলিয়াম—নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ।

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড
৮০ বছরের বেশি সময় ধরে নির্ভরযোগ্য ঘরোয়া ওষুধ প্রস্তুতকারক

সমালোচনা

প্রেম

গ্রীক প্রেমকথা। গৌতম রায়।। নাথ ব্রাদার্স।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। বারো টাকা।

প্রেম পৃথিবীর আদি এবং অকৃত্রিম অনুভূতি। চেতনার প্রথম উন্মেষে এই প্রেমানুভূতিই বুঝি মানবাত্মাকে পাগল করে দিয়েছিল। যুগে যুগে তাই শুধু জীবনযাপনেই নয়, শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসেও প্রেমের এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা। প্রেম পৃথিবীর যেকোন এপিক সাহিত্যেই এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং অনেক মিলনের সুখগাথা ও বিচ্ছেদের করুণস্মৃতি নিয়ে বারে বারেই রচিত হয়েছে নতুন আলেখ্য—যা একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনা, সুখ-অসুখ, মাধুর্য ও যন্ত্রণায় আজও অম্লান।

দেবতা যেখানে মানুষ

গ্রীক প্রেমকথা সেই প্রেমেরই আলেখ্য। এবং এর অধিকাংশ স্থানে জুড়েই আছেন গ্রীক দেবদেবীরা। শুধু দেবতাই নয়, দেবতা এবং মানব উভয়ের প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদের মধুর কাহিনী নিয়েই লেখা হয়েছে এইসব পুরাণের গল্প। গল্পগুলো পড়লে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে এইসব দেবদেবীরা সাধারণ মানব-মানবী থেকে খুব দূরে একটা ছিলেন না। কেননা যখন মর্তে সাধারণ মানুষের ভেতরে এঁরা নেমে আসতেন তখন এঁদের স্বভাবচরিত্রও ধরা পড়ত সাধারণ নরনারীর মতই। এঁরা প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের জন্য সাহায্য করতেন। মর্তের মানবের একান্ত ডাকে সাড়া দিতেন, আবার নিজেদের মধ্যে, এমনকি মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া, মারামারি হিংসা ও দ্বন্দ্বে পড়ে মরতেন। কখনো কখনো হয়ে উঠতেন মহীয়সী। তবে সবকিছুর মূলেই ছিল

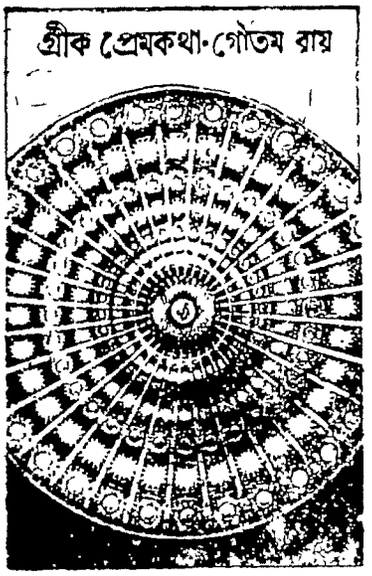

কিন্তু তাঁদের রূপের তৃষ্ণা এবং প্রেমের জন্য আকুতি। অলিম্পাস পাহাড় থেকে তাই সাধারণ এক নারীর অপূর্ব সুন্দর রূপ দেখে গ্রীক পুরাণের সর্বশক্তিমান দেবতা দেবরাজ জিউসকে মর্তের মাটিতে নেমে এসে ওই নারীর রূপ আহরণের জন্যে ছলনার আশ্রয় নিতে একমুহূর্তও দেরি হয় না। দেরি হয় না প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির সাধারণ এক অতিসুন্দর যুবকের পুরুষকে ভালবাসতে। রূপ এবং প্রেমের তৃষ্ণায় তাঁরা যেমন মাঝে মাঝেই মর্তে নেমে আসতেন, আবার পাশাপাশি সর্গোদ্যানে অলিম্পাস পাহাড়েও চলত তাঁদের সেই রূপের বন্দনা। কিন্তু সুখ কখনো অবিচ্ছিন্নভাবে ধরা দেয় না। রূপ কখনো এক রূপের বন্দনায়ই শান্তি পায় না। তাই দেবদেবী হলেও তাঁদের জীবনেও নেমে আসে দুর্ভোগ। দেখা দেয় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সংঘর্ষ, শঠতা এবং কাবচুপি ও ছলনা। দেবরাজ জিউস থেকে, আফ্রোদিতি, ইকো, হেরা, আরীজ, অবদিউস, প্রমিথিউস, সেফালাস, পিগম্যালিয়ন প্রভৃতি প্রত্যেকেই হন সেইসব দোষত্রুটির শিকার। তবে দোষ-ত্রুটি থাকলেও নিজস্ব গুণ ও শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে গ্রীক পুরাণের এইসব আলেখ্য যুগ-যুগান্তর ধরে পৃথিবীর মানুষের মনে ছবি হয়ে বসে থাকবে।

বাংলায় এই ধরনের আখ্যানগুচ্ছকে প্রথম দুই মলাটের মধ্যে নিয়ে এসেছেন সম্ভবত শিল্পী গৌতম রায়। বারটি এপিক গল্পকে কেন্দ্র করেই এই গ্রন্থ। অনুবাদ বা অনুকরণ নয়, মূল গল্পের কাঠামোটা রেখে তিনি উপযুক্ত কাব্যময় ভাষা এনে কল্পনার আশ্রয়ে রচনা করেছেন প্রতিটি আখ্যান। পড়তে পড়তে কখনোই ছাড়া যায় না। ভাষা এবং পরিবেশ ও পটভূমির বর্ণনায় তিনি যে প্রাচীন মেজাজটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রশংসা করার মত। কোথাও কোথাও আরণ্যক পরিবেশ বা অলিম্পাস পাহাড়ের মনোরম বর্ণনায় তিনি এমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে যেকোন প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছেই তা ঈর্ষণীয়। এছাড়া তারই অঙ্কিত প্রচ্ছদপট এবং ভেতরের স্কেচগুলো গ্রন্থটিকে আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছে। যেকোন পাঠকের কাছেই বইটি সংগ্রহ করার মত।

শচীন দাশ

সুভাষচন্দ্র

মাই আংকল নেতাজী। অশোকনাথ বসু। এসেম পাবলিকেশন।। ৬৭।২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-১। ৩০ টাকা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় যত বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, ভারতের অন্য কোন নেতাকে নিয়ে বোধহয় আর লেখা হয়নি। কারণ নেতাজীর জীবনের বিচিত্র ঘটনা আজও চমকের সৃষ্টি করে। তাঁর জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত ঘটনা-বহুল বলে, সুভাষচন্দ্রের যে কোন কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে, তা অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

আলোচ্য বইটির লেখক নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ অশোকনাথ বসু। যাঁর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্ক ছিল সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও মধুর। বিদেশে বা ভারতের বিভিন্ন স্থানে থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বইপত্র, পত্রিকা ও তথ্য সরবরাহের কাজ করেছেন লেখক অশোকনাথ বসু। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র লেখককে যে সব পত্র লিখেছিলেন, তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ একটি আলাদা দৃষ্টি-কোণ থেকে কালানুক্রমিক সাজিয়ে প্রকাশ করেছেন 'মাই আংকল নেতাজী' গ্রন্থে। যা ঐতিহাসিক যুক্তিবিন্যাসে হয়েছে নেতাজীর একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ।

ইতিহাসের নতুন সূত্র

সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর স্বার্থত্যাগ ও নিরলস সাধনা ছাড়া তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় ও বিদেশে ভারতবাসীর জন্য তাঁর মাতৃসুলভ সেবার যে সব নিদর্শন গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে সুভাষচন্দ্রের মহত্ত্ব পাঠকদের মুগ্ধ করবে। ১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যের জন্য ভিয়েনায় অবস্থান করছেন, তখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুভাষের কাছে বিহারের শ্রীকৃষ্ণবল্লভপ্রসাদ সিংহকে ভিয়েনায়

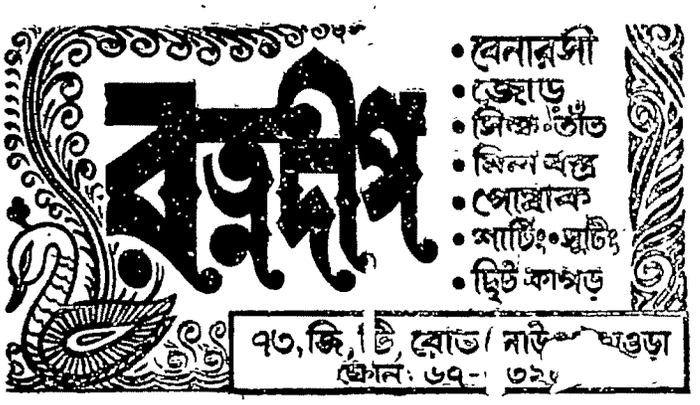

চিকিৎসার জন্য পাঠান। ১৯৩১-৩২ সালে জেলে থাকার সময় তাঁর কণ্ঠে অসুখ হয় এবং তখন কথা বলতে তাঁর কষ্ট হতো। সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় মহামায়াপ্রসাদকে তাঁর ফ্ল্যাটে রেখে, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁকে নিরাময় করে দেশে পাঠিয়ে দেন। ১৯৬৮ সালে ইনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ভি জে প্যাটেলের সেবা ও বিদেশে প্রচার কার্যের জন্য সুভাষচন্দ্রের হাতে এক লক্ষ টাকা দেবার জন্য তাঁর উইলের মামলার কথা সকলের জানা আছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালে জহরলাল যখন জেলে আবদ্ধ তখন শ্রীমতী কমলা নেহেরু চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় যান। সুভাষচন্দ্র তখন নিজের চিকিৎসার জন্য কার্লসবাদ যাওয়া স্থগিত রেখে কমলার চিকিৎসায় সহায়তা করেন। পরে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বার্লিন পর্যন্ত যান। জহরলাল জেল থেকে মুক্ত হয়ে যখন ইউরোপে যান তখন সুভাষচন্দ্র তাঁকে তাঁর বোর্ডিংয়ে রাখেন। ১৯৩৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী কমলার লাউসানে মৃত্যুর পর তাঁর শেষকৃত্যের সময়ও সুভাষচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যখন রোমে 'হল অফ মার্টিয়ার্স' দেখে তিনি মুগ্ধ হন, যার ফলে কলকাতায় স্থাপিত হয় মহাজাতি সদন। ভিয়েনা রেডিওতে সুভাষচন্দ্র প্রতি মাসে একবার রাত দশটা থেকে ৪৫ মিনিটের জন্য ভারতীয় প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেন। ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের জন্য 'ইণ্ডিয়া স্পিকস্' ও 'বেঙ্গলী' নামে চিত্র দুইটি প্রদর্শন বিদেশে সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় বন্ধ হয়। নেতাজীর দাঁ-কুঁচনের নীচে ছিল একটা বড় আঁচিল। সেইটি পাসপোর্টে ছিল তাঁর 'আইডেনটিফিকেশন মার্ক'। ভারত থেকে নিরুদ্দেশ হবার স্বরূপ তাঁর বহু দিনের। তাই ১৯৩৯ সালে তিনি রাজনীতিক ব্যস্ততার মধ্যেও এক সময় সেটিকে 'অপারেশন' করে নেন দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৮ সালে ১৭ মার্চ কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে দর্শন করতে আসেন ২২ মার্চ। গান্ধীজী দোতলায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন শুনে মহাত্মা গান্ধী নীচে নেমে এসে নতজানু হয়ে রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। এই ধরনের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনায় সমৃদ্ধ নেতাজী সম্বন্ধে অশোকবাবুর এই প্রামাণ্য বইখানি পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তার পর আছে এই বইয়ে ছ'খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও নেতাজীর নিজের হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি। নেতাজী সম্বন্ধে ঠিক বিবরণ যাঁরা জানতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এই বই অবশ্য পাঠ্য। লেখককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে এইটি বাংলা ও হিন্দীভাষায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুন্দর মিত্র

প্রেম : পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র

জীবনের চেয়ে বড়। দেবেশ দাস। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩। ১৫৲।

বাংলা উপন্যাসে নায়ক চরিত্রে প্রেমিক পেয়েছি, হতাশ প্রেমিক পেয়েছি, ভবঘুরে, বাউন্ডুলেও পেয়েছি। ইদানীং নায়ক চরিত্রের বিন্যাসে আরো বৈচিত্র্য যুক্ত হয়েছে। শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর সাম্প্রতিক এই গ্রন্থে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন, প্রেমিক মিলিটারি অফিসার। প্রেমে হতাশ হয়ে যে দেবদাস হয়ে যায় নি, সন্ন্যাসী হয়নি, আত্মহত্যা করেনি। সুকঠিন অনুভব আর দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে সে জীবনের কর্মভূমিতে যোদ্ধা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। বিদুষী আলট্রামডার্ন ধনী-কন্যা, কাহিনীর নায়িকা যখন প্রেমের প্রথম স্পর্শে তাকে বলেছে 'লিভ এ লিটল' তখন সে মনে মনে শপথ নিয়েছে যে একটুখানি নয় জীবনের অনেকখানি তাকে অর্জন করতে হবে।

প্রেমধন্য নায়ক স্বয়ম্ভু এবং নায়িকা স্বাতী দু কোটীর মানুষ। একজনের জীবনে সংগ্রাম, আর একজন স্বচ্ছন্দ বিহঙ্গ। স্বয়ম্ভু জীবনের মোটা একটা চাকলা দখলের জন্যে একটু করে সংগ্রামের পথে এগিয়েছে। এগোতে গিয়ে সে মন্বন্তরের কলকাতা মাড়িয়ে গেছে। ব্ল্যাকআউটের অন্ধকারে জীবনের বিচিত্র দিকের সাক্ষাৎ পেয়েছে। সবশেষে হাজির হয়েছে উত্তর-সীমান্তে জাপানী আক্রমণের মুখোমুখি। তখন সে পুরো দস্তুর সামরিক অফিসার।

উপন্যাসের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারত 'পাঁচন'। শ্রীদাস এই যুদ্ধের বহু তথ্য এখনো অপ্রকাশিত বিভিন্ন রেকর্ড থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সংগ্রহ করে অত্যন্ত হার্দ্য, অতি কোমল একটি কাহিনীর চারপাশে চালচিত্রের মত সাজিয়ে একটা অদ্ভুত কনট্রাস্ট তৈরি করেছেন যার সঙ্গে তুলনা চলে চিত্রের। ভাল শিল্পীর তুলিতেই এইরকম কনট্রাস্টের নজির খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ এই উপন্যাসের আবহাওয়া। কোথাও প্রচণ্ড হাতাহাতি, বক্তাবক্তি নেই। আছে ধূমথমে একটি গণিমণ্ডল। ধোঁয়া, গুলির শব্দ, ফ্লেম থ্রোয়ার, প্যারাচুট, মৃত্যু সব কিছুর মধ্যে দিয়ে নায়ক তার একটি অপরাজিত মন নিয়ে, তার বিশ্লেষণ, আর সাহস নিয়ে, তার জীবন-দর্শন নিয়ে এমন একস্থানে হাজির হয়েছে যেখানে জীবনের চেয়ে ছোটো কিছু নেই, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রতার মহাশ্মশানে ত্যাগ, আর আদর্শ আর প্রেমের মন্ত্র নিয়ে স্বয়ম্ভু জীবনের চেয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে।

অনেকদিন পরে 'বাঙ্গালোরের' লেখক একটি সুন্দর উপন্যাস উপহার দিলেন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নিজের দিকে ফিরে

অন্য আমি : বিনয় চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত। বইপত্র। ৩ যদুনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

স্মৃতিকথা এবং আত্মকথা—এই দুইয়ের মধ্যে একটা লক্ষণীয় প্রভেদ আছে। শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্য আমি' পড়তে পড়তে সেই কথাই মনে হলো। ব্যক্তিজীবনে বিনয়বাবু একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক—কিন্তু তিনি যে একজন সাহিত্যিকও এই সংবাদ বাঙালী পাঠক বোধহয় এর আগে পাননি।

গ্রন্থের বিস্তৃতি লেখকের শৈশব থেকে সাংবাদিক জগতে প্রবেশবার পর্যন্ত। বিনয়বাবু স্মৃতিকথা লিখেছেন। আত্মকথা নয়। দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবন তাঁর। জীবনের রাস্তায় চলতে চলতে তিনি বহু বিচিত্র চরিত্রের কাছাকাছি এসেছেন, বহু বর্ণাঢ্য মুখ দেখেছেন—ক্রমশঃ তাঁর নিজস্বতা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিজের স্থান নির্ণয় করতে শিখেছেন। এটা কম কথা নয়। অন্য একজন 'আমি' হয়তো আমাদের সকলের ভিতরেই বাসা বেঁধে থাকে। কিন্তু আমরা তাকে চিনে উঠতে পারি না। বিনয়বাবু পেরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের মনেই এই প্রশ্ন উদয় হয়। তার ওপর সেই মানুষ যদি সাহিত্যিক হন—তাহলে এই চিরকালীন প্রশ্ন তাঁর এক

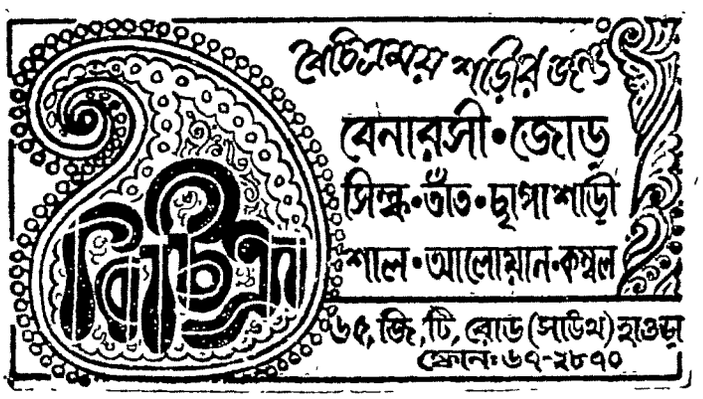

আশ্চর্য জাগরণ সঞ্চার করে। বিনয়বাবু এই জাগরণের রহস্য সঠিক উন্মোচন করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই অন্য আমি গ্রন্থটি পাঠকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আমাদের সকলের ভিতরেই একটি করে অন্য 'আমি' বসবাস করে। আমাদের প্রত্যহকে সে নিবিড় করে তোলে এবং নিজেও স্বাস্থ্য লাভ করে। এই খবর আমরা রাখি না। রাখলে হয়তো জীবন অন্যরকম হতো। জীবন সম্ভবতঃ হয়ে উঠত আরো সুন্দর ও কষ্টহীন।

ঐতিহাসিক কিছু তথ্যও এই গ্রন্থে রয়েছে। যেমন বিনয়বাবুর রাজনৈতিক জীবন পর্বের সবটাই ইতিহাস স্বীকৃত। বাঙালীর পরিচিত যে সমস্ত দেশবরেণ্য মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, যে সমস্ত সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন—এঁরা সবাই তার কলমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। এই কৃতিত্বও কম নয়।

অভীক রায়

কেবল ভ্রমণ নয়

অপরূপ নেহারলুঁ ।। সুশীলকুমার গুপ্ত ।। দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স। এম-টি, ৭২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-৭। পনেরো টাকা ।।

সুশীলবাবু ভারতীয় ধ্যানধারণায় আমেরিকাকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। সফল তাঁর ভ্রমণ আর তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী। ওয়াশিংটন, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, ওকলাহোমা ও টেক্সাস, মেরিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এবং নিউ-ইয়র্ক তিনি ঘুরেছেন। যা দেখেছেন—যেমনভাবে দেখেছেন, যার সঙ্গে কথা বলেছেন সমস্ত কিছুই উপন্যাসের মতো ঝরঝরে গদ্যে তিনি পাঠককে পড়াতে পেরেছেন—বোঝাতে পেরেছেন। এডুকেশনের একটি প্রোগ্রামে সুশীলবাবুর এই ভ্রমণ—যার অন্যতম ফসল এই বই,—যে বই পড়তে পড়তে ভ্রমণ পিপাসুদের মন খারাপ হয়ে যাবে,—ঘরকুনো মানুষদের ভ্রমণে নেশা ধরিয়ে দেবে।

ওয়াশিংটনকে বলা যায় আমেরিকার ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে পৃথিবীর সব দেশের লোক মিলে দশ লক্ষ লোক বাস করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী স্থপতি পিয়ের লাঁফা প্রথম এই নগরের পরিকল্পনা করে-ছিলেন। এই ওয়াশিংটন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল অন্ধকার, রাস্তায় কাদা, লোকজন নেই শুয়োর আর মুরগীর দল এখানে ঘুরে বেড়াত, ঘোড়ায় টানা বাক্সের মতো গাড়ি ছিল, আর ছিল এলোমেলো গাছের জটলা। জর্জ ওয়াশিংটনই এই স্থান নির্বাচন করেন। ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকা স্বাধীন হবার পর তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়। ওয়াশিংটনের বাড়ি, সমাধি, যে বোটানিক্স গার্ডেনে তিনি চাষ-সংক্রান্ত গবেষণা করতেন, পুরনো আমলের সূর্যঘড়ি কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাগান—এই ওয়াশিংটনেরই চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

মেরিল্যান্ড একসময়ে লীর কনফেডা-রেট আর্মি আক্রমণ করার ফলে প্রতিরোধের জন্যে ২০,০০০ সৈন্য হতাহত হয়েছিল। এখন সেই জায়গার নাম হয়েছে 'ব্যাটলফিল্ড ডে অব দি ওয়ার।' এইসব জায়গার বর্ণনা তথ্য, তত্ত্ব, সম্বন্ধে সুশীলবাবু আলোচনা করেছেন। কিংবা শিকাগোর মতো শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান যে কতখানি গুরুত্ব-পূর্ণ সে সব সম্পর্কে লেখকের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি দেখার মতো।

আমেরিকার সাহিত্য সম্পর্কে আমে-রিকান ইউনিভার্সিটির হ্যারী লীর মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, '.... বাইরের কোনো কোনো দেশে ওদের নিয়ে হইচই হয়েছে শুনেছি, কিন্তু আমেরিকার একমাত্র স্যানফ্র্যান্সিসকো ছাড়া অন্য জায়গার লোকেরা ওদের সম্বন্ধে মোটেই তেমন উৎসাহী নয়।' ওদের বলতে এখানে কেনেথ রেক্সরথ অ্যালেন গিন্সবার্গ প্রমুখ বিটনিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

শুধু ভ্রমণ কাহিনী বললেই এই বইয়ের ঠিক চরিত্রটা বলা হয় না। আরো কিছু যোগ করতে পারলে ভালো হত। চমৎকার। পড়তে পড়তে ভ্রমণের স্বাদ, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, অস্পবিস্তর ইতিহাস পড়ার আনন্দ একই সঙ্গে উপভোগ করা যায়।

তরুণ চৌধুরী

যে রকম লেখা হয়

আত্মজা ।। চিত্তরঞ্জন ঘোষ ।। দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কোলকাতা-১২ ।। পাঁচ টাকা ।।

'আত্মজা' বিবাহ-বিচ্ছেদের অভিশপ্ত দিক নিয়ে লেখা নাটক। রণবীর দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাওয়ার সময় তার তরুণী মেয়েকে পূর্বের স্ত্রীর কাছে কয়েকদিনের জন্য রেখে গিয়েছে। মেয়ে পল্লির ব্যবহার বাবা এবং মা উভয়ের প্রতিই অত্যন্ত উদ্ধত এবং অস্বাভাবিক। ফোন করে সে তার পুরুষ-বন্ধুদের ডেকে আনছে আগের মায়ের বাড়ি, নেশা করছে মায়ের সামনে। বোধহয় এসব প্রতিশোধ-স্পৃহারই বহিঃ-প্রকাশ। মিত্রা (মা) চেষ্টা করছে মেয়েকে কাছে টানার, মেয়ে ঘৃণায় সরে যাচ্ছে। কিন্তু নাটকের শেষের দিকে যখন সে বুঝতে পারছে পুরুষ বন্ধুরা আসলে কেবলমাত্র তার শরীরকে ভালোবাসে, মনকে নয়—তখন সে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি খুঁজছে। মোটামুটি এই হচ্ছে নাটকের বিষয়বস্তু।

একটি নাটক মূলতঃ অভিনীত হবার জন্য, পঠিত হবার জন্য নয়। কিন্তু কিছু কিছু মহৎ নাটক আছে, যা মঞ্চসফল তো বটেই, আবার পড়তেও ভাল লাগে। 'আত্মজা' এ দুয়ের কোনো ক্ষেত্রেই খুব সফল হবে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ সমস্যাটি সর্বজনীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, নাটকের গতি অত্যন্ত শ্লথ। খুব মহৎ বিষয় নিয়ে রচিত নাটকের গতি অবশ্য অনেক সময় ধীর হয়ে থাকে, যেমন 'ওয়েটিং ফর গোদো' কিংবা ইউজীন ও'নীল বা এলিয়টের কোনো নাটক—কিন্তু এখানে সেরকম কোনো কাহিনী নেই।

রণবীরের সঙ্গে পল্লির সংলাপও নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে। হতে পারে পিতা তার মাকে ডিভোর্স করেছে, কিন্তু তার জন্য মেয়ে অত অশালীন ভাষায় পিতাকে জর্জরিত করবে, এটা মানতে কেমন যেন আটকায়। পল্লির আধুনিকতা বোঝাবার জন্য নাট্যকার তার মুখে অজস্র ইংরেজী সংলাপ বসিয়েছেন, বাংলা নাটকে তা একটু শ্রুতিকটু লাগে। অন্যভাবে এটা বোঝানো যেত না কি? রণবীর ও মিত্রা এবং পল্লির বন্ধুরাও অনবরত ইংরেজীতে কথা বলছে। কানে এবং চোখে লাগে।

গল্প খুব দানা বেঁধে ওঠেনি এবং শীর্ষসন্ধি বা ক্লাইম্যাক্সও অনুপস্থিত—তবে সামগ্রিকভাবে চিত্তরঞ্জনবাবুর রচনার মুনশীয়ানা অস্বীকার করা যায় না। বেশ ঝরঝরে বাংলা লেখায় তাঁর দক্ষতা আছে। শেষের দিকে দু'একটি পরিস্থিতি তিনি খুবই উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন।

কুমার রায়ের প্রচ্ছদ মনোজ্ঞ। ছাপা খুব ভাল। মুদ্রণকার্য প্রশংসার দাবী রাখে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪৯/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়-সিল্ক
• তাঁত-মিল
• পোষাক
• সার্টিং-সুটিং
ও ছিট কাপড়

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাট্‌তি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-লরি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে কীর্তন আসরে

গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

মনোরঞ্জন বসু

'নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্যাকুলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ যতই মা জগদম্বার পূজা করতে লাগলেন, ততই তাঁর মনে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠল। শেষে মা কৃপা করলেন, প্রথম মাতৃদর্শন সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—'মার দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা .. অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর এ-জীবনে প্রয়োজন নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্ত প্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম। ..'একটা অননুভূত জমাট বাঁধা আনন্দ-সোত প্রবাহিত হইল, মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিলাম।' ....'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল, কোথাও যেন আর কিছুই নাই এক অসীম অনন্ত জ্যোতিসমুদ্র—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল।.. 'সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম'। 'অসহ্য যন্ত্রণার সময়ে সময়ে বাহ্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম, এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম মার বরাভয় করা চিন্ময় মূর্তি—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকার সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।'

রামকৃষ্ণের দীর্ঘ ১২ বছর (১২৬২—১২৭৩) সাধনকাল বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। ১২৬২-৬৫ প্রথম ৪ বছর দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পূজারী রামকৃষ্ণের মাতৃ-দর্শন, কঠোর সাধনা, দিব্যোন্মত্ত ভাব, বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রম করে অহেতুক প্রেমভক্তি প্রভৃতি উচ্চ মার্গের সাধন, সবই বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণের উন্নত ভাব যে দিব্যোন্মাদনা, বায়ুরোগ নয় তার প্রমাণ মেলে তাঁর পরবর্তী কালের সাধনায় ও বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে। সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনে নানা ভাবের কথা আচার্য শংকর তাঁর বিবেক চূড়ামণি-গ্রন্থে বলে গেছেন। ব্যবহারিক জীবনে বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন ও অভ্যাস, আচরণের সীমার মধ্যে সাধারণ মানসিকতা-বদ্ধ, সেই মন ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের একজন পূর্ণ সাধকের আচরণ ধরা যায় না। তাই সম্ভবতঃ ঐ সময় রামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা নিয়ে সাধারণের কাছে নানা প্রশ্ন উঠেছিল।

১২৬৬-৬৯ এই ৪বছর সময়ের শেষ ২বছর রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ভৈরবীর কাছে গোকুলব্রত থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান তন্ত্র নির্দিষ্ট সাধন সকল যথা-বিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১২৭০-৭৩ ৪বছর তিনি জটাধারী নামে রামাইত সাধুর কাছে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও রামলীলা বিগ্রহ লাভ করেন। তা ছাড়াও বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধি লাভের জন্য ৬-মাস তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করে থাকতেন। পরে আচার্য তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহন করে সমাধির নির্বিকল্পক ভূমিতে আরোহণ করেন। পরিশেষে গোবিন্দর কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তিনি উপদেশ নেন। তাছাড়াও ঐ বার বছরের মধ্যে বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের, কর্তাভজা ও নববসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সাধন মার্গের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সাধনা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, তাঁর সাধনার সর্বদিক বা কোন একটি বিশেষ দিকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমার সামান্য আভাস বর্তমান প্রবন্ধে দেওয়ার চেষ্টা হবে। সম্প্রদায়গত দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় যেন একটা আপাত বিরোধ দেখা যায়, কিন্তু পূর্ণতার দৃষ্টি-কোণ থেকে অখণ্ড সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ধারা দেখলে দেখা যাবে সেখানে বিরোধের কোন অবকাশ নেই। প্রথম চার বছর রামকৃষ্ণ সাধনার বৈশিষ্ট্য হল মাতৃ-দর্শন ও যোগবিভূতি লাভ। প্রশ্ন মাতৃ-দর্শন লাভ করার পরেও রামকৃষ্ণকে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে সাধনা করতে হল কেন? উত্তরে বলা যায় ধর্ম বিশ্বাস ক্ষেত্রে দর্শন মনকে অনেকখানি দৃঢ় ও ঈশ্বরাভিমুখী করে ঠিক, কিন্তু প্রত্যয় ছাড়া কোন বিশ্বাস স্থির, নিশ্চয় হতে যায় না, এবং দেহ ও মনের স্থায়ী সিদ্ধি দিতে পারে না। তাছাড়াও ব্যব-হারিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন অনুভব পরীক্ষিত হওয়ার আগে অনুভব মাত্র, সত্য পর্যায়ে স্বীকৃত হয় না ফলে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ অনুভবগুলি শাস্ত্র-বাক্য ও অন্যান্য সত্যদ্রষ্টা আচার্যদের

অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতএব রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার কোন একটি স্তরে সমাপ্তির রেখা টানা যায় না। কারণ রামকৃষ্ণের সাধনায় সাধ্য-সাধক সবই সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক হয়ে যায়। রামকৃষ্ণের সাধনা ছিল মূলতঃ অকালিক ও অখন্ড। তা ছাড়াও রামকৃষ্ণ সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সে সময়ের পরস্পর বিবাদে রত ধর্মরত-গুলির মধ্যে একটা ঐক্য সূত্রের সন্ধান, তাই তাঁকে ধর্মক্ষেত্রে নানা মতবাদের সাধনা করতে হয়েছিল। সমগ্র অধ্যাত্ম রাজ্যের আচার্য হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, ফলে ব্যক্তি-মুক্তির মধ্যেই তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শ সীমিত ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যায়, নিরন্তর ত্যাগ ও সংযমের সহায়তায় সাধক যখন নিজের মনকে স্ববশে আনতে পারেন, ঐ মনই তখন তাঁর গুরু হয়। ঐ পবিত্র মনে যে সব ভাব তরঙ্গ ওঠে সেই সব ভাব ভুল পথে নিয়ে যাওয়া ত দূরের কথা সাধককে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শুদ্ধ মন গুরুর মত তাঁকে পথ দেখিয়ে সাধনার প্রথম চার বছরেই তাঁকে মাতৃ দর্শনের যোগ্য করে তোলে। শুধু তাই নয়, তাঁকে কখন কি করতে হবে, এমন কি কখন কোন আচরণ করতে হবে, সে নির্দেশও তিনি পেতেন। আবার কখনও কখনও কোন বিগ্রহ তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে মূর্ত হয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়ে বা উপদেশের ছলে সাধন পথে উৎসাহ দিতেন। একদিন শাণিত ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে তাঁকে বললেন, অবান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করে ইসা চিন্তা, যদি না করবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে দেব। তাছাড়াও অনেক সময় ভিতরের ভোগ-বাসনাময় পুরুষকে ঐ সন্ন্যাসী নিহত করে। দুরন্ত দেব-দেবীর মূর্তি দর্শন করতে করতে অথবা কীর্তন গান শুনে কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করে জ্যোতির্ময় রত্ন অবলম্বনে রামকৃষ্ণের দেহে আবার প্রবেশ করতেন। ঐ সব ঘটনা সাধারণের কাছে আজগুবি মনে হতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে বিবেকের উদয় হয় নি তার কাছে বিবেক দর্শন শব্দটি যেমন অর্থহীন, তেমনই নীতি রাজ্যে যে প্রবেশ করেনি তার পক্ষে নৈতিক আদেশ বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি শব্দগুলি কাল্পনিক বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভবের খবর যাঁরা না রাখেন তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ দর্শন অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন ও অনুভবগুলি যে দিনের আলোর মতই সত্য তা পরবর্তীকালে তাঁর বিস্ময়কর কাজকর্মে প্রকাশ পেয়েছে। এবং আজও তার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। ঐ সময় তিনি যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন অথবা যা তিনি অনুভব করতেন সে সব তত্ত্ব তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী (যোগেশ্বরী) তোতা-পুরী (ন্যাংটা), প্রভৃতি সাধক-সাধিকার কাছে আবার শুনেছিলেন। যা তিনি জানতেন সে কথাই তাঁরা আবার তাঁকে জানালেন। শাস্ত্রবিধির মান্য রাখবার জন্যই সম্ভবত ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী প্রভৃতি সাধক রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন।

রামকৃষ্ণ সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনে আরও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিল, দীর্ঘদিন পরে তিনি তাঁর বাস্তুভিটা কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। কারণ তখন তিনি এত ভাবোন্মত্ত থাকতেন যে পূজা-অর্চনা ঠিকভাবে করতে পারতেন না। সেখানে এসে তিনি ভূতির থাল ও বুধুই মোড়ল শ্মশানে দিন-রাতের অনেক সময় কাটাতেন। নতুন হাঁড়িতে মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে তিনি শ্মশানে যেতেন এবং বলি নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালের দল সেখানে এসে হাজির হত, আর উপ-দেবতার নিবেদিত হাঁড়িগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেত, আবার কখনও কখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত অশ্বত্থ গাছের তলায় জপ-ধ্যানে কাটাতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাত্ম মুক্তিপথের সাধকদের বিশেষ এক স্তরে অশরীরী জগৎ অতিক্রম করতে হয়, চিত্তকে ভয়শূন্য করবার জন্য।

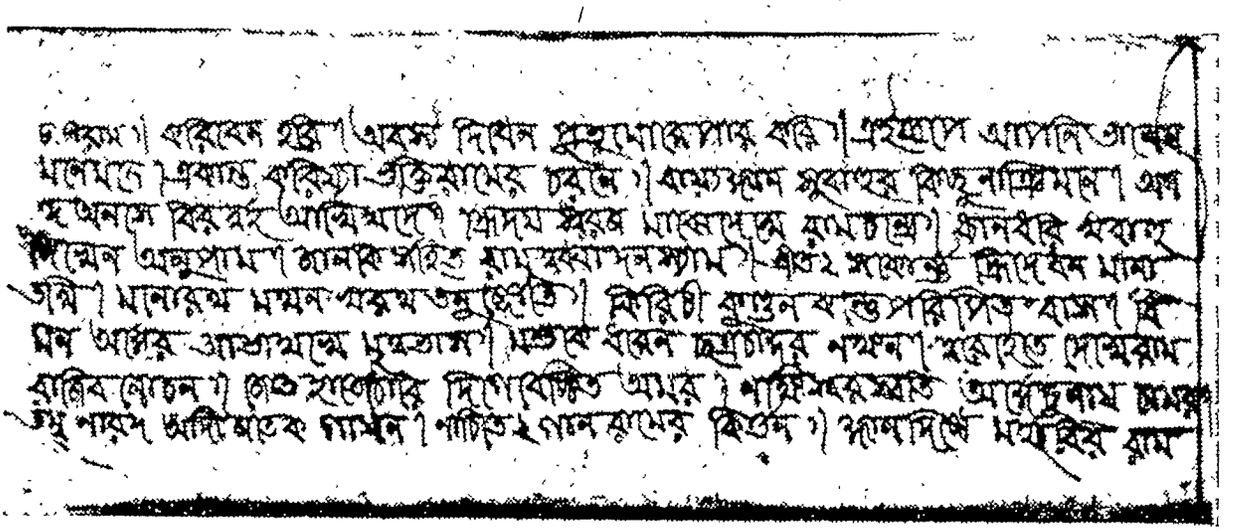

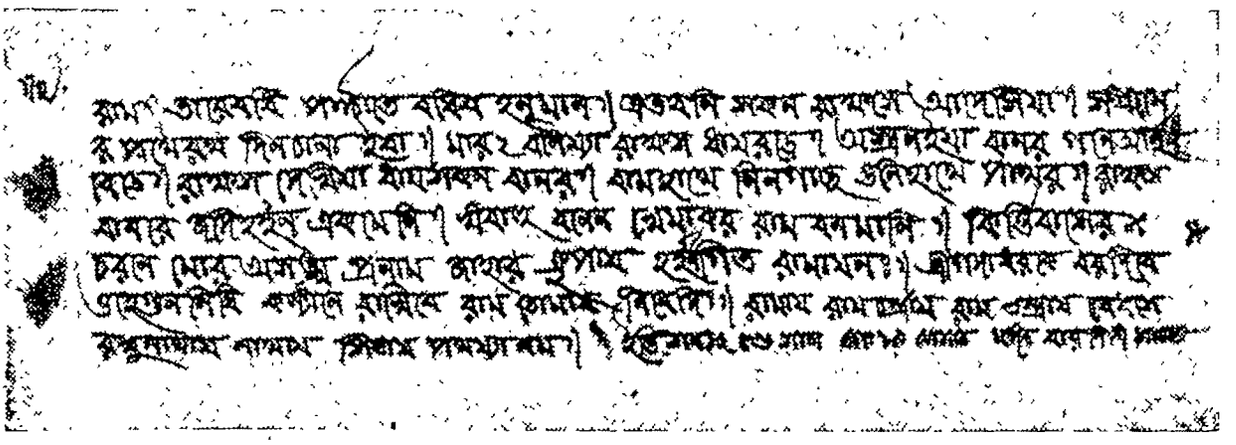

মণিকর্ণিকা ঘাট। বারাণসী

ঐ সময় তিনি জগন্মাতার অসিমুণ্ডধারী, বরাভয় মূর্তি প্রায়ই দেখতেন। গদাধরের মতিগতি দেখে তাঁর মা চন্দ্রাদেবী ও মেজভাই রামেশ্বর গদাধরের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু মনের মত পাত্রী না পাওয়ায় তাঁরা খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন। ভাবাবিষ্ট গদাধর হঠাৎ তাঁদের একদিন বললেন,—অন্যত্র পাত্রী অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটো বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। ১২৬৬-র বৈশাখ মাসের শেষের দিকে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছরের এক-মাত্র মেয়ের সঙ্গে গদাধরের বিয়ে হল। গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ বছর। বিয়ের পর গদাধর প্রায় এক বছর সাতমাস আমার-পুকুরে ছিলেন। ১২৬৭-র অগ্রহায়ণে বধূর প্রায় সাত বছর বয়স হল, কাল প্রধানতঃ গদাধরকে একবার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে হল এবং পাঁচদিন দেখে নববধূসহ তিনি কামারপুকুরে এলেন। বাড়িতে এসে হঠাৎ তাঁর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবার ইচ্ছা হল। কারও কথা না শুনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। সাধক রামকৃষ্ণ জগৎ সংসার সব ভুলে গেলেন। দিনরাত মায়ের স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে রামকৃষ্ণের বুক ভরে হয়ে থাকত। সংসার বা সাংসারিক কথা তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হত। শারীরিক দিক থেকে নিয়ম পালন দাহ ও অনিদ্রায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। মথুরবাবু ঐ সময় রামকৃষ্ণের মধ্যে শিব-কালী রূপ প্রত্যক্ষ করলেন।

১২৬৭—ইং ১৮৬১, রামকৃষ্ণের জীবনে এবং সাধনার দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল—রানী রাসমণির মৃত্যু এবং ভৈরবী যোগেশ্বরীর (রাসমণির) দক্ষিণেশ্বরে আসা ও আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা তখনও শাস্ত্রীয় দিক থেকে প্রমাণিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেনি। তাঁর সাধনা সম্পর্কে তখনও অনেকের ভুল ধারণা ছিল। শাস্ত্রীয় ধারায় তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ যেন শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতার অধিকারী হয়ে দিব্য ভাবে পরিচিত হন, সে দিকে ভৈরবী মন দিলেন। রামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ মন ব্রাহ্মণী নির্দিষ্ট তন্ত্র সাধনার পথে এগিয়ে চলল। অন্ত সমুদ্রের ঊর্মিমালার বিচিত্র ভাব তরঙ্গে ভেসে না বেড়িয়ে সর্বস্ব ছেড়ে সমুদ্রের তলদেশে ডুব দেওয়ার মত দুরূহ সাহস অর্জন করবার জন্য রামকৃষ্ণের মন প্রস্তুত হল। রামকৃষ্ণ তন্ত্র সাধনার রহস্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের বীর এবং সাহসী হওয়ার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে রামকৃষ্ণ তখন পূর্ণ সাধনায় মগ্ন হলেন। প্রজ্ঞাবতী, কর্মকুশলী ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়ার উপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ করতেন এবং ঐ সমস্ত সামগ্রীর উপকারিতা ও সাধন-ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে রামকৃষ্ণকে নানা উপদেশ দিতেন। নর ও অন্য চারটি প্রাণীর মুণ্ড গ্রহণহীন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনলেন ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার উত্তর দিকে বেল গাছের নীচে এবং ঠাকুরের তৈরী পঞ্চবটীর তলায় দুটি সাধনার বেদী তৈরী হল। ঐ মুণ্ডাসন দুটির উপর বসে জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যান ইত্যাদিতে সাধক রামকৃষ্ণ দিন কাটাতেন। সারা দিন কেমনভাবে কাটল সে সম্পর্কে দুর্জয় সাধক ও কুশলী উত্তর সাধিকার কোন হুঁস ছিল না। রাত্রিতে বিল্ব বৃক্ষের নিচে অথবা পঞ্চবটীর তলায় সব প্রস্তুত করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে ডাকতেন এবং তন্ত্র মতে মা জগদম্বার পূজা সেরে তাঁকে জপ, ধ্যানে মগ্ন থাকতে বলতেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ঐ সব কাজ-কর্মের যত্ন রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতেন। দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব অদ্ভুত, অদ্ভুত কত কি তখন তিনি দেখতেন, শুনতেন তা কথায় বলে শেষ করা যায় না। বিষ্ণু ক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪ খানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনার কথা আছে সবগুলিই একে একে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দিলেন। দুরূহ সাধন-গুলি যা আয়ত্ত করতে উচ্চস্তরের সাধকরা পরাস্ত হন, সাধক রামকৃষ্ণ অতি সহজেই তা সম্পন্ন করলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয়ের জন্য তন্ত্রে যে সকল সাধনার কথা আছে তার ২।১টি এখানে উল্লেখ করা হল।

একদিন রাত্রে এক সুন্দরী যুবতীকে ব্রাহ্মণী কোথা থেকে নিয়ে এলেন, তাকে বিবস্ত্রা করে দেবীর আসনে বসালেন এবং দেবীজ্ঞানে ঐ সুন্দরী যুবতীকে পূজা করার জন্য ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে নির্দেশ দিলেন। পূজা শেষ হলে ব্রাহ্মণী তখন ঐ যুবতীকে জগজ্জননী জ্ঞানে তাঁর কোলে বসে রামকৃষ্ণকে জপ করতে বললেন। দিব্য শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জপ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রামকৃষ্ণ ঐ যুবতীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হলেন। রামকৃষ্ণের দেহবোধের পূর্ণ লোপ দেখে ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হলেন। আর একদিন মড়ার মাথার খুলিতে মাছ রেঁধে জগদম্বাকে অর্পণ করে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণকে খেতে বললেন, মনে কোনও ঘৃণার ভাব না রেখে রামকৃষ্ণ তা খেলেন। আর এক-

দিন গলিত মহামাংস খণ্ড নিয়ে ব্রাহ্মণী হাজির হলেন এবং তাঁকে (রামকৃষ্ণকে) জিভ দিয়ে ঐ মাংস খণ্ড স্পর্শ করতে বললেন। রামকৃষ্ণ ঘৃণায় শিউরে উঠলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী যে মুহূর্তে নিজের জিভ দিয়ে ঐ মাংস স্পর্শ করলেন সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা শক্তির উদ্দীপনা এল, রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে আত্মস্থ হলেন, ব্রাহ্মণী তখন ঐ মাংস খণ্ড রামকৃষ্ণের মুখে দিলেন, তিনি তখন তা নির্বিবাদে গ্রহণ করলেন। এইভাবে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন বীরাচার নির্দিষ্ট পঞ্চ 'ম'-কারে ও নানা সাধন ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধক রামকৃষ্ণের চিত্ত থেকে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও ষড় রিপুর কু-প্রভাব ও সংস্কার দূর হল। আনন্দাসনে বসে বীরাচারে সিদ্ধ রামকৃষ্ণ দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তন্ত্র মতে বীরাচারের এটাই শেষ সাধনা।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কোন সাধনায় সাফল্য লাভ করতে তাঁর তিন দিনের বেশী সময় লাগেনি। স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ না করে বীরাচারী সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অতি অল্প সময়েই সিদ্ধি লাভ দেখে এ-কথা স্পষ্ট যে, স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ ও পঞ্চ 'ম' কার সাধন বীরাচারী সাধনার বিশেষ অঙ্গ হলেও অবশ্যকৃত্য নয়। আত্মিক শক্তি প্রভাবে প্রকৃতি নিজেই সাধকের কাছে ধরা দেয় এবং সাধ্য বস্তু লাভে সাধককে সহায়তা করে।

১২৬৭-৬৯ দু বছর পূর্ণোদ্যমে তন্ত্র সাধনা করে বৈষ্ণব সাধনার দিকে রামকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। জটাধারী নামে এক রামাইত সম্প্রদায়ের সাধুর কাছে বৈষ্ণব মতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা নেন এবং বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় নিজেকে সিদ্ধ করেন।

সাধক রামকৃষ্ণের জীবন বিচিত্র, এক বিস্ময়। ১২৬২—যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আসেন তখন তিনি জানতেন না তিনিই উত্তর কালের লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে যুগের প্রয়োজনে জগৎকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে এসেছেন। তখনও তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধারা অনুসরণ করে সৎ জীবন ও সংসার ধর্ম পালন করবেন। সংসারের অন্য কোন লোকের চেয়ে তিনি যে কোন অংশে বিশেষ গুণসম্পন্ন আজন্ম আত্ম-অভিমানশূন্য রামকৃষ্ণ কখনও তা ভাবেন নি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবই বিপরীত হল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি তাঁকে যেন সংসারের রূপ-রস থেকে কোন এক নিগূঢ় রহস্যময় অধ্যাত্ম রাজ্যে নিয়ে গেল। যে কোন ভোগ্য-বস্তুর প্রতি তাঁর কখনও কোন আকর্ষণ আসেনি। তা ছাড়াও রামকৃষ্ণের স্মৃতি-শক্তি ছিল প্রখর যা তিনি একবার শুনতেন তা তিনি কখনও ভুলতেন না। জগদম্বার সন্তান জ্ঞানে তিনি শুনতে পেতেন 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু'—একথা শুনে তাঁর

স্ত্রীজাতির প্রতি কখনও ভোগ-লালসার ভাব জাগেনি।

বৈষ্ণবোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ ভাব-সাধনার চরম ভূমিতে উন্নীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সর্বভাবের অতীত অদ্বৈত সাধনার প্রবল প্রেরণা দেখা দিল। অদ্বৈত সাধনার ব্যবস্থাও মা-জগদম্বা করে দিলেন। ১২৭১-র শেষ ভাগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এলেন। অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়েছিলেন। পুরীর মন্দিরে যাওয়ার পথে দক্ষিণেশ্বরে এলেন তিনি। রামকৃষ্ণকে অদ্বৈত সাধনার উপযুক্ত দেখে ঐ সাধনায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে বললেন। মধুর ভাব সাধনার পর রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা যায়, ভাব ও ভাবাতীত—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধি করবার জন্যই সম্ভবতঃ ঠাকুরের ঐ ইচ্ছা হয়েছিল। ঠাকুরের নিজস্ব কথায় বলা যায়, 'রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার মনে হইত, অনন্ত ভাবময়ী, অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে দেখিব'।

বেদান্ত সাধনে বসার আগে শিখা-সূত্র সব ছেড়ে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রেমময় সত্তা নিজের গর্ভধারিণীর ক্লেশের কথা ভেবে গোপনে সন্ন্যাস নিলেন। শুভ মুহূর্তে তোতাপুরীর কাছে দীক্ষিত হয়ে তাঁর নির্দেশে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং নিজ আহার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করলেন। যাত্রিশেষে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে হোমাগ্নি জ্বেলে সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে পড়ালেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহস্পর্শে সমগ্র পরিবেশে এক নতুন জীবনের সঞ্চার হল। সন্ন্যাস দীক্ষার সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গদাধরকে রামকৃষ্ণ নাম দেন। আবার কেউ কেউ বলেন মথুরবাবু ঠাকুরকে ঐ নামে ডাকেন।

(চলবে)

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।

শ্যামল রায়

'তুমি কিছু মনে করো না ভাই... অপরাধ নিও না।' একটু দাঁড়াও, এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি।' বলে, খস খস করে একটা রঙিন কার্ডের ওপর কিছু লিখলেন। তারপর কার্ডটি পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, 'এসো ভাই, তোমার হয়ে গেছে।' ছেলেটি বেড়িয়ে আসে। ঘৃণায় জ্বলন্ত ছায়া চাপা মুখ নিয়ে ছেলেটি চলে যায় করিডোরের শেষ প্রান্তে। কালো পর্দা দেয়া দরজার সামনে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটা নাম ডাকা হল। আমার নাম। পুলিশ ভদ্রলোকটি বললেন, 'যান।' আমি সামনের ছেলেটিকে দেখিয়ে বললাম, 'ও-যাবে না?'

'যাবে—এখন ওকে টোপকে যান... পরে যাবে।' আমি ছেলেটির পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ি। টেবিলের সামনে আগের ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াই। ডান পাশের মেয়েটি প্রথমে কথা বলল।

'কি করছেন?'

'কিছু না।'

'বাইরে কি করতেন?'

'আকুপাংচার।'

একটা উৎসাহের নড়াচড়ায় চেয়ার-গুলো শব্দ করে ওঠে। একজন আর একজনকে ডেকে বলে, 'এই দিদি, উনি আকুপাংচার করেন।' আমি টান টান হয়ে দাঁড়াই। ডান পাশের মেয়েটি বললেন, 'পুলিশে ধরল কেন?'

'পুলিশ জানে।'

'আপনি কিছু জানেন না?'

আমি চুপ করে থাকি।

বাঁ পাশের মেয়েটি দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে, চোয়ালটা ডান হাতের তালুর ওপর আলতো করে রাখলেন। কড়ে আঙুল দিয়ে ঠোঁট ছুঁয়ে একটা অশ্লীল রসিকতা করল। সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। ডানপাশের মেয়েটিও হাসে। ধমকের সুরে বলে, 'কি হচ্ছে?'

'কি আর হবে....ব্যথা বেদনার কথা বোঝব না?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে আমার কার্ড লেখা শেষ করলেন। কি যেন ভেবে বললেন, 'বিজয়বাবু তো চীনে গিয়েছেন—না।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখনো চীনে গিয়েছেন?'

'না।'

'যাবেন কখনো?'

'না।'

'কেন?'

'প্রয়োজন নেই।'

'না থাকাই ভালো।' বলে, আমার কার্ডটা পাশের একটি মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়েটি কার্ডটির ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

আমি বললাম, 'যেতে পারি?'

'যান, বাইরে দেখা হবে।'

'আচ্ছা।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। একবার ফিরে তাকাই—বেরিয়ে আসি। পুলিশ ভদ্রলোক দুঁধরে ছিলেন। 'আপনি মশাই,—যা ভা'

'কেন?'

'ওই কথার উত্তর দিতে পারলেন না।'

আমি চুপ করে থাকি।

'আপনার জায়গায় আজ আমি থাকলে দেখতেন খেলটা।' বলে, হাঁটতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে করিডোরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাই। কালো পর্দার সামনে এসে দাঁড়াই। পর্দা সরে যায়। ঘরে ঢুকি। ছোট্ট ঘর। ঘরের মাঝখানে স্ট্যান্ডের ওপর একটা ক্যামেরা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। ক্যামেরার সামনে, একটু দূরে একটা চেয়ার। হাতল নেই। ক্যামেরার পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বলল। আমি একপা দু-পা করে চেয়ারে গিয়ে বসি। লোকটি কথা না বলে আঙুল তুলে নানা রকম ইঙ্গিত করতে থাকে। ডান পাশে, বাঁ পাশে, উঁচু, নীচু নানা দিকে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিকভাবে বসতে বলে। আমি ওর কথা মত বসতে চেষ্টা করি। ওর মনমত বসা হলে, ঘরের এক কোণ থেকে তক্তার মত কালো একটা কাঠের টুকরো আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। ইঙ্গিতে বুকের কাছে ধরে থাকতে বলে।

আমি বুকের কাছে ধরে বসে থাকি। লোকটি কয়েকটি নম্বর কাঠের টুকরোর গায়ে ঝুলিয়ে দেয়। আমার নম্বর আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। লোকটিকে দেখতে থাকি। রোবট বলে মনে হয়। রোবট ক্যামেরার পিছনে চলে যায়। কালো কাপড়ের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ক্যামেরায় চোখ রাখে। ডান হাত তুলে একবার, দুবার, তিনবার উঠিয়ে নামিয়ে কাপড়ের ভেতর থেকে মাথা বার করে নিয়ে আসে। আমার ছবি তোলা হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ক্রিমিনালদের তালিকায় একটি নাম, একটি ছবি বেড়ে যায়। আমি উঠে দাঁড়াই। রোবট ক্যামেরার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

'হল?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন তা হলে।'

'কোথায়?'

'বাড়ি।'

'হাতের, পায়ের ছাপ নেবেন না?'

'না।'

'কেন?'

'প্রয়োজন নেই।'

'কেন?'

'কেন-র কোন প্রয়োজন নেই।'

ধীরে ধীরে আমরা করিডোরের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। বাঁয়ে সারি সারি অফিসঘর, ডান পাশে তারের জাল। করি-ডোর ফাঁকা। আমি যে ছেলেটিকে টপকে গিয়েছিলাম তাকে কোথাও দেখা গেল না। সিঁড়ি এসে গেল। পুলিশ ভদ্রলোকটি বলল, 'নামুন। এদিক ওদিক তাকাবেন না।'

আমি এদিকে ওদিকে না তাকিয়ে নামতে থাকি। কাঠ-বোর্ডের 'সি-আর-এস' পার হয়ে নামতে থাকি। এক সময় নীচে

চেয়ে যাই। কেন, জানি, মনে হল কটা বাজে? পুলিশ ভদ্রলোকটিকে বললাম,

'কটা বাজে?'

'বাজা বাজির দরকার কি?' তিনি আমাকে গাড়ির সামনে নিয়ে আসেন। 'এবার অনুগ্রহ করে ভেতরে গিয়ে বসুন।' বলে, গাড়ির দরজা খুলে দেন। আমি ভেতরে গিয়ে বসি। আশ-পাশ থেকে সন্ডা মার্কা লোক দুটো ছুটে আসে। দু-দিক থেকে উঠে আমার দু-পাশে বসে। আমি সিটের ওপর হাত রাখি। জোড়া হাত। নতুন করে ধরার কিছু নেই। পুলিশ ভদ্রলোকটি সামনের সিটে উঠে বসে বললেন, 'চলো।' গাড়ি চলতে থাকে। ডাইনে, বাঁয়ে বাঁক নেয়। চলতে থাকে।

ড্রাইভার মাঝে মাঝে থামাচ্ছেন। পুলিশ ভদ্রলোকটি বললেন, 'শরীর খারাপ নাকি?'

'না, স্যার।'

'খারাপ হলেই বা দোষের কি?'

ড্রাইভার গাড়ি চালান, কোন উত্তর দেন না। পুলিশ ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে তাকান। একটু কাত হয়ে ঘুরে বসেন।

'হয়ে গেল।'

'কি।'

'আপনার ইহকাল, পরকাল ঝড় ঝড়ে হয়ে গেল।'

'কেন?'

'জীবনে আর কিছু করতে হবে না।'

'দেখা যাক।'

'দেখবেন আর কি। সব দেখা শেষ।'

অফিস পাড়া পার হয়ে যায় গাড়ি। ধর্মতলার পাশ দিয়ে ছুটে চলে দক্ষিণে। কাছে দূরে মানুষজন ট্রাম বাস শো শো করে চলে যায়। আকাশে কালো মেঘ ঢাকতে থাকে। চারদিকের ঝিমঝিম ঝিম-ঝিম শব্দ ঘন হয়ে আসে। বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে। সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। জলাশার আস্তরণ ঘুমের মত নেমে আসে নীচে। গাড়ি চলতে থাকে।

(১৪)

সন্দীপদা একটু দূরে বসে আছেন। উঠোনের বুকে জল দাঁড়িয়ে আছে। যতিনদা কাছে পিঠে কোথাও আছে বলে মনে হল না। ঝড়ের চাল ছুঁইয়ে জল পড়ছে। টপ-টপ শব্দ হচ্ছে জলের ওপর। কোথাও কোন আলো নেই। একটা নিঝুম স্তব্ধতা রক্তের ভেতর খেলা করছিল। অন্ধকারের রিণ-রিণ শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

'নগেন দাসের নাম শুনেছিস?'

'কে নগেন দাস!'

'মিঠোকে যারা লোকজন ধরে নিয়ে গেছে।'

'না।'

একটা বাঁশের খুঁটিতে পিঠ ছুঁইয়ে, ঘাড় তুলে সন্দীপদা বসে রইলেন।

বললাম, 'কে নগেন দাস।'

'থাক কিছুদিন, চিনতে পারবি ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে চিনে নিস।'

'কেন, তোমার বলতে কী?'

'আমার কথা শুনে তাকে চিনতে তোর ভুল হতে পারে।'

'হবে না, বল।'

'হবেই, নিজে দেখে শুনে চেনা যোগ্য আর কারো কথা শুনে চেনা বোঝা এক জিনিস নয়।'

'সবাইকে কী দেখে শুনে চেনা যায়?'

'যেখানে সুযোগ নেই সেখানে যায় না, যেখানে আছে সেখানে যায়। কেউ যখন কারো সম্পর্কে কিছু বলে তখন সে নিজের মত করে বলে। তার ভাল লাগা মন্দ লাগা, দৃষ্টিভঙ্গী সব তার নিজের। আমার চোখ আর বোধ দিয়ে নগেন দাসকে চেনাবো কী করে?

'একটু তো চিনবো।'

'সে চেনার কোন মানে হয় না। ধর তুই তেঁতুল গাছ দেখিসনি, খাসনি কখনো তেঁতুল। তোকে যদি তেঁতুল আর গাছ সম্বন্ধে হেনতেন বলি কী বুঝবি?'

'বুঝবো না কিছু কিন্তু একটা ধারণা তো হবে।'

'যে ধারণা দিয়ে শুধু কথা বলা যায় কিন্তু কোন কাজ করা যায় না—সে ধারণা দিয়ে কী করবি?'

'ঠিক আছে, আমি নিজেই দেখে শুনে নেব, তোমার কিছু বলতে হবে না।'

সন্দীপদা হো-হো করে হেসে উঠেন। হঠাৎ হাসি বন্ধ করে উঠে আসেন আমার কাছে।

'রাগ করেছিস?'

'না, রাগ কেন।'

'তবে অমন করে বললি যে।'

আমি চুপ করে থাকি। অন্ধকারের রিন-রিন শব্দ আমাদের ঘিরে ঘুরতে থাকে।

'নগেন দাসের কথা বলবো....শুনবি?'

'না।'

আমার বুকের নীচে একটা চাপ চাপ ব্যথা, চোয়ালে, গালে কী রকম কষ্ট হচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে। হু-হু বাতাস বইছে উঠোন ভোর। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছিল ..ই..ই..ই..ন...।

সন্দীপ বললেন, 'ওরা ফিরছে হয়তো।'

আমি ফিরে তাকাই। আকাশের গায়ে একটা লাল আভা ঘন হয়ে ওঠে। ফর ফর সট..সট..শব্দ শুনতে পাই। কোথা থেকে যেন যতিনদা ছুটে আসেন। দু হাত ওপরের দিকে তোলা। 'হেই..শানু, হেই শানু..' বলে ভেজা উঠোনে নড়বড়ে পায়ে ছুটে আসছিল। 'উঠ গো, ওরা আগুন লাইক্‌য়েছে...।'

সন্দীপদা উঠে দাঁড়ান। আমাকে বললেন, 'ওঠ।'

'কারা?'

'নগেন দাসের লোকেরা।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে।' বলে, সন্দীপদা উঠোনে নেমে পড়লেন। আমি ওর সাথে সাথে নামতে থাকি। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি রক্তের ভেতর দিয়ে মাথায় উঠে আসে। হু-হু করা বাতাসের ভেতর ভিজে মাটি, বনোজ ফুল, গোয়াল ঘরের গন্ধ ঘন হয়ে ওঠে। যতিনদা দাঁড়িয়ে যান। সন্দীপদা বললেন, 'কার কার ঘর পুড়ছে?'

'মিঠো নিধু বুধনের ঘর', যতিনদা কথা শেষ করেন না, কাঁদতে থাকেন।

সন্দীপদা বললেন, 'এই বৃষ্টিতে ঘরে আগুন দিল। ইনিই হচ্ছেন নগেন দাস। কথায় নড়চড় নেই। কেঁদ না যতিনদা ও আগুন জ্বলবে না। পেট্রোল পুড়ে গেলে এখুনি নিভে যাবে।'

যতিনদা কাঁদতে থাকেন। কিছুক্ষণ আগে যে মানুষটিকে নির্মম হৃদয়হীন বলে মনে হয়েছিল সে যে অমন করে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। আমি সন্দীপদাকে বললাম, 'চল ওখানে—একবার যাওয়া দরকার তাই না।' সন্দীপদা যতিনদাকে কাছে ডাকলেন, আমাকে বললেন, 'গিয়ে কী করবি। যারা আগুন দিয়েছে তারা কেউ নেই, শুনা কয়েকটা পেট্রোলের টিন পড়ে আছে। যাদের ঘর তারা সব জেগে গেছে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে চীৎকার কান্না নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। আগুন নিভে গেছে। কিছু ধোঁয়া গন্ধ তুলে মিঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। এই তো দেখবি।' আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি আকাশের লাল ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে আকাশ—নিঝুম নিঃস্তব্ধ হয়ে আসছে চারদিক। যতিনদা মাটিতে বসে পড়েছেন। সন্দীপদা যতিনদার হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করছেন। 'ওঠ। কান্নাকাটি করে ধরে পড়ার মত কিছু হয়নি—বসস হচ্ছে আর ছেলেমানুষ হচ্ছো—ওঠ।'

আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছা করছে, অনেক কিছু। বললাম, 'আমরা কী এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো সন্দীপদা? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—কিছু একটা করা দরকার।'

'কিছুই বুঝতে পারছিস না—তবে করবিটা কী? এত তাড়া কিসের?'

আমি দমে যাই। চুপ করে থাকি। কিছু একটা বলা দরকার মনে করে বলে ফেলি, 'তুমি তো বুঝতে পারছো—তুমি কিছু করছ না কেন?'

সন্দীপদা হাসলেন 'করছি তো, এই মুহূর্তে আমার না করার করছি। তোকে নিয়ে তো মহা মুস্কিল হল—এত চঞ্চল কেন? আঁ।'

যতিনদা উঠে দাঁড়ান। প্রথমে বাঁ-হাতের চাটু দিয়ে নাক চোখ মোছেন তারপর কাপড়ের খুট হাতে তুলে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ার দিকে চলে যান।

অসহায় নিঃসম্বল একটা ভাঙাচোরা মানুষকে আমি যেতে দেখি।

'আয়।'

আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

'আয়।' বলে, সন্দীপদা আমার হাত ধরলেন। বললেন, 'যখন কোথাও কিছু হবে আগ বাড়িয়ে যাবি না, আগ বাড়িয়ে কিছু করবি না। সবাই যা করবে তুই তাদের বুদ্ধি, যুক্তি শ্রম দিয়ে সাহায্য করবি। নেতা হবি না। নেতা হতে চেষ্টা করিস না কখনো। মনে থাকবে তো?'

আমি মাথা নাড়ি।

'এই তো। ..তোকে এনে ভালই করেছি. কী বল।'

আমি চুপ করে থাকি।

সন্দীপদা আমার হাত ধরে উঠোন পেড়িয়ে দাওয়ার দিকে চলে যান।

চারপাশটা দেখে মনে হয় এখানে কদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে, কমছে, ধাড়ছে আবার বৃষ্টি হচ্ছে। নগেন দাস কী তা জানে না? ঘরে আগুন দিতে বলল কোন আক্কেলে। কোন আক্কেলে লোক-গুলো আগুন দিল। জলের ওপর আগুন দাঁড়ায় না। যদি দাঁড়াতো? গনগন করা আগুনে গনগন করতো চারদিক। কত কিছু জ্বলে যেত। পুড়ে যেত, মরে যেতো হয়তো কেউ কেউ। জলে আগুন দাঁড়ায় না—আগুনে জল। নগেন দাসটা কী?

'তুমি কী করে বুঝলে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়েছে।'

'এই ভেজা ঘর-বাড়িতে পেট্রোল ছাড়া আগুন জ্বলে?'

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
আরাম পেতে
বিশ্বস্ত
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে!
3653 BEN

'কী করে বুঝলে এই আগুন নিভে যাবে।'

'পেট্রোলের আগুন খুব হাল্কা, ভিজে জায়গায় নিজে জ্বলে, অপরকে জ্বালাতে পারে না। উঠে আয় একটু বসি। ওরা ফিরে আসবে এখুনি।'

'তুমি ওদের সাথে যাবে বলেছিলে গেলে না যে!'

'বলেছিলাম যাবো। ভেবে দেখলাম যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'আমি কাছে থাকলে ওদের যুক্তি বুদ্ধি উদ্যোগ সব হারিয়ে যায়। আমি ছেবে যাই। এ যে কী কষ্ট তুই বুঝবি না। এতদিন কী আমি ওদের পরনির্ভর করে তুলেছি। স্ব-নির্ভর করে তুলতে পারিনি?'

আমার অবাক লাগে। এমন অসহায় করুণ স্বর, এত অগোছাল কথা সন্দীপদা বলছেন? কিন্তু একটা বলা দরকার। বললাম, 'তা কেন. তা কেন হবে?' সন্দীপদা ঘাড় তুলে মাথা উঁচু করলেন। বললেন, 'নারে, আমার ভেতরের আগুন খুব হাল্কা। এত-দিন আমি নিজে জ্বলেছি—অপরকে জ্বালাতে পারিনি।'

আমি আকাশের দিকে তাকাই। আলো নেই কোথাও। নিথর কালো অন্ধ-কারে সব ভিজে আছে। গাছপালা, পাখ-পাখালি, মানুষজন—সব। কোথাও কোন স্থায়ী শব্দ নেই। ভাঙা ছেঁড়া ফেটে যাওয়া শব্দ উঠে আসছিল আশপাশ থেকে, আবার তলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দূরে একটা গাছে হুস করে শব্দ হল। ডালপালা নাড়িয়ে গাছটা দুলছে। ধুপ করে একটা শব্দ। যেন শব্দটাই চিৎকার করে উঠল... পুলিশ.. পুলিশ....।

সন্দীপদা দাওয়ার ওপর পা তুলতে গিয়ে থামিয়ে দিলেন আমাকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে বললেন, 'এ-দিকে আয়....শুনলি?

'কী?'

'পুলিশ এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'কী করবি এখন?'

'তুমি বল।'

'ধর আমি নেই।'

'কী আর করবো—লড়বো।'

'কী নিয়ে লড়বি?'

আমি চুপ করে থাকি। যতিনদা ওপর থেকে নেমে আসেন। সন্দীপদা আমার হাতে চাপ দিয়ে আবার বললেন, 'বল তাড়াতাড়ি—কী করবি?' আমি চুপ করে থাকি। যতিনদার ঘর থেকে প্রথম শাঁখ বেজে ওঠে। তারপর পর পর শাঁখ আর কাঁসর ঘন্টা বাজতে থাকে। নিথর কালো অন্ধকারের ভাঙা ছেঁড়া-ফাটা শব্দগুলো একটানা সুর পায়। গাছগাছালির ভেতর থেকে পাখীদের চিৎকার ডানা ঝাপটানোর শব্দ সেই টানা সুরের সাথে মিলে যায়। বহু দূর থেকে ভেসে আসে মানুষের স্বর। কোন স্বর চিনি না কী করবো আমি কী।

যতিনদা বললেন, 'চল, হুথা যাই।'

'কোথায়?'

'বুধনের ঘর।'

'চল'—বলে, সন্দীপদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সমস্ত গ্রাম কাঁসর ঘণ্টা হয়ে বাজতে লাগল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পিছল উঠোন দ্রুত পায়ে পেরিয়ে যাই। মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে এখানে ওখানে। ঘরের ডান দিকে বেশ প্রশস্ত ভাঙন। যতিনদা সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় আমাদের দ্রুত আসতে বললেন। আমরা দ্রুত হাঁটতে থাকি। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরে ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। একটু দূরে এগিয়ে গেলেই সামনে পুকুর। দু-পাশে পুকুর মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। পুকুর পেরিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম কয়েকজন নারী পুরুষ জটলা করছে। ওঁরা আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। সবার আগে একটি মেয়ে, অল্প বয়স। সাদা থান কোমরে জড়িয়ে প্রায় দৌড়ে এল।

'তোমরা পেইলে যাও।'

'কেন?'

'তোমাগো খুইজতেছে—বিপিন দাসের ব্যাটারে ধরি লই গেছে। তোমাগো...'

মেয়েটি এক নিশ্বাসে বলতে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। তাঁর বুক উঠছে নামছে, চুলগুলো উদভ্রান্ত. হাত পায়ের চলাফেরা তড়িৎ, দৃপ্ত।

'তুমি একটু শান্ত হও যশোদা.... আস্তে কথা বল।' বলে, সন্দীপদা ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেলেন। সবাই সন্দীপদাকে ঘিরে ধরল।

ঘটনাটা কী ঘটেছে সবাই এক সাথে বলতে লাগল। সন্দীপদা এর দিকে এক-বার ওর দিকে একবার মুখ করে শুনতে লাগলেন। যশোদার গলার স্বর আবার শুনতে পেলাম।... 'নাগো, পবন নিজের ঘরে আগুন দেইছে....পুলিশ ডেইকে লিয়ে এইয়েছে....।'

সন্দীপদা আমার দিকে ফিরে তাকা-লেন। আমি খুব আস্তে ধীরে বললাম, 'পবন কে?'

'নগেন দাসের লোক।'

যশোদা আমার দিকে এগিয়ে এল। এবার আমি ওঁর মুখ দেখলাম। নিটোল মুখ। বসন্তের কালো কালো দাগ। নষ্ট চোখ।

'ই ছেলাটি কে গো?'

'তোমাদের ভাই।'

'লতুন বুঝি....লতুন ভাই।'

আশপাশের ছেলেমেয়ের দল আমাকে ঘিরে ধরল।

শাঁখ আর কাঁসরের শব্দে গম গম করছিল চারদিক। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল। সারা গ্রামে আলো

ঘুরছে ব্যস্ত হয়ে—হ্যারিকেন। মানুষ জেগে উঠছে কাছে দূরে। শ্লোগান উঠছে ইন...ন....ন...। এই সব ছাপিয়ে গিয়ে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠলো। সবাই সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। আলো নেভে দুপ-দাপ। সারা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়।

'লতুন ভাই, ইদিক এইসো।' ঘন অন্ধকারে আমার হাত ধরে কে যেন টানতে থাকে। গলা শুনে মনে হল যশোদা। 'তুই ওদের সাথে চলে যা....' বলে, সন্দীপদা কয়েকজনকে ডাকলেন। ওরা অন্ধকারের ভেতর থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। সন্দীপদা ওদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম যশোদার কাছে। ওর আশপাশে কিছু মেয়ে বৌ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়ে ছিল। এ-বার সেটা ভেঙে গেল। আমি বললাম,

'ওরা কোথায় গেল, আমি ...যাবো।'

'তুমি পথ-ঘাট চিন নি....যাবা কুথা, ইদিক থাক দিকিন।'

'এখানে থেকে আমি কী করবো.... মেয়েদের মধ্যে....।'

'কেনু মেয়েরা কি মানুষ লয়....নরম জাত—মানুষ তো বটে।'

ওঁরা হাঁটতে থাকে। আমাকে মাঝখানে রেখে ওরা হাঁটতে থাকে।

বহুদূরের কোলাহল কাছে আসছে। পুব দিকের অন্ধকারে আলোর আভা দুলছিল। গনগনে লাল আগুন হাতে নিয়ে ওঁরা মিছিল করে আসছে। মশাল মিছিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেই পুকুরের পাড় দিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই।

'ইটা নগার বাড়ি গো লতুন ভাই।'

নতুন বাড়ি। বুক সমান উঁচু ইটে গাঁথা পাঁচিল। সারি সারি ঘর। সারি সারি সুপারী গাছ। মানুষজন কোথাও নেই। আমরা ক-জন পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়াই।

কোলাহল কাছে আসে। হাতে হাতে আগুন। মশাল জ্বলছিল প্রায় সবার হাতে। কারো হাতে তীর-ধনুক, বল্লম, বর্শা। যশোদা শ্লোগান তুলল ইন-কিলাব সমবেত জনতা উত্তর দিল—জিন্দাবাদ। উত্তর কাছ থেকে দূরে—বহু দূরে ছড়িয়ে যেতে লাগল। বহু দূর থেকে শ্লোগান উঠল—নকসালবাড়ি। উত্তর ভেসে আসতে লাগল লাল সেলাম....লাল সেলাম। যশোদা আবার শ্লোগান তুলল। কে একজন বলল, 'সব এইচে গো ...দশ বিশটো গ্রাম আইচে ...ভাঙ্গ শালু নগার ঘর ...ভেইঙ্গে...।'

নগেন দাসের বাড়ির চারদিকে জনতার ভিড় জমতে থাকে। অন্ধকারে নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।

যশোদা আমার হাত ধরে আছে। হাতে একটা চাপ দিয়ে ও আমাকে নীচু হতে বলল, আমি মাথা নীচু করে ওঁর মুখের কাছে কান নিয়ে আসি।

যশোদা ফিস ফিস করে বলে, 'ভাইস রে?'

'কী?'

'নগার ঘর।'

'ঘর ভেঙ্গে কী হবে?'

যশোদা মাথা নাড়ে। আমি বললাম, 'পারলে ওঁকে ধর।'

'ধইরবো কী গো, ও কি আছে ইখানে?'

'কোথায় ও....থাকে কোথায়?'

'থাকে ইখানে....বিশুদবার মাগ লিয়ে টাউনে গেল....দিন কয় ফিরবে নি ইদিক।'

'তবে ঠিক কর কী করবে—ঘর ভাঙা ঠিক হবে না।'

যশোদা মাথা নাড়ে। হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে যশোদা পাঁচিলের ওপর উঠে যায়। শরীর দুলতে থাকে।

'নগা দাস বাড়িত নাই—ফিরে চলগো সব—ফিরে চল।' বলে যশোদা পাঁচিল থেকে নেমে আসে। একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। মিছিল ফিরতে থাকে। যশোদা ফিরে আসে আমার কাছে। 'কাজটা ভাল হলনি।'

'কেন?'

'সেই রাখাল ছাওয়ালের গপ্প শইনেছো ...সেই রাঘের গপ্প।'

'হুঁ।'

'আর ডাইকলে আইসবেনি কেউ ... ঘণ্টা বাজিয়ে সার হইবে।'

আমি বললাম, 'তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সবাই এসে নগেন দাসের ঘর ঘেরাও করল কেন? পুলিশ আছে গ্রামে—তার কী হবে?'

যশোদা কোমরের কাপড় শকত করে জড়াতে জড়াতে বলল, 'পুলিশ কি আর থাকে গো....উরা ইদিক আর মারাবেনি। গামের মাইনষের সার পেইয়ে কোন ঝোপ ঝাড় দি পেলাই গ্যাছে দেখ।' আশপাশ থেকে মানুষ জন সরে যাচ্ছে দূরে। একটা হাট ভাঙা কোলাহল যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আকাশের তারা মিট মিট জ্বলে। চাঁদ ঢেকে কালো মেঘ সরে যায়। 'কতা ছিল শাঁখ ঘন্টা বাজলেই সব্বাই নগার বাড়ি ঘেইরে ধইরবে..শালু....' বলে যশোদা আমার দিকে তাকায়। 'তুমি বইললে ভাঙ্গলোনি ঘর....কাজটা ঠিক হলনি লতুন ভাই।'

আমি চুপ করে থাকি। কাজটা কী ঠিক হলো? আমি যশোদার মুখের দিকে তাকাই। কত আর বয়স হবে মেয়েটার? কী আর দেখেছে জীবনে। জীবনে যা পেয়েছে তার চেয় বঞ্চিত হয়েছে বেশী। বঞ্চিত হওয়াটাই কী দেখা?

আমরা হাঁটছি। কোলাহল সরে যাচ্ছে দূরে। আলোর মশাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। অন্ধকার কাঁপিয়ে মশালের আগুন লকলকিয়ে উঠে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে। আমরা সেই পুকুর পারে এসে পড়লাম।

দু-দিকে পুকুর মাঝখানে সরু রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে যতিনদার বাড়ি। যশোদা আমার হাত ধরল।

এর আগে এমন নিশ্চিন্তে কোন মেয়ে আমার হাত ধরেনি। অসহায় পরাজিত হাত।

'লতুন ভাই?'

'কী?'

'কাজটো ঠিক হলনি।'

আমি চুপ করে থাকি। ওর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিই। এই হাত বেশীক্ষণ ছুঁয়ে থাকা যায় না। আবার বৃষ্টি নামল। আচমকাই হৈ হৈ করা বৃষ্টি। আমরা দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে যতিনদার ঘরের দাওয়ায় উঠে আসি। যশোদা হাঁপ ছাড়ে। কোমড় থেকে কাপড় আলগা করতে করতে বলে, 'তুমি ইখানে থাকো লতুন ভাই, আমি ঘর যাই। ছেলাটো একা রইয়েছে—শুইয়ে, উইঠে আমি নাই দেইখলে কাইন্দবে।'

বললাম, 'যাও'। যশোদা ছুটে উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে গেল। ঝিরঝির বৃষ্টি। কতদূরে ওঁর ঘর কে জানে। ওকে থাকতে বললে হত। যাও বললাম আর অমনি চলে গেল। দাওয়ার ওপর একটা মোড়া ছিল, আকাশ চমকে উঠতেই আমি সেটা দেখতে পেলাম। মোড়াটা কাছে টেনে নিয়ে বসতে যাবো। যতিনদার গলা শুনলাম। আরো অস্পষ্ট অচেনা গলা। ওঁরা ফিরে আসছে। হুট করে দরজা খুলে গেল। লম্বা পা বাড়িয়ে প্রথমে ঢুকলেন যতিনদা। তারপর অন্ধকার আর বৃষ্টির জল জড়িয়ে মড়িয়ে কয়েকজন ঢুকল। সবশেষে সন্দীপদা। যতিনদা হাত তুলে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে কী সব বলছেন, বৃষ্টির শব্দ সব কিছু ঢেকে রাখছে। অন্ধকার কালোজল মানুষগুলোকে ভিজিয়ে চুপসে দিয়েছে। একটা উৎসুক উত্তেজনা নিয়ে সবাই উঠে আসছে দাওয়ার ওপর। খালি গা, পরনে খাটো কাপড়। জল গড়াচ্ছে দরদরিয়ে। সন্দীপদা আমাকে দেখেই বললেন, 'তুই এখানে?'

(চলবে)

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি বারংবার জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উ' পরিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পক্ষে বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
P.O. KATRISARAI (GAYA)

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন এবং গান গেয়েছেন। কিন্তু সারা জীবন ধরে কয়েকশ কবিতা লিখলেও বই ছাপা হয়েছে মাত্র একখানি, তাও অন্যের চেষ্টায়। লিখিত গানের সামান্য এক ভগ্নাংশই খুঁজে পাওয়া যায় অনুরাগীদের কাছে। তার মধ্যে নবজীবনের গান ছাড়া আর কিছুর স্বরলিপিও ছাপা হয় নি। এবং সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেও তাঁর গানের রেকর্ড মাত্র একখানি।

ফলে একালের অনেকের কাছেই তিনি অপরিচিত। যদিও অনেকেই তাঁর নাম শুনেছেন, খানিকটা লিজেন্ড-এর মতো। কিন্তু কেন তিনি এত বড় তা আন্দাজ করতে পারেন নি। অবিশ্যি খানিকটা কারণ হয়ত এইটেই যে মাঝখানে প্রায় বছর কুড়ি ছিলেন তিনি কলকাতার বাইরে। কিন্তু যখন তিনি কলকাতায় ছিলেন, তাঁর সেই সব থেকে সক্রিয় পর্বেও তিনি যে খুব ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে ছিলেন তা বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে দেশে-বিদেশে তিনি অনেক রকম জ্ঞানীগুণী বড় মানুষ দেখেছেন কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো বড় নন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তাহলে দ্বিজেন্দ্রনাথের সে রকম নাম-যশ হল না কেন? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, হল না তার কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার কোন গৃহিণীপনা ছিল না।

জানিনে গৃহিণীপনা বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে যদি হয় সাংসারিক বুদ্ধি তো স্বীকার করতেই হবে দ্বিজেন্দ্রনাথের তা ছিল না। অন্তত তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত নানা ধরনের কাহিনী ও কিংবদন্তী থেকে সেই রকমই মনে হয়।

আমাদের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও ছিলেন খানিকটা সেই ধাঁচের মানুষ। তাঁরও প্রতিভার কোন গৃহিণীপনা ছিল না। কিছুতেই তিনি গুছিয়ে-গাছিয়ে বুঝে-সুঝে চলতে পারতেন না। সেজন্যে তাঁর সম্বন্ধেও প্রচলিত রয়েছে অনেক রকম গল্প, যাতে বোঝা যায় যে মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর এত জোরাল ছিল যে নিজেকেও তিনি ভুলে যেতেন।

বলাই বাহুল্য তার জন্যে তাঁকে দাম দিতে হয়েছে। আজকের এই ঊর্ধ্বশ্বাস সংসারে, উন্নতি এবং আরো উন্নতির জন্যে মূষিক-প্রতিযোগিতাই যেখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের প্রতিভার বিষয়ে নিজেই ঢাক বাজিয়ে তাকে বাজারে হাজির করা ছাড়া উঁচু দাম পাবার আশা নেই। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তা পারেন নি কাজেই তাঁকে থাকতে হয়েছে কাজের জগতে বেশ খানিকটা অবহেলিত। কিন্তু মনের জগতে তাঁর স্থান হয়েছে অনেক বেশি উঁচুতে। তাই সেদিন তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শয়ে শয়ে অনুরাগী এসে তাঁরই গান তাঁরই সুরে গেয়ে শোকযাত্রায় অনুগামী হয়েছেন। এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির নানা দিকের সুখ্যাত ব্যক্তিরা এসে এই আত্ম-উদাসীন শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন।

॥ ২ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের জীবনের কোন ঘটনাই চমকে দেবার মত নয়, কিন্তু বৈচিত্র্য তাই বলে কিছু কম নয়। পড়ছিলেন বিজ্ঞান নিয়ে, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতকও হন, কিন্তু স্পেশাল বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হলেন তিনি এম-এ ক্লাশে। সঙ্গে কিছু দিন আইনও পড়ছিলেন। এর আগে বি, এস-সি পাশ করার পর ডাকতারী পড়ার জন্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতেও গিয়েছিলেন একবার। এবং এম-এ পাশ করার পর ঢুকলেন গিয়ে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মে শিক্ষানবীশ হিসেবে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বছর খানেক পরই সে পথও ছেড়ে দিলেন তিনি। তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে খুলে বসলেন ওষুধ তৈরির কারখানা। এবং তারও বছর দুয়েক পরে মেদিনীপুরে গিয়ে যৌথ খামার স্থাপন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি সংসারী হয়েছেন। কাজেই আজীবন স্বপ্নদর্শী এই মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত উকিল ডাকতার হিসাবপরীক্ষক ব্যবসায়ী এবং আদর্শ কৃষক হবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, যা ছিল তাঁর অবকাশের আনন্দ এবং সামাজিক যোগাযোগের সেতু তাকেই ব্যবহার করতে হল রুজিরোজগারের কাজে। প্রথমে গীতবিতানের সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে, এবং পরে দিল্লির সঙ্গীত নাটক একাডেমির সঙ্গীত পরিচালনার বৃত্তিতে।

দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়েছে। তিনি ছিলেন আমার নিকটআত্মীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বয়সে যথেষ্ট বড় হলেও তিনি ছিলেন আমার আকৈশোর বন্ধু। সেজন্য নানাভাবেই তাঁর খুব কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি। এবং যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানেন তাঁর মত বুদ্ধিদীপ্ত সরস মনের মানুষ লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। সত্যি বলতে কি, উইট এবং হিউমারের বোধ ছিল তাঁর মজ্জাগত। কিন্তু দিল্লিতে প্রায়ই অনুভব করেছি, তিনি যেন বেশ কিছুটা মজ্জাগত। কিন্তু দিল্লিতে প্রায়ই অনুমাছ ডাঙায় উঠে আসার মত। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মত মানুষ যে কী ভীষণ বেখাপ্পা তা মর্মে মর্মে বুঝেছি। তাঁকে দেখলেই মনে জাগত বোদলেয়ারের সেই এলবাট্রাস কবিতাটি। সেই সমুদ্রচারী এলবাট্রাসও হঠাৎ প্যারিসের রাস্তায় নেমে এসে এই রকম বেমানান হয়ে উঠেছিল—কেননা আকাশে উড়ত বলে সে তার পায়ের ব্যবহার জানত না, এবং আকাশে ওড়ার সেই বিশাল দুটি পাখাও পথের ধুলোর আছাড় খেয়ে খেয়ে তার এগোবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই এলবাট্রাস বলা বাহুল্য একালের যাঁরা সত্যিকারের বড় মাপের শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদেরই প্রতীক। এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রও ছিলেন সেই মর্মপীড়িত কাতর শিল্পীদেরই একজন।

॥ ৩ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বিষয়ে ইতিমধ্যে যেটুকু বলা হয়েছে তাতেই আশা করি বোঝা গেছে, তাঁর ঝোঁক ছিল জীবনের বহু দিকে। আমার যখন কৈশোর তাঁর তখন যৌবন। সে সময়ে দেখেছি খেলাধুলোয় তাঁর কি তীব্র আসক্তি। ফুটবল আর ক্রিকেট দুদিকেই ছিল তার সমান ঝোঁক। কিছুকাল তিনি কলকাতার এক ক্লাবের হয়ে বড় মাঠেও ফুটবল খেলেছেন। অন্যসময় করতেন তিনি জিমন্যাস্টিকের চর্চা। একবার, বোধ-

হয় বি-এস-সি পরীক্ষার আগে প্যারালেল বার থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতের কব্জি ভেঙে যায়। সে ভাঙার চিহ্ন সারাজীবনই থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, যখন যা পেতেন তাতেই তিনি মেতে উঠতেন। পাবনায় থাকার সময় বর্ষার ভরা পদ্মায় বাড়ির ছোটো বোটে দাঁড় টানা ছিল তাঁর আরেক নেশা।

অথচ এই স্বভাবের মানুষকেই দেখা যেত ঘন্টার পর ঘন্টা একা বসে গানের রেওয়াজ করতে এবং কবিতা লিখতে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত-রকম একসট্রোভার্ট এবং অবিশ্বাস্য ধরনের ইনট্রোভার্ট।

দিল্লিতেও দেখেছি, সেই ছড়ান-ছিটানো শহরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শুধু আলাপী লোকদের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করে বেড়াতে। আবার কখনো কখনো দিল্লির পুরনো কোন বাগানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। এইভাবে একা থাকার স্বভাব থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল পক্ষী পর্যবেক্ষণের দিকে ঝোঁক। অনেক রকম পাখিকে প্রায় পেশাদারের মতো চিনতেন তিনি, আর সে বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করেছিলেন। একবার মনে পড়ে, দিল্লির বিজ অঞ্চলে পাহাড়ী জঙ্গলে সারা দুপুর ও বিকেল ধরে আমাকে পাখি দেখিয়ে ফিরেছিলেন।

এসব কথা বলার কারণ হল এইটে জানান যে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না, জলমাটি গাছপালা পশুপাখি নিয়ে যে বৃহত্তর জগৎ তারই অঙ্গ হিসেবে এসেছে। সে জন্যে তাঁর গানের সুরে একই সঙ্গে এসে মিশেছে ভারতীয় রাগের ধ্রুপদী ধারা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষা লোকগীতির ঐশ্বর্য। সেই জন্যেই তাঁর মনের দরজাটিও ছিল সমস্ত রকমের চিন্তা, নতুন ভাবধারা এবং নতুন মানুষের জন্যে উন্মুক্ত।

॥ ৪ ॥

কবিতা এবং গানের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনার সময় এখন নয়। শুধু এই-টুকু বলা যায়, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সৃষ্টি নবজীবনের গান, যা শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্রের যুগ্ম আবৃত্তিতে সারা বাংলাদেশের হৃদয় মনকে আলোড়িত করেছে একদিন। সেদিনের ঈষৎ অবহেলিত আধুনিক কবিতার যুগে মধুবংশী গলির মত সুদীর্ঘ কবিতার এই জনপ্রিয়তা ছিল সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার। আর গানের দিকে তাঁর অবদান হল, দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লিখিত নবজীবনের গান। একটি অতি-প্রত্যক্ষ কঠিন বাস্তবকে এইভাবে থীম হিসেবে গ্রহণ করে যেভাবে তিনি পর্যায় ক্রমিক গানের ভেতর দিয়ে তাকে অপেরার চেহারা দিয়েছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তা তাঁর আগে, এমন কি পরেও, সার্থকভাবে করেছেন কিনা জানিনে। যাঁরা ভাল গান জানেন তাঁরা দেখেছেন মালকোষ, হিন্দোল ইত্যাদি খাঁটি ভারতীয় রাগকে তিনি বিস্ময়করভাবেই প্রয়োগ করেছেন। তেমনি আশ্চর্য তাঁর লোকসঙ্গীতের ভাটিয়ালি সারি-জারি ইত্যাদি সুরের ব্যবহার। দুঃখের বিষয়, এমন আশ্চর্য পালাগানেরও কোন গ্রামোফোন রেকর্ড নেই।

তবে হতাশ হবারও কারণ নেই। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যে ধরনের স্রষ্টা তাঁরা বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতেই বেশি করে বাঁচেন। একদিন নিশ্চয়ই দেশে এমন সময় আসবে যখন শিক্ষার বিকীরণ সমাজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে, জনরুচিও হবে আজকের চেয়ে অনেক বেশী রকম উন্নত, তখন সেদিনের নতুন মানুষেরা পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁদের জন্যে কী ঐশ্বর্য রেখে গেছেন।

ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র খানিকটা তৃষ্ণা, খানিকটা প্রেরণায় মেশান এক অপ্রতিরোধ্য সুর যা কানের কাছে সব সময়ই বলে যাবে—এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার। যার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায় রবীন্দ্র-নাথের শিশুতীর্থ কবিতার চিরন্তন প্রার্থনা—মাতা দ্বার খোল।

মণীন্দ্র রায়

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার কেওড়াতলা শ্মশানে কলকাতার কবি - শিল্পী - সাহিত্যিক —এক কথায় বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন। সদালাপী, বন্ধুবৎসল—প্রায় শত্রুহীন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র— মানে বটুকদা ছিলেন এক আনন্দপুরুষ। শবদেহ ঘিরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন জীবিত বটুকদা তাঁদের একসঙ্গে দেখতে পেলে হয়ত নতুন করে জীবনের গান লিখতেন। আক্ষেপের মত শোনালেও, এমন সমাবেশ সচরাচর ঘটে না। সান্ত্বনা এই যে, শ্মশানে তবু সবাই মিলেছিলেন।

বটুকদার গান হচ্ছিল সমবেত কণ্ঠে। তিনি শায়িত। ফুলের পাহাড়ে শুধু মুখটুকু ঢাকা পড়েনি। গানের কথাগুলি যেন মুখের উপর তুড়ি মারছিল। কারণ বটুকদা মরণের মুখে তুড়ি মেরে প্রাণের উপনিবেশে নব-জীবনের ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন। সে গান আজও গাওয়া হল। বার বার কানে বাজছিল 'মরে যেতে দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র করেন নি এমন কাজ নেই। বিজ্ঞানের স্নাতক হয়েও ইংরাজী সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। কৈশোরে ছবি আঁকতেন। পরে কবিতা, সুরযোজনা আর গান গাওয়া। ধ্রুপদী গানের সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা তিনি করেছেন। তাই তাঁর গানে প্রথাগত রাগরাগিনীর সঙ্গে তাল-লয়ের উপস্থিতি যেমন পাই, তেমনি গানের শব্দ চয়নে রবীন্দ্রনাথ থেকে সম-কালীন কবিদেরও খুঁজে পাই। জমিদার বংশের রক্ত গায়ে নিয়েও মার্জিত রুচি আর সংস্কৃতিবান বটুকদা বৈজ্ঞানিক সমাজ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। ছিলেন আজীবন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। জীবনে অনেক কিছুই ধরেছেন, ছেড়েছেন তিনি। ছাড়েন নি কম্যুনিস্ট পার্টি। তাঁর সৃষ্টিকে সংযত রাখতে তাঁর রাজ-নৈতিক বিশ্বাস কতটা সক্রিয় ছিল বলা কঠিন। বটুকদার সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য মধুবংশীর গলি ও নবজীবনের গান। অক্ষরবৃত্তে মিলে - অমিলে দীর্ঘ কবিতা মধুবংশীর গলি তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মন্বন্তরের পটভূমিতে নবজীবনের গান বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

জীবনে কখনও স্থির থাকেন নি। প্রচুর ঘুরেছেন। দেশেবিদেশে। দিল্লীতে রামলীলা (নাকি গীতায়ন) তাঁর সমাজসচেতনতার পরিচয় দেয়। এখানে কর্মী বটুকদাকে দেখতে পাই আমরা। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনাও এই পর্যায়ে পড়ে। মনে পড়ে রেকর্ডের সেই অপূর্ব রবীন্দ্রসঙ্গীত 'ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।' সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে মধুবংশীর গলি আর নব-জীবনের গানের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে। এখানেই তিনি স্বরূপে প্রকাশিত।

আন্তর্জাতিক গানের সঙ্গে বটুকদা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ঢুকে গেলেন। কানে বাজছিল—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড এসো মোরা মিলি একসাথ।' যাঁরা মিলেছিলেন তাঁরা পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে মধুবংশীর গলিতে চোখ বোলাতে গিয়ে দৃষ্টি আপসা হয়ে এলো—

'হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি
আর এক কথা।
এই তো সেদিন, ট্রেন থেকে
দিলো নামিয়ে,
হাতের তলায় সবত্নে চাপা
অচল পুরনো টিকিট
দিলো কে নামিয়ে অচেনা স্টেশনে
জীবনের ট্রেন থেকে।'

অমরা তোমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার নতুন স্টেশনের নাম কি?

সুবোধ বসু

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

ষোল বছর বয়সে আমরা জানতাম নকল চুল ভারি খারাপ। ছিলও মাথায় এক ঢাল চুল, এলো খোঁপা করাতে বাধা ছিল না। ঠোঁটে রং, ভুরুতে রং, চোখের পাতিতে রং, নখে রং—এসব অন্য জগতের ব্যাপার। তবে নাক-মুখ চকচক করলে বিশ্রী দেখায়, তাই একটু পাউডার মাখা চলত। তাও মুখে মাখার জন্য আলাদা রকম পাউডার কিনতে হয়, সেটা শিখতে সময় লেগেছিল।

প্রসাধনের কথা বাদ দিয়েও অন্য সমস্যা ছিল। সারাদিন এক গাদা কাপড়-চোপড় টেনে বেড়াতে হত। সে পোশাকের ডিজাইন হয়েছিল মহারানী ভিকটোরিয়া যখন প্রথম সিংহাসনে চড়েন নির্ঘাৎ সেই সময়ে। ১৯২৪ সালে আমরা তখনো তাঁর সময়কার ভেতরের কাপড়-চোপড় পরতাম। অন্তর্বাস কথাটার তখনো চল হয়নি, শুনলে নিশ্চয় একটু অসভ্য-অসভ্য মনে হত। আমরা কি পরে কলেজে যেতাম তাই বলি। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ইজের। তার ওপর গলার কণ্ঠা থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা একটা সাদা লংক্লথের সেমিজ। তার ওপর কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা লংক্লথের সায়া। ওপর দিকে সেমিজের ওপর ছোট হাতাওয়ালা আঁটো একটা বডির ওপর কনুই হাতা, কণ্ঠা অবধি উঁচু একটা ব্লাউজ আর সবার ওপরে ডান কাঁধে পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে পরা শাড়ি। তখন থেকেই সামনে কুঁচি দিয়ে মাদ্রাজি ফ্যাশানে কাপড় পরার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও ফ্যাশানটা ভারি অসভ্য, কাজেই দিদি আর আমি এম. এ. পাশ করে স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে শাড়ি পরেছি। পায়ে ছোট গোড়ালি সু। বাড়িতে বাঙালী ধরনের কাপড় আর পায়ে চটি, কিংবা খালি পা। সে যাই হক, আমি হলপ করে বলতে পারি আমরা ঐ সব পরে যখন অরক্ষিতভাবে ট্রামে চড়ে এম. এ. পড়তে যেতাম আর ছেলেদের সঙ্গে ক্লাশ করতাম, তখন আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় এতটুকু উঁচু নিচু টকরর আছে বলে মালুম দিত না। তবে স্বাভাবিক গুজনের চাইতে নিশ্চয় আমরা সের দুই ভারি হয়ে যেতাম। তাছাড়া আরেকটা অসুবিধা ছিল যা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো টের পাওয়া অসম্ভব ছিল। সেটি হল যে ঐ তলাকার সেমিজটা তার ওপরকার পেটি-কোটটা আর সবার ওপরকার শাড়িটার আড়াই পাঁচ পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমনি জড়িয়ে যেত যে হাঁটাই দায় হয়ে উঠত। আর গরু তাড়া করলে যে কি হত সে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

কলেজে পড়তে বেজায় ভালো লাগত। সে সময় ডায়োসেসান কলেজে ইংরিজি, ইকনমিকস, ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্য বিলেত থেকে ভালো ভালো খাঁটি মেম আনা হত। আর সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিস তো ছিলেনই। মনে হয় খুব ভালো পড়ানো হত। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন চারুলতা দাশ। এঁর কাছে আমরা স্কুলের ওপরের ক্লাসেও ইতিহাস পড়েছিলাম। পাতলা ছিপছিপে, অতি পরিপাটি করে কাপড়-চোপড় পরা, এক অভিজাত খ্রীশ্চান পরিবারের মেয়ে। ভারি কড়া, কিন্তু চোখ দেখে সন্দেহ হত সেই সঙ্গে বেজার রসবোধও ছিল। পরে যখন নিয়ম হয়ে গেল যে এম-এ পাস না করলে কেউ কলেজে পড়াতে পাবে না, তখন আধ-বুড়ো চারুদি কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সমানে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজে পড়ে তৈরি হয়ে, ১৯৩০ সালে আমি যেবার এম-এ দিলাম, সেবার উনিও ইতিহাসে এম-এ দিয়ে, পাস করে, পুরনো চাকরিতে ফিরে গেলেন। আরো আট-দশ বছর পরে উনি ডায়োসেসান স্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে অনেকদিন অতি দক্ষভাবে বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন।

পরে শুনতাম ওঁর নাকি বেজায় কড়া মেজাজ। শুধু ছাত্রীদের নয়, তাদের মা-বাবাদেরও নাকি বকে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আগাগোড়া অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। এক সময় আমাদের ক্লাস-টিচার ছিলেন। মনে আছে তখন আমার বাংলা শেখার চেষ্টা দেখে ভারি উৎসাহ দিতেন। মাস্টারণী জিনিসটি নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। যেন ভারি কৌতুককর কিন্তু মা-বাবারা কত সময়ে—বিশেষ করে বাবারা—মেয়েদের কাছে তাদের দিদিমণিদের নীরস চেহারা আর কড়া মেজাজ নিয়ে তামাসা করেন। এ একটা মজার ব্যাপার। পুরুষ অধ্যাপকরা স্বাভাবিক জীবন কাটান, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার থাকে। হয়তো মাঝে মাঝে মনে হয় না থাকলেই ছিল ভালো—তবু তাঁদের জীবন থেকে সব রস শুকিয়ে যায় না। তাছাড়া তাঁদের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাইরের একটা সরস জীবনও থাকে। মেয়েদের কিছুই থাকে না। আমাদের দেশে সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার কথা, তা সে সুখেরি হক কি দুঃখেরি হক। তবু বিধবারা আছে আর যে কোনো কারণেই হক বিয়ে হল না এমন অনেক মেয়ে আছে। মা-বাবা যতদিন বেঁচে থাকেন, তারা একটা বাড়ির আদর যত্ন পায়। তাঁরা গেলে, প্রায়ই দেখা যায় বোর্ডিং-এ, হস্টেলে, কিংবা কোথাও এক-খানা ঘর নিয়ে, তাঁদের জীবন কাটে। সে ঘরটি একটা নিরাপদ আশ্রয় হলেও, নিজের বাড়ি নয়। মনের কোমল বৃত্তিগুলো শুকিয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এসব মেয়েরা পরের ছোট ছেলেমেয়েদের দেখতে হয় গলে কাদা হয়ে যায়, নয় নির্মম উগ্র মূর্তি ধারণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়ে-পড়াবার যোগ্যতা হারায়। আরেক রকম আছে, তাদের অবস্থা ভালো, নিজেদেরো গুণ আছে, হয়তো বিদেশ ঘুরে এসে ভালো চাকরি করে কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন। কথায় কথায় তারা পারিবারিক জীবনের প্রতি ঘৃণা, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। কিশোর মন নিয়ে তারা করবেটা কি? যতই ওইমেন্স লিব' সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কথা শুনি, ততই আমার সেই সব বঞ্চিতা নিঃসঙ্গ দিদিমণিদের কথা মনে পড়ে। তাঁদের একজনকেও আমার সুখী বলে মনে হত না। শুধু বিদ্যা দিয়ে জীবন ভরে রাখতে পারে লাখে একজন। আর পারে যাদের অসাধারণ প্রতিভা থাকে। নইলে পারিবারিক জীবনের মতো আছে কি? এ তেতো, কিন্তু এত মধুর। চার দিক দিয়ে এমনভাবে হাত-পা বেঁধে রেখে দেয়—একবার একা গিয়ে জ্বালামুখী দেখে আসা এত শখ সত্ত্বেও, সারা জীবনে হয়ে উঠল না। পৃথিবীতে দর্শনীয় এত জায়গা ছেড়ে চারটি ঘরের মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসা।

আমাদের একটা মস্ত কাকাতুয়া ছিল, পায়ে শেকল পরে সে দাঁড়ে বসে থাকত। রোজ সন্ধ্যায় একবার সে একটানা পাঁচ মিনিট ধরে বিকট চ্যাঁচাত আর ডানা ঝাপটাত। মেয়েমানুষের জীবনেও তাই হয়, দিনান্তে একবার ডানা মেলে, যে জায়গা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সেইখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। আবার ঐ চারখানি ঘরের মধ্যেও যে এতখানি ধরে কে জানত! আমি বাড়ি না থাকলে অসুবিধা হয়, আমি এলে কেউ খুশী হয়। এমন সব মানুষ আছে আমার যাদের জন্য সারা দিন কাজ করেও, আমার কাজের শেষ থাকে না। ফেলে দেবার মতো পাঁচ মিনিটও সময় আমার নেই। এই

দুঃখ যে না পেল, সে কতটুকু সুখ পেল? তাই জীবনের প্রদোষে, আমার সেই সব দিদিমণিদের— যাঁদের এক কালে জ্বালিয়েছি কম নয়—তাঁদের কাছে আমার হৃদয়ের ভালোবাসা জানাই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, পারি লেখা-পড়া করব, কিন্তু অধ্যাপনা করে কখনো আমি জীবন কাটাব না। ভাবতাম একটা বড় লাইব্রেরিতে দিন কাটাতে কেমন লাগবে? নয়তো একটা ছাপাখানায় বা প্রকাশনালয়ে? নিদেন একটা বইয়ের দোকানে? যেখানে সারাদিন নতুন বইয়ের গন্ধ পব; যে বইতে কেউ হাত দেয়নি, সে বই প্রথম খুলব। কিন্তু সর্বদা তার পেছনে থাকবে একটা ছোট বাড়ি, একটা মানুষ আর দুটো একটা ছেলেমেয়ে, আমার ঘর, আমার মানুষ। সেই ষোল বছর বয়সেই জানতাম এদের না পেলে আমার সুখ কোথায়? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়াসের উদ্দেশ্যই হল একটি ছাদের তলায়, কটি [illegible]। তা না পেলে ছোটদের জন্য গল্প [illegible] কি করে? জীবনের আধখানা ফাঁকা [illegible], তাকে ভরব কি দিয়ে? নকল [illegible]নিসে তো কাজ হবে না।

বলা বাহুল্য এত গুছিয়ে কথাগুলো ভাবিনি, কিন্তু একবারো ইচ্ছা করেনি নিজেকে বেজায় রকম ভালো করে তৈরি করে, মস্ত একটা চাকরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিই। তা ইচ্ছে না হলেও স্বাধীন হবার প্রবল বাসনা ছিল। এই বইতে আমি শুধু আমার প্রকৃত মনের কথা লিখব। সেই কৈশোর থেকে কারো কোনো কর্তৃত্ব আমি ভালো মনে মেনে নিতে পারিনি। না শিক্ষকদের, না বাবার, না মার। নিজের অক্ষমতা মূর্খতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম বলে সেই অবাধ্যতা কখনো কাজে প্রকাশ করিনি। [illegible] তর্ক করে যতই গুরুজনদের অপ্রীতি-[illegible]জন হয়েছি, ততই মনে মনে সংকল্প [illegible] আমার এই ভালোবাসার মানুষ-গুলোর কাছেও আমার নিজেকে সমর্পণ করব না। তবে এও ভাবতাম যে ভালোবাসার মানুষগুলো সুখী না হলে, আমিও কখন সুখী হতে পারি না, তবে আবার স্বাধীন হব কি করে? অনেক পরে, অনেক সুখ অনেক দুঃখ পেরিয়ে বুঝেছিলাম স্বাধীনতাও বাইরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তার নিবাস আমারি মনের মাঝে। এত কথা বলার মানে হল আমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। অন্য লোকের কথামতো চলা আমার পক্ষে বড্ড কঠিন।

বাবা আমাদের মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে হকি ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যেতে [illegible]ইতেন, কিন্তু যখন শেকসপীয়র [illegible]টেনি থিয়েটার এসে প্র্যাট. স্কুলে [illegible]নয় দেখান, কলেজ থেকে মেম দলবল [illegible] টিকিট কেটে দেখতে গেলেন, বাবা আমাদের যেতে দিলেন না। মনে মনে বেজায় রাগ হয়েছিল। মার কাছে গিয়ে খুব খানিকটা গজ-গজ করেছিলাম। মাকে কখনো বাবার বিচারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু চোখে বেদনা দেখেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ের কারো গায়ে কখনো হাত তোলেননি, খালি আমার আর একটা দুরন্ত ভাইয়ের গালে এক-আধবার চড় বসিয়েছেন। মনে হয় ভগবান থাকলেও সে অবস্থায় চড় দিতেন। ভাগ্যিস তিনি নিরাকার, তাই বড় বাঁচা বেঁচেছি। বলেছি তো যাকে লক্ষ্মী মেয়ে বলে, আমি তা ছিলাম না। তবু কেন আমার মাসি, মেসো, পিসি, জ্যাঠা, কাকা, দাদা দিদি আর এতাব বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এত স্নেহ পেয়েছিলাম জানি না। আশা করি তাঁদের মনে আমার অবাধ্য স্বভাব শুধরোবার উচ্চাশা ছিল না।

জ্যাঠতুতো পিসতুতো ভাইবোনগুলোও তত দিনে অনেক বড় হয়ে গেছিল। সম-বয়সীদের সঙ্গে একটা কোমল স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তাই বলে তর্কাতর্কি কম হত না। আমার মাসিমা একবার মাকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা এদের কারো সঙ্গে বারো মত মেলে না কেন?' মা কাষ্ঠ হেসে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছ না কেন? সবাই যে আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি চালাক।' এ হেন মন্তব্য শুনে আমরা একটু-ক্ষণের মতো হাঁ হয়ে গেছিলাম। মাও কিছু কম চালাক ছিলেন না।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে মায়ের ভবলা নিউমোনিয়া হল। প্রাণ যায় যায়। ডাক্তার, ওষুধ, অক্সিজেন, রাত জাগা, টাকা-কড়ির শ্রাদ্ধ। একদিন সেই আমাদের ছোটবেলাকার পাতানো কাকারা দুজন আলাদাভাবে এসে দিদির আমার হাতে কয়েক শো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বাবাকে এখন কিছু বলিস না। সে আমাদের বড় অফিসার। কিন্তু তাই বলে একা একা পারবে কেন?' বলে জোরে জোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। বাবাকে যখন দিদি বলল, আশ্চর্যের বিষয়, বাবা এতটুকু রাগ করলেন না। বললেন, 'তুলে রাখ। দরকার হলে খরচ করা যাবে।' পরে মা সেরে উঠলে ঐ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, 'টাকা শোধ হলেও ও ঋণ শোধ হয়নি।'

মা সেরে উঠতে কল্যাণের ম্যাট্রিক আর দাদা দিদির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেল। এবং দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল। আড়াই মাস পরে ফল বেরোলে দেখা গেল তিনজনেই ভালো করে পাশ করেছে। দিদি মেয়েদের একটা স্কলারশিপও পেয়েছিল। এদিকে ডাক্তার বলেছিলেন রোগ সেরেও মার রোজ ৯৯ ডিগ্রী জ্বর হচ্ছে, কোনো শুকনো জায়গায় চেঞ্জে গেলে ভালো হয়। হাজারিবাগে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, মায়ের সঙ্গে দাদা, দিদি, কল্যাণ গেল, তাদের লম্বা ছুটি। আর ছোট বোন লতিকা আর ছোট ভাই যতি স্কুল থেকে ছুটি করে নিয়ে সঙ্গে গেল। আমরা বাকিরা কলকাতায় রইলাম, গরমের ছুটি হলে আমরাও যাব। আমি হলাম বাড়ির গিন্নি। আমার গিন্নিপনা অমি-সরোজের কিংবা ভাইপো অশোকের নানান মন্তব্যের বিষয় ছিল। কিন্তু বাবা ঐ সময় আমাদের কাউকে একবারো বকেননি। তার মধ্যে আবার সরোজের গায়ে হাম বেরোল। সবাই মিলে সেবা করলাম। হাম বেরোলে লোককে কি বিকটই না দেখায়। সরোজকে সেকথা বলায় সে অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় নিজের মুখ পরীক্ষা করে বলল, 'ঠিক বলেছ।'

মাসিমা নোটন আমাদের সঙ্গে যাবেন। মাঝে মাঝে শিবপুরে মাসিমার কাছে ছুটি ছাটা কাটাতাম। বেজায় ভালো বাবুর্চি ছিল মাসিমাদের; চপ কাটলেট যা বানাত!' আর মাসিমা বড্ড আদর যত্ন করতেন, কি করবেন কোথায় রাখবেন ভেবে পেতেন না। নিজের আত্মীয় বলতে তো ঐ দুই বোন। তার মধ্যে ছোট মাসিমা পাটনায় থাকতেন, আমাদের বাড়িতে দু-একবার যদি বা থেকে গেছেন, বড় মাসির বাড়িতে কখনো না। মাসিমা তাঁর বঞ্চিত শৈশবের যত দাবি সব আমাদের ওপর মেটাতে চাইতেন। এখন মুশকিল হল যে ওঁদের কারো বেশি খিদেটিদে পেত না। দুপুরে বারোটায় পেট ভরে ভাত খাবার পর, কারো যে চারটে বাজতে না-বাজতে আবার খিদে পেতে পারে একথা মাসিমা ভাবতেই পারতেন না: অথচ আমাদের বেজায় খিদে পেত। বাড়িতে বিকেলে পাঁউরুটি মোহনভোগ কিংবা পাতলা পরটা আলু কুমড়োর ছক্কা, নিদেন আলু পটল কুচি ভাজা দিয়ে মুড়ি খেয়ে আমাদের অভ্যাস। মাসির বাড়ি বিকেলে বড়রা এক পেয়ালা করে চা খেতেন, জল-খাবারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এমন সময় দেখা গেল বাগানে অযত্নে বেলগাছে পাকা বেল, পেয়ারা গাছে ছোট ছোট মিষ্টি পেয়ারা। জামরুল গাছ, কামরাঙা গাছও ছিল, কিন্তু সে সব হয়তো ঐ সময়ে ফলত না। জলখাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল, আর আমাদের পায় কে। বাস্তবিকই নোটনের মতো সুন্দরী আজ পর্যন্ত দেখিনি। সোনার মতো গায়ের রং। আঙুরের থোপার মতো কোঁকড়া চুল আর মুখখানি যেন প্রাচীন ডায়নার মূর্তি থেকে কেটে বসানো। আমি একটা পুরনো ফটোগ্রাফ দেখে ডায়নার মুখের নকল করেছিলাম, অবিকল নোটনের মুখ।

সত্যি বলছি মনের মধ্যে তখন আর এতটুকু হিংসে ছিল না। হিংসা হয় সমানে সমানে। যার সঙ্গে কোনো তুলনাই হতে পারে না, তাকে কি কখনো হিংসা করা যায়? নোটনের রূপের গর্ব করতাম আমরা। শুধু রূপ নয়, চমৎকার গাইত, পিয়ানো বাজাত, ছবি আঁকত। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি হত। তবে কাউকে বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা বোধহয় ওর একটু কম ছিল। কিন্তু বড্ড ভালো ব্যবহার করত, সেই যথেষ্ট। আমার কাছে রাতে চুল বাঁধতে আসত। আমি ইচ্ছে করে চুলে তেল ঘষে একটা সরু চিরুনী দিয়ে হেঁচড়ে কোঁকড়া চুল-গুলোকে মাথার পেছনে উঁচু করে এক টাইট বেনী বেঁধে দিয়ে, মুখখানি ঘুরিয়ে দেখতাম, তবু পদ্মফুলের মত রূপ করে পড়ছে। সমস্ত মনটা গলে জল হয়ে যেত।

(চলবে)

সেকালের রেস একালে

জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রীকে লুকিয়ে রেস খেলেন রেশ নিয়মিতই। বলা বাহুল্য স্ত্রীও বেশ নাছোড়বান্দা। মনে মনে সন্দেহ করলেও স্বামীকে মুখে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু হঠাৎ অসতর্ক হয়ে ভদ্রলোক একদিন ধরা পড়লেন। পকেট থেকে বেরুল ঘোড়দৌড়ের বই। ব্যাস্! স্ত্রীর উল্লাস তখন দেখবার মতো। হাতে নাতে ধরে ফেলেছেন স্বামীকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই উল্লাসের রেখা বদলে গিয়ে তাঁর চোয়াল হয়ে উঠল শক্ত ও পাথুরে।

তুমি রেস খেলো?

না তো।

পকেটে যে ছাইপাঁশ বই দেখছি একখানা।

তাহলে খেলি।—অবলীলাক্রমে উত্ত ভদ্রলোক যাঁর নাম ধরা যাক রামবাবু, জবাব দিলেন। ধরা যখন পড়ে গেছেন লুকিয়ে লাভ কি?

টিকিটের দাম কত?

গ্র্যান্ড এনক্লোজারে যাই তো। গেট মানি পনেরো টাকা। প-নে-রো টাকা। বলো কি?

রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের সেকেন্ড এনক্লোজারে যায় গরীবরা। প্রবেশ মূল্য চার টাকা।

গ্র্যান্ড এনক্লোজারে নিশ্চয় সুন্দরী মেয়েরাও যায়?

তা যায় বৈকি!

এতক্ষণে বুঝলাম তুমি কেন ওই গ্র্যান্ড এনক্লোজারে যাও। তা তো যাবেই। সুন্দরী মেয়েদের দেখা যায় কিনা!

ভদ্রমহিলা সপ্তাহান্তে ঘোড়ার পিছনে বেশ কিছু অর্থ অপচয়ের দুঃখ ইতিমধ্যে বেমালুম ভুলে গেছেন।

ঘোড়ারা মেয়েদের চেয়েও দেখতে সুন্দর। হাজার হাজার সুন্দরী চলাফেরা করে বেড়ালেও রেসের মাঠে কেউ মেয়েদের দিকে তাকায় না। রেসুড়ে বা পান্টারদের কাছে ঘোড়াই ধ্যানজ্ঞান। তিলোত্তমা; ক্লিওপেট্রা। ঘোড়ার বাইরে আমরা আর কোনো কিছু জানি না।

গত প্রায় দু যুগ যাবৎ সিঁথির বাসিন্দা, সওদাগরী আপিসের বড় কেরানী মধ্যবয়সী আমাদের এই রামবাবু। তাঁর দুই ছেলে স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র এবং বড় মেয়ে সদ্য কলেজে ঢুকেছে, মোটামুটি ভাবে শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছল পারিবারিক জীবন। বড় কিছু ধারদেনা নেই বাজারে। থাকলেও তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না, চটপট শোধ হয়ে যায়। পাড়ায় ও কর্মস্থলে মোটামুটি সুনামই আছে রামবাবুর। পাকা রেসুড়ে বলে কেউ কোনো বদনাম দেয় না তাঁকে। দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক জীবন পালন করেন। অথচ তাবই ফাঁকে রেস নিয়ে মাতাল হয়ে আছেন গত দু যুগেরও বেশী। এমনকি কলকাতার বাইরে ব্যাঙ্গালোর, পুণা ও বম্বেতেও রেস খেলেছেন কয়েকবার। টালীগঞ্জ জিমখানা কিংবা রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব—এই দুটো জায়গাতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। বহুজনের তিনি পরিচিত। ভালোবাসার পাত্র। এই রামবাবুই আমাকে বলেছেন তাঁর পারিবারিক জীবনের ওই গল্পটি। অফিসেই কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। ফাইলপত্র সরিয়ে চোখ বুজে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো তিনি আমাকে বললেন—বুঝলেন মশাই, ঘোড়া যখন দৌড়য় তার যে কী সাংঘাতিক সৌন্দর্য সে আপনি ও রেসের রসিক না হলে বুঝতে পারবেন না। এতো আর ছ্যাকড়া গাড়ি-টানা ঘোড়া নয়। ভালো খাবার, ভালো তদারকি—কি নেই তাদের। সহিস, ট্রেনার জকির ছড়াছড়ি। সবার ওপরে আছেন মালিক। ঘোড়া নিয়ে ঘুম নেই তাঁদের। যে ঘোড়াদের শিল্পীরা তুলিতে আঁকে এরা সেই। যেমন ফর্ম, তেমনিই গতি, সাহস আর শক্তি। আসুন না একদিন রেসের মাঠে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

রামবাবুর কথাতেই মনে পড়ল বর্তমানের অন্যতম প্রধান শিল্পী সুনীল দাস ঘোড়া এঁকেই বিখ্যাত হয়েছেন রাতারাতি। তারপর রকমারি ভাব, ছন্দ আর অভিনব আঙ্গিকের ছবি এঁকেছেন সুনীল। কিন্তু আজো তাঁর ঘোড়ার ড্রয়িংয়েরই সমাদর বেশী। খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে এখনো তাঁকে মাঝে মধ্যেই ঘোড়ার ছবি আঁকতে হয়। অনবদ্য সেইসব ড্রয়িং। নিখুঁত আর পরিপাটি। চোখ ফেরানো যায় না এমন সুন্দর। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে সুনীল একদিন নিজেকে বিখ্যাত দেখলেও ঘোড়ার পিছনে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। ঘুরেছেন আস্তাবলের পর আস্তাবল, রেস কোর্সের মাঠ। ঘোড়াদের দানা খাইয়েছেন দিনের পর দিন। সুস্বাদু, সবুজ ঘাস মুখে নিয়ে এই সব ঘোড়া শিল্পীর চমৎকার মডেলের কাজ করেছে। সুনীল ঘোড়ার খোঁজখবর নিয়েছেন সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বহু মানুষের কাছে। বুকি থেকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ মালি, মালিক, স্টুয়ার্ট, দালাল কার না স্বাবস্থ হয়েছেন তিনি। এই হলো ঘোড়া আর তার আকর্ষণ। রামবাবু বলেছিলেন—মেয়েদের পিছনেও তো শুনি পয়সা কম খরচ হয় না মশাই। আমার কাছে রেসিং-এ খরচ করাটাই আকর্ষণীয়।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে রাজবাবুর মতো বাঙালী রেসুড়ে এক আধজন নেই, আছেন অগণ্য অসংখ্য মানুষ যাঁরা হেরে সর্বস্বান্ত হয়েও আশা করেন জিতবেন, যত টাকা নষ্ট করেছেন সব উদ্ধার করবেন, এবং শুধু তাই নয়, ধনী হবেন, হবেন বিত্তবান।' আশা সত্যিই কুহকিনী! যে রেসে সর্বস্ব খুইয়ে পণ করে আর কখনো রেসের মাঠমুখো হবে না তাকেই আবার শুক্রবার সকাল থেকেই উসখুস করতে দেখা যায়, এবং শনিবার দুপুর হলেই সব প্রতিজ্ঞা জলাঞ্জলি দিয়ে যেখান থেকে হোক টাকা যোগাড় করে তিনি সোজা হাজির হন রেসের মাঠে এবং রেস্ত না ফুরনো পর্যন্ত বাজি ধরেন একের পর এক খেলায়।

যাঁরা বহুদিন ধরে খেলছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন দেখি—দাদা এতদিন তো খেলছেন—নীট রেজাল্টটা কি বলুন তো? খেলাশেষে শেয়ার ট্যাকসিতে ঘরমুখো ছ জন রেসুড়ে কিংবা গুটি-গুটি পায়ে হেঁটে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যারা বাড়ি ফেরে তাদের আমি প্রশ্ন করে মর্মান্তিক উত্তর পেয়েছি।' কেউবা আবার দার্শনিকসুলভ প্রজ্ঞার উত্তর দিয়েছেন—লাভ ক্ষতির হিসেব করে কি হবে! একটাই তো জীবন যেভাবে খুশি খরচ করা যাক!

এই আমাদের বাঙালী জাত আর তার অকারণ মরীচিকার পিছনে দৌড়নোর বাতিক! রেসের আকর্ষণে এদেশে কোনো জাতই পিছিয়ে নেই। কিন্তু ঘরে ভাত না থাকলেও বাঙালীর মতো আমোদ-পাগল হতে পারে কতজন? বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যিই আমি দেখেছি পায়ে পাম্প-শু, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরিহিত বিয়ে করতে যাওয়া হবু বর গুরগুর করছেন রেসের মাঠে, কিংবা সদ্য শ্রাদ্ধবাসর থেকে উঠে এসেছেন মুণ্ডিতমস্তক, ক্লিষ্ট পুরুষ, অথবা মাতা বা পিতার মৃত্যুজনিত অশৌচ পালনকারী কোনো সন্তান, ক্যাচে ভর দেওয়া মানুষ—এখানে এই রেসের মাঠে। তাঁরা আবার ভাবুকও হতে জানেন।' রেসের মাঠের সব কিছুকেই জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখেন। টেন্সারদের কথা জিজ্ঞেস করার এক বাঙালী রেসুড়ে আমাকে বলেছিলেন—ওঁরা তো স্কুলের মাস্টারমশাই। ঘোড়াগুলো ওঁদের ছাত্র। মাস্টারমশাই যেমন আগে থেকেই বুঝতে পারেন ক্লাসের কোন্ ছেলে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হবে, এঁরাও তেমনি আগে থেকেই বুঝতে পারেন কোন্ ঘোড়া কি প্লেস পাবে, কে জিতবে বাজি। ক্লাসের পরীক্ষায় যেমন এক-আধবার দেখা যায় সব অনুমান ব্যর্থ করে সেকেন্ড বা থার্ড বয় ফার্স্ট হয়ে গেল, রেসের মাঠেও কখনো কখনো তেমন ব্যাপার ঘটে। টেন্সাররা জানেন লাস্ট ঘোড়া কখনো ফার্স্ট হবে না।

জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়েই রেসের মাঠের অভিজ্ঞতাকে সহজ মনে গ্রহণ করে বাঙালী। একটা রেসে খুব ভালো একটা ঘোড়া, নাম ধরুন 'মিডনাইট কাউবয়' (মধ্যরাতের রাখাল)—তার ওপর বাজি ধরল সবাই। কিন্তু মিডনাইট কাউবয়কে ডিঙিয়ে অন্য একটা ঘোড়া হয়ত বাজি জিতে গেল খেলায়। এমন বাঙালী রেসুড়ে খুব কমই আছেন যাঁরা এই দেখে হা-হুতাশ করবেন বা দুঃখে ছিঁড়বেন মাথার চুল। এই অবস্থায় তাঁদের বলতে শুনেছি—চাকরিতে তো এমন ব্যাপার হামেশাই দেখা যায়। পিছনের একজন যোগ্য আরেকজনকে কি ডিঙিয়ে বড় চেয়ারে গাঁট হয়ে বসে যায় না? সুখে দুঃখে নির্বিকার ও অবিচল এক অসাধারণ মানুষ এই বাঙালী রেসুড়ে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন কে না দেখে। গরীব হয়ে বেঁচে থাকতে বিবক্তি কি কারো আসে না? দারিদ্র্য, দুঃখ, নানা শঠতা ও প্রবঞ্চনার হাতে মার খেয়ে যদি কেউ আর কোনো উপায় না দেখে অগত্যা টিকিট কেটে, সরকারকে ন্যায্য ট্যাক্স দিয়ে রেসের মাঠে গিয়ে বড়লোক হবার বাসনা প্রকাশ করে তাকে কি আমরা দোষ দিতে পারি? বরং জয়-পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করার যে প্রজ্ঞা ও উদার জীবনবোধ রেসুড়েদের মধ্যে দেখা যায় তা দু বেলা বহু কৃতী মানুষের সংস্পর্শে এসেও আমি কদাচ পেয়েছি। জীবনটাই যখন জুয়া তাদের, অর্থাৎ রেসুড়েদের বিশেষভাবে জুয়াড়ি হিসেবে চিহ্নিত করার যথার্থই কোনো সার্থকতা আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে! রেসে বারবার হেরেছেন এমন একজন রেসুড়েকে আমি জিজ্ঞেস করেছি—টাকা নষ্ট করে দুঃখ হয় না?

রেসুড়ে বড়লোক হলে বুকি গরীব হবে, আর বুকি বড়লোক হলে রেসুড়ে গরীব হবে। কেউ না কেউ তো টাকাটা পাচ্ছে। আমার টাকা যাচ্ছে তার হাতে, তার টাকা আসছে আমার হাতে—এই তো নিয়ম। এই তো খেলা।—সাফ জবাব দিয়েছিলেন ভদ্রলোক।' তাই যে ঘোড়া জিতলে হাজার হাজার মানুষ টাকা পাবে, সে হেরে যাবার ফলে হাজার হাজার মানুষের টাকা ভাসতে ভাসতে চলে গেল বুকি ও টার্ফ ক্লাবের কাছে—এই ট্র্যাজিক ঘটনায় আশাহত যে মানুষ নির্বিকার থাকে তার মন যে শক্ত ধাতুতে গড়া বোঝাই যায়। দৌড় দেখে মনে হয় যত ঘোড়া ছোটে সব জেতার জন্যে ছোটে না, একজনকে জয়ী করে সকলে মিলে হেরে যাবার জন্যেও অনেক ঘোড়ার প্রয়োজন হয়!—এই কথা কবি বাঙালী রেসুড়ে ছাড়া হাসতে হাসতে আর কে বলতে পারে?

বাঙালিয়ানার খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ই রেসের মাঠে গেলে চোখে পড়বে। কেউ কেউ বলেন আমরা বড় কানপাতলা, যাচাই না করে খুব সহজেই অন্যের কথা বিশ্বাস করি। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় রেসের মাঠে। কোন্ ঘোড়ার ওপর বাজি ধরা হবে তা নিয়ে নানা রকমের কথা কানাকানি করা হয়। এমন দৃশ্য রেসের মাঠে প্রায়ই দেখা যাবে যে চুপিচুপি একজন আরেকজনকে বলছেন-রাজলক্ষ্মীর ওপর বাজি ধরুন। সহিস আমাকে যা বললো না!' কি বলল—তা অন্যে শোনার জন্যে কান খাড়া করলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। হলই বা প্রকাশ্য মাঠে। গোপন শলাপরামর্শ সর্বদাই গোপন থাকবে! প্রয়োজন নেই তবু কেন এই ডিপ্লোম্যাসি? সব কথা মুখ ফুটে বলতে বাধা কি? এত গোপনতা কি শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে লাগে? দেখে মনে মনে বহুবার হাসি পেয়েছে আমার। আরো হাসি পায় যখন দেখি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করার কি মর্মান্তিক চেষ্টা করছেন একজন। সহিস নয় আমি টেন্সারের কাছ থেকে এইমাত্র খবর পেলাম ...। —তাঁর মুখের বাকি কথাটা শুনতে পাই না। ফিস্‌ফিস্ সেই কথা এত মৃদু ও নিচুস্বরে যে সন্দেহ হয় যাকে বলা হলো তিনিও আদৌ শুনতে পেলেন কিনা। ঘোড়ার ওনারের কাছ থেকেও কাউকে আবার খবর আনতে দেখা যায়। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে রেসুড়েদের মধ্যে কোনো ব্যোমকেশ, এরকুল পয়রো বা লর্ড পিটার ভাগ্যিস সেখানে উপস্থিত থাকেন না।

স্বার্থপরতাও মাঠে কম দেখা যায় না। কে কোন্ ঘোড়া খেলবে তার কার্ড কাউকে দেখায় না। অন্যে 'নজর' দেবে অর্থাৎ লোভী চোখে তাকাবে বা নিজে দাঁও মারবে এই ভেবে একে অন্যকে লুকিয়ে রেস খেলতে চায়। রেসের মাঠে টাকা ধার দেওয়া হয় না। যদি কেউ ধার চায় এক পকেট টাকা নিয়েও সবাই তাকে ফিরিয়ে দেবে, এক কানাকড়িও দেবে না। নানারকম কুসংস্কারও দেখা যায়। ঘোড়ার নাম ধরে অনেকে বাজি ধরেন না। নম্বর নিয়ে তিনি মেতে ওঠেন। গতবার তিন নম্বর জিতেছে এবার এজিতবে পাঁচ কিংবা সাত—এই ধরনের উটকো যুক্তিহীন বিশ্বাস রেসুড়েদের মনে হঠাৎ এসে ভর করে। সেই মতো তারা বেটিং করে ভাগ্যের হাতে ফিরে সাজে। এই সংস্কার সত্যিই বেশ ক্ষতি করে রেসুড়েদের। বাড়িতে কাগজপত্র দেখে ঠিক করে আসে অমুক ঘোড়ার বেটিং নম্বর—মাঠে এসে নানা টানাপোড়েনে সিদ্ধান্ত বদলে যায়—পরে অন্য ঘোড়া খেলে হেরে গিয়ে বলে—ঐস্ ওই ঘোড়াটাই ঠিক করেছিলাম! —মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার এই ধরনের কিছু কিছু রেসুড়ে প্রায়ই আমার চোখে পড়ে। হেরে গিয়েও কিন্তু এরা ঘোড়ার নম্বরের প্রেমে

পড়ে থাকে। এই বেসুড়েরাই বলে—নারীর চেয়েও বেশী সুন্দর ঘোড়া, আরো সুন্দর সংখ্যা।

নারীর কথা যখন উঠল বলি মেয়েরাও রেস খেলেন। এমনকি সোনাগাছির বারবনিতারাও নাকি রেস খেলতে আসেন। মনে পড়ল সিঁথির রামবাবু মাদ্রাজের মাঠে তাঁর এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন। লাস্ট রেস সেদিন। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সেদিন সব টাকা খুইয়েছেন। একেবারে অপরিচিত রামবাবুর কাছে হাতের বালা খুলে দিয়ে কোনো ভূমিকা না করে বললেন—দশটা টাকা দিন, এটা রাখুন, আমাকে খেলতেই হবে।

রেসের মাঠে টাকা ধার দিতে নেই। তাই সেদিন আমি টাকা দিই নি, বালাটাও ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে ছিল না—রামবাবু আমাকে বলেছিলেন। মেয়ে ঘোড়া রেসের খেলায় পুরুষ ঘোড়াদের হারিয়ে দেয় কখনো কখনো। বুদ্ধির খেলায় পারে কিনা জানি না। তুলনা করব না, কিন্তু আজ মনে হয় রামবাবু অবধারিত পরাজয়ের হাত থেকে নেশাগ্রস্ত অচেনা এক নারীকে রক্ষা করেছিলেন নিছক বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমবেদনাও সেই মুহূর্তে বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

রামবাবুর মতো বহু মাঠের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রেসুড়েদের কাছে শুনেছি গেম ভালো বাঙ্গালোর ও বোম্বাইয়ের মাঠে, কিন্তু মাঠ। রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব ও টালিগঞ্জ জিমখানার দুটি মাঠ মাঠ ভালো কলকাতায়। কলকাতার মাঠের সৌন্দর্যই আলাদা। দুটি ইডেন গার্ডেনের মতো সুন্দর। বারোমাস খেলা হয় না টার্ফ ক্লাবে। প্রধান খেলা নভেম্বরে শুরু হয়ে শেষ হয় মার্চে। আছে বিভিন্ন ঋতুর খেলা, ক্রিস্টমাস মিটিং ইত্যাদি। টার্ফ ক্লাবে যখন খেলা বন্ধ, আসর বসে টালিগঞ্জে। আগে কলকাতার সকালে রেস হতো, এখন হয় দুপুরে। সপ্তাহে একদিন। ঘোড়া আসে কলকাতার বাইরে থেকে। আগে আরবি ঘোড়ার চল ছিল। সাহেবরা আনলেন ইংলিশ ঘোড়া। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসত বলে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ঘোড়া দুর্বল হয়ে পড়ত। এরপর আসে অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া। এখন যেমন বাইরে থেকে রপ্তানি করতে হয় না বলে বহু বিষয়েই বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হয়েছে ঠিক তেমনিই দৌড়ে স্বদেশী ঘোড়াই ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘোড়ার মালিক কিছু অবস্থাপন্ন বাঙালী থাকলেও বেশীরভাগ মালিকই অবাঙালী। ঘোড়া কেনা ও তা পোষার খরচ প্রবচনের হাতি পোষার মতোই এলাহী ব্যাপার। ইচ্ছে থাকলেও সবাই টাকা খরচ করতে পারেন না। শোনা যায় যে জকি বা ট্রেনার একজনও বাঙালী নেই। স্টুয়ার্ট হিসেবে অবশ্য দু একজন মান্য গণ্য ধনী বাঙালীকে দেখা যায়। রেসের বিষয়ে যাবতীয় বাদ বিতণ্ডায় স্টুয়ার্টের বিচারই চূড়ান্ত। কলকাতার মাঠের দর্শক স্বভাবতই বেশীর ভাগই বাঙালী। কি করে তাঁরা রেসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেউ কেউ বলেন ভাগ্য ফেরাতে নিজে থেকেই অগ্রসর হয়েছেন, কেউ গেছেন বন্ধু বা অফিস কলিগের হাত ধরে। যেভাবে সিগারেটের নেশা একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে চলে যায় অনেকটা সেরকম। একজন জাত রেসুড়ে কেবল বলেছেন শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন যৌনচেতনা আসে ঠিক তেমনিই রেসের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে আমার মনে।

আনন্দ, উত্তেজনা ও আকর্ষণের দিক থেকে ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে অন্য কোনো খেলার তুলনা হয় না। এর পিছনে আছে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও অজস্র অর্থব্যয়। রেস পরিচালনা করা থেকে শুরু করে ক্যাটালগ ও হিস্ট্রী তৈরী পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে। কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই এখানে খাটে না বলে এর আকর্ষণ অতুলনীয়। এই বিষয়ে কলকাতার রেসের এক অসাধারণ প্রাণপুরুষ গলস্টোনের স্মৃতিচারণে একটা সুন্দর গল্প আছে। ব্যাণ্ডি গ্র-কে নাকি একবার বলা হয়েছিল রেস খেলতে। উনি বলেছিলেন একটা ঘোড়া তো দিতবেই, এতে আর বাহাদুরি কি আছে। গলস্টোন লিখেছেন—শ-র সামনে সেদিন আমার মতো যদি কেউ থাকত তাঁকে প্রশ্ন করত—বাট মিঃ, শ—হুইচ ওয়ান? এই গলস্টোন কলকাতায় পড়াশুনো করতে এসেছিলেন সুদূর ইস্পাহান থেকে। মা তাঁকে পথে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। মা-র সঙ্গে সেই তাঁর শেষ দেখা। কলকাতায় কেল্লার মাঠে মাঝে মধ্যেই টাট্টুতে চড়তেন গলস্টোন। তাঁর দক্ষতা দেখে একজন বলল—তুমি রেসের মাঠে যাও না কেন। পয়সা পাবে। গলস্টোন জকি হয়ে অনেক রেস জেতালেন। পরে হন ট্রেনার ও শেষে ঘোড়ার মালিক। গলস্টোন লিখেছেন এক বাঙালী রেসুড়ের কথা যাঁকে সেই সময়ের বুকিরা চিনতেন। তিনি ধারে খেলতেন। যাকে বলা হয় সাউট-এ-খেলা তাই। এই সাউট-এ খেলার হিসেবপত্র থাকে কাগজে-কলমে। তিনি প্রায় নব্বই হাজার টাকার মতো হারার পর বুকিরা আর তাঁকে ধার দিতে চায় না। বাড়ি বিক্রী করে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বুকিরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অচল থাকে। এই রেসুড়ের টাকা বুকিরা আদায় করে নিয়েছিলেন সম্পত্তি বিক্রী করে, কিন্তু ভদ্রলোক সেই যে রেসের মাঠ থেকে হারিয়ে গেলেন তাঁকে আর ফিরে আসতে দেখা যায় নি।

গলস্টনের কথায় আমরা এসে গেছি ইতিহাসের পাতায়। রেসের ব্যাপারে পুরাণ ইতিহাস কি বলে দেখা যাক। শতশত বর্ষক্ষণে আছে একটা মজারগল্প। মহামূল্য এক রত্ন নিয়ে দেবতাদের মধ্যে একবার প্রচন্ড কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরূপ সেই মণিখণ্ডের একচ্ছত্র অধিকার পেতে চায় সবাই। বহুদিন যাবৎ সেই দ্বন্দ্বের কোনো সুষ্ঠু মীমাংসা হয় নি। শেষে ঠিক করা হল এই রত্নটিকে বেট ফেলে ঘোড়দৌড় হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের ঘোড়ারা সব দৌড়বে। যার ঘোড়া জিতবে, রত্ন হবে তার। প্রাচীনতম সেই ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। বলা বাহুল্য রত্নটি পেলেন তিনিই।

কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনীটি বৈদিক যুগের পটভূমিকায় কোন নতুন কথা নয়। পন্ডিতরা মনে করেন ঘোড়দৌড় সেকালের এক জনপ্রিয় খেলা। একালের ঘোড়দৌড় সেকালের আজি ক্রীড়া। ঘোড়দৌড়ের মাঠকে বলা হতো আজি। রেসকোর্স ছিল গোল চক্রাকার। যে জায়গা থেকে দৌড় শুরু হতো চক্কর দিয়ে বাজির ঘোড়া সেখানেই ফিরে আসত। এই চিহ্নিত জায়গাকে বলত 'কার্ম্মাণ'। দৌড়ের আগে ঘোড়া আর জকি উভয়কেই নানাভাবে সাজানো হতো। দৌড় জেতার পর তো কথাই নেই। ঋগ্বেদে সবচেয়ে নাম করা ঘোড়ার নাম 'বিশপলা'। একবার দৌড়ে তার পা ভেঙে যায়। তখন তার লোহার পা করে দেওয়া হয়। তবে লোহার পা নিয়ে সে আর কখনও দৌড়য়নি।

না দৌড়াক, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের আদিকালের ইতিহাসে সে তার নাম রেখে গেছে নিশ্চয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি এ প্রমাণও রেখে গেছে যে এদেশের বুকে এ-খেলা এখনো কিছু বিদেশী নয়। ঘোড়ায় চেপে আর্যরা এসেছিলেন এদেশে। তাই ঘোড়ায় চেপে দৌড়ের খেলাই বোধহয় আদিমতম খেলা তাদের। আদিমতম হয়ত বা হতে পারে, তবে জনসমাজের প্রিয়তম বা সুপ্রচলিত ক্রীড়া বোধহয় ছিল না। তাই কি শত শতাব্দীর সেই ধাবমান অশ্বের হেষ্রাধ্বনি ইথারের বুকে তরঙ্গ তুলে একদা মহামৌনের সাঝে মিলিয়ে গিয়েছিল। দ্রুতগতি, শক্তিমান সেই ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ বিস্মৃতির মরুবেলায় নিঃশেষে এমনি করে হারিয়ে গেল? আজি ক্রীড়া কি অশ্বমেধের মধ্য দিয়ে মুঘল যুগে চৌগানে বা পোলো খেলায় আশ্রয় পেয়েছিল? নয়ত অশ্বে ধাব আসক্তির অন্ত ছিল না সেই সম্রাট আকবরের অশ্বশালায় অজস্র মাইনে করা তুরানী, ইরানী,

খোরসানী তাঁত্রি বাজী থাকতেও তাঁর জমানায়, কোন ঘোড়দৌড়ের খবর দেন নি কেন আইন-ই-আকবরীর সম্রাট-সম্বন্ধে গ্রন্থকার?, আকবরনামার পাতায় তার কোন উল্লেখ নেই কেন? এই খেলায় সামান্যতম সংবাদ নেই কেন সে-যুগের বিদেশী ভারত পথিকদের ঐতিহাসিক বিবরণে?,

সে কথার কোন সঠিক বাস্তব ভিত্তিক উত্তর না দেওয়া গেলেও বিশপলার বন্ধুরা এই প্রায় হাজার দুই বছরের ব্যবধান অকেশে অতিক্রম করে একেবারে হাজির হল অষ্টাদশ শতকের কলকাতায়। নতুন ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণের বিশাল প্রান্তরে। কলকাতার মসনদে তখন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতায় গভর্নর হাউস তখনও তৈরী হয়নি। কখনও হাতির হাওদায় চেপে, কখনও বা ঘোড়ার জিন দিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস সারা দেশ জুড়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন স্থাপন করার ঐকান্তিক বাসনায়। মাঝে বছর কয়েক হল তাঁর অপরূপা প্রেয়সী শ্রীমতী ইমহফকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছেন বেলভেডিয়ারে। তবে তখন তাঁর বিরুদ্ধে চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল যে নিখুঁতভাবে পাতা হয়েছে তিনি তা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন এদেশে তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, সুচিরেই তাঁকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। সাল ইংরেজি জন্মের ৭৭ একাত্তর। জানুয়ারির সতেরই। শনিতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল আশেপাশের

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কি ভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

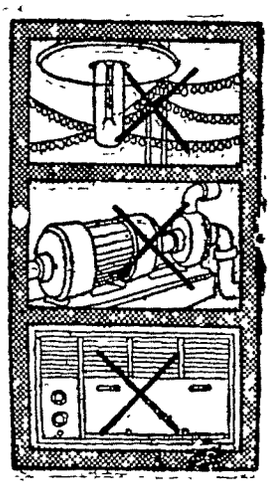

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মেনে চলবেন। সকাল ৯—৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

ISB 1364/77

গাছগাছালিতে পাতা করার খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু সেসব করা-পাতা অকেশে পায়ে মাড়িয়ে কেউ বা পালকি, কেউ বা ফিটনে চেপে প্রায় শ' দেড়েক ইংরেজ নয়া নবাবের দল সেই সবুজ ঘাসে ঢাকা সুবিস্তৃত রেস মাঠে এসে হাজির হয়েছেন। এসেছেন নানা বেশভূষায় সেজেগুজে মেমসাহেবরাও। বাহারী পোশাকের ঝিলিক আর বিদেশী আতরের গন্ধ। এরই মাঝে সুরু হল দৌড়ের তোজ-জোড়। ঘোড়া মাত্র দুটি। টাচেট সাহেবের 'গরগন' আর হেম্ফল সাহেবের 'ম্যাচ-দেম-পিটার'। দৌড়ের আগে যথারীতি ফেলা হয়েছে 'বেট'। শুরু হল দৌড়। সাহেব মেমদের হৈ হুল্লোড়। যে যার ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছে। হাওয়ায় রুমাল উড়ছে, উড়ছে টুপি। গলার স্বর উদারা, মুদারা থেকে তারায় উঠেছে : বাক্ আপ, বাক্ আপ-গরগন গরগন ..পিটার .. পিটার। আজ এমন একটি দৃশ্য অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। অবশেষে বাজি জিতল গরগন। ঘোড়দৌড়ের নাটকের উপর পড়ল যবনিকা। সাহেব মেমের দল বাঙালীবাবু ও দর্শকদের পিছনে ফেলে দল বেঁধে দৌড়ের মাঠ থেকে সোজা গিয়ে উঠল এই বেলভেডিয়ারে। লিভিয়াস সাহেবের বাগানবাড়িতে। সেখানে পান পর্ব। চা, কফি আর লেমনেডের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। পানের পর নৃত্য ও গীত। তা চলে বাগানবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বহু সময় ধরে।

কার্জন সাহেব অবশ্য বলেছেন কলকাতায় আরও একটা রেস-কোর্স ছিল—আক্রায়, গার্ডেন রীচের নিচে। এখানেও খেলা শুরু হয় সতের শ' আশি সাল নাগাদই। ঐ সালে কলকাতা রেস কোর্সে দু হাজার টাকার একটা প্লেটে দৌড় হয়েছিল—তার সাক্ষী সাংবাদিক হিকি সাহেব। কেরী আর কার্জন—দুজনেই এ কথা মেনে নিয়েছেন। সতের শ' চুরাশি সালে, অর্থাৎ হেস্টিংস বিলেত ফিরে যাবার আগের বছরও ওখানে একটা রেস হয়েছিল শীতকালে। সেখানে রেসের আনন্দের চেয়েও প্রধান হয়ে উঠেছিল ভোজন পর্ব। ছিল বসনালোভন খাদ্যসামগ্রীর অঢেল সমারোহ। সবাই তো আর বাজি জিতবে না। কাজেই তাদের মনের ক্ষোভ যাতে খাদ্যবস্তু দিয়ে অনেকটা পূরণ করা যায়, তার জন্যেই যেন কয়েক কোর্স ব্রেক-ফাস্টের আয়োজন ছিল রেসের পর। আর এই উপলক্ষে খাটান তাঁবুর মধ্যে ছিল দ্বিপ্রহর অবধি নাচগান হুল্লোড়ের বিস্তৃত আয়োজন। রেস খেলার জন্য তখন নিয়মিত পত্রসহযোগে আমন্ত্রণ জানানো হতো এবং কাগজে স্টুয়ার্ডদের পক্ষ থেকে থাকত তার বিজ্ঞাপন।

পরের বছর, অর্থাৎ সতের শ' পঁচাশি ওয়ারেন হেস্টিংস বিদায় নিয়েছেন কলকাতার রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে। ম্যাক-ফারসন, কর্নওয়ালিশ প্রথম বার এসে আবার চলে গেছেন। স্যার জন শোর তখন কলকাতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভদ্রলোক একেবারেই নিরামিষাশী। সাত মাস যাবৎ কলকাতায় এসে বসেছিল লর্ড কর্নওয়ালিশ কখন তাঁকে গদি ছেড়ে দেবেন এই অপেক্ষায়। থাকতেন কলকাতার সেই বিখ্যাত ভারতবিদ্যাপথিক স্যার উইলিয়ম জোন্সের গার্ডেন রীচের বাড়ির পাশেই। তারপর একদিন কর্নওয়ালিশ সোয়ালো জাহাজে চেপে মাদ্রাজের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে, মসনদে এসে বসলেন শোর। বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসের লোক। রাজস্বটা বুঝতেন ভালো। আর তাই বুঝি স্বভাব কৃপণ। রবিবারে কোন কাজ করতেন না। যদিও গীর্জায় যাবার বাতিক ছিল তাঁর। জোন্সের প্রতিবেশী ছিলেন বলেই নয়, নিজেও তিনি উর্দু, ফার্সী, আরবি ছাড়াও লাটিন ও গ্রীক জানতেন বেশ। মোটামুটি কাব্যচর্চা করতেন অবসর সময়ে। তবে জবাবটা কখনোই ভালো যেত না তাঁর, আর তাই বারবার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে ফেলে ছুটে চলে আসতেন রেসকোর্সে। এহেন গভর্নর জেনারেলের আমলেই ঘোড়দৌড় বেশ জমে উঠেছিল দেখা যায়। এ বছর দৌড় হয়েছিল নভেম্বরে। প্রতিযোগী ঘোড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল বলেই রেসের আগে হয়েছিল হিট।

রেসের জনপ্রিয়তা এভাবেই আস্তে আস্তে বাড়ছিল। দেখতে দেখতে কলকাতার উপকণ্ঠ বারাসতে রেসের আসর বসেছিল। এখানে হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য রিচার্ড বারওয়েলের এক বন্য বরাহ শিকারের আস্তানা ছিল। জন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যেসব সামরিক ক্যাডেটরা বাংলা দেশে আসত তাঁদের শিক্ষণের জন্য ছিল একটা বিদ্যায়তন। তবে রণবিদ্যা শিক্ষার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল রেসকোর্স—বারাসতের রেসকোর্স। রেসের ইতিবৃত্ত-কারগণ অবশ্য মনে করেন, সামরিক স্কুলটা উঠে যাবার পরেই ঘোড়দৌড়ও বন্ধ হয়ে যায়। উঠে যায় আক্রার ঘোড়দৌড়ের মাঠটাও। এখানে একটা 'কৃষিফার্ম' স্থাপন করা হয় আঠার শ' তিরিশ সাল নাগাদ। কিন্তু কলকাতা ময়দানের রেসকোর্স জমে উঠেছিল। দুঃসময় গেছে লর্ড মিন্টোর আমলে, তিনি এ খেলা অপছন্দ করতেন। কাজেই রেসুড়েরা একটু সরে যেত ব্যারাকপুরের মাঠে। খাঁ খাঁ করত কলকাতা ময়দান। দৃশ্যপট বদলে যায় আঠার শ' ষোল সালে। কলকাতা তথা বাঙালীর রেসের ইতিহাসে এই সালটা স্মরণীয়, এই বছরেই প্রথম ডার্বির খেলা হয়। দু বছর পরে, আঠার শ' আঠারোয় যে ডার্বি খেলা হয় তার বিজয়ী ঘোড়ার নাম 'ট্রাম্পেটার'। ময়দানে এ বছর হয় পাঁচটি রেস। এবং এই বছরেই প্রথম খেলা হয় অপরাহ্ণে।

কিন্তু কলকাতার বুকে আজকের যে রেসকোর্স তার পত্তন হয় আঠার শ' উনিশে। ফ্যানী পার্কসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় কলকাতা আর ব্যারাকপুর দুটো মাঠেই ছিল ঘোড়দৌড়ের বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। তবে অকল্যান্ড কাপ প্রথম খেলা হয় আঠার শ' সাঁইত্রিশে। লর্ড কার্জনও কলকাতার রেসের খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন তাঁর আমলে রেসের মাঠে ছিল দুটি আসন। একটা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড আর একটা পুরোনো, আদি আসন, প্রাচীন প্রেসিডেন্সী জেলের কাছে। শেষের গ্যালারি পরে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাঙ্গালীর রেসের ইতিহাসে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নাম বেশ মোটা হরফে লেখা হয়ে থাকবে। ইনি ছিলেন বাবু রূপলাল মল্লিকের ছোট ছেলে। এ-বংশে কেউই দীর্ঘজীবী নন। শ্যামাচরণ মারা যান মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে। বহু রেসের ঘোড়া ছিল তাঁর। রেসের ঘোড়া নিয়েই নিজে গিয়েছিলেন শোনপুর রেসে। নভেম্বর মাসে। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা ফিরে আসেন, কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। অচিরেই তিনি মারা যান। কলকাতা মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রকে সোনার মেডেল দিতেন তিনি। আবার কলকাতার রেসের মাঠেই শুধু নয়, ভারতের নানা জায়গাতেও তাঁর ঘোড়া দৌড়ত।

কলকাতার রেসের মাঠে বাঙালীদের হেমন্তা নিয়ে বাঙালীরা নাকি নিজেদের একটি রেসের আয়োজন করেন। বেঙ্গল ক্লাবের বদলে যেমন তৈরী হয়েছিল ক্যালকাটা ক্লাব। অনেকে বলেন পাস্তার বাজা সুখময়ের দুই ছেলের যে এক শ' বিঘা করে মাঠ ছিল ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের কাছে, রাস্তার দুই ধারে, সেখানেই নাকি বাঙালীদের রেসের আয়োজন হয়েছিল। তবে কেমন চলেছিল সেই রেস, কতদিনই বা চলেছিল, কারা ছিলেন নায়ক— তা আজ কিছু সঠিক বলার উপায় নেই। তবে এই রেসের আয়োজন শ্যামাচরণ মল্লিকের জীবদ্দশায় হয়ে থাকলে মল্লিকমশাইয়ের দাক্ষিণ্য বা সমর্থনের যে তাতে অভাব হয়নি, তা আন্দাজ করা যেতে পারে। তবে দেশীয় ব্যক্তিদের সমর্থনপুষ্ট এক রেসের খবর রয়েছে সেকালের হিন্দু প্যাট্রিয়টে। তারিখটা ইংরেজি আঠার শ' আটান্নর একুশে জানুয়ারি। সংবাদটা অনুযায়ী এই : 'এ প্লানি রেস ওয়াজ রান

ইয়েস্টারডে ফর এ কাপ গিভন্ বাই দি রাজা অফ কুচবিহার বাই ইয়ঙ্গার নেটিভস্।' কুচবিহারের মহারাজার দেওয়া এই কাপে প্রতিদ্বন্দ্বী টাট্টু ঘোড়ার রেসে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কালেজের এক জমিদারনন্দন সওয়ার হয়েছিলেন। এই ঘটনার গূঢ়ার্থের প্রতি সম্পাদক যে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা কি? সেটা কি ইঙ্গ-বঙ্গ রেষারেষির প্রতি? না নবজাগ্রত বাঙ্গালী বিদ্রোহী মানসিকতার প্রতি? সেকালের কাগজে তার কোন নিরিখ নেই।

না থাক, তবে রেসকোর্সে বাঙালীর বিপ্লবী সত্তা যে একটা অন্যুৎপাতে ফেটে পড়েছিল তার ইতিহাস আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। উনিশ শ' চৌত্রিশ সালের এ কাহিনী। তার দৃশ্য দেখতে হলে বাংলাদেশের এই অসহ্য গুমোট গরম পেরিয়ে বাতাসিয়া লুপের চক্রাকার খেলনা রেলপথ দিয়ে আমাদের দার্জিলিং চলে যেতে হবে। ইংরেজি আটই মে। বৈশাখের রুক্ষ সূর্যের রক্তচক্ষু এড়িয়ে হিমালয়ের হিমশীতল মনোরম কোলে সেদিন উৎসবের বাঁশী বেজেছে। ছোট লাট এসেছেন দার্জিলিং। চারদিকে সাজ সাজ রব। টার্ফ ক্লাব থেকে পাস 'ইস্যু' হয়েছে। সাহেবসুবোরা সব সেজেগুজে চলেছেন লেবাং রেসকোর্সে। চলেছেন কিছুরা অতি উচ্চকোটির কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী। শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে পুলিশ। বাংলাদেশে তখন বিপ্লবীদের বড়ই রবরবা। আর ছোট লাট স্যার জন এন্ডারসন তো রীতিমতো কুখ্যাত ব্যক্তি। পুলিশ পাহারার ওপর পাহারা বসিয়েছে। সামান্য ফাঁকও রাখেনি সাদা পোশাকের গোয়েন্দার দল। লেবাং রেসকোর্সে এসে বসেছেন লাট বাহাদুর। ঘোড়দৌড়ের জন্য উন্মুখ অভ্যাগতরা। হঠাৎ কে যেন বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে এসে গভর্নরকে তক করে তার বিভলভারটা দেগে দিলে। দুম্-দুম্ শব্দে কেঁপে উঠল খেলার মাঠ। তার প্রতিধ্বনি বিপুল শব্দ করে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল সারা দার্জিলিং। যেন হা-হা শব্দে সারা পুলিশী ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে জয়ী হল বাংলার বিপ্লবী সন্তান।

লেবাং রেসকোর্স বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে চিরকালের জন্যে ভাস্বর হয়ে থাকলেও, অন্য একটি কারণে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে ব্যারাকপুর। এই ব্যারাকপুর রেসকোর্সের জন্যই একদা রেললাইন পেতেছিল বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে। দেড় মাইলের কিছু বেশী ছিল এই লাইন। উনিশ শ' আটাশের সাতাশে জানুয়ারি লাইনের উদ্বোধন হয় বিনা অনুষ্ঠানে। ঘোড়দৌড় হয় পরের দিন, শনিবার। ব্যারাকপুরের এই মাঠটাকে বয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের নতুন রেসকোর্স বলে উল্লেখ করা হয়। ভিড় সামলাতে পুলিশ ব্যারাকপুরের বাস বন্ধ করে দেয়। খুবই ভিড় হয়েছিল মাঠে। উদ্বোধনী কাপ জেতে ওল্ড ডিকসন। মালিক ডবল্যু এম ক্যাডক্। জকি মিকিংস। তিনজন বাঙ্গালীর ঘোড়া দৌড়েছিল। স্যার আর এন মুখার্জীর ঘোড়া 'ইয়ার বিড' হয় তৃতীয়। জনৈক এইচ কে দে-র ঘোড়া চতুর্থ হয়েছিল। দে মশায়ের ঘোড়ার জকি ছিল রামপ্রসাদ নামে ক্ষিপ্র তরুণ বাঙ্গালী।

কিন্তু বাঙ্গালী ঘোড়দৌড় নিয়ে সাহিত্য করল কবে? আশ্চর্যের বিষয় যে রেসে বহু বাঙ্গালী পরিবার ফতুর হয়ে গেলেও তা নিবারণের জন্য কোন কবিই কলম ধরেন নি. কোনো সমাজ-সংস্কারক বা প্রচারক বিশেষ বাণী দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। কালীঘাটের পটুয়ারা ঘোড়দৌড়ের ছবি এঁকেছিলেন কিছু। কবি ঈশ্বর গুপ্ত চার লাইন ত্রিপদী লিখে রেসের ছবি কিছুটা দিয়েছেন। তাও খুব অযথেষ্টই। তবে এই দুঃখ থেকে বঙ্গজনকে উদ্ধার করেছেন কবি আনন্দ সেনগুপ্ত। তাঁর 'ঘোড়া কর ভগবান' সেকালের এক হিট কবিতা। 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় বড় দিন সংখ্যায় কবিতাটি বেরতেই কবি বিখ্যাত হয়েছিলেন। শুধু শুকনো খ্যাতি নয় কবির জীবনে 'জ্যাকপট' লাভ ঘটেছিল এই কবিতাটির কল্যাণে। সচিত্র ভারতের তৎকালীন মালিক শিল্পপতি নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে অতিরিক্ত দশ টাকা দিয়েছিলেন কবিতাটির সম্মানদক্ষিণা হিসেবে। সে যুগের হিসেবে খুব একটা কম টাকা নয়। বাঙ্গ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি ছিল এরকম :

'মানবজীবন খোঁড়া করে প্রভু' ঘোড়া কর ভগবান
বেতো ঘোড়া নয়—ছ্যাকরা টানিয়া আবার যাইবে প্রাণ।
রেস কোর্সের ঈপ্সিত ঘোড়া করে মোরে ছেড়ে দিও,
তোমা চেয়ে বেশী ভক্ত জুটিবে শনিবারে দেখে নিও।'

বাংলা সাহিত্যে রেসের মাঠের আর একটা ছবি আছে। সেও প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' একটি ছেলে একদা 'মাই মাদার' নামে ঘোড়ার বাজি ধরে প্রচুর টাকা পেয়েছিল তার অর্ধেক শেয়ারে। সেই টাকা দিয়ে সে তার মাকে বন্দনা করেছিল। শিবরামের সেই অনবদ্য কিশোর উপন্যাসের এই হৃদয়গ্রাহী ছবি অনেকের মনে থাকতে পারে।

হাসি-কান্না, দুঃখ-আনন্দের ছবির পর ছবি নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার রেসকোর্সের ইতিহাস। টাকার প্রলোভন এই ইতিহাসকে আজো পর্যন্ত নিদারুণভাবে সচল রাখলেও হৃদয় এখানে জমে গিয়ে নিরেট পাথরে পরিণত হয়নি। তাই রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যারা বাড়িমুখো হয় তাদের দিকে ভিক্ষার নিঃস্ব হাত প্রসারিত করে না ভিখারী। যারা কাউন্টার ঘুরে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে বাড়ি ফেরে ভিখারীরা জানে তাদের অন্তত আর কিছু না থাক ভিক্ষা দেবার পয়সা থাকে। সেই লোকগুলিও প্রসন্ন চিত্তে ভিখারিকে সন্তুষ্ট করে।

সন্তুষ্ট করে ঘোড়াবাও তাদের মালিকদের। দু বছর বয়স থেকে দৌড় শুরু করে একটি ঘোড়া চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মালিককে টাকা দেয়। 'ঘোড়া নেমকহারাম নয়, যত্ন করলে সে মালিককে টাকা দেবেই।'—রামবাবু আমাকে বলেছিলেন। তাঁর কথা আজো আমার কানে বাজে—'হর্স ইজ এ নোবেল অ্যানিমেল। হেরে যাওয়া হতাশ মানুষের জীবনে রঙীন আশার প্রতীক ছাড়া তাকে আর কিই বা বলতে পারি!'

নারায়ণ দত্ত
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাট্টার গাঁট্টা

যারা রেস খেলে তারা রেসুড়ে। যারা তাসের জুয়ায় সমর্পিতপ্রাণ তারা জুয়াড়ী। সত্য কথা যাঁদের ধর্ম তাঁরা সত্যবাদী। দুনিয়ায় যাঁরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁরা সাম্যবাদী। আর, সাট্টাই যাঁদের কর্ম তারা সাট্টাবাদী।

বিশ্ব চরাচরের মালিক যিনি সর্বশক্তিমান ভগবান তিনি মানুষের চর্মচক্ষুর আড়ালে থাকেন। অদৃশ্য সেই লোক থেকে তিনি আপন খেয়ালে কান্না-হাসির দোলায় দুলিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সন্তানদের। সন্তানরা কেউ কিন্তু সেই বিশ্বপিতার পিন কোড জানে না। ফলে তাঁকে চিনতে পারে না, জানতে পারে না। চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কবে আমার হাসির পালা আসবে?

জুয়ার সৌরজগতে সাট্টা নামক গ্রহটিও যার হাতের লোফা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা লাট্টুর মত বনবন করে পাক খাচ্ছে আর পাক খাওয়াচ্ছে হাজার হাজার নারী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, বেকার ব্যবসায়ী, ছাত্র শিক্ষক পণ্ডিত ও মূর্খকে তিনিও এক অদৃশ্যলোকের বাসিন্দা। ফলে তাঁকে চিঠি লিখে সাট্টার উৎপত্তি ও প্রসারের কোন প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার।

তবে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মানুষজনের মুখ থেকে যতটুকু কাহিনী শুনতে পাওয়া গেছে তাতে ধারণা হয় বছর আট-দশ আগে কলকাতা ও তার শিল্পাঞ্চলে সাট্টা অবতারের আবির্ভাব হয়। সেই সময় থেকে শত শত লোক পেনসিলারের পার্ট টাইম কাজে লেগে পড়ে।

পেনসিলারের কাজ হল সাট্টাবাদীদের স্বীকৃতিপত্র দেওয়া। স্বীকৃতিপত্র দেবার আগে জানা দরকার সাট্টাবাদীদের বীজমন্ত্রটি কি। সাট্টাবাদীদের বীজমন্ত্র হল সংখ্যা—এক থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন একটি সংখ্যা জপ করে মোক্ষ লাভের সাধনাই তাদের কাজ। বেছে নেওয়া নির্দিষ্ট বীজ সংখ্যাটি যিনি ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে যত বেশী বার জপ করতে পারেন সাট্টাতন্ত্র সাধনায় তাঁর মোক্ষলাভের সংখ্যা তত বেশী উজ্জ্বল হয়। এ কথায় আমরা আবার পরে আসব।

সাট্টা দেবতার দরজা খোলে রোজ দিনে দুবার। সাট্টাবাদীদের পরিভাষায় তার নাম ওপেন আর ক্লোজ। ধরা যাক সেই দিনে ওপেনের পয়া সংখ্যা দুই এবং ক্লোজের পয়া সংখ্যা পাঁচ। কোন সাট্টাবাদী সেইদিন কোন পেনসিলারের কাছে গিয়ে পঁচিশ পয়সা দিয়ে ওপেনে দুই ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা পয়া হিসাবে ধরল ফলে সেদিন তার ওই পঁচিশ পয়সা জলে গেল, কিছুই জুটল না। আর যে পয়া সংখ্যা হিসাবে দুই ধরেছিল সে পঁচিশ পয়সা দিয়ে পেল দু টাকা পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ লগ্নী করা পুঁজির নয় গুণ তার হাতে ফিরল।

আবার যে ওপেনে দুই এবং ক্লোজে পাঁচকে পয়া সংখ্যা হিসাবে ধরেছিল সে পঁচিশ পয়সা দিয়ে পেল কুড়ি টাকা পঁচিশ পয়সা। অর্থাৎ পুঁজির একাশী গুণ। যে পয়া সংখ্যা কি হবে তা ধরতে ভুল করল সে কিছুই পেল না।

পেনসিলার সাধারণতঃ পেনসিল দিয়ে পুরিয়া মোড়ার মত কাগজের টুকরোয় যে যেমন সংখ্যা ধরতে চায় তা লিখে দেয়। ধরা সংখ্যা মিলে গেলে ঐ স্বীকৃতিপত্র পেনসিলার বা বুকির কাছে নিয়ে গেলেই পাওনা টাকা হাসিল হয়। সাধারণতঃ সে টাকা মার যায় না। যে পেনসিলার বা বুকি যত তাড়াতাড়ি মক্কেলের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে বাজারে তার নামডাক, এক কথায় গুড-উইল তত বাড়ে। ফলে তার মক্কেলের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

কালো টাকার চোখধাঁধান শহর বোম্বাই গোড়ার দিকে ছিল সাট্টা বাজারের এক এবং অদ্বিতীয় কেন্দ্র। যত দূর জানা যায় এখন কলাবাগান এবং ভূতনাথ বাজার নামে আরও দুটি কেন্দ্র সাট্টা বাজারে কাজ করছে। কোনদিন কোন সংখ্যা পয়া হল তা ঐসব কেন্দ্রে ঠিক হয় এবং তা সাময়িক তৎপরতার সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমনকি বোধহয় ভারতের বাইরেও।

পয়া সংখ্যা নির্ধারিত হয় যে পদ্ধতিতে তার প্রধান উপকরণ হচ্ছে তাস বা পাত্তি। এই বিশেষ ধরনের তাসের এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে সাট্টার কারবার। মূল কেন্দ্রে এক রহস্যময় অদৃশ্য মানুষ একের পর এক তিনটি তাস তোলেন। ধরুন প্রথম তাসটি চার দ্বিতীয়টি তিন এবং তৃতীয়টি পাঁচ। এই তিনটি সংখ্যার যোগফল ১২। তাই সেদিন ওপেনের পয়া সংখ্যা হল দুই। ক্লোজের জন্যও অমনিভাবে একের পর এক তিনটি তাস তোলা হয় এবং তার যোগফলের শেষ সংখ্যাটি হয় ক্লোজের পয়া সংখ্যা।

সাট্টাবাদীদের পরিভাষায় তাস হল পাত্তি এবং সংখ্যা হল ফিগার। শুধু ওপেন ক্লোজ বা ডবল নয় সাট্টা অবতারের সাধনা করার আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কোন পদ্ধতিকে বলা হয় পাত্তি, কোনটিকে পাত্তি সে পাত্তি, আবার কোনটি পাত্তি সে ফিগার। খুব বেপরোয়া গোছের সাধক ছাড়া বাকিরা শুধু সকাল বা সন্ধ্যায় অর্থাৎ ওপেন ও ক্লোজে সাট্টার পুজো দিয়ে থাকেন।

আর যারা ওপেন, ক্লোজ, পাত্তি, পাত্তি সে পাত্তি ইত্যাদি সব মতেই সাধনা চালান তাদের মাথায় সাট্টার স্বাদ গাঁট্টার মতই ঝাল লাগে। সাট্টার সাধনায় যারা মাথার চুলের সঙ্গে বুদ্ধিটাও কিছু পাকিয়েছেন তারা একটা কৌশল আবিষ্কার করেছেন। এই কৌশলে সাট্টার গাঁট্টার স্বাদকে মিষ্টি করা যায়। তবে তার জন্য দরকার বকের ধৈর্য, শুয়োরের গোঁ ও শিয়ালের লোভ। আর চাই অঢেল পুঁজির পাকা বন্দোবস্ত।

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ কর আইনগুলি জেনে রাখুন

দান কর ধার্যের জন্য দানের সামূহিক হিসাব

১৯৭৬-৭৭ সাল হল তার আগের বছরের দান—কর নির্ধারণের খতিয়ান বর্ষ; দান—করের হিসাব করার সময়ে সংশ্লিষ্ট বছরের আগের চার বছরে দান-কর বিধি অনুযায়ী যদি করযোগ্য কিছু দান করা হয়ে থাকে তারও হিসাব সংশ্লিষ্ট বছরের সঙ্গে জুড়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে দান-কর ধার্য করা হবে। এই ব্যবস্থা ১৯৭৬-৭৭সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে।

তবে ১৯৭৩ সালের পয়লা জুনের আগে কোনও দান করা হয়ে থাকলে তা সামূহিক হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না।

করযোগ্য দান অর্থে বোঝাবে উক্ত যে কোনও বছরে দান করা হয়ে থাকলে তার সর্বমোট মূল্য, যার থেকে নিম্নোক্ত হিসাব বাদ যাবে, যথা :—

* যে সব দান—করের আওতায় পড়ে না এবং
* বার্ষিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত যে সব দানের ক্ষেত্রে করে রেহাই নির্ধারিত।

দান-কর কিভাবে নিরূপণ করা হবে ?

(১) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে কত দাঁড়ায় হিসাব করুন—

(ক) সংশ্লিষ্ট **খতিয়ান বর্ষের** পূর্ববর্তী বছরে করযোগ্য দানের পরিমাণ এবং

(খ) পূর্ববর্তী বছরের আগের চার বছরে (১-৬-৭৩-এর পরে) করযোগ্য দান করা হয়ে থাকলে, তার সর্বমোট পরিমাণের ওপর, **খতিয়ান বর্ষে** প্রযোজ্য হারে দান-করের পরিমাণ।

(২) পূর্ববর্তী চার বছরের করযোগ্য দানের মোট পরিমাণের ওপর, **খতিয়ান বর্ষে** প্রযোজ্য হারে, দান-করের পরিমাণ হিসাব করুন।

(৩) ১নং অংশের হিসাব মত দান-করের পরিমাণ থেকে ২নং অংশের হিসাব মত দান-কর বাদ দিন। অবশিষ্ট যা থাকবে তাই আপনাকে **খতিয়ান বর্ষে** দান-কর হিসেবে দিতে হবে।

দান-কর অগ্রিম জমা দিলে রেহাই পাওয়া যাবে।

করযোগ্য কোনও দান করার ১৫ দিনের মধ্যে আপনি যদি দান-কর-বিধিতে উল্লিখিত হারে দান-করের পরিমাণ হিসাব করে তার কোনও অংশ সরকারী খাতে অগ্রিম জমা দেন তাহলে আপনার দান-করের পরিমাণ নিরূপণের সময়ে,

* আপনি যে টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছেন তা প্রদত্ত বলে ধরা হবে এবং
* অগ্রিম করের এক-নবমাংশ অথবা মোট দান-করের এক-দশমাংশের (সামূহিক হিসেবের ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট হারে নিরূপিত) মধ্যে যেটা কম হবে সেটা রেহাই দেওয়া হবে।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(পাবলিকেশান্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশান্স)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী

—ডিএভিপি ৭৭।২৬৫

তখন ফালগুন

কয়েকদিন হল বিকালবেলাটা সোমেন কাটাতে শুরু করেছে এই বুড়োবটের তলায়। এখান থেকে সূর্যাস্তটা দেখতে ভাল লাগে, আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসাটাও দেখতে বেশ লাগে। জায়গাটা এখন নির্জন থাকে। হয়ত দূরের আখ ক্ষেতের আশে-পাশে দু-একটা লোক থাকে, বা বাচ্চাগুলো খেলা করে। আর একদিকে বাউরীদের কুঁড়েগুলো দেখা যায়, লোকজন দেখা যায়, তবে এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। এটা হল হিজলডাঙা গাঁয়ের পশ্চিম সীমানা। বুড়োবটের তলায় বসে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকলে সামনে প্রকাণ্ড ধানক্ষেত, এখন খালি, ধু ধু করে। সাঁই সাঁই করে এক এক দমকা হাওয়া আসে। বুড়োবটের ঝুরিগুলো দোলে, পাতায় পাতায় মরমর সিরসির শব্দ হয়। অনেক দূরে এবড়ো-খেবড়ো মাঠের মধ্যে দিয়ে ছাতা বগলে কে যেন যাচ্ছে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে। আস্তে আস্তে সূর্য ডোবে। হাওয়া কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বুড়োবটের সানবাঁধানো বেদীতে বসে পায়ের পাতা ঘাসে আস্তে আস্তে বোলায় সোমেন, অনুভব করে মাটি কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেই ঠাণ্ডা ঘাসের স্তর ভেদ করে উঠে যেন ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। পায়ের পাশ দিয়ে সড়াৎ করে কাঠবেড়ালী যায়। তারপর পাখীর ঝাঁক কিচমিচ করে ফিরতে শুরু করে। পশ্চিম দিক থেকে অন্ধকার এগিয়ে আসে, যেন হঠাৎ। তারপর চারদিক লেপেপুঁছে একাকার হয়ে যায়। দূরে দূরে শুধু এক একটা লণ্ঠনের আলো দুলে দুলে যায়। বাবলা আর শ্যাওড়া গাছের ডালে, কালকাসুন্দে আর ভাঁটবনের ধারে ধারে জোনাকিরা ঘুরে বেড়ায়।

এখন আর অন্ধকার হয়ে গেলেও ঘরে ফিরতে সোমেনের অসুবিধা হয় না। সাত আটদিনে রাস্তা চিনে গেছে। পুকুর পাড়, ধানের গোলা, রাস্তার উঁচুনীচু, মোড়গুলো এখন মুখস্থ। শুধু ঐ মাধব দাসের কুঁড়ের পরে যেখানে প্রকাণ্ড দুটো শ্যাওড়া গাছ, আলোকলতার ঝাড়, ফণিমনসা আর গুচ্ছের জংলী ঝোপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, ঐ জায়গাটা পার হতে ভয় ভয় করে। ওখানে একটা প্রকাণ্ড সাপ আছে, সোমেন ঐ ঝোপে সেটাকে ঢুকতে বেরতে দেখেছে। বোধহয় কেউটেই হবে। এখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। হাসবে, বলবে হাঁ বাবু, ওনারা সব আছেন ইদিকে উদিকে। আগেত সংখ্যায় আরও পুষ্ট ছিলেন, এখন কম সমেও মা মনসার কৃপায় তা দু'চারজন আছেন বই কি। বোধহয় শহরের লোক ভয় পাবে বলেই এর বেশী কেউ বলতে চায় না।

বলতে এরা চায় না আরও অনেক কিছুই, সোমেন বোঝে। আর যা বলতে চায় তার সবটা সে বোধহয় বুঝতে পারে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, কতটুকুই বা সে বুঝতে পারছে। অথচ এই বোঝার জন্যেই ত আসা। পনেরদিনের প্রোগ্রাম, কিন্তু পনের মাস থাকলেও বোধহয় খুব বেশী বোঝা হবে না তার দ্বারা। খুঁচিয়ে

মনোজিৎ মিত্র

থুঁচিয়ে কথা বলেও সে দেখছে, এবা সামান্য হাসি, চোখের চাউনি, অল্প কথা দিয়ে অনেক কিছু ঢেকে রাখে। কিংবা হয়ত সেটাই বলার ভঙ্গী, শহরের মানুষ ধরতে পারে না। কে জানে।

এখনও অন্ধকার হয় নি, কিন্তু আর একটু পরেই হবে। বাউরীপাড়ায় কে যেন চীৎকার করে গান ধরেছে। দূরে কাটাখালের দিক থেকে কয়েকটি বউ জল নিয়ে ফিরছে। গাছের ছেঁড়া পাতাগুলো হাওয়ায় সরসরিয়ে বেড়ায়। কিছুই হল না। সাতদিনে হয় নি, পনের দিনেও হবে না। অথচ যেদিন হিজলডাঙায় এল সোমেন, সেদিন মনে মনে কত ছক করে, অঙ্ক কষে তৈরী হয়ে এসেছিল। গ্রামটা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খবরটবর নিয়ে ভেবেছিল পপুলেশন প্যাটার্ন, সোসিও ইকনমিক গ্রুপস, ক্রপ প্যাটার্ন, ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি দিয়ে প্রথমেই একটা কাঠামো দাঁড় করিয়ে নেবে। তারপর শুরু করবে হ্যাবিটস ট্রাডিশন রিলিজিয়েশন ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজপত্র। একেবারে সম্পূর্ণ গ্রামটা উঠে আসবে তার পেপারে।

অবশ্য গোড়াতেই একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন ডিরেক্টার সাহেব, ডাঃ ভাদুড়ি। যেমন অফুরন্ত ভদ্রলোকের প্রাণশক্তি, তেমনি অফুরন্ত তার মাথায় নানারকমের নতুন নতুন ফন্দি। কিছুদিন হল খেয়াল হয়েছে যে শুধু শুখনো স্ট্যাটিসটিকস আর এ্যানালিসিস করলে চলবে না, কিছুটা সংবেদনশীল লেখাও চাই। এখনকার স্লোগান হল ইম্প্রেশনিজম। অর্থাৎ ধাও থাক মেশ ঘোর এবং শুধু যা হিসাবে এল তা না, যা তুমি অনুভব করলে তাও লিখতে হবে। সোমেনকে ঘরে ডেকে পাইপ টেবিলে ঠুকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চীৎকার করে বললেন, নেশন এ্যাপ্রোচ চাই। তুমি আমাদের নতুন জয়েন করেছ, তাই তোমাকে দিয়েই শুরু করছি। এতকাল আমরা যে সব পাবলিকেশন করেছি, সেগুলো শুধু ব্যুরোক্রাটদের জন্যে আর এ্যাকাডেমিসিয়ানদের জন্যে। খালি হিসাব আর অঙ্ক। কিন্তু আমি চাই লোকে জানুক যে ইনস্টিটিউট অফ সোসাল স্টাডিজ শুধু শুকনো শুকনো মনোগ্রাফ আর রিপোর্টই তৈরী করে না। আই এস এস এর স্কলারদের সব কিছুতে একটা ইনভলভমেন্ট থাকা দরকার। এবারে আমরা দশটি গ্রাম নিয়ে যে ডিটেলড কাজটা করব, তাতে শুধু ঐ চার্টগুলো আর কয়েক প্যারাগ্রাফ তত্ত্ব থাকলে চলবে না। সেখানকার মানুষ কি খায়, কি করে সময় কাটায়, কি ভাবে, কি বলে, সেখানে পরিবর্তনের ঢেউ লাগছে কি না, তাদের ইমোশন সেনটিমেন্ট অপটিমিজম সিনিসিজম সবটুকু ধরা চাই। তাল মাটির পেপার হয়ত কয়েকটা বড় চ্যাপ্টার আমরা এইসবের উপরেই রাখবো। ইট উইল বি এ পাবলিকেশন উইথ এ ডিফারেন্স্।

অবশ্য ডাঃ ভাদুড়ি শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। এই হিজলডাঙা গ্রাম তিনিই বেছে দিয়েছেন। নিজের চেনাশোনা লোকজন দিয়ে খোঁজখবর করিয়ে এই গাঁয়ে কোন বাড়ীতে আই এস এস এর লোক এসে থাকবে সে পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছেন। বলেছেন প্রথমে এসে পনেরদিন থাকতে, যদি দরকার হয়, তিন মাস পরে এসে আবার পনের দিন।

এখানে পৌঁছে মনে মনে ডাঃ ভাদুড়িকে বাহাদুরী দিয়েছিল সোমেন। সেই কোন ছেলেবেলায় দু'একবার দু'একদিনের জন্যে মুর্শিদাবাদের গাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়া ছাড়া গ্রামের সঙ্গে তার বলতে গেলে কোন সম্পর্কই হয় নি। বড় জোর ডায়মন্ডহারবার। না হলে বেড়ান মানেই দীঘা শান্তিনিকেতন দার্জিলিং পুরী কিংবা দিল্লী লখনউ। ছাব্বিশ বছরের জীবনে সে আর গ্রাম দেখল কবে? কিন্তু ডাঃ ভাদুড়ী সারাজীবন বড় বড় চাকরী করেও এইরকম একটি এঁদোপড়া ঝোপজঙ্গলে ভরা গাঁয়ের খোঁজ যোগাড় করতে পারেন, এটা সোমেনের কাছে প্রশংসার ব্যাপার মনে হয়।

এখন চাঁদ উঠেছে এক ফালি, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। আস্তে আস্তে পা চালিয়ে সোমেন ফেরে এবার। জায়গায় জায়গায় লণ্ঠনের ঝাপসা আলো কুঁড়েঘর থেকে এসে রাস্তায় পড়েছে। চাঁদের অল্প আলোয় রাস্তার ফটফটে সাদা ধুলোটুকু বোঝা যায়। শীত ত চলে গেছে, এখনও গরম পড়ে নি। রাত্রে বেশ আরাম লাগে, ভোরবেলায় এখনও একটু ঠান্ডার আমেজ, একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিলে আরাম। সোমেনের ঘরখানা বাগানের মধ্যে, তাই হাওয়া একটু বেশী, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে। লণ্ঠনের পলতেটা নামিয়ে দিয়ে টানটান হয়ে খাটে শুয়ে পড়ে সোমেন। খাবার ডাক আসতে এখনও দেরী আছে।

শুয়ে শুয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ীর অন্য মানুষগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখা যায়। ঠিক বারান্দার নীচে ঘাসের উপরে একখানা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে মশা তাড়াচ্ছে ষষ্ঠীপদ দাস, এ বাড়ীর মালিক, যার অতিথি হয়ে সোমেন আছে। সারাদিন ঘোরাঘুরি কাজকর্মের পর রোজ এই সময়টা ষষ্ঠীপদ ঘাসের উপরে আরাম করে। তার স্ত্রী, যাকে সোমেন মাসিমা, বলতে শুরু করেছে, সে এখন খুব ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। পাতের বাসনের আওয়াজ আসছে ভিতর থেকে। ছোট ছেলে নিবারণটা একগাদা কাগজ নিয়ে লণ্ঠনের কাছে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে। বোধহয় ঘুড়ি বানাচ্ছে। ষষ্ঠীপদর দিদি, বাটের উপর বয়স, অন্ধকার বারান্দার এক কোণে বসে বকবক করছে। বাড়ীতে এখন নাকি লোক কম। বড় ছেলে কি কাজে হুগলী গেছে, এক মেয়ে ত শ্বশুরবাড়ী ফিরে গেল সোমেন আসার পরদিনই।

লণ্ঠনের আলোয় ছায়ায় আর একজনকেও বাগানের ঘর থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তার চুলের ঢাল, আঁচলের ঝলক, নিঃশব্দ দ্রুত চলা সব মিলিয়ে দূর থেকে তাকে কেমন রহস্যময়ী মনে হয়। এই গাঁয়ের না-বোঝা অনেক কিছুর সঙ্গে সোমেনের কাছে আর এক সমস্যা এই মেয়ে। ষষ্ঠীপদর ছোট মেয়ে, নাম মালতী। রং কালো, হাসিটি ভালো। ভালো তার চোখের চাউনীও। আরও কি সব যে ভালো, সবটা সোমেন বোঝে না। ভালো, এটুকু বোঝে। ডাঃ ভাদুড়ীর মাথায় ত এই সমস্যাটা ছিল না। এ ত সোস্যাল স্টাডির বাইরের ব্যাপার। কিন্তু এসে গেছে। এ্যাসেসমেন্ট, এ্যানালিসিস, ইভ্যালুয়েশন, কনক্লুশন—ভাবতে ভাবতে হাসি পায় সোমেনের।

গায়ে এসেই দুম করে একটা শ্যামলী কাজলী মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবে, তেমন অবস্থা সোমেনের নয়। কিন্তু এ কদিন ধরে মনের মধ্যে একটা ভাল লাগার সুর গুনগুনিয়ে ফিরছে নাকি? সেটি খুব স্পষ্ট কিছু নয়, আবার মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না। অনেক দূর থেকে বাঁশীর আওয়াজ কানে আসার মত, অনেক দূরে নূপুর পরে কেউ নাচলে যেমন মনে হয়, তেমনি। মাঝে মাঝে সুর শোনা যায়, আবার ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু চলে যায় না। এসব নতুন। ঠিক এমনটি কখনও ঘটে নি।

প্রথম দিনটা মনে পড়ে সোমেনের। কলকাতা থেকে ট্রেনে সত্তর মাইল, তারপরে ছোট ট্রেনে কুড়ি মাইল, তারপরে হেঁটে আড়াই মাইল, তারপরে নদী পেরিয়ে এই হিজলডাঙা গ্রাম। পা দিয়ে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ঘাস কি ঘন সবুজ। খেজুর গাছ কলাবাগান নারকেল, তার মাঝে মাঝে ঘন ঝোপ, তাতে নানারকম ফুল ফুটে আছে। নদীর একধারে চড়া পড়েছে এক ফালি, সেখানে কাশবন হাওয়ায় দুলছে। এবড়ো খেবড়ো আঁকাবাঁকা ধুলোভরা রাস্তা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে গরুর গাড়ী চলেছে। এপাশে ওপাশে ছোটখাট পুকুর, কোনটা শ্যাওলায় ভরা, কোনটা অর্ধেক পরিষ্কার। তাতে তিড়িং-বিড়িং করে নানারকম পোকা ঘোরে। রাস্তাটা মাঝে মাঝে এক একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে গেছে। সেখানে আম-কাঁঠাল জামরুলের ঠান্ডা ছায়া। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় শুকনো পাতার রাশ উড়ে বেড়ায়। ভাঙা নারকেলের গুঁড়ির আশেপাশে ছেলেরা খেলে। হাওয়ায় পাকা নোনার গন্ধ আসে, শিমুলের আঁশ নেচে বেড়ায়। উলুঘাস আর ফণিমনসার ঝোপ পথের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

অনেক পুকুর আর লজ্জাবতী বউএর মত মাথা নীচু করা কুঁড়েঘর পেরিয়ে অবশেষে ষষ্ঠীচরণের বাড়ী পৌঁছোন গেল। ডাঃ ভাদুড়ীর নির্দেশ হচ্ছে, একজন টিপিক্যাল স্মল ফার্মার-এর বাড়ীতে থাকতে হবে। ষষ্ঠীচরণের খোঁজ তিনিই যোগাড় করে সঙ্গে লোক দিয়ে দিয়েছিলেন, সে লোকটি পাশের গাঁয়ে থাকে। পৌঁছে দিয়ে সে চলে গেল। সোমেনকে বলে দিয়েছিলেন, তোমার ব্যবহারে পাশাকে আশাকে তারা যেন বিব্রত না হয়, তোমাকে এ কদিন তাদের ঘরের লোক হয়ে থাকতে হবে। দরকার হলে বিড়ি টিড়ি খাবে, বুঝেছ?

সোমেনের জন্যে ওবা বাগানের ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে বেখেছিল। অনেকদিন ওটাতে কেউ থাকে নি। সোমেন কিন্তু জিনিসপত্র রেখে ময়লা পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরে সোজা এসে ষষ্ঠীচবণের বাবান্দায় ধপাস করে বসে হাঁক ছাড়ল, মাসিমা।

ষষ্ঠীর বউ এতক্ষণ ঘোমটা দিয়ে দূরে দূবে ছিল, মাসিমা ডাক শুনে আশ্বস্ত হযে এবাব এগিযে এল। হ্যাঁ বাবা, আপনার জন্যে চা বসিয়েছি।

মাসিমা ঠিক মনের কথাটি ধরেছেন, সোমেন হাসে। ষষ্ঠী কলকেটা ধবাতে ধবাতে একটু লজ্জাব হাসি হেসে বলে, চা কিন্তু আপনাদের মত হবে না। আমরা চা বিশেষ খাই না, তাই ভালবকম বানাতেও জানি না। ঐ আপনার জন্যে একরকম আব কি।

ষষ্ঠীব বউ এবারে সাহস কবে বলে, সঙ্গে চারটি মুড়ি দি বাবা, নারকেল কুচিয়ে দিযে?

হঠাৎ সোমেনের মনে হয়, ঘন হবাব একটা বাস্তা পাওয়া গেছে। প্রায় চীৎকার কবে বলে, আলবাৎ দেবেন। তার সঙ্গে যদি বাতাসা থাকে, তাহলে আরও জমবে। মুড়ি নারকেল বাতাসা একসঙ্গে মিশিয়ে খাওযাটা সোমেন তালতলায় এক বন্ধুর মেসে শিখেছিল।

কিন্তু এবাবে বাড়ীব লোকেদের আফশোষের পালা। বাড়ীতে বাতাসা নেই। ছোট্ট ছেলেটাকে তখনি পাঠান হল দোকানে, সেখানেও নেই। দোকান বলতে হিজলডাঙায় একটিই, আবিফ চাচাব দোকান। তাতে মালপত্তব থাকে খুব কমই। না হলে নদী পেবিয়ে আড়াই মাইল গিয়ে সেই পায়বা-ডুবিব হাট। সোমেন যতই বলে ঠিক আছে, বাতাসা লাগবে না, ষষ্ঠীব বউএব আফশোষ ততই বেড়ে যায়। মনে মনে মানতেই হল, গল্প কবিতায় পড়া ব্যাঙ্গাল বেংগল এখনও বেঁচে আছে। ছায়া সুনিবিড় শান্তিব নীড় গোছেব চেহাবাটাও আছে, মানুষেব আতিথেযতাও আছে।

সোমেন লক্ষ্য করেছিল, রান্নাঘবেব দবজা থেকে দুটি কৌতূহলী চোখ তাব মাপজোক নিচ্ছে। সেদিকে তাকাতেই আড়ালে সবে যায়। মজাই লেগেছিল। সে শুধু দেখতেই আসে নি, সে নিজেও দেখার জিনিস, এই ভেবে।

চোখেব মালিক আস্তে আস্তে কাছে এসেছে ক'দিনে। প্রথমে মা-এব আড়ালে, খেতে দেবাব সময়। তারপব হঠাৎ বাড়ীব বাইবে, রাস্তায়, পুকুরে মুখোমুখি হযে গেছে দুজনে। মালতী প্রথম দু'একবাব আঁচল দাঁতে চেপে দ্রুত পাযে সবে গেছে। তারপর চোখ অন্যদিকে বেখে জবাব দিযেছে প্রশ্নেব। তাবপব চোখ ফিবিযেছে। তিনদিন চাবদিনে খানিকটা সহজ হযেছে। কিন্তু সব সময়ই ঐ অল্প একটুব জন্যে। আজ খুব খাওয়ালে, বলতে খিলখিল করে হেসেছে। ওমা, এই ছাইএব খাওয়া আপনাদের চলে নাকি? আপনাবা শহরের মানুষ, কত মাংসটাংস খাওযা অভ্যাস।

সেদিন বিকালে চা দিয়ে মালতী বলে, মা আজও বাতাসাব খোঁজ করেছিল আপনার জন্যে। ন্যাড়াব বাবাকেও বলে বেখেছিল পাযবাড়ুবি থেকে আনতে। এখানেও নেই, সেও ভুলে গেছে।

ন্যাড়া কে?

ঐ যে হবেন কাকাব ছোট ছেলেটা। দিনবাত্তির বাস্তায় খেলে বেড়ায় দেখেন নি? ওমা, উনুনে কাঠ দিতে হবে, আমি যাই।

একটু একটু কবে বাঁধ ভেঙেছে, ওদিকে সোমেনও একটু একটু কবে ঢুকেছে হিজলডাঙাব ভিতবে। ষষ্ঠীচরণ ওকে নিয়ে ঘোবে। মাঠে নিয়ে যায়, চাষবাসেব কায়দা-কবণ বোঝায়। খবায কি হয়, বর্ষায কেমন করে কাটাখাল উপছে এসে খেত ডোবে, বোঝায়। নিয়ে যায় সুবোধ বাউবীর বাড়ীতে। বাউবীদের বাস্তু ছাড়া জমিজমা নেই। তারা ক্ষেতে জনমজুর খাটে। এই ফালগুন মাস পড়ল, আব হিজলডাঙাব মাঠে কাজ নেই। এবার পাঁচজন দশজন কবে তারা বেবিয়ে পডবে কাজের খোঁজে, বিনাটিকিটে ছোট বেলের ছাদে চেপে কেউ যাবে বর্ধমান, কেউ যাবে বীবভূম। বদমাইশ ঠিকাদাবেব পাল্লায় পড়লে আবও মুশকিল, খাটবে কিন্তু পযসা পাবে না। তাদেব বউবাচ্চাবা এক মাস এখানে ওখানে ফাইফরমাস খাটবে, কেউ বাঁশেব ঝুড়ি বানিযে বেচতে যাবে পাযবাড়ুবি। আব ধাবকর্জ করবে। সুবোধ বাউরী বলে আর হাসে। তার সঙ্গীসাথীবাও হাসে।

নারাণ দাসেব বাড়ী নিয়ে যাওয়াব আগে ষষ্ঠী সাবধান করেছিল, এ লোকটা দালাল শ্রেণীব লোক। দালাল মানে? নাবাণেব নিজেব পনেব ষোল বিঘা জমি আছে, সে সব হয়েছে দেবেন্দ্র গোস্বামীব কল্যাণে। দেবেন্দ্র গোস্বামী এ গাঁয়েব বড়লোক। নাবাণ ঐ দেবেন্দ্রকে নানা ভালমন্দ উপায়ে তুষ্ট বাখে। গোস্বামীদের আগের মত জমিদাবী নেই, কিন্তু স্বনামে এখনও শ'দুই বিঘা তাঁদেবই দখলে। নাবাণ খানিকটা নায়েবেব কাজ কবে। গাঁযেব অনেক গবীবের জমি যে চুপিসাড়ে গোস্বামীদেব খপ্পবে গেছে গত পনের বছবে, তাতে নাবাণেব হাত অনেকখানি। দেবেন্দ্র গোস্বামী সোমেনের সঙ্গে আলাপ হযে অবাক হযে গেলেন। আপনি এই গাঁয়ে সাবভে কবতে এসেছেন? আবে মশাই, এই গাঁযে কেউ আসে? যখন বযস কম ছিল, আমি আব দাদা অনেক চেষ্টা কবেছি এই হিজলডাঙাব উন্নতিব জন্যে। এম এল এ ধবেছি, দববাব কবেছি। জানেন আজ পনেব বছব ধবে একটা বাস্তা বানাতে পাবলাম না? পি ডব্লু ডিব স্কীম স্যাংশান হয়, আর আটকে আটকে যায়। সবকার বলছেন চাষ বাড়াও। চাষ বাড়িয়ে হবেটা কি? একটা রাস্তা না থাকলে আপনার ধান যাবে কোথায়? ঐ পাশের গাঁয়ে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা বস্তা বিক্রী করলে পডতা ওঠে না। এসব বোঝে কে? মাথাই বা ঘামাচ্ছে কে?

গভীব বাতে যখন চট্‌কা লেগে ঘুম ভেঙে যায়, সোমেন এসব ভাবে। আব মাথা গোলমাল হযে যায়। তখন দূবে গাবগাছ থেকে একটা ডাহুক পাখী ভয় পেয়ে চেঁচিযে ওঠে। দুটো কুটুবে প্যাঁচা খ্যাচ ম্যাচ্ করে ঝগড়া করে। অন্ধকার যেন বুকের উপব চেপে বসেছে। চালের বাতায় পোকা আওয়াজ কবে কট কট কটাস। দূরে কে হেঁটে যাচ্ছে, নিঝুম রাত্তিরে অনেক-ক্ষণ ধরে তার পায়েব আওয়াজ কানে আসে ধুপ ধুপ ধুপ। এখন নিশ্চযই সেই কেউটে সাপটা বেবিয়ে পডেছে ঝোপ থেকে, সোমেন ভাবে। ব্যাঙ্গাল বেংগল।

সোমেন ভাবে, আজ বিকালে সে যখন বুড়োবটতলায় বসেছিল, তখন মালতী হঠাৎ একা ওখানে গিযে পডল কি করে? ও কি একা অত দূবে যায়? হাতে দুটো আখ ছিল। সোমেন ডাকতে যেন অবাক হয়ে এগিয়ে এল। তুমি এখানে, সোমেন জিজ্ঞাসা কবে?

ঐ নবকাকাব বাড়ী গেছলাম।
আখ কাব জন্যে?
ঐ এমনি ... ...
আমায় একটা খাওযাবে?

ওমা, আপনি আখ খাবেন? সঙ্গে সঙ্গে বাড়িযে দিযেছিল মালতী। মুখে খুশির রংটুকু সোমেনেব চোখ এড়ায় নি।

তখন ধাবে পাশে কেউ নেই। হু হু করে হাওয়া আসে। মালতী আঁচল সামলায়, অবাধ্য চুল ওডে। সোমেন দাঁত দিযে অনেকক্ষণ চেষ্টা কবেও আখের খোসা ছাড়াতে না পেরে বিপন্ন মুখে তাকায়। এটা আমি ঠিক..

হাসি চেপে মালতী বোঝায়, নিন, এইভাবে ধরুন, দাঁত দিয়ে চাপুন, টান দিন।

তারপব খুব খুশী হযে আখ চিবোয় সোমেন। মালতী দাঁড়িযে থাকে। তাব চোখ সোমেনেব দিকে নয়, অন্যদিকেও নয়। ধাবে পাশে কেউ নেই।

তোমাদেব এখানে আমাব খুব ভাল লাগছে, মালতী।

আমি জানি, আপনাব খুব কষ্ট হচ্ছে।

মোটেই না। তোমবা সবাই খুব ভাল। তোমার মাকে, বাবাকে আমাব খুব ভাল লাগে। তাবপব হঠাৎ মাথায় দুষ্টুমি খেলে সোমেনেব। একটু থেমে বলে, তোমাকেও।

প্রথমে লাল হযে তাবপব যেন একটু কালো হয়ে যায় মালতীর মুখ। যেন ঝটকা দিযে পিছন ফিবে দাঁড়ায়, আমি যাই।

আমিও যাব।

আমি একটু ওদিক হযে যাব। বলে দু পা এগিযে গিযে থমকে দাঁড়ায় মালতী। আজ রাতে জলসা শুনতে যাবেন না?

কোথায় জলসা ?

ঐ গোস্বামীদের মন্ডপে। বাউলগান হবে, আর কি যেন থিয়েটার হবে। আমি যাই।

রাত্রে গোস্বামীদের মন্ডপে গেল সোমেন। গানগুলো ভালই লাগল। দাড়ি-ওয়ালা এক বাউল নেচে নেচে গাইল।

শ্যামসোহাগীর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়,
ও যে ঘর মানে না; বর মানে না
কেবল খোঁজে, শ্যাম কোথায় ...

কিন্তু তারপরে কি একটা অদ্ভুত জিনিস আরম্ভ হল সেটার মাথামুন্ডু কিছুই সোমেন বুঝতে পারল না। জোটা কয়েক বড় বড় চুলওয়ালা লোক অদ্ভুত ভাঁড়ামি করছে আর তাই দেখে গাঁশুদ্ধ লোক হেসে কুটি-পাটি। সোমেন লক্ষ্য করল, একেবারে সামনে বসে আছে বাউরীপাড়ার মেয়েলোকেরা। খুব হাসছে। কিছুক্ষণ দেখে উঠে এল সোমেন। এই ভাঁড়ামি দেখে হাসি। নিজেদের অভাবের কথা বলতে গিয়েও হাসি। এরা কাঁদে কিসে ? সোমেন ভাবে, শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু হবে না। কে বোঝাবে তাকে এসব ? দেবেন্দ্র গোস্বামী কতটা খারাপ লোক ? কানা সত্যিকারের ভাল লোক এখানে ? অনেক কুঁড়েঘরে নাকি হাঁড়ি চড়ে না। তারাও বোধহয় আছে এই মন্ডপে ? তারাও হাসছে না কি ! ঐ ভাঁড়ামি দেখেও ?

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে ফিরছিল সোমেন। রাস্তা অন্ধকার, ফাঁকা। গাঁওশুদ্ধ সব এখন মন্ডপে। হঠাৎ সামনে একজনকে দেখে থেমে গেল। মালতী। অন্ধকারেই বোঝা যায়, আজ সে একটু সেজেছে। কপালে কাচপোকার টিপ চিকচিক করছে।

তুমি কোথায় ছিলে ?

এই একটু বাড়ী ঘুরে আসতে হল, অপ্রতিভ গলায় হাসে মালতী। আপনি বাড়ী যাচ্ছেন ? ভাল লাগল না দেখতে ?

নাঃ, মন্দ কি? তবে একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

মালতী খুব তাড়াতাড়ি মন্ডপের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে থাকে। সোমেন বলে, চল, একটু আমায় এগিয়ে দেবে চল। নিঃশব্দে এগোয় দুজনে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে তুমি লজ্জা পাও বুঝি ?

না, অস্ফুট জবাব আসে পাশের অন্ধকার থেকে।

জান মালতী, আমার খুব ইচ্ছে ছিল একদিন বসে তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করব। কিন্তু হল না। এবারে ত আমায় চলে যেতে হবে।

চলে যাবেন ? কাজ হয়ে গেলে ?

হ্যাঁ, প্রায়। একটু থেমে সোমেন বলে, যদিও আরও থাকতেই ইচ্ছে করছে। চুপ করে হাঁটে মালতী।

তোমার টিপটা অন্ধকারেও যেন জ্বলছে।

কোন জবাব নেই। সোমেন অন্ধকারেও বুঝতে পারে, এবার লজ্জা পাওয়ার পালা।

আবার কবে আসবেন আপনি ?

এলে তুমি অনেক গল্প করবে আমার সঙ্গে ? এমনি পালিয়ে পালিয়ে থাকবে না ?

আমি ? আমি কি আপনার সঙ্গে বেশী গল্প করতে পারব কখনও ?

বাড়ী এসে গেছে। দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করে সোমেন। অন্ধকারের মধ্যে মালতীর একখানা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে।

মালতী, পরের বার তোমার জন্যে কি নিয়ে আসব বলো ?

কিছু না, কিছু না....আপনি আর কখনও আসবেন না, আমি জানি....হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায় মালতী। মিশমিশে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ সোমেন দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু নিজের বুকের উথাল পাথাল শব্দ শোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঝড়ের মত গত কয়েক মিনিটের ঘটনাগুলো ঘটে গেল যেন। কি চেয়েছিল সে ? মালতীকে কাছে পেতে ? কি চেয়েছিল মালতী ? কি পারবে তারা দুজন দুজনকে দিতে ? তাহলে এ কিসের চাওয়া ? গায়ের আশপাশ দিয়ে ফালগুনী হাওয়া যায়। দূরে নদীতে কোন মাঝি হৈ দিল গলা ছেড়ে। চারদিক ফাঁকা। হঠাৎ বড় একা লাগে সোমেনের। অবসন্ন পায়ে আস্তে আস্তে এগোয় বাড়ীর দিকে।

পরের দিন একা একা ঘোরে সোমেন সারাটা দিন। সারাদিনই মনে হয়, কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু দেখার নেই, শোনার নেই। বোঝার পালা শেষ।

এদিনও সন্ধ্যাবেলায় মন্ডপে কি সব গানবাজনা ছিল। দেরী করে ফিরল সোমেন বুড়োবটতলা থেকে।

বাড়ীতে এসে দেখে, সবাই মন্ডপে গেছে, একা ষষ্ঠীপদ মাদুর পেতে ঘাসে শুয়ে আছে। কি হল, আপনি যান নি, সোমেন জিজ্ঞাসা করে। ষষ্ঠীপদ উঠে বসে, একটু হেসে বলে, না, ওরাই সব গেল; আমি শুয়ে থাকলাম।

শরীর ভাল ত ?

হ্যাঁ, শরীর ভাল। বলে একটু থেমে ষষ্ঠীপদ বলে, বড় চিন্তায় পড়ে গেছি, তাই....তারপর একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে থেমে যায়।

খাঁচাখুঁচি করে সব বার করে সোমেন।

এই ফালগুনে মালতীর বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। তারা মেয়ে পছন্দ করে গেছে, দেনাপাওনার কথাও প্রায় ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু আজ খবর এসেছে, ছেলের সাইকেল চাই। অন্য সব কিছু দাবী ধার-দেনা করে পূরণ করার চেষ্টা করেছে ষষ্ঠীপদ, কিন্তু এর উপরে সাইকেল বোঝার উপর শাকের আঁটি। এর পরে চৈত্র মাস, তখন বিয়ে হয় না। আর তার সঙ্গে শুরু হবে অভাবের মরশুম। আবার কোথায় সম্বন্ধ হবে, কবে বিয়ে হবে, কে জানে।

মালতীর বিয়ে হবে, রাত্রে শুয়ে সোমেন ভাবে। কেমন বর ? নিশ্চয়ই চুলে খুব তেল দেয় ? লাল নীল ফুলকাটা তোয়ালে ব্যবহার করে ? মালতী সেখানে সুখে থাকবে, যেমন কোটি কোটি গাঁয়ের মেয়েরা থাকে। সে কি সুখ ? এই হিজলডাঙায় যেমন সুখের চেহারা সেইরকম ? আলাদাই বা কি হবে ? এই গ্রামবাংলায় চিরদিনই ত মেয়েরা চওড়া সিঁদুর পরে, কাঁদতে কাঁদতে, পানাপুকুর ডাইনে রেখে, ফণি-মনসার পাশ দিয়ে অশ্বত্থগাছের নীচে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যায়। যেমনটি হচ্ছে, তেমনটিই হবে। দূরে আখের ক্ষেতে হাউ হাউ করে শেয়াল ডাকে। রাতজাগা পাখীর শব্দ শুনতে শুনতে সোমেন ঘুমোয়।

দু' সপ্তাহ হয়ে গেছে। কলকাতায় ফেরবার ইচ্ছেটা কদিন থেকেই মনে চাড়া দিয়েছিল। পরদিন সকালবেলা অলসভাবে বসে সোমেন ভাবছিল কি করা যায় এমন সময় খানিকদূর থেকে একটা ভয়ংকর কান্নাকাটির শব্দ কানে এল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই দৌড়োল, সেও গেল সঙ্গে। গিয়ে দেখে, গগন দাসের বাড়ীর সামনে প্রচুর লোক, মেয়েরা আছড়ে পড়ে কাঁদছে। মাঝখানে একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে গগনের বড় ছেলে নবীন। সোমেনেরই বয়সী হবে, সুন্দর পেশল চেহারা। হাত দুটি বুকের উপরে জড়ো করা, চোখ দুটি বোজা। কাল গভীর রাতে জলসা থেকে ফেরার সময় সাপের মুখে পা পড়েছিল।

এত কান্নাকাটি হট্টগোলের মধ্যে কিছু বোঝা মুশকিল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, পাঁচবাড়ুরি হেলথ সেন্টার ছাড়া ধারে কাছে কোন ডাক্তার বদ্যি নেই। পাশের গাঁয়ে এক ছোকরা হাতুড়ে আছে, মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে তাকে আনা হয়েছিল। সে কিছু করতে পারে নি। তারপরে খেয়ার মাঝিকে তুলে, নদী পার হয়ে, আড়াই মাইল হেঁটে হেলথ সেন্টারে যখন পৌঁছেছে, তখন কাজ শেষ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা প্রচন্ড রাগে সোমেনের মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। এখন সব মাটিতে মাথা কুটছে। বাবা রে, বাছা রে ! হাজার হাজার মানুষ থাকে, ডাক্তার থাকে না, ওষুধ থাকে না। আর গাঁ ভর্তি কচুরিপানা। মা মনসার পুজো। জমি নিয়ে খালি মামলা না লড়ে কেন এরা শাবল কোদাল নিয়ে সব

জঙ্গলগুলো সাফ করে না? সাপ ব্যাঙ ইঁদুর বিছের ঝাড়বংশ উৎখাত করে দিতে পারে না? কারা করবে এসব? কবে করবে? কোনদিন কি হবে? মেয়েলোকগুলো কি বিশ্রী চীৎকার করে কাঁদছে।

বাড়ী বসে সারাদিন সোমেন নিজের এ'কদিনের নোট্‌স্‌গুলো পড়ল। বিকাল-বেলায় মনে হল, যথেষ্ট হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর হবে না। আর দেখে লাভ নেই। যদি ডাঃ ভাদুড়ী খুশী না হন সে আবার পরে আসবে। কিন্তু এবার ফেরা দরকার। ষষ্ঠীপদকে ডেকে বলে, কাল সকালে আমি যাচ্ছি।

ষষ্ঠীপদ সেই অপ্রস্তুত হাসি হাসে, আর দুটো দিন থাকা যায় না। অবিশ্যি, কষ্ট খুবই হচ্ছে.....

সোমেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে। ভোর ভোর বেরোন দরকার, পায়রাডুবিতে সকাল সকাল পৌঁছলে আটটা পনেরয় ছোট লাইনের গাড়ীটা ধরা যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় একলা শুয়ে শুয়ে সোমেন ভাবে, আর কি হিজলডাঙায় কখনও আসা হবে? হয়ত না। আরও কত গ্রামে কতবার যেতে হবে কে জানে? আবার যদি ঘুরেফিরে কোনদিন সে এখানে ফেরে, মালতী কি থাকবে তখন? হয়ত সামনের বার ষষ্ঠীচরণ ধার করে সাইকেলটাও কিনে ফেলবে। তারপর মালতী চলে যাবে ডুলিতে চড়ে, পানাপুকুরের পাশ দিয়ে, অশ্বত্থ-গাছের নীচে দিয়ে। তখন আর এই বাড়ীতে থাকতে কি ভাল লাগবে? সোমেন বোঝে, লাগবে না। নিজের কাছে কি করে অস্বীকার করা যায়, এ কদিন ঐ কালো মেয়েটিকে সে বার বার চুরি করে দেখেছে, কথা বলে ভাল লেগেছে, মনে মনে আরও বেশী করে তার সঙ্গ চেয়েছে। হিজলডাঙার সবচেয়ে বড় পুরস্কার তার কাছে মালতী।

ঠক করে শব্দ হতে তাকিয়ে দেখে মালাতী ঘরের কোণে লণ্ঠন রাখছে। সোমেন উঠে বসে।

মালতী, আমি কাল চলে-যাচ্ছি।

দরজায় হাত রেখে মালতী দাঁড়ায়। চোখে চোখ পড়তেই মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা বলছিল....আপনার এখানে কত কষ্ট হচ্ছে....

কষ্ট হয় নি। খুব ভাল লেগেছে।

দুজনে চুপ করে থাকে। বাইরে আমগাছটায় শন শন শব্দ ওঠে। জানালার বাইরে থেকে একটা জোনাকী হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, উড়ে বেড়ায়। কোথায় যেন শাঁখ বাজল।

আবার আসবেন ত?

এসে কি আর তোমায় দেখতে পাব? তুমি হয়ত চলে যাবে তোমার জায়গায়।

একবার তাকিয়েই মালতী আবার চোখ নামায়।

না, আমি আরও অনেকদিন থাকব। সোমেন হাসার চেষ্টা করে, আমরা সবাই মিলে তোমাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেব, বুঝলে? জবাব নেই। কিন্তু মালতী যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা নীচু, দরজায় হাত। সোমেন দেখতে থাকে।

মালতী, তোমাকে আমি যদি কিছু দিই, তুমি নেবে?

মালতী চমকে উঠে তাকায়, কিন্তু চোখে চোখ রাখে না। পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝের মাটি খোঁড়ে।

মালতী, আমি তোমার বাবার কাছে সব শুনেছি।

আমি জানি না.. আমি কিছু জানি না....আমি যদি....যদি সাইকেলটা দিই.... তোমার বাবা নেবেন?

আপনি? মালতী হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখায়।

আমার বাবা পারছে না বলে আপনি ..আপনি দান দেবেন?

দান নয় মালতী, আমি যদি....

না। আমি নেব না, আমি নেব না। এমন করলে আপনি আর আসবেন না.... অতিথির দান আমরা নিই না....কখনও না.

শেষের দিকে তার গলা বুজে আসে। রাগে না কান্নায়, সোমেন বুঝতে পারে না। এগিয়ে যাবার আগেই ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়ায় মালতী, তারপর বাগানের অন্ধকারে মিশে যায়।

জোনাকীটা তারপরেও অনেকক্ষণ ঘুরল ঘরের মধ্যে। সারারাত আধঘুমে সোমেনের কানে কত শব্দ এল, কতকগুলো এলোমেলো স্বপ্ন এল, গেল। হাওয়ার আওয়াজ বাড়ল, কমল। কি এক অস্বস্তিতে বার বার ঘুম ভাঙল। সারারাত মনের মধ্যে জেগে রইল এক অদ্ভুত বিষাদ। তারপর ভোরের এক টুকরো আলো কেমন যেন অপরাধীর মত এসে ঘরে ঢুকল।

সব কাগজপত্র জামাকাপড় ঠেসে ঠুসে তোরঙটা ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে অবশেষে বাইরে এসে দাঁড়াল সোমেন। ষষ্ঠীপদ আর তার বউএর মুখে ম্লান মন খারাপ হাসি। কত কষ্ট হল, তবু আপনি হাসিমুখে রয়ে গেলেন, ষষ্ঠীপদ বলে।

জোরগলায় হাসে সোমেন, না, এখন ত এটা আমার নিজের বাড়ী হয়ে গেল, যখন খুশী আসব। মালতীকে কোথাও দিয়ে যায় না।

ষষ্ঠীপদ খুব জোরজার করছিল ঘাট অবধি পৌঁছে দেবে বলে, কিন্তু সোমেন কিছুতেই আসতে দিল না। বলল, আপনি আর বেরোবেন না, আমি রাস্তা চিনে গেছি।

আসলে আর এখন কারু সঙ্গ ভাল লাগছে না এই যাবার সময়। এখন একাই ভাল, সোমেন ভাবে। মন ভাল নেই, মন ভাল নেই। মাথার উপরে আমের পল্লব দোলে, দূরে বাগানে বউ কথা কও ডাকে। এখনও ধুলো ওড়ে নি। পথের দুপাশে ঘাস মখমলের মত হয়ে আছে। ফড়িংগুলো উড়ে বেড়ায়, নীল নীল ডানা। মন ভাল নেই। নারকেলের পাতা রোদে চিক চিক করে। মন ভাল নেই। চারপাশের গ্রামটা কেমন যেন নিঝুম নিশ্চুপ। কেমন এক মায়াঝরা মায়াঝরা ভাব। কতকাল যেন এমনি চুপ করে কুড়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে। পরদেশীর আসা-যাওয়া দেখছে। মন ভাল নেই।

ঘাটে আগের দিন রাত্রে খবর দেওয়া ছিল। ভরত মাঝি নৌকো নিয়ে তৈরী। ইঁটে পা রেখে নৌকোয় নামতে যাবে সোমেন, এমন সময় চীৎকার কানে এল, বাবু-উ-উ।

তাকিয়ে দেখে, ন্যাড়া। ভীষণ হাঁপাচ্ছে, হাতে ফর্সা কাপড়ে বাঁধা এক ছোট্ট পুঁটুলী।

মালতী মাসি পাইঠেছে, আপনার জন্যে। বইলেছে বাতাসা আইন্যে রেখেইছিল কাল বেতে, মুড়ি আর নারকোলের সাথে দিইয়েছে। বইলেছে পথে ক্ষিদা লাইগলে আপনি খাবেন।

উর্দ্ধশ্বাসে ন্যাড়া আবার ছোটে গ্রামের দিকে। পুঁটলী হাতে সোমেন দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে গ্রামের দিকে তাকায়। ঐ অনেক দূরে, ঘোষেদের গোয়ার পাশে জামরুল গাছে হেলান দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে তার চুলের ঢালটুকু শুধু বোঝা যায়। তার চোখ এদিকেও নয়, অন্যদিকেও নয়। তার চোখ কোথায়, কে জানে।

দেন, জিনিসগুলো দেন, ভরত মাঝি এগিয়ে আসে। সোমেন ব্যাগটা বাড়িয়ে দেয়।

ওটা দেন?

না, এটা না। পুঁটলীটা শক্ত করে ধরে সোমেন নৌকোয় পা দেয়, এটা থাক, এটা আমার কাছে থাক।

কণ্ডাকটার আমার দিকে এগোতে গোতে বলল, টিকিট। এক টাকার একটা ট তার দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, পঁচিশ। কণ্ডাকটারের পাশের আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ থাকার পর জিজ্ঞেস করল, কটা কণ্ডাকটারের হাত থেকে টিকিট ও পয়সা নিতে নিতে বাঁ হাতের জি চোখের সামনে আনলাম। দেখলাম, তে ঘড়ি নেই। অবাক কাণ্ড ত, ড় কোথায় গেল। তাড়াহুড়ো করে ড় থেকে বেরুবার সময় কখনও কখনও ড়টা হাতে না পরে প্যান্টের পকেটে বা আর পকেটে রেখে দেই। তাই, প্যান্টের কট হাতড়াতে লাগলাম। জামার পকেট তড়াতে লাগলাম। কোথাও ঘড়ি পেলাম । লক্ষ্য করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে বাসের অনেক লোক বেড়ে গেল। যে সময় জানতে চেয়েছিল তাকে আর লাম না। বাসের ভেতর কিছু ধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। কারুর কথা বুঝতে পারলাম না। ম ঘড়ির কথা ভাবতে লাগলাম। ঘড়িটা হারিয়ে গেল? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কি কি করেছিলাম। আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ঘড়িটা হাতে পরেছিলাম কিনা।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। ঝগড়া করতে করতে ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। রাগে চিৎকার করতে শুরু করেছিলাম। চিৎকার করতে করতে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই তর্কাতর্কি শুরু হয়েছিল। ছোট-খাট তর্কাতর্কি করতে করতে চা খেয়েছিলাম। বাজার গিয়েছিলাম। তেল মেখেছিলাম। চান করেছিলাম। ভাত খেয়েছিলাম। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই প্রতিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। আমি কত মাইনে পাই, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা কতটুকু, চাকরি থেকে রিটায়ার করার কতদিন বাকি ইত্যাদি। আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের ঠিকঠিক উত্তর দিয়েছিলাম। প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনে প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। তারপর বলল, আমার ধারণা, তুমি আর সংসার চালাতে পারবে না। বললাম, সংসার ত ভালই চলছে। প্রতিমা চিৎকার করে উঠল, এখন ত কোন রকমে চলছে, ভবিষ্যতে চলবে না। 'ভবিষ্যত' শব্দটা শোনার পর আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, ভবিষ্যতে আরেকটু খারাপ থাকব, ক্ষতি কী! 'এর থেকেও খারাপ থাকব, এর থেকেও খারাপ থাকব' বলতে বলতে প্রতিমা চিৎকার করতে লাগল। হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমিও চিৎকার শুরু করে দিলাম। খারাপ খারাপ ভাষায় প্রতিমাকে গালাগালি করতে লাগলাম।

চিৎকার করতে করতে আমি অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তর্কাতর্কি করতে করতে গেঞ্জী পরেছিলাম। জামা পরেছিলাম। জাঙ্গিয়া পরেছিলাম। প্যান্ট পরেছিলাম। মোজা পরেছিলাম। আরও আরও অনেক কিছু করেছিলাম। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কব্জি-ঘড়িটা

পরেছিলাম কিনা। ঘড়ির কথা ভাবতে ভাবতে অফিসে পৌঁছে গেলাম। উপস্থিতি খাতায় সই করার জন্য পকেট থেকে কলম বের করতে গিয়ে দেখি, পকেটে কলম নেই। অন্য একজনের কলম দিয়ে সই করলাম। তারপর ভাবলাম, আশ্চর্য, কলমটাও কি হারিয়ে গেল। না, বাড়িতে ফেলে এলাম। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে কলমটা পকেটে রেখেছিলাম কিনা। আবার ভাবতে শুরু করলাম, আমি কি ভাবে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে একে একে গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, জামা, জুতো ইত্যাদি পরতে লাগলাম। তারপর, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাল করে চুল আঁচড়ালাম। গালে ও ঘাড়ে পাউডার লাগালাম। তারপর প্রতিমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে কলমটা পকেটে রেখেছিলাম কিনা। প্রতিদিন অফিসে বেরুবার সময় প্রতিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, ঘড়ি পরেছি কিনা, কলম নিয়েছি কিনা, অন্য কোন দরকারি জিনিস নেওয়ার কথা আছে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু, আজ প্রতিমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

অফিসের ড্রয়ারে আমার একটা ডট পেন আছে। আমি ডট পেন দিয়ে অফিসের কাজকর্ম করতে লাগলাম। অফিসের কাজ করতে করতে প্রতিমার কথা ভাবতে লাগলাম। বেচারাকে আজ খারাপ খারাপ ভাষায় গালাগালি দিয়েছি। আমার দিক থেকে এতটা গোঁয়ার্তুমি করা ঠিক হয়নি। প্রতিমা আজকাল একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে। সামান্য ব্যাপারে ঝগড়াঝাঁটি করে। রাগারাগি করে। তর্কাতর্কি করে। এখন প্রতিমার পেটে বাচ্চা। আমাদের বংশধর। শুনেছি, এই সময় সব মেয়েরাই নাকি একটু খিটখিটে হয়। আশ্চর্য, আমি এই কথাটা একদম ভুলে যাই। প্রতিমার শরীরের ও মনের কথা ভেবে ওকে একটু প্রশ্রয় দিলে ক্ষতি কী। প্রতিমার জন্য দুঃখ হতে লাগল। কষ্ট হতে লাগল। আরও অনেক কিছু হতে লাগল। প্রতিমার কথা ভাবতে ভাবতে অফিসের জরুরি কাজগুলো করতে লাগলাম। সামান্য কাজকে এত শক্ত মনে হতে লাগল যে আমি ঘামতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। গাল ও কপালের ঘাম মোছার জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে দেখি, পকেটে রুমাল নেই। আশ্চর্য, রুমালটা কোথায় গেল। রুমালটাও কি হারিয়ে গেল? বাড়ি থেকে রুমালটা এনেছিলাম ত। আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, বাড়ি থেকে রুমালটা এনেছিলাম কিনা। সাধারণত, অফিস থেকে ফেরার পর ময়লা রুমালটা পকেট থেকে ফেলে দেই। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিষ্কার রুমাল পকেটে রেখে দেয়। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, গতকাল প্রতিমা আমার পকেটে ফর্সা রুমাল রেখেছিল কিনা। আমি ভাবতে শুরু করলাম, গতকাল বাড়ি ফেরার পর কি কি ঘটনা ঘটেছিল।

গতকাল একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছিলাম। বাড়িতে ঢোকামাত্র ধূপের গন্ধ পেলাম। চন্দন ধূপ। আমি ধূপের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না। আমি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ধূপ জ্বেলেছ কেন?

প্রতিমা অনেকবার জানতে চেয়েছে, তোমাকে বলতেই হবে, কেন ধূপের গন্ধ সহ্য করতে পার না? প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছুই বলতাম না। কিছুই না বললে প্রতিমা আরও রেগে যায়। ঝগড়া শুরু করে দেয়। চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। বলে, তোমার জন্য ঘরে ঠাকুরের কোন ফটো নেই, তোমার জন্য সন্ধেবেলা ধূপ জ্বালাতে পারি না। গতকালও প্রতিমা জানতে চেয়েছিল, তোমাকে বলতেই হবে, কেন ধূপের গন্ধ সহ্য হয় না।

প্রতিমাকে কখনই বলিনি, ধূপের গন্ধ পাওয়ামাত্র আমার বাবার কথা মনে পড়ে। বাবার মৃত মুখ চোখের সামনে আবছা ভেসে ওঠে। মুখটা চোখের সামনে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। স্পষ্ট হতে হতে এমন হয় যে মনে হয়, একেবারেই সত্যিকারের মুখ। এভাবে বাবার মুখোমুখি হলে আমার খুব কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। ভয় হয়। আরও অনেক কিছু হয়। বাবার দুটো চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। মাথাটা শরীর থেকে ঝুলছে। বাবাকে এইভাবে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। প্রতিমাকে এ-সব কথা কোনদিন বলিনি। কয়েকমাস আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল থেকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে যতক্ষণ লেগেছিল ঠিক ততক্ষণই ধূপ জ্বলেছিল। চন্দন ধূপ। শ্মশানে পৌঁছবার পরও ধূপ জ্বলেছিল। মুখাগ্নির সময় পর্যন্ত ধূপের গন্ধ পেয়েছিলাম। ধূপের গন্ধ পাওয়ামাত্র কখনও কখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শববাহকেরা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা বারবার পিছিয়ে পড়ছি। রাস্তায় খই ছড়িয়ে পড়ছে। পয়সা ছড়িয়ে পড়ছে। আরও অনেক কিছু ছড়িয়ে পড়ছে। এসব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমি খুব কষ্ট পাই। প্রতিমাকে এসব কথা কোনদিন বলিনি। গতকাল প্রতিমাকে সব কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। গতকাল প্রতিমা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। রে[illegible] দাঁড় ফুলিয়ে আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি শু[illegible] করেছিল। তাই, ওকে সব বলেছিলাম। সব কথা শোনার পর ও ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ করে দিল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ভাবতে লাগলাম, গতকাল আরও কি কি করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, গতকাল প্রতিমা আমার পকেটে ফর্সা রুমাল রেখেছিল কিনা।

অফিস ছুটির পরও প্রতিমার কথা ভাবছিলাম। ঘড়ির কথা ভাবছিলাম। কলম, রুমাল ইত্যাদির কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, রাগারাগি করে বা[illegible] থেকে বেরুলে আগে প্রতিমা দুপুরে[illegible] দিকে আমাকে টেলিফোন করত। জান[illegible] চাইত, আমি ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছে[illegible] পেরেছি কিনা, বাগ করেছি কিনা, টিফিনে কি কি খেয়েছি ইত্যাদি। বাড়ির কাছাকাছি সে পোস্ট অফিসটা সেখান থেকে প্রতিমা টেলিফোন করত। এখন রাগারাগি করে বেরুলে প্রতিমা আর টেলিফোন করে না। এখন মাতৃত্বের লক্ষণগুলো তার শরীরে এত স্পষ্ট যে যখন তখন বাড়ির বাইরে আসতে চায় না। প্রতিমার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। বাড়ির কাছে পৌঁছে মনে হল, ঘড়ি, কলম ও রুমাল বাড়িতেই ফেলে গিয়েছিলাম। কিছুই হারায়নি। মনে হল, বাড়িতে গিয়ে জানতে পারব, আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে সারাদিন প্রতিমার মন খারাপ ছিল। আমি ঘড়ি নিতে ভুলে গেছি বলে প্রতি[illegible] মন খারাপ ছিল। যখন জানতে পারল [illegible] কলম, রুমাল ইত্যাদি নিতে ভুলে[illegible] তখন তার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছি[illegible] এত খারাপ যে সে ভাল করে চান ক[illegible] পারেনি। ভাল করে খেতে পারেনি। অ[illegible] চেষ্টা করেও দুপুরে ঘুমোতে পারেনি।

বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখলাম, আমার ধারণাই ঠিক। আমার ঘরে ঢুকে দেখলাম, ড্রেসিং টেবিলের এক কোণে পড়ে রয়েছে আমার কলম, ঘড়ি ও ফর্সা রুমাল। জানতে পারলাম, আমি আর যা-যা ধারণা করেছিলাম সবই সত্যি। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার সামান্য চেষ্টাতেই প্রতিমার রাগ জল হয়ে গেল।

বিজয়া

কবিতা সিংহ

মা যে কবে আসেন ?

না, তারিখ শুধোলে বলতে পারব না। আকাশ দেখলে বলতে পারব। সেই ছোট-বেলা থেকেই দেখছি যে। হঠাৎ একদিন বর্ষার পাঁশুটে রোঁয়া ঝেড়ে আকাশটা রবিন বুলুতে ধুয়ে দেয় কেউ—হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরার পথে শিউলির ফিকে গন্ধ ছুটে আসে পোড়া ডিজেল ছাপিয়ে।

বুঝতে পারি, মা এবার মনে মনেই পৌঁছে গেছেন তাঁর বাপের বাড়ি। তারপর হাসেন নবপত্রিকায়, জোড়াবেল বাঁধা সবুজ গাছটি যেন তাঁর শরীরের প্রতীকটি। ষষ্ঠী যায়, সপ্তমী যায়, অষ্টমী যায়, নবমী যায়। কত পুরোনো দুঃখ নতুন হয়ে ওঠে, নতুন দুঃখ পুরোনো হয়ে যায়। কত ঘরে ফেরার আনন্দ, কত ঘরে না-ফেরার বিষাদ, কত শেষ মুহূর্ত খেটে জোগাড় করা পুজোর ছুটি, কত, ছুটি জোগাড় করেও শূন্য মনের মনোমালিন্য—মায়ের আগমনে অন্তরে-বাইরে নিজেকে খুশি রাখার, অন্যকে খুশি করার কি প্রাণপণ চেষ্টা। এমন টালমাটাল হৃদয়মন্থনে, এমন সামগ্রিক এক-তারে বাঁধা মনন, বছরের আর কোনো সময়েই বাঙালীকে এমন করে বাঁধে না। নাড়া দেয় না। তারপর আসে নবমীর পর দশমী।

মায়ের আসার তারিখটা যেমন বলতে পারিনে, যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক তেমনিই বলতে পারি ঘণ্টা পল মিলিয়ে। কিশোর দিনে বিজয়ার দিন সকাল বেলায় হাতে পরিয়ে দেওয়া হত অপরাজিতা লতার বালা। তাতে হলুদে ছোপানো পাতলা কাপড় জড়ানো। মণ্ডপে মায়ের গালে ঝলমলে গর্জন তেলে হঠাৎ যেন চোখের জল। তাঁর সামনে বিজয়ার সকালের ভোগ পান্তাভাত, অম্বল, মাছের ল্যাজা। মেয়ে বড় সকাল সকাল ঘরে ফিরছে, তাই গরম ভাত রান্না হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এ-নিয়ম [illegible]বরীর ওপারের হঠাৎ ঢাকির ঢাকে বেজে [illegible] বিসর্জনের বাজনা। স্টেথিসকোপ [illegible] দেখলে বুকের ভিতরে তার গুর-গুর [illegible] শোনা যেত। তারপর দর্পণে মায়ের প্রতিফলনটি রেখে পিতলের প্রদীপে গন্ধোদকে [illegible] প্রতিফলনের বিসর্জন।

যাঃ, সব শেষ।

এখন ও-দেহ প্রাণহীন। যে-কেউ ছুঁতে পারে। এখন সিঁদুর খেলা।

গঙ্গার জেটির ওপর দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর দেখেছি পেট্রোম্যাকসের উজ্জ্বল আলোয়, মাঝগঙ্গায়, দু' নৌকো সরিয়ে নেওয়া হল, খাড়া অবস্থায় সোজা ডুবে গেলেন সম্পূর্ণ প্রতিমাখানি।

আমার মা, আমার বন্ধুদের অনেকের মা, নাকি আপনাদের সকলের মা—এঁরা সবাই এত এই দুর্গা-প্রতিমার মত কেন ?

এঁদের নবম পায়ে হাত ঠেকিয়ে কেবল পোষাকী নমস্কার করতে সাধ যায় না, মাথা লুটিয়ে, মুখ ঘষে, চুমো খেতে বাসনা জাগে। বিজয়া সেই অন্য দিন। মা হারানোর দিন, মা হারিয়ে শূন্য হয়ে যাবার দিন, আবার সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে তোলার জন্য আকুল কোলাকুলি বন্ধুতা, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব বিনিময়ের লুটোপুটির দিন। এই দিনে এমনকি সীমান্তের সীমানাও খুলে যায়, শত্রুর দরোজা উন্মুক্ত হয়। একটি প্রণামে, একটি আলিঙ্গনে মিটে যায় বাসী ঝগড়া, পুরোনো কোন্দল।

এমনি দিনের একটি স্মৃতির কাহিনী বলি।

একটি মেয়ে পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে যৎসামান্য চাকরি করত কলকাতার কোনো নগণ্য স্কুলে। তার মা তখন ঘোর ক্যান্সারে হাসপাতালে। বিরূপ আত্মীয় পরিজন চলে গেলে মেয়েটি চোরের মত দেখতে আসত তার মাকে। এমনি মহা-পুজোর দু'মাস আগে একদিন সে মাকে দেখতে গেছে। মায়ের নাকে, হাতে শিরায়, নানান নল পরানো। আস্তে বালিশের তলা থেকে ভাঁজ-করা লুকোনো কয়েকটি নোট্ বের করে দিয়ে মেয়েকে বললেন—এখুনি একটা শাড়ি কিনে নিয়ে আসতে পারিস ?

—এখুনি কেন মা ? তোমার এমন অবস্থা। আজ থাক—

—না, থাকবে না। একজনকে দেব। এখুনি আন। মেয়েটি মনে মনে জানত শাড়ি কার জন্য। তার বেশি শাড়ি ছিল না। তাই সে একটির জায়গায় দুটি খেলো শাড়ি কিনে নিয়ে এলো কাছাকাছি কাটরা থেকে।

মা শাড়ি দুটি বালিশের পাশে রেখে কি যেন ভেবে নিয়ে, বড় নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

একমাস বাদে মায়ের মৃত্যু হল।
আরো একমাস বাদে পুজো।

সেই মেয়েটির বাড়ি ছোট্ট একটি প্যাকেট এসে পৌঁছোল মহাষষ্ঠীর আগের দিন। সঙ্গে ক্ষুদ্র পত্র।

—'তোমার মা, তোমার জন্য পুজোর কাপড় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রেরণ করিলাম। ইতি—'

বিজয়ার দিন সেই মেয়েটিকে দেখা গেল জ্যালজেলে নতুন শাড়ি পরে তরুণ স্বামী ও কোলের শিশু নিয়ে কলকাতার ফুটপাতের পুলিশ কর্ডন-করা ভিড়ে অজস্র মানুষের মধ্যে মিশে দাঁড়িয়ে থাকতে। কখনোবা শূন্যদৃষ্টিতে, কখনো বা সব ভুলে গিয়ে শোভাযাত্রার রং চং দেখে মেতে ওঠার আনন্দে। তারা ভাসান দেখতে বেরিয়েছে।

সেই তার মায়ের দেওয়া নতুন শাড়ি পরার শেষ বছর। যে মা, অন্তিম শয্যায় শুয়েও মেয়েকে আগামী পুজোর দিনে নতুন শাড়ি পরাতে চেয়েছিলেন।....এমন মা আজও এই দেশের ঘরে ঘরে। এমন নিঃস্বার্থ নারীদের জন্য আজও আকাশে চন্দ্র-সূর্য !

বিজয়ার দিন তাই, মা-হারানোর ব্যথার দিন, আর ব্যথার মধ্যে দিয়ে মা যে কী, তা বোঝারও এক মহান্ মুহূর্ত।

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং
সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

ছেড়ে দিয়ে সাজানো বিছানা

জীবনময় দত্ত

বিকেল চুঁইয়ে মৌটুসি বোদ
বিদায় নেয়। কাশের বুকে সন্ধ্যা নামে
নিঃশোন উঠোনে পূর্ণিমার রাত
আলপনা আঁকবে শুভ্র জ্যোৎস্নার।

আমি শুধু হিরণ্ময় স্মৃতি নিয়ে মশগুল।
প্রত্যাশাহীন আগন্তুক আকাঙ্খারা
বুকের ভিতর অশ্রুত পদধ্বনি তুলে
জ্যোৎস্নার শরীরে মিলিয়ে যায়।

এভাবেই এক সময় নিরালম্ব শূন্যতায়
উৎসব শেষের নির্যাস নিয়ে
মাঝরাতে আমি শব্দ খুঁজি
ছেড়ে দিয়ে সাজানো বিছানা।

কবিতা

শঙ্কর দে

কি বেঁধে দিয়েছে হাতে; শব্দমালা
গলা দিয়ে উঠেছে যে সুর
জলে-পায়ে বেজে ওঠে ধূলি
পাথরে পুরবী, জাগে প্রাণে।

আলো নেই, আছে একতারা
মানুষের হাতে এই আঁখি
পাখি নেই, আছে অন্ধকার
জলে-ভেজা মেঘে চেয়ে থাকি।

বৃষ্টি

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ছবির মধ্যে বৃষ্টি পড়ে
মুছে যায় মুখ।
বৃষ্টি পড়ে, সে এক অসুখ—
হয়তো বা সুখ নিয়ে অসুখের খেলা।
নেশার চলকে ওঠে মদের পেয়ালা।
আমার ছবির মধ্যে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি সারাবেলা।

রাইমোহনের ঘরে

একরাম আলি

রাইমোহনের ঘরে একা বসে আছে রাইমোহন
টেবিলে বিদেশী বই, হাওয়া এসে উল্টে দ্যাখে
ফরাসী তরুণীটির চপলতা
রাইমোহন দেখেছিল একদিন, আজ উচ্ছিষ্ট দেখবে বলে
ঈশ্বর ঝুঁকেছে ঐ নিউজপ্রিন্টের গর্তে, গন্ধে,
কালির চাতুর্যে

তার হাতে অবিশ্বাসী দাঁড় নেই, প্রতিশ্রুত শাখা
তাকে কখনো ডাকেনি
আত্মবিক্রয় থেকে উঠে-আসা লাল ঠাট্টা শেখেনি সে
মানুষের ঈশ্বর তবু দ্যাখে মানুষের মেয়েছেলেগুলি

আর কে দেখবে, কেউ নেই
টেবিলে বিদেশী বই, একাকী ঈশ্বর উল্টে দ্যাখে
ফরাসী তরুণীটির চপলতা
ক্যালেণ্ডারে বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত কেঁপে যায়, আর
স্থির পরিপার্শ্বে রাইমোহনের ঘরে একা

চুপচাপ বসে থাকে আমাদের স্থির রাইমোহন

ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবি

বেশ কিছুদিন আগে কলাভবনের স্নাতক তিনবন্ধু শিল্পশিক্ষা শেষে বেরিয়ে পড়েছিলেন ছবি এঁকে জীবনধারণের তাগিদে এই শহরে কিংবা রাজধানীতে। এঁদের কাছে দিল্লী-কোলকাতা-বোম্বের কোনি প্রভেদ ছিল না—জন্ম আবর্ষণ ছিল না তো? একজন রামচন্দ্রণ; একজন সুধা-রঞ্জন ভূষণ অন্যজন ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত। ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় এঁরা স্থানি করে নিয়েছেন। ধর্মনারায়ণ হাওড়ায় থাকেন, শিক্ষকতা করেন। ইদানিং ছোট ছবি টেম্পারায় আঁকছেন। সহজ পরিচিত সকলের চেয়ে তাঁর সরল ছবি বিশেষভাবে চিহ্নিত ও প্রশংসিত হচ্ছে।

আনন্দ আশ্রম ছবিতে উত্তম।শর্মিলা

সিনেমা

আনন্দ আশ্রম

কিছুদিন আগে প্রায় একই টিম এবং আইডিয়া (প্রথমে বাংলা পরে হিন্দী) নিয়ে পরিচালক শক্তি সামন্ত 'অমানুষ' করেছিলেন। সে-ছবির অমানুষিক সাফল্যই হয়ত এই নতুন ছবি 'আনন্দ আশ্রম'-এর অনুপ্রেরণা। এখন তিনি 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে...প্রবাদে বিশ্বাস রাখতে পারেন। কারণ, ঐ-ছবিও হিট।

হিট হবে নাই বা কেন। আনন্দ আশ্রমে আছে কালার। আছেন উত্তম-শর্মিলা। সেই সঙ্গে শক্তিবাবুর বিশেষ ফরমুলা। যদিও এর একটু হেরফের আছে। যেমন ছবিতে ভিলেন নেই। নেই মারপিট। তাহলেও যা আছে তাতে গরিষ্ঠ দর্শকের মন ভরবে। কারণ শক্তিবাবু জানেন, কি কি কারণে দর্শককে আনন্দ দেওয়া যায়। অর্থাৎ কোনোরকমে একটা আদর্শকে (এখানে 'ডাক্তার গ্রামে চলো') খাড়া করে ছবির প্রথম হাফে সবকিছুর জট পাকানো এবং পরের হাফে সেই জট ছাড়ানো। এ-ব্যাপারে তিনি নিজের এবং প্রযোজকের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। কোনোরকম গোঁজামিল নেই। একদম ব্যবসায়িক এবং স্ট্রেট। তিনি জানেন শর্মিলা যতই গরিব হোন তাঁকে ভালভাবে সাজাতেই হবে। আর উত্তম-কুমারকে এখনও দর্শকরা সবে লেখাপড়া শেষ করা যুবক বলে মেনে নেবে।

এবার ছবির কথায় আসা যাক। তিন-পুরুষের ঘটনা। উত্তমকুমার মধ্যম। ওপরে অশোককুমার। নীচে রাকেশ। এঁরা সকলেই যে যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। অর্থাৎ উত্তম-শর্মিলাকে। রাকেশ-মৌসুমীকে। বাবা চেয়েছেন ছেলেকে বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করিয়ে এনে গ্রামের সেবায় লাগাতে। একটা আশ্রম করতে। এ-সবই সফল হয়েছে। কেবল সফল হননি ছবির মেক-আপম্যান। তবে তাঁরই বা দোষ কী। উত্তমকুমারকে সদ্য ডাক্তারী পাশ করা যুবকে পরিণত করা কি সোজা কথা। আবার সেইরকম যুবক—যিনি জেট স্পীডে প্রেম করেন। গান করেন হাত-পা ছুঁড়ে। পরের দিকে অবশ্য তিনি চশমা আর অল্প গোঁফ-দাড়ির কাজ ভালই করেছেন। তবে খেয়াল করে পাকা চুলকে বর্জন করেছেন। কারণ, সব পাকা চুল বসাতে হয়েছে অশোককুমারের মাথায়।

ছবিতে সেবা এবং আদর্শকে নিয়েই ঢাক পেটানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে উত্তমের মত আদর্শ চরিত্রের কাছ থেকে ছেলেকে হাতছাড়া করা আর ছেলের কাছে নিজের পরিচয় গোপন করার ব্যাপারটা কিরকম যেন। অন্যদিকে পরিচালক মেলোড্রামার কাজটাও কিছুমাত্র কমাননি। ধরা যাক শেষের দিকের পর পর কয়েকটি দৃশ্যের কথা। যেখানে উত্তমকুমার আর থাকতে না পেরে ছেলের বৌভাতে আশীর্বাদ করতে এলেন। চোরের মত ছেলে-বৌকে উঁকি মেরে দেখলেন। লুকিয়ে বাবাকে ফলো করলেন। আর 'বাবা' বলে ডেকে ফেললেন এমন সময় যখন বাবা অশোককুমার পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলছিলেন। অতঃপর পালাতে গিয়ে সকলের মুখো-মুখি। অপর একটি হল শর্মিলার বাবার মৃত্যুদৃশ্য। বেশি নাটকীয়। ঐ দৃশ্যের বিশেষত্ব—শর্মিলার হাতে কিছু সময় নিয়ে কাঁদা। আর একেবারে শেষ দৃশ্যের তো কোনো জবাব নেই। যেখানে শর্মিলা (শহীদ?) বেদিতে শ্বশুর অশোককুমার এসে হাত বোলাচ্ছেন।

উত্তম, শর্মিলা, অনিতা, মৌসুমী, অশোককুমার, অসিত সেন, রাকেশ এবং উৎপল দত্ত—এঁরা সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। টেকনিকাল কাজও (বিশেষ করে ক্যামেরা) বেশ ভাল। তুলনায় সংগীত তেমন জমেনি।

শেষে আর একটি দৃশ্যের কথা—ট্রেন আসছে। আপ না ডাউন তা নিয়ে ছোট-উত্তম ও ছোট-শর্মিলার মধ্যে বাজি। ফ্ল্যাশব্যাকের ঘটনা। পরে ঐ ঘটনারই দু-দুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবারে বাজি জিতে মা শর্মিলা বাবা উত্তমের পিঠে কিলের বদলে চুমু খেয়েছেন। দ্বিতীয়-বারে ছেলে রাকেশ মৌসুমীকে খেয়েছেন সেই একই জিনিস। ধরে নেওয়া যায়, বংশপরম্পরায় ধরে ওই পরিবারের পুত্র-বধূরা তাঁদের স্বামীদের পিঠে ওইরকম বিশেষ ভঙ্গিমায় চুমু খেয়ে থাকেন। অভিনব আইডিয়া। যা হয়ত এসেছে বিবিধ ভারতীর সেই তেলের বিজ্ঞাপন থেকে। মা যেখানে চুল বেঁধে দিতে দিতে মেয়েকে তার দিদিমার একরাশ কালো চুলের কথা গল্প করছেন আর বলছেন—আমার মাও আমাকে এমনি করে.....

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

বাঙালী হোটেলমালিক এবং বোর্ডার-দের নিয়ে তোলা যে ছবিগুলো এর আগে আমাদের ভালো লেগেছে, তার মধ্যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এবং 'শেষ পর্যন্ত'র কথাই বিশেষ মনে পড়ে। এবারের ছবি 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস'। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী নিয়ে তোলা এ-ছবিও মোটামুটি ঘরোয়া এবং আন্তরিক।

পান্থপাদপ হোটেলের মালিক হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। বোর্ডাররা যাঁর কাছে ঠাকুর-দেবতার মত। মাঝেমধ্যে কিছু কুকুরও জেটে বৈকি। যাই হোক, কাহিনী ঘিরে উঠেছে তাঁর মেয়ে সন্ধ্যা রায় এবং বড়লোকের ছেলে বোর্ডার রঞ্জিৎ মল্লিককে নিয়ে। অনেক বাধাবিপত্তি এলেও অবশেষে তাঁরা মিলেছেন। এর জন্য অবশ্য ছায়া দেবীকে মরতে হয়েছে। তবু পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। কারণ, তিনি একেবারে ফরমুলামাফিক দুয়ে-দুয়ে চার করেননি। চারের আভাস দিয়েছেন। কিছু দৃশ্যপরিকল্পনাও সুন্দর। যেমন এক জায়গায় সন্ধ্যার মনের অবস্থা বোঝান হয়েছে শুধুমাত্র ক্যারামবোর্ড আর রুমাল দেখিয়ে। কোনো একটি মুহূর্তে বোর্ডার-দের রাগ ফোটান হয়েছে ঠোঁটের কোণে-

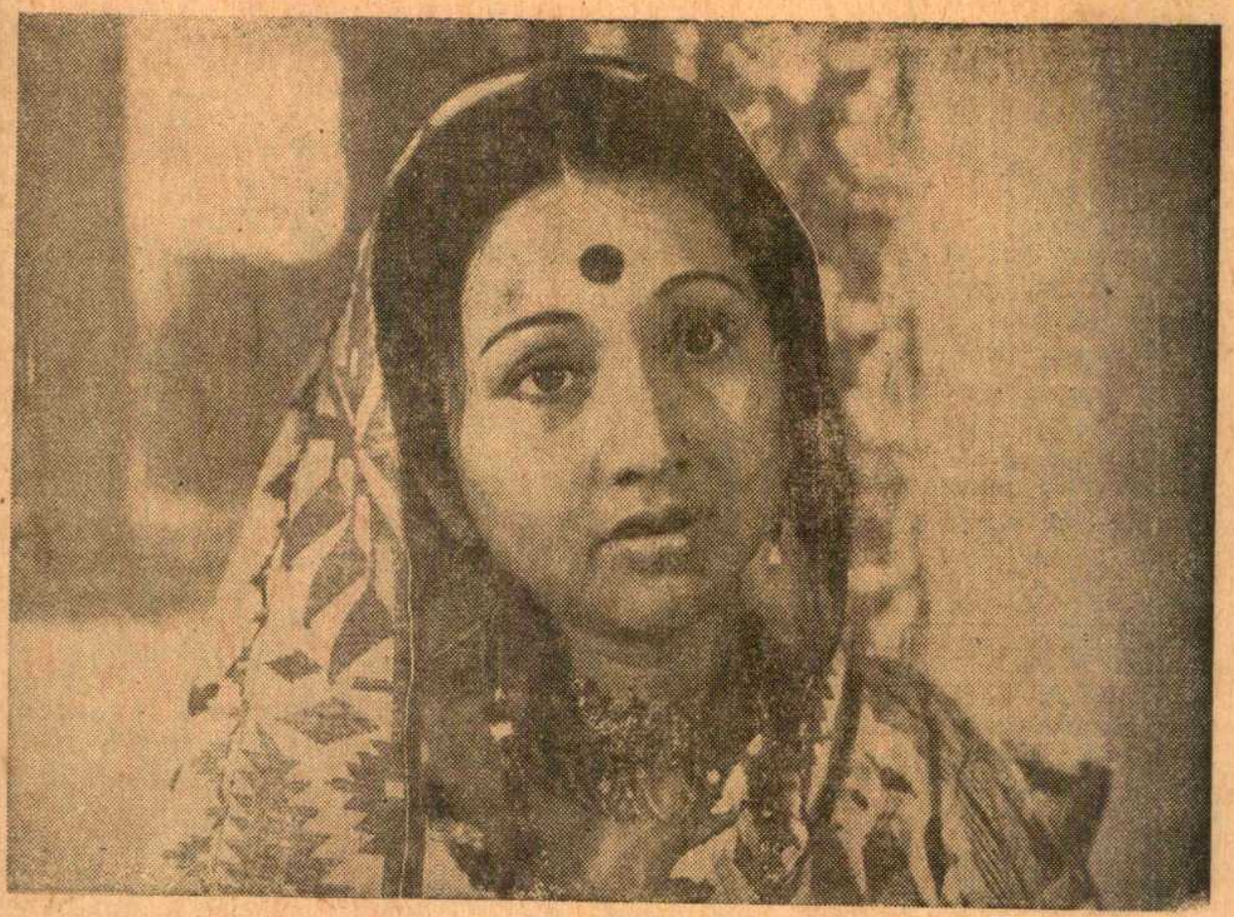

আপে। আরেকটি দৃশ্যও অভিনব, যেখানে পার্শ্ব-নায়িকা আয়নায় নিজের মুখে বসন্তরাগের চিহ্ন কল্পনা করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। এইরকম আরও কিছু আছে। যেমন ছায়া দেবীর গান গাইবার দৃশ্যের শট কমপোজিশন। ক্যামেরার সামনে থেকে গাড়ি চলে যাবার পর মিডলং শটে সন্ধ্যা রায়ের উচ্ছ্বাস।

তবে ছবিতে কিছু কাঁচা ব্যাপারও রয়ে গেছে। যেমন ছবি শুরু হয়েছে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে। মারো রঞ্জিৎ মল্লিক অকারণ প্রমিনেন্স পেয়েছেন। আবার শেষে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছেন ছায়া দেবী। কোনো একটি দৃশ্যে চোরকে টাকাকড়ি, ঘড়ি, চাকরি দিয়ে নায়ক হঠাৎ মহাপুরুষ বনে গিয়েছেন। আর এক জায়গায় সুব্রত সেন ও ফ্যামিলির চারপাশে স্যুটিং দেখবার জন্য জনতা ভিড় করেছে। তবে চলতি বছরে বাংলা ছবির যা বহর, সেই তুলনায় এ-ছবি কিছুটা ভাল।

দলগতভাবে অভিনয়ে প্রত্যেকেই কুশলী। তবু মান অনুসারে শিল্পীদের তিন ভাগে সাজান চলে। প্রথম ভাগে রয়েছেন একা অনবদ্য ছায়া দেবী। দ্বিতীয় ভাগে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, সুমিত্রা, শোভা সেন ও অনুপকুমার। আর শেষের ভাগের শিল্পীরা হলেন—রঞ্জিৎ মল্লিক, বিপ্লব চ্যাটার্জি, তপতী ব্যানার্জি, বনানী, সুলতা, সিপ্রা মিত্র এবং সন্ধ্যা রায়। রাজেন সরকারের সংগীত কিছু জায়গায় ভাল লেগেছে। যেমন জনৈকা বোর্ডারের বিদায় দৃশ্যের নেপথ্যে আহীর ভৈঁরোর সুর। ফটো দেখবার সময় হঠাৎ আবহ থেমে যাওয়া। 'আমি তোমার সঙ্গে' রবীন্দ্রসংগীতটির অভিনব ব্যবহার। বিশেষ করে পরের বারে (কণ্ঠ—হেমন্ত, সুচিত্রা ও সুমিত্রা)। এছাড়া আরতি মুখোপাধ্যায়ের ভজনটিও শুনতে বেশ ভাল লাগে।

চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা আর একটু ভাল হলে ছবি আরও জমত।

অসিতবরণ মিত্র

প্রণয় বাসু চ্যাটার্জীর স্টাইলে

জনজীবন থেকে মুখ সরিয়ে যখন কোন শিল্পী মানবমানবীর শুধু জোলো প্রেমপর্ব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে 'পলায়নী' আখ্যা দিলে অন্যায় হবে না নিশ্চয়ই। উপরন্তু সেই শিল্পীর যদি শিল্প-মাধ্যমটির ওপর দখলী ক্ষমতা ঈর্ষাজনক হয়, তাহলে তাঁকে আজও কিছু বিশেষণে বিভূষিত করাও যেতে পারে।

রজনীগন্ধা, ছোটিসি বাত, চিতচোর—পূর্বেকার এই তিনটি ছবিতেই পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি প্রমাণ করে দিয়েছেন, দর্শকের চোখ ভোলাতে তিনি পি সি সরকার, কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির দরজায় যেতে অপারগ। সুতরাং তাঁর নতুন সৃষ্টি 'প্রিয়তমা' বাঞ্ছিত পথে একই সরলরেখায় এগিয়েছে। দর্শকের মস্তিষ্ককে বোধহয় তিনি এই আকার বাজারে আর পীড়িত করতে চান না। ক্ষণিকের চোখ ভোলানো-তেই তিনি সন্তুষ্ট।

এবং সেজন্যই তিনি জীতেন্দ্র-নীতু সিং-কে এক অস্বাভাবিক ও অসামাজিক মানসিক টানাপোড়েনে কাটাতে বাধ্য করেছেন। প্রেমের আরেক নাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলেই আমরা জানি। সেই প্রেম করে বিয়ে হবার পরও দুজনের মধ্যে এত মিস্‌আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেন? তাও প্রায় বিনা অজুহাতে। বহিরঙ্গের ত্রুটিগুলোও সুপাচ্য নয়।

টি ভি-র প্রোডিউসার রবিকে কর্ম-ক্ষেত্রে প্রতিবারই কতগুলো ফাইল দেখা ছাড়া কোনো কাজ করতে দেখা গেল না। বারোশ টাকা মাইনের চাকুরের স্ত্রী যেসব অড ডিজাইনের জামাকাপড় পরেছে, তা বোম্বাইয়ের মত শহরে কি করে সম্ভব বাসুবাবুই বলতে পারেন।

জীতেন্দ্র আর নীতুর মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি তার কারণটা এত অযৌক্তিক কেন? শ্বশুরমশাই উৎপল দত্তের বুদ্ধি ও ব্যবস্থায় জীতেন্দ্র-নীতু শেষ মুহূর্তে অবশ্যই মিলিত হয়েছে, হতেই হবে। নইলে আর ছবি করা কেন! কিন্তু

দর্শকের চোখ আর কানকে এত পীড়া দেওয়া কি উচিত? কে কে মহাজনের ফটোগ্রাফী চোখকে আরাম দেয়, সম্পাদনার কাজও তারিফ করব। কিন্তু এতসব আয়োজন যদি শুধু মাত্র একটি সুদৃশ্য অন্ধবিম্ব প্রসব করেই ক্ষান্ত হয়, তাহলে?

আসল গলতিটা দৃষ্টিভঙ্গিতে। জীবন সম্পর্কে অগভীর চেতনা, ফিল্ম নিয়ে পুতুল খেলার মানসিকতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি পরিচালক। কিংবা এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত জীবনবিমুখ চেতনা থেকেও এ-ধরনের নির্বীজ সৃষ্টির জন্ম হতে পারে। কোনটা এক্ষেত্রে সত্যি? কারণ, ফিল্ম দর্শকের একাংশ এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—'সব শিল্পসৃষ্টিই কোন-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেই।' এ-ধরনের ছবি তো এক জাতের অফিম।

নির্লিপ্ত ঘর

কেন এই ছবি

নায়িকার গান শুনে নায়ক দৌড়ে এল আর প্রেমে পড়ে গেল—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ছক আজো হিন্দি ছবিতে প্রবহমান। 'ডিম্পল' তার একটি সামান্য উদাহরণ। এ-জাতীয় ছবিতে সাধারণতঃ যা থাকে, যেমন রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, নায়ক-নায়িকার গান, ভিলেনী, খুন ইত্যাদির সবকিছুই এখানে উপস্থিত। অনুপস্থিত কেবল একটি নিটোল গল্প ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা। ক্যামেরা, সম্পাদনা ও গান ছবির গল্পের মতোই স্থূল। আজিকের নামে পরিচালক বিজয় সিংহ কোথাও কোথাও এমন কিছু চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যা তাঁর নির্বুদ্ধিতাকে আরো বেশি প্রকট দেয়।

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

দেবব্রত দত্ত প্রণীত

সঙ্গীত সহায়িকা

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—৬-৫০ ও ১২-০০—উচ্চাঙ্গ)
(তৃতীয় খণ্ড—৭-০০—রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)

সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত সুধাকর, প্রাচীন কলাকেন্দ্র এবং অন্যান্য উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত সহায়ক পুস্তক।

সম্ভ্রান্ত বাদ্যযন্ত্র ও গ্রন্থালয়ে পাওয়া যাইবে।

দে বুক স্টোর ফোন : ৩৪-৫০৩৫
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

প্রকাশক—**ব্রতী প্রকাশনী**
৪৯।৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

শ্রেয়সী ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য

নাটক

হবো ইতিহাস

চতুরঙ্গ'র সাম্প্রতিক নাটক 'হবো ইতিহাস'-এর নায়ক দন্ডীরামের ঠাকুর্দার জমিজিরেত শোষকের গ্রাসে গিয়েছিল, আর তার সর্বস্বান্ত বাপকে চোর ধরার পুলিশের চাকরি নিতে হয়েছিল। কিন্তু ছেলে দন্ডীরাম বাপ বা ঠাকুর্দা, কারুই মেজাজ পায় নি। প্রথম জীবনে ঠ্যাঙাড়ে হয়ে বহু খুন খারাপী করে, পরবর্তী জীবনে বিধবা বোনের সহযোগিতায় বাড়ি বসেই মদ চোলাই করত। সেই দন্ডীরাম পরে লোভের বশবর্তী হয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে শোষকের হাতের শিকার হয়ে পড়লো। তার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সে যে সব কিলবী কাজ করল, 'হবো ইতিহাস' তারই নাটক।

এ নাটকে অনেক চরিত্র। তারা সবাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মানসিকতার বা রিপুর প্রতিনিধিত্ব করেছে। নাটকের উপস্থাপনা সুন্দর, বলার কথার মধ্যেও কিছুটা ঋজুতা আছে, অভিনয়ও অনেকেরই সুন্দর, কিন্তু যে গল্পের মাধ্যমে সে সব প্রকাশ করা হয়েছে (নাট্যকার সুদের) সেটা কতদূর বাস্তব এবং যুক্তিগ্রাহ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

একজন খুনীকে নিয়ে অসাধারণ নাটক হতে পারে, কিন্তু মদ চোলাইকারী লোককে সাধারণ শোষিত মানুষের প্রতিনিধি ভাবতে একটু সংকোচই হয়, যুক্তির খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে সে অবস্থায় বেকারত্ব এবং সমাজের (?) অবহেলার শিকার, তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, আর কোন পেশা কি দন্ডীরামকে দিয়ে (এবং সেই সঙ্গে তার বোন) করানো যেতো না? শোষক এবং শোষিত তো আমাদের জীবনে প্রতি স্তরেই আছে। আমরা

জীবনের এবং যুক্তির আরো কাছাকাছি নাটক চাই। এবং চতুরঙ্গর মত দল সে আশা পূরণ করতেও সক্ষম বলে বিশ্বাস করি।

এ নাটকে অভিনয় কম বেশী সবারই ভাল। দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ-সঙ্গীতের বৈচিত্র্য ঐ নাটকের পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হাতিবাগানের নাটক

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার জন্ম একদা হাতিবাগানসহ সমগ্র উত্তর কোলকাতায়। হাতিবাগান বাংলা নাটকের ছিল জাতুরঘর। এই এলাকায় এবং এই এলাকার আশে পাশে বহু রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। হাতিবাগানে জন্ম নটকেশরী অমর দত্ত ও অভিনেত্রী বিনোদিনীর। উত্তর কোলকাতায় যে নাটকের বীজ পোঁতা হয়েছিল একদিন, তা অংকুরিত হয়েছিল বহু নট্যধারীর সমতা লালনে। আজও এখানে নাটক হয়—তবে নাটক নয়, নাটকের ব্যবসা।

হাতিবাগান পাড়াটা আজ কোলকাতার অন্যতম প্রমোদ তীর্থ। শুনেছি এখানে কোন নবাবের শখের হাতিশালা ছিল। আজ সেই নবাব নেই, হাতিও নেই। কিন্তু নবাবের ছদ্মবেশে কোনো কোনো ব্যবসায়ী নাট্যমঞ্চে ঢুকে পড়ে শখের নাট্যশালা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং নাটক থেমে নেই। নাটক হচ্ছে। হাতিবাগান নামক প্রমোদ তীর্থে মানুষ উপচে পড়ে বাংলা নাটকে সিনেমা কিংবা সিনেমা-নাটক দেখছে। দর্শক দর্শক এই চলছে। ম্যাটিনি ইভনিং হাউসফুল। হাততালি পড়ছেই; নাটক ফাটক নাকি হচ্ছেই।

শিল্প মাধ্যমগুলির মধ্যে নাটকই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া দর্শককে কেন্দ্র করে যেহেতু নাটকের প্রতি, নাটক নামক শিল্পের প্রতি একটি দায়িত্ব থেকেই যায়। কিন্তু হাতিবাগানের নাট্যশালায় কিছু ভদ্রলোক ব্যবসায়ী পুঁজি পড়ে নাটককে সরাসরি পণ্য করে ফেলেছেন। বাণিজ্যিক নাটক করছেন পেশাদারী মঞ্চে সুতরাং নাটক নিয়ে ব্যবসা করতেই পারেন। টিকিট বেচলেই তো তা ব্যবসার মধ্যে পড়ে। কিন্তু ঐ নাটকের ব্যবসায়ীরা স্টার, বিশ্বরূপা, আরকাডিয়া, রঙ্গনা, বয়েজ ওন হলে, মিনার্ভায় যে হুল্লোড়কে বিক্রী করছেন তাকে কোন অভিধায় নাটক বলবো? মঞ্চে পর্দা তুলে সংলাপ চালালেই নাটক হয় না। মনে রাখতে হবে গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ী এঁরাও পেশাদারী অভিনয় করেছেন। কিন্তু নাটককে বিকৃতি ও বিকৃত করে দেননি।

এই মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চগুলি মঞ্চরঙ্গে পরিণত। নাটকের নামে চলেছে অনাটকের ফাটকা বাজার। হাতিবাগানের তাবৎ রঙ্গমঞ্চে ব্যাওসার জাল ছড়ানো। এইসব রঙ্গমঞ্চ আজ সিনেমা আর্টিস্টদের পার্ট-টাইম রুজি-রোজগার। আমোদের সব ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। নাটক হয়ে উঠেছে বিচিত্রানুষ্ঠান। ভাঁড়ামো, ক্যাবারে নৃত্য, গান, মেলোড্রামা, যোগব্যায়াম, তবলা লহড়া, আলোর তুবড়ি যা চাই আপনার সবই চোখের সামনে হাজির। এইসব রঙ্গমঞ্চগুলির নাট্য ব্যবসায়ীরা যাচ্ছেতাই কাহিনীকে যাচ্ছেতাইভাবে নাট্যরূপ দিয়ে প্যানপ্যানানি প্রেমের মেলোড্রামা দেখিয়ে যাচ্ছেন, সস্তায় মিস এ বি সি ডি ক্যাবারে নৃত্য দেখিয়ে দিচ্ছেন। এবং অবশেষে ক্যাবারে নর্তকীও নায়িকা হন এইসব মঞ্চেই।

বহ্নি জ্বলে না, অগ্নিবন্যা শুধুই হয় আলোর তুবড়ি। কড়ি দিয়ে কিনে দর্শক কি কেনেন তিনিই জানেন না, সম্রাট কেঁদে ওঠে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে। এখানে জীবনের কোন বক্তব্য থাকে না। শুধু বড় বড় বুলি আউড়ে যায় ঠোঁটস্থ করে অভিনেতাগণ। নাট্য ব্যবসায়ী মানুষটি কখনো নামে কখনো বেনামে নির্দেশনা দেন নাটকের। মঞ্চ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না—তবে কিনা ডেকরেটর চেয়ার আনিয়ে মূল্যবান আসনের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে যান। মঞ্চ সংলগ্ন গন্ধাগারের বিষয় এঁরা ভাবেন না যতটা ভাবেন চাইনিজ ফুড বিষয়ক ব্যাপার স্যাপার। পুরোদস্তুর এরাই বেচেন শাড়ি পোশাক সাইড বিজনেস হিসেবে। অথচ এরাই নাটকের বিশেষ রীতি প্রবর্তকের দাবী করেন, পাবলিক থিয়েটার নিয়ে বক্তৃতা দেন।

এইভাবে হাতীবাগান নাটকের পাড়া এখন জমে মল্লে রয়েছে। ভীড় হচ্ছে বা হচ্ছে না, তিনমাস আগে বুক হচ্ছে বা হচ্ছে না, তবে নাটক ফাটক হচ্ছেই। ব্যবসায়ীরা এখন নাটক ফাটক করছেন। শিল্পের বা খসিয়ে উল্লাস করতে এদের লজ্জা নেই। স্টেজ সেটিং ব্যাপারে এখন এঁরা চিরায়ত সাজানো দৃশ্যসজ্জা ভাবেন। জমনা দৃশ্যসজ্জা ও জমনা আলোর মধ্যে অভিনয়ের দাপাদাপি চলে। কাহিনীতে প্রেম থাকবেই, সেক্স থাকবেই, চুটকী ভাঁড়ামি থাকবেই। আদর্শের বুলি উড়িয়ে বক্তৃতা থাকবেই। দর্শকদের সম্পর্কে এই নাট্য ব্যবসায়ীরা বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। কারণ দর্শকদের ঝোপ বুঝে কোপ মারতে এঁরা জানেন এবং দর্শকরাও অক্লান্তভাবে এই-সব গ্রহণে কার্পণ্য করেন না। সুতরাং অতঃকিম্ এভাবেই চলছে চলবে। সবশেষে একটা কথা—আমরা যতদিন না সচেতন হবো আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে শিল্পের নাম করে এঁরা পয়সা লুটবেন এবং নাটককে বিবস্ত্র করে ছাড়বেন।

—সন্দীপ দত্ত

দস্যু রত্নাকর পালায় ফিরোজাবালা এবং নির্মল নাগ

নীলাম

১২সি, রাসেল স্ট্রীটে যখন পৌঁছই, [illegible]শে নীলাম শুরু হয়ে গেছে। নীলামদার—মডার্ন একসচেঞ্জ। দিনটি রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর। উঁচু প্ল্যাটফর্মে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে আছেন নীলামদার। টেবিলে উঠেছে মেরুন রঙের একটা ট্র্যাভেলিং সুটকেস। বেশ ঝকমকে। দেখে লোভ হয়। ডাক উঠে চলেছে। সানগ্লাস খুলে এক যুবক হাঁকলেন, একশো আশি। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে দুশো। দুশো দশ, তিরিশ—এভাবে বাড়তেই ঐ যুবক 'দুশো পঞ্চাশ' হেঁকে হাঁফ ছাড়লেন। আশপাশে তাকিয়ে দেখলেন, সবাই চুপ। উনি উঠে গিয়ে সুটকেসটি নিজের জিনিসের মতোই হাল্কা হাতে নেড়ে দেখলেন।

[illegible] চারিদিকে লোকজন বসে-দাঁড়িয়ে [illegible]ছেন। মহিলারা রুমাল হাতে মাঝে মাঝে [illegible] মুছছেন। চুড়ি ও শাড়ির শব্দে, সিগারেটের ধোঁয়ায় বেশ একটা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায়। এর মাঝে একমাত্র নীলামদারই হাল্কা চালে কথা বলছেন; মাঝে মাঝে টুকরো রসিকতাও শোনা যায়।

ব্লেড ও রেগুলেটারসহ দুটি পুরোনো সিলিং ফ্যান যখন নীলামে উঠল, নীলামদার প্রত্যেকের মুখ দেখে নিয়ে বললেন, 'কত বলবো, চল্লিশ?' পান চিবোতে চিবোতে এক রোগা অবাঙালী ফ্যানের বিবর্ণতা দেখে হেসে বললেন, 'বিশ।' নীলামদার, 'না, পাঁচ টাকা বেশী। পঁচিশ। বলুন, পঁচিশ। দুটি ফ্যান সঙ্গে রেগুলেটার। সেলের দামও বেশী। বলুন কেউ' বলে নীলাম শুরু করলেন। সেই ফ্যান দুটা অবাঙালী ভদ্রলোকটি পুরো চারশো পঞ্চাশ টাকায় [illegible] আগের মতোই হাসলেন। ততক্ষণে তাঁর চুলে অনেকবার আঙুল চলেছে। মাথা এলোমেলো।

কোম্পানির একজনের সঙ্গে কথা হল। সাঁইত্রিশ বছরের পুরোনো এই দোকান। দুঃখ করে বললেন, 'সাহেবরা নেই, দেশীয় রাজা-জমিদারদের অবস্থাও খারাপ। কী করে চলে, বলুন? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জোরেই এই ব্যবসা এখন চলছে, কারো গায়ের জোরে নয়। তবে, আগেকার মতো দামী জিনিস এখন আর এ-বাজারে আসে না।

এইমাত্র বিক্রী হল একটা ডাইনিং টেবিলসহ ছ'টা চেয়ার। ডাক উঠেছিল, সাড়ে [illegible]শো। এক বাঙালী ভদ্রলোক নিয়েছেন। [illegible] সিগারেট খাচ্ছেন তিনি। ওটা কতো নম্বর সিগারেট? একটা বিদেশী আয়নার ড্রেসিং টেবিলও উনি কিনলেন মাত্র দেড়শো টাকায়।

তারপর একটা তিন খণ্ডের সোফা সেট নীলামে উঠতেই ভাবলাম, উনিই কি নেবেন? নীলামদার ততক্ষণে পাল্টে গেছে। অন্য একজন এসে বসলেন প্লাটফর্মের ওপর। গলা ঝেড়ে শুরু করলেন, 'একেবারে নতুন, দুশো পঞ্চাশ, টু-ফিফটি, নতুন সোফা সেট।' আশ্চর্য, তিনিই ডাকলেন, দুশো সত্তর! একটা কিওরিও ক্যাবিনেটের পাশ থেকে এক মহিলা হাঁকলেন 'তিনশো।' তিনশো কুড়ি, চল্লিশ, সত্তর, চারশো, চারশো কুড়ি, এভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। 'চারশো তিরিশ' বলে ভদ্রমহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সারা দোকান চুপচাপ। অনেকেই ঘন ঘন সিগারেট টানছেন। হঠাৎ বাঙালী ভদ্রলোকটি উঠে সোফা সেটটা খুঁটিয়ে দেখলেন। জোরে থাপ্পর মারলেন একবার। নীলামদার ওদিকে হাঁকছেন 'চারশো তিরিশ, এনি মোর?' ভদ্রলোক সোজা দাঁড়িয়ে বললেন 'ফোর ফিফটি।' ক্রেতাদের নিঃস্তব্ধতার মাঝখানে চারশো পঞ্চাশ টাকায় ওটা তাঁরই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

একরাম আলি

নৃত্যের আসরে

ভারতবর্ষের এক ছোট্ট অঙ্গরাজ্যের নাম মণিপুর। যেখানকার কালচার সুপ্রাচীন। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে বিদেশী কালচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—সেখানে মণিপুর রাজ্যের মানুষেরা বিদেশী কালচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের আপন ঐতিহ্য সযত্নে লালন করেছেন। অন্যান্য রাজ্যের মানুষের মনের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন। সৌন্দর্যপ্রধান এদের নৃত্য পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্গদা, ভানুসিংহের পদাবলীতে মণিপুরী স্টাইল এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। মণিপুরও আজ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত।

যেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটা বিস্ময়। সারা জীবন যিনি উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর অজস্র শিল্প-সাহিত্য। সেই রবীন্দ্রনাথ যাদের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত—তাদের নৃত্যাংশ উপলব্ধি করতে গিয়েছিলাম সম্প্রতি অবনমহলে। 'মণিপুরী নর্তনালয়' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। মণিপুরের উৎসবের সময় যে নৃত্য তারা পরিবেশন করেন, সেই নৃত্য দিয়েই এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শেষে ভানুসিংহের পদাবলী নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। গৌরী দত্তকে ধন্যবাদ। ছোটো ছোটো মেয়েদের এতো সুন্দর করে তৈরী করে নেওয়ার জন্যে। গোষ্ঠলীলাতে, 'কৃষ্ণ' ও বলরামের ভূমিকায় অপর্ণা ও কাকলি নাথের নৃত্য অনেক দিন মনে থাকবে। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে প্রত্যেকেই নিজস্ব নৃত্যপটুতা দেখিয়েছেন। কল্যাবতী দেবী, দীপা সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ মুখার্জী, সুজাতা মুখার্জী, মধুরা দাশগুপ্তের গান ভাল, বাদ্যযন্ত্রীরাও মন্দ নয়, আলোকসম্পাতের দিকে আরো নজর দেয়া উচিত ছিল। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি স্মরণযোগ্য অবশ্যই।

তরুণ চৌধুরী

শাপমোচন

গত ১২ অকটোবর, রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে সংস্কৃতি নিবেদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হল। প্রতিষ্ঠানটি নবীন এবং সদস্যরাও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। কোন কোন শিল্পীর সঙ্গীত মাধুর্য এবং নৃত্য-কুশলতা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য অরুণেশ্বরের ভূমিকায় ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পারদর্শিতা, কমলিকার ভূমিকায় মৌসুমী চক্রবর্তী ভাল অভিনয় করেছেন। সঙ্গীতাংশে তুম্বুর ভঞ্জ ও ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের গান প্রশংসনীয়। মধুশ্রী ও সৌরসেনের ভূমিকায় যথাক্রমে ঈশানী সেন ও চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ। উর্বশীর নৃত্যে তুহিনা মুখার্জী চলনসই। কমলিকার সখীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। সে তুলনায় সখাদের নাচ উপভোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ করে শেষার্ধ বেশ আকর্ষণীয়। আমরা এই নবীন প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানাই।

আমি কঙ্কাবতী বলছি

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে যেটি মূল্যবান, সৌন্দর্যচিন্তায় তার স্থান কম নয়। কারণ, এই পৃথিবীর আলোক, এই ঘাস, এই বহুবিধ রঙ শরীরের যে জানালা দিয়ে আমরা পান করি, তা নিজেই আশ্চর্য সুন্দর একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, আমি চোখের কথা বলছি। ব্যক্তিত্ব চোখে প্রতিফলিত হয়।

এবং বিপজ্জনকভাবে, আমাদের মনের কথা অজান্তেই ধরা পড়ে আমাদের দৃষ্টিতে। অপর ব্যক্তিটির হৃদয়ে কি খেলা করছে—বিরক্তি, না কি প্রেম, রাগ না দুঃখ না ঘৃণা, সামাজিক ভাষায় যেসব সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না, তার খাঁটি ও অবিকৃত উত্তর পাওয়া যায় চোখের ভাষায়। সেইজন্যই হয়তো নতুন মানুষের মুখমন্ডলে সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চোখ দুটি। চোখের স্বাস্থ্য তাই সৌন্দর্যচর্চার একটি প্রধান শর্ত।

বাঙালী মেয়ের বাদামী ত্বক আর গাঢ় বাদামি চোখ বিশ্ব সৌন্দর্যের খাতায় নিশ্চয়ই তুলনাবিরল। কিন্তু চশমার দু টুকরো গোলাকার কাঁচের তলায় সেই শ্রী অন্তর্হিত হলে সৌন্দর্যের আলো বড় ম্লান হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, চশমাচ্ছাদিত মুখশ্রীটি ঠেকে অতিরিক্ত কৃত্রিম। মেয়েলি দৃষ্টির যে রহস্যময়তা এতোদিন কবির চিত্ত ভরে রেখেছে, সামান্য দুটি কাঁচের নিচে তা হারিয়ে যাওয়াটা দুঃসংবাদ নয় কি? চশমা বিষয়ে সুন্দরীদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। না কন্ট্যাক্ট লেন্স বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত করছি না আমি। বলতে চাই চোখের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের কথা।

চশমা এড়াতে তো পারেনই, এমনকি বর্জনও করতে পারেন: এমন কথা বলেন ডাকতার হ্যারল্ড পেপার্ড তাঁর 'সাইট উইদাউট গ্লাসেজ' বই-এ। স্বচ্ছ দৃষ্টি বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, যাদের দুর্বল দৃষ্টি শকতি তাঁদের উচিত বার বার পলক ফেলা। সোজা বাংলায় যাকে বলে 'পিট পিট' করা, আরকি। এতে চোখ ধুয়ে যায়। আর ঝকঝকে হয় দৃষ্টি।

চোখে যে বিন্দুটি আসলে দেখবার কাজ করে চলেছে, তার আকার একটা আল পিনের ডগার চেয়ে বড় নয়। সুতরাং একসঙ্গে অনেকদূর অবধি দেখবার চেষ্টা করবেন না। দৃষ্টিকে একসঙ্গে অতিরিক্ত প্রসারিত করারচেষ্টা না করে (অর্থাৎ পারস্পেকটিভ না বাড়িয়ে) বস্তু বা দৃশ্যবিশেষের অংশের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করুন। চোখের মণি যেন হয়সচল ও সহজ। কটমট করে তাকাবার এই অভ্যেসটি পরিত্যাগ করতে হবে।

পড়ার সময়ে হাতের বইটি কিভাবে ধরা আপনার অভ্যাস? কতখানি আলোতে আপনি পড়েন, আলোটি কোথায় এবং কেমনভাবে অবস্থিত? বই ও চোখের সঠিক দূরত্ব হলো পনেরো ইঞ্চি। বইটি ধরতে হবে আলোর নিচে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে সচেতনভাবে চোখকে আলগা, নরম করে এলিয়ে দিন। তা না হলে কিন্তু বন্ধ পাতার নীচে মণি দুটি প্যাট প্যাট করে তাকিয়েই থাকবে সারা রাত।

সূর্যের আলো চোখের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর। রোদ্দুর চোখকে একইসঙ্গে 'রিল্যাকস' ও 'স্টিমুলেট' করে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে দিনের ঝকঝকে রোদে বেরুলে আপনার চোখ ধাঁধা খায় ঠিকই, তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আপনার চোখ দুর্বল। চোখের দৃষ্টিবিন্দুটি আচমকা রোদে ছোটো হয়ে যায়। আকস্মিক আলোয় অভ্যস্ত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে ই বিন্দুটির। অনেক সময় প্রায় দু তিন মিনি অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোয় এসে প্র দু মিনিট, অর্থাৎ যতক্ষণ আপনার চোখের মণি তার সাইজ বদলাচ্ছে, ততোক্ষণ চোখের দৃষ্টি নিচু করে রাখলে বাড়িটা খেতে হয় না। চোখের পক্ষে এটা খুব ভালো।

আলো স্বাভাবিকভাবে সইয়ে নেবার বদলে আজকাল অনেকেই কালো চশমা ব্যবহর করেন। কালো চশমা চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। চোখকে শকতিশালী করার জন্য ডাকতার হ্যারল্ড পেপার্ড একটি প্রকিয়া দিয়েছেন। এটি নিয়মিত অভ্যাস করলে হয়তো কালো চশমার দরকার হবে না:

আলতো করে চোখের পাতা বন্ধ করুন। সূর্যের দিকে মুখ ঘোরান। চোখ বন্ধ অবস্থায় মাথা ধীরে এপাশ ওপাশে ঘোরান। চার পাঁচবার মাথা এ ওদিক করতে হবে। এক মিনিট এই ব্যায়াম করে চোখে সূর্যের তাপ কিছুটা সয়ে যাবে। এবার মাথাটি একপাশে ঘুরিয়ে রেখে এক মুহূর্তের জন্য চোখ খুলুন, সোজাসুজি সূর্যের দিকে না তাকিয়ে তাকান পাশ থেকে। কিছু দেখবার চেষ্টা করবেন না, চোখ খুলেই বন্ধ করতে হবে।

আত্মরক্ষার যত উপায় চোখে রয়েছে, তেমন আর কোনো ইন্দ্রিয়ে নেই। এইসব কলকব্জা ব্যবহার করতে যে শেখে একমাত্র সে—বালক রবীন্দ্রনাথের রাবচ্ছায়ার গানের নায়িকার মতো 'বয়ান খুলিয়া নয়ান তুলিয়া হাসিবে সুখের হাসি।'

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

গোপন কথা...?

আপনিও জানতে পারেন।

আমার নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে দু'ভাবে লাভ সুনিশ্চিত!
আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সি টি ডি, জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে টাকা লগ্নী করলে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
এই সবের মধ্যে, জীবন বীমা শুধু যে আপনার করের টাকা বাঁচাতে সাহায্য করে তা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি জীবন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই আপনার জন্য এক সম্পত্তি গড়ে তোলার গ্যারান্টী দেয়।
জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর সংক্রান্ত সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আপনার বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখা করুন না কেন?

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

PRATIBHA-LIC-1156/77 BEN.

সুগৃহিণীদের জন্য!

গুঁড়ো মশলার

কুকমী

১ কে.জি.'র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা • মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় • গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ • ফোন : ৩৩০৯৯৫ • পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ • ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 353

ফটো-কম্পোজ : এন. কে. গোয়েন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

15 NOV 1977

সম্পাদক—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ১৮ নভেম্বর ১৯৭৭ ৭৫ পয়সা

অমৃত

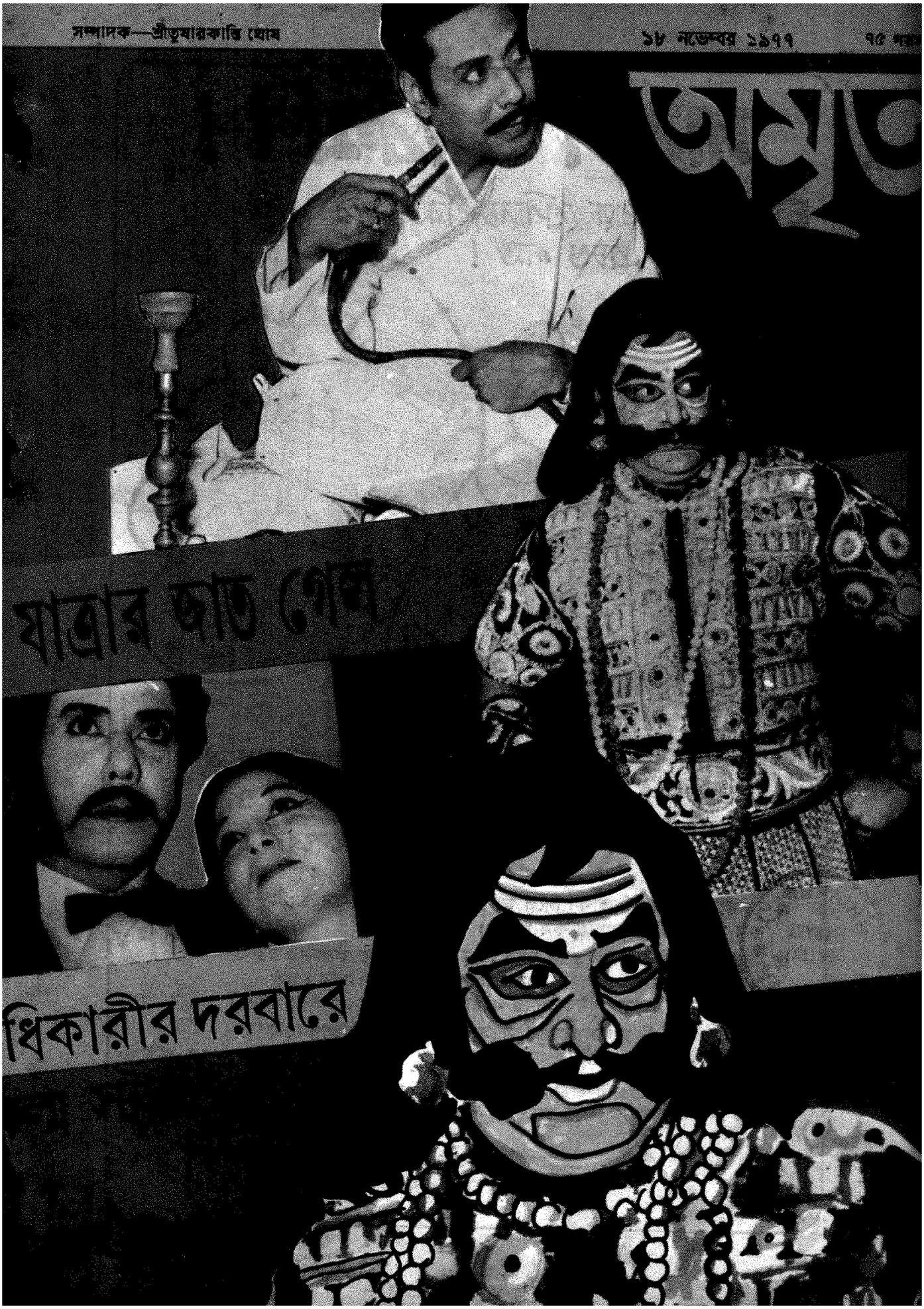

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

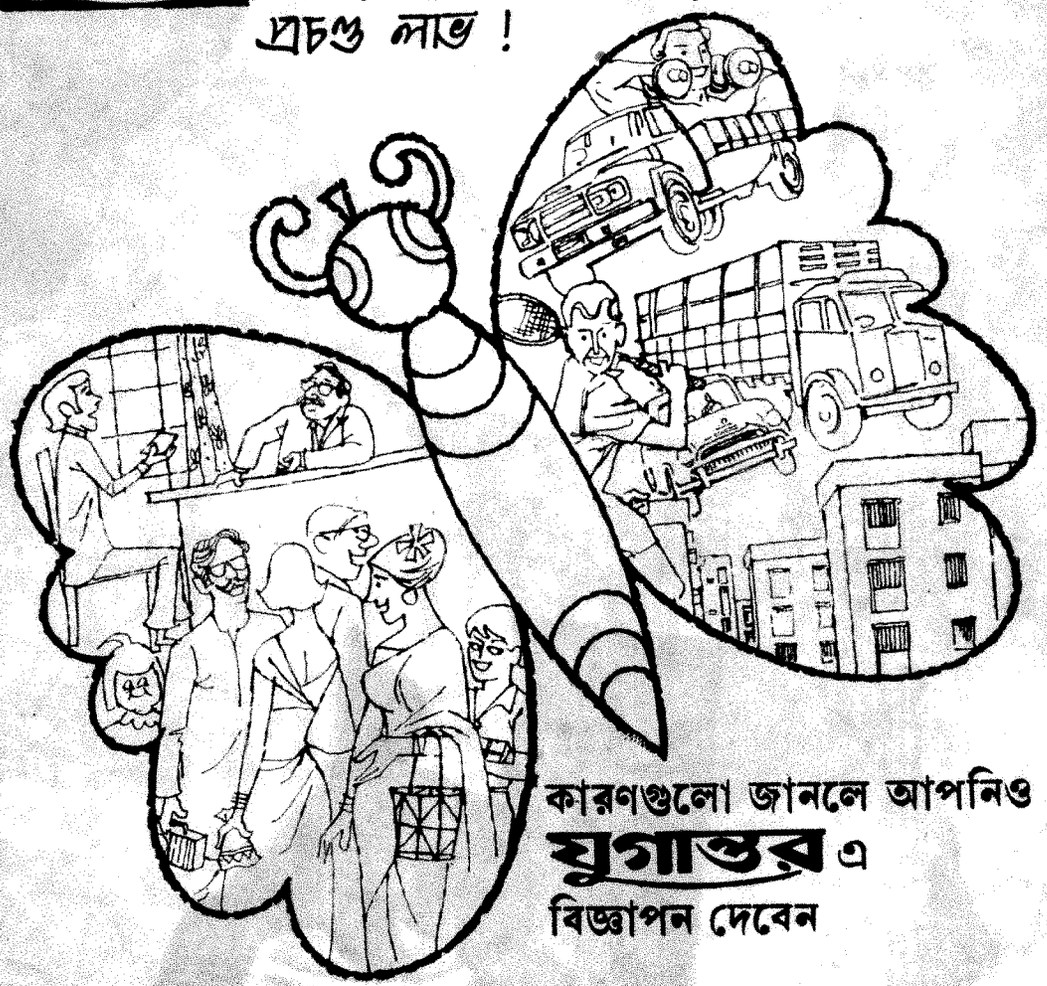

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাট্‌তি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-লরি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

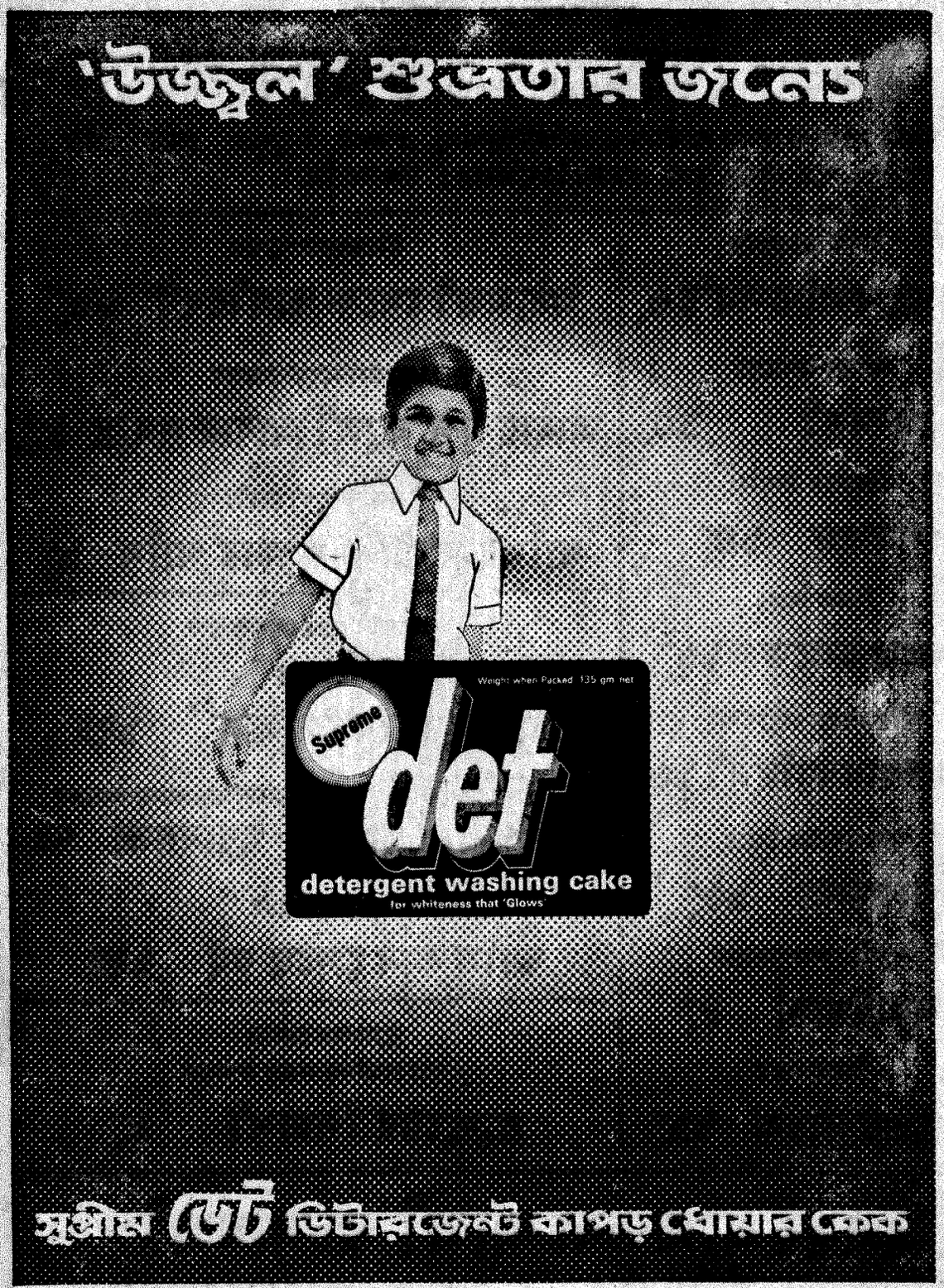

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়, কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

Shilpi-DM TA/76 Ben

অমৃত

১৭ বর্ষ
২৭ সংখ্যা
২ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
18th Nov. 1977

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ৪ বৈকুণ্ঠ পাঠক
সমালোচনা ৫
চিঠিপত্র ৯
মানুষ কেনাবেচার ইতিহাস ১১
বজ্রমোহন ভট্টাচার্য
গাড়ির পেছনে ঘোড়া জুতলে ১৬
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৭
মনোরঞ্জন বসু
মিসা ৭৩ / ২১ শ্যামল রায়
পাকদণ্ডী ২৫ লীলা মজুমদার

গল্প
গলির ভেতরের সেই মানুষটা ২৮
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
শিল্পীর কাগজপত্র এবং চিঠি ৩২
সন্দীপ সরকার

শব্দবৃক্ষ ৩৭ কবিতা সিংহ
প্রচ্ছদ কাহিনী ৩৮
যাত্রার জাত গেল
প্রভাতকুমার দাশ

কবিতা ৪৮
বীতশোক ভট্টাচার্য, আবদুশ শুকুর খান
ব্রততী বিশ্বাস, দিলীপ আচার্য
সুনীল দাশের ছবি ৪৯
বাংলা গান স্বল্পায়ু কেন ? ৫০
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
১০০ বছর আগে বানান সংস্কার ৫৩
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
বাঙলার বাইরে বাঙালী ৫৬
খেলা ৫৮
সিনেমা ৫৯
বিচিত্রা ৬২

আগামী সংখ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দেখেন নি
লিখেছেন গোপালচন্দ্র রায়
সমীর রক্ষিত
এবং বরুণ চৌধুরীর গল্প
প্রচ্ছদ কাহিনী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
লিখেছেন শচীন দাশ

এ সংখ্যায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়
ভিতরের ছবি ও অলংকরণ করেছেন
সুবোধ দাশগুপ্ত এবং অসিতবরণ কুণ্ডু

জাতীয় গ্রন্থাগারে 'নেই'-এর রাজত্ব

জাতীয় গ্রন্থাগারের বাগান ঘেরা বাড়ির পরিবেশটি বড় শান্ত, কিন্তু ভেতরে যা ঘটছে তাকে শান্তিপূর্ণ বলা চলে না। কেন্দ্রীয় সরকার '৭৬ সালের জুন মাসে একটি আইন পাশ করে গ্রন্থাগারটির জন্যে একজন ডিরেক্টারের পদ সৃষ্টি করেন। সেই অনুযায়ী এ বছর একজন ডিরেক্টার এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনে আরো যেসব ব্যবস্থা ছিল তার রূপায়ণ ঘটেনি. কিম্বা অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যবস্থারও আশা দেখা যাচ্ছে না। ফলে গ্রন্থাগারটির প্রায় এখন দ'এ মজার মতো অবস্থা।

অব্যবস্থার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এখন সব দিকেই। উঁচু থেকে নিচু প্রায় সমস্ত স্তরেই রীতিমত একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা, তাই দুর্নীতির সুযোগ এখানে এন্তার। স্বয়ং ডিরেক্টারের অভিযোগ থেকেই জানা যায়, বেশ কিছুকাল ধরে নাকি শখানেক লোক গ্রন্থাগারের মূল্যবান দলিল ও নথিপত্র নকল করে বাইরে পাচার করছিল, এবং এইভাবে দু পয়সা রোজগার করে নিচ্ছিল। না বললেও চলে, এই শেষোক্ত ব্যাপারে ভেতরের কোনো কোনো ব্যক্তিও নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকত না, নয়তো একাজ সম্ভবই হত না।

শুনতে অবাক লাগে, জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক নেই সাড়ে ছ' বছর ধরে। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সমাজের শেষ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপ্তি কিছু কম নয়। এহেন একটি দেশে এত দীর্ঘকাল ধরে এমন একটি পদের জন্যে যোগ্য লোক পাওয়া যায় নি তা বিশ্বাস করা শক্ত।

তাছাড়া সহকারী গ্রন্থাগারিক আছেন দুজন, অথচ পদ রয়েছে পাঁচজনের। অর্থাৎ এখানেও তিনজন যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটেছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এত বড় একটি গ্রন্থাগারের প্রশাসকের পদও শূন্য পড়ে রয়েছে এক বছর ধরে। প্রশাসনিক ব্যাপারে এই ধরনের অন্ধকারময় পরিস্থিতির পর বইপত্রের দিকে তাকালেও খুব যে একটা আলোর আভাস পাওয়া যায় এমন নয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এর দাম ৫০ কোটি টাকা। বইগুলি ঠিকমতো বাঁধাইও করা হয় না। বছরে যেখানে ১০ হাজার বই বাঁধানো দরকার, বরাদ্দ আছে মাত্র এক হাজার বই বাঁধানোর। পত্র-পত্রিকাগুলি তো যত্রতত্র ছড়ানো-ছিটানো। সেগুলি ভালো করে বাঁধানো বা তালিকাভুক্ত করা হয় না। তাছাড়া মূল্যবান বইপত্রও ভালো করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি না দেন, একদিন হয়তো দেখা যাবে সর্বব্যাপী এই 'নেই'-এর ছোঁয়াচে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও 'নেই' হয়ে গেছে।

নিশুতি রাতে বিকেলের দাগ

বয়স হয়ে গেছে—আজকাল ঘুম ভেঙে যায় রাত তিনটেয়। তখন জানালা দিয়ে ওই পাকা ধানের হলুদ মাঠখানা জ্যোৎস্নায় ধরা পড়ে। হাত দিয়ে তুড়ি বাজাই। ধানখোর টিয়ার ঝাঁক উড়ে গিয়ে গাছে বসে। তখন বৈকুণ্ঠবাবু—আমার মনে হয়, সবে বিকেলবেলা। আসলে কিন্তু নিশুতিরাত। জ্যোৎস্নাকে বিরক্ত করার কেউ নেই। চার-চারটে কুকুর—হালের বলদ আর গাইবাছুর যে-যার মত গাছপালায় বাতাসের সরসর শব্দ শোনে। আমি তো কানে শুনতে পাই না। তাই ওদের মুখ দেখে মনে হয়—ওরা ওদের হারানো কথা ভাবছে। আপনি যেখানটায় বসে আছেন—ওখানে এক-একদিন সারগল বসে গান গাইতেন। বাবা হাতে তালি দিতেন। পৃথিবীরাজ কাপুর ডায়লগ শোনাতেন। বাবা বলতেন, না-না পৃথিব, ও-জায়গাটা এরকম হবে। বলেই বাবা নিজে সে-ডায়লগ রিপিট করতেন।

স্থান : কলকাতার বাইরে গাছপালায় ঢেকা বিশাল এক বাগানবাড়ি। কাল : এই নভেম্বরের একটি অলস দুপুর। পাত্র : একদা ভারতবিখ্যাত ছায়াছবির স্বর্গত সুদর্শন নায়কের এখন বয়স্ক পুত্র। শ্রোতা : বৈকুণ্ঠ। তাছাড়া উপস্থিত : দুটি অ্যালসেসিয়ান ও দুটি ল্যাব্রাডর কুকুর। একটি দুধেল গাই ও তার ইঞ্জেকশনের বাছুর। চারটি হালের বলদ। পাঁচটি জামরুল গাছ। নয়টি রাজহাঁস ও দুই একর প্রমাণ একটি প্রাচীন পারিবারিক দীঘি।

দূরে পাঁচ রাস্তায় বাসের টায়ারে অলস বিজবিজ শব্দ। সামনে শীত। স্মৃতিভুক ঘাটের কাছাকাছি একজন মানুষের সামনে বসে আছি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিয়ে করেননি কেন?

আমাদের ব্যাচে অনেকেই করেনি। আজ রাজপুতানা, কাল রেঙ্গুন—এই করে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝে বাবার সিনেমা দেখতাম। থিয়েটার দেখতাম। হরিশ্চন্দ্র হরিশ্চন্দ্র। শ্মশানের সিনে মশালের আলো। বাবার সেকি ম্যাজেস্টিক দাঁড়ানো। পাণ্ডবগৌরবে বাবা সাজতেন মধ্যম পাণ্ডব। পি ভবলু ডি-তে মিস্টার সেন।

ওই মাদী কুকুরটার নাম রেখেছিলাম ক্লিওপেট্রা। সর্টে ডাকি ক্লিয়ো। কিন্তু ধান ভানতে এসে ভানকি মেয়েরা ওকে সবল করে ডাকে কিলো। বৈকুণ্ঠের সামনেই একজন ভানকি মেয়ে এসে বৃদ্ধ অ্যালসেসিয়ান রজার্সকে ডাকল—রজাব খাবেন চলুন। আমরা খেতে বসে দেখলাম রজার্সদের শূন্য থালা পড়ে আছে। চারখানি কলাইয়ের বগিথালা। তাতে মোটা মোটা আই আর এইট ভাত। আর হাড়ের টুকরো।

চাষীবাড়ির একটি বালককে দেখলাম এই স্মৃতিভুক মানুষটির নয়নের মণি। পেছনে ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। পাশেই ঢেঁকিঘর। এককোণে একটি তরুণ কাঁঠালচারা। বেলা তিনটে হবে। গাছে উঠে বালকটি ডাল নাড়াচ্ছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের এই মানুষটি তাকে সধ্য প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। আসলে অবিবাহিত পুরুষের বাৎসল্য ঝরে পড়ছিল।

কলকাতায় ওঁর সহোদরদের স্থায়ী ব্যবসা ও একাধিক পাকা বাড়ি। উনি নিজে ওখানে একটি চাষী বালকের দাদু হয়ে থাকতে ভালবাসছেন। বাতাসে ধান সেদ্ধর গন্ধ। নিজের হাতে নানা গাছের কলম বসিয়েছেন। ছোট পুকুরের বড় মাছকে এনে বড় পুকুরে দিচ্ছেন। বই খুলে গাঁয়ের লোকদের চিকিৎসা করে থাকেন। খেজুর পাতার খোলপে পেতে জামরুল-তলায় শুয়ে থাকেন। মাথার কাছে ও হেনরী আর সলবেলো—পাশেই নর্সির কৌটো। সামনে দাঁড়ানো গরুটার নাম দিয়েছেন মাণ্ডু। কারণ তাব শিং জোড়া মাণ্ডুসম্রাটের গোঁটের মত বাঁকানো।

এই অব্দি লিখে এখন থেমে আছি। এরকম একটি চরিত্রকে নিয়ে গল্প লিখে স্বচ্ছন্দে নাম দেওয়া যায়—বাজার বাগান। কিংবা বাগানের রাজা। বাৎসল্য, ঔদসীন্য, অনাসক্তি, প্রকৃতি-প্রেম, প্রজ্ঞা—সব জিনিসেরই চিহ্ন এই মানুষটির ভেতর আছে। নিজের জীবন ব্যয় করে ইনি মানুষকে, গাছপালাকে পশুপাখিকে ভালবাসতে গিয়েছেন। নিশুতি রাতে বিকেলবেলার চিহ্ন দেখতে পান।

ওঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়। যায় গল্প লেখা। উপন্যাসও যায়। তার চেয়ে অনেক ভালো—ওঁর সঙ্গে সময় কাটানো।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সত্যজিৎ রায় লিখতে থাকুন

গত ১৫।৭ তারিখের অমৃত পত্রিকাতে প্রকাশিত দীপাবলী সেনের সত্যজিৎ রায়ের লেখা এই তথ্যসম্বলিত নিবন্ধ ভাল লাগলো।

চিত্রজগত থেকে চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় [illegible] সাহিত্যে তাঁর সুনামের

সত্যজিৎ রায় গুণী মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা প্রদর্শন সাহিত্যে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

দীপাবলী সেন সত্যজিৎ-এর কয়েকটি লেখা নিয়ে বলেছেন, অবশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ-এর সাহিত্যে পরিণত মূল্যায়ন আছে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে সত্যজিৎ-এর সত গল্প

। সায়েন্স্ ফিক্শন্ উনি এত

তাঁর লেখা গল্পগুলো পড়লেই মনে হয়

প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে তাঁর যেসব পরিণত-টুকরো অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সত্যজিতের নিজস্ব সাহিত্যিক চরিত্র তাৎপর্যের সত্যজিৎ রায়ের লেখার মধ্যে, বিশেষ করে ছোটদের জন্য লেখাতে, জন্মগত প্রতিভার পরিচয় বরঞ্চ, সুকুমার রায় এবং উপেন্দ্রকিশোরের লেখাকে ভুলভাবে অনুসরণ করে। তিনি বেশ আত্মতুষ্টির সাথে তাঁদেরকে করেছেন। সাহিত্য সবার মধ্যে থাকে না। লিখলেই যদি সাহিত্যিক হোত, তাহলে পৃথিবীর সবাই একজন দিকপাল হোত।

প্রচারের প্রয়োজন হয় যখন কোন কিছুর নিম্নমান সবাই গ্রহণ করতে।

জন্য। সত্যজিৎ রায় সিনেমা-শিল্প নিয়ে তাঁর বোঝা উচিত যে রক্ত-মাংসেগড়া মানুষের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা সব জন্যে সাধনা করতে হয়। যেমন, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুখলতা রাও প্রভৃতিরা শিশু-সাহিত্যে সাধনা করেছিলেন।

এই লেখা না ছাপলেও দুঃখিত হবো না। কারণ, আমার কোন বক্তব্য অমৃতে প্রকাশ করে না। সেটা তার দোষ নয়—কারণ, অমৃততে প্রচুর চামচের আমদানি হোয়েছে। বিতর্ক চাই না। সময় এলেই অমৃত সম্পাদক বুঝবেন। সত্যজিৎ রায় লিখতে থাকুন, কারণ, তাঁর হবে লেখার মধ্য দিয়ে। দীপাবলী সেনকে বিনীত অনুরোধ জানাই যে তিনি যেন পুনর্বার সত্যজিৎ-এর লেখা গুলো আবার নতুন করে পড়েন। নিছক সময় কাটানোর জন্য নয়—লেখককে বুঝতে গেলে তাঁর লেখাগুলো বারবার পড়তে হয়। তাঁর বোঝা উচিত, সমালোচনা আর প্রচার এক নয়।

দিব্যেন্দু দত্ত

সমালোচনা

ছাপাখানা যখন এল : শ্রীপান্থ
প্রকাশক : বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন
দাম ১৮-০০

খৃস্টাব্দ ১৭৭৮। একটি অবিস্মরণীয় সাল। হেস্টিংস তখন গভর্ণর-জেনারেল। রাজকার্যের সুবিধের জন্যে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড নামে এক সাহেব তখন একটি বই লিখলেন। বইটি ঐখানেই ছাপবার দায়িত্ব নিলেন আরেক সাহেব—সংস্কৃত পণ্ডিত এবং হলহেডের বন্ধু উইলকিনস্। সহকারী হিসেবে পেলেন পঞ্চানন কর্মকারের মত এক অসাধারণ কারিগর। এই দুই প্রতিভার মিলনে ঘটল যুগান্তকারী এক ঘটনা, হল এক অসাধ্য সাধন। হুগলি থেকে বেরুল প্রথম ছাপা বই—বাংলা ব্যাকরণ।

'যে দেশে ছাপার কর্ম চালিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপ সভ্য বলা যায় না।' এটি সেকালের খবরের কাগজ থেকে একটি উদ্ধৃতি। কথা কটির তাৎপর্য একটু খতিয়ে দেখা যাক।

ছাপার 'কল' আবিষ্কৃত হবার আগে বই, পুঁথিপত্র ইত্যাদি হাতে লেখা হত। স্বভাবতঃই সংখ্যায় হত মাত্র কয়েকটি—রাজারাজরা, যাদকদের পাতে পড়ত। সাধারণ মানুষও দৈবাৎ ভাগ পেত। গুটেনবার্গ ১৪৫২ সালে চলমান হরফ-এর সাহায্যে যখন প্রথম বাইবেল ছাপলেন তখন তাঁর মুদ্রণ কলটি থেকে বেরুল অল্প সময়ে, একই সঙ্গে, একাধিক বই। ঘরে ঘরে পৌঁছল বাইবেল। এই আবিষ্কারের ফলে, কিছুকালের মধ্যেই বেরুল অন্যান্য বিষয়ের বই—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল—আরো কত কি। মুদ্রিত বই-এর মাধ্যমে শুধু ধর্মের প্রচারই হল না, হল মানুষের জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির প্রসার। এক কথায়, সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি, হল মানসিক দিগন্তে এক নতুন সূর্যের উদয়। তার আলোয় কুসুমিত হল মানুষের অন্তরের গভীরতম গোপন কথা।

হুগলিতে ছাপা হলহেড সাহেবের ছাপা বইটি আমাদের, অর্থাৎ বাঙ্গালীদের কাছে, গুইটেনবার্গ বাইবেলের মতই, একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। আমরা যখন খবরের কাগজ কিম্বা বইপত্র পড়ি, তখন একবারও কি ভাবি যে এটি কিভাবে 'তৈরী' হল? এবং ছাপাখানা না থাকলে আমাদের কি অসুবিধে হত? ভাবলে আতঙ্কে উঠতে হয়। জন্মাবধি ছাপা বই, পুঁথিপত্র সহজেই পেয়ে আসছি বলে আমরা ধরেই নিই যে, এ সব সাবান তেলের মত আবহমানকাল থেকে তৈরী হয়ে আসছে। কথাটি যে আদৌ সত্যি নয়, শ্রীপান্থ রচিত 'যখন ছাপাখানা এল' বইটি তার জ্বলজ্বলামান প্রমাণ। এমন একটি বই-

ছাপার কথা

এর আবির্ভাবও একটা মহত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ ইতিপূর্বে এই বাংলায় এমন বই প্রকাশিত হয় নি। যাক বইটির কথায় পরে আসছি।

পূর্বোক্ত প্রশ্ন দুটির জের টেনে বলি যে, বই কিম্বা খবরের কাগজ কিভাবে ছাপা হয়, ছাপার অক্ষরগুলো কোত্থেকে এল, কে বানাল। লাইন ব্লক হাফটোন ব্লক, লাইনো, মোনো—এসবের মানে কি? লেটার প্রেস, অফসেট বলতেই বা কি বোঝায়। শতকরা পাঁচজন লোকেদেরও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

প্রতি বছর, আমার সুদীর্ঘ দিনের কর্মস্থল যাদবপুরের ইনস্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ভর্তি হবার সময়, হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট এমন কি বি-এ, বি-এস-সি পাশ করা ছেলেদের এই সব প্রশ্ন করে দেখেছি। নিরানব্বুইজনেরই এ সব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

শ্রীপান্থ লিখিত যখন ছাপাখানা বইটিতে এ সবের সরাসরি কোন জবাব নেই। থাকবারও কথা নয়। কিন্তু যাঁরা মনোযোগ দিয়ে বইখানি পড়বেন তাঁরা, এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে যে নিতান্তই কৌতূহলী এবং আগ্রহী হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বটতলার একটি রঙীন কাঠ খোদাই। ব্লকে ছবি ছাপার পর এসব চিত্রে রঙ দেওয়া হতো।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A

GRAMMAR

OF THE

BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হলহেডের ব্যাকরণের নামপত্র। প্রকাশ কাল ১৭৭৮—স্থান : হুগলী

যখন ছাপাখানা এল বইটি বাংলার মুদ্রণ শিল্পের চমৎকার একটি ইতিহাস। তার রোমাঞ্চকর বিবর্তনের কাহিনীটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একটি সরস রূপকথার গল্প পড়ছি। যেমনি লেখার স্টাইল, তেমনি ঘটনা প্রবাহের নাটকীয় উন্মোচন। একটি তথ্য সমৃদ্ধ এবং আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক বিষয়কে পাঠকদের সামনে এভাবে পরিবেশন করার শ্রীপান্থের বাহাদুরী প্রথম সারির কাহিনী-কারদের চাইতে কম কিসের! নীচের উদ্ধৃতিটি পড়ে দেখুন।

....শ্রীরামপুরের মিশনারীর কোল-ব্রুককে ধরে পড়লেন—আমরা পঞ্চাননকে চাই। দাবি নয়, কাতর আবেদন। আবেদনের পর আবেদন। কিন্তু কোলব্রুক অনড়। শ্রীরামপুর থেকে সাহেবরা তখন সরাসরি চিঠি লিখলেন পঞ্চাননের কাছে। চিঠির বক্তব্য—তোমাকে বেশী মাইনে দেব পালিয়ে এসো। কিন্তু এবারে পঞ্চাননের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। কেরী বাধ্য হয়েই আবার কোলব্রুকের শরণাপন্ন হলেন। এবার তাঁর আবেদন—আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। অনুগ্রহ করে অন্তত দিন কয়েকের জন্য পঞ্চাননকে ছাড়ুন। কোলব্রুক এবার আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি পঞ্চাননকে কদিনের জন্যে ছুটি দিলেন। বললেন—একবার শ্রীরামপুর ঘুরে এস। সেই যাওয়াই অগস্ত্য যাত্রা। পঞ্চাননের আর ফেরা হল না শ্রীরামপুর থেকে। কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে মুক্ত করতে। তিনি ভারত সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন। কিন্তু কেরীও ওদিকে দিনেমার সরকারকে নামিয়েছেন আসরে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক লড়াই এক বাঙ্গালী কারিগরকে নিয়ে। কেরীর সওয়াল ছিল নাকি—কলকাতার ইংরেজদের কোন অধিকার নেই এমন একজন কারিগরের ওপর একচ্ছত্র অধিকার বহাল করেন। মনোপলি চলবে না, এই ছিল নাকি তাঁর স্লোগান।

ভাষার চমৎকারিত্ব ত আছেই। তাছাড়া আছে কাব্যিক প্রতিমা—ইংরিজিতে আমরা যাকে বলি পোয়েটিক ইমেজারি। যেমন—কেরী যে কাঠের ছাপাখানাটি নিয়ে বাংলা-দেশের সিমিত হৃদপিণ্ডে হঠাৎ সেদিন স্পন্দন বাড়িয়ে তুলেছিলেন।' কিম্বা 'এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই যে, আমাদের মুদ্রণ এবং প্রকাশন শিল্পের ইতিহাসে শ্রীরামপুর এক আলোক মিনারের মত।' পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এসব লাইন।

বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটিতে বাংলায় ছাপাখানা আসার ইতিহাস। দ্বিতীয়টিতে আছে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু খবরাখবর। শেষোক্তটিতে এখানকার ছাপা-খানার উদ্ভব সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের প্রাচুর্য। গ্রন্থকার বই-এর শুরুতেই বলে-ছেন,....যথার্থ গবেষক বলতে যা বোঝায়—আমি ঠিক তা নই। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে আমার যোগ্যতাও সীমাবদ্ধ।' দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়ে গ্রন্থকারের এ উক্তিটি মেনে নেওয়া কঠিন। সংখ্যায় পৃষ্ঠা (১৩৬ পাতার টেক্সট) কম হলেও বহু দিনের অধ্যাবসায়, মুদ্রণ শিল্পে প্রীতি এবং চিন্তার যোগফল।

তাছাড়াও বইটিতে আছে ৪৪ পাতার ছবি, আর্ট পেপারে ছাপা। বাংলা হরফের বিবর্তন থেকে নিয়ে সেকালের খবরের কাগজ, বই-এর পৃষ্ঠা এবং কাঠ ও মেটালে খোদিত পুরানো নানা বই-এর ব্লক। টেক্সট এবং ছবি—এ দু-এরই ছাপা পরিচ্ছন্ন এবং ঝকঝকে। পূর্ণেন্দু পত্রীকৃত মলাট, ডাস্ট-জ্যাকেট এবং সজ্জা বইটির চাক্ষুষমান বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি করেছে। হলহেড মুদ্রিত, বাংলা ব্যাকরণের পর বাংলা মুদ্রণ শিল্প অবিকল ইউরোপ আমেরিকার মত না হলেও, অনেকটাই যে এগিয়ে গেছে, শ্রীপান্থ রচিত, যখন ছাপাখানা এল' তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। বইটি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রণিধানযোগ্য। স্কুল-কেলেজের লাইব্রেরীর পক্ষে অবশ্য সংগ্রহনীয়।

পরিতোষ সেন

অন্য হিলারী

Nothing Venture, Nothing Win — Edmund Hillary Corronet Books
Price Rs. 18.00

পুজোয় যখন আমরা কেউ রাঁচী বা কেউ পুরী বড়জোর দার্জিলিং বা দক্ষিণ ভারতী বাবার তোড়জোগড় করছি হিলারি তখন পাড়ি দিলেন গঙ্গার উৎসমুখে—'সাগর থেকে স্বর্গ' অভিযানে। দুঃসাহসী হিলারি। এই আটদশকেও কেমন আটাশের মত টগবগে, প্রণোচ্ছল ও ক্লান্তিহীন। হিলারি মানেই যেন পাহাড়—উঁচু, তুষারবৃত, দুর্লঙ্ঘ্য; আবার হিলারি মানেই সাফল্য—স্থির, শ্রমসাধ্য ও সার্থক।

গত মাসখানেক ধরে সংবাদপত্রে হিলারির এই অভিযানের জন্য ধারাবাহিক

সংবাদ যখন আমাদের সদাকৌতূহলী করে রেখেছে, তখন তাঁর আত্মজীবনীর পেপার-ব্যাক সংস্করণটির কলকাতার বাজারে আত্ম-প্রকাশ আমার মত ঘরকুনোর কাছে প্রায় হিমালয় অভিযানের মত উত্তেজক। এবং বলাই বাহুল্য যে বইটির লেখক যখন হিলারি তখন তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করতে হয়। ছোট্ট কুড়ি লাইনের ভূমিকা থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় এই বিশালায়তন নিউজিল্যান্ডবাসীর এক লাজুক, বিনয়ী অথচ দৃঢ় চরিত্রের, যা বইটির বাকী তিনশো সত্তর পাতা জুড়ে তাঁর অজস্র কাজের অভিজ্ঞানের ও সাফল্যের মধ্যেও কখনো সামান্য আত্মতৃপ্তিতে ম্লান হয় নি। হিলারি সদাজাগ্রত, সদাপ্রস্তুত। সর্বদাই নতুন নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত এবং সর্বদাই সচেতন এই ভেবে যে তিনি বোধহয় বড় বেশী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন বা পারি-বারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দে ডুবে যাচ্ছেন নিজেরই অজান্তে। বস্তুত প্রথম তিরিশ বছরের নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও পরের পঁচিশ বছরের অবিরাম দুঃসাহসী অভিযান ও আশ্চর্য সব কাজকর্মের পরেও (যেমন অভিযানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে কখনো এক দিনে পাঁচশো মাইল ভ্রমণ করে চারটি পর্যন্ত জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে) বই-এর শেষ বাক্যাংশ যখন

> "Yes there is plenty left to do".

তখন অমরা বিমূঢ় না হয়ে পারি না।

কেমন ছিল হিলারির শৈশব বা কৈশোর? কেমন ছিল তাঁর যৌবন আর প্রেম? কি ছিল তাঁর প্রেরণা, কোথায় পেয়েছিলেন সেই আগুন যা তাঁকে এমন-ভাবে দৌড় করাল পাহাড় থেকে পাহাড়, কিছুতেই স্থির হতে দিল না তার পরিবারে, তাঁর দেশ শান্ত নিউজিল্যান্ডে, যেখানে সূর্যের উষ্ণ আলো, হাওয়া আর মৌমাছিদের মধ্যে কেটেছে তাঁর শৈশব? কি সেই দুর্মদ নেশা যা তাঁকে কচিৎ কখনো-পাওয়া পারি-বারিক নিগ্রাম সুখ তুচ্ছ করে আবার নিয়ে যায় নতুন নতুন বিপদের মুখে, এন্টার্টিকার তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে অথবা হিমালয়ের গভীরে ইয়েতির সন্ধানে? এই সবই অত্যন্ত সহজ, সরল ও আন্তরিক ভঙ্গীতে লিখেছেন হিলারি তাঁর আত্মজীবনীতে।

বইটি পড়তে পড়তে আমার আর একজন অতিসফল মানুষের কথা মনে হচ্ছিল। তিনি মহম্মদ আলি—ভূতপূর্ব ক্যাসিয়াস ক্লে। হিলারির মত ক্লের শৈশবও সুখের ছিল না; কিন্তু দুজনের অসুখের কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অসম্ভব লাজুক, দুর্বল ও আত্মসচেতন বালক হিলারি যখন তাঁর বাবা বা স্কুল-শিক্ষকের কাছে শারীরিক শাস্তি পেয়ে অপমানে লাল হয়ে উঠেছেন, ক্লে তখন আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে স্বাধীনতার পূর্বাকাশ শুভ্র মার্কিন সমাজের দ্বারা

তেনজিং আর হিলারি

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন গাত্রবর্ণের অপরাধে। বালক হিলারির সমস্যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা, তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যা, তাঁর নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার সমস্যা। অন্যদিকে মহম্মদ আলীর সমস্যা ছিল আবহমান কালের সাদা-কালোর সমস্যা, সুবিচারের সমস্যা, মানুষের মত বাঁচার অধিকারের সমস্যা। তাই স্বভাবতই ক্লে হলেন উদ্ধত, গর্বিত ও বেপরোয়া এবং হিলারি হলেন দৃঢ়, বিনয়ী আর দুঃসাহসী। একজন বেছে নিলেন অন্য মানুষকে জয় করার জন্যে তাঁর বজ্রমুষ্টি অন্য জন প্রকৃতিকে বশ করলেন তাঁর দুর্জয় সাহস দিয়ে। আর উভয়ের যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা হল অধ্যবসায়, দৃঢ় সংকল্প ও সাফল্য। সাফল্যই একজনকে গর্বিত করেছে অন্যজনকে নম্র। তাই ক্লের আত্মজীবনীর নাম 'দি গ্রেটেস্ট' আর হিলারি তাঁর আত্ম-জীবনীর নাম রেখেছেন 'নাথিং ভেনচার্ড, নাথিং উইন।'

এক বোন আর এক ভাইয়ের মাঝখানে এডমন্ডের জন্ম হয় অকল্যান্ডে, ২০শে জুলাই ১৯১৯ সালে। মায়ের পরিবার ক্যার্কসরা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, বাবার পরিবার তেমন কিছু নয়। পিতামহ হিলারি ছিলেন বেশ দুঃসাহসিক ধরনের মানুষ তবে তাঁকে ঘিরে যে সব আজগুবি পারি-বারিক গল্প গড়ে উঠেছিল এডমন্ড তা সরল মনেই অবিশ্বাস করেছেন। কিন্তু এর প্রমাণ আছে যে তিনি ভারতবর্ষে এসে ঘড়ি তৈরীর ব্যবসায় বেশ পয়সা করে নিউজি-ল্যান্ডে ফিরে যান। যদিও সেই পয়সার সদ্ব্যবহার করতে না পারায় হিলারিদের অবস্থা কোনদিনই তেমন স্বচ্ছল ছিল না। অকল্যান্ড থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে তুয়াকাউতে ছিল হিলারিদের জায়গা-জমি সমেত বেশ বড়সড় একটি বাড়ি। বাবা ছিলেন পুরনো ধরনের মানুষ। কড়া, জেদী আর পরিশ্রমী। ছেলেদের মারধোর করায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু গল্প বলতে পারতেন অসাধারণ। সেই সব গল্প শিশু হিলারির মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে বড় হয়ে নিজের পালা যখন এল তখন তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েদের সেই সব গল্প বলেই ভুলিয়ে রাখতেন। আর ছিলেন মৌমাছি পালন ও মৌমাছি সংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনায় অত্যন্ত দক্ষ। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মনিপুণা ও স্নেহশীলা; গর্বিতাও কম ছিলেন না। হিলারি মায়ের কথা লিখেছেন গভীর মমতায়। এই রকম মা, বাবা, নিউজিল্যান্ডের আলো-হাওয়া ও মৌমাছিদের মধ্যে বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে কৈশোর কেটেছে হিলারির। নিঃসঙ্গ ছিলেন লাজুক ছিলেন বলে যা এখনো তাঁর হাসিতে ধরা পড়ে। তাই বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাবার রেলগাড়িই ছিল হিলারির জগৎ — তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন ও রোহেমিয়া। বই ছিল নিত্য সঙ্গী। প্রথম দিকে নানা দুঃসাহসিক অভিযানের বই কলেজে উঠে রূপান্তরিত হল ধর্ম, দর্শন ও নৃতত্ত্বে। কলেজে একটা সময় হিলারি বেশ আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠেন অবশ্য তা খুবই সাময়িক। কিন্তু কলেজে পড়া হল না বেশী দিন। মনে নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে কর্মহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়োজিত করলেন বাবার মৌমাছির ব্যবসায়। কি নির্ভার আর নিশ্চিন্ত জীবন ছিল তখন। পরিশ্রম, বই পড়া আর আলো-হাওয়া - মৌমাছি। হিলারি বারে বারে এই জীবনের কথা বলে-ছেন। বারে বারে ফিরে গেছেন। এমন কি পাহাড় অভিযানের পথে কোন শ্বাসরুদ্ধ-

কারী গ্লেয়িসারের ব'কে তাঁর মন চলে গেছে সেই মৌমাছি, মধু আর রোদের জগতে। ফলে হিলারির জীবনে এসেছে এক সার্থক পরিপূর্ণতা। তিনি দুই অভিযানের মাঝখানে যেমন বক্তৃতা দেশ ভ্রমণ ও আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলির সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করেন তেমনি সমানভাবে মনোযোগ দেন মৌমাছি ও সন্তান পালনে, গৃহ সংস্কারে এবং স্ত্রী। সর্বোপরি লুইসের জন্যে ভাবনা চিন্তা করে। হিলারির জীবনে লুইসের আত্মত্যাগ কিছু কম নয়। যদিও এভারেস্ট বিজয়ের পর সাতারাতি যখন হিলারির বিশ্ববিখ্যাত হন আত্মজীবনীতে তখনও এই মহিলা অনুপস্থিত পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও। হিলারি লাজুক স্বভাবই সম্ভবত তাঁকে সরিয়ে রেখেছিল আমাদের কাছ থেকে। তাই এভারেস্ট জয় করে দেশে ফিরেই দুম করে বিয়ে করার ঘটনাটি কয়েক লাইনে সেরে ফেলেছেন। এভারেস্ট জয়ের সঙ্গে রোমান্স মিশিয়ে যদিও তখনকার পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলি বেশ গরম হয়ে উঠেছিল কিন্তু আত্মজীবনীতে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। প্রেম জিনিসটি বিবাহোত্তর পর্বেই মনে হয় হিলারির জীবনে এল। বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা হিসেবে সারা ইউরোপ ও পরে আমেরিকা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন হিলারি। এবং জনসংযোগের প্রাবল্যে চাপা পড়ল তাঁদের নিভৃত দাম্পত্য জীবন। এই সবই লুইস গ্রহণ করেছেন হাসি মুখে।

এন্টার্টিকা অভিযানই (১৯৫৮) হিলারির জীবনে সবচেয়ে দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও ভয়ংকার। সেই বরফে ঢাকা বিশাল ভূখণ্ডে ট্র্যাকটর, স্লেজ, খাবার ও লোকজন ছাড়াও এক বিশাল কুকুর বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার বিবরণটি এতই নিখুঁত, বাহুল্যহীন ও রোমহর্ষক যে বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের ঘটনা বলে মনেই হয় না। এভারেস্ট বিজয় নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তা এন্টার্টিকার মত সর্ব অর্থেই ব্যাপক নয়। এভারেস্ট অভিযানের অংশটি শ্রম ও ক্লান্তি, বন্ধুতা, তিক্ততা আশা ও নিরাশার মিশ্রণে আশ্চর্য রকমের সুলিখিত। ইদানীং একমাত্র ক্রিস বনিংটন ছাড়া পাহাড়ের ওপর এত ভাল লেখা আর চোখে পড়ে না।

এর পরেও আরো অভিযান, আরো ভ্রমণ, আরো বক্তৃতা ও বই লেখা। নিস্তরঙ্গ নিউজিল্যান্ডের সেই লাজুক নিঃসঙ্গ বালকটির এখন আর এক মুহূর্তও সময় নেই স্বপ্ন দেখার। আসলে যে স্বপ্ন সে সমস্ত বাল্য ও কৈশোর ধরে দেখেছে এখন তাদের বাস্তবে রূপ দেবার সময়। ফলে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন হিলারি। এই সব কাজের অন্যতম হল শেরপাদের জন্যে স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী করা। যে শেরপারা তাঁকে এত সাহায্য করেছে, যাদের মধ্যে থেকে তিনি দিনের পর দিন এত আনন্দ পেয়েছেন, তার প্রতিদানে হিলারির মানবতা ঐ সব পাহাড়ী মানুষগুলির জন্যেও কিছু করতে চায়। তাই ১৯৬৬ সালে হিলারি শেরপাদের জন্যে একটি হাসপাতাল তৈরী করে। ছ সপ্তাহের উপভোগ্য শ্রমে হাসপাতালটি নির্মিত হল নিউজিল্যান্ডবাসীদের চাঁদায় ও ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানীর গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর সাহায্যে। জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটিও আত্মজীবনীতে একাধিকবার রয়েছে। এবং হিলারির জীবনী সে অভিজ্ঞতা সর্বদা খুব সুখের হয় নি। এভারেস্ট জয়ের পর হিলারি যখন নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ তখন এক অভিযানের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে হিলারি লেখেন

> Fund-raising proved the toughest part of the whole expedition.

একমাত্র বোধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারটি সব দেশেই সমান দুরূহ। তা সত্ত্বেও সরকারের চেয়ে জনসাধারণের ওপরই হিলারির আস্থা বেশী বলেই মনে হয়।

এই সুলিখিত বইটির প্রধান গুণ হল যে, পড়তে পড়তে হিলারিকে কখনোই অতিমানব বলে মনে হয় না। ফলে দুর্বল ও ঘরকুনোকেই সুউচ্চ হিমালয় বা সুদূর কুমেরুতে না হোক অন্তত একটা অভিযানের নেশার আমেজ এনে দেয়। আর আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক নানা হতাশা, দুঃখ ও বাধা-বিপত্তি সঙ্গে লড়াই করার জোর দেয়। আবার লেখার গুণেই হিলারি আমাদের বুঝতে দেন না কখন তিনি কৈশোর থেকে যৌবনে এসে পাহাড়কে ভালবেসে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে খুব ইঙ্গিতময় সব রসিকতা বা কবিত্বর ছোঁয়া একটানা বরফের মধ্যে হঠাৎ কোন পাহাড়ী ঝলমলে ফুলের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তেমনি তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা আমাদের মনে এসে লাগে যখন তিনি কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন নান দেশের বন্ধুদের অথবা তাদের ভালবাসার কথা। কিন্তু তেনজিং-হিলারির এভারেস্ট বিজয় পর্বের গাঢ় সম্পর্কটির উল্লেখ পরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আত্মজীবনীর শেষের দিকে হিলারি আবার শংকিত হয়ে পড়েন আত্মতৃপ্তির আশংকায়। তাই তিনি কখনো বিশ্রাম চান না এবং আমাদের জানান—

> "Finding new adventures has never been a problem in my life—the big difficulty is finding time to do them".

এটা শুধু লেখার কথা নয়। তার প্রমাণ এই আটান্ন বছর বয়সেও হিলারির দুঃসাহসিক 'সাগর থেকে স্বর্গ' অভিযান। এই অভিযানের ওপর লেখা আরো একটি সুখপাঠ্য বই-এর অপেক্ষায় আমরা সবাই রইলাম।

[illegible]

কবিতা

মাও সে তুঙের কবিতা সংগ্রহ। মানব মিত্র বুক মার্ক, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অনুবাদে কবিতার মূল রস প্রয়াশ থাকে না। তার ওপর অনুবাদ্য অনুবাদ হলে তো কথাই নেই। কবিতা আর হেঁয়ালির ফারাক বোঝা মুস্কিল হয়।

এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত মাও সে তুঙের কবিতার কোন বাংলা অনুবাদ গ্রন্থই মূলানুগ নয়। ইংরিজী থেকে ভাষান্তরিত। ফলে সাত নকলে আসল খাস্তা হয়েগেছে। বিষ্ণু দের অনুবাদও ব্যতিক্রম নয়।

আরো একটি সমস্যা আছে। কবিতার রস বোঝার জন্যে একটা বিশেষ ভূখণ্ডের ঐতিহ্য এবং সংস্কারের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূগোল এবং সংস্কৃতির ধারণা না থাকলে বাল্মীকী থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউই পাঠকের অনুভূতিতে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

মাও সে তুঙের কবিতা পড়ার সময় এই অজ্ঞতার কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। বিশাল চীন দেশ, সেখানকার আশী কোটি মানুষ, আড়াই লক্ষ বর্গমাইল আর হাজার বছরের ইতিহাস আত্মসাৎ করেই মাও বেঁচেছিলেন। সেই প্রখর অভিজ্ঞতা ও চেতনা তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দে ধরা আছে। চীনের মানুষ এবং পাঠকদের কাছে হয়তো সেগুলো প্রাঞ্জল, আকর্ষণীয়, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক যে কতটা বুঝবেন এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়।

মানব মিত্রের অনুবাদ সরল এবং সাবলীল। অনুবাদে পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার ছাপ আছে। কবির টীকা এবং অনুবাদকের টীকা দিয়েতিনি পাঠকের কষ্ট কমাতে চেয়েছেন। ছাপা, বাঁধাই ভাল। অলমরী অলো করবে।

শৈবাল মিত্র

মনশ্রী—ইন্দু দাঁ। প্রকাশিকা—শ্রীমতী মমতা দাঁ। ভদ্রকালী, হুগলী। আট টাকা।

সব কবিতা নয়, কিছু কিছু কবিতা, পুরোপুরি কাব্যিক মেজাজ বজায় রাখতে পেরেছে। কবির আসল এবং একমাত্র হাতিয়ারটি হল—যে তিনি সরল, দারুণ সহজ সরলভাবে কথা বলতে পারেন তাঁর কবিতায়। এই সহজ সরল ভঙ্গীটি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাব্যভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পর্শকারী প্রকাশ ঘটিয়েছে। তবে 'ক্যারে' 'সোমবারের সকাল', 'বাঙালীর প্রতি ভারতমাতার আবেদন'—এরকম বেশ কয়েকটিই কবিতা হয় নি 'পদ্য' হয়েছে। মানে কাঁচা হয়েছে। এগুলো সংকলনে ঠাঁই না পেলেই ভাল হত।

গৌতম ভট্টাচার্য

চিঠিপত্র

গ্যালারী "এ"

১৯৭৫ সাল থেকে চৌরঙ্গী মনোহর দাস তড়াগের পাশে (ওয়াই এম সি এ-র উল্টো-দিকে) রঙীন গম্বুজে উন্মুক্ত চিত্রপ্রদর্শনী এবং কবিশিল্পী সাহিত্যিকদের কবি সভা বা আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। চলমান শিল্প আয়োজিত এই উন্মুক্ত প্রদর্শনীশালাকে চলমান শিল্পের পক্ষ থেকে নাম দেয়া হয়েছে গ্যালারী 'এ'। গত প্রায় তিন বছরে যে অসংখ্য শিল্পী চিত্রপ্রদর্শনী করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রামকিঙ্কর বৈজ, পরিতোষ সেন, সুনীলমাধব সেন, রথীন মৈত্র ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের বহু তরুণ প্রবীণ লেখকেরা এখানে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশা করেন। দর্শকেরাও সহজভাবে এখানে এসে খোলামনে ছবি দেখতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পসংস্কৃতির প্রসার ও আধুনিকমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার পথে চলমান শিল্পের গ্যালারী 'এ'র প্রচেষ্টা সমস্ত সাধারণ মানুষ ও সংবাদপত্রের উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করেছে। বর্তমানে ভূগর্ভ রেলের প্রকল্প অনুযায়ী ঐ গম্বুজ ঘিরে ফেলার আয়োজন হচ্ছে। যার ফলে লেখক ও শিল্পী-দের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা বর্তমান মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এই অবস্থায় কলকাতার সমস্ত রুচি-বান মানুষের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর-কারের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, ঐ অঞ্চলে রাজপথের আশেপাশে এমন একটি স্থান চলমান শিল্পকে ব্যবহার করতে দেওয়া হোক, যেখানে প্রতি শনি ও রবিবার দুপুর দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রদর্শনী ও সাহিত্য পর্বের আসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বিনীত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, নবনীতা দেবসেন, অমিতাভ চৌধুরী, নিখিল সরকার, কৃষ্ণ ধর, প্রফুল্ল রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অহিভূষণ মালিক, শুদ্ধশীল বসু, শেখর বসু, সুব্রত সেন-গুপ্ত, অসিত পাল, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য চিত্র ঘোষ, কল্লোল মজুমদার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অমলকুমার দাস, নিশীথরঞ্জন ঘোষ, সমীর ঘোষ, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর সাহা, সমীর গুপ্ত, তপশ্রী সেনগুপ্ত সম্মিত্রা ঘোষ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল শুভ, বঞ্চিত, সুনীল মিত্র, সুতনুকা বাগচী,

আমরা কৃতজ্ঞ

আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। [illegible] পত্রিকা সম্পাদনা করুন আপনার সুচিন্তিত অভিমত আগ্রহসহকারে পড়ে থাকি। আপনার একক দশক শতক, পাঠক সম্মান দক্ষিণা লেখা মনে রেখাপাত করে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক মহাশয়, প্রবন সারির সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছেন তা সর্বদা সমর্থনের যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ এবং পরবর্তী শৈলজানন্দ, তারাশংকর এঁরা পাঠক-সাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে রেখে-ছেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের যোগ্যতায় একথা অনস্বীকার্য, তবু যাঁরা অন্তরালে বসে লিখে চলেছেন অদম্য উৎসাহ নিয়ে, সেই সব আজকের আধুনিক লেখক যাঁরা তাঁদের একেবারে অবহেলা করলে তাঁদের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হয়, তাঁরাও তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের হৃদয়বেদনা হাসি-কান্নার সমান অংশীদার হতে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিখে যাচ্ছেন, আশা, যাতে সে লেখা প্রকাশ হয়—ও ক্ষণকালের জন্য হলেও পাঠকের মনে রেখাপাত করতে পারে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে তারাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের লেখা ভাল লাগে, তাঁর লেখা ডিজেলের গন্ধ ও পাখির গান, ইস্কাপনের বিবি, মৃগতৃষ্ণা, সহজ সরল ভাব ব্যঞ্জনা-ময়। পিতা সুখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্য পুত্র পরিচয়ে যে লেখনী হাতে তুলে নিয়েছেন আশা করি তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে সুনাম অর্জন করবেন। ডিজেলের গন্ধ ও পাখির গান গল্পটি অতি অল্প কথায় বাস্তবানুগ ও মনোগ্রাহী, ঠিক তেমনি পাশাপাশি আরও আধুনিক গল্প লিখিয়েদের গল্প অনেক সময় রুচির পীড়াদায়ক ও বুদ্ধির অগম্য বলে মনে হয়। যেমন ধরুন, ১৫ জুলাই, ১০ সংখ্যা অমৃতে কল্যাণ সেনের গল্প 'যখন' প্রচ্ছদপটে নাম দেখে হয়েছে আগ্রহ নিয়ে পড়লাম, দেখলাম যন্ত্রণার বা বেদনার অথবা অসুস্থতার অনুভূতি লেখক যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে-ছেন কিন্তু একই কথার পুনরাবৃত্তি মনকে পীড়িত করে তোলে না কি?

সোমনাথ পড়ে গেলেন, তাঁর চেতনা লুপ্ত হল, কি তার কারণ, পাঁচতলার বাড়িটি অফিস না হসপিটাল কিংবা আর কিছু, বেদীপদ কে? পথে নামলেন, আবার চেতনা হারাবার মত অনুভূতি, সমস্ত গল্প জুড়ে সেই এক কথা নিয়ে দ্বন্দ্ব গাঁথা হয়েছে অথচ লেখকের ভাষাজ্ঞান স্বাদ গ্রাহ্যবার ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ—সামান্য চেষ্টায় গল্পটি ঠিক মত সাজিয়ে তুললে মনে হয় ভালই হত। যাই হোক ভবিষ্যতে তিনি আরও লিখবেন

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
ভারতীয় দর্শন—(১ম) ১ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খন্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (কান্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন— **(Religion)** ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
(For B.U.) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(পরিবর্তিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—
দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত
কুলীন কুলসর্বস্ব ১০-০০

শিক্ষক শিক্ষণ
(B. Ed and Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও
পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস— ১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান ৩য় সং ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
সংশোধিত ৩য় সংস্করণ ১৫-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, ঘোষ ও হালদার
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৮-০০

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০১ ফোন : ৩৪-৭২৩৪

এবং সুলেখক হিসাবে স্বীকৃত হবেন আশা রাখি। পরিশেষে অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও ক্রিস্টিন এক অমূল্য সংগ্রহ। ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া এই ভারতপ্রাণা বিদেশী মহিলা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। অমৃত পত্রিকা ও শ্রদ্ধেয় নেতাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার আলোকপাতে এই মহীয়সী মহিলার ও স্বামী বিবেকানন্দর জীবনের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায় প্রকাশের মাধ্যমে এক মূল্যবান তথ্য জানার সৌভাগ্য লাভ করলাম। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সীমাহীন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতের কল্যাণে নিজেকে ও তাঁর সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধার পাত্রী, তেমনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী স্বামীজী শিষ্যা ক্রিস্টিন।

এ বিষয়ে অমৃত পত্রিকা সম্পাদকের নিকটে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং বৈকুণ্ঠ পাঠকের কাছেও।

—অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়,
সান্ত্রাগাছি, হাওড়া—৪।

অভিনন্দন

যতদিন যাচ্ছে অমৃত হয়ে উঠছে সর্বজনীন। যেন তীর্থক্ষেত্র। জিজ্ঞাসা করে ফাঁস আলগা নয়, নিশ্চিন্ত। ইচ্ছে হয় ঘটি নিয়ে ছুটে যাই। ডুব দিয়ে নিয়ে আসি তীর্থ সলিল। কবি এবং কবিতার জন্য এত বেশী পাতা বরাদ্দ যে অমৃতের মত কাগজ করতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। পৃষ্ঠাপরনের দিন আগেই শেষ হয়েছে—তবু এরকম বলিষ্ঠ ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে অপেক্ষাকৃত অনামীদের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে আমরা বাধ্য।

ধন্যবাদ জানাই নতুন দৃষ্টিতে নতুন আঙ্গিকে পত্রিকাকে ঢেলে সাজানোর জন্য। প্রত্যেকটি ফিচার সুষ্ঠু চিন্তার ফসল, এতে কোন দ্বিমত নেই। সাধারণভাবে বলতে পারি—বড় সুন্দর।

বৈশ্যতান্ত্রিক যুগে বাস করে এত কম দামে অমৃতের মত কাগজ—সত্যি ভাবা যায় না।

সাহিত্যের অঙ্গনে আপনারা যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছেন তার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরেশ মণ্ডল, যযাতি দেবল, পীতম দরবেশ, পানাগড় গ্রাম, পানাগড় বাজার, বর্ধমান।

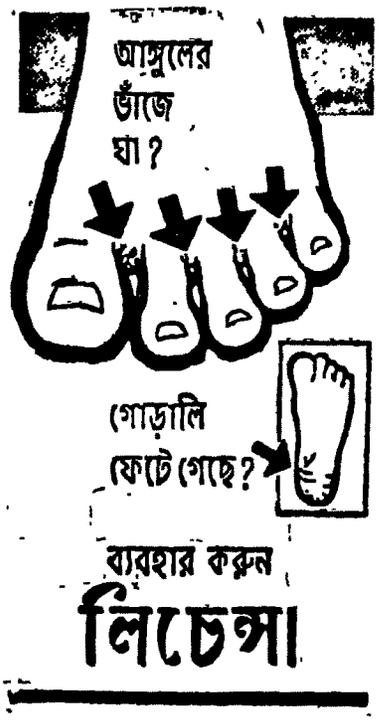

আমাদের নদী

অমৃতে 'আমাদের নদী' নামক প্রচ্ছদ কাহিনীটি বেশ সাবলীল ও প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্মিত করে প্রচ্ছদের শৈল্পিক চেতনা। এ যেন এক আবেগময় রহস্যের সৃষ্টি করে। ঠিক বলতে পারব না, সেই জন্যই কি আমার দুরন্ত মন এই পত্রিকার অন্তরে বাসা বেঁধেছে; আরও মনে হয়, এই বাসার জন্য দায়ী কবি-পরিচিতিসহ কবিতা এবং সুত্তরের কবিতা কি নয়। এ বললেও নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে, নানা অজানা রহস্যের ধুয়ো থেকে বেরিয়ে আসে এক সুন্দর জগৎ। যেমন বিবেকানন্দ ও ক্রিস্টিনা প্রমুখের কাহিনী, ছোটগল্প বলতে গেলে চমকে দেয়, এছাড়া সমস্ত বিষয়গুলোই আমাকে হাতছানি দেয়। আমিও তাই 'অমৃত' পান করে চলি। আশা করি চলব। —প্রবীর দত্ত, মধ্যমগ্রাম, শ্রীনগর, ২৪ পরগণা।

একি আদৌ সমালোচনা?

গত ২৬।৮।৭৭ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'সমালোচনা' কলমে সমালোচক অমল মুখোপাধ্যায় দুটি কবিতার বই সম্পর্কে যা লিখেছেন তা কি আদৌ 'সমালোচনা' হয়েছে?

সমালোচনার নামে ইতস্ততঃ যে ধরনের আক্রোশ। বিদ্বেষ প্রচারিত হচ্ছে তিনি তার ব্যতিক্রম হতে পারেন নি। স্বকারণে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আধুনিক কবি ও কবিতার দিকে তাক করে কাদা ছুঁড়েছেন। কবিরা প্রায়শই জড়বস্তুতে প্রাণ আরোপ করেন এবং সেক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ যে কোন একটি লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে সকলেই অবহিত।

চাঁদের যে স্ত্রীলিঙ্গ-কল্পনা কবিতায় হয়েছে সে সম্পর্কে জীবনানন্দ থেকেই উদাহরণ দেওয়া যায়। কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'থুবথুরে অন্ধ পাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে। চোখ পাল্টায়ে কয়, বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?'

সমালোচক লিখেছেন, 'এতদিন জানতাম সরল বর্গীয় বৃক্ষ হয় বড় জোর তৃণ।' ভূগোলের বই খুললে সমালোচক দেখতে পেতেন সরলবর্গীয় বৃক্ষ হয় পাইন, ফার, ওক প্রভৃতি। সমালোচকের মতে উদ্ভিদ নাকি চার প্রকার; তৃণ, লতা, গুল্ম ও বল্লী। কিন্তু উদ্ভিদ যে পঞ্চবিধ, অর্থাৎ ওই চারটি ছাড়াও বৃক্ষ একটি শ্রেণী তা তিনি জানেন না। 'ঋজু' শব্দের উনি একটি অর্থ বোঝেন, মানে সরল। কিন্তু ঋজুর আরো তিনটি অর্থ রয়েছে—যেমন সহজ, সুসাধ্য ও অকপট।

রসিক সমালোচক সরলবর্গীয় শব্দটিকে খেয়ালখুশীমতো ভেঙেছেন, করেছেন 'সরল বর্গীয়'। কথাটা কিন্তু সরলবর্গীয়। শব্দটি একটি বিশেষ শ্রেণীর বৃক্ষের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সমালোচকের জ্ঞাতার্থে জানাই 'সরলবর্গীয় ঋজু উদ্ভিদ' নামকরণের অর্থ 'এক শ্রেণীর বৃক্ষ যা সহজভাবে ঊর্ধ্বে ওঠে। যেমন পাইন, ওক প্রভৃতি।

কবিতা বোঝার জন্যে শব্দের বাহ্য অর্থ ছাড়াও অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বোঝার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি দরকার। তা থাকলে আস্তো সমাজের বপন কাজটিও বোঝা যেতো। মতি মুখোপাধ্যায়; কুলটি বর্ধমান।

বৃক্ষ যদি বৃদ্ধ হয়

দিনের পর দিন বাংলাসাহিত্য যেমন ঝিমুচ্ছে আমরা পাঠকরা তেমনি বসে বসে ঝিমুচ্ছি। মাঝে মধ্যে এক-আধটা দমকা হাওয়া আমাদের জাগিয়ে তুলছে। আপনার বৃক্ষ যদি বৃদ্ধ হয় ৮ জুলাই, ১৯৭৭ হঠাৎ মনটাকে যেন এক ঝাঁকুনি দিল। কিছুদিন আগে এ যুগের এক বিখ্যাত কবি, যাঁর লেখায় 'কলকাতার যীশু' আমাদের চোখে ঘুরে বেড়ায়, যখন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় হাত দিলেন এবং (এক বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের) ব্যক্তি পুজোয় মেতে উঠলেন তখন মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। এখন বুঝতে পারছি সেই বৃক্ষ আজ বৃদ্ধ। ওঁর কাছে আমাদের আর কিছু পাওয়ার নেই।

বৃক্ষ সত্যিই বৃদ্ধ কিনা এ বাচাই করাটাও কিন্তু সহজ নয়। যৌবনের সুমিষ্ট। ফল আর সে উপহার দিতে পারছে না বলেই পবিত্যাজ্য হতে পারে না। আগের মিষ্টতা নাই থাকুক এখনও যদি অনেক নবীন বৃক্ষের ফলের চেয়ে তা মধুর হয় তবে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'বার ঘর এক উঠোন' আর দিতে পারবেন না সত্যি, কিন্তু শেষ বিচারই যদি দেন তবে মুখ ফিরিয়ে থাকব কেন? আশাপূর্ণা দেবী প্রথম প্রতিশ্রুতি নাই বা দিলেন কখনো দিন কখনো রাত যদি পাই তাতে আপত্তি কি?

পাঠক মশাই, পাঠককে লেখকের খুব কাছে নিয়ে আসার বিপদ কি জানেন—অভিনন্দন যেমন সহজে আসে, নিন্দা ও ভর্ৎসনা আসে ততোধিক সহজে। আপনার লেখা যখন পড়ি তখন আপনার আর আমার মধ্যে কোন দূরত্ব আছে বলেই যে মনে হয় না।

'অমৃত' ও 'বৈকুণ্ঠের কলম' আরও প্রিয়তর হয়ে উঠুক এই কামনা নিয়ে চিঠিটা শেষ করছি। নমস্কারান্তে —সুপ্রিয় দত্ত চৌধুরী, শিলং।

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

রোম-ইতিহাসে দাস-ব্যবস্থার ক্রম-বিন্যাসের স্তর তিনটি। প্রথম দিকে প্রতি পরিবারে দু-তিনটি 'দাস' থাকতো। জমিদার-বাড়ি বেগার বা চাকর-বাকর যেমন থাকে। তাদের হর্তা-কর্তা বাড়ির প্রধান যিনি, তিনিই। সর্বেসর্বা তিনিই। রোম্যানরা পরিবারে থাকবেন সাদাসিধে-ভাবে। কাজেই খাওয়ায়, ওঠায়, বসায় দাসদের সঙ্গে একত্রে প্রানাহারে ক্রীড়া-আমোদে কোনো বাধা ছিলো না। (ভারতে এটা বরাবরই ছিলো),। দাসরাও পরিবারের একজন হয়েই থাকতো। কাজেই 'অত্যাচার' বলতে যা হোতো, যদি কখনও হোতো, সেটা 'দাস' বলেই যে হোতো তা নয়। কড়া মেজাজের বাপের পাল্লায় ছেলে, পতির পাল্লায় স্ত্রী, শাশুড়ীর পাল্লায় পুত্রবধূ, শিক্ষকের পাল্লায় ছাত্রেরা অনেক সময়েই অনুরূপ বা ততোধিক দুর্ব্যবহার পেতো। আজই কী পায় না? পারিবারিক প্রভুত্ব কি অর্থনৈতিক ক্ষমতারই একটা অঙ্গ নয়? যার উপার্জন, তার হুকুমৎ।

বেশ্যারা যেমন কুমার পুজো, মদন পুজো, শিব পুজো করতো, তেমনি দাসেদের দেবতা ছিলেন হর্কুলেস। কর্মবীর হর্কুলেস্। একটি অর্থপূর্ণ নির্বাচন। লেবর্স অব হর্কুলেস্, কাজ করেন, খেটে খেটেই জীবনপাত, খাটুনির প্রভাবেই হীরো', গণ্যমান্য দেবতা। দাসেদের পর্ব মাত্রানেলিয়া, সাতানেলিয়া। বিশেষ করে দাসেদের পর্বদিন। এদিনে সব দাস-দাসী মুক্ত, স্বেচ্ছাচার নাগরিক। কতো দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তে কতো বিরহী-বিরহিণী পেয়ে যেতো এই মধু-মিলনের অবসর। ব্যভিচার বলা হোতো না এ-পর্বের কোনো মিলনকে। সব শয্যা কামশয্যা, সব অঙ্গ অনঙ্গের দেউল, সব স্তুতিই উৎসব, আরতি নিবেদন। বাড়িতে গোলাপজামের মতো টসটসে দাসী রগরগে দাস থাকবে পরিবারের অঙ্গ হয়ে, অথচ মন্মথ মনকে মথে দলে হালুয়া করে দেবে না—এ তো আর হয় না। ঘৃতকুম্ভ-ভস্তাসায় সম্পর্কটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। বাকি সব চাপা দেওয়া ধামা। বেড়াল ঘুর ঘুর করে ঘোরে বলেই চাপার দরকার।

তা বোলে হুল্লোড়বাজিকে বীভৎসতা হতেও দেওয়া হোতো না। কড়া আইন ছিলো। সবার ওপরে ছিলো মর্যাদাবোধ। দাসেদের প্রতি ব্যবহারেও সেই রোম্যান মর্যাদাবোধ, টসকাতে পেতো না।

অতিভোজন গরহজমী আনে। রোম্যানরা যেদিন পূর্বদিকে এগিয়ে গেলো, এশিয়ার ঝাল-মশলাদার খানার সঙ্গে ঝাল-মশলাদার মেয়েদের দাসী করে আনলো (দাসও এলো বহু) সেই সময় থেকে রোম্যান সমাজের 'মর্যাদা'র বাঁধনও খসে গেলো। রোম থেকে বহুদূরে সেইসব প্রাচ্য নগরীর প্রাচুর্য এবং ঐশ্বর্যের সেতুতে গা ভাসিয়ে দিলেন রোমক রাজ্যপালেরা। রোম-সমাজের ভোলই পাল্টে গেলো, তাদের আইন, নীতি, সংযমে ফাটল ধরলো। কারণ, সেই সুদূর প্রসারিত সাম্রাজ্যের সীমা থেকে রোম বহুদূরে। মার্জার বহুদূরে, মূষিকদের বীরবিক্রম তা-তা-থৈতে মত্ত হোলো। এই বিবর্তন দ্রুত এগিয়ে নিয়ে এলো রোমে দাস-ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব।

এই পর্বেই গ্ল্যাডিওটেরিঅল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আসরের পত্তন। ষোরগা, বৃষ, মেষ-এর লড়াই দেখে দেখে তখন রোমের স্নায়ু ক্লান্ত। কাজেই পশু ছেড়ে মানুষ ধরলো তারা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আয়োজিত হতে থাকলো। এই দ্বন্দ্বের উত্তেজনা অবশেষে মানুষে-পশুতে দ্বন্দ্ব নেমে এলো। এইসব মানুষেরা 'দাস', প্রাণ-দণ্ড দণ্ডিত অপরাধী। প্রাণের মায়ায় সব ভুলে পাষণ্ড জেদে কোনো দাস যখন বাঘ, সিংহ বা ভালুকের সঙ্গে (প্রায়ই) খালি হাতে লড়াই করতো, তার ত্রস্ত বিভ্রম, তার প্রাণান্তিক আর্তনাদ, তার প্রলাতক পদ-

ক্ষেপে থাকতো নিদারুণ উত্তেজনা, মাদক ভয়ংকরতা। সোহাগের গায়ে ঢলে-পড়া সোহাগিনীর, বিনোদের বাহুবন্ধে আপ্লুত বিনোদিনীর পানপুষ্ট রক্ত-কণিকায় এসিডের বীভৎস আর্তনাদ, প্রচণ্ড মৃত্যু,—ঝনঝনা তুলে দিতো। কী মজা!, কী মজা!! অহো উল্লাস!

অযন্য বর্বর অনাচারের পর অনাচার ঘটতেই থাকলো। প্রখ্যাত কথিকা আছে ফ্লামিনিউস-এর সম্পর্কে। মাত্র একটি অতিথির সাময়িক মনোরঞ্জনের খ্যাতির দাবিতে ফ্লামিনিউস একটি দাসকে মনোরম নির্যাতনে বিদ্ধ করে খণ্ড খণ্ড করেছিলো। তিদিউস পিললো তার পোষা মাছদের আহার্য জোগাতো দাসেদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে। মহামতি সম্রাট অগাস্টসের কোনো দাস সম্রাটের প্রিয় তিতির পাখীর মাংস খেয়েছিলো এই অপরাধে তাকে ক্রুশে চড়িয়ে তিলে তিলে তিনি মেরেছিলেন। এ-সবই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু জুভেনালও নিবেদন করেছেন যে এক রোম-কুমারীর হঠাৎ এক অবসর বিনোদনের ক্ষণে মনে হোলো একটা মানুষকে মজা করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে তার মুখটা দেখতে কেমন হয়? ব্যস, একটি দাসকে তখুনি বিঁধে মারা হোলো। বিনোদিনী বিনোদ লাভ করলেন। এ অবশ্য জুভেনালের বর্ণিত কথা। কথাকারের কাহিনীও হতে পারে। রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটদের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে দাসেদের প্রতি জঘন্য, ঘৃণিত অমানুষিক দুর্ব্যবহারের ছবি পাই। দাসেদের সঙ্গে বিবাহ আইনে অসিদ্ধ ছিলো। কাজেই বহুপতিত্ব, বহুপত্নীত্ব ব্যভিচার, জ্ঞাতি বা সপিণ্ড গমনও ছিলো অবাধ, আইনে তা বাধতো না। নিষেধগুলোই অর্থহীন হয়ে গিয়েছিলো। আদালতে এ-ব্যাপারে সাক্ষ্যই পাওয়া যেতো না। তাই স্বীকারোক্তি আদায়ের একটিই পথ ছিলো—দৈহিক নির্যাতন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দাসের মৃত্যু হোতো রোমহর্ষক নির্যাতনে। ....তাইবর নদীর একটি দ্বীপে বৃদ্ধ জরগ্রস্ত দাস ও দাসীদের ছেড়ে আসা হোতো। সেখানে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতো তারা। বাড়িতে দরোয়ান, মাঠে ক্ষেতী,—সবই দাসেরা করতো, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়। ওভিদ্ এবং জুভেনালকে প্রায়ই বলতে দেখা যায় যে, ক্রোধান্ধ রোমান সুন্দরী নখ দিয়ে বা কাঁটা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে দাসের চোখ-মুখ। প্রভু যে-কোনো সময়ে দাসকে গ্লাডিওটোরিঅল্ দ্বন্দ্বে অংশ নেবার জন্য বেচে দিতে পারতো।' (হিস্ট্রি অব রোমোপীয়ান মর‍্যালস্—গুবল্যু ঈ এইচ লেকী, ওয়াট্স এণ্ড কোং ১৯৪৬, পৃঃ ১২৭-২৮)

হোক। কিন্তু পরে এই দাসেদের বিবাহও আইনগত হয়েছিলো। না হয়ে আর উপায় ছিলো না। এখন যেমন আমাদের সমাজে অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে। বিবাহিত দাস পরিবারকে আর খণ্ডিত করা যেতো না। দাসেদের ব্যক্তিগত বিত্তাধিকারও স্বীকৃত হয়েছিলো। মৃত্যুর পর দাসের সম্পত্তি প্রভুতে অর্শাতো। কিন্তু প্রভু দাসকে নিজের উইল করে যেতেও বলতেন। দাসদের বেছে বেছে ভোটের অধিকারও দেওয়া হোতো।

সিসেরোর দাস ছিলো তাইরো। প্রাইভেট সেক্রেটারি বলতে সিসেরোর যাবতীয় কাগজপত্র চিঠিপত্রের মুসাবিদা দেখাশোনা সবই করতো তাইরো। প্লীনীকে দেখছি দাসের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলছেন। এপিক্টেটাস্ ছিলেন দাস, হয়ে গেলেন সম্রাটের পার্শ্বদ। গৃহযুদ্ধে স্বেচ্ছায় প্রভুর জীবন-বিত্ত রক্ষার জন্য দাস প্রাণপাত করেছে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। বহু দাস মুক্তি পাবার পরেও প্রভুর বাড়ি ছেড়ে নড়েনি। শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার মাত্রেই গৌরব করার মতো একটি পরমাত্মীয় দাস বা দাসী থাকতোই।

গ্রীসে দাসেদের লেখাপড়া শেখানো হোতো। তারা সমাজে মানাও ছিলো। কেবল সরকারি ব্যাপারে, ভোট অধিকারে তারা ছিলো বঞ্চিত। এইসব দাস-দাসী বা আরবের দাস-দাসী—বেশির ভাগই ছিলো বিজিত দেশের বাসিন্দা, যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দী। অর্থ বিনিময়ে তাদের মুক্তিও সম্ভব ছিলো। এটা বিশেষ করে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়ের সমস্যা ছিলো না। এটা সেকালের বীরত্বের অধিকার, বীর মাত্রেই বন্দীকে, পরাজিতকে নিজের ব্যক্তিগত দাস এবং সম্পত্তি মনে করবে। এ হোলো হক, অধিকার। শিকার খেলতে গেলে মাংসে যা অধিকার। এটার বিনিময়ে মানুষ বাড়ির চাকর-চাকরানী থেকে নায়েব, তশিলদার, দরোয়ান, বরকন্দাজের কাজ আদায় করতো। কিন্তু বেপরোয়া ঢালাও দাস কেনা-বেচার প্রথায় দাসকে পুরোদস্তুর বেনেতি পণ্য করে তোলাটা হোলো আরও পরের দুর্ঘটনা। এটা বিলকুল 'সভ্য' পশ্চিম য়োরোপের খাঁকতির পরিণাম।

কাজেই 'দাস' কথাটা নতুন নয়। 'দাস' প্রথাও নতুন নয়। কিন্তু যে 'দাস' প্রথায় আফ্রিকা ঘায়েল, তার রূপ, রং, ব্যঞ্জনা অন্য। নিগ্রো আফ্রিকাকে নিয়ে য়োরোপের বেনে আর আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা যা করেছে, এবং আজও যা করছে, মানুষের ইতিহাসকে তা কলঙ্কিতই করেছে। কিন্তু যারা চায় ধন-সম্পত্তি-প্রভুতা, শক্তির দম্ভমঞ্চে বসে মানুষকে নিগৃহীত করাতেই যাদের বিপুল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি, তাদের বোধ করি কলঙ্ক সম্বন্ধে কোনো তোয়াক্কাই নেই। পরিতৃপ্তির তালাশ তাদের, পরিতৃপ্তি জোটে না। রক্তের গন্ধে ব্যাকুল হাঙ্গরের মতো, পিরাঈ মাছের মতো, ছাবপোকার মতো তারা ব্যাকুলতর, নির্মমতরই হতে থাকে। কলঙ্ক, পাপ, নৃশংসতা ইত্যাদি কথাগুলো তাদের বিলাসিত উন্মত্ত রঙ্গশালায় শোনায় ভিত্তিহীন, অর্থহীন কতকগুলো ঠুনকো শব্দের ব্যর্থ গোঙানি।

তা হলে কথা ওঠে,—আগেও যদি 'দাসপ্রথা' সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায্য বলে গণ্য হোতো, এবং আজও যদি সে প্রথা থাকে, দাস যদি পণ্য বা পারিতোষিক হিসেবে গণনীয় হতে পারে তা হলে আজ এ নিয়ে এতো আপত্তি কেন? সমাজে মানুষ মানুষকে 'দ্রব্য' হিসেবে, বাজারের সওদা হিসেবে ব্যবহারে এনেছে তো আজই নয়। এটা কিছু য়োরোপীয় সমাজেরই বৈচিত্র নয়।' তবে দাস ব্যবসার বাবদে য়োরোপীয়দেরই এতো গালাগাল কেন? কী বিশেষ বিষ এর মধ্যে য়োরোপ ঢোকালো? যারা এই ব্যবসায়ের লভ্যাংশ ঘরে তুলেছে তারা কী কেবল শাদা? কেবল গুণ্ডা? প্রাচীন পুঁথী-খাতা-দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখেছি দাস-ব্যবসায়ের লক্ষপতি যক্ষদের মধ্যে শাদা আছে, কালোও আছে।' চোর, বোম্বেটে, ডাকুও আছে, রাজন্যবর্গ, সামন্ত-ভূপতি, জমীদার, সাধু, পাদ্রী সবাই আছে। ইংলণ্ডের রাজা, রাণী, মন্ত্রী,—ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল,—সবার সমাজের শিরোমণি,—এই ব্যবসায়ের মুনাফায় লাল। আমেরিকার সেনেটে, শিল্প-সাম্রাজ্যে বসে যারা আজ দুনিয়ার কর্ণ ধরে আছেন সেসব দারুণ দারুণ যক্ষদের মধ্যে অনেকের সম্পত্তিই দাস ব্যবসায়ের ফসল।

তবে উষ্মা কেন? বাদ দিই কাকে? শাদাদেরই বা এতো কথা কেন?

প্রথমতঃ, যদিও প্রাচীন দাসপ্রথা ছিলো একটা চালু প্রথাই, তবু দাস-সম্পর্কে পুরাকালের আইনও ছিলো কড়া, সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট। দাসেদের প্রতি অত্যাচার হোলে সেকালে শাস্তির ব্যবস্থা ছিলো। কোরাণ, বাইবেল, মনুই হোক,—গ্রীস, আর্য, রোম, মুর, আরবই হোক, দাস নিয়ে ছিনিমিনি কেউই আইনতঃ খেলতে পারতো না। দাস যারা ছিলো তারা মানুষই ছিলো। আইন তাদের মানুষ হিসেবেই দেখতো। তাদের জন্য বিশিষ্ট নির্দিষ্ট অধিকারও ছিলো। দাসের-পো, বা দাসীর-পো চড়ে বসেন নি সমাজে এমন কোনো তক্তপোষ বা সিংহাসন ছিলোনা।

কিন্তু যে দাস ব্যবসায় নিয়ে এই আলোচনা প্রস্তুত করা হচ্ছে এটি কিন্তু সফেদ য়োরোপের নিজস্ব মাল। এর ধরণ ধারণের, করণ-কারণের বার্তাই আজব, অদ্ভুত,— একসে এক নম্বরের পেজুমী। পরম নচ্ছার, অমায়িক পাষণ্ড ছাড়া এ মোচ্ছবে কেউ গণ্ডায় আণ্ডা মেলাবে না। সারা এশিয়া-আফ্রিকার এর দোসর মিলবে না। ভারতবর্ষ তো নয়ই। ভুললে চলবে না।' যে দাস-কন্যার গর্ভজাত পুত্রেরই সন্তান বংশ আমাদের কৌরব-পাণ্ডব।' এদেশে দাস অবশ্যই ছিলো। কিন্তু তার রূপই ছিলো আলাদা।'

যে দাস-প্রথার কথা এ লিখনের বিষয়বস্তু এ-পার ও-পার আফ্রিকার সেই নির্যাতন য়োরোপেরই একটি কলঙ্কগাথা।' বিশ্ব ইতিহাসে এর জুড়ি নেই। জুড়ি নেই তো বিশ্ব-মহাযুদ্ধেরও, এটমবোমার, সি আই-এ, মাফিয়া, প্রাকৃতিক স্যাটেঁয়ের

বিপর্যয়েরও। এ সবই য়োরোপীয় সভ্যতারই উদ্‌গার। এরও জুড়ি নেই।

দ্বিতীয়তঃ কালো বলেই যে শাদারা কালোর ওপরে খড়্গহস্ত ছিলো তা নয়। আমরা দেখবো যে যাঁরা এই ব্যবসায়ে চোয়াল-ডুবিয়ে বসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো সেরফ একটি। আজও বিশ্বের সমাজে যে ঘোর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার কারণও সেই একটিই। রাতারাতি ধনী হওয়ার নেশাই হোলো সেই উদ্দেশ্য। সবার ধন 'একের,' যা 'কিছুর' থলের পুরে সবাইকে জব্দ করে রাখার নেশাই চরম নেশা।' বিপদের কথা এই যে এই নেশা পেয়া হয় সধর্মের মুখোষ এঁটে, সংনামে ঢেকে; ভগবানের পোষাকের আড়ায়, মা-বোন-মেয়ের সর্বনাশ সাধন করে। এটাই হোলো বিপদ। সমূহ বিপদ। বিপদ, এবং এ যুগের বিশেষত্ব। এটা সেরফ শাদাদের আমদানী করা, এবং যন্ত্র-যুগের অপপ্রয়োগের ফল এই 'সদুদ্দেশ্য' সাধনে কোনো শাদা-কালোর বিচারই নেই। এটা যদি না বুঝি আমাদেরই লোকসান। শাদারা কেবল কালোদের ওপরই অত্যাচার করতো প্রবাদ অনৈতিহাসিক প্রসিদ্ধি মাত্র। আসল যাচাইয়ের ধোপে টেঁকে না। শাদাদের ওপর শাদাদের অত্যাচারেরও প্রচুর নিদর্শন আছে। শাদা-দাস, শাদা-কুলী, শাদা বন্দী নিয়ে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে কোনো ঘাটতি ছিলো না। কেন থাকবে? ব্যাবসা তো ব্যাবসা। ওর মধ্যে আবার আত্ম-করুণা এসব কেন? যথাকালে আমরা দেখবো কে জাহাজে জাহাজে সফেদ খালাসীদের প্রতি সফেদ কাপ্তানদের অত্যাচার কখনও কখনও নিগ্রোদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। তার কারণও শাদা-কালো নয়। সেরফ মুনাফা। জাহাজে নিগ্রো ঢোকালেই হয়ে যায় সদাগরের "মাল"। তার হোফাজৎ করা দরকার বলেই শাদা খালাসী, শাদা কর্মী। "মাল"এর চেয়ে চাকরকে কোন্ সদাগর বড়ো মনে করে? ফ্রান্সের হিউগিনট, হল্যান্ডের প্রটেস্টান্ট, আয়র্লন্ডের ক্যাথলিক, ডিউক-অব-মনমাথের দলের লোকেরা, জেফ্রীজের নির্যাতন থেকে পলাতক প্রেসবিটীরিয়ন-রা, প্রিন্স রুপার্টের দলের রয়্যালিস্টরা—বহু বহু প্রখ্যাত যোদ্ধা, নাবিক, নাগরিককে এই নিকৃষ্ট লোভের ফাঁপরে পড়ে দাসানুদাস হয়ে থাকতে হয়েছে। ক্যারাবিয়ানের দ্বীপপুঞ্জে খোঁজ নিলে আজও গরীবি শ্বেতকায়দের উপনিবেশ পাওয়া যায়। শাদা হলেও তারা দাস ছাড়া আর কী ছিলো? আজও তাদের সমাজের বিকৃত ভয়াবহ চেহারা দেখলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে বিমনা হবে। তাদের তুলনায় কালোরা ঢের সুস্থ সরল স্বাবলম্বী।

আসলে এই যে দাস ব্যবসায় এটা চিরকেলে সেই নিরীহের প্রতি শক্তের গুণ্ডামী; সবলের প্রতি ফিকিরবাজের নষ্টামী; শিকার করে, লুঠ করে, গায়ের জোরে জাঁক বাড়ানোর দারুণ লোভ। এটা ছিলো; আজও আছে। চেহারা বদলেছে,—মনুষ্যত্বের 'ধর্ম' বলে কারুর কোনো তোয়াক্কা নেই। যারা শক্ত তাদের হাতে রাষ্ট্র। যাদের হাতে রাষ্ট্র, ন্যায় এবং আইনও তাদেরই হাতে। আইন এবং ন্যায় যাদের হাতে তারাই আইনের মধ্যে থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই রাহাজানি, উৎপাত, লুঠতরাজ, গুণ্ডামী করার উপায় গড়ে নেন। আজও নিচ্ছেন। আইন হয়েছে হাতের পুতুল। পার্লামেন্টে সংখ্যা-পরিষ্ঠতার বলে হাত তোলো, আর আইন বাঁধো। আইন তোমার দাসানুদাস হয়ে কাজ করবে। দাস? দেশে দেশে, খনিতে, কারখানায়, বন্দরে, জাহাজে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে,—জলে-স্থলে দাসস্য দাস হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও ধীরে ধীরে ক্ষয় থেকে ক্ষয়ে চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? মাত্র কয়েকটি লোভী গোষ্ঠীর লোভকে আরও লোভনীয় করে তুলতে। বর্তমানের ইতিহাসে যুদ্ধই একটা ব্যবসা। আমরা যারা যুদ্ধ চাই না, অথচ যুদ্ধের কাঁধে কাঁধ জোগাই, আমরা হলাম প্রভুদের ইচ্ছার দাসস্য দাস, অন্ধ ও বধির দাস। দেশের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি ইত্যাদি বচনগুলো শুনতে বেশ চম্ চম্ শোনায়। কিন্তু এ উন্নতির লাভটা যাচ্ছে কোথায়? দেশের তহবিলে না ব্যকতির তহবিলে? আর একটি ব্যর্থ ধারণা এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিতে হয়।

আমাদের ধারণা যে দাস ব্যবসায়ে ইউরোপীয়রাই লিপ্ত ছিল। ও বাবদে যেন দায়ী কেবল স্পানিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। এটিও কিন্তু হকীকৎ নয়। এই পরম লাভজনক ব্যবসায় ধুরন্ধর বদান্য ইয়াকীবাও ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত ছিলেন। দাস প্রথা আইনত বন্ধ হয়ে যাবার পরেও দাস নিয়ে চোরা বাণিজ্য করার সর্দার ছিল আমেরিকা। আমেরিকা গোলার্ধে নিগ্রো দাস রপ্তানী করা হয়েছে তার গোটাতম অংশই আমেরিকার বণিকদের ব্যবসায়, এবং এটা দাস ব্যবসায় বেআইনী হবার পর হয়েছে। আজও হচ্ছে, তবে তাদের দাস আর বলা হয় না। যারা দাস ব্যবসায় রদ করার স্বপক্ষে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন পর পর তাদের ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে লিকুই-ডেট (খতম) করার ব্যাপারেও ঐ সফেদ ইয়াংকী। এটাও স্পষ্ট করতে হবে। নৈলে কু ক্লাচ ক্লান বা লিমকেন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অস্পষ্ট থেকে যাবে।

চতুর্থ ধারণা এই যে দাস-প্রথা নাকি বন্ধ হয়েছে। মানুষ জেনে নিয়েছে আজ আর সভ্য দুনিয়ায় দাস নেই। এটি কিন্তু একটি জাঁদরেল গোলমেলে ধারণা। যাঁরা মেয়ে-পাচার করার ব্যবসা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন পৃথিবীতে মেয়ে-বাজারে মেয়েদের লেন-দেন পুরোদমে আজও চলছে, চলে, চলবে। এ বন্ধ হবার উপায়, একমাত্র উপায়, — ঐ ক্যাস্ট্রো জানতেন। উনি কুবায় হাভানার মত প্রখ্যাত মেয়ে-বাজার বন্ধ করে দেন। কিন্তু ক্যাস্ট্রোর সেই উপায়কে ব্যবহার করার হিম্মৎ কজনার? ক্যারাবিয়ানের ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলো টুরিস্ট ডলারের ওপর নির্ভর করে আছে। প্রচার পত্রিকায় ছাপে বীচ ভর্তি মেয়ে পাবে, সমর্থ হাসি-খুশী জোয়ান ড্রাইভার তোমার তবিয়ৎ খুশ করে দেবে। এসো! ফুর্তিতে গা ঢেলে দাও। হে পরিশ্রান্ত ব্যবসায়ী এখানে এসেই এই নম্বরে ফোন কর। সেক্রেটারীকে সেক্রেটারী, অবসরের সঙ্গীকে সঙ্গী, যা চাও! —দাস প্রথা বন্ধ হয়েছে? কে বলে?

দাস প্রথা বন্ধ হয়েছে কী হয় নি এ বিষয়ে খুব ভাল বলতে পারবেন আমেরিকা মহাদেশের (উত্তর-দক্ষিণ) কৃষ্ণকায়েরা। এটাই আমার পঞ্চম বক্তব্য। আজ সারা আমেরিকা ভূখণ্ডে কৃষ্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিদারুণ সমস্যা। কিছু দিন আগে পর্যন্ত আমেরিকান নিগ্রোরা হল্লা তুলেছিল ফিরে চলো আফ্রিকায়। ম্যালকলম্ এক্স, ষ্টোকলীকার মাইকেল, মাইকেল এক্স্, প্যাডমোর, সি এল আর

জেমস প্রভৃতি নিগ্রো নায়কেরা ফিরে চলোর চিৎকারে ইয়াংকী প্রেস-কে জর্জরিত করেছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলির তো বিচার এবং সাজাই হয়ে গেল। মার্টিন লুথার কিংকে প্রাণ দিতে হল।

আজ দাস প্রথা নেই। কিন্তু মরশুমে মরশুমে আপেল তোলার, তুলো তোলার, নাসপাতি কাটার, মরশুমী ফসলের শ্রমিক মুচলেকা লিখে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ বছর ধরে খেটেও তারা সে দেশের বাসিন্দা নয়। এরা কী? দাস নয়?

কাজেই দাস প্রথা বন্ধ হয়ে যাবার পরেও আমেরিকা ছেড়ে কৃষ্ণকায়েরা কেন চলে আসতে চান সেটা ভাবতে হবে। এনক পাওয়েল ইংলণ্ডে এখন যা-ই বলুন না কেন,—একযোগে যদি অইংরেজরা ইংলণ্ড ছেড়ে আজ এখুনি স্ব ঘরে ফিরে আসতে চায়, অনাদারা যদি আমেরিকা হঠাৎ খালি করে দেয়,—এই সফেদী-করা সমাজগুলোর কী যে অবস্থা হবে ভেবে দেখা কর্তব্য। কানাডা, ইউ এস থেকে নিয়ে ব্রাজিল পর্যন্ত রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত-খামারের কাজ বোদা মেরে যেতে বাধ্য।

কর্তা-ব্যক্তিদের ধারণা বুভুক্ষু ভিখিরী এশিয়াটিকগুলো প্লেগ-লাগা জাহাজ থেকে ইঁদুরের মত পালিয়ে পরিত্রাণ চাইছে এই সব লক্ষ্মীমন্ত পয়মন্ত দেশগুলোর ছাতার তলায় ঢুকে। এ ধারণা 'স্বাগতম' ঝোলান দেশগুলোর কাপ্তেনরাও যেমন পোষণ করেন, তেমনি ভিন্ন অর্থে পোষণ করেন আমাদের দিকের হ্যাংলারাও। যদি তাঁরা শোনেন ছোনা মিস্তিরের পো চন্না মিস্তির যাচ্ছে কালাপানীর পাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খান,—এঃ! বেঁচে গেল চর্ণা! কপাল খুলে গেল। ফরেন যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোনার পুত্র চর্ণার লম্বাই দু-চার ফুট বেড়ে গেল। বিবাহ-বিজ্ঞাপনের কলামে তার দাম গরু ভেড়ার দামের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিলার নাতির দামে চড়ে যাবে।

উভয়তঃই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত। সুস্থ নয়; স্বাভাবিক নয়;—এবং যথার্থ নয়। পুরোপুরিই ভ্রান্ত। দীর্ঘকাল বিদেশ বাসের মধ্যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পূর্ব ও পশ্চিম কানাডা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ—ঘুরে ঘুরে বহু প্রবাসী ভারতীয়দের দেখেছি। বহুভাবে, বহু কাজে, বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে উঁচু-নীচু হয়ে এঁরা বিন্যস্ত আছেন। হঠাৎ দেখলে আমার মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, বাঃ চেতনার চর্ণা, কীই বা তালেবর গোঁসাই! বি এস সিও নয়। অথচ, দেখো, —আছে কেমন তোফা! বা বীণা মিস্তির মাস্তোর তো বম্বে থেকে একটা এম এ ডিগ্রী হাসিল করেছে কী করে নি। চলে গেল কোন ফিকিরে ফরেন-এ। দেখগে যাও, — ভ্যাংকুভারে না ভেনেজুয়েলায় বাড়ী-ক-কে বাড়ী, গাড়ী-ক-কে গাড়ী, —মাস গেলে বারো হাজার রুপেয়া,—আবার শাদী না তো শাজাদী,—সদ্য সদ্য এক পঞ্জাবী কাংলাকে কংলে আম করে.... ইত্যাদি।

ও ধরনের কথা সকলেই আকচার শোনেন।

যা শোনেন না তা ঐ চর্ণা মিস্তির, বীণা মিস্তিরদের আসল কাহিনী। মানুষের বাঁচা মরাটা দেহ নিয়ে তো নয়।

সেটি মন। এই দীর্ঘ বিদেশ বাসের মধ্যে তাজা তাজা মনকে বিষণ্ণ, উদাস, ঘোলাটে, ছন্নছাড়া হয়ে যেতে দেখেছি। বাইরে থেকে তারা তরোতাজা ক্রাঁদরেল। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক অপ্রীতি অন্তরের গহনে হাহাকার, দেহকে নির্যাতিত করেছে। পদে পদে সামাজিক অবহেলা, অমর্যাদা, অপাংক্তেয়তা, ছুঁৎমার্গী ফাবাকপনা, মনকে ভিখারী করে শান্তিকে বিঘ্নিত করেছে। এই অকথনীয় অবমাননার চাপ তৃপ্তিকে ফোঁফরা করে দিয়েছে। ডাকের সাজ সত্ত্বেও প্রতিমা কিন্তু মাটিরই। এবং সে প্রতিমাও ভক্তের পূজার মহিমায় মর্যাদার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

দেশেও এমন যৌবন ও মন আছে বইকি। কিন্তু দেশের সমাজে এটা সাধারণ নয়, সংঘাতের মধ্যে যারা সকলকে নিয়ে বাড়ে তাদের মধ্যে মনের তাড়সে ভোগা রুগীর সংখ্যা কম। পোষাকে-আশাকে ঢেকে যাঁরা মনের রোগ পোষেন দেশে তাঁরাও সংখ্যায় কম। বিদেশে গিয়ে যখন হ্যাংলা দেশের বাচচারা হ্যাংলাতর হয়ে হা হনো হয়ে ঘোরে তখন দেখে খুব ভাল লাগে নি। তারপর তাঁরা অগোচরে বিদেশেই একটি ভারতীয় বস্তি গড়ে তোলেন। এবং উত্তরকালে আবার তাঁদের বাচচারা চান, আড্ডায় গণ্ডা মিলিয়ে পাকাপাকি ফরেন থেকে ফরেনার হয়ে যাই। যখন যা যত দিনে তাঁরা বুঝতে পারবেন ফরেনার হওয়া চলবে না, বাধা থেকেই যাবে, ততদিনি তাঁদের স্বপ্ন ছিঁড়ে চৌচির। তাঁরা গড়ে তুলবেন একটি ঘেটো। বিদেশে পাওয়া কেতাবী আদর্শ ধসে যাবে; স্বদেশে জানা সমাজ-আদর্শ ফকসে গেছে। এ অবস্থায় নতুন যারা জন্মাবে তাদের সমাজ এক নয় এখনকার এই নিগ্রো বিদ্রোহের মতো এক বিদ্রোহ জরজব হবে, কিন্তু খোলাখুলি বিপ্লবে ভয় পাবে; নৈলে জুজুর ভয়ে মুখে লেপ চাপা দিয়ে অন্ধকারকে বন্ধু ভেবে দিনের ভরসায় এক জায়গায় থেমে থেকে কাঁপতে থাকবে। এরাও এক ধরনের দাস। পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকের দাস। হতে পারে এই সব ফরেন সন্তানদেরই কাঁধে বন্দুক দিয়ে ফরেন সরকার বলবেন,—চলো ভারতবর্ষের বুকে গুলি চালাও। তখন তারা তা করতে বাধ্য হবে, বা মহম্মদ আলির মতো জেলে যাবে।

বিদেশের এনক পাওয়েল চেঁচায় চাই না ওদের এদেশে। বিদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা জানে এদের নিজেও চলবে না। আমরা ভাবব ফরেন মানেই উঁচুর ধাপে চড়া। ফরেনে গিয়ে বিষ কামড় দাঁতে দাঁত চেপে হজম করব। বুঝব এদের সমাজে সত্যি পাত্তা নেই আমাদের। সাকসেস-ফুল ফোটার বাগান অবধি পৌঁছানই গেল না। অথচ দেশে বসে হ্যাংলার মত মুখে জিভে লালা ঝরিয়ে চেয়ে আছি কবে যাব ফরেন। এ এক নবতর দাসত্ব। দাস মনোবৃত্তি তো বটেই। বিদেশে গিয়ে এম এস সিব সার্টিফিকেটখানা গুটিয়ে রেখে বেবী সিটার হব, সুইমিং পুলে বাচচাদের খবরদারী করব,—কসমেটিক নিয়ে দোরে দোরে ফিরি করব, কিন্তু দেশে সেই আমিই বনেদী ঘরের বৌ! কাজ করলে কাটা যাবে গো!

তাই বলি, দাস প্রথা আজও চালু। যাদের প্রয়োজন তারাও চায় দাস; যারা চায় দাস হতে তারাও চেয়ে বসে আছে কবে পাব প্রভু।

কিন্তু ইতিহাসের মানুষ মনের এই গতিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। মানুষের ধর্ম নয় মেনে নেওয়া; মেনে নিয়ে বসে থাকি। যেসব নিয়মকে বেদ, স্মৃতির দোহাই দিয়ে আমরা মেনে নিয়ে থাকি সে নিয়মগুলোও তো দিনে দিনে কালে কালে মুহুর্মুহু বিপ্লবের পরিণাম। বিপ্লব হয়েই চলেছে, কখনও পরোক্ষে, কখনও প্রত্যক্ষে। কখনও চিন্তায় কখনও কর্মে। কখন গড়নে, কখনও ধ্বংসে। কখনও মৈত্রীতে, কখনও সংঘাতে। কখনও শান্তির পথে, কখনও আগুনের পথে, রক্তের পথে। বিপ্লব এবং শান্তি জীবনের দুই পদক্ষেপ। এক পা ফেলে অন্য পা ফেলার অবকাশের মধ্যে যারা ঝুলে থাকতে চায় তারা স্বপ্নবিলাসী, ভাবাতুর, ধর্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। এগুতে না চায়, না দেয়। এটাই ব্যর্থতা। গতিশীলতাই সত্য। অন্ধতাই ধৃতরাষ্ট্র; রাষ্ট্রকে চেপে ধরে রাখে। এগুতে দেয় না।

এই ধরনের চিন্তায় সত্যিকার জ্ঞান লাড়িয়ে দেয় কারা? ওই যারা অল্পবিত্ত-মধ্যবিত্তের দল। যাদের রুজিই সব; পুঁজী নেই। যারা দিন আনতে পেলে দিন খায়। নৈলে খায় না। এবং আর এক দল; যারা আনছে প্রতিদিন ঠিকই। জাল ভরতি মাছ তুলছে। সারা দিন মাকুর সুতো পালটাচ্ছে জুড়ছে। মাঠ ভর্তি ফসল তুলছে। রাশি রাশি ইঁট পোড়াচ্ছে। কিন্তু প্রতিদিনের ফসল যাচ্ছে কোন দানবের গহ্বরে তার পাত্তাও পাচ্ছে না। সেই কবে কয়লা খনিতে নেমেছিল, আর উঠতে পেল না। সেই কবে,

শ্রীরাম সম্পাদিত
শারদীয়া
সোনার তরী
বাজার মাত করেছেন বহু স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক—দাম ৩ টাকা।
ঠিকানা—১১।সি, রাজা বি এন রায় স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০৭০, ফোন ৩৩-৪৫২৯।
বি—৩৭৮৪

মিলের বস্তিতে লক্ষ্মীর পট ঝুলিয়েছিল। আজও বার হতে পারছে না। সোমোত্তো মেয়েটি রাতের রোজগার ধরেছে। ছেলে দালাল।

১৬৪২ খৃস্টাব্দে ইংলেন্ডে এল মহা-বিপ্লব। তার আগে আগে অনেক বিপ্লব গেছে, ওয়াট টাইলারের চাষী বিপ্লব, অষ্টম হেনরীর সময়ে বরার্ট আসক-এর বিপ্লব, ষষ্ঠ এডুয়ার্ডের সময়ে নরউইচের চাষী বিপ্লব। এলিজাবেথের সময়ে আয়ারল্যান্ডে চাষী বিপ্লব। বিপ্লব হয়েই চলছিল। আঘাত আসছিল নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারার ফলে যারা বনেদী জমিদারদের পাশা-পাশি দাঁড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী জনতা ক্ষেপলো। বলল, রুটি দাও, রুজি দাও, সমতা দাও। কিন্তু সে বিপ্লবও গিয়ে পড়ল মধ্যবিত্তদের বেড়া-জালে। তারাও বনেদী জমিদারদের সরিয়ে সেই জমিদারীই করতে চাইল। ১৯১৭তে রুশে যে বিপ্লব এল সেটা এল জনতার গৌরবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বৈপ্লবিক গতিবেগ অবরুদ্ধ। শাসক গোষ্ঠীর বেড়াজালের মধ্যে একটা বুনিয়াদী মনোভাব দানা বাঁধছে। ইউরোপের আদর্শে আমেরিকাও নেমে পড়ল বিপ্লবে। কিন্তু সেটা ছিল মূলত ব্যবসায়, ব্যবসায়ী, শুল্কদেনেওলা - লেনেওলার লড়াই। হবেই। এটা তো শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতে জাতে লড়াই নয়। এ হল বেনেয় বেনেয় লড়াই। ফলে সে লড়াইয়ের লভ্যাংশ গিয়ে পড়ল মূলত সওদাগরী কবলে। আর সেই সদাগরী পংকতির বাইরে যারা তারা সেই চাষী, মজদুর, দাস। বিপ্লব হল। আরও টাকা বানাবার ফিকির হল, সুযোগ হল। কিন্তু গরীবরা হা-হন্যে হয়ে পংকতির বাইরেই রয়ে গেল। তবুও ইতি-হাস একে বিপ্লব বলে। মন্ত্রী-বদলকে বিপ্লব বলা ইতিহাসের একটা বিলাস।

এবার তারা ক্ষেপেছে। কৃষ্ণকায়েরা বলছে,—যে ধনে হইয়া ধনী, কালোরে ধলো মান নি, তাহারি খানিক দিতেই হবে। 'আমি আমেরিকান'। আমার আমেরিকান বলে মান। কারণ তুমি যদি আমেরিকান হয়ে থাক বাইরে থেকে চড়াও হয়ে লাল-আপাচে আদি বাসীদের খেদিয়ে,—আমিও আমেরিকান, বাইরে থেকেই এসেছি, এলেও এ দেশের জমিকে উর্বরা, মুখরা, সুজরা, পিয়ারা করে তোলায় আমাদেরই ঘাম রকত সেঁচা হয়েছে। তোমরা যদি মানুষের ভিটেয় চড়ে তাদের উচ্ছন্নে দিয়ে রকতে ভেজানো মাটিতে গেড়ে বসে চড়াও হয়ে আমেরিকান হাও, আমরা সে আমেরিকা গড়েছি, সাধিয়েছি। আমেরিকা আমাদের। তোমরাও আমাদের। মানো। নয়তো দেহি যুদ্ধং। এ দেশে যদি যুদ্ধ করায় আপত্তি বা প্রত্যাব থাকে,—বেশ,—চলো ফিরে আফ্রিকায়। সেখানে গিয়ে সেখান থেকে যুদ্ধ করা যাবে। আফ্রিকায় শ্বেত আছে। এবং এদেশেও একদা আফ্রিকা চড়াও হতে পারবে। অস্ত্রে না হোক বাণিজ্যে, কাঁচা মালের সরবরাহে। সুতরাং দেহি যুদ্ধং। আমরা আর কাকুতি-মিনতি করব না। সমঝোতার দু-মুখো সাপের কবলে পড়ব না।

এ হল জনমুখের দাবী। বিপ্লবের প্রাণই হল এই দাবী। জনতা যখনই এক আকুল বাণীর প্রেরণায় সংগ্রামকে শপথ নিয়ে এগিয়ে যায়,—ইতিহাসে তা পরিণতি লাভ করে বিপ্লবে। বিপ্লবের দুই চরণ, দুই চোখ, দুই বাহু, দুই ফুসফুস : তার একটি হল জনগণের শপথ, দ্বিতীয়টি সেই জনমানসকে জাগিয়ে রাখার মত দীপ্ত কোনও আশ্চর্য শপথ,—ভবিষ্যতের অন্ধ-কারের মধ্য থেকেও যা জ্বল জ্বল করে চেয়ে থাকে। সে শপথ যেন অন্ধকারের সুপ্রভাত। সে শপথের দীপ্ত উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হচ্ছে ষড়ৈশ্বর্যে মণ্ডিতা জ্যোতির্ময়ী দেশমাতৃকার অফুরন্ত প্রাচুর্যের মন্দিরে। সেই শকতির মুকতিই আগামী যৌবনের রকতের ডাক, প্রাণের স্ফুরণ। এরই নাম আদর্শ। এই বাণী আজ এপার-ওপার আফ্রিকার সোচচার। বাণ ডেকেছে। সাড়া জেগেছে। কূলের তরী আকুল হয়ে ককিয়ে উঠেছে। আজ শ্বেত আমেরিকা সভীত খেদে কুঁকড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই শংঘচূড় পাল্টা শাদা ছোবল মারার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমনি ফণা তুলে সে ছুবলেছে একদিন আপাচে (রেড ইণ্ডিয়ান) আদিবাসীদের। সেদিন তার সেই গোপন ডাকাতির সাক্ষ্য কেউ ছিল না। রাত্রির অন্ধকারে হায়েনার মত তারা চুপি চুপি একটা গোটা বীর অথচ শান্ত জাতির অস্তিত্বকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। একটা স্নিগ্ধ শান্ত জাতের কর্ম, নর্ম, মর্ম, এই পরকাল,—অমোঘ দুর্বার নিয়তির মত মাত্র চোয়ালের জোরে বিশ্বাস-ঘাতকতার আঘাতে ধুলোয় মিটিয়ে দিয়েছে। সেদিন ছিল না টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সংবাদপত্র, রেডিও, বিশ্ব জাতিসংঘ, পেট্রোল কাঁচামালের ক্ষিধে। —আজ এই সব শাখা-পল্লবিত জনগণ সম্পর্ক বিন্যাস দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। নিষ্কৃতি নেই। নীরবে চুপ করে জাতকে জাত সাবড়ে দেবার দিন ছোট হয়ে আসছে। —রাত্রির অন্ধকারে আজ আর যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ শাহারা ভীত, সন্ত্রস্ত। তারা বুঝছে সংঘাত আসন্ন, দীর্ঘ এবং অবশ্যম্ভাবী। তারা সেকালে এক জায়গায় গোল হয়ে জড়ো হয়ে লড়েছে আপাচেদের চার ধার থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে। আজ তারাই নিগ্রোদের পুরেছে ঘেটোয়, শহরে, পাড়ায়। এবং চতুর্দিক থেকে তারাই আজ কেন্দ্রীভূত নিগ্রোদের ঠেসে ধরেছে। আজ তাদের ঘিরে দমবন্ধ করার মৌকা তালাশ করছে। আমেরিকায় আজ দাঙ্গার পর দাঙ্গা। সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে কমিশন বসিয়েছে (১৯৬৭) - দাঙ্গা কেন? সরকারী কমিশনের রায় বেরিয়েছে। জাহির হয়ে গেছে এ দাঙ্গার কারণ শাদা-কালোর বর্ণ-সমস্যার বিকৃতি। আমেরিকায় মানুষ আর মানুষ নয়। রং-ই মানুষ। রং না থাকে,—নির্যাতিত হও। রং-সাজী সভ্যতা এ। রং থাকে বাঁচো, না থাকে নিপাত যাও।

কী ভয়ে যে ভীত এই বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেত সমাজ তার পাত্তা লাগাতে হবে এ কালীন কিছু ঘটনার ফিরিস্তি সামনে রাখলো।

১। রোডেশিয়ায় ইয়ান স্মিথ কড়া হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাম্বিয়ার পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল গেরিলা-বাহিনী। অথচ এদেরই দেশ। এরা শান্তি চায়।

আমেরিকায় আপাচেদের কী দশা। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোর কী দশা, প্রত্যক্ষ করার পর কোন সাহসে কী বিশ্বাসে নিগ্রো চুপ করে থাকবে শাদা শাসকদের নীতি-বোধের গান গেয়ে?

২। রোডেশিয়ায় নিগ্রোদের দেশেই নিগ্রোদের দলকে দল ফাঁসি কাঠে ঝুলেছে (১৯৬৮) এবং গেরিলারাও ধ্বংসে লেগে গেছে ঠিক এর পরেই। জাইরে-য়, জাম্বিয়ায় মহাঅরণ্যে তারা মোক্ষম দুর্গ রচনা করেছে। ভিয়েৎনামে আমেরিকা যা পারে নি আফ্রিকার অরণ্যে স্মিথ কী তা পারবে?

৩। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডে-শিয়ার মধ্যে সৌখ্য যত নিবিড়তর আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তের গেরিলাদের সৌখ্য ততই ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য। এসকালেশন নামক খাঁড়াটি দু ধারেই কাটে।

(চলবে)

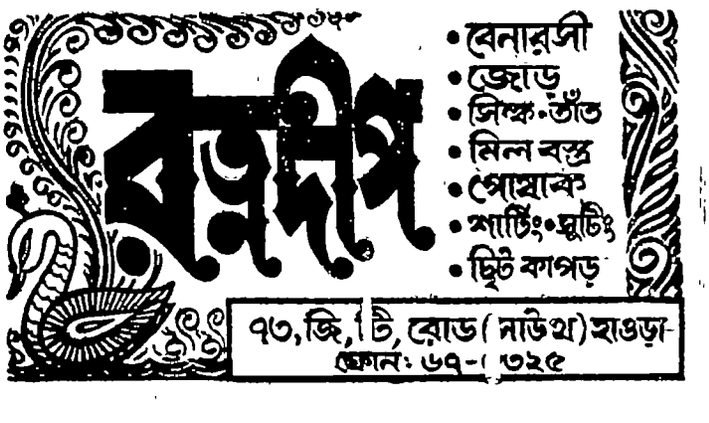

গাড়ির দেখনে ঘোড়া জুতলে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বছর কয়েক আগে 'এক্ষণ' নামক পত্রিকায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি উপন্যাস(?) বেরিয়েছিলো। পুরো পত্রিকাটি জুড়ে উপন্যাস। নাম 'ফ্রাইডে আইল্যান্ডস'। বাংলা উপন্যাস, তার নাম ইংরেজীতে? তাৎক্ষণিক চমক কাটিয়ে সংখ্যাটি কিনে পড়লাম। পড়তে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার। এটা বাংলা ভাষায় লেখা, না অ্যাংলো-বেঙ্গলি বলে নতুন কোনো ট্যাঁশ-গরু ভাষা? —বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার লেখক বন্ধুদের দশাও তা-ই। অতএব, সেলফে তুলে রাখতে হল। আমি সতীনাথের অচিন-রাগিনী পেড়ে নিলাম সেলফ থেকে। এর ভাষা আমার চেনা ভাষা, বাঙালীরা যে ভাষায় কথা বলে। আর লেখকের সঙ্গে আত্মীয়তা নিবিড় হতে লাগলো যতোই পড়ে যেতে লাগলাম। একজন বিহার-প্রবাসী বাঙালী লেখক, কতোদিন আগে আমাদের পরিচিত জগতেই দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর আর আমার মধ্যে সময়, দেশকালের কোনো দেয়াল ওঠেনি আজও।

কিছুদিন আগে, দেবেশ রায় নামক গল্পলেখক কোন একটি পত্রিকায় যেন কমলকুমার মজুমদার মশাইর পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। দেবেশ রায় বামপন্থী লেখক বলে পরিচিত। এদের সঙ্গে দীর্ঘদিন মিলে-মিলে জেনেছি, সাহিত্য হবে জনসাধারণের জন্য এদের উপযুক্ত—এরকম সিদ্ধান্তে এরা পৌঁছেছেন। জনসাধারণ কারা? অগণিত সেই মানুষ যারা গ্রামে-গঞ্জে শহরে বন্দরে খেটে খায়? শিক্ষা পায়নি? স্বাস্থ্য নেই? এদের জন্য লেখা অবশ্যই উচিত। তবে দেবেশ রায় বা দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় লেখেন তা এরা কানেও শোনেননি। জন্মত বামপন্থী সাহিত্যের পাঠক হন পড়েন তারাই যারা সাহিত্য পাঠক, কোনো বিচার না করেই সাহিত্যের স্বাদ নিতে এদের অসুবিধে হয় না।

কমলকুমার মজুমদার অনেকেরই কাছে কিংবদন্তীর নায়ক। লেখকের আদর্শ। ভাষার আদর্শ। জীবনযাপনের আদর্শ। তাঁর লেখা নিয়ে বিরুদ্ধ কথা বললে অনেক শিক্ষিত লোক লগুড় হাতে তেড়ে আসবেন। ওকে নিয়ে দেবেশ রায় যেমন উচ্ছ্বাস দেখান তেমনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও একদা আবেগ-মথিত হয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। কমলকুমারের লেখার বিষয়-বস্তু নিয়ে কথা বলছি না, ভাষা নিয়ে প্রশ্ন অনেকেরই আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামরাম বসুর ভাষা কমলবাবুর হাতে কিছু হেরফের হয়েছে মাত্র, মনেই হয় না, উনি বিশ শতকের শেষপাদের মানুষ। ভাষার নিয়ম কি সনাতন হওয়া না পেছু হটতে হটতে দুশ বছর পেছনে ফিরে যাওয়া?

'কলিকাতা একটি নয়নাভিরাম মায়াময় গভীর নগর....ক্রমাগত শ্মশান ও যে কোন বৈরাগ্য জননী ভাববিগ্রহকে গলধঃকরণ করে, চিবায়ঃ অধুনা চাবিদিকের রমণীসকল তাহারই শুভ্র উৎকৃষ্ট ঘোর দন্তপঙ্‌ক্তি।'

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরমা হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয় বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই বর্ণবিরহিত করে, সে স্থির যে পুরুতমশাইকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল; গ্যাসের আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান ছায়ার অন্ধকার পথ হইতেই শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে প্রবঙ্গ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি... হৃদিস্থং সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্। ইহা ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন।

কয়েকটি পংক্তি ও অনুচ্ছেদের অংশ পাঠক পড়ুন। এ কোন ভাষা যা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? এর সঠিক বঙ্গানুবাদ করা খুব কঠিন কেন না বাংলা ভাষার সহজ চাল এখানে নেই। কৃত্রিম আর অস্বচ্ছ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেন। তিনি যে ভাষায় লেখেন তা শহুরে বাঙালীর কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। কিস্রাপদের স্বাভাবিক পরিণতিকে আর পাঁচজনের মতন তিনিও মেনে নিয়েছেন। কমলকুমারের প্রশংসা তিনি কি ভেবে করেন বোঝা কঠিন? কমলকুমারের পাঠক যে অত্যন্ত সীমিত তা খুব গর্বের বিষয় নয়। সহজভাবে গভীর কথাটা লিখলে পাঠক হয়তো পেতেন তিনি, তা তিনি চাননি। নিজেকে মানুষ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে সহজ হননি, পাঠকের রুচিকে মেনে নেননি, তাকে নিয়ে যে কমার্স করা যায় না এটা গুণ হিসেবেই আমরা জেনে এসেছি। অথচ পথের পাঁচালী বা পদ্মানদীর মাঝি যে বড়ো মাতের লেখা তাও জেনে গেছি আমরা। বিভূতিভূষণ বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুষ্টিমেয় অভিজাতগর্বী মানুষের বিস্ময় মাখানো শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন, না বাঙালী জাতপাতহীন পাঠকের বুকের কাছে যেতে চেয়েছিলেন? সহজ ভাষায় গভীর দেখাটি দেখতে পেরেছেন তাঁরা। বাঙালী তাঁদের বই কেনে। পড়ে। উপহার দেয়। এঁদের লেখা নিয়ে কমার্সও হয়। আভিজাত্যও থাকে। ছদ্ম পোষাকের আড়ালে সন্ত সাজতে হয়নি এঁদের।

একজন বামপন্থী আর অন্যজন স্বাধীন সাহিত্যপন্থী, দেবেশ রায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমারকে নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন তা প্রায়শই প্রশংসা-সূচক। আমরা তাঁদের নিন্দা করতে বলছি না, তবে দুজন লেখকের যে সাহিত্য-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার সঙ্গে কমলবাবুর আদর্শ অসমানজমিন ফরাক। তবু এঁরা প্রশংসা করতে পেরেছেন। এই উদারতার কাছে শিক্ষা করবার অনেক কিছু আছে। সুনীলবাবু জানেন, কমলবাবু যা লেখেন, যেমনভাবে লেখেন তা নিয়ে তিনি কোনোদিন বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবেন না। অতএব প্রশংসা করলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। দেবেশবাবুও হয়তো বুঝে গেছেন, কমলবাবু শংকর, নিমাই, বুদ্ধদেব গুহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার। কমলবাবুর আদর্শ জয়ী হলে ওরা হেরে যাবেন। অতএব ওকে প্রশংসা মানেই যুদ্ধে নেমে পড়া। আমরা, সাধারণ পাঠক একটু গোলোকধাঁধায় পড়ে যাই, এই যা।

ভাষা, চিন্তার অনুভূতির আবেগের মুক্তির বাহনমাত্র। লেখার কাজ, মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয় বিনিময়, শুভেচ্ছা বিনিময়। নিজেকে অন্যের কাছে মেলে ধরতে হলে ভাষার স্বাবলম্ব হতেই হবে। সেই লেখকই সার্থক যিনি এই কাজটি বিনা ছলচাতুরির সাহায্যেই করে ফেলতে পারেন। তার ভালোবাসা, ঘৃণা, দ্বন্দ্ব, উৎসাহ, নৈরাশ্য তিনি এমন সহজভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন, যাতে পাঠক তার ডাকে সহজেই সাড়া দিতে পারে। বিশেষ করে গদ্যের ক্ষেত্রে। তার মানে এই নয়, খবরের কাগজের ভাষাই লেখার আদর্শ। তবে লেখাতো এক ধরনের সংবাদও বটে। পাঠকের সঙ্গে বিরোধ নয়, আত্মীয়তাই লেখকের কাম্য। তিনি কি চান, তার এতো শ্রম-স্বেদরক্তের ফসল শুধু শেলফ-শোভন হয়েই থাকুক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই বইটি তাক থেকে নামিয়ে এনে পাঠক পড়বেন, এটা কি তিনি অবচেতনে চান না? যাদুকরের আলখাল্লা পরে জনপদ থেকে দূরে রহস্যবাড়ি আড়ালে আত্মগোপন কি লেখকের কাম্য?

গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

মনোরঞ্জন বসু

আবার ঠাকুর নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন—পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই ইদানীং (নিজের দেহ দেখিয়ে) এই খোলটার ভিতর এসেছেন। তবে এবার লুপ্তভাবে আসা, রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগর দেখতে আসেন।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, দেশ-কালাদি অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তু সৎ, আর সব কিছুই ভ্রান্ত মায়া, নানা যুক্তি সহায়ে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে ঐ কথা মনন করতে নির্দেশ দিলেন এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হতে বললেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু মনকে নির্বিকল্প করে নাম-রূপের ঊর্ধ্বে যেতে পারলেন না। অন্যান্য পার্থিব সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পারলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁর মনকে কিছুতেই নাম-রূপের স্তর অতিক্রম করতে দিল না। তিন দিন চেষ্টা করেও রামকৃষ্ণ যখন নির্বিকল্প স্তরে উঠতে পারলেন না, তখন তিনি হতাশ হয়ে তাঁর গুরু তোতাপুরীকে বললেন, 'না কিছুতেই আত্ম-নিমগ্ন হতে পারলাম না।' তোতাপুরী তখন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে একখণ্ড কাচ দিয়ে রামকৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল সজোরে বিদ্ধ করলেন, এবং ঐ বিন্দুতে মন গুটিয়ে আনতে বললেন। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রামকৃষ্ণ এবার ধ্যানমগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীমূর্তি আগের মত তাঁর মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে ঐ মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, এবং হু-হু করে সমগ্র নাম-রূপের উপরে উঠে পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন। তিন দিন তিন-রাত কেটে গেল, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রীতিপূর্ণ মুখে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রদীপের মত রামকৃষ্ণের চিত্ত ব্রহ্মে লীন হয়ে রইল।

তোতাপুরী স্তম্ভিত হলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর কঠোর সাধনা করে তিনি যা লাভ করেছেন মাত্র তিন দিনে সাধক রামকৃষ্ণ তা পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেললেন। এ কি, অদ্ভুতপূর্ব বিস্ময়! বৈদান্তিক তোতাপুরী তখনও জানেন না বাংলার শক্তি সাধনার দুর্জয় প্রভাব জগদম্বার লীলা সাধনরাজ্যে সাধককে কতদূর নিয়ে যেতে পারে।

'হরি ওম' মন্ত্রের সুগভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটীর চতুর্দিক পূর্ণ করে তোতাপুরী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সমাধি থেকে তুললেন। নির্বিকল্প সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সাধক রামকৃষ্ণ অদ্বৈত সাধনে সিদ্ধ হলেন। ঐ সময় বহু বেদান্ত-মার্গী সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এসেছিলেন এবং 'অস্তি ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্ত প্রসিদ্ধ তত্ত্বের বিচার-আলোচনায় তাঁর বাসস্থান মুখরিত থাকত। নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান কালে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন ও উপলব্ধি হল, 'ভাবমুখে থাক'—এই আদেশ তিনি পেলেন। সাধনার সিদ্ধি স্ব-ভাবে থেকেই হয়।

অদ্বৈত ভাবের কথা জিগ্যেস করলে রামকৃষ্ণ বলতেন—'উহা শেষ কথার শেষ কথা.. জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং 'যত মত, তত পথ'। অদ্বৈত মতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঠাকুরের মন এত উদার ভাবাপন্ন হয়েছিল যে, তিনি সুফী সম্প্রদায়ের ফকির গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

সাধক রামকৃষ্ণের সাধনার শেষ পর্ব উপস্থিত হল। 'ষোড়শীপূজা তাঁর শেষ সাধনযজ্ঞ। ১২৮০-র জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্যতিথি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান। কিন্তু 'পূজার আয়োজন সেদিন মন্দিরে না হয়ে গুপ্তভাবে ঠাকুরের ঘরে হচ্ছে। রাত্রি ৯টা রহস্যপূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। মাতাঠাকুরাণীকে (শ্রীশ্রীসারদা মা) পূজার সময় উপস্থিত থাকতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যথা সময়ে ঠাকুর পূজায় বসলেন। পূজার জিনিসপত্র শোধন করলেন। আলপনা দেওয়া পীঠে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বসতে বললেন। পূজা দেখতে দেখতে মা আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তিনি পূর্বদিকে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ-দিকে উত্তরাস্যা হয়ে বসলেন। শ্রীশ্রীমার শরীরে মন্ত্রাদির যথা বিধানে ন্যাস করে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ঠাকুর তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিত ভোগের কিছুটা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে দিলেন। মায়ের বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। তিনি সমাধিস্থ হলেন। আত্ম-সমাহিত পূজক সমাধিস্থা পূজ্যা দেবীর সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর ঠাকুরের ভিতর চেতনার উদয় হল। তখন তিনি দেবীকে আত্ম-নিবেদন করালেন এবং দেবীর পাদ-পদ্মে নিজেকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তাঁকে প্রণাম করলেন।

পূজা শেষ হল। ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাস রহস্য পূজার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লেখা হল। নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে

'দেবী জ্ঞানে পূজার মধ্য দিয়ে দেব-মানবের ব্যবধান ঘুচে গেল, ব্যবহারিক দিক থেকে নারী মাতৃশক্তিতে রূপান্তরিত হল।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথা, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা দেখে তাঁকে সর্বাগ্রে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন; —পরে অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে নানা শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করে ঐ দর্শন মিলিয়ে নেওয়ার অবসর দেন। অতএব, তাঁর কাছে এখন তিনি কি চাইবেন? চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধন একে একে শেষ হয়েছে। বৈষ্ণব তন্ত্রের পঞ্চ ভাবাশ্রিত যত প্রকার সাধন পথ ভারতে প্রবর্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ, নিরাকার রূপের দর্শন হয়েছে, এবং জগদম্বার অচিন্ত্য লীলার ভারতের বাইরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনার ফল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অতএব, তাঁর নিকট আর তিনি কি পেতে বা শুনতে চাইবেন?

রামকৃষ্ণের সাধন পরিক্রমা

শংকর বেদান্ত অধ্যাত্ম মুক্তিপথগামী যতি সম্প্রদায়ের একান্ত কাম্য। হরিদ্বারে গুরুকুল সম্প্রদায়ে ঐ বিষয় বিশেষভাবে পঠন-পাঠন, সাধা-সাধন হয়। সেই সুদূর পশ্চিম থেকে, শ্রীমৎ তোতাপুরী (ঠাকুর যাঁকে ন্যাংটো বলতেন), দক্ষিণেশ্বরে এলেন, ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ঠাকুর পূর্বেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্র-সাধনার নানা দিক শিক্ষা করেছেন। ভৈরবীর তত্ত্বাবধানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে (এই আসনে একমাত্র অভিষিক্ত সাধকেরা বসবার যোগ্য) বসা থেকে আরম্ভ করে, বীরাচারী সাধনার অংশবিশেষ পঞ্চ 'ম'কার কৃত্য শেষ করে তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হয়েছেন; এবং শক্তির ক্রমিকধারায় একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে মহাশক্তির অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছেন। ফলে কট্টর অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর ভক্তিবিহীন জ্ঞান-সাধন, রামকৃষ্ণের বংশ-পরম্পরায়, অনুভব, বাংলার জল-বায়ু-মাটি ও শক্তি-ভক্তি সাধন ধারা প্রভৃতির দিক থেকে আপাত-বিরোধী বলে সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেও, যত মত, তত পথ'-র প্রবক্তা সহজেই ঐ সাধনা হজম করে ফেলেছিলেন। আজ্ঞাচক্রের রহস্য ভেদ করে সাধক রামকৃষ্ণ উঠেছিলেন নির্বিকল্পক সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে। প্রাণের অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন ঐ স্তরে কেটে যায়। চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে রামকৃষ্ণ খুঁজে পেলেন আত্মস্বরূপ, সমগ্র বিশ্ব একীভূত হল আত্ম-চেতনার কেন্দ্র বিন্দুতে, বেদান্তের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মম', বা 'তত্ত্ব মসি, শ্বেতকেতো' ঠাকুর প্রত্যক্ষ করলেন চেতনার আলোকে, তোতাপুরী স্তম্ভিত হলেন।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী, এক ও অদ্বিতীয়, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নেই, দক্ষিণেশ্বরে একথা নতুন করে শিখলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী। বক্তামাশয়-ক্লিষ্ট তোতাপুরী সাধন-লব্ধ সম্পদ সর্বস্ব পণ করতে দেহাত্ম বোধ থেকে যখন মুক্ত হতে পারলেন না, তিনি তখন আত্মঘাতী হবেন সংকল্প করলেন, গঙ্গায় ডুবে মরবেন ঠিক করলেন। পশ্চিমের জলবায়ুতে মানুষ হঠযোগে সিদ্ধ সাধক তখনও জানেন না মহাইচ্ছাময়ী ভবতারিণীর ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তাঁর সাধনা পূর্ণতা স্তরে যাবে না। নির্বিকল্পক সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়েছে, মুক্তির আনন্দ তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের মূলীভূত শক্তি-চৈতন্যের স্বরূপ মহিমা তিনি তখনও উপলব্ধি করেননি, ফলে তাঁর অধ্যাত্মমুক্তি তখনও পূর্ণতার স্তরে প্রবেশ করেনি।

একদিন রাত্রিতে স্বামীজীর পেটের যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেল। পুরী মহারাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিছানা থেকে উঠে বসলেন, বসেও সোয়াস্তি নেই। আবার শুলেন, আবার উঠলেন। যতবার সমাধি-ভূমিতে মনকে তোলবার চেষ্টা করলেন ততবার মন দেহস্থ পরিধির উর্ধ্বে যেতে পারল না। স্বামীজী নিজের উপর খুব বিরক্ত হলেন। ভাবলেন পচা দেহটার সঙ্গে থেকে আর কেন কষ্ট পান। এই গভীর রাত্রিতে এটাকে বিসর্জন দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান হোক। মনকে ব্রহ্মচিন্তায় ঠিক রাখবার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে তিনি গঙ্গায় নামলেন এবং গভীর জলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এ কি! ভাগীরথী কি অত্র শুকিয়ে গেছে? না তোতাপুরীর কাছে সবটাই কল্পনা। ভাবতে ভাবতে তোতাপুরী প্রায় ওপারে চলে গেলেন। কিন্তু কোথাও তিনি ভবজল পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল এ কি সব মায়া, না ঈশ্বরের লীলা। লীলা শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতর থেকে কে যেন বুদ্ধির আবরণ টেনে নিল, তোতা-

---

গত সংখ্যায় ২৬ পাতায় ছাপা ছবিটির পরিচিতি হল : কামারপুকুরে মন্দির ও পৈতৃক বাসভবন

মনিকর্ণিকা ঘাট । বারাণসী

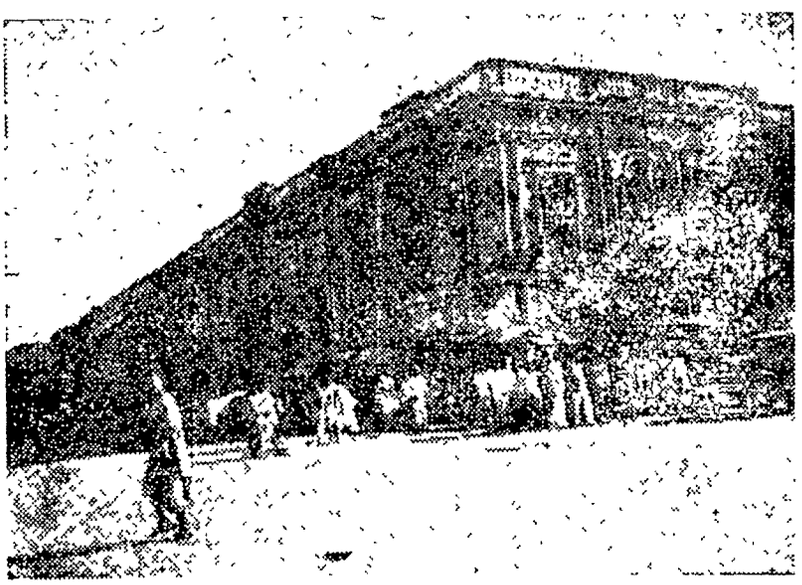

রানী রাসমনির বাড়ি

মথুরনাথ বিশ্বাস

পুরীর চোখ উজ্জ্বল জ্যোতিতে ঝলসে উঠল —তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অচিন্ত্য শক্তি-রূপিণী মাকে। তিনি দেখলেন জলে, স্থলে সর্বত্র মা; শরীর, মন, বুদ্ধির পারেও মা,—তুরিয়া, নির্গুণময়ী মা! এতদিন তোতা-পুরী যাকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করে এসে-ছেন, সেই মা! মায়াবাদী মাতৃশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করলেন।

গভীর রাত্রে তিনি মা জগদম্বার অচিন্ত্য, অব্যক্ত, বিরাট রূপের দর্শন করতে করতে মা, মা চীৎকারে চারিদিক মুখরিত করে তুললেন এবং মায়ের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন। সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে তোতাপুরীর প্রাণ আজ উল্লসিত। ধীরে ধীরে তিনি পঞ্চবটীর তলায় ধুনির ধারে বসে সারা রাত জগদম্বার ধ্যানে কাটালেন।

সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর সংবাদ জানতে গিয়ে দেখেন তোতাপুরী যেন সে মানুষই নয়। মুখে সামান্যতম ক্লান্তির ছাপ নেই, মন খুশীতে ভরা। রামকৃষ্ণকে ইঙ্গিতে পাশে বসতে বললেন, এবং পূর্ব রাত্রির সব ঘটনা বললেন, মায়ের দর্শন পেয়ে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন, তাঁর মনের সব দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। এতদিনে তিনি বুঝেছেন, তাঁর অদ্বৈত সাধনাকে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা তাকে এতদিন দক্ষিণেশ্বরে রেখে-ছিলেন। প্রভাতী সুরে নহবত ধ্বনি শুনে শিবরামের মত গুরু-শিষ্য মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। প্রভাতের অরুণ আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠেছে। মার মন্দিরের দরজা খুলে গেল। তোতাপুরী মা ভবতারিণীকে দেখলেন। অনাস্বাদিত আনন্দে তোতাপুরীর মন ভরে গেল। তিনি তৃপ্ত হলেন। জ্ঞানসাধক শক্তির মহিমা উপলব্ধি করলেন। তোতাপুরী-রামকৃষ্ণ গুরু-শিষ্যের অপূর্ব মিলনে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস ঐ মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠল। তোতাপুরী প্রত্যক্ষ করলেন সৃষ্টি রহস্যের আদি চৈতন্য শক্তি মা ভবতারিণীকে। শিব-শক্তির মিলনে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হল—তোতাপুরী মা-ভবতারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। লোটা-কম্বল নিয়ে পশ্চিমের পথে যাত্রা করলেন। শোনা যায় তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন নি। কিংবদন্তী আছে মহা-বৈদান্তিক পুরীর 'নাঙ্গা বাবা' ২৬২ বৎসরে যিনি দেহ রেখেছেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধনার গুরু তোতাপুরী।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ পথের সাধক ছিলেন। উত্তর, রামকৃষ্ণ কোন বাঁধা-ধরা পথ ধরে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধন শুরু করেন নি। তিনি ছিলেন স্বভাব সাধক, আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর সাধনার ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় ব্যক্তিগত অনুভব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সাধন পথে যাত্রা শুরু করেন এবং যখনই যে ধারার

সাধনার পক্ষে গুরুর প্রয়োজন হয়েছে তখনই যোগ্য গুরু এসে তাঁর কাছে হাজির হয়েছেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম—সবই তাঁর সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে, তবে সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায়, এবং উন্মেষ জ্ঞানে। বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, জ্ঞানী, প্রেমিক, যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর দিকদর্শনের খোঁজ পাবে না—রামকৃষ্ণের সাধনার অনন্যতা সেখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য প্রতিনিধি কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, রামকৃষ্ণের প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ নিজেই, তবে বিবেকানন্দের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বিরোধী নয়। প্রচলিত মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়া, তন্ত্র সাধনা নয়। বিভূতিবাদ বা অষ্টসিদ্ধি লাভও তান্ত্রিক সাধনা নয়, (সাধনার পথে সাধককে আত্মচ্যুত করার জন্য ঐসব প্রলোভন আসে), অথবা পঞ্চ-মুণ্ডিত আসনে বসে 'পঞ্চমকার' সাধনা বামাচারী সাধনার অঙ্গ হলেও অন্যের জন্য উপজীব্য নয়। তন্ত্র সাধনা মূলতঃ প্রাণ ও চৈতন্য শক্তির জাগরণ, চৈতন্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে লোকহিতার্থে মাটির পৃথিবীতে অবতরণ, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে পরাশিব লোকে অবস্থান, স্বজনী শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ। অন্যদিকে বেদান্তের মহাবাক্যের প্রায়োগিক বা সাধনার দিক হল তন্ত্র, ফলে তন্ত্র ও বেদান্ত—সাধন-অভিজ্ঞতার দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে কোন মৌল বিরোধ নেই। অতএব, বিবেকানন্দের 'শিবোঽহং' বা 'সোঽহং'বাদ রামকৃষ্ণ শিক্ষার প্রতিধ্বনি।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এখানে আর একটি প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্ম-কতার বৈশিষ্ট্য কোথায়? কোথায় ঐ সাধনার মৌলিকতা? ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষ অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান—গয়া, কাশী, কাঞ্চী, হরিদ্বার, কংখল, নর্মদার তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল, অধ্যাত্ম ভারতের সাধনার গৌরব গাথায় সমুজ্জ্বল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—পঞ্চোপাসক ছাড়াও আউল, বাউল, অঙ্ঘড়, অঘড়, হংস, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, অবধূত অঘোরী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের [illegible] ভরা ভারতভূমি। তা ছাড়াও [illegible]

ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি দশনামী সম্প্রদায়ের যতিগণ অধ্যাত্ম ভাবতের সাংস্কৃতিক পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে। স্থির, গম্ভীর, মৌনী ভারতের অন্তরাত্মা স্পর্শ-করলে আজও ভারতের অধ্যাত্ম বাণী শোনা যায়। গিরিকন্দরে, পুণ্যসলিলা নদীবক্ষ, গভীর অরণ্য, মঠ-মন্দিরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থ-ক্ষেত্রে। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় এই ভারতেই রাজার ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, ধনী ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছেন, রাজা ঋষিত্বে উন্নীত হয়ে রাজ কর্তব্য পালন করেছেন। সেই অধ্যাত্ম ভারতের মানচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়, কি বা কোথায় তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রকাশ অধ্যাত্ম চেতনায়, প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে এবং সিদ্ধি-ক্রিয়ায়—এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আমরা মাতৃজ্ঞানে শক্তিসাধন, বৈদান্তিকের দণ্ড গ্রহণ, ও নির্বিকল্পক সমাধিতে উত্তরণ, দেশ কালের অলঙ্ঘ্য গণ্ডী অতিক্রম করে পূর্ণতের অধিষ্ঠান, প্রারব্ধের রহস্য ভেদ করে মনুষ্য জীবনের জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র ইতিহাস তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। পরিণামে অমৃতত্ব লাভ করে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তিনি উঠেছিলেন। শক্তি চেতনার সূত্র ধরে তিনি অতিক্রম করলেন প্রাণ শক্তির গণ্ডী, স্বরূপতঃ চৈতন্যশক্তির কেন্দ্র-বিন্দুকে তিনি আবিষ্কার করলেন আত্ম-স্বরূপ মহিমায়, উপলব্ধি করলেন এমন এক অবস্থা যেখানে রবি, শশী স্তব্ধ, নক্ষত্র জগৎ অবলুপ্ত, ছায়াছবির মত সমগ্র বিশ্ব জগৎ অনন্ত আকাশে ঘুরে চলেছে। জীব-চেতনার সূক্ষ্মতম অভিমানরূপ সংস্কার সেখানে নির্লিপ্ত, কর্মবীজ দগ্ধ, সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যে বিধৃত হয়ে আছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সেখানে আন্তর বৃত্তাকারে। বিকল্পের জনক কাল সেখানে কুক্ষিগত হয়েছে কালসঙ্কর্ষিণী শক্তিতে, চৈতন্য শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তির রূপান্তর ঘটে, স্থূল বিশ্ব তখন চিন্ময় হয়ে উঠে। সংহারের পরবর্তী স্তর তিরোধান শক্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিকল্প বিলুপ্ত হয়ে চিত্ত শান্ত, নিস্তরঙ্গ ভাব পায়; পরবর্তী ধাপে অনুগ্রহ শক্তির প্রকাশ নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রে ঊর্মি বা তরঙ্গের অনুভব, শিবলোকে উত্তরণ। মহাশক্তি সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সে শক্তির আভাস সাধক সমাজকে দিয়ে গেছেন।

ব্যবহার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় গ্রহণ, অনুভব, বিশ্লেষণ উত্তরণ ও বৈকল্পিক ন্যায়ের ধারায় বিবাদ-কারী বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ মীমাংসার মধ্যে। সাম্প্রদায়িক দিক থেকে প্রশ্নের শেষ ধারাটি এভাবে তোলা যায়—একজন দিব্যাচারী তান্ত্রিক ও একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী দুইয়ের মধ্যে সাধনাংশে বা উপলব্ধি স্তরে কি কোন বিরোধ থাকতে পারে ? বা একজন ভক্তি সাধক ও একজন শক্তি সাধক—দুইয়ের সাধনার মধ্যে শক্তি-চৈতন্যের দিক থেকে কি কোন অসঙ্গতি দেখা যায় ?

দুটি প্রশ্নের একই উত্তর 'না'। কারণ দিব্যাচারী তান্ত্রিক ও বৈদান্তিকের লক্ষ্যবস্তু এক—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতিগত দিক থেকে, বৈদান্তিক এটা নয়, ওটা নয়, (নেতি, নেতি)-র সূত্র ধরে, মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্যে দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছান, আর একজন ইতির মহিমা শেষ করে, পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় মহাশক্তিকে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর অপার করুণা লাভে সমর্থ হন। তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমান উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই সাধনার দিক থেকে তন্ত্রকে বেদান্তের প্রায়োগিক দিক বলা হয়। দ্বিতীয়—বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাধক—সাধনার দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ দুজনেই মূলত শক্তিসাধক, 'হ্লাদিনী'-শক্তি ও 'চিতি শক্তি'—দুইয়ের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। ব্যবহার ভূমিতে যে পার্থক্য দেখা যায় তা আচরণগত দিক থেকে। বৈষ্ণব তন্ত্র সাধারণভাবে তন্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সাধন রাজ্যে কোন জাত-বিচার নেই।

ঈশ্বরলাভের পক্ষে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হতে হবে, এ-কথা শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে দেখা যায় না। আজীবন শাদা কাপড় পরে তিনি সাধনা করে গেছেন এবং গেরুয়া না পরেই তিনি আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। গার্হস্থ ধর্ম সঠিক পালন করে বা একজন আদর্শ গৃহী যে ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হতে পারেন সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের অভিপ্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে নাগ মহাশয়, শ্রীবলরাম বসু প্রভৃতি অনেক আদর্শ গৃহী উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন।

কোন ধর্মমত বা পথকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বর্জন করতেন না। গ্রহণই তাঁর সাধনায় প্রাথমিক শিক্ষা। অনুভবে পাওয়া সাধনার সিদ্ধান্তগুলি তিনি যাচাই করে নিতেন অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ফলে কোন আগন্তুক সংস্কার তাঁর সাধনাকে হাল্কা মানসিকতায় নামাতে পারত না। এইভাবে তিনি অধ্যাত্ম রাজ্যের একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতার স্তরে উঠেছিলেন এবং সম্প্রদায়-গত ধর্মের ওপরে উঠে তিনি এমন এক সম্যক দৃষ্টি লাভ করেছিলেন যার ফলে তিনি যে কোন ধর্মমতের মূলে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক জীবনে যা কিছু পেয়েছেন সবই আচরণের মধ্য দিয়ে। 'আপনি আচরি ধর্ম, পরের শিখাও'—এই বাক্যটির সার্থক রূপায়ণে রামকৃষ্ণের সাধক জীবন।

(চলবে)

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বপরিচয় ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছোটদের উপযোগী বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ৩.০০ টাকা

পূজাপার্বণ ।। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির আলোচনা। মূল্য ৩.০০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ।। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১.৫০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ।। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২.৩০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ।। যোগেশচন্দ্র বাগল
উনিশ শতকের বাংলা দেশের নব্যচিন্তা ও নবনির্মিতির চিত্র। মূল্য : ১.৪০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ।। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিক-দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মূল্য ২.০০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ।। নির্মলকুমার বসু
প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র সম্বলিত। মূল্য ২.৫০ টাকা।

'নবভারত' গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ
কলিকাতা : ১৩ প্রিন্টোরিয়া স্ট্রীট কলিকাতা ৭১
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।

শ্যামল রায়

আমি উঠে দাঁড়াই, কাছে এসে বলি, 'নিয়ে এল।'

'কে?'

'যশোদা।'

'ও কোথায়?'

'বাড়ি গেছে।'

'ও' বলে সন্দীপদা ঘুরে দাঁড়ালেন। আঙুল তুলে একটি ছেলেকে কাছে ডাকলেন। রোগা, লিকলিকে একটি ছেলে বড় একটা মাথা নিয়ে এগিয়ে এল। সন্দীপদা বললেন, 'মিঠো... ভাল করে দেখে রাখ একদিন তোর কাজে লাগবে।' ছেলেটি বসে পরে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হল যন্ত্রণা হচ্ছে কোথাও। ছেলেটি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন বলে, আমি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরি। ঠাণ্ডা শক্ত হাত কাছে টানে। আশপাশের সবাই এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। আমি বললাম, 'আপনারা সবাই ভিজে গেছেন, কাপড় পালটে নিন—অসুখ করবে।' সবাই নির্বিকার থাকে। কে একজন বলল, 'আমাদের আর কাপড় লাই গো—ছাড়লি জন্মের জামা পইড়ে থাকতি হইবে।' সবাই হেসে ওঠে। আমি বিব্রত বোধ করি। সন্দীপদা বললেন, 'জলে ভিজলে এদের অসুখ করে না—রোদে ভিজলেও না। দেখিস সবাই কাল সুস্থ থাকবে।' আমি ম্লান হেসে বললাম, 'মিঠোকে পেলেন কী করে? ওকে তো ...'

'ছেইড়ে দিল... আমরা যেতি না যেতিই ছেইড়ে দিল।' কে একজন বলল, 'দেখানি, উয়ার ডর নাই... শালু...' একটা গুঞ্জন ওঠে। স্পষ্ট কোন কথা নয়, ছেঁড়া কথার জড়তা। হাত ছাড়িয়ে মিঠোকে আমি বসিয়ে দেই, মিঠো বসতে চেষ্টা করে। সন্দীপদা বললেন, 'ছেড়ে দে ও নিজেই বসতে পারবে।' মিঠো মাথা নাড়িয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে বলে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াই। সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে বসেছে। সন্দীপদাও এক কোণে গিয়ে বসেছে দেখে, আমিও সেদিকে এগিয়ে যাই। পাশে গিয়ে বসি।

'নগেন দাসের বাড়ি গিয়েছিলি।'

'হ্যাঁ।'

'কী হল?'

'কিছু নয়।'

'ঘর ভেঙেছে।'

'না।'

'ভাল করেছ। ভাঙলে আমাদের ক্ষতি হত।'

'কী ক্ষতি?'

'বিশাল পুলিশ বাহিনী আসতো, অনেককে ধরপাকড় করতো, বাড়ি-ঘর ভেঙে দিত—এই সব হত। আমরা কিছুই করতে পারতাম না।'

'কেন?'

'আমাদের পায়ের নীচে শক্ত মাটি নেই। শিকড় চালাতে পারিনি বেশী, মাটির নিচে। এখন একটু নড়াচড়া করলেই উপড়ে ফেলবে। যাক কিছুদিন বুঝবি।'

'এত লোক এল বল্লম তীর ধনুক নিয়ে...'

'সে আসুক। পুলিশের সঙ্গে লড়াই বাঁধলে দেখেছি হাজারে পাঁচজন থাকে।'

'কেন?'

'আমরা যা করছি তা গ্রামের মানুষ জীবন দিয়ে বুঝতে পারছে না। মন দিয়ে বুঝছে। এই দুই বোঝা তো সম্পূর্ণ আলাদা। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংগ্রামকে জড়াতে না পারলে মানুষ সংগ্রামকে ভয় পাবে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাবে। তুই যেমন অন্ধকারে পুকুরের জল দেখে ভয় পাস।'

আমি এ কথার কোন উত্তর দেই না। উত্তর নেই।

ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠলো। দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তীরের মত আলো ছুটে আসছে বাইরে। বৃষ্টি ধরে এসেছে। যতিনদা আলো নিয়ে বাইরে এলেন। বললেন, 'শানু যাবানি।'

'যাবো—বৃষ্টিটা থামুক।'

'ফিরবা কোন দিন?'

'মঙ্গলবার।'

'রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ।'

'খোকা আমার কাছে থাকুক। মঙ্গলে ফিরা দেইখবা জ্যান্ত আছে।'

সন্দীপদা হাসলেন। কিছু বললেন না। বৃষ্টি আবার জোরে তেড়ে এল। সবাই চুপ। কোন সাড়া শব্দ নেই। যতিনদা আলো নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। আলো নিভে গেল। অন্ধকার ঢেকে দিল সবাইকে। আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। নিজের হাত আমি মুখের কাছে নিয়ে আসি। দেখতে পাই না। হাত দিয়ে সন্দীপদাকে নাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'কয়টা বাজে।'

'ভোর হয়ে আসছে।'

'খাওয়া হবে না?'

সন্দীপদা কোন উত্তর দেন না। আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। আশে-পাশে কত লোক আছে আমাদের। ঘরে যতিনদা। এই একটু দূরেই মিঠো, তার পাশে আরো কত কে? এখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি সন্দীপদার হাত ধরে বসে থাকি। বৃষ্টি পড়তে থাকে।

জলাশার আস্তরণ ভেঙে ভেঙে গাড়ি চলছে। খন্ডা মার্কা লোক দুটো আমার হাত ধরে বসে আছে। সামনে ড্রাইভার। ড্রাইভারের পাশে পুলিশ ভদ্রলোক:

গাড়ির কাচ সব তোলা। বাতাস আসছে না একটুও। খুব গরম আর রুক্ষ লাগছিল। ফুসফুস শুকিয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। খুব কষ্ট। সন্দীপদা তুমি এখন কোথায়? কতদিন দেখি না তোমাকে।

বুঝলেন ডাকতার! মানুষ মাত্রেই অসৎ—কাকে বিশ্বাস করবেন? মানুষ দিয়ে বিপ্লবের কাজ হবে না। গরু ঘোড়া মানে পশু পাখিদের দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন। ওরা ঘাস খায় কিন্তু মানুষের চেয়ে শক্তিতে বলুন, বিশ্বাসে বলুন, আকারে বলুন, প্রকারে বলুন অনেক বেশী এফিসিয়েন্ট, অনেস্ট। কবে থেকে দেখুন আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো কাজ করছে কোন দিক দিয়েই ওদের কোন প্রডাকশান নেই। ভাবা যায়। আপনি বলবেন, ওরা সব সংশোধনবাদী, কিন্তু সত্যি কি তাই—তা নয়। আসলে আমাদের দেশের মানুষের শরীরে একটা জিনিসের অভাব রয়েছে সেটি হচ্ছে এনিমেল প্রটিন। যা থাকে ঘাসের মধ্যে। আপনারা বিপ্লবের কথা না ভেবে ঘাসের কথা ভাবুন। এনিমেল প্রটিন চাই। এনিমেল প্রটিন ছাড়া বিপ্লব হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ঘাসটা খাওয়াবো কী করে?'

'কেন বড়া করে। শাক, চচ্চড়ি যেভাবেই হোক খাওয়াতে হবে।'

আমি বললাম, 'আপনি আগে খেয়ে দেখুন না, আপনার মধ্যে বিপ্লবের ভাব জাগে কিনা। যদি ভাল ফল পান আপনার সহকর্মিদেরও খেতে বলবেন। আপনাদের পুরো বাহিনীটা যদি বিপ্লবী হয়ে যায় তবে আমাদের তো আর ফৌজের কথা ভাবতে হবে না। আপনারাই হবেন গণফৌজ।'

গাড়ি একটা বাক নিল। প্রথমে ডানদিকে তারপর বাঁদিকে ঘুরে সোজা সদর দপ্তর। পুলিশ ভদ্রলোক প্রথমে নামলেন। দু হাত দিয়ে প্যান্ট টেনে ওপরে তুললেন। তারপর হেসে উঠলেন, 'হি-হি গণফৌজ লাল ফৌজ। কত কী। নাম শালা, ফৌজ সারাচ্ছি—নেমে আয়।' ফড়া মার্কা লোক দুটো পাশ থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর আমি নামলাম। বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ। দাঁড়িয়ে কেন, চলে আসুন ওকে নিয়ে এস তোমরা উললুক।' বলে পুলিশ ভদ্রলোক লন পেরিয়ে অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন। লোক দুটো আমার হাত ধরল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। এই জায়গায়, বাড়ি ঘর নতুন নয় কিন্তু এখানকার লোকজনদের সব সময় নতুন বলে মনে হয়। মনে হয় আগে কখনো দেখিনি এদের—আগে কখনো ছিল না।

আমাকে ওরা একটা ঘরে নিয়ে এল। নতুন ঘর। আগে কখনো আসিনি। একটা টেবিল। একটা চেয়ারে একজন লোক বসে আছে। ফর্সা নাদুস-নদুস চেহারা। অন্য চেয়ার খালি। টেবিলের ওপর কিছু কাগজ-পত্র। লোকটির পেছনে একটি জানালা। গিলে দেওয়া। সবুজ একটা পর্দা ঝুলছে। আমি যেতেই তিনি চোখ তুলে বললেন, 'আপনার মামার বাড়িতে দোতালায় একটা ব্যাগ ছিল?'

'না।'

'নাকি মশাই—ঠিক করে বলুন।'

'বলছি তো ছিল না।'

'ছিল।'

'আমার ব্যাগ আমি জানি না—ছিল বললেই হল।'

'বললেই হবে কেন...আমরা নিয়ে এসেছি ব্যাগটা—দেখবেন?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কী চুপ করে কেন?' বলে একজনকে বললেন, 'নিয়ে এসো তো ব্যাগটা। আপনার ব্যাগ আপনি জানেন না, আশ্চর্য!—কী ছিল না?

'ছিল হয়তো।'

'হয়তো কী, ছিল বললেন কেন ছিল না।'

'অনেক দিন আগে দেখেছিলাম, মনে ছিল না।'

'ঠাট্টা বলুন—কি কি ছিল ব্যাগে?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কি কি ছিল আমরা দেখছি কিন্তু বলুন আপনি আপনার মুখ দিয়ে আমরা শুনতে চাই।'

'একটা বেড শাক সি-পি-সির টিস্টিং, কিছু কাগজপত্র এই আর কী।'

'আর কিছু নয়?'

'না।'

ভদ্রলোক এবার বেল বাজালেন। একজন লোক ঘরে ঢুকলো। স্যালুট করল। ওকে দেখে ভদ্রলোক বললেন 'নিয়ে এসো।' স্যালুটটি সেলাম করে বাইরে চলে গেল। 'এমন এই হিসাবে—কিছুই মনে রাখতে পারেন না—কী করে যে কী করেন।'

আমি চেয়ারে এসে বসি। টেবিল দেখি। কাগজ দেখি। দেয়ালে ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখি। 'আসুন' আসুন', বলে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখি ছোটমামা। আমি উঠে দাঁড়াই। ছোটমামা বললেন 'একাস বোস কী ব্যাপার?'

'আপনার ঘরে দোতালায় ওর একটা ব্যাগ আছে—একটা পাঠিয়ে দেবেন।'

'দোতলায় তো ওর কোন ব্যাগ নেই।'

'আছে আছে দয়া করে একটা।'

'না নেই। থাকলে না করবো কেন... নেই।'

ভদ্রলোক এবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন 'কী নেই?'

ছোটমামা অসহায় হয়ে বললেন, 'কোথায়?'

'খাটের নীচে।'

'আমি তো জানি না!'

'অনেক দিন আগে রেখেছি—মনে ছিল না।'

ভদ্রলোক চেয়ার নিয়ে বসলেন। 'এবার একটু দয়া করে ব্যাগটা পাঠিয়ে দিন.... আপনিই নিয়ে এলে ভালো হয়। ব্যাগটা আমাদের দরকার—জরুরী।' ছোটমামা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি চেয়ারে এসে বসি।

'আর কিছু মনে পড়ল?'

'না।'

'দেখলেন তো, বাড়িতে একটা জিনিস আছে আপনারা কেউ জানেন না—আমরা জানি—কী করে?....আর কি কি আছে বলুন।'

'আর কিছু নেই।

'ঠিক তো?'

'এলেই দেখতে পাবেন।'

ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে থাকেন। আমি চেয়ার, টেবিল কাগজপত্র দেখতে থাকি। কিছুক্ষণ পর। একজন অফিসার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের কাছে উপুর হয়ে ভদ্রলোকটিকে কি সব বললেন। তারপর আমাকে বললেন, 'আসুন।'

'যান,' ওঁর সঙ্গে যান—আপনার ব্যাগ এক্ষুনি এসে পড়বে, চিন্তা নেই।' বলে ভদ্রলোকটি হাসলেন। আমি একটু হেসে উঠে দাঁড়াই। 'চলুন', বলে অফিসারটির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। অফিসারটি বললেন, 'আপনি আগে আগে চলুন, আমি পিছনে আছি। আমি একটু দাঁড়িয়ে বললাম, 'কোন দিকে?'

'চলুন বলছি—এখন সোজা চলুন।'

একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে করে অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে ডি-সির ঘরে নিয়ে এলেন। একটা ঝকঝকে সবুজ পর্দা সরিয়ে ডি-সির ঘরে ঢুকলাম। সেই আগের মত সাজানো ঘর। পরিপাটি মানুষটি। পরিপাটি সব কিছু।

'বসুন,' ডি-সি আমাকে বসতে বললেন। সামনের একটা চেয়ার টেনে আমি বসলাম। অফিসারটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, পর্দা একটু নড়ে উঠল, উনি চলে গেলেন। ডি-সি হাত দুটো জড়ো করে কাচে-ঢাকা টেবিলের ওপর রাখলেন। আমার মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি সব দেখলেন। টেবিলে রাখা ঢাকা গ্লাস থেকে জল খেলেন।

'আপনার বাড়ি থেকে আক্কুপাংচারের যন্ত্রপাতিগুলো আনিয়েছি'—বলে ডানদিকের ড্রয়ার থেকে আক্কুপাংচারের বাক্সটি বার করলেন। 'দেখুন তো সব ঠিক আছে কি না।' আমি বাক্সটা কাছে টেনে নিই। খুলে ফেলি, দেখি।

'ঠিক আছে?'

'এবার আমার হাতটা দেখুন।' ওর হাত দেখি।

'আমাকে অ্যাকুপাংচার করলে কোথায় কোথায় সূচ দেবেন। কটা সূচ দেবেন।'

'পাঁচ-সাতটা।'

'কোথায় কোথায় দেবেন?'

'স্যাংচি, তাচৈ, চিয়েন-ইউ, ছুজো থিয়ান চুং, নাও-শু ..

'এই সব নাম আমি বুঝবো না, শরীরের কোথায় কোথায় বলুন।

'অক্সিপিটাল হাড়ের ঠিক নীচে, স্টারনোম্যাসটয়েড ও ট্রাপেজিয়াম মাংস-পেশীর ফাঁকে, সার্ভাইকাল স্পাইন আর থোরাসিক....।'

'থাক, থাক, এই সব শরীরের কোথায় থাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিন।'

আমি উঠে দাঁড়াই। উনি থাক থাক বলে, বসতে বললেন। 'আমাকে একটা সূচ ফুটিয়ে দেখান না।'

কোথায় ফোটাবো।'

'এখানে ফোটান।' বলে একটা হাত বাড়িয়ে দেন। আমি ওঁর হাত কাছে টেনে নিয়ে দ্বিতীয় মেটাকারপেল হাড়ের মধ্য-বিন্দুর বাইরে একটা সূচ ফুটিয়ে দিই। উনি 'আ', বলে হাত তুলে নেন। 'বেশ লাগে.. খুলুন, খুলুন'—বলে, হাসতে থাকেন। আমি সূচ তুলে নিই।

'বুঝলেন, আকুপাংচারের ওপর আমার একটা বিশ্বাস আছে। আমি রীতিমত পড়া-শুনো শুরু করে দিয়েছি।....বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলে বাঁ পাশের ড্রয়ার থেকে কী সব বার করতে চান। আমি বললাম, 'থাক। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে।' উনি এবার নড়ে চড়ে বসলেন। দুটো হাত ঘাড়ের পিছনে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম, মনে কিছু করবেন না। চা খাবেন ?'

বললাম, 'না।'

'না কেন? আচ্ছা, আমি যে আপনাকে নিয়ে এই সব করেছি—কাউকে বলবেন না যেন।'

আমি মাথা নাড়ি। 'এ-সব কী বলার কথা?'

'সত্যি', উনি হাসলেন।

কে একজন লোক পর্দা সরিয়ে বলল, 'স্যার।' উনি বললেন, 'আসুন।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকালেন। 'এবার যে আপনাকে আসতে হবে।' আমি উঠে দাঁড়াই। উনি উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন। আমি হাত ছাড়িয়ে ফিরে দাঁড়াই—হাঁটতে থাকি। অফিসারটি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উনিও হাঁটতে লাগলেন।

'কথা হল?'

'হ্যাঁ।'

'কী কথা।'

'প্যাঙের মাথা।'

অফিসারটি চুপ করে থাকেন। আমরা হাঁটতে থাকি। চুপচাপ হাঁটতে থাকি। আশ-পাশ দিয়ে দালান কোঠা পেরিয়ে যায়। আগের ঘরে চলে আসি। ভদ্রলোকটি বসে আছেন। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ভদ্র-লোক মুখ তুলে বললেন, 'কথা হল?'

'হ্যাঁ।'

'কী কথা।'

আমি চুপ করে থাকি।

'আপনার মামা ব্যাগটা নিয়ে এখনো এলেন না।' আমি চুপ করে থাকি। দূরে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে।

'দাঁড়িয়ে কেন। বসুন....চা আনতে বলেছি।'

আমি চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে থাকি। বাইরে থেকে হাওয়া আসছে খুব। জানালার পর্দাটা মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। বাইরেটা কেমন অন্ধকার অন্ধ-কার ভাব। কেমন শীত শীত করছে। সন্ধ্যা আসছে ধীরে। পাখপাখালিরা ঘরে ফিরছে। বাইরে লোকজন কথা বলেছে, হাসছে, কাঁদছে। কত কিছু করার আছে মানুষের—কথা বলা, হাসা, কাঁদা—কত কী? আমি টেবিল থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসি। সময় চলে যায়। দিন যায়।

(১৫)

ঘন্টা দুয়েক পরে ছোট মামা ফিরে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সেই ব্যাগ। বড়বাবু ঘরেই ছিলেন। খুব অমায়িক ভঙ্গিতে ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর রাখতে বললেন। আমাকে বললেন, 'এদিকে আসুন, খুলুন দেখি ব্যাগটা—কী আছে?' আমি উঠে গিয়ে ব্যাগ খুলি। বড়বাবুর দিকে এগিয়ে দিই। উনি প্রথমে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন। কয়েকবার ব্যাগের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে কী সব পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'কী হল? হাত চালান, বার করুন—কী আছে দেখি। ছোট মামা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক যিনি আমাকে ব্যাগের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি একটু এগিয়ে এলেন। ভাবটা এমন যে, আমি যা বলেছি তার সঙ্গে ব্যাগের ভেতরকার জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখতে চান। আমি তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে দেই।

'করেন মশাই অ্যাকুপাংচার....এত বড় মেডিকেল ব্যাগ কেন?' বলে, ভদ্রলোক ব্যাগের মুখে ঝুঁকে পড়লেন। আমি একটা লাল ডাইরী তুলে আনছি দেখেই তিনি বলে উঠলেন 'ওইতো... ওইতো'। আমি তুলে বাইরে আনি। বড়বাবু ডাইরীটা হাতে তুলে নিলেন। নাড়িয়ে চাড়িয়ে খুললেন। 'এ-তো ডাইরী....রেডবুক কৈ?'

আমি চুপ করে থাকি।

'কী হে! রেড বুক কৈ?'

আমি ব্যাগের নীচে হাত চালিয়ে আর একটা জিনিস তুলতে তুলতে বললাম, 'এটাই হবে....

'এটাই হবে মানে?....এটাই হবে মানে কী?'

'অনেকদিন আগে রেখেছিলাম..'

'সেই জন্য রেড বুকটা ডাইরী হয়ে গেছে?

বললাম, 'না তা নয়। অনেকদিন আগের রাখা—দুটোই লাল। লাল একটা কিছু ছিল. মনে ছিল, তবে সেটা রেড বুক, না ডাইরী মনে ছিল না।

বড়বাবু একটু ফুলে উঠলেন, লাল ডাইরীর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। বললেন, 'এসব করেছেন কী?' ভদ্রলোকটি বললেন, 'কী স্যার।'

'কী আর, হাড়গোড়.. মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, হাতের থাবা।' ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সবে একটা বই তুলেছি। উনি দেখি দেখি বলে হাত তুলে নিলেন। 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।'

'এই বই পড়েছেন?'

'আমি মাথা নাড়ি।'

'চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস কই?'

'তা তো জানি না।'

'জানি না মানে? আপনি বলেননি, ব্যাগে সি পি সির হিস্ট্রী আছে।'

'বলেছি।'

'তবে?'

'এটাই হবে।'

'মানে।'

'এইটির কথাই বলেছি হয়তো... ইতিহাস একটা ছিল মনে আছে কিন্তু কোন্ দেশের....'

'মনে নেই—তাই না।'

ছোটমামা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবার কাছে সরে এলেন। বললেন, 'না জেনে বলিস কেন?....না জেনে....' বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। 'না জেনে বলবে কেন-জেনেই বলেছে—আপনিই সরিয়ে দিয়েছেন বা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। সেদিন বাড়ি সার্চ করিনি, আজ আমার চাকরিটি যাবে, আপনার চাকরিও যাবে।' ছোটমামা প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, না যে অবস্থায় ছিল আমি সেই অবস্থায় নিয়ে এসেছি... এর মধ্যে..' 'তা হলে সেই সব গেল কোথায়। আমরা করিয়েছি? ঠিক আছে!, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' বলে বড়বাবু ছোটমামাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ঘাট-ছিলাম। ভদ্রলোকটি আমার হাত ধরে তুলে নিলেন। হাতটা জোড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, ব্যাগটাকে খুব তুচ্ছভাবে অলতো করে তুললেন, তারপর ঘরের কোণায় ফেলে দিলেন। পড়ে গিয়ে ব্যাগটা কাত হয়ে শুয়ে রইল।

'চালাকি হচ্ছে আঁ....আদ্দিন গায়ে হাত দেইনি শুয়ার....আজ তোকে....'

আমি ঘুরে দাঁড়াই। 'কী করবেন?'

'দ্যাখ কী করি' বলে দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। স্পষ্ট কিছু শোনা যায় না ..কিন্তু আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। উনি মনে মনে কথা বলে যান, কথা বলে যান। আমার পা ব্যাথা করছিল। বুকে একটা কষ্ট হচ্ছিল খুব। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, আমি সেটা টেনে নিয়ে বসে পড়ি। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—'এই' বলে তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওঠ ওঠ, ওটা কী বসার জায়গা—আঁ! তোকে কে বসতে বলেছে...ওঠ।'

আমি বসে থাকি। হাত দুটো জড়ো করে আঙুল মটকাই। চোখ তুলে দেয়াল দেখি, লাইটের সুইচ দেখি। ...ঘরে ফিরে ভদ্রলোকের দিকে তাকাই।

উনি কিছু বলেন না। চুপ করে বসে থাকেন। আমি জানি ওর কিছু বলার নেই। বলার থাকলে কিছু করতো।

বাইরে একটা হৈ হল্লা হচ্ছে। ভারি কিছু একটা তুলছে কেউ—অন্যরা সব মজা করে হাসছে, চীৎকার করছে। আমি বাইরে তাকাই। অন্ধকার, কর তকছু স্পষ্ট কিছু নয়। একটা গাড়ি শব্দ করে চলে গেল। বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ার টেনে বসতে বসতে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। বেল বাজালেন। দুটো লোক এলো। 'একে ঝোলাও।' লোক দুটো আমার কাছে এগিয়ে আসছিল। আমি উঠে দাঁড়াই। লোক দুটো আমার দু হাত চেপে ধরে। বড়বাবু আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,

'এখনো বল—ব্যাগ থেকে সে সব জিনিস গেল কোথায়?'

'যাবে কোথায়, সেখনেই আছে।'

'ওগুলো নয়—সেই সব জিনিস।'

'কোন সব?'

'যা আগে বলেছিস।'

'আগে ভুল বলেছি। এখন যা দেখলেন তাই ছিল।'

'তাই ছিল—ঠিক আছে তাই থাক।' বলে ঘড়ি দেখলেন। হাত তুলে ওদের ইঙ্গিত করলেন। ওরা আমার হাত তুচ্ছ জিনিসের মত ছেড়ে দিল। হাতে হাত ঘসল।

ঘরের কোণে একটা চেয়ারে ভদ্রলোকটি যেভাবে বসেছিলেন, সেইভাবে বসে রইলেন। বড়বাবু ঘাড় তুলে ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'ওকে নিয়ে যান। কাল পাঠিয়ে দিবেন। এর দ্বারা কিসসু হবে না—নিয়ে যান।'

'চলুন স্যার।' বলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আরমোড়া ভাঙ্গলেন। কোমড়, ঘাড় ঠিক করলেন। আমি একটু নড়ে উঠি। পা বাড়াই সামনের দিকে। ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। লোক দুটোকে বললেন এগিয়ে যেতে। ওরা আগে আগে চলল, আমরা পিছু পিছু। বড়বাবু বললেন, 'দাঁড়ান। আমরা ফিরে দাঁড়াই। আপনি যবেই ছাড়া পান না কেন, ছাড়া পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন?'

'কেন কী? অ্যাকুপাংচারের বাকস নেবেন না?'

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বলি—'নেবো।'

'তবে। এখানেই থাকবে—কোন কিছুর ক্ষতি হবে না। চিন্তা নেই কিছু।'

আমি একটু হেসে ধন্যবাদ জানাই। উনি ফাইলের ওপর মুখ গুঁজে কী সব দেখতে থাকেন। আমরা ঘর থেকে বেড়িয়ে আসি। বাইরে কোন লোকজন নেই। কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছাড়া ছাড়া পরিবেশ। চারদিক অস্পষ্ট অন্ধকার। কুয়াশার মত কী সব জমে আছে আকাশে। দূর থেকে একটা আলোর রেখা সামনে কাছে আসছিল। আমরা লন পেরিয়ে বাদাম গাছের নীচে চলে আসি। কোথেকে একটা গাড়ি নিঃশব্দে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ায়। গাড়িটা বড় আর কালো। নাম জানি না। আমরা সবাই গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

থানায় এসে যখন পৌঁছালাম রাত তখন সাড়ে নয়টা। ভদ্রলোক সারা রাস্তায় আমার সঙ্গে কোন কথা বলেননি। নির্জন নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে আমরা চলে এসেছি। এইখানে—এই থানার সামনে একজন সিপাই দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে রাইফেল, খোলা বেয়নেট। বুক টান, খালি পা। সে আমাদের দেখে স্যালুট দিল। কোন শব্দ হল না। আমরা থানার বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। অন্ধকার বাগান, অন্ধকার হয়ে আছে।

'এখানে আজ রাতটা কষ্ট করে থাকুন কাল চলে যাবেন।'

'কোথায়?'

'যেখানে সবাই যায়—সেইখানে।'

বললাম, 'যাবো।'

ভদ্রলোক আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। আমি ঘাড় থেকে ওঁর হাত ছাড়িয়ে বললাম, 'এসব আবার কেন?'

'এসব কী আর—এমনি।' বলে, ভদ্রলোক সিঁড়ির ওপরে পা রাখলেন। দূরে কে একজন দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে এল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আমরা ওর পাশ দিয়ে অফিস ঘরে চলে এলাম।

'নিয়ে এলাম এখানে....নতুন লোক একটু দেখে শুনে রাখবেন।' বলে ভদ্রলোকটি কাগজপত্র ও-সির টেবিলের ওপর রাখলেন। ও-সি বসে ছিলেন একা। ডাইনে-বাঁয়ে শূন্য চেয়ার। হাত বাড়িয়ে কাগজ ধরলেন। বললেন 'বসুন।'

'না এখন আর বসবো না—রাত হয়েছে চলি।'

ও-সি বললেন, 'ঠিক আছে—আসুন একদিন। আজকাল তো একদম এদিকে আসেনই না।'

'আসবো... আসবো।' বলে হাত তুলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। ও-সি আমাকে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।' আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলাম। কোন কথা হল না।

ও-সি মাথা গুঁজে একমনে কাজ করতে থাকেন। কাজ করতে করতে উনি এক সময় বললেন, 'কতদিন ধরা পড়েছেন?'

বললাম, 'চৌদ্দ দিন।'

'মাত্র।' বলে ড্রয়ার খুলে কি একটা খুঁজলেন। না পেয়ে বেল বাজালেন। কনেস্টবল ঘরে ঢুকলো।

'একে লক-আপে দিয়ে এসো—যান ওর সঙ্গে।' বলে, আবার নিজের মনে কাজ করতে লাগলেন।

কনেস্টবলটি একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি ওকে দেখতে দেখতে কাছাকাছি চলে আসি। ও হাঁটতে থাকে। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। এই থানাটা একটু পরিষ্কার। নতুন দালান। ঝকঝকে রং করা সব কিছু। আলো খুব তেজি। সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। বাগানটাকে কেন যে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝখান দিয়ে সরু বারান্দা সোজা চলে গেছে দূরে। আশেপাশে ঘর। কোনটা বন্ধ কোনটা খোলা। আমি দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে লক-আপ। একটা খালি টুল পড়ে আছে পাশে। নীচের দিকে দু-একটা চায়ের ভাড় কাত হয়ে আছে। কনেস্টবলটি এক গোছা চাবি বার করে নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে লক-আপের তালা খুলল। শব্দ হল একটু। হা করা লক-আপের মুখের ভেতর দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে যাই। পেছন থেকে লক-আপ বন্ধ করার শব্দ হয়। একটা নির্জন হাহাকার আমাকে গ্রাস করতে থাকে।

(আগামীবারে সমাপ্ত)

লীলা মজুমদার

সুন্দরকে নোটন নিজেও বড় ভালোবাসত। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে ওর ভারি একটা প্রসন্নতা ছিল। একবার আমাকে বলেছিল, ঠোঁটের তলার কোণে কুচকুচে কালো ছোট্ট গোল তিল থাকলে, মুখটা আরো সুন্দর দেখায়। ওকে বিউটি স্পট বলে।' আমি তখন পড়াশুনো করছিলাম, হাতে কুচকুচে কালো কালি-কালি ভরা কলম ছিল। বললাম, 'আয়, তোর মুখে আমি বিউটি-স্পট বানিয়ে দিই। আমার মুখে তুই দে।' নোটন ভারি খুশী হয়ে আমার মুখে ক্ষুদে একটি কালো তিল বানিয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।' তখন আমি কলমটা নিয়ে ওর ঠোঁটের নিচে খুদে একটা মাকড়সা এঁকে দিলাম। যখন আটটা ঠ্যাং আঁকছি, ও একবার বলল, 'অত খোঁচা খোঁচা কি করছ ভাই? গোল হবে না?' আমি বললাম, 'হুঁ, হবে, কিন্তু এখানে তোর একটা টোল আছে কিনা, তাই অসুবিধা হচ্ছে।' ছোটবেলায় নোটনকে কখনো মিছে কথা বলতে শুনিনি। আর কেউ যে বলতে পারে ও স্বপ্নেও ভাবেনি: কাজেই মাকড়সা এঁকে আমি যখন তিলটার ভূরি-ভূরি প্রশংসা করতে লাগলাম, ও ভারি খুশী হয়ে বসে রইল। আয়নায় গিয়ে দেখল না পর্যন্ত। এমন সময় আমার মা এসে সব মাটি করে দিলেন। নোটনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে শুন্যে খামচা মারতে লাগলেন। নোটন বলল, 'ওরকম কচ্ছ কেন মাসিমা?' মা বললেন, 'ছোট্ট একটা মাকড়সা রে।' মাকড়সা শুনে নোটন আঁৎকে উঠল, মাকড়সাতে তার বড় ভয়। তারপরেই মা বললেন, 'দাঁড়া দাঁড়া, এ যে আঁকা মাকড়সা দেখছি।' বলেই চোখ পাকিয়ে আমাকে বললেন, 'নিশ্চয় তোর কাজ?' নোটন এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত, মর্মাহত। কত বললাম যে মাকড়সার কুরূপের পাশে ওর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তা কে শোনে?

তবু সে আমাকে ক্ষমা করেছিল। এখানে ওখানে অদ্ভুত কথা বলে বলত, 'আমার লীলাদি বলেছে। তার চেয়ে তোমরা বেশি জান? সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়।' এই নোটন তার মায়ের সঙ্গে হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসল। গাড়িটা আলো হয়ে রইল। মাসিমা অনেক চপ কাটলেট করে এনেছিলেন নৈশ ভোজের জন্য। আমরাও লুচি, আলুর দম, ফল মিষ্টি নিয়েছিলাম। বেশ জমেছিল। কিন্তু মাসিমার মনে সুখ ছিল না। সদাই নোটনকে নিয়ে ভাবনা। বাবাকে কেবলি বলছিলেন, 'দেখ, মুখটা একটু ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে না?' বাবা বললেন, 'ফ্যাকাশে নয়, ফরসা।' মাসিমা বললেন, 'মোটে খিদে হয় না।' বাবা বললেন, 'বেশ তো খেল।' মাসিমা বললেন, 'কিন্তু খেলে আবার রাতে হাত-পা জ্বালা করে। কি করা যায় বল তো?' বাবার তো আর কখনো ধৈর্যের জন্য খ্যাতি ছিল না। এবার বললেন, 'কেটে ফেলে দে।' শৈশব থেকে চেনাশোনা, বাবা বড় শ্যালীকে তুই-তোকারি করতেন। মাসিমা ফোঁস করে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। সকালে জলখাবারের সময় দেখা গেল আমাদের আলুর দমের গা থেকে গরমের চোটে লম্বা লম্বা শুঁয়ো মতো বেরিয়েছে, কিন্তু মাসিমার বাকি চপকাটলেট অক্ষত রয়েছে। মাসিমা আমাকে ঘরকন্নার পাঠ দিলেন, 'গরম জিনিস কখনো এঁটো বন্ধ করে রাখতে হয় না। ঠান্ডা হলে বন্ধ করলে টপ করে নষ্ট হয় না।' এই পাঠ যে পরে আমার কত কাজে লেগেছিল সে আর কি বলব।

হাজারিবাগে ছুটিটা খুব জমেছিল। সেখানে তখন উপেন্দ্রকিশোরের মেজ-জামাই অরুণনাথ চক্রবর্তী আর আমার মেজদি পুষ্পলতা ছিলেন। অরুণবাবু ওখানকার এস-ডি-ও। আমাদের জন্য সুন্দর বিলিতী কায়দায় তৈরি বাংলো ভাড়া করে দিয়েছিলেন। রোজ একসঙ্গে বেড়ানো, এদিকে ওদিকে দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া, রামগড়, ভেড়া নদী আর দামোদরের সঙ্গমস্থলে ছিন্নমস্তার ভয়াবহ মন্দির। বড় আনন্দে দিন কেটেছিল। আরেকটা কারণে আমার কাছে হাজারিবাগ যাওয়ার গুরুত্ব ছিল। সেখানে একজন বড় সুন্দর মানুষকে দেখলাম। তাঁর নাম কামিনী রায়। অনাত্মীয়া লেখিকা এই আমি প্রথম দেখলাম। চমরু-বাগ বলে ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর পঙ্গু কিন্তু অতিশয় বুদ্ধিমান এক ছেলেকে নিয়ে কিছুদিন থেকে বাস করছিলেন। বয়স হয়তো ষাটের কাছাকাছি। ঠিক বলতে পারছি না। চুল পেকেছে, থান পরা, কথায় বার্তায় বুদ্ধি ঝলমলাচ্ছে। দেখবামাত্র আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর লেখা অজস্র কবিতা পড়ে শোনাতেন। বলতেন দুটি বই হয়ে কবিতাগুলি প্রকাশিত হবে, এখন কে সেগুলি বেছে দেয়। ওঁর ছেলে মনাদা তখনো বি-এ পড়ে, তার একার কর্ম নয়। আগ্রহের চোটে বললাম, 'আমি দেব।' দিয়েওছিলাম, তবে একা নয়। মনাদার ভারি সাহিত্যানুরাগ ছিল। মাকে নিয়ে তার ভারি গর্ব ছিল। দেখে ভালো লাগত। এর আগে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কামিনী রায়ের লেখা কবিতা পেয়েছিলাম। ইংরেজি কবিতার বাংলা রূপ। 'নাই কি রে সুখ? নাই কি রে সুখ? এ ধরা কি শুধু বিষাদময়।' সেটি হল লংফেলোর 'টেল মি নট্ ইন মোর্নফুল নাম্বার্স লাইফ ইজ বাট অ্যান এম্পটি ড্রীম' কবিতাটির বাংলা। সেই বয়স থেকেই আমি মৌলিক লেখার ভক্ত ছিলাম। অন্যের রচনা নিয়ে তাতে নিজের রঙ-ব্যাখ্যানা দিয়ে লেখা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ছিল না। তাই মজার মধ্যে কামিনী রায়কে বিশেষ স্থান দিই নি। এবার বুঝলাম তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলাম। অপূর্ব সব মৌলিক রচনা আছে তাঁর। 'দীপ ও ধূপ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে আছে সেসব।

বিশেষ করে একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। কামিনী রায়ের তখনো বিবাহ হয়নি, সবাই তাঁকে কামিনী সেন বলে জানত। একদিন তাঁরা জগদীশ বসুর পরীক্ষাগারে গিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এক-ফোঁটা ময়লা জল দেখেছিলেন। তাতে প্রাণ-কণিকা ঝিকমিক করছে। তাই নিয়ে কবিতা। শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। অনেক পরে আবার ওটি পড়ে সমান ভালো লেগেছিল। খুব ইচ্ছা করত কবিতা লিখতে। কলেজের ম্যাগাজিনে ইংরিজিতে কিছু কিছু লিখে প্রশংসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজে জানতাম সেরকম কিছু হয়নি। এবার থেকে বাংলায় কবিতা লিখবার চেষ্টা করতাম। একটা খাতায়। সেটিকে ভরিয়ে ফেলে আরেকটা শুরু করেছিলাম। সুখের বিষয় ততদিনে মাস ছয় কেটে গেছিল এবং আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে গেছিল। কাব্য আমার পন্থা নয়। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে রস তো আর কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়, অন্য পন্থাও আছে। কিন্তু আমি কখনো কবি হব না, একথা জেনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন ভাবি অন্য লোকে সেকথা আবিষ্কার করবার আগে আমি নিজেই যে করেছিলাম সে আমার বহু ভাগ্য। তবে একেবারে যে কবিতা লিখি না তা নয়। মাঝে গান পর্যন্ত লিখেছি। তবে সেসবই আন্ত-গুবি, উদ্ভট, সেরফ মজা করে লেখা। তাকে কাব্য বলে না।

(২২)

সতেরো বছর বয়স আমার। জীবনের মাধুর্যের দিকটা চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটতে লাগল। সদাই উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, এই বুঝি রোমাঞ্চময় কিছু ঘটবে।

ছোট জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে, আমাদের বুলুদিও সে সময়ে হাজারিবাগে মেজদির বাড়িতে ছিল। সেই ছিল রোমান্সের কেন্দ্র-বিন্দু। তার মধ্যে ভারি একটা চমৎকারিত্বের সম্ভাবনা দেখতাম। আমার চাইতে সাত বছরের বড় উজ্জ্বল উচ্ছল স্বভাব। তার অনেক ভক্ত ছিল। তারা ওকে গোলাপফুল, চকোলেট, হলু কেনের ইংরিজি উপন্যাস উপহার দিত। অন্ততঃ ও আমাদের আগ্রহ-পূর্ণ ইচ্ছুক কানে এইসব বলত। পরে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হত। ও নাকি তাদের মনে খুব আঘাত হানে। কখনো একটা ভালো কথা বলে না। উপহারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাহলে নাকি ভক্তদের কাছে আদর বাড়ে।—এই অবধি শুনে আমরা প্রবল আপত্তি করেছিলাম। সে না হয় হল, কিন্তু অমন ভালো ভালো জিনিস ফেলে দেওয়ার মানে কি? বুলুদি আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তোরা তো দেখছি ভারি বোকা। সত্যি কি আর ফেলে দিই? ওরা হতাশ হয়ে চলে গেলে পর পাত্তির মাকে পাঠিয়ে জিনিসগুলো তুলিয়ে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখি, বইগুলো পড়ি, চকোলেটগুলো খেয়ে ফেলি।' আমি বললাম, 'সামনাসামনি নিলে কি হয়?' বুলুদি বলল, 'ছিঃ! বাইরের ছেলেদের দেওয়া উপহার কক্ষনো নিতে হয় না।'

কথাটা বোধ হয় ঠিক। কারণ মা-মাসিরও সেই মত। তবে দিদিকে আমাকে দেখে কারো ফুল চকোলেট দিতে বোধ হয় ইচ্ছা করত না। করলেও হয়তো বাবার ভয়ে কেউ দিতে সাহস পেত না। এক বুলাদা ছাড়া। এই মানুষটি যে আমাদের বাড়ি সুদ্ধ সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিল, ৬৩ বছর বয়সে ওর মৃত্যুর পর পদে পদে সেকথা বুঝেছিলাম। ও ছিল বুলুদির সব ভক্তদের মধ্যে সব চাইতে নীরব। বুলাদার কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, নইলে ওর ওপর অবিচার করা হবে। ওর ভালো নাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ। কবে থেকে যে ও আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেছিল মনে পড়ে না। কালো, লম্বা মানুষটির চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় কিছু ছিল। চমৎকার বাঁশী বাজাত; ভারি সুরেলা গলা ছিল, কিন্তু ভালো করে গানটান বড় একটা গাইত না, খালি গুন গুন করত। ছবি আঁকার হাত ছিল। সুন্দর গল্প লিখতে পারত, দু-একটা প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। মেদিনীর মতো হৃদয় ছিল। লোকের সাহায্য করতে পারলেই কৃতার্থ। বার বত দায় ছিল, সব ও খুশী হয়ে এগিয়ে এসে নিজের ঘাড়ে তুলে নিত। আমি ওর মতো কাউকে দেখিনি। স্বনামধন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই, চৌরঙ্গীতে ওদের গ্রামোফোনের ও খেলার সরঞ্জামের দোকানটি ছিল নামকরা একটা সাময়িক মিলন স্থল। দোকানে বুলাদাই ছিল তার বাবার ডান হাত। ওর সঙ্গে করে কিভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল মনে নেই। সম্ভবত শিলং থেকে কলকাতায় এসেই,

প্রশান্তদা ছিলেন বড়দার বন্ধু, বুলাদা ছিল তাঁর ভক্ত। ভারি চমৎকার শিল্পী-মন ছিল তার। চেনা-জানা কারো বাড়িতে বিয়ে-থা হলে, ওকে ডেকে নিয়ে যেত ফুল সাজিয়ে দেবার জন্য। কোনো প্রশিক্ষণ পাওয়া শিল্পীরও এমন সৌন্দর্য-বোধ ছিল না। আমার তখন হয়তো ১৩ বছর বয়স, বেঁটে, বেজায় রোগা, বড্ড কথা বলি—মোট কথা আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। দিদি আমার চেয়ে বড় সাইজের ছিল, দেখতেও ভালো, কম কথাও বলত, কিন্তু ও-ও যে খুব আকর্ষণীয় ছিল মনে হয় না। তবু বুলাদা আমাদের রাশি রাশি আবদার সহ্য করত, ফাই-ফরমায়েস খেটে দিত। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের বেজায় ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে বুলাদা তাঁকে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়। রোজ দেখা হয়। আমি এক টাকা দিয়ে দু ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি কালো চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা অটোগ্রাফ খাতা কিনে বুলাদাকে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে আনো, পুরনো জিনিস না, নতুন কবিতা যেন হয়।' বুলাদা দু-তিন দিন বাদে খাতাটা দিয়ে গেল। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'নামের আখর কেন লিখিস আপন সকল কাজে? পারিস যদি প্রেমের আখর রাখিস জীবন মাঝে।'

যখন হাজারিবাগে গেছি তখন আমার বয়স সতেরো, বুলুদির চব্বিশ, বুলাদার সাতাশ। ততদিনে আমরা মেনে নিয়েছি যে বুলাদা হল বুলুদির ভক্ত, তাই আমাদের ওপর ওর অত টান। আসলে কিন্তু বিশ্ব-প্রেমিক যদি কেউ থেকে থাকে, সে হল বুলাদা তাই বলে অবিশ্যি বুলুদির অন্য ভক্তদের ও খুব সুনজরে দেখত না। মুখে কিছু বলত না। বিশেষ করে ফরসা, মোটা, গুণী ভালো চাকুরে এক পাণিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁকে দেখলেই বুলাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। আমরা ছিলাম বুলাদার দলে। ওকে এই বলে আশ্বাস দিতে ইচ্ছা করত যে বুলুদি বলেছে সেই লোকটি পাঁটরুটির মতো দেখতে, কাজেই ওঁর কাছ থেকে কোনো আশংকার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এত পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও কিছু বলতে সাহস পাইনি কারণ ছোটবেলা থেকেই, আমাকে মুখ তুলতে দেখলেই বড়রা বলতেন, 'এই! মুখ বন্ধ!' সে যাই হক আমরা হাজারিবাগে থাকতে থাকতে বুলাদা বার দুই মোটর সাইকেলে করে ঘুরে গেছিল। আমাদের মনে হত সীতাদেবী শান্তাদেবীর কোনো রোমাঞ্চময় উপন্যাসের ঠিক মধ্যিখানে বসেছি। বুলুদির মনের ভাব বোঝা দায় ছিল। এত বেশি কথা বলে এত কম তথা প্রকাশ করতে আর কাউকে দেখিনি। এর মধ্যে আসলে একটু বেদনার ইতিহাসও ছিল। বুলুদির দাদা বুলাদার এক নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করবে বলে বিলেত গিয়ে মেম এনেছিল বলে বুলুদির মনে বোধহয় ভারি একটা অপরাধ বোধ ছিল। তাই বোধ

যেত। তাছাড়া সব উপন্যাসেই দেখতাম প্রেমের পথ খুব সহজ নয়। সে যাই হক, এর পরেই ইউ বার অ্যাণ্ড সন্স লাটে উঠেছিল, বাড়ির বাসিন্দারা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, মেজজ্যাঠাইমা সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠে, কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন, এসব কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলেছি। বুলুদি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ১৯২৮ সালে বুলাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বলা বাহুল্য বুলুদির সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা এতে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন। বিশেষ করে আমার মা বাবা। পরে আমার বিয়ের সময়ে বাবা যতখানি ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বুলুদির বিয়েতে সেই রকম আনন্দিত হয়েছিলেন। এই আমার সান্ত্বনা।

হাজারিবাগে মাসিমা হঠাৎ বললেন, 'তোদের বাবার এত উন্নতি হল, নিজ গুণে ইম্পিরিয়েল সার্ভিস হয়ে গেল, কই তোরা তো কিছু বলছিস না। শুনে আমরা অবাক। বাবার যে উন্নতি হয়েছে তা এই প্রথম শুনলাম। ঐ রকম ছিলেন আমার বাবা: নিজের কিংবা ছেলেমেয়েদের সাফল্যে এতটুকু উল্লাস প্রকাশ করতেন না। সময়কালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলাম, তখনো আমাকে সোনার গয়না দেওয়া বা ভোজের আয়োজন করা দূরে থাকুক, একবারও মুখে বলেননি, 'আমি খুশী হয়েছি।' কিন্তু খুশী নিশ্চয়ই হতেন। অথচ অখুশীর বেলা সেকথা পঞ্চমুখে প্রকাশ করতেন। এখনো ভাবি ঐ কটি কথা বললেই তো আমার মন ভরে যেত। কি এক কড়া স্কুলের ছাত্র ছিলেন বাবা যে কিছুতেই মুখে প্রসন্নতার ভাব আনতেন না। এখনো ভাবলে দুঃখ হয়। তখন খুশী হলেন কিনা তাও বুঝতে পারতাম না। তবে বুলুদির বিয়েতে নিঃসন্দেহে খুশী হয়ে, দু হাতে টাকা-কড়ি খরচ করেছিলেন।

মাসিমার ও কথার মাকে শিবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: বাবার ততদিনে ছুটি ফুরিয়ে গেছিল, উনি কলকাতায় ফিরে গেছিলেন। মা আরো বললেন যে কলকাতায় ফিরে আমরা আর ঐ ছোট ফ্ল্যাটে উঠব না। গড়পারের সংসার উঠে যাচ্ছে, মণিদা, নানকুদা, বুলুদি আমাদের বাড়িতে আসবে। ছোট জ্যাঠামশাই আর মেজজ্যাইমা সুন্দর জ্যাঠার বাড়িতে যাবেন। মেজবৌদি, বড়বৌদি তখনকার মতো বাপের বাড়ি যাবেন। কি আর বলব, শুনে বুকটা হু-হু করে উঠেছিল। কত স্বপ্নের কত আশার ঐ ১০০ নং গড়পার রোডের বাড়ি। আজ পর্যন্ত প্রেসের ঝমঝম শব্দ কানে বাজে, ছাপার কালির গন্ধ নাকে আসে। কখনো কোনো ছাপাখানায়, প্রকাশালয়ে কিংবা বইয়ের দোকানে পা দিলেই মনের মধ্যে কে যেন বলে—এই আমি বাপের বাড়ি এলাম। ইচ্ছে করে নতুন ছাপা বইতে নাক ডুবিয়ে সারা-দিন বসে থাকি।

শুনলাম কিছুই সাধ্য যাবে না। শুধু

পাবে আর সামান্য একটা মাসোয়ারা। মায়ের কথায় চোখের সামনে মায়ার প্রাসাদ ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল। আমরা নাকি ক্রাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে একটা বড় তিনতলা বাড়িতে উঠে যাব। সেখানে সকলের জায়গা হবে। বাবা এখন থেকে বাড়ি ভাড়া বাবদ মোটা টাকা পাবেন। আমরা রইলাম হাজারিবাগে। বাবাই বাড়ি ঠিক করে, আমাদের সামান্য যা আসবাব জিনিসপত্র ছিল সব নতুন বাড়িতে তুললেন। আপিসের চাপরাশি, চৌকিদার, বাড়ির চাকরবা আর বাবার বন্ধুরা সাহায্য করলেন। মাকে কোনো মতামত প্রকাশ করতে শুনিনি। বাবা যা ব্যবস্থা করতেন, মা তাতেই খুশী থাকতেন।

এক্ষেত্রে কলকাতায় ফিরে দেখলাম রাস্তাটা ভালো, বাড়ির সামনে খুদে এক তে-কোণা ঘাস জমিতে মস্ত একটা কৃষ্ণচূড়ো গাছ লালে লাল হয়ে আছে। বড় বড় ঘর, বড় বড় জানালা, তিন পাশে একতলা বাড়ি, খোলামেলা, তিনতলায় আমাদের শোবার ঘরের পাশে রাল দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটি বারান্দা। সেখান থেকে অর্ধেক ভবানীপুর দেখা যায়। ঐ বারান্দায় কয়েক বছর ধরে কত যে কবিতা পড়েছি, স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছি, পাঁচজনে মিলে কত গল্প করেছি, তার ঠিক নেই। তবু বসা লোডের ছোট ফ্ল্যাটের গাদাগাদি করে থাকা দিনগুলোর জন্য মন কেমন করত।

হাজারিবাগেও বড় আনন্দে ছিলাম। বাড়ির পেছনে একটা মাঠ। মাঠের ওপারে পোস্টাফিস, সেখানে জানালা দিয়ে রোজ বেলা এগারোটা থেকে চিঠিপত্র বিলি হত। পোস্টাপিসের পাশে বুড়ো সায়েবের বাড়ি। তাঁর দশটা মেয়ে, কেউই খুব কালো নয়, দেখতেও মন্দ নয়। পোস্টাপিসের সামনে পুলিশ সার্জেন্টদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শুনলাম কচি কচি সার্জেন্ট ধরে সায়েব এর আগেই নটা মেয়েকে পার করেছেন, এবার দশ নম্বরের মহড়া দেওয়া হচ্ছে। আমরা থাকতে থাকতেই পোস্টাপিস থেকে চিঠি আনতে গিয়ে কে যেন শুনে এল দশ নম্বরও বাগদত্তা হয়েছে। সার্জেন্টদের নিস্তার ছিল না।

মেজদি ভারি রসিক মানুষ ছিলেন আর যেমন রান্নায়, তেমনি কাজ সেলাইতে দক্ষ। মেজ মাঠাইমার হাতে কতগুলি মেয়ে মানুষ হয়েছিল, সব কটি বেজায় ভালো রাঁধিয়ে। শুধু ঘরোয়া রান্নায় সিদ্ধহস্ত নয় পান্তুয়া রসগোল্লা, কেক পুডিং, রোস্ট থেকে শুরু করে পেশাদার মিস্ত্রির হাতের খাজার মতো খাজা পর্যন্ত। শেষেরটিতে আমার বড়দি, সুলেখিকা সুখলতা সব চাইতে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা লেখাপড়া গান-বাজনাও শিখেছিলেন। খালি মায়ের গলায় গান আসত না, দিদির অমারও যেমন আসে না। ছবি আঁকতেও সব ওস্তাদ আর এঁদের স্বামীসেবা দেখে অবাক হতাম। বড়দির একটু মেজাজ ছিল, মাকে কিংবা মেজদিকে কখনো প্রকাশ্যে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতেও শুনিনি। অবিশ্যি সে ব্যবস্থার আমি খুব প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ কিঞ্চিৎ ন্যায্য কথা না শোনালে পুরুষদের বড্ড বাড় বেড়ে যায়।

যতই ফেরবার সময় কাছে আসে, আমাদের ভ্রমণের নেশা ততই বাড়ে। শহরের ভেতরটা দেখতে কিছু বাকি রাখা হয়নি, জানহারি পাহাড়, লেক, কলাম্বাস কলেজ ইত্যাদি দেখা হয়ে গেছিল। এর মধ্যে দাদামশায়ের এক শিষ্যবাড়ি থেকে কি করে আমাদের পরিচয় পেয়ে, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল। কি ভালো লোক তাঁরা সে আর কি বলব। দাদামশাই ১৯০২ সনে কাশীতে মারা যান, আমি বলছি ১৯২৫ সালের কথা। ইতিমধ্যে তাঁর প্রকৃত শিষ্যরা সবাই পরলোকে গেছেন, তবে তাঁদের ছেলে-বৌরা আছেন। তাঁদের কেউ কেউ দাদামশাইকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কিন্তু বইপত্র ছিল তাঁদের কাছে, কি বই তা আর খুলে দেখাননি। একটা আসন, তা সে বাঘ-ছাল না হরিণের চামড়া মনে করতে পারছি না। আর একটা মস্ত বড় চীনে মাটির পেয়ালা। তাতে করে দাদামশাই চা খেতেন। এত বড় পেয়ালা আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। অবনীন্দ্রনাথের কোনো বইতে পড়েছি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মস্ত এক পেয়ালায় চা খেতেন। একবার কে যেন সে পেয়ালাটি ভেঙে ফেলাতে, মহর্ষির বড় নাতি দীপু ঠাকুর সমস্ত চীনা বাজার ঘুরে তবে একটি পেয়েছিলেন। তাও বোধ হয় বুড়ো ভদ্রলোকের খুব পছন্দ হয়নি। আমার সেদিন ঐ পেয়ালাতে হাত বোলাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ওঁরা এমন আলগোছে ধরে দেখাচ্ছিলেন যে ঠিক সাহস পাইনি। দাদামশায়ের ব্যবহার করা কোনো জিনিস আমি চোখে দেখিনি। মায়ের কাছে একখানি চিঠি পর্যন্ত ছিল না। দাদামশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সামান্য যা কিছু সংসার-জীবনের সম্পত্তি ছিল, ওঁর শিষ্যরা কেউ কেউ সেগুলি ওঁর প্রতিষ্ঠিত ছোট আশ্রমটির জন্য দাবি করেছিলেন। তখন বড় মাসিমার বিয়ে হয়ে গেছিল। মেসোমশাই অনাথা শ্যালীদের সম্পত্তি যাতে অপরে না নেয় তাই মামলা করেছিলেন। ঐ মামলা বেশ ধনোয়। বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে ঐ সম্পত্তির ওপর আশ্রমের কোনো দাবি থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে নিজের শ্রাদ্ধ করে কেউ সন্ন্যাসী হল, সেই মুহূর্তে সংসারের কাছে সে মৃত। মৃতের সম্পত্তি তখনি তার ন্যায্য ওয়ারিশদের হয়ে যায়। সে সময় আশ্রমের অস্তিত্ব ছিল না, তাই ন্যায্য ওয়ারিশ হলেন দাদামশায়ের তিন মেয়ে।

মায়ের কাছে শুনেছি তাঁর মন এই ব্যাপারে এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে সেই ১৬-১৭ বছর বয়সেই তিনি তাঁর ভাগটি জ্যাঠামশাইকে বলে ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র ভাণ্ডারে আমার দিদিমার নামে দান করেছিলেন। দুঃখের বিষয় মা-মাসিদের পরিচয়ের প্রমাণস্বরূপ দাদামশায়ের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করতে হয়েছিল। সেগুলি তাঁরা আর ফেরত পায়নি। উকীল বলেছিলেন নাকি হারিয়ে গেছে। এই নিয়ে মাকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। বিশেষত সবার শেষে লেখা চিঠিখানিতে দাদামশাই মাকে বলেছিলেন, মায়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়ে গেলে, মাকে কিছুদিনের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন। আমরা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'দাদামশাই ডাকলে তুমি এঁদের ছেড়ে চলে যেতে?' মা অবাক হয়ে বলেছিলেন 'সেই মুহূর্তেই চলে যেতাম। যদিও এঁরা আমাকে মানুষ করেছিলেন।' ঐ পেয়ালার কথায় এত কথা মনে পড়ছে।

একটা আনন্দের বিষয় হল হীরেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে আর প্রকাশক মিত্র ঘোষের চেষ্টায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৯০০-১৯০১ সালে 'হিমাদ্রি' নামে দাদামশায়ের লেখা কৈলাস ও মানস সরোবর ভ্রমণের যে কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সংগ্রহ হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সহকারে মিত্র ঘোষ সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী। দাদামশায়ের সেই আসন আর পেয়ালা দেখে শুধু, আমিই যে জড়িভূত হয়েছিলাম তা নয় মা মাসিমা দোহেও জল দেখেছিলাম। ও বই বেরুলে তাঁরা বড়ই খুশী হতেন।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন আগে আমাদের ভগ্নীপতি অরুণনাথ চক্রবর্তী হঠাৎ এসে বললেন, 'কাল সারা দিনের জন্য কে কে ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে যাবে? জায়গাটার ভারি কুখ্যাতি। যারাই যায় তাদের একটা না একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। কে কে যাবে বল।' মাসিমা বললেন, 'নোটন আর আমি যাব না। অন্যদেরো যাবার কি দরকার আছে?' অরুণবাবু বললেন, 'আমাকে একটা তদন্তে যেতেই হবে। তিনটে গাড়ি আসবে, যতজন ধরে যেতে পারে।' অমনি সবাই বলে পড়ল, সবাই যাবে, নোটনও। শেষ পর্যন্ত লতিকা আর যতির সর্দি-কাশীর জন্য ওরা গেল না, মা তো সবে রোগ থেকে সেরে উঠেছেন, মা গেলেন না। মাসিমা গেলেন না। মেজদির জায়গা হল না। বাকিরা গাদাগাদি করে গাড়িতে চেপে বসলাম। আমরা ৬ ভাইবোন, অশোক, নোটন, অরুণবাবু, নানকুদা, ওদের বাড়ির পাঁচটা ছেলেমেয়ে। আর দুই ড্রাইভার। আমরা কেউ-ই সাধারণত মধ্যেষ্ট খাদ্যাদি না নিয়ে এক পা নড়তাম না। কিন্তু অরুণবাবু বললেন, 'খাদের গাড়ি তারা প্রচুর খাওয়াবে, জল পর্যন্ত নেবার দরকার নেই।' ১৭ জন লোক জল কিংবা খাবার না নিয়ে অমনি রওনা হয়ে গেলাম।

(চলবে)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

আশু কাকা আমার কাকা নয়, আসলে কেউ নয়। কিন্তু এই কথাটা নিজে ত ভাবতামই না, যদি কেউ ভাবাতে চাইত তাহলে মনে মনে খুব যন্ত্রণা অনুভব করতাম। কেন, তা জানি না। হয়ত আমাদের পরিবারে পর-পর ভাবার ব্যাপারটাই আমল পেত না বলে এরকমটা হত। সন্ধ্যের পর, বাইরের খোলা বারান্দার বুকে আতা গাছের ছায়াটা চাঁদের আলোয় হেলে-দুলে হাওয়ার খবর দিত তখন সুশীলা কাকী গলি পথে দিয়ে টুক করে এসে জুটতো আর আমরা ছেঁকে ধরতাম 'কাকী একটা গল্প বলো!' কাকীর গলাটা ভারি মিষ্টি, হয়ত বলার ধরনটাও—তাই বাচ্চারা ওঁকে খুব ভালবাসত। কাকীও ছেলে-মেয়ে ভারি পছন্দ করত। লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা-ওটা এনে খাওয়াতো। কানে-কানে সাবধান বাণী 'কত্তামাকে বলিস না যেন।' কত্তামা আমাদের ঠাকুমা, তাঁর আচারবিচারের দাপটে বাড়ির সবাই তটস্থ। কিন্তু সুশীলের গলা পেলে তিনিও সাড়া নিতেন—'কে সুশীলা এলি? বস'—এবং এসে বসতেন, তবে ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

—সুশীল্যা—অ—সুশীল্যা—

আশু কাকা লণ্ঠন আর লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লেই সুশীলা কাকী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ত। গল্পের রাজপুত্র তখন জঙ্গলে থাকলেও উদ্ধার করার উপায় নেই। চেপে ধরা আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতেই কাকী বলত—বাকীটা আবার রাম রাত্তির পোহালে শুনো সোনা। মানুষটা ঠেতে-পুড়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছে—

কাশিমবাজার রাজবাড়ির পাইক রাস-বিহারী দাস। কিন্তু ওই নামে কেউ তাকে ডাকে না, হয়ত ডাকলে আশু কাকার সাড়াই পাবে না। নিজেই ভুলে গিয়েছে। যারা অল্প পরিচিত তাদের কাছে রাসা বোরেগী আর পাড়ার সবাই ডাকে আশু বোরেগী। বৈরাগ্যের পরিচয় যদি তুলসীর মালা হয়, আশু আলবাৎ বৈরাগী। না, আরও আছে, আশু খুব ভাল খোলদাম, গলায় সুর না থাকলেও তালের দিক দিয়ে পয়লা নম্বর সেরানা। আশুর ডাক পড়ে তাই বৈষ্ণবদের আখড়াতে, ধুলোটের নগরপরিক্রমায়। শুনেছি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যখন ধুলোটে খালি পায়ে, খালি গায়ে শহরে হরিনামে বেরোতেন আশু কাকাও সে দলে থাকত। এই রকম বায়নাতে অনেক সময়ে কাকা রাতে বাড়ি ফিরতে পারত না। কাকী তখন হয় আমাদের বাড়ি মায়ের ঘরে মেঝেতে আস্তানা নিত, কাকী মায়ের ঘামাচি মেরে দিত। আঁচল বিছিয়ে রাতও কাটাত। নয়ত আমাদের সাধাসাধি করত ওর ঘরে থাকবার জন্য। এতেই আমাদের ভাই-বোনের উৎসাহ বেশি। ফুরু ওর বেড়াল নন্দদুদুকে সঙ্গে নিয়ে যেত আর গল্পের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। কাকীর একটিই শর্ত—'হুঁ' দিতে হবে। 'হুঁ' না দিলে গল্প বন্ধ। যা-ই হোক, কাকী একা থাকতে পারত না।

মাঝে মাঝে কাকী বাপের বাড়ি যেত গরুর গাড়ি করে। গঙ্গার ওপারে পাড়া-গাঁয়ে বাপের বাড়ি। তখন গলিটা বড় শূন্য মনে হত। আশু কাকাকে তখন দিনের বেলা বড় একটা দেখতাম না। রাতে মাঝে মাঝে প্রাচীরের ওপার থেকে হুঁকো টানার শব্দ আর দা-কাটা তামাকের কড়া গন্ধে টের পওয়া যেত কাকা ঘরে ফিরেছে। কখনও বা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করত—'বরুণ বাবাজী আছ নাকি?'

বরুণ বাবাজীর সঙ্গে যে কোন কাজের কথা আছে তা নয়, তবে ওই সুবাদে খোঁজ-খবর দেওয়া-নেওয়া আর সেটা বৌঠাকুরানের সঙ্গে। —'সুশীলা কবে আসবে?' মায়ের প্রশ্ন। এবং প্রশ্নটা জরুরী, কেন না, সুশীলার জন্যে মা মিশনহোমের নীরদা দিদির কাছে দরবার করে কিছু সেলাই-ফোঁড়াই জোগাড় করে রেখেছে। অবসর সময়ে যাতে গরীব বৌটা দু পয়সা আয় করতে পারে সেদিকে মায়ের নজর। শুধু সুশীলা কেন, পাড়ার অনেক বিধবা, সধবা, কুমারী মেয়েই মায়ের এই নামহীন ইনস্টিটিউশনের অলিখিত সদস্য। গোরাবাজারের হোম থেকে প্রতি শনিবার দুপুরে ঘোড়ার গাড়ি এসে লাগে আমাদের বারবাড়ির দরজায়। কাঁধে সেফটিপিন আঁটা ধবধবে শাড়ি পরা নীরদা দিদি এবং তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন টীচার গাড়ি থেকে নামেন। খুব সাদাসিধে বেশবাসও যে পরিচ্ছিন্নতার ফলে অসাধারণ হতে পারে তা এঁদের না দেখলে ছেলেবেলায় ধারণাই হত না। না, তার চেয়ে বরং বলা ভাল যে, ওঁদের দেখে সেই যে ধারণা হয়েছিল সাদাই হল শ্রেষ্ঠ রং সে ধারণা কোন দিনই ঘুচল

না। আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল 'টীচার' আর কত্তামাব 'খৃস্টান।' বস্তুত দুই-এ মিলে দাঁড়াল ফিটফাট মানে টীচার আব টীচার বুঝি খৃস্টান ছাড়া দুনিয়ায় নেই।

যেদিন ওঁরা এসরাজ, বেহালা সঙ্গে আনতেন সেদিন আমবা সব কিছু ফেলে ভেতব বাড়ির বারান্দা থেকে ছাদের সিঁড়িতে গেড়ে বসে থাকতাম। প্রথমে কাজ আর কাজেব কথা। কাকে কি সেলাই বরাত দেওয়া হয়েছিল, খাতা দেখে মিলিয়ে 'বুঝ' নেওয়া চলত—হিসেব করে মোট দক্ষিণার টাকা মায়ের হাতে দেওয়ার পর, নতুন কাজগুলো একে একে বুঝিয়ে দেওয়া হত। সাধারণ ঘবের মেয়েদেব হাতের বেডকভারে এমব্রয়েডারিব কাজ, কুশেব বোনা টেবল ক্লথ, ডয়লি, খাঞ্চপোশ, পুঁতির ঝালর দেওয়া কত রকমারী সূচীশিল্প এই বৈঠকে দেখতাম তা আজ ভাবলে অবাক লাগে। কিছুই ত বুঝতাম না, শুধু ভাল লাগাতেই সব সময়দাবিব শেষ। টীচাবরাই কাপড়, সুতো, ছুঁচ, থিমবল, ফ্রেম সব সঙ্গে আনতেন। মায়ের কাজ ছিল ম্যাচিং সুতো আব তার পরিমাণ হিসেব করে গুছিয়ে নেওয়া। নীরদা দিদি সেলাই বেশ ভালই বুঝতেন তবে সাবিত্রী দির চয়েসের কাছে সর্বদাই নতি স্বীকার করতেন। মাকে উনি কখনো ওই নামে ডাকতেন, কখনো প্রিন্সিপাল বলতেন।

কথা হচ্ছিল আশু বোরেগীর সম্পর্কে তা থেকে আমরা কোথায় চলে এলাম। আপাতদৃষ্টিতে যোগসূত্র না দেখা গেলেও ব্যাপারটা মোটেই বিচ্ছিন্ন করে দেখান যাবে না। যে কিশোরটি নীরদা দিদিদের সাপ্তাহিক কর্মকাণ্ড চাক্ষুব করেছে এবং এসরাজ, বেহালার সঙ্গে সুর মেলানো প্রার্থনা সঙ্গীত শুনেছে তার দৃষ্টির বাইরে আমরা যাই কি করে? অথবা তার সেই অপরিসীম কৌতূহল আর অতল বিস্ময় জড়ান মনের দরিয়ায় ভাসমান কোন্ স্মৃতিকেই বা অবান্তর বলে বাদ দেওয়া চলে তা কে নির্ণয় করবে? অতএব বিশল্যকরণীর বিশেষত্ব না জানা থাকলে গন্ধমাদন পর্বতটা বয়ে আনা ছাড়া উপায়ই বা কী! ভরসা এই যে, পাঠকের মত এমন সহৃদয় আর সহিষ্ণু সমাজে বিরল।

পাইক আশু বোরেগীকে বৈরাগ্য ব্যামোতে ধরে নি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ মিলল যেদিন কৌশল্যা কাকী সংসাব করতে এল। প্রথমে অবশ্য বাইরেব লোকে কিছুই টের পায় নি। তবে মায়ের অজানা ছিল না কিছুই। সুশীলা কাকী অনেক আগেই খবর দিয়েছিল, আশু কাকা দইহাটার ওদিকে কোথায় এক মেছুনীর সঙ্গে কণ্ঠী বদল করেছে। একেবারে ঘর করতে আসার আগে দু-চার দিন এ পাড়াতে 'মাছ লিবাগো মুটা মাছ কেটে দিব, মাছ লিবা গো—।' হাঁক পেড়ে মাছ বেচে গিয়েছে কৌশল্যা। আমাদের বাড়িতে যেদিন মাছ দিয়ে গেল প্রথম সেদিন মা বলেছিলেন—'মানুষটার খুব মুখ মিষ্টি আর দামও শস্তা নিল। পচা-ধচাও নয়—হয়ত বাজারে আমদানী বেশি তাই পাড়ায় ঘুরে কাটাতে চায়। তখন কাটা মাছের দর ছিল খুব বেশি হলে চার আনা সের। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। না-ই বা হবে কেন, রসগোল্লা-ছানাবড়াও চার আনা, চড়লে পাঁচ আনা। দুধ টাকায় ষোল সের তাও মাসকাবারে পেমেন্ট। আর চাল—। বাড়ি বাড়ি মাথায় করে বস্তা বোঝাই চাল এনে ঢেলে ওজন করে দিত তমেজ মিয়া 'রাম-এ রাম-দুই-এ দুই—' করে টাকায় ষোল সের রামসাল। রাম দিয়ে শুরু করার রীতিতে হিন্দু-মুসলমান কোন ফারাক ছিল না। ধর্ম তখন পথেঘাটে ঘটা করে জাহিরের বস্তু ছিল না, ওটা ঘরে যত্ন করে রেখে যে-যার নিজের কাজ-কাববারে বেরুত। অন্তত সাধারণ মানুষেরা ত বটেই।

পরে যখন কৌশল্যাও কাকী হয়ে এল তখন সুশীলা কাকীর জন্যে মায়ের দরবার করে কিছু লাভ হল না। আশু কাকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হরির দোহাই পেড়ে বলে তাঁর দয়া হলে সেরে উঠবে তখন আসবে বই কি, এখানে পড়ে থাকলে দেখবে কে। সুশীলার কি অসুখ সেটা আশু কাকা বলে না।

এই অবস্থায় একদিন কৌশল্যা এল কাকার ঘরে—একেবারে ছেলে কোলে করে। ছেলেটা হামাগুড়ি দেয়, তার কোমরে রুপোর গোট। কালো কুচকুচে তেল পিছল নিটোল অঙ্গে রুপোর গোটের জৌলুষ যেন অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। ছেলেটা মায়ের রং পেয়েছে, বাপেরও বলা যায়। এমনিতে হতকুচ্ছিৎ নয় তবে নাকের তলা থেকে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত কে যেন ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে—সোজা নয়, তেবছা-ভাবে কাটা। ওর মা বলে—শংকবা আমাদের গোপাল। বোরেগীর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না তা বুঝি ঠাকুরের সইল না।

পাড়ার লোকে ব্যাপারটা সুনজরে দেখল না, কৌশল্যা সেটা জেনেই এসেছিল। তাই মাছের ঝুড়ি বঁটি মাথায় করে, ছেলেটাকে কাঁখালে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি মাছ বেচতে শুরু করল। নিজেই সাফাই গায়—বোরেগীর কষ্ট দেখে মরা মানুষেবও চোখ ফেটে জল আসে। আর সবই সেই। কখনো বলে—এইবার সুশীলাকে আনতে হবে। ছেল্যা ত তারই, সে ত বোবেগী বিহ-হা কবা ইস্তিরি। গণক ঠাকুব যাই বলল সুশল্যা বাঁজা তাই—ছেল্যা দিয়া উরার কোলে আমি আপন ঝাড়ার হাত-পা হতে পারলে বাঁচি।

আশু কাকার কোন বিকার বৈলক্ষণ্য নেই। ছেলেটাকে একটু আদর করে বটে, তাছাড়া আর সবই গতানুগতিক। তবে একটা ব্যাপার আমরা ছোট হলেও টের পেলাম, কৌশল্যা কাকী গলাবাজি করে আশু কাকার ওপর হুকুম চালায়। এবং তার হুকুমেই আশু কাকা একদিন তেলপাকানো লাঠিখানা নিয়ে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে সুশীলা কাকীকে আনতে গেল রুকুন-পুরে। যাবার আগে মায়ের কাছে একটু কান্নাকাটি করল—'বৌঠাকুব্যান, সুশল্যাকে ত আনতে যেছি। কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা ঠাকুরই জানেন। তবে আপনার কাছে ব্যাগ্যেতা বৌঠাকুব্যান সতীনে-সতীনে ঝগড়া-কেজিয়া হলে আপনাকে জগদ্ধাত্রির মত আগলাতে হবে। হেই বৌঠাকুব্যান আপনিই ভরসা—।'

মায়ের এক বিচিত্র হাসি আছে যে হাসি সত্যি ভরসা দেয়। সেই অনন্য হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন — বোরেগী ঠাকুরপো এসো গিয়ে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে—। তাছাড়া সুশীলার বড় সাধ ছিল ছেলের।

শংকরা বড় হয়ে উঠল আমাদের চোখেব সামনে। বয়সে ছোট হলেও ওর হাসিখুশি ডাকাবুকো চালচলনে আমাদের খেলার দলে দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। বার বাড়ির উঠোন আব বারান্দা জুড়ে ঢালাও কানামাছি, কুমীর-কুমীর, চোর-পুলিশ খেলায় বিকেলটা কেটে যায়।

শংকরা শংকবা কোন্‌খানে
পদ্ম বিলের মাঝখানে
সেখানে শংকরা কী-ঈ করে?
—কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ ধরে—।

এই ধুয়োটা সবাই সুর করে গায়। শংকরা নিজেও বাদ যায় না। তবে, ওর গন্না-কাটা ঠোঁটের ওপর দিয়ে শংকরা কাদ ঘেঁকে ঘেঁকে উচ্চারণ হয়। তাতে সবাই হাসে, সে হাসিতে শংকরাও যোগ দেয়। চোর-পুলিশ খেলায় সে যখন চোর হয় তখন গোটা পুলিশ বাহিনী হিমসিম খেয়ে যায়, আতা গাছের ডালে ডালে কাঠ-বেড়ালীর মত স্বচ্ছন্দে চলাচল করে, কখনো বা পাঁচিল বেয়ে ওদের বাড়ির পিছনে জাম গাছে শংকরা বসে বসে ছড়া কাটে শংকরা শংকরা....।

সুশীলা ভালবাসে ব্যাটাকে—খুবই ভালবাসে। নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই মা

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়-সিল্ক
• তাঁত-মিল
• পোষাক
• সার্টিং-সুটিং
ও ছিট কাপড়

ছাড়া হয় না ব্যাটার। কিন্তু যত ঝামেলা বাধে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ নিয়ে। সুশীলা মনে-প্রাণে চায় ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক। তার জন্যে চেষ্টারও শেষ ছিল না। মুস্কিল এই যে, মায়ের চেষ্টা আগ্রহ যত বাড়তে থাকে ছেলের তরফের অনিচ্ছা তার দ্বিগুণ মাত্রায় ধেয়ে চলে। সাতখানা বিদ্যাসাগরের ছবিওলা বই লুচি হয়ে খতম করেও অজগরের আক্রমণ পেরিয়ে আয়ে আমটি পেড়ে খাওয়া হল না। অবশেষে ছেলের নতুন জামা-কাপড় এল এবং তার ফলে একেবারে এককাগাড়ি ছুটে গিয়ে ওই ঔষধ পর্যন্ত পৌঁছল। এদিকে কৌশল্যার মাছ-বেচা পুঁজিতে টান পড়ল। দুই মা এবার সম্মুখ যুদ্ধে নামল। কৌশল্যাকে শংকরা দেখতে পারে না, ছোট হয়ে সুশীলা কিনা ছেলেকে পর করে দিচ্ছে। বড়মা বাড়িতে এলেই ছেলে বেরিয়ে যায় কিংবা মা-এর আঁচল ধরে ঘুরতে থাকে। ডাকলে কাছে আসে না। তোর গায়ে মেছুনীর গন্ধ। ব্যস কৌশল্যার চোপা ভোট—'আরে আমার পুরুত ঠাকুরের বাচ্চা। বলি তোর কোন্ মায়ের পয়সায় এ্যাতো লবাবী হচ্চে শুনি? তোর মা কোন্ বাড়ি থেকে টাকা এনে বাবুগিরির কড়ি জোগায় রে?

মোট কথা ছেলেকে নিয়ে বড়-মা আর মায়ের ঝগড়া-ঝাঁটি আশু বোরেগীর সংসার পাড়ার মধ্যে মেছোহাটা বসিয়ে দিল। সুশীলার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তাতে আরও জ্বলে যায় কৌশল্যা। বলে বোবার শত্তুর নাই ভেবেচ? মুখ বুজে আমার শিলনোড়া দিয়ে আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গবা তুমি। ওরে হারামজাদী! যুদ্ধ এক তরফাই চলে। বোবেগী বাড়িতে পা দিলে কৌশল্যার ঝাঁঝ আরও বাড়ে।

আশু নির্বিকার। মুখ বুজে শুনে যায়। তার আওয়াজের মধ্যে হুঁকো টানার শব্দ। বেশি বাড়াবাড়ি হলে মানুষটা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলে—দুই মাগীর জ্বালায় কি ঘর তেগ করব আমি! সিডা কি ভাল হবে? বল কৌশল্যা তোর মনের ইচ্ছা খোলসা করে। আমার কী, ঠাকুরের দয়ায় খোল বাজালে প্যাটের ভাবনা ভাবতে হবে না।

আশু কাকা বিবাগী হওয়ার সংকল্প, কৌশল্যার পেটের ছেলের কাছ থেকে অযাচিতভাবে আনুগত্য অনুরাগ আদায়ের চেষ্টা আর সুশীলার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলার সাধ — প্রত্যেকটিই যেমন আন্তরিক এবং পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে অচ্ছেদ্য তেমনি চরিতার্থ না-হওয়ার মত অলেয়া।

এইভাবেই চলছিল আশু বৈরাগীর সংসার।

অথচ মাঝের গলিটার গায়ে প্রাচীরের এ-পারে আমাদের বাগানে কাপাস গাছের পত্তন হয়েছে ফুলের কেয়ারি ঘুচিয়ে। বাইরের বৈঠকখানার দালানে এক হাঁটু গর্ত করে একটা হাতমাকুর তাঁত-গাড়া তৈরি হয়েছে এক দিকে আর এক দিকে ফ্লাই শাটলের দুখানা তাঁত চলছে। বিপ্রদাস কাকা আর নবেনদা আসেন, তাঁদের কাছে দাদা, জ্যোতিদা তালিম নিয়ে নিজেরাই তাঁত চালান কখনো। আমাদের ছুটির দুপুর কাটে চরকা আর তকলিতে সুতো কাটার কাজে। এ বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেছে বিলকুল। যেমন শংকরাকে নিয়ে আশু কাকার সংসারে নিত্য কুরুক্ষেত্র। আশু কাকার বাড়ির হাওয়া বদলে দিয়েছে। আমাদের পরিবর্তনটা বাবা খুব সুনজরে দেখলেন না। উইকেন্ডে কলকাতা থেকে বাড়ি এসে এই কাণ্ড দেখে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ তলব—হ্যাঁ রে এসব কি হচ্ছে?

দাদা খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন—ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেল, পুরনো কাঠের দামে তাঁত, চরকা আরও অনেক জিনিস খুব শস্তায় পেয়ে কিনে ফেললাম। আমি ওখানকার পুরনো ছাত্র বলেই পেয়েছি। আর কেউ হলে তিন-চারশ লাগত। টাকাও জোগাড় হয়ে গেল। ছবি ধার দিল। পঞ্চাস টাকায় এত জিনিস পেয়েছি যে, কিছু কিছু বেচে দেনা শোধ করেও লাভ হয়েছে আর এগুলো ত উপরি! বেশ ভাল কাজ হচ্ছে বাবা। গামছা, কাপড় বুনে তাঁতীদের মজুরী মিটিয়েও আমাদের লাভ থাকছে।

বাবা আর কিছু বললেন না। দাদা যে আর লেখাপড়া করবেন না সেটা বুঝে গুম মেরে রইলেন। বহরমপুরের হাওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় উঠেছে তা তিনি জানেন। তবু ব্যবসাপাতি করে দাদা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে দেখে হয়ত একটু সান্ত্বনা পেয়ে থাকবেন। গোটা সংসারের দায় একা কলকাতায় থেকে সামলাবার মনা পা বাড়াবার আগে, শুধু বললেন—ছোট ভাই-বোনগুলোর লেখাপড়ার দিকে নজর দিস, শুধু চরকা কাটা নিয়ে থাকলে ত চলবে না। পরকাল ঝরঝরে না হয় সবার।

দাদার অবশ্য সেদিকেও নজর খুব কড়া। আমাদের রুটিনের বাইরে একচুল এধার-ওধার হলে রক্ষে থাকত না। আরং ধোলাই!

সদরে ঘটা করে তাঁত-চরকা চলে তার আড়ালে আরও অনেক ব্যাপার আছে যা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। দাদার বন্ধু জগা মামা, ফণীদা, বিশু মামা এমনি আরও সবাই আসে। তখন বৈঠকখানা ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি চাইতে হয়—ভেতরে যাবো?

—কেন? কি চাই! কিম্বা একটু পরে আসিস। জবাব মেলে। ওর মধ্যে যে বিরাট রহস্য রয়েছে তারই টানে ছুতোনাতা করে ওই ঘরে একবার ঘুরে আসাটাই বড় কাজ।

তখন কি-বা বা বুঝি। মিশনের নীরোদা দিদিদের আসরে একদিন বুক ফুলিয়ে একটা জরুরী খবর পরেশন করলাম—এবার ত ইস্কুলে ইস্কুলে পিকেটিং হবে। তখন কে জানতো যে, মিশনারিদের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সাপেনেউলে সম্পর্ক। তা ছাড়া পিকেটিং ব্যাপারটা যে কি তাও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বড়রা বলাবলি করে, পিকেটিং হলে পড়াশুনো করতে হব না। নীরদা দিদি চশমার ফাঁক দিয়ে এক নজর আমাকে দেখে ছবিওয়ালা একখানা বই দিয়ে বলেছিলেন—বেশ ত ভালই হবে তখন এই বইখানা পড়ে ফেলো। কেমন।

পিকেটিং হল না আমাদের হার্ডিঞ্জ স্কুলে। তবে অন্য কোথাও নাকি হচ্চে। সুনীল, চরণ, শিবু, গোলমরিচ, অমিয় সবাই গঙ্গার ধারে যায়, লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি খায়—সবাই খায় না তবে যায়, দেখার মধ্যেও উত্তেজনা কম নেই। আমাকে প্রথম প্রথম ডাকতো কিন্তু অত সাহস আমার নেই, তা ছাড়া বিড়ি খাওয়া যে আদৌ দেখার মতো ব্যাপার সেটা মাথায় যায় নি, তার চেয়ে মায়ের ভয়টাই বড়। হারাধনবাবুর বেত। তার পর বাড়িতে দুরমুষও অনিবার্য—। সঙ্গে যাওয়া আর খাওয়াতে কোনো তফাৎ নেই বেরাঘাতে চলন আর অমিয়র হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে প্রমাণিত হল একদিন। দিদির ভাসুরপো শিবু। আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে তার বিধবা মা পাঠিয়েছেন, লুকিয়ে ধূমপানের অপরাধে দাদা শাস্তি বিধান করলেন—একনাগাড়ে চারঘন্টা চরকায় সুতো কাটার। বড় হয়ে শুনেছি যে কোনও অপরাধ, এমন কি লুকিয়ে প্রেম-করার অপরাধেও দাদারা হয় চরকা নয় তকলি বিধান দিতেন এবং যাতে সেই সাজা ঠিকমত হাসিল হয় সেদিকেও প্রখর প্রহরা থাকত।

দাদাদের দলের হাতেই যেন পাড়ার লোকের সহবৎ শোধরানোর আদালত—ভয়ে হোক বা যে কারণেই হোক এটা মেনে নিয়েছিল সকলে।

কিন্তু আসল ক্ষমতার মালিকেরা যে এত মোটেই স্বস্তি বোধ করছিলেন না তার প্রমাণ এক শীতের শেষ রাতে পাওয়া গেল। বাড়ির সামনের রাস্তা, পাশের গলি এবং যেখানে সম্ভব লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে। ভারি বুটের শব্দে দাদার ঘুম ভেঙে গেল, জানলার ফুটো দিয়ে আশু কাকার বাড়ির দিকের গলিতে আয়োজন দেখে তিনি, পাশে ঘুমন্ত জ্যোতিদাকে খুঁচিয়ে তুলে ইশারায় সব বুঝিয়ে দিলেন। জ্যোতিদার স্বাস্থ্য বেশ পালোয়ানী কিন্তু পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে বুঝে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কি হবে?

দাদা বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার করে জ্যোতিদার হাতে দিয়ে বললেন—বাগানের ভেতর দিয়ে, গর্তর জলাটা সাঁতরে পার হয়ে ছুতোর পাড়ায় পড়বি, তারপর জঙ্গলে জঙ্গলে লোকনাথ ভটচাযের বাড়ি, বুঝলি!

জ্যোতিদার হাতপা অবশ। গুঁতো খেয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দাদার ধমক পড়ল—যা বলছি। এক মিনিট দেরি করলে সর্বনাশ।

—তুই কি করবি?

—দেখতেই পাবি। তুই পার হয়ে যা মাল নিয়ে—

তারপর দাদা আর জ্যোতিদা পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে। জ্যোতিদা চলে যাবার পর দাদা বাগানের দিকের পাঁচিল টপকে ভেতর বাড়িতে গিয়ে মাকে ঘুম থেকে তুললেন—মা, আমি কি পালাবো?

মা নিমেষে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে শান্তভাবে জবাব দিলেন—না বাবা, পালিয়ে কোথায় যাবি। ওদের রাজত্বে কি পালিয়ে বাঁচতে পারবি? তার দরকার নেই। যেমন ছিলি বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি এদিকে তোদের প্রেশের টাইপগুলো গলিয়ে ফেলি, নইলে ওগুলো নিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

মায়ের কথায় দাদা নিশ্চিন্ত হয়ে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

তখনকার দিনে রাত দুপুরে বাড়ি ঘেরাও করলেও এখনকার মত পুলিশ চট করে ভোর হওয়ার আগে খানাতল্লাসী করত না। অন্ততঃ আমাদের বাড়িতে করে নি।

পুলিশ দলের নেতৃত্বে এসেছিলেন বড় সাহেব নিজে এবং তিনি আমাদেরই এক সম্পর্কে মামার আপন শ্বশুর। যথাসময়ে তিনি প্রবেশ করলেন এবং দাদা তাঁর বাড়ি সার্চ করে নিলেন—দাদামশাই আপনি কিছু অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে এনে ফাঁসাবার তালে আছেন কি না সেটা আমায় দেখে নিতে দিন তারপর ঢুকবেন।

দু-তরফেই সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলির লড়াই চলল। দাদামশাই প্রথমে ঘরে ঢুকেই একেবারে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন—বাঃ, ম্যাজিক! দাদু গো এখনো যে ছাপ রয়েছে কিন্তু মাল কোথায়? আর তোমার শয্যাসঙ্গিনীটিই বা কোথায়?

—দাদুর কি নেশার ঘোর কাটে নি। কি বাজে বকছেন?

—তা বটে। দুটো বালিশে কি একাই শুচ্ছ? বলি সে কোথায়?

—রাতে যারা শরীর ভাড়া দেয় তাদের কি এক জায়গায় থাকলে চলে। অন্য কোথায় বেশ্যাগিরি করতে গিয়েছে।

বৈঠকখানায় হাঁটকে হুঁটকে কিছু পেলেন না। বারান্দায় বসে একটু জিরোচ্ছেন তিনি। লোকজন কাজ করছে। বোধহয় সাহেবের কথাবার্তায় তারা একটু ভদ্রভাবেই দেখছিল। এমন সময়ে ছোট ঘরের দরজা খুলে মা মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন—হ্যাঁ রে! বরুণ, কে এল এই ভোরে? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

—দাদামশাই এসেছেন?

—ও মা তাই নাকি। এতক্ষণ বলিস নি। ছি-ছি! বসুন তাহে মশাই। আমি

দাদামশাই উঠে এলেন এবং মা তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি মা। তুমি বুদ্ধিমতী এর বেশি বলা দরকার হবে না।

—আপনার কাজ নিশ্চয় করবেন তাহে মশাই। তবে আমার কাজও ত আমাকে করতে হবে। একটু চা খেলেই আমি খুশী হবো।

—আজ থাক।

—না, না, আবার কবে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে তার ঠিক কি। আপনারা ভেতর বাড়ি তল্লাসী করতে করতে উনুন ধরে যাবে তাহে মশাই।

পুলিশের বড়সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন, না মা, আমাদের ভেতর বাড়িতে যাবার দরকার হবে না। শালা আমার ওপর দিয়ে যায়। খুব ফাঁকি দিয়েছে মা! তা এত ভোরে উনুনে আঁচ?

—ঠাকুর সেবা আছে। ছেলে-মেয়েদের ত জলখাবারও কিছু করতে হয়।

আমাদের বাড়িতে কিছু পাওয়া গেল না কিন্তু মাল বেরুল আশু কাকার ঘর থেকে। ভেতর বাড়ি সার্চ না করে আশু বোরেগীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে একটা টিনের সুটকেশ বোঝাই নিষিদ্ধ বই বার করে ফেলল। বই ত নয় এক সুটকেশ গোখরো সাপ—এর যে কোন একটিই যেন দুর্বল ইংরেজ সরকারের মত গোবেচারি মানুষটির প্রাণ নাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব বিদায় নেবার সময়ে পুলিশ সাহেব দাদামশাই বেশ হাসিখুশি।

আশু কাকাকে সুটকেশ সমেত থানায় নিয়ে গেল। অবশ্য থানা পর্যন্ত টানাটানির দরকারই হত না। যদি এখানেই ভালয় ভালয় আশু কাকা কবুল করত সুটকেশের আসল মালিক বরুণ। তা না করাতেই ঝামেলা পোহাতে হল তাকে। থানার হাজতে যথাবিহিত মেথড প্রয়োগ করেও কোন লাভ হল না। আশু কাকাকে জেরা করে এইটুকু কবুল করাতে পেরেছিল পুলিশ—আজ্ঞে আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না এডা সত্যি কথা। গলায় কণ্ঠি আছে, ভগমানের দয়ায় আমরা সবাই বেঁচে আছি। তবে ইডাও সত্যি সুটকেশটা যখন আমার ঘরে পেয়েছেন তখন উয়ার মালিক আমি। উয়াতে কি লেখা আছে জানি না বাবু। তবে উয়ার জন্যে যা সাজা হয়, জেহেল-ফাঁসি যা আপনাদের বিবেচনায় বিচার হয় সেই সাজা বাহাল করুন। আমি মাথা পেতে তাই লিবো মেনে। ব্যস ফুরিয়ে গেল —

কিন্তু অত সহজে ফুরোতে দিতে পুলিশ কেন রাজি হবে! তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দাদাকে টানতে চায়। অমনি জিভ কেটে আশু কাকা মাথা নাড়ে—ওরে বাপরে, অমুন কথা মুখেও আনতে নাই। বরুণকে আমি সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসি, দেবতার মত ভক্তি করি। উয়ার তুল্য ছেল্যা ভুভারতে দেখি নাই। বলেছি ত বাবু মশাইরা আমার কথার লড়চড় করাতে পারবেন না। আমার ঘরের দুট্যা বৌ, এক ব্যাটা, খোল করতাল সবই যেমুন আমার দায় তেমনি এই সুটকেশও আমার। বই পড়তে পাল্যাম আর না-ই পাল্যাম তাথে আপনার কি দরকার। ফাঁসি দিবেন ত তাই দ্যান ক্যানে! কেহু বাঁচবে না মশাই, সবাইকেই একদিন না একদিন মরতে হবে।—হরি হে পার করো।

আশু কাকা নির্যাতন, পীড়ন সবই হজম করল এবং হাজত থেকে জেলেও দিন কয়েক কাটিয়ে এসেছিল।

ফিরে হাসতে হাসতেই গল্প করেছিল—বুঝল্যা বাবাজী। তাজ্জব জায়গা বটে এই জেহেল। সরকার বাহাদুরের জেহেলে না যেলে ত কিছুই জানতে পারতাম না বাবা। তা উয়াদেরও কীর্ত্তন শুনাত্যাম। হাজার হোক শালোরা ত আসল পাতকী, কীর্ত্তন বুঝি প্যাটে সইল না তাই বললে—ওই বোষ্টমটাকে বিদায় করো, নইলে ধম্মের রোগে মজিয়ে দিবে। বুঝল্যা! অনেক কাল পরে হাঁক দিল—সুশ্ল্যা—তামুর্ক সাজ।

আমরা চরকা থামিয়ে আশু কাকার জেলের গল্প শুনেছিলাম। স্বদেশী করার জন্য জেলখাটা মানুষ জীবনে সেই প্রথম দেখলাম।

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সাটিং
সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

শিল্পীর কাগজপত্র এবং চিঠি

সন্দীপ সরকার

কাজটা খুবই শকত। এই কোনো শিল্পীর কাগজপত্র এবং চিঠি সম্পাদনার কথা বলছি। মুস্কিল হলো দীপক মণ্ডলকে আমি চিনতাম। তার সঙ্গে অবশ্য আমার বৈবাহিক কোনো সম্পর্কে ছিল না। দেখা গেছে এসব কাজ জামাইরা ভাল পারে। দীপক আমার সমবয়সী ছিল। সে আমার বন্ধু ছিল।

'বন্ধু' বা 'পরিচিত' এসব কথাগুলো খুব গোলমেলে। কারণ শেষ পর্যন্ত তো কাউকে চেনা হয় না। দীপকের মা জীবিত এই সাধারণ খবরটা আমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'ঘনিষ্ঠ' শব্দটা লক্ষ্য করুন—জানতাম না। তার একজন বোন আছে যার কথা সে মাঝে মাঝে বলতো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খুঁটিনাটি কিছু বলা তার স্বভাবে ছিল না।

আমি তার নাম জানতাম। ছবির প্রদর্শনী দেখেছি। দু একবার কফি হাউস কি ন্যু ইয়র্ক সোডা ফাউনটানে দেখেছি। আলাপ হয়নি। কারণ পাজামা পাঞ্জাবি পরা দাড়িওলা লম্বা চওড়া কালো শকত সমর্থ একটা লোকের সঙ্গে কুড়ি বাইশ বছর বয়সে পরিচিত হবার কোনো তাগিদ মনের ভেতরে অনুভব করতাম না। বিশেষত তখনও মনের ভেতরে একটা ধারণা ছিল আর্টিস্টরা মুখচুরা হয়।

তারপর খাটালে দুধ আনতে গিয়ে উত্তেজিত স্টাডবুলের ছবি স্কেচ খাতায় আঁকতে দেখে আমার কৌতূহল হল। বিশেষত তার জোরালো নিশ্চিত রেখা আর আত্মবিশ্বাস দেখে আমার কেমন মনে হলো দীপকের কব্জীর জোর আছে। যেচে আলাপ করলাম। গেলাম তার স্টুডিওতে। মেজানাইন ফ্ল্যাটে একা থাকত। যন্ত্রতন্ত্র থেত। ছাদে চিলেকোঠায় তার স্টুডিও ছিল।

কতদিন সে বলেছে হতাশ হয়ে, বুঝলি আমাদের কিসসু হবে না। প্রতীক বা চিত্রকল্প বা ছবির ভাষা নতুন করে খুঁজে পাচ্ছি না— ছবিতেও তো এদেশের জীবনের সঙ্গে খাপ খেতে হবে। অথচ ইলেস্ট্রেশন হলে চলবে না। ঘর সাজাবার

ছবি নয়—আসল ছবি। অলংকরণ নয় ছবির ভেতরের ব্যাপারটা থাকা চাই।

মাঝে মাঝে ভেতরে ভেতরে ওর ভীষণ টানাপোড়েন চলত। বাইরে থেকে বেশ বোঝা যেতো সে ছটফট করছে। অস্থির অস্থির ভাব। হয়তো বলত, একটু মদ খাওয়াবি। কিংবা আয় চল না যাই—

কিন্তু দু দণ্ড স্থির হতে পারত না। মদ তবুও সে আনন্দ করে বরং খেতো—অনেকখানি খেতে পারত। কিন্তু অন্য ব্যাপারটাতে সে ঘর থেকে অনেকটা চাবুক খেয়ে বেরিয়ে আসত যেন, নিজেকে জানোয়ারের অধম মনে হয়।

আসলে দীপক মানুষটা ছিল সাত্ত্বিক। ওর ডায়েরী পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে অন্তর্জাত সমস্যাটার মধ্যে বাবুদ ছিল। শেষ পর্যন্ত ওর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নড়েচড়ে উঠেছিল। ওর মনের খবরটা আমি ভাল বুঝিনি। বহু পরে ওর মায়ের কাছে শুনি যে দীপকের বাবা ছিলেন নিরীহ ভালোমানুষ। সুতরাং সংসার চালানো থেকে ছেলে শাসন পর্যন্ত উনি করতেন। দীপকের বাবা হয়তো কিছু পরিমাণে স্ত্রৈণ ছিলেন। হয়তো সেই কারণে দীপকের ছবিতে—ভাল ভাল ছবিতে—শেষের দিকের ছবিতে মেয়েমানুষের চেয়ে আগ্রাসী পুরুষমানুষ সৈনিক, নাবিক, খুনে, গুন্ডা, বদমায়েস বেশি। অর্থাৎ ওর বাবার উল্টো ধরনের লোক।

একটা কথা মনে হচ্ছে কারু মৃত্যুর পর—বিশেষ সে যদি শিল্পী হয়—তাহলে লেখা খুবই কঠিন।

কেন যে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল সেটা ভেবে ওঠা যায় না। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স তো আর মৃত্যুর বয়স নয়।

চোখ বন্ধ করলেই সেই তামাটে লম্বা চেহারা আমার সামনে ভেসে ওঠে। একটা বুনো ঘোড়ার শক্তি ছিল তার দেহে। শক্ত মুঠিতে ব্রাস চালাতো সে। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। ছবি আঁকার সফল সমস্যা তা সে নন্দনতাত্ত্বিক হোক আর শৈলীগত হোক, আমার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আলোচনা করতো। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে আলোচনা সেই অনুপাতে ছিল না।

মুস্কিল হল যে কোনো মানুষের মৃত্যুর পর তার বলা প্রতিটি কথা তা যতো তুচ্ছ হোক, অন্য তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়।

কতো জায়গা ঘুরেছি তার সঙ্গে শনি রবিবারে পুজোর ছুটিতে। কলকাতায়। কলকাতার বাইরে। পোড়ামাটির মন্দির দেখতে গেছি ইলামবাজার, আটপুর, দীঘনগর। ঢোকরা শিল্পী আর পোটদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি। ঘুরেছি গ্রামে গ্রামে মেলায় যাত্রার আসরে। সে সবাইয়ের সঙ্গে অতিসাধারণ হয়ে মিশে যেতো। কখনো উন্নাসিক হতো না। পয়সা না থাকলে মুড়ি-মুড়কী বাতাসা এক ঘটি জল দিয়ে খেয়ে নিতো।

আবার কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সে ঘুরতো। দরজী, গয়লা, ঠেলাওয়ালা, ভদ্রলোক, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, ট্রাক ড্রাইভার, মিঠাইওয়ালা, ফড়ে, দোকানদার, বেশ্যা থেকে ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার সবাইয়ের সঙ্গে সে মিশতো। মানুষ সম্বন্ধে তার কোনো মোহ ছিল না, আবার বিরাগও নয়। ভিখারীর সঙ্গেও সে সহজ সুরে কথা বলতে পারতো। মানুষ আর প্রকৃতির মতো শহর সম্বন্ধে তার সমান আগ্রহ ছিল। ভীষণ পরিশ্রমী ছিল। আঁকতো নিয়ম করে দিনে আট ঘন্টা। তাকে বাউন্ডুলে বলে লোকে চিনেছে। সে যে খাটতে পারতো একথা ক'জন জানে।

দীপক বলতো, লোকে মনে করে শিল্পী যেন অসামাজিক জীব। তার কাজ অপ্রয়োজনীয়। কি আশ্চর্য যন্ত্রণায় ফল গর্ভ কান কেটে ফেলে কেউ বোঝে না। বেঁচে থাকার তীব্র অনুভূতিকে শানাবার জন্য শিল্প। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে শিল্পবোধ জেগে উঠলে, অনেক কাজ হবে। বোধ জেগে ওঠার পর একজন মানুষ যদি দেখে আরেকজন খেতে পাচ্ছে না বা শীতে কাঁপছে তাহলে তার অসহ্য মনে হবে।

অথচ শুধু ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, সে সমানভাবে কাঠামো নির্মাণ, অবয়ব, রং লাগানো, রচনা, শৈলী, ছবির ভাষা—সব বিষয় নিবলসভাবে ভাবতো।

যে সব শিল্পী যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে কৈশোর কাটিয়েছেন এবং স্বাধীনতার পর হয়েছেন যুবক, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত চিত্রসৃষ্টির একটা কাল। রামকিংকর, বিনোদবিহারী তাঁদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললেন। নীরোদ মজুমদার, পরিতোষ সেন এবং ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন পথ দেখালেন। শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে দীপকও ছবি সম্বন্ধে জটিল দ্বন্দ্বে পড়লো, ভাবল বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কথা। বস্তুত তার ছবিতে ইউরোপীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নয়। তার চারপাশের জীবনধারা থেকে সে ছবির মালমশলা নিয়েছে। লৌকিক কলাশিল্পের কাছে ঋণ করেছে অলক্ষ্যভাবে। শুধু আধুনিকতার ভাবনাগুলো সে পেয়েছে ইউরোপের কাছে। ঠিক সেই কারণে বিমূর্ততা সম্বন্ধে তার ছিল প্রচণ্ড অনীহা।

আজকের দিনেও অবাস্তব কাজ করা অসম্ভব নয়, দীপক প্রমাণ করেছিল। অথচ দীপকের ছবি রিয়েলিস্টিক নয়। ধরা যাক তার একটি ছবির বিষয়বস্তু হলো রাস্তায় একটা ট্যাক্সী ড্রাইভারকে ঘিরে ধরে অনেক মানুষ মারছে। ট্যাক্সীর সামনে একজন পড়ে রয়েছে। আর ছবির এক কোণে তলোয়ার হাতে একজন দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে। বা উন্মাদ ভিখারী মেয়ে গাছে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে তাপ্পি-মারা ব্লাউজ। কিংবা গরম পড়ছে, হাঁস মুরগী, মানুষ, মেয়েমানুষ, বাচ্চা পালাচ্ছে। সমস্ত ছবিগুলোর মধ্যে দম বন্ধ উত্তেজনা। নির্বিবেকী হিংসা। দীপক সেন মানুষকে সতর্ক করে দিতে চাইছে। এক ধরনের ঘৃণা, ক্রোধ, কখনো বা হয়তো ব্যঙ্গ তার ছবিকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

বৈদ্যনাথবাবু দীপকের এবং সেই সূত্রে আমারও, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়। শেষকালটা তার বদান্যতা দীপককে বাঁচিয়েছিল। তিনি হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে আঁখ মাড়াইয়ের যন্ত্র তৈরীর কারখানা করে ধনী হয়েছিলেন। তাঁর অর্থানুকূল্য ছাড়া দীপকের ছবি এমন অফসেটে ছাপার বই প্রকাশের দুঃসাহস কোনো প্রকাশকের হতো না।

দীপকের জীবন খুব জটিল বা ঘটনাবহুল নয়। তার চিঠিপত্র বিভিন্ন বয়সে ভিন্ন মেজাজে লেখা। কিন্তু তা থেকে তার জীবনের আদল অস্পষ্টভাবে হলেও ধরা পড়ে।

দীপক নিজেকে অসাধারণ ভাবতো না। সংবেদনশীল ছিল সে, সহানুভূতি ছিল তীব্র। তার এসব বোধ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক ছবিও হয়েছে ধারালো। জটিল হয়েছে ছবির নির্মিতি। কঠিন আর দৃঢ় হয়েছে কাঠামো। বয়ে এসেছে নানান ছায়া আর ক্যানভাসের বাকলে বিচিত্র কারুকৃতি। তার বোধ শিল্প আর জীবনের ধারা এক করেছে। আবার এর বিষ কণ্ঠে ধারণ করতে পারে নি বলে তার জীবনটাই হয়েছে নীল। কৈশোর যৌবনের সীমারেখা

দীপকের এই সময়কার চিঠিতে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। লক্ষণীয় সে ছবি আঁকিয়ে হতে চেয়েছিল সেই ছেলেবেলা থেকে।

(১)

১লা ডিসেম্বর ১৯৪৭ ১
দেওঘর

শ্রীচরণকমলেষু
মা,

প্রথমে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে। আমি ভাল আছি। আশা

---

১ এই চিঠি দীপকের মাতৃদেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে দীপকের টাইফায়েড হয়। সেরে উঠে তাকে তার মামা শ্রীজলেশ্বর বিশ্বাসের কাছে চেঞ্জে পাঠান হয়।

করি তুমি ভাল আছ। বুলার২ জন্য মন কেমন করে। এখানে এক রকম পাহাড়ী ফুল হইয়াছে—সে থাকিলে মজা করিয়া খাইত।

আমি খুব ছবি আঁকিতেছি। বড় হইলে আমি শিল্পী হইব। ডা ভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পী না হইলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মামীমাও আমার ছবি বাঁধাইয়া বসিবার ঘরখানি সাজাইয়াছেন। মামা তো তোমার ভাই—উঁহার মাথায় ছবি ঢোকে না, বড় বকাবকি করেন। তুমি বকো আর মারো—আমি ছবি আঁকিব, আঁকিব, আঁকিব—তিন সত্যি। ইতি

মনু৪

(২)

কলকাতা

১লা মার্চ, ১৯৫২

ভাই ফাল্গুনী ৫

অবশেষে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হলাম। মা তো কিছুতেই রাজী নয়। আমার মনে হয় প্রতিভাবান পুরুষের unsympathetic mother -ই বোধহয় নিয়ম। সোপেনহাওয়ার এবং বাইবলের কথা ধরো না। মপসাঁর মা-র কথা কোথায় পড়েছিলাম— তিনি বোধহয় ব্যতিক্রম। ছেলে এবং মার চিন্তাজগতের মধ্যে যদি সংযোগ-সেতু না থাকে তাহলে সেটা মর্মান্তিক। যার সমগ্র সত্তাকে কেন্দ্র করে মানুষ গড়ে ওঠে, বড় হয়। যার রক্ত-মাংসের মধ্যে সে বেড়ে ওঠে, তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার বিচ্ছেদটাই যদি স্থায়ী হয়, দিনের পর দিন যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে মানুষের আত্মা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে।

মা আমাকে ভালবাসে না, আপন মনে করে, তাই আমাকে বুঝতে পারার কোন তাগিদ তার নেই। মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে বলেই বিয়ে করে। বড়সড় হয়ে ঢুকে পড়ে সে তার হিম-লাগা দেহকে অন্যের ভালবাসার উত্তাপে সেঁকে নেয়।

আমি আমার মনের কথা কিভাবে বোঝাব। অসহ্য এই নিঃসঙ্গতা। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে বম্বে থেকে ফিরে এলে সব কথা খুলে বলব। ভালবাসা নিস। ইতি

দীপক

(৩)

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

ভাই বৈদ্যনাথ ৬

কলেজে পোষাল না। ছেড়ে দিলাম। অমন জেলখানার মত জায়গা আমার জন্য নয়। সাহিত্যিকদের জন্য তো আলাদা বিদ্যালয় নেই। আসল জিনিষটা না থাকলে হয় না। আমি বরং নিজে হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে নেব। জীবনের সবকিছু নিজের মত করে শিখে নিতে হয়। আমি কোথায় কিভাবে মানিয়ে নেব, অন্যে কি তা বলে দিতে পারে?

কাগজে বোধহয় ফুটপাতে আমার প্রদর্শনীর কথা পড়েছিস। প্রচুর লোক হয়েছিল। প্রশংসা-নিন্দা দুই হয়েছে।

মা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার একজন সুহৃদ আমিনুল রহমান সাহেব পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছে, তাঁর ২ ব্রিটন স্ট্রীটের বাড়ির গ্যারাজের ওপরের ঘরে থাকতে দিয়েছেন। মামীমা ত্রিশ টাকা পাঠান। চার আনার শিক কাবাব পরোটা খেয়ে তোফা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। রহমান সাহেব রঙ তুলি পট সব কিনে দেন।

মা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিল, অথচ আমাকে একদম বুঝতে পারে না। মামীমা গাঁয়ের মেয়ে কিন্তু খুব সহজে সব বুঝে ফেলে কলেজ ছেড়ে দিয়েছি বলে মা লংকাকাণ্ড বাধিয়ে দিল। প্রচলিত ধারার বাইরে কিছু ঘটলেই মার সব গুলিয়ে যায়। যাচ্ছে-তাই ভাষায় গালাগাল, মারধোর সব কপালে জুটেছে।

একটু ভালবাসার জন্য কী-না করতে পারি। মেয়েরা রূপ, অর্থ, নিরাপত্তা দেখে, আসল মানুষটাকে দেখে না। কোন মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে জানলে খুশি হই। পক্ষীরাজারোহী রাজপুত্তুরের পেছনে ছোট না যাও! ইবা৭ আজকাল গণেশের৮ সঙ্গে উড়ছে। ইরা জানে না সে আমার জীবনটাকে কতটা শূন্য করে দিয়েছে। সেই চিরন্তন জাতের প্রশ্ন তুলে আমাকে আঘাত দিল। তুই একদিন আসিস, অনেক কথা আছে। ভালবাসা জানিস। ইতি

দীপক

যৌবন

১৯৬০ সাল থেকে দীপকের ছবির মধ্যে পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। চব্বিশ বছর বয়স থেকে সে যেন নিজেকে আরো বেশি খুঁজে পেতে থাকে। মৃদু মোলায়েম রঙে আঁকা নিসর্গচিত্রের পরিবর্তে কঠোর রূঢ় রঙের প্রতি সে মননিবেশ করে। গল্প নয়, ছবির মেজাজ তৈরী করার ঝোঁক। মনের ভেতর থেকে রেখা উঠে আসে, কর্কশ, জান্তব অথচ আশ্চর্য সেগুলোর জীবনীশক্তি। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয় বলে ছবিগুলোর পেশী-বহুল শক্তির উল্লাস। একটা রুদ্ধ আগ্নেয়গিরি যেন আকোশে ফেটে পড়ছে। অথচ নির্মিতির প্রতি তার ঝোঁক। ছবি যেন এক বলিষ্ঠ কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছে সে।

(৪)

৩রা আগস্ট, ১৯৬০
কলকাতা

স্নেহের বুলা,

আশা করি তুই ভাল আছিস। বৈদ্যনাথ আমাকে তোফা রেখেছে। মাসে দুটো করে ছবি ওকে দিই। ওর বিশ্বাস একদিন আমার ছবি বিক্রী করে বড়লোক হয়ে যাবে। আমার ভয় করে। যদি আমার মধ্যে প্রতিভা না থাকে। তাহলে আমি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করছি না, ওকেও ঠকাচ্ছি। মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি, সাহচর্য—কিছুতেই যেন নিষ্কৃতি নেই। কাজ করতে করতে ক্লান্তি লাগে। তখন এই প্রশ্নটা বিপন্ন করে তোলে। আসলে খুব একা।

মা-র কাছে যাই। গুরুদেব, ঠাকুর-ঘর, এই সব নিয়ে ওঁর দিনগুলো বেশ কাটছে। তুইও নেই, আমিও নেই, সুতরাং মাথাব্যথা নেই। শুভ্র শুচিতার তলাকার ফাঁকটা নজরে পড়ে না কারো। লৌকিকতা-লৌকিক ধর্মের কিয়াকর্ম মানুষের মনকে ঘুম-পাড়িয়ে দিতে পারে।

তোর কাছে যাবার কথা লিখেছিস। সত্যি, আমার বাসা থেকে তোদের পাড়া কতইবা দূর। কিন্তু, তোর দেওর-ননদ-রা যেভাবে আমাকে দেখে। আমি যেন কিম্ভূত চিড়িয়াখানার জন্তু। অতীনকে সঙ্গে করে তুই তারচেয়ে আমার স্টুডিওতে

---

২ বুলা-দীপান্বিতা মণ্ডল, দীপকের ছোট বোন।

৩ মামীমা—শ্রীমতী বাসন্তী বিশ্বাস। স্বল্প শিক্ষিতা হলেও দীপকের ওপর এঁর প্রভাব অপরিসীম।

৪ মনু—দীপকের ডাকনাম।

৫ ফাল্গুনী কর দীপকের বাল্যবন্ধু। ১৯৫৩ সালে আঠারো বৎসর বয়সে মেনেঞ্জাইটিসে কবিযশঃপ্রার্থী ফাল্গুনীর মৃত্যু দীপকের মনে আঘাত হেনেছিল। আমাকে সে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি যদি মরবে তাহলে কেনইবা ওর জন্ম!

৬ বৈদ্যনাথ আদকের বিষয় জ্ঞাতব্য গোড়ার দিকে রয়েছে।

৭ ইবা—নামটা কল্পিত। মাডেকস স্কোয়ারের দীপকদের বাড়ির পাশে এদের বাড়ি।

৮ গণেশ নামটা কল্পিত।

আসিস। তোদের দুজনের জন্যে পাঠালাম আমার স্নেহাশীষ। ইতি

দাদা

(৫)

২২ বেড়কশ অ্যাভেনিড়,

দিল্লি-৬

১৮-৬-৬১

ভাই বৈদ্যনাথ,

দিল্লি এসে ছবি মাউন্ট আর ফ্রেম করতে ব্যস্ত ছিলাম বলে তোকে চিঠি দিতে দেরী হলো। কিছু মনে করিস না। এখানকার গ্যালারীর আলোর ব্যবস্থা কলকাতা থেকে অনেক ভাল।

হানিফ[৯] প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। এখানে একটি জিনিস ভাল লাগল, বয়স্ক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীরা প্রদর্শনী দেখতে আসেন। তবে মহাধড়িবাজ। কার সঙ্গে দেখা হলে ছবি বিক্রী হবে, কি করলে পত্রিকায় আলোচনা বেরুবে বা বিদেশে যাওয়া যাবে, এসব নিয়ে মহাব্যস্ত। কিন্তু কাজ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রাণবন্ত নয়, খামোকা দিশী হবার চেষ্টা যাতে বিদেশীরা কেনে। কারো আবার মনের মধ্যে তাগিদ নেই, তাই বিমূর্ততার জন্য বিমূর্ততার প্রাচুর্য। ছবির টেকসচার সম্বন্ধে অহেতুক মাথা-ব্যথা। চোখ-ধাঁধান নৈপুণ্য, ভেতর কিছু নেই। বেশীর ভাগ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ।

প্রশংসা নিন্দা দুই পেয়েছি। হানিফ বললেন, Why are you so angry with the world?

বললাম জলটুঙ্গি ঘরে বাস করার প্রবৃত্তি আমার নেই। একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। ছবি দেখালেন। আমি চুপ করে থাকলাম। উনি বললেন, বুঝতে পারছি ভাল লাগছে না। আমি কি যেন বলতে গেলাম। বললেন, আমার মন-যুগিয়ে কথা না-ই বা বললে। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তারপর দূতাবাস, রাজনৈতিক নেতা, বড় সরকারে চাকুরে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান —নেমন্তন্নের শেষ নেই। একটা পাঞ্জাবী মেয়ে, নাম মনে কর লিলি কাউল। লাল টু সিটার গাড়ি করে ঘোরাল। রঙ-করা মুখে সিগারেট। যৌন-জীবন জলবৎ করে ফেলেছে। ছবি-টবি বোঝে না। তবে আমার দুটো ছবি কিনেছে।

লিলির ব্যবহার এমন সহজ যে আমি টেরা হয়েছি। পরে সব বলব।

---

৯ এ পি হানিফ—দেশে-বিদেশে পরিচিত ভারতবর্ষের সর্বাধিক বিতর্কিত শিল্পী।

দিল্লির সমাজে পাশ্চাত্যকরণ ঘটেছে উপরতলায়। তবে অন্যান্য শহরের চেয়ে অন্যান্য স্তরেও এর প্রভাব কম নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে, আধুনিক হয়েও কিভাবে ভারতীয় থাকা যায়। ১৯ শতকে রামমোহন থেকে শুরু করে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র এর একটা কাজ-চলা গোছের সমাধান করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার জন্যে তাঁদের ব্যবস্থা আমাদের কাজে আসছে না। ইউরোপ আমাদের মানস-জগত আলোড়িত করছে না, কল-কারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে এসে দাঁড়াচ্ছে। তবে বনেদটা ঔপনিবেশিক থাকার দরুণ, সমস্যাটা খুব জটিল। প্রাচীন গ্রামীণ মূল্যবোধ নিয়ে আধুনিক নাগরিক জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র প্রাচী-প্রতীচ্যের যে-সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে-নির্দ্বন্দ্ব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমাদের কালের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নতুন প্রতীক খুঁজতে হবে। এমন প্রতীক যা সমসাময়িক যুগের দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং নৈরাশ্যকে অর্থপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। অথচ মনের ভেতরে দোটানা। তাই সিদ্ধান্তে না-পৌঁছতে পারার যন্ত্রণা। তাই প্রতীচ্যের অন্ধ অনুকরণ।

আসলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান তো কমছে না। শতকরা আশী ভাগ মানুষ যত গরীব হচ্ছে, উপরতলার সাহেবের সংখ্যা তত বাড়ছে। সুতরাং শিল্পবোধ-ফোদ আসলে প্রতারণা এমন একটা সন্দেহ জাগছে মনে। ইতি

দীপক

(৬)

নিউ দিল্লি

৩০-৬-৬১

ভাই বৈদ্যনাথ,

তুই আমাকে দোষ দিবি হয়তো। আমি চাকরি পেয়েও নিলাম না। আমার প্রায় মনে হয়, অদৃশ্যে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলেছে। চলেছে বলছি না। তবে মনে হয়। এখানে মিসেস কৌশিক বলে এক ভদ্রমহিলার গ্যালারী আছে, তোকে বোধহয় বলেছি। তিনি আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন, মাসে পাঁচশ টাকা করে দেবেন, পরিবর্তে একটা করে ছবি দিতে হবে। আমার কেমন যেন, মনে হল ইনি আমাকে কিনে নিতে চাইছেন।

হরেনাম মিলে তিন দিন ধরে ইন্টারভ্যু দিলাম। টেকসটাইল ডিজাইনিং। হাউস-জার্ণালের লে-আউট—সাত পাঁচ। ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন মোদি বলে এক ভদ্রলোক। শেষ দিনে বললেন, তিনটের সময় আমার আপিসে কাজ নিয়ে দেখা করুন। তিনটের সময় ওর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলাম। উনি আমাকে দেখিয়ে দিতে এক পাশের সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়লাম। পরে জানতে পেরেছি ওর সঙ্গে ছিল ওর বস, মিস্টার ভ্যাস। মোদিকে বললাম, তিনটের সময় আসতে বলেছিলেন।

মোদি বলল, বাইরে গিয়ে বসুন।

ভ্যাস বলল, তুমি বাইরে গিয়ে বস। আমি এঁর সঙ্গে কথা বলব। মোদি চলে যেতে ভ্যাস আমার সব কথা শুনলেন। একটু চিন্তিতভাবে বললেন, আমাদের স্টুডিও যামিনী রায়দের জন্যে নয়। আপনি একদিন সময় নিন। যদি স্থির করেন চাকরি করবেন, তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আমার কিন্তু মনে হয় এটা আপনার জায়গা নয়।

ভ্যাস আমাকে স্যান্ডউইচ আর কফি খাওয়াল। লোকটা কেমন যেন জোর দিয়ে বলল আমি চাকরি নিলে ভুল করব।

চাকরি নিই নি। ইতি

মনু

এই ছটা চিঠি ছাড়া দীপকের তেমন উল্লেখযোগ্য চিঠি পাইনি। চিঠিগুলি কালানুক্রমিক হলেও মাঝখানে এত সময়ের ব্যবধান থাকার জন্যেই হয়ত কিছুটা খাপছাড়া। এ ছাড়া আমরা ওর ডায়েরী পেয়েছি। বছরের পর বছর ও নিয়মিত ডায়েরী রেখেছে, কিন্তু তেমন কাজের কিছু এর মধ্যে নেই। ও হয়ত লিখেছে : হিমাদ্রির বাড়ি গেলাম। সংপাল সিং কাট আমার একটা ছবি কিনেছে। একটা ক্যানভাসে রঙ চাপিয়েছি। ঈগলের ডানা নাম দিলে বোধহয় ভাল হয়। এই ধরনের দু-চার লাইন। এরই মধ্যে আবার কয়েক জায়গায় সে গুছিয়ে কিছু কথা লিখেছে। সেই অংশগুলো তুলে দেওয়া গেল।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬২

কলকাতার সবচেয়ে বড় অভাব আর্ট ডিলারের। ফলে শিল্পীদের নিতে হয় দোকানদারের ভূমিকা। ককটেল পার্টিতে যাও, কনসুলেটগুলো ঘোর। বিদেশীদের সঙ্গে বাতচিত বল। তাদের কাছে তোমাদের সওদা গছাও। যাদের চটালে ক্ষতি হবে, তাদের কাছে দেঁতো হাসি হাসো।

বিদেশীরা কলা শিল্পের প্রধান ক্রেতা। তারা চায় পুরোপুরি ভারতীয় চিত্রকলা। খাঁটি ভারতীয় চিত্রকলা বলতে কি বোঝায় জানি না। তন্ত্রের প্রতীক, ত্রিশূল কমণ্ডলু বাকোষ্ঠির ছকের ডিজাইন আঁকছে কেউ। ভারতীয় বলে যদি কিছু থাকে তবে সে তার মানুষ আর প্রকৃতি। বোঝা যাচ্ছে, চতুর ঠগরা বেশ ফলাও ব্যবসা জমিয়ে বসেছে।

স্থায়ী গ্যালারী বলতে যা আছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। ভাল ছবি না-দেখলে শিল্পী নিজের কাজ যাচাই করবে কেমন করে? নতুন দর্শক তৈরী হবে কি?

২রা ডিসেম্বর, ১৯৬২

আসলে আমি নানা রকম কমপ্লেকসে ভুগি। আমি যখন ছোট তখন বাবার মৃত্যু হয়। মা-র সঙ্গে কোন হৃদ্য সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং বাইরের মানুষকে আপন করে নিতে পারি না। আমার স্বভাবটা চড়া সুরে বাঁধা। আজ মনে হচ্ছে হাসিকে১০ আমার মাংসের অভিলাষ পূরণ করার জন্যে ব্যবহার করেছি। রাতের ট্রেনের জানলা দিয়ে একটা নিঃশেষ সিগারেটের টুকরোর মত ফেলে দিয়েছি। সে হয়ত আমাকে সুখী করতে পারত। আমাকে বোধহয় বুঝত।

আমার মনের ভেতরটা একটা বিকার-গ্রস্ত রোগীর মত। চারিদিকে তার খাঁচা। খাঁচার শিক ধরে গজরাচ্ছে কে যেন। আমার এই একটা রূপ আছে। টগ-বগ করে যখন আমার রকত ফোটে, তখন আমি বিনত হই। লোকে বুঝতে পারে না। ভদ্র আর বিনয়ী বলে আমার খ্যাতি। অথচ আমি হাতুড়ী মেরে মাথা ফাটাতে চাই।

তাই আমার করুণ মুখটা যারা দেখেছে তারা আমার ছবি দেখে চমকায়। দাঙ্গা, বিভীষিকা বা হত্যার দৃশ্য আঁকায় আমার উল্লাস কেন? কেন বর্শা এবং তরোয়াল হাতে লোকগুলো আমার ক্যানভাস জুড়ে থাকে? কেন আমার আঁকা মানুষগুলো যন্ত্রণায় বিকৃত? দৈত্যের মত বড়? কেন গিরগিটি, ব্যাঙ আর পেঁচা অমন বীভৎস করে আঁকি?

বড় বেশী কথা বলি। কম কথা বল, আঁকো বেশী।

---

১০ হাসি—একটি কল্পিত নাম।

২১শে জুলাই ১৯৬৫

তিন মাস আগে আমার প্রথম বার হয়। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা—দুঃস্বপ্ন। স্কটিশ চার্চ কলেজের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। দেখি কয়েকজন ফুটপাত বাসিন্দা। নোংরা কাপড় পরে জন কুড়ি মানুষ-মেয়েমানুষ। কয়েকটা ছেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে। একজন ডেনের ধারে হাগতে বসেছে। একটা বুড়ির বুকে কাপড় নেই—শুকনো স্তন, কিসমিসের মত শুকনো বোঁটা। একজন যুবতী মেয়ে বিড়ি ফুঁকছে। ইঁট পেতে হাঁড়ি চাপিয়েছে দুজন। ওপাশে ডাস্টবিন, জঞ্জাল সাফ হয় নি কয়েক দিন। চারিদিকে নোংরা, মানুষের ধ্বংসাবশেষ, অসহ্য দুর্গন্ধ। হঠাৎ মনে হল আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সূর্য বন বন করে ঘুরছে। ইট কাট সব যেন ওজন-হারিয়ে উল্কার মত ছুটছে। আর মানুষের চামড়া যেন ছেঁড়া কাপড়ের ফুটো, তার মধ্যে উঁকি মারছে কংকাল।

বাস-ট্রাম-ভিড় কিছুই আমাকে দুঃস্বপ্নের কাছ ছাড়া করতে পারল না। আমার তখন বাড়ি ফেরার তাড়া। মনে হচ্ছে কে যেন আমার ওপর ভর করেছে। তীব্র অস্বস্তি। উত্তেজনায় ঘামছি। তারপর ক্যানভাসের সামনে কুলায় তুষ-ঝাড়ার মত অন্য এক বাতাস আমাকে চালিত করল। পাক্কা সাত ঘন্টা আমি যেন যুদ্ধ করলাম। ক্লান্তিতে যখন নেতিয়ে পড়ছি তখনও কে যেন আমাকে জোর করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

ছবিটা শেষ করবার পর আমার নড়বার শকতি ছিল না। মনে হচ্ছিল আঁক-মাড়াই কলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে রস পিষে বার করে নিয়েছে।

তারপর আবার দেখলাম। ঘন ঘন। ডিসান না-দেখে ছবি আঁকার পদ্ধতি ভুলে গেলাম। স্টুডিও ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে পারি না। দূরে গিয়ে দর্শন দেখলে আমাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়।

কাল দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখলাম, মেঘটা রথ হয়ে গেল। ঘোড়া-গুলোর ঈগলের ডানা। মুখগুলো পেঁচার মত। রথের গায়ে লাল-নীল নানা পাথর—পাথর নয় চোখ। আর চাকাগুলো ঘুরলে আগুন ঠিকরাচ্ছে। বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে ভেঙে চুরমার করে রথ চলেছে।

রবিবার

বেঁচে থাকা অসহ্য। আমি আর পারছি না। আলি দৈব দর্শন দেখে হয়রান। ছবি এঁকে এঁকে ক্লান্ত। আমার পৃথক কোন অস্তিত্ব যেন নেই। আমি যেন ক্রীতদাস। আমার ক্ষুধা, ঘুম, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কোন নিয়ম নেই। সময় অসময় নেই। অন্য এক শকতি আমাকে চালাচ্ছে। সে আমাকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে।

আমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না। গাছ, ফুল, পাতা, মানুষ, পশু, পাখি—অন্যদের মত স্বাভাবিকভাবে দেখতে চাই। এটাকে কি ভূতে পাওয়া বলে?

আমাকে কে যেন ভেঙে ফেলছে। চুরমার করছে।

আমি উঠে দাঁড়াতে চাইছি।

কিন্তু কে যেন আমাকে....

১১

১৯শে জুন ১৯৬৬। মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে লেখা।

শব্দব্রহ্ম

কবিতা সিংহ

এ জন্মে শব্দ কারো কারো কাছে ব্রহ্ম হয়ে যায়। আবার কারো কারো হাতে ব্রহ্মাস্ত্র।

আমার জন্ম থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে কিছু কিছু শব্দ পাই। শব্দের মধ্যে আমরা এমনভাবে বাঁচি যেন তা বাতাসের মত স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পাওয়া শব্দের শব্দবীজ আবার পুঁতে দেন। তাই থেকে বেরোয় শব্দমূল, শব্দ-কাণ্ড, শব্দশাখা আর শব্দলতা। সেই শব্দ-বৃক্ষে শব্দফুল আর শব্দফলও ধরে বৈকি। আবার কেউ কেউ কেবলই পুরাতন শব্দ-বীজ পুঁতেই ক্ষান্ত হন না, তাঁরা শব্দ-কলমও তৈরী করেন। শব্দে শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে। কিন্তু শব্দ কি কেবল ঠোঁটের সামগ্রী? কলমের ছবি?

শব্দের জন্য কি অন্য মাধ্যম নেই? যেমন কানের জন্য এক বিশেষ শব্দ-লোক? সেই শব্দলোককে লেখার শব্দলোকের সঙ্গে মিশিয়ে দেখার একটা দিব্যি আলাদা মজা আছে। কানের মাধ্যমের জন্যও শব্দ সংগ্রহ করতে হয়। সে শব্দও সাহিত্যের শব্দের মত, কোন প্রকৃত বা বাস্তব-শব্দ নয়। এই শ্রুতিকর্মে প্রথমত বছরের পর বছর কান পাতা শিখতে হয় মনোমত শব্দ সংগ্রহের জন্য, এবং তা ঝাড়াই-বাছাই-এর জন্য। তারপর 'শব্দ-রূপের' নয় 'শব্দ-ধ্বনির' কলম তৈরী করতে হয়।

যে শিল্পী শব্দধ্বনির মাধ্যম দিয়ে মানুষের দরবারে পৌঁছতে চায়, সে শ্রোতাকে ভাবে ধৃতরাষ্ট্র কিংবা গান্ধারী। আর সে নিজে যেন সেই আশ্চর্য সঞ্জয়। যাকে পৌঁছে দিতে হবে তার শোনা শব্দের সেই অবিকল ধ্বনি। শ্রোতাদের কানে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি পৌঁছে দেবার জন্যে তার নিজের শব্দ ধরার কান ক্রমশ যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

ঠিক সাহিত্যমাধ্যমের লেখকের মতই, শ্রুতিমাধ্যমের যিনি কারুকার মরমে পশা শব্দগুলোকেই বন্দী করে নেন ম্যাগনেটিক ফিতায়। একটি আন্তরিক কবিতার মত, একটি দরদী ছোট গল্পের মত, সেই শব্দ ধ্বনির সৃজনকেও, শব্দকারুকার পৌঁছে দিতে চান তাঁর শ্রোতাদের কাছে।

কোন লেখা, পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুভূতি লেখকদের কাছে কেমন তা আজ আর পাঠকদের অজানা নয়। অনেক লেখকই সে উপলব্ধির কথা লিখে গেছেন। কিন্তু শব্দ-ধ্বনি সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা—অনুভূতির খুশি, উপলব্ধির চমক—যেহেতু শব্দ-ধ্বনি-মাধ্যমটি অব্যবহিত নতুন, এবং যেহেতু এই পথে সতত চলা-ফেরা করার মানুষজন সংখ্যায় কিঞ্চিৎ কম, সেহেতু অনেকেরই তা অজানা।

তাই আজ শব্দের রূপ নিয়ে নয়—শব্দের-ধ্বনি নিয়ে যে জগৎ—তাই নিয়ে এই সামান্য গল্প-সল্প।

বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট মেধাবী প্রবীণ লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার। আকাশবাণীতে প্রযোজিকা ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তিনি একবার লিখেছিলেন যে ঝন ঝন করে একটি বড় আলোর ঝাড় ভেঙে পড়ায় তাঁর খুব আক্ষেপ হয়েছিল। কারণ তক্ষুনি তক্ষুনি টেপ রেকর্ডার ছিল না বলে শব্দটুকু ধরে রাখতে পারলেন না। মহাশূন্যে হারিয়েই গেল না রয়েই গেল শব্দটি কে জানে?

যাদের শব্দ সংগ্রহের বাতিক কিংবা শব্দ রচনার,—তারা যে কি দুর্দান্ত পাগলামি করতে পারে তা সচক্ষে না দেখলে যেন প্রত্যয় করাও সম্ভব নয়। মাটির অনেক নীচে, কোলিয়ারীর দুর্ঘটনায় বন্দী মানুষের কুড়ি দিন পরের প্রথম ভেসে আসা কণ্ঠস্বর? আহা বেঁচে থাকার দলিল রচনায় এই স্বরের কি কোন বিকল্প আছে?

পাতার পর পাতা বর্ণনা দিয়ে গেলেও কি ধরা যায় বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা সচক্ষে দেখে সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়া দশ বছরের মেয়ে জারিনার কান্না? ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচে জয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের উল্লাস ধ্বনি? এর কোন বিকল্প শব্দরূপ দেওয়া সম্ভব কি? অথচ ধ্বনি-চিত্রে সেই উল্লাস মুহূর্তেই পৌঁছে দেওয়া যায়।

শব্দ সংগ্রহের পাগলামিতে কাজি-রাঙ্গা অরণ্যে, জলদাপাড়ায়, বীরভূম, মান-ভূম, ধলভূমের গ্রামীণ অঞ্চলে অঞ্চলে কত মধ্য রাত, কত উধাও দুপুর গিয়েছে আলো আঁধারিতে, শুকনো নদীর বালিয়াড়ী পেরিয়ে। গঙ্গাসাগর, আক্রান্ত বাংলাদেশের যশোর খুলনা কুষ্টিয়া, অজন্তা ইলোরা, রাজপুতানা, হৃষিকেশ দেবপ্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ—এবং নানান মেলা, গ্রামীণ হাট, আদিবাসী নৃত্যের আসরে আসরে যেমন ঘোরা—তেমনি এই শহর কলকাতার রেড-লাইট এরিয়া থেকে রেসের মাঠ খালাসী-টোলার মদের টেবিলের তলায় ঘুরেছে লুকানো টেপ রেকর্ডার। ভিড়ে, গোলমালে, দুর্ঘটনায়, শোভাযাত্রায়, শোকযাত্রায়, আনন্দ উল্লাসে—কাঁধের ঝোলা ব্যাগে শুধু লুকিয়ে রাখা ক্ষুদে শব্দ-ছিপ—অর্থাৎ টেপ রেকর্ডার—বড়শি গেঁথে অজস্র অভাবনীয় শব্দ জমে উঠে আসবে। সে সব শব্দের সত্যিই তুলনা নেই। সে সব শব্দ মণি-মাণিক্য।

অতর্কিতে পাওয়া সেই সব ধ্বনি, যেমন চোখ গেল পাখির কান্না, মহরমের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, মাটির বেহালার করুণ সুর, কালীঘাটের মন্দিরের গর্ভগৃহের ভক্তের সমর্পিত মা-মা ধ্বনি—ঢাকার সীমানায় যুদ্ধের গোলার বিস্ফোরণ এবং আরো যে কত কত অসম্ভব সব শব্দ উঠে এসেছে টেপ রেকর্ডারে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক নামকরা মনীষী, সাহিত্যিক ও শিল্পীর অতর্কিত কিছু কথাও দিব্যি জমে যায় শব্দ-সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে। মাথার মধ্যে বাজতে থাকে হার্ট অপারেশনের আগে বুকের স্টারনাম হাড় ফাঁড়ার, ভয়ংকর করাত কাটা আওয়াজ কিংবা হৃদয়ের কোমল লাপ-ডুপ। তবু সব কথার শেষ কথা হল শব্দ-ধ্বনির যে বিশেষ কারুকর্ম, তা ঠিক সাহিত্যের মতই মাত্রই বাস্তবানুগ নয়, দারুণভাবে সৃজনাত্মক। সাহিত্যিক যেমন রিপোর্টিং করেন না, বাস্তবকে যে অবস্থায় পেয়েছেন তেমনি হুবহু দেখান না,—সৃষ্টি করেন, গড়ে তোলেন,—শব্দ-ধ্বনির সৃষ্টিও ঠিক তেমনিভাবেই হয়। অনেক সময় বাস্তবিক শব্দকে শোনায় না বাস্তবিক। তখন বাস্তবিক করার জন্য কৃত্রিম শব্দ তৈরী করতে হয়। একটি উদাহরণ দিই।

কলকাতার এক ব্যস্ত চায়ের দোকানে টেপ-রেকর্ডার লুকিয়ে নিয়ে তোলা হল খদ্দেরের গ্যানজামের সঙ্গে মিশিয়ে লোহার ট্রেতে এক রাশ কাপ-প্লেট নিয়ে যাওয়ার থর থর শব্দ।

সেই শব্দ যখন নিয়ে কানে নেওয়া গেল, তখন দেখা গেল কোথায় কাপ-প্লেটের শব্দ? যে শব্দ উঠেছে তা অবিকল ঘন্টা বাজিয়ে যাওয়া ছুটন্ত দমকলের। তাই মোক্ষম বাস্তব ইমপ্যাক্ট আনার জন্যও অনেক সময় অন্য প্রক্রিয়ায় বাস্তবানুগ শব্দ তৈরী করতে হয়। যেমন প্রকৃত হৃদয়ের ধুকধুকের চেয়ে ইচ্ছামত ধুক ধুক বানান যায় টান করে রাখা রেক্সার বা ফেল্টের কাপড়ের ওপর লাপ-ডুপের ছন্দে আঙুলের টোকা বাজিয়ে। আবার প্রতীকী শব্দ তৈরী করার জন্য ব্যবহার করা যায় সহমর্মী শব্দকে। অঝোর ঝরণ শ্রাবণ সন্ধ্যার শব্দ-মায়া রচনায়, বৃষ্টিধারার সঙ্গে সেতার থেকে ঝরিয়ে দেওয়া যায় মেঘ-মল্লারের ঝালা, সেই সঙ্গে দু-একটি একাকী ফোঁটার জন্য জলতরঙ্গের টুং টাং, মাঝে মাঝে মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ ধ্বনির সঙ্গে মেঘ গর্জনের শব্দ—আর তখনই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে থাকে,—বৃষ্টির ছবি, জলের গন্ধ, ভেজার আনন্দ, অপেক্ষার ব্যথা, অনুভবের অশ্রুমাখা সুস্বাদু। এভাবে এ জন্মের কারো কারো কাছে শব্দ ক্রমশ ব্রহ্ম হয়ে ওঠে। এবং কারো কারো কাছে ব্রহ্মাস্ত্রও।

যাত্রার জাত গেল

প্রভাতকুমার দাস

আসন্ন মরসুমের নির্বাচিত পালাগুলির বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে বোঝা যায় চিৎপুরের পেশাদার যাত্রা দলগুলি আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। নিকট গত কয়েকটি বছরের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা শুভ যাত্রার যে বিস্তারভূমি লাভ করেছিল, মনে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই প্রসারতা এখন একটু করে গুটিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নিষ্ফল অনুপ্রেরণার সাজানো সামাজিক পালার ক্লান্তিকর একঘেয়েমি খুব দ্রুত না কাটিয়ে উঠতে পারলে, যাত্রাশিল্পকে পিছিয়ে পড়তে হবে আবার।

পরস্পর প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। সম্ভবত এই জন্যেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের দলকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার লক্ষেই নিত্য নতুন চমকের ঘোষণা দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে। চলচ্চিত্রের বা মঞ্চের গ্লামার অভিনেতা, এমন কি কলকাতা কাঁপানো ক্যাবারে নৃত্যের সংযোজন ছাড়াও, উট, ঘোড়া, থেকে সুরু করে 'সম্পূর্ণ রঙিন' কিংবা যাত্রার আসরে একই সঙ্গে পুতুল নাচ ও ইন্দ্রজাল দেখানোর প্রতিশ্রুতিতে ক্রমাগত চমকের তালিকা বাড়ছে। কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ করার মত, শুধু মাত্র বিজ্ঞাপন বা হৈ-চৈ দিয়ে আধুনিক যাত্রাগানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হলেও যাত্রা গানের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণ দর্শকদের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান করে নিজেদের ভুল পথটি সংশোধন করে নেবার সময় এসেছে আজ।

অর্ধশতাব্দীর কিছু পূর্বে, পৌরাণিক পালার নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন স্বল্পায়ু ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। তিনি তাঁর সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় পালাকার ছিলেন। সামাজিক মানুষ হিসেবে পালা রচনাকে তিনি একটি মহান দায়িত্ব বলেই গ্রহণ করেছিলেন। 'ভাষার ঝঙ্কারে মুখরিত করবার জন্য নয়,' ভাবের সমৃদ্ধিতে নাট্যজগতের কোন অভাব মোচনে নয়, প্রশংসাপত্রের প্রতীক্ষার নয়, আমি জাহ্নবী প্রকাশ করিলাম—শুধু আর্য সন্তান-গণকে জাগাইবার জন্য।' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য পালার ভূমিকায় এই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছিলেন কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়। চিত্ত-বিনোদনের ভেতর দিয়ে পুরান প্রচার করে গ্রামজীবনে জাগরণের গান নিয়ে তাঁরা হাজির হতেন।

যুগেরই প্রয়োজনে, দর্শকরুচির ভারতম্যে, পরবর্তীকালে পালা গানের ভিতর থেকে অনেক পুরাতন বৈশিষ্ট্য সরিয়ে দেওয়া হলেও, পুরাণই ছিল সেই সব রচনার ভিত। ভোলানাথ বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু বক্তৃতা আর গান দিয়ে মানুষের মনের ভিতরে সাড়া জাগানো সম্ভব নয়। চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমেই অনেক গভীর তত্ত্বকথা প্রচার করতে হবে। অথচ গল্পটিকে এমনভাবে সাজাতে হবে, তত্ত্বপ্রচারটাই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে। কেননা দেবতার নাম গানের সঙ্গে মাটির রঙ মিশিয়ে তাকে আরও সহজ ও সাধারণ করে তুলতে হবে। এমন কি পরবর্তীকালে ইতিহাস ও পুরাণ দুধরণের বিষয় নিয়ে লেখা পালাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পালাকাররা শক্তিশালী গল্পের উপরই নির্ভর করতেন বেশী।

পুরাণ ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও এক সময় দর্শকদের

ক্রান্ত করে তুলল। ঠিক সেই সময় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রনাথ কাল্পনিক পালার প্রবর্তন করলেন। পুরাণ ও ইতিহাসকে সামনে রেখেই, স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর প্রচার ছিল এই ধরণের পালার বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় ব্রজেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত ছিল বলেই, তিনি এই পথে ময়মনসিংহ গীতিকার অনেক প্রধান ও জনপ্রিয় কাহিনীকে যাত্রার পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। আর দর্শক সাধারণ এই সব কাহিনীর ভেতরে নিজেদের সামাজিক জীবনকে আরও গভীরভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, পুরাণ আর ইতিহাসের কথা কিছু দিন ভুলে থাকতে পেরেছিলেন।

কিন্তু গত দশ বছরে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যাত্রাগান। দীর্ঘদিন ধরে কলিয়ারীর শ্রমিক, চা বাগানের মালিক, যাঁরা নিছকই প্রমোদের অভিপ্রায়ে যাত্রার আসর বসান, লোকশিক্ষা প্রচারের অভিপ্রায়কে সরিয়ে দলকর্তারা প্রধানত সেই সব দর্শকদের মনোরঞ্জনের আশায় পালা গাইতে সুরু করলেন। কিন্তু দর্শক-রুচির বিবর্তন হল, গ্রাম আর শহরের শিক্ষাভিমানীরাও নতুনের স্বাদ পেলেন দীর্ঘদিন অবহেলিত যাত্রার আসরে বসে।

কাল্পনিক কাহিনীর সূত্র ধরেই সামাজিক পালার প্রবেশ ঘটল যাত্রার আসরে। এ ক্ষেত্রে দর্শকরা অভিনন্দন জানালেন, সুখ-দুঃখ আনন্দবিষাদময় একেবারে ঘরের কথাই স্থান পেল ঐ সব পালায়। সত্যপ্রকাশ দত্ত নির্মল মুখোপাধ্যায় আর ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে এই সামাজিক পালা রীতিমত বাণিজ্যিক সাফল্যের চূড়ান্ত পথ প্রস্তুত করল। সামাজিক পালার পাশাপাশি জীবনী-মূলক পালারও একটি বাজার গড়ে উঠল। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক চমক নয়, পুরাণের মহাত্ম প্রচারের মতই মহামানবের জীবনের ভেতর দিয়েই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা দিল যাত্রাগানে। জীবনী-মূলক পালার অক্লান্ত রূপকার শান্তিগোপাল যখন শম্ভু বাগ রচিত 'হিটলার' প্রচার করলেন, বিশ্ব রাজনীতির একটি ভয়াবহ অধ্যায় স্থান পেল পালায়। একই বছরে, জনপ্রিয় অভিনেতা স্বপন-কুমার 'মাইকেল মধুসূদন' পালাটি পরিবেশন করে ততোধিক জন-প্রিয় হলেন এই জন্যে যে, অভিনয় নৈপুণ্যে মহাকবির দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের শরীক করে নিলেন দর্শকদের। কিছুদিন পূর্বে, 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালায় পরিচালক পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষামূলকভাবে আলো ব্যবহার করেছিলেন। সার নাম দেওয়া হয়েছিল যাত্রাস্কোপ। যাত্রার দর্শক আর আসরকে মিলিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি দু-একটি দৃশ্যে অভিনেতাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দর্শকদের আসনে।

ততদিনে যাত্রায় একটি নতুন জিনিস চালু হয়ে গিয়েছে—পুরুষ রাণীদের পরিবর্তে আসল মেয়েদের দিয়েই স্ত্রী ভূমিকাগুলি অভিনয় করানো। পুরাতন পুরুষরাণীদের অভিনয় এতদিন যে জনপ্রিয় ছিল শুধু তাই নয়, তাঁদের কণ্ঠের জোর এমন একটা গ্রামে বাঁধা থাকত, পরবর্তীকালে মহিলাশিল্পীদের অনেককেই সেই জনপ্রিয়তা ও কণ্ঠের জন্য রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছে। স্বপনবাবু মাইকেলে ব্যবহার করলেন মাইক্রোফোন। পরি-চালক অমর ঘোষ 'হিটলার' পালায় আলো-মাইক-টেপরেকর্ডার ব্যবহার করে আঙ্গিক ও প্রয়োগ ভাবনার সঙ্গে যাত্রাকে যুক্ত করে ছিলেন। সম্ভবতঃ এক বছর পরে নিউ প্রভাস অপেরার 'পাগল

ঠাকুর', ভক্তিরসাত্মক জীবনীমূলক পালা হিসেবে যে সাফল্য এনেছিল, বলা যেতে পারে তার মূলেও ঐ পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ভাবনা।

জীবনীমূলক পালায় চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা একটা সমস্যার ব্যাপার। অন্য দিকে প্রয়োগ ও পোষাকের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় বলে প্রায় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পালা একটা ঝুঁকি হয়ে উঠল। যেজন্য সামাজিক পালার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পিছিয়ে পড়তে হল তাকে।

দেখা গেছে, কোন বিশেষ একটি দলের সাফল্য, আর পাঁচটা দলকেও একই কেন্দ্রবিন্দুতে আকর্ষণ করে। যার ফলে পালা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, অনেকটা জনতাগ্রহের উপর নির্ভর করে অপরাপর দলগুলিকে প্রস্তুত হতে হয়। মাঝে আঙ্গিক বা প্রকরণের এমন একটা হিড়িক এসেছিল যে আলো-মাইক-টেপরেকর্ডার ছাড়া দল বারনাই হত না। এই তিনটি উপকরণের অনুপস্থিতিকে দর্শকরা নিম্নমানের প্রয়োজন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে, অপ্রয়োজন ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলো-মাইক-টেপ ব্যবহার করতে গিয়ে ঐতিহ্যের সুতায় টান পড়ল।

চিৎপুরে যখন এই অবস্থা, তখন একজন নতুন কর্ণধার মোহন চট্টোপাধ্যায়, কয়েক বছর পূর্বে পৌরানিক পালায় সাফল্য আনলেন অন্যভাবে। পুরাতন কয়েকটি পালাকেই তিনি নির্বাচন করে, নতুনভাবে সম্পাদনা করালেন নটনাট্যকার আনন্দময়কে দিয়ে। তাতে পুরাতন অনেক কিছুকেই যেমন বাদ দিতে হয়েছিল, তেমন যুক্ত হয়েছিল এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, যাগাগানের আধুনিকতায় যা মানিয়ে যায়। একেবারে সাদামাঠা গদ্য সংলাপ, আলো বা টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে কোন বাহুল্য প্রচেষ্টা নেই, শুধু অভিনয় দিয়েই পালাগুলিকে আগাগোড়া বেঁধে রাখা। আর অবশ্যই গানগুলি ছিল সে সব পালার একটা অকর্ষণ। যেজন্য 'হরপার্বতী' কিংবা 'সীতার বনবাস' বাণিজ্যিক দিক থেকে অনেক সাফল্য এনেছিল।

তবে পৌরানিক পালার এই গদ্য সংলাপ নিয়ে সনাতন-পন্থীদের কয়েকজন আপত্তি করেন। বছর কয়েক পূর্বে অতুল ভট্টাচার্য যখন 'সম্রাট অন্ধকাসুর' পালাটি নির্বাচন করেছিলেন, রিহার্সাল চলাকালীন পরিচালক এবং নামভূমিকার অভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায়কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর পালার সংলাপ নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, সুরে টানা, কিছুটা গমক প্রধান, সেই সব সংলাপ ক্ষেপনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখালেন, ভাষা ও ছন্দ পৌরানিক চরিত্রকে অনেক জীবন্ত করে তোলে। আর, এই তো সেদিন প্রবীন অভিনেতা, অমিয় বসু উল্লেখ করলেন, ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে রূপসজ্জা ও পোষাকের ব্যবহারটিও জরুরী। কোন বিশেষ চরিত্রের মহিমা কিংবা ভর—দুটোই রূপসজ্জা ও পোষাকের তারতম্যে বিঘ্নিত হতে পারে। তাঁরই সহকর্মী বিমল লাহিড়ী কথা প্রসঙ্গে একটি গল্পও বললেন : জনৈক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী একবার কংস সেজেছিলেন। চরিত্রটিকে আধুনিক করবার জন্য কোঁচানো ধুতি, কাজকরা পাঞ্জাবী, সাধারণ রূপসজ্জা নিয়ে যখন আসরে ঢুকলেন, তখন দর্শকরা 'বালিগঞ্জের কংস চাই না' বলে চিৎকার করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে।

আসলে ততদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, যতদিন ভেতর থেকেই অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই উঠে আসছিল সেই সব পরিবর্তন। যাত্রাজীবনেরই সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত পালাকার-অভিনেতা বা পরিচালক, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করতে পারতেন—দর্শকরা কি চায়। কোন উপায়ে পূরণ করা যেতে পারে সেই গণদর্শকের আকাঙ্খা। তাঁরা সেইভাবেই প্রস্তুত করতেন নিজেদের। কিন্তু পরবর্তী আধুনিক পর্বে, নিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়িত্বটাই গিয়ে পড়ল তাঁদের উপর, যাঁরা প্রধানত মঞ্চ কর্মী। মনে হয়, যাত্রার ঐতিহ্য নয়, মঞ্চ নাটকের অভিনবত্বই তাঁরা আরোপিত করতে চাইলেন। এমন কি দৃশ্যসজ্জা যাত্রা গানের ক্ষেত্রে যা বাহুল্য মাত্র—তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার দেখা দিল পালায়। বলা বাহুল্য, পরীক্ষামূলকভাবে মঞ্চ নাটকে যখন দৃশ্যসজ্জার দিকটি উপেক্ষা করা হচ্ছে, আধুনিকতার অজুহাতে যাত্রায় তা প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল। প্রকরণ বা আঙ্গিকের দিকে ঝোঁক দিতে গিয়ে, অভিনেতাদের ভেতরের জোর কমতে সুরু করল। অথবা প্রবীণ পালাকার নন্দ-গোপাল রায়চৌধুরীর মতামতও ভেবে দেখা যেতে পারে, 'পুরাতন রীতির শক্তিমান অভিনেতাদের অবলুপ্তির পথেই যাত্রা গানে প্রবেশ করল আঙ্গিক আর প্রয়োগ চর্চার প্রাচুর্য।' যেজন্য পুরাতন আর নবীনের সন্ধিস্থলে সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে অভিনেতা, সেই পূর্ণেন্দুশেখর যখন বলেন, 'আজকের যাত্রাভিনেতা, পরিচালক অধীন পালা নাটকের কারাগারে বন্দী, কথাটা অত্যন্ত উপযুক্ত মনে হয়। তাঁর ধারণা এই যান্ত্রিক রীতিতে অভিনয় করতে করতে একজন অভিনেতার নিজস্বতা ধরা পড়ে না। কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে নিজস্বতা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এমন কি এই এক যুগ আগেও একই আসরে সিরাজদ্দৌলা পালায় অভিনয় করে ছোট ফণিবাবু এবং পূর্ণেন্দুবাবু অভিনয়ের দিক থেকে দুটি পৃথক রীতিতে চিহ্নিত হয়ে ছিলেন। যেমন বাঙালী পালায় বড় ফণিবাবু এবং পঞ্চু সেন দাবুদ খাঁর অভিনয়ে, স্বাতন্ত্র্যের জন্যই অর্জন করে-ছিলেন সমান জনপ্রিয়তা।

আসলে চমক প্রবেশ করেছিল, অন্য কয়েকটি দুর্বলতা ঢাকতে। পূর্বে যেমন পালার গানগুলি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হত—কথা, সুর আর গায়কের নিজস্ব গায়ন পদ্ধতির সমন্বয়ে। এখনো যে প্রাচীন দিনের অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতা বিজয়কৃষ্ণ মিত্র কিংবা বটকৃষ্ণ দত্তগুপ্ত তাঁদের অভিনয় জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটা সাত ঘন্টার পালার হুবহু মুখস্থ বলে যান অবলীলা-ক্রমে, তা আর কিছু নেয়,—ঐ সব, সুরের নিবিড় আত্মীয়তা। বিনোদ ধাড়া এবং তিনকড়ি ভট্টাচার্যের মত প্রতিভাবান বিবেক গায়কেরা, তাঁদের নিজেদের সময়ে অভিনয় এবং গানকে মিলিয়ে দিয়ে নতুন যুগের একটা বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁদেরই উত্তরসাধক গুরুদাস ধাড়া যে বর্তমানকালের অন্যতম গায়ক এবং নায়ক অভিনেতা, তাঁর কারণ, পূর্বসূরিদের অনুসরণকে তিনি যুগপোযুক্ত করে তুলেছেন নিজের স্বাতন্ত্র্যে। এমন কি ক্ষিতীশ রায়ের মত উদাত্তকণ্ঠ গায়কের চাহিদা এখনো এই আধুনিক যুগেও যে সমাদৃত হয়, তার কারণ তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলে-ছিলেন পূর্ব যুগের দীক্ষায়।

কিন্তু কি ছিল সেই গানে, যে গান একনাগাড়ে, একজনের কিংবা কোরাসের কণ্ঠে একঘন্টা ধরে বসে বসে শুনতে দর্শকরা কোন রকম ক্লান্তি বোধ করত না। একটা পালায়, কম করে হলেও গোটা তিরিশেক গান থাকত পুরুষ আর নারী চরিত্রের কণ্ঠে। সাম্প্রতিক-কালে সেই গানের পরিমাণ একেবারেই কমে যাচ্ছিল, সংক্ষিপ্ত সময়ের অজুহাতে। এ অজুহাত অসঙ্গত মনে করা উচিত না, কিন্তু গান ছাড়া যে দর্শকদের মন সন্তুষ্ট হওয়ার নয়, তা কয়েক বছরের ভেতরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, জ্যোৎস্না দত্ত, বীণা দাশগুপ্তা, তারারাণী পাল, সাহানা বসু প্রভৃতি শিল্পীরা গানের জন্যই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এখন যে গান ছাড়া যাত্রার কথা ভাবা মুশকিল তাই নয়, নাচের দিকেও একটা বিশেষ চাহিদা গড়ে উঠছে। হয়তো এই নতুন চাহিদার ভেতরেই লক্ষ করা যাচ্ছে পুরাতন গীতাভিনয়ের বিবর্তন। সাম্প্রতিককালে একদিন রাত্রে,

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

মতি রায়

অঘোর কাব্যতীর্থ

লায়লা মজনু বা হাসির আড়ালে—নতুন রীতির পালাগুলিতে যে পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, তা অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এই জন্যে যে নাচগান, অভিনয়কে তিনি এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দর্শকরা চান বলেই যে কারণে অকারণে নাচগানের হুল্লোড় বইয়ে দিতে হবে তা নয়। দর্শকরা চান আনন্দ। সেই প্রার্থিত আনন্দকে, শিল্পের উপকরণে উপহার দিতে হবে পরিবেশকদের। বিশেষ কোন বক্তব্য, প্রচারের উদ্দেশ্য থাকতে পারে কোন কোন পালায়, কিন্তু দেখা দরকার প্রয়োগের চমক যেন ভারী করে না তোলে পালাভিনয়ের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যকে।

সামাজিক পালাগুলি যে একঘেঁয়ে হয়ে উঠছিল, তার একটাই কারণ, পালাকাররা গল্পকে বাঁধতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রের অনুকরণে নিজোদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। না গ্রাম, না শহর—পালাগানের বিষয় হিসেবে তাঁরা যে সমাজকে আশ্রয় করেছিলেন তা যেন একটা জগাখিচুড়ি হয়ে যাচ্ছিল। যেজন্য নাট্যরস নির্মাণের চেয়ে, সস্তা সেন্টিমেন্ট বা অকারণ করুণ রসাত্মক করতে গিয়ে পালার চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে দুর্বল। পালাকারদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সীমিত হওয়ার জন্য, একটিই বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে কাহিনীগুলি ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিতে পরিণত হতে বাধ্য। কয়েক বছর পূর্বে কোন কোন পালাকার এই ক্লান্তি দূর করার প্রচেষ্টা করেছিলেন ঝুমুর, কবি, গান, বাউল, তর্জা প্রভৃতি লোককলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ পালার বিষয়ের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, ঐ সব গান কোন কোন গায়কের কণ্ঠে জমলেও, পালার গতিকে শিথিল করে দিয়েছিল।

কাহিনী নির্বাচনের এই সমস্যা থেকেই হয়ত যাত্রায় সেক্সপীয়র কিংবা হোমারের আবির্ভাব। জোরালো গল্প, জমজমাট পোষাক, প্রয়োগের এলাহি ব্যাপার, সব মিলিয়ে একটা বাণিজ্যিক চমক আছে এই ধরণের নির্বাচনে। তাছাড়া এখনকার ব্যবসার যা বাজার, চিৎপুর থেকে নৈমিত্তিক চমকের ব্যাপারটি সরিয়ে দেওয়াও মুস্কিল। তরুণতম প্রযোজক পাহাড়ী ভট্টাচার্য এই কথাটাই সেদিন সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, 'নিছকই ব্যবসার দিকটি এড়িয়ে আজকাল চিৎপুরে শিল্পসৃষ্টি করা অসম্ভব। আর প্রতিযোগিতায় নতুন বাজারে ব্যবসাকে লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হলে চাই চমক, চাই গ্লামার।'

কিন্তু এই চমকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে যাত্রাকে। করতে হবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে। বলিষ্ঠ পালা, শক্তিমান অভিনেতা, সর্বজ্ঞ পরিচালক আর যাত্রাপ্রেমিক দলকর্তা—হয়তো সেই জন্যেই নিছক বিনোদন থেকে লোকশিক্ষার দিকে, বাণিজ্য থেকে বন্দনার দিকে ফিরে তাকানোর সময় এসেছে এবার। যাত্রাগানের নিজস্ব ধারাতেই যাত্রাগানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। বাইরের থেকে কোন চমক নয়, ভেতরের আধুনিকতাতেই জাগিয়ে তুলতে হবে যাত্রাগানের নতুন মহিমা।

ভুল প্রশংসা

বরিসালের ভোলা শহরে একটা সখের দল ছিল। উকিল মোক্তাররা অভিনয় করতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের দলে সুরেশ দত্ত মহাশয়ের ছোট্ট মেয়েটির ডাক পড়ত। নামকরা সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র নন্দী। তার কাছেই গান শিখত মেয়েটি।

হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে গেল। পাঁচ-ছ বছর বয়স, মা আর দু-দাদার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসতে হল। শালিমারে থাকতেন যোগেশ নট্ট। তিনি তাঁর বাসায় সবাইকে নিয়ে যান। মিলিটারীতে কাজ করতেন বড়দা, সে সময় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ট্রেনিং-এ ছিলেন। খবর পেয়ে সকলকে যাদবপুরে নিয়ে যান।

খুব কষ্টের সংসার। কোন রকমে সকলের প্রানপাত শ্রমে জীবন যাপন করতে হয়। পড়াশুনার ইচ্ছে থাকলেও, চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। নাচ-গানটা ভেতরে থেকে গিয়েছিল। যাদবপুরের ঠিকে দল, 'মুরতকেশী অপেরায়' করেকদিন নাচিয়ে হয়ে যাওয়ার সুযোগ হল। একটা আসরে বাঁশী বাজাতে এসেছিলেন যোগেশবাবুর আত্মীয় রামকৃষ্ণ নন্দী। তিনিই চণ্ডী অপেরায় আনেন মেয়েটিকে। সখীর দলের নাচিয়ে করে।

কলকাতার পেশাদার দল। নতুন জীবন শুরু হল মেয়েটির। তখন একটা দল মানে সব মিলিয়ে সওয়া-আশিজন। দলে বাচ্চা ছেলেদের নাচগান শেখানোর জন্য মাষ্টার মশাই থাকতেন। তখনকার দিনের নামকরা মাষ্টার হরিলাল বন্দোপাধ্যায়ের হাতে পড়ে মেয়েটির সম্ভবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বড় অভিনেতাদের চাহিদা অনুযায়ী, মাষ্টার মশাই ছেলেদের প্রস্তুত করে দিতেন। ভাল একানে ছেলে হতে পারলে, অধিকারী মশাই তার জন্য একটু আলাদা ব্যবস্থা করেন। মেয়েটির বড় ইচ্ছে সে একানে হয়।

একানে হয়ে ইতিমধ্যে পাঁচ-ছটি দলও তার ঘোরা হয়ে গেছে। যাত্রাদলে তখন পুরুষরাই মেয়ে সাজতেন। তাদের এক একজনের দাপট কি তখন। একটা সময় এলো যখন মেয়েটিকে দিয়ে

আর এখানে করানো যায় না। অথচ যাত্রায় স্ত্রী ভূমিকার জন্য যে মেয়েটিকে সাজানো হবে, সে সাহসও নেই অধিকারীদের. মেয়েটি তার নিজের গুনেই দলশুদ্ধ সকলের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ের দিকে ঝোঁক কি, শুনে শুনে পালাগুলো আগাগোড়া মুখস্থ।

শিয়াখালার বাড়িতে গান হবে সত্যসুন্দর অপেরার, বন্দীর ছেলে পালা। পুরুষ নায়িকা নন্দরানীকে পাওয়া যাচ্ছেনা। খুব মজা হল মেয়েটির। সাহস করে শেফালির ভূমিকায় অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিল, প্রথম রাতেই প্রাইজ। অকস্মাৎ সম্ভাবনার আর একটা দরজা খুলে গেল। পরের বছর 'ছিন্নশীর' পালায় নতুন পার্ট পেল মেয়েটি, কাঁকনবাঈ। কিন্তু মেয়েটি তার স্বনামে পরিচিতা হল আরও পরে। 'সোনাই দীঘি' পালায় সোনাই করে, সতের বছরের মেয়েটি সকলের মন কেড়ে নিল। নতুন যুগের সূচনা লগ্নের সঙ্গে যুক্ত হল একটি প্রতিভা। যাত্রার দর্শকরা উপহার পেলেন, একটি নতুন চরিত্র সোনাই, একজন নতুন নায়িকা জ্যোৎস্না দত্ত।

আগে এক-এক আসরে সাধারণত সাত আট দিন গান হত। উনিশ দিন পর্যন্ত একই জায়গায় গান করেছি। একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিল তখন। দলে পাঁচ-ছজন করে বড় অভিনেতা থাকতেন। এখন তো ভাবাই যায় না। শিল্পীদের উদার মনোভাবের অভাবে সব নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকাল একজন টপ ,, আর কাউকেই সহ্য করতে পারেন না। যদি বশ্ ভাগ হয়ে যায়। কত কষ্ট করে শেখাতেন সেই সব বড় অভিনেতারা। যাঁরা শিখতেন তাঁদের নিষ্ঠাও কম ছিল না। এক পক্ষের ভয়, অন্যপক্ষের স্নেহ, দুটো মিলিয়ে অভিনেতা গড়ে উঠত।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল বৈকি। কোন কোন বড় অভিনেতা নিজেদের সম্মানের দিকটাই বেশী দেখতেন। সাজঘরে বা খাওয়ার ঘরে শুধু নয়, আসরে পর্যন্ত। যেহেতু তিনি একজন বড় অভিনেতা, তার সহ অভিনেতারা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন সেটা বড় কথা নয়—অভিনয় চলাকালেও যাত্রা হিসেবে তাঁকে সম্মান দিতে হত। এখন বাইরের পরিচালকরা নির্দেশ দেন বলে, এ ক্ষেত্রে বড় হোক ছোট হোক অভিনেতাদের কিছু করার থাকে না। নির্দেশ মাফিক কাজ করতে হয়। পরিচালনার বাইরে কিছু করার নেই। এতে ক্ষতিও হয়। গত বছর একটি চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায় প্রতি দৃশ্যেই উপস্থিত থাকতে হত। দর্শকরা একই চরিত্র বারবার দেখে নিশ্চয় ক্লান্ত হতেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী দৃশ্যের কোন বিশেষ অভিব্যক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়া যাবে তার উপায় নেই। যন্ত্রের মত অভিনয় করে যেতে হল।

দল থেকে অভিনেতা তৈরী এখন সম্ভব কি তাহলে তো আবার সেই ব্যালে গ্রুপ তৈরী করা দরকার। একবার এ-ব্যাপারে আলোচনাও হয়েছিল আমার বন্ধু-প্রযোজক দীনেশ নন্দীর সঙ্গে। হাসতে হাসতে বললেও, সে প্রায় ঠিকই বলেছিল, অতগুলো ছেলেকে বাসে বসতে জায়গা দেব কোথায়। যাতায়াত একটা সমস্যা না। কিন্তু ঐ ব্যালে গ্রুপ থেকে, দু-একজন অভিনেতা, ভাল নাচিয়ে, গায়ক-গায়িকা নিশ্চয় তৈরী হতে পারত। অন্ততঃ প্রত্যেক দলে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক রাখা দরকার, যিনি নতুন গায়ক-গায়িকাদের নিয়মিত তালিম দেবেন।

আজকাল সব জায়গাতেই 'যাত্রা উৎসব' হচ্ছে। প্রত্যেকটা দল একদিন করে নেওয়া হয়। পালার নাম আর পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে নামেকরা যাননা নেন। এক রাত্রির বেশী গান হয় না। ভেবে দেখুন, সব পালায় সকলের তো পার্ট সমান থাকে না, ফলে যাঁদের পার্ট অপেক্ষাকৃত ছোট, কিংবা কমজোরি—তাঁরা শক্তিমান অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার মধ্যে আসতে পারলেন না।

ভাল পালাকারের অভাব যাত্রাশিল্পের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা। গল্প আর চরিত্র সৃষ্টির মৌলিক ক্ষমতা নেই বলেই সামাজিক পালা এত জনপ্রিয় হয়েও কিরকম ধপ্ করে পড়ে যাচ্ছে। অভিনয়তো আর অমনিতে দাঁড়াতে পারে না। পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক পালার চাহিদা দেখা দিচ্ছে অনেকটা এই কারণে বলা যেতে পারে। সব জিনিসটাই তো একটা চাকার মত ঘুরছে। সুতরাং পুরাণের দিকে কিংবা ইতিহাসের দিকে দর্শকের মন ঘুরবে, বিচিত্র কি।

আলো কিংবা মাইক—এখনকার যাত্রাগানে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে সত্যি। আমার এই ছোট্ট চোখ দুটি, এর অভিব্যক্তি কি দেখতে পাবেন একেবারে পেছনের সারিতে বসে থাকা দর্শক। আলো সেক্ষেত্রে সাহায্য করে বৈকি! এমন কিছু কিছু সংলাপ আছে, খুব চেঁচিয়ে বললে মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় অথচ সব দর্শকেরই তো শোনা উচিত—মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। তবে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগের অপব্যবহারে যাত্রার পতন ত্বরান্বিত করছে। বিশেষ করে আলোর পরিচালকের সতর্ক এবং সুপরিণত নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ থাকা দরকার।

সমালোচনা? দর্শকরাই চিরকাল বড় সমালোচক। এক জায়গায় পাঁচ-সাত রাত গান হত। একদিন গান খারাপ করলে পরের দিনে অভিনেতারা বেরুতে পারতেন না। এখন তো সে-সবের বালাই নেই। তাছাড়া বর্তমান খবরের কাগজের সমালোচনা ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব যে লাভজনক হয়, তাও নয়। দেখুন না পাতা খুললেই ভূয়সী প্রশংসা। খারাপ বলে কিছু নেই। দর্শকরা যে এ সমালোচনায় বিশ্বাস করেন, তাও বোধহয় নয়। আজকাল কাগজের সঙ্গে দলমালিকদের ব্যবসায়িক আপোসের ব্যাপারটা বেশীর ভাগ দর্শকই আঁচ করে নেন। এক্ষেত্রে তারেদারি নয়, আসল এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রবর্তন হওয়া দরকার। সঠিক সমালোচনার বদলে ভুল প্রশংসা যাত্রার ক্ষতি করছে।

পুরস্কার তো জীবনে অনেক পেলাম। পুরস্কার পেতে কার না ভাল লাগে? এমন পুরস্কার কি পেয়েছি, যা অর্জন করবার জন্য অনেক-অনেক ক্ষমতা বা যোগ্যতা দেখাতে হয়েছে আমাকে? যদি সেরকম কোন পুরস্কার আমার জন্য নির্ধারিত হয়, তবে হয়ত বেশ কিছুকাল তৃপ্ত থাকতে পারব। আর দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, তাঁদের ভালবাসা, আনন্দ—এর চেয়ে সত্যি কি বড় পুরস্কার কিছু আছে?

এই তো সেদিন, কান্দুয়াতে বিনোদিনী পালা সবে শেষ হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যেই প্যাণ্ডেল শূন্য করে সবাই চলে গেছে। পর্দার আড়ালে মেক্আপ তুলছি আমি। সাজঘরে কমিটির কয়েকজন লোক নিজেদের হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'এই ভাই কি করছ, সরে যাও না, মেয়েদের সাজঘর' —বারবার কাউকে যেন সাবধান করে দেওয়া হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে হাতমুখ ধোবার জন্য বেরিয়ে দেখি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর। ছেঁড়া পা-জামা মলিন সার্ট গায়ে। চোখাচোখি হতেই একটু লাজুক ম্লান হাসল। তারপর আমার পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমি তো অবাক। ছেলেটি বলল, 'আমার বাবা নামকরা কীর্তন গাইয়ে। তাঁর কাছেই গান শিখেছি আমি। আমরা

জাত বোষ্টম। আজ আপনার গান শুনে মনে হল কিছুই শিখতে পারিনি। কিন্তু আপনার তো এ গানে অধিকার নেই। আপনি কি করে গাইলেন? পকেট থেকে একটাকার একটা নোট বের করে আমার হাতে তুলে দিল ছেলেটি। পুরস্কার! নোটটাতে নিজের নাম লিখে ফেরত দিয়ে দিলাম ছেলেটিকে, 'তোমার কাছেই স্মৃতি হয়ে থাক ভাই।'

জাত? জাত তো আর বিধবার মেটে কলসী নয়, ছুঁলেই যাবে। আধুনিকতার নামে বাড়াবাড়ি আমি যেমন প্রতিবাদ করি, তেমন যাত্রা যদি শিল্পের প্রয়োজনে আধুনিক হয়ে ওঠে তাতে আমি আপত্তি দেখি না। একটা মেয়েকে লালপাড় শাড়ী পরলে ভাল লাগে, কাউকে আবার বেনারসী না পরলে মানায় না। সেক্ষেত্রে পোষাকটা আসল নয়, কেমন মানিয়েছে সেটা।

শিবু গোস্বামী লেনের একতলার ঘরটি, হঠাৎ একদল শিশুর কোলাহলে ভরে যায়। বাইরের ঘরে পাড়ার শিশুবন্ধুদের জন্য বসেছিলেন গুরুদাস ধাড়া। সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় গায়ক অভিনেতা। মেঝেতে অবলীলাক্রমে ক্যারমের আসর পাতা হয়ে যায়।

ওইসব শিশু, কোলাহল, হৈ-হট্টগোল—অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন জ্যোৎস্না। দেয়াল ভর্তি বাঁধানো অভিজ্ঞান, প্রশস্তি,—বিভিন্ন চরিত্রের রূপসজ্জা—সাজানো পুরস্কারের সামগ্রী। মুহূর্তে মনে হয়, এখানে তাঁকে মানায় না।

ছোট ছেলেমেয়েদের আমার ভীষণ ভাল লাগে। আগে যখন একই জায়গায় দিনের পর দিন গান হতো, তখন সহজে ছাড়ত না কেউ। চলে যাওয়ার সময় রীতিমত কান্নাকাটির রোল পড়ে যেত।

একটু থেমে, কতকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার মত বলে চললেন, শিশুর সাবলা একটা বিরাট আশ্রয়। বাইরের থেকে মনে হয় এত সম্মান প্রতিপত্তি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি আরও অসহায় ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আমার আশি বছরের বৃদ্ধা মা, তাঁর সেবা-যত্ন, আমার এক প্রবাসী দাদার মেয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব আমিই নিয়েছি, তাছাড়া সংসারের কত খুঁটিনাটি আছে। ম্লান হাসলেন জ্যোৎস্না। অভিনেতৃদের একটা স্বপ্নের জগত আছে; সেখানে বাস্তব প্রবেশ করলে সব নষ্ট হয়ে যায়। এই দুঃসময়ের ভারে, দেখছেন না দিন দিন আমি কেমন অকালে বয়স্কা হয়ে উঠছি।

কৌটা থেকে একখিলি পান মুখে দিয়ে, বাইরের ঘরে চলে গেলেন তিনি। আর মুহূর্তের মধ্যেই একদল ছেলের হৈ-চৈ একাকার হয়ে গেল, মধ্যবয়স্ক দুই শিশুর যোগদানে।

যাত্রার দর্শক এখন আধুনিক

আর্য অপেরার অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক, তাঁর দলের অভিনেতা পরিচালক পঞ্চু সেনকে নিয়ে ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে গিয়েছিলেন 'শেষ রক্ষা' নাটক দেখতে। কারো কাছে হয়ত শুনে থাকবেন, সনৎ মুখার্জি নামে একজন ছাত্র অভিনেতা, গদাই চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছেলেটির অভিনয় দেখে খুব পছন্দ হয় দুজনের। ঠিকানা নিয়ে একদিন বাড়ীতে গিয়ে হাজির। অভিপ্রায় সনৎকে তাঁদের দলে চাই। মা করুণাময়ী বেঁকে বসলেন। সনৎকে শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলে পাঠাবেন? তা হয় না।

এদিকে সংসারের খুব করুণ অবস্থা। বাবা অবনীভূষণ কিছুদিন হল গত হয়েছেন। উপরের দু-দাদা প্রভাতকুমার আর বিজনকুমার দুজনেই অভিনয় পাগল। মা বোধহয় অভিনেতা জীবনের স্খলন পতনের সম্ভাবনায় আশংকিত হয়ে উঠেছিলেন। ইচ্ছে, ছোটছেলে সিটি কমার্সের ছাত্র তাঁর বাবার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চাটার্ড একাউন্টেন্ট হোক।

আগন্তুক অতিথিরা নাছোড়বান্দা। পঞ্চুবাবুর উৎসাহই বেশী। তিনি বিধবা মাকে সবিনয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'চারিত্রিক গোলমালের কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে আমিই আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।' সনৎ মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'অভিনয়টাকে-শুধু রুজি-রোজগারের উপায় হিসেবেই নেবো, কোনো উশৃংখলতার পথে যাবো না। মা হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন ছেলেকে। সনৎকে তিনি আদর করে স্বপন বলেই ডাকতেন। পঞ্চুবাবুর ঐ নামটাই পছন্দ; পোষাকী নামের পরিবর্তে তিনি ঐ নামটি গ্রহণ করে যাত্রা জগতের সঙ্গে একটি নতুন প্রতিভার সংযোজন করলেন। সেদিনের সেই পঁচিশ বছরের ভাগ্যান্বেষী যুবক, আজকের যাত্রা-জগতের স্বপনকুমার।

সেই প্রথম চিৎপুরে এলেন স্বপন। অবশ্য ইতিপূর্বে চিৎপুরে না এলেও বছর দুয়েক আগে, মেজদার উৎসাহে, সিরাজ-দ্দৌলা ও চক্রছায়া পালা দেখার সুযোগ হয়েছিল। ছোট ফণিবাবু, সিরাজ ও কৃষ্ণ সেজেছিলেন পালা দুটিতে।

বড়দা এবং মেজদা দুজনেই শিশিরবাবুর গ্রুপে অভিনয় করতেন। বড়দা প্রভাতকুমার ছিলেন সৌখিন সম্প্রদায়ের গুরু। মূলতঃ স্বপনের তাঁর কাছেই হাতে খড়ি। তাঁর সম্পাদনার গুণে কত খারাপ নাটকও উতরে যেত। বড়দার সম্পাদনার অভিজ্ঞতা স্বপনকে এখনও প্রাণীত করে।

খুব ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক। বলা যায় পারিবারিক সূত্রে এই ঝোঁক তিনি অর্জন করেছিলেন। বাবা ছিলেন রেলের কর্মী, তিনি তাঁদের কাছে অভিনীত নাটকগুলিতে

ভোলানাথ রায়

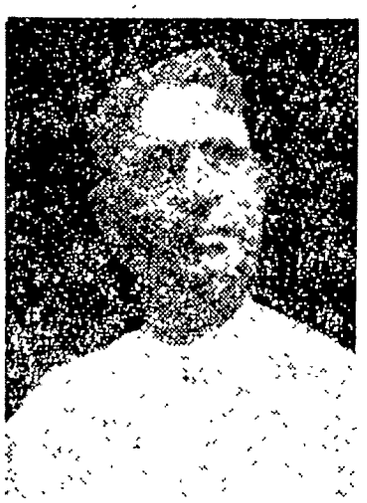

ফণী বিদ্যাবিনোদ

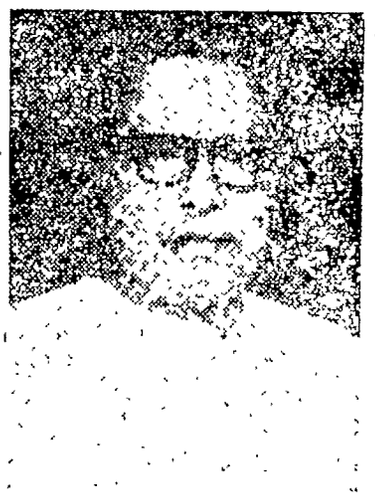

ব্রজেন্দ্র দে

ফণী মতিলাল

বিনোদ ধাড়া

প্রভাত বসু

নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। ছেলেবেলায় স্বপন সে-সব অভিনয় দেখেছেন।

বেলগাছিয়ায় দিগম্বর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময়, কেদার রায় পালায় কার্ভালোর ভূমিকায় অভিনয় করে সোনার পদক পেয়েছিলেন, হেডমাস্টার রামগোপাল সোমের কাছ থেকে।

যাত্রায় এসে 'বাঙালী' পালায় চরিত্র পেলেন নাসির খাঁ। প্রথম অভিনয়েই চিহ্নিত হয়ে গেলেন স্বপন। যাত্রায় তখন অভিনেতার সংলাপের চেয়ে দর্শকরা কসরৎ বা আঙ্গিক বেশী পছন্দ করতেন। হাত পা নেড়ে খুব জমিয়ে অভিনয় করতেন অভিনেতারা। দর্শকরা চিৎকার করে দাবী তুলতেন, 'কিছু আর্ট দেখান মশায়।' আর্ট মানে পশ্চার, অঙ্গভঙ্গি। বড় বড় অভিনেতারা প্রস্থানের সময় আর্ট দেখাতেন। এইভাবে তখন গেট ডায়লগ যাত্রার একটা জনপ্রিয় অঙ্গ ছিল।

থিয়েট্রিক্যাল অভিনয়ে অভ্যস্থ স্বপন, অনভ্যাসের জন্য প্রথমে একটু অসুবিধেয় পড়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চুবাবু সাহস দিলেন, 'তুমি তোমার মত অভিনয় করে যাও।' পঞ্চুবাবু নিজেও তখন গমকের সংলাপ ভেঙে, খুব স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অভিনয় করতে শুরু করেছেন। তিনি জানতেন দর্শকরা কি চায়। সহ-অভিনেতারা কিন্তু আপত্তি করেছিলেন, এরকম কথা বলার মত অভিনয় করলে তাদের অসুবিধে হয়।

সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিলেন যাত্রাভিনেতারা। বয়স্করা বলতেন যাত্রাওয়ালা। যাত্রাদলের আসামী। ছোটরা চিৎকার করে ছড়া কাটত, 'যাত্রা করে ফাত্রা লোকে, থিয়েটার করে ভদ্রলোকে।' শহরের সভ্যসমাজে যাত্রার তখনও প্রচলন ছিল না। কলকাতার কয়েকটি বাজার বা পট্টিতে আলুওয়ালা মাছওয়ালারা ছিলেন যাত্রার দর্শক। যাত্রার আসরে, অভিনেতার চেয়ে নিজেরাই নানা রকম হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করতেন প্রকাশ্যে। পথচারী ভদ্রলোকেরা কখনো সখনো দাঁড়িয়ে দেখতেন। অভিনয় কতটুকু হচ্ছে, সেটা বোঝার আগেই দর্শকদের কাণ্ডকারখানা দেখে সরে পড়তেন। এই জন্যে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়দের কাছে স্বপন নিজের মর্যাদা বাঁচানোর জন্য বলতেন, 'কলিয়রীতে কাজ করি।' দু-একজন যাঁরা জেনে ফেলেছিলেন পরিহাস করে বলতেন, 'কিরে, সীতা সাজিস্ না হনুমান সাজিস্?'

বড় বড় অভিনেতারা কেউ কেউ ভয়ানক অপমান বিদ্রূপ করতেন কনিষ্ঠদের। কেউ পলে চট্ করে স্থান দিতে রাজী হতেন না। অনেক প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে নিজেকেই স্থান করে নিতে হত নবাগতদের।

কলকাতায় তখন দল বলতে, কয়েকটা। আর্য, নবরঞ্জন, সত্যম্বর, নিউ গণেশ, নটা কোম্পানী। ঠিকের দল ছিল কয়েকটা, রয়েল বীণাপানি, ক্যালকাটা মিলন বীথি, এইসব।

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পালা যখন যাত্রার দর্শকের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে, সবেমাত্র কাল্পনিক পালা প্রবর্তিত হচ্ছে, স্বপনকুমার খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সময়টাকে ধরে নিয়েছিলেন। পুরাণ বা ইতিহাস নয়, দর্শকরা তাঁদের নিজেদের ঘরের কথা শুনতে চান। যেজন্য পরবর্তীকালে যখন সামাজিক পালা সুরু হল, তখন সহজ স্বাভাবিক অভিনয়, সাদা পোষাকের সাধারণ আয়োজন—যাত্রাগানের সামনে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। স্বপনবাবু নিজেও চাইছিলেন এই পরিবর্তন। সুতরাং যুগরুচির নবতম চাহিদার অনুহাতে, তিনি এই বদলকে ত্বরান্বিত করলেন। ১৯৬৪ সালের 'অগ্নিনাসর' পালা থেকে, তাঁর নিজের এই ইচ্ছে চরিতার্থ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পেলেন প্রথম পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে।

তারপর তিনি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাত্রায় আধুনিকীকরণে তৎপর হয়েছেন। শুধু অভিনয় ধারা নয়, বিষয় নির্বাচন, আঙ্গিক, সংলাপ, সাজ-পোষাক, রূপসজ্জা, সবকিছু নিয়েই তিনি পরীক্ষা করতে চান।

দোতালার ছোট্টঘরে বসে আছি, সামনে স্বপনকুমার। নতুন মরসুমের পালা সম্পাদনা করছিলেন। আসবাব-পত্র, টি-ভি, টেলিফোন, পরিচ্ছন্ন ঘরটি ঝক্‌ঝকে করছে। শরীর চর্চার দু-একটি সরঞ্জাম দেখে মনে হল নিয়মিত ব্যায়াম করেন। গেরুয়া পর্দা ঝুলছে জানালা দরজায়। সাঁইবাবার দুটি বড় ছবি টাঙানো দেয়ালে। সব মিলিয়ে ঘরটাকে আশ্রম বলে ভ্রম হতে পারে। পরে একদিন উত্তরে জানিয়েছিলেন, 'না, আমার জীবনের সঙ্গে সাঁইবাবার কোন যোগ নেই। বহরমপুরে গান শুনে দর্শকরা একটা উপহার দিয়েছিলেন, পরে দলের প্রোপাইটার আর একটা। দুটোই ঘরে রেখে দিয়েছি। এই যা।'

পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিনয় জীবন। এপর্যন্ত পঞ্চান্নটি পালায় ছাপান্নটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। উনসত্তর সালে 'রক্তলেখা' পালায় একই সঙ্গে দুটো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মূলতঃ রোমান্টিক নায়ক হিসেবেই স্বপনবাবুর খ্যাতি। সত্যব্রতর 'অগ্নি-পরীক্ষা' পালায় অর্চনারূপী জ্যোৎস্না দত্তের সঙ্গে, উত্তমের ভূমিকায় স্বপনবাবুর রোমান্টিক চরিত্রের সুরু বলা যেতে পারে। তার পূর্বে পুরুষবার্ণাদের সঙ্গে দু-একটি চরিত্র করেছিলেন। আগরতলায় ঐ পালা দেখে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল। সেখানকার জাগরণ পত্রিকায় লিখেছিল, 'জানি না, তাঁরা সত্যি জীবনে প্রেম সূত্রে আবদ্ধ কিনা!'

আজকাল যাত্রার আধুনিকতা নিয়ে অনেকের আপত্তি শোনা যায়। সিনেমা আর থিয়েটার এসে গ্রাস করে নিচ্ছে যাত্রাকে।

বেন না স্বপনকুমার। বরং সেদিন, চিৎপুরের এক গদীঘর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট একটি ছোট্ট ঘরে বসে, প্রসঙ্গক্রমে এই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। 'পরিবর্তন তো ই। রামমোহনের ভাষায় লেখা উপন্যাস পড়বেন এখনকার ঠক? যাত্রার বেলায় দোষ কোথায়। আগে যাত্রার আসরে কালো লখাল্লা-পরা জুড়িরা আসরে দাঁড়িয়ে গান ধরতেন চিৎকার করে,। রকম কোন ব্যবস্থা যদি এখনকার পালায় করা হয়, নেবেন কিরা। পূর্বে সখীদলের নাচ যাত্রায় একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল। ন যাত্রা হচ্ছে, মধ্যরাত্রি—একদল বাচ্চা, সাত থেকে সতের বছর স—অভিনয়ের মাঝখানে সাজঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চতুর্থ বের পঞ্চম দৃশ্যে—রাজকুমারীর সহচারী সেজে প্রবেশ করতে ব। ম্যানেজার এসে ধাক্কা দিয়ে সবকটাকে তুলে দিলেন। পিঁচুটি হতে গিয়ে চোখের কাজল সারামুখে ছড়িয়ে পড়েছে, ঘাঘরা খুলে ছে কারো, ওড়না বেসামাল, কোনরকম ঘুমন্ত অবস্থাতেই তারা। ড়া খেয়ে আসরে গিয়ে গান ধরল, সঙ্গে নাচ। আর উচ্চারণের াহার যে, 'বাশী মোর নাই' গানের কলিটি দূর থেকে শুনে 'বাসি মড়া খাই।' আজকাল পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে শুনবে দর্শকরা?

দর্শকরা আগের তুলনায় অনেক সচেতন। শহরের কে যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা আরও প্রতিযোগী করে তুলেছে গুলিকে।

সামাজিক পালা বর্তমানে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, কার করতেই হয়। আসলে সেরকম পালাকার কোথায়, নতুন নের পালা লিখবেন। বাণিজ্য সফলতার কথা ভেবে পালাকে তা করতে রাজি অনেকে। সেই জন্য জনপ্রিয়তার পরিবর্তে যাত্রা নেক হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে হয়ত। বলছি না, পুরাণ বা ইতিহাসের আজন নেই। নিশ্চয় আছে, কিন্তু সবদিক থেকে বাস্তব করে লতে হবে ঐসব পালাকে। একেবারে সাম্প্রতিককালে রাধাকৃষ্ণের ষয় নিয়ে যদি পালা করি, তবে পুরনো দিনের সুর আর গমকের ভিনয় বাদ দিতে হবে। সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ঐ সব চরিত্রকে লিয়ে দিতে হবে।

দর্শকরা চান গল্প আর অভিনয়। মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় অনেক গভীর ও কঠিন সত্য সাধারণ দর্শকদেরও আকৃষ্ট র। হাওড়া স্টেশনে রেলওয়ে ক্লাবে 'মাইকেল মধুসূদন' অভিনয় র। দর্শকদের আসনে মাত্র শ'দুয়েক বাংলাজানা দর্শক, বাকী সব াঁওতাল। দর্শকদের ব্যাপারে আমি একটু খুঁতখুতে। অবস্থা খে আমার খুব খারাপ লাগল। রেগে গেলাম।' ম্যানেজার এসে সলেন বাঙালীবাবুরাই আপনার অভিনয় দেখবেন বলে বায়না রেছেন। অভিনয় আরম্ভ হল। সারা আসর নিস্তব্ধ।' শেষ শ্যে অভিনয় করার সময় দেখলাম, সাঁওতাল মেয়েরা চোখের জল ছে। গান শেষ হতেই প্রায় শ'পাঁচেক সাঁওতাল এসে সাজঘরে কে পড়ল, হুড়মুড় করে।' জড়িয়ে ধরে বলল, 'বড় ভাল করেছিস বু, কাঁদায়ে দিছিস্।' এই ঘটনা আমার জীবনে একটা শিক্ষা য়ে আছে।

কয়েক বছর ধরে চলচ্চিত্রের অনেকগুলি সফল কাহিনী র পরিবেশন করেছি। তার মানে এই নয় সিনেমার দিকেই ঝোঁক বেশী। প্রধানত প্রোপাইটারদের ইচ্ছে অনুযায়ী ঐ সব গল্প নির্বাচন করতে হয়। তাঁদের ধারণা, উত্তমবাবু যে সব চরিত্র করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, সেই চরিত্রগুলি স্বপনবাবু করলে, ব্যবসার দিক থেকে আকর্ষণীয় হবে। পিল্-খাল্ করে দর্শকরা আসবে। কিন্তু চরিত্রটি নির্বাচন করার পর আমি চেষ্টা করি নিজের মত করতে। সিনেমার চেয়ে যাত্রায় গল্প জানো কঠিন ব্যাপার।

অভিনয়ের সময় চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা রি, যাতে দর্শকরা চরিত্রটির সঙ্গে এক হয়ে যায়। তবে সচেতনভাবে,

বুলেমার্কস পালায় নামভূমিকায়
শান্তিগোপাল

নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি চরিত্রটিকে। শুধু নাট্যভারতীতে 'নিশিপদ্ম' পালার সময় অনঙ্গ দত্ত চরিত্রটি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গ ছাড়ত না। শেষ দৃশ্যে অভিনয় করে কতদিন সাজঘরে এসে কাঁদতে হয়েছে। কিন্তু ঐ মেকআপ তোলা পর্যন্ত। মেকআপ করা আর সাধারণ অবস্থায়, দুই পৃথক স্বপনকুমার আসমানজমিন ফারাক।

অভিনেতা তৈরির প্রসঙ্গটা সত্যি জরুরী। আমার মতে অভিনেতা তৈরি হয় না, জন্মগ্রহণ করে। প্রতিভা দরকার। সেই প্রতিভাকে বিকশিত করে আর একজনের শিক্ষা। তাছাড়া সকলে শিক্ষক হতে পারেন না, অভিনেতা হয় অনেক। ছোট ফণিবাবু ভাল অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু বড় ফণিবাবু শিক্ষক হিসেবে অনেক যোগ্য। ছোট ফণিবাবুও তাঁর কাছে শিখেছেন।

তাছাড়া এখনকার যাত্রাদলে অভিনেতা তৈরি খুব ঝামেলার। পূর্বে একই দলে এক নাগাড়ে অভিনয় করবার ফলে, নতুন অভিনেতারা অনেক শেখার সুযোগ পেতেন। আলাপ আলোচনায় ভুলগুলি সুধরে নিতে পারতেন। এখন মরসুম শুরু হতে না হতেই অন্য দলের জন্য চুক্তি হয়ে যায়। কেউ তেমন মন দিয়ে শিখতে চায় না। বরং কোন অভিনেতা যদি জানতে পারে দলের প্রধান অভিনেতা শুধু

মুকুন্দ দাস

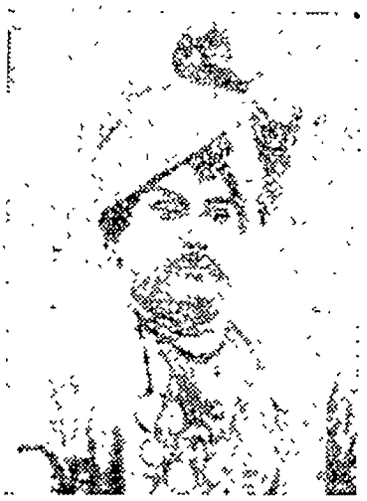

সুবেন মুখার্জি

পঞ্চু সেন

হয়েছেন, তাহলে পরের বছরের জন্য মাইনে ডবল চেয়ে বসেন। যেজন্য সত্ত্বাধিকারী তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মাইনে বাড়ানোর এই নৈমিত্তিক খেলায়, অভিনেতার শেখার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যায়।

একেবারে নতুন শিল্পীকে গড়েপিটে তৈরি করতে কষ্ট হয় অনেক। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছিলেন দলের নায়িকা স্বপ্না কুমারী, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা তুললেন। সুপন বাবুর কাছে আসার পূর্বে, একদিনও যাত্রা দেখেন নি। এখনও না। অথচ সুপন বাবুর সহযোগিতা ও শিক্ষায় তাঁর যাত্রাভিনেত্রী হওয়া অনেক সহজ হয়েছে।

আসর, মঞ্চ, চলচ্চিত্র—তিনটেতেই অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্রে অভিনয় দেখানোর সুযোগ অনেক বেশী। পেশাদারী মঞ্চের প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই। আকর্ষণ বোধ করি না। তিন দিক ঘেরা, কি রকম আড়ষ্ট লাগে। যাত্রায় চোখের উপর চোখ রেখে—একতন্ত্র হয়ে পড়ায় সুযোগ অনেক বেশী। তবে ইদানিং আলো ও মাইকের ব্যাপারে যে সব অভিযোগ উঠছে, অস্বীকার করা যায়না বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অচির কালেও মধ্যে হয়ত আলোর প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মাইকটা আজকাল জরুরী, আসরের আয়তনই কারণ। নিয়মিত অভিনয় করতে হয় বলে প্রতিদিন চেঁচিয়ে অভিনয় করাও সম্ভব নয়।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর গেল। রাত দশটা। উঠে দাঁড়ালেন স্বপনকুমার। মাথে হাল্কা লাল গেঞ্জীতে, অন্তত পঁচিশ বছর কমে গিয়েছি তাঁর বয়স। 'তবু, নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তি সম্পর্কে সবসময় সচেতন তিনি,' যাত্রা এমন একটা মাধ্যম, এখানে ক্ষমতা না থাকলে নিজেকে টেকানো মুশকিল। আমি সম্মানের সঙ্গেই যাত্রা থেকে বিদায় নিতে চাই। যাত্রার দর্শক এখন আধুনিক, অনেক উন্নত—কোন দুর্বলতা তাঁরা ক্ষমা করবেন না।'

হোচিমিন্ন প্রালার দৃশ্য

অধিকারীর দরবারে ফিল্মস্টার

যাত্রা আজ আর একমাত্র গ্রাম্য লোকের দর্শনীয় নয়, মহাজাতি রবীন্দ্র-সদন আজ যাত্রাপালায় মুখর। চারদিকের খোলা হাওয়া ছেড়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরই এখন পছন্দ করে অধিকারীর দল। গাঁয়ে-গঞ্জে যে কামাস পাড়ি দেন তাঁরা তার চাইতে কম সময় কাটে না তাঁদের এই শহরে, কলকাতায়।

যাত্রা এখন তাই নাগরিক সংস্কৃতির প্রায় প্রথম সারিতে। মহাজাতি রবীন্দ্র-সদনের বাতানুকূল চেয়ারগুলিতে এখন আর গ্রাম্য লোকের দেখা পাওয়া ভার, দশ-পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট কেটে নিউ আলিপুর বালীগঞ্জের পশু এলাকার সুবেশা সুগন্ধী মহিলাদেরও দেখা যায়।

একটা সময়ে যাত্রা ছিল বাংলার লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ। জায়গা বদল করে এখন শহরে এসেছে। শুধু জায়গা বদলই বা বলি কেন, চেহারাও বদলেছে, বদলেছে চরিত্র। খোল-নলচে সবই হারিয়েছে এখন যাত্রা। শুরুতে কনসার্ট আর মাঝখানে বিবেক চরিত্রটিই যাত্রার জাত বাঁচিয়ে রেখেছে। কর্পোরেশনের জল পেটে পড়ার গুণেই তো এটা।

হাট-মাঠ-বাটের সহজ সরল নিষ্পাপ এই গণমাধ্যম আজ শহুরে জৌলুষে রঙিন হচ্ছে, দাম বাড়ছে। বায়না ঊর্ধ্বমুখী।

এই স্ট্যাটাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার পালার, সঙ্গীত পরিচালক অধিকারীরও দর বেড়েছে। লেজ মোটা হয়েছে তাঁদের। আর বেড়েছে প্ল্যামার। শুধু যাত্রারই নয়, যাত্রা শিল্পীদেরও, এঁদেরই রমরমা যেন সবচাইতে বেশী। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের মত বছর বছর ঘর বদলাচ্ছেন শিল্পীরা, নীলামে দর উঠছে সেই মত।

চিৎপুরের যাত্রা বাজার বছরের শুরুতেই তাই জাঁকিয়ে ওঠে কে কোন্ দলে যাবেন সেই গুঞ্জনে।

যাত্রার এই বর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই অধিকারীরা শুরু করলেন ফাটকাবাজি। বছরখানিক আগেও উর্বর মস্তিষ্কগুলো থেকে আমদানী হতে লাগলো উদ্ভট কিছু পরিকল্পনা। ভালুক - উট - ঘোড়া - বাঁদর এলো শিল্পী হয়ে। শিল্পীরা আড়াল হলেন। চমক লাগাবার উৎসাহে যাত্রার বারোটা বাজাবার দাখিল করলেন এঁরা।

সময় বদলেছে এখন। খানিক মেকানিতে আর দর্শকদের ভোলানো যাচ্ছে না। সুতরাং আরম্ভ হলো নতুন চাল। শিল্পী তালিকায় ফিল্মের লোকদের সংগ্রহ করার মহড়া শুরু হলো। নাট্যকার-অভিনেতা সঙ্গীতকার সবাইকেই টেনে আনা শুরু হলো পালার মাঝখানে।

ফিল্মের লোকদের যাত্রার অনুপ্রবেশের কারণগুলো স্পষ্ট। যেমন—(ক) নগদ আর্থিক লাভ, (খ) বাংলা ছবির মন্দা বাজারের জন্য স্টুডিও পাড়ায় কাজের অনিশ্চয়তা ও (গ) যাত্রার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। আর এই কারণগুলোর পেছনে আরও অনেক বহিঃকারণও আছে।

ফিল্মের গ্ল্যামার ছেড়ে কে-ইবা আর সাধ করে গাঁয়ে-গঞ্জে সশরীরে পাড়ি দিতে চায়। ফিল্মের তেমন সাড়া না পেয়ে তাই বেশীর ভাগ তথাকথিত একস্ট্রা জাতের শিল্পীরাই ভিড় করেছেন যাত্রার আসরে।

ফিল্মের বাড়তি সুনাম আঁচলে বেঁধেও মেয়েরা কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না চিৎপুর পাড়ায়, অধিকারীর দল আরও আরও বড় নামগুলোকে পাবার আশায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও তাই সেখানে পুতুল চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না দত্ত, বর্ণালী ব্যানার্জি, স্বপ্নাকুমারীর জয়-জয়কার। গাঁয়ে-গঞ্জের বায়নাদাররা ফিল্মের মেয়ের চাইতে আদি-অকৃত্রিম যাত্রার মেয়ে যে দলে আছে সেদিকে ঝোঁকেন।

মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সম্ভবতঃ কমপ্লেক্স রোগাক্রান্ত হয়েই ফিল্মের এক্সট্রা ছোকরাগুলো চিৎপুরে যায়নি। অন্ততঃ এখনও। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবু ভাওয়াল ছাড়া আর তৃতীয় নামতো চোখে পড়ছে না।

উৎপল দত্ত এখন আর সেরাত-শিবনীর মত কল কল ধারায় বইছেন না। লোকনাট্যকে মুক্তিদীক্ষা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত। ভানু ব্যানার্জির যাত্রার আসার কারণ আমি জানি। কোন এক ঘটনায় ফিল্মে অভিনয় করব না, যাত্রা করব এমনি প্রতিজ্ঞা করেই তিনি শুরু করেছিলেন সুশীল নাট্য কোম্পানী। গোঁ-এর বশেই তাঁর পালার আসরে উপস্থিতি। আজ তিনি জমিয়ে বসেছেন। সুশীল নট কোম্পানী ছেড়ে তিনি এখন যুক্ত মঞ্চের কর্ণধার। ভৈরব মন্ত্র শ্রীযুক্ত আলিবাবার ভানু স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইনিই বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি যাত্রার আসরে নেমে ফিল্মের মোহ কাটিয়েছেন। মাঝখানে বছর দুই-তিন তাঁকে টালিগঞ্জ পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায় নি। এখন কখনও সখনও আসছেন।

অধিকারীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন আরও অনেকেই। শেখর চ্যাটার্জি ভারতী অপেরার জন্য সম্রাট আলাউদ্দীন পালা লিখে দিয়েছেন, ভূপেন হাজারিকা, শ্যামল মিত্র লাইন দিয়েছেন চিৎপুরে সুর দিবার জন্য। এঁদের তো ফিল্মে কাজের অভাব নেই, তবু কেন যাত্রায়?

যাত্রা এখন আজকের উঠতি ফ্যাশান। যাত্রার জনপ্রিয়তা বোধহয় এঁদের কাছে তাই ঈর্ষার বিষয়। যাত্রায় কাজ না করলে আধুনিক হওয়া যাচ্ছে না হয়তো এই মনোভাব কারও মনে কাজ করতে পারে। কেউ কেউ আবার মুখে যাত্রার নামে দু-পাঁচটা গালাগালি আউড়ে মনে মনে ভাবছেন কোন্ অধিকারীর দরজায় হাজির হলে টাকার অংকটা বাড়তি পাবে।

শুধু ফিল্মের লোকদেরই বা দোষ দিই কেন, গ্রুপ থিয়েটারের একাধিক জাঁদরেল নাট্যকার পরিচালক অভিনেতাও যাত্রার জনপ্রিয়তার শিকার হয়েছেন। যাঁকে এক সময় বিপ্লবধর্মী নাটক নিয়ে একাডেমী রসনায় বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত জলে উঠতে দেখেছি সেই অসিত বসু এখন সস্ত্রীক আনারকলি ও রত্নাকর গিরিশচন্দ্র পালায় বিপ্লবের কোন্ ধ্বজা উড়োচ্ছেন জানতে ইচ্ছে করে। লোকায়নের অরুণ রায় বাঁদী লালবাঈ পরিচালনা করে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু পেলেন কি? অন্ততঃ নিজের বিশ্বাসী আদর্শের কাছে সৎ রইলেন কি?

কোনো জলের মত যাত্রায় এভাবে সকলের অনুপ্রবেশ কেন? প্রশ্নটা আসত না যদি দেখতাম এতসব প্রগতিশীল নাট্যবিদ শিল্পীদের উপস্থিতি বাংলার এই একান্ত গণ মাধ্যমটির উল্লেখযোগ্য, ঈর্ষনীয় কোন পরিবর্তন হয়েছে। তাতো হয়নি। হুজুগে জনপ্রিয়তাকে মদত দিয়ে দেশী বিদেশী রাজনৈতিক পটভূমিতে কিছু পালা রচনা হয়েছে মাত্র, আর কি। এই পরিবর্তনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কোন কারণ নেই। অনুপ্রবেশের কারণ যেখানে মূলতঃ অর্থকেন্দ্রিক সেখানে অবশ্য কোনো পরিবর্তন আশা করাও অনুচিত।

বলি কি, আপনারা ফিল্ম থেকেই আসুন, বা যজ্ঞ থেকে, এমন কি গুড়ের আড়তদারের আনতে মাল নেই। আপনাদের উপস্থিতি যেন যাত্রার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়, কমায় না। এই গণসংস্কৃতি মাধ্যমটি আপনাদের ছোঁয়ায় নগরে প্রান্তরে নতুন জীবন নতুন আদর্শের বার্তা ছড়িয়ে দিক, নইলে আপনাদের আসার দরকার নেই। যে যাঁর জায়গায় থাকুন।

চিৎপুর আপন মনে ঘরে যাক, আপন মন নিয়ে থাকুক।

হরিপদ দর্শক

তর্পণ

বীতশোক ভট্টাচার্য

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন জেগে শুয়ে থাকে :
যাতে নিশ্বাসের বেশি কথা নই।
কতো দর্শনের বই, আরো কতো থরে থরে কবিতার পাতা
পুড়িয়েছো ভুতুড়ে জ্যোৎস্নায়—
ঐ ধোঁয়া ওঠে, ঐ শেষ বিছানার একপাশে
ভারি কাঁধ, কাঁপে পিঠ, গোঁজা মুখ;
বিষ বিষ চাকা অন্ধকারে
এই নীল বাষ্প ক্ষমা করো।
ক্ষমা। কেন—

তোমার ঘুমের হাত তত ভারি যাতে তার বুক ভেঙে যাবে;
স্খলিত স্বপ্নের থেকে মুখের অতৃপ্তি তুলে এতো কেন বলো :
যেতে নই, আসি।

মনে নেই, এও শুধু স্বপ্ন মনে পড়ে—
একটা অস্পৃশ্য চোখ, একটাই অশ্রুগর্ভ চোখের নির্মাল্য
ভেঙে গেলো, তাই
পাতা ছায়া অন্ধকার, গাছের শরীর ঠেলে অনর্গল চোখ :
কিছুটা পিছন ধুয়ে গেলো;
পিছল বুকের ডোল ধসেছে কিছুটা;
আছে স্রোত, জলপাত ভাসমান, স্নান পান কিছুই না আছে :
এই টাল খাওয়া থেকে তুলে
কোলে কাঁখে ধরে রাখা শিশু—
শেষ বিকেলের আলো মাংসল গেরুয়া আর আংশিক আঁধার
কিশা গোতমীর মতো তুলে ধরো তুমি :
ও কেন সম্পূর্ণ মৃত নয়।

দিন যায়

আবদুশ শুকুর খান

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে দিন যায়, সমস্ত দিন যায়
ভাতশূন্য থালার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে—
তোমার ভালোবাসার উপর লাফিয়ে পড়ছে চাঁদ, একটা
নিশুতিরাতের বেড়াল নখ ও পায়ের থাবা তুলে
তোমাকে বোঝাচ্ছে নির্ভয়, কি চূড়ান্ত শান্ত দিপ্রহর,
শিখে রেখেছে আমাদের বেঁচে থাকা, আর ওই কর্কট বেড়াল
তোমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলছে—ভয়ংকর খেলা, আমি চাই
এমনি এক খেলার মাঝে হাজার বছর তোমার পাশাপাশি থাক,
সব দুঃখ তাপ অনুভূতিগুলি লাফ দিয়ে উঠুক তোমার শরীরে।

বেড়ালের থাবার নীচে চাঁদ যায়, তোমার বিষণ্ণ বুক কাঁপিয়ে—
অন্ধকার নামে, আর গায়ের বাতাস থেকে
নেমে আসছে আমাদের বিস্মৃতা, স্বপ্ন ঝাঁঝালি বাতাস।

আমার সুখ জানে সমস্ত পৃথিবী

ব্রততী বিশ্বাস

আমার সুখ জানে সমস্ত পৃথিবী
অভিজাত গোলাপ যেভাবে জানে
বিমুগ্ধ ফুলদানীর আশ্রয়
প্রাচীন দেবদারু চন্দনবনের সুগন্ধি ঝালর
বাতাসে আনে
বোঝে অন্তঃপুরের আশ্বাস একান্ত বরাভয়
আমার সুখ জানে ড্রয়িংরুমের গালিচা
পুতুল বালিকার ছোঁওয়া ওষ্ঠে ফোটে
ডাকবাংলোর নরম রাতের শিশির পাহাড়ী কুয়াশা
অবিচ্ছেদ্য শিরোপা আমার
সুখ নিয়ে লুটোপুটি করে তুলোর বীজ
আকাশকুসুম, স্বাতী নক্ষত্রের জল বয়ে যায়
মৎস্যকন্যা তুলে আনে হাতের মুঠোয়
জ্যোৎস্নার প্রাসাদ
আমার সুখ বাতাসে রটে যায়
পৃথিবীর দূরতম নগরে

বৃষ্টিধারা ভালোবাসা

দিলীপ আচার্য

এতদিন কোথায় ছিলে জানি না, অপেক্ষায় ছিলে ?
আমারই জন্যে অপেক্ষায় ছিলে ?
মনে মনে দ্বিধা ছিল খুব,
সময় উত্তীর্ণ হলে আসো কিনা ?
অবিশ্বাস রক্তের ভিতর ঘুলিয়ে ওঠে, আমি সীমার প্রান্তে চলে আসি
দীর্ঘ দাহময় দিন শেষ হয় দিগন্ত-রেখাতে,—
বরাভয় অন্ধকারে আমার শরীর স্পর্শ করো চুপি চুপি:
ফাটলে ফাটলে, অভেদ্য কন্দরে, যেখানে কেউ নামে নি কখনো
দূর্নিরীক্ষ্য মায়াময় ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে ফেলে
আমার শিকড়ে শিকড়ে ঝরে পড়ো বৃষ্টিধারা, ভালোবাসা।

সুনীল দাশের ছবি

যদিও ইউরোপে অগুন্তি অপেশাদার চিত্রকরদের ঘোড়া আঁকা মুন্সিয়ানার পরিচিতি মাত্র। কিন্তু এদেশে তেমন ঘোড়া আঁকিয়ে দেখা যায় কম। অবশ্য এই ঘোড়াই যুগের হাতে সারা পৃথিবীর অন্যতম শিল্পকীর্তি বলে সমাদৃত হয়েছে। সুনীল দাস ঘোড়া এঁকে নাম করেছিলেন। তারপর নানাপথে ঘুরে এখনও নিশ্চিন্ত হননি তাঁর ধারণায়—ফাঁকে ফাঁকেই ঘোড়ার স্কেচ করতে হয় যদিও এখন পশুকে সামনে দেখতে হয় না। বর্তমান রেখাচিত্রটি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি নিদর্শন।

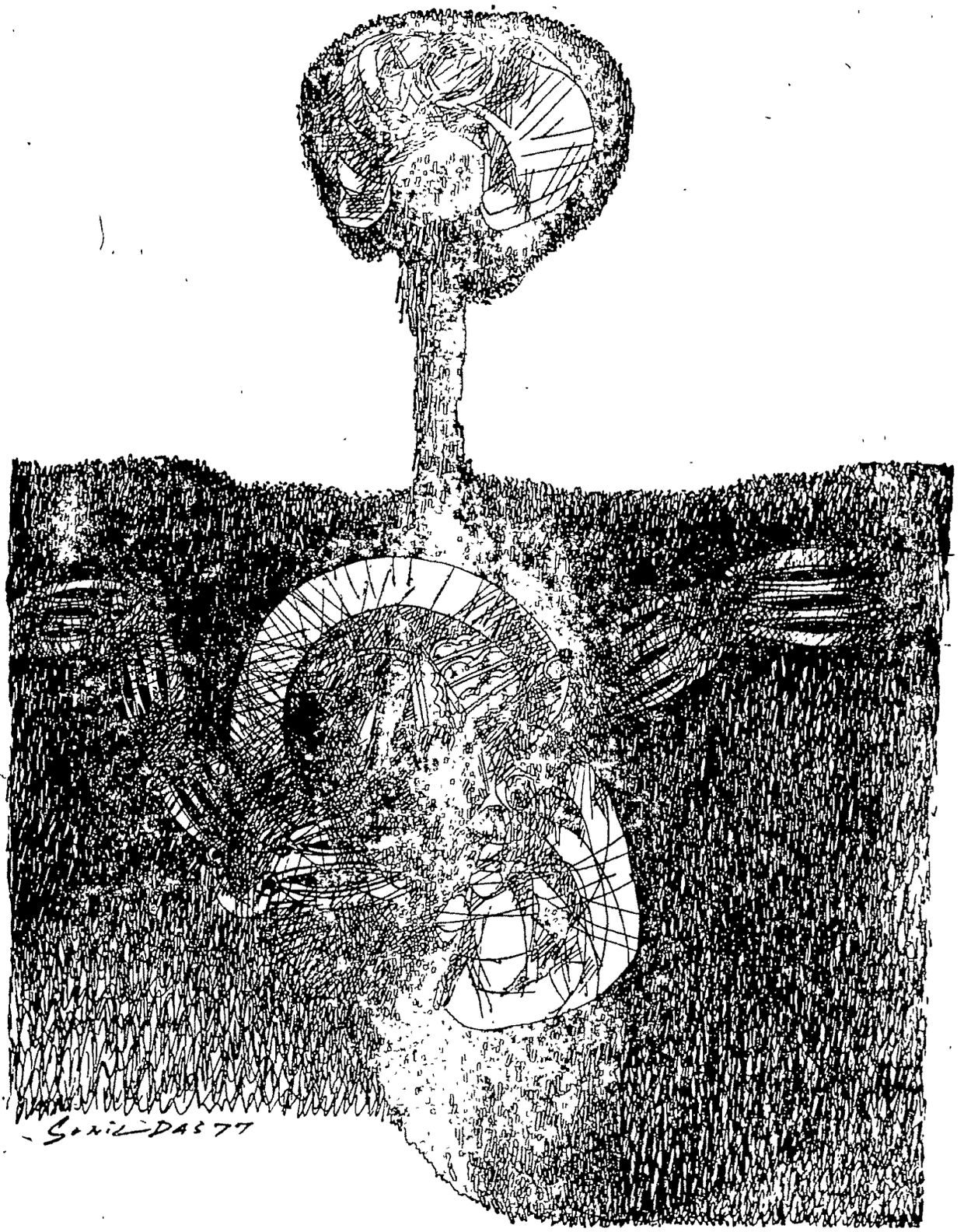
SUNIL DAS 77

বাংলা গান স্বল্পায়ু কেন ?

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতকে আশ্রয় করে বাঙ্গালীর ভাবনা চিরকাল সম্প্রসারিত হবে এসেছে। যা সে চিন্তা করেছে তারই প্রতিফলন হয়েছে গানে। চিন্তায় যেমন বাঙ্গালীর অবদান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সকলেই স্বীকার করেন, গানের ভাণ্ডারও তার সেই তুলনায় অনগ্রসর নয়। গানের পুঁজি তাই তার চিন্তা জগতে প্রতিষ্ঠার ফলক তার প্রদীপ্ত চিন্তার প্রতিফলন।

সর্বভারতীয় থেকে এধারাকে ভিন্ন বলা চলে না। কারণ, সেখানেও আমরা দেখি সঙ্গীতের সমারোহ। বেশি বিভিন্ন ধরণের লঘু ও লোক সঙ্গীত। কাব্য ও সঙ্গীতের এই সংস্পর্শ সর্বভারতীয় হলেও বাংলার চিন্তাগত পক্ষিরাজে চড়ে তা যতটা অগ্রসর হয়েছে তা বোধহয় আর কোথাও হয়নি। অন্যান্য স্থানের লঘু ও লোক-গীতের সঙ্গে বাংলার বিভিন্নতা শুধু বৈচিত্র্য নিয়ে। এতো সুফলা ভারতের অন্যান্য প্রান্ত নয়। সেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছোঁয়াচ লেগেছে অনেক আগে। বাংলায় তার প্রভাব আসে অনেক পরে।

উচ্চাঙ্গ ও লঘু সঙ্গীতের ক্ষেত্র উভয় স্থানে গড়ে উঠলেও বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গানই ছিলো সমধিক প্রসিদ্ধ। কারণ, নবাবী আমলের রেশ এখানে এসে পৌঁছোতে কিছু সময় লেগেছিলো। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঢেউ যখন বাংলায় এলো তার ফলে লঘু বা লোকগীতের অগ্রগতিতে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি। কারণ বাঙ্গালী গীত সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই চিন্তাধারাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সুরের আশ্রয় সে নিয়েছে শুধু ভাব বিকাশের মাধ্যম হিসাবে।

বলতে বাধা নেই যে, উচ্চাঙ্গ ও লঘু যাই হোক না কেন, ভারতীয় সঙ্গীত মূলতঃ ব্যক্তিমুখী। ব্যক্তি বা শিল্পীকে আশ্রয় করেই তার বিকাশ হয়েছে যুগে যুগে। নিভৃত সঙ্গীত সাধনার অবাবহিত ফল হিসাবে গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্য এবং অধিকতর সম্প্রসারণের ক্ষেত্র। এই যুগপ্রসারী সঙ্গীত প্রচেষ্টার মূলে উপাদানের সন্ধান নিতে গেলে শিল্পীর খোঁজ নেওয়াই সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে পড়ে। সঙ্গীত এখানে শুধু সুরের সমষ্টি নয় গানের আকারে কারোর অনু-প্রবেশ সেখানে আবশ্যিক এবং অনিবার্য।

মুসলমানী আমলের আগেই—ভারতীয় সঙ্গীত উৎকর্ষের শিখরে উঠে-ছিলো। একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যে ধারা আজ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে তা মুসলমানী প্রেরণায় সিকর্ত। প্রাক-মুসলমানী যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে বটে কিন্তু ব্যবহারিক পরিবেশন রীতির কোনও নমুনা পাওয়া যায় না। গান হয়তো আছে সুরের হদিস [illegible] পাবেন বলে মনে হয় না। ধারা দিতে পারেন বলে দাবী করেন তাদের অবদান নির্ভরযোগ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এ ব্যাপারে ১৪ থেকে ১৯ শতকই হচ্ছে নবসৃষ্টির প্রেরণায় বিশেষ সমৃদ্ধ। পারস্য সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের যোগাযোগ এই সময়েই ঘটে, যার ফলে সৃষ্টি হয় খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী এবং অসংখ্য রাগ-রাগিণী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শক হুন দল যেমন এক দেহে লীন হয়েছিলো, তেমনি ভারতীয় সঙ্গীতকে অবস্থার চাপে পড়ে সংমিশ্রণের পথ নিতে হয়েছিলো। তারপর গ্রহণ বর্জনের স্বাভাবিক মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত রইলো তাই স্থায়ী আসন পেলো ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গনে। স্থান, কাল, পাত্রের বৈষম্য আর রইলো না। ফলে আজ মিয়াঁমল্লার, মিয়াঁ তোড়ি, দরবারী কানাড়ার খেয়াল গান শুনে আকবরের কৃপাপুষ্ট তানসেনের উপর কোনও বিপরীত ভাব আমরা পোষণ করি না। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ প্রবর্তিত বিলাসখানি তোড়ি গাইতে গিয়ে বর্তমান কালের কোনও গায়কের মনে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে না। রসগ্রহণের ব্যাপারে আমরা মনের দ্বারের অর্গল মুক্ত করেছি। অবারিত যে দ্বার দিয়ে আমরা গ্রহণ করেছি অনেক আগন্তুককে সহানুভূতি দিয়ে তাদের জিইয়ে রাখবারও চেষ্টা করেছি প্রচুর। তা না হলে আমরা ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলী, আবদুল করিম প্রমুখ প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের 'খেলত নন্দকুমার', 'মনমোহন বৃজকে রসিয়া', যমুনাকে তীর, 'হরি ওম তৎসৎ' প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত গান শুনতে পেতাম না। কৃষ্ণ রাও, রতন জানকার, রাজাভাইয়া প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের মুখে যখন আল্লা জানে, বোবে জিন আল্লা, কুমার সাহেব সুলতান, প্রভৃতি গান শুনি তখনও একই কথা মনে হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েনি। কারণ ব্যক্তির অবদান সেখানে এতোই সমৃদ্ধ যে, কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে সমন্বয়ের তীর্থে স্নান করিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছে।

রাগ-রাগিণীর মৌলিক বিশেষত্ব নিয়ে তেমন কোনও মতান্তর না থাকলেও প্রকৃত গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় একজনের গান অন্য জনের থেকে ভিন্ন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গায়কি নিয়েই যত ভেদাভেদ, গান নিয়ে নয়। ব্যক্তিগত সৃষ্টির প্রয়াস এক্ষেত্রে শুধু পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে। গান এখানে গৌণ। কিন্তু লোক সঙ্গীত তা নয়। সেখানে সুর এক গান ভিন্ন। রামপ্রসাদী গান অন্য সুরে গাওয়ার নজির নাই। কিন্তু রাগসঙ্গীতে গান সংগৃহীত হয়েছে নানাভাবে। সঙ্গীতজ্ঞরা কবি ছিলেন না। তাঁদের কবিতার মতো লোকজনেরও অভাব ছিলো। গায়ক ও কবি, একাধারে দুই গুণসম্পন্ন লোক খুবই কম বলা চলে। পার্থক্য শুধু দেখা গেছে সদারং ও মেহবুব খাঁর ক্ষেত্রে।

সদারং ওরফে নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশীয় এবং তাঁর সময় থেকেই গানের একটা সুনির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে। পরে রাজপৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে এই ধারা উত্তর ভারতের প্রধান ধারা হিসাবে পরিগণিত হয়। সদারং রচিত বহু খেয়াল গান কালের গণ্ডী লঙ্ঘন করে আজও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অঙ্গনে অম্লান রয়েছে। সদারং ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ ও গান রচয়িতা। অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের ক্ষেত্রে এই যুগ্ম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়নি। সঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করলেও গানের চাহিদা মিটাতে তাঁরা দৃষ্টি দিতেন ভজন গীতকার-দের রচনাবলীর উপর' এবং এইভাবে কবীর দাসের ঘুঁঘটকে পট খোল' গানটি দরবারি কানাড়ার ক্ষেত্রে স্থান পায়। এই গানটি আজও খেয়াল গায়করা গেয়ে থাকেন। কিন্তু মূলত গানটি ভজন শ্রেণীর। কিন্তু খেয়াল গানের অঙ্গনে তাকে স্থান দেওয়াতে একথাই প্রমাণিত হয় যে খেয়াল গানের পৃষ্ঠপটে কোনও কাব্য প্রচেষ্টা ছিলো না। কিন্তু খেয়াল গান গাইতে গেলে শুধু রাগ-আলাপ তান, বিস্তার, সরগ্রাম নিয়ে চলে না। কবিতা চাই। এই কবিতা আসবে কোথা থেকে? সহজেই বোঝা যায় যে, অবস্থার চাপে পড়ে তদানীন্তন সঙ্গীত স্রষ্টারা সাধারণ শ্রেণীর কবিতাকে গ্রহণ করলেন পরিবেশনের রীতি বজায় রাখতে। এই জন্য লক্ষ্য করা যায় যে খেয়াল গানের কথা-ধারা তেমন সমৃদ্ধ নয় এবং তা হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তেমন অনুভূত হয়নি। কারণ সুরের আলঙ্কারিক বিশিষ্টতাই যেখানে প্রধান সেখানে কাব্যের রসাস্বাদ গৌণ।

শুধু খেয়াল গান নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধারা। কাব্যের ছটা কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। অতি সরল কয়েকটি কথার কাঠামোতে সুরের মালা পরানো যেমন খেয়াল গানে দেখা যায় টপ্পা বা ঠুমরী শ্রেণীর গানেও তাই। পূর্বী ঠুমরীতে শাশুড়ি, ননদের সঙ্গে গৃহবধূর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে, আর হয়েছে কৃষ্ণকাব্যের সংযোগ-বিয়োগের বিভিন্ন। ভাষা অতি সরল যথা—যাও মোরি বাইয়া না ঘরোরো গিরিধারী। অর্থাৎ হাত মুচড়ে দিয়ো না সরে যাও। এখানে কাব্যের চাইতে অনুভবের সম্ভাবনা বেশি এবং তা বাস্তবমুখী। গানটিতে পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'দেখত নর-নারী ঠিঠোলি হোসে না করো' অর্থাৎ লোকজন দেখতে পাবে ঠাট্টাতামাসা আমার সঙ্গে কোরো না। আর একটি ঠুমরী গানের কথা মনে পড়ে যায়—'বাবুল মোরা নাইহার ছুটো যায়।' লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ আলী শাকে

বিটিশরা বন্দী করে যখন কলকাতার প্রান্তস্থিত মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে নিয়ে আসে তখন গানটি বন্দী নবাব রচনা করেন। ভৈরবী ঠুমরীর মধ্যে আমার মনে হয় বাবুল মোরার সমতুল্য গান খুব কমই আছে। বহুদিন পূর্বে রচিত এই ঠুমরী গানটি এখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শুনলে মন আবেগে ভরে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বন্দী নবাবের আর্তনাদের কথা। কাব্য যাই হোক না কেন, সুরের মধ্যে সেই আর্তনাদ আছে বলেই ভৈরবী ঠুমরীর এটি এক অপূর্ব সম্পদ। কথার অর্থ অতি সরল—অন্তর আমার নাইহার অর্থাৎ শশুর বাড়ি ছুটে যায়। লক্ষ্ণৌর নবাবী পরিবেশ ত্যাগ করে মেটিয়াবুরুজের জেলখানাকে এইভাবে প্রকাশ করার অর্থ যা-ই থাক না কেন মুস্লিয়ানা তেমন নাই। কিন্তু গানটি সুরের সমারোহে এতোই উজ্জ্বল যে শুধু এই কারণেই সময়ের গন্ডী পার হয়ে আজ অবধি তার আবেদন অবিকৃত আছে।

এতো কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাগরাগিনী আশ্রিত গান সময়ের গন্ডী পার হওয়ার স্পর্ধা রাখে। খেয়াল গান, টপ্পা গান, ঠুমরী গান সব শ্রেণীর গানেরই আয়ু অনেক। ফৈয়াজ খাঁর শশুর মেহবুব খাঁ দরকাপিয়া নাম দিয়ে যেসব গান রচনা করে গেছেন এবং আগ্রা-উলী ঘরানা হিসাবে যাকে গণ্য করা হয়, সেসব গান শুধু ফৈয়াজ খাঁ ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের মুখে আজ অবধি শোনা যায়। এসব গান স্বল্পায়ু নয়, কারণ রাগভিত্তিক গান এক মুখ থেকে যখন অন্য মুখে যায় তখন ব্যক্তিগত পরিবেশন রীতির মাধ্যমে খানিকটা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে নেয় এবং এই ভাবে পরিবর্ধনের ফলে বহুদিন পর্যন্ত তার পথ চলার সামর্থ্য পাকা করে নেয়। এই সামর্থ্য তার কাব্য কেন্দ্রিক নয়, রাগকেন্দ্রিক।

কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্র অন্যরূপ। এ বয়রের গান আসছে বছরে চলে না। এমন কি এমাসের গান ওমাসে বাসি হয়ে যায়। বাংলা গান এতো স্বল্পায়ু কেন?

আজ যদি কেউ বাংলা গানের আসরে কে, মল্লিকের 'বাঁধ না তরী খানি আমারি নদীকূলে' গাইতে শুরু করেন শ্রোতৃমন্ডলী তা কতটা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন নাই। ভ্রূ-কুঞ্চন, স্তিমিত দৃষ্টি, স্থানত্যাগের জন্য অহেতুক তাগিদ দেখেই বোঝা যাবে গানটি তাদের মনঃপূত হয়নি। এই রকম একটি নয় বহু বাংলা গানই আছে যা আর এখন শ্রোতার মনোরঞ্জনে অসমর্থ। অথচ এসব বাংলা গানই এক কালে ঝড় তুলেছে। কে মল্লিক যে সময়ের লোক সে সময়ে রেকর্ড রেডিওর বাহার আজকের মতো ছিলো না। তদানীন্তন গ্রামোফোন রেকর্ড সঙ্গীতের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। অনুরাগের কাঠামোতে ঘুণ ধরবার কোনও লক্ষণ তখন প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আজ সেসব গান বিস্মৃতির অতলে। কালের বেষ্টনী ভেদ করে গানের যে আয়ুষ্কাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বাংলা গানের ক্ষেত্রে তা নাই বললেই চলে। আজকের বাংলা গান কালকে অচল। নূতনত্বের তাগিদ বাংলা গানে এতোই বেশি যে তার আবর্তে পড়ে গানের অপমৃত্যু অহরহই ঘটছে এবং এই কারণেই পুরাতন বাংলা গান বা যাহোক কিছু একটা নাম দিয়ে সেগুলিকে পুনর্বহাল করবার চেষ্টা করতে হয়। ফল তাতে হয় কি না জানি না, কিন্তু তপশীল শ্রেণীভুক্ত গানের সংখ্যা বেড়েই যায়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ঠিক তার উল্টো; একই গান দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা ও প্রয়োগশৈলীর দরুন হয় তো কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু মূল সুরের আবেদন তাতে কমে যায় না। মূল সুরের কথা বলছি এইজন্য যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সুরকে চিহ্নিত করার জন্যই গান বা কবিতার প্রয়োজন হয়। নিছক সুর বা রাগ-রাগিনীর গতিভঙ্গি দিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রচিত হয়নি। কিংবাসিদ্ধ এসব গানের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সুর এবং এই সুরের ইমপ্রভাইজেসনের মধ্যেই আয়ুষ্কাল। সুরকে সঞ্চারিত করতে যতটুকু কথার প্রয়োজন তার বেশি চেষ্টা এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও বিশেষ অনুভূত হয়নি।

কিন্তু বাংলা গান কাব্য প্রধান। কবিতার কুঞ্জবনে বর্ধিত হয়ে এখন সে অসমান্যা রূপসী। সুর ও কথার যুক্ত বেদীমূলে তার আসন এবং এই সংযুক্তির মহিমাতেই সে মহিমান্বিত। কথা যেখানে সুর আশ্রয়ী এবং সুর যেখানে কথা আশ্রয়ী সেখানে কথা ও সুরের পৃথক অস্তিত্ব অনাবশ্যক এবং ইমপ্রভাইজেসনরেও অবকাশ কম। সুরকে বেশি আন্দোলিত করলে পাছে কথার বা কাব্যের মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়, এই ভীতিই বাংলা গানের বিভিন্ন গীতকারদের নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। এই কারণে একক সুরের মনধ্য বহু গানের বিকাশ হয়েছে। কবি গান, পাঁচালী ইত্যাদি বিচার করে দেখলে দেখা যায়, সুরের আঙ্গিক এক শ্রেণীর গানে এক, বিভিন্নতা শুধু কাব্যের। রামপ্রসাদী গান বহু থাকলেও সুর সর্বক্ষেত্রেই এক। এই সুরকে বিক্ষিপ্ত করে যদি কেউ অভিনবত্ব দেখাবার চেষ্টা করতে যান, শ্রোতাদের কাছে তা গৃহীত হবে না। কারণ শ্রেণীগত সুরের কাঠামোর মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আসে অথবা যে ব্যক্তিত্বের ফলে শ্রেণীগত সুর রূপ গ্রহণ করেছে তার পরিবর্তন সমীচীন নয়। 'মা আমায় ঘুরাবি কতো' রামপ্রসাদী গানটিতে যদি কেউ রাগরাগিনী প্রয়োগ করে গাইতে শুরু করেন তার ফলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবেই। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর কথা মনে আসে। সিরাজোল্লা আমলের কাহিনী, ঐতিহাসিক সত্য তাতে কতটা আছে জানি না। তখন মুর্শিদাবাদ ছিলো বাংলার রাজধানী, রামপ্রসাদ সেই আমলের লোক। নবাব সিরাজদৌল্লা মাঝে মাঝে রাজকীয় বজরায় চড়ে নদী পথে কলকাতায় আসতেন। একদিন এই অবস্থার মধ্যেই তাঁর বজরা হালিশহরের কাছ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ নবাবের কানে এলো কে যেন গান গাইছে। সঙ্গীতপ্রিয় নবাব বজরা বজরা ভিড়ালেন হালিশহরের ঘাটে। পাইকদের বললেন কে গান করছে খুঁজে আনতে। রামপ্রসাদ এলেন নবাবের বজরায়। নবাব আদেশ করলেন গান করতে। অবাঙ্গালী শ্রোতার কাছে বাংলা গান গ্রহণযোগ্য হবে না ভেবে রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গান ধরলেন। হিন্দি গান তিনি কিছু জানতেন। নবাব শুনে বললেন, না না, এসব গান নয়, যে গান গাইছিলে তাই গাও। শুরু হলো রামপ্রসাদী গান। ভক্তিসিক্ত এগান নবাবের কতটা মনোরঞ্জন করেছিলো ইতিহাসে তার কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু নবাব ফরমাস করে যে রামপ্রসাদী গান শুনেছিলেন সে কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কাহিনীটির মধ্যে। এক্ষেত্রে বলা যায়, রামপ্রসাদী গানের সুরের প্রতিই নবাব আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কাব্যের জন্য নয়।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুরের কারুকার্যের চাইতে কথার তাৎপর্যের প্রতিই শ্রোতাদের আগ্রহ অধিক। এই কারণে কথার সঙ্গে সুরের সংযুক্তি বাংলা গানকে চিরকাল সমৃদ্ধ করে এসেছে। সুরের বিন্যাস এক্ষেত্রে কথার পরিবেশনকে অগ্রাহ্য করে গড়ে ওঠেনি। কথার অভিনবত্ব অথবা মনোহারিত্ব শ্রোতার মনকে সিক্ত করলে সুরের প্রয়োগ সম্বন্ধে সে ততো উৎসুক হয় না এবং সেই কারণেই বাংলা গানে কালোয়াতি ধরণের সুর বিন্যাস তেমন স্থান পায়নি। গান রচনার ক্ষেত্রে এই ধারা প্রথম থেকেই অনুসৃত হওয়ার ফলে মোটামুটি একটা বিধিগত আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে যা শুধু বাংলা গানের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কবিতার প্রাধান্য এ-ধারার মূল কথা।

বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানেও সুরের একক গঠন লক্ষ্য করবার বিষয়। শ্যামা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খানিকটা স্বাধীনতা নেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা-ও বিশেষ পরিবর্তিত নয়। বাগেশ্রী রাগই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে, অন্যান্য রাগরাগিনীর মধ্যে মনোরঞ্জনের রসদ থাকলেও ভক্তি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার সীমিত।

পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে বাংলা গীত-রীতির মধ্যে বহু পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নিছক সুরের আলপনা শ্রোতার মনে অনুরাগ সৃষ্টি করেনি। সুরকে সে কবিতার পার্শ্বচর হিসাবেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, বাংলা গান শুনে আমরা যখন বাহবা দিয়ে থাকি তা সুরের চাইতে কথাকে উদ্দেশ্য করেই বেশি।

কথার ভাবকেন্দ্রিক আবেদন সুরের তুলনায় অনেক কম। কারণ মন তা সবসময়ে

নতুন কথা। নতুন ভাববিন্যাসের উপকরণ। সুরকে স্থায়িত্বের পর্যায়ে আনতে কোনও বাধা বা বিপত্তি সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কথার মিছিল না হলে মন ভরে না। যোগিয়ার কোমল রেখাব বা জৌনপুরীর কোমল ধৈবত সে রসাস্বাদে অপ্রয়োজনীয়। অথচ এই সুর আরোপের বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অফুরন্ত জীবন। কাব্যকেন্দ্রিক বাংলা গানে নবচেতনার চাহিদা এতই বেশি যে আজকের রচনা কালকে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। নিছক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন নব আঙ্গিকের আমদানি অহরহই চলেছে, গানের ক্ষেত্রেও তা আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তারই ফলে আজকের রচনা কালকে আর সেই ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে না, গানের আয়ু যায় কমে।

এই অবস্থার তাঁবেদারি করতে সংশ্লিষ্ট মহল যে পথ অবলম্বন করছেন তা আয়ুবৃদ্ধির পরিপোষক নয়। রাগসঙ্গীতকে বাদ দিয়ে যেমন-তেমন একটা সুরের কাঠামো সৃষ্টি করার মধ্যে বাহাদুরি আছে বলে মনে হয় না। সুর-আরোপের রথীদের রাগরাগিনী সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান নেই বলেই তাঁরা কষ্টার্জিত পথ অবলম্বন না করে নকলনবিসি করেই আসর জমাচ্ছেন। এপথ পরিত্যাগ করার জন্য কোনও আইন নেই বলেই অপ্রতিহতভাবে চলেছে তাঁদের গান সৃষ্টির অপ্রাসঙ্গিক প্রয়াস। ভারতের রাগকেন্দ্রিক ধারা বর্জন করে তাই দেখা দিয়েছে এলোমেলো সুরের প্রয়োগ, যেন আমাদের সঙ্গীত ঐতিহ্যকে নির্জীবকরণের দিকেই সুরকারদের লক্ষ্য। রাগসঙ্গীতের ধারা সুপ্রাচীন, তার মর্মার্থ করতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। সে সময় সুরকারদের নাই। তাঁরা চান সুরের লম্ফ করে কিছু অর্থোপার্জন। বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে তাই দেখা দিয়েছে অপ্রাসঙ্গিক ধারা এবং তা অভারতীয়ও বটে। বিদেশী সুরের নকল-নবিসিতে তাই ভরে উঠেছে বাংলা গানের প্রাঙ্গণ এবং ভারতের মূল সঙ্গীতসংস্কৃতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই বলেই আধুনিক বাংলা গানের আয়ু আজ সীমিত। বিদেশী গ্রামোফোন রেকর্ডের তর্জমাকে যদি বাংলা গানের সমৃদ্ধির পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তার চাইতে অপমানকর অবস্থা আর কি হতে পারে?

এই অবস্থার মধ্যে অচেতন হয়ে বসে থাকার অর্থ আন্তরিক অনুভবের অভাব। মাছের বা সরষে তেলের দাম বাড়লে আমরা সচকিত হই, কিন্তু সাংস্কৃতির বিপর্যয় দেখা দিলে আমাদের মনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে পরিবেশের কথা ভাবতে হয়, যে পরিবেশ আমাদের লম্বা জুলফি, বেল বটম প্যান্ট, সস্তা আনন্দের দিকে চালিত করছে, সে-পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণ করে আমরা শরীর দিয়ে চিন্তা করি, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়। অতএব এমন একটা পোষাকী পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে সঙ্গীতেও তার প্রভাব এসে পড়ে। শ্রোতার মান সঙ্গীতের মান নির্ধারণ করলে সঙ্গীতের দৈন্য প্রকাশ পাবেই। কারণ সঙ্গীতকে যেখানে হুকুম তামিল করতে হয় সেখানে বাইরের সস্তা চটক বাদ দেওয়া যায় না। রুজ লিপস্টিক মাখিয়ে তার মনোহারিত্ব বাড়াতে হয়।

জনরুচি যে নিম্নগামী সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে—সঙ্গীত বা গান জনরুচির পর্যায়ে নামবে, না জনরুচি উচ্চগ্রামে উঠে সঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করবে? আর্টকে নিম্নগামী করার অর্থ বেসাতি এবং এর ফলে যে অকিঞ্চিৎকর অবস্থা সৃষ্টি হয় তার নজির ইতিহাসে আছে। রাজগী ত্রিপুরার অবস্থা সম্বন্ধে একটি বইয়ে দেখলাম, ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো 'রাস্তায় রাত্রিতে কি দিবাতে যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কোনও প্রকারের অশ্লীল গাহান.. ইত্যাদি করা প্রকাশ হইলে ঐ ব্যক্তি ১৫ দিবসের অনধিককাল শ্রম কি বিনাশ্রমে কোন একপ্রকার কয়েক ও ১০৲ দশ টাকার অনধিক জরিমানা' হইতে পারিবেক।'

বলা বাহুল্য কবি পাঁচালি প্রভৃতি শ্রেণীবাচক বাংলা গান দিয়ে জনরুচির তাঁবেদারি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল যে আদিরসাত্মক গানের অবতারণা করতে থাকেন তার ফলেই এককালে সৃষ্টি হয়েছিলো বিদ্যাসুন্দর, খেউর প্রভৃতি গান। এসব গান যে অতি নিম্নরুচির পরিচায়ক এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর তা উপরোক্ত রাজগী ত্রিপুরার রাজনির্দেশ থেকেই বোঝা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই নিম্নগতি সুরে নয়, গানের ভাষায়।

সুরকে নিম্নগামী করার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায় আধুনিক বাংলা গানে। রাগরাগিনী বিসর্জন দিয়ে এমন কতকগুলি আঙ্গিক বাংলা গানে এসে পড়ছে যার অর্থ খুঁজে পাই না (অবশ্য সব গানে নয়)।

শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েরই অবচেতন মনে একটা গ্রহণ-বর্জনের অনুভূতি থাকে। এই অনুভূতির পৃষ্ঠপটে থাকে শিক্ষা, দীক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাব। শিল্পী চায় তাঁর অনুভবের অনুরূপ গান শোনাতে, শ্রোতা চায় তার অনুভবের অনুরূপ গান শুনতে। এই দুই বিপরীতধর্মী টানের মধ্যে পড়ে বাংলা গানকে নিষ্পেষিত করা কখনই উচিত নয় এবং উচিতও নয় তাকে কাক শেয়ালের ডাক দিয়ে মণ্ডিত করে জনরুচির দাসত্ব করা।

যারো টাকার গান লেখক আজকাল বহু হয়েছে। যেমন তেমন করে মনের সঙ্গে বনের মিল করে তারা চাহিদার যোগান দিয়ে চলেছেন। ভাবের ধার তাঁরা ধারেন না, শুধু কথার ছট হলেই হলো। আজকালকার দেশাত্মবোধক গান শুনলেই বুঝতে পারবেন কতো ঠুনকো তাদের ভাববিন্যাস। টেন্ডার মাধ্যমে গান রচনা আজকালকার দিনে যেভাবে দেখা দিয়েছে তার পরিসমাপ্তি যে কোথায় বলা যায় না। কিন্তু 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' পর্যায়ের গানের সঙ্গে আধুনিক দেশাত্মবোধক গানের তুলনা হয় কিনা সেবিষয়ে পাঠকমাত্রেই আশা করি ভেবে দেখবেন। দ্রব্যমূল্যের পর্যায়ে বাংলা গানকে টেনে আনলে ভেজাল মেশানো থাকবেই হাট-বাজারের সকল অভিজ্ঞান আজকাল বাংলা গানে দেখা যাচ্ছে। আজকের চাহিদা যেমন কালকে থাকে না, গানের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতির ধুয়া ধরবার অভিপ্রায় তাই নিছক ব্যবসাগত প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়েছে। বেশি মাল কাটানোর বৃত্তির পশ্চাতে তাই থাকে প্রচার অর্থাৎ চাহিদাবৃদ্ধির নিরঙ্কুশ অভিযান। প্রচারকে আমি খারাপ বলি না, সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভেইলী প্যাসেঞ্জাররা যখন হকারদের বাক্যবাণে কাবু হয়ে ধূপকাঠি কিনে বাড়ি গিয়ে যখন দেখেন গোলাপগন্ধের লেশমাত্র নাই তখন ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা সাবধান হয়ে যান, প্রচারে আর তখন তাঁদের মন গলাতে পারে না।

আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে বাংলা গানকে এখন রাগভিত্তিক হতে হবে। পাখি মুরগি পায়রার ডা কনিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। রাগভিত্তিক অর্থে আমি খেয়াল ঠুমরীর কার্বন কপি হতে বলছি না। সপ্তসুরের মধ্যে যে রসভান্ডার সঞ্চিত রয়েছে তা মন্থন করে যেসব গান ভারতীয় সঙ্গীতকে যুগে যুগে সঞ্জীবিত করে রেখেছে তার কণামাত্র বাংলা গানে থাকলে হয়তো আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে। বাংলা গানে সুরের বৈচিত্র্য আছে সত্য কিন্তু তা এখন এমন খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে যে কিছুদিন পর আর হয়তো বাংলা গানকে চেনা যাবে না, যেমন চেনা যায় না আজকালকার ছেলেমেয়েদের পিছন থেকে। সুরের প্রবাহে অভারতীয় স্রোত মিলে সব ঘোলাটে করে তুলেছে। সুরের মাধ্যমে শিল্পীর মনোগত ভাব রূপায়িত করার ব্যাপারে আমরা পরের দ্বারস্থ হতে যাবো কেন? আমাদের কি কি কোনও সম্পদ নাই? স্বাতন্ত্র্য, সাবলীলতা বজায় রাখতে অভারতীয় ধারা অবলম্বন করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। বৈচিত্র্য অবশ্যই দরকার। কারণ সঙ্গীত তো কুচকাওয়াজ নয় যে সকলে একতালে পা ফেলবে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও ভাববিকাশের ধারা বজায় রেখে বাংলা গানের রাগরাগিনীভিত্তিক রূপায়ণ সম্ভব বা প্রয়োজন কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন এসেছে। কথার সৃষ্টির পাশে সুরের সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা না করলে একাজ সম্ভব নয়। বাংলা গানের আয়ুবৃদ্ধির ব্যাপারে একাজ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সুর অর্থে খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী নয়, রাগরাগিনীভিত্তিক সামান্য কিছু নক্সা। যেমন ধরুন তিলক-কামোদের পানিসারেগমা, বেহাগের পামগাঙ্গাগা, শঙ্করার পাসাসা, রাগেশ্রীর সাণিধাণিসাগা ইত্যাদি বহু প্রকার শব্দ-সমষ্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগরাগিনীর এসব শব্দসমষ্টি যুগ যুগ ধরে যখন জীবন্ত রয়েছে তখন সেগুলিকেই অলঙ্কার হিসাবে বাংলা গানের গলায় পরালে মনে হয় কিছু আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে।

১০০ বছর আগে বানান সংস্কার

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

'আনন্দ সঞ্চার' শব্দ দুটিকে যদি 'আনংদ সংচার' এভাবে বানান করা যায় তাহলে পড়া ও লেখায় কোনও ব্যাঘাতের সম্ভাবনা (সংভাবনা) আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আজও অনেকে অস্বস্তি বোধ করবেন, ইতস্তত ত করবেনই।

অথচ অমন সংস্কারের প্রস্তাব করার দুঃসাহস একশ বছর আগে হয়েছিল শ্রী.....-এর। বঙ্গ দর্শন-পত্রে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তখন বঙ্গ দর্শনের ষষ্ঠ বর্ষ চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, তবু নিয়ন্ত্রণ আছে পুরোমাত্রায়। সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী প্রবন্ধকারের নামটি অনুল্লেখিত। তিন মাসে তিনটি কিস্তিতে লেখার শুরুতে বা শেষে কোথাও যেমন লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি তেমনি ঐ বর্ষের অন্তিম সংখ্যায় সমগ্র বছরের রচনাসূচিতেও ঐ প্রবন্ধের লেখকের নাম নেই।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনাবশ্যক বর্ণগুলি বর্জন করার যুক্তি দেখিয়ে ঐ প্রবন্ধ লেখক বলেছিলেন, '..যদি ঙ প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণ দ্বারা উপরে সংযুক্ত বর্ণগুলিকে পূর্ববর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া লেখা হয়, তবে ঙ্গ, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ট, ঙ্ঠ, ঙ্ড, ঙ্ঢ, ঙ্ত, ঙ্থ, ঙ্দ, ঙ্ধ, ঙ্প, ঙ্ফ, ঙ্ব, ঙ্ভ এই দ্বাবিংশতি বর্ণ এবং তাদের স্বর ও ফলাযুক্ত ভেদ সকলকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া যায়।' এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদিক মন্ত্র, প্রাকৃত ও হিন্দির দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে এই রীতি অনুসরণের পক্ষে প্রমাণও দাখিল করেছেন। সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, 'কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন দন্ত-কে দংত লম্ফ-কে লংফ ইত্যাদিরূপে লিখিলে উচ্চারণ ভেদ হইতে পারে। একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দংত এরূপ লিখিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় মনুষ্যের প্রকৃত উচ্চারণ সেইরূপ, দন্ত এরূপ সংস্কৃত উচ্চারণ মাত্র।'

প্রায় একশ বছর আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে বর্ণমালা সংস্কারের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়: '.... তাহার উচ্চারণের কোন হানি না হয় অথচ মুদ্রাঙ্কনের সৌলভ্য হয় ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।' বিদেশি ও এদেশি নবশিক্ষার্থী যাতে সহজে বর্ণপরিচয় করতে পারে সেদিকটাও বিবেচনা করা হয়েছে। তাই 'অভীপ্সিত সংস্কারের সহিত প্রথমে বাঙ্গালার বর্তমান বর্ণমালার স্বরূপ নির্দেশ করা' ও হয়েছে। প্রবন্ধকার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, 'এস্থলে ইহাও বলা যাইতেছে আমরা যেসকল সংস্কার করিব তাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবেন তাঁহাদের সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা উচিত। কারন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ্য করা উচিত হয় না।' একটু পরে আবার উল্লেখ করা হয়েছে: 'সংস্কৃত বর্ণমালা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতানুরূপ করিলে অধিক লোকের বৃথা ক্ষতি সহ্য করিতে হয় মাত্র।'

বর্ণমালা সংস্কারে উদ্যত এই নামহীন প্রবন্ধকার যে যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ভাষা ও ব্যাকরণে সম্যক ব্যুৎপন্ন তা এই দীর্ঘ লেখাটি পড়লে বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। সেইসঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয় যে তিনি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এবং দূরকালের কথা মনে রেখে এইসব প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। শতবর্ষের অবসরে আমরা তাঁর অনেক প্রস্তাব গ্রহন করেছি বটে, কিন্তু এখনও অনেকগুলি রয়েছে রূপায়নের অপেক্ষায়।

আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠবর্ষ (বাঙলা ১২৮৫ সন) নবম সংখ্যায় ৪১৩ থেকে ৪২৬ পৃষ্ঠা দশম সংখ্যায় ৪৪৯ থেকে ৪৫৮ পৃষ্ঠা এবং একাদশ সংখ্যায় ৪৯৩ থেকে ৪৯৭ পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবন্ধের সূচনায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 'বর্ণমালাগত বৈষম্য দূর করিবার নিমিত্ত' ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ডক্র সাহেব 'রোমান বর্ণমালার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ উচিত' বলে 'নিজ মত সমর্থনের জন্য যেসকল যুক্তির উপন্যাস' করেছেন তার বিচার করা হয়েছে। ডক্র সাহেবের আগে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোনস 'ভারতবর্ষীয় বাক্যসকল রোমান অক্ষরে লিখিতে প্রবৃত্ত হন'। চার্লস ট্রিবিল্যান, ডফ সাহেব, টমাস সাহেব, প্রফেসর মনিয়র উইলিয়ম প্রমুখ ছিলেন এই মতের সমর্থক। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ লাইটনর, রেভারেন্ড জেমস লং, পার্সন সাহেব প্রভৃতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন এই পক্ষে। তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসায়েটির জার্নালে 'হিন্দী-ভাষার মূল নিরূপন' বিষয়ে ইংরেজী প্রবন্ধে প্রসঙ্গত যে অভিমত প্রকাশ করেন সেটি অবলম্বনে 'বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার' প্রবন্ধের শেষ কিস্তিটি রচিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্ত হল: একরূপ ভাষা ও একরূপ বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র।

প্রবন্ধকার বলেছেন, 'ডাক্তার লাইটনরের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের বর্ণমালার কোনরূপ সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত।'

রোমান হরফে বাঙলা লেখার পক্ষপাতী না করে বরং প্রচলিত বর্ণমালাকে সংস্কৃতের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করলেই তা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে—একথা প্রবন্ধকার যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন। তারপর অগ্রসর হয়েছেন বর্ণমালা সংস্কারের কাজে। সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়ার সময় তিনি বাঙলাভাষার বিশেষ চরিত্রটি অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছেন।

বর্ণমালা সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবের মুখ বন্ধ হিসেবে প্রবন্ধকার দীর্ঘ ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে বৃহস্পতির মন্তব্য উদ্ধার করা হয়েছে। স্বর ও ব্যঞ্জনের মৌলিক সংখ্যা, স্বর-সংযোগে ব্যঞ্জনের ভেদ, স্বিত্ব বিধান দ্বারা সংযুক্ত অক্ষর বৃদ্ধি, সন্ধি, প্রত্যয়, আগম, চিহ্ন প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। তারপর দেখানো হয়েছে প্রাকৃতে ঋ ৯ ঐ ঔ এই চারটি স্বর নেই এবং ব্যঞ্জনের মধ্যে ঙ ঞ ন ষ শ য ও এগুলির সংযুক্তবর্ণ ব্যবহৃত হয় না। '....ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে প্রাকৃতের বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা ন্যূন।' প্রাকৃত থেকেই বাংলা হিন্দি এ-সব ভাষার উৎপত্তির কথা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে 'অনেক স্থলে প্রাকৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ অবস্থান করিলেও লেখন পদ্ধতি প্রাকৃতকে তুচ্ছ করিয়া সংস্কৃতানুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে।' 'আমরা যদিও উচ্চারণ করিবার সময় কাজ, দ্বার, বিসসাস, কৃষ্ন বা কৃষ্ন ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করি কিন্তু লিখিবার সময় কার্য, দ্বার, বিশ্বাস, কৃষ্ণ এইরূপ লিখি। এরূপ না লিখিলে সর্বশাস্ত্রবেত্তাও মূর্খ হন। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।'

প্রবন্ধ লেখক একশ বছর আগেই বাঙলা স্বরবর্ণ থেকে ঋ ৯ ৯৯ এই তিনটিকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাঙলা বর্ণমালা থেকে ঋ ও ৯৯ দীর্ঘস্বর দুটি অপসৃত হলেও এখনও ৯-কে বিদায় দেওয়ার সাহস আমরা দেখাতে পারি নি। বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—বাঙলায় দুটো ব এক নয় বটে, কিন্তু সংস্কৃতের মত এদের আ[illegible] ও উচ্চারণে ভিন্নতা রক্ষিত হয় না বলে

বর্ণমালা মধ্যে কেবল একটি ব রাখিলে আমরা কিছুই হানি দেখিতে পাই না।' তবু আজ পর্যন্ত দুটি ব-ই বাঙলা বর্ণমালায় বজায় আছে।

বাঙলায় ঙ বর্ণটির 'পৃথকরূপে ব্যবহার নাই অর্থাৎ ইহাতে এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে ঙ স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে'—এই যুক্তি দেখিয়ে প্রবন্ধলেখক ঙ-র জায়গায় অনুস্বার ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাহলে 'পঞ্চমবর্ষীয় বঙ্গবালকের বিষম ভীতির স্থান বর্ণগণিদিগের মত বৃহৎ উর্ধ্বাধারী এই অক্ষরটিকে হাস্যমুখে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি'। এপ্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে: বর্তমানে অবশ্য ং-এর ব্যবহার বিস্তৃত হলেও প্রবন্ধলেখকের প্রস্তাব সর্বৈবভাবে গৃহীত হয়নি।

প্রসঙ্গত ঞ বিষয়ে একটি সরস মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: 'কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় একটি কথা আছে যাহা ঞ দ্বারা সংযুক্ত। সে কথাটি 'বাঞ্ছা' বাঙ্গালীদের একমাত্র ভরসাস্থল। অম্লানমুখে দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিতে এমন আর কোন জাতিই নাই' সুতরাং ঞ-টিকে রাখিতে হইতেছে। 'বাঞ্ছা' উঠান অপেক্ষা বাঙ্গালাভাষার লোপ করাও সহজ।

প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছিলেন যে বাঙলায় অচসংযুক্ত কয়েকটি বর্ণের আকার কিছু অস্বাভাবিক। যেমন গ্+উ=গু, র্+উ=রু, শ্র, হ্র, স্ত্র, স্ত, প্র, স্ত্র, শ্র, শ্র, সু, ব্র এভাবে সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত বর্ণগুলিকে চেনাই দুঃসাধ্য। এগুলিকে গ্র, র্র, শ্র, হ্র...প্রভৃতি আকার দেওয়ার প্রস্তাব করে প্রবন্ধকার লিখেছেন: 'ইহাদিগকে স্বাভাবিকরূপে লিখিলে কোন হানি হয় না, বরং শিক্ষার সৌলভ্য হয়।' লেখকের এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য আমাদের চলতি শতকের অর্ধেকটা পার করে দিতে হয়েছে। লাইনো হরফ উদ্ভাবনের পর ঐসব কিম্ভূত অক্ষর আর ছাপায় দেখা যায় না। 'গ্র, র্র, শ্র, স্ত্র'-র জায়গায় 'ক্ত, ত্ত, ত্ত্ব, স্ত্ত্ব' লেখার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু এর সবগুলি প্রচলনের সাহস এখনও আমাদের হয়নি। তাছাড়া পুরনো ছাঁদে লেখা ও ছাপা ত আজও চলেছে।

বাঙলা সংযুক্ত বর্ণের বর্গীকরণ করে প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন যে বাঙলায় দশটি ল-সংযুক্ত (ক্ল, প্ল,....), এগারটি ম-সংযুক্ত, চব্বিশটি ম-সংযুক্ত, পাঁচটি ঙ-সংযুক্ত, ছটি এ-সংযুক্ত, নটি ণ-সংযুক্ত, ছটি স-সংযুক্ত, পাঁচটি ষ-সংযুক্ত, দুটি শ-সংযুক্ত, পাঁচটি ধ-সংযুক্ত, দুটি গ-সংযুক্ত, তিনটি ক-সংযুক্ত, দুটি চ-সংযুক্ত, তিনটি ত্র-সংযুক্ত, একটি ট-সংযুক্ত, একটি ত-সংযুক্ত, একটি থ-সংযুক্ত, একটি ড-সংযুক্ত বর্ণ আছে। এছাড়া ব-ফলা ৩৬টি, ব-ফলা ১৬টি, ব-ফলা ২৫টি ও বেফযুক্ত ১৭টি বর্ণভেদের হিসেব দেওয়া হয়েছে। সংযুক্তবর্ণগুলির ভয়ংকরাকৃতি উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, 'বর্ণপরিচয়ের সংযুক্তবর্ণ বিষয়ক পত্রগুলি দেখিলে বোধহয় যেন কুস্তির আখড়া, একটার উপর আর একটা চড়াই করে বসেছে।'

সংযুক্তবর্ণের সংস্কারের ব্যাপারে লেখক চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ব্যঞ্জনসংযুক্তবর্ণ স্থলে আমরা এইরূপ একটি সাধারণ নিয়ম করিতে চাই যে সংযুক্ত বর্ণদ্বয়কে একত্র না লিখিয়া তাহাদের মধ্যে অচহীন বর্ণের নীচে যদি হসন্ত দিয়া লেখা যায় তাহা হইলে কোন হানি হয় না বরং বর্ণপরিচয়ের অনেক সৌকর্য উৎপন্ন হয়। ঘ, ন্ব ইত্যাদি বর্ণ যে কিসে কিসে সংযুক্ত তাহা সহজে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের মতে যদ্যপি স্থানব্যয় হইবে বটে কিন্তু কোনরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ আমাদের মতে 'বুদ্ধি' 'বুদ্ধি' একই। আর সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করিয়া লিখিতে হইবে তাহার কোন বিধি নাই। পাণিনী বলিয়াছেন অচ দ্বারা অব্যবহিত হল বর্ণকে সংযুক্ত বলা যায়।' একটু পরে এই প্রসঙ্গে আবার বলেছেন: 'সংযুক্তস্থলে অক্ষর না থাকিলে এখনও পূর্ববর্ণে হসন্ত যোগ করিয়া লেখা হয় সুতরাং ইহা একপ্রকার স্বীকৃত পদ্ধতি।' তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রচলনে যে দুঃসাহস আবশ্যক তা এই একশ বছরের আমরা সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। কেবল লাইনো হরফের কল্যাণে বেশির ভাগ সংযুক্তবর্ণের আকার সরল হওয়ায় বর্ণগুলিকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়ায় সুবিধে হয়েছে। কিন্তু জ্ঞ (=জ্+ঞ) আর ক্ষ (=ক্+ষ) আজও দুর্জ্ঞেয় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজিত। 'জ্ঞ' নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের একটি পাদটীকা উদ্ধারযোগ্য: জ্ঞ এই অক্ষরটি জ-এর নীচে ঞ-র যোগে সম্পন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু এ তত্ত্ব আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে জানি। বাঙ্গালায় ইহার আকার ও উচ্চারণে ইহাতে যে ঞ-র সম্পর্ক আছে তাহা ত বোধহয় না।'

গীত রচনা: পুলক বন্দ্যো ।। চিত্রগ্রহণ: দীপক দাস ।। সম্পাদনা: বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ।। শিল্প নির্দেশনা: সূর্য চ্যাটার্জী ।। প্রধান কর্মসচিব: সুখেন চক্রবর্তী ।। প্রচার: ধীরেন মল্লিক ।। নেপথ্য কণ্ঠে: হেমন্ত।।আরতি।।হৈমন্তী।। ।। দিপালী ।।

।। প্রাপ্ত বয়স্কদের ছবি ।।

উত্তরা - পূরবী - উজ্জলা - পদ্মশ্রী

জয়া ।। পুষ্পশ্রী বেহালা ।। যোগমায়া ।। শ্রীকৃষ্ণ নৈহাটি সিনেমা ।। শ্রীরামপুর টকীজ ।।

রেফাক্রান্ত দ্বিত্ব শব্দের দ্বিত্ব শব্দের দ্বিত্ব বর্জনেরও প্রস্তাব প্রবন্ধলেখক করেছিলেন। '...ইহাও বক্তব্য যে রফলা-যুক্ত বর্ণ যে দিত্ব করিয়া লেখা হয় সে কেবল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে, সংস্কৃতেও তাদৃশ দ্বিবিধিত নিত্যতা নাই। যাহা হৌক ভাষায় ওরূপ দ্বিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ 'কর্ম্ম' যদি 'কর্ম' এইরূপে লেখা হয় তাহা হইলে কিছুই হানি নাই।' এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কেটে গেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের যে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয় সেখানে সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত শব্দে রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনের বিধান অনুমোদিত হয়। গোড়ার দিকে এ নিয়ে খুব হইচই ও বিরোধিতা হলেও শেষপর্যন্ত এই বিধি স্বীকৃত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। তবে রেফাক্রান্ত শব্দের দ্বৈততা লোপের কৃতিত্বটা যদিও বৈধভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির প্রাপ্য তবু দূর অতীতে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় যে সেই চিন্তার নিদর্শন রয়ে গেছে সেটাও স্বীকার্য ও স্মরণযোগ্য।

প্রবন্ধলেখক স্বরবর্ণের সংস্কারকল্পে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাকে বৈপ্লবিক বলা চলে। ' যদি ই ঈ উ ঊ ঋ এ ও ঐ ঔ ইহাদিগকে যথাক্রমে অি অী অু অূ অৃ অে অো অৈ অৌ এইরূপ করিয়া লেখা হয় তাহা হইলে আপাতত দেখিতে কিছু কেমন কেমন ঠেকে মাত্র, আসলে কিছুই হানি হয় না।.... অনুশীলনপূর্বক দেখিলে এবং ইহা জানিতে পারা যায় যে পূর্বে 'ই' প্রভৃতির আকার 'অি' 'অী' ইত্যাদি রূপ ছিল কালবশে পরিবর্তন লাভ করিয়া 'অি' ই এবং 'অী' ঈ হইয়াছে...। প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের স্বরাকারের ভেদ কেবল দশটি থাকে। যথা—অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ো, ৌ।' এর ফলে যে কম্পোজিটর ও ডিস্ট্রিবিউটরদের বিশেষ সুবিধে হবে এবং কেসবকস অর্থাৎ অক্ষরাধারের প্রকোষ্ঠ কমানো যাবে সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই মত অবশ্য পরবর্তীকালে আরও কেউ পুনরায় উত্থাপন করেছেন। এই শতকের মাঝামাঝি এ নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়। কিন্তু পরিণামে ই ঈ ইত্যাদিকে অি অী ইত্যাদি রূপে লেখা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

প্রবন্ধলেখক তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে সবশুদ্ধ ৮২টি অক্ষরেই বাঙলা বর্ণমালার কাজ চালানো সম্ভব। তাঁর হিসেব অনুসারে: স্বরবর্ণ দশটি, ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিশটি (ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ) এইসব বাঙনের আরও একত্রিশটি অঙ্গীকার, হসন্ত অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি পাঁচটি ক্ষ ও জ্ঞ এই দুটি এবং পাঁচটি ফলা (য, ব, ম, র ও রেফ)। একশ বছর আগে এরকম প্রাগ্রসর চিন্তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রস্তাব করতে গিয়ে প্রবন্ধকার বাঙলা বানানের ক্ষেত্রে অনেক যুগান্তকারী সংস্কারের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সেদিন অমন রক্ষণশীলতালেশহীন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে তাঁর যুক্তিমন ও স্বচ্ছচিন্তা নির্ভুলভাবে প্রতিভাত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর পত্রিকায় (যদিও তখন বঙ্গদর্শন সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের উপর) এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশ করে লেখকের যুক্তির সারবত্তাকে প্রকারান্তরে স্বীকার নিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি যখন পত্রস্থ হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সতের-আঠার।

প্রবন্ধকারের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন এখন সম্পূর্ণাংশে গৃহীত বলা চলে। এই শতকের তিনের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত বাঙলা বানান সংস্কার সমিতি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনপুষ্ট হয়ে যে অনেকগুলি কার্যকর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঙনের দ্বিত্বলোপ তার অন্যতম। অনুস্বারের ব্যাপারেও ঐ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান দিয়েছিলেন। তবে সেটি খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃতশব্দে সন্ধির সময় পরপদের গোড়ায় ক খ গ ঘ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্-এর স্থানে ং লেখা চলে। তার মানে, 'অহঙ্কার সঙ্গীত' প্রভৃতির বদলে 'অহংকার সংগীত' লেখা চলতে পারে। কিন্তু আশংকা বা গংগা বিধেয় নয়। আর অ-সংস্কৃত শব্দের বেলায় 'বাঙলা রঙ' প্রভৃতির জায়গায় 'বাংলা রং' এরকম লেখাও চলবে। বানান সংস্কার সমিতির বিধানের ফলস্বরূপ অবশ্য বাংলা বানানে অনুস্বারের প্রয়োগ অনেক ব্যাপক হয়েছে। বিধান ভেঙে অনেক তথাকথিত ভুল বানানও লেখা হচ্ছে। কিন্তু বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধটির প্রস্তাব অনুসরণ করলে অনুস্বার শুধু ক-ন বিকল্পেই নয়, ঞ ণ ন ম-র বদলেও লেখা যাবে। হিন্দিতে 'পংডিত' 'সংচয়' লেখা হয়। প্রাকৃতে ত ছিলই।

যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখার প্রস্তাবটি সোয়াসুজিভাবে গৃহীত না হলেও বাঙলা বানানে এর দেখা মেলে একটু অন্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনকে ভেঙেছেন। তাঁর লেখায় 'উদ্বেগ উদ্যোগ' রূপ পেয়েছে 'উদ্‌বেগ উদ্‌যোগ'। 'আপনা ইস্কুল' ইত্যাদিকে স্বাভাবিক বানান করা হয় 'আলপনা ইসকুল'। অতৎসম ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেই এটি চলে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে নির্বিচারে এই সংস্কার চালানোয় হয়ত একটু অসুবিধে হবে। কারণ তাহলে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তৎসম শব্দের অক্ষর ও আকৃতি সংস্কৃতানুগ হলেও বাঙালির উচ্চারণে প্রায়শই সেগুলি অশুদ্ধ। তাই বিস্ময় আহ্বান চিহ্ন পরে এই সব শব্দের যুক্তাক্ষর হস্-চিহ্ন দিয়ে লিখলে অন্য রকম গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর জ্ঞ ও ক্ষ-র আদি উচ্চারণ বাঙালি ত্যাগ করেছে। ঐ দুটি যুক্তাক্ষর বজায় রাখার কথা ত প্রবন্ধকার নিজেই বলেছেন।

প্রবন্ধকারের অপর বৈপ্লবিক প্রস্তাব ই উ প্রভৃতিকে অি অু আকার দেওয়া আর হয়ত হয়ে উঠবে না। তার কারণ ঐ প্রস্তাবের যৌক্তিকতার অভাব নয়। কারণ হল, ই উ এ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এত দিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এগুলিকে আজ আর লোপ করার উপায় নেই। ভাষায় যখন কোনও বর্ণ বা বানান দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থেকে স্থায়িত্ব অর্জন করে তখন সেগুলির আকস্মিক বিলোপসাধন সহজ-সাধ্য নয়। ঐ প্রস্তাবের পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হল বলে পরবর্তী শতবর্ষে যদি একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে তা গ্রাহ্য হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধটি নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তা উদ্রেককারী। তবু কেন জানি না, এটি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এমন কি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরাও প্রবন্ধটির লেখকের নাম উদ্ধার করতে উৎসাহ বোধ করেন নি। প্রবন্ধকার যেমন ভাষা ও ব্যাকরণের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর লেখার ঢংটিও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও চিত্তাকর্ষক। এই রচনার ছত্রে ছত্রে যেন ঠাকুরবাড়ির মর্যাদা ও প্রসাদগুণ ওতপ্রোত।

বাংলার বাইরে বাঙালী

ভূপাল

বর্ষা শেষ। কালিদাসের কল্পনার মালবার মধ্যমণি ভূপালের আকাশ মেঘ-মুক্ত। নীলের বুকে তুলো মেঘের আনাগোনা শুরু—বিরামহীন। ভূপালকে তালের শহর বলে। তাল মানে জলাশয়। বড় দুই লেক শহরকে ঘিরে রয়েছে। বড় লেক দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল। অতীতের রাজা ভোজপাল থেকে অপভ্রংশে পরিণত হয়েছে ভূপালে। আফগান সর্দার দোস্ত মহম্মদ খান ১৭০৮ সালে নবাবীর পত্তন করেন, তাই শহরে মুসলীম নামের ছাপ সর্বত্র। বিশেষ করে পুরোনো ভূপালে। বর্তমানে এ শহর চার শরীকের ভাগে। পুরাতন, নূতন আর বৈরাগড় এবং হেভী ইলেকট্রিকস।

স্টেশনে নেমে তিন রাস্তার মোড় থেকেই সুসজ্জিত দোকান, হোটেলের মনোরম শোভা। এর পিছনেই পুরাতন শহর। ছোট ছোট গলি পথ। বাঁশের চিক্‌শোভিত লাগোয়া বাড়িঘর, সীমানা চিহ্নিত করা কর্পোরেশনের পক্ষে মাথা ব্যথার সামিল। সেমরাবা, মঙ্গলবাবা, বুধ-বাবা, ইতবারা—মহল্লার নাম, অতীতে ঐদিনে জাহাঙ্গীরাবাদ, যে অঞ্চলে নবাবের প্যালেস—তাকে বলে আহমদাবাদ। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পাতৌদি বর্তমানে নবাব খানদানের উত্তরাধিকারী। শর্মিলা টেগোর ওর ঘরণী। স্কুল, কলেজের নাম হামিদিয়া, সুলতানিয়া এই দুই নামে দুটি বৃহৎ এবং প্রধান হসপিটাল আছে। নবাব এবং বেগমের নামানুসারে।

ছোট গলি। নোংরা জলের গন্ধ। দূষিত পায়খানার দুর্গন্ধ। সেইজন্য প্রবাদ প্রচলিত, নর্দা পর্দা, জর্দার সংমিশ্রণে তৈরী ভূপাল। কাঁচা নর্দমা, দরজায় চিকের ব্যবহার, নবনারী জর্দার ব্যবহারে অভ্যস্থ। সৌখীন মখমলের থলিতে পান সুপারী ও জর্দা রাখে। এমন কি মহিলারাও অভ্যস্থ।

প্রায় তিন লাখের শহর। বাস আর ছোট তিন চাকার টেম্পো চলাফেরার জন্য একমাত্র সহায়, পাহাড়ী শহর। উঁচুনিচু পথ। তবু সাইকেলও খুব চলে। পুরোনো ভূপালের পথঘাটের অনেক সংস্কার হয়েছে ১৯৫৬ এর পর, যখন নতুন প্রদেশের রাজধানীর পত্তন হয়।

শিমলা হিলস-এর শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে বৈরাগড় ছবির মত চোখের সামনে ধরা পড়ে, এরোড্রামের টাওয়ার সুস্পষ্ট। সৈন্য ছাওনীর জলের ট্যাঙ্ক প্রতীয়মান। বৈরাগড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইটালীয়ান বন্দীদের এনে রাখা হয়েছিল, ভারত বিভক্ত হবার পর সিন্ধুদের তীর ছেড়ে, [illegible] ত্যক্ত ব্যারাক দখল করে। কত কর্মঠ ওরা—এখন দেখলে বোঝা যায়। ব্যবসার কেন্দ্র রূপে একে গড়ে তুলেছে। ছিন্নমূল হয়েছিল, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরিশ্রমের ফল পেয়েছে। গরীব হলেও কর্ম-বিমুখ নয়। ভিখারী নেই কোন সিন্ধী।

দুই জেলা বিশিষ্ট অতীতের ভূপাল রাজ্যের চীফ্ কমিশনারের যে বাসভবন ছিল, তা বর্তমানে গভর্নর হাউস—এরপর বোশনপুরা হতেই নতুন ভূপালের শুরু। শাসকগোষ্ঠী—চীফ সেক্রেটারী হতে শুরু করে কেরানী, পিওন সবাই দুটো লম্বা টানা পাহাড়ের খাঁজে যে কলোনীর পত্তন হয়েছে, তাতে বাস করে।

নূতন শহর টি, টি, নগর। সিপাহী বিদ্রোহের বহুচর্চিত নায়ক তাঁতিয়া টোপের নামে উৎসর্গিত। সুন্দর প্রশস্ত ঝকঝকে রাস্তা। বর্ষাতে জল জমে না। কাদাও নেই। পাহাড়ী শহরে নালা ও মাটির বুকের গর্তে হুস করে বৃষ্টির জল মিলিয়ে যায়। পথের ধারে গাছের সারি। সুদৃশ্য পার্ক। সুইমিং পুল। সর্বজনের ব্যবহার যোগ্য। কৌলিন্য বর্জিত। টি, টি, নগরে মোহল্লার নামে বিস্ময়ের ঘোর, ১২৫০, ১৪৬৪, ৭৫ বাংলো, ৪৫ বাংলো। এই এক এক এলাকার বাসিন্দা পরিচয় বলে দেবে—কে কত বেতনভুক্। এখানে স্কুল, কলেজের নাম—কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, দীপ-শিখা সুভাষ ট্যাগোর। পুরোনো শহর হতে নামকরণের ব্যতিক্রম।

বাঁ হাতের রাঁকা পাহাড়ের নিচে থাকেন জনগণের প্রতিনিধি। এম-এল-এ বেস্ট হাউসে। মধ্য স্থলে ভগবানের বাস। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, লোকে বলে বিড়লা মন্দির। পাহাড়ের বুকে সবুজ মখমল। পাদদেশে সারি সারি চোখে লাগার মত ইউক্যালিপ্টাসের ভিড়। কয়েকটি জল সরবরাহের ট্যাংক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলে, শাসনের বজ্রমুষ্টীর আসন, সেক্রেটারিয়েটে। অদূরে বাঁকা রেল লাইনের উপর হতে দেখলে মনে হয় বিশাল কোন জাহাজের উপর শাসকগোষ্ঠী দূরবীণ দিয়ে শহরকে দেখেন।

পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালী বাসিন্দা কেউ নেই। সবাই নূতন। পরম্পরারূপে বাঙ্গালী এখানেও কালীবাড়ী করেছে টি টি নগরে। কালীমূর্তি অবশ্য স্থাপনা হয় নি। ২০ হাজারের অধিক কর্মীর কলোনী হেভী ইলেকট্রিক্যাল— ওখানে করালবদনা চতুর্ভুজা বেদীতে সমাসীন। দু স্থানেই সরস্বতী, কালী, দুর্গাপূজা হয়। আর হয় শখের থিয়েটার। এ অভিজ্ঞতার ব্যাপ্ততাকে [illegible] হিন্দী ও বাংলা সিনেমার চমক সৃষ্টি করেছে ভূপালের মেয়ে [illegible] ভাদুড়ী।

প্রবাসী বাঙ্গালী পুজো করে, থিয়েটার করে—আবার মনোমালিন্যের ভেলায়ও ভেসে চলে। চাঁদা, ভোগ, প্রসাদ নিয়ে হাসতে হাসতে তর্কের আসর জমায়। এখনকার এক চাকুরে ভদ্রলোক অতীতে শৈশবে শান্তি-নিকেতনে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—বাবাকে পুছে আসিনি। মানে জিজ্ঞাসা করে আসিনি। গুরুদেব হেসে বলেছিলেন আর পড়তে হবে না, আমি শিখিয়ে দেব। তবু কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের ছেলেরা বর্তমানে আরও বেশী হিন্দী মিশ্রিত বাংলা বলে। আ [illegible] বাংলাভাষার গুণ আর ভাব কতদিন প্রবাসে বর্তমান বংশধররা ধরে রাখতে পারবে, কে জানে?

অনিল রায়

গৌহাটি

ভারতের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম বাংলাসহ প্রতিটি রাজ্যে বাঙালীর অস্তিত্ব বহুকাল থেকেই। বিশেষ করে আসামের বাঙ্গালীরা সর্বসুখ-অধিকারপুষ্ট হয়ে আজও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। আসামের মধ্যে বৃহত্তম শহর গৌহাটি। আসামের রাজধানীও বটে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লোহিত নির্ঝর অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। পূর্বে নীলাচল পাহাড়ের শীর্ষদেশে বিখ্যাত কামাখ্যাধাম। এই লোহিত নির্ঝর ও মা কামাখ্যার আশীর্বাদ নিয়েই বেঁচে আছে এখানকার অসমীয়া অধিবাসীরা, বেঁচে আছে এখানকার বাঙালী।

এই শহরের বেশীরভাগ বাঙ্গালী চাকুরিজীবী. কেউ কেউ আসাম সরকারের উচ্চপদস্থ মধ্যপদস্থ নিম্নপদস্থ চাকুরী করেন—কেউ কেউ শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেন—কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী করেন—আবার কেউ কেউ ব্যাংক ও জীবনবীমা প্রভৃতিতে কাজ করেন। আপনি যে অফিসেই যান সেখানে আপনার বাঙ্গালীর অস্তিত্ব চোখে পড়বেই। এখনকার অনেক বাঙ্গালী ডাক্তার ও আইনজীবী। আইনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা এখানে বেশী মর্যাদা পান।

বৃহত্তর গৌহাটিতে সাতখানা বড়ো কলেজ আছে। এর মধ্যে ছয়খানা কলেজেই অনার্সসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয়। এইসব কলেজে অনেক বাঙ্গালী সসম্মানে অধ্যাপনা করছেন অনেককাল ধরে। এই শহরের বুকে বাঙ্গালী স্কুল রয়েছে প্রচুর। বর্তমানে বেশীরভাগ বাঙ্গালী স্কুল আসাম সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চলে গেছে। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি বিখ্যাত শিক্ষানিকেতন। শিক্ষার মানে প্রশাসনে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে এই বিশ্ববিদ্যালয় কম যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীরা পড়াশুনা ও পাঠদান করার সুযোগ [illegible]

আজ গর্বিত। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমমর্যাদা পেয়েছে। কয়েক বছর যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করারও সুযোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গবেষক ও ছাত্রদের জন্য প্রচুর বাংলা বই রয়েছে।

কথাই আছে বাঙালী যেখানেই থাকুক তার সঙ্গে থাকবে সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলা ও একটি কালীবাড়ি। এখানেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই শহরের আনাচেকানাচে বাঙালীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলাচর্চা পুরোদমে চলছে। নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে অনেক সাপ্তাহিক মাসিক, পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক এখান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এর মধ্যে একাল, অধুনা, পৃথিবী, কণ্ঠস্বর, যুগযাত্রী দেশবাণী, ঝিনুকী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা অফিসে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সওদাগর, যুবম, যুবতীর্থ এই তিনটি নাট্যগোষ্ঠী সগৌরবে স্বক্ষেত্রে বাংলা নাট্যধারাকে বেগবান রেখেছে। চিত্রশিল্পে প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী ও মাখনলাল সাহা ইতিমধ্যে চিত্রকলা জগতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। সঙ্গীত জগতেও অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি গেয়ে নাম করেছেন। আকাশবাণী গৌহাটী থেকে মাঝে মাঝে তাদের গান প্রচারিত হয়ে থাকে। (এছাড়া গৌহাটি তথা সারা আসামের বাঙালী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গৌহাটী রেডিও প্রতি সোমবার ও বুধবার বাংলা আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করে থাকে।) এখানকার বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনার অন্ত নেই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা বাড়াবার জন্য বিজ্ঞান-উৎসাহী বাঙালীরা এখানে একটি সায়েন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন অধ্যাপক ডঃ বিভাসদাস পুরকায়স্থ। তাঁরই আগ্রহে এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'কিশোর বিজ্ঞান' নামক একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্পে একমাত্র বাঙালীরাই এখানে আধিপত্য বিস্তার করেছে। বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী বাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীও রয়েছেন এই শহরে।

অতএব কূল কূল বেগে যেমন লোহিত নির্ঝর বয়ে যেতে থাকবে চিরকাল তেমনি চিরকাল এইভাবে বাঙালী তার অসমীয়া ভাইদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে সামনের পথ ধরে—এক উজ্জ্বল প্রাপ্তির দিকে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[illegible]

বোম্বাই

শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে শরৎ এলেই বাংলার ধমনীতে বোধনের বাজনা বেজে ওঠে। বাংলার বাইরে বাঙালী সব সময় হয়তো কাশ ফুলে ছাওয়া শরৎ ঋতুকে দেখতে পায় না, তবু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনুভব করে শরৎকে। নীল আকাশে শাদা মেঘের পাল তার মনে মায় আগমনীবার্তা ঘোষণা করে দেয়। তাই বাংলার বাইরেও নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে দুর্গাপূজা হয়।

বোম্বাই শহরে দুর্গাপূজার (সর্বজনীন) বয়স প্রায় অর্ধ-শতাব্দী। কিছু বাঙালী একত্রিত হলেই যেমন দুর্গাপূজা বা কালিবাড়ির অভাব অনুভব করেন, সেইভাবেই এই পূজারও সূত্রপাত ১৯৩০ সালে। প্রথম পূজাটি হয় তারদেও-তে। এরপর পূজার সংখ্যা একটি-একটি করে বেড়ে চলছে। তারদেও-এর পূজা এরপর অন্য অন্য স্থানে হয়েছে। এই পূজার তত্ত্বাবধান করেন বোম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতি। ১৯৫৪ সালে এই পূজার রৌপ্য-জয়ন্তী হয়। সেই উপলক্ষে প্রধান আচার্য ছিলেন ডাঃ গোবীনাথ শাস্ত্রী। বর্তমানে বোম্বে দুর্গাবাড়ি সমিতি তাঁদের পূজা করেন স্থানীয় তেজপাল হলে, কারণ, এঁদের নিজস্ব কোন ক্যাবঘর নেই।

আগেকার দিনে সাধারণতঃ দুর্গাপূজা হতো ধনী গৃহস্থের ঘরে। ক্রমে ক্রমে তা হলো সর্বজনীন। গৃহস্থের বাড়ি যখন পূজা হতো, তখন সেই পাড়ায় বা গ্রামে তিনদিন কারুর বাড়ি হাঁড়ি চড়ত না। সকলেই পূজাবাড়ি পাত পাততেন। পূজা সর্বজনীন হওয়ায় এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সেই গ্রাম-ভোজ এখন প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা মণ্ডপসজ্জার সৌকর্য দিনদিনই উন্নতি লাভ করছে ঠিকই, কিন্তু সেই বসুধৈব কুটুম্বের অনুভূতি বিগত প্রায়।

আনন্দের বিষয় এই যে, বোম্বাই শহরে দুর্গাপূজা দেখলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কিংবা তারও আগের বাড়ির পূজার আমেজ অনুভব করা যায়। ভোর থেকে মেয়েরা পূজামণ্ডপে এসে শুদ্ধাচারে পূজার আয়োজন করেন। পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময় পূজা, অঞ্জলি ইত্যাদি হয়, তারপর প্রসাদ বিতরণ। দ্বিপ্রহরে উত্তম ভোগের ব্যবস্থা যাতে খিচুড়ি, ভাজা, চাটনি, পায়েস বা বোঁদে, কিছুরই অভাব নেই। আহূত, অনাহূত সকলকে আত্মীয়ের আদরে ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

[illegible] প্রতিটি পূজামণ্ডপে বাংলা সংস্কৃতির উদাহরণ হিসাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। যাত্রা, নাটক, গান, বাংলা সিনেমা ইত্যাদি বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এইসব অনুষ্ঠানে শিশু থেকে বৃদ্ধেরা সমান আগ্রহে নিয়ে যোগ দেন।

প্রতিমা কোথাও কলকাতা থেকে বিনে আসে, কোথাও মৃৎশিল্পী আসেন কলকাতা থেকে। স্থানীয় শিল্পীও অনেক ক্ষেত্রে মূর্তি তৈরি করে থাকেন। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসেন পুরোহিত এবং ঢাকী। পূজামণ্ডপগুলির মধ্যে স্টল বসে—তাঁতের শাড়ি, সিঁদুর-শাঁখার দোকান, বাংলা রেকর্ডের দোকান, বাংলা বই, বাঙালী মিষ্টি সবই থাকে। কলকাতার নামী প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ এবং দে পাবলিশার্স আসেন বাংলা বই-এর ডালি নিয়ে।

দেখতে দেখতে পূজার পাঁচদিন কেটে গিয়ে আসে বিজয়া দশমী। সন্ধ্যায় শান্তির জল, বিদায় সম্ভাষণের পর থাকে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা। পূজাপর্ব সমাধা হয়, বোম্বাই-এর বাঙালীরা তাকিয়ে থাকেন আগামী বছরের পূজার দিকে।

দুর্গাপূজায় শুধু বাঙালী নয়, যোগ দেন বহু অবাঙালী। পূজা, ভোগ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এই পূজায় বাঙালীদের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে, তা নিজেদের মধ্যে দেখাশোনা, মেলামেশা করার সুযোগ। বৃহৎ বোম্বাই শহরে বাঙালীর সংখ্যা কম নয় কিন্তু তাঁরা নির্দিষ্ট কোন স্থানে থাকেন না, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন। দ্রুতগতি জীবনধারা আর দূরত্বের জন্য অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও অনেকের সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে না। পূজা উপলক্ষে যোগাযোগ হয়ে যায়। বলতে গেলে দুর্গাপূজা বাঙালীদের মিলন-অঙ্গন।

নিজস্ব সংবাদদাতা

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা [illegible] হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি [illegible] আমাদের ঔষধের [illegible] থেকেই [illegible] অসুখের পথ [illegible] আমাদের ঔষধের জন্য [illegible] নিন [illegible]

Bharat Ayurvedashram (A.L.)
P.O. K[illegible]SARAI (GAYA)

খেলা

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে কলকাতা ৫—৪ গোলে (টাইব্রেকার পদ্ধতিতে) গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। উভয় পক্ষই দুটি করে গোল করেছিল। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার পদ্ধতির সাহায্যে খেলার নিষ্পত্তি হয়। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৬ বার ফাইনালে খেলে ১৩ বার চ্যাম্পিয়ান হল। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুটি রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে—সর্বাধিকবার খেতাব জয় (মোট ১৩ বার) এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান (মোট ৪ বার—১৯৬৪-৬৭)। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলা থেকে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আশুতোষ শীল্ড জয়ী হয়েছে—কলকাতা (১৩ বার), যাদবপুর (৩ বার) এবং বর্ধমান (১ বার)।

আলোচ্য বছরের মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কলকাতা ১—০ গোলে বোম্বাইকে এবং গুরু নানক দেব ৪—০ গোলে কালিকটকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় কালিকট ৪—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

এখানে উল্লেখ্য, এ-বছর আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলায় পূর্বাঞ্চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরাঞ্চলে গুরু নানক দেব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠেছিল।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ বার খেতাব জয় : ১৯৪১-৪২, ১৯৫০-৫১, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ (উপর্যুপরি চারবার—রেকর্ড) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৬-৭৭। তারা রানার্স-আপ হয়েছে ৩ বার—১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৭৩-৭৪।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা

ওড়িশায় ১৭শ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফাইনালে একদিক থেকে উঠেছে গত বছরের রানার্স-আপ বাংলা এবং অপরদিক থেকে ওড়িশা। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান অন্ধ্রপ্রদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে ০—১ গোলে ওড়িশার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১৬টি দল চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল হিসাবে এই ৮টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল—'এ' গ্রুপ থেকে ওড়িশা ও বিহার, 'বি' গ্রুপ থেকে বাংলা ও ত্রিপুরা, 'সি' গ্রুপ থেকে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে আসাম ও মহারাষ্ট্র। কেরালা 'ডি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হলেও কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের খেলবার যোগ্যতা বাতিল হয়। কারণ, তাদের ৮ জন খেলোয়াড়ের বয়সের সার্টিফিকেট ঠিক ছিল না।

কোয়ার্টার ফাইনালে ওড়িশা ১—০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে, কর্ণাটক ২—১ গোলে বিহারকে, বাংলা ৬—০ গোলে আসামকে এবং মহারাষ্ট্র ১—০ গোলে ত্রিপুরাকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

সেমি-ফাইনালে ওড়িশা ২—০ ও ২—২ গোলে কর্ণাটক এবং বাংলা ২—১ ও ৫—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামে ৩৪তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস এবং মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। অনুষ্ঠানে মোট ১২টি জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১০৭ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (৯৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় দিল্লি (৯১ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৯১ পয়েন্ট), ২য় কেরালা (৬৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় দিল্লি (২১ পয়েন্ট)

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে সার্ভিসেস ৮—৫ গোলে রেল দলকে পরাজিত করে।

আন্তঃ রাজ্য জুনিয়র ব্যাডমিন্টন

গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তঃ রাজ্য জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগে কেরল পেয়েছে নারাঙ্গ কাপ এবং বালিকা বিভাগে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় জয়ী হয়েছে শফি কুরেশি কাপ।

বালক বিভাগে কেরল ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে এবং বালিকা বিভাগের ফাইনালে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

জাতীয় স্কুল গেমস

অমৃতসরে ২৩তম জাতীয় স্কুল গেমসের সাঁতারে পশ্চিমবাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। সিনিয়র এবং জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রী বিভাগে পশ্চিমবাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে এক অসাধারণ নজির প্রতিষ্ঠা করেছে। সিনিয়র বালিকা বিভাগের মোট সাতটি ইভেন্টেরই ফাইনালে পশ্চিমবাংলা খেতাব জয়ী হয়।

সিনিয়র (বালক) : ১ম পশ্চিমবাংলা (৪৫ পয়েন্ট)

সিনিয়র (বালিকা) : ১ম পশ্চিমবাংলা (৪৯ পয়েন্ট)

জুনিয়র (বালক) : ১ম পশ্চিমবাংলা (২৩ পয়েন্ট)

জুনিয়র (বালিকা) : ১ম পশ্চিমবাংলা (২৭ পয়েন্ট)

এশীয় দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৩শ এশীয় দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় ইরাক দলগত খেতাব জয় করে। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সিঙ্গাপুর এবং তৃতীয় স্থান ইরাণ। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল ১১টি দেশ। ভারতের প্রতিনিধিরা মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিযোগীদের ফলাফল এই রকম দাঁড়ায় : ব্যান্টমওয়েটে সুনীল পাত্র ৬ষ্ঠ স্থান, লাইটওয়েটে মলয় রায় ৬ষ্ঠ স্থান, মিডলওয়েটে কে বরগোহাইন ৫ম স্থান লাভ করেন।

দলগত খেতাব বিজয়ী ইরাক লাইটওয়েট বিভাগে প্রথম স্থান, এবং হেভীওয়েট বিভাগে প্রথম স্থান লাইটওয়েটে দ্বিতীয় স্থান এবং মিডলওয়েটে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়ী হন ব্যান্টমওয়েটে মো টেক হিন (সিঙ্গাপুর), লাইটওয়েটে তালিব সেহাব (ইরাক), মিডলওয়েটে রহমৎ জুরাইম (সিঙ্গাপুর) এবং হেভিওয়েটে এ আব্দুল করিম (ইরাক)।

চূড়ান্ত দলগত অবস্থা : ১ম ইরাক, ২য় সিঙ্গাপুর, ৩য় ইরাণ, ৪র্থ ইন্দোনেশিয়া, ৫ম হংকং এবং ৬ষ্ঠ ভারত।

দর্শক

আশা সচদেব

সিনেমা

মন্ত্রমুগ্ধ

বাংলা সাহিত্য আমাদের হাসাতে পারে। তুলনায় বাংলা ছবিতে হাসির বড় অভাব। হাসাবার লোকের অভাব। অপরদিকে হাসবার লোক অনেক। এই অভাবের কারণ হয়ত এই যে হাসি দিয়ে মুগ্ধ করবার মত কোনো মন্ত্র আমাদের পরিচালকদের তেমন জানা নেই। এ ছবির কথাই ধরা যাক। বন-[illegible]র কাহিনীতে রয়েছে [illegible] রসদ। কিন্তু ছবির বেলায় তার ভিরিটাই গেছে পাল্টে। চলচ্চিত্রের শর্ত অনুযায়ী তা ঠিকমত কাজে লাগান যায়নি। এই ধরনের কমেডি-অঙ্গের চলচ্চিত্রের যেখানে চলনটাই বড়, সেখানে প্রয়োজন গতির, সেখানে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই থেমে গেছেন। তাই এসেছে একঘেঁয়েমি। যা কাটিয়ে উঠতে সৌমিত্র-উৎপল-সাবিত্রী-রবির মত শিল্পীরা খুবই চেষ্টা করেছেন। চোখে পড়েছে সম্পাদনার দুর্বলতা। ছবিতে একদিকে রয়েছে অনেক মজার ঘটনা এবং হিউমার। যে দৃশ্যগুলিতে সাবিত্রী এ্যালসেশিয়ানকে প্রেম করেছেন, ঘরের মধ্যে ফ্যাবলা রঞ্জিতকে পাগলা সৌমিত্র তাড়া করেছেন, নাটকীয় কায়দায় উৎপল দত্ত উৎকট মন্ত্র আউড়েছেন বা যেখানে রবি ঘোষ কন্যাগত সাহেবের গ্রুতো হজম করে চলেছেন, সে সব দৃশ্যগুলি না হেসে পারা যায় না। এক দৃশ্যগুলি হেমন্ত-কণ্ঠের গানের সঙ্গে সৌমিত্র-কণ্ঠের তাযালগ বেশ মজা দিয়েছে। এর ওপর আছে অ্যানিমেশন। আবার অন্যদিকে রয়েছে একই মাপের বেশ কিছু দৃশ্য বা ঘটনা যেখানে বিন্দুমাত্র মজা নেই। কিছু গান যা ছবির গতিকে ব্যাহত করেছে। কুকুর নিজেও হয়ে গেছে বাড়াবাড়ি। এগুলোর ওপর কাঁচি চালাতে পারলে ছবি অন্যরকম হত। এখনো এই সমালোচকের বিশ্বাস যে রঞ্জিৎ-সুমিত্রা এবং মেয়েদের হস্টেলের ব্যাপার-স্যাপার বাদ দিলে ছবি অন্য চেহারা নেবে। তবে ছবি পরিচ্ছন্ন। টেকনিক্যাল কাজ ভাল। আর হাসির নামে কোনো ছ্যাবলামিও নেই।

প্রাণ খুলে হাসতে কে না চান। আর যাই হোক হাসতে পারলে শরীর-মন ত ভাল থাকে। কবে যে বাংলা ছবি দেখে হেসেছিলাম তা মনেও পড়ে না।

অসিতবরণ মিত্র

আমরাই বা কম কিসে

প্রযোজক-পরিচালক - সংলাপ - লেখক নাসির হোসেন, কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার শচীন ভৌমিক, সঙ্গীত পরিচালক আর-ডি-বর্মন, শিল্পনির্দেশক শান্তি দাস, চিত্র-গ্রাহক মুনীর খান এবং আরও কিছু টেকনিশিয়ান মস্তিষ্কপ্রসূত ফলটি যে কি পরিমাণে হৃদয়বিদারী হতে পারে তার প্রমাণ নিতে গেলে হিন্দ সিনেমায় 'আমরাই বা কম কিসে' ছবিটি দেখতে ঢুকে পড়ুন। শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ, আর আবার রঙীন ছবি, সুতরাং দর্শনী একটু বেশীই নিতে হবে। কিন্তু আফসোস থাকবে না আপনার।

টিকিট কাটার আগে পরিশ্রমক্লিষ্ট মাথা ধরা ব্যামোটি দশ মিনিটের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। বাজারে জোর গুজব মিউজিক্যাল ছবি করায় নাসির হোসেনের নাটুকে দারুণ দক্ষতা। (ইয়াদো কি বরাত স্মর্তব্য।)

শুধু মিউজিক্যাল নয়, গল্পের গরুকে আকাশে ওঠাতেও তিনি পারেন। ইউরোপ-আফ্রিকা থেকে যখন তখন ঋষিকাপুরকে ফোন পাওয়া যায়, এমনকি ভিলেনের ডেরার ফোন নম্বরটিও তাঁরা জানেন। 'হেলিকপ্টার ব্যবহার সম্পর্কে' ভারত সরকারের কোন বাধা নিষেধ নেই এই ছবি দেখে—এমন ধারণাও আপনি করতে পারেন অনায়াসে। যেমন বিনা আয়াসেই ঋষিকাপুর শারীরিক কসরতে (যা দেখেছি তাকে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বলি কোন জ্ঞানে!) ফার্স্ট প্রাইজ পান, তেমনি হেলিকপ্টার চালাবার লাইসেন্সটি যে কিভাবে কখন যোগাড় করলেন তা দেখতে পেলে পুলকিত হওয়া যেত না হয় কাঁদি রিলের ছবি বাইশ রিল হতো। ক্ষতি কি?

বাবার মৃত্যুশয্যায় আফ্রিকার এক ব্যবসায়ী তাঁর কোটি টাকার সম্পত্তিকে ছাঁকে-চুনী-পান্নায় উপহার করে একটি কোমরবন্দে রেখেছিলেন এবং সেটি অনেক সুপরিচিত ভারতীয়ের হাতে দিয়ে অন্যত্র

করেন ভারতে তার একমাত্র গায়ক ছেলে ঋষি কাপুরের হাতে তুলে দিতে, কিন্তু কাঁঠালের গন্ধে মাছি ভিড় করার মত ঐ কোমরবন্দকে ঘিরে জুটেছে ভিলেনের ভিড়।' আর সেই সঙ্গে কাহিনীকারের মতলবিতে এসেছে. ষোড়শী নায়িকা কাজলকিরণ, সঞ্জীবকুমার, দীপঙ্কর দে'র মিক্স প্রোডাকট প্রেমিক তাবিক। এবং এ'দের প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রমাফিক কার্যকলাপ. উল্লম্ফন, ঘোড়দৌড়, নাচ-গানা-শওয়ালী, কুমারী মেয়ের রং ঢং।'

নাচে গানে (?) মারপিঠ তারপর সে' আর এক ধৈর্যের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা শেষ হতে মনে হোল—'গুড' মার্কস্ নিয়েই পাশ করেছি আমরা। নইলে কোন্ যুক্তি আর সাহসে এমন ভয়ানক একসপেরিমেন্ট চালাতে পারেন নাসির হোসেন-শচীন ভৌমিক প্রমুখ উর্বর মস্তিষ্কগুলি। আমাদের রুচিকেও এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেননা হাউস-ফুল বোর্ডটা ঝুলিয়ে চলেছি আমরাই।

নির্মল ধর

জীবন-মুকত

কয়েকবছর আগে হিন্দী ছবিতে যে নবতরঙ্গ এসেছিল, এই ছবিটি সেই তরঙ্গ বেয়ে হাজির হয়েছে। পরিচালক সুধেন্দু রায় আমাদের পূর্বপরিচিত এবং বাঙালী। আমরা জানি; তিনি বেশ পরিচ্ছন্ন ছবি করতে উৎসাহী। সুধেন্দু রায় এই ছবির জন্য যে বিষয় পছন্দ করেছেন, তা একটু জটিল। মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ক, প্রেম, প্রেমের বিভিন্ন রূপ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা —এসবের ওপর তিনি আলো ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। জটিল হলে-ও এটা একটা সমস্যা।

অনিতা (লক্ষ্মী) এই ছবির চরিত্র। তার মা মারা যায়। প্রথম প্রেমিক তাকে আঘাত দিয়ে দূরে চলে যায়। এক যুবক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি অত্যাচার করে ও আত্মঘাতী হয়। আর এক ব্যক্তি ধর্ম ও বৈরাগ্যের মধ্যে তাকে নিয়ে যেতে চায়। এবং এমনকি প্রেমিকের পুত্রসন্তানের প্রতি অপার স্নেহ থেকে-ও সে আঘাত পায়। কেননা, অনিতার স্নেহ ঐ শিশুটিকে বাঁচাতে অক্ষম হয়েছিল।

এতোবড় একটা সমস্যা নিয়ে ছবি করতে আসার আগে যে চিন্তা-ভাবনার দরকার, মনে হয় পরিচালকের তা ছিল না। ফলে, ছবিটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে পুরুষ-চরিত্রগুলিকে চরিত্র বলে মনে হয় না; মনে হয়, তারা ঐ ধরনের চরিত্রের প্রতিনিধি। এই ব্যাপারটা মেনে নিলে ও আত্মঘাতী যুবকটির বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে ছবিটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অন্ততঃপক্ষে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।

গিরিশ কারনাডের চরিত্রটি বেশ সাহসের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। নপুংসক চরিত্রের অবতারণা ভারতীয় ছবিতে আগে হয়েছে কিনা জানি না। তবে, এখানে চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছবির টেকনিক্যাল কাজকর্ম বেশ উন্নত মানের। বিশেষ করে ক্যামেরা। বিশেষ করে, অনিতা যখন বিদেশ-ফেরৎ প্রেমিকের দেখা না-পেয়ে এক বান্ধবীর বাড়ি এল সান্ত্বনার জন্য, সেই খানে আলিঙ্গনের দৃশ্যটি বহুদিন মনে থাকবে।

সবচেয়ে প্রধান কথা, ছবিতে কোনো-কিছু নিয়েই খুব-একটা বাড়াবাড়ি নেই।

অনিতার চরিত্রে লক্ষ্মীর অভিনয় খুবই স্বতঃস্ফূর্ত ও যথাযথ। পরিক্ষিৎ সাহনী তাঁর চরিত্রে একটু বেমানান হলে-ও অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। আর গিরিশ কারনাডের অভিনয় একটু উঁচুপর্দায় হলে-ও একটা দৃশ্যে তাঁর অভিনয় ভোলা যায় না। যখন দুর্গম হিমালয়ের দিকে তীর্থের জন্য যেতে যেতে অনিতা থেকে পড়ে, পাথুরে রাস্তায় তার পদশব্দ আর শোনা যায় না, তখন সেই নৈঃশব্দের মাঝে দাঁড়িয়ে গিরিশ কারনাড পেছন ফিরে অনেতাকে একবার দেখল। তারপর একটু হেসে একাই এগোতে শুরু করল। এই দৃশ্যটি গিরিশের অভিনয়ের জন্যই মনে থাকে।

ছবির গানগুলি শ্রুতিমধুর। আর, ডি, বর্মনের, পরিচালনায় এর থেকে বেশী কিছু আশা করা অন্যায়। তবু অন্যান্য ছবির তুলনায় এখানের মিউজিক বেশ নিচু স্তরে বাঁধা।

জয় মা মঙ্গলচণ্ডী ছবিতে ইন্দ্রজিৎ এবং আঁখি দে

নাটক

কলকাতার হ্যামলেট

সরকারী চাপে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার 'কলকাতার হ্যামলেট'-এর অভিনয় শুরু হয়েছে।

একটা ছোট নাটকের দল, এই কলকাতা শহরে, টিঁকে থাকতে গিয়ে কি কি অসুবিধায় পড়ছে, নাটকটিতে তা দেখানো হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, আরো কিছু। নাটকের দলের প্রত্যেক সদস্যই এখানে বেশ সৎ, একমাত্র সদস্যাটিও। এদের রিহার্সাল রুমে একটি উগ্রপন্থী ছেলে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়ে, এদের টাকা পয়সা অভিনয়ের মঞ্চ নেই। এদের বিরুদ্ধে আছে পাড়ার মস্তান, বাড়িওয়ালা। সরকারও এদের বিরুদ্ধে। ঐ উগ্রপন্থী ছেলেটি এ'দের ছেড়ে যাবার সময় যে সাদা গোলাপটি নিয়ে যায়, একটু পরেই তারই রক্তে সেটা ভিজে গেছে। তার আগে ছেলেটির মুখে আমরা শুনেছি, 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।' এর-পর নানা চরিত্র এসেছে। এবং এসেছেন শতাব্দী অতিক্রমকারী হ্যামলেট। যাকে আমার কলকাতার হ্যামলেট বলে হয়েছে, তিনি নাটকের দলের প্রধান —অভী।

ভারতের সমসাময়িক রাজনীতির ছাপ এই নাটকে আছে। এবং এই সময়টা হচ্ছে নকশাল আন্দোলনের দু-তিন বছর ও কংগ্রেসী আমলের পুনরাবির্ভাব। এটা

দেখাতে গিয়ে নাট্যকার নিজের নাটকের ওপর সবটা নির্ভর করতে পারেননি। ফিল্মের (মৃণাল সেন) সাহায্যে কলকাতার হাল-হকিকৎ কিছুটা দেখিয়েছেন। এইখানেই নাট্যকারের অক্ষমতার শুরু। তারপর নানা-ভাবে সেটা দেখা গেছে।

যেখানে অভী চিৎকার করতে করতে পৃথিবীর শোষণের বিরুদ্ধে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে, সেখানে বাঙ্গালীর কলমপেশা হাত যে স্থির থাকতে পারবে না—এটা জেনেই পরমুহূর্তে অভীর মুখে নাট্যকার হাততালির বিরুদ্ধে কিছু সংলাপ জুগিয়েছেন। 'না না হাততালি নয়! কেন না এটা নাটক নয়।' এধরনের চমক সৃষ্টিকারী সংলাপে হাততালি বাড়ে না কমে? মিনার্ভা থিয়েটারে সেদিন ঐ অভিনেতার গলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের হাততালিও চরমে উঠছিল। কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের বাক্‌ভঙ্গিমা, হাঁটাচলা, মাথার পেছনে হাত রাখা সবই বিশেষ একজনের কথা মনে পড়ায়। সে সময় যদি কেউ নাট্যকার সম্পর্কে একটু কৌতূহল হয়ে পড়ে, তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? তবে, ঐ চরিত্রটি ভালো ফুটিয়েছেন অলোক বিশ্বাস। এসবের ওপরে আবার নিয়তি-নির্দেশ বেশ কয়েকবার এসে পড়েছেন বাংলাভাষী হ্যামলেট। এবং এটাই দুঃখের যে স্বয়ং হ্যামলেট এসেও নাটকটি বাঁচাতে পারেননি।

নাট্যকারের আর দোষ কী? রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা নাটক যে এক পাও এগোয়নি, তা এখনকার যে কোনো নাটক দেখেই বলা যায়। এবং তারই শিকার হয়েছেন এই নাট্যকারও। গত পাঁচ-সাত বছরে কলকাতায় যত নাটক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ নাটকের বিষয়বস্তু একই। এটা কোন কারণে এবং কিসের অভাবে হয়, তা এবার ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয় অসিত বসুর কথা। অভী চরিত্রটির যে গাম্ভীর্য, যে স্থিরতা থাকা দরকার, অসিত বসুর অভিনয়ে তা বারবার নষ্ট হয়েছে। তিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা, তা তিনি মাঝে মাঝেই ভুলতে পারেননি। আবার কখনো বেশ স্বচ্ছন্দে তিনি অভীর ভেতর ঢুকতে পেরেছেন। বিমল দের এক-কথায় অনবদ্য। তাঁর হাঁটাচলা, পান খাওয়া, বাচনভঙ্গী—এসবই লালমোহন-বাবুর ছাড়া আর কার। তাঁকে মনে না রেখে দর্শকদের উপায় নেই। এছাড়া বাধার ভূমিকায় ভদ্রা বসু চমৎকার অভিনয় করেছেন। তবে, প্রথমদিকে তাঁর অভিনয় একটু নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল। অন্যান্য চরিত্রে সবাইকেই মোটামুটি মানিয়ে গিয়েছে। আলো (তাপস সেন) ও মঞ্চসজ্জা যথাযথ।

নাটকের শেষের দিকের দু-একটি দৃশ্য বাস্তবিকই ভালো। কিন্তু সারা নাটকের বিশাল বিশাল ফাঁকগুলো তা দিয়ে ভরানো যায় না। তবু সরকারের হস্তক্ষেপে নাটকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। এবং এটাই মজার।

একরাম আলি

কলকাতায় মার্কিণ নাটক

কলকাতায় তখন অফিস-ফেরতা, পুজোবাজার-চষা গৃহকর্তার মানুষের উদ্বিগ্ন ভিড়; বৃষ্টি, কাদা; চৌরঙ্গি এস এন ব্যানার্জির মোড়ে দ্রব্যমূল্য দাবাতে, বেকার-ভাতার দাবিতে সভা, স্লোগান; পেরিয়ে আমি ইউএসআইএস অডিটোরিয়ামে ঢুকে পড়ি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে অমিতাভ রায় আমেরিকার আধুনিক নাটক ও নাট্যকার বিষয়ে কয়েকটি জরুরি ভাববার কথা ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। তার আলোচনা রসিক বিদগ্ধের, অথচ প্রাঞ্জল, বিষয়টিকে তিনি তন্ন-তন্ন করে নাড়াচাড়া করেছেন। হালের নাট্যকার, যেমন এডোয়ার্ড অ্যালবি কি তাঁর পরবর্তী আর্থার কোপেটের নাটকে মার্কিন সমাজের সাকসেস মিথ, কি ফাঁপা পারিবারিক সম্পর্কের মুখোশ খুলে দেখানো তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে চমৎকার গুছিয়ে দিলেন "ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌কে ডরায় কে?" কি "চিড়িয়াখানা বৃত্তান্ত" কলকাতায়ও সুপরিচিত, ফলে তাঁর উদ্ধৃতিগুলি তাঁর পাণ্ডিত্যকেও সরস রাখে। একালের নাটক আসলে মনুষ্যত্বহীন, রাশভারি সমাজকে ব্যঙ্গ করে, ঝাকুনি দেয়, ফোলানো-ফাঁপানো ভুল বিন্যাসের বেলুনে পিন ফোটায়। মানুষকে সামগ্রী হিসেবে দেখা, সামগ্রীর মতোই তাকে দখল কি বিনিময় করার আধুনিক প্রবণতা একালের নাট্যকাররা কীভাবে খুলে দেখান বা তাকে আক্রমণ করেন অমিতাভ রায় সেইদিকে শ্রোতাদের নাট্যভাবনাকে উশকে দিতে পেরেছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিলো কালো মানুষের চৈতন্য হিসেবে কালো নাটককে দেখা। ত্রিশের যুগ থেকেই আমেরিকার নাটকে কালো মানুষের দুঃধরনের—হয় ভীরু, দাস দাসত্বপ্রেমী, নয়তো বর্বর, হিংস্র—চিত্রণ প্রথমেই তিনি প্রায় গণিতশিক্ষকের মতো ব্ল্যাক বোর্ডে এঁকে ফেললেন। নিজে আগাগোড়া ব্ল্যাক বোর্ডে এঁকে প্রসঙ্গটির নানান জটিলতা খুলে দেখান তিনি। প্রয়োজনে, বেভেলিডিশানারি থিয়েটার সম্পর্কে পণ্ডিতের পুঁথি থেকেও পড়ে শোনালেন। আমেরিকায় হালের কালো নাটক নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে ভেবেছেন, তার নানা প্রবণতা, খুঁটিনাটি ও তাঁর প্রতি-পাদ্যকে শ্রোতাদের সামনে সংকলন করে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা মতো বিস্তৃত, তার চেয়ে বেশি গভীর।

দুজন বক্তাই বাঙালি, শ্রোতারাও তাই, আমার কেমন আশা হয়েছিল—উচ্ছেদক্ষেতে বেগুন খোঁজার মতন আর কি—বাংলা নাটকের কথাও, তার বন্ধ্যাদশা, দুর্দশা, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কথাও মাঝে-মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারবে। বুদ্ধদেব বসু, উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় কলকাতার সাম্প্রতিক নাট্যপ্রযোজনার ল, সা, গু, এইসব। হঠাৎ ঝকঝকে ঘরে ঢুকে, আমেরিকার সাম্প্রতিক নাটক নিয়ে নিচ্ছিলাম আলোচনা একটু আকস্মিক লাগে, একটু অপ্রাসঙ্গিক, এই কলকাতায়। অবশ্য নির্দিষ্ট ওই বিষয় নিয়েই আলোচনা। তা-ই হয়েছে। আয়োজন করেছিলেন কলকাতার ইউ এস আই এস, ৫ অক্টোবর।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রেম অমৃতঃ যৌবন-যজ্ঞ

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত।

ভাষার অপূর্ব ইন্দ্রজালে চিন্তার গভীরতায়, সাহিত্যিক অনুভবে, অনুপম প্রেমের মাধুর্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। বিবাহে উপহার। নাথ ব্রাদার্স

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

ক্যালিক্স্® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নিরিঘ্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :

★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।

★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।

★ অন্তরঙ্গে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।

★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।

★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর। টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং

৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১১

ফোন : ৩৫-৪১৪৫

এজেন্ট চাই

বিচিত্রা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বুকে পেসমেকার বসানো। পঁচাত্তর বছর বয়স। টকটকে ফর্সা রং। আস্তে হাঁটেন। চোখে চশমা। ভিড়ের ভেতরেও চেনা যায় ছান্দোনিক আচার্য-অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়কে। হাজরা রোডে ওঁর ফ্ল্যাটের ছোট ঘরখানায় ফুল স্পীডে টেবিল ফ্যান চলছিল। বাইরের জষ্টি মাসের রোদের দিকে চেয়ে বললেন, 'রংপুর কলেজে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্য গৌরগোবিন্দ গুপ্তের প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে লেখার সূত্রপাত। সেটা উনিশশো সাতাশ। বলাকার ছন্দ নিয়ে কথা হতেই গৌরবাবু বললেন, বেশ ত লেখো না। শুধু বলাকা নয়, বাংলা সংস্কৃত কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখালেখি করছি তখন।

'আপনার পি আর এস গবেষণার কাজটা ত ইংরেজিতে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক ইতিহাস।'

বলে আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ। উনিশশো উনত্রিশ একত্রিশে ডিসেম্বর, বেশ মনে আছে। গৌরবাবু বললেন, কই হে অমূল্য কি করলে? সেই রাত্রেই লিখতে বসলাম। মাসছয়েকের মধ্যে থিসিস শেষ। অধ্যাপক মণীন্দ্র বসু। আজ আর নেই। ওই টাইপ করে দিলে। স্টাডিজ ইন বেঙ্গলি প্রোসোডি। ভল্যুম ওয়ান। প্রিন্সিপ্‌লস্‌। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। সুনীতিবাবু ছিলেন একজন পরীক্ষক। উনিই পড়ে খুব অবাক হয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তখন কবির ৭০ বছর পূর্তি উৎসব চলছে। সঙ্গে গেলেন রঙীন হালদার আর কালিদাস নাগ। তিনদিন ছিলাম। রোজ দু'বেলা আলোচনা হত। বললাম, আপনি কবি, স্রষ্টা, আমি ছান্দসিক। কবি স্মিত হেসে বললেন, আমি যা পারিনি, বৈজ্ঞানিকভাবে তুমি তা করেছ। বলাকা থেকে কবি পড়তে লাগলেন। আমি যেভাবে স্ক্যান করেছিলাম, প্রশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিকই আছে। ধূর্জটি প্রসাদ এক সময় দিলীপ রায়কে চিঠিতে লেখেন, আমার ছন্দোসূত্রই ঠিক।

'আচ্ছা স্যার, বাংলা ছন্দের মূল কথাটা কি?'

'বাংলা ছন্দ সাংগীতিক, মিউজিক্যাল। কবিতার লাইনকে পর্বে ভাগ করা হয়। পর্ব-পর্বাঙ্গের গোড়ার কথাটা ত আমার 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' বইতে পড়েছ। কি জানো, হয়ত আমার মত অনেকে মানবেন না, কিন্তু বাংলা সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমি যেভাবে এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলি তুলে ধরেছি বলতে পারি, মহর্ষি পিঙ্গলও আমার মত করে সংস্কৃত কবিতার ছন্দকে বোঝেননি। ছন্দবোধ দার্শনিক ব্যাপার নয়—বৈজ্ঞানিক, এ বোঝবার মত ক'জন আছেন?'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছন্দ নিয়ে আপনার মতভেদ হয়নি?'

'হ্যাঁ, ৯ মাত্রার ছন্দ নিয়ে হয়েছিল—সেসব প্রসঙ্গ আমার বাংলা ছন্দ বইতে আছে। কবি শেষকালে আমার মত মেনে নিয়েছিলেন।'

'আপনার অন্যান্য সাহিত্যকর্ম নিয়ে কিছু বলুন?'

'অনেক লিখেছি। প্রবন্ধ পাঠ করেছি। বাংলা সাহিত্যে অবদান আমার কতটুকু জানি না, তবে এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আমায় সরোজিনী মেডেল দিয়েছেন। আমার স্নেহভাজন আশুতোষ কলেজের বাংলার তিন অধ্যাপক আজ আর নেই। অনিল-অমিয়-বিভাস আমার লেখার খুব ভক্ত ছিল, এখানে ওখানে প্রকাশ করত। 'কবিগুরু' বইখানার খুব সমাদর করত অমিয়রতন। 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' পড়েছ ত?

'হ্যাঁ। সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রবীন্দ্র-সমস্যা তিনজন রবীন্দ্রনাথ, এসব লেখাগুলো আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।' হেসে বললেন, হ্যাঁ, রবীন্দ্র-সমস্যা, তিনজন রবীন্দ্রনাথ সুকুমার সেনের খুব ভাল লেগেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে গিরিশ ঘোষের নাটকের ওপর প্রবন্ধ শুনে শ্রীসুকুমারবাবু বলেছিলেন, নাটক সম্পর্কে এযাবৎ এরকম আলোচনা বেরোয়নি।

'আচ্ছা স্যার, রূপক ও প্রতীক কি এক জিনিস?'

'না। ইংরেজিতে মেটাফর এলিগরি সিম্বলের ধারণা যেমন স্বচ্ছ, বাংলা সমালোচনায় রূপক সাংকেতিক প্রতীক ইত্যাদির ধারণা এখনও বেশ ধোঁয়াটে মনে হয়, আমি সেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।'

'এখন কি পড়ছেন, বা লিখছেন?'

'ভাল বই পেলেই পড়ি। একটু-আধটু লিখিও। প্রভাতকুমারের গল্প খুব ভাল লাগে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের এক-একটা গল্প এমন বাস্তব জীবন-ধর্মী অথচ বাংলা সাহিত্যে প্রভাতবাবু কিছুটা অবহেলিত।'

'কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পড়াতে আপনার ক্লান্তি বা বিরক্তি আসেনি?'

'না। সাময়িকভাবে এক-আধদিন হয়ত—সে আলাদা, কত ছেলেমেয়ে আমার কাছে গবেষণা করেছে। থিসিসের পরীক্ষক হয়েছি। ভাল কাজ এখনও হচ্ছে। আশুতোষ কলেজে '৬৫ সাল পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর পার্ট-টাইম। তারপর যাদবপুরে বছর কুড়ি ইউ-জি-সি'র অধ্যাপক তবে যাদবপুরে বড় ক্লাশেও পাঠাত, একটু কষ্ট হত তখন। উনিশশো একাত্তরে হার্ট এ্যাটাক হল, এখন ভাল আছি'

'এতবড় অসুখের পরও সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে ইংরেজি বই লিখলেন?'

'ওসব ঈশ্বরের আশীর্বাদ। মজার ব্যাপার তবে বলি শোনো। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত ছন্দের ওপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সুনীতিবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যায়তনের চেয়ারম্যান প্রোঃ লুডো রোশার। করমর্দন করে বললেন, 'অসমমাত্রিক সংস্কৃত ছন্দের বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ খুব ভাল লাগল। অনেক কিছু শিখলাম।' —পরে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে রোশার এক চিঠিতে লিখেছিলেন, সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান আমাদের সীমিত। এশিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার বক্তৃতা আমার

মনে আছে। আপনার মত গভীর অধ্যয়নের ফলে আপনার পদ্ধতি ও আবিষ্কার অনুসরণ করে এটি বুঝবার সুযোগ পাব।'

বৈজ্ঞানিক। কাব্যপাঠক সাহিত্য ছাত্র হিসাবে আমরা তাঁর রাস্তা ধরেই বাংলা কবিতার ছন্দকে পর্বমাত্রা উচ্চারণ রীতির বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে চিনতে ও পড়তে শিখেছি। কেরিয়ারের জন্য ছুটোছুটি করেননি অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। পড়াশুনা গবেষণা সক্রিয় সৃজনশীল সাহিত্য-চিন্তা। বললেন, 'যখন বেশ অসুস্থ তখনও তারাশংকরের ওপর একটা লেখা ডিক্টেট করেছি, অনুণ লিখে নিয়েছে। অক্লান্ত শিক্ষাব্রতী ছান্দসিক সাহিত্য-রসিক অমূল্যধনের স্বাস্থ্য ও শতায়ু কামনা করে প্রণাম সেরে বেরিয়ে এলাম।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

নীলাম

আজকেও সুমনস্ এক্সচেঞ্জ সন্ধ ছিল। ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে পড়লাম য়াসেল এক্সচেঞ্জে। মাইকে নীলামদারের গলায় তখন, 'চারমো গ্রামোফোন রেকর্ড, বেঙ্গলি। সাত টাকা, সাত।' গিয়ে দেখি, অনেকেই ঝুঁকে রেকর্ডগুলো দেখছেন। প্রথমটাতে ক্ষুদে ও বিবর্ণ অক্ষরে লেখা আছে 'ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে।' শচীনদেবের দোলায়িত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল। বাকি তিনটি অমর ভট্টাচার্যের—যিনি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। মাত্র দশ টাকায় এক তরুণ কিনে নিলেন রেকর্ড চারটি। এখানে আর নীলাম হল একটা টাইম-পিস একত্রিশ টাকায়, প্রজাপতি বসানো দেওয়ালঘড়ি উনপঞ্চাশ টাকায় ও একটি এভারেডি দু-সেল টর্চ সাত টাকায়। মাইকে যখন নীলামদার হাঁকছেন, 'এ ফ্যান্সি ডল, টোয়েন্টি রুপিজ', তখন বেরিয়ে এলাম।

আর সবচেয়ে চড়া বাজার ছিল অলহোসি এক্সচেঞ্জের। দুটো মার্কিন-দেশীয় ঢাকনা-দেওয়া ডিশ যখন নীলামে উঠেছে, তখন এখানে এলাম। একশো থেকে ডাক শুরু হল। শেষ হল দুশো তিরিশে। কিনলেন এক বাঙালী ডাক্তার। হাওয়া অত্যন্ত গরম দেখে টুক্ করে কেটে পড়লাম একসময়। তবে, ডিশ-দুটো ছিল খাঁটি বিলিতি তৈরি।

মডার্ন এক্সচেঞ্জে ঢুকেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। চমৎকার, প্রায়-ফুরফুরে একটা ব্যাস্কেট, সম্ভবতঃ বিদেশী, টেবিলে পড়ে থাকলে প্রত্যেকেরই এরকম হতে পারে। এতো ভালো কম্বল সচরাচর দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরই ওটা নীলামে উঠল। দাম উঠতে উঠতে মাত্র দুশো টাকায় ওটা বিক্রি হয়ে গেল। জানা গেল, ওটা বিদেশীই। যিনি নিলেন, তাঁর ঠোঁটে সিগারেটের উত্তেজনাটুকু বেশ কিছুক্ষণ লেগে ছিল। এরপর যা হল, তা অভাবনীয়। কোত্থেকে একটা বাগ নিয়ে এসে রাখলেন নীলামদার। বিস্কুট রঙের ঐ বাগ কাঁধে সাধারণতঃ কালিফোর্ণিয়ার লোকেরা ঘোরাফেরা করে। এখানে এল কি করে? সকলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বাগটা হেসেখেলে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। তিনি নিলেন, ভিড়ে তাঁর মুখটা দেখা গেল না।

চৌরঙ্গী সেলস্ বুরোতে, দেখি, একটা ছবি নীলামে উঠেছে। বড়সড় একটা পেইন্টিং। তুষার-ঢাকা বিদেশী গ্রাম। কাছে গিয়ে দেখি, এককোণে ইংরেজিতে লেখা আছে 'অশোক'। আশ্চর্য, ছবিটা চল্লিশ টাকায় নিলেন এক অবাঙালী ভদ্রলোক। নীলামের বাজারে অবশ্য মাঝে মাঝে ছবি আসতে দেখা যায়। সবই সস্তা ধরনের। তবে, ঢং-টা আছে। আমাদের কলকাতার পেইন্টাররা কিন্তু এ-ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারেন। ছবি এখানে পড়ে থাকে না। ত্রিশ, চল্লিশ টাকায় হেসে-খেলে বিক্রি হয়। যদি সত্যিই ভালো ছবি বাজারে আসে, তাহলে বেশি দাম উঠতেও পারে। কে বলবে, এখানেই ছবির বাজার গড়ে উঠবে না?

একরাম আলি

রান্না

ডালিয়ার মোহনভোগ আর পুডিং

ডালিয়া ঘরে জমে গেছে এক গাদা। ডালিয়ার ভাত খিচুড়ী, পোলাও খেয়ে কতদিন আর ভালো লাগে। সেদিন মণি-বৌদিকে বললাম, ডালিয়ার মোহননভোগ, পুডিং কী সব বলছিলে। তুমি থাকতে থাকতে করে দিয়ে যাও—খেয়ে দেখি। মণিবৌদি সেলাই করছিলেন মুখ না তুলেই বললেন, সে অনেক খরচ তোর সাধ্যির মধ্যে হবে না। বললাম, আহা এতে সাধ্যির কি আছে কোনটা বাকী রেখেছি বল, খাওনি কিছু? কিছু আটকেছে? খাবো না কেন। আটকাবে কী। তোর তো লেখার দরকার লিখে নে। সময় মত করে খাওয়াবো—আমাকে লোভ দেখাস নে। লোভ তোমাকে দেখিয়েছি বলে। তুমি শুধু শুধু রাগ করছো। রাগ করবো কেন—বলছি লিখে নে—মোহনভোগ। ডালিয়া ঘণ্টা পাঁচ-ছয় ভিজিয়ে রেখে সিদ্ধ করবি। একটু নরম হলে জল শুকিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিবি। সেদ্ধ করার পর যতটা ডালিয়া হবে ঠিক সেই পরিমাণ সুজি ঘিতে লাল করে ভাজবি। সমান সমানও ভাজতে পারিস। সুজি ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে ডালিয়া দিয়ে আবার ভাজবি। একটু দুধ দরকার হবে। দুধে পরিমাণমত জল মিলিয়ে চিনি মিলিয়ে ওই ভাজার মধ্যে ঢেলে দিবি। কিছু কিসমিস দিবি। নাড়তে থাকবি। নেড়েচেড়ে শুকিয়ে গেলে একটু কপূর দিয়ে খেতে দিবি। খুব ভালো লাগবে খেতে। হজম হবে ভালো পুষ্টিকরও খুব।

এবার লিখে নে—ডালিয়ার পুডিং।

এই একই রকম ভিজিয়ে রাখবি সিদ্ধ করবি শুকিয়ে নিবি। তারপর ঠাণ্ডা ঘন দুধে বা কাঁচা দুধে আধ কাপ পরিমাণ ডালিয়া মেশাবি। পরিমাণ মত চিনি দিবি। ওর ভেতর হাঁসের ডিম ফাটিয়ে মেশাবি। তারপর বেক করবি। তারপর ওটাকে বন্ধ একটা বাটিতে রেখে দিবি। রান্না হয়ে যাওয়ার পর উনুনের জ্বলন্ত কয়লা ফেলে দিয়ে সেই গরম উনুনে বন্ধ বাটিটা বসিয়ে দিয়ে চট দিয়ে ঢেকে দিবি। যখন ওটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন থেকে বার করে দেখবি পুডিং হয়ে গেছে। এখানে আরো কতগুলো ব্যাপার আছে যেমন ধর, বন্ধ বাটিটা ফুটন্ত জলে বসিয়ে রাখলেও পুডিং জমে যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যতে ভেতরে জল না ঢুকতে পারে। দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ দিয়ে করতে পারিস। চিনির বদলে স্যাকারিণ দিয়েও এই পুডিং করতে পারিস। রোগীভোগী সবাই খেতে পারবে।

আত্রেয়ী সেনগুপ্তা

কেন এই পুরস্কার

প্রায় এক মাসের মধ্যে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতি ও চিত্রজগৎ নামে দুই সংস্থা রবীন্দ্র সদনে সিনেমা, যাত্রা, পেশাদারী মঞ্চ ইত্যাদির ওপর পুরস্কার বিতরণ করলেন। এই দুই সংস্থার নির্বাচনে এমন অনেক গোলমেলে ব্যাপার আছে যা নির্বাচকদের যোগ্যতাও রুচি সম্পর্কে প্রশ্ন আনে। আমরা কিন্তু এই বিতর্কে যাচ্ছি না। আমাদের কথা এই যে এই সব পুরস্কারে চলচ্চিত্রের কতটা কি লাভ হয়! রবীন্দ্র সদন ভাড়া করে ব্যবসায়িক বক্তৃতা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য বীভৎস ছোটাছুটি, সিটি সহযোগে হাততালি, ঝলমলে শাড়ির একাধিপত্য, মানপত্র ইত্যাদির মধ্যে চলচ্চিত্রের কোন ভাল ব্যাপারটা থাকে?

কলকাতায় সারা বছরে একটা দিন দুটো দেখার মতো ছবি হয়, ছবির সংখ্যা পর পর কমছে, প্রায় ছবি ফ্লপ করছে, টেকনিশিয়ানরা খেতে পাচ্ছে না, স্টুডিও-গুলো উঠে যাওয়ার অবস্থায়, মৌলিক বাংলা নাটক পাওয়া যাচ্ছে না, থিয়েটার হলের অভাব মাত্রায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে টাকা জমছে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ভুখা থাকছে. এই সব যে নানা সমস্যা—তার দিকে আগে লক্ষ্য দেওয়া উচিত নয় কি?

আমি কঙ্কাবতী বলছি

হোক তা কাদা, ব্যাঙের শরীর, কিম্বা শুকনো কাঠের টুকরো—প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা দৃশ্যত অসুন্দর, এই সত্য গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তাই চাই স্বচ্ছ, সুন্দর দৃষ্টি, যাতে জীবন ও প্রকৃতিতে যথার্থ আবেগের সঙ্গে পান করতে পারি। যাঁর চোখে প্রাণের স্পন্দন, তিনিই তো প্রকৃত সুনয়না, সুন্দরীতমা তিনিই। সৌন্দর্য প্রসঙ্গে এবার তাই চক্ষু-চর্চা বিষয়ক আলোচনা করবো।

মাথাধরা যে চোখ খারাপের লক্ষণ, এ-কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিন ডাক্তার শ্রীহ্যারল্ড পেপার্ড ভাবেন অন্যরকম। তাঁর বিশ্বাস, চোখের সঙ্গে মাথাধরার সম্পর্ক সামান্যই। একুশ রকম শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে মাথা ধরতে পারে। চোখের দুর্বলতা তার মধ্যে একটি মাত্র। এই একুশটি দুর্বলতার কোনটি যে আপনার মাথা ধরার কারণ, তা আন্দাজ করা খুবই কঠিন। এমনকি দক্ষতম ডাক্তারের পক্ষেও। সময়সাপেক্ষ, বুদ্ধি, শ্রম ও মনোযোগ সাপেক্ষ কাজ এটি। দুর্ভাগ্যের কথা যে, বেশির ভাগ ডাক্তারই মাথা-ধরার আসল কারণ অনুসন্ধান করার পরিশ্রমটি বাঁচিয়ে ছেলে-মেয়েদের চশমা পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। এই পরামর্শে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। কারণ, বলা বাহুল্য, চশমা হলো চোখ এবং দৃষ্টি-শক্তির স্বাভাবিক বাড়ের প্রতিবন্ধক।

অসুস্থ চোখ নিশ্চয়ই মাথাধরার কারণ হতে পারে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। অথচ মাথা ধরলেই আমরা অন্ধভাবে চোখকে দোষী সাব্যস্ত করি। যাঁরা চশমা পরেন, তাঁদেরও ঘন ঘন মাথা ধরে। চশমা নেওয়া সত্ত্বেও ব্যাগে, পকেটে অ্যানাসিন বড়ি মজুত রাখতে হয় অনেককেই, এ-তথ্য কিন্তু আমাদের নজর এড়িয়ে যায়।

চশমা নেবার আগে দু'বার ভাবুন, বলেন ডাক্তার পেপার্ড। নিম্নে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি অভ্যেস করলে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

(১) পাঁচ থেকে দশ ফিট দূরত্বে 'ক-খ-গ' লেখা শক্ত কাগজ দাঁড় করিয়ে রাখুন। এই কাগজটিতে লেখা থাকবে বর্ণমালা, নম্বর, টুকিটাকি শব্দ ইত্যাদি। একটি করে অক্ষর পড়ুন ও চোখের পলক ফেলুন। এটা অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে করতে হবে। তারপর ডান চোখ বন্ধ করে (হাত দিয়েই এমনভাবে চোখটি বন্ধ করতে হবে যাতে হাত চোখকে একটুও স্পর্শ না করে।) কার্ডটি পড়ুন। এবারে বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখ ব্যবহার করুন।

(২) দাঁড়িয়ে কার্ডটি পড়তে পড়তে ধীরে ও মসৃণভাবে প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাঁ দিকে হেলুন। প্রতি অক্ষরের পর মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করতে হবে।

(৩) পা দু'টি ছ' ইঞ্চি দূরত্বে ফাঁক করে দাঁড়ান। এইভাবে দাঁড়িয়ে শরীর ডানদিকে ঘোরান। সেই সঙ্গে বাঁ পায়ের আঙুলের উপর বা গোড়ালি ভর করে তুলুন। ঘোরার সময় হাত, পা ও দৃষ্টি যেন হয় সাবলীল ও অনাড়ষ্ট। একটুও শক্ত হলে কিন্তু চলবে না। ঘোরার সময় ঘরে কোনো একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, দৃষ্টি ছড়িয়ে দিন এইভাবে এক মিনিটে ষোলোবার ঘুরতে পারলে সবচেয়ে উপকৃত হবেন।

এবার চোখের প্রসাধন বিষয়ে দু'-একটি কথা :—

১। মুখের যে অঙ্গটি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো চোখ।

২। ঠোঁটে-গালে রঙ মাখলে অনেক সময় উগ্র দেখায়। কিন্তু চোখ হলো মুখের একমাত্র অঙ্গ যার সৌন্দর্য প্রসাধনে সত্যিই খোলে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, কি আপনার চোখের আকার। ছোটো, বড়, কিম্বা কোটরস্থ, আপনার চোখ দু'টি যেমনই হোক, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করলে প্রসাধন সব ত্রুটি ঢেকে দিতে পারে।

৩। চোখের নিচে তেলতেলে ভাবটা এড়াবার জন্য প্রসাধন করবার আগে শুধু চোখ দু'টি সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। সামান্য একটু পাউডার চোখের ঠিক নিচটায় মসৃণভাবে বুলিয়ে নিলে ভালো হয়।

৪। চোখের জন্য অপরিহার্য প্রসাধন-সামগ্রী হিসেবে সাজঘরে রাখতে হবে : কাজল, ভুরু আঁকবার পেন্সিল, চোখের পাতায় ছোঁওয়ানোর জন্য 'আইশেড' নামক রঙ (ল্যাকমের) চোখের জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুটি তুলি (ল্যাকমে কিম্বা ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোম্পানীর) এবং এক শিশি কালো 'আইলাইনার' (ল্যাকমে ইত্যাদির)। সলকাতা শহরের যে-কোনো ভালো মনে-হবী দোকানে এই ক'টি জিনিস পাবেন। মোট খরচ পড়বে সাড়ে উনিশ টাকা।

শহরের মেয়েরা আজকাল কাজল পরে না। পরিবর্তে ব্যবহার করেন 'আইলাইনার' চোখের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই তরল কালি আজকাল সর্বত্র পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রসাধন ব্যবসায়ী নানান রকম শিশি-বোতলে এই দ্রব্য বাজারে ছেড়েছেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, সবগুলির উৎকর্ষ একরকম নয়। অতি আধুনিকা, সুরুচিসম্পন্না ও প্রসাধনে দক্ষ কয়েকজন মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, ল্যাকমে কোম্পানীর আইলাইনারই হলো সবচেয়ে ব্যবহারযোগ্য। আরও দু'-একটি ভালো আইলাইনার বাজারে পাওয়া যায়, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনটি আপনার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক।

মাঝারি আকারের চোখ প্রসাধনের পক্ষে আদর্শ। বেশি বড় কিম্বা ছোটো চোখে উগ্র প্রসাধন না করাটাই ভালো। কি রকম প্রসাধন আপনার চোখে মানাবে, সেটা ভেবে দেখুন।

শুরু করতে হবে চোখের পাতা দিয়ে। সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যা কিম্বা পড়ন্ত দুপুর যদি হয়, 'আই-শ্যাডো'র সাহায্যে চোখের পাতায় হাল্কা সবুজ রঙের আভা ছোঁওয়াতে পারেন। বোঝা গিয়েও বোঝা যায় না, এমনি ফিকে হতে হবে এই আভা। ছাই রঙ, হাল্কা নীল কিম্বা সোনালী, কোন্ রঙের আভা চোখে ছোঁওয়াবেন তা শাড়ি-জামার সঙ্গে মিলিয়ে বাছুন।

এবার আপনারে আঁকতে হবে দুটি সূক্ষ্ম কালো রেখা। একটি চোখের নিচের পাতায়, ও একটি উপরে। এই দুটি সরু কালো রেখায় ঘেরা থাকবে আপনার চোখ দুটি। আইলাইনারে তুলি ডুবিয়ে [illegible] দুটি খুব সরু ও সূক্ষ্ম করে টানতে এতো সূক্ষ্ম যে, দেখে মনে হবে কাজ চোখের এক কোণা থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত চোখের পলকগুলির একদম গায়ে গায়ে রেখাটি টানুন।

নিচের পাতায় তুলি টানতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হবে। হাত কেঁপে যাবে, তুলিটি এবড়ো-খেবড়োভাবে এগুতে গিয়ে ঢুকে যাবে চোখের মধ্যে। এতে কিন্তু ঘাবড়াবেন না। হাতকে অভ্যস্ত হবার জন্য একটু সময় দিতে হবে তো।

এবারে চোখের দুই পাশে টানতে হবে ছোটো দুটি রেখা। এই রেখা দুটি কেমন করে টানলেন তার উপরই নির্ভর করছে আপনার চক্ষুসজ্জার বাহার। সুতরাং সব-চেয়ে ভালো হয় যদি নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনরকম চোখ আপনার সবচেয়ে পছন্দসই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত
বিনোদন সংখ্যা
১৩৮৪

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা

জীবন

সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি

পরিতোষ সেনের গল্প
অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস

যূথিকা রায় মানে গান
তাঁকে নিয়ে লিখেছেন বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল

বাংলা গানের উৎস সন্ধানে
অভিযাত্রী : মধুসূদন মজুমদার

শান্তিনিকেতনের সেই দিনগুলি

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী
কেয়া চক্রবর্তীর অসমাপ্ত প্রবন্ধ
তাঁরই তর্জমায় একটি বিদেশী নাটক

বসন্ত

আরো দুজন বিশিষ্ট বাঙালীকে নিয়ে লেখা

দাম ৫ টাকা

কপির জন্য যোগাযোগ করুন :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৩

Gram : AMRITA Calcutta-700003 Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

গুঁড়া মশলার
কুকমী
১ কে.জি.'র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না

গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

1 5 NOV 1975

অমৃত

পাকাচুল আর হেয়ার ডাই (কলপ) সম্বন্ধে আপনার এক তরফা ধারনা, গোদরেজ তা সহজেই নাকচ করে দিচ্ছে—

পাকাচুল হওয়াই তো স্বাভাবিক

তা তা বটেই! তবে গোদরেজ যখন চুল ডাই করার ব্যাপারটাকে চুল শ্যাম্পু করার মতই সহজ আর স্বাভাবিক করে দিয়েছে, তখন পাকাচুল পাকা রাখাটাই অস্বাভাবিক।

পাকাচুল চেহারায় বৈশিষ্ট্য আনে

পাকাচুল হয়তো চেহারায় বৈশিষ্ট্য আনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার চেহারায় খানিকটা বয়েসও জুড়ে দেয়। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে দেখুন।

চুল ডাই করার ঝামেলায় কে যেতে চায়?

কেউই চায় না। সেই জন্যেই গোদরেজ এমন হেয়ার ডাই এনেছে যা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁথি কেটে চুল ভাগ করে ডাই দিয়ে চুল পেন্ট করতে হয় না, তার বদলে চুলে খানিকটা ডাই ঢেলে, ঘষে ফেনা করে নিয়ে, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর চুল ধুয়ে ফেললেই ব্যাস্! ব্যাপারটা সত্যিই এত সহজ!

হেয়ার ডাই চুলের ক্ষতি করে না?

কিছু সেকেলে হেয়ার ডাই নিশ্চয়ই করতে পারে। সেই জন্যে গোদরেজ অন্য ফরমুলায় তৈরী! এতে এক রকমের হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো আছে যার ফলে চুল পুরুষ্ট দেখায় আর ঝলমলে তারুণ্যে ভরে ওঠে!

ভারতের প্রথম আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়া হেয়ার ডাই!

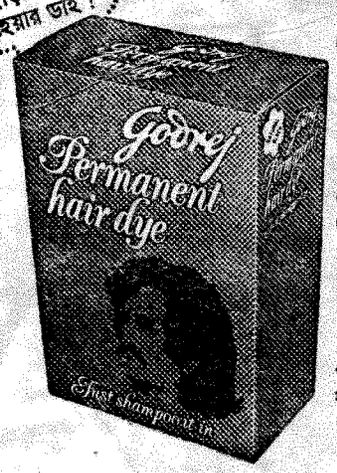

গোদরেজ

পার্মানেন্ট হেয়ার ডাই

—চুল ডাই করা থেকে "ঝামেলা" বাদ দিয়েছে, আপনি যাতে চেহারা থেকে খানিকটা বয়েস ছেঁটে বাদ দিতে পারেন!

পুরুষদের জন্যে,
মহিলাদের জন্যেও।
২টি শেড: স্বাভাবিক কালো,
গাঢ় ব্রাউন

CASGS-109-203 Bn

কয়েকটি একসেট অভিনয়োপযোগী মঞ্চ-সফল পূর্ণাঙ্গ নাটক

অগ্নিদূতের
বিশ্ব বৃত্ত ভালবাসা (১ নারী) ৫.

অগ্নিমিত্রের
নেপো-নটবর কথা (২ নারী) ৫.

দিব্যেন্দু গুহর
ল্যাঙ্গুয়েজ (৩ নারী) ৫.

মনোজ মিত্রের
নরক গুলজার (১ নারী) ৫.

রাধারমণ ঘোষের
শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৫.

কিরণ মৈত্রের
রাতের কান্না (২ নারী) ৫.

সুশীলকুমার গুপ্তের
সমান্তরাল (২ নারী) ৫.

মনোরঞ্জন দাসের
অরণ্য ফসল (২ নারী- ৫.

রতনকুমার ঘোষের
জম্বুদ্বীপের ইতিকথা (নারী-বর্জিত) ৫.
সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫.
সীতাহরণ (২ নারী) ৫.
এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫.
দোহাই হাসবেন না (২ নারী) ৫.
ভোরের মিছিল (১ নারী) ৫.

কয়েকটি পুরস্কৃত একাঙ্ক নাটক

রতনকুমার ঘোষের
- পিতামহদের উদ্দেশ্যে ৫.
- শেষ বিচার ৫.
- সোনালী স্বপ্ন ৩.
- শেষ প্রহরী ৩.
- পারঘাটায় দাঁড়িয়ে ৩.৫০
- রাজার বাড়ি কতদূর ৩.৫০
- যবনিকা পতনের আগে ৩.৫০
- বিষুব রেখা ৩.৫০
- সমুদ্র সন্ধানে ৩.৫০
- পাপপুণ্য ৩.৫০
- মহাকাব্য ৩.
- তৃতীয় কণ্ঠ ৩.

অগ্নিদূতের
- সুতরাং যদি ৫.
- কাঠের ঘোড়া ৫.

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের
- স্লোগান ২.৫০
- আওয়াজ ২.৫০

সলিল মজুমদারের
- ত্রিধারা (তিনটি একাঙ্ক) ৩.

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
- উজান (সাতটি একাঙ্ক) ৪.

উমানাথ ভট্টাচার্যের
- রঙ্গ/বানভাসি/ডাক ৩.

মনোজ মিত্রের
- কোথায় যাব ৪.
- টাপুর টুপুর ৪.

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের
- চুপ সত্যি বলছি ৫.
- সম্ভবামি ৫.
- সওদাগরের দেশে ৩.৫০
- শ্মশানে রক্তের স্বাদ ৩.৫০

পরিমলচন্দ্র দে'র
- ফেরত/প্রমাণ ৫.

চিত্তরঞ্জন সুরের
- আজকের নাটক ৩.

বর্তমান নাট্য-জগতে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সার্থকতম পূর্ণাঙ্গ নাটক

রতনকুমার ঘোষের

সকালের জন্য

(১ নারী ।। ৫ সংস্করণ) ৫.

নাটকটির ৪ বছরে ৫টি সংস্করণই এর জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

—ঃ পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন ঃ—

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

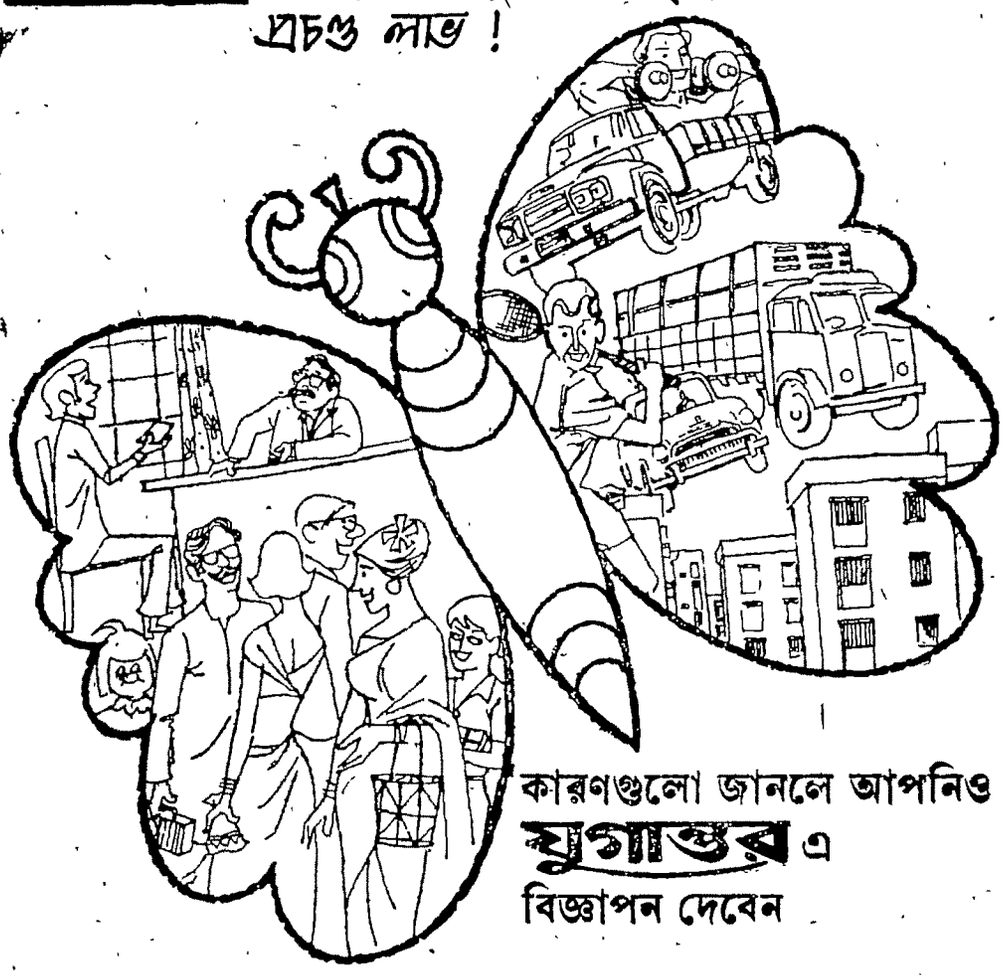

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাট্‌তি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-লরি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

অমৃত

১৭ বর্ষ
২৮ সংখ্যা
৯ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
25th Nov. 1977

সম্পাদকীয় ৩
বক্তমাংসের রবীন্দ্রনাথ ৪
বৈকুণ্ঠ পাঠক
সমালোচনা ৫
চিঠিপত্র ৮

মানুষ কেনাবেচার ইতিহাস ১৬
বজ্রমাধব ভট্টাচার্য
মিসা ৭৩। ২২ শ্যামল রায়

গল্প
ভূতগুহের নকশা ১০ অজিত দে
ঈশ্বরের ইচ্ছা ২৬ সমীর রক্ষিত
সিংহাসন তুমি কার? ৩১ বরুণ চৌধুরী

ভূতের পা পিছনে হাঁটে ৩৫
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩৬
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শচীন দাস
গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ৪২৩
মনোরঞ্জন বসু
বিয়ার গীত ৪৫ সুবিমল বসাক
পাকদণ্ডী ৫৪ লীলা মজুমদার
খেলা ৫৬
সিনেমা ৫৯
বিচিত্রা ৬২

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
থিয়েটার আমাদের আন্দোলন
লিখেছেন শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি
গল্প লিখেছেন
চণ্ডী মণ্ডল

ওড়িশায় ফরাসী টি ভি দলের সঙ্গে
লিখেছেন নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
হেলেনিক মন : সুনীতিকুমার
লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন
শ্যামল দত্তরায়
ভিতরে ছবি ও অলংকরণ :
সুবোধ দাশগুপ্ত, ধ্রুব রায়
এবং নিতাই ঘোষ

আমাদের শিক্ষানীতি

দিন কয়েক আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব শিক্ষানীতি স্থির করতে পারবে। ভারতের মতো এক বিশাল দেশের সবগুলি রাজ্যে একই ধরণের শিক্ষানীতি চালানো অসম্ভব এবং অসঙ্গত। কেননা, শিক্ষাক্ষেত্রে সকল রাজ্যের অগ্রগতির হার এক রকম নয়। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক চাহিদাও বিভিন্ন। কাজেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চন্দ্রের এই ঘোষণাকে স্বাগতই জানাবেন সকলে। বিশেষ করে, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে রাজ্যগুলির তরফ থেকে কেন্দ্রীয় অসহযোগিতার অজুহাত তোলার সুযোগ থাকছে না এটাও কম আশ্বাসের বিষয় নয়। রাজ্যগুলিকে এখন থেকে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

বেশ কিছুকাল ধরে শিক্ষানীতি নিয়ে নানাভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি, চিন্তা করা হচ্ছে দুদিকেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী, সে প্রশ্ন তো আছেই।

আসলে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি নিয়েই ঝামেলা এখন সব থেকে বেশি। শিক্ষাদানের অনেক রকম উদ্দেশ্যের কথা অনেক দিন থেকেই চালু আছে দেশে। যেমন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাতে সক্ষম করা, চরিত্র গঠনে সাহায্য করা, সামাজিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উপযুক্ত করে তোলা. ইত্যাদি। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে এইসব উচ্চ মার্গীয় কথার মারপ্যাঁচ এড়িয়ে স্পষ্টভাবেই বলা হচ্ছে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করা।

সম্ভবত এই জন্যেই এখন পাঠ্য বইয়ের বোঝা কমিয়ে ছাত্রদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার কথা উঠেছে। শিক্ষিত হবার পর কেউই যাতে রবোটের মতো যন্ত্রচালিত না হয় এবং সকলেই যাতে তাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও সৃষ্টিশীলতাকে প্রয়োগ করতে পারে, সে সব কথাও বলা হচ্ছে।

অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে, এই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন। কবিগুরুর শিক্ষানীতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিয়েছে দেশ। কিন্তু অন্য-নিরপেক্ষভাবে শুধু এই শিক্ষানীতির দ্বারাই ছাত্রদের সকল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায় কিনা সন্দেহ। অন্তত শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের পর ছাত্রদের সামাজিক সাফল্য যে অন্যত্র শিক্ষিতদের চেয়ে বেশি হয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই।

কাজেই দেশের শিক্ষানীতি অন্যান্য কর্মনীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থির করা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। এমন হতে পারে যে, শিক্ষানীতির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের ওপর।

দেরিতে হলেও আলোচনা শুরু হতে পারে [illegible]

রক্ত-মাংসের রবীন্দ্রনাথ

রামায়ণ মহাভারতের ঋষিরা দর্শন এবং ঈশ্বর নিয়ে যতখানি জড়িত ছিলেন—ইহলোকের সঙ্গেও বোধকরি সমান জড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। পান ভোজন, ছদ্মবেশ ধারণ, মাছ-ধরা, শাপশাপান্ত তো তাঁরা আকছার করে এসেছেন। গোধন রক্ষার লড়াই লেগেই থাকতো। এর পর আরও যা ছিল—তাতেই প্রমাণ হয়—পুরাণ-মহাকাব্যের ঋষিরা ছিলেন সবদিকে পূর্ণ। মৎস্যগন্ধাকে পদ্ম-গন্ধা করতে তাঁদের আটকায়নি। চিত্তবিকল হওয়ার জন্যে তাঁরা কোন দিন লজ্জিত হননি। আমরাও তাই দেবতাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে কোনদিন দ্বিধা করিনি। মানুষের গৃহস্থ ঘরাণায় আমরা ভগবানকে সাজিয়েছি।

কিন্তু বড়মাপের মানুষকে আবার দেবতা বানানো আমাদেরই স্বভাব। পাছে সেই ভগবান-ভাবনার ভেতর থেকে খানিকটা মানুষ বেরিয়ে পড়ে—তাই আমরা ক্যালেন্ডারে তাঁর ছবি ছেপে মাথার চারপাশে দৈবী আলোর গোল এঁকে দিই।

আমাদের পিতা পিতামহরা তবু রবি-বাবু বলতেন। অভিনেতা, গায়ক, দেশকর্মী রবিবাবুকে ওঁরা ছবিতে দেখেছেন। খবরে তাঁর কথা শুনেছেন। আমরা অভ্যস্ত তাঁর ক্যালেন্ডারের ছবিখানায়। আমরা তাঁর পা দেখিনি। আমরা তাঁর গা দেখিনি। ছত্রিশ বছর আগে মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি এত বড় হয়ে আমাদের মনের ওপর ছায়া ফেলে ছিলেন—যার ফলে—তখনই তিনি ঋষি—এবং এক লাফে সমতুল সব ঋষি—বঙ্কিম-চন্দ্র, রামনারায়ণদের সমবয়সী তো হয়েই পড়েন—উপরন্তু বেদ ও সামগানের সময়-কার ঋষিদের বিভাও তাঁর ভাবমূর্তিতে ঐশী বিভূতি হয়ে একটু একটু করে জমা হতে থাকে।

আমরা ভুলে বসে আছি—তাঁর শরীরটা ছিল মানুষের। তাতে রাগ ও অনুরাগ তো থাকবারই কথা। সেকথা গত কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধানী রসিক অমিতাভ চৌধুরী নানাদিকে আলো ফেলে ফেলে মানুষী রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরছেন। কখনো জমিদার, কখনো পরলোকসন্ধানী রবীন্দ্রনাথকে তিনি ফুটলাইটে বের করেছেন।

এবার তিনি রবি অনুরাগিনীদের তুলে ধরেছেন। তাঁদের ভূমিকা রবীন্দ্র-নাথের গানে-কবিতায় কতখানি সৃষ্টির কাজ করেছে—সে-জায়গাগুলোও সফল ডুবুরির ধাঁচে তিনি উদ্ধার করেছেন। এ-জন্যে তিনি কল্পনার ওপর নির্ভর করেননি। কবির লেখা আর কবিকে নিয়ে লেখা অবলম্বন করেই সমগ্র বিষয়টি তিনি কয়েক বছর আগে একটি শারদসংখ্যায় প্রকাশ করেন।

গত রবিবার ৬ নবেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে কিশুক রবি অনুরাগিনীদের প্রতি নিবেদিত কবির গান ও কবিতা দিয়ে একটি সুপ্রযোজিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

আন্না তড়খড়, মিস মুল, লুসি, বৌঠান, ভিকটোরিয়া ওকামপো, ওয়াদা কোরা এবং হেমন্তবালা দেবী—এঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক এক সময় এসে ছিলেন। সতেরো বছরের রবি থেকে সত্তরের রবীন্দ্রনাথ—এই দীর্ঘ সময়ে এই অনুরাগিনীরা এক একজন রবি-সাগরে এক এক রকমের ঢেউ তুলেছেন। এই বিশাল জীবনের খুঁটিনাটি জায়গাগুলো গদ্যে, কাব্যে, গানে শোভন, সংযত ভাষায় অমিতাভ চৌধুরী গ্রন্থিত দিয়েছেন। তা সুন্দর করে পড়েছেন কল্যাণ রায়, গৌরী ঘোষ। কল্যাণ-বাবুর কণ্ঠস্বর বড় সুন্দর। গৌরীরও। কথার মানে তাঁর গলায় উঠে আসছিল। বাণী ঠাকুরের পরিচালনা সংযমী: কিংশুকের মেয়েরা খোলা গলায় গেয়েছেন।

সাগর সেনের 'অলি বার বার ফিরে যায়' কিংবা 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' গান দুটি কল্যাণ-গৌরীর গ্রন্থনা-পাঠের সঙ্গে সুন্দর মিশে গিয়েছিল।

অনেকদিন পরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মঞ্চে বসে হারমোনিয়ম ধরে গাইলেন। তাঁর গলার স্বরের মধুর দানা একটুও ক্ষয় হয়নি। তিনি প্রতিটি কথা পুরো অনুভব করে গান করেন।

শ্রোতাকে কিন্তু আগাগোড়া সমান-ভাবে টেনে রেখেছিল রবীন্দ্র জীবনের নানা অনুরাগের গ্রন্থিবন্ধ মূলকাহিনী। বিশেষ করে বৌঠান পর্বের ভাষ্য অমিতাভ চৌধুরী এত সংযত এত মর্মস্পর্শী করে সাজিয়েছেন যে তার তুলনা দেখি না। শুনতে শুনতে গত শতকে চলে যাওয়া যায়। তেইশ বছরের রবি যে সেদিন দীর্ণ হয়েছিলেন—তার অংশ নিতে কারও কোন অসুবিধে হয় না। আবার সত্তরের রবীন্দ্রনাথ যে মানসিকতায় হেমন্তবালাকে চিঠি লিখছেন—তাও শ্রীযুক্ত চৌধুরী অতি সাবধানে শোভন শিল্প করে তুলতে পেরেছেন।

সমগ্র গ্রন্থনায় সাহিত্য এবং সঙ্গীত সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

শুধু এক জায়গায়—১৯১৬ সালে ২১ বছরের ওয়াদাকে কিশোরী বলা হয়েছে। এই সামান্য অসতর্কতা এই বিপুল ও সফল প্রযোজনার পাশে কিছুই নয়।

শঙ্কু মহারাজের সদ্য প্রকাশিত ভ্রমণ-কাহিনী

মালালীর মালঞ্চে ৮৲

সমরেশ বসুর নবতম গ্রন্থ

কীর্তিনাশিনী ৭৲

আশাপূর্ণা দেবীর সুবৃহৎ উপন্যাস

কখনো দিন কখনো রাত ৩০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যোপন্যাস

উর্বশী সন্ধ্যা ৯৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

তিনে একে চার ২০৲

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲

কিরীটী অমনিবাস

এ পর্যন্ত প্রকাশিত দশখানি খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে।
মোট মূল্য ১৭০৲ টাকা। গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ২০% কমিশন

[illegible] সাহিত্য প্রকাশন ৯ [illegible] কলিকাতা ১

সমালোচনা

মানুষের দলিল

নকশাল—নকশাল বিপ্লবের প্রথম দশক। তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনাল, কোলকাতা। অকটোবর ১৯৭৭ দাম : নয় টাকা। পৃঃ ১২৭

নকশাল অধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর ঘটনা। বিভ্রান্তিকর এই জন্য যে নকশাল সংঘর্ষের স্বরূপ প্রায় সবটাই এখনও কুহেলিকায় ঢাকা। তার যথার্থ মূল্যায়ন এবং রাজনীতি ও সমাজনীতিগত ফলশ্রুতি ঠিক এ সময়েই যথাযথভাবে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। সময় একদিন তথ্যের অপ্রতুলতা ঘুচিয়ে দেবে। নকশার-পরবর্তী রাজনীতি ও সমাজনীতির চেহারাও ক্রমশ সুস্পষ্ট হবে। আর তখনই হয়তো এই বিভ্রান্তির জাল উন্মোচন সম্ভব হবে।

তবু একথা তো সত্যি যে আমাদের চোখের সামনে নকশাল স্ফুলিঙ্গের জন্ম ও মৃত্যু ঘটল। আমরা দেখেছিলাম কেমন করে এই আন্দোলন 'মাত্র চার-পাঁচ বছরেই সারা ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কাঁপিয়ে তুলেছিল।' এই কালের মানুষ হিসেবে এই আন্দোলনকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখে-ছিলাম, তার একটা দলিল ভবিষ্যতের মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজন। সাংবাদিক তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ যে তিনি এই প্রয়োজনীয় কর্মটি সম্পাদন করলেন তাঁর নকশাল—নকশাল বিপ্লবের প্রথম দশক গ্রন্থে।

কে কাকে কবে মারল, কটা বন্দুক বা রাইফেল চুরি হল—এসব খুঁটিনাটিতে গ্রন্থকার যান নি। আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক তাৎপর্যের নতুনসন্ধান তাঁর কাছে অনেক জরুরী প্রশ্ন। মোটামুটি তাঁর আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের আলোচনায় তিনি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন গোপীবল্লভপুর এবং ডেবরার ঘটনাবলী, বীরভূমের ঘটনা এবং কোলকাতা ও অন্যান্য শহরের ইতস্তত ছড়ানো শহর অভিযানের ঘটনা। দুর্ভাগ্য-বশত মূল নকশালবাড়ীর সংঘর্ষ তাঁর আলোচনায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম স্থান পেয়েছে। নকশাল আন্দোলনের প্রায় সমস্ত প্রধান নায়কদের জীবন ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ গ্রন্থে আছে—চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী, সন্তোষ রাণা, সুশীতল রায়চৌধুরী ইত্যাদি। স্বল্প পরিচিত আরো কয়েকটি প্রধান চরিত্র যেমন,

বাংলা উপন্যাসে সর্বকালের রেকর্ড!
মাত্র ১৫ মাসে ৫০ সংস্করণ

প্রকাশিত হলো

সংস্কৃত-এর বাঙ্গালিত
দুর্লভ সুবর্ণ সংস্করণ

দিগ্বিজয়ী ট্রিলজি উপন্যাস
স্বর্গমর্ত পাতাল

জন-অরণ্য – সীমাবদ্ধ – আশা আকাঙ্ক্ষা

বর্ণাঢ্য সুবর্ণ সংস্করণের প্রতিটি বই লেখক স্বাক্ষর করেছেন, সেই সঙ্গে বিশেষ ভূমিকা যা কেবলমাত্র এই সংস্করণেই থাকবে। সুবর্ণ সংস্করণ অচিরেই একটি মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ মুদ্রণ সংখ্যা সীমিত এবং পুনর্মুদ্রণ হবে না।

- কোন সংগ্রাহককেই দু' কপির বেশী দেওয়া হবে না।
- ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিক্রেতা, গ্রন্থাগার ও পাঠকরা যে অর্ডার পাঠাবেন তা সরবরাহ করা হবে।
- বিনা নোটিশে সুবর্ণ সংস্করণের প্রচার বন্ধ হতে পারে।
- আগাম ১৪ টাকা পাঠালে আপনার নাম উল্লেখ করে প্রিয়-জনকে উপহার পাঠাতে পারি। বিদেশে জাহাজে ২০ টাকা, বিমানে ৪৪ টাকা।

৬৮০ পাতার মূল সংস্করণের প্রতিটি লাইন অক্ষত থাকছে।

—৩২ টাকার বই মাত্র ১২ টাকায়
ডিপি ১৫৲

এই স্মরণীয় দিনে আমরা স্মরণ করি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রণাম জানাই সকল জীবিত দিকপাল লেখকদের। গুণগ্রাহী পাঠকসমাজ ও বিক্রেতাবন্ধুরা, আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।

নয় থেকে নব্বুই পর্যন্ত ছোটবড় সবার জন্য
এক ব্যাগ শংকর ৬৲ ডিপি ৮৲
শংকর-এর দুঃসাহসিক উপন্যাস
সম্রাট ও সুন্দরী ১০৲ ডিপি ১২৲

৫ রচনা
তিনটি বই
একত্র
ডিপি ৩০৲

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

শংকর-এর সব বই দে বুক স্টোরে পাওয়া যায়—
কত অজানারে ১০৲ চৌরঙ্গী ২৫৲ এপার বাংলা ওপার বাংলা ১৫৲
যেখানে যেমন ১০৲ নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৮৲ ধাত্রী পত্রী ৫৲

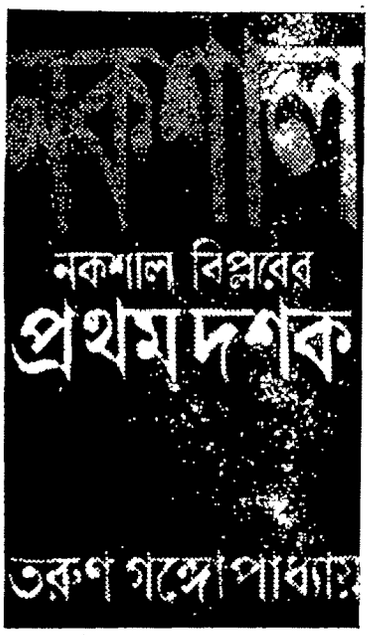

মুখার্জী ইত্যাদি ব্যক্তিরাও আলোচনায় স্থান পেয়েছেন। এসব চরিত্র চিত্রায়ন এবং ডেবরা-গোপীবল্লভপুর-বীরভূম ও শহরের সংঘর্ষের গতিপ্রকৃতি আলোচনা—এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

নকশাল-আন্দোলন এদেশের মাটিতে স্বয়ম্ভূ নয়, এর শিকড় ছড়িয়ে আছে দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাসে—লেখকের এ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট চিন্তার দাবী রাখে। ১৯০৫ থেকে বাংলার বিপ্লববাদের শুরু। ১৯৪২ অব্দি এর বিস্তৃতি। অগ্নিযুগের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যপ্রণালী, বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া আদর্শবাদী, আত্মত্যাগী তরুণ সন্ত্রাসবাদী সমাজ, বৃহত্তর জনজীবন ও জন-আন্দোলনের বাইরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থান, গুপ্ত-সমিতির উপর গুরুত্ব স্থাপন—ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী চরিত্রের সাথে নকশাল আন্দোলনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জাতীয় নেতাদের মূর্তি ধ্বংস, ইস্কুল-কলেজ পোড়ানো—ইত্যাদি নকশালী এ্যাকশনের সাথে গ্রন্থকার মিল খুঁজে পেয়েছেন ইয়ং বেঙ্গলদের গো-মাংস ভক্ষণ এবং দেশীয় দেবদেবীদের প্রতি উপহাস প্রদর্শনের মধ্যে। উভয়ই এসব কৌতুককর কার্যাবলীকে বিপ্লবাত্মক কর্ম মনে করতেন। বিদেশী মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য। বাংলার ইতিহাসে বারবার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'—এই তাত্ত্বিক শ্লোগান আরেকবার প্রমাণ করেছে, নকশালীরা মার্কসবাদী হলেও 'বাঙ্গালীপনা' মোটেই বিসর্জন দিতে পারেন নি। দেশীয় মাটিতে বিদেশী চারা গজাবার অন্ধ চেষ্টার মধ্যেই নকশালী আন্দোলনের ব্যর্থতার বীজ প্রোথিত হয়েছিল—তর্কসাপেক্ষ হলেও গ্রন্থকারের এ সিদ্ধান্তও বিশদ চিন্তার দাবী রাখে।

নকশালরা ভারতীয় মার্কসবাদীদের বিশাল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের সর্ব বৃহৎ অংশ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। সর্বহারার এ পার্টিতে চিরকালই মধ্যবিত্তের প্রাধান্য। তাই একদিকে যেমন এ পার্টি অর্থনীতিবাদের (ইকনোমিজম্) শিকার হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নানা গোষ্ঠীতন্ত্রের কবলে পড়েছে। ১৯৬৪তে দু ভাগে পার্টির বিভাজন, ১৯৬৭তে সি পি এমের গর্ভ থেকে নকশালপন্থীদের জন্ম, ১৯৬৯এ সি পি আই (এম এল)এর প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে এম-এল পার্টির শতধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া—এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির এই বিভাজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে আছে, কিন্তু তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নেই। কেন ভারতীয় মাটিতে এত মার্কসবাদী দলের অবস্থান। কেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বয়স প্রায় চীনের পার্টির সমান হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল দেশে তার প্রভাব এত কম এবং কেনই বা এই পার্টি বারে বারে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—এসব প্রশ্ন যেমন মার্কসীয় কর্মীদের কাছে জরুরী, তেমনি প্রয়োজনীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও ইতিহাসের ছাত্রের কাছে।

নকশালদের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত : 'অহিংস বিপ্লবের গুণগত পরিবর্তন নকশালরা ঘটিয়েছেন।' অগ্নিযুগের বিপ্লব ছিল উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বিপ্লব। নকশাল বিপ্লবের রণাঙ্গনে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সাথে একই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিম্নবর্ণের হিন্দু, আদিবাসী এবং মুসলমান। খোকন মজুমদার মুসলমান, জঙ্গল সাঁওতাল এবং গুণধর মুর্মু আদিবাসী, সন্তোষ রাণা তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত, চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জী বা কানু সান্যাল উচ্চবর্ণের হিন্দু। একথা এতে স্পষ্ট হয় যে নকশালীরা ধর্ম এবং জাত (কাস্ট)-এর বন্ধন এড়াতে পেরেছিলেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। অগ্নিযুগের জাতীয়তাবাদের মূলে ছিল হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের রোমান্টিকতা। নিষ্ঠুর হলেও কথাটা সত্যি যে, কোন মুসলমান বা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসী এই বিপ্লববাদে আকৃষ্ট হন নি। নকশালরা কিন্তু জাতিধর্মের এই ভেদ ঘুচিয়েছিলেন। এটুকু সত্য স্বীকার করলেও প্রশ্ন থেকে যায় কাস্ট-এর ভেদ ঘোচালেও তাঁরা কি ক্লাসের ভেদ ঘোচাতে পেরেছিলেন? নকশাল এ্যাকশন বেশীর ভাগ সংঘটিত হয়েছে মধ্যবিত্তদের দ্বারা। শহরে তো বটেই। গ্রামে যদিও বা তীর-ধনুকে সজ্জিত সাঁওতালদের জমি-দখল লড়াই হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবের এই সৈনিকদের রাজনীতিগত কোন ধারণাই ছিল না। গরীব হিন্দু বা মুসলমান যাঁরা গ্রামের কৃষি-মজুর বা ভাগচাষী তাঁরা কেউ ক্ষমতা-দখলের মার্কসীয় রাজনীতি বুঝে নকশালদের সঙ্গে জোতদার খতম অভিযানে যোগ দিয়েছেন—এমন ঘটনা শোনা যায় না। শ্রেণীভেদের বদলে বর্ণভেদের প্রাধান্য ভারতীয় সমাজনীতির রূপরেখা এবং গতিশীলতার (ডায়নামিক্স) আলোচনার এক প্রধান দুর্বলতা। ভারতীয় অর্থনীতিতে বর্ণ এবং শ্রেণী বর্তমানকালে সর্বদাই সমার্থসূচক নয়। মনে হয় এ অংশে গ্রন্থকার বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছেন।

বাংলার একদল বুদ্ধিজীবী নকশালীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এঁদের সমর্থন অবশ্য সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধে এবং মৌখিক তর্কযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থেকেছিল। এঁদের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায়, এঁরা মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কেউ-কেউ চাকুরী-বাকুরীতে স্থিতিলাভ করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের এসব শূন্যগর্ভ কচকচানী বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁদের সমাজ-বিচ্যুত অবস্থান, সুবিধাবাদী আচরণ, তার্কিক ও প্রাবন্ধিক আস্ফালন বাংলার বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সুপরিচিত ইতিহাসের ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন।

গ্রন্থকার সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নকশাল-সংঘর্ষের এক দশক তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তারই ফলশ্রুতি এ গ্রন্থ। উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হবে যে তিনি এই সংঘর্ষকে কেবলমাত্র ঘটনার সমষ্টি হিসেবেই দেখেন নি। এই সংঘর্ষ কিছু সমাজবিরোধী মানুষের কার্যকলাপ কিংবা কিছু ভাবপ্রবণ তরুণের আকস্মিক উচ্ছ্বাস—এ ধরনের প্রচলিত মতবাদের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হননি। এ সংঘর্ষের যথার্থ রূপ এবং তার রাজনীতি ও সমাজনীতিগত তাৎপর্য অনুধাবনে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর কিছু মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত দ্রুত মনে হতে পারে। কিন্তু এসব মন্তব্য যেসব প্রশ্নগুলি তুলেছে, সেসব খুবই জরুরী এবং তারা বিশদ আলোচনার দাবী রাখে। সাংবাদিক হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন—কর্মী-ই হোন বা গবেষকই হোন—তাঁরা কি এগিয়ে আসবেন এই প্রশ্নগুলির তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বিশদ আলোচনায়?

গৌতম ঘোষ

শ্বেত দাগ
আমাদের চিকিৎসা থেকে রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে। মাত্র তিনদিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়।
MRITUNJAYA SUDHA AUSHDHALAYA
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

বেঁচে থাকাই যেন চূড়ান্ত বিপ্লব

বালক জানে না। সুব্রত চক্রবর্তী। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা-৯। দাম ৫ টাকা।

ঠাণ্ডা, সাদা, মৃত্যু, অন্ধকার, নিরপনেষ আলো-আঁধারী, নিঃসঙ্গতা, ঘর-গেরস্থালী এইসব সারিবদ্ধ অনুষঙ্গের ভেতরে সুব্রত আমাদের জন্য নির্মাণ করে তোলেন তাঁর কবিতা শিল্প। কোনো বিপ্লব নেই। আন্দোলনও না। শুধুমাত্র বাঁচা। বেঁচে থাকাই যেন চূড়ান্ত বিপ্লব। তবু 'বালক জানে না' কাব্যগ্রন্থে কোনো চরিত্রই চৈতন্যহীনভাবে আত্মতৃপ্ত নয়, দেখে আমাদের ভালো লাগে। অবিরল নিজেকে খোঁড়া আছে তাঁর কবিতায়। খননকালে প্রোথিত সম্পত্তির মতোই এক-একটি বোধ উঠে আসছে তাঁর হাতে। এবং ক্রমে আর্তনাদ স্তব্ধ হয়ে আসছে। এক নিখুঁত শিল্পীর ছবির মতো স্তব্ধতায় তাঁর কবিতা যেন নতুন একটি দিকে বাঁক নিতে চায়। অর্থাৎ বেঁচে থাকা এই বৃহত্তর ব্যাপারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর কবিতার শব্দচেতনা।

অল্পবিস্তর আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে আছি একটি টাকার এপিঠ ওপিঠের মতো। কবিও তাই। তাঁরও জীবনের আলোড়ন সাধারণ মানুষের মতোই। শুধু 'তিনি তাকাবেন তাঁর আত্মার দিকে, বিচার করবেন, জানবেন যখনি কেবল তিনি তা জানতে পারবেন, তখনি কেবল তার পরিচর্যা সম্ভব।' সুব্রত চক্রবর্তী সেইরকম স্পষ্ট চোখে আত্মার দিকে তাকিয়ে জানতে পারেন, 'কবি তো সন্ন্যাসী নয়, ওর ঘর-গেরস্থালী আছে। ঃ আছে নাতি বাবা তার (কবির ঘর-গেরস্থালী)' তৎসত্ত্বেও কি এক দুর্জ্ঞেয় কারণে তার মুক্তি নেই ক্ষুদে লাল পিঁপড়ের মতো লক্ষ শব্দ থেকে, যা তাঁর মগজের অন্ধকার খোঁড়ে অনবরতই। তিনি নিজে সন্দেহ-পরায়ণ প্রশ্ন তুলে বুঝতেও চান শব্দগুলির সত্যিই কোনো কার্যকারীতা আছে কিনা। নাকি শুধুই তা এলোমেলো শব্দের কংকাল।

'প্রতিক্রিয়াশীল' এই বহু-ব্যবহৃত হাস্যকর শব্দটির চাপে আরো যাঁরা কিঞ্চিৎ নুয়ে আছেন, তাঁরা অবলীলায় সুব্রতকে বলতে পারবেন প্রতিক্রিয়াশীল। কেননা চৌষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী গোটা এই কবিতাগ্রন্থের সব কবিতাগুলিই নিভৃত মানুষেরই কোনো-না-কোনো ঘটনা দুর্ঘটনার কথা। প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক জীবন পাল্টে দেবার সত্যিই কোনো দৈবী-ওষুধ জানা নেই কবির। তিনি ঠিক যেরকম আছেন, তাঁর কবিতাগুলিও তাঁকে সেইভাবে ধরে আছে নিরুদ্বেগে। 'জীবন যাপন রোপে অন্ধকার নেমে আসে, হাত থেকে চলে যাচ্ছে সবই (চলে যাচ্ছে)।' দংশিত হবার জন্যে তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় অপেক্ষা করার চিহ্ন এখানে স্পষ্ট।

যখন আমরা তাঁর কবিতা থেকে জানতে পারি 'মৃত্যুহীন, জন্মান্তরহীন একটি ধূসর মথ বসে থাকে নিঃসঙ্গ টেবিলে' তখন টেবিলটির বিশালতায় ও মথের ক্ষুদ্রতায় আমরা আন্তরিক কম্পিত না হয়ে পারি না। এতো কালো জীবনের ছবি তিনি আমাদের না দেখলে ভালো করতেন। কবির অভিজ্ঞতাই হয়তো উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দূরে ধূসরে টান দিচ্ছে তাঁকে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমরাও এক ভয়াবহ অন্ধকার গহ্বরের মুখোমুখি হই। অবশ্য সুব্রত আমাদের মিথ্যে স্তোকবাক্য শোনান নি। তাঁর এই আন্তরিকতা মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

তবু আশ্বাসের এই যে অন্তত গার্হস্থ্য জীবনটির সঙ্গে তিনি জড়িত থাকতে ভালবাসেন। 'শিশুর বুকে হাত রেখে অন্তত শৈশবের স্মৃতিগুলি তাঁকে হানা দেয়। তাই তাঁর মুখচ্ছবি শেষ পর্যন্ত মানুষেরই মতন। আরো কিছু উচ্ছৃঙ্খল সড়কের খবর তাঁর জানা আছে। ফলে পড়ে যেতে যেতেও তিনি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। 'কেউ কি জানে ঐ মানুষের বুকে দারুণ খরা। বালিকা তাই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে ঝরে।' আরেকজন সর্বশক্তিমান কেউ আছেন কবির—'তাঁর শান্ত চোখের ইঙ্গিতে বজ্র ও বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নামে বাড়ের খরায়।'; মাঝরাতে ফেরিঘাটে শোনা যায় মন্দ্র কণ্ঠস্বর ঃ চলে আয়, চলে আয় ওরে ..।' এছাড়াও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁকে, 'মানুষের হাত রেখেছে, পিছনে টেনে, অপরাধে, শুশ্রূষায়, প্রেমে ..।' সন্ন্যাসীর স্বাজাত্যবোধ ছাড়া কি এই সম্মানটুকু উচ্চারিত হোতো?

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দুঃখই শেষ কথা নয়

হাওয়া, স্পর্শ করো ।। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ।। ঈশান ।। ৭৯।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯ ।। পাঁচ টাকা ।।

কবিতা ব্যক্তিত্বের সুষুপ্তি ভেদে মনের অন্তর্লীন ভাবনাগুলিকে ছুঁয়ে আসতে পারে। গদ্যে এতখানি করা খুব কঠিন। যা পুরোপুরি খুলে বলা হোলো না, শুধু আভাস দেওয়া হোলো মাত্র—শব্দের চকিত ব্যঞ্জনা কেবল ক্ষণিক আলোর উদ্ভাসিত করলো মনকে। কবি ইয়েট্স বলেছিলেন—যে প্রতীকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, যে প্রতীক কেবলমাত্র নিগূঢ় ভালো লাগায় পাঠকের হৃদয়কে দুলিয়ে দেয়, তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি এই ইঙ্গিতময়তায় মুখর। অনেকগুলি ভাবনা বার বার ঘুরে ফিরে কবিতায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরে সবচেয়ে অর্থবহভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই আপাত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের অন্য কোনো পরমলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার আর্তি। যেমন, 'আকাশে একটু একটু তারা ফুটে উঠছে,/ বাদামী রঙের ঘোড়া নিম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে এখন কোথায় যেতে হবে।' কিংবা 'কে এখন কাকে ডাকছে?/ দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে।/... 'কে এখন কার কাছে?' প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ঘরে।'

সমসময় চিরকালই কবিদের দুঃখিত করেছে। কবির মনোজগতের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটার মিল হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো প্রকৃতিনিমগ্ন কবিকেও একবার সচেতন হয়ে বলে উঠতে হয়েছিলো—'This world is too much with us'—তেমনি স্পষ্ট অনুভব করা যায় প্রণবেন্দুও কি এক অনির্দেশ্য যন্ত্রণায় দীর্ণ হচ্ছেন। সেই বেদনা থেকেই উঠে এসেছে এইসব পংক্তি—'ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে, অথচ বাইরে ছাই জমছে না। এই আমার চুরুট—। একে তোমরা লক্ষ করো।'

কিন্তু দুঃখই কবির কাছে কিছু শেষ কথা হতে পারে না। তাই গ্রন্থের সবশেষ কবিতাটিকে প্রণবেন্দু উচ্ছ্বল বিশ্বাসের কোমলতায় সিক্ত করে তুলেছেন। একটি আশ্চর্য কবিতা, যেখানে কবি নিজেকে বলছেন—'. সুখদুঃখ আসুক, সেভাবে/ আলোছায়া খেলা করে, পাতাবাহারের নড়ফড়া / তুমি লিখে যাও, তুমি শব্দ লিখে যাও।'

শব্দের ব্যবহারে, প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সার্থকতা পেয়েছে বইখানি। মুদ্রন পারিপাট্য সুন্দর। প্রচ্ছদে রুচির পরিচয় আছে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

বহুল প্রচারিত 'অমৃত'-এ মনোরঞ্জন বসু লিখিত 'গদাধর থেকে রামকৃষ্ণ'র প্রথম কিস্তি পড়লাম, ভাল লাগল। শুধু দেখে মনে হচ্ছে এ রচনাটি যেমন মননশীলতার সমৃদ্ধ হবে, তেমনি হৃদয়গ্রাহীও হবে। কিন্তু পড়তে গিয়ে আমাদের মত সাধারণ পাঠক, বিশেষত যারা এসব মনন থেকে দূরে আছে; দু'এক জায়গা ঠেকে যাচ্ছে প্রথম কিস্তিতেই যদি এ অবস্থা হয় তবে পরবর্তী কিস্তিগুলিতে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন স্তর এবং স্তরগুলির অতিক্রমণ বর্ণিত হবে, সেখানে আমাদের মতো পাঠক অবশ্যই তার রস গ্রহণে অসমর্থ হবে। এ-কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মূলতঃ এগুলির রস-গ্রহণ উপলব্ধি দিয়েই করতে হয়। সেই সাধন লব্ধ উপলব্ধি আমাদের অনেকের নেই। তবু লেখক মহাশয়কে অনুরোধ যে প্রথম কিস্তির যে সে জায়গাগুলি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ছিল (অবশ্য বিদগ্ধ জনের জন্য নয়) সেই জায়গাগুলি পরবর্তী কালে প্রকাশিত অংশগুলিতে যেন একটু সরল করে বলে দেন।

এতদিন রামকৃষ্ণের জীবনী শুধু পড়েছি শুনেছি তোতাপুরী এসেছিলেন বেদান্ত শিক্ষা দিতে এসেছিলেন ভৈরবী তন্ত্রে দীক্ষা দিতে, কিন্তু গদাধর যে যে সাধন স্তর অতিক্রম করে রামকৃষ্ণের লক্ষে সঠিকভাবে পৌঁছেছিলেন এবার সেগুলি জানবার কৌতূহল মিটবে।

আধ্যাত্মিক জগতে 'চিতি শক্তি উন্মেষের' কথা আগেও জেনেছি কিন্তু চিতি শক্তি উন্মেষের লক্ষণ কি কি তা একটু বললে আমাদের সুবিধা হত। আবার 'ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট জাগতিক বস্তু সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি...ইত্যাদিতে ত্রিমাত্রা কি, কাল চতুর্থ মাত্রা কেন? জানতে ইচ্ছা হয়।

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Bharat Ayurvedashram (A C.)
P.O. KATRISARAI (GAYA)

হাফিজ ইব্রাহিমের জিজ্ঞাসা

এবারের কিস্তি পড়লে মনে হয় লেখক কেবল প্রবন্ধই লিখেছেন না (যেমন ইতি-পূর্বে লিখেছেন অনেকে) নিজস্ব উপলব্ধি কিছু সত্যকে অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সাধন ধর্মকে প্রকাশ করতে চান। আমার আকাংখা এই জন্যই সম্ভবতঃ এমন আশা অনেকের থাকবে।

১৮ পৃঃ তৃতীয় কলমে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যে সব প্রশ্নগুলি তিনি রেখে-ছেন, তাঁর যথাযথ উত্তর তিনি অবশ্যই দেবেন। আমাদের অনুরোধ আমাদের মত সাধারণ পাঠকের জন্য তিনি আর একটু শ্রম স্বীকার করুন।

হাফিজ ইব্রাহিম
মহিষাদল
মেদিনীপুর

তুলনা হয় না

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় এর 'মৃত্যুদণ্ড শেষ বিচার হতে পারে না', (সত্যিই হতে পারে না।) ও উৎপলকুমার বসুর পাবলো নেরুদার জবানবন্দী' খুবই ভাল লাগলো। এরকম রচনা অমৃতের পাতায় মাঝে মাঝে আশা করি পাব। ২০ আশ্বিন '৮৪ ১৭ বর্ষ. ২২ সংখ্যার মত অন্য সংখ্যাগুলো তেমন মনকে টানেনি। কবিতা সিংহ-র 'বসালাপ' সত্যিই সুন্দর। অমৃত নবীন-প্রবীনের লেখা নিয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করুক এটাই কামনা করি।—কৃশাঙ্কুর সাহা, সম্পাদক—উৎসাহ। নৈহাটী, ২৪ পরগণা, ২ নং বিজয়নগর।

পাঠককে ধোকা দেবার গল্প

গত ২২ জুলাই-এর 'অমৃত'-এ প্রকাশিত শৈবাল মিত্রর দিন নেই রাত নেই' গল্প প্রসঙ্গে দু'কলম লিখছি।

লেখকের লেখার ঢং সাবলীল ও সুন্দর অনস্বীকার্য; কিন্তু গল্পটির বিষয়-বস্তু একেবারেই জোলো। গল্পের নায়ককে একজন বিপ্লবী কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু একটা ব্যাগ পৌঁছে দেবার ঘটনা ছাড়া তার কার্যকর্মের (বৈপ্লবিক) বিশেষ কোন উল্লেখ নেই।

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বা 'নয়া গণতন্ত্র' ঘরে মাথার কাছে রাখলেই যেন সাচ্চা কম্যু-নিষ্ট হওয়া যায়—এটাই কি লেখক পাঠকদের বুঝাতে চেয়েছেন? একটা বটতলার বই পড়ার পর নায়কের কিয়াকলাপ শৈবালবাবু যেভাবে এঁকেছেন তাতে এটুকু বলার আছে যে একজন সত্যিকারের আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে মোটেই অতটা অসংযত হওয়া সম্ভব নয়—যারা শুধু বড় বড় বুলি মুখেই আওড়ায় তাদের পক্ষেই সম্ভব। কথা প্রসঙ্গে আরও বলছি যে, বিপ্লবীদের জীবনে প্রেমিকার আবশ্যিকতা অবশ্যই আছে, তা হচ্ছে সহকর্মিনী হিসাবে কিন্তু রেস্টুরেন্টের নির্জন কোণে শারী-রিক আরাম উপভোগের উৎস হিসাবে নয়। লেখক নায়ককে একবার জেলে অন্তরীণ দেখিয়েছেন। কিন্তু জেলের মধ্যে সত্যিকার আদর্শবাদী রাজবন্দীদের উপর যে অত্যাচার হত তার বিশেষ কোন চিহ্নই গল্পে আমরা পাই না। লেখক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতেই সমস্ত বিপ্লবীদের বিচার করেন বলেই মনে হল। 'অমৃত'-এর কাছে এটুকু প্রত্যাশা করি যেন সস্তা এবং পাঠককে ধোকা দেবার গল্প তাতে না থাকে কারণ অপসংস্কৃতির জোয়ার তো এদেশে চলছেই তার থেকে যেন অমৃত রেহাই পায়।—বুলান দত্ত কলকাতা-৪০।

ভ্রান্তিবশত উল্লেখ করা হয়েছে

১৯ আগষ্টের অমৃত পত্রিকায় মুদ্রিত শ্রীশকতিপদ রাজগুরুর 'বোম্বাই চিত্রলোকে বাঙ্গালী গল্পকার' প্রবন্ধে লেখক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ভ্রান্তিবশত উল্লেখ করা হয়েছে। ১। আমার স্ত্রী কোল-কাতার হিন্দুস্থান পার্ক অঞ্চলের মেয়ে নন। উনি দিল্লির মেয়ে।

২। আমাদের ফার্ম গ্যানসন্স লিমিটেডের ওষুধ তৈরীর মেশিনারী ও অন্যান্য ইঞ্জি-নিয়ারিং ইকুপমেন্ট তৈরী করে। আমাদের নিজস্ব কোনও ওষুধের কারখানা নেই: স্যান্ডোজ কোঃ-র সঙ্গে আমাদের কোনও বাণিজ্য সম্বন্ধ কিংবা ইনভেস্টমেন্ট নেই। প্রসঙ্গতঃ আমার ছোট ভাই শ্রীরন্তনাথ ব্যানার্জি স্যান্ডোজ কোঃ-র ম্যানেজিং ডাইরেকটর। শ্রীনীলিমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ২০৭ কাকদ চেম্বারস, ডঃ অ্যানি বেসান্ত রোড, ওরলি, বোম্বাই-৪০০০১৮।

বিশপ রিচার্ডসনের কথা বলতেই হয়

'অমৃত'-র ২৪ জুন সংখ্যায় শ্রীমনোজিৎ মিত্র-র 'আমার নাম হোলচু' রচনাটি পড়ে পাঠকের কিছু পুরাতন স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একাধিকবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপমালা ভ্রমণ করার ফলে সমগ্র অঞ্চলটির প্রতি একটি ভালবাসা জন্মে গিয়েছে। তাই মাঝে মাঝেই এই অঞ্চলের ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। বোধহয় এই কারণেই মন দিয়ে শ্রী মিত্রের মনোরম রচনাটি বার বার পড়লাম। শ্রী মিত্রের রচনাটির বিষয়ে দু'একটি কথা বলার ইচ্ছে হল।

মনোজিৎ বাবু লিখেছেন বিমানে রেঙ্গুন ছুঁয়ে আটশ মাইল আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু আসলে তা নয়। বর্ত-মানে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ভাইকাউন্ট বিমানে কলকাতা থেকে রেঙ্গুন ছুঁয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যেতে সময় লাগে প্রায় সোয়া পাঁচ

ঘণ্টা। কলকাতা থেকে রেঙ্গুন দু ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। রেঙ্গুনে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আবার দু ঘণ্টার রাস্তা পোর্ট ব্লেয়ার। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আরও জানিয়ে দিচ্ছি যে, যেহেতু প্লেন রেঙ্গুন হয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যায় সেই জন্য বিমানে আন্দামান যেতে হলে প্রতিটি যাত্রীর প্রয়োজন। পাসপোর্ট ও আন্তর্জাতিক হেলথ সার্টিফিকেট। এই দুটি ছাড়া কারো পক্ষে বিমানে আন্দামান যাওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যে জাহাজ আরও দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপমালার দিকে যাতায়াত করে সেই জাহাজ সম্বন্ধে মনোজিৎ বাবু কিছু মন্তব্য করলে আন্দামান ও নিকোবরবাসীদের অনেক ধন্যবাদ কুড়োতেন। ভারতের শিপিং কর্পোরেশনের দুখানি প্রায় ১৫০০ টনের অতি পুরাতন যাত্রীবাহী জাহাজই হচ্ছে এই দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র অবলম্বন। জাহাজ ক্যাবিনের সংখ্যা অত্যন্ত কম বহু সময়ই যাত্রীদের সপরিবারে ডেকের ওপর বসে রাত কাটাতে হয়। বর্ষার সময় ডেক ও বাংকের যাত্রীদের কষ্টের শেষ থাকে না। ডেকের ওপর বসার জন্য চেয়ারের বা বেঞ্চেরও ব্যবস্থা নেই। তাই খবরের কাগজ বা চাদর বিছিয়ে হাঁটু মুড়ে ডেকের ওপর বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। জাহাজ কর্তৃপক্ষের উচিৎ অবিলম্বে এই অবহেলিত দ্বীপমালা ও তাদের ভুলে যাওয়া মানুষদের দিকে নজর দেওয়া।

এবার আবার ফিরে আসা যাক মনোজিৎ বাবুর মনোরম রচনায়। উনি লিখেছেন নিকোবরে সবাই খৃষ্টান। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। একমাত্র কার-নিকোবর দ্বীপে শতকরা ৯৮ জনই খৃষ্টান। মাত্র শতকরা ২ জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু গোটা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্টানবলম্বী হলেন শতকরা ৮০ জন। চৌড়া ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে এখনও বেঁচে আছে উপজাতীয় ধর্ম; রয়েছে মূর্তি ও নানা উপদেবতা পূজার প্রচলন। চৌড়ার প্রাচীন পুরোহিতদের নিকোবরী খৃষ্টানরাও সমীহ করে চলেন।

নিকোবরে এখনো শহরের খবরের কাগজ বা আইসক্রীমের গেলাস পৌঁছয়নি বটে কিন্তু দুটি শহুরে জিনিস লেখকের চোখ এড়িয়েছে। প্রায় প্রতিটি নিকোবরির ঘরে রয়েছে কম করে একটি বাই সাইকেল। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো প্রত্যেকের পরম প্রিয় বস্তু এই বাই সাইকেল। আর প্রায় প্রতি ঘরে রয়েছে একটি করে সেলাই করার কল। বস্ত্রসঙ্গে বুশসার্ট, হাফ প্যান্ট, ব্লাউজ আর লুঙ্গী সব বয়েসের স্ত্রী-পুরুষের অতি প্রিয়। মেয়েরা ঘরে বসেই এসব সেলাই করেন।

যদিও কার নিকোবরে সিনেমা হল নেই কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসীরা সিনেমার পরম ভক্ত। খোলা আকাশের নীচে যখন মাঝে মাঝে সিনেমা দেখানো হয় তখন মাঠে তিলধারণের জায়গা থাকে না। কার নিকোবরের অনেক যুবক যুবতীর কণ্ঠেই শুনতে পাওয়া যায় পরিচিত হিন্দী সিনেমার গান।

প্রাইমারী ও হাই স্কুলের সংখ্যা ও কার নিকোবরে নেহাৎ কম নয়। এখানে ছেলেরা যেমন খেলে ফুটবল, তেমনি মেয়েরা মেলে ভলিবল। প্রায় প্রতিটি স্কুলের সঙ্গেই রয়েছে ভলিবল খেলার মাঠ।

আধুনিক সমাজের আরেক প্রতীক ব্যাংক। তাও রয়েছে কার নিকোবরে। মনোজিৎ বাবু বোধহয় স্বল্প সময়ের ভ্রমণের মধ্যে জানতে পারেননি যে আজ কার নিকোবরের মানুষ গর্বের সঙ্গে নতুন অতিথিদের দেখান তাদের 'চুক চুচা' গ্রামে 'স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া'র কার নিকোবর শাখার বিরাট সাইনবোর্ড। সঞ্চয় বিমুখ নিকোবরবাসীরা আজ বস্ত্র বেরঙের পাশ বই হাতে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে। পরিবর্তনের হাওয়া নিকোবরের সবত্র নারকোল ধনের ওপর দিয়ে বেশ জোরেই বয়ে চলেছে।

কার নিকোবর ও নিকোবর দ্বীপমালার কথা বলতে গিয়ে আধুনিক নিকোবরের জনক বিশপ রিচার্ডসনের কথা বলতেই হয়। তা না বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা দখল করেছিল কার নিকোবর। বিশপের নেতৃত্বে নিকোবরবাসীরা বার বার বাধা দিয়েছে জাপানীদের। জাপানীদের হাতে দুবার মৃত্যু দণ্ড পেয়েও দৈবক্রমে রক্ষা পান বিশপ রিচার্ডসন। বিশপ রিচার্ডসন তাঁর দ্বীপের মানুষদের উপহার দিয়েছেন নিকোবরী ভাষায় লেখা প্রথম সুবৃহৎ বাইবেল, যা প্রতিটি নিকোবরীর গর্বের বস্তু। আজও সরকারী অথবা বেসরকারী প্রচেষ্টায় কোন উন্নয়নমূলক কাজ বিশপের অনুমতি ছাড়া আরম্ভ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। গোটা কার নিকোবর ঘুরে দেখা যায় একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ মর্মর মূর্তি। সেটি বিশপ রিচার্ডসনেরই।

মনোজিৎ বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।—সুদেব দাস, গরচা রোড, কলকাতা-১৯।

দিন নেই রাত নেই

অমৃততে শৈবাল মিত্রের লেখা বড় গল্প 'দিন নেই রাত নেই' পড়লাম এবং অভিভূত হলাম। কয়েকটি বিশেষ কারণে গল্পটিকে সাম্প্রতিককালের অনেকের লেখা অনেক গল্প থেকে আলাদা করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ এত তাজা ও জীবন্ত গল্প অনেকদিন পড়ি নি। লেখকের কলমের ছোঁয়ায় গল্পটি সত্যিকার প্রাণ পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, লেখাটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট আছে। পড়তে আরম্ভ করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ করতে হয়েছে। কোনো সময় একঘেয়ে বা অবাস্তব লাগে নি।

তৃতীয়তঃ লেখকের ভাষা অনবদ্য একেবারে নিজস্ব। মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সময়েও তিনি কখনো দুর্বোধ্য তৎসম কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি। তাঁর সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ভাষাটিও লক্ষ্যণীয়।

আমি অন্যতম বিচারক হলে শৈবাল-বাবুকে গল্পটি লেখার জন্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত করতাম। তাঁকে অমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। তাঁর লেখার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সম্ভব হলে তাঁর ঠিকানাটি আমাকে জানাবেন।

সান্ত্বনা চৌধুরী;
পি-১১০, বিজেন্ট পার্ক,
কোলকাতা-৭০০০৪০

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার সূচী। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর (স্ফুলিঙ্গ), ভরতমুনি (নাট্যশাস্ত্র), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (দুই শিল্পী), হরপ্রসাদ মিত্র (রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রথম পর্ব), অজিতকুমার ঘোষ (চিরনায়ক অমরেন্দ্রনাথ), রামজীবন আচার্য (উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িকপত্রে মুখবন্ধ শ্লোক), রামবহাল তেওয়ারী (হিন্দী সাহিত্যে শরৎ-রবণ), অমলেন্দু চক্রবর্তী (রবীন্দ্র-নাট্যে প্রত্যাবৃত্ত প্রতিমা) শোভন সোম (শিল্পী অতুল বসু), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (গ্রন্থসমালোচনা)।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যা তিন টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

ভগবানের বিরুদ্ধে

অজিত দে

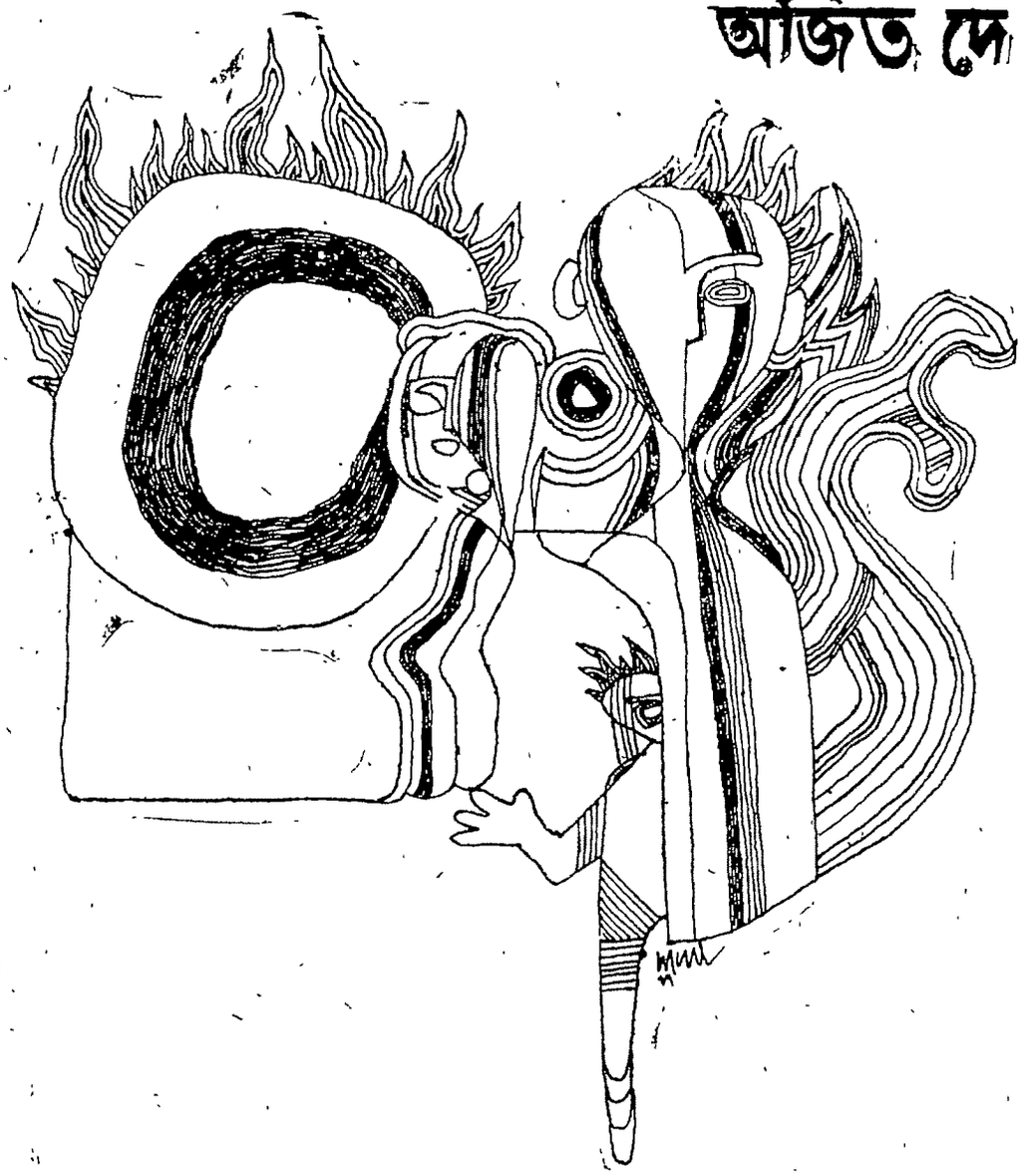

বেসিনের ওপর ঝুঁকে চোখে মুখে বেশ খানিকটা জল ছিটিয়ে তুষার মাথা তুলল। নাহ্, আজ আর নিজেকে অন্যান্য দিনের মতো ফ্রেস লাগছে না কিছুতেই।

আলতোভাবে রুমালে মুখ মুছে তুষার বেসিনের ওপরে দেয়ালে হালফিল লাগানো ডিম্বাকৃতি আয়নায় নিজেকে দেখল। ভিতরে ভিতরে সে আজ ভীষণ বিপর্যস্ত, এখন তার মুখে চোখে বাইরের চেহারারও বিধ্বস্ত ভাবগুলো ফুটে উঠছে। চুলে প্লাস্টিকের হাত-চিরুনী চালাতে চালাতে তুষার দেখল, তার মুখটা সম্পূর্ণ চুপসে গিয়েছে,। চোখ বসা এবং নিখুঁত-ভাবে কামানো দুটো গালেই কেউ যেন কালির পোঁচ টেনে দিয়েছে এমন মনে হচ্ছে। ঘন দাড়ির জন্য কামানোর পর তুষারের ফর্সা গাল দুটো অন্যান্য দিন ঈষৎ নীলাভ দেখায়। আজ সারাটা দিনই তার ভিতরে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সেই আঁচে তার সারা মুখটাই যেন ঝলসে কালো হয়ে গেছে।

অথচ সকালেও অফিসে আসবার পথে সিগারেট কেনার সময় দোকানের আয়নায় তুষার নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখেছিল। প্রতিদিনের মতই তার নিজেকে বেশ সুশ্রী এবং স্মার্ট মনে হয়েছিল। টেরিকটনের ট্রাউজার ও সার্টে সপ্রতিভ ঝকঝকে চেহারায় তাকে রীতিমতো সুখী ও সম্ভ্রান্ত লাগছিল। এমন কি, লরেটোয়-পড়া তার তন্বী শ্যালিকা তনিমা যে একদিন মুগ্ধ সপ্রশংস চোখে তার চেহারার তারিফ করেছিল এবং বলেছিল, তুষারদার চেহারাটা পুরো একসিকিউটিভ টাইপের, পান-সিগারেটের দোকানের আয়নায় নিজেকে আড় চোখে দেখতে দেখতে এ-সব কথাও একবার তুষারের মনে এসেছিল।

চিরুনিটা পকেটে রাখতে রাখতে আয়নার দিকে তাকিয়ে তুষার বিড়বিড় করে বলল, আমি শলা পুরো ফ্রাসটেটেড হয়ে গেছি। বেলা এগারোটা নাগাদ বিল সেকশনের সুখময় খবরটা দেওয়ার পর থেকেই আমার মধ্যে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। অন্য কেউ বললে এমন কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু বিল সেকশনের সুখময় পার্টির বিল তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে দেওয়ার সুবাদে বেশ টু-পাইস কামায় এবং নীতি-ফিতির বালাই রাখে না বলে পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গী অঞ্চলের হোটেল-ফোটেলে তার অনায়াস গতায়াত আছে। সপ্তাহে অন্তত দু' দিন সুখময়ের গলা ভীষণ শুকিয়ে যায় এবং কয়েক পেগ হুইস্কি গলা দিয়ে না নামা পর্যন্ত তার তৃষ্ণা মেটে না। গতকাল সন্ধ্যায় সুখময়ের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলে সে পার্ক স্ট্রীটের কোনো এক নামজাদা হোটেলে ঢুকে যখন সবে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে চুমুক দিয়েছে সেই সময় সে স্টোর্স ডিভিশনের শেখর বোস এবং ডেপুটি কমার্শিয়াল ম্যানেজার সোমেন হাজরাকে

এক সঙ্গে এক টেবিলে বসে গেলাস ঠোকা-ঠুকি করে মদ্যপান করতে দেখে। দুজনের পানের মাত্রা এমন চড়ে গিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত ক্যাবারে নাচের শেষ দিকে সোমেশ হালদারকে তার প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে নাচতেও দেখা যায়। শেখর বোস হালদার সাহেবের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে না থাকলে একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেত। শালা গজকচ্ছপ হালদারের সে কি নাচ মাইরি! হি-হি করে হাসতে হাসতে সুখময় বলল, হালদার ব্যাটা যে ডুবে ডুবে জল খায় জানতুম না। আমারও প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি, আমার কি মনে হচ্ছিল জানিস? মনে হচ্ছিল বলি, দেখতো দেখতো কাত্যায়ন আমি বেঁচে আছি কিনা।

টয়লেট রুম থেকে বেরোতে বেরোতে তুষার সুখময়ের ওপর খেপে উঠল। সব সময় শালার থিয়েটারি ঢঙ। সেই কবে একবার অফিস ক্লাবের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে অভিনয় করেছিল। চাণক্যের রোলটা পেয়েছিল সুখময় এবং চানক্যের ভূমিকায় তার অভিনয় প্রেক্ষাগৃহ মাৎ করে দিয়েছিল। ব্যস, সেই থেকে সুখময় চলনে বলনে পুরোপুরি চাণক্য বনে গেল। তেমনি দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তেমনি কুটিল চাউনি।

প্রোমোশনের দফা গয়া। সুখময়ের কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শীত শীত অনুভূতির মধ্য দিয়ে তুষার সে কথা বুঝতে পেরেছিল। পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে ক্যাবারে নাচ দেখতে দেখতে শেখর বোসের সঙ্গে হালদার সায়েবের ঢুকু ঢুকু করে মদ খাওয়ার পর তুষারের আর প্রোমোশনের আশা রাখার কোনো মানেই হয় না। বহুদিন ধরে তুষার এই প্রোমোশনের আশা সযত্নে লালন করছিল। বস্তুত এ জন্যই ইদানীং সে প্রতিদিন দাড়ি কামানো শুরু করেছিল এবং নিজেকে ফিটফাট রাখছিল। প্রায় আধা অগোচর-ভাবেই সে ভাবী অফিসার পদের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল। অফিসের প্রয়োজনে এ্যাসিস্টান্ট পাবলিসিটি অফিসারের একটি বাড়তি নতুন পদ তৈরি হয়েছে। এক্স-ক্যাডার পোস্ট। অতএব সিনিয়রিটির প্রশ্ন অবান্তর। অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাই এক্ষেত্রে যোগ্যতার একমাত্র নিরিখ। বিভাগীয় প্রার্থীদের যোগ্যতা থাকলে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এমন কথা আছে। এই অফিসে কেরানী হয়ে ঢোকবার আগে দু' দুটো ভালো পাবলিসিটি ফার্মে তুষার কাজ করেছিল। সুতরাং পাবলিসিটির কাজকর্ম সম্পর্কে সে মোটামুটি ওয়াকিবহাল বলে দাবী করতে পারে। এছাড়া এই অফিসে তার সার্ভিস রেকর্ডও ভালো। পাঁচটায় ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সে কোনদিন বেরোয় নি, বাকি কাজ শেষ করে উঠতে উঠতে প্রায় রোজই সাড়ে ছটা সাতটা বেজে গিয়েছে। সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সারা অফিসেও তার সুনাম আছে। তুলনায় শেখর বোস ফাঁকিবাজ এবং অভিজ্ঞতার নজির হিসেবে সে দুরথ্যেস্তের সঙ্গে যে সব কাজের প্রশংসাপত্র দাখিল করেছে তা সম্ভবত ভুয়া বলেই তুষারের ধারণা। কিন্তু তাতে শেখর বোসের প্রোমোশন হতে বাধা কী? সার্টিফিকেটগুলোই না হয় ফলস, পার্ক স্ট্রীটের হোটেলের সেই মদির সন্ধ্যাটি তো আর ভুয়া নয়।

খবরটা দেওয়ার পর কুটিল চাউনি হেনে সুখময় মন্তব্য করেছিল, তা শেখরের হাঁটুর জোর আছে বলতে হবে, কেমন ল্যাংখাম্ন দিল তোকে?

নিজের সীটে এসে ভুয়ারে চাবি দিয়ে তুষার ঘড়ি দেখল। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। বড়বাবুর টেবিলে এসে হাজিরা খাতায় ডিপারচারের সময় নোট করতে গেলে ধুলো-পড়া চোয়াল নাড়িয়ে বড়বাবু রমা-প্রসন্ন বললেন, কি ব্যাপার, শরীর খারাপ না কি, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন যে!

কথা বাড়াবার ভয়ে তুষার বলল, হ্যাঁ, কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে শরীরটা।

বিল সেকশনের পাশ দিয়ে যাবার সময় সুখময়ের চোখে চোখ পড়ল তুষারের। ঠিক একেবারে পাঁচটায় তুষার অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এ অবশ্যই একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য এবং সেই জন্যই হয়তো সুখময়ের চোখ দুটো কৌতুকে অমন চকচক করছে। ভীষণ ভয় পেয়ে তুষার জোরে হাঁটতে সুরু করল। কে জানে সুখময় হয়তো এখুনি চেঁচিয়ে উঠবে, দেখ তো দেখতো কাত্যায়ন বেঁচে আছি কিনা।

অফিসের বাইরে এসে তুষার হাঁপ ছাড়ল। উদাস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে সুরু করল সে। ট্রাম-বাসে যা ভিড়, হাঁটা ছাড়া উপায় কি! তাছাড়া, তুষার ভাবল, হাঁটাই তার উচিত। কেননা, সে ফ্রাসট্রেটেড এবং ফ্রাসট্রেটেড মানুষেরা হেঁটেই বাড়ি ফেরে। রেসের মাঠে সে অবশ্য কখনো যায় নি। তবে শুনেছে রেসে হারবার পর মানুষগুলো আখ চিবোতে চিবোতে হেঁটে বাড়ি ফেরে। তুষার কোনো আখওয়ালা দেখতে পেল না। অগত্যা সে দশ পয়সার চিনে বাদাম কিনে পকেটে পুরল। এক একটা চিনে বাদাম ফটাস ফটাস করে ভেঙে মুখে দিতে দিতে সে এগোতে লাগল। চিনেবাদাম ভাঙবার সময় একবার পথ চলতি কোন এক দোকানের আয়নায় সে তার মুখ দেখল। খোসার ওপর আঙুল দিয়ে টিপে ভাঙবার চেষ্টায় মুখটা ঈষৎ বিকৃত এবং নৃশংস দেখাচ্ছে। তুষার খুশি হল। তার একটু নৃশংস হওয়ার বড়ো প্রয়োজন।

বাড়ি পৌঁছে তুষার জামা কাপড় ছাড়ল না। শুধু কোনো মতে জুতো জোড়া খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তার শরীরের হাড় মাংস ধুলো আলগা হয়ে যেতে চাইছে। অপরিসীম ক্লান্তিতে তুষার চোখ বুজে রইল।

কানের কাছে মায়ের গলা বেজে উঠল, চা খাবি—না, বৌমা এলে এক সঙ্গে দেব। বৌমার আজ দেরি হচ্ছে কেন কে জানে।

—আমারটা দিয়ে দাও বরং। জড়ানো গলায় তুষার কোন মতে বলল।

একটা আস্ত পাজী ওই হালদার সায়েব। পার্কস্ট্রীটের হোটেলে মদ গিলে ন্যাংটো মেমসাহেবের নাচ দেখবার সময় ব্যাটাছেলের সময়ের অভাব হয় না। অথচ হালদারকে একটু এন্টারটেন করবার জন্যে তুষার বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করেছিল মাস চারেক আগে। হালদার সায়েবকে যথারীতি নেমন্তন্ন করেছিল। গুচ্ছের পয়সা খরচা করে বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি ভুতভোজন করাতে হল, উপায় কি, এক হালদার সায়েবের আর আসার সময় হল না। পরিবর্তে কোন এক নামকরা নার্শারী থেকে উর্দি-পরা তকমা-আঁটা এক বেয়ারা গুটিকয়েক রজনীগন্ধার ডাঁটি ও হালদার সায়েবের নামাঙ্কিত একটি গ্রীটিংস কার্ড নিয়ে হাজির। এসে ফুল আর কার্ড হাতে দেওয়ার পর বিরাট এক সেলাম ঠুকে সেই যে ব্যাটা দাঁড়িয়ে রইল আর নড়ে না। শেষে একটাকা বকশিস দিতে তবে কপাল থেকে হাত নেমেছিল।

হালদার সায়েব এল না বটে, কিন্তু আরতিদের স্কুলের সেক্রেটারী ধ্রুবেশ সাহা ঠিক এসে হাজির। গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘাড়ে গলায় পাউডার মেখে মোলায়েম হেসে সারাক্ষণ ব্যাটাছেলে আরতিকে যেন চাটছিল। আরতিকেও হাসতে হচ্ছিল। ঈষৎ চটুল মদির হাসি। ঠিক সৌজন্যের খাতিরে নয়, আরতিরও প্রোমোশনের ভাবনা। হেডমিসট্রেসের পোস্টটা খালি হয়েছে, সেই-দিকে চোখ রেখে ধ্রুবেশ সাহার সঙ্গে ইদানীং একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে। তা আরতি বোধহয় হেডমিসট্রেসের পোস্টটা পেয়ে যাবে। কেননা, আজকাল মাঝে মাঝেই ধ্রুবেশবাবু আরতিকে নিজের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে

—চা নে। মাথার কাছে একটা টুল এনে মা চায়ের কাপ রাখলেন। তুষার একটু কাত হয়ে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আরতি বলল, বাব্বাঃ, কী ভিড়, একটা বাসে উঠতে পারি না। ঠায় একটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি শেয়ালদায়।

—শেয়ালদায় হঠাৎ?

হেডমিসট্রেস হবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে বলেই বোধহয় আরতি তার পুরনো কমলা রঙের ব্যাগটা বাতিল করে ইদানীং কালো রঙের ভারী চামড়ার একটা ব্যাগ কিনেছে। স্ট্র্যাপ খুলে কাঁধ থেকে সেই ভারী ব্যাগটা নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে খুলতে খুলতে আরতি বলল, কি আর করব, তোমাকে তো বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত আজ নিজেই লটারীর টিকেটটা কিনে আনলাম। এই দ্যাখো। ফার্স্ট প্রাইজ তিন লাখ টাকা।

একখানা লটারীর টিকেট আরতি তুষারের চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরল।

পরিহাস তরল গলায় তুষার বলল, যাকগে, টাকাটা পেলে আমাকে লাখখানেক দিও। ট্রামে বাসে আর চড়তে পারি না,

প্রথমে একখানা গাড়ি কিনব তারপর—

ইঃ, যেন সত্যিসত্যিই লটারীর ফার্স্ট প্রাইজের তিন লাখ টাকা পেয়ে যাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে লটারীর টিকেটখানা সমেত সবে যেতে যেতে ঘাড় গোঁজ করে আরতি বলল, ওরকম ভাবে টাকা ওড়াবার জন্যে একটি পয়সাও কাউকে দিচ্ছি না আমি।

—আলবৎ দিতে হবে। হঠাৎ তুষারও কেমন জেদী গলায় বলল, চালাকি পেয়েছ নাকি!

দেয়ালে ঝোলানো কাঠের আসনে লক্ষ্মীর পট। টিকিটটা কপালে ছুঁইয়ে পটের পিছনে রাখতে রাখতে আরতি বলল, চালাকি আবার কি? আমার টাকা আমি কাউকে দেব না, ব্যাস।

থমথমে মুখে আরতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর তুষারের মনে হল, নিতান্ত অকারণে এই বাড়াবাড়ি করাটা মোটেই উচিত হয়নি। কত লোক অমন হামেশা লটারীর টিকিট কাটছে তা বলে সবাই কী প্রাইজ পাচ্ছে নাকি? একখানা টিকিট কেটে অমনি তিন লাখ টাকা পেয়ে গেছি মনে করে আরতির মত ধেই ধেই করে নাচছেই বা কে? একে মেয়েছেলে, তায় মাষ্টারী করছে, কত আর বুদ্ধি হবে? তাও তো এখনো মাষ্টারির বারো বছর কমপ্লিট হয় নি বাপু। হলে তখন যে কি হবে!

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যেই আরতিকে দেখতে পেয়ে তুষার বেশ একটু অবাক হয়। কেননা এইমাত্র যে স্বপ্নটা দেখে সে জেগে উঠল তাতে আরতির তার নাগালের মধ্যে থাকার কথা নয়। অথচ খাটের একধারে একটু সরে এসে একরকম হাত বাড়ালেই সে এখন আরতিকে ছুঁতে পারে। ধরা ছোঁয়ার মধ্যের এই আরতি কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে কত দূরে সরে গিয়ে ভীষণ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার পরই আরতির মতিগতি হালচাল কেমন পালটে যায়। তুষারকে এই ভাড়াটে বাড়িতে ফেলে রেখে আরতি আলাদা হয়ে যায়। শহরের অভিজাত পাড়ায় নতুন ডিজাইনের একখানা বাড়ি কিনে আরতি সেখানে গিয়ে ওঠে। আরতি ফিরে আসবে এই আশায় বহুদিন নিষ্ফল অপেক্ষার পর অধৈর্য হয়ে তুষার একদিন আরতির সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যায়। বাড়ির সামনে লোহার গেটের কাছে তুষার যখন পৌঁছয় তখন সেখানে একখানা মোটর গাড়ি আসে। সেই গাড়ির ভিতর সে আরতি এবং সুদর্শন এক যুবককে দেখতে পায়। পিছনের সীটে আরতিকে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে যুবক বসেছিল। আরতিকে বেশ সুখী এবং পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিল। অদিচ তুষার নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়ে এবং ধোপদুরস্ত পোশাকে নিজেকে সেদিন যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছিল তথাপি আরতি তার দিকে একবারও তাকায়নি। মোটর ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর লোহার গেট বন্ধ হয়ে যায়। তুষার সেই লোহার গেট ঠেলে ঢুকতে গেলে দারোয়ান এসে বাধা দেয়। দশাসই চেহারার ভুঁড়িওলা দারোয়ানের মুখখানা দেখে তুষার একটু চমকে যায়। হালদার সায়েবের কাঁচাপাকা গোঁফজোড়া চিনতে তার একটুও কষ্ট হয় না। হালদার সায়েব কবে আবার দারোয়ানের চাকরি নিল অবাক হয়ে তুষার সে কথা ভাবতে সুরু করলে তার ঘুম ভেঙে যায়।

ঘরের মেঝেয় তুষারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আরতি আলনা গোছগাছ করছিল। আরতির পরনে খাটো ব্লাউজ। ফলে ওর কাঁধ বাহু ও পিঠের বহুলাংশ অনাবৃত। সকালের আলোয় আরতির খোলা দেহাংশের নরম মসৃন ত্বক অপরূপ লাবণ্যে টলমল করছিল এবং ওর পাতলা কোমর ও সুডৌল নিতম্বের দিক থেকে তুষার চোখ ফেরাতে পারছিল না। বস্তুত বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ আট বছর ধরে জানা আরতির অতি পরিচিত পুরনো শরীরটার প্রতি তুষার এখন এক প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করল। ভোর রাতের স্বপ্নটার পর আরতি কি ফের নতুন করে তুষারের কাছে দুর্লভ হয়ে উঠল না কি? তুষারের হঠাৎ আরতিকে আদর করার ভীষণ ইচ্ছে হল। হল। আদুরে গলায় তুষার ডাকল, এই, শোনো!

আরতি একখানা শাড়ি পাট করছিল, শাড়ির ভাঁজে আঙুল রেখে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, কি বলছ?

নিষ্পলক তাকিয়ে, তুষার বলল, আগে এসে বোস এখানে তারপর বলছি।

ভুরু কুঁচকে আরতি বলল, কিছু বলতে হয় বলে ফেল, এখন বসতে-টসতে পারব না। হাতে অনেক কাজ আমার।

খাটের ধারে সরে গিয়ে তুষার আরতির হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। হাত ছাড়িয়ে সরে যেতে সামান্য বিরক্ত স্বরে আরতি বলল, বেলা হয়েছে, কোথায় তাড়াতাড়ি বাজারে যাবে তা না, যত সব ইয়ে আরম্ভ করেছ বুড়ো বয়সে। ভাললাগে না বাপু।

তুষার বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। কি ব্যাপার, আরতি কি সত্যিসত্যিই দূরে সরে যেতে চাইছে না কি?

সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ইডেন গিল্ডে একবার ঢুঁ মারা তুষারের নিত্যকার অভ্যেস। এক কাপ চা নিয়ে বসে মন্মথর সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে না পারলে তার ভাত হজম হয় না। বাল্যবন্ধু মন্মথ পোড়খাওয়া মানুষ, তার কাছ থেকে নানা ধরনের কথাবার্তা শুনতে মন্দ লাগে না তুষারের। সাত ঘাটের জল খাওয়া মন্মথ অনেক কথাই বেশ রসিয়ে বসিয়ে বলতে পারে। একটু জ্ঞান দেয় অবশ্যি আর কিছুটা পরশ্রীকাতর এই যা।

খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে মন্মথ বিড়ি ফুঁকছিল, তুষারকে এক নজর দেখে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের কাগজে মনোনিবেশ করল।

তুষার একখানা চেয়ার টেনে বসে চুপচাপ কিছুক্ষণ মন্মথকে লক্ষ করল। স্বপ্নের ব্যাপারটা তখনো তার মগজের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। চিন্তিত অন্যমনস্ক স্বরে তুষার হঠাৎ শুধোল, আচ্ছা মন্মথ, তুই তো অনেক কিছু জানিস, বলতো ভোর রাতের স্বপ্ন সত্যি হয় কিনা?

মন্মথ গম্ভীর ভাবে বলল, চা বল।

তুষার হাঁক দিয়ে দোকানের ছোকরা বয় কালিপদকে দু' কাপ চা দিতে বলল তারপর আগ্রহভরে মন্মথর দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু চা না আসা ইস্তক মন্মথ একটা দেশলাই কাঠি বের করে সমানে দাঁত খুঁচিয়ে চলল।

চা আসবার পর তুষার বলল, কি রে, আমার কথার জবাব দিলি নে?

—কি জবাব দেব? মন্মথ মুখ বিকৃত করে বলল, আমি তো আর স্বপ্নটপ্ন দেখিনে, ওসব তুই-ই দেখবি। তোর তো এখন স্বপ্ন দেখারই সময়। তোর বৌ হেড মিসটেস হতে যাচ্ছে। হবেই সিওর, ধনুবেশের গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেকালে—

তুষার প্রতিবাদ করল, বেড়ানো কবে দেখলি তুই? আমার ওয়াইফকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য যদি কোনো ভদ্রলোক—

—ভদ্রলোক! উত্তেজনায় মন্মথর গলার শিরা ফুলে উঠল, ধনুবেশ শালা পয়লা নম্বরের লম্পট তুই জানিস না?

—তাতো বলবিই। ধনুবেশ তোর খোঁড়া শালীকে চাকরি দেয়নি কিনা!

মন্মথর মুখের ওপর কথা কটা ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ তুষার চায়ের পয়সা মিটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিসে নিজের সীটে বসে ঘাড় গুঁজে তুষার অনেকক্ষণ ধরে কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজ আদৌ এগোল না। আজ অফিসের পথে আসতে আসতে না হলেও কমসে কম সাত আটখানা লটারীর দোকান চোখে পড়েছে তুষারের। দোকানগুলো অবশ্যি আগেও ছিল, এতদিন ঠিক নজরে আসেনি—আজ সচেতনভাবে লক্ষ করতে তার দৃষ্টিপথে এসেছে। তা সাতখানা কেন, অমন সাতশো দোকান থাকুক, লক্ষ লক্ষ টিকিট বিকিকিনি হোক তাতে তুষারের কিছু এসে যায় না। আরতির কেনা একখানি মাত্র টিকিট নিয়েই তার যত কিছু ভাবনা, যত কিছু সমস্যা। অবশ্যি আরতির মত অমন লক্ষ লক্ষ টিকিটধারী রয়েছে। সে হিসেবে ওর ফার্স্ট কেন, কোনো প্রাইজ না পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য দিক থেকে চিন্তা করলে আবার আরতির প্রাইজ পাওয়ার সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? টিকিটধারীদের মধ্যে কেউ না কেউ তো প্রাইজ পাবেই। পাচ্ছেও হরদম। এই

তো সেদিন অমরেশদার অফিসের লিফটম্যান গৌরহরি দাসও দুম করে সেকেন্ড প্রাইজটা মেরে দিল। ভাগ্যের কাছ থেকে নিজের লিফটটা কেমন ম্যানেজ করে নিল ব্যাটা লিফটসম্যান। কার কপালে কি আছে তা কি কেউ বলতে পারে? টাকা না পেলে তো ঝামেলা মিটেই গেল, আসলে সমস্যাটা হচ্ছে যদি তিন লাখ টাকা আরতি পেয়ে যায় তাহলে কি হবে? বৃদ্ধ মা, আরতি, তিন বছরের শিশুপুত্র তোতন এবং সে নিজে—এই চারখানা রেশন কার্ডের হেড্ অব দি ফ্যামিলি হিসেবে তুষার সেনের যে অস্তিত্ব তার কোন হেরফের হয়ে যাবে কী?

মাথা ঝিমঝিম করছিল। টিফিনের সময় হতে তুষার তাড়াহুড়ো সীট ছেড়ে উঠে পড়ল।

ক্যান্টিনের এক কোনে এ্যাকাউন্টসের হিমাংশু দত্তকে পাওয়া গেল। বেশ প্রমাণ সাইজের দু' দুখানা ভেজিটেবল চপ সামনে নিয়ে প্রফুল্ল ভঙ্গিতে বসে আছে। তুষার কাছে যেতে বলল, ভেজিটেবল চপ নে। খাসা করেছে, অল রেডি এক রাউন্ড হয়ে গেছে আমার।

তুষার ভেজিটেবল চপ আর চায়ের অর্ডার দিল। নিমেষের মধ্যে কপ্ কপ্ করে সামনের দুখানা চপই উড়িয়ে দিল হিমাংশু তারপর জলের গেলাসে চুমুক দিল।

তুষার আচমকা বলল, ধর যদি তোর বৌ লাখ তিনেক টাকা পেয়ে যায়—

—এ্যাঁ, কেন, চমকে উঠে বিষম খেয়ে হিমাংশু বলল, আমার বৌ হঠাৎ তিন লাখ টাকা পেতে যাবে কেন?

—আঃ, তুষার ঈষৎ বিরক্ত হয়, কেনর কী আছে? কথার কথা বলছি।

—ও, তাই বল। হিমাংশু আশ্বস্ত হওয়ার ভান করল তারপর বলল, পেলে আমারও বিকাশের দশা হবে।

—কি রকম? কি হয়েছিল বিকাশের?

—কেন মনে নেই? বাড়তি রোজগারের লোভে বৌকে ফিল্মে নামিয়েছিল, তারপর যেই না স্টার হিসেবে একটু নাম হয়ে গেল বৌ অমনি হুট করে বিকাশকে ছেড়ে অন্য নাগর ধরল।

ভেজিটেবল চপ আর চা এসে গিয়েছিল। চপে কামড় দিয়ে প্রত্যয়ের অভাব অনুভব করতে করতেও তুষার কোনমতে বলল, আরে, সবাই কি ওরকম হয়?

—সব, সব সমান, হিমাংশুর গলা দৃঢ় ও কঠিন, মওকা পায় না বলে সতী সেজে থাকে।

—তুই ভীষণ সিনিক আর ভালগার হয়ে উঠছিস আজকাল। তুষার হাসতে গিয়ে দাঁত বের করল।

তুষারের কথায় আরো উত্তেজিত হয়ে হিমাংশু বলল, অমন হি হি করিস নি বাঁদরের মত। পাক না—তোর বৌ একবার পাক না তিন লাখ টাকা দেখব তখন কেমন দাঁত বের করতে পারিস।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে তুষার বলল, খুব পারব। আমার বউকে আমি খুবই ভালো করে চিনি।

বলল বটে, কিন্তু তুষারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। আমি আরতিকে সত্যিই চিনি কী? তুষার ভাবল। স্কুল মিসট্রেস আরতি হয়তো আমার সত্যিই চেনা কিন্তু লটারীতে তিন লাখ টাকা পাওয়ার পরের আরতিকে আমি আদৌ চিনি কি? স্বপ্নের মধ্যে আরতির আচরণ অভাবিত ও রহস্যময় ঠিকই কিন্তু বাস্তবে ওই পরিবর্তন কি একান্তই অসম্ভব?

সুতরাং ক্যান্টিন থেকে নিজের সীটে ফিরে যেতে যেতে তুষার আপনমনে বলল, আমাকে কালকের মধ্যেই এই সমস্যার একটা মীমাংসা করতে হবে। লটারীর খেলা যে আগামীকাল এবং ফলাফল পরশু অর্থাৎ বোববার সেটা লটারীর দোকানের বাইরের ডিসপ্লে বোর্ডে তুষার দেখে নিয়েছিল আগেই।

কিন্তু মীমাংসার সূত্রটা তুষারের মাথায় সহজে আসেনি। মস্তিষ্কের কোষে

বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দেখেননি এই রচনাটি অনিবার্যকারণে প্রকাশিত হল না।

কোষে প্রচণ্ড তোলপাড় চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত পরদিন সকালে বাজার থেকে ফিরে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত অবস্থায় খাটের ওপর বসবার পর বুদ্ধিটা প্রথম তুষারের মাথায় বিদ্যুত চমকের মত খেলে যায়। টিকিটটা যার টাকা তার। অর্থাৎ রাতে সুযোগমত এক সময় লটারীর টিকিটটা তুষার সরিয়ে রাখবে এবং পরদিন সকালে কাগজে ফলাফল দেখবার পর টিকিটটা সম্বন্ধে ইতি-কর্তব্য স্থির করবে। যদি ফলাফলের তালিকায় টিকিটের নম্বরটা থাকে তাহলে টিকিটটা তুষার নিজেই রেখে দেবে এবং ব্যাপারটা আরতির কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। আর যদি নম্বরটা তালিকায় না থাকে তাহলে টিকিটা আবার যথাস্থানে রেখে দেবে। ব্যাপারটা অবশ্য খুব সন্তর্পনে করতে হবে। কেন না, এটা চুরি বই আর কিছু নয়।

চুরি কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তুষার কি খুব একটা বিবেকের দংশন অনুভব করল? উম্ না। কারণ, বিবেক বড়ো প্রাচীন এবং বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাওয়ায় ইদানীং তার দাঁত-ফাত সব পড়ে গেছে। ফোকলা দাঁতের কামড়ে কি আর জোর থাকে? এহেন ফোকলা বিবেকের কল্পনায় তুষার বেশ আমোদ বোধ করল। মজা পেয়ে সে একা একাই আপনমনে হ্যা হ্যা করে হাসতে সুরু করল।

কী একটা কাজে ঘরে ঢুকে তুষারকে ওরকমভাবে হাসতে দেখে অবাক হয়ে আরতি বলল, ওমা, একা একা হাসছ কেন, হল কি?

হেসে শুয়ে পড়তে পড়তে হাত নেড়ে তুষার বোঝাল, ও কিছু না।

কিছুক্ষণ বাদে স্নান সেরে ঘরে এসে তুষারের মনে হল, টিকিটটা যথাস্থানে আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া দরকার। বলা যায় না, আরতি হয়তো ওটা অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে।

ঘরে কেউ ছিল না। সুতারাং তুষার নির্ভাবনায় লক্ষ্মীর পটের পিছনে হাত ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক খণ্ড কাগজের স্পর্শ পেল সে কিন্তু সেটা বের করে এনে দেখার সুযোগ আর তার হল না। তার আগেই পিছনে একটা মৃদু শব্দ অনুভব করে চমকে হাত সরিয়ে নিল সে। নির্ঘাত আরতি এসে পড়েছে। আরতির পায়ের শব্দ তার চেনা। বতমত ভাবটা কাটাবার জন্য চকিতে দু'হাত জড়ো করে লক্ষ্মীমূর্তিকে প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ছোঁয়াল তুষার। তারপর একটু বাদে পিছনে ফিরতেই একেবারে চোখাচোখি আরতির সঙ্গে। আরতির চোখে বিস্ময়।

সন্দিগ্ধ চোখে তুষারকে দেখতে দেখতে আরতি বলল, ও বাবা, এসব আবার কবে থেকে?

সপ্রতিভভাবে তুষার বলল, অনেক দিন। ভক্তি অন্তরের জিনিস, তোমার মতো বাইরে দেখিয়ে বেড়াই না এই যা।

আরতি আর কিছু বলল না।

সেদিন রাতে খাওয়ার পাট চুকতে এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু খাওয়ার পর ঘরে ঢুকে সোজাসুজি বিছানায় শুতে গেল না তুষার, জানালার পাশে একখানা চেয়ার টেনে বসে একটা ঢেকুর তুলে আরতিকে বলল, তুমি শুয়ে পড়ো। খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে, একটু না বসে আমি শুতে পারব না।

আরতি ততক্ষণে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। চোখে হাত চাপা দিয়ে ক্লান্ত গলায় সে বলল—আলোটা নিবিয়ে দাও বরং। তারপর থাকো তুমি বসে যতক্ষণ খুশি।

আলো নিবিয়ে তুষার অন্ধকারের মধ্যে বসে রইল। অনেকক্ষণ। জনবিরল রাস্তায় রিকসার কচিৎ ঠুং ঠাং আওয়াজও থেমে গেল একসময়। সামনের বাড়ির সব কটা ঘরের আলোও নিভে গেছে কখন। শুধু রাস্তার আলোটা জ্বলছে। তারই অস্পষ্ট আভা ঘরময়। সেই আভায় ঘরের আসবাবগুলোর অবস্থা অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা থমথম করছে চারদিকে। তুষার হাই তুলল। বেশ ঘুম পাচ্ছে তার। আরতিও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তুষার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ব্রাকেটে ঝোলানো লক্ষ্মীর আসনের দিকে। পটের পিছনে হাত ঢুকিয়ে টিকিটটা বের করে আনল সে। এই সময় অন্ধকারের মধ্যে কেমন

করে যেন তার হাতে ঠেকে ছোট্ট পেতলের গ্লাসটা আসন থেকে মেঝের ওপর পড়ে ঠং করে একটা আওয়াজ তুলল। সেই ধাতব আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে আরতির ধমক শোনা গেল, আঃ, কি জ্বালা রে বাবা! ওখানে আবার কি দরকার পড়ল তোমার?

কি মুস্কিল! আরতি কি জেগে ছিল না কি? ও কি সব দেখে ফেলেছে তাহলে? তুষার টের পায়, তার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, আরে দেখ না— সিগারেটের প্যাকেটটা রাখতে গেছি আমি— বিরক্ত গলায় আরতি বলল, রাত দুপুরে আর জ্বালিও না। এখন এসে শুয়ে পড়ো দিকি।

হ্যাঙারে ঝোলানো সার্টের বুক-পকেটে দ্রুত টিকিটটা গুঁজে তুষার বিছানায় উঠল।

বেশ বেলায় তুষারের ঘুম ভাঙল পরদিন। রোদ হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মেঝে পর্যন্ত চলে এসেছে তখন।

চা হাতে আরতি এসে দাঁড়ালে তুষার কটু অবাক হয়। আরতি মুখ টিপে হাসছিল। বিয়ের পর একেবারে গোড়ার দিকে যেমন হাসত ঠিক তেমনি। হাসিতে সেই গোপনতা, সেই রহস্যময়তা। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য তুষার আরতির মুখখানা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকলে আরতি চেপা হাসিটা ঠোঁটে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তুষারের কেমন খটকা লাগে।

তুষারের খটকা কাটতে অবশ্য খুব দেরি হয় না। খানিক বাদেই সে যখন চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ খুলে লটারীর রেজাল্ট বের বের পকেটে হাত দেব তখনই ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। লন্ড্রীর বিল, তোতনের জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামের রসিদ, ইলেকট্রিক বিল মায় হাওড়ার যে জ্যোতিষীর ঠিকানা সে পাঁজি দেখে টুকে রেখেছিল তা পর্যন্ত আছে, শুধু লটারীর টিকিটখানাই নেই।

টিকিটটা ভাল করে খুঁজতে গিয়ে পকেটের সব কাগজগুলো টেবিলের ওপর জড়ো করেছিল তুষার, সেগুলো এক এক করে ফের পকেটে রাখতে রাখতে সে ভাবল, একমাত্র আরতিই পকেট থেকে টিকিটটা সরাতে পারে। কেননা, আরতি ছাড়া কারো পকেটে টিকিট থাকার কথা জানতে পারার কথা নয়। এই জন্যই কি সকালবেলা আরতি অমন করে হাসছিল?

তুষার উঠে পড়ল। বাজারের দেরি হয়ে গেছে অনেক। উনুন বয়ে যাচ্ছে হয়তো। আরতি নিশ্চয়ই মনে মনে গজরাচ্ছে এতক্ষণে।

সরু নোংরা গলি জুড়ে বাজার। ঢোকার মুখে দু দুটো মাংসের দোকান। পাশাপাশি। দু'টোরই সামনে বেশ ভিড়। দিনটা রোববার। প্রায় সব ফ্যামিলিতেই আজ মাংস খাওয়ার রেওয়াজ। তুষাররাও খায়। কিন্তু তুষার মাংসের দোকানের দিকে গেল না। এমনিতেই বেলা হয়ে গেছে, তার ওপর যা ভিড়। তাছাড়া, মাংস খাওয়ার বাতিকটা তুষারেরই বেশি, আরতি খুব একটা ভালবাসে না।

পাকা-পোনা ছিল বাজারে। গাদা পেটি যা নাও—ষোলো টাকা কিলো। পেল্লায় সাইজের রুইয়ের পিস তবু দামটা একটু বেশি মনে হয় তুষারের। সামান্য সময় সাত-পাঁচ ভাবে সে তারপর দুম করে তিনশো গ্রাম মাছ কিনে ফেলে।

ভিড়, ঠেলাঠেলি এখানেও কিছু কম না— উপরন্তু জলে-কাদায় একসা। তুষার হন হন করে বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় তার চোখ গেল চমৎকার টাটকা মৌরেলার ওপর। তুষার থমকে দাঁড়ায়। আরতি মৌরেলা ভীষণ ভালবাসে। এই মাছ দিয়ে কাঁচা লংকার পাতলা ঝোল আর তেঁতুলের টক খুব পছন্দ ওর। তুষার এগিয়ে যায়। দু কিসিমের মৌরেলা—একধারে ছোটো পুঁচকে সাইজের, অন্য পাশে বেশ বড় মতন। বড়র দাম আট টাকা কিলো। বাড়তি দুটো টাকা খরচ করে আড়াইশো গ্রাম মৌরেলা নিল তুষার। আরতি খুশি হবে।

বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় পা দিয়েই তুষার থমকে যায়। শোবার ঘর থেকে কার গলার আওয়াজ ভেসে আসে। তুষার একটু সময় কান পাতে। তারপরই স্বরটা চেনা মনে মনে প্রমাদ গোণে তুষার। একবার লাগে তার। ধ্রুবেশের গলা। কী মুস্কিল! এলে ধ্রুবেশ আর সহজে নড়তে চায় না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেই তুষার শোবার ঘরের দরজায় উঁকি দেয়। সোফার ওপর বেশ জমিয়ে বসে আছে ধ্রুবেশ। সামনে বেতের চেয়ারে আরতি। ধ্রুবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা গিলছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে তুষার চোখের ইসারায় আরতিকে ডাকে। আরতি উঠে আসে। মুখ অপ্রসন্ন।

—দু রকমের মাছ এনেছি, তুষার থলেটা ফাঁক করে আরতির চোখের সামনে তুলে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, এখন ধ্রুবেশকে বিদেয় করো, না হলে পরে আর মাছগুলো ম্যানেজ করতে পারবে না।

আরতি মাছের দিকে একবারও তাকায় না। বলে, ওঁকে এখন বিদেয় করা যাবে না। খুব দরকারী কথা বলছি ওঁর সঙ্গে।

'দরকারী' শব্দটা বলার সময় আরতির গলাটা বেশ রাসভারি লাগে। তুষার মিইয়ে গিয়েও কোনমতে বলে, বেশি বেলা হলে মাছগুলো নরম হয়ে যাবে যে।

—তুমি বরং এক কাজ করো, আরতি ব্যস্ত গলায় বলল, উনুনে ভাত চড়ানো আছে—হয়ে এল বোধ হয়। তুমি ততক্ষণে মাছটা কেটে-কুটে নাও, আমি পরে আসছি। আরতি আর দাঁড়ায় না।

তুষার রান্নাঘরের দিকে এগোয়। খোলা দরজার সামনে বাসনপত্র এলোমেলো ছড়ানো, সামান্য দূরে উনুন। তার ওপর হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। একধারে বঁটি কাত হয়ে আছে, পাশে কিছু আলুর খোসা, দু একটা আস্ত আলু গড়িয়ে গেছে এদিকে-ওদিকে। আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেউ খুব ব্যস্তভাবে সব ফেলে রেখে উঠে গেছে বোঝা যায়।

অরাতি ভেবেছেটা কী? যা, তাকে বলে কিনা মাছটা কেটে-কুটে রাখতে! কেন, তুষার কি কারো বাপের চাকর?

তুষার রান্নাঘরে ঢুকল না। হাত বাড়িয়ে মাটি-সেফের মাথায় বাজারের থলেটা রেখে দিল। রাখার সময় চোখে পড়ল, হাঁড়ি বেয়ে ফেন উপচে পড়ছে, সেই সঙ্গে কী রকম একটা গন্ধ হঠাৎ ঢুকে গেল তুষারের নিশ্বাসে। তলাকার ভাত ধরে গেছে নিশ্চয়। হাঁড়িটা এখুনি নামিয়ে ফেলা দরকার।

রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই তুষার হাঁড়ির তলায় উনুনের আগুনের দিকে দেখল। যা গনগনে আঁচ, একটু বাদেই ভাত একদম পুড়ে যাবে।

যাক। তুষার জেদীর মত অনড় দাঁড়িয়ে রইল। পুড়ে যাক।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ
আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা

গোবিন্দ রাজনের জমা টাকায় ছয়জন তাঁতী তাঁদের জীবিকা ফিরে পেলেন।

রাজন কিন্তু জীবনে কখনও তাঁত দেখেন নি।

আমাদের রিকারিং ডিপজিট পরিকল্পনায় গোবিন্দ রাজন যখন মাসে মাসে ২০০৲ টাকা করে জমা রাখতে শুরু করলেন, তাঁর ধারণাই ছিল না তাঁর টাকায় ছয়জন তাঁতী তাঁদের জীবিকা ফিরে পাবেন।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত গোবিন্দ রাজনেরও জমা টাকা সমাজের অসহায় ও নিঃসম্বলদের উন্নয়নকল্পে ব্যবহার করা হয়।

যেমন এই তাঁতীরা—আমরা সহায় হলাম বলে তাঁরা আবার পুরোদমে কাজে লাগতে সক্ষম হলেন। এমনিভাবেই পঙ্গু ও অপারগকে উপযুক্ত কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা মহিলাদের জীবিকার্জনে সাহায্য করা হচ্ছে। যাঁদের দরকার তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে নানা উপায়ে আপনার স্বল্প সঞ্চয়ই বড় রকমের সাহায্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্কের যে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছেন। এবং সেইসঙ্গে নির্বিঘ্নে ও লাভজনক উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে।

মহারাষ্ট্রের একটি অখ্যাত গ্রামের একজন তাঁতশিল্পী।

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

- সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট
- ফিক্সড ও টাইম ডিপজিট
- রিকারিং ডিপজিট
- রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত ফিক্সড ডিপজিট
- ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা
- কৃষকের যোজনা
- ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত জনতা পার্সোনাল অ্যাকসিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স পলিসি পরিকল্পনা

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-9 BEN

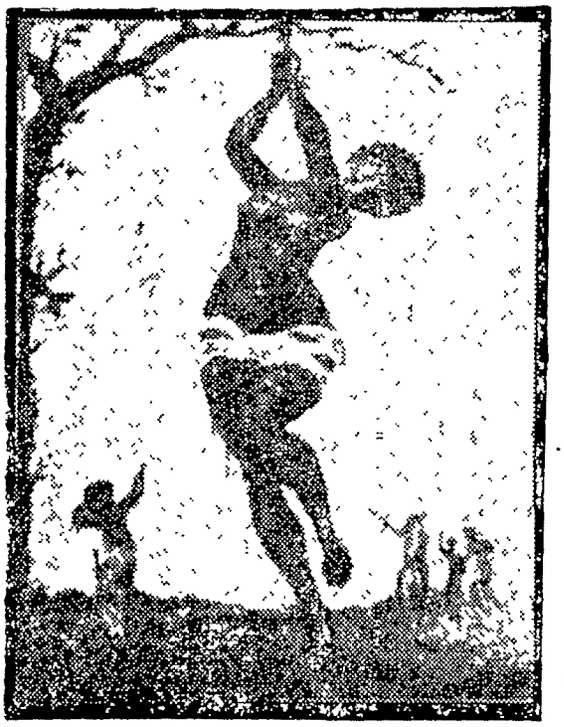

মানুষ কেমন বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

৪। বিলেতে কালোরা ঘন ঘন ক্ষেপছে। ব্রিটেন চায় কাঁচা মালের সরবরাহ শিল্প পণ্যের জন্য বাজার। ওরা জাত সওদাগর বেনে। ওদের সব বিচারই সওদাগরীর বিচার। তামার জন্য রডেশিয়া কিছু বলবে না, অনেক কিছুর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে কিছু বলবে না অথচ ব্রিটেনের কৃষ্ণকায় ছোটও লেবার পার্টির প্রশ্নে বিরক্ত দরকার। ফলে ব্রিটেনের সফেদ নীতি স্পষ্ট অস্পষ্টতার ভাঁজে আটক পড়েছে। এবং তার খেসারৎ পোয়াচ্ছে। ব্রিটেনের কৃষ্ণকায় নাগরিক। তারা প্রতিবিধান চায়। ইয়ান স্মিথের এবং এনক পাওয়েলের ব্যাপারে সরকার যে কার দিকে সেটি স্পষ্ট জানতে চায়। কার্যত সরকার কী করছে? সময় কাটাচ্ছে। ভাবছে এই প্রয়োজ্য, প্রস্তুরাস্ত্রর, সখি ধরো ধরো নীতি, যেমনি বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না গানই ভরিয়ে দেবে এ যাত্রা।

ব্রিটেন আজ বিব্রত। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক বিপন্নতার এজাহার দেবার জায়গা এ নয়। কিন্তু এমন একটা বিব্রত কালের প্রকোপে যে গোটা সওদাগরী সামন্তশাহী অতি ঔপনিবেশিক দালালরা বেসামাল বোধ করবেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

জাঁ-পল সার্ত্রের বলা একটা মত মনে পড়ছে। তাঁর মতে পৃথিবীতে বাস করছে পাঁচশো মিলিয়ান মানুষ আর দেড় হাজার মিলিয়ন নেটিভ। মানুষরাই 'বাণী'র বাহক। বাকীরা শুধু ঐ বাণীর ফতোয়া মাফিক ঘাড় গুঁজে শুনবেন। এই 'বাণী' দেওয়া আর প্রচারের মাঝখানে একদল দালাল আছে। তারাই জমিদার খোকা রাজা, নোকা ভদ্দরদের গুষ্টি। নেটিভের দেশে সত্য খেলা করতো নোংটা হয়ে, কর্তারা তাকে পোশাকে-আশাকে ঢেকেঢুকে পেশ করতে বোলতো। পোশাক দিয়ে সত্য ঢাকার চেষ্টা হয়েছে। আজ সেই সত্য আবার স্বরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছে।

তাই তো হয়ে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর রাজা-বাহাদুর, রায় বাহাদুররা শামলায় পাগড়িতে ভূষিত হয়ে উড়নী পণ্ডিত আর পাজামা মৌলবীকে করে দিলেন অপাংক্তেয়। সাহেবপাড়ার গাড়ি-বাড়ি জমানোর শাঁসে ভরপুর হোতো সেই কালের ভদ্দলোক, যাঁরা আমাদের জমি, শকতির ধারক ছিলেন। ধোলাই করে ছাড়তো সাহেবরা। কলপ মেরে ইস্ত্রী করে ভাঁজ করে দিতো মোসাহেবরা। রকে বৈঠকখানার ফরাসে, তাকিয়ায় শোভিত হয়ে বলতাম— ফাটিয়ে দিয়েছে গোলদিঘী আজ সার নফর সিতিন অবেটারিতে! কী রবর বকতিমে দিলো গোবর কুণ্ডু! বার্ক কোথায় লাগে। কোনা পালের ইংরিজি শুনেছ? খাস অকসোনিয়ান। (যেন বার্ক শুনে এসেছি, অকসোনিয়ান কী জেনেশুনে বেদব্যাস।) সাহেবপাড়ার তা-বড়ো তা-বড়ো পাদ্রী মার্কা শিক্ষকরা শেকসপীয়র আর সেকলে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ য়োরোপের উদার নীতির এবং সভ্যতার গান ধরতো। কিন্তু আমরা ধরতে পারতাম না সেই উদার নীতির ফলে আমাদের উদারনীতি চোপসানো যে কতোটা, অসভ্য আমাদের মাত্র দু গজ কাপড় যোগাতে গিয়ে সেই উদার যা কেন যে তামাম ফেলাও হাবে লঠ করতে ব্যস্ত বুঝতাম না। সভ্য-অসভ্যের স্বন্দের মাঝিয়ে বেধে গাঁট কাটতো যারা তারা এদেশের জনতাও নয় ওদেশের জনতাও নয়। তারাই এককেবারে শাদা শাদা মহাশাদা। আমরা বন্দেগী করতাম ওরে বাপরে! সায়েব।

এই থেকেই নাম উঠে গেলো তেসরা দুনিয়া। প্রথমে যখন ব্রাজিলিয়ান কোভিয়ার This struggle for the third world (Bodly Head) বইতে এই 'তেসরা দুনিয়া'র ছবি তুলে ধরেন, তখন মানুষ

হকচকিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হোলো পৃথিবীটা কেবল ধনের লুঠ আর ধনের পুলিশীর মধ্যেই ভাগ করা নেই। কেবল যে কামদুধা পৃথিবীকে দোহন করনেওয়ালার পাশে ঠোসা নিয়ে দুধ বন্টকও দাঁড়িয়ে আছে তাই নয়। ভুলে গেলাম যে ঐ গরুটারও একটা পৃথিবী আছে। যারা অর্থনীতিকে গুটিয়ে কয়েকটি ব্যক্তির থলেতে ভরার চেষ্টায় ব্যস্ত তারা একটা দল। তাদের দেশের ফাঁকও বড়, ফাঁকও অফুরান, তাদের পথে বাড়ি পেললাম, পথ পেললাম, মোটর পেললাম, জাহাজ পেললাম। পেললাম হাবে তারা খরচ করে, রোজগার করে। তারা ধনপতি সদাগরের দেশ। আবার যারা অর্থনীতিকে থলের ভরে থলের বাঁটোয়ারা সবার মধ্যে সমান করে দেবার প্রযত্নে সীমিত হাবে খায়, পরে, থাকে তারাও সাগ সদাগরের দেশ। তেসরা দুনিয়া তাদের যাদের খনি আছে যন্ত্র নেই, ক্ষেত আছে, মিল নেই, চাষ আছে কারখানা নেই, মানুষ আছে, টাকা নেই। যাদের আছে একটিই সম্পদ। পোঁতা সম্পদ, অসংগৃহীত সম্পদ,—প্রাকৃতিক সম্পদ। তাদের না আছে টাকার ধমক, না আছে অস্ত্রের ধমক। তাদের চোখে কেবল কয়েকটা নাম জ্বল জ্বল করে—লেনিন, হোচিমিন, ক্যাস্ট্রো, চোগুয়েভারা, তারা মেনল ধরে সেই সঙ্গে আরও নাম—লুমুম্বা, এনকুমা, সুকার্নো, নাসের, আয়াফাৎ, আয়েন্ডী, গান্ধাফী, শীহানুক—কিন্তু সে সব নাম শুরুতে না করতেই আবার কী করে যেন মিটেও যায়। তারা লজ্জার কথা বলতো বলে কী? তাই কী তাদের সরানো হোলো? তবে মার্টিন লুথার কিংকে, দাগ হামারশোল্ডকে গান্ধীকে সরানো হোলো কেন? লোকে বলে নাসেরও নাকি বলি।

কাজেই তেসরা দুনিয়া সচেতন। তেসরা দুনিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে জোট বেঁধেছে। আফ্রো-এশিয়ান এই গুটিবন্দীর ফাঁপরে পড়ে তেললো দুনিয়া আর মেললো দুনিয়া দুই দুনিয়াই টোবা হয়ে চেয়ে আছে। তেললো বলছে ওদের না পিষলে তেল পাবো কোথায়? বাগানো যায় কী করে? মেললো দুনিয়া বলছে, ওরা যদি মিলে মিশে থাকতে চায় তখন কি ওরা আমাদের কথা মানবে? একদল পাঠাতে চায় গোলা-বারুদ, কারখানা, ব্যাঙ্ক। অন্যদল পাঠাতে চায় বই, মাসিকপত্র, ইস্তাহার, প্রাচীরপত্র, মাস্টার, সর্দার, ওস্তাদ, কাপ্তেন। তিসরা দুনিয়ার এরাই ছিলো কালা দুনিয়ার পারে। এই তেসরা দুনিয়ার সমুদ্রতট থেকেই এগারো কোটী মানুষ পাচার হয়েছে বিরাট আমেরিকান মহাদেশকে দলাই মলাই করে কয়েকটী সওদাগরের পকেটে তামাম মুনাফা ভরে দেবার ব্যবস্থা করতে। ওদেরই লাগানো হয়েছে নিজেদের শেকল নিজেরা গড়তে নেবার ব্যাপারে। সেদিন শাদা দুনিয়া এদের কালো দেখেছে।

আজ যাদের আমরা তেসরা দুনিয়া বলে জানি তারাই এই নব মহাদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রমিক যুগিয়েছে। কেউ আইনতঃ দাস। কেউ বিনা আইনে দাস। কেউ মুচেলকা লেখা দাস। কেউ চামড়ায় ছাপ দাগা দাস। ফিলিপাইন থেকে, বাহি-সুমাত্রা-যবদ্বীপ থেকে মালয়, সিংগাপুর, হংকং থেকে, চীন থেকে, ভারত থেকে, সারা আফ্রিকা থেকে জোগানো গেছে উত্তর আমেরিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, ফিজিতে, মাদাগাস্কার, জাঞ্জীবারে, পোর্তোরিকো, ক্যারিবিয়ানের শত শত দ্বীপ। এই মানব-সোতের কুখ্যাত ধারাটীর নামই হয়ে গেল 'মাঝের-ধারা', এবং এই মাঝের ধারার এক-পাশে রইলো 'গোড়ার ধারা' অন্য পাশে রইলো 'আখিরী ধারা'। এই তিন ধারার ইতিহাস শেষ করে তারপর তিসরা দুনিয়ার খবর নেবো আমরা।

প্রথমেই আমরা দেখবো মানুষকে 'দাস' করার ফিকিরটি কীভাবে কেবল শাদা-দুনিয়া জুড়ে সমৃদ্ধি এনেছে। কী করে মানুষকে পশুর মতো বন্দরে বন্দরে নিয়ে তারাই বিক্রী করেছে যারা নিজেদের সভ্য বলে। আরও দেখাবো যে দাসপ্রথা উঠে গেছে এটা একটা বাজে কথা, মিথ্যা কথা। আইন যা বলে সেটা আদলতী ভাষা। অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং ইতিহাস যা বলে সে ভাষায় দাসত্ব ছিলো, আছে এবং এটা রাখার চেষ্টার অন্ত নেই।

এই কথাতেই আসা যাক্।

(২)

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল। আর্গুইন্ উপসাগর। ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ মাইলের পর মাইল শাদা ধবধবে বালি ঢাকা তীর। বাচ্চারা খেলা করছে। মেয়েরা ডিঙ্গি তুলে এনেছে অনেকক্ষণ। সমুদ্রতীরের শ্যামল বনানীর আঁচলে ঢাকা নিগ্রো গ্রাম। সেখানে স্বল্প-বাসে অঢাকা, অবাধ প্রকৃতির গায়ে গা-ঠেকিয়ে বেড়ে ওঠা নিগ্রো মেয়েরা রান্না সেরে কালাবাসের বাটীতে করে রাঁধা মাছ আর সেদ্ধ কাঁচকলা নিয়ে পুরুষদের ডাকছে; বাচ্চারাও ডাক শুনে ছুটেছে।

কিন্তু পুরুষরা যেতে পারছে না। সকালের দিকে ভেবেছিলো শাদা শাদা জল-লাসা পাখীর দল। দুপুরের দিকে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছে তীরের ঢেউয়ের বেড়া পেরিয়ে। সন্ধ্যার আগে এখনও সেই শাদা-পাখা কালো পাখী আসছে, আসছে,—ভেসে আসছে; নির্ঘাৎ আসছে। এই গাঁয়ের দিকে আসছে। এরা কারা?

ভূত নয়, দানো নয়, অতিকায় পাখী নয়। ভাসা-বাড়ি, শাদা-পাখা; অদ্ভুত, বিচিত্র, কিন্তু ভয়াবহ। নিসর্গের প্রথম চিৎকার—প্রাণ; প্রাণের মমতা; প্রাণের ভয়।

স্তব্ধ দুনিয়া তাংগাং গনা-গা (শাদা মানুষরা) পাখা ছড়ানো নাওয়ে চড়ে এসেছিলো। সূর্যের আলোয় ঝলসেছিলো থেকে আগুন ছিটতে লাগলো। সেই কবে! সেই থেকে আজ অবধি শাদারা আমাদের দিলো কী? কেবল লড়াই আর অত্যাচার!" ১

শাদার জানতো নিগ্রোদের। নিগ্রোরা জানতো রোমানদের, স্পানীয়দের। য়োরোপের বন্দরে, বাজারে, রাজবাড়িতে হঠাৎ নিগ্রো দেখে মানুষ অবাক হয়েছে। ১৪৭২ রুই-দ্য-সিকুয়েরাই প্রথম শাদা যে নিগ্রো মহালে য়োরোপ থেকে এসেছিলো। সে এসেছিলো পর্যটক, বেভুল, পথ হারিয়ে।

কিন্তু সেদিন ভাসা-বাড়ি থেকে যে য়োরোপ নেমে পা রাখলো গিনীর বালুতটে, এবং যে আফ্রিকা চোখ দুলে বললো—হে অদ্ভুত বিদেশী, স্বাগতম, তারা আজ নেই। কিন্তু সেইদিন থেকে অদ্যাবধি বোঝাপড়ারও আর অন্ত নেই। আমরা উভয়েই 'মানুষ' কিনা; উভয়েই এক ঈশ্বরের সন্তান, এক দুঃখ সুখের ভাগীদার কি-না! এই বোঝাপড়া আজও শেষ হয়নি। আফ্রিকা দাঁড় করিয়েছে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে সফেদ দুনিয়াকে; জবাব চায়। আফ্রিকা খাঁড়া তুলেছে বলি দিতে, বলি পেতে,—রক্ত চায়। কোনো একটা পথে এ জবাব এ শতাব্দীর জবাব হয়ে থাকবে। এ কণ্ঠ না যাবে স্তব্ধ করা, না যাবে কাটা। যন্ত্র-সভ্যতা [illegible] থাকে [illegible]।

কিন্তু সেদিন ভাসা-বাড়ি থেকে যারা পা রেখেছিলো গিনির আর্গুইন উপসাগরের তীরে তারা অবকাশ দেয়নি। রাতের অন্ধকারের মুখ টিপে ধরে তারা নামিয়ে ছিলো জাহাজ থেকে জালিবোটের দল। ফসফরাসের রসে জ্বলে উঠেছে বৈঠার মুখে ঢেউ। ঘুমন্ত মৃগশিশুর দিকে অজগর এগিয়ে যায় যেমন সন্তর্পণে, তারও চেয়ে চুপি-সাড়ে ঘুমন্ত গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেছে বর্ম আঁটা স্পানিশ খ্রীষ্টানরা, শাদা তাদের রং। সভ্যতা তাদের জাঁকালো, ধর্ম তাদের মহামানবতায় আরকে ভেজা। তাদের সব পাপ ধুয়ে দেয় রোমের মহামতি পোপ, তাদের লুঠ-রাহাজানির বখরা পেলেই। তারা পৃথিবীর সদাগর। তারা টাকার হাঙ্গর।

রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বলে উঠলো। বালক-বৃদ্ধ-বনিতা হায় হায় করলো। ১৬৫ জন উধাও হয়ে গেলো। সকালে সে ভাসা-বাড়ির চিহ্নও নেই,—গাঁয়ের ১৬৫ জন মানুষও নেই।২

(১) ক, পাদটীকা—
Slave Trade — O. Ransford
পৃঃ ৭।

খ, দ্রষ্টব্য—
Sweet Malefactor W. R. Aykroyd — (Heinemann) — 1967 Malefactor.

(২) Gomes Azurara-এই 'প্রথম' হামলার বিবরণ রেখে গেছেন।

এই আরম্ভ হোলো এক রক্তাক্ত কাহিনী। কোনো আগুন ধরা নরকের তুষ ফেটে গিয়ে এই কিছু লোণিতে কিছু অশ্রুতে মেশানো লাভা ইতিহাসের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। মানুষের মনুষ্যত্ব পুড়িয়ে দিলো। সেই প্রচণ্ড লোভের দাহ জ্বালিয়ে দিলো সভ্যতার প্রত্যেক সাধুবাদ। ঢেলে দিলো মানব সমাজের প্রত্যেকটি বহু-বর্ণনিত, বহু প্রশংসিত, বহু আকাংক্ষিত সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে সুপ্ত বিষাক্ত কালো বিষ। এ বিষের প্রতিক্রিয়া পাঁচশো বছরের পারে আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। আফ্রিকাকে এপার ওপার ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কেনিয়াটা রক্ত পিপাসায় জর্জর, ইঁড়ি আসীন প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ঠুর; প্রেসিডেন্ট কাউন্ডা সেদিন ঘোষণা করেছেন (১৫-১-৭৬) 'এতোকাল যে আফ্রিকাকে পিষেছো, আজ সে আফ্রিকা নেই। গোলা-বারুদ-নাফাম-নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পাহাড়ে চেপে ধমকাতে পারো। কিন্তু আর সে দিন নেই যে আফ্রিকাকে ধমকে সাবধান করবে।' নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে আবিসিনিয়ায়, এঙ্গোলায়, গিনি-বিসাওতে, মোজাম্বিকে, নামিবিয়ায়। রক্তের নদী বয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায়।

গিনী বলতে আফ্রিকার সমুদ্রতট-বর্তী এক বিরাট ভূখণ্ড। জিব্রালটারের অপর পারে। দক্ষিণে, কুয়েটা-বন্দর। সেখান থেকে বরাবর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে কানারী দ্বীপপুঞ্জ, আর্গুসিন্ উপসাগর পর্যন্ত (১৪শ—১৫শ শতাব্দী) য়োরোপীয় নাবিকদের জানা ছিলো। কিন্তু তারও দক্ষিণে য়োরোপীয় জাহাজ আসতে সাহস করতো না, যদিও আরব এবং 'বার-বার' জাহাজদের এ অঞ্চলে গতিবিধির কথা জানা যায়। জানা যায় যে মাঝে মাঝে ইতালিয়ন জাহাজে কালো নিগ্রোরা ইতালিতে নামতো। রাজা-রাজড়ার সভায় অদ্ভুত স্বাস্থ্যবান্ (স্বাস্থ্যবতী?) কুচকুচে কালো বরণ সেই কর্মনীয় মানুষগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তাদের চোখের দৃষ্টির জ্বলন্ত চমক, তাদের অন্তরের টাটকা নিবারণতা য়োরোপের সভায়, শিবিরে, অন্তপুরে বিশেষ সমাদর পেতো; অদ্ভুত কোনো জীব পোষ মানলে যে কৌতুক আমোদের সৃষ্টি হয় তেমনি রসে মশগুল থাকতো ধনীরা। এইসব সূর্য-সেঁকা দেহ-গৌরব সাজিয়ে রাখা হত বৈচিত্র্যের চমক লাগিয়ে তাক্ করে দেবার উপকরণ আসবাব হিসেবে। সমকালীন ভিনীশিয় শিল্পীদের পটে মাঝেমাঝেই সুশোভিত নিগ্রো মূর্তি আঁকা হোতো।

য়োরোপীয়রা মানতে রাজী নয় যে ভাস্কো-দা-গামা-র পূর্বে কেউ কখনও অতলান্তিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে আফ্রিকা বেড় দিয়ে গিয়েছিলো। য়োরোপের কোনো নাবিক যায়নি সত্য হতে পারে; কিন্তু এই দুই মহাসাগরের বুকে জেগে থাকা দুই বিরাট মহাদেশের উপকূল-[illegible] মহাসাগরের বুকে জাহাজ চলেছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। সুমের, আবিসিনিয়া, মাদাগাস্কার, সিংহল, মালয়, বরদ্বীপ, চীন—বরাবরই সেই জাতকেরও বহু পূর্ব থেকে বাঁধা ছিলো বাণিজ্য সূত্রে। এই সব জাহাজের পক্ষে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যাতায়াত মোটেই অসম্ভব ছিলো না। এই দিকে বড় বড় শমিসান আফ্রিকান সাম্রাজ্যের বিবর্তন, উত্থান পতন হয়েছে। কিন্তু ভাদী অন্তরীপ থেকে ক্যানারী দ্বীপের মধ্যেকার উপকূল সাহারা মরুভূমির শুকনো নিঃশ্বাসে একেবারে জন প্রাণীহীন, সবুজের চিহ্নহীন। এই 'মৃত' লোকের ভয়ে কেউ এদিক ঘেঁষো মাড়াতো না। এটা ছিলো 'প্রেতভূমি।' নাবিকরা বলতোও এটাকে 'প্রেতভূমি'-ই।

কিন্তু সেনেগাল নদীর মোহানা থেকে নাইজার নদীর মোহানা পর্যন্ত যে তীরভূমি, —(কৃষ্ণ-চন্দ্রকলা) এইখান থেকেই আফ্রিকান দাস পাচার হয়েছে লাখে লাখে। কারুর কারুর অনুমান—ছেড় কোটীর মতো লোক পাচার হয়েছে মাত্র এই অঞ্চল থেকেই। তারপর দাস ব্যবসায় যখন তার প্রথম পর্ব শেষ করেছে,—অর্থাৎ য়োরোপীয় জলদস্যুদের উৎপাতে মানুষ ধরার পর্ব যখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তখনই হোলো দ্বিতীয় পর্বের পত্তন। সেই পর্বে আফ্রিকান 'সর্দারেরা'-ই এই 'ব্যবসায়ে' প্রবেশ করলেন। 'দাস' এরাই ধরে দিতেন; ব্যবসায় এরাই করতেন; লাভের অংশ এরাও নিতেন। এবং এদেরই অনেককেই আবার শাদারা ঢুকিয়ে নিতেন খাঁচায়। তখন গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওনী ছেড়ে সোজা গোলড্ কোস্টে ঢুকে পড়েছে এ ব্যবসায়। তারপরে বেনিন উপসাগর,—একেবারে দক্ষিণে আঙ্গোলা পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্বে দাস ব্যবসায়ের 'ফসলের' বাজার আরও ফলাও। পূর্ব উপকূলে আরবরা 'ধরছে' দাস। তাদের জলদস্যুতার কেন্দ্র হোলো মাদাগাস্কার এবং মাদাগাস্কারের আশেপাশের দ্বীপ। ভারতের সমুদ্রতীর তখন ছিলো সুশাসিত সুরক্ষিত। সেখানে দন্তস্ফুট করতে পারেনি এ ব্যবসায়। ভারতে দাস ধরে বেচা ব্যবসায় হিসেবে চালু ইংরেজদের আগে হয়নি।

কিন্তু চতুর্থ পর্বে ভারতও বাদ যায় নি; বাদ যায়নি মালায়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, চীন। কিন্তু তখন ভারতে ইংরেজ। ইংরেজ আইন করে অবশ্য কাগজে কলমে 'দাস' ব্যবসায় তুলে দিয়েছে। কী করে আর এ ব্যবসায় করে। কিন্তু ইংরেজ, ওলান্দাজ, ফরাসী, স্পানিশ আমেরিকার বিশাল সাম্রাজ্যগুলোয় শ্রমিক দরকার যে। কে জোগাবে? চতুর্থ পর্বে জাহাজ জাহাজ 'মুচেলেকা' লেখা শ্রমিক পাচার হতে লাগলো। কাগজে কলমে 'দাস' না হলেও এরাও এই চতুর্থ পর্বে দাসই ছিলো। এবং এই 'শ্রমিক'দের বংশেই সেঁচা হয়েছে ক্যারাবিয়ান, গুয়ানা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, পানামা, হন্দুরাস, হেতী, পোর্তোরীকো, ক্যুবা, বারমুদা। সে এক বিশাল ভূভাগ প্রায় অর্ধেক এশিয়ার মতো।

বাস করতো তারা তখনও লোভাতুর য়োরোপের পাঞ্জার বাইরে ছিলো, অনেক দক্ষিণে বলে। আবার আরব সাগরের দস্যুদের পাঞ্জার বাইরে ছিলো অনেক উত্তরে বলে। ওদিকে উত্তর-পূর্ব তট থেকে আসতে গেলে এক মরু-বলয়, এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব তট থেকে (উত্তমাশা থেকে) উত্তরে যেতে গেলে অন্য এক মরু-বলয়। গিনীর তটবর্তী অধিবাসীরা যেন ছিলো পৃথিবীর অন্যান্য কৃষ্টি থেকে সরে থাকা এক কৃষ্টি। মহাকাল যেন তাদের একটা বোতলে ছিপি এঁটে সরিয়ে রেখেছিলেন। শ্বেত তস্করদা এসে সেই বোতলের ছিপি খুলতেই কালো দৈত্য আকাশ-পাতাল জোড়া অতিকায় এক আকার নিয়ে আধুনিক ইতিহাসকে ওলট-পালট করতে লেগে গেছে।

নিগ্রোরা কারা? কৃষ্ণবর্ণ কেন এদের? 'জাতি' বিভেদের মূল কথা কী—এ সব হোলো নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের ব্যাপার। আমাদের কাছে এরাও 'মানুষ', আমাদের মতোই মানুষ।—আফ্রিকার খর্বকায় মানুষরাই বোধহয় এদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ। সাহারা চিরকাল মরুভূমি ছিলো না। এদেশে তখন মানুষ থাকতো। সেই মানুষরাই ক্রমশঃ পশ্চিম উপকূলে সরে এসেছিলো মরুভূমির গ্রাসে এড়িয়ে। খৃষ্টপূর্ব দশ হাজার অব্দেও এই উপকূলে নিগ্রোরা যে বাস করতো তার পরিচয় আছে।

কিন্তু খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এরা লোহার কোদাল, কুড়ুল ব্যবহার করছে। ফলে আর এরা কেবল আরণ্যক হয়ে রইলো না। চাষ-বাস এলো; ভদ্রতা এলো; সমাজ এলো; নিয়ম এলো; আইন, ধর্ম, বিবাহ, সংসারও ক্রমশঃ চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে এসে বনেচরদের গ্রামবাসী করলো। ভারতবর্ষ সিংহল থেকে এরা ওল, কচু, আম, কলা পেলো। আফ্রিকায় এরা ব্যবহার করতো জনারী জোয়ার ঘেসারী, জোয়ার আর এক ধরনের শস্য। ফলা, আম, কচু পেয়ে এদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকলো বৃহৎ হারে। ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এরা। দূরে দূরে অন্যান্য নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবহার বাড়লো; বিবাহও চলতে লাগলো। নিগ্রোদের প্রধান দুই শাখা—খোইসান এবং হামিতিক রক্তে মিশ্রণ হোলো। বর্তমানে দক্ষিণের বান্টুদের দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় এই মিশ্রণের ফল ভালোই হয়েছিলো।—

পুরাকালে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ফিনীশিয় জাতির প্রভাবটাই ছিলো প্রবল। তারও দক্ষিণে ছিলো সাহারার মৃত্যুময় যোজনের পর যোজনব্যাপী দগ্ধ প্রান্তর। মিশর ও সুদানের দক্ষিণে অনধিগম্য জঙ্গল-পাহাড়। কাজেই শ্রীরামচন্দ্র ও অগস্ত্যের আগে বৈদিক গাঙ্গেয় সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে দক্ষিণের যেমন কোনো যোগাযোগ ছিলো না,—তেমনি আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণে যোগাযোগ ছিলো না বললেই চলে। এ যোগাযোগ সাধন আজও দুষ্কর। তাই 'আফ্রিকা' হলেও আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণের মানুষ ও কৃষ্টির পার্থক্য

সামান্য যা যোগাযোগ ছিলো তা উপ-পূর্ববর্তী সোমালিয়া, আবিসিনিয়া, মিশর সুদানে ছিলো। মোটামুটি এ দিকটা ছিলো ফিনীশীয় এবং গ্রীকদেরই আওতায়। এদের সমাজে অবশ্য 'দাস' রাখা চালু ছিলো। কিন্তু সে দাসেরা পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হোতো। দিল্লীর মসনদে, দক্ষিণেও, দাসের মাথায় মুকুট চড়েছে। বাজিয়ার প্রেমিক দাস, মালিক কাফুর দাস। অন্য খোঁয়াড়ের ছাগল, মুর্গী ভেড়ার সামিল ছিলো না ইসলামীয় দাস। তারা মালিকের পরিবার গোষ্ঠীর একজন হয়েই থাকতো। শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন দাস-রাজ গুহক। হরিশ্চন্দ্র দাস হলেন, তাঁর প্রভু তাঁকে ছাগল-ভেড়ার সামিল করেন নি।—বহু দাস 'গায়' হিসেবে প্রভুর গোত্রও ব্যবহার হতো। 'গো-ত্র' শব্দের অর্থই এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তি।—ভারতবর্ষের সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ থাকায় আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দাস সমাজ কিছুতেই নিছক 'সওদা', বাজারের বাণিজ্য হয়ে যেতে পারেনি। দাসেদের প্রতি ব্যবহার করার ভদ্র অনুশাসন কোরাণে, হাদিসে, মনুতে, যাজ্ঞবল্ক্যেও বিধৃত আছে। তার অন্যথায় অধর্ম হোতো।

কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মানুষের মেজাজ ছিলো অন্য। ওদের কেউ কখনও য়োরোপ থেকে খোঁচায় নি। য়োরোপ এদেশের পাত্তাই রাখতো না। এক তো ছিলো সমুদ্র-বাধা। দ্বিতীয়তঃ, ফিনীশিয়া প্রতাপ। যে রোমকরা সভ্যতার বিস্তার করেছে বোলে এতো হাঁক পাড়া হয় তারা এই ফিনীশিয়দের কিন্তু সহজে ঘাঁটাতেই চাইতো না। বিশেষ করে জলের ওপরে ফিনীশিয়দের ছিলো দুরন্ত এবং অবাধ অধিকার। মাঝে মাঝে ইতালীর ঘরে যে নিগ্রো দেখা যেতো না তা নয়। রোমের জাহাজে কাপ্তেনরা আফ্রিকার উত্তর দেশের খালাসী কাজে বহাল করতো। নির্দিষ্ট বেতন বলে কিছু থাকতো না, স্বাধীন জীবন বলতেও বিশেষ কিছু ছিলো না। গ্রাস ও আচ্ছাদনের পরিবর্তে তারা কাজ করতো। এমন বেগারী খালাসীদের জোগানদার প্রতি বন্দরেই থাকতো, কিন্তু কোনো অর্থে এরা 'দাস' নয়। এদের থাকা-খাওয়া এদের মর্জি। এরা 'রং রুট', মানে রিক্রুট করা মজদুর। কার্থেজ, সিসিলি, মলটা, ত্যুনিস, আলজিয়ার্স, মোরোক্কোর বাজারে এরা আজ ঘোরে ফেরে, তখনও ঘুরতো ফিরতো। এরাই ফিনীশিয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আলবুকের্কী বা ভাসকো-দা-গামার বহু শতাব্দী পূর্বে এরা আফ্রিকা মহাদেশের উপকূল ধরে ঘুরেছে।

কিন্তু তার বেশী নয়। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে য়োরোপের আসল যোগাযোগ হবার কোনো ধারাবাহিক সুযোগ সুবিধা ছিলো না। আফ্রিকার গিনী-উপকূল, আর্গুইন উপসাগর, বেনুইন হিংসায় ফিনীশিয় সভ্যতা উৎখাত হবার পর ও পথ প্রায় বন্ধই হয়ে গেলো। মুরবাই একমাত্র ফিনীশিয়দের 'অস্থি' হিসেবে জাহাজে জাহাজে যোগাযোগ রেখেছিলো। উটে করে দক্ষিণে সিনিগাল, তিম্বাকতু, বেনিন আর উত্তরে তাঞ্জিয়ার ত্যুনিস, ত্রিপলির মধ্যে যোগাযোগও ছিলো। কিন্তু আমরা দাস-ব্যবসায় বলতে যে নরক-দর্শনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি সেই জঘন্য মনুষ্যত্বহীন ব্যবসায়ে মুররাও কখনও লিপ্ত ছিলো না (সমগ্র য়োরোপীয় সাহিত্যে, লেখায় মুরদের অতি জঘন্যভাবে চিত্রণ করা সত্ত্বেও)।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় গিনি-বাসীদের সমাজ ছিলো নিতান্ত অপরিণত। ওদের পুরোপুরি নিসর্গ-সন্তানই বলা যায়। চাষবাস এরা ক্রমশঃ পরে শিখেছিলো। পরিবার পালন, সংসার ধর্ম অবশ্য ছিলো। রাজা, সর্দার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, বাণিজ্যও কিছু কিছু মোটামুটি জানতো। কিন্তু সবই গৌণ ভাবে। গিনী উপকূলভাগ 'উপকূল' হিসেবে পরিত্যাজ্যই ছিলো। কেন না যখন জাহাজই ছিলো অগোচর, তখন সমুদ্রতীরও ছিলো বর্জিত বিষয়। মাটির দুনিয়াই তখন একমাত্র দুনিয়া। হাউসা, আইবো, আশান্তি, সান্দিঙ্গো, স্বাহীলী, বান্টু সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ক্ষমতা মাটির দুনিয়াতেই সীমিত ছিলো।

এ ছাড়াও অভিশপ্ত বেনিন উপসাগরের ওপর বিধাতার একটি আশীর্বাদ ছিলো। সেটি হোলো এ্যানোফালিস গ্যাম্বী নামক মশা। ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়ার বিষ এদের কামড়ে। যারা নিগ্রো নয় তাদের এ রোগ ধ্বংস করে দেয়। আমাদের রক্তে যে হিমোগ্লোবিন আছে, এবং অক্সিজেন সরবরাহে যে হিমগ্লোবিনের কাজ জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, তার 'সেল' গুলো গোল। কিন্তু সকলের হিমোগ্লোবিন সেল গোল হয় না। কারুর কারুর সেল চাঁদের কলার মতো। এ্যানোফ্যালিসের বিষক্রিয়া এই শেষোক্ত সেলের ওপর হয় না। (কেন হয় না জানি না বলেই ভগবান মানতে হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান যেখানে স্তব্ধ, সেই নিঃশব্দ সাহারায় বসে আছেন সকল জ্ঞানের উৎস সেই জ্ঞানাতীত)। গিনীর এই নিগ্রোদের রক্তের সেলও ঐ চন্দ্রকলাকৃতি। তাই

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

ফরহ্যান্স ব্যবহারকারীরা স্বেচ্ছায় জানিয়েছেন

"আমার মাড়ি দৃঢ় ও সুস্থ হয়ে গেছে"

"আপনাদের 'ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট' ব্যবহার করে আমার মাড়ি দৃঢ় ও সুস্থ হয়ে গেছে। এর আগে মাড়ির যন্ত্রণায় ভুগতাম। এখন শুধু আপনাদের টুথপেষ্ট ব্যবহার করেই সে যন্ত্রণা থেকে বেঁচেছি।"

(ডাঃ) ডি. এম. দাস, শিকারপুর

"আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো"

"রাজামুন্দ্রির এক ডেন্টিস্ট···আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।"

(ডাঃ) পি. জে. ল্যাজার,
চিরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্ট্যাট) মেসার্স ম্যানার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

দাঁতের সঠিক যত্ন নিতে হলে, রাত্রে আর সকালে আপনার দাঁত পরিষ্কার আর মাড়ি মালিশ করার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন। ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করবেন, কারণ দাঁত ব্রাশ করার ও মাড়ি মালিশ করার জন্যে এ বিশেষভাবে তৈরী।

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

বিনামূল্যে দাঁত ও মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ডাকখরচ বাবদ ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসারী ব্যুরো, [illegible] T 129-189 [illegible] লিখুন

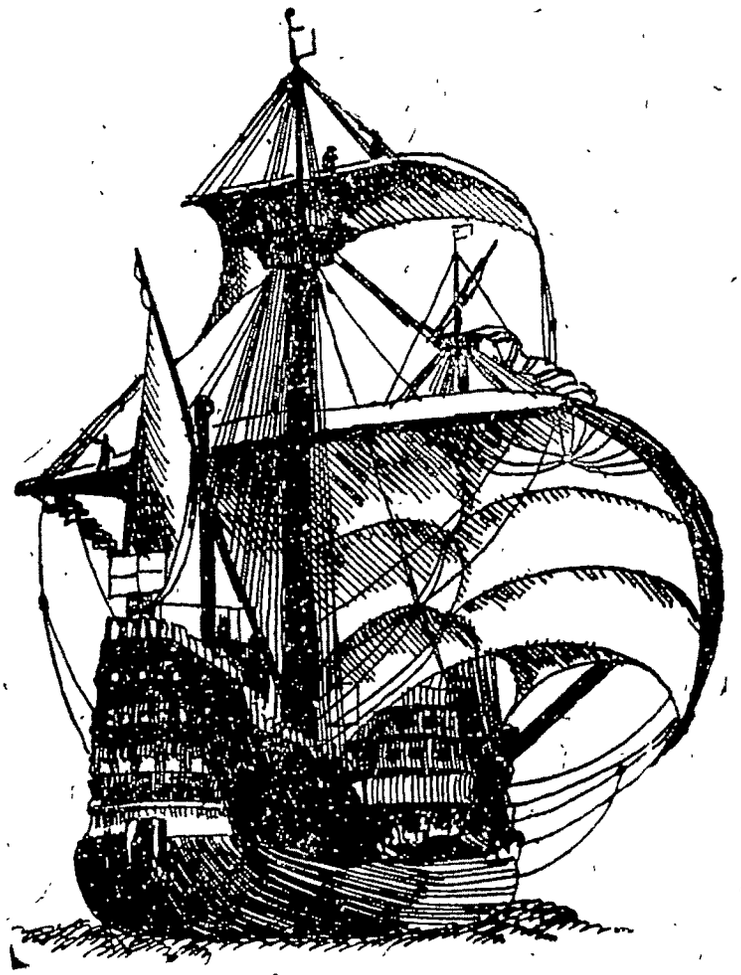

ভাসাবাড়ি

মশার কামড়ে ওদের কিছু হয় না। মশার ডেঙ্গুর ভয়ই তখন কেউ জানতো না। জানতো জ্বরের ভয়। বেনিন উপসাগরের চন্দ্র-কলাকৃতি ভূমিভাগকে নাবিকরা বলতো 'মৃত্যু-কলা',—'ডেথ ক্রীসেন্ট'। আর নিগ্রোদের সম্বন্ধে ভাবতো ওরা যমের অরুচি, মরতে জানতো না।

প্রকৃতির মধ্যে এই সব বৈচিত্র্য দেখেই তো কথা ওঠে মানুষ দেশ গড়ে না, দেশই মানুষ গড়ে। লোহা-ধর্মী সভ্যতার বাহক যারাই হোক,—তারা এসেছিলো গিনীতে। এবং এ্যানাফিলিসের তাড়সে গঙ্গালাভও করেছে। তবুও পুত্র পৌত্ররা বেঁচে গেছে সংক্রমণের ফলে। লোহ-ধর্মী কৃষ্টিও তাই বেঁচেগেছিলো। আবার সূর্য বিহীন উত্তরের শাদারা শাদতর হতে লাগলো শীতের প্রকোপে। তারা বেঁচে রইলো তুষার ঝড়ের মধ্যেও বছরের ছ মাস ধরে শুধু জমানো মাংস খেয়ে।—সাহারার মানুষরা সে জীবন ভাবতেও পারে না। বছরে ছ মাস সূর্য না পেয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকা তাদের বুদ্ধির অগোচর।

শীতের জ্বালায়, সবুজের তালাশে শাদারা কেবল ছুটোছুটিতেই অভ্যস্ত হোলো না,—হটাৎ হামলা করে জীবনের ছন্দ তছনছ করে লুঠতরাজ করেই ভেগে পড়াও শিখলো। কারণ শীত কেটে গেলেই তারা বাড়িমুখো হোতো। কাজেই নিগ্রো কৃষ্টির মধ্যে আমরা কয়েকটি বিশেষত্ব

মাটির মায়া, ভিটের দেবতা পিতৃ পুরুষের স্মৃতিতে আত্মনিবেদন, নৈসর্গিক চমৎকারের বুনিয়াদে অপ্রত্যক্ষে শ্রদ্ধা,—এবং ঐ শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বন্য-ভাষায় দক্ষ, বন্য বেশে পারগ পুরোহিতের আনুগত্য।

এমনটা ছিলো না উত্তরের শ্বেতকায় সমাজে। তাদের ছুটোছুটি করতে হোতো গরমের দিনে চাষের জন্য, এবং শীতের দিনের জন্য শিকারের খোঁজে। শীতের দিনে তারা ছুটতো কোথায় পাবে গরম। কোথায় পাবে মাংস জারিয়ে রাখার নুন, মাংস রান্নার মশলা। মাটির দয়া যে তারা পেতো না তা নয়, কিন্তু সে দয়া শুধু ছ মাস, বাকী ছ-মাস পেতো মাটির মৃত্যু হিমে নৃশংস অবহেলা। ছ মাস জীবন, ছ মাস মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বেঁচে ওঠা জীবন এই ছবিই আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা হয়ে গেলো। ঈশ্বর আবার জন্ম নেবেন এ বিশ্বাস করা সহজ হোলো। মাটি-আকাশ-শ্যামল জীবনে মৃত্যুর পর জীবন, জীবনের পর মৃত্যুর বিবর্তন-ছন্দ দেখে দেখে তাদের মনেও জীবন থেকে মৃত্যুতে, মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে আসার দেবতা ও ধর্ম আসন পেলো। ভিটে নয়, পিতৃপুরুষ নয়, শেকড় গেড়ে বসা নয়। এই শ্বেত-কৃষ্টি যাযাবর। ঘোরে আর ঘোরে, ঠিক যেমন বাস এশিয়ার স্তেপস্-এর মোঙ্গলরা, তাতাররা ঘুরতো। বিশাল পরিক্রমা করতো শুধু পায়ে হেঁটে, গরুতে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, নৌকোয়, জাহাজে। এরা ধর্ম, দেবতা, রান্না, নীতি সবই,—চলো, ভাগো, লোঠো, বাঁচাও প্রাণ। বর্তমানের স্থূল প্রাপ্তিই এদের জীবনের উপাদান। শীতজর্জর, শীত-ত্রস্ত এই কৃষ্টির অপ্রসূতি এই উপাদানেই গঠিত। তাই মনে হয় দেশই গড়ে মানুষ, মানুষ দেশ গড়ে না।

কিন্তু উপকূল থেকে সরে এলেই আফ্রিকার বনরাজী নীলা। অবণ্য আফ্রিকার জীবন সমারোহ। শীতের দেশের ধূসর চোখের ওপরে এই ঘন শ্যামল ধরনী যেন যাদুমন্ত্র বুলিয়ে দেয়। যেমন তারা বুঝতে পারে না এদের দেহের রং, চুলের স্তম্ভিত-কুণ্ডন, চোখের তারার প্রোজ্জ্বল নগ্ন প্রত্যক্ষতা, চিক্কণ ত্বকের অবারণ নিরাবরণতা,—তেমনি বুঝতে পারে না এদের ধর্ম, এদের দেবতা, এদের সহিষ্ণুতা,—বিদেশীর প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যবহারে অমায়িকতা, স্বাগতোক্তিতে তৃপ্তি। এই সম্পূর্ণ সদানন্দ-আদিমতার অনাবিল সৌন্দর্য এদের চোখের তারায় তরুণ ঋষ্যশৃঙ্গের বন্দনা তোলেনি, তুলেছে রাক্ষসী ক্ষুধা, তস্করের তৃষা।

সেই ঘন বনের শ্যামল প্রচ্ছায়ে, থরে থরে জীবন স্পন্দিত, কম্পিত, ত্রসিত, ব্যাকুলিত। সম্ভারে, সম্ভারে, সংহারে সে জীবন মুখর সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির লীলা-প্রাঙ্গণের অলংকরণ বৈচিত্র্যে।

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে
আরাম পেতে
বিশ্বস্ত
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে!

আমি ওকে

ফ্যারেক্স®

খাওয়াতে শুরু করে ভালই করেছিলাম।

আমার ডাক্তার বলেছিলেন: "বাচ্চা ৩ মাসে পড়তে, দুধই যথেষ্ট নয়। ওর দরকার ফ্যারেক্স।"

ডাক্তাররা ফ্যারেক্স খাওয়াতে বলেন কেন?
দুটো কারণে: এটি এক নিখুঁত সুষম আহার যা আপনার বাচ্চার প্রথম শক্ত আহারের চাহিদা পূরণ করে; আর কচি বাচ্চার কোমল হজমশক্তির পক্ষেও এটি খুব ভাল।

বাচ্চার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ফ্যারেক্স চমৎকারভাবে সুষম কেন?
আপনার বাচ্চার মস্তিষ্ক আর শরীরের বিকাশের জন্য প্রোটিন দরকার: ফ্যারেক্স সঠিক আর সহজে হজম-করার প্রোটিন যোগায়। আপনার বাচ্চার শক্তি দরকার: এই শক্তির জন্যে ফ্যারেক্স যোগায় কার্বোহাইড্রেট। আর আপনার বাচ্চার বয়স ৩ মাস হয়ে উঠতেই ও জন্মের সময় আপনার কাছ থেকে যে আয়রণ পেয়েছিল—ওর সেই আয়রণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনার বাচ্চার চাহিদা পূরণের জন্য আর ওর রক্ত সুস্থ রাখার জন্য ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত আয়রণ। এছাড়া ফ্যারেক্সে আছে পর্য্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২ যার দৌলতে আপনার বাচ্চার গ'ড়ে ওঠে মজবুত হাড় আর শক্ত দাঁত।

৩ মাসে পড়তেই কেন?
ওর চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গ'ড়ে তোলার জন্য, আর তা'তে শক্ত আহার ও চিবিয়ে না খেয়ে গিলে ফেলবে না। আপনি যদি ওকে এখন থেকেই ফ্যারেক্স খাওয়াতে শুরু করেন তাহ'লে ও পরের দিকে "বড়দের" খাবার সহজে আয়ত্ব ক'রে নিতে পারবে আর তা ভালভাবে চিবিয়ে খেতে এবং হজমও করতে পারবে।

সেদ্ধ আলু চটকে দিলে চলবে না?
আপনার বাচ্চাকে কোনো শক্ত আহার দেবার আগে ওর হজম-শক্তির ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। ৩ মাসে ওর হজমশক্তি এখনও কোমল ও তাই ওর এমন এক শক্ত-আহার দরকার যা ও সহজে হজম করতে পারবে। তাছাড়া গতানুগতিক খাবার সবসময় সুষম হয় না যা থেকে আপনার বাচ্চা ওর শরীরের জরুরী চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে: আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস আর ভিটামিন ডি২। তাই ডাক্তাররা যে বলেন ৩ মাসে পড়তেই বাচ্চাকে অবশ্যই ফ্যারেক্স-খাওয়ানো উচিত—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কখন থেকে ওকে "বড়দের" খাবার খাওয়াতে শুরু করব?
যখন থেকে ও প্রথম হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করবে। ওকে ফল, শাকসব্জি, ডাল, ডিম দিন, তবে ফ্যারেক্স খাওয়ানো বন্ধ করবেন না। আপনার বাচ্চার বয়স ৩ বছর না হওয়া পর্য্যন্ত একটু কল্পনার সাহায্যে আর আপনার স্নেহ উজাড় ক'রে ওর সমস্ত খাবারের সঙ্গেই ফ্যারেক্স মেশান।

শিশুদের প্রথম শক্ত আহার—সব দিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

লিনটাস-GF-57-2115 BG (R)

কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে, তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে পুলিশে চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।

শ্যামল রায়

এই লক-আপটা ছোট নয়। প্রায় হল-ঘরের মত, শূন্য বিশাল। তিনদিকে পুরো দেয়াল, জানালা দরজা কিছু নেই। একদিকে সারি সারি বড় বড় কাঁচের জানালা। মাঝখানে লোহার শিকের গাঁথুনী, অনেকটা গিরিলের মত। তারপর আবার কাঁচের জানালা। জানালা পেরিয়ে ওপারে ইটের দেয়াল। দেওয়ালের ওপর দিয়ে একটা পেট্রোল পাম্পের মাথা দেখা যাচ্ছিল। লক-আপের পূবদিকে সারি সারি চারটে ছোট ঘর। দরজা নেই। পায়খানা আর প্রস্রাবে ভরে আছে। তার পাশে আর একটি—বাথরুম, জল পড়ছে। ডানদিকের দুটো ঘর থেকে প্রস্রাব গড়িয়ে গড়িয়ে ঘরের মাঝামাঝি চলে এসেছে। দু-তিনটে কম্বল বিছানো রয়েছে সেখানে। একটা উৎকট গন্ধ ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘর। আমি একা ঘুরে ঘুরে সব দেখি। খিদে পেয়েছে খুব। শরীর মন অবশ হয়ে ঘুমোতে চাইছে।

এতবড় হল ঘরে শোবার জায়গা নেই। লক-আপের দিকে এগিয়ে যাই। কোথাও কিছু আছে কিনা দেখি। ডাকি, কে আছো? কে আছো? কোন সাড়া নেই। ফিরে আসি। পা দিয়ে শোবার জায়গা করি। স্তরে স্তরে ময়লা জমে আছে মেঝের ওপর। সরে না, নড়ে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, দেয়ালের দিকে চলে আসি। দেয়ালে পিঠ রাখি, দিয়ে শরীর অচল হয়ে আসতে থাকে। আমি পা ভেঙে বসে পড়ি। কোথেকে একটু হাওয়া আসছিল। মনে হল হাওয়া। বুক ভরে নিশ্বাস নিই। সেই উৎকট গন্ধে বুক ভরে যায়। আবার পেট গুলিয়ে ওঠে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বুক চাপ চাপ ব্যথায় ভারি হয়ে যায়। ঘরের ভেতর গনগন করে আলো জ্বলছে, সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। আবার হারিয়ে যায় সব কিছু। অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক, আবার আলোয় ভরে যায়। বুকের কাছে ভিজে ভিজে লাগে। হাত দিয়ে দেখি ভিজে গেছে বুক। আমি শুয়ে পড়ি। চারদিকে একবার আলো ঝলসে ওঠে। আবার নিভে যায়। নিভে যেতে থাকে।

কেমন একটা শব্দ হল। চোখ খুলি—আলোয় ঝলসে যায় চোখ। বন্ধ করে শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। হাত তুলতে চেষ্টা করি, পারি না। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করি—পারি না। সমস্ত শরীর অবশ অসার। গলা শুকিয়ে আসছে। বললাম, জল, শব্দ হল না। মাথাটা কাত হয়ে পড়ে রইল। আমার মনে হল, আমি মরে যাচ্ছি। এই বিশাল শূন্য ঘরে গনগন আলোর ভেতর আমি মরে যাচ্ছি। আমি চোখ খুলি—সামনে দুটো মুখ। চোখ ঘোরাই—আমার দু পাশ থেকে দুজন উবু হয়ে আছে। অস্পষ্ট ওদের

'কেয়া যে—কেয়া হুয়া তুমহারা?'

আমি চোখ তুলে ওদের দেখতে থাকি।

'নিশা কিয়া?'

আমি মাথা নাড়াবার চেষ্টা করি। ওরা আরো ঘন হয়ে আসে। কপালে হাত রাখে। ....বিমার....বিমার....একজন উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। মাথায় জল পড়ে। জল পড়ে চোখে মুখে। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। কাঁপতে থাকে। ভীষণ শীত করছে। আমি দুমড়ে দুমড়ে কুঁকড়ে যেতে থাকি। কিছু দূরে কী একটা ছেঁড়ার শব্দ হয়। চড়চড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে দীর্ঘ একটা কিছু। আমার গায়ে কী একটা এসে পড়ে। আরাম পাই। চারদিক আবার নিঃস্বাড নিঃশব্দ হয়ে আসে। কে যেন বলল, 'আবে ছোড় ....কম্বল কিয়া....তারপর কী হয়েছে মনে নেই।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। জেগে উঠে বসতে চেষ্টা করলাম। কে ধরে শুইয়ে দিল। চোখ চেয়ে দেখলাম দুটি ছেলে। পাশে বসে আছে। একজন মুখের কাছে একটা ভাঁড় এনে ধরল। বলল, 'চা পি লেও....' আমি উঠতে চেষ্টা করি ওরা আমাকে ধরে তুলে দিল। হাতে ভাঁড়টা ধরিয়ে দিয়ে একজন বলল, 'কেয়া নাম তুমহারা।'

আমি গুনগুনিয়ে নাম বললাম।

'কেয়া কেস?'

আমি মাথা নাড়ি। ওরা চুপ করে থাকে। আমি জানালার দিকে তাকাই, আলো আসছে। জানালার ওপারে দেয়ালটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে সারা ঘর দেখে নেই। সেই সারি সারি পায়খানা। বাথরুম। পেচছাপে ভিজে যাওয়া কম্বল। আবার গা গুলিয়ে ওঠে। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে। চোখ ফিরিয়ে নেই। দেখি দু পার্টি ভিজে জুতো পাশে পড়ে আছে। আমার কেমন সন্দেহ হয়—জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকি। ওরা হাসে।

'কাল রাত্রে জল দিয়েছি মাথায়।'

আমি চুপ করে থাকি। নিজের দিকে ফিরে দেখি। কিছু মনে হয় না। ওদের একজন কাছে এগিয়ে আসে। একটা বিড়ি দেয়। আমি সেটা হাতে তুলে নিয়ে মুখে দেই। ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। চারদিক ধোঁয়ায় ভরে যায়। সমস্ত শরীর রিমঝিম রিমঝিম করে বাজতে থাকে। ওদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে আমার পাশ থেকে একটা ছেঁড়া কম্বল তুলে নিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। যেখানে পেচছাপে ভিজে যাওয়া কম্বলগুলো পড়ে ছিল। সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার চলে এসে আমার পাশে বসল। নির্বিকারে বিড়ি টানতে লাগল। ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বালা করছিল। কোন কিছু ভাল করে দেখার

থাকি। নিজের দিকে ফিরে তাকাই। কম্বলের কয়েকটা লোম আমার গায়ে লেগেছিল। ওরা সব সাফ করছিল। একজন বলল, 'কী দেখছেন?'

বললাম, 'কিছু না।'

'ওটা আপনার....'

আমি বললাম। 'থাক। বুঝেছি।'

ওদের মধ্যে একজন একটু বিব্রত বোধ করে হাত তুলে কিছু বলতে চেষ্টা করল। আমি বললাম, 'বলুন।'

'আপনি কাল কষ্ট পাচ্ছিলেন....'

বললাম, 'আর বলতে হবে না। ঠিক আছে। তাতে কী।'

ওরা চুপ করে থাকে। আমি দূরের কম্বলের দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকটা জায়গা ছিঁড়ে। ওখান থেকে যে অংশটা শুকনো ছিল, সেখান থেকে কাল খানিকটা ছিঁড়ে এনেছে। গায়ে দিয়েছে। ভালই করেছে। আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি—পারি না। কিন্তু উঠতে হবে। ওরা আমাকে হাত চেপে বসতে বলে। আমি হাত তুলে বাথরুমের দিকটা দেখিয়ে দেই। ওরা আমাকে দুদিক ধরে তুলে নেয়। আমি ওদের শরীরে ভর রেখে হাঁটতে থাকি। ওরা বাথরুমের মুখটা ধরিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার কাজ শেষ হলে, আবার নিয়ে ফিরে আসে। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল। মুখের ভেতরটা তিতো তিতো। মাথাটা থর-থর করছে। আমি শুতে চেষ্টা করি। ওরা আমাকে বসতে বলে। আমি দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকি।

লক-আপের মুখ থেকে কে যেন ডেকে গেল। আমি মাথা তুলি না। ওরা গলা থেকে উঠে যাচ্ছে বলে মনে হল। ওরা উঠে যায়। আমি ঘুরে বসি। ওরা লক-আপের মুখে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। খুব উত্তেজিত বলে মনে হল। একজন চিৎকার করে কিছুটা ফিরে এসে আবার লক-আপের মুখে ফিরে গেল। কোন ফল হল না, কে এসেছিল, সে ফিরে গেছে। ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এল।

'কী হয়েছে ভাই।'

'কিছু নয়। কাল খেতে দেয়নি তাই বলছিলাম।'

'আপনারা কখন এসেছিলেন।'

'প্রায় একটা হবে—আপনি।'

'সন্ধ্যার কিছু পরে।'

'আপনি খেয়েছিলেন?'

'না।'

'ও তাই— আপনারটাই তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'হবে হয়তো। শুয়ে ছিলাম, ফিরে গেছে হয়তো।'

বিনোদন **অমৃত** ১৩৮৪

পুত্র-কন্যা, প্রতিবেশী, বন্ধু, তাঁর সমসময়ের
দর্শকের দৃষ্টিতে মঞ্চ ও ছায়াছবির
অবিস্মরণীয় নট কন্দর্পকান্তি

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি, চিঠি, সাক্ষাৎকারে সাজিয়ে
লিখেছেন শচীন দাশ

যূথিকা রায় মানে গান
তাঁকে নিয়ে বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র রচনা

দিন গুলি মোর পদ্মেরই দল

রবীন্দ্রপ্রীতিসিক্ত অতুলপ্রসাদ ছিলেন
গভীরভাবে রবীন্দ্র অনুরাগী
তাই নিয়ে ছবিতে-চিঠিতে সৌমেন গুপ্তের সুদীর্ঘ লেখা

প্রীতিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ - অতুলপ্রসাদ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা : জীবন
সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি
শান্তিনিকেতনের সেই দিনগুলি নিয়ে
অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

পরিতোষ সেনের গল্প
অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস

গানের উৎস সন্ধানে
অভিযাত্রী : মধুসূদন মজুমদার
বাঙালী প্রেমিক প্রখ্যাত মারাঠী জীবনশিল্পী
পু ল দেশপাণ্ডের চোখে : বাংলা ও বাঙালী
বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী : কেয়া চক্রবর্তীর
অসমাপ্ত প্রবন্ধ। তাঁরই তর্জমায় একটি বিদেশী নাটক

বসন্ত

তৃপ্তি মিত্রের নাটক : বলি

সমীর সরকারের আঁকা প্রচ্ছদ

দাম ৫ টাকা

'কিছুদিন হল।'

'কেন ধরেছে?'

'রাজনীতি করতাম — তাই।.... আপনারা।'

'আমরা রাজনৈতিক নই। আমি চুরি করি, ও পকেট মারে।' বলে, একজন অপরজনকে দেখিয়ে দিল। কোন সংকোচ নেই, গ্লানি নেই। পকেটমারটির মুখ দেখে মনে হল ওর কাজটা বেশ সম্ভ্রমের। বেশ উৎসাহিত আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওকে। এই সব কাজ কখনো কারো পরিচিতি হতে পারে জানা ছিল না।

'আপনি কী চুরি করেন?'

'সে অনেক কিছু....আগে তালা ভাঙতাম, দল ছিল। এখন দল নেই, একাই করি—স্বাধীন কাজ।' বলে, হাসতে লাগল। ওর হাসির মধ্যে কোথায় যেন বিদ্রূপ লুকিয়ে ছিল—যেন পকেট-মারটির কোন স্বাধীনতা নেই। পকেট-মারটি এবার মুখ খুলল, 'না দাদা, ও শালা চোর। মায়ের বাকসের তালা ভেঙে চুরি শিখেছে। দল-ফল ছিল না কোন দিন।'

চোরটি সেইভাবেই হাসতে থাকে। কোন বাদ নেই, প্রতিবাদ নেই। ওকে আমার বেশ ভাল লাগে। 'কাল ধরা পড়লে কী চুরি করে?'

'জেলারের হার।'

'মানে?'

'জেলারের কোয়ার্টারে কাজ করতাম। ওর বৌয়ের হার....'

'চুরি করেছ....তুমি তো মস্ত চোর হে।'

ও হাসতে থাকে। হাত কচলায়। ঘাড় কাত করে।

'হারটা কোথায়—ধরা পড়েছে?'

'না ওটা চালান করেছি — বাবার কাছে।'

'তোমার বাবাও চোর?'

'ওর বাবা কেন, গুষ্টি চোর। ওর মা, ছোট ভাই জেলে আছে।' বলে, পকেট-মারটি এমন ভঙ্গি করল যে ওদের বংশের কেউ এমন নয়। নিজের কথা আলাদা। চোরটি হাসে। বিড়ি তুলে মুখে দেয়। ধরায়। আমার মনে হল ও একদিন বড় হবে। চুরির কাজে ওর সততা আছে, নিষ্ঠা আছে। ও একদিন খুব বড় চোর হবে। সৎ চোর।

লক-আপের মুখ থেকে একটা শব্দ আসে। কে যেন বুট দিয়ে লক-আপের দিকে লাথি মারছে। ওরা ভ্রূক্ষেপ করে না। বসে থাকে। বিড়ি খায়। আমি বললাম, 'দেখুন না কে—কী চায়।'

ওরা মাথা নাড়ে, কেউ নয়—কিছু নয়। আবার শব্দ হয়। জোরে। চীৎকার করে ডাকতে থাকে। পকেটমারটি উঠে যায়। প্রায় ছুটে গিয়ে লক-আপের মুখে দাঁড়ায়। হাত

'আপনাকে ডাকছে!'

আমি উঠে যাই। সেই ভুতো খোলা কনেস্টবলটি দাঁড়িয়ে ছিল লক-আপের মুখে। আমাকে দেখেই চীৎকার করে।

'ডাকছি .... কান নেই ....'

বললাম, 'কেন?—কী হল।'

চোরটি উঠে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমার পাশে। এবার আমার কাঁধে হাত রাখল। কনেস্টবলটি দুজনকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'কোর্ট আছে।'

চোরটি বলল, 'যাবে না।'

'কেন?'

'না খেয়ে যাবে না।'

'না খেয়ে কে যায় কোর্টে।' বলে কনেস্টবলটি দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে কী দেখতে থাকে। কাছে কে যেন এগিয়ে আসছে এমনভাবে ওর দৃষ্টি নিজের কাছে চলে আসে। একটি ছেলে এসে লক-আপের মুখে দাঁড়ায়। হাতে একটা কাপড়ে বাঁধা বোচ্‌কা। কনেস্টবলটি লক-আপ খুলে দেয়। ছেলেটি ভেতরে ঢোকে। কনেস্টবলটি লক-আপ বন্ধ করে চলে যায়। আমরা ভেতরের দিকে ফিরে আসি। পকেটমারটি যেখানে বসেছিল, ছেলেটি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বোচ্‌কাটা নীচে নামিয়ে রাখে। আমাদের তিন জনের ওপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তারপর বসে পরে বোচ্‌কা খুলতে খুলতে বলে, 'ক-জন আছে এখানে?'

'দেখছো না?'

'দেখছি তো তিনজন।'

'তবে!'

'বলেছে পাঁচ জনের খাবার; দেখছি তিনজন, তবে-টবের কী আছে— আঁ!'

'দিয়ে যাও তিনজনকেই, ভাগ করে খাই। কষ্ট করে আবার নিয়ে যাবে।'

'আহা রে জামাই আমার—পয়সা কে দেবে, তুমি?'

ওরা হাসে। চোখমুখের ভঙ্গিতে একটা আবদার এনে ওকে ভাত কয়টা দিয়ে যেতে বলে। ছেলেটি একমনে বোচ্‌কা খুলে শাল-পাতা ছড়িয়ে দেয়। আমরা গোল হয়ে বসি। ছেলেটি পাতের ওপর কী সব তুলে দেয়। ভাত আমি চিনি। অন্য সব কি চিনতে পারি না। ভাতের সঙ্গে মেখে মিলিয়ে একাকার হয়ে আছে। চোরটি একেবেঁকে আসনপিঁড়ি হয়ে বলল, 'এসব কী বাপ!'

ছেলেটি কোন কথা বলে না। একে একে তুলে দেয় সব। আমরা মিলিয়ে বুলিয়ে খেতে থাকি। শীত শীত করে। গায়ে কাঁটা দেয়। তবু সেই সব গলা বেয়ে নেমে যেতে থাকে। নিশ্চিন্তে নেমে যায়। ছেলেটি বসে বসে দেখতে থাকে।

'এমন প্রসাদ কোথায় তৈরী হয়, বাপ।'

'মন্দিরে', বলে, ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়; আবার নীচু হয়ে ভাতের পাত্র, বোচ্‌কার কাপড় তুলে নেয়। আমাদের সামনেই কয়েকবার ঝেড়ে কাঁধে তুলে রাখে। লক-আপের দিকে চলে

আপের বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখে নেন। ওর হাতে একটা লম্বা কাগজ। আমাকে দেখে কাগজ তুলে হাত নাড়ল। ভাবটা এমন তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমের দিকের কলে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম। মুখটা আমার হাতলে মুছে, হাতটা পাছায় ঘসে নিয়ে এগিয়ে যাই লক-আপের দিকে। ভদ্র-লোক বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন; আমাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 'চলুন, আসুন গাড়ি দাঁড়িয়ে।' 'চলুন' বলে, আমি ধীর পায়ে হাঁটতে থাকি। আবার ফিরে আসি। উনি বললেন, 'কী হল?' কোন উত্তর না দিয়ে আমি ফিরে আসি। লক-আপের মুখে এসে দাঁড়াই। পকেটমার আর চোরটিকে কাছে ডাকি। ওরা কাছে আসে। আমি হাত জোড় করে বলি, 'ক্ষমা কর ভাই।' চোরটি হাসে, পকেটমারটি মুখ নীচু করে কী সব দেখে। আমি বললাম, 'চলি ভাই।'

ওরা হাত তুলে নাড়িয়ে দেয়। আমি হাত তুলে ফিরে আসি। ভদ্রলোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। 'এ-সব আবার কী?'

আমি মুখ তুলে হাসি।

'আবার হাসা হচ্ছে!' বলে আমার একটা হাত জোরে চেপে ধরলেন। প্রায় টেনে টেনে অফিসে নিয়ে এলেন। এক কোণায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ও-সির টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। এক-জন কনেস্টবল হ্যান্ডকাপ নিয়ে এল। হাতে লাগিয়ে চাবি দিয়ে দিল। টেনেটুনে দেখলো। ভদ্রলোকটি বললেন, 'হয়েছে?' কনেস্টবলটি হাত তুলে দেখাল হয়েছে।

'আগে আগে চলুন।'

আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

'আপনাকে বলছি—আগে আগে চলুন।'

আমি দাঁড়িয়ে থাকি। বুকের ভেতরটা আবার সেই রকম করছে—কেমন কষ্ট। মাথার ভেতর কী যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। হাত পা শিথিল হয়ে আসছে। আমি একবার টাল খেয়ে দাঁড়িয়ে যাই।

'কী হল—নকসা হচ্ছে? ওসব আমরা বুঝি—।' বলে ভদ্রলোকটি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে হাঁটতে থাকে। আমি চোখ বুঝে হাঁট-ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মনে হল সিঁড়ি ভাঙছি। মনে হল, বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছি, কোথাও দূরে।

'উঠুন এবার....কী হয়েছেটা কী? চোখ বন্ধ করে এ-সব কী হচ্ছে—অ্যাঁ।'

আমি চোখ খুলি। পা তুলি গাড়ির পা-দানিতে কিন্তু শরীর তুলতে পারি না। ভদ্রলোক আমার কোমর ধরে তুলে দেন, তারপর নিজে উঠে পড়েন। সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে বললেন, 'চল'।

গাড়ির দরজা বন্ধ হতেই ভেতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। ওপরে ঘুলঘুলির মত ছোট্ট জানালা মোটা জাল দিয়ে ঢাকা রয়েছে। জানালার মুখের কাছে কিছুটা আলোর আভা ছিল। ভেতরটা প্রায় শূন্য। দুদিকে দুটো লম্বা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। মাঝখানে কিছুটা ভাঙা অংশ। পেটোলের টিন ছেঁড়া টায়ার গাড়ির বুকের কাছটায় পড়ে ছিল। গাড়ি দুলছে আর পেটোলের টিন ছেঁড়া টায়ার শব্দ করছে, এ-পাশ থেকে ও-পাশে যাচ্ছে, সরছে, নড়ছে। ডান দিকে পাতা লম্বা বেঞ্চের ওপর আমি কাত হয়ে-ছিলাম। এবার শুয়ে পড়লাম। লম্বা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আমি উঠতে যাবো। ভদ্রলোকটি একহাতে দরজা খুলে আর এক হাত আমার দিকে তুলে বললেন, 'শুয়ে থাকুন—নামবেন না।'

'কোথায় এলাম।'

'কোর্ট।'

দুম করে একটা শব্দ করে গাড়ির ভেতরটা আবার অন্ধকার হয়ে যায়। আমি পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করি—হয় না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি। চোখ খোলা ছিল, বন্ধ করি। নানান রকম আলোর বিন্দু চোখের ভেতর খেলা করতে থাকে। মনে হয় শরীর নিয়ে কোথাও তলিয়ে যাচ্ছি, আবার ভেসে উঠছি। অন্ধকারের ভেতর থেকে আলো সরে যাচ্ছে। আলোর ভেতর থেকে অন্ধকার। আমি আলো আর অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যেতে থাকি—হারিয়ে যাই।

গাড়ি আবার দুলে উঠল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আমি নীচে পড়ে গেলাম। চোখ বন্ধ ছিল। খুলে তাকিয়ে দেখি দরজাটা হাট হয়ে খুলে যাচ্ছে। ভদ্রলোক গাড়ির ওপর উঠে আসছেন। আমি উঠে বসতে চেষ্টা করি। বুকের কাছে লেগেছে খুব। কনুইয়ের নীচে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। হাত দিয়ে যন্ত্রণাকে ধরার কোন উপায় নেই। বুকের কাছে জোড়া হাত তুলে আনি। বাইরের দিকে তাকাই—অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে। মনে মনে বলি, সন্ধ্যা হয়ে এল—সন্ধ্যা।

ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এসে একটা ঠোঙা মুখের কাছে তুলে ধরলেন। আমি বললাম, 'কী।'

'খাবার।'

'কেন?'

'জেলে গিয়ে খেতে হবে না।'

বললাম, 'রাখুন পাশে।'

'থাকবে না, পড়ে যাবে।'

আমি জোড়া হাত ওপরে তুলে ওর হাতের ঠোঙা ধরে থাকি। উনি পেছন দিকে ফিরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেন। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার হয়ে যায়। খুব অন্ধকার।

বললাম, 'খাবার কে দিল?'

'কোর্ট।'

'কেন?'

'এটাই নিয়ম। কোর্ট থেকে জেলে পাঠালে খাবার দিয়ে দিতে হয়।'

[illegible]

গিয়ে এই খেয়ে থাকুন। কাল থেকে আপনার রেশন হবে, খাবার পাবেন।'

আমি জোড়া হাতের ভেতর ঠোঙা নিয়ে চুপ করে বসে থাকি। ঘুলঘুলির দিকে তাকাই, আলো নেই। সমস্ত গাড়ি নিঝুম অন্ধকারে দুলতে থাকে। বুকের ভেতর দুপ্‌দুপ্‌ করে। আমি কান পেতে শুনি। বুকের ভেতরটাকেও অন্ধকার গাড়ি বলে মনে হয়। একটানা স্রোত বয়ে যাচ্ছে কোথায়। আশ-পাশ থেকে সবকিছু সরে যাচ্ছে। বাইরের খোলা হাওয়া-বাতাস, মানুষ-জন, সুখ-দুঃখ সরে যাচ্ছে কোথায়? বুক টান করি। চোখ খুলে তাকাই, নিথর অন্ধকারে চোখ ঢেকে যায়। গাড়ি বাঁক নেয়, সামনে এগোয়। বাঁক নেয়, বাঁয়ে যায়। আমি ডাইনে বাঁয়ে দুলে দুলে অনুভব করি। জেলে যাচ্ছি, জেলে। কোন জেল? কোথায়—কত দূরে?'

কত দূরে? বলে, মনে মনে চীৎকার করি। অন্ধকারে গাড়ির গা দেখা যায় না। অন্ধকার ছড়িয়ে যায় চারপাশে। বহু দূরে ছড়িয়ে যেতে থাকে। ছড়িয়ে যায়।

আমি অন্ধকারের ছড়িয়ে যাওয়া দেখতে থাকি। এক সময় মনে হয়, এই গাড়ির জানালা নেই। দরজা নেই। ড্রাইভার নেই। ভদ্রলোক নেই। গাড়ি নেই। ঠিক সেই সময় গাড়ি থেমে যায়। দরজা খুলে যায়। ভদ্র-লোক গাড়ি থেকে নামেন। গাড়ির দরজা হাট করে খুলে রাখেন। আমি গাড়ি থেকে নামতে থাকি। ডাইনে-বাঁয়ে লম্বা উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপরে ঘুমটি ঘর প্রথমে চোখে পড়ল। আমি জোড়া হাতে খাবারের ঠোঙাটা ধরে মাটির ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। গাড়ি একটা বাঁক নিয়ে দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দূরে জেলগেট দেখতে পাই। লম্বা লম্বা শিকে গাঁথা বেশ বড় গেট। ভেতরে মিট মিট করে আলো জ্বলছে। কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। একজন সেনট্রী রাইফেলের মুখে খোলা বেয়নেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা লম্বা কাগজ ঝুলিয়ে ভদ্রলোক সেই দিকে হাঁটতে লাগলেন। বললেন, 'আসুন।'

আমি হাঁটতে থাকি। আকাশের দিকে তাকাই। তারা ফুটছে আকাশে। কাছে দূরে গাছের পাতা নড়ছে। বাতাস বইছে হু-হু করে। পশুশালার ওপার থেকে বিদেশী পাখি সার বেঁধে উড়ে যায়। সেনট্রী চীৎকার করে ডাকে, 'ছয়শো ষোল।' আমি জেল গেটের মুখে এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে থাকি। জেল-গেট খুলে যায়।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বিশ্বভারতীর বই

তাপগতিবিজ্ঞান

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

প্রাঞ্জল ভাষায় তাপ, শক্তির রূপান্তর, শক্তির পরিমাপ, রূপান্তরে শক্তির সমতা, এনট্রপি, সাম্যস্থিতি, পরিবর্তন, শক্তির উৎস-প্রভৃতি বিষয় আলোচিত।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ১৩৪ মূল্য : ৪.৫০ টাকা

সম্ভাবনাতত্ত্ব

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

বিজ্ঞানচর্চায় সম্ভাবনাতত্ত্ব বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর আকর্ষণ কম নয়। রাশিবিজ্ঞানের নানা শাখায় একে প্রয়োগ করা হয়। এই গ্রন্থে বিষয়টি সরলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ১৩৩ মূল্য : ৩.০০ টাকা

মৌল কণা

শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে যে অংশটি বর্তমানে বিজ্ঞানীদের সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে সেটি হল মৌল কণা। বিজ্ঞানীরা কেন এই বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন, তাই আলোচনা করেছেন লেখক সহজবোধ্য এবং সরস ভাষায়।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ১৩২ মূল্য : ৪.৫০ টাকা

পত্র দিলে বিস্তৃত তালিকা পাঠানো হয়

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা-৭১

ঈশ্বরের ইচ্ছা

সমীর রক্ষিত

এত ভোরে গোপালের ঘুম ভাঙে যে তখন ভোর বলে মনেই হয় না। সাহস করে কাকটাকও ডাকে না। আকাশে তারা জ্বলে। আর ঘরের ভেতরে এক-চিমটে সবুজ বাতি একটা। মিহিন নরম এই আলো ঈশ্বরের জ্যোতির মতো।

এই কথা ভেবে গোপাল হাঁ করে হাই তোলে। কিন্তু বুজতে গিয়ে বিপদ ঘটে, রুদ্ধ হয় না। মাঝপথে আটকে যায় যেন। আসলে সোমার দিকে গোপালের নজর পড়েছে তাতেই এই গোলমাল। চিৎ হয়ে সর্বাঙ্গ টান করে, ওপরের দিকে দুখানি হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে সোমা। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। থাকলে সোমার আঁচলটাচল এমন-ভাবে স্থানচ্যুত হত না। রাতে বস্ত্র-মুক্ত হবে আয়েস করাই সোমার অভ্যাস। ইদানীং সোমার শরীরে কিঞ্চিৎ মেদবৃদ্ধি ঘটেছে—যাতে লাবণ্য ঢলঢল করে। শিখরতুল্য ঊর্ধাঙ্গ এবং ঠোঁট দুটি স্বর্গীয় সবুজ আলোয় খুব বেশী পুষ্ট এবং প্রখর বলে মনে হয়। সামান্য হাসির আভাসও রয়েছে মুখে।

ঘুমের মধ্যেই বা স্বপ্নের মধ্যে বিড়-বিড়িয়ে কী যেন বলে সোমা। এবং ভাবভঙ্গীমার এক রমণীয় মুদ্রার ভঙ্গিতে সামান্য আড়মোড়া ভাঙে। আহা! গোপালের কণ্ঠার ভেতরে জিহ্বায় ঠোঁটে কেমন যেন তৃষ্ণা জাগে। উপুড় হয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করতে বিষম ইচ্ছা হয় তার। কিন্তু বাসিমুখে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে স্ত্রীকে চুম্বন করা বিধেয় কিনা ভাবতে থাকে গোপাল। এ বিষয়ে তার পরমপূজ্য ঠাকুরের কোন উপদেশ আছে কী?

ঘুম থেকে উঠে আগে স্নানটান করে তবে সে ঠাকুরপুজোর বসে। এ নিয়ম তার জানা। কিন্তু এখন স্ত্রী-চুম্বন বিধেয় কিনা বুঝে উঠতে পারে না সে। তার গুরুভক্তিতে তিলমাত্র খাদ নেই। আগে সপ্তাহে সে দুবার স্ত্রীসঙ্গম করত। এখন পক্ষকালে একবার। সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে সে মনে মনে জগজ্জননী বলে সম্বোধন করে থাকে—এসবই ঠাকুরের অমৃতবাণীর নির্দেশ। ছেলে বগো ঘুমের জোরে পা ছুঁড়ে যাবে যে গোপাল ফোঁস করে ওঠে। গোপালের ডান পাঁজরায় লাগে। তৎক্ষণাৎ একটা চড় মারতে হাত ওঠায় গোপাল কিন্তু কী ভেবে নামিয়ে নেয়। অক্রোধী হবার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে সে দীর্ঘদিন। কামক্রোধ তার কাছে বিষতুল্য। গোপাল নিরংকুশ নিরা-মিষাশী। পূর্ণিমা অমাবস্যা এবং একা-দশীতে সে শুধু দুধ ফলমূল আহার করে থাকে। এ-বিষয়ে তার নিষ্ঠা যে-কোন নিষ্ঠাবতী বাঙালী বিধবারও ঈর্ষার যোগ্য। চল্লিশও পেরোয়নি গোপাল। কিন্তু বয়েসে কী আসে যায়। তাঁর কৃপা যে পেয়েছে সে কী যৌবনে কী প্রৌঢ়তে, যে-কোন সময় যোগী হতে পারে, রীতি-মত সংসারে থেকেও।

খাট থেকে নামার সময় গোপালের পিপাসু হাতটা কেমন করে যেন সোমার ঊর্ধাঙ্গে স্থাপিত হয়। তন্মুহূর্তে সোমা সদ্য ঘুমভাঙা আধবোজা চোখে তাকায় এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুটি করে। তারপর পাশ ফিরে ছেলের গায়ে হাত রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়ে। গোপাল বগোর বাঁ পাটা

ঘণ্টাটাক আসনে বসে তবে মনটা কিঞ্চিৎ শান্ত হয় গোপালের। ডাইনিং টেবিলে পবিত্র পাথরের রেকাবীতে দুটো কড়াপাকের সন্দেশ, পাঁচটা ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা এবং এক গ্লাস দুধ সোমা নিজে হাতে দিয়ে যায়।

স্নানের পরে গাছকোমর করে শাড়ি পরা সব মেয়েকেই যোগিনী যোগিনী দেখতে হয়। পাট করে সোমার আঁচড়ানো চুল এলিয়ে পড়েছে কাঁধ-পিঠ বেয়ে কোমর অবধি। যেন কালো জলের দুরন্ত ঝর্ণা। গোপনে সোমার দিকে ভাবের ঘোরে তাকায়, হেসে বলে—তোমার শরীর থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে! তবে সিঁদুরটা পরলে আরো গ্রান্ড লাগত—

সোমা গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে বলে—গ্রান্ড লাগার দরকারটা কী? রূপ ধুয়ে কী জল খাবো?

সন্দেশ মুখে পুরে গোপাল বলে—রূপ ধুয়ে জল খাবে মানে? রূপ কী হেলাফেলা করবার জিনিস? রূপ হচ্ছে, ভগবানের দান। যাকে তাকে তো দেন না তিনি, কথা বুঝলে?

সোমা এক কাপ চা নিয়ে টেবিলে বসে, অবাক হয়ে বলে—কথাটা নতুন শুনছি, আগে তো বলনি কোনদিন?

হা-হা করে হাসতে গিয়ে বিষম খায় গোপাল। জল এগিয়ে ধরে সোমা, ডান-হাতে মাথায় চাপড় মারে আস্তে। জল খেয়ে গোপাল বলে—বলিনি এসব পুরনো কথা সবাই জানে। আমাদের ঠাকুরকে দেখলে তো, তুমিই বল কী রূপ। গৌরবর্ণ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া—

সোমা বলে—চওড়াটা একটু বেশী, অতবড় ভুঁড়ি দেখলে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধরাধরি না করলে তো নড়তে চড়তেও পারেন না।

—আহা সেতো এখন, বয়েসটার কথা ভাববে তো, আশির কাছাকাছি। কিন্তু চোখ দুটি আর মুখখানা দেখলেই বোঝা যায় ভগবানের অংশ—

সোমা হাসে—তার বলতে ইচ্ছে হয় বিনা পরিশ্রমে অমন দুধ-ঘি খেলে সবারই চেহারা খোলে। কিন্তু সোমা এখন কোনরকম মনোমালিন্যে যেতে চায় না। হেসে বলে—তাহলে বলো আমিও ঈশ্বরের অংশ?

বেগুনভাজা চটকে গোপাল বলে—একটা কথা কী জানো, বাইরের রূপটা নয়, ভেতরের রূপটাই আসল। মনের মধ্যে আলো জ্বালতে হয়—ডিভাইন লাইট। হা-হা হেসে দুহাত ঊর্ধে তোলে গোপাল ভাবে-পাওয়া কীর্তনীয়ার ভঙ্গিতে। (গোপাল ভাল খোল বাজায়, বাড়িতে মাঝেমধ্যেই ঠাকুরের কীর্তন হয়।)

কী? বলে একটুও বিরকত না হয়ে বলে সোমা। মনের বিরকতি কী করে ধামা চাপা দিতে হয় সেটা সোমা ভাল চর্চা করেছে। নরম স্বভাবের মেয়ে সে।

হা হা করে ওঠে গোপাল, দুধে চুমুক দিয়ে বলে—এই তো গোলমাল করলে রাধা, (খোসমেজাজে থাকলে গোপাল সোমাকে রাধা বলে ডাকে।) মানুষ মানুষ কিন্তু তারও আলো চাই নয়তো আমরা এ সংসারে অন্ধ। মণি-মানিক্য ছেড়ে তখন আমরা পাঁক ঘাটা-ঘাটি করি—কাম ক্রোধে মায়ায়..... বলতে বলতে সোমার দিকে আড়চোখে তাকায় গোপাল।

সোমাও তাকায়। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়। গোপালের চোখদুটো মাঝে মাঝে মাইকরস্কোপের লেন্সের মতো দেখায়। কী যেন দেখতে চায় গোপাল। সোমার ভেতরটা?

সোমা বলে—মানুষের হাতে পায়ে অনেক কাদা পাঁক। সংসার করছ বুঝতে পারছো না। নরম স্বভাবের মেয়ে হলেও সোমার স্বরটাতে একটু তাপ ঝলসে ওঠে। সে উঠে যায় ছেলেকে ওঠাতে—এই রণো, ওঠ, তোর না আজকে পরীক্ষা।

সোমার শেষ কথাগুলো, তার উঠে যাবার বাঁকা ভঙ্গিটা একটা কুটোর মতো চোখে পড়ে গোপালের। ফরফর করতে থাকে। ইদানীং সোমার ভেতরে যোগিনী ভাবটা যেন ফিকে হয়ে আসছে। মানুষের জিভটা বড় ছোটলোক, অপথ্য কুপথ্যের দিকে ঝোঁকটা তার বেশী। বাড়ির মধ্যে হালে যেন গোপাল কিছু পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাচ্ছে। তামসিকতার একটা কালোছায়া যেন কুলের মতো এখানে ওখানে আজকাল চোখে পড়ে। রণোর মাস্টার স্বপন ছেলেটাকে তো ভালই মনে হত আগে। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। বিজ্ঞানটা যেন ওর সাধনা। বি-এস-সিতে গোল্ড মেডেল কব্জা করে চুটিয়ে এম-এস-সি পড়ছে। তবে চেহারায় একটু কার্তিক কার্তিক ভাব। স্বাস্থ্যটাও ষণ্ডমার্কা, ময়দানের অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়ার মতো। হাত রাখলে পিছলে যাবে এমন। গা-ভরা যৌবন-তেজ।

অপার জীবন যৌবন, সব তো পদ্ম-পাতে জল। মৃত্যু মুখব্যাদন করে আছে শিয়রে, জীবন তো অনন্ত কাল সমুদ্রের বুদ্বুদ; ওহে যুবক, আমরা তো এই আছি, এই নেই। কিসের এত গুমোর। আসলে ঠুলি বাঁধা আমাদের চোখে। মোহে ঘুরছি—মায়ায়। অথচ কত অহ-কার বিদ্যা বুদ্ধি স্বাস্থ্য যৌবনের!

সোমারও ছিল— তার রূপও যেমন ছিল, তাই নিয়ে গর্বও। তারপর সে রূপের পরিচর্যার দিকে ঝোঁকও ছিল। তিন চার রকমের ক্রিম মাখতো সে বিয়ের পরে হাজাররকমের ফেস পাউ-ডার। কিন্তু মনে যতক্ষণ অন্ধকার তত-ক্ষণই এসব তামসিক ভাবনা। আলো পড়লে তখন একমাত্র শুধু অপরূপকেই দেখা যায়—অরূপকে, সেই সৃষ্টি-কর্তাকে। কিন্তু তাঁকে কি যে সে পায়? তাঁর কাছে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্য কাণ্ডারী চাই। বিয়ের পরে পর পর তিনবার গোপাল সোমাকে নিয়ে গেল ঝাঁ ঝাঁতে। সেখানেই তার ঠাকুরের আশ্রম। আহা, সেই রুক্ষ মরুভূমিতে যেন নন্দন কানন—মধুবন। ধীরে ধীরে সোমার চোখের ওপরের ঠুলি গেল সরে। সহজ সৌন্দর্যের তুল্য আর কী আছে? প্রসাধনে কী রূপলাবণ্য বাড়ে? বাড়ে মনের আলোয়—খানিকটা যেন বুঝল সোমা, রূপবতী ক্রমে হল সন্তানবতী—রণোর জন্ম হল। অবশ্য গোপালের অবস্থা বিয়ের সময় ভাল ছিল না।

এম-এ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে। সংসারে বড় জ্বালা। একটা চাকরীর জন্য যত সাধনা তাতে ভগবানের সাক্ষাৎ মেলে। কাজেই সে চেষ্টাটাই শেষ। ঘুরতে ঘুরতে গোপাল চলে এল। ঝাঁ ঝাঁতে। তখন এই পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে জীবনটা পরিত্যক্ত একটা ছিন্ন বস্ত্রের মতো মনে হতো। রেল-লাইনে প্রায় গলা দিচ্ছিল সে।

ঠাকুর বললে—রাস্কেল! মরবি কোন্ দুঃখে? দেখছিস না আমি দুখানা বিয়ে করেছি? জীবনটা হচ্ছে মধুবন, ফুলগাছের চারা লাগা, ফুল ফুটবে, সবাই মিলে মধু খা। তবে রয়ে সয়ে; সংসার করবি কিন্তু চোখ থাকবে সর্বদা ওপরে। তিনি ছাড়া গতি নেই জানবি।

গোপাল বলল—স্যার, আমার তো কিচ্ছু নেই। বাগান করব কী দিয়ে?

ঠাকুর বললেন—স্যার বলবি না খবর্দার। বাবা বলবি। বল শালা—বলেই এক লাথি কষালেন। ধন্য ধন্য পড়ে গেল শিষ্যদের মধ্যে, বাবার এমন কৃপা কজনে পায়! তখনই সবাই জেনে গেল গোপাল একজন মহাশিষ্য হবে।

লাথি মেরে বাবা ডাকলেন—অবিনাশ!

অবিনাশ এল, তাকে বাবা বললেন—একে তুই নিয়ে যা। তুই তো বড় কন্ট্রাকটর, ওকে কাজে লাগা।

তারপর ডাকলেন—করুণা, এদিকে আয়। তুই তো ব্যাটা আই-এ-এস অফিসার। তুই থাকতে এদের যেন কাজের অভাব না হয়। দেখিস।

অবিনাশ করুণা দুজনেই জোর-হাতে এসে জোড়-হাতে ফিরে যাচ্ছিল, বাবা ডাকেন ফের, বলেন—এই শালারা, এমনি এমনি চলে যাচ্ছিস, আমার পা ছোঁ।

তখন দুজনেব মুখে হাসি ফোটে, লাল্টাঙ্গে শুয়ে কপাল দিয়ে পা ছোঁয়। গোপাল একটা ধমক খায়—রাস্কেল, তুই হাঁ করে আছিস কেন? উপুড় হ।

ব্যস, কলকাতা ফিরেই গোপাল সোমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রাই-ভেট পড়াত সোমাকে গোপাল। সোমার আর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হল না, বিয়ে হয়ে গেল।

এক পয়সাও পণ দিতে হল না বলে সোমার বাবা ঝাঁ ঝাঁ চলে গেল ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে।

দুধটুকু এক চুমুকে শেষ করে, জল খেয়ে যখন গেলাস বেসিনে হাত ধুয়ে নিচ্ছে তখনই সোমা রণোকে টেনে নিয়ে আসে বেসিনের সামনে। রণো তখনো ঢুলছে। সোমা বুরুশে পেস্ট লাগিয়ে বলে—তাড়াতাড়ি করো রণো, এক্ষুনি মাস্টার মশায় এসে যাবেন। আজকে আবার অঙ্ক পরীক্ষা।

—স্বপন কেমন পড়চ্ছে বলতো?

গোপাল ফুলকুচি করে।

—পরীক্ষা বলে রোজই আসতে হচ্ছে। দারুণ পড়ায়। বলে সোমা ছেলেকে ধমক দেয়—কী হচ্ছে থু থু গিলছ কেন?

—গুরু! গুরু! বলে গোপাল ড্রইং রুমে এসে কাগজ পড়ে। ডাইনিং আর ড্রইং রুম একটাই, মাঝখানে বইয়ের আলমারি। গোপালের ঠাকুরের বই আর সোমার আধুনিক নভেল। আলমারীর মাথায় ঠাকুরের একটা অয়েল পেইন্টিং—খোলা গা, হাতে গড়গড়ার নল—আহা! ঠিক এমনি সময়ে কলিং বেল।

গোপালের মনে হয় একটা বাঁদ বুলডগ থাকতো বাড়িতে! নিশ্চয়ই স্বপনা কিন্তু কুকুর পোষার সখ এজন্মের মতো গেছে। একটা এ্যালসে-শিয়ানের বাচ্চাকে নিরামিষ খাইয়ে বড় করা হল, সেটা রাস্তায় নেড়ে কুকুরের ডাক শুনলে বেড রুমে গিয়ে সেঁধোত।

সোমাই ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে গোপাল, সে অক্রোধী হবার চর্চা করছে বহুদিন।

চোরের মত ঘরে ঢোকে বিলাস। সিমেন্ট আর লোহার সাপ্লায়ার। বিলাস উপুড় হয়ে পায়ের ধুলো নেয় গোপালের।

সোমা কাকে যেন ভেংচি কেটে চলে যাচ্ছিল কিন্তু থমকে দাঁড়ায় মাঝ পথে।

—বৌদি, আমার একটু দেরী হয়ে গেল, ডোন্ট মাইন্ড। স্বপনকে দেরী করার অপরাধে সোমা একটা ভ্রূকুটি করে, নিচের ঠোঁটে দাঁত চেপে।

সচেতন হয়ে স্বপন বলে—গোপালদা, গুড মর্নিং। কেমন আছেন দাদা?

এইসব দাদা দাদা ডাক ভীষণ বিরকতিকর। গোপাল তবু আকর্ণ হেসে বলে—ভালো, ছাত্রের আজ অঙ্ক পরীক্ষা শুনছি?

—ওসব ম্যানেজ হয়ে যাবে। যাচ্ছি—বলে স্বপন রণোর পড়ার ঘরে চলে যায়।

ম্যানেজ ফ্যানেজ আবার কী কথা! পরীক্ষা, তার জন্য পড়তে হবে, এতে ম্যানেজের কী আছে?

যতসব টুকে পাশ-করা স্কাউন্ডেল। —এই স্কাউন্ডেল, গোপালের ধমকে আনমনা বিলাস চমকে ওঠে।—দাদা।

—শালা এখন দাদা কপচাচ্ছ! অবিনাশদাকে বোকা ঠাউরে রড আর সিমেন্টের দাম বেশী বেশী নিয়েছিস?

—না দাদা, ঠিক ঠিক নিয়েছি। আসলে অবিনাশবাবু অনেক কম দিতে চেয়েছিলেন, সে রেটে মাল দিলে দাদা,

গোপাল জিরাফের মতো গলা উঁচু করে দেখে সোমা রণোকে টেবিলে খাবার দিয়েই ভেতরে চলে গেল—বিলাস জিভ কাটে।

গোপাল সামলে নেয় নিজেকে, আস্তে বলে—তুইই ভুগবি শালা, আমার কী? আমি তোকে মন্দ দিলাম সাপ্লাইয়ের কাজ দিলাম, আর এখন—

—কেন দাদা, আপনি বলামাত্র এই টি-ভিটা আমি আপনার এখানে বসিয়ে দিয়ে যাইনি?

—চোপ রাস্কেল! ভাবী একটা টি-ভি, তার আবার। গলা লম্বা করে গোপাল বলে—রণো, পড়তে চলে যাও। ম্যাড়ার বাচ্চাটা এখনো বসে বসে পাউরুটি চিবুচ্ছে। —যাহ্ বলছি।

মুখ ফিরিয়ে গোপাল বলে—দ্যাখ, বিলাস, হাউসিং এস্টেটের ছ' লাখ টাকার কাজ অবিনাশদা বলেছে মটর সিংকে দেবে।

—দাদা আমি জানি আপনিই সবা আপনি যা বলবেন অবিনাশদা তাতেই হ্যাঁ। দাদা, এ কাজটা আমার চাইই। তার জন্য দাদা—

—ও আমার হাত নারে বিলাস। গোপাল জানে একটু মোচর বেশী না দিলে রস বেশী বেরয় না। ঈশ্বর সাধনা কী স্বর্ণ সাধনা কোন সাধনাতেই কঠোর কঠিন না হলে সিদ্ধি নেই।

—আপনারই হাত দাদা আমি জানি। আপনি তো যোধপুর পার্কে একটা তিন কাঠা জমি দেখেছেন শুনলাম।

—তাই কী! তুই কী করতে চাস?

—ঠাকুরের দয়ায় আপনার টাকাও আমার টাকা, আমার জমি ও আপনারই জমি, জমিটা আমি বৌদির নামে—

গোপাল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিলাসের কাঁধে একটা চাপড় মারে, বলে-তুই শালা এখন নাছোড়বান্দা মাইরি। আমি কে রে? আর দু বছর সংসারে আছি তারপর সব ছেড়ে দিয়ে ড্যাড়াং ড্যাড়াং করে চলে যাব বে।

বিলাস অস্ফুটে আর্তনাদ করে ওঠে—দাদা, সে কী কথা। এই বয়েসে কী সমাধিস্থ হবেন?

—নারে ব্যাটা ঠাকুরের পায়ের-তলায় গিয়ে বসে থাকব। সোমা, সোমা—দু পা এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁকডাক ফেলে দেয় গোপাল।

আঁচল ঠিক ঠাক করতে করতে ছুটে আসে সোমা—কী হল চেঁচাচ্ছ কেন?

—শোনো। বিলাস কী বলছে?

জয় গুরু। সংসার মানেই মায়া, বিষে-ভরা সংসার।

সব শুনে সোমা বিলাসকে বলে- চা খান। আমি করে আনছি—

গোপাল বলে- তোমাকে করতে হবে না। ঠাকুরটাকে বলে দাও না তুমি এর সঙ্গে বসে গল্প কর।

সোমা খর চোখে তাকায়। আর তখনই ফের কলিং বেল। একেই বলে ভাগ্য। সাদা জামা, সাদা ধুতির লুঙ্গি পরনে, হাতে লাঠি, বংকিম ঘরে ঢোকে- জয় গুরু।

সোমা গোপাল বিলাস বলে ওঠে—জয় গুরু।

গোপাল বিলাসকে চাপা গলায় ধমক দেয়—তুই এখন ওঠ বিলাস।

বিলাস চলে যায়। দরজার সামনে সোমার সঙ্গে তার কী কথা হয়।

—আরে বঙ্কিমদা, তুমি কী ঝাঁ ঝাঁ থেকে নাকি? কী মনে করে? এসো বসো। গোপাল ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সোমা এসে বলে-বঙ্কিমদা, কী খাবেন সরবত না চা?

—কফি, ঠাকুর আজকাল ভীষণ কফি খাচ্ছেন। বলে বংকিম হাসে, বলে—ঠাকুর বলেন কফিতে ঈশ্বরিক তেজ আছে।

সোমা চলে যায়, গোপাল কথা খোঁজে, বঙ্কিম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে, বলে—এটা কী হে, টি-ভি? বাহ। সুন্দর কার্পেট পেতেছো তো! ওখানে? ও-হ্যাঁ ফিজ। ঠাকুরেও আশ্রমে আরো দুটো ফিজের অর্ডার দেয়েছেন, দিল্লী থেকে জনা কুড়ি গুরু ভাই আসে জানো তো প্রতি বছর।

গোপাল বলে— আমি আগে ঠাকুরকে ভুল বুঝতাম জানো দাদা। কিন্তু তিনি যে কত বড় একজন অবতার, এযুগে বসে বিশ্বাস করা যায় না।

—ভুলটা কী বলছিলে?

—এই যে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করো, বিলাসিতা করো না, ভোগ করো না, যন্ত্রের দাস হয়ো না, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে মেলাও— প্রকৃতিই ঈশ্বর, আর মানুষকে ভালবাসো, ভাতের মতো একসাথে সকলকে মেখে নাও—

—এসব তো বলেনই ঠাকুর, ভুলটা কী? —বঙ্কিম খুব অবাক হয়ে যায়।

গোপাল হাত কচলিয়ে বলে— ভুল আমারই। তিনি যে কতটা যুগো-পযোগী তা আমি ধরতে পারিনি গোড়াতে। টি-ভি ফিজ এসবের তো তিনি বিরোধী নন। তিনি মডার্ণ-মড্ দেন না। যাকে বুঝতে পারেন উচ্চমার্গে উঠে গেছে, এসবের মায়া আর যাকে টানতে পারবে না তাকেই শুধু অনুমতি দেন। তুমি তো অনুমতি পাওনি, এ সব না নিলে ভাল করতে গোপাল।

—আমি তো দাদা, সত্যি বলছি, গোপাল দু হাত জোড়া করে বলে— আর ছ'মাস, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঠাকুরের পায়ের তলায় গিয়ে বসব।

সোমা কফি নিয়ে আসে ভ্রূকুটি করে বলে—একথা তুমি রণোর জন্মের পরের দিন থেকে বলছি।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গোপাল বলে—গেলে তখন মজাটা বুঝবে থাকগে এসব কথা। বংকিম কফি খেতে খেতে বলে—আসল কথাটা শোনো। বাবা পাঠালেন, হাসপাতাল করবেন একটা, সবাইকে চাঁদা দিতে হবে। তোমাকে বোধহয় হাজার দশেক।

এক সঙ্গে গোপাল এবং সোমা আঁতকে ওঠে।

করুণ মুখে গোপাল বলে— বংকিমদা, একটা কথা বলি? ঠাকুরের কৃপায় আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এত হাই হয়ে গেছে, মাইরি, এক পয়সা বাঁচাতে পারি না। ছেলেটার পেছনে মাসে দুশো, আড়াইশো। থাকগে আমি দু'পাঁচেক- থাকগে ওসব কথা পরে হবে তুমি স্নানটান করো খাওয়া দাওয়া- সোমা তাড়া দিয়ে বলে— তোমার না এক্ষুণি সাইটে যাবার কথা?

—হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। গোপাল উঠে পড়ে—রাত্রে কথা হবে বংকিমদা।

বংকিম বলে— আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাব। টো টো করে সারা কল-কাতা ঘুরব। তুমি অন্ততঃ হাজার পাঁচেক।

—না দাদা, অত হবে না। যাকগে তুমি দুপুরে খেয়ে যাবে। বলে গোপাল ওঠে। আর তক্ষুণি রণো বেরিয়ে এসে বলে- মা আমি চান করতে যাচ্ছি।

পেছন থেকে স্বপন বলে—আমি কী বৌদি তাহলে—

সোমা বলে- দাঁড়াও তোমার সঙ্গে কথা আছে, শোনো বলে সোমা তাকে ফের ঘরে নিয়ে যায়।

রণো স্কুলে চলে গেছে, বংকিম চলে গেছে, স্বপন চলে গেছে, গোপালও বেরিয়ে যাবে। যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই কিন্তু আজকে মনটা কেমন ছন্নছাড়া লাগছে সকাল থেকে। মনটা বড় কু-গায়। বুকের ভেতরে যেন একটা কাঁটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে খচ্‌খচ্ করে ঢুকে যাচ্ছে বার বার।

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত কাব্য, উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী ও প্রবন্ধ-সংকলন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের :
সমগ্র কবিতা ২০্ ।। উত্তরায়ণ ৬্
শেষ স্বাক্ষর ৪্
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমগ্র কবিতা ৬্ ।।
কিশোর বিচিত্রা ৬্
বনফুলের :
ত্রিনয়ন ৮্
বুদ্ধদেব বসুর :
বাসর ঘর ৬্ ।। লাল মেঘ ৬্
জগদীশ গুপ্তের :
লঘু-গুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ৬্
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের :
পদসঞ্চার ১০্ ।। ঘূর্ণি ৪্
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের :
উদ্যোগ পর্ব ১৫্
দ্বীপপুঞ্জ ৮্ ।। অনাগত ৬্
বিমল মিত্রের :
চাঁদের দাম এক পয়সা ১০্
প্রতিভা বসুর :
জন্মান্তর ১০্
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের :
জনপদবধূ ৮্ ।। কর্ণাটরাগ ৮্
নগরনন্দিনীর রূপকথা ৮্
তীরভূমি ৫্
নিরঞ্জন চক্রবর্তীর :
কাঠগোলাপের গন্ধ ৬্
শেষ বসন্ত ৮্
প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮্
আজ কাল পরশু ৬্
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের :
আবছা আলোর জাল ৭্
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের :
পিপাসা ৫্
বিকাশ বিশ্বাসের :
উদিত ভানুর দেশ জাপান ১৫্
ডঃ সরোজমোহন মিত্রের :
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য ১৮্ ।। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শরৎ-সাহিত্য ১২্
সুকান্তের জীবন ও কাব্য ১০্
রবীন্দ্র পরিষদ, পাটনার :
রবীন্দ্র সমীক্ষণ ১০্

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

যেন আজ আবার তার মন বলে। অন্য কেউ হলে গোলাম হয়ে থাকত। কিন্তু গোপাল যেন এতকাল জেগে ঘুমিয়ে ছিল।

হঠাৎ গোপাল সোমাকে ডাকে বেডরুমে, বলে—তুমি আমাকে ভালোবাসো সোমা!

সোমা অবাক হয়ে বলে—এ আবার কী কথা? তোমার কী ভীমরতি হয়েছে?

—তার মানে কী ভালোবাসো?

সোমা এমন মোহময় হাসি হাসে বলে—বাসি গা? তুমি বাসো তো?

গোপাল বলে—এই যে সব ফ্রিজ টি-ভি, এ্যায়ার কুলার এসব কার জন্য? তোমার জন্য না? মুহূর্তে সোমার মুখ শক্ত হয়ে যায়, বলে—দ্যাখো, আমার সঙ্গে চালাকি করো না। আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ো না, ভাল হবে না বলছি।

তাড়াতাড়ি গোপাল সুর পাল্টে বলে—যাকগে, ঠিক আছে, তোমার না রণোর জন্য। কিন্তু শোনো সোমা, বিলাস যে জমিটা তোমার নামে লিখে দেবে সেটা হতে গেলে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

সোমা অবাক হয়ে বলে, কী?

গোপাল বলে—স্বপনকে ছাড়িয়ে দিতে হবে, রাজি?

সোমা বলে—কেন! স্বপন কী করল?

গোপাল বলে— না, ছেলেটার চালচলন ভাল নয়, তুমি রাজি কিনা বল?

সোমা বলে—স্বপনের বদলে কত ভাল মাস্টার পাওয়া যাবে। ভাত ছড়ালে রাজি।

—ফাইন। বলে গোপাল আচমকা একটা চুমু খায় সোমাকে তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়।

—আমি যাচ্ছি।

সাইটে ছাদ ঢালাই হচ্ছে। একটি কামিন দু মাসের এক শিশুকে শুইয়ে বেখে মশলা তুলে আনছে। গোপাল শিশুটিকে দেখে। বড় মায়া লাগে। আহা, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য সৃষ্টি! সাবাস ঈশ্বর!

কিন্তু হঠাৎই আবার তার বংকিমের মুখটা মনে পড়ে—শালা। তারপর ফের সোমার মুখটা মনে পড়ে। তারপরই বুকের মধ্যে আবার কাঁটাটা গচ্‌গচ্‌ করে। তারপরই স্বপনের মুখটা ভেসে ওঠে। মনের মধ্যে কী যেন সন্দেহ উঁকি মারে। তারপরই গোপাল তরতর করে নেমে আসে, একটা ট্যাকসি খোঁজে হনে হয়ে। বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে ট্যাকসিটা ছেড়ে দেয় গোপাল। তারপর বাড়ির দিকে দ্রুত-আপনমনে বলে—জয় গুরু। বলে কলিং বেলে দেওয়া হাতটা নামিয়ে নেয়, বোতাম টেপে না। ভাগ্যিস কুকুর-টুকুর পোষেনি। তারপর আস্তে নেমে আসে। একটু ঘুরে বাগানের গেটে আসে, খোলে। তারপর পা টিপে টিপে বাগানের ভেতর দিয়ে এগোয়। একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা পায়ে পিষে জানলার পেছনে দাঁড়ায়, বেড রুমের জানলা। দাঁড়িয়ে থাকে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। একবার ভাবে কীসব করছে পাগলের মতো? যদি সোমা এখন উঠে আসে, যদি তাকে এখানে দেখে, কী বলবে সোমা?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কান খাড়া করে গোপাল। জানলার কাচে চোখ রাখে। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষের মন কী করে আগের থেকেই সব টের পায়? তার মন তো কবে থেকেই বলছে—এসব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কী করে মন এসব টের পায়? ঠাকুরের দয়া? সাবাস ঠাকুর।

সোমা আর স্বপনকে যেরকম অবস্থায় দেখতে পায় গোপাল, সে-দৃশ্য এমন উত্তেজক এমন ভয়ংকর অথচ আকর্ষণীয়, রক্ত মাথায় উঠে যায় কিন্তু গোপাল না দেখেও পারে না। স্বপনের স্বাস্থ্যটা সত্যি মজবুত। এতদিন তো তার মুখটা আর হাতের পাঞ্জা দুটো বা পোষাকের বাইরে থাকে, তাই দেখেছে গোপাল, কিন্তু আজ তাকে পরিপূর্ণভাবে দেখে গোপাল।

কলিং বেলের তলায় বাইরের দরজার সামনে মাটিতে বসে থাকে গোপাল এলো হয়ে। তার মাথাটা ঘোরে বলে ডান হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে থাকে। বোগেনভ্যালিয়ায় কোন গন্ধ নেই। ঘন্টা খানেক বাদে যখন স্বপন বেরিয়ে চলে যায় তার সামনে দিয়ে তখনো গোপাল তেমনি বসে থাকে।

সোমা দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে উঠে সে। বেরিয়ে আসে, বলে—তুমি এখানে? শরীর খারাপ করেছে নাকি?

কোন জবাব না পেয়ে সোমা গোপালকে দুহাতে ঝাঁকুনি দেয়। চমকে উঠে থতমত খেয়ে গোপাল বলে—আমি বাবার কাছে চলে যাচ্ছি। সুটকেস গুছিয়ে দাও।

সোমা বলে—হঠাৎ? হঠাৎ বাবার কাছে কেন?

গোপাল বলে—কেন? রণোর জন্মের পর থেকে বলে আসছি মনে নেই? সংসার আমার ভাল লাগে না—

—বলেছ কিন্তু যাওনি তো? আজ কেন যাবে? সোমা মুখ কালো করে বলে।

সোমার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে গোপাল বলে—কেন যাব না? এসময় গোপালের ভীষণ রাগ চীৎকার করছে। আস্তে গোপাল বলে—আমি আজ সব দেখেছি, বেডরুমের জানলার দাঁড়িয়েছিলাম, এইমাত্র স্বপন আমার আমার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোমার চোখ দিয়ে জল পড়ে হু হু করে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সোমা। এত কান্না দেখে গোপালের রাগ হয়। নিজেই গোপাল সুটকেস গোছায়।

সোমা এক গ্লাস শরবৎ এনে দেয়। গোপাল জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। গোপাল বলে—আমি যাচ্ছি।

সোমা বলে—একটা কথা বলব?

—বলো।

সোমা এগিয়ে গোপালের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে—তুমি ঠাকুরকে মানো? সত্যি করে বল। গোপাল বলে—আলবৎ মানি। এতদিন তোমার পাল্লায় পড়ে আমি গোল্লায় গেছি। আর না।

সোমা চোখে জল নিয়েও হাসে, বলে—তুমি আমি স্বপন এরা কারা? পদ্মপাতায় জল না? দুদিন পরে কে কোথায় থাকব আমরা? বলতে বলতে সোমা গোপালের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, ড্রইং রুমে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সজোরে সোমা বলে—এই ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বলতো আমাদের সবার শিয়রে মরণ দাঁড়িয়ে নেই? আমাদের জীবন মহাকালের বুদ্বুদমাত্র, ঠিক না? মানো তুমি? বলো ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে। সোমা রীতিমত চীৎকার জুড়ে দেয়।

গোপাল ভড়কে যায়, সে আমতা আমতা করে বলে—হ্যাঁ ঠিক। ঠাকুরের এসব কথা আমি মানি।

—তবে? সোমা একটা ধমক দেয়, বলে—তবে আমিই বা কে, তুমিই বা কে, স্বপনই বা কে? তোমাতে স্বপনে কোন তফাৎ রেখেছেন ঈশ্বর, বলো? ঠিক করে বলো। রুষ্ট চোখ সোমার, তীক্ষ্ণ গলা। গোপাল আরো আমতা-আমতা করে বলে—না। কোন তফাৎ রাখেন নি ঈশ্বর।

—তাহলে। এবার বলো—কেন তুমি যাবে? কেন তুমি এক্ষুণি যাচ্ছ বলো? সোমা রক্তবর্ণ চোখে তাকায়। চোখ নামিয়ে নিয়ে গোপাল আরোও আমতা আমতা করে বলে—তাহলে যাব না।

—বেশ। এই তো লক্ষ্মীছেলে। বলে দুহাত গোপালের কাঁধে তুলে দিয়ে সোমা গোপালকে চুম্বন করে। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন। আর তখন গোপালের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো শিহরণ খেলা করে যায়। সে তন্দ্রাগত

সিংহাসন, তুমি কার ?/বরুণ চৌধুরী

ছোট্ট আঁটসাঁট তেঁতুল গাছটায় চড়ে বিশু সমানে ডাল ঝাঁকাচ্ছে। পাকা তেঁতুল পড়ছে টপাটপ আর পাতায় একটানা ঝিম-ঝিম শব্দ ঠিক দূরের বৃষ্টির মতো। ধাঁয়ে যতদূরে চোখ যায় সে খানেও ঝাপসা বাণ্টির মতো শেষ ফাগুনের কচি বাঁশপাতা। অথচ চৌদিকে বড্ড তেজী ডালকুত্তা রোদ। হারাধন ভরদুপুরে একা একা হাঁটুগেড়ে ধামকা ঢাক পেটায়। আর কোনো ঢাকী নেই। যৌবন গেলে কি হয়, চেহারাটা এক ছটাক টসকায় নি। বিরাট শরীরটায় এমন একটা বোদ-পোড়া চন্ডাল রাগ মাখানো যে চোখে চোখে তাকাতে ভয় ধরে। চোখের তারায় আধখানা ওপরের পাতার তলায় সেঁধিয়ে থাকে, জেগে থাকে অনেকখানি শাদা। মানুষজনের অর্ধেক কথার ভালমত উত্তরই দেয় না। মস্ত ঝাঁকড়া মাথাটায় কি যে গুনগুনায় সে নিজেই জানে। বাচ্চারা ছাড়া কেউ বড় একটা হারাধনের কাছে ঘেঁষে না। ওকে ঘিরে আদুল গায়ে ঘন্টু, ভোমলি আর বুবাই এক নির্বিষ্টে ঢাকে কাঠি মারা শিখছে। ঘন্টুটা বেশি চনমনে। আচমকা দুম করে ঢাকে মেরেছে এক চাঁটি। হারাধনও ধাঁ করে এক চড়—

'কতোদিন বলিচি উদিকটায় চাঁটি মারতে নেই, কড়া দিকে চাঁটি দিবি তা গেরাজ্যি নেই। চামড়া ফেটে গেলে এখনি শালা পাচটা টাকা গলে যাবে, তখন?'

কোমরের গামছা খুলে গলায় আর বগলের ঘাম মোছে তারপর ফের একখানা ভুড়ুং ভুড়ুং। খাঁখাঁ নিঃসাড় ফাগুনের ভরা দুপুরটা ঢাকের শব্দে, অর্চনা বৃষ্টি মাৎসর্যে কেমন দুর্গাপুজোর গমগমে বিকেল হয়ে যায়।

আসলে ঢাক পেটানো হারাধনের কাজ নয়। কুমীরছড়ার বাবুরা হারুর বাবাকে মাসে তিনটে করে টাকা দিতো রোজদিন পীরের দরগায় ঢাক বাজাবার জন্যে। বাপ মরতে কাজটা হারুর ঘাড়ে চাপে। এখন অবশ্য তিন টাকা বেড়ে মাসে আট টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবু মন ওঠে না হারুর। ছোট থাকতেই বেশ পাকা হাতে কাঠি চালাতো হারু। কিন্তু কাঠি ছোঁবে না যে কিবে করেছে তাকে বোঝাবে কে। আগে মার্টিন রেল ছিল, দিব্যি ছাপাখানার রোয়াক থেকে সটান বেলকামরায় ঝুলে পড়া যেত। এখন শালা লাইন পড়ে আছে, রেল নেই। তাই বা কই। লাইনকে লাইন খুলে কলকাতায় মানিক-তলার কালোযাবদের বেচে অনেকেই দুপয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। সেত্রফ আটটা টাকার লোভে হারু কখনই গতর নাড়াতো না। নেহাৎ বৌটা চোপরদিন কাঁ কাঁ করে তাই। মাস গেলে আট আটটা টাকা তাই বা দিচ্ছে কে 'তোমার মতো কুঁড়ের বেহদ্দকে।' হারুরও যেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ভরদুপুরে ঝাটমাট একা একা ভুড়ুং ভুড়ুং করে। পলকাটা পীরের পুজো দিতে আসে বুলা, খুশি, কোকিল ওরা সবাই। এই চালটা বাতাসাটা হারুর উপরি পাওনা। এই মেয়েগুলোকে সে ফ্রকপরা অথবা আদুল গায়েও দেখেছে সেই কতটুকু বয়েস থেকে। আজকাল কোকিলটা শাড়ি ধরেছে। শরীরটা ভোরের গঙ্গা ফড়িংয়ের মতো উড়ুউড়ু সবুজ। মনটা বড্ড সাদা। বর জুটছে না বলে বাড়িতে নিত্য মারের বক্সা যায়। এক একদিন রেগে গেলে চোখটা ছাড়ানো লিচুর মতো ঝাপসা দৃষ্টিশূন্য লাগে।

হারাধনের হাত থেকে ঢাকের কাঠি ছোঁ মেরে আচমকা তার গলা জড়িয়ে বলে, 'ধ্যাৎ, চলো তোমাদের বাড়ি পালিয়ে যাই, আর কক্‌খোনো আসবো না।' হারাধনের মেয়ে দোপাটি বেঁচে থাকলে সে মুখপুড়িটাও হয়তো এতোদিনে শাড়ি পরতো। ভরা আশ্বিনে দোপাটি ফুল ফোটার সময় কুমার গর্ভে এসেছিল। আট বছরের ছোট্ট মাথা দুলিয়ে যখন হারুর আদুল ভুঁড়িতে কচি আঙুলে তবলা বাজিয়ে বলতো, 'পেট পড়ে গেছে, খেতে চলো', হারাধন তখন ওর মাথায় নাক ঘষে বাইরে বিকেলের ঠান্ডা আলো দেখতো, ভাবতো তার হাতের কদর এবুড়িটা ছাড়া তো আর কেউ দেয় না। পেছনে চাটুজ্যে বাগানে একসার সবুজ দোপাটি গাছের তলাটা অলস্য ঝরা দোপাটির কিচ্ছু না-হারানো গোলাপী দুঃখে থৈ থৈ.

মতো ক্রমে বড়ো হতে হতে কতদূরে হারিয়ে যায়। আজ হঠাৎ হারাধনের মনে হয় মেয়েটার নাম দোপাটি না রাখলেই বোধহয় ভাল ছিল।

প্রায় তিনসপ্তা পর নিজের কোটর ছেড়ে একটু বেরিয়েছে হারাধন। পুরোনো খাটিয়াটা নিমতলায় টেনে নিজের বিরাট বপুটা তাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি সুখটান দিচ্ছে সিগারেটে। দাঁত মাজেনি, নাকি গত-শতের পানের ছোবে দাঁত লাল। চুলেও তেমন তেলজল নেই। তালপাতার মতো মাথার চুল টোকা করা। খাটিয়া থেকে ঠ্যাংটা বাইরে ঝুলছে আর ঝুলন্ত পায়ের খড়ো আঙুলে একখন্ড বাঁকা চাঁদের মতো নীল নোখ গাঁথা। খাটিয়ার পায়ায় বাঁধা ওর আসঙ্গী বেঁজিটা। পাতলা ধারালো দাঁত বের করে এমন খ্যাকখ্যাক করে তেড়ে আসে যে খাটিয়ার কাছে ঘেঁষে কার সাধ্যি। কেউ আসুক বা না-আসুক এমন হুড়মুড় করে একনাগাড়ে ছুটোছুটি করে যে গলায় টান না পড়লে থামেই না। ছোলার ছিবড়ে আর পেয়ারের শুকনো খোলায় ছত্রাকার একটা প্রচন্ড গরমে পোড়া বিকেল খাটিয়ার তলায় বিছানো। আগে আগে এখানে খাটিয়া পাতার জো ছিল না। ছোট লাইনে মাটির রেল, উঠোনের গা-বেয়ে সর্বক্ষণ ঝিকঝিক ঝিক-ঝিক। সোজা চাঁপাডাঙ্গা হয়ে শিয়াখালা। আর ওদিকে একেবারে চন্ডীতলা হয়ে ভান-কুনি, তারপর তো নতুন হাইওয়ে। বাসে মালিবিজ ফুড়ুৎ। তখন চারদিকেই গমগমে বাজার। তবে সোলার পুতুল, ফল আর মানুষ এখন আর তেমন বানায় না হারাধন। মালতু পয়সার ধান্দাবাজিতে আর মন ওঠে না। সারা বছর ধরে দুর্গার অল্পস্বল্প ডাকের সাজ, কলকাতার আর্টিস্টের ডিজাইন, মাফিক ঘর সাজাবার দুচারটে টুকিটাকি ছাড়া সোলার কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে হারাধন। এখন খুব জমিয়ে শুরু করেছে বেতের কাজ। গোটা পাঁচ-দশ মোড়া বানায়, শনি-মঙ্গলে মশাটের হাটে দিব্যি কেটে যায়। কিন্তু কি সে মাথায় ঢুকেছে এখন ঐসব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে মস্ত উঁচু এক বেতের সিংহাসন বানাচ্ছে, তাতে নানা ফুলতার সূক্ষ্ম কারু-কাজ। আর সেইজন্যেই জয়ার যত গায়ের জ্বালা। 'যত সব বদ খেয়াল, কে কিনছে তোমার ঐ রাবণরাজার সিংহাসন।'

'দ্যাখো বেশি ফুট কেটো না।'

হারুর লাল চোখের দিকে তাকিয়ে ওর চাউনিটা কেমন স্বাভাবিক মনে হয় না জয়ার। অবশ্য মানুষটা কবেই বা সহজ? চিরদিনই কাট গোঁয়ার। তবু একটু আদুরে টানে মন ভেজাবার তালে জয়া বলে, 'বলো না গো, সত্যিই কেউ কিনবে? কতো টাকা পাবে?' ওর কানের লতিতে একটা টান দিয়ে তাতে আলতো দাঁত বসিয়ে হারাধন বলে, 'কলকাতার একটা যাত্রাপার্টির অর্ডারী মাল, বায়নার টাকা ওরা কালই দিয়ে যাবে।'

অনেকটা গরম রসে সদ্য খোলা থেকে নামানো রাজভোগের মতো জয়ার চোখ ফুলে ফেঁপে ঢোল। মেয়েমানুষ শালা টাকার গন্ধ পেলে একেবারে ওস্টনো গুবরে পোকা। তাও ভাল করে একবার দেখলো না পর্যন্ত হাতের কাজটা। বাচ্চাগুলো ছাড়া পাড়ার সবাই এড়িয়ে চলে হারাধনকে। আর বিকেল হলেই বাচ্চাগুলো ঠিক ঝাঁকবেঁধে ভিড় করবেই ওর জানলায়। কাজ করতে করতে পিঠে মাছি বসলে যেভাবে টের পাওয়া যায়, হারাধনও সেইভাবেই টের পেতো পিঠের ওপর একজোড়া বাচ্চার চোখ। বিরাট উঁচু এই সিংহাসনটার কাজ যত শেষ হয়ে আসছে ততই যেন হারাধনের বুকে একটা ব্যথা উঠছে। এরপর তো সবই ফাঁকা। অনেকদিন একটা কাজের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে আসল বাঁচাটা কেমন খেলো হয়ে যায়। তাই সে কাজটা শেষ করতে বুকে একটা খিঁচ ধরে। কেমন একটা ধুকপুকুনি। বাপ মারা যাওয়ার পরেও এমনি কঠিন একটা খিঁচ ধরতো পথে-ঘাটে। সরা বুক আড়ষ্ট। মরার সময়ও মানুষটা একবার বললো না কোথায় কষ্ট। অজ্ঞান মেঘ-নীলিমা থেকে ভেসে আসা বার-বার একই উত্তর: 'আমার কোনো কষ্ট নেই বেশ আছি।' হারাধন এখনো রোজই ভাবে মরার সময় সত্যিই কি মানুষের কোনো কষ্ট থাকে না, সত্যিই কি শরীরে 'বেশ আছি' ভাব আসে? নিজের গেঞ্জিতে এখনো বাপের ধানজমি, নানা কষ্টের ছেঁড়া ঘাসের কুঁচি, শ্লেষ্মা জড়ানো কন্ঠস্বরে আগলে রাখা প্রিয় ফুলের মত পাঁতাজা....। পুরোনো গেঞ্জিতে কিছুতে নতুন শাদা আসে না, কাচতে কাচতে কেমন একটা কালো-হলুদ ছোপ। জলেরও নিজস্ব ক্লান্তি থাকে, বয়মান বলে তা ধরা পড়ে না, শুধু জীবনে তার ছোপ লেগে থাকে। আর মোটে এক সপ্তা বাকি। সোমবার ওরা কিনে নেবে সিংহাসন।

দিনটা ছিল মঙ্গল। এ-সপ্তারও হাটে যায়নি হারাধন। ট্যাঁকে আগের কিছু মোড়া বিক্রির টাকা ছাড়া সিংহাসনের বায়নার একটা মোটা টাকা। শেষের দিকে সিংহাসনটা আর ঘরে কুলাতো না। আড়াআড়ি করে রাখার ফলে দরজা ছাপিয়ে রাস্তায় উঁকি দিতো। আজ অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওটাকে ঘর থেকে বার করেছে হারাধন। দোরের সামনে উঠোন নেই, ফুটপাথও না। ফলে একেবারে উদোম রাস্তার গোটা রাস্তা আলো করে বিশাল মহিমময় এক সিংহাসন। ওপরে শেষ চৈত্রের বুকের ছাতি-ফোলানো আকাশ, বেলা সাতটার রোদে দশটা কেঁদো বাঘের বিক্রম। পথ দিয়ে যে যায় থমকে দাঁড়ায়। সাত সকালেই কুঁচো ছেলেমেয়েগুলোর ভিড়। বুলা, খুশি ওরাও এসেছে, শুধু কোকিলটা নেই। নিমতলায় যথারীতি হারা-ধনের খাটিয়া পড়েছে। পায়ার সঙ্গে লোহার চেনে-বাঁধা বেঁজিটা বাঁশির সুরের মতো কিলবিল করছে। সিমেন্টের ভুঁয়ে লোহার চেন-ঠোকা বিচিত্র আওয়াজ উঠছে। আজ হারাধন শুয়ে নেই। দিব্যি চানকরা চুলে চিরুনি দিয়েছে, পাটে পাটে বসানো চুল। সদ্য কামানো মুখে ফর্সা গেঞ্জির শাদা আভা। কোলের কাছে বসা জয়ার লম্বা চুলে নিজের মোটা মোটা আঙুল ডুবিয়ে মেখি-মেশা নারকোল তেল মাখাচ্ছে। জয়া চন্দনা গলায় খুশির শিস দেয়,

'কি দারুণ হয়েছে গো সিংহাসনটা। দেখো, তুমি ঠিক সোয়াশো টাকা দাম পাবে। আগে থেকে বলে রাখছি একটা ভালো রেডিও কিন্তু এবার কিনতেই হবে।'

হারাধন খুব ভালই জানে টাকা ওর বেশি বই কম পাবে না। তবু সাক্ষাৎ কারণেই তা চেপে যায়, 'দূরে পাগলী, টাকা কি গাছে ফলে।'

হারুর মেজাজটা আজ তিরিক্কে নয় বলেই জয়ার সাহস বাড়ে, সে একটা উল্টো ফুসমন্তর ঝাড়ার তাল করে।

'একটা কথা বলবো রাগ করবে না বলো?'

উত্তরে পিঠে ছোট একটা কিল হজম করে ভয়ে ভয়ে কিরে বসে, হারুর দিকে নিজের চোখের বাদাম খুলে ধরে। দ্যাখে সে চোখেও মোমের পর্দার আড়ালে গাঢ় সোনালী মধু, রানী মৌমাছির ঘরে-ফেরা ভোর। অজ্ঞ পাওয়া জয়া তবু খানিক মেঘলা গলায় বলে,

'কাল মেজমামা এসেছিলেন। তুমি কাজে ব্যস্ত ছিলে তাই ডাকি নি। উঁকি মেরে সিংহাসনটা দেখে খুব পছন্দ। তোমার হাতির কাজেরও অনেক প্রশংসা করলো। ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। [illegible]

বৌ-ভাতের দিন বৌ বসাবেন ঐ সিংহাসনটায়। অমন সিংহাসন নাকি এ তল্লাটে কেউ দ্যাখে নি। অনেক গন্যিমান্যি লোক আসবে তো। দেখবে চারিদিকে তোমার ধন্যি পড়ে যাবে। আর হাতে হাতে একশোটা টাকা দিতে চাইছিলেন, আমি নিলাম না। যাবার সময় বললে, হাবুর হাতের কাজ তো ভালই, তবে দিনকাল যা পড়েছে, ওতে কি সংসার চলে। ওর ওষুদ দোকানের কম্পানডার বিষ্টু চাকরি ছেড়ে কয়লার ডিপো দিয়েছে। তোমাকে ঐ কাজটা দিতে পারে। তিরিশ টাকা অবধি মাইনে দিতেও রাজি।'

এতো কথার পর ছোট্ট এক টিপ নস্যির মতো হারুর এক ফুয়ে সব উড়ে গেল।

'কে তোমার মেজমামু? চন্ডীতলার ঐ ওষুধের দোকানের শয়তান প্যালা মন্ডল? শালা জল মিশিয়ে মিকচার বেচে তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে। এক পয়সার পাশ না দিয়ে ধন্বন্তরি ডাকতার হয়েছেন আর সেই দেমাকে শালা আমার বন্ধু শংকর ডাকতারের ওপর টেক্কা মারতে চায়। আরে ম্যাড়া, শংকর যে এম-বি পাশ আর তুই শালা একটা খাসি হয়ে—। মাইরি বৌ, এ মাল যে কি করে তোমার মামু হয় বুঝি না।

রাগী ষাঁটুলের মতো ঠিকরে বেরিয়ে যায় জয়া। কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে শুধু নষ্ট টোপাকুলের বিচির মতো একটা শব্দ খু করে দেয়—'ছোটলোক।'

'কি রে হোরা যে—'

একটা শুনেই হারাধনের মাথায় ঝাঁক মারে। জ্ঞাতি সুবাদে মনি দত্ত দূর পর্কের কাকা হতে পারে। কিন্তু হাবু নয়, একেবারে 'হেরো' বলার মতো মামদো-বাজি ঠিক সহ্য হয় না।

'তোকে তো আর ফাঁকায় দেখাই যায় না, একেবারে কুটুরে প্যাঁচা হয়ে গেলি নাকি. ওরে ব্বাস-রে-বাস কি একখান জগঝম্প বানিয়েছিস বাপা কে বসেছে ওটায়. আমাদের জয়াবতী নাকি?'

'তাছাড়া আর মহারাণী দুনিয়ায় কে আছে বলো? কাকিমাকে না খাইয়ে খাইয়ে তো শুকনো আমলকি বানিয়ে ফেলেছ, না হলে আমি নিজেই কোলে তুলে কাকিকে ওটায় বসিয়ে দিতাম।' গলায় গুড়ের মুড়কি আটকানোর মতো কেমন থতমত খেয়ে কঁক্কক শব্দ করে মনি দত্ত। হালকা একটা আদুরে ঘাঘথাবায় মনি দত্তকে নিজের দিকে টেনে নেয় হারু। একটা মাঠময় হাসি দিয়ে বলে—

'রাগলে নাকি খুড়ো। খাও একটা সিগারেট খাও।'

'তাতে [illegible] হয়ে গেছে। পারি না। চিনি ছাড়া চা মুখে তোলা যায়. তুই বল।'

মনি দত্তর ভুঁড়িতে টুসকি মেরে হারু বলে—

'সিগারেট না, চা না, মদ না—কিন্তু না খেয়ে কি নিয়ে বাঁচবে খুড়ো। দুদিনেই তুমি টেঁসে যাবে মাইরি। ওসব এক-আধটা নেশা না থাকলে শালা ভাবনা-চিন্তাগুলো বড়ো ইঁদুরের মতো কাটে। তাছাড়া তোমার ব্যারামটার বা কি যে সব ছেড়েছুড়ে সাগা হয়ে যাবে? কবে বুকে একটু হাঁপ উঠেছিলো তো কি হয়? শংকর ডাকতার তো বলেছিল পেটে বায়ু, বদহজম থেকেই ওটা হয়? যা কর ধর্ম সামলে তুমি শালা না খেয়ে, না পরে জলদি ফুটে যাবে আর তোমার ছেলেরা তখন বড়ো পাতি ফুঁকে দিব্যি মজা লুটবে। তার থেকে মজাসে থাকো। ওসব ভাবনা-ফাবনা বাদ দাও, বুঝলে খুড়ো?'

মনি দত্ত ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে তাকে হারু এতো মধুঢালা কথা বলবে। খুশি-বিস্ময়ে মাখোমাখো গলায় সে বলে, 'তুই ঠিক বলেছিস হারু। কলকাতার ডাকতারও আমাকে তাই বলেছে। ভাবনা-চিন্তা দুঃখ-টুকখো একদম বাদ দিতে বলেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না ওগুলো। তাড়াই কি করে। ভাববো না, দুঃখ করবো না বললেই তো ভাবনা-চিন্তাগুলো ধরে যায় না।

হারাধন মনি দত্তর থুতনিতে হাত দিয়ে একটু বু-বু আওয়াজ করে বলে, 'তোমার দ্বারায় কিসসু হবে না খুড়ো। বুকে একটু ফুর্তিফার্তা না থাকলে ঘন্টা হবে। তুমি শালা গুনে গুনে ঠিক তিন মাস পরে টেঁসে যাবে। আমি কাকিমার তখন একটা জোয়ান বর জোটাবো—মাইরি বলছি।'

কচুপোড়া মুখ করে মনি দত্ত বলে—

'তুই কথায় কথায় বড়ো মুখ খারাপ করিস। ঐজন্যে কেউ তোর ছায়া মাড়ায় না।'

হারাধন গলা ফাটিয়ে হাসে। ঝরা-পাতার মিছিল লেলিয়ে দেওয়া যে বড়ো বেয়াড়া হাসি, শুনলে ঠান্ডা মড়ারও গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

চোখ রগড়ে হারাধন যখন উঠলো তখন বেলা পড়ে থাক। বেঁজিটা ঘরে ঢুললো। দেওয়ার সঙ্গে খাটিয়াটা দাঁড় করিয়ে চকাচক এক ঘটি জল খেতে খেতে ঘুমন্ত জয়ার ঘুমে থকথকে কাদা-কাদা শরীরটার জিভ দেওয়ার মতো দূর থেকে লেহন করলো। তারপরেই হঠাৎ কেমন থির নির্বাত, নিষ্কম্প শিখার মতো একরোখা। বিশাল সিংহাসনটা পিঠে ফেলে মশাটের দিকে হাঁটা দেয় হারাধন। বাজার। যাত্রা পার্টির লোকেরা ওখান থেকেই টেম্পো করে ওটা কলকাতা নিয়ে যাবে। খুচরো সার বিক্রির দোকানগুলো পেরুতে পেরুতে রীতিমতো গাঁদি লেগে যায় হারুর পেছনে। চারদিক ভোটের পোস্টারে ছেয়ে গেছে। দেওয়ালে হিজিবিজি দেখতে দেখতে চোখ ভরে যায়। একটু ফাঁকায় গেলেই কিন্তু চোখে-জলপটি দেওয়া সবুজ ধু-ধু ধানের মাঠ। আজকাল ডীপ টিউবেলের কৃপায় গর্ত খালি গেলেও জমি খালি যায় না। তবু কেন যে শালা লোকের অবস্থা ফেরে না। হঠাৎ মাথার পোকা নড়ে ওঠে হারাধনের। মাইন পার হবার আগে বাঁদিকে দীনু স্যাকরার দোকানের পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ে। পাঁচু সাহার শুঁড়িখানার চেতালো রোয়াকটায় পিঠের সিংহাসন নামিয়ে ধুপ করে বসে পড়ে।

এ গলিটা হারাধনের আজকের চেনা নয়। গত পনেরো বছরের কতো ঝড়-ঝাপটা সমেত বন্ধুতের রাঙা ধুলো আজও চটিতে পুরু হয়ে আছে। ওকে দেখেই পাঁচু আর কেলো বেরিয়ে আসে। ফুলুরির থোলা নামিয়ে হৈ হৈ করে ওঠে নরেশ। কয়লার স্তূপের ওপর নিঃঝুম কুকুরটাকে থামকা একটা লাথি কষিয়ে, দাঁড়িপাল্লা থেকে বাটখারা নামিয়ে হুড়মুড় করে বিষ্টু এগিয়ে আসে। হারুকে চেনে না এমন মনিষ্যি এপাড়ায় একটা নেই। বিরাট সিংহাসনটা দেখে সকলেরই চোখ ছানাবড়া। বিস্ময়ে প্রশংসায় কারুর মুখে কথাটি নেই। সকলেই নানা মতলব দিতে শুরু করলো হারুকে, হারু যে তাদের আপনজন। কেউ কেউ আবার তাতাচ্ছে হারু নিজেই যাতে ওটা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দুশো-আড়াইশো টাকায় বিক্রি করে। হারু নিজের গেলাস ভরে আর মিটিমিটি হাসে। এখন আর ওর চোখে কোথাও ধুমকেতু নেই। গলার মদের মরণ ছায়া ঢেলে বলে,

'ধ্যুস, বাজ্যের পাগলের পাল্লায় পড়ে গেছে। আরে এখন আর কিছুই হবার নয়। বায়নার টাকা খেয়ে বসে আছি যে। এখন যাকে তাকে বেচবো বললেই হলো?'

বিষ্টুটা আগের মতোই কাঠগোঁয়ার আছে। হারুর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—

'হবে না বল্লেই হলো? তুমি কি যে বলো হারুদা, বায়নার টাকা বুঝি ফেরত দেওয়া যায় না?'

যাঃ তেরি. শালা মানুষের কথার একটা দাম নেই বুঝি। একি তোর কয়লার ডিপো পেয়েছিস। আমি আজ উঠি, তোরা বোস।' সবাই একসঙ্গে হা-হা করে ওঠে। দু-তিনটে শাদা ঝাঁঝালো গেলাস যেন ভোজবাজির মতো হারাধনের সামনে জমে যায়। বন্ধুতের দূর নৌকো ভেসে আসা পতি আলো, অস্তিত্ব বনাম ভালবাসার কিছু অস্থায়ী ধাঁধা আর পরমাত্মীয় নেশার জমাট

সেই শিল্পী মনটা নিশ্চিন্তভাবে ফিরে পাচ্ছে যেখানে সে একাই ঈশ্বর। চিৎকার করে কাকে একটা কি বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজর পড়লো এক বোতল কেরোসিন আর একটা এক পাউন্ডের লম্বা রুটি বগলে তার সেই মামা শ্বশুর প্রহ্লাদ ওরফে প্যালা ঘোষ তাদের পাশ কাটিয়ে হনহনিয়ে অন্ধকারে সটকে পড়ার তাক করছে। আর যায় কোথা। একটা বাজপাখির ভারী ডানায় হারু দ্রুত পিছু নেয়। বয়েস হলেও বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা প্যালা ঘোষের। মোটেই ভয় পাবার মতো মানুষ নয়। তবু একদম ঘাড়ের কাছে বাজখাঁই গলায় 'মামু' ডাক শুনে মানুষটার বুকটা একটু ছ্যাঁৎ করে উঠলো। পেছু ফেরবার আগেই হারু প্যালা ঘোষকে ডিঙিয়ে ঠিক তার সামনে বিরাট মালগাড়ির মতো রাস্তা জুড়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

'শুনলাম সিংহাসনটা খুব মনে ধরেছে তাই জিগেস করছিলুম কতো দেবেন। কতো ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন অথচ ভাল করে হাত উপুড় করবেন না তাই আবার হয় নাকি। বোতল বোতল লালজল বেচে কতো মানুষকে টেঁসিয়ে তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন আর আমার শালা না-খাওয়া না-ঘুম সত্তর দিনের রক্তজল-করা ঐ বিশাল সিংহাসনটার জন্যে কমসে কম শ-তিনেক টাকাও ছাড়বেন না?' কোনো রকম হ্যাঁ-না করার আগেই প্যালার হাতের কব্জীটা হারুর হেপাজতে চলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বগল থেকে শাদা পাঁউরুটিটা খসে ধুলোয় মাখামাখি। উঠোনে পড়ে থাকা ছাই মাখানো বুই মাছের মুড়োতে এখন শুধু পাংশু নির্বোধ একটু হাসি, সাইজের সোনা বাঁধানো দাঁতটাতেও যেন আর কোনো শকতি নেই।

'তিনশো টাকার একটা বেতের সিংহাসন কেনার ক্ষমতা আমার নেই।

বাবাজী, শখানেক টাকায় যদি হয় তো বলো এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।' হাতের কব্জিতে আর একটু জোরালো মোচড় লাগতেই ঘড়ির সোনার চেনটা মড়মড় করে। হারু ফিসফিস করে।

'আপনার বোনকির একটা রেডিও কেনার বড়ো সখ। আর কিছু বাড়ান মাইরি। অন্তত শ-আড়াই না ঝাঁকতে পারলে কোনো ভালো রেডিও হয় না— সত্যি বলছি।'

ওর গলার ভিজে পায়ের ছাপ চিনতে পেরে এবার একটু সাহসী গলায় প্যালা বলে—

'রাস্তাঘাটে এভাবে মাতলামি করে কোন লাভ নেই হারাধন। হাতটা মুচড়ে ভেঙে ফেললেও রাস্তায় তো লোকে পকেটে দু পাঁচশো টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না। বাড়ি এসো, দেখি একশো টাকার ওপর যতটা দিতে পারি নিশ্চয়ই দেবো।'

হারাধন তাতেই হঠাৎ রাজি হয়ে যায়। পিঠে সিংহাসন ফেলে প্যালা ঘোষের কিছু পিছু নিঃশব্দে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে যায়। বাণীপুর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে দুজনের পেছুতে তখন দিব্যি একটা অন্ধকার ফৌজ। সবাই হারুর চ্যালা। কারুর মুখে টু-শব্দ নেই। সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই হারু ভেতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। বাইরে অদূরে একতাল অন্ধকারের জটলা হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে। ভেতরে প্যালা ঘোষের মুখোমুখি হয়েই হারু চকিতে ওর টুঁটি টিপে ধরে। মদের গন্ধ ভরা চাপা হুংকার ওকে একটা খেপা হায়নার মতো হিংস্র লাগে—

'একটু চিল্লাবার চেষ্টা করলে একেবারে খতম করে দেব।'

একথা বলার অবশ্য কোনো মানে নেই। ওর পরিশ্রমী আঙুলের আদরে এমনিতেই প্যালা ঘোষের চোখ কপালে উঠেছে। কিন্তু হারুর এখন আর ওসব খেয়াল নেই। সে আবার চাপা গর্জন ছাড়ে।

'আমাদের সোনার মেয়ে কোকিলটা যে তোমার ঘরের বৌ হবে আর তুমি ওর মাস্টার বাপকে দুবে দশটি হাজার টাকা ঝাড়বে এসব খবর আগে জানলে তোমার মতো গেঁড়ে খচ্চরকে কি করে টাইট দিতে হয় তা দেখিয়ে দিতাম। আমার শালা ঐ ধেড়ে সিংহাসনটাই কাল হলো। দু মাস ঘর ছেড়ে ফাঁকে বেরুইনি আর তারই মধ্যে সব শালা ওলোট-পালট হয়ে গেল। ঐ সিংহাসনটা রেখে গেলাম কোকিলের জন্যে। ওর বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার মতো হাতে কিছু নেই। ওটার জন্যে তোমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। শুধু দেখবে ওদের বাড়িতে যেন কালই সিংহাসনটা পৌঁছে যায়, তোমার বাড়িতে যেন একবেলাও ওটা না থাকে।'

উড়নচণ্ডী হারাধন কি করে হয়তো বোধ করেছিল এতবড়ো তিনতলা বাড়িতেও সিংহাসনটা ধরবে না। উঠোনে একটা ঝড়ের মতো যখন হারাধন সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ওর আকাশ-ছোঁয়া মাথায় তখন অনেক পান্নার মতো সবুজ ভাবার রাজমুকুট। পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে লম্বা লম্বা হাত তুলে ও তখন আধার অন্ধকারে এক নাচের মুদ্রা দিলো। দশ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে একটা দুরন্ত জ্বলজ্বলে গ্রহের মধ্যে ওর ছায়া পড়লো। সবাই দলবেঁধে ফিরে এলো পাঁচুর শুঁড়িখানায়। প্যালা ঘোষের মতো ছুঁচোর কাছ থেকে আড়াই শো টাকা ছিনিয়ে এনেছে বলায় হারুকে আজ ওরা কাঁধে তুলে নাচতে চায়। সবাইকে কাঁধ টিপে মাটিতে বসিয়ে হারু চিৎকার করে।

'থা শালা কে কতো মদ খেতে পারিস আজ দেখবো আমি।' অজস্র মদে রাত্রির গরল ধুয়ে কিশোরী জ্যোৎস্নায় আকাশ ছেয়ে যায়।

যত রাত বাড়ে ওদের কথার কামাই নেই। হারুর মাথায় তখন দুনিয়ার সব থেকে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ভর করেছে। একটা সিংহাসনে যদি আড়াই শো, দুটোয় তাহলে পাঁচশো, চারটেতে হাজার....দশ হাজার বিশ হাজার....। কি এমন কঠিন। কিছু লোক রাখলেই হলো। কিংবা তারই দরকারটা কি। এখানের সকলে হাত লাগালেই তো ল্যাটা মিটে যায়। দুনিয়ার যত প্যালা ঘোষ আছে সবাই কিনবে তখন। আর না কিনে যাবে কোথায়। টাকা দিয়ে কি ব্যাটারা স্বর্গে বাতি দেবে? যত সোনার ঘড়ি কিনবে ততো করকরি ছিনে হবে। যত সোনালী চশমা পরবে ততো চোখের জ্যোতি যাবে। তখন বোঝ ঠেলা। কিসে খরচা করবে যাদু? হে-হে-হে, বড়লোকগুলোর কতো কষ্ট মাইরি। শালারা খেতে পারে না চর্বির ভয়ে, শুতে পারে না হার্টফেল করার ভয়ে, মুততে পারে না চিনি বেরুবার ভয়ে, সিগারেটে গলায় ক্যান্সার, মদ খেলে লিভার পচে বকত হাসবে.... হে-হে-হে।

শেষ রাত্তিরে সবাই যখন একে একে চলে গেছে, হারু তখন টলতে টলতে বাণীপুর হাইস্কুলের প্রকাণ্ড মাঠটায় দিব্যি নিজের শরীরটাকে ঘাসের ওপর মেলে দেয়। ভোর রাতে অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে কার যেন মুখ ভেসে আসে হারাধনের মাথায়। মদের নেশার এই এক বড়ো দোষ, কিছুতেই ভাল করে মুখ চেনা যায় না, বোঝা যায় না, মুখটা কোকিলের না দোপাটির।

ভুতের পা চিহ্নে হাঁটে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া কিংবা পড়ান—এমন লোকের মুখে শুনি, আজকাল আর কবিতা পড়ি না। আগে খুব পড়তাম। সত্যেন দত্ত, অক্ষয় বড়াল, নজরুল, সুকান্ত পড়ি মাঝে মাঝে। তবে সংসারের চাপে সময় হয় না আর। এখনকার কবিতা পড়তে ভালো লাগে না, মানে বুঝি না।

এধরনের মন্তব্য কোনো বিদ্বেষবশতঃ এঁরা করেন না, এঁদের বিদ্যাবুদ্ধি জাতপাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলবে না। কবিতার পাঠক হবার যোগ্যতা এঁদের নেই তা বলা মূর্খতা। 'অবশ্য জীবনানন্দ পড়েছি, ভালো লেগেছে।' কেন জীবনানন্দ ভালো লাগলো তা বুঝিয়ে দিতে পারেন। অতএব এঁরা পাঠক। এঁদের কথা শুনুন।

অতিসাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে এঁদের এই ধারণা কোনো হল? এঁরা খুব পুরনো ধাঁচের লোক বলা চলবে না। অনেকেই ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে দিয়েছেন। ফুলফল চিত্রিত হাওয়াই সার্ট পরেন, কেউ কেউ ঢোলা প্যান্ট, ছুঁচলো শু। কথাবার্তায় পাঁচাত্তর পার্সেন্ট ইংরেজী শব্দ, রেগে গেলে হিন্দি। সব ব্যাপারে এঁরা হাল আমলের, কিন্তু হালের কবিতার প্রতি বিরূপ। প্রশ্ন করে যা জেনেছি তা হ'ল—

(১) সত্যেন দত্ত, নজরুল সুকান্তর ছন্দ ছিলো, লাইনের পর লাইনের মানে বোঝা যায়। হালের কবিদের কবিতায় ছন্দ নেই, মানে হয় না কিছু।

(২) প্রকৃতি বর্ণনা নেই। রোদ বৃষ্টি মেঘের খেলা এঁরা দেখেন না। সোজা কথা সোজাভাবে লিখতে পারেন না।

(৩) সব সময়ই এঁরা দেখাতে চান তাঁরা কতো পন্ডিত, কিন্তু কেমন পন্ডিত? আমরাই যদি না বুঝতে পারি!

(৪) সবই গদ্যভাষায় লেখেন। কবিতা আর গদ্যের তফাৎ এরা জানেন না। আর ব্যক্তিসর্বস্ব ইমেজারি বলে ওর মানে নিজেরাই জানেন।

আরো আরো অনেক অনেক যুক্তি-তর্কো তাঁদের আছে।

আমি এরকম একজন বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কবির পক্ষে 'সাম্প্রতিক' হওয়া কি খুবই অপরাধের যেমন ধরুন, আপনি যদি আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে জন্মাতেন তবে কলেজে যাবার আগে পাট-ভাঙা ধুতি গরদের বা খদ্দরের পাঞ্জাবি, কারো মটকার চাদর থাকতো কাঁধের উপর। [illegible] ভেসে ওঠে। অন্যদিকে, আমাদের মধ্যে এখন এক বড়ো অংশ রঙিন প্যান্ট (যখন যেরকম বাজার চালু), রঙিন ফুলকাটা শার্ট, পায়ে চকচকে শু, হাতে ফোল্ডিও—এখনকার শিক্ষক অধ্যাপকদের ছবি উঠে আসে। ব্যতিক্রম হলেন তারাই যাদের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, কিংবা অতীতের রুচি দ্বারা যিনি আংশিকভাবে প্রভাবিত। সত্যজিৎ ঋত্বিক নিয়ে তর্ক করেন, আবার প্রকাশোই হিন্দি বই-এর লাফঝাঁপ দেখতে ছোটেন, জানিয়ে যান—মাথাটা একটু হালকা করা দরকার। এঁরা বঙ্কিম শরৎ ক্লাসে পড়ান, প্রমাণ করে ছাড়েন ওরা যে কোনো দেশের সেরা লেখকদের সমান, বিভূতি মানিক তারাশঙ্করের বার কয়েক নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতা আছে....ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম, পোশাকে আশাকে, চলনে-বলনে, সিনেমা-থিয়েটারে আমাদের হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, কিন্তু কবিতা বা চিত্রশিল্প—ওদুটো যেনো এর সঙ্গে পাল্লা না দেয়। ওদের আধুনিক হলে চলবে না, আমাদের অসুবিধে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় পর্যন্ত চলবে, যাঁরা ছবি আঁকবেন, এঁদের মতন আঁকুন, আমরা দেখবো। পারলে কিনেও ফেলতে পারি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সত্যেন দত্ত-সুকান্তর মতন কবিতা লিখলে পড়বো।

পোশাক-আশাক রুচি বোধে নামবে হাল আমলের শেষ ঘোড়াটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাতে কোনো প্রশ্ন নেই। কবিতা বা ছবির বেলা তাঁদের পছন্দ পুরনোকে। যাকে সহজে হজম করা যায়, হয় দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দ্বারা কিংবা লেখাগুলোই সহজ পাচ্য বলে। এই অসঙ্গত আচরণ সম্বন্ধে নিজেরা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? সব উপরিতলের সেন্সেক্স যাবে তরতর করে এগিয়ে, আর চিন্তা অনুভূতির জগৎ থাকবে পেছনে পড়ে, এ কখনো হয়? কোনো দেশে হয়েছে? বরং উল্টোটাই। ফরাসী বিপ্লবের আগে দার্শনিক লেখকরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। রুশ বিপ্লবের আগেও তাই। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সমান তালে সাহিত্য শিল্প ভূমিকা নিয়েছিলো। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি মানিক, এমন কি সমরেশের কোনো কোনো রচনা নিয়ে তর্ক করতে আপত্তি নেই এঁদের। জীবনানন্দ না পড়েও 'ভালো'-র স্তরে উঠে গেছেন। ওঁকে নিয়ে আর বিতর্ক নেই। খুঁজলে এদের বাড়িতে রূপসী বাংলা বনলতা সেন পাওয়া যাবে। বিষ্ণু দে নিয়ে কথাবার্তা বলা আধুনিকতার লক্ষণ, একটা বিশেষ ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুধীনবাবু পন্ডিত কবি—দায়িত্ব শেষ। প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসু—না পড়েও জেনে গেছেন—তেমন কিছু কবি নন। তবু এঁদের নিয়ে কথাবার্তা চালানো যেতে পারে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। খবরের কাগজের বিপুল প্রচারে কয়েকজন কবির নাম ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এঁদের কোনো কোনো লেখা বাধ্য হয়ে পড়তেই হয়েছে, না হলে কাগজপত্র কেনাই বন্ধ করে দিতে হয়। তবে জাতে তোলা? একেবারেই না। কেউ কেউ কাউকে কাউকে পছন্দ করেন। এখনো কবির সংজ্ঞা দিতে নারাজ। অভিযোগ এঁদের লেখায় ছন্দ নেই, কি বলতে চান—তা অস্পষ্ট। এই ধরনের যারা পাঠক—তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন অবান্তর। তবে কবিতা বা চিত্রশিল্পের ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। ছবি দেখতে একেবারেই যান না এঁরা, ব্যতিক্রম খুব কম। ছন্দ বলতে বোঝেন যাতে বেশ স্বচ্ছন্দ দুলুনি আছে, অনেকটা সত্যেন দত্তীয়। আর বিষয় বলতে নজরুলের চড়া গলায় মোদ্দা কথাটা জানিয়ে দেওয়া। আমি বলছি না, এই মন্তব্য সাধারণ অভিজ্ঞতা। বলছি—এ দেখা যাচ্ছে চারপাশে অহরহ। ভাষা যে পাল্টায়, প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে, মূল নিয়ম মেনেও ছন্দ নিয়ে কতো ভাঙচোরা চলছে, কতো নতুনভাবে অনুভূতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করছেন দায়িত্ববান কবি, তা এঁরা বুঝতে চান না। কেনো অভ্যেসের সঙ্গে মিললো না, যতো অভিযোগ ওখানে। আজকের সময়ের কবি, শিল্পী, গল্পকার ঔপন্যাসিক চলচ্চিত্রকার আর পাঁচজনার মতই সামাজিক টানাপোড়েনের মানুষ; হালের জামাটা তাঁরাও পরেন, ছবিটা দেখেন, ঝুলতে ঝুলতে চাকরি করতে যান, তেরো-চৌদ্দ টাকা দরের সরষের তেল কিনে খান, এটা বুঝতে হবে। তাঁদেরই রচনা পঞ্চাশ বছর পেছোবে কি করে? কেনো পুরনো ছন্দ ভাষা শৈলী এঁরা ব্যবহার করবেন? শিল্পসাহিত্য সব সময়ই সাধারণ মানুষের ভাবনাচিন্তা থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এসে কথা বলে। পাঠক বা দর্শক যদি পেছু হঠতে থাকেন, কিংবা থাকেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তবে এগিয়ে যাওয়া সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে পাল্লা দেবেন কি করে?

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক
• তাঁত
• মিল
• পোষাক
• সার্টিং
• সুটিং

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শচীন দাশ

জীবন ও শিল্প

দ্বারভাঙা স্টেশনে নেমে সিকি মাইলের মত হেঁটে গেলে আপনারাও কোন দিন সেই বাড়িটা পেয়ে যাবেন। দূর থেকেই অনেকটা ছবির মত সাজানো। সামনে বাগান। বোগেনভেলিয়া, গোলাপ আর ক্যাকটাসে ছায়া বিস্তার করে আছে। বোঝা যায় এক সময় বাগানটা আরও সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন যত্ন ও সময়ের অভাবে অনেকটাই শ্রীহীন; তবু ওরই ভেতরে এক সময় আপনি লক্ষ্য করবেন ঝকঝকে বাঁধানো উঠোনের উপরে সটান দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছের গা-বেয়ে কাঠবেড়ালিগুলো তরতরিয়ে নেমে এসে একছুটে বাগানের দিকে চলে যাচ্ছে, বাগান থেকে উঠে এসেই আবার গাছের গুঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে। কোন ভয় নেই, সন্দেহ নেই, শুধু মুখে একটা অচেনা শব্দ—এছাড়া সারা বাড়িটা ডুবে আছে নৈঃশব্দে। আপনি ততক্ষণে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন, ভাবছেন, কাকে ডাকা যায়, কিন্তু ডাকতে হ'ল না।' তার আগেই আপনার চোখে পড়ে অদূরে খোলা বারান্দায় পায়ের উপরে পা রেখে

কেদারায় বসে বুকের কাছে একটা প্যাড নিয়ে আপন মনে কি লিখে চলেছেন এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধের কোন হুঁশ নেই। মাঝে মাঝে পাশের রাস্তা দিয়ে ভারী ট্রাক কিংবা বাস চলে যাচ্ছে। কানে আসছে দ্বারভাঙা স্টেশন থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিনের সান্টিং-এর শব্দ, মধুবনী কিংবা রক্সৌলগামী কোন এক্সপ্রেস ট্রেনের তীব্র হুইশেলের আওয়াজ। তবু কোন কিছুই তাকে অন্যমনস্ক হতে দিচ্ছে না। বরং তিনি আরও গভীরভাবে ডুবে আছেন নিজের স্মৃতিতে। লিখছেন স্মৃতি-কাহিনী। তাই মন তাঁর চলে গেছে অনেক পেছনে। প্রায় ৮২ বছর আগের মিথিলার জেলাশহর পান্ডুলের শান্ত জীবনযাত্রার। যেখানে একটি রক্ষণশীল বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এক শিশু। পা যার বাইরের দিকে, মন যার উন্মুক্ত অবাধ প্রকৃতির বুকে, নদী-বৃক্ষ-পাহাড় আর মানুষের মাঝখানে, তাকে আটকাবে কে? তাই সমস্ত বাধাবন্ধন ডিঙিয়ে সেই শিশুও একদিন বেরিয়ে এলেন—খুঁজলেন নিজেকে; আবিষ্কার করলেন জগৎ ও জীবনের রূপ। দেখলেন ও দেখালেন জীবনের সত্যকে।

হ্যাঁ ইনিই সেই শিশু, এখন যিনি বৃদ্ধ। নাম বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়। যাঁর নাম উঠলেই নামের পাশে উঠে আসে তারই রচিত কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থ—নীলাঙ্গুরীয়, দুয়ার হতে অদূরে, স্বর্গাদপি-গরীয়সী, নবসন্ন্যাস ও কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি থেকে রাণুর প্রথম ভাগ কিংবা বরযাত্রী ও বাসর। যার নাম উঠলে নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ে উইট এবং হিউমার এই দুটো শব্দ; যিনি কৌতুককে দেখেছেন জীবনের পরম সত্যরূপে, আবার জীবনের ভেতরে যিনি আবিষ্কার করেছেন এক আপনভোলা শিল্পীকে, সেই তিনিই জীবনের শেষপ্রান্তে এখনো জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধানী।

অথচ প্রথম যৌবনের কয়েকটি বছর বাদ দিলে আজীবন তিনি প্রবাসী। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, হয়ত বছরে একবার কি দুবার; তাছাড়া বাকি সময়টা তিনি দ্বারভাঙ্গায় থাকেন। সেখানে থেকেই লেখেন। জীবিকার প্রয়োজনে এক এক সময় তিনি এক এক রকম চাকরি করেছেন। আর যখনই যেকাজে ঢুকেছেন, প্রথমে মনে হ'ত, নতুন কাজ, নতুন জীবন—কিন্তু তারপরেই আবার ক্লান্ত হয়ে সেটা ছেড়ে দিয়েছেন, দিয়ে অন্যকিছু ধরেছেন।

পাটনার বি এন কলেজে পাঠরত অবস্থায় ১৯১৫ সালেই তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' তৃতীয় পুরস্কার পেয়ে প্রবাসী-তে প্রকাশিত হয়। তারপরেই গল্প লেখার নেশা বাড়তে থাকে। শুরু হয় 'প্রবাসী' ছাড়াও 'শনিবারের চিঠি' 'বঙ্গশ্রী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'-তে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। প্রথম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রবাসীতেই প্রকাশিত হয়। উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, রম্যরচনা, শিশু-সাহিত্য, নাটক ও প্রবন্ধ মিলিয়ে গ্রন্থ সংখ্যা ৮৪।

তাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়' চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে। পেয়েছে 'রাণুর প্রথম ভাগ' ও 'দোল গোবিন্দের কড়চা'। আর 'বরযাত্রী' রিলিজ করার পরে তো রীতিমত দর্শকদের ভেতরে হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। শুধু সেদিনই নয়, আজও সেই 'বরযাত্রী' নতুন করে দেখাবার আগে বিজ্ঞাপন পড়ে, '...আবার তোতলা গণশার দল শহরে আসছে। সাবধান!'

অক্টোবর ১৯৫৮ সালেই প্রথম হাওড়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে নিখিল বিহার বঙ্গসমিতি (বাঙ্গালী এসোসিয়েশন) ভাগলপুর অধিবেশনে তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। আনন্দ-বাজার পত্রিকা নগদ ১০০০৲ টাকা ও একটি মানপত্র দিয়ে তাঁকে 'আনন্দ পুরস্কার'-এ সম্মানিত করেছেন। রাজ্য সরকার দিয়েছেন

সরকার প্রদত্ত, বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ পরিচালিত সাহিত্য-কলাকার-কল্যাণ কোষ থেকে তাঁর জন্য দেওয়া হয়েছে মাসিক ৩০০৲ টাকার একটি বৃত্তি।

তবু এক কথায়, এসব খেতাব বা পুরস্কার তাকে বিন্দু-মাত্র স্পর্শ করেনি। তিনি এখনো জীবনের সন্ধানে সেই পরম সত্যকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধির জন্যে জীবনসমুদ্রে ডুবে আছেন।

জীবিকার সন্ধানে

১৮৯৪ খ্রীঃ ২৪শে অকটোবর উত্তর বিহারের মিথিলার জেলা শহর পান্ডুলে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর ঠাকুরদা ৺ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আদিনিবাস হুগলী জেলার চাতরা (শ্রীরামপুর) থেকে ১৬।১৭ বছর বয়সে পায়ে হেঁটে পান্ডুলে এসে নীলকুঠীর চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। পরে বিভূতিভূষণের পিতা ৺বিপিনবিহারীও চাকরির সূত্রে জীবনের প্রায় অর্ধেক সময়ই ওখানে কাটান।

বিভূতিভূষণের জন্মের কিছু পরেই তাঁর পিতা বিপিন-বিহারী পান্ডুল ছেড়ে স্বারভাঙ্গায় গিয়ে বসতবাড়ি তৈরী করেন। মা গিরিবালা দেবী ছিলেন হাওড়া জেলার বেলেপ্রতাপপুরের মেয়ে। মা-র প্রভাব বিভূতিভূষণকে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

শ্রীরামপুরের চাতরায় বিভূতিভূষণ তাঁর বাবার হাত ধরে ছেলেবেলায় গিয়ে উঠেছিলেন ৺মহাদেব পণ্ডিতের পাঠশালায়। প্রায় ৩ বছর সেখানে প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার পরে স্বারভাঙ্গায় গিয়ে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। সেখানেই বাংলা মিডিয়ম রাজস্কুল থেকে ১৯১২ খ্রীঃ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯১৪ সালে হাওড়ার শিবপুরে মামার বাড়িতে থেকে তৎকালীন রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) থেকে আই এ পাশ করেন। পরে ১৯১৬ সালে পাটনার বি এন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে গ্রাজুয়েট হন।

কিন্তু গ্রাজুয়েট হবার পরেই জীবিকার সন্ধানে তাঁকে পথে নেমে আসতে হয় এবং জীবনের এই অধ্যায় থেকেই তাঁর নতুন জীবন শুরু হয়। তিনি একের পর এক চাকরি নিয়ে পরে সেটা আবার ছেড়ে নতুন চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিক্ষক হিসেবেই অনেকদিন সম্মানের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন। প্রথমে শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে এক সময় স্বারভাঙ্গার প্রাক্তন মহারাজা রমেশ্বর সিংয়ের একান্ত সচিবরূপে জীবনের সবচেয়ে দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। কিন্তু প্রায় ১ বছর পরে হঠাৎ সেই পদে ইস্তফা দিয়ে আবার শিক্ষকতায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। একজন মানুষ জীবনে কত অসংখ্যবার যে জীবিকার জন্য চাকরি বদলাতে পারেন তার সার্থক উদাহরণ বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়—বোধ হয় তাঁর নিয়তিই তাঁকে হাত ধরে জীবনের এই বিভিন্ন অধ্যায়গুলো পার করে এনেছিল এবং তারই প্রমাণ হিসেবে তাঁর এ-পর্যন্ত সমগ্র রচনার মধ্যে সেইসব অভিজ্ঞতা ও নিজের চোখে দেখা চরিত্রগুলো এমন উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে।

অনেকবার বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকরূপে সম্মান লাভ করলেও জীবনে যেমন মহারাজার একান্ত সচিব হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তেমনি সেই পদ থেকে ইস্তাফা দিলেও দ্বারভাঙ্গার শেষ মহারাজ কামেশ্বর সিং-য়ের ভাগ্নের গৃহশিক্ষকরূপে তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রায় আড়াই বছর রাজ-প্রেসের ম্যানেজার এবং তিন বছর পুনরায় রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক

এক শীতের সকালে

তিনেক কাটান। এরপরেও সেই চাকরি তিনি ছেড়ে দিতেন নিশ্চয়ই, কেননা তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ, যা একজন লেখককে বড় লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়—কোন প্রিয় জিনিসই তাঁর কাছে বেশী দিন প্রিয় থাকত না। তিনি অনায়াসেই তাকে ত্যাগ করতে পারতেন। তারপরেই আবার শুরু হত নতুন জীবন—নতুন করে অনুসন্ধান।

হয়ত মহারাজের দৈনিক দুটি কাগজের ম্যানেজারি থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়ে বসতেন, কিন্তু তার আগেই ১৯৪২ খ্রীঃ আগস্ট আন্দোলনে কাগজ দুটো আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভূতি-ভূষণও চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এবং এখানেই তাঁর চাকরি জীবনের ইতি।

বাইরের আকর্ষণ

শুধু চাকরি সূত্রেই নয়, ছেলেবেলা থেকেই রক্তের ভেতরে তিনি বাইরের আকর্ষণকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। এবং তার সূত্রপাত বছর পাঁচেক বয়স থেকেই। বাড়িতে সবাই বলাবলি করত, এ-ছেলের কিছু হবে না। কালে কালে গোল্লায় যাবে। কিন্তু বিভূতিভূষণের তাতে হুঁশও নেই। সেই বয়স থেকেই বাইরের টান তাকে অস্থির করে তুলত। পরবর্তীকালে তিনি নানান জায়গায় মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, থেকেছেন, আবিষ্কারও করেছেন। যেখানে যখন গেছেন সেই জায়গাটাই তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি তাকে গভীরভাবে ভালবেসে দেখে-ছিলেন। আবার আশ্চর্য! প্রয়োজনে তাকে ছেড়ে আসতেও দ্বিধা-বোধ করেন নি। ছাড়তে তাঁর মন কেঁদে উঠত, অন্তরে নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হবার বেদনাও উপলব্ধি করতেন। কিন্তু সেই তবু ছেড়ে আসতেন। অথচ সারাজীবনে এখনো তাকে ভোলেন নি। তাই তাঁর রচনার মধ্যে বারেবারে বিভিন্নভাবে ফিরে এসেছে সেই

নিজের বাগানে

গরীয়সী'-তে পান্ডুল, দ্বারভাঙা, চাতরাব, তেমনি 'কুশী-প্রাঙ্গণের চিঠি' উপন্যাসে মধুবনী, দ্বারভাঙা, মিথিলা, কৌশিকী নদী ও তার চারপাশের মানুষজন ও তার আচার অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন।

'দুয়ার হ'তে অদূরে' উপন্যাসে বাইরের এই আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

'ঘোরা বাই ছিল খুব বেশি। ভুল বুঝতে পার, তাই বলে দিই এ-ঘোরার মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। হোল্ড-অল-সুটকেশ-ধ্যাডশ-বিবর্জিত এই ঘোরা, এর একদিকে যেমন ছিল না সিমলা-শিলং-উটী, অন্যদিকে তেমনি ছিল না—কাশী-কাঞ্চী-রামেশ্বরম্। বড় কাজের পর বড় অবসরে একটু বড় করে হাঁপ ছেড়ে আসা নয়, নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য একটু পলাতক-বৃত্তি—এই ছিল আমার ঘোরার মূল কথা। এত সামান্য কথা যে লিখতে কুণ্ঠা আসে।

কিন্তু কি করব? ঐতেই পেতাম আনন্দ হয়তো সবচেয়ে বেশিই। যদি বলি, ঐ একটুখানি ঘুরে আসার নেশা আমায় ঘটা করে ঘোরার উল্লাস থেকে বঞ্চিত করেছে তো মিথ্যা বলা হবে না।..

মনকে একেবারে মুক্তি দিয়ে বেরুতাম, বয়স ভুলে, অবস্থা ভুলে, পদবী ভুলে। পাছে এই মুক্তির মধ্যে একটুও বাধা এসে পড়ে এই জন্যে আমায় এ ধরনের পর্যটনে কখনও সাথী নিতাম না। যেখানে খুশি যাব, যা খুশি দেখব, যখন যেখানে যেভাবে খুশি বসব, যতক্ষণ খুশি মূঢ় বিস্ময়ে হাঁ করে থাকব চেয়ে—এত নিজেকে এলে-দেওয়া ভ্যাগাবন্ডিজমের সাথী পাওয়া দুষ্কর; আর সত্যি কথাই বলছি, এই ভূতে পাওয়া মানুষটাকে বুঝবে এত কান্তবন্ধু বন্ধু বা আত্মীয় আমি পাইনি এখনও। আমার

মীরা কে?

বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়'-র নায়িকা মীরা। এমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল বলিষ্ঠ বাঙালী নারী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। মীরাকে চেনেন না, মীরাকে জানেন নি বা মীরার সঙ্গে পরিচয় হয়নি এমন পাঠক বা পাঠিকা বোধহয় বাংলা ভাষায় নেই। বরং বইটি পড়ার পরে মীরার জন্যে অনেকে দুঃখ পেয়েছেন, অনেকে কেঁদেছেন। এমন কি শুনেছি রেগে গিয়ে অনেকে বিভূতি-ভূষণকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। আর আমার এক বন্ধু তো পড়া শেষ হয়ে গেলে বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, এই লেখকের কোন লেখাই আর সে পড়বে না। তখন বয়স ছিল অল্প, তাই আবেগও ছিল বেশি। কিন্তু কিছুকাল পরেই সেই বন্ধুটিই আবার অন্যান্য লেখাগুলো পড়তে শুরু করে এবং আবার নীলাঙ্গুরীয় পড়ে জানায়, না ঠিকই হয়েছে। তবে মীরা বোধহয় ওঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে-ছিল। না হ'লে এমন চরিত্র ....

শুধু আমার বন্ধুটিই নয়, অনেকেই এ'কথা জানেন মীরা তাঁর বাস্তব জীবনেরই অংশ। অন্তত বললেও বিশ্বাস করবেন না যে মীরাকে তিনি দেখেন নি। অথচ সত্যি, মীরা একটি কাল্পনিক চরিত্র। অন্তত বিভূতিভূষণের বয়স ৪৭-৪৮-এর ম্যাচিওর কল্পনা।

এ'সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, মীরার সঙ্গে অনেকে আমার বাস্তব জীবনকে একত্র করতে চান। বোধহয় লেখাটায় যে একটা নিবিড় ব্যাকুল বাস্তব ঘেঁষা ভাব প্রকাশ পেয়েছে তার জন্যেই। এর মধ্যে নিজেকে নায়ক করার ব্যাপারটাও আছে। যাতে করে একটা সত্য অভিজ্ঞতার রূপ ফুটে উঠে থাকবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, নীলাঙ্গুরীয় কেন লিখেছিলেন? কখনো কি প্রাইভেট টিউটর ছিলেন?

ধীরে সুস্থে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, নীলাঙ্গুরীয় আমার প্রথম উপন্যাস। ১৯৪০-৪১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বেরোয়। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আমার প্রায় ৪৭-৪৮-এর কল্পনা। ম্যাচিওর কল্পনা বলতে পারা যায়। শুরু হবার আগে সম্ভবনাটা আমি অস্বীকার করছি না। তবে রোমান্সটা বহুদিনই পর্যন্ত লালিত ও অশান্তিতে আমার মনে জাগরিত ছিল।

আর প্রাইভিট টিউশ্যানি অনেক করতে হয়েছে। তবে কোন মেয়ের টিউশ্যানি আমি কখনো করিনি, কোন বয়সেরই; মীরার মত কোন যুবতীর কথা তো দূরে থাকুক। জিনিসটি সম্পূর্ণই কাল্প-নিক। যৌবনের একটা সম্ভাবনার কথা নিয়েই।

যাত্রাবাড়ীর শিবপুর ও তোতলা গণশার দল

শিবপুরের পরিবেশে 'বরযাত্রী'-ও বিভূতিভূষণ মুখো-পাধ্যায়ের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। ১৯১২ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত শিবপুরে মামার বাড়িতে থেকে কলকাতায় কলেজে পড়াশোনা কর-তেন। হাওড়া থেকে লঞ্চ-এ গঙ্গা পার হয়ে ইডেন গার্ডেন-এর পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে রোজ রিপন কলেজে যেতেন পড়তে। সেই সময় যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা হাওয়া বইছিল যে তাকে নানানভাবে তিনি রূপ দিয়েছিলেন। তারই ফলে 'বরযাত্রী'।

তাঁর নিজের কথায়, সেই সময়ের যে একটা আবহাওয়া যাতে যুবক সম্প্রদায় বর্তমানের তুলনায় ঢের বেশি নিশ্চিন্ত কেয়ার-ফ্রি জীবন লাভ করতে পারত তারই একটা চিত্র দেবার চেষ্টা করেছিলুম। অনেক সময় এমন অনেক পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ত যা তাদের পক্ষে ট্র্যাজিক হয়ে পড়ত কিন্তু দ্রষ্টা বা শ্রোতার পক্ষে হাসি কৌতুকেরই খোরাক জোগাত। কেননা এটা তো ঠিক অনেক ক্ষেত্রে একের বিপদ অন্যের হাসির কারণ হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক—'বরযাত্রী'-তে গণশার দলের সবার পুকুরে পড়াটা দর্শকদের

দুয়ার হ'তে অদূরে

'দুয়ার হ'তে অদূরে' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি স্মরণীয় উপন্যাস। অধুনাবিলুপ্ত কালীঘাট-মাঝেরহাট-ফলতা লাইনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সে সময়ে কলকাতায় একটু অবসর পেলেই তিনি পল্লীবাংলাকে দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এ-ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক ছিল ভীষণ। আসলে প্রবাসে থেকেও বাংলার মাটি-হাওয়া-জল বাংলার মানুষ তাকে ভীষণভাবে কাছে টেনে নিত। তাই তিনি সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তেন। 'দুয়ার হ'তে অদূরে' লিখতে গিয়ে বলেছেন : ....বাংলাদেশ আমার প্রবাসী মনটাকে অষ্টপ্রহর রাখত টেনে—এর নদী-নালা, ডোবা-জঙ্গলের অদ্ভুত মোহ দিয়ে; এর ভাঙা অট্টালিকা, পুরনো-দেউল, জটিল বট-অশ্বত্থের মৌন স্বপ্ন দিয়ে মৃত্যুর কোলে এর জীবনের যতটুকু বেঁচে আছে—এখানে-সেখানে—তার হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে। তুর সইত না; কাজ নিয়ে গেলে ক্রমাগতই মনটা ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়বার অবসর খুঁজত, আর যখন শুধু অবসর বিনোদনের জন্যই যেতাম দেশে তখন তো কথাই নেই, নাকে-মুখে তাড়াতাড়ি দুটি গুঁজে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় পা না বাড়ালে চলতই না আমার।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাঝেরহাট-ফলতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়েই 'দুয়ার হ'তে অদূরে'—তখন সেখানকার চেহারা ছিল অন্যরকম। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখেন সব পালটে গেছে তাহ'লে কি মনে হবে আপনার ?

—হবে কি! হয়েছে তো আমার। আমি এই ফলতা-কালীঘাট লাইনে কয়েকবারই গেছি। একটা মমতা ধরে গিয়েছিল। যার জন্যে, যে আনন্দটা পেতাম তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা এই বইটিতে। লাইনটা উঠে যেতেই আমার মনের প্রতিক্রিয়াটা তুমি বুঝতেই পারবে।

হঠাৎ গিয়ে একবার দেখি নেই। হঠাৎ একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে শোনা সে শুধু যে বাড়িতেই নেই তা নয় আর ইহলোকেই নেই।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিনি, সতীনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলাম

আশ্চর্য! অন্তত কয়েকটা বছর শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি থেকেও কিন্তু বিভূতিভূষণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেখা হয়নি। বিভূতিভূষণ দেখা করতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ, কলকাতা থেকে তাঁর ৩০০ মাইল দূরত্বে থাকা। যার জন্যে সে সময়ে গঙ্গার উপরে পুল না থাকায় কলকাতায় যাওয়া-আসা খানিকটা দুরূহ ছিল। তার উপর তাঁর চাকরিজীবন তাঁকে নানাভাবে দূরে সরিয়ে রাখত। কিন্তু ১৯৪২-এ চাকরিজীবন শেষ হলে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে চলে গেছেন। তার ফলে তিনিও আর চেষ্টা করেননি।

—কিন্তু সতীনাথ; বনফুল, শরদিন্দু এদের সঙ্গে দেখা করেন নি ?

—হ্যাঁ এঁদের সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দুবাবু এদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ। বনফুলের বাড়ি আমি অনেকবারই গেছি। আর একটু অন্তরঙ্গতার কারণ ছিল—আমার ছোট ভগ্নীর নাম লীলা—বলাইবাবুরও স্ত্রীর ঐ নাম ছিল, এই জন্যই আমি ঐ পরিবারে জ্যেষ্ঠের আসন দখল করে ছিলাম। এবং তুমি একথাও বলতে পার যে প্রবাসী লেখক বলেই যেন ওর সঙ্গে একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কেদারবাবু ছিলেন একেবারে সার্বভৌম। ওকে আলাদা

ছোট ভাইয়ের নাতনী কোলে

ভিন্ন প্রবাসের প্রবাসী ছিলেন। তার জন্য সম্বন্ধের দিক থেকে একটা যেন দূরত্বই ছিল অর্থাৎ ঠিক বলাইবাবুর মতন নয়।

আর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ওর সঙ্গে আমার পূর্ণিয়াতেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম দেখা। তাও বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের জন্য। তবে তাঁর স্মৃতিটি বেশ গভীর হয়ে আছে। ওর সঙ্গে একটা যায়গায় আমার মিল ছিল—বাগানের শখ। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। সেই বাড়িতে একধারেই চুপ করে বসেছিলেন—তরুলতা ফুল নিয়ে কি করে একটু আলোচনা উঠল। লাল টুকটুকে লবঙ্গর আকারে ছোট্ট মিষ্টি ফুল। উনি কখন নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে প্রায় সেইরকম নিঃসাড়েই একটি ছোট্ট লতা নিয়ে প্রবেশ করলেন। এগিয়ে এসে বললেন এর সাদা ভ্যারাইটিও হয়। এই গাছটা নিন। লাজুক মানুষ তার উপরে বাগান উটকে বের করতে মেহনত করতে হয়েছে। মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে।

ওই একটি চিত্রেই উনি অমর হয়ে আছেন আমার স্মৃতির ভেতরে। অদ্ভুত রকম শান্ত, স্বল্পভাষী, অল্প-পরিচয়ে বিব্রত মানুষটি।

প্রবাসী বাঙালীর চোখে বর্তমান বাঙালী

...আমি নিজে বাঙালী। সুতরাং আমার মনে সবকিছুর উপরেই আমার স্বজাতি বাঙালীর জায়গা। তার উত্থানের প্রথম যুগটা আমি দেখিনি। কিন্তু সেই যুগের যে পূর্ণ বিকাশ শৌর্যে, বীর্যে, মনীষায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই—সেটা অনেকখানি আমি দেখেছি।

বর্তমানে সেই যুগটা যেন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। একটা উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এই সেদিন নিভে গেল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তার জায়গা নেবে কে। অন্য অনেক ক্ষেত্রেও এরকম অনেক হচ্ছে। ভাবী বংশীয়রা সেসব জায়গা নিতে

ভারতীয় কোন জাতেরই পক্ষে ভারতের কোন অংশ প্রবাস নয় একথা মেনে নিয়েই বলছি। এই সঙ্গে একটা প্রসঙ্গ না আনলে চলে না। বিস্তৃত আলোচনার জায়গা নয় এটা—কতকটা নিজের দোষে—কতকটা অবস্থার চাপে, কতকটা অন্য ধরনের ব্যাপারে—যার উল্লেখ না করাই ভাল—সব মিলিয়ে বাঙালী আজ যেন বড় একলা পড়ে গেছে। ভগ্নোৎসাহ। আমি আশাবাদী। বাঙালী মণীষা-সম্পন্ন কর্মকুশলী জাত—ইতিহাস একথা প্রমাণিত করেছে। যদি পড়েই গিয়ে থাকে একলা তো কবিগুরুর একটা মন্ত্রে আবার নিজের জায়গা দখল করে নিতে পারবে। আর তা হ'ল যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল একলা চল একলা চল রে...'

বাংলার বাইরে বাঙালী পাঠকের কাছে

বাইরের প্রবাসী বাঙালী পাঠকের কাছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় নানাভাবে সমাদর লাভ করেছেন। মানুষ ও সুলেখক হিসেবে। তারা একদিকে যেমন তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য, আবার অন্যদিকে তাঁর সম্পর্কে অগাধ কৌতূহল রেখেছেন। ভেবেছেন বাংলা থেকে এতদূরে বিশেষ করে স্বারভাঙ্গার মত এমন একটা একটেরে জায়গায় থেকে বাঙালীর জীবনের এত খুঁটিনাটি চিত্র তাঁর লেখায় কি করে উঠে এল? বিশেষ করে কয়েকটি উপন্যাসের (যেমন কাঞ্চনমূল্য উপন্যাসের কণক স্বরূপ মণ্ডল-এর মুখে হুগলী অঞ্চলের ভাষা) চরিত্রের মুখে পল্লী অঞ্চলের ভাষার ব্যবহার?

কিন্তু বিভূতিভূষণের মতে, এটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট বা কৃতিত্ব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারণটা কি?

—কারণ আমাকে যদি পাণ্ডুলেই শিক্ষা উপজীবিকা নিয়ে পড়ে থাকতে হত তাহলে যেমন বাংলার জীবন নিয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না, তেমনি প্রয়োজন মত ভাষা আয়ত্ত করাও সম্ভব ছিল না। পাণ্ডুলের কথা ছেড়ে দাও এমনকি বেহারের এ-অঞ্চলে যদি আবদ্ধ থাকতে হ'ত। সেটা হয়নি। আমার যৌবনে এবং উত্তরকালে বাংলার সঙ্গে নিবিড় যোগ থেকে গেছে। বাংলাকে ভাল করে দেখেশুনে লেখার জন্যে সেই যোগটা আমাকে নানারকমে চেষ্টা করেও রক্ষা করে যেতে হয়েছে। যুগোপযোগী যানবাহনের নানা সুবিধের জন্য যোগাযোগও সহজ স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে এসেছে। এই জন্যই এখানকার জীবন ও সেখানকার জীবনের প্রভেদটা দিন দিনই ঘুচে এসেছে।

—কিন্তু ভাষা?

একটু থেকে বিভূতিবাবু বললেন, আমি হুগলী জেলার মানুষ। সেখানকার গ্রামাঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল এবং মমত্ব থাকা সম্ভব। আমার একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবার বাই আছে যেটা বাংলায় গেলে আরও বাড়ে। কাঞ্চনমূল্য, তাজাম এবং স্বরূপ মণ্ডল কথিত কয়েকটি গল্পসমষ্টির ভাষার আমি খানিকটা এভাবেও আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছি।

অকৃত্রিম হাসি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে এই দুটি গুণ—উইট এবং হিউমার। অকৃত্রিম নির্মল হাসির ব্যবহারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চরিত্র সৃষ্টি, গল্প বলার ঢঙ এবং ভাষার ভেতরে এই দুটো শব্দকে তিনি ভীষণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার লেখার মধ্যে উইট এবং হিউমারের ব্যবহার বেশী—একটা সূক্ষ্ম কৌতুকরস ছড়িয়ে আছে সর্বত্র; সে সম্পর্কে কিছু বলুন?

—আমার প্রথম গল্প 'অবিচার' একটি করুণ রসের কয়েকটি লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একদিন কৌতুকরসের দিকে আমার ঝোঁকটা চলে গেল। এবং যতদিন শুধু গল্প লিখেছি তা প্রায়, ১৯৩৯-৪০ অর্থাৎ নীলাঙ্গুরীয় শুরু করা পর্যন্ত এই রসই আমার লেখায় প্রাধান্য লাভ করে। এইদিক দিয়ে আমার প্রথম উপন্যাস নীলাঙ্গুরীয় আমার সাহিত্যে একটা 'ল্যান্ড মার্ক' বলে ধরে নিতে পার। এই থেকে ধারাটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল বলা যায়; উপন্যাসগুলো গুটি তিন-চার বাদ দিয়ে সব সিরিয়াস, আর গল্পগুলো পূর্বের মতনই সব কৌতুকরসের। এটা, দেখেছি আমার সমালোচকদের অনেক ক্ষেত্রে একটু বিব্রত করে তোলে এবং সিরিয়াস জাতীয় বই যেমন 'নীলাঙ্গুরীয়' আমারই লেখা কিনা এ বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন করতে হয়েছে।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমার হাসির গল্প, হাসির আসর বেশি প্রিয় ছিল। এবং যেখানেই হাসির আড্ডা জমত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তাম, বাধা থাকলে কাছাকাছি একটু আড়াল-আবডাল দেখেও। উত্তরজীবনে আমি অনেক হাস্যরসিকের সঙ্গ পেয়ে যাই, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবরকমই, এর মধ্যে একজন ছিলেন আমার মেজোমামা, যার কথা আমি অনেক জায়গায় বলেছি। তাতে আমার এই দিকটা পুষ্ট হতে থাকে। এর সঙ্গে ইস্কুল যুগ থেকেই আমি ইংরেজী বাংলা কয়েকজন এই অঙ্গের লেখকের সন্ধান পেয়ে যাই এবং তাদের ভক্ত হয়ে পড়ি—ইংরেজীতে ডিকেন্স, জেরোম কে জেরোম, মার্ক টোয়েন, ওড হাউস এবং আরও অনেকে—বাংলায় সর্ব রসের রসিক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নিয়ে প্রভাতকুমার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি। আমার সমসাময়িকদের কথা আর ধরলাম না।

চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া

প্রায় সব উপন্যাসিকের মতই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পেরও চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে। যেমন নীলাঙ্গুরীয়, আপুর প্রথম ভাগ, বরযাত্রী, দোলগোবিন্দের কড়চা ইত্যাদি। কিন্তু কোন সৃষ্টিধর্মী সুন্দর সাহিত্য যদি ঠিকমত চলচ্চিত্ররূপ না পায় তাহলে এক অর্থে সেই সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটে এবং আমাদের দেশে তা হামেশাই দেখা যায়। এমন অভিজ্ঞতা বাংলার কোন না কোন লেখকের নিশ্চয়ই হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তাই কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নিজের লেখা চরিত্রগুলো যখন সেলুলয়েডে সজীব হয়ে উঠল তখন আপনার কি মনে হয়েছিল?

বিভূতিবাবু বলেছিলেন, যদি চিত্রটি সফল হয় তাহলে নিজের লেখার আর একটা সাফল্যের দিক দেখে স্বভাবতই উৎফুল্ল হবার কথা। তবে ভাল ডিরেকটর না হ'লে কিংবা প্রডিউসারের কার্পণ্যের জন্য যখন মূল বক্তব্যটা নষ্ট হয়ে রসবিভ্রাট ঘটে তখন স্বভাবতই মনটা বড় ঝিমিয়ে পড়ে। আমার দুরকমেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এ-বিষয়ে যেমন কয়েকটি ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সাফল্যে আনন্দ পেয়েছি, তেমনি সাফল্য যেখানে প্রত্যাশিত সেখানে নৈরাশ্যের তীব্র আঘাতও পেতে হয়েছে। এই কথাটা বলতে গিয়ে আমার একটি চিত্রের কথা মনে পড়ছে যেখানে আমি, দৈবানুগ্রহেই বলব অদ্ভুতভাবে হয়ত কঠোর আঘাত থেকে বেঁচে গিয়ে, সেই পরিমাণেই সাফল্যের আনন্দ লাভ করেছি।

তখন তিনি শিবপুরে তাঁর বোনের বাড়িতে আছেন। কলকাতায় যেখানে গিয়ে তিনি সাধারণত উঠেন। তা সেবারও গিয়ে তেমনি শিবপুরে উঠেছেন, একদিন হঠাৎ খবর পেলেন কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নিচের বৈঠকখানায় বসাতে বলে তিনি যখন একটু পরে নিচে নেমে এসেছেন তখন

জানলেন, তার মধ্যে একজন পরিচালকও আছেন। অর্থাৎ ডিরেকটর নিজেও এসেছেন। যিনি তখন বেশ নাম-টামও করেছেন। সেই ভদ্রলোকই বললেন, আপনার 'বরযাত্রী' গল্পটি আমরা নিতে এসেছি। নীলাঙ্গুরীয়-এর পরে এটিই তাঁর কাহিনী চলচ্চিত্ররূপের দ্বিতীয় প্রস্তাব। বলাবাহুল্য শুনে বিভূতিবাবু খুশীই হলেন। বিশেষ করে প্রস্তাবটা এমন একজন পরিচালকের, যাঁর দু-একটি ভাল চলচ্চিত্রের নাম তখন তিনি শুনে ফেলেছেন।

তা কথাবার্তা হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনাও চলল। উনি কিভাবে সেলুলয়েডে কাহিনীটাকে দাঁড় করাবেন তার একটা ধারণাও বুঝিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণকে। সব শুনে তাঁর ভালই মনে হ'ল। সুতরাং তারপরে আর কোন পাকা কথা হতে দেরি হ'ল না। সেই পরিচালক ততক্ষণে একটা চেক ও চুক্তিপত্র তাঁর সামনে এগিয়ে ধরেছেন। চেকটা নিয়ে চুক্তিপত্রে তিনি সইও করবেন, এমন সময় উনি হঠাৎ করে কি যাই হোক তাঁর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, আমি এই বইটাকে একটা ট্র্যাজিডি করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু চমকে উঠেই হাতটা টেনে নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বরযাত্রী ট্র্যাজেডি! এটা কি করে সম্ভব হতে পারে! এর পরিকল্পনা, চরিত্রাবলী, ঘটনাসংঘাত সবই তো নিছক কৌতুকরসের, কিন্তু যে পরিমাণে এটা চরিত্রের কাছে ট্র্যাজেডি সে পরিমাণে দর্শকদের কাছে তো কমেডি। কাজেই তাঁর মাথায় ঢুকল না ওরা কি করে এটাকে ট্র্যাজেডি করতে চায়।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ঝুলোঝুলি। সঙ্গে তিন-চারজন যারা ছিলেন তারাও যোগ দিলেন। ওঁদের মন্তব্য—আজ-কালকার বাঙালী দর্শকরা নাকি কৌতুকরসে সাড়া দিচ্ছে না, তাই ঝোঁক ট্র্যাজেডির দিকে। বিভূতিভূষণ ততক্ষণে নিজের সিদ্ধান্তে আরও অটল হয়ে উঠেছেন—'বরযাত্রী'কে কখনোই তিনি ট্র্যাজেডি করতে দেবেন না। একে ট্র্যাজেডি করার মত ট্র্যাজেডি আর নেই। তখন সেই পরিচালক বললেন, তিনি সাতজন ভাল পরিচালককে নিয়ে এসে তাঁকে কনভিন্সড করাবেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের এক উত্তর—সাত কেন ৭০ জনকে আনালেও তিনি কনভিন্সড্ হবেন না। অবশ্য কথাবার্তায় কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। ফলে এইরকম অবস্থার কোন অবসান না ঘটায় সেই ভদ্রলোক তাঁর ইউনিট নিয়ে চলে গেলেন। বিভূতিবাবুও নিজের মত ধরে উপরে উঠে এলেন। অবশ্য আর দেখা হয়নি।

অথচ আশ্চর্য! এর কিছুদিন পরেই অন্য এক পরিচালক, সত্যেন বসু তাঁর প্রস্তাব নিয়ে এলেন। এবার বিভূতিবাবু নিজেই প্রথমে ওই কথাটা তুললেন অর্থাৎ ট্র্যাজেডি নয়, কমেডি। কিন্তু তার আগেই সত্যেন বসু বলেছিলেন, 'এ অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন কেন?' তখন বিভূতিভূষণ জানিয়েছিলেন, বর্তমান দর্শকদের মেজাজ তো তাঁর জানা নেই। কিন্তু তারপরেই লেন-দেন হয়ে গেল। এক চুলের এদিক ওদিক দিয়ে 'বরযাত্রী' সেদিন বেঁচে গেল।

ইডেনকে ভুলতে পারিনি

কলকাতার প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূরে তিনি চলে গিয়েছিলেন। শুনছিলাম, পুরোনো কলকাতার কত স্মৃতি তাঁর মনে ছবি হয়ে বসে আছে। অথচ ক'দিন আর কলকাতায় থেকেছেন! তবু ওরই ভেতরে ইডেনকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। বলছিলেন, কলকাতার ইডেন সত্যিই তাঁর কাছে ইডেন, স্বপ্ন-কানন, মায়াকানন যাই বলা যায় না কেন। এখন অবশ্য সেসব নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে তিনি পেয়ে এসেছেন তাঁর কলেজ-জীবন থেকে। যখন তিনি আই-এ পড়েন। শিবপুর থেকে গঙ্গা পার হয়ে পায়ে হেঁটে কলেজে আসা-যাওয়া করতেন।' রাস্তা অনেকটা। তবু দূর মনে হ'ত না, ওপারে গিয়ে কলকাতার নানা রাস্তার সঙ্গে পরিচয় নিতে নিতে কলেজে যেতেন। আর এই যাত্রা পথেই যেতে যেতে একদিন [illegible] ইডেনকে দিতেন। যেদিন কলেজের ক্লাস কম থাকত বা সকাল সকাল ছুটি হয়ে যেত সেদিন বেশ ঢালাও সময় দিয়ে দিতেন ইডেনকে। তাড়াহুড়ো ছিল না। কাছেই ছিল গঙ্গার ফেরীঘাট—চাঁদপাল ঘাট। সেখানে স্টিমারের বাঁশি বেজে উঠলেই গিয়ে উঠার সময় থাকত যথেষ্ট। তাই ইডেনের সময় কমাবার দরকার ছিল না।

বললেন, ইংরেজদের গালাগাল দাও, আমিও তার সঙ্গে দুটো জুড়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা আর সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রশংসা একমুখে করা যায় না।

যে ঋতুতেই হোক ইডেন ছিল নন্দনকানন। তরতরে আঁকাবাঁকা ঝিল—কৃত্রিম উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমির উপরে ছোট বড় মাঝারি ধরনের নানা প্রকারের গাছ, কচিৎ কুঞ্জ, কৃত্রিম অরণ্য, মাঝে মাঝে পাথর পুঁতে নানা ধরনের পাহাড়ী গুল্মলতা দিয়ে সাজিয়ে কৃত্রিম পাহাড় সব মিলিয়ে একটা অপূর্ব মাধুর্য যা বলে তিনি শেষ করতে পারেন না। তাঁর সেখানে কয়েকটা পেয়ারের জায়গা ছিল—ঝিলের ধারে কোন বেঞ্চ বা তৃণাস্তরণ। গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত, সব ঋতুর সাজ পরেই মোহিনীরূপে দাঁড়িয়ে থাকত ইডেন।

কিন্তু তাঁর সে যুগের কলকাতার সঙ্গে, তাঁর সে যুগের ইডেনেরও মৃত্যু ঘটেছে। এখন যা আছে তা শতাব্দীর ফসিল। তার শবদেহটাকে খানিকটা খুবলে নিয়েছে রেডিও অফিস, খানিকটা স্টেডিয়াম।

বলছিলেন। বলতে বলতে প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

বললেন, ভাবি, বাঙালীর সৌন্দর্যজ্ঞানটা কি আসলে ইংরেজদের কাছ থেকে ভাগ করা ছিল, যাওয়ার সঙ্গে শোধ করে দিয়েছে।

সামান্য থেকে অসামান্যে

যে কোন শিল্পী বা লেখকের পক্ষেই অতি সাধারণ যে কোন বিষয় থেকে শুরু করে বিষয়ের গভীরে গিয়ে সেই বিষয়কে অসামান্যের স্তরে উত্তীর্ণ করা এক বিশেষ গুণ সন্দেহ নেই। সব লেখক বা শিল্পীর ভেতরে তা থাকে না। এখানেই এদের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় উক্ত গুণের অধিকারী। যে কোন সামান্য বিষয় থেকেই তিনি বিষয়ের গহীন অন্তরে যেতে পারতেন: শুধু লেখার সময়েই নয়—কথা বলতে বলতেই কথার মধ্যে সামান্য থেকে বিশেষ এক জায়গায় চলে যান। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবোধ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের অনুসন্ধানী একটি মন। তা না হলে 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি'-র মত এমন সাদামাটা বিষয়কে তিনি কি করে এত গভীরতায় পৌঁছে দেন। কি করে বিন্দুমাত্র ঘটনা বা কাহিনী গুণ না রেখে শুধুমাত্র ভাষা দিয়ে তিনি পাঠককে টেনে নিয়ে যান।

আর যে কথা না বলে বিভূতিভূষণকে অশ্রদ্ধা করা হয় তা হল তার সংযমী আবেগ। তিনি কোথাও আবেগে ভেঙে পড়েন না। যে কথা বলার কথা, যে কথার দ্বারা গভীরতায় ডুবে যায় চরাচর, তিনি কেবলমাত্র সেইটুকুরই আশ্রয় নিতেন। কোথায় থামতে হবে তিনি তা জানতেন। তিনি অতিরিক্ত নস্টালজিক অনুভূতিতে ডুবে যান নি, হন নি ঘটনার মায়াজালের শিকার, তিনি পাঠককে যাদুকাঠি দিয়ে ঘুম পাড়ান নি, কিন্তু দিয়েছেন যা তা বাংলা সাহিত্যে অন্য এক মাটিঘেঁষা সুর। একইসঙ্গে জীবনের সত্যকে কখনো সিরিয়াস চোখে কখনো তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকে নতুন করে দেখেছেন। তাই তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলোকে দেখে আমরা কাঁদি কখনো হাসি, কখনো মজা পাই আবার কখনো বা রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু একেবারে ফেলে দিতে পারি না। [illegible]

গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

মনোরঞ্জন বসু

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় গদাধরের শুদ্ধাভক্তি সাধন পরবর্তীকালে তাঁকে দিব্যাচারী তন্ত্র সাধনার পথ খুলে দিল, বাৎসল্য, মধুরভাব প্রভৃতি পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে তিনি অদ্বৈতবাদের চরমতত্ত্বে উঠলেন—সাধনার সব দিক শেষ করে সিদ্ধসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম, জোরাস্থ্রীয়ানাবাদ, প্রভৃতির মূল্য কথা নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন। ফলে তাঁর দিব্যদৃষ্টি ধর্মবিশেষের সূত্র বিশ্লেষণের মধ্যে সীমিত ছিল না, জীবন দিয়ে যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, চিত্তের বীক্ষণাগারে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অভিজ্ঞ সাধকদের অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি যা পরীক্ষা করেছিলেন, তা কেবলমাত্র ব্যক্তিমুক্তির জন্য নয়—সমগ্র বিশ্বের কল্যাণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এ-সব ছাড়াও রামকৃষ্ণ সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর মৌলিকতায়। পূর্বে ধর্মাচরণ করেন নি, অনুভব বা অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্রবিন্দু, ঈশ্বরোপলব্ধির মাপকাঠি। তাঁর সাধনা যতক্ষণ প্রত্যক্ষ রাজ্যে প্রবেশ না করত, ততক্ষণ তিনি অন্বেষণ চালিয়ে যেতেন, অপরোক্ষ অনুভূতিতে তাঁর অন্বেষণের সমাপ্তি। ভাব-সাধনা থেকে তিনি উঠেছিলেন বস্তুরাজ্যের সূক্ষ্মতম স্তরে সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শক্তি-মহিমার মূল উৎস জ্যোতি সমুদ্র—ব্যক্তি মুক্তির স্তর ফেলে দিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-রূপে। 'যত মত, তত পথ'-র আবিষ্কারক, 'সর্বধর্মসমন্বয়'-র বাণী উচ্চারণ করলেন বাংলার (দক্ষিণেশ্বর) এক অখ্যাত জঙ্গল থেকে, সে বাণী ধ্বনিত হল আসমুদ্র হিমাচল, বিস্তার লাভ করল ভারত-তথা-সমগ্র বিশ্বে। তিনি আহ্বান করলেন ভাবীকালের মনুষ্য সমাজকে, ভারতকে তিনি বিবেকানন্দের মুখ থেকে শোনালেন,

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ব্যবহার ভূমিতে 'শিবজ্ঞানে' জীবের 'সেবাই' রামকৃষ্ণ সাধনার পরিণতি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, সাধন বলতে কেবলমাত্র অনুভব, অভিজ্ঞতা, অধ্যাত্ম রাজ্যে বিচরণ ও দিব্য-শক্তির অধিকারী হওয়া নয়। ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লোকহিতের জন্য যে কোন কর্মই সাধন বলা চলে। তাই একজন প্রকৃত শিল্পী, বিজ্ঞানী, তত্ত্ববিদ, সমাজসেবী এবং প্রেমিক সাধারণ অর্থে তার তার রাজ্যে প্রত্যেকেই সাধক। আধ্যাত্মিক রাজ্যে সাধক রামকৃষ্ণের অনুভব 'ভাবমুখে থাক, ব্যবহার ভূমিতে প্রচলিত জীবে দয়ার পরিবর্তে 'শিব জ্ঞানে জীবের সেবা',—এই সংক্ষিপ্ত কথাটিই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এমন পরিবর্তন এনেছিল যে, ঐ বাক্যটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। লক্ষ্য, ঐ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এই রূপায়নের অবশ্যম্ভাবী ফল হল সমাজ-জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং সাধক রামকৃষ্ণের লোকগুরু পদে উত্তরণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে অধিষ্ঠান।

এখানে প্রশ্ন, লোকগুরুর লক্ষণ কি? কাকে আমরা লোকগুরু বলব? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারায়ই বলা যায়, ক্ষুদ্র স্বার্থপর আমিটা ধ্বংস হয়ে যার মধ্যে বিরাট ভাবমুখী আমি প্রকাশ পেয়েছে, দশের কল্যাণ খোঁজাই যে 'আমি'র স্বাভাবিক বিকাশ, তাঁর মধ্যেই লোকগুরুর লক্ষণ দেখা যায়। তাছাড়াও ঐ বিরাট ভাবমুখী আমিটার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম-জিজ্ঞাসু ও তাপিত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে ছুটে আসেন, যেমন ফুল ফুটলে ভ্রমরদের ভিড় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গোটা জীবনটাই স্বাভাবিকভাবে দশের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। মানুষকে তিনি শিবদৃষ্টিতে দেখতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মানের মাপকাঠি দিয়ে মানুষকে তিনি বিচার করতেন না। তাঁর মধ্যে এমন এক সমদর্শিতা ছিল যেখানে বিভেদের কোন অবকাশ ছিল না। ঠিক যেমন মনুমেন্টের উপরে উঠে দেখলে নীচের তিনতলা, চার-তলা বাড়ী উঁচু গাছ ও মাটির ঘাস সব এক হয়ে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে এমন এক স্তর থেকে দেখতেন যেখানে উচু-নীচুর কোন ভেদ থাকে না। ঐক্য বোধই ভাবতীয় সাধনার মূল কথা, ঐক্যের দৃষ্টিতেই বৈচিত্র্য অর্থপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়।

দীর্ঘদিন ত্যাগ তপশ্চর্যার ফলে সাধক রামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র অহং বুদ্ধি একেবারে চলে যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরের জন-কল্যাণ সাধন-রূপ নিত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন বর্তমান যুগের ধর্ম-গ্লানি-নাশের নূতন বিরাট কাজ তাঁর শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপ করে সাধিত হয় এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন,

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নেই, সেখানেই দল বা নানা আগাছার উৎপত্তি হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে সাধক আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য বলে মনে করে নি[illegible] হয়ে বসে থাকে, সেখানেই দল, গ[illegible]ন্ধ সম্ব[illegible] এসবের জন্ম। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সব সময় লক্ষ্য ছিল পাছে নরেন্দ্রনাথ কাল ধর্ম প্রভাবে দ্বারাপুত্র, সম্পদ ও লোকহিত প্রভৃতি কোন রূপ বন্ধনকে স্বীকার করে অপূর্ণতা বরণ করে, কারণ ঠাকুরের মতে নরেনই ছিল অতি উচ্চ স্তরের আধার, যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-কল্যাণের কাজ হবে। নরেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন কেশব (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) একটা বিশেষ শক্তির উৎকর্ষে পৃথিবী খ্যাত হয়েছেন, নরেন্দ্রের মধ্যে ঐ ধরনের আঠারটা শক্তি পুরোমাত্রায় আছে। কেশব ও বিজয়ের (শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) অন্তর দীপ শিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে [illegible], কিন্তু নরেন্দ্রের ভিতরে জ্ঞানসূর্যের উদয়ে সেখান থেকে মায়ামোহের লেশমাত্র দূর হয়েছে।

তা ছাড়াও শৈশব থেকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায় যা আকর্ষণীয়। দৈহিক বিকারের মূল মানসিক ভাবসমূহের এক থেকে অন্যে ছড়িয়ে পড়া একটু লক্ষ্য করলেই ধরা যায়। কারণ একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-রূপ সমগ্র জগৎ বাঁধা আছে, এটাই ঋষিদের অনুভব। রামকৃষ্ণের সে অনুভব হয়েছিল। ফলে ঐ সময় যারাই শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন; তাঁরাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, তাঁদের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিত, আবার কারও কারও মধ্যে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উদয় হত। অতএব, লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুত্ব ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত। বাল্যকালে কামারপুকুরের সাধারণ মানুষ ঠাকুরের গুণাবলীতে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর অভাব তাঁরা সব সময় অনুভব করতেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মাভিমানী কৃষ্ণকে গ্রহণ, প্রধান রক্ষক ও সহায়ক হিসেবে ঠাকুরের প্রতি সেবাপরায়ণ মনোভাব, রামকৃষ্ণের জীবনে বিশেষ অর্থপূর্ণ। সাধক জীবনে রামকৃষ্ণ একাধিক গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন। মন্ত্রগুরু এক হলেও শিক্ষাগুরু একাধিক হতে পারেন। শাস্ত্রে এ ধরনের নজীর আছে। কেনারাম চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুফী সাধক গোবিন্দ রায় পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিক্ষাগুরুই পরবর্তীকালে তাঁর কাছ থেকে সাধনার নতুন আলো পেয়ে নিজেদের সাধনার পূর্ণতার পথে গিয়েছিলেন। শিক্ষাগুরুদের মধ্যে ভৈরবী যোগেশ্বরী, তোতাপুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবার উপরে রাখাল, নরেন্দ্রনাথ, কালী প্রভৃতি বারোজন যুবক (শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য) রামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে এনে এক নতুন সমাজসৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই বারোজন শিষ্যই রামকৃষ্ণ সাধনার মূল স্তম্ভ ও মূর্ত প্রকাশ। তাছাড়াও রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মহারাজের সাংগঠনিক প্রতিভা, নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) দীপ্ত, দৃপ্ত আহ্বান ও মর্মস্পর্শী বাগ্মিতা, কালী মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দ) সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য ও বৈশ্লেষণিক দক্ষতা ও অন্য সকলের ত্যাগ, ধৈর্য ও নিষ্ঠা সবই অসাধারণ। শিষ্যদের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম শক্তির প্রকাশ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ঐ মানুষটির চুম্বক শক্তিকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে এক নতুন প্রেরণা দেখা দিল। তাছাড়াও নাগ মহাশয়, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গৃহী হয়েও নিরাসক্ত জীবনের এমন এক আদর্শ রেখে গেছেন যা আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পূর্বোক্ত 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা-র উৎস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করে 'রামকৃষ্ণ মনন' শেষ হবে। ঠাকুরের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার সত্য প্রিয়তা ও শ্রদ্ধাভক্তি শতগুণে বেড়ে গেল। ১৮৮৪ খ্রীষ্ট কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একদিন বৈষ্ণবধর্মের মূল সম্পর্কে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর রাম-

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেতদাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৪৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন : ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

কেশবচন্দ্র সেন

স্বামী বিবেকানন্দ

কৃষ্ণের কথাবার্তা হচ্ছিল।। বৈষ্ণবধর্মের সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, 'নামে-রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন'। তিনি আরও বলতে লাগলেন, নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বক্ষণ অনুরাগের সঙ্গে নাম করতে হবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভিন্ন জেনে সর্বদা সাধুভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা, বন্দনা করতে হবে। কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার, এ-কথা হৃদয়ে ধারন করে 'সর্বজীবে দয়া'—এ-কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরম সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন, কিছুক্ষণ পরে অর্ধ বাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, 'দূর শালা! দয়া করবার তুই কে?' না, না, জীবে দয়া নয়, 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। ভক্তদের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি তাঁর গুরুভাইদের বললেন, কি অদ্ভুত ছায়াবিহীন আলো আজ ঠাকুরের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল মধুর কথা ঠাকুর আজ শোনালেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার ধর্ম সব ত্যাগ করে বনে যেতে হবে এবং ভক্তি-ভালবাসা প্রভৃতি মনের কোমল ভাব সকল মন থেকে। চিরতরে দূরে ফেলে দিতে হবে—এ-কথাই শোনা যায়। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন তাতে বোঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন করতে পারা যায়।। ভারতের প্রাচীন আরণ্যক সাংস্কৃতির নব-রূপায়ণ হল, সন্ন্যাসী ও গৃহীর ব্যবধান ঘুচে গিয়ে নতুন সম্বন্ধ সূত্র স্থাপিত হল, গৃহী মুক্তি পথের সন্ধান পেয়ে মনে নতুন জোর পেল, ভারতীয় সমাজ নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হল।

শুধু তাই নয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেদিনের ঐ কথায় ভক্তি পথেরও নতুন দিক খুলে গেল। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হলে পরাভক্তি সাধকের আয়ত্তে আসে। রাজযোগ বা কর্ম নিয়ে যারা এগিয়ে যান তাদের কাছেও ঠাকুরের ঐ বাণী পথ দেখাবে। কর্ম না করে দেহী এক দণ্ডও থাকতে পারে না, তখন কর্মীর পক্ষে শিব-জ্ঞানে জীবের সেবাই একমাত্র কাজ। নরেন্দ্র-নাথ সেদিন সংকল্প করলেন ঈশ্বর যদি তাঁকে (নরেন্দ্রনাথ) সুযোগ দেন তবে ঠাকুরের ঐ কথাই তিনি সর্বত্র প্রচার করবেন—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকলকেই কর্মের মধ্য দিয়ে ঐ বাণী তিনি শোনাবেন।

সাধক রামকৃষ্ণের ভাবমুখে থাক—আধ্যাত্মিক অনুভব বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের মধ্য দিয়ে শিবজ্ঞানে জীবের সেবায় মূর্ত হল। ভারতের সমাজ-চেতনায় এক নতুন সাম্যবাদের ভিত্তিস্তর স্থাপিত হল। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলার পথ প্রশস্ত করল। বর্ণভিত্তিক জন্মগত জাতিভেদের অচলায়তন ভেঙে গেল। স্ব-ধর্মকে কেন্দ্র করে গুণ ও কর্ম অনুসারে, মূল্য-বোধে অনুপ্রাণিত, মানবতাভিত্তিক এক নতুন বিশ্বচেতনার সূত্র আবিষ্কৃত হল।

এখানে প্রশ্ন, বর্তমান অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজ-চেতনার দ্বান্দ্বিক ধারায় পূর্বোক্ত চিন্তার অবকাশ কোথায়?

উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নটির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এর সমাধান পাওয়া যায়। যৌক্তিক ধারায় দ্বন্দ্বই যে অভিব্যক্তির একমাত্র নির্দেশক, এবং অভিব্যক্তি যে নীচের তলা থেকে আরম্ভ হতে হবে, এ-কথা পুরো সত্য নাও হতে পারে; ভাব-চেতনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে তথা ও মূল্যবোধের সমন্বয় এবং সেইসঙ্গে পূর্ণ মানুষের ধারণা কি অবাস্তব? পূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক দ্বন্দ্বের অবসান কি একেবারে অসম্ভব? বর্তমান প্রবন্ধে এ-সব বিষয় আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এখানে এটুকু বলা যায় মানুষের চেতনা এখনও সীমিত দেশ-কালের গণ্ডীতে বদ্ধ এবং চেতনার অভিব্যাপ্তির শেষ কথা বলবার দিন এখনও আসেনি।

বর্তমান বণিক-বুদ্ধি চালিত, রাজনীতি-সর্বস্ব সমাজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত অনুভব 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' এক নতুন পথের নির্দেশ দিতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের অধ্যাত্ম-চেতনার নব-রূপায়ণ, লোকহিতকর কর্মযজ্ঞের অনু-সন্ধান, বিভ্রান্ত ভারতকে স্বগৃহে ফিরিয়ে

বিয়ার গীত

সুবিমল বসাক

ঢাকায় প্রচলিত বিয়ের গানকে 'বিয়ার গীত' বলা হয়। কেবল ঢাকা নয়, সমগ্র ঢাকা জেলায় 'বিয়ার গীত' বলে প্রচলিত—তা সবই বিয়ের সময়ে গাওয়া হয়। বিয়ার গীতের পেছনে কোন কারণ বা তত্ত্ব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বস্তুতঃ এই ধরনের গান বা গীতের পেছনে কারণ থাকেই। মুখ্যত, এগুলো সবই আনন্দ বা উল্লাসের জন্য গাওয়া হয়। বিয়ের উৎসবকে আরও শ্রী ও আনন্দমণ্ডিত করে তোলাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া, বিয়েতে গান গাওয়া একটা রেওয়াজ ছিল এবং একে বিয়ের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ধরা হতো। অর্থাৎ গীত ছাড়া বিবাহ উৎসব কল্পনার বাইরে ছিল। এইসব গানে তখনকার কাল, যুগ, পরিবেশ ইত্যাদির একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, তখনকার সমাজের সহজ সরল অনাড়ম্বর অনুভূতির রেশ এইসব 'বিয়ার গীতে' উপস্থিত থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ ভঙ্গি ও রীতি সম্পূর্ণ পৃথক। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের উচ্চারণগত পার্থক্য আছে। কেবল ভঙ্গি ও রীতি নয়—মূলতঃ উচ্চারণ ধ্বনিও একেবারে পৃথক। এইসব গীতে তাই উচ্চারণগত পার্থক্য স্বভাবতঃই লক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলা—বরিশাল, খুলনা, পাবনা, রাজশাহী, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণগত পার্থক্য প্রভূত বর্তমান, এবং প্রতিটি জেলার নিজস্ব রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'বিয়ার গীত' রচিত হয়েছে—

যার মাঝে ধ্বনিগত, উচ্চারণগত এবং শব্দগত ব্যবধান আছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রতিটি ভাষায় বিয়ার গীতের আবেদন ও সুর প্রায় একই ধরনের। যাই হোক, এছাড়া শব্দের উঁচুনীচু আছে, বিভিন্ন অর্থ আছে। যেহেতু সমস্ত 'শব্দ' পুঁথি থেকে আহরিত হয়নি, তাই তাদের এক অর্থ হয় না। এক স্থানের শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ, অন্যস্থানে প্রায় অর্থহীন, কিংবা বিপরীত। যেমন, পূর্ববঙ্গে ঢাকায় 'হ্যালো' শব্দের অর্থ রোগা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই শব্দের অর্থ একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। বহু শব্দ এরকমই বিশেষ এক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ফলতঃ সেই শব্দের অর্থও সীমাবদ্ধ থাকে। আমি মূলতঃ এখানে ঢাকা শহরে প্রচলিত 'বিয়ার গীত' আলোচনা করছি।

পৃথিবীর সর্বপ্রকার লোকসঙ্গীতের মত বিয়ার গীতও চলে এসেছে সকলের মুখে-মুখে। লোকসঙ্গীতের যেমন কোন উৎস-ইতিহাস নেই, নেই রচয়িতার নাম, কোনো পাণ্ডুলিপি—কেবল ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে লোকেদের মুখে মুখে। ব্যক্তি-পরম্পরায় সচল থেকেছে জীবনধারা, জেগে উঠেছে নতুন করে। বর্ষিয়সী রমণীবৃন্দ গানের মাধ্যমে দিয়ে গেছেন উত্তরসূরীদের। বেঁচে আছে এইভাবে। 'বিয়ার গীত'ও এইভাবে প্রাচীনদের মুখ থেকে লাভ করেছে নবীনার দল, নবীনারা দান করে গেছে পরবর্তী বাহকদের। চলে এসেছে এইভাবে বিয়ার গীত। লোকসঙ্গীত অধি-

এবং নানাবিধ উৎসবাদিতে প্রচলিত গানে। ভেবে-চিন্তে, পূর্ব নির্দিষ্ট কিছুই হয়তো স্থির করা হয়নি, বহু গানই আকস্মিকভাবে রচিত। কারও বিয়েতে হঠাৎ তৈরী গীত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। একটি বিবাহ বাসরে আমি একজন প্রেমের সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, যার বিয়ের সময় রচিত হয়েছিল গীত, এবং তা ধারাবাহিক চলে এসেছিল। আকস্মিকতায় ভরা সেই মুহূর্তে, প্রৌঢ় মৃদু হাস্যে তার স্ত্রীর দিকে চেয়েছিলাম, যার মুখশ্রী তখন নব-বধূর মত রাঙা :

আলালো তরা দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ না চ্যায়া
যায় সতীন জামাই
অ্যাইলা জামাইয়ের ল্যাইলা বউ
বুড়া জামাই চায় না বউ
আলালো দ্যাখ্ দ্যাখ্....
তিরিশ বছরের পাঠার সাথে পাঁচ বছরের পাঁঠির
কিবা শোভা পায়
আলালো....
এল-এ বি-এ ফেল হয়েছি
এত টাকা পাইবো কই
আলালো দ্যাখ্ দ্যাখ্...

তাই বহু লোকসঙ্গীতে আচার-বিচার সামাজিক চেহারাও ফুটে ওঠে।

প্রবন্ধে উল্লেখিত গান সবই ঢাকা শহর ও শহরতলীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও ঢাকার বিয়ার গীত; তবুও এক সুর সার্বজনীন, এর আবেদন সর্বকালীন। কেবল মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করলে সহজেই অন্য দেশের গান বলে অভিহিত করা চলে। এবং এইসব লোকাচারে ব্যবহৃত সঙ্গীতে প্রায় একই ধরনের মূল সুরের আভাস থাকে। তাছাড়া, এইসব গানের অকৃত্রিমতা, অনাড়ম্বর শব্দচয়ন, গভীর দ্যোতনা এবং সরল ভাব সহজে হৃদয় স্পর্শ ও মনকে আকৃষ্ট করে।

প্রসঙ্গত, আরো কিছু তথ্য-বিবরণ জানানো প্রয়োজন বোধ করি। এই ধরনের লোকাচারমূলক গানে পটভূমির একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। ঢাকা শহরে বহু বসাক ও সাহা পদবীধারীর বাস। এঁরা অধিকাংশ বৈষ্ণব—পরম্পরা সূত্রে। এঁরা গলায় কণ্ঠিধারণ করেন, গুরুমন্ত্র গ্রহণ করার পর গোঁসাইয়ের নাম জপ করে থাকেন। তাই, ঢাকায় লক্ষ্মীনারায়ণ জী, মদনগোপাল জী, এই সব নামধারী ঠাকুরের মন্দির ও মূর্তি আছে। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসপূর্ণিমা, দোলযাত্রা উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিয়ার গীত এই সব বিগ্রহ-ঠাকুরের মূর্তি কল্পনা করে রচিত। গানে বর-কনেকে কখনও রাম-সীতা, কখনও কৃষ্ণ-রাধা, কখনও বা রাধা-শ্যাম রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং গীতে ব্যবহৃত হয়েছে

বাহুল্য—যা স্বভাবতই প্রতিটি লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায়—বিয়ার গীতেও তার স্বাভাবিক উপস্থিতি বর্তমান।

বসাক সাহা রায় কর্মকার পাল দে ঘোষ আরো অন্যান্য পদবীধারীদের মধ্যেও বিয়ে উপলক্ষে গানের প্রচলন ছিল। অহিন্দুদের বিয়েতেও গানের রেওয়াজ শুনেছি, যদিও তাদের গানের পদ, ভাবাভঙ্গি, ধ্বনি, উচ্চারণ—সবই ভিন্ন। তবুও মূল লক্ষ্য একই। ঢাকার সাহা ও বসাক পদবীধারীদের মধ্যে বিয়ের আচার-বিচার সামাজিক আচরণ প্রায় একই রকম। বিয়ের পূর্বে পাকা-দেখা, জব-লওয়া, অধিবাস, সোনান্দন, বিয়ে, বরজাগানি, বাসি বিয়া, শাখাগাঁথুনি, ফুলসজ্জা, দশমঙ্গল সবই আছে, আছে পুনর্বিবাহ এবং নানা ধরনের আচার-ব্যবহার, দেওয়া-থোওয়া, তত্ত্ব-তাবাস। বিয়েতেও একই ধরনের গানের ব্যবহার শুনে এসেছি।

বিয়ের পূর্ব দিন অধিবাস। ভোরবেলায় গান শুরু হয়—

ওঠোরে গোপাল ওঠো নন্দলাল
আর কি সময় ঘুমের আছে
মায়ে ডাকে ধীরে ধীরে
মাসী ডাকে মধুর সুরে

বরকে প্রাতস্নান করাবার পর কোরাধুতি পরানো হয়, তারপর নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদি চলে। তখন যে গীত গাওয়া হয়, তাতে বরের আত্মীয়রা পাড়া-প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানায় :

অধিবাস করাইতে আসো যত নারীগণ
আসমানের শোভা করে আসমানের তারা
নারায়ণের গলায় শোভা করে
বেলফুলের মালা
ভিন্না বস্ত্র ছাইড্যা নারায়ণ
পট্টবস্ত্র পড়

এবার সুর পাল্টে :

কালো-কালো ভ্রমরা-রে
তারপরে সারা
হাতে ধরে-লো ছত্র
মাথায় প্রাণের ধরা
সে'রে লইয়া যান ভোমরা
প্রতি এয়োর ঘরে
নারায়ণের মাসী-লো—কি করো ?
—ধান-দূর্বা-বাটা ভরি
নারায়ণের পিসীমা-লো—কি করো ?
—সোনা রূপা বাটা ভরি

ঠান্ডা হস্তে পরাইয়ো নারায়ণরে
শীতল হস্তে পরাইয়ো নারায়ণ-রে

কাঁচা কলায় পাইড্যা কাজল
ছাওয়াল নারায়ণ-রে পরাইয়ো
বিনাসুতে গাঁথিয়া মালা-লো
ছাওয়াল নারায়ণ-রে পরাইয়ো
বিনা জলেরে ঘষিয়া চন্দন লো
ছাওয়াল নারায়ণ-রে পরাইয়ো

এক পাখা উড়াইয়া যায়
আরেক ছায়া এঁয়োগণ
জানাইও নারায়ণের শুভকাম

জানাইও নারায়ণের শুভকাম

বিয়ের 'পাকা দেখা' অনুষ্ঠান হবার পর থেকেই উৎসবের সূচনা এবং গীত গাওয়া শুরু হয়। এর কোন সুনির্দিষ্ট সময়-গময় নেই। বিয়ের অনুষ্ঠানাদি করার ফাঁকে ফাঁকে, পিঁড়ে চিতি (আঁকা) করতে করতে, চার-পাঁচজন মহিলা একত্রে জমায়েৎ হলেই গীত গাওয়ার ধুম ওঠে। এর জন্য অবশ্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। গীত বিবাহ সম্পর্কিত হলেই হলো। কনের বাড়ির গীত-শিল্পীরা কনের গুণাপনার প্রকাশ সহ বরের নিন্দাসূচক গানও করে থাকেন। অপর পক্ষও তাই। গীতের জন্য সঙ্গীত-শিল্পী সন্দেহাতীতভাবে বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। বিবাহ উৎসবে অনুষ্ঠানে এঁদের উপস্থিতি যে নির্ভরযোগ্য ভাবে বাঞ্ছনীয়, বলাবাহুল্য। কেউ একজন গীতের ধুয়া তোলে, তারপর অন্যান্য উপস্থিত মহিলাবৃন্দ গলা মিলিয়ে সমবেত কণ্ঠে কোরাস গেয়ে ওঠে।

বিয়ের গানে, বিশেষ করে কনে ও বরের (ম্যায়া-জামাইর) রূপ বর্ণনা করা হয়। ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত বিয়ে, বিশেষতঃ বসাক পদবীধারীদের, শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। অনুরূপ ভাবে রাজসাহী বা দিনাজপুর বাসীদের মাঝেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যাই হোক, মেয়ের বা ছেলের বিয়ে একই শহরে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে আত্মীয়-কুটুম্বের স্বজন সংখ্যা বেশী হয়ে পড়া আশ্চর্য নয়। এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে পরস্পরের মধ্যে ক্ষীণ সূত্রের সংযোগ পাওয়া যেত। ঢাকার হাট থেকে বনগ্রাম, কলতা বাজার থেকে উষারী, মুগীনগর থেকে নবাবপুর কিংবা বড়লোব মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বা ধামরাই অবধি সীমাবদ্ধ। বিয়েতে বরের সঙ্গে বরযাত্রী রূপে নারিরাও পুরুষদের সঙ্গে অবাধে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, বরযাত্রী যতজন যাক না কেন, তাঁদের ভোজন বরের ঘর থেকেই যায়। বলা হয়—সাজু। সম্ভবতঃ 'সাজানো' শব্দ থেকে নেয়া। নারী বরযাত্রীরা সাধারণতঃ বরের বোন, বৌদি, দিদিমা, বান্ধবী, আত্মীয়া হয়ে থাকে। এবং গীত এদের মাঝ থেকেই শুরু হয়। বিয়ে বাড়িতে কনের তরফের গানের প্রতিবাদ স্বরূপ বর-পক্ষের মহিলারা গেয়ে ওঠে। কিংবা বরের রূপ গুণও তারা গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। বরের বাড়িতে সাজগোছের সময় দেখতে আসে, তখন—

চল না সখি দেখিয়া আসি
রাম সাজনের বাকী কি ?
ধুতি দিয়া সাজাইয়াছি
চান্দর মাত্র রেখেছি।
চল না সখি দেখিয়া আসি
রাম সাজনের বাকী কি ?
চান্দর দিয়া সাজাইয়াছি
মালা মাত্র রেখেছি।
চল না সখি দেখিয়া আসি...

বর সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়েছে কনের বাড়ি। ডুলি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে কনের বাড়ির সদরে। কন্যাপক্ষরা ছুটে এসেছে বরকে নিতে। শাঁখ, লোকার (উলুধ্বনি) দিতে দিতে এয়ো-নারীগণ ছুটে এসেছেন। এ রকম সময়ে একজন গীতের ধুয়া তুলবেই, অমনি অন্যান্যদের কণ্ঠে :

আগো গো-পি-নী—বিচিত্র মন্দিরে দেখ হরগৌরী
এক লক্ষ সানাই বাজে,
নব লক্ষ ঢোল বাজে
আ-গো—বিচিত্র মন্দিরে দেখ হরগৌরী

দক্ষ রাজার কন্যা দুর্গাবে শিবে করে বিয়া
আগো—বিচিত্র মন্দিরে দেখ হরগৌরী
কানে সোনা ঝলমল করে
মাথায় মটুক লড়ে

আগো—বিচিত্র মন্দিরে দেখ হরগৌরী

আবার তাঁরাই বরযাত্রীদের গালাগাল দেয় গীতের মাধ্যমে। এই গালাগালও বিয়ার গীতে ব্যবহৃত হয়। কখনও-সখনও তা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। বরকর্তাকে তখন কন্যার-মাসী-পিসী-বেয়ান —কর্কেরা ঠেস মেরে গেয়ে ওঠে :

আইছে আইছে কলুর বৈল্
কুষ্টাবে১ খাইতে দে-রে
ভুষির থৈল

পাঁচ-সাত দিন পরে দিব
মাথায় ঘইরযার থৈল
অঘলারা২ থাকস্ তারা
আ-রে কলুর বৈল

মাগীর দোবড়া পিনছস্-রে কুষ্টা
দে-রে জোতা মাইর‍্যা
আইছে আইছে কলুর বৈল
কুষ্টাবে খাইতে দে-রে ভুষির থৈল।

এই গীত বরযাত্রীরা সহজে হজম করে না। এরাও পাল্টা আক্রমণ করে। বরযাত্রীদের সঙ্গে আসা রমণীবৃন্দ তখন শুরু করেন :

সুবল বাবু বলি তরে
রাখাল বাবু বলি তরে
রুপার খাটের ভাপ্তি দিয়া
ম্যাষা নিকাশ করিলি-রে
কাম কইর‍্যা কাম ভাঙ্গালি-রে
শ্রাদ্ধের দান ধ্যান চালালি-রে
ভাপ্তি দিয়া তরা আবার নাক বোঁচা
ম্যায়া চালালি-রে

সুবল বাবু বলি তরে
রাখাল বাবু বলি তরে
যা কইর‍্যা যা ভালা করলি
উল্টা বদনাম তরা দিলি

কাম কইর‍্যা কাম ভাঙ্গালি
রুপার খাটের ভাপ্তি দিয়া
বোঁচা ম্যায়া গছাইলি রে

সুবল বাবু বলি তরে
রাখাল বাবু বলি তরে

বলাবাহুল্য রাখালবাবু ও সুবলবাবু কন্যাপক্ষের লোক। কন্যা-পক্ষরা নেহাৎ হজম করার পাত্রী নয়—বিশেষতঃ বরকে যখন তাদের বাড়িতে হাজির হতে হয়েছে। কন্যার রূপ-গুণের ব্যাখ্যান চলে এক প্রস্থ :

শোন-রে কুষ্টা তরে বলি
তর বরাটাট খুব ভালা রে
ঘায়া গরীব সব তে বুঝায়
মনে মনে ভাবো ক্যানে

এমন ম্যায়া আমরা দিলাম ব্যানিয়া নগরে
তোদের আন্ধার ঘর আলো করে
তোদের গৈবষ করা খাটবে না লো

তোদের এমন পোলা দিলি
অন্ধকারে চোহে দেহায় না
আমাদের এমন ম্যায়া দিলাম
অমাবস্যা ঘর আলো করে
শোনবে কুষ্টা বলি তরে....

একে বলা চলে বঙ্গগীত। বিয়েতে এ ধরনের গীতও প্রচুর থাকে। একদিকে যেমন বিয়েতে বর-কনের রূপ-গুণ-বিয়ে ইত্যাদি কেন্দ্র করে, অন্যদিকে দেনা-পাওনা, সাজু-পারশ ইত্যাদি নিয়েও এ ধরনের ঠাট্টা-তামাশা-বিদ্রূপ মেশানো গীত থাকে। ভদ্রভাবে যতটা সম্ভব গালাগাল দেয়, কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় কোন রাগ-দ্বেষ-মনকষাকষি নয়। গীতের প্রত্যুত্তর গীতের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। জামাই'র দল উপরোক্ত গীত শুনে জবাব দেয় :

কি কয় রে বাচ্চা ঠক
তরা হইছস্ পুরা ঠগ্
কি কইর‍্যা তুক্ করলি তরা আমগো রে
সাধে কি কয় বাচ্চা ঠক্
তরা হইছস্ সত্যি ঠগ্

কি কইর‍্যা তরা ঠগালি আমগো রে
দুই ভাঁড় সোনা দিলি
টোপাটাপি বাসন দিলি
ঠকাইলি তরা আমগো রে—

কন্যাপক্ষরা তখন :

ম্যায়া বিয়া দিছি সকলির ঘরে
এমন বেহাস্তর ক্যাটালো করে
লাড়ু আনতে টাকা লাগে
গাছের ফুল কি ফোটে না
মালা গাঁইথতে জানস্ না
আয়লো কুড়ানিরা....

কন্যাপক্ষরা আবার :

রাসা বাজারের পুলের উপর দিয়া
মিনতি গেল পিছলা পইড়্যা
দুই চারিতো খালে পইড়্যা গেলো
পিক্কম দিয়া চায়া দ্যাখে
কুট্টিয়া লইয়া গেলো
এই টাকাতে এই সাজু
লায় না কোন বড়লোক
দ্যায় না কোন জমিদার লোক
গুগো বড় আগদারের বাসা
তপো মাগীগুলিন কুলাচারী

(১) বরকর্তার নাম।। নাম বিশেষে পরিবর্তন হয়ে থাকে।

ওগো শরম মাই ভড়ং ভাবি
দেইহা লাজে মরি।

কিংবা, দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে কন্যাপক্ষরা—

এক ম্যায়ার বিয়া দিছি
রসা ঘামারের গামছা দিছি
আরেক ম্যায়ারে বিয়া দিয়া

কি আবার দিমু গো—
শোনো শোনো রাখাল বাবু তুমি
বলি এতো তোমার গো—

তামাশা-বিদ্রূপ মেশানো এই ধরনের গীতে এক আলাদা মেজাজ লক্ষিত হয়। বরের বাড়ির গায়িকারা বিয়ের আসরে নেমে কন্যার দিদিমা, ঠাকুমার উদ্দেশ্যে :

কুথায় লো চুনাউলি
চুনের টিন কই রাখিলি
নিয়া আয় তড়াতড়ি
দিয়া যা সের চারি

বরকর্তাকে দেখে, তাঁর উদ্দেশ্যে কন্যাপক্ষরা—

ঐ আসছে নকুলবাবু
ঐ আসছে গোকুলবাবু
পাঁচ বছরের আশা তোমার
এতদিনে মিটলো
কালা কট্‌কইট্যা পোলার মিললো
টুকটুইক্যা ম্যায়ার সঙ্গেতে

ম্যায়ার মায় পড়ছে ঢুলে
পোলার বাপের রঙ্গেতে
কালা কট্‌কইট্যা পোলার মিলুলো
টুকটুইক্যা ম্যায়ার সঙ্গেতে

বরযাত্রিনীরা নেমেই খোঁজ করে—কনে কোথায়? এ-ঘর ও-ঘর খোঁজে। এ-কোঠা ও-কোঠা বিচড়ায়। তখন কনের বাড়ির গায়িকারা গেয়ে ওঠে :

হাথি সাজে আগ্‌দারে
ঘোড়া সাজে পিছ্‌দারে
কন্যা সাজে আমার মাকঘরের ভিতরে।

তারপর তারা কনে দেখে। কনে দেখে মোটেই খুশী নয়। সাজগোছ এ-সবে খুঁত ধরতে থাকে। এবং সেই ভাল-না-লাগা ভাবটুকু প্রকাশ করতে দেরি করে না বিন্দুমাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে ওঠে :

সীতার সাজন ভালা হইলো না
তোমরা সাজাইতে জানো না
সীতার সাজন ভালা হইলো না

কনের তরফের সবাই তখন বড় বিব্রত বোধ করে। কনের সাজগোছ ভালোই হয়েছে। যেহেতু, বরের তরফ সদা খুঁত ধরতে ব্যস্ত, তাই....। কনের সাজগোছ চূড়ান্ত ধরনের হয়েছে। বরের তরফের মনে বিশ্বাস এনে দিতে চায়। তখন গেয়ে ওঠে :

কাজল দিয়া সাজাইয়াছি
চন্দন দিয়া সাজাইয়াছি
ওলো, ম্যাঘে আন্ধার করে লো
ওলো, দেব্‌তা আন্ধার করে লো
ঝলমল্ করে লো
দ্যাখ দ্যাখ ঝলমল করে লো

কনের সাজগোছ এত সুন্দর হয়েছে যে তা দেখে মেঘ লজ্জা পেয়ে মুখ আন্ধার করে সরে যায়। বজ্র আঁধার মুখে দূরে লুকিয়ে পড়ে। কনের রূপ যেন ফেটে পড়ে, আলোর মত ঝলমল করে। তবুও, বরপক্ষ মোটেই খুশী হয় না। তাদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ভাল-না-লাগা ভাব। কন্যাপক্ষরা তখন গেয়ে ওঠে আবার :

ওগো রাজনন্দিনী
সাজিয়া দাও শরৎকামিনী—
সাজনের আর কি কি বাকী?
শাড়ি মাত্র আছে বাকী

সাজিয়া দাও শরৎকামিনী
সাজনের কি আর সময় আছে?
রাজনন্দিনী কুথায় আছে?
সাজিয়া দাও শরৎকামিনী
সাজনের ত সময় হইলো
রাজনন্দিনী কুথায় গেলো?
কুথায় আছে?

এ গীতে একপক্ষ প্রশ্ন করে, অন্যপক্ষ জবাব দেয়। অর্থাৎ, একই দলে দু পক্ষে ভাগ হয়ে যায়। কনের সাজগোছ যথারীতি শেষ হয়। চন্দন, কাজল, মালা, ঝরা, মুকুট, আলতা, সব সাজানো হয়ে গেলে মেয়ের রূপ প্রকাশ পায়। কন্যাপক্ষর বুকে বল নামে। তখন তারা আরো প্রকাশ করতে চায়। এবার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার নয়। তারা তখন বরপক্ষের গায়িকাদের উপদেষ্টা হিসেবে মনে করে।

শ্যামবাজারও নদীর ধারে
আরেক বাজার বন-ভিতরে

অগণিত শিক্ষকের প্রশংসাধন্য একটি প্রশ্ন-সংকলন
AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE QUESTIONS
FOR MADHYAMIK PARIKSHA Rs. 15/- only
• মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত অভিনব এক বই।
• বইটি তোমার সঙ্গী হলে পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাবেই।
• অনুশীলন করার মত এ বইয়ের তুলনা নেই।
ষোলো টাকা মানি অর্ডার পাঠালে রেজিস্ট্রী ডাকে বইটি পাঠানো হয়। সরাসরি যোগাযোগ করার

কৃষ্টচন্দর রাজার মিল্যা নতুন বাজার ভাইঙ্গা যায়
দিদি লো, নতুন সাজে কেমন দ্যাখা যায়।
থাকা-থাকা দেশী গয়না—পরছি সারা গায়
নতুন সাজে কেমন দ্যাখা যায়।
দিদিলো, নতুন সাজে কেমন দ্যাখা যায়।।

প্রসঙ্গতঃ একটি ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার মনে করি। বিয়ের সময় যে গানের প্রচলন, তাকে 'বিয়ার গীত' বলে। এ রকম নানা-বিধ অনুষ্ঠানে—জন্মাষ্টমীর মিছিল, রাসযাত্রা, ঝুলনে যে নানাবিধ গানের প্রচলন আছে, অনেক সময়ে বিবাহ-অনুষ্ঠানেও সেই গান ব্যবহৃত হতে শুনেছি। বস্তুতঃ, গানের মেজাজ যখন চরমে থাকে, তখন একের পর এক ক্রমাগত উজার করে দেয় ঝাঁপি।।

এবার বাতাস পাল্টায়। বিয়ের পিঁড়েতে পাত্রকে দেখে কন্যাপক্ষের পরিহাসের আগ্রহ জন্মে। কন্যার সাজগোছ নিয়ে তাদের বিদ্রূপ শুনতে হয়েছিল, সে-কথা স্মরণ করে তারাও তৎপর হয়ে ওঠে। তারা তখন পাত্রের সাজগোছের খুঁত বার করে—পাত্র কালো, কুরূপ। এতসব শুনে পাত্রপক্ষরা শুরু করে ঃ

কৃষ্ণ কালো কুকিল কালো
কালোয় কালো মিলা গেলো
এই য্যান কাপড় সবাই পড়ে
মাজার গুণে শোভা করে, গো—
এই য্যান বর্ণ ভালো
এই-না চান্দর সবাই পড়ে
গলার গুণে শোভা করে, গো—

এই য্যান বর্ণ ভালো
এই-না মালা সবাই পড়ে
গলার গুণে শোভা করে, গো—
কৃষ্ণ কালো কুকিল কালো
কালোয় কালোয় মিলা গেলো

এই য্যান বর্ণ ভালো
এই-না চন্দন সবাই পড়ে
কপাল গুণে শোভা করে, গো
এই য্যান বর্ণ ভালো
এই-না কাজল সবাই পড়ে
নয়ন গুণে শোভা করে, গো

এই য্যান বর্ণ ভালো
এই-না মটুক সবাই পড়ে
মাথার গুণে শোভা করে, গো
কৃষ্ণ কালো কুকিল কালো
কালোয় কালোয় মিলা গেলো....।

এখানে পাত্রের রূপের চূড়ান্ত প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। সকলেই সব কিছু ব্যবহার করে, পরিধান করে—কিন্তু, সকলকে কি তেমন মানায়? মানাবার ব্যাপারে শারীরিক গুণ থাকা চাই। পাত্রকে সব কিছুতেই মানিয়েছে। আর রূপ? কালো জগতের আলো! কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো—।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হবার পর আত্মীয়তার সূত্রে বাধা পড়ে। এবার বোঝাপড়া দুপক্ষেরই। তখন একই কণ্ঠে গেয়ে ওঠে দুই তরফ—কোন বিদ্রূপ নেই ঃ

ঢোল ঢগর বাজে রামের নগর, রামের নগর
কাস-করতাল বাজে সীতার বাসর
উত্তর শিরে থাকো রামেরে
দক্ষিণ শিরে ঘর

তোমার লাইগ্যা জুড়ছি কন্যা, উজাড়নি নগরে
বাড়ির পিছে ভালা গোয়াল, ভালা দধি পাতে
লো ভালা দধি পাতে
দধিমঙ্গল কইর‍্যা রামরে চরণ-যাত্রা করে
উজাড়নি নগরে কন্যা বড় টোনা জানে
বড় সন্ধি জানে

ফুলেরো মালা গাইথ্যা রামেরে সীতা বন্দী করে
উজাড়নি নগরে হারু
আর দিও না ঝাড়ু
জঙ্গলে ছুটিয়া দেওগো রাম যাক চলিয়া
কানে সোনা ঝলমল করে
মাথায় মটুক লড়ে

রাম সীতার বিয়া হইবো সেই-না জ্যোতির তলে—।

বিয়ের অনুষ্ঠান চলে। কন্যার সাত-পাক হয়। তারপর, পর্দা ঘিরে হয় শুভদৃষ্টি। সাতপাকের সময় বর দাঁড়িয়ে থাকে পিঁড়ের ওপর, কনেকে পিঁড়ের ওপর বসানো অবস্থায় প্রদক্ষিণ করানো হয়। উলু ও শঙ্খধ্বনি। বর-কনে পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায়, তখন গেয়ে ওঠে সমবেত পুরনারীরা ঃ

কালা চাঁন চাঁন চাঁন
চাঁনের বামে চাঁদবদনি দাড়াইলো
দাড়াইলো দাড়াইলো বাই
কাইল কদমের তলে
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া
রাইয়ের মাথায় বেণী
ওগো চূড়ায় করে ঝলমল ঝলমল
বেণী ধরে ফোঁণ
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ শ্যামের বামে
চাঁদবদনি দাড়াইলো
কালা চাঁন চাঁন চাঁন
চাঁনের বামে চাঁদবদনি দাড়াইলো

বিয়ের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাপন হয়। এরপর, বর-জাগানি।। বরকে ঘিরে সারারাত জেগে আনন্দ-উল্লাস। তখন কেবল রমণীদের রাজত্ব। কনের বোন, বান্ধবী, ঠাট্টা-রসিকতা সম্পর্কিত কুমারী-এয়োতী রমণীবৃন্দ বরকে ঘিরে রাখে। নানাবিধ আনন্দে, রসিকতায়, ঠাট্টায় বরকে সঙ্গদান করে। সারারাত জাগার চেষ্টা হয়। এই সময় শুরু হয় অন্য ধরনের গীত। বরপক্ষরা সর্বদা উচ্চাসনে থাকার চেষ্টা করে ঃ

ছিঃ ছিঃ মোরা লাজে মরি দেইখ্যা তগো কীর্তিকারখানা
কালা ম্যায়া নিয়া তরা নীলাম ডাকলি পাড়ায় পাড়ায়
কেউ তোদের দিল না সাড়া
বলি মোদের চরণ বন্দনা

ছিঃ ছিঃ মোরা লাজে মরি দেইখ্যা তগো কীর্তিকারখানা

কন্যাপক্ষরাই বা চুপ করে হজম করবে কেন? বিশেষতঃ, কন্যা-পক্ষের দল যেখানে ভারি, তদুপরি কন্যার বাসভবনে তারা। একজন বিদ্রূপ করে ওঠে ঃ

আমগো কালী যক্ষাকালী
নিন্দা করে বেরজী গালী
কালী তগো দিবো বলি

পাণে যাইকো চয়
তরা করস কালীর নিন্দা সব
তরা করস্ কালীর নিন্দা সব

এই কথা শুনে বরপক্ষের গায়িকারা তখন :

চল্ ক্ষীরোদা চল্ ক্ষীরোদা
চুপ চুপ ধীরে ধীরে
এসব কথা বলতে গেলে
চল যাই মোরা নদীর ধারে
চুপ্ চুপ্ ধীরে ধীরে—

কন্যাপক্ষরা—

এসেছো মোদের গরীব কুটিরে
বসে যা না গো মাটির উপরে

বরপক্ষ—

তোদের গৌরব করা খাটবে না লো
তোকে বিক্রী করবো ঘোড়দলে

চল ক্ষীরোদা চল ক্ষীরোদা
চল যাই মোরা খাল-পাড়ে

কন্যাপক্ষরা যতই মুখে বড়াই করুক, তাদের জানা, মর্যাদায় বরপক্ষের আসন উচ্চ। কন্যা উদ্ধারের ব্যাপারও আছে। অবশ্য কন্যাপক্ষরা অর্থশালী হলে তারা সে বিষয় নিয়ে গান গায়। বরপক্ষরা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে অন্যভাবে আক্রমণ করে :

আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট
কপাল গুণে গিয়া পড়ছি বড়ঘরে
সোনা—কুনোদিন চোখে দেখিনি
অত ভাঁড় সোনা দিয়া আমগো ঠগালি

আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট
কপাল গুণে গিয়া পড়ছি বড় ঘরে
টাকা কুনোদিন চোহে দেহিনি
অতো গুলান টাকা দিয়া আমগো ঠগালি
আমরা নেহাৎ.....
কপাল.....

মিষ্টি কুনোদিন চোহে দেহিনি
পচা মিষ্টি খাওয়াইয়া আমগো ঠগালি
আমরা নেহাৎ.....
কপাল.....
অগো নাম আছে ইণ্ডিয়ার মধ্যে
আমগো নাম আছে রাস্তাঘাটে
আমরা নেহাৎ.....
কপাল গুণে.....

বর-জাগানী অনুষ্ঠান রসিকতা, ঠাট্টা ইত্যাদিতে ভরে থাকে। কেউবা বরের পক্ষে, কেউ বা কনের পক্ষে গান শুরু করে। কনের পক্ষ বরকে বলে :

শোনগো আদরের সোয়ামী
শ্বশুর বাড়ী যাবো আমি
বাদামী ত্যাল মাথায় দিবো না
বাদামী ত্যালের সঙ্গে কেরাসিন ত্যাল মিশালো তাতে
সেই ত্যাল মাথায় দিলে আমার চুল পাকবো না

শোন গো আদরের সোয়ামী
শ্বশুর বাড়ি যাবো আমি
চাল আইন্যা চিনিগুড়া
তামুক খাইন্যা কালাজীরা
মোটা চাইলের ভাত আমার পাটে সইবো না
শোন গো আদরের সোয়ামী

শ্বশুর বাড়ি যাবো আমি
গুড়া মাছের কাটা ভারি
আমি নি গো খাইতে পারি
ইলশা মাছের গোটা চারি আইনো গো
শোন গো আদরের সোয়ামী
শ্বশুর বাড়ী যাবো আমি
হাটের যাইও বাজারে যাইও
আমার লাইগ্যা শাড়ি আনিও
মোটা শাড়ি আনলে পরে পড়তে পাড়বো না
শোন গো আদরের সোয়ামী
শ্বশুর বাড়ী যাবো আমি....

বৌ স্বভাবতই লজ্জায় নুয়ে পড়ে, অবশ্য মনে মনে খুশী। জামাইয়ের গায় ঠেলাঠেলি করে, রঙ্গতামাশা করে। জামাই'র গায় চিমটি কাটে, থোবড়া ধরে ইয়ার্কি করে। কেউ গেয়ে ওঠে,

মান কইর‍্যালো ও মাইল্যানি
ক্যানে কথা কইল্যা না।
কানে কথা কইল্যা না প্রাণ
ক্যানে ফিরা চাইল্যা না
শুনিয়াছি পরস্পরে
জামাইনিগো ভিক্ষা করে
এবার জামাই আইলে পরে
বলবো ম্যায়া ঘরে নাই
মাকাল ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল ভিতরে কালো
জবা ফুলের রূপ আলো
তাইতে ভ্রমর বসে না
মান কইর‍্যালো ও মাইল্যানি
ক্যানে কথা কইল্যা না—

বরকে উপলক্ষ করে—

অতি সোন্দরী পাইয়া
রামগোপাল করলো বিয়া
ঘরের বেসাত বেইচা
বাসনা, সার খাইছে ধুলার ক্রোড়ে

কনেকে উপলক্ষ করে—

কি টোনা করলি রে বাসনা
হে তব মুখ থিকা মুখ ফিরায় না
হাত চলে তো পাও চলে না
পাও চলে তো মন চলে না

কনে তার বান্ধবীদের প্রতি কপট রাগ করে। তখন :

হাসি-ঠাট্টায় দুই হান কথা
বাসনারে আমরা বলিতে চাই (২)
সে কথায় রাগ করিলে
পাছে কি হবে উপায় (২)

বর-জাগানী অনুষ্ঠানে কন্যাপক্ষদের বাজতর। অধিকাংশ গীতই কন্যা তরফের। বর-কে উপলক্ষ করে এই অনুষ্ঠানে নানাবিধ গীত গাওয়া হয়ে থাকে।

মুরগী গুলান দেখতে ভালো
মাথায় লাল [illegible]
অত্যন্ত ভালবাসিতে [illegible]
যাবে জাতের ক[illegible]
আইনা দাওগো তিলকমালা
দেখখোশ্ নবীন ছেল্লা

মড়া সাপে ব্যাঙ ধরিছে
তারে খাইলো সাপে

সাপেরে মারিতে গিয়া
লাঠি গেলো ভেসে
আইন্যা দাও তিলকমালা
দেলখোশ নবীন জ্বালা

বরের বন্ধুবান্ধব, ভগ্নিপতিরা থাকলে তাদেরও নিস্তার নেই। তাদের উপলক্ষ করে গাওয়া হয়

আঙুরের মুখে শুনছি মোরা
নীলকান্ত আমগো খাওয়াইবো মুড়িমুড়কী

সেই মুড়িমুড়কী হালই দোকানে
হুম পাড়ে লো সই—

নীলকান্ত বোঝস, কি রে সমাদর
শালার বিয়ার রঙের কলাদর
একশালা বিয়া করাইছ
চুপে চাপে কর আদর

জলদি কইব্যা টাকা যাইব কবে নীলকান্ত
যারে বা যাইস না নীলকান্ত
শুনছি রে এর ফরফরি
টাকা যদি না হয় রে
আঙুরের কাছ থিক্যা কর্জ কর
নীলকান্ত বোঝস্ কি রে সমাদর....

পরদিন বাসি-বিয়া। বর-জাগানীর বিছানা তুলতে শালী, শালাজরা চেপে ধরে বরকে। 'হেজ-তুলানী'র টাকা নেয়। বাসি-বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। বরকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয়। স্নানপর্বে গীত শুরু হয় :

বেলা একটা বাইজ্যা গেছে
রামকান্তবাবু স্নান করতে চলেছে
বাদাম জলে চান করিবে
এসেন্স দিবে তাতে
কুয়ার জলে চান করিবে
আতর দিবে তাতে
বেলা দুইটা বাইজ্যা গেছে
রামকান্তবাবু চান করতে চলেছে

খাওয়া-দাওয়ার পর খেলা। ঝাঁপি, কড়ি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে বর। পুকুর কাটা হয়, পুকুরে আংটি লুকোচুরির খেলা চলে। শ্বশুর বাড়ি থেকে জামাই-কে নতুন কাপড় দেয়া হয়। গ্রামপক্ষ থেকে এসময় যে গীত গাওয়া হয় :

পুকুরের পাড়ে পাড়ে কালা ধলা মাটি
তাহার মধ্যে রুইয়া থুইলাম রামের সন্ধ্যা মেথী
নাওয়াইয়া-ধোওয়াইয়া রাম-রে অঙ্গ করলাম শশী
চান করিয়া বসিয়া আছে, পরতে দেব কি ?
শ্বশুর বাড়ি কইয়া পাঠাও—গরদের ধুতি।
চান করিয়া বসিয়া আছে, জল খাওয়াবো কি ?
শ্বশুর বাড়ি কইয়া পাঠাও—কাঁচাগোলা বরফি।

নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আসে কনে বিদায়ের পালা। বিদায়ক্ষণ যতই নিকটে এগিয়ে আসে; পরিবেশ হয়ে ওঠে বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত। কড়ি খেলার সময় কনেকে লক্ষ্য করে গীত গেয়ে ওঠে :

খেল-খেল লো সবিতা সোনার চৌপর দিয়া
আর তো খেলিতে পাবি না-লো পরের ঘরে গিয়া

আসন্ন বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। কনের খেলাঘর শেষ হয়ে গেল আজ থেকে, বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন গুরুজন সকলেই এসে দাঁড়ায়। তাঁদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, কনে কেঁদে ওঠে। বাপ-মা, গুরুজন এঁরা সামাল দিতে পারেন না। কনেকে তবু উঠে বসতে হয় বরের পাশে।

মায়ে কান্দে বাপে লো কান্দে ডুলিং দিকে চ্যায়া
পরের পুতে লইয়া গেল গো জিন্দাজিন্দি কইয়া
যেমতে গেলো ফুলও তুলিতে
তেমতে হইলো বিয়া
ট্যাঙরা মাছের কাঁটা ফুইট্যা
ডুলিং চড়লো গিয়া
মায়ে কান্দে বাপে লো কান্দে ডুলিং দিকে চ্যায়া
পরের পুতে লইয়া গেল জিন্দাজিন্দি কইয়া

কনে কাঁদতে কাঁদতে বরের সঙ্গে চলে। বাপ-মায়ের কান্না সে সহ্য করতে পারে না। সমস্ত সম্পর্ক সে ছিন্ন করে চললো। বাপ-মায়ের কান্না কনেকেও কাতর করে তোলে, তবুও, দূরে বিয়ে দেয়ার জন্য দোষ দেয় তাঁদের। ইচ্ছেমত, সহজে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে না। তাই, কনের গভীর দুঃখ ও প্রচণ্ড অভিমান :

ক্যানগো কান্দ আমার মাসীমা
ক্যানগো কান্দ আমার পিসীমা
দিছে বাপ বিয়া দিগর পথ চ্যায়া
বাপে আমার নিদারুণ
লাড়ু খাইছে কি কারণ
দিছে বাপ বিয়া দিগর পথ চ্যায়া

মনের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত হয় :

মার দ্যাশের মানু পাই
পক্ষী হইয়া উইড্যা যাই

মা কান্না সংবরণ করতে পারে না :

আছিলো জোড়ের দুই বুইন
কে নিলো ভাইঙ্গা হলা
কে নিলো।

বর তখন সান্ত্বনা দেয় কনেকে। সাহস ও প্রবোধ দিতে থাকে।

কত কান্দন কানছো ও সবিতা
বেলা হইলো শেষ
কান্দন ক্ষান্ত করগো সবিতা
চল আপন দ্যাশ

কনে তবুও কান্না সংবরণ করতে পারে না। পুরনো পরিচিত পরিবেশ মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবী সকলকে ত্যাগ করে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। জানে না, সেখানে কি ধরনের পরিবেশ, কেমন অবস্থা। এতসব ভেবে কনে স্বভাবতই কিছুটা ভীত হয়ে পড়ে। কনে জানায় :—

তব দ্যাশে যাইতে রে জামাই, তব মা'য় দুর্জন

বর তখন আশ্বাস দেয় :

মা'য় যদি দুর্জন হয়—আমি মধ্যে রেজা দিমু
আমার ঘরে মা আছে, মা বলিয়া ডাকিয়ো

কনে আশ্বাস মানে না :

পরের মা-রে মা বলিলে, শরীল কিগো জুড়ায়

নানা ধরনের অশ্বাস-সাহস জুগিয়ে কনেকে নিয়ে রওনা হয় বর

আগে যায় রে মামারা
পিছে যায় রে বহুরা
মধ্যে কইন্যা লইয়া যায়-রে সবিতা-রে।

কনে এসে ওঠে শ্বশুরবাড়িতে। তার মনে ভয় শঙ্কা, সঙ্কোচ এবং এক ধরনের কৌতূহল। বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি বধূবরণ করে নেয়। ছেলে এতদিন বিয়ে করবে না বলে বেঁকে ছিল, মনের ভেতরে মা'র ক্ষোভ জমে ছিল। এবার প্রতিবেশিনীরা শুরু করে :—

আর কাইন্দো না লো হরিদাসী তুমি
তোমার ছেলের বো আসিয়াছে রে
ঐ দ্যাখো না ঐ দ্যাখো না
খাওয়া-পাওয়া শেষের কথা
আকাশে পাখী গাহিছে গান
মেয়ে মোদের গিন্নীসোনা
তোমার ছেলের বো আসিয়াছে রে
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা
জ্যোৎস্না ভরা আকাশ-ধরা
মেয়ে মোদের গিন্নীসোনা
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা
তোমার ছেলের বো আসিয়াছে রে।

শাশুড়ির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাঁর ঘরে পুত্রবধূর আগমন ঘটে। বৌমাকে সে বুকে টেনে নেয়। ছেলেকে পাঠিয়েছিল একা, ফিরে এল আরেকজন সঙ্গ করে। তখন শুরু

একাসুরে গেলিরে নীলকান্ত দোয়াসুরে আইলা
ছোট গাসের থনে লো সবিতা বড় গাসে পড়লা
বত্রিশ বৈঠা নৌকার চাইপ্যা অচেতন হইলা
চেতন পাইয়া সবিতার পড়ে চোক্ষের জল
জামাই'র মাথার পাগড়ি দিয়া মোছে চোক্ষের জল

বৌয়ের শুষ্ক মুখখানি দেখে অভিজ্ঞা শাশুড়ী বুঝে ফেলে তার কষ্ট-দুঃখ। সংসারে তাকে অংশীদার করে। বৌয়ের প্রবেশ ঘটে নতুন সংসারে। এরপর শ্বশুরবাড়িতে চলে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, ফুলশয্যা ইত্যাদি। নানা ধরনের রঙ্গগীত পরিবেশিত হয়। বরের ছোট ভাই, বাড়ির আইবুড়ো ছেলেদের কিংবা বিপত্নীক মধ্যবয়সীদের কেন্দ্র করে। তামাশা থেকে এরাও বাদ পড়েন না :

এই বচ্ছর থাকরে গোপাইলা মনে-বে বুঝ দিয়া
সামনের বচ্ছর বিয়া দিমু গোদা বউ দেইহা-রে
ল্যাংড়া বউ দেইহা-রে
কানা বউ দেইহা-রে

কিংবা—

ঢ্যাইস্কা-চুইস্কা গোরাঙ্গ-রে
তরে লইয়া কি করুম-রে
মাগীর বন্দা পিনছস্ রে
তরে লইয়া কি করুম-রে

কিংবা—

অতি সাধের বিয়া
বৌ দোল মইয়া
মরণ কালে কিছু বইল্যা দোল না
বৌ'র পায়ের মল
তারে ধুইয়া খাইতাম জল
মল বিনে আমার প্রাণ ত বাঁচেনা।

স্বামী জানে, বৌ পরের ঘরের মেয়ে। তার সুখ-সুবিধের জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। তাছাড়া, নতুন বিয়ের উন্দামতা। বৌ-য়ের মন-জানাজানির ব্যাপার থাকে, বৌয়ের মনের ইচ্ছে অভিলাষে আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলে খুনসুটি পর্ব। স্বামী জানায় :

বেলা ১টা দশটা বাজে—পাকের ক্যান দেরি
কাইল্‌কা রাত্রে খাইনি আমি
প্যাটের ক্ষুধায় জ্বইল্যা মরি
পাকের ক্যান দেরি

হাত চালাইয়া তড়াতড়ি
জ্বাল ধরিয়া বসাও হাড়ি
রাসা বাজারে গিয়া আমি কিন্যা আনি মাছ-তরকারি
পাকের ক্যান দেরি

ঝিঙা দিয়া সুক্তা করো
খাইতে লাগে মজা বড়
কই-মাগুরে রসা করো তাতে দিও ডাইল-বড়ি
পাকের ক্যান দেরি

খইলসা পুটি আর বজুরি
করো ইটু রস-পাতুরী
বাচা-ভাজনা ভাজা করো ইচা মাছের করো কুরি
পাকের ক্যান দেরি
কাইল্‌কা রাত্রে খাইনি আমি
প্যাটের ক্ষুধায় জ্বইল্যা মরি

বিয়ের দশদিনে হয় দশ-মঙ্গল। দশ-প্রধানও বলে থাকে। এই দশদিনে বৌকে কয়েকবার শ্বশুরবাড়ি-বাপের বাড়ি যাতায়াত করানো হয়। ধীরে ধীরে হাবভাব বোঝে। ননদরা পেছনে লাগে, বৌ পিত্রালয়ে এলে কন্যাপক্ষের কেউ বরপক্ষের বোন/বৌদিকে উপলক্ষ করে খোঁটা দেয় :

ওলো বিন্দে, কি জ্বালান জ্বালাইলো
বাসনা তোমার মন্দে
আমি যখন শুইতে যাইগো
তখন পার্বতী চুপ্যি মারে গো
পাড়ায়-পাড়ায় ঘুইর‍্যা আইলাম
বাসনা বলে মল বাজার

বরকে 'দশপ্রধানে' নিমন্ত্রণ করা হয়। বন্ধু-বান্ধব-ভাই-ভগ্নিপতি সহ বর আসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। জামাইর ভোজনপর্ব দেখার মত। তখন, ঠাট্টা-ইয়ার্কি সম্পর্কিত মেয়েরা গায় :

আইলো না জামাই ব্যাটা
আমার মিথ্যা চাল কোটা

আমি নাইরকল ভাইঙ্গা করলাম ছ্যাই
জামাই'র অদিষ্টেতে নাই
সেই দুঃখ কারে বা জানাই

ওই পাড়াতে দেইহা আইলাম গো
পিঠার বড় ঢেঁঘটা
আইলো না জামাই ব্যাটা
আমার মিথ্যা চাল কোটা

শালী-শালাজকে নিয়ে জামাই রঙ্গ-তামাসা করলে, তাকে শুনতে হয় :

হায় হায় হায় রসিক নাগর তুমি বড় নটখইট্যা
তোমারে দে ভাজুকে দিমু মান্দুস গাছের ডাল কাইট্যা

তুমি দিনে থাকো কদমতলায় রাত্রে আসো ঝটপইট্যা
হায় হায় হায় রসিকনাগর তুমি বড় নটখইট্যা

এরপর, ক্রমশঃ সংসারের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া। বৌ-এর প্রতি মাত্রাধিক মনযোগ ও তোয়াজ শাশুড়ির ভাল লাগে না। ভাবে, তার ছেলেকে বুঝি কাছছাড়া করে দিল বৌ। সব কিছু যেন বৌ-য়ের জন্য। মার মনের ব্যাপার স্যাপার সহজে বুঝতে পারে ছেলে, সে মা'র মনের ভ্রম দূর করার চেষ্টা করে। মা-কে তখন বোঝায় ঃ

বো-বো-বোয়ের জন্য
টাকা দিলাম ভাল শাড়ি আনো গা কিনে
মাগো, তোমার যদি পিনতে শখ হয়
ছিড়া কাপড়হান গিঠিয়া পড়
বোয়ের শাড়ি চাইয়ো না—
চাইয়ো না—চাইয়ো না—চাইয়ো না
মা, তুমি আর বৌ-য়ে কিছু কইও না—।

শাশুড়ি চুপ করে। বৌ-য়ের হাতে সংসারের যাবতীয় তুলে দেয়। বৌ রান্নাবান্না করে। স্বামী এবং নিজের জন্য বেশী অংশ রাখে। ফলতঃ, শাশুড়ি ও বৌ-এর মাঝে খিটিমিটি বাঁধে।

বৌ ছাজে ভাজাপোড়া
শাশুড়িরে দেয় থোরা থোরা

শাশুড়ি তখন ঃ

ক্যান গো বৌ ল্যাজা দিলা না
ক্যান গো বৌ ল্যাজা দিলা না

বৌ সাফাই গায় ঃ

ল্যাজা নিছে বিড়ালে, দোষো ক্যানো আমারে
দুষ্টু বিড়াল ধোরতে পারলা না
দুষ্টু বিড়াল ধোরতে পারলা না
আসুক আসুক আমার সোয়ামী

কাইন্দা কাইট্যা বলবো আমি
আমার মনে এই বাসনা
আমার মনে এই বাসনা
আমার মনে এই বাসনা

স্বামীকে বলে ঃ

তোমার মা'র মরতো যদি
মঙ্গলচণ্ডী করতাম আমি
আমার মনে এই বাসনা
আমার মনে এই বাসনা

শাশুড়ি-বৌ-এর মনোমালিন্য শুরু হয়। শাশুড়ি প্রাচীন মানুষ, বৌ-এর আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, তরিবত-সহবত সম্পর্কে ধৃত-খুৎ প্রকাশ করে। বয়স্কা নারী শাশুড়ি জীবনে স্থিতাবস্থা এসেছে এবং বয়সগুণে হয়ে পড়েছেন অচঞ্চল, স্থির, গম্ভীর। অথচ পুত্রবধূর চপলতা হ্রাস পায় না, অনেকাংশে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। শাশুড়ি ঠারে-ঠুরে বারণ করে, বৌ জানে স্বামীই একমাত্র রক্ষক। প্রতিবেশীদের চোখেও তার চপলতা ধরা পড়ে। তারা বিস্ময় মানে। এযুগের মেয়েদের ধরণ-ধারণই বুঝি আলাদা ঃ

কলি উল্টা হইলো কারখানা
বৌ শোনে না দেহি শাশুড়ির কথা
শ্বশুর-ভাসুর মানে না বৌ
গলা বাড়াইয়া কয় কথা
বৌ শোনে না দেহি শাশুড়ির কথা
সকালে ভাত বসায় ঘরে
ভাতে পাঁচ ফুটকি হাসে
শ্যাষে উথলাইয়া পড়ে
বৌ শোনে না দেহি শ্বাশুড়ির কথা
কলি উল্টা হইলো কারখানা।

বৌ এসব শুনে ছুটে যায় পাড়া-পরশীর কাছে। বলে ঃ

কইস না-লো দিদিরা শাশুড়ির কাছে
ভাইঙ্গবো লো বৌ তর মাথা

শাশুড়ি সব কিছুই শোনে। নিজের কপাল ও ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করে না। পুত্রবধূ তাকে সেবা যত্ন করে না, পুত্র তাঁর প্রতি তেমন লক্ষ্য ও যত্নআত্তি করে না। শাশুড়ি ভাবে ঃ

এ ভবে পয়সা নাই যারো
বিফল জনম তারো
এ কলিতে পয়সা বিনে
মা-বাপেতে ভালবাসে না
একপাশেতে থাকি পড়ে
তবুও বলি সরো সরো
এ ভবে পয়সা নাই যারো
বিফল জনম তারো....

কলকাতায় বছর কুড়ি আগেও ঢাকা অধিবাসীদের বিয়ে-উৎসবে এইসব গীতের প্রচলন ছিল। আমি কিছু কিছু গীত শুনেছি। ক্রমশ এইসব গীতের প্রচলন হ্রাস পায়। এখন, শহর কলকাতায় এইসব গীতের প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ শহুরে মানসিকতার সঙ্গে এইসব গীত খাপ খেতে পারেনি। এছাড়া জনজীবনে এসেছে আর্থিক সামাজিক নানাবিধ সমস্যা—এসবের চাপে মানুষের মধ্যে যেন আনন্দ-উৎসবের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। নবীনাদের কাছে এইসব গীতের তেমন কোন আবেদন নেই, আগ্রহ নেই। প্রাচীনারা উত্তরসূরী রেখে যেতে পারে নি, তাই তাদের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। প্রাচীনাদের দেখেছি, এখনও মফঃস্বল বা গ্রামে বিবাহ-উৎসবে আনন্দ উত্তেজনা চাপতে না পেরে গেয়ে ওঠে। কিন্তু, এইসব গীত একক ব্যবহারের নয়, তাই বেশীদূর এগোয় না।

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

রামগড় হবে ডাইনে চুটুপালুর রাস্তা, বাঁয়ে আমাদের পথ। কিছু দূর গিয়ে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম। সেখান থেকে এক স্থানীয় ভদ্রলোক সঙ্গে একটা আধ-ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা একটা থালা আর এক পেতলের কলসী নিয়ে উঠলেন। উনিই নাকি মালিক। আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া কিছু বলেন না। অরুণবাবুও আঞ্চলিক ভাষা বলতেন। মালিক বললেন, ওতে নাস্তা আছে। নাস্তা মানে জলখাবার। আমাদের বয়স ১৮ থেকে ৮, সেই সকালে চা রুটি খেয়ে বেরিয়েছি। নাস্তার পরিমাণ দেখে মুষড়ে পড়লাম।

তারপর ভেড়া নদী যেখানে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে পৌঁছলাম। গাড়ি তখন আর যেত না। হেঁটে ভেড়া নদী পার হলাম। গ্রীষ্মকালে নদীতে হাঁটু জলও ছিল না। ওপারে উঠে একটা অন্য রাজ্যে পৌঁছলাম। সেখানকার আবহাওয়া থমথমে ভয়াবহ। খানিকটা বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, দুই নদীর সঙ্গম-স্থলে ছিন্নমস্তার মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছলাম। মনে হল মন্দিরটির আব-হাওয়া সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাথরের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে ভেড়া নদী দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে একটি জলপ্রপাত; নিচে ঘূর্ণির মতো স্রোত পাক খাচ্ছে। সেখানে নাকি কত লোকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরেছে। আগে এখানে নরবলি হত। কয়েকটা কালো লম্বা লোক মন্দিরের পাশে পাথরের ওপর বসে-ছিল। আমাদের দেখে উঠে গেল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। বাইরে লাল মাখা কুচকুচে কালো বড় বড় গিরগিটি চলে বেড়াচ্ছিল। আমাদের গা শিরশির করতে লাগল। ছিন্ন-মস্তাকে দেখতে পেলাম না।

মালিক আমাদের ডেকে ভেড়া নদীর জলে হাত-পা-মুখ ধুতে বললেন। তারপর পোঁটলা খুলে 'নাস্তা' বের করলেন। গোল গোল খাস্তা গজা। খুব ভালো কিন্তু খুব শুকনো আর খুব কম। আর আঁজলা ভরে ভেড়া নদীর জল। সেই কলসীটার কি হল বুঝলাম না। তার পরেই দেখি অরুণ-বাবু হাত-ঘড়ি দেখতেন। নাকি এখনি ফিরতে হবে। সন্ধ্যার আগে ঐ এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। ওখানে সেসময় কিছু গোলমাল হচ্ছিল। নিঃশব্দে গিয়ে সবাই ভেড়া নদী পার হয়ে গাড়িতে উঠলাম। মালিক ড্রাইভারদের তাড়াতাড়ি চালাতে বললেন। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল; সেই গাঁয়ে গিয়ে গাড়ি থামল। দুপুরে যে নাস্তা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি, এ-কথা কারো মনে ছিল না। এতক্ষণ পর বেজায় খিদে পেল।

মালিকের অতিথি-শালা ছোট্ট দোতলা মাটির বাড়ি, মাটির সিঁড়ি, খড়ের চাল। বাড়ির চারদিকে সীতাহার গাছের বাহার। দোতলার ছাদটা এত নিচু যে আমিও সোজা দাঁড়াতে পারছিলাম না। বড় বড় দুটো তক্তাপোশ ছাড়া আসবাব নেই। চাকররা প্রকাণ্ড থুঞ্চিপোষে করে রাশি রাশি পুরী, একটা পাথরের থালায় ১২ রকম আচার, আরেকটাতে ক্ষীরের সন্দেশের পাহাড় এনে দিল। আচার বেজায় টক, বেজায় ঝাল। আলু চচ্চড়ি দিলে পারত। খেয়ে উঠে সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু জল কোথায়? মালিক হেসে বললেন, "এখানকার বড় কুয়োর জলের ভারি খ্যাতি। সেই জল আনতে পাঠিয়েছি, একটু সবুর করুন।" আমরা যে যার বসে রইলাম। আধ ঘন্টা পরে কলসী ভরে ঠান্ডা মিষ্টি জল এল। পেট ভরে জল খেয়ে, অরুণবাবু মালিককে আমাদের সকলের হয়ে ধন্যবাদ জানালেন। মালিক থেকে গেলেন, আমরা রওনা হলাম।

গাড়ি ছাড়তেই মনে হল মাথার ওপর থেকে একটা কালো মেঘ উঠে গেছে, আমরা গান করে, গল্প করে এগোতে লাগলাম। অরুণবাবুকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "কই? অ্যাকসিডেন্ট তো হল না?" সঙ্গে সঙ্গে সে-গাড়ির একটা টায়ার ফাটল। দেখা গেল কোনো গাড়িতে বাড়তি টায়ার নেই। ওটা মেরামত করতে হবে। চোদ্দবার ঐ গাড়ির টায়ার ফাটার পর, পথের ধারে ওটাকে ত্যাগ করে বাকি দুটোকে সবাইকে ভাগাভাগি করে নেওয়া হল। দেখা গেল জখম গাড়ির চালকও এসে আমাদের গাড়িতে উঠে বসেছে। এ পথে নাকি বাঘ বেরোয়। মোট কথা বাঘ বেরোয়নি, অন্ততঃ আমরা দেখিনি। রাত এগারোটায় হাজারিবাগ পৌঁছে যে যার বিছানা নিলাম। রাতে লুচি মাংস হয়েছিল, সে খাবারো কারো উৎসাহ ছিল না। অথচ শিলং-এ পিকনিকে গেলে আমরা দৌড়-ঝাঁপ করে এলাকার করতাম। এই পাঁচ বছরে কি আমরাই বদলে গেলাম? নাকি জায়গাটাই কেমন যেন?

(২৭)

আবার সকলে দলেবলে কলকাতায় ফিরে এলাম। মেজদি তাঁর দুই মেয়ে কল্যাণী আর নলিনীকে নিয়ে শেষবারের মতো গড়পারে উঠলেন। শুনেছিলাম ঐ বাড়ি যে কোনো সময় ছেড়ে দিতে হবে। খালি বাড়ি নিলাম হবে। সেকালে স্ত্রীধনের নিয়ম ছিল, তাই বৌদিদিদের গয়নাগাঁটি, বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় আনা খাট-পালংক বেচে যাবে। জ্যাঠামশায়ের আঁকা সুন্দর সুন্দর তেল-রঙের ছবি ছিল। তার মধ্যে যেগুলি একে ওকে দান করে গেছিলেন, সেগুলিও বেচে গেল। কিন্তু রাশি রাশি ছবি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই, বহুমূল্য টেলিস্কোপ, ক্যামেরা, প্রেসের যাবতীয় সরঞ্জাম, সব যাবে। মেজদিরা, বুলুদি, নানকুদা সেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে উঠলেন।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠ[illegible]। দেখলাম একতলার একটা বড় ঘর [illegible]লি রাখা হয়েছে; গড়পারের বেসব বাক্স-প্যাঁটরা আসবাব-পত্র নিলেম হবে না, কিছু-দিনের জন্য সেখানে রাখা হবে। মাসিমা নোটন কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে থেকে গেলেন। মা মহাখুশি। বোন দুটি মায়ের প্রাণ; নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। ছিল না বলাও উচিত নয়, কারণ ছিল অনেকেই। কোতরঙের অচলানন্দের বাড়িতে অনেকেই ছিলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এর অনেক বছর পরে, আমার বিয়েরও কয়েক বছর পরে, আমার শ্বশুরবাড়ির পুরোহিত বংশের একজনের কোতরঙের দিকে বাড়ি ছিল, তিনি চার-পাঁচজনের খবর এনে বলেছিলেন, মা যদি যেতে চান, তিনিই নিয়ে যাবেন। মাকে সারা জীবনে ২-৩ বারের বেশি কাঁদতে দেখিনি। সেদিন ঐ কথা শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে বলেছিলেন, 'আর হয় না।'

সে যাই হোক গে, ম্যাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের নতুন বাড়ি দেখে মাসিমা খুব খুশি হলেন। তবে পাশের একতলা বাড়িতে নাট্যজগতের বিখ্যাত নরেশ মিত্রের সপরি-বারে বাস করাটা খুব একটা অনুমোদন করতে পারলেন না। আমরা কিন্তু খবর পেয়ে রোমাঞ্চিত। তারপর ৫২ বছর কেটে গেছে, সব কথা ভালো করে মনে নেই; শুধু মনে আছে নিবিবিলি শান্তিপূর্ণ জীবন-যাত্রা ছিল ওঁদের। নাট্যজগতের হইচইগোল ও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত না। নরেশ মিত্রের স্ত্রীকে মনে পড়ে হাসিখুশি, ফরসা, গিন্নি-বান্নি মানুষটি। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সম্ভবতঃ ওঁর ভাই, ভাই-বৌ ইত্যাদি হবেন। একটা দোলের দিনের কথা মনে

নেতাজী স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চীনা জুটির সঙ্গে ফাইনালে খেলছেন জাপানের মাসাওসা, সাইড (ক্যামেরার মাঝামাঝি)

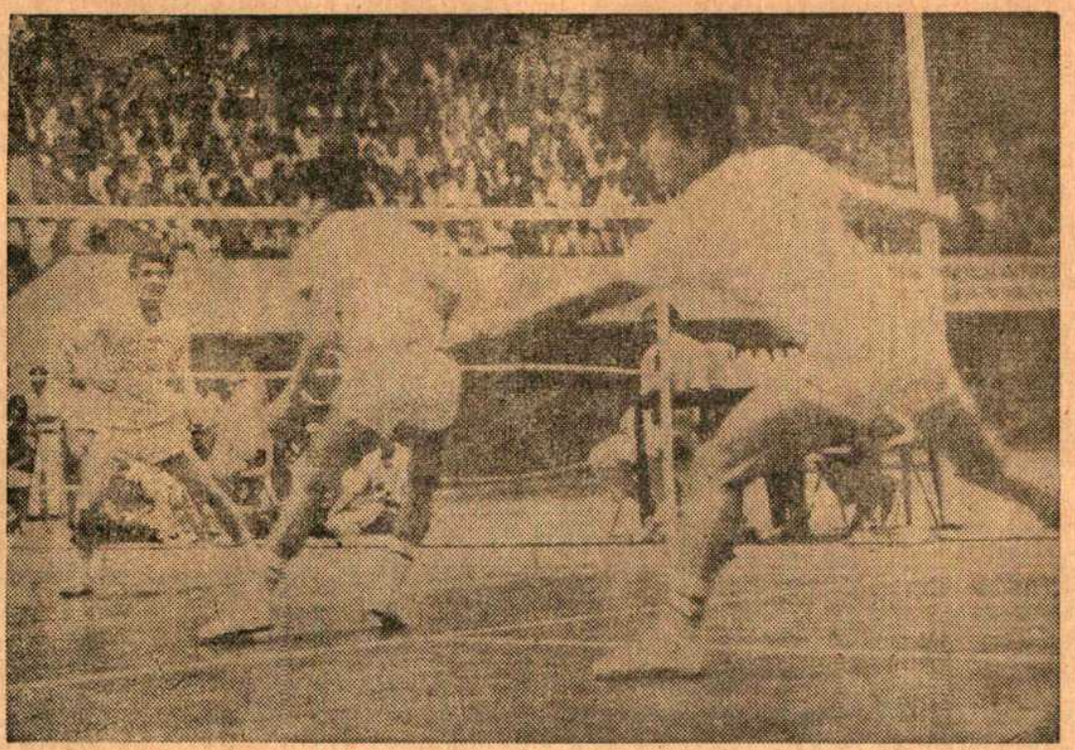

খেলা

জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা

ওড়িশায় অনুষ্ঠিত ১৫শ জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১—০ গোলে ওড়িশাকে হারিয়ে ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ী হয়েছে। এই জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৬২ সালে এবং এই নিয়ে বাংলা ১০-বার ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ী হন।

আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে বদলী খেলোয়াড় অসিত বাগচী জয়সূচক গোলটি করেন।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বাংলা দল মোট ৩০টি গোল দিয়ে মাত্র ১টি গোল খায় (মহারাষ্ট্রের কাছে সেমি-ফাইনালে)। বাংলা লীগ পর্যায়ের খেলায় ত্রিপুরাকে ৬-০, তামিলনাড়ুকে ৪-০ এবং হরিয়ানাকে ৬-০ গোলে পরাজিত করে বি গ্রুপ শীর্ষস্থান লাভ করে। এরপর বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে আসামকে ৬-০ সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ২-১ ও ৫-০ এবং ফাইনালে ওড়িশাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল—এ গ্রুপ থেকে ওড়িশা ও বিহার, বি গ্রুপ থেকে বাংলা ও ত্রিপুরা, সি গ্রুপ থেকে কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) এবং ডি গ্রুপ থেকে আসাম ও মহারাষ্ট্র।

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ৬-০ গোলে আসামকে ওড়িশা ১-০ গোলে অন্ধ্র-প্রদেশকে, কর্ণাটক ২-১ গোলে বিহারকে এবং মহারাষ্ট্র ১-০ গোলে ত্রিপুরাকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠেছিল।

সেমি-ফাইনালে বাংলা ২-১ ও ৫-০ গোলে মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা ২-০ ও ২-২ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় কর্ণাটক ২-১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

ইন্টার সার্ভিসেস ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম মাঠে আয়োজিত ২৯তম ইন্টার সার্ভিসেস ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে এয়ার ফোর্স ৩-১ গোলে গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী ইস্টার্ণ কম্যান্ডকে হারিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর চ্যাম্পিয়ান হন। এই দুই দলের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোল শূন্য ছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল ৭টি সামরিক দল—পাঁচটি কম্যান্ড দল এবং ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এবং ইন্ডিয়ান নেভী। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী এই দলগুলি দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়েছিল : এ গ্রুপ থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (চ্যাম্পিয়ান) ও ইস্টার্ন কম্যান্ড (রানার্স-আপ) এবং বি গ্রুপ থেকে সাউদার্ন কম্যান্ড (চ্যাম্পিয়ান) ও সেন্ট্রাল কম্যান্ড (রানার্স-আপ)।

সেমি-ফাইনালে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ১-০ গোলে সেন্ট্রাল কম্যান্ডকে এবং ইস্টার্ণ কম্যান্ড ১-০ গোলে সাউদার্ণ কম্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ্য গত বছর ইস্টার্ণ কম্যান্ড এবং সাউদার্ণ কম্যান্ড যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল।

সি কে নাইডু ক্রিকেট

দিল্লির ফিরোজশা কোটলা মাঠে আয়োজিত সি কে নাইডু ক্রিকেট প্রতি-যোগিতার (২২ বছরের নীচের খেলোয়াড়-দের) ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল এক ইনিংস ও ৫০ রানে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য গত বছরের ফাইনালে এই পূর্বাঞ্চল দলের কাছেই দক্ষিণাঞ্চল ইনিংস পরাজয় বরণ করেছিল।

প্রথমদিনের খেলায় পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ১০৭ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১২৮ রান সংগ্রহ

করেছিল। পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের খেলার দোষেই দলের এই বিপর্যয় ঘটেছিল। পূর্বাঞ্চলের ৩৫ রানের মাথায় ২য় ও ৩য় এবং ৪১ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংস চা-পানের ১০ মিনিট আগে ৩৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ১০৭ রানের থেকে ২৫৬ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পূর্বাঞ্চল ২য় ইনিংসে ১ উইকেট খুইয়ে ৮৮ রান সংগ্রহ করে। দক্ষিণাঞ্চলের ১৯ বছরের তরুণ খেলোয়াড় এন্টনী এডমাস সেঞ্চুরী করেন (১৩৭ রান)।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু সময় আগে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৬ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল এক ইনিংস ও ৫০ রানে জিতে যায়। চারদিনের বরাদ্দ এই ফাইনাল খেলাটি তিন দিনেই শেষ হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পূর্বাঞ্চল : ১০৭ রান (অশোক পধি নট-আউট ৩০। আরশাদ আয়ুব ২০ রানে ৩ এবং যাদব ৩১ রানে ৪ উইকেট)।
ও ২০৬ রান (প্রণব রায় ৩৫ এবং শামন্ত রায় চৌধুরী ৩০ রান। গৌতম ৬৯ রানে ৬ এবং যাদব ৭১ রানে ৩ উইকেট।

দক্ষিণাঞ্চল : ৩৬৩ রান (আরশাদ আয়ুব ৪০ এবং এন্টনী এডামস ১৩৭ রান। সুবীর ভট্টাচার্য ৮৪ রানে ৪ এবং অভীক মিত্র ১১৪ রানে ৬ উইকেট)

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯৭৭ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান সমস্ত খেলায় জিতে মোট ১৫ বার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগের ইতিহাসে সমস্ত খেলায় জিতে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার নজির এই প্রথম। লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ১৯টা খেলায় ৩৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা ৫৯টা গোল দিয়ে মাত্র দুটো গোল খেয়েছে—ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এবং কাস্টমসের কাছে একটা করে গোল। মোহনবাগানের সর্বাধিক গোলে জয়—হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ১১—০ গোলে। কাস্টমস ১৯টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রাণার্স-আপ হয়েছে। তাদের জয় ১৫, ড্র ৩ এবং হার মাত্র একটা—মোহনবাগানের কাছে ১—৩ গোলে। তারা ৪০টা গোল দিয়ে ৬টা গোল খেয়েছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক বার হকি লীগ জয়ের রেকর্ড কাস্টমসের—মোট ১৬ বার (এর মধ্যে একবার যুগ্ম বিজয়ী)।

গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এবং রাণার্স-আপ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন এ মরসুমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

মহিলা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

পানাজীর জিমখানা স্টেডিয়ামে গোয়া তৃতীয় মহিলা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গোয়া ৩-০ গোলে বাংলা পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য প্রথম এবং দ্বিতীয় মহিলা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা জয়ী হয়েছিল।

এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলগুলি প্রথম লীগ পর্যায়ে খেলেছিল এবং চারটি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স আপ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ৩-০ গোলে কেরল, মণিপুর ৭-০ গোলে চন্ডীগড়, গোয়া ৫-০ গোলে গুজরাট এবং কর্ণাটক ৩-০ গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি ফাইনালে বাংলা ৫-০ গোলে কর্ণাটক এবং গোয়া ৬-০ গোলে মণিপুরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় কর্ণাটক ১-০ গোলে মণিপুরকে পরাজিত করে।

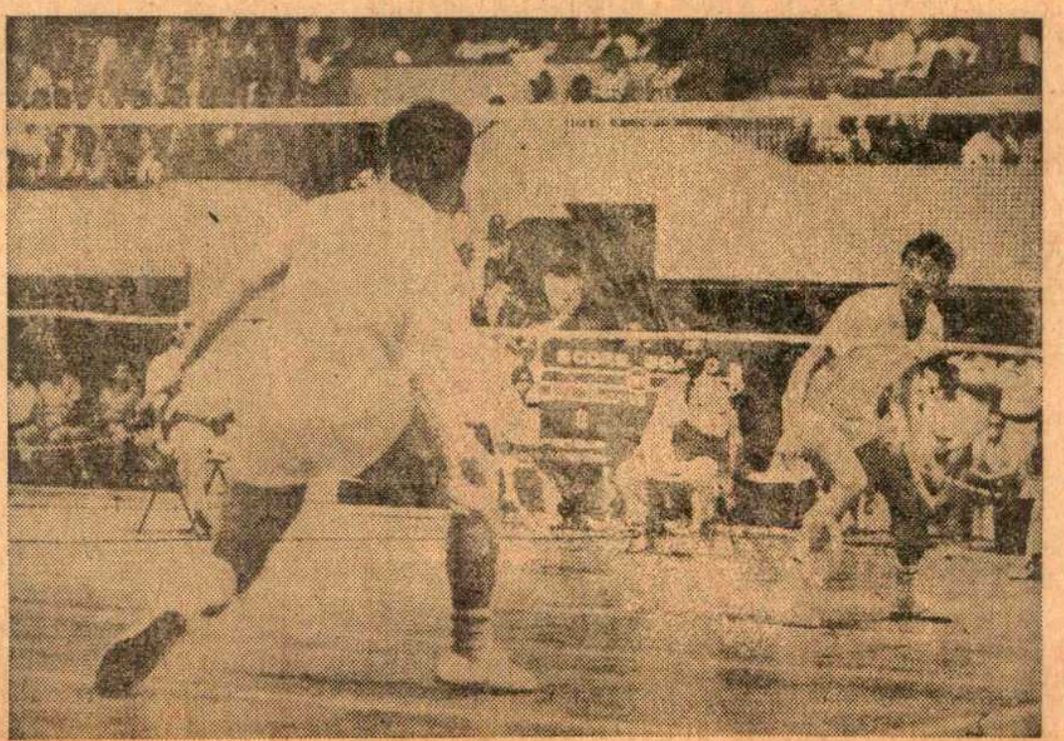

নেতাজী স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে (ক্যামেরার মুখোমুখি) চেন তিয়েন-লাও

সিনেমা

ডিস্ক গার্ল

প্রমোদ চক্রবর্তী চিরদিনই প্রমোদ চিত্র পরিচালনায় অভ্যস্ত। ইতিপূর্বে উনি 'জিন্দী'; 'লভ ইন টোকিও', 'জুগনু' এবং 'বারুদ' প্রভৃতির মতো ছবি পরিচালনার মাধ্যমে আশুতোষ দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। এরই মধ্যে উনি ব্যতিক্রম হিসাবে পরিচালনা করেছিলেন 'নয়া জামানা', যেটি ছিল হাতী মার্কা হিন্দী ছবির বোম্বে সংস্করণ। সেজন্যে মনে হয়েছিল উনি 'ডিস্ক গার্ল' ছবিতে বিদেশী ছবির অনুকরণপ্রিয়তাকে কাজে না লাগিয়ে পুরোপুরি ভারতীয় কাহিনী নিয়ে একটি সুন্দর ছবি উপস্থিত করবেন। কিন্তু কাহিনীকার এবং চিত্রনাট্যকার যে বস্তু উপস্থিত করেছেন, সেটা হিন্দী ছবির জগতে একাধিকবার সফলোর সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে, বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকার 'ডিজনী ল্যান্ড' এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গৃহীত এ-ছবির আলোকচিত্র এর অন্যতম সম্পদ। আর বাকী যা কিছু হয়েছে তা কহতব্য নয়, এমন কী সঙ্গীত পরিচালনায়ও পুনরাবৃত্তি। ছেলেবেলায় আশ্রমপালিতা এক স্বপ্নকন্যা, পরবর্তীকালে অসামাজিক কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে একজন সাকরেদ এবং কুখ্যাত কুচক্রীও জুটে গেল। শহরের বুকে এঁরা একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। আচমকা স্বপ্নকন্যার সঙ্গে এক বিত্তশালী তরুণের দেখা হওয়ায়, ওঁরা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হলেন এবং বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লেন। এরপর মিলন ও বিবাহ ও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। শচীন ভৌমিকের উদ্ভট কাহিনীর দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে পরিচালক চরিত্রদের আমেরিকা ও ইউরোপ ট্যুর করিয়েও ব্যর্থ হলেন। **অশোক মজুমদার**

আন্দোলন

দীর্ঘ দিনের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি এই 'আন্দোলন'। এ ছবির পটভূমি অগ্নিযুগের কাহিনীকে নিয়ে। পরিচালক মোহন ভাটিয়া কাহিনীর সূত্রপাত করেছেন বেশ সুন্দরভাবে। এক বৃদ্ধ তাঁর বিগত জীবনের কাহিনী পরিবেশন করছেন উগ্র আধুনিক কয়েকটি যুবক-যুবতীর কাছে, যারা রেডিও মিউজিকের তালে তালে ট্যুইস্ট নাচছিল। কাহিনীটি অবশ্য তাঁরই ছেলে শংকর (রাকেশ পাণ্ডে)কে নিয়ে, যে এই ছবির নায়ক। ঘটনা ১৯৪২ সালের সমসাময়িক। সারা দেশে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। ব্যাণ্ডমাস্টার শংকর ধীরে ধীরে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। ধরা পড়ে তাকেও একদিন কারাবরণ করতে হল। সেই সময় ছোট বড় সবাইয়ের মনে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিরাজ করত তা পরিচালক কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। এডিটিংও বেশ ভালই হয়েছে। গতানুগতিক হিন্দি ছবির তুলনায় এটা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। অতিনাটকীয়তা ও অবাস্তবতাকে পরিচালক সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া যে ছবির মুখ্য উপজীব্য ইতিহাস, সেখানে পরিচালক মনগড়া কোন পরিবেশ বা ঘটনার অবতারণা না করে ভালই করেছেন। নায়ক একজন মুক্তিসংগ্রামী, কিন্তু তার জীবনেও প্রেম আসতে পারে। কিন্তু এই প্রেমের আবর্তে শংকর তার মহান আদর্শকে বিসর্জন দেয়নি বা দায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র শিথিলতা প্রকাশ পায় নি। এক্ষেত্রে পরিচালক তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এ ছবির মূলমন্ত্রী দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা পাই, যখন দেখি জেল কর্তৃপক্ষ নায়িকা কাজরীর ওপর শত অত্যাচার চালিয়েও তার মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারে না। নৃত্য ও সঙ্গীত যা হিন্দি ছবির মূল ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাকে কিন্তু পরিচালক একেবারে বাদ দিয়ে যান নি। একটি দৃশ্যের মাধ্যমে সে দিকটাও তিনি পূর্ণ করেছেন। **স্বপনকুমার চক্রবর্তী**

খেল খিলাড়ীকা ছবিতে শাবানা আজমী

বাংলা চলচ্চিত্র ও গুরুবাদ

স্বার্থক ও সফল বাংলা ছবি অনেকদিন দেখিনি। অনেকদিন দেখিনি তেমন কোনো ছবি যা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিতে পারে। যে আনন্দ আসবে কোনো সমস্যের স্বার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে, আসবে শিল্প-ধর্মের প্রতিষ্ঠায়, বা কোন গল্পে, যেখানে সুখদুঃখ হাসিকান্না সবকিছুর মধ্যেই থাকবে সময়ানুগ রুচির পরিচয়। অথচ এখনো সেই সমস্ত পরিচালকরাই ছবি করেন যাঁরা একদশক আগেও দর্শকদের হলের সামনে লাইন দিতে বাধ্য করাতেন। দুর্ভাগ্য যে আজ তাঁদের ওপর থেকে ধীরে ধীরে দর্শকের আস্থা চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদারদের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি এই শিল্পের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা সিনেমার ইমারত এত দ্রুত ধ্বসে পড়ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রির তুরুপের তাস উত্তমকুমারও এই ব্যর্থতা ঢেকে দিতে পারছেন না। অবশ্য উত্তমকুমার ও তাঁর স্তাবকেরা যাঁরা এতদিন চেঁচিয়ে এসেছিলেন যে তিনিই হলেন চলচ্চিত্র ও তিনি থাকলেই আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, এখন সেই উত্তমকুমারের ছবিগুলোর পরিণতি দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন বা পারবেন।

কয়েক বছর হল কলকাতার বেশ কয়েকটা স্টুডিও গুদামঘরের রূপ নিয়েছে। এবং এরকম চলতে থাকলে ধীরে ধীরে বাকী স্টুডিওগুলোও সাট্টা খেলার জায়গা হয়ে উঠবে, বাংলা সিনেমা হলগুলোতে সাড়ম্বরে মুক্তি পাবে বোম্বাই বা মাদ্রাজের ছবি। আমি যদি বলি উত্তমকুমারই বাংলা ছবির এই সর্বনাশের প্রধান কারণ, যদি বলি তাঁর জন্য এই ছবি এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তাহলে তা কি ভুল বলা হবে?

বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার এক বিস্ময়ী প্রতিভা। অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতায় কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু এই মহান শিল্পী যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে বাংলা চলচ্চিত্রকে আরো পঞ্চাশ বছর এগিয়ে দিতে পারতেন, সেখানে তাকে ভাল করে তলিয়ে যাওয়ার পথ করে দিচ্ছেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে উত্তমকুমারের পদচারণা অনেকটা স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মতো। তিনি তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবং সেই

নিয়াজ আউর নামায় ছবিতে মাহেরা।

ক্ষমতা প্রযোজক, চিত্রগ্রাহক থেকে শুরু করে পরিচালকের ওপরেও (সত্যজিৎ ছাড়া) প্রয়োগ হয়। তাঁর নির্দেশে গল্প নির্বাচন হয়, চিত্রনাট্য পরিবর্তন হয়, তাঁরই কথামতো ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা চালান, পরিচালক পরিচালনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে দর্শকদেরও উত্তমকুমার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একটা সময় ছিলো যখন তিনি যে ছবিতেই অভিনয় করতেন না কেন দর্শকরা সেই ছবিকেই ভালবাসতেন যেহেতু সেটা উত্তমকুমারে ছবি।

বি এন সরকার, প্রমথেশ বড়ুয়া বা সত্যজিৎ রায়দের কথা মনে রেখেও বলব বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এমন প্রভাবশালী কোন মানুষ আসেন নি, যিনি উত্তমকুমারের মতো অসীম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এই ক্ষমতা বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থকতার জন্য প্রয়োগ হয়নি। অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় যেখানে তাঁর অভিনীত ছবিই বছরে বেশী মুক্তি পা সেখানে সেই সব ছবি যদি স্বার্থক চলচ্চিত্রের রূপ নিত, তাহলে তার প্রভাবে বাদবাকী অন্যান্য ছবিগুলোও উন্নত হতে পারত। এবং বাংলা চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই তখন এই 'হাঁটি হাঁটি পা পা' অবস্থায় থাকত না। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা প্রায় তিনশ'র কাছাকাছি। অথচ এর মধ্যে চার-পাঁচটা ছবি ছাড়া সব ছবিই ভীষণভাবে মামুলি। এবং সেইসব ছবির ঘটনা এই সময়ের কাছে চূড়ান্তভাবে দুর্বল। তিনি চিত্রনাট্য পড়ে তারপর ছবি করতে রাজী হন, অথচ এমনই তাঁর নির্বাচনের মাপকাঠি যে 'অনুভব' করতে রাজী না হয়ে 'অমানুষে' রাজী হয়ে যান। এমনসব ক্যামেরাম্যানদের পছন্দ করেন যাঁরা শুধু ক্লোজ আপ দিয়েই ১২ রীলের ৬ রীল ভরিয়ে দেন। তাঁর সমকালীন ছবিগুলোর দিকে তাকান দেখবেন সেগুলো কতো জেলো ও হাস্যকর। ঐসব ছবিতে অভিনয় করে তিনি শুধু

সাহিত্য সুধা

শ্রীনিরপেক্ষ-র (অমিতাভ চৌধুরীর)
শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা
সতীকান্ত গুহর
চাঞ্চল্যকর সম্পূর্ণ উপন্যাস 'কপাল'
শ্রীগ্রন্থকীটের চুলচেরা সমালোচনা
ও অন্যান্য
বিশেষ পৌষালী সংখ্যা
ডিসেম্বরেই বের হচ্ছে।
আজই লেখা পাঠান। বই / বিজ্ঞাপন / অর্ডার পাঠান। নতুন গ্রাহক করা হচ্ছে।
সম্পাদক
৩৩/৩ই চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলি-২৭

তাঁর শিল্পীসত্তার পতন ঘটান নি, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পেরও পতন ঘটিয়েছেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয় মধ্যবিত্ত জীবন। সেই নির্বাক যুগ থেকেই সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী চলচ্চিত্রের প্রায় ৯৫ ভাগ জায়গা দখল করে আছেন। তাঁদের ভালবাসা, সংঘাত, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদিই ছবির বিষয়বস্তু। অবশ্য পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের যে রূপ দেখানো হয়েছে, তা প্রেমনির্ভর। আনন্দ বা দুঃখ বলুন, সংঘর্ষ বলুন সবই এই প্রেমকে আশ্রয় করে। সেদিন সেইসব ছবি দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে। কিন্তু আজ আর পারছে না। তার কারণ আর কিছুই নয়, তার কারণ এই সময়। কয়েক দশক আগে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত জীবন যা ছিল, এখন তা নেই। তখনকার সমস্যার সঙ্গে এখনকার অনেক তফাৎ। এখন যেখানে লোকে থাকার ঘর পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না, বাঁচার চেষ্টায় দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ভালবাসা, সুখ, সংঘাত সব কিছুর ধরণধারণও বদলে যায়। অথচ এখনো আনন্দমেলা, সেই চোখ, অসাধারণ, বহ্নিশিখা জাতীয় ছবিতে বাংলা চলচ্চিত্র ভরে যায়। এইসব ন্যাকামি বা মেলোড্রামা পঞ্চাশ দশকে হয়তো শোভা পেত, কিন্তু এখন একেবারেই নয়। আসলে দর্শকরা কি চান সে বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এই ঘটনার জন্য দায়ী। আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা সেই পুরোনো থিয়েটারীটাই আঁকড়ে আছেন। দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের একেবারেই নেই। রাজনীতিক থেকে শুরু করে ভিখিরী পর্যন্ত সবারই তাঁদের পেশায় সফল হতে গেলে জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ থাকা দরকার। তা না হলে ব্যর্থ হবেন-ই।

দর্শকেরা এই রুক্ষ্ম সময়ের আঘাতে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, অনেক বেশী বাস্তব। যে মনোভাব নিয়ে তাঁরা হিন্দী ছবি দেখেন, সেই মনোভাব নিয়ে বাংলা ছবি দেখতে যান না। তাঁরা হিন্দী ছবি যে আনন্দে দেখেন তা নাচ গান হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সীমায়িত। কিন্তু বাংলা ছবির বেলায় সেই আনন্দ পেতে চান নিজেদের সুখ দুঃখ সংগ্রামের বাস্তবায়িত রূপ দেখার মাধ্যমে। অথচ আমাদের চলচ্চিত্রকারেরা হিন্দী ছবির বিশাল দর্শক দেখে তার অনুকরণ করে তৈরী করেন হোটেল স্নোফকস, রাজবংশ জাতীয় ছবি। এবং ব্যর্থও হন।

আমি এসব কিছুর মূলে প্রযোজক, পরিচালকদের চেয়ে উত্তমকুমারকেই দায়ী করব এজন্য যে বর্তমান বাংলা সিনেমায় তাঁর স্থান এমন জায়গায় যেখানে সমস্ত কিছুর ওপর তাঁর রুচি ও চাহিদাটাই প্রধান গুরুত্ব পায়। দু-তিনজন পরিচালক ছাড়া বাকী সব পরিচালকই উত্তমকুমারের হাতের পুতুল। তাঁর নির্দেশ পালনই যেখানে তাঁদের নির্দেশনার প্রধান অঙ্গ, সেখানে সমস্ত দায়দায়িত্ব বেশী করে তাঁর ওপরেই তো এসে পড়ে।

এবং এখানে এসেই তাঁর রুচি সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন জাগে। ভেবে পাই না কোন যুগে বাস করে, কোন্ মনোভাবে তিনি তাঁর ছবিগুলো নির্বাচন করেন। সম্পূর্ণ ছবির কথা বাদ দিয়ে শুধু অভিনয় অংশে এলেও উত্তম এখন দারুণভাবে ব্যর্থ। তাঁর গত কয়েক বছরের ছবিগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাব এক গতানুগতিক ভঙ্গীসর্বস্ব উত্তমকুমারকে, যিনি শুধু জাবর কেটেই চলেছেন। তাঁর স্টার ইমেজ ও শোম্যানশিপ এত বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে যে 'ভোলাময়রা' ও 'সব্যসাচী' জাতীয় ছবিতেও আমরা গুরু উত্তমকুমারকে দেখি। সব্যসাচী বা ভোলা ময়রাকে নয়।

সবশেষে উত্তমকুমারের কাছে সরসারি দুটো প্রশ্ন রাখছি —এক : আপনি এমন কোন ছবিতে অভিনয় করেছেন কি যা একশ বছর দূরের কথা, দশ বছর পরেও পুরোনো হবে না? এমন কোন ছবিতে অভিনয় করেছেন কি যা চূড়ান্ত শিল্পের স্বাক্ষর রেখেছে?

দুই : আপনার সম্পূর্ণ অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় কোন্ ছবিতে রেখেছেন, যা অভিনয় সম্পর্কে আমাদের নতুন কিছু জানতে সাহায্য করবে?

বিকাশ জানা

শের আফগান পালায় স্বপনকুমার

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
ও "ক্রাউন"
অর্থাৎ টি ভির রাজা!
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টীরওগ্রাম ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯০

বিচিত্রা

মণিপুরের দুই বোন মণিপুরীর দুটি মণি

কদিন আগে কলকাতার মণিপুরী নর্তনাশ্রমের এক অনুষ্ঠানে অনবদ্য মৃদঙ্গ শুনে চমকে উঠেছিলাম—এ কার হাতের ধ্বনি? খোঁজ নিয়ে জানলাম, ইনি গুরু বিপিন সিংহের শিষ্যা, মণিপুরী নৃত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা কলাবতী দেবী। ও দিনের অনুষ্ঠানের নৃত্য ও সংগীত রচনা এই গুরু-শিষ্যারই।

মণিপুরী সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ বোধ হয় মণিপুরী নৃত্য। মণিপুরের মণি মুক্তো বলতে লোভ হয়। ওখানকার লোকনৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্য মিলে এক অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ—ছন্দের, আনন্দের, বর্ণাঢ্য কারু-কাজের। পাহাড়-আরণ্যময় ওই জনপদের ছয় ঋতুর নয়নাভিরাম ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওই নৃত্যসৌন্দর্যই শুধু পারে। ইমফলের বিখ্যাত জাগোই মারূপ সংস্থার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁরা আবহমানকালের ওই মণিপুরী ছন্দ-সৌন্দর্য জগৎসভায় তুলে ধরেছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে তাঁদের মনোমুগ্ধকর মণিপুরী নৃত্যানুষ্ঠানে কলা-বতীকে আবার দেখলাম। নৃত্যরতা। আমরা মুগ্ধ। কেনই-বা না হবো? শৈশব থেকে তিনি মণিপুরের নানান উৎসবে রাসলীলা ও ব্যাপক নৃত্য পরিবেষণ করে আসছেন। সঙ্গীতে, নৃত্যে, মৃদঙ্গবাদনে সিদ্ধকণ্ঠ, সিদ্ধদেহ, সিদ্ধহস্ত এই মণিপুরীকে তাঁর জন্মভূমি 'নর্তন-বিশারদ' উপাধি দেন ১৯৫৯ সালে। দর্শনা ঝাভেরীর সঙ্গে বসে লেখা তাঁর 'মণিপুরী নর্তন' বইটি আমি মাসখানেক আগে পড়েছি। ওই শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া ওই সিদ্ধিতে কে পৌঁছোবে। কলা-বতীকে অভিনন্দন, ভারতের বাইরেও তিনি মণিপুরী নৃত্যের রুচি ও ঐশ্বর্য বয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর ললিত-উদ্ধত (লাস্য-তাণ্ডব) নৃত্য নানা দেশের হৃদয় হরণ করেছে।

আমাদের মনে অবশ্য মণিপুরী ললিত-উদ্ধত নৃত্যভঙ্গির শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, কলাবতী দেবীর কোমল লাস্যের পাশে তাঁরই বোন শান্তিবালা দেবীর উদ্ধত তাণ্ডব। কোমলে-কঠোরে এক অপরূপ যুগলবন্দী। মণিপুরী নৃত্যকলার আরেকটি প্রতিভা এই শান্তিবালা। যতোদূর মনে পড়ে, তাঁর অভিনয়াংশের প্রশংসায় কোনো সমালোচক একবার লিখেছিলেন, স্তানি-স্লাভস্কি যদি এই নৃত্যাভিনয় দেখতেন, তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের এই ভারতীয় শিল্পীর কাছ থেকে কিছু শিখে নেবার উপদেশ দিতেন। সবাই জানেন, স্তানি-স্লাভস্কি-পদ্ধতিতে মূকাভিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।

দিদির মতো শান্তিবালাও গুরু বিপিন সিংহের কাছে নৃত্য শিক্ষাক্রম শেষ করে 'নর্তন-বিশারদ' উপাধি পান ১৯৬৯-এ। তিনিও মৃদঙ্গ বাজান। গর্বের কথা, ইয়োরোপ-আফ্রিকার নানা দেশে তাঁর মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন ভারতীয় মার্গনৃত্যের মহিমা প্রচার করেছে। দাক্ষিণাত্যের ধ্রুপদী নৃত্য-কলার পাশে মণিপুরীও যে একটি প্রাচীন ঐশ্বর্য, ভারতের আরেকটি ধ্রুপদী নৃত্য-রীতি, সেকথা বিদেশীদের মর্মে যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন, শান্তিবালাও তাঁদেরই একজন।

আমাদের সৌভাগ্য, এই দুই মণিপুরী ভগিনী এই কলকাতারই একটি নৃত্যশিক্ষা-লয়ে শিল্পী ও শিক্ষিকা হিসেবে ধ্রুত।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

নিখিল ভারত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ রাত

কিরানা-গন্ধর্ব-লখনৌ ম্যারিস উজির খানী মাহিয়ার আর পটবর্ধন ওঁকারনাথ ঘরানার উজ্জ্বল তারকাদের নিয়ে এ বছরের মত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ দিনের আসর শনিবার ৭ অকটোবরের সন্ধ্যায় শুরু হয়ে শেষ হল রবিবারের ভোর ৬টায়। শেষ গানের রেশ নিয়ে রবীন্দ্রসদন থেকে বেরুলাম কলকাতার মলিন ময়লা ভোরের রাস্তায়। পিয়াসে মিলন কী আশরে—অনিরুদ্ধের কথক ও জয়তী বাগচীর খেয়াল শোনা হয়নি। চিন্ময় লাহিড়ী তখন গাইছিলেন, সঙ্গে সুযোগ্য পুত্র শ্যামল। চিন্ময়বাবুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বড়ে গোলাম আলি একবার বলেছিলেন সর্ব-সমক্ষে, 'বাংলায় এই একজন আছেন যিনি দিমাগ সে মানে মগজ খাটিয়ে গান করেন।

কলাবতী ও শান্তিবালাদেবী

অমৃত
বিনোদন সংখ্যা
১৩৮৪

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা

জীবন

সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি

পরিতোষ সেনের গল্প
অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস

যূথিকা রায় মানে গান
তাঁকে নিয়ে লিখেছেন বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল

বাংলা গানের উৎস সন্ধানে
অভিযাত্রী : মধুসূদন মজুমদার

শান্তিনিকেতনের সেই দিনগুলি

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী
কেয়া চক্রবর্তীর অসমাপ্ত প্রবন্ধ
তাঁরই তর্জমায় একটি বিদেশী নাটক

বসন্ত

আরো দুজন বিশিষ্ট বাঙালীকে নিয়ে লেখা

দাম ৫ টাকা

কপির জন্য যোগাযোগ করুন :
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৩

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 25th November, 19

Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

কুকমী গুঁড়া মশলার
১ কে.জি.'র নূতন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

অমৃত

ডিসেম্বর ১৯৭৭ / ৭৫ পয়সা

চণ্ডীমণ্ডপে

থিয়েটার

আমাদের

অগ্রগতি

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ
আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা

এখন থেকে দশ বছরে অনিতা কাপুরের জমা টাকায় নয়টি শিশু স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে বেরিয়ে আসছে।

তারা কেউই তাঁর সন্তান নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, অনিতা কাপুর জানেনই না, তিনি বস্তির নয়টি শিশুর ভরসা।

তিনি শুধু ইউকোব্যাঙ্কের ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনায় একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। তাঁর পক্ষে এইভাবে টাকা রাখাই ছিল সবদিক থেকে নিরাপদ ও লাভজনক। পনেরো বছরে তাঁর জমা টাকা চারগুণেরও বেশি বেড়ে যাবে।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীর টাকার মত অনিতা কাপুরের জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সমাজকল্যাণ প্রয়াসে ব্যবহার করা হয়। যেমন, বস্তির স্কুলকে সাহায্য দেওয়া, বা, বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করা, অথবা অসহায় মহিলাদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করা, কিংবা, চাষীদের সময়মত ঋণ দিয়ে সাহায্য করা। এইরকম নানা উপায়ে আপনার স্বল্পসঞ্চয় সমাজে যাঁরা অসহায় ও নিঃসম্বল তাঁদের বড় রকমের সহায় সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্কের যে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছেন। এবং সেইসঙ্গে নির্বিঘ্নে এবং লাভজনক উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে।

পাঠ্য পুস্তক কিনতে সাহায্য পেয়েছে
তামিলনাড়ুর এই দুটি
ছেলে মেয়ে

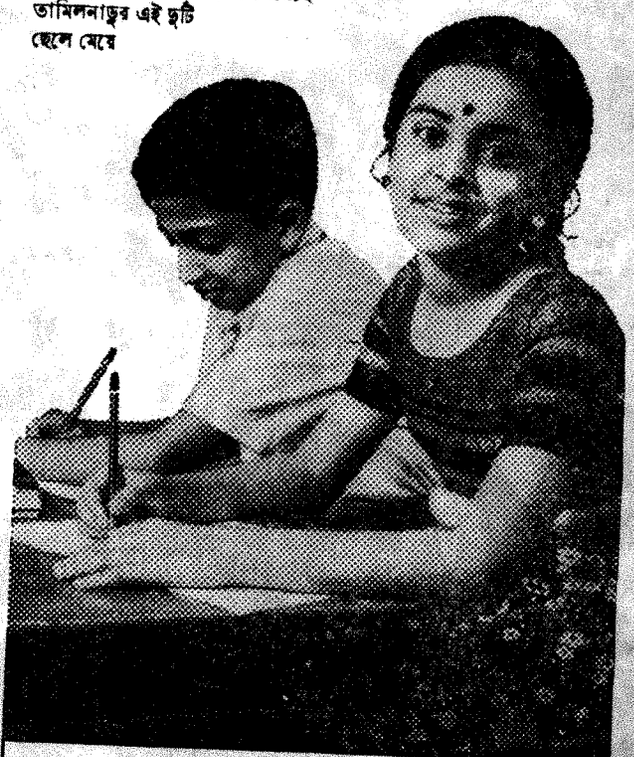

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
ফিক্সড্ ও টাইম ডিপজিট
রিকারিং ডিপজিট
ফিক্সড্ ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত রিকারিং ডিপজিট
ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা
কুবের যোজনা
ফিক্সড্ ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত জনতা পার্সোনাল অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স পলিসি পরিকল্পনা

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক জমা পরিকল্পনা কী কী?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

সগৌরবে প্রকাশিত হয়েছে

জ্যোতিষশাস্ত্রের মহান্ দিক্‌পাল ভৃগুজ্যোতিষের

১৯৭৮ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

* জ্যোতিষ সম্রাটের গণনানুযায়ী ১৯৭৮ সালটি প্রতিটি রাশির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর।
* ভাল-মন্দের বিচারে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আগামী বৎসরটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—বছরের প্রথমেই জানতে হলে অবিলম্বে এই মহামূল্যবান বইটি সংগ্রহ করুন।
* জন্মমাস, রাশি ও লগ্ন অনুসারে ভাগ্যফল নির্ণয় ও দুঃসময়ের প্রতিকার নির্দেশ এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
* এ ছাড়া একটি বিস্তারিত পঞ্জিকা এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ।
* দুই টাকা (২৲) অগ্রিমমূল্য পাঠিয়ে এই বইটি V.P. যোগে সংগ্রহ করুন। অগ্রিম মূল্য ছাড়া বইটি সরবরাহ করা হবে না।
* যে সকল এজেন্ট ইতিমধ্যে অগ্রিমমূল্য পাঠিয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট কপির চাহিদা জানিয়েছেন—তাঁরা অবিলম্বে তাঁদের বইগুলি সংগ্রহ করুন।

চার টাকা

আমাদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত রচনাবলীগুলির যে কোনটির এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবকটি খণ্ড একসঙ্গে নিলে শতকরা ১৫% কমিশন পাওয়া যাবে। যে খণ্ডগুলি ঐ সময়ে পাওয়া যাবে না পরে প্রকাশিত হলে ক্যাশমেমো দেখিয়ে ঐ কমিশনে পাওয়া যাবে।

বিভূতি রচনাবলী ঃ (রেক্সিন বাঁধাই)
১ম খণ্ড-২৪৲ ২য় খণ্ড-২৫৲ ৩য় খণ্ড-২৬৲ ৪র্থ খণ্ড-২৬৲ ৫ম খণ্ড-২৬৲ ৭ম খণ্ড-২৫৲ ৮ম খণ্ড-২৫৲ ১০ম খণ্ড-২৫৲ ১১শ খণ্ড-২৫৲ (বর্তমান মোট মূল্য—২২৭৲)

তারাশঙ্কর রচনাবলী ঃ (রেক্সিন বাঁধাই)
১ম খণ্ড-২০৲ ২য় খণ্ড-২৪৲ ৩য় খণ্ড-২৫৲ ৫ম খণ্ড-২০৲ ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০৲ ৭ম খণ্ড-২০৲ ৮ম খণ্ড-২০ ৯ম খণ্ড-২০৲ ১০ম খণ্ড-২০৲ ১১শ খণ্ড-২০৲ ১২শ খণ্ড-২০৲ ১৩শ খণ্ড-২০৲ ১৪শ খণ্ড-২০৲ ১৫শ খণ্ড-২০৲ (বর্তমান মোট মূল্য—২৮৯৲)

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ঃ (প্লাস্টিক কভার)
১ম খণ্ড-২০৲ ২য় খণ্ড-২০৲ ৩য় খণ্ড-২০৲ ৪র্থ খণ্ড-২০৲ ৫ম খণ্ড-২০৲ ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০৲ ৭ম খণ্ড-২০৲ ৮ম খণ্ড-২০৲ (বর্তমান মোট মূল্য—১৬০৲)

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী ঃ (রেক্সিন বাঁধাই)
১ম খণ্ড-২০৲ ২য় খণ্ড-২০৲ ৩য় খণ্ড-২০৲ ৪র্থ খণ্ড-২০৲ ৫ম খণ্ড-২০৲ (বর্তমান মোট মূল্য—১০০৲)

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর লরি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক্ না কেন
যুগান্তর এ
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো :

* যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত উর্ধগতি। গত ছ'মাসে দৈনিক প্রচার বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের কাটতি এখন ৩,১০,০০০ এরও ওপর।
* পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
* প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

অমৃত

১৭ বর্ষ
২৯ সংখ্যা
১৬ অগ্রহায়ণ
১৩৮৪
2nd DEC. 1977

সম্পাদকীয়
ভুল জায়গায় হাততালি ৪
বৈকুণ্ঠ পাঠক ৫
চিঠিপত্র ৬
রবীন্দ্রনাথের পেছনেও টিকটিকি ৯
শিশির কর

গল্প
টান ১১ চন্ডী মন্ডল
অন্য হাত ১৫ অমল আচার্য

প্রচ্ছদ কাহিনী ১৮
থিয়েটার আমাদের আন্দোলন
শান্তিবঞ্জন চ্যাটার্জি
কিন্নর কিন্নরী ২৬ হীরেন্দ্রকুমার বসু
বুকের আগুন ৩০ পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিতা ৩২ দাউদ দায়দার, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত চক্রবর্তী, সামসুল হক
সুবোধ দাশগুপ্তের ছবি ৩৩
ওড়িশায় ফরাসী টিভি দলের সঙ্গে ৩৪
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
মানুষ কেনাবেচার ইতিহাস ৪১
বজ্রমাধব ভট্টাচার্য
হেলেনিক মন/সুনীতিকুমার ৪৬
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
পাকদণ্ডী ৪৯ লীলা মজুমদার
বাঙলার বাইরে বাঙালী ৫২
খেলা ৫৩
সিনেমা ৫৭
বিচিত্রা ৬১
প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুনীল দাশ
ভিতরের অলংকরণ ও ছবি সুবোধ দাশগুপ্ত, ধ্রুব রায়, অসিতবরণ কুণ্ডু

আগামী সংখ্যায়
প্রচ্ছদ কাহিনী
লোকাল ট্রেন : চলন্ত পৃথিবী
লিখেছেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ফাদার দ্যতিয়েনের গল্প
আলাউদ্দিন সম্পর্কে
লিখেছেন তথাগত চক্রবর্তী

জনরুচি ও সিনেমার পোস্টার

সিনেমার মতো সিনেমার পোস্টারও সেন্সার করা হবে শোনা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, অপরুচির অপসারণ।

একথা অবিশ্যি স্বীকার করতেই হবে, কোনো কোনো সিনেমার পোস্টারে যেসব বেশভূষা ও দেহভঙ্গি অংকিত হয় তা সুরুচিসঙ্গত নয়। এটাও ঠিক যে, পোস্টারে অংকিত ঐসব ছবি অনেক সময়ই হয়ে থাকে আসল সিনেমাটির বাইরের ব্যাপার। সম্ভবত সেন্সারের আশংকায় এই সব দৃশ্য সিনেমায় স্থান দেওয়া হয়নি। অথবা এমনও হতে পারে, দৃশ্যগুলি তোলার পর সেন্সারের ফলেই সেগুলো বাদ গেছে। কিন্তু বক্স অফিসের মুখ চেয়ে সেগুলো পোস্টারে ঠাঁই দিতে হয়েছে।

বিষয়টি অবৈধ তো বটেই; অনৈতিকও। কাজেই কুরুচিকর পোস্টারের প্রদর্শন বন্ধ করার ব্যবস্থাকে সুপ্রয়াসই বলতে হবে। কিন্তু,—

হ্যাঁ, 'কিন্তু' একটি থেকেই যাচ্ছে। সিনেমার পোস্টারে অর্ধনগ্ন বেশভূষা এবং কুৎসিত দেহভঙ্গি দেখলে জনরুচি বিকৃত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু রুচিবিকারের কারণ কি ঐ একটিই ?

গণতন্ত্রে নাগরিকের অনেক রকম অধিকার থাকে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ইত্যাদি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে—চিত্তবিনোদনের অধিকার। আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলে শেষোক্ত ঐ অধিকারটির দাবি আরো প্রবল হয়ে উঠছে। অন্যদিকে রয়েছে পর্বতপ্রমাণ অশিক্ষা—দেশের শতকরা সত্তর ভাগ মানুষই তার শিকার। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ রুচি টিঁকিয়ে রাখা খুবই শক্ত; বিকৃত রুচিকে সরিয়ে নতুন করে সুরুচি তৈরি করা আরো কঠিন।

সমস্যাটি জটিল তাতে সন্দেহ নেই। সমাধানের পদ্ধতিও সময়সাপেক্ষ হতে বাধ্য।

সুনীল দাশ

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯৩৯ সালে কলকাতায় সুনীল দাশের জন্ম। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে একল ন্যাশন্যালে সুপিরিয়েরে দ্য বো আর্টস-এ ফাইন আর্টস এবং ফ্লেসকো শিক্ষা করেন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। এটালিয়ার ১৭-এ গ্রাফিক আর্টস শেখেন। ১৯৬৩তেই প্যারিসের সোসাইটি দেস্ অ্যামিস দ্য মিউজে ন্যাশন্যাল দ্য মডার্ণ-এর সদস্য হন। ১৯৬০ সাল থেকে কলকাতার 'সোসাইটি অফ কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস'এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বলসয় থিয়েটারের মঞ্চে দু'শোর ওপর নাচিয়ে গাইয়ের ভেতর দিয়ে দু'জন অশ্বারোহী টগবগ করে ঘোড়া ছোটাতে পারে। সে-দৃশ্য দেখতে দু হাজারের ওপর দর্শকের আসন।

সে-তুলনা রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে জায়গা অনেক কম। ১৮ নবেম্বর বলসয় ব্যালের সন্ধ্যের শো শুরু হওয়ার মাত্র ঘন্টাখানেক আগে রবীন্দ্রসদনে দুর্লভ আসনের আশ্বাস পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম।

এমনই নাচ—যার জন্যে ব্রিগেড মাঠে মঞ্চ আর আলোর ব্যবস্থা থাকলে—শব্দ প্রক্ষেপের আয়োজন থাকলে পেলের জন্যে ভিড়ের সমান ভিড় হতে পারতো।

একসটরা আসনে পা ফেলার জায়গা ছিল না। মুখ্যসচিব শ্রীযুক্ত সেন আর সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য ঠাসাঠাসি করে বসেছেন।

ওদের ভাষা বুঝি না। বাজনা বুঝি না। নাচের তাল অন্যরকম। মাইকে নাচিয়ে বাজিয়েদের নাম বলা হচ্ছিল। বাঙালীর কানে সেসব নাম মনে রাখা কঠিন। সে চেষ্টাও এ-লেখায় করছি না। কিন্তু শরীরের ভঙ্গিমা, পিয়ানোর ঝাঁকুনি, বেহালায় জলদে ছড়ের টান—পটভূমি কুয়াসাচ্ছন্ন বুশী নিশীথ—হাজার দেড়েক বাঙালী দর্শককে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল। বুশী উপন্যাস বহুকাল হোল বাঙালী মননকে পুষ্ট করেছে। এবারে তাঁদের ধ্রুপদী নাচ, রূপকথার সারল্য, সেই বিশাল দেশের প্রাণের লাবণ্য আমাদের মনে স্থায়ী আসন পেল। কোন খোলা মাঠে অনেক বেশি মানুষকে বেশ কয়েকদিন ধরে এ-জিনিস দেখতে দিলে আমরা ওঁদের আরও বেশি করে অভিনন্দন জানাতে পারতাম। এত বাঙালীর প্রশংসায় ওঁরা নাচের ভেতর আরও বেশি অর্থ পেতেন। অবশ্য দুনিয়া জুড়েই ওঁরা অভিনন্দিত।

অনভ্যস্ত চোখে প্রথমেই মনে হয়—ছাল ছাড়ানো মুর্গি। তারপর শাদা ক্যানভাস নেটের পোশাক, ক্ষীণকটি, পায়ের আঙুলের ডগায় হাঁটাচলা দেখে মনে হবে—স্নিগ্ধ প্রকৃতির ভেতর কোন নিস্তব্ধ দিঘী থেকে একদল হাঁস উঠে এসে তীরে ধীরে সুস্থে গায়ের জল ঝেড়ে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে রূপকথা। সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে যুবরাজ, রাজকুমারী, অপদেবতার কাহিনী আশ্রয় করে নাচ-বাজনা যে কী ভয়ংকর সুন্দরভাবে প্রাণের স্ফূর্তির, বিষাদের কথা বলতে পারে তা না দেখলে বোঝা যায় না।

উৎফুল্ল বসন্ত, গুরুভার বিরহ কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুর আগে স্পার্টাকাসের আলিঙ্গন—সবই নাচে, সঙ্গতে, মুখশ্রীতে ফুটে উঠছিল।

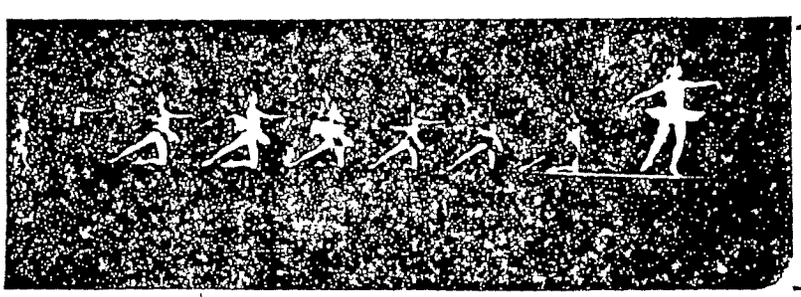

ভুল জায়গায় হাততালি

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সবার আগে মারা পিসিস্কায়া

অবশ্য একটি লোকনৃত্যে মঞ্চ পরিক্রমা কলকাতার মণিপুরী নাচের গুরু বিপিন সিংয়ের দলের নারায়ণ সিংয়ের নাচের কথা মনে করিয়ে দেবেই। মনে হবে—নারায়ণ সিংয়ের নাচ আরও কঠিন।

মঞ্চে পুরুষ নাচিয়েদের দৌড়, লাফ, শূন্যে দু'পায়ের গোড়ালি ঘষা—পশ্চিমী পুরুষের শৌর্য, স্ফূর্তি আর বিষাদকে স্পষ্ট করে। সে-তুলনায় আমাদের দুষ্মন্ত, কিংবা অর্জুনের আচরণ আমাদের ভারতীয় ধারণায় অনেক বেশি পরিণত। অবশ্য রুশী রূপকথার পুরুষদের মানসিক বয়স ভারতীয় পুরাণকাহিনীর চরিত্রের বয়স থেকে অনেক কম।

গঙ্গার বুকে চলন্ত জলের লেগে ঢেউ ভাঙা ফেনার মাথায় মাথায় কখনো কখনো ভাসন্ত শাদা পাখি পাখা মেলে নিজেদের ভেতর জায়গা বদলায়। সে এক দৃশ্য। মঞ্চে সেদিন সন্ধ্যায় তাই হচ্ছিল। সেই সঙ্গে রঙ্গে ফিনকি দিয়ে বাজনা সুর তুলছিল। এক জায়গায় দু'কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল। লাইন মনে থাকে না বলে ধরে রাখতে পারিনি।

নাচ দেখার পরদিন সকালে তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। ও'রা তিনজনেই নাচ দেখেছেন। বলসয় ব্যালের নাচ ও'রা নিউইয়র্ক, মস্কো, লণ্ডনে দেখেছেন।

১। শিল্পী পরিতোষ সেন, ২। মণিপুরী নাচের গুরু বিপিন সিং আর ৩। কলাবতী সিং।

পরিতোষবাবু বলশয় দলকে দেখেছেন নিউইয়র্ক, লণ্ডন আর এবারে কলকাতায়। কলাবতী সিং বলশয় থিয়েটারে ওদের নাচ দেখেছেন। গ্রীনরুমে ও'দের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। ও'দের রিহার্সেলে উপস্থিত থেকেছেন। ও'দের নেচে দেখিয়েছেন। যাত্রা প্রিসিস্কায়ার সঙ্গে নেচেছেন। কলাবতী দেবী লণ্ডনে নুরিয়েভ আর আবগোর্ট ফাউন্টেনের রোমিও জুলিয়েট দেখেছেন। বিপিন সিং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার বার্লিনে হিটলারকে নাচ দেখিয়েছেন মাদাম মেনকার সঙ্গে। আবার যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মঞ্চে মঞ্চে নেচেছেন।

ও'দের মতে—

বলশয় এর চেয়েও ভালো নাচে।' এদেশের মঞ্চ ছোট। সাজসরঞ্জাম ও'রা সব আনতে পারেননি। ন' বছর ধরে মহলা দিয়ে তবে হাজার থেকে একটি ব্যালেরিনা বেছে

মস্কোর বলশয় থিয়েটারে নাচের মহলায় কলাবতী

নেওয়া হয়। নাচের সঙ্গে সঙ্গে ম্যামিতি জানতে হয়। জানতে হয় ড্রইং। আর খাবার বলতে—শুধু সেদ্ধ রান্না। নয়তো শরীর অতটা লতানো যায় না। না হলে হাঁসের মত তুর তুর করে অতটা হাঁটবেই বা কি করে!

পুরুষরা নাচের সময় শূন্যে দু' পায়ের গোড়ালি এক করে ফেলেন। পরিতোষবাবু বললেন—ফরাসীকে জিনিসটির নাম 'পা দে দ্যু।' বিপিন সিং বললেন, ভরতমুনীর নাট্যশাস্ত্রে এই 'আকাশচারী' ব্যাপারটি আছে। কলাবতী দেবী বললেন, আফ্রিকায় নাচবার সময় দেখেছি—ওরা খুব 'অ্যাকরোব্যাটিকস্' পছন্দ করে। আমাদের রাধাকৃষ্ণ পালার পাশে বোমিও জুলিয়েটকে ততটা পরিণত মনে হয় না।

তবে সাধারণ রুশীদের নন্দন-অনুভূতি সাধারণ ভারতীয়দের চেয়ে বেশি। ওরা আমাদের মত আনাড়িভাবে ভুল জায়গায় হাততালি দেয় না। মণিপুরী মাইভি নাচের সময় এখানে খুব হাততালি পড়ে। পরিতোষবাবু বললেন, সেতারে সওয়াল জবাবের সময়েও শুধু হাততালি পড়ে। কলাবতী দেবী বললেন, রুশীরা তা করবে না। ওঁরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে জানে। অত তালি দেবে না। মুখচোখ দেখলেই বোঝা যাবে।

একথায় বুঝলাম—রবীন্দ্রসদনে আমরা অনেক বাঙালী সেদিন অনবরত ভুল জায়গায় হাতালি দিয়েছি।

আরেকটি কথা মনে হয়—রূপকথারও তো বয়স হয়েছে। কিছুটা বোধহয় সংস্কারের দরকার। আর দরকার রুশী পুরুষ নাচিয়ের পোশাকের পরিবর্তন। স্কিনি পোশাকে পুরুষের শরীরের সুষমা সব সময় খোলে না।

চিঠিপত্র

অভিমানের বিষন্ন বাঁকে

অমৃতের সাহিত্য ও স্বাধীনতা ১৩৮৪' সংখ্যাটিতে বারোজন লেখকের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য সংযোজন। এটিতে যেমন পেয়েছি সদা-জাগ্রত স্বাধীনতার মূল্যবোধ তেমন পেয়ে অসহায়তার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

লেখক সত্য ও সুন্দর সৃষ্টির রূপ-কার এবং পৃথিবীকে সংশোধন করার নিপুণ কারিগর। স্বাধীনতার তিনটি দশক পার হল। অথচ সরকার এবং প্রকাশকরা লেখক-দের আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে কঠোর উদাসীন। কিছু জাঁদরেল লেখক বাদে অপরাপর লেখকরা আর্থিক দুর্বলতায় মিয়মাণ। কিন্তু এমন বৈষম্য কেন? শিল্পীর অন্নকষ্ট মানেই তো শিল্পের অপমৃত্যু অর্থাৎ সমাজের মৃত্যু। লেখকদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিপূরক ভারসাম্য থাকবে বটে, কিন্তু প্রকাশনায় আর্থিক সহযোগিতা একান্ত উদার হওয়া প্রয়োজন। একজন লেখক অবশ্যই লেখেন তাঁর কষ্টার্জিত চিন্তাধারা পাঠককুলে বিস্তারের জন্য, নিছক বস্তাবন্দীর জন্য নয়। যদি সে লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আর্থিক সহ-যোগিতা না পায় তবে প্রতিভার স্ফুরণ কিভাবে হবে। ব্যাংকিং ঋণদান, ভাল রয়্যালটি, নিখরচে ভ্রমণ, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, পেন্সন প্রভৃতি লেখকদের একান্তই আবশ্যক। কারণ মানুষের মূল্য-বোধ জাগাতে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনে লেখকগণ দেশের কাছে উৎসর্গীকৃত।

শুধু এক ডজন লেখক বা আমার মনের কথাই নয় এটা—অভিমানের বিষণ্ণ বাঁকে বাঁকে উপেক্ষিত প্রতিটি লেখকের হৃদয়-নিংড়ানো কথা। এমন কি সচেতন নাগরিক মাত্রই এই ন্যায্য কথার দৃঢ় সমর্থক। সরকার এবং প্রকাশকরাই বা এ-ব্যাপারে কেন কঠোর উদাসীন থাকবেন?

পুলক দেবনাথ; বিধানপল্লী, ইছাপুর, ২৪ পরগণা।

কবিতায় ধূপের গন্ধ

১৩ মে তারিখের অমৃত পত্রিকার চিঠিপত্র কলমে রমাপ্রসাদ ঘোষাল আর সমীরণ মজুমদার এই দুজনের দুটি চিঠি পড়লাম। এঁরা দুজনেই অমৃতের পাঠক এবং কাব্যরসিক। শুধু এই দুটো গুণের জোরেই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন রচনা সম্বন্ধে এঁরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। সুস্থ তো বটেই। কারণ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পাঠকের জন্মগত অধিকার। এবং এই স্বাধীনতাটুকু সম্বন্ধে রমাপ্রসাদবাবু আর সমীরণবাবু দুজনেই যে ওয়াকিবহাল তার জন্যে এঁরা ধন্যবাদার্হ। ধন্যবাদ এই জন্যেও যে এঁরা পত্রিকা মারফত নিজেদের মতামত পাঠকের দরবারে পেঁছে দিয়ে পাঠককেও তাঁদের মন্তব্যের ওপর পাল্টা মন্তব্য করবার সুযোগ দিয়েছেন।

চিঠি দুটি পড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না যে রসপ্রসাদবাবু আর সমীরণবাবু ২৯ এপ্রিল তারিখের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত মানস রায় চৌধুরীর নেওয়া সাক্ষাৎকারে দেবারতি মিত্রের একটি উক্তিতে এবং তাঁকে কবি আখ্যায় ভূষিত করায় বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ রুষ্ট এবং বিরক্ত হয়েছেন।

মানসবাবুর সাক্ষাৎকারে দেবরতি এক-জায়গায় বলেছেন, 'জীবন কবিতার থেকে অনেক বড়ো।'

শুধুমাত্র এই উক্তিটির জন্যই দেবরতি এঁদের দুজনের কাছেই অকবি বনে গেছেন। শুধু এখানেই এঁরা থামেন নি। আরো এক কদম এগিয়ে অমৃতের দরবারে আরজি পেশ করেছেন তাঁরা যেন দেবরতিকে কবি আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর 'অপুটি রোগাক্রান্ত' মনের রোগটিকে সংক্রামিত কোরে না তোলেন। এ আরজিটা রসপ্রসাদবাবুর। অন্য-দিকে সমীরণবাবু পরিমিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন দেবারতিকে কবি নামে চালাতে গেলে সহৃদয় পাঠকমহলের সুস্থ রুচিটাকেই বিকৃত কোরে তোলা হবে।

গৌতম গুপ্ত; কলকাতা-৪।

কবিতা জীবনবোধেরই ফসল

অমৃতে প্রকাশিত তিন কবির এক কবি দেবারতি মিত্রের কবিতা বিষয়ে বক্তব্য লিখেছেন মানস রায়চৌধুরী। সে বক্তব্যের একটি উক্তি 'জীবন কবিতার চেয়ে বড়',—সম্পর্কে সমীরণ মজুমদার ১৩।৫। ১৯৭৭,

ত্যবিথের অমৃতে অসহিষ্ণু হয়ে লিখেছেন যে দেবারতি অ-কবিসুলভ কথা বলেছেন।

দেবারতি অ-কবিসুলভ কথা বলেছেন এ কথা ঠিক নয়। কারণ কবিতা জীবন-বোধেরই ফসল।

এ-প্রসঙ্গে জীবন বড় না কবিতা বড় এ প্রশ্ন নিতান্ত নিরর্থক। কারণ কবিতা জীবনবিবিক্ত নয় অবশ্যই। কবিতা জীবনের অঙ্গীভূত গূঢ়তম কূটতম প্রজ্ঞার ফসল। তাই কবিতা ব্যক্তিজীবন অতিক্রম করেও সমষ্টিজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে কালের সীমা অতিক্রমের স্পর্ধা প্রকাশ করে।

পরিশেষে জানাই, অমৃত নবীন কবি-দের রচনা ও বক্তব্য প্রকাশের যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছে তাতে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হবে এবং পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

আশুতোষ বিশ্বাস
চৌবেড়িয়া, ২৪-পরগণা।

উত্তেজিত না হয়ে ভাবা দরকার

১৩ মে ১৯৭৭-র 'অমৃতে' চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সমীরণ মজুমদারের চিঠি পড়লাম। তাঁরা উভয়েই 'তিনকবি'-র অন্যতমা দেবারতি মিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমি অতি সামান্য একজন মানুষ, তবু একটু বলতে চাই। দেবারতি মিত্র নাকি বলেছেন, 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়'। 'তিনকবি'-তে দেবারতি দেবীর কথার মধ্যে তো আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখ নানা ঘটনা থেকে কবিতার জন্ম হয় কবিমানসে এক রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক তাই। অতএব জগৎ ও জীবনজাত কবিতার মহিমার ব্যাপ্তি যতই থাক না কেন, কবিতা জগৎ ও জীবন-ভিত্তিক বলে কবিতাকে জগৎ ও জীবনের মুখ চেয়ে থাকতেই হয়। আবার জীবন ব্যতিরেকে জগতেরই বা স্বীকৃতি কোথায়? অস্তিত্ব কোথায়? মূল্য কোথায়? তাই জগৎও জীবনের মুখাপেক্ষী। অতএব কবিতার চেয়ে জীবন অনেক বড়। তাছাড়া কবিকে চিরার্চিত কথাই বলতে হবে কেন? তিনি মানসিকতায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বতন্ত্র হবেন বৈকি। তিনি যদি কিছু নতুন কথা শোনান তাহলে আমাদের উত্তেজিত না হয়ে বেশ-ভাবা দরকার এবং তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া দরকার। তবেই তো আরও শুনতে পাবো আমরা। কিন্তু আমাদের মধ্যে গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেবো কেন? আবার সমীরণবাবুর অভিযোগ, দেবারতি দেবী তৈরী না হয়ে সাহিত্যের উত্তর দিতে অসুবিধে বোধ করেছিলেন। সেহেতু সমীরণবাবু দেবারতি দেবীকে অ কবির সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় দেবারতি দেবী যে অসুবিধের পড়ার মত ভাব দেখিয়েছিলেন তা আদৌ সত্যি নয়। আসলে তিনি মানসবাবুর সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন। অথবা ওটা মানসবাবুর মতে অত্যন্ত বিনয়।

অজিতকুমার সু
কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

ধন্যবাদ

তখনই আমাকে ২৯ এপ্রিল ৭৭ সংখ্যা 'অমৃত' থেকে 'তিনকবি' প্রচ্ছদ কাহিনী আবার পড়তে হলো ব্যস্ততা ও কুড়েমির মধ্যেও এবং কলম নিয়ে বসলাম যখন ১৩ মে সংখ্যায় তিনকবি প্রসঙ্গে পর পর দুটি চিঠি পড়ে (যথাক্রমে রমাপ্রসাদ ঘোষাল এবং সমীরণ মজুমদারের, উভয় পত্রদাতাই লিখছেন মেদিনীপুর থেকে) হতবাক বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। শ্রীঘোষাল এবং শ্রীমজুমদারের চিঠি দুটির বক্তব্য মোটামুটি এরকম ১। তিনকবি পর্যায়ের দেবারতি মিত্রের মন্তব্য, 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়র প্রতিবাদ, ২। অমৃত 'সিনেমা পত্রিকার কায়দায়' কবিদের পরিচিতি প্রকাশ করে একটি ভীষণ আপত্তিকর কাজ করেছে।

শ্রীমজুমদার দেবারতির উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর মতে 'জীবন কবিতার চেয়ে ছোট' এবং দেবারতি যা বলেছেন তা অকবিসুলভ। 'কবিসুলভ' ব্যাপারটি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, তাঁর ভাষায় 'অ-কবি' দেবারতির কটি কবিতা তিনি পাঠ করেছেন তাও না!!) এই বিভ্রান্তিকর কথাগুলির প্রতিবাদে আমার বক্তব্য—কবিতার (ও অন্যান্য শিল্পের) জন্ম শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, চেতনা, আনুভূতিক জগৎ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ধ্যানধারণাকে ভাষা-আশ্রয়ী (চিত্রকলা সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রেরও নিজস্ব ভাষা আছে) আঙ্গিক, চিত্রকল্প ইত্যাদির দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনায় একটি সুসম সাজুজ্য-যুক্ত মাধ্যমে অপরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনে। শ্রীমজুমদার 'জীবনবোধ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন, যদিও সম-অভিধান উভয়েরই সুলভ, আমি বুঝতে পারলাম না জীবনবোধের সংজ্ঞা তাঁর কাছে কি রকম। যথার্থ এবং সর্বজনস্বীকৃত অর্থে কবিতা কি তা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ বিতর্ক কিন্তু একথা অনস্বীকার্য কবিতা যখন 'কবি' নামক একটি মানুষসৃষ্ট সুতরাং তা নিশ্চয়ই জীবনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না সে কবিতা যতই মহৎ হোক; শিল্প মানুষের জন্য, মানুষ শিল্পের জন্য নয়, একটি মহৎ কবিতা তখন সৃষ্ট হতে পারে যখন তা জীবনের মহত্ত্ব ও মূল্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে অনুভূতি ও বোধকে উত্তরিত করে একটি বিমূর্ত জগতে (যেখানে 'জীবন' মূলকথা বলেই কবির অবশ্যই 'জীবনবোধ' থাকতে হয়) যা কোন এক-ভাবে জীবনেরই চলচ্ছবি। স্বল্পপরিসর সুতরাং বিস্তৃত আলোচনা করতে পারছি না, তবে আমার বিশ্বাস শ্রীঘোষাল ও শ্রীমজুমদার সদৃশ দু'একজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া আর সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

'সিনেমা পত্রিকা' প্রসঙ্গে লিখি, (ফ্যাসান-নির্ভর মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে প্রকাশিত অধিকাংশ সিনেমা পত্রিকা, চলচ্চিত্র-শিল্প নির্ভর সিরিয়াস পত্রিকাগুলি নয়) তাঁরা যদি বকস্ অফিস গরম করা ছবির বহু পরিচিত স্টারদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রতি-নিয়ত পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করতে পারেন (যার মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা মাত্র) তবে একটি সাহিত্য-সাপ্তাহিক কবিদের সঙ্গে পাঠকের সরাসরি পরিচয় করে কি ভীষণ অন্যায় করে ফেললেন? নাকি এদেশে কবিরা অধিকাংশ পাঠকের খেউড় ছাড়া আর কোন উপহার লাভের অযোগ্য!

পরিশেষে, এই সুযোগে অমৃতকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি 'তিনকবি' প্রকাশের জন্য, ভাস্করের বেশ কিছু কবিতা পড়েছি কিন্তু চিনতাম না, পঁচিশে বৈশাখ ভোরা-সাঁকোর সকালে হঠাৎ একটি সুখের সঙ্গে স্মৃতি থেকে অমৃতর একটি ছবি মিলিয়ে নিতে পারলাম।

পিনাকী ঠাকুর
রাঁশবেড়িয়া
হুগলী-৭১২৫০১

দেবারতি স্টান্ট দিয়ে কবি হন নি

গত ১৬ বৈশাখ সংখ্যার 'অমৃতে' প্রকাশিত 'তিনকবি'র কবি দেবারতি মিত্রের বলা 'জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়োর' বিরুদ্ধে গত ৩০ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও সমীরণ মজুমদারের অপরিণত মনের কয়েকটি অগভীর বক্তব্য পড়লাম। আমার মনে হয় এঁরা কবিতায় প্রথম প্রেমে পড়ার স্তরের ভাবালুতা নিয়ে উক্ত কবির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। যা কেবল একরকম মোহগ্রস্ত মনের উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি শ্রদ্ধেয়া মিত্রের সমর্থনে বলি হ্যাঁ একটি মহাজীবনের কাছে কবিতা একটি খণ্ডাংশ মাত্র। জীবনের প্রগাঢ় বেদনার নিয়ত বহমান স্রোতধারার একটি ধারার প্রকাশই হল এক একটি কবিতা। জীবন অনিঃশেষ একটি সমুদ্র। তার গভীরের অন্তহীনতার মধ্যে থেকে এক একটি ছোট আকারের মুক্তোই হল এক একটি কবিতা। উৎসের কাছে আমরা ঋণী, কবিতার উৎস জীবন, তাই জীবনের কাছে কবিতা সন্ধানী দাই, জীবন কবিতার চেয়ে অনেক বড়'। অপরপক্ষে সমালোচকদ্বয় যথার্থ জীবন-বোধে জারিত না হয়েই তাঁর সম্পর্কে অগভীর বক্তব্য রেখেছেন। রমাপ্রসাদ ঘোষাল ও সমীরণ মজুমদারের বক্তব্যের শেষের কথাগুলি হাস্যকর মনে হয়েছে। তাঁদের জানাই কবি দেবারতি মিত্র কবি পরিচিতি নামক কোন স্ট্যান্ট দিয়ে কবি বলে পরিচিত হননি। তাঁর লেখার পরিচয়েই তিনি একজন কবি এবং তাঁর লেখার গুণেই গুণীজন তাঁর পরিচয় নিতে ও সবার কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী হয়েছেন। নিন্দুক সমালোচকের অকবি এই আখ্যার তোয়াক্কা

না করেই আশা রাখি তিনি তাঁর বক্তব্যের নিরিখে আরও বড়ো জীবনের অনুভূতিতে পৌঁছে যেতে পারবেন।

অনুরাধা মহাপাত্র;
ফন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

আপসোস রয়ে গেল

অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যা পড়ে লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে আমরাও অলক্ষ্যে মতবিনিময় করে নিলাম। কিন্তু আপশোস রয়ে গেল। লেখকদের আঞ্চলিক তথা সর্বভারতীয় পরিচয়টাকে আমরা আঠাশ-কুড়ির তরুণেরা জানতে পারলাম না। চেষ্টা করলেই লেখকদের একটা মিনি পরিচিতি ছবির সঙ্গে ছাপিয়ে দেওয়া যেত। তাহলে আমরা নতুন করে খুঁজে পেতাম লেখকদের এবং লেখাগুলোও হয়ে উঠত আকর্ষণীয়। স্বপন কুমার নন্দী; মোহনপুর, নদীয়া।

অভূতপূর্ব

অমৃতে স্বাধীনতা ও সাহিত্য ৮৪ সংখ্যাটি পড়লাম—সুন্দর— অভূতপূর্ব। 'লেখক লেখা নিয়েই থাকবেন,' 'লেখকের মৃত্যুই শিল্পের মৃত্যু,' 'চার বছর আটক ছিলাম,' 'নিজেই নিজের রাজা,' 'স্বাধীনতা ছাড়া শিল্প বাঁচবে কি করে,' রচনাগুলো মনকে তোলপাড় করে দিল। আমাদের মতো নবীন সাহিত্যিকদের এই রচনাগুলো অবশ্যই পড়া উচিত। শ্যামল গাঙ্গুলীর 'সত্যজিৎ রায় দা টেবিলে'র মধ্যে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও পড়তে ভাল লাগে। বক্তব্য সত্যজিৎ রায়-এর মতো ব্যক্তিকে নিয়ে বলেই। এছাড়া বৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখাটি সুন্দর। অমৃত আরো নতুনদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের আকৃষ্ট করুক এটাই কাম্য। কৃশাঙ্কুর সাহা, ২নং বিজয়নগর, নৈহাটি, ২৪-পরগণা।

ধন্যবাদ

অমৃত (১৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা) পড়লাম। এতে যে প্রচ্ছদ কাহিনী (আমাদের জঙ্গল) প্রকাশিত হয়েছে, পড়ে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি।—এ জন্য আপনাকে এবং লেখক অশোককুমার চক্রবর্তী ও বাঁশী মান্নাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—

এর আগেও (১৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা) অমৃতে যে প্রচ্ছদ কাহিনী 'বাঘ চক্রকোত্তির সংসার' প্রকাশিত হয়েছিল তা-ও আমাদের ভাল লেগেছে। পিনাকী চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেঞ্জ অফিসার। সেই কারণে আমরা ছোট বেলা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বহু জঙ্গলে ঘুরেছি-থেকেছি। এই কারণেই জঙ্গলকে ভয়ংকরভাবে ভালবেসে ফেলেছি।

লেখক 'অরণ্যে অভয় চাই' কলমে সামান্য ভুল করেছেন। তারা লিখেছেন 'দার্জিলিং জেলায় দুটি অভয়ারণ্য— মহানন্দা আর সিঙ্কল।' এই মহানন্দা অভয়ারণ্য 'সুফলা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।' এখানে 'সুফলা' হবে না, 'সুকনা' হবে। আর, এখানে বাঘ, হাতি, হরিণ, অজগর ও মরাল সাপ।

(এটি ছাপার দোষ নয় বলে মনে হয়, কারণ এই 'সুফলা' আমরা (১১ এপ্রিল, ১৯৭৫) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যায় অমৃতে ২৯ পৃষ্ঠায় পেয়েছি।)

আশা করি, লেখকদ্বয় ভুল বুঝতে পারবেন। প্রণব বিবাড় ও প্রবীর বিবাড় সুকনা ফরেস্ট বেঙ্গ অফিস, সুকনা দার্জিলিং।

শহরের সবুজ এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়

গাছগাছালি যদিও মানবসমাজের পরম সুহৃদ তবুও মানুষের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধের উন্নতি হল না। 'আমাদের জঙ্গল' প্রচ্ছদ কাহিনীতে এ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ। এককালে ব্রতচারিগণের অন্যতম স্লোগান ছিল 'কেটে গাছের নিবিড় বন' সভ্যতা প্রসারে সহায়তা করা। আজকের দিনে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' এটাই হওয়া উচিত দল-মত-নির্বিশেষের স্লোগান। শহরের 'সবুজ' তো ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামের দিকেও 'সবুজ' যা কিছু আছে তা ধ্বংসের জন্য এক অলিখিত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। একদল তাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তির মালিক হয়েই মাত্র কটা টাকার লোভে বিরাট মহীরুহগুলিকে কেটে বিক্রী করছে— অভাবে নয় স্বভাবে, আর একদল ব্যবসায়ী শহরে দাঁতনকাঠি, ফুলের তোড়া, অশথপাতা, দেবদারু পাতা, আম্রপল্লব প্রভৃতি সরবরাহের ও বিক্রয়ের জন্য গ্রামের এখনো জীবিত কটা গাছকে নিপত্র করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আজকাল গ্রামে একটা বট বা দেবদারু গাছ পাওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তৃতীয় একদল গ্রামেরই গরীব বাসিন্দা মুদ্রানী সংগ্রহের জন্য কাঠ কুড়োবার নামে জ্যান্ত গাছের ডাল, বাকল, শেকড়, কাঁচা জীবন্ত গাছ নির্বিচারে কেটে ধ্বংস করে চলেছে। বড় রাস্তার দুধারে একদা রোপিত সরকারী গাছগুলির অনেকগুলিই কুঠারাঘাতে মৃত্যুপথযাত্রী। ক্ষতবিক্ষত বৃক্ষকাণ্ডটির নীচের অংশ কেটে নেওয়ায় উল্টো ত্রিভুজের আকৃতি নিয়ে দিন গুণছে—সামনের ঝড়ে মহানিপাতের অপেক্ষায়।

কানাডায় শুনেছি একটা গাছ কাটলে দশ বছর জেল হয়। এদেশে? এদেশে 'বৃক্ষরোপণ' ও 'বনমহোৎসবের' নামে কিছু সরকারী পয়সার শ্রাদ্ধ হয় মাত্র। গাছ কাটা মানুষের (এদেশের) জন্মগত অধিকার। এদেশটা তো ইংলন্ড নয় যে, 'রাস্তার দুধারে গাছ রুইবার জন্য সমিতি' হবে, 'পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আন্দোলন' চলবে, কিংবা ল্যান্ডস্কেপ সংরক্ষণ সমিতির সেক্রেটারী সচেতন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাবেন, 'আপনি কি জানেন আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?' স্বপনকুমার গোস্বামী, বাগনান চৈতন্য বাটি, হুগলী।

প্রশংসনীয়

১০ জুনের অমৃততে বিচিত্রা বিভাগে একটি নতুনত্বের সন্ধান পেলাম 'ভিখারী গবেষণা সংস্থা'র কথা জেনে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাকে সালিখার অধিবাসী হিসাবে জানি। তবে তিনি যে এত মহৎ একটি পরিকল্পনা করছেন ভিখারীদের জন্য তা সত্যই সমর্থনযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। দেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত ভিখারীদের সাহায্য করতে এবং ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করতে। এই প্রবন্ধে জানতে পারলাম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখারীদের জীবন নিয়ে কিছু সাহিত্য রচনা করেছেন। এই রকম কিছু লেখা আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ হলে আমরা পড়ে এ বিষয়ে আরও জানতে পারব। আপনাদের যে প্রতিনিধি এই সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ পত্রিকাকেও। শ্যামাপ্রসাদ মাহিন্দার, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, হাওড়া—৬

প্রতিবিধান প্রয়োজন

'বেগার রিসার্চ ব্যুরোর' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিকতা বোধের জন্য ধন্যবাদ। একক প্রচেষ্টায়ও তিনি উদ্যোগী হয়ে ভিখারীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু ভেবেছেন, কিছু করেছেন। যা অন্যে করেননি। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। বন্যা রোধকল্পে আগে বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকিয়ে তারপর অন্য চিন্তা যাতে বন্যা একেবারেই না হয়। ভিখারীর পুনর্বাসন চিন্তার সঙ্গে দেখা উচিত ভিখারী সম্প্রদায় যাতে নতুন করে গড়ে না ওঠে এবং সেই সঙ্গে ভিক্ষা ও বিখারীবৃত্তির ধার্মিক পৃষ্ঠপোষকদেরও শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। সকলেই জানেন একদল পুণ্যলোভী সমাজপতি আছেন যাঁরা নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে কুষ্ঠরোগী ও বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ভিখারীদের কুম্ভমেলা, সাগরমেলা বা কেঁদুলী মেলায় পৌঁছে দেন। কারণ সাগরদ্বীপে দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে বিত্তহীন বিকলাঙ্গের পক্ষে পৌঁছান দুরূহ। প্রথমে এই পুণ্যলোভীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর পুণ্য সঞ্চয়ার্থে ভিক্ষা না দেবার জন্য জনগণের মনোভাব গঠনে সহায়তা করা— ভিক্ষায়াম নৈব নৈব চ'—এদেশেরই শাস্ত্রবাক্য। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ আইন পাশও হয়েছে। এছাড়া যে প্রাথমিক কারণগুলি একজন নাগরিককে ভিখারীতে পরিণত করে সেইগুলির বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করে তার প্রতিবিধান প্রয়োজন। স্বপনকুমার গোস্বামী, বাগনান, চৈতন্য বাটি, হুগলী।

রবীন্দ্রনাথের পেছনেও টিকটিকি/শিশির কর

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো—
একলা চলো রে।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলের আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়েনিয়ে
একলা জ্বলো রে।'

রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটি কেবল আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ অহিংস যোদ্ধা মহাত্মা গান্ধীরই প্রিয় ছিল না, যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন সেইসব অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রেরণা দিয়েছে একলা চলার এই ডাক। রবীন্দ্রনাথের আরও অসংখ্য সঙ্গীত, কবিতা ও গদ্য রচনা আছে যা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনে। আমাদের অন্তরে জ্বালিয়েছে দেশাত্মবোধের আলোকবর্তিকা যা আমাদের ভগ্ন শুষ্ক বুকে এনেছে আশা। আর রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের একমাত্র কবি, যার সঙ্গীত দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে। তবু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয় নি। অথচ দেশাত্মবোধক রচনার জন্য তাঁর সমসাময়িক এবং তাঁর আগের ও পরের অনেকের বই ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে। তবে কি ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথকে নিতান্তই নিরীহ মনে করতেন? না। মোটেই তা নয়। তখনকার বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজদের আশংকা মোটেই কম ছিল না। সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের তাঁর প্রতি। রবীন্দ্রনাথের লেখা নিষিদ্ধ করা হলে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হতে পারে—এই আশংকাতেই হয়তো ইংরাজরা এ থেকে বিরত হয়েছে। কারণ দেখা যায়, গোয়েন্দারা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনাকে 'আপত্তিকর' বলে নোট দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ্য, রাশিয়ার চিঠি।

সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কম হেনস্তা করেনি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ও বাজপুরুষরা। যেমন, একবার তুচ্ছ কারণে সমন জারি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে আদালতে আসতে হয়। 'হুংকার' নামে একটি কবিতার বই রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা জানতেন না। বইটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেন। সে সম্পর্কেই সম্পাদক বইটির লেখক হীরালাল সেন পরে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ও সহানুভূতি পান। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ পান। পরে সেখানে টিকটিকির আনাগোনা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর জমিদারি দেখার কাজে নিয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের উপরও এক সময় ইংরেজ শাসকদের বিষদৃষ্টি পড়েছিল। সরকারী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে সরকারী আদেশ জারি হয়, সরকারী নথিপত্রে এখনও আছে। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসের সার্কুলারে বলা হয়েছে :

Dear Sir,

I am desired to refer to Eastern Bengal and Assam Government's demi-official letter No. 1636-52 N, dated the 24th Oct. 1911 regarding the Santiniketan and Brahmacharya Asram institution at Bolpur in the District of Birbhum. It was stated in that letter that the L. Governor of Eastern Bengal and Assam considered the institution altogether unsuitable as a place for the education of the sons of Government servants and desired that any well-dis-

মাইনের দিনই হ'ল প্রিমিয়াম দেবার দিন

আপনি হয়ত কোনো অফিসে চাকরী করেন এবং প্রত্যেক মাসে মাইনে পান। অথবা আপনি হয়ত কোনো ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনি কিছু উপার্জন করেন। আপনার আয় যে ভাবেই, বা যে সময়েই হোক না কেন, জীবন বীমার প্রিমিয়ামের কথাটা মনে রাখবেন। এটি খাওয়াদাওয়া, বাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য অপরিহার্যের সমগোত্র। তার কারণ নিরাপত্তাও তো অপরিহার্য্য, তাই নয়?

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

RADEUS/LIC/AS/20A

posed Government servants who might be known or believed to have sons at the institution, or to be about to send sons to it might be warned to withdraw them, or not to send trem as the case may be, unless they were prepared to find their sons debarred from Government employment.

কয়েক মাস পরে অবশ্য ওই সার্কুলার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের একজন অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিদেশী পণ্য দেশের বাজার যাতে গ্রাস না করে, সেদিকে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। দেশি পণ্য বিক্রিতে ও ব্যবহারে দেশের মানুষকে উৎসাহিত করতে তিনি উদ্যোগী হন। তিনি 'স্বদেশী ভান্ডার' গড়ে তোলেন। কিন্তু বিদেশী শাসক তা ভাল চোখে দেখে নি। - এটা গত শতাব্দীর ব্যাপার। সেই সুদূরের দিনেও যে রবীন্দ্রনাথের উপর বৃটিশ গোয়েন্দার সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তা বোঝা যায় এই রিপোর্টটি থেকে।

"In 1897, Rabindranath Tagore started 'Swadeshi Bhandar' at 82, Harrison Road, to encourage sale of country-made goods and to start schools far instruction in indigeneous Arts; but the effort met with little success"

দীর্ঘ দেহী হউন।
নতুন ধরনের ব্যায়াম ও গোপন ফর্মুলার সাহায্যে সুস্বাস্থ্য লাভ করুন। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই উপযোগী। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ।
P.O. Box-1378, Delhi-6

বি/৩৮৬৯

বৃটিশ গোয়েন্দা পরিতৃপ্তির সঙ্গে জানিয়েছে যে, স্বদেশী পণ্য বিক্রিতে উৎসাহ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। শুধু কলকাতা বা শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের প্রতি গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল না। সুদূর গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ. তাঁর জমিদারিতে কী করছেন, না-করছেন তাঁর প্রতিও শোনদৃষ্টি রেখেছিল ইংরেজের গোয়েন্দা। পূর্ববঙ্গের দুর্গম গ্রামেও রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে ও দেশী পণ্য ব্যবহার করাতে চেয়েছিলেন। বিটিশ গোয়েন্দারা তা ভাল চোখে দেখেন নি। তাই গোয়েন্দা রিপোর্টে এর প্রতি কটাক্ষ রয়েছে।

"Swadeshi in Rabi Tagore's Zamindary: Rabindranath Tagore reorganised his zamindari administration with the sub-division of Kusthia and appointed 4 Circle Inspectors and directed them to get supplies of country-made clothes and threads and sell them at the lower price to the tenants than the foreign made goods"

শরৎচন্দ্রের মত সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও দেশাত্মবোধের উন্মেষসাধনে ও স্বদেশী পণ্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ জন্মানোর জন্য তাঁর প্রয়াসের শেষ ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যও তাঁর চিন্তা-ভাবনা কত প্রবল ছিল, শুধু তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতা, গান ও প্রবন্ধেই তা মূর্ত নয়। সমসাময়িক অসংখ্য ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ অনেকে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছেন অনুপ্রেরণা পাবার জন্য। আর সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল, তা আমরা সকলেই জানি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সকলের জন্যই ছিল তাঁর অন্তরের ভালবাসা, শ্রদ্ধা। নানাভাবে তিনি তাঁদের সমর্থন, সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর শান্তিনিকেতনে তাঁদের কাউকে কাউকে তিনি শিক্ষকতার কাজ দিয়েছিলেন। সেজন্যই তো এক সময় শান্তিনিকেতনে সরকারী কর্মীদের ছেলেদের পড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছিল। নিজের জমিদারী থেকেও এঁদের কাউকে কাউকে তিনি সাহায্য করে থাকতেন। এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই মহান কবি এগিয়ে এসেছিলেন। একবার তিনি একজনকে সোনার পদক দিয়ে উৎসাহিত করেন। বিটিশ-গোয়েন্দাদের নোটে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

'Swadeshi convicts awarded by Tagore'

শীর্ষক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে:

'It was announced that silver medals to be presented to those convicted in connection with Swadeshi movement in recognition to their services. Rabindranath Tagore had promised a golden foremost of Barisal salt-rate star to be presented to the man The meeting was held at Grand Theatre on Harrison Road. Three thousand people attended, twenty-three persons received medals, greatest reception was awarded to a young student who was sentenced to fifteen stripes by the Calcutta Chief Presidency Magistrate for crying Bandemataram in the street."

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ ঐ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যা লিখেছিলেন, তা থেকে অনেকেরই ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি ইংরেজদের খুব সুনজরে ছিলেন। ঘটনা কিন্তু তা নয়। এখনও আমাদের দেশের বিভিন্ন আর্কাইভসে ও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে যেসব সরকারী দলিল, নথিপত্র, ফাইল রয়েছে, তা খুঁজলে দেখা যাবে, ইংরেজ গোয়েন্দারা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বার বার বিরূপ মন্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ মোটেই তাদের সুনজরে ছিলেন না। হয়তো অন্যদের মত এইবিশ্ববন্দিত কবিকে উত্যক্ত করার নৈতিক বল তাদের ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে সরকারী কর্মকর্তাদের সুনজর ছিল না, তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই বিশ্ববন্দিত মনীষীকে যখন ভারত সরকার সম্মানিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তখন বাংলা সরকার আপত্তি করেছিলেন। কারণ গোয়েন্দাদের চোখে রবীন্দ্রনাথ তো আপত্তিজনক ব্যক্তিই ছিলেন।

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

টান / চণ্ডী মণ্ডল

কেউ বলে—নাকখত দিক বিশ হাত। কেউ বলে—জরিমানা হোক দুকুড়ি টাকা। কেউ কেউ বলে—জরিমানা নাকখত দুই-ই হোক।

বিচারে রায় দেবেন হরেন দাস। তাঁর পাকা মাথা—গ্রামের মাথা তিনি। আজকের সালিসীর আসরে তিনিই সভাপতি। সভা [illegible] দ্বারই বৈঠকখানায়।

তিরিশ বছর ধরে গ্রামের যত মেরুবী জমায়েত হয়ে আসছে হরেন দাসের বৈঠকখানায়। গত তিরিশ বছর প্রত্যেকটা সভায় যে সতরঞ্চিটা পাতা হয়ে আসছে, আজও সেটা পাতা হয়েছে মূল আসরে [illegible] কম করেও তিরিশজন মানুষ বসেছে। বৈঠকখানার সামনের দাওয়ায় বসেছে [illegible] লোক। বাকী লোক দাঁড়িয়ে আছে দাওয়ার দুদিকে—একদিকে পুরুষের দল, অন্যদিকে ছেলে, কোলে ঘোমটা মাথায় মেয়ের দল।

হরেন দাসের বাড়ি থেকে দুটো হ্যারিকেন এসেছে। আরো চার-পাঁচটা হ্যারিকেন ছড়িয়ে জ্বলছে চারপাশে, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে সব হাতে হাতে এসেছে। দু-তিনটে লম্প জ্বলছে বৌ-ঝিদের হাতে হাতে। বিড়ি এসেছে তিন বাণ্ডিল।

তামাকও এসেছে—একটা হুঁকো আলোচনা আরম্ভ হওয়ার আগে থেকে হাতে হাতে ঘুরছে।

বিড়ি তামাকের পয়সা রতনের মাকেই দিতে হয়েছে।

আজ সকালে রতনের মার হয়ে পাড়ার একজন বাড়ি বাড়ি বলে এসেছে—হরেন দাসের বৈঠকখানায় বিচার বসবে আজ রাত্রে, সবর সবর যাবে গো সব—সককলের যায়া চাই-ই। ছেলে বুড়ো, বৌ-ঝি কেউ বাদ যায়নি, পাড়া কেঁটিয়ে মানুষ এসেছে।

মেয়েদের ভিড়ের সামনে আছে রতনের মা। বৈঠকখানার মূল আসরে হরেন দাসের চারপাশে গ্রামের মুরুব্বিরা। অদূরে বৈঠকখানার দেয়ালে বসে গোষ্ঠ। তার মুখ ভালো করে দেখার উপায় নেই—তার ঘাড় হেঁট।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো—আকাশে মেঘ ডাকল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসর সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল—ঝড়-জল আসতে পারে যখন-তখন।

দাওয়ার ওদিক থেকে কে বলে উঠল—ঘটনাটা কী ঘটেছিল আর একবার যদি বলা হয়,—আমি বিলম্বে এয়েছি গোড়া থেকে শুনিনি।

সঙ্গে সঙ্গে যারা একটু দেরিতে এসেছে এবং যারা অনেক আগে এসেছে, দুপক্ষের অনেকেই এক সুরে বলে উঠল— আমরাও শুনিনি।

মিথ্যা কথা, সবাই জানে!! পরশু রাতের পর থেকে কাল সারাদিন, আজ সারাদিন—দুদিন ধরে একটা কথাই মুখে মুখে ঘুরছে। পথেঘাটে মাঠে দুটো মুখের দেখা হলে ওই একটাই কথা। কথাটাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে গ্রামের সীমানা পার করে আশেপাশের গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে।

হরেন দাস সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—আগে দুবার বলা হয়ে গেছে।

—আর একবার হোক।

—হোক। হোক। উপস্থিত প্রায় সকলেই আগ্রহ দেখায়। —আরো একবার হোক।

রতনের মাকে আর একবার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তৃতীয়বার, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম ঘটনাটা বিচারসভায় শোনাচ্ছে রতনের মা।

আমার সাদা সরল মন, কার মনের ভেতরে কী আছে আমি অত কি বুঝি! বউ বলে, মা গরমে আমি ঘুমতে পারিনি—আমি দাওয়ায় শোব। সেই থেকে দাওয়ার বোয়ের বিচনে হয়, আমি রতনের ঘর আগলাই। রতনের ঘরে ফেরার ঠিক নি, মন হলে সাতদিনে একদিন আসে, নাহালে মাসের আদেক দিন পায় হয়ে যায় রতন আসে নে।

বউ রান্না করল, শাউড়ি বোয়ে রান্না-ঘরে বসে খেলুম। বোয়ের বিচনে পড়ল দাওয়ায়। আমি বসে আচি, বউ বলল—কেরাসিন পুড়িয়ে কী হবে। আমি বললুম—আমার মন বলচে আজ রতন আসবে। বউ বলল—আসবে নে। ভাবলুম রতন তাহলে বউকে বলে গেচে সে কবে আসবে। বউ মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। আমিও ঘরে গিয়ে শুলুম। শুলুম কিন্তুক চোকে ঘুম আসে নে, খালি ছেলেটার কতা মনে আসে। ছেলেটা ঘরের সুক বলে জিনিস পেল নি। বাইরে বাইরে পড়ে থাকে, নিজের হাত পুড়িয়ে খায়। খায় কি খায় নে। দু-দুটো ঠাকুর গড়ার বায়না নিয়েচে। পুজো যত এগিয়ে আসচে তার ঘরে আসা তত কমে আসচে। দুগ্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো তারপর কালীপুজো। যকন ঠাকুর গড়া থাকে নে, তখনও রতনের ঘরে মন টেকে নে—বলা কয়া নি কোতাস চলে যায়—। অমন পতিমার পেনা দেকতে বউ আনলুম ঘরে তা সে বট আমার রতনের ঘরে বাঁদতে পারল নি। আমি আজ আচি কাল নি—যেদিন থাকব নি. আমার রতনের সংসার কে দেকবে! ভাবি, ভেবে কী করব, তকন চোকে তো দেকতে পাব নি! মন শোনে নে—চোকে ঘুম আসে নে। সকাল থেকে মন বলছিল আজ রতন আসবে। রাত কত হল—তবে আর সে এল নি। এমন সময় যেন রতনের গলার আবাজ পেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে দেখি রতন। রাতেরবেলা রতন বরাবর কাজের জাগা থেকে থেয়ে আসে। অনেক রাত হয়েচে, বললুম, শুয়ে পড। আমি হাওয়ায় বোয়ের বিচনেয় এসে শুলুম।

ঘুমিয়ে পড়েচিনু, আচমকা ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল কে যেন গায় হাত দিল। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি ভালো করে, মনে হল মশারির ভেতরে কালো মত কী—অবিকল যেন মানুষ। বাবা গো কী বলব, কী ভয় করেচিল। গলা দে স্বর ফোটে নে—চেঁচাব কী! দেকি মশারি তুলে সে পালাচ্চে। আমার যেন তকন হুঁশ হল; অমনি দুহাতে জাপটে ধরলুম তাকে। ধস্তাধস্তিতে মশারিতে জড়িয়ে গেলুম, তাকেও জড়ালুম।

রতনের মা একটু থেমে আবার শুরু করল—যার ঘরে সোমত্ত বউ ভগবান তাকে অমন মতি দিলে। আপনারা পাঁচজনে এর বিহিত কর—।

কে বলে উঠল—গোষ্ঠর বউ-এর ছেলে হবে—সেইজন্যই।

আর একজন বলল—এমন তো আর চিরকাল ছিল নি।

আর একজন বলে উঠল—সলচ যে অনেকদিন থেকে রতনের পরিবারের সঙ্গে গোষ্ঠর পিরিত।

তাই। তা রতন এসব জানত নি?

জানবে নে কেন—সব জানত।

তাহলে বউকে শাসন করেনি কেন?

এসব বেপারে যত শাসন করবে তত বেড়ে যাবে।

তাই বলে এর কোন বিহিত নি?

বকত-মাংসের মেয়ে মানষের ওপর নিশ্বাস হারিয়ে রতন জ্যান্তো মাটির পিরিমের অত মন দিয়েচে।

আজকের সভায় রতনের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

থেকে কী করবে—নিজের পরিবারের পক্ষ হয়ে বলবে।

রতনের পরিবার তাহলে বলুক।

পদ্ম আসেনি।

পদ্ম আসেনি—অন্যায় কথা।

তার কি দোষ বল, রতনের মা বলে, সে কচি মেয়ে, কাঁদার পেনা মন, মন্দ লোকে তাকে মন্দ করেচে। বাচার দুদিন নায় নি খায় নি, সেই যে দোরে খিল দিয়েছে আর দোর খোলেনি।

অনেকেই সায় দেয়—না, না, পদ্মর কোন দোষ নি! পদ্মর কোন দোষ নি।

তাহলে গোষ্ঠ বলুক।

গোষ্ঠর ওপর আলো পড়ে।

এতক্ষণ গোষ্ঠর পাশে বসে ছিল যারা, তারা কেউ কেউ গোষ্ঠর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, বল গোষ্ঠ, বল, বল না—বল না—।

গোষ্ঠ মুখ তোলে না।

মুখ তুলবে কি—মুখে যে চুনকালি।

কে—কে বলল কথাটা।

বাইরে জোর বাতাস উঠেছে। গাছের পাতার ঝর্ঝর, মর্মর শব্দ। তারপর হু-হু হাওয়া।

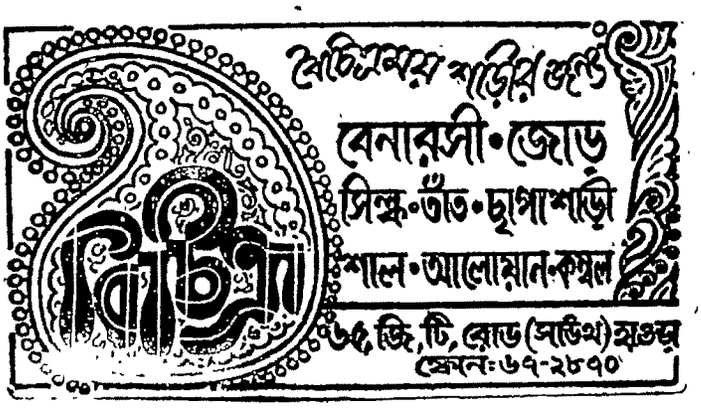

ঝড়-জল আসচে—তাড়াতাড়ি কর!—তাড়াতাড়ি কর।

হরেন দাস বলেন বল গো সুধন্য, বল নগেন, শ্রীনিবাস,—তোমরা পাঁচজনে যা বলবে তাই হবে।

আপনি বলেন!—আপনি বলেন!—আপনি বলেন! আপনি সকলের মাথা!

হরেন দাস কেশে গলা সাফ করেন। চুপ—চুপ সব! চুপ—!

আমি বলি, গোষ্ঠর অবস্থা তোমরা সকলে জানো, ভিটেটুকু ছাড়া ওর আর এক ছটাকও জমি নি, রোজগারপাতিও ভাল করে নে, জরিমানার টাকা ও দেবে কোত্থেকে। জরিমানা করে লাভ নি—।

তাই হোক! তাই হোক! তাই হোক!, সকলেই সায় দেয়—তাই হোক।

হা-হা রবে বাতাস ধেয়ে এল। পাতায় পাতায় হাহাকার উঠল। কোন পাখীর ডানার ঝটপট আর করুণ আর্তি শোনা গেল খুব কাছে। গোষ্ঠর ছেলেবেলার সঙ্গী বন্ধু তুলসী যাকে গোষ্ঠ হাতে ধরে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখিয়েছিল একদিন, সেই তুলসী এগিয়ে এসে ভিড় সরিয়ে, মাটিতে হাত ফেলে কুড়ি হাত মাপল। তারপর রতনের মা এসে বাঁপায়ের একটা আঙুল দিয়ে ছিল হাত দাগ কেটে দিল মাটিতে।

মাটিতে বৃষ্টির টপ টপ ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে।

কই গোষ্ঠ, আয়।

বৃষ্টির মধ্যেই একে একে অনেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে বৈঠকখানা ফাঁকা হয়ে গেল।

সতরঞ্চি আগেই বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে হরেন দাস ঘরের দিকে পা বাড়াবেন দেখেন গোষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে বৈঠকখানার দাওয়ায় খুঁটি ধরে। হরেন দাস কাছে গিয়ে আলো তুলে ধরলেন। গোষ্ঠর দুটো গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

ঘরে যা গোষ্ঠ, ঘরে যা।

গোষ্ঠ যায় না, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। গোষ্ঠ চোখের জল মুছছে, আবার ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

গোষ্ঠর মা যদি বেঁচে থাকত, গোষ্ঠকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেত। গোষ্ঠর নিজে থেকে ঘরে যেতে লজ্জা করে। সাগর যদি আসত তাকে নিয়ে যেতে তবে তার আরো বেশী লজ্জা করতো, তবু তার ঘরে যাওয়া হত। মনে মনে তাই যেন চেয়েছিল সে, ভেবেছিল, সকলে চলে গেলে বৃষ্টি মাথায় করে সাগর আসবে। সবাই কখন চলে গেছে, সাগর আর কখন আসবে।

বাইরে বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস উথাল পাথাল। গোষ্ঠ ভেবে আকুল হয়, কোথায় যাবে। একবার ভাবে কোন দূর দেশে চলে যাবে যেখানে কেউ তাকে চেনে না। অচেনা দেশের অজানা পথে পথে ঘুরবে সারাজীবন, কোনদিন আর ফিরবে না। আর যদি ঘরে ফিরতে না পারে তবে আর কোনদিনও তার ঘরে ফেরা হবে না। ঘরে ফেরা হবে না, হারমনিয়াম বাজিয়ে কোন সন্ধ্যায় আর গান গাওয়া হবে না, ভাবতে মন হু-হু করে গোষ্ঠর। এই গানের জন্যই সংসারে যত দুঃখ। কোনদিন পয়সা রোজগারে মন দিতে পারেনি, সব সময় মন শুধু সুর খুঁজেছে। সন্ধ্যে হলেই রোজ হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। নিজে গান লিখেছে কত। নিজেই গানে সুর দিয়েছে। গ্রামে বিয়ে হলে বরযাত্রী, কনেযাত্রীর দলে গোষ্ঠর নিমন্ত্রণ বাঁধা। কত আসরে সে গান গেয়েছে। তার গানের সুরে মুগ্ধ হয়েছে কতজন। এই গানের জন্যেই সাগর প্রর হয়ে

ধবধবে ঝকমকে
নিরাপদে ধোলাই
ঘরেই করতে হ'লে
সিফোম চাই!

আরো সাদা আরো উজ্জ্বল ক'রে বাড়ীতে কাচার জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী সিফোম। সবরকম তাপ-উৎপাদনকারী ক্ষতিকর রাসায়নিক মুক্ত সিফোম জামা-কাপড়ের পক্ষে যেমন মোলায়েম তেমন খরচেও লাগে অনেক কম।

সিফোম

কাপড় বাঁচায়—পয়সাও বাঁচায়

র‍্যাপসল ল্যাবরেটরী
১৪৬/৫, লেক গার্ডেন্স ● কলিকাতা-৭০০০৪৫

গেল। একদিন পদ্ম এল এই গানের সুরের পথে। সেই সব কথা আজ খুব মনে পড়ে গোষ্ঠর। মন চায় অনেক অনেক দূরে কোথাও চলে যায়, যেখানে গেলে এই সব স্মৃতি অনেক দূরে পড়ে থাকবে, কেউ তাকে ছুঁতে পারবে না। কেউ তাকে আর কোনদিন কোন কষ্ট দিতে পারবে না। না। সাগর না পদ্ম না। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক অভিমানে বুক ভেঙে যায় গোষ্ঠর। সে যত ভাবে পদ্মকে আর ভাববে না ততোই পদ্মকে মনে পড়ে। তার মুখখানা যত ভাবে আর মনে করবে না ততোই সেই মুখ এই ঘোর অন্ধকারে পদ্ম হয়ে ফুটে ওঠে তার চোখের মণিতে। গোষ্ঠ চোখের জলে ওই ফুল ভাসিয়ে দিতে চায়। সে চলেই যাবে এই গ্রাম ছেড়ে। এ জীবনে আর পদ্মর সঙ্গে তার দেখা হবে না—এই কথাটা মনে হলেই মন তার হাহাকার করে ওঠে। মনে হয়, কেন মনে হয় পদ্মকে দেখতে না পেলে সে মরে যাবে।

তবু সেই ভালো, এই মরণ তার ভালো। —বেঁচে থাকবে তবু পদ্মকে দেখতে পাবে না তার চেয়ে তার মরণ অনেক ভালো। জীবনে আর কোনদিন পদ্মর সামনে গিয়ে তো সে দাঁড়াতে পারবে না, মুখ তুলে কোনদিন চাইতে পারবে না তার মুখের দিকে। এ জীবনে আর কি কোনদিন পদ্ম তার মুখের দিকে চাইবে, তাকে আবার ভালোবাসবে!

পদ্ম আর তাকে ভালোবাসবে না, আর তার কথা ভাববে না, তাকে ভুলে যাবে—এসবই মেনে নিতে হবে। সে কিন্তু ভুলেও কোনদিন ভুলতে পারবে না পদ্মকে মরণের পরেও যদি মন থাকে তখনও তাকে মনে রাখবে। তাকে ভালোবেসেছিল পদ্ম, সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে সুখে-দুঃখে সংসারে বেঁচে থাকবে গোষ্ঠ। ও একজন সাধারণ সংসারী মানুষ হয়ে যাবে।

সংসারী তো একদিন তাকে হতেই হোত। ফিরতে তাকে হোতই কোনদিন। পদ্মকে ভালোবাসার পরিণাম কী ছিল। কোথায় ছিল সেই ভালোবাসার শেষ? কত রাত চোখে ঘুম নেই, ভাবনার ভোর হয়ে গেছে কত রাত—কোন আলো তবু দেখতে পায়নি। ভেবেছে, যদি এমনি চলে চিরটাকাল—সেই কি ভালো? ভালো-মন্দর কথা মনে আসেনি, ভালোবাসায় শুধু ভেসেছে, সুখের দ্বিগুণ দুঃখ পেয়েছে, দুঃখে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তবু ফেরা যায়নি, এমনি সে নিয়তি। দুজনের ঘর পুড়েছে, দুজনেই তুষের আগুনে জ্বলেছে অহরহ. তবু মনে হত এই খেলা কোনদিন শেষ না হয় যেন। পদ্ম বলেছিল, যদি কোনদিন আমাকে ভুলে যাও সেদিন আমি ঠিক মরে যাব।

না, পদ্ম মরবে না। রক্ত-মাংসের মানুষ ভালোবাসার জন্যে কি মরে যায়! পদ্মর ঘরেও রক্ত-মাংসের মানুষ আছে, সেও তো ভালোবাসতে পারে। এই ভালো হল। শান্তি সে মুখ বুজে মেনে নিল সে তো পদ্মর ভালো হবে বলেই। তার লোকভয় যত অপমান সব দূর হবে, ঘরের মানুষ নিয়ে পদ্ম এবার সুখে ঘর করবে। যে শাস্তি দশজনে আজ তাকে দিল, সে তো বাইরের তুচ্ছ ঘটনা, সবাই তাকে সংসারের সত্য বলে দিল—এই ভালো হল, ভালোবাসার কষ্ট দূর হল, এবার নতুন করে বাঁচবে পদ্ম।

গোষ্ঠও নতুন করে বাঁচবে। হারমনিয়াম সে বিক্রি করে দেবে। ব্যবসায় মন দেবে। ফি হাটে আনাজ নিয়ে যাবে। সন্ধ্যায় হাট থেকে ফিরে কাঁচা টাকা বেঁধে দেবে সাগরের আঁচলে। সাগর সুখী হবে। সেও সুখী হবে। সুখ তো শেষ কথা নয় সংসারে। সুখ-দুঃখে কী এসে যায়। শুধু বেঁচে থাকা।

রাত গভীর হয়েছে। বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশের সব মেঘ ধুয়ে গিয়ে পরিষ্কার আকাশে তারা ফুটেছে। আকাশ থেকে নীল আলো নেমেছে পথে। পথের ধারে বেড়ার গায়ে বনো লতায় সাদা রঙের কী ফুল ফুটে আছে, যেন চেয়ে আছে গোষ্ঠর দিকে।— আকাশের তারা, আকাশ, গোটা জগত-সংসার চেয়ে আছে গোষ্ঠর দিকে—দেখছে তার ঘরে ফেরা।

অন্ধকারে উঠোন পার হয়ে গোষ্ঠ দাওয়ায় উঠে আসে। ভেবেছিল দাওয়ায় আলো জ্বলবে, সাগর তার পথ চেয়ে থাকবে। সে দেখে দাওয়া জুড়ে জমাট অন্ধকার। ভেবেছিল ঘরের দরজা খোলা থাকবে তার জন্যে। সে দেখে দরজা বন্ধ। তার পায়ের শব্দেও কেউ দরজা খুলে দেয় না। সাগর যে ঘুমোয়নি গোষ্ঠ জানে। গোষ্ঠ যে আসবে যেমন সাগর জানে। সাগর অভিমান করেছে।

গোষ্ঠ দরজায় হাত রাখে। সাগর কি শুনতে পায় না, দরজা খোলে না।

গোষ্ঠ হাত দিয়ে দরজায় শব্দ করে। কতবার কত শব্দ করে। শেষে ডাকে—সাগর-সাগর—। সাগর সাড়া দেয় না।

গোষ্ঠ আবার ডাকে—সাগর দোর খোল—সাগর দোর খোল।— দোর খোল সাগর!

দরজা খুলবে সেই আশায় দাঁড়িয়ে থাকে গোষ্ঠ। দরজা খোলে না। গোষ্ঠ তবু দাঁড়িয়ে থাকে যদি কখনো দরজা খোলে।

রাত আরো গভীর হয়। কোথায় পেঁচা ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশে আবার মেঘ ঘনিয়েছে। গোষ্ঠর ভয় হয়। অজানা এক উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে ডাকে—সাগর-সাগর—। কোন সাড়া নেই। সাগর সাড়া দেয় না! এ শুধু অভিমান নয়, গোষ্ঠর মনে হয় স্থির বিশ্বাসে সে জেনে যায় ওই পাষাণ দরজা কোনদিন আর খুলবার নয়!

বাইরে হু-হু হা-হা অট্টহাসিতে মেতেছে হাওয়া। ঝড়ো আবেগে ঝড়ের বেগে উঠোন ঝাঁপিয়ে ঝড়ের মুখে গিয়ে পড়ে গোষ্ঠ। আকাশে মাতন, মাটিতে মাতন, গোষ্ঠ নিজেকে ঝড়ের মুখে সঁপে দেয়। ঝড়ের টানে ছিন্নমূল গোষ্ঠ কোথায় ভেসে যায়।

রতনের কথা ভাবতে ভাবতে দু প্রহর রাতের পর রতনের মার দু চোখের পাতা সবে এক হয়েছে, তন্দ্রার মধ্যে মনে হল কে যেন উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় এসে উঠল—দোরে টোকা দিল—দোরের খিল খুলে গেল—।

রতনের মার ঘুম টুটে যায় কিন্তু চোখের পাতা খোলে কী সাধ্য! শুধু বলে—কে রে রতন এলি—।

দরজায় খিল তুলে দিতে দিতে ঘরের ভিতর থেকে পদ্ম উত্তর দিল— হ্যাঁ মা।

ফটোগ্রাফী এবং স্ক্রীনপ্রিণ্টিং

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে ঐ দুটি বিষয়ের কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করুন। আমাদের এই কোর্স উন্নত ধরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বল্প বিনিয়োগে বেশী লাভ করার পথে আপনাকে পরিচালিত করবে। অতি অল্প খরচে হিন্দী, ইংরাজী অথবা তামিল ভাষায় করেসপণ্ডেন্স কোর্সে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

প্রসপেক্টাসের জন্যে লিখুন : **Kalaimathi Nilayam (AM)**
Nanjaithalaiyur-639204 Tamil Nadu

অন্য হত // অমল আচার্য

ডাহুক পাখির কর্কশ বিরক্তিকর গলার শব্দে নগেনের ঘুম ভাঙতেই দেখল, কামিনীর একটা হাতে তার গলা সাপটানো। সারা রাত, সম্ভবত অনেকটা সময় ধরে হাতটা ওভাবে থাকার দরুন নগেনের মনে হয় তার গলায় ভার কিছু চেপে বসেছে যেন। অন্য রাত, অন্য সময় হলে সে নিজের হাতে একইভাবে কামিনীর গলা সাপটে ধরত, দুটো শরীরের দূরত্ব একটা রেখায় গুটিয়ে নিত। কিন্তু এখন ডাহুক পাখির গলার নালিতে রাত পোহানোর গোঙানি, টিনের চালে ধরে আসা বৃষ্টির ক্লান্ত শব্দ, এবং পাশে শোওয়া বউ ও ছেলেকে বাঁচানোর কঠোর তাগিদ।

নগেন কামিনীর হাতটা আলতো করে তুলে নিয়ে বালিশে ভাঁজ করে রাখে। কামিনীর ঘুম ভাঙে না।

অন্ধকার ফুঁড়ে চোরের মত বিছানায় উঠে বসে নগেন। চোখ ভারি। ঘুম ছুটলেও ঝিমুনি যায় না। শরীরের আলস্য থেকেই যায়। গলার ভারটা কিছুতেই মিলাতে চায় না। নগেন নিঃশব্দে হাই তোলে।

ঘরের একদিকে চাল নেই। টিনের চালা ক্ষয়ে গেছে। ফুটো ফাটায় কাঁঝরা। বৃষ্টির জল সেই ফুটো দিয়ে মেঝেয় পড়ে। মাটির মেঝে। শব্দ হয়। সানকিতে শব্দ হয় ঘ্যাস ঘ্যাস। এঁটো সানকি একটাই। তার [illegible] ছেলে বলু গড়ে দিয়ে রুটি [illegible] একটা, ঘুমনোর আগে। চটে যাওয়া অন্য দুটো সানকি মাটির দেয়ালে হেলিয়ে-রাখা, ব্যবহারে লাগে নি। না হলে সে দুটোতেও জল পড়ে শব্দ হত। নিশ্চিত-ভাবেই ফাঁকির শব্দ।

নগেন মাচা থেকে নেমে প্রথমে লণ্ঠন জ্বালাল। ঘিয়ে রঙ আলো ছুটে গেল ঘরের কোণে। বার করে আনল ঘর থেকে ঘর, তার মানুষজন, ঘরগেরস্থালির জিনিসপত্তর।

দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো। তাতে কামিনীর শাড়ি, ছেলের ইজের, নগেনের গেঞ্জি। গেঞ্জি পরে নিল নগেন। পরতে গিয়ে বগলের কাছটা ছিঁড়ে গেল ফ্যাঁত করে। কিছু করার নেই।

নগেন ঘরের অন্য কোণে সরে এলো। সেখানে কামিনীর সংসার। ইঁটের পর কাঠের তক্তা পাতা। তক্তার পর একদিকে মাটির কলসী। কলসীর পর কলসী। তিনটে। নগেন হাত ঢোকাল। পেল না কিছু। পাশেই কয়েকটা শিশি। খালি, এমন কি তেলেরটা পর্যন্ত। কিছু জংধরা কৌটো-কাটা। কৌটো-গুলো নাড়ালো নগেন, শব্দ হল না। একটা ছোট্ট মাটির হাঁড়ি ছিল। হাত দিতেই এক-মুঠো খেসারির ডাল উঠে এলো। ডাল মুখে পুরে নিল নগেন। চোখ বুজে চিবোতে লাগল পরম সুখে। দাঁতের ফাঁকে আটকে গেল ডেলা ডেলা। আঙুল ঢুকিয়ে ছাড়িয়ে নিল ডেলা দাঁতের খাঁজ চেঁচে। আবার চিবোল। চোয়াল ধরে এলেও চোয়াল থামে না। পেটে তীব্র জ্বালা, যা ঘুম ভাঙার পর থেকেই নগেন সরে নিচ্ছে তিল তিল। নগেন তেষ্টা অনুভব করে। এক ঘটি জল ঢক ঢক করে গিলে নেয় আকণ্ঠ।

মেরুদণ্ডের সঙ্গে সিটকে থাকা পেটের দিকে তাকিয়ে নগেনের মনে হল বলু অপুষ্টি রোগে ভুগছে দীর্ঘকাল, জন্ম ইস্তক। বলুর বয়েস ছয় ক্যালেন্ডারের তারিখ মত। দেখে মনে হয় পাঁচ বা চার শরীরের গড়নে। হাত-পা সরু লিকলিকে, বুকের খাঁচায় জালি চামড়ার আবরণ সার। জোরে ফুঁ দিলে যে কোনো মুহূর্তেই ফেঁসে যেতে পারে। দুটো হাড়ের মাঝখানে আঙুল বসিয়ে জোরে চাপ দিলে ফুটো হয়ে যেতে কতক্ষণ। একটা মোটাসোটা তড়বড়ে ছেলের শখ ছিল নগেনের।

ঘুমিয়ে গেলে কামিনী কাদা। তার শরীরের বিভিন্ন অংশগুলো অসাড় হয়ে যায়। শুধু শ্বাস প্রশ্বাসে বেঁচে থাকে কামিনী। নগেন কামিনীর মাথার কাছে সরে গেল। সরে গিয়ে কামিনীর আগাপাছতলা খুঁটে খুঁটে দেখে। কামিনীর বয়েস কত হল চেষ্টা করে হিসেবে আনতে। হিসেব ঠিক হলে, শরীর মেলায়। মেলে না। যতটা মেদ, মাংস থাকলে ওই বয়েসের মেয়েরা যুবতী থাকে, লালিত্য থাকলে সুশ্রী হয়, মাজা ঘষা ঘত্ন থাকলে পুরুষের চোখে মোহ উসকায় —কামিনী সবটা থেকেই বঞ্চিত। তবু নগেন কামিনীতে সুখ পায়। কামিনীর শরীরের

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
অল ইন্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী জীবন, আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রশোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, অষ্টম মুদ্রণ—১৪৲।

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
আনন্দবাজার পত্রিকা : বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা অতীত ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূত হন।

ডিঃ ক্রাউন সাইজে ৪০০ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রে শোভিত, বোর্ড বাঁধাই।
ষষ্ঠ মুদ্রণ—৮৲।

দুর্গামা

। শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনী
সন্ন্যাসিনী শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এ যুগে বিরল। 'দুর্গামা' জীবনচরিতখানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা বহু চিত্রশোভিত সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲।

সাধনা

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক (এবারে সাড়ে তিন শতাধিক) মনোহর বাংলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সাধনার ফুলে মনোহারীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ডিঃ ক্রাউন সাইজে ৩৬৮ পৃষ্ঠা, প্ল্যাস্টিক কভারে। ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬৲।

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা।
তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী কলিকাতা-৪

বিভিন্ন রংগুলো মেখে উঠলে কামিনীর জন্যে নগেনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। রক্তের এখন কামিনীর শরীর লাগাতে চায়।

তাহুক পাখি আবার ডেকে ওঠে। তার কর্কশ ডাক নিশুতি রাতের স্তব্ধতা খান খান করে দেয়। ডাকতে ডাকতে গলা চিরে রক্ত তোলে। তার বাচ্চার চোখে ফোঁটা ফোঁটা লাগিয়ে দেয় রক্ত। বাচ্চার চোখ ফোটে। চোখ ফোটামাত্র সে দেখে অন্ধকার, ঘোরতর অন্ধকার। একসময় দৃষ্টির জড়তা কেটে যেতে থাকে, ফুটে বেরোয় আলো পুবের বলয় রেখা ফেড়েফুঁড়ে। তাহুক বাচ্চা আলো দেখে, পৃথিবীর প্রথম আলো।

সময়ের দরজায় দাওয়ায় উঠে এসে জানলায় মুখ রেখে ডাকে : নগেন, বেরিয়ে পড়।

নগেন কামিনীর শরীর লাগাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়। ঘরের কোণায় হ্যাজাগ ছিল। সেটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় আসে। পুরনো হ্যাজাগ। কয়েক দিন হল কিনেছে। সঙ্গে, চটের থলি, বড়শি, ছিপ। কেনাকাটি শেষ হলেও বেরনো হয়নি একদিনও। আজই সে বেরোবে।

মাঠে কাজকর্ম না থাকার দিনগুলো নগেনের জীবন থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় কয়েকটা বছর। এক চোখো কাকের মত ছোঁ ছোঁ করে ঘুরতে হয় তাকে। দিনের আলো দুর্দিনের ছায়া হয়ে তার পিছু পিছু হাঁটে। চোখে অন্ধকার দেখে নগেন। দেখছিল। পড়শী যুগল হালদার এসে বলল, আর কেন, এবার লেগে পড় আমাদের সঙ্গে। রাত বারোটা একটা থেকে সকাল পাঁচটা-ছটা। কিছু কামাতে পারবে। দিন চলে যাবে এক রকম।

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিল নগেন। উঠোনের এক কোণে কুলগাছ। তার ছায়ায় উদম বলু ভাঙা মাটির খুরি, কাদা, পাতা নিয়ে খেলছে। ভরভরে সর্দি তার নাকে। গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ঠোঁট অবধি। ভ্রূক্ষেপ নেই বলুর। ঠোঁটের ডগায় চেটে খাচ্ছে সর্দি, খেলছে মহা সুখে। মাঝে মাঝে চিৎকার করছে : মা, খিদে—।

চনমনে রোদ্দুর উঠোনে। কুলগাছের শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ছে উঠোনময়। খড়ের ছাউনির ছোট্ট ঘর, চারদিক খোলা। রান্না হয়। কামিনী উবু হয়ে ফুঁ দিয়ে পাটকাঠি ধরাচ্ছে। উনুনে হাঁড়ি, চাল ডাল শাকপাতা একসঙ্গে সেদ্ধ হয়।

নগেন কামিনীকে ডাকে : শোনো।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কামিনী সামনে এসে দাঁড়াল। কামিনীকে দেখে নগেন। দেখে বলুকে। দু বেলা বউ-ছেলেকে পেট পুরে নুন-ভাতও যোগাতে পারে না সে। ভিজে ওঠে তার চোখ।

নগেনকে চুপ থাকতে দেখে কামিনী বলে : বল, কি বলছিলে ম

—না কিছু। রক্তের ছিপে ছিপে বিড়ি খেতাম।

জয়দুপুরে নগেন কামিনীকে আবার কাছে ডেকে নিল। সে মনস্থির করে ফেলেছে এর মধ্যে। নগেন ছুটল সদরে। কিনে আনল সাজ-সরঞ্জাম কামিনীর শেষ সম্বল মাকড়ি বেচে।

দুদিন ধরে যুগলের কাছে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে নগেন। যুগল অভিজ্ঞ। কাজটার ভাল-মন্দ দুটোই তার জানা। যুগল খুঁটিনাটি বুঝিয়েছে তাকে। বিশেষ করে মন্দ দিক। খাল বিল ডোবা ঘন-ঝাদাড়ে কাজ। বিপদ অনেক। ভুল বোঝাবুঝির ফলে পুলিশ বা অন্যের কাছ থেকেও বিপদ কম নয়। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে রেষারেষি তো আছেই। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে। এসব ঝক্কিঝামেলা কাটিয়ে নিতে পারলে, দুটো পয়সা হাতে আসবে।

নগেন হ্যাজাগ জ্বালায়। হ্যাজাগের উজ্জ্বল তীব্র আলো অন্ধকারের গলা টিপে ধরে। ছিপ বড়শি থলি গুছিয়ে নিল নগেন। বৃষ্টি থামলেও, আকাশ মেঘলা। হাওয়ার বেগ মাঝে মধ্যেই বেড়ে গিয়ে ইতরের মত ঢলাঢলি করে চলেছে। ঘরে বউ ছেলেকে নিয়ে আরামে শুয়ে থাকার রাত। নগেনের কাছেও। কিন্তু নগেন এই রাতটা বেচে কিছু রোজগার করে নিতে চায়। যুগল বলেছে, এ ধরনের রাত নাকি তাদের পক্ষে লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

নগেন কামিনীকে ডাকে। অসাড় দেহ একতাল কাদার মত ভেসেভেসে যায়, তবু কামিনী মরা। ঝড়জলের রাতে ঘর থেকে নগেনের বেরিয়ে যাওয়া তার কাছে অমনোযোগী ব্যাপার যেন। কামিনী তাকে তাচ্ছিল্য করে নাকি? দপ করে রেগে ওঠে নগেন। দু আঙুলে কামিনীর গাল মুচড়ে দিয়ে বলে : বড্ড সুখ, অ্যাঁ! দুর্যোগের রাতে ঘরের লোক চলেছে রোজগার করতে, আর তোমার কি দরদ!

গালে জ্বালা ধরতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল কামিনী। চোখ রগড়ে তাকাল। বারান্দা থেকে হ্যাজাগের তীব্র আলো ছুটে এসে ধাঁধিয়ে দিল চোখ। অন্ধের মত মাচা থেকে নামে কামিনী। কামিনী নগেনের পিছু পিছু বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। নগেন কথা বলে না। ডান হাতে হ্যাজাগ, বাঁ হাতে ছিপ আর থলি নিয়ে রাস্তায় নামে। এগিয়ে চলে নগেন।

অন্ধকার বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কামিনী। তার চোখে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যায় মানুষটা, বিঁধে থাকে আলো। থই থই অন্ধকারের বুকে আলোর পিন্ডটা একসময় বিন্দু, অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নগেন অন্ধকার কেটে কেটে পথ হাঁটে। হ্যাজাগের আলো খাবলে নেয় দুপাশের অন্ধকার। ঝমঝমে আলোয় নগেনের পা আগুপিছু হয়ে ভৌতিক ছায়া ফেলে পথ জুড়ে থাকে [illegible]

বৃষ্টি পড়ে মাথায়, সর্বাঙ্গে অবিরাম। পৃথিবীর শীতল দেহ থেকে উঠে আসে ঠাণ্ডা নিশ্বাস। মাঝে মাঝে নগেনের শরীর ভীষণ কেঁপে ওঠে শীতে। বকতে ঘড়ঘড়ি কাটে। নগেন দ্রুত পা চালায়।

যুগলের ঘর পথের দশ গজ দূরে। বেড়ার ফাঁক গলে আলো কচুরপাতায় ঝলঝল। ছাইগাদা মাড়িয়ে উঠে যায় নগেন দাওয়ায়। ডাকে : যুগল ভাই—

ক্যাচ ক্যাচ শব্দে দরজা খুলে দাঁড়ায় অতসী, যুগলের বউ। লালপেড়ে মোটা খাটো শাড়ি শরীরের ভাঁজে অগোছাল। নগেনকে দেখামাত্র অতসীর চোখে সুখ উগড়ায়। রক্ত উথলানো হাসি তার দাঁত ছুঁয়ে ঠোঁটে জড়ো হয়। চোখের তারায় ইসারা কাঁপে।

যুগলের বউ দোরগোড়ায় আটকে থাকে।

—ভেতরে আসবে না?

—যুগল কোথায়? ফুসানো রক্ত-সোঁত দাঁত চেপে ঠেকিয়ে বলে নগেন।

—মাঠে।

ঘরের ভেতর থেকে কাতরানি ভেসে আসে। অতসী সরে যায় শব্দর নিশানায়। মেঝেয় বিছানা। যুগলের দুই ছেলে-মেয়ে শুয়ে। ছেলের কপালে হাত রাখে অতসী। গা পুড়ে যাচ্ছে।

—ছেলের কি হয়েছে? নগেন ঘরের মধ্যে পা রাখে।

—তিনদিন ধরে জ্বর।

—ওষুধ দাওনি?

—পীরসাহেব জলপড়া দিয়েছে, খাওয়াচ্ছি। ছেলের কপালে হাত বুলিয়ে দেয় অতসী। সেই ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নগেন।

নব্বুই বছরের বুড়ি রায়ঠাকরুণ খক খক কেশে চলে একটানা। হাঁপানির রুগী। সারা বর্ষা কাশতে কাশতে প্রাণান্ত হয়। বিরাট ধসে পড়া বাড়ির একমাত্র জ্যান্ত বাসিন্দা। ছেলে নাতিপুতি কলকাতায়। বুড়ি ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতা যায়নি, জোবাজুরি সত্ত্বেও। কি সেই অনিবার্য মোহ টেনে রেখেছে তাকে, নগেনের সাধ হয় জানতে। কাশতে কাশতে রায়ঠাকরুণ বেঁকে যায়, চোখ ঠিকরোতে চায় শিরা ছিঁড়ে, অসংখ্য মশা তার ঢিলেঢালা চামড়া ফুঁড়ে হুল বসিয়ে দেয়, এক গেলাস জলের জন্যে শীর্ণহাত কেঁপে কেঁপে ঘোরে, তালের ফ্যান পড়ে কষ্টিতে ফোসকা ওঠে টসটস, তবু রায়ঠাকরুণ স্বামীর ভিটে ছাড়ে না, কেন ছাড়ে না নগেন জিজ্ঞেস করবে কি এখন?

না, তার সময় নেই। ঘরে হাড় জির-জিরে বলদ একখানা রুটি চিবিয়ে ঘুমিয়ে আছে, সকাল হলেই চেঁচাবে খিদেয়।

একটা শেয়াল বাঁ থেকে ডান দিকে ছুটে পালাল। নগেন সরু হয়ে গেল মুহূর্তে।

দূর থেকে নগেন দেখল খালের ধারে বেশ কয়েকটা আলোর কোনোটা স্থির, কোনোটা গতিময়। নগেন বুঝে নেয় তার দেরি হয়েছে, কিছুটা সময় হারিয়ে ফেলেছে সে। ওদিকটা গেলে সুবিধে নাও হতে পারে ভেবে নগেন উত্তরমুখো হল। উত্তরদিকে দুএকটা মাঠ পার হয়ে গেলে গুটিকতক ডোবা আছে। হয়ত অতদূরে এখনো কেউ গিয়ে পৌঁছয়নি, পৌঁছলেও সংখ্যায় কম।

নগেন বড় বড় পা ফেলে হাঁটে। বৃষ্টির জল জমা একটা নিচু জমি পাশ কাটাতে গিয়েই হ্যাজাগের আলোয় নগেন দেখে দুটো চকচকে চোখ। আল-এর পর স্থির বসে আছে মাথা উঁচিয়ে। নাদুসনুদুস প্রমাণ-সাইজের প্রাণী।

এরকম চারটেতেই কে-জি খানেক। টাকা দুই নগদা নগদা হাতে এসে যাবে। আটটা ধরলে চার টাকা। ষোলটা ধরলে আট টাকা। আরো ধরলে আরো টাকা, অনেক টাকা....।

ঘরের দড়িতে শাড়ি ইজের ডবল ডবল হয়ে যায়। খালি কলসী শিশি কৌটো ভরে যায় চাল ডাল মশলায়, লিকলিকে হাত-পা মোটা হয়ে গিয়ে বলু তেজী হয়ে ওঠে, কামিনীর ঢিলেঢালা শরীর ভরাট দেখায় সিনেমার মেয়েদের মত। চোখের সামনে এসব দেখে নগেন। আর দেখে, সে ডাক্তার ডেকে নিয়ে চলেছে যুগলের বাড়ি, অতসীর ছেলের জন্য। এসব ভাবতে ভাবতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে তার মন।

শিকার ধরাতে অনভ্যস্ত নগেন। কি-ভাবে শুরু করবে ভেবে পায় না। হাত থেকে হ্যাজাগটা লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা আল-এ নামিয়ে রাখল সে। আলোর বন্যা বইল। বৃষ্টিতে ভেজা ঘাস চকচক করে উঠল। আলতো করে থলি নামাল। শিকারটা এত কাছে যে ছিপের প্রয়োজন হয় না, হাতেই ধরা যায়। নগেন ছিপটাও সতর্কভাবে মাটিতে শোয়ালো। তীব্র আলোর ছটায় অন্ধ প্রাণীটা নিশ্চল, আসন্ন ভবিতব্য জেনেও।

নগেন এক-পা এক-পা এগিয়ে শিকার ধরার জন্যে সবে হাত বাড়াতে যাবে, আরেকটা কুদ্ধ বিষাকত প্রাণী লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে ফুঁসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সামনাসামনি। বিশাল ফণার নিচে সাদাকালো ডোরা দাগ। উজ্জ্বল কুটিল চোখ, জিভের লিকলিকানি বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত শূন্যে কাঁপে।

নগেন হাত সরিয়ে নেয়। একদিকে মানুষ, অন্যদিকে বিষধর সাপ। মাঝখানে সোনালী চামড়ার হৃষ্টপুষ্ট বেঙ। আরেকটা প্রাণী—আপাতত খাদ্য, সাপের মানুষের। তাকে আয়ত্তে আনার সতর্কতা দুজনেই কঠোর।

চকিতে একটা ছায়া পড়ে সরে যায়, অমনি শব্দ করে থেঁতলে যায় সাপের ফণা। সোনালী বেঙ লাফ মেরে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ে। একসঙ্গে দুটো হাত দুদিক থেকে আবলে ধরে তাকে। নগেনের হাতের পর আরেকটা শক্ত হাত।

—খবরদার, এটা আমার।

নগেন চোখ তুলে তাকায়। যুগলের ধকধকে হিংস্র চোখ সাপের থেকেও ঘোরতর কুটিল লাগে।

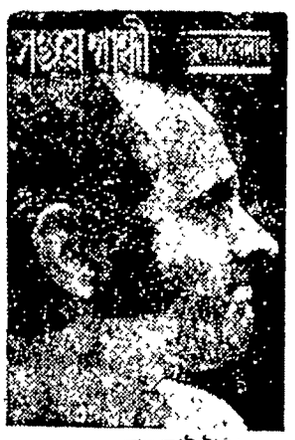

দাম আট টাকা

॥ প্রকাশিত হল ॥

ছোট বেলায় যে ছেলেটির প্রিয় খেলা ছিল কুকুরকে লাথি মারা বড় হয়ে জরুরী অবস্থার সময় সেই ছেলেটি কীভাবে তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতাকে লাথি মারছিলেন তারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী—সঞ্জয়ের উত্থান ও পতনের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রথম প্রকাশিত হল। লিখেছেন

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক
কৃষ্ণ দেবনাথ

সঞ্জয় গান্ধী / উত্থান ও পতন

মনোমোহন প্রকাশনী ৫৪/৮ কলেজ স্ট্রীট—কলি-১২

জগন্নাথ নাটকের একটি মুহূর্ত

থিয়েটার আমাদের আন্দোলন

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

বিজন ভট্টাচার্যর লেখা গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক থেকে যে নাট্যআন্দোলনের শুরু, আজকে সে আদর্শগত সুষ্ঠু পরিণতির রূপ না পেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, নাটকের ক্ষেত্রে এমন একটা কিছু অগ্রগতি ঘটেছে, যাকে সঠিক অর্থে সৎ বা ঠিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায়। এবং সেই অর্থেই বলা যায় গত তিন দশক ধরে এই নাট্যআন্দোলনের মোটামুটি একটা রূপরেখাও গড়ে উঠতে পেরেছে। এর জন্যে বহু নাট্যগোষ্ঠী প্রচুর শ্রম ও ক্ষতি স্বীকারও করেছেন। যার ভিত্তিতে আজকের এই গ্রুপ থিয়েটার অথবা মুভিয়ে বলা যায় থিয়েটার গ্রুপগুলি অস্তিত্ব বজায় রেখে একটা পরিণতির কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পেরেছে। যেটা একদিন অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টা ছিল, আজকে তাকে আন্দোলন বলা যেতে পারছে।

কিন্তু সঠিক অর্থে সত্যি কি নাট্যআন্দোলন সেকাল থেকে একালে খুব একটা এগিয়েছে? নাকি ফর্ম, প্রয়োগ আর টেকনিকের মধ্যে এসে পথ গুলিয়ে ফেলেছে সেই নাট্যআন্দোলন নামক বাক্যটি। একালের কারুর কারুর মতে 'নবান্ন' বা 'রক্তকরবী'র চেয়ে এক পাও নাট্যআন্দোলন এগোয়নি। শুধু চতুরভাবে রূপ বদল করেছে মাত্র। সেই আন্দোলন যদি সত্যি সত্যি এগুতো তাহলে এখনও ব্যবসায়িক মঞ্চগুলি সমানে নাটক নিয়ে নিরঙ্কুশ ব্যবসা করে যেতে পারতো না। সৎ নাটকই সৎ দর্শককে টানতো। তা না হয়ে বরং সৎ দর্শক একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছে। তবে এটা ঠিক, নাট্যআন্দোলনের ঘোড়া তেমনভাবে না ছুটলেও, নাটকের ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী'র চেয়েও জোরদার কোন বক্তব্য না রাখতে পারলেও নাটকের ক্ষেত্রে যে পালা বদল ঘটেছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এখনকার নাটকের দর্শক যেমন বেড়েছে, তেমনি ফর্ম, টেকনিক ইত্যাদির সঙ্গে নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রেও একটা আন্তর্জাতিক এবং সচেতন সামাজিক চিন্তাধারার প্রতিফলন অনুভূত হচ্ছে। এটাও বড় কম কথা নয়। অগ্রগতি না হোক, নাটক যে দাঁড়িয়ে নেই, কি দাঁড়িয়ে পড়েনি, এটা তারই বড় প্রমাণ। প্রগতিশীল নাট্যদলগুলির কাছে সেটাই নাট্যআন্দোলনের হাতিয়ার এবং স্বীকৃতি।

থিয়েটার নিয়ে আন্দোলন এবং থিয়েটারের মাধ্যমে আন্দোলন, কথাটা যা-ই হোক না কেন, এর সরীক এখন অনেক। নাটক এবং নাটকের বক্তব্য নিয়েই যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে যাচ্ছেন। অপর দিকে এর সুযোগ নিয়ে কিছু বেনো জলও ঢুকে পড়েছে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই 'পবিত্র শর্তটি' ভাঙ্গিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা, এমন অনুযোগও শোনা যায়। কেউ কেউ আবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বেশী করে দর্শক আকর্ষণ করার জন্য, অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায়, টিকিট ঘরের দিকে তাকিয়ে, কমার্শিয়াল নাটকও করেন। বলা বাহুল্য যুক্তি দেখিয়েই।

তবু বলবো, যাঁরা সৎ নাটক, ঠিক নাটক করেন তাঁদের সেই প্রচেষ্টার নাম সঠিক অর্থে 'নাট্যআন্দোলন'ই।

অরুণ মুখোপাধ্যায় (চেতনা)

প্রথমত নাটক মঞ্চসফল হবে কি না আগে থেকেই একথাটা ভেবে নিয়ে নাটক করি না আর আমার মনে হয় কারুর পক্ষেই সেটা বলা সম্ভবও নয়। অন্তত আমাদের মত যাঁরা নাটকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাটা সবচেয়ে আগে স্থান দেন। তবে এটা ঠিক যে,

নাটক যদি সার্থক হোক, নাটক মঞ্চসফল হোক, এটা আমরা সবাই এবং সব সময়ই চাই। তার কারণ আমাদের উদ্দেশ্য তো নাটককে বেশী লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেই অর্থে যত বেশী লোক আমাদের নাটক দেখবে, ততই তাকে আমরা সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক বলবো।

তবে প্রোডাকশন নামাতে ভয় কি করে না? নিশ্চয়ই করে। শুধু নাটক লেখাই নয় তাকে সঠিক এবং দর্শকগ্রাহ্য করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার মধ্যে যে দায়িত্ব, যে পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সম্মিলিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে আমাদের বক্তব্যটি নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারলুম কিনা বলে যে উৎকণ্ঠা থাকে তারও তো মূল্য কম নয়। তাই ভয় বা দুর্ভাবনা একটা থেকেই যায়।

যেমন ধরুন, আমাদের প্রথম নাটক 'মারীচ সংবাদ'। এ নাটক মঞ্চস্থ করার সময় কি আমরা ভাবতে পেরেছিলুম যে, ঐ প্রথম নাটকই আমাদের যশ এবং সার্থকতা এনে দেবে? সবিনয়ে এখানে একটা কথা বলে রাখি। সারা ভারতে 'চেতনা' গোষ্ঠীই বোধহয় প্রথম যারা প্রথম নাটকেই সার্থক হয়েছিল এবং নাট্য জগতে সামান্য হলেও একটা হাওয়া বদল ঘটিয়েছিল। যোগ্যতার কথা আমি বলি না, কিন্তু এটা ব্যতিক্রম অবশ্যই। তবে 'মারীচ সংবাদ' আমাদের যে অনুপাতে খ্যাতি এনে দিয়েছে (মঞ্চে সাফল্যের দিক থেকে), সেই অনুপাতে পয়সা পাইনি। গ্রুপ থিয়েটারগুলির (এবং প্রথম দিকে আমাদেরও) ধার-দেনা করে করেই নাটককে জিইয়ে রাখবার প্রাণান্তকর প্রয়াস করতে হয়। কলকাতায় আমাদের মোটামুটি পঁচিশটা শো লাভ এনে দিয়েছে, পঞ্চাশটা শো, ১ নো লস নো গেন, বাকিগুলি লসই বলব, কারণ আমাদের টিকিটের দাম বেশী নয়। সেই লসটা আমরা পূরণ করি বাইরে 'কল-শো' করে। অন্যদের কথা অবশ্য জানি না।

তবে শুনলে অবাক হবেন, আমাদের দ্বিতীয় নাটক ব্রেশ্‌টের 'ভালো মানুষের পালা'র প্রথম দিন (কলামন্দিরে), কাউন্টার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই লাইন পড়ে গিয়েছিল। অথচ সে নাটক আমাদের গরের শোতে তেমন অর্থ দেয়নি, তবে সেল বাড়ছিল, এটা ঠিক।

: সে নাটক বন্ধ করে দিলেন কেন? লস হবার ভয়ে?

: না। বলতে পারেন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম ভেতর ও বাইরের কিছু কিছু অসুবিধার জন্যে। তবে এটা ঠিক, 'ভালো মানুষের পালা' আমরা আবার করব, সেটা অর্থ না দিলেও। তার কারণ আমার মতে 'ভালো মানুষের পালা' সত্যিকারের একটি ভাল এবং সৎ নাট্য-প্রচেষ্টা।

: 'মারীচ সংবাদ' মঞ্চসফল হবার মূল কারণ কি আপনার মতে?

: এর আঙ্গিকে এমন কিছু আকর্ষণ নেই, বক্তব্যেও তেমন বলিষ্ঠ কোন ভাবনা নেই, তবে গান এবং অভিনয় খ্যাতি অবশ্য আছে, তার চেয়েও বড় কথা, 'মারীচ সংবাদ'-এর সার্থকতার মূল চাবিকাঠিটি হল এর স্পন্টেনিটি বা স্বতঃস্ফূর্ততা। এ নাটকে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে, যা এর সম্পদ। যেটা তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। অথচ দেখুন 'ভালো মানুষের পালা'য় ক্র্যাফটসম্যানশিপ অনেক বেশী, চরিত্র বিশ্লেষণ অসাধারণ এবং নতুন এমন একটা উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে এ নাটকের মধ্যে যা ফুটিয়ে তোলা হয়তো এখনও বিয়ন্ড আওয়ার ক্যাপাসিটি। সেই সব ব্যাপারের জন্যই বোধহয় আমরা তাকে সঠিক অর্থে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। নাটক করার পেছনে আমাদের যে শর্ত—সৎ, সুস্থ, মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ এবং মানুষের উত্তরণের জন্য যে সংগ্রাম, তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া—এই শর্তগুলি পূরণ করা যে নাটকের মাধ্যমে সম্ভব, আমরা তাকেই বলি ঠিক নাটক, এবং সর্বদাই সেটা বলি। আর একটা কথা, তার সঙ্গে সেই উপস্থাপিত চরিত্রগুলির অর্থনৈতিক দিকটাও দেখি। শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংগ্রামকে আমরা কখনই ছোট করে দেখি না। তবে নাটক অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ হতে হবে। এই ঠিক নাটক করা এবং তাকে মঞ্চসফল করা আমাদের আদর্শ। ঠিক নাটক নয় অথচ মঞ্চসাফল্যের সম্ভাবনা বেশী, তেমন নাটক আমরা কখনই করবো না, তবে ঠিক নাটককে মঞ্চসফল করার জন্যে কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ তাকে পপুলার করার জন্যে যদি (অর্থাৎ টিকিট বিক্রি বাড়ানোর জন্যে) বিজ্ঞাপনকে পেশাদারী করতে বা ব্যবসায়িক কায়দা-কানুন প্রয়োগ করতে হয়, তাতে কখনই কার্পণ্য করব না। সেটা অবশ্যই ভেজাল দিয়ে নয়, আদর্শ বজায় রেখেই। তবে অর্থনৈতিক দিকটাও তো দেখতে হবে। তার ওপরেই আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আর এর বড় কারণ হল, এর কোন বিনিময় ব্যবস্থা নেই বলেই ঐ ব্যবস্থা নিতে হয়। বিনিময় ব্যবস্থা বলতে আমি বুঝি নিরাপত্তা। যদি বুঝতাম নাটক করাটাই আমাদের শুধুমাত্র কর্তব্য, সব দায়িত্ব অন্যে নেবে তাহলে এর কোন প্রয়োজনই হোতো না।

অরুণ মুখোপাধ্যায়

তাই বলে নিছক প্রচারধর্মী নাটক করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদিও পৃথিবীর সব নাটকই প্রচারধর্মী। তবে সেটা অন্য অর্থে। একটা নাটককে তখনি আমরা প্রচারধর্মী বলি যখন সে সৎ শিল্পধর্মী আদর্শ থেকে বঞ্চিত। আর শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাটা মিটলেই চলবে না, কারণ অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক অবস্থারও সম্পর্ক আছে, তারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেটা কিভাবে আসবে আমি জানি না। তবে একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। যা সমাজের পরিবেশ সুস্থ ও মানবিক সম্পর্কের অনুকূল হবে।

সত্যিকথা বলতে কি, আমি মধ্যবিত্ত সমাজকে যেমন গভীরভাবে চিনি, আমি যাদের নিয়ে নাটক লিখেছি (বাম যাত্রা), সেই কৃষক সমাজকে ততটা গভীরভাবে চিনি না। তাদের সম্বন্ধে আমার

ধারণা বলতে পারেন পড়াশুনা করে, শুনে—অর্থাৎ থিওরেটিক্যাল। কিন্তু আমি মনে করি তারাই সমাজের মূল কাঠামো। তাদের মাধ্যমেই একমাত্র সমাজ বিপ্লব সম্ভব। সেই অনুপ্রেরণাযই আমি 'রামযাত্রা' লিখেছি। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে, খেটে খাওয়া লোকদের নিয়ে নাটক লিখবো বলেই আমার 'রামযাত্রা' লেখা। রামযাত্রা প্রথমে ছিল ওয়ান এ্যাক্ট। তখন নাম ছিল 'জটায়ু সংবাদ।'

চেতনার নতুন নাটক 'জগন্নাথ'। জগন্নাথ দাস একটি কৃষক চরিত্রের নাম। সে কৃষক চিরকাল বঞ্চিত এবং অবহেলিত, অমানুষ হিসেবে আমাদের সমাজের নিবে তলায় যে মার খেতে খেতে বেঁচে আছে। আমি চীনের বিখ্যাত লেখক লু সুনের 'আ'র সত্য কাহিনী' গল্প পড়ে ইন্সপায়ার্ড হয়েই কিছু পাল্টে ভারতের পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে নাট্যরূপ দিয়েছি। বলতে পারেন সম্পূর্ণই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক। তাই এ নাটক মঞ্চসফল হবে কি না সন্দেহ আছে। তবু আমরা এ নাটক করছি, তার কারণ আমরা যাকে ঠিক নাটক বলি, অর্থাৎ সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অনুকূল, পরিচ্ছন্ন সৎ নাটকের শর্ত পালন করবো বলে। আমরা আশাবাদী এবং বিশ্বাস করি যে সৎ নাটকের প্রচেষ্টা কখনও মার খায় না। নাটক করার সার্থকতাই সেখানে। যাঁরা বলেন এ দেশে এখনও দর্শক তৈরী হয়নি, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ভাল জিনিস দিলে দর্শক নিশ্চয়ই তা নেবে। এ-দেশের মানুষ নাটক দেখতে ভালবাসে। এবং সেটা বহুযুগ আগে থেকে ধারাবাহিকভাবেই। নাটক যদি পরিচ্ছন্ন এবং সৎ হয় তাহলে সে নাটক ভাল লাগবেই। জর্জ বার্নার্ড শ'র মত আমিও বিশ্বাস করি যে, ভাল নাটক খারাপ প্রযোজনা হলেও জমবে।

: ইদানিং কালের কোন্ নাটক আপনার ভাল লেগেছে ?

থিয়েটার কমিউনের 'দানসাগর' আমাকে দারুণ উৎসাহিত এবং আশাবাদী করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সহজ সরল নাটকের কথা বলতে পারি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নাট্যরূপ (আমারই দেওয়া) 'হারানের নাতজামাই'। সুস্থ মানবিক গল্প, বাঁচার সংগ্রাম, সহজ সরল নাট্যরূপের জন্যে ওটা আমার ভাল লেগেছে। দর্শকের ভাল লাগার শর্তও সেটাই বলে আমি বিশ্বাস করি। আসল কথা, নাটক সমাজের সুস্থ মানবিক সম্পর্কের অনুকূল হওয়া চাই। আর সেই শর্ত পূরণ করার জন্য যে কোন রকমের ঝুঁকি নিতে আমরা প্রস্তুত।

শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা (সর্জনা)

অত্যন্ত মার্জিত চেহারা, বাঙ্গালী, বুদ্ধিমান পুরুষের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়ে গ্যাছে, বেশ ভাল বাংলা বলেন, কথা বলার ধরনটি যেমন মিষ্টি তেমনি অন্তরঙ্গ, বিখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকারের সম্পর্কে পঞ্চমুখ এই মানুষটি সম্প্রতি বাদল সরকারেরই যে বাংলা নাটকটি হিন্দী ও বাংলার মিশ্র ভাষাভাষী দর্শকদের উপহার দিয়েছেন, তার নাম 'সারা রাত্তির'। যার হিন্দী নাট্যরূপও তিনি উপহার দিয়েছেন। দুটি নাটকই তিনি পরিচালনাও করেছেন।

শুধু এই নাটকই নয়, অন্যান্যকার তরফ থেকেও তিনি একাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন।

নাট্যকার বাদল সরকার সম্পর্কে শিবকুমারবাবুর মন্তব্য : এত বড় একজন নাট্যকার শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীতেও কম আছে। তাই তাঁর খ্যাতি এখন বিদেশেও পৌঁছে গেছে। আর বাদলবাবুই একমাত্র নাট্যকার যিনি আজও কোন কিছুর সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করেননি, নিজের আদর্শ বজায় রেখেছেন। তাঁর মত অত স্ট্রাগল আর কেউ করেন নি। তিনি এখনও যেভাবে নাটক নিয়ে

শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা

হওয়া উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, কম-বেশী সবাই তো কমপ্রোমাইজ করছে। যেমন ধরুন, যে বাংলা নাটক আমাদের পথ দেখিয়েছে, সেই বাংলা নাটকই এখন ক্রমশ কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে। দশ বারো বছর আগেও বাংলা নাটক নিয়ে একস্পেরিমেন্ট হোতো, এখন সেই রকম প্রচেষ্টা কোথায় ? তাই বাংলা নাটক লোকে যতই বলুক না কেন, এগুচ্ছে না। হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আসলে ফাইটিং স্পিরিটটাই এখন নেই।

আমার প্রশ্ন : আপনি তো বাঙ্গালী নন, তবু দুঃসাহস করে বাংলা নাটক করলেন কেন ?

: আমি বাংলাদেশের মানুষ। এখানেই আমাদের ঘরবাড়ি ব্যবসা-পত্তর ইত্যাদি। সেদিক থেকে এটা আমার কর্তব্য মনে করি। আর আমাদের ইচ্ছে আছে মাঝে মাঝেই বাংলা নাটক করে হিন্দী নাটকের দর্শকদের টেস্ট পালটানো। আমি হিন্দী বা বাংলাভাষী দর্শকদের মধ্যেকার বেড়া ভাঙতে চাই। এটার প্রযোজনও আছে। আমাদের সর্জনা ইউনিট তৈরী হয় '৭২ সালে। প্রথম এটা ছিল ডান্স ও মিউজিকের একটা ইন্সটিটিউশন বা মিড়িয়া। উদ্দেশ্য ছিল ক্ল্যাসিক্যাল ডান্স ও মিউজিকের উন্নতি। সেই উদ্দেশ্যেই স্বর্গত সঙ্গীতকার কে কে ভার্মা এর সৃষ্টি করেন। তিনি গত বছর মারা গেছেন। নাটক করছি হালে। আমাদের সংস্থার একটা মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের, তিনি যে ভাষাভাষীর বা জাতের লোকই হন না কেন, যে সব ট্যালেন্ট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের সুযোগ করে দেওয়া। যেমন ধরুন কিছুদিন আগে কথক ডান্সার চিত্রেশ দাসের (প্রহ্লাদ দাসের ছেলে) একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা কলা-মন্দিরের রেসমেন্টে। ছেলেটি দারুণ নাচে, আমেরিকায় আলি আকবর মিউজিক কলেজে নাচ শেখায়, কিন্তু এখানে কেউ তাকে

ইংরেজী মৃচ্ছকটিকম নাটকের দৃশ্য

আগামীতে আমরা আরো একটি বাংলা নাটক করবো বলে ঠিক করেছি। তারআগে ইচ্ছে আছে 'মৃচ্ছকটিকম'-এর ইংরেজী মঞ্চস্থ করার। (তার সঙ্গে সঙ্গেই করছি 'যদি আর একবার'-এর হিন্দী। এর পরে ইচ্ছে আছে হিন্দী আর্টিস্ট দিয়েই বাংলা নাটক করাবো।) পরিচালক আমি নিজেই। অনামিকাতে আমার পরিচালনায় প্রথম বই 'চাটনী টমাটোর কী'। এছাড়া ওখানে 'বাকি ইতিহাস' (বাদল সরকারের নাটক), 'ইস আন্ধেরে সে'ও ডাইরেক্ট্ করেছি।

আমি অভিনয় করি অবশ্য একষট্টি সাল থেকেই (অনামিকায়)। আজ পর্যন্ত অনেক নাটকেই অভিনয় করেছি। এছাড়া টেলিভিসনেও হিন্দী নাটকে অভিনয় করেছি। নাটকের উন্নতির জন্যে তো বটেই তাছাড়া অভিনয়টা আমার একটা নেশাও বলতে পারেন। অভিনয় করার সময় ভেতর থেকে যেন একটা আগুনের স্পর্শ পাই।

: কি উদ্দেশে নাটক করেন?

: প্রধানত মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে। এটা আমার কর্তব্য মনে করি। তাছাড়া হিন্দী ও বাংলা নাটক করে বেড়া ভাঙতে চাই।

: গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আপনার কি মত?

: ওটা একটা হেগ টার্ম। সব নামেই গ্রুপ। আসলে সবই ওয়ান ম্যান শো। যেটা করা উচিত ইউনাইটেডলি, সেটা কি হয়? একজনের ইচ্ছায়ই তো দলগুলি চলে।

: আপনাদের দলে কি বাঙ্গালী শিল্পী আছে

'সারা রাত্তির' নাটকের তিনজন শিল্পীই বাঙ্গালী। আগামী হিন্দী নাটকেও (যদি আর একবার-এর হিন্দী) তিনজন বাঙ্গালী আছে। এছাড়াও আমাদের দলে বহু বাঙ্গালী শিল্পী আছে।

: দর্শক কেমন এবং কোন্ শ্রেণীর?

: আমাদের নাটকের বাঙ্গালী দর্শকও আছে। অবাঙ্গালীদের মধ্যে মিডল ক্লাস, হায়ার মিডিল ক্লাস এবং সাধারণ শ্রেণীর লোকই বেশী।

: নাটক করে সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে অর্থাৎ কি প্রয়োজনে ব্যয় করেন।

: নাটক হাউসফুল হলেও অর্থ উদ্বৃত্ত হবার কোন চান্সই নেই। কারণ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। তাই উল্টে ধারই হয়। সেই ঋণ শোধ করি বছরের শেষে মেম্বারদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে। প্রোডাকসন কস্ট, হলভাড়া ইত্যাদি খরচ একটা নাটকের কখনই টিকিট বিক্রি থেকে ওঠে না। তবে আমার প্রিন্সিপ্যাল হোলো নাট্যকার, শিল্পী, পরিচালক সবাইকেই মর্যাদাসম্পন্ন এমাউন্ট টাকা দেবার জন্য ব্যবস্থা করব ভবিষ্যতে। এটা একদিকে যেমন তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি, তেমনি তাঁরা যাতে এই নাটক নিয়েই থাকতে পারেন, তার সিকিউরিটি। অর্থাৎ শিল্পীরা এটাকে যাতে পেশা হিসেবে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আমার আর একটা উদ্দেশ্য হল, ট্যালেন্টকে তুলে ধরা। অর্থাৎ প্রতিভা স্ফুরণের ব্যবস্থা বা তার আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। এই নাটক থেকে আমার কিছু চাই না। কারণ আপনাদের শুভেচ্ছায় আমার সে সঙ্গতি আছে।

: শুধুমাত্র বাংলাদেশের নিজস্ব একটা নাটমঞ্চ গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টা হলে কি আপনারা তাতে অংশ গ্রহণ করবেন?

: নিশ্চয়ই থাকবো, এবং সেটা যে কোন শর্তেই। তবে তার পরিবেশটা মনের মত হওয়া চাই এবং আমার দলের স্বাধীনতা থাকা চাই সেখানে। আমি বিশ্বাস করি সবাই এক হলে ব্যাপারটা আদৌ অসম্ভব নয়। তবে একটা কথা, দায়িত্বটা আলটিমেটলি কারুর না কারুর ওপর ছাড়তেই হবে। আর আমার ব্যক্তিগত মত হল মুক্ত অঙ্গনের মত আর একটা মঞ্চ হলেই খুব ভাল হয়। যেখানে খুব কম খরচায় ছোট ছোট দলগুলি তাদের পরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে। এই সঙ্গে আর একটা কথা স্পষ্ট করেই বলতে চাই। সেটা হল আমার নাটক নিয়ে যত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই আমি এই কলকাতায়ই করতে চাই। কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমি কলকাতারই মানুষ। আর এমন মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা আর কোথাও নেই। বোম্বেতে নাটক লেখা হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু এখানকার মত সলিট প্লেরাইট সেখানে অবশ্যই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর তেমন নাটক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে না এখানে।

: বাদলবাবু ছাড়া আর কোন নাট্যকারের নাটক আপনাকে নাড়া দেয়?

: যেমন ধরুন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আর অভিনয় ও প্রোডাকশনের দিক থেকে শেখরবাবুর গ্রুপের নাটক আমার খুব ভাল লেগেছে। এছাড়া বাংলা অনেক নাটকই আমার ভাল লাগে।

: আপনারা কি কোন সরকারী অনুদান পান?

: না। চাইও না। সরকারী সাহায্য পেয়ে অন্য দলগুলিই বা কি করছে? আর সরকারী আওতায় গেলে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। তাই একাডেমী হেল্প অন্যরাই নিক, আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং সেই টাকাটা কোন কালচারাল গ্রুপ পাক এটাই চাই। আর সেটা পাইয়ে দেবার জন্যে এমন কিছু সৎ লোক থাকা দরকার যাঁরা (অন্তত দশ বারো জনের একটা কমিটি) নিরপেক্ষ ভাবে সেইরকম কিছু দলের নাম বেছে সরকারকে তাদের সাহায্য করতে বলবে। অর্থাৎ আমি চাই ঐ টাকাটা সৎ ও প্রয়োজনীয় কাজে

ব্যয় হোক। আর সেই সঙ্গে নাটকের ওপর থেকে সরকারী ট্যাক্স অবিলম্বে উঠে যাওয়া উচিত।

: বিদেশী নাটক করা সম্পর্কে আপনার কি মত ?

: বিদেশী নাটক করার খুব একটা ইচ্ছে নেই। অন প্রিন্সিপ্যাল আমি প্রেফার করি না। কেন, এদেশে কি তেমন নাটক নেই কিংবা যোগ্য নাট্যকার নেই ?

: জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে আপনার কি মত ?

: ওটা তো সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, যখন তার টনক নড়বে তখন সে করবে। হলে অবশ্য খুবই ভাল। অন্তত কমন একটা প্ল্যাটফর্ম তো হবে।

: ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, পুরনো দল ভেঙে নতুন দল হচ্ছে। কেন ?

: মতভেদ বা ব্যক্তিগত ইন্টারেস্টে ঘা পড়লেই দল ভাঙে। তাছাড়া আর একটা কারণ আইডিয়া ফুলফিল করার টেন্ডেন্সী। সেই সেন্সে ওটা হেলদি নিশ্চয়ই।

বিভাস চক্রবর্তী (থিয়েটার ওয়ার্কসপ)

গণনাট্য, নবনাট্য, সৎ-নাট্য, ঠিক নাটক, গ্রুপ থিয়েটার ইত্যাদি যে নামেই অপেশাদারী আধুনিক নাটককে অভিহিত করা হোক না কেন, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার যে চেহারা এসে দাঁড়িয়েছে, তা মোটামুটি এই রকম : মূলত কিছু নাট্যপ্রেমী ব্যক্তি একজোট হয়ে নিজেদের বিষয়গত ও প্রয়োগগত ভাবনা-চিন্তা অনুযায়ী থিয়েটার করেন। সাধারণত এইসব নাট্য-কর্মীরা কোন পারিশ্রমিক পান না।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ আজ পর্যন্ত আটটি পূর্ণাঙ্গ (বাজরকত, চাক ভাঙা মধু'র পর আমাদের নতুন নাটক নরক গুলজার) এবং পাঁচটি একাঙ্ক নাটক প্রযোজনা করেছে। এক একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে পাঁচ শো থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়ে। কখনও কম-বেশীও হয়। এটা হোলো প্রথম অভিনয়ের আগে প্রযোজনা ব্যয়। বর্তমানে প্রতি শোতে অন্তত দু হাজার কিংবা তার বেশীও খরচ হয়। তাই কোন শোতেই এখনো লাভের মুখ দেখিনি। সুতরাং সৎ কাজের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কল শো অবশ্য আমরা চিরকালই ভাল করি। ইদানিং একটু কমেছে। নাটক ভেদে কল শো'র রেট ঠিক করা আছে। তবে কম টাকায় কল শো করার জন্য আমাদের থিয়েটার ওয়ার্কশপের সুনাম এবং দুর্নাম দুই-ই আছে।

আমাদের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন থাকে অবশ্যই। নিছক প্রমোদ বিতরণের জন্য আমরা থিয়েটার করি না। আমাদের দলের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত—এদের মধ্যে চাকুরে, বেকার এবং রাজনৈতিক আদর্শ বিশ্বাসী লোকজন আছেন।

মক্ষিরানীরাই দায়ী

হেমন্তের শেষ বিকেল! গঙ্গার দিকে একটা অদ্ভুত লালচে আভা। ময়দানের ঘাস মাড়িয়ে দুজনে যেন কখন হাঁটতে আরম্ভ করেছিলুম আউটরামের দিকে। ওই-ই কথা বলছিল—তুই অনেক পাল্টেছিস্! বেশ মোটাসোটা চকচকে দুধেল গাইয়ের মত। উচ্ছ্বাস টুচ্ছ্বাস অনেক কমেছে।

বাধা দিলুম—তুই কিন্তু একই রকম।

হাঁটতে হাঁটতে সিগারেটটায় বেশ জোরে টান দিয়ে দার্শনিকের গলায় বলল—দূর পাগল, মানুষ কি চিরকালই একই রকম থাকে ? প্রতিদিনই আমাদের কত ছোট ছোট পরিবর্তন ঘটছে।

ওর মুখের দিকে তাকালুম। তীক্ষ্ণ নাকের ভাঁজে, চশমার আড়ালে ভাসা-ভাসা চোখে, একটু লালচে ধবনের মুখে কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর ছড়িয়ে ছিল। যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। নিজের মনেই ও বলে যাচ্ছিল—এই ত আবীর ব্যানার্জী আর আজকের এই আমি কি এক ? আগে মনে হত দেখে নোব এই শহরটাকে! পাগলা করে দোব মানুষগুলোকে। এখন কি মনে হয় জানিস, তোরাই ঠিক। ভালো চাকরি, মিষ্টি বৌ, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে, সুখী পরিবার!

কথায় কথায় আমরা গোয়ালিয়র মনুমেন্টের কাছে চলে এসেছিলুম! এক সময় আবীর বলল—চল ওখানটায় বসি!

এক সময় ওকে জিজ্ঞাসা করলুম—গ্রুপটা তুলে দিলি তাহলে ?

কথাটা শুনে একবার ও আমার দিকে তাকাল, তারপর একটু ম্লান হেসে বলল—কি হবে এসব করে ?

—সে কিরে, একদিন ত বলতিস্ থিয়েটারই তোর জীবন।

—কিন্তু জীবনটা বোধহয় থিয়েটার নয়! মাঝে মাঝে মনে হয় ছত্রিশ বছর বয়সটা পর্যন্ত জীবনটাকে নিয়ে ইয়ার্কি মেরে গেলুম! আর পাঁচজনের মত যদি কেরিয়ার টেরিয়ার নিয়ে মাথা ঘামাতুম—এদ্দিনে কি আর কোন মার্চেন্ট অফিসের মাঝারী একজিকিউটিভ হতে পারতুম না। সবটাই বরাত!

আবীর হঠাৎ চুপ করে গেল। এটা ওর স্বভাব। বরাবরের। আগেও দেখতুম, সেই কলেজ লাইফে, কফি হাউসে একাই অনেক বকবক করে, সবাইকে ক্ষেপিয়ে হঠাৎ কখন ও নিজের জগতে ডুব দিয়ে দিত!

থিয়েটার পাগল আবীর ব্যানার্জী। ছোট থেকে স্বপ্ন দেখত স্টেজে আর নাটকে একটা কিছু না করে ছাড়বে না। পাশটাশ করে আমরা ওর কাছাকাছি বন্ধুর দল যে যার ধান্দায় হারিয়ে গেলুম। কিন্তু আবীর লড়ে যেতে চাইল নাটক নিয়ে! কলকাতার বাইরে থেকে কাগজে ওদের দলের নামটাম দেখতুম। ওরা রেগুলার শো-টো করে যাচ্ছে তাও শুনতে পেতুম। দলটা বেশ নামও করেছিল। হঠাৎ কেমন করে যেন ভাঙতে শুরু করল!

—হ্যারে, অবনীশদার খবর কি ? কি করছে এখন ?

আবীর যেন ক্ষেপে গেল—জোচ্চোর, ঠগ! আসলে ওদের ধান্দা কি জানিস, বোকা ছাগলের মাথায় পা রেখে কুয়ো ডিঙিয়ে যাওয়া! আমরা ঘড়ি আংটি বেচে মা-বোনেদের গয়না বন্ধক রেখে শো করাব টাকা জুগিয়ে যাব আর এইসব সো কল্ড ডিরেকটারগুলো বইয়ের মলাট নিয়ে আসরে ছড়ি ঘুরিয়ে যাবে! খাটব আমরা, নাম বাগাবে ওরা! খালি চান্স খুঁজবে কি করে নিজের আখের গোছানো যায়! আর সব থেকে মারাত্মক কারা জানিস, ঐসব মক্ষিরানী।

—মক্ষিরানী ? সে আবার কে ?

—ঐ যে তোদের বিশুদ্ধ ভাষায় নায়িকা, হিরোইন। আসলে কি জানিস, যেমন পরিচালকরা ফিকিরবাজ তেমনি এই মেয়েগুলো ধান্দাবাজ। নাটক করতে আসে, দল তৈরি করতে আসে। ওসব কিছু নয়, সেজে নিজেদের আখের তৈরি করার তাল। মনে আছে তোর বাবলির কথা!

—বাবলি ? মানে তোর সেই সোনাকী বসু ?

—অয়, অয় বাবলি! সোনাকী ত' ওর পোশাকীনাম। নিয়ে এলুম ভুবন-ডাঙার এঁদো বাড়ি থেকে। কোথাও পাত্তা পাচ্ছিল না! গ্রুপে এসে অভিনয় শিখল! স্টেজ চিনল! ব্যাস তারপর দেখি কাটায় মতলব। প্রায়ই রিহার্সালে এ্যাবসেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি

না, দেশী বা বিদেশী নাটক বলে আমাদের কোন ছুঁৎমার্গ নেই। নাটক ভাল লাগলে, এবং তা মঞ্চস্থ করার ক্ষমতা থাকলে আমরা সেইসব নাটক করে থাকি। আমাদের নাটকগুলির মধ্যে মৌলিক বাংলা নাটক এবং বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর দুই-ই আছে।

আমাদের নাটক করার অভিজ্ঞতা? একাধারে তিক্ত ও আনন্দদায়ক, হতাশাজনক আবার উৎসাহব্যঞ্জকও। এক্সপেরিমেন্টাল নাটক বলতে বুঝি 'রাজরক্ত'। অ্যাবসার্ড নাটক বুঝি না।

আজকাল থিয়েটারের প্রযোজনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন নাটক, এমন সমালোচনা দুর্লভ। অন্যদিকে হল ভাড়া বেশী। কাগজে বিজ্ঞাপনের চার্জ অসম্ভব বেশী। আমাদের বক্তব্য, বেশী ভাড়ার ঢাউস হল দরকার নেই। কম ভাড়ায় ছোট হল চাই, বড় পত্রিকাগুলি যাতে আমাদের জন্যে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন চালু করেন, তার ব্যবস্থা চাই। সঙ্গীত, চারুকলা, সাহিত্য প্রসঙ্গে সচরাচর কেউ মুখ খোলে না। কিন্তু থিয়েটারের সমালোচনায় সবাই মুখর। তাদের উপরোক্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কি কোন দায়িত্ব নেই? তার ওপর আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা থিয়েটার সম্পর্কে কিছু না জেনেও বিচারক এবং সমালোচকের আসনে বসে পড়েন। তবে এদেশে চিরকাল এই রীতি চলে আসছে। তার ওপর আছেন 'ভাত দেবার ভাতার নয় কিল দেবার গোঁসাই' সরকার, রাজনৈতিক দলও তাদের ভাড়াটে লেখক বা গুন্ডা।

অবশ্য কিছু লোকের কাছে নাটক করা নিছকই অভিনয় স্পৃহা মেটানো সন্দেহ নেই। তবে সবার কাছেই তা নয়। সংগঠনে অনেক ব্যক্তি আছেন, এমনকি এমন পরিচালকও থাকেন যাঁরা অভিনয় করেন না। থিয়েটার একটা শিল্পরীতি, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কেউ কেউ এই নাট্যকর্মে সৃজনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন, আবার কেউ কেউ থাকেন শুধুমাত্র সাংগঠনিক দায়িত্বে। তাই নাটকের দলে কারুরই ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। শিল্পীরাও পয়সা পান না। আর নিজস্ব হল তো কারুরই নেই। তাই আমাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক মঞ্চগুলির আদর্শ, চিন্তা ও মূলগত তফাৎ দুস্তর।

যেমন রক্তকরবীর সঙ্গে সেতুর, চাকভাঙ্গা মধুর সঙ্গে বাবরধুর, ব্যারিকেডের সঙ্গে কফকান্তের উইলের, মঞ্জরী আমের মঞ্জরীর সঙ্গে তুষার যুগ আসছের, দান সাগরের সঙ্গে রক্ত নদীর ধারার তফাৎই হোলো আমাদের সঙ্গে পাবলিক থিয়েটারের মৌলিক পার্থক্য।

না, সবগুলো দল মিলে কিছু করা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা-চিন্তা। সুতরাং এটা আশা করাই অন্যায় যে, বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী কোন দলের সঙ্গে মিলে মিশে মঞ্চ তৈরী বা পত্রিকা প্রকাশ করবে। তার কারণ পারস্পরিক ঈর্ষা, ব্যক্তিত্বের লড়াই, সর্বোপরি থিয়েটারের ভাবনা-চিন্তা বিবর্জিত বাইরের এক শ্রেণীর দালাল আছে যাদের কাজই হোলো নাট্যদল

তখন এ্যামেচার দলে খেপ মারতে ব্যস্ত।

আমি বাধা দিলুম—খেপ বলছিস কেন? বাবলির বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। বাইরে একটু রোজগারের চেষ্টা কি অন্যায়? তোরা আর কতই বা দিস?

—সেটা আমরাও বুঝি। তাই আপত্তিও করিনি। কিন্তু জেনেশুনে শো-এর দিনতিনেক আগে এসে যদি বলে এই শোটা ওকে ছুটি দিতে হবে—কোন ফিল্মে দু দিনের একটা কাজ পেয়েছে, এটা না হলে ওর ফিল্ম কেরিয়ারটাই নাকি নষ্ট হয়ে যাবে—মেজাজটা তখন কোথায় থাকে বল্?

—তা অবনীশদা কি বলল?

—বললুম ত ওটা একটা ইনভার্টিবেট। সব শুনে টুনে বলল, তা কি করা যাবে, ও যদি একটা কেরিয়ার পেয়ে যায় আমাদের ওকে আটকানো উচিত হবে না। এ শোটা নয় ক্যানসেল করে দাও। বোঝ ব্যাপারটা, ধার-দেনা করে হলের টাকা মিটিয়েছি, যে লোক বাপের জন্মে ধর্মতলা যাত্রার ওপরে ওঠেনি, তাকে দিয়ে একটা টাফ এক্সপেরিমেন্টালি নাটক নিহত শতাব্দীর টিকিট গছিয়েছি—তখন যদি বলি শো পোস্টপোন্ড—পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবে? আর কোন দিন তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব?

—কিন্তু এমনি করেই ত বাংলাদেশের দলগুলো বেঁচে আছে।

আরীর যেন খেঁকিয়ে উঠল—তোর মুন্ডু—একে বেঁচে থাকা বলে? বল কোন রকমে টিঁকে আছে। মুখ থুবড়ে একদিন পড়বে, আর উঠবে না।

—কিন্তু এর জন্য ত একলা তোর ভাষায় মক্ষিরানীরাই দায়ী নয়?

—আলবৎ দায়ী। এক হাতের চেটোতে অন্য হাতের ঘুষি থাবড়ে বলল, —কেন নয়?

দে আর নট অ্যাট অল লয়্যাল টু আওয়ার আর্ট।

—কিন্তু এই সব জেনে শুনেই ত' দল গড়তে এসেছিলি।

—হ্যাঁ এসেছিলুম। অনেক বাধা, অনেক ঝড় তাও জানতুম। জানতুম মাসের পর মাস ঘরের ভাড়া বাকী থাকবে—চাষের দোকানের টাকা মেটানো যাবে না—ভালো নাটক পাওয়া যাবে না—ছেলেরা ঠিক মত রিহার্সালে আসবে না—এমনি হাজারো প্রবলেম—কিন্তু এগুলোর কি মানে বল্? ফেন্স মেয়েগুলোকে নিয়ে আসব কাঁচা মাটির বুক থেকে—তাদের স্তানিস্লাভস্কি পড়াব—নাটক সম্বন্ধে সচেতন করে তুলব—অথচ এরা দল বুঝবে না। ছেলেদের মেহনতের কদর দেবে না—পদে পদে রাস্তার লোকের কাছে অপমান আর অসম্মানের জন্য এতটুকু সহৃদয় হবে না—কেবল নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া। কেউ চাবে ফিল্ম কেরিয়ার করতে। কেউ দেবে অফিস ক্লার্কের ধর্না, কেউ বা পাবলিক বোর্ডে হিরোইনের স্বপ্ন দেখবে।

বোধহয় ওর গলাটা শুকিয়ে এসেছিল। আর একটা সিগারেট ধরাল। কিন্তু গলার সুরে পুরনো ক্ষোভটা গেল না—কেউ বা বাবলির মত আরো মোক্ষম ঘা দেবে। চেকন চেহারার বোশনাইতে কয়েকটা ছোকরার মাথা চিবোবে, আসলে কি জানিস, দে ডু নট বিলিভ ইন সিনসিয়ারিটি। ভালো অফার পেলে একদল থেকে অন্য দলে পালাতে এদের বিবেকে বাধে না—

—বাবলি এখন কি করছে?

—অবনীশদার সঙ্গে প্রেম আর ফিল্মে চান্স খুঁজছে।

—বাবলি ত' শুনেছিলুম তোদের স্বপনকে বিয়ে করেছিল।

—দলটা ভাঙ্গল ত' সেখানেই। একটা বইয়ে স্বপনের সঙ্গে ও হিরোইন হতে গিয়ে হল প্রেম—দুম করে একদিন বিয়ে করে ফেলল। তারপর যা হয়। কিছুদিন পর বিয়েটিয়ে শিকেয় তুলে দিয়ে অবনীশদার সঙ্গে ভিড়ে গেল। এই নিয়ে ঝগড়া, অশান্তি—শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। দলের অন্য সবাই ক্ষেপে গেল—বেশ কয়েকজন রেজিগনেশন দিল—দলের নৈতিক অধঃপতনের জন্য—

—বলিস কিরে, এসব এখনও হয়? একটা মেয়েকে নিয়ে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি?

—একটা মেয়েকে নিয়েই ত' দুনিয়ার যত বড় বড় অঘটন। আর নারে আর না, জীবনটা অযথা আসরে নামিয়ে বড় ভুল করে ফেলেছি। নাটক নাটক করে মন দিয়ে কোনদিন চাকুরিটাও করা হয়ে উঠল না।

গৌতম রায়

যা নাট্যব্যক্তিত্বদের মধ্যে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব জিয়িয়ে রাখা। এরা যতদিন থিয়েটারের চারপাশে ভন্ ভন্ করবে, ততদিন কোন গঠনমূলক কাজ করা কঠিন।

দল ভাঙে নানা কারণে। পরিচালকের ব্যবহার, সাধারণ সদস্যদের ন্যায্য ও অন্যান্য বিভোক্ষ বা হতাশা, টাকা পয়সার গন্ড-গোল, নারীঘটিত অনাচার ইত্যাদি কারণে।

না, বর্তমানে নাট্য আন্দোলন বলে কিছু নেই। নাটকের বিষয়বস্তু, প্রয়োগ, সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা ও কাজকর্মের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার জন্য সক্রিয় কোন প্রয়াস নেই।

আর একটা কথা। দলের বহু ছেলে যে রকম সীরিয়াসলি নাটক ও দল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, দলের পেছনে সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেন তেমন মহিলা আমাদের দলে কেন—কটা দলেই বা আছেন? তাই তো কেবার মত শিল্পীর মৃত্যুতে আমাদের এই থিয়েটারের জগত হাহাকার করে উঠল।

থিয়েটার কমিউন

গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্যও লক্ষ্য—অর্থাৎ নাটক করা, 'ভালো নাটক' করা। 'ভালো নাটক' শব্দ দুটি যদিও বহু ব্যবহারের বিভিন্ন অর্থেই সমৃদ্ধ, তবু আমরা এই সামাজিক বিষম বিন্যাসে সংখ্যাধিক্যের বেঁচে থাকার যে প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতাবান অংশের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত যে জীবনবোধ তারই সহায়ক শিল্প রূপ নাটককে ভালো নাটক বলি। সুতরাং সেই ভাবনার শিল্পসম্মত নাটক করাই আমাদের উদ্দেশ্য—করতে পারাই আমাদের লক্ষ্য।

থিয়েটার কমিউন এ যাবৎ পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। প্রথম নাটক উইলিয়াম স্যারোয়ানের 'ট্রেসিস টাইগার' এর ভাবনায় নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর 'বিকল্প বাঘ,' দ্বিতীয় নাটক জোসেফ হেলারের 'উই বম্বড্ ইন ন্যু হেভেন' (নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও তরুণ ঘটক কৃত)-এর অনুবাদ 'পরবর্তী বিমান আক্রমণ' তৃতীয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী নক্সা,' চতুর্থ নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর 'কিং কিং' এবং পঞ্চম নাটক প্রেমেন্দ্রের 'কফন' অবলম্বনে দেবাশিস মজুমদারের 'দয়াসাগর'।

না, লাভ দূরে থাক, খরচাই উঠে না অনেক সময়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ধার দেনার দায়গ্রস্ত হতে হয়। তার কারণ টিকিট বিক্রি করে যে টাকা ওঠে তার সিংহভাগই তো খেয়ে নেয় হল আর বিজ্ঞাপন। আর টিকিট বিক্রি? বলা যায় বোদ উঠলে বেশী আর বৃষ্টি হলে কম। এবং খরচা লাভ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নেরও ঐ একই উত্তর। অর্থাৎ প্রতি শোর বিক্রি কনস্ট্যান্ট নয়। কখনো কষ্ট ছুঁয়ে হয়তো বিক্রি আটকে যায়, আবার কখনো সেই আকৃতি কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে। সুতরাং এরই মধ্যে যদি কিছু সঞ্চয় এবং ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তবে তা এই থিয়েটারের জন্যেই। গ্রুপ থিয়েটারের কাছে এর চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্য আর কি থাকতে পারে।

কল শো' মোটামুটি ভাল। অর্থের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। দু'হাজার টাকার কমে যে কোথাও শো করিনি তা নয়। আবার অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় সেটা বেশীও হয়েছে। আর একটা কথা। এই কল শো দিয়েই আমরা অর্থকরী ব্যাপারটার ব্যালান্স রাখি। অর্থাৎ ধার, দেনা, ক্ষতি ইত্যাদি পূরণ করার চেষ্টা করি।

সংস্থার প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত। তারই মধ্যে যেটুকু তফাৎ তা শ্রেণীগত নয়। আর বেকার তো থাকবেই। অফিস কলার ছাড়া আর যে কোন ক্ষেত্রে দশজন একত্রিত হলে বেকারের সংখ্যাই বেশী থাকে এদেশে। আমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতায় ঘটবে কেন? আর মহিলা শিল্পীর সমস্যা আমাদের থিয়েটারে অল্প বিস্তর সবাইকেই ভোগ করতে হয়। ওরই মধ্যে আমাদের মহিলা শিল্পী দলের একজন সদস্যা। তাই আমাদের সমস্যাটা একটু কম।

না, আমাদের আলাদা বেঞ্চ এবং ব্ল্যাকবোর্ড-এর ব্যবস্থা করে অভিনয়ের ক্লাস নেবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে আমাদের থিয়েটারে কোন শিল্পী অভিনয় করতে গেলে কিছুটা পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা, পরিচালকের নির্দেশ, দু'একটা বই আর বাকিটা নিজে ভেবেই শিক্ষিত হতে হয়।

কোন একটি বৃত্ত বা সীমারেখাকে চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে নতুনত্বের অন্বেষণ বা অন্বেষিতের বিকাশই এক্সপেরিমেন্টাল। তবে অবশ্যই তাকে যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে। আর এ্যাবসার্ড নাটক বলতে একটি ফর্মকে বুঝি আমরা। শিল্প সংস্কৃতির জগতে এই কথাটির জন্ম বিশেষ এক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিণতিতে—আমাদের এখানে তাকে হঠাৎ উপস্থিত করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে দুর্বোধ্য নাটক মানেই এ্যাবসার্ড অথবা এ্যাবসার্ড নাটকই দুর্বোধ্য।

গ্রুপ থিয়েটারের তো হাজারো সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যা, ভাল নাটক পাওয়ার সমস্যা, নাটক করার জন্য হল পাওয়ার সমস্যা, মহিলা শিল্পীর সমস্যা, প্রচারের সমস্যা,—এর মধ্যে দিয়েই আমাদের লড়াই করে চলতে হয়।

ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে আমাদের মূল পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গীর। এখনও ব্যবসায়িক মঞ্চে প্রযোজনাটির যে বড় কথা প্রযোজিত অর্থের, সেই কারণেই তারা যে কোন গল্প কিছু নামী শিল্পী আর শরীর দর্শনো নৃত্য সহযোগে যে বস্তুটিকে মঞ্চে উপস্থাপিত করছে তা আর যাই হোক, প্রায়শই থিয়েটার হয় না। এই বিকৃতির বন্যায় কিছু মধ্যবিত্ত দর্শক শিকার হচ্ছেন এটাই দুঃখের। নতুবা শিল্পগত তুলনা অপ্রযোজ্য।

স্থায়ী মঞ্চ? সেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শিশির ভাদুড়ীর পরে এই কিছুদিন আগেও এ রকম একটা চেষ্টার উৎসাহজনক কথাবার্তা শোনা গেছে। কাজও নিশ্চয়ই কিছুটা হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এখন শুনি তার পরিণতিস্বরূপ একে অপরকে 'নির্দারিতিক থিয়েটারী প্রবক্তা' হিসেবে আঙুল দেখানো চলছে। আসলে প্রাথমিক স্তরের সংহতি না থাকলে হঠাৎ উৎসাহে স্থায়ী মঞ্চ তৈরী হলেও কখনোই তাকে বাঁচানো যাবে না। আর একক বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা বা চেষ্টায় কখনও কোন দেশেই 'জাতীয় নাট্যশালা' তৈরী হতে পারে না। একটি প্রেক্ষাগৃহের পোশাকী নাম জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে, আর কিছু নয়।

না, দেশী বা বিদেশী নাটক সবে কথা নয়, আমাদের আনুগত্য ভালো এবং সৎ নাটকের প্রতি। আমরা যেমন জোসেফ হেলারের নাটক করেছি তেমনি মোহিত চট্টোপাধ্যায় বা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের মৌলিক নাটকও মঞ্চস্থ করেছি।

আর বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের সূচনা আজ পর্যন্ত যে বিস্তার, তাতে সব সময়েই, বিভিন্ন আক্রমণের মধ্যেও, কোন না কোনভাবে গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য স্পষ্ট। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা দেশে গ্রুপ থিয়েটার সামগ্রিকভাবে কখনই থেমে থাকেনি। এই আন্দোলনের সূচনা 'নবান্ন' নাটক থেকে। আর 'নবান্ন'কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূচনা তা গণনাট্য আন্দোলন।

'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে আমাদের আজ একটি মত হোলো, সেটা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির সুস্থ যোগাযোগের মাধ্যমে। এবং এই কাজ সফল হতে পারে সরকারী চেষ্টায় (তা কি সম্ভব?) অথবা বর্তমান কাঠামো বদলের মাধ্যমে, এটাই আমাদের বিশ্বাস।

(প্রবন্ধটি : থিয়েটার কমিউন-এর পক্ষে থিয়েটার বাংলার প্রাণ্যায় ও দেবাশিস মজুমদার)।

দুঃসাহসের দৃশ্য

হীরেন্দ্রকুমার বসু

কিন্নর কিন্নরী

(১)

আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ইতিহাসটুকু শোনাতে চাইলেও শোনার মত অবকাশ-কার আছে বলুন। তাই যখন আমার জীবনের শিল্প আলেখ্য ও জীবন-পানশালের অতিথিদের সমাবেশের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছিলাম তখন সে লেখনীর নামকরণ করেছিলাম 'জাতিস্মরের শিল্পলোক ও জাতিস্মরের পান্থশালা'.... লেখক ছিল পঞ্চবর্ষী। আজ সেই পঞ্চবর্ষী পাঠক সমাজের কাছে তার নিজের ছদ্মনাম গোপনের ব্যর্থতা জেনে, আসল নামেই লিখতে বসেছে।

এসব লেখার বিপদ অনেক। প্রথমত লেখাকালীন 'আমি করেছি—আমি করেছি' বলে নিজের অহমিকা ফুটে বেরোয়, দ্বিতীয়ত স্মরণ বিস্মরণের পাকে পড়ে সামান্য রসিকতাও বেরসিক সমালোচকের টিপ্পনীতে জর্জরিত হয়।

সাত দশক জীবনে পার করে এনেছি প্রায়, অথচ ছন্নছাড়া জীবনে কোনো দিনই ডাইরী লেখার অপচেষ্টা করিনি। স্মৃতি থেকে মন্থন করে প্রতিদিন মাস বছরের নামচা বলে যাওয়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা নিশ্চয়ই আপনারা উপলব্ধি করেন। তবে স্মৃতি-শক্তি আজও প্রখর বলে হয়ত প্রায়শই সঠিক বলে যাবো—খালি দিন তারিখের কিছু হেরফের হতে পারে।

১৯২৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত আমার পিতা বর্তমান ছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ুয়া ছেলে—বয়স ১৯ বছর ৩ মাস। বাবার মৃত্যুর পরই বলা চলে, হয়ে গেলাম একটি পুরো বাউণ্ডুলে। আমি ছিলাম বাবার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ওপরে তিন দাদা বর্তমান....তার মধ্যে দুই দাদা আমার মতই পড়ুয়া আর সবার বড় যিনি তিনি হঠাৎ ব্যবসায়ে বিপর্যস্ত হয়ে সংসার তরীটিকে তখন কর্ণধারবিহীন করে তুলেছেন। এই ডামাডোলের মাঝে পড়ে আমি লেখাপড়া ছেড়ে ঢুকে পড়লাম এক সরকারী অফিসে (এ জি সি আর) মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। মাসকাবারে টাকা হাতে পেয়ে কান্না পেলো... ছ'মাস কাজ করে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে বার হয়ে পড়লাম। কি যে করি—কোন লাইন ধরি এইসব ভাবনার মাঝে পড়ে দিশেহারালাম। মূলধন বলতে আমার ছিল উদাত্ত গানের গলা। কিন্তু তখন আবার এখনকার মত গান বেচাকেনা হোতো না।

স্কুল কলেজ জীবনে গানের সমাদর বহুতর পেয়েছিলাম—যার সবিস্তারে বর্ণনা আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে দিয়ে গেছি। শুধু এইটুকু বলে রাখি ভাগ্য-অন্বেষণে বিধ্বস্ত হয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতাম সঙ্গীতের জলসায়। মুরারী সম্মিলন, কানা শরৎ সম্মিলন, লালচাঁদ সম্মিলন সবই ছিল আমার পরম প্রিয়... এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুদের নিয়ে বাড়ী বাড়ী মজলিস রচনা করে গান গেয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতাম।

এ ছাড়াও আমার ছিল সাহিত্য প্রীতি ....কারণ নিজেও দু'এক কলম লিখতে পারতাম তার সমাদরও কিছু কিছু প্রবাসী, অর্চনা, মানসী ও মর্মবাণী বিচিত্রা থেকে পেয়ে নতুন আস্বাদে পুলকিত হয়েছিলাম। মেসার্স এ, টি দেবের বাড়ীর মেজছেলে শ্রীসুবোধ মজুমদার আমার সহপাঠী ছিল। তার বাড়ীতে প্রতি সকালেই, তৎকালীন বড় বড় সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত—সে আসরেও নাক গলিয়ে বসে থাকতাম।

বন্ধু ডাঃ আদিত্য গুপ্ত তখনকার কালে 'মুকুল' পত্রিকার ব্যবস্থাপক ছিল—সে আড্ডাতেও আমার যাতায়াত ছিল—ফলে সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য প্রভৃতিরাও আমার বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেন মশাই-এর ছেলে শ্রীঅজিত আমার বন্ধু ছিলেন বলে কল্লোল গোষ্ঠীতেও আমার সমাদর ছিল। শনিবারের চিঠির সজনীদারও আমি স্নেহের পাত্র ছিলাম।

এ ছাড়াও আমাদের এক স্পেশ্যাল গোষ্ঠির অধিবেশন হোতো ৭নং রামমোহন রায় রোডের ত্রিতলে। (৭নং রামমোহন রায় রোডের বাড়ীটি বাণী দাস ও দীনেশ মজুমদারের জন্যে পরে বিখ্যাত হয়েছিল)। 'ইউ'—অর্থাৎ ডাঃ অমিয় বসু ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—ওর ওখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য সুধীর ধরচৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে আড্ডা বসতো। ইউ-সায়েন্স কলেজে এম-এস-সির ছাত্র ছিল—সেই সুবাদে এ আড্ডা সাইয়েন্স কলেজের ছাতে পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছিল। সেই সুবাদে ডাঃ প্রফুল্লবাবু যিনি আচার্য পি, সি, রায়ের স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন তার সঙ্গেও অত্যন্ত হৃদ্যতা ঘটে....যার কল্যাণে আমি আচার্য পি, সি, রায়কে আমার গানে বিমুগ্ধ করে প্রায়ই ওঁর ঘরে বসে থাকতাম।

এইভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সালের শেষাবধি আমি বিভিন্ন সংস্থা বা আড্ডায় নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতাম যাতে করে ভাগ্যক্রমে কোনো লাইনের হদিস পাই।.... হঠাৎ যেন হদিস পেলাম ...১৯২৫ সালেই এক চমকপ্রদ ঘটনায় আমার গতানুগতিক জীবনকে মোড় ঘুরিয়ে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে শুরু করল। বসেছিলাম আচার্য রায়ের ঘরে, খাচ্ছিলাম মুড়ি নারকেল হঠাৎ ঝড়ের মত একদল ছেলে ঘরে ঢুকে বললে—'এখানে কে গাইতে জানেন—শীগগীর আসুন—ডাঃ মিত্র ডাকছেন। সবাই মিলে—এমন কি আচার্য রায় পর্যন্ত আমায় বলেন—'যা-যা-বেতারে গান গেয়ে আয়—খুব ভাল করে গাইবি।'

১৯২৫ সালে কলকাতা সাই-য়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে এক প্রগতি সন্ধ্যায় বেতারযোগে গান আবৃত্তি প্রচারের আয়োজন ঘটালেন ডাঃ শিশির মিত্র মহাশয়। সারা কলকাতায় শ্রোতারা অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

সেদিনের প্রথম আসরে প্রথম গান গেয়েছিলাম 'ঐ মহাসিন্ধু ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে'....মনে হয়েছিল আজকের প্রথম আসরে এই গানখানিই একমাত্র উপযোগী গান।

ডাঃ পি, কে, বোস ডি, এস, সি, এফ, এন, এ যিনি বোস ইনস্টিটিউট-এর একজন প্রাক্তন ডিরেকটর....তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এক টেলিফোনিক আলোচনায়—তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুকে বেতার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের ১৯শে এপ্রিল....চিঠিখানি নীচে তুলে ধরলাম।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ১৯২৩ সালে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় আমি রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করি ঐ বিজ্ঞান কলেজের অন্যদিকে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণাগারে।

ডাঃ মিত্র ঐ সময় হইতে বেতার সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন (বোধহয় ১৯২৫ সালে)। পদার্থ বিজ্ঞানের একটি ছোট ঘরে তিনি বেতার প্রেরণ যন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁহার একজন সহযোগীর সাহায্যে মাঝে মাঝে বেতারে কথোপকথন, গান, আবৃত্তি পাঠাইতেন। যাঁরা এইসব গ্রহণ করিতেন তাঁরা রিপোর্ট দিতেন।

আমি সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ঐ বেতার প্রচার ঘরে যাইতাম। কোন কোনদিন পরিচিত ২।১ জন সঙ্গে থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহীরেন বসুর নাম বিশেষ করে মনে পড়ে, কেননা যেদিন ডাঃ মিত্র প্রথম বেতার প্রেরণ করেন সেদিন সেই আসরের প্রথম গাইয়ে ছিলেন শ্রীহীরেন বসু। তারপরও তিনি মাঝে মাঝে নিজের গাওয়া গান অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে প্রচার করিতেন।'

তখন বেতার শ্রোতাদের কানে হেড-ফোন লাগিয়ে বেতারের বার্তা বা গান বা সঙ্গীত শুনতে হোতো....সেট-গুলির নাম ছিল ক্রিস্টাল সেট। যে কজন চেনা পরিচয়ের মাঝে এই সেট ছিল তাদের কাছে আমার গানের ভূয়সী প্রশংসাভিনন্দন পেলাম—বিশেষ করে এইচ বোস (যাঁর দিলখোস বা ফুলতলীন ছিল) তাঁর বড় ছেলে হিতেন বসু ও তাঁর বন্ধু স্বর্গত সুকুমার রায় আমায় ডেকে উৎসাহিত করেন। এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ফুটবল খেলার মাঠে, ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলে আমাদের সিক্স-এ-সাইড ম্যাচে এঁরা দুজনেই আমাদের রেফারি হতেন। কিছুটা আশার আলোর আভাস পেলাম। ১৯২৬ সালের প্রথমেই আমার লেখা 'ধূপ-ধুনা' (পদ্যের বই) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশিত করলেন। ধূপ-ধুনা লেখা ৪০টি বিচ্ছিন্ন কবিতা হলেও তার প্রত্যেকটির সঙ্গে এমনি এক যোগসূত্র ছিল যা ওমার খৈয়াম দর্শনকে হিন্দুদর্শনে রূপান্তরিত করা মনে হয়। ধূপধুনা প্রকাশের পূর্বে আমি আমার ম্যানুস্ক্রিপ্ট কপিটা আমার শ্রদ্ধেয় কবি নরেন দেব—একক্ষণ্ণ নরেনদার হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিছুটা দেখে দেবার জন্যে। তিনি কবিতা-গুলির প্রভূত প্রশংসা করে দুই একটি ছন্দের কিছুটা রূপান্তর করে আমায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। রেডিওর গান ও পদ্যের বই-এর দুমাসরইকেই আমায় পথ দেখিয়ে আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দীক্ষা দেয়। এই সময় আমার ভাগ্যদেবতা দুহাত বিস্তার করে আমায় যেন দুদিকে ডাক দিলেন। একদিকে হিজ্ মাস্টার ভয়েস কোম্পানীর অধিকর্তারা অপরদিকে শুনলাম ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানী, ভারতে ব্রডকাস্টিং-এর ব্যবসায়িক সুযোগ নির্ধারণে টেম্পল চেম্বার (হাইকোর্টের সামনের বাড়ী) বাড়ীর ত্রিতলে একটি বেতার প্রেরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর

অনুপম ঘটক, হীরেন্দ্রকুমার বসু এবং রাইচাঁদ বড়াল

প্রতিভূ ছিলেন মিঃ সি, সি, ওয়ালিক। এখান থেকে তিনি প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পীদের আবৃত্তি, নাটকীয় দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন যন্ত্রীদের বাজনা বেতারে প্রেরণ করছেন এবং পাথেয়স্বরূপ শিল্পীদের হাতে কিছু কিছু দক্ষিণাও দিচ্ছেন। তৎকালীন প্রখ্যাত প্রচার সচিব সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল মশাইও এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁর হাস্য-রসাত্মক নাটিকা 'দেবতাদের মর্তে আগমন' বইখানিকে অভিনীয় প্রয়োগ করতে। সুধীরদার বই-এর সুরকার হয়ে আমি রিহার্সালে গিয়ে মিঃ ওয়ালিকের সম্মুখীন হই—ফলে আমার কাজ দেখে তিনিও আমাকে ওখানে গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমি প্রায় ৩।৪ দিন গান করার সুযোগ পাই। এইচ্ এম্ ভিতে যোগদানের ইতিহাস আমি জাতিস্মরের শিল্পলোকে প্রকাশ করেছি।

এইখানে, এইচ-এম-ভি রেকর্ডিং এর পূর্বতন আয়োজন সম্বন্ধে কিছুটা বলি। তখনকার দিনে শিল্পীকে একটি টিনের চোঙার সামনে বসে উচ্চস্বরে গান গাইতে হোতো। তখন মাইকটাইক থাকতো না—চোঙার মধ্য দিয়ে গান গিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান মোমের চাকতির ওপর পিনের সাহায্যে স্ক্র্যাপ করে দিত—সেই স্ক্রেপিং ভাইবেশনেই গান বাধা থাকতো। মোমের চাকতির থেকে সেগুলিকে তামার চাকতিতে ছাপ তোলা হোতো এগুলিকে ম্যাট্রিক্স বলতো এবং এই তামার চাকতি থেকে আবার গালা, ইবোনাইট মিশ্রিত নরম চাকতিতে সেই-গুলিকে ছেপে তুলতে হোতো। চাকতি শক্ত হবার সময় লেবেল লাগিয়ে রেকর্ড করে ছাড়া হোতো। তখন এইচ-এম-ভি রেকর্ডিং স্টুডিও ফ্যাক্টরী [illegible] ছিল না—ছিল বেলেঘাটায়। [illegible] এর জন্যে গানের রিহার্সাল হোতো [illegible] গবাণ-হাটার মোড়ের বাড়ী 'বিষ্ণু ভবনে'।....

এখনকার মত সব সময় রেকর্ডিং সুযোগ-সুবিধে তখন ছিল না। বিলাত থেকে রেকর্ডিস্ট আসতো বছরে দুবার—অর্থাৎ বছরে দুবার সেশন হোতো। সমস্ত শিল্পীবৃন্দকে গান শিখিয়ে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হয়ে সেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হোতো। কাজেই যদিও আমি ১৯২৬ সালেই এইচ-এম-ভির শিল্পী হয়েছিলাম, রেকর্ডিং সেশন হোতে প্রায় ডিসেম্বর হয়ে গেছিল।

২৬ সালের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল দেখে আমি একটি প্রেস শুরু করেছিলাম জুন মাসে। মুকুল পত্রিকার সারা দফাটিকে নিয়ে আমি একটি ছেলেদের মাসিক পত্রিকাও শুরু করি। 'আলপনা' পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেন, সম্পাদকের আসন নিলেন সুনির্মল বসু, প্রচ্ছদপট এঁকে দিলেন প্রখ্যাত যতীন সেন, ভিতরের ছবি অলঙ্কৃত করলেন শ্রীচারু রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। লেখক হিসাবে সবাই যোগ দিলেন—অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সব্বাই। কেবল লেখা পাইনি গুরুদেবের কারণ তিনি তখন ভারতের বাইরে। এই সূত্রে বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, কথাশিল্পী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুলেখিকা সুখলতা রাও, সবারই সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠলো।

এদিকে আবার ২৬শে অগাস্ট ১৯২৬ সালে ১নং গারস্টিন প্লেসে মিঃ ওয়ালিক নতুন করে গড়ে তুললেন ইণ্ডিয়ান ব্রড্-কাস্টিং কোম্পানী। ইংরাজী প্রোগ্রাম ডাইরেকটর ও স্টেশন ডিরেকটর ছিলেন ওয়ালিক সাহেব—তাঁর সহকারী ছিলেন মিঃ চ্যাপম্যান। মিঃ ওয়ালিক এইচ-এম-ভির অধিকর্তা মিঃ কুপার সাহেবের পরামর্শে ভারতীয় প্রোগ্রাম ডাইরেকটর হিসাবে ও তাঁর সহকারী হিসাবে নিয়োগ করলেন যথাক্রমে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার

ও শ্রীরাইচাঁদ বড়ালকে। মিঃ কোয়েস সাহেব হলেন সাউন্ড এঞ্জিনিয়ার।

১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালের গোড়া পর্যন্ত ব্রডকাস্টিং স্টেশনে বিভিন্ন বিভাগের পত্তনী করে মিঃ ওয়ালিক বি, বি, সিতে ফিরে গেলেন এবং তাঁরই স্থানে বসিয়ে গেলেন মিঃ স্টেপল্‌টন সাহেবকে এবং স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারের আসনে বসালেন শ্রীসুধীন রায়কে। সুধীন রায় মশাই ছিলেন ডাঃ শিশির মিত্রেরই কৃতী-ছাত্র।

নৃপেনবাবু একজন গুণী শিল্পী—অদ্ভুত সুরেলা কেরিওনেট বাজাতে পারতেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের থিয়েটারে 'সীতা' বইতে তিনি কিছু গানে সুরসংযোজনা করেছিলেন আর করেছিলেন আবহসঙ্গীত রচনা। সীতা নাটকের প্রস্তাবনার 'কথাকও' ও 'ধরিত্রীর গান' 'ধরার মেয়ে' এই দুইখানি গানে তিনিই সুরসংযোজনা করেন। শিশিরবাবুর নিজস্ব পরিষদেব যে গুণী সমন্বয়, তাঁদের সাহচর্যও নৃপেনবাবু বেতারে পেয়ে গেলেন। যেমন সু-সাহিত্যিক 'প্রেমাঙ্কুর আতর্থীব সম্পাদনায় বেতার জগত পত্রিকা শুরু করলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কথিকার আসর বসালেন হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট যোগেশ বসুকে এনে বসালেন 'গল্পদাদুর' আসরে—বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার রাজেন সেনকে (মোহনবাগানের শিল্ড খেলার হাফব্যাক) বসালেন বেতাব বার্তা প্রচারের আসনে—এমনিতর।

তাঁর সুদক্ষ সহকারী রাইচাঁদ বড়ালও সে সময়ে কম নাম কবেননি গুণী সমাজে। ১৯২৬ সালেই তিনি অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে তবলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাছাড়া ওঁর পিতা লালচাঁদ পড়ালের স্মৃতি সম্মিলনে ভারতের কোন্ বড় গুণী না আসতেন? কাজেই শিল্পী সমন্বয়ে রাইবাবু ছিলেন অদ্বিতীয়। সেই জন্যে রেডিও তার শৈশব যাত্রাতেই জমিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক এই সময় আমি ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাস্টিং কোম্পানীতে পাকা-পাকিভাবে যোগদান করি। ....সুপারিশ বলতে আমার ছিল—আমি এইচ এম ভির গায়ক....আমার পূর্বতন ব্রড্‌কাস্টিং অভিজ্ঞতা আছে ...তাছাড়া রাইচাঁদ আমাব বাল্যবন্ধু ...স্কুল ফাংশনে আমার গান সর্বসমাদৃত ছিল তিনি তা জানতেন তাই গায়ক পর্যাবপর্যবসিত হয়েও আমি অচিরেই গীতিকার সুবকার এবং নৃপেনবাবুব নতুনতর চিন্তাধারার রূপকার হয়ে উঠলাম। নিজের গান গাওয়া ব্যতিরেকে কি কি তখন করতে হোতো, আমি তারই লেখা সার্টিফিকেট থেকে কতকাংশে তুলে ধরছি :

'I have much pleasure to certify, Mr. Hiren Bose whom I know since 1927. His merit in music, composition of Musical Vorses and Dramatic talents charmed me during his services in All India Radio In Radio he was the incharge of Drama Section and from his own conception he established acoustic Effect Dept. He was a songstar, Music composer, Playwriter, composer of verses Dramatist and Actor. His talents in so many scbjects at the sametime was really a singular nistance in my office Apart from these qualification his original and creation. Genius always helped me in the construction of variety Musical Blocks, features, Music training class, Morning Programme in Radio for which the listnero of India are indebted him etc etc."

১৯২৬ সালের শেষাংশের গানগুলি রিহার্সাল শেষ হয়েও স্থগিত হয়ে রইল ১৯২৭-এর আশাপথ চেয়ে; কারণ এইচ-এম-ভির পুরাতন পদ্ধতিব রেকর্ডিং বর্জন করে বসাচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডিং মেশিন; অর্থাৎ এর সব কাজই ইলেকট্রিক ড্রাইভে ঘটবে। এর জন্যে বিলাত থেকে একসপার্ট বেকর্ডিস্টকে আনিয়েছেন মিঃ কুপার....মিঃ কোরান সাহেব গত কয়েক মাস ধরে মেশিন ইনস্টলেশনে ব্যস্ত ছিলেন, এবার তৈরী হয়ে আমাদের আহ্বান জানালেন।

ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডের উদ্বোধনী হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। সেই আয়োজনে বেলেঘাটায় আমাদের রিহার্সাল-ঘর থেকে ডাক পড়েছে ধীরেন দাসকে এবং গায়ক-গায়িকা হিসাবে আমাকে আর মিস্ হরিমতীকে। এবাবেব দ্বৈত ভজন 'সংসার মায়া ও আসল মন ফাঁকিয়ে গান দুটি টেস্ট বেকর্ডিং হবে এই নতুন ধারায়, কৃতী হলে উদ্বোধনী উৎসব শুরু হবে।

বেলা সাড়ে দশটায় কবিগুরু এসে গেছেন, সঙ্গে আছেন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ। এঁদের নিয়ে মিঃ কুপার ডিপার্টমেন্ট ঘুরে ওদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন।' এই ফাঁকে মিঃ কোরান আমাদের দ্বৈত ভজন নিয়ে রেকর্ডিং টেস্ট শুরু করে দিয়েছেন। গান দুখানি বি-শ্লে কবে সন্তুষ্ট হয়ে কবির অপেক্ষায় আমরা বসে থাকি।'

উদ্বোধনীতে কবিগুরু আবৃত্তি করবেন। যতদূর মনে আছে, উনি বোধকবি সেদিন 'আজি হতে শত বর্ষ পবে' কবিতা দিয়েই উদ্বোধনী শুরু করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সেদিনের রেকর্ডিং আসরে যেটুকু রসাল ঘটনাটুকু ঘটেছিল সেটুকু না বললে উদ্বোধনী উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মাটিব উপর পুরু গালিচার ওপব কার্পেটের আসন বিছানো ছিল। ঘরেব একপাশের দেয়ালের দিকে খান চারেক চেয়ার রক্ষিত ছিল। মিঃ কুপার কবিগুরু ও প্রশান্তবাবুকে রেকর্ডিং রুমে পৌঁছে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ভগবতী ভট্টাচার্য মশাই কবিকে কার্পেটের আসনে সমাদবে বসালেন। প্রশান্তবাবু বসলেন পাশের একটি চেয়ারে; আমবা একপাশে দাঁড়িয়ে।

ভগবতীবাবু কবিগুরুকে অল্প কথায় রেকর্ডিং নিয়মাবলী জানালেন অর্থাৎ লাল আলো জ্বললেই আর কথা নয়, একেবারে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আবৃত্তি শুরু হয়ে যাওয়া চাই। তথাস্তু। যথাসময় লালবাতি জ্বলে উঠলো। ভট্টাচার্য মশায় ইশারায় কবিগুরুকে শুরু করতে বললেন। কবিগুরু বললেন—'প্রশান্ত তুমি অমন দূরে বসে রইলে কেন; আমার পাশে এসে বসো'.....

প্রথম শ্লোট ব্যর্থ হলো।' প্রশান্তবাবু এসে কবির পাশে বসলেন। আবার লালবাতি জ্বলে উঠলো। কবি আবৃত্তি শুরু না করে বলে উঠেন—'শুরু করার আগে এক গেলাস জল খেলে হোত না প্রশান্ত।

বলে ফেলেই নিজেই হেসে উঠে বললেন, 'এই যা এবারও ভ্রষ্ট হলো তো....সবাই হেসে ফেলি।

কিছুটা সময়ক্ষেপ করে আবার জ্বলে ওঠে লাল আলো .এবার কবি কিন্তু ভুল করলেন না। অনবদ্যভাবেই আবৃত্তি করে চলেন।'

মাঝে বোধহয় একটু গলা ঝেড়ে নিয়েছিলেন অতি সাবধানে মিঃ কোরান বলেন, দ্যাটস্ ন্যাচারাল।

এরপর মিষ্টান্ন বিতরণের পালা। ইতরজনেরাও ভাগবাটোয়ার বঞ্চিত হলেন না।

এইচ-এম-ভি ১৯২৭ সালের রেকর্ডিং-এর ফলাফল ১৯২৭ সালের প্রথমেই পাওয়া গেল। আমার গাওয়া সোলো গান 'বেলা-বেলি চল পথিক ঘবে' ও 'মোর গানের সকল ব্যথা' শ্রোতৃসমাজে সমাদৃত হয়েছে আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করলো আমার ও হরিমতীব গাওয়া ডুয়েট ভজন 'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম জপ মন' আর 'মন আসল ফাঁকিরে'।' গান দুখানি যা ছিল ইলেকট্রিক রেকর্ডের প্রথম নিদর্শন। ফলে এইচ-এম-ভির কর্ণধার মিঃ কুপাব-এর আমি সুনজরে পড়ে গেলাম। তিনি আমায় তাঁর অফিসে ডেকে বললেন—মিঃ বোস তুমি প্রোটোটাইপ রেকর্ড সঙ্গীত ছেড়ে

ভজন ডুয়েটে যেমন নতুনত্ব দেখিয়েছো, তেমনি নতুন নতুন পরিকল্পনায় ১৯২৮ সালে আমায় কিছু রেকর্ড করে দাও। ওঁর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি তাঁকে কথা দিয়ে এলাম। ঐ সিজন-এ আমারই শ্রদ্ধেয় কাজীদা বাংলা সঙ্গীতে উর্দু গজলের রূপ প্রকাশিত করেন—শিল্পী কে মল্লিককে দিয়ে। গাওয়ালেন 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' ও 'কে বিদেশী মন উদাসী' গান দুখানি। হঠাৎ গ্রামোফোন কোম্পানীর জয়-জয়কার ছড়িয়ে পড়লো। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন 'হরেন দত্ত মহাশয়। তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত সুললিত ছিল....দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি অকালে মারা গেলেন। ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ চায়না থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর সব গানের সত্ত্ব শান্তি নিকেতনকে দিয়ে দিলেন।' ফলে শান্তিনিকেতনের হটকারীতায় হরেনবাবুর গাওয়া রেকর্ডগুলি ভাঙা পড়লো। কারণ দর্শালেন সুর ঠিক হয়নি। এখানে বলে রাখি রেডিওতে তখন আমি আমার নিজের লেখা গান গাইতাম না। গাইতাম রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায়, রজনীকান্তের গানগুলি। কিন্তু হরেন-বাবুর বিধবা পত্নীর শত অনুরোধেও যখন শান্তিনিকেতন হরেনবাবুর গাওয়া একখানি রেকর্ডও রাখতে দিলেন না—সেই দিন থেকে ক্ষোভে দুঃখে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম সবার লেখা গান গাওয়া। সেই দিনই থেকেই শুরু করেছিলাম আমার নিজের লেখা ও সুরে গান গাইতে।

রেডিওর কর্মতৎপরতা ও এইচ-এম-ভি'র রেকর্ডিং-এর চাপে পড়ে আমার শিশুদের পত্রিকা 'আলপনা' ও 'প্রেস' বন্ধ হয়ে গেল। এর পেছনে অর্থ সমস্যাটাও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ শিশু-কবিতার প্রতি আমার নিজের এক নিবিড় প্রেম ছিল।

তাই ভাবলাম শিশুদের উপ-যোগী হালকা সুরে গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়লে কেমন হয়! মিঃ কুপারের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ২৮ সালেই সর্ব-প্রথম নার্সারি রেকর্ড (আর্ট ইণ্ডি) বার করলাম। বিমল দাসগুপ্ত ও কমল দাস-গুপ্তর ছোটবোন 'সুধীরা দাসগুপ্তাকে দিয়ে গান গাওয়ান হয়—'ওলো বকুল ফুল ও শেফালি ও শেফালি'। রেকর্ডটি শিশু-দের মনে তুফান তুলেছিল। ১৯২৮-এর শেষে নিজের সোলো গান (আমার বুকে আগুন জ্বালে) ছাড়াও নতুনত্বের প্রোগ্রাম ছিল—'বাদলের গান ও কালবৈশাখীর গান (ঢাকা ইউনিট), 'মন্দির আরতী সঙ্গীত' ও পদ্মাতে আশ্রম দৃশ্য (কলকাতা ইউনিট) 'ভজন ডুয়েট' বাংলা ভজন'....গানগুলির প্রতিটিতে ছিল একাউস্টিক এফেক্ট যার ফলে অভিনবত্বের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। যেমন বাদলের গানে (অম্বর মাঝে ডম্বরু বাজে) ছিল সেতারের ঝালার সঙ্গে বৃষ্টির আওয়াজ ও মেঘ গর্জন। কালবৈশাখীর গানে ছিল — ঝড়ো সাইরেন — প্রতিধ্বনিযুক্ত দূরাগত গান ('ঐ আসে ধেয়ে কালবোশেখি মেয়ে') মন্দিরারতীর গেয়েছিলেন মিস্ ইন্দুবালা (জ্বালো আজি আরতী দীপ ও বন্দনা করো') এর সঙ্গে ছিল মন্দিরের ঘণ্টা ঝাঁঝর কাড়ানাকাড়া শিঙা ইত্যাদি...প্রভাতে আশ্রমদৃশ্যে ছিল ভোরের কাকলীর সঙ্গে নহবৎ এবং তার সঙ্গে আশ্রমবাসীদের স্তোত্র-মালা। রেকর্ডগুলি যখন বাজারে বার হলো তখন সত্যিই নতুনত্বের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করলো এইচ-এম-ভি।

এই প্রসঙ্গে বলতে ভুলেছি যে কল-কাতার শিল্পীগোষ্ঠী ব্যতীত ঢাকার শিল্পী-গোষ্ঠীর রেকর্ডিং একসঙ্গেই হোতো। কল-কাতার ইউনিটের বড়বাবু ছিলেন 'ভগবতী ভট্টাচার্য এবং ঢাকা ইউনিটের কর্তা ছিলেন হেমচন্দ্র গুহ। এই দুই ইউনিটেই আমার ছিল অবারিত দ্বার। কারণ হরিমতী ঢাকা ইউনিটের শিল্পী, তার সঙ্গে ডুয়েট হিট করার আমি হেমবাবুরও প্রিয়পাত্র হয়ে-ছিলাম।

ভাবছেন এত বার রেকর্ড রয়েলটি, রেডিওর বাধা মাহিনা, তার আবার আর্থিক সংকট কি?! সত্যি বলছি তখন যা আমাদের দক্ষিণা ছিল তা বলতেও লজ্জা আসে। রয়েলটি তো ছিলই না, উপরন্তু গান লেখা সুর করা শেখানো রেকর্ডিং করিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে গান পিছু পাঁচটি করে রৌপ্যমুদ্রা মূল্যস্বরূপ আসতো। ভাবুন কি পেতাম। তবু সৃষ্টিমূলক কাজে প্রকৃত শিল্পীরা চিরদিনই পাগল। তাই এটা, পেশার চেয়ে নেশা হয়ে পড়েছিল বেশী। যার ফলে বাড়ি ভাবতেন সরকারি চাকরী ছেড়ে ছেলে আমার কী টাকাটাই না রোজ-গার করছে! অর্থাৎ এসব কাজ মানে বকামীর নামান্তর মাত্র—তাই এই বাউণ্ডুলেদের না দিত বাড়ীরা উৎসাহ, না দিত তখনকার সমাজ এঁদের ইজ্জত।

১৯২৭ সালের শেষ কি ২৮ সালের প্রথম, ঠিক মনে নেই, বেতারে কীর্তন, কালীকীর্তন, ভগবৎ পাঠ প্রভৃতির বাইরের দলকে নিমন্ত্রণ করে নৃপেনবাবু তাঁদের গাইবার সুযোগ করে দেন। এমনি সময় চিত্রাসংসদ নামে একটি সংস্থা পরশুরাম রচিত 'চিকিৎসা সংকট' নাটিকা নিয়ে রেডিওতে এসে উপস্থিত হন। এঁদের সদস্য-দের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে বাণী কুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, পংকজকুমার মল্লিক, সত্য দত্ত (পরে যিনি বেতার নাটকে দলে অভিনয় করতেন) বিজন বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ। এঁদের অভিনয়-কুশলতায় প্রীত হয়ে নৃপেনবাবু এই সংসদের কয়েকজন কৃতী সভ্যকে বেতার-ভুক্ত করে নেন।

তখন মহিলা মজলিস চালানো হোতো বাইরের বিশিষ্ট খ্যাতনামাদের আনিয়ে.... তাঁদের অনুপস্থিতিতে সময় সময় আমাকেও এর পরিচালনা করতে হোতো। বীরেন গুপ্ত মহাশয়কে পেয়ে নৃপেনবাবু মহিলা মজ-লিসের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করলেন। বীরেনবাবু তখন ই আই আর রেলের কর্মী, ..অসুবিধা হলেও তিনি সাগ্রহে এ ভার নিয়েছিলেন 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে। পংকজ-বাবুকে গাইয়ে হিসাবে নেওয়া হোলো কারণ পংকজবাবুর গলা খুবই মধুর ছিল। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। গীতিকার ও ফিচার, স্কেচ প্রোগ্রামের লেখক হিসাবে বাণীকুমার নিয়োজিত হন। বিজন বসু শ্রীযুত রাজেন সেনকে সাহায্যার্থে সংবাদ পরবরাহে নিযুক্ত হন। কিছুটা অবকাশ পেয়ে আমার ওপর ভার পড়লো বেতারের নিয়মিত স্ত্রীশিল্পী-দের গান শেখানোর। তাছাড়া শ্রীরাইচাঁদ প্রতিষ্ঠিত ঘরের মেয়েদের দিয়ে রবিবার সকালের মেয়েদের গানের আসরের পরি-চালনার ভার।

১৯২৮ সালের শেষে আমার নিজের বাড়ীতে এক বিপর্যয় ঘটলো। আমার মেজদা হেমেন্দ্রকুমার হঠাৎ মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর ইনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হন। মেজদা ছিলেন স্যার বি এন মিত্রের ভাই তৎকালীন পোস্টমাস্টার জেনারেল ফণী মিত্র মশাই-এর জামাই। এম-এ, ল' পাশ করে তিনি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পোস্টঅফিসের পোস্টে সবে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তাঁর বিয়োগে বাড়ীর ভারসাম্য হারিয়ে গেল। বড়দা নৃপেন্দ্রকুমারের ব্যবসা আগেই বন্ধ হয়েছিল, ছোড়দা ডাঃ নীরেন্দ্রকুমার তখনও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, কাজেই সাংসারিক ভারসাম্য সামলাতে আমাকেই অগ্রণী হতে হোলো। ১৯২৮ সালের গ্রামোফোন শেসনের ফলাফল ২৯শের গোড়াতেই বার হলো যার সাফল্য আমাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে দিল এবং ২৯ সালেই কতগুলি নতুন যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা অঘটন পটীয়সী ভগবান জুটিয়ে দিলেন।

'২৯ সালের প্রথমেই বার হলো আমার 'মধুসূদন দাদা' পালা—যা একমাত্র পালা সে-যুগে বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল। কারণ সর্ব-স্তরের শিশুর মুখে তখন উচ্চারিত হোতো 'এসো এসো মধুদাদা'। আমার সোলো গান 'আরতিদীপ কে জ্বালিল—যমুনার তীরে সখি কাজল মাখা নীরেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করল। তাছাড়া সেবারের ভজন ডুয়েট ছিল 'শ্রীগোবিন্দ মুখ চন্দ ও মায়ায় মদির মোহে' ডুবিয়ে—যা তার পূর্বের আসনকে দৃঢ়-ভাবেই ধরে রাখতে পেরেছিল।

(চলবে)

Free / Free / Free

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Bharat Ayurvedashram (A.C.)
P.O. KATRISARAI (GAYA)

বুকের আগুন

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সবচাইতে বেশী লেখা হয় কবিতা, সবচেয়ে বেশী বাজে লেখা হয় কবিতা। অথচ বাঙালীর মধ্যে এমন প্রবীণ বা বৃদ্ধ খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি ছেলেবেলায় বা যৌবনে একবারও কবিতা লেখার চেষ্টা করেন নি। হয়তো উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিলো না, লেখক হতে গেলে যে ধরনের নিষ্ঠা থাকা দরকার তা তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেছিলেন; হয়তো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এটা ঠিক; হয়তো সুদূর মফস্বলে চাকুরী নিয়ে আছেন; কাছাকাছি শহরে লেখক এসেছেন জানতে পেরে অফিস কামাই করে ছুটে আসবেন। উদ্দেশ্য—একটু আলাপ করা। পুরনো দিনগুলোকে ভুলতে পারছেন না, ঘর ভরতি ছেলেমেয়ে, গৃহিণী যথেষ্ট ভালো রান্না করেন, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা গানবাজনায় মফস্বল শহরে যথেষ্ট নামডাকে আছে, তিনি কিন্তু খুশী নন তাতে, কিংবা খুশীই—তবে কোথায় যেনো কি হল না মনে হয়; ছুটে আসেন, আলাপ করেন, মতামত জানাবার চাইতে জানতে আগ্রহ বেশী দেখান।

বাঙালীদের স্বভাবের মধ্যে কোথাও একটা অতৃপ্তি লক্ষ্য করি; তা গাড়ি-বাড়ি হলো না বলে নয়, 'এসেছিল যখন একটা দাগ রেখে যা—' তার জন্য। এটা ভাবেন না, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর লেখক হবার চাইতে অনেক বেশী জরুরী একজন ভালো সংসারী হওয়া; এর তো কোনো গ্যারান্টী নেই, লেখক হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর লেখক মরণোত্তর বিস্মৃতি এড়াতে পারবেন; বেঁচে থাকতেই লোকে তাকে আদর করে না; তবু তো লেখক একজন আলাদা মানুষ—এই ভেবে তৃপ্তি পান লেখক; অথচ এর চাইতে অনেক বেশী সুখের—ছেলেমেয়েরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; মাথা গুজবার মতন একটি কোঠাবাড়ি করেছেন নিজের চেষ্টায়, এরসব জীবনটা জমানো টাকা আর পেন্সনের টাকায় মাথা উঁচু রেখেই কাটাতে পারবেন, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছুটি কাটাতে যাওয়া। না এতে সুখী নন বাঙালী; কৈশোর আর যৌবনের স্বপ্নগুলো ফিরে ফিরে আসে; তাই সাহিত্য সভায় সমিতিতে ছুটে আসা।

শেষ পর্যন্ত লেখক হওয়া কতো কঠিন, বুঝতে পারেন যখন—সময় অনেকটা চলে গেছে; নতুন করে জীবন শুরু করবার সময় নেই। তাই অভ্যেসটা না ছেড়ে লেখা নিয়ে সময় কাটানো—ওটাও অভ্যেস হয়ে যায়। তবে বাঙালী স্বভাবে কবি হওয়ার স্বপ্ন ছাড়তে কেউ রাজি নয়। সে যে বয়সেরই হোক; লিখে যাবেন নিয়মিত, পকেটে নিয়ে পত্রিকার অফিসে ঘোরাঘুরিও চলবে; কিন্তু আত্মসমালোচনা? তা কে করে। 'বেশ লিখছি, এরকমই তো সবাই লিখছে এখন' এই সন্তোষ পেয়ে বসে; যদি সঙ্গে সঙ্গে কৃতি কবিদের রচনা কেন শ্রেষ্ঠ, গুণাগুণ কি বা কালের ধোপে টিঁকিয়ে রেখেছে তাঁদের—তা আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার করতে শেখে তবে নিজেদের অক্ষমতা কোথায় ধরা পড়ে। তা করতে নারাজ। বাঙালী মধ্যবিত্তদের বাবামায়ের স্বপ্ন যেমন ছেলে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, তেমনি তরুণ লেখকদের প্রথম স্বপ্ন কবি হবার। যদি প্রশ্ন করা যায় একশো তরুণ লেখককে ডেকে, নাটক লেখো না কেন, উপন্যাস, গল্প? অস্পষ্ট উত্তর দেবে; আমি এখনো এমন ছেলে দেখিনি, যার সঙ্গে পরিচয় হতে সে তাকে 'নাট্যকার' বলে পরিচয় দিচ্ছে। 'ঔপন্যাসিক' হবো—তা শুনি কদাচিৎ; তবে গল্প লেখক হবার স্বপ্ন দেখে তেমন তরুণ দু-চার জন চোখে পড়ে। শুরুটা কবিতা দিয়ে করে শেষ পর্যন্ত গল্পে উপন্যাসে চলে গেছেন, তার উদাহরণ আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে আছে; ইদানিং কবিতা লেখার সহজ কাজটাই বেশীর ভাগ তরুণ বেছে নিয়েছে। তা কি সময় কম লাগে বলে? ছাপাতে সুবিধে হয় বলে? সহজে কিছুটা নাম হয় পরিচিত সমাজে, তার জন্য? হয়তো এইসব প্রশ্নগুলো অবাস্তব নয় মোটেই। এটা মনে রাখে না অনেকেই, সব শিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই কঠিন, অনেকটা সহজাত প্রতিভা থাকা চাই, অনেকটা অনুশীলন। এসব থাকা সত্ত্বেও একজন প্রথম শ্রেণীর কবি নাও হতে পারে। ঠিক তেমনি গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—যা কিছু হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখা যাক না কেনো, প্রতিভা ও পরিশ্রম তারও সাফল্যের মূলে। অনেক দিতে হয়, অনেক জানতে হয়, অনেক ছাড়তে হয়—আমরা আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সেই সব ছাড়ার সাধনা দেখেছি। আমরা অনেকেই ওই দিকটায় তাকিয়ে দেখার সময় পাই না কিংবা ইচ্ছেও নেই। বেশ লিখছি, নাম হচ্ছে না কেন, যেমন ওর হয়েছে—এইসব অভিযোগ নিয়ে যতোটা মাথা ঘামাই, নিজের লেখা কি করে মানুষের মন ছুঁয়ে দিতে পারে তার জন্য চেষ্টা করি না। এক-একটা দশক শুরু হয়, কতো কবি, কতো পত্রপত্রিকা, কতো জেহাদ। এসবই স্বাস্থ্যের লক্ষণ; কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ভীড় পাতলা হতে থাকে; সেইসব উদ্ভাসিত তরুণের মুখ আর দেখা যায় না। দু-চারজন যুদ্ধক্ষেত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করে আঁকড়ে পড়ে থাকে। এটাও স্বাস্থ্যকর। এটাই নিয়ম। যারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রের সার্থকতার টানে চলে গেলো তারা সেসব ক্ষেত্রে অনেকেই বিজয়ী হবে; তবু শেষ বয়সে পৌঁছে ওই কান্নাটুকু তার কাঁদতেই হয়—এই হল বাঙালীর স্বভাব। যাদের এরকম দেখিনি তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এদেশে যতো সংখ্যক লোক কবিতা লেখে তার তুলনায় গল্প উপন্যাস নাটক লেখকের সংখ্যা অনেক কম, প্রায় তুলনাই হয় না। ধরে নিই যদি, কবিতা লেখার প্রতি গভীর টান রয়েছে বাঙালীর, লিখছেও অনেকে, তবে কজন সার্থক কবি আমাদের দেশে জন্মেছেন, যাদের রচনার কাছে সুখ-দুঃখে দাঁড়াতে হয় মাথা নত করে? দাঁড়ি কবিতার কোনো না কোনো স্তবক বা পংক্তি প্রবাদের মতন স্মৃতিতে বেঁচে আছে দীর্ঘ দিন? কিন্তু গল্প লেখকমাত্রই কিছু না এমন গল্প লিখেছেন যা না পড়লে সাহিত্য-পাঠ আংশিক হতে বাধ্য। দু-চারটে অসাধারণ গল্প মোটামুটি গোছের লেখকও লিখেছেন; উপন্যাসের কথায় তা বলবো না, নাটকেও না। কিন্তু অসংখ্য কবিতা লেখকের মধ্য থেকে এমন কজন কবি আমরা পেয়েছি যাদের রচনার মধ্যে বোধ, মন ও মনন, অনুভূতি ও রচনাশৈলী পরিণতি পেয়েছে দু-চারটে কবিতাতেও। যেহেতু কবিতা লেখাটার পিছনে আমাদের স্বভাবের তাগিদ যতোটা থাকে, স্বাভাবিক প্রেরণা ততোটা নয়; তাই মোটামুটি চলতিকালের মাপের একটা ছাপারযোগ্য লেখা লিখে ফেলেই আমরা খুশী। এই জন্য অগণন লেখা হচ্ছে পাঠ্য, স্মরণযোগ্য সামান্যই; স্মরণীয় কবি দু-চার জন। প্রথম শ্রেণীর কবির তুলনায় বেশ কিছু অসামান্য গল্প লিখেছেন এরকম লেখকের সংখ্যা আমাদের ভাষায় অনেক বেশী। এই রূঢ় সত্য আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

ক্যালিক্স্® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নির্বিঘ্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :

★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর। টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

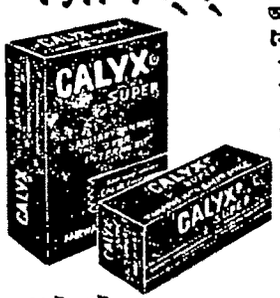

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০৯৯
ফোন : ৩৫-৪৯৪৫

এজেন্ট চাই

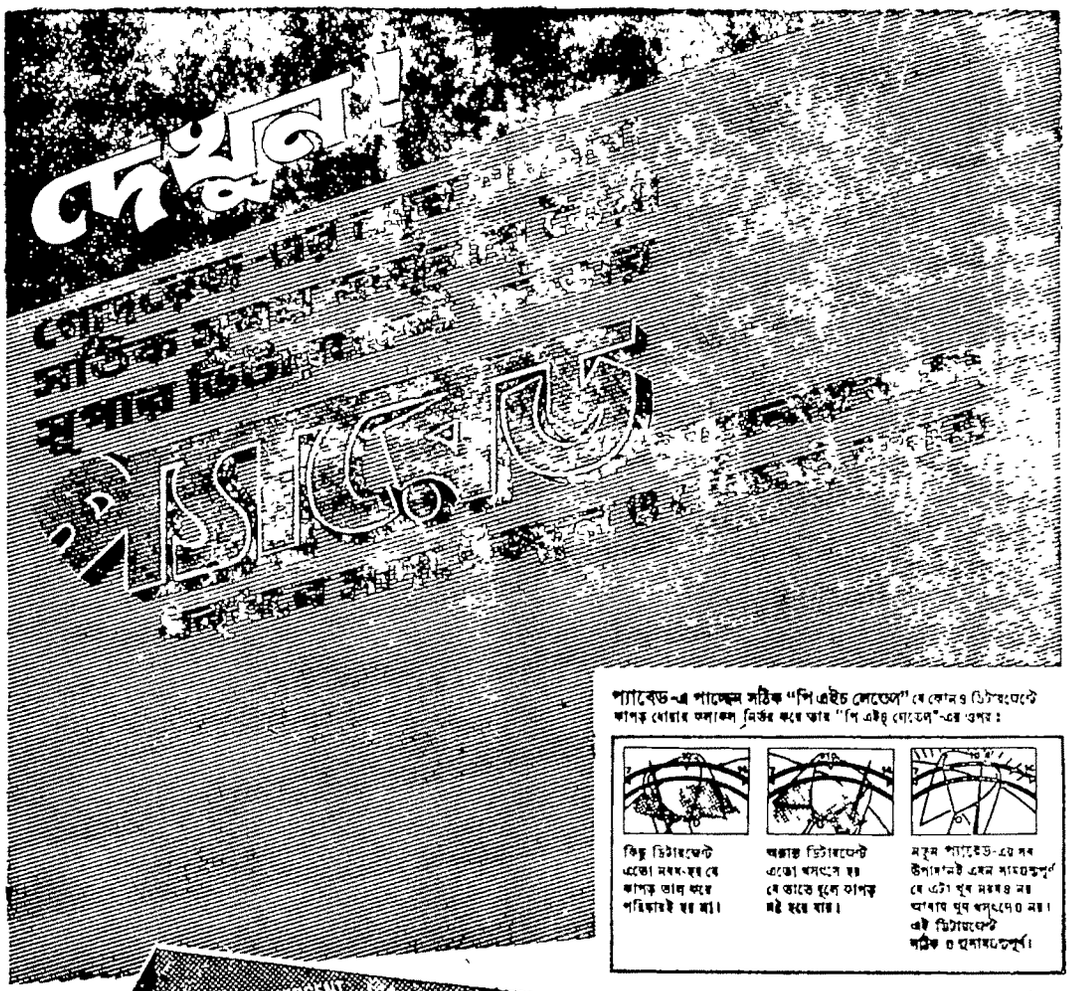

প্যারেড-এ পাবেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোনও ডিটারজেন্টে কাপড় ধোয়ার ফলাফল নির্ভর করে তার "পি এইচ লেভেল"-এর ওপর :

কিছু ডিটারজেন্ট এতো নরম-হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।

অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো কর্কশ হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটা খুব নরমও নয় আবার খুব কর্কশও নয়। এই ডিটারজেন্ট সঠিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

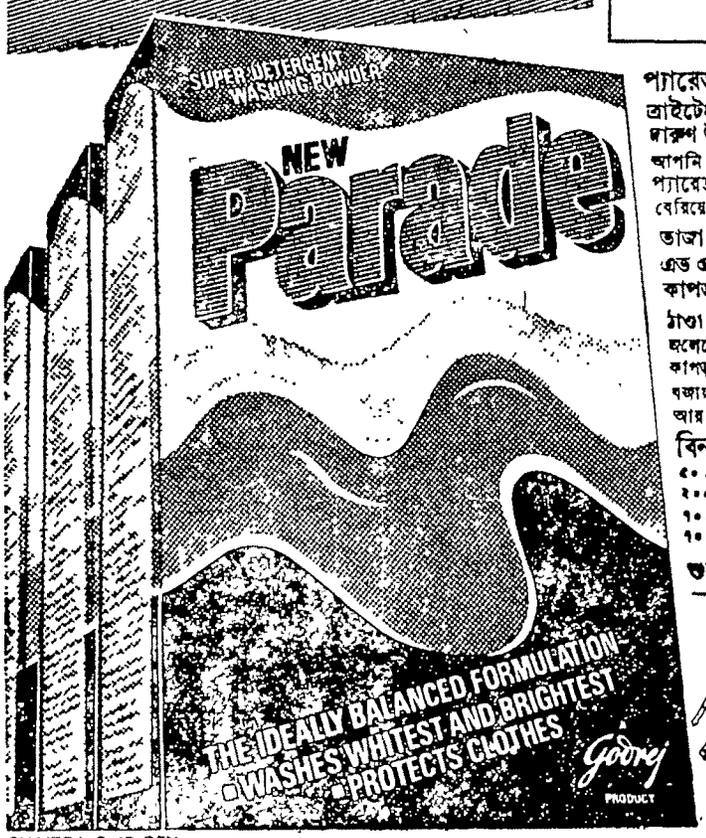

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় দারুণ সাদা দারুণ উজ্জ্বল করে।

আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর যে বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা কখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।

ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, কার জল বা পরিষ্কার জল সব জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যার ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

বিনামূল্যে!

৫০ গ্রাম সিম্বল—
২০০ গ্রাম @ ৪০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে
৭০ গ্রাম সিম্বল—
৭০০ গ্রাম @ ১০০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে

শুভ্রতা ও ঝলক, চোখের পড়েনা পলক
—নতুন প্যারেড-এর চমক

খুলনার ফটোগ্রাফ

দাউদ হায়দার

বড়ো দীর্ঘ পথ মুড়ে তাঁর দিনের শুরু—গুরু গুরু করে মেঘ
আবেগ মিশ্রিত অবেলায় হেঁটে যায় নগর-আক্রান্ত প্রেমিক—
ঠিক আমি জানি না, এরকম বললে হয়তো রাষ্ট্রপ্রধান হেগ
থেকে ফিরবেন যথারীতি। 'রাতি জ্বালাবো কি পথে?' দিক-
সীমানা সত্যিই ভুলে গেছেন?—উত্তরে রাজা রাজেন্দ্রলাল,
মন্ত্রাখাল দক্ষিণে নয়, বাম হাতে পোস্টাপিস; নাক বরাবর
রহিম ওস্তাগর!—একমাত্র দুপুর ছাড়া সন্ধ্যায় কি সকাল
আমি লুফে নিই শহরের সব জানু অলিগলি!—সকল প্রহর
মোর ঠোঁটস্থ এই;— বলা ভালো, কোথায় দ্বিজেনবাবুর পুরানো
কুড়ানো ছাপাখানা, কোথায় ধানভট্টের প্রতিকৃতি, কোথায় মানিক
বাড়ুজ্যে বাংলায় আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন—সব হারানো
স্মৃতি তাঁর দীর্ঘ নখে চুলে ঝুলে আছে!—হয়ত খানিক
বাদে পাওয়া যাবে ঝুলন্ত ব্যাগের মাঝে খুলনার অম্লান
ফটোগ্রাফ। সেখানে ছড়ানো আছে হাঁটি হাঁটি শিশুটির মুখ,
বুকভরা জল নিয়ে একজন কিশোরী সলজ্জ দাঁড়িয়ে; পান
খান রাঙা ঠোঁটে, পিতার ঝাপসা চোখের চশমার মতো মুখ
লেপটে আছে ওর পেছনে তিন সারি শ্বেত হাঁস, দুই একটা সুপুরি
খুপড়ির মতো চালাঘর, পায়রা, আঙিনায় নিবিবিলি শাড়ি
সোয়ারী যায় পালকির তালে, কপালে কি আছে;—হয়তো কুড়ি
বছর বয়সের আগেই সাত পাঁচ ভেবে একদিন পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে
কলকাতার ভারি

গাড়ি চড়ে, চলে আসেন, বড় একা, একলা!—বেলা
অবেলা এখন কাটে কি তাঁর মোহন পংক্তিতে!'—অথচ জন্ম থেকে
আমি তো এরকম অভ্যস্ত নই!—বুঝি তাই খেলা
সাঙ্গ করি বেখোরে করিডোরে কমলকুমার মজুমদারে আর
দেবব্রত রৈবিকে!

রবিবার

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোন মাসের প্রত্যেকটি রবিবার আমার নিজস্ব
এবং নিজস্ব বলেই যেমন খুশি হাঁটবো চলবো বলবো
আর যখন জানালার পাল্লা দুটো সটান খুলে দিই
সকালবেলার হাওয়া যেন ওলটপালট ঝড় তুলে দেয়

প্রথম আমার নিয়মমাফিক কাজ নেই, জামার আস্তিন
জোড়া দি সাত অসঙ্গত ইচ্ছে বলে ওঠে—
অকারণ চেনো, ভালোবাসো তোমার হল বাইরের অসময়
লগ্নে শুধু একটি দিনের জন্যে চেয়ে নাও বসন্ত বাতাস।

উৎপল বসু নির্বাচিত

কবির মৃত্যুর পর শোকসভায় আমার স্বীকারোক্তি

জয়ন্ত চক্রবর্তী

আমাকে বে-ইমান বলে ডাকুন, কাপুরুষ বলে ডাকুন
কেন না,
আমি প্রতিবার মনীষীদের জন্মউৎসব এড়িয়ে যাই,
কোনো মনীষীকে বেঁচে থাকা কালীন সম্মান দেখাই না,
মুখ ঘুরিয়ে পালাই—সুযোগ পেলেই গালিগালাজ সমেত
কূট ষড়যন্ত্র করি—

আমাকে বেইমান বলে, ডাকুন, শত্রু বলে ডাকুন
কেন না
আমি প্রতিবার সেই সব মনীষীর মৃত্যুসংবাদে
কাতর হই, চোখ কচলে জল বের করি,
আস্ত দালালের মতো শোকসভার আয়োজন করি
মৃত্যুর পর,

মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে ভাবি, গর্বে বুক ফোলাই অহেতুক
আমাকে বেইমান বলে ডাকুন, শত্রু বলে ডাকুন।

পাপপুণ্য

সালসবিল হক

যেতে চাও যাও

পথের ফকির
পাখিটিকে নিয়ো
যে ছিলো মৃতের
নিকট আত্মীয়

যেতে চাও যাও

পুত্রের সোনার
হরিণকে নিয়ো
যে ছিলো পৌত্রের
কাছে খুব প্রিয়

যেতে চাও যাও

পুণ্যের নদীতে
হতে পাপাপাপ
যত্নে ধরে রাখো
পিতার পাপের
ভেঙে-পড়া সাঁকো

সুবোধ দাসগুপ্তের ছবি

ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে ক্যামেরাম্যান বফ্‌তি,
পাশে রোসিফ

ওড়িশায় ফরাসী টিভি দলের সঙ্গে

নারায়ন মুখোপাধ্যায়

১

পাঠকের এজলাসে লেখকের একটি ধর্ম শপথ আছে, যে সত্য বলিব....'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনাদের কাছে আমার ধর্ম শপথটি হল, ঘটনা বলব! একটু বুঝিয়ে বলি... পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এটি হল সত্য, আর সূর্য পূবদিকে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়, এটি হল ঘটনা। এমনি একটি ঘটনা আপনাদের বলব।

ঘটনাটি সাধারণ, তবে পূবদিকে সূর্যোদয়ের মতো দৈনন্দিন নয়, তাই হয়ত বা এর মধ্যে কিছু মজা বা সত্যের দু-একটি কণাও পেতে পারেন।—ঘটনাটা খুব অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে তাই না? পাঠক; ভুল করছেন; যেহেতু এটা ঘটনা, তাই আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নেই; যেটা আছে সেটা হল এই যে এমন ঘটনা রোজ ঘটে না।

আপনি রোজ কাজে যান, আপনি হেঁটে যেতে পারেন, অবশ্য যদি আপনার কর্মস্থান আপনার বাসস্থান থেকে খুব দূরে না হয়। আপনি বাসে করে কাজে যেতে পারেন, ট্রেনে ও বাস বা ট্রেন ও ট্যাকসিতে যেতে—আপনি গাড়ি করেও কাজে যেতে পারেন; এগুলি নেহাৎই দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু যদি আপনাকে একদিন, কোন কারণে গড়িয়া থেকে হেঁটে বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগে কাজে যেতে হয় তাহলে সেটাকে একটু অস্বাভাবিক অথচ সাধারণ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অফিসে, বেলা তিনটে নাগাদ শুরু হল প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, কলকাতা জলমগ্ন হল (সি এম ডিরের কর্মচারীরা যেন নিজগুণে মাপ করে দেন, তাঁদের প্রতি কোন কটাক্ষ করছি না) এবং প্রথমে ট্রাম, তারপর ট্যাকসি, তারপর মিনি বাস এবং সর্বশেষে স্টেট ও প্রাইভেট বাস বন্ধ হল এবং রাত আটটা পর্যন্ত চলল প্রবল বর্ষণ; তখন কি আপনি শোয়া আটটা নাগাদ ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে মাথায় রুমাল বেঁধে হাতে জুতো নিয়ে 'জয় মা' বলে গৃহাভিমুখে রওনা হবেন না? পাঠক, এখন কি আপনাকে বলে দিতে হবে যে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের মধ্যে ফারাকটা অত্যন্তই অল্প। কাজেই যে-ঘটনাকে আমার মনে হচ্ছে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক সেটা শোনবার পর আপনি হয়ত বা হাই তুলে বলবেন—'দূর মশাই এটা ত' খুবই সাধারণ ঘটনা, এটা নিয়ে এত ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন কেন?—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন। আমরা সবাই নিজেকে বিরাট একটা কিছু বলে মনে করি, তাই যেই একটা নতুন কোন ঘটনা ঘটে অমনি সেটা পাঁচজনকে বলতে ইচ্ছে করে; হাতে কলমে আর সামনে কাগজ থাকলে লিখে পাঁচজনের জায়গায় দশ জনকে বলতে ইচ্ছে করে; অবশ্য সম্পাদক মহাশয় যদি অনুমতি দেন। এই লিখে বলবার আরও একটা কারণ আছে, তাহল, আদতে আমরা বড়ো নিঃসঙ্গ কারণ আমরা বড়ো পাকা আর এই পাকামী করতে গেলে আড্ডায় বড়োদের কাছে কানমলা খেতে হয়, কাজেই কান তথা মান বাঁচাতে গেলে লেখা ছাড়া উপায় নেই, কারণ আপনারা ত আর আমাকে চেনেন না, আর চিনলেও 'ছেঁড়াটা খেটে লিখেছে' এই কথা মনে করে কানমলা দেবেন না।—পাঠক বুঝতেই পারছি আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, এইবার হাতের কাছে আমার জন্য না পেয়ে আপনি হয়ত বা পত্রিকাটাই ছিঁড়ে ফেলবেন। দয়া করুন, একটু ধৈর্য ধরুন, আসলে আমার ইচ্ছে এই যে ঘটনাটা, যেটা বলব বলে আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করেছি, এইটাকে ছুতো করে আপনাদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারব,—রাজী ত?—দয়া করে প্রত্যাখ্যান করবেন না— বড্ডো কষ্ট পাবো, মাইরী বলছি কেঁদে ফেলব।—আচ্ছা, এইবার শুরু করছি, কিন্তু তার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে রাখি; অধম মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্য দোভাষীর কাজ করে থাকে। বুঝতেই পারছি আপনার প্রশ্নটা—'কোন ভাষায়'—ভাষাটা একদিকে হল ফরাসী অন্যদিকে ইংরাজী, বাংলা বা বাজারের হিন্দী এবং প্রয়োজন হলে একটু আধটু ভাঙা উড়িয়াও বটে।

—আপনি কি করেন সে কথা ত আমরা শুনতে ইচ্ছুক নয়, যে ঘটনাটা বলবেন বলে শুরু করেছিলেন সেটা কোথায় গেল?

—বলছি, আমার কাজের ফিরিস্তীটা ঘটনাটার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ওটা বাদ দিয়ে ঘটনাটা বলা যাবে না; বলতে পারেন, ওটা হল গৌরচন্দ্রিকা।

বিশ্বাস করুন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখ শনিবার সকালেও আমি জানতাম না যে ২৮শে সোমবার রাতে আমি পুরীতে ঘুমোবো।—কেমন করে?

—বলছি, শনিবার দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় বেলা ৩টে নাগাদ ভারতীয় ট্যুরিস্ট ব্যুরো থেকে লোক এসে হাজির; বিশ্ববিখ্যাত তথ্য-চিত্র নির্মাতা ফেদেরিক রোসিফ ফোনে জানিয়েছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন প্লেনে করে পুরী পৌঁছই, দোভাষীর কাজ করতে হবে। কলকাতার কাজকর্ম গুছিয়ে নেবার জন্য সোমবার সকালটা চাইলাম; মঞ্জুর হল; সোমবার বিকেলের প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছলাম; উড়িষ্যার ট্যুরিস্ট ব্যুরোর লোক বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে গাড়িতে করে রাত আটটা নাগাদ পৌঁছলাম পুরীর রেলওয়ে হোটেলে।

ব্যবস্থাপক জঁ-শার্ল কুতোরী আলাপ করিয়ে দিলেন রোসিফ সাহেবের সঙ্গে। লম্বা, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেছেন, চওড়া কব্জি, চ্যাটালো বুক, মাথায় টাক ও

পাকা চুল, চোখ দুটো টানা ও তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত ভদ্রভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন ও হাভানা চুরোট খাওয়ালেন। ভদ্রলোকের জন্ম ফ্রান্সে নয়, জন্মেছেন যুগোশ্লাভিয়ার মন্টে-নিগ্রোতে ১৯২২ সালে। যুদ্ধের সময় প্যারীতে পালিয়ে আসেন; তারপর থেকে প্যারীর বাসিন্দা ও ফ্রান্সের নাগরিক।

১৯৫১-৫২ সালে জঁ ককতোর সর্ট ফিল্ম 'সাঙ্গো সোসপিরা'এ অ্যাসিস্টেন্টের কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর বিখ্যাত তথ্যচিত্র মুরির আমাদরিদ প্রকাশিত হল, ছবিটি গোড়ায় ফরাসী সরকার বেরোতে দেন নি পরে অঁদ্রে মালরোর চেষ্টায় প্রকাশিত হল। ব্যক্তিগত ভাবে রোসিফ হেমিংওয়ে ও অঁদ্রে মালরোর বন্ধু ছিলেন।

'মুরির আ মাদরিদ' বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই রোসিফ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন এবং তথ্য-চিত্রকার হিসাবে হলিউডের অস্কার পেলেন। ফ্রেদেরিক রোসিফের তথ্য-চিত্রে একটি থিম বা বস্তু থাকে; গত কয়েক বছর ধরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথ্য-চিত্র তুলেছেন এবং সামগ্রিকভাবে এগুলির নাম 'ওপেরা সোভাজ' (প্রকৃতির ওপেরা) তাঁর উড়িষ্যার ওপর তথ্য-চিত্রটিও এই ওপেরা সোভাজের ওপরেও একটি 'ওপেরা সোভাজ' তৈরী করেছেন।—তৈরী করেছেন বলা ভুল হল, কারণ এখানে শুধুই শ্যুটিং করলেন, প্রধান কাজটি, অর্থাৎ এডিটিং করবেন ফ্রান্সে।

—তাত বুঝলাম, কিন্তু কি শ্যুটিং করলেন? কোথায় শ্যুটিং করলেন? এসব কথা ত কিছুই বলছেন না।

—বলছি বলছি সব বলব অতো অধৈর্য হলে কি করে বলি?—দাঁড়ান একটা সিগারেট ধরিয়ে নি। একটু গুছিয়ে বলতে হবে ত। যেন কোন কথা বাদ না পড়ে বা কোন কথা বেড়ে না যায়। কি ভাবে বলব, একটু ভেবে নিতে দিন।—

—'ওপেরা সোভাজ' বলতে কি বোঝায়?—ওপেরা সোভাজ মানে রঙ্গলের ছবি নয়, ওপেরা সোভাজ মানে যা কিছু প্রকৃতিতে আছে তার মধ্যে যে নাটক সদা উপস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতিতে আছে প্রাণী ও মানুষ; আমাদের মতো প্রকৃতির সঙ্গে সরল সম্পর্ক বিবর্জিত মানুষ নয়, যে মানুষ প্রকৃতির বুকে প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে বাঁচছে; যে মানুষ লাঙ্গল হাতে জমি চষে, জাল হাতে কাঠের নৌকা বেয়ে সমুদ্রে মাছ ধরে—সেই মানুষ, তাদের কাজ কর্ম, পুজো-পার্বণে তাদের নাচ-গান, এই সমস্তই ওপেরা সোভাজের অঙ্গ। এইবার শ্যুটিং-এর কথা বলি তাহলে ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারি রাতে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরলা মার্চ ভোর ৬টায় শ্যুটিং আরম্ভ হল, পল্লীর বালুকা-বেলায়, জেলেদের গ্রামের সামনে, যেখানে তারা দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের নৌকা ভাসিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। শুরু হল শ্যুটিং, পুলিশ এল শান্তি বজায় রাখবার

গোপালপুরে ব্যাক ওয়াটারের তীরে শ্যুটিং। ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে ফ্রেদেরিক রোসিফ সঙ্গে এসিসটেন্ট ক্যামেরাম্যান দানিয়েল, জঁ শার্ল এবং লেখক

জন্য, যাতে লোকে ক্যামেরার সামনে এসে কাজে অসুবিধা না করে। ক্যামেরাতে চোখ লাগিয়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জঁ বফ্তি, তাঁর একপাশে তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট দানিয়েল অন্য পাশে পরিচালক সাহেব; তিনি মাঝে মাঝে ক্যামেরার চোখ লাগাচ্ছেন, ক্যামেরার স্থান পরিবর্তন করতে বলছেন, কোনটা নিতে হবে তা বলে দিচ্ছেন; আর জঁ বফ্তি কখনও উত্তেজিত কখনও শান্ত আবার কখনও বা উল্লসিত হয়ে ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছেন; মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে পরিচালককে ডাকছেন ও হুকুম পেলে ছবি তুলছেন। আমার স্থান হল পরিচালকের ঠিক পিছনে এবং যেহেতু আদতে আমি মহাপাকা, তাই সুযোগ পেলেই পরিচালক সাহেবকে প্রশ্ন করছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি আমায় বোঝালেন যে দূর থেকে জুম ব্যবহার করে ক্লোজ-আপ নেবার সুবিধা হল এই যে তাতে 'কম্পোজিশন' করা অনেক সুবিধা আর তাছাড়া যাদের ছবি তোলা হচ্ছে তারা বুঝতে পারবে না ফলে ব্যাপারটা অনেক বেশী স্বাভাবিক হয়; ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য দু-একবার ক্যামেরায় চোখ লাগাতেও দিলেন। দলের অন্যেরা, অর্থাৎ স্টিল ফটোগ্রাফার বেরনার ও শব্দ-গ্রাহক পাতরিক তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; দলের ব্যবস্থাপক জঁ-শার্ল জিনিসপত্র দেখা-শোনা করছে এবং সময় পেলেই হয় ক্যামেরার আশে-পাশে অহেতুক উত্তেজিত ভাবে ঘোরাফেরা করছে না হয় সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে পানিয়ের প্রয়োজন আছে কিনা। সমুদ্র তীরের খাড়া রোদে দাঁড়িয়ে কাজ করছি বা করছি না, তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু রোদে দাঁড়িয়ে ত আছি; ফলে—'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম জল; তাড়াতাড়ি এনে দিলে' এক বোতল বিয়ার। বললাম জল খাব। জঁ-শার্ল শান্ত গলায় বললে 'জল পাবে না, বিয়ার যদি পছন্দ না হয় ত কোকা-কোলা বা লিমকা পেতে পারো'—বফ্তি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল 'ছ্যা ওসব মানুষে খায়? নে নে তাড়াতাড়ি চুমুক মেরে বাকি বিয়ারটা দিয়ে দে বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে'—বুঝতেই পারছেন, ফরাসীদের সঙ্গে কাজ করতে যাওয়ার সুবিধা বা অসুবিধা, তেষ্টা পেলে জল পাবেন না, পাবেন বিয়ার বা কোকা-কোলা, আমি অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিয়ারই পছন্দ করি কারণ জলের বদলে কোকা কোলার চেয়ে বিয়ার ভালো, আর তাছাড়া আমি ত 'জেতেতে বাঙ্গালী' তাই পরের পয়সায় পাই ত...

জঁ-শার্ল, ক্যামেরার আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করছে, মাঝে মাঝে কুলীদের হুকুম করবার জন্য আমার স্বাবস্থ হচ্ছে—এইভাবে কাজ চলছে, বেলাও বেড়েই চলেছে, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপক জঁ-শার্লের ছুটোছুটি, বফ্তি ঘন ঘন বিয়ার চাইছে, বেরনার চায় কোকা-কোলা এবং পরিচালক সাহেব চান বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা চা; এছাড়া জঁ-শার্ল উত্তেজিত হয়ে ক্যামেরার আশে-পাশে ঘোরা-ঘুরি করছে। বেলা এগারোটা নাগাদ জেলে ডিঙ্গিগুলো ফিরতে আরম্ভ করল। সমুদ্রের তীরে শুরু হল মানুষের কোলাহল, ঝগড়া, কর্মব্যস্ততা এর ওপরে আছে চিল, তারা এই হট্টগোলের মাঝে ছোঁ মেরে মাছ চুরি করতে চেষ্টা করতে লাগল জেলেদের কর্মচারীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। রোসিফ সাহেব মহা উৎসাহে ছবি তুলতে লাগলেন আমারও কাজ বাড়ল। হঠাৎ পরিচালক সহেব জঁ-শার্লের খোঁজ করলেন, দেখতে না পেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম জঁ-শার্লের টিকিও দেখতে পেলাম না।

—সাহেবরা ত টিকি রাখে না।

—আরে আর মানে, লোকটা বেমালুম লোপাট।—অগত্যা গেলাম তার খোঁজে।

—কোথায় পেলেন?

—ঘাটে মাছ নামলে আপনাদের যেখানে পাওয়া যেত সেখানেই পেলাম।

বেরামপুরে শুটিং চলছে।

—কোন জায়গায়।

—সেটা কি বলে দিতে হবে? আপনারা ত বাঙ্গালী, বুঝে নিন।

—মানে যেখানে মাছ নামছে সেখানে, ভিড়ের মধ্যে?

—ঠিক ধরেছেন।' —গিয়ে বললাম বস্ ডাকছে। মুখটা ব্যাজার করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল এবং বসের প্রয়োজনটা মিটিয়েই আবার তীর বেগে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল; তারপর হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে ছুটে এসে আমায় প্রায় পাঁজাকোলা করে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। বললাম 'আরে বস হয়ত ডাকবে'—খিঁচিয়ে উত্তর দিল —'নিকুচী করেছে, তাড়াতাড়ি চল্ নয়ত হাতছাড়া হয়ে যাবে।' —ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম, গিয়ে দেখি, একটা ছোঁড়া তিনটে বড়ো গলদা চিংড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গলদা চিংড়ি বলছি কিন্তু সেগুলো মোটেই বাদার গলদা নয়, সমুদ্রের লালকে ধুমষো চিংড়ি—তাই জঁ-শার্ল কিনবে, হা দেখলে আর কাকে বলে? পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনলো, তারপর ফ্যাঁয়ে হিসেব করে দলের সবাইকে দেখিয়ে বলতে লাগল—'কি দারুন সস্তা তাই না?'—দলের সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।—পরিচালক মহাশয়ের হুকুম হ'ল রাতে ওগুলো খাওয়া হবে। —রাতে. ডিনারে সেই সেদ্ধ ধুমষো চিংড়ির একটা টুকরো খেয়ে পুরীর ঠান্ডা সমুদ্রের হাওয়ায় বাদার গলদা চিংড়ির কথা ভেবে আমি মেশালাম আমার দীর্ঘশ্বাস, আর দলের বাকি সবাই অত্যন্ত খুশী হয়ে জঁ-শার্লকে আশির্বাদ করল। খাবার পরে হুইস্কি সহযোগে আড্ডা তারপর নিদ্রা।

পরদিন ভোরে গাড়ি করে ভুবনেশ্বরের পথে পাড়ি দিলাম;সোজা ভুবনেশ্বরে না গিয়ে. সেখান থেকে আট কিলোমিটার দূরে স্বাভাবিক পরিবেশের পশুশালা নন্দনকাননে যাওয়া হ'ল; কারণ বাঘের শুটিং হবে। সিনেমার ভেল্কী বাজীটা বুঝুন—পশুশালার প্রাকৃতিক পরিবেশ মানে সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চার ওপরে বিঘে দু জমিতে দুটো বড়ো বড়ো বয়াল বেঙ্গল টাইগার সেখানে বাঁশ ঝাড় ও আগাছা—আর মধ্যে বিচরমান রয়াল বেঙ্গল টাইগার ধারা টাটকা ভেড়া বা গরুর মাংস পেয়ে শীকার ধরতে প্রায় ভুলেই গেছে; ডাকলে ডাক শোনে এমন বাঘ ক্যায়েরার কায়দায় হয়ে উঠবে হিংস্র বন্য ব্যাঘ্র আর তার ছবি টেলি-ভিশানে দেখে ইউরোপ ভূখন্ডের তাবৎ ছেলে বুড়ো রোমাঞ্চিত হবে এবং জানবে ব্যাঘ্র বংশ ক্রম বর্ধমান এই কথা বুঝে, ব্যাঘ্র প্রকল্পকে জানাবে ধন্যবাদ। গোল বাধবে তখনই, যখন এদের মধ্যে দু একজন রোমাঞ্চকর অনুভূতি-প্রেকিম-গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে উড়িষ্যায় এসে অনেক কষ্ট সহ্য করে বোশিপুর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পোষা ন্যাকা বাঘিনী ধৈরীকে দেখে হয় গাল দেবে না হয় রোমাঞ্চিত হবে।' —

—বাঘিনী কি করে ন্যাকা হয়?

—বাঘিনী ন্যাকা হতে পারে না বুঝি? —তা হলে বলি।। —অনেক দূর দ্বীপে করে গিয়ে দেখলেম একটা গোছানো মাটির বাংলো, শ্রীসরজ রাজ চৌধুরী ব্যাঘ্র একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাস-স্থান; সেখানে গিয়ে আপনি গুছিয়ে বসে ভদ্রলোককে আপনি প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করছেন এমন সময় হঠাৎ দেখেন আপনার সামনে এক বিরাট বাঘ—খুড়ি বাঘিনী—আপনার নাকের কাছে বিরাট মুখব্যাদান করছে; আপনার আত্মারাম যখন খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড় তখন শ্রীরাজ চৌধুরী মহাশয় বললেন—'ও ধৈরী আপনাকে অভ্যর্থনা করেছে; ওর গায়ে হাত বোলান কিচ্ছুটি বলবে না।' ভয়ে ভয়ে আপনি তার গায়ে হাত বোলালেন. বাঘিনী উলসে উঠলেন - এক ধরনের গর-গর আওয়াজ করে আরও কাছে একেবারে ঘাড়ে পড়লেন—পেছনে শ্রীরাজ চৌধুরীর আশ্বাস বাণী 'আপনাকে ওর পছন্দ হয়েছে।' —বলুন, তখন কি মনে হয়?—এই বেঘো আত্তিতে আপনার পিত্তি জ্বলবে কি না?—মনে মনে ভয়ও করছে, এই পছন্দের ফলে বাঘিণীর মনেই হতে পাবে—আহা এখন খাসা লোকটা একে একেবারে আমার জঠরে ঠাঁই দি'—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মুখে একটা বোকা বোকা হাসি বাঁধিয়ে রেখে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে হবে। তারপর তিনি আপনার হাত ও মুখ একটু চেটে প্রথমবারের মতো আপনাকে রেহাই দেবেন।—বলুন, এমন বাঘিনীকে ন্যাকা বলব না ত কি বলব?—বন্যজন্তু ত বটে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যাঘ্র কুলে এই বাঘিনীর নিন্দার শেষ নেই। যাকগে কি যেন বলছিলাম?—ও হ্যাঁ ভুবনেশ্বরের নন্দন-কাননে বাঘের শুটিং এর কথা—কোথায় ভুবনেশ্বর আর কোথায় বোশিপুর—এই হল আড্ডার দোষ বা গুণ। অবশ্য এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়; নেকী ধৈরীও রোসিক সাহেবের ছবিতে ঠাঁই পেয়েছে।

যাই হোক ভুবনেশ্বরের খাঁচার বাঘ—না না, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, পশুশালার বাঘিনীর জন্য (কারণ পশুশালার অধ্যক্ষ বলেছিলেন যে ওটা বাঘিনী) একটা বাঁশের ডগায় মাংসের চ্যাঙড় বেঁধে তার কাছে এগিয়ে দিতেই ভয় পেয়ে বাঘিনী লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করল—ব্যাপারটা রোসিক সাহেব আন্দাজ করতে পারেন নি—ফলে একই উপায়ে বাঘিনীটিকে আবার লম্ফ-ঝম্ফ করানো হ'ল।' অবশ্য বিলাতে ছেলে বুড়ো সবাই দেখবে জঙ্গলে বাঘিনীর লম্ফ-ঝম্ফ; ভয় পেয়েই হোক বা বেভাবেই হোক বাঘিনীর লম্ফ-ঝম্ফ ত; তার ব্যাপারটাই আলাদা—আবার টেলীলেন্স দিয়ে ক্লোজ-আপে নেওয়া হল; না হলে সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চার পাড়টা দেখা যাবে যে।'

—এই যে এত সব ঘটছে এর মধ্যে আপনার কাজটা কি?

—আমার কাজটা হল ভীড় হটানো, আর মাঝে মাঝে পশুশালার অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করা ও তাঁর উত্তরটা রোসিক সাহেবকে তর্জমা করে দেওয়া। —হ্যাঁ ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল, কারণ পুরীতে সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়াটা ছিল আর নন্দনকাননে, তার নাম নন্দন-কানন হলেও, রোদে পাথর তাতবেই আর ফলে গরম হবেই। —ও আচ্ছা বলতে ভুলে গেছি, নন্দন-কাননটা তৈরি হয়েছে একটা পাহাড় আর একটা হ্রদের মাঝামাঝি দু-তিন কিলোমিটার জায়গা জুড়ে।—বুঝতেই পারছেন, বেলা দশটার পর থেকে কি গরম হয়, সেই গরমে ঠাঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তেষ্টার কি দোষ? আর যতবারই জল চাই পাই বিয়ার, বুঝুন কষ্টটা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম রাতে, হোটেলে সবার সামনে বিয়ার ফেলে জল খাবই।

বেলা বারোটা নাগাদ সকালের শুটিং শেষ হল তারপর আধঘন্টাটাক বিশ্রাম তার-পরে নন্দন-কাননের গায়েই একটা জলায় অনেক জংলী পাখি চরছিলো, ঠিক হল তার শুটিং হবে। জলায় এত ঘন আর বড়ো ঘাস সে মনে হয় ওটা বুঝি একটা মাঠ, তার ওপর পাখিগুলোও ঐ খালের ওপরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফলে বোঝবার কোন উপায়ই নেই যে ওটা জলা। রোসিফ, বফতি স্যার দানিয়েল ক্যামেরা নিয়ে জলার ধারে আড্ডা গাড়ল, জঁ-শার্ল যথারীতি ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে ক্যামেরার আসে-পাশে ঘোরাঘুরি

করতে লাগল, আর আমি সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার পাত্রিকের সঙ্গে একটা গাছের ছায়ায় বসে ঝিমোতে লাগলাম। আমরা পরিচালক সাহেবের যত বশংবদই হই না কেন পাখিরা [illegible]থা কানেও নেবে না, ফলে, দুজন চা[illegible]কে জোগাড় করা হল, তারা পাখি-গুলোকে তাড়িয়ে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে বলে তারা মোটা বকসিশের লোভে কাজটা করল এবং তা পেলোও। এবার পরিচালক সাহেবের ইচ্ছা হল যে পাখিগুলো উড়ুক-পাখিগুলো ছিল আমাদের উল্টো দিকে বেশ খানিকটা দূরে পরিচালক সাহেব তাঁর ইচ্ছাটি প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঁ-শার্ল ছুটলো তার কর্তব্য পালন করতে, অর্থাৎ পাখিগুলোকে ওড়াতে। জলাটা বেশ বড়ো, আমাদের উল্টো দিকে পৌঁছতে জ্ঁ-শার্লের অনেক সময় লাগবে। জ্ঁ-শার্ল সেখানে পৌঁছক তারপর বলব কি হল।

—ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখিয়ে ক্যামেরায় [illegible] রেখে ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে বফতি [illegible]জর মনেই হাসতে লাগল আর মাঝে মাঝে শালা পড়েছে কলে, কি দরকার ছিলো? ফেলে দে না। ইত্যাদি অদ্ভুত সব উক্তি করতে লাগল. তারপর আমায় ডেকে বলল, 'দেখ দেখ মজা দেখ।' ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখি উঁচু গাছের ডালে একটা মাছরাঙা গোছের পাখি নিজের ঠোঁটের চেয়ে বড়ো একটা মাছ ধরেছে, মাছটা তখনও ত্রাস্ত কাজেই কিছুতেই সেটাকে বাগাতে পারছে না, কিন্তু ফেলতেও রাজী নয়, অতয়েব বিভিন্ন কায়দায় সেটাকে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। অনেকটা আমার মতো অবস্থা। তাই না? —ইচ্ছেটা আপনাদের সঙ্গে আড্ডা মারা এবং আপনাদের মজা দেওয়া, কিন্তু ঠিক জুত হচ্ছে না।— [illegible]মার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আপনারা মজা [illegible] পাচ্ছেন না কিন্তু আম্মো নাছোড়, [illegible] যখন পেয়েছি বকে যাবই। যাই হোক কি যেন বলছিলাম?

—ও হ্যাঁ জ্ঁ-শার্ল।— সে এতক্ষণে জলাটার অপর পাড়ে পৌঁছে গেছে এবং পরিচালক সাহেবের হুকুম পাওয়া মাত্রই জলায় নেমে পড়ল, আস্তে আস্তে সাবধানে এগোচ্ছে. যেন পাখিরা সেই দিকেই ওড়ে. সেদিকে পরিচালক সাহেব চান। কিন্তু এ কি? জ্ঁ-শার্ল বেপাত্তা।, হ্যাঁ তাকে আবার দেখা যাচ্ছে তার টাকের ওপর একটা কিছু, দূরে থেকে মনে হচ্ছে কচুরীপানা বা ঐ গোছের একটা কিছু। পাখিরা কিন্তু উড়ল না জ্ঁ-শার্লের অবস্থা দেখে বা অন্য কোন কোন কারণে পরিচালক সাহেবের মত [illegible]লো. জ্ঁ-শার্লকে ফিরে আসতে ইঙ্গিত [illegible]ছেন—জ্ঁ-শার্ল ফিরছে।

—এই দেখুন ঘটনাটা তখন এত [illegible] লাগছিল যে হেসে পেট ফাটিয়ে ফেলেছিলাম—আপনাদের বললাম, আপনারা হাসলেন না। কি করি বলুন, আমার অক্ষমতা, কিন্তু ধ্যামা দেবো না—ঐ পাখিটার কাছ থেকে শিখেছি—শেষে কিন্তু পাখিটা মাছটাকে গিলেছিলো।

ছত্রপুরে, দোলের শুটিং-এ

রাতে ভুবনেশ্বরের গেস্ট হাউসে ফিরে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আবার টেবিলে বেয়ারার কাছে জল চেয়ে খেলাম। সবাই বড়ো বড়ো চোখ করে দেখল, কেউ কিন্তু বিশেষ কিছু বলল না, শুধু বফতি বলল যা ভালো বুঝিস কর। কপাল মন্দ হলে কি না হয়? সেই রাতেই পেট ছাড়ল। পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে কিছু বলবার আগেই জ্ঁ-শার্ল জিজ্ঞাসা করল কিরে রাতে ঘুম হয়নি নাকি? ব্যাপার মুখে উত্তর দিলাম পেট ছেড়েছে। আর যাই কোথায়? দলের সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর জ্ঁ-শার্ল ছুটলো ওষুধ আনতে, কেন জল খেতে গেলি? বফতির বকতব্যটা হল 'বলেছিলাম শুনলি না, এমন ভাব করলি যেন বিয়ার বাড়ন্ত, এখন বোঝ, যা বলছি শোন, জ্ঁ-শার্লের ঐ সব ওষুধ-বিষুধ-গুলো গেল, আর আজ থেকে জল এককেবারে বন্ধ কর, বিয়ার ছাড়া আর কিছুটি ছুঁবি না আর রাতে আমরা দুজনে গুছিয়ে বসে স্কচ খাবো তা হলেই দেখবি তোর পেটের সব পোকা মরে গেছে।' ভাবখানা যেন পেটের ইনফেকশান বিয়ার আর হুইস্কি খেলেই সেরে যাবে। হট্ট-গোলের চোটে পরিচালক মহাশয় এসে প্রশ্ন করলেন, সবাই বোঝালো যে কাল রাতে বিয়ারের বদলে জল খেয়ে আমার পেট পেট ছেড়েছে, পরিচালক সাহেব মাথা নেড়ে রায় দিলেন সত্যিই কাল রাতে জল খাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। মনে মনে বললাম নিকুচী করেছে, আর গতকাল জু-গার্ডেনের বাঘকে সে বনের বাঘ বলে চালালে সেটা বুঝি খুব ন্যায় সঙ্গত?

যাই হোক প্রাতরাশের পর একেবারে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে চড়লাম সারা সকাল নন্দন-কাননে শুটিং করে বেলা বারোটা নাগাদ রম্ভা অভিমুখে যাত্রা ও সেখানে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে সন্ধ্যায় গোপালপুর-অন-সীতে আস্তানা গাড়া। প্রাতরাশটা কিন্তু সারা হয়েছে ভোর ছটায়।

—এটা বলবার মানে?

—মানে আছে, সাড়ে ছটা নাগাদ বেরিয়ে নন্দন-কাননের পথে যেতে যেতে দেখা গেল, একপাল হনুমান ক্ষেতে নেমেছে। পরিচালক সাহেবের হুকুমে দাঁড়ান হল, ক্ষেতের শত্রু হনুমানদের ছবি তোলা হল, তারপর ক্ষেতের মালিককে বিশ টাকা ঘুষ দিয়ে মিনিট দশেকের জন্য হনুমানদের ক্ষেত নষ্ট করতে দেওয়া হল, তারপর হনুমানদের নির্দিষ্ট দিকে তাড়া দেবার জন্য ক্ষেতের মালিককে আরও দশ টাকা দেওয়া হল। হনুমানের দল আমাদের সাহায্য করল, অর্থাৎ যেদিক দিয়ে তারা পালালে পরিচালক মহাশয় খুশি হন সেদিক দিয়েই পালালো। যাবার সময় ক্ষেতের মালিক তার লাল চুণে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বার করে হেসে আবার আসতে বলল ভাবখানা হল ভাগ্যিস ক্ষেতে হনুমান নেমে-ছিল তাই তিরিশটা টাকা ফালতু পেয়ে গেলাম।

নন্দন-কাননে পৌঁছে একই খেলা, এবারে বাঘ নয় সম্বর হরিণ, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বিয়ার দিয়ে গলা ভেজানো, মাঝে মাঝে বফতিও পরিচালক সাহেব দয়া করে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে দেখতে দিচ্ছেন। এইভাবে বেলা বারোটা পর্যন্ত রোদে পুড়ে গাড়িতে উঠলাম, গন্তব্য রম্ভা।

রম্ভা হল চিল্কার ধারে একটা গণ্ড-শহর। এখানে উড়িষ্যা ট্যুরিস্ট ব্যুরোর একটা ট্যুরিস্ট লজ আছে, সত্যিই এটা অপূর্ব, বিরাট বাগান আর বাগান পার হয়ে চিল্কা। ইচ্ছে করছিল একটা দিন কাটিয়ে যাই, কিন্তু উপায় নেই। ঘন্টা দুয়েক থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে আবার গাড়িতে উঠে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ গোপালপুর-অন-সী পৌঁছলাম। উবেরয় পামবিচ হোটেলে ঘর বুক করা ছিল ক্লান্ত দেহে যে যার ঘরে ঢুকলাম। তারপর হাত মুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেতে গেলাম। খেয়ে উঠে ঘরে শুতে যাবার কথা ভাবছি বফতি ধরল: তোর পেট কেমন আছে?

—খারাপ।

—তা হলে চ তোর পেট সারিয়ে

দিচ্ছি—এই বলে ধরে নিয়ে গেল যারে, সেখানে বসে গোটা চারেক হুইস্কি গেলবার পর ছাড়া পেলাম।

পরের দিন সারাটা দিন কাটল গোপালপুরের সমুদ্রের তীরে। —জঁ শার্লের ওষুধ বা বফতির ডাকতারী যে কারণেই হোক পেটটা সেরে গেল। গোপালপুরের দোল যাত্রা বিখ্যাত। দোলের আগের আগের দিন রাতে সারা রাত চলে গান বাজনা, যাত্রা আর মদ খাওয়া। কাজেই তেশরা মার্চ আমাদেরও ঘুম নেই, সারারাত চলল শুটিং, তার জন্য অবশ্য পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ঐ ছোট গোপালপুরের আরও ছোট্ট নুলিয়া পাড়ায় বসেছিল চারটে যাত্রা আর একটা গানের আসর, আর নুলিরা পাড়ার বাইরে শহরে ঠিক ঢোকবার মুখে পুলিশ স্টেশনের সামনে হিন্দি সিনেমার নাচ গানের আসর। সেখানে গিয়ে দেখি দেহের বক্র রেখার ওপর ভরসা রেখে একটি মেয়ে এক হিন্দি সিনেমার হিরো মার্কা এক ছোঁড়ার সঙ্গে নাচের নামে দেহের রেখাগুলোকে আরও ভালোভাবে জাহির করে ছেলেটির সঙ্গে দ্বৈত-সংগীত বেসুরো গলায় গাইছে—তবে পারে তালটা ঠিক রাখছিল আর ভুঁড়িওয়ালা রক্তচক্ষু সাব ইনস্পেক্টারগণ লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে।

—কার দিকে কিসের দিকে?

—সেটা কি আপনাদের বলে দিতে হবে নাকি —যাইহোক রোসিফ সাহেব এর ছবি নিলেন না, তাঁর রুচিতে বাধল। তবে আমি হলে ছবি নিতাম। বেশিক্ষণ নিতাম ঐ দর্শকদের আর অল্পক্ষণ নাচের। তারপর বিজ্ঞাপনের ঠেলার টেনে আনতাম ঐ দর্শকদের ছবিটা দেখবার জন্য তারা আসত—আর এসে বেশীক্ষণ দেখত নিজেদের। অবশ্য যার জন্য এত কাণ্ড করতাম সেটা এদের মগজে ঢুকতো কিনা সন্দেহ আছে। ছবিতে নিজেদের মুখ দেখে হয়ত যা খুব খাজিয়ে বলে বেড়াত এবং ছেলে বউ সবাইকে দেখাত। —যাকগে যে কাজ হয়ত কখন করব না—বা করতে পারব না, তার বৃথা ভেবে কি লাভ?

—কেন?

—খুব স্বাভাবিক উত্তর। যেহেতু কেউ নিজের পাঁচের কড়ি খরচা করে সিনেমা তুলতে পারে না, অন্তত আমরা পারি না, কারণ আমাদের অর্থ নেই, ফলে প্রডিউসার সাহেব আপত্তি করতেন এবং আমার বেশীক্ষণ তুলতে হত ঐ মেয়েটির ছবি তাতে মেয়েটি খুশী হত তার দর বাড়বে বলে আর প্রডিউসার সাহেবও খুশি হতেন পয়সা আসবে বলে। —এই দেখুন অনেকক্ষণ যাত্রে বকলাম, আড্ডার এই দোষ, গোপালপুর-অন-সীতে দোলের আগের আগের দিন রাতে শুটিং-এর গল্প বলতে গিয়ে কতো কি বলে ফেললাম—কিছু মনে করবেন না, যদি কোনো প্রডিউসার সাহেবের চোখে এটা পড়ে, তা হলে আগে থেকেই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। পরের দিন সকালটা ঘুমোনো হল বেলা এগারটা নাগাদ তোড়জোড় করে বেরোনো হল রম্ভার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে চিল্কার বার্ডস আইল্যাণ্ডে পাখিদের ছবি তোলবার জন্য।

রম্ভায় পৌঁছে সেখানকার রেস্ট হাউসে সংক্ষিপ্তভোজ সেরে স্পীডবোটে চড়ে বেরোন হল বার্ডস আইল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে। অনেক পাখি দেখলাম, কিন্তু আগের বারের মতোই অসুবিধা তারা পরিচালক সাহেবের অঙ্গুলী হেলনে। চলতে চায় না, ফলে ঠিক হল যে ক্যামেরাম্যান বফতি ও তার এ্যাসিস্টেন্ট দানয়েল একটা পছন্দ মতো জায়গায় নেমে ক্যামেরা গুছিয়ে তৈরি হবে, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার পাতরিক ওবেয়মার অন্যান্য শব্দ গ্রহণ করবে ও স্টিল ফটো তুলবে এবং জঁ-শার্ল ও আমি আর একদিকে নেমে পাখিদের ওড়াবো। যেখানে আমাদের নামবার কথা সেখানে ত আমরা নামলাম, কিন্তু জঁ-শার্ল গাছাড়ে ভালো চড়তে পারে না বলে একটু দূরে গিয়ে ফিরে গেল আমি একাই এগোলাম উদ্দেশ্য হল পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে সেখানে পরিচালক সাহেব ও বফতি আছে সেখানে পৌঁছান। —পাপের শাস্তি বলে একটা কথা আছে, তাই হল। আমার ক্ষেত্রে আবার একজোড়া পাপ, প্রথমটা হল পাখিদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটানো, তারা বেশ শান্তিতে নিজেদের ডিমে তা দিচ্ছিল আমি গিয়ে তাদের শান্তি হরণ করলাম। দ্বিতীয় পাপটা হল দিন চার-পাঁচ আগে ঠিক একই কাজ করতে গিয়ে জঁ-শার্লের ডোবায় পতন দেখে পেট ফাটিয়ে হেসেছিলাম। এবার ঠিক উল্টো হল, পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে নামতে গিয়ে একটা পাথরে পা হড়কে একেবারে চিৎপাত আর জঁ-শার্ল স্পীডবোটে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল। কি রাগ যে হচ্ছিল কি বলব—ঠ্যাঙে লাগল তার যন্ত্রণা আর তার ওপরে জঁ-শার্লের প্রতিশোধ। —যাইহোক ব্যাজার মুখ করে পরিচালক সাহেবের কাছে পৌঁছলাম, বফতি জিজ্ঞাসা করল কি রে কি হল? বললাম পড়ে মরেছি ঠ্যাঙে লেগেছে।

ভাঙেনি ত। ঠিক আছে সেরে গেলে ভালো হয়ে যাবে।

ক্ষেপে গিয়ে বললাম শালা একবার পড়ে গিয়ে দ্যাখো না—টের পাবে। অম্লান মুখে ব্যাটা উত্তর দিল তোর দুঃখের ভাগ নেবার জন্য তাই করতাম কিন্তু ক্যামেরাটা ভেঙে যাবে যে মনে গজগজ করতে করতে চেপে গেলাম। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে বফতি আমাদের সমবয়সি, মোটেই কিন্তু তা নয়। বফতি ফ্রান্সের সবচেয়ে দামী ক্যামেরাম্যানদের একজন বয়স একচল্লিশ, কিন্তু মনটা পনেরোর, কখনই মনে হয়নি যে ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কথা বলছি, এত খোলামেলা ও প্রাণবন্ত লোক এই বফতি। কাজের সময় গম্ভীর, অন্য সময় আড্ডাবাজে হৈ-চৈ মদখোর সবার পেছনে লাগছে এবং নিজের পেছনে কেউ যদি লাগতে পারে তো [illegible] হয় আর ছদ্ম ক্রোধে তাকে তাড়া [illegible] হুটোপাটি করে আবার অত্যন্ত অ[illegible] শীল, নিজেকে জাহির করতে নারাজ—একদিন প্রশ্ন করেছিলাম যে কোন কোন বড় পরিচালকের সঙ্গে ও কাজ করেছে? উত্তরে বলল—ওসব কথা বাদ দে—জঁ-শার্ল বললে কার কার সঙ্গেও কাজ করেনি সেটা জিজ্ঞাসা কর ওর উত্তর দিতে সুবিধা হবে। দাঁত খিঁচিয়ে বফতি বলল—তা জেনে কি তোর দুটো হাত আর চারটে পা গজাবে? পঁচিশ বছর এই লাইনে সব মক্কেলের সঙ্গেই কাজ করেছি কোনো না কোনো সময়। ভুল করে বলে ফেললাম ভাবছি একটা প্রবন্ধ লিখব। উত্তরে বফতি বিভৎস চেঁচিয়ে বায়ম্যানকে বলল স্কচ হুইস্কি (বফতি ঐ একটাই ইংরাজি কথা [illegible] পারে); বায়ম্যান তাড়াতাড়ি এনে দিল, [illegible] আমায় ঠেলে দিয়ে সে বলল যাতে কথা না ভেবে স্কচ খা— হ্যাঁরে। তোদের কোলকাতার ছুঁড়িগুলো কেমন রে। ইত্যাদি বলে কথা ঘুরিয়ে দিল। সেদিনকার মতো চেপে গেলাম, পরে অসতর্ক মুহূর্তে বফতির মুখ থেকে বার করতে পেরেছিলাম যে ১৯৫০ সালে বিখ্যাত নাট্যকার জঁ জেনে একটি ফিল্ম করেছিলেন, নাম মেপ্রিজোঁ। ফিল্মে বফতি সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করেছিলো। বফতি খুবই মদ খায় এবং তাই নিয়ে সবাই ঠাট্টাও করে, এমন কি নিজেও তা নিয়ে মজা করে, কিন্তু মাতলামি করে না, বললে উত্তর দেয় মরুভূমিতে কি বন্যা হয়? —বফতি বিবাহিত দুবার প্রথম বউ ঝামেলা [illegible] বলে যা কিছু সম্পত্তি করেছিলো [illegible] তাকে দিয়ে দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। এ পক্ষে দুটি সন্তান, বড়টি মেয়ে বয়স পঁচিশ, পরেটি ছেলে বয়স কুড়ি সে ক্যামেরা চালায়। বফতির ভাষায় বিশ বছর বয়সে বাবুর যদি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তাই করুন, কাজ দেখো কিন্তু থার্ড এ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে—তাও আমার যদি তার দরকার হয়—চরে খাও। বফতির দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে একটি ছেলে হয়েছে, তার বয়স পাঁচ, ছেলের কথা শুরু করলে তাকে থামানোই যায় না। আর গত চার মাস হল বফতির এক নতুন প্রেমিকা জুটেছে, ওর ভাষায় পাগলের মতো প্রেম, এক মা[illegible] তাকে কুড়িটা চিঠি লিখেছে, তাই নি[illegible] সবাই ঠাট্টা করে তাতে বফতির [illegible] নেই, বলে হ্যাঁরে শালারা জোটে তাই [illegible] তোদের জোটে না তাই আওয়াজ দিচ্ছিস। বফতির চিঠি পাওয়াটা সবার হাসির খোরাক প্রথম প্রশ্ন কপাতা চিঠি? কপাতা উত্তর?—বফতির বাঁধা উত্তর মাইরী হিংসে করছিস কেন? টিকিটটা দেখে যদি প্যারিস ত আঁচ

কর। সত্যিই কাজের সময় ছাড়া বোঝাই যায় না যে বর্ফতি একটা কেউ-কেটা।—এই দেখুন বার্ড আইলাণ্ডে শ্যুটিং এর কথা বলতে বলতে কোথায় এসে গেলাম বর্ফতির কথা বন্ধ করলাম।

সন্ধ্যায় গোপালপুরে ফিরে এলাম। পরদিন ভোরে ছত্রপুর বলে একটা শহরে গেলাম দোল খেলার শ্যুটিং করতে পুলিশ এল আমাদের তথা ক্যামেরার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, যাতে লোকে আমাদের ও তার সঙ্গে ক্যামেরাকে রংয়ে না চোবায়। শহরের বড় রাস্তায় সকাল আটটার মধ্যে ক্যামেরা গুছিয়ে আমরা তৈরি আস্তে আস্তে একটি দুটি লোক আসতে শুরু করল, রং খেলা শুরু হল, পুলিশের দয়ায় বেলা নটা পর্যন্ত আমাদের কারোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ল না। দলের সবাই সাহেব, শুধু আমিই কালা আদমি ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, ফলে আমিই হয়ে উঠলাম বাচ্চাদের লক্ষ্য, ফাঁক পেলেই ভীড়ের ভেতর থেকে বাচ্চাগুলো কখনও দূর থেকে কখনও পুলিশের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে এসে আমার ওপর গেরিলা আক্রমণ চালালো, আর আমি গাম্ভীর্য নিয়ে তাদের তাড়া দিতে লাগলাম, একবার একটাকে ধরেও ফেললাম কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। ক্ষুদে শয়তানগুলো টের পেয়ে গেল যে আসলে আমি রাগ করছি না, আর যাই কোথা গেরিলা আক্রমণ দ্বিগুণ তেজে শুরু হল। এমনিভাবে চলল বেলা এগারটা পর্যন্ত তারপর ফেরবার পালা। গাড়িতে উঠেই রোসিফ সাহেব বললেন, ভাগ্যিস নারায়ণ ছিলো তাই বাচ্চাগুলোকে এমন মজায় মেতে পেলাম। মনে বড়ো ব্যথা পেলাম, আমার নতুন সাদা পাঞ্জাবিটা এমন বিচিত্র রংয়ে রঙিন হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ ত নয়ই বরং আনন্দ। —ভগবান আমার দুঃখটা বুঝেছিলেন, মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্রমাণ পেলাম, একটা গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছিলো এবং দোলের সময় সারা ভারতে যা হয়, তবে জিনিষটা ছিলো নেহাৎই রং আর কিছুই নয়, কিন্তু তাতেই রোসিফ সাহেব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তাঁর ক্রোধের যেপ্রকাশটি করলেন তাতে বেশ আশ্চর্য লাগল। পরের দিন, নুলিয়া পাড়ার মোড়ল টনির সাহায্যে গোপালপুরের ব্যাক-ওয়াটারের তীরে উড়িষ্যার লোক নৃত্য ও গীতের শ্যুটিং-এর ব্যবস্থা হল।

এই টনির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ১৯৬১ সালে। তখন গোপালপুর-অন-সীতে একটা ইউথ হস্টেল তৈরী হচ্ছিল, আমরা কলকাতার কিছু চ্যাংড়া ঐ ইউথ হস্টেল তৈরীর কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গিয়েছিলাম। সবে তখন ফার্স্ট ইয়ার বি-এ ছাত্র কাজেই নিজেদের চ্যাংড়া-আখ্যা দিতে লজ্জিত বোধ করছি না, তখন যদি কেউ আমাদের ঐ নামে চিহ্নিত করত তাহলে রাগ করতাম, যেমন এখন কেউ যদি আমার সম্পর্কে ঐ কথাটা বলে তাহলে অপমানিত বোধ করি। অবশ্যি হয়ত দশ বছর বাদে এখনকার আমাকে আমিনিজেই চ্যাংড়া বলব। এমনই হয়। সময় এমনই মজার বস্তু।—যাকগে, আমি জ্ঞানী নয় কাজেই এমনসব বড়ো বড়ো কথা আমার মুখে মানায় না—তাই না? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, টনি। আমরা তখন টনিকে দেখতাম, কালো, ছিপছিপে, লম্বা তখন ওর বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ, একটা লাল সুইমিং ট্রাংকে পরে সর্বদা একদল বিদেশিনী পরিবৃত হয়ে রাজার মতো চলাফেরা করত, দেখে, স্বাভাবিকভাবেই রাগ হত, আসলে হিংসা হত, আমরাও ত সমুদ্রে সাঁতার কাটতাম এবং ভালোই কাটতাম, কিন্তু কই আমাদের দিকে ত কেউ অমন করে তাকাতো না।—এখন বুঝি, ঐ গোপালপুরে টনির জন্ম, ঐ সমুদ্রের কোলেই ওর মানুষ, তার ওপরে ওর রূপ, এইসব নিয়ে টনি ছিলো ওখানকার রাজা—আর আমরা ছিলাম কলকাতার শহুরে পাকা ছোঁড়া, ফাঁপা গর্বে ভরা, নিজেদের সম্পর্কে বিরাট ধারণা—অনেক কিছু জানি বলে, কিন্তু সবই বয়েতে পড়া, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত। এই দেখুন, আবার বড়ো বড়ো কথা বলতে শুরু করেছি, ভাবখানা যেন আমি জ্ঞানী অ্যারিস্টটল। সেই ১৯৬১ সালের টনির সঙ্গে দেখা হল। এখন ওর বয়স চল্লিশের ওপর, পাকা গৃহস্থ, পনেরোটা নৌকার মালিক। আজকের

সগৌরবে চলিতেছে

নেপথ্য কণ্ঠে ঃ লতা, হেমন্ত, নির্মলা, হৈমন্তী, হাঁসু, শক্তি

রাধা - প্রাচী - পূর্ণ

পদ্মশ্রী - নেত্র - জয়া - জয়শ্রী
মীনা - মায়া - পার্বতী - কৈরী - উদয়ন

বি/৩৮৮৩

টনির মধ্যে তার সেই স্বচ্ছন্দকে, সেই গর্বিত ভাব চট করে নজরে পড়ে না, সে অনেক চতুর হয়ে গেছে, কিন্তু তাও, উইকেন্ড পামবীর হোটেলের বাগানে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে পুরোনো দিনের কথার মধ্যে সেই ১৯৬১ সালের টনি মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে উঠছিল। টনি খৃষ্টান নয় হিন্দু, ওর মা বাপের দেওয়া নাম রামমূর্তি, টনি নামটা বিদেশিনীদের থেকে পাওয়া এবং গোপালপুরে সে ঐ নামেই বিখ্যাত। এই টনির সাহায্য না পেলে গোপালপুরে শ্যুটিং করা সম্ভব হত না।

ব্যাক-ওয়াটারের তীরে মহাজন সাহুর ছেলে উড়িষ্যার বিভিন্ন লোক-নৃত্য পরিবেশন করল, আমরা তাদের ছবি তুললাম। বুঝলাম রোসিফ সাহেব ওগুলোকে বলবেন, গোপালপুরে অঞ্চলের জেলেদের জীবনের অঙ্গ, সেটা সত্যি নয় তবে ইউরোপের লোকেরা বাড়িতে বসে টেলিভিশনে এগুলো দেখে চোখের সুখ পাবে এবং উড়িষ্যায় ট্যুরিস্ট হয়ে আসবে। মনে পড়ে গেল, তাই বলে রাখছি, উড়িষ্যার ট্যুরিস্ট ব্যুরোর আমন্ত্রণে রোসিফ সাহেব এই তথ্যচিত্রটি তৈরী করেছেন) তখন অবশ্য বেচারা গাইডেরা অসুবিধায় পড়বে এবং অনেক গল্প-গাপ্পা দিয়ে ম্যানেজ করবে —তা করুক, সে হ্যাঙ্গামাটা ত আমায় পোয়াতে হবে না। যে লোক-নৃত্যকে রোসিফ সাহেব দৈনন্দিন ঘটনা বলে চালাবেন তা দেখবার জন্য ভীড় কিন্তু মন্দ হয় নি, বলা যায় গাঁ উজাড় করে লোকে দেখতে এসেছিল এবং মোড়ল টনির হুকুমের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের কাজে অসুবিধা করবার সাহস করে নি। কতকগুলো নাচ এই ব্যাক ওয়াটারের তীরে বালির ওপর নাচা যাবে না বলে, সেগুলোর শ্যুটিং স্থগিত রেখে রোদে ঝলসানো দেহ নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। পরের দিন যথারীতি প্রাতরাশ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য বেরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত-বাতাস মঞ্চ। বেরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বলা যায় কিশোর ১৯৭০ সালে স্থাপিত, শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে প্রচুর জায়গা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়, এটি ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়, আশেপাশে কোন বসতি নেই। ফলে ছাত্ররা থাকে ছাত্রদের মধ্যে এবং থাকেন মাস্টার মহাশয়রা, এতে নিশ্চয়ই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে— তা ছাড়া উপায়ও নেই, কিন্তু এই ধরনের আবহাওয়া শিক্ষাকে কতটা সাহায্য করে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এখানকার শতকরা আশি ভাগ ছাত্রই আবাসিক ছাত্র, মাস্টার মহাশয়রাও তাই। শিক্ষা বলতে যদি পুঁথি-গত বিদ্যা বোঝায় তাহলে শিক্ষার জন্য এর চেয়ে ভালো আবহাওয়া হতে পারে না, কিন্তু জীবন, অর্থাৎ শহরে, গ্রামে, গঞ্জে যে জীবন তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের যদি ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক হয় তাহলে হয়ত বা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—এখান থেকে পাশ করে যারা বেরোবে আশা করি তাদের 'তোতা কাহিনীর' তোতা পাখীটার অবস্থা হবে না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত-বাতাস মঞ্চে লোক-নৃত্যের শ্যুটিং হবে বলে ঠিক হল। মহাজন সাহু তাঁর দলবল নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। গোড়ার একবার মহড়া, তারপর শ্যুটিং। বফ্‌তি ক্যামেরার চোখ লাগিয়ে বলল উঁ হুঁ, প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে না, একটা ইলেক-ট্রিক খুঁটি বাদ সাধছে।' গোড়ার চেষ্টা করা করা হল ওটাকে বাদ দিতে সম্ভব হল না, রোসিফ সাহেব প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করা যায়? মুস্কিল আসান করল বফতি, গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ঐ ইলেকট্রিক খুঁটির দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল 'পাতাওয়ালা বড়ো গাছের একটা ডাল হলেই চলবে।' একটা বট গাছের বড়ো ডাল জোগাড় হল, বফ্‌তি সেটাকে মঞ্চের গায়েই একটা জায়গায় পুঁতে দিতে বলল। ব্যস ঐ ইলেকট্রিকের খুঁটি বেমালুম। লোপাট, শ্যুটিং শুরু হল, বেশ কিছুক্ষণ শ্যুটিং চলবার পর জুটলো আর এক ফ্যাচাং, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদল। তারা শ্যুটিং দেখতে বাগড়া এবং আরও ভালো করে দেখতে পাবার জন্য তারা এমনসব জায়গায় দাঁড়াতে শুরু করল যে শ্যুটিং করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো, ফলে অনুনয়-বিনয় এবং সর্বো-পরি অমায়িক ভঙ্গিমায় রোসিফ সাহেবের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ও তার সঙ্গে দুএকজন অধ্যাপকের বাবা-বাছার কাজ হল। আবার শ্যুটিং চলল, বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ শ্যুটিং শেষ হল। শ্যুটিং-এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছর বয়স্ক 'জন-সংযোগ' বিভাগ থেকে রোসিফ সাহেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল, রোসিফ সাহেব নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়লেন আমি তর্জমা করলাম। এক ছাত্র প্রশ্ন করল, 'আপনার মতে উৎকৃষ্টতম জনসংযোগের মাধ্যম কি?' রোসিফ সাহেব আমার মাধ্যমে উত্তর দিলেন 'সিনেমা'। অধ্যক্ষ যোগ করলেন 'আমাদের বিভাগে শীঘ্রই তথ্য-চিত্র যোগ করা হবে' রোসিফ সাহেব প্রশ্ন করলেন 'তথ্য-চিত্র তৈরীর কাজ কি হাতেকলমে শেখানো হবে?' —উত্তর 'না, সেই সম্পর্কে ক্লাসে পড়ানো হবে।' আমার বার বার মনে হচ্ছিল, বলি, যে জনতা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ক্লাসের মধ্যে জন-সংযোগ শেখানোটা নেহাৎই ভস্মে ঘি ঢালা, কিন্তু আমি ত দোভাষী, নিজের কথা বলার অধিকার নেই, কাজেই চুপ করে রইলাম। চা-বিস্কুট সহ-যোগে সম্বর্ধনা শেষ হল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরের দিন সারাটা দিন গোপালপুরের সমুদ্রের ধারে শ্যুটিং চলল, গোড়ার দিকে গান, যে গান সত্যিই গোপালপুরের নুলিয়ারা গায়। এগুলোর উপজীব্য হল, সমুদ্রের দেবতার কাছে আর্জি, যাতে জালে মাছ বেশী ওঠে এবং ঝড়-ঝাপটা না হয়। এই গানগুলো গাওয়ানো হল তীরে একটা নৌকায় বসিয়ে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার পাতরিক গানগুলো টেপ করল, ল'-শাল' তার অর টনি ও আমার সাহায্যে লিখে নিলো। তার পর সারাদিন চলল সমুদ্রের তীরে বিভিন্ন জায়গায় শ্যুটিং।

শেষ শ্যুটিং হল গোপালপুরের ব্যাক-ওয়াটারের তীরে নুলিয়াদের তোটাম্মা দেবীর পুজোর। তোটাম্মা দেবী নুলিয়াদের দেবী ইনি সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটা থেকে জেলেদের রক্ষা করেন আবার রই আশীর্বাদে জালে, মাছ ওঠে। প্রত্যেক গ্রামের বাইরে সমুদ্রের দিকে মুখ করা তোটাম্মা দেবীর মন্দির, যে কোন শনি বা মঙ্গলবারে পুজো দেওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা মিছিল করে মন্দিরে যায় সঙ্গে যায় পুরোহিত। এই পুরোহিত কিন্তু ব্রাহ্মণ নয়, তবে পুরো হিতের বড় ছেলেই একমাত্র পুরোহিত হতে পারবে। যাই হোক, পুরোহিত তোটাম্মা দেবীকে এক টুকরো কাপড় ও কয়েকটি নারিকেল উৎসর্গ করেন, তারপর একটি নারিকেল নিয়ে পুরোহিত সমুদ্রের ধারে গিয়ে তারস্বরে তেলেগু ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে সেটি ভেঙ্গে সমুদ্র দেবতাকে দান করেন এই হল তোটাম্মা দেবীর পুজো, তবে একটা কথা, তোটাম্মার পুজো যেদিন হবে সেদি[illegible] কিন্তু গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই মদ খা[illegible] এটাও নাকি পুজোর অঙ্গ।

রোসিফ সাহেবের উড়িষ্যার ওপর [illegible] চিত্রের শ্যুটিং শেষ হল, পরদিন ভোরে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে গোপালপুর থেকে রওনা হয়ে, পথে চিল্কায় জেলেদের শ্যুটিং করে বেলা একটা নাগাদ ভুবনেশ্বর পৌঁছলাম এবং সন্ধ্যা সাতটার প্লেন ধরে কলকাতায়।

বিদায়ের মুহূর্তে খারাপই লাগছিল দশ দিন কষ্টসহ্য বন্ধুত্বের ওপর যবনিকা নামল—হয়ত বা এদের মধ্যে কারোর সঙ্গে কখনও আবার দেখা হবে আবার নাও হতে পারে, জীবনের গতি সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না,—তাই না?

মানুষ কেনা বেচার ইতিহাস

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বর্ণালি পাখা মেলে পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়। কিংখাবে মোড়া জোম্বার আঁটা নানা মাপের, নানা ধরনের সাপ, গোসাপ, গিরগিটী থেকে কুমীর, গণ্ডার, হিপো, জেব্রা, হাতী, বাঘ, সিংহ থেকে নিয়ে কতো মাছ, কতো হরিণ, কতো বাঁদর। ভীষণ গোরিলা, সুন্দর উট পাখী, [illegible] কচ্ছপ।—চীনের এই মহোৎসবের মাঝে দাঁড়িয়ে শুধু মহাবিস্ময়ের ঝাপটেই সেই শীত কম্পিত কৃষ্টি তার ভয়ের তাড়সে চমকে উঠলো; ভীষণকে জাপটালো। আলিবাবার ভাই যেমন হঠাৎ ধনের বিপুলতা স্পর্শ করার উত্তেজনায় মস্তিষ্কের সহজ ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো,—এই বিপুল জীবনের সম্পূর্ণ সমাবেশ করাতে দেখে যোবোপীয়েরও যেন মানসিক ভারসাম্য হারালো। আপসেই একে অন্যের গলা টিপে ধরলো। রাতের অন্ধকারে এক বেরাল অন্য বেরালকে খেদিয়ে তাড়াবার হল্লায় পাড়া ব্যস্ত করে তুললো। তখন থেকে আজ অবধি আফ্রিকা-এশিয়ার ভাগাভাগি নিয়ে শাদা দুনিয়ায় যেন খাওয়া-খাওয়ির অন্ত নেই।—ক্যাপিটালিজম বলতে যে কুৎসিত কৃষ্টি-কুষ্ঠের কথা আমরা জানি, তার গোড়ার কারণ এই অবাধ সুযোগ সুবিধার দৌলতে দুটো জিনিস গুছিয়ে ফেলা : (১) ধন-কে কুক্ষীগত করা, (২) সেই কুক্ষীকে ক্রমশঃ জবর-দোকতো করে এনে কয়েকজনের মধ্যে আটকে রাখা. এবং বিরাট জনতাকে খেদড়ে ঠগিয়ে ঠেকিয়ে রাখা। শুধু তাই নয়, এই ধনগৃধ্নু দলটির মনের বাসনা স্পষ্ট। জনতার প্রয়োজনীয়তার চাহিদা বাড়িয়ে রাখার তালে সেই চাহিদার জের মেটাবার খাটুনীর ভারও জনতারই। তাদের চাহিদা বাড়লেই এদের লাভ। এই নীতি। মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই ঘরে ঘরে ক্যামেরা, রেডিও, টি-ভির। কিন্তু বাড়াও চাহিদা। গড়ো বাজার। এবং এ বাবদে খাটুনী খাটাও তাদের যাদের হাতে শুধু মূল্য গুনে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে মূল্যও ঐ চাহিদা মেটাবার তালেই সুড় সুড় করে আবার ঘরে ফিরে আসছে। জোগান দিতে দিতে, রোজগার করতে করতে থই পাবে না মানুষ। সে খেটে খেটে ভূত হয়ে যাবে। কিন্তু টাকা ঘরে তুলবে সে যে খাটছে না। এই রীতি, এই ধারাই ধনতন্ত্রবাদ। জীবনের প্রয়োজন রুটি, কাপড়, থাকার ঘর। প্রয়োজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আনন্দ। ঐ প্রয়োজনকে মহার্ঘ্য করা চাই। এর সেবায় মানুষের মনুষ্যত্ব দলে পিষে গোবর করে দেওয়া চাই।

জনতার খাটুনী বাড়িয়ে নিজের খাটুনী খাতিল করার ফিকিরের নাম ধনতন্ত্র। এই অপরিশ্রমের ভূরিভোজের ওপারে পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত, আত্মপ্রত্যয়হীন বিশাল জনতা। তার মাঝে রাখা আছে একদল দালাল। নটী-বারাঙ্গনার থাকে পুরুষ দূতী, 'টাউট'। ব্যবসায়ের বেলায় বলে দালাল, এজেন্ট। দালাল সমাজের কর্ম-সূচীর একটিই ধারা। এদের কাজ কী করে শোষকের দলকে আরও শোষণ করার সুযোগ করে দেওয়া যায়। এবং এই বাবদে কতো তাড়াতাড়ি বাড়ি, গাড়ি বাগিয়ে রাজ-সম্মানে ভূষিত হওয়া যায়। গত শতাব্দীর ভারতবর্ষে এমন চোগা-শামলা-পাগড়ী চাপা রাজা-মহারাজ, লর্ড-লেডী দালালের সংখ্যা ইতিহাসের পাতার পর পাতা কালো করে রেখেছে। এরা দালাল। এই দালাল হবে 'হাইফেন'। তার এপারের দল ভাবনে নিগ্রহ করার অধিকার তাদের আছে, কারণ তাদের জমানো টাকা। ভুলে যায় তারা টাকা প্রকৃতির দান নয়, টাকা সম্পদ নয়, টাকা বিত্ত নয়। প্রকৃতির সম্পদ-বিত্ত প্রকৃতির কাছে জমা আছে। তা ব্যক্তির নয় জনতার। ভূকতের নয় ভূস্বামীর।

অলসের নয়, শ্রমিকের। যা কিছু জমা, তার সবটাই শ্রমিকের শ্রমের ঘরে চুরি। নৈলে জমা হোতো না, ভাগ হোতো। একদল তবু ভাববে নিগ্রহ করা, শোষণ করা, পুঁজী করা তার অধিকার। আইন তাকে অধিকার দিয়েছে। দালালরা সে আইন গড়ে পোক্ত করে তুলেছে তার দাবী। ফলে অন্য দল ভাবতো নিগ্রহে পীড়িত হবার বাইরে তাদের আর অন্য জীবন নেই। মায়ের গর্ভ যেমন বেদনায় মণ্ডিত, রক্ত না দিলে যেমন নবজাতকের সম্ভাবনা নেই, তেমনি পরিশ্রমের পরেও দুর্নিবার দারিদ্র্য ছাড়া দেশের সেবা, দেশের সম্পদ বাড়াবার অন্য উপায় নেই। এই অদ্ভুত ভাগাভাগির সংহিতাকে ধর্ম বলে যারা মজায় মজায় চারিয়ে দিয়েছে তারাই এই শোষক-শোষিত জগতের বিচারক, আইন স্রষ্টা; শিক্ষক পুরোহিত,—পুলিশ, আদালত ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলো যে প্রত্যক্ষে দালালি করছে তা বোঝার শক্তি যুগ যুগ ধরে দালালি করেই তারা ভুলেছে। এই দুর্দান্ত মনোবৃত্তিই রোম-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিলো। য়োরোপীয় আদর্শে এই মনোবৃত্তি গোড়া থেকেই ঠাসা। এরা লুঠেরাকে কুর্নিশ করেছে চিরকাল।

আফ্রিকার উত্তরেই য়োরোপ। মাঝে ভূমধ্য সাগর। এই ভূমধ্য সাগরের বুকে যুগে যুগে যতো সভ্যতার উত্থান পতন হয়েছে তার মধ্যে বার বার আফ্রিকা য়োরোপের সংস্পর্শে এসেছে। আফ্রিকার উত্তর উপকূলের দাস বাজারে শ্বেতাঙ্গনা চড়া দামে বিক্রীত হয়েছে। য়োরোপের দাস বাজারে কৃষ্ণকায় মানব হাবশীদের প্রায়ই কেনা হোতো। হানীদলের সৈনাদের মধ্যে কেবল হাতীই ছিলো না, কৃষ্ণকায় অতিকায় ঘোরবর্ণ দৈত্যের মতো মানুষও ছিলো বহু। এছাড়া সওদাগরীর খাতে আফ্রিকা-য়োরোপে সম্পর্ক চিরকালের সম্পর্ক।

কিন্তু এবার যারা এলো বেনিন্ উপসাগর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে তারা মুরদের, হাবশীদের, মিশরীয়দের জানা য়োরোপ নয়। এবার যারা এলো তাদের মনোবৃত্তি কেবল মুঠো বেঁধে গ্রাস করার লোভেই ঠাসা ছিলো। এরা য়োরোপের সেই প্রতিখাতিতে পালিশ করা রেনেসাঁ যুগের ফসল। বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, জোচ্চোর, রিরংসু, মদাপ এবং লড়াকু দল। এ যুগের দীপ্তি স্মারক নামেই যুগন্ধরতার চরম পরিচয়,—এক ম্যাকিয়াভেলীর নীতিশাস্ত্র, দুই পোপ্ আলেকজাণ্ডারের সভাপর্ব।

এবং এই সময়ে আরও একটি কাণ্ড হয়ে গেলো। ইতিহাস এগিয়ে গেলো সম্পূর্ণ অন্য খাতে। কলম্বাস একটা নয়া দেশ আবিষ্কার করেও তার নবত্ব বুঝতে না পেরে দেশের নাম ভারত দেশবাসীর নাম ভারতীয় দিলেন। মজা এই যে আবিষ্কৃত ভূভাগটি পর্তুগালের নামে রক্ষা করা হোলো। চড়াও আর কাকে বলে। (যেন ভারত দেশটার মা-বাপ ছিলো না!) উড়োখই গোবিন্দায় নমঃ হয়ে গেলো। যাক; সে ইতিহাস বলার জায়গা এটা নয়। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কার, পশ্চিম 'ভারতীয়' দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে লড়াই, মেক্সিকো ও পেরুর বলাৎকার,—পর পর ঘটনাগুলো ঘটে গেলো ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগেই। ওই সব জায়গায় উপনিবেশ বসাবার হিড়িক লেগে গেলো যেন। এই ঘটনার মাত্র একশো বছরের মধ্যেই হোলো অরেঞ্জ ফ্লাণ্ডের জন্ হকিন্সের প্রথম সেই দাস-ব্যবসায়ের অভিযান। ১৫৬২ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত দাস-ব্যবসায় এবং তার মুনাফা নিয়ে অতলান্তিকের বুকে হাজার জাহাজ ধ্বংস হয়েছে, মানুষ মরেছে এই মারপিটের ফলে। ইংলণ্ডের সদাগরেরা শুধু কাঁচ থেকে বাঁশ, আঙুল ফুলে কলাগাছই নয়, খড়কে থেকে তালগাছ হয়ে গেছে। যদি আমেরিকা ভূখণ্ডে শ্রমিক জোগানদারীর ঘাটতিতে হাহাকার না পড়ে যেতো, দাস ব্যবসায়ের রূপ এমন কদাকার হয়ে উঠতো না। এ কথাটা যে মাত্র লেখকের ব্যক্তিগত 'মত' নয়, —তা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

শুধু একটি কথা মনে রাখা ভালো। আমেরিকা 'আবিষ্কৃত' হবার একশো বছরের মধ্যে য়োরোপে নানা কারণে নানা বিপ্লব দেখা গেলো। বিপ্লবগুলোও যেন কোনো নতুন দিশার সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। মানুষের লড়াই আর মাটি নিয়ে নয়; লড়াই এবার সমুদ্রের অধিকার নিয়ে। মাটির লড়াই হয়ে গেলো জলের লড়াই। লড়াইয়ের অস্ত্রহাত অবশ্য অনেক ছিলো। আসলে প্রতিটি য়োরোপীয় "জাত"-ই ডাকাতির লোভ সামলে উঠতে পারতো না। জল-দস্যুদের নিয়ে কোম্পানী গঠন করে জল-দস্যুদেরই ভাগের বখরা নিতেন য়োরোপের বড় বড় রাজা, রানী থেকে সমাজপতিরাও। কিন্তু এ নেওয়ার একটি গালভরা বাহানা তো চাই। বাহানা বানানো হোলো। ঐ সময়ে খ্রীষ্টধর্মের একচ্ছত্রতায় চীড় ধরলো: 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' ও 'ক্যাথলিক' এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো শাদা চার্চ। সেই ভাগের বাহানায় লড়াই; কিন্তু সে লড়াই স্থলেও যতো, জলেও ততো। জলের লড়াইয়ে একচ্ছত্র অধিকার ছিলো স্পেনের, পর্তুগালের। কিন্তু কালক্রমে একদা অধিকারে বাগড়া দিলো ইংরেজ এবং ওলন্দাজ নৌবাহিনী। স্পেন-পর্তুগাল অবশ্য ক্যাথলিক। ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রটেস্ট্যাণ্ট। তা বলে যে স্পেনে পর্তুগালে লড়াই হোতো না, বা ইংরেজে ওলন্দাজে লড়াই হোতো না তা নয়, কিন্তু বাহানা দেবার সময়ে ইতিহাসের নৈয়ায়িকেরা, ঐ বাহানাই দেন। যখন যার যে ভাবে সুবিধা হয় বাহানা সেই সুরে রচিত হয়। যে যে-বর্ণের যে গোত্রের ঐতিহাসিক সে সেই-ভাবে বক্তব্য পেশ করে। ঐতিহাসিক স্পানিশ না, ইংরেজ, ক্যাথলিক না প্রটেস্ট্যাণ্ট। এই 'জাতে'র ওপর কারণ দর্শানো আর যুদ্ধের দোষ চাপানো নির্ভর করছে। কিন্তু শুধু এসব যুদ্ধেরই বা কেন, সব যুদ্ধেরই আসল কারণ পুঁজী সামাল দেওয়া। পুঁজীর ভোগে যাদের চোয়ালে লালা ঝরে, তারা পুঁজী বাড়াবার জন্য মানুষ মারার ফিকির বার করবেই। তারই নামই যুদ্ধ। সে-কালের ইতিহাসের সাধ্য ছিলো না এটা স্পষ্ট করে বলে।

কিন্তু সব যুদ্ধের মতো এসব যুদ্ধে তো হারজিত ছিলোই। যারা হারতো, বেশীর ভাগই ফেরার হয়ে যেতো। স্থলের সৈনিকরা বন্দী হোতো। জলের যারা তারাই হোতো ফেরার, বোম্বেটে। জাহাজে জাহাজে স্বাধীন জীবনযাপন করলেও তারা হয়ে যেতো জল-দস্যু। এই সব ফেরারদের আস্তানা ছিলো এই নয়া দুনিয়া। রাজনীতি ছাড়াও ধর্মের নামে অত্যাচারেরও সীমা ছিলো না। তা থেকেও মানুষ দূরে চলে যেতে চাইতো। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ শান্তির আশায় চলে আসতো নয়া দুনিয়ায়। ভাবতো যদি মুঠিভরা মাটি পাই, মুঠিভরা ফসল ফলাতে কী? দারিদ্র্যের একটি স্বপ্ন—অন্ন, তার আবার স্বদেশ বিদেশ কী?

ফলে য়োরোপের সমাজের যতো [illegible], ডাকাত, ঋণগ্রস্ত, লম্পট চোর, বাটপাড়ের ধাপার-মাঠই ছিলো এই নয়া দুনিয়া। সভ্য য়োরোপের উদ্গার এসে বসত করলো এই সভ্যতা-বর্জিত দেশে। এসে করতো কী? জমি দখল করতো।

ঐই দখল করার নেশায় এ দিগন্তের নীতিই ছিলো আদিম অধিবাসীদের মারো, খেদাও, নিপাত দাও। যেমন করে হোক ওদের জমি থেকে ওদের উৎখাত করো; নিপাত দাও। এটাই ধর্ম, এটাই নীতি। এর জন্য অন্য ধর্ম, অন্য নীতি না মানলেও চলবে।

সে এক মর্মন্তুদ ইতিহাস। সে ইতিহাস মেলে ধরার জন্য অন্য গ্রন্থ লিখতে হয়। আমেরিকান-আমেরিকার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। এখনও তা দলিল আছে। আমরা আমেরিকাকে নতুন দুনিয়া নতুন মহাদেশ বলি। আসল আমেরিকার সভ্যতা বহু প্রাচীন, বহু অলংকৃত সভ্যতা। সেই সভ্য আমেরিকাকে ধ্বংস করে এই সভ্য (?) আমেরিকা।

জমি দখল করা এক। সেই জমিকে বাগে আনা অন্য। যা হচ্ছিলো মিসৌরী নদীর উত্তরে আপাচেদের নিয়ে, তাই হচ্ছিলো মিসৌরী নদীর দক্ষিণে মায়া-জাতি এবং আজটেক জাতিদের নিয়ে। ধোকাবাজি, বেইমানী, জুলুম করে একটা কৃষ্টিকে ঘায়েল-করা যায়। মানুষগুলোকে বন্দী করে জব্দ করাও যায়। তাদের মাঠে, ঘাটে, খনিতে জবর ধরে খাটানোও যায়। তারপর? তারা স্রেফ কাজ করতো না। সুযোগ পেলেই উগ্র হয়ে খড়গ ধারণ করতো। তারা বীর। [illegible] প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই খুব বড়ো [illegible] করতো না। মান-ই ছিলো বড়ো। আত্মহত্যা করতো দলে দলে। দলে দলে বিষাদের অন্ধকারে ডুবে গিয়ে চোখ বুজতো। মুষ্টিমেয় য়োরোপীয় এসে এই বিশাল ভূমিখণ্ড হাতের গ্রাসের মতো হামলে পড়ে নিলো। কিন্তু এই ভূমির উপযুক্ত সেবা করার মতো তাকত তো এই মুষ্টিমেয়

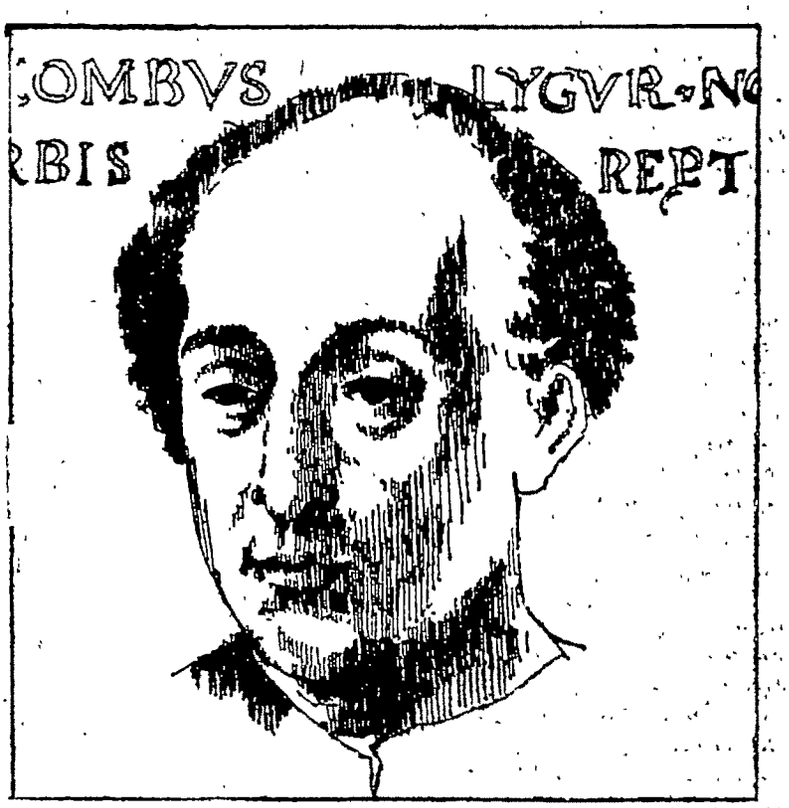

ডাকাতদের ছিলো না। কাজেই এই শ্রম সরবরাহের জন্য "দাস" আমদানী। দাস ব্যবসায় এবং আমেরিকার অভ্যুদয়ের [illegible]তলায় একটি নাম লেখা,—নিগ্রো, কা[illegible] দুর্ধর্ষ জাত। এটা করতেই হোলো। নৈলে বাঁচার হয়তো উপায় ছিলো। উপায় ছিলো না ধনী হবার। সে জন্য চাই দাস।

কিন্তু য়োরোপের বাচ্চারা তো ওহাইও, ভার্জিনিয়া, টেনেসী, কারোলাইনা, ফ্লরিডার সূর্যকে মাথায় করে মাটি থেকে খাদ্য, খনি থেকে রত্ন বার করার তাকত [illegible]া না। সে জন্য চাই এশিয়া-আফ্রিকার [illegible]ান। এশিয়া সহস্র দেশ নয়। গ্রীকদেরও [illegible]ম করেছে। হূনদের লোলিয়েছে। ওদের [illegible]টাবার আগে আফ্রিকা দেখা যাক। তখন [illegible] হকিন্সের অভিযান। নিগ্রোরাই [illegible]বিপদে কাণ্ডারী। ধরো নিগ্রো, খেদাও [illegible], বাঁধো নিগ্রো। নিগ্রোকে [illegible]য়ারের মতে বেচো। এই আরম্ভ। নিগ্রো চরিত্রে ছিলো সরলতা, বশ্যতা, সততা। লোভই যার নেই চরিত্র তার যাবে কিসে? য়োরোপীয় মনের ক্ষুধাতুর বিচার-লীন দস্যুতার চেহারা নিগ্রো মনের মাপের মধ্যে মোটেই বসতো না। ওরা বুঝতে পারতো না এরা কী চায়, কেন চায়, চেয়ে করে কী, করবে কী? দাস জাহাজের কান্নার গান অনেক লিপিবদ্ধ হয়ে আছে নিগ্রো কবিতায়। সেগুলো আমাদের স্কুল পাঠ্য নয়। আমরা জানি চার্ল্স-ঋব-দি-লাইট বিয়েগড, প্রিজনার অব্ শিলো।

নিগ্রো জীবনের ছন্দে ছিলো আরাম, শান্তি, অল্পে সন্তোষ, দলের (সমাজের) প্রতি আনুগত্য। বিধাতাপুরুষের পরই মর্ত্যের ভগবান দলের সর্দার। নিগ্রো মনের [illegible] এক, দেহের গঠন এক, চরিত্রের পর্যায়ে [illegible]ও সামান্যই। "সভ্য" দুনিয়ায় [illegible] আর শয়তানে অনেক ফাঁক; স্বর্গে আর নরকে ফারাক বিপুল। ওদের দুনিয়ায় বিপদ-সম্পদ, অভিশাপ-আশীর্বাদ বন্যা-শুখো, প্রজনন-মহামারী একই দেবতার মেজাজের বৈচিত্র্য। ওরা মেনে নেয় দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যেরই অন্য ভাই মনে করে। জীবনযাপনে দুটো দিক থাকবে।

ওদের পিতৃপুরুষের আত্মা রুষ্ট হলে নানাভাবেই বিপদ দেখা দেয়। এই এরা জানে। বাঘে কুমীরে সাপে মারে। রাতে বাড়ে ভূতের অত্যাচার। ঝড় ওঠে, বন্যা আসে; আগুন লাগে; হাতীর পাল ক্ষেপে; মাটি [illegible] ওঠে; সূর্য হঠাৎ কালো হয়ে যায়। [illegible] ভরা ক্ষেতে নেমে আসে পঙ্গপাল। [illegible] ছেলেকে বসন্তে ধরে। কে দায়ী? [illegible]তপুরুষ শান্ত হও। শক্তিমান্ [illegible] পুরুষকে কিছু বলি ইত্যাদি দিয়ে [illegible]ত করে রাখে। পাপ-পুণ্যের বিচারের [illegible] পুরস্কার-সাজার বিচারটাই ওদের বেশী প্রত্যক্ষ। কাজেই যুগে যুগে মানবায়নের বিবর্তনে যে প্রসার, কৃষ্টির অগ্রগতি ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে [illegible] বিবর্তন ওদের মনকে অধিকার করে না। ওদের শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা বুটি: এক প্রয়োজনের সাধন; দ্বিতীয় প্রকৃতির সত্তার অনুকরণ। নিতান্ত নিঃশব্দের মধ্যে বাস করে করে ওরা শব্দকেই আনন্দের প্রধান উপকরণ হিসেবে সাধন করে গেছে। তাই শিকার করা জন্তুর চামড়ায় ওদের নানা ঢোল। সেই চামড়ার বাদ্যভাণ্ডে নানা শব্দের ঝংকার। ঢেউ দেখে, পাতার কাঁপন দেখে, মৃগযূথের নাচ দেখে, ওদের মধ্যে দেখে যৌথ নাচ। শঙ্খ বাজায়, বাঁশ বাজায়। হাতীর ডাকের মতো ডাকতে পেলে ওরা ভারি খুশী। ভাষাকে ওরা ধ্বনি এবং এক-স্বরে সীমিত করেছে। বহুস্বরিত শব্দ ওদের কম। ওদের ভাষায় যুক্ত বর্ণ নেই বললেই চলে। কিন্তু, যে পরিমাণে ওদের ভাষা সীমিত, সেই পরিমাণে সঙ্গীতে ওরা চমৎকার। নিগ্রো কণ্ঠের তেজস্বীতা, ওজস্বীতা এবং কমনীয়তা আধুনিক সঙ্গীত জগতের বিপুল সম্পদ। নিগ্রো কণ্ঠ যারা শুনেছে তারা কখনও সে কণ্ঠ ভুলতে পারে না, চায় না। ওদের কণ্ঠে পাওয়া যায় পুরুষে পৌরুষ; নারীতে কমনীয়তা।

তবু গিনীর নিগ্রোদের মাথার খুলী লম্বাটে; চামড়া কালো; নাক চওড়া; ঘাম হয় প্রচুর এবং সে ঘামের গন্ধও বিশেষ একটা রূপের (তার কারণ সাধারণ মানুষের গায়ে ঘর্মগন্ধী যতো থাকে গিনীর নিগ্রোর গায়ে তার ঢের বেশী গন্ধী); কান ওদের ছোটো এবং ছুঁচলো; ঠোঁট মোটা, বড়ো এবং বাইরের দিকে ওল্টানো; শরীরের ওপর [illegible] থেকে [illegible] দেখলে দারুণ শক্ত মনে হলেও হাত পা ততো বলদৃপ্ত বা লম্বা নয়।

খুঁটিয়ে দেখতে গেলে তখনকার নিগ্রো জীবনের ধারা এবং এখনকার নিগ্রো জীবনের ধারায় খুব যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা মনে হয় না। আমাদের দেশে আমরা যদি ছোটনাগপুরের জংগলে, হিমাচল প্রদেশের ভীতে ভীতে মগ গুহাতে পাতা থাকা উপত্যকায়, রাজস্থান, কচ্ছ, জবলপুর-নীবের গ্রামে, নাগা-খাসিয়া পাহাড়ে ঘুরে যাই—সত্যি কতোটা পরিবর্তন পাবো? সেলপথ? সদর রাস্তা? পুলিশ ফাঁড়ি? তাই-ই বা কোথায়? দেশের শতকরা দশ জনও দিল্লিতে তক্তে কে চড়ছে, কে নামছে তার তোয়াক্কাও করে না। সেই অযোধ্যার রামজীর পরে জানে আকবর আর বীরবল। তাছাড়া জানে ওপরে ভগবান, নীচে জমি হাল, লুঙ্গো, শুখো। বাস।

নিকোলাস আওয়েন গাম্বিয়ার দাস ব্যবসায়ের গোড়ার দিকে এক দালাল-ফাকটর ছিলেন। তাঁর কড়চায় ওদের বাস, বেশ, খাদ্য ইত্যাদি জীবনের চিত্র পাই। আজও গাম্বিয়ার জংগলে গ্রামে অবিকল সেই চিত্র। সুরিনামের জংগলে নিগ্রোরা আজও প্রাচীন দাস-কালের নিগ্রোদের মতোই বাস করে। তাদেরও যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে বোধ হয় না। জানি না পরিবর্তন পরিবর্তন বলেই ভালো বা কাম্য কিনা। আধুনিকতা ব্যাধি কিনা এখনও সঠিক নির্ণীত হয়নি।

অবশ্যই এদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিলো। না থাকার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও তো [illegible] প্রতিক্রিয়া

বা এক পত্নীত্বের উদাহরণ পায়নি। কিন্তু সন্তান সব পিতার। চাষী ক্ষেতে চাষ করে। ফল ক্ষেতের নয়, চাষীর। পুরুষও নারী-দেহে চাষ করে। ফল যা হবে তা জমির নয় হলের মালিকের। (যখন থেকে জমির মালিক এবং হলের মালিক আলাদা হোলো তখন থেকেই পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষ। মেয়ে তফাৎ রইলো। এখন যখন সে সংঘর্ষের ফয়সালা হচ্ছে মেয়েও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে)। প্রত্যেক পত্নীর স্বতন্ত্র নিজস্ব চালা, স্বতন্ত্র নিজস্ব জমি, চাষ—পার্থিব সম্পত্তি। নৈলে পত্নী যতোই হোক সবই পুরুষের অধিকারে। তবু পুরুষের ঘরে পালাপালি প্রতি পত্নীই সময় মতো নিয়মিত আসে, থাকে। এ অধিকার নিয়ে বাদ-বিবাদ কলহ নেই। যৌথ জীবন, যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় এ জাতীয় কলহ অবাস্তব, সময়ের অপব্যয়। গর্ভাধানের পর থেকে শিশুর স্তনাপানের কাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-স্বামী গৃহে আর আসবেন না। সে সময় কতো দীর্ঘ হতে পারতো? মায়ের রুচি সন্তানের প্রয়োজনীয়তা। তা এমন ব্যবধান তিন বৎসরও হতে পারতো।

নিগ্রোর স্বভাবই নিগ্রোকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান দাস করেছে। য়োরোপের লোভীরা সময়ে অসময়ে সুযোগ মতো ফাঁদ পেতে পৃথিবীর সব জাতকেই দাস বাজারে নিয়ে গেছে। কিন্তু চীনারা স্বাবলম্বী, ভারতীয়েরা স্বাধীনচেতা ধর্ম-ধর্ম করে হয়রাণ এবং বিদ্রোহ পাকাতে ওস্তাদ, য়োরোপীয়েরা রোদকাতর মুরেরা উগ্র। কিন্তু নিগ্রোদের আসল স্বভাবটি যে কী সে সম্বন্ধে তাদের মনিবদের রায় প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধ। তবু ইতিহাস প্রমাণ করে যে এরা কর্মঠ, ভীতু, বশ্য, বিশ্বাস্য, মর্যাদাবোধে সর্বদা কাজ করার জন্য প্রস্তুত। বৃদ্ধদের এরা সম্মান করে; শিশুদের এরা পালন করে; কান্না-হাসির প্রকাশ এদের স্পষ্ট; যৌন ভাগিদকে এরা সংযত রাখতে জানে। (যদিও এ বিষয়ে মেম-সায়েবদের ভয় (?) এবং বাবু-সায়েবদের হ্যালোপনা রায় দেয় অন্য। হক কথা জানা যাবে ক্রমশঃ)।

গিনীর নিগ্রোদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ক্ষীণ হলেও ছিলো। সে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা, এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু ঈশ্বরের মান মর্যাদা এতো উচ্চ কোটীর যে তাঁর পক্ষে মানুষের মতো নগণ্যতা নিয়ে মাথা ঘামানো সময়ের অপব্যয়। কাজেই মানুষের দুনিয়া দেখা-শোনার ভার তিনি ছোটোখাটো দেবতাদের ওপরেই ছেড়ে রেখেছেন। সুতরাং গিনীর নিগ্রোরা এই ছোটো-খাটো দেবতাদেরই বেশী ভোগ চড়ায়। (৩)

(3) Bosman W. 'A New and Accurate Description of the Coast of Guinea. Lond. Cass. 1967. 1st end — 1839.

মৃত্যুর পরে প্রেতলোক থেকে যেমন আশীর্বাদ পাওয়া যেতো তেমনি বিরুদ্ধ প্রেতের অভিশাপে মানুষ যথাসর্বস্ব-হারিয়েছে, পাগল হয়ে গেছে এমন উদাহরণ নিগ্রো সমাজে নিবিড়ে প্রচুর শুনতে পাওয়া যায় সুপ্রচুর জোরের সঙ্গে। ফলে প্রেত এং মানুষের অন্তর্বর্তী অজ্ঞাত এবং শূন্য ফাঁকায় জমাট হয়ে উঠেছে পুরোহিত, ওঝা, সর্দার, মাদুলী, ঝাড়ফুক, প্রেতকল্প প্রতীকের থান। আজও খ্রীস্টান নিগ্রোরা ক্যারিবিয়ানে, ব্রাজিলে, পানামায়, মেকসিকোয়—আমেরিকায়ও প্রেত সম্পর্কের আচরণে এবং মৃত-আত্মীয়ের রুচি এবং দাপট সম্পর্কে খুব সজাগ। কথায় কথায় এরা ওবিয়াকে আশ্রয় করে। (ওবিয়া-ঝাড় ফুক, মারণ-উচাটন-বশীকরণ)। যে হেতু বৃদ্ধেরা জীবন থেকে এগিয়ে এগিয়ে মৃত্যুলোকের পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তাই বৃদ্ধেরাই প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ। চট করে তারা মর্ত্য লোকের বাসিন্দাদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারে। এই বিশ্বাস আছে বলেই বৃদ্ধদের এতো সম্মান। অথচ য়োরোপে বৃদ্ধদের সম্মান তখনই দেখানো হয় যখন সে বৃদ্ধের তবিলে সম্পত্তি থাকে; এবং সেই সম্পত্তির ওপর অ-বৃদ্ধদের ঝাঁকতি থাকে। কাজেই য়োরোপময় সম্পত্তিহীন বৃদ্ধ দুনিয়ায় অবান্তর বোঝা। রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় তারা প্রতিপালিত হয়। টাকা থাকলে বিশেষ বিশেষ 'হোম'। য়োরোপের এই বৈশিষ্ট্য আমেরিকায় আরও প্রবল, বিশেষ খ্রীস্টানদের মধ্যে।

প্রথম প্রথম য়োরোপীয়েরা এসে এদের বর্বর অসভ্য বলতো, তার কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এদের একটা আত্মিক বোধ থাকলেও ধর্ম ব্যবস্থা বলতে এরা কোনো ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশের তোয়াক্কা করতো না। প্রকৃতির সঙ্গেই ছিলো এদের আত্মিক সম্বন্ধ। এবং এই সম্বন্ধ থেকেই এরা চিত্তের যা কিছু সাড়া হোক, পেতো। এই তাদের শান্তি, এই তাদের ভীতি থেকে পরিত্রাণ। গাছ, পাহাড়, ঝর্ণা, গুহা—প্রকৃতির এই সব রূপ। প্রচণ্ড ক্রোধের তাড়না থেকে জ্বালানো প্রতিহিংসার জ্বালায় অস্থির হয়ে যখনই এদের বিশেষ কোনো 'শক্তি'র সাহায্য চাইতে হোতো তখন এই সব 'তীর্থে' এরা যেতো, বা মানুষের গড়া প্রতীক-স্তম্ভের গোড়ায় গিয়ে বিশেষ পূজা দিতো। এই প্রতীক-স্তম্ভগুলো তত্ত্ববিদদের ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ এ স্তম্ভ পৃথিবীর প্রায় সব আদিবাসীদের মধ্যে দেখা গেছে। —তবে এগুলো কী? কোথা থেকে এর শুরু?

প্রতীক-স্তম্ভ বিশেষ বিশেষ আদিবাসী সমাজের বিশেষ বিশেষ চিহ্নে অলংকৃত হোতো। বারো ফুট উঁচু স্তম্ভ হাতীর দাঁতের বৃত্তের ওপর দাঁড়ানো প্রথম এ্যাঙ্গোলায় দেখা গেলো ১৫৯৯তে। হাতীর দাঁত না হয়ে বৃত্তাকারে রাখা মানুষের করোটী হওয়ায়ও বাধা নেই। যুদ্ধে নিহত শত্রুর মাথা দিয়ে এ সব স্তম্ভকে পুজো করা হোতো। ছোটো ছোট গাঁয়ের পথে হাতীর দাঁতের বেড়ের মধ্যে রাখা [illegible]র খুলির স্তূপ প্রায়ই চোখে পড়তো। [illegible]র লম্বা গুঁড়ি ফাঁপা করে তার মধ্যে [illegible] থেকে নিয়ে তেল, মাটি, হাড়, [illegible], বকত, জানোয়ার ইত্যাদি ঠেসে, সেটাকে খাড়া করে রেখেও কখনও কখনও প্রতীক পুজো হোতো। এখনও হয়। (৪) মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, পার্লামেন্ট সদস্য, ক্যাবিনেট মন্ত্রী ভাবতেও যেমন, আফ্রিকারও তেমন পুরুৎ, গণৎকার, মাদুলী তাবিজওলাদের কথায় এখনও বশীভূত। বশীভূত মানাহাটন, ওয়াশিংটন, হোয়াইট হল, ডাউনীং স্ট্রীটের ওঁরাও। মাম্বো-জাম্বো 'এগবো', পোবো—এ সব ওদের ওবি[illegible] জগতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট দিগগজ তা[illegible] বেতাল, নন্দী-ভৃঙ্গী, চামুণ্ডা, [illegible] ডাকিনী নাম। এঁরা দাপটে এখনও যেমন সিদ্ধ করেন, তেমনি সিদ্ধাই দেনও। এঁদের নাম, ধাম, মন্ত্র-পুজো রকতে, রমণে, পানে, গমনে ভেজা।

সাধারণতঃ অ-নিগ্রো 'ফুটানী মহালে' প্রচলিত ধারণা যে যারাই উলঙ্গ তারাই অসভ্য, যারাই অসভ্য তারাই যৌন-ব্যবহারে অমিতাচারী। নগ্নতার সঙ্গে অসংযমের সম্পর্কটা যে ঠিক কোথায় তা কেউই পরিষ্কার করে বলেনও না, বলতে চানও না। বলতে যে চান না, এটাই কেন যে বলেন না তার কারণ বলে বোধ হয়। নগ্ন তো আমরা সকলেই। দৈনন্দিন বহু ব্যাপারে যৌন না হয়েও আমরা নগ্ন। কিন্তু শরীরের যে অবয়বগুলো জীব জনন, জীব ধারণ ও জীব পোষণের জন্য অনিবার্য সেই গুলিকেই আমরা জবরদস্ত নিবারণের বে[illegible] ঢেকে রাখি, এবং এই ঢেকে রাখা না [illegible] ওপরেই সভ্য অসভ্যের বিচার করি। [illegible] নিশ্চয়ই কারণ আছে। (অবশ্য এটাও দেখা যাচ্ছে যে নিজেকে যতো উঁচুদরের ওপরতালার সভ্য বলে মনে করছেন সে-ই কতো তাড়াতাড়ি, নির্বিচারে, কায়দা করে কতোটা আড়াল রেখে কতোটা নগ্ন হওয়া যায় তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। কাগজের কলমে চোখ পেতে বসে আছেন। আধুনিকতম কায়দায় কতোটা আরো কাটা-যায়। এ বাবদে নানান স্থানভেদে নানা প্রকার নগ্নতার বিধি-শাস্ত্রও আছে। কিন্তু এ সবই সভ্য দুনিয়ার ব্যাপার)।

যজ্ঞবাড়িতে যে লোকটা অদ্ভুতরকম বেশী খাচ্ছে সে কারুর কৌতুকের, কারুর লজ্জার কারণ। আমার মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, বিয়ে করতে যাচ্ছে। [illegible]

(4) 1. Battel - Andrew - Strange Adventures of Andrew Battel —(Hackluyt Society)

2 Bosman — পূর্বোক্ত।

3. Newton J. Journal of a Slave Trader (Epworth Press).

খেও। বাড়ি বৌ নিয়ে এলে তখন আমি আবার খেতে দেবো। আমার অকৃপণ খাওয়া সম্বন্ধে মার হয়তো 'লজ্জা' ছিলো না,, (আমার তো ছিলোই না) কিন্তু 'ভয়' ছিলো। 'নজর' লাগার ভয়, আবার কেউ না হাবাতের ঘরের ছেলে বলে। থিয়েটার দেখার নেশা, সিনেমার নেশা, ভালো গন্ধের নেশা, রূপসীকে দেখার নেশা,—নেশা মাত্রেই অসামাজিক অমানান—ডর দেখায়। কেন না ব্যক্তিতেত্বর পূর্ণ-প্রকাশে নেশা এনে দেয় মাত্রাজ্ঞানহীনতা। নেশাড়ী মন যেন কাৎ হয়ে থাকা ছবি। কাৎ হয়ে যাওয়া ঘড়ি, ঘড়া বা গ্রামোফোন রেকর্ড। প্রতেকটাই সুস্থ পূর্ণতার প্রকাশে বাধা। বিপজ্জনকও বটে। অসাম্যই বিপ্লবের সৃষ্টা। প্রত্যেক প্রকাশ (সৃষ্টি মাত্রেই তো প্রকাশ) একটা আত্মমর্যাদার মান নিয়ে সৃষ্ট। —মানুষও সৃষ্টি। মানুষের আত্মমর্যাদার মান আছে। সে মান মানানসই হয় চৌকশ হলে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কৃপায় ও মাধ্যমেই আমরা রূপ-রস-গন্ধের জগতে প্রবেশ করতে পারি। এই জগতটার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। সম্পর্কটা গভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই সম্পর্কটির মর্যাদায় আনন্দ, অমর্যাদায় শোক বিষাদ। মর্যাদার পূর্ণতায় আনন্দের পূর্ণতা, আনন্দ পূর্ণ তো আমি পূর্ণ। মর্যাদার অপূর্ণতায় আমার অপূর্ণতা; আনন্দ অপূর্ণ তো আমি অপূর্ণ। সেই কারণেই আবার আমি বিষণ্ণ, শোকগ্রস্ত। অপূর্ণতা মানেই আমি 'কাৎ' হয়ে আছি। ভারসাম্য খুঁজে পাচ্ছি না। তোৎলা যেমন চুপ করে থেকে তোৎলামী ঢাকে, কানে খাটো যেমন সহজে কানের যন্ত্র ব্যবহার করতে চায় না, পেটুক যেমন সভার মধ্যে খেতে চায় না,—তেমনি 'অবৈধ' প্রণয়ের প্রণয়ীকে সমাজের অগোচরে রাখার প্রয়াসের আর অন্ত নেই আমাদের। দেহের কোনো কোনো অবয়বকে ঢেকে রাখাও যেমন যৌন অসাম্যের বিকৃত পরিচয়—আবার তাকে ঢাকার বদলে লাল ঢেঁড়া টেনে প্রকট-প্রচার করার প্রচেষ্টাও অসাম্যের বিকার বলেই মনে করতে হবে। আবার ঐ ধরনের প্রকাশ বা অপ্রকাশের ধাঁধায় মাৎ হবে, যখন মানুষ ল্যা-ল্যা করে হন্যে হয়ে পড়ে আর হুমড়ী খেয়ে মর্যাদা, সম্ভ্রম কাৎ করে থুবড়ে থাকে,—তাও এক বিচিত্র, অসাম্য, অশান্ত ব্যাপার। অপ্রীতিকর।

কাজেই দেহের যৌন এলাকাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা গুণেরই বিকার। ঢাকো ঢাকো' বলে যারা চিল্লায়, তারাও যেমন বিকৃত, 'খোলো খোলো' বলে যারা 'হল্লা-য়' তারাও তেমনিই বিকৃত। হারেম গড়ে দ্যাল তুলে ঘোমটায় কাঁসিয়ে যাঁরা 'লজ্জা' বজায় রাখেন তারাও যেমন মর্যাদা-হানির অপরাধে লিপ্ত, বীচ-পার্টি, সুইমীং পুল, ক্যাবারে-সুইং, ব্রাজ-হটপ্যান্ট, টুইস্টের প্যাঁচে ফেঁসে যাঁরা 'লজ্জা' জলাঞ্জলী দেন তাঁরাও তেমনিই মর্যাদা জিয়া-বাউলবা করে গেছেন। ওরে মন সহজ হবি সহজ হবি।

এই সহজেরই সন্তান বনেচরবা। এস্কিমোও বনেচর। কিন্তু ন্যাংটা হতে পারে না, চায় না, হয় না। উত্তর আমেরিকার 'আপাচে'রা উলঙ্গ হয় না। আবার আমেরিণ্ডিয়ানরা হয়। উলঙ্গতাই তাঁদের স্বধর্ম। বেদুইনরা, টোডারা আপাদমস্তক ঢাকা। কিন্তু নিগ্রোরা উলঙ্গ। আফ্রিকার উত্তরের নিগ্রোরা, মুররা, আপাদমস্তক ঢাকা। এরা সবাই বনেচর আদিবাসী। উলঙ্গ কি উলঙ্গ নয় এটা তাদের মোটেই বিব্রত করে না—বিব্রত করে ১২০ ডিগ্রীতে, বর্ষায়, ক্লেদে ভ্যেপসানো, মশা জোঁক-পোকা-মাকড়ে আচ্ছন্ন দুনিয়ায় কাপড়ের ভাঁজের বাইরে বেরিয়ে আসাটাই সুস্থ মনের, এবং সুস্থতর যুক্তির পরিচয় কিনা। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে নদীর তলায় ডুব মেরেই যদি খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়—জোব্বা-জমজম, শাড়ি-লাহাঙ্গা পরি কখন?

ওরা প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখেই প্রকৃতির বাচ্চা। কাপড় না-পরায় আমাদের মতো লজ্জা, তার ঢের বেশী ওদের লজ্জা যে আমরা কিসের জন্য অতো ঢাকতে চাই। কী ঢাকতে চাই? যে ঢাকা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য তার নামে এতো খরচ-খরচা হাঙ্গামাই কেন? ওরা বুঝতেই পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন জিভ কাটে, ছি, ছি করে, ভাবে এই পোলাপানগুলো সেয়ানা কবে হবে! কী অসভ্যরে বাবা!

বুঝতে ওরা পারে না কারণ ওদের যৌন জীবনে আনন্দ আছে। গোষ্ঠীর মেলবন্ধনে যৌথ আনন্দও যেমন, দুজনের বিজনে মেল বন্ধনেও ততো। যৌন সাধনা, যৌন আরাধনা ওদের কাছে, ওদের বাইবেলে তো চুরির ফল নয়। তাই সেটা ওদের কাছে এতো প্রিয়।

ওদের যৌন-জীবন ও যৌন আনন্দে পুরুষের যতো মাতব্বরী এবং মুন্সিয়ানার দরকার, সে তুলনায় মেয়েদের ঢের বেশী। কারণ তিনটি। এক মেয়েদের বেলায় কোনো মেয়ে যদি নিজের বা পুরুষের পুরোপুরি তাগিদ না মেটাতে জানে, না চায়, পুরুষের জীবনে সে মেয়ে হয়তো অপরিহার্য নয়। কিন্তু মেয়ের জীবনে ঐ হিংস্র জংগলে পুরুষের বলিষ্ঠ সাহচর্য যে অপরিহার্য। তাই তাকে খুশী রাখতেই হবে। তবেই শিকারের সময় সে ঠাণ্ডা মাথায় তীর বিঁধতে পারবে। নিজের কথা কম ভাবতে শেখে এ বনেচরী। দ্বিতীয়তঃ, জীবন থেকে জীবনকে কেঁচে তুলতে গেলে আনন্দের পর্বটা যতই রঙীন হোক না কেন, তার পরের পর্বে অসংযত হলে ভূমিষ্ঠ জীবনটিকে সমাজের তীরে টেনে এনে শক্তিমান করে গড়ে তুলতে পারা যাবে না। এ ছাড়াও আছে বহু পতিব্রতের পতিদের মধ্যে কম্পিটিশান। যে মানুষটা কাছে এসেছে, আবার কবে আসবে কে জানে,—তাকে কান্নায়, নালিশে, তাগাদায় বিব্রত করে তুলতে অবসর পেলেও, ইচ্ছা হলেও, সাহস হবে কেন? ইশারা পাবে কেন? বাঁধতে জানাও একটা শিক্ষা। বাঁধার মধ্যেও গুণ থাকা দরকার। সেও সাধনা, সেও ব্রত। কাজেই যৌন লীলা সাধনও সাধন। যৌন সাধনার ব্যাপারে নিগ্রোদের বর্ষীয়সীরা প্রখর ও সচেষ্ট। সে শিক্ষা পুরোপুরি কন্যাকাল থেকেই দেওয়া হয়। পুরুষদের শিক্ষা 'দল' থেকে আসে। ভীত যারা তারা বীর নয়। বীর যারা নয়, সাহসী তারা নয়। সাহসহীন পুরুষ নারীর ভুজবন্ধনে লবণহীন পান্তাভাত।—সাহস, বলিষ্ঠতা,—এ দুটি গুণই নিগুণতার চোখের দুই তারা। (৫)

(চলবে)

(৫) এই তথ্যগুলির জন্য ঋণী জেমো কেনিয়াটার 'আত্মচরিতের কাছে।

হেলেনিক মন ও সুনীতিকুমার

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মৃত্যুর আগে বুদ্ধদেব বসুকে ধরে রেখেছিল গ্রীক নাটক আর মহাভারত, সুনীতিকুমারকে গ্রীক নাটক আর রামায়ণ। এঁরা দুজনেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন হেলেনিক মানসের সমগ্রতার কাছে। ইয়েট্সের ধারণা, এই সমগ্রতার তুলনায় শেক্সপীয়রের নাটকগুলিও যে কিছু উজ্জ্বল ভগ্নাংশমাত্র, দুজনেই সমর্থন করতেন। মজার ব্যাপার, এই সংক্ষিপ্ত অথচ চূড়ান্ত তাৎপর্যময় পর্যায়ে সুনীতিকুমার তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কার ডিঙিয়ে বুদ্ধদেব-কর্ষিত বিশ্বসাহিত্য। তুলনাশ্রিত সাহিত্যকে 'অ্যাকাডেমিক' এলাকার অন্তর্গত করতে শিখেছিলেন। ছাত্রের মতো, কখনো-বা নাদ্ভ নম্রতায় আনুই বা বেশ্রেটের নামে। বানান ও উচ্চারণ আয়ত্ত করে নেওয়ার আগ্রহ তাঁর ছাত্রেরও ছাত্রের কাছে স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করতেন না।

আমার পরম সৌভাগ্য, বুদ্ধদেব আমাকে দিয়ে সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন, আর তার এক দশকেরও পরে 'ভাষাচার্য' সেই ভাষান্তর অনুমোদন করেছিলেন। নান্দীকার আয়োজিত 'আন্তিগোনে' দেখবার পর তাঁর মনে যে-মিশ্র প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, সে সম্পর্কে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই সঙ্গে সেটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঐ সময় কখনো কখনো আমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন, আমি তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ে পাঠ নিতাম, তিনি বাংলা সাহিত্যে হেলেনিক চেতনা আরো সঞ্চারিত করা যায় কিনা সেই মর্মে আমাকে উত্তেজিত করতেন। এরকম দুয়েকটি অধিবেশনের কথোপকথনের কয়েকটি টুকরো এখানে তুলে দিচ্ছি। শেষ সংলাপিকার ঘটনাস্থল কোনো কনস্যুলেটের মহাফিলে। চারদিকে বধির পিপাসুরা আমাদের এড়িয়ে গিয়ে তখন 'লেন' অথবা 'রামানুজন'।

(২)

সু: তুমি তোমার অনুবাদের ভূমিকায় মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের করা Stychomythia (এক-এক লাইনে ক্ষিপ্র কথা-কাটাকাটি) প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা করেছো। ৩৫ পৃষ্ঠায় কথা-কাটাকাটির এই উদাহরণ আমার ভালো লেগেছে:

প্রহরী: আমি কি এখন যাবো? অনুমতি করেন তো যাই।

কেয়োন: তোমার প্রত্যেক শব্দ কাঁটা হয়ে বিঁধছে আমাকে।

প্রহরী: হুজুর, কোথায় বিঁধছে, মাথায়, না কানে, কোন্‌খানে?

কেয়োন: ব্যথার ঠিকানা নেবে বিদূষক নাকি বেয়াদব?

প্রহরী: ফেরারি আসামী তবে বুক-ব্যথা, আমি কর্ণশূল।

কেয়োন: এ কোন লাগাম-ছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল!

প্রহরী: ঐটেই শিখেছি, কিন্তু সেই কাজ কখনো করিনি।

কেয়োন: করোনি? তোমার আত্মা অর্থমূল্যে বিকিয়ে দাও নি?

(এই আট লাইন সুনীতিকুমার স্মৃতি থেকেই তুলে দিয়ে আমাকে বিস্মিত করলেন—]

তোমার বন্ধুদের মধ্যে আর কেউ কি গ্রীক নাটক তর্জমা করেছেন?

অ: আমার একজন তরুণতর সতীর্থ, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈসকাইলাস ও শেলির প্রোমেথেউসের অনুবাদ করেছেন। ঈসকাইলাস থেকে তাঁর করা কথা-কাটাকাটির একটি অংশ এরকম:

ইও: তাঁর শক্তি কেড়ে নেবে কে এমন আছে শক্তিমান?

প্রোমেথেউস: নিজেরই দুর্বুদ্ধি তাঁর নিজেকে মারবে শক্তিবান।

ইও: কিন্তু কেমন করে ক্ষতি যদি না থাকে বলুন।

প্রোমেথেউস: অবৈধ প্রণয়ের পরিতাপে হবে না করুণ।

ইও: দেবী না মানবী সে কে? বলুন বলার যদি হয়।

প্রোমেথেউস: বলব না তার নাম এত কৌতূহল ভালো নয়।

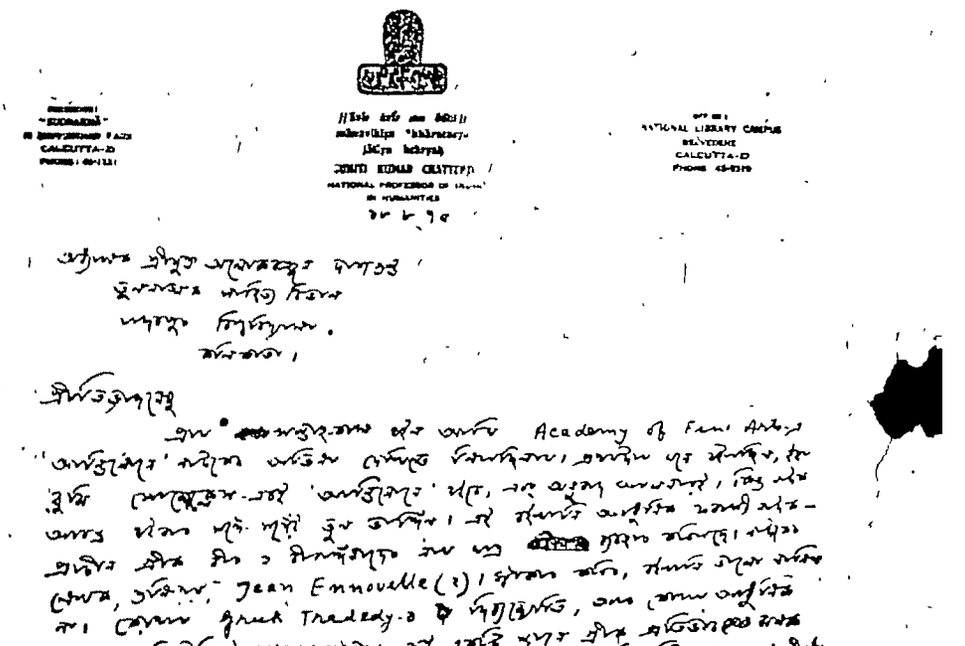

ইও : তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবে শেষে তাঁরই দয়িতা ?

প্রোমেথেউস : না তার যে বংশধর তার কাছে হারবে দেবপিতা।

সু : শুনতে বেশ লাগছে। তুমি আরো অনুবাদ করো। তোমার বন্ধুদের দিয়েও করাও। গ্রীক কোরাসে অনেক জায়গায় বেশ ভালো লীরিকের ব্যাপার আছে। আলাদা করে সেগুলো নিয়ে একটা সংকলন হলে ভালো হয় খুব।

[এমন সময় তাঁর ছোট্ট নাতি পরীক্ষা দিতে যাবার মুখে দাদুকে প্রণাম করতে এল। বেচারাকে তিনি, তার হাতে একফোঁটা সময় না থাকা সত্ত্বেও পিণ্ডার থেকে বারোটি লাইন আবৃত্তি করে আমাকে শোনাতে বললেন। সে কাঁচুমাচু হয়ে চটপট শুনিয়েই, আমাকে হতবাক্ অবস্থায় ফেলে, ছুটে পালাল]

অ : আমার বন্ধু জগন্নাথ চক্রবর্তী কোরাসের এরকম কিছু অংশ সুন্দর অনুবাদ করেছেন :

সালামিসে ফেনায় উদ্বেল
সমুদ্র-ঢেউ, মৌমাছি-মর্মর
তৈলামনের ভ্রমণ করে শেষ
সাত-সমুদ্র সিংহাসনের পর।

অথবা

গুহায় নিয়ে লুকানো যদি যেত
সূর্যহীন, অথবা গিরিচূড়ে,
অথবা মেঘে আবাস বাঁধা যেত
পাখিরা যথা আকাশনীল নীড়ে।

(হিপ্পনতুস)

অথবা

প্রাচীন, জীবধাত্রী ধরিত্রী
মাঠে মাঠে ছড়ায় আনন্দ

সু : বাঃ, মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ শুনছি। আসলে তিনিই তো আমাদের সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়। দুঃখ হয় তিনি গ্রীক কোরাসের কোনো তর্জমা করলেন না।

অ : তা ঠিক, কিন্তু গ্রীক নাটকের কয়েকটি তত্ত্ব মালিনী নাটকে তিনি লীরিকের অন্তঃশরীরে আনতে পেরেছিলেন।

সু : এ বিষয়ে একটু খুলে বলো।

অ : Peripeteia বা অবস্থা-বিপর্যয় দারুণ ফুটেছে সেই জায়গায় যেখানে সুপ্রিয়র সমস্ত আনন্দ ও সম্ভাবনা যখন হাচমকা চুরমার হয়ে গেল, অ-দর্শনপূর্ব হস্তক্ষেপে যখন তার আসন নীড় ভেঙে পড়ল, সেইখানটাতে। আবার এইখানেও :

আমি কি দেখি নি ওরে ?'
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে

[বাকি অংশ সুনীতিকুমার নিজেই মন্ত্রাবিষ্টের মতো আবৃত্তি করলেন—]

সু : এসেছে অনাদিধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপারে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
স্বপ্নে নি কি স্বপ্নাবেশ ?

অপূর্ব সঙ্গীতে
বক্ষের পিঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশা কল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরী উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের তরে—

অ : ক্ষেমঙ্করের এই হঠাৎ-স্বীকৃতির মধ্যে যে-রহস্য আবিষ্কারের চমক আছে তা Anagnorisis -এরই লক্ষণান্বিত। ক্ষেমঙ্করের প্রেমের এই উদ্‌ঘাটন ঐ তত্ত্বেরই ছায়াবহ বললে বোধহয় অন্যায় হয় না। সবশেষে, মালিনীর 'মহারাজা, ক্ষমো ক্ষেমংকরে' উক্তিটির মধ্যে Sophrosyne বা শুভ প্রজ্ঞাই প্রকাশ পেয়েছে।

সু : 'মুক্তধারা'তেও আছে গ্রীক নাটকের Nemesis -এর জগৎ। আছে রক্তকরবীতেও। ভেবে দ্যাখো, এই নাটক রামায়ণেরই নতুন ভাষ্য।

অ : আমার একটি অনুমান আপনাকে সন্তর্পণে জানাই। রক্তকরবী জুড়ে কাজ করছে শস্য-বোনা, বীজের মৃত্যু আর অংকুরের স্ফুরণের আবহাওয়া। রঞ্জন যেন Osiris —তার মৃত্যুর মধ্যেই পুনরুত্থান, পুনর্জন্মের সংকেত। তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ধূলোর আঁচল পাকা ফসলে ভরে উঠল। এভাবেই রঞ্জন পরিণত হলো পুরাণে। এখানে প্রাচ্য পুরাণেরই সার্থক প্রয়োগ হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয় না ?

সু : ঠিকই বলেছো তুমি। তাঁর নাটকে কী করে ভারতপুরাণ মিশরপুরাণ তথা বিশ্বপুরাণের অনুষঙ্গ মিশে গেছে সে-বিষয়ে একটা বই লিখবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু রামায়ণ সম্পর্কে কিছু কথা বলেই তো লোকজনকে চটিয়ে দিয়েছি। এরপর আর কোনো বড় কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না তো।

[বিষণ্ণতার ছায়া একটু সময়ের জন্য তাঁর সর্বজয়ী মুখের উপর কাঁপল। কিন্তু তা ঐ স্বল্পকালের জন্যেই। তারপর আবার

তিনি বাগীশ্বরের স্বাভাবিক প্রতিভার কথা বলে চললেন। সকাল কখন গড়িয়ে গেছে লক্ষ্যই করিনি। বন্ধু শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি, একবার নাকি বিজ্ঞানসাধক রমণ তাঁকে রাস্তায় প্রায়-একলা পেয়ে 'আরে কী খবর ডঃ চ্যাটার্জি' এই বলেই একটানা ঘন্টা দুই কথা বলে গিয়েছিলেন। অধ্যাচার্যের এরকম দুর্দশা আর দ্বিতীয়বার ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।]

(৩)

অ : আধুনিক কবিতা আপনি ভালোবাসেন না এরকম একটা অপবাদ আছে। কথাটা কি সত্যি ?

সু : তুমিই বলো কী আছে সেখানে? রবীন্দ্রনাথের ভাষা আর ভাবনার ঐশ্বর্য কি একফোঁটাও আছে ?

অ : আপনার একথাটা মানতে পারছি না। আপনাকে আগের দিন যে কবিতার বইগুলো দিয়েছিলাম, সময় করে পড়েছেন ?

সু : পড়েছি, পড়েছি। মন টানল না।

অ : যেটুকু মন দেবার কথা আপনিই কি তাই দিয়েছিলেন ?

সু : এ তো তোমার অভিমানের কথা। আচ্ছা ধরো, এই গ্রীক সাহিত্যের বিরাট ঋদ্ধির কথা। তোমাদের কোনো আধুনিক কবি কি সেই জগতের সঙ্গে আজকের জগতটা মিলিয়ে কিছু লিখতে পেরেছেন ?

অ : বিষ্ণু দে-র 'কিবা গ্রীস কিবা ট্রয়' থেকে উপাত্য স্তবকটি আপনাকে শোনাচ্ছি :

আমার ভাগ্য একা বুঝি ? বাম গোটা
সমাজেরই বিধি,
ইতিহাস আজ কানে ধরে-ধরে জানায়
সোনায় বোমায় উচাটনে আর মারণেরই
জয় জয়।
বিশ্বব্যাপ্ত সেই লজ্জার আমি এক প্রতিনিধি,
কেসিডাও আজ অভাগী প্রতীক
দেশের দুঃখ বয়;
কিবা গ্রীস কিবা ট্রয় ?

সু : কী বললে ? ইতিহাস আজ কানে ধরে ধরে জানায় ? এটা একটা বিশুদ্ধ ঠাট্টা। এর মধ্যে কবিত্ব কোথায় পেলে ?

অ : এর মধ্যে কি গ্রীক মানসের উত্তরাধিকার পাওয়া যাচ্ছে না ? আর আমাদের ব্যবহৃত বাগ্‌বুলি ঢুকিয়ে দিলেই কবিতার জাত যাবে, এরকম কথা যদি আপনি বলেন, তাহলে আমরা যাই কোথায় ?

সু : আধুনিক কবিতায় যদি কিছু থাকে, আমার কথায় কিছুই আসবে-যাবে না।

অ : অধ্যাপক হেরমান বার্গার বলছিলেন আপনি নাকি আধুনিক কবিতার নাম শুনলেই চটে যান।

সু : বলেছেন বুঝি ? তা তুমি আর কোনো কবি থেকে আজকের বিষয়টা নিয়ে আর কোনো জায়গা শোনাবে ?

অ : শুনুন শক্তির লেখা একটি কবিতার অংশ। কবিতাটির নাম 'কখনো বুকের মাঝে জাগে গ্রীস' :

অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের।]
আর স্তব্ধ লোভ তবু গ্রীস যেন
অমল মুকুট তুলে ধরে
অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
পড়ে আছি।

সু : এ তো দেখি আমারই মনের কথা। কার কবিতা বললে ?

অ : শক্তির, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।

সু : ওঁর কোন্ বইতে এই কবিতা আছে ?

অ : 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ'। পরের দিন বইটি আপনার জন্যে নিয়ে আসবো।

বইখানি আমার লাইব্রেরি থেকে বেপত্তা হয়েছিল। খোঁজ করে নিয়ে যাবো-যাবো করছি, এমন সময় এল সুনীতিকুমারের মৃত্যুখবর। এখনো বুকের মাঝে জাগে গ্রীস। আর ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও সেই জাগরণে স্মৃতিচর্চার আনুষ্ঠানিক বিচ্যুয়াল ছাপিয়ে, আমাদের সবার বিবেকের মতো দীপ্যমাণ। ভুল বললাম ? জেগে আছেন, নাকি আমাদের স্তূপীকৃত অবিবেকের মধ্যে, দৃপ্ত দামাল যুক্তিজাগর এই মানুষটি অভিমান ভরে ঘুমিয়ে রয়েছেন আজো ? আর সেই অমানুষী বিনয় ? 'ইয়োরোপের যে-কোনো য়ুনিভার্সিটির বারান্দা ঝাঁট দিলে অন্তত দশ-দশটা সুনীতি চ্যাটার্জি পাওয়া যাবে, তোমরা আমাকে নিয়ে এত ভাষাচার্য ভাষাচার্য করো কেন ?'—এই ধরনের উক্তির মূলে আত্মসমীক্ষণের চেয়েও সৌজন্যের ভাগ নিশ্চয়ই ছিল বেশি। আমাদের সুষুপ্তির ভিতরে এর কোনোটাই কি মিলবে ?

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

মোট কথা আমাদের পরিবারের ছেলেরা ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের সদস্য। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও নেহাৎ দু দিনের প্রতিষ্ঠান নয়। শুনেছি ১৯০০ সালের আগে কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের চেষ্টায় ব্রাহ্ম বয়েজ স্পোর্টিং নামে একটা ছোট দল উত্তর কলকাতার পান্তির মাঠে ক্রিকেট খেলা শুরু করে। পরে দ্বিজেন সেন, এইচ বসু আর সারদারঞ্জনের উৎসাহে এর বদলে একটা নতুন দল গড়ে ওঠে, তারি নাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। তারা খেলত মার্কাস স্কোয়ারে। সেখানে আমিও অনেকবার আমার সোনাপিসিমা, অর্থাৎ এইচ বসুর স্ত্রী, আর তাঁর মেয়েদের সঙ্গে খেলা দেখেছি।

১৯২৫ সালে আমাদের পরিবারের অনেকগুলো ছেলে ক্রিকেটে নাম করেছিল। সবাই বলত তাদের দিয়েই একটা খুব ভালো টীম তৈরি হয়ে যায়। শুনে বেজায় গর্ব হত। একেক রকম খেলা কারো বকতে থাকে কিনা জানি না, বরং মনে হয় পরিবেশের জন্য খেলোয়াড় তৈরি হয়। বড় জ্যাঠামশাই যে-যন্ত্র দিয়েছিলেন, তারি জোরে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তৈরি হয়ে গেল। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল যে তাঁর ভাইদের মধ্যে ছোট জ্যাঠামশাই আর বাবা পাকা খেলোয়াড় তৈরি হলেন। সুন্দরজ্যাঠা অর্থাৎ মুকুন্দরঞ্জন ছিলেন বিস্ময়কর অ্যাথলীট, তার একটা ভালো বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু তাঁর নিজের চার ছেলের মধ্যে কেউই খেলাধুলোর দিকে গেলেন না। গেল মুকুন্দরঞ্জনের ছেলেরা। তাদের বিষয়ে আরেকটু বলা দরকার, কারণ খ্যাতির এমনি বিড়ম্বনা যে আজ ঘরে ঘরে যাদের নাম, কুড়ি বছর বাদে তাদের কেউ মনেও করে না। তখন নব নব নায়ক অবতীর্ণ হয়ে মঞ্চ দখল করেছে। সেটাই অবশ্য বাঞ্ছনীয়; কিন্তু বর্তমান জন্ম নেয় অতীতের কোলে। বিগত দিনের খেলোয়াড়রা খেলার গতি যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আজকের উন্নতি অনেকখানি তাঁর ওপর নির্ভর করে আছে। সেকালে মাইকেল তাঁর মেঘনাদ-বধের চতুর্থ সর্গের আরম্ভে বাল্মীকি ইত্যাদিকে মনে করে লিখেছিলেন '...তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবাযামিনি, পশিয়াছে কৃত যাত্রী যশের মন্দিরে, অমর...'

স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় মুকুন্দরঞ্জনের বড় ছেলে শৈলজাকে অনেকবার ক্যাপ্টেন হতে দেখেছি। বলিষ্ঠ শরীর, প্রথম যৌবন পার হয়ে গেছে, একটা পা পুরনো একটা দুর্ঘটনার ফলে কিঞ্চিৎ খোঁড়া। কিন্তু খেলার জাদুকর। আসল কথা হল যে কোনো ক্ষেত্রেই জাদুই বলা যাক, কিংবা প্রতিভাই বলা যাক, তার জন্ম শুধু হাতে কিংবা পায়ে নয়, বরং মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে, তবে হাত-পায়ের কেরামতি না থাকলে, প্রতিভাই বা দাঁড়াবে কোথায়?

শৈলজারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আশীর ওপর বয়স, এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর ছোট হেমন্তা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। হকি, ক্রিকেট দুই-ই ভালো খেলতেন। তিনি নেই। তাঁর ছোট নীরজা ছিলেন আশ্চর্য গুণী খেলোয়াড়, শুধু যে ক্রিকেট খেলতেন তা নয়, খেলোয়াড় তৈরি করতেন। আমি কয়েকজন দক্ষ ক্রিকেটারদের শুনেছি নীরজাদাকে 'গুরু' বলে উল্লেখ করতে। তাঁর ছোট ইন্দুজা লম্বা বলিষ্ঠ মানুষটি। একে অমারা বলরামদা বলে ডাকি। সেকালে একে দিয়েই পিসিমার ছেলেরা ওদের বদমেজাজী কুমীর পালালে, তাকে ধরাত। ভয়-ডর বলে ওর কিছু ছিল না; দড়ির ফাঁস দিয়ে অত বড় কুমীরটাকে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসত। বলরামের ছোট দুই ভাই ক্ষীরজা আর নৃপজাও ক্রিকেট খেলত।

সোনা পিসিমার তিন ছেলে গণেশদা, কার্তিকদা আর বাপি রূপে-গুণে বিখ্যাত ছিল। শুধু খেলার মাঠে বল পিটিয়ে ওদের খেলার শখ মিটত না। অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটে ওদের বাড়ির খাস জমিতে কোনো দিন ফুলবাগান হল না। তার বদলে হল একটা ২২-গজি ক্রিকেট পিচ্। সেখানে কত যে অল্পবয়সী অজ্ঞাতকুলশীল সম্ভাব্য ক্রিকেটারকে উৎসাহ আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত তার ঠিক নেই। স্বনামধন্য পংকজ গুপ্তের কাছে শুনেছি ও বাড়ি থেকে তিনি যা লাভ করেছিলেন তার মূল্য হয় না। বেচুদা, প্রেমাদা এবং ওদের ছোট ভাই আরেক গণেশও ওখানে গিয়ে আলোচনার আর অভ্যাসের ফলে দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল।

বেচুদার কথাও বলতে হয়। খেলা এক জিনিস আর পরিচালনা আরেক জিনিস। দুটিতেই দক্ষ হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। ১৯২০ সালে শিলং থেকে আমরা যখন কলকাতায় এলাম তখন আমার বয়স ১২, বেচুদার হয়তো ২১। তখনো ওর নাম হয়নি, ওর মধ্যে এতখানি ক্ষমতা আছে বোঝা যায়নি। তাছাড়া ও একটু পিছনে সরে থাকত। সোনাপিসিমার চটকদার ছেলেদের যত ভক্ত ছিল, বেচুদার ছিল না। ওর প্রতিভা তো আর শুধু চোখে-লাগা ছিল না, তার পরিচয় পেতে আরো গভীরে নামা দরকার। তাছাড়া তার প্রশিক্ষণ হয় হাতেকলমে এবং অনেক বছর ধরে। গণেশদা, কার্তিকদা যখন ভাবল ওদের খেলার বয়স অতিবাহিত হয়েছে, বেচুদার প্রতিভা তখনো খুলছে। বেচুদা হকি ফুটবলেও সমান উৎসাহী।

বেচুদাকে সবাই এম দত্তরায় বলে জানে। আজ পর্যন্ত আশীর কাছাকাছি পৌঁছেও, তার বিচারবুদ্ধি এবং উৎসাহ ম্লান হয়নি। ১৯৩৮ সাল থেকে ২৭ বছর আই এফ এ-র সেক্রেটারি। অল ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ৯ বছর, প্রেসিডেন্ট ১৪ বছর। ১৯৪৬ থেকে ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত। আরো বহু উচ্চপদ বেচুদা দক্ষতা ও প্রশংসার সঙ্গে ভূষিত করেছে। সম্প্রতি ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। মেয়েদের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে বেচুদার মতো উৎসাহী লোক কম আছে। আমার উৎসাহটা স্রেফ মানসিক বলে সে আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়েছে। তাছাড়া বেচুদা, প্রেমাদা দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, জেল-খাটা ছেলে। অনেকদিন বাড়িতেও অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল।

সমালোচকও আছে অনেক এম দত্ত রায়ের। যারাই দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যায়, তাদেরি সমালোচক থাকতে বাধ্য। আপাততঃ সেকথা ছেড়ে দিয়ে প্রেমাদার বিষয়ে একটা ছোট গল্প বলি, যার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে হলপ্ করে বলতে পারব না। ঘটনার দিবস সন্ধ্যাবেলায় নীরজাদার কাছে শোনা। সম্ভবতঃ সত্যিই।

ইডেন গার্ডেনে বোধহয় স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের খেলা হচ্ছে। প্রেমদা ব্যাট করছে। সেদিন বেশ ফুর্তিতে আছে, সবাই আশা করছে বেশ কিছু তুলবে, এমন সময় পিচের মধ্যখানে থেমে মাটি থেকে কি একটা কুড়োতে গিয়ে আউট হয়ে গেল। খেলার ফলাফল মনে নেই, ছোটজ্যাঠা বলতেন 'ফলাফল আবার কি? ভালো খেলা হল ভালো খেলা, তা যে দলই খেলুক।' ক্লাবে এসে অন্য সকলে ওকে চেপে ধরল। 'কি কুড়োলে?' প্রেমাদা বলল, 'পান। পকেট থেকে পড়ে গেছিল।' 'পান পড়ে গেছিল তো গেছিল, তার জন্য বান ছেড়ে দিলে?' প্রেমাদা বলল, 'গুন্ডি আছিল।' শৈলদা বেজায় চটে গেল, 'সায়েবরা পাছে গুন্ডি দেখে তাই এত ভয়? ছি! ছি!'

প্রেমাদা বলল, 'সাহেববা না, বড় মামাও আছিলেন যে।' বড়-মামা অর্থাৎ সাবদা-রঞ্জন। তক্ষুনি সবাই ওকে ক্ষমা করে দিল।

ওদের বাড়ির একটা ভূতের গল্প শুনেছি। ফ্ল্যাট বাড়ি, পাঁচতলার ছাদে সবাই কাচা কাপড় শুকোত। একদিন কাপড় তুলতে ভুলে গেছিল বলে, রাতে ধোকরা চাকরকে ছাদে পাঠানো হল। সে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে বলল, 'ছাদে বাছুরের মতো বড় কুকুর আছে।' বেজায় অবাক হয়ে ধুপধাপ করে জনাপাঁচেক ছাদে ছুটল। গিয়ে দেখে সত্যি সত্যি বাছুরের মতো বড়, কুচকুচে কালো একটা কুকুর। ওদের দেখেই কুকুরটা আকাশের দিকে মুখ করে বিকট স্বরে ভৌ উ-উ-উ করে ডেকে, একলাফে আকাশে উঠে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। দর্শকদের চক্ষু স্থির। বলা বাহুল্য এটাও শোনা গল্প, সত্যি কিনা সন্দেহ হয়। তাতে কি খুব এসে যায়? যারা মাছ ধরে, তাদের সব গল্পই কি বর্ণে বর্ণে সত্যি?

(২৮)

মনে হয় বিধাতা যাকে যতখানি গুণ দেন, তার সবটুকুই দান করে দিতে হয়। দান করতে হলে অনুশীলন চাই, সাধনা চাই। অর্থাৎ নিজেকেও অনেকখানি দান করতে হয়। নইলে গুণ থেকেও, নেই। আমার পিসিমার গুণী ছেলে-মেয়েদের দেখে বারে বারে সেই কথাই মনে হত। বড় ছেলে হিতেনদা রূপে-গুণে মানুষের মন জয় করে নেবার মত ছিল। মৌলবী রেখে আরবী, ফারশী শিখল। ওমর খৈয়ামের মূল রুবাইতের সুন্দর বাংলা অনুবাদ করল। কবি কান্তি ঘোষের মিষ্টি অনুবাদ মূল রুবাইত থেকে করা হয় নি, হুবহু ফিটজেরাল্ডের ইংরিজির অতি মধুর বাংলা কিন্তু ওমর খৈয়ামের বাং থেকে তার মেজাজ-ই আলাদা। তবে কানে ঝম-ঝম করে, চোখে ফুলঝুরি দেখায়, পাঠকদের বেশীর ভাগ তাই চায়। কান্তি ঘোষকে সবাই চেনে, হিতেন বসুর নাম ও শোনে নি। কি করে শুনবে? কোন প্রকাশকের হাতে বই দিল না হিতেনদা। এত বিদ্যে সত্ত্বেও, আর কিছু করেছে বলে জানতে পারলাম না। ছবি আঁকত সুন্দর। কিন্তু ঘরের কোণে বসে, সযত্নে বাইরের লোকের চোখ এড়িয়ে।

নীতীন আর মুকুল বসু সামাজিক জীবন পরিহার করে চলতে পারে নি, কারণ চলচ্চিত্র জগতে যে একবার নিজেকে জড়িয়েছে, তার আর সে উপায় থাকে না। পিসিমার বড় মেয়ে মালতী ঘোষালকেও সবাই চেনে। যেমন গলা, তেমনি সাধনা। গোপেশ্বরবাবুর ছাত্রী ছিল। আজ পর্যন্ত গানের সাধনা অক্লান্তভাবে করে চলেছে। বেচুদা যেমন ক্রীড়ার সাধনা করে চলেছে। এ-সব মানুষ কখনও বুড়ো হয় না। মালতীদি বা বেচুদাও হয় নি। কিন্তু আমি বলছিলাম অন্য ভাই-বোনগুলির কথা। গণেশদাদা, কার্তিকদাদা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত হওয়া উচিত ছিল। বাপীকে কজন চেনে? মালতীদির আরও তিনটে গুণী বোন আছে, কে তাদের খবর রাখে? ময়নার গলা অনেকে বলত মালতীদির চেয়েও ভাল? কিন্তু সে সাধনা কোথায়? ললিতাও অদ্ভুত ভাল গায়। অরুণা চমৎকার ছবি আঁকত। আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে শিখেওছিল অনেক দিন। কিন্তু কোথায় সেই সাধনা যা দিয়ে মানুষ শিল্পীত্ব পায়? একটা সুরের একটুখানি বেশ একবার কানে গেলেই হল। আমনি শেখা হয়ে গেল, গলায় এসে গেল, কে, কবে, কি-রকম, সব জানা হয়ে গেল কত-টুকু প্রতিভা নিয়ে কত লোক বিশ্ববরেণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এদের বিধাতা দু হাত ভরে দান করেছিলেন, তবু সবাই ওদের নামও জানে না। তবে ওদের সান্নিধ্য আর ভালবাসা পেয়ে আমার জীবন আনন্দে ভরে গেছিল।

এরই মধ্যে দেখতাম দুটো দল আছে, একটা বুড়োদের, একটা ছোটদের। বাবা, ছোটজ্যাঠা স্পোর্টিং ইউনিয়নের নতুন খেলোয়াড়দের সমালোচনা করতেন এবং ভাল মনে করেই করতেন। তাদের মতে এরা নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। গণেশদাদারা কিছু বলা হল কি না হল, অমনি ফেপাশ করে উঠত। তাদের মতে বুড়োরা সেকেলে, টেকনিকের কিছু বোঝে না। আমরা পড়ে যেতাম মাঝখানে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে দুই পক্ষের মধ্যেই কিঞ্চিৎ বালকত্ব প্রকাশ পেত। এরা ক্যাচ ফেলে দেয়। এই নিয়ে যে এত উত্তেজনা জমে উঠতে পারে সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত খেলাটাকে ততটা গুরুত্ব দিতে পারি নি বলেই এ-কথা বলছি।

সন্ধ্যে সাতটা বাজলেই আমি তিন-তলায় নিজের ঘরে পড়তে চলে যেতাম। পাশাপাশি দুটি ঘর একটি দিদির, একটি আমার। মধ্যিখানে একটা দরজা, সেটিকে কখনও বন্ধ দেখি নি। আমার ঘরে একটি সরু খাট, একটি পড়ার টেবিল, একটি বুক-কেস। দিদির ঘরটা একটু ছোট, তাতে শুধু একটি খাট। আমার বিয়ের আগে কখনও ড্রেসিং টেবিলের মালিক হই নি। বাড়িতে একটা কাপড় ছাড়ার ঘরও ছিল, মেয়েদের সার্বজনীন' আলনা, দেরাজ আর দেরাজের ওপর একটা আয়না ছিল। দুটো কাঠের আলমারী ছিল। তার একটার দরজায় মস্ত আয়না ছিল। প্রসাধনী জিনিস বলতে মাথার জন্য নারকেল তেল, সাবান, ট্যালকম পাউডার। শীতকালে ১।৩ গ্লিসারিন, ১।৩ লেবুর রস, ১।৩ জল মিশিয়ে শিশিতে ভরে রাখা হত। রাতে শোবার সময় হাতে, পায়ে মুখে মাখা হত। একশো বার বলব আজকালকার কোন বৈজ্ঞানিক সুগন্ধী প্রলেপ তার কাছে লাগে না। চামড়া হয়ে যেত স্যাটিন। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

একটিমাত্র বিলাসিতার কথা বলতে হয়। এইচ বসু কোম্পানির তৈরি কি যে সব চমৎকার নাম-ওয়ালা সুগন্ধ দ্রব্য তৈরি হত সে আর কি বলব। নামগুলোও যেমন রোমান্টিময়, গন্ধগুলোও তেমনি মৃদু মধুর। একটার নাম ওয়াইল্ড গ্রাস, শুকনো ঘাসের মধুর গন্ধ, নাকে এলেই ছোটবেলাটাও হুড়মুড় করে ফিরে আসত। আরেকটার নাম 'মিশরী', ধূপধুনোর গন্ধ। আজকালকার কৃত্রিম ধুনোর গন্ধ নয়, শিলং-এর সরল গাছের বনের আঠায় ভরা ধূপকাঠের গন্ধ। পিসিমার মেজ ছেলে আসানদা আমাদের অঙ্ক। প্রথম দুটো মনে হত বেজায় সহজ। এনে দিত। ভাবি এমন জিনিস আর তো দেখলাম না। অথচ ব্যবসাটাকে পর্যন্ত এরা রক্ষা করতে পারল না।

সে যাই হোক, তারই মধ্যে আমার আই-এ পরীক্ষা এসে গেল। সেই পুরনো অঙ্গীকারটা মনে পড়ল, কিন্তুতেই ১২তম কি ১৩তম হব না। নম্বর তোলা তিনটি বিষয় ছিল আমার হাতে: লজিক, বটেনি, অংক। প্রথম দুটো মনে হত বেজায় সহজ। কোন জিনিস দুবার মন দিয়ে পড়লেই বেশ শেখা হতে যেত। বইগুলো একেবারে পাখি-পড়া হয়ে গেল। অংকের সব বইয়ের সব অংক কষে তৈরি করে ফেললাম। এ বিষয়ে আমার মস্ত একটা অবলম্বন ছিল দাদা। দাদার মত অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্কের মাথা আমি আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ম্যাট্রিকে পুরো নম্বর, আই এস-সিতে পুরো নম্বর পরে বি এস-সিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে, হার্শেল সুবর্ণ পদক পেয়ে, জুবিলি স্কলার হয়ে, শেষটা কি হল? না কর্তৃপক্ষের কটুক্তি চটিয়ে এম এস-সিতে তাঁর পেপার নাকচ হয়ে, থার্ড ক্লাস পেয়ে পথভ্রষ্ট দিল। এমন পরাজয় আমি ভাবতে পারি না। আমি হলে পিওর ম্যাথেম্যাটিকস নিয়ে প্রথম হয়ে দেখিয়ে দিতাম। দেখতে দেখতে পরীক্ষা হয়ে গেল। তার কয়েক দিন আগে কুলদাদার ছোট বোন বারবির সঙ্গে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের বিয়ে হল, ব্রহ্ম

শ্বেত দাগ

আমাদের চিকিৎসা থেকে রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে। মাত্র তিনদিন ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়।

MRITUNJAYA SUDHA AUSHDHALAYA
P. O KATRI SARAI (GAYA)

ডঃ দীপক দে-র

বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০.০০
(পি এইচ ডি, গবেষণা গ্রন্থ)

অবাঞ্ছিত (উপন্যাস) ৪.০০
(পাকিস্তান থেকে হিন্দুর আগমন)

মাষ্টার মশায় ৫-৫০
(শিক্ষক জীবন নিয়ে উপন্যাস)

উদারপন্থী (উপন্যাস) ৫.০০

কলকাতা দেখেছি ৪.০০

দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

মতে, কিন্তু এ বিয়েও রেজিস্টার হল না। বাবা কোন উচ্চবাচ্যও করলেন না, গেলেনও না, আমাদের যাওয়াতে কোন আপত্তিও করলেন না। প্রশান্ত মহলানবিশ তখন কিছু দিনের জন্য আলিপুরের হাওয়া-আপিসের অধ্যক্ষের কাজ করছিলেন। চাঁদনি রাত। ফাল্গুন মাস। শোনা গেল বাগানে বিয়ের সভা বসবে, মাথার ওপর চাঁদোয়া থাকবে না, ফুল দিয়ে বেদী সাজান হবে—বলাবাহুল্য বুলোদা সাজাবে—কিন্তু কোন আলোর ব্যবস্থা থাকবে না, কারণ কৃত্রিম আলোর এমন বদভ্যাস আমাদের যে প্রকৃতির দেওয়া চাঁদের আলো উপভোগ করতে ভুলে গেছি। মন্তব্যটা যে প্রশান্তদার সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, বিয়েতে পৌরোহিত্য করবেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তা তিনি বিবাহস্থলে এসেই বললেন, আমি লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পৌরোহিত্য করব, আলো না হলে আমার চলবে না।

তখন আলোর ব্যবস্থা করার সময় নেই, কয়েকটি মটর গাড়ি অকুস্থলে এনে, তাদের হেড লাইটের আলোতে বিয়ে হল। এমন বিয়ে কখনো কোথাও হয়েছে বলে শুনি নি। বিয়ের পর উৎকৃষ্ট জলযোগের সময় রোগা লম্বা একটা অচেনা ছেলে এসে আমাকে আসন্ন ইংরিজি পরীক্ষার দুটো প্রশ্ন বলে দিয়ে গেল। এবং পরে দেখলাম ঠিক তাই না হলেও, সেই বিষয়েই দুটি প্রশ্ন এল! যদি প্রশান্তদা ভেবে থাকেন যে ঐভাবে হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানের মত ব্রাহ্ম বিয়ে থেকেও রেজিস্টার অমর্যাদা তুলে দেবেন, তিনি নিশ্চয় হতাশ হয়েছিলেন। কারণ সেটা হওয়া দূরে থাকুক, উল্টে এখন হিন্দু বিয়েও রেজিস্টার হচ্ছে বলে শুনতে পাই।

পরীক্ষা হয়ে গেল। যথাসময়ে ফলও বেরুল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুনীতকুমার ইন্দ্র প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় হয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাট্রিকে যারা প্রথম দশ-জনের মধ্যে হয়েছিল, তাদের প্রায় কারো নামই দেখতে পেলাম না। এই প্রসঙ্গে আমার অনেক সময় মনে হয়, একটা পরীক্ষায় কে দৈবাৎ প্রথম কে বা দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি নবম বা দশম হল, তাই দিয়ে তাদের যোগ্যতা বিচার করার নিয়মে অনেক খুঁৎ আছে। সাধারণত দেখা যায় দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১, কি ২ বা ৩ নম্বরে তফাৎ হয়, তাও সামগ্রিক সংখ্যায়। পরীক্ষকও একজন নন। একজনের কাছে যে ছাত্র ১০ পেল, আরেকজনের কাছে সে-ই হয়ত ৭ পেত, বা ১৫ পেত। তাহলে আর যোগ্যতা বিচার থাকে কোথায়? এ বিষয়ে একটা গল্প না বলে পারছি না।

আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন ম্যাট্রিকের বাংলা পরীক্ষক ছিলেন, সে-কথা আগেও বলেছি। এ-ও তাঁর কাছেই শোনা। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একরকম তাঁর সৃষ্টি বলা যেত, কাজেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ওপরেও যে তাঁর সযত্ন দৃষ্টি থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ওপরে আমি যে মন্তব্যগুলি করেছি, তিনিও সেই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে, পরীক্ষকদের সবাইকে ডেকে একটা প্রশ্নপত্রের উত্তরে তাঁদের বিচারমতো নম্বর দিতে বললেন। নম্বর অবশ্য উত্তরের গায়ে লেখা হবে না। শেষে দেখা গেল ঐ পেপারে কেউ দিয়েছেন একশোতে ৭০, কেউ বা দিয়েছেন ৪০! তাহলে ন্যায্য বিচার কোথায় হল? অবিশ্যি এ-কথাও সত্যি যে ভালো ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ ভালো নম্বরই পেয়ে থাকে; অপ্রত্যাশিত রকম বেশি বা সামান্য কম হতে পারে, কিন্তু খুব তফাৎ কদাচিৎ হয়। এক যদি না পরীক্ষার্থী কোনো গোলমাল করে ফেলে থাকে। সেকালে যে-বছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী বসত, সবাই বলত, বাবা! এত ছেলের মধ্যে সুবিচার হওয়া শক্ত! তাও সে-সময় সমস্ত পশ্চিমবাংলা এবং এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয় সে জায়গা, এই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে পরীক্ষার্থী আসত। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও কত বিস্তার ঘটেছে বলতে হবে। কাজেই গুণ বিচারের কাজও আরো কত জটিল হয়ে উঠেছে, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব কারণে পরীক্ষার ফলকে আমি খুব বেশি প্রাধান্য দিই না। আরেকটা কথাও আছে। কতবার দেখেছি পরীক্ষায় যারা উচ্চ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়, পরে কর্মক্ষেত্রে তারা ততখানি দক্ষতা দেখাতে পারল না। আবার কত কর্মী সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাস করে, কর্মজীবনে আশ্চর্য গুণ দেখিয়েছেন। আসলে কতকগুলো অন্য লোকের-চিন্তায়-ভরা বই গিলে, কাগজে সেগুলি উদ্গীরণ করা ছাড়া আরো কিছু সামর্থ্যের দরকার থাকে। অনেকে তো স্রেফ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জোরেই অনেক দূর এগিয়ে যায়।

আই এ পড়বার সময় আমরা তিনটি গুণী বন্ধু লাভ হয়েছিল। এদের সঙ্গে কলেজে চার বছর পড়েছিলাম। আই এ পরীক্ষায় এদের মধ্যেও দুজন বৃত্তি পেয়ে ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে আমার সঙ্গে পড়তে লাগল। ওদের তিনজনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল। দুঃখের বিষয় কেউ বেশি দিন বাঁচেনি। একজনের নাম সুধা ঘোষ, বিধান-চন্দ্র রায়ের কি রকম ভাগ্নী; একজন নীতা মুখার্জি, ডঃ পি কে রায়ের নাতনি, দেশ-কর্মী রেণুকা রায়ের ছোট বোন; একজনের নাম লিলি সেন, আশ্চর্য রকম গুণী মেয়ে ছিল সে। এখন ভেবে দুঃখ হয় এদের অসুখী জীবন এবং অকাল মৃত্যুতে কত গুণ বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। যাই হক, তখন আমাদের ফুর্তি দেখে কে! ছাত্রীজীবন যে কত মধুর হতে পারে, ভেবে ভালো লাগে।

এখন মনে হয় কলেজের ঐ প্রথম দুটি বছর বড় ভালো ছিল। বড় হওয়ার বছর। আপনা থেকে সাবালিকা হবার বয়স। ১৮তে আই এ পাস করলাম। তার আগে কলকাতার অতুলনীয় সাংস্কৃতিক জীবনের একটা দিকের আস্বাদ পেলাম। দেখলাম সাহিত্য উপভোগের একটা সামাজিক দিকও আছে। শুধু বই পড়ে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাই সব নয়। পাঁচজন সাহিত্যিক আর সাহিত্য-নুরাগীর সঙ্গে মিশে আরেক রকম রস পাওয়া যায়। তাতে এক দিকে যেমন আমার সাবালকত্ব পাওয়ার ভারি সুবিধে হয়েছিল, অন্য দিকে নিজের চিন্তাগুলোকে একটু যাচাই করার অভ্যাসও অল্প অল্প রপ্ত হয়েছিল। অন্ততঃ শুরু হয়েছিল। দুটি মানুষের সংস্পর্শে এসে এটি সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আর তাঁর স্বামী প্রমথনাথ চৌধুরী। এঁদের নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার না থাকলেও, আমার জীবনে যখন তাঁরা নবাগত হয়ে প্রবেশ করলেন, মনের মধ্যে নতুন একটা সাড়া জেগেছিল। একটা সচেতনতা, নিজেকে প্রকাশ করার একটা ইচ্ছা, একটা পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস। এমন মানুষ আমি আগে দেখিনি। কোথাও এতটুকু ছেলে-মানুষি ছিল না তাঁদের। সারা জীবন যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল রসের মধ্যে ডুবে থেকেছি, এ তার থেকে আলাদা। এর জন্য মনে হত অনেক দিন ধরে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল; জন্মগত ক্ষমতা-গুলোকে কঠোর শাসনে রাখতে হয়েছিল; ভারি একটা সুশ্রী শালীনতার গণ্ডির মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে হয়েছিল। ফলে যা লাভ হয়েছিল, তাতে বৈদগ্ধ ছিল, সুরুচি ছিল, আত্মসচেতন শিল্পবোধ ছিল; তীক্ষ্ণ মেধা ছিল; সঙ্গে সঙ্গে এক রকম আড়ষ্টতাও ছিল, নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে ফেলার একটা ভীতি ছিল। শেষ পর্যন্ত দুজনার মধ্যে কেউ একবারের জন্যেও মনের ঘোড়ার বল্গা ছেড়ে দেননি। ঝরঝরে সুন্দর গান, গল্প, সুর স্বরলিপি তৈরি হয়েছিল।

(চলবে)

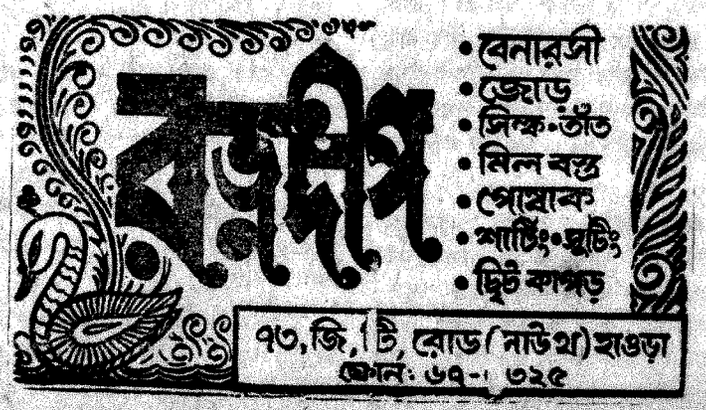

দিল্লির মতি মসজিদ

বাংলার বাইরে বাঙালী

দিল্লী

বাড়ি ফিরতে সেদিন রাত হয়ে গেল। কৈলাসে এক বন্ধুর বাড়িতে ছুটির সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ফিরছিলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছুতে প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা। আশেপাশে থ্রি-হুইলার (স্কুটার) মিলল না। দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্টের নিওন আলোয় একটা মায়াবী নির্জনতা। রাস্তার দুপাশে সুদৃশ্য বাড়ি। বাড়িগুলোতে আলোর মৃদু কারুকাজ। কোথাও কোথাও লাল ইঁটের ঘর-কাটা। নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে অন্ধকার পোড়োবাড়ির মত একেবারে নতুন এইসব বাড়িতে লণ্ঠনের মৃদু আলো। কলকাতার বন্ধ দোকানগুলোর ফাঁকে ইঁটে সাজানো উনোনের মতো সেখানেও তেমনি আয়োজন। উনোনের চারপাশে ওই একই রকম মানুষের মুখ।

এমনি এক বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পাশের কাঁটাঝোপের অন্ধকার থেকে একটি কচি মেয়ের গলা নির্জনতা ভাঙল : বাবা! ওগরে কাছে নাই! চমকে ওঠার আগেই আমার পাশ থেকে গেঞ্জি আর উঁচু-করে-পরা ধুতিঅলা মাঝবয়সী একটা লোক উত্তর দিল : ঠিক আছে। তুই বাড়ি যা! ঈষৎ অন্ধকারে হোক বা অন্যমনস্কতায়, লোকটাকে খেয়াল করতে পারিনি। পাশের রাস্তাটা ধরে লোকটা হন হন করে চলে গেল।

লক্ষ্য করলাম, মেয়েটা পোড়োবাড়ির মত নতুন বাড়িটাতে 'মা মা' বলে ডাকতে ডাকতে ঢুকল। নতুন বাড়ি উঠছে। দরজা-জানালা নেই। তাই আবদ্দুর বালাই নেই। বাড়িটার ভিতরটা লণ্ঠনের আলোয় বেশ ঠাওর করা যাচ্ছিল। আমার দেখতে সাধ হল।

রাস্তার ওপরে ল্যাম্পপোস্টটার গলায় 'বাস-স্টপ' ঝুলছে। জানি, এত রাতে এপথে বাস যায় না। তবু সিগেট ধরিয়ে তার নিচে দাঁড়ালাম।

উনোন জ্বলছে। তার কাঁপা আলোয় তিনটে প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে। নির্জনতার কারণে ওদের কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। পূর্ববঙ্গের মানুষ এমনিতে জোরে কথা বলে। মেয়েটার বয়স বছর দশ-বারো। একটা বছর চারেকের ছেলে, গেঞ্জী গায়ে। ন্যাংটো। মায়ের গায়ে এলিয়ে ঘরের এককোণে কী দেখছে। মহিলা বোধ হয় এদের মা। খুব ধীরে ধীরে খুন্তি পড়ছে। কড়াই বোঝাই শাকপাতা। পাশে তেলের শিশি। খালি নয়।

বুঝতে পারছিলাম না, মেয়েটা 'ওগরে' কাছে কী আনতে গিয়েছিল। তেলের দাম এখন প্রায় চোদ্দ টাকা, তার অভাব নেই। লোকটাই বা হনহনিয়ে কী আনতে ছুটল? কারও অসুখ, এমনটাও মনে হচ্ছে না।

এসব বাড়িতে রাতে যারা থাকে, তাদের চৌকিদার বলে। কনট্রাকটরের লোক এরা। দিনে গতর খাটে, রাতে পাহারা দেয়। বাড়ির মালিকরা যে অর্থে পাহারা দেয়, ঠিক সেই অর্থে। কনট্রাকটর যদি চালু বিজনেসম্যান হন, তবে এদের বাসার অভাব হয় না। বাড়ি হাত-বদলের দিন অবধি এরা থাকে। রাজধানীর মতো দামী শহরে বাসা-ভাড়ার কথা এদের ভাবতে হয় না। এই ফাঁকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফাঁকে ফোঁকরে ওরা কাজও করে। তবে টেম্পোরারি। বাড়ির ইঁটের কাঠামোটা দাঁড়িয়ে গেলে কাজ পড়ে ছুতোর আর কামারের। চুণকামের কাজ আরও পরে, তাই মাঝখানে এদের সময় মেলে। রাস্তার বাজারে দু-চারটে মুলো, শালগম কিংবা আলু নিয়ে বসে যায়। দিল্লির সর্বত্রই বাজার বসে সন্ধ্যায়। তাই কাজের সঙ্গে ব্যবসার সময় নিয়ে বিরোধও হয় না।

মেয়েটা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। ধুলোয় একাকার হয়ে গেল ঘরটা। ধোঁয়ার মতো সেই ধুলো বাইরে আসছে। মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল : তরে কেডা কাম করতে কল। তর বাবা গ্যালো কই? মেয়েটা নাক-মুখ মুছতে মুছতে কিছু বলল, শুনতে পেলাম না।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে মা আবার রান্নায় লেগে গেল। লণ্ঠন উঁচিয়ে কড়াই দেখল।

লোকটা বেশ ছুটে ছুটেই আসছে। গেট পেরিয়ে ঢুকতেই স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠল, তোমার সব কামেই বাড়াবাড়ি। পোলাডা ঘুমায় গ্যালো। হুঁশ নাই।

লোকটা কিছু বলল না। ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মেয়ে আর স্ত্রী ঘরের একটি কোণে কী দেখছে। বোধহয় লোকটা সেখানে দাঁড়িয়ে। আমি একটু সরে এসে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখা যাচ্ছে না। লোকটা করছে কি?

হঠাৎ ঝলমল করে উঠল ঘরটা। বিজলী আলোয় সারা ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। সমস্ত ঘরটা নজরে পড়ছে। কোথাও কিছু নেই। এবরো খেবড়ো। এলোমেলো ইঁটের সাজ। কলকাতার নিমতলার শ্মশানের বিশ্রামাগারটার মতো আবরণহীন। সবার মুখে একটা হাসি নজরে পড়ল। লোকটা বেশ গর্বের সঙ্গে বাইরে এসে একটা ইঁটের ওপর বসল।

আমি চলতে শুরু করলাম। শোনা যাচ্ছিল লেকাটার স্বর : এরপর যদি বল কাইটা যায়, আমি কিন্তুক আর যাইতে পারুম না। [illegible]

বোম্বাইয়ে শরৎ-নাট্যোৎসব

বম্বের দাদার শিবাজী পার্ক দুর্গাপূজা প্রাঙ্গণে এ বছর চার দিন ব্যাপী অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতি-যোগিতায় স্থানীয় কয়েকটি নাট্যসংস্থা অভিনয় পরিবেশন করেন। এর মধ্যে অম্বর-নাথ বাঙ্গালী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'পণ্ডিতমশাই' নাটকটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবসন্ত ভট্টাচার্য। কুঞ্জনাথ চরিত্রে পরিচালক স্বয়ং শ্রীচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমবেত দর্শক ও বিচারকমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন তাঁর চমৎকার অভিনয় ও সুন্দর প্রয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমে। বিভিন্ন চরিত্রে কুসুমের ভূমিকায় শ্রীমতী পাপি বাসুরায়, ধবাশুড়ী—শ্রীমতী মমতা কুণ্ডু, মা—শ্রীমতী রীতা সামন্ত, ব্রজেশ্বরী—শ্রীমতী ইভা ভট্টাচার্য সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া সর্বশ্রী দেবব্রত সিনহা বিনয় রায়চৌধুরী, অরুণ সরকার, কুমারী মৌসুমী মজুমদার, অরূপ ঘোষ, অরুণ মুখার্জি, হরিশংকর চন্দ, স্বদেশ মিত্র, শিশির দাস, জগজিৎ পাল ও সমরেন্দু ভট্টাচার্য সকলেই সুঅভিনয় করেন। নাটকটির দলগত অভিনয় ও পরিবেশনার ভূয়সী [illegible] প্রশংসনীয়।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ও চীন

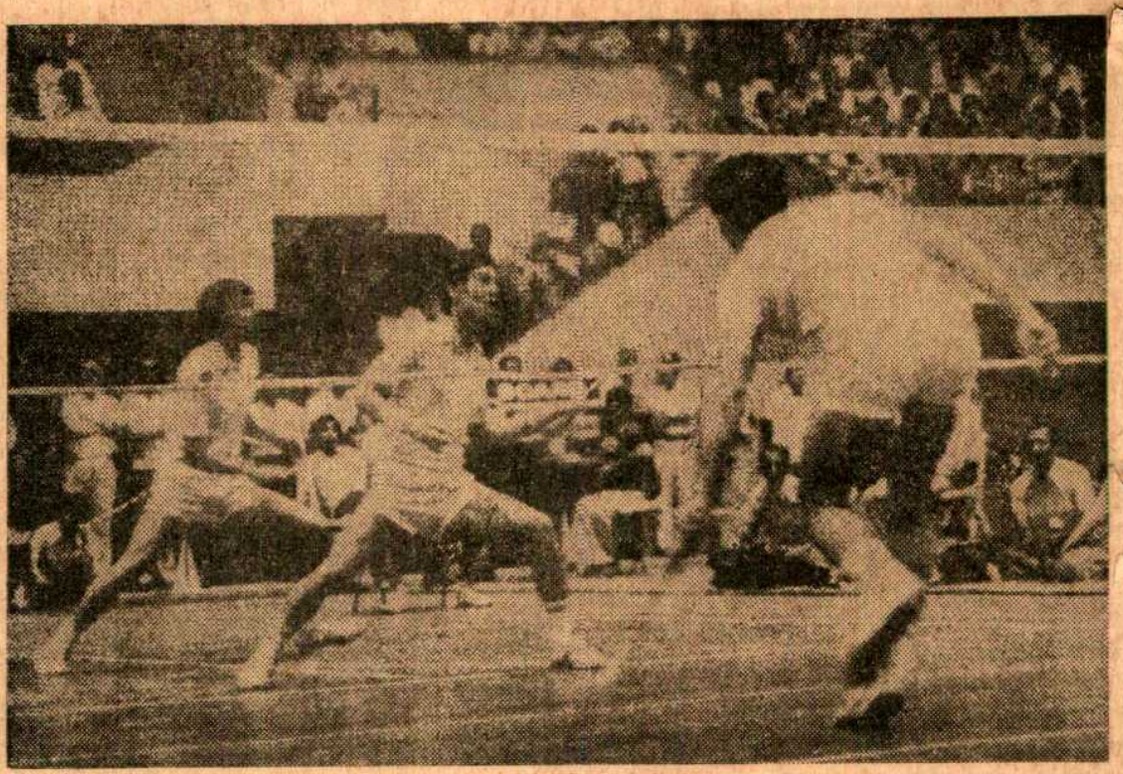

পুরুষদের ডবলস ফাইনালে একটি উত্তেজনা মুহূর্তে জাপানী ও চীনা খেলোয়াড়রা

অবশেষে বহুদিনের বুভুক্ষু ব্যাডমিন্টন পিপাসু অনুরাগীদের মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়ে গত ১-১০-১১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন বেশ দৃঢ় লয়ে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে হয়ে গেল। দুর্ভাগ্য এই যে শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা ছাড়া ভারতের সর্বত্রই প্রতি বৎসর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আবির্ভাব ঘটে। মনে হয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার সঙ্গে বাঙ্গ ব্যাডমিন্টন সংস্থার তেমন সদ্ভাব নেই। কেননা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার ওপরের সারির কর্মকর্তাদের জায়গাতেই কেবলমাত্র এই সব পৃথিবীশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনাগোনা। দুঃখের কথা এই যে এই দুই সংস্থারই জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে এই কলকাতাতেই কিছু আগে ও পরে। সেইজন্য কলকাতার ব্যাডমিন্টন অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আজ এখানে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থায় অনুমতি দেওয়ায় ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই ও সেই সঙ্গে তাঁদের অগ্রীম ধন্যবাদ জানাই যে ভারতের মাটিতে বিদেশী খেলোয়াড়দের পরে আবির্ভাব ঘটলে পশ্চিম বাংলার জন্য যেন তাঁদের মনের কোঠায় কিছুটা জায়গা থাকে।

অনেকেরই অজানা, সর্বপ্রথম এই কলকাতাতেই বিদেশী পেনাং-এর চটকদারী ছোট চীনা খেলোয়াড় চি চুন কেং ১৯৪৫ সালে তার অনবদ্য কৃতিত্বায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। সেদিন দেখেছিলুম কত হালকাভাবে ও মেজাজে কত শক্ত করে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। ঠিক এর আগে যেমন বাংলার খেলোয়াড়দের খেলা ভুলিয়ে দিয়েছিল ভারতের ব্যাডমিন্টন জনক জর্জ লুইস তাঁর অনবদ্য কৃতিত্বায়। ফাদার অফ ইণ্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন জর্জ লুইস (যিনি (১৯৩৬-১৯৩৯) চারবারের চ্যাম্পিয়ন)-এর খেলা দেখে অভিভূত হয়েছিলুম, কিন্তু পেনাং-এর এই সদা মিষ্ট হাসিমুখী কাব্যময় সাবলীল খেলা দেখার পর নিজেদের সব খেলা যেন ভুলে গেলুম। কত হালকাভাবে তার কোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা অর্থাৎ কি অপূর্ব মাপা স্টেপিং, কি অদ্ভুত কণ্ট্রোল বলের ওপর। বল ঠিক তার হুকুম মত যেখানে পড়ার ঠিক সেখানেই পড়ছে, শুধু তাই নয় মারের কি ভ্যারাইটি—প্রয়োজনবোধে মাটি থেকে ৩।৪ ফুট লাফিয়ে স্ম্যাশ। তারই ফাঁকে ফাঁকে ফ্লিক সর্ট বা লেট শেল—সব মিলিয়ে সে এক বিরাট ছন্দময় গতি। যা আজও ভুলিনি। তখনই মনে হয়েছিল চীন দেশে নিশ্চয় ব্যাডমিন্টন খেলার খুবই চলন আছে। না হলে এই যাদুকরের সৃষ্টি কি করে সম্ভব হলো। জিজ্ঞাসাও করেছিলুম—উত্তরে সেই মিষ্টমুখী কেং বলেছিল, ব্যাডমিন্টন তাদের জাতীয় খেলা আর সিঙ্গলসে তার স্থান অনেক পরে, ডবলসে অবশ্য একজন সামনের সারির খেলোয়াড়। তাই প্রথমেই বলে রাখি চীনা দল না এলেও ভারতের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় এই চীনাদেরই একজন ১৯৪০ সালে প্রথম এসেছিল এবং অনবদ্য খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিল এখানকার দর্শক[illegible] ১৯৪০ সালের ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে [illegible] ব্যাডমিন্টনের অনেক প্রভেদ। প্রচণ্ড [illegible] তার সঙ্গে পাওয়ার। দুয়ের সংমিশ্রণ [illegible] হয়েছে শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের [illegible] ফিটনেসের জন্য। গত ৯-১১ তিন দিন নেতাজী স্টেডিয়ামে যে ব্যাডমিন্টনের টাই-ফুন বয়ে গেল এ খেলা তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা সেণ্ট পারসেণ্ট ফিট। মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে বুঝিবা কোন জিমন্যাসিয়াম পার্টির কোন ছেলে তাদের কোনও কিছু ডেমনোস্টেট করছে। যা কিছুটা পাড়াকোন ছাড়া কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। এবারে আসা যাক সদ্য শেষ হয়ে যাওয়া বহু আকাঙ্খিত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের আলোচনায়।

প্লেন দেরিতে দমদম বিমান ঘাঁ[illegible] পৌঁছানর জন্য গত বুধবার ৯ নভে[illegible] বেলা ৩-৫০ মিনিটের পরিবর্তে ৪ [illegible] ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস কাউন্সিল [illegible] সুযোগ্য চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য মহাশয় খেলার উদ্বোধন করেন। এই আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের আসরে চীন জাপান, থাইল্যাণ্ড ও ভারতের [illegible]

যোগদান করেন। ইতিপূর্বে এত বড় ব্যাড-মিণ্টনের আসর কলকাতায় কখনও বসেনি। অবশ্য বহু বিদেশী খেলোয়াড় এখানে মধ্যে মধ্যে খেলে গেছেন যাদের বিষয় আমি পরে জানাব। তিনজন কর্মকর্তা সহ ৭ জন চীনা খেলোয়াড়, দুজন জাপানের ও দুজন থাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড় এসেছিলেন। এছাড়া ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড় ছিলেন ৮জন ও বাংলার চারজন। মহিলা বিভাগে বিদেশী খেলোয়াড় কেউ না এলেও ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন ৬ জন ও বাংলার দুইজন ও রেলের একজন। সত্য কথা বলতে কি বহু ইপ্সিত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন কিছুটা পেলেব কলকাতার প্রদর্শনী ফুটবল খেলার মত আমাকে হতাশ করেছে। প্রথমে ধরা যাক চীনা দলের বিষয়—

চীনা দলের লিডার লি উই ও কোচ ত্রাং জেন সুইকে তাদের দলের স্ট্রেংথ-এর বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা এক কথায় জানান যে একমাত্র লুয়েন চিন, চেন তিয়েন লুং, লিং ই সিউং ও লিন চি ফেং ছাড়া এই দলে আর সব মাঝের সারির খেলোয়াড়। তবে লুয়েনের ওপরে আরও তিনজন খেলোয়াড় আছেন যাঁরা এই টুরে আসতে পারেন নি। আমাদের দুর্ভাগ্য সেই সবে ধন নীলমণি লুয়েন চিন এখানে সিঙ্গলস-এর খেলায় মোটেই যোগদান করতে পারেনি ও ডাবলস-এর খেলাতেও নামকো আস্তে মাঠে নেমে ছিলেন সকলের অনুরোধে, কিন্তু ভারতীয় জুটি এল. ডি'সা ও উদয় পাওয়ার-এর কাছে ১০-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-১৩ পয়েণ্টে পরাজিত হন। আমাদের মন্দ বরাত ছাড়া কিছুই নয় কেননা ১১ অক্টোবর থেকে বোম্বাই এ খেলা শুরু করে পরে অমৃতসর ও লক্ষ্যৌতে প্রতিদিনই তাঁকে হার্ডম্যাচ খেলতে হয়েছে যার ফলে শেষের দিকে তাঁর পায়ের মাসলে টান ধরে যায়, তবুও সকলের অনুরোধে মাঠে নামার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

চীনের দু নম্বর খেলোয়াড় চেন তিয়েন লুং অবশ্য কিছুটা খেলেছেন। বাকী সবের খেলার মধ্যে প্রচণ্ড ফিটনেস ছাড়া তেমন কিছুই দেখিনি। জাপানের খেলোয়াড় দুজন ডবলস-এর খেলায় শুধু জয়ী হননি তাঁদের সেমিফাইনাল খেলা চীনার চেন তিয়েন লুং ও লিপ ই সুইং-এর বিরুদ্ধে প্রতিটি মনে রাখার মত অমার নিজের মত সেরা সমস্ত টুর্ণামেণ্টে এইটাই সবচেয়ে ভাল খেলা। প্রকৃত প্রচণ্ড ফাস্ট গেম—প্রতিটি র‍্যালি-তে কত বুদ্ধির ছাপ, কত দক্ষ হাতের কাজ, কত ভ্যারাইটি এবং একমাত্র গেম যাতে প্রতিটি পয়েন্ট খেলে অর্জন করতে হয়েছে। নেগেটিভ পয়েন্ট খুবই কমই ছিল। খেলা দেখে মন ভরে গেছে। দর্শকদের দেখেও মনে হয় তাঁরা অন্ততঃ এই গেমটি দেখে বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। থাইল্যাণ্ডের লুই টমাস কাপ খেলোয়ারের একজন ট্রে পানি চাইকুল দ্বিতীয় রাউণ্ডে চীনার লি চি ফেংর নিকট ৯-১৫, ১৫-৩ ও ১৫-৭ পয়েন্টে পরাজিত হন। অপর খেলোয়াড় থঙ্গশ্রী ভারতীয় দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক নানা মারের কারু-কার্যের অধিকারী সুরেশ গোয়েলকে তিন গেমের খেলায় ১৮-১৭ ৫-১৫ ও ১৫-৯ পয়েন্টে অতি কষ্টে পরাজিত করেন। প্রথম গেমে সুরেশ ১৭-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। থাই দলের খেলার বিষয় তেমন কিছু বলার নেই ফিটনেস ছাড়া। আজ ভারতের সেরা খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোন ও সৈয়দ মোদী ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছেন ব্যাডমিণ্টনের উন্নতির জন্য শিক্ষানবীশ হিসাবে। আজ কেবলই মনে হয়েছে যে প্রকাশ খেললে ভারতীয়দের এমন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না। প্রবীণ সুরেশ গোয়েল ছাড়া কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বাংলার কাজল সাহার কাছে ভারতের উঠতি খেলোয়াড় প্রদীপ গান্ধের সরাসরি-১৫-৬, ১৫-৭ পয়েণ্টে পরাজয় অবশ্য কাজলের মনের অনেক খোরাক বাড়িয়েছে। ভারতীয় মহিলাদের খেলার মান কিছুটা আজ ঘিয়া ধরে রেখেছেন, বাকী সব একরকম। বাংলার মধুমিতাকে বেশ ভাল লাগল। গত মাসে গৌহাটিতে জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মধুমিতা ১৬ বছরের অনূর্ধ্ব বালিকা বিভাগে ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্রের রাধিকা বসুকে ১১-৬, ১১-২ পয়েণ্টে পরাজিত করে। ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব জুনিয়ার বিভাগের ফাইনালে বোম্বাইয়ের আমিতা কুলকার্ণির কাছে ১১-৪ ও ১১-৩ পয়েণ্টে পরাজিত হয়। মধুর এই জয়লাভ বাঙ্গলায় ব্যাডমিণ্টনের সম্মান যথেষ্ট এগিয়ে দিয়েছে। প্রপার নার্সিং অর্থাৎ ট্রেনিং ও কোচিং পেলে, অবশ্য সেই সঙ্গে ভারতীয় ব্যাড-মিণ্টন সংস্থার বড় কর্তাদের চোখে

চেন তিয়েন

CALCUTTA UNIV. CENTRAL LIBRARY

সফলে, তার ভবিষ্যৎ আজ একদম অনিশ্চিত।

সমস্ত খেলা দেখার পর আজ এই কথাই বার বার মনে ভাবিয়ে দেয় যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বুদ্ধি, মারের বাহার, ম্যানেজমেন্ট, কোর্ট ক্রাফট সব কিছু থাকলেও একমাত্র ফিটনেসের অভাবে দিন দিন পিছিয়ে পড়তে বা তাদের জায়গা থেকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। আর উল্টোদিকে সারা দুনিয়ার খেলোয়াড়রা ফিটনেস-এর জন্য দুর্বার গতিতে হু-হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি অন্যদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার ভারতীয়দের কোনও বোগাড় নেই?

এজন্য প্রথমেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার উচিত চারটি জোনে প্যাতিয়ালা থেকে ভাল কোচ নিযুক্ত করে সেখানে শিক্ষণ শিবির গড়ে তোলা। বছরে অন্তত তিন মাসের জন্য প্রতিটি রাজ্য সংস্থার কাজ হবে তাদের স্থানীয় স্পোর্টস কাউন্সিল-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রাম ও শহরের ছেলেমেয়েদের সুস্থ চোখে বেছে বার করা ও পরে তাদের কোচিং ও ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আর স্কুল ও কলেজে এখন খেলা-ধুলার সিলেবাস হয়েছে, সেখানেও যদি সরকার এই সব ব্যয় সাপেক্ষ খেলার ব্যবস্থা করেন আর প্রতিটি শিক্ষণ শিবিরে জিমন্যাসিয়ামের সঙ্গে আসনের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ব্যাডমিনটন কোর্ট-এ ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার জন্য নাম ডাকলে দর্শকদের চা খাবার জন্য বাইরে যেতে হবে না।

খেলার ফলাফল—পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে চেন তেন লং দলের সর্ব কনিষ্ঠ ১৭ বৎসরের অপর চীনা খেলোয়াড় ১৯৭৭ সালের দুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন সিন ই সুইংকে ১৭-১৪, ১৭-১৬ পয়েন্টে পরাজিত করেন। পুরুষ ডবলস-এর ফাইনালে জাপানের দুই চমাস কাপ খেলোয়াড় কেনজী জীনিয়া ও মাসাও সুচিদা অতি সহজেই চীনা খেলোয়াড় হো লিয়েন পিং ও লিং চিয়াং জিকে ১৫-৪ ১৫-১০ পয়েন্টে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস খেলার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আমি ঘিয়া অপর ভারতীয় খেলোয়াড় লতা কৈলাসকে ১১-৩, ১১-৫ পয়েন্টে পরাজিত করেন। মহিলাদের ডবলসে আমি ঘিয়া ও সুধা বাফনা ১৭-১৪, ১৫-৪ পয়েন্টে সুজাতা জৈন ও নোরিন পাদুয়াকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কাছ থেকে অল্প দিনের নোটিশে খেলা পরিচালনা করার অনুমোদন পেলেও রাজ্য ব্যাডমিন্টনের ব্যবস্থাপকরা বেশ সুষ্ঠুভাবেই তা সম্পন্ন করেছেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

জার্সি বদলের খেলা

কলকাতা যে কেবলমাত্র ফুটবলের শহর সে-কথাটা আর একবার টের পেলাম দিন-কয়েক আগে ডালহৌসী পাড়ার একটি ব্যাংকের হেড অফিসে গিয়ে। তখন দুপুর। ব্যাংকের লাঞ্চটাইম। ক্যান্টিন হলটি একেবারে সরগরম। চা-টোস্ট, সিঙ্গারা, কাটলেট, ফিশফ্রাই-এর বন্যা বয়ে যাচ্ছে সব টেবিলে। সিগারেটের ধোঁয়া আর একসঙ্গে শব্দই মানুষের কলতান বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে ওই ক্যান্টিন হলে। যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম তাকে পেলাম ওই ক্যান্টিনেই। একটি টেবিলে চেয়ার ভাগাভাগি করে প্রায় জন্য পনেরো সহকর্মীর সঙ্গে বসেছিল সে। আমি যেতেই আর একটি চেয়ার বাড়ল ওই টেবিলে। চলে এল এক প্লেট সিঙ্গারা আর গরম ধূমায়িত চা। সামান্য বিরতির পর আড্ডা চলে গেল আবার পূর্বপ্রসঙ্গে। প্রসঙ্গ : ফুটবলের দল অথবা জার্সিবদল।

আড্ডার বিষয়বস্তু শুনেই আমারতো চক্ষু চড়কগাছ। এই তো সবে কলকাতার ফুটবল মরশুম শেষ হল। এখনও রোভার্স বাকি, ডুরান্ড বাকি। এরই মধ্যে দল বদল নিয়ে এই কাণ্ডকারখানা! বন্ধুকে আস্তে আস্তে বললাম—'ফুটবলারদের টিম চেঞ্জিং তো শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারী, এখনও তিন মাস বাকি, ক্রিকেট চলছে, এখনই...'

বন্ধু আমার কথা শেষ করতে দিল না। টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মেরে সমস্ত কাপ-ডিশগুলোকে কাঁপিয়ে বলে উঠল,—'ফুটবল, ওনলি ফুটবল, কলকাতায় ক্রিকেট হকির কিস্যু বাজার নেই, টেস্ট ম্যাচ-ফ্যাচ হলে আলাদা কথা। নইলে সারা বছর ফুটবলই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।'

বাঁচিয়ে যে রাখে তার প্রমাণ পেতেও দেরি হল না। আধঘণ্টা টিফিন আওয়ার্স হুইহই করে কেটে গেল ফুটবলের আলোচনায়। আগামী মরশুমে কোন্ খেলোয়াড় কোন্ দলের জার্সি গায়ে চাপাবেন তাই নিয়েই চলল আগাম গবেষণা। এক-একজন এক-একটা টিপস্ ছাড়েন। অন্যেরা তক্ষুনি সেটা লুফে নেন। তারপর আরম্ভ হয় সেটার ওপর ডিবেট। শুধু ওই ব্যাংকের ক্যান্টিন হলেই নয়, এখন গোটা কলকাতায়, দূর-মফঃস্বলেও এই একই দৃশ্য। ময়দানে এখন ক্রিকেট নেমেছে। শীতের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটও জমে উঠবে। কিন্তু যতই জমুক, কলকাতাবাসীদের কাছে ফুটবলই হৃদয়ের রাজা। ক্রিকেট দেখতে দেখতেও তাঁদের কথাবার্তা ফুটবল নিয়ে...নামী ওই প্লেয়ারটিকে আসছে বছর রাখা যাবে তো?

ফুটবল অনুরাগীরা খেলোয়াড়দের গুণ ও দোষ নিয়ে তাঁদের অ্যানালিটিকাল রিসার্চে কিভাবে খেলোয়াড়দের দল-বদলের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এখন সার্জি বদলের নির্ধারিত সময়ের মাস তিনেক আগে থেকেই বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা হুইল ছিপ, চার, বিভিন্ন ধরনের বঁড়শি নিয়ে আসরে নেমে পড়েছেন। বড় রুই-কাতলা ধরতে হলে আগাম প্রস্তুতি চাই অনেক দিনের। কোন্ ধরনের চারে কি মাছ আসবে সেটাও নির্ভর করছে বহুলাংশে। কলকাতার বড় তিনটি ক্লাবের প্রতিনিধি কিংবা আড়কাঠিরা তাই এখন থেকেই সক্রিয়। টোপও ফেলছেন তাঁরা এদিক-ওদিক। যে-ভাবেই হোক বড় মাছ গাঁথতে হবে বঁড়শিতে। এবার বড় ক্লাবগুলি কিন্তু বেশ বড় রকমের একটি অসুবিধায় পড়ে গেছে। সাধারণতঃ রোভার্স-ডুরান্ডের শেষে জাতীয় ফুটবলের আসরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাকা কথা হয় দলবদলের ব্যাপারে। অন্যান্যবার জাতীয় ফুটবলের আসর বসে বাংলার বাইরের কোন শহরে। বাংলা দলে নির্বাচিত সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি ফাইনাল করার পক্ষে সেটাই হয় সুবর্ণ সুযোগ। কারণ খেলোয়াড়রা সেই সময় ক্লাবের সতর্ক চক্ষুর বাইরে থাকেন। আড়াল-আবডালে কথা বলারও সুবিধা হয়। অবশ্য বড় ক্লাবগুলি জাতীয় ফুটবলের সময় খেলোয়াড়দের চোখে চোখে রাখার জন্য সেই সব শহরে গার্ডও পাঠান। গতবার পাটনায় জাতীয় ফুটবলের আসরে আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখেছিলাম, প্রিন্স হোটেলে মোহনবাগান এবং ইস্ট-বেঙ্গলের দুজন করে কর্মকর্তা সবসময় মোতায়েন। ফাইনালের পরদিন সকালে বাংলা দলের মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের প্লেনে চাপিয়ে মোহনবাগান কর্মকর্তা সটান চলে গেলেন কলকাতায়। পাটনা থেকেই শ্যাম থাপা গেলেন মোহনবাগানের আশ্রয়ে।

এবার কিন্তু জাতীয় ফুটবলের আসরে খেলোয়াড় ধরার সুবিধাটা নেই। কারণ কলকাতাতেই বসছে ওই আসর। স্বভাবতই খেলোয়াড়রা সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। এবং এই সুযোগটা নেই বলেই আড়কাঠিরা এখন, এই তিন মাস আগে থেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন রাঘববোয়াল ধরার কাজে। খেলোয়াড়দের অফিসে, বাড়িতে আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে ক্লাব-প্রতিনিধিদের। কি কি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে তার লম্বা লিস্টি, রেমিউনারেশনের টাকা অংকটংক মাঝে মাঝেই টার্গেট খেলোয়াড়দের শোনান হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব মারফত প্রস্তাব আসছে। খেলোয়াড়রাও কি পিছিয়ে আছেন? বোধহয় না। গত লীগ-শীল্ডের পারফরমেন্সের ওপর তাঁরাও দর বাড়াচ্ছেন। এক-কথায় বাজার বেশ জমে উঠেছে।

নাটক

আজকের গ্রুপ থিয়েটার

"নাটককে যদি শিল্প, সাহিত্যের এক জরুরী অংশ বলে স্বীকার করি, তাহলে অন্যান্য শাখার তুলনায় এই মাধ্যমটি এখনো ঈশ্বর গুপ্ত, কি তারও আগের যুগে বাস করছে।"—এই মন্তব্যটি এক গ্রুপ থিয়েটারের মুখপত্রের। বাংলা নাটক কেন পিছিয়ে, এব্যাপারে অনেকেই অনেক কারণ দেখিয়েছেন কিন্তু তা মূল কারণে না গিয়ে। আমার মতে মৌলিক নাটকের এই অনুন্নতির জন্য দায়ী প্রধানভাবে গ্রুপ থিয়েটারগুলো। একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, পশ্চিমবাংলায় স্বীকৃত থিয়েটার গ্রুপের সংখ্যা কম করেও ৪০০। সারা রাজ্যে প্রতি সন্ধ্যায় অন্ততঃ ৫০।৬০ কি তারও বেশী নাটক অভিনীত হয়। অথচ প্রকৃত নাটক কতো যা বুঝি তা নেই।

ছোট গ্রুপগুলোকে যেসব নাটক [illegible] দেখা যায়, তার বেশীরভাগই বড় বড় কথায় ভর্তি, সমাজ কো বদল ডালো জাতীয় জোলো ভাবাবেগে পূর্ণ। ওখানে যে সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলা হয়, তা কোন সমাজ এবং কোন্ সমাজ বদলে কোন সমাজ আসবে, কারা কিভাবে আনবে, তার জন্য কার কি করা উচিৎ, যে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়, তা কোন শ্রেণী—শ্রেণীর ক্লাশিফিকেশানই বা কি—এইসব ব্যাপারগুলোর অনেক কিছুই তাঁদের অজ্ঞাত। আসলে কিছু পচা সেণ্টিমেণ্ট, ধনী দরিদ্র সংঘর্ষ, প্রেম, বাক্য-বিলাস, এ্যাবসার্ড-এ্যাবস্ট্রাক্ট নামে আবোল তাবোল কথা—এসব নিয়েই যতো-সব। আর এঁদের এই অজ্ঞানতার সুযোগে বেশ কিছু সুযোগ-সন্ধানী লোক কথার পর [illegible] বসিয়ে নাট্যকার হয়ে গেছেন। লেখার [illegible]তা তো দূরের কথা, নিজেদের সমাজ, সময়, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণাও তাঁদের নেই।

এর বাইরে যেসব নাট্যকার কিছু করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সেই চেষ্টাও ঠিকমতো কাজে লাগে না উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে। বিজন ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মনোজ মিত্রদের লেখা তো দূরের কথা নামও অনেকে শোনেন নি। অন্যদিকে এইসব নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পান না। গ্রুপগুলো এ্যাকটেসকে টাকা দিতে পারে, সাউণ্ড ডিস্টকে টাকা দিতে পারে কিন্তু যাঁর নাটক নিয়ে এইসব তাঁর বেলায় 'আমাদের ছোট গ্রুপ বুঝতেই তো পারছেন, ধারধোর করে নাটক করছি....' ইত্যাদি কথাগুলো এসে যায়। এই ব্যাপারটা কিন্তু বড়-ছোট সব গ্রুপেই সমান প্রতিষ্ঠিত।

আজ প্রতি পাড়াতেই একটা না একটা গ্রুপ থিয়েটার আছে। প্রশ্ন হল নাটক করার পেছনে ওঁদের উদ্দেশ্য কি। কথাটা জিজ্ঞেস করলে ওঁরা বিপ্লব, সমাজ, আদর্শ, সাহিত্য, থিয়েটার ইত্যাদি নানা বুলি কপচে যাবেন। মোদ্দা ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। শীতের দুপুরে আমাদের গলিতে প্রায়ই ভাংগুলি খেলা হয়, গ্রীষ্মের বিকেলে ফুট টেনিস। ওদের কিছু করার নেই, তাই এইসব নিয়েই ওরা মেতে আছে। ছোটখাটো গ্রুপগুলোর অবস্থাও এরই মতো। সন্ধ্যায় যাদের একেবারেই কিছু করার থাকে না, অথচ সস্তায় নাম কেনার একটা ইচ্ছে থাকে, তারাই এই সহজ নাটকে ব্যাপারটা বেছে নেয়। অন্ততঃ পাড়ার মেয়েরা তো জানবে, অমুক হলে সে নাটক করেছে। অবশ্য এর মধ্যেও প্রতি গ্রুপেই দু'একজন নাটক পাগল ছেলে আছে, তারা নাটক ভালবাসে, তাদের আদর্শ, জীবনযাপন ইত্যাদির সঙ্গে তারা নাটককে জড়িয়ে ফেলেছে। আস্ থিয়েটার গ্রুপের টাকু, রক্তকরবীর গোপাল, শৈলুসের সন্দীপ, সেবকের শামলোরা তাদের গ্রুপ নিয়ে প্রচণ্ড কিছু করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অনীহায় তাঁরা ব্যর্থ। তাঁরা জানেন, যা করছেন, তা আর যাইহোক নাটক নয়। তবু কিছুতো একটা করতে হবে, এই ভেবে বাধ্য হয়ে করছেন। খারাপ কিছু করার চেয়ে না করাটাই ভাল এই সিদ্ধান্তে কখনই বা আসতে পারে।

এবার বড় গ্রুপগুলোর দিকে তাকানো এরা নিজেরা বেশী করে ব্যক্তিগত খোয়া-খুয়িতে মত্ত। এবং এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটা তাঁরা চাপা দিয়েছেন আদর্শের খোলসে। তাঁরা প্রত্যেকেই চান দৈনিকের বিজ্ঞাপনে তাঁর নামটাই যেন বড় করে থাকে। আর বিরোধ এখানেই। এখানেই গ্রুপগুলো ভাঙে, নতুন গ্রুপ জন্ম নেয়। অবশ্য এই ভাঙাগড়ায় আমাদের সমর্থন বা আপত্তি কোনটাই নেই। প্রশ্ন হল বাংলা নাটকের জন্য এইসব গ্রুপের অধিকাংশের অবদান কি? কাগজে কাগজে ওঁরা সেজাবে নাটক বিষয়ে তাঁদের আদর্শ, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি প্রচার করেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাটকের জন্য তাঁরা সব কিছুই করতে প্রস্তুত। একজন তো পশ্চিম বাংলার জনগণের নাটক করে, সংগ্রামী-প্রোলেতারিয়েত নাটক করে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ে এহটা সাড়া ফেলেদিয়েছেন। আবার সেই তিনিই বোম্বাইহের 'এ' মার্কা হিন্দী সিনেমার জঘন্য নাচন কোঁদন করে ঐ ফাঁকে ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে বসেছেন। আরেক-জন জরুরী অবস্থার পুরো সময়টা শাসক গোষ্ঠীর পেছনে ঘুরে, কথায় কথায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর গুনগান করে এই '৭৭ এর মধ্য ভাগে একটি পত্রিকায় বড়াই করে লেখেন তিনি কতটা শাসক বিরোধী ছিলেন, জরুরী অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে কবার পুলিশ গেছিল। আরেকজন তো নাটকে কম্যুনিজম ইত্যাদি আউড়ে টুক করে সরকারের প্রচার-দপ্তরে একটা হাজারী মসনদ জোগাড় করে ফেলে ছেন। এইই আজকের গ্রুপ থিয়েটারের পিতাদের আদর্শ। বললে আরো অনেক উদা-হরণ এসে যাবে। এসব কথা এই জন্যে যে কেউ যদি তাঁর নিজস্ব কাজে সৎ না হন, তাহলে তাঁর সৃষ্টকর্মও সৎ হতে পারে না। ওখানে ফাঁকি থাকলে এখানেও ফাঁকি এসে যায়।

ক্যারল রীডের ছবি ফলো মী

এবার যদি ও'দের মঞ্চায়িত নাটক গুলোর দিকে চোখ ফেরানো যায়, দেখা যাবে মৌলিক নাটক ও'রা খুব কমই করেছেন। বেশীর ভাগ নাটক বিদেশী নাটক বা সাহিত্য অবলম্বনে। আর মৌলিক যেসব নাটক করেছেন, তার প্রায় সবারই আবেদন তাৎক্ষনিক। দীর্ঘস্থায়ী নয়। কোন সৃষ্টি যদি দশবছর বেঁচে থাকতে না পারে তাহলে তার জন্য এত পরিশ্রম করেই বা কি লাভ। ও'রাও বুঝি সেই সস্তা হাততালির মোহে আবর্তিত, যা তাঁদের চারি করা আঙ্গিক ও বিদেশী আবহাওয়ায় প্রভাবিত। দেশের নাটক ও মঞ্চকে উন্নত করতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নাটক ও তার আঙ্গিক ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক কিছু চিন্তা। অনুকরণ বা অনুসরণ করে কিছুদূর যাওয়া যায়, কিন্তু সব পথ অতিক্রম সম্ভব নয়।

বিকাশ জানা

গোর্কী। পাভেল এবং নিউ ইন্দ্রলোকের 'মা'

গোর্কী বিরচিত 'মা' এবার পালাগানের আসরে এসেছেন। নাটকের কেতকী দত্ত সেই 'মা' সাজবেন। উৎসাহ ছিল দু তরফে। এক সময় রুশী শ্রমিক পাভেলের মাকে আমার আন্তর্জাতিক মা মনে হোত। বিশেষত 'মা' পড়ার পর। কিন্তু আজ অবধি এমন কোন প্রযোজনা (নাটকের) দেখার সৌভাগ্য হয়নি যাতে গোর্কীর মা পাভেলের মা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিকে যেতে পেরেছেন। পাভেল ও রুশী শ্রমিক থেকে গেছেন এযাবৎ।

যাত্রায় এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে নিউ ইন্দ্রলোক অপেরা। পালাগানে সুযোগ কিছু বেশী। অর্থাৎ পালাকার শ্রোতাদের দিকে দেয়ে পালা সাজান। সেটাই রীতি। আর যাত্রার শ্রোতার অধিকাংশই গ্রামভিত্তিক। সে কারণে ভেবেছিলাম নিউ ইন্দ্রলোকের মা হয়ত আমার গ্রামের মানুষজনের মা হবেন।

এখন নতুন ধান উঠছে। চাষীরা প্রতি ৬০ কেজি বস্তার দর পাচ্ছেন ৪৬ টাকা ২০ পয়সা। ওই টাকাতেই পুজো-পার্বনি, গেরস্থ খরচ এবং যাত্রা শোনা। 'চৌধুরী বাড়িতে' এখন আর যাত্রার আসর বসে না। টিকিট কেটে যাত্রার প্যান্ডেলে যেত হয়।

আমাক ধান বিক্রীর টাকায় 'মা' শুনতে হয়নি। সাবলীল বোধের গোর্কী সদনের (ঠান্ডা এবং সুগন্ধী) সামনের সারিতে বসে যথেষ্ট আরাম পেয়েছি। হলটা বেশ।

কেতকী দত্ত-ই মা সেজেছেন। আমি সাজঘরে যাইনি। কেতকী দত্তকে চিনতে পারলাম মঞ্চে আসামাত্র। এই তো মা। পাভেলের মা। রুশী দৃতাবাসের মঞ্চে শ্রীমতী দত্ত পুরোপুরি রুশী মা সেজেছেন। পোশাক নিখুঁত। মেক-আপও। শ্রীমতী দত্তর অভিনয়ের গুণে মাঝে মাঝে গোর্কীর মাকে দু-একবার কলকাতার মা মনে হচ্ছিল। কেন? আমার ভিচ, ডিরেকটর, শ্রমিক গায়ক প্রভৃতির রুশী চালচলনে তিনি বাধ্য হচ্ছিলেন রুশী মা হয়ে-যেতে।

সুযোগ ছিল না তা নয়। নিকোলাই কি অদ্ভুতভাবে নিতাই কিংবা নিমাই হয়ে গেলেন। এ যেন আমার ঘরের নিতাই কিংবা নিমাই। নিকোলাই নয়। মলয়কুমারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মারিয়া এবং সাশাকে। ইরা চক্রবর্তী এবং সুপর্ণা দেবী ওই দুজনকে ভারতীয় করে রেখেছেন।

নিউ ইন্দ্রলোক অপেরা ভেবে দেখুন কিভাবে কেতকী দত্তকে দেখ আমাদের যেন মনে না পড়ে যায়, রুশী শ্রমিক পাভেলের মা উনি—উনি নিউ ইন্দ্রলোকের 'মা' হয়ে থাকুন।

প্রভাত চৌধুরী

"পথিকৃৎ"এর পণ্ডিতমশাই

রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'পথিকৃৎ' নাট্য সংস্থার 'পণ্ডিতমশাই' ভাবাবেগে দৃপ্ত অভিনয়ে দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল। শরৎ সাহিত্য বাঙ্গালীর কাছে শুধু রসসাহিত্য নয়, শাণিত ও প্রখর। 'পণ্ডিতমশাই'-এর সুর মানবিক। একদিকে বৃন্দাবন ও কুসুমের মধ্যে গার্হস্থ্য বিরোধ আর একদিকে ব্যাধি ও কুসংস্কারলিপ্ত গ্রামজীবনে একজন আদর্শ পণ্ডিতমশাইয়ের বিবেকের লড়াই।

বৃন্দাবনের ভূমিকায় প্রদীপ পাল, কুঞ্জ অজয় ভট্টাচার্য, চরণ অঞ্জনাভ চক্রবর্তী, তারিণী শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জর শ্বাশুড়ী মণিদীপা রায়, বৃন্দাবনের মা দুলালী সরকার, স্বরক্ষেপণ, হাঁটাচলা ও আচরণে এ'রা চরিত্রগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। কিন্তু প্রতিভার ছাপ রেখেছেন কুসুমের ভূমিকায় শুক্লা রায়চৌধুরী। মঞ্চটিকে পরিচালক আশ্রয় করেছেন, ব্যবহার করেন নি, প্রয়োগকৌশলের ছিটে-ফোঁটাও দেখলাম না।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক

রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে বেশ বড়-সড় শিশুমেলা গোছের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয় অভিভাবক সমিতি এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ ও পরিবর্তন দুটিই উপভোগ্য। ঋতুরঙ্গের গ্রন্থনায় ছিল শ্রীমতী মীনা গুপ্তা ও সঙ্গীত পরিচালনা

ছবি দিয়ে যাই ছবিতে সুমিত্রা মুখার্জি

করেছিলেন শ্রীমতী অর্চনা চক্রবর্তী ও ময়েত্রী ঘোষ। সংলাপ শ্রীতরুণ চক্রবর্তী (অতিথি শিল্পী আকাশবাণীর সৌজন্যে)। সঙ্গীতে শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস মজুমদার ও অরুণ সিংহরায়। এঁরা সকলেই যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনই তেমনই সঙ্গীত ও নৃত্য অর্চনা মৈত্রেয়ী গার্গী চন্দ্রিমা শুক্লা ঋমা জয়ন্তী ভজন রজত সবিতাব্রত প্রসূন পার্থ ইন্দ্রনীল দীপ সুমিত এঁরা সবাই শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন।

পরিবর্তন নাটকের রচয়িতা মনোরঞ্জন ঘোষ, পরিচালক নিখিলচন্দ্র রায়। নির্দেশনায় রণজিৎ মুখোপাধ্যায় ও ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি উপভোগ্য। এই অভিভাবক সমিতিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা শিশু শিল্পীদের এমন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছোট ছেলে-মেয়েদের শিল্প প্রতিভা বিকাশের পথ করে দিয়েছেন।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সিনেমা

দ থ্রি মাস কেষ্টিয়ার্স

বিচিত্র বোম্বাইয়ের কার্যকলাপ সত্যিই ঝা দায়। সেখানে মেয়ে ডাকাতের সঙ্গে ম হয় বেকার কাওয়ালের, থানার দারোগা-ড্ ষ্ট্রীট গার্লের চোখ ভেজানো কথায় মে পড়েন, কিংবা অ্যান্টনীর মত হিন্দি-চান মডেল সুন্দরী পরভিন বাবীকে খেই 'দিল কি ধড়কন' অনুভব করতে করেন।

আর এই তিনজনের জন্ম সূত্রটি যে বা-মার শরীরে বাঁধা সেটি ভাগ্যিস মিসেস দেশাই আগে-ভাগেই দিয়েছিলেন নাহলে 'অমর-আকবর-র জন্মসূত্রের খোঁজে সত্যান্বেষী বকসি, গোয়েন্দা পরাশর বর্মা লুদাকে একসেঙ্গ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বের হত না। দর্শক তো কোন! প্রয়াগ রাজের চিত্রনাট্যটি অ্যাকশন রি-অ্যাকশনে ঠাসা। অবশ্যই শুধু য়, দর্শকে চারিত হয় না কিছুই এক-ক্লান্তিকর বিরক্তি ছাড়া।

অঘটন ঘটানোর যাদুকরী শক্তিতে অমর-আকবর-অ্যান্টনী বোম্বাই রের পাশাপাশি মহল্লায় কৈশোর থেকে ক হবার দীর্ঘ সময় বাস করেও একের অপরের পিতৃ পরিচয় রয়েছে। কিন্তু সময় মাফিক ষোলটা রিল র পর সকলের বুদ্ধির জট খুলেছে, র হয়েছেন সাকরেদসহ ভিলেন জীবন, ওয়ালী অন্ধ মা এবং ওদের পালক রা। এমন নয়ন মনোহর মিলন দৃশ্যে ল বাবা ভদ্রলোকটি অনুপস্থিত বন! তা তো হয় না, সুতরাং আগাথা স্টর গোয়েন্দা গিরিকে হার মানিয়ে র হলেন হাফ-ভিলেন প্রাণ অন্ধ ওয়ালী নিরুপা রায় আধুনিক চিত্রিকা

করুণাময়ী ছবিতে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে দৃষ্টি ফিরে পেলেন শিরদির সাঁইবাবার দয়ায়। তিনিও ম্যাকস-ফ্যাকটর খচিত হয়ে উপস্থিত। অবশ্য তার আগে আকবরবেশী ঋষি কপূর গান শুনিয়ে বাবাকে তুষ্ট করেছেন।

আর আছে অ্যাকশন। অমিতাভ-বিনোদ খান্না যেখানে উপস্থিত, সেখানে ঐ বস্তুটির উপস্থিত অপরিহার্য। তবে দর্শকের আক্ষেপ থাকবে ফেভারিট অমিতাভকে আয়না ঝাড় দিয়েছ বিনোদ খান্না ভাই! এন্টারটেইনিং ছবির সংজ্ঞা যদি বোধবুদ্ধিহীন ঘটনা,। পিলে চমকানো বেআইনী সংঘর্ষ আর নাচে-গানে শহুরে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর বাটি চচ্চড়ি হয় তাহলে মনোমোহন দেশাই নির্ঘাত পদ্মশ্রী খেতাব পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি। দুঃখ হয় শুধু শাবানা আজমির মত শিল্পীদের এরকম ছবিতে অসহায় অবস্থা দেখে।

নির্মল ৪৪

হাতে রইল তিন

নাম শুনে মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে। কি রইল বা কার হাতে রইল গোছের। নায়িকার বাড়ির একতলার জনৈক ভাড়াটে ছবির শেষের দিকে এসবের উত্তর দিয়ে গেছেন। যা শোনবার জন্য নায়িকাকে খামোখা সেই ব্যক্তির পায়ের ধুলো নিতে হয়েছে। ভাড়াটে ভদ্রলোক যা বলেছেন তা অনেকটা এই রকম—ভগবানের হাতে রইল জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ, এই তিনটি মানুষের রইল ওই তিন ছাড়া আর সবই। এই বাকী সবের একটা অবশ্যই ছবি পরিচালনা। এ ছবিতে যা সরিৎ ব্যানার্জির হাতে। নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিয়ে তিনি ছবি শেষ করেছেন। বিবাহ যদিও ভগবানের হাতে তবে ছবিতে নিশ্চয়ই তা সরিৎবাবুর। তাই শেষে নায়ক সংকাজে প্রতিষ্ঠিত হস্ত পেয়েছেন। নায়িকাকে পাপের জগৎ থেকে

উদ্ধার করতে পেরেছেন। এবং বিয়ে করেছেন।

চোন্দ রিলের সবটাই কান্না আর কান্না। তিরিশ বছর আগেকার সেঁদা সেন্টিমেন্টপ্রধান ছবিগুলোর মত। গর্বাবের মেয়েকে জোর করে পাপের পথে নাবানো তার অন্তঃস্বত্বা হওয়া, নায়কের জেল খাটা—এই সবই ছবির প্রধান প্রধান ঘটনা! আর দারিদ্র্য? এক জায়গায় নায়িকা পেটি-কোটের অভাব মিটিয়েছেন বাবার লুঙ্গি পরে।

এসব সত্ত্বেও পরিচালক গল্প খারাপ বলেননি। দু-এক জায়গায় সম্পাদনার কাজ লক্ষ্যণীয়। নায়িকার পতিতা হবার ব্যাপারটা চার-পাঁচটা ছোট শটে ভালই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্ল্যাশব্যাক পর্বগুলোও একঘেঁয়ে নয়।

নায়িকা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার অভিনয়ের ওপর ছবি অনেকটা নির্ভর করেছে। অপরদিকে নায়ক রঞ্জিৎ মল্লিকও তাঁর অন্য ছবিগুলোর তুলনায় এখানে অনেক উন্নত। দিলীপ রায় আগা-গোড়া ভাল। আর যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ঝুমুর গাঙ্গুলী, গীতা দে, তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং বিশেষ করে জহর রায়। দুঃখের মধ্যেও তিনি কিছুটা রিলিফ দিয়ে গেছেন। দুঃখ হয় একটি মাত্র দৃশ্যে অতীতের কামেডিয়ান অজিত চ্যাটার্জিকে নাচতে দেখে।

অসিতবরণ মিত্র

মধ্যবিত্ত জীবন ও চলচ্চিত্র

শিল্পসাম্য ও সামাজিক সাম্য কি পরস্পর নির্ভরশীল? ভারতবর্ষের সামাজিক কার্যকারণ অনুধাবন করলে ব্যাপারটা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জীবন সাম্য যত লুপ্ত হচ্ছে, শিল্পসাম্যরও সেই একই রকম দ্রুততর অপমৃত্যু হচ্ছে। শিল্প, কতক-গুলো বোধক, বেহিসেবী লোকের কেলেঙ্কারী সন্দেহ নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এঁরা মধ্যবিত্ত সমাজের হাজারো নিষিদ্ধতার মধ্যে উল্কাবৎ জ্বলে ওঠে নিষেধ নির্মোক ভেঙ্গে। যদি বলা যায় মধ্যবিত্ত সমাজই প্রধানতঃ শিল্পের ধারক, বাহক ও পোষক তাহলে বোধহয় বেশী বলা হয় না—অনেক বিক্ষিপ্ত লগ্নে সাধারণ নীতি ব্যর্থ হওয়া চলচ্চিত্রের দর্শক হিসেবে মধ্যবিত্তরাই সংখ্যায় বেশী। তারাই চলচ্চিত্রের সব থেকে বড় প্রতিপোষক। অথচ মধ্যবিত্তের কথা কি কোন চলচ্চিত্রের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ধরা দিয়েছে? হয়ত কখনও সখনও মনে হতে পারে; হ্যাঁ, এ ছবিটায় ঘটনা—কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তারপর ধনী, প্রেমিক, শক্তি-শালী প্রায় ভগবান সদৃশ যে ব্যক্তি আত্ম-প্রকাশ করেন তাকে আর যাই হোক বিত্ত মধ্যম এ অপবাদ দেওয়া যাবে না। তাহলে এ ছবি কার জন্য নির্মিত? যে ছবিতে আমার ভাব, ভাষা নেই; যে ছবিতে আমার সংগ্রামের রসদ নেই; যে ছবি বিস্মরণ ঘটায় মনুষ্যত্বের। এ ছবি কার? কে দর্শক? কে প্রার্থী? তার মানে এ নয় যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছবি তৈরী হবে না। পৃথিবীর সর্বদেশে সমস্ত সংস্থা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছবি তৈরী করেন। কোন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পক্ষেও পয়সা নষ্ট করে ছবি করা সম্ভব নয় (অর্থাৎ যে ছবির দর্শক নেই)। কিন্তু এদের সঙ্গে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের প্রভেদ (হিন্দী, বাংলা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির) এই যে এখানে কখনই বিভিন্ন ধর্মের বা স্বাদের ছবি হয় না এবং করতে পারার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নেই। এরা তাৎক্ষণিক সামাজিক দৈন্য—যেমন, আমাদের এই ভাগ্যহত দেশে অর্থ, যৌনজীবন এ[illegible] শক্তি—উপজীব্য করে, একটিই সা[illegible] সুরে অব্যাহত রাখেন সমস্ত ছবির মাধ্য[illegible]

চলচ্চিত্রের এহেন ব্যর্থতা আ[illegible] বিজ্ঞান, কারিগরী ও অর্থনৈতিক ব্যর্থ[illegible] দ্যোতক। শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরী আমাদের সমাজজীবন বা ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কখনই অখণ্ড হয়ে দেখা দেয় নি; বরং চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা আজ সামাজিক ক্ষেত্রে সবথেকে ক্ষমতাশালী বাধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এর বিপুল প্রচ্ছন্ন শক্তির জন্য।

সুদর্শন বসু

সন্ধিপ্রকাশ রাগ পুরিয়া কল্যাণে....

রাগরঙ রবীন্দ্রসদনে গত ৩ সেপ্টেম্বর একটি সুন্দর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান উপহার দিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন যোগ্যপিতার যোগ্য পুত্র বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্যানুসারী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরিয়া কল্যাণ ও যোগ দুটি রাগেই অমিয়বাবু তাঁর প্রসিদ্ধ ঘরানার শান্ত রাগরূপের পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। ধ্রুপদাঙ্গিক স্বর বিস্তার পদ্ধতি আজকাল খেয়াল থেকে প্রায় চলে যেতে বসেছে। অমিয়বাবু সন্ধিপ্রকাশ রাগ পুরিয়া কল্যাণের ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চমের প্রাণ-স্পর্শী ব্যঞ্জনায় রাগের আরাধনা করলেন, লঘু চমকবর্জিত তান স্বরগ্রাম-এর ফলে তিনি কোথাও তাঁর রাগযুগলের রসহানি ঘটাননি।

সেতারের আসরে ছিলেন উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইন্দ্র-নীল ভট্টাচার্য। ইন্দ্রনীল নিখিলবাবুর পরের সিঁড়িতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় আসীন। মালকোষের যথার্থ রাগ নির্বাচনে তিনি যেমন পরিণামদর্শী তেমনই একটা পর্দাকেও পিছলে দিয়ে তিনি আলাপজোড়ের অঙ্গহানি ঘটাননি। সাধনার দুরূহ অভিনিবেশ ছাড়া এটা সম্ভব হয় না। মাহিয়ারের ধ্যানজ্যোতি যেমন ইন্দ্রনীলের নিষ্ঠাবান অনুশীলনে প্রতিফলিত তেমনই অমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের (ভোম্বলবাবু) কাছ থেকে তিনি সেতার-বাদনের আত্মীয়তার যে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন তার ললিত মধুর ছন্দবিশ্লেষণ তাঁর আঙ্গুলগুলির পরতে পরতে। অমিয়কান্তির বাজনা যাঁরা শুনেছেন, আশা করি তাঁদের স্মৃতিতে তা আজও উজ্জ্বল আছে।

কৌশিক কানাড়ার মধ্যে করুণ মধুর গাম্ভীর রসের দীর্ঘায়িত সমন্বয়। ইন্দ্রনীলের বাজনায় কৌশল প্রধান নয়, কলাশিল্প-বোধটাই তাঁর হাতের নাগালে আগে আসে।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রী চিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

শ্রী অখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন : ৪৫-০৯৩৯

উদয়শংকরের জন্যে

১৫ অকটোবর শনিবার রবীন্দ্রসদ[illegible] পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এ[illegible] সভার আয়োজন করেছিলেন—পরলোকগ[illegible] শিল্পী উদয়শংকরের স্মৃতি চারণ[illegible] উদ্দেশ্যে। উদয়শংকরের মৃত্যু হয়ে[illegible] সেপ্টেম্বর, সেখানে ১৫ অকটো[illegible] উদ্দেশ্যে সরকারের শুভবাজ্ঞাপন সময়ে[illegible] দিয়ে দ্রুততার পরিচয় নয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রচুর [illegible] জ্বলেছে ভি আই পিদের নিয়ে হ[illegible] পড়ে গেছে—যা আমাদের স[illegible] সাধারণত হয়। উদয়শংকরের [illegible] সভাতেও তার পুনরাবৃত্তি [illegible] আঘাত দেয়। কিন্তু অনুষ্ঠান [illegible] পরে তার ভাব গাম্ভির্য আমাদের শে[illegible] দেওয়ার এমন এক জায়গায় নিয়ে [illegible] যেখানে কোন ক্ষোভই আর থাকে [illegible] যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ঐ মহান শিল্প[illegible] উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধা জান[illegible] পারি। এই কৃতিত্ব ঐ সভার বক্তাদে[illegible] সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে যে পরিবেশ ঐ[illegible] দিছিলেন, তাকে আরো মহনীয় [illegible] তুলেছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন, অন্নদাশ[illegible] রায়, তিমির বরণ, সন্তোষ সেনগু[illegible] সুখী প্রধান সুকুমারকান্তি ঘোষ প্র[illegible] বক্তাদের ভাষণ স্মৃতিচারণের মাধ্য[illegible]

বিচিত্রা

এলিজি ঃ উদয়শংকর

উদ্দেশ্য ছিল এবারে একটু ভিন্ন। শংকর ফাউণ্ডেশন ফর ক্রিয়েটিভ আর্টস্ গতবারে উপস্থিত করেছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর-কে নেতাজী ইণ্ডোর ষ্টেডিয়ামে বারো হাজার শ্রোতার সামনে। সেবারের বাজনা শুনে হয়তো অনেক শ্রোতাই সন্তুষ্ট হন নি তাঁর হাল্কা মেজাজের বাজনা শুনে। কিন্তু এবারে মঞ্চের একেবারে মাথায় ছিল হলুদ-আলোয় মাখা উদয়শংকরের হাসি-মুখভরা ছবি। মঞ্চের একপাশে কিছু ধূপ পুড়ে যাচ্ছিল। বেদগান আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্মেলক পরিবেশনা হতে চেয়েছিল সঙ্গীতনিমগ্ন পরলোকগত নৃত্যশিল্পী-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তবু প্রায় বারো হাজার দর্শক অনেক চেষ্টা করেও গানের কথা-কে ভালভাবে বুঝতেই পারেন নি গায়কদের সম্মিলিতভাবের উচ্চগ্রামতায়। এর চেয়ে পরিচালিকা সুচিত্রা মিত্র যদি একা গাইতেন, তাহলে হয়তো অনুষ্ঠানের মূল সুরটাকে প্রথমেই ধরা যেত।

এরপরে ছিল দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—'গুরুবন্দনা'। সম্মিলিত গান এবং অর্কেষ্ট্রার সমন্বয়ে গড়ে তোলা স্বয়ং রবিশংকর বিরচিত তাঁর অগ্রজ নটরাজপ্রতিম উদয়শংকরের প্রতি নিবেদিত আন্তরিক সুরাঞ্জলি। আমাদের দুর্ভাগ্য, শঙ্করা রাগের ভিত্তিতে রচিত এই অনুষ্ঠানটি মাইকবিভ্রাটে সব শ্রোতার কাছে পৌঁছতে পারে নি। তার থেকেও বেদনাদায়ক এই যে কাছাকাছি থেকে যাঁরা এই লক্ষ্য করেছেন, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবার সময় যে বেদনার চিহ্ন পণ্ডিতজীর চোখেমুখে ছিল, তার এক ভগ্নাংশও সমবেত গায়কদের গলায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। জাইলোফোনের ব্যবহারে মন্দিরের আরতি করবার যে ইমেজটুকু আনতে চেয়েছিলেন, সমবেত কলরব সে দেবতা-কে কোথাও-ই প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় নি।

রবিশংকর

বিরতির পরে আসরে এলেন স্বয়ং রবিশংকর আল্লারাখা-কে সঙ্গে নিয়ে। উদয়শংকরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে তিনি কিন্তু অগ্রজের উদ্দেশ্যে নূতন কোন রাগসৃষ্টি করেন নি। বরং বেছে নিয়েছেন প্রাচীন রাগ শ্রী-কে একদম প্রথমে। চল্লিশ মিনিটের আলাপ আস্তে আস্তে রূপ পেয়েছে বিনম্রিত, মধ্য ও দ্রুত-জোড়-ঝাঁপতালের গৎ-এ। মন্দ্র সপ্তকে বীণার মতো গভীর সুরেলা কাজ আস্তে আস্তে আমাদের গভীর থেকে গভীর-এ নিয়ে গিয়েছে মনে হয়েছে গুরুবন্দনায় তাঁর যে অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল—তা যেন তিনি আবার ফিরে পেতে চাইছিলেন তাঁর আলাপের মধ্যে। এটুকু বলা যায় যে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করবার চেয়েও বড়ো কোন তাগিদ তাঁর ছিল।

তারপরে ইমন-মনজ্। এই রাগবিস্তারে যদিও অপেক্ষাকৃত হাল্কা, তবু আগোগোড়া অদ্ভুত একটা সুরের জহু তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। সহজভাবে পর্দাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে ঠুংরীর চলন চিরাচরিতভাবে এনেও আবার ফিরে গেছেন সেই জায়গায়। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্য লেগেছে আল্লারাখা-র ব্যবহার। আগাগোড়া অনুষ্ঠানে কোথাও কোন চমক ছিল না। ছিল না সওয়াল জবাব করবার কোন প্রচেষ্টা। ছিল না বারো হাজার দর্শক-কে আলগাভাবে বেঁধে রাখবার কোন ইচ্ছে। অনুষ্ঠান হয়তো এখানেই শেষ হতো। তবু শ্রোতাদের অনুরোধ বাংলা গানের গানের সুর-কে মুখ হিসেবে বেঁধে নিয়ে শোনালেন ধুন। শৈশবে শোনা রজনীকান্তের গান ('পাতকী বলিয়া যদি'—বাজাবার আগে বলে নিয়েছিলেন)-কে কুড়ি মিনিট ধরে। আড়ি ছন্দে মাঝে মাঝে কীর্তনের আকুলতা আর বেহাগের গাম্ভীর্য মিশে কান্না-হাসির পরিবেশ ক'রলেন তিনি।

সোয়া দুই ঘন্টা ধরে অগ্রজের প্রতি স্মৃতি-নিবেদন করতে গিয়ে তিনি যে পরিবেশ চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন কী! তা নইলে উদয়শংকরের স্মৃতিবাসরে ধুনের চটুলতা শোনবার জন্যে এতো ব্যস্ত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে যখন স্বয়ং রবিশংকর সুরের এলিজি রচনা করতে চেয়েছেন!

আমরা বোধহয় মূল সুর-কে ধরতে আজও শিখি নি।

তথাগত চক্রবর্তী

আমার দেশের আজব কথা, সুরে-তালে

ছোটোদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে ইলেকট্রনিক একালে, এই মহাকাশ পাড়ির যুগেও আজব দেশের আজব কথার ধার কিছুমাত্র কমেনি। বিজ্ঞান যতোই রহস্য ফাঁস করতে-করতে গ্রহ থেকে গ্রহে এগিয়ে যাক, আজগুবি কল্পকথার প্রাণভোমরা মানুষের মনের লুকোনো সোনার কৌটোয় ঠিকই বেঁচে থাকে। বিশেষত শিশুমনে।

'ভিজার্ড অব ওজ' অবলম্বনে 'আজব দেশ মে মিনু' নত্যনাট্যে এই রূপকথা পিয়াসী শিশুমনের একেবারে ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন জামশেদপুরের টেগোর সোসাইটি। ৯ অকটোবর রবীন্দ্রসদনে শিল্পনগরীর ওই সাংস্কৃতিক সংস্থাটির ছাত্রীরা নৃত্যো-

আজব দেশ মে মিনু

অভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। আজগুবি কল্পকথার টান তো ছিলোই, ছোটোদের মন কাড়তে বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা ও আলো-ছায়া-রঙে-রহস্যময় মঞ্চসজ্জাও চমৎকার কাজ দিয়েছিল। কলকাতার সি-এল-টির গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিবেশনা, শ্যামলেশ ঘোষ ও নন্দলাল বসুর সঙ্গীত পরিচালনা রূপকথাটিকে কথায়-সুরে সুন্দর জাগিয়ে দিয়েছিল। কণিষ্ক সেনের আলোর যাদুতে ও এল-আই-সিং-এর মঞ্চসজ্জায় গুণে কল্পনার আজব দেশ সত্যিই মঞ্চে নেমে এসেছিল। কস্টিউম ও মুখোশ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। সিংহের ও উড়ুক্কুদের মুখোশ খুবই নিপুণ ও কল্পনাপ্রবণ হাতের কাজ।

সেদিনের দ্বিতীয় নৃত্যনাট্য আরব্য-রজনী অবলম্বনে 'আলাদিন আউর যাদু-ই-চিরাগ'-এ রাজকুমারীর ভূমিকায় ছোট্ট মেয়ে দীপান্বিতার নাচ ভারি সুন্দর। শিল্পীদের দলগত নৃত্যাভিনয় যথাযথ। তবে অভিনয়ে কিঞ্চিৎ বোম্বাই ফিলমের ছাপ ছিলো। গোটা নাট্যগড়নটিকে আরেকটু নৃত্যশীল করে অভিনয়-আতিশয্যের বদলে আরো ভাববহ, আরো প্রকাশক্ষম অভিনয়ের হয়তো সুযোগ ছিলো। কণিষ্ক সেন ও এল আই সিং তাঁদের যতোদূর যা করবার করেছেন। শ্যামলেশ ঘোষের গান-রচনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার সুন্দর সুযোগ নিয়েছেন নেপথ্যশিল্পীরা। কয়েকটি গলা আলাদা করেও কানে লেগে থাকে। শ্যামলেশ ঘোষের নাট্যকাঠামো, আজব দেশ মে মিনুতেও দেখা গেছে, বড্ড বেশি টুকরো জোড়া লাগানো। দুটি দৃশ্যের মাঝে প্রায়ই ছেদ, ঘন-ঘন শূন্যমঞ্চমুহূর্ত। নৃত্যপরিচালনায় পরেশ দাস আরো শাস্ত্রীয় ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র বুনে দিতে পারতেন। জলি রায়চৌধুরী, সবিতা সেনগুপ্ত, শেফালি গুপ্ত, ইরা পানি প্রমুখের কস্টিউম-কল্পনা, রিতা সরকার ও কল্যাণ গুপ্তের মেক-আপ তারিফযোগ্য। তবে পুরুষবেশী বড়ো মেয়েদের বেল-বটম্ বা আঁটো শার্ট একটু বেমানান। প্রযোজক-প্রধান মঞ্জু কুমার ও অমর লালার পরিকল্পনায় নিষ্ঠার পরিচয় স্পষ্ট।

—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

উদয়শঙ্করের নামে নৃত্যানুষ্ঠান

মহালয়ার সন্ধ্যায় কলামন্দিরে মমতা-শঙ্করের পদম্ দেখে মনে হচ্ছিলো প্রাচীন মন্দিরের কোনো নৃত্য-মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অভিনয়াংশ এবং অঙ্গভঙ্গিমা দুই-ই প্রশংসনীয়। তিল্লানাও নিপুণ। সে-তুলনায় আলারিপু কিঞ্চিৎ ম্লান মণিবন্ধ এবং গুরুবার কাজের আতিশয্যে। মমতার ভরত-নাট্যমের পর ভারতীয় নৃত্য পর্যায়ে কয়েকটি লোকনৃত্য পরিবেশন করলেন উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টার। হিমাচল প্রদেশের একটি লোকনৃত্য দেখে পাহাড়িয়া পরিবেশ সুদ্ধু মনে আসে। এর পাশাপাশি ফসল-কাটার নাচটিতে কল্পনার সেই আনুপুঙ্খিক প্রসার পাওয়া যায় না। মেয়ে-পুরুষদের সমবেত ভাংড়া-আশ্রয়ী নাচ খুবই প্রাণবন্ত।

'যুগছন্দ'-র কিছু অংশ বেশ আকর্ষণীয়। সূচনার প্রদীপ-নৃত্যে চিরকালীন ভারতীয় মঙ্গল ও সৌন্দর্য-প্রত্যয় শুভ্র-সুন্দর রূপ হয়ে ফুটে ওঠে। কথকের কিছু অংশেও শিল্পীরা সুন্দর নেচেছেন। ধুনুচি নৃত্যটি বাস্তবানুগ। টুইস্ট-জাতীয় আধুনিক বিদেশী নাচ ও আনুষঙ্গিক রুচিবিকার, সেই সঙ্গে অভিনয়ের স্টাইলাইজেশন যথাযথ। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও মৌলিক সাধনা থেকে আরম্ভ করে এযুগের উগ্র, উদ্ধত যৌবন-মত্ততা, অন্ধ বিদেশী অনুকরণপ্রবণতা সব কিছুই শিল্পীদের দলগত নৃত্যাভিনয়ে ধরা পড়েছিল। একালের এইসব যুগলক্ষণ ফুটিয়ে তুলতে মমতাশঙ্করও সুন্দরভাবে সফল হয়েছেন। তবে যে-কোনো মার্গ-নৃত্যের উপাসিকার পক্ষে এই সফলতা এক চরম দিকভ্রান্তি। অমলাশঙ্করের নৃত্য-পরিচালনা প্রশংসনীয়। আনন্দশঙ্করের সঙ্গীত-রচনা থীম-উপযোগী।

—নৃত্যশ্রী দর্শক

স্পর্ধিত মস্তক নিশীত নিয়তি

নয়, অকটোবর সাত্তাত্তর। সন্ধ্যে ছটা। আবছা আলোয় পর্দা উঠল। মাথা গুণে দেখলাম মোট দর্শক সংখ্যা বড়জোর চল্লিশ। এর মধ্যে আঠারোজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এটা হাওড়া শহর! নটধা হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে একটি নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকরা বলেন, হাওড়ায় আবার শিল্পী, আর শিল্প কর্মীরা বলেন, হাওড়ায় রসিক দর্শক নেই, এই পারস্পরিক অবিশ্বাস আর দ্বন্দ্বেই এখানে একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি আজও অনেক অসুবিধা সামনে রেখেও প্রতি মাসে দুটি, সম্ভব হলে চারটি অভিনয়ের পরি-কল্পনা নিয়েছেন নটধা, এই রামগোপাল মঞ্চেই, নাটকের নাম ঐশ্বরিক।

আমরা ভগবান বিশ্ব আমাদের... গানটির পর্দা ওঠে। বুঝতে পারি আমাদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ভগবানের রাজ্যে। পরামর্শ চালাচ্ছেন নারদ আর দেবরাজ ইন্দ্র। স্বর্গ! স্বর্গ! রঙিন স্বর্গ! কিন্তু ঐ কোন স্বর্গ? নাট্যকার।নির্দেশক, শিবু মুখোপাধ্যায় এ কোন স্বর্গ দেখালেন আমাদের। চক্রান্ত! এসব পলিসি— নাটকের দ্বিতীয় অংক শুভ চিৎকার করে ওঠে দেবরাজের সঙ্গে নারদের ফিসফিসে পরামর্শের মধ্যে তারই আভাস। এই চক্রান্তেরই শিকার দধিচি, মেঘনাদ, একলব্য। কাহিনী অবিকৃত রেখেও চরিত্র-গুলির আধুনিকীকরণ ভারি সুন্দর। ষ্টেজ মেক-আপের সরল পদ্ধতি দর্শককে বেশী করে নাটক দেখতে আঁকড়ে ধরে; লাইট ব্যবহার আর একটু সময় মতো হলে ভাল লাগত।

জাগাও চারিদিক থেকে জাগাও। বুঝিয়ে দাও কি চলছে আর কি চলা চলা— নাটকের দ্বিতীয় অংকে শুভ চিৎকার করে ওঠে। না শুভ, সুবোধ কেউই বোঝাতে পারেনি। শিকার পিন্টু। গুরু ভক্তির মূল্য তাকে কড়ায় গণ্ডায় মেটাতে হয়েছে জেলে পচে, আলোর রঙে পিন্টুর প্রেমিকা মিতার ভাবনার দৃশ্য বলে, সহজেই চেনা যায়। স্কুলীন টানার ভয়ার্ত আওয়াজ নাটক দেখতে অনামনস্ক করে। পিন্টুর মতে

মমতা শংকর

শিকার হন লেখক। সত্যি কথা সহ্য করতে পারেন না সম্পাদক। লেখক, লেখার বিষয় পুরাতন। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতাকে বিষয় হিসাবে বাছেন।

প্রবাল মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অরুণ চক্রবর্তীর অভিনয় ভালো লাগে। গৌতম মুখোপাধ্যায় বড়ো আড়ষ্ট অভিনয় করেছেন। স্বর্গের উর্বশীকে মানায়নি। নাটকটি দুঃখ ভোলায় না, দুঃখ দেয়। আবেগ হৃদয়ের শিরা বেয়ে চোখে পৌঁছায় না। **নির্মলেন্দু ঘোষাল**

সুরসভার অনুষ্ঠান

সুরসভা শেষ বর্ষণের পালা উদযাপন করলেন রবীন্দ্র সদনে ২৩ সেপ্টেম্বর। তার আগে রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় আনন্দ-লোক-এর সমবেত গান রবিতীর্থের শিশু শিল্পীবৃন্দের 'আনন্দেরি সাগর হতে' সুষমা ঘোষ ও লক্ষ্মী গুপ্তের কণ্ঠে ও তারক সাহার সঙ্গত হিমাংশু গীতি এবং উল্লেখ-যোগ্য নৈপুণ্যে সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নম নম বাংলাদেশ মম' গানটির সুরে গীটার ও অজয় ঘোষের তবলা সহযোগিতা ইত্যাদি। সুচন্দ্রার আঙুল ছোঁয়া তারের অনুরননে নির্ভুল সুরের আলিম্পন। সচরাচর গীটার বেহালায় গান শুনি না কেন না মনে মনে কথাগুলি গাঁথবার মত করে যন্ত্রকে কথা বলানো হয় না। সুচন্দ্রা সেদিকে সতর্ক ছিলেন। একক সঙ্গীতে সুচিত্রার এদিনে প্রথম দিকের দু-একটি গানে কণ্ঠের ক্লান্তি থাকলেও 'যে কাঁদনে হিয়া' 'আমার ঝরা পাতা' প্রভৃতি গানগুলিতে তিনি আমাদের মনে সুর বাণীর দাগ কেটে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বিরতির পর নৃত্য ও গানের ডালায় উপচে উঠল মঞ্চ। শেষ বর্ষণের আটটি গানের মধ্যে হেমন্ত ও সুচিত্রাও ছিলেন। হেমন্তবাবুর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' ভাল লাগল না। সুরভঙ্গ হচ্ছিল এবং দমের অসুবিধা টের পাচ্ছিলাম মাইক্রোফোনে। রেকর্ডে ওর গলার এই গানটি স্মৃতির হংসবলাকায় আমাদের মনের সাথী। পলি গুহর নাচের সঙ্গে অবশ্য মোট আবেদনটা তেমন মার খায়নি। 'মধু গন্ধে ভরা'তে হেমন্তবাবু অনেকটা সংশোধিত। নাচে ইন্দ্রা ও ভারতী একেবারে সমবেশিনী সবুজ সোনালী ধানী। কালা-ছায়া বিদ্ব-প্রতিবিম্ব। 'তারা ভরা নিঃসীম অন্ধকারে' এই অতীন্দ্রিয় আবেদন ফোটানোর জন্যে আলোক সম্পাত ও সহযোগী সমবেতের একটু-আধটু সাজেসশন ছিল না বলে শরতের কচি-কাঁচা-তারুণ্যের ভাবটাই ছিল নাচিয়েদের বেশেভূষায় রূপে রসে। নৃত্য অংশে পলি গুহ মধুমিতা ভট্টাচার্য মেখলার 'শাঙন গগনে ও সংখমিত্রা বাণার একলা বসে বাদল শেষের সঙ্গে অনবদ্য সেচেছেন। বিশেষ পলির চোখ হাত ও সমস্ত শরীরের গতি কাব্যিক আবেদনের অনুলেখন সাবলীল ও গানের সুর কথার রসানুগ। হেমন্তবাবুর পাশাপাশি দ্বিতীয়। মুখোপাধ্যায় রবীন 'হে নিরুপমা' 'শেষ গানেরই রেশ' এ দুটি গানেই রীতিমত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মধুমিতা শুভাশিস রেখা এদের নাচের আবেদনের ঠিক ঠিক জায়গায়—সুরের ওঠা-নামা ও ভাবনাট্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেটা অনেকের বেলায় ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের নাচ সুরেলা নাচ রবীন্দ্রনাথের গান আবার নাচের মত ছন্দায়িত। রবীনের গলা মিষ্টি পরিষ্কার এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতানুসারী পরিশীলিত। এবারের মত বর্ষার পালা শেষ। এটা আবহাওয়া অফিস জানাতে ভরসা পান না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষার—গানে আকস্মিক নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় না। সুরসভা এটি ঘোষণা করে 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' দিয়ে শরতকে দিলেন ডাক। 'কালো মেঘের আর কি আছে—দিন।'

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

রেস্তোরা

দুটো টেবিল জুড়ে মহাজনরা বসে আছে। উল্টোদিকের টেবিলের উপর আর একটা বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে পাড়ার ছেলেরা। দুটো সিগারেট ঘুরে বেড়াচ্ছে ছ'টা ছেলের মধ্যে। এরা নিয়মিত এখানে আড্ডা মারে। বন্ধুদের কাছে এদের ঠিকানা কেয়ার-অফ পণ্ডিতের চায়ের দোকান। সকাল ন'টা থেকে একটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে দশটা এখানে ওদের পাওয়া যাবে।

উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ এই রেস্তোরার মালিক। প্রায় পঁচিশ বছর এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। একে একে কয়লার, বিস্কুটের, দুটো পাঁউরুটির মহাজনকে দেনা মেটাচ্ছে। চায়ের ভাঁড়ের মহাজনকে দেখলাম আঁচল ঠিক করে নিয়ে টাকা গুনছে। দেড় টাকা শ' ভাঁড়। এক সপ্তাহের সাড়ে দশ টাকা গুনে, গেঁথে নিল হাফ-হাতা গেঞ্জি-গায়ে চায়ের ভাঁড়ের মালিক। ক্যালেণ্ডারের মহাদেবকে নমস্কার করে বিদায় হলো।

খদ্দের খুব একটা নেই। রাত সাড়ে আটটায় তিন কেজি মটরের ঘুগনি, তিন কেজি আলুরদম আর পাঁচ ডজন কোয়ার্টার পাউণ্ড রুটি শেষ। এখন নিজেদের রান্না চাপে। এই রেস্তোরার মালিক এখানেই একলা থাকে একটা ঘর ভাড়া করে। তিরিশ টাকা। জল আলাদা, ইলেকট্রিক বিল আলাদা।

বাকি একটা টেবিলে আমি এখন একা। বাইরে কোয়ার্টারের সামান্য কিছু লোকজন। ভেতরে ওরা ছজন, রেস্তোরার মালিক, একটা সুন্দরবনের ছোট লেছে আর একজন বয়স্ক বিহারের মানুষ। শুয়োরের মাংসের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। এটা ওদের। কি একটা ব্যাপারে বাতিতে জেতার জন্যে এই মাংস।

রেস্টুরেন্ট এটাকে ঠিক বলা যায় না। কেননা রেস্টুরেন্ট বলতে চপ-কাটলেটের গন্ধই যেখানে শুধু উড়ে বেড়ায়। এটা কি ততখানি না হলেও রেস্টুরেন্ট। ৬৫ পয়সায় ডিমের চপ, ২৫ পয়সা ভেজিটেবল চপ বিকেলের দিকে খুবই সামান্য তৈরি হয়। দিনের বেলায় চলে রুটি, ঘুগনি, আলুরদম, বিস্কুট, চা, টোস্ট।

এখানকার খদ্দের প্রধানত রাস্তার ওপার-এপার মিলিয়ে কিছু কারখানার শ্রমিক। পুরোনো লোহার রড, টিন, এ্যাস-বেসটস, কিংবা দরজা-জানালার কাঠ কিনতে কিংবা অর্ডার দিতে যারা আসে তারাই এখানকার বেশির ভাগ খদ্দের।

বছরে ছটা লাইসেন্স, একশো ভের টাকা দোকান ভাড়া, লাইট, পাখা, দুটো লোকের খাওয়া-দাওয়া, মল খাবার, আর সত্তর টাকা মাইনে, বৎসরান্তে একবার জামা-কাপড় দিয়ে নিলে খুব বেশি আয় করতে পারে না।

তিরিশ পয়সা করে ঘুগনি, আলুরদম, কুড়ি পয়সার চা, পাঁউরুটি পঁচিশ আছে পনেরো আছে আর আছে সামনের টেবিলে সাজানো বিস্কুট, কেক, পাশে ঘুগনি, আলুরদমের ডেকচি।

দক্ষিণ কলকাতার দীপ্তির মোড় এখন আর কারোর কাছে অচেনা নয়। ডানদিকে চলে গেছে তারাতলা, বেহালা, ভায়মণ্ড হারবার রোড, মোড় থেকে চলে গেছে সোজা কুদঘাট কিংবা গড়িয়া। এই মোড়ের গা ঘেঁষে সি আই টির নতুন ফ্ল্যাট আর সুপার মার্কেট হয়েছে। ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। মার্কেটেও সব দোকানদার এখনও আসেনি। কিছু কিছু দোকানদার এসেছে। খুব একটা জমেনি এখনও বাজারটা। এই সুপার মার্কেটেই এই রেস্তোরা। চলে না দোকান ভাড়া আর সব কিছু দিয়ে মাসান্তে কিছু আয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবু ওদের এত কষ্টেও মুখের হাসিটুকু ফুরোয় নি।

রান্না

ডিম চিংড়ির পাটিসাপটা

সেদিন মণিপুরী বৌদি বললেন, মাংসের পরটা কেমন খেলি? বললাম, দারুণ। মণিপুরী বৌদি এক গাল হেসে বললেন, কাল সকালে একটা নতুন জিনিস বানাবো। খেলে টেবিলে যাবি। চায়ের সাথে দারুণ জমবে। বললাম, সাধ্যের মধ্যে হবে তো? তোমার যা আয়োজন। উনি চটে গেলেন, আয়োজনের কি? আড়াইশো গ্রাম ময়দা, একশো পঞ্চাশ গ্রাম টাটকা কাঁচা চিংড়ি, একশ গ্রাম আলু, আদা পাঁচশ গ্রাম, পেঁয়াজ পঞ্চাশ গ্রাম, দুটো কাটা হাসের ডিম, একটু ডালডা বা ঘি, একটু ভিনিগার, লংকা হলুদ, চিনি নুন—ব্যস। তুমি তো বললে, ব্যস! বাজার দর জানো? ময়দার কেজি দু-টাকা, টাটকা কাঁচা চিংড়ি পাঁচ টাকা, আলু দেড় টাকা, আদা তিন টাকা,

পেঁয়াজ আড়াই টাকা, ফাটা হাসের ডিম বড় দুটো এক টাকা, তাছাড় হলুদ, লংকা, চিনি নুনের খরচ তো আছেই। মণিবৌদি বললেন, ভাল খেতে গেলে, একটু খরচা তো হবেই —এতো এমন কিছু নয়। ইচ্ছে হলে লিখে নিতে পারিস। বললাম, বল, কি আর করা যাবে।

উনি বলতে লাগলেন, প্রথমে ডিম ভেঙে ময়দার সাথে মাপমত জল দিয়ে গুলে নিতে হবে। তাতে তেল, চিনি পরিমাণ মত মিলিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তারপর চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে বেটে নিয়ে আলু সেদ্ধ করে আলুর সাথে মাছ বাটা ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে পেঁয়াজবাটা আদাবাটা, লংকাবাটা, সামান্য হলুদ দিয়ে একটু তেলে নাড়াচাড়া করে তার ভেতর আলুমাখা চিংড়িমাছ, একটু চিনি ও নুন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। পাটি-সাপটা যে ভাবে করে, সেইভাবে চাটুর ওপর একটু ঘি বা ডালডা দিয়ে, ডিম ও ময়দা গোলা অল্প অল্প ছেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ডিমের অমলেটের মত করে তাতে আলুমাখা চিংড়ি মাছের কষা পুর দিয়ে গুটিয়ে নিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। চায়ের সাথে গরম গরম খেতে কেমন লাগবে বলতো?

আয়েত্রী সেনগুপ্ত

আমি কঙ্কাবতী বলছি

সকল ঋতুর মত শীতকালেরও আছে দু-একটি বিশেষ উপভোগ্য। যেমন ধরুন, কার্তিকের পড়ন্ত বেলার সেই লালকে সোনালী আলো যা ক্ষণিকের জন্য সোনালী করে দেয় মেয়েদের চুল, গাছের পাতার সবুজ। কিম্বা, কুয়াশা বিজোড়িত শীতের ভোরে প্রথম পেয়ালা চা। শীতকালে লেকের ফাঁকা জলাশয়ে একলা সন্তরণ। শীত-কালে শ্রমণ। শীতের রোদ। শীতে আলস্য। আর, গৃহস্থ কিম্বা যাযাবর, সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে যা, তা হল শীতকালের ঝলমলে তরকারীর বাজার। একসঙ্গে এত তীব্র রঙ কদাচিৎ চোখে পড়ে, রকতর মত লাল টোমাটো, সবুজ কড়াইশুঁটি, গাঢ় সবুজ শাক, আগুন রঙা কমলা লেবু — একান্তই শীতকালের বিলাস এইসব।

প্রকৃতি দেবী অসামান্যা, যে ঋতুতে যেমন খাদ্যগুণ প্রয়োজন সেই রকম ফলমূল দান করেন তিনি। শীত-কালে সর্দি হয়। তাই প্রয়োজন ভিটামিন সিতে উপচে-পড়া টোমাটো ও কমলা লেবু। শারীরিক দুর্বলতা, সর্দি-জ্বর, সাইনাস ইত্যাদির জন্য ভিটামিন সি অপরিহার্য। একটি মাঝারী আকারের টোমাটোতে আছে পঁয়ত্রিশ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি এবং আড়াই হাজার ইউনিট ভিটামিন এ। ফলের রসের মত বিলাসীতা মধ্যবিত্ত ঘরে চলে না, কিন্তু শীতকালে টোমাটোর রস তেমন ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। প্রকৃত সুস্বাদু রসের জন্য টোমাটোগুলো সেদ্ধ করে নিন, রসের সঙ্গে মেশান নুন কিম্বা চিনি, অথবা দুটোই, আর প্রয়োজন মত জল। এই পানীয় পাশ্চাত্যে বিশেষ জনপ্রিয়।

শীতের আরেকটি প্রিয় সব্জি হল কপি। এক কাপ পরিমাণ সেদ্ধ ফুল-কপিতে পাবেন চৌত্রিশ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ১০০ ইউনিট ভিটামিন এ, সামান্য আয়রণ, সোডিয়াম, ২৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৮৪ মিলি-গ্রাম ফসফোরাস। সমপরিমাণ বাঁধা-কপিতে রয়েছে ৫৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৫০ ইউনিট ভিটামিন এ, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, পোটাসিয়াম ও সোডিয়াম। এক কাপ সেদ্ধ কড়াই-শুঁটিতে আছে ২৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ৯৬০ ইউনিট ভিটামিন এ।

বলা বাহুল্য, যে কোন সবুজ তরকারি সেদ্ধ খাওয়াটাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। একথা বলা যতটা সহজ, রাখাটা অবশ্য তত নয়, কারণ, প্রচুর তেল-মশলাসহযোগে রাঁধা বাংলাদেশের তরকারী রান্নার আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা বড় কঠিন। বাংলাদেশের দর্শনতুল্য রন্ধন শিল্পের সঙ্গে বর্বর সেদ্ধর তুলনা কখনই করা চলে না, এ সত্য মেনে নিয়েও প্রতিদিন প্রাতঃরাশে তরকারি সেদ্ধ খেতে বাধা নেই।

দুর্বল শরীরের প্রয়োজন অধিক প্রোটিন, ভিটামিন এ, বি সি ও প্যান্টো-থেটিক অ্যাসিড। এগুলির পরিমাণ অবশ্য বদলায় ব্যক্তিবিশেষে। শরীর যখন অতিরিক্ত দুর্বল, প্রতিবার খাবারের সঙ্গে খেতে হবে ৫০০ মিলি-গ্রাম ভিটামিন সি, ১০০ মিলিগ্রাম প্যান্টোথেটিক অ্যাসিড ও ২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি২ এবং বি৬। ভিটামিনের এই সব বড়িগুলি পাওয়া যাবে যে কোন ওষুধের দোকানে।

খাদ্যের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হল দই, মেটে, দুধ এবং শাক। মেটেতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, যার ভূমিকা হল বীজাণুর সঙ্গে যুদ্ধ শাকের মধ্যে পালং ও কলমি শাক সমাদারিত। কিন্তু, যদিও বাংলাদেশের খাদ্যরসিক শর্ষে শাককে বড় একটা আমল দেন না, শর্ষে শাকেই আছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভিটামিন এ। এই শাক বেশি ব্যবহার করেন পাঞ্জাবী বধূরা— বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট হল পালং। তাই বর্ণনা করছি পাঞ্জাবের প্রিয় একটি রন্ধন প্রণালী।

এই রান্নার জন্য চাই : ৫০০ গ্রাম শর্ষে শাক, ৫০০ গ্রাম পালং শাক, ৩ চামচ তেল, নুন, দুটি পেঁয়াজ, ৫০০ গ্রাম মেটে, দুটি টোমাটো।

মশলার মধ্যে দরকার : ১ চায়ের চামচ লংকা গুঁড়ো, ১ বড় চামচ ধনে গুঁড়ো (ব্যবস্থা থাকলে বাটা) ১ চায়ের চামচ হলুদ, ১ বড় চামচ শর্ষে ২ চায়ের চামচ জিরে, দেড় ইঞ্চি মাপের এক টুকরো আদা, ৬টি রসুনের কোয়া, গরম মশলা, ৫টি গোলমরিচ।

মশলা বেটে মিশিয়ে নিন পেঁয়াজ কুচি গরম তেলে বাদামী করে ভাজুন। এবারে মশলা ছাড়ুন। মেটের টুকরো-গুলি মশলার সঙ্গে কষে নিন। এবারে এককাপ জল দিন। সমস্ত জলটা মাংসের গায়ে শুকলে দিন টোমাটো আর শাক। শাক হয়ে গেলে নামান।

আটার তন্দুরী রুটির সঙ্গে বধূরা এই রান্না পরিবেশন করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

বিনোদন **অমৃত** ১৩৮৪

অবিস্মরণীয় নট কন্দর্পকান্তি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি, চিঠি, সাক্ষাৎকারে সাজিয়ে
লিখেছেন শচীন দাশ

যূথিকা রায় মানে গান
তাঁকে নিয়ে বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিত্র রচনা

দিন গুলি মোর পদ্মেরই দল

ছবিতে-চিঠিতে সৌমেন গুপ্তের সুদীর্ঘ লেখা

প্রীতিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ - অতুলপ্রসাদ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা : জীবন
সৈয়দ মুজতবা আলির ডায়েরি

শান্তিনিকেতনের সেই দিনগুলি নিয়ে
অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

পরিতোষ সেন রচিত ও চিত্রিত রচনা
অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস

গানের জন্মকথা
মধুসূদন মজুমদার

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী : কেয়া চক্রবর্তীর
অসমাপ্ত প্রবন্ধ। তাঁরই তর্জমায় একটি বিদেশী নাটক

বসন্ত

তৃপ্তি মিত্রের নাটক : বলি

এ ছাড়া খেলার ওপর একটি বড় লেখা

সমীর সরকারের আঁকা প্রচ্ছদ

দাম ৫ টাকা

কপির জন্যে যোগাযোগ করুন

সার্কুলেশন ম্যানেজার;

অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা—তিন

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 2nd December, 1977

Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

গুঁড়া মশলার
কুকমী
১ কে.জি.র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকে

ব্যবহারে সুবিধা ● মজুত রাখা সহজ
জায়গা বাঁচায় ● গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শ বছরেরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রা
১৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ ● ফোন : ৩৩০৭ ৯৫ ● পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী :

1 DEC 1977

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

বই মেলা/ ২৪ ফেব্রুয়ারি-৫ মার্চ

শৈবাল মিত্রর গল্প

vol-17

বিদেশে পাড়ি দেবার আগে, পহেলা জানুয়ারী
থেকে আর মাত্র কয়েক দিনের জন্য

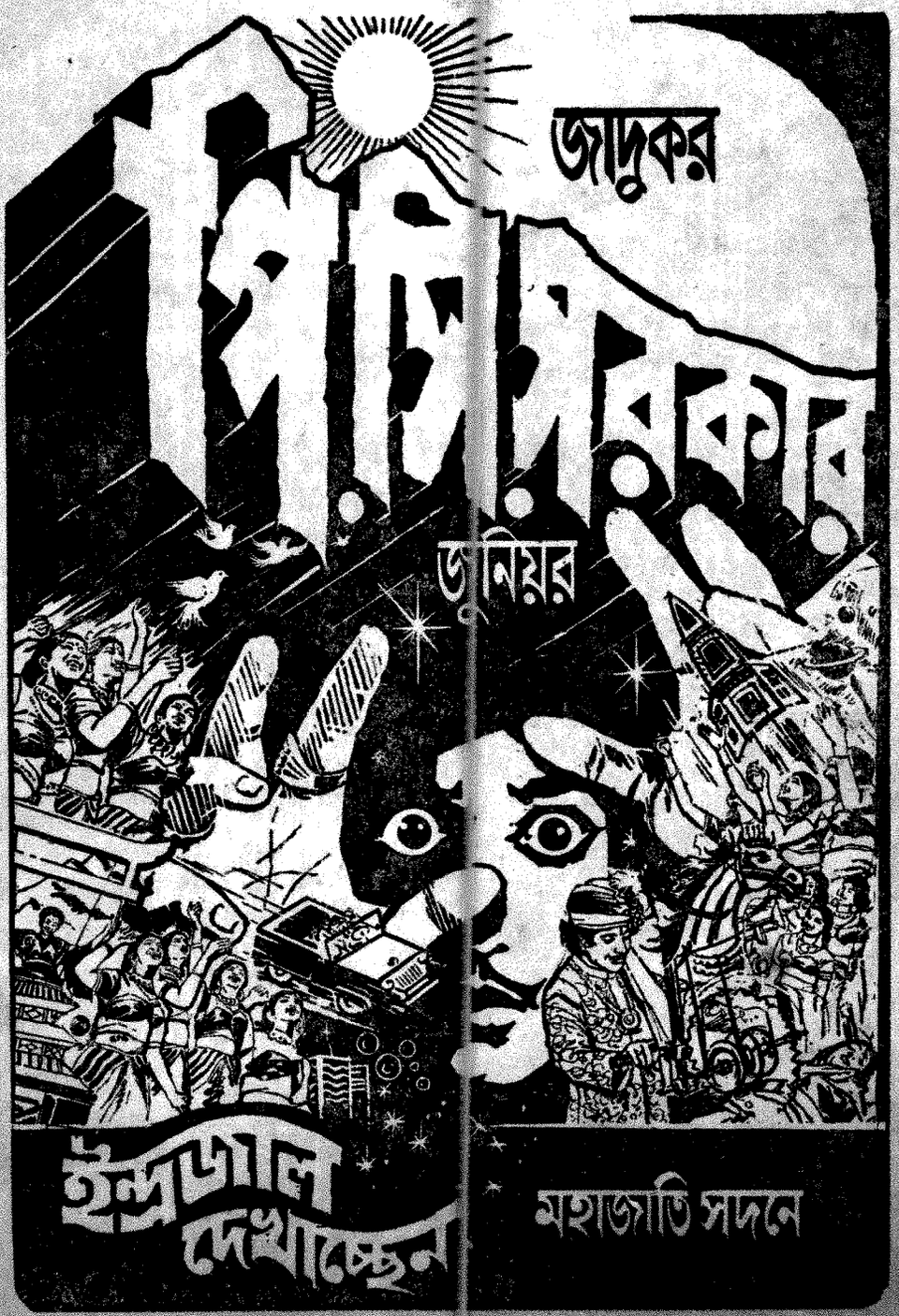

প্রতিষ্ঠা সপ্তাহের বিশেষ ঘোষণা

আগামী ৯ মার্চ আমাদের প্রতিষ্ঠানের শুভ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পুস্তক ব্যবসায়ী, বন্ধুগণ, পাঠাগার কর্তৃপক্ষ এবং সহৃদয় পাঠক ও ক্রেতাকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। এই উপলক্ষে আগামী ৬ই মার্চ সোমবার হইতে ১১ই মার্চ শনিবার পর্যন্ত আমাদের সকল প্রকার পুস্তকে প্রতিটি সহৃদয় ক্রেতাকে ১৫ শতাংশ কমিশন দেওয়া হইবে। পুস্তক ব্যবসায়ীরাও ঐ সময়ে বিশেষ সুবিধা পাইবেন।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

দুইখানি নতুন উপন্যাস

সমরেশ বসুর — আনন্দধারা ৬৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের — রক্তের বিষ ৮৲

—পুনর্মুদ্রিত হইল—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ (৩য় খণ্ড) ১৫৲

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ১২৲

আবদুল জব্বারের

বাংলার চালচিত্র ২০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অস্তি ভাগীরথী তীরে ২০৲

সুলভে বই সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুযোগ—

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতা, ময়দানে অনুষ্ঠিত Calcutta Book Fair-এ বিরাট বই মেলায় আমাদের স্টল হইতে আমাদের প্রকাশিত সমস্ত বই প্রত্যেক ক্রেতাকে শতকরা ১০% কমিশনে দেওয়া হইবে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সগৌরবে প্রকাশিত হইতেছে

বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড। দাম গ্রাহকদের পক্ষে মাত্র ২০৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ — ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ ৩৪৮৭৯১ ; ৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৩৪৯২

প্যারেড-এ পাবেন সঠিক "পি এইচ লেভেল" যে কোনও ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার জন্যে নির্ভর করে তার "পি এইচ লেভেল"-এর ওপর।

কিছু ডিটারজেন্ট এতো মসৃণ হয় যে কাপড় ভাল করে পরিষ্কারই হয় না।

অন্যান্য ডিটারজেন্ট এতো খসখসে হয় যে তাতে ধুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।

নতুন প্যারেড-এর সব উপাদানই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটা খুব মসৃণও নয় আবার খুব খসখসেও নয়। এই ডিটারজেন্ট অটুট ও প্রভাবসম্পূর্ণ।

প্যারেড-এ এমন একটা বিশেষ "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে যা আপনার কাপড় ঝকঝক সাদা, দারুণ উজ্জ্বল করে।

আপনি যখন কাপড় ধোবেন তখন প্যারেড-এর এ বিশেষ প্যারেড "অপ্টিকাল ব্রাইটেনার" আছে তা তখনও ধুয়ে বেরিয়ে যাবেনা।

তাজা ফুলের সুরভিতে ভরা প্যারেড-এ এত প্রচুর ফেনা হয় যা আপনার কাপড় ধোয়া অতি সহজ করে দেবে।

ঠাণ্ডা জল বা গরম জল, কাচা জল বা পরিষ্কার-জল যত জলেতেই প্যারেড অতি সহজে গুলে মিশে যায়। কাপড় কাচার সময় এর প্রচুর ফেনা সমানভাবে বজায় থাকে যায় ফলে একই সাবান জলে আপনি আরও বেশী কাপড় ধুতে পারেন।

বিনামূল্যে!

৫০ গ্রাম সিদ্ধল—
২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে
৭০ গ্রাম সিদ্ধল—
৭০০ গ্রাম ও ১০০০ গ্রাম প্যারেড প্যাকের সঙ্গে

শুভ্রতা ও ঝলক, চোখে পড়েনা পলক
—নতুন প্যারেড-এর চমক

CHAITRA-G-17 BEN

অমৃত

১৭ বর্ষ
৪০ সংখ্যা
১২ ফাল্গুন,
১৩৮৪

24 Feb. 1978.

সম্পাদকীয় ৩

সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়

ভুবনবাবু ও একজন চোর (গল্প) ৫
শৈবাল মিত্র

বই মেলা / ১৭-৩৮

বইমেলা ১৭ রেখা ধর
প্রকাশক ও গ্রন্থকার ২০
সুপ্রিয় সরকার

ভারতে বিদেশী বই ২২
দাউদয়াল মেহরা

প্রবন্ধ সাহিত্যের সেকাল একাল ২৩
শ্রীশকুমার কুণ্ডু

বই বাজার ৩১
সুমথনাথ ঘোষ

অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশনা ৩৩
শিবানী দে

বাঙলা বইয়ের বাজার ৩৫
দীপংকর চক্রবর্তী

সমালোচনা ৪০

সুনীল দাস এবার জাতীয় ললিতকলা পুরস্কার পেলেন ৪৩ প্রণবরঞ্জন রায়

রূপকথার দুঃখ (গল্প) ৪৫
অভীক রায়

হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ৪৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

খেলা ৫৬ দর্শক

বাঘা কিংকেটার পাতৌদি ৫৭
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রধ্বনি ৫৯

শিল্প ও শিল্পী ৬৩
প্রচ্ছদ এঁকেছেন শংকর ঘোষ

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

মমতা কুলপড়

বড় গল্প লিখেছেন
বিমলকুমার ঘোষ

সুব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গীত সমালোচনা

অনন্ত সিংয়ের
[illegible]

বই মেলা : প্রকাশনার নতুন দিক

কলকাতা শহরে লোকসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি নয়, তা সকলেই জানেন। কিন্তু লেখাপড়া জানা লোকদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কম বলে যে রটনা ছিল এতদিন, তা সত্যি নয় মনে হচ্ছে। অন্তত বইমেলার অভিজ্ঞতা সেই রকমই।

বইমেলা প্রথম শুরু হয় '৭৬ সালে। সে বছর মেলায় যোগ দিয়েছেন ৭৭টি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে কলকাতার প্রকাশক ছিলেন ৬৭ জন, অন্যেরা এসেছিলেন বাইরে থেকে। '৭৭ সালে কলকাতার প্রকাশক ছিলেন ১৩৩ জন এবং বহিরাগত ২৫ জন। অর্থাৎ সবশুদ্ধ দ্বিগুণ সংখ্যা। আর বিক্রির দিক দিয়ে টাকার অংক বাড়ে দ্বিগুণেরও বেশি। প্রথম বছরের ১৫ লক্ষ টাকা বিক্রির জায়গায় দ্বিতীয় বছর হয় ৩৫ লক্ষ টাকা। খুবই উৎসাহিত হবার মত ঘটনা তা আশা করি না বললেও চলে। এ বছর নিশ্চয়ই আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি ব্যাপকভাবে আয়োজিত হবে মেলা। এবং সাফল্যের দীপ্তি আগের বারের উজ্জ্বলতাকেও ম্লান করে দেবে।

বইমেলা যে সফল হয়েছে তব প্রধান গৌরব নিশ্চয়ই কলকাতার শিক্ষিত মানুষদের, যাঁরা প্রতিদিন হাজারে হাজারে যোগ দিয়েছেন মেলায়, এবং মনের মত বইটি সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের আনুকূল্যেই কলকাতার পুস্তক প্রকাশনার জগতে একটা নতুন পথ খুলে গেছে।

কিন্তু প্রকাশকদেরও ধন্যবাদ যে, তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে এমন একটি মেলার আয়োজন করেছেন এবং ক্রেতাদের সামনে এগিয়ে এসেছেন। নতুন কালের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের যে এইভাবে সংগঠিত করতে পেরেছেন, তাতে আশ্বাস জাগে, কলকাতার মুমূর্ষু প্রকাশন শিল্পে নতুন প্রাণের সাড়া জাগবে। আর, এতে কেবল প্রকাশকরাই নন, লাভবান হবেন পাঠকরাও। প্রথমত, অনেক রকম বই এক জায়গায় পেয়ে পছন্দমত বইটি খুঁজে নিতে পারবেন তাঁরা। তাছাড়া একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন বইয়ের ভেতর থেকেও তুলনা করে বাছাইয়ের সুযোগ পাবেন তৃতীয়ত, যে বিষয় তিনি আগে সচেতন ছিলেন না এমন কোন নতুন বিষয়ের বই পেয়ে লাভবানও হতে পারেন। তাছাড়া, বইমেলায় অন্য শহরের প্রকাশকরা যোগ দেন বলে কলকাতার বাইরে নতুন ধরনের চিন্তা-ভাবনা কী হচ্ছে, সেটাও জানতে পারেন তাঁরা।

এবং এই প্রসঙ্গে কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিরা এটাও দাবি করবেন, বিশ্ব বইমেলা শুধু দিল্লিতেই বসবে না, কলকাতাতেও অনুষ্ঠিত হবে। কেননা কলকাতার বইয়ের বাজার শুধু বাংলা বইয়ের নয়, বাঙালিদের জন্যেও নয়। সমস্ত পূর্ব ভারতের সবগুলি ভাষার বই-ই ছাপা হয় এখানে, কেনাবেচা হয়। ইংরেজি এবং বিদেশী বইয়েরও একটা বড় ক্রেতা কলকাতা। বিশ্ব বইমেলা তার নিজের স্বার্থেও কলকাতায় এলে ভাল হয়।

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের দেখেছি, কিন্নর কিন্নরী এবং মানুষ কেনাবেচার ইতিহাস প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত বেরোবে।

সাহিত্য ইত্যাদি

সমালোচনা কী ও কেন ?

পুরনো 'বঙ্গদর্শনে' একটা রিভিউ দেখেছিলাম। ছোটো লেখা, কিন্তু সমালোচনার দিক দিয়ে মোক্ষম।

বইটি হাতের কাছে নেই। স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আশা করি বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, সমালোচনা করেছিলেন বংকিমচন্দ্রই। লেখাটি এইরকম।

আজিকালি গ্যাসের আলো ও কলের জলের ন্যায় মুদ্রণ যন্ত্র সুলভ হওয়ায় রাশি রাশি কবিতা পুস্তক বাহির হইতেছে। এই বইটিও সেইরূপ। (ইত্যাদি)

না বললেও চলে, এ রিভিউ পড়ে লেখক উৎসাহিত হন নি। এবং বংকিমচন্দ্রেরও নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল সেইরকমই। নয়তো এত কঠোর তিনি হতেন না।

এইরকমই ছিল মনে পড়ছে বুদ্ধদেব বাবুর একটি রিভিউ। এক ভদ্রলোক, ধরা যাক তাঁর নাম হযবরল সেন, তিনি বাংলা কবিতার একটি বার্ষিক সংকলন [illegible] করেছিলেন। ধরা যাক, সংকলনটির নাম— ১৩৪৬-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। আধুনিক কবিদেরও বেশ একটু প্রভাব প্রতিপত্তি হয়েছে। সেই সময়ের কথা।

বুদ্ধদেববাবুর সমালোচনা ছিল সম্পাদকের মতামত নিয়ে। 'কবিতা' পত্রিকায় ঐ আলোচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, (এটিও স্মৃতি থেকে তুলে দিচ্ছি।) বইটিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নেই। অথচ সম্পাদকের আছে। কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, ১৩৪২ সালে রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতা তাঁর চোখে পড়েনি। একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর স্থান 'বোধনা-নিকেতন'। শুনেছি সেখানে নাকি জন্ম হাবাদের চিকিৎসা হয়। (ইত্যাদি)

এ রিভিউ-এরও উদ্দেশ্য ছিল, এই ধরনের দায়িত্বহীন কাজকে সমূলে উৎখাত করা। এবং তা সফল হয়েছিল। সম্পাদকের কাজ যে শুধু স্টাণ্ট দিয়ে নিজের কবিখ্যাতি জাহির করা নয়, তা হযবরলবাবুকে টের পেতে হয়েছিল।

তার মানে এ নয় যে, এলোপাথারি গদা চালানোই সমালোচকের কাজ। মোটেই তা নয়। বংকিমচন্দ্রের অনেক রচনায়, বিশেষ করে ঈশ্বর গুপ্তের ওপর লেখাটিতে দেখা যায় তাঁর দৃষ্টি কতো সূক্ষ্ম স্বচ্ছ এবং সুদূরপ্রসারী ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে বলতে গিয়ে এখন পর্যন্ত কেউই বঙ্কিমকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

বুদ্ধদেব বসুর বেলাতেও অনেকটা সেইরকম। 'কবিতা'র পাতায় অনেকবারই তিনি লিখেছেন আধুনিক কবিদের নিয়ে। প্রত্যেক কবির ধরণধারণ তিনি আলাদা করে বুঝিয়ে দিতেন। কবিতা পড়ার কায়দাটিও ধরিয়ে দিতেন তিনি পাঠককে। যেমন, বিষ্ণু দের ঘোড়সওয়ার কবিতাটি অনেকেরই হয়তো পড়া আছে। কিন্তু 'হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার' এই লাইনটির মধ্যে যে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে তা টের পেয়েছি আমরা বুদ্ধদেববাবুর লেখা থেকে। তেমনি মনে পড়ছে, জীবনানন্দ দাশের সেই 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে এক কথা কয়' লাইনটির বিষয়ে তাঁর উক্তি। এই কথা কটির মধ্যে ঘুরন্ত জলের আওয়াজ কোনোদিনই হয়তো শুনতে পেতাম না, যদি না বুদ্ধদেববাবু সেদিকে কান পাততে বলতেন।

এমন আরো আছে। শুধু বুদ্ধদেববাবুর নয়, অন্য অনেকেরই। যেমন কারো উপেক্ষিতা' লেখাটি। রবীন্দ্রনাথ এতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের একটি অদেখা দিকে আলো ফেলেছেন। দুষ্মন্ত যখন কণ্ব মুনির আশ্রমে প্রথম দেখেছিলেন শকুন্তলাকে, তখন তার সঙ্গে ছিল দুটি সখি, অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা। দুষ্মন্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল তারাই। ফলে শকুন্তলার স্মৃতির সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন প্রতিমা থাকে তার চালচিত্রের সঙ্গে এক হয়ে। কিন্তু শকুন্তলা যখন আশ্রম থেকে রাজসভাতে গিয়ে দাঁড়াল, সে হয়ে গেল একা। খানিকটা বিচ্ছিন্ন আর নিষ্প্রভ। দুষ্মন্ত তাকে চিনতেই পারল না।

সমালোচক যখন এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, রচনার আস্বাদ তখন একশ গুণ বেড়ে যায়। বইটি নতুন করে পড়তে ইচ্ছে হয়। ভালো বইয়ের বেলায় এটাই সঠিক পদ্ধতি। আর নতুন লেখক হলে তো কথাই নেই। তখন সমালোচকের আসল কাজ হল তাঁর ভালো দিকগুলোর ওপর আলো ফেলা। তাকে চিনিয়ে দেওয়া।

যেমন করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' বইটির রিভিউয়ের বেলায়। 'অর্কেস্ট্রা' সুধীন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় কবিতার বই। সুধীনবাবু তখন অল্প-পরিচিত, তার ওপর দুর্বোধ্য। প্রেমেনবাবু তাঁর রিভিউয়ে বললেন, সুধীনবাবু খুবই ভালো কবি, আমাদের নিজের কবিও বটে। তাঁর মধ্যে অচেনা যেটুকু, তা বাইরের ব্যাপার। শব্দের বাধা পার হতে পারলে দেখা যায়, তাঁর কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের চেনা জানা আকাশ পৃথিবী ফুল পাখি প্রেম বিরহ, চিরদিনের মানুষ। ইত্যাদি। এ রিভিউ পড়ে বইটি নতুন করে পড়তে হয়েছিল। এবং ভালো লাগার মাত্রা একটু বেড়েও গিয়েছিল।

আর সুধীনবাবু? হ্যাঁ, তিনিও খুব খুশি হয়েছিলেন। অনেক, অনেকদিন পরে সে কথা বলেছিলেন তিনি আমাকে। বলেছিলেন [illegible] লেখা এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে [illegible] 'অর্কেস্ট্রা' আমার কাছে অনেক দামের জিনিস। বাট দ্যাট্ রিভিউ ওয়াজ রিয়েলি গুড। অ্যাট লিস্ট ফর মি। শুনেছি, প্রেমেনবাবুকেও তাঁর ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলেন সুধীনবাবু।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। দুর্বোধ্যতার জন্যে সুধীনবাবুর কবিতা যে কেবল কম লোক পড়তেন তখন তাই নয়, রীতিমত একটা বিরুদ্ধতাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কবিতার ভারী শব্দ এবং ভারী চলনের জন্যে 'শনিবারের চিঠিতে' তাঁর নামের আগে প্রায়ই যোগ করা হত 'হাতিবাগানের মাইকেল'। একবার তাঁর একটি সনেট নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। তাতে ব্যাজস্তুতি মারফৎ বলা হয়েছিল, সনেটটি যাঁরা দুর্বোধ্য বলবেন তাঁদের সঙ্গে সমালোচক একমত নন। শুধু ৭ম লাইনে 'ছুটি' এবং ১৩শ লাইনে 'মোরা' এই দুটি শব্দ দুর্বোধ্য, কেননা সে দুটির অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে পাওয়া গেল না। বাকীগুলো জলের মতো সোজা। শুধু অভিধান ঘাঁটার ওয়াস্তা।

এই পটভূমিতে প্রেমেনবাবুর ঐ সামান্য কথাকটিও অসামান্যই ছিল বলতে হবে।

আসলে সব থেকে বড় কথা, ভালো লেখাকে ভালো বলে সনাক্ত করা। এই কাজটি করতে গেলে, পয়লা জিনিস যা দরকার তা হল সমালোচকের একটি উন্নত মানের সাহিত্যরুচি। তারই নিরিখে তিনি যাচাই করতে পারেন, কোন লেখাটা খারাপ আর কোনটা ভালো। বিশাল এই সাহিত্য যশঃপ্রার্থীদের সমুদ্রে সত্যিকারের একটি সাহিত্যরুচি ছাড়া তাঁর আর কোনো কম্পাস নেই।

এবং ঐ সাহিত্যরুচি তৈরি করার একমাত্র উপায় হল সাহিত্য পড়া, এবং আরো খুটিয়ে খুটিয়ে সাহিত্য পড়া। অবশ্যই সাহিত্য বলতে এখানে ক্লাসিক সাহিত্য এবং সেরা সাহিত্যের কথাই বোঝানো হচ্ছে। সেইসব লেখা, আর সেই লেখাগুলোর ওপর ভালো সমালোচকের লেখা—এই পড়ে পড়েই রুচি করতে হয় পাঠককে। এবং সব থেকে রুচিবান পাঠকই হতে পারেন একজন ভালো সমালোচক।

এইরকম একজন সমালোচক শুধু ভালোকেই ভালো বলেন না, খারাপকেও খারাপ বলে চিনিয়ে দেন। যেমন করেন একজন ভালো কৃষক। ফসলের ক্ষেতে নিড়িয়ে দেবার কাজ করেন তিনি, সারও দেন; কিন্তু আগাছাগুলোকেও উপড়ে ফেলেন।

লেখাটা শুরু করা হয়েছে সেইরকম উদাহরণ দিয়েই। বংকিমচন্দ্র বা বুদ্ধদেববাবু তাই ভালো সমালোচক হতে পেরেছিলেন।

তারপর? তারপরেও কেউ কেউ সে দায়িত্ব পালন করছেন বই কি। কিন্তু নতুন মানুষ সেখানে বড়ই কম।

এবং এদের ভালো লেখকরাও তাই খুবই অসহায়।

নবীন্দ্র রায়

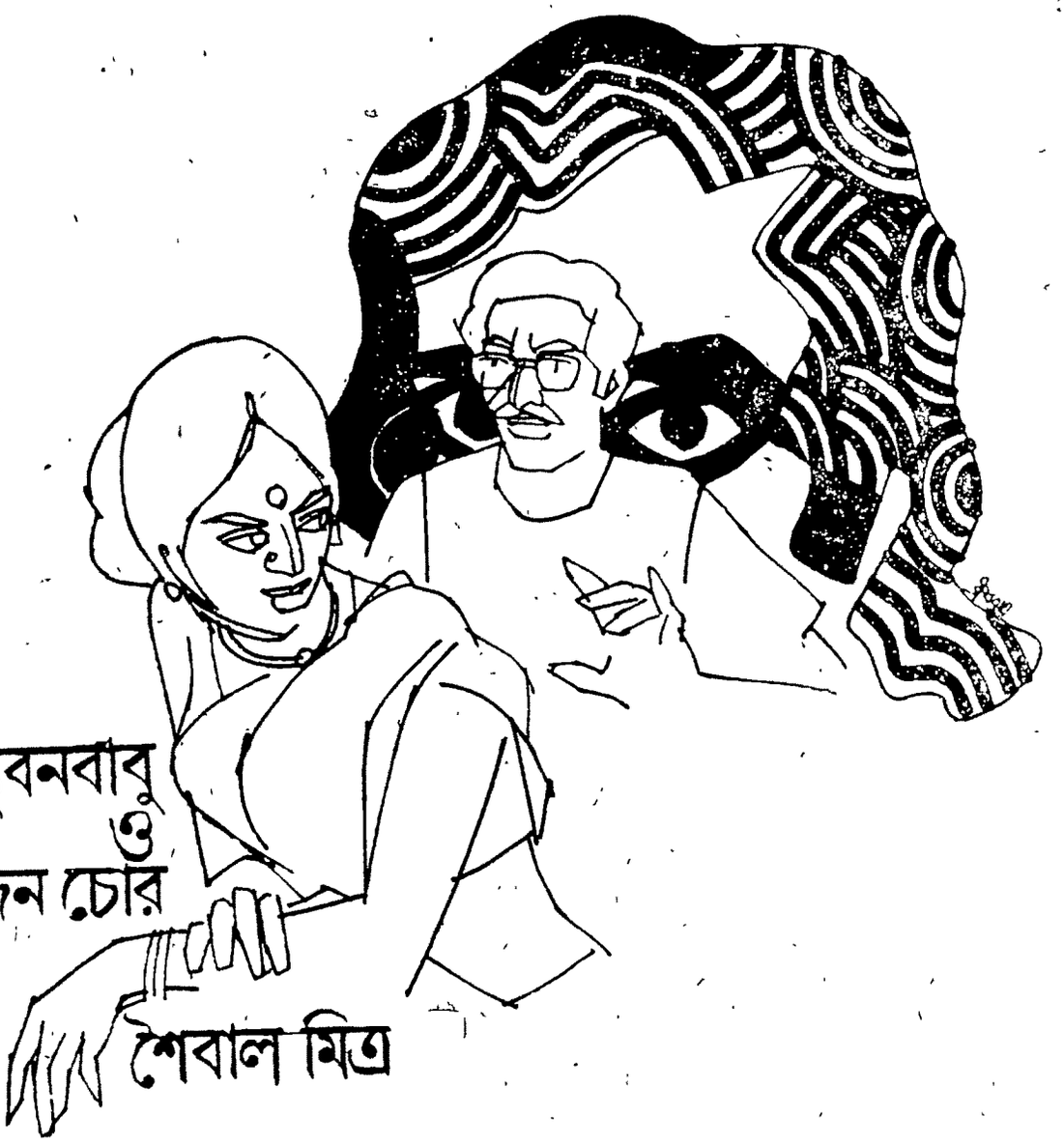

ভুবনবাবু ও একজন চোর

শৈবাল মিত্র

ঘুটঘুটে অন্ধকার। তক্তাপোশে বিছানায় ভুবনবাবু জেগে ছিলেন। বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে সহজে ঘুম আসে না। ঘুমটাও পাতলা। কম। কিন্তু সব সময়ে ঘুমের ঘোরে ভারী হয়ে থাকে চোখের পাতা। ভুবনবাবু বোঝেন এটা সেই মহাঘুমের সঙ্কেত।

জানলার বন্ধ কাঁচে খুট খুট শব্দ হয়। চোরটা এসেছে। রোজ মাঝ রাতে ও আসে। বন্ধ কাঁচের ওপাশে ওর মাথা। ঘসা কাঁচ। মাথায় ঝাঁকড়া, আলুথালু চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গলির মুখে কর্পোরেশনের আলো আছে। ম্যাট-মেটে ফ্যাকাসে আলো, কাঁচে লোকটার আবছা ছায়া। আরো দুবার কাঁচের ওপর শব্দ হয়। জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। লোকটা হতাশ হয়। ফস করে একটা দেশলাই জ্বলে। [illegible] দু টুকরো হয়। লোকটা একটা বিড়ি ধরায়। বিছানায় শুয়ে ভুবনবাবু দেখেন। কিন্তু সবটাই আভাসে, ঠারে ঠোরে। লোকটাকে চেনা যায় না।

চোরটার অসীম ধৈর্য। রোজ রাতে জানালার কাঁচে ঠেলা দেয়। ওর ধারণা কোনো এক রাতে হয়তো এই বুড়োটা জানলা বন্ধ করতে ভুলে যাবে। পুরোনো আমলের বাড়ী। জানলায় গরাদ নেই। ভেতরে ঢোকার খুব সুবিধে। ভুবনবাবু মনে মনে হাসেন। সেটা হবে না। চোরটা নিতান্তই ছিঁচকে, লোয়ার ক্লাসের লোক। দিন সাতেক আগে এক রাতে পায়ধানার ফুটো মগটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সুতো পুড়িয়ে বিড়ি খায়। প্রায় রোজ সকলেই দু তিনটে বিড়ির টুকরো ভুবনবাবুর চোখে পড়ে। মাস দুয়েক আগে ওকে একবার তিনি ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাটার টনটনে বুদ্ধি। তাই হাতে পেয়েও ভুবনবাবু আটকাতে পারেন নি। সে রাতে দরজায় তিনি খিল লাগান নি। ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। ঘাপটি মেরে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন ভুবনবাবু। তারপর রাত গভীর হয়। চারপাশ নিশুতি, নিঝুম। ভুবনবাবু ওৎ পেতে থাকেন। ঠিক মাঝরাতে কাঁচের ওপর সেই খুটখুট শব্দ। জানলা খোলার চেষ্টা। দরজার পাল্লা খুলে ভুবনবাবু নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন। তারপর দু হাতে জাপটে ধরেন চোরটাকে। লোকটা প্রথমে একটু ভড়কে যায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর ভুবনবাবুর লুঙ্গি ধরে একটান মারে। কোমর থেকে লুঙ্গি খসে যায়। ভুবনবাবুর হাত শিথিল। তাড়াতাড়ি লুঙ্গি সামলান। চোর ভতোখানে পগার পার। পাশের বাড়ীর অন্ধকার পাঁচিলে একটা বেড়াল ঘাপটি মেরে বসেছিল। এই দৃশ্য দেখে সে ম্যাও ম্যাও ডাক ছাড়ে। ভুবনবাবুর মনে হয় বেড়ালটা হাসছে।

কপালের ঘাম মুছে ভুবনবাবু এক গ্লাস জল খান। বিছানায় শুয়ে পড়েন। মনে মনে চোরটার তারিফ করেন—ব্যাটার বুদ্ধি আছে। ঘুম চটে যায়। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাত কাটে।

ভুবনবাবুর বাড়িতে এর আগেও চোর এসেছে. তখন স্ত্রী আশালতা বেঁচে ছিল। সে চোরটা ছিল খুব সৌখিন। দামী সিগারেট খেতো। বিলিতি সেন্ট মাখতো গায়ে। রাতের ডিউটি সেরে ভুবনবাবু বাড়ী ফিরতেন। আকাশে ভোরের দিকে আলো। বাড়ীর সামনে গোলঞ্চ গাছের পাতায় শিশিরের সর। টুপ টুপ শিশির পড়তো। পুব আকাশের গায়ে ভেসে ওঠা লাল থালাটার দিকে তাকিয়ে দু একটা চড়াই পাখি কিচির মিচির ডাকতো। ভুবনবাবু দেখতেন, জানলার নীচে ফিলটার টিপড্ সিগারেটের টুকরো: হাল্কা মিষ্টি গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। প্রথম দু চারদিন পাত্তা দেন নি। জিজ্ঞেস করেছিলেন আশালতাকে কি ব্যাপার বলোতো?

চোরটোর হবে।

ভুবনবাবু ভয় পেতেন। বলতেন—সাবধানে থেকো।

স্বামী স্ত্রী তখন শুতেন দোতলার ঘরে। আশালতার সঙ্গে বয়েসের তফাৎটা ছিল একটু বেশী। কোনো অসুবিধে হয়নি তাতে। ভুবনবাবুর বুকে মুখ গুঁজে অনেক রাতে আশালতা বলেছে—একটু বয়েস হওয়া ভালো। সুস্থিত থাকে. বিশ্বাস জাগে। তা ছাড়া বয়েস হলেই তো আর সব পুরুষ বুড়োয় না।

ভুবনবাবু খুশী হতেন। অন্ধকারে আশালতার চিকন কালো বিনুনি নিয়ে খেলা করতেন। রাস্তার আলোয় দীঘল বিনুনি হঠাৎ ঝকঝকিয়ে উঠতো। হাল্কা মিষ্টি গন্ধ জড়িয়ে থাকতো আঙুলে। হাতের আঙুল সারারাত ধূপ হয়ে গন্ধ ছড়াতো। ভুবনবাবুর বয়েস তখন সাতচল্লিশ। আশালতা ত্রিশ পেরোয় নি।

দুজনের কেউ খোলাখুলি না বললেও দুঃখ একটা ছিল। ছেলেপুলে হচ্ছিল না। মান্ধাতা আমলের এই বড়ো বাড়ীটায় যাওয়া কমেছে। দোতলা, ফাঁকা, বাড়ীটায় অনেককাল কোনো শিশুর জন্ম হয় নি। ভুবনবাবুর আরো এক ভাই আছে। আমেদাবাদে তার ঘর সংসার, চাকরী। এ বাড়ী থেকে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তিন ছেলে মেয়ের জন্ম নার্সিং হোম বা হাসপাতালে। বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে আগে দু-চার দিনের জন্যেও বছরে এক আধবার সে আসতো। ভুবনবাবুর বিয়ের পর আসা-যাওয়া কমেছে। দোতলা, ফাঁকা বাড়িটা এখন দিনরাত হা হা করে। সারা শরীরে ফাটল, বট, অশ্বত্থের চারা. যে কোনো দিন মুখ থুবড়ে পড়বে।

ভুবনবাবু কাজ করতেন কাগজের অফিসে। তিন শিফটের চাকরী। ডিউটির ঠিক ছিল না। বছর খানেক হলো রিটায়ার করেছেন। সরকারী কাগজ। একশো আট-চল্লিশ টাকা পেনসন পান। মাসের খরচ একশো ত্রিশ। পনেরো টাকা জমান। কোন রকম আপদ বিপদ হতে পারে। খৈনি বাবদ মাসে লাগে তিন টাকা। ওই একটাই নেশা। আশালতা মারা যাওয়ার পর বাড়ীর একটা দিক ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। ছোট ভাইয়ের অমত। সে লিখেছে. টাকার দরকার থাকলে পাঠাতে পারি। ভাড়াটে বসানো যায় নি। ভাইকে টাকার জন্যেও লেখেন নি। আসলে টাকা নয়, দু চারজন মানুষ এ বাড়ীতে ঘুরে ফিরে বেড়াক, দরজায়-জানালায়-দেওয়ালে শব্দ, কথা, হাসির লুকোচুরি খেলা হোক, এটাই তিনি চেয়েছিলেন। আজকাল বড়ো একা, ফাঁকা লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আশালতাকে বিয়ে করা ঠিক হয় নি। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। এক সময় খুব জমজমাট ছিল এই বাড়ী। বাবা, মা, বিধবা পিসি ভাই কতো লোক, বন্ধু অতিথি। মা পিসির দিনভর রান্নাঘরে কাটতো। এখনো তেল চিটচিটে, অন্ধকার ঘরটায় ঢুকলে পঞ্চাশ বছরের রান্নার গন্ধ হু হু করে বুকে ঢুকে যায়। পিসী ভাজতো হিংয়ের কচুরি-ফুলকো, ধোঁয়াওঠা। মা বানাতো মাংসের ঘুগনি। ওপরে ছড়িয়ে দিতো গরম মশলার গুঁড়ো। পোকড়াওয়ে জাফরান। ঝুলভর্তি স্যাঁতসেঁতে এই ঘরটায় সেই সব দিনের শব্দ, গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে।

আশালতা ছিল প্রুফরীডার অক্ষয়-বাবুর ছোট বোন। অক্ষয় বয়েসে ভুবনের ছোট। বোনের বিয়ে হচ্ছে না। দুঃখের সংসার। অক্ষয় ধরে বসলো—ভুবন-বাবুকে। ভুবনদা গরীব ভাইটাকে উদ্ধার করুন। আশা বড়ো ভালো মেয়ে, আপনার অপছন্দ হবে না।

প্রথমটা ভুবনবাবু উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বয়েসে বিয়ে। দূর ওসবের সময় পেরিয়ে গেছে। অক্ষয় কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার চাপাচাপিতে ভুবনবাবু একদিন চা খেতে গেলেন অক্ষয়ের বাড়ী। বেলেঘাটায় এঁদো গলির মধ্যে ওরা ভাড়া থাকে। চারপাশে বস্তি। বাড়ীটার শরীরে পলেস্তারা নেই। দুটো ঘর। ঘরের দেওয়াল ভিজে ভিজে। ঠাণ্ডা অন্ধকার। আশালতা চা নিয়ে এলো। বাইশ তেইশ বছরের ভরপুর মেয়ে। টানা চোখ. সামান্য চাপা নাক। মুখে পানপাতার ডৌল। মাথাভর্তি চুল। ভুবনবাবু জীবনে এই প্রথম সোজাসুজি একটা মেয়ের দিকে তাকালেন। মুগ্ধ হলেন। এমন শ্রীময়ী চেহারা কখনো তাঁর চোখে পড়েনি। আশালতা কিছুদিনের মধ্যে এ বাড়ীর বৌ হয়ে এলো।

ভুবনবাবুর চোখে ঘুম নামে। চোরটা চলে গেছে। একটা ইঁদুর মেঝের এঁটো বাসনে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.GLXMB.1-203 BG

ভুবনবাবু পাশ ফেরেন। জল তেষ্টা পায়। উঠে বসেন। মাথার কাছে টুলে জলের গ্লাস। গ্লাস সরিয়ে দুচুমুক জল খান। ঠাকুরদার আমলের ঘড়িটা যেন একটা তক্ষক। দিনরাত ডেকে যায়। সময় আন্দাজ করেন।

ভোর রাতে আসবে মোক্ষদা। বুড়ি লজ্জা বলতে হবে। মোক্ষদাই এখন একমাত্র কাছের লোক। দুবেলা বাসন মাজে, জল তোলে, রান্না করে যায়। চোখে দেখে কম। কানেও শোনে কম। সারাক্ষণ গজগজ করে নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা করে।

আশালতার সঙ্গে কটা বছর বড়ো সুখের কেটেছিল। একটু, একটু ভালবাসা স্মৃতি আজো বুকের মধ্যে ছলছল করে। বিয়ের চার বছর পরেও বাচ্চা এলো না আশার পেটে। আশার কোনো অভিযোগ ছিল না। একদিনও মুখ ফুটে কিছু বলেনি। বয়েসের লজ্জায় তাঁর নিজের বুক ভারী হয়ে থাকতো। আশাকে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলেন। সেই প্রথম এবং শেষ। সব শুনে আশা আর যেতে চায় নি। বলেছে, মাগো কি লজ্জা। একতারের কাছে এসব বলা যায় নাকি। ভুবনবাবুও আর জোর করেন নি। তবু কি একটা অশান্তি মনে খচখচ করতো সবসময়।

আশা বলতো—তুমি তো আছো রাতের ডিউটিটা বাদ দাও। ভুবনবাবুও সে চেষ্টা করেছিলেন। বেশী বয়েসের বৌ। রাতে ছেড়ে থাকতে মন চায় না। কিন্তু পারেন নি।

পাড়ার ক্লাবের উদ্যোগে নরেশ ভট্টা জোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গায় ধরলো। ভুবনবাবু, শচীন সাঁতারুলেন। নরেশ পাড়ার ছেলে। বাবা জাহাজের কোন দীপ বানায় নীচু পদের কর্মচারী। অতি শান্ত বাবাটা কে মিনিস্ট সাত্তার সেকেন্ড হাতে থাকে। গুরুত্ব সাহেব-ক্লাব। থাকবে বাড়ি আড়াইটে পর্যন্ত। পাল সরকার সানিয়াল। নরেশের সঙ্গে এই ব্যাপারে সামান্য কিছু কথা আগে হয়েছিল।

লজ্জায় ভুবনবাবুর কান লাল। তবু একটা ভীষণ উত্তেজনা তাঁর শরীরের ছড়িয়ে পড়ে।

তাই নাকি—তিনি ফিসফিস করেন।

হ্যাঁ। অবাধ। তবে তার আগে একটু কিন্তু-কিন্তু আছে। রাত দশটা পঁয়ত্রিশে আজ গঙ্গায় বান আসবে। কাটালের বান। একটা ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরবেন। শুধু কাপড় আগে তিনবার জপ করবেন—স ঈশ্বর [illegible] দেবাপাতাহ। হে পুষ্পাপতি [illegible]। তিনবার বলবেন এই শ্লোক।

[illegible]—ভুবনবাবু অনুরোধ করেন—মনে থাকবে না।

[illegible] এগিয়ে দিন [illegible] কাটালের [illegible] হবে কিন্তু, ভুবনদা।

টুনু রাস্তায় পা দিয়েই ভুবনবাবু চোখে দেখলো একটা বিবাট চাঁদ। সদ্য দাঁড়াতে শেখা শিশুর মতো আকাশের গায়ে সেটা তখনো টলমল করছে।

সাব-এডিটর জীবনবাবু রাতের পালিতে আছে। লোকটা রগচটা। ভুবনবাবুর সমবয়েসী। কিন্তু তাঁকে একদম পাত্তা দেয় না। রাত্রের ঝামেলা ভুবনবাবুর কাঁধে চাপাবার জন্যে সে সবসময় তৈরী। সেদিনও তাই হলো। বাজার এল আর বাজেট সমস্যা গুচ্ছের কাজ এসে জমা হলো টেবিলে। ভুবনবাবুর বুকের মধ্যে অসহ্য চিনচিনানি। এই রাতটা যেন না ফসকায় একরকম শুভ মুহূর্ত বেশী আসে না। একবার মনে হলো, জীবনকে খোলাখুলি সব বলে ছুটি চাইবেন। পরক্ষণেই বুঝলেন, কাজ হবে না। বরং জীবন সারা বাড়ীতে হল্লা করে দেবে। সহকর্মীদের সামনে মুখ দেখানো যাবে না। অস্বস্তি বাড়ে। একটা লাইনও লেখা হয় না। হঠাৎ একটা সাংঘাতিক দুঃসাহসের কাজ তিনি করে বসেন। চেয়ার থেকে দুম করে মাটিতে পড়ে যান। পাশের টেবিলের পাঁচুবাবু ছুটে আসেন—কি হলো কি হলো?

রাতে লোকজন কম। ভুবনবাবু তখনও মাটিতে পড়ে। দু চোখ বোজা। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। শচীকান্ত বলে—স্ট্রোক স্ট্রোক। ডাক্তার ডাকুন।

জীবনও এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ না খুলেই ভুবনবাবু দেখতে পান জীবনের [illegible] মুখ, কুঁচকোনো কপাল। [illegible] মুখে চোখে জলের ঝাপটা দেয় [illegible]। এবার চোখ খোলা যায়। ভুবনবাবু চোখ খোলেন। [illegible] দিয়ে ধীরে ধীরে বসেন।

শুয়ে থাকুন। উঠবেন না—পাঁচুবাবু বাধা দেয়।

শচীকান্ত জিজ্ঞেস করে—কেমন বোধ করছেন ভুবনদা?

ভুবন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়। যেন এখনও পুরো ব্যাপারটা সে ধরতে পারছে না। ঘরের এককোণে ডাঁই করা [illegible] বালিশ। বাড়ের লোকজন ঘুমোয়। শচী [illegible] ধমক দেয়—হাঁ করে দেখছিস কি [illegible]? টেবিলের ওপর একটা [illegible] দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজলো।

সাড়ে মিনিট পনেরো শোয়ার পর শচী বলে—চলুন বাড়ী পৌঁছে দি। জীবনের দিল থেকে সাড়া নেই। ভুবনবাবু বিব্রত। শচী বুঝতে পারে। জীবনদাও বললেন তাই—সে জানায়।

ভুবনবাবু আর দেরী করেন না। কাগজপত্র গুছিয়ে নীচে নামেন। শচীকে রাস্তা থেকে বিদায় দেন। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না ভাই। এইটুকু পথ। ঠিক চলে যাবো।

অফিস থেকে গঙ্গার ঘাট পায়ে হেঁটে [illegible] দশ মিনিট। মনটা বেশ খুশী খুশী। ঝুরঝুরে ঠান্ডা হাওয়া। মাথার ওপর গম্ভীর চাঁদ। পুরোনো অনেক গানের ছিন্নভিন্ন লাইন মাথায় উড়ে বেড়ায়। চারপাশ এক চমক দেখে গান ধরেন। নিজের বুদ্ধি আর অভিনয়ের শক্তি দেখে তাঁর নিজেরই তাক লেগে গেছে। কি কান্ড! আশালতা শুনে ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকাবে। হেসে কুটিপাটি হবে। বলবে—পেটেপেটে এতো।

পাশ দিয়ে একদল লোক হরিধ্বনি তুলে চলে যায়। ভুবনবাবু চমকে ওঠেন। এসব মরা-টরার ব্যাপার তাঁর একদম সহ্য হয় না। অনেকগুলো মৃত্যু তাঁকে দেখতে হয়েছে। মৃত্যু তাঁকে কষ্ট দেয়। ফাঁকা, পুরোনো বাড়ীটা চোখের সামনে জেগে ওঠে।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে হাতঘড়িতে দেখেন দশটা দশ। জোয়ার আসতে আরো পঁচিশ মিনিট দেরী। চারপাশ অন্ধকার, চুপচাপ। একজন সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে। জনা তিনেক লোক শানবাঁধানো মেঝেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাড়টা খালি। কিছুটা দূরে জলের ওপর পাশাপাশি কয়েকটা নৌকো। আলো জ্বলছে একটাতে। চাঁদের আলোয় জলে ঘন দুধের রং। ঢেউ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ। চাঁদটা চটকে কে যেন জলে মিশিয়ে দিয়েছে। ভুবনবাবুর শরীরের লোমগুলো শিরশির করে। দাঁড়িয়ে যায়। ঘাটের ওপর তিনি বসেন। একটু, পরেই বান আসে। উদোম দস্যি। ঢেউ ফুলে ফুলে ওঠে। ফেনায় আলো জ্বলে। কোটাগরীর চাঁদ জলের মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায়। ভুবনবাবুর বুকের মধ্যে কি এক অনুভূতি উলটন হবে। সেটা সুখ না দুঃখ তিনি বুঝতে পারেন না। বন্দী হয়ে তিনি বসে থাকেন। এমন চাঁদ, জ্যোৎস্না, ভরা জোয়ারে গঙ্গা তিনি এই পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে একবারও দেখেন নি। অথচ এগুলো দেখা উচিত। অন্ধকার রাতে, চারপাশ যখন নিঝুম, এক তারাশ তারা আর চাঁদ তখন এসব ছবি দেখলে মনে হয় এদের সঙ্গে কি যেন একটা নাড়ীর যোগ আছে। এই গঙ্গা, ফুলে ওঠা জোয়ারের জল, ঢেউ, ধ্যানে বসা গম্ভীর রাত মনে বানিয়ে দেয় মানুষ খুব একটা তুচ্ছ খেলো জিনিস নয়, এদের মতো একই ধাতুতে তৈরী। বোঝে না কষ্ট পায়। চিরকাল অসহায়, তুচ্ছ থেকে যায়। ঢেউগুলো পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে। ভুবনবাবুর মনে হয় তাঁর বুকেতেও কি একটা যেন ভেঙে পড়ছে।

ঢেউ কমলে ভুবনবাবু চান করেন। ভিজে কাপড়ে ফেরার পথে নমস্কার করেন সাধুবাবাকে। প্রণামী দেন একটা টাকা। সাধু বাসা চোখে তাকায়। বলে শান্তিস্তু। শরীরে মনে জ্যোৎস্না তার [illegible] আলো নিয়ে ভুবনবাবু বাড়ী ফেরেন। নরেশের কথা মতো সব কিছু করেন। কিন্তু, কাজ হয় না। ভুবনবাবু একটু দমে যান।

এর মধ্যে তাঁর মাথায় এক নতুন নেশা চাপে। নিয়মিত ভরা জোয়ার দেখতে যান। কাগজের অফিসে কাজ। জোয়ার [illegible] ভাঁটার খবর পেতে অসুবিধে হয় না।

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর লরি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক্ না কেন
যুগান্তর এ
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো :

- যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত ঊর্ধ্বগতি। গত ছ'মাসে দৈনিক গ্রাহক সংখ্যা ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের লাটতি এখন ৬,০০,০০০ এরও ওপর।
- পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের মতর এড়াবে না।
- প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

গলাব্যথা-
কাশি থেকে
নিমেষে
আরাম...

ভোকাসিল

কাশির
বড়ি

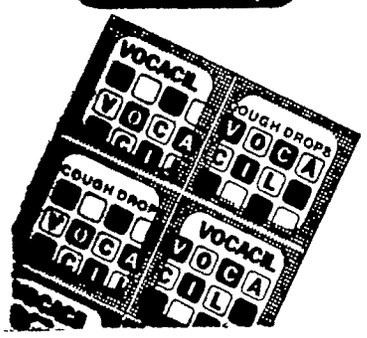

আশালতাকেও বার কয়েক সঙ্গে নিয়েছেন। পরে, আশা আর যেতে চাইতো না। অফিস থাকলে কেটে পড়ার ফাঁক ফিকির খুঁজতেন। না পাবলে কষ্ট পেতেন। বাতিকটা এমন ধারালো হলো যে, অনেক সময় কাগজ না পড়েও তিনি জোয়ারের সময় বুঝতে পারতেন। তাঁর রক্তেও তখন প্রবল টান লাগতো।

দরজায় ঝনঝন কড়া বাজে। ভুবনবাবু চোখ খোলেন। অন্ধকার চুঁইয়ে পড়ছে। জানলার ঘষা কাঁচে ফ্যাকাসে রং। মোক্ষদা এসেছে। ভুবনবাবু দরজা খুলতে যান। ঘরে ফিরে জানলা খোলেন। ভক করে বিড়ির গন্ধ নাকে ঢোকে। জানলার নীচে দুটো বিড়ির টুকরো। বাড়ীর সামনে এক চিলতে জমি। আগে সেখানে মরশুমী ফুল ফুটতো। কয়েকটা ঝাউ আর পাতাবাহারের গাছ ছিল। সে সব বাবার আমলের কথা। বাবা নিয়ম মতো গাছের গোড়ায় জল দিতেন। মাটি উসকোতেন। যত্ন, আত্তির শেষ ছিল না। বাবা মারা যাওয়ার পর কেউ আর পরিচর্যা করলো না। তারা কিছুদিন অপেক্ষা করলো। তারপর অবহেলায় ঝরতে সুরু করলো। প্রথমে হলদে হয়ে এলো বাহারী পাতা। তারপর ঝরে পড়লো টুপ-টাপ। ফুলগাছগুলো রোগা, কাঠি কাঠি। সবশেষে মরলো তিনটে ঝাউগাছ। ফাঁকা জমিতে তাদের পাতাগুলো খাড়া ছিল অনেক দিন। ঘোষদা একদিন সেগুলো কেটে তোলা উনুনে আঁচ দিল। শুধু ঠাকুর্দার আমলের চ্যাঙা গোলগু গাছটা এখনো টিকে আছে। বিয়ের পর ভুবন-বাবু সখ করে কয়েকটা অর্কিড কিনেছিলেন। বাঁশের পাতায় ছোট লাল টবে সেই সুশ্রী অর্কিডগুলো ঝুলতো। শোবার ঘরে, বারান্দায় চোখের সামনে তিনি রেখেছিলেন গাছগুলো। জল দিতেন, দেখাশোনা করতেন। কিন্তু একটাও বাঁচলো না। বড়ো আশ্চর্য হয়েছিলেন। পাশের রাস্তায় জজদের বাড়ী। তাদেরও বাগানের সখ। ফল ফুলের গাছ আছে অনেক। তাজা, ঝকঝকে ডাল, পাতা। দেখে চোখ জুড়োয়। নিবা-রণদার স্ত্রী মলিনার কাছ থেকে তিনটে মানি প্ল্যান্টের লতা এনেছিলেন। তিনটে হরলিকসের শিশিতে সামান্য জলে ডুবিয়ে রাখলেন সেগুলো। জানলার হাতার বেখানে আলো, হাওয়া খেলে সেখানে ঠাঁই মিললো তাদের। দিন সাতেক বেশ ভালো ছিল গাছগুলো। আশালতাও যত্ন নিত। কিন্তু রং বদলাচ্ছে। হলদে, ভারী হয়ে যাচ্ছে পাতার শরীর। দুদিনেই খসে গেল সব পাতা। শুধু সরু, শুকনো ডাঁটাটা হড়-হড়ে কেঁচোর মতো শিশির বাইরে গলা তুলে থাকলো। আশালতা তখন বেঁচে। পিঠের ওপর বোদ লাগছে। নরম মাটিতে খুরপি চালাতে চালাতে ভুবনবাবুর মনে হয় এই একডজন দোপাটি গাছ কি বাঁচবে।

দিন দশেক আগে শেয়ালদায় গিয়ে-ছিলেন, রথের মেলা দেখতে। বিকেলে কাজ থাকে না। এইসব মেলা, মোচ্ছব দেখে সময় কাটে। মেলায় অনেকগুলো গাছগাছালির দোকান। সামনে বিরাট ভীড়। এতো মানুষের গাছপালার সখ। ভুবনবাবু এই লোকগুলোকে দেখছিলেন। এই দুর্দিনে মানুষ গাছপালা, ফুলের ওপর ভালোবাসা বাঁচিয়ে রেখেছে। বেশীরভাগ খদ্দেরই নিরীহ, সাধারণ। দোকানদার, ফেরিওলা, কেরাণী, দালাল। এরা যখন গাছের গোড়া নিড়োয়, জল দেয়, ফুলে আলতো আঙুল ছুঁয়ে আদর করে, তখন এদের মুখ চোখ কেমন দেখায়। ভুবনবাবু ভীড়টা ঠেলে একটু এগিয়ে যান। সবুজ, সজীব গাছের চারা। গোড়ায় মাটির তাল। কোনোটা টবে বসানো। অনেক গাছে ফুল বসেছে। এক-জন দোকানী প্রায় জোর করে তার হাতে একজন দোপাটি চারা গুঁজে দেয়। নেন বাবু একমাস বাদে ফুল দেবে; রাতে বাড়ীতে আলো জ্বালাতে হবে না। গাছ কেনাবেচা দেখে মনটা তাঁর গলে গিয়েছিল। এড়াতে পারলেন না। দোপাটি চারা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তখন সন্ধ্যে। তখনি সেগুলো জমিতে লাগানো যায় না। ভিজে গামছায় মুড়ে ঘরের কোনে রাখলেন। তারপর সারারাত সে কি হাঁকপাক। অনেক-বার উঠতে হয়েছিল চারাগুলো দেখার জন্যে। মরে না যায়। শিশুহত্যা মহাপাপ। ভোর-রাতে আবছা ঘুমের মধ্যে দেখলেন, তাঁর বাগান ভরে দোপাটি ফুটেছে। লাল হলুদ বেগুনি আরো কতো রং। পাপড়ির ওপর গাঢ় সোনালী ফোঁটা। বাগান জুড়ে যেন রং-এর অলৌকিক প্রজাপতি বসে আছে। তাদের শরীর থেকে আলো বেরোচ্ছে। সে আলোয় অন্ধকার ঘেঁসে না। চারপাশ ঝলমল করে।

কয়েকটা শুকনো ঘাস, ইঁট, পাথরের-টুকরো পাওয়া গেল। সেগুলো ফেলে দিলেন। গোলগু গাছের পচা পাতা খারাপ নয়। এগুলো গাছের খাবার। ঘটি করে জল দিলেন গাছে। মোক্ষদা গজগজ করছে আর বাসন মাজছে। সব কটা গাছ, প্রত্যেকটা পাতা তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। কি একটা ভয় অহরহ তাঁকে কাঁপিয়ে দেয়। আজ পর্যন্ত কোনো গাছ তাঁর হাতে বাঁচেনি।

বাড়ীর উত্তর দক্ষিণে টানা বস্তি। সেখানে দিন রাত কিছু মানুষ জেগে থাকে। সকাল বেলায় চেঁচামেচি বেশী। জল, কল, পায়খানা নিয়ে হৈ-চৈ। ছেলেবেলা থেকে ভুবনবাবু শুনে আসছেন এসব। গরীব লোকেদের ব্যাপার। চুলোচুলি, মারামারি, গালমন্দর শেষ নেই। তেমনি আবার খুশী আর পীরিতের হল্লা। ডানদিকে সুটকেশ তৈরীর কারখানা। কাজ শুরু হয়েছে। টিন পেটানোর কড়া আওয়াজ কানে বেঁধে। বস্তির ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কাঁচা কঠের ধোঁয়া। বস্তির দু-চারজন ভুবনবাবুর চেনা। সনাতন ঘুগনি বিক্রী করে। মেয়েদের মহলে তার খ্যাতি আছে। মুরলির কুলপি ছেলেবেলায় খুব খেয়েছেন তিনি। মুরলী বুড়ো হয়েছে। তার ছেলে এখন বাপের কারবার দেখে। সকালে কাগজ

দের এক ছোকরা। নাম গুপি। সেও এই বস্তির বাসিন্দা। তাছাড়া আরো বহু লোকের মুখ চেনেন। রকমারি মুখ। নানা ধরনের চোখ। এখানকার দু-চারজন যে রাতে চুরিও করে, এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ নেই। সারাদিন বস্তির উঠোনে, দাওয়ায় অনেকে ঘুমোয়। এরা রাতের কর্মী। কেউ কারখানায় কাজ করে, কেউ সেলফ এম-প্লয়েড। বেশীরভাগ মেদিনিপুর, হাওড়া, হুগলীর লোক। অনেক বছর আছে। দেশ ভাগের পর এসে, এখানে বিশেষ কেউ জায়গা পায়নি। হাওয়ায় দোকতা সোঁকার গন্ধ। মোক্ষদা হাঁচছে। আজ ভুবনবাবু খৈনি বানাবেন। মাসে দুদিন করতে হয় এ কাজ। দোক্তাপাতাগুলো একটু মুড়-মুড়ে হলে গুঁড়োতে সুবিধে, খেয়েও সুখ।

হাত পায়ের কাদা ধুয়ে ভুবনবাবু খেলেন। মোক্ষদা রাঁধছে। ডাল, ভাত, তরকারি। হপ্তায় একদিন মাছ খান। টাকার টানাটানি। তাছাড়া একা একা ভালোমন্দ খেতেও ইচ্ছে করে না।

মোক্ষদা চলে গেলে ভুবনবাবু খৈনি বানান, চান করেন। শরীরের ভার, ঘুমের নেশা কিছুক্ষণের জন্যে কেটে যায়। দরজায় চাবি এঁটে রাস্তায় বেরোন। গলি ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতে দেখা হয় মলিনাদির সঙ্গে। সঙ্গে বাচ্চা নাতি। ফুটফুটে গোলগাল চেহারা। নিবারণ মারা গেছে আজ বিশ বছর। ওদের ছেলে প্রশান্তর তখন বছর সাতেক বয়েস। সেই ছেলে বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখে চাকরী করছে। এখন সেও বাপ। মলিনা-দিকে দেখেই অনেক স্মৃতি ভুবনবাবুর মাথায় ঝলসে ওঠে।

মলিনাদি কিন্তু চড়া গলায় কথা শুরু করে—বুঝলেন ঠাকুরপো, চোরের জ্বালায় আর বাঁচা যাবে না। চারপাশে যত ছোটলোকের আড্ডা। ভবদুপুরেও বাড়িতে চোর ঢোকে। ভুবনবাবু স্মৃতি থিতিতে যান। চারপাশে নজর চালান। বস্তির অনেক লোক এ এ রাস্তায় যাতায়াত করে। শুনে ফেললে মুস্কিল।

'কি ব্যাপার, চুরি হয়েছে নাকি—ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

চুরির চেয়েও খারাপ। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। বলা যায় না।'

ভুবনবাবু তাকিয়ে থাকেন। মলিনাদি সবটাই বলবে। এটা নেহাত ভনিতা।

কাল দুপুরে গিয়েছিলুম বোনের বাড়ী। অনেককাল দেখা নেই। দুপুর ছাড়া সময়ও পাই না। বৌমা ছেলেকে গিয়ে ঘরে শোয়া। দুটো নাগাদ একবার বারান্দায় এসে দেখে বাগানের পেয়ারাতলায় একটা চোর। বৌমা ভয়ে চেঁচাতে যাবে, এমন সময় চোরটা কি করলো জানেন?

ভুবনবাবু কিছুটা অবাক। নিজের অজান্তেই মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল—কি?

বৌমার গলার আওয়াজ আর বেরোলো না। ভয়ে, লজ্জায় তার শরীরে তখন কাঁপুনি। সেই সুযোগে চোর হাওয়া।

ভুবনবাবুর মুখে কথা সরে না। মলিনাদি বলে—রাত থেকে বৌমার জ্বর। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।'

মলিনাদি যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করেন—চোরটাকে কেমন দেখতে? বৌমা দেখেছিল।

মলিনা একটু অবাক হয়। হ্যাঁ দেখেছিল। কালো ধুমসো চেহারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

ভুবনবাবুর বুকটা ধক করে ওঠে। কথা না বাড়িয়ে তিনি চলে যান। মাথায় কি এক চিন্তা পাক খায়। রাতের সেই মানুষটাকে আজকাল দিনেও দেখা যাচ্ছে।

নিজের মনে তিনি বিড়বিড় করেন—এ[illegible] বাড়াবাড়ি ভালো নয় বাপু। রাস্তার [illegible] মলিনাদি। পাশে নাতি। কচি হাত পা। টলমল পায়ে হাঁটছে। বাচ্চাটাকে আদর করবার ভীষণ ইচ্ছে জাগে।

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন
ইন্‌ক্রিমিন* টনিক দিয়ে

বাড়তি আহারকে
বাড়তি বৃদ্ধিতে
পরিণত করে

Lederle এর উৎপাদন
* আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Sista's-INC-915A/77 BEN.

দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমে চোখ ভারী হয়ে আসে। শত চেষ্টাতেও খুলে রাখা যায় না। ভাত ঘুমের নেশা। দু' একটা পুরোনো বই, খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করে ভুবনবাবু জেগে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু কাজ হয় না। ছাপা, ক্ষুদে হরফগুলো অনুপানের কাজ করে। ঘুমকে যেন টেনে আনে। জবির কাজ করা দুপুরের রোদ মাথার অলিগলিতে ঝিলমিল করে। টিনের কারখানায় হাতুড়ির শব্দ, চড়াই পাখীর চেঁচামেচি ধূসর হয়ে যায়। ছাপা লাইনগুলো কাঁপতে থাকে। কখনো ভেসে, গলে একাকার হয়। দুপুরের আকাশে একটা কালো মেঘ ঘন হয়ে ওঠে। আধো ঘুমের মধ্যে পুরোনো দিনগুলো ভুবনবাবুর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়, সব কিছু যেন এই সেদিনের ঘটনা। চল্লিশ বছর আগে মৃত ঠাকুর্দাকে ঘন দুধ ভাত মর্তমান কলা চটকাতে দেখেন।

আশালতাকে নিয়ে সেবার কুম্ভ-মেলায় গিয়েছিলেন। তীর্থ করা, বেড়ানো দুটোই হবে। ভুবনবাবু নাস্তিক নন। সেটা খোলাখুলি বলেন। লজ্জা পান না। কুম্ভমেলায় যাওয়ার পেছনে আরো একটা কারণ ছিল। সেটা বলেন নি। বলতে পারেন নি। সংকোচ, জড়তা কাজ করেছে। মনের সেই গভীর, ব্যক্তিগত আকাংখাটাও ছিল। বাড়ীতে একটা নতুন মানুষ, টাটকা কচি মুখ। তা না হলে বাড়ীটা বড়ো ছন্নছাড়া, ভুতুড়ে লাগে। আশালতার দাদা অক্ষয়ও উসকেছিল—ধুরে আসুন। সাধু সন্ত মহাত্মা লোকেদের দেখা পাবেন। ভালোই লাগবে।

অক্ষয়ই থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ওদের এক দূরসম্পর্কের পিসীমা ছিল এলাহাবাদে। তার বাড়ীতে ওরা উঠলো।

সন্ধ্যেবেলায় সন্ন্যাসীদের আখড়ায় ঘুরতো। চারপাশে ধুলোর ঝড়। হাজার লক্ষ মানুষ উপচে পড়ছে। শীতের হুহু ঠান্ডা। তবু কষ্ট হতো না। এক সন্ধ্যেতে আশালতাকে নিয়ে ভুবনবাবু ঢুকলেন নাগা সন্ন্যাসীদের আখড়ায়। একটা বিরাট ছাউনির নীচে সারি সারি তাঁবু। প্রতিটা তাঁবুর সামনে ধুনি জ্বলছে। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি। ধিকিধিকি আগুন। চারপাশে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার। উলঙ্গ বাবাজীরা গায়ে ভস্ম মেখে ধুনি আগলে বসে আছেন। রাঙা চোখ। জটাজুটে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধ জুড়ে। হাতে ডম্বরু। কেউ শিঙ্গা ফুঁকছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে। আশালতা জাপটে ধরে আছে ভুবনবাবুর একটা হাত। একজন নাগাবাবার সামনে ভক্তের ভীড় বেশী। ভুবনবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। সাধুবাবা লাল চোখ মেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে অলখ। গমগমে গলার স্বর। হাওয়া কেঁপে ওঠে। ভক্তেরা একজন করে এগিয়ে বাবাকে নমস্কার করছে। প্রণামী দিচ্ছে। বাবা বসে আছে অজিন আসনে। সামনে টাকা, খুচরো পয়সার স্তূপ। ভুবনবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হয়। ভুবনবাবু শিউরে ওঠেন। তারপর আশাকে নিয়ে তিনিও ভক্তের দলে ভীড়ে যান। বুকের মধ্যে ধুকপুক করে। অনেকদিন ধরে আটকে থাকা একটা কথা জিভের ডগা থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়।

একটা গোটা পাঁচ টাকার নোট বাবাজীকে দিয়ে ভুবনবাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আশালতাও কপাল ঠোকে। ভুবন-বাবু খুব নীচু গলায় আর্জিটা পেশ করেন। পাঁচজনের কানে কথাটা তিনি দিতে চান না।

আধবোজা চোখে নাগা সন্ন্যাসী ভুবনবাবুকে একলহমা দেখেন। তারপর গর্জন ছাড়েন—তু মরদ হো। সেই বাজখাঁই চীৎকারে ভুবনবাবুর পিলে চমকে যায়। সব লোক দেখছে তাঁকে। লজ্জায় কান লাল। মুখে কথা সরে না। তবু কোনোমতে বলেন—হ্যাঁ বাবা।

নাগাবাবা এবার ধুনি থেকে এক খাবলা ছাই তুলে নেয়। আশালতার হাতে দেয়। খা লেও—সে বলে।

এতোক্ষণ ধরে অনেককেই আশালতা আর ভুবনবাবু মুঠোভর্তি ছাই খেতে দেখেছেন। আশালতা এক সেকেন্ড ভেবে সেটা মুখে ঢোকায়। সাধুবাবা বলে—লেড়কা হোগা।

আশালতার মুখের দিকে ভুবনবাবু তাকাতে সাহস পান না। সাধুবাবা বলে—দশ বছর বাদে ছেলে নিয়ে আসবি। আর আমার জন্যে এক হাজার টাকা।

নাগা সন্ন্যাসীদের ছাউনি থেকে অন্ধকার রাস্তায় এসে ভুবনবাবু একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলেন। আশালতা রুমালে মুখ মুছছে বারবার। রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওয়াক তোলে।

বমি হবে—ভুবনবাবু ভয় পান। আশালতা জবাব দেয় না।

কষ্ট হচ্ছে—ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

আশালতা চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে—একটা বাচ্চা কি তোমার খুব দরকার?

ভুবনবাবু জবাব খুঁজে পান না। ধাঁধায় পড়ে যান। আশালতা ফিসফিস করে—ছাই খেয়ে কারো বাচ্চা হয়েছে?

ভুবনবাবু সাড়া করেন না।

সেই রাতেই কেলেংকারি বাঁধলো। প্রবল বমি শুরু হলো আশালতার। কনকনে ঠান্ডায় বার দশেক ঘরবার করলো সে। ভুবনবাবুও উঠলেন।

বাড়ীতে কারো ঘুম নেই। লজ্জায় ভুবনবাবু মুখ তুলতে পারলেন না। ভোররাতে আশালতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। হয়তো স্বপ্নে কিংবা ক্লান্ত হতাশায়। আবার ঘুমিয়ে পড়লো। সকাল থেকে শুরু হলো জ্বর। তাপে শরীর রিরি করে। ভুবনবাবু ভয় পেলেন। রাতের

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
সোনার হরিণ নেই
১০ মার্চ থেকে
অমৃতে শুরু হচ্ছে

ট্রেণে রওনা হলেন কোলকাতায়। যোগের চান আর করা হলো না। ডাকতার বললো —বিকোলাই উইথ ডিসেন্টি।

ফ্যানের শব্দে ডাক্তারের কথা পরিষ্কার বোঝা যায় না। আপনার কি মাথা খারাপ—ডাক্তার চোটপটি করে—একমুঠো নোরা বৌদিকে খেতে দিলেন? ভুবনের লজ্জা করছিল। বলার কিছু নেই। ডাকতার পাড়ার ছেলে। ওর বাবা সুধাময়বাবু স্কুলে হেডমাস্টার। চাকরী প্রায় শেষ করে এনেছেন। মাটির মানুষ। ছেলেটাও ভালো। আশালতার মুখ চোখ ফ্যাকাসে। একরাশ চুল খাটের ওপর থেকে মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে আছে। ডাকতারকে খুব গম্ভীর দেখায়। হুস হুস সিগারেট টানে। ওষুধের ফর্দ লেখে। আশালতা সেরে ওঠে। মুখ [illegible]র রং ফেরে। ডাক্তার রোজ দু-একবার [illegible]সে। অনেক টাকার ওষুধপত্রের ধাক্কায় [illegible]ড়ে যান ভুবনবাবু। মায়ের পুরোনো [illegible]কটা বিচে হার বিক্রী করেন। আশালতাকে জানান না। ডাক্তার প্রথম দুদিনে টাকা নিয়েছিল। তারপর কিছুতেই রাজী হলো না।

বড়ো লজ্জায় থাকবো—ভুবনবাবু বলেছিলেন

টাকা নিলে তার চেয়েও বেশী লজ্জা হবে আমার—ডাকতার হেসে বলেছিল। ডাকতারের বয়েস বছর বত্রিশ। লম্বা, শকত চেহারা। বয়েসের বিদ্যুৎ আছে স্বাস্থ্যে। আমুদে, হাসিখুশি ছেলে। ভুবনবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। বড়ো টানাটানি চলছে। রোজ ডাকতারের ফি জোগাতে হলে বাড়ী বেচতে হবে।

মাঝে মাঝে সেই নাগা সন্ন্যাসীর কথা মনে হয়। লোকটা ঠগ, [illegible]ড। ভুবনবাবু রাগে জ্বলেন। গঙ্গার জোয়ার আসে। উথালপাথাল ঢেউ। দুপুরের নীল আকাশে মেঘ ঘনায়। দু-একটা নৌকা মাঝগঙ্গায় বয়াতে বাঁধা। সেত্রতের টানে দুলতে থাকে। ভুবনবাবুর রক্তে কি এত সেত্রত ভুলভুল করে বয়ে যায়। মনে হয়, চটপট কোনো বিষয়ে শেষ কথা বলা উচিত নয়। আকাশ, মেঘ, ঢেউ এবং আরো অনেক বিশাল ব্যাপারের সঙ্গে মানুষ জড়িয়ে আছে। এলাহাবাদ থেকে ফেরার মাসতিনেক পরেই জানা গেল আশালতা মা হতে চলেছে। কথাটা ভুবনবাবু শুনলেন আমার মুখ থেকে। খুশীতে মনটা ভরে যায়। হঠাৎ যেন বয়েস কমে গেছে তাঁর। আশালতার সামনে ডাকতারকে বললেন—পৃথিবীতে এখনো অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যার ব্যাখ্যা নেই। ঠিক কি না?

ডাকতার হাসে। জবাব দেয়—হয়তো।

আশালতার মুখ লাল। কাজের ছুতোয় সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ডাকতার বলে—বৌদি কিন্তু এ্যানিমিক। খাওয়া-দাওয়াটা একটু দেখবেন। আমি কয়েকটা হেলথ টনিকের স্যাম্পেল পাঠিয়ে দেবো।

তখন থেকেই বাড়ীতে চোরের আনাগোনা।

অনেক ধরাকরার পর অফিসে নাইট ডিউটি একটু কমেছিল। ফাঁকা বাড়ী। বাড়ীতে পোয়াতি বৌ। অক্ষয়কে বলেছিলেন আশালতার মাঝে পাঠানোর জন্যে। কিন্তু তারও গেঁটে বাত। তার ওপর বয়স্ক জামাইকে শাশুড়ির বড়ো লজ্জা। রাতে চোর আসার কামাই নেই। দু-একদিন ওৎ পেতে বসেছিলেন ভুবনবাবু। কিন্তু ধরতে পারেন নি। সকালবেলায় দেখেন, জানলার নিচে ফিলটারটিপ সিগারেটের টুকরো হাওয়ায় দামী সেন্টের হাল্কা গন্ধ।

এই সময় মনের মধ্যে কি একটা অস্বস্তি খচ খচ করতো। ভয় হতো হঠাৎ পড়ে যাবেন, চলতে-ফিরতে সিঁড়ি ওঠানামায় বুক কাঁপতো এই বুঝি পা পিছলে যায়। ঘুমের প্রথম অবস্থায় এরকম হয়। খাট থেকে পড়ে যাওয়ায় এরকম হয়। খাট থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে। এই অস্বস্তিটা বহু চেষ্টা করেও ভুবনবাবু কাটাতে পারেন না। মনে হয়, কোনো শকত রোগ হয়েছে। চিন্তাটাকে আমল দেন না। নবজাত একটা শিশুর পায়ের ভারে তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী তখন কাঁপছে।

আশালতাকে শুধু বলেন— সাবধানে থেকো। চোর-টোর দেখলে ভয় পেও না। কিইবা নেওয়ার আছে।

আশালতা চুপচাপ শোনে।

পাঁচ মাসের মাথায় ঘটলো সেই দুর্ঘটনা। কিভাবে যেন পেটে বাধা পেয়েছিল আশা। সারা রাত ছটপটানি ডাকতার এলো। আশালতা হাসপাতালে গেল। বাঁচলো না। মরার আগে জ্ঞান ছিল। ভুবনবাবু ভাবেন নি, আশা মারা যাবে। বলেছিলেন—ভয় নেই আশা। সেরে যাবে। বুকের মধ্যে কান্না পাক খাচ্ছিল। তবু গলা সাফ রেখে যোগ করেছিলেন—যে মানুষটা আসেনি, তার জন্যে ভেবো না। সে আবার আসবে।

আশালতা অসাড় হয়ে শুয়েছিল। ডাকেনি।

একবার তাকাও —অনুরোধ করেছিলেন ভুবনবাবু।

কিন্তু আশালতার চোখের পাতা বোজা; আঠা লাগানো। ঠোঁট কাঁপছিলো, রুক্ষ এলো চুলের টুকরো উড়ছিল হাওয়ায়। সেই রাতে আশালতা মারা গেল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এত ধাককায় আবছা ঘুম ছুটে যায়। মোক্ষদা এসেছে। ভুবনবাবু উঠে পড়েন।

দুবেলার রান্না মোক্ষদা সকালে করে যায়। বিকেলে শুধু বাসন মাজা, ঘর মোছা।

ভুবনবাবু মুখে চোখে জল দেন। একটিপ খৈনি রাখেন ঠোঁটের নীচে। বিকেলে চা হয় না। আকাশের মুখ ভারী। পুব দিকে জমাট কালো মেঘ। হাওয়া নেই। আজ রাত নটায় জোয়ার আসবে। ভুবনবাবু ঠিক করেছেন সন্ধ্যেতেই খাওয়ার পাট শেষ করে বেরিয়ে যাবেন। আজ বড়ো বান আসবে। যেমন তার চেহারা রং, তেমন শব্দ।

ভুবনবাবুর মনটা তবু ভার হয়ে

রন্ধন শিল্পে দু'টি বিস্ময়কর অবদান

পারুল সেনগুপ্তের জনপ্রিয় রান্নার বই

রান্না-পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী

উপহারে ও ব্যবহারে অনুপম

পত্র পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত, ঘরে ঘরে সমাদৃত অখণ্ড বাংলা তথা সারা ভারতময় ছড়িয়ে থাকা অন্ন-ব্যঞ্জনের বিচিত্র সম্ভার : রোজকার রান্নাঘরে ও বিশেষ দিনের রান্নাঘরে পটিয়সী সাধনার ফলশ্রুতি—প্রায় পাঁচশো বাছাই বাছাই রান্নার লোভনীয় সন্নিবেশ। এ ছাড়াও, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ শতাধিক 'রান্নার সংকেত'। প্রবীণা ও নবীনা গৃহিণীরা সমভাবে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

গৃহবিজ্ঞান কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী গৃহবিজ্ঞান ছাত্রীদের পাঠ্যোপযোগী করে লেখা সহজবোধ্য ও সুবিন্যস্ত রান্নার প্রণালীগুলি অনায়াসে অনুসরণযোগ্য।

যুগান্তরের ভাষায় বলতে গেলে :

দৈনন্দিন জীবনে রস-গন্ধ-স্বাদের মধ্য দিয়ে জিহ্বা চায় নূতনত্ব, চায় পরিবর্তন। না হলে রোজকার জীবনের একঘেয়েমী থেকে যায়। ...বিশ্বজোড়া খাদ্য সংকটের দিনে অল্প খরচে নিত্য নূতন রান্নার একটা বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতির কোর্স চালু করা উচিত—যেখানে এই ধরনের বইয়ে উল্লিখিত ব্যঞ্জন প্রণালীর সঙ্গে নবীনারা পরিচিত হতে পারেন। ..বলতে দ্বিধা নেই যে সে অভাব পূরণ করতে পারে এই বইটি।

দেশ দেশের জল খাবার

তৃতীয় সংস্করণ : ১২.০০

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ কর্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজ বইরূপে অনুমোদিত বিহারীলাল গৃহবিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী মমতা অধিকারী কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্তির সুপারিশ প্রাপ্ত

প্রাত্যহিক জলযোগের বিচিত্র সংকলন 'দেশ দেশের জলখাবার' যে ইতিমধ্যেই বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছে তার প্রমাণ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এর পুনর্মুদ্রণ।

বাংলায় এই ধরনের বই সম্ভবতঃ এই প্রথম

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর্স
নাথ ব্রাদার্স, শৈব্যা পুস্তকালয়
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৬
ভিঃ পিতে : পারুল সেনগুপ্ত
৮৪ এন বি ব্লক ই, নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৫৩

বাকে দুপুরের আবছা ঘুমের মধ্যে বার-কয়েক আশালতাকে দেখেছেন। পাট করে কাপড় রাখছে আলনায়, পানে দুটো পাতলা ঠোঁট লাল টুকটুকে। বারান্দায় বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো একরাশি চুল বুকে নিয়ে বিনুনি বাঁধছে কিন্তু আশালতার চোখ দুটো একবারও দেখেন নি। সবসময়েই সে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। অথচ কথা বলার জন্যে ঠোঁট কাঁপছিল তার। ভুবনবাবু নিজের মনেই বলেছেন—আশা তাকাও। কথা বলো। মনে দুঃখ রেখো না। সব ঠিক হয়ে যাবে

দরজায় তালা দিয়ে ভুবনবাবু রাস্তায় এলেন। গলির মুখে মিটমিটে আলো। বস্তির খুপরিগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে। অন্ধকার আর ধোঁয়া মিশে ছায়া ছায়া ভাব। মুরলির ছেলে কুলপি মালাই হাঁক দেয়। সারা গলি জুড়ে পুরোনো দিনের গন্ধ ভাসে। রাস্তার মুখে দেখতে পান ডাকতারকে। হাতে ব্যাগ—মুখে সিগারেট। ভুবনবাবুর মুখোমুখি হন। ডাকতার সামান্য ঘাড় কাত করে হনহন করে চলে যায়। পাশের রাস্তায় তার চেম্বার। ডাকতারের শকত, ধারালো চেহারায় বয়েস হাত বুলিয়েছে। এখন ও সংসারের কর্তা। সুধাময় মাস্টার রিটায়ার্ড। বাড়িতে থাকে। ভুবনবাবুর সঙ্গে দু-একবার বাজারে দেখা হয়েছে। পাড়ায় তার অনেক ছাত্র।

ভুবনবাবু একটা রাসে ওঠেন। আকাশে মেঘ করেছে। আউটরাম ঘাটে যখন পৌঁছোলেন তখন সাঁই সাঁই হাওয়া বইছে। ঠান্ডা ঘন হাওয়া। একটা লঞ্চ বাঁশি বাজিয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। ঘাট ফাঁকা। রাস্তায় দু-একটা গাড়ীর শব্দ। অন্ধকার গাঢ় হয়। জলের রং মলিন। ঘোলা জল ক্রমে কালো হয়ে ওঠে। জলের ভেতরে এখন তুমুল হৈ-চৈ। অথচ ওপর থেকে বোঝা যায় না। ভুবনবাবু ধরতে পারেন। তাঁর রক্তের মধ্যে দুটো দুমুখী ঢেউ দাপাদাপি করে। জোয়ার আসছে। শরীরের স্নায়ু, শিরায় দমকা ঢেউ ফুলতে থাকে। বাড়ীতে থাকলেও এটা হয়।

অনেক দূরে কালো জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। আকাশ আর জল মিশে যায়। লক্ষ পায়ে ছলছল কলকল মল বাজে। সাইরেন ডেকে ওঠে। কাঁপা-কাঁপা ধারাল আওয়াজ বুক চিরে দেয়। কোথাও একজনও মানুষ নেই। গঙ্গার তীর ধুধু ফাঁকা। জল বাড়ে। ভুবনবাবুর মনে হয়, আকাশটা যেন গলে জল হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভার নেমে যায়। মন হাল্কা। হাওয়া ফোঁপাচ্ছে। হঠাৎ মনে হয়, আশালতা যেন কাঁদছে। কি একটা গভীর দুঃখ নিয়ে ও চলে গেছে। অথচ পৃথিবীতে দুঃখ জমিয়ে রাখা বোকামী। এই জোয়ার জলের দাপাদাপি সব ধুয়ে দেয়। ভুবনবাবুর মনমরা ভাবটা কেটে যায়। তাজা, চাঙ্গা লাগে। মনে হয় পৃথিবীতে সব কিছু একেবারে শেষ হয় না। কিছু একটা থাকে। থেকে যায়। একটা অদেখা ছোট শেকড় রক্তের শেষ ফোঁটায় বেঁচে থাকে। চোর ডাকাত তার হদিশ পায় না। সব কিছু মরে হেজে গেলেও সেই শেকড় উসখুস করে। উন্মুখ থাকে। মেঘে, জলে, জোয়ারের টানে চনমন করে তার প্রাণ। শেকড় চারিয়ে যায়। ভুবনবাবু অন্ধকারে বন্দি হয়ে বসে থাকেন। এখন তাঁর কোন কষ্ট নেই। অভাব-অভিযোগ নেই। রক্তের মধ্যে ছলছল শব্দ। আর সেই শেকড়টার দাপাদাপি।

পায়ে হেঁটে বাড়ী ফেরেন। রাস্তার ওপর দোতলার ফ্ল্যাটে সুধাময় মাস্টারের বাসা। সামনে খুল বারান্দা। দূর থেকে দেখা যায়। ভুবনবাবুর চোখে পড়ে মাস্টারমশাই বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছেন। রোগা শকত শরীর। সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায় না। বহু রাতে বাড়ী ফেরার পর ভুবনবাবু নিঃসঙ্গ সুধাময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। মাথায় সাদা চুল। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। রাস্তার দিকে চোখ রেখে সুধাময় দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনবাবু বুক পকেটের ঘড়ি বার করে দেখেন। রাত প্রায় বারোটা। ফাঁকা রাস্তায় ভুবনবাবুর পায়ের হাল্কা শব্দ। বারান্দার কাছে এসে শুনতে পান সুধাময় কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রাস্তার একটা লোক। বারান্দা থেকে একটা শাড়ী ঝুলছে। সুধাময়ের দুটো হাত, শরীর কাপড়ের ওপর চাপানো। সুধাময় বলছেন—এত রাতে রাস্তায় কেন? বাড়ী যাও। মা-বাবা চিন্তা করবেন। রাস্তার লোকটার যাওয়ার কোন তাড়া নেই। সে শাড়ীটা টানছে।

'বাড়ী যাও—সুধাময় বলে—কোন সালে পাশ করেছো?' ভুবনবাবু এখন বাড়ীটার কাছাকাছি। তাঁর পায়ের শব্দে লোকটার হুঁশ হয়। সে ভুবনবাবুকে দেখে। ঘাবড়ে যায়। তারপর শাড়ী ছেড়ে দৌড় লাগায়। সেই লোকটা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ভুবনবাবুর বুকের মধ্যে একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়।

সুধাময় জিজ্ঞেস করে—ভুবন নাকি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

'আজকালকার ছেলেপুলেরা আর কথা শোনে না—সুধাময় অভিযোগ করে—লেখাপড়া নেই। রাত দুপুরে রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ভুবনবাবু কি বলবেন, ভেবে পান না। ডাকতার বারান্দায় আসে। ভুবনবাবুকে দেখে তখনি চলে যায়।

শাড়ীটা তুলে রাখুন — ভুবনবাবু বলে। সুধাময় হাতের নীচে শাড়ীটাকে এতক্ষণে খেয়াল করেন। ভুবনবাবু আর দাঁড়ান না। অন্ধকার ঘর। তক্তাপোশে বিছানা পাতা থাকে। ভুবনবাবু আলো জ্বালান না। হাতে পায়ে জল দেন। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়েন। খালি মাথায়

ধোঁয়া ধোঁয়া চিন্তা ঢুকে পড়ে। চোরটার বেজায় সাহস। বারোটার সময় একজনের সামনে থেকে কাপড় নিয়ে কেটে পড়তে হয়। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। ভেতরটা ভাপসা গরম। কিন্তু ভুবনবাবুর কোন কষ্ট হয় না। ঠান্ডা, গরমের বোধটাও তাঁর ভোঁতা হয়ে গেছে। হয়ত সব বুড়ো মানুষের এমন হয়। চামড়ার কোষগুলোতে সাড় থাকে না। শিথিল আধমরা ভাব। শীত, বসন্ত একাকার হয়ে যায়। বাইরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। একটানা চড়বড় শব্দ ওঠে। তারপর চার পাশের জলের বাজনার মধ্যে ডুবে যায়। ঘরটা বোধহয় একটু ঠান্ডা হয়। ভুবনবাবুর শরীরটা সিরসির করে। ঘসা কাঁচের ওপাশে বিদ্যুৎ চমকায়। অন্ধকার এক মুহূর্তের জন্যে ঝনঝন করে ভেসে পড়ে। আবার জুড়ে যায়। আজ আর চোর আসার উপায় নেই। এই বৃষ্টিতে কেউ রাস্তায় বেরোয় না। চোরটার জন্যে একটা ফিকে দুঃখ জেগে ওঠে। আজই প্রথম ভাল করে মুখটা দেখলেন। খুবই গরীব, ভাঙাচোরা চেহারা। দেখে মনে হয় ও নিজেই সর্বস্বান্ত, সব চুরি গেছে। মুখ, চোখ, শরীরে ভয় মাখান। মাথায় ভয়ের পাহাড় নিয়ে ও বেঁচে আছে। এত ভয় নিয়ে ও বাঁচে কি করে! হাত সাফাইতেও খুব একটা কিছু জোটে না। পায়খানার ভাঙা মগ, গাড়ু, দু-একটা শাড়ী মেরে ওর চলে কেমন করে! হয়ত চলে না। হঠাৎ তাঁর প্রশ্ন জাগে, ওই লোকটার রক্তেও কি সেই অদেখা ছোট শেকড়টা আছে? অন্ধকার মাঝ রাতে এক আকাশ তারার নীচে একা দাঁড়িয়ে সেই ছোট পদার্থটা কি ওর বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে। ওকে ঘরে থাকতে দেয় না। ভেবে কূল পান না। কিন্তু লোকটার ওপর তাঁর কোন রাগ থাকে না। বরং মায়া লাগে। হয়ত ওই লোকটা আমার চেয়েও অনেক বেশী একা। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ। আকাশ-ফাটান আওয়াজ। ভুবনবাবুর চোখের পাতা ভারী হয়।

সারা রাত ভাঙা ছেঁড়া ঘুম। তার মধ্যে বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গুড়-গুড় কানে আসে। ভোর রাতে ঘুম ভাঙে। জানলার ঘসা কাঁচের ওপাশে আবছা আকাশ। ঘোলা জলের রঙ আকাশে। স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। তক্ষক ঘাঁড়টা ডেকে যায়। সকাল হচ্ছে। কাল রাতে চোরটা আসে নি। ভুবনবাবুর মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে যায়। লোকটার সঙ্গে তিনি যেন কেমন জড়িয়ে গেছেন। রাতের বেলায় সঙ্গী। এ ফাঁকা ভুতুড়ে বাড়ীটায় একা থাকেন। তবু মাঝ রাতে একজন মানুষ আসে। বন্ধ জানলায় টোকা দেয়। বিড়ির আগুন জেলে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক রাতের আসা-যাওয়া। এই লোকটাও তাঁকে ত্যাগ করল নাকি! ভুবনবাবুর বড় খারাপ লাগে। মোক্ষদা আসে। দরজা খুলে দেন। দোপাটি গাছগুলো কেমন আছে কে জানে! কাল রাতে খুব দুর্যোগ গেছে। দুর্বল, নরম শরীর। ছোট বাগানটায় এসে ভুবনবাবুর চোখ কপালে ওঠে। মাটি ওলোট-পালোট। একটা গাছও নেই। কাদায় একজোড়া খালি পায়ের ছাপ, বিড়ির টুকরো পড়ে আছে। ভুবনবাবুর রাগ হয়, কান্না পায়। মোক্ষদাকে ডাকেন। দু-চার বার ডাকার পর মোক্ষদা আসে। 'কি ব্যাপার দেখেছিস—ভুবনবাবু বলেন—গাছগুলো লোপাট। মোক্ষদা দেখে। নিজের মনে গজগজ করে। বাসন মাজে। তখনও টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। ময়লা আকাশে দুঃখী ভাব। লুঙ্গিটা কোমরে শকত করে বেঁধে ভুবনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। এলোমেলো মাটি। ফাঁকা বাগান। বহু বছর বাদে ফুলের চারা লাগিয়েছিলেন। ভাগ্য ভালো গাছ-গুলো বেঁচেছিল। ঘন সবুজ পাতা, লালচে শিরা-জাগা শরীর। তর তর করে বেড়ে উঠেছে। ফুল ফুটতে দেরী ছিল না। সেই সময় এই চুরি। বড়ো অসহায় লাগে নিজেকে। সারা সকাল ভুবনবাবু গুম হয়ে থাকেন। খবরদার করেন। রাতেও ঘুম হয় না। চোরটা শেষ পর্যন্ত গাছ চুরি করলো। হয়তো বেচে দেবে। কিংবা পোষা ছাগলকে খাওয়াবে। অনেকদিন পর তিনি আজ সত্যি যতো উতলা হন। চোরের জন্যে জেগে থাকেন। চোর আসে না। ঘসা কাঁচের ওপাশে কোনো শব্দ বা আলো নেই। ভুবনবাবু অন্ধকারে চোখ মেলে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, চোরটা আর আসবে না। তার শেষ পাওনা সে পেয়ে গেছে। আশালতা মরে যাওয়ার পর সেই সৌখিন চোরটাও আর আসে নি। ফিলটারের টুকরো দামী সেন্টের গন্ধ মুছে গেল বাড়ীর চৌহদ্দি থেকে। ভুবনবাবুর এখন নিজের ওপর করুণা হয়। ফুলগাছ তাঁর হাতে বাঁচে না। নষ্ট বা চুরি হয়ে যায়। হয়তো এই গাছ-গুলোও মরে যেত। ফুল ফোটার আগেই শুকিয়ে কাঠি হয়ে থাকতো। তাতে দুঃখ বাড়তো। অপরাধী লাগতো নিজেকে। তার চেয়ে এটা ভালো। অন্য বাগানে তারা বাঁচবে। রসালো শরীরগুলো থেকে জেগে উঠবে অনেক রঙীন প্রজাপতি। রাতে গাছ-গুলোয় জ্বলে থাকবে আলো। চোরটা একদিক থেকে হয়তো উপকার করে গেল।

দিনসাতেক একটু ফাঁকা ঠেকলো ভুবনবাবুর। তারপর শোকটা কেটে গেল। সারাজীবনে অনেক হারিয়েছেন। বিচ্ছেদটা এখন তাঁর কাছে জলের রেখা। সহজে শুকিয়ে যায়। চিহ্ন থাকে না।

দিনদুয়েক মোক্ষদা আসে নি। বছর-দশেকের একটা বাচ্চা মেয়ে এসে খবর দিয়েছিল, দিদিমার অসুখ। পাশের বস্তিতেই মোক্ষদা থাকে। ভুবনবাবু ওকটা চেনেন। সকালে রোদ ছিল। ভুবনবাবু বেরোলেন। মোক্ষদাকে একবার দেখে আসা দরকার। বয়েস হয়েছে। হয়তো মরে যাবে। পাঁচটা টাকা নিলেন সঙ্গে। মোক্ষদার জ্বর হয়েছিল। শরীর বেশ কাহিল। ভুবন-বাবুকে দেখে কাঁদতে শুরু করলো। বৃদ্ধির এক ছেলে আছে। মাকে দেখে না। বাইরে বাইরে থাকে। ভাগ্যিস দুখীরামের মেয়ে ওই পুঁটিটা ছিল, তাই রক্ষে—মোক্ষদা বলে—জল দিয়েছে। সাবু দিয়েছে। মা-মরা কচি মেয়ে। বাপটা মানুষ নয়। থেকেও না থাকার অবস্থা। মোক্ষদা জানায়, কাল থেকেই কাজে যাবে। ভুবনবাবু টাকা পাঁচটা মোক্ষদাকে দেন। দু পাশে সারি সারি ঘর। করোগেট ঘরের সামনে একটা তুলসী গাছ। মাটি দিয়ে নিকোনো। কোথাও দুটো গাঁদা গাছে কুঁড়ি এসেছে। বস্তির শেষ দিকের ঘরের গায়ে হাতচারেক জমি। ভুবনবাবু থমকে দাঁড়িয়ে যান। অনেকগুলো দোপাটি গাছ। গোটা-পাঁচেক গাছে ফুল ফুটেছে। হলুদ ভেলভেটের পাপড়ি, লালের ফোঁটা। বেগুনি, খয়েরী আরো হরেক রঙ ছড়িয়ে আছে গাছগুলোকে। সেই বাচ্চা মেয়েটা, নাম পুঁটি একটা ভাঙা ফুটো মগে জল ঢালছে গাছের গোড়ায়। ভুবনবাবুর চোখ জুড়িয়ে যায়। অথচ কি এক কষ্ট বুকে। পুঁটি ভুবনবাবুকে দেখে হাসে। বলে—

বেনারসী সাড়ী
ইণ্ডিয়ান
মিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

দাদু ফুল নেবেন। ভুবনবাবু ঘাড় নাড়েন। পুঁটি এক মুঠো নরম ফুল এনে দেয়। ভুবনবাবু বাড়ী ফেরেন। রাস্তায় নেমে তাঁর মনে হয় টিনের মগটা যেন চেনা। সেইরকম মর্চে ধরা, ফুটো।

ভুবনবাবু ফুলগুলো জল ভর্তি কাপে সাজিয়ে রাখেন। ঘরের অন্ধকার সত্যি যেন ফিকে হয়ে যায়। পরদিন মোক্ষদার সঙ্গে পুঁটি আসে। বলে—দাদু অনেক ফুল এসেছে আমাদের গাছে।

'বেশ বেশ, ভুবনবাবু হাসেন—দেখতে যাবো বিকেলে।'

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখেন। শ্যামলা, রোগা মেয়ে। ছেঁড়া ফ্রক, ইজের পরেছে। মাথায় রুক্ষ চুল। চোখ দুটো বেশ ডাগর। অনেকটা আশালতার মতো। কথাটা ভাবতে বুকে ঘা পড়ে। জিজ্ঞেস করেন—তোর বাবা কি করে?'

'কারখানায় কাজ। রোজ রাতে।'

ভুবনবাবু থমকে যান। মেয়েটার নিষ্পাপ, সরল মুখ দেখে বুকে মোচড় দেয়। মা নেই। বাবা থেকেও নেই। মেয়েটি যেন তাঁর থেকেও অসহায়, একা। বড়ো করুণ অবস্থা। ভুবনবাবু হাসার চেষ্টা করেন। বলেন—চল তোকে ল্যাবেঞ্জস কিনে দেবো। আর চানাচুর।'

মেয়েটা অবাক হয়। এতো আদর সে কখনো পায় নি। ভাবতে পারে না। খুশীতে চিকচিক করে তার চোখ। ভুবনবাবু কাগজ মোড়া দুটো টুকি, চানাচুর কিনে দেন পুঁটিকে।

'রাতে তুই একা থাকিস—ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করেন—ভয় করে না?'

পুঁটি বলে, আমি ঘুমোলে বাবা বেরোয়। কোনো সময় মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গলে বুক কাঁপে। কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। তাকাই না।

এক দুপুরে বস্তির মধ্যে ভুবনবাবু ঢুকলেন। একটা নধর কালো মেঘ তখন ঝুলছিল বস্তির মাথায়। একটু ছায়া ছায়া ভাব। পুঁটির বাগানের সব কটা দোপাটি গাছ ফুলে ভরে আছে। থিকথিক করছে ফুল। এক মুঠো পাঁচমিশেলী রঙ যেন ছড়িয়ে দিয়েছে সেখানে। ভুবনবাবুর চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘাড় উঁচু করে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীরের লাল শিরায় রক্ত বইছে। আশপাশে কেউ নেই। পুঁটিদের ঘরের জানলায় নজর পড়তে ভুবনবাবুর মনে হয় কে যেন সরে গেল। ছোট জানলা। অন্ধকার ঘর। লোকটাকে পরিষ্কার দেখা গেল না। ভুবনবাবুর লোকটাকে চেনা লাগে। বাগানের মধ্যে গাছে জল দেওয়ার মগটা রয়েছে। পুঁটিকে দেখলেন না।

ঘণ্টার সময় কাজ সেরে মোক্ষদা চলে গেল। রাত আটটার পর জোয়ার আসবে গঙ্গায়। ভুবনবাবু খেয়ে তৈরী হলেন। এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কেটে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভুবনবাবু ঘর থেকে চাঁদটা দেখতে পান না। বস্তির মাথায় মিহি হলুদ আলো তাঁর চোখে পড়ে। ঘরে আলো জ্বলছিল। পুঁটি আসে। হাতে ভলাপাতায় মোড়া একগাদা দোপাটি ফুল। পাপড়িতে বৃষ্টির জল লেগে আছে।

'রুটি খাবি—ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করেন। পুঁটি ঘাড় নাড়ে। রুটি খায়। তারপর বলে—দাদু রাতে তোমার ঘরে শুতে দেবে?'

'তোর বাবা কোথায়? বকবে না—ভুবনবাবু জানতে চান।'

বাবা সন্ধ্যে লাগতেই বেরিয়েছে—পুঁটি বলে।

একটা পুরোনো সতরঞ্চি আর তাকিয়া ভুবনবাবু জোগাড় করেন। তক্তাপোষের পাশে মাটিতে শতরঞ্চি পেতে পুঁটি শোয়। ভুবনবাবু ভুলে যান যান দেখার কথা।

দরজা, জানলা খোলা। ঠান্ডা হাওয়া আসে। দুটো অসমবয়েসী মানুষ নানা সুখ-দুঃখের গল্পে মশগুল হয়ে যায়। একদল লোক একদিন ভরদুপুরে খাটুলিতে চাপিয়ে কাকে নিয়ে গেল। এর বেশী নিজের ব্যাপারে বিষয়ে পুঁটি মনে করতে পারে না।

দুখীরাম তখন দিনে কাজ করতো। সেদিন কাজে যায় নি। পুঁটিকে কোলে নিয়ে ঠায় বসেছিল।

ভুবনবাবুর রক্তে টান লাগে। বুঝতে পারেন—অনেক দূর থেকে, পাহাড় পর্বত পেরিয়ে সেই বিশাল ঢেউটা ছুটে আসছে। তার বুকে ফসলের পলি, যা পৃথিবীকে উর্বর করে। তাঁর রক্তের মধ্যে সেই ছোট অদেখা শেকড়টা চনমন করে। পুঁটিকে বলেন—তুই আমার বাড়ীতেই থাক পুঁটি। দাদু, নাতনীতে খাবোদাবো, ঘুরে বেড়াবো।'

পুঁটি হাসে। জবাব দেয়—বাবা আসতে দেবে না।

রাত বাড়ে। পুঁটির চোখ ঘুমে বুজে আসে। কথার মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ভুবনবাবু দেখেন বাইরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। ঘরের ভেতরে ফুরফুরে হাওয়া। বুক বোঝাই হাওয়া টানেন। আলো নিভিয়ে দেন। দরজা, জানলা খোলা পড়ে থাকে। বড়ো আরাম লাগে। ভুবনবাবুর মনে হয়, শরীরের চামড়া আলগা, শিথিল হলেও, সব কোষ মরে নি। কিছু আজো বেঁচে আছে। এই হাওয়া, এই জ্যোৎস্নার তাপে তাঁর ঘুম পায়। অনেক চেষ্টাতেও যে ঘুম সারারাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, আসে না, আজ খোলা দরজা, জানলা পেয়ে সেই ঘুম ভুবনবাবুর মাথায় নিঃশব্দে হৈ-চৈ জুড়ে দেয়।

অনেক রাতে চোর আসে। হাট করা দরজা জানলা দেখে সে অবাক হয়। ভাবে ফাঁদ পাতলো নাকি। জানলার গরাদ নেই। উঁকি দিয়ে সে ঘরটা দেখে। চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে। তার দু চোখ ঘরের মেঝেতে আটকে যায়। পুঁটি আরামে ঘুমোচ্ছে। তার মুখে চাঁদের আলো। বালিশের পাশে কলার পাতায় এক মুঠো দোপাটি ফুল। মেয়েটা আজ দুপুরে কেঁদেছিল। এখন তার মুখে দুঃখ জ্বালার কোনো দাগ নেই। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ দুখীরামের বুকটা হুহু করে। ফাঁকা লাগে। কি যেন একটা বড়ো কিছু চুরি হয়ে গেছে তার। চলে যেতে চায়। পারে না। রাতে জগবন্ধুও আজ কাজে বেরিয়েছে। মুখে তেল কালি মেখে সে বেরোয়। দেখলে ভয় লাগে। দুখীরাম ভাবে, অন্ধকারে আচমকা জগবন্ধুকে এই জানলায় দেখে পুঁটি ভীষণ ভয় পাবে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। দুখীরাম রাস্তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। জগবন্ধু তাকে দেখলে আর এ বাড়ীতে ঘেঁসবে না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা নিয়ে দুখীরাম পাহারা দেয়।

এক ঘর চাঁদের আলো নিয়ে অনেক-দিন পর ভুবনবাবু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমিয়ে থাকা মুখে স্বপ্নের ছাপ। জোয়ারের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

আসুন। দেখুন। পছন্দ হলে খরিদ করুন—

প্রকাশিত হলো :— প্রকাশিত হলো :—

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ

আকাশবাণী খ্যাত বেলা দে'র

গৃহিণীর অভিধান ২০

উৎসবে, বিবাহে উপহার দেওয়ার ও ঘরে রাখার মনের মত বই—

এতে কি কি পাবেন?

আমাদের শিক্ষা, সংসার পরিচালনা, ঘর সাজানো, ফুল সাজানো, বাগান, বস্ত্র ধৌতি, ড্রাইং ক্লিনিং, মা ও শিশু নার্সিং, নানান ধরণের সেলাই ও বোনা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, দেশ-বিদেশের রান্না ও জলখাবার, চাইনিজ রান্না ও জলখাবার, বিলিতি রান্না ও জলখাবার, জ্যাম, জেলি, আচার, কুটিরশিল্প ও টুকিটাকি, টুকিটাকির ভিতর বহু অজানার সন্ধান পাবেন।

পার্ল পাবলিকেশন C/o পার্ল বুক এজেন্সী

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩, ফোন : ৩৫-৬০৬২

কলিকাতা পুস্তক মেলা

সংগ্রাহক

পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ড

বইপাগল মানুষদের মনের খোরাক জোগাতে তৃতীয় কলকাতা বইমেলা তার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হচ্ছে। ১৯৭৬ সালের মার্চে প্রথম কলকাতা বইমেলার সূচনা হয়, অর্থাৎ কলকাতা বইমেলার বয়স মাত্র দু বছর। ১৯৭৮ সালে এই মেলা সবেমাত্র তিন বছরে পা দিতে চলেছে। তাই ভাবতের বাইরের যে কোন দেশের যে কোন পুরোন বইমেলার সঙ্গে আমাদের বইমেলার তুলনামূলক আলোচনা একান্তই ধৃষ্টতা। তবুও একথা সগর্বে বলতে পারা যায় যে, গত দু বছরেই কলকাতা বইমেলার যতখানি অগ্রগতি হয়েছে তা অভাবনীয়।

আপনারা জানেন ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লিপজিগেই প্রথম বই মেলার সূচনা হয়। ক্রমে বইব্যবসার ক্ষেত্রে ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ব বইমেলাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা বলতে ফ্রাংকফুর্টেরই মেলাকে বোঝায়। বর্তমানে প্রতি বছর নিয়মতভাবে ফ্রাংকফুর্টে বিশ্ব বইমেলাটি অত্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বিশ্ব বইমেলায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। বাইরের চাকচিক্য দেখে চমকে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু তবুও আমি বলছি, সেই ফ্রাংকফুর্টের মেলা আমাকে ততখানি আকর্ষণ করে নি, যতখানি করেছিল কলকাতা বইমেলা। হয়ত আপনারা মনে করতে পারেন দেশপ্রীতিই এর অন্যতম কারণ। আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না। ফ্রাংকফুর্টের বিশ্ব বইমেলাটির সঙ্গে যদি আমাদের কলকাতা বইমেলার তুলনামূলক আলোচনা করি, তবে দেখা যাবে যে, কলকাতা বইমেলার এমন একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমাজকে আকর্ষণ করে। যদি বলেন কেন? প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে। যে দেশের মানুষ অহরহ পেটের চিন্তায়ই মগ্ন, যেখানে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে মানুষ হিমসিম খায়, সেদেশে বইমেলা বিলাসিতারই নামান্তর। তারপর বিগত দশকে এদেশের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না যে বইয়ের আবার একটা মেলা হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সভ্যতার হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দেশের বইপাগল মানুষরা বইমেলার সার্থকতা বুঝতে পেরেছে।

ফ্রাংকফুর্টের বইমেলাটি একটি স্থায়ী আচ্ছাদিত বিরাট সীমানা জুড়ে হলের মধ্যে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আকারে আয়তনে বিশাল, সারা পৃথিবীর ছয় থেকে সাত হাজার প্রকাশক এখানে যোগদান করেন। এবং ৬০ থেকে ৬৫ হাজার নতুন বই প্রতি বছর দেখান হয়। এখানে কেবল প্রকাশকরা ও পুস্তক বিক্রেতারা পাইকারী দরে বই কেনা-বেচা করে থাকে। সাধারণ মানুষ সেখানে বই পরিদর্শন করে বটে, কিন্তু ইচ্ছামত বই সংগ্রহ করতে পারে না। যদি কোন বই কেনায় আগ্রহী থাকে, তবে তাকে শহরের দোকান থেকে কিনে নিতে হয়। এই ধরনের বইমেলা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই হয়ে থাকে। দিল্লীও পেছিয়ে নেই, প্রতি দু বছর অন্তর সেখানে আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন হচ্ছে।

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কলকাতা বইমেলার প্রথম আয়োজন করেন। দিল্লীর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট যে ধরনের জাতীয় বইমেলার আয়োজন করে থাকে, বলা চলে, কলকাতা বইমেলা যেন অনেকটা সেই ধাঁচের। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের ওপর খোলা আকাশের নীচে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কতখানি উপভোগ্য ও মনোরম, তা বোধ করি না বললেও চলে। ময়দানের মুক্তাঙ্গনে প্রথম যে কলকাতা বইমেলার আয়োজন হয়, তাতে ছিল না কোন ঝালাপালা-করা হিন্দী গানের আওয়াজ, ছিল না সেখানে ফুচকা ভেলপুরীর দোকান। ছিল কেবল বই-বই আর বই। তার ফাঁকে দু-একটি চা-কফির স্টল ক্লান্ত দর্শকের মনে কান্তি অপনোদন করে স্ফূর্তির মেজাজ এনে দিচ্ছিল। বই দেখতে দেখতে যখন দর্শক অবসন্ন হয়ে পড়েন, তখন চা-কফি কিংবা কোকাকোলা তাঁর অবসাদ দূর করে, তাঁকে চাঙ্গা করে তোলে। তারই মাঝে

মাঝে ভেসে আসে রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা সুরেলা নারী কণ্ঠের ঘোষণা। যখন বই-সমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে, মানুষ মনের খোরাকের জন্য কিছু বই কিনে মাঠে বসে পুরোন কোন হঠাৎ দেখা বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়, তখন যেন বইয়ের ভাবই তাকে পেয়ে বসে, সেই পরিবেশ ছেড়ে সে যেন আর উঠতেই চায় না। সে মনে করে বুঝি বাস্তব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন এক নতুন জগতে এসে পড়েছি। সেখানে না আছে কোন সময়ের তাগিদ, না আছে কোন ব্যস্ততা। কলকাতায় শীতকালে যেসব মেলা হয় সেখানকার দর্শক থেকে এই বইমেলার দর্শক আলাদা জাতের। পাঁচ বছরের শিশু থেকে আশী বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এখানে সমান তালে সময় কাটাতে চায়। যারা সবেমাত্র পড়তে শিখেছে তারাও যেমন বর্ণ-বৈবর্ণ্যের রাহারী ছবির বই দেখে কেনার জন্য আবদার করেছে, ঠিক অনুরূপভাবেই কোন ভদ্রলোক তাঁর প্রিয় বইটি নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আবার সুগৃহিণীরা যাঁরা স্বামীদের বই কেনা ব্যাতিককে দুচক্ষে দেখতে পারেন না, তাঁরা পর্যন্ত রান্নার বই বা সেলাই শিক্ষার বই কিনতে ব্যস্ত। বইমেলা এমনই একটি স্থান যেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই জাতি, ধর্ম, ভাষা, নির্বিশেষে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনমত জ্ঞান আহরণ করতে পারে।

কলকাতা বইমেলা দশ দিনব্যাপী চলতে থাকে। বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যে কিভাবে কেটে যায়, তা বলে বোঝান যায় না। হৃদয়ঙ্গম করার আগেই এই দশ দিনের মেলা যেন কোন এক ফাঁকে এসে নিঃশব্দে চলে যায়। আসা যাক গত বছরের মেলায় কথায়। মেলাটির উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয় জাতীয় অধ্যাপক সদ্যপ্রয়াত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বটে, কিন্তু রেখে গেছে তাঁর সেই মুখানসৃত বাণী, যা মেলার উদ্যোকতাদের বছরের পর বছর প্রেরণা জোগাবে। মেলায় বহু নিমন্ত্রিত জ্ঞানীগুণীর পদধূলি পড়েছিল। এসেছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল সপরিবারে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, লেখক-লেখিকা, সিনেমা পরিচালক এবং সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের পড়ুয়া লোক। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, তাঁরা সবাই যেন মনে করছেন, তাঁদের নিজস্ব জগতে এসে পড়েছেন। ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা টিকিটে ঢুকতে দেওয়া হত। অর্থাৎ এই সময় তাদের অবাধ গতি ছিল। আইসক্রীম হাতে নিয়ে খেতে খেতে মেয়েরা যখন দলে দলে মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে দৃশ্যও কম উপভোগ্য নয়।

ফ্রাংকফুর্ট বইমেলায় গিয়ে এসব কিছুই চোখে পড়ে নি। মনে হয়েছে, ওখানের সব ব্যাপারটাই যেন যান্ত্রিক। লোকেরা এসেছে, বই দেখছে, ব্যবসায়িক আলোচনা শেষে ফিরে গেছে। সবটাই যেন নিষ্প্রাণ। যদিও প্রাচুর্যের অভাব নেই। ফ্রাংকফুর্টের মেলাটি এত বড় যে, মেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গাড়ীতে যাতায়াত করে। বই ছাড়াও শিক্ষার জন্য যা যা দরকার তা এই মেলায় প্রদর্শন করা হয়। যেমন—ভিডিও টেপ, মাইক্রোফিস, স্লোব, শিক্ষামূলক খেলনা, সবই মেলায় দর্শনীয় বস্তু। কলকাতা বইমেলা ঠিক এতখানি উন্নতি না করলেও দু বছরেই সাধারণ মানুষের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাও কম গর্বের নয়। ফ্রাংকফুর্টের মেলাটি চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে কলকাতায় দশ দিন হয়ে থাকে। কলকাতা বইমেলার আরেকটি আকর্ষণীয় অঙ্গ হল শেষ তিন দিনের বই-বাজার। খুবই স্বল্পমূল্যে এখানে নামী-দামী বই পাওয়া যায়। তাছাড়াও প্রত্যেকটি স্টল মালিক কমিশনে বই জনসাধারণের কাছে তুলে দিচ্ছেন। আরেকটি মজার খবর হল, উদ্যোকতারা প্রবেশপত্রের ওপর লটারীর বন্দোবস্ত করে থাকেন। ব্যবস্থাটি খুবই জনপ্রিয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয়ও বটে। আশা করি অন্যান্য বছরের মত এবারেও উদ্যোকতারা সাধারণের সুবিধার্থে এই সব ব্যবস্থার আয়োজন করবেন এবং আরও অনেক সুবন্দোবস্ত হবে।

গত দু বছরের অভাবনীয় সাফল্যে তৃতীয় বইমেলার সূচনা হচ্ছে। প্রথমবারে ৬৭টি স্টল, দ্বিতীয়বার ১৩০টি স্টলে পাঁচশত হাজার বইয়ের সমাবেশ ঘটেছিল। তার মধ্যে ৫০ হাজার ইংরাজী, ২০ হাজার বাংলা, আর বাকী ৫ হাজার অন্যান্য ভাষায়। কিন্তু এবারে আশা করা যায়, বিদেশী বই আরও বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ, যখন সরকারের আমদানী নীতি একেবারে উদার হয়ে গেছে, তখন বিদেশী দুষ্প্রাপ্য বই এবার সহজলভ্য হবে। আধুনিক সভ্যতার হাওয়া যতই আমাদের গায়ে লাগছে, ততই আমরা বইকে আঁকড়ে ধরে থাকছি। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বই ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। বই আমাদের নিত্যসঙ্গী ও নির্বাক বন্ধু। পরিশেষে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইমেলাটির আয়োজন করে তাঁরা তাঁদের প্রগতিশীল ও শিক্ষা-প্রসারকামী দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিচ্ছেন।

রেখা ধর

প্রকাশিত হল : আবদুল জব্বারের নতুন স্বাদের উপন্যাস

অলৌকিক প্রেমকথা

বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রচুর ধনসম্পদ আছে কিন্তু মহাভারত বা আরব্য উপন্যাস ছাড়া অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ তেমন দেখা যায় না। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত মানুষ প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা থেকে পালিয়ে গিয়ে অলৌকিক সুখভোগের সন্ধানী হয়। "অলৌকিক প্রেমকথা" সেই সুখের সাগরে পাঠক-পাঠিকাদের অবগাহন করাবে। মূল্য : ২০্।

শৈলেশ দে-র স্বাধীনতা বিপ্লবের ভুলে যাওয়া কাহিনী

ইতিহাস মনে রাখেনি

ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নেবার আগে ওঁরা সবাই বলেছিল—"আবার আমরা ফিরে আসবো"। নতুন নামে, নতুন রূপে, নতুন পরিচয়ে ওরা কি আবার ফিরে এসেছে? ওঁদের পদভারে আবার কি দিক-বিদিক কেঁপে উঠেছে? মূল্য : ১০্।

শপথ নিলাম (২য় সং)	৬	প্রজাপতি মন	১০্

মৃণাল গুহঠাকুরতার দু'টি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

ভাগ্যে ভার্যা (২য় সং)	১০	জল শুধু জল (২য় সং)	৮্
দেবযানীর নতুন উপন্যাস	।।	আবীরের রঙে	১০্
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের	।।	সমাচার দর্পণ	৫্
অবনী সাহার ভ্রমণ কথা	।।	টালা থেকে তামিলনাড়ু	৮্
চিরঞ্জীবের	।।	খেলার মাঠে মেয়েরা	৭্
অর্ধেন্দু দত্তের	।।	শিকারের জার্নাল	৭্

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ, টেমার লেন, কলিঃ-৯; ফোন : ৩৪-৯৫৯২

কলিকাতা পুস্তক মেলা

রবীন্দ্র সদনের বিপরীত ময়দানে

২৪ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ ১৯৭৮, ১টা থেকে ৯টা পর্যন্ত

উদ্যোক্তা

পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ড

৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য (ছুটির দিন ব্যতীত) ১টা–৪টা প্রবেশ মূল্য নাই

আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন

অজন্তা পাবলিশার্স
৪।২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
পি ১৭ মিশন রো এক্সটেনশন
কলিকাতা ১৩

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড বুক এজেন্সি
১৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭২

আই; এ. বি; বুকস
৯।১ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭।

ইউ বি এস পাবলিশার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
৮।১বি, চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা ১৬

এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

এস চাঁদ অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২৮৫জে, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭২

ওরিয়েন্ট পেপারব্যাকস্
৩৬ সি কনট্ প্লেস, নিউ দিল্লী ১

ক্রাইস্টস ডিসাইপল
১২৭ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

কে পি বাগচি অ্যাণ্ড কোং
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কোয়ালিটি বুক কোং
৩১ লেনিন সরণি, কলিকাতা ১৩

চ্যাটার্জি পাবলিশিং কনসার্ন
৪২।১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

মিত্রাসা
১-এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মোনাকি
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ
২৫৭-বি, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দি ম্যাকমিলান কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

নিউ বুক স্টল
৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

নিউ বুক সেন্টার
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি ৯

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

পি এম বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৯ গুরু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬

পুথিপত্র
৯ অ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা ৯

প্রেন্টিস হল অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ
এম-৯৭ কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী ১

প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭।এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

বিকাশ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৮।১বি, চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা ১৬

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

বেস্ট বুকস
১-এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

ভারতী বুক স্টল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি ৯

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

মিনার্ভা অ্যাসোশিয়েটস (পাবলিকেশন্স) প্রাইভেট লিমিটেড
৭-বি, লেক প্লেস, কলিকাতা ২৯

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
(প্রকাশন বিভাগ)
১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

রূপা অ্যাণ্ড কোং
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

শরৎ বুক হাউস
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ডি বি,
কলিকাতা ২৯

স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
এবি।৯ সফদরজঙ্গ এনক্লেভ,
নিউ দিল্লী ১৬

কলিকাতা পুস্তক মেলা উপলক্ষে অভিনন্দন—
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এ-৫ গ্রীন পার্ক নিউ দিল্লী ১১০০১৬

প্রকাশক ও গ্রন্থকার

সুপ্রিয় সরকার

গ্রন্থ গ্রন্থকারের সম্পত্তি এবং গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবসায়ের উপকরণ। স্বভাবতই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রন্থস্বত্ব আইনের একটা বন্ধন, এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিক ভূমিকা পালন করে। লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক কেমন হবে—প্রীতিপূর্ণ আত্মীয়তামূলক না অবিশ্বাসপূর্ণ দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভময়—তা নিঃসন্দেহে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত পারিবারিক সম্পর্ক যেমন নিবিড় আত্মীয়তা আর বিচ্ছিন্ন অনাত্মীয়তা—এ দুটো রূপই তুলে ধরে, লেখক-প্রকাশক সম্পর্কও ঠিক তেমনি পারস্পরিক গভীর বিশ্বাস এবং বিশ্রী অবিশ্বাস—এই দুয়ের সীমায় আবদ্ধ। গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কিত আইন অবশ্য আছে লেখক-প্রকাশকের মধ্যে চুক্তিও অবশ্যই হয়, কিন্তু আইন বা চুক্তি পারস্পরিক সম্পর্কের শেষ কথা হতেই পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়।

প্রথমে গ্রন্থস্বত্ব আইন (কপিরাইট অ্যাক্ট) সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা ভালো। এই আইন অনুযায়ী গ্রন্থকারের রচনা তার মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি, এবং এই আইনানুগ চুক্তির ফলে লেখক অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী প্রকাশকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রয়্যালটি বাবদ অর্থ পান। গ্রন্থস্বত্ব আইনের জন্যই লেখকের রচনা তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউ প্রকাশ করতে পারেন না, যদি বা প্রকাশ করেন তা হলে তার জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে। রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রেও গ্রন্থস্বত্ব আইন লেখককে যোগ্য অধিকার দিয়ে রেখেছে। দেশের পরিধিতে আইন যেমন বলবৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব আইন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। মোট কথা গ্রন্থস্বত্ব আইন লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের একটি অংশমাত্র, এই অংশের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। লেখক-প্রকাশকের সম্পর্কের অন্য অংশ সন্দেহাতীতভাবে আইন বা চুক্তির ঊর্ধ্বে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার এই বক্তব্য পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি।

ধরা যাক, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশন-সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক, যিনি সংস্থাটির সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। কোনো বিশেষ কারণে টাকাকড়ির টানা-টানিতে পড়েছেন, এ সংবাদ শোনামাত্র প্রকাশক তাঁর জন্য প্রাপ্য হিসাবের অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থা করলেন। অথবা এমনও দেখা যায় প্রকাশক কোনো বিপদে পড়েছেন গ্রন্থকার তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর সাধ্যমত শক্তি দিয়েছেন প্রকাশককে। লেখক-প্রকাশকের এ ধরণের সম্পর্ক কোনক্রমেই আইন দিয়ে বিচার করা যায় না।

রাজশেখর বসু মহাশয়ের (পরশু-রামের) গল্পগ্রন্থগুলি এম সি সরকার থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রতি বছর পুজো সংখ্যাগুলিতে যে সব গল্প লিখতেন সেগুলি একত্রিত করে কালী-পুজোর পরই টেলিফোন করতেন পাণ্ডু-লিপি নিয়ে আসবার জন্যে। প্রকাশক-গ্রন্থকার যেন এক পরিবারভুক্ত। আমি যে তাঁর বই পাবই এ নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিলো না।

ঠিক একই রকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' সম্পর্কে। এ রচনা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় রচনা প্রকাশের প্রায় বছর দেড়েক আগে একদিন বুদ্ধদেববাবু রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সংক্রান্ত কিছু বই আমাকে জোগাড় করে দিতে বললেন। কতগুলি বই পৌঁছে দেওয়ার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রামায়ণ মহাভারত নিয়ে কিছু লিখছেন নাকি?' তিনি বলেছিলেন, তাঁর লেখার ইচ্ছা আছে। উত্তরে আমি বলি, বইটি আমি ছাপবো। এরপর ধারাবাহিকভাবে তাঁর মহাভারতের কথা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রচনাটি পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটি অন্য কোনো প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হবে, এমন একটা ধারণা আমি মনে মনে পোষণ করে এ সম্পর্কে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। কিন্তু আমার ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হল দেশ-এ শেষ কিস্তি প্রকাশের পরে। টেলিফোনে বুদ্ধদেববাবু আমায় ডাকলেন এবং অনুযোগের সুরে বললেন, তোমার জন্যে মহাভারতের কথা-র প্রেস কপি নিয়ে বসে আছি অথচ যোগাযোগ করছো না।

প্রকাশিত হ'লো

বিনায়ক সান্যালের

অবসৃতের অপলাপ ২য় সংস্করণ ৮-০০

গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়—শীত আসে, শীতের পর বসন্ত, তারপর আবার শীত . . পিছিয়ে পড়া বছরের দ্বীপ জেগে ওঠে....স্মৃতির তারে টান প'ড়ে রিনিঝিনি বাজে—এলাচ - লবঙ্গগন্ধী বাল্য-কৈশোর ও টাট্টুর দুরন্ত যৌবন দাপাদাপি করে কখনো শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর, কখনো বা শহর কলকাতায়। কৈলাস কবিরাজের আখড়া, নাট্যসংঘ, পেশাদার যাত্রাপার্টি এবং স্কুল-কলেজে আসর বসায় হেড়পণ্ডিত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, মুষ্ঠিযোগখ্যাত বাঘমারা বাঘা-পণ্ডিত 'ষড়্‌তীর্থ' মন্মথনাথ, ছাত্রিদরদী ডগলাস্ সাহেব, আমোদপ্রিয় ডঃ দাস, নীতিবাগীশ অধ্যক্ষ মৈত্র, sadism বা ধর্ষকামভাবাপন্ন উৎকেন্দ্রিক ঘোষসাহেব ...। লেখকের হাল্কা মেজাজে লেখা এক মনোরম জীবন-আলেখ্য।

অজন্তা পাবলিশার্স

৫৬, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯, পোঃ বকস্ নং-১০৮৫৪

অনেকে এডভ্যান্স দিতে চাইছে, তুমি এখনি কপি নিয়ে যাও।'

আমার অন্য আর দুটি অভিজ্ঞতা রীতিমত গর্ব করবার মত। আমার প্রকাশিত একজন প্রখ্যাত লেখকের একটি জনপ্রিয় বই অন্য একটি প্রকাশন-সংস্থা পকেট বুক সিরিজে বার করছেন। লেখক তাঁদের বলে দিলেন, 'সুপ্রিয় রাজি হলে এবং তাকে রয়্যালিটির একটা অংশ দিলে তবেই এটা হতে পারে।' লেখকের এ মহানুভবতায় আমি অভিভূত। আইন নয়। মানবিক সম্পর্কই এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি হোলো স্যর যদুনাথকে নিয়ে। আমরা তাঁর ইংরাজী 'শিবাজী'র সোল সেলিং এজেন্ট ছিলাম। নিজের খরচে তিনি বইটি প্রকাশ করেছিলেন। বইখানির দেড়শো মতো কপির স্টক তখনো আমাদের কাছে রয়েছে এমন সময় বইটির পরবর্তী সংস্করণ ছাপা হয়ে গেল এবং বইটি বাঁধিয়ে তিনি আমাকে বাজারে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি বললাম, স্টক শেষ হয়ে গেলে বই নিয়ে যাবো। তিনি একটু রেগেই বললেন, ঐ একশো-দেড়শো জন কেতা কি তাহলে ঠকবে? পরের সংস্করণে আমি যেসব নতুন তথ্য দিয়েছি তা থেকে তারা কি বঞ্চিত হবে? না, তুমি পুরোনো স্টক নষ্ট করে ফেলো। কাল থেকেই বাজারে নতুন সংস্করণ বিক্রী করতে আরম্ভ করো।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এমন আইন ব্যতীরেকে দৃষ্টান্ত প্রকাশন জগতে ভূরি ভূরি আছে। এ সব দৃষ্টান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে না, বরঞ্চ প্রকাশন-জগতের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হয়। সমস্যার ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে দেখা যাবে প্রকাশক গ্রন্থকারকে যে হিসাব দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশী বই ছাপছেন। অথবা, প্রকাশক লেখককে না জানিয়েই তাঁর বইয়ের আর একটি মুদ্রণ বাজারে ছাড়লেন এবং ধরা পড়ে গিয়ে নানা রকম সাফাই গেয়ে প্রাপ্য রয়্যালটি পাঠিয়ে কোন রকমে মুখ রক্ষা করলেন। অথবা, প্রকাশকরা যখন দামি নামি লেখকের বই জোগাড়ের জন্যে অগ্রিম রয়্যালটির প্রচলন সুরু করে নিজের ফাঁদে নিজে পড়েন—অর্থাৎ দু হাজারের একটি মুদ্রণের অগ্রিম রয়্যালটি গ্রন্থকার কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিলেন আগেভাগেই, অথচ প্রকাশক শেষ পর্যন্ত হয়ত ঐ মুদ্রণের দেড় হাজার মত কপি দীর্ঘদিন ধরে বিক্রি করলেন এবং নিজেকে সমস্যার জালে জড়ালেন।

প্রকাশনা জগতে এসব সমস্যা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় কথা হল লেখক-প্রকাশকের নিকট সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা এবং এর ওপর ভিত্তি করেই প্রকাশক-জগৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রকাশিত

শংকর	।।	স্বর্গ মর্ত পাতাল	১২৲
”	।।	এক ব্যাগ শংকর	৬৲
”	।।	সম্রাট ও সুন্দরী	১০৲
সন্তোষকুমার ঘোষ	।।	শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা	২০৲
”	।।	দূরের নদী	৫৲
কালকূট	।।	মিটে নাই তৃষ্ণা	৮৲
নিমাই ভট্টাচার্য	।।	পিকাডিলী সার্কাস	১৪৲
বুদ্ধদেব বসু	।।	প্রভাত ও সন্ধ্যা	৮৲
রমাপদ চৌধুরী	।।	দ্বিতীয়া	৬৲
সমরেশ বসু	।।	আম মাহাতো	৬৲
প্রফুল্ল রায়	।।	আমাকে দেখুন ১ম/২য়	২২৲
”	।।	একাকী অরণ্যে	১০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	।।	সোনালি দিন	৭৲
চাণক্য সেন	।।	গেরিলা	১০৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	।।	বাসকশয়ন	১০৲
”	।।	ফয়সলা	৭৲
বুদ্ধদেব গুহ	।।	লবঙ্গীর জঙ্গলে	৮৲
শচীন ভৌমিক	।।	হাউস ফুল	১২৲
প্রবোধকুমার সান্যাল	।।	পর্যটকের পত্র	১৫৲
শঙ্কু মহারাজ	।।	পুণ্যতীর্থ প্রভাস	১০৲
সুনীল চৌধুরী	।।	হিমালয়ের গহনে নির্জনে	৮৲
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	।।	দক্ষিণী	১২৲
গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী	।।	শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত	১০৲
প্রতিভা বসু	।।	সকালের সুর সায়াহ্নে	৮৲
বিক্রমাদিত্য	।।	ইনফরমার	১৪৲
বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী	।।	আবর্তন	১৬৲
পরিতোষ মজুমদার	।।	কনসেনট্রেশন ক্যাম্প	১২৲
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	।।	সুন্দরবনের আতঙ্ক	৮৲
শ্রীপারাবত	।।	চিতোরগড়	৮৲
প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী	।।	টেক ওভার	৭৲
গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ	।।	নায়ক একাকী	৮৲
নটরাজন	।।	স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড	৮৲
আবু সয়ীদ আইয়ুব	।।	পথের শেষ কোথায়	১২৲
”	।।	পান্থজনের সখা	১২৲
বুদ্ধদেব বসু	।।	সাহিত্যচর্চা	১২৲
ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত	।।	নজরুল-চরিতমানস	২৬৲
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	।।	কালের প্রতিমা	২৫৲
শঙ্খ ঘোষ	।।	ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ	১২৲
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	।।	গিরিশচন্দ্র	৩৫৲
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	।।	কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ	২০
কিরণশশী দে	।।	রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা	১২৲

দে'জ পাবলিশিং কেঃ অঃ দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ : ফোন ৩৪ ৫০৩৫

ভারতে বিদেশী বই

দাউদয়াল মেহ্‌রা

ভারতে বিদেশী বইয়ের কথা বলা মানেই ইংরেজী বইয়ের কথা। প্রাক-স্বাধীন ভারতে ইংরেজী বইয়ের কারবার সবটাই ছিল বড় ইংরাজ প্রকাশকদের হাতে। ঐ প্রকাশকদের শাখা অফিস ছিল কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে। (পরে দিল্লীতেও এই রকম শাখা অফিস খোলা হয়) বিক্রয়ের প্রধান ভাগই ছিল পাঠ্য বই—যে সব বই ইংলণ্ডে তাদের প্রধান সংস্থারা প্রকাশ করত। আজকাল আমরা যাদের বলি সাধারণ বই (জেনারেল বুকস) অর্থাৎ সেগুলোতে পাঠ্য পুস্তকের গন্ধ থাকত না এবং সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানের ও আনন্দের খোরাক জোগাত, এই সব বইয়ের কাটতি ছিল নগণ্য। যে দু-একজন ভারতীয় পাইকারী ইংরেজ বই আমদানীকারী ছিল, তারা ইংরেজ প্রকাশকদের শাখা অফিসগুলো থেকে কোন রকম সহযোগিতা পেত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইংলণ্ডের কলিন্স কোম্পানি সুলভ সংস্করণের উপন্যাস এদেশে পুনর্মুদ্রণ করতে শুরু করে। এগুলো চাহিদা ছিল প্রচুর। এর বেশীর ভাগই যেত এদেশে অবস্থিত ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনীদের অবসর-বিনোদনের খোরাক হিসাবে। অবশ্য এসব উপন্যাস হত রহস্য জাতীয়। ওই সময়ে ভারতে আসতে শুরু করে বিখ্যাত পেঙ্গুইন বই। এই বইগুলো ছিল সস্তা এবং নানা বিষয়ের। ক্রমে ক্রমে এই বই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই জনপ্রিয়তা আরও অটুট।

তবে তখন ইংরেজী বইয়ের চাহিদা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু যোগান ছিল কম। এই ব্যবধান কমাবার উপায় নানা কারণেই তখন সম্ভব হয়নি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজী বইয়ের বাজার ছিল তেজী। যেন পালতোলা নৌকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে।

উত্তর-স্বাধীন ভারতে অবস্থার হল বিশাল রূপান্তর। বহু ভারতীয় বিদেশী পুস্তক ব্যবসায়ীর বাজারে ঘটল আবির্ভাব। যে সব ব্যবসায়ী ইংরেজ প্রকাশনা সংস্থার শাখা অফিসগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল, তারা সরাসরি ইংরেজী বই আমদানী করতে শুরু করল। প্রথম দিকে অবশ্য তাদের কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে ইংরেজী বইয়ের ব্যবসা সব রকমেই উন্নতি লাভ করল। কয়েকজন ভারতীয় পুস্তক ব্যবসায়ী ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় প্রকাশক সংস্থার এদেশীয় প্রতিনিধিত্বও লাভ করল।

বিশেষ করে প্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বইয়ের চাহিদা অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। ক্রমশ এই জাতীয় আমেরিকান বইও হু-হু করে এদেশে আসতে শুরু করল। এটা খুবই স্বাভাবিক যেহেতু আমেরিকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকটা সর্বশ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

তাই বহুভারতীয় আমদানিকারীরা যারা পূর্বে ইংলণ্ড থেকে বই আনত, তারাই আমেরিকা থেকে বই আনায় বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ল। এইজন্য আমদানি লাইসেন্সের বেশ বড় একটা অংশ ইংলণ্ডের ভাগ থেকে সরিয়ে নিয়ে আমেরিকা থেকে বই আনার জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল।

১৯৬০ সাল নাগাদ আমেরিকার পি এল ৪৮০-এর অর্থানুকূল্যে আমেরিকায় প্রকাশিত অনেক প্রযুক্তি বিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক এদেশে ছাপা শুরু হল। যদিও এর দ্বারা এদেশের ছাত্র ও অধ্যাপক বিশেষ উপকৃত হলেন কিন্তু গ্রন্থকারদের ভাগ্যে জুটল বিপরীত ফল।

আজ এদেশেই ইংরেজী বইয়ের প্রকাশ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নতুন ভারতীয় প্রকাশকের জন্ম হয়েছে। অবস্থান্তরে বিদেশী প্রকাশকমণ্ডলীরাও আজ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে এবং বহু ইংরেজী বইয়ের পুনর্মুদ্রণের স্বত্ব দেশীয় প্রকাশকদের দিতে সম্মত হয়েছে। এই সহযোগিতার ফলে ইংরেজী বইয়ের বিক্রি বিশেষভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। অবশ্য পি এল ৪৮০-এর সাহায্যে ছাপা বইয়ের ভাগ অনেক কমে গেছে। বইয়ের চাহিদার দিক থেকে দেখতে গেলে উপন্যাস ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত বই-এর স্থানই সবার উপরে। এর পরে দেখা যাবে রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর লেখা বইয়ের স্থান। এই বৃদ্ধিতে ইংলণ্ডের সুলভ ই এল বি-এস সংস্করণের বইগুলোর অবদান কম নয়, কারণ এই সংস্করণে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের লেখা বই ছাপার দরুন ছাত্ররা ও অধ্যাপকবর্গ বিশেষ উপকৃত হয়েছেন।

আমার মনে হয় ইংরেজী বইয়ের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নয়। কারণ আজকে আমাদের শিল্পোন্নতি ও অগ্রগতিকামনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি উন্নয়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বইয়ের চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী হবার সম্ভাবনাই বেশী। এরই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে (এবং যা চিরকাল হয়েছে) উপন্যাসের তৃষ্ণা। যে ইংরেজী বই হল আমাদের আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভের জানালা তা উন্মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কি, যতদিন না আমরা জ্ঞানের বাজারে স্বনির্ভরশীল হই?

অনুলিখন—
নরেন্দ্রনাথ সিংহ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী

মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বনফুল রচনাবলী (১১/১০ খণ্ড প্রকাশিত হলো)

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৫ম খণ্ড প্রকাশিত হলো)

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (৫ম খণ্ড প্রকাশিত হলো)

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২য় খণ্ড প্রকাশিত)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (১ম খণ্ড প্রকাশিত হলো)

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী ৫ম খণ্ড ও বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহের ৫ম খণ্ডের মূল্য ২৫৲। এই দুটি খণ্ড বাদে প্রতিটি রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের মূল্য ২০৲। মূল্যবান তথ্যপঞ্জী সমৃদ্ধ।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রবন্ধ সাহিত্যের সেকালে ও একালে

শ্রীশকুমার কুণ্ডু

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স দেড় শতের সামান্য কিছু বেশী। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে রাজা রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করার পর থেকেই বলা যেতে পারে দ্রুততালে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা শুরু হয় এবং এইসব প্রবন্ধ মুখ্যতঃ শিক্ষা সমাজ সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক নানা চিন্তাকে কেন্দ্র করে আলোচিত। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী, তথা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও এই আলোচনার স্রোত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন খাতে প্রবহমান ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই ধারা অব্যাহত নেই। যুদ্ধোত্তর বাংলায় সমস্যার অভাব নেই, কিন্তু সে-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যথার্থ চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। নইলে, অবশ্যই দেখা যেত দিক-দিশারী আলোচনা সমৃদ্ধ নিবন্ধমালা, দেখা যেত মৌলচিন্তার অমলিন প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার মূলে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। বর্তমান প্রবন্ধে এর গুটি কয়েক কারণ তুলে ধরছি।

১। মাতৃভাষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টির অভাব।

২। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রের বিচ্ছিন্নতা।

৩। শিক্ষাদীক্ষা; কাজকর্মে ইংরেজি চর্চার আধিক্য।

৪। রূপান্তরিত সামাজিক অবস্থা ও অনিশ্চিত জীবন।

১। মাতৃভাষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টির অভাব

বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা, মনের সূক্ষ্মভাবনিচয় মাতৃভাষায় যেমনভাবে প্রকাশিত হবে, তা অন্য কোন মাধ্যমেই সম্ভব নয়। অথচ আশ্চর্য এদিকটায় আমাদের অমনোযোগ সর্বাধিক এবং তা এসেছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, বস্তুত ইয়ংবেঙ্গল-এর আমল থেকেই। তখন ছিল একরকম আর এখন হয়েছে অন্যরকম, এইমাত্র প্রভেদ। রাজকীয় প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ ক্রিয়া করেছে, বিদেশী ভারত-বিদ্যা পণ্ডিতগণ এবং খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ দেশীয় ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এদেশ এবং তার অধিবাসিবৃন্দকে বিশেষভাবে জানবার এবং তাদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করবার জন্য, আর অন্যদিকে, বাংলাদি ভাল অনুশীলন করেছিলাম আমাদের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের কথা চিন্তা করে। এদিক থেকে আমরা বাঙালীরা অল্প কাল মধ্যেই বেশ কিছু সিদ্ধকামও হয়েছিলাম। রাজকীয় ভাষার অনুশীলনে বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে বিদেশীয় ভাবধারণার সমৃদ্ধ দেশাত্মবোধ দেখা দেয়। আমরা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকি এবং তার প্রকাশ বিশ্বের দরবারে পরিবেশন করতে স্বাভাবিকভাবেই রাজভাষার সাহায্যে আরম্ভ করি। এতে কোন দোষ নেই; তবে দেশের কথা, দশের কথা দেশের অগণিত সাধারণ মানুষই জানবার সুযোগ পেল না। বলাবাহুল্য দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষকে আমরা মানুষ বলে ভাবতে ভুলে গেলাম। উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি পাদে তবুও যা হক দেশের এই দুদিকের মানুষের সম্পর্কটা বিভিন্ন সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে এবং তদানীন্তন কালের লোকশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে কিছুটা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তারপর সেসবও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। দেশের মানবদরদী চিন্তানায়কগণের দৃষ্টিতে এই অসম অবস্থা ধরা পড়েছিল, তাঁরা এর গুরুত্ব যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্বদেশ ও স্বজাতিবোধ সম্পর্কে তাঁরা সকলকে সজাগ করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের নব্বই শতাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে যে-শিক্ষা একবার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ-দেহে অনুপ্রবেশ করেছে তা আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ত্রিশ বছর পরেও কোন প্রকারেই মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, গুরুদাস, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বোস আরও কতজন কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলেন,

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

[প্রায় সাড়ে-তিন হাজার জীবনী সম্বলিত আকরগ্রন্থ]

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু।

সেকালে কি একালে
বাংলায় কি বহির্বাংলায়
প্রবাসীই হোন
আর পরদেশী-ই হোন
বাংলার জনমানসে
যাঁরা স্বাক্ষর রেখে গেছেন
এমন প্রায় সাড়ে-তিন হাজার ব্যক্তির
জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'প্রকাশিত চরিতাভিধানের মত একখানি পুস্তকের অভাব বাঙালী পাঠকসমাজে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে।....এই চরিতাভিধানখানি 'সাহিত্য সংসদ'-এর মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে।'

ছাত্র শিক্ষক লেখক গবেষক
সাংবাদিক বা পাঠানুরাগী ব্যক্তি
সকলের কাছে রাখার মত বই।

। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

নতুন নাটকের তালিকা

স্বনির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ—
বাদল সরকার ১৪.০০
সারারাত্তির, যদি আর একবার, পাগলা ঘোড়া; শেষ নেই
৪টি মঞ্চসফল বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক একত্রে

বল্লভপুরের রূপকথা—
বাদল সরকার ৫.০০
হাসি-খুশির পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারীচরিত্র। একটি সেট

কবি কাহিনী—
বাদল সরকার ৫.০০
(পূর্ণাঙ্গ নাটক। হাসির। দুটি নারী চরিত্র। একটি সেট।)

রাম শ্যাম যদু—
বাদল সরকার ৫.০০
(সিরিও কমেডী পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী-চরিত্র। দুটি সেট।)

কৈলাশ বন্ধ উন্মাদ !! হয়তো নয়তো—
রাধারমণ ঘোষ ৫.০০
দুটি নারীবর্জিত জনপ্রিয় একাঙ্ক একত্রে

কেননা মানুষ ।। নচিকেতা ।।
বন্দীশালার ডাক
(অমল রায়ের তিনটি সিরিয়াস একাঙ্ক একত্রে। নারীবর্জিত।)

মৃত্যু নেই ।। গোবিন্দের পেরী ।।
যেখানেই অত্যাচার— ০০.৭
(অমল রায়ের তিনটি জনপ্রিয় একাঙ্ক একত্রে।)

বারান্বাস— অমল রায় ৫.০০
(জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ। তিনটি সেট। দুটি নারী।)

রাজকাহিনী— অমল রায় ৫.৫০
(পূর্ণাঙ্গ নাটক। সামাজিক। ২টি সেট। ১টি নারী।)

পদ্মপাতায় জল—
গৌতম রায় ৫.০০
(জমাট সাসপেন্স পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী চরিত্র। একটি সেট।)

চুপ— সমর মুখোপাধ্যায় ৫.০০
(একটি জমজমাট হাসির পূর্ণাঙ্গ নাটক। দুটি নারী)

প্রকাশ নন্দীর
নাটক পরিচালনা ১৫.০০
(নাট্য প্রয়োগের একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ)

নাটক অভিনয় ১৫.০০
(মঞ্চাভিনয়ের জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ)

পরিবেশক : **নব গ্রন্থ কুটির** ।।
৫৪।৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

কিন্তু কী হল ? সবই যেন বৃথা হল। আমরা বাংলাভাষায় কথা বলতে, বাংলাভাষায় যথার্থ চর্চা করতে আদৌ প্রস্তুত নই। এতে যেন আমাদের নিদারুণ অনীহাবোধ; সম্ভবত এই কারণেই সরকারী কাজকর্মে বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আমরা বাংলাভাষা চালু করতে পারলাম না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বরম্ভর মেজাজী স্বার্থের জন্য এই বিরাট জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ হল না।

স্থান কাল পাত্রানুযায়ী যদিও অনেক উন্নতমানের সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে, তবুও বলব সব মিলিয়ে তা খুব একটা গৌরবজনক নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যবিধ ধারায় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রকাশ এখন যেন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ভাষার সে লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা থাকছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন বিদেশী ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করবার কষ্ট-কল্পিত প্রয়াস আমরা অনুধাবন করে চলেছি। হৃদয়বোধের পরিবর্তে যন্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে আমাদের অবস্থার পরিমাপ করছি। এমনতর অবস্থায় তথ্যের পরিবেশনা যদি বা সম্ভব, হতে পারে না তত্ত্বের ব্যাখ্যা, তত্ত্বানুশীলন। যুগান্তরের ব্যবধানে ভাষার গঠন ও প্রকৃতি, শব্দ ও অর্থের কত না পরিবর্তন দেখা যায়। কত পুরাতন হারিয়ে যায়, আবার কত নতুন এগিয়ে আসে—এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দূরের কথা সাধারণ বিদ্যা-চর্চারও আমরা এখন বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে ফেলে রেখেছি। বলতে লজ্জা বোধ করিনে, — মাতৃভাষার আবার চর্চার প্রয়োজন কী ? এমন মানসিকতার মধ্যে মাতৃভাষার স্থায়ী চিন্তা প্রকাশ করবার অবসর কোথায় ?

২। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রের বিচ্ছিন্নতা

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মাতৃভাষা এবং রাজকীয় ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে জ্ঞানার্জন ও রসভোগের বিস্তৃত ক্ষেত্র সুপ্রাচীন ভাষা সমূহের অফুরন্ত সাহিত্য সম্ভারের সহিত নিবিড়তম পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁরা অনায়াসে তাই নবীন-প্রাচীনের মধ্যে তুলনা-মূলক আলোচনা করতে পারতেন। নিবিষ্ট-ভাবে তাঁদের পাঠ্য-বিষয়ের গভীরে ডুবে গিয়ে তা থেকে বিচিত্র রত্নসম্ভার আহরণ করে সর্বসাধারণেও তা আবার মাতৃভাষায় পরিবেশন করতেন। বিষয়গৌরবে এইসব আলোচনা যেমন বিচিত্র ছিল তেমনি নিপুণ ছিল সে সবের রূপান্তরিত প্রকাশ। কখনও পাঠকের মনে পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে কোন বিরূপতার লক্ষণ দেখা দিত না; পাঠক অনায়াসে সে ভাষান্তরিত আলোচনায় ডুবে যেতে পারতেন। রসিকজন রসের সন্ধানে অধ্যয়নযোগ করে নিজেও যেমন আনন্দ-সাগরে ডুবে যেতেন, তেমনি আবার সে আনন্দের স্বাদ পরিবেশন করতেও কোন প্রকার দ্বিধাসংকোচ বোধ করতেন না, এবং এটা সম্ভব হত তাঁদের অধীত বিষয়ের উপর পরিপাক-ক্রিয়ার সহজাত শক্তি থাকার জন্যই।

বিপুল ঐতিহ্যের আকর এই সমস্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যে যে জ্ঞান ও রসধারা বিকীর্ণ হয়ে আছে, তার স্বাদগ্রহণ করা আধুনিক কালের রসবেত্তাদের বড় একটা হয়ে উঠছে না। মূলের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় না থাকার জন্য পরের মুখে ঝাল খেয়ে অনেক সময়ই রসিকজনকে বড়ই আফশোস করতে হয়। দেশ-কালের অবস্থার চাপে যেখানে জ্ঞান রাখতে প্রাণ যায়, তখন এ-সাহিত্যসাধনা নিরর্থক, মনের বিলাসমাত্র। এইসব নানা কারণেই আধুনিক প্রকাশভঙ্গী অনেক সময়ই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। আবার অনুরূপ কারণেই তেমন রসিক পাঠকও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। গোটা বিষয় নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠবার লোকের অভাব দেখা দিয়েছে। কড়া, গণ্ডা, আধলা, পয়সা, আনি, দোয়ানী, সিকি, আধুলি, মণ, সের, ছটাক, কাঁচ্চা যেমন এ যুগে অপাঠ্য এবং অবোধ্য তেমনি সুপ্রাচীন জ্ঞান ও রস-ধারাও আধুনিককালে ক্রমশ অপাঠ্য বলে বর্জিত হতে চলেছে। মৃতভাষায় রস সন্ধানের অভ্যাস বর্জন করে, বিশেষ বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ হওয়া একালের হাওয়া। আধুনিক মানদণ্ডে প্রস্তাবিত বিষয়ের চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ ধারাটির বর্তমান বাজার দর [illegible], রুজি-রোজগারের প্রশ্নে বিশেষ আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। এতে সামাজিক সকল প্রকার দায় মিটিয়ে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার সকল প্রকার কৌলীন্য অর্জন করাও সম্ভব। এই অবস্থা কাঙ্ক্ষিত সন্দেহ নেই; তবে কতটা বাঞ্ছিত তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কোন বিষয়কে সকল দিক বিবেচনা করে সরল বুদ্ধিতে মেলান যত সহজ, সূক্ষ্ম-বুদ্ধির বেড়াজালে, আধুনিক বিচার বিশ্লেষণে তাকে ধরা বড়ই মুস্কিল। পরিপূর্ণ মানুষের পরিচয় ক্রমশ যেন হ্রাস পাচ্ছে। তার কারণ বোধহয় আধুনিক সূক্ষ্মবিচার বিশ্লেষণের মানদণ্ডে পরিশীলিত বিশেষজ্ঞ স্বাভাবিকভাবেই আংশিক) প্রস্তুতকারক কারখানায় গোটা বিষয়ের কোন কারবার নেই। অথচ সাহিত্যে গোটা বিষয়টিই প্রধান এবং তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনাই অন্যতম আকর্ষণ। হৃদয়হীন মনুষ্যত্বের কল্পনা যেমনি অবাস্তব তেমনি নিছক সূক্ষ্মবিচার-নিষ্ঠ পাণ্ডিত্যও। পরিপূর্ণ মানবতাবাদে বিকশিত মনুষ্যত্ববোধের ক্ষেত্র একান্তভাবে প্রয়োজন সুগঠিত হৃদয়বোধ এবং যথার্থ বিচারবোধও। একমাত্র এ দুটির সমন্বয়েই গোটা বিষয়ের যথার্থ প্রকাশ সম্ভব।

৩। শিক্ষাদীক্ষা কাজকর্মে ইংরেজী চর্চার আধিক্য

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে আমরা মধ্যস্বত্ব ভোগ করে আসছি দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দিরূপে। এ ব্যবস্থা আরও পাকা হয় কর্নওয়ালিশ সাহেবের অবদান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে। তারপর থেকে আবার সরকারী কাজকর্মে নিজেদের

উপযোগী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছি। এজন্য ইংরেজি ভাষা একান্ত অপরিহার্য। ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করি দীক্ষিত হই ইংরেজি ভাষার সুবিশাল সাহিত্য-সম্ভারের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য। অস্ত-বিহীন দিবালোকের মত দশদিক আলোকিত করে ইংরেজি ভাষা সকল দেশের বিদগ্ধ মহলে বিশেষ একটি স্থান করে বসে আছে। ভাষাশিক্ষা আদৌ অনাদরের নয়, বরং গৌরবেরই; কিন্তু আমি এখানে কথাটা সেদিক দেখে দেখছি নে, দেখছি জাতিগত-ভাবে;—যেখানে সম্পর্কটা নেহাৎই শোষক এবং শোষিতের জীবন মরণ প্রশ্নে বিশেষভাবে বিজড়িত। ইংরেজ তার জাতীয় আয়ের প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ আজ ঘরে ওঠাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে বিচিত্র প্রকাশনীর বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে। তার এই আয় দ্বিগুণ হউক তাতেও আমাদের নিরানন্দের কারণ নেই। সার্থক ইংরেজি ভাষা, সমসার্থক ইংরেজ জাতি। এদের সংস্পর্শে রাজাপ্রজা হিসেবে প্রায় দুশ বছর আমরা কাটিয়েছি। অনেক শিখেছি,—কতটা ভাল কতটা মন্দ সে কথাও নয়—শিখেছি অনেক। চলনে,-বলনে, অশনে-বসনে, আচারে-ব্যবহারে আজও আমরা ইংরেজকেই অনুকরণ করে চলেছি;—প্রায় ইংরেজ বনে গিয়েছি। ইংরেজি ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয় সত্য, কিন্তু আশ্চর্য, আমরা যেন এ ভাষাটাকে মাতৃভাষার চাইতেও অনেক বেশী ভালবাসি; ভালবাসি আমাদের অপর দেশীয় সরকারী ভাষা। ভারতীয় জনসংখ্যার সর্বাধিক ভাষাভাষীর প্রিয়ভাষা হিন্দীর চাইতেও। বহুভাষাভিত্তিক আমাদের সরকারী কাজকর্মে তাই আমরা ইংরেজিকেই আদর করি বেশী। শুধুমাত্র উত্তর দক্ষিণ দেশবাসীর ভাষাগত সমস্যার প্রশ্নে নয়, আমরা ইংরেজিকে আদর কি এর বিশ্বজনীন আবেদনের জন্যে। যাঁরা মুখে ইংরেজিকে হটিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরাও মনে-প্রাণে ইংরেজি ছাড়তে চাইছেন না। তাঁরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাতে কসুর করেন না—একমাত্র কারণ—তাঁরা মনে করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরাই ভবিষ্যতে দেশের শাসনভার পরিচালনা করবেন এবং দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার পারঙ্গম না হলে শেষ পর্যন্ত ঐসব ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না। দুনিয়া কতটা আজব তা বলা মুস্কিল। তবে আমরা যে আজব সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। আমরা মুখে যা বলি মনে তা ধরে রাখিনে। যা ভাবি, তা করিনে, যা করি তা ভাবিনে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের ও সমাজের হিতকারী কোন বিষয় আমাদের নিজেদের হিতকারী কাম্য বিষয় নয়। আমরা আমাদের সরকারী বিষয়-সম্পত্তি আমাদের নিজেদের বিষয় বলে মনে করিনে; সরকারকে ঠকিয়ে দু পয়সা রোজগার করতে বা সরকারী খরচ বাড়িয়ে ফেলতে আমরা কখনও দ্বিধা বোধ করিনে। এই অবস্থাটি আমাদের অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলেই প্রায় এক অবস্থায় একই রকমভাবে বিচার করে থাকি। এ অবস্থাটি আমাদের এসেছে দুশ বছরের দাস-সুলভ মনোবৃত্তি থেকে; আমাদের স্বভাবে এটি জমাট হয়ে গেঁথে গিয়েছে। তাই আজ ইংরেজ চলে গেলেও আমরা ইংরেজকে বর্জন করিনি। 'কুইট ইণ্ডিয়া' এদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পরপদলেহী মনোবৃত্তির কোন পরিবর্তন সহজসাধ্য বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের আপামর জনসংখ্যার সঙ্গে এই বিশিষ্ট ইংরেজি-নবীশ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোন নাড়ীর সম্পর্ক না স্থাপিত হয়। ইংরেজি ভাষার সম্মোহনী শক্তির যে বিজাতীয় কৌলীন্য আমাদের এনে দিয়েছে তার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে হলে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালীকে তার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। তাকে দেশের সমষ্টি চেতনার মধ্যে আত্মসচেতন হতে হবে। যত-দিন তা না হচ্ছে ততদিন কথা ও কাজে এক হবে না এবং তা না হলে চিত্তের সংকীর্ণতাও ঘুচবে না। সংকীর্ণচিত্ত যত বড়াই করুক সুস্থ চিন্তার অধিকারী হতে পারে না। তার সমস্ত ছলাকলা মিথ্যার বেসাতি সাজাতে তৎপর—সত্যের সন্ধান সেখানে দূর অস্ত। সত্য সুন্দরের ছোঁয়া ছাড়া মঙ্গলের কোন বলিষ্ঠ প্রকাশ আদৌ সম্ভব নয়।

৪। রূপান্তরিত সামাজিক অবস্থা ও অনিশ্চিত জীবন

ভারতে ইংরেজ শাসনে আর কিছু না হোক আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জাতীয়তা-বোধ জাগরিত হয়েছিল। এই বোধের সঙ্গে যদি দেশের চিন্তানায়কগণ চরিত্রমাধুর্যে

ভাল বই আজও হয়, ভবিষ্যতেও হবে!

বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার — মহাভারতের উপাখ্যান — ৫-০০
তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত

আশালতা সেন — বাল্মীকি রামায়ণ। — ৫-০০
মূল সংস্কৃত থেকে সার্থক পদ্যানুবাদ।

মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় — (পশ্চিমবঙ্গের) জমি ও ফসল — ৫-০০
বিশেষজ্ঞকৃত এই সচিত্র বইয়ের সাহায্যে যে-কোন জমি লাভজনক হ'তে পারবে।

অনীশ দেব — নরকে আমিই রাজা — ৬-০০
এই তরুণ অপরাধ-কাহিনীকারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। প্রথম বই, তবু পরিণত।

তরুণদেব ভট্টাচার্য — গীত গোবিন্দ (সচিত্র) — ৮-০০
নতুন ভূমিকা, নতুন অনুবাদ ও মূল।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) — রামাইপণ্ডিতের শূণ্যপুরাণ। শূণ্য-পুরাণ সংজাত-পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ — ২৫ ০০
এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্করণ।

মানসী দাশগুপ্তা — সমাজ মন (সামাজিক মনস্তত্ত্ব) — ১২-০০

নির্মলকুমার ঘোষ — যেশুইট পাদ্রীর আকবরনামা — ২০-০০
বিদগ্ধ সম্পাদক ভাষ্য যোগ করে এই ঐতিহাসিক দলিলের মূল্য বৃদ্ধি করেছেন।

ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সর্বজনহিতায় স্বদেশীয় স্বার্থবোধ সংযুক্ত করতে পারতেন. তাহলে আর বাঙালীর ভাববার কোন কারণ থাকত না। বাঙালী ইংরেজের মতই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবার যথেষ্ট উপকরণ সঞ্চ করতে পারত। ইংরেজ শাসকজাতি এবং বৈষয়িক দুনিয়ায় অনেক পোড়-খাওয়া জাতব্যবসায়ী। তারা আপন স্বার্থে যে ভেদাভেদ প্রবৃত্তি শোষিতের অস্থিমজ্জায় করে দিয়েছে তাতে নিশ্চয়তার যত মনোমোহন চিত্রাবলীই থাকুক স্বস্তি থাকতে পারে না। তথাকথিত স্বস্তির নামে নিদারুণ মানসিক অস্বস্তি। বাদশাহী নজরানা ও বনেদী বিলাসের পরিবর্তে নতুন ধরনের ভেট পূজা ও প্রভু-প্রশস্তি। এজন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রও কম দায়ী নয়। বহুকালের বহু মিশ্রণের অন্তরালে আমরা যে জাতীয় চরিত্রটি গড়ে তুলেছি তা যত হেমকান্তিযুক্ত হউক, যত জগৎ মিথ্যা বক্ষ সত্যের আবরণে তাকে আড়ং ধোলাই করে তার মালিন্য দূর করতে সচেষ্ট হই না কেন, সময় বিশেষে তা ফুটে বেরুবেই। মুনি ঋষি ব্রহ্মবিদের দোহাই দিয়ে গোটা সমাজকে সমুন্নত করা যাবে না, তা কখনও সম্ভব নয়। অতীতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে—ইহাই ইতিহাসসত্য। সমুন্নত সমাজ ও জাতীয় চরিত্রের যথার্থ উন্নতি বিধানে একান্তভাবে প্রয়োজন সমুচিত শিক্ষা ও সত্যের সাধনা। একমাত্র তেমন লোক-শিক্ষা বা লোক-নায়কের আশ্রয়েই এ শিক্ষা ও সাধনা সফল হতে পারে।

ইংরেজ আমাদের চরিত্রে যে অভাবটি অপরিস্ফুট আকারে বিদ্যমান ছিল তা তাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে আমাদের জাতীয় জীবনে পাকাপোক্তভাবে গেঁথে দিয়েছে। একদিকে ঐশ্বরিক বিধানপুষ্ট অধিকারে বলীয়ান শ্রেণীস্বার্থ, অপর দিকে বিশুদ্ধ বণিকসুলভ বিষয়বুদ্ধির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ আদর্শজীবন. আমাদের জাতীয় জীবনকে যেভাবে গঠিত করে দিয়েছে তাতে আমরা অনায়াসে খুশীমত ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল করতে কোন অসুবিধা বোধ করব না। জাতীয় আন্দোলনের সূচনা থেকে আজকের জনকল্যাণের চরমতম সর্বাধুনিক প্রস্তাব পর্যন্ত আমাদের জাতীয় চরিত্র একই-ভাবে কাজ করে চলেছে। বড় কথা, ভাল কথা—সব সময়েই গ্রাহ্য, তবে সেও কেবল কেতাবী জনজীবনে আচরণের জন্যে নয়। পরম চরমবাদীরা বরং একদিক থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট। তাদের সাধুবাদ জানাতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু দেখা গেছে তাঁরাও মসজিদ পর্যন্ত এগিয়েই ছত্রখান হয়ে পড়েন।

স্থান কাল ও পাত্রভেদে প্রস্তাবিত বিষয় প্রবক্তার গুণগত চরিত্র সুষমায় জন-মানসে যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করে দেয়, তাই হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এখানে নরম-চরমের কোন ভূমিকা নেই—একমাত্র প্রশ্ন মানবকল্যাণ এবং প্রতিটি জাতি তার আপন বিশিষ্ট ধারায় তা অর্জন করতে সচেষ্ট হয় মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনে জনজীবনে বিভ্রান্তি আসে কিন্তু তা সর্বত্র সমানতালে ক্রিয়া করে না। রাজনৈতিক পরি-বর্তনে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালী জীবন খুব একটা সুস্থ পরিবেশে অগ্রসর হয়নি। বাঁটোয়ারার দৌলতে সমাজজীবন তছনছ হয়ে পড়ে, জীবনযাত্রা সুরু হয় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে। ফলে দেখা দেয় সকল স্তরে বিপর্যয়। সকলেই শুধু হারালেন এমন নয়, কেউ কেউ সুবিধে মত বেশ গুটিয়েও নিতে পেরেছেন। এই পরিবর্তিত অবস্থায় যে নতুন জীবন গড়ে উঠতে লাগল তাতে বাঙালী মানসিকতায় বিরাট কোন পরিবর্তন এল না। এল শুধু অর্থনৈতিক নব সামাজিক বিন্যাস। এতে সামাজিক বাঁধন অনেক শিথিল হল সত্য কিন্তু ভাঙল না।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এবার একবার একটু নজর করে দেখা যাক বিগত দেড় শতাধিক বৎসরের আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের যাত্রাপথ। সামান্য কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করলেই আশা করি বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যের কুল-মর্যাদা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করা যেতে পারে।

১। প্রস্তুতিপর্ব : ১৮০০-১৮৩০, ত্রিশ বছর।
২। সংগঠনপর্ব : ১৮৩০-১৮৭০, চল্লিশ বছর।
৩। বিস্তারপর্ব : ১৮৭০-১৯২০, পঞ্চাশ বছর।
৪। পরীক্ষা-নিরীক্ষাপর্ব : ১৯২০-১৯৪৭, সাতাশ বছর।
৫। যুদ্ধোত্তরপর্ব : ১৯৪৭-১৯৭৮, একত্রিশ বছর।

প্রস্তুতি পর্ব : ১৮০০-১৮৩০

'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। তাকে আদর কর, ভালবাস, তার সুখে দুঃখে সম-ব্যথী হও।' মানবসেবার প্রশ্নে যীশু এই বাণীই রেখে গেছেন তাঁর ধর্মপথের পথিকদের জন্য। খ্রীষ্টীয় সেবাব্রতীগণ ভাষাবৈষম্যের জন্য বড়ই বিপদে পড়লেন জনসাধারণের মধ্যে যীশুর বাণী প্রচার করার পথে। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে এসে উঠে পড়ে লেগে গেলেন স্থানীয় ভাষায়

বিনয় ঘোষের

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

প্রথম খণ্ড ৪০-০০

দ্বিতীয় খণ্ড মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলীর বিবরণসহ আগামী এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হবে। পাঠকদের অনুরোধে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ঠিক হয়েছে। ১৫ টাকা জমা দিয়ে ২৫% কমিশনে গ্রাহকরা বই পাবেন। জমা টাকা তৃতীয় খণ্ডে শোধ হবে। তৃতীয় খণ্ডের মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ টাকা হতে পারে।

বাংলার বিশ্বৎ সমাজ

অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চেই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য ১৫ টাকা। ৩০শে জুনের মধ্যে কিনলে ক্রেতারা ২০% কমিশন পাবেন।

অবনীন্দ্র রচনাবলী

১ম ২০-০০, ২য় ২২-৫০, ৩য় ২৮-০০ ৪র্থ যন্ত্রস্থ

চাণক্য সেনের এপিক উপন্যাস — বনফুলের

পুত্র, পিতাকে ১৮-০০ — **বহুবর্ণ** ৯-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কাশীনাথ ৭-৫০ — **শরৎ-বিচিত্রা** ১৫-০০ — **পণ্ডিত মশাই** ৪-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

পুতুল নাচের ইতিকথা ১২-০০ — **বলাকার মন** ১০-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের — জরাসন্ধ — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠগল্প ১২-০০ — **উত্তরাধিকার** ১২-০০ — **বরযাত্রী ও বাসর** ১২-৫০

প্রকাশ ভবন : ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা-৭৩ ফোন : ৩২-৩৩২১

গ্রন্থাদি প্রকাশ করতে। শিক্ষার বিকীরণ করতে পারলেই যীশুর বাণী প্রচার করা সম্ভব হবে, আর তাছাড়া রয়েছে মনের তাগিদ,—এদেশের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানচর্চা। দুই-ই তাঁদের একান্ত মানবিক প্রশ্ন। প্রায় সব দিক থেকেই বাংলার আকাশ তখন ঘন-কুয়াশাবৃত, সূর্যালোক ক্ষণে দেখা যায়, আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। এমন সময় জ্যোতির্ময় আলোর বর্তিকা হাতে নিয়ে রামমোহন কলকাতায় এলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য। কলকাতা এসেই তিনি শুরু করলেন তাঁর আরব্ধ কর্ম—শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর মতবাদ প্রচার করা। স্ব-পক্ষ বিপক্ষ জোড় কদমে এগিয়ে এলেন, রীতিমত অসি-মসির যুদ্ধ লেগে গেল। এক-দিকে যুক্তি-জাল বিস্তার, আর একদিকে তা খণ্ডন করবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা,— খিস্তি খেউরও কম চলল না। কিন্তু তা হলে কি হবে, কালের বাখাল তখন 'ইয়ং বেঙ্গল'; এদের নেতা হলেন ডিরোজিও। আধুনিক বাংলার গোড়াপত্তন এখানেই. ন্যায় নীতি, সমাজ ও শিক্ষা বিষয় মৌল চিন্তায় সুস্পষ্ট পথরেখা অবলম্বন করে।

এ-সময়কালের মধ্যেই সমাচার দর্পণ (১৮১৮), সুবদা কৌমদী (১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন খ্রীস্টান মিশনারীগণ. রাজা রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালংকার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ দিক-পালগণ।

সংগঠন পর্ব ঃ ১৮৩০-১৮৭০

দিবালোকের প্রথম প্রহরে রাজার আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে জ্ঞানান্বেষী 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন বুদ্ধির দীপ্তিতে বাংলার দিক-দিগন্ত আলোকিত করে তুলেছেন। রক্ষণ-শীলদের মহাবিপদ, চারদিকে কেবল গেল গেল রব। আপন ঘর রক্ষা করবার জন্য তাঁরাও তৎপর হয়ে উঠেছেন—শিক্ষাসমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই। এই সংঘর্ষে একটি তৃতীয় ধারা বাঙালী জনমানসকে সুস্থভাবে গড়ে তুলবার জন্য তাঁদেরও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন.—সাহিত্য গড়ে আসছে, আসছে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ থেকে সারগর্ভ সমস্ত রচনা বিচিত্র টীকা-টিপ্পনী সহ, সে-সবের মূল্য অতুলনীয়। পুরাতন ও নবীনের যুক্ত প্রচেষ্টায় পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ ধরেই এ-সব করছেন তাঁরা।

এ-সময়ে প্রকাশিত হয়েছে,—সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), জ্ঞানান্বেষন (১৮৩১), সংবাদ ভাস্কর (১৮৩১), তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), তত্ত্বকৌমুদী (১৮৪৩), বিদ্যার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), পূর্ণিমা (১৮৫৯), অবোধবন্ধু (১৮৬৩), ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা।

শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম ও স্বদেশ চিন্তায় সমুজ্জ্বল প্রতিভাধর লেখক-সম্প্রদায় এসেছেন এ-সময়। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

'জিজ্ঞাসা'-র নূতন **প্রয়াস ঃ স্বল্পমূল্যের নিবন্ধ সাহিত্য**

'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য, মানবিকী বিদ্যামূলক যাবতীয় বিষয়ের উপর বিশিষ্ট লেখকদের রচনা পাঠকসমাজের কাছে সুলভে পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে 'জিজ্ঞাসা' **বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা** প্রকাশে ব্রতী হয়েছে। গ্রাহক-সদস্য ভিত্তিতেও এই গ্রন্থমালা বিপণনের ব্যবস্থা আছে।

গ্রাহক-সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

* যে কোন ব্যক্তি 'বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা' সংগ্রহের জন্য এককালীন দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক-সদস্য হতে পারেন, উক্ত অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য নয়।
* গ্রাহক-সদস্যগণ 'গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত যে কোন বই কিনতে পারেন, সব বই কেনা আবশ্যিক নয়।
* সদস্যগণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বাংলা এবং অনুরূপ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহের উপর ২৫ শতাংশ কমিশন পাবেন।
* একমাত্র এই গ্রন্থমালার সদস্যগণ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের উপর ১৫ শতাংশ কমিশন পাবেন।
* গ্রন্থমালার সদস্যগণকে বই কেনার সময় সদস্যপত্র দেখিয়ে বই কিনতে হবে।
* **বিশেষ উপহার** ঃ কোন গ্রাহক-সদস্য বছরে একশো টাকার বেশী বই কিনলে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত এক বা একাধিক বই উপহারস্বরূপ পাবেন।
* ডাকযোগে বই পেতে হলে ডাকমাশুল গ্রাহক-সদস্যগণকে বহন করতে হবে।
* সদস্যপত্র পুনঃসংগ্রহের কালে এক টাকা দিয়ে নূতন পত্র নিতে হবে।
* **যোগাযোগ কেন্দ্র** ঃ ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৪-৫৬৭৪

১. **সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস** ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪·০০
২. **ঈশ্বর-সন্ধানে** ঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী ৩·৫০
৩. **বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়** ঃ অতুল সুর ৩·৫০
৪. **রামকথার প্রাক্ ইতিহাস** ঃ সুকুমার সেন ৪·০০
৫. **অর্থনীতির পথে** ঃ ভবতোষ দত্ত ৫·০০
৬. **বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন** ঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় .....
৭. **কলিকাতায় বিদ্যাসাগর** ঃ রাধারমণ মিত্র ৪·০০
৮. **উপসর্গের অর্থবিচার** ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর .....
৯. **ভারতে মূলধনের বাজার** ঃ অতুল সুর ৪·৫০
১০. **ব্যাকরণের ইতিহাস** ঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য .....
১১. **স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা** ঃ রাজেশ্বর মিত্র ৫·০০
১২. **ভারতীয় দর্শন** ঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় .....

জিজ্ঞাসা

প্রকাশন বিভাগ ঃ ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
" ঃ ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

দীর্ঘকাল পরে আবার একটি বাংলা বই বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায়

চিত্ত সিংহের **ঈশ্বর পাটনী** প্রসঙ্গে

বিশ্ববিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক

আরস্কিন কল্ডওয়েল

Dear Sirs.

I have read the novel Iswar Patni by Chitta Sinha and found it to be an unusually interesting work of fiction. I find that I have been impressed so much that the story leaves me with the implication that it itself is a legend of long ago. And I, for one, consider the story to be universal in its meaning and could have happened anywhere in the world other than in India.

Sincerely,

11 January 1978 Erskine Caldwell

Erskine Caldwell

TRANSLATED FROM BENGALI ORIGINAL BY ANADI

COVER : RAGHUNATH GOSWAMI **Rs. 15.00**

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক

নারায়ণ চৌধুরী

....'ঈশ্বর পাটনী' চমৎকার বই হয়েছে। অসাধারণ বই হয়েছে। অনেককাল বাংলা ভাষায় এত ভাল বই পড়ার সুযোগ ঘটেনি। যতক্ষণ বইখানা পড়ছিলুম, বইয়ের ভাবজগতে তন্ময় হয়ে ছিলুম। ... অনির্বচনীয় কাব্যগুণে বইখানা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-শীলতার রূপ পেয়েছে। ...

... 'ঈশ্বর পাটনী' গ্রন্থরচনার জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমার লেখনীর বাড়বাড়ন্ত হোক।....

একটি চিঠি / ২৯-১২-৭৬

একটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস : ঈশ্বর পাটনী ৯·০০

চিত্ত সিংহ প্রণীত আরো কয়েকটি বহু আলোচিত উপন্যাস

মতুগৃহ ১০-০০ বেহুলা ৬-০০ নিষাদ ৭-৫০ জলবিম্ব ১০-০০

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ : ইংরাজী অনুবাদ : মতুগৃহ/বেহুলা

হিন্দী অনুবাদ : মতুগৃহ / ঈশ্বর পাটনী / বেহুলা

আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরবর্তী উপন্যাস : নতজানু

কাব্যগ্রন্থ : বেলা যায় পুনর্মুদ্রণ : সুধন্য ও সেবারের বর্ষা

বাংলা সাহিত্যের ঋতু বদল **আসন্ন**

সৃজনী ৪, ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০০৪
ফোন : ৫৫-৪৬১৬

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বিহারীলাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিস্তার পর্ব : ১৮৭০- ১৯২০

বাংলা সাহিত্যের মধ্যগগন, পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বাংলা সাহিত্যের ধুরন্ধর শিল্পীসমাজ, এগিয়ে চলেছেন দিকে দিকে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত ধারায়, ব্যবহারিক জীবনের কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বাঙ্গনে অবারিত তার গতি। সত্য-মিথ্যা, নিন্দা-স্তুতি, আঘাত-প্রতিঘাতের স্তর পেরিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সমষ্টির চিন্তাভাবনা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতিবোধের আন্তরিক আবেদন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান ব্রতী-সন্তানগণ তখন বাংলার আকাশে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন—সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের গৈরিক পতাকা। সাদামাটা সরল কথা, সুচি-সূক্ষ্ম বিচার-নিষ্ঠা কোন কিছুরই অভাব নেই। তবুও তাঁদের চিত্তের ক্ষুধা মেটেনি,—আরও চাই, আরও কিছু—বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক—এই প্রার্থনা। প্রার্থনা বিফল হয়নি সত্য কিন্তু পরিপূর্ণও হয়নি। চাওয়া আর পাওয়ার মাঝখানে নিশ্চয়ই কোথাও কোন ফাঁক রয়েছে এবং তা ধরি-ছুঁই করেও ধরতে পারা যায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন (১৮৭২), যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের আর্যদর্শন (১৮৭৪) ঠাকুরবাড়ীর ভারতী (১৮৭৭) বালক (১৮৫৫) সাধনা বঙ্গবাসী (১৮৮১) সঞ্জীবনী (১৮৮৪) প্রচার (১৮৮৪) নবজীবন (১৮৮৪) সাহিত্য (১৮৯০) জন্মভূমি (১৮৯০) হিতবাদী (১৮৯১) দাসী (১৮৯২) প্রবাসী (১৯০১) সন্ধ্যা (১৯০৪) যুগান্তর (১৯০৬) যমুনা (১৯১২) ভারতবর্ষ (১৯১৩) নারায়ণ (১৯১৪) সবুজপত্র (১৯১৪) মানসী, মর্মবাণী ১৯১৪, ১৯১৫) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার আসর জমিয়ে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের আশা করি আমরা চিনি।

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব : ১৯২০-১৯৪৭

প্রথম মহাযুদ্ধের হিমেল স্পর্শ আর নেই। সেখানে দেখা দিয়েছে বসন্তের মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়ায় অসহযোগের তরঙ্গায়িত দোলা; এর মধ্যেই কালবৈশাখীর আগমনসূচক সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সত্যি একদিন ধারা নেমে এল। বাঁধনহারা পাগলপারা বঞ্চিত পীড়িতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভূর্যনিনাদে বাংলা সাহিত্যের মসনদ কেঁপে উঠল। জোরাল আক্রমণ—তবু একদিক থেকে নয়—ফলে

ফুলে পত্রে পুষ্পে, শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত কুঞ্জকানন জুড়ে দাপাদাপি চলেছে—নিত্য নূতন প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে ফুল্ল কুসুমিত কাননঘেরা প্রশান্ত চারদেয়ালী আত্মকুঞ্জ থেকে অতি আধুনিক রণাত্মক সাহিত্যের কল্লোল বান বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে-গঞ্জে মাঠে-ময়দানে। এ তরঙ্গ রোধিবে কে? অন্যদিকে বাংলার বাউল একতারাতে সুর বাঁধলেন, 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর'। সবই সত্য সবই মিথ্যা, তবে কি এই সুধামাখা ধরণীর ধূলিকনার কোন মূল্য নেই?—না তাও আছে, তাকে সুন্দর করে দেখা।

বাঙালী সবে সেদিন আত্মসমীক্ষা সুরু করেছে। এমনি সময়েই সব যেন তলিয়ে গেল। সাইরেন বেজে উঠলো। বাংলার আকাশে বাতাসে বিষের বাঁশীর ডাক। কেবলই ধ্বংস আর নিধন। বুদ্ধির মুক্তি হল না, হল না জীবনের যাত্রাপথের আন্তরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অন্ধ আবেগে এরই মধ্যে আবার শুরু হল পথচলা—প্রধূমিত বহ্নির ব্যবধান দিয়ে — কখনও দুর্বার গতিতে, কখনও ধীর পদক্ষেপে, কদম কদম পা বাড়িয়ে। কানে ভেসে আসে ক্ষুধার্তের কাতর কান্না। অন্ন চাই হা অন্ন, মা গো এরই মধ্যে সব কিছু চলেছে, মানুষ মুনাফার শিকার হচ্ছে। কাল ঘোড়সওয়ার আরও অন্ধকারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তার চলার পথ করে নিচ্ছে। উদ্ভ্রান্ত মানুষ এরই মধ্যে দুর্ভাগ্যের ভাগি ভাগ করবার জন্য ব্যস্ত—কে কতটা পাবে তাই নিয়ে রক্তারক্তি। অবশেষে দেশও ভাগ হল, স্বাধীনতাও এল—খাঁটি না ঝুটা তা খতিয়ে দেখল না। সাহিত্যের আসন স্বভাবতই হোল মালিন্যে আবৃত।

এ সময়কালের মাত্র কয়েকটি পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখ করছি। কল্লোল (১৯২৩) শনিবারের চিঠি (১৯২৪) রূপ ও রঙ্গ (১৯২৪) উত্তরা (১৯২৫) কালিকলম (১৯২৬) পরিচয় প্রগতি (১৯২৭) চতুরঙ্গ পূর্বাশা প্রভৃতি।

প্রতিটি পত্র-পত্রিকার গোষ্ঠীতেই কিছু প্রবীণ ও নবীনের সমাবেশ হয়েছিল। এদের নামোল্লেখ আশা করি নিষ্প্রয়োজন এই পর্বের সাহিত্যকগণ তাঁদের নানা স্খলন ও পতনের মধ্যেও অপরিসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন—যার অনুরণন আজও চলছে হয়ত আগামীতেও কিছু চলবে। কিন্তু যা একান্ত বেদনার তা হল সংগ্রামে যেন তাঁরা প্রায় সকলেই পিছু হটে এলেন—এগিয়ে চলার পথে ক্ষয়িত শক্তি, তাঁদের মধ্যে দেখা দিল ক্লান্তি ও অবসাদ। দুর্ভাগা বাংলার এবং বাঙালীর।

যুদ্ধোত্তর পর্ব : ১৯৪৭-১৯৭৮

দীর্ঘ একত্রিশ বছরেও অবসাদ কাটেনি—এরই মধ্যে চলেছে নিত্য নূতন ভাঙ্গাগড়া। স্বাধীনতা পেলেও মানুষের মোহমুক্তি আসেনি। জাগতিক ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে সকল দেশের মানুষই কম বেশী ছিটেছাড়া হয়েছেন—আজও সে ধারা অব্যাহত। সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে রয়েছে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন এসেছে। এসেছে সমস্যা মোকাবিলা করবার সমাধানের প্রস্তাবও; কিন্তু প্রস্তাবই কোন সমস্যার সমাধান এনে দেয়নি—দিতেও পারে না। ভোগের রাজ্যে চরিত্র সৃষ্টি হয় না। সত্য সর্বকালে, সর্বদেশে একইভাবে চলে—সেখানে কোন বাছবিচার নেই। যুদ্ধোত্তর-কালে এই সত্য ভাবটিই অপরিজ্ঞাত রয়েছে। ভোগের জন্যে চাই অর্থ, সাহিত্যক্ষেত্রেও এসে জুটেছে সেই এক ভাবনা। আধুনিক-কালের পত্র-পত্রিকায় তাই সমস্যা এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে কাহিনীর চাইতে, সমস্যার মুখো-মুখি হওয়ার চাইতে নানা কসরতী রচনা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কল্যাণের চাইতে কড়ির আদর বেড়েছে। এ অবস্থাকে স্বীকার করে নিলেও আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে তাঁরা কম কিছু শক্তিধর নন তাঁদের শক্তি ও সাহস দিন কতক আগেই অনেকটা যাচাই হয়ে গিয়েছে—এটাই আশার কথা। সোনারকাঠির রূপ পরকাঠির ছোঁয়ার প্রবৃত্তি একটু কমালে তাঁরা যে দেশের হাল অনেকটা সুস্থভাবে গড়ে তুলতে পারেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে। মনন-শীল সৃষ্টির অভাব নেই—তাহলে সৃষ্টির আসর জমবে না কেন? থা সঙ্গে কিছুটা তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে আসুন আধুনিক বাংলার সাহিত্য পথিক।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বের লেখক সম্প্রদায়ের লেখার মধ্যেই তাঁদের মানদণ্ড উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রবন্ধ নিবন্ধে ভাষার কথাও বড় মনে হয় না—এদিক থেকে দুটো ধারাই দেখা গেছে—গুরুগম্ভীর ভাষা বা চলতি ভাষা সবই প্রবন্ধ সাহিত্যে এসেছে—ভাষা সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু চিন্তা-প্রসঙ্গ বড় কথা। চিন্তার ক্ষেত্রে লঘু-গুরু সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন সর্বকালে সর্ববিষয়ে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। একমাত্র প্রত্যয়শীল চিন্তাপ্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যাশ্রয়ী হলেই প্রবন্ধ-সাহিত্য গ্রাহ্য।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের পূর্বসূরিগণ একটি বিষয়েই তাঁদের কৌলিন্য দাবী করতে পারেন। সেটা হল তাঁদের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। যুদ্ধোত্তর সমাজ জীবনে আদর্শ নিষ্ঠার খুব একটা মূল্য দেওয়া হয়না, এতে গৌরব করবার কিছু নেই, তেমনি নেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামিল হবে নব মূল্যায়নের গতিপথ নির্দিষ্ট না করেও বিচক্ষণ সাহিত্যপ্রাণ এই পরিবর্তনের মধ্যেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলার পথ না করলে অবশ্যই খুব ভুল করবেন।

বস্তুতপক্ষে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীই হল সংগঠনের কাল এবং স্বাভাবিকভাবেই এ কালটি বিষয় সমূহের তত্ত্বাশ্রিত বিস্তারকে কেন্দ্র করে রচিত এবং সেই সৌভাগ্যের কথা এদের প্রায় সকলই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সমাক পরিচিত ছিলেন। তারপর বিংশ শতাব্দীর যাঁরা এই ধারার অনুসরণী হয়ে এলেন তাঁরাও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ-সূত্রহীন ছিলেন না। তাঁদের রচনার ধারা

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলাদেশের ইতিহাস (৪ খণ্ডে) ১১৫.০০
রাজা রামমোহন ৬.০০
ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১২.০০
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস ৩৫.০০
ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি ৬.০০
ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ডে) ৪০.০০
হালের গাথা-সপ্তশতী ১০.০০
শ্রীদিলীপকুমার রায়
যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ ১০.০০
তীর্থংকর ১৮.০০
বীরেশ মজুমদার
শ্যামাপ্রসাদ ৫.০০
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যাত্রী ১৮.০০
মোহিতলাল মজুমদার
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ১০.০০
বিস্মরণী ৬.০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ১০.০০
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
বাংলা নাটকের ইতিহাস ২২.০০
ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য
এক দিগন্ত দিনান্তের ৬.০০
[ফরাসী কাব্য পরিক্রমা]
সুখময় মুখোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর ৫.০০
হিমাংশু চৌধুরী
বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা ৬.০০
ডঃ অমলেন্দু বসু
সাহিত্যলোক ১০.০০
অমলেন্দু দাশগুপ্ত
ঋষি রবীন্দ্রনাথ ৩.০০
আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ৫.০০
ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী
রবীন্দ্রসংগীত ১২.০০
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-চর্যা ১০.০০
রেঃ লালবিহারী দে
চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ৬.০০
মীর মশাররফ হোসেন
আমার জীবনী ২০.০০

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স]
জেনারেল বুকস
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

অনেকটা পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেই প্রবাহিত হল এবং অনেকক্ষেত্রে এই ধারাটি আরও সম্প্রসারিত প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করবার সুযোগ পেলেন। যুদ্ধোত্তর বাংলা বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার দেখা দিল নিদারুণ সমস্যা সম্বলিত অস্থির অবস্থা। একদিকে সাহিত্যের মান মূল্যায়ন-ক্ষেত্রে বিদেশীয় প্রভাবযুক্ত বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি অপরদিকে সাহিত্যের প্রাণ-বিষয়ক আমাদের ঐতিহ্যধর্মী বিশুদ্ধ ভাব-সঞ্চারী রক্ষণশীল মনের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ। দুদিকের টানা-পোড়েনে নিত্য নূতন সমস্যা জর্জরিত সাহিত্যপ্রাণ অস্থির হৃদয় তাই যেন বেড়াজালের শুষ্ক কঠিন তার ছিঁড়তে উঠে পড়ে তথ্যনির্ভর আশ্রয় খুঁজতে, শুধু করল, শিক্ষা সমাজ ধর্ম—সকল দিক থেকেই যেন ভাঙার গান সরবে গীত হতে থাকল চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে অতীতের অনেক দৃঢ় ভিত্তির টনক নড়ল। সাহিত্যের মূল্যায়নের বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক কিছুকেই অবহেলায় কবরখানায় পাঠাতে লাগল। এ অবস্থা নিশ্চই প্রীতিপদ নয়, তাহলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই, পায়ের নীচে দৃঢ় ভূমি না আবিষ্কার করা পর্যন্ত, এই অস্থিরচিত্ত মুকুর রণাঙ্গনে সুসংহত চিন্তা বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সাহিত্যে আজ লঘুচাল পরিদৃষ্ট হচ্ছে; সৃষ্টিতে চমক থাকলেও চিরায়ত নিত্য সত্য-বস্তুর অভাব দেখা দিয়েছে।

এই বাহ্য; এত শুধু সমাজের অতি সামান্য অংশের কথা। বৃহৎ যে অংশ জন-সংখ্যার প্রায় বরাই শতাংশ তার বিষয়ে বর্তমান সাহিত্যের অবদান কি?

এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা নেই। কালাতীত কাল থেকেই আমরা সাহিত্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সংস্কৃতিবান মানুষের জন্যেই ভেবে এসেছি। সাহিত্য যে সর্বমানব মনের বহিঃপ্রকাশ তা কথায় বললেও আমরা মনে কোন দিনই বড় একটা স্থান দিইনি। এ অপরাধের কোন মার্জনা নেই। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন অনেক অশিক্ষকের অন্তর্গত প্রশ্নের মীমাংসা করে যাচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের দরবারে শুধুমাত্র কতকগুলি সংখ্যাতত্ত্বের অবতারণাসূচক গবেষণার কারবার দিনকে দিন আসর সাজিয়ে চারদিক থেকে বাহবা নিচ্ছে। নিষ্প্রাণ এ গবেষণা কার্য্য পথের ইঙ্গিত দেওয়া দূরে থাক সমস্যা আরও জটিল করে তুলবে। সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই মুকুর চিত্ত, চাই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা উদার হৃদয়—যার আশ্রয়ে গড়ে উঠবে নির্মল আকাশের নীচে সদানন্দ-ময় মানব সন্তান।

প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশনা ক্ষেত্রে যে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই অভিব্যক্তি এই নিবন্ধে আলোচনা করলাম। জানি আমি আমার সীমাকে অতিক্রম করে ফেলেছি, কিন্তু তা করেছি নিরুপায়ে।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরকাল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ডালি সাজিয়ে যে বেদনার ভারী বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছি, তার ইতিকথা আমার জবানীতে না বলে কোন একজন কবি-শিল্পী বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পূজারী যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছরকাল এক নাগাড়ে একটি নিছক প্রবন্ধের মাসিক সম্পাদনা ও পরিচালনা করে আসছেন তাঁরই জবানীতে বলা ভাল। তিনি কথা ছলে দিন-কয়েক আগেই আমাকে বললেন—আমার পত্রিকাটির মৃত্যু আসন্ন, অতঃপর এটি আর আমার পক্ষে মাসিক পত্রিকারূপে রাখা সম্ভবপর হবে না। এখন থেকে দেখব এটিকে একটি ত্রৈমাসিক করে চালাতে পারি কিনা?

অনুজকল্প বন্ধুর যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না—মন সায় দিল না।

সমকালের দরবারে প্রতিষ্ঠা হল শুধুমাত্র ভোগের—জীবনভর ভোগ থাকবে তার ভোগান্তি থাকবে না?

এ প্রশ্নে সদাহাস্যময় বন্ধুর মুখটি যেন বড় করুণ দেখাল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যে কয়েকদিন আর মাত্র বাকী তাকে নির্মম অত্যাচারের ফাঁদে ফেলবার তার কী অধিকার আছে?

অধিকার কারও নেই সত্য, তবে কালের একটা দাবী রয়েছে। মহাকালের দরবারে চিরকাল যে দাবী অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে, তা হল মানবের আত্মজিজ্ঞাসার অধিকার। এই অধিকারই একদিন বাঙালী সাহিত্য-সেবীর পথ ধরবার সুযোগ করে দেবে।

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষালের

অপরাধ তত্ত্ব ১ম খণ্ড ২৫-০০

বিনয় ঘোষের

কলকাতা শহরের ইতিকথা দাম : ৪৫-০০

শংকর-এর

এক যে ছিল দাম : ৮-০০

চৌরঙ্গী দাম : ২৫-০০

সার্থক জনম দাম : ৮-৫০

এপার বাংলা ওপার বাংলা দাম : ১৫-০০

মানচিত্র দাম : ১০-০০

বিমল মিত্রের

গল্প সম্ভার ২২-০০

এর নাম সংসার ১০-০০

জয়াসন্ধ-র

পাড়ি ৬-০০

আশ্রম ৩-৫০

নামের আড়ালে ৫-০০

স্বীকৃতি ৫-০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

তাঞ্জাম ৪-৫০

বিশেষজ্ঞ ৬-৫০

নিমাই ভট্টাচার্যের

উইং কমান্ডার ৮-০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর

জলভ্রমি ৩-৫০

বনফুলের

প্রথম গরল ৮-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

উপনিবেশ ৮-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিশিপদ্ম ৪-৫০

ব্যর্থ নায়িকা ৪-০০

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের

হরিলক্ষ্মী ২-৭৫

ধীরেন্দ্রমোহন আচার্য

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি দাম : ১৬.০০

মাতৃভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি ১০-০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড: ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯

বই বাজার

সুমথনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায় এখন রবরবা! স্কুলপাঠ্য বইয়ের 'সিজিন' লেগেছে। ডিসেম্বরের শেষ থেকে শুরু হয়েছে, মার্চ মাস পর্যন্ত গড়াবে—দোকানে দোকানে ভিড়, প্রকাশকের ঘরে স্থানাভাব। ও অঞ্চলে পথেঘাটে হাঁটা দায়।

এই বইপাড়া এখন আর কলেজ স্ট্রীটের ওই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। ওর কাছাকাছি যেখানে যত ছোট বড় গলিঘুঁজি আছে তার অন্ধিসন্ধিতে, অন্ধকার খুপরীর মধ্যে, সিঁড়ির নীচে, দরজার পাশে, গৃহস্থের বৈঠকখানায়, এমন কি কল-তলা পেরিয়ে অন্দরমহলে পর্যন্ত হয়েছে বিস্তৃত। অসংখ্য ছোট-বড় প্রকাশক, কত বিচিত্র তাদের নাম। এদের এত বাড়বাড়ন্তর মূল কারণ 'কুইক রিটার্ন'। লগ্নীকৃত টাকা দ্রুত ঘরে ফিরে আসে, ছ' মাসের মধ্যে। তাই স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় নামা যায়; ঋণ করলেও বেশিদিন সুদ গুনতে হয় না। কারণ পাঠ্য-পুস্তকের বিক্রীর সিংহভাগ ওই তিন-চার মাসের মধ্যেই প্রকাশকের ঘরে ফিরে আসে।

ইদানীং স্কুলবোর্ড থেকে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী স্কুলের বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ভার গ্রহণ করার ফলে এইসব প্রকাশকদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন ওইসব বইয়ের অর্থপুস্তক, 'কোশ্চেন আনসার' 'মেড ইজি' ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সাহায্যকারী বই প্রকাশ করে কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখলেও নিজেদের মধ্যে এমনি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যে দু টাকার পাঠ্যপুস্তকের রোয়িনী ষোল, আঠারো এমনকি কুড়ি টাকায় গিয়ে পৌঁচেছে আর খুচরা ব্যবসায়ীদের কমিশনের হার বাড়তে বাড়তে তিরিশ, চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ পার্সেন্টে পৌঁচেছে। এতে পুস্তক বিক্রেতাদের সুবিধা একখানা বই বিক্রী করলেই মোটা টাকা হাতে আসে। অথচ প্রকাশকদেরও খুব অসুবিধা হয় না। কারণ এই শ্রেণীর পুস্তক হাজারে হাজারে বিক্রী হয়।

এইসব প্রকাশকরা আবার অনেকেই গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছেন। যদিও তাঁরা ভাল করেই জানেন, পাঠ্যপুস্তকের মত হাজারে হাজারে এসব উপন্যাস গল্পের বই বিক্রী হয় না, তবু সারা বছর ধরে যা বিক্রী, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কারণ এটা তাঁদের কাছে উপরি পাওনা। পাঠ্যপুস্তকের সিজিন শেষ হয়ে গেলে, বসে না থেকে অতিরিক্ত যা ঘরে আসে। এর জন্যে হয়ত তাঁদের গুদামে অবিক্রীত বই অনেক জমে থাকে, কিন্তু সেটা তাঁরা সামলে নেন পাঠ্যবইয়ের রসদ থেকে।

কিন্তু অসুবিধা ভোগ করেন সবচেয়ে বেশি সেইসব প্রকাশকরা যাঁরা কেবলমাত্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসা করেন। তাঁদের তো নির্দিষ্ট কোন সিজিন নেই। বারো মাস ধরে চলে বেচা-কেনা, মন্দ মন্থর গতিতে। আগে পুজোর সময় কিছু বই বিক্রী হতো, নতুন কাপড় জামার সঙ্গে কিছু নতুন বই কিনতেন শিক্ষিত লোকেরা, ছুটির অবসর বিনোদনের জন্যে। কিন্তু সে স্থান এখন কেড়ে নিয়েছে পুজোসংখ্যা-গুলো। দৈনিক পত্রিকা থেকে সাপ্তাহিক মাসিক বার্ষিক হরেক রকমের পত্রিকা। এতে একসঙ্গে পাঠকদের কাছে নানা রসের খোরাক দেওয়া হয়। সিনেমার চিত্রতারকাদের নানা কাহিনী, তারসঙ্গে খেলাধুলার খবর, বহু বিচিত্র ছোটগল্প, বড়গল্প, তার সঙ্গে অতি-রিক্ত তিন-চারখানি সুবিরাট উপন্যাস।

বিবাহ, জন্মদিন, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারেও আগে যেমন বই উপহার দেওয়ার রীতি ছিল শিক্ষিত সমাজের, এখন সেখানেও ভাঁটা পড়েছে। গল্প, উপন্যাসের বদলে লোকে প্যান্টের কাপড়, ফ্লাস্ক, জামা-গেঞ্জি উপহার দেয় জন্মদিন উপনয়নে আর বিয়েতে কাঁচের সরবত-সেট, টেবিল ল্যাম্প, ইস্ত্রিরী, প্রেসারকুকার ইত্যাদি। এইভাবে দিনে দিনে গল্প উপন্যাসের চাহিদা যত কমে যাচ্ছে প্রকাশকদের মুখে তত চিন্তার রেখা গভীরতর হয়ে উঠছে।

এছাড়া একমাত্র বাংলা গল্প উপন্যাস নাটক নভেলের ভরসা হলো লাইব্রেরী। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে যে অসংখ্য

পড়ুন ও পড়ান

রামপ্রসাদ জীবনী ও রচনাসমগ্র ২০৲

সম্পাদনা : ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

—এখনও গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে—

৬৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হোন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী (তিন খণ্ডে সমাপ্য)

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

তিন খণ্ডের গ্রাহকমূল্য ৩৬৲

সম্পাদনা : ডঃ নির্মল দাশ

রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র

(চার খণ্ডে সমাপ্য)

তিন খণ্ড প্রকাশিত

চার খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ৪৮৲

সম্পাদনা : ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রতি খণ্ডের সাধারণ মূল্য ২০৲

গ্রন্থ মেলা

এ।১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

পাঠাগার তারাই মুখ্যত এর ক্রেতা হলেও, তাদের সামর্থ্য সীমিত; অধিকাংশই সরকারী অনুদাননির্ভর। বই কেনার জন্যে সরকার থেকে এইসব লাইব্রেরীকে বাৎসরিক কিছু কিছু টাকা দেওয়া হয়, কখনো বা সেই টাকার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরা বই কিনেও দেন। সরকারী তহবিল থেকে শিক্ষার খাতে সাধারণত এই অনুদান দেওয়া হয় মার্চ মাসে। তাই যদি মরশুম বলতে হয়, তো এই মার্চ মাসটাকেই বলা যেতে পারে। যদিচ সারা বছর ধরেই লাইব্রেরীরা সুবিধামত ও সাধ্যমত কিছু কিছু বই কেনেন। এছাড়া বিয়ের মাসগুলোতে যেমন কিছু গল্প উপন্যাস বিক্রী হয়, তেমনি জন্মদিন উপনয়ন উপলক্ষেও উপহারের বই কিছু চলে।

ইদানীং কিছুদিন ধরে এই অনুদানের ক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাওয়া দূরে থাক, সরকারী দপ্তরে লেখালেখি বা হাঁটাহাঁটি করেও জানা যায় না, কবে বা কখন সে অনুদান মিলবে। অনেক বিলম্বে কখনো বা দু' বছরের একসঙ্গেও দেওয়া হয়। বন্টন-নীতিতেও হেরফের কমবেশি ঘটে যায় কখনো কখনো।

ফলে প্রকাশক যাঁরা এইসব লাইব্রেরীর পথ চেয়ে বসে থাকেন, তাঁদের দুশ্চিন্তা বেড়েই চলে। এরপর আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। সরকারের কৃপায় হু হু করে কাগজের দাম বেড়ে যায়। ওদিকে ছাপার মূল্যবৃদ্ধি (লোডশেডিংয়ের অনুগ্রহে), তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের হারবৃদ্ধি এবং সবশেষ মার ডাকঘরের মাশুল বৃদ্ধিতে। একখানি দু টাকার বই রেজেস্ট্রী করে পাঠাতে খরচা প্রায় দু টাকার মত। ফলে বইয়ের দাম যেটা ছিল চার-পাঁচ বছর আগে পাঁচ-ছ' টাকা, সেটা দাঁড়ালো আট-দশ টাকায়।

এদিকে লাইব্রেরীরাও বই কেনার ব্যাপারে হাত গুটোতে বাধ্য হয়। সব জিনিসের যেমন মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, ওদের অনুদান তো সে পরিমাণে বাড়েনি, একই স্থানে অচল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বছরে যে লাইব্রেরী হয়ত পঞ্চাশখানা বই কিনতো, এখন তার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় পঁচিশ-তিরিশে।

আবার যেসব গ্রাহকরা আগে প্রতি মাসেই কিছু কিছু নতুন বই কিনে পড়তেন তাঁদের সংখ্যাও কমে আসে—অর্থনৈতিক কারণে গল্প উপন্যাসের বিক্রী এইভাবে কমে যাওয়ায় অনেক প্রকাশক তখন কম খরচে বই কি করা যায়, চিন্তা করতে থাকেন এবং তার ফলে দেখতে দেখতে বাংলা সাহিত্যের যত পুরনো গ্রন্থাবলী একের পর এক প্রকাশ হতে লাগল। এমনি করে বঙ্কিম, মাইকেল, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, নবীন, হেমচন্দ্র গিরীশ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে সেকসপীয়ার, গ্যয়টে, স্কট, মিলটন ও শিশু-সাহিত্যের মহারথী এদেশ ও বিশ্বসাহিত্যের সকলের রচনাবলী এখন প্রকাশকদের ঘরে ঘরে। লেখকদের রয়েলটি এসব বই ছাপলে দিতে হয় না বলেই যেন বেশী আগ্রহী প্রকাশকরা। এর ফলে প্রকাশকরা কতটা লাভবান হয়েছে জানি না। তবে তারা একদিকে সমৃদ্ধতর করেছেন বাংলা সাহিত্যকে এইসব মহা গ্রন্থগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করে, অন্যদিকে তেমনি বর্তমান পাঠকদের কাছে এইসব বিস্মৃত লেখকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কিন্তু অতঃ কিম্। এর পরে কি করবেন? সবাই মিলে এক জোটে এ পরিকল্পনাকে তো নিঃশেষ করেছেন। অথচ বর্তমানে যেসব নতুন উপন্যাস প্রকাশকরা ছাপছেন, কোনটাই আকারে ছোট নয়, ফলে মূল্য কোন কোনটির পঁচিশ-তিরিশ-চল্লিশ। সকলের পক্ষে এত দামে বই কেনা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে লাইব্রেরীরা একটা বইয়ের পিছনে এতগুলো টাকা খরচ করতে নারাজ। ওই টাকায় তিন-চারখানা বই কিনলে তাঁরা তিন-চারজন গ্রাহককে একসঙ্গে তুষ্ট করতে পারবেন।

বড় বই, মোটা বই লেখার দিকে লেখকদের প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তার জন্যে প্রকাশকদেরও খুব অসুবিধা। সকল প্রকাশকের পক্ষে একখানা বইয়ের পিছনে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই ও রয়েলটি বাবদ এত হাজার টাকা একসঙ্গে লগ্নী করা সম্ভব হয় না। আবার যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব, সেখানেও অন্য আরো পাঁচজন লেখকদের বঞ্চিত হতে হয় প্রকাশকের সামর্থ্যের অভাবে। এই জন্যে বহু লেখক আজ ভাল প্রকাশক না পেয়ে অর্থাভাবে ভুগছেন।

এদিকে যাঁরা বইয়ের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির জন্যে সস্তার বই, যেমন পকেট বই, বা পেপারব্যাক ক্লাসিক প্রকাশ করছেন, তাঁরাও আজ নানা অসুবিধার সম্মুখীন। 'পেপারব্যাক' বই সস্তায় দিতে হলে বেশী সংখ্যায় ছাপতে হয়, নইলে পড়তায় আসে না। অন্তত পাঁচ হাজার একসঙ্গে ছাপতে হয়, তার জন্যে যে বইটার দাম মাত্র সাড়ে বারো টাকা, তা হয়ত আটচল্লিশ ফর্মা (ডবল ডিমাই, ষোল পেজী) কত হাজার টাকার কাগজ লাগে সহজেই অনুমেয়। অথচ সে বই দ্রুত বিক্রী না হলে লাভ তো দূরের কথা লোকসান অনেকদিকে। যেমন দপ্তরীর ঘরে স্থানাভাব। সে বই বেশীদিন ঘরে রাখতে চায় না, তার জন্যে আলাদা বাড়ী ভাড়া গুনতে হয় প্রকাশককে। আবার দ্রুত বই যাতে কাটে তার জন্যে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দিয়ে যেতে হয়। বিজ্ঞাপনের মূল্য বর্তমানে 'দেশ' পত্রিকার যেখানে একপৃষ্ঠা প্রায় সাড়ে বারো হাজারের মত। কাজেই সস্তার বই করতে গিয়েও প্রকাশকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অথচ হিন্দী বইয়ের প্রকাশকরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দাম করেন বইয়ের এবং একটার পর একটা ছেপে চলেছেন! কি করে এটা সম্ভব হয়?

এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ওদের সরকারের সহানুভূতি। প্রথমত 'কনসেশন' মূল্যে কাগজ পান হিন্দী প্রকাশকরা। আমাদের কেবল এখন 'টেকস্ট' বইয়ের জন্যে কনসেশনে কাগজ দেওয়া হয়। সাধারণ বইয়ের জন্যে একবার মাত্র দু বছর আগে দেওয়া হয়েছিল, এই কনসেশনের কাগজ। গত দু বছর ধরে আর আমরা তা পাচ্ছি না। অথচ ওরা পেয়েই চলেছে। অজস্র হিন্দী গল্প, উপন্যাস ওই কাগজে ছাপা হচ্ছে। ফলে আমাদের বইয়ের দাম বেশী হয়ে যাচ্ছে এখন ওদের তুলনায়।

ওদের বই বিক্রীর ব্যাপারেও সরকার থেকে প্রকাশকদের অন্যভাবে সাহায্য দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল হিন্দী ডাইরেকটরেট দিল্লী থেকে দু হাজার কপি করে অধিকাংশ বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিনে নিয়ে লাইব্রেরী ও স্কুল-কলেজে বিতরণ করা হয়ে থাকে। আমাদের সরকার কিন্তু নীরব। এসব দেখে যদি তাঁরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথা একটু চিন্তা করতেন ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখতেন, তাহলে প্রকাশকদের সঙ্গে লেখকদের মুমূর্ষু অবস্থাও দূর হতো বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারের পথ সুগম হতো। সাহিত্যের পথই একমাত্র শিক্ষার পথ, জ্ঞানের পথ কে না জানে!

উপন্যাস এবং গল্প

বহুজন নন্দিত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত অসামান্য উপন্যাস
জ্যোৎস্নাময় বসুর

যখন বৃষ্টি

দাম : আট টাকা

এই লেখকের আরেকটি সার্থক উপন্যাস

সাঁকিদিরি

দাম : সাত টাকা

সোহাগ রাতি সলিল সেন	৪.৫০
মধুরেণ কুমারেশ ঘোষ	৩.০০
রহস্যের নায়িকা কৌশিক রায়	৩.০০
কার্নিভালে খুন ডঃ বাসুদেব	৩.৫০
স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাস ভদ্র	৫.০০
সিন্ধু-সাবস (২য় মুঃ) পিনাকীরঞ্জন গুহ	৭.০০
স্মৃতি তুমি বেদনা সুশীলকুমার ভট্টাচার্য	৫.০০

অন্যান্য বইয়ের জন্য ক্যাটলগ দেখুন

লিপিকা। ৩০।১-এ কলেজ রো, কলি-৯

অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশনা

শিবানী দে

প্রায় এক দশক হতে চললো, অনুবাদ সাহিত্য যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা তার ক্রমে বেড়ে ওঠা চাহিদা ও ব্যবসার সাফল্য পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলোতে অনুবাদ বইয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেখানে একই অনুবাদ একাধিক সংখ্যায় রাখতে হয়। সুপ্রচুর গ্রন্থাগারিকের কাছে খবর নিয়ে জানা গেছে সেখানে নামী লেখকদের হালে লেখা মৌলিক উপন্যাসগুলোর চেয়ে অনুবাদ বইগুলোর চাহিদা অনেক বেশি। সেগুলো কখনই আলমারিতে পড়ে থাকে না। একাধিক পাঠকের মতে প্রায় বেশির ভাগ মৌলিক উপন্যাসে ইংরিজি প্লটের ব্যর্থ অনুসরণ ও অনুকরণ পড়ার চেয়ে নির্ভেজাল অনুবাদ পড়া অনেক শ্রেয়। পাঠকদের অনেকেই নামীদামী লেখকদের বিরুদ্ধে কুম্ভিলক বৃত্তির (সে অপরের লেখা নিজের বলে চালায়) অভিযোগও আনেন। সে বিষয়ে পরে আসছি। অনুবাদ জনপ্রিয় হওয়ার আর এক প্রমাণ ব্যাংয়ের ছাতার মত নিত্য বেড়ে ওঠা তার প্রকাশক। অবশ্য এতে বিপত্তিও ঘটছে। পরে আসছি সে কথায়।

কিছু বছর আগেও অনুবাদ বইয়ের নামে অনেকেই নাক সিঁটকোতেন। এখনও যে তা কেউ করেন না এমন নয়, তবে সংখ্যায় তারা আগের তুলনায় অনেক কম। তার একটা কারণ, কয়েকজন বিশিষ্ট অনুবাদকের বিশিষ্ট কয়েকটি বই ছাড়া তখনকার আর সব অনুবাদ বইগুলো এখনকার মতো পাঠকের মন জয় করতে পারেনি। সেটা সম্ভবত অনুবাদের জন্যই। আর এখানেই সম্ভবত ইদানিং কালের অনুবাদকেরা বেশি পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্যই সকলে নন।

সাধারণ সাহিত্য প্রেমীর মধ্যে মূল বিদেশী ভাষায় পড়ার সুযোগ বেশির ভাগেরই হয় না, বুঝতে পারার সংখ্যা সম্ভবত আরও কম। বিশেষত যাঁরা মূল ভাষার রসাস্বাদনে অসমর্থ, অনুবাদ সাহিত্য নিশ্চয়ই তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া বিশ্ব সাহিত্যের বরণীয় লেখকদের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভারের রসাস্বাদন তো আমরা ইংরিজি অনুবাদের মাধ্যমেই করে থাকি। কজন আর জার্মান ফরাসী বা রুশ জানি। এদিক থেকে অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে একথাও ঠিক ক্ল্যাসিক বা চিরকালের সাহিত্যের তুলনায় হাল্কা সামাজিক উপন্যাস, রহস্য বা গোয়েন্দা উপন্যাসের দিকেই বর্তমানের পাঠকের ঝোঁক বেশি। ফলে অনেকে কালজয়ী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ অপ্রকাশিতই থেকে যাচ্ছে। যদিও বা প্রকাশিত হয়, যথেষ্ট ভালো অনুবাদ সত্ত্বেও সেগুলো অবিক্রিতই থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ—আগাথা ক্রিস্টির 'মাউস্‌ স্ট্র্যাপ' বা 'এরকুল পোয়ারো', জেমস হেডলী চেজের 'শকুনের চোখে পলক পড়ে না' বা 'হাতের মুঠোয় পৃথিবী', অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীনের 'আতঙ্ক সেই সংকেত' বা 'তুষারে মৃত্যুর ছোঁয়া', ফ্রেডরিক ফরসাইথের 'শৃগালের শেষ প্রহর' বা 'ওডেসা ফাইল', হ্যারল্ড রবিন্সের 'দ কার্পেটবাগার্স' বা 'শুধু একটি উপল', ব্রাস স্টোকারের 'ড্রাকুলা', জন গর্ডির 'পেলহ্যাম একটা তেইশ', মারে লেইনস্টারের 'মৃত্যু বিসর্পিল' ইত্যাদি জাতীয় বইয়ের যতখানি ব্যবসায়িক সাফল্য, এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'তবুও বসন্ত' বা 'স্বপ্নের পাখিরা' সে তুলনায় কম। আর গর্কির 'ভাঙাচোরা মানুষ' বা 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'পুশকিনের বচন সংকলন' বা 'চেখভের নির্বাচিত সংকলন' জাতীয় বইয়ের ব্যবসায়িক সাফল্য তো নেই বললেই চলে। অথচ আগের জনপ্রিয় বইগুলোর মতো অসফল ক্ল্যাসিক বইগুলোর অনুবাদও কিন্তু যথেষ্ট ভালোই বলে মত দিয়েছেন, যাঁরা পড়েছেন। তা হলে কেন এমন? তবে কি আমাদের সাহিত্য পাঠের রুচি যথেষ্ট উঁচু মানের নয়? এবং অনুবাদ প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানান অসুবিধের মধ্যে এটাও একটা। হচ্ছে থাকলেও অনেক ভালো বই ছাপা সম্ভব হয় না, একই ধরনের বই ছেপে যেতে হয়।

তীর্থংকর সাংবাদিকের
আণ্ডার গ্রাউণ্ড বাংলা দেশ ৮·০০

সুমন্ত সোমের
প্রেম লজ্জাহীন ৬·০০

নিশাচরের
মিস্টিক মার্ডার ৮·০০

চতুর্মুখের
পলাশের রঙ নীল ১০·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের
প্রথম প্রেম দ্বিতীয় পুরুষ ৬·০০

সুজিত নাথের
শরৎ কথা ৬·০০

হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৫·০০

নাটক

চুণীলাল ভঞ্জের
মহাদেব মাস্টার ৪·০০
শ্বেতা মিতা ছন্দা ৪·০০

তপন সেনের
শেষ সংগ্রাম ৪·০০

ছোটদের বই

সুমন্ত সোম
গোয়েন্দা পানু ৩·০০

অরুণকান্তি সাহা
রাজপ্রসাদের রহস্য ৩·০০

রাজর্ষি
এদের দাবী মানতে হবে ৪·০০

প্রমোদ সাহা
কেষ্ট খুড়োর কাণ্ড ৪·০০

অমরেন্দ্র ঘোষ
গল্প শোনার গল্প ৩·০০

বরেণ্য ভট্টাচার্য
বারোয়ারী ৪·০০

সুজিত নাগ
ঝুমঝুমি ৪·০০

প্রকাশিত হচ্ছে
পরেশ ভট্টাচার্যের
আমি মুসাফির ১০·০০

অনিল রায়ের
কফি থেকে কফিন ৮·০০

অনুপম দত্তের
পাতার মুকুট ১০·০০

অজিত ভট্টাচার্যের
সঙ্গী বিহীন ৫·০০

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ৪০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা-৯

আর এক মুশকিল হলো একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর অনেকেই জানিয়েছেন বা জানান, সেই বইটির প্রায় আরেকটি বাংলা সংস্করণ নামী কোন লেখকের মৌলিক রচনা হয়ে রয়েছে লাইব্রেরীতে। একই কাহিনী দুটি রাখা অর্থহীন, এই যুক্তিতে অনুবাদটি ফেরতও দেন অনেক ক্ষেত্রে। যেহেতু আগে কেনা গ্রন্থাগারের ছাপ দেওয়া বই ফেরত হয় না, তাই অনুবাদটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এমন আগে থেকে বিদেশী সাহিত্যকে চুপিসাড়ে বাংলায় মৌলিক বলে চালিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বের অধিকারীদের মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার জয়ী লেখকও বাদ যান না কিন্তু বিভিন্ন লাইব্রেরীর সভ্যদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযুক্ত এমন অনেক বইয়ের কয়েকটির নাম : এরিক সেগালের লাভ স্টোরি, আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' (অনেকের মতে ক্রিস্টির এই বিশ্ববিখ্যাত প্লটটিকে কোন এক রবীন্দ্র পুরস্কার জয়ী লেখক তাঁর ইদানিংকালের একটি রহস্য উপন্যাসে আত্মসাৎ করেছেন), 'সামার অফ ৪২', একটি বিশ্ববিখ্যাত অপরিণত বয়সের প্রেম-কাহিনী। এর চলচ্চিত্রও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। বইটি ছাপার অনুমতি পেয়েও এবং সম্পূর্ণ অনুবাদ করানো সত্ত্বেও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। জানা গেল বিখ্যাত ও অত্যন্ত শক্তিমান এক সাহিত্যিক বইটিকে নিজের মৌলিক বলে চালিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্বটুকু সযত্নে আগেই পালন করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলা সিনেমা হওয়ার কথাও পাকা করেছেন। 'দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল', ইদানিংকালের বিশ্বের অন্যতম বেস্ট সেলার। ছাপার অনুমতি ও অনুবাদ দুটোই করিয়েও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি একই কারণে। বিশ্ববিখ্যাত লেখক আর্ভিং ওয়ালেসের বইয়ের অনুমতি পেয়েও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি কারণ তাঁর 'দি চ্যাপম্যান রিপোর্ট' এবং 'সেভেন সিনিটসকে কেন্দ্র করে জনৈক রবীন্দ্র পুরস্কার জয়ী লেখক কৌশলে আগে থাকতেই নিজের মৌলিক রচনার সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছেন। আরও অনেক এমন দৃষ্টান্ত পাঠকরা জানান যা সবগুলো এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

যাঁরা কখনও অনুবাদ প্রকাশ করেননি বা করবেন ভাবেনওনি, অনুবাদের জনপ্রিয়তা রাতারাতি সেইসব প্রকাশককেও অনুবাদ ছাপতে অনুপ্রাণিত করে তুললো। ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো অনুবাদ প্রকাশন সংস্থা ও অনুবাদক বেরোতে লাগলো। অনুবাদ যে একটা সাহিত্য, ভালো অনুবাদ যে সবাই করতে পারেন না, অনুবাদ যে অত্যন্ত, সুক্ষ্ম ও দুরূহ কাজ, পরের মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজেকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে মিশিয়ে দিতে পারলে মূল রচনাকে নিজের মনে করে ভালোবাসতে না পারলে অনুবাদ যে কখনও মূলানুগ হতে পারে না, এতসব ভাবনা-চিন্তা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রকাশক বা তাঁদের অনুবাদকেরা সম্ভবত চিন্তা করেন না। এই নিষ্ঠাটুকু শুধুমাত্র সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ক্রাইম, থ্রিলার, গোয়েন্দা উপন্যাস অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আগাথা ক্রিস্টির একজন পোষাকের অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা বা জেমস হেডলী চেজের কাহিনীর দুরন্ত গতি প্রত্যেকটি চরিত্রের অসাধারণ তুখড়ভাব বা স্মার্টনেস ও ততোধিক চোস্ত ডায়ালগ এর অনুবাদ ফুটিয়ে তোলা যে কত কঠিন একজন ভালো অনুবাদকই শুধুমাত্র জানেন। ম্যাকলীন-এর বেরাডা ধরনের কনস্ট্রাকশন-কে সেইভাবেই বাংলায় ফুটিয়ে তুলতে এখনও একটি বা দুটি অনুবাদ সফল হয়েছে। বাকিগুলোকে বিকৃতরূপ বলা যায়। হ্যারল্ড রবিন্সের অনুবাদ করা যে কত দুরূহ কাজ বিশেষত তার কাল্পনিক ভাব বোঝে, সেটা দক্ষ অনুবাদকই বোঝেন। ইদানীংকালের জনপ্রিয় অনুবাদ বইগুলোর সফল অনুবাদকেরা এই মূল ব্যাপারটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তাই আজ অনুবাদ জনপ্রিয় হয়েছে। তবে খুব সম্প্রতি অনুবাদের এই সুনামে চিড় ধরাচ্ছেন কিছু প্রকাশক। তাঁরা যাকে দিয়ে যা পারছেন অনুবাদ করিয়ে নিচ্ছেন। বলা বাহুল্য অল্প পারিশ্রমিকেই। কেউ একদাখ্যাত প্রাচীনা অনুবাদিকার হাতে তুলে দিচ্ছেন অতি আধুনিক অ্যামেরিকান উপন্যাস। ফল যা হবার তাই হচ্ছে। না মিলছে ফনসিকতায়, না মিলছে লেখার স্টাইলে। মাঝখান থেকে অনুবাদ সাহিত্যটাই খানিকটা ছোট হয়ে যাচ্ছে পাঠকের কাছে। সামারসেট মমের একাধিক বইয়ের সম-অনুবাদ পড়লে স্বয়ং মমও ভিরমি খাবেন। অথচ একটু দরদ আর আন্তরিকতা থাকলে মমের অসাধারণ অনুবাদ প্রকাশ থাকলে মমের অসাধারণ অনুবাদক প্রকাশ করা সম্ভব। যোগ্য হাতে যোগ্য বই না দিলে অনুবাদ যে কখনই ভালো হতে পারে না একথা প্রকাশকেরা যেন ভুলে না

প্রকাশিত হলো

আগাথা ক্রিস্টির

সূর্যের নীচে অন্ধকার

ভাষান্তর/অনীশ দেব ।। ১৫.০০

জেমস হেডলী চেজ-এর

নীল ছবি

ভাষান্তর/দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ।।১৪.০০

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন, "ভুলো না, জঘন্যতম অপরাধ অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস করা। মনে রেখো শাশ্বত সেই বিধান : জীবন যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্যে যত মূল্যই দিতে হোক।" অমর এই বাণীর উদ্দেশ্য জানতে হলে পড়ুন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

কোন পথে ? ১ম ১২.০০ ও ২য় ১৮.০০

শতাব্দীর অদ্বিতীয় বাস্তব থ্রিলার—ফ্রেডরিক ফরসাইথের

শৃগালের শেষ প্রহর ২৫.০০

(এ মাসেই ইংরিজি চলচ্চিত্রে দেখতে পাবেন)

পত্রপুট/পরিশেক-কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-৭৩

বাঙলা বইয়ের বাজার

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

বাবার বাজার চষে বেড়ানোর ব্যাপারটা ছোটবেলায় বাড়ির সবাইকে ভীষণ বিরক্ত করত। বাজার করতে সাত সকালে বাবা সেই যে বেরিয়ে পড়তেন ফিরতে ফিরতে তাঁর অনেক দেরি হয়ে যেতো। পোনে নটা নাগাদ থলে ভর্তি নাম না জানা শাক-তরকারী-মাছ নিয়ে বাবা যখন ফিরতেন, মা তখন রেগে আগুন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাবা অফিস যাবার আগে ওইসব ছাই পাঁশ (মার মতে) রান্না করে দেওয়া চারটিখানি ব্যাপার নয়। আমি কখনই বাবার এই অদ্ভুত নেশাটার মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পেতাম না। বড়ো হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম কারণটা। বাবার মনটা ছিল ভীষণ গেঁয়ো। খুলনা জেলার সবকটা নদীনালা খাল-বিল ঝোপঝাড়ের গন্ধে তা ম ম করতো। আমার পিতৃদেবের মতে পাড়াগাঁর আঁশটে গন্ধ, জোলো হাওয়া আর বাদলা বৃষ্টির স্বাদ খুঁজে পাবার একমাত্র ঠাঁই এ পোড়া শহরের বাজার। উচ্ছে, বেগুন, পটল মূলোর দরকষাকষির মধ্যে নিত্যি সেই মাটি, সেই জল, সেই বাতাসের কারখানার সঙ্গে পরিচিত থাকতে চাইতেন তিনি, যা তাঁর একান্ত আপন ছিল। কপির পাতা ফেলতে বারণ করতেন মাকে, চিতল মাছের মুইঠ্যারা জন্য অপিসের গরহাজিরা তাঁর কাছে লোকসান বলে মনে হত না। কলেজে ওঠার পর থেকে আমি বাবার এইসব অভ্যাসগুলোকে খুবই করুণার চোখে দেখতাম। আমার মাথায় তখন ভারি ভারি পদ্যের কঠিন কঠিন লাইন ঘুরতো। পাভলভের গোল্ডেন টেজারি থেকে লাইন টুকে টুকে পাশের বাড়ির পিউকে চিঠি লিখতাম। কোন মোচাটা তিতকুটে হবে, কোনটা হবে না—চালানী মাছ আর টাটকা মাছের চেহারার তফাৎ কী এসব আমার মোটেই জানতে ইচ্ছে হতনা। বরং কলেজস্ট্রিট পাড়ায় ঘুরে দুর্দান্ত লেখকের সাম্প্রতিক কবিতার বই বা চটকদার আন্দোলনের উপরে লেখা ব্যর্থ বিপ্লবের করুণ বাংলা উপন্যাস বা প্রচুর মদ-মাংস মেয়েছেলে করা বাঙালী নায়কের জীবন-যন্ত্রণার কাহিনী আমার কাছে অনেক বেশী উপাদেয় ছিল। টাটকা মাছ বা বাসি মাছের পার্থক্য আমি এখনও চিনি না। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের বাজার চষে চষে আমি এখন বুঝে গেছি কোনটা খাঁটি জিনিস, কোনটা হাত ফেরতা। চালানী সাহিত্যকে কেমনভাবে বিজ্ঞাপনের বরফে ঠেসে কোনো-রকমে টিঁকিয়ে রাখা হয় বাঙালী পাঠককে ঠকানোর জন্যে তা একটা দেখার জিনিস। বাজার চষে বেড়ানোর গুরুত্বটা আমি আরও বেশ বুঝতে পারি। দেশের মাটির খাঁটি ফসল বুঝে নেবার জন্য বাবা যে জন্য অকারণে বাজার ঘুরে বেড়াতেন সেই কারণেই বোধহয় বাঙলা সাহিত্যের যে কোনো অনুরাগীর উচিৎ মাঝে মধ্যে সাহিত্যের বাজার ঘুরে ঘুরে দেখে নেওয়া। কোন সময়ে কোন ফসল বোনা হয় কাদের হাত দিয়ে কোন হাত দিয়ে কোন পথ বেয়ে সে ফসল এসে পৌঁছোয় বাজারে কোন ধরণের লোক কী জিনিস চাষ সে তা বুঝতে পারলে আমাদের সাহিত্য বিতর্কের অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান হয়ে যেতো। ঘন ঘন সেমিনার আর অ্যাকাডেমিক কনফারেন্স করতে হত না।

সমস্ত ভাষার মত বাংলা ভাষারও কিছু কিছু বইকে ক্ল্যাসিক্সের পর্যায়ে উন্নতি করা হয়েছে। করেছেন পাঠকরা। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', তারাশংকরের 'গণদেবতা'। সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে এদের তফাৎ কি, কেন সাধারণ মানুষের মূল্যায়ণে এঁদের এতো বেশী স্বীকৃতি, তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল এক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে। তাঁর মতে যে সাহিত্য সমকালের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়েও তার উপরে নিজেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে তাকেই মানুষ ক্ল্যাসিক্স বলে সমাদর জানায়। এসব সাহিত্যকে মানুষ কখনই কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা বিশেষ সমস্যার একমাত্র দাওয়াই হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেনা, অথচ লোক জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের, আশা-আকাংখা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে এদের এমন এক অদৃশ্য যোগাযোগ থেকে যায় যে মানুষের সমস্ত অসুখের সময়েই মানুষ এদের সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়—বুকে বল ভরসা ফিরিয়ে আনার জন্য।

আমি সেই লেখককে প্রশ্ন করেছিলাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। কেননা মহৎ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা সেই অনুসারে সাধারণ মানুষের মনে বিভূতিভূষণ মহৎ লেখক হিসেবে ঠাঁই পেলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো পাওনা কথা নয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ তো যুগের প্রতি পক্ষপাতির নবায়নই দেখিয়েছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী তো বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্তর্দ্বন্দ্বের গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া এক বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতীক। এ অন্তর্দ্বন্দ্বের তো আজকের দিনে আর তেমন গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয়। লেখক আমার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' এদের মধ্যে কার লেখা তোমার বেশী ভাল লাগে।' এক মুহূর্ত দেরি না করে আমি বলেছিলাম যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাই আমার বেশী পছন্দ। সাহিত্যের আসরে বাহবা পাওনার দাবী আমার কখনই নেই। বিভূতিভূষণের লেখা আমার যথেষ্ট ভাল লাগা সত্ত্বেও একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে বিভূতিভূষণের লেখায় সমাজ-চেতনা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেক কম। পথের পাঁচালির মধ্যে দুঃখের দারিদ্রের রিক্ততার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা যে মানুষের কথা বলা আছে সে মানুষ আমাদের নাড়া দেয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কে বা কারা তার এই দৈন্যের জন্য দায়ী সে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা সেখানে অত্যন্ত কম। দুঃখ যেন দুঃখই শুধু দারিদ্র্য যেন দারিদ্র্যই শুধু। তার পিছনের ইতিহাস সেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। এখানেই মাণিকবাবুর জিৎ। মানুষকে কে যে শোষণ করে তার নগ্ন চেহারাটাকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে তুলতে পারতেন মাণিকবাবু তাঁর লেখায়।

অনেকক্ষণ তিনি আমার কথা চুপ করে শুনছিলেন। আমি থামতে তিনি শান্ত স্বরে আমায় বললেন—'তোমার এই উত্তরের মধ্যেই তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে। তোমার বয়স এখন পঁচিশ। পঁচিশ বছর বয়সে বেকোনো সৎ অনুভূতিশীল মানুষই দুঃখের মূল খুঁজে বেড়ায়। আরো যখন বড়ো হবে তখন বুঝতে পারবে যে দুঃখের একটা না একটা কারণ চিরদিনই পৃথিবীতে থেকে যায়। হিটলার চলে গেলে আসে নতুন কোনো হিটলার স্তালিন চলে গেলে আসে নতুন কোনো স্তালিন। সেটা বড়ো কথা নয়। দুঃখটাই আসল, যন্ত্রণাটাই বড়ো। যে লেখকের লেখায় সে দুঃখের, সে যন্ত্রণার প্রতি থাকে সহানুভূতি, থাকে সে দুঃখের প্রতি প্রতিবাদ, সে লেখকের লেখাকেই লোকে কাছে টেনে নেয়। কেননা প্রতিটি মানুষই মনে মনে দুঃখ বিরোধী। প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনেই একটা 'অপু' থাকে, যে কৈশোরে স্বপ্ন দেখে, যৌবনে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত হয়, এবং আরো পরে একদিন দেশ, মাটি, জলহাওয়ার মধ্যে মিশে গিয়ে ক্রমশ ক্রমশ হয়ে ওঠে একটা নিরেট দিশি মানুষ। দুঃখ কে যে অতিক্রম করে আসে জীবনের অভিজ্ঞতায়। আজ থেকে বিশ বছর পরে আবার যদি কখনো তুলনা করতে বসো দেখবে বিভূতিভূষণ তখন মাণিকবাবুর তুলনায় আরো অনেক বেশি নিজের মনে হচ্ছে। মাণিকবাবুর তুলনায় বিভূতিভূষণ অনেক বেশি সমকালের উর্ধ্বে। অনেক বেশি শাশ্বত। চিরকালের সাহিত্যকে মাঝে মাঝেই সমকালের কাছে নিষ্প্রভ লাগে। প্রখর যৌবনে আমরা কেউ রামায়ণ-মহাভারতে তেমন উত্তেজনা খুঁজে পাই না। কিন্তু মজাটা এই যে, রামায়ণ-মহাভারতের বক্তব্য নিয়ে যতই তর্ক করি না কেন তাদের মন থেকে মুছে ফেলা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ প্রথম বই পড়া শুরু করে থেকে আজ অবধি কতো লেখকের লেখাই তো তুমি পড়েছো। যুগের সমস্যার জর্জরিত সে সব লেখার কটা তোমার মনে আছে? তুমি বলছো মাণিকবাবুর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। কটা সাধারণ মানুষ সে কথা বোঝে? সবাই কে নিজের মতো ভেবোনা। সাধারণ মানুষ বলতে আমি তোমার মা-মাসি-পিসেমশাই কাকা-কাকিদের কথা বলছি। অথবা যে সব লোক সহরে, মফঃস্বলে, গ্রামে গঞ্জে থাকে ট্রামে, বাসে, অফিসে, আদালতে পেটের ধান্দায় ছোটাছুটি করে তাদের বোঝাচ্ছি। তারা ভালোমন্দের তফাৎ বুঝতে পারে। শুভ অশুভের পার্থক্য বুঝতে পারে। সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এসব কথা তোমাদের জন্য—তোমরা তো খুব অল্প কয়েকজন লোক। বেশির ভাগ লোকের কাছে এসব কথার কোনো মানেই নেই। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব হোক আর বুর্জোয়া মূল্যবোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের লড়াই হোক সব-সময়েই তারা তারই পক্ষ নেবে যা তাদের চোখে খাঁটি, সত্যি। লেখক এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করলে তার কলমে যত জোরই থাকুক না কেন তিনি কালের ধোপে টিকে থাকতে পারবেন না। অবশ্য সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা শক্তি যে লেখকের থাকে তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সমকালের রক্ষাকবচ তাঁকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। মাণিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি মাণিকবাবুর নিজস্ব আপন যুগের ভিত্তিতে তার জন্ম। কিন্তু আজো সে লেখা মানুষের কাছে সমাদর পায় যে কারণে তার জন্য মাণিকবাবুকে যুগধর্মের বাইরে থাকা শাশ্বত মনুষ্যধর্ম নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। সে মানুষ জীবন-যুদ্ধে, ভালোবাসায়, ঘৃণায় বেঁচে থাকে। কখনো হারতে হারতে নিঃস্ব হয়ে আর কখনো জয়ের গৌরবে দীপ্ততম হয়ে ওঠে।.....

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। জেরা করে সমকালের ধুয়ো তুলে যে যতই নতুন পসরা সাজাক চিরদিনের জন্য সাহিত্যের বাজার মাত করতে গেলে এই অনিবার্য। অন্য এক বিশেষ অতিরিক্ত বোধ যে বোধ একদিন জন্ম দিয়েছিলো মহাভারতের।

তবু কেন এ সমস্ত প্রচেষ্টা? এই আভা গার্দ, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের চমক দেওয়া আন্দোলনের ফাঁকা আওয়াজ? সঠিক কারণ সহজে বলা যাবে না তবু যতদূর মনে হয় সেই একই কারণে যে জন্য অন্যান্য ব্যবসার বাজারে এজেন্সি বা ফড়ের দলের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। মুফতে হঠাৎ কিছু টাকা করে নেওয়ার এই সমস্ত অস্থায়ী বাণিজ্য প্রকল্পের হাত থেকে সাহিত্য রেহাই পাচ্ছে না। সব বাজারের মতো সাহিত্যের বাজারেও 'এজেন্সি' খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। একজনের তৈরী খেলো জিনিসকে এইসব এজেন্টরা নামমাত্র দামে কিনে নেন প্রথমে। তারপর তাদের চমকদার প্যাকেটে মুড়ে (কোনোটার গায়ে আভাঁ গার্দ আর কোনোটার গায়ে শাস্ত্রবিরোধী লেবেল এঁটে) বেশি দামে বাজারে ছাড়েন। এরা নিজেরাও জানেন যে এসব লেখা কখনোই সাহিত্যের রাজকোষে জমা হবে না। অচল আধুলির মতো ফেলে দেওয়া হবে (হয়ত গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বই কিনতে হলে তারা নিজেরাই অন্য বই কিনতেন)। কিন্তু তাতে এদের কিছু যায় আসে না। বই বিক্রির পরে সে বই কোথায় গেল, কোন পাঠকের মন তা পড়ে কতটা রসাতলে নেমে গেল তা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু যারা সাহিত্যকে ভালোবাসি তাদের আছে। কেননা ফেলে দেওয়া অচল আধুলি তা সে যতই অচল হোক না কেন তারও একটা ক্ষমতা আছে। লোক ঠকাবার ক্ষমতা। সে ভূমিকাটা এসব লেখা বহুদিন নিয়ে যাবে। সবে পা ফেলে হাঁটতে শেখা জীবন তাতে হোঁচট খাবে। আপত্তি সেখানেই।

'প্রকাশকরা যবে থেকে সাহিত্য আন্দোলনের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করতে শুরু করলেন ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য, সাহিত্যের বাজারের সদর দরজার চাবিকাঠি যেদিন থেকে চলে গেল প্রকাশকের হাতে, সেদিন থেকেই বাংলা সাহিত্যের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল।'

সেদিন আমার বন্ধু অভিজিত আমাকে এ কথায় সে-কথায় এসব বলেছিল। অভিজিত বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। অভিজিত বললো, 'দেশ বিভাগ' অনেক ক্ষতি করেছে আমাদের। তার মধ্যে একটা মেজর ক্ষতি হল বাংলা বইয়ের বাজারের ক্ষতি। তার আগে যে কোন প্রকাশকই প্রতি সংস্করণ হাজার তিনেক ছাপাতে দ্বিধা বোধ করতেন না। দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫৩ সাল অবধি এ ব্যবস্থাটাই মোটামুটি চালু ছিল। এরপর থেকে প্রকাশকরা প্রতি এডিশন বাবদ ক্রমশ আরো কম বই ছাপাতে শুরু করলেন। বইয়ের মার্কেট ছোট হয়ে যাবার ক্ষতিটা পোষানোর জন্য বইএর সাহিত্য

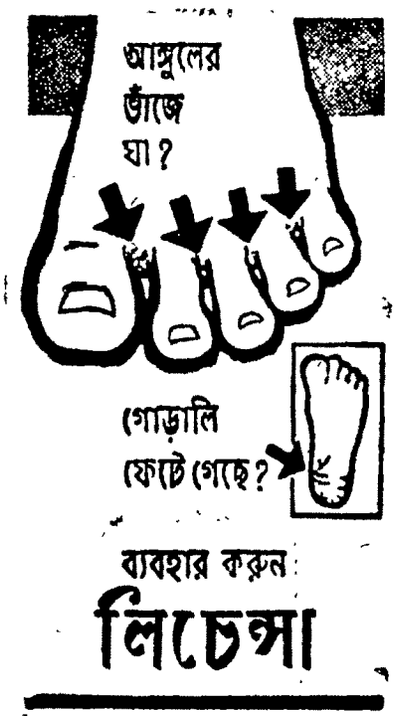

মূল্যের দিকটার প্রতি কম গুরুত্ব দিয়ে ক্রমশ বিজ্ঞাপনের দিকটাকে বড়ো করে দেখতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ভাঙ্গা বাংলার উদ্বাস্তুস্ফীতি আমাদের মধ্যে কতগুলো নতুন সমস্যা এনে দিল। ইকোনমিক ক্রাইসিস মেয়েমানুষ ব্যাপারটাকে আরো অনেক সহজলভ্য করে দিল। কলোনি এলাকার মেয়েরা এক ধরনের নতুন 'সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে' নাম লেখালো, যার নাম 'কলগার্ল'।

ওপার বাংলা থেকে আসা শহরতলির অধঃপতিত নিম্ন মধ্যবিত্ত চরিত্রে কোলকাতা শহর চড়া রঙের দাগ টানলো। রাতারাতি ইমিটেশন শাড়ি, গহনায় কোলকাতা শহর ভরে গেল তাদের লোভের ভোগান দিতে। আর কোলকাতাবাসীর চোখে এলো অন্য ঘোর। শাপলা শালুকের গন্ধ মাখা বুনো নারী শরীরের প্রতি এক দুর্বার লোভ জাগলো তার দেহে-মনে। সাহিত্যে এসবই প্রভাব রাখতে শুরু করলো। অবদমিত কামনার দেশে সাহিত্যের এই ধারাটা অন্যরকম ভাবে জনপ্রিয় হ'ল। উপরতলার মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি এক দীর্ঘস্থায়ী মোহ নারীদেহের পণ্যমূল্য সাহিত্যের শরীরে এসে বাসা বাঁধলো প্রগতিবাদের ছদ্মবেশে।'

আমি অভিজিতকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তুই বলতে চাস মেয়েমানুষ আর লোভ ছাড়া এ সময়ের সাহিত্যের আর অন্য কোনো বিষয়বস্তু ছিল না?' অভিজিত উত্তর দিলো, 'আমি তা বলছি না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু কমার্সিয়াল সাকসেসের দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা সাহিত্যের বাজারে প্রথম দলের সংখ্যাই তখন বেশী।'

'তুই বলতে চাস পাবলিশাররা এই সিচুয়েশনটাকে এক্সপ্লয়েট করেছে?' 'একজ্যাকটলি। এরপর থেকেই পাবলিশাররা এক নতুন ধরনের লেখক তৈরী করা শুরু করলেন, যাঁরা কেবলমাত্র এই ধরনের থিমের ওপরেই বিশেষজ্ঞ হতে লাগলেন, যাঁদের নাম আজকে বলা অপ্রাসঙ্গিক, তুইও জানিস, আমিও জানি।'

'গণসাহিত্যও তো অনেক জন্ম নিচ্ছিল তখন অভিজিত। তুই ইতিহাসের পজিটিভ্ দিকটাকে দেখতে পাস না কেন?'

'পজিটিভ্ দিকটা নেই বলে। যে জিনিস নেই তাকে কেবল স্বপ্নে অথবা কল্পনায় ছাড়া অন্যত্র দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। গণ সাহিত্য লেখার চেষ্টা করা আর সার্থক গণসাহিত্য লেখা, এ দুটোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে বন্ধু!'

'কেন, লোকের মনে তো সে সমস্ত বই যথেষ্ট দাগ কেটে ছিল অভিজিত?'

'লোকের মনে দাগ কাটলেই যদি তাকে গণসাহিত্য বলতে হয় তবে অনেক বইকেই গণসাহিত্য বলতে হয়।

মিত্র-ঘোষ প্রকাশনীর ভানুবাবুর সঙ্গে সেদিন আরো অনেক কথা হয়েছিল তাঁদের কলেজ স্ট্রিটের আপিসে। আমার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে ছিল, বাংলা বই প্রকাশের ব্যাপারে। তিনি সাধ্য মতো সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছিলেন। মিত্র-ঘোষ বহু দিনের প্রকাশক। ১৯৩৪ সাল নাগাদ তারা প্রথম পার্টনারশীপের ভিত্তিতে তাঁদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মিত্র-ঘোষ আজ একটি লিমিটেড কোম্পানী। বাংলা ভাষায় তাঁরাই প্রথম পেপারব্যাক চালু করেন। এছাড়া চালু করেন পকেটবই। পেপরব্যাকে বার করা তাঁদের একটি বিখ্যাত বই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা'। দাম বারো টাকা। হার্ড কভারের বইটির দাম আঠারো টাকা। ছ' টাকার পার্থক্য। গেট-আপের ক্ষেত্রে বাংলা পেপারব্যাকের চেহারা এখনো কেন এত দুর্বল ইংরিজি পেপার-ব্যাকের থেকে। সে-প্রশ্নের জবাবে ভানুবাবু জানালেন, তার প্রধান কারণ বাংলা পেপার ব্যাক সংখ্যায় এখনো এত কম ছাপা হয় যে স্ট্যাণ্ডার্ড নীচু না রাখলে কস্টিং (মানে বই পিছু প্রোডাকশন খরচ) বেড়ে যায়। তাছাড়া ইংরিজি পেপার ব্যাক যাঁরা ছাপেন তাঁদের হাতে ছাপার টাইপ অনেক বেশি। ভানুবাবুর কাছে কপিরাইট আইনত কতদিন থাকে তা জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল। ভানুবাবু জানালেন কোনো লেখকের মৃত্যুর পর থেকে ৫০ বছর অবধি সে লেখার কপিরাইট লেখকের উত্তরাধিকারীর হাতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এর কোনো ব্যতিক্রম তাঁর জানা আছে কিনা। উত্তরে ভানুবাবু আমায় জানালেন যে তাঁরা নিজেরাই রমেশচন্দ্র দত্তের একটি লেখা লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার আগেই ছেপেছিলেন। অবশ্য লেখকের উত্তরাধিকারীর অনুমতি নিয়েই। বিজ্ঞাপনের উপর মিত্র-ঘোষ কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তা জানতে চাইলে ভানুবাবু বললেন যে তা বই-এর উপর নির্ভর করে। যেমন আজকাল তাঁরা পেপার ব্যাকের উপর বিজ্ঞাপন বাবদ একটু বেশি টাকা খরচ করেন। এছাড়া যে সমস্ত বই বা রচনাবলীর তাঁরা সুলভ সংস্করণ বার করতে পারেন, সে সমস্ত বই বাবদ তাঁরা স্পেশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। অগ্রিম টাকা দিয়ে গ্রাহক সংগ্রহ করার জন্য। অবশ্য তার ফলও ভালো হয়, ভানুবাবু জানালেন। বহু লোক গ্রাহক হবার জন্য অগ্রিম টাকা পাঠান।

ভানুবাবু বললেন, বাংলার বাইরে বাংলা বই-এর প্রচুর চাহিদা। প্রধানত আসাম বিহার উড়িষ্যায় বই সাপ্লাই করেন তাঁরা। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র এমনকি আন্দামানেও মিত্র-ঘোষের বই যায়। প্রবাসী বাঙালীরা বাংলা বই সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেন। প্রত্যেক বছর বোম্বাইতে নিজেদের বই-এর প্রদর্শনী করেন মিত্র-ঘোষ। অনেক টাকার বই কেনাকাটি হয় তখন। এছাড়া আরো অনেক দরকারি খবর জানতে পারলাম ভানুবাবুর কাছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় বর্ধমানে তাঁদের বই বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি। তারপর ২৪ পরগনায়। সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা মফস্বলে কলকাতার তুলনায় আনু-

Rupa PAPERBACKS

COOKING

PREMILA LAL
Indian Recipes 12.00

HOBBY
LAURENCE MALLORY
The Right way to use a Camera 8.00

SPORTS & PASTIME
FRANK WORRELL
Cricket Punch 10.00

ROHAN KANHAI
Blasting for Runs 8.00

SUNIL GAVASKAR
Sunny Days 10.00

VINOO MANKAD
How to Play Cricket 7.00

TREVOR BAILEY
Sir Gary 12.00

VIJAY HAZARE
Cricket Replayed 10.00

MUSHTAQ ALI
Cricket Delightful 10.00

ADVENTURE

KENNETH ANDERSON
The Black Panther of Sivanipalli 12.00
The Call of the Man-Eater 12.00
Man-Eaters and Jungle-Killers 12.00
Nine Man-Eaters and One Rogue 12.00
This is the Jungle 12.00

List of other books on application

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073
Also at :
Allahabad : Bombay : Delhi

পাতিক হারে বেশি। জনপ্রিয়তার ক্রম অনুযায়ী সবচেয়ে প্রথমে আসে উপন্যাস তারপর যথাক্রমে ভ্রমণ কাহিনী, রম্য-রচনা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ।

বাঙলা শিশু সাহিত্যের যে ক'টি বই আজো ভীমনাগের সন্দেশের মতোই সবার কাছে লোভনীয় তাদের মধ্যে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'হিন্দুস্থানী উপকথাকে বিনা দ্বিধায় প্রথম সারিতে বসানো যায়। সাম্প্রতিক কালে এই দুটি বইএর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন মিত্র-ঘোষ। ছোটরা ঠিক কি ধরনের বই পছন্দ করে জানতে চাইলে ভানুবাবু বলেন যে ছোটরাই একমাত্র সাহিত্যের প্রকৃত সমঝদার। তারা বিষয়-বস্তুর চেয়ে গল্প বলার ভঙ্গিকেই (যাকে ইংরিজিতে স্টাইল বলা চলে) বেশি তারিফ করে। যাঁর স্টাইল যত ভালো ছোটরা ততবেশি তাঁর লেখার ভক্ত হয়। শিশু সাহিত্যে কে কতটা পারদর্শী তাই দিয়ে সহজেই একজন লেখকের কলমের ক্ষমতা বোঝা যায়।

কথাবার্তার মাঝে চা আসতে ভানুবাবু থামলেন। চা ও সিগারেট দিয়ে আমায় আপ্যায়ন জানালেন। একটু বিরতির পর আমি আবার প্রশ্ন শুরু করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম লোড-শেডিংএ বইএর ব্যবসা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে কথা। উত্তরে তিনি বললেন যে লোড শেডিং বইএর ব্যবসাকে গুরুতর আঘাত দিয়েছে। পেপার সাপ্লাই প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং—বই তৈরির প্রাথমিক এই তিনটি দিকই লোড শেডিংএ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ফলে বই-এর দাম বেড়ে যায়।

ছাপার ভুল বা অন্যান্য ত্রুটিকে পাঠক কেমন চোখে দেখে সে কথা তুলতে ভানুবাবু জানালেন যে পাঠকরা আজকাল এসব ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন হয়ে গেছেন। শুধু ছাপার ভুল নয়, ছাপার টাইপ, কাগজের কোয়ালিটি, বই-এর গেট-আপ তাঁদের পছন্দ না হলে তাঁরা নালিশ

বই পাড়ায় (কলেজ স্ট্রীট) নিয়মিতই গজিয়ে উঠছে পাবলিশিং হাউস। একখানা বা আধখানা ঘর নিয়ে (কখনো কখনো বা কোনো বাড়ির সামনের বারান্দাকে কাঠ দিয়ে ঘিরে- 'পাবলিশিং হাউস' বানানো হচ্ছে। এর মধ্যে কে খাঁটি আর কে ভেজাল তা খুঁজে বার করা সহজ ব্যাপার নয়। ঠগ এর মধ্যে অবশ্য দু' একজন তরুণ প্রকাশককে চিনি যাঁরা বাংলা সাহিত্যের বাজারে নতুন হলেও ইতিমধ্যেই সবাইকে বেশ চমক লাগিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি ভিন্নস্বাদের বই প্রকাশ করে।

আশা প্রকাশনীর সুবীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলে আমি সেদিন বুঝতে পারলাম যে এই যুবক প্রকাশকেরা নেহাৎ হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে প্রকাশনায় নাবেন নি। রীতিমতো সিসটেমিক প্ল্যানিং এবং প্রোগ্রামিং-এর ওপর নির্ভর করে নতুন কাজে হাত দিচ্ছেন, নতুন পরীক্ষার ঝুঁকি নিচ্ছেন।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এক প্রকাশকের মতে মফস্বলে 'মেইলিং' করে (অর্থাৎ বিভিন্ন বুকসেলার ও লাইব্রেরিতে চিঠির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে) তাঁরা যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। আসাম অঞ্চলেও তাঁরা বই সরবরাহ করেন। লাইব্রেরি অর্ডারের ওপর তাঁরা অনেকটাই নির্ভর করেন। কোন কোন বিশেষ মাসে বাংলা বইএর বিক্রি সাধারণত বেশি হয় জানতে চাইলে সুবীরবাবু জানালেন যে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস অবধি লাইব্রেরি অর্ডার এবং জুন থেকে অগাস্ট অবধি (বাংলা হিসেবে) বিয়ের মাস পড়ায় কাউন্টার কাউন্টার সেল বেড়ে যায়।

আপনি কি বাংলা সাহিত্যের প্রকাশক হবার স্বপ্ন এখনো দেখেন ? তা হলে আপনাকে আমি তার কতগুলো অসু-[illegible]

চাই। প্রথমত একজন ছোট প্রকাশকের পক্ষে কলেজ স্ট্রীটে বা তার কাছাকাছি বইপাড়ার সীমানার মধ্যে একখানা ঘরের সন্ধান পাওয়া এবং তার ভাড়া (সেলামী সমেত) গোনা চাট্টিখানি কথা নয়। আবার কলেজপাড়ায় ঘর যোগাড় না করতে পারলে অথবা নিদেনপক্ষে একটি কাউন্টার না খুলতে পারলে আপনার পক্ষে প্রকাশক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা কঠিন।। ঘরভাড়া, ইলেকট্রিক বিল (টেলিফোনের কথা না হয় বাদই দিলাম), বড় লেখকের হাতে রয়্যালটি বাবদ অগ্রিম সুউচ্চ দক্ষিণা, কাগজের বাড়তি দাম, দপ্তরীর ও ছাপাখানার বিল মিটিয়ে আপনার হাতে লাভ বাবদ যে কিঞ্চিৎ টাকা পড়ে থাকবে তার অনেকটাই আপনাকে ব্যয় করতে হবে বড় কাগজে (সাপ্তাহিক) বিজ্ঞাপন বাবদ। বক্সে বিজ্ঞাপন দেবেন ভাবছেন ? তাও নিতান্ত সুলভ নয়। বক্স বাবদ অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকা ৬০-৬৫ টাকা দর হাঁকেন। বড়-সড় বিজ্ঞাপন হলে তো কথাই নেই। (এ খরচটা আপনাকে করতেই হবে। সবচেয়ে ভাল উপায় তাই বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া। তাতে আপনার খরচা খানিকটা কাজে লাগবে।) লোডশেডিং যে বই-এর দাম বাড়িয়ে দেয় সে কথা তো ভানুবাবুর মুখেই শুনলেন। অথচ বইয়ের দাম দশ টাকার বেশি করলে সে বই বিক্রি করতে আপনি হিমশিম খেয়ে যাবেন। ফর্মা পিছু (১৪ থেকে ১৬ পৃষ্ঠায় এক ফর্মা এই হিসেবে) এক টাকা বইয়ের দাম আপনাকে রাখতেই হবে। বেশি সংখ্যায় বই না ছাপালে আপনার লাভের গুড় বিজ্ঞাপনের পিঁপড়েরা খাবে। আবার বেশি ছাপিয়ে বিক্রি না করতে পারার সম্ভাবনাটাকেও উল্টো দিকে ধরে রাখবেন। লাইব্রেরি মালিকদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে আপনার ? অথবা ভবিষ্যতে তা হবার ? না হলে এদিকটা নিয়েও ভাববেন। মুখে যে প্রকাশক যাই বলুন আজকের দিনে কেউই খালি খুচরো ক্রেতার ওপর নির্ভর করে বই-এর ব্যবসা করেন না। বুক-সেলার্স ও লাইব্রেরীর সহযোগিতা আজ প্রকাশকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এসব কথা না ভেবে যাঁরা প্রকাশনার কাজে নামেন বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁদের অনেকেই হয় খেয়ে না খেয়ে সমস্ত পুঁজি খরচ করে অথবা ধার দেনা করে প্রথম বছর অনেকগুলি বই বার করেন এই আশায় যে বছর ফিরতে না ফিরতে তাঁরা টাকায় লালে লাল হয়ে যাবেন। কিন্তু আশানুরূপ রিটার্ন তাঁরা পান না। ফলে পরের বছর বই-এর লিস্ট অপেক্ষাকৃত কম বই ছাপা হয়। বিজ্ঞাপন দেবার সামর্থ্যও তাঁদের কমে আসে। লোকের নজরে স্বাভাবিকভাবেই কম আসে তাঁদের নাম। খুচরো বিক্রিও তাই কমে যায়। হতাশ হয়ে সাহিত্যের জগতকে গুডবাই জানিয়ে বহু প্রকাশক চলে গেছেন তাই টেক্সট বই-এর বাজারে। কবিতা-উপন্যাস ছেড়ে ধারাপাত ভূগোল, পাটিগণিত ছাপাতে শুরু করেছেন। অথবা টেস্টপেপার বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার স্যুজেশন-বা নোটবই।।

উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

রাতভ'রে বৃষ্টি ৩-০০
আয়নার মধ্যে একা ৫-০০

অন্নদাশংকর রায়

বিশল্যকরণী ৫-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মনু দ্বাদশ ৩·৫০

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

রেশমী সুতোর ফাঁস ৭-০০

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মিশর সাহানা ১০-০০

মীরা বালসুব্রমণিয়ন

দিনের আলো রাতের আঁধার ৬-০০

গল্প সংগ্রহ

সুধীরচন্দ্র সরকার

কথাগুচ্ছ ১২-৫০

তুষারকান্তি ঘোষ

বিচিত্র কাহিনী ৬-০০
আরও বিচিত্র কাহিনী ৬-০০

অন্নদাশংকর রায়

কথা ১৫-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নির্বাচিতা ২০-০০

বুদ্ধদেব বসু

ভাসো আমার ভেলা ১২-০০

বাণী রায়

পুনরাবৃত্তি ৬·০০

চিত্রিতা দেবী

চুনিমুক্তার ফুল ৬-০০

অসিত গুপ্ত

নিরুদ্দেশ যাত্রা ৭-০০

স্মৃতি চিত্রণ

সুধীরচন্দ্র সরকার

আমার কাল আমার দেশ ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু

আমার ছেলেবেলা ৩-০০
আমার যৌবন ৪-০০

কামন দেবী

সবারে আমি নমি ১২-০০

সুধীরঞ্জন দাস

স্মরণের তুলিকায় ২০-০০

অভিধান

রাজশেখর বসু

চলন্তিকা ১৫-০০

সুধীরচন্দ্র সরকার

পৌরাণিক অভিধান ২০-০০

ভ্রমণ কাহিনী

অন্নদাশংকর রায়

পথেপ্রবাসে ৪-০০
জাপানে ৮·০০

বুদ্ধদেব বসু

জাপানী জর্নাল ৩-৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল

দেবতাত্মা হিমালয় ২০-০০

মহাকাব্য

রাজশেখর বসু

রামায়ণ ২৫-০০
মহাভারত ৩০-০০

নাটক

শম্ভু মিত্র

চাঁদ বণিকের পালা ৮-০০

চিত্রকলা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের কাহিনী ২৫-০০

বিবিধ গ্রন্থ

দাশরথি সোম

মানব জীবনের দিকযন্ত্রজ্যোতিষ ৮-০০
উপনিষদ ৬-০০

সুলেখা সরকার

রান্নার বই ৮-০০
টক ও মিষ্টি রান্না ২-০০

লোকনাথ ভট্টাচার্য

তিক্ততার এই রংয়ে জন্ম ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু

মেঘদূত ১৫-০০
কবিতার শত্রু ও মিত্র ৫-০০

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

সমাজচিন্তা ৫-০০

উৎপল দত্ত

সেক্সপিয়ারের সমাজ চেতনা ২৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহেশ (সচিত্র) ৩-৫০
অভাগীর স্বর্গ (সচিত্র) ৩-৫০

কাব্যগ্রন্থ

বুদ্ধদেব বসু

স্বাগত বিদায় ৪-০০
যে আঁধার আলোর অধিক ৩-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অথবা কিন্নর ৩-৫০

সুশীল রায়

তৃতীয় পাণ্ডব ৫-০০

গ্রন্থাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎ সাহিত্য-সংগ্রহ
(ত্রয়োদশ সম্ভারে সম্পূর্ণ)
প্রতি সম্ভারের মূল্য ২০.০০

রাজশেখর বসু

পরশুরাম গ্রন্থাবলী
(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)
প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫.০০

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ফোন : ৩৪-১৭৪২

ভাষার মূল্যায়ণ : পুণ্যশ্লোক রায় ১৩৭৩ খৃঃ পৃঃ ১০৮, শঙ্কর প্রকাশন, কলকাতা-৬, মূল্য আট টাকা

কিশোর জ্ঞানকোষ : প্রথম খণ্ড। সমবায় প্রকাশনন। পরিবেশনা : মডেল পাবলিশিং হাউস।

২।এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম : পঁচিশ টাকা।

ভাদু ও টুসু : রামশঙ্কর চৌধুরী। ফোক মিউজিক এ্যাণ্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলকাতা।

দাম : দশ টাকা।

ভাষার মূল্যায়ণ

বর্তমান গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত সাতটি প্রবন্ধের সংকলন। এর মধ্যে দুটি মূল বাংলায় রচিত, অন্য পাঁচটি পূর্বে প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী লীলা রায়। গ্রন্থটির নাম যদিও ভাষার মূল্যায়ন, গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুধুই ভাষার মূল্যায়নের বিভিন্ন সমস্যা ও পদ্ধতি নয়। দর্শন শাস্ত্র ও ভাষা, শব্দার্থের প্রকৃত রূপ ভাষার সমতা, বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিশেষ লেখা প্রায় বিরল। এমনকি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলিও গতানুগতিক এবং আধুনিক ভাষাচিন্তার ধারার সঙ্গে যোগ বিহীন। সে ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কোন গ্রন্থ, বিশেষ করে যে গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক মৌলিক প্রশ্নগুলির আলোচনার প্রযত্ন আছে তা স্বভাবতই আদরণীয়।

এই গ্রন্থে অবশ্য আধুনিক ভাষাচিন্তার কোন ধারাবাহিক বিবরণ নেই। লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়। ভাষার আলোচনায় যে সব প্রশ্ন ওঠে তার কয়েকটি অবলম্বন করে এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। যেমন দর্শনশাস্ত্র ও ভাষা প্রবন্ধে ভাষা কি, ভাষার প্রকৃতি কি, দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের ভাষার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাষার পার্থক্য কি এই সব প্রসঙ্গ উঠেছে। আবার ভাষার মূল্যায়ন প্রবন্ধের মূল বিষয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আদৌ কোন তুলনা করা যায় কিনা, যদি যায় তবে কিভাবে সেই তুলনা সম্ভব। শব্দার্থের প্রকৃত রূপ প্রবন্ধে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক, অর্থের নানা স্তর ইত্যাদি প্রসঙ্গ। আবার ভাষার সমতা প্রবন্ধটির বিষয় হল বার্তাবিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভাষার সামাজিক ভূমিকা কিভাবে ভাষার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য, নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমতা আনা সম্ভব। সব প্রসঙ্গকে লেখক সমান গুরুত্ব দেননি, কতকগুলি প্রসঙ্গকে বেছে নিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক বিষয় আছে যা খুবই বিতর্ক সাপেক্ষ, অনেক বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা সম্ভব। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রবন্ধগুলি যাঁরা ভাষার প্রকৃতি, ভাষার গঠন, ভাষার সামাজিক ভূমিকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁদের নূতন চিন্তার খোরাক করবে সন্দেহ নেই।

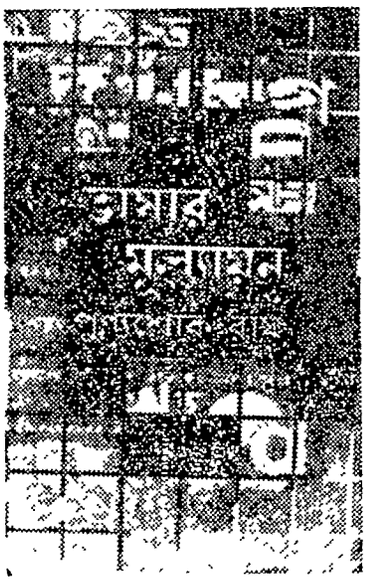

এই ধরনের বই পড়ার পর একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে জাগে, কার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ সংকলন। এ কি বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করা, কিংবা প্রস্তুয়মান ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করা। এ কি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের মত সাধারণ পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করার চেষ্টা না ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা। এই প্রবন্ধগুলি পড়তে গেলে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান নিতান্তই আবশ্যিক। লেখক ভাষা বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষা, অনেক ধারণার উল্লেখ করেছেন, ব্যবহার করেছেন। এবং তার ব্যাখ্যা করেননি। তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি কোন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কথা ভেবে এই বইর পরিকল্পনা করেননি। আবার ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের কাছে প্রবন্ধগুলির অনেক অংশ প্রাথমিক মনে হবে। যেমন প্রথম প্রবন্ধে (ভাষাতত্ত্বের ভবিষ্যৎ) লেখক ধ্বনিতত্ত্ব এবং ব্যাকরণ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য কি কি বই পড়া উচিত তার সংক্ষিপ্ত এবং মূল্যবান তালিকা দিয়েছেন, কি কি 'আরম্ভে পড়া উচিত নয়' সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন ভাষা আলোচনার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা নিয়ে সমতা অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এই প্রবন্ধটি বোঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য রচিত। এবং সেই জন্যই অন্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট। প্রবন্ধ সংকলনে এ রকম বিসমতা সম্ভবত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, প্রবন্ধগুলি যখন বাংলায় রচিত এবং বাঙ্গালী পাঠকের জন্য, তখন পরিভাষা নির্মাণ, বাক্য গঠন, শব্দ বিন্যাস ইত্যাদি কি রকম হবে? এই গ্রন্থের ভূমিকায় অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন 'বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বের দুরূহ মূল ইংরেজীর সঙ্গে মিলিয়ে বাংলায় বাক্য রচনা এক প্রকার অসাধ্য সাধন। বাক্য গঠন রীতি যদি ইংরেজীর মতো হয়ে থাকে সেটা এমন কিছু অমার্জনীয় নয়।' প্রশ্নটা মার্জনা বা অমার্জনীয়তার নয়, প্রশ্ন বোধগম্যতা। বোধগম্যতার জন্য যদি মূল ইংরেজীর শরণ নিতে হয় তাহলে অনুবাদের প্রয়োজন কোথায়? এই গ্রন্থে অনেকবার 'সাফ্‌ফিক্স প্রিফিক্স' 'অ্যাফ্‌ফিক্স' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলির কি বাংলা প্রতিশব্দ নেই? না লেখক (যিনি এই অনুবাদ অনুমোদন করেছেন) বিশেষ কোন কারণে ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহার করতে চান বুঝলাম না। ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন 'যা জানার প্রয়োজন বেশী তা ভাষাতত্ত্বের অবহেলিত। দুঃখের কথা ঠিকই তবে জগতের সামগ্রীর কোন সীমা নেই। জগৎ অপরিমিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও কোন সীমা নেই। শব্দার্থ চর্চা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখতে হবে, যদি অবহেলার ওপরে এতো জোর দেওয়া হয়। ভাষাতত্ত্বের শব্দার্থ অবহেলিত এটা স্কোটনশীল একটা ধারণা।'—এর মূল ইংরেজী কতটা দুরূহ জানি না, কিন্তু অংশ বোঝার জন্য যদি মূল রচনা পড়তে হয় তাহলে বোধকরি পাঠকের প্রতি অবিচার করা হয়।

'স্ট্যান্ডার্ড' বোঝাতে কোথাও সাম্য কোথাও সমতা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি ভাষার স্ট্যান্ডার্ডাইজেসন নিয়ে চিন্তিত, তিনি নিজের ভাষার সম্বন্ধে একটু সতর্ক হবেন না? আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক : 'ধারের উৎপত্তিস্থান' একাধিক হয় কখনও কখনও। সারিবদ্ধ হয়ে একই উৎসে মিশে যায়' (৮১ পৃঃ)। 'ধারের উৎপত্তিস্থান' ও 'উৎসর দুটো কি একই ব্যাপার না আলাদা?' 'সারিবদ্ধ' হওয়াটাই বা কি? 'একই উৎসে মিশে যাওয়া'—তাই বা কি? কঠিন বিষয় নিয়ে লেখা সহজ নয়। আর সহজ করে লেখা একটা কঠিন কাজ সন্দেহ নেই।

শিশির দাশ

কিশোর জ্ঞানকোষ

মানুষের জ্ঞানস্পৃহা অসীম। সভ্যতার আদি থেকেই অনন্ত কৌতূহল মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে। নতুন আবিষ্কার ও উপলব্ধি ইতিহাসের পাতাকে অভিনবতের রোমাঞ্চময় করে রাখছে। অনুসন্ধিৎসু মানব-মন আজও ক্ষুদ্র গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সীমাকে অতিক্রম করে, অর্জিত সত্তা অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে সে অসীম ক্ষমতাশালী। তবু আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে অনেক কিছু। আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে অন্ধকার ওপারের জগৎটাতে আলোর রশ্মি জ্বালিয়ে দেওয়ার।

কোন আদিম যুগে মানুষ শিখেছিল আগুন জ্বালাতে। তারপর শিখল ঘর বাঁধতে। চাষআবাদ জানল। সমাজজীবন গড়ে উঠল। ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল শিল্প। গ্রামনগর শহরের পত্তন হল। ধর্মপ্রচার হল। গ্রামা মোড়ল থেকে রাজা এল। এল প্রজাতন্ত্র - গণতন্ত্র সাম্যতন্ত্র। পাখির মত উড়তে গিয়ে একদিন মানুষ গিয়ে হাজির হল মহাশূন্যে। মানুষ প্রথমে শিখেছিল দেওয়ালের গায়ে আর ভূর্জপত্রে লিখতে, অবশেষে সেই মানুষই আবিষ্কার করল ছাপাখানা। তারই সাহায্যে স্মৃতিনির্ভর জ্ঞানকে ছাপার অক্ষরে পরিবেশন করা হল বহুজনের জন্যে। এই ছাপার অক্ষরের আশীর্বাদে আজকের দিনে পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে।

এবছর বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের শতবর্ষ। বাংলা ভাষার দৈন্য এখনও কাটেনি। সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই-এর অভাব রয়েছে। জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অনেক এদেশে। কিন্তু অর্জিত জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে পরিবেশনের দক্ষতা আছে কমজনেরই। বড়দের উপযোগী বইপত্র মিললেও, ছোটদের জগতটা বঞ্চিত সবদিক থেকেই। অনেককাল আগে 'শিশুভারতী' বেরিয়েছিল। পরবর্তী দীর্ঘকাল থেকে গেছে বন্ধ। 'ছোটদের বিশ্বকোষ'-র কয়েকটি খন্ড বেরোয় বছর কয়েক আগে। 'বিজ্ঞান চেতনার' পাঁচটি খন্ড এখনও পাওয়া যায়। মূল্যবান 'আবিষ্কারের কাহিনী'র তিনটি খন্ড কিশোর পাঠকের কাছে অপরিহার্য। অথচ এ বই কমই চোখে পড়ে।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'কিশোর জ্ঞানকোষ' বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানি প্রয়োজনীয় বই। বহু অর্থব্যয়ে এই সুদৃশ্য মূল্যবান বইটি যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরা সাধুবাদ পাবেন। এই জাতীয় একখানি বই-এর অভাব পূরণ করে বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকমন্ডলী মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন।

'কিশোর জ্ঞানকোষে'র প্রথম খন্ডটিতে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানান দিকের আলোচনা আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি, মহাদেশ ও মহাসমুদ্রের উৎপত্তি, খনিজ সম্পদ, প্রাণের উদ্ভব, উদ্ভিদ ফসিল বা জীবাশ্ম, প্রাচীন সভ্যতা, মিশর, গ্রীস ও রোমক সভ্যতা, কলকারখানা, ভাষার উদ্ভব, লিপির ক্রমবিকাশ, মুদ্রণযন্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সমবায় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান ও প্রাচীন ভারতের জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। খেলাধুলার বিবরণ, ট্যুরিস্ট গাইড, মানুষের অবদান, বাঘ সম্পর্কে তথ্য ছাড়াও এই বই-এর বিশেষ আকর্ষণ 'তুমি বড় হয়ে কি হবে' বিষয়টি। লিখেছেন দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু

চক্রবর্তী, দেবব্রত মল্লিক, দিলীপ সেন, সুনীল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে জ্যোতির্ময় সাহা, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, সমীর রক্ষিত, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী নারায়ণ ভট্টাচার্য সত্যেন্দ্র আচার্য, বিশ্বনাথ বসু। প্রতিটি বিষয় কিশোর পাঠকের উপযোগী করে লেখা। সংক্ষিপ্ত হলেও বিবরণগুলি পূর্ণাঙ্গ। আনুষঙ্গিক ছবি বিষয়বস্তু বোঝবার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অবশ্য কোথাও কোথাও শব্দ ব্যবহারে অসতর্ক হয়ে পড়ায় ভাষাগুণ নষ্ট হয়েছে। কিশোর পাঠকের উপযোগী বই-এর ভাষা আরও মনোরম হওয়া উচিত ছিল। 'বহু বচনের দ্বিতত্ব' ব্যবহারই ভাষার অন্যতম ত্রুটি।

বেশ কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়ল। এব্যাপারে আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। ২১২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে বেড সুইচের শেষাংশ ছাপা হয়েছে প্রথম কলমের শেষে।

আশা করি ভবিষ্যৎ খন্ডটি দ্রুত বেরোবে। প্রকাশক ছাপার ব্যাপারে আরও সযত্ন হবেন।

কমল চৌধুরী

কিশোর জ্ঞানকোষ: প্রথম খন্ড। সমবায় প্রকাশনী। পরিবেশনা: মডেল পাবলিশিং হাউস। ২।এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম: পঁচিশ টাকা।

টুসু ও ভাদু

বাঙলার খাঁটি লৌকিক উৎসবগুলির মধ্যে যে কটি আজও মোটামুটি অবিকৃতভাবে টিঁকে আছে, 'ভাদু' এবং 'টুসু' তাদের মধ্যে বোধহয় সব চাইতে পরিচিত। পশ্চিমবাঙলার তিন-চারটি জেলায় এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে রীতিমত ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এই দুটি উৎসব প্রতি বছর পালিত হয়ে থাকে—পরিচয় - গ্রন্থের আকারে এদের বিশদ আলোচনা হবার প্রয়োজন সে হিসাবে অবশ্যই আছে। লেখক রামশঙ্কর চৌধুরী তথা ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেই দায়িত্ব পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সুন্দর ছাপাই, মাত্র ৮৮ পাতার এই ক্ষুদ্র বইটি লোকসংগীত নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় লোকসংগীতে আগ্রহী পাঠকের প্রত্যাশা সবটা না মেটাতে পারলেও, তাদের কৌতূহল আরও জাগিয়ে তুলবে, সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের পাওয়া-না-

যে বই TEST PAPERS কে হার মানিয়েছে।

AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE QUESTIONS
FOR MADHYAMIK PARIKSHA

অনুশীলন করার জন্য এ বইয়ের তুলনা নেই।
• দাম পনের টাকা •

ষোল টাকা M.O. পাঠালে রেজিস্টারী ডাকে বইটি পাঠানো হয়।

বি, বি, কুণ্ডু এণ্ড সন্স : ১৮এল ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯

পাওয়াগুলি এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে :

১। ভাদু ও টুসু উৎসবের অঞ্চল বোঝাতে বইয়ের প্রথমেই একটি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া এই পাঁচটি জেলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মেদিনীপুরের সর্বত্রই কি এই উৎসব পালিত হয়? সম্ভবত হুগলী জেলার একটি-দুটি গ্রামেও আলোচ্য উৎসব দুটির চল আছে—লেখক তার উল্লেখ করেন নি।

আধুনিক নাটকের অনবদ্য সমাবেশ

মাক্সিম গোর্কির 'মা' অবলম্বনে

মা—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়	৫.০০
ত্রিশূল—ধনঞ্জয় বৈরাগী	৫.০০
পকেটে চোখের জল—শচীন ভট্টাচার্য	৫.০০
গরমিল—অজিতকুমার দে	৪.০০
ঢাক ভাঙা মধু—মনোজ মিত্র	৫.০০
অজগর—সমর মুখোপাধ্যায়	৫.৫০
শ্যালক-সমাচার—অগ্নিদূত	৪.৫০
সমুদ্র-শঙ্খ—রতনকুমার ঘোষ	৩.০০
বাঘা যতীন—বীরু মুখোপাধ্যায়	৪.৫০
রাজা-বদল—জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪.০০
উৎসর্গ—সলিল সেন	৩.০০
রং বদলায়—জ্যোৎস্নাময় বসু	৪.০০
জটায়ু-সংবাদ—দিলীপ মজুমদার	৪.০০

ভালো নাটক এবং নাট্য আলোচনার অসামান্য সংকলন

নাট্যলিপিকা

বাংলা ভাষায় নাটকের প্রথম অমনিবাস

দাম : আট টাকা

অন্যান্য নাটকের জন্য ক্যাটলগ দেখুন

লিপিকা

৩০।১-এ কলেজ রো, কলি-৯

রামশঙ্কর চৌধুরী

২। টুসুর একটি নামান্তর 'তুষু'—কোন কোন জেলায় শেষোক্ত শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। এই গ্রন্থে আগাগোড়া টুসু নামটিই রাখা হয়েছে। যদিও টুসু উৎসবের সঙ্গে যে ধানের তুষের যোগ আছে, লেখক নিজেই তা বিশ্বাস করেন (পৃঃ ৪২)—সে হিসাবে তুষু শব্দটির একটি যৌক্তিকতা থেকে যায়। লেখক এই উৎসবকে কেবলমাত্র টুসু নামেই কেন অভিহিত করলেন—রচনায় তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

৩। টুসু এবং ভাদু কেন উৎসব—ব্রত নয়—খুব অল্প কথায় লেখক তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'ব্রত' এবং লৌকিক উৎসবের আচরণগত পার্থক্যও সাদৃশ্যবাহী 'তোষলা'র মতো ভাদু মাসের 'ভাদুলী' নামের একটি ব্রতের কথাও অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত'-এ পাওয়া যায়। উৎসাহী পাঠক এই আশ্চর্য মিল দুটির কথা ভেবে দেখতে পারেন।

৪। 'ভাদু' সম্পর্কে প্রচলিত লৌকিক কাহিনীটি লেখক ভ্রান্ত মনে করেন। এই মত সেদিক দিয়ে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। তবে এই কিংবদন্তীটিকে ইতিপূর্বে অনেক লেখকই মূল্য দিয়েছেন, উপরোক্ত ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর' ইংরেজী গ্রন্থে শ্রীমানিক-লাল সিংহের রচনায় (পৃ ৩৫—৩৬) এই কিংবদন্তীকে পরিষ্কার সমর্থন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 'ভাদু' নামটির উৎপত্তি নির্ধারণ করতে পারেন নি।

৫। ভাদু এবং টুসু—দুটি উৎসবের বেশ কিছু বাছাই-করা গান (কয়েকটি সুর-লিপিসহ) সংকলিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, গানের ব্যাকরণগত দিকটিও আলোচিত হয়েছে—এই ধরনের গ্রন্থে যা প্রায়শ দুর্লভ। তবে ভাদু গানের সঙ্গে যে আগমনীর একটি যোগ আছে, তার কোন উল্লেখ বা সেই জাতীয় কোন গান সংকলন করা হয় নি।

৬। দুটি উৎসবেরই কাল ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভাদুর মূর্তি ও টুসুর মালসাটির ফোটো দেওয়া হয়েছে। টুসু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'পুরুলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে চৌদলে করেও নিয়ে যাওয়া হয়। এই রীতির চল বাঁকুড়া জেলায়ও আছে—সেখানে চৌদলের ভিতর ছাবা বা মালসার বদলে একাধিক সলতে ধুপের মাটির প্রদীপ রাখা হয়। এই বিষয়টির উল্লেখ গ্রন্থে নেই। টুসু প্রসঙ্গে আরও বলা যায় মকর সংক্রান্তির সকালে টুসু ভাসানের পর ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার একটি রীতি আছে—যথেষ্ট আর্থিক আনুকূল্যে নেই এমন পরিবারও ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং টুসু উৎসবের সঙ্গে পিঠার সম্পর্ক প্রায় অঙ্গাঙ্গী মনে করা যেতে পারে। লেখক তেমন জোর দিয়ে এই বক্তব্যে উপস্থিত করেন নি যদিও এই জাতীয় একটি গান গ্রন্থে (পৃ ৪৯) স্থান পেয়েছে।

ভাদু ও টুসু—রামশঙ্কর চৌধুরী। ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলকাতা। দাম দশ টাকা।

First attempt in India

BISWAKOSH (Encyclopedia)

in Bengali

Being Published very Shortly

Last date for enrolment as subscribers — 15-3-78

on payment of Rs. 100 / Rs. 900.

Indian Institute of Knowledge

C/o. Chuckerberty, Chatterjee & Co. Ltd.

15, College Street, Cal-700 073 Phone — 341934.

সুনীল দাস জাতীয় ললিতকলা পুরস্কার পেলেন

প্রণবরঞ্জন রায়

ললিত কলা অকাদেমি আয়োজিত ১৯৭৮-এর জাতীয় ললিতকলা প্রদর্শনীর বিচারকরা কলকাতার খ্যাতনাম্না চিত্রকর সুনীল দাসের ছবিকে প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নির্বাচন করে তাঁকে এ-বছরের জাতীয় চারুকলা পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েক বছর পরে আবার একজন পশ্চিম বাংলার শিল্পী এ-পুরস্কার পেলেন। গত বছর এ-পুরস্কার প্রাপকদের অন্যতম একজন বাঙালী ভাস্কর ছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষা-দীক্ষা বা কর্মসূত্রে পশ্চিম বাংলার লোক ছিলেন না। এ-বছরে সুনীল ছাড়া আরও একজন বাঙালী শিল্পী এ-পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দিল্লীর চিত্রকর ও ভাস্কর সুধীরঞ্জন ভূষণ। সুনীল যেমন ১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারী চারু ও কারু-কলা কলেজের শিক্ষা সমাপণ করেই কলকাতার সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সদস্য হয়েছিলেন, সুধীরঞ্জনও তেমনই ঐ একই বছরে বিশ্বভারতীর কলা-ভবনে তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ করে সোসাইটিতে যোগ দেন। সুধীরঞ্জন আজ আর সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন কিন্তু সুনীল আজও ঐ সংস্থার একজন সক্রিয় সদস্য। ১৯৭৮ সালে আর যাঁরা জাতীয় ললিত কলা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন— মাদ্রাজের বর্ষীয়ান চিত্রকর সুলতান আলী ও তরুণ ভাস্কর এস, নন্দগোপাল, পশ্চিম-জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয় ছাপের ছবি নির্মাতা এম, মমতানি ও লক্ষ্ণৌর চিত্রকর জি, গজলব। দিল্লী যেহেতু এখন চতুর্থ ভারতীয় আন্তর্জাতিক দ্বৈবাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যাপারে সরগরম, সেজন্য এ-বছরের জাতীয় ললিত কলা প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আহমেদাবাদের মিউজিয়ম ভবনে। এই ভবনটির স্থাপত্য-পরিকল্পনা জগৎবিখ্যাত ফরাসী স্থপতী ল' কর্বুসিয়ের-এর।

পঁতাল্লিশ বছর বয়সের নীচের যে-ক'জন বাঙালী শিল্পী সর্বভারতীয় চারু-কলাকর্মকাণ্ডের বৃহৎ ক্ষেত্রে নিজেদের গুণের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন সুনীল দাস তাঁদের অন্যতম। এবং সুনীল খুব অল্প বয়সেই এই বিরল গৌরবান্বিতদের দলভুক্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর ছাত্রত্ব ঘুচবার আগেই সুনীলের ছবি জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে স্থান পাবার জন্য নির্বাচিত হয় এবং ঐ প্রথমবার জাতীয় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেই তাঁর ছবির উৎকর্ষের জন্য সুনীল ১৯৫৯ সালে প্রথম বার জাতীয় ললিতকলা পুরস্কার লাভ করেন। তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি বছর (ও'র জন্ম কলকাতায় ১৯৩৯এ)। উনিশ বছর পরে আবার একই পুরস্কার পেলেন

সুনীল দাস

১৯৭৮-এ। এর মধ্যে অবশ্য পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আর অর্থের মূল্য সাত-ভাগ কমে গেছে।

১৯৫৯ থেকে '৭৮-এর মধ্যে গঙ্গার বুকে অনেক পলিমাটি জমেছে, সুনীলের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৬০ সালে নবগঠিত সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সদস্য হয়েছে, কলকাতার আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস, মহীশূরের দশহরা প্রদর্শনী, দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস সোসাইটি, হায়দরাবাদ আর্টস সোসাইটি, বম্বে আর্ট সোসাইটি আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। ফরাসী সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে ১৯৬১ থেকে '৬৩ পর্যন্ত একোল নাশিওনাল সুপেরিয়র দ্য বোজ-

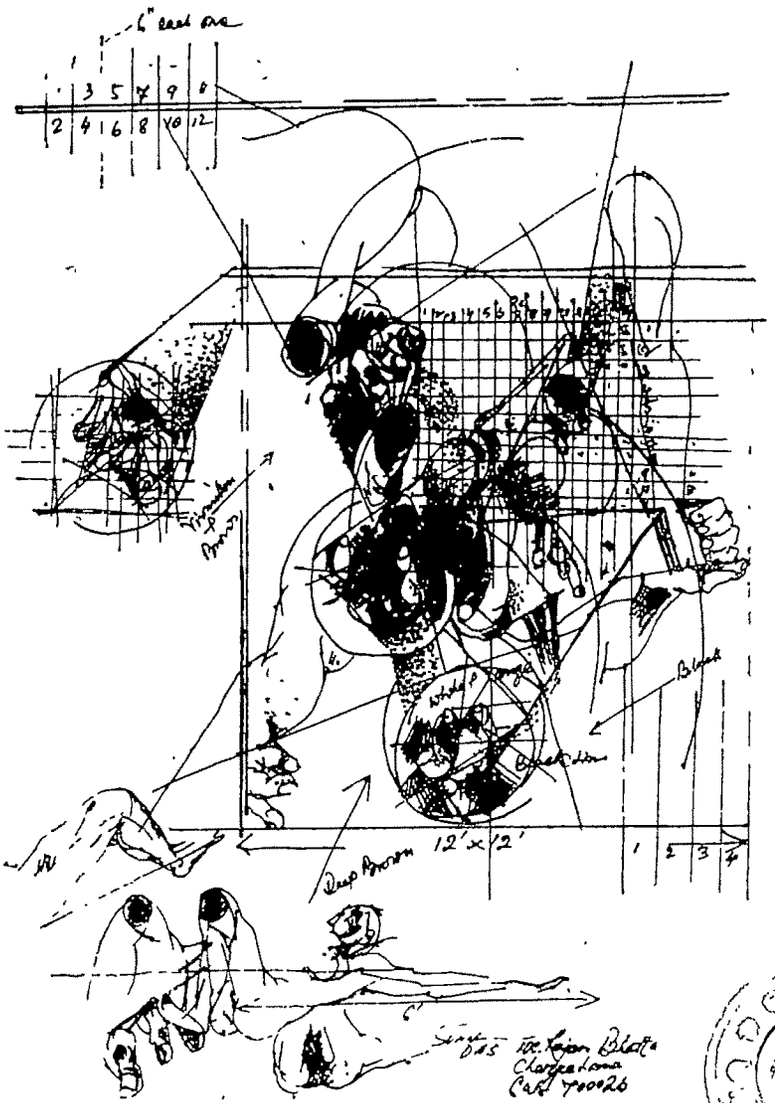

আর্টস-এ ভিত্তিচিত্র বা ম্যুরাল পেনটিং-এর কলা-কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। সে-দেশে থাকতে তিনি পোলাণ্ডের ভারসাউ-এ অনুষ্ঠিত ইন্টার-ন্যাশন্যাল আর্ট একজিবিশন (১৯৬১), পারীর সালোঁ দ্য লা মুজ পেঁইতর (১৯৬২), বিয়েনাল দ্য পারী (১৯৬৩), এক্সপোজিশিও' দে পেঁইত্র এ'এ'জের দ্য পারী (১৯৬৩) প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৩ সালে দেশে ফিরে এসে অল ইণ্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ডের উইভারস সার্ভিস সেন্টারে চাকরি নিয়েছেন। সুনীল প্রতি বছর কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী এবং মাদ্রাজে একাধিক একক প্রদর্শনী করে আসছেন সে-সময় থেকেই। ১৯৬৭ সালে সুনীল দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয়বার ঐ সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৯৬৪-৬৫ থেকে সুনীলের সঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এবং প্রীতিশ নন্দীর সৃজনী-মূলক সখ্যতা গড়ে ওঠে। কখন সুনীল তাঁদের কবিতাকে ভিত্তি করে ছবি আঁকেন, কখনওবা তাঁরা সুনীলের ছবিকে সূত্র ধরে কবিতা লেখেন। এ-সবের সাক্ষ্য নানা পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, অ্যালবামে ছড়িয়ে আছে। মার্মানীতে অলোকরঞ্জন হন সুনীলের ভাষ্যকার। দুই বাংলার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মার্কোস ফ্রান্ডা। তিনি সুনীলের ১৯৬৬ থেকে '৭২ এর মধ্যে করা ড্রইং-এর মধ্যে বাংলার অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, আগ্নেয় চিত্তের প্রতিভাস খুঁজে পেয়ে তাঁর গবেষণা গ্রন্থে সুনীলের ড্রইং-কে স্থান দেন।

কিন্তু সুনীল কখনও কোন ধ্যানে একনিষ্ঠ থাকেননি। ধ্যানের ও দর্শনের বিচিত্রের সন্ধানে নিজের ছবির বিষয়-বস্তুকে, শৈলীকে, রীতিকে বার বার পরি-বর্তন করেছেন। তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে সুনীল নিত্যনতুন রূপে তাঁর দর্শকের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। তাতে মাঝে মাঝে দর্শকের সুনীলকে চিনতে অসুবিধা হয়েছে।

শত পরিবর্তনের মধ্যেও যে-ব্যাপারটায় ক্রমান্বয় থেকে গেছে তা'হল সুনীলের অসাধারণ কারুদক্ষতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি উদ্রেককর বস্তু নির্মাণ যদি সৃজনকর্মের সার্থকতার অন্যতম নিবীখ হয়, তাহলে সে-ধরণের বস্তু নির্মাণক্ষমতা বা কারুদক্ষতা শিল্পীর অন্যতম গুণ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে বাধ্য। গুণের এ-নিরীখে সুনীল গুণী। বস্তুজাগতিক কোন বস্তুর প্রতি-নিধিত্বমূলক রূপবন্ধ হোক বা বিশুদ্ধ বিমূর্ত কোন রূপবন্ধ হোক অথবা বস্তু-জাগতিক-রূপভিত্তিক কোন রূপকল্প হোক সুনীলের ড্রই-এর গুণে সে-রূপবন্ধ বা রূপকল্প অনন্য হয়ে ওঠে। রেখাভিত্তিক হোক বা পুঞ্জ-ভিত্তিক হোক, ফ্ল্যাট হোক বা ঘনত্ববোধক হোক সুনীল তাঁর হাতের রেখার জোরে এবং বর্ণলেপন পদ্ধতির জোরে তাঁর রূপবন্ধকে ঐচ্ছিক রূপ দিতে পারেন। রেখাকে নিয়ে তিনি খেলতে পারেন, রেখাকে খেলাতে পারেন। বর্ণচয়নে নির্ভুল তিনি, বর্ণলেপনে সিদ্ধহস্ত। আলো-ছায়া তাঁর আদেশে খেলে। সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর চিত্র-ক্ষেত্র নিয়ে খেলবার ক্ষমতা। রূপবন্ধের উপস্থাপন, রূপবন্ধ সকলের পারস্পরিক বিন্যাস এবং শূন্য-ক্ষেত্রের কৌশলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি চিত্র-ক্ষেত্রকে বিস্তারিত করে দিতে পারেন, সংকুচিত করতে পারেন এবং গভীরতা দান করতে পারেন। আবার অন্যদিকে ছবিকে স্পর্শগ্রাহ্য সত্তা দিতে পারেন। যে চিত্র-মাধ্যম বা মিডিয়ম-এই সুনীল কাজ করেন, সে-মাধ্যমকেই তিনি অনায়াসে স্ববশে আনতে পারেন। এমনই কৌশলী শিল্পী সুনীল দাস।

বিচিত্র বইয়ের সমারোহ

রসিকরঞ্জন ছদ্মনামী প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীকেদার ঘোষ রচিত দেশী-বিদেশী প্রেক্ষাপটের নানা রঙে বোনা উজ্জ্বল রম্যরচনার সংকলন—

অথ রসিকরঞ্জন কথা

প্রথম খণ্ড : আট টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড : আট টাকা

সরকারী বাণিজ্য বিভাগের জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী এবং কারিগরী বিদ্যার বিচিত্র বিবরণ—

সুরদাসের

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে

দাম : আট টাকা

বাঙালীর কবিগান এবং কবিয়ালদের জীবন-বেদ। একাধারে জীবনী, সঙ্গীত ও বাস্তব কাহিনীর সমন্বয়।
লাইব্রেরী এবং গবেষকদের অপরিহার্য গ্রন্থ

দীনেশচন্দ্র সিংহ-র

কবিয়াল কবিগান

দুই খণ্ড একত্রে পঁচিশ টাকা

অন্যান্য বইয়ের জন্য ক্যাটলগ দেখুন

লিপিকা। ৩০।১-এ কলেজ রো, কলি-৯

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ॥ **এই জীবন ৬৲**
এ সি সরকারের ॥ **আনন্দ চুমকী ১০৲**
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ॥ **দু'জন একাকী ৫৲**
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ॥ **অন্যায় খেলা ৪৲**
নিখিলচন্দ্র সরকারের ॥ **স্বপ্নের ধ্বনি ১০৲**
অসীমানন্দ মহারাজের ॥ **নরকে বৈকুণ্ঠের স্বপ্ন ৬৲**
চিরঞ্জীব সেনের ॥ **সিকেট সিগন্যাল ১০৲**
নিশাচরের গোয়েন্দা কাহিনী ॥ **তিন তাসের খেলা ৫৲**
ঐ ॥ **রক্তঝরা সন্ধ্যায় ৫৲**
পরিচয় গুপ্তের ॥ **রহস্যের ধোঁয়া ৬৲**
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ॥ **সোনার পিতল মূর্তি ৭৲**
অমলেন্দু ঘোষের ॥ **মার্কসবাদই শেষ কথা নয় ৬৲**
ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ॥ **হিমালয়ের তিনসঙ্গী ১৫৲**
মণীন্দ্রনাথ দাসের ॥ **স্বর্ণ ও মণিরত্নের কথা ৫৲**
সন্তোষকুমার ঘোষের ॥ **গুড্‌বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০৲**
অমরনাথ রায়ের (অভিধান) ॥ **রসায়ন ভারতী ১০৲**

পূর্ণ প্রকাশন ॥ ৮এ, টেমার লেন কলিঃ-৯, ৩৬-৯৫৯২

রূপকথার দুঃখ

অভীক রায়

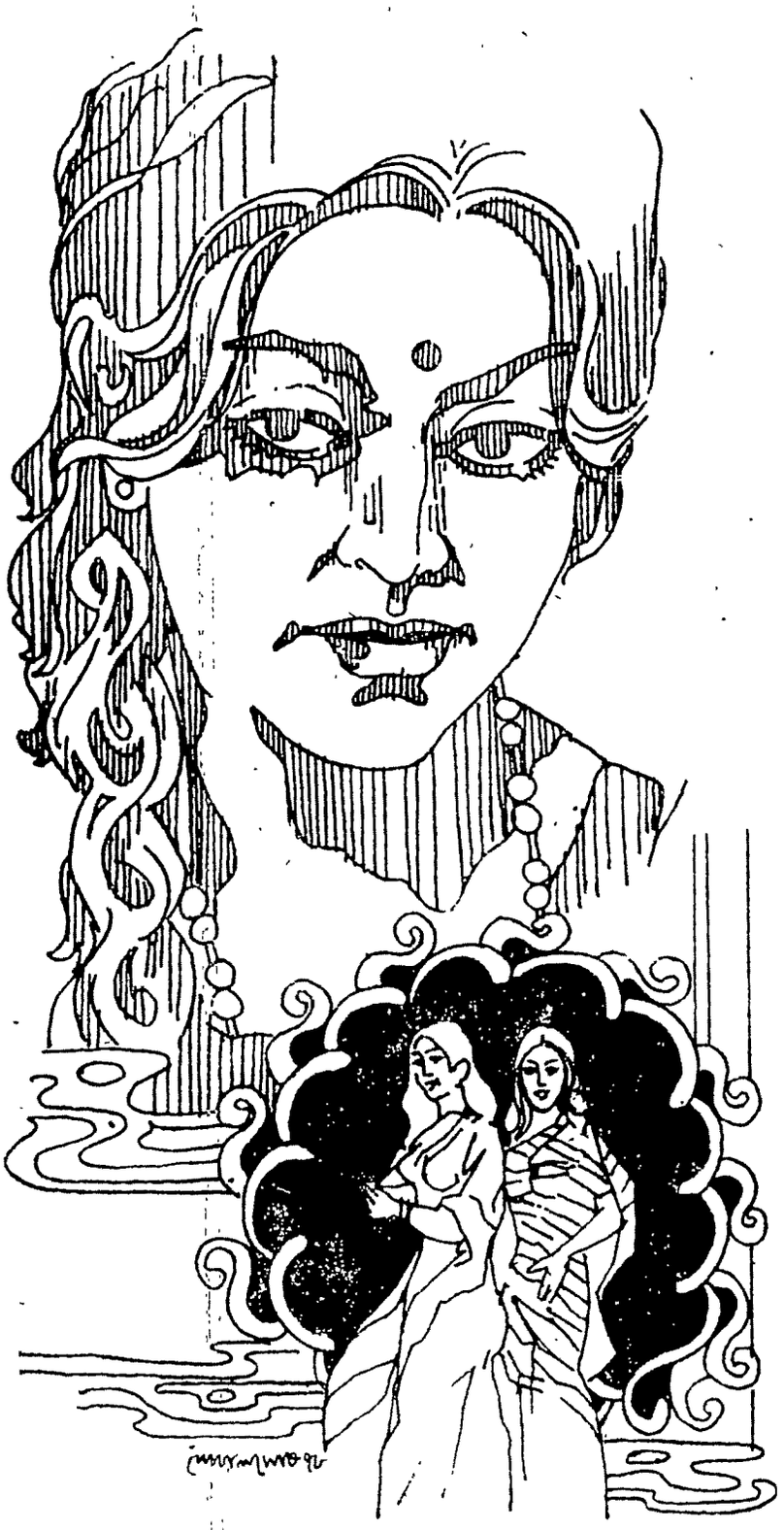

সাত

হঠাৎ যুদ্ধ লাগল। পাকিস্থানের সঙ্গে। এর আগে ছোটবেলায় আরেকটা যুদ্ধ শুনেছি। চীনের সঙ্গে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। যুদ্ধ বলতে দেশপ্রেমের কিছু দারুণ গান, রেডিও আর খবরের কাগজের হট নিউজ ছাড়া আর কিছু মনে নেই। রাস্তাঘাটে এর ওর মুখে শুনতাম, এটা গেল সেটা গেল। রোজ সকালে চটপট ঘুম থেকে উঠতাম। গান শুনতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম, মিছিল। আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের। বেশ লাগত। সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতাম। লেকে বড় বড় পরিখা কাটা হোলো। খেলতে গিয়ে আলোচনা করতাম, বোমা পড়লেই হেলো। চট করে এগুলোর মধ্যে সেঁধিয়ে যাব। উত্তেজিতভাবে আমরা পরিখা পরখ করতাম।

কিন্তু এবার অন্যরকম। চোখের সামনে দেখলাম টানা অগ্নিদীপ। দিনের পর দিন। পুজো আসছে। এবার খরচপত্তর কম হবে। দেশের এই অবস্থা, পুজোর ঝাঁক-জমক মানায় না। অংশু এন সি সি করে। রোজ এসে গরম গরম খবর শোনায়। লেকের ঘাসে বসে আমরা হাঁ করে গিলি। এন সি সি করার কথা আমারো। কিন্তু করি না, এই জন্য তেমন কোনো জোরালো কারণ নেই। আসলে জিনিসটা আমার পছন্দের না। একদিন অংশু বলল, 'চল সোনা ব্যায়ামে ঢুকি।' বললাম, 'হঠাৎ এই শখ?'

—শখ কিরে? এই তো সময় হেলথ তৈরী করার। সাঁতার তো আবার সেই এপ্রিলে। এখন চল ব্যায়াম করি। বুঝলি না আমাদের তো লড়তে হবে।

—লড়বি মানে? কার সঙ্গে?

—কেন পাকিস্থানের সঙ্গে। যে কোনো দিন ডাক চলে আসবে। বললাম, ডাক এলে তুই যাবি?' 'নিশ্চয়ই।' অংশু বলল, 'আমার যে দাদা আর্মিতে আছে, তাকে বলে রেখেছি। এমনিতে আমি পাশ করে বেরিয়েই চলে যাব। এখন ভাবছি এই সময়টায় গেলেই বেশ হোতো। কবে ঢুকবি বল ব্যায়ামে? একলা ঢোকার ইচ্ছে নেই।' তেমন গা করলাম না। অংশু অগত্যা

দেখাদেখি আমিও। অংশু সীমন মশালে শরীর বাগাবে, আর আমি বসে আঙুল চুষব, সে হয় না।

ব্যায়ামের টেন্সার নুটুদাকে বোধহয় আমাকে ভাল লেগে গেল। একদিন বলল, 'সিগারেট খাস?' চোখ নামিয়ে ফেললাম। নুটুদা জিগ্যেস করল, 'দিনে কটা।' বললাম, 'তিনটে।'

—ভেরি গুড। এর বেশী খাবি না। বড়জোর পাঁচ অব্দি উঠতে পারিস।

ব্যায়ামের এখানে শব্দ কাটছে না। এদিকে যুদ্ধ। পুজোর সময় দেখি, অংশু আর সীমন জুতো পালিশের মালপত্র নিয়ে বসে গেছে। ওদের প্যান্ডেলের সামনে। অবাক হলাম। অংশুকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'কি ব্যাপার রে! হঠাৎ এসব শুরু করলি?' অংশু বলল, 'ভগবানদের জন্য। যা টাকা উঠবে সব ডিফেন্সে দিয়ে দেব। তুই ও চলে আয় না আমাদের সঙ্গে। বেশ জমবে। কাল থেকে কেকাও আসছে।' বাড়ি ফিরে অনেক রাত অব্দি আমার ঘুম হোলো না। হিংসায়। ওরা জুতো পালিশ করছে ভগবানদের জন্য। আমি কি করব? পরদিন আবার গেলাম। খুব সাজিয়ে বসেছে। চারপাশে বড় বড় ছবি। পোস্টার। সীমন ডাকল, 'চলে এসো সোনা। খারাপ লাগবে না।' অংশু বলল, 'কেকা সোয়েটার বুনছে ভগবানদের জন্য। তুই কি করছিস? আয় না আমাদের সঙ্গে।' উত্তর দিলাম না। একটু বাদে কেকা এল। একা না। সঙ্গে এক বন্ধু। আমাকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল। কথা বলল না। সরে গিয়ে অংশুর সঙ্গে গল্প করতে লাগল। প্যান্ডেলের পাশে চায়ের দোকান। সামনে বেঞ্চ। বসলাম। চা বানাতে বলে তাকিয়ে রইলাম ঠাকুরের দিকে। বেশ ভিড় হয় এপাড়ায়। চা নিয়ে আমি সীমনকে ডাকলাম, 'চা খাবে?' সীমন উঠে এল। বলল, 'চা তো খাই না। তবে পুজোর দিন। তোমার অনারে খেতে পারি।' বললাম, 'কেন চা খাও না কেন? রং কালো হয়ে যাবে?' সীমন হাসল, 'দূর! আমার অত ইগো নেই। এমনি খাই না। হ্যাবিট নেই তো। তবে আজকে খাব।'

—থাক। হ্যাবিট যখন নেই তখন বাদ দাও। শরীর খারাপ করবে। সীমন শুনল না। চায়ের গেলাস হাতে পাশে বসে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেট বার করল। বলল, 'চলবে?' নিলাম। সিগারেট ধরিয়ে মন্দ লাগল না। বেঞ্চের ওপর আসনপিঁড়ি হলাম, 'কেকার ব্যাপারটা কি বল তো? একদম পাত্তা দিচ্ছে না।'

—কেকা হেভী খচে আছে তোমার ওপর। সীমন বলল।

—কেন? খচে আছে কেন?

—ব্যালের দিন তোমার সঙ্গে কি হয়েছিল? কোনো ঝগড়াঝাঁটি?

বললাম, 'তুমি কি কৈফিয়ৎ চাইছ? আমি কিন্তু কখনো কৈফিয়ৎ দিই না।'

—পাগল! আমি কেন কৈফিয়ৎ চাইব? আমি খালি জানতে চাইছি ব্যাপারটা কি। কথাটা শুনে একটু লজ্জা পেলাম। বললাম, 'কেকা কিছু বলে নি?'

—নাঃ। ব্যালের পর রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার সময় খুব একচোট কাঁদল। তারপর গুম হয়ে গেল। জিগ্যেস করাতে বলল, সোনার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কি ব্যাপার বল তো! মেয়েটা অত চটল কেন?

—আমি কি জানি? পয়সা দেবার জন্য দাঁড়ালাম। পা চাপা প্যান্ট। বসে থেকে পকেটে হাত দেওয়া যায় না। পয়সা মিটিয়ে বললাম, 'সেদিন ব্যালে কেমন হোলো?'

—ভালই। আচ্ছা তুমি প্রাইজ নিলে না কেন? ব্যালেও দেখলে না। সবাই এত খুঁজল। তুমি কি এসব পছন্দ কর না?

—কি পছন্দ করি না আমি!

—এই, এইসব প্রাইজ-টাইজ। অনেকে আছে তো বললাম, 'আমি অনেকের দলে না। তোমার বুঝতে ভুল হচ্ছে।' সীমন আর কথা বাড়াল না। এমন সময় অংশু চেঁচিয়ে বলল, 'কি রে তোরা ওখানে কি করছিস! এই সীমন? এই সোনা? অংশুর পাশে কেকা দাঁড়িয়ে। কেকার বন্ধুটা প্যান্ডেলে আরতি দেখছে। অংশুর পাশে কেকা। সিনটা সাংঘাতিক লাগিয়ে গেছে। কেকাকে কি সবসময় সুন্দর লাগবে? আরতি ফুরিয়ে গেছে। মাইকে গান বেজে উঠল। চারপাশে আলো। ঝলমল করছে। মাইকে গান বাজছে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব সুর। ভিড়। হৈহৈ। চৈতিদি কোথায় এখন? সেই সেদিন রাগ করে চলে এলাম। আর তো যাই নি। চারপাশে আলো। ঝলমল করছে। ভীষণ ভীষণ সব গানের সুর। ঠাকুরের মুখ জ্বলছে। ঠাকুর জ্বলছে আগুন। বুক শিরশির করছে আমার। ভিড়। হৈ হৈ। কি এত জেদ, একবারো খবর নিল না? কতদিন বিছানায় পড়ে রইলাম একবারো এল না। সব, সব, সবাই একরকম। অংশু আর কেকা পাশাপাশি হাসছে। দুঃখ না, কান্না না, মনখারাপ না, রাগ। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আমার। চৈতিদির ওপর, কেকার ওপর, অংশুর ওপর অথবা সব মিলিয়ে আমার নিজের ওপর। সীমাদের লড়াই বেধেছে। অনেক রাগ ফেটে পড়ছে সেখানে। আমার রাগ ফেটে পড়ছে সেখানে। সীমনের কাছ থেকে আমি আরেকটা সিগারেট চেয়ে নিলাম।

আট

পরদিন সকালে আর থাকতে পারলাম না। প্রায় সারারাত ছটফট করেছি। সামনের বাড়িতে পুজো হয়। আজ পুজোর শেষ দিন। অল্প ঘুম মতন এসেছিল। ঢাকের শব্দে কেটে গেল। লাফিয়েই উঠলাম বলতে গেলে। বুকটা ঢিপঢিপ করছে। মশারির বাইরে এসে আলো জ্বাললাম। ভিতরের ঘরে মা ঘুমোচ্ছে। চোখেমুখে জল দিলাম। বাইরে এলাম। সুন্দর সকাল। পাখী ডাকছে। শিশির পড়েছে উঠোনে। ঝিমঝিম বাতাস। হেমন্ত আসছে। মুখ তুললাম। ছড়ানো আকাশ। নীল। সাদায় বাধা মেঘ। নরম। সুন্দর। আজ পুজোর শেষ দিন। কাল সকালে আলো ভাসান। সবটা উতল হয়ে উঠছে আমার। উতল হয়ে উঠছে সমস্ত পৃথিবী।

ডঃ দীপক দেব
বঙ্কিমমূল্যায়ন ১০-০০
(পি এইচ ডি থিসিস)
সাম্যবাদ (উপন্যাস) ৫-০০
(১৯৬৭ থেকে বিপ্লব, ৭৭ অবধি শাসন)
মাস্টার মশায় ৫-৫০
(শিক্ষক জীবন নিয়ে উপন্যাস)
অবাঞ্ছিত (উপন্যাস) ৪-০০
(পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন)
কলকাতা দেখেছি ৪-০০
উদারপন্থী উপন্যাস ৫-০০
প্রেমিক প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪
দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
বি।৪৯১২

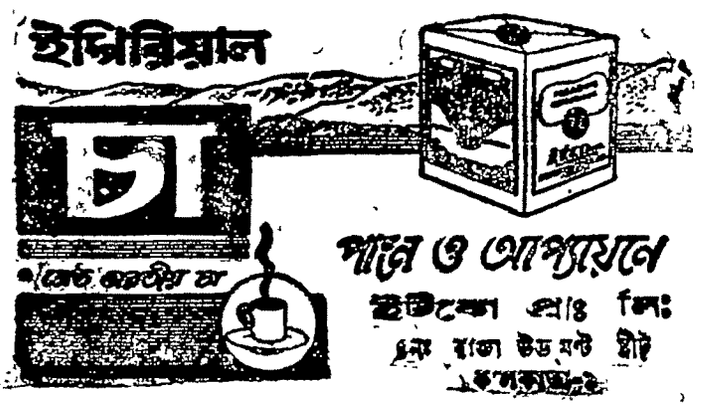

নয়

মা বলল, 'চান করবি না? এত সকালসকাল বেরোচ্ছিস যে?'

—এক্ষুনি আসছি। এসে চান করব। খাব। সব করব।

—কি যে পাগলামি করিস। মুখ ভার করে মা রান্নাঘরে চলে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ফাঁকা বাস পেয়ে গেলাম। উঠে পড়লাম।

কড়া নাড়তেই চৈতিদির মা খুলে দিল। বললাম, 'মণিমা চৈতিদি কই? এখনো ঘুমোচ্ছে?' হঠাৎ আমাকে দেখে মণিমা অবাক হয়ে গেল, 'একি রে! তুই? কবে ফিরলি?'

—কবে ফিরলি মানে?

—তুই না দেওঘর গেছিস? তা কবে ফিরলি? কাল?

সেরেফ বোকা বনে গেলাম। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'কাল না। পরশু ফিরেছি।' 'পরশু।' মণিমা গালে হাত দিল, 'পরশু ফিরেছিস, আর কাল সারাটা দিন একবার সময় পেলি না এখানে আসার। তোকে কদ্দিন দেখি নি জানিস? ভারী পাজী ছেলে তো। এখন তোকে কি শাস্তি দিই?' যেন ভাবনায় পড়ে গেল মণিমা। আমার চোখে জল এসে গেল। বললাম, 'বড্ড দোষ করে ফেলেছি। এবারটা মাপ করে দাও।'

—মাপ করব দেব? আমার হাত ধরে মণিমা ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল 'আগে তোর চৈতিদি আসুক। সে খুব রাগ করেছে তোর ওপর। তুই কোনো চিঠি দিস নি। আগে সে আসবে তারপর মাপ করব। ততক্ষণ তুই চা মিষ্টি খা।' তাড়াতাড়ি মিষ্টি নিয়ে এল মণিমা। বললাম 'কিন্তু আমার মাস্টারমশাই কনা গেলেন কোথায়?'

—ও গেছে প্যান্ডেলে। ফুল কাটতে। পাড়ার পুজো তো। ওরা সব বন্ধুরা মিলে ফুল কাটে।

—লাটু কই?

—লাটু? ও ঘরে গিয়ে দ্যাখ, নবাব-পুত্তুরের এখন মাঝরাত। বড় শব্দ বলি, পুজোর দিন। সকাল সকাল উঠবি। কে শোনে কার কথা। আটটা অব্দি পড়ে পড়ে ঘুমোবে।

—দাঁড়াও তো। হাতে একটা সন্দেশ নিয়ে লাটুর ঘরে গেলাম। হাত পা ছড়িয়ে বেদম নাক ডাকাচ্ছে। আচ্ছা করে ঠেলা দিলাম, 'এই লাটু, ওঠ। ওঠ। দ্যাখ কি এনেছি। ওঠ। ওঠ।' দু-চারবার ধাক্কা দিয়েও কিছু হোলো না। ও পাশ ফিরে নাক ডাকাতে লাগল। এবার টেনে তুলে বসিয়ে দিলাম। খুব জোরে ঝাঁকুনি দিতেই চোখ মেলল। আবার ঝাঁকুনি দিলাম, 'হাঁ কর। হাঁ কর।' ঘুমের ঘোরে লাটু হাঁ করতেই সন্দেশ পুরে দিলাম ওর মুখে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জেগে গেল লাটু। সন্দেশ মুখে, ওকে কেমন কাঁচুমাচু লাগছে। তাড়াতাড়ি বললাম 'খা। খা। খেয়ে ফ্যাল।' চটপট খেয়ে ফেলল। তারপর হাসল, 'সেনা তুই?' বললাম, 'উঠে দ্যাখ কটা বাজে। এখনো ঘুমোচ্ছিস যে?'

—তুই কবে এলি? দিদি বলছিল দেওঘর গেছিস। কবে এলি?

—পরশু। এখন জলদি জলদি ওঠ। তোদের প্যান্ডেলে যাব।

—প্যান্ডেলে যাবি। এই সকালবেলা প্যান্ডেলে যাবি কেন?

প্রখ্যাত গবেষক ও প্রবন্ধকার হারাধন দত্ত-র

সেকালের শিক্ষাগুরু

সেকালের শিক্ষকসমাজের অনেকেই আজ প্রায়-বিস্মৃত। এই গ্রন্থে বিগত-কালের ঈশ্যনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সারদাচরণ রায়, কুঞ্জলাল নাগ, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রমুখ উনিশজন শিক্ষাব্রতী সহ গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের জীবন ও সাধনার কাহিনী আলোচিত হয়েছে। দাম পনের টাকা।

গ্রীক নাটক সংকলন

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এতে আছে : এসকাইলাসের প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড, এ্যাগামেনন, সোফক্লিস, ইউমেনাইদেস। সোফোক্লিসএর ঈডিপাস, দি কিং, ঈডিপাস এ্যাট কলোনাস, আন্তিগোনে। ইউরিপিদেসএর হিপ্পোলিটাস, হেলেন, এ্যালসেস্টিস, মিডিয়া এবং এ্যারিস্টোফেনস্‌এর দি ফ্রগ। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। গ্রাহকমূল্য পনের টাকা।

শেকস্‌পীয়ার

৫ খণ্ডই পাওয়া যাচ্ছে।
গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা।

মপাসাঁ

৪ খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে।
গ্রাহকমূল্য ৬০ টাকা।

দান্তে

১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকাশিত হয়েছে।
গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা।

অসকার ওয়াইল্ড

২ খণ্ড সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকমূল্য ৩০ টাকা।

দেশবন্ধু রচনাসমগ্র

বাংলা ও ইংরেজী সকল রচনা। প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকমূল্য ২২ টাকা।

আসন্ন প্রকাশ :

শার্লক হোমস্‌

সম্পূর্ণ উপন্যাস ও গল্প। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহকমূল্য ৬০ টাকা।

প্রতিটি রচনাবলীর জন্য
৫ টাকা অগ্রিম দিন।

ডক্টর অমিয়কুমার সেন
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ১০্

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালরাত্রি ১০্ অভিনেত্রী ৬

অবধূত
ভোরের গোধূলি ১৬্ জয়ামাধুরী ১৫্
বিশ্বাসের বিষ ১০্
আমার চোখে দেখা ১০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নিশিবধূ ৮্ সূর্যমহল ৮্

কৌটিল্য গুপ্ত
স্নোফকস্‌ ক্যাবারে ১০্
বুদ্ধোকাসী ১০
পাথরের শিহরণ ১০্ প্যাশান ১২্

প্রবোধ সরকার
রূপসাবিণী ১৫্ বারবধূ ১০্

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ
কার্ল মার্কস ১০্ সবার প্রিয় সুভাষ ১৫্
নকশালবাড়ি ১০্ অলিন্দকোরক ১০্

বেদুইন-এর রাজনৈতিক গ্রন্থ
মাও সে-তুং একটি নাম ১২্
ওরা নকশালপন্থী কেন? ১০্

ভুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯, ফোন : ৩৪-৮১৮০।

—দরকার আছে।

লাটু হাসল, 'দিদির কাছে যাবি?'

রাস্তায় বেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। দুধের ডিপোর সামনে এসে লাটু বলল, 'তোরা দুধ পাচ্ছিস?'

—রোজ না। কি যেন একটা গোলমাল চলছে।

—এখন কদিন এরকম চলবে? আর দুধ যা দেয়। সব জল মেশানো। বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ। বললাম, 'খালি জল মেশালে বোঁটকা গন্ধ কেন হবে। অন্য কিছুও দেয়।'

প্যান্ডেলের কাছে এসে পড়েছি। পাশে একটা গ্যারেজ। দেখিয়ে বললাম, 'চৈতিদি কি এখানে ফল কাটছে?'

—হুঁ। তুই একটু দাঁড়া। আমি দিদিকে ডেকে আনছি।

একটু বাদে ফিরে এসে বলল, 'ভিতরে চল। দিদি ডাকছে।' বললাম, 'তোদের ঠাকুর তো এবার দারুণ হয়েছে। একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছিস।'

—সত্যি বলছিস? হেসে উত্তর দিলাম, 'না মাইরী সত্যি বলছি। দারুণ ঠাকুর হয়েছে তোদের।' কথাটা বলে আমি ঠাকুরের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি চৈতিদির কাছে এগিয়ে গেলাম। বিশাল শরীর। ডাকের সাজ। দশ হাত। কপালে তৃতীয় চোখ। দারুণ দুঃখে চৈতিদি জ্বলে যাচ্ছে। পায়ের কাছে অনেক ছড়ানো ফুল। ফুলের গন্ধ। চৈতিদি আমার চৈতিদি। কবে যেন মা বলেছিল, সুখ। কে যেন সুখে নেই? কে যেন সুখে আছে? আমি কি সুখে আছি? সুখ কি অসুখ—আমার চৈতিদি অসুখ হয়ে গেছে। আমার চৈতিদি অসুখ। লাটু আমার হাত ধরল, 'চল্ দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' চোখে জল মানায় না। একদম মানায় না আমাকে। তুমি অসুখ? চৈতিদির সামনে দাঁড়িয়ে আমি দুহাতে চোখ ঢাকলাম।

দশ

কালীপুজোর দিন বাজি কিনতে যাচ্ছি, নির্মলার সামনে দেখি কেকা। সঙ্গে ওর দিদি শম্পা। দেখি নি ভাব করে কেটে যাচ্ছিলাম, শম্পাদি ডাকল, 'এই ছেলেটা, পালাচ্ছিস যে। এই ছেলেটা।' থামতে হোলো। বললাম, 'কি ব্যাপার? তুমি? এদিকে কোথায়?' 'ধোসা খেতে।' আঙুল তুলে শম্পাদি কেকাকে দেখাল, 'ওর জন্য। দ্যাখ্ না, কোথায় ভাবলাম একটা ইভিনিং শো মারব বরের সঙ্গে। এখানে টেনে নিয়ে এল। উল্লুলাম যা একখানা বই এসেছে না। উত্তমের। তুই দেখেছিস?' আমি ঘাড় নাড়লাম, দেখি নি। শম্পাদি বলল, 'তুই এসময় এখানে কেন? কি কিনতে চলছি? বাজি? এবার তুবড়ি বানাস নি? আমি জানিস, সেদিন তোর অতীশদাকে বলছিলাম তোর তুবড়ির কথা।'

—অতীশদাটি কে?

—ভারী অসভ্য তুই। খালি ফাজলামি। ধোসা খাবি?

—ধোসা! আমি কেকার দিকে তাকালাম। কেকা তখন মন দিয়ে পাশের দোকানের ছ'মন্তর সুপুরীর প্যাকেট দেখছে। আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। হেসে বললাম, 'ধোসা থাক। আমরা এখন ছ'মন্তর সুপুরী খাব।' শম্পাদি অবাক হয়ে বলল, 'ওটা কি একটা খাবার জিনিস?'

কেকা এবার গম্ভীরভাবে এগিয়ে এল। বলল, 'দিদি বাড়ি যাব।'

—এই বললি ধোসা খাব। আবার বলছিস বাড়ি যাব। কেন?

—আমার ভাল লাগছে না। বাড়ি যাবি তো চল্।

—তোর কি সোনার সঙ্গে ঝগড়া নাকি? কথা বলছিস না যে?

—আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করি না।

—তাহলে কথা বলছিস না কেন? এই সোনা, কি হয়েছে রে? তোরা কথা বলিস না? কি হয়েছে?

—কি আবার হবে। আমি হাসলাম, 'কিচ্ছু হয় নি। আমি যাই শম্পাদি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

—তোর আবার কি হোলো? কিনবি তো ঐ বাক্সোবোমা, বোতলবোমা। তার জন্য এত তাড়া কিসের রে? এই ছেলেটা, শম্পাদি আমার পিঠে হাত রাখল, 'কি হয়েছে রে? তোরা কথা বলিস না কেন?' আমি আবার হাসলাম, 'কথা বলব না কেন? কথা না বলার কি আছে?'

—তাহলে বল্। বস্ তাহলে আমার সামনে।

—এই তো। আমি কেকার দিকে তাকালাম, 'ভাল আছো?' অদ্ভুতভাবে হেসে কেকা ঘাড় কাত করল। বলল 'তুমি ভাল? দিদি তুই যাবি তো চল্। আমি চললাম।' শম্পাদির প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা, 'চললাম কি রে? কি যে তোদের ধরন বুঝি না বাবা। এতদিন বাদে দেখা হোলে তো মানুষ বেশী বেশী কথা বলে। আর তোরা পালা দিয়ে ঢং শুরু করলি।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। বললাম 'আমি চলি শম্পাদি। অতীশদাকে বোলো যাব একদিন।' সোজা হাঁটা দিলাম বাজারের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা উড়নতুবড়ির কমপিটিশন হোলো আমাদের পাড়ায়। তিন রাস্তার মোড়ে। অংশু আসে নি। প্যান্ডেল গেছে। সীমন এল। একগাদা উড়ন নিয়ে। মোড়ে দাঁড়িয়ে খুব উড়ন ছাড়ল। আশেপাশে ভিড় জমে গেল দেখার জন্য। মা জানলা দিয়ে দেখছিল। ডেকে বলল, 'ছেলেটার বড় সাহস তো! তোর বন্ধু না? কি নাম রে?' উত্তর দিলাম সীমন। কেয়াতলায় থাকে। দারুণ ছবি আঁকে। বুঝলে?'

—তুই ওকে বারণ কর না। ঐসব উড়নটুড়ন ভারী পাজী জিনিস। কখন কি হয়ে যায়। আহা কি সুন্দর ছেলে গো!

হেসে বললাম, 'ভেবো না মা। ওর কিচ্ছু হবে না। দেখছ না সব ফটা উড়নকে কিরকম চাকর বানিয়ে রেখেছে।'

—তা হোক। চিন্তিতমুখে মা সীমনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু বাদে বলল, 'ছবি আঁকে বলছিলি। কি ছবি রে?'

—সূর্যাস্তের। ওটাই ওর সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট।

(চলবে)

যৌন রোগ সিফিলিস সম্বন্ধে
এক প্রামাণ্য গ্রন্থ
গোবিন্দ বিশ্বাস রচিত

সিফিলিস

দাম ষোল টাকা
প্রাপ্তিস্থান
বি বি কুণ্ডু এণ্ড সন্স
১৮এল, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৯

বিশ্বভারতীর বই

কলকাতা বই মেলায়
১০ শতাংশ কমিশনে পাওয়া যাচ্ছে।

১ মার্চ ১৯৭৮ থেকে

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা—৭০০০১৭

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।।পাঁচ।।

লাবণ্য আরজেন্ট অর্ডার দিয়ে একবেলার ভেতর দিলীপের জন্যে পাঞ্জাবি বানিয়ে দিল। টেবিসিল্কের। মজুরি সমেত একশো সাতচল্লিশ টাকা।

সেই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দিলীপ বলল, আমি নাচবো। পেটে তখন তার মোট পাঁচ পেগ হুইস্কি। দু' বোতল বিয়ার। একসঙ্গে খায়নি।। [illegible] আটটার ভেতর—দফায় দফায় খেতে হয়েছে। মোট তিনবারে। তিনরকম লোকের সঙ্গে।

পশ্চিম ভারতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মত একই ফ্লাইট রেটে গোবিন্দ স্টিলকে কয়লা দেবার চুক্তি আজই করেছে দিলীপ। ওদের কলকাতার জোনাল অফিস সেই সুবাদে পার্টি দিল। ওরা ভৌমিক ট্রাস্টের সঙ্গে চুক্তি করলো। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে। [illegible] ক্যাপিটাল চাই। তার অনেকটাই গোবিন্দ স্টিল জোগাবে।

ব্যাংক ন্যাশানালাইজ করার পরেও অনেক ব্যাংক তার বাইরে। তেমনি কোল ন্যাশানালাইজেশনের পরেও রাজমহল, আসাম, মধ্যপ্রদেশ—অনেক জায়গায় কয়লার নতুন খনি কিংবা আগেকার লিজ খনি এখনও ন্যাশনালাইজেশনের বাইরে। ভৌমিক ট্রাস্টের এ-খনিও ন্যাশানালাইজেশনের

কঠিন হয়নি সেখানে। সাবসয়েলের শুরুতেই কয়লা। প্রায় কুপিয়েই পিট সাইড ওপেন করা সম্ভব হয়েছে।

আইনের মারপ্যাঁচ, খনির, রেলের নিয়মকানুন—সবই এতদিনকার চাকরিতে বসে দিলীপ ভালোভাবেই চিনেছে। সেই সঙ্গে দিলীপ একথাও জানে—কয়লার স্তর শুরু হবার আগে যে সেল বা জয়াট কাদা থাকে—তা যদি মিশেল দিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে পড়তার গিয়ে ভালো লাভ থাকারই কথা।

কে না জানে—প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীগুলো গত কবছরে এল আই সি-র ব্যবসার বড় এক চাঙ্ কেড়ে নিয়েছে। টাকার অঙ্কে কয়েকশো কোটি। আজই দুপুরে গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে কয়লা ডেলিভারির কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর চুক্তির কাগজে টাকার অঙ্কটা দেখে নিজেই ভেতরে ভেতরে দুলে উঠেছিল দিলীপ। ছত্রিশ লক্ষ। সত্যিই যদি কোনদিন ভৌমিক স্ট্রাস্টের খনি সফল হয়—মুনাফার শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে যায়—তাহলে আশপাশের সব খাদান খুলতে হবে। কোল ইন্ডিয়ার ব্যবসার একটা বড় চাঙ্ ভৌমিক স্ট্রাস্ট কেড়ে নেবে সেদিন।

কোল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেকটর, বোর্ডের চেয়ারম্যান খোঁজ নেবে। কে এই দিলীপ বসু? কোথায় ছিল এতদিন? আমাদেরই স্টাফ? আশ্চর্য! ওকে গত চোদ্দ বছরে আমরা কোন প্রোমোশন দিইনি। আমাদের এতবড় ইন্সটিটিউশনের কমপেন-সেশনও টারিফ, ক্লায়েন্ট, ওয়াগন মুভমেন্ট দেখতো। আশ্চর্য! আসলে তো লোকটা কয়লার উইজার্ড। আমরা কি করেছি এতকাল?

গোবিন্দ স্টিলের লোকজনের সঙ্গে পার্টিতে মজে যেতে যেতে এসব কথা আজই দুপুরে মনে হচ্ছিল দিলীপের। এরকম তো কোনদিন হতেও পারে। ওরা কোলগ্যাস দিয়ে একটা তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফার্নেস চালায়। গুজরাট, রাজস্থান মহারাস্ট্রের দিককার ইনগট সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারে না। ওরাও তো মাত্র কয়েক বছর আগে ভৌমিক ট্রাস্টের মতই সামান্য দিয়ে শুরু করেছিল। আমরাও তো একদিন গোবিন্দ স্টিলকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। ওয়েস্ট কোস্টের খনির সামলাতে এখুনি বোম্বাইয়ে অফিস খোলা দরকার। সেখানে বসে পশ্চিম ভারতের চাহিদা পরিষ্কার দেখা যাবে। বছরে অন্তত দুবার গিয়ে দিলীপ সেখানে কাটিয়ে আসবে।

বিকেলে ভ্যান্সিটার্ট রোয়ের সেভিংস্ কোম্পানীগুলোর একটাতে গিয়ে ওদের কর্তাকে পাকড়েছিল দিলীপ। ওদের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানটা খুলতে গিয়ে কিছুই বোঝা হোল না। মাঝখানে থেকে একটা বিয়ার গিলতে হোল। সন্ধ্যেবেলা ঋষির ফোন। অফিসে আসছিস্ নে কেন?

তুই তো অফিসের চোখে গুড্ বয়। আমরা চক্রোত্তির সঙ্গে জিন্ খেয়ে বেড়াচ্ছিস।

ফোন করে ট্যুরে নিয়ে গেল। লোকটা বুড়ো হয়ে গেল চোখের সামনে—সেতো অফিসেরই ট্যুর ঋষি।

অনাথদা বললে কি করবো বল দিলীপ।

আমি তো অফিসের চোখে ব্যাড্ বয় হয়ে যাচ্ছি।

তা কেন?

মার্কেটিং ডিভিশন নিশ্চয় জানতে পেরেছে।

ও চিন্তা করিসনে দিলীপ। ভৌমিক ট্রাস্টের কয়লা এতই সামান্য—যে, কোল ইন্ডিয়ার পক্ষে কিছু মনে করার মত নয়।

আমিও বেড়াতে যেতে পারতাম ঋষি।

যাবি।

কিন্তু যাইনি ঋষি।

ফোনের ওপাশে ঋষি খানিক থেমে থেমে বলল, সবাই তো একরকম হয় না দিলীপ। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না।

কাজ কথাটা শুনে—এপাশে দিলীপের কানে ফোনের বিসিভার সিসের চেয়েও ভারি হয়ে উঠলো। আজ ক্লাস হোল—দিলীপ কাজের বদলে কমিশন পায়। সই করে চেক দেয় ঋষি। কখনো ঋষির বউ লাবণ্যও সই করে। লাবণ্যর সই করার ভঙ্গীটা খুব মজার। চেকটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দেখুন তো দিলীপ—কোন ভুল হয়নি তো। খনি, ইনভেস্টমেন্ট, কমিশন থেকে লাবণ্য যেন যোজন যোজন দূরে। শুধুমাত্র চেকের এই সইটা দিয়ে অলীক এক খাদানের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছে লাবণ্য। যে-খাদান দ্বারকানাথ ঠাকুরের টাইমে হয়তো জরীপ হয়েছিল। খাদান খোলার কাজে হাত গড়েছিল হয়তো দেবেন ঠাকুরের দিনকালে। তারপর বন্ধ ছিল কয়েক যুগ। মীরা তার অনন্ত ভৌমিককে দৌড়ঝাঁপ করাতে গিয়ে খাদানটা খুলে দিয়ে বসে আছে। কলকাতা থেকে কালীপাহাড়ি—তারপর আরও খানিকটা—সেখানে মাঠের ভেতর অবিকল এক স্বপ্ন। যাকে সেন্টার করে কলকাতায় ঋষি, মীরা, অনন্ত, গোকুল, দিলীপ—যে যার মত টগবগ করে ফুটছে, বড় বাধা এসে দাঁড়ালে বিষাদ তার জাল ফেলে ওদের তুলে নিচ্ছে।

ঋষি আবার বলল, তুই যা পারিস—আমি কি তা পারি?

সেকথা হচ্ছে না। আমি তো সারাদিন পরে এই চান করে উঠলাম।

বানীকে নিয়ে চলে আয়।

কাল কিন্তু আমায় বিমলা গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সিপিং—মাইনিং—দুজায়গাতেই মহিলার ফ্যামিলি ইন্টারেস্ট—

তা যাবি। এখন তো আয়।

মহিলাকে যদি বোঝানো যায়—তাহলে আর আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। একাই এগিয়ে আসবেন। প্যাসিফিকে ওঁর নিজেরই তিনখানা জাহাজ ঘুরে বেড়ায়—

এখন তো চলে আয়। পরে শুনবো। গোকুলদা এসেছে। রেখা বৌদি, মীরা, অনন্ত—সবাই এসেছে। চলে আয় এখুনি।

আমার একটা ভালো পাঞ্জাবি লাগবে। বাঙালীর পোশাকে যাবো ভেবেছি। ওদিকে অফিসেও যাইনে কতদিন। সব ছুটি যে ফুরোয় ঋষি—

লাবণ্য তোর জন্যে পাঞ্জাবি বানিয়ে রেখেছে। চলে আয়—

ঋষির ফ্ল্যাটে পৌঁছে সিঁড়ির মুখে বানী বলল, রোজ এতটা করে মদ খাচ্ছো। সকালে মাথা ধরে পড়ে থাকবে। এত কমিশন দিয়ে কি হবে আমাদের?

দরজার বেল টিপবার আগে দিলীপ বানীর মুখে ফিরে তাকালো। সিঁড়ির আলোটা নিভু নিভু। দিলীপের গলা দিয়ে চাপা শব্দ বেরিয়ে এলো। একটু আনন্দ করতে শেখো।

আনন্দ তুমি খুঁজে বেড়াও কেন? তোমার মনে আনন্দ নেই?

আরেকটু হলেই ডোরবেল বেজে উঠতো। ভাগ্যিস টিপিনি। নিজেই নিজেকে বলল দিলীপ। বন্ধ দরজার ওপাশে ঋষির গলার গান। গোকুলদার হা হা হাসি। দিলীপ আবার বানীর মুখে তাকালো। সেখানে সংসার বসে আছে।

রবি আজ তিনদিন বাড়ি ফেরে নি। কোন খোঁজ নিয়েছো তুমি।

তাই নাকি? আমায় বলোনি কেন?

কাকে বলবো! তুমি মাঝরাতে বেহুঁস হয়ে ফিরছো আজ ক'মাস।

সে তো আমার কাজ।

কাজ না ছাই। ও কমিশনে তোমার কি দরকার? কুটুকে বিশ্বনাথ একখানা চিঠি দিয়েছে—

বিশ্বনাথ বড় ভালো ছেলে। সুন্দর গায়। ভারি সুরেলা গলা।

তাই বলে তোমার মেয়েকে চিঠি দেবে?

আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওরকম দু'একখানা চিঠি লেখে। পায়। ও নিয়ে তুমি কোন ইম্পর্টান্স দিও না। আপনা-আপনি ভুলে যাবে সব ওরা। আমাদের চেয়ে ওরা কত অ্যাড্ভ্যান্সড্ তা জানো? রবিটা কোথায় যেতে পারে? আগেও তো এমন হাওয়া হয়ে যেত। ফিরেও এসেছে।

সামনে অনার্স পরীক্ষা। একটা খবর নেই।

দিলীপ ডোরবেল চাপ দিল। ভেতরে ঢুকতেই রীতিমত হুল্লোড়। প্লেটভর্তি টাটকা মাছভাজা। কাঁচা লঙ্কা। নুন। মীরা বোতল থেকে বিয়ার খাচ্ছিল।

ঋষি মীরার কাঁধে হাত রেখে গান ধরলো। সেদিকে তাকিয়ে অনন্ত ভৌমিক হাসলো। তারপর একবার বলল, বেচারা—! খানিক বাদে সেই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দিলীপ বলল, আমি নাচবো। পেটে তখন তার মোট পাঁচ পেগ হুইস্কি। দু' বোতল বিয়ার।

এ ঘরে এখন নাচ সম্ভবত কেউ জানে না। দিলীপ নিজেও জানে না। বিকেলের ক' পেগের পর সন্ধ্যায় স্নান—নেশাটাকে ঝাঁঝিয়ে দিয়েছে। তারপর এখানে আরও খানিকটা। দিলীপের শরীরের ভেতরটা চনমন করে উঠলো। ঋষির গলায় তালের গান। দরাজ, মিষ্টি স্বর।

দিলীপ দুলতে লাগলো। সেই সঙ্গে গোকুলদার হাততালি। মীরার হাসি। গোকুলদার দুই নম্বর বউ এত সবের ধার ধারে না। এখানে কেউ, তাকে রেখা বউদি বলে। কেউ বলে রেখা সে আগে গোকুল দত্তর বিয়ের ক্যানভাসার ছিল। এখন তার জন্যে আলাদা ভাড়া করা বাড়িতে মাসে বড় এক কৌটো গোকুলস ঘি যায়। সেই ঘি খাওয়া শরীরে গরমের ভেতর লাল জর্জেটের আঁচল খসখস শব্দ করে খসে যাচ্ছিল। দিলীপ দু'পাক নাচবার পরেই রেখা তার হাত ধরে দুলতে লাগলো। আর অমনি গোকুল দত্তর হাতে বাজের আওয়াজে তালি দিতে লাগলো। প্রায় কান ফাটানো শব্দে। সেদিকে তখন কারো খেয়াল নেই। খেয়াল রাখার অবস্থাও নয় কারও। শুধু বানী সেই আওয়াজে কেঁপে উঠে নিজের কান খোঁটাতে লাগলো। আমি তো জানতাম না—তুমি এত সুন্দর নাচতে পারো।

লাবণ্যের খুব ভালো লাগছিল। পাঞ্জাবি গায়ে দিলীপ দিব্যি গানের তালে নেচে যাচ্ছে। ঋষি হাসি মুখে গাইছে। তার হাতের সামনে কালো গম্ভীর নামের বোতল। মীরা এখনো ঋষির ভারি ডান হাতখানা কাঁধের ওপর রেখেছে। অনন্ত তাতে একটুও আপত্তি করছে না। মীরা একবার রাগ করে বললো, সব বিয়ার ফুরিয়ে গেছে? যাও। এক্ষুনি নিয়ে এসো এক বোতল।

অনন্ত উঠছিল।

লাবণ্য বললো, বোসো। যেতে হবে না। ফ্রিজের ভেতর থেকে একটা এনে দিল।

রেখা সমান তালে দিলীপের হাত ধরে নাচছে। দু'জনেই ঘেমে অস্থির। গোকুল দত্ত হাততালি থামায়নি। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান ফাটানো আওয়াজ করছিল। সেটাই তার আনন্দ এখন।

দিলীপের নাচতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু শরীরের ওজন তাকে দমবন্ধ করে দিতে লাগলো। নয়তো আজকের সারাটা দিনই তার—সাকসেস্। একটার পর একটা। এখন সে স্বচ্ছন্দে স্বপ্ন দেখতে পারে—কোল ইন্ডিয়া ছাড়াই ভৌমিক ট্রাস্টের নতুন ক্যাপিটালে নতুন নতুন খাদ খোলা হচ্ছে। একটার পর একটা। একদিন হয়তো রাজমহলে—আসামে ভৌমিক ট্রাস্টের পতাকা উড়বে।

দিলীপ এখন জানে না, তাকে কেমন দেখাচ্ছে। তার গলার স্বর আদৌ সুরেলা নয়। তবু সে গেয়ে উঠলো—

কয়লার বয়স নাকি পঁচিশ কোটি বছর-অ-অ—

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত গাইলো—তাই নাকি? তাই নাকি? মোটে?

আপনাদের সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
একটা সুসংবাদও দিচ্ছি। বর্ধমান, রাঁচী ও জামসেদপুরে আমরা মুখ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছি।
যাতে আপনাদের আরো কাছ থেকে সেবা করতে পারি।
তাঁদের ঠিকানা নীচে দেওয়া হ'ল।

এখন আমরা ত' আপনাদের প্রায় দোরগোড়ায় এসে গেলাম।
আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করুন। আমাদের পরিকল্পনাগুলি বিশদ ভাবে জেনে নিয়ে আপনার যেটা পছন্দ বেছে নিন।
আশা করি আমাদের সাত লক্ষ পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে আপনিও যুক্ত হবেন।

ইউনিট কিনুন। ধা. . ধাপে সঞ্চয় বাড়ান।

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

8 ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা ৭০০০০১

★ বর্ধমান
জে. এম. বিশ্বাস
১০৩ আর বি. ঘোষ রোড
খোশবাগান
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন : ৩৪৪৩

★ জামশেদপুর
জে ডি অধিকারী
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং
বিস্টুপুর, জামশেদপুর

★ রাঁচী
এইচ. পি চৌধুরী
সি/১৫ নেতাজীনগর
কান্টাটোলী
রাঁচী-৮৩৪০০১
টেলিফোন : ২৩০৫৪

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

দু পাক ঘুরে দিলীপ আবার গাইলো—

সেখানেই আমাদের ফরচুন—অ—অ—অ—

আ হা—বলেই সেই সুরে গলা মেলালো অনন্ত

কোল রাস! কোল রাস!! ওনলি? টু হাণ্ড্রেড ইয়ার্স বিহাইণ্ড—

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। হাসি থামলে ঋষি আদর করে ডাকলো, এই পাগল! এদিকে আয়। একটু জিরিয়ে নে।

ঋষির গলায় এ-ডাক দিলীপের পক্ষে অনেকখানি। সে ঋষির গলায় গান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। মনে হয়, সে গলায় আগেকার আভার দানা চিনি ঝরে পড়ে। সে ঋষির মুখে কোনদিন কারও নিন্দা শোনেনি। আগে আগে একটু পেটে পড়লেই দিলীপের নেশা হয়ে যেতো। তখন সে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে? এই ঋষি তো। ঋষি তখনো এখনকার ঋষি নয়। লাবণ্যর সঙ্গে সবে বিয়ে হয়েছে। তখন একবার দিলীপ ঋষির সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। সারারাত আড্ডা দেবে বলে। দোতলায় জ্যোৎস্নায় বসে। রাত আটটার পর। ট্যাকসিতে। দোকান বন্ধ। পথে এক এক জায়গায় থামছিল ঋষি। সর্দারজীর হোটেলে খোঁজ নিচ্ছিল। যদি পাওয়া যায়। সেই ঋষি।

দিলীপের হাতে পেটির বড় মাছখানা তুলে দিল ঋষি। মোটা হবে গেছিস। এই শরীরে অতটা নাচিসনে। খেয়ে নে—

লাবণ্য দেখছিল—দুজন পুরুষলোক—দুজনকে কেমন করে ভালবাসে। দুজনই মোটা। একই সময়ের মানুষ। তার স্বামী গেয়ে উঠলে দিলীপ যে কী প্রশংসার চোখে তার স্বামীর মুখে তাকায়। ভাবখানা—দ্যাখো, আমার বন্ধু শুধু কোল ইণ্ডিয়ার চাকুরেই নয়—তার চেয়ে অনেক বড়—কী সুন্দর গায়।

রানীও এ-দৃশ্য না দেখে পারেনি। সে-ও তাকিয়ে ছিল।

ঋষি প্রায় ঘোষণার গলায় বললো, দিলীপ আমাদের মিরাক্যাল্ ম্যান।

গোকুল দত্তও চেঁচিয়ে বললো, সে একশোবার। পাগল যদি মাথাটা ঠিক রাখতো।

আমি পাগল নই গোকুলদা। আমি আস্তে আস্তে হাবা হয়ে যাচ্ছি।

সবার হাসির ভেতর ঋষি বলতে লাগলো। দিলীপ না হলে ডৌমিক ট্রাস্টের খনি খোলাই যেত না। আজ যে সেখান থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে—তার পেছনে দিলীপের পরিশ্রম অনেকখানি।

মীরা একটা বিয়ার এগিয়ে দিল দিলীপকে। এইটে খেয়ে নাও দিলীপদা। অনেক নেচেছো।

তুই খা। তারপর দিলীপ চেঁচিয়ে বলল, একা আমি নই—সবাই মিলে—সবাই মিলে—

বোঝাই যাচ্ছিল, দিলীপের নেশা হয়েছে।

অনন্ত হাসতে হাসতে বললো, বুঝলে দিলীপদা—তুমি এখন টপ অব দি ওয়ার্ল্ডে আছো।

সেখানে তো বরফ পড়ে!

টাকাও পড়ে দিলীপদা। এত অল্প-দিনে এত জোগাড় করলে কি করে?

গোকুল দত্ত বলল, দিলীপ আমাদের সব পাবে। সব—

নেশা এসে দিলীপের ঘাড় ধরলো। শকত করে। দিলীপের লজ্জা হচ্ছিল। সে এভাবে কোন আলাদা ক্রেডিট চায়নি। খনি একটা বড় জিনিস। সবাই মিলে একসঙ্গে এগোবার ব্যাপার। এসব ভাবতে ভাবতেই দিলীপ বলে ফেললো, একদিন ঋষি দেখবি—ঠিক রেল কোম্পানী আমাদের জন্যে লাইন পেতে দেবে। পিটসাইড অব্দি। তখন আমরাও বড় খনি চালাবো। সবাই আমাদের জানবে—

বড় জিনিসে আমার ভীষণ ভয় দিলীপ। তখন অনেক গভীরে গিয়ে কয়লা কাটতে হবে। এই তো বেশ চলছে। একদম ওপর থেকে মাটি কাটার মত কয়লা কাটা যাচ্ছে।

তাই বলে গভীরে যাবিনে?

বেশ তো আছি ভাই।

আমরা কোনদিন কোল ইণ্ডিয়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো না?

ওসব পাগলামি দিলীপ। আমরা তো অরগানাইজেশন, ইন্সটিটিউশন বানাতে আসিনি। কিংবা শিল্পপতিও হতে চাইনি।

মীরা বিয়ারের বোতলটা নামিয়ে রেখে বলল, হলে দোষটা কি? ভালোই তো হয়।

দিলীপ নেশার ভেতরেই বলল, তবে আমরা কি হতে চাই?

অনন্ত ঘরের থমথমে ভাবটা কাটিয়ে দিতে বলল, কথাবার্তা সব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি একটা গাইবো।

রানী পরিষ্কার বুঝলো, তার স্বামী আর এখানে একজন আগন্তুক মাত্র। অথচ আগন্তুক হয়েও দিলীপ একটু আগে এখানে নেচেছে। গেয়েছে।

সেদিন সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মিনিবাস থেকে নেমে স্বাতী বলল, এটাই তো মোমিনপুর। তাই না?

দিলীপ ওকে কোন কথা বলতে না দিয়ে সোজা একটা গাড়িবারান্দার নিচে এনে দাঁড় করালো। আমি তো কাছেই থাকি। এখনি ট্যাকসি পেলে চলে যাবো। কিন্তু তুমি তো ভিজে যাবে। ফার্ন রোডের ওদিকটাতেই আছো?

স্বাতী বলল, না। মতিলাল নেহরু রোডে—

সুধীরবাবু ও-পাড়ায় উঠে এলেন কবে?

ও আসেনি তো। আমি এসেছি। আমরা আর একসঙ্গে থাকি না।

কি বলছো স্বাতী? আমার জন্যেই সুধীরবাবু সাততাড়াতাড়ি তোমার বিয়ে করে ফেললেন।

তখন তো আমার বয়স কম ছিল। কিন্তু বুঝতাম না দিলীপদা। তুমি আমাকে অঙ্ক কষাতে। সুধীর এসে পাহারা দিতো।

একদিন আমায় খুব অপমান করেছিল সুধীরবাবু। আমি তখন বেকার। ও তখন সরকারী দফতরে ক্যামেরাম্যান। তার কদিন বাদে তোমায় পড়াতে এসে দেখি—সিঁথি ভর্তি সিঁদুর।

খুব কষ্ট পেয়েছিলে! আমিও বুঝিনি। বাবা নেই। মা সুধীরের ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে বিয়ে দিয়ে দিল।

তা পেয়েছি। কিন্তু এখন আর কোন কষ্ট নেই। অনেকদিনই নেই।

তাই হব দিলীপদা।

ইস্! গাড়িটা যদি থাকতো এখন। তোমায় পৌঁছে দিতাম। খারাপ হয়ে পড়ে আছে গঙ্গার ধারে। ড্রাইভার সারিয়ে নিয়ে তবে ফিরবে।

সোফার ড্রিভিন। তুমি নিজে চালাও না?

শেখার সময় পাইনি।

বড়লোক! তা ভালো। ব্যস্ত লোকদের নিজে চালানো ভালো নয়। আমি কিন্তু নিজে চালাতাম।

গাড়ি? কোথায় রেখেছো?

এখানে নয়। আমেরিকায় থাকতে। নিউইয়র্কে—

আমেরিকায় গিয়েছিলে? বলে নিজের মনেই হিসেব করছিল দিলীপ। কি করে গেল? স্বাতী তো হায়ার স্টাডিজের মেয়ে ছিল না কোনদিন।

বিউটিসিয়ানের কোর্স করতে। একটা কসমেটিক কোম্পানী পাঠিয়েছিল। তারপর থেকেই তো সুধীর বিগড়ে গেল। আচ্ছা বল তো দিলীপদা—আমি সাধারণ মেয়ে। নিজে থেকেই সবার সঙ্গে মিশতে বললো। চাকরি করতে পাঠালো। কাপড়ের শো-রুমে ছিলাম কিছুদিন। তারপর চাকরি পাল্টাতে পাল্টাতে একদিন দেখি আমি একটা কসমেটিক কোম্পানীর ফিল্ড অর্গানাইজার বনে গেছি। তখন থেকেই ও আমায় ইনসাল্ট করতে শুরু করলো। দু দুবার এবরশনের পর আমি সব মা হয়েছি। সেই অবস্থায় সুনন্দকে মায়ের কাছে রেখে স্টেটসে চলে গেলাম।

বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো থেঁতলে যাচ্ছিল। অসময়ের মোমিনপুর কেমন ফাঁকা ফাঁকা। দিলীপ যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কোন অজানা লোকের জীবনী শুনছিল। এই

মেয়েটির জন্যে আমি একদা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

তুমি নিশ্চয় কোন বড় অফিসে কাজ করো। অনেক কন্টাক্টস তোমার। আমায় একটু হেলফ করো না। আমি এখন একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে ভাড়ার কাজ জোগাড় করি। তুমি তো অনেককে চেনো। দ্যাখো না একটু দিলীপদা।

তোমার থিউটিসিয়ানের কোর্স ?

তার জন্যে তো চেম্বার চাই। সে জন্যে তো টাকা চাই। সেলামি ছাড়া কি কেউ ভালো রাস্তায় ঘর দেবে। ভালো রাস্তায় সাজিয়ে না বসলে বড়লোকের বউ-ঝিরা কেন আসবে ? সে জন্যে তো টাকা জমাচ্ছি।

এর চেয়ে তো সুধীরের বউ হয়ে থাকলে পারতে।

তা আর সম্ভব নয়। মার সামনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে আমার মন নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ একদিন নিজেই আমায় ঠেলে ডালহৌসি পাঠিয়েছিল। আমি কিছু জানতাম না সেদিন। ধাক্কা খেতে খেতে সব শেখার পর—আমায় বলে কিনা—আমি অস্পৃশ্য ? আমি অশুচি ? বোকো মজা। এর পর আর এক সঙ্গে থাকার মানে হয় না।

সুধীর কোন খরচ দেয় না ?

আগে ছেলের পড়ার খরচা দিতো। এখন আর দেবে কি করে।

কেন ?

বাঃ। আমি তো পালিয়ে আছি। আমার ঠিকানাই জানে না। ছেলেকে স্কুল পালটে একদম অন্য পাড়ায় নিয়ে গেছি। সুধীর তো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ছেলে কিছু বলে না ?

বলে। কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে হতে সব বুঝবে। আমি কিছুই ভাঙি নি ছেলের কাছে।

এই ক' বছরে এতগুলো গোলমাল পাকিয়ে বসে আছো।

আর বোলো না। জানোই তো বাবা কত খোলা মনের মানুষ ছিলেন। অবস্থাও আমাদের ভালো ছিল তখন। বাবা চলে যেতে আমরা এমন গরিব হয়ে পড়লাম—নয়তো সুধীরের মত লোক মাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে ? আমি তো সব বুঝতে পেরে বিয়ের প্রথম দশ বছর মা হইনি। সুধীরও চাইতো না। শেষের দিকে ও কিন্তু প্ল্যান করে আমার মা করে দিল। আমাকে যেন তেন দখল করতে ও তখন উঠে পড়ে লেগেছে। একটু অসাবধান ছিলাম—আর অমনি। ততদিনে ওকে আমি চিনে ফেলেছি। সেলফিস্। হিংসুটে। পারভার্ট। শেষ দিকে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে পাড়ার কচি মেয়েগুলোর সঙ্গে ফ্ল্যার্ট করতো।

সর্বাঙ্গ ভিজে একটা বাস এসে থামলো। সেটাকে যেতে দিয়ে স্বাতী বললো, বিশ্বাস করবে না দিলীপদা—বিবাহিত লোক—তবু আশপাশের বাড়িতে কাউকে দেখলে ইসারা করে, অঙ্গভঙ্গী করে।

এ পাগলামি তোমারই জন্যে স্বাতী। তোমাকে না পেয়ে।

হয়তো আমাদের একদিন ভালোবাসা ছিল দিলীপদা। তবে তা অনেক দিন আগে। আর কিছু পড়ে নেই। তোমার বউ নিশ্চয় খুব সুন্দরী।

ভীষণ। একদিন চলে এসো।

আমার তো বেড়িয়ে বেড়ানোর সময় নেই। কাজ আর ছেলেকে নিয়ে আছি।

এই কার্ডখানা রাখো। দরকার হলে ফোন করবে।

দরকার তো হবেই দিলীপদা। তুমি কোল ইন্ডিয়ায়। বাঃ। আমায় দু একটা বড় খদ্দের ধরে দাও না। যাদের অনেক সার্ভিস চাই—

তোমায় আমি একটা ভালো কাজ দিতে পারি। ফোন করে চলে এসো।

আমি যাবো কিন্তু।

তোমার ঠিকানা তো দিলে না স্বাতী ?

ফলো করার চেষ্টা কোরো না। আমি এখন কাউকে ঠিকানা দিচ্ছি না।

আমার ছেলে অনার্স পড়ছে।

পুরুষ লোকের আবার বয়স কি? একদম বিশ্বাস নেই। একই ছেলে ?

ছেলে একটা। মেয়ে একটা। মেয়ে ছোট।

আমার খুব মেয়ের শখ ছিল।

বিফাইনারি থেকে ডিস্টিলারি। চা থেকে চিনি। সব ব্যবসাই আছে—এমন কোম্পানী তো স্যার লেজলিউডের। স্বাধীনতার মাত্র এক বছর আগে স্যার লেজলি স্যার হন। তখন ওঁর মোটে বাইশ বছর। ওয়া বাপ থেকে ছেলে—সবাই

মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ

প্লেক (Plaque)
হল জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আলগার দাঁত আর মাড়িতে অবসরেই জড়িয়ে থাকে। অযত্নের ফলে, প্লেক বছরানে পুরিণত হয়।

ফলক
দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজ করবার সময় দুর্বল আর ফোলাটোলা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে ঘাবড়া না গেলেও ক্ষতের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তারদের বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাতে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

বিনামূল্যে—দাঁত আর মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙিন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন: ফরহান্স কেমিক্যাল এক্সটাইনারী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১১৪১৩, ডিপার্টমেন্ট P 129-180, বম্বে ৪০০ ০২০। যে ভাষায় চাই জানাবেন।

ফরহান্স
টুথপেস্ট
দাঁতের
ডাক্তারের তৈরী

180-F.173-P BG

এভাবে নাইট হয়ে আসছে। রানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে। ওদের বাড়ির কেউ না কেউ রাজবাড়ির জন্যে প্রাণ দিয়েছে। সম্মান এনেছে।

বয়স বোঝার উপায় নেই। দিব্যি জোয়ান চেহারা। স্যার লেজলি দিলীপকে তার ভিলায় নেমন্তন্ন করলো। তোমাদের খানির সঙ্গীদের বাউকে এনো। আমায় সব বুঝিয়ে বলতে হবে।

দিলীপ বুঝলো স্যার নরডো অনন্ত—বাউকে নিয়ে আসতে হবে। সে কাগজে দেখেছে, পার্লামেন্টে স্যার লেজলির খরচ-খরচা নিয়ে কোশ্চেন আনসার হয়। বিলেতে 'সীমাতিরিক্ত' কথাটা কোম্পানির খরচার ব্যাপারে দিয়ে ইংরেজি বাংলা—দুই ভাষাতেই লেখা।

পুরনো আমলের বাড়ি। তখ, কোম্পানির ইতিহাস যে এসেছে দেড়শো বছরের পুরনো তা বোঝাতেই যেন বনেদী প্যাটার্নের দরজা, কাঠের প্যানেল, রিসেপশনে ঘন সবুজ কার্পেট, হাউস ম্যাগাজিনে, কিছু সুখী কর্মচারীর ছবি।

একতলায় নেমে দিলীপ দেখলো, কোম্পানির লোকজনের প্রায় একশোখানা গাড়ি ফুটপাথে লেজা গুঁজে সারি সারি দাঁড়ানো। তার এক ফাঁকে সনাতন গাড়ি পার্ক করিয়েছে। কলকাতায় পুরো দস্তুর বর্ষা। গাড়িগুলোর ছাদে বর্ষা পড়ে নানা রকমের ছবি আঁকতে আঁকতে জলের ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ছিল।

এখন ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলে একদম ভিজতে হবে। বৃষ্টি থামা অব্দি দাঁড়িয়ে থাকবে বলেই ঠিক করলো দিলীপ। সামনেই কি একটা আদালত বাড়ি—সাত পুরনো—গায়ের ছাল-বাকল উঠে গেছে—পুরনো পাইপ দিয়ে নল গল করে জমা জল ছাড়ছে।

এখন গোকুলদা নিশ্চয় তার গোডাউনে বসে ঘিয়ের টিন সিল করাচ্ছে। কিংবা খাটালের মোষদের জন্যে খড়ের স্টক পরীক্ষা করে দেখছে। সামনে পুরো বর্ষা। অনন্ত তার ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে বসে হয়তো চেয়ারম্যানকে দরকারী স্ট্যাটিসটিকস্ এগিয়ে দিচ্ছে। পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে। এম-পি'রা ঘুরে ঘুরে কোশ্চেন করছেন। কলকাতায় পর এম পি-দের টিম যাবে মাদরাজে। মীরা পার্ক হোটেলের আর্কেডিয়ায় সম্ভবত সারা গায়ে অর্ধেন্টমেন্ট বাথ নিচ্ছে। তাতে কর্পূরের গন্ধ। মাথাটা তেলের ওপরে। আজ সাত দিন হোস কাল করিয়েছে।

বৃষ্টির ছাঁট এসে পা ভিজে যাচ্ছিল দিলীপের। সনাতন কাঁচ তুলে দিয়ে ভেতরে ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়। এখন কোন বিজনেস হাউসে—কিংবা বড় বাড়িতে ড্রাইভার মুখে—সনাতনের চোখের সামনে ডান হাতের দুটো আঙুল দোলায় দিলীপ। একটা ধরো। হবে? কি হবে না শেয়ার নেবে তো? যদি নেয় তো আমার কমিশন থেকে কি চাই তোমার?

একটা হাতঘড়ি দেবেন দাদাবাবু।

কিংবা কোনদিন সনাতন বলে, এবার দাদাবাবু আমাদের দেশে দশ বিঘে ধানী জমি কিনুন।

কিনবো। কিনবো। এই ডিজাটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই কিনে ফেলবো। দশ নয়—একবারে পঞ্চাশ বিঘে। বড় করে দিঘী কাটাবো।

এক লক্ষ্যে তো অত জমি পাবেন না দাদাবাবু।

টাকা বেড়ি থাকলে সব পাওয়া যায় সনাতন।

এই পৃথিবী এখন দিলীপের অন্তহীন লাগে। বিশেষ করে ডালহৌসি। এইটুকু জায়গা। অথচ এর এক ফুট অন্তর শেয়ার, লগ্নী, কমিশন। আমি এত বছর তাহলে কি করেছি? শুধু চেয়ারে বসে অন্যের বোঝা বয়েছি—আর মাস মাইনে পেয়ে খুশী থেকেছি। এখন আমার সামনে সারা ডালহৌসি। তার ওপর দিয়ে শুধু হেঁটে গেলেই হয়। পুরো ডালহৌসিকে যদি বোঝাতে পারি—যদি কনভিন্স করা যায়—তাহলে তো অঢেল ক্যাপিটাল। সেই ক্যাবিটালের কার্পেটের ওপর দিয়ে আমি এখন হেঁটে যাবো। আমার গলায় সমকলের গাড়ির সেই ঘন্টাটা বাজবে। পেছনে থাকবে চিড়িয়াখানার একটা হরিণের বাচ্চা। নতুন টাটকা গায়ের রং। রোদ পড়ে পিছলে যাবে। আমরা দুজন হেঁটে রাস্তা পার হবো জি. পি ও-র সামনে। তখন সব গাড়ি থেমে যাবে। টয়োটা, কারমান ঘিয়া, ওপেল অ্যামবাসাডর অস্টিন, টুরার। সবার স্টিয়ারিং থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখবে। ওই যে সে আর তার হরিণশিশু রাস্তা পার হচ্ছে। সারা ডালহৌসিকে লোকটা কনভিন্স করেছে। আমার মত লোককেই ইংরেজিতে টিকস্টার বলে। অথচ আমি আসলে মোটেই স্মার্ট নই। মোটা সব ভুলে যাচ্ছি। হয়তো শীগগিরি হাবা হয়ে যাবো। অনেক দিন পরে নিজের চেয়ারে বসে দিলীপ বসু ইন্টার কমে ঋষিকে চাইলো। ঘরে নেই। কোথায় যেতে পারে। বাইরে বৃষ্টি।

কোল ইন্ডিয়ার সিক্সথ্ ফ্লোর সবচেয়ে বেশি সাজানো। সেখানে মেরুন রঙের কার্পেট, আগাগোড়া কাঠের প্যানেল, একজন অনামা খনি শ্রমিকের ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু, গদিওয়ালা চেয়ার দিয়ে সাজানো ভিজিটার্স রুম, কনফারেন্স রুম, বড় বড় কর্তাদের পেল্লায় পেল্লায় ঘর। সে সব ঘরের একদিকের দেওয়াল পুরোটা কাঁচের। দরকারে ভারি পর্দা টানলে ঘরের আবহাওয়া ভারি গম্ভীর হয়ে যায়। পর্দা সবাইকেই ছাদের ওপর তৈরি সাজানো বাগান। সেখানে শীতের দুপুরে কিংবা গরমের সন্ধ্যায় ডিগনিটারিদের জন্যে গার্ডেন পার্টি বসে দুপুরবেলায় রঙীন ছাতার নিচে কখনো কখনো চেয়ারগুলো ঘনিষ্ঠ হয়।

এই ঘরগুলোর একদম কোণেরটায় বসেন চেয়ারম্যান। তার তিন ঘর আগে বসে অনাথ চক্রবর্তী। ন্যাশানালাইজেশনের অনেক আগে থেকেই কয়লায় যারা নিজেদের কাজের ছাপ রাখতে পেরেছে—তাদের ভেতর প্রথম দুটি নাম—অনাথ চক্রবর্তী আর সাধন গুপ্ত। অনাথদা আজকাল খুব অ্যাকটিভ নয় ঠিকই—কিন্তু যারা জানে—তাদের চোখে তিনি একটি নাম। একদা তার কাজ তাকে এ-নাম দিয়েছিল। এখন একদম কিছু না করার—তার জিন খাওয়া—তার আড্ডা—তাতে আরেক রকমের নাম দিয়েছে। তাতে কিছু গল্প কথা মেশানো। কিছু পাগলামি মেশানো। বছর বছর কোল ইন্ডিয়া তার পুল থেকে অনাথকে নতুন গাড়ি দেয়। তার বেডানো, তার মেডিক্যাল, তার এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টস—যেন, এখন একদা কাজ করার—ভীষণ বেশি কাজ করার জন্যে ঋণ শোধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কোল ইন্ডিয়ার পক্ষে। সেই তুলনায় সাধন গুপ্ত—অতটা কাছাখোলা নয়। সে নিয়ম-মাফিক এক্সটেনশনের মেয়াদ বাড়িয়ে চলেছে। গাম্ভীর্য সহকারে এই ফ্লোরে

একটি ঘরও দখল করে আছে সাধন গুপ্ত। এই সাধন একদা নতুন খাদান খোলার লোক আমদানী করতো ছত্তিশগড় থেকে। পুরনো খাদান ছেড়ে আসার সময় বালি বোঝাই করে স্টো করতো—পাছে না পাশের খাদান কোল কাটিংয়ের সময় ভেঙে পড়ে। সিক্‌সথ ফ্লোরে এলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়লার ইতিহাসের শেকড়শুদ্ধ যেন দেখতে পায় দিলীপ। এখানে সব পুরনো। এখানকার সেই ইতিহাসের গন্ধ সে পরিষ্কার টের পায় নিজেরই নিঃশ্বাসে। এই দেড় যুগের ওপর কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারে বসে বসে—পয়লা তারিখে মাইনে পেয়ে পেয়ে সে এইটুকু বুঝেছে—এই অফিস তাকে কিছুই দেয় নি। আরও বেশি করে বুঝতে পেরেছে এই ক'মাসে। ভৌমিক ট্রাস্টের হয়ে খাদান খোলার ক্যাপিটাল জোগাড়ে নেমে সে জানতে পেরেছে—এই ফ্লোরে বসে যারা ডিসিসন নেয়—তাদের অনেক কিছু করার ছিল তার জন্যে। কিন্তু কিছুই করে নি তারা। দিলীপ বসু এতকাল তাদের কাছে 'ফর গ্র্যান্টেড' হয়েই ছিল। এক এক সময় এদের অদ্ভুত লাগে দিলীপের। উঠতেও দেবে না তাকে। বাড়তেও দেবে না। প্রিয় দিলীপ—তোমাকে আমরা যে চেয়ারটি, যে টেলিফোনটি দিয়েছি—সেটি নিয়ে আমাদের পছন্দমত থাকো। ফাঁকি দাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়তে চেয়ো না। তোমায় যেমন রাখতে চাই তেমন থাকো দিলীপ। এক একদিন ভালো গাইতি দিয়ে এই ফ্লোরটা আগাগোড়া তার উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অনাথ চক্রবর্তীর ঘরের দরজা খুলতেই যা আশা করেছিল—তাই দেখতে পেলো দিলীপ। অনাথের মুখোমুখি ঋষি বসে। বাধা, সুবোধ, অনুগত অনুগামী কথা। মাইকেলের লাইনগুলোর টিউন এসে ধাক্কা দেয় কানে।

বোসো দিলীপ। বোসো। এখন আমি ঋষিকেই সবচেয়ে ভালবাসি। তার পরেই তুমি।

অন্যদিনের মত দিলীপ এ হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। তার মন বললো, ঋষি—আমি যখন অফিস ফেলে স্যার জেজাজির টেবিলে সাত কাহন কথা পেড়ে চলেছি—তখন তুমি এ-ঘরে বসে অনাথ চক্রোত্তির সঙ্গে বসে তার ইন্ডিওসিনক্রেসিতে তা দিয়ে চলেছো। কারণটা আমি জানি ঋষি। ম্যানেজমেন্টের হাই পাওয়ার কমিটিতে অনাথ চক্রোত্তি আছে—তাই নয় কি?

ঋষিকে পরিষ্কার অনাথ চক্রোত্তির কথা তুলতে ঋষি বলেছে—হি ইজ এ ব্লেক শাউ। একসময় তো অনেক করেছে মানুষটা। কলার জন্যে। আমাদের জন্যে তো বটেই। ভেবে জন্যেও—

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই দিলীপের। দিলীপও চুপ করে রেকেছে। কিন্তু একথাও সে ভুলতে পারে না—কৃতজ্ঞতার দাম কত? রাস্তা থেকে ধরে এনে অনাথ চক্রোত্তি তাকে, ঋষিকে এ অফিসে বসিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেই বসানোর দাম কত? কতদিন ধরে সে-দাম দিতে হবে?

কি? কথা নেই কেন মুখে। এখন তো তুমি মোটা টাকার মানুষ!

কোথায় আর? আমি কি কাজ করি এ-অফিসে তা তো আপনি জানেন অনাথদা।

অফিসের বাইরেও তো করো!

সে-ও তো আপনি জানেন। একটু থেমে দিলীপের মনে হোল এখুনি তার ভেতরকার অনেক কথার ডালা খুলে ফেলা দরকার। হাসতে গিয়ে দেখলো, যদিও নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, তবু বুঝলো—তার মুখে সামান্য জ্বালা হচ্ছে। নিজের মুখটা যেন দুমড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, আমার সামনে আর কোন রাস্তা খোলা রাখা হয়নি। আমি তো এতকাল এমন একটা সুযোগের জন্যে বসেছিলাম। আমাকে ঋষি ওরা কাজে লাগানোতে আমি তো বেঁচে গেছি। এখানে তো জানিই—আমার কিছু হবার নয়। হবার নয় অনাথদা—

ধৈর্য ধরো।

একথা একদিন সাধন গুপ্তও বলেছিলো। অনেকদিন আগে।

ঋষি কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবে বলে একদম অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। দিলীপ কিন্তু উইজার্ড লোক। কোত্থেকে যে ক্যাপিটাল আনছে—কীভাবে আনছে—ভাবলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন অনাথদা।

সে-জন্যেই তো দিলীপের জন্যে আমার চিন্তা হয়।

দিলীপ মনে মনে একটা মার খাওয়া মানুষ হয়েই ছিল। একথার মানে সে জানে। সে জানে—আজ হোক কাল হোক কোল ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিভিশন সব জানবে। কিংবা অলরেডি জেনে বসে আছে। আচমকাই দিলীপ বলে বসলো, অনাথদার ভালবাসাবাসির নদীতে নিজেই উনি পছন্দমাফিক উঁচু নিচু ঢেউ তোলেন। আর ও তো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না। কিন্তু তুই? তুই ঋষি? তোর তো এমন কথা ছিল না।

ঋষি কি বলবে বলে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না।

(চলবে)

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খন্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস) কান্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন— (Phl. of Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
(For B.U.) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—
দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত
কুলীন কুলসর্বস্ব ১০-০০

শিক্ষক শিক্ষণ (B. Ed and Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস—
(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস— ১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান ৩য় সং ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
সংশোধিত ৩য় সংস্করণ ১৫-০০
Higher Secondary
Philosophy (English) edition 18.00
অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, ঘোষ ও হালদার
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৮-০০

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯ ফোন : ৩৪ ৭২৩৪

অস্ট্রেলিয়া সফর \ ১৯৭৭-৭৮

সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের ১৯৭৭-৭৮ সালের টেস্ট সিরিজের ব্যাটিং গড় তালিকায় ভারতের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন—গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮৯, মোট রান ৪৭৩ এবং গড় ৫২-৫৬। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন—গ্রেহাম ইয়ালাপ—খেলা ১, ইনিংস ২, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২১, মোট রান ১৪৫ এবং গড় ৭২-৫০। তার পরই দ্বিতীয় স্থানে আছেন রিক ডার্লিং—খেলা ১, মোট রান ১২১ এবং গড় ৬০-৫০। তৃতীয় স্থানে আছেন অধিনায়ক বব সিম্পসন—খেলা ৫, ইনিংস ১০, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৬, মোট রান ৫৩৯ এবং গড় ৫৩-৯০।

উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন সিম্পসন—মোট ৫৩৯ রান। তার পরই বিশ্বনাথের মোট ৪৭৩ রান। টেস্ট সিরিজে মোট ৪০০ বা তার বেশী রান করেছেন ভারতীয় দলে এই তিনজন—বিশ্বনাথ (৪৭৩), গাভাস্কার (৪৫০ রান) এবং অমরনাথ (৪৪৫ রান)। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া দলে একমাত্র—সিম্পসন (৫৩৯ রান)।

টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন এই পাঁচজন—ভারতের গাভাস্কার (৩টি) ও অমরনাথ (১টি) এবং অস্ট্রেলিয়ার সিম্পসন (২টি), টনি ম্যান (১টি) এবং ইয়ালপ (১টি)। গাভাস্কারের তিনটি সেঞ্চুরীর বিশেষত্ব আছে। তিনি উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে এইভাবে সেঞ্চুরী করেছেন—১ম টেস্টে ১১৩ রান, দ্বিতীয় টেস্টে ১২৭ রান এবং ৩য় টেস্টে ১১৮ রান। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে এইভাবে একজনের পক্ষে উপর্যুপরি তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরী করার নজির আর নেই। আলোচ্য টেস্ট সিরিজের ব্যাটিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন ভারতের স্পিনবোলার চন্দ্রশেখর—তিনি ১ম, ৩য় ও ৪র্থ টেস্টে গোল্লা করে আউট হন, দ্বিতীয় টেস্টের উভয় ইনিংসে কোন রান না করে নটআউট থাকেন এবং শেষ ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ২ রান ও ২য় ইনিংসে ২ রান করে আউট হন।

টেস্টের বোলিংয়ের গড় তালিকায় ভারতের পক্ষে শীর্ষস্থান পান মদনলাল—১৯৭ রানে ৯ উইকেট (গড় ২১-৮৯)। এরপর দ্বিতীয় স্থান পান বিশেষ সিং বেদী ৭৩০ রানে ৩১ উইকেট (গড় ২৩-৫৫) এবং তৃতীয় স্থান চন্দ্রশেখর ৭০৪ রানে ২৮ উইকেট (গড় ২৫-১৪)। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে ভারতের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করলেন বেদী—৭৩০ রানে ৩১ উইকেট। এবিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ছিল প্রসন্নর—২৬ উইকেট (১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজ)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজের বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন টমসন—৫১৬ রানে ২২ উইকেট (গড় ২৩-৪৬)। অস্ট্রেলিয়ার দিক থেকে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন ক্লার্ক—৭০১ রানে ২৮ উইকেট (২৫-০৪)। এঁরা দুজনেই মদনলালের বোলিংয়ের গড় (২১-৮৯) থেকে অনেক নীচে।

টেস্টের বোলিংয়ে এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশী উইকেট এবং একটি খেলায় ১০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন একমাত্র ভারতীয় বোলাররা। এই দুই বিষয়ে ভারতীয় বোলাররা অস্ট্রেলিয়াকে টেক্কা দিয়েছেন। এক ইনিংসের খেলায় বেদী ৫টি করে উইকেট পান তিনবার—১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫৪ রানে ৫ উইকেট এবং ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৮৯ রানে ৫ ও ২য় ইনিংসে ১০৫ রানে ৫ উইকেট। চন্দ্রশেখর ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫২ রানে ৬ ও ২য় ইনিংসে ৫২ রানে ৬ উইকেট এবং ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ১৩৬ রানে ৫ উইকেট পান। মদনলাল ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ৭২ রানে ৫ উইকেট পান টেস্টের একটি খেলায় ১০ বা তার বেশী উইকেট পান এই দুজন—চন্দ্রশেখর ১০৭ রানে ১২ উইকেট (৩য় টেস্ট মেলবোর্ণে) এবং বেদী ১৯৪ রানে ১০ উইকেট (২য় টেস্ট, পার্থ)।

যে ১৭ জন ভারতীয় খেলোয়াড় ১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে যান তাঁদের মধ্যে সুবিন্দর অমরনাথ এবং অতিরিক্ত উইকেট-কিপার ভারত রেড্ডী বাদে বাকি ১৫ জন টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। পাঁচটা করে টেস্ট ম্যাচ খেলেন এই ৭ জন—বেদী, গাভাসকার, বিশ্বনাথ মহিন্দর অমরনাথ, বেঙ্গসরকার, কিরমানি এবং চন্দ্রশেখর। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলে খেলেছিলেন ১৯ জন। পাঁচটা করে টেস্ট ম্যাচ খেলেন এই ৫ জন—সিম্পসন, টুহি, বিকসন, টমসন এবং ক্লার্ক।

ভারতের বেদী, প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, অমরনাথ, মানকাদ, বিশ্বনাথ এবং ভেঙ্কটরাঘবন—এই সাতজন বাদে বাকি সকলের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলা এই প্রথম। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বব সিম্পসন বাদে বাকি সকল ভারতের বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

বিবিধ রেকর্ড

এডিলেডের শেষ ৫ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ভারতের ৪৪৫ রান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতের সর্বাধিক রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ভারতের এই ৪৪৫ রান আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসের খেলায় ৪০০ বা তার বেশী রান করার যে ক্ষুদ্র তালিকা আছে তাতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। ভারতের এই ৪৪৫ রানের মাথার উপরে আছে—ইংল্যান্ড ৬৫৪ রান ৫ উইকেটে (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯)।

এডিলেডের ৫ম টেস্টে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার সমষ্টিগত রান দাঁড়ায় ১৪৭৫ (৪০ উইকেটে)। এই রান ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার যে-কোন একটি টেস্ট খেলায় সমষ্টিগত রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালের টেস্ট সিরিজে বি বিশ্বনাথের ৪৭৩ রান (গড় ৫২-৫৬) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের পক্ষে রেকর্ড রানে পরিণত হয়েছে।

মেলবোর্নের ৩য় টেস্টে চন্দ্রশেখরের ১২ উইকেট (১০৪ রানে) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের পক্ষে একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ডে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ সালের টেস্ট সিরিজে বেদীর ৩১ উইকেট (গড় ২৩-৫৫) ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ডে পরিণত হয়।

১৯৭৭-৭৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : মোট খেলা ২০, জয় ১২, পরাজয় ৬, ড্র ১ এবং খেলা পরিত্যক্ত ১।

পার্থের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ২ উইকেটে হারার পর ভারতীয় দল পর পর দুটি খেলায় দুর্বল টাসমানিয়া দলের কাছে ৩ উইকেটে এবং ৮৪ রানে হেরে যায়।

দর্শক

বাঘা ক্রিকেটার পাতৌদি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

।। নয় ।।

ভারতীয় নির্বাচকদের মতিগতি বোঝা দায়। এক সময় তো তাঁরা এক একটি টেস্টের জন্যে এক একজনকে অধিনায়ক করে মাঠে নামাচ্ছিলেন। যার জন্যে পুরো ভারতীয় দলটাই নড়বড়ে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

ক'বছর আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত সফরে এলে তরুণ সেনগুপ্ত নামে এক অজানা খেলোয়াড় সফরকারী দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করেছিলেন। পলি উমরিগড় চেয়েছিলেন তরুণ সেনগুপ্তকে টেস্টে খেলাতে। উমরিগড়ের ফুর্তি ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল, গিলক্রীস্টের মতো দুর্ধর্ষ ফার্স্ট বোলারদের বিরুদ্ধে যিনি অমন সবলীল ভঙ্গীতে শতরান করতে পারেন তাকে টেস্ট দলে নেওয়া উচিত। কিন্তু উচিত-অনুচিতের ধার ধারতেন না ভারতীয় নির্বাচকরা। তাই নিয়ে নির্বাচকদের সঙ্গে উমরিগড়ের মতোভেদ হল। এবং উমরিগড় সরে দাঁড়ালেন ভারতীয় দল পরিচালনা করা থেকে। ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে তা ছিল অপূরণীয় ক্ষতি।

তবে তরুণ পাতৌদি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হবার পর ভারতীয় ক্রিকেটের চেহারা একেবারেই বদলে গিয়েছিল। দলগত সংহতির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর ফিল্ডিংয়ের দারুণ উন্নতি হয়েছিল। ফিল্ডিং ভারতীয় ক্রিকেটের এক চিরন্তন দুর্বলতা। পাতৌদি অধিনায়ক হয়ে প্রথমেই নজর দিয়েছিলেন সেই দিকে। পাতৌদি নিজে নিপুণ ফিল্ডার। তাঁর অনুপ্রেরণায় ভারতীয় দলের চেহারাটাই পুরোপুরি বদলে গেল।

তারপর আচমকাই একদিন নির্বাচকদের খামখেয়ালীপনার শিকার হতে হতে বেঁচে গেলেন ভারতের তরুণ দলনায়ক। নির্বাচকদের মধ্যে কারো কারো মাথায় ঢুকেছিল যে তিনি নাকি চোখে ভালো দেখতে পান না। পাতৌদি নাকি এক চোখে খেলেন।

কথাটা মিথ্যে নয় ঠিকই। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? বাটসম্যান হিসেবে পাতৌদি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। এক বছর আগে দিল্লিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ২০৩ রান করেছেন। ভারতের আর কোন খেলোয়াড়ই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দুশোর ওপর রান করতে পারেন নি। আর দল পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে মুহূর্তে পাতৌদির মধ্যে ভারত একজন সৎ ও নিপুণ অধিনায়ককে খুঁজে পেয়েছে বলে সবাই ধরে নিয়েছিলেন তখনই নেপথ্যে চলছিল আর এক খেলা।

ক্রিকেটের রাজকুমার পাতৌদিকে সরিয়ে দেবার জন্যে, তাঁর হাত থেকে অধিনায়কের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেবার জন্যে অনেকেই কোমর কষে মাঠে নেমে পড়েছিলেন ১৯৬৪ সালে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রবি সিম্পসন তাঁর দল নিয়ে ভারত সফরে আসছেন। ভারতীয় দল গড়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে আগেই। পাতৌদিই যে অধিনায়ক হবেন সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই ছিল না।

অথচ ঝামেলা বাধলো ঐ অধিনায়ক নির্বাচনের সময়ই। নির্বাচকদের কেউ কেউ পাতৌদিকে খারিজ করে দেবার চেষ্টা চালালেন। তাঁদের অভিযোগ, পাতৌদি চোখে ভালো দেখতে পান না। অবশ্য কেউ কেউ আবার পাতৌদির পক্ষেও ছিলেন। ভোটাভুটিতে দেখা গেল সমান সমান ফলাফল। তখন নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন বেচুবাবু অর্থাৎ এম দক্ত রায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাস্টিং ভোটের জোরেই পাতৌদি ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন।

পুরো ব্যাপারটাই ছিল অত্যন্ত গোপন। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেল। কাগজে ছাপা হল নির্বাচন পর্বের পুরো ব্যাপারটাই। পাতৌদি দারুণ অবাক হয়েছিলেন খবরটা পড়ে। সেই সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে একটা জেদ দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁকে ভালো খেলতেই হবে। তিনি যে অধিনায়ক পদে যোগ্য তার প্রমাণ তাঁকে দিতেই হবে।

অস্ট্রেলিয়ার দলটা অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংলণ্ড সফরের তিরিশটি খেলার মাত্র তিনটিতে হেরেছে তারা। তাছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া বরাবরই ভালো খেলে। মাত্র একটি টেস্টে হেরেছে তারা। ১৯৫৯-৬০ সালের কানপুর টেস্টে। নতুন সেই উইকেট যেন ঠিক সময়েই ভেঙে গেল। জেসু প্যাটেল মাত্র ২৪ রানের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আট আটজন ব্যাটসম্যানকে। অফ স্পিনার প্যাটেল অবশ্য তারপর আর বেশীদিন খেলেন নি।

মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে পাতৌদি টসে হারলেন। আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র তখন বাপু নাদকর্ণীর নিপুণ হাতে মাঝ লেংথে বোলিং আর আঁটোসাঁটো ফিল্ডিং।

নাদকার্ণী দারুণ বল করলেন। মাত্র ৩১ রান দিয়ে পেলেন পাঁচটি উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার শেষ দুটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৫০ রান যোগ হতে না হতেই। প্রথম

।। প্রকাশিত হলো প্রকাশিত হলো ।।

• শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের •

।। ক্রিকেট খেলার আইন কানুন ।।

সকলের ভালো লাগার মতো করে লেখা বইটি গল্প উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়। প্রতিটি আইনের সঙ্গে আছে সেই নিয়মটি সৃষ্টির গল্প। ছোটদের জন্য সরলভাবে লেখা এবং অজস্র স্কেচ ও ছবিতে ভরা বইটি ক্রিকেট খেলতে হলে, শিখতে হলে, বুঝতে হলে, কি আম্পায়ার হতে হলে এই বইটি পড়তেই হবে।

দাম—ছয় টাকা

• শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের •

।। আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বই ।।

।। বাদশা গোলাম ।।

[তৃতীয় সংস্করণ]

বিশ্ব ফুটবলের দুই কিংবদন্তী পুরুষ পেলে আর ইউসোবিওকে নিয়ে লেখা এই আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বইটিতে আছে ভাল ফুটবলার হওয়ার গোপন কাহিনী। এঁরা কেমন করে বড় হলেন, খেলা শিখলেন, বিশ্ব বিজয় করলেন—তারই কাহিনী। ফুটবলের দুই দিকপাল পুরুষের নানা ছবিতে ভরা বইটি পড়া উচিত, তাঁদেরই যাঁরা ফুটবল ভালোবাসেন বা ভাল খেলোয়াড় হতে চান।

দাম—পাঁচ টাকা

খ্যাতনামা বেতার ভাষ্যকার ও সাংবাদিক

• অজয় বসুর •

।। সম্রাট সোবার্স ।।

[শীঘ্রই প্রকাশিত হবে]

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার স্যার গ্যারী সোবার্সকে নিয়ে বাংলা ভাষায় এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বই বেরুচ্ছে। বইটি বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি এবং পাঠক পাঠিকাদের অনেক দিনের একটি চাহিদা পূরণ করবে। বইটির আর এক আকর্ষণ ঝকঝকে কাগজে ছাপা অনেকগুলি ছবি।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ-৭০০০৭৩

ইনিংসে টেনেটুনে তারা করলো ২১১ রান।

ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠলো গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি আর নীল হকের বলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা অসহায়ের মত আউট হয়ে যেতে লাগলেন। মাত্র ৭৬ রানের মধ্যে ভারত হারালো পাঁচটি উইকেট। বোরদে তখন ব্যাট করছিলেন। পাতৌদি এসে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

খেলার চেহারাও বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মারার বল মেরে ওঁরা দুজনে খেলতে লাগলেন। অস্ট্রেলিয়ার কোন বোলারই ওঁদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। ষষ্ঠ উইকেটে বোরদে ও পাতৌদি ১৪২ রান যোগ করলেন। তৃতীয় দিন সকালে পাতৌদি শতরাণ পূর্ণ করলেন। কিন্তু বোরদে আউট হয়ে যাবার পর পাতৌদিকে সঙ্গ দেবার মত আর কেউ রইলো না। ম্যাকেঞ্জি আর হক ভারতের নিচের দিককার ব্যাটসম্যানদের চটপট প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ৬৫ রানে এগিয়ে থেকে ভারত শেষ করলো ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে সিম্পসন ও বিল লরী ৯১ রান যোগ করায় খেলাটা ভারতের মুঠোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল। বার্জ ও ভিভার্সও দারুণ ব্যাট করলেন। ভারত যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিং শুরু করলো জেতার জন্যে তখন দরকার ৩৩৩ রান। কিন্তু গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির বলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা চটপট আউট হয়ে যেতে লাগলো। মাত্র ২৪ রানের মধ্যেই ভারত হারালো চারটি অতি মূল্যবান উইকেট। পঞ্চম দিন সকাল থেকে বিজয় মঞ্জরেকার ও হনুমন্ত সিং দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়তে লাগলেন। মনে হল ভারত বুঝি জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওঁরা দুজন আউট হয়ে যাবার পর ওনীল আর ভিভার্সের স্পিন বোলিং ভারতের সব আশা ধূলিসাৎ করে দিল। মাত্র ১৯৩ রানে শেষ হলে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। অস্ট্রেলিয়া জিতল ১৩৯ রানে।

সেঞ্চুরি করে পাতৌদি নির্বাচকদের মুখের ওপর জবাবের মত জবাব দিলেও, ঐভাবে হেরে যাওয়াটা তিনি মোটেই খুশী মনে নিতে পারেন নি। যে খেলায় ভারত জিততে পারতো সেই ম্যাচেই হেরে গেল।

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন : ৬৭-২৩৫৯, শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পাতৌদির মনে তখন জয়ের সংকল্প। শতরান করে তিনি ব্যাটিংয়ে পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। ফিল্ডিংয়ে নিপুণতার দিক দিয়ে তাঁর ধারে কাছে পৌঁছুতে পারেন ভারতে তেমন আর কেউ নেই। সেদিক দিয়ে তিনি তাঁর সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে পেরেছেন। এবার তাঁকে জিততে হবে। যে করেই হোক জিততে হবে।

তিনদিনের মধ্যেই বোম্বাইয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। প্রথম টেস্টে পরাজয়ের শোধ সেখানে তুলে পাতৌদি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিতে চান। চান নিজের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটকে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করতে। তারই পরীক্ষা বোম্বাইয়ে: এবং মাত্র তিনদিনের মধ্যেই....!

(চলবে)

ঘটেছিল

সিডনির খুব কাছেই কিলানে দ্বীপ। পিকনিক করার অতো সুন্দর জায়গা চট করে পাওয়া যায় না। আই যাঁরা সিডনিতে খেলতে যান—কিলানে দ্বীপে পিকনিক করতে কিংবা বেড়াতে তাঁরা যানই।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সেবার এম সি সি দল গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফরে। সিডনিতে খেলার ফাঁকে ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা ঐ দ্বীপে গেলেন। প্যাটসি হেনড্রেন ছিলেন দলে। তাঁর মত মজা আর হৈ হৈ করতে পারেন এমন খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়াই ভার। যেমন নিজে হাসেন, তেমনি পারেন লোককে হাসাতে।

হেনড্রেনই হৈ হৈ করতে করতে সকলকে নিয়ে সাত সকালে দ্বীপে এসে হাজির। সেখানে তখন জনা দশ-বারো ছেলের জটলা। দূর থেকে দেখা গেল ব্যাট বল আর উইকেটও আছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু বাকী যাদের আসার কথা ছিল তারা আসেনি। তাই খেলাও শুরু করা যাচ্ছে না।

ঠিক সেই সময়ই ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের নিয়ে নৌকোটা এসে ঘাটে লাগলো প্যাটসি লাফিয়ে নেমে পড়লেন. ছেলেদের দল থেকে একজন ছুটে এসে তখন বললো, 'তোমরা কজন আছো?'

প্যাটসি হেনড্রেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'তা জনা বারো তো হবেই।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার জন্যে তোমাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'

ছেলেরা কেউই ওঁদের চিনতে পারে নি। বরং আনাড়ি ভেবেছে। মজা পেয়ে ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা হৈ হৈ করতে করতে নৌকো থেকে নেমে পড়লেন।

খেলা শুরু হল। বড়দের দলই আগে ব্যাট করছে। ধ্যাৎ এরা কেউ খেলতে পারে না। ছেলেরা ভাবছে এদের হারিয়ে ভূত করে দেবে। চটপট উইকেট পড়ে গেল দু-তিনটে। এবার হেনড্রেনের পালা। ডাকসাইটে ব্যাটস ম্যান হেনড্রেন। জগৎজোড়া নাম তাঁর। কিন্তু ওখানে কে আর চেনে তাঁকে।

হেনড্রেন উইকেটের সামনে এসে উল্টো করে ব্যাট ধরলেন। বাঁহাতটা নীচে, ডান হাতটা ওপরে। তাই দেখে ছেলেদের দলের উইকেটরক্ষক তো হেসেই খুন। সে তাড়াতাড়ি এসে কিভাবে ব্যাট ধরতে হয় দেখিয়ে দিল। হেনড্রেন সেইভাবেই ধরলেন। এবং বলটি পত্রপাঠ সমুদ্রে পাঠালেন। উইকেটরক্ষকের গর্ব আর ধরে না। বললো, 'দেখছ তো ঠিকভাবে ব্যাট করলে কি, রকম মারা যায়।'

ছেলেদের একজন ততোক্ষণে জামা প্যান্ট খুলে সাঁতার কেটে বলটা এনেছে। বোলার বল করতে আসছে। হেনড্রেন আবার ভুলভাবে ব্যাট ধরেছেন। বোলারকে থামিয়ে উইকেট রক্ষক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। আবার সে হেনড্রেনের ব্যাটটা ঠিক করে দিল। 'তোমায় বলেছি না এইভাবে ব্যাট ধরতে হয়। কোনদিন খেলোনি নাকি ক্রিকেট?'

পরের বলটা হেনড্রেন সমুদ্রের আরো গভীরে ফেললেন। সেখান থেকে আনা আর সম্ভব নয়। খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা ফিরে যাচ্ছেন। বোলার ছেলেটির খটকা লেগেছিল। অমন সহজভাবে মেরে যে তার বল সমুদ্রে ফেলেছে সে কিছুতেই আনাড়ি হতে পারে না। সে এসে বললো, 'আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো—আপনি কি প্যাটসি হেনড্রেন?'

কথা শেষ হল না, তার বন্ধুরা হো-হো করে হেসে উঠলো। একজন বলে উঠলো, 'উনি যদি হেনড্রেন হন তাহলে আমি চার্লি ম্যাকারটনি.'

নৌকোটা তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে আর ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের প্রাণখোলা হাসিতে বাতাস যেন কাঁপছে....!

চিত্রধ্বনি

চকোলেট কেলেংকারি

ফর্মুলা ফিল্মের গণ্ডী ডিঙিয়ে পরিচালক জে ওমপ্রকাশ যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। তা বলে তার মোহমুক্তি ঘটেছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বারো বিলের যে-ছবিতে একটা নিটোল গল্পের সম্ভাবনা ছিল, ষোল রিল জুড়ে তাকে তিলে তিলে হত্যা করা হল।

জিতেন্দ্র আর সুলক্ষণার ভাবি মিষ্টি প্রেম হল। অথচ অনেক আগেই জিতেন্দ্রের বিয়ে, ছেলে এবং ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রেমিকাকে সবই জানালো সে। সুলক্ষণার প্রেম নির্বাদ। অতএব বিয়ে হয়ে গেল।

কনভেন্ট-পড়া মা-হারা শিশুটির মায়ের সাধ মেটাতে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে ওরা গেল কাশ্মীরে। ঘটনাচক্রে সুলক্ষণার সঙ্গে আলাপ হল জিতেন্দ্রের প্রথমা পত্নী বীণার—পূর্ব পরিচয়ের আড়ালে। বিবেক ও পরিবেশ বীণার উদ্দাম জীবন অপত্য স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়া দিল। ভুল ভাঙল—ভুলের বাধা ঘুচল না। অপরিচয়ে, অনাধিকারে বীণার মাতৃত্ব ভিখারি হল।

এমন যে গল্প এতে জিতেন্দ্রের ঝি অরুণা ইরানী আপন বক্ষে ধারণ করে সাহেবের মাথা টিপে দিল, সাহেবের বিয়েতে নাচলো গাইলো, জিতেন্দ্র-সুলক্ষণার প্রেমের নিবিড়তা মাপল আর এমনই অনেক কিছু হল ওমপ্রকাশজীর নিষ্ঠায়।

এসব বাদ দিলে ক্যামেরার নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। আবহসংগীত যদিও প্রথানুগ, তবু মানানসই আর পরিমিত। দু-একটা গানও বেশ ভালই লাগে। ভালো লাগে বীণা রায়ের অভিনয়। মনের পরিবর্তনের পর্যায়গুলো বেশ স্পষ্ট হয়েছে ওঁর অভিনয়ে। আর সঞ্জীবকুমারের অভিনয় তো আজকাল আর প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। বাকিদের অভিনয় চলনসই।

শেষ করতে গিয়ে শেষ দৃশ্যটা [illegible] মনে পড়ছে। পরিচালক ওমপ্রকাশজীর মুন্সিয়ানার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একদিন যে শিশুটির হাত চকোলেট মাখা বলে বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এক মহিলা, আজকাল মাতৃত্ব নিয়ে সেই হাতেই হাত মেলাতে হল তাঁকে, কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকৃতি নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ল বঞ্চিত মাতৃত্ব চকোলেট-লাঞ্ছিত হাত [illegible] এল। [illegible] শিশুকে চাপা দিয়ে [illegible] মিষ্টত্ব আবার [illegible]

দেখেশুনে ত পরের কথাটাই আগে মনে হল।

আলোচ্য ছবি—আপনাপন
পরিচালক—জে ওমপ্রকাশ

বিমান দাস

শরৎচন্দ্রের কাহিনী ছিনতাই

আজকের 'প্রগতিশীল নাটকে' প্রায়ই এক জোতদারকে দেখা যায়, যে গ্রামের চাষীদের সুদে টাকা [illegible] দিয়ে তার জমি-গরু বাছুর দখল করে, [illegible] পোড়ায়, এমনি আরো নানা কাণ্ডকারখানা। তার থাকে [illegible] একর জমি। ঠিক এই ঘটনাই এই আলোচ্য হিন্দী ছবির গল্পের প্রধান অংশ। বাংলা নাটকের সঙ্গে হিন্দী ছবির এখানে প্রগাঢ় মিল। হিন্দী ছবিতে গ্রামের ঘটনা থাকলেই সেখানে জোতদার এসে যায়। নাটকের সঙ্গে এ-ছবির এইখানে শুধু অমিল যে, নাটকে যেখানে জমিদার চাষীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মুখোমুখি, এই ছবিতে সেখানে তার অনুশোচনা ও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ।

না, ছবিটি সম্পূর্ণ এই কথিত জমিদারকে নিয়ে নয়। অবশ্য মূল ঘটনার সঙ্গে আমরা আগে অনেকবারই পরিচিত হয়েছি। বড় ভাই ত্যাগ স্বীকার করে ছোট ভাইকে পড়াল, ছোট ভাই দাদার মনে আঘাত দিয়ে নিজের পছন্দমতো বিয়ে ইত্যাদি করল, দাদা তবুও ভাইকে স্নেহ করে যেতে লাগল এবং ভাই আরো দুঃখ দিল ও অবশেষে ভাই সব ভুল বুঝতে পারার পরে মিলনের মধ্যে ছবি শেষ হল—এরকম ঘটনার মুখোমুখি আমরা এই নতুন হচ্ছি না। ত্যাগের এক আশ্চর্য কাণ্ড এখানে আছে। তা হল ছোট ভাই-এর সুখের জন্য দাদা-বৌদির সহবাস না করা। কেননা, তাহলেই তো সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য দর্শক যাতে অসন্তুষ্ট না হন, সেজন্য শেষে সব ঝামেলা চুকে যাওয়ার পরে ছোট ভাইকেও হৃদ্‌রোগ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এতসব ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও বলব, এখানে এমন কিছু নাটকীয় মুহূর্ত আছে যা ছবিটিকে স্লো হতে দেয় না। মারামারি নেই, নেই প্রকৃতি বা প্রাসাদের সৌন্দর্য, গানের ব্যবহারও কম, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিরও কোন চেষ্টা দেখা যায়নি, তবুও হিন্দী ছবির পেশাদার দর্শকরা দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে, এও কি কম দক্ষতার! আসলে কাহিনীকার-পরিচালক শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস ছিনতাই করে স্বনামে চালিয়ে দিয়েছেন। এবং এ-ছবি ভালো একথার প্রমাণ করল, এখনো ভারতীয় ছবিতে

শবরেশ ছবিতে রত্না [illegible]

রজনীগন্ধা
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক-তাঁত
• মিল বস্ত্র
• গেঞ্জি
• শার্টিং-সুটিং
• ছিট কাপড়
৭৩, জি, টি, রোড (নর্থ) হাওড়া
ফোন ৬৭-৩২৫

শরৎচন্দ্রের গুরুত্ব দশজন বড় স্টারের চেয়েও বেশি।

অভিনয়, গান, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ ইত্যাদিতে নতুন করে বলার কিছু নেই। হিন্দী ছবিতে স্বাভাবিক যা হয়ে থাকে, এখানেও তাই। অভিনয়ে নতুন, শশিকলা, কানাই পসানো, পরীক্ষিত সাহানী ও সংগীত পরিচালনায় শংকর জয়কিষণকে অনেকদিন পরে দেখে বুঝলাম, এ'রা এখনো ফুরিয়ে যাননি।

আলোচ্য ছবি : দুনিয়াদারী
রচনা-পরিচালনা : রাম কালওয়াব
বিকাশ জানা

শতবর্ষে অপমৃত্যু

বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী বলেছে—'আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না।.....আমি জন্মান্ধ।' স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং শ্রবণ এই তিনই যে রজনীর সবকিছু, এ সবের মাধ্যমেই যে সে পৃথিবীকে দেখেছে, আলোচ্য চিত্রের রজনীকে কই সেরকম তো মনে হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীর ভীষণ সমস্যা। একদিকে শচীন্দ্র যাকে সে ভালবাসে। অপরদিকে অমরনাথ, যার প্রতি সে চিরকৃতজ্ঞ। যে রজনী একবার বলেছে—'তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব— আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম।' আবার সেই রজনীই অমরনাথ সম্পর্কে জানিয়েছে—'তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।' এই সমস্যা নিয়েই বংকিম কাহিনী। দীনেনবাবু তাঁর ছবিতে যা পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর রজনী কেবল শচীন্দ্রের জন্যই কাতর। অমরনাথের প্রতি সে কোথাও কোনো কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। অথচ কাহিনীতে রজনী তার ছেলের নাম রেখেছিল অমরপ্রসাদ।

পাঠক হয়ত বলবেন, এত কথার দরকার কি। চলচ্চিত্র কখনও কাহিনী হতে পারে না। চারুলতা বা পথের পাঁচালী তা হয় নি। আমিও স্বীকার করি, কিন্তু সে সব ছবির বিজ্ঞাপনে কখনও লেখকের ছবি ছাপিয়ে বলা হয় নি 'রবীন্দ্রনাথের চারুলতা' বা 'বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী'। বলা হয়েছে—সত্যজিৎ রায়ের ছবি'। আর এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ছাপিয়ে জানানো হয়েছে—'বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী' এবং তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের 'শতবর্ষে' নিবেদিত।

অন্য দশটা ফর্মুলা ছবির মত এখানেও নায়ক ছোট থেকে বড় হয়েছে গান গাইতে গাইতে। রজনীর গান তো আছেই। আর সেকালের চালচলন বোঝাবার জন্য অমরনাথ বা শচীন্দ্রকে বড় বেশী কাজ করা পাঞ্জাবী পরতে হয়েছে। কাহিনীর ছোট খাট ঘটনাও

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত রজনী

অনেক পাল্টানো হয়েছে। লবঙ্গলতা এবং অমরনাথের চরিত্রের প্রতি অকারণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছবিতে রজনীর থেকে এদের ব্যাপারই যেন বেশী। আর এ'রা যে একসময় রোমিও জুলেয়ট স্টাইলে প্রেম করেছিলেন—তারও পরিচয় মিলেছে।

টেকনিক্যাল কাজ চলনসই। গান মোটামুটি, যা না থাকলেই ভাল হত। আবহ কিছুটা আধুনিক ঘেঁষা। তবে অভিনয় ভাল। রজনী হয়েছেন সোনালী গুপ্ত। রজনী যখন দৃষ্টি ফিরে পেয়ে শচীন্দ্রকে খুঁজেছে, সে দৃশ্যে সোনালীকে সব থেকে ভাল লাগে। তাঁর অভিনয় আগাগোড়াই ভাল। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ছোট মা হিসাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে বাড়ীর গেটে তাঁর আঁচলের চাবি আটকে যাওয়া বেশ অর্থপূর্ণ। এ ছাড়া ভাল অভিনয় করেছেন শচীন্দ্র হিসেবে দীপঙ্কর দে। অমরনাথের চরিত্রে রঞ্জিৎ মল্লিকের কাছ থেকে আরও কিছু পাবার ছিল।

সবকিছুর বিচারে ছবির রজনী যেমন বঙ্কিমভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে নি; তেমনি শিষ্টাচার সম্মত হয়ে ওঠেনি।

অসিতবরণ মিত্র

ছকে ধাঁধা ছবি

ঠিক যে ভাবনায় এবং উদ্দেশ্যে বছরের পর বছর ঝুড়ি ঝুড়ি হিন্দী ছবি তৈরি হয়, আলোচ্য ছবিটিও ঠিক তাই। অর্থাৎ একই উপকরণে তৈরি। কেবলমাত্র মারদাঙ্গার পর্দা কাপানো, টেক্‌শাস এ্যাক্‌শন ছবিতে নেই। ছবিটা রঙিন 'মনোরঞ্জন কে লিয়ে' দর্শকদের তিনটে ঘণ্টা খুব খারাপ কাটবে না। গান আছে। প্রেম-প্রণয় নিয়ে উত্তেজনা এবং নাটক আছে। আছে ছবির বিরাট অংশ জুড়ে স্থূল-কমেডির হুড়াহুড়ি। নায়িকা কামু ফুলওয়ালী। তার বাবা-মা নেই। সে একাই থাকে। নায়ক প্রেম বিত্তশালী দাদাজীর স্নেহে প্রতিপালিত। হার্ট এ্যাটাকে ভগবান অসুস্থ হয়ে দাদাজীর যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তখন তিনি প্রেমের হবু স্ত্রীকে দেখতে চান। কিন্তু প্রেম রীতা নামে যে মেয়েটিকে ভালবাসে, সে তখন শ্রীনগরে প্রতিকূল আবহাওয়ায় আটকে পড়েছে। এহেন সংকট পরিস্থিতিতে নায়ক প্রেমের দোস্ত ফটোগ্রাফার জগদীশ ফুলওয়ালী কামুকে রীতা সাজিয়ে নিয়ে আসে। কামুর আবির্ভাবে দাদাজী ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবং তারপর দাদাজীর শারীরিক সুস্থতার জন্যই কামুকে প্রেমের হবু দুল্‌হনের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হয়। এই পর্বে বাড়ির সকলেই কামুর রূপে-গুণে মুগ্ধ। দাদাজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ডক্‌টর বিদসহ সকলেই চায় কামু এ-বাড়ির দুল্‌হন হোক। কিন্তু নায়ক প্রেম এই সাজানো রীতাকে গ্রহণে অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসল রীতার জায়গায় ফুলওয়ালী কামু-ই দাদাজীর পরিবারে বহু হয়ে আসবে তাই নিয়ে ছবির গল্প। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছবিটির মোটামুটি গতি ধরে রাখতে পেরেছেন এইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। দাদাজীর ভূমিকায় মদনপুরীর অভিনয় স্বাভাবিক। রীতা ও প্রেমের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যামলী ও প্রেমকৃষ্ণণ-এর অভিনয়-মান ভালই। তবে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন নবাগতা রামেশ্বরী কামুর ভূমিকায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর অভিব্যক্তি নিখুঁত।

আলোচ্য ছবি : দুল্‌হন ওহি যো পিয়া মন ভায়ে।
পরিচালক : লেখ ট্যাণ্ডন।

লাইম লাইটের পদ্মা নদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন। বক্তব্য ছিল, সম্ভাবনা ছিল তবু নাটক হলো না। কেননা, নাটক মানে শুধু বক্তব্য নয়, শুধু জোরালো গল্পের পটভূমিকায় ভাটিয়ালী গান গাওনা নয়। হাত-পা নেড়ে আধা-গ্রাম্য আধা-শহুরে ভাষায় কিছু কিছু কথা বলে যাওয়াও নয়। নাটকে অভিনয় করা দরকার। 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মতন উপন্যাসের জন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী অভিনয়। তা না হলে তা একঘরে হয়ে যেতে বাধ্য।

আর সেই কারণেই লাইমলাইটের 'পদ্মা নদীর মাঝি' কখনও কখনও অত্যন্ত একঘেয়ে। কারো কারো অভিনয়ে অতি-নাটকীয়তা বিরক্তিকরভাবে অনাটকীয়। সুচেতা দাসের অভিনয় সম্পর্কে ঐ কথা বলতেই হবে। চরিত্রটিকে তিনি সস্তা মেয়ের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছেন। তার ভেতরকার গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়নি। অজিত সান্যালের হোসেন মিয়া ছাড়া সকলের অভিনয়ই অত্যন্ত সাধারণ মানের। তাছাড়া কারোরই উচ্চারণ শুদ্ধ নয়। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলাটা আরও একটু অভ্যেস করার প্রয়োজন ছিল। ভাষার কখনও কখনও শব্দ ব্যবহারেও ভুল আছে।

'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন অজিত সানাল। নাট্যরূপটি ত্রুটিশূন্য না হলেও সার্থক। তবে বড্ড বেশি বড়। সম্পাদনার কাজটি আরও

সুষ্ঠু হওয়ার প্রয়োজন ছিল। দৃশ্য বদলের অভাবও কখনও কখনও অত্যন্ত পীড়া দেয়। নাটকে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত ছিল, কিন্তু সুঅভিনয়ের অভাবে তা অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু এসমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও লাইমলাইটের প্রযোজনাকে স্বাগত জানাতে হয়। মানিকবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তাঁরা সৎ অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৩৬ সালে লেখা উপন্যাসের সমসাময়িকতা যে এখনও বর্তমান, তাও তাঁরা দেখিয়েছেন। নাটকের শেষে তাঁদের বক্তব্যটি অনেক বেশি মূল্যবান। শোষণের শিকলটি দেখতে দেখতে দর্শক অনুভব করবেন সেই সামাজিক সত্য, যা তাঁকেও শৃংখলাবদ্ধ করেছে। আর এইখানেই নাটকটির সাফল্য। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন থেকে যাত্রা

আর মাসকয়েকের মধ্যে একশো বছর পূর্ণ হবে।

যজ্ঞেশ্বরের জন্মের শত বর্ষ। একশো বছর আগে যজ্ঞেশ্বর জন্মেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বরকে যদি যাত্রাওলা বলি, তাহলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এই চরমতম উজ্জ্বল যুগটিতে আজকের যাত্রাজগতে তেমনি বিশুদ্ধ যাত্রাওলা একজনও নেই।

আজকের যাত্রা-যুগচেতনায়, সমকাল ভাবনায় ব্যবসাগত আদর্শে একটি বৃহত্তম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, বিশাল এই জগতের প্রত্যেকটি মানুষ কাজ নিয়ে চরম ব্যস্ত, ভাবনা নিয়ে চরম অস্থির অথচ সংসার থেকে আলাদা নন, সংসারের গণ্ডীতে আজকের যাত্রাওলারা এক-একজন আদর্শ গৃহস্বামী হিসেবে বিরাজমান, একে অন্যের পরিপূরক, সংসারের চার দেয়ালের ভিতরকার পৃথিবীতে নিজের গড়া জগতে হয়তো বা অনন্য চরিত্র, যাত্রাওয়ালা হিসেবে অনেকেই খ্যাতিমান, অর্থবান কিন্তু তাদের নিয়ে ঠিক এমনি করে আজ থেকে একশো বছর পরে কোন গবেষক-শিল্পী যাত্রা-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যজ্ঞেশ্বরের মত খোদাই করবেন কিনা জানি না। বোধহয় নয়।

যজ্ঞেশ্বরকে যদি বলি জীবন্ত অভিনেতা, তাহলে এই সবচাইতে উন্নত মানের অভিনয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন অভিনেতার খোঁজ মেলেনি এখনো।

যজ্ঞেশ্বরকে যদি বলি গায়ক—তাহলে তেমন গায়ক কৈ।

যজ্ঞেশ্বরকে যদি মানুষ বলি, তাহলে এই মুহূর্তে তেমনি মানুষ দেখি না।

যজ্ঞেশ্বর জাত কবি। তাই চারণ কবির মর্যাদায় তিনি বরণীয়।

যজ্ঞেশ্বর নেই, আমরা এই মুহূর্তে সেই যজ্ঞেশ্বরের যোগ্য প্রতিচ্ছবি চারণ-কবি মুকুন্দ দাসের স্মরণে প্রাক্তনিমন্ত্রণ।

মুকুন্দ দাসের প্রাক্ জন্মশতবর্ষ প্রণাম।

ইনকার ছবিতে আমজাদ খান

আজকের পালা লাল নিশান।

লাল নিশান নামকরণের মধ্যে যুগ-চেতনার ছবি দেখতে পাই। আসলে এই পালাটি ঐতিহাসিক। পালাটি সর্বজন প্রশংসাধন্য হয়ে শিল্পীমহলের বিজয়-নিশান উড়িয়েছে, তাই সাধারণের কাছে এর গল্পাংশ প্রকাশ করে অপ্রকাশ্য চমকভঙ্গ করতে রাজি নই শিল্পী[illegible] বছরেই যাত্রাজগতে প্রতি[illegible] রয়ে একটি বছর এখনও হয়নি এর বয়স, ইতিমধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর দল হিসেবে চিহ্নিত। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত উল্লেখযোগ্য, সুর এবং আবহ-সংগীত এই নাটকের সম্পদ। ভোলা পালের অবিস্মরণীয় অভিনয়। তারাবাণী পাল এবারও এই পালায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তার গান চমৎকার। এছাড়া সুবিমল আদক, কার্তিক অধিকারী, অমর ব্যানার্জি, নির্মল নাগ, ফিরোজাবালা, স্বর্ণালী মিত্র সকলেই স্ব স্ব চরিত্রে অসাধারণ। নন্দিতা দাশগুপ্তের অভিনয় দর্শকের মন জয় করতে পেরেছে, সেখানেই তার কৃতিত্ব। ভক্ত মল্লিকের কণ্ঠ প্রশংসনীয়। আবহসংগীত রচনায় খোকা মল্লিক এবারও এই পালায় চমক সৃষ্টি করেছেন। পালা নির্দেশনায় ভোলা পাল যে কতখানি নবীন, তা লাল নিশান পালা না দেখলে বোঝা যায় না।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

জনগণমন

অতি সম্প্রতি পাবলিক স্টেজে দেশাত্মবোধক (?) নাটক প্রযোজনা করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা তাঁদের আত্মশুদ্ধির একটা চেষ্টা হতে পারে, গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রগতিশীল নামক নাটকের উত্তাল সাফল্যের ঢেউ দেখে হতে পারে, আবার সুচতুর ভাবে ব্যবসায়িক বুদ্ধিও তাতে কাজ করে থাকতে পারে, কিংবা নিছকই যুগকে ধরবার একটা সৎ প্রচেষ্টা তার পেছনে কাজ করতে পারে, কিন্তু সেটা কত শতাংশ নিষ্ফল তা বলতে পারবেন একমাত্র সচেতন দর্শকই। সত্যিকারের মরাল নাটকে (দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে) নাচ, গান, বড় বড় উদ্দীপক সংলাপ, বিপ্লবের তূর্যনিনাদ, অন্য পরিচয়ে ক্যাবারে নাচ কতটা সেসব ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত, এবং নাটককে মর্মগ্রাহী করার ক্ষেত্রে তার কতটাই বা প্রয়োজন অনিবার্য, এসব তর্ক ও পাল্টা যুক্তির ব্যাপার। তবে এ ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে, যে নাটকে বিপ্লবের কথা বলা হবে, সেটা কতটা আদর্শে চিহ্নিত এবং দর্শকের মনে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করবে, তা নির্ভর করছে তার পরিবেশনের ওপর। অর্থাৎ সেটা শুধুই চতুর নাটক না সত্যিকারের আদর্শমূলক নাটক। এবং কতটাই বা স্পষ্ট বা ডাইরেক্ট।

বিশ্বরূপা থিয়েটারের সাম্প্রতিক নাটক 'জনগণমন' সেদিক থেকে অন্তত স্পষ্ট। এ নাটকে সরাসরি এই দশকের গোড়ার দিকের বাংলা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বা বলা যায় অস্থিরতার একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। বক্তব্য বা উদ্দেশ্য যাই থাক, নাট্যকার পরিচালক রাসবিহারী সরকার অন্তত একটা ব্যাপারে ধন্যবাদের যোগ্য যে, তিনি তাঁর নাটক দর্শকদের মনে ধরাবার জন্য এইবার নাটকে ক্যাবারে, প্ল্যামার বা মালটি স্টারের দ্বারস্থ হননি। বস্তুত এ নাটকে তিনি বক্স অফিসের কোন তারকা সন্নিবেশই ঘটান নি। রবীন মজুমদার, কণিকা মজুমদার ও প্রেমাংশু বোস ছাড়া জনগণ ভাল ভাবে চেনেন ও তাদের দেখার জন্য আগ্রহ বোধ করবেন, এমন কোন শিল্পীই এ নাটকে নেই। ব্যবসায়িক মঞ্চে এমন দুঃসাহসকে স্বাগত জানাতেই হয়। এই শিক্ষা যদি তারা সুখ্যাত গ্রুপ থিয়েটারগুলির কাছ

থেকে পেয়ে থাকেন, তাহলে সে গৌরবের অংশীদার তারাও নিশ্চিত। তাঁরা পাবলিক স্টেজকে যে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিতে পেরেছেন এটাই তার প্রমাণ। 'জনগণমন' (বিমল মিত্রর লেখা উপন্যাস অবলম্বনে) নাটকে অনেকবার সংলাপে বলা হয়েছে 'স্বাধীনতার পরে আজ বাইশ তেইশ বছরেও'—তাহলে মোটামুটি' নাটকের সময়কাল ধরে নেওয়া যায় সত্তর একাত্তর সাল। নাটকে কোন দলের নাম করা হয়নি, ধ্বনি দেওয়া হয়েছে 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', সে ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি যারা দিয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেসের অনুসারী, এ নাটকের প্রধান পুরুষও সেই সুবাদে চিহ্নিত, এবং তিনি ঘনঘন তাঁর ঘরে টাঙ্গানো মহাত্মা গান্ধীর তিনটি বিরাট বিরাট অয়েল পেন্টিংয়ের একটার সামনে নাকে কানে তিনবার হাত ছুঁয়ে (যেমন এক শ্রেণীর ভীরু, অতিরিক্ত ভক্ত মানুষ কালী, শনি কিংবা শীতলা মন্দিরে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে গদগদ হয়ে প্রণাম করে থাকে) প্রণাম করেছেন ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এবং অন্যত্র গাঁয়ের লোকের সামনে তাঁর বাড়িতে মহাত্মা গান্ধীর পদার্পণের একটা গল্প ফেঁদে থাকেন—এসব থেকেই তিনিও চিহ্নিত। কিন্তু সেই অনুপাতে স্পষ্ট করে চিহ্নিত নন তার বিরুদ্ধে ভোটের লড়াইতে নেমে বাড়িতে আগুন লেগে সবংশে পুড়ে মরা পায়জামা গেরুয়া পাঞ্জাবী ও কাঁধে ব্যাগ বামপন্থী কানাই ঘোষ, এককড়ি নামক সর্বদাই সব কিছু সংস্কার বলে বাপের পরিচয়ও মানে না, মহাপুরুষের মূর্তি থেকে সব কিছু যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রচণ্ড উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও যাকে এক সময় পাগলের বেশে জেলে (যার মধ্যে অন্য এক গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের একটি চরিত্রের টেন্ডেন্সীগত আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়) চোখা চোখা ব্যঙ্গোক্তি ও গান করতে দেখা যায় এবং তার পরেই বিজ্ঞ ও খুনের ব্যাপারে নির্বিকার তাত্ত্বিক(?) নেতার ভূমিকায় দেখা যায়, তার পরিচয়ও স্পষ্ট নয়। নাট্যকার চেয়েছেন এঁদের পরিচয়, ভূমিকা, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিপ্লবী সংলাপ নিয়ে একটা আলোচনার হাওয়া উঠুক দর্শক ও রাজনীতি সচেতন জনগণের মধ্যে। এক্ষেত্রে তিনি পূর্বের নাটকগুলিতে কতটা সৎ এবং প্রয়োজনে তার থেকে কতটা সরে এসেছেন এবং কে, সেটা অন্য প্রশ্ন। ক্যারারে এবং পূর্ববর্তী অলিখিত রাজনৈতিক ভূমিকা থেকে রাতারাতি হঠাৎ তাঁর এই মোহভঙ্গ এবং এতদিন পরে হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের মত লোকের চরিত্র হনন প্রয়োজন ঘটল কেন, সেটা অন্য প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন ও কৌতূহল বাদ দিলে 'জনগণমন' নাটককে এ মুহূর্তে একটি সমাজ দর্পণ মনে করে বিতর্কিত নাটক বলে আমাদের চিহ্নিত করা যায়। [illegible] তিনিও সেই কানাই ঘোষের আগুনের হাত থেকে

জনগণমন নাটকে কিরণ ঘোষাল ও সুলেখা ঘোষ

বেঁচে যাওয়া এবং তাঁরই পুত্রের দ্বারা বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ধ্যার হাতের বিভলবারে খুন হয়েছেন। এখানে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার কার জবকে চিহ্নিত করে দেখাতে চেয়েছেন? সেই অর্থে কি এই নাটক যাতে মার্কস, এঙ্গেল লেনিন, চীন, রাশিয়া দুশো বছর আগের ফরাসী 'বিপ্লবের ইতিহাস—সংলাপে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেয়েছে? এ নাটক দেখে এমন অনেক প্রশ্নই মনে হতে পারে, যেমন অনেক ছড়ানো ছিটানো অসঙ্গতি, তথ্যগত অসাম্য ইত্যাদি লক্ষ্য করা

বজ্রবুলি ছবিতে উত্তমকুমার/শিপ্রা বসু

যায়, সে সম্পর্কে সত্তর দশকের শেষ পাদে এসে, যখনি দেশে একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক হৃদরোগ বিরাজ করছে, সেই সময় এমন নাটক করার কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে প্রশ্ন এবং কৌতূহল দুই-ই মনে জাগা স্বাভাবিক। তবে রাসবিহারীবাবুর প্রধান গুণ, অনেক ইঙ্গিত নাটকে উপস্থিত করলেও কখনই তিনি নাটকে স্পষ্ট করে কিছু চিহ্নিত বা শেষ কথা বলে কিছু নির্দেশ করেন নি। দর্শক বুঝে নিক এটাই তিনি চেয়েছেন।

এ নাটকের গল্পটি অত্যন্ত সরলিকৃত হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার রাসবিহারী সরকারের প্রশংসা করতে হয় এর সংবন্ধ নাট্যরূপ দেবার জন্য। সে ব্যাপারে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি মুন্সিয়ানারই পরিচয় দিয়েছেন। আর এ নাটক উত্তরে দিয়েছেন শিল্পীরা তাঁদের সম্মিলিত টিমওয়ার্ক দিয়ে।

অভিনয়ে আমাদের অবাক করেছেন হরিসাধন চাটুজ্যের মত দুরূহ চরিত্রে স্বচ্ছন্দ এবং যাকে বলে লিভিং অভিনয় করে স্বল্পখ্যাত নট বিশু চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ মঞ্চে এমনপা পরিমিত অভিনয় দুর্লভ। প্রেমাংশু বসুর মোসাহেব টাইপ চরিত্রটিতে স্বয়ং অভিনেতাই যেন মিশে গেছেন। এমন অসাধারণ তাঁর অভিনয় এবং অভিব্যক্তি। রবীন মজুমদারের হরিহর যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। মাত্র দুটি দৃশ্যেই তিনি যে কত বড় অভিনেতা তা আর একবার প্রমাণ করেছেন। সৈকত পাকড়াশীর এককড়ি একটু বেশী নাটকীয় এবং অস্পষ্ট হলেও অবকাশ আছে। সৈকত পাকড়াশীর মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে বলেই একথা বলা। কিরণ লাহিড়ীর 'স্বদেশ নাটকের দুই-তৃতীয়াংশে খুব সুন্দর, কিন্তু শেষটাকে বড্ড বেশী স্থূল এবং ড্রামেটিক। আর একটু পরিমিত অভিনয় তার কাছে অবশ্যই আশা করা যায়। যেমন চরিত্রের সঙ্গে মানাক না মানাক। বড় সন্ধ্যার চরিত্রে কণিকা মজুমদার কোন কোন দৃশ্যে আশ্চর্য সজীব, তেমনি আবার শেষের দিকে চূড়ান্ত বাড়াবাড়িও করে ফেলেছেন চপলতার জন্যে। সত্যিকারের বিপ্লবী নারী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর আরও ওয়াকিবহাল হওয়া কর্তব্য। ছোট সন্ধ্যার চরিত্রে মিঠু পাল ও ছোট স্বদেশের চরিত্রে মাষ্টার অরিন্দম কিন্তু সুন্দর। যেমন সুন্দর 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটির প্রয়োগ এবং গজলের চালে বাইজীর মুখে (অভিনেত্রীর নাম নেই। যিনি লিপ্ট দিয়েছেন চমৎকার) খুরো গানটির অসাধারণ গায়কী ঢং। ভি ভালসারার পরিশ্রম সার্থক। সুলেখা ঘোষের জয়ন্তী দর্শকদের বেশ ভাল লাগবে। দুটি একটি দৃশ্যে লিপি গোস্বামী, বকুল ধর, অনুরাধা রায়, বিষ্ণু ঘোষ, কিরণ মৈত্র, অরুণ মুখার্জি, শিশির চক্রবর্তী এবং বেশ বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও গীতা নাগের সদর্প অভিনয় ভাল লাগে।

সুরেশ দত্তর মঞ্চ, অপস লাইটের আলোর কাজ নাটকের সহায়কই হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প ও শিল্পী

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনী

আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্-এর উদ্যোগে, আঠারোই ডিসেম্বর থেকে আঠারোই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি বড়ো শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এ হলো আকাদেমির দিক থেকে বিয়াল্লিশতম বার্ষিক প্রদর্শনী।

টিকিট কাউন্টার থেকে, প্রথমেই একদম বাঁদিকের ঘরে চলে যাই। বাঁদিকে পড়লো বিকাশ সেনগুপ্তের ছবি, নামের বাংলা তর্জমা হবে দ্যাবাপৃথিবী। নম্বর ২৬২। ছবিটির পুরো টেন্‌শন সাঙ্গীতিক। একটু বাদে, বেয়াল করলাম, এটি পুরস্কৃত। এই ছবিটির ডানদিকে বিশ্বপতি মাইতির 'প্ল্যাটফর্মে যখন' নাম্নী রচনাটি রয়েছে। এই ছবির রঙের রহস্য, এফেকট-এর সাফল্য প্রশ্নাতীত, কিন্তু একটা খট্‌কা লাগছিলো। অপেক্ষমান মানুষটির পরিকল্পনা যদি একটু মিশরী ছাঁচেই বিশ্বপতিবাবু ভাবলেন, তাহলে তার নেপথ্যে প্রায় স্কেচধর্মী চেয়ার কেন?

বাঁদিকের টানা দেয়ালে, সর্বান্তঃকরণে যার ছবিকে সাধুবাদ ও প্রিয়বাদ দিতে হয়, তিনি শুভাপ্রসন্ন। ছবি দুটির নাম ইল্যুশন, নম্বর ২৭৪ ও ২৭৫। ইল্যুশনকে তিনি চিনেছেন ও চিনিয়েছেন—একটি ছবিতে দুটি মানুষ-হাতের উপস্থাপনা ভোলবার নয়। কিন্তু এরপরই শুরু হলো খারাপ ছবি। চিত্রশিল্পীদের মাথা যদি প্রবন্ধাংশে ভর্তি থাকে, তাহলে যে কি খারাপ ফলাফল হয়, তার প্রমাণ পৃথ্বীশ শিকদারের মডার্ন ক্যালামিটি। সমস্ত ছবিটা, আধুনিক যুগযন্ত্রণা বোঝাবার দায়ে পড়ে গিয়ে, গ্রোটেস্ক হয়ে গেছে।

কিন্তু পৃথ্বীশ শিকদার যে আর্টিস্ট এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকলো না, যখন ডানদিকে [illegible] কার্তিক পাইনের 'অ্যাকোরাইজম বিড়াল', নির্মল দত্তের 'স্ট্রোক' ও 'মুক্তি', দীপংকর দত্তের 'অসমাপ্ত ছবি' প্রভৃতি কাজগুলো দেখলাম। চরক ছবিটিতে মুনিঋষিরা বসে আছেন, মাথার উপরে শিব—এ-কারণেই কি ছবিটি পুরস্কৃত? কাউন্টারের ঘরে এসে একমাত্র ভালো ছবি দেখলাম অসিত পালের। ছবির নম্বর ২০৫ ও ২০৬। প্রুফ-ভ্রমিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে বরঞ্চ সবসময়-সচেতনতার সঙ্গে বর্ণবিলোপের একটি নন্দনবন্দনকে তিনি আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছেন। বড়ো কোণাকুনি রাখা হয়েছে তার ছবি, যাতে ঠিকমতো আঘাত ও অভ্যর্থনা করে উঠতে পারছে না।

পরের তিনটি ঘরে আমাদের বিমূঢ় করে দিয়েছে প্রায়-নভিস, বর্ণবোধহীন শিল্পীদের বহুসংখ্যক আলেখ্য। সুনীল-মাধব সেনের 'মেদি গার্লস' ভালো লাগেনি : পেশেন্টস রুম, যা এঁকেছেন শানু লাহিড়ী, দেখে মেনে হয়েছে, হঠাৎ সরলীকরণের দিকে মুখ ঘোরাতে চেষ্টা কেন। কিন্তু শুধুমাত্র ঘটনা বা বস্তুর সরল কার্বন-কপি দেখতে পেলে নিরাশ হয়ে চলে আসতাম, যদি চিত্রপ্রতিধ্বনিগুলির গঠনে অন্তত শিক্ষার্থী নম্রতা থাকতো। ধর্মপ্রাণতা, কার্বনকপি, অসম উগ্র বর্ণবিন্যাস—এগুলো একসঙ্গে মিললে যা হয় তার প্রমাণকে যেন স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। মাঝখানে দেখতে পেলাম উপেন মল্লিকের পুরস্কৃত 'যমজ'। নম্বর ১৯০। পরিকল্পনাটি প্রায় জীববিজ্ঞান-বিশ্লেষণমূলক। গবদ, বেগুনী ও তেঁতুল রঙে খানিকটা বাফতা পাঞ্জাবির মতো। তারই কাছাকাছি বিহারের সত্যনারায়ণ করের ভাস্কর্য নমুনা 'এ্যাগনি'। কাষ্ঠময়, স্ফীত একটি রমনীশরীর। রেখা ও টেনশনের গুণে, এ্যাগনি নয়, কমপ্লাসেন্স। এই ঘরেই রয়েছে ওড়িশার শিল্পী ধীরেন্দ্র দাশগুপ্তের চাঁদ আর বন্ধ্যা বসন্ত। এই অপরূপ ছবিটির নম্বর ৯৩। দেখে আসার জন্য পাঠককে অনুরোধ রইল। কিন্তু ওই প্রবন্ধাংশময় মাথার জন্যে একটা কাজ কিভাবে মার খায়, তার নমুনা তাঁরই অন্য কাজে—যে আলেখ্যটির নাম শুধুমাত্র বন্ধ্যা বসন্ত। নম্বর ৯২। ডিকম্পোজড [illegible] তার ওপরে লেখা ইন [illegible]থেল—তারও ওপরে ডিকম্পোজড দেবশিশু। বর্ণলাবণ্য ও বস্তুরচনায় হীরেন্দ্র দাশগুপ্ত অসাধারণ—এ ছবিতে তার কিছু ছাপ থাকলেও, পরিকল্পনা এমনিতেই একটু স্পষ্টীকৃত। এবং, ইন্ বুথেল লেখাটি ছবিকে খুন করে জানিয়ে দিয়েছে চিত্রীর অসাধুতাকে, বেশ্যালয় সত্যি-সত্যিই তাঁর শিল্পী-পরিকল্পনাকে নাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু চাঁদ ও বন্ধ্যা বসন্তে, প্রায় বাল্ড-সোনালিরঙের নৈপুণ্যে, পৃথিবীর আবর্তনের ছন্দে রমনী ও রমনী-সংক্রান্ত মানুষরহস্যের অনেকটাই ধরা পড়েছে।

ভাস্কর্যের কাজের মধ্যে, যেটি গভর্নরের পদক পেয়েছে, সেটি (১০৬ নম্বর) সর্বোত্তম। গোপালপ্রসাদ মন্ডলের 'রাধা' সংগ্রহ করে রাখার মতো। সুরেন দে-র মঞ্চ-এর নমনীয়, নম্র কৌশলে অনেকগুলি ডাইমেনশন ধরা পড়েছে—পাশাপাশি ছিলে বলেই বোঝা যাচ্ছিল, বয়োদার লীতিক্ষ কাট্টি তাঁর ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর বেইজের মেধাবী পৌরুষকে অনেকটা দিল-খোলা মাস্কুলাইন ভঙ্গিতে ধরতে পারলেও, গভীর করে তুলতে পারেননি। তাও বলা দরকার, প্রদর্শিত তিনটি ভাস্কর্যনমুনার মধ্যে, মাত্র এই তিনটিকে আমি নিতে পেরেছি।

অরূপ রায়ের লিথো আছে দুটি। ২৩২ নম্বর, কার্ফু নামক আলেখ্যটি চমৎকার। রাস্তা, দুটি মূর্তির ছায়া, পাশে বাড়ির সারির আবছাভাবে আলোর কাজ খেলিয়ে তিনি প্রত্যাশিত ভয়ের স্বরূপটিকে ধরে ফেলেছেন। অর্থাৎ কার্ফু ঘটনাটির চিত্রযোগ্য মুহূর্তটিকে সরাসরি ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। ভারতীয় স্কুলিং-এ কিছু কাজ দেখলাম অসিত মন্ডলের ও মনোহর মাকোয়ানার। কয়েকদিন আগে, বিড়লা একাডেমিতে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের এই রীতিতে যে কাজ দেখেছি তার সঙ্গে এই

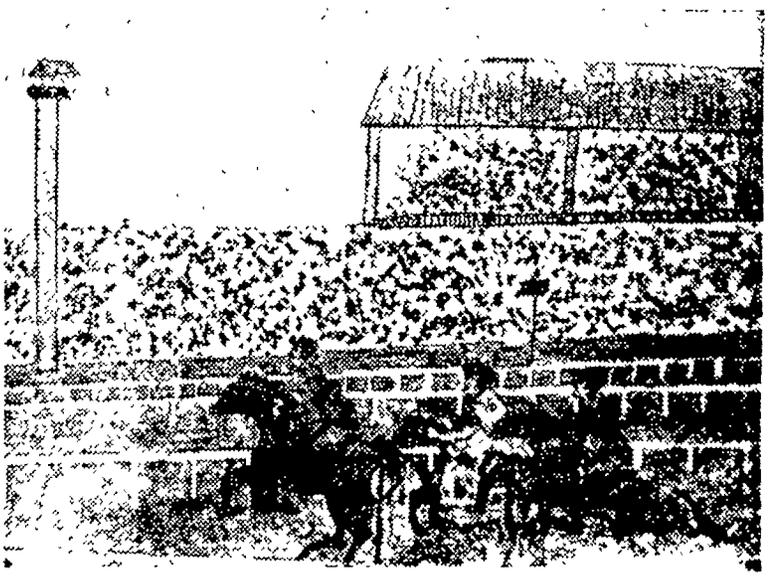

শিল্পী : সরোজ

চারটি কাজের তুলনা হয় না, তাও এই কাজে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া গেছে। মাদ্রাজের ভি জয়রামনকে ভাবিয়েছে সাসপেনশন শব্দটি আর সালভাডর ডালির কাজ। তিনি ডালিপন্থী হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে দুটি ছবি তাঁর এখানে আছে তারা প্রায় কিশোরসাহিত্যের মলাট। ল্যান্ডস্কেপ একটিও ভালো না। পুরস্কৃত লক্ষ্মী-এর সতীশচন্দ্রের কাকে ধরেই বলছি। ডি ডোবাইস্বামীর পারিবারিক পানভোজনের দৃশ্যটি অনেকে হয়তো স্যাভোনিরে মুদ্রিত দেখে দেখতে যাবেন। এর লালাটেবিল, বর্ণ-পরিকল্পনা অস্বস্তিকর, অসংযত। একটিও স্টিললাইফ ভালো নেই এই প্রদর্শনীতে। অল্পের জন্য ফসকে গেছে সুকুমার দাসের 'লোহিত বৃক্ষেরা'। বক্তিমতার যে সৌন্দর্য পরিবেশসাপেক্ষ ছিলো, সেই পরিবেশ বর্ষাল বাদ রং এসে ছন্দোপতন ঘটিয়েছে। স্বপন কুমার দাসের সোশিওলজিও একটি নিম্ন-স্টান্ট, চেষ্টাকৃত সমাজসচেতন আয়োজন।

আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে এই তিনশো-একটি জিনিষ দেখানোর মধ্যে শিল্পীদের মধ্যে স্নেহ থাকতে পারে। শিল্পকর্মের প্রতি ততো মনোযোগ নেই। বহু শিল্পীর পক্ষেই, তাঁদের ঐ নমুনাগুলি সাধারণ্যে উপস্থিত করা উচিত হয়নি। মাদ্রাজের বশীর আহমেদের 'জ্বলন্ত মিঙ' নামক ছবিটি তো প্রায় যে কোনো দর্শকের শিল্প রুচির বাইরে। নম্বর ৪। কতকগুলি আর্কিটেকচারাল ড্রইং রয়েছে—দেখে মনে হয় সিনেমা পত্রিকায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্টার্টিং ইলাসট্রেশন। আগেই বলেছি, বেশ কিছু শিল্পীকে শিল্প-তোয়াক্কা না করে কমিউনিকেটিভ অর্থাৎ কার্বন-কপিস্ট, ধর্মপ্রাণ কি সমাজচেতন হতে দেখা গেছে। এই ধর্মপ্রাণতার আর একটি দৃষ্টান্ত পুরস্কৃত 'হরি ওম' ছবিটি। শিল্পী আমেদাবাদের অশ্বিন মোদী নিজের পরি-কল্পনায় সন্তুষ্ট না থেকে, ছবিতে কিছু মন্ত্র চড়িয়েছেন। এতো খারাপ জিনিস দেখতে হবে বলেই বোধহয় টিকিটের দাম আট আনা। যদিও, প্রদর্শনীটি শিবঃপীড়া ঘটায় আসলে এই কারণেই যে এর মধ্যে কয়েকজন সত্যিকার ছবি-আঁকিয়ের সত্যিকারের ভালো কাজ আছে। শুভাপ্রসন্ন, বিকাশ, অসিত পাল কিংবা সুবেন দের ভাস্কর্য ছাড়াও, ওড়িশার হরেন্দ্র দাশ-গুপ্তের কাজ আমি আগে দেখি নি। এরকম কয়েকটি লাভ ঘটে যায় বলেই বিরক্তির পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

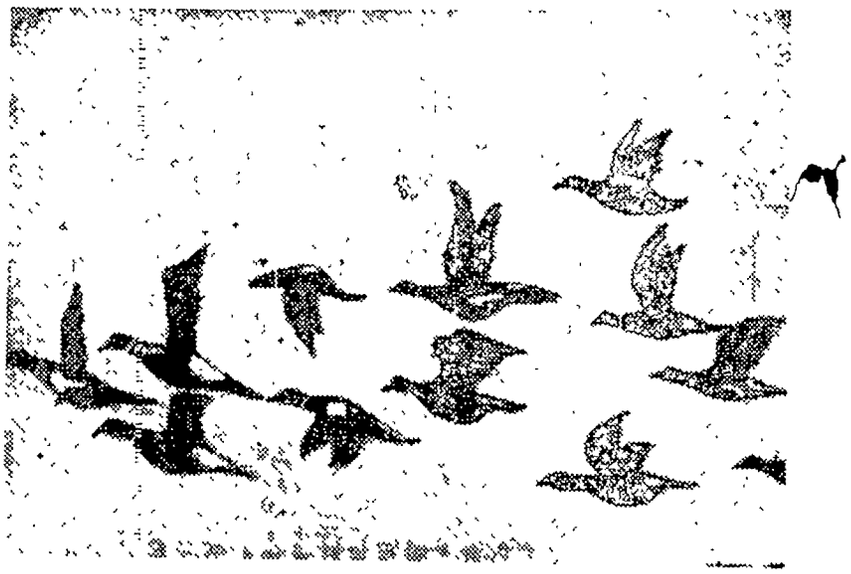

সরসিজ । ৯

৯ বছরের শিশুশিল্পী সরসিজ দাশগুপ্ত, জন্ম ৭ই আগস্ট ১৯৬৮, দমদমে। ছয় বছর বয়স থেকে ছবি আঁকার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কাগজ কেটে নানারকম নক্শা তৈরী ও গাছের পরিত্যক্ত ডাল বা টুকরোর মধ্যে নানা রকমের আকৃতি আবিষ্কার করে তার একটা বিশেষ রূপ দেবার প্রবণতা আছে। বিগত ২ বছর বহু জায়গায় 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় প্রচুর পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র পেয়েছে। চিত্রশিল্প শিক্ষায় হাতে খড়ি শ্রীকৃষ্ণদিবাম পাত্র-এর কাছে। সমস্ত শিল্পকর্মই তার স্বাধীন চিন্তাধারার ফসল, শিল্পকর্মে কোন বাধাধরা নিয়মে সে আগ্রহী নয়। সরসিজ প্রথিতযশা শিল্পী স্বর্গীয় অজিতকৃষ্ণ গুপ্তের নাতি। বর্তমানে 'জুলিয়েন ডে স্কুলের' পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

11+1

আপনি যদি রপ্তানীর কারবারে নেমে থাকেন

তাহলে কাণ্ডলা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে টাকা লগ্নি করুন

এই বারোটা কারণে

- - - - - - - - - - - - - -

* আপনি বিনা শুল্কে মূলধনী মাল পান
* বিনা শুল্কে কাঁচা মাল পান
* ভারতে যেসব কাঁচা মাল আমদানীর ওপর প্রতিবন্ধক বা নিয়ন্ত্রণ আছে সেই কাঁচা মাল আপনি আমদানী করতে পারেন
* আপনার লাভের শতকরা কুড়ি ভাগের ওপর দশ বছরের জন্যে আয়করে রেহাই পান
* আপনাকে পৌর, অকট্রয় ও বিক্রয়কর দিতে হয় না
* আপনার কারবারের মোটা অংশের ওপর আবগারি শুল্ক লাগে না
* আপনি আপনার স্থাবর সম্পত্তির জামিনে কম সুদে সহজ সর্তে এক কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য পান
* আপনার প্রকল্পের জন্যে আপনি রপ্তানী মূল্যের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বাড়তি কলকব্জা, সরঞ্জাম আদি কিনতে পারেন
* আপনার রপ্তানীর 'এফ-ও-বি' মূল্যের শতকরা এক ভাগ অর্থ সাহায্য হিসেবে নগদ হাতে পান
* রপ্তানীর সম্ভাবনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের জন্যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার 'ব্ল্যাঙ্কেট পারমিটের' ভিত্তিতে আপনি বিশেষ কয়েকটি সুবিধাও পান
* ঢালাও জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় আপনি যন্ত্রপাতি বা কম্পোনেন্ট এবং কাঁচামাল আমদানী করতে পারেন

+ ১-১১-৭৭ সালের পর চালু করা ইউনিটগুলিকে সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য সাপেক্ষ ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান এবং মাঝারি ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে [illegible]

এসব ছাড়াও বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার কিয়্যারেন্স রিজার্ভ ব্যাংকে করণীয় কাজ সম্পাদন, শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং এম আর টি পি র কিয়্যারেন্স ইত্যাদি ব্যাপারে চটপট সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে।

[illegible]

Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 24th February, 1978

Phone 55-5231 (14 lines)

সুগৃহিণীদের জন্য!

কুকমী গুঁড়া মশলার
১ কে.জি.র নতুন, সুদৃশ্য প্যাকেট

ব্যবহারে সুবিধা • অফুরন্ত রান্না সহজ
ঝাঁঝরা ঝাঁঝালো • গন্ধ ও স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে
অপচয় হতে দেয় না
গুণগত উৎকর্ষতায় সর্বজন-সমাদৃত 'কুকমী'র সাফল্যের পিছনে
রয়েছে এক শতাব্দীরও অধিক কালের কারিগরী অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

১৫৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭ • ফোন : ৩৩-৯৯৫ • পোষ্ট বক্স নং : বড়বাজার [illegible] • ফ্যাক্টরী : [illegible]

প্রাথমিক শিক্ষককে কী দিয়েছি

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২৮ এপ্রিল ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

অমৃত

নববর্ষ ॥ ১৩৮৫

অবিশ্বাস্য কম দামে সেরা সেরা লেখা

*

অন্তরঙ্গ বিভূতি-তারাশঙ্কর

বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের দু'জনের সঙ্গে গভীরভাবে অন্তরঙ্গ স্নেহধন্য গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের এ লেখায় বাংলা সাহিত্যের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের ভেতরকার জীবনের ছবি অদ্ভুত জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে নববর্ষ অমৃতের এটি বিশেষ উপহার।

*

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ডায়েরি

*

প্রফুল্ল রায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুটি বড় গল্প লিখেছেন

মহাশ্বেতা দেবী / বুদ্ধদেব গুহ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী

লীলা মজুমদার, অমিতাভ চৌধুরী এবং নবনীতাহরণ সেনের বিশেষ রচনা

গল্প

[illegible] অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সিংহ, [illegible]
অমর মিত্র

*

দাম তিন টাকা [illegible]
রেজিস্ট্রি ডাকে [illegible]

[illegible] জন্য এখনই হকার বা এজেন্টকে [illegible]
[illegible] : সার্কুলেশন ম্যানেজার, [illegible]
লেন, কলকাতা-[illegible]

নটরাজন-এর চাঞ্চল্যকর রচনা

লাল বাজার ১৬.

স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কুখ্যাত কিম্বা বিখ্যাত ভয়ঙ্কর লালবাজারের পুলিশী কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে উপন্যাসের ঢঙে লেখা এই ধরনের বই বাংলাভাষায় এই প্রথম। বইখানি পুলিশী সাহিত্যের পথিকৃৎ নটরাজন-এর লেখনী মাধুর্যের এক সর্বোত্তম নিদর্শন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮.

উপন্যাস রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাফল্য শুধু বিষয় ভাবনায় নয়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তিনি যে কত বড় শিল্পী তার সাম্প্রতিক কালের লেখা এই বই আর একবার তা প্রমাণ করল। বাবা ও ছেলেকে নিয়ে বিষাদ বাসনার এক দুঃসাহসিক সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা এবং দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার কৃষ্ণলীলা-স্থল পরিক্রমা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কর মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২.

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরলীলা এবং বিশ্বের প্রাচীনতম পদ-যাত্রা ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ভ্রমণকাহিনী, এই লেখকের

মধু-বৃন্দাবনে

তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সম্পূর্ণ। প্রতিটি পর্ব আলোকচিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও বিষয়সূচীসমৃদ্ধ। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

গজমুক্তা ১০.

অমলেন্দু ঘোষের

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশের আয়না ১০

একাল চিরকাল ১০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্ণশিরি ২০.

দৃষ্টিহীনের

মঞ্চ ১০

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২.

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

কুলহনের

খবরে প্রকাশ ১০.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮.

গাইনিক ওয়ার্ড ৮.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

সম্পূর্ণ ক্যাটলগের প্রয়োজন হলে লিখুন।

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

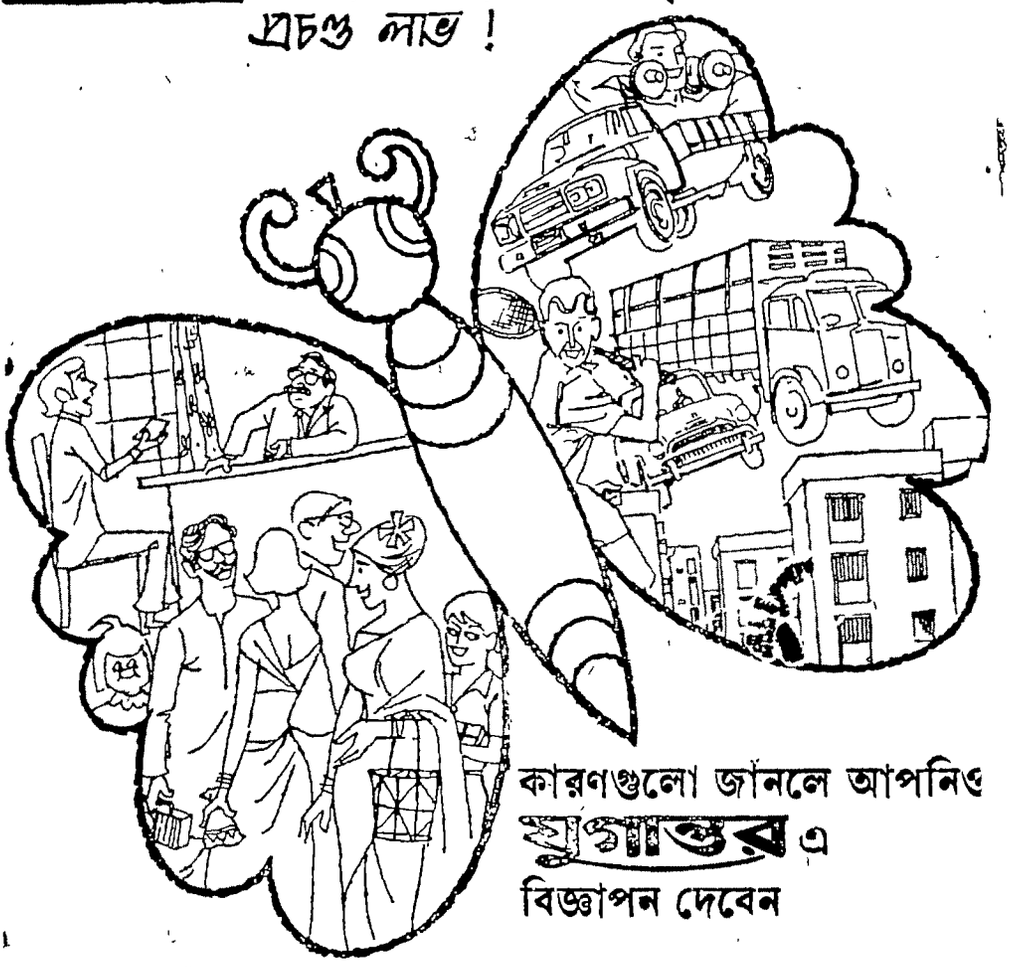

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাট্‌তি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-লরি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি সুবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

অমৃত

১৭ বর্ষ
৪৯ সংখ্যা
১৪ বৈশাখ,
১৩৮৫
28 April, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মনীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ? ৫
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
চিঠিপত্র ৬
প্রচুর ও দুর্লভ ৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদকাহিনী ১০
প্রাথমিক শিক্ষককে কী দিয়েছি ?
অমল আচার্য । বিকাশ জানা
প্রচ্ছদ শিল্পী রবীন মন্ডল
হীরকের দিনগুলি (গল্প) ১৭
বিজনকুমার ঘোষ
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কনকদি (গল্প) ২৭
বাণীব্রত চক্রবর্তী
লালকাই-এর দেশে ২৯
রেখা বড়ুয়া
পল্লীগীতিকার হাসন রাজা ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ৩৩
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত
যাঁদের দেখেছি ৪০ অনন্ত সিং
চতুর্থ আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৮। ৪৪
শৈবাল ঘোষ
হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ৪৭
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
লেখিকার নবজন্ম ৫৩
অশ্রুকুমার সিকদার
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ৫৭
সোমেন্দ্রনাথ রায়
মাঠে মাঠে চলেছে দল গড়ার পালা ৬০
শান্তিপ্রিয়
খেলা ৬১ দর্শক
চিত্রধ্বনি ৬২

আগামী সংখ্যা

নববর্ষ

সুকমলকান্তি ঘোষ

সুকমলকান্তি ঘোষ আর আমাদের মধ্যে নেই। যুগান্তর পত্রিকার সূচনা থেকেই তিনি ছিলেন তার সংগঠক ও পরিচালকবর্গের অন্যতম, এবং গত পনের বছর ধরে তিনি ছিলেন সম্পাদক। বাংলাভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসেবে যুগান্তরের এই বর্তমান প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পত্রিকা ভবনে কর্মরত অবস্থাতে তিনি রোগাক্রান্ত হন এবং সেখানেই ঘটে তাঁর জীবনান্ত। একজন সক্রিয় স্বভাবের কর্মপ্রিয় মানুষের পক্ষে এ-মৃত্যু গৌরবের সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছেন তাঁদের মনে, এবং শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের যেসব সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সেখানে তাঁর অভাব শূন্যতা সৃষ্টি করবে। বাংলার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল সুগভীর। শিল্পকলা সঙ্গীতনৃত্য সাহিত্য ও নাটমঞ্চের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ নিয়ে প্রতিটি সংস্কৃতিকর্মীর সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন তিনি ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। তাঁর মাধুর্যময় স্মৃতি তাঁদের কাছে হয়ে থাকবে অনুপ্রেরণার উৎস।

সাহিত্য ইত্যাদি•••

গান, অর্থাৎ লিরিক কবিতা

কবিতা দিয়ে কী হয়? প্রশ্ন করেছিলেন এক কবি বন্ধু।

উত্তর দিতে নেই এসব কথার। জিজ্ঞাসা যিনি করেন, জবাব তিনি নিজে দেবেন এটাই হল ভদ্রলোকের চুক্তি। আমিও অতএব মুখখানা রীতিমত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মতো করে রাখলাম।

ঘন্টা হয়। কবিতা দিয়ে কিস্যু হয় না। বলে একটা সংশোধনী পয়েন্ট জুড়ে দিলেন বন্ধু, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে প্রাইজ একটা পাওয়া যায় হয়তো। কিন্তু সে তো এক-হিসেবে কনসোলেশন প্রাইজ। সারা জীবন ধরে কবি যা লেখেন, তার কী পরিণাম? কিস্যু না।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। মামলা খাড়া করার পর এবার সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করার কথা।

বন্ধু উবাচ, অন্য কোনো লাইনের কথা ভাবো। ডাক্তারী পড়ে লোকে ডাক্তার হবার জন্যে। ওকালতী পড়ার শেষে উকিল। এমনকি জেনারেল এডুকেশনও নিষ্ফলা নয়। কেরাণী আর শিক্ষকরা সেখান থেকেই আসেন। কিন্তু কবিতা? কবিতা কোন কর্মে লাগে!

কিন্তু তুমি বোধহয় একটু গুলিয়ে ফেলছ। —মুখ খুলতে হল আমাকে, অন্যগুলো হল বৃত্তিশিক্ষা। এমন কি তোমার ঐ জেনারেল এডুকেশনও তাই। মেকলে সাহেব সেই টার্গেট নিয়েই বনেদ তৈরি করেছিলেন লেখাপড়ার। মানে সাধুভাষায় যাকে বলে, কেরাণী মনুফ্যাকচারিঙের মেশিন। কিন্তু কবিতা আর্ট ফর্ম। রবীন্দ্রনাথের সেই গান্ধারীর আবেদনে কথিত ধর্মই ধর্মের শেষ গোছের ব্যাপার। তা থেকে অন্য বাই-প্রোডাক্ট নেই।

বটে, বটে! তা তোমার ঐ আর্টফর্ম কি একা কবিতাই? গল্প-উপন্যাস ছবি গান নাটক সিনেমা এগুলো কী? কোন আর্টফর্ম থেকে রুজিরোজগার করা যায় না বলো। শরৎচন্দ্রের পর থেকে নভেল লিখে বাড়ি তৈরি করেছেন অন্তত এক-কুড়ি লেখক। ছবি তো ইনটারন্যাশনাল ভাষা। লেগে গেলে লাখ-লাখ টাকা। না লাগলেও ক্যাফটস টিচার। গান-বাজনা ইদানীং আন্তর্জাতিক স্নেহধন্য। উপরন্তু তা থেকে ফরেন একসচেঞ্জ। নাটক আগে ছিল শখ, এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রফেশন। তাছাড়া সিনেমা ও যাত্রার মধ্যে সংযোগ-সেতু। অতএব অর্থকরী। আর সিনেমা তো অর্থ থেকে শুরু, শেষও অর্থে। অনর্থকারী শুধু কবিতা। ঠিক কিনা বলো।

দম ফেলার জন্যে বন্ধু একটা সিগারেট ধরালেন।

কিন্তু কবিতা থেকেও কি গান তৈরি হয় না? — আত্মসমর্থন করতে চাইলাম আমি, সেই সব গান, যা সিনেমায় গাওয়া হয় বা গ্রামোফোন কোম্পানী নেন? সেগুলো তো অনর্থকারী নয়, ভালভাবেই সার্থক, অর্থাৎ স-অর্থক।

বন্ধু বললেন, প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর?

রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ নজরুল—

রাখো, রাখো, আধুনিক কবিদের কথা বলো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর নিজের সিনেমায় গান লিখেছেন। জানো নিশ্চয়?

জানি। নেকস্ট?

বিমলচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন।

ওয়েল, ইয়েস। চালিয়ে যাও—

সত্যেন দত্তের পাল্কীর গান—

কিন্তু ও তো কবিতায় সুর দেওয়া। সুকান্তের রানার তাই। গান গাওয়া হবে বলে লিরিক লিখেছেন কে? —বন্ধুর গলায় প্রায় দারোগার জেরা।

বাস্তবিক মাঝে মাঝে এমন বিপাকে পড়তে হয়। কবিদের ওপর রাগই হতে লাগল। সারেন্ডার করব ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়ল একটা নাম। বললাম, দিনেশ দাস, একবার জ্যোতির্ময় রায়ের সিনেমার জন্যে গান লিখেছিলেন মনে পড়ছে।

সে তো অনেককালের কথা। তারপর কী হল? আর লেখেন নি কেন?

কথাটা আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম দিনেশবাবুকে। উত্তর যা দিয়েছিলেন সেটাও মনে ছিল আমার। বললাম দিনেশ-বাবুর মনে হয়েছে উনি এমনিতেই সহজ-ভাবে কবিতা লেখেন। লোকে বলে, তাঁর ছন্দের হাতও খুবই মিষ্টি। শুনে তাঁর ভয় হয়েছে, গান লিখলে এই সুবেলা ভাবটা এত বেশি পেয়ে বসবে যে, সত্যি-কারের কবিতা আর তিনি লিখতেই পারবেন না। তা গান লেখার চেয়ে কবিতা লেখা তিনি অনেক বেশি জরুরী বলে মনে করেন। অন্তত নিজের দিক থেকে।

কিউ, ই, ডি,—বন্ধু সোল্লাসে বলে উঠলেন, ইহাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু দিনেশবাবু নন, সব কবিরাই এক রা, গান লিখলে কবিতা লেখার দফারফা। কিন্তু কথাটা কী সত্যি?

আমি নীরব রইলাম।

বন্ধু আরগুমেন্ট শুরু করলেন, একজন দুজন কবির বেলায় সত্যি হতে পারে, সকলের ক্ষেত্রে নয়। কারণ তুমি দেখ, একালের অনেক কবিই তো ফিচার লেখেন। অনেকেই চেষ্টা করেন গল্প-উপন্যাস লেখার জন্যে। মহৎ কোনো টানে। নয়। বেশির ভাগই অ-সাহিত্যিক প্রেরণার। তবে আর গান লিখতে দোষ কী? বরং কবিতা লেখার প্র্যাকটিস থাকে বলে সেটা অনেক ভালোভাবে উৎরে যাওয়ার কথা। গল্প-উপন্যাস তো পরধর্ম। ঠিক কিনা বল?

কী বলব ভেবে পেলাম না। আমার শুধু মনে হতে লাগল, কবিরা না লেখার ফলে কবিদের ভাল-মন্দ যাই হোক, শ্রোতাদের দিক থেকে ফলটা খুব সুখকর হয় নি। কিম্বা তা যদি হয়েই থাকে সেটা হয়েছে আরও শোচনীয় রকম খারাপ।

দশ-বারো বছর আগে একজন জনপ্রিয় গাইয়ের একটা গান শুনেছিলাম রেডিওতে। শুনেছিলাম বলা ঠিক হবে না, পথচলতি কানে এসেছিল এক প্যান্ডেল থেকে। তার প্রথম লাইনটি মনে আছে আজও। গায়ক বেশ দরদ দিয়ে গাইছিলেন — বল্লভ চলে গেল, পল্লব ঝরে গো।

কত আর বয়স হবে তখন সেই গাইয়ের? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। সেই বয়সের একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক (তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতও গেয়ে থাকেন) গাইছেন কিনা বল্লভ— এবং কীর্তন নয়, আধুনিক গান হিসেবে। একবারও মনে হল না তাঁর, পৌরা-ণিক ধাঁচের যাত্রায় ছাড়া বল্লভ শব্দটি এ শতাব্দীতে আর একবারও ব্যবহার করা হয় নি। এবং তার পরে ঐ পল্লব— কী তাৎপর্য ঐ শব্দটির? শুধুই বল্লভের সঙ্গে বেশ একটু অনুপ্রাসের মত শোনাবে এই জন্যেই তার আমদানি? নাকি কবি এইটেই বোঝাতে চাইছেন যে বল্লভের উদবস্থ হবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল পল্লব, এবং সে চলে গেল বলেই ঝরে পড়ল সেগুলো? অথবা এ কী সেই বিখ্যাত কাব্যালংকার যাকে বলা হয় — প্যাথেটিক ফ্যালাসি? তা সেদিক থেকে ব্যবহারটা বেশ প্যাথেটিক বটে। এবং ফ্যালাসিও তৈরি করেছে বটে।

আজকাল কি এর চেয়ে ভাল কিছু লেখা হচ্ছে?

মণীন্দ্র রায়

আমি কেমন আছি?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

নন্দ চৌধুরীর মাঠে আর যাওয়া হয়নি কখনো। আর কোনোদিন ফুটবল খেলতে যাইনি। কেবল পরাশরের জন্যে নয়। বিপদ জনক এগারোজন প্রতিপক্ষের লাথি গুঁতোর ভয় এবং নিজের দলের লোকজনের গালা-গালি, সমালোচনা—এসব আমার কাছে অসম্ভব ছিল। কয়েকদিন বা কয়েক মাস খেলা-ধুলোর পরেই কেমন যেন বুঝে গিয়েছিলাম ফুটবল খেলোয়াড় আমি কোনোদিনও হতে পারবো না। বল যতো কাছে আসতো আমার পা ততো অসাড় শক্ত পাথরের মতো ভারী হয়ে যেতো। কয়েকদিন ইস্কুলে মাঠে ক্রিকেট খেলতে গিয়েও দেখেছি একই অবস্থা। আকাশ থেকে উল্কার মতো তীব্র একটা বল যখন ঠিক আমার কাছেই নেমে আসে, মাঠ ভর্তি লোকজন যখন দারুন কোনো উত্তেজনায় সচকিত সাবধানী, আমি তখন দু হাতের ফাঁক দিয়ে বল ফেলে দিয়েছি। সারা মাঠ জুড়ে বিদ্রূপ, বিশ্রী আওয়াজ নির্মম হাসি আমাকে একা করে দিয়েছে। তারপর ফুটবল থেকে ক্রিকেট সমস্ত দলেই আমি বাদ পড়ে গেছি। অথবা এলেবেলে। ক্রমশ ক্রমশ আমার বন্ধুত্ব হোলো থ্রি মাসকেটিয়ার্স, ডেভিড কপারফিল্ড আর টম সইয়ারের সঙ্গে। অপুর সঙ্গে। পটলডাঙ্গার প্যালারাম, কাঁচ সংসদের সঙ্গে। হাকল বেরি ফিনকে নিয়ে আমি তখন নদী-নালায় ভেসে যেতাম দিব্যি নিরাপদে চিলে ঘরের সিঁড়িতে বসে। স্বপ্নের অনিয়মে। ইস্কুল ফেলে দুধের গেলাস হাতে চিলে ঘরের সিঁড়িতে সম্রাটের মতো বসে থাকতাম। তারপর একসময় বিকেল ফুরিয়ে যেতো দুধের গেলাস ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। যে সব ঘুড়ি তখনো বিরাট আকাশে ভোকাটা না হয়েও ভেসে ভেসে এ ওর সঙ্গে গলাগলি রসিকতায় বিভোর তারাও ক্রমশ লাটাই-এর কাছে ফিরে যেতো আমার তখন পড়ার ঘরে ফিরে আসার সময়। সারা বাড়ির মিয়ানো হলুদ আলোয় মন খারাপ লাগতো। বারান্দায় ঠাকুর্দার খালি ইজিচেয়ার, ভাইবোনদের পড়া মুখস্থের হেঁচকা স্বর আর ঘরের বাইরে কালো আকাশে একটা দুটো দশটা হাজারটা তারার দল—মনে হোতো কোথাও চলে যাই, দমবন্ধ করে জলে ডুব দেবার মতো এই সন্ধ্যে রাত্তিরটা থেকে ভেসে উঠি অন্য কোনোখানে। মনের ভিতরটা একরকম কথা বলতো আর শরীর অন্য রকম। মাঝে মাঝেই আমার জ্বর হোতো। বিছানায় ঝিমিয়ে থাকা ঠুনঠুন করে কাঁচের গেলাসে হরলিকস কিম্বা বার্লি গোলার আওয়াজ, ডাকতারের জুতোর মসমস বিছানার এক-কোণে দাগ কাটা মিকসচার, থার্মামিটার—বাড়ির লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচির পাশে নিঃঝুম একা আমি—কেবলই সব কিছু থেকে বাদ পড়ে যেতাম। যে মানুষ অহংকারী সে মানুষই একা। মহাভারতের কর্ণ সফোক্লেসের ঈডিপাস, কেরেন, রসিনের ফেদ্রা। এদের সবার মধ্যে নিরন্তর কোনো কিছু জ্বলে যায়, কেউ তা বোঝে না। পৃথিবী নির্বোধ কেবল কয়েকটা মানুষ ছাড়া—এরকম একটা ধারনা আমার শৈশব যৌবনের মাঝে যে বয়ঃসন্ধি সেখানে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিলো।

ওই সময়েই মানে চোদ্দো থেকে বিশের মধ্যেই আমি জানতে পারলাম কেউ কাউকে বোঝে না, বুঝতে চায় না। পৃথিবীর প্রায় পঁচানব্বই ভাগ লোকই পরাজিত এবং দুঃখী। এ দুঃখের শিকড় কোথায় তা বড় বুঝতে ইচ্ছে হোতো। প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলায় বাবা যখন বাড়ি ফিরতেন দাদার চিঠির জন্য হা পিত্যেশ করতেন আর তারপর ঠাকুর্দার শূন্য চেয়ারের পাশে বসে পড়তেন জগোছালো তখন বাবার মুখের মধ্যে একটা মেঘলা আকাশ নেমে আসতো। ওর নাম দুঃখ। তখন বাবার একা থাকার দরকার ছিল। তখন আমার রাস্তার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে করতো। চোদ্দো বছর একটানা বিছানায় শুয়ে শ্রীরামপুরের বাড়িতে দাদামশাই যখন মারা গেলেন, তাঁর চিতার ধকধকে আগুনের মধ্যেও ওই একই রং ছিল। তা কেবল দিদিমার মন জানতে পেরেছিলো হয়তো। সেদিন শ্মশানে সারা দুপুর পোড়া কাঠের গন্ধ, গঙ্গার জল এবং রোদ্দুর ঘামের মধ্য দিয়ে আমার প্রাত্যহিক অসুখ অতৃপ্তি কেমন যেন জবু-থবু হয়ে বসেছিলো। বাড়ি ফিরে স্নান করেও আমি মৃত্যুর গন্ধকে ভুলে যেতে পারিনি। কেবলই ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো আমার। কেবলই উনুনের আগুনের সামনে হাত-পা মেলে ধরে সেই নির্মম সত্যটার আঁচ নিতে ইচ্ছে করছিলো। যেদিন আমি মরে যাবো তখন তখন আমার ওই প্রিয় শরীর জুড়ে এই এক গন্ধ পাওয়া যাবে। রাতদিন ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছি এরপর একদিন বাবার মতো হয়ে যাবো। তারপর ঠাকুর্দা দাদা-মশাই-এর মতো ভেবে ভেবে কেবল এক কান্না বুকের মধ্যে শির-শির করতে লাগলো। বুকের ওই শিরশিরটা একদিন তলপেটে জমা হোলো। তারপর একদিন খাটের তলায় বাবার পেনের ঢাকনি খুঁজতে গিয়ে সেই ব্যথাটা প্রবল কোনো উত্তেজনা হয়ে আমার স্প্রার্মাটোজোর জন্ম দিল। শৈশব থেকে এক কিশোর-পুরুষ হয়ে গেলাম আমি। ঘটনাটাতে ভীষণ ভয় পেলাম। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেই অবাক। আমি। আমি। আমি! আরো কোনো প্রশ্ন আর কোনো দুঃখ জন্ম নিয়েছে। মাকে জানাবো? কে যেন ভিতর থেকে বলে দিলো না।। অহংকার জন্ম নিল। আমার মধ্যে আর একটা আমি শুরু হলাম।

এসব কথা লেখার কোনো মানে নেই। অনেকটা কবিতার মতো। মানে নেই তবু কবিতার জন্য যেমন হন্যে হয়ে যায় কেউ কেউ। যন্ত্রণার কাছে কবিতা ছাড়া আর কেই বা থাকে। মানে না থাক ওর মধ্যেই কোনো মানে কোনোদিন জন্মাবে। সবচেয়ে শেষে যদি কোনো সুন্দর থেকে যায় যন্ত্রণার মূল ধরে নাড়া দিলে একদিন না একদিন তাকে কাছে পাওয়া যাবেই। আঠেরো বছর বয়স আমাকে সে কথাই বুঝিয়েছিল। দুঃখের কাছে আমি চিরঋণী। আর হ্যাপিনেস একজল্টস, হ্যাপিনেস ফ্ল্যাকেনস ব্লেকের এই কথাগুলোকে আলাদা আলাদা করে চড়া দামে কিনে নিয়েছিলাম ওই অতটুকুন আমি। মন্বন্তর দেখিনি, মহামারী দেখিনি—তবুও। আঠেরো থেকে একুশে আমাদের সবাই তাই সুখকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। শুধু ইডেন হস্টেল থেকে বেরুর ল্যাবোরেটরিজ, বেরুর ল্যাবোরেটরিজ থেকে প্রেসিডেন্সির মেইন বিল্ডিং বা কলেজ করিডোরে নয়, সারা কলকাতা জুড়ে আমাদের বিভিন্ন কোরাসের একটাই মূল কথা ছিল। মিছিলে নিমগ্ন থেকে আমরা আঁদে জিদের মতো বলেছিলাম 'আদিও ডিয়ার ফ্রেন্ড, মে গড র‍্যাশন ইয়োর হ্যাপিনেস।

আমরা সবাই ছিলাম আলাদা আলাদা দ্বীপের একক অধিবাসী। তবু শৈশবের এই সেকেন্ড চ্যাপটারে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মতো অকসিজেনের বুদ্বুদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আলোজ্বলা কলকাতার উপর ধাক্কা দিচ্ছি সব সময়। শ্রীলা তখন ল্যাভারিস্কিস পয়েন্টের নায়িকার মতো কেবল স্বপ্নে স্বপ্নে গানে গানে। কোথায় ওহায়োতে চারজন যুবক মারা গেছে পুলিশের গুলিতে, দশজন সৈন্য নিয়ে বিকসন ঘটনার তদারকিতে আসছেন। কোথায় যুবক বব ডিলান শ্মশানের নরকের মৃত্যু নদীর ইতিহাস শোনাচ্ছে। কোথায় বেহালায় বারাসতে অন্ধকার নির্জন জলার ধারে অভিমন্যু নিধন হচ্ছে—শ্রীলা কেবল ভালোবাসার পেগাসাস ঘোড়াকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছে শ্রীলা, ঘন ঘন চারমিনারের তামাকের সঙ্গে গাঁজা মিশোচ্ছে। রাত নটার পর দারোয়ান কলেজ থেকে মাঝে মাঝে ওকে ধমকে বার

করে দেয় বলে শুনি। যাত দুলোয় পর পুলিশ হানা দেয় কলেজ হোস্টেলে। খুঁজে পাবে না জেনেও পুলিশ যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা সবাই বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, উপত্যকায়, পাহাড়ে। শহরে বারুদের গন্ধ। দোকানদার ঝাঁপ বন্ধ করে, বড় রাস্তা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যায়। দেশে দেশে শহরে শহরে দান করতে বেরোন বিশ্ব ব্যাংক চেয়ারম্যান ম্যাকনামারা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসর প্রাপ্ত মার্কিন সেনাপতি। টোকিও এয়ারপোর্ট থেকেই ম্যাকনামারা ফিরে যান ছাত্র অবরোধে। জাপান ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে। অথচ কলকাতা ইয়ুনিভার্সিটির ভাইসচ্যান্সেলর ম্যাকনামারার সাদর অভ্যর্থনায় সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেন। হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্ল্যাওয়ারস গান গাইতে গাইতে শ্রীলা মিছিলের মাঝে এগোতে থাকে। সে মিছিল ম্যাকনামারারকে ফিরে যেতে বলেছিলো। [illegible] হয়তো করে দেব মিছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে অনেক রক্ত বয়ে গেছে। ম্যাকনামারা অসুখী তাই বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান ম্যাকনামারা কলকাতাকে সুখী করতে এসে ছিলেন। তার হাতে ছিল অনেক টাকা।

ভালোবাসা। এই ভালোবাসার জন্যেই তো আমরা সবাই ঘন হয়েছিলাম তখন একে অন্যের কাছে। ভালোবাসার জন্যেই তো প্রতিবাদ, ভালোবাসার জন্যেই তো বিপ্লব। লেট মি সে অ্যাট দ্য পয়েন্ট অব সিমিং বিডিকিউলাস, দ্যাট আ টন্ রেভলি-উশনারি ইজ গাইডেড বাই দ্য গেন্টে ফিলিংস অভ লভ—চে গুয়েভারার এ কথাগুলোতে যুক্তি তর্কের বিচার ছিল না, ছিল সেই আবেগ, বিপ্লবের সেই মহৎ তাড়না—দিন কে রাত করে দিতে পারতো। আমরা উনিশশো আশি সালের দিন গুনতাম। তখন শ্রেণীহীন সমাজ আসবে, তখন নিরন্তর কবিতায় মগ্ন থেকে খোলা আকাশের নিচে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে হেঁটে যাবো—উই শ্যাল গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সমডে—উই শ্যাল ওভারকম... কিপ ইয়োর আইজ অন দ্য প্রাইজ হোল্ড অন লেট দ্য বুলিং ক্লাসেস টেম্বল অ্যাট দ্য কম্যুনিস্ট রেভলিউশন দ্য প্রোলেতারিয়েনস হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট দেয়ার চেইনস.... তখনো উনিশশো একাত্তর সামনে আসেনি। ম্যালকম এক্সের মৃত্যুকে আমাদের বক্ষতের গভীরে ঢেকে রেখেছিলাম গোপন পিস্তলের মতো। ঋতিকের সুবর্ণরেখা দেখতে গেলাম একদিন—আমি, সুমন্ত্র, শ্রীলা। বোধবারের মর্নিং শো-এ।

এক অল্পবিস্তর ধানক্ষেতের পটভূমিতে নবজাতকের চিরজীবিতের গান শুনতে পেলাম। তখনো আমি ভালো ছিলাম।

চিঠিপত্র

শরৎচন্দ্রের নাম বাদ গেছে

কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর 'সাহিত্য ইত্যাদি ..লেখায় ২৪ মার্চ ও ৩১ মার্চ সংখ্যা অমৃততে কয়েকটি ভুল ধারণা পরিবেশন করেছেন। অমৃত পাঠকবৃন্দ যাতে সেগুলো সংশোধন করে নিতে পারেন তারই জন্যে এই চিঠির অবতারণা।

প্রথমতঃ ২৪ মার্চ অমৃততে তাঁর 'বই-পড়া ও বইমেলা' লেখাটিতে মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, কারো কারো মুখে তিনি শুনেছেন মানিকবাবু নাকি বইপত্র পড়তেন না। তিনি নাকি বলতেন বই পড়লে তাঁর অরিজিনালিটি নষ্ট হয়ে যাবে। ইত্যাদি। এই 'কারো কারো' মুখগুলি কাদের, একবার দেখতে বড় সাধ হয়। ফ্রয়েড হ্যাভলক ইত্যাদি হয়তো তাঁর পড়া ছিল। কিন্তু দেশ-বিদেশের সমস্ত সাহিত্য শুধু পড়া নয়, অধ্যয়ন করা ছিল তাঁর। তবে আজে বাজে বই তাঁর হাতে উঠত না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বেঁচে দেওয়ার হাত থেকে আমার মস্ত ট্র্যাকভরা টলস্টয়, গোর্কী, শ, মোপাসাঁ, দস্তয়েভস্কি, শেকসপীয়র, শরৎ বংকিম, ছাড়াও অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শনের লেনিন স্ট্যালিন রজনীপাম দত্ত, সব তিনি তাঁর কাছে আটক রেখে আমার প্রয়োজনে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, যাতে আমি ওগুলি বেচে নষ্ট না করি। আমি দেখেছিলাম, ওসব এবং আরো অনেক বই, যা আমার সংগ্রহে ছিল না, তাতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বরং কোন বই কেমনভাবে পড়তে হয় ছাত্রের মত, তা তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন। অতএব ধূর্জটি মুখুজ্যের অশিক্ষিত পটুত্বের কথাটা গায়দাহেরই নামান্তর বলে মনে করি।

এবার শরৎচন্দ্র। মণীন্দ্রবাবু একথা ঠিকই লিখেছিলেন যে শরৎচন্দ্র নিজের অল্প পড়াশোনার কথা নিজেই চালু করে গিয়েছেন। কথাটা সত্য। আরো একটা কথা তিনি চালু করেছিলেন যে তিনি ইংরিজি-টিংরিজি জানতেন না। ভাগলপুরে গিরীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে দেখেছি শরৎবাবুর ইংরিজি লেখা চিঠি। না পড়লে সাতবার এম-এ পাশ করা যায়। গিরীনবাবুর দুই ছেলে সন্তু মন্তু আমার সহপাঠী বন্ধু। শরৎবাবুর ইংরিজিতে লেখা চিঠি ঐ বাড়ীতে বাঁধিয়ে রাখা ছিল।

অবশ্য মণীন্দ্রবাবু বলেছেন এবং খাঁটি কথাই বলেছেন যে মানিকবাবু যে-বই পড়তেন না সেকথা ঠিক হতে পারে না, এবং শরতের কথায় লিখেছেন, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন এবং বিশেষ করে নারীর মূল্য বইয়ে দেখা যায় কেমন কোমর বেঁধে শরৎ পড়াশোনা করেছেন। অতএবে ধারার দরকার কি। শরৎবাবু যখন রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে দ্বিতীয়স্থান দিয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করা হলে দেববাসকে প্রথম, তখনই বোঝা উচিত যে তাঁর পড়াশোনা কত গভীর এবং সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল। স্কুল-কলেজের ক্লাশরুমে মাস্টারমশাই আর অধ্যাপকের নির্দেশে পড়া এবং পরবর্তী জীবনে তা শিকেয় তুলে রেখে ধান্দাবাজী করে বেড়ানো এক জিনিস আর আজীবন গভীর অধ্যয়ন অন্য জিনিস। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল পালিয়েছেন। নাইটহুড ছাড়বার চিঠিখানির ইংরিজির সামনে অনেক দিগ্গজ খাস ইংরেজকেই মুখ্যু মনে হবে। আসল কথা অবন ঠাকুর যামিনী রায় ভ্যান গগ্ ক্লাশ অবধি পড়েছেন, একথা জানতে তথাকথিত শিক্ষিত জনের লজ্জা হওয়া উচিত। পড়ার সমুদ্র ছেঁচে ফেললেও নেসফিল্ড-চেম্বার্সরা কোনদিনও শেকসপীয়র-শেলী হতে পারবে না।

৩১ মার্চের অমৃততেও মণীন্দ্রবাবু তুলি-কলমের সমাচারে সাহিত্যিকদের ছবি আঁকার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের নামটি বাদ পড়ে গেছে। শরৎচন্দ্র বর্মাতে ছবিও আঁকতেন। রীতিমত ক্যানভাসে এবং নানা রং মিলিয়ে পরীক্ষা করতেন নতুন রংএর।

তরুণকুমার চক্রবর্তী
হার্নগঞ্জ, হাজারীবাগ

অনেক বাঙালী সাহিত্যিকই ছবি আঁকেন

৩১ মার্চের অমৃততে 'সাহিত্য ইত্যাদি' বিভাগে মণীন্দ্র রায় লিখেছেন, '..বাঙ্গালী লেখকরা এখন আর কেউ ছবি আঁকেন বলে জানি না।' তাঁকে জানাই, তিনি না জানলেও বর্তমান অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকই ছবি আঁকেন এবং তা ছাপাও হয় সসম্মানেই। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সত্যজিৎ রায় ও পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁদের নিজেদের বই ছাড়াও অন্যান্য অনেক পত্রপত্রিকা ও বইয়ের প্রচ্ছদ ও আভ্যন্তরীণ অলংকরণের কাজ কৃতিত্বের সঙ্গেই করে থাকেন। শীরাস কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু পত্রী বা সত্যজিৎ রায়ের অবদানের কথা স্বীকার করেন না?

প্রবীর মোষরায়
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কয়েকটা দিন পুরীতে কাটিয়ে এলুম; পাষ সমস্ত শুক্লপক্ষটা।

মাথায় খেয়ালটা উঠল একদিন ডায়মণ্ড হারবারে জোয়ারের ভরা গঙ্গার ওপর জ্যোৎস্নার কারসাজিটা দেখে। ভাবলুম, এখানেই যদি এই রকম তাহলে না জানি সীমাহীন সমুদ্রের ওপর কি রকমটা হওয়া সম্ভব। কৌতূহলটা হতে ধারা পুরী বা দীঘা হয়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা করলুম। সবচেয়ে বেশী আমার নাজ্জামাইয়ের ওয়াকি-বহাল হওয়ার কথা। সে একটু কবিভাবা-পন্ন, সেখেটেখেও, তা ভিন্ন পুরীই যায় বিয়ের পর হনিমুন বা মধুচন্দ্র করতে। আমি আশা করেছিলুম হয়তো একটা কবিতাই বের করে শোনাবে সেই সময়ের লেখা।

বলল—দাদু মধুর দিকটা নিয়ে এমন পড়েছিলুম চন্দ্রের দিকটা একেবারেই বাদ পড়ে গেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকে প্রশ্ন করি সে হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু মানিক। খুব ঘোরা-ফেরার বাই আছে, পুরীই যে কতবার গেছে তার ঠিক নেই, তা ছাড়া ওয়ালটেয়ার, জুহু, দীঘা। সমুদ্রের ওপর জ্যোৎস্নার শোভা দেখবার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয় লোকে, আশ মেটে না বলে, তা মানিক নিজে কেমন দেখল ?

বিশেষজ্ঞ হিসাবেই প্রশ্ন করা, মানিক উত্তর না দিয়ে আমার মুখের ওপর খানিকটা দৃষ্টি মেলে রাখল, বার দুই তুলে আমার কপালের ওপরও রাখল, তারপর প্রশ্ন করল— সারাদিন ঘুরেফিরে এসে সারারাত সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বসে জ্যোৎস্না দেখব। ভাগিস বালি গুনতে বলিস নি। তোর মাথার ঠিক আছে তো ?"

আর জিজ্ঞাসার দিকে না গিয়ে নিজেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়ে আশা ঠিক করলাম। আমি নিরাশ হইনি।

অবশ্য, এমনই নিরাশ হওয়ার কথা নয়, তার ওপর আমি যে উপায়টি অবলম্বন করেছিলুম তাতে সমুদ্রবক্ষলগ্ন জ্যোৎস্নার পূর্ণরূপটি ধরা না দিয়েই পারে না। আমি প্রায় গোটা শুক্লপক্ষটা কাটালুম বটে পুরীতে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেল ঘর ভাড়া নিয়ে, কিন্তু তার মধ্যে দেখবার মতো করে জ্যোৎস্না দেখলুম মাত্র পাঁচটা দিন; বলা বাহুল্য শেষের দিনটা ছিল পূর্ণিমাই। তার মানে, একবার দেখার পর আমি গড়পড়তা তিন চারটে দিন বাদ দিয়ে গেছি যাতে ক্রম-বর্ধমান শশীকলায় যে প্রভেদটা সৃষ্টি করে যাচ্ছে সেটা আমার দৃষ্টি না এড়িয়ে যায়। রোজ দেখে গেলে যেমন প্রভেদটা ধরা পড়ত না চোখে, তেমনি এমন একটা জিনিস এক-ঘেয়ে হয়ে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

বুঝছি একটু বাড়াবাড়ির মত শোনায় বটে, কিন্তু কেমন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল, আমার এই সৌন্দর্য অভিযানে একটা নখকণাও বাদ দোব না।

বাকি কটা দিন যে সমুদ্র আর জ্যোৎস্নাকে বাইরে রেখে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতাম এমন নয়। কটা দিন পালা করে বাইরে কাটালুম; কটক, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, দেখেশুনে কিছু কিছু আত্মীয় পরিচিতও আছে তাদের সঙ্গে দেখাশুনো করে। এর থেকে মনটা বিষয়ান্তরে এসে পড়ে যেন আরও বুভুক্ষু হয়ে থাকত পুরীর সমুদ্র তটের জন্যে। বিরহ যে একটা মানুষকে নিয়েই হবে তার কি কথা আছে ?

শহরের মধ্যেও পরিচিত দু-তিন ঘর ছিল, এসারে আর দু-তিন ঘর বাড়েও। তাঁদের বাড়ি সন্ধ্যার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমি খানিকটা রাত করেই ফিরতুম। পুরী-যাত্রীদের মরশুম নয় এমনই লোক কম হোটেলে, ওপর তলায় দারা থাকত তারা আহারাদি সেরে ভেতরে শুতে চলে গেলে আমি বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসতাম। হোটেলটা সমুদ্র দেখবার মত করেই তোয়ের।

অপূর্ব দৃশ্য। ওপরে দিগন্ত-প্রসারিত নীলাভ আকাশ। গোটাকতক বড়-বড় নক্ষত্র দূরে-দূরে ছড়ানো, সেগুলোই দীপ্ত, বাকিগুলো অবলুপ্ত, শুধু স্পষ্ট-অস্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে ছায়াপথটা অর্ধ-বৃত্তাকারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লুটিয়ে রয়েছে।

নীচে ঊর্মি-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ওপর জ্যোৎস্না। ঊর্মিগুলো তীরের কাছে উত্তাল, তারপর যত দূর ততই সেগুলো ছোট হতে হতে দিকচক্রবালে একটি অচঞ্চল রেখায় যেন স্থাণু হয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলে উঠে উঠে যাচ্ছে মিলিয়ে।

সমস্তর ওপর জ্যোৎস্না। এত সূক্ষ্ম, এত সীমাহীন এত বিরাট যে মনে হয় যেন অপার্থিব কি একটা মায়ালোক চোখের সামনে দুলছে, সামনের ঢেউগুলোর মত যে-কোন মুহূর্তে গুটিয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারে। ধরাবাঁধা বয়েসে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাবটা গেছে বেড়ে। চতু-র্দশী আর পূর্ণিমায় আমি উপর্যুপরি দুটো রাতই বসেছিলুম। পূর্ণিমার দিন যখন ভেতরে শুতে এলাম, টেবিলে হাত-ঘড়িটায় দেখি রাত তিনটে বেজে গেছে।

এত ভরাট মন নিয়ে পূর্বে কখনও কোন স্থান থেকেই ফিরে আসিনি বাড়ি। অনেকদিন পর্যন্তই, জ্যোৎস্না পক্ষ এলেই আমার মনে সেই জ্যোৎস্নারবন্যা যেন আস্তে-আস্তে চেপে এসে অভিভূত করে দিত।

তারপর আবার একদিন দেখলাম জ্যোৎস্না। তার জন্যে আমায় প্রত্যাশা নিয়ে প্ল্যান করে দূরে যেতে হয়নি কোন বিশেষ লগ্ন বা তিথির জন্যেও অপেক্ষা করতে হয়নি। সে-জ্যোৎস্না ছিল যেমন আক-স্মিক, ভঙ্গুর, তেমনি অল্প পরিসর। সেও এক হোটেলেই। বেড়াতে গেছি। দুটি পরিবার আমরা দোতলার দুটি ঘরে পাশা-পাশি রয়েছি দিন দশ ধরে। যোগসূত্র বিশেষ করে হয়েছে ও'দের বছর দেড়েকের মেয়েটি, নাম বুবা। ঋতুটা হেমন্ত। রাত্রে শীতল হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। আমি ওপর থেকে নীচে আসছিলুম কি একটা দরকারে, আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে নজর যেতে দেখি, ঘুমের ঘোরে হাত-পা চালানোয় বুবার গায়ের ঢাকাটা একটু সরে গেছে। ঘরে কেউ নেই। হালকা গোছের দমকা হাওয়ায় ওদিকের জানলাটা অল্প একটু খুলে গিয়ে শরু একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। নিতান্তই আকস্মিক, শুধু আর একটি আকস্মিক তার সঙ্গে যোগ দিল। একটি ক্ষণিক হাসি ফুটে উঠে তখনি আবার মিলিয়ে গেল রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে। ওরা সদ্য স্বর্গচ্যুত হয়ে এই সময় কি স্বপ্ন দেখে। মেয়েরা বলে দেয়ালা করা।

তখনই আর একটা দমকা হাওয়া উঠে জানলাটা চেপে দিল; জ্যোৎস্নাটাও গেল মিলিয়ে।

আমি ওর গায়ের ওপর ঢাকাটা ভালো করে টেনে দিয়ে বেরিয়ে এলুম। হ্যাঁ লোভ হয়েছিল বৈকি জানলাটা ভালো করে একটু খুলে দিয়ে দেখতে। কিন্তু পরের ঘরে একটা স্বাভাবিক সংকোচ তো ছিলই, তা ভিন্ন মনের গভীরতা থেকে একটা বিষণ্ণ বিশ্বাস এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল, ঠিক এ-জিনিসটা আবার পাওয়া যাবে না। দুবার আসবার জিনিস নয় এ।

লোভ সংবরণ করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম।

তারপর আজ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারিনি, আমার অভিজ্ঞতায় জ্যোৎস্না কোথায় সবচেয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল—অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে সেই অপরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে, না, একটি মাত্র সংকীর্ণ দেখায় একটি সুপ্ত শিশুর ক্ষণপ্রতিভূত হাস্যকণিকার ওপর।

দীর্ঘকাল অবজ্ঞা, অবিচার, অবহেলা কুড়িয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষাগুরুরা, তাঁদের অন্ধকার ঘরে সূর্যরথ ঢুকে দাঁড়াল না এখনো। দেশে কত বড় বড় পরিকল্পনা, অর্থ বিনিয়োগ কত বিশাল বিশাল ডিগ্রিখানা অথচ যেটা গোড়ার কথা তার কোন হিল্লে হল না। যে দেশে নিরক্ষরতার অসুখে কোটি কোটি মানুষ ভুগছে, মানবিক আকৃতি নিয়েও তারা অনেকাংশে প্রাগৈতিহাসিক থেকেই গেল— তাদের মহাসভ্যতার ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না, এত বড় অবিচার ভারতীয় জল-বায়ুতে অটুট থেকে গেল দিনকে দিন। যাঁরা মানুষকে সাধারণ বিদ্যে-বুদ্ধি দান করার কাজে নিজেদের লগ্নী করেছেন, সেই সব মহাতপস্বী প্রাথমিক শিক্ষাগুরুরাও সমানভাবে সামাজিক চোখে কৃপার পাত্র হয়ে কোনভাবে বেঁচে আছেন।

প্রাথমিক শিক্ষককে কী দিয়েছি?

লোকটাকে চেনেন?

ওই যে পা ঘষটে ঘষটে, সামনে ঝুঁকে, কোনোদিক না তাকিয়ে হাঁটছেন, চেনেন ওঁকে?

উনি রামবাবু। প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ান। আমার মাস্টারমশাই ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষাগুরু রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবুরা...

রামবাবুর বয়েস আটান্ন টপকে গেছে গত ডিসেম্বর। দেখলে ষাটবট্টি মনে হবে। গালের মাংস ক্ষয়ে গেছে চামড়ার নিচে, তোবড়ানো হাঁড় জামিতিক ঔষধের বাহ্য ফলতঃ। তোবড়ানো গালের সড়কে বোঝা যায় প্রোটিনের তীব্র অভাব। চোখে দুধের পাতলা সরের মত ছানির গভীর আয়োজন। পুরু কাঁচ চশমার হাইপাওয়ারেও রেটিনায় শুয়ে থাকা আবছাভাব কাটে না, দু আঙুলে মণি কচলালেও না, বলে থাকেন রামবাবু। বত্রিশটা দাঁতের মধ্যে এখনো সাতটা থেকে গেছে কি ভাগ্যি। দু'টোর গোড়া ঢিলে হয়ে গেছে ইদানীং, টুপ করে খসে যেতে পারে যে কোনো সময়। একদা উচ্চতা সাত ফুটের কাছাকাছি ছিল। দেড় ফুট ছাঁটাই হয়ে মেরুদণ্ড এতই বাঁকা। কণ্ঠার হাড় করকরে চোখের মত রাতিকানা বোতামশূন্য হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবির ফাঁক চেয়ে থাকে বোকাবোকা। তিনু ইঞ্চি কব্জিতে ঘড়ি থাকে না, সময় জেনে নিতে হয় অন্যের কাছ থেকে প্রায়শই। পায়ের পেশী শিথিল বলেই ঘণ্টাটা হাঁটার পর জিরিয়ে নিতে হয় এক টিপ নস্যি নিয়ে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার নিত্য সঙ্গী ছাতি বোদ্দুরে বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে কাকরঙ চিত্রাবাঘের কালো ডোরা। ত্যাম্পি ফ্যাকাশে সাদায় বেমানান ঠেকে। পাকা চুল, ছাঁটা পড়ে হপ্তায় একবার। বিরল কেশ মাথায় কাঁশ থাকে না।

রামবাবুর সংসারে পাঁচজন প্রাণী। তিনি ও তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে। বড়ছেলে কলেজের একটা পাশ দিয়ে ব্যবসায় সংসারের অভাব অনটন সহ্য হত না তার। রামবাবুও পারছিলেন না পড়ার খরচ। ফলে বড় ছেলেকে ভর্তি হল, অ্যামপিউল তৈরির ব্যবসা। ঠিক হয়েছিল মাসের টাকা নগদ দিলেই চলবে, বাদ বাকি টাকার ব্যাপার অন্য বন্ধুদের। তাকে শুধু শ্রম দিতে হবে বেশি। ছেলে বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংসারের হাল পালটে দেবে বছর না ঘুরতেই। রামবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, দেখছিলেন উজ্জ্বল চোখ, যদিও কৃশ চেহারা। গিন্নির ভাঙাচোরা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুকাল। ওই শরীরে অপরূপ লাবণ্য ছিল। সে কি খুব দূরের কথা? ছোটো ছেলেটা প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে শরীরে মনে, অনুক্ষণ ধুঁকছে মনে হয়। মেয়েটার মনে যৌবনের ছোঁয়া লাগলেও অপুষ্ট থেকে গেছে শরীরের অনেক অংশ। ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে, টালি ভেঙে গেছে গত ঝড়ে। সে ঝড় বছরের প্রথম কালবৈশাখী ছিল। নিজের বুকের ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন, একটু বিশ্রাম পেলে ভাল হয়। সকাল সন্ধ্যায় টিউশানি, দুপুরে ইস্কুল। তবু রাত্তিরে রুটি চিবোতে হয়, সপ্তাহে একদিন তেলাপিয়া মাছ।

হাজার টাকার লগ্নীতে এ সবকিছুই হয়ত বদলে যেতে পারে। তাই শেষ সম্বল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে হাত রাখতে হয় অনেক চিন্তাভাবনার পর। কিন্তু সব স্বপ্ন চৌপাট হয়ে যায় ফিরতি বছরেই। ব্যবসা লাটে উঠে যায়। বড় ছেলে ফিরে আসে নিঃস্ব হয়ে, সেই সঙ্গে হাসপাতালে রেখে আসে একটা পা। মাল ডেলিভারি দিতে গিয়ে টেম্পো উলটে ঘটে যায় এই বিপর্যয়। দু'রকম শোক রামবাবুর বুকে বিঁধে গেল। হাজার টাকা দু'বছর ধার কাটা যাবে মাইনে থেকে মাস মাস। স্বপ্ন দেখার ভরতুকি দিয়ে যেতে হবে নির্বোধের মত। পঙ্গু ছেলে অহরহ অভিশাপ হয়ে ঘুরছে তাঁর চৈতন্যে ঘা মেরে। সে কার্যত বেকার, অনেকাংশে অক্ষম। রেশন দোকানে হিসেব লেখে, মাস গেলে সত্তর টাকা। ছোটো ছেলে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছে চাকরি চাকরি মানে কোনো কলকারখানায় কাজ। তার মেজাজ তিরিক্ষি সব সময়। বাবা মাকে সহ্য করতে পারে না সে বিশেষ করে বাবাকে। বাবার অক্ষমতাই যেন তার হাড়ে বাতাস ধরিয়ে দিয়েছে। আশেপাশে রকমারি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন, টান টান বেড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত, অথচ তার জীবন আয়োজনশূন্য। আসলে সে তেজি ঘোড়ার মত খেলতে পারছে না। না পারার কারণ বাবা। বাবা ভদ্রলোক আনাড়ি।

মেয়ের শরীর সুখ চায়, বয়েসের চাহিদা অনুযায়ী

ছাঁটাই হয়ে যেতে দেখলাম

গোবরডাঙ্গা গিয়েছিলাম বেড়াতে। মাসির বাড়ি। গোবরডাঙ্গা সেই প্রথম। সেখানকার বাতাসে, গাছগাছালির ছায়ায়, ঘুঘুর ডাকে, মেঠো পথের ধুলোয় দেশের বাড়ির মায়া লেগে ছিল। ভাল লাগছিল খুব। ঘরে না থেকে টো টো করে ঘুরতাম। রোগা যমুনার ধার দিয়ে এমনিই হেঁটে যেতাম লক্ষ্যহীন। বাড়ি ফিরতাম সন্ধ্যে উৎরে গেলে। ফিরে গল্প করতাম পাশের বাড়ির মাস্টারমশায়ের সঙ্গে। গোবরডাঙ্গার একটা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়াতেন। হাসিখুশি প্রাণখোলা মানুষ। জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। গল্প শোনার লোভ বোধ সন্ধ্যায় আমাকে তাঁর বাড়ি টেনে নিয়ে যেত। গেলেই তাঁর স্ত্রী চা করে খাওয়াতেন। চা খেতে খেতে গল্প হত।

পরের দিন কলকাতা ফিরব। মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেলাম দেখা করতে। গিয়েই দেখলাম দাওয়ায়, উঠোনে বেশ কিছু লোক। মাস্টারমশাই মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর স্ত্রীর মুখ দরজার ফাঁকে, চোখে উৎকণ্ঠা। তাঁর ছেলেমেয়েরা সামান্য দূরে হাবার মত বসে আছে।

বুক কেঁপে উঠল আমার। কোথাও গোলমাল হয়ে গেছে নির্ঘাৎ। আস্তে আস্তে দাওয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। যাঁরা ছিলেন কেউ চেনেন না আমাকে। তাঁদের কৌতূহল হল। তাঁদের পাশ কাটিয়ে মাস্টারমশায়ের পাশে গেলাম। মাস্টারমশাই চোখ তুলে তাকালেন। চোখের নৌকো জলে ডুবে গেছে। বড় অসহায় মনে হল তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম : কি হয়েছে ?

—ষোল বছরের চাকরি এক কথায় নট হয়ে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মাস্টারমশাই।

—অত সহজ নয়। আমরা ছাড়ব না। অল্পবয়স্ক একজন বলে উঠলেন। অর্গানাইজেশানকে জানাব। ডি আই-এর কাছে ডেপুটেশানে যাব। হেডমাস্টারকে ঘেরাও করব। প্রয়োজন [illegible] উত্তেজিত মনে [illegible] পেটে হাত বলে কথা [illegible] করবে নাকি ?

একজন বয়স্ক [illegible] বললেন : কাকস্য পরি[illegible] হবে না। যা হবার হয়ে[illegible] থাকলে তো কিছু হবে [illegible] কেশনে কি কোনো [illegible] কেনিমেষের কাজ করলে [illegible] পন্ন হব ? ও গুড়ে [illegible] মোছা।

আমি বয়স্ক মাস্টার[illegible] করলাম : কি এমন [illegible] চাকরি গেল ?

তিনি তাকালেন [illegible] বললেন : কিছু করা [illegible]

—কোর্টে যান [illegible]

—আইন থাকলে [illegible] বুঝেই নেই। ধ্বসর চোখে [illegible] তাকালেন আমার দিকে।

চাইতেই পারে। রামবাবু অমনোযোগী নন। তাঁরই চেষ্টাচরিত্তে মেয়ে সেজেগুজে চার দফায় ছেলের বাড়ির লোকজনের সামনে ভোগ্যপণ্য হিসেবে হাজির হয়েছে। সওদা বিকোয় নি। দুঃখ অপমানে মেয়ের বুক ভেঙে যাচ্ছে বারবার।

পঞ্চাশের গিন্নি আটান্নর স্বামীর কাছে মাঝে মধ্যেই আবদার করে থাকেন। বলেন : কোথাও নিয়ে গেলে না কোনো দিন। ঘাটে যাওয়ার সময় তো হল। চল না দিনহাটা বোনের বাড়ি কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি ? কত করে লেখে।

রামবাবু নস্যি টেনে বলেন : যাব, যাব। মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নি, নিশ্চয়ই যাব।

গিন্নি মুখ গোঁজ করে শুয়ে পড়েন। আবার কখনো বলেন : বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে গেছে। না কিনলেই নয়।

—হবে, সব হবে। দাঁড়াও না, মাইনেটা বেড়ে যাক। সরকার আমাদের মাইনে শীগ্‌গির বাড়িয়ে দিচ্ছে।

—আর বাড়িয়েছে। আজ তিরিশ বছর ধরে শুনে আসছি। বাড়াবে না কেন, সে তো মুষ্টিভিক্ষে।

রামবাবুর বুকের ব্যথাটা চনচন করে ওঠে সেই সব দিনে যখন কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু এসে পড়ে বাড়ি। চা জল-খাবার লাগে। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। করতে হয় বৈকি ? মানুষের বাড়ি জ্ঞাতিকুটুম্ব আসবে না ? রামবাবু থলে হাতে বাজারে যান। তরিতরকারি কেনেন। চাল কেনেন। বুইমাছের দোকানের চারপাশে চিলের মত পাক দেন। একসময় ধাঁ করে থলেটা এগিয়ে দিয়ে বলেন : কই, দাও তো হে পাঁচশ মাছ।

ফেরার পথে মুদিখানার দোকান এড়িয়ে আসেন। বাকির পরিমাণ মাস মাস বেড়ে যাচ্ছে। জগু মিত্তিরের কয়লার দোকান মাড়িয়ে হাঁপ ছাড়েন। জগু মিত্তির দেখে ফেললে নির্ঘাৎ বলে বসত : মাস্টারবাবু, বলেছিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই মিটিয়ে [illegible]

থাকেন তখন। আর ভোলার চায়ের দোকানে [illegible] ধরেন চোখের সামনে। তন্ন তন্ন করে দেখেন [illegible] ঘোষণা আছে নাকি কোথাও।

শ্যামবাবুর ছেলে নাইনে পড়ে, মেয়ে [illegible]। [illegible] বেরোনোর সময় শ্যামবাবুর স্ত্রী চারখানা আটা [illegible] টিফিন বাক্সে ভরে দেন, স্বামীর টিফিন। আর [illegible] পানের খিলি। শ্যামবাবু পান খেতে ভালবাসেন। ছাত্ররা শ্যামবাবুকে ভয় করে, পড়া না পারলে তিনি ভয়ানক রেগে যান [illegible] ভাল ছাত্রদের আদর করেন ভীষণ। মন মেজাজ ভাল থাকলে তাদের লজেন্স কিনে দেন। ইস্কুল ছুটির পর টিচার[illegible] বসে টিফিন করেন। টিফিন শেষে ঢকঢক করে [illegible] গেলাস জল। এক খিলি পান মুখে পুরে [illegible] কিছু দোক্তা। বোঁটায় করে চুন জিভের ডগায় চেটে [illegible]। তারপর জানলা দিয়ে কয়েকবার পিক ফেলবেন অসাবধা[illegible] ছিটে পড়বে জামায়, লাল লাল ছোপ পড়ে [illegible] জামায় বিস্তর পিকের দাগ।

শ্যামবাবু ইস্কুলের পর কোচিং [illegible] কোচিং সেরে বাড়ি বাড়ি টিউশানি। টিউশানির [illegible] দশটা। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলের চোখে ঘু[illegible] থাকে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন : তোর মাস্টারম[illegible]

ছেলের উত্তর দেয়ার আগে মা জানিয়ে[illegible]
ছেলে ঘুমোতে যাওয়ার অনুমতি পে[illegible]

শ্যামবাবু জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম [illegible] দাওয়া হয়ে গেলে পরীক্ষার খাতা দেখা চলে [illegible] ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে চান সেরে বাজার-হাট [illegible] পৌঁছে দিয়ে ফিরতি পথে একটা টিউশানি। [illegible] যাওয়ার তাড়াহুড়ো। এরি মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে [illegible]

রামকৃষ্ণ মঠে যাওয়া। শ্যামবাবু রামকৃষ্ণের ভক্ত।

শ্যামবাবু আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ন'মাসে ছ'মাসে যান। বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ নেই। এ-বাড়ি ও-বাড়ি টিউশানি যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তায় পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে চার-পাঁচ মিনিট কথা হয়। কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিল গেলে পথের পাশে সরে দাঁড়ান। সিনেমা পোস্টারের দিকে চোখ পড়লে নামিয়ে নেন চোখ। পান-বিড়ির দোকানের রেডিও থেকে খবর পাঠ শোনা গেলে দাঁড়ান না এক মিনিট। প্রসঙ্গ উঠলে হেডটিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যান অনর্গল। পুরনো ছাত্রর সঙ্গে দেখা হলে : এখন তো আমাদের চিনবিই না, বলেন।

খেপে গেলে স্ত্রী বলে বসেন : তোমার মধ্যে কোনো শখআহ্লাদ নেই। কেবল ইস্কুল, টিউশানি, বাড়ি। তুমি তো অমানুষ হয়েইছ, সেই সঙ্গে আমাকেও করে ছাড়ছ।

শ্যামবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় তিনি অনেকদিন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখেন নি। বড় লোড হয় দেখার। ঘুরতে ঘুরতে একেকদিন বিকেলে গঙ্গার ধারে এসে বসেন। গঙ্গার জলে টান। স্টীমার জল কেটে চলে যায়। সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিম ঢালুতে। বটের পাতায় দীর্ঘশ্বাস। আকাশে ক্লান্ত পাখিদের ফিরে আসা। অদূরেই শ্মশান—মানুষ পোড়ার গন্ধ ভেসে আসে নাকে। শ্যামদুলাল স্যারের চোখ ফুঁড়ে জল নামে। কিছুই পেলাম না। কেবল ফুরিয়ে যাচ্ছি। অর্থহীন ভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছি। কেন এই ক্ষয়?

—জীবনে একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে পারলে না, এমনি অপদার্থ। স্ত্রী বিদ্রূপ করেন।

—কেন, এটা কি চাকরি নয়? মাইনে পাই না? শ্যামবাবু যুক্তি দেখান।

—কর তো প্রাইমারি ইস্কুলে মাস্টারি, তার যে না মাইনে। সরকারী অফিসের পিওনও তোমাদের থেকে বেশি মাইনে পায়। তার ঘরে সুখশান্তি আছে। সিনেমা থিয়েটার আছে।

—সিনেমা থিয়েটার দেখতে চাও চল দেখিয়ে আনি। এতে রাগারাগির কি আছে? শ্যামবাবু নাভিতে তেল মাখেন। অভ্যেস তাঁর।

—থাক হয়েছে। ভিখ্ চাইনে তোর কুকুর ঠেকা। টিউশানি যেতে না পারার দরুন শেষে মাসখানেক ধরে খোঁটা শুনতে হবে। দুঃখে শ্যামবাবুর স্ত্রীর চোখে জল এসে যায়।

শ্যামবাবু কথা না বলে বাথরুমে ঢুকে যান। অনেকক্ষণ ধরে চান করেন। শরীর ঠাণ্ডা হতে সময় নেয়।

খেতে খেতে বলেন : পড়িয়ে টাকা নিই। কামাই করা কি ভাল?

—তাই তো বলছি, মাথা বিক্রি হয়ে আছে। আমোদ ফূর্তি করবে কি করে? শ্যামবাবুর স্ত্রী ধরা গলায় বলেন : মহা শত্রুরেরও যেন প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে না হয়।

বাধ্য হয়ে শ্যামবাবুকে থেমে যেতে হয়। ইস্কুলে যেতে যেতে ভাবেন তিনি : গীতার কথাগুলো কি সবই মিথ্যে?

যদুবাবু প্রাইমারি ইস্কুলে ঢোকার আগে চাকরির জন্যে পাঁচশ দরখাস্ত করেছিলেন, ইন্টারভিউ দিয়েছেন সত্তুরবার। সিঁকে ছেঁড়েনি। অপ্রত্যাশিতভাবে ইস্কুলের কাজটা জুটে গিয়েছিল পাড়ার ইস্কুল বলে। যদুবাবু হালে পানি পেয়ে গেলেন। অন্তত বেকার নন তিনি। আপাতত চলুক। পরে দেখা যাবে। অবশ্য তার পরে আর কিছু দেখাদেখির রইল না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ামাত্র যদুবাবু ঠিক করে ফেললেন তিনি অরগানাইজেশন করবেন। প্রাইমারি শিক্ষকদের লট ভাল করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখবেন। যদুবাবু লেগে গেলেন।

তার ইস্কুল সকালে। দুপুরে অরগানাইজেশন করেন। পড়াশুনা করেন রাত্রে। অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন যতখানি বাড়ানো যায়। মাঝে মাঝে পদ্য লেখেন। কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন। ভাল ইংরেজি ছবি দেখেন। আর্ট এক্সজিবিশানে যান। চায়ের দোকানে আড্ডা মারেন। সংসারের ঝক্কিঝামেলা কম। চলে যায় একরকম। মা বিয়ের বায়না ধরেন। ছেলে রাজি হয় না। ছেলের একজন ভাল লাগার মানুষ আছে মা হয়ত অনুমান করে থাকবেন। তাহলেও এখনো অবিবাহিত রয়ে গেছেন যদুবাবু।

সংগঠনের কাজে ক্রমশ জটিলভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন তিনি। পড়াশুনা বাতিল হয়ে যায় সময়াভাবে। কলমের আঁচড়ে পদ্য খোলে না। কবি সম্মেলন বোর লাগে। ছবিটবি দেখা হয়ে ওঠে না। যদুবাবু রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়েন। রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত হয়ে যান।

যদুবাবুর ভাবগতিক এবং ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ বুঝে নিয়ে লতিকারাণী (যদুবাবু পছন্দ করতেন) বাবা মার বাধ্য মেয়ে হয়ে গেছেন। বাবা মার ঠিক করা পাত্রর গলায় গোবের মালা পরিয়ে চেতলায় ঘরসংসার করছেন। যদুবাবু খবর পেয়েছেন। লতিকা সুখেশান্তিতে থাক আন্তরিকভাবে কামনা করেন যদুবাবু।

যদুবাবু যখন একলা থাকেন, ভীষণ একা—খুব ভাবেন, তার কিছু চাওয়া পাওয়া ছিল। কিন্তু হল না।

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাগুরুর চালচিত্র

প্রাথমিক শিক্ষাগুরু রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুর সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি। চুয়াত্তরের ডিসেম্বর অবধি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার দুশো পঁচাত্তর আর রাম-বাবু শ্যামবাবু যদুবাবুদের নাম্বার ছিল এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ন'শ এগার। বিগত আড়াই বছরে নিশ্চিতভাবেই ইস্কুলের সংখ্যা বেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষক সংখ্যা। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে সাতাত্তরের জুনে ইস্কুল চুয়াল্লিশ হাজার মত এবং শিক্ষকরা দেড় লক্ষের মাইল স্টোন ছুঁয়ে ফেলেছেন। দেড় লক্ষ শিক্ষাগুরুরা অনিশ্চয়তার অসুখে ভুগছেন, অন্ধকার ঘাঁটছেন কতকাল, একটু সুখস্বাচ্ছন্দের আশায় সূর্যের জন্ম মৃত্যু গুনছেন আঙুলের খাঁজে। অথচ তাঁরাই না শিখিয়েছিলেন অ আ, দুই আর দুই এ চার, লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই, সদা সত্যকথা বলিও? তাদের কাছেই না জ্ঞানোন্মেষ ঘটেছিল সেইসব মহাপুরুষদের যাঁরা আজ পরিকল্পনা করেন, বাজেট করেন, যাদের কৃপণ অস্ত্রশাস্ত্র তাঁদেরই শিক্ষাদাতাদের দু'বেলা দু'মুঠো খেয়েপরে থাকার পরিবেশ সৃষ্টিতে নির্মম থেকে যায়? প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা চেঁচেছুলে দিনকে দিন কেমন সরু করে ফেলা হচ্ছে চারটে পাঁচশালা পরিকল্পনার দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়।

	প্রাথমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চশিক্ষা	কারিগরি শিক্ষা
প্রথম পরিকল্পনা	৫৬ শতাংশ	১৩ শতাংশ	৯ শতাংশ	১৩ শতাংশ
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	৩৫ শতাংশ	১৯ শতাংশ	১৮ শতাংশ	১৮ শতাংশ
তৃতীয় পরিকল্পনা	৩০ শতাংশ	২১ শতাংশ	১৯ শতাংশ	৩০ শতাংশ
চতুর্থ পরিকল্পনা	১৪.৪ শতাংশ	২৪.৩ শতাংশ	১৫.২ শতাংশ	২৮.৫ শতাংশ

এক মাসের মাইনে

কথা হচ্ছিল প্রাথমিক ইস্কুলের একজন দিদিমণির সঙ্গে। চল্লিশ সালে প্রথম কাজে ঢোকেন। এ-ইস্কুল ও-স্কুল হয়ে এখন কৈলাস বোস স্ট্রীটের একটা স্কুলে পাকাপাকি আছেন। মেদশূন্য টান টান চেহারা, উজ্জ্বল চোখ। বয়েসের ভার শরীরে খুব বেশি দাঁত বসাতে পারে নি। হাসিখুশি—অথচ মুখের ত্বকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের ছাপছোপ। সিঁথি থেকে অনেককাল আগে সিঁদুরের চিহ্ন মুছে গেছে, কাঁচাপাকা চুলের ফাঁকে বিস্তর চওড়া সিঁথি। বলছিলেন তিনি : হুগলি জেলার তেদেশ্বর আর চাঁপদানির মাঝামাঝি একটা প্রাথমিক ইস্কুলে পড়াই। বেতন পেতাম তখনকার দিনে অবিশ্বাস্য রকম ভাল, মাসে পঞ্চান্ন টাকা। বিয়াল্লিশ সালটাল হবে। কলকাতা বা আশেপাশে বোমা পড়ার আতঙ্ক। লোকজনের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, ভয়। হুগলি জেলার মানুষজনও ভয়ে জড়োসড়ো। আমি যেখানে কাজ করতাম সেইসব অঞ্চলে বিভিন্ন স্পটের আন্ডার গ্রাউন্ডে নাকি প্রচুর পেট্রল মজুত থাকত। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গিয়েছিল ব্যাপরটা, সবার ধারণা। তাই যে কোনো মুহূর্তে বোমা উড়ে এসে ধ্বংস করে দিতে পারে সব, এই আশঙ্কায় মানুষ পালাচ্ছে, নিরাপদ জায়গা বেছে সরে পড়ছে। ইস্কুলের শিক্ষক। শিক্ষিকারাও মাস্টারি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাই কর্তৃপক্ষ আমাদের সামনে টোপ রাখলেন। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা পালাবেন না এবং নিয়মিত ইস্কুলে এসে পড়াবেন তাঁরা নির্ধারিত বেতন ছাড়াও যতবার সাইরেন ততগুণ মাসিক বেতন পাবেন। ধরা যাক, বিমান আক্রমণের সতর্কীকরণ হিসেবে একমাসে দুবার সাইরেন বাজল। তাহলে সাধারণ্যে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই-মাসে বেতন পাবেন। নির্ধারিত মাসিক বেতন+নির্ধারিত মাসিক বেতন×২। শর্ত একটাই, মাত্র একজন ছাত্র বা ছাত্রী উপস্থিত থাকলেও ইস্কুল চারটে পর্যন্ত চালাতে হবে এবং পড়াতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ব্যয়বরাদ্দর পারা কি অশোভনভাবে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ওপরের হিসেব তার ঐতিহাসিক সাক্ষী। ভয় হয়, প্রাথমিক শিক্ষার শরীরের তাপ এক সময় এমন শীতল হয়ে যাবে যে, পারা বিপজ্জনক স্থানাঙ্কের অনেক নিচে থেকে পালস্ বীট থেমে যাওয়ার সঙ্কেত জানাবে। সেই সঙ্কেত এরি মধ্যেই ট্রাফিক সিগন্যালের মত কখনো সবুজ, কখনো হলুদ, কখনো লাল—এত দ্রুততর যে, নাড়ি স্পন্দন ডেড স্টপ হয়ে যাওয়ার পূর্ববর্তী চাঞ্চল্য ঘোষণা করে। রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুদের নাড়ির স্পন্দনে মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে চলে সবার অলক্ষ্যে।

উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেট প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ছিল মাসিক ষোল টাকা, অশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পেতেন বার টাকা। এই বেতনের শরীরে ক্ষয়বৃদ্ধি ছিল না। যেহেতু কোনো বেতন কাঠামো ছিল না—তাই ষোল হেঁটে যেত না সতেরর ঘরে বা বার তেরর ঘরে। অবশ্য বোর্ড এবং সরকার উভয়ে মিলে প্রতি শিক্ষক পিছু মাগ্‌গী ভাতা দিতেন সাড়ে পাঁচ টাকা বা ওরকম। এই বেতন নিয়েই ছেচল্লিশের রামবাবু শ্যামবাবু যদুবাবুদের শারীরিক গড়নে, আবেগ-প্রবৃত্তি, ক্ষয়বৃদ্ধিতে কোথায় যেন মানুষের সঙ্গে মিল থেকে গেছে একটু। তাই একষট্টিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যে সর্বপ্রথম বেতন কাঠামো ঘোষিত হল। কঠিন বরফের চাঁই ডিকমপোজড্ হতে শুরু করল। বেতন কাঠামোর তিনটে স্তর হল।

'ক' (শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেট) টাকা ৮০—১—১২৫।
'খ' (অশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেট) টাকা ৭৫—১— ৮০।
'গ' (ক ও খ থেকে কম যোগ্যতা) টাকা ৬৫—১— ৭০।

সময়ের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যেতে থাকে। অর্থনীতি এক জায়গায় চিরকাল এক পায়ে খাড়া থাকে না। তার গতি থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না হোক, অন্তত তা মনে রেখে বেতন কাঠামো কিছুটা অদলবদল করতেই হয়। তাই ছেষট্টি, সত্তর, চোয়াত্তর এবং পঁচাত্তর সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের পে স্কেল রিভিশান হয়েছে।

বর্তমানে তাঁরা যে স্কেলে বেতন পাচ্ছেন :

'ক' = টাকা ২৩০—৫—২৫০—৭½—৩১০—১০—৪০০
'খ' = টাকা ২২০—৫—২৭০—৮ —৩৫০
'গ' = টাকা ২০০—৫—২৬০—৮ —৩০০

একাদশ ছাপ্পান্ন থেকে একত্রিশ তিনএকষট্টি পর্যন্ত একটা বিশেষ স্কেল চালু হয়েছিল। সেই বেতন হারের সুযোগ পেতেন কেবলমাত্র বেসিক ট্রেইন্ড শিক্ষকরা। স্কেলটি ছিল, টাকা ৫৫—৯০+২৫ শতাংশ মাগ্‌গী ভাতা। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক কথিত বেতন স্কেলের সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

স্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন থেকে ৬¼ শতাংশ টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে কেটে রাখা হয়। সমপরিমাণ টাকা সরকার দিয়ে থাকেন। আটষট্টি সাল থেকে পেনসান আর গ্র্যাচুইটি চালু হয়েছে। তবে পেনসান ও গ্র্যাচুইটির মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নিতে হয়, একই সঙ্গে দু'রকম সুবিধে ভোগ করার সুযোগ নেই। এর মধ্যেও কিন্তু আছে। রুরাল এলাকার শিক্ষকদের জন্যে এক ব্যবস্থা, আরবান এলাকার শিক্ষকদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। রুরাল এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা পেনসান অথবা এককালীন আড়াই হাজার টাকার গ্র্যাচুইটি দুটোর যে কোনো একটা গ্রহণ করতে পারেন। আরবান এলাকায় গ্র্যাচুইটির প্রসঙ্গ নেই, তাঁরা পেনসান পাবেন। পেনসান অথবা গ্র্যাচুইটির মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন তাঁরা, আজো। একই বৃত্তিতে অঞ্চলভেদে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই অসাম্য বিস্ময়কর।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার হালচাল

সব থেকে তাজ্জব ব্যাপার হল কোনো সুনির্দিষ্ট আইনের ফাঁসে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার রাশ টানা নেই। পাড়ার বাচ্চা ছেলেদের রথ টানার মত, যে যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারে। চুয়াত্তরের আগে উনিশ শ' তিরিশের অ্যাক্ট বলে, রুরাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ফ্রি। ইস্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল স্কুল বোর্ডের 'পর। শিক্ষাপ্রসারে বা সুষ্ঠু পরিচালনায় তাঁদের ব্যর্থতা সীমাহীন প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের দু'নম্বরী খেলার নিপুণ আঙুল চালাচালিতে প্রাথমিক শিক্ষার নাভিশ্বাস উঠেছিল। স্বজনপোষণ, মামলা-মকদ্দমা, ছাঁটাই, টাকাপয়সার লেনদেন ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে অসহনীয় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছিল। প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন বিড়ম্বনায় ভরে যাচ্ছিল। যুক্তফ্রন্ট আমলে স্কুল বোর্ডগুলো বাতিল হয়ে অ্যাডভাইসরি বোর্ড গঠিত হল। সমস্যার সমাধান হল না। [illegible] আইনকানুনের।

অনেক গড়িমসির পর ভেবাওরে প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট তৈরি হল। প্রাইমারি শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভরসা হল, যাক একটা কিছু হল। কিন্তু সে অ্যাক্ট বাতারাতি ঠাণ্ডা ঘরে চালান হয়ে গেল। কত হাজার ফাইলের নিচে চাপা পড়ে আছে কে জানে। প্রশাসনিক নিয়মকানুনের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ পর্যন্ত এলোমেলো থেকে গেছে, অনিশ্চিত থেকে গেছে রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবুদের ভবিষ্যৎ। স্বভাবতই প্রভূত ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে পড়ছেন ডি পি আই, ডি আইরা। তাঁরা খুশিমত রথ টেনে নিয়ে যেতে পারেন, বলার নেই কিছু।

চুয়াত্তরের পর আরবান এলাকাতেও ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন চালু হল। কিন্তু আইনের ফাঁক থেকেই যায়। আইন এমনভাবে তৈরি হল না যাতে ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক হয়। তাই শহর কলকাতায় দু'রকম প্রাথমিক শিক্ষার ধারা দেখা যায়—ফ্রি প্রাইমারি, হেডিলি ট্যাক্সড প্রাইমারি। কলকাতায় বহু ইংলিশ মিডিয়ম, হিন্দী মিডিয়ম প্রাইমারি ইস্কুল আছে। আছে প্রাইভেট বা কোচিং টাইপ ইস্কুল। এগুলোর সংখ্যা ভালই। এই ইস্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের দেয় মাইনেপত্তরের বহর দেখলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ঠাটবাটও চটকদারি। এরকম ইস্কুলে একটা সীট পাওয়ার জন্যে মন্ত্রীর সুপারিশ পর্যন্ত দরকার হয়। এত ভিড়। শিক্ষার বকলমে ইন্ডাস্ট্রি, মনোপলি বিজনেস। ব্যাঙের ছাতার মত ঘরে ঘরে প্রাইভেট বা কোচিং টাইপ নার্সারি। প্রাইমারি ইস্কুল গজিয়ে উঠছে, শিক্ষা প্রবলভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পথেঘাটে।

সূর্যরথ আসবে কি?

দীর্ঘকাল অবজ্ঞা, অবিচার, অবহেলা কুড়িয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষাগুরুরা, তাঁদের অন্ধকার ঘরে সূর্যরথ এসে দাঁড়াল না এখনো। দেশে কত বড় বড় পরিকল্পনা, অর্থবিনিয়োগে কত বিশাল বিশাল কাণ্ডকারখানা অথচ যেটা গোড়ার কথা তার কোনো হিল্লে হল না। যে দেশে নিরক্ষতার অসুখে কোটি কোটি মানুষ ভুগছে, মানবিক আকৃতি নিয়েও তারা অনেকাংশে প্রাগৈতিহাসিক থেকেই গেল—তাদের মহাসভ্যতার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না, এতবড় অবিচার ভারতীয় জলবায়ুতে তেজলো থেকে গেল দিনকে দিন। যাঁরা মানুষকে সাধারণ বিদ্যেবুদ্ধি দান করার কাজে নিজেদের লগ্নী করেছেন, সেইসব মহাতপস্বী প্রাথমিক শিক্ষা-গুরুরাও সমানভাবে সামাজিক চোখে কৃপার পাত্র হয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছেন। সমস্যার মূলে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন বলে তাঁরা জোটবদ্ধ হয়েছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছেন সমস্যাটা। বারবার ইস্কুল বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে রাজপথে নামছেন আন্দোলনে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে। আন্দোলনের ফাঁকতালে নিজেদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়া তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, তাঁদের লক্ষ্য ব্যাপক। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সর্বজনীন করতে চান। তাই তাঁরা বিভিন্ন সময়ে দাবি সনদ পেশ করেছেন। দাবিগুলোর অন্তত কিছু কিছু দাবি কার্যকর করা হলেও অনেক সমস্যা মিটে যায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস কনডিশান নিরাপদ হয় এবং তাঁদের আর্থিক দুর্গতি কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।

তার জন্যে প্রয়োজন সহানুভূতিশীল মন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাখাতে কয়েক পার্সেন্ট ব্যয়বৃদ্ধি। তবু বিশ্বাস রাখতেই হয়। কবিগুরু বলেছেন : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু আর কতকাল?

॥ দুই ॥

: গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন, এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ বাহুল্য নয়। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও

ডিগ্রীগত বৈষম্য

আজকের দিনে প্রাথমিক ইস্কুলে কাজ পাওয়ার সর্বনিম্ন যোগ্যতা হল ম্যাট্রিক। স্কুলফাইনাল। হায়ার সেকেণ্ডারির যে কোনো একটা পাশ। উনসত্তর সাল অবদি তৎসহ ট্রেনিং আবশ্যিক ছিল। উনসত্তর সালের পর তদানীন্তন সরকার ট্রেনিং-এর বার তুলে দিলেন। এবার টাইট কম্পার্টমেন্টে আলোবাতাস খেলার প্রচুর অবকাশ করে দেয়া হল। অনেক বি-এ, এম-এ প্রাথমিক ইস্কুলে শিক্ষকতা করে চলেছেন। অবশ্য কোনো ভিন্নতর হবে তার জন্যে বেতন পাচ্ছেন না তাঁরা। মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে আলাদা আলাদা পে-স্কেল আছে। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে তা নেই। এখানে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত সাম্যের দিকে সচেতন ঝোঁক, তা অন্যান্য ব্যাপার-স্যাপারে যত বৈষম্যই থাকুক না কেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে পে-স্কেল তৈরি হোক, এ দাবি প্রাথমিক শিক্ষকরা দীর্ঘকাল জানিয়ে আসছেন। কিন্তু টাকার বড় অভাব। দেশের শিক্ষা বড়, না অন্য কিছু? তাই শিক্ষাখাতের ব্যয়বরাদ্দ কাটছাঁট করে অন্য খাতে বিনিয়োগ করার প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়। গত পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলোতে কি তার ছায়া পড়ে নি? চোখ বুলিয়ে নিন।

	সামগ্রিক ব্যয়বরাদ্দ	শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ	শতকরা হিসেব
প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা	৩,১০০ কোটি টাকা	১৫৩ কোটি টাকা	৪.৯ শতাংশ
দ্বিতীয় ,, ,,	৭,২০০ ,, ,,	২৭৩ ,, ,,	৩.৮ শতাংশ
তৃতীয় ,, ,,	১০,৪০০ ,, ,,	৫৮৯ ,, ,,	৫.৭ শতাংশ
চতুর্থ ,, ,,	২৩,৭৫০ ,, ,,	৮২২ ,, ,,	৩.৫ শতাংশ
পঞ্চম ,, ,,	৫৩,৪০০ ,, ,,	১.৭২৬ ,, ,,	৩.৩ শতাংশ

পরে ১.৭২৬ কোটি টাকা ৯০০ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে।

উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়াভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে, ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে এখানে বাঁচিয়া যায় মাত্র। ঃ

প্রায় ৪৮ বছর আগে বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালী'র চতুর্দশ পরিচ্ছেদে পাঠশালার এই যে ছবি এঁকেছিলেন, আজো তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আজো প্রসন্ন গুরুমহাশয়েরা একই সঙ্গে 'মুদীর দোকান' আর 'পাঠশালা' চালাতে বাধ্য হন। বেত এখনো ছাত্রদের শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। তফাতের মধ্যে এখন আর শিক্ষকেরা ছাত্রদের সামনে হুঁকো টানেন না; গুরুগৃহের বদলে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে 'পাঠশালা'য় অপুরা পড়তে যায় এবং তা বিনা বেতনে।

পাঠশালা চালু হওয়ার প্রথমদিকে অভিভাবকেরা প্রতি মাসে সামান্য পয়সাই মাইনে দিতেন এবং সেটাই হত শিক্ষকের বেতন। ডি. এ. হিসেবে পেতেন ছাত্রদের বাড়ীর শাকসব্জী, কখনো বিবাহ বা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ। যাঁরা পড়াতেন, তাঁদের শিক্ষাও বিশেষ কিছু ছিল না। মোটামুটি বর্ণপরিচয় কি শুভঙ্করী পড়াতে পারলেই তিনি শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। সে সময় পাঠশালায় গুরুমশায়দেরই নিজেদের স্বার্থে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলে জোগাড় করতে হত। অবসর সময়ে তাঁরা কেউ কবিরাজী কিংবা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন, কেউ দোকানের খাতা লিখতেন, কেউ বা বাড়ী বাড়ী পুজো করতেন। তখন স্কুলের জন্য আলাদা কোন ঘর ছিল না। বর্ষিষ্ণু কোন গ্রামবাসীর বারান্দা বা বৈঠকখানায় পাঠশালা বসত। সকালে তিন চার ঘন্টা ও বিকেলে দু'তিন ঘন্টা এই ছিল পাঠশালার সময়। রবিবারেও পাঠশালায় ছুটি থাকত না অনেক ক্ষেত্রেই। আর ছুটি থাকত গুরুমশায়ের অসুস্থতায়। এরপর আস্তে আস্তে বাড়ল শিক্ষকের মাইনে। এক পয়সা থেকে ততদিনে ছাত্রদের বেতন স্থানবিশেষে আট আনা, এক টাকা হয়ে গেছে। তখন আর উঠোন বা বৈঠকখানায় ছাত্রদের জায়গা হয় না। তাই তৈরি হল আলাদা ঘর। চাটাইয়ের জায়গা দখল করল বেঞ্চ। সেকালের পাঠশালায় অনেক সময় চোখে পড়ত ছাত্রদের নামতা মুখস্থ করতে দিয়ে সেই অবসরে গুরুমশায় কাজ সেরে আসছেন বা একচোট ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, প্রয়োজনমতো ছেলেদের নিজের কাজেও পাঠাচ্ছেন। তখন ঘড়ির সময় অনুযায়ী স্কুল বসত না। শিক্ষকদের আসা-যাওয়ার সময়টাই ছিল স্কুলের সময়। শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। তাই এইসব পাঠশালার গুরুমশায়েরা সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা পেতেন। চিঠিপত্র লেখা থেকে শুরু করে পাড়ার বিচারসভা পর্যন্ত এঁদের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। লোকেরা তাঁদের কথা শুনতেন, এবং এজন্য এক স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ কাজ করত। তার মূলে ছিল ঐসব শিক্ষকদের ব্যবহার। শিক্ষকেরা এমন কিছু করতেন না যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের অসম্মান বা উপহাস করেন। শিক্ষকসুলভ এক অভিমান ও মর্যাদাবোধে তাঁরা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের একটু আলাদা করে রাখতেন। পাঠশালায় গুরুমশায়রা পড়াশোনায় ফাঁকি দিতেন না। লেখাপড়া বিষয়টা তাঁদের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ছাত্রদের ওপর তাঁরা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। আজও পাঠশালায় পড়া কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তায় তার প্রমাণ মেলে।

প্রথম যে শিক্ষালয় চালু হল তার নাম টোল। টোলের শিক্ষার মাধ্যম প্রধানত সংস্কৃত। টোলের পণ্ডিতরা নিজেদের বাড়ীতে ছাত্রদের শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। তখন ছাত্রদের বেশীর ভাগই ছিল ব্রাহ্মণ। শিক্ষকেরাও তাই। এইসব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। রাজারাও এঁদের শ্রদ্ধা করতেন। জনসমাজে পণ্ডিতদের ছিল এক বিশেষ স্থান। কিন্তু নিজেদের পাণ্ডিত্য অভিমানে সাধারণের সঙ্গে এঁদের তেমন সংযোগ ছিল না।

মুসলমানদের রাজত্বে টোল আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু ইংরেজ আমলে তা একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আর সে সময় থেকে ইংরেজী ও নিজেদের মাতৃভাষার ওপর শিক্ষার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ফলে সৃষ্টি হয় পাঠশালা এবং তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আমাদের শিক্ষার একেবারে প্রথম ধাপ। এখন প্রতি গ্রাম ও শহরে জনসংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছড়িয়ে আছে। এসব বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বর্তমানে সম্পূর্ণ সরকারের। সরকার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করেন, শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দেন, স্কুলের অন্যান্য যা খরচ তাও তাঁরা বহন করেন। এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নিয়োগ হয়েছেন ইন্সপেক্টার। প্রতি স্কুলের জন্য স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালন কমিটিও আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখনো মুমূর্ষু। এবং তার মূলে আছেন সরকার, অভিভাবক পরিচালন কমিটি এবং শিক্ষক। সরকার যেদিন থেকে প্রাথমিক স্কুলগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন, সেদিন থেকে শিক্ষকের বেতনের উন্নতি হয়েছে, স্কুল বাড়ীর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ছাত্রদের তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। স্কুল ঠিকমতো চলছে কি না এসব দেখার জন্য পরিদর্শক থাকেন। কিন্তু তিনি পরিদর্শনে যান না। প্রায় ১৫।১৬ বছর আগে অবশ্য ইন্সপেক্টাররা বছরে একবার অন্তত স্কুলে যেতেন, কিন্তু ব্যাপারটা এতই রাজকীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হত যে, স্কুলের সমস্ত সমস্যাই সেখানে চাপা পড়ে যেত।

শিক্ষকরাই বিদ্যালয়ের প্রাণ। তাঁদের ওপরেই বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাঁদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সব কিছুর প্রভাব ছাত্রদের ওপর প্রতিফলিত হয়। এবং এটাই স্বাভাবিক। পাঁচ ছ' বছর বয়সে যখন তারা প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে, তখন সেই এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যাওয়ার মধ্যে তারা এক দারুণ উত্তেজনা অনুভব করে। শ্লেটে খড়িয়ে দাগ টানতে বা বর্ণপরিচয়ের পাতা ছিঁড়তে তাদের সে কি আনন্দ! এবং এই আনন্দটা টিকিয়ে রাখা দরকার আগামীদিনের জন্য। কেননা, এই প্রথম শিক্ষালাভের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা যে ব্যবহার পায় তার অনেকটাই তাদের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এখানে পড়ানোর ওপরেই পড়ার প্রতি ছাত্রদের

প্রাইমারী স্কুলের জন্যে লাইসেন্স ইস্যু করা উচিত

বলছিলেন কোনো এক কলেজের অধ্যক্ষ ঃ মশাই, শিক্ষার নামে এরকম পকেট কাটা ব্যবসা সহ্য হয় না আর। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে মমির মত নীরব। জনসংখ্যা আর ব্যক্তিগত মালিকানায় ফ্যাশানদুরস্ত প্রাইমারি ইস্কুল সমান তালে বেড়ে যাচ্ছে। ধান্দা পয়সা কামানোর। একটা মুদিখানা দোকান করতে গেলেও লাইসেন্স দরকার হয়। অথচ প্রাইমারি ইস্কুলের ক্ষেত্রে কোনো বালাই নেই। চেকিং নেই। সরকারের আইন করা উচিত লাইসেন্স ছাড়া প্রাইমারি ইস্কুল খোলা চলবে না। এই নিয়ম চালু হলে দেখবেন ব্যাপারটা চেক্‌ড হয়ে যাবে।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কথাটা ভাবার মত।

ভালবাসা বা ভয় জন্মায়। মনে হয় ঐ সময়টাই শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ সবচেয়ে বেশী অবহেলিত।

আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধানত দুই শ্রেণীর —স্কুল বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিদ্যালয় ও বেসরকারী বিদ্যালয়। দুই বিদ্যালয়েরই শিক্ষকের বেতন, ছুটি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে প্রায় সমধর্মী। কিন্তু পড়ানোর পদ্ধতি অনেক আলাদা। প্রায় ৬০।৭০ বছর আগে পাঠশালায় যেভাবে পড়ানো হত, আজকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোও সেই একই স্টাইল বজায় রেখেছে। শিক্ষকেরা প্রায়ই সময় মতো স্কুলে আসেন না, সুবিধে মতো যখন ইচ্ছে চলে যান। ক্যাজুয়েল ও মেডিক্যাল লীভের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। যতক্ষণ স্কুলে থাকেন, তার মধ্যে পড়ানো ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, পাড়া পলিটিক্স ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা চলে। সরকারের স্কুল বোর্ড বই এইসব বিদ্যালয়ের পড়ানোর মান ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সারা বছর ফাঁকি দেওয়ার পরে ছাত্র ও শিক্ষক পরীক্ষার মাস চারেক আগে থেকে সকাল বিকেল রাত সব সময়েই পড়ানো ও পড়তে শুরু করেন। পড়া বলতে ডাইজেস্ট জাতীয় একটি বইকে পুরোপুরি মুখস্থ করা। আর তা করলেই ফেলের ভয় থাকে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সিলেবাস সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রক করেছেন তাও ভীষণ ত্রুটিযুক্ত। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী সব পড়েও কোন কিছু না পড়ার সামিল হয়ে যায়। শিক্ষকেরা এটা বোঝেন, আর তাই হয়তো এই গোঁজামিলে তাল দেওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোন উপায় থাকে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যাঁরা নিযুক্ত হন, তাঁদের যথাযোগ্য কোয়ালিফিকেশান (সার্টিফিকেট অনুযায়ী) থাকলেও ক্ষমতা বা যোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে যাঁরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছিলেন তাঁরাই অন্য কোন কাজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। এই পেশাটি মনে হয় বর্তমান সময়ের সবচেয়ে অবহেলিত পেশা। শিক্ষকেরা অনেকে নিজেদের শিক্ষক বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা পান।

বর্তমানে এঁরা যে বেতন পান, তার চেয়ে ঐ কোয়ালি-ফিকেশানের এক ব্যাক্তের পিয়ন পান অনেক অনেকগুণ বেশী। অনেকের মতে দিনে ঘণ্টা চারেক কাজ করে তাঁরা যা পান, তা যথেষ্ট। কিন্তু তাই কি। নানা চরিত্রের একদল ছাত্রকে একটা নিয়মের মধ্যে রাখা যে কি কষ্টকর তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাছাড়া এই মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অনেকেই ঐ বেতনে তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারেন না। ফলে অর্থের জন্য তাঁদের আরো ছোটখাট নানা কাজ করতে হয়। অনেকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে পড়ান, মোকদ্দমার সাক্ষী দেন, মুদীর দোকান করেন এমনি অনেক কাজে তাঁদের সময় দিতে হয়। আর এসব করেও তাঁরা অভাব থেকে রক্ষা পান না। সেই প্রাচীন আমল থেকে শিক্ষকের যে অলিখিত বিধিনিষেধ, যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আজকে তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটা বজায় রাখতেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন।

বিদ্যালয়ের কনটিনজেন্সি ও অন্যান্য খরচের জন্য প্রতি মাসে বেশ কিছু টাকা আসে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা খরচ না হলেও খাতায় হিসেব ঠিক থাকে।

একদিক দিয়ে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষকেরা গর্ব করার অধিকারী। এক ম্যাট্রিক পাশ প্রাথমিক শিক্ষক যেখানে মাস শেষে বেতন পান দু'শ ত্রিশ টাকা, সেখানে এক গ্র্যাজুয়েট মাধ্যমিক শিক্ষক পান দু'শ পঁয়ষট্টি টাকা (বর্তমানে অবশ্য রিভাইজড্ স্কেলে ওঁদের সামান্য কিছু বেতন বেড়েছে)। আবার ঐ টাকা তাঁরা মাস শেষে পান না। কেননা সরকারের গ্রান্ট আসে চার মাস অন্তর। কোনো কোনো মাধ্যমিক স্কুল আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বছরের পর বছর বেতন পান না। তবুও তাঁদের কাজ করতে হয়। মধ্যমগ্রামের একটি জনশূন্য পুকুরের একদিকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরেকদিকে একটি মাধ্যমিক স্কুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এত ছোট যে ছাত্ররা বারান্দা উপচে গাছের নীচটাকেও ভর্তি করে ফেলেছে। সমস্যা সেখানে ঘরের। আর তার সামনের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা আজ প্রায় ছ মাস বেতন, ডি. এ. কিছুই পাননি। এবং এরকম অবস্থার মধ্যেই তাঁদের পড়াতে হয়। অথচ অভিভাবক, সরকারের শিক্ষামন্ত্রক, পরিচালন কমিটি কারুরই এ ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নেই। সারা বাংলায় মধ্যমগ্রামের মতো হাজার হাজার সমস্যাবহুল স্কুল রয়েছে। যদি তাঁদের সমস্যা সমাধানে কোন ব্যবস্থা না হয়, তাহলে আগামীদিনে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

১। **স্কুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম :**

২০ থেকে	৪৫ জন	ছাত্রের জন্য		১ জন	শিক্ষক
৬৪ ,,	৯৯ ,,	,,	,,	২ ,,	,,
১০০ ,,	১৩৯ ,,	,,	,,	৩ ,,	,,
১৪০ ,,	১৭৯ ,,	,,	,,	৪ ,,	,,
১৮০ ,,	২১৯ ,,	,,	,,	৫ ,,	,,

মন্তব্য : সাধারণত বেশীর ভাগ স্কুলে ৩ জন শিক্ষক থাকেন এবং তার মধ্যে অধিকাংশ স্কুলেই প্রকৃত ছাত্রসংখ্যা ১৩৯-এর কম। কিন্তু খাতায় মিথ্যে নাম লিখে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা আনান হয়।

২। **প্রাথমিক শিক্ষকের গুণাবলী :**

প্রধান শিক্ষক—স্কুল ফাইনাল পাশ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দু বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। ট্রেনিং থাকলে আরও ভাল।

সহকারী শিক্ষক—(ক) স্কুল ফাইনাল পাশ ও ট্রেনিং অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গৃহীত হয়।

(খ) তফশিলী অধ্যুষিত গ্রামে যোগ্য প্রার্থী না থাকলে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রার্থীকেও শিক্ষক-রূপে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৩। **শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি :**

(ক) রাজ্যের জনশিক্ষা অধিকর্তা সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি নির্বাচক কমিটি গঠন করেন। ১৮ বছরের নীচে কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না। নির্বাচন কমিটি যে সব প্রার্থীদের উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁদেরই ইন্টারভিউতে ডাকবেন। পরীক্ষা পদ্ধতিও স্থির করবেন তাঁরাই। এ ব্যাপারে কারুর কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

(খ) নির্বাচক কমিটি তাঁদের সুপারিশসহ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের তালিকা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে পাঠাবেন। শিক্ষা অধিকর্তা ইচ্ছে করলে ঐ তালিকার পরিবর্তন করতে পারেন। এবং তারপর তাঁরা শিক্ষকদের একটি প্যানেল প্রস্তুত করেন। ঐ প্যানেলের স্থায়িত্ব প্রায় এক বছর।

৪। **বেতনের ক্রমপর্যায় :**

১৯৫৭—৪৫+১২.৫০

১।৪।৬১—৭৫-১-৮০.০০

১।৪।৬৬—১১৫-৩-১৬০-৪-১৮০

১।৪।৭০—১৭৫-৩-২১৪-৪-২৫০

১।৪।৭৪—২০০-৪-২১৬-৫-২৭৬-৬-৩০০

১।৪।৭৫—২৩০-৫-২৫০-৭.৫০-৩০০-১০-৪০০

+প্রধান শিক্ষকের এ্যালউন্স ২০ টাকা

৫। **কন্টিনজেন্সী ও অন্যান্য খরচের জন্য মাসিক অনুদান :**

ঘর মেরামত	—	৫৫.০০
বইপত্র কেনা	—	৫৫.০০
ভ্রমণ ও আনন্দোৎসব	—	১৪.০০
চাষাবাদ, বাগান, ঘর পরিষ্কার	—	১৫.০০
কনটিনজেন্সী	—	১৪.০০

দ্রষ্টব্য : **Vide G.O. No. 3790 Ed n Dated 13/6/52 Appendix X**

৬। **পরিচালন সমিতি গঠনের নিয়ম :**

(ক) কলকাতা, অন্যান্য পৌর এলাকা বা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য—

(১) সভাপতি—কলকাতার জন্য মনোনীত করবেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা। এবং অন্যান্য এলাকার জন্য মহকুমা শাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।

(২) একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও একজন শিক্ষানুরাগী মহিলা।

(৩) প্রতি একশজন ছাত্র হিসেবে দুজন করে অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হবেন অভিভাবকদের দ্বারা।

(৪) কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য কাউ বা কমিশনার।

(৫) প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে।

(৬) শিক্ষকদের মধ্য থেকে দুজন শিক্ষক (৬ তার বেশী শিক্ষক থাকলে) শিক্ষকদের নির্বাচিত হবেন।

(৭) কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে যে কোন স (শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়া) সম্পাদক নির্বাচিত করতে পারেন।

(৮) কমিটির মেয়াদ থাকবে তিন বছর পর্যন্ত।

(খ) বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচজনের একটি পরিচালন কমিটিতে দুজন ভাবকের পক্ষে, দুজন বিদ্যালয়ের হিতৈষ পক্ষে ও প্রধান শিক্ষক পদাধিকারবলে থাকে

৭। **ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম :**

(ক) বছরে নৈমিত্তিক ছুটি ১৪ দিন ও অসুস্থতার দিন ছুটি পাওয়া যাবে।

(খ) অসুস্থতার জন্য বছরে আরও ১৫ থেকে ২ অর্ধ বেতনে ছুটি পাওয়া যেতে পারে।

(গ) শিক্ষয়িত্রীদের মাতৃত্বের জন্য আলাদা ছুটির আছে।

৮। **শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড; গ্রাচুইটি বা পে ব্যবস্থাও আছে।**

৯। বছরে রবিবার ছাড়া গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজো ইত্যাদি উ প্রায় ৮৮ দিন ছুটি প্রাপ্য।

বিকা

পেটের রোগে আশু ফলপ্রদ

পুদীন হরা

আপনার গৃহ চিকিৎসক

পুদীন হরা অজীর্ণ, পেটব্যথা, গ্যাস এবং বায়ুর প্রকোপ থেকে আপনাকে রক্ষা করে এবং শরীর স্বাভাবিক ও নীরোগ রাখে। ইহা ব্যতীত উষ্ণতাজনিত পেটের যাবতীয় অসুখে যেমন পেটফোলা, পেট গড়গড় করা, টক ঢেকুর ওঠা, গলা জ্বালা করা এবং গা বমি বমি ভাব ইত্যাদিতে বিশেষ উপযোগী। পুদীন হরা সব সময় হাতের কাছে রাখুন।

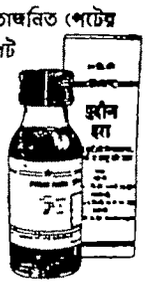

ডাবর দ্বারা প্রস্তুত

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

ইন্দিরা গান্ধী আর চরণ সিংয়ের মধ্যে এখন চলেছে ধৈর্য পরীক্ষার খেলা। ইন্দিরা গান্ধী চাইছেন গৃহমন্ত্রী উত্যক্ত হয়ে নিজেপক্ষে তাঁকে নাকাল করতে উঠে-পড়ে লাগুন। ব্যাস আর দেখতে হবে না। এর রাজনৈতিক ফায়দা কী করে তুলতে হয় উনি দেখিয়ে দেবেন সকলকে। কট্টর ইন্দিরা বিরোধীরাও স্বীকার করেন যে, তেমন রাজনৈতিক নাটকের 'ক্লাইম্যাকস' কলকাতার বড় বড় নাট্য গোষ্ঠীকেও অবাক করতে পারে।

সাঙ্গোপাঙ্গদের সাহায্যে হৈ-চৈ চরমে তোলবার ক্ষমতা যে ইন্দিরা গান্ধীর আছে সেটা কেবল আন্দাজ করা নয় উপরন্তু তার রাজনৈতিক প্রচার মূল্য সম্বন্ধে ইদানীং বেশ সচেতন চরণ সিং। একবার বারো নম্বর উইলিংডন কিসেন্টের বাড়িতে পুলিশ ঢুকিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সব সমালোচনার ছোবল খেয়েছেন চরণ সিং সেকথা মনে রেখে উনি আপাতত লম্বা সুতো ছেড়েছেন। ওঁর ধারণা এই সুতোর নিজেই একদিন ইন্দিরা গান্ধী জড়িয়ে পড়বেন। জড়িয়ে পড়বেন—এর অর্থ হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বাবুদ শেষ হয়ে যাবে। কলকাতা, বম্বে, আলিগড়, কাশ্মীর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ান, বক্তৃতা করুন জনসভায় সরকারের সমালোচনা করুন। কথার বাণ ছুড়ুন। যত খুশি চরণ সিংয়ের দিকে। তাতে আখেরে হবেটা কি? কথা বলতে বলতে উনি হয়রান হয়ে যাবেন। শ্রোতারা ক্লান্ত হবেন একই কথার পুনরাবৃত্তিতে: আমার আমলের সব ভাল কাজ জনতা সরকার নষ্ট করে দিচ্ছে। সময় দাও। আরও সময় দাও ইন্দিরা গান্ধীকে। সময়ের স্রোতে ক্ষমতার মসনদ থেকে দূরে, আরও দূরে নিয়ে যাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধীকে। চরণ সিং মনে করেন ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে আর কিছু দিন দূরে থাকলে ইন্দিরা গান্ধীর 'পলিটিক্যাল ইরিপস' ঘটবে।

নতুন দল তৈরীর পর মহারাষ্ট্র, জোয়ালিশন সরকারে অংশীদারিত্ব এবং কর্ণাটকে ও অন্ধ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের শাসন তাঁকে রাজনীতিতে ধুমধাম করে ফিরে আসবার ছাড়পত্র দিল। কিন্তু এই সাফল্য সর্বভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় দলীয় সদস্যদের রাজনৈতিক কার্যকলাপও নিয়ন্ত্রিত করল। সাফল্যও কাল হয়। আর হয়েছেও তাই বিশেষ করে কর্ণাটকে এবং অন্ধ্রে। বিরোধী নেতা দেবরাজ আরস ও চেন্না রেড্ডি এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরস ও চেন্না রেড্ডির ভাবমূর্তির পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে ঘটনার নিজস্ব নিয়মে। কেননা মাঠ-ময়দান আর স্টেট সেক্রেটারিয়েট এক জায়গা নয়। তাই ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারকে কথার বোমায় যতই আক্রমণ করুন না কেন তাঁরই দলের দুই মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরস ও চেন্না রেড্ডি নয়াদিল্লিতে জাতীয় ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিংয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলে গিয়েছেন যে, তাঁরা প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি থাকতে পারে তাহলে দেবরাজ আরস বা চেন্না রেড্ডির স্বপ্ন-বাসনা কেন থাকবে না? বিশেষ করে তাঁরা দুজনেই যখন ধুরন্ধর রাজনীতিক। এঁদের দুজনের মধ্যে দেবরাজ আরসের রাজনৈতিক বনিবাদ আবার বেশী পাকা। উনি ইন্দিরা গান্ধীর দাক্ষিণ্যে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হননি। উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ব্যক্তিগত কৃতিত্বে। ইন্দিরা গান্ধীর তাই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত দেবরাজ আরসের কাছে।

সাতাত্তর সালের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর দেবরাজ আরস সর্বপ্রথম ইন্দিরা গান্ধীকে নতুন দল খোলবার পরামর্শ দেন। সুতরাং মুখ বুজে ইন্দিরা গান্ধীর বশংবদ থাকা তো দূরের কথা উল্টে তাঁকে পরামর্শ দেবার এবং নিজের মতামত প্রকাশ করবার মত শক্ত মানুষ হলেন দেবরাজ আরস। কমলাপতি ত্রিপাঠীরও এমন অবস্থা নয় ইন্দিরা কংগ্রেসে। দেবরাজ আরস রীতিমত 'পজিশন' থেকে এখন কথাবার্তা বলছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসে সেই পুরোন 'ককাস' গোষ্ঠীর আধিপত্য দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে দলের লোকজন অস্বস্তি বোধ করছেন। ককাসের আধিপত্যের অর্থ হল দিল্লি ও উত্তর ভারতের কয়েকজনের খবরদারী। এই লক্ষণ মনঃপূত নয় দেবরাজ আরস এবং চেন্না রেড্ডির। এঁরা চাইছেন ইন্দিরা কংগ্রেসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিদের। মাত্র এক বছরের মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস যদি কোন রাজনৈতিক 'স্ট্যাটাস' পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা দক্ষিণের দুই রাজ্য—কর্ণাটক এবং অন্ধ্রের দৌলতে। তাই পার্টিকে মোক্ষমভাবে নাড়া দেবার জন্য দক্ষিণ থেকে ঝড় উঠছে।

দলের মধ্যে এই ঝড় যাতে না ওঠে সেজন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট নন ইন্দিরা গান্ধী। ব্যাপারটাকে উনি ধামাচাপা দিতে চান।

ইন্দিরা: দলে থেকেও দলের বাইরে

এর কারণ উনি ককাস ভাঙতে পারেন না। ভাঙতে গেলে নিজেকে ভাঙতে হয়। আর সেটা সম্ভব নয়। এই ককাস তাঁর সফরসূচী ঠিক করে। তাঁর রাজনৈতিক গতিবিধি অনেকাংশে ককাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীই দেখা যাচ্ছে তাঁর একমাত্র ভরসার দ্বীপ বিশাল এই জনসমুদ্রে।

সুতরাং দলীয় সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এবং দলকে সঙ্গে না নিয়ে সেরফ দলের মাথার ওপর দিয়ে বাইরের জনতার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী এখন ব্যস্ত। পার্টিকে ডিঙ্গিয়ে জন-যোগাযোগ করতে পারলে আবারও পার্টির গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছামত পার্টিকে চালানো যাবে। এর ফলে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য সম্ভব হবে। দলের ওপর ছড়ি ঘোরাবার অপর এক উপায় হল দলের মধ্যে নানারকম কোঁদল জিইয়ে রাখা। এই দলীয় কোঁদলে ইন্দিরা গান্ধী নিজে জড়িয়ে পড়তে চান না। কিন্তু অন্যদের জড়াতে চান যাতে শেষ পর্যন্ত বিচারক বা রায় দানের ভূমিকাটা তাঁর থাকে।

আর জন-যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলনে নামবার পরিকল্পনাও তিনি তৈরি করছেন। বামপন্থী ধ্বনির ভিত্তিতে উনি নাকি এবার মিছিলে নেতৃত্ব দিতে চান। ইন্দিরা গান্ধীর দলের লোকজনের বামপন্থী ধ্বনি তুলে আন্দোলন করবার মত রাজনৈতিক বিশ্বাসের জোরটা এবার বোঝা যাবে। বামপন্থী ধ্বনি অতীতে উনি অনেকবার দিয়েছেন। এমনকি জরুরী অবস্থার সময়েও। এটা পুরোনো টেকনিক। ধোপে টিকবে কিনা সেইটেই প্রশ্ন।

পর্যবেক্ষক

হীরকের দিনগুলি

বিজনকুমার ঘোষ

জানালার কাঁচের ওপিঠে জলের অবিরাম ধারা। মনে হয় সারা রাত্রি ধরে চলবে। মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে গিয়ে হীরকের মনে পড়ল, বৃষ্টি আর ধানক্ষেতের জলে খালটা কাল সকালেই কানায় কানায় ভরে যাবে। কতদিন খালধারে ছিপ নিয়ে বসে না। কোথা থেকে এই দিনগুলি এসে হীরকের জীবনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে শুধু। রথের মেলায় সাধ করে কেনা গাছ বিবর্ণ হয়ে ঝরে যাচ্ছে। কত দিন হীরক নিড়ানি নিয়ে ওদের সেবাযত্ন করে না। কতদিন ঢেউ খেলানো ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে না, এমন কি ছাদে উঠে পায়চারি পর্যন্ত করে না। সব গেছে।

বৌদি সিদ্ধার্থের পাশের খাটে বিছানা করে দিল। আলো নিভল। সব শব্দ থেমে গিয়ে এখন শুধু জলের শব্দ। হীরকের ঘুম আসছে না। বিয়ের পর এই প্রথম না বলে বাইরে রাত্রিবাস। হেনার উদ্বেগপূর্ণ মুখটা কল্পনা করে হীরক অত্যন্ত খুশি হল। ঝিঝি ঝিঝি ধুম এখন অচেতনা। খালের ধার থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। মাঠের পাশে বলে বাতাসের মাতলামীরও সীমা নেই। রান্না ঘরের টালিগুলি উড়ে গেলেই মুশকিল। দারোগাটা অতি নচ্ছার, দু'খানা রুটি গিলেই দৌড়বে। যেমন হেনা তেমনি দারোগা। কেউ ভাল কথা শোনার মানুষ না। তবে হ্যাঁ, চোরের ভয় আছে। আব্বার সুবিধেও আছে, চুরি করার মত কোন জিনিসই নেই। হেনার খানকয়েক গয়না, বিয়েতে পাওয়া সোনার বোতাম আংটি হীরক রান্নাঘরে তেজপাতার হাঁড়িতে একটা পোঁটলা বেঁধে রেখে দিয়েছে। চোরের বাপের সাধ্যি নেই এগুলি খুঁজে বের করে।

নতুন জায়গায় ঘুম আসতে চায় না। বৃষ্টি কি একটু ধরে এল? ঘুমের মধ্যে সিদ্ধার্থ বোধহয় বুকডন দিচ্ছে। হঠাৎ দাদার কথা মনে পড়ল। দিদি জামাইবাবু হীরক আর তার ডালপালাকে তাড়িয়ে দাদাকে রাখতে চেয়েছিল। কারনটা খুবই সোজা। ব্যাচেলার লোক। ভোরবেলায় বাজার করে খেয়েদেয়ে অফিস যায়, ফেরে রাত দশটায়। রবিবারেও বাড়ি থাকে না। দিদির মেজমেয়ের বিয়ের ঝামেলায় পুরোটা এবং খরচের অর্ধেক। দাদাই বহন করে। সুতরাং এমন লোককে রাখার অসুবিধে কিছু নেই, সুবিধে ষোল আনা। যাদবপুরে বাসা পাওয়ার পরে হীরক যেদিন লরী নিয়ে মালপত্র আনতে যায় দাদাও বৌদির নিজের সুটকেশটা গুছিয়ে চলে আসে। এই তো অল্পতা সিনেমার কয়েক স্টপেজ আগে অফিসের জানা কয়েক বন্ধুর সঙ্গে মেসে থাকে।

দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে হীরকের কোন ভাই-বোনের সম্পর্ক নেই। বিলেত থেকে সাইত্রিশ দিনের ছুটিতে বো আর এক ছেলে নিয়ে দীপক এসেছিল। আসাম থেকেও এসেছিল তন্দ্রা, স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে। কিন্তু কেউ রজনী সেন রোডে দেখা করতে যায়নি। হেনা বলে, এটাও এক রকমের শাস্তি। নীল আকাশে ভগবান না থাকলে নাকি এমনটি হত না!

বৌদির সঙ্গে ঘুম ভাঙল। [illegible]

আর [illegible] নেই। চায়ের [illegible] নিয়ে হীরক বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চমৎকার ঝকঝকে রোদ। নিচ দিয়ে [illegible] ড্রেনের দিকে, [illegible] চলেছে। [illegible] বেড়ি হচ্ছে। বলল, তোমার [illegible] আমি কিন্তু তোমাকে [illegible] করতে পারছি না।

—আজ আমার অফডে।

—তাহলে তো ভালই। ক্ষিদে লাগলে কেন্টর কাছে চাইবে। আমি চললাম। আর শোন, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে। হেনা বেচারা শুধু শুধু চিন্তা করছে।

বৌদি বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরে সিদ্ধার্থ ইস্কুলে চলে গেল। সারা বাড়িতে এখন শুধু কেন্ট আর হীরক। বৌদির ঘর-সংসার ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে এক সময় নিজেকে বেমানান আর অবাঞ্ছিত মনে হল হীরকের। একদিন বৌদি ছিল খুবই প্রিয়। হাজরা পার্কের বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে বিয়েতে কত খাটাখাটনি করেছে হীরক। এভাবেই সব কিছু হারাতে হারাতে মানুষ একসময় নদীর মত নির্জন হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে হীরক কেন্টর কাছে ভাত চাইল। দরজা ভাল করে বন্ধ করতে বলে একটু পরে নিচে নেমে এল। কোথায় যাবে?

ট্রাম বাস অদল বদল করার পর হীরক নিজেকে এসসময় আবিষ্কার করল বালিগঞ্জ স্টেশনে। বালিগঞ্জ থেকে এক স্টেশন পর যাদবপুর। সেখানে মাঠের ধারে এক বাড়িতে সিমেন্টের বেঞ্চে হেনা একা বসে আছে। হেনা বুঝে নিক এভাবেই একদিন সবাইকে একলা হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, ট্রাম বাস অদল বদল করে হীরক তো শ্যামবাজারেও চলে যেতে পারত। তবে কি দুপুর বেলায় হেনার কাছে চলে আসবে, এইরকম কোন গোপন অভিসন্ধি আছে? একথা ভাবতেই হীরক লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি দত্তপুকুরের এক-খানা টিকিট কেটে ফেলল। পনের মিনিট বাদেই সিয়ালদার ট্রেন।

হঠাৎ গীতাদির সঙ্গে দেখা। গীতাদি বারুইপুরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে। হীরক জিজ্ঞাসা করল, কি গীতাদি, আপনি এখানে?

গীতাদি বলল, আর বলবেন না। আপনার দাদার সখ জানেন তো? বারুইপুরে এসসঙ্গে দশ বিঘে জমির খোঁজ পেয়েছে। ফলের বাগান করবে। আমি বলেছি, আমার না দেখা পর্যন্ত ওই জমি কিনতে পারবে না।

হীরক বলল, ভালই তো। ঝাড়গ্রাম বড্ড দূর। এবার আমরা সপরিবারে বারুইপুর যাব।

—হেনার খবর কি?

—ভাল।

গীতাদি চারপাশ তাকিয়ে গলার স্বরটা নিচু করল সেটার কি হল? হেনা আমাকে সব বলেছে।

একটু চুপ করে থেকে হীরক উত্তর দিল, আপনার কথাই রইল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

গীতাদির মুখটা হাসিতে ভরে গেল।

—যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। কোন্ হাসপাতালে কার্ড করালেন?

—করাইনি।

—অবশ্য এখনো দেরী আছে।—গীতাদি গলা বাড়িয়ে সিগন্যাল দেখে নিল: তা আমার বাড়ির কাছে প্রভাবতী মাতৃসদনে করান না। চমৎকার ব্যবস্থা ওদের। খরচও কম। ডাক্তার, নার্স সবাই আমার চেনা। তবে ভাত দেবার ব্যবস্থা নেই ওদের। আমি বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়ে দেব।

ইতিমধ্যে সিয়ালদার ট্রেন এসে গেছে। আচ্ছা, বলে হীরক দৌড়ে তাতে চড়ে বসল। বেশ ভিড়। কোলে মার্কেটের মাল যাচ্ছে এই ট্রেনে। হীরকের সামনে পিছনে বিরাট বিরাট কাঁচালঙ্কার বস্তা। রোগাপানা এক অফিসের বাবু গর্জন করছে, ভেণ্ডারের কামরায় উঠতে পার না? দেব একদিন লাথি মেরে লাইনে ফেলে। ট্রেনের কামরা থেকে হীরক অনেক দূরে চলে গেল। কে এই গীতাদি? বন্ধুর প্রাক্তন বাড়িওয়ালী। ধূমকেতু হওয়ার সময়ও গীতাদি হেনাকে বাড়ি এনে রাখতে চেয়েছিল। পৃথিবীতে এখনো এই রকম মানুষেরা বাস করে। অথচ হীরকের অনেক আত্মীয় পোয়াতীকালীন কি করা উচিত, কি উচিত নয়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে চা খেয়ে বাড়ি চলে গেছে। হীরকের একটা স্বভাব, কেউ সামান্য উপকার করলে সেটা কিছুতেই ভুলতে পারে না। আবার আঘাত দিলে সেটাও মনে থাকে।

সিয়ালদায় এসে বনগাঁ লাইনের ট্রেন ধরতে হল গতকালের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রেল লাইনের দুপাশে জল দাঁড়িয়ে গেছে। কোথাও লাল শাপলা ফুটে আছে। একটা হাস পেছন উঁচু করে গুগলি তুলছে। বিরাটির কাছে দেখা গেল জলের মধ্যে গোটা আকাশ; একটা মাছরাঙা ঝাঁপ দিতেই সেটা খান খান হয়ে গেল।

কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াতেই মাস্টারমশাই, টুবলু হিমানী সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। হিমানী বলল, রাঙাদা রাত্তিরে কোথায় ছিলি?

হীরক অবাক।

—তুই জানলি কি করে?

—বারে, এই তো কিছুক্ষণ আগে বৌদি কাঁদতে কাঁদতে যাদবপুর চলে গেল। সারা রাত বৌদির ঘুম হয়নি। তোর অফিসেও ফোন করেছিল।

মাস্টার মশাই বললেন, আপনি তো এরকম কাজ করেন না। অবশ্য শুনেছি বিয়ের আগে নাকি মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতেন। এটা হল কলকাতা শহর। ঠিক টাইমে ঘরে না ফিরলে চিন্তা হয় বৈ কি।

—কাল অফিসের পর এক বন্ধুর বাড়ি গেছি, প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হল, বন্ধু কিছুতেই বাড়ি ফিরতে দিল না।—হীরক ধুলো মাখা পা' দুখানা জানালার শিকে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

—বেশ তো। সকালেই বাড়ি ফিরে আয়। বৌদি বলছিল, তোর আজ অফডে।

মাস্টার মশাই বললেন, বেলা এগারো-টার সময় টাইপিস্ট ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বৌদি এসে হাজির। খবর শুনে আমরা তো হতভম্ব। আমরা খেয়ে যেতে বললাম। বৌদি এক চা ছাড়া কিছুই খেল না। ঘণ্টা-খানেক থেকেই চলে গেল। দেখুন দিকি কাণ্ড!

হীরকের এসব কথা কানে যাচ্ছিল না। জানালার শিকে পা নাচাতে নাচাতে ভাবছিল, হুঁ, আমার নাম বাঘা তেঁতুল! দজ্জাল বৌকে কি করে টাইট করতে হয় তার ওষুধ আমি জানি। দশ দিন বাড়ি ফিরব না। দেখি তেল মরে কিনা। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে দত্তপুকুরে এসেছিল হেনা, একথা শুনে মনটা যেন কেমন করে উঠল। তখন হীরক মাইকেলের স্টাইলে আবৃত্তি করতে লাগল, রে কোমল মন মম, কবে পোহাইবে রাতি—

দত্তপুকুরে এলে রাত্রে খিচুড়ি হবেই। এটা হীরকের দারুন প্রিয় জিনিস। আহা, জিভের স্বাদই যেন মরে গেছে আজকাল। হিমানী বলল, জানিস রাঙাদা, তন্দ্রার চিঠি এসেছে কাল। ওর ছেলে গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

—বাঃ, বেশ। লিলি মিলি ধুম কেমন আছে শুনলি নাকি?

—তুই কাল সকালে ভাত খেয়েই চলে যাবি। ধুমের খুব জ্বর পায়খানা। সত্যি তোর আক্কেল বলে কিছু নেই।

পরদিনও বেহালার বৌদির বাড়ির মত অবস্থা হল হীরকের। হিমানী মাস্টার মশাই দুজনের ইস্কুলে চলে গেছে। রাঙা-মামা বাড়ি আছে বলেই টুবলু ইস্কুলে যায়নি। ওর ছবি আঁকার সখ দারুন। রঙিন পেন্সিল দিয়ে সূর্য বাড়ি ফুলের গাছ, বিড়াল—এই সব আঁকছে আর ছুটে ছুটে গিয়ে রাঙামামাকে দেখাচ্ছে। ভাত ঢাকা দেওয়া আছে। হিমানীর কড়া নির্দেশ, ভাত খেয়েই যেন যাদবপুরে কেটে পড়া হয়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আবার নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হল।

মনে হতেই আবার শিয়ালদার সাউথ স্টেশন। পাঁচ মিনিট পরেই যাদবপুরের ট্রেন। কি করবে হীরক? ওর তো এখনো আট রাত বাইরে কাটানো দরকার। কিন্তু মুশকিল বাঁধিয়েছে ধুম। হেনা কি সময় করে পাড়ার কালু ডাক্তারের কাছে যেতে পেরেছে? কালু ডাক্তারের ওষুধ খুবই ভাল কিন্তু বড্ড বাজে বকে। সেজন্যে ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখ হলে হেনা বলে, আমার রান্নাবান্না আছে, কালু ডাক্তারের কাছে তুমি যাও না। হীরক উত্তর দেয় তুমি যাও। বাজে কথা শোনার আমার টাইম নেই।

ঘণ্টা দিয়ে ট্রেনটা নড়েচড়ে উঠতেই হীরক দৌড়ে গিয়ে চড়ে বসল। যাদবপুরে যাওয়া মানেই তো বাড়ি যাওয়া নয়। কিন্তু যাদবপুরে নেমে হীরকের মনে হল, যাই না, ছেলেমেয়েদের একটু দেখে আসি। মিলিটা যা পেটুক। ওদের জন্যে দু টাকার সন্দেশ নিয়ে গেলে কেমন হয়? বাড়ি ঢুকব না, রাস্তা থেকে একবার উঁকি দিয়েই চলে আসব।

কিন্তু দূর থেকে দেখতে পেয়েই দারোগা এমন হৈ-চৈ শুরু করে দিল যে ঘর থেকে ছুটে এল লিলি মিলি ধূম। তারপর টেলিফোন এ জি বেঙ্গল, টাইপিস্ট, টীচার। সবার শেষে হেনা। একেবারে গরু চোরের মত অবস্থা হীরকের।

—ছিঃ ছিঃ। বলা নেই কওয়া নেই একেবারে ডুব। আমি অবাক হয়ে যাই একটা গ্যাচিওর লোকের কাণ্ড দেখে।—টেলিফোনের মুখখানা থমথম করছে।

টাইপিস্ট বলল, আপনার জন্যে অফিস কামাই করতে হল। হেনাদিকে নিয়ে দত্তপুকুরে গেলাম। ধন্য আপনি!

এ জি বেঙ্গল বলল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াটগড়া একটু হয়। কিন্তু তাই বলে—

টীচার সবাইকে সাবধান করে দিল, আর কিছু বলিস না দিদি। পালিয়ে গেলে আমাদেরই মুশকিল।

টাইপিস্ট ঝংকার দিয়ে উঠল, মোটেই না। আমরা লালবাজারে খবর দেব। আকাশ-বাণী থেকে বলবে, চল্লিশ বছরের একটা লোক হারিয়ে গিয়েছে। মাতৃভাষাটা বাংলা। গায়ের রং কালো, কপালে কাটা দাগ আছে। মস্তিষ্ক সামান্য বিকৃত। কেউ সন্ধান দিলে—

হাসির দমকে শিউলি গাছটা থেকে একটা মরা পাতা উড়ে উড়ে নিচে নামতে লাগল। হেনাও হাসি চাপতে পারল না।

ইতিমধ্যে লিলি জড়িয়ে ধরেছে, মিলি কোলে। ধূমকেতুকে কেউ নাচ শেখায়নি, তবু সে ঘুরেফিরে বারবার চারপাশে স্বরচিত নাচ শুরু করে দিল। কারণ বাবা দুই রাত বাড়ি ছিল না। ছোট শিশুটির সেকথা জানে।

একটু পরে বাচ্চাদের নিয়ে দত্তবাড়ির পরোপকারী মেয়েরা চলে গেল। এরই মধ্যে টাইপিস্ট আবার কূটনৈতিক মার্কা হাসি ছড়িয়ে দিল। যার অর্থ হচ্ছে চান্স করে দিলাম, ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন এইবার।

হেনার চোখে জল এসে গেল।

—তুমি আমার কথাটা একটুও ভাবলে না? কিভাবে যে আমার দুটো রাত গেছে।

হীরক শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল। হু-হু করে খালের ওপার থেকে বাতাস ছুটে আসছে। লজ্জা পেয়ে হেনা বলল, ছাড় দারোগা দেখছে।

হীরক হো-হো করে হাসল।

—দারোগাকে দেখেও তুমি লজ্জা পাও।

—না গো, দারোগা আজকাল মানুষের মতই সব বুঝতে পারে।

—কি রকম?

—পরশু দিন দুপুর থেকেই আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। প্রত্যেক দিন অফিস যাবার সময় তুমি আমাকে বলে যাও, সেদিন কিছুই বললে না। আমি দারোগাকে অনেক করে বোঝালাম। চারখানা রুটি পুঁটি মাছের ঝোল লাউ ঘন্ট দিয়ে মেখে দিলাম। দিব্যি খেয়েদেয়ে বারান্দায় শুয়ে রইল। সকালে উঠে দেখি সেইভাবেই শুয়ে আছে।

হীরকের হাসি থামতেই চায় না।

—মনে নেই পরশু দিন কি ভীষণ বৃষ্টি। সেইজন্যেই যেতে পারেনি।

—কাল রাতে তো বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু দারোগা তো চলে গেল না অন্য দিনের মত?

—তাহলে নিশ্চয়ই লাগ খেয়েছে।

—আহারে, ওর কি কষ্ট! আমি দত্তবাড়ির লালির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। লালির স্বভাব চরিত্র ভাল। দুটিতে মানাবে বেশ চা করব?

—আর একটু পরে। —দারোগাকে সরে যেতে বলে হীরক সেই ভাবেই বসে রইল।

এবাড়ির আর একটা সুবিধে ইচ্ছে করলেই খুব কাছাকাছি আসা যায়। হেনা বুকের মধ্যে নরম গালটা পেতে আস্তে বলল, চল আমরা এখন ডাক্তার সরকারের কাছে যাই। জানি, তুমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছ না। আমিই সহ্য করব।

হীরকের শরীরটা কেঁপে উঠল। কি উত্তর দেবে? মাত্র দুই রাত বাড়ি ছিল না, তার মধ্যে কঠিন প্রশ্নটা এত সহজ হয়ে যাবে। হেনা বলছে, কথা দাও, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। তোমাকে সুখী করতে আমি সব কিছুই পারি। পারি কিনা, তার প্রমাণ আজই হয়ে যাক। আধ ঘন্টার মধ্যে আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি।

হীরক সজোরে মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল।

—আমাকে এ্যাডা চা করে রেডি হয়ে নিতে হবে। লিলি মিলিরা মাসীদের কাছে ভাল থাকবে।

হীরক জিজ্ঞাসা করল, তুমি মন স্থির করে ফেলেছ তো?

একটু চুপ করে থেকে হেনা বলল, হ্যাঁ।

—নড়চড় হবে না?

—না। চল উঠি।

হীরক যেন পশ্চিমবঙ্গ লটারির ফার্স্ট প্রাইজটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। ফেলে আসা দিনগুলির কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। সাতপাখিরা, বৃন্দাবন পাল লেন, চেতলা রোড, রজনী সেন রোড হীরক এই মুহূর্তে একটি নতুন শিশুর পৃথিবীতে আসা বন্ধ করল। সেই অজ্ঞাত শিশুটিকে অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত থেকেও হীরক এই মুহূর্তে মুক্তি দিল। ওর এখন গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। হে অজ্ঞাত শিশু, আমাকে অপরাধী কোরো না। ভুল বুঝো না। তুমি পৃথিবীতে এসে কষ্ট পাও, অপমানিত হও, আত্মীয়-স্বজনরা লাথি মারুক— তা আমি চাই না হে শিশু তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে আসতে দিলাম না বলে রাগ কোরো না। তুমি সুখী হও। তুমি খুশী হও। বিদায়। বিদায়। একটা বড় ফোঁটা হীরকের চোখ থেকে হঠাৎ ঝরে পড়ল।

একটু পরে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে হেনা পাশের ঘরে গেল রেডি হতে। হীরক বলল, এখন আমি যাই। ডাক্তারবাবু হয়ত কাল খুব ভোরে তোমাকে যেতে বলবে। বরং আমাকে কিছু টাকা বের করে দাও।

সাদা শাড়ি আলনায় আবার পাট করে রেখে হেনা পাশে বসল। চোখে গরম নাতাসের হলকা এসে লাগছে। রোদের মালিকের বনের আড়ালে চলে যেতে এখনো ঢের দেরী। খালের ধারে ডুমুর গাছে সুখে ছিল দোয়েল পাখিটা, কি মনে করে উড়ে গেল মাঠের দিকে।

—তোমার অফিসে পর্যন্ত ফোন করেছি। কোথায় ছিলে বললে না তো?

হেনার একটা গুণ, কোন বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ কচলাতে ভালবাসে না। হীরক জিজ্ঞাসা করল, ধূম কেমন আছে?

—ভাল। কালু ডাক্তারের ওষুধ চট করে ধরে। —হেনা কপালে হাত রাখল: কি ঝড়বৃষ্টি সেদিন, তুমি বাড়ি নেই, এদিকে ধূমের সমানে চিৎকার। আমার কথাটা ভাব তো? ভাগ্যিস দত্তবাড়িতে একটা খবর দিয়েছিলাম।

—তোমাদের নিয়ে দিন কতক পুরী ঘুরে আসব। খরচ খুব একটা বেশি না। সমুদ্রের বালিতে লিলি মিলি ধূমকে ছেড়ে দেব। কি মজাই হবে ওদের।

হেনা আরও কাছে সরে এসেছে।

—এবার থেকে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে।

একটু চুপ থেকে হীরক বলল, নিশ্চয়ই। একটা শিশুর কি দোষ! সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

—জান কাল মেজদি এসেছিল চিনুকে নিয়ে।

—তাই নাকি। কি বলল মেজদি?

—খুব আনন্দের খবর। সুশান্ত একেবারে পাল্টে গেছে। অফিস থেকে ফিরেই মেজদির খোঁজ-খবর নেয়, কি লাগবে জিজ্ঞাসা করে। জান, বরাখাবো থেকে প্রশান্ত মেজদির জন্যে সুন্দর একটা ঘড়ি পাঠিয়েছে। তার বারোটা ব্যান্ড, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে পড়তে হয়। মেড ইন জার্মানি।

হীরক নড়েচড়ে বসল।

—তাহলে তো দারুন খবর। ঠিক বলছ তো?

—মেজদি নিজ মুখে বলেছে। সঙ্গে চিনু ছিল। ইচ্ছে করলে তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

—যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন মেজদির উচিত কি জান, এই ভালবাসাকে টিঁকে রাখা। মনে রাখবে, কোন কিছুই এক তরফা হয় না।

—তা তো বটেই।

—তোমার ভাই বৌদেরও অনেক গুণ আছে দেখেছি। মেজদিকে তাদের ভাল-

বাসতে হবে। তাই বোরা তখন কিছুতেই ফেলতে পারবে না, এ আমি বাজি ধরতে পারি।

—আচ্ছা আমার মধ্যে কিছু গুণ দেখতে পাওনি?

—খালি হিংসে। —হীরক গালে একটা টোকা দিল।

একটু পরে হেনা বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেখলে তো আমার কথা ঠিক?

হীরক বুঝতে পারল না, কোন কথা?

—আমি যে বলেছিলাম ভগবান আছে। —হেনা সুন্দর করে হাসল: ভগবান না থাকলে কি কসবার বাড়িতে শান্তি আসত? মেজদি এখন ভাইদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

একটু হেসে হীরক বলল, তোমার ভগবান আমারই মত, বড্ড লেটে বোঝে।

—যাও ভগবানের সঙ্গে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

—তোমার ভগবানকে দিদি জামাই-বাবুর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিতে বল না? এই যে আমরা ছাড়া ছাড়া আছি এটা কি ভাল?

—তা সময় হলে নিশ্চয়ই হবে।

দুপুরের রোদে এখন ঝিম ধরেছে। কোথাও পাতার আড়াল থেকে ঘুঘুপাখির ডাক ওঠানামা করছে। চারদিকে বড় নির্জন আর নিস্তব্ধ। একটু বাদে আকাশ থেকে আলো গোটানোর কাজ শুরু হবে। মনে পড়ল রজনী সেন রোড থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর হীরক জামাইবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিল। সে চিঠির ভাষা ছিল খুবই কড়া। উদ্দেশ্য, জামাইবাবুকে পাল্টা অপমান করা। এখন মনে হচ্ছে, সেদিন অপমান করাটা কি খুবই জরুরী ছিল?

মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হীরক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা হেনা, তোমার সেই ছেলেগুলির কথা মনে পড়ে? একদিন ছোরা হাতে আমাদের এই বাড়ি থেকে তুলে দিতে এসেছিল।

—হ্যাঁ মনে পড়ে। এক একজন কতগুলি করে কপির তরকারি পরোটা খেল।

—আবার এসে খাবে বলেছিল।

—ভাগ্যিস আসেনি। এখন কি হাট-বাজার কিছু হয়? গত সপ্তাহে রেশনটা পর্যন্ত ধরনি। তবু চাল ডালটা কেনা ছিল। বুড়ি কিন্তু ডিমের দাম চেয়েছে।— হেনা এক সঙ্গে জমা কথাগুলি বের করে দিল।

—হবে হবে, সব হবে। কাল থেকে দেখবে আমি অন্য মানুষ। —হীরক জোরে হেসে উঠল: এক মাসের জন্যে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দেব। আমাদের দুজনের শরীরে অনেক ক্লান্তি আর ক্লেদ জমে গেছে। সমুদ্রের নীল জলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

সিগারেটের টুকরোটা বেড়ার ওদিকে ছুঁড়ে দিয়ে হীরক উঠে দাঁড়াল। এবার যেতে হবে ডাকতার সরকারের নার্সিংহোমে। এসব অপারেশন খুব ভোরে খালি পেটে করাতে হয়। আগের দিন জানালে ট্রেন্ড নার্সকে খবর দিয়ে ডাকতার সরকার রেডি হয়ে থাকতে পারেন। এই রকমই নিয়ম। হীরক মনে মনে হাসল। যাক, দু রাত বাইরে থেকে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। বুড়িটা আগে কবলে লাঠা চুকে যেত করে। আবার একটু ভয়ও হল। বেরোবার মুখে হেনাকে বলল শোন, এ্যাডভান্স করে আসছি। কাল সকালে যেন মতটা বদলে না যায়?

—না যাবে না। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

—হুঁ। ফেরার সময় লিলি মিলিদের নিয়ে আসব। —হীরক ঠোঁট লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

দারোগা এই সময় হঠাৎ ফেউ ফেউ করে উঠতেই লজ্জা পেয়ে হেনা সরে গেল।

তেরো

যাদবপুর স্টেশন পেরুতেই ট্যাকসি পাওয়া গেল। এই ড্রাইভারটিও একজন তরুণ শিখ। ভারতবর্ষে এঁরাই কথা কম এবং কাজ বেশি করে। প্রথমে হেনা উঠল, পরে হীরক। দত্তবাড়ির মত প্রতিবেশী পাওয়া ভাগ্যের কথা। লিলি মিলি ঘুম এখানেই থাকবে। আসার সময় হীরক টেলিফোনকে বলেছে, আমার এক বন্ধুর বিবাহ বার্ষিকী, কাচ্চাবাচ্চাদের তাই রেখে গেলাম—। বাড়ি পাহারা দেবে দারোগা। ও নাকি এখন মানুষের মত কথাবার্তা বোঝে। আড়চোখে হীরক তাকাল। আজ খুব ভোরে উঠেছে হেনা। হীরককে এক কাপ চা করে দিয়েছে। নিজে খায়নি। ছেলেমেয়েদের জামা জুতো পরানো পাউরুটি হরলিকস খাওয়ানো—এই সব ঝামেলা পোহাতে গিয়ে একবারও মাথা গরম করেনি।

কিন্তু মুশকিল হয়ে গেল স্টেশন রোডের মোড়ে। অধীর মুখার্জী নিজেই ড্রাইভ করে ফিরছে। চোখাচোখি হতেই হাসল। কিছুদিন আগে এই অধীর অকালের আনারস খেতে দেখেছিল আর দেখল ট্যাকসি চড়তে। এখনো পঞ্চাশ টাকা শোধ দেওয়া হয়নি। তবু অস্ট্রেলিয়ারা মককেলদের দিকে তাকিয়ে চমৎকার হাসতে পারে। হীরক মনে মনে ভাবল, এজীবনে আমি অস্ট্রেলিয়া হতে পারব না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পাশে একটা ছোট সুখী প্রবাল দ্বীপ তো হতে পারি। ট্যাকসি চড়ে সেই প্রবাল দ্বীপ হতেই যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখো না ভায়া। তোমার টাকা আমি শোধ করে দেবই।

ইচ্ছে ছিল দশ মিনিটের মামলা চুকিয়ে চিত্ত মজুমদারের বাড়ি যাবে। সেখানে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হেনার ঘোরতর আপত্তি। এ অবস্থায় কোথাও যেতে পারবে না। হীরক বলেছে বেশ তাই হবে। বাড়ি ফিরে জনতা স্টোভে আমি রান্না চড়িয়ে দেব। ভাত আর ডিমের ঝোল। পুরোপুরি রেস্ট তোমার।

হঠাৎ পাশে তাকাতেই হীরকের বুকটা হিম হয়ে গেল। হেনার দুই চোখ নিঃশব্দে ভেসে যাচ্ছে। কতক্ষণ ধরে কাঁদছিল হেনা? কিছুই টের পায়নি। এই মুহূর্তে হীরক কি করবে বুঝতে পারছে না যেন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বস্তুত চল্লিশ বছরের জীবনে অনেক রকমের কান্না কখনো দেখেছে কিন্তু এমন গভীর আর মর্মভেদী নিঃশব্দ কান্না কখনো দেখেনি। নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হতে লাগল। যেন এতদিন সীমাহীন কোন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে শিশুর খেয়ালে ঢিল ছুঁড়ছিল হীরক। সেই বিপুল সীমা-হীনের সঙ্গে বুঝি হেনারই তুলনা চলে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতেই হীরক পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—একি! একি! —হেনা অপ্রস্তুত: লক্ষ্মীটি ছেড়ে দাও—ছিঃ ছিঃ—

—আমাকে ক্ষমা কর হেনা, আমি ভুল করেছি। তোমাকে আর কষ্ট দেব না।— হীরকের চোখেও জল: চল আমরা ঘরে ফিরে যাই—

—তা হয় না, তা হয় না—তুমি সহ্য করতে পারবে না লক্ষ্মীটি। আমাকে ডাকতারের কাছে নিয়ে চল—

—খুব সহ্য করতে পারব হেনা, তুমি দেখে নিও।

—না না, তুমি সহ্য করতে পারবে না। —নীরব কান্না এবার সশব্দে হীরকের বুকে আছড়ে পড়ছে: তুমি আমাকে ডাকতারের কাছে নিয়ে যাও। আমি কিছুতেই বাড়ি যাব না।

গাঙ্গুলীবাগানের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ট্যাকসি। কাঁপন লাগা হেনার শরীরটা জড়িয়ে ধরে হীরক চাপা গলায় হুকুম দিল, ড্রাইভারজী যাদবপুর চলিয়ে—

ড্রাইভারজি অনেক আগেই আয়নার সাহায্যে বুঝতে পেরেছিল, কিছু একটা ঘটেছে পিছনে। কিন্তু ফালতু বাতচিতের অভ্যেস না থাকায় একটা ছোট গলির মুখে ট্যাকসিটাকে ঘুরিয়ে যাদবপুরে উড়িয়ে দিল।

—কাজটা ঠিক করলে না। —বুকের মধ্যে মুখ রেখে আদুরে গলায় হেনা বলল।

—বেশ করেছি।

দুজনের শরীরেই প্রচুর ক্লান্তি আর ক্লেদ। তা মুছে দেবার জন্যে ভোরের আকাশ থেকে রাশি রাশি নীল বাতাস ট্যাকসির গহ্বরে হু-হু করে ঢুকতে লাগল। মনে পড়ে গেল মিহিরদার কথা। নতুন শিশুর যাত্রাপথ আনন্দময় রাখতে হবে।

সমাপ্ত

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। আট ।।

ঠিক এক বছরের মাথায় বনমায়াকে নিয়ে আবার এক-প্রস্থ হৈ-চৈ। আর তার এক মাসের মধ্যে ওর মাহুত মন-মরা ভীম-বাহাদুরের আশা আর ভবিষ্যদ্বাণী দুই-ই তাক লেগে যাওয়ার মতো সফল।

বনমায়া আবার পালিয়েছে। আর, এক মাস না যেতে ঠিক আগের বারের মতো একা নিজেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর এবারের পালানোটা একেবারে অন্যরকম। এবারে আর জঙ্গলের কেউ বা আশপাশের বন্দুক-অলা সাহেবদের কেউ দ্বিতীয় কোনো বুনো হাতির হাঁকডাক শোনেনি। এদিকে প্রথমবার পালানোর ফলে বনমায়ার পায়ের শেকল বদলে ঢের শক্ত-পোক্ত শেকল আনা হয়েছিল। পেল্লায় শাল গাঁড়ির সঙ্গে বাঁধা সেই শেকল ছেঁড়া একলা বনমায়ার কর্ম নয়। একলা যে ছেঁড়েনি তারও প্রমাণ মিলেছে। আগের রাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। সেখানকার মাটিতে বনমায়া ছাড়া আরো একটা হাতির পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আর জঙ্গল থেকে দূরের পাহাড়ের দিকে পাশা-পাশি দুটো হাতি চলে যাওয়ার হদিসও মিলেছে।

মোট কথা, এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে, বুনো মরদ হাতিটা এবারে নিঃশব্দে এসেছে। দুজনে মিলে শিকল ছিঁড়ে তেমনি নিঃশব্দে একসঙ্গে পালিয়েছে। এই পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় একটু বৃষ্টি হলেই দিব্যি ঠাণ্ডা পড়ে। সাহেব-সুবোরা বিলিতি আর জঙ্গল বা বাগানের নিজের ধাপের জোয়ান-বুড়োরা কিছুটা মদ টেনে পাকা ঘুম লাগায়। বড়

রকমের হাঁক-ডাক না হলে এমনিতে তাদের অসময়ে ঘুম ভাঙার আশা কম।

বড় সাহেব নন্দীপ নন্দী গেল বছরের হাতি পালানোর ফিরিস্তি শুনেছেন। এবারে এমন নিঃশব্দে পালানোর ব্যাপারটা নিজে চাক্ষুষ তদারক করে ভীম বাহাদুরের খুব একটা দোষ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু মরা হাতির দাম যেখানে লাখ টাকা, সেখানে পোষা জ্যান্ত হাতি পালালে সরকারি কৈফিয়তে দোষ-ত্রুটি তো কিছু বার করতেই হবে। হাতি তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে অতএব কারো দোষ নেই এ-কথা তো আর লিখতে পারেন না। ও-দিকে চোখের জল ফেলে আর দু-হাত জোড় করে ভীম বাহাদুর যা বলছে তাতে তড়িঘড়ি শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, গম্ভীর থাকা দায়। তার আর্জির সার কথা, সাহেব যেন নারাজ না হন, সে নিরপরাধ হলেও দোষ মেনে নেবে যদি মা বনমায়া ফিরে আসে। গা জুড়লেই বনমায়া ফিরে আসবে। আসবেই।

ওর সমব্যথী ফরেস্ট গার্ড আর বীট-ম্যানদেরও সেই বিশ্বাস। অতএব বড়সাহেব তদন্তসাপেক্ষ রিপোর্ট দিয়ে বিচার স্থগিত রেখেছেন। আর মুখে ভীম বাহাদুরকে বলেছেন, ভালো করে তল্লাসি চালিয়ে যেতে, না গেলে মুশকিল হবে।

ভীম বাহাদুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ করে গেলবারের মতোই এক মাসেরও আগে বনমায়া যেমন নিঃশব্দে গেছল তেমনি নিঃশব্দে আবার ফিরে এসেছে। আর রাগের চোটে এবারে ভীম বাহাদুর পাগলের মতো কাণ্ড করেছে। ঘর থেকে ডাঙাটা এনে ওর মাথায় চেপে বসে এলোপাথারি মার শুরু করেছিল। বনমায়াও তেমনি গাঁ-গাঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। ভীম বাহাদুরের একটা পা ধরে টেনে আবু ওকে হিঁচড়ে নামিয়েছে। তারপর ঝাঁকিয়ে উঠে বলেছে, কি বুদ্ধি তোমার, প্রেম মাথায় চড়লে ও পালাবেই, কিন্তু এরকম মার খেলে আর ফিরে আসবে?

ওর যুক্তির কথা শুনে বনমায়াকে ভীম বাহাদুরের এরপর সে-কি আদরের ঘটা।

কত কি আছে যা ভাগ না করলে ভোগের আনন্দ বাড়ে না। বাপীও সেই গোছের খেদ। খেদ কেন, রাগই বলা যেতে পারে। রাগ মিষ্টির ওপর, মিষ্টির মায়ের ওপর, এমন কি কলকাতায় কারা সব ঘোড়ায় ডিমের আত্মীয় আছে ওদের, তাদের ওপরেও। এক মাসের ওপর হয়ে গেল ছেলেমেয়ে নিয়ে মিষ্টির-মা কলকাতায় গেছে কোন্ আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। মহারাণীর এখনো ফেরার নাম নেই। আসলে ছেলেমেয়ের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, পরীক্ষার ফল বেরুলেও নতুন ক্লাস এখনো শুরু হয়নি, তাই ফেরার তাড়াও কম। কিন্তু বনমায়াকে নিয়ে এ-দিকে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল আবার মিষ্টি জানতেও পারল না।

এই একটা বছরে বাপীর বুদ্ধিসুদ্ধি আরো পেকেছে। ওর জন্যেই জঙ্গলে বেড়ানোর নামে মিষ্টির এখন জিভে জল গড়ায়। আগের থেকে ওর সাহসও অনেক বেড়েছে। ছুটির দিনের দুপুরে ও-ই বরং বাপীর অপেক্ষায় ঘর বার করে এখন। খরগোশ কাঠ-বেড়ালি বা বন-মোরগ তাড়া করার ঝোঁকে বাপী যে এক-একদিন ওকে নিয়ে কতটা দূরে চলে যায় মিষ্টি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। আবু সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। মিষ্টি তখন নিজের খুশিতেই একটু দূরে পা বাড়াতে চায়। বাপীর বোল-চালের ফলে হোক বা আবুর হাব-ভাব দেখেই হোক, মিষ্টির এখন বিশ্বাস বাঘ-ভালুক সামনে পড়ে গেলেও আবু ওদের কলজে ফুটো করে দেবে। আবু নিজেই বলে, তোমাদের যেমন দেবতা আছে, জঙ্গলের তেমনি অপ-দেবতা আছে। আমি হলাম গিয়ে সেই অপদেবতা, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই খুকুমণি।

কিন্তু বাপীর নিজের দোষেই মিষ্টি একটা জিনিস ইদানীং বুঝে ফেলেছে। ফাঁক পেলেই ওর এই সুন্দর শরীরটার ওপর ও হামলা করে। চালাকি করে গায়ে পিঠে হাত দেয়, মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। নিজে এখন অনায়াসে উঠতে পারলেও খুকের সঙ্গে সাপটে ধরে গাছের ডালে বসায় নয়তো ডাল থেকে নামায়। একদিন তো ডাল থেকে নামার সময় ইচ্ছে করেই ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। এমনি করল যেন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। মিষ্টির অবশ্য লাগেনি, লেগে থাকে তো ওরই একটু আধটু লেগেছে; কারণ মিষ্টি ওপরে আর ও নীচে। কিছু বুঝুক না বুঝুক, মিষ্টির এরকম হামলা করতে দিতে আপত্তি। আগেও বলেছে—দাদা মারলে মা দাদাকেই বকে মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে হয় না, বুঝলে? আর তুমি কেবল আমাকে পেলেই ধরে টানাটানি করো। এরকম করলে মাকে আমি বলে দেব।

বাপীর রাগ যেমন ভয়ও তেমনি। হেসেই ওকে ভোলাতে চেষ্টা করেছে, তুই যেমন বোকা, মেয়েদের মারতে নেই বলে গায়ে হাত তুলতে নেই—আমি কি তোকে মারার জন্যে গায়ে হাত দিই?

—তবে কেন দাও?

বাপী ভয়ে ভয়ে খুব মোলায়েম করে বলেছে, আমার ভালো লাগে।

—আমার বিচ্ছিরি লাগে। তুমি ও-রকম করলে আমি আর আসবই না।

বাপী কথা দিয়েছিল ও-রকম আর করবে না। কিন্তু তার পরের ছুটির দিনেই ইচ্ছে করে গাছের ডাল থেকে নামানোর সময় ওকে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে। মিষ্টি আর কিছু না বুঝুক, এটুকু বুঝেছে ওর শরীরের ওপর হামলা করতে ওই পাজী খুব মজা পায়।

এরপর কলকাতায় যাবার আগে মাত্র দুটো ছুটির দিনে জঙ্গলে এসেছিল। দুদিনই মিষ্টি বেঁকে বসেছিল, আসবে না। দাদার বন্ধু দাদাকে বলেছে, চা-বাগানের এক দুষ্টু লোক একটা মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিল, সেই জন্য রেগে গিয়ে অন্য লোকেরা ওই লোকটাকে মেরেছে। মিষ্টির মা বলেছে, বেশ করেছে মেরেছে, ও-রকম অসভ্য লোককে মারাই উচিত।—জঙ্গলে গেলে তুমিও অসভ্যের মতো করো, তোমার সঙ্গে যাব না!

নিরুপায় বাপী তখন নিজের কান মলেছে, বলেছে, ও-রকম করাটা যে অসভ্যতা ও ঠিক জানত না—আর কখনো ও-রকম করবে না।

এরপর মিষ্টি এসেছে। বাপী ওর হাত ধরেছে তাতে খুব আপত্তি হয়নি। হাত ধরাটা তো আর গায় হাত দেওয়া নয়। পরের বারেও মিষ্টি আগে থাকতে গায়ে হাত না দেবার কড়ার করে তবে জঙ্গলে ঢুকেছে। বাপীর তাইতে প্রচণ্ড রাগ হয়েছে, হাত দুটো আরো বেশি নিশপিশ করেছে। আর অতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলার জন্য মনে মনে নিজেকেই গালাগাল করেছে।

বাগ বাপীর ওই বড় সাহেবের বাংলোর সকলের ওপরেই। মিষ্টির বাবা-মা দীপুদা সকলের ওপর। ও-বাড়িতে ঢুকতে হলে আবুর সঙ্গে খরগোশ বা বন-মোরগ নিয়ে, আম-জাম-জামরুল-পেয়ারা খেজুর নিয়ে, ঝুড়ি ভরতি শাল-পলাশ নিয়ে, বা চাক-ভাঙা মধু নিয়ে যেতে হয়। আবুর আশা মেম-সাহেবের নেক-নজরে পড়লে সে বীট-ম্যান হবে। আর বাপীর আশা, মেমসাহেব বা দীপুদার কাছে ওর একটু আদর হবে, যার ফলে যখন-তখন এই বাংলোয় আসাটাও সহজ হবে। কিন্তু একটা বছরে এটুকু ভালোই বুঝে নিয়েছে, আদরের আশা দূরে থাক, এই বাংলোর মানুষেরা ওদের মানুষই ভাবে না। জিনিস-টিনিস পেলে এমন ভাব দেখায় যেন এসব তাদের পাওনা। এমনিতে মিষ্টির সঙ্গে একটু গল্প করার লোভে বাংলোয় পা দিলেই মেমসাহেবের দুই ভুরুর মধ্যে বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। সকালে জিনিস দেবার পর বিকেলে এলেও এমনিই অখুশি মুখ দেখে মেমসাহেবের। আর একদিন আবুর সঙ্গে এক ভাঁড় চাক-ভাঙা মধু নিয়ে এসে মেমসাহেবের মুখে হাসি দেখে সাহসে ভর করে তার সামনেই মিষ্টিকে ডেকে বলেছিল, মিষ্টি একটা কথা শুন যা—

সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবের ফোঁস-মূর্তি।

—এই ছেলে, অসভ্যের মতো তুই-তুকারি করিস কেন? ফের শুনি তো কান ছিঁড়ে দেব—

অপমানে বাপীর মুখ কালি একেবারে। বাইরে এসে আবু আবার তার ওপর হেসে হেসে নুন ছড়িয়েছে।—কি রে, ওই মেয়ের সঙ্গে আর প্রেম করবি নাকি এরপর ওর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করবি?

বাগের চোটে বাপ [illegible] উঠেছিল, ওই মিষ্টিকে একদিন আমি [illegible] গিলে খাব দেখে নিও।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবু বলেছিল, এই তো মরদের মতো কথা।

মেমসাহেব তো তবু মুখে বলেছে কান ছিঁড়ে দেবে। দীপুদা তো যখন-তখন কান টেনেই ধরে আর মাথায় খট-খট করে গাঁট্টাও বসিয়ে দেয়। সব ছুটির দিনেই

একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ হয় না। কোনো কোনো ছুটির দিনে ওদের বাংলোয় অতিথি আসে, কোনদিন বা দীপুদা এমনিই বেরোয় না। তখন একলা মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার আশায় ছাই। বাপী তখন ছুটে গিয়ে আবুকে ধরে নিয়ে আসে। আবুকে দেখলে দীপুদার জঙ্গলে ঢুকতে আপত্তি নেই। বাড়িতে লোকজন দেখে বেরুবার আশায় এই লোভটা মিষ্টিই একদিন দাদাকে দেখিয়েছিল, আর বাপীকে বলেছিল আবুকে ডেকে আনতে। তারপর থেকে ঘরে থাকলে এই বাবুও জঙ্গলে ঘোরার রস কিছু পেয়েছে। এক-একদিন নিজেই ওকে ডেকে বলে দেয়, আবুকে ডেকে নিয়ে আসিস—

এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে ভয়-ডর আপনা থেকেই কমে আসে। মিষ্টি এখন সামনের রাস্তা পেরিয়ে একলা জঙ্গলে নামলে আর খুব কাছাকাছির মধ্যে ঘোরাঘুরি করলেও ওর মা বকা-ঝকা করে না। কেবল বলে দেয়, খবরদার দূরে যাবি না, এখান থেকে ডাকলে যেন শুনতে পাস—

ছেলে আর আবু সঙ্গে থাকলে কিছুই বলে না। তার ধারণা কাছাকাছির মধ্যেই থাকে ওরা। সে-সময় দীপুদার মাতব্বরি আর শাসন দেখে বাপীর গা জ্বলে যায়। এই জঙ্গলটাও যেন ওদের সম্পত্তি। ইচ্ছে মতো বাপী এদিক ওদিক ছুটে লাগালে চোখ পাকাবে। পশু-পাখি টিপ করে পাথর ছুঁড়লেও এক-একসময় আচমকা গাঁট্টা। কি, না আমি মারতে যাচ্ছিলাম, তুই আগে মেরে বসলি কেন? ওর সঙ্গে ছুটতে গিয়ে মিষ্টি হোঁচট খেয়ে ব্যথা পেল কি পেল না, দীপুদার চড়-চাপড়টা এসে পড়ল ওর ওপর। বাপীর সব থেকে বেশি অপমান হয় এসব যখন আবু দেখে আর তেরছা চোখে ওর দিকে তাকায়। যেন বলতে চায়, ভালবাসার আর কত দাম দিবি, এরপর কি জুতো-পেটা শুরু হলে আক্কেল হবে?

সেই এক বছর আগে মিষ্টিকে ভালবাসতে ইচ্ছে করার কথাটা বোকার মতো আবুকে যদি না বলে ফেলত, তাহলে এতটা খারাপ লাগত না। মিষ্টির মা বা দীপুদা শাসন করলেও আবু এভাবে তাকিয়ে মজা পেত না, বা ঠাট্টা-ঠিসারা করত না। ওই বাংলোর মহারাণী আর তার ছেলের ওপর কত যে রাগ বাপীর সে শুধু ওই জানে। রাগ বড় সাহেবের ওপরেও। বাপীর বাবার থেকে এত ওপরের একজন না হলে ওকে এত হেলা-ফেলা কেউ করত না। আর রাগ সময় সময় তাদের ওই আদুরে মেয়ের ওপরেও। ওই মিষ্টির থেকে বনমায়া ঢের ভাল। পারে শেকল বাঁধো আর যা-ই করো, ভালবাসার পুরুষ হাতি এলে সব ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে ও তার সঙ্গে চলে যাবেই। মিষ্টি যদি বনমায়ার মতো হত।

ওই বনমায়াকে নিয়ে আবুর সঙ্গে অনেক রসের কথা হয়েছে বাপীর। সে-সব কথা মিষ্টিটাকে বলাও যাবে না। এক বছরেই বাপী ভিতরে ভিতরে যেমন ধা-ধা করে বড় হয়ে গেছে, ও-তো আর অতটা হয়নি। আর আবুর তো কথাই নেই, আঠের বছর পার—জঙ্গলের যাকে বলে বুক-চিতানো মরদ একখানা। ওকে দেখলেও বাপীর চোখ জুড়য়।

কিন্তু মিষ্টিরা নতুন বছরের ছুটির মধ্যে এখানে না থাকাতে জন্ম থেকে দেখা এই বানারজুলির জঙ্গলটাকেই যেন আরো চেনা আরো জানার সুযোগ হয়েছে বাপীর। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ, ছুটির আগে বেরোলটও বেরিয়ে গেছে। নতুন ক্লাসের বই-পত্রই কেনা হয়নি এখন পর্যন্ত—বই নিয়ে বসার তাড়াই বা দেয় কে? তার ওপর স্কুল ছুটি।

সকাল দুপুর বাপীর আবুর সঙ্গেই কাটছে। আঠের পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবুর বীটম্যান হওয়ার দাবী। এতদিন স্কুল ছাড়া সার্টিফিকেটে ওর বয়েসটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাকরির জন্য আবু এখন কোমর বেঁধে তৈরি। ওর বাবা কালুকে নিয়ে বাপীর বাবার সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত পেশ করেছে। বাবা দরখাস্ত রেখেছে, আশাও

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৮ মে থেকে ২২ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২·৫০ টাকা বাদ দিয়ে—সমুদয় রবীন্দ্র-গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুযোগ পাবেন।

এজন্য স্থানীয় পুস্তকবিক্রেতাগণ ৬ মে ১৯৭৮ থেকে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ৭৩

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড। বর্ধমান

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড। পাটনা ৪

ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি
আখাউড়া রোড। আগরতলা

চিঠিপত্র, অগ্রিম ও মফস্বল থেকে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলিকাতা ৭০০০১৭

২৭ এপ্রিল থেকে ১৬ মে ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতা-সেগুলিতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া সম্ভব হবে। দের অর্ডারে যেগুলি ডাকে, রেলে, সড়কপথে ও বিমানে সরবরাহ করা হবে

কাগজ ছাপা ও বাঁধাইয়ে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য পূর্বের চেয়ে বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত খণ্ডগুলির দাম বাধ্য হয়ে বাড়াতে হওয়ায় অনেক পাঠক রবীন্দ্র-রচনাবলী সংগ্রহ করবার অসুবিধার কথা জানিয়েছেন—তাঁদের যাতে কিছুটা সুবিধা হয় সেজন্য ৮ মে থেকে ২২ মে ১৯৭৮ পর্যন্ত অচলিত সংগ্রহ দু'টি খণ্ড সমেত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমানে প্রাপ্তব্য সবগুলি খণ্ড এক সঙ্গে কিনলে সর্বসাধারণকে ২০%, সাধারণ পাঠাগারকে ২২½% এবং স্থানীয় ও মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতাদের ২৫% কমিশনে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ পুস্তকবিক্রেতাগণ মোট পুস্তকমূল্যের শতকরা ২৫ এবং সাধারণ ক্রেতাগণ ৫০% অগ্রিম পাঠাবেন।

দিয়েছে। চাকরি দেওয়া না দেওয়ার মালিক বড় সাহেব—মিষ্টির বাবা সেটা সকলেই জানে। কিন্তু তার কাছে সুপারিশ তো কাউকে করতে হবে। বাপীর বাবা সেই সুপারিশের আশ্বাস দিয়েছে।

আবুকে মুখে কিছু না বললেও এখানেই বাপীর যা একটু সংশয়। বড় সাহেবকে দশ গজের মধ্যে দেখলেই বাবার চোখ-মুখের যা অবস্থা হয় তার দ্বারা ধরা-কবার ব্যাপারটা কদ্দূর হবে কে জানে। তবে আবুকে অন্য দিক থেকে একটু আশার কথা শোনাতে পেরেছে বাপী। বাবা ওর দরখাস্ত বড় সাহেবকে দিলেই ও মিষ্টিকে ধরবে। মিষ্টি বাপের আদুরে মেয়ে তার ওপর আবুকে ওরও ভারী পছন্দ। তাছাড়া এটা-ওটা ভেট দিয়ে দিয়ে আবু মেমসাহেবকেও খুশি রেখেছে। আবুর চাকরি তাহলে হবে না কেন?

কিন্তু আবু কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারে না। নিজের কাছে ও পাকাপোক্ত বীট ম্যান একজন হয়েই বসেছে। বাপ অর্থাৎ হেড বীটম্যান কালুর চার ভাগের তিন ভাগ কাজ ও-ই করছে এখন। বীটম্যানদের প্রথম কাজ জঙ্গল টহল দেওয়া। বাপী তার সেই টহলের দোসর এখন।

জঙ্গলের মধ্যেই মাটির ঘরে থাকে ওরা। সব বীটম্যানরাই তাই। অনেকটা দূরে দূরে ওদের ঘর। ভাড়া গুনতে হয় না, এমনিতেই থাকতে পায়।

সকালে মুখে কিছু গুঁজেই বাপী ছোটে আবুর ওখানে। দেরি হলে আবু একলাই বেরিয়ে পড়বে। কারণ কালু তো এখন আর সকালের মুখ দেখে না। পড়ে পড়ে ঘুমোয় না ঝিমোয়। বাপীর ধারণা, ছেলে অনেক কাজ বুঝে নেবার পর থেকে ওর নেশার মাত্রা বেড়েছে। আবু নিজে থেকে কিছু বলে না বলে বাপীও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করে না।

টহল দেবার সময় বীটম্যানদের হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি থাকে। কিন্তু আবু নিজের পিয়ানের সেই লোহার খাপ আঁটা ইস্পাতের ফাল বসানো লাঠিটা সঙ্গে নেয়। বাপীর হাতেও থাকে তার নিজের ছোট লাঠি। শাল শিশু অর্জুন আবুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলোয় ঘা মারতে মারতে এগোয় তারা। স্ফূর্তি করার জন্য ঘা মারা নয়। কোনো গাছে পোকা ধরল কিনা ঘা মারার শব্দ থেকে সেটা বোঝা যায়। বাপী বুঝতে পারে না, কিন্তু আবু ঠিক বুঝতে পারে। গাছের শত্রু উই, গান্ধীপোকা, গন্ধ ফড়িং, পঙ্গপাল। কোন্ শত্রু নিকেশের জন্য কি ওষুধ দরকার আবু তাও জেনে ফেলেছে। কোনো গাছে পোকা ধরলে বা শত্রুর সন্ধান পেলে বীটম্যানের কাজ ওপরওলার কাছে রিপোর্ট করা।

ফাঁকি না দিলে বীটম্যানের আরো অনেক কাজ। চারাগাছের বেড নিয়ম করে পরীক্ষা করা একটা বড় দায়িত্ব। জলের নালা দিয়ে ঠিক মতো জল আসছে কিনা, বেশি জল আসছে কিনা, ওর কাছাকাছি সজারু গর্ত খুঁড়ল কিনা, এইসব। বুনো শুয়োরও কত সময় চারা গাছ মুড়িয়ে দিয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা দেখলে আরো লোকজন ডেকে লাঠি আর টিন কানেস্তারা নিয়ে আশপাশের বড় গাছের ডালে বসে পাহারা দিতে হয়। পাহারা মানে টিন-কানেস্তারা পিটে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

কিন্তু আবুর সেরকম পাহারাদার হতে ইচ্ছে করে না। বীটম্যান হলেই ও একটা বন্দুক পেতে চেষ্টা করবে। ওর বাপের যদি সেরকম হিম্মত থাকত তাহলে ঠিক একটা বন্দুক আদায় করতে পারত। কিন্তু রাত হলেই তো নেশায় পেয়ে বসে বাপটাকে। তার হাতে বন্দুক দেবে কে? না, বাপের ওপর খুব একটা শ্রদ্ধাভক্তি নেই আবুর। বাপীর বাবা মানে কেরানিবাবু নেহাত ভালোমানুষ বলে ওর বাপের দোষত্রুটি ধামাচাপা দিয়ে রাখে—একথা আবু নিজের মুখে ওকে বলেছে।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা ভাটিখানা আছে বাপী এতদিন সেটা জানত না। একদিনের অভিজ্ঞতায় তাও জানা হয়ে গেল। বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা বড়সড় হরিণ কচের মতো ওদের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। ওটার গায়ে একটা তীরবেঁধা ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

ব্যাপার ভালো করে বোঝার আগেই বাপী দেখে আবুর দুচোখ ঝলসে উঠেছে ভোজাল কঠিন। হাঁচকা টানে বাপীকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। কিন্তু তীর-ধনুক হাতে উল্টোদিকের ছুটন্ত লোক দুটো দেখেই ফেলল ওদের। থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

আবু তারস্বরে একটা বিকট চিৎকার করে লোক দুটোকে তাড়া করল। জঙ্গল-চোর বা অন্য কোনো বিপদআপদ দেখলে বীট-ম্যান অন্য বীটম্যানদের বা ফরেস্টগার্ডদের এমনি চিৎকার করে জানান দেয়।

লোকদুটো চোখের পলকে উধাও। আবো কয়েকবার চিৎকার করেও আবু অন্য কোনো বীটম্যানের সাড়া পেল না। ওর যতো উত্তেজনা ততো রাগ। মাল বা পলিয়া জঙ্গল-চোরদের এই কাজ। ফাঁক পেলে তীর ধনুক দিয়ে তারা হরিণ মারে, রাতে কাটা গাছের কাঠ সরায়। হরিণটা নিশ্চয় কোথায় মরে পড়ে থাকবে। তখন প্রথম দোষটা পড়বে ওর বাবার ঘাড়ে। এ-এলাকায় তার নিজের টহল দেবার কথা, অন্য লোকও মোতায়েন রাখার কথা। আর এ-দিকের ফরেস্ট-গার্ডকেও জবাবদিহি করতে হবে।

আবু তার বাবার খোঁজে ছুটল। পিছনে বাপী। কিন্তু কালু ঘরে নেই। দাঁত কড়মড় করতে করতে হনহন করে আবু আবার জঙ্গলের আর এক দিকে চলল।

গাছ-গাছড়ার আড়ালে একটা মাটির ঘর। সেখানে আসতেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে এলো বাপীর। সামনেই পেল্লায় কড়ার মধ্যে ফুটছে কি। উৎকট গন্ধটা সেদিক থেকে আসছে। এদিকটায় মাটির ওপরেই বসে আছে আবুর বাবা কালু, তার সঙ্গে আরো তিন চারজন। সকলের হাতেই মাটির ভাঁড়।

আবু ঝাঁঝালো গলায় খবরটা কালুকে দিল। কালু বসে বসে দুলছিল। ঘোলাটে চোখ। জঙ্গল চোরের উদ্দেশ্যে একটা বিচ্ছিরি গাল দিয়ে উঠল সে। তার সঙ্গীরা আরো কিছু গালাগাল যোগ করল। কালু ছেলেকে হুকুম করল, চোর দুটোকে গাছের সঙ্গে কষে বেঁধে রাখ—আমরা যাচ্ছি। আর বলল খুঁজে পেতে মরা হরিণটাকে ঘরে নিয়ে যেতে—রাতে ভোজ হবে।

বাপীর হাত ধরে টেনে আবু রাগে গজগজ করতে করতে ফিরল আবার। অভি-সম্পাতও করল দিনের বেলায়ই বেহেড মাতাল হয়ে আছে—মরুক—ধরা পড়ে মরুক সব।

বাপী সেই প্রথম জানল ওটা ভাটি-খানা। চুরি করে মদ চোলাই হয় ওখানে। সকলেই জানে, এমনকি পাহারাদাররাও কিন্তু ভাবখানা দেখায় যেন কেউ কিচ্ছু জানে না।

বাপী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল হরিণমারার ব্যাপারটা ধরা পড়লে তোমার বাবার শাস্তি হবে?

আবু ঝাঁঝালো জবাব দিল, হওয়া তো উচিত। কিন্তু শাস্তি দেয় কে—এখানে ছোট থেকে বড় সব শালা চোর।

বাপী ঘাবড়েই গেল। —আমার বাবাও?

—না, তোর বাবার অত সাহস নেই—তা বলে তোর বাবার বাপ খুড়োরা কেউ কম যায় না—বুঝলি?

বাপীকে হাঁ করে থাকতে দেখে রাগের মুখেও আবু হেসে ফেলেছিল। তারপর চুরির ব্যাপারটার ব্যাখ্যাও করেছিল। বাপীর বাবার বাপ খুড়ো বলতে জঙ্গলের বড় মাঝারি ছোট সাহেবরা। এবারের বড় সাহেব অর্থাৎ

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি.টি. রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• প্রোডাক্ট
• সাটিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

নাকি আগের থেকেও বেড়ে গেছে। কন্ট্রাক-টারদের গাছ ইজারা দেওয়ার সময় মোটা ঘুষের টাকা ওই সাহেবসুবোদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। অনেক শিশু গাছে ইচ্ছে করেই চিহ্ন দেওয়া হয় না। চিহ্ন না থাকা মানেই সরকারী হিসেবে সে গাছ নেই। শিশু গাছ খুব দামী। ভালো কাঠ আর তক্তা হয়। টাকা খেয়ে বড় সাহেব মেজ সাহেবরা সেইসব মার্কাছাড়া গাছ কাটতে দিলে কে আর ধরছে? কার বুকের পাটা আছে যে বলে দেবে? তাছাড়া ঘুষ দিয়ে বেআইনী শিকারও কম হচ্ছে নাকি এখন এখানে?

মিষ্টির বাবা পর্যন্ত এরকম খারাপ কাজের মধ্যে আছে শুনে বাপীর মুখে কথা সরে না। কিন্তু কাউকে বলার জো নেই, এমন কি পিসীকেও না। আবু সাবধান করে দিয়েছে, খবরদার কাউকে বলবি না—তোর বাবার কানে গেলে উল্টে তোকেই ধরে পিটবে। আর বড় সাহেব মেজ সাহেব-দের কানে গেলে তো তোর আমার বাবারই চাকরি নট।

মুখে না বলতে পারুক, এতসব জানার ফলে বাপীর ভিতরে ভিতরে রাগ খুব। জঙ্গলটা একটু আদর-যত্ন আর দেখা-শুনার আশায় মানুষের মুখ চেয়ে আছে, আর মানুষই কিনা সব থেকে বেশি হামলা করছে তার ওপর।

বড় সাহেবের বাংলোয় ওই আদুরে মেয়ের দেখা পাওয়া গেল স্কুল খোলার ঠিক আগের দিনটিতে। এসেছে, বাপী তাই জানত না। তবে রোজই একবার করে এদিকটায় টহল দিয়ে যায়।

সকালে মিষ্টিকে বারান্দায় দেখেই আনন্দে বুকের ভিতরটা দাপাদাপি করে উঠল। কিন্তু ডাকবে কি, বড় সাহেব ওই বারান্দায় বসেই কাগজ পড়ছে।

ডাকতে হল না, মিষ্টি নিজেই দেখল ওকে। ঘাড় বেঁকিয়ে বাপকে একবার দেখে নিয়ে ও গেটের কাছে চলে এলো।

বাপী গেট-এর ওধারে।

—জানো, আমি ফার্স্ট হয়েছি—বাবা বলল। দাদাও পাশ করেছে—

ফার্স্ট বা পাশের ধার ধারে না বাপী। ওকে দেখেই খুশিতে টইটম্বুর।—কবে ফিরলি?

—কাল বিকেলে। ছুটির মধ্যে তুমি আর আবু খুব জঙ্গল চষলে তো?

—খুব। বাপী কথা বলবে কি, প্রায় দেড় মাস বাদে মিষ্টিকে দেখে চোখে পলক পড়ে না। মিষ্টির বয়েস এখন মাত্র নয় কিন্তু এই দেড়টা মাসের মধ্যে ও যেন দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছে। মাথায় বেড়েছে মুখ আরো ফর্সা হয়েছে। বলল এদিকে কত কি কাণ্ড হয়ে গেল তুই জানিসও না— দুপুরে জঙ্গলে আসবি তো? সব বলব—

—মিষ্টি!

পিছনের বারান্দা থেকে ধমকের সুরে বাবার আচমকা ডাক। তাঁর হাতের কাচের গেলাসে দুধ। অপ্রসন্ন চাউনি।

জবাব দেওয়া হল না। মিষ্টি ঘুরে আবার বারান্দার দিকে ছুট। বাপীরও আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই। মহারাণীর মুণ্ডুপাত করতে করতে বাড়ির দিকে চলল। ফিরে আসা হয়েছে জানলে বাপী ঠিক হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। শুধু কর্তাকে ঘুষ ছাড়া গিন্নিরও খুশি মুখ দেখা যায় না। এখন কতক্ষণে দুপুর হবে আর কতক্ষণে একলা পাবে মিষ্টিকে ঠিক নেই।

ঠিক সময়েই দুপুর হল, আর মিষ্টিকেও একলাই পেল। কিন্তু এতদিন বাদে জঙ্গলে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও মেয়েটার হাব-ভাব কিরকম যেন। গেট পর্যন্ত ছুটে চলে আসারও তাড়া নেই। নেহাত যেন গেট-এর কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বলেই আসা।

বাপীর সবুর সয় না। আবার ওর মুখ দেখে শংকাও একটু। গলা চেপে জিজ্ঞাসা করল, তোর মা ঘুমোয়নি?

—ঘুমিয়ে কাদা। আর বোরও বাড়ি নেই।

—তাহলে কি হল, জঙ্গলে যাবি না?

মিষ্টি একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল ওকে। এরকম করে দেখাটাও নতুন ঠেকছে বাপীর।

—আবু কোথায়?

—আবুকে দিয়ে কি হবে? সে জঙ্গলে ঘুরছে কি বাড়িতে ঘুমুচ্ছে কে জানে।

কড়ার করে নেওয়ার সুরে এবারে মিষ্টি বলল, জঙ্গলে ঢুকে তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না?

এতদিন বাদে এসে ও সেই পুরনো কথাই আগে বলবে বাপী ভাবেনি। বলার ফলে রাগের সঙ্গে ওই লোভটাই যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল।—তোর কি নন ধরার নাকি যে হাত দিলে গলে যাবি? হাত দেব না সে-তো সেই করেই বলেই রেখেছি।

গেট খুলে আর বন্ধ করে মিষ্টি বেরিয়ে এলো। কত দিনের মধ্যে জঙ্গলে পা দেয়নি। বেরুনোর তাগিদ তারও কম নয়। জঙ্গলে ঢুকে বাপী ওর হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিল।

—ফের?

বাপী থতমত খেল একদফা। দেড় মাসের মধ্যে কতটা বড় হয়ে গেছে ঠাওর করে উঠতে পারল না।—হাত ধরতেও দিবি না?

—না। কলকাতার সোনাদি বলেছে তুমি একটা অসভ্য ছেলে, তোমার সঙ্গে একলা জঙ্গলে আসতেও বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার মতলব খারাপ।

বাপী হতভম্ব।—সোনাদি কে?

—আমার বড় মাসির মেয়ে। আর এখন তোমার মতো তেরো বছর বয়েস।

—সে আমার কথা জানল কি করে?

সোনাদির কাছে তোমার সঙ্গে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়ানোর গল্প করেছি না? আমাকে একলা পেলে তুমি কতকমের দুষ্টুমি করো তাও বলেছি। তাই শুনেই তো সোনাদি আমাকে সাবধান করে দিল—আমি কি অত বুঝতাম?

একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ

সেরা মানুষ

দাদাঠাকুর

নির্মলরঞ্জন মিত্র

[সচিত্র/১২·০০]

'.....ইনি বেশ মিষ্ট করিয়া হক্-কথা শুনাইয়া দেন। . বেচারার জাঁক-জমক নাই, সদানন্দ পুরুষ।'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

'..... যে সব মনীষী ও চরিত্রবান ব্যক্তি আমাদের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ-স্বরূপ আসিয়া দেখা দেন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'হে হাসির অবতার! লহগো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।

কাজী নজরুল ইসলাম।

'বাংলাদেশের অর্ঘ্যথালে তিনি যে খাঁটি নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে হয়ত আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু নির্ভেজাল-রসে সরস উপভোগ্য।'

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাদাঠাকুরের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা, সরল জীবন, চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই রচনায়। লেখক দাদাঠাকুরের অপূর্ব ছবিটি জীবন্ত করে তুলেছেন।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বাপীর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। আবার ভয়ও কম নয়।—আর তোর সোনাদি তোর মাকেও বলে দিল?

ঠোঁটে উল্টে মিষ্টি জবাব দিল, হুঁঃ, সোনাদি অত বোকা কিনা। ওদের বাড়ির পাশের এক বজ্জাত ছেলে এক সন্ধ্যায় চুপি-চুপি ছাদে উঠে গিয়ে সোনাদিকেই পিছন থেকে জাপটে ধরেছিল—সোনাদি সেকথাই তার মাকে আজ পর্যন্ত বলেনি—তারপর সেই পাজী ছেলে চুমু খেতে চেয়ে সোনাদিকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছে—সোনাদি তাও মাসিকে বলেনি, বুঝলে?

বাপীর ভয়-ডর উঠে গেল। একথা শোনার পর একটা অজানা ইচ্ছে যেন মুখের দিকে এগিয়ে আসছে, আর হাত দুটো আগের থেকে আরো বেশি নিশপিশ করেছে। বলল, তোর সোনাদির খুব বুদ্ধি তোর যদি সে-রকম বুদ্ধি থাকত।

সঙ্গে সঙ্গে বনমায়ার গল্পে চলে এলো সে। আগের বার বনমায়ার পালানো আর ফিরে আসার গল্প ঢের আগেই মিষ্টিকে বলেছিল। এবারেও বনমায়া কি কাণ্ড করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তার ভালবাসার পুরুষ হাতির সঙ্গে চলে গেছল, একমাস ধরে ফুর্তিটুর্তি করে করে আবার ফিরেছে—ওকে দেখে ভীম বাহাদুর ক্ষেপে গিয়ে কি করেছিল, আর আবু কি বলেছিল—এই সব।

এই গল্প শোনানোর ফাঁকে বাপী তখন ওর একটা হাত নিজের হাতের দখলে নিয়ে নিয়েছে, মিষ্টির খেয়ালও নেই। ও-দিকে মিষ্টিও এবারে সোৎসাহে কলকাতায় টারজানের ছবি দেখে আসার গল্প বলল। জঙ্গলের আর জঙ্গলের রাজা টারজানের গল্প। টারজানের মতো বীর আর কাউকে হতে হয় না—গাছের ঝুরি ধরে অনেক দূরের গাছে দোল খেয়ে চলে যায়, পাহাড় থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে, তার সেই ভীষণ ডাক শুনলে হাতি-বন্দুক আর শিকারীরা চলে আসে, লড়াই করে বাঘ সিংহ কুমির মেরে ফেলে। মনে করতেও গায়ে কাঁটা মিষ্টির।

ভাগ্য বটে মিষ্টিটার! কলকাতায় গিয়ে এমন ছবিও দেখে এলো। শুনেই বাপীর বকত নাচছে, আর টারজান হবার সাধ যাচ্ছে। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে টারজানের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল না?

—ছিল না কি গো! টুকটুকে মেম-সাহেব মেয়ে! তারও পরনে টারজানের মতো এইটুকু চামড়ার মতো কি—আর বুক শুধু একটু ঢাকা—তাতেও কি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বাপীর নিঃশ্বাস বন্ধ। —টারজান সেই মেয়ের গায়ে হাত-টাত দিত না?

মিষ্টির খিলখিল হাসি। দিত না আবার—দুজনে জড়াজড়ি করে গাছের শিকড় ধরে দোল খেত, টারজান মাটিতে শুয়ে থাকলে মেয়েটা তার বুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ত—

আনন্দে বাপী মিষ্টির দু কাঁধ ধরে ঝড়সড় দুটো ঝাঁকুনি দিল। —তবে? তোর সোনাদি জঙ্গলের খেলা কি-চুছু জানে না—বুঝলি? জঙ্গলের সব অন্য রকম।

টারজানের ছবি চোখে লেগে থাকায় মিষ্টি খুব যেন সেটা অস্বীকার করে উঠতে পারল না।

নতুন বছরের শুরু থেকেই বাপীর পড়াশুনা শিকেয় উঠেছিল। সেবারের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ভালো মানুষ হরিবাবুরও মেজাজ গরম। ভালো নম্বর কিছুতে নেই, তারমধ্যে সুপেপারে ফেল। পড়াশুনার জন্য সেই প্রথম ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেছলেন তিনি। এক স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া ঘরের বাইরে পা দিলে আস্ত রাখবেন না বলে শাসিয়েছেন।

কিন্তু বাপী কি করবে? দুবেলাই বইখাতা নিয়ে সময় মতো পড়তে বসে। কিন্তু ওর চোখের সামনে কেবল জঙ্গল আর আবু আর মিষ্টি আর টারজান। পড়ার ফাঁকে তারা কখন যে এসে হাজির হয় বাপী নিজেও জানে না। তাছাড়া পড়তে বসেই দীপুদার ওপর রাগ, আবুর এই ছ'মাসের মধ্যেও চাকরি না হওয়ার জন্য বড় সাহেবের ওপর রাগ। আর সব থেকে বেশি, চাকর-বাকরের মতো ওকে হেলা-ফেলা করার জন্য মিষ্টির মায়ের ওপর রাগের যত সব কাল্পনিক ফয়সলা মাথায় ভিড় করে আসে।

.. এর মধ্যে। চালাকি করে একদিন মিষ্টিকে বাড়িতেও আনা গেছল। তারপর আর একদিন মিষ্টি নিজেই এসেছে। পিসী বড় সাহেব টাহের পছন্দ করে না। কিন্তু বড় সাহেবের এই মেয়েটাকে পিসীরও ভালো লেগেছিল। দুদিনই আদর করে খেতে দিয়েছে। আর বাপীকে বলেছে, সুন্দরই তো মেয়েটা, আর বেশ বাড়ন্ত গড়ন।

পড়তে বসলে এ-সবও বাপীর মনে পড়ে। বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে আরো একটু চটপট বড় হয় না কেন তাও ভাবে।

পরীক্ষার ফল নিয়ে বাবার কাছে বকুনি খাওয়ার দিন-কতকের মধ্যে আবার বিপর্যয়ই নেমে এলো একটা। অথচ এর উল্টো হবার কথা।

মাত্র চারদিন আগে বড় সাহেবের কাছেও আবুর একটু খাতির কদর হয়েছে। আবুটা ডাকাতই বটে। সাঁঝের আঁধারের আগে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল। একা। গাছে একটা বন-বিড়াল দেখে পিছন থেকে একটা বড় পাথর ছুঁড়ে ওটাকে পেড়ে ফেলেছিল। বন-বিড়াল এমনিতেই ভীষণ হিংস্র। পাথরের ঘায়ে ভালো মতো জখম হয়েও মাটিতে পড়ে ওটা তেড়ে এসে আবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবুর লাঠির পেল্লায় ঘায়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আবু লাঠিপেটা করেই ওটাকে শেষ করেছে।

এই বন-বিড়ালটাই একধার থেকে জঙ্গলের ছাগল ভেড়া আর মুরগি মারছিল। এমন দুঃসাহসের জন্য বড় সাহেব সন্দীপ নন্দী পাঁচ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন।

বাপীর আনন্দ ধরে না। বাবা যতই শাসন করুক, ছুটির দিনে ঘরে বসে থাকা ওর কুষ্ঠিতে নেই। চারদিন পরের রোদ্দুরে মিষ্টিকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। আর মনের আনন্দে বেশ দূরেও চলে গেছল। আবুর এতবড় বীরত্বের পর ওদেরও যেন ভয় সাজে না।

গোঁ-ভরে একটা খরগোশের পিছনে ছুটেছিল বাপী। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেছল।

একটু বাদে বিশহাত দূরের শিশু গাছটার দিকে চোখ পড়তে ওর ছোট্ট শরীরটা একেবারে নিস্পন্দ কাঠ যেন। সব রক্ত যেন ঠাণ্ডা জল হয়ে যাচ্ছে।

গাছের মোটা গুঁড়িটা পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে একটা অতিকায় ময়াল সাপ। সমস্ত গায়ে ঝকঝকে কালো-সাদার ছোপ-ছোপ দাগ। তার লম্বা চ্যাপটা মুখটা সামনের দিকে টান হয়ে এগিয়ে আছে। চোখ দুটো মিষ্টির চোখের সঙ্গে আটকে আছে। একটা সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাস যেন ওর গায়ে এসে লাগছে।

মিষ্টির নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। সর্ব অঙ্গ অবশ। গলা দিয়ে একটু শব্দও বার করতে পারছে না।

ওকে দুচোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে।

তারই মধ্যে ফিরে এসে বাপী এই দৃশ্য দেখে ভেবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রথম। তার পরেই মাথার মধ্যে কি যে খেলে গেল ও-ই জানে। বিদ্যুতবেগে ছুটে এসে মিষ্টিকে এক ধাক্কা। সেই ধাক্কায় ওর পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে বাপী ওকে টেনে তুলল। —ওঠ্! ছোট্! নইলে আস্ত গিলে ফেলবে!

পাগলের মতোই ছুটেছে দুজনে। বাংলোয় এসেও মিষ্টির সমস্ত মুখ নীল-বর্ণ। থরো-থরো কাঁপুনি। বাপীর সেই ধাক্কার ফলে হাত-পা কেটে ছড়ে বক্তাক্ত। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে বাইরের লোক পর্যন্ত ছুটে এসেছে। বড় সাহেব বাংলোতেই ছিলেন।

কি হয়েছে না হয়েছে তাঁর জেরায় পড়ে বাপীকে সবই বলতে হয়েছে। কোথায় কত দূরে ঘটেছে এ-ব্যাপার—তাও। আর মায়ের ধমকে সব ছুটির দিনের জঙ্গলে বেড়ানোটাও মিষ্টি ফাঁস করে দিয়েছে।

তারপর বাপীরও তার বুদ্ধি আর বীরত্বের পুরস্কার মিলেছে।

বড় সাহেবের থমথমে মুখ। তিনি কিছু বলেননি। মেম সাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর একটা কান ছিঁড়েই নিতে চেয়েছে। তারপর গালাগাল করতে করতে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর বাবার সপাসপ গোটাকতক চটির ঘা।

জীবনের সব সাধ আহ্লাদই বুঝি শেষ বাপীর। নিঝুম রাত। পিসীর দুহাত তফাতে সরে শুয়ে আছে। ঘুমোতেই চাইছে। ভাবছে, রাতের ঘুম সকালের মধ্যে আর একেবারে না ভাঙলে কি হয়?

(চলবে)

বিকেলবেলায় শীলভদ্র বড়ো রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ট্রামলাইন পেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। চা খেতে খেতে সে ভাবে এমন সুন্দর বিকেলে আমি কার কাছে যাই। সে বড়ো একা। তার বান্ধবীরা আজ দূরতর, বন্ধুরা ছিন্ন বিছিন্ন। আপনজনেরা সম্পর্কহীন, কেউ বা মৃত। লিখতে লিখতে অন্যমনস্কভাবে সে নিজের যৌবনের কাছ থেকে সরে এসেছে। চল্লিশ পেরিয়ে ইদানিং একচল্লিশে। চা খেতে খেতে শীলভদ্র এও ভাবল যে সে যোগ্য লেখক হতে পারেনি। একটা নিঃসঙ্গ এবং ব্যর্থ মানুষ ছাড়া এখন সে নিজেকে অন্য কিছু বলে ভাবতেও পারছে না।

পাঠকবর্গ তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না। তাই শীলভদ্র অন্তরে অন্তরে বিষণ্ণ, ক্রমশ অলস এবং নিরাশ। কম লেখা তাকে পেয়ে বসছে।

একটা ডায়ারিতে সে টুকরো কতক গুলি ঘটনা টুকে রাখে। লেখার সময় তা খুবই কাজে দেয়। এবং বহুকাল ধরে সে মনে মনে সেই উপন্যাসটি লেখার কথা পোষণ করে আসছে যা তাকে এক ধাক্কায় অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে। দশ-বারো বছর আগে তার লেখার ত্রুটিগুলো অংশু আবিষ্কার করেছিল। তার লেখায় বৈচিত্র্যের অভাব, শব্দ ব্যবহারে কুশলী প্রবণতা, আরোপিত ইমেজ তাকে সত্য থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। অংশু তাকে সতর্ক করে বলেছে, 'শীলু, তুই যদি না পাল্টাস তবে মরবি।'

অংশুর কথা যে ভয়ানক সত্যি তা শীলভদ্র আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে বদলায়নি, পাল্টায়নি, একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে সে বন্দী। আর সে সত্যিই মরতে চলেছে।

বহুকাল অংশুর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। এককালে কেষ্ট কাফের পাথরের টেবিলে মুখোমুখি বসে কতো আড্ডা। মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে অংশুর অন্ধকার ঘরে বসে আড্ডা। হাতকাটা নন্দ সেই মেসেরই দারোয়ান। দশ বছর আগে শীলভদ্র মোটেই ছেলেমানুষ ছিল না। তখন মা বেঁচে। আসানসোলে বড়দার কাছে থাকে। সারা জীবনটা শীলভদ্রর বাইরে বাইরেই কেটে গেল। স্কুল কলেজ সবই হস্টেলে থেকে। দশ বছর আগে সে তখন একটা স্কুলে পড়ায়, থাকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে। তারপর মা মারা গেলেন। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে শীলভদ্র একেবারে একা হয়ে পড়লো। তার রাগ দুঃখ অভিমান সুখ সমস্তই সে ব্যক্ত করে লেখায়। জীবনের উত্থান-পতন অভিজ্ঞতা এবং রহস্যগুলি লেখার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত সে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এরই ভেতর সে টের পেয়েছে তার ব্যর্থতার উৎসটি কোথায়। অংশুর নিরপেক্ষ চোখ যা সহজে সনাক্ত করে বন্ধুকে সাবধান করে দিতে একদিন প্রচেষ্ট হয়েছিল। এখন চা খেতে খেতে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে শীলভদ্র হঠাৎই যেন মুখ ফসকে বলে ওঠে— কনকদি, আমি মিথ্যে হয়ে গেছি। কথাটা বলামাত্র সে নিজে চমকে ওঠে। এই বিকেলে আমি কার কাছে যাই এমন ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর এতো সহজে জুটে যেতে শীলভদ্র চায়ের দাম চুকিয়ে রাস্তায় নেমে ফাঁকা ট্যাক্সিকে চিৎকার করে ডাকে। ল্যান্সডাউন রোড ধরে ট্যাক্সি নর্থের দিকে ছুটতে থাকে।

অনেকদিন আগে কনকদি তাকে বলেছিল, 'তুই একদিন খুব বড়ো হবি।' সেদিন পাশে ছিল অংশু। কনকদির কথা শুনে সে বলেছিল, 'মন দিয়ে লিখেটিখে হয়তো একদিন তুই সত্যি বড়ো হয়ে উঠবি।' শীলভদ্র তখন চুপ করে ছিলো। কনকদি আবার বলেছিল, 'কি যে লিখিস ছাই, একদম বুঝি না। হ্যাঁরে আজকালকার লেখা বুঝি এমন?' তখন শীলভদ্র কথা বলেছিল, 'তবে যে বলছো আমি বড়ো হবো।' কনকদি কথা ফিরিয়ে নেয়নি, 'তুই একদিন বড়ো হবি।' এ-কথাটা আবার বলেছিল।

সে তো প্রায় এক যুগ আগের কথা। তখন শীলভদ্র চুটিয়ে লিখছে। ভালো মন্দ বিচারের সময় নেই। সেই সময়ই সে অংশুর কুঞ্জকাকার বাড়িতে যায়। পাকপাড়ার নিত্যগোপাল চ্যাটার্জি লেনে কুঞ্জকাকার বাড়ি। কুঞ্জকাকার বড়ো মেয়ে কনকদি। শীলভদ্রের চেয়ে বয়সে সুন্দর বড়ো, বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটুখানি মুচকি হয়ে

হাসি, শান্ত এক মহিলা। কুঞ্জকাকার দ্বিতীয় সন্তান রাজেন ফুড কর্পোরেশনের ক্লার্ক এবং ওদের ছোটোবোন কাঞ্চন তখন স্কুলে পড়ে। কুঞ্জকাকা শেয়ার মার্কেটে দালালি করতেন। সেই সময় অনেক লেখায় শীলভদ্র কনকদিকে ধরতে চেষ্টা করেও পারে নি। তখন তার মনে হতো কাগজে কলমে শব্দের পাশে শব্দ এনে কনকদিকে ধরা মুশকিল।

এতোদিন বাদে শীলভদ্র ট্যাক্সি নিয়ে ছুটছে কনকদির কাছে। তার সমূহ যোগ্যতা আজ বিপর্যস্ত। সে না পারল লিখতে না করল সংসার, সে ফাঁকা আর শূন্য হয়ে গেছে। ট্রাফিক সিগন্যালে ট্যাক্সি থাকে। জানলার কাছ দিয়ে তার দৃষ্টি ক্ষমতা মতন প্রসারিত হয়। বাঁ দিকে পরিত্যক্ত কবরখানার মাথায় দেবদারুর ডালে বসে আছে কয়েকটা কাক। এখনি সন্ধে এসে যাবে। শীলভদ্র গা এলিয়ে দেয়। একটা সিগারেট ধরায়। তার মনে হয় সমস্ত কিছুকে নস্যাৎ করে সে কি ভীষণ একা হয়ে বেঁচে আছে। কনকদি প্রায়শই বলতো, 'আমার দুঃখু কিসের। আমার তিনি আছেন।' তিনিটি কে তা অংশু জানতো, শীলভদ্র জানতো। তাঁর কথা বলতে বলতে কনকদির সারা মুখে আনন্দ ও শান্তি আলো হয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে এ দেখা গেছে। শীলভদ্র অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখেছে, ধর্মমন্দির দেখেছে, বই পড়েছেও বিস্তর কিন্তু কই কনকদির মতন অমন আত্মপ্রত্যয় আর তৃপ্তি অর্জন করলো না তো? গরমকালে ছাদে বসে কনকদি দুবন্ধুকে মীরার ভজন শোনাতো। কনকদির বন্ধ চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তো। গান শেষ করে ভিজে চোখ গাল শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে কনকদি বলতো, 'কেমন লাগল রে।'

সন্ধের পর নিত্যগোপাল চ্যাটার্জি লেনে শীলভদ্রকে বাড়ি খুঁজতে দেখা যায়। এতো তোড়জোড় এতো আশা ছোটাছুটিই সার। সে বাড়ি ছেড়ে কনকদিরা বহুকাল আগেই উঠে গেছে।

রাত্তির বেলায় অন্ধকার ঘরে শীলভদ্র শুয়ে থাকে। তার চোখে ঘুম নেই। টেবিলে ইঁদুর ঘুরছে। এই কাগজপত্র কি কেটে দেবে? লেখার ফাইল ডায়েরি যদি ইঁদুরের দল কেটে কুচি কুচি করে দেয় তবে কি শীলভদ্র হারিয়ে যাবে? বিছানার এ পাশে ও পাশে কোথাও শুয়েও চোখে ঘুম আসে না।

কনকদি বলল, 'তোমরা চোখ বন্ধ করে হাঁ করো।' দুবন্ধুর মুখে পড়ল বাতাসা ও ভাঙা পাঁড়া। তারপর ওরা চোখ খোলে। অংশু ডাকে 'কাঞ্চন। কাঞ্চন।' কাঞ্চনের সাড়া নেই। কনকদি বললো 'কি ব্যাপার?' শীলভদ্র অংশুর হয়ে বলে 'আমরা চা খাবো।' ততোক্ষণে কাঞ্চন চা নিয়ে হাজির রাজেন এক প্যাকেট তাস নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। অংশুর কাছে এসে বলল, 'অংশুদা তাস খেলবেন?' অংশু বললো 'বেশ তো তাই খেলা যাক।'

কাঞ্চন রান্নাঘরে। কুঞ্জকাকা ভেতরের ঘরে চৌকিতে শুয়ে হাতপাখা নাড়ছেন। পুজোটুজোর পর কনকদিকে বেশ লাগে। ঠাকুরঘর থেকে এসেই কনকদির এই টুরেন্টি নাইন খেলা শীলভদ্রর মোটেই পছন্দ নয়। কনকদি হাতে তাস নিয়ে ডাকে 'আঠারো', অংশু সাড়া দেয় 'আছি।' শীলভদ্র পাশ দিয়ে বসে আছে। রাজেনের ডাক এখনো আসে নি। এই ভাবে খেলা চলতে থাকে। একঘেয়ে লাগলে শীলভদ্র হাতের তাস ফেলে দেয়। 'কি হলো' কনকদি অবাক। শীলভদ্র সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'ধ্যাৎ। ভাল্লাগে না।' রাজেন খুব আশা নিয়ে খেলতে বসেছিল। শীলভদ্র এইভাবে মাঝপথে খেলা ভেস্তে দিলে সে তো ক্ষুণ্ণ হবেই। অংশু বলল, 'তবে আজ থাক রাজেন।'

অন্ধকার ছাদে এসে দাঁড়ায় দুই বন্ধু। রাজেন পাড়ার আড্ডায় চলে গেছে। কাঞ্চন পড়তে বসেছে। রান্নাঘরে কনকদি। অন্ধকার ছাদে কাঠের বাকসে রাজেনের পায়রাগুলো বকবকম্ করে ওঠে। একটা নয়, দুটো নয় একুশটা পায়রা। শাদা, কালো, খয়েরি, পাটকিলে পায়রারা রাজেনের হাতে দানা খায়। অফিস থেকে ফিরে রাজেন ওদের ওড়ায়। বিকেলের আকাশে ওরা ডিগবাজি খায়, চক্কর দিয়ে ওড়ে।

শীলভদ্র সন্ধেবেলায় গিয়ে দেখেছে কনকদি ঠাকুরঘরে। কাঞ্চন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। এই দুই মা-মরা মেয়ের দিকে তাকিয়ে দুর্ভাগা শীলভদ্রর মনেও কষ্ট হতো। তবে অনেক-অনেক বেশি কষ্ট হতো কুঞ্জকাকার দিকে চাইলে। সন্ধেবেলায় বালতিতে বালতিতে জল ভরা ছাড়া ভদ্রলোকের করণীয় বলতে কি আর কিছুই ছিল না?

আর দ্বিতীয় অভিযানের জন্যে শীলভদ্রকে প্রস্তুত হতে হয়। মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস বাড়ি। দরজায় টুল পেতে বসে আছে হাতকাটা নন্দ। চুল পেকে দাঁত পড়ে চামড়া কুঁচকে সে একেবারে বুড়ো। বহুকাল আগেই এই মেস ছেড়েছে অংশু। নন্দ চিনতে পারে। ফোকলা মুখে ছড়িয়ে পড়ে খুশির হাসি এবং 'আরে বাবু যে' বলে সে আহ্লাদে এগিয়ে আসে। অংশুর ঠিকানা পাওয়া যায়। দিন দশেকের মধ্যেই শীলভদ্র অংশুর চিঠি পায়। সে চিঠিতে অংশু লেখে—

শীলু,

আমি বেঁচে আছি। তোর চিঠি পেয়ে জানলুম তুইও বেঁচে আছিস। অবিশ্যি এখানে ওখানে তোর লেখা-টেখা কখনো যে চোখে পড়েনি এমন নয়। কটকে আছি চাকরি সূত্রে। একবার আমার কাছে আয়। তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। এলে প্রাণখুলে গল্প করা যাবে। আমার কাছে এখন কনকদি আছে। দিন সাত আট থাকবে। এর মধ্যেই চলে আয়। ভালোবাসা জানবি।

কাঠজুড়ি নদীর ধারে বালির চর। কনকদি অংশু আর শীলভদ্র সেই চরে পাশাপাশি বসে আছে। অনেকটা ধু ধু বালি। তারপরে জল। আশেপাশে গাছ-পালার চিহ্ন নেই। কনকদির এই বয়সেই অনেকগুলো দাঁত পড়েছে, কতকগুলো তুলতে হয়েছে। ফলে বাঁধানো দাঁতে কনকদির মুখের চেহারা বেশ পাল্টে গেছে। কনকদির সেই ভারি চেহারা নেই, রোগা হয়ে গেছে। অংশু কিন্তু অনেকটা একই রকম আছে। বিকেল আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। নদীটা ফাঁকা। নৌকো নেই, ডিঙি নেই। গেরুয়া জল স্থির। ওরা তিনজন সেই জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

শীলভদ্র বলল, 'তোমার প্রেডিকশন্ মেলে নি কনকদি। আমি বড়ো হইনি।' অংশু বলল, 'কেন আগডুম বাগডুম লিখে শুনি যে তোর একটু আধটু নাম হয়েছে।'

শীলভদ্র বলল, 'দু....র, তাকে কি বড়ো হওয়া বলে? আচ্ছা কনকদি, তোমার তাঁর কি খবর?'

অংশু মুখিয়ে ওঠে, 'তুই না রাইটার। মানুষের বিশ্বাস নিয়ে এমন ঠাট্টা তোর মুখে কি মানায়? অংশুকে থামিয়ে কনকদি বলল, 'তিনিই তো আমার সব রে শীলু।' অংশু জ্বলে ওঠে, 'সারাটা জীবন তো তিনি তিনি করে গেলে? দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কিছু পেয়েছো কি?'

কনকদি নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজেন এখনো পায়রা পোষে তাতে সে কি পায়?'

শীলভদ্রর হাসি পায়। রাজেনের বিয়ে হয়ে গেছে। কুঞ্জকাকা মারা গেছেন। হরিতকি বাগান লেনের ভাড়া বাড়ির ছাদে সেই সংসারী মানুষটা এখনো পায়রা পোষে। ভাইয়ের সংসারের দায় দায়িত্ব সবই যেন কনকদির একার। কচিৎ কখনো শ্বশুর-বাড়ি থেকে কাঞ্চন আসে। এখানে এসে এসব কথা কনকদির মুখেই শোনা। কাজি-বাজারের এক মঠে কনকদির গুরুদেব এসেছেন। সেই জন্যেই কনকদির কটকে আসা। ভকতের দলের সঙ্গে এসে উঠেছিল ধর্মশালায়। হঠাৎ একদিন রাস্তার অংশুর সঙ্গে দেখা। কটক চণ্ডীর মন্দির থেকে পুজো দিয়ে ফেরবার পথেই রাস্তায় চলন্ত সাইকেলে অংশুকে দেখতে পেয়ে কনকদি ডেকেছিল 'অংশু'। তারপর ধর্মশালা থেকে কতো কষ্টে কনকদিকে অংশু এনেছে নিজের কোয়ার্টারে।

এরপর কিছু বলতে পারে না ওরা। শীলভদ্র জলের দিকে তাকিয়ে ভাবে আমার ঈশ্বর নেই কিংবা রাজেনের মতন কোনো পাখিকেও ভালোবাসতে শিখিনি। আমি একা। দূরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। নদীর ঘাটে মন্দির। পাথরের মহাবীর হনুমান লাল টকটকে সিঁদুর মেখে থাকে। শিব-মন্দিরে পা মুড়ে বসে আছে পাথরের ষাঁড়। দর্শনার্থীরা ঝুলন্ত ঘণ্টা দুলিয়ে দিলে সেই ঘণ্টা গম্ভীর ভাবে বাজতে থাকে। কনকদি বললো, 'হ্যাঁরে শীলু, তোর বুঝি এখন লিখে টিখে খুব নাম।'

শীলভদ্র লজ্জা পায়। চুপ করে থাকে। নামটামের ব্যাপার তো দূরের। সে এখনো পর্যন্ত তো কিছুই লিখে উঠতে পারেনি। অংশু ওদের রেখে সিগারেট কিনতে চলে যায়।

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

সে যাইহোক, বীর সিংহের কথা বলি। ইনি মহাপরাক্রমশালী আর প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজার জলকষ্ট দূর করা আর দেশ-রক্ষার দিকটা শক্ত করার জন্যেই এঁর এই বাঁধ তৈরীর দিকে মন গিয়েছিল। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত কন্ট্রাডিকশন দেখা যায়। ধর্মের দিক দিয়ে ইনি পরম বৈষ্ণব। কিন্তু বৈষ্ণব বললে আমাদের কি মনে হয়? শান্ত ধীরস্থির গলায় তুলসীর মালা, এমনি একটা চেহারা, তাই না? কিন্তু বীর সিংহের যা বর্ণনা পাই তা এর বিপরীত। ধর্মপ্রাণ ছিলেন তিনি এটা সত্যি কারণ অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও শংকর কবিচন্দ্রের লেখায় পাচ্ছি,

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদামতি ইষ্টের চরণে—

এই ধার্মিক, তেজী আর একাধারে সাহিত্য, কলাশিল্পরসিক নরপতির নিষ্ঠুরতার কাহিনীও আবার অক্ষয় হয়ে আছে।

—আশ্চর্য তো—

—হ্যাঁ আশ্চর্যই, বললাম আমি, আন্দাজ তিনশো বছর আগেকার কথা শোন তবে। বীরসিংহ রাজা হয়ে প্রজার সুখ-শান্তির জন্যে অনেক করলেন। বাঁধ হল, দুর্গ হল, তোরণ হল, কিন্তু এই সব করতে গিয়ে সাধারণ প্রজার ওপর অত্যাচারও কম হল না। ভারি খেয়ালী রাজা তিনি, তাই যখন যা মনে হত, তাই করতেন। তার জন্যে কার প্রাণ গেল, কার ভিটেমাটি গেল তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না তিনি। দেশের লোকও তাঁকে এত ভয় করত যে সাহস করে কেউ এর প্রতিবাদও করত না। ফলে অশেষ কষ্ট ভোগ করত তারা। এই সব দেখেশুনে একদিন রাজার ভাই মাধব সিংহ রাণী চূড়ামণির কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন, দেবী, প্রজারা সন্তান-তুল্য, এভাবে তাদের ওপর অত্যাচার আর কতদিন সহ্য করা যায়?

রাজকুমাররা সমর্থন করলেন তাঁকে বললেন, সত্যি মহারাজ এমন খেয়ালখুশি মত চললে প্রজাদের যে সর্বনাশ হবে।

রাণী চূড়ামণি বললেন, বৎস-গণ, তোমরা কি মহারাজকে চেন না? এমন করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এন না, এর ফল ভয়ংকর হবে।

কিন্তু মাধব সিংহ তবুও স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন দ্বিপ্রহরে রাজার বিশ্রামাগারে এলেন তিনি। শুভ্র অনাড়ম্বর তাঁর বেশ। হাতের রুপার থালায় একরাশ বেলফুল। থালাটি জ্যেষ্ঠের পায়ের কাছে রেখে আসন নিলেন তিনি।

বীর সিংহ তখন বিশ্রাম করছিলেন। পরিতৃপ্ত আহারের পর শয্যা নিয়েছিলেন গজদন্তের কারুকার্য করা পালঙ্কে। কিংকরীরা কেউ পদসেবা করছে, কেউ বা অপেক্ষা করছে রাজার আদেশের, কখন কি প্রয়োজন হয় মহারাজের। মাধবকে দেখে সজাগ হলেন বীর সিংহ। বললেন, কি সংবাদ মাধব? তোমাকে যেন বিমর্ষ দেখছি।

মাধব বললেন, মহারাজ, প্রজার দুঃখেই আমি বিমর্ষ।

—বটে—বীর সিংহ উঠে বসলেন শয্যায়। বললেন, আমার রাজ্যে প্রজারা কি খুবই দুঃখে রয়েছে মাধব? তোমার কি তাই বক্তব্য?

—সবাই নয়, মাধব বললেন, তবে অনেকের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, তাদের কান্না আমাকে বিচলিত করে তুলেছে মহারাজ।

—তাই বুঝি, বীর সিংহ কপট চিন্তার ভানে বললেন, তাই তারা তোমার কাছে অভিযোগ করেছে—পাষাণ্ডের বিরুদ্ধে মহাত্মার কাছে, কেমন? কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেন বীরসিংহ

সে দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন না মাধব, আত্মগতভাবে বললেন, বিদ্রূপ করবেন না মহারাজ, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না—শুধু আমি কেন, আপনার পুত্রেরাও—সম্বিত ফিরতে থেমে গেলেন মাধব সিংহ।

—বাঃ, শান্তিত গলায় বললেন বীর সিংহ, পুত্রেরাও তাহলে কষ্ট পাচ্ছে তোমারই মত, আমার অন্যায় অত্যাচারে—ভালো ভালো, প্রতিকার নিশ্চয় হবে, কথা দিচ্ছি, প্রজার কান্না যাতে তোমাদের বিব্রত বিষণ্ণ না করে তার ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। মুখ ফিরিয়ে নিলেন বীর সিংহ। সামনের দেওয়ালে বিরাট আয়না এক বিদেশী বণিকের দেওয়া উপহার, সেই আয়নায় ছায়া পড়ল।

শিউরে উঠলেন রাণী চূড়ামণি, বিষ্ণুপুর রাজের পট্টমহিষী। সুখ আরাম বিলাসের জীবনে গা ভাসিয়ে তিনি থাকতে পারতেন কিন্তু তা থাকেননি। রাজ অন্তঃপুরিকাদের মত অবসর সময়ে গোলাকৃতি দশ অবতার তাস খেলায় অথবা নানা উপচারে অঙ্গসজ্জায় কাটাতেন না তিনি। তিনি ছিলেন বিদুষী আর প্রখর বুদ্ধি-শালিনী। তাঁর অবসর কাটত সংস্কৃত কাব্য পাঠে আর বীণাবাদনে।

আজ দর্পণে রাজার কুটিল মুখের ছায়া দেখে মুহূর্তে আশঙ্কায় ভরে গেল তাঁর মন। কি করে রক্ষা করবেন নিজের সন্তানদের সে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন রানী।

সেইদিন গভীর রাতে বিশ্বস্ত সেবক হরিহর নিঃশব্দ পায়ে রাজপ্রাসাদের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল, সঙ্গে রাজকুমার দুর্জন সিংহ। ওই একটিকেই রক্ষা করতে পেরে-ছিলেন রানী চূড়ামণি।

আর বাকীরা? মাধব সিংহ?

তাঁদের ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন সকালে প্রহরীদের হাতে বন্দী অবস্থায় দুর্গ প্রাচীরের কাছে এলেন তাঁরা। প্রাচীর গড়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দুশো মজুর আর ষোলজন দক্ষ কারিগর ব্যস্ত কাজ নিয়ে। কোথায় খিলান হবে, কোথায় বাঁক পড়বে সব তদারক করছিল ওদের প্রধান চক্রধর। রাজা ডাকলেন তাকে। বললেন, প্রাচীরের কাজ কতটা বাকী চক্রধর?

আমার গল্পের মাঝে আলো নিভে গেল।

—লোডশেডিং চলছে এখানেও, ঝুমুর বলল।

বাইরে যতদূরে দেখা যায় ঘন অন্ধকার। টুরিস্টলজের অন্ধকার ঘরে আমরা দুজন। গল্প আবার শুরু হল।

বীরসিংহের প্রশ্নে চক্রধর হাত জোড় করে বলল, মহারাজ, উত্তরের প্রাচীরের মাত্র আর পঁচিশ হাত বাকী আছে। সেটুকু আজই শেষ হয়ে যাবে।

—উত্তম, রাজা বললেন, ওই প্রাচীরের খাঁজে খাঁজে তিনহাত করে জায়গা শূন্য রেখো।

—মহারাজ? নির্বোধ চোখে চাইল চক্রধর।

—হ্যাঁ, প্রজাদের কান্নায় কর্ণপীড়া উপস্থিত হয়েছে কুমারদের। প্রাকারের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে আশাকরি আর কোন শব্দ পৌঁছবে না তাদের কানে, কি বল? আর্তনাদ করে উঠল চক্রধর।

[illegible] আর্তনাদ করে উঠল রক্ষীরাও, আবার রাজার অমোঘ আদেশে তারাই ঠেলে দিল কুমারদের ওই মৃত্যুর গহ্বরে। তারপর গাঁথা হল প্রাচীর। স্তব্ধ হল মৃত্যুর আর্তনাদ।

অন্দরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন মহারানী, আর আকাশের দিকে চেয়ে রক্ত-চক্ষু বীরসিংহ ইষ্টমন্ত্র জপ করে চললেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—প্রধান কারিকর চক্রধর আত্মহত্যা করেছিল সেইদিনই।

—মানুষ না পিশাচ—অন্ধকারের মধ্যে ঝুমুর বলল।

বললাম, ঠিক করে বলা শক্ত, আবার কিংবদন্তী এক বলে যে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে মেরে ফেলে সেই অনুশোচনায় বীর সিংহ নিজে আত্মহত্যা করেছিলেন।

—তবু তো একটা ছেলে বেঁচে গেল।

—হ্যাঁ, তাই এ বংশ রক্ষা পেল তা না হলে তোর এত সাধের লালবাইকেও পেতিস না।

ঝুমুর বলল, তারপর কি হল বল।

—তারপর রাজা হলেন দুর্জন সিংহ। অনেক নিষ্ঠুরতা বীভৎসতা দেখেছিলেন বলেই বোধহয় ইনি শান্তিকামী ছিলেন। প্রজাদেরও ভালোবাসতেন। এই দুর্জন

সিংহের ছেলে হলেন তোদের গল্পের নায়ক রঘুনাথ সিংহ।

ঝুমুর নড়েচড়ে বসল। বলল, তারপর ?

আমি বললাম, খাওয়া-দাওয়ার পর বলব সেকথা। আমাদের কথার মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। ঘড়িতে তখন আটটা পঞ্চাশ। দেখেই তিড়বিড় করে উঠল ঝুমুর।

—উঃ সত্যি কি খিদে পেয়েছে ফুলমাসি, এরা কি খেতে-টেতে দেবে না। আমার যে খিদেয় কাহিল অবস্থা।

হেসে বললাম, তুমি যে এখানে এসে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছ মা, ডাকো না কারুকে বেল টিপে।

বেয়ারা আসিতেই তেড়ে উঠল ঝুমুর, কি হল, খেতে দেবে না নাকি তোমরা ?

অল্পবয়েসী ছেলেটি বলল, দিদি খাবার তো তৈরী। আপনাদের ডাকিনি আলোর জন্যে। নটা পর্যন্ত এখানে আলো যাওয়া আসা করে তাই—আসুন আপনারা ডাইনিং রুমে।

ঘরে তালা দিয়ে ডাইনিং রুমে চলে এলাম। বেশ বড় লম্বাটে ঘরখানা, ওপাশে কিচেন। দরজা জানলায় ডোরাকাটা লাল পর্দা, বেশ ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন টেবিল চেয়ার। আমরা দরজার কাছে একটা টেবিল নিলাম। ওদিকে আমাদের পাশের দিকে বসেছে একটি জোড়া। দেখে মনে হল ইটালীয়ান। ছেলেটির চেহারায় খুব একটা বিশেষত্ব নেই, শুধু কুচকুচে কালো চুলটা। নজরে পড়ে। তবে মেয়েটি কিন্তু চোখে পড়ার মত। উজ্জ্বল বাদামী গায়ের রং চুলেও সোনালীর সঙ্গে বাদামী মিশ খেয়েছে, চোখ দুটি এ্যাম্বারের মত। গায়ে একটা লাল সবুজে ছাপা কাপড়ের হলটার, গলায় সবুজ পাথরের মালা, চুলগুলো চূড়ো করে বাঁধা একটা টুকটুকে লাল শিফনের স্কার্ফ দিয়ে।

—মেয়েটা ভারি সুন্দর, না ফুলমাসি ? ঝুমুর খেতে খেতে বলল।

আমি হাসলাম। ওই আগুনে রং চোখ ? আমার বাপু কালো চোখ না হলে মোটে ভালো লাগে না।

—তুমি বড্ড সেকেলে বাপু, ঝুমুর বলল।

দুটো চিকেন মিল অর্ডার দিয়েছিলাম। বেশ ভালোই দিয়েছে দেখলাম। ডাল, পাঁপড়, আলুর তরকারী আর মুরগীর ঝোল।

আমাদের খাওয়া অর্ধেক হতে এলেন একজন মোটা-সোটা ভদ্রলোক, দেখে মনে হল বেশ পান করে এসেছেন। ওঁর খাবার এল ফ্রায়েড রাইস, আস্ত মুরগীর রোস্ট আর স্যালাড। গোগ্রাসে খাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। আমরা উঠছি যখন তখন আর একটি বোল নিয়ে এল বেয়ারা। ঝুমুর আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, নিশ্চয় আইসক্রীম ফুলমাসি—বাব্বা—

আমি বললাম, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি ?

রক্ষে কর, ঝুমুর চোখ বড় বড় করে বলল, ওই দেহখানির ওজন কম করে হান্ড্রেড এ্যান্ড টুয়েন্টি কিলো তো হবেই। অমন খেলে—পরমুহূর্তে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল, একটু হুইস্কি খেয়ে দেখবে ফুলমাসি ? কেউ তো টের পাবে না এখানে, খাবে ?

—খুব গুল হয়েছে দেখছি, চোখ পাকালাম, দাঁড়া তোর বাবাকে বলছি ফিরে গিয়ে।

—বাবা বিশ্বাসই করবে না, ঠোঁট ওলটাল ঝুমুর, বাবা জানে আমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে—জানো ফুলমাসি, আমার বন্ধুরা কিন্তু অনেকে খেয়েছে।

—বাঃ চমৎকার বন্ধু সব তোর।

ঝুমুর বলল, ঠক বাছতে গাঁ উজাড় —সেই যে মা বলে না, তাই হবে বুঝলে ফুলমাসি। পনেরো কুড়ি বছরে দেশটা কতখানি এগিয়ে গেছে তোমরা তা টেরই পেলে না। আমার বন্ধুরা তাদের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কতদিন বারএ গিয়ে খেয়ে আসে—

—পয়সা পায় কোথায় অত ? আমি প্রশ্ন করলাম।

—কেন বড়লোকের ছেলে হলে তো ভাবনাই নেই, তাদের সঙ্গে ভিড়লে নিশ্চিন্ত, আর না হলে ? মেয়েরাই বাড়ী থেকে হাতিয়ে আনে, বইটই বিক্রি করে।

ওকে আর ঘাঁটাতে সাহস হল না। দিব্যি অবলীলায় বলে যাচ্ছে—বললাম, বাজে বকিস না, চল ঘুম পাচ্ছে।

ঝুমুর বলল, তুমি ভয় পেয়েছ ফুলমাসি, ভাবছ—আর কি না জানি বলে বসে মেয়েটা।

ওর হাসিমুখের দিকে চেয়ে বললাম, শুধু তো পরের কথাই বলছিস, নিজের কথা বল কিছু।

আমার কেমন আবছা ধারণা যে ঝুমুরের বিয়ে নিয়ে ওদের বাড়ীতে কিছু একটা অশান্তি চলছে। শুধু কেমন কৌতূহল হল, তাই বললাম, তোর বয়ফ্রেন্ডের কথা তো বললি না—

—তোমার কানে আবার এসব কথা কে তুলল ? ঝুমুর রুষ্ট গলায় বলল, নিশ্চয় মা।

আমি আর জবাব দিলাম না। কৌতূহল ততক্ষণে সম্বরণ করেছি।

বিছানায় শোওয়ার অনেকক্ষণ বাদে ঝুমুরের গলা শুনলাম। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ও বলল, তোমাকেই বলব ফুলমাসি, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না—

তারপর চুপ করল ও। অন্ধকারে নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আইবে ভোরকী চিড়িয়া—

ভোরের নরম আলোর মত সুরটাও যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। ঝুমুরের গলাটি জোরাবাঁদার। কড়ি মধ্যম থেকে পঞ্চম বিবর্তকে পেরিয়ে অতি সুন্দরভাবে ও ছুঁয়ে আসছিল কোমল নিষাদকে। কেমন একটা। আলস্য জড়ানো বৈরাগ্যের ভাব যেন ধরা দিচ্ছিল ওর গলায়।

ও থামতে চোখ খুললাম। বললাম, বিষ্ণুপুরের রামকেলীতে কিন্তু কড়ি মধ্যম লাগে না।

—ও মা, তুমি জেগে গেছ, ঝুমুর যেন হঠাৎ একটা ঘোর কাটিয়ে উঠল, কি বললে, কড়ি মধ্যম লাগে না? শুনিনি তো কখনও।

বললাম, বইএ প্রাচীন ধ্রুপদগুলো দেখিস—অবশ্য বিষ্ণুপুরী মত যাঁরা মানেন তাঁদের সঙ্কলনে। তবে ও রীতি আজকাল অপ্রচলিত হয়েছে তাই তুই শুনিস নি। আসলে বিষ্ণুপুর ঘরাণার গায়কদের রাগ সম্বন্ধে কতকগুলো নিজস্ব কনসেপশন ছিল যা হিন্দুস্থানী মতের সঙ্গে মেলে না। থাকগে—চা বলেছিস?

গরম চা খেয়ে শরীরের জড়তা কাটল। অল্প ঠাণ্ডা পড়েছে তার ওপর নতুন জায়গা বলেই বোধ হয় মাথাটা ভার ভার লাগছিল। ঝুমুরকে বললাম, ব্রেকফাস্ট খেয়ে কিন্তু বেরোবো।

—কোথায় যাব প্রথমে?

—আগে মন্দির-টন্দিরগুলো দেখে নিই, তারপর শহর লোকজন সব দেখা যাবে।

—আমার কিন্তু ওই সব পুরোনো ভাঙাচোরা জিনিস দেখতে মোটে ভালো লাগে না, ঝুমুর বিদ্রূপের চেষ্টা করল, কি হবে ওই সব মরা জিনিস দেখে ?

—ও মা, আমি অবাক হলাম, বিষ্ণুপুরে এসে মন্দির দেখবি না কিরে, তবে কি দেখতে এসেছিস?

—যাবে, ঝুমুর বলল, আমি তো এসেছি লালবাইএর দেশ দেখতে, গানের খোঁজ নিতে।

কিচেনের ছেলেটি এসেছিল দুপুরের খাবারের অর্ডার নিতে। আমাদের কথার মাঝখানে বলল, গানের এখন আর কিছু নেই দিদি, আগে এই টুরিস্ট লজেই কত গানের আসর বসত, বড় বড় গাইয়েরা আসতেন।

—এখন ? ঝুমুর জানতে চাইল।

—কিছু নেই—মুখে একটা আক্ষেপসূচক ধ্বনি করে মাথা নাড়ল ছেলেটি—সব ঝগড়াঝাটি রেষারেষি—

শেষ পর্যন্ত মত হল ঝুমুরের, আমরা বেরোলাম। বেরিয়ে টুরিস্ট লজের বাইরেই রিকসা মিলে গেল। সামনের রাস্তাটা ধরে এগোতেই অনেকটা পিরামিডের মত দেখতে একটা মন্দির দেখতে পেলাম, কিন্তু কাছে যেতে বোঝা গেল এটা মন্দির নয়। আমি বইপত্রে যা পড়া ছিল সেটুকু বললাম, যদি ঝুমুর তাতে একটু ইন্টারেস্ট পায়। বললাম ঐতিহাসিকদের মতে এই ইমারতটি তৈরী করিয়েছিলেন বীর হাম্বির ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। নীচে যে বেদী দেখছিস সেটা আমাপাথরের আর আসল মন্দিরটি হল ইঁটের। এটা লম্বায় প্রায় আশী ফুট, এখানে রাজাদের আমলে

বিষ্ণুপুরের সমস্ত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এনে জড়ো করা হত রাসের সময়। সমস্ত নগর-বাসী তখন আসত এখানে দেবতার দর্শনের জন্যে, বিরাট উৎসব হত।

—অদ্ভুত কিন্তু গড়নটা, ঝুমুর বলল।

হ্যাঁ, সায় দিলাম আমি, এমন গড়ন বোধ হয় বাংলা দেশের আর কোনও ইমারতে নেই।

বাসমঞ্চের গায়ে টেরাকোটার কাজে গাইয়েদের মূর্তি দেখে ঝুমুর খুব উৎসাহিত হল। বলল, দেখ ফুলমাসি, বিষ্ণুপুরে গান তাহলে অনেক আগে থেকেই আছে। এতক্ষণে মন্দির দেখায় ওর একটু উৎসাহ দেখা গেল।

—এবার আমরা কি দেখব ফুলমাসি? ও প্রশ্ন করল।

বললাম, দেখ ঝুমুর, বিষ্ণুপুর হচ্ছে মন্দিরে জায়গা, পুরাতত্ত্ববিদদের নন্দন-কানন বলতে গেলে। এইসব মন্দিরের পেছনে কত উত্থানপতন, সামাজিক রীতিনীতির ইতিহাস রয়ে গেছে। রাজাদের আর্থিক অবস্থা, মানসিক গঠন তার পরিচয়ও কম নেই। তাছাড়া পুরনো কালের স্থাপত্য, ভাস্কর্যের নিয়ম, স্টাইল সবেরই নিদর্শন এখানে পাওয়া যাবে। তবে আমরা তো টেকনিক্যাল দিকটা অত বুঝব না তাই নাম করা মন্দিরগুলো শুধু দেখে যাব। তাতে অন্ততঃ একটু আন্দাজ পাবে যে সে যুগটা কেমন ছিল, কেমন ছিল শিল্পীদের ক্ষমতা। তাছাড়া রাজাদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যাবে বলে আমার মনে হয়।

ঝুমুর বুঝল। তারপর বেশ কয়েক ঘন্টা আমরা ঘুরলাম। আমি যেটুকু জানি তা ঝুমুরকে বললাম। ফেরার পথে ও প্রশ্নের ঝুলি খুলে বসল। প্রথম প্রশ্ন হল বড় উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে প্রাচীন।

বললাম, আমার মনে হয় নামকরা মন্দিরগুলোর মধ্যে বোধ হয় ভট্টাচার্য-পাড়ার মল্লেশ্বর শিবমন্দিরটি খুব প্রাচীন। হাম্বিরের ছেলে বীর সিংহ এটা তৈরী করে-ছিলেন। এই মন্দিরটির বহু সংস্কার হয়ে আসল চেহারা খানিকটা বদলে গেছে। কালাচাঁদ মন্দিরও বেশ প্রাচীন, হাম্বিরের আর এক ছেলে রঘুনাথ সিংহ এর প্রতি-ষ্ঠাতা। এই মন্দির ল্যাটেরাইট, যাকে বাংলায় মাকড়াপাথর বলে, তাই দিয়ে তৈরী।

—কোনটা? ঝুমুর প্রশ্ন করল, যেটায় তুমি বললে পংখের কাজ করা ছিল? আচ্ছা, বিষ্ণুপুর রাজাদের তৈরী সব শেষ মন্দির কোনটা?

—বোধ হয় রাধাশ্যাম মন্দির। তৈরী করিয়েছিলেন চৈতন্য সিংহ ১৭৫৮ সালে। ওই মন্দিরে এখন বহু দেবীমূর্তি একত্র করে রাখা হয়েছে। রাজাদের অবস্থা পড়ে যাওয়ার পর থেকে খরচ বাঁচানোর জন্যে সবার একসঙ্গে পুজো হয়। এর কাছেই তো দেখলি লালজী মন্দির। এটা করিয়েছিলেন বীর সিংহ। ওই মন্দিরও পাথরের, একে একরত্ন মন্দির বলে। সংক্ষেপে বললাম আমি।

—একরত্ন মানে? ঝুমুর জানতে চাইল।

—রত্ন মানে এখানে চূড়া। আমি বোঝালাম ওকে, এমনি পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, অর্থাৎ পাঁচ, নয় চূড়াওয়ালা মন্দিরও আছে কিছু।

—আচ্ছা ফুলমাসি, একচূড়াওয়ালা একটা নতুন ধরনের কি মন্দির দেখলাম না?

বললাম ওটা কেষ্ট রায়ের মন্দির। ওকে জোড়বাংলা মন্দির বলে ওর গড়নের জন্যে। দুখানা বাংলার কুঁড়ে ঘরের ধরনের মন্দির ওপরে একটা চূড়া দিয়ে জুড়ে মজ-বুত করা হয়েছে। গায়ের কারুকার্যের জন্যেও এই মন্দিরের খুব নামডাক। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন রঘুনাথ সিংহ—না, লালবাই-এর রঘুনাথ নয়, তোর মাথার তো খালি লাল-বাই ঘুরছে। এ রঘুনাথ হাম্বিরের ছেলে, যিনি কালাচাঁদ মন্দির গড়েছিলেন।

আর একটা কথা বলা হয়নি ঝুমুর, ভট্টাচার্যপাড়ায় যে মুরলীমোহনের মন্দির দেখলি আর এদিকে মদনগোপালের সেই মস্ত বড় মন্দিরটা—দুটোই কিন্তু করিয়ে-ছিলেন একজন মহিলা, রানী চূড়ামণি, মহারাজ বীর সিংহের স্ত্রী।

—দুর্জন সিংহের মা? ঝুমুর প্রশ্ন করল, যিনি তাসটাস খেলে, সেজেগুজে সময় নষ্ট করতেন না।

হেসে বললাম, সব মনে রেখেছিস দেখছি।

—আচ্ছা ফুলমাসি, ঝুমুর চিন্তিত গলায় বলল, এখানে বেশীর ভাগই ছোট মন্দির। খুব বড় মন্দির একটাও দেখলাম বলে তো মনে পড়ছে না। কেন, রাজাদের বেশি টাকা ছিল না নাকি?

উত্তরে সায় দিলাম বললাম, এটা একটা বড় কারণ। হাজার হলেও ছোট রাজ্যের রাজা। এখানে বেশীর ভাগ মন্দিরই পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের বেশী উঁচু নয়, তাছাড়া খুব দামী পাথর-টাথরও বিশেষ ব্যবহার করা হয়নি হয়তো একই কারণে। তবে শুধু ইঁটের মন্দিরে বাঙ্গালী শিল্পীরা যেসব কাজ করেছেন, তা দেখতে এখনও দেশবিদেশ থেকে লোক এই বিষ্ণুপুরে আসে।

হঠাৎ প্রশ্ন করল, টেরাকোটা কি ফুল-মাসি? কোন দেশী শব্দ এটা? বাংলা নয় নিশ্চয়?

বললাম, না, আসলে কথাটার অরিজিন ইটালীয়ান। মানে হল পোড়ামাটি।

ঝুমুর বলল, টেরাকোটার কাজে কত রকমের নকসাই না দেখলাম। ফুলপাতা, ঘরের বউ, গাইয়ে বাজিয়ে, দেবদেবী সবার মূর্তিও আছে এর মধ্যে।

—আর একটা কথা, দেবদেবী বলতে কিন্তু বৈষ্ণব রাজাদের তৈরী বলে শুধু রাধাকৃষ্ণের নয় অন্য দেবদেবীর মূর্তিও রয়েছে। যাই হোক, টেকনিক্যাল ব্যাপারটা না বুঝলেও আজকের এই দেখায় কিন্তু বাংলাদেশের পুরোনোকালের শিল্পীদের জ্ঞান আর ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা ধারণা হল আমাদের, তাই না? আমি ঝুমুরের দিকে চাইলাম।

—তা সত্যি, কত কিছু জানি না আমরা—ভাবতেই অবাক লাগে যে তিন-চার শো বছর আগেকার মানুষ এগুলো তৈরী করে রেখে গেছে, অথচ তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমরা।

অনেক ঘোরাঘুরি গেছে সকাল থেকে, এখনও দলমাদল কামান দেখা হয়নি। বিষ্ণু-পুরের পুরোনো জিনিসের মধ্যে ওটাও দেখার বস্তু। রাত্রে ঠান্ডা হাওয়া দিলেও আজকের দিনটা বেশ গরম। ঝুমুরের মুখটা লালচে দেখাচ্ছে। বললাম ধারি নাকি দল-

মাদল দেখতে? রিক্সাওয়ালা বলল, এই তো টুরিস্ট লজের কাছেই, চলুন দেখিয়ে আনি।

কামানটা দেখে মনে হয় লোহা দিয়ে তৈরী, কিন্তু রোদ-বৃষ্টিতে তো মরচে ধরেনি একটুও। মস্ত বড় পাথরের বেদীর ওপর বসানো রয়েছে কামানটি। কিংবদন্তী আছে যে গোপাল সিংহের আমলে যখন মারাঠা আক্রমণ হয়, তখন নগরদেবতা মদন-মোহন নিজে একটি কিশোরের বেশ ধরে এসে এই কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে বর্গীদের তাড়িয়েছিলেন। কামানের কাছে মদনমোহনের হাতের একগাছি বালা পড়ে থাকতে দেখা গেলে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মন্দিরে বিগ্রহের কাপড়ে নাকি বাবুদের দাগও পাওয়া গেছিল।

এসব গল্পকাহিনী, তবু বিষ্ণুপুরের সাধারণ মানুষের মনের তলায় তলায় যেন একটা বিশ্বাসের ভাব রয়ে গেছে যা যুক্তি দিয়ে খতম করা যায় না।

—গাঁজা—

গল্পটা শুনে ঝুমুর ঠোঁট উল্টে বলল। বলল, এইসব বাজে গল্প বলছ ফুলমাসি কিন্তু লালবাইএর গল্প, তার গানের কথা বললে না। তাছাড়া লালবাঁধও তো দেখলাম না।

লালবাঁধ দেখার জন্যে আবার টুরিস্ট-লজের সামনে দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মোড়ে এলাম। ডান দিকে একটু এগোলেই লালবাঁধ। পাশে সর্বমঙ্গলার মন্দির। আমাদের নামিয়ে দিয়ে রিকসাওয়ালা বলল, যান দিদি দেখে আসুন।

—এই? হতাশ গলায় ঝুমুর বলল।

আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কি আর করা যাবে বল, তিনশো বছর হয়ে গেল—

—তাবলে এই? আমি কত ভেবে-ছিলাম, ঝুমুর উদাস গলায় বলল, ভরা টলটলে দিঘি, মাঝে মাঝে পদ্ম ফুটে থাকবে, চারধারে অন্ততঃ ভাঙ্গা হলেও প্রাসাদটাসাদ থাকবে। তা না, অর্ধেক মজা, ঘাসপাতা—খাচ্ছেতাই—

হাসি চেপে বললাম, ঝুমুর শোন, টলটলে দিঘিতে পদ্ম ফোটে না, পদ্মের জন্যে চাই, কাদা শ্যাওলা ভরা মজা পুকুর। তা পদ্ম হয়তো খুঁজলে এখানেই পাবি, যা হাল হয়েছে দিঘির।

ঝুমুর বলল, তা সবকার দেখে না কেন, এত তো টুরিস্টদের ডাকাডাকি—

গম্ভীর হয়ে বললাম একপক্ষে কিন্তু ভালোই হয়েছে বুঝলি নইলে আমার তো ভয় ছিল যে তুই না হয়ে প্রতিস্মর হয়ে বসিস—আমিই ছিলাম লালবাই, নতুন মহলের ঘরে ঘরে আমিই ঘুরেছি, শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতাম, পূর্ণিমার রাতে জানপুরো নিয়ে আমি—

—ভালো হবে না কিন্তু ফুলমাসি রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল ঝুমুর। বলল, চলো ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়ার পর কিন্তু লালবাইএর গল্প শুনবই আজ।

রিকসাওয়ালা বলল, দিদি, গানের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, এই দেখুন একজন বড় গাইয়ের বাড়ী। সামনের বাড়ীটার জানলায় ছিটের পর্দা, দরজায় নেমপ্লেটে লেখা, সত্য-কিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ওমা, ফুলমাসি, আমার ছোটপিসির গুরু ইনি। ঝুমুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমি গান শুনিনি, তবে বাবা বলতেন—তা যাবে ফুলমাসি, একটু দেখে আসতাম?

—না দিদি, রিকশাওয়ালা ওকে নিভিয়ে দিল, এ বাবু তো এখন কলকাতায়। বাড়ীতে বোধহয় ভাড়াটে রয়েছে।

—তবে আর কি, বাড়ী চল—মানে লজে চল। উঃ যা ক্ষিদে পেয়েছে—ঝুমুর ব্যস্ত হয়ে উঠল আবার।

টুরিস্ট লজ, তখন গমগম করছে। নোংরা জামাকাপড়, রবারের চটি পরা, খালি পা অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এসে উঠেছে। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই অ্যামেরিকান বলে মনে হল। ওদের হাতে কলা, পাঁউরুটি থেকে ঠোঙা ভরা মুড়ি ছোলাভাজা পর্যন্ত নানারকম খাবার। আগে খাবে না কি ডরমেটরীতে সিট বুক করবে তা নিয়ে দেখা গেল অনেকেই মনস্থির করতে পারছে না।

খাওয়া-দাওয়া মিটতে ঘরে এসে শয্যা নিলাম আমি। রিকশার ঝাঁকিতে গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

ঝুমুর শাসাল, ওতে রেহাই পাবে না ফুলমাসি, লালবাইএর গল্প না শুনে আজ ছাড়ছি না আমি। বলতে গেলে ওই জন্যেই আসা—

—তা সে গল্প তো কলকাতায় বসেও শুনতে পেতিস।

—আহা, আমি ভেবেছিলাম আগে লালবাঁধ নতুন মহল সব দেখেটেখে তারপর—তা সেসব তো বলতে গেলে শেষই হয়ে গেছে। তা যাকগে—তুমি বল।

বললাম, লালবাইএর জন্যে তো পাগল হবে যাচ্ছিস, কিন্তু আগে যে একটু ইতিহাস জানতে হবে, নইলে তো বুঝতে পারবি না।

—ঠিক আছে বল তুমি। ঝুমুর তৈরী।

—সময়টা ১৬৯৬ সাল। আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সম্রাট বিরাট সাম্রাজ্য পেয়ে-ছিলেন পূর্বপুরুষের কাছ থেকে, তাছাড়া নিজেও জয় করেছিলেন অনেক। কিন্তু আকবরের মত সে সাম্রাজ্যকে শক্ত বাঁধনে বেঁধে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তার মানে এ নয় যে, আওরঙ্গজেব নির্বোধ বা দুর্বল ছিলেন। শক্তি বা কূটবুদ্ধি কোনটাই তাঁর কম ছিল না তবে সমস্তই নষ্ট হয়েছিল সাম্রাজ্যের আর একরোখা মেজাজের জন্যে। হিন্দুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আকবর যে শক্তি অর্জন করেছিলেন তার সুফল ভোগ করলেন জাহাঙ্গীর এবং সাজাহান, কিন্তু আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসলেন একেবারে গরমাগরম হয়ে। জিজিয়া তুলে দিয়েছিলেন আকবর শাহ? আমি আবার বসাব। হিন্দুদের পূজাপার্বণ? অত ঘটা-পটা করা চলবে না আমার রাজত্বে। ভেঙ্গে দাও মন্দির, কয়েদ কর কাফেরদের, যারা আমার হুকুম মানবে না। গানটান বন্ধ কর, কোনও দরকার নেই ওর—এমনি সব ফতোয়া জারী করলেন তিনি একের পর এক। ফলে দেশের হিন্দুদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ধীরে ধীরে জমে উঠতে লাগল। এর থেকে জন্ম নিল ঘৃণা। ওরা আর আমরা এক নই, ওরা আমাদের সর্বস্ব লুটে খাচ্ছে এমনি একটা ভাব সৃষ্টি হল তাদের মনে।

এই সব নানা কারণে দেশের এখানে ওখানে বিদ্রোহ লেগেই থাকত, তার ওপর ছিল পাঠানরা। পূর্ব দিকে ওরা আবার মাথা তুলছিল। এমনি সময় মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা বিভাগের চেতোয়ারবদার জমিদার শোভা সিংহ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করছিলেন। শোভা সিংহের উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় এক হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সুযোগসন্ধানী পাঠানরা তাতে ইন্ধন যোগাল এবং শোভা সিংহকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। বলল, আমাদের কোন স্বার্থ নেই, আমরা চাই শুধু মোগলকে শায়েস্তা করতে।

বাংলায় তখন মোগলের মিত্র ছিলেন বর্ধমানের পাঞ্জাবী ইজারাদার রাজা কৃষ্ণরাম আর এদিকে বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ সিংহ। রঘুনাথের স্বার্থ ছিল। তিনি জানতেন মোগল দূরে আছে, বনজঙ্গল নদী পেরিয়ে তারা এতদূরে আসবে না বিষ্ণুপুর দখল করতে, তাই বিষ্ণুপুর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন থাকতে পারছে। অন্যদিকে পাঠান একেবারে দুয়ারের কাছে। উড়িষ্যা থেকে আসা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, তাই ওদের ঠেকান সবার আগে দরকার। বিপদটা একেবারে সামনে এল যখন চেতোয়ারবদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন মোগলের বিরুদ্ধে।

এই যুদ্ধে শোভা সিংহ অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। প্রবল বিক্রমে তিনি তখন বাংলার এ-প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে আছড়ে পড়ছিলেন। বর্ধমানের কৃষ্ণরাম মারা গেলেন যুদ্ধে। বর্ধমান জয়ের পর শোভা সিংহ ছুটলেন হুগলীর দিকে আর সেখানে ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। হুগলীতে অবশ্য শোভা সিংহ তবুও বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। উল্টে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের ছুতো তুলে ইংরেজ বণিকরা কলকাতায় দিব্যি নিজেদের দুর্গ তৈরী করে নিল।

—দুর্গ মানে ফোর্ট উইলিয়ম?

—হ্যাঁ, মূল ঘাঁটি তখনই তৈরী হয়েছিল, তার ফলাফল পরে বোঝা গেছে—যাই হোক, শোভা সিংহের কথাই আগে বলি। জয়ের আনন্দ আর অহংকারে বোধহয় বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণরামের মেয়ের হাতে ছুরি খেয়ে জীবনান্ত হল তাঁর।

—বাঃ হয়ে গেল নেতাগিরি, ঝুমুর বলল।

(চলবে)

পল্লীগীতিকার হাসনরাজা ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত

আমরা আগেই দেখেছি, মোগল বাদশাদের মত হাসন রাজার হারেমও বহু যুবতী নারীতে ছিল পরিপূর্ণ — তাদের মধ্যে দস্তুর মাফিক বিবাহিতা ছিল আর কজন? কিন্তু তাদের সকলেই ছিল তাঁর আশ্রয় ও তাঁর যৌবন প্রসাদের উপরে নির্ভরশীল। এই বহু পত্নীকতা এবং বহু নারী গমনের ব্যবস্থাকে তিনি বাদশাহী আভিজাত্যের বেওয়াজ হিসাবেই সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন, এতে অন্যায়, দূষণীয় বা লজ্জাবোধ করার কিছু তিনি দেখেন নি, কেননা, আশ্রিতা নারীদের সঙ্গে তাঁর কোন জোর-জবরদস্তি বা জুলুমবাজির সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হল অন্য দিক দিয়ে। হাসন রাজা নিছক ভোগী পুরুষ ছিলেন না, জীবনে ভোগের বোশনাই জ্বালিয়ে অন্তরে অন্তরে তিনি নিরাশকাতর সাধনা করে গেছেন। এ যেন একই ব্যক্তির ভিতরে দুই হাসন রাজার বাস—একজন কামনা-বাসনার মোহে আচ্ছন্ন, অন্যজনের কাছে পৌঁছেছে অনন্তের আহ্বান। মুক্তি-পিয়াসী শেষোক্ত হাসন রাজা মওকা পেয়ে ভোগী হাসন রাজাকে খুব একচোট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করছেন—

একদিন তোর হইবে রে হাছন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ।
মায়াজালে বেড়িয়ে মরণ,
না হইল স্মরণ রে হাছন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ।।
যমের দূতে আসিয়া তোমার,
হাতে দিবে দড়ি।
টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে
যমের ও পুরীরে।।
সে সময় কোথায় রইব (তোমার)
সুন্দর সুন্দর স্ত্রী।
কোথায় রইব রামপাশা,
কোথায় লক্ষণছিরি রে।।
করবায়নি রে হাছন রাজা
রামপাশার জমিদারী।
করবায়নি রে কাপনা নদীর পারে
ঘুরাফিরি রে।।
আর যাইবায়নি রে হাছন রাজা
রাজাগঞ্জ দিয়া।
করবায়নি রে হাছন রাজা
দেশে দেশে বিয়া রে।। (৩১)
(করবায়নি = করবে নাকি)

হাসন রাজা যে দেশে দেশে বিয়ে করে সুন্দরী স্ত্রীদের এনে অন্দরের শোভা বর্ধন করেছিলেন, একথা তিনি অকপটে নিজেই বলে গেছেন, এতে গ্লানিবোধ করার কিছু তিনি পান নি। আইনসিদ্ধ বিবাহ হোক বা না হোক, যাদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাদের সকলকেই তিনি স্ত্রী বলে মেনে নিয়েছেন।

হাসন রাজা তাঁর গানে হিন্দু ধর্ম-সংস্কারের নানা বিশ্বাস, মতবাদ, জ্ঞান-ধারণা, ভাবের অনুষঙ্গ ইত্যাদিকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে রূপায়িত করতে। যেমন, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা বৈচিত্র, মৃত্যুর পর বৈতরণী পার হয়ে পরলোকে যাওয়া মৃত্যুর অধীশ্বর যমরাজের কল্পনা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি। এই শিক্ষাবঞ্চিত পল্লীকবি কোন্ যাদু মন্ত্রে গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকের মর্ম-বাণীকে তাঁর গানে রূপ দিয়েছেন ভাবলে অবাক হতে হয়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ১২
দ্বিতীয় অধ্যায়

হাসন রাজা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করার পরিবর্তে শুধু জীর্ণ দেহতরী পরিত্যাগের কথা বলেছেন—

আর কতদিন ভাঙ্গা বজরা ঠেলিব।
বজরা যে পুরানা হইছে,
বুক কাঠ পচে গেছে
দুতারগিরি নাহি জানি
কেমনে গড়িব।

বন্ধুরা যে পুরানা মোর
কেমনে থাকি তার অন্দর,
বন্ধুরা দেখি লোকে হাসে,
ছাড়িয়া যাইব।।
হাছন রাজার মন কইছে,
বন্ধুরা ফেলিব।
সুন্দর দেখে নতুন জাহাজ
খরিদ করিব।। (৩২)

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ সাধারণ লোকেও দেখতে পাচ্ছে যে, পৃথিবীর এক কোণে উচ্চারিত ধ্বনি অতি সহজে বেতার মাধ্যমে শ্রুতিগোচর হয় দূর-দূরান্তে, প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত প্রেরক ও ধারক যন্ত্রের। অধ্যাত্ম জগতেও তেমনি কোন সাধকের উপলব্ধিতে যখন একটি পরম সত্য বাণীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কোনদিন আর তার ক্ষয় নেই, বিলয় নেই: অক্ষয় অব্যয় প্রাণশক্তিতে মানবিক অধ্যাত্ম-বোধের অন্তরীক্ষে সে চিরসঞ্চরমান থাকে এবং যোগ্য আধার পেলে স্থান-কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে অনায়াসে বারংবার তার প্রকাশ ঘটে অন্যতর মানুষের চিত্ত-লোকে। বিদ্যা বা জ্ঞানযোগের পথে নয়, সহজাত উপলব্ধির সাধনায় হাসন রাজা অধ্যাত্ম জগতের পরম সত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর চিত্তলোক ছিল বিশ্বজনীন সত্যদর্শনের উপযুক্ত ধারক-যন্ত্র।

হাসন রাজা হয়ত জীবনে এমন সব কর্মে লিপ্ত হয়েছেন, যাতে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না, কিন্তু তিনি যে নিরুপায়। এক অদৃশ্য 'মৌলা' অর্থাৎ প্রভুর হাতে রয়েছে লাটাইর 'ডুরি' (সুতো) আর হাসন যেন তার সঙ্গে বাঁধা ঘুড়ি। 'মৌলা' তাঁকে নিয়ে 'খেইড়' খেলাচ্ছেন, তিনি যখন যেমন ঘোরাচ্ছেন তেমনি ঘুরতে হচ্ছে হাসনকে।
গুড়ুভি উড়াইল মরে মৌলার হাতে ডুরি।
হাছন রাজারে জেমনে ফিরায় তেমনে দিয়া
ফিরি।। (৩৩)

হাসন রাজা তাঁর বেশির ভাগ গানই লিখেছেন আঞ্চলিক বাংলা ভাষায়, এবার শুনুন উর্দু ভাষায় লিখিত তাঁর একটি গজল গান—
হাছন রাজা কা নেহি, মাকান্ কা ইয়াদ্ হ্যায়।
দো দিন্‌কা মুছাফির হ্যায়,
চলা উথান কা জানা হ্যায়।
হাছন রাজা কা নেহি, মাকান, কা ইয়াদ
হ্যায়।।
চলু রাজার, কর ছওদা, মাকান ছে খবর
স্মরি হ্যায়।
পয়সা কড়ি সবকো ছোড়,
উথান কা আসবাব খরিদ করু।।
খরিদ ফরোক্ত জলদি কর,
সাম্ হোত আফি হ্যায়।
হাছন রাজা কা নেহি,
মকান্ কা ইয়াদ হ্যায়।।(৩৪)

হাসন রাজার পল্লীগীতির একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। এ হল নিতান্তই তার খণ্ডিত রূপ, যেন ডানা-কাটা পাখি। সুরের ডানা মেলে গানের পাখি ' যখন উধাও হয়ে উড়ে চলে অসীম ঊর্ধ্বপানে, তার সেই পরিপূর্ণ রূপটিকে ত শুধুমাত্র কথার বন্ধনে ফুটিয়ে তোলা যায় না। সুরসমন্বিত গান শুনলে আলোচনা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

হাসন রাজার গানের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। রচয়িতার নামের ভণিতা পল্লীকবিরা সাধারণত গানের শেষ চরণে একবার মাত্র করে থাকেন, কিন্তু হাসন রাজা এই রীতির ধার ধারেন নি। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গানের গোড়াতে, মাঝখানে, শেষে একবার বা একাধিকবার নামের ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে সকলেই বলে থাকেন যে, হাসন রাজা তাঁর গান রচনা করেছিলেন সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়, কিন্তু এ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে এ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। একথা সত্য যে, আঞ্চলিক ভাষার নির্ভেজাল রূপ হল সেখানকার কথ্য ভাষা। হাসন রাজার গানে আঞ্চলিক শব্দ, উপমা, উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান, ক্রিয়াপদের রূপ প্রভৃতির অভাব নেই সত্য, কিন্তু সব মিলিয়ে সেই ভাষাকে পুরোপুরি সেখানকার কথ্য ভাষার হুবহু লিখিত রূপ বলা যায় না। তাছাড়া সিলেটেরই বিভিন্ন স্থানে কথ্যভাষার নানা ধরনের গরমিল সুস্পষ্ট। যে যত অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হোক, অন্তরের কোন উপলব্ধি বা গভীর ভাবকে প্রকাশ করতে গেলে তার ভাষায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহিত্যিক শব্দ সম্ভার এবং সাহিত্যিক ভাষাশৈলীর প্রভাব অল্প বিস্তর এসে পড়বেই। হাসন রাজার গানেও সেই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ এড়িয়ে যাবে না বলে আশা করি।

যাইহোক, হাসন রাজার গান সম্পর্কে আসল প্রশ্ন যা সকলেরই মনে জাগে তা হল, হাসন রাজা মোট কতগুলো গান রচনা করেছিলেন? সঠিকভাবে বর্তমানে কেউই বলতে পারছেন না। যথোচিত অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এইসব তথ্যের উদ্ধার হবে বলে আশা করা যায়। 'হাছন উদাস' নামক গানের বইখানি হাসন রাজা তাঁর জীবিত কালে ছাপিয়েছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। সে বইয়ের কোন কপি অখণ্ড অবস্থায় কারো কাছে আছে কিনা সন্দেহ। খণ্ডিতাংশ আছে হয়ত কারো কারো কাছে, অন্তত শ্রীপ্রভাতকুমার শর্মার ছিন্ন কপিতে আছে ১—৩৯ পৃষ্ঠা, শেষের বাদবাকি পৃষ্ঠাগুলো নেই। বইখানি ছাপা হয়েছিল মুসলমানী পুঁথির আকারে এবং তার শুরু হয়েছিল ডান দিক থেকে বাঁয়ে। মুহম্মদ আব্দুল হাইর মতে এই বই প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯০৭ সালে। এই তারিখকেই সঠিক বলে মনে হয় যদিও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ্ তাঁর ধারণা থেকে বলেছেন—'আমার যতদূর মনে পড়ে ভাইয়ার (হাসন রাজা) 'হাছন-উদাস' তাঁর জীবিতকালে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ ইংরাজিতে। ছাপা হয় সিলেট রহমানিয়া প্রেসে।' (ঢাকার দৈনিক সংবাদ' ৩০ আশ্বিন ১৩৮৩, আবুল আহসান চৌধুরীর প্রকাশিত প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ হাসন রাজা') (হাছন-উদাস' এর এই মুদ্রণকে প্রথম সংস্করণ বা প্রথম মুদ্রণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু আজরফ সাহেবের অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ প্রভাতকুমারের অর্ধছিন্ন কপিতে মুদ্রিত আছে—

> 'শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে, শ্রীমান আবদুল গণি দ্বারা মুদ্রিত।
> শ্রীযুক্ত জমিদার দেওয়ান হাছন রজা কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 'হাছন-উদাস' প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল 'ইসলামিয়া প্রেসে' রহমানিয়া প্রেসে নয়। প্রকাশের তারিখের কোনো উল্লেখ নেই প্রভাতকুমারের কপিতে।

১৯২৫ সালে হাসন রাজার কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম উল্লেখ করলেন তাঁর ভাষণে তখনই সুধী সমাজের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে এবং লোকের আগ্রহ বাড়ল তাঁর গান সম্পর্কে। এতে 'হাছন-উদাস' আবার প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হলেন হাসন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী। দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হল 'হাছন-উদাস' ১৯২৫ সালে, বাংলা ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে, মুদ্রক দুর্গাপ্রসাদ দাস, ভুবন প্রেস, সুনামগঞ্জ। এটিকে আমরা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বা দ্বিতীয় মুদ্রণ বলতে পারি, এতে গানের সঙ্গে যুক্ত হল প্রভাতকুমারের প্রবন্ধটি। 'হাছন-উদাস' দ্বিতীয় মুদ্রণের পূর্ণাবয়ব কপি বাংলাদেশের কারো কারো কাছে সংরক্ষিত রয়েছে এবং এতে মোট ২০৬টি গান সংকলিত হয়েছে বলে জানা যায়। ভূমিকা বাদে দ্বিতীয় সংস্করণটি ছিল প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। সেক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ 'হাছন-উদাস'এও মোট ২০৬টি গান প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর হাসন রাজা আরো বছর পনেরো জীবিত ছিলেন, এই সময়ে নিশ্চয়ই আরো অনেক নতুন গান তিনি রচনা করেছিলেন। সেগুলির অনু-সন্ধান ও উদ্ধার সাধনের কাজে বাংলাদেশের দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও আব্দুল হাই প্রমুখ গবেষকরা নিরত রয়েছেন বলে আশা করা যায়। অনেকে অনুমান করেন, হাসন রাজার রচিত গানের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি যাবে।

মুহম্মদ আব্দুল হাইর মতে 'হাছন-উদাসে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে, ১৯২৬ সালে নয়। তার এই মতটি ভ্রান্ত বলেই আমাদের ধারণা। তিনি আরো বলেছেন, হাছন-উদাসে প্রকাশিত মোট গানের সংখ্যা ২০৬ নয়, ২০৩। এই

সন্দেহের নিরসন বাংলা একাডেমি অবশ্যই করতে পারেন।

'সৌখিন বাহার' ও 'হাচন বাহার' নামে আরো দু'খানি বই হাসন রাজা লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ হয় নি বলে বই দু'খানার উল্লেখ মাত্র করা গেল।

হাসন রাজার গানের উদ্ধৃতিতে অনেক সময় 'হাছন-উদাসের' পাঠের সঙ্গে কথার কিছু কিছু গরমিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমেই ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে (১) নম্বর বলে এই প্রবন্ধে নির্দেশিত গানের চার পংক্তির উদ্ধৃতির কথা। হাছন-উদাস (১ম সং)-এ ঐ চার লাইনের অবিকল মুদ্রিত রূপ মূল বানান সহ নীচে দেওয়া গেল—

মম আখি এ হইতে পয়দা আছমান জমিন।
শরিরে করিল পয়দা শকত আর নরম।।
আর পয়দা করিয়া আছে ঠান্ডা আর গরম।।
নাখে পয়সা করি আছে খুসবয় আর
বদবয়া (১)

দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ লাইনে 'আর' শব্দটি বাদ দিয়েছেন এবং সাতটি শব্দের বানান বদলে দিয়েছেন—'আখিএ', 'আছমান', 'শরিরে', 'করিয়া আছে', 'নাখে', 'করিআছে' ও 'খুসু'।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির (২) নম্বর গানের 'হাছন-উদাস' (১ম সং) বইয়ের পাঠ নিম্নলিখিত রূপ—

রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাজত বাহির হইয়া
দেখা দিল মরে।।(২)

এই গানে পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র দুইটি শব্দে—'মাজত' ও 'মরে'।

প্রভাতকুমার শর্মা জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে হাসন রাজার গানগুলি কপি করে পাঠাবার সময় তিনি 'হাছন-উদাস'-এর নির্ভুল প্রতিলিপি পাঠাবারই চেষ্টা করেছিলেন। (দেশ, ২ ফাল্গুন ১৩৭৬) সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-কৃত গানের পাঠে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তা তাঁর ইচ্ছামত বলেই ধরে নিতে হয়। শব্দের বানান পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলার থাকতে পারে না। 'হাছন-উদাস'-এর মুদ্রণ কার্যের তত্ত্বাবধান যিনিই করে থাকুন তাঁকে বানান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলা যেতে পারে না। কথোপকথনে আঞ্চলিক উচ্চারণ করলেও লেখার সময় সকলেই সর্বজনবোধ্য সাহিত্যগ্রাহ্য বানানই অনুসরণ করে থাকেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে আর দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—(১) নম্বর গানের শেষ চরণে 'আর' শব্দটির বিলোপ এবং (২) নম্বর গানের শেষ চরণে 'মরে'র বদলে 'আমারে' লেখা। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার উল্লিখিত 'দেশ' পত্রিকায় যা লিখেছেন আমরাও তার সঙ্গে এক মত—'কবিতার ভাবের কোন হানি না করে বাক্যের বিন্যাস না বদলিয়ে হাসন রাজার কবিতার ঐটুকু প্রসাধন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল মনে হয় না।'

এই ধরনের প্রসাধন, বিশেষভাবে বানানের ব্যাপারে, 'হাছন-উদাস'এর প্রথম মুদ্রণের পাঠের উপরে দ্বিতীয় মুদ্রণের পাঠেও করা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক (১২) নম্বর বলে নির্দেশিত গান। উদ্ধৃতিতে আছে প্রথম মুদ্রণের পাঠ। দ্বিতীয় মুদ্রণে 'খদা'র বদলে 'খোদা', 'নমাজ রুজা'র বদলে 'নামাজ রোজা' এবং 'পিরিত', 'কলমা' ও 'পাইয়া'কে বদলিয়ে যথাক্রমে 'পিরীত', 'কলমা' ও 'যাইয়া' ছাপানো হয়েছে।

হাসন রাজার গানের পাঠান্তর (বেশির ভাগই বানান সংক্রান্ত) সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা গেল এই উদ্দেশ্যে যে, এরূপ সাধারণ পাঠান্তরকে উপেক্ষা করে গেলে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না বলেই আমরা মনে করি। কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করে উপদেশ দিয়েছেন যে, গায়করা যেন 'হাছন-উদাস'-এর পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের কপিতে কথাগুলোকে সংশোধন করে নেন। মূল রচনা থেকে বিচ্যুতি ঘটা বাঞ্ছনীয় নয় এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু কথা হল, 'মূল' ধরব কোন্ পাঠকে? 'হাছন-উদাস'কে প্রমাণ ধরতে গেলে সমস্যা দাঁড়াবে—বইয়ের কোন্ সংস্করণ বা মুদ্রণকে নজির ধরা হবে? দুইটি মুদ্রণে যে গরমিল রয়েছে তার আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে।

আসল কথা হল, হাসন রাজার নিজের হাতে লেখা গানের কোনো পান্ডুলিপি যদি থাকত তবে তাকেই 'মূল' বলে গণ্য করতে হত এবং তার থেকে বিচ্যুতিকে সকলকেই বর্জন করে চলতে হত। তেমন কোনো পান্ডুলিপি থাকার কথা নয়, কারণ, ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় নিজের নাম দস্তখত করার বেশি লেখাপড়ার জ্ঞান হাসন রাজার ছিল বলে অনেকেরই ধারণা ছিল না। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে গানগুলি হাসন রাজা মুখে মুখেই রচনা করে গেছেন এবং তাঁর গায়িকারা শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে সেগুলিকে আয়ত্ত ও রক্ষা করে চলছিল, ব্যাপারটা এই রকম ঘটেছিল বলেই মনে করা যেতে পারে। পরে 'হাছন-উদাস' প্রথম ছাপাবার সময় গানগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং লিপিকার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বানান অনুসরণ করেছিলেন, তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল—

কএ দিন	(কয়দিন)
শরির	(শরীর)
যাইয়া	(যাইয়া)
যাএরে	(যায় রে)
মএনা	(ময়না)
হাওই	(হাউই)
সুন্যে	(শূন্যে) ইত্যাদি

শব্দগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণের সঙ্গে উল্লিখিত বানানের কোন সম্পর্ক নেই, বানানগুলো সম্পূর্ণত লিপিকারের নিজস্ব। এই বানান অনুসরণ করার সার্থকতা কোথায়? বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণে সংশোধন অসঙ্গত কারণে করা হয় নি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কাছে অনুসন্ধান করাতে তিনি জানিয়েছিলেন, 'হাসন রাজা সাহেবের স্বহস্ত লিখিত কোন পান্ডুলিপি আমি দেখি নি। তবে আমার মনে হয়, তিনি নিজেও লিখতেন, অপরকে দিয়েও লিখিয়ে নিতেন।'

মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর প্রকাশিত 'হাছন রাজার গান' পুস্তিকায় লিখেছেন—'কালের গ্রাস থেকে আজো বেঁচে আছে মরমী কবির স্বহস্ত লিখিত কতকগুলো পান্ডুলিপি। এদের সঙ্গে আছে অন্যদের কৃত তাঁর গানের অনুলিপির খাতা ও বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো পাতায় তাঁর গান ও কবিতা। বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর উপরোল্লিখিত জ্যেষ্ঠ পুত্র খান বাহাদুর গনিউর রাজা চৌধুরীর পরে তাঁর সর্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান আফতাবুর রাজা চৌধুরী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান আনোয়ার রাজা চৌধুরী। এখন এ অমূল্য সম্পদ সব কবির লক্ষণশ্রীর বসতবাড়ীতে বর্তমান উত্তরাধিকারীদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। তাছাড়া তার অনেক রচনা তাঁর পিতৃপুরুষের মূল বাড়ী সিলেট সদরের রামপাশায় আছে বলে শুনা যায়। কবির অন্যান্য আত্মীয়দের বাড়ীতেও তাঁর রচনাবলীর কিয়দংশ পাওয়া যেতে পারে।'

হাসন রাজার স্বহস্ত লিখিত এইসব পান্ডুলিপি ইত্যাদির কথা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের একেবারে অজ্ঞাত থাকাতে একটু বিস্মিত বোধ করছি। কারণ, তিনিই জানিয়েছিলেন—'খান বাহাদুর গনিউর রাজা আমার শ্বশুর এবং তাঁর দুই মেয়ে ছাড়া অন্য কোন আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর পুঁথি পুস্তক, গানের পান্ডুলিপি, খান বাহাদুর উপাধির মেডেল এবং অন্যান্য দলিলাদি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার স্ত্রী পেয়েছে। সেগুলো এখন আমাদের কাছে আছে।'

যাইহোক, উল্লিখিত পান্ডুলিপি ইত্যাদির যথোচিত অন্বেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব হাসন রাজার অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সহযোগে অথবা তাঁদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় বাংলা একাডেমির পরিচালনেই গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। সম্প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নাকি সুনামগঞ্জে একটি 'হাসন রাজা একাডেমি' স্থাপিত হয়েছে, সেই একাডেমিও নির্ভর-যোগ্যভাবে এই কাজের ভার নিতে পারেন কিনা বাংলাদেশের সুধীবর্গ তা বিবেচনা করুন।

মুহম্মদ আব্দুল হাইর সঙ্গে সম্প্রতি ব্যক্তিগত পরিচয় ও কিছু আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁর বাড়ি লক্ষণশ্রী গ্রামে, হাসন রাজার তিরোধানের কিছুকাল পরে তিনি জন্মেছিলেন বলে হাসন রাজাকে দেখার সুযোগ তাঁর হয় নি। অল্প বয়সে তিনি ছাত্র আন্দোলন করেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে কারাবাস করেছেন এবং কারাবাসকালেই বি-এ পাস করেন। মুক্তি লাভের পর

তিনি শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেছেন এবং একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে কবি খ্যাতিও লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি অনন্যভাবে হাসন রাজা সম্পর্কে অনুসন্ধান কাজেই লিপ্ত রয়েছেন বলে আভাস পাওয়া গেল। এই বিষয়ে তাঁর দু-চারখানা পুস্তিকা, ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও ভাষণাদির পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। 'হাছন পছন্দ' এই ছদ্ম নামে তিনি সাধারণত লিখে থাকেন, কিন্তু এই বিশেষ ছদ্ম নাম গ্রহণ করার রহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সুনামগঞ্জের 'অনুপম প্রেস' বলে একটি প্রেসের তিনি মালিক।

যাইহোক, হাসন রাজা 'নিরক্ষর' ছিলেন বলে প্রভাতকুমার যে তথ্য সংগ্রহ ও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা মোটামুটি ঠিক হলেও একেবারে নির্ভুল নয় বোঝা গেল। তাঁকে একেবারে 'নিরক্ষর' না বলে 'স্বল্পাক্ষর' বললেই সম্ভবত বর্ণনাটা যথাযথ হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেছেন, হাসন রাজার অক্ষর-জ্ঞান ছিল নিতান্তই 'প্রাথমিক'। অর্থাৎ বাংলা শব্দ ও বাক্য তিনি মোটামুটি লিখতে পারতেন, বানানের নিয়ম শৃঙ্খলা বা শুদ্ধাশুদ্ধির জ্ঞান তাঁর যৎসামান্যই ছিল।

'হাছন-পছন্দ' তাঁর পুস্তিকায় বলেছেন, হাসন রাজার গানের সমাদর থাকলেও বর্তমানে এই বিশেষ শ্রেণীর গান কয়েক রকমের বিপদের সম্মুখীন (১) পরিবেশিত হাসন গীতিতে অনেক সময়ই নানা ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়ে, অর্থাৎ মূলের সঙ্গে গরমিল, (২) হাসন গীতি বলে প্রচারিত হলেও মূলত সন্দেহজনক, কারণ, তাঁর নামে প্রচারিত হলেও কোন কোন গান আদৌ তাঁর গান নয়, (৩) সংশোধিত গান, অর্থাৎ গানের শব্দ ও বাক্যাংশের পরিবর্তন বা সংশোধন চেষ্টা (৪) সুরান্তরিত বা ভুল সুরে গাওয়া গান।

অভিযোগ যখন উঠেছে তখন তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই ধরনের সমস্যা যে শুধু থাকবে তাই নয়, ক্রমশ বেড়েই চলবে যতক্ষণ না তার মূলোচ্ছেদ হচ্ছে। 'হাছন-পছন্দ' তাঁর নিজের প্রেসে নিজের তত্ত্বাবধানে যেসব পুঁথিপুস্তক ছাপাচ্ছেন তাতেও মুদ্রণ-প্রমাদের অভাব নেই, ভুলভ্রান্তির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমশ আরো প্রসারিত হয়ে চলেছে।

অথচ, হাসন রাজার গানের সমাদর বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের সব বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিনই পরিবেশিত হচ্ছে তাঁর গান, টেলিভিসনেও প্রচারিত হয়ে থাকে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে হাসন রাজার গানকে নাকি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত বলা চলে। তাঁর জীবনী নিয়ে নাকার 'চন্দন ফিল্ম' নামক প্রতিষ্ঠান একটি চিত্রনাট্য তৈরি করতে উদ্যোগী হয়ে মহরতের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সে কাজ বর্তমানে স্থগিত আছে। 'রেডিয়ো বাংলাদেশ'এর শামশুল ইসলাম হাসন রাজার অনেক গান টেপ রেকর্ড করে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা আলোচনা ঢাকার 'মোহম্মদী', 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা', 'দৈনিক সংবাদ' প্রভৃতি সংবাদপত্র পত্রিকাদিতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর পল্লীগীতি নিয়ে চটি বইও দুচারখানা বেরিয়েছে। নানা সেমিনারেও তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদি হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে খুব ঘটা করে সুনামগঞ্জে হাসন রাজার স্মৃতি-উৎসব দুদিন ধরে পালন করা হয়েছিল, তাতে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে বাংলাদেশের অনেক কবিসাহিত্যিক, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও জনকয়েক মন্ত্রীও যোগ দিয়েছিলেন। হাজার হাজার শ্রোতা সারা রাত জেগে এই উৎসবে মরমী কবির গান নিবিষ্টমনে শুনেছে। এর আগেও নাকি সুনামগঞ্জে হাসন রাজার স্মরণে আরো পাঁচটি স্মৃতি-উৎসব পালিত হয়েছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সুনামগঞ্জে একটি 'হাসন রাজা একাডেমি' স্থাপিত হয়েছে, একথা আগেই বলা হয়েছে।

'হাছন-পছন্দ' হাসন রাজা সম্পর্কে তাঁর প্রারব্ধ গবেষণার কাজ যদি ব্যাপকভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে যান এবং অন্যান্য অনিসন্ধিৎসু পণ্ডিতব্যক্তি যাঁরা এই প্রতিভাবান পল্লীকবির সম্পর্কে অনুরূপ কাজে নিরত আছেন তাঁরা সকলে যদি উদ্যোগী হন তবে অনেক অজ্ঞাত তথ্যাদির উদ্ঘাটন হওয়া সহজ হবে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের লিখিত 'মরমী কবি হাসন রেজা' বইখানি প্রকাশিত হলে তাঁর জীবনী ও জীবন দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকদের জিজ্ঞাসু মনকে পরিতৃপ্ত করবে বলে আশা করি। হাসন রাজার জন্ম ও কর্মস্থল ছিল বাংলাদেশে, সেখানকার গুণী-ব্যক্তিরা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তাঁর গুণবিচারের দায়িত্ব আর কারা নিতে পারেন? সকলের সমবেত চেষ্টায় এই অনন্য সাধারণ মরমী কবির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংকলিত হলে সেটি বাংলা সাহিত্যের এক উপভোগ্য সংকলন বলে পরিগণিত হবে।

এই সম্পর্কে একটি ব্যাপারে আমরা কিছুটা বিস্ময় ও পরিতাপ বোধ না করে পারছি না। হাসন রাজা বাংলাদেশে উত্তরোত্তর সমাদৃত হচ্ছেন, কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল, তাঁর গানের বই 'হাছন উদাস'এর দ্বিতীয় মুদ্রণের পর আজ পর্যন্ত সেই বইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য নির্ভুল পুনর্মুদ্রণে প্রকাশিত হল না কেন জানি না, তাঁর রচিত সমস্ত গানের একটি সুসম্পাদিত সংকলন প্রকাশিত হওয়া ত দূরের কথা। বাংলা একাডেমি কি এই অবশ্য পালনীয় কর্মসূচী অবিলম্বে গ্রহণ করতে পারেন না?

৪ বিনোদন পর্ব

হাসন রাজার চরিত্রের আরো দুই একটি বৈশিষ্ট্যের কথা না বললে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি ছিলেন শৌখিন ব্যক্তি, কতকগুলো শখ বা ব্যতিক তাঁর আচরণে অভ্যস্ত নেশার মত প্রকাশ পেত, সেগুলো ছিল তাঁর চিত্ত-বিনোদনের ব্যাপার। আর, তাঁর চিত্ত-মন্থনের নেশা ছিল গান রচনায়, তাতে যখন তিনি মগ্ন হয়ে হয়ে যেতেন তখনই ঘটত তাঁর পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ। সেখানেই ছিল তাঁর একাগ্র সাধনা, তাঁর নিঃশব্দ উপাসনা। সৃষ্টিধর্মী মানুষের সৃষ্টির কাজ চলে নিরালা মনকে নিয়ে, সেখানে সে একক এবং নিঃসঙ্গ এবং এই নিঃসঙ্গতা তার গভীর অনুভবের চিরসঙ্গী হয়ে থাকে। বাইরে থেকে লোকে তা বুঝতে পারে না, হাসন রাজাও তার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'চিনিবা না কোনজনে আমায় ধরতে পারে'। মুস্কিল হল, গান রচনার প্রেরণায় মন খুব সময় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে না, সৃষ্টির ডাক আসার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। বোধ করি, এই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার অবকাশ কাটাবার জন্যেই হাসন রাজা কতকগুলো চিত্ত-বিনোদনের নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতেন। তাঁর এই নেশাগুলো ছিল ঘোড়ায় চড়া, মাছধরা, পাখিশিকার, দাবা-খেলা প্রভৃতি। বাইরে থেকে দেখলে এগুলো অবশ্যই ধনীর বিলাস-ব্যসনের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এগুলোই ছিল হাসন রাজার অন্তর্মুখী সাধনার অবসর কাটাবার উপায়মাত্র।

হাসন রাজা সম্পর্কে মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন লিখেছেন—'অশ্বারোহণে তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁহার হাতীশালে হাতী ছিল, অশ্বশালে অশ্ব ছিল, তিনি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেন। এই সম্পর্কে তাঁহার অশ্বগুলির যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।' (হারামণি, ৭ম খন্ড) বর্ণনা শুনে স্বভাবতই কল্পনায় জেগে ওঠে আমাদের অতিপরিচিত রূপকথার সেই রাজার কথা, যাঁর ধনদৌলতের সীমাপরিসীমা ছিল না, অশ্বশালে অশ্ব, হস্তীশালে হস্তী, লোক-লস্কর সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাঁর ছিল দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী এক রাজ্য। কিন্তু যেহেতু হাসন রাজা ছিলেন বাস্তব জগতের একজন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি, তাই মূল বিষয়টাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা দরকার। হাসন রাজা কোন রাজার অধীশ্বর ছিলেন না, ছিলেন তুলনায় একজন ছোটখাটো জমিদার এবং সেই জমিদারির বার্ষিক আয় হাজার ষাটেকের মত ছিল বলেই জানি। সুতরাং কুবেরের অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী তাঁরা ছিলেন না, তাঁদের ঐশ্বর্যের যে সীমা ছিল, উৎসবের পথে পা বাড়ালে দুই এক পুরুষের উড়নচন্ডীর পক্ষে সেই সম্পত্তিকে উড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া অনায়াসসাধ্য ছিল। কিন্তু পুরুষানুক্রমে এই বংশীয়েরা নীতি ও ধর্মবোধ, সংযম, সম্ভ্রম ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরবকে উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করে এসেছিলেন, তাই সম্পন্নতাহানির মুখে তাঁদের কখনো পড়তে হয়নি এবং লোক-সমাজে রাজোচিত সম্মানলাভই করেছেন তাঁরা চিরদিন।

'হাতীশালে হাতী' বলতে যা বোঝায়

হাসন রাজার কখনো তা ছিল না, বস্তুত নিয়মিতভাবে হাতী পোষণ করে হস্তীবাহন জমিদারের জাঁকজমক কখনো তিনি দেখান নি। তবে লাউড়ের পাহাড়ে বার তিনেক খেদা করে হাতী ধরার আয়োজন তিনি করেছিলেন তা ঠিক। আসলে সে ছিল বুনো হাতী শিকারের উত্তেজনা, যা সহজেই তাঁর প্রাণোচ্ছল প্রকৃতিতে সাড়া জাগাত। এই খেদার ব্যাপারে তাঁকে অনেক টাকার লোকসানে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু তাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। যাই হোক, খেদায় ধরা বন্য হাতীগুলোকে পোষ মানাবার জন্য অস্থায়ীভাবে বাধা হত তাঁদের লক্ষ্মণশ্রীর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে সুরমা নদীর অপর পারে সুন্দরগড় বলে একটা জায়গায়। তাকে হাতীশাল আখ্যা দিলে হাতীশালের অপমান করা হয়। বড় বড় গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত বন্য হাতীগুলোকে এবং পোষ মানলেই তাদের বিক্রি করে দেওয়া হত। এসব কাহিনী হাসন রাজার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত খানসামা মুশরফ আলীর কাছে অনেকবার শুনেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং তিনি নিজে দেখেছেন যে, শেষ বয়সে হাসন রাজা অন্যের খেদায় ধরা লাউড়ের একটা হাতী কিনে এনে ছোট মেয়ে জামাইকে তা যৌতুক দিয়েছিলেন। আজরফ সাহেবের বক্তব্য হল—'হাসন রেজার কোন স্থায়ী হাতীশালা ছিল না।'

তবে একথা ঠিক যে, ঘোড়ার প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল হাসন রাজার। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন এবং তাতে যথেষ্ট পটুত্বও ছিল তাঁর। তাঁর নানা রঙের ভালো ভালো ঘোড়া ছিল এবং এসব ঘোড়া নিয়ে তিনি সুনামগঞ্জ, সিলেট, করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জের মেলায় যেতেন এবং দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাঁর ঘোড়ারা যোগ দিত। একবার তিনি ঢাকাতেও গিয়েছিলেন, সেখানে নবাব স্যার খাজা আহসানউল্লা সাহেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'দরিয়াবাজ' ঘোড়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হাসন রাজার 'জং বাহাদুর' ঘোড়া জয়ী হয়ে সকলের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। তাঁর প্রিয় ঘোড়াগুলির তিনি নাম রেখেছিলেন: জং বাহাদুর, চান্দ মুসকী, খোদাদাদা, মুলকী মিট্‌সন ইত্যাদি। আর একটি ঘোড়ার নাম তিনি 'বাংলা বাহাদুর' রেখেছিলেন। 'হাছন পছন্দের' মতে নেটিভ বাঙালীদের প্রতি ইংরেজ জাতের সদম্ভ অবজ্ঞার সমুচিত জবাব হিসাবেই নাকি ঐ নাম তিনি সদর্পে রেখেছিলেন। তবে একটা কথা ঠিক যে 'অশ্বশালা' শুনলে পাকাপোক্ত স্থায়ী আস্তাবল নামে ঘোড়ার যে আস্তানার চিত্র আমাদের মনে জাগে তা কখনো তাঁর ছিল না। নিজের বসবাসের জন্য স্থায়ী ঘরবাড়ি বানাতে যিনি ছিলেন নারাজ, ঘোড়ার জন্য তেমন ব্যবস্থা করা ছিল অবশ্যই তাঁর কাছে সমান যুক্তিহীন। আজরফ সাহেব বলেছেন—'কাঁচা ভিটাতে ছনের ছানি ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘর তৈরি করে তিনি তাতে প্রিয় ঘোড়াগুলোকে রাখতেন।'

নৌকা রাইচেও উৎসাহ ছিল হাসন রাজা সাহেবের।

মাছধরাও ছিল তাঁর আর এক বাতিক। হাসন রাজার লক্ষ্মণশ্রীর বাড়ির পূর্বদিকে সুরমা নদী থেকে বেরিয়ে 'কামারখাল' নামে একটা খাল সুনামগঞ্জ শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের সীমারেখা নির্দেশ করে দক্ষিণমুখী হয়ে পড়েছিল 'দেখার হাওরে' গিয়ে। সেই হাওরের বড় বড় বিলে ছোটবড় মাছের কোন অভাব ছিল না। কখনো কখনো দেখেছি, হাসন রাজার নৌকো কামারখাল বেয়ে চলেছে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে, মাছধরার ছিপবড়শি ও সাজ-সরঞ্জামাদি এবং সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাসন রাজা বসে আছেন নৌকাতে, হয়ত বা একেবারে খালি গায়ে। সামাজিক ব্যাপারে জমকালো পোশাক আসাক পরে যেতেই তিনি ভালোবাসতেন তা ঠিক, কিন্তু মাছধরার মত কাজে আটপৌরে পোশাকে ও আদুড় গায়ে শহরবাসীদের কৌতূহলী দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যেতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর।

হাসন রাজা দোয়েল পাখি পুষতে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় নেশা ছিল 'কুড়া' পাখি শিকারে। শিকার করা মানে কিন্তু বধ করা নয়, পোষা কুড়ার সাহায্যে জংলি কুড়াপাখিকে জ্যান্ত ধরে আনা এবং তাকে পোষ মানানো। কুনকী হাতির সাহায্যে যেমন বুনো হাতিকে খেদায় বন্দী করে তাকে আস্তে আস্তে পোষ মানানো হয়, এও কতকটা সেইরকম। খেদায় হাতি ধরার মত কুড়া পাখি শিকারের ব্যাপারেও যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক জুটত। কিন্তু এর জন্য দীর্ঘকাল ধরে চলত প্রস্তুতিপর্বের এলাহি ব্যবস্থা। একদল নিপুণ কুড়াশিকারী থাকত এই কাজে মোতায়েন এবং তাদের প্রত্যেকের জিম্মায় একটি বা দুটি করে পোষা কুড়া। দিনের পর দিন শিকারের কৌশলক্রমে পোষা পাখিগুলোকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে তৈরি করে নিতে হত, তবেই তাদের দ্বারা কার্যোদ্ধার করা সম্ভব হত।

সকলের মনেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই কুড়া পাখি নিয়ে এত মাতামাতি করার কারণ কি ছিল? সালিম আলি ও এস ডি বিপ্লে প্রণীত এবং বোম্বাইর অকস-ফোর্ড য়্যুনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হ্যাণ্ড বুক অফ দ্য বার্ডস অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্থান। নামক বইয়ের একটি মন্তব্য এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য—'পূর্ব পাকিস্থানের সিলেটে শিকারী পাখি হিসাবে এই পাখির (কুড়া) দারুণ কদর। এদের শক্তিপরীক্ষার লড়াইয়ের উপরে বহু টাকার বাজি ধরা হত।' মুরগির লড়াই দেখতে যে লোক ভেঙে পড়ে, এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। আর, সেকালে কলকাতার 'বাবুরা' বুলবুলির লড়াইয়ে রেষারেষি করে হাজার হাজার বা লক্ষ টাকা খোলামকুচির মত ব্যয় করতে পেছপা হতেন না। কুড়া পাখিও অনুরূপ আভিজাত্য লাভ করেছিল সিলেটের বিলাসী মহলে, বিশেষভাবে ভাটি অঞ্চলে।

শুধু সিলেট নয়, মৈমনসিং-এও কুড়াপাখি যে অতি মূল্যবান পাখি বলে পরিগণিত হত তার প্রমাণ পাই ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' পালাটিতে। তার নায়ক চান্দ বিনোদ বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে গৃহহীন ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং এই দরিদ্র অবস্থার জন্যই মলুয়াকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে মলুয়ার বাবা অনিচ্ছুক হলেন। তখন বিনোদ কুড়া পাখি শিকার করে বহু টাকা রোজগার করল এবং তার দ্বারা বাড়ি ঘরদোর জায়গা জমির মালিক হয়ে অবশেষে মলুয়াকে বিয়ে করতে সমর্থ হল।

'কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল
জমীন বাড়ী।
ইনাম বকশিস পাইল কত কইতে
না পারি।।
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয়
হইল তারে।
কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্যা
দিল তারে।।'

পাখি বিক্রি করে এত অর্থোপার্জন করা সহজ কথা নয়। 'রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব'কে নিশ্চয়ই হাসন রাজা সাহেবের মত কুড়াপাখি সংগ্রহের দুর্দান্ত নেশার ধরেছিল এবং এই বিলাস বাসনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।

প্রথমোক্ত বই থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে 'কুড়া' বা 'কোড়া' পাখির ল্যাটিন নাম হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে পাকিস্থানের সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে পূর্বতম প্রান্তে আসামে ও বাংলাদেশে এবং দক্ষিণ ভারতে আবার তার থেকে পূব ও দক্ষিণ দিকে সিংহলে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ ও পূর্ব চীনে, কোরিয়া, জাপানে, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো, ফিলিপাইন প্রভৃতি অঞ্চলে এই পাখির বাসভূমি। জলাভাবিত জায়গায় এরা বসবাস করে—নলখাগড়ার জলাভূমি, যেসব জলমগ্ন নীচু জায়গায় ধান বা আখের চাষ হয় সেখানে, খাল, নালা ও পয়ঃপ্রণালীর জলস্রোতের কাছে, এমনকি, পুকুর-খানা-খন্দ ডোবাতেও এরা থাকতে ভালোবাসে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে এই পাখি পরিচিত—হিন্দিপ্রধান অঞ্চলে এর নাম কোড়া বা কাংড়া, বিহারে ভুরকা অথবা কোড়া বঙ্গদেশে কোড়া অথবা জলমোরগ, আসামে খোরা সেরাই, মণিপুরে উতুম্ (সম্ভবত পাখির ডাক থেকে এই নামকরণ)। কুড়াপাখি মাথা উঁচু করে একটানা দশ বারোবার ডাক ছাড়ে কক্-কক্, কক্-কক্ আওয়াজ বলে, তারপর একসময় হঠাৎ আবার মাথা নামিয়ে ভরাট গলায় ধাতব আওয়াজে ঘন ঘন নতুন ধরনের ডাকে মেতে ওঠে — উতুমর উতুমর উতুমর্। অন্তত আধ ঘন্টা ধরে এক নাগাড়ে চলে এই দুই ধরনের ডাক।

কুড়া পাখির খাদ্য সাধারণত জলজ পোকা-মাকড় ও তাদের শূককীট, শামুক-

গুলোলি, ধান, বীজ, নানা রকম শস্যের দানা এবং সবুজ শস্যের শীষ ইত্যাদি। অনেক দিক দিয়েই কুড়া পাখির কাছাকাছি পাখি হল ডাহুক। আকারে কুড়া প্রায় তিতির পাখির সমান—পুরুষ কুড়া ১৬।১৭ ইঞ্চি ও স্ত্রী ১৩।১৪ ইঞ্চি হয়ে থাকে। কুড়া পাখির ঠ্যাং লম্বা, তবে ঠিক বকের মত নয়, বরঞ্চ অনেকটা মুর্গির মত এবং অন্যান্য শিকারী পাখির মত কুড়ারও ছুঁচাল এবং ধারাল নখর, সামনের দিকে সামান্য বাঁকান। কুড়া পাখির মাথায় ঠিক ঝুঁটি নেই, তবে প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখির মাথায় একটা মাংসল শিং-এর মত গজিয়ে ওঠে, দেখলে মনে হয় যেন ছোট ত্রিভুজাকৃতি একটা ঝুঁটি—উপর দিকটা টকটকে লাল, তলার রং হলুদে। তার ঠোঁটের গোড়ার রংও লাল এবং ধারাল ও ডগার দিকটাতে ক্রমশ কালচে হলুদের রং ধরান। কুড়ার পা মাটি-মেটে বাদামী রঙের, তাতে কিছুটা সবুজের ছোঁয়াচ। তার গায়ের রং মোর বাদামী। কুড়া পাখির চোখের মণির চার পাশের বৃত্তাকার অংশ জ্বলজ্বলে রক্তবর্ণ।

এবার হাসন রাজা সাহেবের কুড়া শিকার করার একটা বর্ণনা শুনুন, জেনেছি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কাছ থেকে—কুড়ার বাস উন্মুক্ত আকাশের নীচে হাওরে দামাদলার উপরে এবং হাওরেই কুড়া শিকার হয়। পোষা কুড়াকে নিয়ে শিকারী নৌকাযোগে হাওরে বেয়ে তার পোষা কুড়াকে ডাক দিতে প্রবোচনা দেয়। সেও মালিকের ফরমায়েসমত ডাক ছাড়লেই জংলী কুড়া এ ডাকের জওয়াব দেয়। এভাবে কিছু সময় ডাকডাকির পরে ক্রমেই জংলী কুড়া ঘরোয়া দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে শিকারী তার কুড়াকে ছেড়ে দিলে উভয়ে যোরতর যুদ্ধ হয়। সে সময় জংলী কুড়ার সঙ্গে ঘরোয়া কুড়ার একেবারে ল্যাপটা-ল্যাপটি ভীষণ বন্ধ হয় এবং জংলী কুড়ার উন্মত্ত বাগের সুযোগে শিকারী তাকে ধরে নেয়। তবে অধিকাংশ সংখ্যক ক্ষেত্রে উভয়ে মারামারি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে জংলী কুড়ার অবসানের সুযোগে শিকারী তাকে ধরে নেয়। আমি হাসন রাজা সাহেবের সঙ্গে ছেলেবেলায় কুড়া শিকারে গিয়েছি। তিনি তাঁর বিরাট ভাওয়ালিযোগে মাস-খানেকের জন্য শিকারে বের হতেন এবং কবিমগঞ্জের বদরপুর থেকে সুনামগঞ্জের সেলবর্ষ পর্যন্ত নানা জায়গায় বর্ষার দিনে সাঙ্গপাঙ্গো নিয়ে শিকার করতেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর নায়িকারাও থাকত এবং তারা উৎসুক গ্রামবাসীদের গান শোনাত।

বর্ষাকালটা কুড়া পাখির মিলনের ঋতু, তাই বর্ষাকালেই হাসন রাজা বেরুতেন কুড়া শিকারে। শিকারের উত্তেজনায় উল্লাসে অবসর বিনোদনের আমোদ ত্রুটিত যথেষ্ট, কিন্তু গানের কথা কি গান-পাগল হাসন রাজা ভুলে থাকতে পারেন কখনো? তাই গানের দলবলও থাকত। তাঁর সঙ্গে, তারা পথযাত্রায় গ্রামে গ্রামে হাসন-গীতি শুনিয়ে মাতিয়ে রাখত গ্রামবাসীদের এবং হাসন রাজাকে প্রেরণা দিত নতুন নতুন গান রচনা করার।

কুড়া পাখি ও কুড়া শিকারের কথা একটু বিশদভাবেই বলা চলা। এই কুড়া শিকারই ছিল হাসন রাজার সবচেয়ে প্রিয় বিলাস-ব্যসন এবং নিজেকে তিনি একজন অভিজ্ঞ কুড়াবিশারদ বলে মনে করতেন। কুড়াকে নিয়ে তিনি গানও রচনা করেছেন, একটি গানে তিনি গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন—

কুড়ার গুণ যত আমি জানিয়াছি ভাই
আমার মত জানে লোক বেশী দেখি নাই।
* দু'এক কুড়া পালি চিনযাব
দাবি করে
তবে কি লিখিব আমি
আকলে না ধরে।।
(৩৫) আকলে=আক্কেলে, বুদ্ধিতে)

দাবা খেলারও শখ ছিল হাসন রাজার। সুনামগঞ্জ শহরে দাবা খেলোয়াড় হিসাবে কিছু খ্যাতি ছিল বাবার, হাসন বাবা তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতে মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাসায়। তখন ছেলে-মানুষ ছিলাম, তাঁদের খেলার আসরের পাশে বসে উভয় পক্ষের কাটা ঘুঁটিগুলোকে দখল করে সেইগুলো নিয়ে আপন মনে ছেলেমানুষী খেলা চলত কিশোর বালকের। তখন কাছে থেকে হাসন রাজা সাহেবকে দেখার সুযোগ ঘটেছে এবং তাঁর স্নেহ-শীল মনের পরিচয় পেয়েছি সেই সময়। জীবনের পরিক্রমায় কত অজস্র লোকের সংস্পর্শে আমরা এসে থাকি, তাদের অনেকের স্মৃতিই ঝরাপাতার মত ঝরে পড়ে মুছে যায় মন থেকে, কিন্তু মুষ্টিমেয় জনকয়েকের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকে সারা জীবন। হাসন রাজা ছিলেন এমনিতর একজন ব্যক্তি।

ছুটির দিনেই দাবা খেলতে আসতেন হাসন রাজা। মনে পড়ে, অন্তত বার দুয়েক তাঁকে দেখেছি রবিবার সকালে আসতে। তখন দুপুরের আহার্যও সঙ্গে নিয়ে আসতেন তিনি এবং নিশ্চিন্তে দিনভর জমিয়ে দাবা খেলা চলত তাঁদের, শুধু মধ্যাহ্নভোজনের জন্য খানিকক্ষণ বিরতি দিতে হত, এই যা। আমাদের বাসায় যখন তিনি আসতেন, সে সময়কার এক অপূর্ব সমারোহের দৃশ্য কোনদিন ভোলবার নয়। সুনামগঞ্জের আধা-গ্রাম্য শহরে তন গাড়িঘোড়া যানবাহন বলতে কিছুই ছিল না, সকলকেই যাতায়াত করতে হত পদব্রজে। শুধু দিনের বেলায় মেয়েদের আবরু বাঁচিয়ে চলার জন্য ছিল গুটিকয়েক ডুলি। সাইকেল তখন আবি-ষ্কৃত হয়ে থাকলেও সুনামগঞ্জে আমদানী হয় নি, মোটর ত স্বপ্ন। হাসন রাজা সম্ভবত তাঁর ভাওয়ালি বা অন্য কোন নৌকায় তাঁর বাড়ির ঘাটে চড়ে সুরমা নদীর উজান বেয়ে এসে পৌঁছতেন শহরের জাহাজ ঘাটে, সেখানে থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব ছিল ফর্লংখানেক। এই পথটুকু তিনি আসতেন মানুষের কাঁধে চেপে। এমন অভিনব কাণ্ডকারখানা জীবনে আর কখখো দেখি নি, শুধু পড়া ছিল সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পে। তাঁর সঙ্গে থাকত এক দঙ্গল সাঙ্গোপাঙ্গো ও খিদমদগার। শক্ত সমর্থ জোয়ান একজন ত হত তাঁর বাহন, তার মাথায় বড় ছাতা ধরত অন্যজন। তা ছাড়া কারো হাতে থাকত পিকদানী, কারো হাতে পানের ডিবে—অবিশ্রান্ত পান খেতেন হাসন রাজা। তাদের সকলকেই চলতে হত খানিকটা দৌড়ে দৌড়ে, বাহন বাহন লোকটির হনহনিয়ে চলার সঙ্গে তাল রেখে বেখে। দলের আর কাকে কি করতে হত অতশব খুঁটিনাটি মনে নেই, তবে আহার্য সামগ্রী, থালা ঘটিবাটি বদনা ইত্যাদিও বয়ে আনতে হত কয়েকজনকে। এই বিচিত্র ও অভূতপূর্ব দৃশ্য দোর সঙ্গে সঙ্গে ছবির মত মনের কোণে তা আঁকা হয়ে রয়েছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু হাসন রাজা সাহেবের এই অলৌকিক অভিযান পর্ব একটি মজাদার চলচ্চিত্রের মত আমা-দের মনে যতই কৌতূহল জাগাক না কেন, তাঁর কোন ভাবান্তর হত না এতে, তিনি নির্বিকারভাবে বসে থাকতেন তাঁর ভার-বাহী বাহনের কাঁধে চেপে। যারা তাঁকে কাঁধে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াত, তারা কাজটাকে হীন বা অপমানকর মোটেই মনে করত না, বরং এতে গৌরবই বোধ করত তারা, আর এই কাজের পক্ষে তাদের দৈহিক শক্তিসামর্থ ছিল সন্দেহাতীত।

হাসন রাজার কথা বলতে বলতে অনেক সময় আমাদের মনে হয়েছে যে, একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ওর চরিত্রের যেন অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। তিনি হলেন মোগল সম্রাট শাহানশা আকবর। অবশ্য একজন ছিলেন বিশাল সাম্রাজ্যের পরাক্রান্ত অধীশ্বর, অন্যজন এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য জমিদারমাত্র, যেন সাগরের তুলনায় গোষ্পদের জল। ধনৈশ্বর্য, ভূম্যধিকার, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদির নিরিখে দুজনের মধ্যে ছিল যাকে বলে আসমান জমিন ফারাক। সমকক্ষতার প্রশ্নই

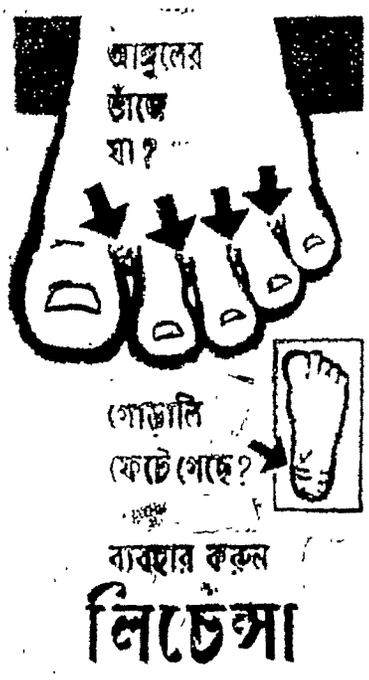

ওঠে না, তবু আপন আপন জীবনবৃত্তে উভয়ের মধ্যেছিল এক ধরনের চারিত্রিক সমতা। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হাসন রাজাও ছিলেন সর্বেসর্বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তারও প্রাচুর্যের অভাববোধ ছিল না। দুজনের ছিলেন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর, অথচ যার যার রাজ্য ও জমিদারী পরিচালনায় উভয়ে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। দুজনেই শৌখিন এবং নানা বিলাসব্যসনের শখ মিটিয়ে অবসর যাপন করতে ছিলেন অভ্যস্ত। শরীয়তের আইন বাঁচিয়ে হারেমে পত্নী-উপপত্নীদের সংখ্যা সীমিত রাখার ধাত ছিল না কারো, বস্তুত এই সব আশ্রিতা নারীদের সঙ্গ-সম্ভোগে বীতস্পৃহা ছিলেন না কেউই, কিন্তু এসব সত্ত্বেও দুজনের মধ্যেই একটা সহজাত অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত ছিল। আকবর বাদশাহ সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং তিনি বিশেষভাবে হিন্দু মুসলমানের সহজ মিলনের সুর বেজে উঠেছে। একটি বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য। সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টির বিধিদত্ত প্রতিভা নিয়ে হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আকবর ছিলেন তাতে বঞ্চিত, যদিও তার মত যথার্থ সঙ্গীতরসজ্ঞ বিরল। সাম্রাজ্য-পরিচালনায় ও রাষ্ট্রনৈতিক কুশলতায় আকবরের অসামান্য কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ হই, বুদ্ধি বিচার দিয়ে বুঝতে পারি তার মহিমা। আর হাসন রাজা তাঁর মধুর পল্লীগীতি দিয়ে স্নিগ্ধ করেন আমাদের মন-প্রাণকে, তিনি আসন পেয়েছেন লোকের হৃদয় রাজ্যে।

৫ উপসংহার

গীতিকার হাসন রাজা প্রথম কিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত, তাঁর গানের পরিচয়, তাঁর মানস-জগতের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কার্যধারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ভিতর দিয়ে গোটা মানুষটিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এখনো অপ্রকাশিত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, তাই আলোচনাটি যে অনেক দিক দিয়েই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, এ সম্বন্ধে লেখক সম্পূর্ণ অবহিত. তবে তথ্যাদি পরিবেশনে যাতে ভুলভ্রান্তি না ঘটে তার জন্য সতর্ক-ভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে।

বিচিত্র-চরিত্র হাসন রাজাকে বহুকাল আগে কাছে থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল এবং কিশোর চিত্তকে তিনি তখন অসাধারণ আকর্ষণে নাড়া দিয়েছিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আজও সেই স্মৃতি অম্লান রয়েছে। তারপরে তাঁর কথা অনেক শুনেছি, অনেক জেনেছি, তবু যেন তাঁকে জানতে আরও অনেকখানি বাকী ছিল। সেই সব পুরনো স্মৃতি ও শোনা কথাকে ঝালিয়ে নিয়ে হাসন রাজা নামধেয় সত্তাকে নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করতে কিছুকাল যাবৎই অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেম। তার থেকেই এই রচনার সূত্রপাত। বাংলাদেশে হাছন রাজা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণাদি চলছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি অনেকটা অপরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধ এই অপরিচয়ের দূরত্ব যদি খানিকাংশে ঘুচিয়ে দিতে পারে তবেই তার সার্থকতা।

লেখার ভিতরে হাসন রাজার কতকগুলো গানের সম্পূর্ণাঙ্গ এবং অনেকগুলোর আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ক্রমিক নম্বর দিয়ে গানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বানানসমেত গানের কথা যাতে হাছন উদাস বইয়ে মুদ্রিত মূল পাঠ অনুযায়ী যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয় এবং তার থেকে কোন রকম বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে, তবে এ বিষয়ে বহুলাংশে অন্যদের উপরেই নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে, যেহেতু লেখকের কোন নিজস্ব হাছন উদাস বই-এর কপি নেই। এই প্রবন্ধ মুদ্রণের সময়েও কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। ১-৭নং ৯ ও ১০নং ১৩-১৫নং, ১৮-২০নং, ২২ ও ২৪নং এবং ২৬-২৮ নম্বর গানগুলি হাছন উদাস প্রথম মুদ্রণ থেকে নেওয়া এবং বাকীগুলো অর্থাৎ ৮, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ২৫ এবং ২৯-৩৪ নম্বর গান বইয়ের ২য় মুদ্রণ থেকে প্রাপ্ত। ৩৫ নম্বর গানটি হাছন পছন্দের কাছ থেকে পাওয়া।

হাছন উদাস প্রথম মুদ্রণ অনুযায়ী গানগুলির কপি শ্রীপ্রভাতকুমার শর্মার সৌজন্যে প্রাপ্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণের গানগুলি ঢাকার প্রতিচ্ছবি থেকে প্রকাশিত হাছন রাজার গান ও সাধকগীতি (প্রথম খণ্ড) পুস্তিকা থেকে প্রধানত প্রাপ্ত। এ ছাড়াও বিভিন্ন গানের কপি দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীমান নির্মলেন্দু চৌধুরী ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী বীণা মজুমদার।

অনেকের সহৃদয় সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে বর্তমান রচনার কাজে হাত দেওয়াই সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে প্রথমেই ঋণ স্বীকার করতে হয় শ্রীপ্রভাতকুমার শর্মা ও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কাছে। লেখার ভিতরে নানা প্রসঙ্গে যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, হাসন রাজা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কিছু কিছু তথ্যাদির জন্য আজরফ সাহেবের শরণাপন্ন হয়েছি এবং যখনই কোন বিষয়ে কোন সংশয়ের কথা তাঁকে জানিয়েছি তখনই তিনি তা সাগ্রহে নিরসন করতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি ছাড়া বাংলাদেশের মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, মুহম্মদ আবদুল হাই হাছন পছন্দ এবং সৈয়দ মুর্তাজা হয়েছি। তাঁদের ঠিকানা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা শ্রীমান দাউদ হায়দার করে দিয়েছিলেন। তার উৎসাহ-দীপ্ত তরুণ সাহচর্য নানাভাবেই প্রীতিপদ ও সহায়ক হয়েছে।

এ ছাড়া আরো নানাভাবে যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা না পেলে প্রবন্ধ কাজে সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হওয়াই সম্ভবপর হত না, তাঁরা হলেন ইউ এস আই এসের ডিরেক্টর শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী ডঃ মদন-মোহন কুমার, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, জুলজিক্যাল সার্ভের ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস ও শ্রীদিলীপকুমার ঘোষাল, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, স্নেহভাজন শ্রীমান উৎপল দাশ-গুপ্ত প্রভৃতি। উল্লিখিত সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যদিও তাতে ঋণ শোধ হয় না। শুভানুধ্যায়ী অনেকের কাছ থেকে বর্তমান কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি, এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই তাঁদের কথা বিশেষভাবে স্মরণে আসছে।

শেষ

যাঁদের দেখেছি
অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

মিলিটারীরা একটা তার দিয়ে বেড়া দেয় না। অন্ততঃ দশ-বারো ফিট জায়গা জুড়ে চারদিকে একগজ লোহার খুঁটি অনেকগুলো পোঁতা হয় এবং সেই সব খুঁটির সঙ্গে কাঁটাতার জড়িয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। কাজেই কাঁটাতারের বেড়া এড়িয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। জেলের সামনে এক কোম্পানি মিলিটারীর ছাউনি পড়েছিল। ঘন ঘন অফিসারদের আগমন ও ইন্সপেক্সান সিপাইদের সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে বাধ্য করেছিল। এই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে জেলখানার প্ল্যান তারা প্রায় শেষ করে। পাহাড়ের উপরে কমিশনার সাহেবের বাংলো। পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটি বড় রাস্তা গেছে এবং সেই রাস্তার সঙ্গে লাভলেনের সংযোগ ছিল যেটি নাকি ইউরোপীয়ান ক্লাবের পাশ দিয়ে পুলিশ লাইনে যায়। লাভলেনের উপরে তারা তিনটি ল্যান্ডমাইন পোতার কাজ প্রায় সমাপ্ত করে। এইটি খুবই দুরূহ কাজ ছিল —কারণ, রাত্রিবেলাতেও পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ি প্রতি পাঁচ-দশ-পনের মিনিট অন্তর প্রায় প্রত্যেকটি রাস্তার উপর দিয়ে টহল দিত, বিশেষ করে এই লাভলেনটির উপর দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ি হরদম যাতায়াত করতই। আগেই বলেছি পাঁচ সের ও দশ সের কানেস্তারায় বারুদ ভর্তি করে ল্যান্ডমাইন তৈরি হয়েছিল। এইসব ল্যান্ডমাইন ইটের রাস্তার নীচে চোখের অন্তরালে পুঁতে রাখা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তবু তারা সেই দুঃসাধ্য কাজও কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ ছিল, তারা অনুরূপ রাস্তা খুঁড়েই ভারি ক্যানেস্তারা পুঁতে রাখার মহড়া দেয়। ইটের রাস্তা খোঁড়ার পরে যদি রাস্তাটা খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দেওয়া না যায়, তবে যে-কোন একটি জিনিস পোঁতা আছে, তা বোঝা সম্ভব। সেইজন্য খোঁড়ার সময় হুঁশিয়ার হয় যেন খুব তাড়াতাড়ি খোঁড়া শেষ করতে পারে এবং খোঁড়ার জন্য ছোট যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। যেখানে গর্ত খুঁড়বে, তার পাশেই চট রাখত আর মাটি ইট প্রভৃতি খুব তাড়াতাড়ি খুঁড়ে চটের উপর রাখত। আর খোঁড়া শেষ হলে সেগুলো দিয়ে চাপা দিয়ে খুব ভাল করে রাস্তার অন্য অংশের সঙ্গে মিশিয়ে দিত যেন বোঝা না যায়। তবে সবচেয়ে বড় মুশকিল ছিল, পুলিশের গাড়ি যখন-তখন রাস্তা দিয়ে যেত, তারজন্যই সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল। যে গর্ত করত, তার একশো গজ, দুশো গজ দূরে রাস্তার দুদিকে পাহারা থাকত। তারা সেখান থেকে যত-দূরে সম্ভব দূরে দেখতে পেত কোন মোটর ট্রাক বা গাড়ি আসছে কিনা। সেই-রকম গাড়ির আগমনবার্তা জানতে পারলে তারা তখুনি মাটি-ইটগুলো পোঁটলা বেঁধে নিত আর লোহার পাতটি টেনে এনে গর্ত ঢেকে দিত। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কোন একটি পাশে, বিশেষ কোন আড়ালের পাশে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। গাড়ি চলে যাওয়ার পর আবার এসে তাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করত। এইরকমভাবে বহু ধৈর্য ও কৌশলের সঙ্গে ল্যান্ডমাইন বড় রাস্তার উপরে পুঁতে রাখতে হয়। কেবল লাভলেন নয়, অন্যান্য রাস্তাতেও তারা ল্যান্ডমাইন এইভাবে

পুঁতে রাখে। যদি তাদের কাছে ডিনামাইট থাকত, তবে এত পরিশ্রম হতই না। কারণ ডিনামাইট অনেক ছোট। ল্যান্ডলেনের রাস্তার উপর দিয়ে ট্রাইব্যুনালের দুজন কমিশনার ও একজন প্রেসিডেন্ট একসঙ্গে একই গাড়িতে যাওয়া-আসা করত।

ট্রাইব্যুনালকে খতম করার উদ্দেশ্যে তারা কাছারি পাহাড়ের উপরে ট্রাইব্যুনালের আসা-যাওয়ার পথে ল্যান্ডমাইন বিশেষভাবে বসাবার ব্যবস্থা করে। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের নিয়ে মোটরগাড়ি সামনে দিয়ে ঘুরে কোর্টের পেছনে যেত। আর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতেন। কোর্ট ঠিক পাহাড়ের উপরে। কোর্টের চারপাশে যে রাস্তা গেছে, তার প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তরের রাস্তাটি প্রায় দশ-বারো হাত নীচু দিয়ে গেছে। ল্যান্ড-মাইনগুলো বসানো হয়েছিল উপরের পথটিতে রাস্তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে। তার কারণ যদি একটি ল্যান্ডমাইন গাড়ীর ঠিক নীচে না পড়ে, তবে কোন না কোন একটি পড়বেই। এই তিনটি মিলিয়ে একটি তার গিয়েছিল মাটির নীচে দিয়ে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে। সেটি আবার আরেক ধাপ নীচে আরেকটি পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে খুব আড়ালে বসে সুইচ টেপা যায়, এমন স্থানে রাখা হয়েছিল। এই প্রস্তুতিটির উদ্দেশ্য ছিল ট্রাইব্যুনালের গাড়ী যখনই মোড় ঘুরবে তখনই বিস্ফোরণ করা হবে। তাছাড়া আরো বন্দোবস্ত ছিল। এই রকম একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে যাবার পর পুলিশ ও মিলিটারীর বড় বড় সাহেব ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশানাল কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেনই, তাই তাদের ধ্বংস করার করার উদ্দেশ্যও সম্ভাব্য দুটি স্থানে আর দুটি ক্যানেস্তারা পুঁতে রাখা হোল এবং তার ও সুইচ ভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়া সম্ভাব্য বিস্ফোরণের উদ্দেশ্যে আরও দুটি ল্যান্ড-মাইন পুঁতে রেখে সুইচ ও তার অন্যত্র গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল।

যেদিন কোর্টে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল সেই দিন একটি ল্যান্ড-মাইন পোঁতা হয়নি বলে কাজ শেষ হল না। তারা কাজ শুরু করত রাত সাড়ে বারোটা একটার সময়। কাছারি ট্রেজারী বিল্ডিং ও ট্রাইব্যুনাল কোর্টের অংশ-টুকুতে এক কম্প্যানি সৈন্য প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকত। এত লোকের মধ্যে অনেকেই রাত্রিবেলা পায়খানা, পেচ্ছাপ করতে উঠত, কাজেই তাদের এড়িয়ে এই পোঁতা কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পুঁতে রাখার যে রকম বর্ণনা আগে দিয়েছি সেই রকম ব্যবস্থা করে পাহারা মোতায়েন রেখে কাজ শুরু করত অর্থাৎ যদি কাউকে সেদিকে আসতে দেখতো, তবে একটি সংকেত দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোত। কোন একটি ঢিল মেরে বা পাখীর শব্দের মত কোন শব্দ করে তারা সংকেত জানাত। ঠিক এই রকম ভাবে তারা আরেকটি বাড়ী, যে বাড়ীর খোঁজ তারা নিজেরাই পুলিশকে দিয়ে ডেকে আনবে ঠিক করেছিল, সেই বাড়ীর কামরাতেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সুইচে ল্যান্ডমাইন সংযুক্ত করা ছিল। একটি বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই সংবাদ পেয়ে বড় অফিসাররা আসতই। তখন তাদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হোত।

শেষের দিন কোর্টে ল্যান্ডমাইন সব কটি পোঁতা হল না, একটি মাত্র বাকি ছিল। ভোরে খালি গায়ে একটু কাদা-টাদা মাখা গায়ে সেই ল্যান্ডমাইনটি নিয়ে তাদের একজন খুব বিশ্বাসী কমরেড নিজের বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। জেলের সামনের রাস্তার উপর জেল ওয়ার্ডার তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে নাকি সন্দেহ করে এবং তাকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়, পুলিশ থানায় তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই গ্রেপ্তার করে।

সবার মনে হবে এক্সিডেন্টালি জেল ওয়ার্ডার তাকে সন্দেহ করে ফেলল। তাই এই রূপ ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, এইটি পুলিশের একটি তৈরী ফাঁদ। প্রশ্ন আসবে পুলিশ কি করে জানবে সেইদিন ল্যান্ডমাইন সবকটি পোঁতা

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন
ইনক্রিমিন* টনিক দিয়ে

বাড়তি আহারকে
বাড়তি বৃদ্ধিতে
পরিণত করে

এর উৎপাদন
মিলারিয়ার ফার্মাসিউ কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Sista's-INC-915A/77 BENG

হয়নি? আর কি করেই বা তারা মানবে এই রাস্তা দিয়ে সেই ছেলেটি ল্যান্ডমাইন নিয়ে যাবে? এই প্রশ্ন শুনে লোকের মনে হবে যে এইটি তৈরী ফাঁদ হতে পারে না। কিন্তু আমি বলছি এইটি তৈরী ফাঁদ হতে পারে কারণ যে গ্রুপটি সেই রাত্রি-বেলা ল্যান্ডমাইন পুঁতে রাখতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে যে পুলিশ এজেন্ট ছিল, সে যদি ইচ্ছে করে অনুপস্থিত থাকে, তবে তার অনুপস্থিতিতে সবকটি ল্যান্ডমাইন পোঁতা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, যদি ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে কে কে সাধারণতঃ ফিরিয়ে নিয়ে যায়? আমার মতে পুলিশের পক্ষে পুরোটা জানা সম্ভব ছিল না কিন্তু এগুলো জানা সম্ভব হয়েছে কারণ তাদের এজেন্ট নিশ্চয় ছিল। কাজেই নিবারণকে জেল ওয়ার্ডার ধরবে তাতে আশ্চর্য কি। যদি আই,-বি, পুলিশ গ্রেপ্তার করত তবে দলের লোক ধরে নিত যে, দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আমি যেভাবে বললাম সেভাবে যদি গ্রেপ্তার ঘটানো যায় তবে ভাল ভাবেই বিভ্রান্ত করা সম্ভব এবং পুলিশের যে কোন কার-সাজি আছে, তা বিপ্লবীদের বোঝা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু আমি আমার বিভিন্ন ষড়-যন্ত্রমূলক কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকু বলতে পারি, এটি পুলিশের কারসাজি এবং এই ভাবে জেল ওয়ার্ডারকে দিয়ে ধরানোটা পুলিশের ইচ্ছায় ঘটেছে।

নিবারণ ধরা পড়ার পরে পুলিশ কয়েকটি বাড়ী সার্চ করল এবং কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারও করল। মনে হবে যেন নিবারণই ঐসব বাড়ীর খোঁজ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, নিবারণ সেই সব কোন খবরই দেয় নি। পুলিশের এটাও কর্তব্য তাদের গুপ্তচরদের অস্তিত্ব গোপন রাখা। তাই তাদের প্রচেষ্টা থাকে গুপ্তচরদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যের প্রতি সন্দেহ উদ্রেক করাবার।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি যা বুঝেছি, বৃটিশ আমলে টেন্ড পুলিশ অনেক বেশি তাদের কাজে ফলবান হয়েছে, আর এই যুগে আমাদের স্বদেশী আমলের পুলিশরা ততোধিক যেন অসহায় হয়ে পড়েছে। মূল দোষ হচ্ছে যে, বর্তমানে পুলিশ স্টাফ-দের কাজ করতে হয় প্রচুর, তাদের সময় হাতে থাকে না। সেই একটি মার বিশেষ কারণে বর্তমানের পুলিশের কাজের সফলতা কম দেখা যায়। নিবারণকে ধরার পর কোর্ট অফিসের পাহাড়ের উপরে যে স্থানে তারা ল্যান্ড-মাইন পুঁতে রেখেছিল, সেগুলি তারা খুঁড়ে বার করল, ইলেকট্রিক তারও তারা খুঁড়ে খুঁড়ে বার করেছিল। কাছেই সুইচ বোর্ডগুলি কোথায় ছিল তাও তারা পেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নিবারণই এগুলি ধরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি বলতে পারি সে ধরিয়ে দেয়নি। দুশো-আড়াইশো গজ দূর থেকে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালাতে হলে সামান্য টর্চলাইটের ব্যাটারিতে খুব সহজ হয় না, তার জন্য মোটরের স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবেই। স্টোরেজ ব্যাটারিগুলোও তারা প্রত্যেকটি সুইচের সাথে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। ইলেকট্রিক বাল্ব যা বাড়িতে জ্বালাই, সেই বাল্ব ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, সেই বাল্বের তার রাস্তার উপরের গাড়ির যাওয়ার ধাক্কা সহ্য করতে পারবে না। সেইজন্য আমরা সেগুলোতে মোটরের হেডলাইটের বাল্ব ব্যবহার করি।

এই বিরাট ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা আবিষ্কার করার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও এত আয়োজন তারা কি করে করতে পারল। যেদিন নিবারণকে ধরল, সেদিন তারা তাদের একটি প্রধান ঘাঁটিতেও অনুসন্ধান চালায় এবং কাউকে কাউকে সেখানে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। আমাদের মামলার আসামী অর্ধেন্দু গুহ ও অনিল রক্ষিতকেও বন্দী করে। পুলিশ হানা দেয় দিনদুপুরে তাদের 'ছোট কারখানায়' অর্থাৎ যেখানে ল্যান্ড-মাইনগুলো প্রস্তুত হত। যে বিবরণ এত-ক্ষণ পর্যন্ত দিলাম, তা হচ্ছে অপারেটিভ পার্ট। কিন্তু এর পেছনের প্রস্তুতিপর্ব কত যে ভীষণ ও কঠিন, তা না জানলে বোঝাই যাবে না। পুলিশ হানা দিয়ে প্রায় দশ মণ গান-পাউডার ও ক্যানাস্তরা আটক করল ও নানাজনকে বন্দী করল। একে সংগঠনের প্রথম সারির অনেক লোকের বিচার হচ্ছিল, তাছাড়া আরও অনেকে এই ব্যাপারে ধরে নিয়ে গেল। কাজেই এই ডিনামাইট পর্বের প্ল্যানটি কার্যে পরিণত করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ও দুষ্কর হয়ে পড়বে। পুলিশ মিলিটারীর তৎপরতা বেড়ে গেল। তাদের যেখানে এইসব বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত হত, সেইসব জায়গাগুলো পুলিশ জেনে ফেলেছিল। তাই নতুন লোক নিযুক্ত করতে না পারলে অল্প সময়ের মধ্যে আবার অনেকগুলো ল্যান্ডমাইন তৈরি করা সম্ভব হত না। 'বিপ্লবী সদস্যদের প্রত্যেকের বাড়ি এক-একটি দুর্গ হবে'—এই স্লোগানটি বারে-বারে তাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছিল। এই স্লোগানই প্রাণে শক্তি জোগায়, সাহস জোগায় আর ল্যান্ডমাইন আবার প্রস্তুত করার জন্য তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। সেই সময় এই কালি দে-র স্ত্রী বারুদ তৈরি করার জন্য জাঁতাকলে কয়লা পিষতে লাগল। তার বাবা কুল গাছ কেটে আন-লেন এবং তা পুড়িয়ে কয়লা করলেন। তার মা ও স্ত্রী পোড়া পেষা কয়লা থেকে কাপড় দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মিহি পাউডার বার করে নিল। সোরা এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, তা জাঁতাকলে পিষে নেওয়া হয়েছিল। গন্ধক আরেকটি রাসা-য়নিক পদার্থ তাও পিষে নেওয়া হয়েছিল। এইসব জাঁতাকলে পেষা কাজ কালি দে-র বাড়িতে পুরো উদ্যমে চলেছিল। এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন কালি দে-র কাকা, বাবা, মা, তার পাড়ার দুই ছেলে। তাঁরা দিন-রাত পেষা, ছাঁকা ও মেশানোর কাজে নিযুক্ত হলেন ও বাড়ির বাইরে উপযুক্ত স্থানে পাহারা রেখে সেই বাড়িতে দিনরাত কাজ চলল। পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে যে দশ মণ তৈরি পাউডার তাদের ফেলে দিতে হয়েছিল, সেটাকে পূরণ করতে চেষ্টা করেও মাত্র পাঁচ মণ তৈরি করে। সেই অবস্থায় এই পাঁচ মণ গান-পাউডার তৈরি করাও একটি দুরূহ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে। তাদের অনেকগুলো গুপ্ত জায়গা পুলিশ আবিষ্কার করেছে। অনেক দায়িত্বশীল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের তৎপরতা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। শহরে স্বাভাবিক ঘোরাফেরা একে-বারে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল, কাজেই প্রচুর সোরা, প্রচুর গন্ধক, প্রচুর কয়লা ও এর সঙ্গে প্রচুর পটাসিয়াম ক্লোরাইড কোথা থেকে কিভাবে জোগাড় হবে এবং কিভাবেই বা একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাচার করা যাবে? পথে যে-কোন জায়গায় আটক হতে পারে, পুলিশ সেইরকম ভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। এইরকম বিপদের মধ্যে আর না গিয়ে এই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া যেত। কিন্তু কেউই তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কাজেই সীমিত শক্তি নিয়ে ও সীমিত সুযোগ ও সুবিধার মধ্যে তারা আবার আগের উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেছিল। বিপ্লবীদের গুপ্ত বাড়ি যেগুলি দুর্গের মত তাদের আয়ত্তে ছিল, সেইসব বাড়ির সবাইকে পূর্ণ উদ্যমে কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হল। তারা একবাক্যে সেই সিদ্ধান্ত অন্তর থেকে অনুমোদন করল। আদেশের অপেক্ষায় আর কেউ ছিল না। তারা নিজেরাই উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কাজের প্রোগ্রাম দশদিনে সমাপ্ত করতে হবে, সেইরূপ একটি সাধারণ নির্দেশ তাদের উপরে ছিল। কালি দের নিজের বাড়ি ও তার কাকার বাড়ি পুরোদস্তুর-ভাবে গুপ্ত কারখানায় পরিণত হল। এই-সব বাড়ি আগে ইতিমধ্যে সার্চ হয়ে গেছে। অনেককে ধরেও নিয়ে গেছে। তবু শংকা নেই, আছে বিচক্ষণতা ও দুর্জয় সাহস। পুলিশ ও পাড়ার লোকের চোখ এড়ি[illegible] বাইরের বেশি কমরেডের তার বাড়ি[illegible] যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়ির [illegible] এই প্রস্তুতি কার্য সমাধান [illegible] তাই একদিকে কাজ চলল [illegible] অন্যদিকে কাজ চলল [illegible] পটাসিয়াম ক্লোরাইড [illegible] করার। তারপর এই [illegible] পদার্থের মিশ্রণের জন্য [illegible] খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে [illegible] বাড়িতে দুজনে কুলগাছ [illegible] রাখল আর দুজন এই [illegible] গুঁড়িয়ে একেবারে মিহি [illegible] তৈরি করল। তিনরকম [illegible] পদার্থও গুঁড়িয়ে, পিষে মিহি [illegible] জন্য তিনটি জাঁতি সর্বক্ষণ [illegible] অন্যদিকে পাঁচ সের ও দশ সে[illegible] ক্যানেস্তারা তৈরি করা হচ্ছিল [illegible] ইলেকট্রিক তার, স্টোরেজ ব্যাটা[illegible]

জোগাড় করার কাজে তাঁরা লেগে পড়লেন। যে-কোনভাবেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই কর্ম সমাপ্ত করেন।

এত বাধা সত্ত্বেও যখন বিপ্লবীরা 'ডিনামাইট পরিকল্পনা' শেষ করতে চলেছে, আর জেলখানার মধ্যে তাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ, তখন কোন এক ভীষণ বিভ্রাট দেখা দিল। জেলখানায় অত প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায়ও আধ-মণ গানপাউডার ভিতরে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখা, দুটো আর্মি রিভলবার ও পুলিশ ও মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে জেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, আর জেলখানার দেওয়াল বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়ে তাদের বেরিয়ে যাওয়া প্রায় ঠিক। তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জেল অফিসারদের মনে শান্তি ছিল না। রোজই তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পরে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মিলিটারী কম্যান্ডেন্ট ও অন্যান্য অফিসাররা জেলের অভ্যন্তরে ঢুকে এসে খোঁজ করত কোন অস্ত্রশস্ত্র বোমা প্রভৃতি জেলের ভেতরে আনা হয়েছে কিনা। একজন সাধারণ কয়েদী একটি রিপোর্ট দিয়েছিল যে, সে দেখেছে বাবুরা বোমা জাতীয় জিনিস স্তূপীকৃত নারকেলের ছোবড়ার নীচে ঢুকিয়ে রেখেছে। এইরকম রিপোর্টটি জেলারবাবু খুব বিশ্বস্তসূত্রের খবর বলে মনে করলেন এবং এই কয়েদীটিকে নিয়ে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। এই রিপোর্টের পরে জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে একমত হয়ে ঠিক করলেন, আমাদের তিনজন—লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও আমাকে আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার সেলে এনে ঢোকাবেন। আর সত্যিই একদিন সকালে এসে বললেন, আপনারা আপনাদের সেলে এখুনি চলুন। আমরা জেলারের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আবার সেলে এলাম। তারপরে দেখলাম সেলের সামনে ইঁট এসে জমতে লাগল। মিস্ত্রী এলো এবং মিস্ত্রীকে বলল যে, আমাদের সেলের সামনে যে অ্যান্টি-সেল (দেওয়াল ঘেরা ছোট উঠোন) আছে, সেই উঠোনের মেঝেকে কংক্রীট দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে। এই আদেশ দেওয়ার পরে কাজ চলতে লাগল। দশ-পনের মিনিটের মধ্যে দেখলাম, ওয়ার্ডার ও সার্জেন্ট যারা পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তারা খুব ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে ছুটল জেলারের অফিসের দিকে। খুব অল্পক্ষণের মধ্যে জেলার ছুটে এল। আমাদের মনে হতে লাগল মাটি খুঁড়তে গিয়ে তারা মাটির নীচে কিছু পেয়েছে। সেইজন্য তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চার-পাঁচ মিনিটের ভেতরে জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে হাজির। অর্ডার দিল আমাদের তিনজনকে আবার যে যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফিরিয়ে নিতে। জেলার-বাবু এসে খুব মিষ্টি কথায় জানালেন, বিকেলবেলা কিংবা আগামীকাল আবার তারা আমাদের এখানে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে তারা সেলের সামনে অ্যান্টি-সেলগুলো ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন যাতে আমাদেরও স্নান করার সুবিধে হয়। এই বলে আমাদের আবার ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। মিস্ত্রীর কাজ চলছিল। আধঘণ্টা পরে জেলে এলার্ম বেল বাজল, জেলে এসেছে মিলিটারী অফিসার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর জেলা-হাকিম। তাদের হুকুম হল, সব কয়েদী ঘরে আটক থাকবে। আর হুকুম দিল জেলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খাদের গভীর গর্ত খুঁড়ে তল্লাসী করতে হবে। ইতিমধ্যে তারা নাকি দুটি আর্মি-রিভলবার সিরাপের দু-তিনটে বোতলে ভর্তি বন্দুকের বারুদ ইত্যাদি পেয়েছে। পরে পরে জেনেছিলাম সারা জেল খুঁড়ে নানা স্থান থেকে উদ্ধার করেছিল বোতলে ভর্তি করা আধমণ গান-পাউডার, দুটি আর্মি-রিভলবার, কতগুলো রিভলবারের কার্তুজ, টর্চলাইটের চব্বিশটি ব্যাটারি, ইলেক্ট্রিক তার প্রায় দুশো গজ, মোটরের ব্যবহারযোগ্য ইন্ডাকিটিভ কয়েল, মোটর গাড়ির প্রায় চব্বিশটি বাবো ভোল্টের বাল্ব, সে-ও আবার দশ-বারোটি, একটি আতসী কাঁচ যা সূর্যের রশ্মি ফেলে আগুন জ্বালানো যায়, বারোটি ধারালো ছোরা—এসবই প্রায় দু' ফিট মাটির নীচে ছিল জেলের বিভিন্ন জায়গায়। এই আবিষ্কারের পর পুলিশ নিশ্চিত হয়েছিল, আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি এবং আমরা জেল ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারি। এই পুরো প্রস্তুতিটি প্রায় চ্যালেঞ্জ করে।

পুলিশ আর মিলিটারী এইরকম প্রস্তুতি যে চলছে তা তারা জানত বলে আমাদের প্রায় বলেছে, জেল কর্তৃপক্ষও তাই বলত। আমরা তাঁদের উত্তরে বলতাম, নির্ঘাৎ পালাবার জন্য প্রস্তুতি কাজ চলবে, আমরা পালাবই, আমাদের কেউ বাধা রোধ করতে পারবে না, এইরকম প্রস্তুতি চলবেই। আমাদের এই প্রস্তুতির কাজ আপনাদের পুলিশ, মিলিটারী এতদিন আটকে রাখতে পারেনি। অসুবিধায় পড়ব সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অসুবিধা জয় করে আমরা পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে পারব, এইরকম দৃঢ় ধারণা আমাদের আছে।

এইগুলি যে আমাদের মিথ্যা বড়াই নয়, তা পুলিশ জানত। পুলিশ এটা কখন বোঝেনি যে, বৃটিশ সরকার পরাজিত হবে, কিন্তু বুঝেছিল সরকার প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন হবে। যেরকম আঘাত তারা চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সময় পেয়েছিল।

এই সময় থেকে পুলিশ দেখল, সত্যি সত্যিই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চললে তারা খুব লাভবান হবে না। কারণ, অত-গুলো রাইফেল নিয়ে মাস্টারদার বাহিনী প্রায় অটুট অবস্থায় শহরে আছে। আমরাও আমাদের প্রায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে জেলের মধ্যে ও বাইরে শহরের বুকের ওপরে জেল ভাঙার প্রস্তুতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এবার যা সংঘর্ষ তাদের সঙ্গে হবে, সেই সংঘর্ষ নতুন ধরনের। ল্যান্ডমাইনের প্রচণ্ডতা তাদের বিধ্বস্ত করবে। কর্মঠ উদ্যোগী তরুণ বিপ্লবীদের কাছে এই মারাত্মক ল্যান্ডমাইন এক নতুন আবিষ্কার। এর ভয়াবহ প্রয়োগ একবার যদি সফল হয়, তবে বিপ্লবীদের কর্ম-কৌশলের প্রয়োগ-ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যাবে। কাজেই সেই অবস্থায় যেন তাদের পড়তে না হয়। সেইজন্য তারা ঠিক করলেন, ল্যান্ডমাইন এই প্রচারটি বন্ধ করে দিয়ে 'ডিনামাইট' নামে প্রচার করা হোক।

ডিনামাইট কোলিয়ারী বা মিলিটারীর গুদোম থেকে জোগাড় করতে হবে। তা সবার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ইমপ্রোভাইজড্ (ঘরের তৈরি) ল্যান্ডমাইন বানানো ও জোগাড় করা বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে অনেক সহজ। সেইহেতু এটা তাদের প্রচারে উহ্য থাকবে। সেইজন্য ল্যান্ডমাইন কন্সপিরেসি কেস না বলে ডিনামাইট কন্সপিরেসি কেস নাম দিয়ে মামলা করা ভাল, আর বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য কথা চালানো প্রয়োজন। পরবর্তী পর্বে ডিনামাইট কেস মিটে যেতে পারে যদি তারা বিপ্লবীদের সহযোগিতার নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারেন। এই পর্বে তাদের তৎপরতা ছিল কি করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা লাইন নেবে যাতে মামলা নিষ্পত্তি হয়। আমরাও সেইজন্য প্রস্তুত ছিলাম। দু' পক্ষের ইচ্ছা হওয়ার বাস্তব কারণ ছিল।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চট্টগ্রামে আর একটি ট্রাইব্যুনাল মামলা শুরু হয়ে গেল। এইটি ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা বলে রটে গেল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্খীরা প্রমাদ গুণেছিল—মামলা বহু বছর চলবে, বেশির ভাগ ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। অভিভাবকরা দু' বছর ধরে আমাদের স্বপক্ষে অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আসছিলেন। তাতে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন—অর্থের ও সামর্থ্যের দিক থেকে। তারপর আবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা। তাঁরা সত্যিই ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না। মায়েদের চোখের জল আর থামে না। তাঁরা মা-কালীর চরণে তাঁদের প্রার্থনা জানালেন। বিপ্লবীরা কেবল মায়ের পূজা করে তাঁদের কাজ শেষ করেননি। তাঁরা পুলিশ ও সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। সরকার বুঝে-ছিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার কাউকে ফাঁসি না দেওয়াই শ্রেয় ও ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় খুব সামান্য সাজা দিয়ে মিটমাট করে ফেলা তাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

চট্টগ্রামবাসীকে খুব চমকে দিয়ে প্রথম দিনই ডিনামাইট মামলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি একজনেরই সাজা হোল—তিন বছরের জন্য। আর বাকিদের এক বছর, দেড় বছর, ছ' মাস করে সাজা দিয়ে ট্রাইব্যুনাল কোর্ট তাদের কাজ সম্পন্ন করে। এই ভৌতিক কাণ্ড সবাইকে উৎসাহিত করে। যে যেদুকাঠি ভৌতিকভাবে মামলা দুটির সমাপ্তি ঘটায় সেটি হচ্ছে মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী-দের একতা।

(চলবে)

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৮

শৈবাল ঘোষ

(দুই)

আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীর যে অংশ প্রগতি ময়দানের ডিফেন্স্ প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করা হয়েছে, তা আকৃতিতে এতই বিশাল যে একদিনে সব ছবি দেখে শেষ করা যায় না। প্রত্যেক দেশকেই একটা দুটো বা তারও বেশী কিউবিকল দেওয়া হয়েছে, ছবি বা ভাস্কর্যের পরিমাপ বিচার করে প্রদর্শন করার জন্য। প্রতি দেশই একটা নিজস্ব ঢং-এ কাজ করেছেন। সেই নিজস্বতা প্রত্যেক দেশের শিল্পের আপন আপন রূপরস এনে দিয়েছে। কোনও কোনও দেশ আবার একটাই স্টাইল বা পদ্ধতিতে কাজ করেছে, যা দেখলে মনে হয় একটাই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা সকলেই কাজ করেছেন। যদিও প্রত্যেকের ছবি অথবা ভাস্কর্যের বিষয় ভিন্ন।

হাঙ্গেরীর শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন চারজন। এজোনাঙ্গ তামাস, রবার্ট সিকজেন্ড্মিহা লিঙ্গ, আবনো ফত্ এবং মেনিহারট টথ।

এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ দেখিয়েছেন মানপত্রে সম্মানিত শিল্পী এজোনাঙ্গ তামাস। এঁর কথা আগেই লেখা হয়েছে। এনার দুটো নিদর্শন প্রদর্শনীতে আছে। যদিও রিলিফ মেডালিয়ন এক প্রচলিত ধারার কাজ, তবুও এনার কাজ সবকাজের থেকে আলাদা ধরণের এবং আপন বৈশিষ্টে সেরা।

রবার্ট সিকজেন্ডমিহা লিঙ্গ এজোনাঙ্গ তামাসেরই সমগোত্রীয় শিল্প সৃষ্টি করেছেন এবং এর মূল উপাদান নারী ও পুরুষের মিলনের গোপন রহস্য, প্রকৃতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নারী ও পুরুষের রূপ। কোথাও বা এঁর রিলিফ মেডালিয়ন আকৃতির ভাস্কর্যের মধ্যে এক পরী কোনও মিলন পিয়াসী নারী পুরুষের কাছে কিছু গোপন বার্তা রেখে যাচ্ছে। আবার কোথাও বা সবুজ প্রান্তরের চাদরের মধ্যে প্রেমঘনিষ্ঠ নারী ও পুরুষ, অদূরে দিগন্তের কাছে দাঁড়ানো এক মানুষ এক আবিষ্কার আনন্দে মত্ত।

এঁর ভাস্কর্য দেখে মনে হয় এঁরা দুজনেই এক স্কুলিং এ কাজ করেছেন। সুন্দর গঠনভঙ্গি, বোঞ্জে করা অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর শিল্পের নমুনা।

মেনিহারট্ টথ্ কাগজের ওপর তেল-রংএ কাজ করেছেন। ওনার করা 'দাড়িওলা লোকের প্রতিকৃতিতে' তুলি চালানো, রং লাগানোর কায়দা ভীষণভাবে ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্ এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওনার আরও একটি ছবি 'বয় উইথ ক্যাপ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী সংখ্যা ৭, কাজ ভাল লাগলো সুনারিও, রাহারু এবং দিন্দো কুসদিনার-এর।

সুনারিওর কাজ স্ক্রিনপ্রিন্টে করা। অত্যন্ত আধুনিক আঙ্গিকে পুরু রং-এ ছাপা 'ইমেজ অব আইরিয়ান ৫' এবং ডন এ্যাট সেন্টারি এই দুটি কাজ এর গঠনপদ্ধতি দর্শনীয়।

রাহারু ড্রইং করে সূক্ষ্ম জটিল রেখার সাহায্যে পুরো বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর ছবিতে বিভিন্ন রংএর কালি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তিনি গ্রাফ কাগজে ছক কেটে কাজ করে থাকেন।

দিন্দো কুসদিনার-এর স্ক্রিনপ্রিন্ট 'রেন অন এ ফ্লাওয়ারি হিলসাইড' একটি দর্শনীয় ছবি। পোস্টার গঠনের আকৃতি ধরে তিনি জমাট রং-এ সরলরেখায় পাহাড়, ফুল এবং বৃষ্টির ফোঁটা দেখিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীদের একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, সবাই স্ক্রিনপ্রিন্টে কাজ করেছেন। রাহারু খালি ড্রইং করেছেন।

ম্যারল্যান্ড-এর লুইস লে বোথুই-এর কথা আগেই লেখা হয়েছে। ইনি একজন পারদর্শী গ্রাফিক শিল্পী। এই প্রদর্শনীতে তাঁর দশটি ছবি আছে, তার মধ্যে সাতটি লিথোগ্রাফ 'দ্য টেইন' বলে একটা সিরিজের করা। তার মধ্যে একটির জন্য উনি সম্মানিত হয়েছেন।

'স্টাডি টুওয়ার্ডস এ্যান ইমেজ অব ডাবলিউ বি ইয়েটস' এই বিষয়টির উপর ওঁর আরো তিনটে এচিং আছে। এতে সাদার উপর সাদা রংএ তিনি কবির প্রতিকৃতি ছেপেছেন চোখে এবং চশমার কাছটার লাল রং। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো প্রতিকৃতিটি ক্রমশঃ ইউরোপীয় ধাঁচ থেকে ভারতীয় ধাঁচে পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েছে।

প্যাটরিক হিকীর 'বডা অন মাউন্টেন' এবং অন্যান্য এচিংএ শিল্পীর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। ইনি অত্যন্ত নিয়েলিস্টিক ধরনে ছবিগুলি এঁকেছেন এবং একটি মাত্র খয়েরী রং-এ ছেপেছেন। এনার সব কাজই ড্রইং-প্রেজেন্টধর্মী।

জাপানের শিল্পকলায় ট্রাডিশন্যাল ছাপ একেবারেই দেখা গেল না। জাপানী শিল্পীরা ট্রাডিশন্যাল বিষয়কে আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। তোশিমিৎসু ইমাই দুটি পার্টিশন অ্যাক্রিলিক রং ব্যবহার করে এঁকেছেন। জমিতে সোনালী রং-এর উপর মোটা (সোজা টিউব থেকে বের করে লাগানো) রং-এর ছন্দময় রেখা তাঁর ভাবকে প্রকাশ করেছে। তাঁর ছবি 'রেড'এ আগুনের আভাস এবং ব্লুতে সমান্তরাল আঁকাবাঁকা গতিময় রেখার সামুদ্রিক ঢেউয়ের আভাস। খুব সুন্দর দেখতে এই পার্টিশনগুলো, অতীব মনোরম আধুনিক আঙ্গিকে মনের ভেতর থেকে প্রকাশ করা ছবি। এই দুটি কাজ দেখলে মন ভরে যায়।

কোশো ইটোর কাজ সম্বন্ধে আগেই লেখা হয়েছে। ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী।

ইস্ত্রোকিও সাটোমের মোনোক্রোমধর্মী বড় ছবিতে দেখা যায় এক বিশাল প্রকৃতির মাঝে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে আকাশভর্তি সংবাদপত্র ছিটকে উঠছে। এই ছবি একটা প্রচণ্ড ইঙ্গিতবাহী ছবি। নতুন আঙ্গিক গঠন করা হয়েছে। ছবি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শিল্পী পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আজকালকার আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন স্কাইস্ক্র্যাপার বিল্ডিং ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। এই ছবি দেখার পর বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা অনুভব করা যায়। মাইকেল আঞ্জেলো আন্তোনিওনির পরিচালনায় করা ছায়াছবি 'জ্যাবরিস্কি পয়েন্ট'-এর একটা মাস্টারপিস বিস্ফোরণের সিকোয়েন্স-এর কথা এই ছবি মনে পড়িয়ে দেয়। তফাৎ খালি ছায়াছবিটি রং-এ করা এবং এই ছবিটি কালোয় সাদায় করা। রং লাগানো অর্থাৎ ব্রাশিং খুবই ভালো এবং টেকনিক্যাল দিকও প্রশংসনীয়।

মেকসিকোর শিল্পী গেবিয়েল ম্যাকোটেলার মধ্যে আধুনিক আঙ্গিকে গঠিত অ্যাক্রাইলিক মিডিয়ামে করা ছবি 'পাসিও ক্যাম্পেস্টারো'। তিনটি ছবি নিয়ে একটি সিরিজ করা হয়েছে। আঠা এবং বালি দিয়ে ক্যানভাস-এর ওপর জমি তৈরী করে লাল এবং খয়েরী রং-এ ক্ষেত-এর ছবি। ছবির মাঝে সরু ধারালো কিছুর আঁচড়ে ছবিটি আরো বক্তব্যময় হয়ে উঠেছে।

পোল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে পাঁচজন তার মধ্যে সবচাইতে দর্শনীয় এবং আবেগমিশ্রিত ছবি এঁকেছেন লেজেক

গুয়েন হাই 'প্লেইং মিউজিক' নামক দুটি টেরাকোটার মূর্তি প্রদর্শন করেছেন। ছোট্ট গোলগাল মানুষ গীটার বাজাচ্ছে। ফর্ম দেখে পিকাসোর ফর্ম ভাঙার সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

ইবাকের নিদর্শন একজন মাত্র শিল্পী-দ্বারাই উপস্থিত করা হয়েছে। আল্লা হুসেন বসির-এর ছবিও আছে প্রদর্শনীতে এবং ভাস্কর্যও আছে। তার মধ্যে ছবির চাইতে ভাস্কর্যগুলো বেশী মন-মাতানো। বিরাট বিরাট ভাস্কর্য করেছেন এই শিল্পী। তাঁর করা স্কাল্পচারে আমরা এক বিরাট মানুষের মোষের মাথা দেখতে পাই। অন্য একটিতে এক ঈগলের দেহ থেকে তিনটি মানুষের মাথা বেরিয়েছে আর একটিতে কালো উলের করা মানুষের ওপর ছড়ানো সড়কির মতো ফর্ম। সড়কিগুলো বুকের ওপর দিক থেকে সোজা নীচে নেমে এসেছে এবং সূর্য কিরণের মতো চারদিকে ছড়ানো। এই আল্লা হুসেন বসিরের কাজে বেশ অভিনবত্ব আছে এবং নিজস্বতায় গড়া এই মূর্তিগুলো দর্শকদের ভালো লাগে।

যুগোস্লাভিয়ার শিল্পকলায় একস্প্রেস-নিজম এবং সুরিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মারসাদ বারবার-এর অনন্যসাধারণ উড্‌কাট সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। ইনি একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। এঁর কাজে ওল্ড মাস্টারদের আভাস পাওয়া যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে শিল্প ইতিহাসের জগতের মানুষদের নিয়ে এঁর ছবি। তাঁর ছবি দেখলে একটা কথা মনে হয় তা হলো তিনি ছবির মধ্যে ছবি এঁকেছেন।

গ্র্যাডোভানি একজন ভাস্কর। উওম্যান বোলার এবং লিটল মাদার নামক দুটি ভাস্কর্য এর করা। ছোট্ট মা পিঠ চুলকাচ্ছে, এই রকম সহজ সরল বিষয় নিয়েই এঁর ভাস্কর্য। ইনি ব্রোঞ্জ এবং কাঠে কাজ করেছেন।

জোস সিউহার ছবি বড় কাঁচের উল্টো পিঠে করা। মিকসড্ মিডিয়াতে তিনি প্লেকিগ্লাসের ওপর কাজ করেছেন। পাঁচটা ছবিই এনার অসাধারণ সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে ক্যাপটিভিটি-২ একটা মানুষকে যাদুকরের মত পোষাক পরা লোক কোলের ওপর শুইয়ে চেপে ধরে আছে। এর ছবির ফর্মের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে মানুষের মাথাগুলো খুবই ছোট আকৃতির হয় দেহের তুলনায়। এটাই একটা অসাধারণ ছন্দ এনে দেয় তাঁর ছবিতে।

কারটোভিক-এর কাজ মার্ক শাগালের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মিষ্টি মিষ্টি ছবি। নীল রঙের প্রাধান্যে আঁকা 'ক্যাস সেকশন অব এ কন্ডিশন' এবং 'স্ম্যাশড্ অব ফ্রাস্ট ব্রেকেন ব্যালান্সেস' বেশ অনুরাগ সৃষ্টি করে।

নেবোসা মিত্রিক তার ভাস্কর্যে রূপ-কথার পাওয়া কবির গঠন করেছেন। মাথায় বড় বড় থাম। বুকটা দরকার মত। কবি বসে আছেন এবং এই 'পোয়েট' নিয়েই তাঁর তিনটে কাম্পিং আছে। খুব সুন্দর লাগে ব্রোঞ্জে করা এই কাজ দেখতে।

প্রগতি ময়দানের ডিফেন্স প্যাভিলিয়নে প্রদর্শিত অংশের এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি ও ভাস্কর্য ছাড়া আর যেসব ছবি বা ভাস্কর্য আছে তার মধ্যে কোনটাই নিম্নমানের নয়। সব দেশই তার নিজস্ব স্বকীয়তায় কাজ করেছে এবং সব চাইতে সেরা কাজটি প্রদর্শিনীতে দেবার চেষ্টা করেছে।

রবীন্দ্র ভবনের ললিতকলা অ্যাকাদেমীর গ্যালারীতে যেসব দেশের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন যেসব দেশ, তারা হলেন অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, চায়না, আমেরিকা, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানী এবং ভারত।

আমেরিকান শিল্পকলার রীতির নাম দেওয়া হয়েছে (ভিলনারী) অর্থাৎ মানসিক দর্শনে দেখা ছবির কালি কলমে রূপদান করা হয়েছে এইসব শিল্পে। এই শিল্পীরা স্বীকার করেছেন যে তাঁদের ছবিতে সালভাদোর স্বীকার করেছেন যে তাদের ছবিতে সালভাদোর ডালি, ম্যাকস্ আর্নস্ট, জোন মিরো, রুশ এবং উইলিয়াম ব্লেকের ছাপ পাওয়া যায় এবং এই ভিলনারী শিল্প প্রথম গড়ে ওঠে এক রক পোস্টার থেকে।

এই ছবির রীতি সুরিয়ালিজম এর বিপরীতধর্মী অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর গলিত রূপ দেয় না, এরা এমন এক আধ্যাত্মিক জগতের রূপদান করে যা অজ্ঞানাবস্থায় মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয়।

এই প্রকৃতির শিল্প চড়া রং দিয়ে অত্যন্ত বাস্তববাদী বিষয়কে অবাস্তব পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং যা দেখলে আশ্চর্য লাগে ঠিকই কিন্তু ক্লান্তিকর লাগে না।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ বিল মার্টিন-এর 'ক্যানিয়ন'। কলোরাডো গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দৃশ্যের আকাশে পেঁজা তুলোর মত গোলাপী মেঘে কিসের ইঙ্গিত। চড়া রঙে করা এই ছবি একটি দর্শনীয় বস্তু। অমানুষিক পরিশ্রম করে এই ছবি আঁকা হয়েছে। প্রত্যেকটি গাছের পাতার থেকে পাথরের ফাটল একই রকম তৈরী করা। এই ছবির মধ্যে ফটোগ্রাফিক গুণ বড় বেশী চোখে ঠেকে।

ক্লিফ ম্যাকরেনল্ডস এ নিউ আর্ট তেল রঙে ক্যানভাসে করা ছবি। বিশাল গাঢ় নীল সৌরমণ্ডলের মাঝে চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি ছোট্ট সাদা সাদা ছিটানো গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলে করা সেই বিখ্যাত 'ঈশ্বর ও আদম' বর্তমান। ছবিটা দেখে গভীরে প্রবেশ করলে মনে হয় অসীম শূন্যতার মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে এবং ছবির কোথায় একটা সতেজ পবিত্রতা আছে যেটা ভালো লাগে।

লিওনার্ড সিলভারমাগের কাজও ভালো লাগে।

অস্ট্রেলিয়ার দুই শিল্পী জন ডেভিস এবং কিথ লুবি প্রথমোক্ত শিল্পীর কাজে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। এই শিল্পীর গাছের ডাল কাঠি, কাগজ, সুতো, ক্যানভাস, পাথরের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ছোট ছোট ভাস্কর্য তৈরী করেছেন। প্রথম দর্শনেই মনে হতে পারে এটা দর্শককে ধাক্কা দেবার জন্যই তৈরী হয়েছে এর অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই কম। আবার অবন ঠাকুরের কার্টুন কুটুমের কথা মনে পড়ে গেলেই কখনো মনের অজান্তেই এইসব টুকরো জিনিসগুলোকে ভালো লাগতে শুরু করে এবং এই মূর্তির বক্তব্য বা ভাবও তখন আর কিছু অস্পষ্ট ঠেকে না।

কিথ লুবির এচিংগুলো দর্শনীয় উনি একটা ধারাবাহিক সিরিজ তৈরী করেছেন যথা কিন্ডার গার্টেন, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস এরকম করে সিকস্থ ক্লাস অবধি ছটা কালোর সাদায় এচিং আছে। তাতে লক্ষণীয় ব্যাপারটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস থেকে বাচ্চাদের রূপ গঠন হতে শুরু হচ্ছে এবং সিক্সথ ক্লাসে গিয়ে বাচ্চারা পূর্ণ রূপ পাচ্ছে। এই ব্যাপারটা বোঝাতে উনি এক অভিনব পদ্ধতি নিয়েছেন ফার্স্ট ক্লাসের বাচ্চাদের বস্তার মত আকৃতি চোখ মুখ তখনও ফোটেনি, সেখান থেকে ধীরে ধীরে উনি সিক্সথ ক্লাসে বাচ্চাদের পুরো চোখ-মুখ-নাক-কান পুরো গঠন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে একটা শিশুর পুরো জ্ঞান আসতে ওই ছটি বছর লাগে। অতি সুন্দর নূতনত্বের ভরপুর অভিনব কাজ।

রোজগা। ইনি পেন্সিলে ড্রইং করেছেন। ছবির নাম 'টেন্সেস্ অব টু ডেটস্'। সাদা কাগজের মাঝখানে পড়ে থাকা এক পাখীর পালক এবং একটি শুকিয়ে যাওয়া ধুলোর পাশে এক ফোঁটা টাটকা চোখের জল। এই শিল্পী ন্যাচারালিজম'এ বিশ্বাসী এবং এঁর ছবির মধ্যে কোথায় একটা ব্যঞ্জনা আছে। মনের গভীরে দাগ কেটে যায়।

রোমানিয়ার উল্লেখযোগ্য কাজ দেখিয়েছেন ভ্লাদিমির জ্যামফাইরেস্কু, ইনি ওল্ড মাস্টার ধরনে ছবি এঁকেছেন। তাঁর ছবিতে আঁকা মানুষের মুখ লম্বাটে এবং সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর কালো জামা একটা আবেগ তৈরী করে দেয়। ছবির নাম 'পসিবল পোর্ট্রেট'। ছবি দেখে মনে হয় ওনকেন্ড আবনার দেখা প্রতিকৃতি। রবীন্দ্রনাথের ছবির রং এবং প্রতিকৃতি গঠনের সঙ্গে এনার ছবির গঠনপদ্ধতি, রং এবং বিষয়ের খুবই সামঞ্জস্য আছে।

ইলিয়ানা মিকোডিনের এচিং বেশ অদ্ভুত ধরনের। ছবির বিষয় ব্যাঙ্গাত্মক। একটি উলঙ্গ মানুষের টুপি। সারা দেহের গঠন দেখে মনে হয় চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া মানুষ মাংসল ও টিস্যুর সমষ্টিতে গঠিত, হাত এবং পা শরীর থেকে আলাদা করা। এই বিষয় নিয়ে ওনার আরও একটি অ্যাকুয়াটিন্ট আছে। সেটার বিষয় একই শুধু পুরুষের জায়গায় নারী। এনার কাজ নিজস্ব ধারায় খুবই অভিনব।

'ভিক্টরি' নামক বেরোঞ্জ ভাস্কর্যের শিল্পী পল ভ্যাসিলেস্কু যে মূর্তিটি গড়েছেন, তাতে এক মানবদেহকে চারজন বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গঠনভঙ্গি অনেকটা শবযাত্রার মতো। বাহকদের পায়ের জায়গায় মানুষের বদলে ঘোড়ার পা।

সুইডেনের সিক্সটেন হাগ 'রিয়ালিজমে' বিশ্বাসী। ওনার সব ছবিতেই গথিক আর্কিটেকচারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অসাধারণ দক্ষতায় উনি কালোর সাদায় এই ছবিগুলোর ড্রাইপয়েন্ট এবং অ্যাকুয়াটিন্টে প্রিন্ট নিয়েছেন। সব কাজেরই মুদ্রণকৌশল অতীব উঁচু মানের।

কেলাক গেরিডারও খুব সুন্দর এচিং করেছেন। ইনিও রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। এনার ছবি হয় কালোয় সাদায় না-হয় সিপিয়ায় করা। বিষয় জঙ্গল, গাছ ঝোপঝাড় ইত্যাদি।

সুইজারল্যান্ডের কাজ ভীষণ অ্যাবস্ট্রাকট্ ধর্মী। এর মধ্যে রলফ লেম্যান একজন পুরস্কৃত শিল্পী (এনার ছবির কথা আগেই লেখা হয়েছে)।

হ্যানস স্কোইজারের বিমেস্বার আইজ্যাক বি-১-৫ পাঁচটি অনবদ্য এচিং। এতে বিষয়ের চাইতে প্রিন্টের কারিগরীই বেশী।

ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক-এর শিল্পীদের, সোস্যালিস্টিক বাস্তববাদের মনোলিথিক শিল্প তাদের ছবিতে উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখযোগ্য কাজ দেখিয়েছেন ভিকটর ভিলনার তাঁর পলিক্রোম্যাটিক লিথোগ্রাফ 'দ্য স্কুল লিভিং ওয়ালজ'-এ। এটি একটি বহুরং-এ মুদ্রিত ছবি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলের ডান্স হল-এ নৃত্যরত। এই ছবির প্রতিটি মানুষ, বাড়ি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গড়া। একটু ডেকরেটিভ প্যাটার্নের ছবি, কিন্তু দেখতে খুবই ভাল লাগে।

ভিয়েতনামের শিল্পীদের মধ্যে ভুঅং গক্ কান 'ফোক টয়' নামক উড্‌কাটে তাঁদের দেশের স্থানীয় লোকশিল্পের ঘোড়া পুতুল ইত্যাদির ছবি মুদ্রণ করেছেন।

নাং হুয়ান নাং হোয়ান-এর ছবি খুবই অভিনব। তিনি গেভেন ল্যাকার দ্বারা প্রস্তুত করেছেন 'ইমেনস' আর 'দ্য টে গুয়েন হাইল্যান্ডস'। এনার ছবিগুলি খুবই বড় মাপের এবং দেখতে অনেকটা সেরামিক টাইলে করা এনগ্রেভিং-এর মতো লাগে। কালো সবুজ আর সোনালী রং-এর প্রাচুর্যে ভরা তাঁর ছবি ভিয়েতনামির রীতি পদ্ধতি ধরে আঁকা।

লে টাট লোইও একজন মানপত্রে সম্মানিত শিল্পী এবং এনার কাজ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

Sankyo

নির্ভয়ে যাত্রা
চিরস্থায়ী এবং
উজ্জ্বল আলোর জন্য
স্যাংকিও সাইকেল
ডায়নামো লাইট

১২ ভোল্টস্ এবং ৬ ভোল্টস্
স্যাংকিও সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ডায়নামো লাইট

প্রস্তুত কারক :

ইন্দো-জাপানীস ইন্ডাস্ট্রীস লিমিটেড
১৪ ক্যানাল স্ট্রীট, কলিকাতা—ইণ্ডিয়া

বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় :
নিগম ব্রাদার্স
১৫০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১৩, ফোন : ২৪-৪১৩৫/৩৬

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।। চোদ্দ ।।

পার্লামেন্ট হাউসের কমিটি রুমে ফুলস্কেল কনফারেন্স। ইস্পাতমন্ত্রী, খনি-মন্ত্রী পাশাপাশি বসেছেন। হর্সশু টেবিলের দুধারে দুদে এম পি-রা বসে। হিন্দুস্থান স্টিলের চেয়ারম্যান, কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর — সবাই হাজির। কয়লার ষোল পারসেন্টের বেশি ছাই থাকলে ইস্পাত কারখানার পক্ষে সে-কয়লায় কাজ করা কঠিন। তাই কয়লা কাটাইয়ের সময় কয়লার গেড্ বুঝে কাটার কথা।

বুঝে বুঝে কাটলে বেশি কয়লা কাটা যায় না সারাদিনে। অথচ প্রোডাকসন, ওভার-টাইম আছে। তাই আসলে খনিতে বুঝে বুঝে কাটাইয়ের কোন বালাই নেই। এলো-পাথারি কেটে প্রোডাকসন বাড়ানো হচ্ছে। ফলে সব কয়লা মিশে গিয়ে একাকার। ছাইয়ের পরিমাণ ঠিক রাখা অসম্ভব।

এই নিয়ে এম পি-দের ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং বৈঠক। দিলীপ সাক্ষী দিতে এসে যা করলো—তা সে এতদিন শেয়ারের টোপ গাঁথতে বেরিয়ে করেছে। যেমন গোবিন্দ স্টিল। কয়লায় ছাইয়ের মাত্রা নিয়ে কথা-বার্তা যখনই দানা বাঁধছে—অমনি দিলীপ তা গুলিয়ে দিচ্ছিল।

এখানে সাক্ষী দিতে এসে নিজে থেকে কিছু বলা যায় না। কোশ্চেন করলে তবে আনসার দেওয়া যায়। বিহারের দুজন এম পি একদম মোক্ষম মোক্ষম কোশ্চেন করছিল।

কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চোখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ জবাব দিচ্ছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আগে মিনিস্টার ছিল। ইলেকশনে হেরে গিয়ে কিছুকাল চুপচাপ ছিল। তারপর প্রধান-মন্ত্রী এই বুড়ো ভদ্রলোককে ওই পোস্টে বসিয়ে দিয়েছেন। একটু খিট-খিটে। তাপর আগেকার মন্ত্রীর মেজাজ থেকে গেছে খানিকটা। কয়লার কোন খবরই ভদ্র-লোক রাখেন না। এম পি-দের এক একটা কোশ্চেনে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। আর

দিলীপ তার তরল সরল কৈফিয়ৎ তৈরি করে যাচ্ছিল।

খেলাটা মন্দ না। এই কোশ্চেন আনসারের সময় কোল ইণ্ডিয়ার এম ডি তাকিয়ে থাকতে পারবেন। কিন্তু নিজে থেকে কোন কথা বলতে পারবেন না। তাঁর হয়ে যা কিছু জবাব দেবে—দিলীপ বসু। দিলীপের কথা শোধবাবার অধিকারও তাঁর নেই। পার্লামেণ্টারি কমিটিতে নিয়মটা প্রথমে করলো।

ঠাণ্ডা ঘর। কার্পেট। একজোড়া সেণ্ট্রল মিনিস্টার। জায়গাটাই অন্যরকম। জনা তিনেক স্টেনো। যে যা বলছে—তা কপি হয়ে যাচ্ছে।

বার্ণীগঞ্জের এম পি একটি কথাই বার বার জানতে চাইছিলেন। কয়লা হবার আগের অবস্থার নাম সেল। কয়লার সঙ্গে কাটাই হয়ে তা গুঁড়ো অবস্থায় মিশে যায়। এটা বন্ধ হচ্ছে না কেন?

মিশে যাবার কথাটা দিলীপ অস্বীকার করলো।

এম পি মশাই লোকসভার তুখোড় বক্তা। তিনি ফুয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের অ্যানালিসিস রিপোর্ট মেলে ধরলেন টেবিলে। কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিলীপের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে।

এম পি মশাই আবার জানতে চাইলেন, সেলের গুঁড়ো মেশানো কয়লা কিনে ইস্পাত কারখানাগুলো ভুগছে। ব্লাস্ট ফারনেসে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। এই একই কারণে থারমাল পাওয়ার স্টেশনের বয়লারগুলো বিগড়ে যাচ্ছে। লোডসেডিং হচ্ছে—

দিলীপ যতবারই এটা ওটা বলে এড়িয়ে যাচ্ছিল—এম পি মশাই আরও শক্ত করে দিলীপকে ধরছিলেন।

দিলীপ হয়তো বললেন, সবকিছু নির্ভর করছে—কয়লার ব্যবহারের ওপর।

এম পি মশাই আরও শক্ত করে বললেন, না—কয়লার ভেতর ছাই রয়েছে কতটা—তার ওপর সব নির্ভর করে।

বলতে বলতে এম পি ভদ্রলোক রেগে উঠলেন, আর নির্ভর করে কর্মীদের সার্ভিস কণ্ডিশনের ওপর। চাকরির অবস্থা। সিকিউরিটি। নিশ্চয়তা। প্রোমোশনের সুযোগ—

দিলীপ তাঁকে থামিয়ে বললো, সব কিছু নির্ভর করে জব স্যাটিসফ্যাকশনের ওপর। রেকগনিশনের ওপর।

বার্ণীগঞ্জের এম পি মশাই বোধ হয় জন্মে ইস্তক খাদানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। হয়তো তাঁর বাড়িতে কেউ খনিতে ছিলেন। কিংবা আছেন। না হয়—নিজেই হয়তো কোন সময় কোল কাটার ছিলেন। দিলীপকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতেই যেন ভদ্রলোক বললেন, জব স্যাটিসফ্যাকশন থাকলে কেউ কি আর কয়লার সঙ্গে সেল কেটে মিশিয়ে দেয়।

দেয়। কারণ—কাজে কোন আনন্দের কারণ নেই। কোন স্বীকৃতি নেই। তখন লক্ষ্য পড়ে—যাহোক করে ওভারটাইম পেতেই হবে। গোজামিল দিয়ে প্রোডাকশন বেশি দেখাতেই হবে।

খনি মন্ত্রী সব শুনছিলেন আর নোট নিচ্ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বুঝলো দিলীপ বসু নামক কর্মচারীটি সাক্ষী দিতে এসে হাটে হাঁড়ি ভাঙলো। এই কমিটি রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে অপোজিশনের ওই এম পি নিজেই রিপোর্টারদের ডেকে সব বলে দেবেন। কাল সকালেই ন্যাশনাল ডেইলি-গুলো লোড শেডিংয়ের জন্যে—ব্লাস্ট ফারনেসে গণ্ডগোলের জন্যে কোল ইণ্ডিয়াকেই দায়ী করবে। দিলীপ বসুর মুখের কথাগুলোই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। অর্থাৎ এই বুড়ো বয়সে আবার বেকার হতে হবে। এম ডি রাগে নিসপিস করছিলেন। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। তারই প্রতিনিধি হয়ে কথা বলছে। সাক্ষী দিচ্ছে।

দিলীপ তখন তোড়ের মাথায় বলে যাচ্ছিল। বার বার ওয়েজ বোর্ড বসিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েও এ প্রোবলেমের সলিউসন হবে না।

খনিমন্ত্রী বললেন, কেন হবে না?

দিলীপ আস্তে আস্তে বললেন, মাইনে বাড়লে একজন কর্মী আরেকজন কর্মীর সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে জেলাসি নয়তো আপারহ্যাণ্ডের পেসেণ্ট হয়ে পড়ে।

সেণ্ট্রল মিনিস্টার ফর মাইনস বললেন, তা তো হতেই পারে। সবাইকে তো সমান জিনিস দেওয়া যায় না। ইচ্ অ্যাকর্ডিং টু হিজ মেরিটস্। এটাই তো রেকগনিশন। এখন কর্মীকে দেখতে হবে—আমি যে মাইনে দিচ্ছি—সেই অনুপাতে কতটা কাজ দিচ্ছি—

দিলীপ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। কখনো কোন সেণ্ট্রাল মিনিস্টার সে ফেস্ করেনি। ধীরে সুস্থে বললো, আপনি ওয়েজ্ এথিকসের কথা বলছেন। ক্ল্যাসিকাল সেন্সে। কিন্তু ফিল্ডে নামলে অবস্থা অন্যরকম।

কিরকম?

ইচ্ অ্যাকর্ডিং টু হিজ মেরিটস্ ব্যাপারটা আদৌ কোন রেকগনিশন নয়। বলে দিলীপ বুঝলো, তার ওপর কেউ যেন ভর করেছে। খনিমন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মী যে এভাবে তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারে—সে ধারণা দিলীপের নিজের ছিলো না। তার গায়ে জ্বর উঠে এলো। সে একটু একটু কাঁপছিলো। সেই অবস্থাতেই বললো, প্রাইভেট সেক্টরে থাকবার সময় তো কয়লার ফাইয়ের মাত্রা স্পেসিফিকেশন মত থাকতো। কোল কাটাইয়ের নামে সেল কাটাই করে মিশেল দেওয়া হয়নি কখনো। মিশেল হলে সে কয়লার চালান ক্যানসেল হয়ে যেতো। তখন তো এত ওয়েজ বোর্ড ছিলো না। ইনসেনটিভ্ ছিলো না।

তাহলে ?

রেকগনিশন মানে সবসময় মাইনে বাড়ানো নয়। রেকগনিশন মানে এপ্রিসিয়েশন। পার্সোনাল রিলেশন এ-ব্যাপারে এক সময় একটা বড় রোল খেলে করেছে। রেকগনিশন মানে সব সময় ইনসেনটিভ্ নয়। মাইনে বাড়িয়ে খানিকটা জেলাসি কেনা যায়। পারফরমান্স কেনা যায় না। একটা লোককে একই টেবিল চেয়ারে বছরের পর বছর সেঁটে রাখলে লোকটা বিটার হবেই। সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ার পর তাকে লিফট দিয়ে কোন লাভ নেই। সময়েরটা সময়ে হওয়া দরকার। ওয়েজ বোর্ড আমাদের কিছু ফিশারের আনন্দ দিতে পারে—জন্মদিনের জন্যে। আগে এত পেতাম—এখন এত পাচ্ছি—এই স্যাটিসফ্যাকশন অল্প-দিনের। ও অত পায়—আমি এত পাই—এ ব্যাপারটাই পার্সোনাল রিলেশন নষ্ট করে। সবাই তখন আমরা পড়িমরি করে ফিগারের হিমালয়ে উঠতে চাই। জব স্যাটিস-ফাকশন—কাজের আনন্দ বাড়াটাই উবে যায়—

খনিমন্ত্রী প্রায় ধমকে উঠলেন। আপনি আদর্শের কথা বলছেন। বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সবটাই ইউটোপিয়ান—

দিলীপ বসু বেঁকে দাঁড়ালো। আমি এরকম বুঝি সবার।

দিলীপকে আগাগোড়া সাপোর্ট দিলেন বার্ণীগঞ্জ থেকে ইলেকটেড অপোজিশনের সেই এম পি।

পরদিন ভোরে কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট

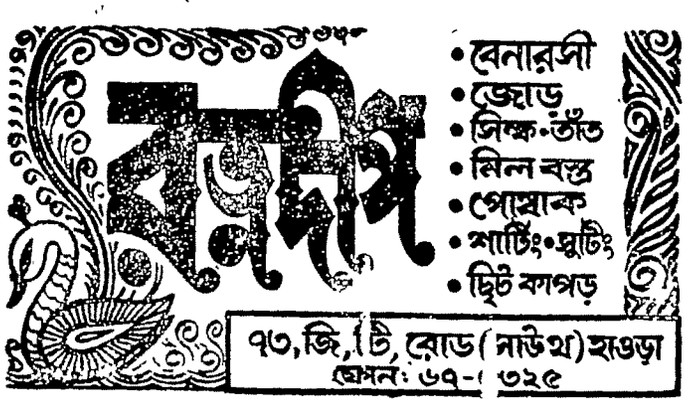

হাউসে দিলীপের ঘুম ভাঙলো টেলিফোনে।

হ্যালো

করেছো কি দিলীপ? এভাবে পথে বসালে সবাইকে?

অনাথ চক্রবর্তির গলা চিনতে পারলো দিলীপ। কি ব্যাপার? কোত্থেকে বলছেন?

অশোকায় উঠেছি। আমি আর ঋষি। আজকের সকালের কাগজ দেখেছো?

এখনো দেখিনি। আপনারা দিল্লি এলেন? এখন?

একটা চেক ডেলিগেশন আসবে। মাইনিং মেশিনারি নিয়ে কথা বলতে। তাই চলে এলাম দুজনে। কাগজটা দ্যাখো আগে। হিন্দুস্থান টাইমস্, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, স্টেটসম্যান — সবাই তোমার মুখের কথা তুলে নিউজ করেছে। কোল ইন্ডিয়ার ভেতরে যেন নৈরাজ্য চলছে—এমন সব কথাবার্তা তুমি বলেছো। এজন্যে তোমাকে সাক্ষী দিতে পাঠানো হয়েছিলো? একটা ডিনায়াল পাঠাও—

যা ভালো বুঝেছি তাই বলেছি। উইটনেস হিসেবে যা বলেছি—তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দেবো না। কাউকেই দেবো না। কিছুই ডিনাই করবো না।

কোল ইন্ডিয়ায় তোমাকে দিতেই হবে।

ধমকাবেন না। অফিসের কাজের নামে ফূর্তি করতে বেড়াতে এসেছেন। তাই করুন। গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরতে ভালোবাসেন—তাই ঘুরুন।

ইউ আর জেলাস অব ঋষি।

বাজে বকবেন না।

হিন্দুস্থান টাইমসে তোমার মুখের কথা যা কোট করেছে—তাতে এরকম মনে না হওয়ার কোন কারণ নেই দিলীপ। প্রোমোশন। ইনসেনটিভ। এটসেটরা—

আপনার পক্ষে-এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবার উপায় নেই। আপনি এই পর্যন্তই ভাবতে পারেন। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমি জেনারেল পলিসি হিসেবে প্রডাকশন-এর কথা ভেবে ওসব কথা বলেছি।

গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে কথাটা বললে কেন তাহলে?

কারণ খুব সাধারণ। ঋষি এখন কোল-ইন্ডিয়ায় গুড বয়। তার কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরতে কার না ভালো লাগে!

ভৌমিক খাদানের কমিশন তোমায় উদ্ধত, দুর্বিনীত করেছে। এথিকসের কথা তোমার মুখে মানায় না দিলীপ। কোল ইন্ডিয়ার একসপিরিয়েন্স তুমি ভৌমিক খাদানে খাটিয়ে দু'পয়সা করেছো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে এসব কথা বলছেন কেন? এসব তো সাধন গুপ্তর কথারই ইকো। যে-সাধনকে আপনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। তার প্রমিনেন্স আপনার চক্ষুশূল। তার ঘরের কার্পেট আপনার চেয়ে বড় হলে রেগেমেগে তিনদিন অফিসে আসেন না।

কলকাতায় ফিরে চলো—তখন তোমায় দেখাচ্ছি আমি।

ধমকাবেন না অনাথদা। ব্যথা পাবেন। অনেককাল ছাড়ি ঘোরাচ্ছেন—কাজের নামে অন্তরম্ভা। কোল ইন্ডিয়া থেকে বেরিয়ে গেলে আমি কাজ পাবো। আপনাকে বের করে দিলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।

দু' জায়গার পয়সা নিতে তোমার লজ্জা করে না?

কিসের লজ্জা! আপনি তো কোন কাজ না করেই মোটা মাসোহারায় আছেন। সে তুলনায় আমি তবু ভৌমিক খাদানের জন্যে খেটেছি। আমার পয়লা নম্বরের এনিমিও একথা ডিনাই করতে পারবে না। এবার ফোনটা নামিয়ে রাখলো দিলীপ। তারপর গেস্ট হাউসের ফাঁকা ঘরে বিড় বিড় করে বললো, বেশ আছিস ঋষি! ভোরবেলার এই ফোনটা তুই করলে আরো মানাতো!

ডিরেকটর বোর্ডের যে-মিটিংয়ে দিলীপের পাখনা কেটে দেওয়ার কথা হয়—যেখানে স্থির হয়েছিলো—দিলীপকে ভৌমিক খাদান থেকে সরিয়ে এনে তার টেবিল চেয়ারে গেঁথে রাখতে হবে— সে মিটিংয়ের মিনিটস্ কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক পরে দিলীপকে দেখিয়েছে। তার সম্পর্কে সাধন গুপ্তর মতামতও দিলীপ জানে। সে এসব খুবই নরমাল মনে করে।

কিন্তু অ্যাবনরমাল লাগে ঋষির ব্যাপারটা। এ তুই কি করলি ঋষি। তোকে তো আমার সঙ্গে দিল্লি এলে মানাতো। আমি এলাম সাক্ষী দিতে। তুই এলি বেড়াতে। অথচ আমরা একসঙ্গে খাদান করতে নেমেছিলাম। যে-খাদান তোর কাছে ছেলেখেলা—সেটা আমার কাছে মরণবাঁচন হয়ে গেল। অথচ পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইন্ডিয়াকে শেষ করে এনেছিলাম প্রায়—

ইচ্ছে করলেই কাগজ এনে দেখতে পারতো দিলীপ। কিন্তু দেখলো না। কি হবে দেখে?

বেলা এগারোটায় লোকসভা থমথম করছে। অপোজিশন থেকে খনিমন্ত্রীকে তুলোধোনা করা শুরু হয়ে গেল। ছাইয়ের মাত্রা। ভ্রব স্যাটিসফ্যাকশন। লোডশেডিং। ওভারটাইম। গভর্নমেন্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার জোগাড়।

বেলা তিনটেয় প্রাইমিনিস্টার পয়েন্ট অব অর্ডারের জবাব দিতে উঠলেন। সন্ধ্যে নাগাদ সব কাগজের টেলিগ্রাম বেরোলো। কোল ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেকটর চাকরিটি হারিয়েছেন। বেছে বেছে দেখেশুনে কিভাবে কয়লা কাটতে হবে—তার ফতোয়া ঝাড়লেন খনিমন্ত্রী। তাও বেরিয়েছে সন্ধ্যের টেলিগ্রামে। দিলীপ পড়ে দেখলো—আর হেসে উঠলো। ফাঁকা ঘরেই। আজ সারাদিন সে গেস্টহাউসে। পাছে খনিমন্ত্রী ডেকে পাঠান—তাই দিলীপ ঘরেই থেকেছে।

সন্ধ্যেবেলা এলো ঋষির ফোন। চলে আয়। চেক্ ডেলিগেশনকে কোল হাউসে রিসেপসন দেওয়া হবে।

আমি যাবো না।

কেন শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস। যা হবার তো হয়েই গেছে।

দিলীপের অনেক কথাই মনে আসছিলো। কিন্তু কোনোটাই বলতে পারলো না। শুধু বললো, তোর কি কিছু বলার নেই ঋষি?

আমি আর বলে কি করবো। তুই কি আমার কোন কথা শুনবি!

কোনটা শুনিনি?

সেকথা থাক। চলে আয়। সবাই মিলে আনন্দ করবো।

না। আমি যাবো না।

আমার ওপর রাগ করেছিস তো। আমারও ইমোশনস্ আছে। কিন্তু তোর মত আমি তা খুলে মেলে দেখাতে পারি না। আর—

আর কি ঋষি?

তুই যা ঠিক করবি—তা তো তুই করবিই। কারও কথা শুনবি না। বলে কি লাভ দিলীপ।

সাহায্য চাই

রোজ চার পয়সারও কম।

বুদ্ধিজীবি মহলে গুঞ্জরিত,
সরকার কর্তৃক স্বীকৃত,
সৎ ও মহৎ সাহিত্য ভাণ্ডার.
মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ

নয়ন তারা

প্রতি সংখ্যা ১.। ১, ২, ৫ বছর গ্রাহক চাঁদা সডাক—১২, ১৮, ৩০ টাকা। নববর্ষে, ২৬ বছর যুবকের বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে আবেদনসহ অনুরোধ, স্বনিযুক্ত পরিকল্পনায় আপনার সাহায্যে ১০ই জুলাই '৭৮এর মধ্যে প্রেস মেসিন কিনে কাজ শুরু করে ১০ই আগস্ট '৭৮ থেকে নিয়মিত নবীন প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবীণের লেখায় 'নয়ন তারা' পাঠিয়ে যাব। আপনি ৩০শে জুন '৭৮এর মধ্যে সাহায্য স্বরূপ গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে আশীর্বাদ করুন।
যাঁদের সাহায্যে বেকার জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত হব। গ্রাহক হউন, 'নয়ন তারা' পড়ুন, লেখা পাঠান। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

সম্পাদক—
নয়ন তারা, অনিমেষ চক্রবর্তী
পোঃ গাইঘাটা, ২৪ পরগণা, পঃ বঃ
এপ্রিল সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন—চাণক্য সেন, মে সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখবেন—দৈনিক বসুমতীর প্রবীণ সম্পাদক গোপাল ভৌমিক।

সবদিকে মার খাবার পর আমি আর কম্প্রোমাইজ করি কি করে।

মার মনে করছিস কেন?, তোর মত কাজের লোক কজন আছে?

একথাটা শুধু তুই বুঝলি! পাবলিক বোঝে না কেন বল তো? আমার উইটনেস নিয়ে পার্লামেন্টে হই-চই। অথচ তুই, অনাথদা আনপারটাবড্। দিব্যি ডেলিগেশন। দিব্যি বিসেপসন।

বাঃ! এ তো পার্ট অব দি গেম। জীবন তো এরকমই হয়। চলে আয়—

না, ঋষি। আমি মনের দিক থেকে কোন যোগ পাচ্ছি না।

অনাথদার কথায় কিছু মনে করিস না। ও তো পাগল লোক।

সেয়ানা পাগল!

ও কথা বলছিস কেন দিলীপ? তোকে খুব ভালবাসে।

নিজেকে ভালোবাসার জন্যে ঠিক যতটুকু দরকার—ঠিক ততটুকু ঋষি।

আমরা একই শহরে থাকবো—অথচ দেখা হবে না? এমন সন্ধ্যেবেলায়।

আমরা সভ্য না হয়ে যদি কামড়াকামড়ি করতে পারতাম—তাহলে অনেক টেনশন কমে যেতো।

দিল্লির টেলিফোনের তার বেশির ভাগই মাটির নিচে। যেখানে মাটির ওপরে—সেখানে শীত আর শিশিরে ভিজে গিয়ে ভারি হয়ে উঠছিল।

কলকাতায় এখন আদিগঙ্গার গায়ে সন্ধ্যের মুখে মুখে হাত বিকসা থেকে রাণী নামলো। সামনেই পালিত বাড়ি। খোলা দরজা পেয়ে রাণী ভেতরে ঢুকলো। সামনের ঘরে কেউ নেই। পুরনো সিঁড়িটা ধরে দোতলা উঠে এসে চেতলার পুলের মুখোমুখি বড় ঘরটায় রাণী দেখতে পেল, একজন শক্তসমর্থ মাঝবয়সী মানুষ টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে। সারা বাড়ি নির্জন। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে কয়েকটা কেটেল ড্রাম, রানিং সু আর গিটারের একটা বড় খাপ। বা বাকসো। ভুল বাড়িতে আসিনি তো।

কিরীটী তখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মামলার কাগজপত্র দেখছিল। আবার হিয়ারিং পড়েছে: এটাই ফাইনাল। ভাগ্যিস সে তার চিন্তাভাবনা চিরকালই পেটেন্ট করে রাখে। নয়তো রেল একশো কোটি টাকার লাভ বেমালুম নিজের বুদ্ধির জোরে বলেই চালাতো। প্যাসেঞ্জার ইনসিওরের আইডিয়াটা কিরীটী তিন বছর আগেই পেটেন্ট করে রেখেছিলো। নয়তো আজ মামলাই চালাতে পারতো না। কিরীটীর দাবি সামান্য। আমরাই পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে তোমাদের একশো কোটি টাকা মুনাফা। তার এক পারসেন্ট এককোটি টাকা। সে টাকাটা আমাকে দাও। খুব বেশি তো আমি চাইনি। এক পারসেন্টের নিচে চাই কি করে?

কদিনই কিরীটীর মনটা উড়ু উড়ু করছিল। কত কাজ বাকি। বাৎসল্য সম্পর্কে একটি নতুন আইডিয়া তার মাথায় এসেছে। যারা স্নেহ করতে পারে—তাদের তালিকা থেকে লটারি করে নামের প্যানেল তৈরি করতে হবে। স্নেহের অভাবে যারা—যেসব শিশু ঠিক মত বাড়তে পারছে না—তাদেরও নাম রেজিস্ট্রি করে রাখা দরকার। তারপর দু তরফকেই আইডেন্টি কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে।

যাদের স্নেহ করার প্রবল বাসনা তারা মাসে এক টাকা করে সাবসক্রিপসন দিলে সারা দেশের বাপে-খেদানো মায়ে-খেদানো শিশুরা ভালবাসাবাসির একটা স্থায়ী প্রবাহের সঙ্গে পাকাপাকি যুক্ত হবে।

ভালবাসা বা স্নেহ যারা পায়নি—তাদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু ভালোবাসতে চায় এমন মানুষের সংখ্যা আরও বেশি। মাসে এক টাকার চাঁদায় সারা দেশে কয়েক কোটি টাকা উঠবে বছরে। তাই দিয়ে স্বচ্ছন্দে বহু স্নেহভবন গড়ে তোলা যাবে।

চাঁদা তোলার অসুবিধা থাকলে ডাকঘর থেকে, ব্যাংক থেকে, রেল স্টেশন থেকে 'স্নেহ' ছাপ দেওয়া এক টাকার ডাকটিকিট কিনতে পাওয়া যাবে। তা দিয়ে চিঠি পোস্ট করা যাবে না। অনেকটা রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মত নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। ভালবাসতে হলে স্নেহভবনে গিয়ে জমা দিলেই চলবে। পৃথিবীতে তো বেশির ভাগ লোকই ভালো। মুফতসে একটি শিশুকে কোলে নেওয়া যাবে না। তার হাসি, তার আনন্দের শরিক হতে হলে ওই টিকিট কিনে নিয়ে তবে কোলে নাও। অবশ্য শিশুর নিজের মা বাবার বেলায় আলাদা। তাদের তো কোন টিকিটের বালাই থাকবে না।

স্নেহভবনে বড় হয়ে ওঠা শিশুরা মানুষ হলে পর নিজেদের আয় থেকে সারা দেশের 'স্নেহ' টিকিটের খদ্দেরদের মাসে মাসে সুদে-আসলে ফেরৎ দিয়ে যাবে।

এটা একটা আন্দোলন। এটা একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা। উদ্দেশ্য, ভালবাসার নদী যেন জীবন থেকে শুকিয়ে না যায়। নিজের কল্পনাতেই বিভোর অবস্থায় কিরীটী পালিত তার এই আইডিয়াটা বড় নোটবইয়ে টুকে রাখতে লাগলো।

একসময় কলমের কালি নেই দেখে দোয়াতের খোঁজে যেই চোখ তুললো অমনি কিরীটী রাণীকে দেখতে পেল। সাক্ষাৎ বিষাদ। একথা মনে হতেই কিরীটী বুঝলো, বিষাদ বিষয়ে তার আইডিয়াটি, এখনো পেটেন্ট করানো হয়নি। হয়নি পথ বিষয়ে আইডিয়ার পেটেন্ট করা। পথ মানুষের? না, গাড়ির?, কে বেশি ট্যাকস্ দেয়?

বিষাদ বলতে সে আগে ভাসানের দেবী প্রতিমার মুখ ভাবতো। পরে খুকীর মায়ের মুখখানা সেখানে কখন অজান্তে বসে গেছে। কাকে চাই?

রাণী বললো, আপনি মালবিকার বাবা?

হুঁ। আপনি? ববির মা?

হ্যাঁ। আমি মালবিকাকে নিতে এসেছি।

তা তা নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও তো এখন বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে?

ওর মায়ের সঙ্গে নবগ্রহ মন্দিরে নামগান শুনতে গেছে। এই সময়টায় ওসব শুনলে মন ভালো থাকে। সন্তানের মুখশ্রীও ভালো থাকে।

আমি সেখানে যাবো।

কিন্তু যাবেন কি করে। এখন কি কোন খেয়া পাবেন?

শুনে অবাক লাগলো রাণীর। শহর কলকাতার ভেতর খেয়া? আশ্চর্য!

বুঝিয়ে বললো কিরীটী। টালির নৌকো জোয়ার বুঝে ভাসে। পুটিয়ারির কুমোরদের নৌকো। খিদিরপুর অব্দি যায়। ওদিকে গড়িয়া। ঝামেলা নেই কোন। লগি ঠেলে ঠেলে এগোয়। আমাদের বাড়ি তো আদি গঙ্গার ওপর। মাঝিরা ঠাকুর্দার আমল থেকে চেনে আমাদের। যাবেন যদি চলুন।

নদীর পারে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হোল না। দু ধারে শহর। শ্মশানের পোড়াকাঠ ভেসে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা কে বুষকাঠে প্রদীপ দিয়েছে। প্রদীপের আলোয় কাঁচারও পুড়ছিল একটু একটু। কাঁহাতের ভেতর ইলেকট্রিক। শহর। ট্যাকসি। টানা বিকসা। কর্কাচি ডাক সাজিয়ে বসে আছে বাদামওয়ালা।

ক্যালিক্স্® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নির্বিঘ্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য:

★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।

টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

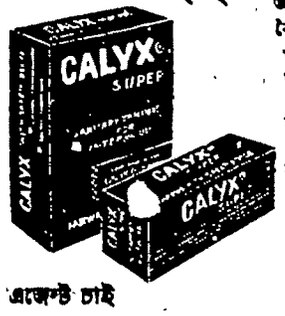

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১১
ফোন: ৩৫-৪১৪৫

এজেন্ট চাই

নৌকোয় উঠেই রাণী বললো, মালবিকাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

রবিদের দলেরই একটি ছেলে—ডাক্তার—সে দেখে যায় ফি বুধবার।

শহরকে তুচ্ছ করে আলিপুরের নতুন পুলের নিচে নামগান হচ্ছিল। নৌকো থেকে নামতে গিয়ে রাণীর পায়ে পাঁক মাটি লেগে গেল। সেই অবস্থাতেই সে কিরীটী পালিতের সঙ্গে ডাঙায় উঠে এলো। ডাঙা মানে নবগ্রহ মন্দিরের লাগোয়া. এক খাটালের সামনের গোবর-চোনায় বসন্থ ঘাসে ঢাকা এক চৌকো। সেখানে রাস্তা থেকে ছিটকে আসা আলোয় কয়েকজন মহিলা। সতরঞ্চির ওপর। তারই কোণে মালবিকা বসে। কপালে সিঁদুর। গায়ে গায়ে এক বৃদ্ধাকে দেখে রাণী বুঝলো, এই সধবা মহিলা রবির কৃপায় তার বেয়ান। যদিও বিয়েই হয়নি এখনো।

জলচৌকির ওপর কথক ভদ্রলোকের সুরেলা কথা আর গান একটু বাদেই শেষ হোল। জনা ত্রিশেক নানা বয়সের মহিলা তখনো বসে। একজন মাঝি আর জনা দুই খাটালের দোহাল বালতি হাতে উঠে দাঁড়ালো।

ভগবানের নাম শুনতে শুনতে মালবিকার মুখখানা একদম শান্ত। রাণীকে দেখে সে মুখে কোন ছায়া পড়লো না। চোখের পলকও পড়লো না।

রাণী হেঁটে গিয়ে পাশে বসলো। কেমন আছো মা?

ভালো। আপনি আবার এতটা পথ এলেন কেন।

তোমায় না দেখে থাকতে পারিনি।

ডাকলেই আমি যেতাম।

না। এ শরীরে একা একা তোমার যাওয়া ঠিক হোত না।

মালবিকা চোখ নামালো।

আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এতক্ষণ মালবিকার মা কোন কথা বলেনি। এবারে মহিলা দূরে বসে রাণীকে দেখলো। রবির মা তার চেয়ে অনেক ভালো দেখতে—বেশ আরামে থাকে—দেখলেই বোঝা যায়। এতদিনে মনে পড়লো?

রাণী একথার কোন জবাব দিল না। মালবিকার মা তো রাগ করতেই পারে। সবই রবির জন্যে। শুধু আস্তে বললো, আমাদেরই দোষ।

মালবিকার মা তবুও সহজ হতে পারলো না। মালবিকার একখানা হাত ধরেই থাকলো। জায়গাটা পুলের ওপর থেকে দেখা যায় না। মহিলারা প্রায় সবাই চলে গেছে। শহরের ভেতর দিয়ে নদী বলতে লিকলিকে এই জলের ধারা। তার ওপর দিয়ে এখন একটা খড়ের নৌকো যাচ্ছিল।

কিরীটী বললো, সবাই চলে যাচ্ছে। এবার ফিরলে হয়—। তার মনে হচ্ছিল, মাতৃস্নেহ কথাটার সবসময় নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এ তুলনায় বাৎসল্য অনেক সহজ জিনিস। বাৎসল্যেরই একটা ভ্যারাইটির নাম মাতৃস্নেহ। বাংলা ডিকসনারিতে এ জিনিসের নাম পালটে ফক্কু কথাটা বসানো যায়।

কুমোরদের বড় নৌকো। তাতে ভালো করেই বসলো চারজনে। অনেকদিন পরে রাণী এত কাছাকাছি জল পেয়ে ডান হাতখানা ঝুলিয়ে দিল। তারপর একটা আঙুল জলে ডুবিয়ে রাখলো খানিক। তাতে জল কাটতে লাগলো।

তখন মালবিকার মা কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারছিল না। সবার দিকে পেছন ফিরে জেলখানার লাল দেওয়ালটা দেখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না! অনেক চেষ্টায় চোখ মুছে, গলা পরিষ্কার করে মালবিকার মা জানতে চাইলো, রবি কোথায়?

রাণী আস্তে বললো, জানি না।

ভালো আছে?

কিচ্ছু জানি না।

শীগগিরি এসেছিলো?

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কুটু বলছিলো।

কুটু কে?

আমার মেয়ে।

মালবিকার মা ধরা গলায় বললো, আমিও অনেকদিন দেখিনি রবিকে। গত বছর শীতকালে একদিন এই আদিগঙ্গা থেকে উঠে এলো। সারা গায়ে গোবর। পুলিশ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই খাটালে লুকিয়ে ছিলো। শীতের সন্ধ্যেবেলায় আমাদের কলঘরে গরম জল—সাবান দিলাম। শেষে খুকীর বাবার ধুতী পাঞ্জাবী পরে বেরুলো।

রাণী তখন নিজের মনে মনে বলছিলো, মেয়ের মা হয়ে কি করে আপনি, অতটা আসকারা দিলেন? তা যদি না দিতেন—তাহলে কি আপনার খুকীর আজ এ অবস্থা হয়?

কিন্তু এসব কথা এখন অবান্তর।

মালবিকার মা রাণীর কানের কাছে গুন গুন করে বলতে লাগলো, এখানে শতকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। চেতলায় আমাদের এখানটা এখনো পাড়া মত। সবাই সবার খবর রাখে। কেউ বলে—হ্যাঁগো! তোমার জামাই আসছে কবে? এর ভেতর আবার পুলিশের লোক নাকি রবির জন্যে তককে তককে ঘুরছে। কি করি বলুন তো? কতদিক সামলাই।

আমাদের দশতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে ওসব ঝামেলা নেই। তবে মালবিকা গেলে পুলিশ আসবে নিশ্চয়।

পুলিশ সেই এলো। তবে তখন নয়। রাত একটায়। ফ্ল্যাটবাড়ির অটোমেটিক লিফটে চড়ে। যথারীতি সারা বাড়ি তছনচ করলো। সেই সঙ্গে মুখে ভালো ভালো কথা। যেমন: বউ এসেছে! বর কোথায়? আমরা ঠিক ধরে ফেলবো কিন্তু বলে দিলাম—

অনেকদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলো মালবিকা। নিশুতি রাতে বিছানায় উঠে বসলো। পাশে কুটু শুয়ে। সে আস্তে বললো, শুয়ে পড়ো তো। পুলিশ অমন করেই থাকে। একটু ভালো করে ঘুমোও।

পুলিশ নেমে যেতে আলো নিভলো। আবার শুতে হোলো। দশতলায় মশা নেই। মাছি নেই। ধুলো নেই। অনেক নিচুতে লরি যায়—সামান্য শব্দ উঠে আসে। কুটু বললো, আগে আমি আর দাদা অনেক রাত অব্দি শুয়ে শুয়ে গল্প করতাম।

মালবিকা কোন কথা বললো না।

দাদা পাল্টে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।

বুঝলে কি করতে?

কিছুই করার ছিলো না। বলে অনেকক্ষণ থেমে থাকলো কুটু। তারপর বললো, আমি বিশ্বাস করি না—দাদা কাউকে খুন করতে পারে—

পুলিশ বলছে—

পুলিশ অমন মিথ্যে মামলা সাজায়।

এত লোক থাকতে তোমার দাদার নামে মিথ্যে মামলা লাগাবে কেন?

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না।

কুটু অনেকক্ষণ পরে বললো, আমার দাদা ওরকম নয়। ছোটবেলা থেকে জানি।

মালবিকা ঠাট্টা করে বললো, কার ছোটবেলা? তোমার? না, তোমার দাদার?

অন্ধকার বিছানায় হাসতে হাসতে কুটু একা একা কেঁদে ফেললো। নিঃশব্দে। বালিশে চোখ ঘষে দুজনের ছোটবেলার যা কিছু মনে পড়ছিল—তা একদম মুছে ফেলতে চাইলো কুটু।

ঘুম আসছিলো না মালবিকার। তার ওপর রাণী তাকে সন্ধ্যেবাতে বেনারসী পরিয়েছে। সেই সঙ্গে বিয়ের রাতের সাজের গয়নাগাটি। মুখের দু পাশে চন্দন মাখানো লবঙ্গর টিপ। এখন বেনারসীর জরি গায়ে কেটে বসছে। তবু রবির মা তাকে শাড়ি

পালটাতে বারণ করেছে। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত—এই পোশাকই নাকি ভালো! শ্বশুর দিল্লিতে।

কুটু জানে, ওই গয়নাগাটির খানিকটা তার জন্যে বানানো। খানিকটা মায়ের বিয়ের সময়কার। বিছানা জুড়ে ফুলগুলো খড়-বাজারের ওখান থেকে কিনে আনা। আজ বিশ্বনাথ মায়ের কথা খুব শুনেছে। ফুল এনেছে। মালা। নিজে দাঁড়িয়ে বিছানা সাজিয়েছে। শেষে, আসব সাজিয়ে গানও গেয়েছে। সতীনাথের একখানা গান খুব ভালো তুলেছে গলায়। ও-ই তো সারাটা সন্ধ্যে জমিয়ে রেখেছিলো।

কুটু বললো, আমাদের বাবার বয়স বেশী নয়। একদম ছেলেমানুষ।

একথায় একদম খিল খিল করে হেসে উঠলো মালবিকা। কুটু মালবিকা কাছাকাছি বয়সের। কুটু এই হাসিতে একটু ঘা খেলো। সে বললো, বেস তো বউদি—আমার কথা সত্যি কিনা—কালই দেখতে পাবে।

কাল?

কালই তো বাবা ফিরবে। তাই তো বলে গেছে। তখন মিলিয়ে নিয়ো। আমার বাবা অল্প বয়সে মাকে বিয়ে করেছে। দাদা তাঁর প্রথম যৌবনের সন্তান—

আবার হাসতে থাকল মালবিকা। একটু পরে থেমে জানতে চাইলো এ বাংলা তুমি কোথায় পেলে কুটু? নিশ্চয় মুখস্ত করেছো।

যাঃ! মা তো এই ভাবেই বলে। শুনে আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। কেন? বাংলাটা কি খারাপ?

তা কেন? রীতিমত ভালো। তবে তোমার আমার বয়সী লোক কখনো এ বাংলা বলবে না। খানিকক্ষণ কথা বলে মালবিকা বুঝেছে, কুটু মানুষটি বয়স আন্দাজে সবল আছে এখনো। তাদের বাড়ির মত টানাটানির সংসারে বড় হয়নি কুটু।

কুটু অন্ধকারেই আস্তে আস্তে বললো, দু'বছর আগেও বাবা কি ফুর্তিবাজ ছিলো।

এখন নেই?

আগের মত আর নয়।

কেন?

আমরা জানি না। তবে পাণ্ডবেশ্বর না কোথায় খাবার খেলার পর থেকেই বাবা একটু একটু করে পালটে গেল।

সেখানে কি লোকসান খাচ্ছে?

না। তাহলে তো বাবাই বলতো। তবে কিছু একটা হয়েছে—যে জন্যে বাবা আর হাসে না।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার। কুটু ভাবছিলো, ভালো বাসর জাগাচ্ছি! দাদা উধাও, পুলিশ ঘুরে গেল। বাবা দিল্লিতে। ঠিক এই সময় মালবিকা বললো, তোমার বিয়েতে আমরা খুব হই চই করবো।

দাদা ওরকম না করলে—বাবা ওরকম না হয়ে গেলে—তোমার বিয়েতেও হোত।

আমার বিয়ের কথা তুলো না। বিশ্বনাথকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল—গাইছিল আর তোমার দিকে তাকাচ্ছিলো।

ধ্যাৎ! ওকে বিয়ে করবে কে? চাল নেই। চুলো নেই।

কি বলছো কুটু! এখন এক রাত গাইবে আর তিনশোটি টাকা গুনে নেবে। ফাংশন করে না বেশি। তার বদলে হোটেলে গাইছে। ওর গানের সঙ্গে আমার দুই দাদা বাজায়।

আচ্ছা। তাই বুঝি।

ন্যাকামি কোরো না। তুমি সব জানো। বিশ্বনাথ এখন মাথলি কন্ট্রাক্টে গাইছে। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছে। এ-মাসে পাটনা তো ও-মাসে শিলিগুড়ি—

ওকে বিয়ে করতে আমার ভয় হয়। ও আর আগের মত নেই।

তা থাকবে কি করে কুটু?

কেন বদলাবে? সবাই কেন বদলে যাবে? আমি কি শত্রুতা করেছি।

যাঃ! তুমিও তো বদলে যাচ্ছো। তাছাড়া—

মালবিকাকে থামতে দেখে কুটু বললো, তাছাড়া কি বৌদি?

পুরুষমানুষ আর করতে শুরু করলে পাল্টাতে থাকে। আমার দাদাদের দেখেই বুঝি। টাপুদা, বাচ্চুদা—দিব্যি এখন গলায় দামী স্কার্ফ বেঁধে ব্যান্ডস্ট্যান্ডে বাজাতে ওঠে। ওরা আমার ভাই বলেই আমি জানি।

বিশ্বনাথ আগে আমায় একদিন না দেখলে চিঠি দিতো। পানের দোকানে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা।

সেরকম কি এখনো ভালো লাগতো তোমার!

না। তা লাগতো না। তবে এখন আর দাঁড়ায় না। চিঠি দেয় কখনো সখনো। সব সময় ব্যস্ত সমস্ত ভাব।

তা তো হবেই। কত হোটেলে সোলো গাইছে বিশ্বনাথ। কখনো শুধু টাপুদা বাজাচ্ছে। কখনো বাচ্চুদা। একজন মিউজিক হ্যান্ড নিয়েই তিন ঘন্টা গাইছে বিশ্বনাথ। ওর বাবার পড়তি দোকানটাকে আবার অনেকটা ঠেলে তুলে ধরেছে। চেতলা বাজারে এক সময় ওর বাবার চিড়ে গুড়ের দোকান সবচেয়ে বড় ছিল।

চিঁড়ে গুড়ের দোকান?

হ্যাঁ। কেন? বিশ্বনাথ তোমায় বলেনি?

হয়তো বলার সময় পায়নি। বলতো নিশ্চয়। বলেই চুপ করে গেল কুটু। রাত তখন সওয়া তিনটে হবে। ঘুম এসে ওদের দু'জনকে পাকাপাকি জাপটে ধরলো। একজনের পেটের ভেতর আরেকজন প্রাণী নাড়াচাড়া করছিল। তার নাড়াচাড়ায় মালবিকা ঘুমিয়ে পড়লো। ক্লান্তির সঙ্গে যে এতখানি আরাম মিলে থাকে—তা আগে জানতো না মালবিকা।

কুটু চোখ বুজেই পরিষ্কার দেখতে পেলো—সে আর অমিতাভ বচ্চন মোম মাখানো মেঝের ওপর সুন্দর তালের গানের সঙ্গে নাচছে। গানের গলাটি চেনা। কিন্তু পেছন ফিরে তাকাবার উপায় নেই। তাহলে তালে ভুল হয়ে যাবে। তবু কুটু একবার ফিরে দেখতে গেল। খুব চেনা গলা।

উহু। বলে অমিতাভ বচ্চন এগিয়ে এলো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় কুটু।

তোমাকেও—। কে গাইছে বল তো?

তোমার চেনা। এখন ফিরে দেখার দরকার নেই কুটু। তাহলে তোমার নাচের তাল কেটে যাবে।

তা কাটুক না অমিত। একবার চেনা গলার মানুষটাকে দেখবো না?

তোমাদের চেতলার বিশ্বনাথ।

আমাদের বিশ্বনাথ! কোথায়?

উহু। পেছনে তাকাচ্ছো কেন কুটু? তাহলে কিন্তু আমাকে ভুলে যাবে তুমি।

না না। ভুলবো কেন? একটু তাকাই।

না কুটু।

একবার তাকাই অমিত।

না। বিশ্বনাথের গলা কত সুন্দর। ও গান সামনাসামনি শুনলে তুমি আর ফিরবে না। আমাকে একদম ভুলে যাবে কুটু।

যাই না ভুলে! তোমার তো মায়া আছে। হেমা আছে। রেখা আছে। হাজার হোক তুমি তো ফিল্ম স্টার। এক কুটু গেলে আরেক কুটু আসবে তোমার—

আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবো না কুটু। এ ভুল কোরো না কুটু। কুটু—

কুটু অমিতাভ বচ্চনের কথা রাখতে পারলো না। ঘাড় ঘুরিয়ে যেই দেখলো—বিশ্বনাথ গাইছে—হাসতে হাসতে—সে-হাসিতে দুঃখের ছিটে পড়েছে খানিক—অমনি কুটু ছুটে গিয়ে বিশ্বনাথের হাত ধরলো। বিশ্বাস করো। আমি আর অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে যাবো না।

তুমি যেখানেই যাও—তোমায় ফিরে আসতে হবে। দেখো কুটু।

ইস! খুব যে নিজের ওপর বিশ্বাস। চলে তো যাচ্ছিলাম—

একটি বছর কুড়ির মেয়ে যে-বিশ্বনাথ প্রেমে পড়ে—ভালবাসে—সেই মন নিয়ে ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেল কুটু।

(চলবে)

লেখিকার নবজন্ম

কুমার সিকদার

অনেক বছর আগের কথা। মফঃস্বলের এক কলেজে কোনো উপলক্ষে অতিথি হয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দেখাশুনোর দায়িত্ব ছিল কলেজের অল্পবয়সী একজন শিক্ষকের উপর। সন্ধ্যায় পায়চারি করতে করতে সেই যুবক শিক্ষকের সঙ্গে শ্রীকুমারবাবু গল্প করছিলেন সাহিত্যের নানান বিষয়ে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারার নতুন সংস্করণে তিনি সম্প্রতিকালের উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করবেন। তিনি মনে করছেন এখনকার মহিলা উপন্যাসিকদের মহিলা বলে আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, কারণ সম্প্রতিকালের লেখিকাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। উদাহরণ হিসেবে তিনি মহাশ্বেতা দেবীর দু-চারটে উপন্যাস পড়া ছিল বলে তাকে আশ্চর্য হতে হয়। তার কাছে কোনো সময়েই মনে হয় নি, মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সিরিয়াস বিবেচনার বিষয় হতে পারে। তাঁর রচনা সেদিন ছিল নিতান্ত অবসর-বিনোদনের উপকরণ। শিক্ষকটি সেদিন মনে-মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিল যে, অভিজ্ঞ 'উপন্যাসের ধারা'য় জগদীশ গুপ্তের নাম না থাকা আর মহাশ্বেতা দেবীর আলোচনা থাকা, আসলে একই অন্ধতার দুইরকম প্রকাশ।

সেই মহাশ্বেতা দেবী যখন একই বছরের শারদীয় সংখ্যায় তিনটি অনেক টি এন টি শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক বোমার মতো তিনটি গল্প (স্তনদায়িনী প্রচ্ছন্ন; জল—'কৃত্তিবাস'; দ্রৌপদী—'পরিচয়') লিখে ফেললেন তখন আক্ষরিক অর্থে অবাক হতে হয়। নড়েচড়ে বসতে হয়, ব্যাপারটি কী খবর নিতে হয়। খুঁজতে হয়, কোথায় আছে এই নবজন্মের কার্যকারণসূত্র; কী করে একজন বিনোদ ব্যবসায়ী উত্তীর্ণ হন যথার্থ লেখকের সামাজিক অঙ্গীকারবদ্ধ সততায়? আর বিনোদনের অধঃপতিত স্তর থেকে লক্ষ্য যেই সবে আসে বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের দায়িত্ববোধে, এমনি ভাষাতে আজকে ঘটে যায় এক অসামান্য চরিত্রান্তর। যিনি আগে লিখেছেন বাংলা সিনেমার মতো ইচ্ছা পূরণের গল্প, তিনি কী করে লেখেন 'স্তনদায়িনী', 'জল', 'দ্রৌপদী'—বিশেষ করে 'দ্রৌপদী'। লেখক হিসেবে এই পরিবর্তনের পিছনে থাকে নিশ্চয়ই মানুষ হিসেবে পরিবর্তনের ইতিহাস। কী সেই ইতিহাস, কোন অভিজ্ঞতার অভিযান ঘটায় এই মৌলিক পরিবর্তন? কী সেই রহস্য?

এই রহস্যের রূপকাত্মক ইতিহাস হয়তো নিহিত আছে মহাশ্বেতা দেবীরই উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা'র মধ্যে। মুক্তির দশকে এক হাজার জনের মৃত্যুর পর এক হাজার চুরাশি নম্বর হলো ব্রতী, তারই

মহাশ্বেতা দেবী

মা সুজাতা নামী বংশের মেয়েরা, অভিজাত তার চেহারা, বিশুদ্ধ তার ইংরেজি উচ্চারণ; স্বামী দিব্যনাথের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম আছে, বড় ছেলে জ্যোতি ব্রিটিশ ফার্মে মেজ সাহেব, বড় মেয়ে নীনার বর কাস্টমসের বড় অফিসার, ছোট মেয়ে তুলির ভাবী বর টোনি কাপাডিয়া এজেন্সি খুলে বিদেশে শৌখিন জিনিস পাঠায়। এই সমাজের সুজাতা, ছোট ছেলে ব্রতীর মধ্য দিয়ে 'সম্পূর্ণ পৃথক এক মানবজগৎ দেখতে পেলেন।' সেই ব্রতী জন্মদিনের আগের দিন খুন হলো। তিল মাত্র সুজাতা কিছু জানতো না। বিছানায় পড়ে থাকতো চোখে হাত চাপা দিয়ে। দাসী হেম, একা হেম ওর কাছে থাকত, ঘুমের ওষুধ দিত। সম্পদের বাড়িতে সমু ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ব্রতীর সেই খুন হবার পর বাড়ির অন্য সকলের চেষ্টা হয়েছিল কী করে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যায়, কী করে তাদের সুশৃংখল সাজানো মিথ্যার জীবনে এই হিংস্র মৃত্যুর ব্যাঘাতকে মুছে ফেলা যায়। আর তিন মাসের অসাড়তার পর সুজাতার চেষ্টা হয়েছিল অর্থ খোঁজার। ব্রতী কেন সেদিন সন্ধ্যায় নীল শার্ট পরে বেরিয়ে গেল, কেন হাজার চুরাশি হয়ে গেল—তার নিহিতার্থ খুঁজেছে সুজাতা। সেই ভয়ংকর মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকীতে বাড়িশুদ্ধ অনুভূতি-হীন ফাঁপা মানুষগুলো যখন তুলি-টোনির এনগেজমেন্টের বীভৎস উৎসবে মত্ত, তখন সারাদিন ধরে সুজাতা একবার গিয়েছে বস্তির বাসিন্দা সমুর মা-র হত-দরিদ্র বাড়িতে—'আজ দু'বছর ধরে একমাত্র এখানে এলেই সুজাতা শান্তি পান। মনে হয় নিজের জায়গায় এসেছেন।' সমুদের বাড়ির ভাঙা চায়ের পেয়ালা দেখে সুজাতা যেন তার অযোধ্য সন্তানকে নতুন করে চিনতে পারে। আর একবার সুজাতা গিয়েছে ব্রতীর প্রণয়িনী নন্দিনীর কাছে, যে নিজেও ব্রতীর মতাদর্শে দীক্ষিত ছিল—জেলের অত্যাচারে যে আজ প্রায় অন্ধ। নন্দিনী অনুযোগ করে, 'আপনারা কখনোই কোন কিছু জানেন না। যা হয় সবযেন একেকটা ঘটনামাত্র। কেন হয়, কেমন করে হয়....না জানলেও চলে যায় সে বিশ্বাসটা ঠিক নয় এখন দেখতে পাচ্ছেন।'

বাস্তবিক সুজাতা খানিকটা দেখতে পাচ্ছে। কেন ব্রতী বেরিয়ে গেল, আপাত-দৃষ্টিতে যাদের সঙ্গে জীবনে কোনো মিল নেই, সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে নতুন জীবন রচনা করতে গিয়ে নির্মমভাবে খুন হলো, তার ব্যাখ্যা টুকরো-টুকরো খুঁজে পেয়েছিলেন সুজাতা। বাকি জীবনটা সেই টুকরোগুলো খাপে খাপে মেলাতে মেলাতে কাটবে।' ব্রতীর মৃত্যুর অর্থ খুঁজতে গিয়ে মা সুজাতার মনে প্রশ্ন জাগে—ব্রতী নেই, ব্রতীরা নেই। তাতে কি শেষ হয়ে গেল সব?' নায়িকার এই সব প্রশ্নই কি লেখিকাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করলো 'একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহনে'? মা থেকে এই ঐতিহাসিক উত্তরণ, তাতেই কি ঘটে গেল মহাশ্বেতা দেবীর লেখক জীবনের নবজন্ম? সেই রকম অনুমান করার সঙ্গত ইঙ্গিত আছে 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের মধ্যেই। যখন কলকাতার প্রত্যহের রক্তোৎসবকে উপেক্ষা করে কবি ও লেখক শুধু ওপায়ের মারণ-যজ্ঞের কথাই বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ভুল? সুজাতার দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় ভুল? নিশ্চয়। কবি-লেখক-শিল্পী, এঁরা তো সমাজের সম্মানিত সভ্য, স্বীকৃতি পাওয়া মুখপাত্র, দেশের প্রতিভূ। সুজাতা কে? তিনি তো শুধু মা। যাদের হাজার হাজার হৃদয়ে এই প্রশ্ন আরও ক্ষরে ক্ষরে যাচ্ছে, তারা কে? তারা তো শুধু মা।' বোঝাই যায় অভিপ্রেত অর্থ বাইরের অর্থের বিপরীত। লেখক-শিল্পীদের দৃষ্টি-ভঙ্গি যে মারাত্মকভাবে ভুল তা মায়ের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে সুজাতা; নিজের দায়িত্বজ্ঞান দিয়ে লেখক-শিল্পীদের সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ভ্রান্তিকে সংশোধনের দায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন মহাশ্বেতা। তাতেই লেখা হয়েছে এই সব অসামান্য গল্প।'

একটি দিনের কালসীমায় 'হাজার চুরাশির মা' বিধৃত। এইদিনে এনগেজমেন্ট পার্টির সুবাসিত অসৎ পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে, হয়তো বা অ্যাপনডিক্সের ব্যথায় চীৎকার করে পড়ে যায় সুজাতা। সুজাতার আর্তনাদ শুনে 'বিস্মৃত অতীত স্মরণে, অতীত, গতকালের অতীত, বর্তমান, আগামীকাল সব যেন কেঁপে উঠলো, টলে

গেল। তাই মহাশ্বেতার রচনায় পুরাণ-ইতিহাস ও সম্প্রতিকাল একাকার হয়ে যায়—অতীতের মধ্যে তিনি খুঁজে পান বর্তমানকে, বর্তমানের মধ্যে আবার অনুরণিত হয় অতীতে। পুরাণের যশোদার আবির্ভাব ঘটে স্তনদায়িনী যশোদার মধ্যে। জলের অধিষ্ঠাত্রী মূর্তিহীনা পাতাল গঙ্গার ভগীরথ হল মঘাই ডোম। বিবস্ত্র দ্রৌপদী মেঝেনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় কৌরবসভায় নির্যাতিতা, দ্রৌপদী, ইতিহাস থেকে উঠে আসে বিরসা মুণ্ডা। কারণ, এই সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন।

সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন, যেহেতু দারিদ্র্য, শোষণ, নির্যাতনও স্মরণাতীত কাল থেকে অব্যাহত। খাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায় তাই ভাত এরকম স্বপ্ন। মহাশ্বেতার অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে বীরসার দাদা কেমতা বলে, বড় হলে ও নাকি হাট থেকে একেবারে এক বস্তা নুন নিয়ে আসবে। তার যত ইচ্ছে, ভাত তুলিয়ে তুলে নিয়ে ঘাটোর মিশিয়ে খাবে। শহরের দোকানে নুন তেল দেখে অবাক হয়ে বীরসা সহপাঠী অমূল্যকে বলেছিল, 'বড় হলে আমি মাকে বোরা বোরা নুন কিনে দেব। ওই তেল নিয়ে যাব গ্রামে। মা বাতি জ্বালাবে।' মহাশ্বেতার নতুন উপন্যাস 'অপারেশন? বসাই টুডু'তে দেখি কৃষকের ডাকা জমি - বওর জমি —নাবাল জমি— দোফসলী জমি সকল জমিই অভিমন্যু বা অজগরের খাদ্য।' মহাজন-জোতদারের জাবদা খাতায় ঢোকে হুড় হুড় করে, বেরোতে জানে না। সাঁওতাল নেংটি পরে, আকালে ইঁদুর সাপ খেয়ে বাঁচে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ওড়িশায় আনাজ বিক্রি হয়। ভাতের হোটেলের কাঁচা নর্দমা থেকে ফ্যান নেয় মানুষ। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় জল নেই, সরকারি টাকায় তৈরি কুয়োগুলো বর্ণহিন্দুরা দখলে। তাই জল গল্প বেশি আষাঢ়ের শেষে চরসায় বান না ডাকা অবধি জলের জন্য চলে এই প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতি। খন্তা দিয়ে নদীর বুক খুঁড়ে তাতে এমনো জল অস্পৃশ্য মেয়েরা ভোরবেলা নিয়ে আসে। এই অঞ্চলের মানুষ কালী সাঁওতা কিশোরে পাবনা গিয়ে অবাক হয়েছিল, এত জল থাকতেও পাবনার মানুষরা দারিদ্র্য ঘোচে না দেখে। তখনো কালী জানে না, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অথবা কার্পণ্যের উপর মানুষের অবস্থা নির্ভর করে না। মানুষের দারিদ্র্য মানুষের সৃষ্ট।

এই দারিদ্র্য, পেটের খিদেই এই শক্তি হয়ে উঠতে পারে সব চেয়ে ভয়ংকর। সেই শক্তিতেই শ্মশানরক্ষক বোঙার ভয়কে উপেক্ষা করে বীরসা মড়ার কবর খুঁড়ে আঙটি এবং পয়সা বের করে নিয়েছিল। বীরসা প্রশ্ন করেছিল, 'মুকতা শুধু ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মতো ভাত খাবে না?' মিশনে পড়তে গিয়ে বইয়ের অক্ষর পড়ে ঈশানের গল্প বুঝতে পেরে বীরসা এক অসামান্য জয়ের স্বাদ পেয়েছে অমোঘ শর, নিরতিহ শেষ কথা নয়। ভাগ্যজয়ের শিক্ষা দিতে লাগল বীরসা মুণ্ডাদের। মুণ্ডারা ছানা-চেচক-সাপকাটা-বাঘধরা মরণকে ভাগ্যের লেখা বলে জানত। বীরসা ওদের শেখালে লাগল চেচক-হায়নার সঙ্গেও যুদ্ধ করা যায়। ব্যাধির সঙ্গে এই যুদ্ধ বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি। জঙ্গল তো সকল মুণ্ডার মা—সেই জঙ্গল থেকে কৃষি ভারতের আদি মানুষেরা দীর্ঘকাল নির্বাসিত। সেই অরণ্যের উপর তাদের অসম্পত্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তবেই নিয়তিকে জয় করা যাবে, খিদের জ্বালা মিটবে। যতোই বীরসা সেই ভাগ্যজয়ী সংগ্রামের নেশায় মেতে উঠলো ততোই তার মা বরাম জানছিল ওর ছেলে আর ওর কোলে ধরবে না। বীরসা ভগবান হয়ে গেছে, সেই ভগবানের কী হবে সেই ভেবে বরাম রাতে জেগে-জেগে কাঁদে। ছেলের জন্যে তার যত গর্ব, তত ভয়। অজানা ভয়ে বুকের ভেতর কেবলই নাগরা বাজে। বুতী ভাবছে ছেলে নয়, হাড়-হাবাতের জানি সে জানে নি কোনোদিন, তবু সে যোগ দিয়েছিল সমুদের দলে যে সমুদের বাড়ি বড় জীর্ণ, খোলার চালে শ্যাওলা বেড়ার দেওয়াল ভাঙা, পিসবোর্ডের তালি-মারা। বাবা-দাদার মতো ফাঁপা-মানুষ হওয়ার নিয়তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে, নিজের জীবনকে অর্থময় করে তোলার জন্যে বুতী—বঞ্চিতের দলে যোগ দেয়। যে বুতী স্কুল-কলেজে মেডেল পেতো, বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিঙে গেয়ে ছবি তুলিয়েছিল সেই বুতী যখন ক্ষুধার্থদের দলে যোগ দেয়, করমির কাছে বীরসার মতো সুজাতার কাছে বুতীও তেমনি অচেনা হয়ে যায়, অজানা হয়ে যায়। বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক জিতো মাইতি,—যে বেয়াল্লিশে জেল খেটেছে, ছেচল্লিশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে মরণপণ করেছে, যে বোকা মানুষটা স্বদেশী করাকে ইনভেস্ট করে ফায়দা ওঠায় নি,—সে চরসা নদী বেঁধে ভাগ্যজয়ের পরামর্শ দেয় ডোম-চামার-চাঁড়ালদের। যদিও পুলিশ এসে বাঁধ ভেঙে দেয়, জল গল্পের পরিণামে আবার পুরুষেরা নদীর বুক খন্তা দিয়ে খোঁড়ে, জমা জল ভোরবেলা মেয়েরা নিয়ে আসে, তবু জিতেন মাইতির ভাগ্য জয়ের পরামর্শ ব্যর্থ হয় না। ব্যর্থ হয় না তারই প্রমাণ হিসেবে যেন দ্রৌপদীর নায়িকা দ্রোপদি ও তার স্বামী দুলন মাঝি সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করে ও আপার কাস্তের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল করে। দ্রোপদী ধরা পড়ে, বীভৎসভাবে ধর্ষিতা হয়, কিন্তু সব গল্পেই মহাশ্বেতার ইশারা হচ্ছে সংগ্রাম চলে, ভাগ্য জয়ের সংগ্রাম ক্রমাগত চলতে থাকে।

বীরসার চিতাভস্ম হাতে নিয়ে সালী শিবনকে জানিয়েছিল বীরসার কালী উলগুলানের শেষ নেই। ভগবানের মরণ নাই। এই কথাটা গানের ধুয়োর মতো অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে ফিরে ফিরে আসে। মহাশ্বেতার সম্প্রতিকালের সব বুড়ো। বোধহয় তাই অপারেশন? বসাই টুডু উপন্যাসের মধ্যে এসে যায় জল এবং দ্রৌপদী গল্পের কথা, প্রসঙ্গ চরিত্র ঘটনা। গ্রাম ফিরে আসবো রে ভারমি। বুন্দ, তামার, কত জায়গায় হোলির আগুন জ্বালাব। সোনপুরে ধুলার আঁধি উড়াব। আমার কথা হতে নতুন কথা বারাবে। তাই উপজাতীয় খেতমজুরের নেতা বসাই টুডু ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ অব্দি চারবার মারা যায়, কিন্তু আসলে মরে না। পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ও সমাহিত। রাতে। একই রাতে বসাই ডেক ছেড়ে পলাতক। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম মরণ বোলেধে কিছু নাই হে কমরেট। ভাবতে থাকে কালী সাঁওতা—যে, রাতে পঞ্চম বসাইকে গোর দিয়ে ষষ্ঠ বসাই হয়ে চলে গেল, সে কী রকম? তাই সুজাতা, নিতান্ত বাইরের লোক সুজাতার মনেও প্রশ্ন জাগে, বুতীরা নেই, তাই বলে কি শেষ হয়ে গেল সব? প্রশ্নের মধ্যেই ইঙ্গিত থাকে, শেষ হয়নি, শেষ হয় না।

সংগ্রাম এক, সংগ্রামের কৌশলও খুব বিভিন্ন নয়। থানা আক্রমণের আগে দোপদি ও দুলনা—এই দুই কয়েদি নরনারী সাইরেন চীৎকারে কুলকুলি দিয়েছে। সাঁওতালদের কাছেও দুর্বোধ্যভাষায় কতকগুলি অসভ্য মানুষ নিহতদের ঘিরে উল্লাসসঙ্গীত গেয়েছে। এই কুলকুলি দিয়ে বীরসার সঙ্গীরাও সতর্ক করে দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত নকশালপন্থী ছেলেদের বসাই বলেছিল, 'পাইপগান কবরু? গুলি ছুটাবু? কেনে? কাঁচফল নহি? মাপ নহি? আমু তীরের টেঁটা বিষে জরাবু, উয়াদের তালিম দিবু। এই তীর এই বিষাক্ত ফলাও বীরসার সংগ্রাম বা আরো আগে থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বীরসা মহাযোদ্ধাদের শিখিয়েছিল সে যদি ধরা পড়ে তাহলে তারা যেন বলে তারা ওকে চেনে না। বিদ্রোহের সব দায়িত্ব যেন তার উপর অর্পণ করে দেয়। মুসাইয়ের বৌ বিপদের আশংকা করলে দোপদী মেয়েনও বীরসার মতো পরামর্শ দেয়, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না। বসাইয়ের পদ্ধতিও এক। বানারির খেত মজুরেরা নেতৃত্ব দেবার জন্যে বসাইকে পলাতাকুড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে। বসাই বানারির সংগ্রামী খেতমজুরদের বলে প্রতাপ গোলদারকে খুন করার পর তারা যেন সব দায়িত্ব বসাইয়ের উপর চাপিয়ে দেয়। যেন বলে, বসাই লোক নিয়ে এসেছিল এবং হ্যাঙ্গামা বাধিয়ে পালিয়ে গেছে।

আর তাই মহাশ্বেতা অতিক্রান্ত অতীতের সংগ্রামের মধ্যে বর্তমানকালের সংগ্রামের পরিস্থিতি প্রসঙ্গ ও ঘটনার অনুরণন বাজিয়ে তোলেন। সেই অনুরণনের মধ্য দিয়ে যুক্ত করে দেন অতীতের সঙ্গে ঘটমান বর্তমানকে, তাকে প্রসারিত করে দেন ভবিষ্যতের দিকে। অরণ্যের অধিকার উপন্যাস থেকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাক্য সাজিয়ে দিচ্ছি। 'মাঝে-মাঝে কয়েক শো নিঃসম্বল মুণ্ডার অরণ্যের অধিকারের লড়াই এমন ভীষণ অপরাধ হতে পারে যে, ব্রিটিশ

লাগালেও কেস তৈরি করতে অনন্ত সময় লেগে যায়। মুণ্ডারা বিচারাধীন থাকে। কেস তৈরি হয় না।' সংগ্রামের বিকল্প অন্য পথের কথাও বীরসা মুণ্ডাদের মনে করিয়ে দেয়। সে-পথ হলো আইনের পথ, শান্তির পথ। 'দিকুদের ভিতর, মিশনের সাহেবদের ভিতর, রাঁচি চাইবাসার সাহেবদের ভিতর অনেকে আছে, যারা মুণ্ডাদের কথা ভাবে আর মুণ্ডাদের দুঃখ কীভাবে ঘুচাবে তাই ভাবতে যেয়ে টেবিলে-চৌকিতে বসে চা-দুধ খেতে খেতে দুঃখ করে। তোমরা শান্তির পথে চললে তারা খুশি হবে, ভেবে দেখ।' 'খুনটি থানা আক্রমণের খবর জানা যেতেই রাঁচির নিরাপত্তার জন্য চারশো সৈন্য আনা হয়। অন্ধকার না হতেই পথ নির্জন।' 'চিরুনি দিয়ে চুল যেমন করে আঁচড়ায়, তেমনি করে জঙ্গল আর পাহাড় খুঁজল পুলিশ।' মুণ্ডারা থানার কনেস্টবলকে খুন করে, কিন্তু থানার টাকা-পয়সায় হাত দেয় না। আত্মসমর্পণ করতে গেলেও পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করবে এবং বলবে মুণ্ডারা বুথে তেড়ে এসেছিল, তাই গুলি করছি। তখন সেই কথা কেউ লিখবে।' এই শেষ কথাটি তো পুরো-পুরি সম্প্রতিকালের কথা। সূর্য সাউ-এর হত্যার পর অর্জন সিং-এর নেতৃত্বে আর্মি বাকুলিতে ঢোকে ও গুলি চালায়। কান্না শুনে বোঝা যায় মেয়ে ও শিশুরাও টার্গেট হয়েছে। কিন্তু জওয়ানদের পক্ষে তখন আর থামা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রথমে জওয়ান বা পুলিশ বন্দুককে চালায়, পরে আগ্নেয়াস্ত্রই তাদের চালায়। অপারেশন বাকুলিতে সকলেই প্রথম দিন সম্মুখ সংঘর্ষে মারা যায়। যাদের হাড়-গোড় ভাঙা, পেছনে হাত-পা বাঁধা—সবারই মৃত্যুর কারণ সম্মুখ সংঘর্ষ। বালক-বালিকা-শিশুর মৃতদেহও সম্মুখ সংঘর্ষ থিওরি দ্বারা একস্প্লেইন্‌ড্‌ হয়।

একদিকে আছে বীরসার আমলের রেভারেন্ড লাসটি, এবং জগমোহন। বীরসা বোঝে এবং বোঝায় শুধু ইংরেজ—স্টুয়ার্ট-ফিল্ড বা ক্যাপটেন রোশ্‌ তার শত্রু নয়, জমিদার মহাজন বেনেরাও মুণ্ডাদের শত্রু। আজ সূর্য সাউ শত্রু, সূর্য সাউ-এর পক্ষে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয় যে অর্জন সিং নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে ব্রান্ডে লি বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কি য়ুনিফর্ম, কি গরুখসাহেব, কেউই তাকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।'—সেও শত্রু। জল গল্পের সন্তোষ পূজারী শত্রু—যার পেশা বিলিফ করা। বড়ই শাহানদার প্রতাপ গোলদার, যার পাঁচ হাজার বিঘা জমি, যার জন্যে প্রশাসন কাছা খুলে ছোটা-ছুটি করে সে শত্রু, শত্রু রামেশ্বর ভুইঞা, শত্রু জগত্তারণ লোহারী যার পিতামহ মণ-খানেক ধান ও শতখানেক টাকা দিয়েছিল বলে বিনিময়ে চারপুরুষ ধরে বনডেড লেবারের শ্রম ভোগ করে। শত্রু 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের সরোজ পালের শ্যামা মা যিনি এবার রক্ত চান এবং সরোজ পাল নিজেও। অন্য দিকে বীরসা, মালী, শিবন, বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ ধানী যে বীরসার মধ্যে বিদ্রোহীর আবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, অন্যদিকে ব্রতী সমু নন্দিনী, অন্য দিকে দোকৃদি মেঝেন ও দুলন মাঝি, মঘাই গুণীর ছেলে ধুরা, যে বলে মোর রাগ মোর বাপের উপর। এততেও আর শিক্ষা হয় না। বর্ণহিন্দুর কুয়ো ছুঁতে দেবে না জেনেও তাদের গোপন জলের সন্ধান জানিয়ে দেয় তার বাবা। অন্যদিকে বসাই টুডু—যে সমস্ত জীবন খেতমজুরের জন্য লড়ে এসেছে। সেও বীরসার মতো মিশনে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। খেতমজুরের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার তাড়নায় সে তেতাল্লিশ সাল থেকে নালিতাবাড়ি কন-ফারেন্সের সময় থেকে কিষাণ সভার কর্মী। হাটগোবিন্দপুর—হুগলি কনফারেন্স একের পর এক, ক্রমে ক্রমে সে বিষাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে 'কিষাণসভা খেতমজুর দলকে ফেলেছিল পাপগর্ভের ছেলার মতো।' কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রমান্বয় অধঃপতন তার আশাভঙ্গ ঘটায়। সে চলে যায় পার্টির বাইরে। নিজস্ব পথ এখন থেকে তার। সেই পথেই সে খেতমজুরদের নেতৃত্ব দেয়, বারবার মরে, বারবার বাঁচে।

এই পক্ষ আর প্রতিপক্ষ। মাঝখানে আছে অপারেশন? বসাই টুডু। উপন্যাসের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লেবার কমিশনার। আগা-গোড়া জানে না বলেই সে বলতে পারে যে, একটা ভালো অফিসার নিজের কাজ ফেয়ারলি করলে দেশের মানুষের ভালো করতে পারে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী ভালো করতে গিয়ে তাকে গভীর শীতে দিল্লিতে বদলি হতে হয়। তার দৃষ্টান্তে স্বভাবতই অন্য উন্নতিকামী অফিসাররা সতর্ক হয়। ব্যুরোক্রেসীর অঙ্গের নাট-বল্টু কোনো রিডিও রবের সঙ্গে ষড় করে দ্রৌপদী গল্পের সূর্য সাউ বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবওয়েল বসায়, কুয়ো খোঁড়ে যেমন তিনটি অন্য গল্পে রিডিও বাবু সূর্য সাউকে বলে রিলিফ আমি নিজে দেব। কিন্তু সূর্যর শক্তির সামনে তারও শুভবুদ্ধি হার মানে—বি ডি ও-র নিজেকে খুব পরাস্ত মনে হয়। অথবা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ কৃষি দপ্তরের সেই ছেলেটি—যে কালী সাঁতরাকে মিনি-মাম ওয়েজ অ্যাক্টের ইনজাংশন-জনিত অকালমৃত্যুর খবর দেয়। এদের চেয়েও উলেখযোগ্য, মধ্যবর্তী মানুষ, মিশন স্কুলে বীরসার সহপাঠী অমূল্য, বুনিয়াদী স্কুলের মাস্টার জিতেন মাইতি, জিলা বার্তা পত্রিকার সম্পাদক খরচের খাতায় তুলে-রাখা বিষাদগ্রস্ত কম্যুনিস্ট কালী সাঁতরা। বীরসার প্রশ্নের উত্তরে অমূল্য বলেছিল সে কোনোদিন দিকু বা বাবু হবে না। জেলে মুণ্ডা বিদ্রোহীদের প্রতি সেই ছিল একমাত্র সহানুভূতিশীল মানুষ। সে-ই জানতো বীরসার মৃত্যু হয়নি, জেলে বীরসার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সেই গোপনে সব খবর পাঠিয়েছে কলকাতাবাসী ব্যারিস্টার জেকবকে। বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক জিতেন মাইতি দেখে, শিক্ষা দিলে গ্রামের ছেলে হয়ে যায় গ্রাম-পরিবেশে মিসফিট অথচ শিক্ষা না দেওয়াও অন্যায়। আজন্ম ন্যাড়া জিতেন মাইতি শিক্ষা-প্রসারণে বিফলসংগ্রামী। মঘাই জলের ব্যাপারে বিফলসংগ্রামী। জিতেন মাইতির সংগ্রামটি মডার্ন ম্যান সৃষ্ট। মঘাইয়ের সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক। বড়-বাঘ ছোট-বাঘকে প্রজা বানাল। ডোমপাড়ায় দোসাজ-পাড়ায় আগুন লাগলে জিতেনের হস্ত-ক্ষেপে এই প্রথম পঞ্চায়েতী কুয়োর জলে আগুন নেবানো হয়। ফলে সন্তোষ পূজারী ক্ষিপ্ত হয়। জিতেনই বাঁধ দিয়ে চরসার জল ধরার পরামর্শ দেয়, যে জিতেন সরকারী নথিপত্রে ফর লং সাসপি-শাস্‌ ক্যারেক্টার। জলকে কেন্দ্র করে যে-কোনোদিন গ্রামের সংরক্ষিত ও তপশীলী জনসমূহ এক বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে। বস্তুত এই বর্ষাসিঞ্চনে শস্য-শ্যামলা চরসা এক জতুগৃহ। চরসানদীতে জিতেন মাইতির পরামর্শে তৈরি বাঁধে যখন ফাটিক-পারা জল ধরা পড়ে, ঠিক তখনই পুলিশ আসে। গুলিবিদ্ধ মঘাই শূন্যে দেহটি বেঁকিয়ে আর্চ করে জলে পড়ে, জিতেন ও ধুরা গ্রেপ্তার হয়। একমাত্র জিতেনই মধ্যবর্তীর নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামে পক্ষপাত দেয়।

Institute of Banking Services

Announces one-year correspondence course for

Bank Clerkship Examination.
(Clerk, Typist, Cashier Steno, Godown-keeper etc.)
Qualification : Matric/S.F /H.S /S.S.C /equiv. with good result.
Age : 18-25 (18-30 for SC/ST)

Probationary Officers' / Trainee Officers' Exam.
(State Bank of India and Nationalised Banks)
Qualification : Graduate with 50% (mere pass graduate for SC/ST)
Age : 20-25 (20-30 for SC/ST)
For Prospectus and Admission Form send a self-addressed 40 paise stamped envelope (12 cms × 24 cms) stating in English the exam. (Bank Clerkship Exam or Probationary Officers' Exam.) in which you are interested to the Programme Director,

Institute of Banking Services,
10, Old Post Office Street, Calcutta-700 001.

Standard

অথচ দীর্ঘদিনের কম্যুনিস্ট কালী সাঁতরাও সেই পক্ষপাত বসাই টুডুকে দিতে পারেনি। বিপ্লব আসন্ন সে-কথা ক্লান্ত কালী সাঁতরা তখন ভাবতে পারে না, অথচ এই কথা ভেবেই একদিন তার নিজস্ব জমি সে মাহিন্দারদের বিলিয়ে দিয়েছিল। পার্টির মধ্যে আজ সে পরবাসী। কালী সাঁতরা ছিটের শার্ট, আধফর্সা ধুতি ও বাটার টেকসই জুতো পরে সৎ জীবনযাপন করে পার্টির ইমেজ রক্ষা করে যাবে এই যেন তার দায়িত্ব। বৌ-ছেলেও আজ তাকে করুণা করে। পার্টির বিরুদ্ধে বসাই টুডুর প্রতিটি অভিযোগের মর্মান্তিক সত্যতা সে জানে। পার্টি-নেতা সামন্তর বাসায় বাবু সদস্যরা কাপে চা পেতো, বসাই পেতো মাটির ভাঁড়ে। কৃষক-ঐক্যের নামে পার্টি গ্রামের সর্বহারা খেতমজুরের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক তীব্র অপচয় ও ব্যর্থতাবোধ কালী সাঁতরাকে পীড়িত করে। এখন 'পার্টি মা'—সেই মায়ের কোলে জোতদার বামেশ্বর এবং উচ্চাশী দলনেতা সামন্ত একই সঙ্গে স্থান পায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন কালী সাঁতরার ভিতরটা কুরে-কুরে খায়। তার সমস্ত সহানুভূতি বসাইয়ের প্রতি। বসাই নিহত হয়েছে মনে করে প্রশাসন তাকে নিয়ে যায় আইডেন্টিফাই করাতে, আবার বসাই আহত হয়েছে খবর পেয়ে কালী সাঁতরা টেরামাইসিন ক্যাপসুল ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলে ছোটে। অথচ যে পার্টিতে আস্থা নেই তাকে ত্যাগ করতে পারে না, আবার বসাইয়ের সংগ্রামে যোগ দিতেও পারবে না।

অমূল্যের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ব্যারিস্টার জেকবের একটা সংলাপ আছে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের শেষে বীরসার প্রসঙ্গে। অমূল্য বলে, এখন সে বিশ্বাস করে যে বীরসা বাস্তবিকই ভগবান। কোন্ যুক্তিতে, জেকব জানতে চায়। অমূল্য উত্তরে বলে, 'বিটেস্যানের, বিশ্বাসঘাতকতার যুক্তিতে। মানুষ যখন ভগবান হয়, তখন কোনো-না-কোনো বেইমান তার পতন ঘটায়।' মিশনে-গড়া অমূল্য বীরসার মধ্যে যেন দেখেছে খ্রীস্টের নিয়তির পুনরভিনয়। নিজের বিশটি আর বাবুদের বাড়ির বিশটি সন্তানের দুধ-মা যশোদাও এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়। সতনের কানে সাবে অসাড় যশোদা ভাবে—'দুধ দিলে মা প্রশ্ন স-ব মিছে কতা! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উল্টি মেরে এটটা কতা শুয়োর।' স্তনদায়িনী গল্পের শেষে লেখকের উপলব্ধি—'যশোদা ঈশ্বরস্বরূপিনী। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।' এই বিশ্বাসঘাতকতায় বীরসা এবং যশোদা এক ভূমির উপর এসে দাঁড়ায়। অনিন্দ্য বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রতীরা খুন হয়—সুজাতা ছাড়া অন্যেরা, ব্রতীর বাবা ভাইবোনেরা তার অস্তিত্বকেই যেন লোপ করে দিতে পারলে বাঁচে। দ্রৌপদি মেঝেনকে ধরিয়ে দেয় সোমাই বুধনা। সোমাই বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়লডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুও-আর্ডস বাচ্চাভূমি। নইলে কাক যদিবা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না। বসাই টুডুর সাগরেদ রতন ডোমের ছেলে মাতো ডোম, পরণে যার ফুল-কাটা লুঙ্গি গলায় রুমাল, সে এসে খবর দিয়ে যায় থানায়, বসাই নাকি যাচ্ছে।' তখনই পুলিশ তৎপর হয় বসাইয়ের সন্ধানে।

এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতায়, সংগঠনের দুর্বলতায় বারে বারে পরাজিত নির্যাতিতের সংগ্রাম হেরে যায়। হেরে যায়, তবু হারে না। যার হাতে শক্তি আছে, আগ্নেয়াস্ত্র আছে, প্রশাসন আছে সেই বিজেতার নাম রেকর্ডে থাকে ইতিহাসেও থাকে, কিন্তু 'বিজিতের নাম মানুষের রক্তে, বঞ্চনায়, খিদের দারিদ্র্যে, শোষণে ধানচারার মতো বেঁচে থাকে, সে নাম বেঁচে থাকে কালো মানুষের গানে-গানে, স্মৃতিতে, ঘাটের বিস্বাদে, উলঙ্গ মুকুতা শিশুর বিবর্ণ চামড়ায়, মুকুতাজননীর স্ফীত উদর ও মহাজনের ধানরক্তা এক সঙ্গে বইবার পরিশ্রমে।' সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করে তাকে বিবস্ত্রা করতে চেয়েছিল দুঃশাসন। দুঃশাসনের কী আশ্চর্য নামকরণ করেছিলেন ব্যাসদেব। নপুংসকের মতো পাণ্ডবেরা যখন সভায় বসে ছিল, সখা কৃষ্ণ সেদিন তখন উৎপীড়িত দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলেন। অন্তরের অন্তরে, রক্তের তরঙ্গে বীরসা কৃষ্ণভাবতের অরণ্য জননীর কান্না শুনতে পায়, দিব্যদৃষ্টিতে তাকে যেন দেখতে পায়—ক্ষুধিতা মুণ্ডারী যুবতীর মতো তার সন্তানজননী আদিম অরণ্য কাঁদছিল আর বলছিল 'বেরস্তা রব না আমি। ওরা আমার লাজলজ্জা কেড়ে নিয়ে লেংটা করে আকাশের নিচে দাঁড় করায়ে দিয়েছে।' ওরা কারা? ওরা সেই দুঃশাসন—প্রশাসনের নামে দুঃশাসন, ইংরেজ সরকার, দিকুরা, মহাজন জোতদার বেনে, আরহমান উৎপীড়ক। বিবস্ত্রা অরণ্য-জননী নীরবে বীরসার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল, তার সন্তান তার লাজলজ্জা বাঁচাক। ধর্ষিতা দ্রৌপদী বিবস্ত্রতাকেই করেছিল প্রতিবাদের অস্ত্র। সেনানায়কের নির্দেশে দ্রৌপদীকে বানানো শুরু হয়—পৌনঃপুনিক ধর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে থাকে দ্রৌপদী, সে দৃশ্যের বীভৎসতা দেখে, চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়।' সকাল বেলা সেনানায়ক ডেকে পাঠিয়েছে শুনে দাঁত দিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দ্রৌপদি মেঝেন—যে বিয়ে করেছিল দুলনাকে, যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বসাই টুডু, সেই 'অত্যন্ত কালো, অত্যন্ত বর্বর অত্যন্ত সুন্দরী' রাণীর মতো দ্রৌপদি মেঝেন। সূর্যের প্রখর আলোয় সে মাথা সোজা করে উলঙ্গ হয়ে হেঁটে আসে সন্ত্রস্ত শান্ত্রীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় আকাশচেরা তীক্ষ্ণ গলায় দ্রৌপদী বলে, 'কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?' সেনানায়ক অর্জন সিং-এর বুশশার্টে রক্তমাখা থুতু নিক্ষেপ করে বলে, 'হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করবো। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর করবি? লেঃ কাঁউটার কর, লেঃ কাঁউটার কর—' এই বলে দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং 'এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।' এই আরণ্য দ্রৌপদীর নগ্নতাই হয়ে ওঠে সংগ্রামের বর্ম।

পুরাণের সময় থেকে দ্রৌপদীরা আছে—বিস্মৃত বীরসারাও আছে, মঘাইরা বসাইরা আছে। ধারাবাহিকভাবে আছে। বীরসা বলেছিল, 'যতদিন একোজন মুণ্ডা একটা ধান গাছ বুইবে, একটা গাছ কাটবে, একটা ঘর বাঁধবে, তার মধ্যে আমি রহব হে পলুস। আমি ধরতি-আবা। আমার বিনাস নাই।' মহাশ্বেতা সেই অবিনাশী সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন। লিখেছেন পুরুষালি সটান পেশল তীব্র গদ্যে—তাঁর কলমের মুখে কিছু আটকায় না, সেই গদ্য কখনো বেদনায় মুহ্যমান, কখনো পবিত্র ক্রোধে জ্বালাময়, কখনো আয়বলির ত্যাগে শুদ্ধধার। লিখে বাংলা কথাসাহিত্যকে পরিশুদ্ধ করেছেন তিনি। কলকাতাবাসী উচ্চ মধ্যবিত্তের মান-অভিমান, দাম এবং পানের গল্প পড়ে পড়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জন্মান্তরিত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী সেই পঙ্ক থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন—অনেক দিন পরে নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নিভুল তিথি লগ্ন জানতে হলে
শ্রীমদন গুপ্তের
ফুল পঞ্জিকা | হাফ পঞ্জিকা
বিনামূল্যে
সারা বৎসরের দৈনিক রাশিফল। কেবল এই পঞ্জিকায় পাবেন। যার আলাদা মূল্য ৩৲
সকল হইতে সারধান
রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট। দ্বিতল। কলিকাতা ৭০০০০১

হৃদয়নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

ঘন্টা তিনেক একটানা চলার পর বাস থামল। কানু বলল, উঠুন উঠুন, উঠে পড়ুন বায়দা। বাস চটি এসে গেছে। খিদেয় নাড়ি ভুঁড়ি হজম হয়ে গেছে। সাড়ে আটটা বাজে। পানু, ছুটে যা, দ্যাখ গিয়ে কি পাওয়া যাচ্ছে।

বাস থেকে নেমে এল অনন্ত। হাঁটু দুটো জাম হয়ে গেছে। সরু বাস রাস্তা চলে গেছে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। শাল গাছই বেশি। কিছু কিছু অন্য গাছও রয়েছে। সব চেনে না অনন্ত। একটু দূরে সেই জঙ্গলের কিছুটা অংশ সাফ করে কয়েকটি দোকান তৈরী হয়েছে। অনেক লোক ভিড় করেছে সেখানে।

দোকানের ঘটি থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে জল দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল অনন্ত, জল খুবই অপরিষ্কার। শুনলো, একটিমাত্র ঝরণার জলই এখানকার জলের সংস্থান। নোংরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নামছে ঝরণা, তাই অপরিষ্কার হবে, এ আর বিচিত্র কি। তবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ঘটিতে জল থিতিয়ে গেলে ওপর থেকে ঢেলে নিয়ে মুখ ধোওয়া বা জল খাওয়ার অসুবিধে কোথায়?

পুরী আর আলুর তরকারী খেতে-খেতেই বাসের হর্ণ শোনা গেল। এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করল অনন্ত শুধু তাদের বাসটাই নয়, সামনে এবং পেছনে আরও অন্ততঃপক্ষে গোটা পঁচিশ ত্রিশ বাস, লরী, মিলিটারী ট্রাক ইত্যাদি দাঁড়িয়ে গেছে। দীপু বলল, খেতে খেতেই চলুন বায়দা। বাসে বসে জল খাবেন। গেট ছেড়ে দিচ্ছে।

দীপুর সঙ্গে যেতে যেতে প্রশ্ন করল অনন্ত, বেলওয়ে ক্রসিং আছে নাকি?

বেলওয়ে? খাবার গিলতে গিলতে ভুরু কপালে তুলল দীপু। রেল পাবেন কোথা এখানে? হিমালয়ের ভেতরে চলে এসেছেন ওঃ, গেট ছেড়ে দিচ্ছে শুনে ভাবলেন রেলের ক্রসিংয়ে গেট খুলে দিচ্ছে। না। এই যে পথ চলে গেছে সেই বদ্রীনাথ কিংবা কেদারনাথ পর্যন্ত, শুধু এই বা কেন, এইসব অঞ্চলে যেখানেই যান না কেন, সব জায়গাতেই পথ ওখান-ওখান। তার মধ্যে গাড়ি চলবে একদিকে। সরু রাস্তা, পাহাড় কেটে বানানো।

গাড়িতে উঠে এসে জায়গায় বসে শেষ করল দীপু, তাই মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গায় এ-পাশের ও-পাশের ট্রাফিককে ক্রশ করাবার জন্যে ব্যবস্থা আছে। তাকেই বলে গেট। একসারি কনভয় দাঁড়াল একটা গেটে। তারপর অন্য সারির কনভয় এল উল্টো দিক থেকে। সাধারণতঃ যেখানে গেট করে ওরা, সেখানে জায়গাটা বেশ চওড়া থাকে। অন্ততঃপক্ষে একশ দেড়শ গাড়ি দাঁড়াতে পারে, এরকম জায়গা থাকা চাই।

গোপু বলল, একশ দেড়শ না হলেও গোটা পঞ্চাশেক গাড়ি দাঁড় করাবার প্রতিশ্রুতি রাখতে হয়।

অনন্ত প্রশ্ন করল, এর পরের গেট কোথায়?

দীপু বলল ঠিক মনে করতে পারছি না। মনে হয়, দেবপ্রয়াগ গিয়ে গেট পড়বে।

১৪

বাস ছাড়ার মিনিট পনেরো বাদেই ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে, বুঝতে পারা যাচ্ছিল। জানলার গায়ে মাথা হেলান দিয়ে শুয়েছিল তরুণী মেয়েটি। ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল। সুরমাটানা ছোটছোট চোখ দুটি আরও ছোট লাগছিল। তার পাশে বসেছিল ছেলেটি। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে না গিয়ে বসল মেয়ের পাশে।

সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা মেয়েটি সিফনের ওড়না দলা করে চেপে ধরছিল মুখে। ভদ্রলোক খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন মেয়েকে এবং মেয়ের মাকে। সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছিলেন বলে মনে হল না। নিজেদের বাস্কেট হাঁটকে একটা পাতি লেবু বার করে ছুরি দিয়ে কাটছিলেন। মেয়েটি তারই মধ্যে বার দুই বমি করল জানলা গলিয়ে। দীপু এবারে বেশ একটু অসুবিধায় পড়েছিল। তার একেবারে ঘাড়ের পাশে মুখ নামিয়ে বমি করছে মেয়েটি। অস্বস্তি হবারই কথা।

বেশ কয়েকবার বমি করে কাহিল হয়ে পড়েছিল মেয়েটি। তার বাবা পাতিলেবু কেটে এগিয়ে দিলেন। গন্ধ শুঁকতে থাকল মেয়ে। লেবুর গন্ধে এ বমি ভাব হয়তো কেটে যায়। তবে দেখা গেল, প্রথমে একটু-খানি সাময়িক বিলিফ হলেও আবার সমস্ত শরীর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তার। সহ্য করতে পারছে না। অবিরাম জল ঝরছে চোখ দিয়ে। সুন্দর নাক, মুখ চিবুক বিকৃত হয়ে উঠছে বমির বেগে। যারা দেখছে তারাও খুব কষ্ট পাচ্ছে। সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীদের মধ্যে আলোচনা করছিল কয়েকজন দেহাতী বুড়ো। কিসের একটা শেকড় পুড়িয়ে ধোঁওয়া দিলে এই বমির বেগ কমতে পারে। কিন্তু কোথা পাওয়া যাবে সে শিকড়।

এতক্ষণ দীপুরা কেউ কোন রকম ঔৎসুক্য দেখায়নি। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী বলে হয়তো এই বিরাগ। অনায়াসে নানা রকম উপদেশ আর পরামর্শ দিচ্ছিল অন্যান্য দেহাতী যাত্রীরা। কণ্ডাক্টার এবং ড্রাইভারও দয়াপরবশ হয়ে রোগীর কষ্টের উপশমের জন্য কিছুটা সময় গাড়ি দাঁড় করালো। কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কনভয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। নইলে ওধার থেকে আসা কনভয় অসুবিধায় পড়বে। তাই আবার ছাড়ল গাড়ি এবং আবার মেয়েটির কষ্ট বৃদ্ধি।

এতক্ষণে সম্ভবতঃ বিরক্ত হয়ে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ক্লাসের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরামর্শ করল দীপু, কানু আর পানু। কানুই সম্ভবতঃ সাজেশান দিয়েছিল। ড্রাইভারকে অনুরোধ করে কয়েক মিনিটের জন্য গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। বুঝিয়ে দিল, ওষুধ আছে তাদের সঙ্গে, তবে আছে গাড়ির ছাদে। খুঁজে নিয়ে আসতে অল্প একটু সময় লাগবে।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে দীপু চটপট ছাদে চলে গেল। নির্দিষ্ট রুকস্যাকের ভেতরে মেডিসিন বক্স ছিল। সেটা ধরে নামিয়ে নিয়ে এল।

বমি বন্ধ করার ট্যাবলেট বার করে এগিয়ে দিল আশু অনন্তর দিকে। বলল, আপনি আমাদের মধ্যে সিনিয়র ব্যক্তি। আপনিই দিয়ে দিন।

এতক্ষণে অসুবিধাটা বুঝতে পারল অনন্ত। এই ছেলেগুলি অবিবাহিত। স্ত্রী-লোক সম্পর্কে এখনো এদের যথেষ্ট সংকোচ। পাছে মেয়েটির মা বাবা অথবা যাত্রীদের কেউ মনে করে, একটি মেয়ে অসুস্থ

হয়েছে বলে অতিমাত্রায় সচেতন এবং কুতূহলী হয়ে উঠেছে, তাই মেয়েটির এত কষ্ট দেখেও নিচু গলায় আলোচনা করা ছাড়া ঔৎসুক্য দেখায় নি। মনে মনে হাসল অনন্ত।

শিখ ভদ্রলোক ট্যাবলেট হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। সুযোগ পেয়ে চোস্ত ইংরেজিতে এক ঝুড়ি বাক্যব্যয় করল অনন্ত। মার্কেন্টাইল ফার্মের স্কোটসাহেব কণাদ। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফারকে প্রায়ই ডিকটেশন দিতে হয়। পড়াশুনোয় ভাল ছিল। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দখল। বাচন-ভঙ্গীতেও মুন্সিয়ানা আছে। সুতরাং বেচারা শিখ ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে গেল।

এদেরই জলের বোতল থেকে জল নিয়ে বড়ি খাইয়ে দিল মেয়েটির মা।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে গাড়ি ছাড়ল। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ওষুধের ফল প্রত্যক্ষ করার জন্য। ঝড়ে কাক মরার মতই ঘটল ব্যাপারটা। প্রায় ম্যাজিক দেখাল বমি বন্ধ করার ট্যাবলেট। মেয়েটি আর বমি করল না। জানলা থেকে মাথা সরিয়ে মায়ের কাঁধে মাথা রাখল প্রথমে। তারপর আধ-শোওয়া হয়ে রইল মায়ের কোলের ভেতরে।

শিখ ভদ্রলোক মিনিট পনের মেয়েকে ওয়াচ করে কৃতজ্ঞতা জানালেন অনন্তকে। অনন্ত হেসে জানাল, কৃতজ্ঞতা যদি কাকেও জানাতে হয়, তবে তা জানানো উচিত ওই ছেলেগুলিকে; বিশেষ করে দীপককে। পিতলের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে যথাসম্ভব বিনয় সহকারে ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতা জানালেন পাঁচটি যুবককে, ইংরেজি এবং হিন্দিতে। যুবকরাও যথোচিত লজ্জা দেখিয়ে প্রত্যভিবাদন জানালো।

দেবপ্রয়াগে গাড়ি পৌঁছুল সব শেষে। দুবার সাবধানে পিছনের গাড়িকে পাশ দেবার মত জায়গা রেখে বাস দাঁড় করাতে হয়েছিল। কাজেই কনভয়ের সব শেষে যেখানে গাড়ি দাঁড়ালো, সেখান থেকে প্রয়াগ অনেকটা দূরে। পানু বলল, চলুন বাবুজী, সঙ্গম দেখিয়ে আনি।

নেমে গেল সকলে। এরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে একটার পর একটা বাস, লরী মিলিটারী ট্রাক পেরিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছুল সঙ্গমের কাছে। অপর পাড়ে থাক থাক সিঁড়ির মত উঠে গেছে ঘাটের পথ। গঙ্গা আর অলকানন্দা ভীমবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরস্পরের বুকে। অলকানন্দার জলের রং ফিকে সবুজ। গঙ্গার জলের রং ফিকে সাদা। মেশবার আগে পর্যন্ত রঙের তফাৎটা বোঝা যায়। তারপর উথাল-পাথাল স্রোতের ধারার সঙ্গে একাকার। দূর থেকে গর্জন শুনেই কানে তালা ধরে যাবার জোগাড়।

পানু আর একটু এগিয়ে গিয়ে দোকান থেকে পাঁপড় কিনে এনেছিল। দীপু বকে উঠল, রাস্তায় বেরিয়েই তোর কেবল খাই খাই বেটা, তুই জানিস ও কি তেলে ভেজেছে? তারপর পেট কামড়ালে—

তাকে বাধা দিয়ে সমান তেজে বলে উঠল পানু, ব্যাসচটিতে দু টুকরো আলু-সেদ্ধ আর দুখানা পুরী খেয়েছি ঠিক দু ঘণ্টা আগে। তোর খাওয়ার ইচ্ছে না হয় খাস না। আমাদের খাওয়া নিয়ে টিকটিক করবি না বলে দিচ্ছি। কথার মাঝে মাঝে বেচারা তোতলাচ্ছিল। গলার স্বরটা ভাঙা। সেটুকু পুষিয়ে নিচ্ছিল হাত-পা ছুঁড়ে। মাঝ থেকে আধখানা পাঁপড় খসে পড়ল রাস্তায়।

আশু বলে উঠল, বেটা আমার খুড়োকে বকছে। কান ধরে দোব তিন থাপ্পড়।

বাস ছাড়লে শিখ ভদ্রলোক চলে এলেন সেকেন্ড ক্লাশে, উপকারী ভদ্রলোকের সন্ধানে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমে গেল আলাপচারী। পরস্পরের বক্তব্য বোঝা নিয়ে কথা। ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষায় কথা বলায় এরা বশ্ত নয়। সেটা আর অসুবিধে বলে মনেই হচ্ছিল না। অনন্ত প্রথম দিকে চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলছিল। কিন্তু তাতে দেখা গেল দীপুরা কথা বলতে অসুবিধে বোধ করছে। তাছাড়া শিখ ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে কিছু বলার মত জ্ঞান ছিল না অনন্তর। জানা গেল, ওঁরা বলছেন তীর্থ দর্শনে। দুর্গম তীর্থ হেমকুণ্ড দেখতে চলেছেন সপরিবারে। হেমকুণ্ড যাচ্ছেন শুনেই সোৎসাহে কথা বলতে শুরু করল সকলে। অনন্ত আলোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্ত দর্শকের মত কখনো বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে থাকল, কখনো আলোচনার টুকরো-টাকরায় কান দিচ্ছিল। আলাপচারীর মাঝখানে শিখ ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে কি যেন বললেন ওঁদের মাতৃভাষায়। উত্তরে জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এলেন ভদ্রলোক। দীপু জানতে চাইল ওঁর মেয়ের অস্বস্তি বেড়েছে কিনা। উত্তরে তিনি জানালেন, অনেক ভাল আছে তাঁর মেয়ে। এখন একটু একটু খিদে পাচ্ছে বলছে।

দীপু বলল, আপনাদের সঙ্গে যদি গ্লুকোজ থাকে, জলে গুলে দিতে পারেন, খুব উপকার হবে।

মাথা নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, ও বস্তুটি সঙ্গে আনার কথা চিন্তা করেন নি। এখন মেডিসিন বক্স থেকে গ্লুকোজের প্যাকেট থেকে বেশ খানিকটা গ্লুকোজ ঢেলে দিল ভদ্রলোকের গ্লাসে। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ে নিতে বলুন।

গল্প করতে করতে এক সময়ে শিখ ভদ্রলোক বললেন, আপনারা হেমকুণ্ড দেখতে যাচ্ছেন, শুনে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ভ্যালী-অব-ফ্লাওয়ার্স দেখতে যাওয়াটা কি উচিত?

তর্কের গন্ধ পেয়ে যোগ করে উঠল দীপু। আপনি একথা বলছেন কেন?

দেখুন আপনারা বাঙালীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পিতৃপিতামহের ঐতিহ্য অস্বীকার করতে চান না। মেমসাহেব ফুলের বন দেখতে এসে মরেছিল, তার কবর দেখতে যান আপনারা। হিন্দু হয়ে খ্রীষ্টান মেয়ে-ছেলের কবর দেখতে যাওয়া কি উচিত? আমরা সব সময়ে পুরোনো ধারা অনুসরণ করার কথা শেখাই ছেলেদের।

খুবই বিতর্ক মূলক প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্য ক্ষেত্র হলে দীপুরা নিশ্চয়ই তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ সুন্দরী মেয়েটি থাকায় ভদ্রলোককে তর্কে পরাস্ত করতে তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না ছেলেগুলি। অনন্তর প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে ফ্র্যাংক স্মাইথের কামেট অভিযান, ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স আবিষ্কার এবং সেই কাহিনী পড়ে লণ্ডনের বোটানিক্যাল সার্ভে অফিসের লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতী জোয়ান মার্গারেট নেগী নামক বিদুষী মহিলার এদেশে এসে ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স নিয়ে রিসার্চ এবং অবশেষে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ইত্যাদি সব তথ্য পরিবেশন করল দীপু। সঙ্গে কানু যোগ দিল এবং গোপু পরিপূরকের ভূমিকা নিল। বেশ উপভোগ্য আলোচনা। এসব খবর কোন দিন জানত না অনন্ত। জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি কখনো। এখন সেই ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স যাবার পথে প্রাসঙ্গিক আলোচনা শুনতে ভালই লাগছিল তার। কিন্তু শিখ ভদ্রলোক খুব যে খুশি হয়েছেন, তা মনে হল না। বললেন, আপনারা বুদ্ধিমান যুবক, শিক্ষিত ব্যক্তি। আপনাদের সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই। তবে আমি অভিজ্ঞতার থেকে এটুকু বলতে পারি, বিধর্মীদের শ্রদ্ধা দেখানোটা ঠিক সুরুচির পরিচয় নয়।

আশু বলল, আমরা সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করি। বদ্রীনাথের মন্দিরে যেমন যাব, তেমনি যাব লোকপাল হেমকুণ্ড আবার ঠিক তেমনি ভাবে যাব ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স দেখতে।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুটা চলত। এমন সময়ে কণ্ডাক্টর জানালো, এবারে যাত্রীরা যেন তৈরী হয়ে নেয়। সামনেই শ্রীনগর। ওখানে মিনিট পনেরো গেট পড়বে। তার মধ্যে যেন সকলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেন। এরপর সেই রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে থামবে বাস। পৌঁছুতে বেলা দুটো।

শিখ ভদ্রলোক উঠে স্ত্রীকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিলেন। তারপর এদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবেন।

দীপু জানাল, কাছেই যে কোন একটা হোটেলে খেয়ে নেবে।

উনি জানালেন, সাধারণ হোটেলে ওঁদের খাওয়ায় অসুবিধে আছে। ওনার স্ত্রী ধর্মভীরু মহিলা। তাই কাছেই যে গুরুদ্বারা আছে, সেখানে গিয়ে দুপুরে খাওয়া সেরে নেবেন ওঁরা।

বাস থামলে নেমে রাস্তার ওপরে একটা ছোট মত হোটেল দেখে গিয়ে উঠল সকলে। জল নিয়ে বাইরে হাতমুখ ধুতে এসেছিল আশু। শিখ পরিবারটি এগিয়ে যাচ্ছিল কোথায় কোন্ গুরুদ্বারা আছে, সেইদিকে। আশুর সঙ্গে চোখাচোখী হতে

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। আশু
য়ে বলল, দেরি মাং কিজিয়ে। গেট্
যায়গা তো মুস্কিল হো যায়গা।
ভদ্রলোক আর একবার হেসে এগিয়ে
ন স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

১৫

আশুর সাবধানবাণী কোন কাজে এল

ওদের খাওয়া-দাওয়া সবে হয়েছে,
এমনি সময়ে গেট খোলার আওয়াজ
সারি সারি গাড়িগুলি। ওধার থেকে
য় এসে হাজির।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে পয়সা
য়ে বাসে গিয়ে উঠল ওরা। অধিকাংশ
চাদরের খুঁটে বেঁধে রাখা ছাতু
ীর শস্যচূর্ণ খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে-
। যারা ওদের মত খেতে গিয়েছিল
টেলে, তারাও তাড়াতাড়ি বাসে এসে
ল। শুধু সেই শিখ পরিবারটির দেখা
তখনো।

একে ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, তার
রে ওদের হোল্ডল সুটকেশ এবং অন্যান্য
কটাকি মালপত্র বাসের ছাদে এবং সিটের
রে নিচে রয়ে গেছে। তাছাড়াও মেয়েটির
সুস্থতার জন্য ওদের সম্পর্কে কিছুটা
নুভূতি আগে থেকেই ছিল ড্রাইভার
ডাকটারদের। তাই যতটা সম্ভব দেরি করে
ছাড়তে চাইছিল। বাসের হর্ণ বাজাচ্ছিল
বরত। কিন্তু দু-তিন মিনিট কেটে
ওয়ার পরেও তাদের দেখা পাওয়া গেল
। পেছনের বাস এবং ট্রাকগুলি অধৈর্য
য় তাড়া দিচ্ছিল হর্ণ বাজিয়ে। অবশেষে
লিশ এবং একজন সাব-ইন্সপেকটর এসে
কাবাকি করতে থাকল ড্রাইভারকে। সমস্ত
ছু তাদের বলা হল। তা সত্ত্বেও তারা
ার করে বাসকে ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ
ল কড়াগলায়।

হঠাৎ এরকম একটা পরিস্থিতিতে খুব
ত হয়ে গিয়েছিল দীপুরা। আশু
ত হয়ে বলল, কত করে বললাম,
কিজিয়ে গা, নেহি তো মুস্কিল হো
া।

দীপু বলল, তুই হিন্দি জানিস না,
হিন্দিতে বলতে গেশীল? ভুল হিন্দি
বিরক্ত হয়ে হয়তো আর গাড়িতে
না।

নিয়ে পরস্পরে কথা কাটাকাটি,
টি; আপোষে কাটিয়া হল কিছুক্ষণ।
মধ্যে শ্রীনগর শহর ছাড়িয়ে বাস
চলল অনানন্দ নদীর উজান ধরে।
ক বিস্তীর্ণ উপত্যকা। দূরে দূরে
মেঘের মত ঘিরে আছে চারদিক।
ন শহর গড়ে উঠেছে নদীর তীরে,
দু-পাশে। এককালে গাড়োয়াল
দর ছিল এই শ্রীনগর। কাশ্মীরের
সঙ্গে অবশ্য কোন তুলনাই হয় না।
ছিমছাম শহরটিতে স্কুল-কলেজ,
আদালত, ক্ষেত-খামার, দোকান-
সবই বেশ সাজানো গোছানো। দু-
প্রাকৃতিক সুষমা মন কেড়ে নেয়।

সকলের মনেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। জিনিসপত্র ফেলে রেখে কোন গুরুদুয়ারায় খেতে গেল দেখ-দেখি ধর্ম-ভীরু শিখ পরিবার! ভদ্রলোকের কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, হিন্দুদের আচারআচরণ সম্পর্কে, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের চালচলন সম্পর্কে খুবই অসহিষ্ণু। তা হলেও ভদ্রলোক সাধারণ কথাবার্তায় এবং সৌজন্যে মার্জিত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, অনন্ত দেখেছে, অসুস্থ মেয়েটি সুস্থ বোধকরা মাত্র বেশ কয়েকবার কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়েছিল এই পাঁচটি বাঙ্গালী যুবকের দিকে। বিশেষ করে দীপুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ কারো চোখই এড়ায়নি। তাই সকলেই কেমন অস্বস্তি অনুভব করছিল। শুধু আশু গলায় জোর দিয়ে দোষারোপ করছিল ভদ্রলোককে।

কয়েকটা ব্যাপার বেশ নাড়া দিচ্ছিল অনন্তকে। বাস যাওয়ার পথ অনেক ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ। কোনমতে একটা বাস যেতে পারে। একদিকে ইঞ্চি পাঁচেক ব্যবধান পাহাড়ের গা থেকে। অন্যদিকে বাসের চাকা দাঁড়াবার মত পরিসরটুকু আছে মাত্র। একবার, অনন্ত বেশ বুঝতে পারল, বাসের পেছনের দুটো চাকার একটা সম্ভবতঃ শূন্যে ঘুরে গেল। বাকি একটা চাকার ভর দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ি গোঁ গোঁ করে হঠাৎ একটা দমক মেরে। তাছাড়া পাহাড়ের যেসব অংশ কেটে সমতল রাস্তা বানাবার চেষ্টা হয়েছে, সেই সব পাহাড়ের কম্পোজিসন অনেক ক্ষেত্রেই মাটি এবং চুন জাতীয় নরম পদার্থে তৈরী। তাই ভেতর থেকে চুঁইয়ে আসা জলের ধারায় ফুলে ফেঁপে পাহাড়ের দেওয়াল থেকে খসে পড়ে চাঙড়। পুরানো বাড়ি থেকে পলেস্তারা খসে যেমন ফুটপাথে বালিশ ঢিবি হয়ে যায়, তেমনি। সময় মত সেই বালিশের হিপস্ রাস্তার ওপর থেকে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। কত লোক তাহলে নিযুক্ত রাখতে হয় সর্বদা শুধু এই কাজের জন্য। তাই অপরিসর পথের ওপরে ডাঁই হয়ে থাকা ছাই-মাটির মত স্তূপের ওপরে উঠতে হয় বাসকে। টলমল করতে থাকে বাসের বডি। নামার সময়ে আরও ভয় ভয় করে। এই রকম একটা জায়গা পার হবার সময়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল অনন্ত। আশু বলল, তাকাবেন না রায়দা, ওদিকে তাকাবেন না। প্রথম প্রথম ওরকম সকলেরই ভয় করে, রক্ত জল হয়ে যায়। তারপর দু-চার বার যেতে যেতেই ঠিক হয়ে যায়।

সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারছিল অনন্ত। বাসের আর কোন যাত্রীই তার মত অমন ভয়-ডরাসে চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে না মনে মনে।

গোপু বলল, এই জন্যেই আপনাকে ধারের দিকে বসতে দেয়নি দীপু। ধারে বসলে দেখতে পেতেন, দু-আড়াই হাজার ফুট খাদ নেমে গেছে কোথাও কোথাও। দু-এক জায়গায় বাস কিংবা ট্রাক নিচে গড়িয়ে পড়েছে, তারপর পড়েই আছে চিৎপাত হয়ে, তাও চোখে পড়ত।

কালু বলল, আগেকার দিনে মানুষ পায়ে হেঁটে এই পথ পেরিয়ে যেত। তাতে সময় বেশি লাগত, তবে এইরকম এ্যাক্সিডেন্টের ভয় থাকত না।

বাস রাস্তা সবসময়েই কিছু বাদের ধার দিয়ে নয়। অনেক সময়েই বিস্তীর্ণ উপত্যকার মত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পিচ্-ঢালা উঁচু-নিচু পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বাস যাচ্ছিল। গোপু বলল, জীম করবেটের লেখা পড়েছেন রায়দা? ম্যান-ইটার্স-অব কুমায়ুন, কিংবা ম্যানইটিং লেপার্ড অব রুদ্রপ্রয়াগ?

পড়েছিল বলে মনে হয় অনন্তর। কুমায়ুন অঞ্চলের মানুষখেকো বাঘ এবং চিতার কাহিনী। ম্যান-ইটার বাঘগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সেই সব গল্পে।

গোপুর প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক সায় দিল অনন্ত।

করবেট যে সব অঞ্চলের কথা লিখেছেন, সেইখান দিয়েই যাচ্ছি আমরা। পঞ্চাশ বছর আগেও এ পথে যাতায়াত করা ছিল প্রচণ্ড দুঃসাহসের কাজ। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী মারা গেছে বাঘের আক্রমণে।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি বই

সোনালী রেখা ৬·০০
প্রণয়পাশা ৮·০০
হিসাব মেলাতে ৭·০০
নতুন তুলির টান ১২·০০

নাথ পাবলিশিং হাউস

পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

মাঠে মাঠে চলেছে দল গড়ার পালা

পি কে : মোহনবাগান

কলকাতার ফুটবলের ঝাঁকে কাঠি পড়লো বলে! মাঝে আর মাত্র কিছুদিন—তারপরই ময়দান মাতিয়ে ফুটবল জাঁকিয়ে বসবে শহরে। তারই প্রস্তুতি চলছে এখন মাঠে মাঠে। সকাল-বিকেলে ময়দানের পথে হাঁটলেই এখন চোখে পড়বে খেলোয়াড়দের অনুশীলন। প্রশিক্ষকদের তৎপরতা আর কর্মকর্তাদের ছুটোছুটি।

ইষ্টবেঙ্গলের এবার নতুন কোচ অরুণ ঘোষ। তিনি নতুন করে দলটিকে ঘষে মেজে নিচ্ছেন। জাতীয় ফুটবলের সফল প্রশিক্ষক হিসেবে অরুণের এখন দারুন নাম। তিনি চাইছেন তাঁর মনের মত করে ইষ্টবেঙ্গল দলটিকে নতুনভাবে গড়ে নিতে। গত লীগে মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার পর ইষ্টবেঙ্গল আর সুবিধে করতে পারেনি। এবার যাতে সারা বছরই তারা ভালো খেলতে পারে, ট্রফি ঘরে তুলতে পারে—তার জন্যে চলছে টানা অনুশীলন—খেলোয়াড়দের স্থান বদল করিয়ে খেলাবার পরীক্ষা নিরীক্ষা।

সেদিক দিয়ে মোহনবাগান এবার অনেক নিশ্চিন্ত। গতবারের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই দলে আছেন। প্রশিক্ষক পি, কে, ব্যানার্জীর কাছে তাঁরা তালিম নিচ্ছেন। এই তো সবে নাগজী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এখন আবার যাচ্ছেন কোয়েম্বাটুরের ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে। সেখান থেকে ফিরতে না ফিরতেই তাঁদের যেতে হবে দূর প্রাচ্য সফরে। ৯ মে মাসের দশ তারিখে মোহনবাগান দূর প্রাচ্য সফরে যাবে। ফিরবে মে-র শেষে। ততোদিনে ওদিকে কলকাতার ফুটবল মরশুম পুরোদমে জমে উঠবে। মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা কথা দিয়েছেন যে তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসে দরকার হলে সপ্তাহে তিনটি করে ম্যাচ খেলতেও রাজী।

তবে মোহনবাগা
এবার বড্ড বেশী খে
ফুটবলের পর নাগজী
কাপ। এরপর সিঙ্গাপুর
জায়গায় খেলা। ফিরে
নামতে হবে লীগের
তাঁদের ওপর এবার চ

মহামেডান স্পোর্টি
প্রশিক্ষক। কলকাতা
খেলোয়াড় রহমানের ও
মহামেডান দল গড়ে
হিসেবে রহমান ইতিম
অধিকারী। তাই মনে হ
মেডান দলকে নতুনর
দল ভাঙ্গাগড়ার দিকে
নজর দেয়নি। তাদের
বাংলার বাইরে থেকে
দিকে। তাই অনেক খে
যদি ভারতীয় ফুটবল
মিটিংয়ে খেলোয়াড়দের
পত্রের বিষয়ে নতুন
যায়। ঐ নিয়ম পাস হ
দারুণ শক্তিশালী দ
ময়দানে খেলতে নাম
ছুড়ে দেবে লীগ
অভিলাষী দুটি দল
ইস্টবেঙ্গলকে। তবে ম
সব কিছুই এখন নির্ভ
রের খেলোয়াড়দের পা

অরুণ ঘোষ : ইস্টবেঙ্গল

লা

লয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টাউনের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রে-
ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিন উইকেটে
হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট
বাদে এখনও তারা ২—১
গিয়ে আছে। তৃতীয় টেস্টে
ইণ্ডিজ পূর্ণ শক্তি নিয়ে
মনি। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট
দলে নির্বাচিত এগারজন
ড়র মধ্যে ছ'জনই ছিলেন
-আগে কখনও টেস্ট ম্যাচ
। এরকম হওয়ার কারণ এই:
ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের এক
জারির ফলে কেরী প্যাকারের
ক্তিবন্ধ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন
ড়ই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলতি
রিজে আর খেলতে পারবেন না।
ধাজ্ঞা তৃতীয় টেস্ট খেলা থেকেই
হয়েছে। তৃতীয় টেস্টে তরুণ
লোয়াড়দের বাদ দেওয়া এবং দল
অধিনায়কের কোন পরামর্শ না
কারণে ক্লাইভ লয়েড প্রতিবাদ
দলের অধিনায়ক পদ ত্যাগ করেন।
জর হিসাবে আরও কয়েকজন টেস্ট
ড় দলত্যাগ করায় হুমকি দেন।
টনার পর পরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
কন্ট্রোল বোর্ডের নিষেধাজ্ঞার
প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ
ড়দের মাথায় নেমে আসে। এখানে
ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং
ন অনেক দিন আগেই প্যাকারের
ক্তিবন্ধ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েই
গঠনের নীতি গ্রহণ করেছিল।
ণ্ডিজ গড়িমসি করছিল। অস্ট্রে-
বপক্ষে চলতি ১৯৭৮ সালের
সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে
সঙ্গে চুক্তিবন্ধ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
রা দলভুক্ত হয়েছিলেন। শেষ
আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে ওয়েস্ট
ক্রিকেট বোর্ড প্যাকারের সঙ্গে
ধ খেলোয়াড়দের টেস্ট দল থেকে
বাধ্য হলেন। এতে অস্ট্রেলিয়া
ড় বাঁচলো। প্রথম ও দ্বিতীয়
কারের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ ওয়েস্ট
ইণ্ডিজের দুর্ধর্ষ তিন ফাস্ট বোলার রবার্টস, কফ্‌ট এবং গার্ণার তিনদিনের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়ভাবে হারাতে সাহায্য করেছিলেন। প্রধানত তাঁরাই অস্ট্রেলিয়ার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা আর দলে থাকছেন না। এঁদের শূন্যস্থান পূরণের মত শক্তিশালী ফাস্ট বোলার বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেই। ব্যাটিংয়ের থেকে ফাস্ট বোলিংয়ে তারা বর্তমানে বেশ কাবু হয়েছে।

তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ২০৫ রান করেছিল। অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ২৮৬ রান করে ৮১ রানে এগিয়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩৯ রান তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ল্যারী গোমেজ ১০১ রান করেন। টেস্টে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। অপরদিকে বেসিল উইলিয়ামস ১০০ রান করার সূত্রে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৩৯ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রে-লিয়ার জয়লাভের জন্যে ৩৫৯ রানের প্রয়োজন হয়। চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা কিন্তু খুবই খারাপ হয়েছিল। মাত্র ২২ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়িয়েছে ২৯০ (৬ উইকেটে)। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫৯ রানে পৌঁছতে আর মাত্র ৬৯ রান দরকার। হাতে জমা চারটে উইকেট এবং একদিনের পুরো খেলার সময়।

শেষ পঞ্চম দিনে আরও একটা উইকেট খুইয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে তিন উইকেটে জিতে যায়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৬২ রানের (৭ উইকেটের) মাথায় খেলা শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিং ব্যাটসম্যান গিলমি উড ১২৬ রান এবং কেগ সার্জেন্ট ১২৪ রান করেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁদের এই প্রথম সেঞ্চুরী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলার চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩৬২ রান (৭ উইকেটে) তুলে এইভাবে তিন উইকেটে জয়লাভ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক অসাধারণ নজির সৃষ্টি করলো। এর আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলার চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া এত বেশী রান তুলে কখনও জয়ী হয়নি। আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলার ইতিহাসে খেলার চতুর্থ ইনিংসে ৩৫০ বা তার বেশী রান তুলে একদল শেষ পর্যন্ত জিতেছে এমন ঘটনার সংখ্যা খুবই কম।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই নিয়ে মোহনবাগান মোট ১৬ বার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ক্যালকাটা কাস্টমসের সঙ্গে সর্বাধিকবার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করেছে। ১৯৭৮ সালের লীগে মোহনবাগানের খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—খেলা ১৯, জয় ১৮, ড্র ১, হার ০, গোল স্বপক্ষে ৫৯ ও বিপক্ষে ২ এবং পয়েন্ট ৩৭। লীগের খেলায় মোহনবাগান দুটো 'ওয়াক-ওভার' পায়—মহামেডান স্পোর্টিং এবং ই আর এ এ দলের বিপক্ষে। একটা করে গোল খেয়েছে কাস্টমস এবং গার্নীয়ার দলের কাছে। কাস্টমসের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে মোহনবাগান একটা পয়েন্ট নষ্ট করে। গত বছর মোহনবাগান সমস্ত খেলায় জিতে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলার ইতিহাসে সমস্ত খেলায় জিতে লীগ জয়ের নজির দ্বিতীয় নেই। এবছরে রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল (পয়েন্ট ৩০) এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে গত বছরের রানার্স-আপ কাস্টমস (২৯ পয়েন্ট)। কাস্টমসও লীগের খেলায় মোহনবাগানের মত অপরাজিত ছিল।

দর্শক

সুকুমারী বারবধূ

রজনী, পোস্টমাস্টার, মহেশ, তিনতারা, পুঁইমাচা, অগ্রদানী এবং সুবোধ ঘোষের বারবধূ গল্পটি দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালির স্মৃতি শাসন করে আসছে। আমাদের রান্না সুকতোর মতোই আমাদের ছোট গল্প। একদম নিজস্ব। এইমাত্র কাঁটাটি বিঁধে গিয়ে সারা শরীরে ব্যথা চারিয়ে যাওয়ার আরাম-টুকু পেলাম। সুবোধ ঘোষ যখন বারবধূ লিখেছিলেন তখন পৃথিবী এখনকার মতো এতো কঠিন ছিল না। পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের (ভাবতে অবাক লাগে এমন সাবালক ও বুদ্ধিদীপ্ত ছবিটির পরিচালকের এই প্রথম কাজ) বারবধূ ছায়াছবির বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে—এক বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনার ছবি। বহু নারী বঞ্চিতা এবং বেদনা অনেকেরই আছে। বেদনা বোধ না করার নিস্পৃহ নিষ্ঠুরতায় পৃথিবী এখন আক্রান্ত। কে বঞ্চিত—কার বেদনা—তা নিয়ে এখন কারো মাথা ঘামাবার সময় নেই। এই বেদনা কদাচিৎ ব্যক্তি ছাড়িয়ে উঠতে পারে। শুধু তখনই তা আমাদের ভাবায়।

বিজয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছেন। ব্যানার ঘোষণার পরে আমাদের সন্দেহ ছিল তিনি পারবেন কিনা: জিনিসটা গ্যাদগেদে হয়ে যাবার বহু চোরা-বালি এই গল্পে আছে। কিন্তু গত শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় উজ্জ্বলায় দেখলাম আমি ছাড়াও হাজার খানেক লোক গম্ভীর হয়ে ছবিটি দেখছেন, হাসছেন আলোড়িত হচ্ছেন। গল্পটি বিজয়বাবুর হাতে পড়ে অভিনয়, ক্যামেরা, গান ও আলোর গুণে গল্পের অতিরিক্ত আরো কোনো বিশেষ অর্থ অর্জন করেছে। সব কটি চরিত্র এত স্বাভাবিক ও তন্ময় যে মনেই থাকে না ছবিঘরে বসে ছবি দেখছি। এই গল্প নিয়ে যাত্রা থিয়েটার চরিত্রগুলোকে প্রায়ই টেনে লম্বা করে থাকেন। বিজয়বাবু সোমা দেকে এমন জায়গায় এনে ছবিতে সেখান থেকে তাকে বর্জন করেছেন যার পরে শিল্পে আর কথা হয় না। ছবির আগাগোড়া একটি দোলাচল দোলনা ও তার আবিষ্কারক বিস্ময় প্রেমিক পাচকপুত্র ছবিতে সুন্দর ও সারল্য নিয়ে অনায়াসে খেলাধুলো করেছে: বারবণিতা লতার ভূমিকায় গীতা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর হাসি, তাঁর উন্মুক্ত উরুর মতোই একই সঙ্গে সাধারণ ও অসাধারণ। নজরুলের একটি পুরোনো গান সম্বল করে সমিত ভঞ্জ যেভাবে দাপটে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে, হেসেছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় সমিতকে এর আগে কেউ ব্যবহারই করেনি। শিমুলতলার পড়ে থাকা ফাঁকা বাড়ি পেছন ফিরলেই হাত তুলে ডাক নেয়—ভেতরে এসো। মুর্গীর ছাল ছাড়ানোর বিশদ বিষাদ ক্যামেরা ষোলো আনা কাজে লাগিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বারবণিতা বিকাশ ও আত্মদর্শন স্তরে স্তরে তুলে ধরেছেন পরিচালক। সিনেমা যে কানে শোনার চেয়েও বেশি করে চোখে দেখার জিনিস বিজয়বাবু তা ভোলেনি। তাই উঁচু-উঁচু জাঙ্গল জমির ভেতর দিয়ে শেষ দৃশ্যের একক ঘুরে ফিরে মিলিয়ে যায়। তারপর স্মৃতি দোলনা দুলতে থাকে বুকে। কাহিনীর পরম্পরা আগাগোড়া যুক্তিনিষ্ঠ ও সাবালক। আবেগ ও উত্তাপ সংযত বলেই বারাঙ্গনা এখানে সুকুমারী। তার ক্রোধ ঈর্ষা ও নকল বউ সাজা যা তুলে ধরে তার নাম এককথায় মনুষ্যত্ব। মেলায় চুড়ি কেনা, ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে ঘুমভাঙ্গা পাহাড়ের মুখো-মুখি হওয়া, পিকনিকে বেরিয়ে বাগাশয়ী গানের শেষে নীরবে অশ্রুপাত—সবই সামান্য আঁচড়ে মানব মনের আবেক দেখিয়েও অনেক বলে দেওয়ার দক্ষ কৌশল। যা কিনা চতুর নয় অথচ বু[illegible] কলকাতার অনেক সিনেমা নায়ে[illegible] ডামি ক্যামেরায় [illegible] তরোয়াল খেলছে। গরম হা[illegible] চেয়ে বারবধূর গীতা অনেক [illegible] কাছাকাছি ছবিঘরে নায়িকাবা[illegible] সুন্দরী ও সুরেলা। তবু দে[illegible] দেখে ফেরা বারবধূর ভাঙ্গা ভি[illegible] মুখে চোখে কিসের বিস্ময় কিসে[illegible]

গানের বাণী, সুর, কন্ঠ ও আগেকার সকল ক্লাসিক ছবির [illegible] পড়িয়ে দেবেই। সাবালক চিত্রনা[illegible] সঙ্গী শকতি বন্দোপাধ্যায়ের ক্যামেরা এই ছবি দেখার পর দর্শকের মনে নতুন নতুন [illegible] করবে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ অর্ধ[illegible] এক-তৃতীয়াংশ। বাকি দুই-ত[illegible] উচ্চারণ নিয়ে এখানকার ছবিতে ধরে রসিকতার চেষ্টা চলছে। ছেঁদো। বিজয়বাবু অবশ্য তা কিন্তু তার একটি চরিত্রের উচ্চারণ ঠিক ওখানকার মতো হয়। সমিত ভঞ্জ তেরো আউন্সের ব[illegible] যেমন অবলীলায় উপুড় করে ক[illegible] নিট খেয়েছেন বার্টলাঙ্কাস্টা[illegible] তা পারতেন না। কামুক ম[illegible] শিল্প ও সঙ্গীত রসিক হয়? [illegible] বিউটিকুইনরা দ্রৌপদী অবশ্য[illegible] কদাচিৎ রন্ধনপটিয়সী হয়ে থাকে। দাদারা আজকাল আর এত অন্যমনস্ক[illegible]

সমিত ও গীতা সবাইকে জীবনকে এমন করে ছবি করেছেন আমাকেও খুঁজে খুঁজে এই [illegible] বের করতে হয়েছে। দেখে ভালো ছবিঘরে ভিড় বাড়ছে।
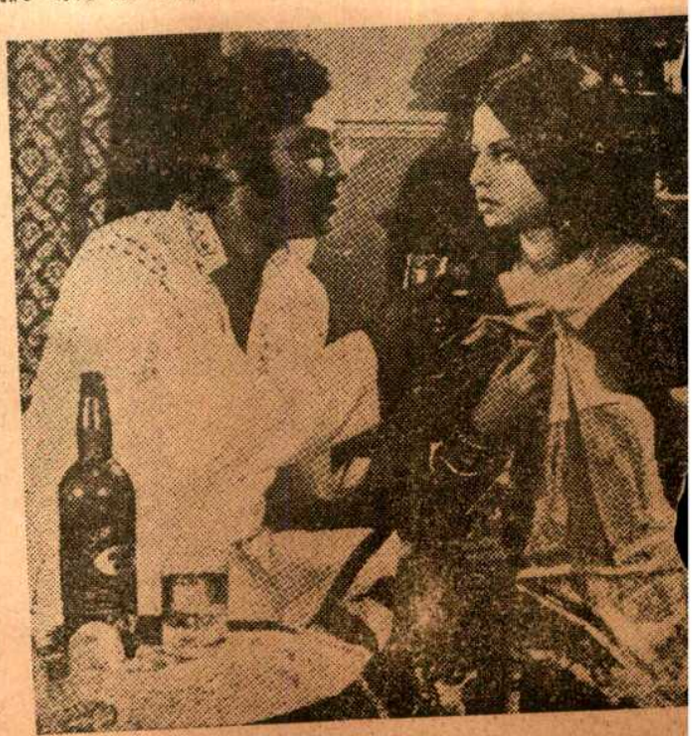
শ্যামল গঙ্গে[illegible]